সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 12th December, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ ৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

ছাত্রবিক্ষোভ

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভ একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলা যাইতে পারে। ছাত্রদের অশিষ্ট ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উপাচার্য পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন, তাঁহার কথাতে প্রকাশ যে, অনেক বিভাগীয় অধ্যক্ষও পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আর শিক্ষক সমিতি শিক্ষকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি (union) হইতে বাহির হইয়া আসেন। যতদূর মনে পড়ে, আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভের পরিণাম এমন গুরুতর আকার ধারণ করে নাই। কিন্তু এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন একটি ব্যাপার মনে করিলে ভুল হইবে। পাটনা, লখনৌ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী সর্বত্র ছাত্রবিক্ষোভ ন্যূনাধিক গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে। আর শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ই বা কেন, কলেজগুলিতেও ইহা ক্রমেই বিক্ষোভের উত্তাল মূর্তি ধারণ করিতেছে। দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি কালে কলিকাতার একাধিক কলেজ এক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে অবস্থা এতদূর শোচনীয় না হইলেও সেগুলিতেও অল্প সময়েই দূষিত আবহাওয়ার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না সর্বভারতে ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ, বিক্ষোভ কোথাও বেশি, কোথাও কম, স্বভাবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বেশি।

সেদিন প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে মন্তব্যস্বরূপে নানা কারণ দর্শাইয়াছেন, জগদ্ব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভের ইহা একটা অংশ; দেশব্যাপী শিক্ষাহীন পিতামাতার সন্তানগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ; অযোগ্য শিক্ষকের শিক্ষাভার গ্রহণ; বিদ্যায়তনে ছাত্র সংখ্যার আধিক্য। নেহরু যে-সব কারণ দর্শাইয়াছেন তাহার সঙ্গে আরো দশটা কারণ যোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেই কি দায়িত্বমুক্তি ঘটিল, তাহাতেই কি কর্তব্য সমাপ্ত হইল? আমাদের জিজ্ঞাসা, কারণগুলি যদি প্রধানমন্ত্রী জানেন, ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা তিনি করিতেছেন? এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কোথাও কাজ আরম্ভ হইয়াছে, জানিলে আমরা আশান্বিত হইতাম। সেরূপ আশার লক্ষণ তো দেখিতেছি না। আশার লক্ষণ দেখিতেছি না বলিলে কম বলা হয়, ছাত্রবিক্ষোভের যথার্থতম কারণটির কারণের অনুল্লেখে নৈরাশ্য আরও ঘনীভূত হইয়া ওঠে।

বর্তমান ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভের প্রধানতম কারণ ছাত্র সমাজের উপরে প্রত্যক্ষ রাজনীতির অবাঞ্ছিত প্রভাব। ইহাকে মৌলিক কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেহেতু এই দূষিত মূল হইতেই অন্যান্য গৌণ কারণের উদ্ভব। ইহা আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি, আরও একবার বলা যাইতে পারে।

আমাদের উক্তি যে কতদূর সত্য, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে অধিকদূর যাইতে হইবে না, একথার বিশদ প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন নাই। আসল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ দেওয়াল ও প্রাচীর রাজনৈতিক দল বিশেষের মুখপত্রে 'লাল' হইয়া উঠিয়াছে। অথচ যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভার (union) নির্বাচন দ্বন্দ্ব দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে, ইহা ছাত্রসভার নির্বাচন না বিধান সভার নির্বাচন। এই তো গেল ছাত্র নির্বাচনের রূপ। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার নির্বাচন—সে আর এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। সরস্বতীর দরবারে প্রবেশের জন্য শুধু লক্ষ্মী ও কুবের নয়, অসুর ও সিংহ ও শিবানুচরগণেরও ডাক পড়ে। এখানেই শেষ নয়। শেষ দশায় আছে রাজ্যসভায় শিক্ষক প্রতিনিধির নির্বাচন। তখন তো রাজ্যের শিক্ষাসমুদ্রে দেবাসুরের মন্থন শুরু হইয়া যায়। তারপরে এইসব নির্বাচনোত্তীর্ণ মাননীয়গণ যে-সব বক্তৃতা করেন তাহা একেবারে হাতে গরম শিঙাড়া, খুব মুখরোচক, কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষার উন্নতি ব্যবস্থার সহিত সিকি পয়সার যোগ নাই। সকলেরই দৃষ্টি কিভাবে হাততালি ও ভবিষ্যতে আরো বেশি ভোট পাওয়া যাইবে। এখন এই দুষ্ট-প্রভাব যদি ছাত্র সমাজের উপরে না পড়ে তবে বুঝিতে হইবে তাহারা রক্তমাংসে গড়া তরুণ জীব নয়, নিতান্তই প্রাচীন পাষাণ। এখন, এসব ব্যাপার কি সরকার জানেন না, খুব জানেন, তবে? তাঁহার 'Tactful'! ঐ একটিমাত্র শব্দের সুকুমার কিংখাবে তাঁহারা নিজেদের কর্তব্যের অভাব, দায়িত্বের ভিরু সুকৌশলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। আবার রাজ্য সরকারের দৃষ্টান্তে নিম্নবর্তী কর্তৃপক্ষগণও সংকট কালে হঠা 'Tactful' হইয়া ওঠেন, ফলে অপরাধ দণ্ডিত হয় না এবং লাঞ্ছিত প্রতিকা পায় না। তাঁহাদেরই বা দোষ দিই কি প্রকারে? তাঁহারা ঠেকিয়া ঠেকিয় শিখিয়াছেন যে, ন্যূনতম বাধার পথটা প্রশস্ততম। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে অপরাধীকে দণ্ড দিতে গেলে মুহূর্তে ব্যাপারটা রাজনৈতিক মূর্তি ধারণ কর আর তখনি অদৃশ্য প্রয়োজকের নির্দে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট, নিরম্বু প্রায়োপ বেশন, সাত্ত্বিক 'সত্যাগ্রহ' কমিটি পথরোধ, দ্বাররোধ প্রভৃতি আরম্ভ হইয়া যায়। ইহা তো পরীক্ষি সত্য, সহস্রবার ঘটিয়াছে, প্রয়োজ ক্ষেত্রে আবার ঘটিবে। এখন এ আবহাওয়া কি শিক্ষার অনুকূ একালের নাগরিক জনপদের কথা হয় ছাড়িয়াই দিলাম, সেকালে তপোবনেও এমনটি ঘটিলে গৌত কণ্ব প্রভৃতি নামকরা কুলপতিদের আ ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইত। শিক্ষ রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবটাই বর্ত দুরবস্থার মূল কারণ—অথচ প্রধ মন্ত্রীর ভাষণে ইহাই অনুল্লিখিত থাকি গিয়াছে। এখন এই অবস্থার য প্রতিকার সরকার চান তবে ম কারণটাকে দূর করুন, বৃথা ডালপা কাটিলে কোন উপকার হইবে

গত ২রা ডিসেম্বর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন অশীতি বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর অবস্থিতির একান্ন বৎসরও এই মাসে পূর্ণ হল।

আচার্য সেনের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা জানেন অগাধ পাণ্ডিত্য কত সরস হতে পারে। সত্যকার পাণ্ডিত্যের সংগে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও নির্লোভিতার সম্পর্ক কত নিবিড়। বস্তুত, এই অগ্নিতুল্য তেজস্বী অথচ জলভরা মেঘের মতো স্নিগ্ধ ঋষিকল্প পার্ষদদের না জানলে রবীন্দ্রনাথকে জানা সম্পূর্ণ হবে না। আমরা আচার্যের শতায়ু কামনা করি।

*

গত ৪ঠা ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নাকে দায়ী করে তাঁর অপসারণ দাবী করা হয়। বিরোধী পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, দণ্ডকারণ্যের স্বায়ত্তশাসনশীল পরিচালন ব্যবস্থা কুক্ষিগত করতে না পেরে শ্রী খান্না এই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ করবার জন্যে "ষড়যন্ত্র" করেছেন। সেখানে নাকি "রাজনীতির নোংরা খেলা" চলছে। জনৈক উত্তেজিত সদস্য এমন কথাও বলেছেন যে, "শ্রী খান্না বাঙালীর এবং বাঙালী উদ্বাস্তুর শত্রু। তাঁকে আর বরদাস্ত করা ঠিক হবে না।" দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় যে অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটছে তা রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি সকল অভিযোগের জবাব দেননি। শুধু বলেছেন, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে একথা এখনও বলা চলে না। শ্রীফ্লেচারের আকস্মিক পদত্যাগের ফলেই যে এই বিক্ষোভের সৃষ্টি, এবং বাঙালী উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে শ্রী খান্নার ঔদাসীন্য ও অবিচারের প্রসঙ্গেই শ্রীফ্লেচারের পদত্যাগ তা অনুমান করা যায়।

এদিকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তারাও যে খুব সুখে আছে এমন মনে করার কারণ নেই। এর জন্যে রাজ্য সরকার একশো কোটি টাকা পেয়েছেন। সে টাকার কি হল এ প্রশ্ন বিধানসভায় উঠেছে। নদীয়া জেলার তাহেরপুরে পনেরো হাজার উদ্বাস্তুর বাস। তাদের পিছনে আশী লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। অথচ তারা যে ভিক্ষুক সেই ভিক্ষুকই রয়েছে। একটি পরিবারও স্বাবলম্বী হতে পারেনি। জনৈক কংগ্রেসী সদস্যও স্বীকার করেছেন, বহু লোক মোটা মোটা টাকা অপব্যবহার করেছে। এরা কারা? এদের ধরার ও শাস্তি দেবার জন্যে কী ব্যবস্থা হচ্ছে?

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনই বলুন আর যে কোনো পরিকল্পনাই বলুন, অর্থব্যয়ের কোনো ত্রুটি নেই। টাকা আকাশে ছোড়া হচ্ছে। কিন্তু মাটি অবধি পৌঁছচ্ছে না। যাদের লম্বা হাত আছে তারা আকাশ থেকেই সে টাকা ছোঁ মেরে নিচ্ছে। যাদের জন্যে অর্থব্যয়, তারা যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই পড়ে থাকছে। তাদের দুঃখ দিন দিন বাড়ছে আর বাড়ছে দেশব্যাপী অশান্তি ও অসন্তোষ।

*

অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেদিন যথেষ্ট হট্টগোল হয়ে গেছে। ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর কয়েক মাস হয়ে গেল, এর মধ্যে দু'বার বিধানসভার অধিবেশন বসল অথচ নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচনের কোনো আয়োজনই দেখা গেল না, এটা নিশ্চয়ই বিধানসভার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সেনের 'পার্লামেণ্টারী প্র্যাকটিসে' আছে 'as often as' তার অর্থ 'অবিলম্বে' কিংবা 'সময়মতো' তার মীমাংসাও হয়নি। কিন্তু অর্থ তার যাই হোক, এই বিলম্বের প্রকৃত কারণ কি? বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য সন্দেহ করেন, অধ্যক্ষ পদের প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন এত বেশি জন যে, কাকে ক[রা] হবে তা নিয়ে দলের মধ্যে গণ্ডগোল বে[ধে] গেছে। অথচ যতদূর শুনতে পাই, উপযু[ক্ত] লোক না পাওয়ার জন্যেই এই বিলম্ব। হ[য়]তো দুটো গুজবের মধ্যেই কিছু স[ত্য] আছে। এমন হতে পারে যে, ড[াঃ] বিধানচন্দ্র রায় যাঁদের অধ্যক্ষ পদের জ[ন্য] যোগ্য বলে মনে করেন তাঁরা ও[ই] কণ্টকাসনে বসতে রাজি হচ্ছেন ন[া], অন্যদিকে যাঁরা ভিড় করেছেন তাঁদে[র] যোগ্যতা সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের মনে হয়[ত] সন্দেহ আছে।

কিন্তু এই প্রসংগে আর একটি প্র[শ্ন] অনেকের মনে উঠেছে: ডেপুটি স্পীক[ার] পদে শ্রীআশুতোষ মল্লিক দীর্ঘকাল থে[কে] আসীন আছেন। গত দুটি অধিবেশন[ে] অধ্যক্ষের আসনে বসে তিনি যথেষ্ট দক্ষ[তা] এবং স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন সভাকক্ষে, বিরোধী পক্ষের কয়েকজ[ন] বিশিষ্ট সদস্য সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁ[র] অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অ[থচ] দেখা যাচ্ছে ডাঃ রায় তাঁর সম্বন্ধে কিছুতে[ই] মন স্থির করতে পারছেন না। কেন?

*

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার চতু[র্থ] ও বৃহত্তম বাঁধ পাঞ্চেতের উদ্বোধন ক[রে] প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সম্প[্রতি] সম্পাদিত হয়। এই উৎসবের একটি মনো[জ্ঞ] অংশ হচ্ছে বাঁধটি জাতিকে উৎসর্গ ক[রা] শ্রমকর্মীবিনী একটি মেয়েকে এবং যারা এ[ই] বাঁধ নির্মাণের কাজে প্রাণ দিয়েছে তাদে[র] উদ্দেশে স্থাপিত প্রস্তরফলকের আবর[ণ] উন্মোচন করে বাবণ মাঝি।

এটি নিয়ে চারটি বাঁধ, তিনটি হাইড[্রো] স্টেশন ও ১৫০ মেগাওয়াটের এ[কটি] থার্মাল প্ল্যাণ্ট নির্মাণ সম্পূর্ণ হল[।] দুর্গাপুর বাঁধ এবং খালগুলিও সম্পূর্ণ প্রায়। দুর্গাপুরে থার্মাল পাওয়ার স্টেশ[ন] এবং বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে বর্ধিত অংশও সমাপ্তির পথে। এই চার[টি] বাঁধ সাড়ে ছয় লক্ষ কিউসেক জলের ব[েগ] নিরোধ এবং নয় লক্ষ একর জমি[তে] জলসেকে সমর্থ। বোকারো থার্মা[ল] প্ল্যাণ্ট ও তিলাইয়া হাইড্রো প্ল্যাণ্টের কা[জ] ১৯৫৩ ডিসেম্বর থেকে, মাইথন হাইড[্রো] প্ল্যাণ্টের কাজ ১৯৫৮ থেকে এবং পাঞ্চে[ৎ] হাইড্রো প্ল্যাণ্টের কাজ ১৯৫৯ থেকে শু[রু] হয়েছে। অন্য কাজগুলি শেষ হ[লে] ১৯৬০—৬১ থেকে শুধু যে যথেষ্ট অ[র্থ] বাঁধি তাই নয়, মূলধনের সুদ এবং পূ[র্ব] পূর্ব বৎসরের ক্ষয়ক্ষতিও শোধ হবে।

এ সমস্ত আশ্বাস বাক্য হিসাবে অত্য[ন্ত] মনোহর সন্দেহ নেই কিন্তু অতী[ত] অভিজ্ঞতায় এর উপর আস্থা স্থাপনে[র] সাহস এখনও জনসাধারণের হবে ন[া]

বিজ্ঞপ্তি

১৯৪০–৪১ রবীন্দ্রজীবনের অন্তিম পর্ব। গভীর বেদনাময় এই দিনগুলির কথা বাঙালীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। কবিগুরুর জীবন সমাপনের এই অধ্যায়টির অন্তরংগ চিত্র পাবার জন্য বাঙালী মাত্রেই উৎসুক। শ্রীযুক্তা রানী মহলানবীশ তাঁর "বাইশে শ্রাবণ" শীর্ষক অসামান্য স্মৃতিকথায় এই স্মরণীয় দিনগুলির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা রানী মহলানবীশ রবীন্দ্রনাথের অসীম স্নেহ ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বহুকাল। লেখিকার স্মৃতিকথাটি তাই একাধারে অন্তরংগ ও অমূল্য। রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র সহ "বাইশে শ্রাবণ" আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক 'দেশ'

চীনা উপদ্রবের শুরু থেকেই—না, ঠিক বলা হল না—বলা উচিত, চীনা উপদ্রবের সংবাদ যখন আর গোপন রাখা গেল না তখন থেকে যে-আশংকা আমরা অনুভব করেছি সেটা অচিরে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে একটা বড়রকমের যুদ্ধ লাগার আশংকা নয়। সীমান্তে চীনারা স্থানে স্থানে ভারতভূমির কিছুটা খাবলা মেরে নিয়ে বসে থাকলে বিলম্বিত তালে খানিকটা ঠেলাঠেলি চলবে, সেটা সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র নাও হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি আশংকার বিষয় বলে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, অতঃপর সারা হিমালয় অঞ্চল চীন কর্তৃক প্ররোচিত ভারত-বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। এর জন্য চীনাদের সামরিক শক্তি বিস্তারের আপাতত যতটা প্রয়োজন ততটা বোধহয় তারা সম্পন্ন করে ফেলেছে। চীনা সৈন্যসামন্ত যতদূর এগিয়ে এসে গেড়ে বসেছে সেটা রাজনৈতিক অস্ত্রক্ষেপণের সহায়তার পক্ষে যথেষ্ট। চীনারা যদি আপাতত আর দক্ষিণে এগোবার চেষ্টা নাও করে, এমন কি এখন তারা যেখানে যেখানে আছে সেখান থেকে যদি তারা দয়া করে কোথাও কোথাও একটু আধটু পিছিয়েও যায়, তাহলেও তারা সিকিম, ভুটান, লাদাক, নেফা এবং নেপালে রাজনৈতিক উপদ্রব সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট চাপ রাখতে পারবে।

সেই রাজনৈতিক উপদ্রব সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। তিব্বত দখল করার সময় থেকেই চীনা নীতি এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ভারত সরকার হয় সেটা বুঝতে পারেননি, অথবা বুঝেও তা নিবারণ করার উপায় খুঁজে পাননি, অথবা স্বেচ্ছায় আত্মপ্রতারিত হয়েছেন। ১৯৫৪ সালের চুক্তির পর থেকে গত চার পাঁচ বছর ধরে চীন সরকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সত্য কথা যদি দেশবাসীর কাছ থেকে গোপন না রাখা হ'ত তাহলেও বোধহয় অবস্থা বর্তমান রূপ নিত না, কারণ তাহলে এর অনেক আগেই দেশ সরকারী নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠত এবং সরকার সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য হতেন। তাতে অন্ততপক্ষে চীনা সরকার এত সহজে এতদূর এগুতে পারতেন না এবং বর্তমানে চীনা সরকারের পক্ষে হিমালয় অঞ্চল জুড়ে রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি করার যতটা সুবিধা হয়েছে এতটা হ'ত না। আজও ভারত সরকার অবস্থা সম্বন্ধে পুরা খবর নিজে রাখেন কিনা অথবা নিজে রাখলেও দেশবাসীকে তা জানতে দিচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এখানে যে-খবরের কথা বলছি সেটা কেবল সামরিক খবর নয়। সৈন্যসামন্তের খবর—নিরাপত্তার দিক থেকে তার প্রকাশে বাধা না থাকলে সরকার এখন বোধহয় গোপন করার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু এখন চীনারা যে-রাজনৈতিক আক্রমণ চালাচ্ছে তার সংবাদের গুরুত্ব বোধহয় আরো বেশি। কারণ সশস্ত্র আক্রমণ এখ হয়ত স্তিমিত হয়ে থাকবে, রাজনৈতি আক্রমণই সজোরে চলবে। এই ক' বছ চীনাদের সামরিক শক্তির অগ্রগতির সংবা গোপন রাখার ফলে যে-ক্ষতি হয়েছে এখ চীনাদের রাজনৈতিক আক্রমণের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ যদি গোপ করা হয় তবে তার চেয়ে কম ক্ষতি হবে ন বেশি ক্ষতি হবে। এখন যে-অবস্থা হয়ে তাতে অনেক জায়গায় সাক্ষাৎভাবে চী

সৈন্যের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিপদ ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে নেপালের সাম্প্রতিক সংবাদ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ইউনাইটেড-নেশনস্-এ তিব্বত সম্পর্কিত আলোচনায় নেপালের প্রতিনিধি যে-সব উক্তি করেন তাতে ভারতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। নেপালী প্রতিনিধির বক্তৃতায় চীনাদের কার্যের বিন্দুমাত্র সমালোচনা ছিল না, বরঞ্চ তাতে এই ভাব প্রকাশ করা হয় যে, চীনারা তিব্বত অধিকার করে তিব্বতীদের ক্ষতি করেনি, উপকারই করেছে! উপরন্তু নেপালী প্রতিনিধি এই কথা বোঝাতে চান যে, চীনের দিক থেকে নেপালের মনে বিন্দুমাত্র আশঙ্কাবোধ নেই। চীন এবং ভারত সম্পর্কে নেপাল সরকারের এই অত্যুগ্র নিরপেক্ষতার ভাব এবং চীনের মতিগতি সম্বন্ধে তাঁদের এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবের প্রকাশ যেমন অস্বাভাবিক তেমনি আশঙ্কাজনক বলে আমাদের মনে হয়েছিল। তারপর শ্রীজওহরলাল নেহরুর একটি কথা নিয়ে যে হৈ-হল্লা হচ্ছে তা আরো বিস্ময়কর ও বিপদ-সূচক। জওহরলালজী বলেন যে নেপালের উপর আক্রমণ হলে ভারত সরকার সেটা ভারতের উপর আক্রমণ বলে মনে করবেন। এই কথায় কোথায় নেপাল খুশী হবে তা না, সেখানে একদল লোক এই বলে চিৎকার শুরু করল যে, ভারত সরকার নেপালের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন! তারা ভারতবর্ষের প্রতি রাজ্য বিস্তারের লিপ্সা— "এক্সপ্যানশনিস্ট" মতলব— আরোপ করে হল্লা আরম্ভ করল। একদল ভারত-বিদ্বেষীর মুখে এই বুলি নেপালে নতুন শুনা যাচ্ছে না। দলীয় রাজনীতিতে এই বুলি অনেকদিন ধরে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এটা আর আভ্যন্তর দলাদলির ব্যাপার মাত্র নয়। এতে চীনারাও নিশ্চয়ই হাত লাগিয়েছে। কাঠমাণ্ডুতে ভারত-বিরোধী আন্দোলনকারীরা সকলেই বর্তমান নেপাল কংগ্রেস গভর্নমেন্টের বিরোধী, সেই গভর্নমেন্টকে তারা নষ্ট করতে চায়। ভারত সরকারের মুখাপেক্ষী বলে দুর্নাম রটনা করে নেপাল কংগ্রেসকে নেপালী জনসাধারণের নিকট হেয় করার চেষ্টা বরাবরই চলছে। এ বিষয়ে রাণাদরদী এবং কম্যুনিস্ট এক পথের পথিক। কিন্তু এই অপচেষ্টা যে সফল হয়নি তার প্রমাণ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে পাওয়া গেছে।

বর্তমানে এই অপচেষ্টার সামনে নেপাল কংগ্রেস সরকার যে-ভাব দেখাচ্ছেন সেটা যথেষ্ট সতেজ নয়—এইটেই দুঃখ এবং আশঙ্কার কারণ। শ্রীনেহরুর উক্তি সম্পর্কে নেপাল সরকারের মুখপাত্রগণ যা বলেছেন আক্ষরিক অর্থে তার মধ্যে দূষণীয় কিছু নেই, কিন্তু মোট ভাবটা আমাদের ভালো লাগছে না। তার কারণ এ নয় যে, নেপাল সরকারের মতিগতি সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে। নেপালে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার চাপে নেপাল সরকার ভীত হয়েও নির্ভয়তার ভাণ করতে বাধ্য হচ্ছেন, এইটাই আমাদের ভালো লাগছে না। নেপালের উপর আক্রমণ হলে ভারত সরকার তার সাহায্যে অগ্রসর হতে ভারত-নেপাল চুক্তি অনুসারেই বাধ্য। কোনো দেশ আক্রান্ত হয়েছে কিনা সেটা স্বভাবতই সেই দেশের সরকারের পক্ষে সবচেয়ে ভালো করে জানার কথা। এবং কোন্ অবস্থায় বাইরের সাহায্য দরকার তাও সেই দেশের গভর্নমেন্টই স্থির করবেন—এইটাই স্বাভাবিক কথা। নেপালের উপর কোনো আক্রমণ হলে তার প্রতিরোধের জন্য কী কর্তব্য, ভারতের সাহায্য কোন্ অবস্থায় গ্রহণীয় সেটা নেপাল সরকারের মতের অপেক্ষা না করে ভারত সরকার স্থির করবেন, এরূপ কথা শ্রীনেহরু কখনো ভাবতে পারেন না। শ্রীনেহরুর উক্তির এরূপ কদর্থ অর্থ করে যে হল্লা শুরু হয়েছে তাতেই সন্দেহ হয় যে, নেপালে এরকম একটা রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে যাতে নেপাল আক্রান্ত হলেও সেটা আক্রমণ বলে নেপাল সরকার ঘোষণা করতে না পারেন। নেপাল সরকার এরূপ অবস্থায় এসে ফেলার চেষ্টা কম্যুনিস্ট চীন সরকারের স্বার্থে এ আনুকূল্যে হচ্ছে সেটা বলাই বাহু এই ষড়যন্ত্রের মূল সবলে উৎপাটন আবশ্যক। কিন্তু নেপাল সরকার সে চে না করে যেন ষড়যন্ত্রকারীদের আক্রম সামনে "ডিফেন্সিভ" ভাব নিয়েছে শুধু তাই নয়, নেপাল সরকারের মুখপ গণের অনেক কথা ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দে সাধনের সহায়ক হচ্ছে। ভারত সরক নেপালের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষে প্রয়াসী—একদিকে এই রব তুলে অন্যদি যেখানে নেপালকে চীনের আওতায় আন জন্য নানা ক্রিয়াকলাপ চলছে সেদিক চোখের আড়াল করে রাখার চেষ্টা চলে নেপাল সরকার চীন সরকারের ক্রিয়াক সম্পর্কে নিশ্চিন্ততার ভাব প্রচার ক চীন এবং ভারত সম্পর্কে সমদৃষ্টির ভ অবলম্বন করে চীন সরকারের নেপা দালালদের কাজের সুবিধা করে দিচ্ছে

চীনের দিক থেকে ভয় নেই বলে নেপাল সরকারের নির্ভরতার ভাণও হয়ে থাকা হচ্ছে। এই নীতির নেপালের বিপদ বাড়ছে কিন্তু এই নীতি গ্রহণের জন্য নেপাল সরকারকে দোষী করা চলে না। ভারত সরকা দুর্বলতার দরুনও এখানে স্মরণ উচিত। চীনা সরকারের কার্য এবং ন সম্বন্ধে ভারত সরকার কীভাবে প্রতারিত হয়েছেন এবং দেশবাসীকে পর বছর ভ্রান্তিতে রেখেছেন সেকথা করলে নেপাল সরকারকে কি দোষ দেওয়া যায়? আর সবচেয়ে বড় কথা হয়। এবং সে বিষয়েও ভারত সর দার্ঢ্য এবং দৃঢ়তার দুর্বলতা দেখাতে প যাচ্ছে। কয়েক বছর ধরে চীনাদের যে এগুতে দেওয়া হয়েছে এবং আজও দের হাত থেকে জবরদখলী ভূমি মুক্ত যে-অক্ষমতা দেখা যাচ্ছে তাতে নেপা যদি ভারত সরকারের দিকে চেয়ে সাহস সঞ্চার না হয় তবে তাকে দোষ যায় না। নেপাল ও ভারতের স্বার্থ একই সূত্রে বাঁধা। নিরাপত্তার কা ভারত-চীন দ্বন্দ্বে নেপালের নিরপেক্ষ ভাণ যে কেবল অর্থহীন নয়, নেপ পক্ষে সেটা মারাত্মক—এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু নেপালকে সাহস হলে ভারতবর্ষ যে দুর্বল নয়, চী জবরদখল ভারতভূমির অংশ দখল করে থাকতে পারে না তার কিছু প্রমাণ আব সে প্রমাণ কেবল নেপাল সরকারের ম পুনরুদ্ধারের জন্য আবশ্যক নয়, হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের আ করার জন্য আবশ্যক। ৭।১২

রামভূমিকায় সৈনিক চরিত্র

কিরণকুমার রায়
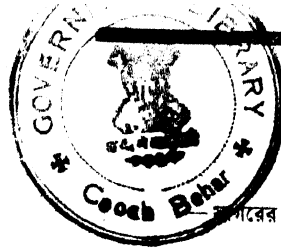
শান্তি কি পায়রা? সুখের পায়রা উড়িয়ে দিয়ে নীল আকাশের পটরেখায় শাদা পাখার ঝটপটানি দেখতে মন্দ লাগে না। কিন্তু তাতে স্বস্তি কই? যতক্ষণ তোমার ও আমার হাতে হাইড্রোজেন বোমা আছে এবং ভদ্রতার হাসি যতই বিস্তার করি না কেন তুমি জান আমি জানি, তোমার বা আমার মৃত্যু না হলে আমার বা তোমার নিশ্চিন্তি নেই, ততক্ষণ শান্তি তো দূরের কথা, স্বস্তি পর্যন্ত কই। সৈনিক আইজেনহাওয়ারের তাই পায়রায় বিশ্বাস নেই।

ষাট বছর আগে, ডেভিড জেকব আইজেনহাওয়ার ছেলে ডোয়াইটকে বলেছিলেন, দেখ বাপু, সুযোগ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সদ্ব্যবহার করতে পারলে বড় হতে পারবে। ইস্কুলে পড়তে চাও? বেশ তো, পড়। ভয় কি? কিন্তু তুমি যদি মনে করে থাক, কারোর সাহায্য ছাড়া অর্থাভাবে বা সমস্যা থেকে তুমি উদ্ধার পাবে না, তাহলে ভুল করবে। নিজেকেই নিজের চেষ্টায় বড় হতে হয়। ভয় কি!

ডেভিড জেকবের ছেলে ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার ভয় পান নি। কারোর সাহায্যেরও প্রত্যাশী হন নি। নিজেই পথ করে নিয়েছেন সার্থক জীবনের। রণনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন জীবিকারূপে, পরবর্তী জীবনে রাষ্ট্রনীতিতে এসেছেন অনায়াসে। স্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পদাধিকারী শাসক [illegible], সারা মানবজাতির অন্যতম নিয়ন্তা রূপেও চিহ্নিত হয়েছেন।

পালাম বিমানবন্দরে [illegible] আগে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা এই দীর্ঘ মানুষটি হাসিমুখে করমর্দন করলেন জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে। কূটনৈতিক সৌজন্য বিনিময়ের পর তাঁরা এলেন [illegible]-আলয়ে।

আইজেনহাওয়ারের চোখ নীল, একটু চাপা নাক, পাতলা ঠোঁট। মাথার সামনের দিকে চুল প্রায় নেই। মাঝখানেও বিরল হয়ে এসেছে। বয়স সত্তরের সীমা ছুঁয়েছে (জন্মঃ ১৪ অক্টোবর, ১৮৯০)। আঠারো কুড়ি মাস আগে [illegible] একবার সামলেছেন। অথচ নিজেকে তরুণ মনে করেন আইসেনহাওয়ার, বয়সে নয়, জীবনশক্তিতে। একটা কথা আছে [illegible] বয়স তাদের দেখে যেমন মনে হয় [illegible] পুরুষের

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

কুমারেশ ঘোষ

সাগর-নগর

সাগরের বুকে এক আজব নগরের কাহিনী—
॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ॥ তৃতীয় খণ্ড ॥	বিনয় ঘোষ	১২·০০
রাজা ও মালিনী	বারীন্দ্রনাথ দাশ	৩·০০
অপারেশন	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৬·০০
কাশ্মীর প্রিন্সেস	এ. এস. কারনিক	৪·০০
রবিতীর্থে	বিনায়ক সান্যাল	৪·০০
ভেলকি থেকে ভেষজ	আনন্দকিশোর মুন্সী	৬·০০

মনোজ বসু ॥ **বাঁশের কেল্লা**

বাঙলা দেশের বিপ্লব-ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। একদা বাঁশের কেল্লা তৈরি করে লড়াই হয়েছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সেই কেল্লার পতনের শতাব্দীকাল পরেও দাঁড়িয়ে আছে কসাড় বাঁশবন আর জেগে আছে সেই উত্তরসূরীর বুকে। নীল-বিদ্রোহ থেকে ৪২-এর অগ্নিক্ষরা বিপ্লবের কাহিনী রচনা করেছেন মনোজ বসু। ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে কবির হৃদয়ের সত্যদৃষ্টির মিলনে অতীব সুখপাঠ্য।
পঞ্চম মুদ্রণ : ২·২৫

মানুষ নামক জন্তু ৩·০০ ॥ রক্তের বদলে রক্ত ২·৫০

শ্রেষ্ঠগল্প (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫·০০
হঠাৎ আলোর ঝলকানি ২·৫০
স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২·৫০
— **বুদ্ধদেব বসু**

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি ভোর (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২·০০ ॥ মধুমতী (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২·৫০
মথুরা (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৪·০০ ॥ মৃগতৃষ্ণা ৩·০০

হরেকরকমবা

পাত্রী দেবতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬·০০ ॥ **পুতুলনাচের ইতিকথা** মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·৫০ ॥ **বিগত দিন** উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩·৫০ **এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্‌ ও সাহিত্যতত্ত্ব** সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৫·০০ অবিশ্বাস্য সৈয়দ মুজতবা আলী ৩·০০ ॥ **এবংপুরের টিকটিকি** ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ১·০০ ॥ **মোমের পুতুল** সন্তোষকুমার ঘোষ ৪·৫০ ব্যঙ্গকবিতা বনফুল ৬·৫০ ॥ **সিন্ধুপারের পাখি** প্রফুল্ল রায় ৯·০০ ॥ **লালুভুলু** বাণভট্ট ৩·০০ ॥ **চিত্র ও বিচিত্র** নীলকণ্ঠ ৩·৫০ ॥ **বিদেশ-বিভুঁই** দক্ষিণারঞ্জন বসু ৬·৫০ ॥ **বরযাত্রী** বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ গণনায়ক সতীনাথ ভাদুড়ী ২·৫০ ॥ **শাদা-কালো** কণ্ডওয়েল ৩·০০ গঙ্গা সমরেশ বসু ৫·৫০ ॥ **দূরের মিছিল** সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

বয়স যেমন অনুভব করে। আইজেনহাওয়ার সে হিসেবে নিজেকে তরুণ মনে করেন। তিনি বলেন, সৈনিকের তারুণ্য ঘোচে না।

সৈনিক থেকে সেনাপতি, সামরিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সাঁইত্রিশ বছরের জীবিকাক্ষেত্রে আইজেনহাওয়ার সমরনীতিকেই একক অবলম্বন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অগ্রগামী মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে অপরাজেয় হিটলারকে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন যে জার্মানীর চূড়ান্ত পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীর সেনাপতি হিসেবে অপরিমেয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি অর্জন করেছেন। আমেরিকা, ইংলাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মান লাভ করেছেন। যুদ্ধোত্তর যুরোপে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর নায়ক ও অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি যে-কোন সৈনিকের আকাশ-কুসুম স্বপ্ন নিজের জীবনে সফল করেছেন।

তাই, নিজেকে সৈনিক ছাড়া আর কিছু ভাবেন না আইজেনহাওয়ার। নিছক ধ্বংসের জন্য যুদ্ধ নয়, শান্তির জন্য যুদ্ধ। শান্তির সৈনিক। আইজেনহাওয়ার নিজেকে শান্তির সৈনিক মনে করেন। কিন্তু শাদা পায়রা উড়িয়ে নয়, দম্ভের বিরুদ্ধে দম্ভ। প্রয়োজন হলে হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমা ছুঁড়ে তিনি শান্তি আনতে চান।

কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমিকায় হ্যারী ট্রুম্যানের পর যুক্তরাষ্ট্র যখন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একজন যোগ্যমানুষ সন্ধান করছে, আইজেনহাওয়ার তখন প্যারিসে 'শেপ' হেডকোয়ার্টারে বসে 'নাটো' বাহিনী সংগঠনে ব্যস্ত। সারা আমেরিকার চোখ তখন আইজেনহাওয়ারের দিকে। আইজেনহাওয়ার, হ্যাঁ, বীর সেনাপতি আইজেনহাওয়ার না হলে যুক্তরাষ্ট্রের এই অকল্পিত শক্তি ও মর্যাদাকে সঠিক পথে কে চালাতে পারবে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান, দু দলেরই মহারথীরা এলেন প্যারিসে। চার-বছর আগেও তাঁরা আগেকার নির্বাচনের সময় এসেছিলেন আইজেনহাওয়ারের কাছে। কিন্তু আইজেনহাওয়ার সকলকেই নিরাশ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তিনি রাজী হন নি। এবার এবার হবেন কি? কে জানে?

যদি সম্মত হন, তাহলে কোন্ দলের টিকিট নেবেন। রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের পার্টি ডেমোক্র্যাটরা একটানা কুড়ি বছর ধরে সরকার চালিয়ে আসছে। আইজেনহাওয়ার কি এদলে আসবেন?

না। তিনি বললেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী আছি। কিন্তু, ডেমোক্র্যাট নয়, কুড়ি বছর ধরে শাসনভার হাতে নিয়ে তারা কিছুই করতে পারে নি। আমি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হব।

সামরিক বাহিনীর জীবিকা থেকে পদত্যাগ করলেন আইজেনহাওয়ার। রওয়ানা হলেন নিউইয়র্ক ওয়াশিংটনের পথে।

দেশে পৌঁছে চমকে গেলেন তিনি। এ কি কাণ্ড, এমন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা সে স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। যেখানে যান বিপুল সম্বর্ধনা, সানুরাগ অভিনন্দন ও প্রচণ্ড আনন্দ কলরব তাঁর পেছনে পেছনে

ডুইট আইজেনহাওয়ার

ঘুরতে থাকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণ, বাড়ির জানালায় জানালায় পতাকা, তাতে একটা মাত্র কথা লেখা, উই লাইক আইক!

ছেলেবয়স থেকে 'আইক' তাঁর ডাক নাম। এ নামে ডাকতেন বাবা জেকব ও মা আইডা এলিজাবেথ। আজ যেখানে যান, ছেলেবুড়ো যুবকযুবতী সবাই হাত তুলে হাসিমুখে চেঁচিয়ে বলে, আইক আইক, আমরা চাই আইককে।

যে শহরে তাঁর বাবা মা ছিলেন, যেখানকার ইস্কুলে তাঁর বিদ্যার্জন, সেই মফস্বল শহর এবিলিনে তিনি প্রথম নির্বাচনী বক্তৃতা দিতে গেলেন। সঙ্গে স্ত্রী মামি, পার্টির কয়েকজন নেতা ও সারা দেশের কয়েকশ রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার।

পড়ন্ত বিকেলের রোদে খোলা মাঠে সভার আয়োজন হয়েছে। সেই মাঠের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল বাবা ও মায়ের মুখ। একটুক্ষণের জন্য বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যখন আহ্বান এল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কি বলবেন তিনি। জানেন, সারা দেশ কাল সকালে আইজেনহাওয়ারের বক্তৃতা পড়ার জন্য উন্মুখ হবে। আজকের এই বক্তৃতা যদি শ্রোতৃবৃন্দের মন ছুঁতে না পারে, তাহ'লে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃথা। আগে থেকে তৈরি হয়ে আসেন নি, প্রস্তুত বক্তৃতা নেই পকেটে। তিনি মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অনেক দূরের দিকে তাঁর দৃষ্টি।

'অনিবার্যভাবে, আজকের এই উপলক্ষে, পুরনো স্মৃতি মনে ভেসে আসছে। বস্তুত ঠিক আট বছর আগে আজকের এই তারিখে, আমার জীবনের সবচেয়ে জটিল সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। আমি স্থির করেছিলাম, শত্রু অধিকৃত দেশের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ জাহাজের রণযাত্রা অন্তত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখতে হবে। সে সময় এ সিদ্ধান্তের ফলাফল কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার মত আমার জীবনে যদি আর কিছুও না থাকে, তবুও পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনাবলী...এই চব্বিশ ঘণ্টায় আবহাওয়ার তাণ্ডব ও রুদ্রলীলা ও সমুদ্রের প্রমত্ত ধ্বংস নাচন আমাদের অপরাজেয় নৌবহর ও নৌসৈনিকদের বিধ্বস্ত করে দিত। কিন্তু আপনারা জানেন, আমাদের নৌবাহিনী চব্বিশ ঘণ্টা পরে যাত্রা করে শত্রুকে পরাজিত করেছিল।'

আইক বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তাঁরা বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দন করছিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করছিলেন, কেউ কেউ এদিক ওদিক ঘুরেও বেড়াচ্ছিলেন। এখন তাঁরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। বৃহৎ ঘটনার অন্তরঙ্গ পরিচয়ে তাঁদের ঔৎসুক্য বাড়তে লাগল।

'কিন্তু আজ আমার স্মৃতি আরো পেছনে চলে যেতে চাইছে। আরো অনেক বছর আগে, আরো অনেক ঘটনার আগে। আমার সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে... আমি সে যুগের মাহাত্ম্যকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই; অন্তত আমি ও আমার ভাইয়েরা সারাজীবন যা বিশ্বাস করে এসেছি, আমার বাবা ও মায়ের চরিত্র মাহাত্ম্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরপ্রীতি সকল জ্ঞানের ভিত্তি। বাইবেল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় ছিল, তাঁদের সব কাজে ছিল বাইবেলের শিক্ষা। ধর্ম তাঁদের কাছে শুধুমাত্র সংস্কার না, শুধুমাত্র সাপ্তাহিক অভ্যাস না, ধর্ম ছিল তাঁদের জীবনবেদ।

'আমি বড় হয়ে দেখেছি, আমরা ছিলাম অত্যন্ত গরীব। কিন্তু আমার বাবা ও মা কিছুমাত্র দুঃখী ছিলেন না, আমরা যে গরীব একথা আমরা বুঝতেই পারতাম না। তাঁরা ছিলেন সাহসী, দুঃখকে জয় করতেন অবহেলায়, ব্যর্থতাকে গ্রাহ্য করতেন না।

'সেকাল ছিল সহজ সরল। আমরা তখন ইরাণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক অনুভব করতাম না, মালয় বা বেলজিয়ান কঙ্গো বা বলিভিয়াতে কি ঘটল না ঘটল, তা নিয়ে মাথা

ঘামাতে যেতাম না। আমরা নিজেদের নিয়েই ছিলাম, নিজেদের কথাই ভাবতাম। কিন্তু এখন আমরা জানি, পৃথিবীর সব দেশই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আমরা বুঝেছি, আমাদের দেশের কোন অংশ বা যে কোন জাতি যথার্থ সমৃদ্ধ হতে পারে না, দীর্ঘস্থায়ী শান্তিতে থাকতে পারে না, যদি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে ও শান্তিতে থাকতে না পারে। আমরা দেখেছি, বিশ্ব পরস্পরযুক্ত একটি জটিল সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়।'

তারপর আইজেনহাওয়ার তুলে ধরলেন তাঁর সবচেয়ে জোরালো বক্তব্যঃ 'তথাপি, আমাদের সমস্যাবলীর জটিলতা ও গুরুত্ব সত্ত্বেও, আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখছি, আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের মনে গতযুগের সরল জীবনধর্মকে শক্তিশালী করতে পারি—আন্তরিকতা, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও বাইবেলে দ্বিধাহীন বিশ্বাস—তাহলে এই সমস্যাবলী কি সহজ হয়ে আসবে না?'

এ কি শুধু নির্বাচনী বক্তৃতা? সারা জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলো নয়? যে আলো মানুষের জীবনকে সার্থকতার দিগন্তে পথ দেখায়? অথচ, অভিজ্ঞতার প্রশ্নই তুলেছিল আইক-বিরোধীরা। সামরিক-নায়কের কী অভিজ্ঞতা থাকতে পারে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে।

আইজেনহাওয়ার একটা গল্প বলেছিলেন ইপ্রুভিলেজের সভায়। একজন বৃদ্ধের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ পদোন্নতির প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু উপরওয়ালা জবাব দেন, ওই সাধারণ সৈনিকটিকে দেখতে পাচ্ছেন, সে পঁচিশ বছর ধরে এই বাহিনীতে আছে, অথচ এখনও সাধারণ সৈনিক। আইক এই গল্পটি তুলে ধরেছিলেন শুধু অভিজ্ঞতা ও কেবলমাত্র কাজ করে যাওয়ার পার্থক্য বোঝাতে।

অনেক রাজনৈতিক নেতা সারাজীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন না, আইজেনহাওয়ার সেনাপতি রূপে তা অর্জন করেছিলেন। প্রায় বাষট্টি বছর বয়সে তিনি যখন সামরিক বাহিনীর হানিকম্ব খুলে রেখে সিভিলিয়ান পোশাক পরেন, তখন য়ুরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান বহু নেতা, ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র, গভীর দেশপ্রেম, আদর্শবাদ ও জটিল সমস্যার অন্তর্দীপ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। মার্কিন সৈন্যবাহিনী রাজনীতি ছাড়া পরিচালিত হয় না ইতিহাসের বৃহত্তম মিত্র সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাজনৈতিক বিদগ্ধতা ছাড়া পরিচালনা (ও জালাভ) করতে পারেন না। কাগজে কলমে রচিত আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়, যদি না বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের রাজনৈতিক নীতি আদর্শ সঠিক উপলব্ধি করা যায়। ব্রিটেনের উইনস্টন

জেনারেল লর্ড ইজমে, ফ্রান্সের রবার্ত সুমাঁ, মার্শাল জুই, বেলজিয়ামের পল হেনরী স্পার্ক, পর্তুগালের সালাজার, ইতালীর গ্যাসপেরী ও জার্মানীর কোনরাড এডেনুয়ার প্রভৃতি অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে জটিল সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। অসলো থেকে লিসবন, লণ্ডন থেকে আঙ্কারা, আইজেনহাওয়ার সব রাজধানীর রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে কম্যুনিজম প্রতিরোধ বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল নেতারূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন।

তবুও, সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে যখন আইজেনহাওয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাইলেন, তাঁর রাজনীতির নতুন পাঠ নিতে হল। এ শুধু শোভাযাত্রার শিশুচুম্বন, হাসিমুখে টুপি নাড়া আর বক্তৃতা দেওয়া নয়। তাঁকে জানতে হল আমেরিকার ইস্পাত এবং সি আই ও, জানতে হল নিগ্রো গৃহিণী ও গমচাষীদের, জানতে হল য়ুনিয়ন, কর্পোরেশন, এলকস ক্লাব ও রাজনৈতিক দলে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের, জানতে হল অভাব, আশা, ভয়।

আইজেনহাওয়ার খুব সহজে সংবাদ ও অন্যদের অভিমত সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে সারমর্মটুকু উপলব্ধি করতে পারেন। এই গুণ তাঁকে অপরিমেয় সাফল্যের দিকে উন্নীত করে দিয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও তাঁর এই স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা বিশেষ কাজে লেগেছে।

আমেরিকান জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি তাঁর শেষ পাঠ গ্রহণ করেছেন। দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে তিনি তাদের দেখেছেন কৃষি জমিতে, ক্লাবে, সভায়, ফ্যাক্টরী, অফিস ও সমরক্ষেত্রে। যখন তারা উল্লাসভরে চীৎকার করে ওঠে, তিনি চুপ করে শুনেছেন। যখন তারা নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তিনি তীক্ষ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছেন।. তিনি যখন তাঁর তিনটি মূল প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—কম্যুনিজম, দুর্নীতি ও সংঘবদ্ধতা—জনসাধারণের প্রতিধ্বনি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

হ্যাঁ। তিনটি মূল প্রশ্নে তিনি বিশ্বাসী। সাম্যবাদ সারা পৃথিবীতে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে (যদিও তাঁর সাম্প্রতিক নীতিতে বলা হয়েছে, ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সহ-অবস্থান সম্ভব এবং ইতালীর কম্যুনিস্ট পার্টি রোমে তাঁকে 'শান্তির ... সম্ভাবনা জানিয়েছে), আমেরিকার শাসনতন্ত্র ও সমাজক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করতে হবে এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি মানুষ যদি একবিশ্বাসে সংঘবদ্ধ হতে পারে, তাহলে তাঁরা অপরাজেয়। এই তিন নীতিতে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়।

সাম্প্রতিক আমেরিকা ফ্রাংকলিন রুজভেল্টের পর ডুইট আইজেনহাওয়ারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের সন্ধান পেয়েছে। শুধু পুঁজিপতিরা নয়, সাধারণ মানুষ, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ, আইজেনহাওয়ার যোদ্ধা, সংগঠক ও নেতা। একালের জটিল আবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব তিনি দৃঢ় করেছেন, গৌরবান্বিত করেছেন।

অথচ নিজেকে সাধারণ মানুষ ছাড়া তিনি ভাবেন না। অর্ধ-শতাব্দী আগে ক্যানসাস শহরের যে বালকটি উদার উন্মুক্ত আকাশের তলায় মানুষ হয়েছিল, ছাব্বিশ বছর বয়সে যে সেকেণ্ড-লেফটেন্যাণ্ট, বিয়ে করেছিল উচ্ছল প্রাণচঞ্চল একটি সুন্দরী সাধারণ মেয়েকে, যাদের একমাত্র সন্তান শুধুমাত্র পয়সা বাঁচাবার জন্য সিগরেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আইজেনহাওয়ার, মিত্রবাহিনীর ভূতপূর্ব সর্বাধিনায়ক, যুক্তরাষ্ট্রের অভূতপূর্ব জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি, ডুইট আইজেনহাওয়ার, নিজেকে সাধারণ একটি নাগরিকের বেশি ভাবেন না। না, তাঁর অহংকার নেই, অহমিকা নেই। শুধু কানসাস শহরে নয়, যুক্তরাষ্ট্রে শত শত মিউজিয়ম, স্টেডিয়াম, ক্লাব তাঁর নামে নামকরণ হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, জেফারসন, লিংকন ও রুজভেল্টের সমপর্যায়ে হয়ত স্মরণীয় নামতালিকায় স্থানলাভ করবেন। তবু, ডুইট আইজেনহাওয়ার সাধারণ সামান্য নাগরিকমাত্র।

একমাত্র ছেলে জন আইজেনহাওয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছে। সামান্য সৈনিক। তিনি ছেলেকে উপদেশ দিলেন, স্বাবলম্বী হও। নিজের উদ্যোগে সাফল্য অর্জন করো।

বারবারাকে বিয়ে করে সুখী হয়েছে জন। এখন একটি ছেলে ও তিনটে মেয়ের পিতা। অথচ আয় বেশি নয়। ডুইট আইজেনহাওয়ার ছেলেকে উপদেশ দিলেন, তোমার খরচ কমাও। বাজে বিলাসিতা বন্ধ কর। সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দাও না কেন? ধরো দিনে যদি দু' প্যাকেট সিগারেট খাও, তাহলে দৈনিক ৭৫ সেণ্ট খরচ হবে। মাসে প্রায় পঁচিশ ডলার। অথচ একটু কষ্ট করলেই এ টাকাটা তুমি বাঁচাতে পারো।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে জন। বারবারাও লক্ষ্মী মেয়ে। স্বামীর মাসিক সাড়ে ছ' শ' ডলারের মধ্যেই চারটে বাচ্চা নিয়ে সংসারের খরচ কুলিয়ে উঠছে।

স্ত্রী মামি। অদ্ভুত মহিলা। স্বচ্ছল পরিবারের প্রিয়দর্শনী মেয়ে। বিয়ের আগে পার্টি আর ক্লাবে যেতে ভালবাসতেন, শৈবতনাচে ছিল অদ্ভুত আসক্তি। অসংখ্য ছেলের ভিড় তাই তাঁদের বাড়িতে অনবরত লেগেই থাকত। স্যান এণ্টোনিওতে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছিল সেকেণ্ড-লেফটেন্যাণ্ট আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে। এ ছেলেটি একেবারে অন্যরকম। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, তারপর নয় মাস পর বিয়ে। 'হনিমুন' করতে গিয়েছিলেন আইজেনহাওয়ারের বাপ-মায়ের কাছে এবিলিনের ছোট বাড়িতে। তারপর ফোর্ট স্যাম হাস্টনের নিরালা দু-ঘরের ফ্ল্যাটে থেকে ক্রমশ দেশান্তরের কোয়ার্টার হয়ে অবশেষে হোয়াইট হাউস! ডেনভার শহরের অখ্যাত ছেলেদের সঙ্গে যে কিশোরী একদা বলড্যান্স নাচত, আজ বৃহত্তম স্টেট-ডিনারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠপুরুষদের সঙ্গে তিনি সেই নাচ নাচেন। পারিপার্শ্বের কত পরিবর্তন। আর, এই পরিবর্তনে তিনি কেমন নিখুঁত খাপ খেয়ে যাওয়া সঙ্গিনী।

পায়ে আঘাত পেয়ে মামি আইজেনহাওয়ার গিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে ওয়াল্টার রীড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। যখন হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসবেন, নীল পোশাক পরেছেন তিনি, মাথায় শাদা টুপি, আইজেনহাওয়ারের কনুইয়ে নিজের কনুই জড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছেন। ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টারদের ভিড়। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনার সেই চোখ-জুড়ান হাসি কই?'

'এখনও হারাই নি, এই যে—'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের দিকে তাকিয়ে চমৎকারভাবে হাসলেন তিনি, আর চোখ টিপলেন।

প্রাণচাঞ্চল্য হারান নি মামি, যৌবন তেজ ফুরোয় নি ডুইটের। আইজেনহাওয়ার দম্পতি আধুনিক আমেরিকার সবথেকে জনপ্রিয় নরনারী খবরের কাগজের সবচেয়ে বড় সংবাদ।

কিন্তু যতই সাধারণ ভাবুন নিজেকে, আইজেনহাওয়ার অসাধারণ। ঠাণ্ডা লড়াইয়ে সারা পৃথিবী যখন দুই শিবিরে বিভক্ত, পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেখানে বিষাক্ত নাগিনীর মত ফুঁসছে, যে কোন মুহূর্তে নিদারুণ ধ্বংসযজ্ঞের বোধন যেখানে সম্ভব, এক শিবিরের নেতা হিসেবে আইজেনহাওয়ার সেখানে অসামান্য। তিনি নিজেকে শান্তির সৈনিক রূপে বিবেচনা করেন। এ শান্তি কুরুক্ষেত্রের শান্তি নয়, সংঘাতহীন সহ-অবস্থানের শান্তি। কিন্তু তিনি নেভিল চেম্বারলেনের ভূমিকা গ্রহণ করতেও নারাজ। বিক্রমের স্পর্ধাকে তিনি পরাক্রম দিয়ে পরাস্ত করতে চান। আইজেনহাওয়ার নাটকের নামভূমিকায় সৈনিক চরিত্র, একথা তিনি ভুলে যেতে বা ভুলে যেতে দিতে প্রস্তুত নন।

১৪

এতক্ষণ গর্জন গেছে, এখন বর্ষণ শুরু হল। রাগের পরে দুঃখের সুর ধরলেন বনবিহারী।

'ভেবেছিলাম তোমাকে দিয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল হবে—'

কাছেই একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে কাকলি। ভাগ্যিস চেয়ারে হাতল ছিল তাই তার উপরে রাখতে পেরেছে কনুই, আর সেই সূত্রে করতলে রাখতে পেরেছে চিবুক। সমস্ত ভঙ্গিতে আনতে পেরেছে বাধ্যতা ও নম্রতার লাবণ্য।

'বড় ছেলে দেবনাথ, তোমার দাদা, অমানুষ হয়ে গেল।' কতকটা বা আত্মগত হলেন বনবিহারী : 'ছেলেবেলায় কী যে এক অসুখ করল, ব্রেন নষ্ট হয়ে গেল। কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না। সামান্য ম্যাট্রিকটাই পারলাম না পাশ করাতে। মাস্টারে-ডাক্তারে কম ঢাললাম না, সব ভস্মে ঘি হল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থামলেন বনবিহারী। যেমনি বসে ছিল তেমনি বিরস-বিরসে বসে রইল কাকলি।

'বোকা হয়েছিস তো বোকা হয়ে থাক। মাথাখারাপ তো থাক ঘরের কোণে বন্দী হয়ে। কিন্তু তুই বদ হতে যাস কোন সুবাদে?' আবার হতাশার সুর ধরলেন বনবিহারী : 'মিশল গিয়ে কিনা গুণ্ডার দলে। কত কিছু ধরবে-করবে বলে কত-কত টাকা নিয়েছে আগে-আগে—পরে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমার নাম করে নিয়েছে ধার, আমার দুর্নাম করে ভিক্ষে—শেষে, শেষকালে শুরু করল বাক্স ভাঙতে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হল, দেবনাথ যদিও আমার ছেলে। ওকে যেন কেউ ধার না দেয়, ভিক্ষে না দেয়, এমন কি বাড়িতে ঢুকতে না দেয়—' আবার থামলেন, সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন বনবিহারী। বললেন, 'যখন বিজ্ঞাপনটা দেখলাম কাগজে, মনে হল কালো কালির কাগজে ঐ বিজ্ঞাপনটাই শুধু লাল কালিতে ছাপা হয়েছে। লজ্জার লাল কালি।'

'দাদার সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।' মুখ তুলল কাকলি

'আগাগোড়াই ভুল। শুধু দেবনাথের সম্পর্কে নয়, তোমার সম্পর্কেও।'

'দাদার কথা উঠেছে, দাদার কথাই হোক। কী হয়েছে ওর বেলায়?' বনবিহারীর মুখের দিকে ভয়-ভয় তাকাল কাকলি : 'তুমি বারে-বারে তাকে সদর দরজা দিয়ে বার করে দিয়েছ আর মা তাকে বারে-বারে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছে। তুমি ওকে জেলে পাঠাতে চেয়েছ আর মা ওর হয়ে দিয়ে দিয়েছে জরিমানা।'

'তেমনিধারা তোমাকে যখন এ বাড়ির বার করে দেব তখন', চোখ বুজলেন বনবিহারী : 'কে জানে, তোমার মা-ই হয়তো আবার তোমাকে টেনে নেবেন কোলের মধ্যে।'

'কক্ষনো না।' পাশের বারান্দায় কাকে চিঠি লিখছিল গায়ত্রী, চোখ আর হাত কাগজে কিন্তু মন আর কান ঘরের মধ্যে, সহসা ঝঙ্কার করে উঠল : 'কক্ষনো না যদি সুকান্তকে ও বিয়ে করে। তখন একবার যে ও যাবে চিরদিনের মত যাবে।'

কথাটা গায়ে মাখল না কাকলি। আগের খেই ধরে বললে, 'দাদার সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্থ চিন্তা ছিল না। একটা সৎ সস্নেহ পরিবেশে ওকে কিছু একটা আমরা গড়ে তোলবার সুযোগ দিইনি। কেবল একদিকে তাড়ন আর পীড়ন, আরেকদিকে প্রশ্রয় আর ক্ষমা। অমানুষের অ-টা আর ঘোচাতে পারল না। আমরাই দিলাম না ঘোচাতে।'

'তাই তো তোমার উপরে নির্ভর। দেবনাথের পরেই তুমি, তুমিই বাড়ির দ্বিতীয়। তোমাকে তাই উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি বড় হবে, সংসারকে শ্রীমন্ত করবে। ফেরাবে দেবনাথকে। তোমার ছোট ভাইবোনগুলির কাছে আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাকবে। আমি জাঁক করে বেড়াব। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকব না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাকাব চারদিকে।'

কষ্টে হাসল কাকলি। চোখ নামিয়ে বললে, 'আমি মেয়ে। আমার কী সাধ্য!'

'তোমার সাধ্য নয়? মেয়ে—মেয়েরা আজকাল কী না করছে। সমুদ্র পেরোচ্ছে,

পাহাড় ডিঙোচ্ছে, মরুভূমি পার হয়ে যাচ্ছে পায়ে হেঁটে—বর্নবিহারী পিঠ খাড়া করলেন।

'সবাই-ই কি সব কিছু করতে পারে? হতে পারে? সকলে কি হতে পারে ঝাঁসির রানী? মীরাবাই?'

'তোমার জীবনে কোনো উচ্চাশা ছিল না?'

'উচ্চাশা!' কণ্ঠে আবার হাসল কাকলি: 'তোমাদেরই বা কী ছিল আমাকে দিয়ে! মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য এম-এ পাশ মেয়ে—কী তার ক্ষমতা! বড়জোর একটা টিচারি নয়তো মুরুব্বির জোর থাকলে কোনো আফিসে ক্লার্ক, বা শুদ্ধ করে বলতে গেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট। একটা সাধারণ মেয়ের পক্ষে এর বেশি আর কি। এর বেশি ভাবতে গেলেই উপন্যাস, আকাশকুসুম।' একটু সাহস নেবার জন্যে বাইরের গাছ, আকাশ, বাড়িঘর, লোকজনের দিকে তাকাল কাকলি। বললে, 'তা ছাড়া মেয়েরা রয়েছে পরের ঘরে চলে যাবার জন্যে, তাদের ভায়ের ঘরকে শ্রীমন্ত করবার জন্যে নয়।'

'তাই, সেই পরের ঘরেই তোকে আমি পাঠাতুম নিজের হাতে।' বর্নবিহারী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'তুই সাধারণ হয়েই থাকতিস। সব দেশ ঘুরে তোর জন্যে আমি অসাধারণ বর নিয়ে আসতুম। রাজারাজেশ্বর বর। সবাই চোখ উঁচু করে তাকাত। আমার ছাদ ভরে প্যাণ্ডেল উঠত। আলোয় আলোময় হয়ে যেত বাড়ি-ঘর নবত বসত, থেকে-থেকে সানাই বাজত দিন-রাত। পাড়ার লোকেরা জিগগেস করত, কী হচ্ছে এ বাড়িতে? রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এম-এ পাশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বর কে? সে কোন এক কৃতকৃত্য—দেখবি চল। চারদিকে পড়ে যাবে ঠেলাঠেলি। দেখতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি স্বাস্থ্যে-শীলে বিত্তে-বিদ্যায় অগ্রগণ্য। যে সব আত্মীয় দেবনাথের বেলায় ঘৃণায় নাক কুঁচকে ছিল এবার তারা

ছিংসের নাক ফুলোবে। তুই তোর বাপকে তা উপভোগ করতে দিবিনে? এবারও তারা নাক সরু করে চলে যাবে? ছেলে মানুষ হয়েছে, মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করেছি এইটুকু ছাড়া আর আমাদের কী মান আছে? আমার এই মধ্যবিত্ত মানটুকু তুই রাখবিনে? আমার মুখ উজ্জ্বল করবিনে?'

কতক্ষণ কথা কইতে পারল না কাকলি। তার দু চোখ ছলছল করে উঠল। শান্ত সিক্ত স্বরে বললে, 'আমার মুখ উজ্জ্বল হলেই কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে না বাবা?' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, বারান্দা এড়িয়ে চলল আরেক দিকে।

'শোন—' হাঁকার ছাড়লেন বনবিহারী: 'শুনে যা—'

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাকলি।

'শোন। তবু যদি তুই ঐ অপদার্থটাকে বিয়ে করিস তবে জানবি আমাদের সঙ্গে তোর আর সম্পর্ক থাকবে না, আর কোনদিন পথ ভুলেও আসবি না এ বাড়িতে। কি, মনে থাকবে?'

কাকলিকে দেখা গেল না। শোনা গেল না হাঁ—না কোনো শব্দ।

'ঠাকুরপোকে ডাকো।' ঘরের মধ্যে চলে এল গায়ত্রী।

কাঁহাঃ বেস আর কোথায়, ইজিচেয়ারের হাতলে হাতের চড় মারলেন বনবিহারী। সংক্ষেপে সেরা বলল আর ডাকতে পারেন না এ বন্ত্রণা চোখে মুখে ফুটে উঠল, সঙ্গে চাকরের নামটা মনে না আনতে পারার যন্ত্রণা। বললেন, 'কি, কী না জানি নাম তোমার চাকরের।'

'ওকে নয়, বিজনকে পাঠাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি চলে এল নরনাথ। ব্যাপার কী?

'আমার একতলাটার জন্যে ভাড়াটে দেখ।' মুখের উপর প্রায় ছুঁড়ে মারলেন বনবিহারী। 'সে কি?' নরনাথ থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, একতলাটা ভাড়া দেব। আরো একজন সরছে। এত জায়গা নিয়ে আমাদের কী হবে? উপরে যা আছে তাতেই কুলিয়ে যাব আমরা।'

'নিচেটা ভাড়া দেবেন বলে তো এ বাড়ি তৈরি হয়নি—' কী একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়ল নরনাথ, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'তখন হয়নি এখন হবে। একজন কণ্ট্রাক্টার ডাকো। তার আগেই ভাড়াটে দরকার। ভাড়াটে এসে গেলেই এ বাড়িতে হাঙ্গাম হুজ্জুত হতে পারবে না। তারা নির্ঘাৎ ঠেকাবে। বলবে, নতুন ঢুকেছি, ছাড়তে পারব না ঘর।'

'কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।' নরনাথ মুখ-চোখ হতাশ করল: 'কে সরছে? কেনই বা হাঙ্গাম হুজ্জুতের ভয়?'

'কাকলির কথা শুনেছ?'

'শুনেছি। বিয়ে করতে চায়। সে তো খুব ভালো কথা।' সুস্থ হয়ে এতক্ষণে বসল নরনাথ।

'ভালো কথা! কাকে চায় তা শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'ও কি একটা পাত্র?'

হাসল নরনাথ। বললে, 'এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইররেলেভেণ্ট, অবান্তর। হয়তো বা আমাদের এক্তিয়ার, জুরিসডিকশানই নেই।'

'নেই? না, আছে।' ইজিচেয়ারের হাতলটা মুঠি করে ধরলেন বনবিহারী: গায়ের জোরের কাছে আবার আইন কী! তুমি যে করে পারো এ বিয়ে ঠেকাও। কিছুতেই হতে দিও না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল নরনাথ। পরে বললে, 'কেন, হতে দেব না কেন? হতে দিলে দোষ কী কোথায় বাধছে? কোথাও না। না ধর্মে না সমাজে না কোনো আচারে-বিচারে।'

'সেণ্টিমেণ্টে?' মুঠো করা ডান হাতটা কাঁপতে লাগল বনবিহারীর।

'আইনের কাছে সেণ্টিমেণ্টের দাম কী!' পায়ের উপর পা তুলে ভঙ্গিটা শিথিল করল নরনাথ: 'আপনি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন সাবালক হবার সুযোগ দিয়েছেন, তার আইন তাকে তার গণ্ডির মধ্যে যাকে খুশি বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। যা বেআইনী নয় তাকে আপনি বাধা দেবেন কী করে? আর বাধা দেওয়ার মধ্যে নীতিই বা কোথায়? ওরা ইচ্ছে করলে আইনমত রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করে এসে বলতে পারত, অনুপায়, এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করে এসেছি, তখন কী করতে পারতেন? আর এখনও যদি বাধাই দিই ওদের রেজেস্ট্রি আটকাতে পারি এমন আমাদের কেস নেই। সুতরাং যার বোঝা সে বুঝবে। যার নির্বাচন সে জানবে কেমন মন্ত্রী এনে বসিয়েছে গদিতে। আমাদের কথা এখানে টিকোবে না। পাঁঠার কথায় ঝোল রান্না হয় না কোনোদিন।'

'কিন্তু পাত্র—লোকে যখন জিগগেস করবে, পাত্র কে, বলতে পারবে, একটা ড্যাম ফুল, সমবয়সী এক কলেজের ছাত্র, বেকার—ছি, ছি, ছি।'

'বা, পাত্র এমন খাস্ত কী! নিদেন একটা লেকচারার তো হবেই—'

'তা হওয়ার পর করলেই হত। এত হন্তদন্ত হবার কী হয়েছিল?'

এখানে নরনাথের একটা ব্রেন-ওয়েভ—মস্তিষ্ক-তরঙ্গ—এল। সব সংক্ষেপ করে দেওয়া দরকার। অনিবার্য করে দেওয়া দরকার। এত কলহ-কোলাহলের দরকার কী! বিয়েই তো করতে চাইছে—আর কিছু তো নয়। সবচেয়ে যা সভ্য, সবচেয়ে যা শাস্ত্রীয়। তার ভিতরেই তো সব রাখে, সব ঢাকে, সব সংশোধন করে, তবে আর কী ভাবনা!

'হ্যাঁ, এই তাড়াতাড়িতেই জানি কী

রকম!' গাল চুলকোলো নরনাথ ঃ 'মনে হচ্ছে কোথায় ডিফিকাল্টি আছে—'

'ডিফিকাল্টি আছে!' ইঙ্গিতটা যেন অনায়াসেই বুঝতে পারলেন বনবিহারী। খাড়া পিঠ এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারে। সাদা শূন্য দৃষ্টি মেলে বললেন, 'তাই!'

'হ্যাঁ, আর গত্যন্তর নেই।' তোলা প

মেঝের উপর নামিয়ে আনল নরনাথ ঃ 'তা, পাঁঠা যখন রান্নাই হচ্ছে তখন তাকে ঘাড়ের দিকেই কাটুক বা লেজের দিকেই কাটুক কিছু এসে যায় না।' কোঁচায় ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ ঃ 'এখন শুভস্য—'

'শুভস্য?'

'যদি বলতে চান, অশুভ, তবে অশুভস্য।'

নরনাথ হাসল ঃ 'কিন্তু শাস্ত্রের সর্বাবস্থায়। তাই অশুভস্য শীঘ্রং।'

'তুমি যা করে পারো, নমো-নমো করে, উদ্ধার করে দাও।' এক পাশে দেয়ালের দিকে ঘাড় কাত করলেন বনবিহারী ঃ 'বিয়ে যদি হয়, আর এখন না হয়ে উপায় কি, তোমার ওখানেই বন্দোবস্ত করো।

টিমটিম করে, নেহাত যেটুকু না হলে নয়, ততটুকুও দায় সারো। যা লাগে আমি দিয়ে দেব।'

'তার জন্যে ভাববেন না। কিন্তু আপনার প্রথম মেয়ে, আপনার প্রথম কাজ—আপনার নিজের বাড়িতে হলেই তো ভালো ছিল। লোকে ভিতরের কথা আর কী জানবে, তারা দেখবে আপনাকে—'

'না, আমার বাড়িতে নয়, আমার সামনেতে নয়। আমার সামনেতে হলে আমার প্রেসার বাড়বে, আমি টলে পড়ে যাব মাটিতে। তাছাড়া আমার বাড়িতে ভাড়াটে বসবে, ছাদ এজমালি হবে, তারা বরদাস্ত করবে না এসব হট্টগোল। না, আমিও করব না।' নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় থরথর করতে লাগলেন বর্নবিহারী : 'এ বিয়ে, এমন বিয়ে আমি মানি না। কাকলিকে বলে দিয়েছি এ বাড়িতে তার স্থান নেই। তুমিও আরেকবার তাকে মনে করিয়ে দিও।' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় ভেঙে পড়ে চেয়ারে ছড়িয়ে পড়লেন বর্নবিহারী।

'দেদিকে ডেকে দিচ্ছি, আপনি বসুন।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল নরনাথ, আর কার্কলির ছোট বোন পত্রালির কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ওদিককার ঘেঁটে ধরে ধরলে কাকলিকে।

'এ কি, বেরুচ্ছ?' জিগগেস করল নরনাথ।

'হ্যাঁ, এই একটু—' ম্লান রেখায় হাসল কাকলি।

'বুঝেছি' জ্ঞানীর মত দুই চোখে জেলাতি আনল নরনাথ। বললে, 'এদিকে অনেকটা এগিয়েছি।'

'সত্যি?' এ যেন প্রায় আশাতীতকে শুনেছে কাকলি।

'হ্যাঁ, বিয়েটা আমার বাড়িতেই হবে আর কিছু খরচও উনি দেবেন।'

'তা হলে আলো জ্বলবে, সানাই বাজবে?' ফ্রক পরা ছোট্ট খুকির মত ঝলমল করে উঠল কাকলি : 'সেজেগুজে আসবে সব লোকজন?'

'দেখি কতদূর কী করতে পারি।' যেন অনেক দূরই করতে পারে এমনি ভাব করল নরনাথ।

'এখন তোমাকে আরেক কাজ করতে হয়।' কাকলি দরজার কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'ও পক্ষে গিয়ে যথাবিধি কথাটা পাড়তে হয়। মানে কথাটা ক্লোজ করতে হয়।'

'হ্যাঁ, আজকালের মধ্যেই যাচ্ছি।' নরনাথ তার ভুরুতে কুঞ্চনের খেলা খেলল। বললে, 'আর, সব সংক্ষেপ করে দিয়ে আসছি। এমন এক প্যাঁচ কষব যে বাঞ্ছা-ধনরা টাঁফো করতে পারবেন না, সুড়সুড় করে বিয়ের আসরে এসে হাজির হবে।'

কিছুই বুঝল না কর্কলি, তবু সরল প্রাণে হাসল। বাধাবিপদ সব বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। পথঘাট সুগম, এই যেন তার শীতের দিনে আরামের রোদ।

গায়ত্রী এসে দাঁড়াল বর্নবিহারীর কাছে। স্নানের তোড়জোড় করতে হয় এখন।

বর্নবিহারী বললেন, 'নরু কাকলি সম্বন্ধে কী একটা ইঙ্গিত করে গেল—'

সর্বশরীরে শিউরে উঠল গায়ত্রী : 'কী ইঙ্গিত?'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করলেন বর্নবিহারী।

'ছি ছি ছি', শতকণ্ঠে না-না-না ক[রে] উঠল গায়ত্রী : 'ও কী কথা! আমি ম[া] আমার লজ্জা নেই?'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' বর্নবিহার[ী] আশ্বস্ত হলেন : কাকলি কি এত বোব এত হালকা এত লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে তবে নরু ওরকম করে বললে কেন?'

'ও বললেই তো হবে না।' বিরক্ত-আরা[ক্ত] মুখ গায়ত্রীর : 'যে বেশি কথা বলে [...]

অমনি বানিয়ে-বাড়িয়েই বলে। ও ভেবেছে অমনি ' করে বললেই হয়তো তোমাকে সহজেই রাজি করাতে পারবে। কিন্তু ও জানে। আমি আছি।'

'তুমি আছ।' মাথার চুলে গায়ত্রীর তৈলাক্ত হাতটা নড়াচড়া করছিল, সেটা সবল স্নেহে আঁকড়ে ধরলেন বনবিহারী। চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কার দলে?'

'তোমার।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চুলে আবার বিলি কাটতে লাগল গায়ত্রী। বললে, 'কাকলি ভেবেছে ওর জেদই জয়ী হবে। কিন্তু ও জানে না ওর ঐ জেদ উত্তরাধিকার-সূত্রে আমার কাছ থেকেই পাওয়া।'

বনবিহারী বললেন, 'কিন্তু তুমি বলতে পারো ও ঐ দুঃস্থ ছন্নছাড়া ছেলেটাকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্যে খেপেছে কেন?'

'স্পর্ধা। স্রেফ অহংকার। ও বলতে চায় প্রেমের মূল্য সম্পদে নয় কৃতিত্বে নয়, প্রেমের মূল্য প্রেমে। আর যে দুঃস্থ তাকে যদি ভালোবাসাই যায়, তবে তার সঙ্গে ঘর করতে দুঃখ নেই। যদি অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে সেটা স্বচ্ছলতাকেই ভালোবাসা হল, ব্যক্তিটাকে নয়।'

'চাইল্ডিস!'

'ও বলে, যদি ধরো, অপেক্ষা করা সত্ত্বেও লোকটার অবস্থা ফিরল না, তা হলে কি আমি ফিরে যাব, আমার ভালোবাসাও ফিরে যাবে? গরিব কত কিছু থেকেই তো বঞ্চিত, শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হবে? গরিব বলে অকৃতী বলে কেউ তার সঙ্গে ঘর করবে না?'

দুঃস্থ অপরিচিতের জন্যে তার এত দয়া, দুঃস্থ বাপের প্রতি তার দয়া হবে না? মেয়ের জন্যে মন আবার হঠাৎ নরম হয়ে গেল বনবিহারীর। তিনি গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন কাকলিকে।

পত্রালি এসে বললে, 'দিদি বাড়ি নেই।'

'বেরিয়ে গেছে?' স্ত্রীর দিকে নালিশের চোখে তাকালেন বনবিহারী: 'যখন তখন বেরিয়ে গেলেই হল? এটা বেরুবার সময়? কাউকে বলে যাবে না?'

'তুমিই তো বলেছ এ বাড়িতে তার স্থান হবে না।' বললে গায়ত্রী।

'সে তো ঐখানে বিয়ে হলে। তা বিয়ে তো এখনো হয়নি। যখন সত্যি কোনো ডিফিকাল্টি নেই, বাধ্যবাধকতা নেই তখন বিয়ে তো শেষ পর্যন্ত না-ও হতে পারে।' পত্রালির উপর মুখিয়ে উঠলেন বনবিহারী: 'কোথায় গেছে এ অসময়?'

'তা আমি কী জানি।' পালিয়ে গেল পত্রালি।

গেছে আর কোথায়। গেছে মার্কেটে, গোল চত্বরে।

একটা ওজন নেবার যন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে সুকান্ত। হাসতে-হাসতে পাশ থেকে কাকলি এসে হাজির। বললে, 'হঠাৎ ওজন নেবার দরকার হল কেন?'

'দেখি বাড়ল কিনা।'

'বাড়বে? তুমি তাই আশা কর?' কাকলি অবাক হয়ে বললে।

'ফাঁসিকাঠে লটকাবার আগে কার, কার নাকি বেড়েছিল শুনেছি।' ফোকরে আনি দিল সুকান্ত।

'ফাঁসিকাঠ!' চোখ কপালস্থ করল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কি। বিয়ে করে সংসারে ঢোকা মানেই ফাঁসিকাঠে লটকানো।' কার্ডটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুলোলো সুকান্ত। বললে, 'হ্যাঁ, যা বলেছি, ঠিক বেড়েছে। বাড়বেই হবে। এবার তুমি ওঠ।'

কুণ্ঠিত হয়ে সরে গেল কাকলি। বললে, 'আমার দরকার নেই।'

'দরকার আবার কার আছে!' নেমে এল সুকান্ত।

'সেই একবার একপক্ষের দরকার হয়েছিল।' হাসিমুখে বলতে লাগল কাকলি। 'সেও এই বিয়ের ব্যাপারেই। মেয়ে দেখতে রোগা, বলছিল বরপক্ষ। রোগা বলছেন কেন, বলুন কৃশ, এ সাফাই কন্যাপক্ষের। বেশ, ওজন করাবেন চলুন। চলুন, ঠিক স্ট্যান্ডার্ড ওয়েটের মেয়ে আমাদের। মেয়েকে নিয়ে আসা হল মার্কেটে, এইখানে। ব্লাউজের মধ্যে গুচ্ছের ঢিল নিয়ে মেয়ে দাঁড়াল ওজন নিতে। একেবারে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট, কাঁটায়-কাঁটায়।'

'পুরোনো গল্প। কিন্তু তোমার ভয় কী! তোমাকে ঢিল নিতেও হবে না ঢিল দিতেও হবে না। যেমনটি আছ তেমনি—'

'তোমার ওজনেই আমার ওজন। তোমার ঐ কার্ডে আমাদের দুজনের ওজনই একত্র যোগ করে লেখা হয়েছে।' কাকলি চলতে শুরু করল: 'এ সব কথা থাক। কাজের কথা—'

'হ্যাঁ, কাজের কথা। তারই জন্যে তো ডেকেছি তোমাকে। কই তোমাদের বাড়ি থেকে সরকারী প্রস্তাব এল কই?' সুকান্তও পা মেলাল।

'নরুকাকা আজকালের মধ্যেই যাবেন।'

'নরুকাকা?'

'হ্যাঁ, বাবা খলহস্তের চেয়েও বেশি, পিস্তলহস্ত। নরুকাকার বাড়িতেই হবে।'

'কী হবে?'

'আহা, যেন বলতে পারি না! বিয়ে হবে।'

'শুধু ঐটুকু?'

'না। মুখচন্দ্রিকা। মালাবদল। সম্প্রদান। মন্ত্র। যজ্ঞ। সপ্তপদী। অগ্নিসাক্ষী—শিলাসাক্ষী। শঙ্খধ্বনি, হুলুরব। আমি কি সব জানি?' হেসে ফেলল কাকলি।

'জানো না? আমি সব জানি।'

'কী জানো?'

'তুমি ভয়ানক সেকেলে। আর তারই জন্যে যত গোলমাল।'

'শোনো, সবচেয়ে গোলমালের যে ভয় করছি তা হচ্ছে প্রস্তাবের পর তোমাদের বাড়ি কোনো দাবি করে না বসে।'

'তা করতেই তো পারে।' সুকান্ত বললে নিশ্চিন্ত সুরে, 'নগদ টাকা না হোক, ফার্নিচার, বাসনকোসন, রেডিও, সেলায়ের কল, সাইকেল—'

'থামো।'

'অন্তত সোনার বোতাম না হোক, একটা ঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন তো দেবে আমাকে।'

'কাঁচকলা দেবে।'

'কিন্তু মার নমস্কারী শাড়ি খান তিরিশ—এ ঠেকানো অসম্ভব।' মুখ গম্ভীর করল সুকান্ত।

'এ তুমি,...মার ছেলে, তুমিই ম্যানেজ কোরো।'

'দেখি কদ্দুর কী পারি। তুমি তোমার নরুকাকাকে শুধু নেমন্তন্ন পত্রটা ছাপতে বলো। তারপর একটা শুধু সামিয়ানা খাটানো আর একটু রোশনাই। কি গো, সানাই একটু বাজবে, কর্তব্য করবে?'

'করবে। কিন্তু তার আগে তোমার কেরামতিটাও দেখিও। তোমাদের দিকের সব শান্ত স্তব্ধ সংযত রাখার কেরামতি।' করুণ চোখে তাকাল কাকলি।

কিন্তু আসল কেরামতি নরনাথের। মূল-কথা বলার পর যখন অবান্তর কথা প্রায় ওঠে-ওঠে, তখন নরনাথ ভূপেনবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'এ বিয়ে না হতে দিয়ে আর উপায় নেই।'

ভূপেন হাঁ হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, ডিফিকাল্টি হয়েছে। এখন দেয়ার ইজ নো গেটিং এওয়ে। একটা কুমারী মেয়ের মান। আর আপনার ছেলে।' নরনাথ সাহস করে চাইল সুকান্তর দিকে: 'পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান—খাঁটি ভদ্রছেলে। হি হ্যাজ অউনড ইট আপ।'

কেউ একটা শব্দ করতে পারল না। হাসবে না কাঁদবে বুঝতে না পেরে সুকো মাথা হেঁট করে চলে গেল ঘর থেকে।

'তবেই বুঝতে পারছেন, যেমন তো করে নমো নমো করে এ বিয়ে এক্ষুনি সেরে ফেলা দরকার।' উঠে দাঁড়াল নরনাথ: বিয়েতে দাবিদাওয়াই কি, লোকলৌকিকতা বা কি।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোনো রকমে মান রা প্রাণ রাখা।' যথারীতি আবার সেলাকেল মধ্যে ডুবে গেল ভূপেন: 'তাড়াতাড়ি ঠিক করে শুভকাজটা সম্পন্ন করান।'

'আমরা আছি।' হেমেন বললে।

এবার নরনাথকে গায়ত্রী ডেকে পাঠাল তুমি আমার মেয়ের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাচ্ছ কেন? কোথায় রাগবে, কেঁদে ফেলল গায়ত্রী।

দু হাত জোড় করে নমস্কার করল নরনাথ। বললে, 'এ কলঙ্ক নয় বৌদি, এ কৌশল। এ কৌশলের উদ্দেশ্য বিয়েটাকে অনিবার্য করা, নির্বিঘ্ন করা, নিরুপদ্রব করা। এ কৌশলে কাকলির লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। যে কৌশলে ঈপ্সিত ধন পাওয়া যায় তাকে কি কলঙ্ক বলে? তাকে অলঙ্কার বলে।' (ক্রমশ

জী ব ন - বে দ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিভৃত মাদুরে মেলে যখন ভাবতে বসি—
জীবনের ক'টা পাতা কালের ধুলোয় ভ'রে যায়।
মনে আসে যায় কতো সোনার সকাল
উজ্জ্বল দুপুর, কতো বিকেলের লাল,
তাদের তাড়িয়ে নিয়ে কালের রাখাল
হ'য়ে গেছে অতীতের ভূত।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে বেদনার বিদূষক
ক'রে গেলো কতোবার মর্মান্ত কৌতুক।

অতীতের ভূত হ'য়ে এ-প্রাণের শূন্য কক্ষে
ফেলে গেছে তারা কতো উত্তপ্ত নিশ্বাস।
তারি তাপে ঝল্‌সালো
জীবনের ফাল্গুনের, আশ্বিনের মাস।

শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের যতো লঘু দিন।
সুন্দর সুরেলা আর রঙিন, রঙিন—
হারায় মর্মর; হয় বিবর্ণ, ম্লান
সব স্মৃতিচিত্র; হয় অবসিত চিরাভাস্ত গান
অনাগত ভবিষ্যেও তাদের নিষ্ঠুর হাত
কতোবার ক'রে গেছে ক্রুর ছায়াপাত
একথা যখনই ভাবি অপচিত জীবনের
ক'টা পাতা আরো যেন কালের ধুলোয় ভ'রে যায়—
এই তো জীবন-বেদ
কালের ধুলোর ক্লেদ
মিশে থাকে মেদে, মজ্জায়।

পা তা বা হা র

সুনীল বসু

আমার এ-মন তোমার মনের রোদ্দুরে হল পাতাবাহার
কখনো তোমার চোখের তারায় ভরো যে মনের নীল আকাশ,
তোমার রূপের চাঁদের কিরণে হৃদয় সাগরে লাগে জোয়ার
তুমি ত বোঝো না তুমি এলে হয় কস্তুরী মৃগ যেন বাতাস।

তোমাকেই দেখে রক্তে আমার মাঝে মাঝে জ্বলে রংমশাল
যেন নিশি ভোরে দিনগুলি লাগে বনরাজি নীল প্রবালদ্বীপ;
সবুজ দূর্বা শিশিরের কাজে যেন হয় মাঠ পশমের শাল
নিখুঁত সাঁঝের কপালের পরে জ্বল জ্বল করে কাঁচপোকা টিপ।

তুমি এলে মন চিত্রিত হয় বোঝো না কি তুমি কেন এমন?
দুঃখিত হাওয়া ঘোরে নাকো আর ধোঁয়ার গন্ধে আকাশ ঘিরে
করে নাকো আর শুকনো ফুলেও পিপাসা ভ্রমর বৃথা ভ্রমণ,
তুমি এলে আসে দিন-রাত্রির হীরা-মুক্তোয় খুশিরা ফিরে॥

উত্তরা

সন্তোষকুমার ঘোষ

[ছয়]
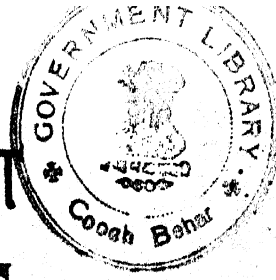
"আমার আনন্দে আজি একাকার
ধ্বনি আর রং
জানে তা কি এ-কালিম্পং।"

কালিম্পংয়ের এক প্রান্তে নয়নাভিরাম কুটির "চিত্রভানু", সূর্যাস্তের দিকে মুখ-ফেরানো। কুটির-সংলগ্ন উদ্যানের প্রাচীরে এই প্রশ্নটি উৎকীর্ণ।

কবিগুরু এই প্রশ্ন কেন করলেন, জানি না। হয়ত বয়সের বিকালে একদিন পশ্চিমের বারান্দায় হেলানো আসনে ক্লান্ত দেহ ঢেলে দিয়ে শুয়েছিলেন। প্রশান্ত গৌর ললাটে সিঁদুররাঙা অস্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল—সেই ছবিটিও কল্পনা করতে পারি। বিদায়ী আলোর লজ্জা ধীরে ধীরে বিষণ্ণতায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, অবশেষে সামনের পাহাড়ের আড়াল থেকে কে ছুঁড়ে দিয়েছে একটি ধূসর আঙরাখা—সব ঢেকে গেছে। আর সেই মুহূর্তেই হয়ত দূরের কোন তিব্বতী মঠে শুরু হয়েছে থেকে থেকে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি। একটি অপরূপ পরিবেশের বসনখানি হাওয়ায় কাঁপছে—ধূসর রঙে আর গম্ভীর ধ্বনিতে বোনা। রঙ আর ধ্বনি, টানা আর পোড়েন।

সন্ধ্যাভিভূত রোমাঞ্চিত কবির কণ্ঠে তখনই প্রশ্নটা ধ্বনিত হয়ে থাকবে।

'জানে তা কি এ-কালিম্পং?'

জানে না। কোন আগন্তুকের আনন্দে ধ্বনি আর রঙ একাকার হয়ে মিশে গেল, নির্বাক-নির্বিকার পাহাড় তার কী খবর পাবে?

কালিম্পংয়ে পৌঁছানো আমাদেরও আনন্দ দিয়েছিল। তবে ধ্বনি, রঙ বা অনুরূপ কোন কারণে নয়। প্রবল শীতের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে। কালিম্পং যে দার্জিলিংয়ের সমকক্ষ নয়, আবহাওয়ার পার্থক্যেই তার প্রমাণ। এখানে ফগ্-এর সঙ্গে রৌদ্রের সারাক্ষণ নিঃশব্দ সংগ্রাম নেই।

সুতরাং স্বস্তি পাব বই কি।

উচ্চতা, ব্যাপ্তি—সব দিক থেকে মাঝারি কালিম্পংকে হিল-স্টেশনের রানী কিছুতেই বলা চলে না। বড় জোর সে দুয়োরানী মাত্র—চালচলনেও সাদাসিধে।

তবু এই দুয়োরানীই আজ সুয়োরানীর ওপর টেক্কা দিয়েছে। দার্জিলিংয়ের নাম দেশ বিদেশে যে-কজন জানত, ঠিক সেই কজনই জানে, কিন্তু কালিম্পংয়ের নাম লোকের মুখে-মুখে। গোটা দুনিয়ার কৌতূহলী ক্যামেরার ফোকাস পড়েছে এই সামান্য পাহাড়ী শহরটির মুখে। কোন ইংরাজ কবির মত একদিন সকালে ঘুম ভেঙে কালিম্পং জানল, সে ... বিখ্যাত হয়ে গেছে।

খ্যাতি না বলে একে ... পারি। তাকে নিয়ে অনেক ... কানাকানি। তিব্বতের ... পাতে পিকিংই বোধ হয় প্রথম ... তোলে। কালিম্পং নাকি ... চক্রান্তের ঘাঁটি। এই একটি ধুয়োই ... বেতারে পুরনো রেকর্ডের মত ফিরে ... বাজে। সেই সুরটুকু তুলে নেবার ... অভাবও এদেশে ছিল না, আজও নেই। ... মূল গায়েন অবশ্য এখনও পিকিং ... পিকিং বেতারে এখনও নিশ ঘোষণায় ... থেকে শোনা যায়, "কালিম্পং ... অবশ্য তাদের আচরণের ... তুলনা নেই। যে-কটি ... বন্দী তাদের হাতে জীবিত অবস্থায় ... তাদের তারা দু' দিনেই "ভাই-ভাই ... ডাকিয়ে ছেড়েছে। এ-কর্ম সহজ নয়।

গুপ্তচর-চক্রান্তের অভিযোগে ... বেশী লোক কান দেয়নি। সরকার ... সঙ্গেই প্রতিবাদ করে বলেছেন, কালিম্প... গুপ্তচর যদি থাকে, তবে বরং চী... আছে। —"দি বট ইজ অন দি ... লেগ।" এবং টনক নড়বার পর গু... চৌর্যের জাল ছিন্ন করার কাজে সর... হাত দিয়েছেন। সর্বস্তিলাভের মত প... স্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। তবু ক... "নেভারের" চেয়ে "লেট" বরং ভাল।

সাংবাদিক বৃত্তির দোষ দেখুন, ঢেঁকি... মত স্বর্গে গিয়েও সে ধান ভানে। আর ধ...

তাঁর শেষ বয়সের এই গৃহটি সুরক্ষিত, দেখে ভাল লাগল। অবশ্য সরকার 'চিত্রভানু'র ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে অবহিত এমন কোন প্রমাণ পেলাম না। অনেক ডাকাডাকির পর মালী এসে ফটক খুলে দিল। তার পর মন দিল তার আপন কাজে।

আমরা ঘরে ঘরে দেখছিলুম। বন্ধ বাংলোর কাঁচের জানালার ফাঁকে দু-একটি আসবাব চোখে পড়ছিল—হয়ত কবির ব্যবহৃত। আমাদের পিছনে-পিছনে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দম্পতিও বাড়ির হাতায় ঢুকে পড়ল। এরা প্রতিবেশী, বোধ হয় নতুন ভাড়াটে। 'চিত্রভানু'র পরিচয় তাদের জানা নেই, শুধু কৌতূহলবশে এসেছে। পরিচ্ছন্ন সুরম্য বাগানটি ওদেরও ভাল লেগে থাকবে।

"কবির কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা কালিম্পংয়ে বসে লেখা।" সহযাত্রী বন্ধু বললেন। "খোঁজখবর নিয়ে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলে বেশ হয়।"

জানতে শিবের গীত গায়। কোথায় ধীর সমীরে তিস্তা-তীরের বর্ণনা করব, অথবা দূরে গিরিচূড়ার কনক-কলসটির কথা লিখব, তা ত না—আবার রাজনীতির ব্রণ খুঁটতে আরম্ভ করেছি!

না। রাজনীতিকে শতহস্ত দূরে রাখব। লিখব না সেই পীতবরণী সুন্দরীর কথা, কালিম্পংয়ের মাটিতে (পাথরে?) পা দিয়েই যাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সানুচর এই বিদেশিনীর মাথায় ছিল রঙীন বর্মী-ঢঙ ছাতা, ইনি ধীরে ধীরে বাজারের দিকে আসছিলেন।

কালিম্পংয়ের বাজারটা সরগরম। সব রকম সওদাই এখানে করা চলে, এবং পণ্যের মধ্যে প্যানিক, গুজব ইত্যাদিও তুচ্ছ করবার মত বস্তু নয়। এই ভারতের মহামানবের পাহাড় 'পরে নানা জাতির ভীড়। তিব্বতী, চীনা, নেপালী, বাঙালী, মারোয়াড়ী—তামা, লোহা, পিতল, রুপো, সব রঙের চামড়াই আছে।

বাজারের হোটেলে রাজস্থানী যে ছোকরা খাবার দিতে দিতে ফিসফিস করে জানিয়েছিল, ব্যবসা গুটিয়ে তারা দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, আতঙ্কগ্রস্ত বলে তাকেও না হয় হিসাব থেকে বাদ দেব।

এ-আতঙ্ক হয়ত অহেতুক নয়। যেদিন থেকে আমাদের উত্তর সীমান্ত বিজলী তারের মত "সজীব" হয়ে উঠেছে, সেদিন থেকেই কালিম্পংয়ে গুঞ্জনের অন্ত নেই। একটা চাপা ভয়, একটা উত্তেজনা, একটা অনিশ্চয়তা।

কালিম্পং আমাদের উত্তরের "খাইবার"—ট্রেড সেণ্টার, গঞ্জ ইতি ভাষা। আজকের চাঞ্চল্যের আড়ালে তার জীর্ণতার আভাসও পেলাম। বিকিকিনির এই হাটে আজ সত্যিকারের কেনা-বেচা কম, সরু সরু পাহাড়ী রাস্তায় সারি সারি সার্থবাহী টাট্টুর গলায় ঘুণ্টি বাজে না। সামান্য যা লেন-দেন, তা শুধু সিকিমের সঙ্গে। তিব্বত ত আমরা বিনা শর্তে বিকিয়ে দিয়েছি।

অথচ কালিম্পংয়ের আসল ব্যবসায় ছিল তিব্বতের সঙ্গে। সেই দেওয়া-নেওয়ার দুয়ারটি রুদ্ধ। আজকের সীমান্ত-বিরোধের সুরাহাও যদি কোন দিন হয়, কালিম্পং তা-হলেও তার হারানো দিনগুলি কি ফিরে পাবে?

ভরসা হয় না। এক যুগ আগেকার বঙ্গ-ভঙ্গের ধাক্কা কলকাতা আজও কি সামলে নিতে পেরেছে? না। কালিম্পং আর কলকাতার বাণিজ্যঘটিত সমস্যা আকারে না হলেও প্রকারে এক।

তিব্বতের প্রশ্ন অতএব আমাদের কাছে নিতান্তই বৈদেশিক প্রশ্ন নয়। থাক্। আবার সেই রাষ্ট্রনীতি আর আন্তর্জাতিক অর্থনীতি? পণ করেছিলাম না, সাধুরা যেমন কামিনী-কাঞ্চন, আমিও তেমনই এ-সব বস্তু ছোঁব না?

তার চেয়ে পেড়ং গ্রামের সেই পাদ্রীদের কথা লিখি না কেন, যাঁরা সুইজারল্যাণ্ড থেকে এসে এই দূর দেশে আপন ব্রত নিয়ে আছেন? শুধু খৃষ্টধর্ম প্রচার এঁদের লক্ষ্য নয়, পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারও। কয়েকজন নির্লোভ ফাদার তাঁদের 'মিশনের' জন্যে এই পাণ্ডব-বর্জিত এলাকা বেছে নিয়েছেন।

কালিম্পং ছাড়িয়ে প্রায় সিকিম-সীমানায় পেড়ং। অনুস্বারান্ত গ্রাম—এ-দিকের সব গ্রাম-গঞ্জ তার শতবর্ষ জাত—[illegible]।
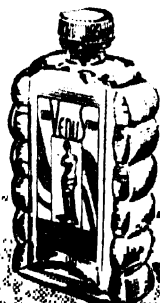
পাহাড়ের পথটা একটা দড়ির মত ঘুরপাক খেতে খেতে এই পেডংয়ে এসে ফাঁস লাগানো অবস্থায় থেমে গেছে।

হঠাৎ মনে হয়, সভ্যতার শেষ সীমা বুঝি এই।

এখানকার স্কুলটিতে ব্লক উন্নয়ন বিভাগের আনুকূল্যে মিশনরি সাহেবরা যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন, তা-ও দেখলুম।

ব্লকের কর্মতৎপরতার নমুনা অবশ্য কয়েক দিনে ঢের পেয়েছি। দুর্গম-দুরারোহ এলাকায় মাইলের পর মাইল কাজ-চলার মত রাস্তা তৈরি হয়েছে মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায়, এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহ-যোগিতায়। সরকারী ধনবলের সঙ্গে জনবল যুক্ত হয়েছে। অতি দূরের ঝরনা থেকে আনা হয়েছে চাষের জল, গ্রামবাসীরা এই প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলেরও স্বাদ পেয়েছে।

আমরা এ-সবই দেখেছি।

পেডং থেকে ফেরবার পথে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। দিনটা গেছে ভাই-টীকার। আমরা যাকে বলি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। এ-দিনটিকে বলা যায়, 'অল্ ব্রাদার্স ডে'। সকালে আর দুপুরে দেখেছি বালক আর কিশোরের দল গলায় গাঁদা ফুলের বড় বড় মালা জড়িয়ে কপালে টিকা দিয়ে ফিরছে।

সন্ধ্যায় দেখলুম "দেওশী"-র ধুম। দলে দলে ছেলে গানের দল তৈরি করে গ্রামের ঘরে ঘরে চাঁদা তুলছে। ঢোলকের আওয়াজে গাড়ি থামাতে হল।

কালিম্পংয়ের উপকণ্ঠে সেই সন্ধ্যার অভিজ্ঞতাও অবিস্মরণীয়। পাহাড়ী ছেলেদের সমবেত কণ্ঠের গান শুনে-ছিলাম। রচনা ওদের, সুর-সংযোজনাও ওদেরই কারও। আস্তে আস্তে অন্ধকার নামল, অথবা উঠে এল কোন গহ্বর-গুহা থেকে। হিমেল হাওয়া ভিজে জিভ দিয়ে চেটে চেটে সমস্ত পরিবেশটাই যেন মুছে দিল। যে পাহাড়টা আমাদের সঙ্গ ছাড়ছিল না কিছুতে সেও যেন বলে উঠল, "তোমরা তবে গান শোন। আমি যাই। গান শেষ হলে আবার ডেকে নিও।" বলেই সেই অন্ধকারে ডুব দিল। তখন চরাচরে আমরা ক'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

ঢোলকটা ধীরে ধীরে উদ্দাম হয়ে উঠছিল, ওদের গলা চড়ছিল। সে-গানের কোন মানে নিশ্চয়ই আছে, আমাদের জানা নেই, এবং জানবার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহও ছিল না। শিল্পসম্ভোগের কালে একটি বাসনা যদি হয় আনন্দলাভ, তবে সে-আনন্দ আমরা ত পুরোপুরিই পেয়েছি। মাত্র কয়েকটি ধ্বনির সমন্বয়ে আর সুরের সংগীতেতেই যদি হৃদয়ে নানা ভাবের সাড়া জাগে—হর্ষ-বিষাদ-আহ্লাদ-উল্লাস নিরাশা, বিধুরতা, ভয় ইত্যাদি; যদি রক্ত দ্রুত চলে বা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তবে ত ঈপ্সিত ফললাভ হয়েই গেল, উপরন্তু অর্থের সুদটুকু দিয়ে করব কী? না, গান বলুন, কাব্য বলুন আর ছবি বলুন, রসের ক্ষেত্রে আমি সেই কুসীদজীবী নই, 'মানে'-নামে এক-পাউণ্ড মাংস যার চাই-ই চাই। আধুনিক কবিরা এমন একটি পাঠক আছে জেনে আশায় বুক বাঁধতে পারেন।

পাহাড় মুছে গিয়েছিল, কিন্তু তার কোল ছিল। সেখানে তালে তালে কয়েকটি ছায়ামূর্তির মাথা দুলছিল। ঢোলকটার ফুর্তি বেড়ে গিয়েছে, তার সংগে তাল রাখতে ওরা হাততালি দিতে শুরু করেছে। জানি না, কখন শক্ত পাথরে পা ঠুকে ঠুকে তাল দিতে শুরু করেছি আমরাও। গানের কথা থেকে সুরটুকু ছেঁকে নিয়ে সহযাত্রী বন্ধু কখন গুনগুন করতে আরম্ভ করেছেন, তিনিও জানেন না। হঠাৎ ওই মায়ামলিন আসরে ছায়াবিলীন মূর্তিগুলিরই একটিকে পিছন থেকে মাঝখানে ঠেলে দিল কে। চট করে সে ঘুঙুর বেঁধে নিল পায়ে, এবং ওই আসরে নিঃসংকোচে নাচ শুরু করে দিল। আভাসে দেখলুম, সংগীতের সুরের সংগে তার দেহভঙ্গি আশ্চর্য মিল খেয়ে গেছে।

(সাত)

কালীঝোরা ডাকবাংলোর সেই চৌকিদার জানে না, আমার স্মৃতির সঞ্চয়ে একটি স্মরণীয় রাত্রি সেও উপহার দিয়েছে।

কালীঝোরা ডাকবাংলোয় বাক্স-বিছানা সমেত যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন বেলা যায়নি ওস্তাদ খেলোয়াড় যেমন হে[...] করে বল ছুড়ে দেয়, উঁচু পাহাড়টা তেমন সূর্যের টকটকে গোলকটাকে ঠেলে গি[...] মাথা দিয়ে, আর আশ্চর্য, নিচের পাহাড় তাকে লুফেও নিল ঠিক। পড়ন্ত শীতে বিকালে এই লোফালুফির খেলাটা দেখতে মন্দ না, আর এও জানতুম, ওই জ্বলন্ত বলটা ঠোকাঠুকি খেতে খেতে নিবন্ত হবে, একবার নিশ্চয়ই গড়িয়ে পড়বে মাটিতে তখন তাকে কুড়িয়ে নিতে কেউ থাকবে [...]

তিস্তা ভ্যালীর এই রম্যস্থলী পৌঁছলে মন আপনা থেকেই খুশিতে [...] ওঠে "এ-ঘাটে বাঁধব মোর তরণী।"

আমাদের ত তরণী নেই, আছে এক চতুশ্চক্র জীপ—তাই দাঁড় করালুম।

দুই পাহাড়ের করপুটের অঞ্জ[...] ছাপিয়ে পড়ছে জলের ধারা। তিস্[...] তিস্তার কোলে ঢলে পড়েছে আর এক ঝোরা।—'তোমার জল আমার হউক, আম[...] জল তোমার হউক, উভয়ের মিলে—কার সমুদ্রের? সমতলের? ডাক নাম তিস্ত[...] ভাল নাম শুনেছি ত্রিস্রোতা। কি[...] তিনটি ত মোটে স্রোত নয়, শত স্রোতে নিজের মধ্যে মিলিয়ে তবে তিস্[...] আপনাকে সোকালয়ে আর প্রান্তরে বিলি[...] দিতে পেরেছে।

এ-সব বোধ কিন্তু প্রথম একটি ঘণ্টা ছি[...] না। কেনন, পৌঁছে দেখি, চৌকিদা[...] নেই। ডাকবাংলার ঘরে-ঘরে তালা।

কোথায় চৌকিদার? আমাদের মু[...]

"লামা-মিছিল"—কালিম্পং কারুকুটিরে অঙ্কনরত শিল্পী

শুকিয়ে গিয়েছিল। চৌকিদার গেছে হাটে, নাকি কাছেরই এক গাঁয়ে, ভাই-টীকা পরবের জের তখনও কাটেনি, একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে বলে।

সর্বনাশ! আমরা ত ওখানেই বসে কিন্তু জীপ ত চার চাকার উপরে খাড়া, বসবে কী করে, অতএব ড্রাইভার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ছুটল চৌকিদারকে খুঁজে-পেতে ধরে আনতে।

একটু একটু করে ছায়া নামছে তিস্তা-উপত্যকায়। আমরা বাইরের লনে বসে বসে আছি। জীপ ফিরল, আওয়াজ কানে যেতেই আমরা উচ্চকিত হয়ে তাকালুম।

আরে, চৌকিদার কই, জীপ থেকে নামছে যে একটি মেয়ে! দূর থেকে ভেবেছিলুম মেয়ে, কিন্তু তরতর করে পাহাড় বেয়ে উঠে এসে সে সামনে যখন দাঁড়াল, দেখলুম, ছিপছিপে একটি তরুণী। সেলাম করে কাঁপা গলায় ভাঙা হিন্দিতে সে যা বললে, তা-তে বুঝলুম, এই মেয়েটি হল চৌকিদারের স্ত্রী—চৌকিদারনী। শুনলুম, চৌকিদারের ফিরতে কিছু দেরি হবে।

দেরি কেন?

লজ্জায় মেয়েটি মুখ ফুটে বলতে পারেনি, কিন্তু আমরা বুঝে নিয়েছিলুম ঠিক। ভাইটীকা পরবের রীতি-নীতি কিছু জানা আছে; এ-ও জানতুম, আমোদের ঘোর সহজে কাটে না।

যাই হক, আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। বারান্দায় আমাদের জন্য চেয়ার পেতে দিয়েছিল ওই মেয়েটিই; ঘরের ভিতরে লণ্ঠন জেলে দিয়ে সে নিজেই মশলাপাতি আনতে আবার বাজারে ছুটেছিল

চেয়ারে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে চুপ-চাপ বসে আছি। কী ভাবছি? কিছু না। কী দেখছি? অন্তত সচেতনভাবে ত কিছু না। হয়ত দেখেছি সেই অপরূপ বিকেলটিকেই। আমাদের চোখের সমুখে আমাদেরই জীবনের আরও একটি বেলাকে বলি দেওয়া হল।

অন্ধকার নামছে। চুপ করে চেয়ে দেখছি ধূমল পাহাড়টাকে। হঠাৎ টের পেলুম, একা আমিই ত দেখছি না, পাহাড়টাও বুঝি অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেই মুহূর্তে শিউরে উঠেছিলুম। তিস্তার জলপ্রবাহ কতক্ষণ পরে না জানি আমার চৈতন্যের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। তিস্তা। এখানে সে না নির্ঝর, না নদী। বলতে পারি, এখানে তার কৈশোর—নদীর বয়ঃসন্ধি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। তখনও পাশে পাহাড় আছে, নীচে নদী আর উপরে আকাশ। জানি, একটু পরে এই পাহাড় অস্পষ্ট হবে, নদীকেও আলাদা করে চেনা যাবে না, কিন্তু তখনও আকাশ থাকবে। একা আকাশই থাকবে। আর তখন অদৃশ্য পাহাড় দুটি দুদিক থেকে পা টিপে টিপে আমার এগিয়ে, আমাকে গ্রাস করবে, অন্ধকারের জাঁতাকলে চাপা পড়ে দম বন্ধ হয়ে মরব।

স্বস্তির বিষয়, এই অনুভূতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। খানিক পরেই মশাল জ্বালিয়ে ঢোলক বাজিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসেছিল চৌকিদার, গলায় তার গাঁদাফুলের মালা, চোখ দুটি ঢুলুঢুলু। পরনে হাঁওয়াই কামিজ-জাতীয় কিছু—সম্ভবত ওই ওর ইউনিফর্ম। বুক ফুলিয়ে সটান দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় আমাদের স্যালিউট করলে। জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কে?"

"হম চৌকিদার হ্যায়।" বলেই লোকটি ফের ঈষৎ নত হয়ে 'বাউ' করলে। পরনে প্যান্ট, নইলে হয়ত সাষ্টাঙ্গেই প্রণিপাত করত। খানিকক্ষণ গরহাজির ছিল বলে মাপ চাইল বারবার। বউকে ধমক দিয়ে বলল, সাহেবদের খিদমতে কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা। হয়নি শুনে হাসল আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। তারপরেই মাথার ওপর দু-হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুরু হল তার নাচ, কাঠের পাটাতন থেকে থেকে কাঁপতে থাকল।

ওদের মশালের আলোয় তিস্তা আর পাহাড়, সব ফিরে এসেছিল। বাঁকা-তলোয়ার নদীর খাপ যেন খানিকটা খসে গিয়েছে।

চৌকিদার বললে, "সাব!"

ওর মুখের দিকে তাকালুম।

"সাব, আপনাদেরও একটু আনন্দ দেব বলে আমার এই গ্রামের সাথীদেরও ডেকে এনেছি। ওরা নাচবে, গান গাইবে। নারাজ হবেন না ত?"

নারাজ? আমরা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলুম। এই নির্জন উপত্যকায় যতক্ষণ লোকজনের সাড়া থাকে, ততক্ষণই ভাল; ততক্ষণই প্রাণের স্পর্শ। এরা চলে গেলে আবার সেই রাত্রির জোয়ারেই ডুবে মরতে হবে ত!

অনেক রাত্রি অবধি সেদিন ওদের নাচ গান চলেছিল। বিস্ময় পরিবেশে নীলাম্বরীতে ঢেকে নিয়েছিল রূপালি পাড়। ওদের দলে মধ্যবয়সী একটি রমণীও ছিল। সে যোগ দেয়নি, এক পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছিল বাকী সকলকে। হঠাৎ দেখি, সে-ও মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। জলজ্বল করছে তার চোখ, মেদমথ্য দেহ বাঁকিয়ে-চুরিয়ে যতটা ভঙ্গিমা আনা যায় ততটাই এনে, পা ফেলছে থপ থপ করে।

মশালের আলো ওর আঁচলে না ধরে যায়।

ওরা হাসছিল, ওরা হাততালি দিচ্ছিল, আমরা হাসিনি, হাততালিও দিইনি। অবাক হয়ে দেখছিলুম। পাহাড়ের জটিল গলির গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে বয়ে এসে যে-তিস্তা তরতর করে বয়ে চলেছে নীচে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, "কোথা হইতে আসিয়াছ নদী?"—সে কি উত্তর দেবে? দেবে না। এই প্রৌঢ়া মেয়েটির প্রাণস্রোতেরই বা উৎস কী, আমার শহুরে রুচি আর বিচার-বিবেচনা দিয়ে কোনদিন জানতে পারব না।

কখন ওদের গান থামল, ওরা চলে গেল কখন, বলতে পারব না। ঘড়ির হিসাব রাখিনি। তবু, যেন এক সময়ে টের পেলুম, খিদেটা বেশ চনচনে।

বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের মর্মকথাই ত এই! ওমর খৈয়ামের 'রুবাই'-তে এই দর্শনটা অত্যন্তই স্পষ্ট। লতাকুঞ্জ চাই, সুরা চাই, সাকী চাই, সংগীত চাই—কিন্তু সেই সঙ্গে রুটিও যে অবশ্যই চাই।

[আট]

কালীঝোরা ডাক বাংলোর পর ভ্রমণের যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু উপসংহার-মাত্র। শরীর বা মনের আর কোন কিছু গ্রহণ করার আগ্রহ ছিল না।

নইলে দশা হিসাবে 'সেবক'ই বা কম কী—বৈতরণী সেতু। তার একটিমাত্র সুডৌল, ঈষৎ ডিম্বাকৃতি, খিলান নদীর এ-পার ও-পার বেঁধেছে। বহু বছর পরে এ-পথে আবার এলাম। আর অজস্র চা-বাগিচা পার হয়ে মাল বাজার আর মেটেলী; ঋষি নদী—আমাদের স্থলচর জীপকে এখানে হাঁস হতে হল। অবশেষে জলঢাকা, ভুটান-সীমানায় যেখানে আগামী-কালের উত্তরবঙ্গকে বিদ্যুদ্দীপ্ত করে তোলার মহড়া চলছে। ফেরবার পথে খুনিয়া আর গোরুমারার জঙ্গলে কী দেখেছি? বনের গহন-ঘন রূপ? না, তাকে ভীষণ মনে হয়নি। এইটুকুই মনে হয়েছে যে, এ আমার এক অজানা সমাজ, যেখানে বনস্পতিরা স্পর্ধিত, ঈর্ষাতুর, পরস্পরের প্রতিযোগী। একে অপরের মাথা ছাড়িয়ে উঠতে চায়, আবার অসংখ্য কোমল মায়াবী লতায় পাতায় তারা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধাও থাকে। আর যে-মাটিতে তাদের মূল, সে-মাটিও ভিজে-ভিজে, সরস নরম।

গোরুমারা ফরেস্ট বাংলোয় যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ আমাদের কপালগুণে একটি গণ্ডারও নালার ধারে জল খেতে এল না। অতএব যা দেখিনি, তার বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। বরং বাঁধানো, নিরাপদ পর্যবেক্ষণ-প্লাটফরমে বসে বসে যে চঞ্চল প্রজাপতিটিকে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করেছিলাম, তার কথাই লিখতে পারি।

তার চেয়ে বরং ফিরে আসি শিলি-গুড়িতে। পুনর্মূষিক হয়ে যখন ফের ঢুকলাম রেল-কামরায়, তখন জবরজং শীত-পোশাকের অনেকগুলিই খসেছে, অথবা বাধ্য হয়েছি খসাতে।

রাত্রে দোলানি খেতে খেতে ভাবছিলাম কী? এই ক'দিনের অভিজ্ঞতায় কী লাভ হল, তাই? হিসাবের খাতায়, বলা বাহুল্য, জমার দিকটাই ভারী। বহু মানুষের সঙ্গে মুখ-চেনা পরিচয়ের মূল্যও কম নয়। উন্নয়ন-উদ্যোগের স্পষ্ট চিহ্নও দেখেছি নানা গ্রামে। আবার সংশয়ও ছিল। সাধারণ মানুষের অনেকেই কল্যাণ-ব্রতে যোগ দিয়েছে ঠিক; কিন্তু এর মধ্যে ক'জন এর প্রয়োজন মর্মে-মর্মে অনুভব করেছে? সত্যকার বিশ্বাসী ক'জন? উন্নয়ন-প্রয়াসের পিছনে সরকারী যে-আনুকূল্য আছে, কোনদিন যদি তা বন্ধ হয়, সাধারণের মধ্যে তখনও কি এই আগ্রহ অব্যাহত থাকবে? এই সংশয়ের উত্তর আমার অভিজ্ঞতায় ত নেই। রাস্তা তৈরি, কারিগরি, ইস্কুল-গড়ার কাজ একদিন গ্রামের মানুষকে 'নিজের কাজ' বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথা ঝিনুকে খাবার অভ্যাস না গেলে পরিণতিতেও কখনও পৌঁছানো হবে না, সর্বভূতেষু 'স্টেট'-ই সংস্থিত থাকবে। তার খবরদারি 'উইদার অ্যাওয়ে' করবার কোন লক্ষণই দেখা যাবে না। ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামের বড় রকমের পরাজয় হবে সেখানেই।

আবার মণিহারি; আবার নদী-পাড়ি। সাহেবগঞ্জে আমাদের মত ভাটির যাত্রী আরও অনেক। মহিলাদেরও ছড়াছড়ি, কারও-কারও বিরস মুখ। রঙীন কোট নেই, ক্লোক নেই! কলকাতায় যে ভাল করে শীতও পড়ে না ছাই! যা-হোক, দু'দিনের জন দার্জিলিং ঘুরে গিয়ে তবু কোট-ক্লোকটা সার্থক হল। ফের ত গিয়ে সব তোরঙ্গ-জাত হবে!

আমি আর সহযাত্রী বন্ধু ধার-করা ওভারকোট আর শেরোয়ানি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম, ও সব ভাবনার বালাই আমাদের ছিল না।

সন্ধ্যায় শিয়ালদা। সেই ইঞ্জিনের ধস-ধস, বাঁশির আওয়াজ, যাত্রীর ব্যস্ততা কুলি-হাঁকাহাঁকি'— অবশেষে? অবশেষে মুখে 'হেল্প মী স্যার' কাকুতি ফুটিয়ে ট্যাক্সি দেখলেই ছুটে গিয়ে দাঁড়ানো। একটি চালকেরও কিন্তু করুণার উদ্রেক করতে পারিনি, হরিণীর চেয়েও মায়াবনবিহারিণী ট্যাক্সিগুলির একটিও ধরা দেয়নি। অগত্যা তিনবার রিক্সা বদল করে, কতকটা রীলে-প্রথায়, ফিরে এসেছি দুই ক্রোশের দূরের ডেরায়। তিন-তিনটি রিক্সায়, একবার ভাবুন ত! এইভাবেই, সমারোহে যে-সফরের শুরু হয়েছিল, নিতান্তই ম্রিয়মাণ ভাবে তার শেষ হল। এলিয়ট হলে হয়ত বলতেন, "দিস ইজ দি ওয়ে দি ট্যুর এণ্ডস্, দিস ইজ দি ওয়ে দি ট্যুর এণ্ডস্, নট উইথ এ ব্যাং, বাট উইথ এ হুইম্পার!

[শেষ]

(১৯৪)

বিশ্ব বীচিত্রা

গত সপ্তাহে ভারতীয় নাট্য সংঘের সভানেত্রী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় আমেরিকার খ্যাতনামা রেডিও ও টেলিভিসন শিল্পী আর্ট লিংকলেটারকে 'গীতা' নামে একটি হস্তীশাবক উপহার পাঠিয়েছেন। 'গীতা' ওদেশের একজন টেলিভিসন শিল্পীরূপে ওখানকার শিশুদের মনোরঞ্জন করবে। এরপর বয়স এবং দেহের ওজন ও পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে গীতা কতদূর জনপ্রিয় এবং খ্যাতি অর্জন করবে বলা যায় না, কিন্তু আমেরিকার প্রমোদ-শিল্পের ইতিহাসে জাম্বো নামক একটি হস্তী যে খ্যাতি ও মান অর্জন করে গিয়েছে তা কোনও দেশে কখনো কোনও পশুর ভাগ্যে ঘটেনি।

জাম্বো অবশ্য ভারতীয় হস্তী ছিল না। ইথিওপিয়ার একদল আরব ১৮৬১ সনে ওকে যখন ধরে তখন ওর উচ্চতা ছিল সাড়ে তিন ফিট। আরবরা ওকে বিক্রী করে ব্যাভেরিয়ার এক পশু সংগ্রাহকের কাছে এবং তার কাছ থেকে ও গিয়ে পৌঁছায় প্যারিসের বোটানিকাল গার্ডেনে। লন্ডনের রয়েল জুলজিকাল সোসাইটির কর্তৃপক্ষ একটি গণ্ডারের বদলে ওকে প্যারিস থেকে লন্ডনের পশুশালায় নিয়ে আসে।

সাত বছর বয়সে জাম্বোর ক্ষুধা অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। প্রতিদিন ওর খাদ্য ছিল আড়াই মণেরও বেশী খড়। তাছাড়া ওর প্রিয় ছিল আপেল এবং লন্ডনের শিশুরা পশুশালায় এসে ওকে প্রচুর পরিমাণে বনরুটি খাইয়ে যেত। ছোটদের ও পিঠে করে ঘুরিয়ে বেড়াত এবং ছোটরা ওর পিঠে ওঠার সময় জাম্বো পা দুমড়ে ঝুঁকে দাঁড়াতে শিখেছিল। সেই সময়ে আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত প্রমোদ উদ্যোক্তা পি টি বারনুম ওকে কিনে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু লন্ডনের পশুশালার কর্তৃপক্ষ বিক্রী করতে রাজী ছিলেন না। জাম্বোর পরিচালক ছিল ম্যাথু স্কট নামে এক ব্যক্তি—পশুশালারই এক কোণে একখানা ঘরে একা সে থাকত এবং জাম্বোর সংগে সে তার সুরা এমন কি চিবানোর তামাক পর্যন্ত ভাগাভাগি করে খেত।

১৮৮২ সনে বারনুম শুনতে পান যে জাম্বো এমন দুরন্ত হয়ে উঠেছে যে ওকে

ওর সাড়ে এগার ফিট ওজন সাড়ে ছ টন; এর একটি পায়ের বেড় পাঁচ ফিট করে। প্রত্যেক দিনের খাদ্য এক বড় পিপে আলু, পনেরটি বড় বড় রুটি, আড়াই সের পিঁয়াজ এবং নৈশ ভোজের সময় এক ছোট পিপে বীয়ার। জাম্বোকে সামলাতে পারা যাচ্ছে না শুনে বারনুম ইংলন্ডে তার প্রতিনিধিকে পঁচাত্তর হাজার টাকায় পশুটি কিনে নিতে তার করেছিলেন এবং আশ্চর্য হলেন এবার প্রস্তাব সংগে সংগেই গৃহীত হতে দেখে।

কয়েকদিন পর লন্ডনের কাগজে জাম্বোর বিক্রী হয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হতে কাগজের দপ্তরগুলিতে শত সহস্র প্রতিবাদ পত্র স্তূপাকার হতে থাকে। অনেক চিঠি ছোটদের লেখা, কোনক্রমে তারা লিখে জানিয়েছে জাম্বোকে যেন ইংলন্ডেই রাখা হয়। এমন কি রাণী ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স অব ওয়েলস যারা জাম্বোর পিঠে চড়েছিলেন তারাও জাম্বোকে রেখে দেওয়ার পক্ষে দাঁড়ান। প্রচুর টাকাও তোলা হয় জাম্বোকে আবার কিনে নেবার জন্যে, কিন্তু বারনুম

আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে পুতুল তৈরীর একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে। পুতুল তৈরীতে ভ.ব. বিষয়বস্তু এবং শিল্প-কুশলতার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। ওপরের ছবিখানিতে মাটির তৈরী দোলনায় দোলখাওয়া নারী মূর্তি'টি পঞ্চম শতাব্দীর

তখন বিক্রী করতে নারাজ। জাম্বোর দাম তখন টাকার মূল্যের চেয়েও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কর্তাদের মধ্যে এই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা এমন পর্যায়ে পোঁচেছিল যে নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকা এই ব্যাপার নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা আছে বলে মস্করা করেছিল। জাম্বো যে এতটা পাবলিসিটি পাবে বারনুমের তা স্বপ্নাতীত ছিল।

অন্য কোন পথ না দেখে ইংরাজরা জাম্বোর বিক্রীর বিরুদ্ধে একটা ইনজাংশন আনার চেষ্টা করে কিন্তু আদালত বারনুমের পক্ষে রায় দিতে বৃটেনের হাজার হাজার অধিবাসী জাম্বোকে শেষ দেখা দেখবার জন্য জমা হতে থাকে। আধ মাইল লম্বা সারি দাঁড়িয়ে যায় এবং পশুশালা প্রবেশ মূল্য বাবদ সওয়া দু লক্ষ টাকা অর্জন করে নেয়।

দোকানে দোকানে জাম্বোর নামে চুরুট, টুপি, অলংকার প্রভৃতি বিক্রী আরম্ভ হয়ে যায় এবং রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় জাম্বো সুপ, জাম্বো স্যালাড, জাম্বো আইসক্রীম পরিবেশনের হিড়িক লেগে যায়। জাম্বোকে পাঠাবার জন্যে বিশেষ মজবুত করে খাঁচা তৈরী হয়ে গেল কিন্তু খাঁচাটি দেখামাত্র সেই যে জাম্বো বেঁকে দাঁড়াল তাকে আর বাগে আনা অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষে ওর পরিচারক ম্যাথু স্কটকে সঙ্গে নিতে তাকে দিয়ে জাম্বোকে খাঁচায় ভরে জাহাজে তোলার ব্যবস্থা হয়। লণ্ডনের পশুশালা থেকে যখন বের হয় তখন ভোর কিন্তু রাস্তার দুধারে অগণিত লোকের সারি, ছাদে অলিন্দে জানালায় লোক ভর্তি দেখা যায়।

১৮৮২ সনের ৯ই এপ্রিল জাম্বো নিউইয়র্কে পোঁছতে মহাসমারোহে ওকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বৃদ্ধ পি টি বারনুম ত আবেগে জাম্বোর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে কেঁদেই ফেলেন। বাইশটি ঘোড়া দিয়ে ওর গাড়ি টেনে ব্যাণ্ড বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দশ দিনের মধ্যে জাম্বো তাকে কেনার দাম এবং জাহাজে আনার খরচ বাবদ লক্ষ টাকা তুলে দেয়। প্রথম মাসেই বারনুম এণ্ড বেইলি সার্কাসকে সে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেয়। নিউইয়র্ক থেকে জাম্বো সারা দেশ ঘুরতে থাকে, সঙ্গে ম্যাথু স্কট। তিন বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন স্থান ঘুরে সার্কাস দলকে সে বহু কোটি টাকা আয় করিয়ে দেয়।

১৮৮৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হল কালরাত্রি। কানাডার অণ্টারিও শহরে সেণ্ট টমাস স্টেশনের ধারে সার্কাস দলের সামগ্রী লাগানো হচ্ছে। ম্যাথু স্কট জাম্বোকে নিয়ে লাইন ধরে যেতে যেতে একখানা মালগাড়ী তুমুল গর্জন করে এগিয়ে আসতে থাকে। স্কট থাপ্পড় মেরে মেরে অনেক চেষ্টা করলে যাতে জাম্বো দ্রুত পায়ে সরে যায়। কিন্তু জানোয়ারটা কোন ভ্রূক্ষেপ না করে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ইঞ্জিনের আলোয় ড্রাইভার তাকে দেখতে যখন পেল তখন ব্রেক কষেও কোন ফল হল না। ইঞ্জিনটা সোজা এসে জাম্বোর মাথায় ধাক্কা মেরে চুরমার করে দিলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাম্বোর মৃত্যু হল। ম্যাথু স্কট ছোট ছেলের মত আকুলভাবে কাঁদতে লাগল।

পরদিন সারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রত্যেক কাগজে এই খবর প্রকাশিত হল। বারনুম পশুটিকে মাউণ্ট করার ব্যবস্থা করলেন। ওর পেট চিরে ফেলতে তার মধ্যে থেকে বের হল শত শত ইংলণ্ডের পেনি মুদ্রা, একটা আধ ক্রাউন, তারের টুকরো, একগুচ্ছ চাবি, পুলিসের হুইসেল একটি এবং আরো নানা জিনিস। পরে বারনুম চামড়াটা ভরিয়ে টাস করে টাফটস কলেজে উপহার দেয়। আজো নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অফ নেচারাল হিস্ট্রির একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে ওর পাশে কঙ্কালটা সংরক্ষিত আছে।

*

মেক্সিকোর এক হাসপাতালের ক্যাণ্টিন থেকে হাজার দেড়েক টাকার সিগারেট চুরি হয়ে যাবার পর হাসপাতালের পরিচালকরা সেই ক্যাণ্টিনে একটি ক্যামেরা এমনভাবে লুকিয়ে এবং তারযুক্ত করে রাখার ব্যবস্থা করে যাতে যে কেউ সেই ক্যাণ্টিনে প্রবেশ করলে তার ছবি তোলা হয়ে যায়। এ ফন্দিটা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাণ্টিন থেকে ক্যামেরাটাও চুরি হয়ে যায়।
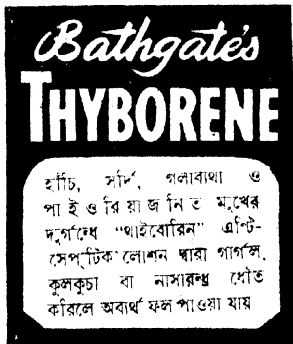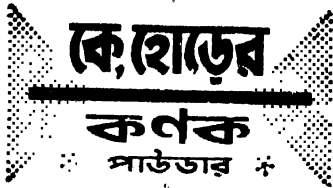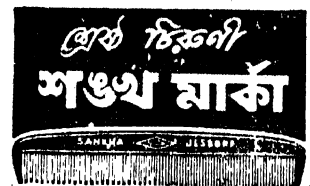
সম্পাদকেষু

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি জানি প্রতিদিন আপনার নামে বহু চিঠি আসে। খ্যাতনামা লেখকদের কাছ থেকে, লেখক যশপ্রার্থী তরুণ তরুণীর কাছ থেকে। আজকের এ চিঠি কিন্তু এদের কারো লেখা নয়। দয়া করে চিঠির তলায় নামটা দেখবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে এ চিঠি পড়বার ইচ্ছা হবে না। নগণ্য পাঠিকার চিঠিটাকে আপনি অবজ্ঞাভরে ঝুড়িতে ফেলে দেবেন, হাজার অমনোনীত রচনার মত।

বিখ্যাত এক পত্রিকার আপনি ব্যস্ত সম্পাদক। অবহেলায় নষ্ট করার মত একটি মুহূর্তও আপনার মুঠোয় নেই, কিন্তু তবু আমার একান্ত অনুরোধ এ চিঠিটা আপনি পড়বেন, একটু ধৈর্য ধরে। এ জীবনে আপনার কাছ থেকে চাইবার মত আমার কিছু নেই। অবশ্য চাইলেই সব জিনিস পাওয়া যায়, এমন মূর্খ অহমিকাবোধও আমার নেই। হয়তো এক সময়ে ছিল, অনেক অনেক আগে। ঢেউয়ের বুকে যখন ফেনার ফুলটুকুই নজরে পড়ত, কাঁটা পার হয়ে পুষ্পের সুষমা, মানুষের জীবনে শোকের দাহ ছাপিয়ে সুখের দীপ্তি।

বিশ্বাস করুন বহু বছর ধরে আপনাকে একটা চিঠি লেখার চেষ্টা করেছি। অনেক বার অনেক কাগজ নষ্ট করেছি, অনেক অক্ষর কেটেছি, যা লিখেছি, কেটেছি তার চেয়েও অনেক বেশী। চিঠি শেষ করে পড়বার আর সাহস হয় নি। বহুদিন বুকের মধ্যে রেখে একদিন খণ্ড খণ্ড করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি। বাতাসের সাহস আমার চেয়েও বুঝি কম। শতছিন্ন চিঠির টুকরোগুলোকে উড়িয়ে আপনার ধারে কাছে নিয়ে যেতে পারে নি। ঘূর্ণি হাওয়ার ঝাপটে টুকরোগুলো আমারই সারা গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে।

এতদিন সাহস হয় নি। আজ হয়েছে। এই সাহস, আপনার কাছে সরাসরি চিঠি পাঠাবার দুর্জয় সাহস, আমাকে দিয়েছে, মান্টু।

মান্টুকে আপনি কোনদিন দেখেননি। এক মাথা কোঁকড়ানো সোনালী চুল, টানা দুটি চোখে শশকের ভীরুভাব, করমচারঙা ঠোঁট। কোথাও জোরে শব্দ হলে চীৎকার করে মায়ের আঁচলে মুখ লুকোত। নতুন কোন আগন্তুক এলে লজ্জায় সংকোচে দরজার পিছনে আত্মগোপন করত। হাজার টানাটানিতেও বাইরে আসত না। ভাবতে পারেন সেই ভীরু, লাজুক, দুর্বল মান্টু আমায় সাহস দিয়েছে?

মান্টুর কথা শোনবার আগে আর একটা কথা শুনুন। পুরানো এক কাহিনী। খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা, তাঁদের তৈরী করা মনোহর সুখ-দুঃখের অনেক কাহিনী তো আপনাকে পড়তে হয়। চমক লাগানো ভাষার ছটা, অভিজাত সংলাপ, বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, চরিত্র চিত্রের অনায়াস-পটুত্ব। আমার এ কাহিনীতে এসব কিছুই পাবেন না। না ভাষার ঝিকিমিক, না ভাবনার দ্যুতি। এ কাহিনী কালি কলম দিয়েও লেখা নয়। রক্ত আর চোখের জল মিশিয়ে অভিজ্ঞতার মোট নিয়ে এর সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামের নাম মাটিপুকুর। তারই প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার সনাতন ঘোষ। নিচু ক্লাশে ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক আর

করাতে হয়, দরকার হলে ড্রিলও। খাটুনির অনুপাতে মজুরি সামান্য, এত সামান্য যে মাসের শেষ পনেরো দিন বাগানের সুপুরি, নারকেল আর শাকপাতা হাটে বেচে তবে দিন চলে। কিন্তু সব মাসে তাও চলে না। রুগ্না স্ত্রী, অসুখ বাড়লে কবিরাজের ট্যাঁকেই ফলমূলে বেচা টাকাগুলোর বেশীর ভাগ গিয়ে ওঠে। এর ওপর সোমত্ত বয়সের এক জোড়া মেয়ে। পেট পুরে খেতে পায় না, অথচ কি করে দুজনের শরীর এত পুরন্ত হয়ে উঠল আশ্চর্যের বিষয়। মাঝে মাঝে বিয়ের কথাবার্তা উঠত, দেখতেও আসত দু একজন। মাস্টার সত্যধন ছেঁড়া কাপড় ঘুরিয়ে পরে, ফাটা পাঞ্জাবি ময়লা চাদরে ঢেকে খেয়াঘাট থেকে আগন্তুকদের নিয়ে আসতেন। সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকতেন। মনে হত মেয়ে দেখতে নয়, বুঝি তারা বাকি খাজনার দায়ে বাস্তুভিটেই ক্রোক করতে এসেছে।

কিন্তু ওই আসা যাওয়াই সার। ঘরের মেয়ে ঘরেই রয়ে গেল, পার একটাও হল না। আটকালো মেয়েদের রূপে, না মাস্টার বাপের রূপোর ঘাটতিতে সঠিক বোঝা গেল না।

যখন আয়োজন করতে করতে বাপ, আর মিথ্যে সাজগোজ করতে করতে মেয়েরা হয়রান হয়ে উঠেছে, এমনি সময়ে ব্যাপারটা ঘটল।

স্কুল ফেরত মাস্টার এলেন, সঙ্গে একটি যুবক। যুবকটি গাঁয়ের যে কেউ নয়, তা একনজরেই বোঝা গেল। বাড়ির লোকেরা মনে করল দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় যাকে কোনদিন চোখে দেখার অবকাশ হয়নি। কিংবা পাত্র বুঝি এবার নিজেই এল মেয়ে যাচাই করতে। পরের মুখে ঝাল খেলে ঠকতে হয়, নিজের রসনায় রসগ্রহণ না করতে পারলে সুখ কোথায়!

একটু পরেই সব জানা গেল। আত্মীয় নয়, পাত্রও না, তবে স্বজাত, পাল্টা ঘর কিন্তু মগডালের ফুল। স্বল্প মাইনের আঁকশী দিয়ে সে ফুল পাড়া সম্ভব নয়। মোতিপুকুর স্কুলের নতুন মাস্টার। একেবারে আনকোরা। সবাই অবাক। গ্র্যাজুয়েট ছেলের তিন ভুবনে আর অন্ন জুটল না এই পাণ্ডববর্জিত এলাকায় এল জীবিকার খোঁজে? এর চেয়ে শহরে কাপড় ফিরি করে বেড়ালেও তো পারত কিংবা মুটেগিরি।

আশ্চর্য হবার আরো বাকি ছিল। এক সময়ে গরু ছিল, এখন শুধু গোয়াল। সংসার থেকে পেনসন পাওয়া জিনিসে ঠাস বোঝাই। জল লাগিয়ে সেই সব আবর্জনা পরিষ্কার করা হল। কাঁঠাল কাঠের তক্তপোশ এল, জাম-কাঠের টেবিল। নতুন মাস্টার এখানেই অস্তানা পাতল।

সত্যধনের স্ত্রী রুদ্রমূর্তি। আপনি পায় না, শংকরাকে ডাকে। বলে নিজের এক মুঠো ভাত জোটে না, ডাইনে আনতে বাঁয়ে নিঃশেষ, আবার বাড়তি লোককে ডাকার শখ।

সত্যধন অভয়মুদ্রার ভংগীতে হাত নাড়লেন। বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। এমনি থাকবে না। রীতিমত খরচ দেবে।

সত্যধনের স্ত্রী খিঁচিয়ে উঠলেন, কত খরচ দেবে শুনি? যেমনি ইস্কুলের ছিরি, তেমনি মাস্টারের মাইনে। নিজের সংসারেই তো দেখতে পাচ্ছি।

সত্যধন উত্তর দিলেন না। দাওয়ায় বসে হুঁকোয় টান দিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু মাস গেলে টাকা হাতে পেয়ে মাস্টারের স্ত্রীর চোখ কপালে উঠল। এ যে অনেক। ভোরবেলা আর বিকেলে চা আর মুড়ি, দুপুরে আর রাত্রে ভাত আর একটা তরকারি,

তারই এত দাম। আহা, থাক, বিদেশ বিভুঁই, ভদ্রলোকের ছেলে এসে পড়েছে কাছে পিঠে আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। একটু দেখা শোনা করা উচিত বৈকি!

দেখাশোনা আরম্ভ হ'ল। সত্যধনের বড় মেয়ের ওপর ভার পড়ল। দেখা শোনা আর কি! সকালে বিছানাটা গুটিয়ে রাখা, ঘরটা ঝাটপাট দেওয়া, টেবিল পরিষ্কার করা এই তো। প্রথম প্রথম মাস্টার স্কুলে চলে গেলে ঘরের কাজ শুরু হ'ত কিন্তু মা আপত্তি জানালেন, এত বেলা অবধি ঘর বাসি পড়ে থাকে এতে কি আর মা লক্ষ্মী থাকে বাড়িতে। একে তো লক্ষ্মী কত সদয়। কেন ধাড়ী মেয়ে সকালে বিছানাটা পরিষ্কার করতে পার না?

তাই হ'ল। সকালে মিনতি ঘরদোর ঝাড়তে শুরু করল। এই সময়টা মাস্টার বাইরে গিয়ে দাঁড়াত।

কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু একদিন মিনতি অসুবিধায় পড়ে গেল।

শীতের সকাল। বাইরে কুয়াশার চাপ। ভাঁজ করে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে ভেজানো দরজাটা ঠেলে বিছানা তুলতে গিয়েই মিনতি থমকে দাঁড়াল। বিছানা তুলবে কি, বিছানার মানুষটাই ওঠেনি এখনও।

আত্মসম্পর্ক না হলেও ইতিমধ্যে কথা-বার্তা কিছু হয়েছে। না হবার উপায়ই বা কি। অনেক সময় পরিবেশন করতে হয়েছে ন, মেয়েকে। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। আর একটু ভাত চাই কিংবা ডালটা যে পাতে রইল এই ধরনের কথার টুকরো না বললেই বা চলে কি করে।

সেই ভাবেই মিনতি বলল, বিছানাটা তুলতে হবে। কোন উত্তর নেই।

মিনতি পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মানুষটার শিয়রে। চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। সাড় নেই। মুখচোখের চেহারা ভাল ঠেকল না। এদিক ওদিক চেয়ে মিনতি সন্তর্পণে নিজের হাতটা মাস্টারের কপালে রাখল। হাত রাখা যায় না এমন গরম। লাল দুটি গাল, সারা মুখ থমথমে।

হাত রাখার সঙ্গে মিনতিরও দুটি গাল আরক্ত হয়ে উঠল। ফরসা মেয়ে হলে হয়তো মুখে আবিরের ছোপই লাগত।

খুব আস্তে আস্তে মিনতি বেরিয়ে এসে মার কাছে দাঁড়াল। কথাটা বলতে গিয়ে সামলে নিল। অনাত্মীয় এক পুরুষের কপালে হাত রেখে তার উত্তাপ পরীক্ষা করেছে, এমন একটা কথার মধ্যে কোথায় যেন সংকোচের সুর, তার জড়ানো ছিল। কি জানি মা আবার কি ভাববেন। তাই মিনতি শুধু বলল, বিছানা তোলা হল না মা। অজয়বাবু এখনও শুয়ে রয়েছেন।

মা চাল বাছছিলেন, মুখ তুলে বললেন, ডাকলি না কেন? শীতের সকালে মানুষ

বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়, কিন্তু স্কুলের যে বেলা হয়ে যাবে!

মিনতি মাথা নিচু করে খুব মৃদু গলায় বলল, মুখচোখ দেখে মনে হ'ল বোধ হয় শরীরটা খারাপ।

শরীর খারাপ? চাল সরিয়ে মা উঠে পড়লেন। ব্যস্ত পায়ে অজয়ের কাছে গিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ, এ যে বেশ জ্বর।

মিনতি ঘরে ঢোকে নি। বাইরে ছোট বোন আরতির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মা সেখানে এসে বললেন, একবার কবরেজ মশাইকে খবর দিলে ভাল হয়। তুই যা আরতি। উনি তো হাট থেকে ফিরলেন না এখনও।

আরতি কবরেজ মশাইকে নিয়ে ফিরল মিনিট দশেকের মধ্যে। বুক, পিঠ, জিভ আর নাড়ি দেখে কবরেজ মশাই খাঁজ ফেললেন নাকের ডগায়, কপালে গোটা তিনেক বাড়তি আঁচড়। জ্বরটা সোজা নয়, বাঁকা। চিকিৎসার জন্য ভয় নেই, তিনি নিজে দেখছেন কিন্তু সেবা দরকার। সব সময় কাছে একজনের থাকা প্রয়োজন।

তাই রইল। মিনতি আর আরতি। ওষুধ খাওয়ানো, রোগীকে সাবধানে সরিয়ে বিছানা ঠিক করা, প্রয়োজনে সব কিছু এগিয়ে দেওয়া। সত্যধন কাজের কিছু করলেন না। রোগীর কাছে আসার সাহসটুকু তাঁর হ'ল না, তবে নেপথ্যে প্রবল লম্ফ ঝম্ফ করলেন। সেবা বা চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়।

অজয় উঠে বসল প্রায় দিন কুড়ি পর। প্রথমে বিছানার ওপর তারপর আস্তে আস্তে মেঝের ওপর হাঁটতে লাগল। একেবারে ছোট-ছেলের মতন হাঁটি হাঁটি পা পা করে।

মিনতি ঘরে ঢুকল। হাতে জ্বালানো লণ্ঠন। টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা রেখে বেরিয়ে আসতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। অজয় টলছে, নেশাগ্রস্তের মতন। চেয়ারের হাতল ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মেঝেয় টলে পড়বার আগেই মিনতি ছুটে গিয়ে জাপটে ধরল অজয়কে। খুব সাবধানে তাকে টেনে টেনে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল।

একটু দম নিয়ে অজয় বলল, তুমি আমায় বাঁচালে। মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তুমি না ধরলে ছিটকে পড়ে যেতাম।

একটি কথাও না বলে ধীর পায়ে মিনতি বাইরে চলে এল। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

অজয় হয় তো বাঁচল, কিন্তু মিনতি বাঁচল না। পারল না নিজেকে বাঁচাতে। অপূর্ব এক অনুভূতি, অনাস্বাদিত এক স্পর্শ। এ যেন দেহের সংগে দেহের ছোঁয়া নয়, এ ছোঁয়াছুঁয়ি রক্তকণিকায়, স্নায়ুতন্ত্রীতে, মজ্জায় মজ্জায়। উনিশ বছরের কোরক যেন সূর্যের একটি রশ্মির ছোঁয়ায় শতদল হ'য়ে উঠল। দুটো হাতে বুক চেপে মিনতি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পরিবেশ ভুলে, নিজেকে হারিয়ে।

পরের দিন থেকে মিনতির চোখের সামনে যেন নতুন এক জগৎ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। পদে পদে কুণ্ঠা, পদে পদে সংকোচ। কেবল মনে হ'ল পৃথিবীর সব লোক বুঝি কেমন করে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তাদের ছোঁয়াছুঁয়ির খবরটা জেনে গেছে। আর আগের মতন নিঃশংকচিত্তে মিনতি গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না অজয়ের সামনে।

তবু যেতে হল। বিছানা পেতে, হাত দিয়ে চাদরের ভাঁজ ঠিক করতে করতে মুখ তুলেই মিনতি মুখ নামাল। অজয় চেয়ারে বসে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে শুধু কি কৃতজ্ঞতার স্পর্শ!

শাড়িটা শরীরে টেনে দিয়ে মিনতি নেমে যাচ্ছিল, অজয়ের ডাকে ফিরে দাঁড়াল।

শোন।

আমাকে বলছেন? মিনতি এক পা এগিয়ে দাঁড়াল।

আর আমার কে আছে। অজয় যেন একটু হাসবার চেষ্টা করল।

আবার সেই আগের সন্ধ্যার বিচিত্র অনুভূতি। শুধু মানুষটার স্পর্শেই নয়, তার আহ্বানে, দৃষ্টিতেও একটা চেতনার স্ফুলিংগ। সারা দেহে আগুনের-উচ্ছ্বাস।

তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি, না? অজয় কথাটা খুব আস্তে আস্তে বলল, তারপর কি মনে হ'তে সংশোধন করে বলল, তোমাদের ওপর বড্ড-অত্যাচার করছি।

মিনতি মাথা নিচু করে পায়ের নখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগল। এ কথা মিনতিকে কেন? তার বাপ রয়েছে, মা রয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তো তাঁদেরই জানানো উচিত। তাঁদেরই নির্দেশে তো মিনতি অজয়ের ভার নিয়েছে। দেখা শোনার ভার।

তুমি যেভাবে আমার সেবা করেছ, তোমার ঋণ আমি কখনই শোধ করতে পারব না

আর দাঁড়াতে পারল না মিনতি। তার সারা শরীর টলমল করছে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হলে অজয়ের মতন সেও হয়তো টলে পড়বে। বলা যায় না, অজয় যদি ছুটে এসে ঝাপটে ধরতে যায় তাকে! বাঁচাবার ভান করে মরণের অতলগর্ভে টেনে নিয়ে যেতে চায়!

একটুকু পড়তেই হয়তো আপনার ক্লান্তি আসছে। আসা স্বাভাবিক। এর চেয়ে অনেক উত্তেজক কাহিনী আপনার সামনে এসে জড় হয়। আদিরসের ঝালমশলা দেওয়া। আপাতশান্ত নিস্তরঙ্গ এক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের জীবনের আর কি দাম! কতটুকু! তবু আমার একান্ত অনুরোধ, ধৈর্য ধরে সবটুকু পড়ুন। অনেক সময় তো হাল্কা নভেল পড়েন সময় কাটাবার জন্য, বারান্দায় চেয়ার টেনে চুপচাপ বসেও থাকেন, আকাশের মুখোমুখি, কিংবা বুঝি নিজেরই মুখোমুখি। মনে করুন অখ্যাত অজ্ঞাত এক লেখিকার অপটু হাতের লেখা কোন গল্পই পড়ছেন।

মিনতি মরল, অবশ্য তখন সে ভেবেছিল, জীবনের পরিধি তার বাড়ল, দু হাতের অঞ্জলি পেতে স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে জীবনরস নিয়ে আকণ্ঠ পান করল। চার পাশের গাছপালা মজা ডোবা, পানা পুকুর, এমন কি আশপাশের মানুষগুলো পর্যন্ত যেন রঙে রেখায় নতুন রূপ নিয়ে ফুটে উঠল তার অঞ্জনমাখা চোখের সামনে। দিনের পর চলল নিশীথ অভিসার। সংসারকে ঘুম পাড়িয়ে নিঃশব্দচরণে মিনতি উঠে এসে ধরা দিত একজনের বাগ্র বাহুর আলিঙ্গনে। নতুন দিগন্তের কথা শুনত, পিছনের বিবর্ণ, নীরস জীবনটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার, মনে হ'ত এতদিন শুধু খেলা করেছে নকল সংসার নিয়ে, মাটির পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। এ সংসারে প্রাণের স্পর্শ ছিল না, নিজের অস্তিত্ব ছিল না। মাটির হাঁড়িকড়া নিয়ে এ শুধু ছেলেখেলা। নিজের হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে গড়ে তোলা আর এক সংসারের ছবি ভেসে উঠত চোখের সামনে। মনের মানুষকে নিয়ে মনের মতন সংসার।

চেতনা হ'ল সত্যধনের কথায়। দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে অজয় নিজের বাপের কাছে ফিরে যাবে। অসুখের পর থেকে শরীরটা ঠিকমত সারে নি। কয়েকটা দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন।

অজয় নেই, তবু মিনতির নিশীথ অভিসারের ইতি হ'ল না। রোজ রাত্রে উঠে তার তক্তপোশের ওপর শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদত। অজয় বলে গেছে দশদিন, কিন্তু মিনতির মনে হ'ল এ যেন অন্তহীন সময়, অফুরন্ত।

দশদিনের দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার উতলা হয়ে পড়তে লাগল মিনতি। ছুলছুতো করে বাইরে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠল গরুর গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে। সারাটা দিন কেটে গেল। গাছের ছায়া দীর্ঘ হ'য়ে পড়ল উঠানে। দীঘির জল ঘন কালো হ'য়ে উঠল। বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির মেলা। দশদিনের পরেও আরো পাঁচটা দিন কাটল।

একদিন সত্যধনই খবর আনলেন। অজয় আর আসবে না। কোনদিন নয়। সম্পন্ন ঘরের ছেলে। বাপের সঙ্গে মন কষাকষি তাই রাগ করে ছিটকে চলে এসেছিল এই অজ পাড়াগাঁয়ে। এমন একটা চাকরি নিয়েছিল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্কুলে চিঠি দিয়েছে, আর নিজের ব্যাপারটা লিখছে সত্যধন ঘোষকে।

সত্যধনের স্ত্রী মুষড়ে পড়লেন। এক-মুঠো বাড়তি টাকা তিরোহিত হ'ল সেই দুঃখে। সত্যধনও আক্ষেপ করলে ছোকরা বড় ভাল ছিল। পড়ানো ইতিমধ্যেই নাম করেছিল, তবে সত্যি কা ওরা রয়েল বেংগল, এমন আশশ্যাওড় ঝোপে ওরা থাকতে যাবে কোন দুঃখে আরতির কোন ভাবান্তর বোঝা গেল কিন্তু মিনতি কাঠ হ'য়ে গেল। দুটো হ বুকের ওপর জড়ো করে দেয়ালে ঠেস দি দাঁড়াল। চোখের সামনে সব যেন কা বোশেখীর ঝড়ে দুলে দুলে উঠছে। হবে তা হ'লে? অজয় সত্যিই যদি আর ফেরে। তার আশ্বাস, তার প্রতিশ্রু তাকে বিশ্বাস করার, যে পরিণতি আত্মগো করে রয়েছে মিনতির দেহকোষে, তার হবে? এতো তার গোপন প্রেম নয় অনন্তকাল ধরে অন্তরের অন্ধকারে ত লুকিয়ে রাখবে, নিজের মর্মবেদনার পুটে। আর কটা মাস, তারপরেই মিনা

গ প্রত্যঙ্গে জাগবে তার আগমনীর ষণা। কি করবে মিনতি? কাকে নাবে ও দুঃস্বপ্নের কাহিনী।

বাপ নয়, মা নয়, সব চেয়ে আগে জানল রতি।

দু বোনে খিড়কির পুকুর থেকে স্নান রে ফিরছিল, আরতি আগে মিনতি পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে দিদির সঙ্গে আরতি গল্প করতে করতে আসছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিনতির দিকে চেয়ে বলল, দিদি?

আরতির দৃষ্টির অনুসরণ করে মিনতি ভিজে কাপড়টা শরীর থেকে আলাদা করার চেষ্টা করল, হাতের গামছাটা বুকে জড়াল, কিন্তু আরতির চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

এ কি সর্বনাশ করেছিস দিদি?

কি করেছি, ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দেবার প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও মিনতির গলা শুকিয়ে গেল! নিষ্প্রভ দুটি চোখ, সারা মুখে রক্তহীন পাংশু আভা।

রোজ রাত্রে তুই উঠে যেতিস তা জানতাম, কিন্তু এমনি করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবি, তা ভাবিনি।

কি পাগলের মতন যা তা বকছিস? মিনতি দুটো হাত দিয়ে আরতির একটা বাহু আঁকড়ে ধরল। দু হাতের নখ বিঁধে গেল আরতির বাহুমূলে। মিথ্যা আক্রোশে ফুলতে লাগল মিনতি।

দিদিকে টেনে জামরুলতলায় নিয়ে এল আরতি। এক ঝটকায় ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এর চেয়ে মরলি না কেন দিদি, এভাবে একটা মানুষের নগ্ন লালসার মুখে নিজেকে ছেড়ে দেবার আগে তাও তো ভাল ছিল।

ল্যাজে পা দেওয়া সাপিনীর মতন মিনতি ফণা তুলল। অজয়দা বলেছে আমায় বিয়ে করবে। কথা দিয়ে গেছে।

মূর্খ, হতভাগিনী দিদির দিকে অনেকক্ষণ ধরে আরতি চেয়ে রইল। বয়সে ছোট হলে হবে কি, পৃথিবীর পিচ্ছিল সড়কের সঙ্গে সে যেন অনেক বেশী পরিচিত। ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠল ব্যঙ্গের কোনাকি।

আর কবে তোকে অজয়বাবু বিয়ে করবেন দিদি? মাস তিনেকের ওপর ভদ্রলোক চলে গেছেন এখান থেকে, একটা চিঠি দিয়েছেন তোকে? একটা খবর নিয়েছেন?

আচমকা মিনতি কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভিজে কাপড় চোখের ওপর চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।

আরতি কাছে এসে একটা হাত রাখল মিনতির পিঠে, কোমল গলায় বলল, এখন কি করবি দিদি? এ বিপদ কি করে কাটিয়ে উঠবি?

মিনতি ভয়ার্ত দুটি চোখ তুলে বোনের দিকে চাইল, তার একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, তুই কথা দে আর, কাউকে কিছু বলবি না? আমি যা হোক একটা বন্দোবস্ত করব নিজের। তোদের মুখে যাতে চুনকালি না পড়ে, কলঙ্কের ছিটে না লাগে, তা আমি নিশ্চয় করব।

আর কথা নয়। দু বোন পাশাপাশি হেঁটে বাড়িতে ফিরে এল। শুতে যাবার আগে পর্যন্ত একটি কথাও হল না। মিনতি মাকে এড়িয়ে গেল, বাপের সামনেও বিশেষ গেল না। মাথা ধরার ছুতোয় অন্ধকার ঘরে বসে রইল।

কিন্তু কতদিন এমনি অন্ধকারে মুখ

ঢেকে বসে থাকতে পারবে মিনতি? কত সন্ধ্যা কাটাতে পারবে এমনিভাবে! যতদিন যাবে, বিপদ তত বেশী। বাপকে হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে কিন্তু মায়ের চোখ এড়ানো অসম্ভব।

একদিন মাঝরাতে বাবা-মার ফিসফিস কথাবার্তার শব্দে মিনতি চমকে জেগে উঠল। একটু কান পেতে বুঝতে পারল আরতি কথা রাখেনি। সব বলে দিয়েছে বাপমাকে। হয়তো দিদির মুখ চেয়েই এ কাজ করেছে, দিদির ভবিষ্যত ভেবে।

কিন্তু মার পরামর্শ শুনেই মিনতি চমকে উঠল। বুকের মধ্যে প্রাণান্তকর এক যন্ত্রণা। মনে হল এই মুহূর্তে বুঝি হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র এক যবনিকা নেমে আসবে।

পরেরদিন ভোর ভোর সন্তানসহ মেয়েকে নিয়ে বেরোবে। শহরে এক আত্মীয়ের বাসায় যাবার নাম করে। তারপরে শহরে অভাব নেই চিকিৎসাবিদের, যারা তাদের হাতের যন্ত্রের চেয়েও নির্মম। সামান্য একটা সম্ভাবনাকে শেষ করতে কতটুকু আর সময় লাগবে। কিন্তু একথা কেন কেউ বোঝে না। তাহলে যে নিঃস্ব হয়ে যাবে মিনতি। অজয় ফিরে এলে কি বলবে তাকে। তোমার স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ সব নিঃশেষে মুছে ফেলেছি। যে স্পর্শ আর স্বাদ আর একটা জীবনে রূপান্তরিত হয়েছিল, হত্যা করেছি সেই প্রাণকণাকে। তা পারবে না মিনতি, কিছুতেই পারবে না। তার চেয়ে, তার চেয়ে রাতের ঘন তিমিরে শুরু হোক নতুন যাত্রা। অন্ধকারকে ডিঙিয়ে, অজানাকে পার হয়ে আর এক অজ্ঞাত অভিসার।

তারপরের কথাগুলো শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। গদিআঁটা নরম চেয়ারে বসে, সহকারী পরিবৃত হয়ে, একরাশ লেখক-লেখিকার ভাগ্যলিপির ফাইল সামনে নিয়ে দুঃস্থা এক মেয়ের একটা প্রাণ বাঁচাবার আশায় স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়ানোর সর্বনাশা প্রচেষ্টাকে আপনার হয়তো হাস্যকরই মনে হবে। একটা প্রাণ নয় একটা কলঙ্ক হয়ে [illegible] মিথ্যা মোহকে, বিশেষত এই যান্ত্রিক যুগে, আপনি উপহাসই করবেন।

আপনি কি করবেন জানি না, কিন্তু মিনতি কি করল শুনুন। •

এক দরিদ্র চাষীর ঘরে মিনতি জননী হল। অপূর্ব কান্তিময় এক শিশু। মিনতির মতন একটুও নয়, সবটুকু অজয়ের মতন। নাম হল মনতোষ। মন্টু। •

মান্টুর বয়স যখন বছর পাঁচেক তখন এক টুকরো কাগজ হাতে এল। ধান ভেনে, ঘরের কাজ করে, গোয়াল নিকিয়ে মিনতির জীবন কাটছিল। আশ্রয়দাতা [illegible] চাষী পরিবারের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে। কাগজটা হাতে আসতেই মিনতির বুকের সেই পুরোনো যন্ত্রণাটা আবার দেখা দিল। অব্যক্ত এক বেদনা, শুধু বুকের মাঝখানেই নয়, ছড়িয়ে পড়ল শিরা-উপশিরায়, মর্মকোষে।

কান্দিবিলের মাঠে বিরাট সভা। চাষীদের দুঃখকষ্ট দুর্দশা ঘোচাতে অজয় আসছে। তাকে মাঝখানে রেখে গ্রাম পরিক্রমা হবে। মোড়লদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনানো। কিন্তু মিনতি কাকে জানাবে নিজের অভাব-অভিযোগের কাহিনী? দুঃখ-দুর্দশার কথা? মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে, নিজের প্রাণ ছেনে ছেনে আত্মজকে বাঁচাবার এই বেদনাময় কাহিনী কাকে বলবে।

মিনতি ঠিক করল সভায় যাবে। মান্টুকে সঙ্গে নিয়ে। সকলের অভাব আর দুর্দশার কাহিনী শোনানো হয়ে গেলে অজয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। বলবে, মান্টু আমার প্রদীপ, সেই প্রদীপ তুলে ধরে নানাদি[ক] আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, আম[ার] সামর্থ্যমত। দেখ, তোমার বিশ্বাসের [মূল্য] অমর্যাদা করি নি। তোমার দেওয়া জিনি[স] বুকে করে রেখেছি। নিজে উপোস ক[রে] মুখের অন্ন তুলে দিয়েছি তার মুখে। নি[জের] নিদ্রা-হরণ করে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি। এবার আমি ক্লান্ত, অবসন্ন, আমাকে তু[লে] নাও।

কে জানে, অজয়ও হয়তো খুঁজে বেড়া[চ্ছে] মিনতিকে। পুরোনো গৃহস্থালীতে, মো[ড়] পুকুরের আশপাশের গ্রামে। কি করে জানবে, সেদিনের অনভিজ্ঞা, ভীরু এ[ক] মেয়ে হেঁটে হেঁটে এতদূরে চলে এসে[ছে।]

কিন্তু কান্দিবিলে অজয়ের সঙ্গে দে[খা] করতে পারে নি মিনতি। সভার স[ামনে] মান্টুকে কোলে নিয়ে নিমেষহীন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখছে। অনেক বদ[লে] গেছে অজয়। আগের দিনের ছিপছি[পে]

হল। এই পোশাকে মান্তু আর মার সামনে আসত না, কিন্তু রোজগারের মাত্রা দেখে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হ'ল না মিনতির যে, মান্তু ভেক পাল্টায় নি।

নিজের মনে মিনতি অনেকবার ভেবেছে। কেন ছেলেকে ডেকে সোজাসুজি বারণ করে দিতে পারে নি। কেন বলতে পারে নি এ পোশাক তুই পরিস নি, এ পোশাক আমি সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু পারে নি মিনতি। কোথায় যেন বাধা ছিল। আর সকলকে বোঝানো গেলেও ছেলেকে বুঝি বোঝানো যায় না। ছেলের কাছে মা শুধু পালয়িত্রীই নয়, পবিত্রতারও প্রতীক। সে ভাবমূর্তিকে ভেঙে চুরমার করা মানে নিজেকে গুঁড়িয়ে ফেলা।

এ অন্তর্দ্বন্দ্বেরও অবসান হল। সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। অসহ্য বেদনা। তৈরী ঠোঙা নিতে লোকেরা দুবার এসেছে, কিন্তু সব ঠোঙা মিনতি দিতে পারে নি। শরীরের অজুহাতে সময় চেয়েছে। তারা বিরক্ত হয়েছে। বিরক্তিটা মনে না চেপে রেখে অর্ধ-স্বগতভাবে বলেও গেছে মিনতিকে—এভাবে চললে কাজ আর তারা দিয়ে উঠতে পারবে না।

মেঝের ওপর মিনতি শুয়েছিল, একটু বুঝি তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিল, আচমকা সশব্দে দরজা খুলে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

মান্তু, পরনে সেই সদাশোকাতুর পোশাক, যে পোশাকে ইদানীং সে মার কাছে আসে না।

মা! মান্তুর চীৎকারে চায়ের টিনগুলো পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল। কি হয়েছে রে?

কোন কথা না বলে মান্তু তীরবেগে কোণের দিকে দৌড়ে গেল। একটা ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাগে মান্তুর স্থাবর সমস্ত সম্পত্তি থাকত, সেটা উপুড় করে ফেলল মেঝের ওপর। দ্রুত হাতে অজয়ের ছবিটা টেনে বের করে মিনতির সামনে দাঁড়াল।

মা!

মিনতি ক্লান্ত চোখে মান্তুর দিকে দেখল।

ইনিই তো আমার বাবা। তুমি নাম বলেছিলে অজয়কুমার বসু, তাই না?

মিনতি মোহাবিষ্টের মতন ঘাড় নাড়ল। চেতনা নেই মিনতির। চোখের সামনে যে দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে, তাতে যেন ওর কোন অংশ নেই। মান্তু ওর সন্তান নয়, নিষ্ঠুর নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিতে অচেনা এক অভিনেতা নির্মম অভিনয় করে চলেছে।

কেন তুমি মিথ্যা কথা বললে মা? কেন বললে বাবা আমার বেঁচে নেই।

মান্তু! মিনতির সমস্ত শরীর দুর্বার বেগে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

মান্তু মেঝের ওপর সবেগে মুখ ঘষতে ঘষতে আর্তনাদ করে উঠল, ভাবতে পার এই পোশাকে তাঁর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। লোকের মিথ্যা কাহিনী বলতে বলতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থমকে থেমে গিয়েছিলাম। আমি চিনতে পেরেছি, তাঁর চোখ, তাঁর নাক, তাঁর কপালের আঁচিল পর্যন্ত আমার জানা। ওই ছবিটা আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছে। যেটুকু সন্দেহ ছিল, সেটুকু বাইরের বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করতেই দূর হল। কিন্তু এ কি করলে মা, এত বড় একটা সত্যকে এমনি একটা মিথ্যা কথায় সম্পূর্ণ ঢেকে দিলে। যে পরিচয়ের জন্য পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, সে পরিচয়ের পথ নির্মম-হাতে তুমি কাঁটাগাছ দিয়ে অবরুদ্ধ করে দিলে?

তিনি আমায় চেনেন না, তিনি তাই কিছু হারান নি, কিন্তু আমি যা হারালাম, তোমার মিথ্যার জন্য, আমার নিজের তৈরী মিথ্যা কাহিনীর জন্য, তা আর কোনদিন খুঁজে পাব না। সত্যিকার পরিচয় নিয়ে কোনদিন দাঁড়াতে পারব না তাঁর কাছে।

সন্তর্পণে দেয়াল ধরে মিনতি উঠে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য মান্তুকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। মান্তুর মুখ-চোখের চেহারা তার ভাল ঠেকল না। কিন্তু পারল না মিনতি। মান্তু পাঁচ টাকার একটা নোট মায়ের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেল।

সারারাত মান্তু এল না। মিনতি চীৎকার করে অনেক ডাকল। শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে এল। কাছাকাছি দু-একটা আস্তানা। কোথাও মান্তু নেই।

মান্তু অবশ্য দূরে দূরে কোথাও যায় নি। পরের দিন বিকেলেই তার সন্ধান পাওয়া গেল। সেই এক পোশাক পরনে। দুটো চোখ লাল। পেট পুরে খেতে পায় না বলেই বুঝি অনেক জল খেয়েছে ছেলেটা। এক জন্মের পিপাসা মিটিয়েছে।

যাক, অনেক আবোলতাবোল লিখলাম। ইতিমধ্যেই হয়তো ধৈর্য হারিয়েছেন। আপনার মূল্যবান সময়ের কতখানি অপচয় ভাবতেই আমার নিজের লজ্জা করছে। ক্ষমা করবেন। আমার চিঠিও শেষ হয়ে এসেছে। আপনার কাছে যেটুকু বলার ছিল, মান্তু সেটুকু বলার শক্তিও হরণ করে নিয়ে গেছে। শুধু আপনার পাঁচ টাকার নোটটা ফেরত পাঠালাম। এ টাকা মান্তুর কোন কাজে লাগে নি, এমন কি তার শেষ কাজেও নয়।

প্রণাম দিতেও ভরসা হচ্ছে না। প্রণাম করার যোগ্যতা আমার নেই, নেবার যোগ্যতাই আপনার আছে কি না তাও ভাবছি।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

(৫)

ডালহৌসীর (?) **লাণ্টিয়ারী** করতে করতে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম থিয়েটারের স্টেজ আর অডিটোরিয়ামটা। আগাগোড়া সব কাঠের। মঞ্চ কাঠের, অডিটোরিয়ামের দেওয়াল কাঠের, গ্যালারী-চেয়ার ও কাঠের বটেই। মেঝেটা পর্যন্ত কাঠের, ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে মঞ্চের সামনে প্রথম দিকে খুব ভালো চেয়ার তারপরে সাধারণ চেয়ার, তারপরে বেঞ্চি আর গ্যালারী। আগাগোড়া চটের মিস্ত্রী দিয়ে তৈরী। টিকিটের দাম কত ছিল তাও মনে নেই। এগজিবিশনের সব স্টলের সামনেটা যেমন মাটি থেকে ৪।৫ ফিট উঁচু করা প্ল্যাটফর্মের মতন ছিল, থিয়েটারের প্রবেশপথের সামনে দিয়েও তেমনি ছিল ৪।৫ ফিট উঁচু করা প্ল্যাটফর্ম চওড়ায় ৬।৭ ফিট। সেও কাঠের তৈরী প্ল্যাটফর্মের মাঝে উঁচু উঁচু থাম করে ওপরে বেশ চালা ছাউনি করা। তার কাঠের থামে সারা এগজিবিশন জুড়ে যেন কাঠের কারখানা, যেন এক শহর। দেখলে মনে হত, কাঠের বাড়ির এক নগরী! কোনো কোনো জায়গায় আবার কাঠের ওপর বাহার করবার জন্য শোলার পাটির প্যানেল করা ছিল, কোথাও বা সুন্দর মাদুর। এই পাটি আর মাদুর এসেছিল বলতে গেলে সারা বাংলাদেশ থেকে। সত্যি কথা বলতে কী আরও কত এগজিবিশন দেখেছি, এত জাঁকজমক দেখিনি কোথাও।

এদিকে, নলদময়ন্তী—অমরেন্দ্রনাথ-কুসুমকুমারী, এসব নামের রঙীন প্ল্যাকার্ড দেখলাম, কাঠের সুন্দর মঞ্চও দেখলাম, কিন্তু অভিনয় আর দেখা হল না। বেলাবেশি পরে, হাল হয়ত-বা একটু চেষ্টা করে দেখা যেত। শুধু হর্ষে শুনলাম যাকে বলে সেই রাত্রে। অতএব বৃথা চেষ্টা! ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

এগজিবিশনে শুধু থিয়েটারই বা কেন, টুকরো টুকরো ফিল্মও দেখানো হয়েছিল। আর নহবতে বাজতো সানাই। আমাদের চন্দনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম সেই সানাইয়ের কম্পিত সুর-বিস্তার। সেদিনকার কৈশোর মনে সে যে কী মোহ সঞ্চার করত, তা বলার নয়।

এগজিবিশনের ভিতরে পশ্চিমধার ঘেঁষে যে পুষ্করিণীটা ছিল বলেছি, তার চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে সুইস ব্যাক রেলওয়ে বা আলপাইন রেলওয়ে তৈরী হয়েছিল, সে-ও এক অভিনব বস্তু। ২৫।৩০ ফিট উঁচু একটা টাওয়ার তৈরী হয়েছিল। তার থেকে ঢালু করে বরাবর দুটি লাইন পাতা নীচে পর্যন্ত। এই লাইনের ওপর ঘরঘর করে যখন গাড়ি নামছে, তখন সে এক রীতিমত দেখবার জিনিস। হুডখোলা পুরনো মোটরগাড়ির মতন দেখতে ক্ষুদে সাইজের, মোট চারজন বসতে পারে। এক-একবার এক-একটা করে ছাড়ত, নইলে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে। ঐ যে টাওয়ারের কথা বললুম, ওটা ছিল ঘেরা। মাঝে মাঝে জালঘুলি। নীচেকার কোনো কোনো ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আমরা দেখতাম কী, মেঝের নীচে ৫।৬ জন কুলি ঘানির মতো করে ঘূর্ণিযন্ত্রটা ঘোরাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে খেয়ে গাড়ি উঠছে একেবারে প্রকাণ্ড চাকতিটার ওপরে। এক-একবার শব্দ হচ্ছে ঘড়াং করে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতুম, গাড়ি চাকতি থেকে এবার প্যাসেঞ্জার-সুদ্ধ লাইনের ওপর পড়ল। অমনি উৎসুক হয়ে উঠতাম আমরা, ঐ আসছে রে ঐ আসছে!

বড়দের সঙ্গে গাড়িতে কখনো-সখনো ছোট বয়সের ছেলেমেয়েদের দেখতাম, খুব ছোট নয়, বালক-বালিকা বলা যেতে পারে। সাহেব-মেমও থাকত। তবে খাঁটি সাহেব খুব কম, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই বেশী। গাড়ি আসছে ওপর থেকে নীচে আঁকা-বাঁকা পথে, উঁচু-নীচু হয়ে, কোথাও বা লাফিয়ে উঠে, মনে হল, এই গেল বুঝি সবসুদ্ধ উল্টে! কিন্তু উলটাতো না, কখনো কোনো দুর্ঘটনার কথা শুনি নি। সেই উপর থেকে নীচে বেঁকে বেঁকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে গাড়ি দুরন্ত গতিতে, ছেলেমেয়েরা চাঁচাচ্ছে ভয়েও বটে, উল্লাসেও বটে। দেখবার মতই দৃশ্য! কিন্তু চড়বার উপায় আমাদের নেই, প্রতিটি সীটের মূল্য ছিল পাঁচ টাকা করে। কোথায় পাবো তখন টাকা? তাছাড়া, ওটা আমাদের কাছে একটি ভয়েরই ব্যাপার ছিল। দূরে দাঁড়িয়ে হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিই শুধু, চড়বার সাধও হয়নি, সাধ্যও ছিল না।

এগজিবিশনে আরও মজার জিনিস ছিল। ছিল মেরী-গো-রাউণ্ড। একটা বড় কাঠের চাকতির ওপরে কাঠের ঘোড়া বসানো, হাতি বসানো, বাঘ বসানো, সিংহ বসানো, আবার খুদে মোটরগাড়িও বসানো। সবগুলিতে লোক বসিয়ে চাকতিটা ঘুরতে থাকত। সেই ঘূর্ণিতে মোটরগুলি স্থির আছে, কিন্তু ঘোড়া-হাতি-বাঘ-সিংহ যে যার জায়গায় প্যাসেঞ্জার-সুদ্ধ উঠছে আর নামছে। এতে অবশ্য বড়দের সঙ্গে ছোটদেরও ভিড় হত।

আবার, পুষ্করিণীতে হয়েছিল "ওয়াটার ট্রাইসাইকেল।" তিনটে ছোট নৌকোমতন জিনিস করেছে। কিন্তু বেশ উঁচু, সাধারণ ট্রাইসাইকেলের তুলনায় ডবল উঁচু বলা

হল। এই পোশাকে মান্তু আর মার সামনে আসত না, কিন্তু রোজগারের মাত্রা দেখে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হ'ল না মিনতির যে, মান্তু ভেক পাল্টায় নি।

নিজের মনে মিনতি অনেকবার ভেবেছে। কেন ছেলেকে ডেকে সোজাসুজি বারণ করে দিতে পারে নি। কেন বলতে পারে নি এ পোশাক তুই পরিস নি, এ পোশাক আমি সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু পারে নি মিনতি। কোথায় যেন বাধা ছিল। আর সকলকে বোঝানো গেলেও ছেলেকে বুঝি বোঝানো যায় না। ছেলের কাছে মা শুধু পালয়িত্রীই নয়, পবিত্রতারও প্রতীক। সে ভাবমূর্তিকে ভেঙে চুরমার করা মানে নিজেকে গুঁড়িয়ে ফেলা।

এ অন্তর্দ্বন্দ্বেরও অবসান হল। সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। অসহ্য বেদনা। তৈরী ঠোঙা নিতে লোকেরা দুবার এসেছে, কিন্তু সব ঠোঙা মিনতি দিতে পারে নি। শরীরের অজুহাতে সময় চেয়েছে। তারা বিরক্ত হয়েছে। বিরক্তিটা মনে না চেপে রেখে অর্ধ-স্বগতভাবে বলেও গেছে মিনতিকে—এভাবে চললে কাজ আর তারা দিয়ে উঠতে পারবে না।

মেঝের ওপর মিনতি শুয়েছিল, একটু বুঝি তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিল, আচমকা সশব্দে দরজা খুলে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

মান্তু, পরনে সেই সদ্যশোকাতুর পোশাক, যে পোশাকে, ইদানীং সে মার কাছে আসে না।

মা! মান্তুর চীৎকারে চালের টিনগুলো পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল। কি হয়েছে রে? কোন কথা না বলে মান্তু তীরবেগে কোণের দিকে দৌড়ে গেল। একটা ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাগে মান্তুর স্থাবর সমস্ত সম্পত্তি থাকত, সেটা উপুড় করে ফেলল মেঝের ওপর। দ্রুত হাতে অজয়ের ছবিটা টেনে বের করে মিনতির সামনে দাঁড়াল।

মা!

মিনতি ক্লান্ত চোখে মান্তুর দিকে দেখল।

ইনিই তো আমার বাবা। তুমি নাম বলেছিলে অজয়কুমার বসু, তাই না?

মিনতি মোহাবিষ্টের মতন ঘাড় নাড়ল। চেতনা নেই মিনতির। চোখের সামনে যে দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে, তাতে যেন ওর কোন অংশ নেই। মান্তু ওর সন্তান নয়, নিষ্ঠুর নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিতে অচেনা এক অভিনেতা নির্মম অভিনয় করে চলেছে।

কেন তুমি মিথ্যা কথা বললে মা? কেন বললে বাবা আমার বেঁচে নেই।

মান্তু! মিনতির সমস্ত শরীর দুর্বার বেগে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

মান্তু মেঝের ওপর সবেগে মুখ ঘষতে ঘষতে আর্তনাদ করে উঠল, ভাবতে পার এই পোশাকে তাঁর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। লোকের মিথ্যা কাহিনী বলতে বলতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থমকে থেমে গিয়েছিলাম। আমি চিনতে পেরেছি, তাঁর চোখ, তাঁর নাক, তাঁর কপালের ঘাঁচুলটি পর্যন্ত আমার জানা। ওই ছবিটা আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছে। যেটুকু সন্দেহ ছিল, সেটুকু বাইরের বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করতেই দূর হল। কিন্তু এ কি করলে মা, এত বড় একটা সত্যকে এমনি একটা মিথ্যা কথায় সম্পূর্ণ ঢেকে দিলে। যে পরিচয়ের জন্য পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, সে পরিচয়ের পথ নির্মম-ভাবে তুমি কাঁটাগাছ দিয়ে অবরুদ্ধ করে দিলে? তিনি আমায় চেনেন না, তিনি তাই কিছু হারান নি, কিন্তু আমি যা হারালাম, তোমার মিথ্যার জন্য, আমার নিজের তৈরী মিথ্যা কাহিনীর জন্য, তা আর কোনদিন খুঁজে পাব না। সত্যিকার পরিচয় নিয়ে কোনদিন দাঁড়াতে পারব না তাঁর কাছে।

সন্তর্পণে দেয়াল ধরে মিনতি উঠে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য মান্তুকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। মান্তুর মুখ-চোখের চেহারা তার ভাল ঠেকল না। কিন্তু পারল না মিনতি। মান্তু পাঁচ টাকার একটা নোট মায়ের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে চলে গেল।

সারারাত মান্তু এল না। মিনতি চীৎকার করে অনেক ডাকল। শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে এল। কাছাকাছি দু-একটা আস্তানা। কোথাও মান্তু নেই।

মান্তু অবশ্য খুব দূরে কোথাও যায় নি। পরের দিন বিকেলেই তার সন্ধান পাওয়া গেল। সেই এক পোশাক পরনে। দুটো চোখ লাল। পেট পুরে খেতে পায় না বলেই বুঝি অনেক জল খেয়েছে ছেলেটা! এক জন্মের পিপাসা মিটিয়েছে।

যাক, অনেক আবোলতাবোল লিখলাম। ইতিমধ্যেই হয়তো ধৈর্য হারিয়েছেন। আপনার মূল্যবান সময়ের কতখানি অপচয় ভাবতেই আমার নিজের লজ্জা করছে। ক্ষমা করবেন। আমার চিঠিও শেষ হয়ে এসেছে। আপনার কাছে যেটুকু বলার ছিল, মান্তু সেটুকু বলার শক্তিও হরণ করে নিয়ে গেছে। শুধু আপনার পাঁচ টাকার নোটটা ফেরত পাঠালাম। এ টাকা মান্তুর কোন কাজে লাগে নি, এমন কি তার শেষ কাজেও নয়।

প্রণাম দিতেও ভরসা হচ্ছে না। প্রণাম করার যোগ্যতা আমার নেই, নেবার যোগ্যতাই আপনার আছে কি না তাও ভাবছি।

(৫)

ভলাণ্টিয়ারী করতে করতে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম থিয়েটারের স্টেজ আর অডিটোরিয়ামটা। আগাগোড়া সব কাঠের। মঞ্চ কাঠের, অডিটোরিয়ামের দেওয়াল কাঠের, গ্যালারী-চেয়ার ও কাঠের বটেই। মেঝেটা পর্যন্ত কাঠের, ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে, মঞ্চের সামনে প্রথম দিকে খুব ভালো চেয়ার, তারপরে সাধারণ চেয়ার, তারপরে বেঞ্চি আর গ্যালারী। আগাগোড়া টিনের ছিপ্‌টী দিয়ে তৈরী। টিকিটের দাম কত ছিল তা মনে নেই। এগজিবিশনের সব বাড়ীর মতনই যেমন মাটি থেকে ৮।৯ ইঞ্চি উঁচু করা [illegible] মতন ছিল, থিয়েটারের প্রায় [illegible] সামনে [illegible] তেমনি ছিল ৮।১০ ইঞ্চি উঁচু করা [illegible] চওড়ায় ৬।৭ ফিট [illegible] কাঠের তৈরী [illegible] ইঞ্চি উঁচু [illegible] ওপরে [illegible]। [illegible] কাঠের [illegible] এগজিবিশন [illegible] যেন কাঠের [illegible], যেন এক [illegible] দেখলে মনে হয় কাঠের [illegible] এক নগরী। কোনো কোনো জায়গায় [illegible] কাঠের ওপর বাহার করবার জন্য [illegible] পার্টির [illegible] করা ছিল, কোথাও বা সম্পূর্ণ মানুষ। এই পার্টি আর [illegible] এসেছিল বলতে গেলে সারা বাংলাদেশ থেকে। সত্যি কথা বলতে কী আরও কত এগজিবিশন দেখেছি, এত জাঁকজমক দেখিনি কোথাও।

এদিকে, নলদময়ন্তী—অমরেন্দ্রনাথ-কুসুমকুমারী, এসব নামের রঙীন প্লাকার্ড দেখলাম, কাঠের সুন্দর মঞ্চও দেখলাম, কিন্তু অভিনয় আর দেখা হল না। বেলা-বেশি শুরু হলে হয়ত-বা একটু চেষ্টা করে দেখা যেত। শুরু হবে শুনলাম যাকে বলে সেই রাত্রে। অতএব বৃথা চেষ্টা! ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

এগজিবিশনে শুধু থিয়েটারই বা কেন, টুকরো টুকরো ফিল্মও দেখানো হয়েছিল। আর নহবতে বাজতো সানাই। আমাদের চন্দ্রনাথ চাটুজ্জে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম সেই সানাইয়ের কম্পিত সুর-বিস্তার। সেদিনকার কৈশোর মনে সে যে কী মোহ সঞ্চার করত, তা বলার নয়।

এগজিবিশনের ভিতরে পশ্চিমধার ঘেঁষে যে পুষ্করিণীটা ছিল বলেছি, তার চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে সুইস ব্যাক রেলওয়ে বা আলপাইন রেলওয়ে তৈরী হয়েছিল, সে-ও এক অভিনব বস্তু। ২৫।৩০ ফিট উঁচু একটা টাওয়ার তৈরী হয়েছিল। তার থেকে ঢালু করে বরাবর দুটি লাইন পাতা নীচে পর্যন্ত। এই লাইনের ওপরে ঘরঘর করে যখন গাড়ি নামছে, তখন সে এক রীতিমত দেখবার জিনিস। হুডখোলা পুরানো মোটরগাড়ির মতন দেখতে ক্ষুদে সাইজের, মোট চারজন বসতে পারে। এক-একবার এক-একটা করে ছাড়ত, নইলে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে। ঐ যে টাওয়ারের কথা বললুম, ওটা ছিল ঘেরা। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। নীচেকার কোনো কোনো ঘুল-ঘুলি দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আমরা দেখতাম কী, মেঝের নীচে ৫।৬ জন কুলি ঘানির মতো করে ঘূর্ণিযন্ত্রটা ঘোরাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাক খেতে খেতে গাড়ি উঠছে একেবারে প্রকাণ্ড চাকতিটার ওপরে। এক-একবার শব্দ হচ্ছে ঘড়াং করে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতুম, গাড়ি চাকতি থেকে এবার প্যাসেঞ্জার-সুদ্ধু লাইনের ওপরে পড়ল। অমনি উৎসুক হয়ে উঠতাম আমরা, ঐ আসছে রে ঐ আসছে!

বড়দের সঙ্গে গাড়িতে কখনো সখনো ছোট বয়সের ছেলেমেয়েদের দেখতাম, খুব ছোট নয়, বালক-বালিকা বলা যেতে পারে। সাহেব-মেমও থাকত। তবে খাঁটি সাহেব খুব কম, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই বেশী। গাড়ি আসছে ওপর থেকে নীচে আঁকা-বাঁকা পথে, উঁচু-নীচু হয়ে, কোথাও বা লাফিয়ে উঠল, মনে হল, এই গেল বুঝি সবসুদ্ধ উল্টে! কিন্তু উল্টাতো না, কখনো কোনো দুর্ঘটনার কথা শুনিনি। সেই উপর থেকে নীচে বেঁকে বেঁকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে গাড়ি দুরন্ত গতিতে, ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে ভয়েও বটে, উল্লাসেও বটে। দেখবার মতই দৃশ্য! কিন্তু চড়বার উপায় আমাদের নেই, প্রতিটি সীটের মূল্য ছিল পাঁচ টাকা করে। কোথায় পাবো তখন টাকা? তাছাড়া, ওটা আমাদের কাছে একটা ভয়েরই ব্যাপার ছিল। দূরে দাঁড়িয়ে হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি শুধু, চড়বার সাধও হয়নি, সাধ্যও ছিল না।

এগজিবিশনে আরও মজার জিনিস ছিল। ছিল মেরী-গো-রাউণ্ড। একটা বড় কাঠের চাকতির ওপরে কাঠের ঘোড়া বসানো, হাতি বসানো, বাঘ বসানো, সিংহ বসানো, আবার খুদে মোটরগাড়িও বসানো। সবগুলিতেই লোক বসিয়ে চাকতিটা ঘুরতে থাকত। সেই সঙ্গে মোটরগুলি স্থির আছে, কিন্তু ঘোড়া-হাতি-বাঘ-সিংহ যে যার জায়গায় প্যাসেঞ্জার-সুদ্ধ উঠছে আর নামছে। এতে অবশ্য বড়দের সঙ্গে ছোটদেরও ভিড় হত।

আবার, পুষ্করিণীতে হয়েছিল "ওয়াটার ট্রাইসাইকেল।" তিনটে ছোট নৌকোমতন জিনিস করেছে; কিন্তু বেশ উঁচু, সাধারণ ট্রাইসাইকেলের তুলনায় তবে উঁচু বলা

যেতে পারে। ট্রাইসাইকেলের মতো পা দিয়ে প্যাডল্ করতে হত করলেই তিনটি চাকার বদলে তিনটি ছোট নৌকো অমনি একসঙ্গে জল্ কেটে জল ছিটিয়ে সর সর করে চলত এগিয়ে।

আর ছিল—গামলা। গামলাতে চড়ে দাঁড় টানতে হত। এক-একজন লোক তাতে বসবে শুধু। সে-ও কম মজার নয়। মাটির গামলা। পূর্ববঙ্গে নাকি কোথাও কোথাও ঐ ধরনের গামলায় বসে দাঁড় টেনে খাল-বিল পার হওয়ার রীতি ছিল।

কুটির-শিল্পের ভালো ভালো নিদর্শন সেদিনকার এগজিবিশনে দেখেছিলাম মনে আছে। মেয়েরা পাঠাতেন। মিহি করে কাটা সুপুরীর কথা আগেই বলেছি, বিরাট বিরাট লাউ-কুমড়োর কথাও বলেছি, যা বোধ হয় বলি নি, তা হচ্ছে চিঁড়ের মতো সূক্ষ্ম করে কাটা নারিকেলের কথা। নানা-রকম ছাঁচে-তোলা আমসত্ত্বের কথা। আর বলি নি, কাঁথার কথা। বিচিত্র ধরনের বিচিত্র নক্শা-তোলা কাঁথা। খেলনাই বা ছিল কতরকম! পাথরের, ধাতুর, গালার, সোলার ও মাটির। ভিড় হত প্রচুর। লোকে লোকারণ্য। আর এগজিবিশনও এত বড়ো যে, তিন-চার ঘণ্টাও ঘুরে শেষ করা যায় না। সঙ্গে যদি মেয়েদের কেনা-কাটা থাকে ত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, তার কমে কিছুতেই হবার নয়।

এসব ছাড়া ছিল যাত্রা, ছিল তরজা আর কবি-গান। ময়ূরপঙ্খীর নাচ। পুকুরে নৌকো সাজিয়ে ভাসান। তার ওপরে গানের দল বসে গান গাইছে। বাস্তবিকই মনটাকে মাতিয়ে তোলবার মতো জিনিস।

শুনেছি, ১৮৮০ সালে হয়েছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ এগজিবিশন যাদুঘরের সামনের মাঠটায়। রাস্তার এপার-ওপার করার জন্য নাকি চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে ওভারব্রীজ পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল। তারপরেই নাম করা যেতে পারে এই এগজিবিশনের—যার কথা এতক্ষণ বললাম। এত বড় এগজিবিশন তখন আর হয় নি। কলকাতায় তখন বাড়ির সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী নয়। মফস্বল থেকে প্রায় প্রতি সংসারেরই আত্মীয়স্বজন এসে ভরিয়ে ফেলেছে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ আর উত্তরবঙ্গ থেকেই লোক এসেছে বেশী। কী ব্যাপার? না, স্বদেশী এগজিবিশন দেখতে হবে।

স্বদেশী যুগের সে এক অদ্ভুত উন্মাদনার দিনই গেছে, বটে! বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে চলেছে গানের দল। কখনো তারা গাইছে অতুলপ্রসাদের গান, কখনো বা রবীন্দ্রনাথের গান। হঠাতই বা কোথাও ধ্বনি উঠতো, বন্দেমাতরম্। অমনি পুলিসের দল যেন ক্ষেপে উঠত। তখনকার দিনে 'বন্দেমাতরম্' ছিল পুলিস-ক্ষ্যাপানোর মন্ত্রও বটে। হিন্দুস্থানীরা ব্যঙ্গ করে বলত, বাঙালীর মাথা গরম,—একথা আগেই বলেছি। বহিঃপ্রদেশের সাধারণ লোকেরা এই ধ্বনিটির ব্যাপারে ততটা সমব্যথী ছিলেন না তখন। তখন বাঙালীর মত্ততাই ছিল অনুভব করবার মত। যেন হঠাৎ একটা মহাসমুদ্র উত্তাল হয়ে চারিদিক কলকল্লোলে ভরিয়ে তুলেছে। পুলিসের লাঠিচার্জও ছিল তখন বিলক্ষণ।

এইভাবে সারা কলকাতা শহর একেবারে মেতে উঠেছে, এমন দিনে লর্ড কার্জন চলে গিয়ে এলেন লর্ড মিণ্টো। তাঁর সম্মানে Minto-Fete বলে আর একটা এগজিবিশন হলো মনুমেণ্টের নীচে, প্রধানত সাহেবদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু সেটা তেমন যেন জমল না। নতুন লাটের সম্মানে ফুটবল টুর্নামেণ্টও হয়েছিল। ডালহাউসী-ক্যালকাটার তখন কী নাম! তারা ত টুর্নামেণ্টে ছিলই, ভারতের বিভিন্ন নামকরা মিলিটারী টিমগুলিও এসেছিল। আর ছিল আমাদের মোহনবাগান। সেদিনকার দুর্ধর্ষ ক্যালকাটাকে মোহনবাগান কিন্তু হারিয়ে দিয়েছিল। তখনকার নামকরা খেলোয়াড় প্রফুল্ল বিশ্বাস খেলতেন ন্যাশনাল ক্লাবে। তাকে মোহনবাগান দলে নিয়েছিল বলে মোহনবাগান 'স্ক্র্যাচ' হয়ে যায়। অতএব জয়টা আর জয় গিয়ে দাঁড়াল না। আমি নিজের চোখে অবশ্য দেখি নি, শুনেছি। Minto-Fete দেখি নি, ফুটবল ম্যাচও দেখি নি। তবে এটুকু বলতে পারি, সেবার এ তিনটি জিনিস—কংগ্রেসের সভা, স্বদেশী এগজিবিশন ও Minto-Fete কলকাতায় বেশ মাতনের জিনিসই হয়েছিল বটে!

তারপরে ক্রমশ দেখা গেল ঐ স্বদেশী ভাবধারা দেশে একটি রীতিমত প্লাবন এনে দিলো। দু-তিন বছরের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া যা হয়ে দাঁড়ালো, তা-ও আমাদের জাতীয় জীবনে কম আলোড়ন আনে নি। মজঃফরপুরের বোমা-কেস। মাণিকতলার বোমা-কেস। ধরপাকড়। সে-ও এক নিদারুণ উত্তেজনা। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী। তারপরে জেলের মধ্যে নরেন গোস্বামীকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে কানাইয়ের গুলি করে মেরে ফেলা।

তখন কিংসফোর্ড বলে এক কড়া ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। 'বন্দেমাতরম্' বলেছ, কি পিকেটিং করেছ ত অমনি জেল, তার আর কোনো ডিফেন্স নেই। বাঙলা কাগজে কিংসফোর্ডকে ঠাট্টা করে ছড়া বেরতো,—

মাই নেম ইজ কিং ফর্দ
আই অ্যাম এ গ্রেট মর্দ!

রাজনৈতিক আন্দোলন আর তার ফলাফলের কথা ঐতিহাসিকরা বলবেন, আমি শুধু আমার শৈশবকালীন যুগের আবহাওয়ার ইঙ্গিত দিতে প্রয়াস করছি মাত্র। ঐসব গান-গাওয়ার দল, পিকেটিং-

এর দল, ওসবের মধ্যে না ভিড়ে যাই, তাই স্কুলের পর বাড়িতেই আটকা পড়তে লাগলাম বাবা-মায়ের শাসনে। বাড়িতে আছি, সংগী ঐ এক তারাপদ। গুলি খেলতে জানতাম না, ঘুড়িও ওড়াতে পারতাম না। তারাপদ ঘুড়ি-লাটাই কিনে আনত মার কাছ থেকে আমার নাম করে পয়সা নিয়ে। দামী দামী সব ঘুড়ি আর লাটাই। কত তার আয়োজন আর আড়ম্বর। ধরাই দিত তারাপদ, কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোর বিদ্যায় যেমন সে বিশারদ, তেমনি আমি। আমাদের ঘুড়ি আর আকাশে কোনদিন উড়লো না! আজ মনে পড়ে, তারাপদকে সেদিন কত না তাক্ত করেছি! পাঁচ ফুট কি ছয় ফুট উঁচু একটা ট্রাঙ্ক ছিল আমাদের। সেই ট্রাঙ্ক থেকে আচমকা ওর কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। মোটাসোটা মানুষটি ছিল। হয়ত বেশ লাগত। সে বলে উঠত, আঃ! কিন্তু পরক্ষণেই ফেলত হেসে। বলত, ছাদে যাবে না ঘুড়ি ওড়াতে?

ও আমাদের ছিল চাকর-খানসামা—একাধারে সব। কাপড় কোঁচাতে শিখেছিল ভাল। পাড়ার লোকেদের কাপড় কুঁচিয়ে দিত। শনিবারের সপ্তাহ-শেষে নতুন জামাইদের শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে, ধরল এসে তারাপদকে—ও তারাপদ?

তারাপদ অপ্রসন্ন মুখে প্রত্যুত্তর করত,—কেন?

—দাও না ভাই ধুতিখানা একটু কুঁচিয়ে।

তারাপদর মুখভার তখনো প্রসন্ন হয় নি। সে প্রথমটায় বিড় বিড় করে কী যেন বলে উঠত। পাড়ার ছেলেদের ওপর সে খুব প্রসন্ন ছিল না। তার কারণ, তারাপদ মোটাসোটা মানুষ ত, ওর পা দুটি স্বভাবতই একটু মোটা ছিল, ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষ্যাপাতো 'হাতিবাবু' বলে। এটা শুনলে সে ভীষণ রেগে যেত। আর সে যত রাগছে, ছেলেরা তত ক্ষ্যাপাচ্ছে—

হাতির গোদা গোদা পা,
হাতি তামাক খেয়ে যা।

তারাপদ অবশ্য তামাকও খেত। অথচ এই তারাপদকেই একটু মিষ্টি সুরে ডাকলে বা কথা বললে তারাপদ গলে একেবারে জল! তার এ স্বভাবের সংগে পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবিশেষ পরিচিত ছিল। তাই একটু খোসামোদের সুরে পাড়ার নতুন-জামাই-হওয়া ছেলেরা বলতো, তোমার মতন সুন্দর কাপড় কোঁচাতে পারে এ তল্লাটে আর কেউ নেই, বুঝলে তারাপদ?

তারাপদর ঠোঁটের কোণে অমনি হাসির রেখা উঠত ফুটে এবং বলা বাহুল্য, শুরু হলো তারাপদর বাড়তি কাজ। এ কাজ সে হাসিমুখে কত করেছে, কিন্তু সেজন্য তার হাতে তুলে তাকে কেউ কখনো কিছু দিয়েছে, এমন ঘটনা ত মনে পড়ে না!

বাড়ি থেকে বেরুবার হুকুম নেই। তবু ক্রমশ বড়ো হচ্ছি, একটু একটু করে খেলতে যাবার অনুমতিও পাচ্ছি। খেলা দেখতে যাবার অনুমতিও। তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরী হয় নি, শুধু শুনতাম তার ভিত হচ্ছে। কতো বছর ধরে যে হবে তা বুঝতে পারতাম না। শুধুই শুনে আসছি ভিত হচ্ছে। ঠিক যেটুকু মেমোরিয়ালের শ্বেত-মর্মর প্রাসাদ, সেটুকু ঘিরে চারিদিকে টিনের বেড়া ঘন করে লাগানো, তার ভিতরে যে কী কাজ হচ্ছে, কতটুকু কাজ হচ্ছে, তা জানবার উপায় আমাদের ছিল না। অনেক কাল ওভাবে টিনের বেড়া পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। এরই পুব দিকের পুকুরটার নাম ছিল 'হাবিলদার-ট্যাংক'—বেশ শান-বাঁধানো, লোকে আসত স্নান করতে। দুপাশে ছিল দুটি ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড বটগাছ। আর ওদিকে চার্চের সামনে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ, তাকে তখন লোকে বলত চার্চফিল্ড। এই ফিল্ডের অর্ধেকটা আজও পড়ে আছে, বাকী অর্ধেকটা চলে গেছে মেমোরিয়ালের বাগানের ঘেরের মধ্যে। এই চার্চফিল্ডে কত দৌড়ঝাঁপ করেছি, কত ফুটবল খেলেছি। ফুটবল খেলার নেশা ছিল, কিছুটা দক্ষতাও ছিল, পরবর্তীকালে ভাল দৌড়তে পারতুম বলে খ্যাতিও

প্রেসিডেন্সী কলেজ ক্লাবও খুব ভাল খেলত ফুটবল। ইলিয়ট শিল্ডের চ্যাম্পিয়ন ছিল। ট্রেডস-এর একটা ম্যাচ খেলতে গিয়ে সুধীর চ্যাটার্জী মশায়ের পায়ে নিদারুণ আঘাত লাগে একবার। যে ইস্কুলে আমি পড়তাম, সেই লণ্ডন মিশনারী স্কুলেই অধ্যাপক ছিলেন এই সুধীর চ্যাটার্জী। স্কুলের ক্লাসেও মাঝে মাঝে পড়াতে আসতেন। ইনি খেলতেন ব্যাকে, মোহনবাগান টীমে। রবারের পারফোরেটেড করা পট্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে নিতেন হাঁটুতে ঐ আঘাতটা লাগবার পর থেকে। ১৯১২-১৩ সাল পর্যন্ত ইনি খেলেছিলেন। দু'পায়েই খেলতে পারতেন, অর্থাৎ দু'পায়েই সমান 'শট' ছিল। বুট পায়ে খেলতেন। মোহনবাগানের তদানীন্তন একমাত্র বুটেড খেলোয়াড়।

আই এফ এ শীল্ড তখন মিলিটারী টীমগুলিই বেশী খেলত। ট্রেডস-এ, [illegible]-এ সব দেশীয়দের ভিড় হত, আই এফ এ-তে অত হত না। গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স প্রথম কলকাতায় এল সেবার। থাকত ফোর্টে। কাস্টমস-এর সঙ্গে খেলে শিল্ড নিলো। পর পর দু'বছরই নিয়েছিলো। তৃতীয় বারের বার তারা [illegible] বাইরে [illegible] হয়। [illegible] এল [illegible]। [illegible], তৃতীয় বারেও তারা শিল্ড নিয়েছিল।

আই এফ এ-তে [illegible] টিম ছিল [illegible] আর [illegible] দল। [illegible] মোহনবাগান তখনো আসে নি। স্থানীয় ইউরোপীয়ান দলগুলি খেলত। ক্যালকাটা, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] আর [illegible] কি [illegible] মিলিটারী টিম। [illegible] শীল্ডের [illegible]। [illegible] [illegible] শীল্ড। [illegible] [illegible] মিলিটারী [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ২০।২২ দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যেত আই এফ এ শীল্ডের টুর্নামেন্ট।

শীল্ডের ফাইনালের দিন এস্‌প্লানেড এক লাইন [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে শুধু, কিছু [illegible] [illegible] [illegible], আর সব দর্শক [illegible] বাইরে দাঁড়িয়ে। [illegible] দিক থেকে [illegible] তো কিছুই নয়। চ্যারিটি ম্যাচও কিছু হত। ইংল্যাণ্ড-স্কটল্যাণ্ড ওয়েলস চ্যারিটি। মিলিটারী ভার্সাস সিভিল টিমের খেলার চ্যারিটি।

১৯০৯ সালে মোহনবাগান প্রথম আই এফ এ শীল্ডে যোগ দিয়ে বাঙালীর কিছুটা দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। সেবার অবশ্য মোহনবাগান হেরে গেল গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্সের কাছে। সে ম্যাচটির কথা কিন্তু বেশ মনে আছে। রেঞ্জার্স মাঠে খেলা। রেঞ্জার্সের বোর্ডের সামনে সেই মাঠ। মোহনবাগান, মানে আমাদের স্কুলের অধ্যাপক-মশাই খেলছেন যে-টিমে, সেই টিমের খেলা, আমাদের উদ্দীপনা কি কম? মাঠটা ছিল পুব-পশ্চিমে লম্বা। এক পশলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গেল—মাঠের কোণায় কোণায় জল—পারবে কি আমাদের টিম জিততে? পারল না। গর্ডনরা সত্যি কথা বলতে কী, বড়ো মারধোর করে খেলত। বেশ গোঁয়ার্তুমি ছিল ওদের। ক্যালকাটা টিম ছিল ভদ্র—তাদের একটা ইজ্জত ছিল। কিন্তু ওরা ছিল ভীষণ rough; Customsও rough ছিল, কিন্তু Gordon ছিল যেন আরও বেশী। Customs-এ আর Gordon-এ যখন ম্যাচ্‌ হ'তো, তখন ছিল দেখবার! একেবারে ঠিক যেন কাঠে-কাঠে পড়েছে! যাই হোক, মোহনবাগান সেদিন সেই ভিজে মাঠে দাঁড়াতে পারেনি না। ৩—১ গোলে জিতে গেল গর্ডন।

মোহনবাগান শীল্ডে আসবার পর থেকে মাঠে ভিড় হতে লাগল খুব। তখন বাইরে থেকে ম্যাচ দেখবার রীতিও দাঁড়ালো বেশ! চৌকি আনছে- টুল আনছে—পেতে-পেতে সব দেখছে। পুলিস অবশ্য আপত্তি করত না। বড়ো-বড়ো বাক্সও মাথায় করে নিয়ে আসতো লোকেরা। যারা দেখতে চাও, মাথা পিছু আট আনা, এমন কি কখনো-কখনো এক টাকাও দর উঠত, বাক্সের ওপর উঠে দাঁড়াও নাও সেই মাথায়-করে বাক্স-আনা লোকটাকে, তার খুশিমতো ম্যাচ্ দেখ।

১৯১০ সালে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে খেলা। এই ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড-এর কেয়ার-টেকার ছিলেন তখনকার নাম-করা খেলোয়াড় Clayton সাহেব। কী তদ্বিরই না করতেন মাঠের! বৃষ্টি হলে মালীদের দিয়ে কাঠের পাটা দিয়ে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে টেনে জল নিকেশ করতেন। গোলপোস্টের কাছে কাদা হয়েছে, saw dust ছিটিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, সেদিন খেলায় প্রচুর লোক হয়েছে। রাইফেল ব্রিগেডের সঙ্গে মোহন-বাগানের খেলা। ইডেন গার্ডেনের দিকে গ্যালারী ছিল, তাতে বসে দেখছিলাম। কিন্তু বাক্সে উঠে লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল, সেখানে ঘটল বিপর্যয়। মড়মড় করে বাক্স ভেঙে পড়ল যেন কোথায়। পড়ে গিয়ে জখমও হল দু'চারজন। তাই দেখে পুলিস আপত্তি করতে লাগল বাক্স পাতার ব্যাপারে। এরা দেবে না পাততে, তারাও ছাড়বে না। অবশেষে মারধোর করতে শুরু করল পুলিস। খানিকটা কাজ হল। কিন্তু তারপর শুরু হল সেখানে এক মজার খেলা। এরা এসে পাতছে, পুলিস এসে তাড়া করছে। তাড়া খেয়ে ওরা পালাচ্ছে, পুলিস একটু সরে যেতে আবার এসে পাতছে। আবার তাড়া, আবার পালানো। খেলা দেখবার একমাত্র আকর্ষণ ছিল কিন্তু মোহনবাগান। অথচ, মোহনবাগান হেরে গেল রাইফেল ব্রিগেডের কাছে। ওরা দুর্ধর্ষ মিলিটারী, তার পায়ে বুট, একেবারেও বাঁশি হয়ে মাঠ ছিল ভিজে। তার ওপরে গায়ে-গায়ে ঠেলা-

ঠেলি, মারধোর তো আছেই, তা নইলে আর মিলিটারী টিম কিসের? আর, তাদের সঙ্গে লড়ছে নগ্নপদ মোহনবাগান, বুট পায়ে একটিমাত্র লোক, তিনি ওদের ব্যাক্—সুধীর চ্যাটার্জী মশায়—আমাদের অধ্যাপক।

এই মোহনবাগান অবশেষে খেলায় জিতে শীল্ড নিলো ১৯১১ সালে। সেকেণ্ড রাউণ্ডে রাইফেল ব্রিগেডকে হারিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যেন নতুন আশার সঞ্চার হলো। সেমি-ফাইনালে খেলা মিড্‌লসেক্স-এর সঙ্গে। প্রথমদিন 'ড্র' গেল, দ্বিতীয় দিনে কী হয় কে জানে! ওদের গোলকিপার পিগট্ কপালে হঠাৎ চোট খেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে এলো সে কী উত্তেজনা। মিলিটারী টিমটা যেন ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু জিত হল মোহনবাগানেরই। এবার ফাইনাল খেলা ইস্ট ইয়র্কের মত নামজাদা টিমের সঙ্গে। তবে, ভদ্র টিম। আমাদের যাবার উদ্যোগ সব ঠিক। কিন্তু ম্যাচ দেখতে কী আর পারব? উত্তর দিকে তখন অল্প গ্যালারী করে দিয়েছে বটে, তবে সে আর লোক-আন্দাজে কতটুকু? চেয়ারের মূল্য দু'টাকা করে। প্রচুর ভিড়। কেল্লার র‍্যামপার্টের ঢালু জমিতে কয়েক হাজার লোক। সাইকেল জড়ো করে, তার ওপরেও দাঁড়িয়ে লোক। হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। খেলা তখনো আরম্ভ হয়নি। কিন্তু কী সর্বনাশ, দাঁড়াবো কোথায়? অবশ্য এখনকার মতো লোক হয়নি, কিন্তু তখনকার দিন-আন্দাজে লোকে লোকারণ্য বলা চলে। কেল্লার র‍্যামপার্ট আর ক্যালকাটা মাঠের মাঝে একটা খানা ছিল, সেটা এখনো আছে। তার ঢালুর ধারে দাঁড়িয়ে কোনমতে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাঠের পূব দিকে বাক্সের ওপর দাঁড়ানো কম ভিড় হয়নি লোকের! দক্ষিণ দিকটা খালি—কিন্তু ৬।৭ সারি লোক। প্রথমেই গোল দিলে ইস্ট ইয়র্ক—সাহেবদের সে কী সমবেত উল্লাস-ধ্বনি! দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল গোরাদের গ্যালারী। ঠিক দক্ষিণে কোনো গ্যালারী ছিল না। পূর্বদিকে বাক্স সাজানো রয়েছে। খুবই উঁচু বাক্স। দু'মানুষ সমান উঁচু বাক্স বয়ে নিয়ে গেছে। দাম নিচ্ছে চার-পাঁচ টাকা করে। মোহনবাগান গোল খেয়ে গেল দেখে মনমরা হয়ে খানার এপারে চলে এসেছি, এমনি সময় উঠল প্রচণ্ড এক চিৎকার—গোল—গোল!

কী ব্যাপার? না, মোহনবাগান গোল দিয়েছে।

আর যায় কোথায়! হাতের ছাতা, পায়ের জুতো, সব শূন্যে উঠতে লাগল। প্রচণ্ড আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে সবাই জুতো আর ছাতা ছুঁড়ছে! আর সঙ্গে সঙ্গে কোথেকে যেন অনেকগুলো বল্ এখানে ওখানে ছিটকে পড়ল দুড়দাড় করে!

আমাদের আর যাওয়া হলো না, আমরা মানে, দাদা আর আমার এক বন্ধু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছি কিন্তু দেখব কী করে? যেখানটায় আগে দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা তো ভর্তি হয়ে গেছে! এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি এবং চাঁইপাঁই করছি দেখে হঠাৎ একটা বাক্সের ওপর থেকে একজন ডাকল। চিনি না। বলছে কী দেখতে পাচ্ছেন না? আসবেন? সেই ছাতা-দেওয়া লোকটি ওদিকে কোথায় দাঁড়িয়ে পাড়ে খেলা দেখছি, এইবেলা উঠে আসুন।

এবং দাদা দাদা আমাদের দুজনের হাত ধরে ওপরে তুলে নিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা মোহনবাগানকে দ্বিতীয় গোলটি দিতে দেখলুম। মোহনবাগান জিতেছিল ২—১ গোলে।

বাড়ি ফিরছি সেদিন ভিড় ঠেলে-ঠেলে। লোকের কী উল্লাস! কোথায় যে কার ছাতা চলে গেছে, কোথায় যে কার জুতো চলে গেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই কারুর!

স্বদেশী এগজিবিশন হয়েছিল যেখানটায়, সেখানটা তখন কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ছিল। সবাই করত কী, তার ভিতর দিয়ে গলে যেত। তখন ভবানীপুর-কালীঘাট থেকে ট্রামে করে ডালহৌসী যেতে ভাড়া ছিল ফার্স্ট ক্লাশ—দু আনা, সেকেণ্ড ক্লাশ—পাঁচ

পয়সা। লোকে অফিসে যেত ট্রামে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফিরে আসত হে'টে। সেদিন দেখি, একটি লোক কাটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে পথ সর্ট-কাট করে কালি-ঘাটের দিকে চলেছে 'জয় মা কালী' বলতে বলতে।

আমরা তার ভাবভংগী দেখে কৌতূহলা-ক্রান্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী ব্যাপার মশাই ?

মশাই বললেন, মোহনবাগান জিতেছে। মার কাছে পুজো দিতে চলেছি। মানত করেছিলুম যে!'

আমরা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তখনো তাকিয়ে আছি দেখে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আরে ভাই, আমি কারখানার হেড মিস্ত্রী। আমার ফোরম্যান হচ্ছে ফিরিঙ্গী। সে বলেছিল—মোহনবাগান হেরে যাবে। তার সংগে বাজী ধরেছিলুম! মা-কালী মুখ রেখেছেন, বাজী জিতেছি। তাই মানত রক্ষা করতে যাচ্ছি। ফিরিঙ্গীটা বড্ড হেনস্তা করতো, বুঝলেন!'

ভদ্রলোক সেই উত্তর কলকাতার লোক! কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফিরে যাবেন সেই উত্তর কলকাতায়! তখনকার দিন! ব্যাপারটা সহজ নয়!

ঐ ১৯১১ সালেই আমি ভালো খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেছি। ভালো দৌড়ুতুম বলে টীম আমাকে ফরোয়ার্ড লাইনেই খেলতে দিত, উইংসে খেলতুম সাধারণত। কিন্তু সেবার ইলিয়ট শীল্ডের খেলায় আমাদের লণ্ডন মিশনারী স্কুল-এর খেলা পড়ল দুর্ধর্ষ প্রেসিডেন্সী কলেজ টীম-এর সংগে। তখন আমার বয়স ১৬।১৭ হবে। আমাকে দিলে সেবার সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে। খেলছি মন-প্রাণ দিয়ে। এক সময় একটা বল ডান উইং থেকে সেণ্টার করেছে—দেখছি বলটা আসছে একটু উঁচু হয়েই—প্রায় বুকে সমান উঁচু হবে—ওটা আমি ধরব—ধরা শক্তও হবে না, দেখি একজন প্রেসিডেন্সীর খেলোয়াড় আসছে তীরবেগে ছুটে বলটা ধরতে। এতো জোরে আসছে যে, প্রচণ্ড ধাক্কা লাগতে পারে। তাই পিছিয়ে গিয়ে পায়ে না ধরে বল হেড করব ঠিক করলাম। হেডও করলুম, আর সংগে সংগে অনুভব করলুম, যে খেলোয়াড়টি ছুটে আসছিলেন, মুখ তাঁর খোলা ছিল, সেই খোলা মুখের দাঁত বসে গেছে আমার মাথায়—ব্রহ্মতালুর কাছটাতে। আমি পড়ে গেছি, তিনিও পড়েছেন আমার ওপরে। রেফারী ছিল সেণ্ট জেভিয়ার্সের একজন পাদ্রী সাহেব। তিনি হুইসেল বাজিয়ে ফাউল দিলেন। আমরাই শট করব। খেলোয়াড়টি আমার ওপর থেকে উঠে গেলেন, আমি উঠতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথায় যেন টান পড়ল, শির যেন টেনে ধরেছে। চোখ তুলে দেখি, রেফারী পাদ্রীসাহেব আমার দিকে থ হয়ে তাকিয়ে আছেন। ঘাড়টা শক্ত হয়ে আছে দেখে ঘাড়টা ধরে মাথাটা সোজা করব, ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি, গরম গরম ঠেকছে, হাত চোখের সামনে এনে দেখি, হাত একেবারে রক্তে রাঙা! ক্যাস্টমস্ মাঠে খেলা হচ্ছিল। ক্যাস্টমস্-এর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুধীরবাবু। চেঁচিয়ে বললেন,—বেরিয়ে এসো মাঠ থেকে।

আমি দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে মোহনবাগানের তাঁবুতে। মাঠের উত্তর-পূর্ব দিকে রাস্তা পার হয়ে যেতে হত প্রেসিডেন্সী-মোহন বাগানের তাঁবুতে। সেই তাঁবু, তখন ছিল প্রেসিডেন্সী আর মোহনবাগানের। তাঁবুর ভিতরে বসেছিলেন তখনকার মোহনবাগানের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিজয় ভাদুড়ী। তিনি আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। আমাকে বসিয়ে ফার্স্ট এড দিলেন দুজনে মিলে, আমার মাথার ক্ষত-স্থানের চারপাশটা কামিয়ে দিয়ে। তারপর সুধীরবাবু বললেন,—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালে চলো।

মুহূর্তে আতংকিত হয়ে উঠলাম,—না-না স্যার, হাসপাতালে যাবো না! বলে, তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছি, সংগে সংগে মনে হল, মাথার মধ্যে যেন আগা-গোড়া বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারপরে, আর কিছু আমার মনে নেই। সমস্ত আলো যেন মুহূর্তে নিভে গেল আমার চোখের সামনে থেকে! (ক্রমশ)

সারাদিন ভোরের মত স্নিগ্ধ ও সজীব
রাখে—
পণ্ড্‌স
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
সারাদিন স্নিগ্ধ ও সতেজ থাকতে হলে
স্নানের পর পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডার
ব্যবহার করুন!
পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডার ভারি
কোমল, মিষ্টি গন্ধে ভরপুর ও ঘাম
শুষে নেয়—এতে দিনভোর ঝরঝরে ও সতেজ
মনে হবে!

লড়াই না খেলা

মদন ঘোষ
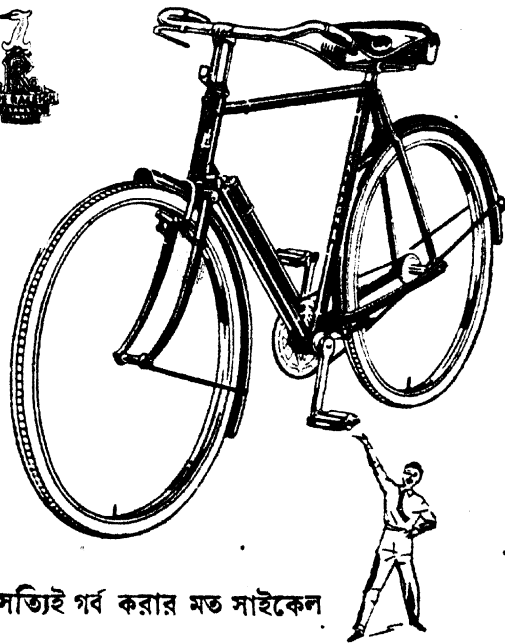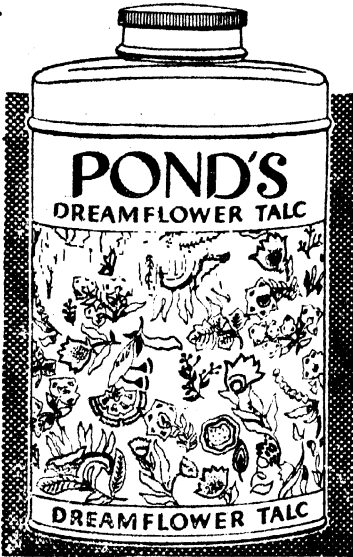
বর্ধমানের কথা উঠলেই যেমন মিহি-দানা-সীতাভোগের কথা ওঠে; স্পেনের বেলায় তেমনি ওঠে "বুল-ফাইট" বা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা।

শেষ পর্যন্ত যখন নেহাতই ঠিক করে ফেললুম কিছুদিনের জন্যে স্পেনে বেড়াতে যাব, তখন আমার ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবরা প্রশ্ন করতে লাগল, "বুল-ফাইট দেখতে যাবে ত?" তার উত্তর দিতুম গাঁই-গুঁই করে। সত্যি কথা বলতে কি, ও লড়াই-টড়াই দেখার ইচ্ছে আমার আদপে ছিল না। ছোরা-ছুরি বা রক্ত দেখা আমার ধাতের একেবারে বাইরে।

স্পেনের অনেক বড় বড় শহরে ঘুরলুম। বার্সিলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, গ্রানাদা, মাদ্রিদ ইত্যাদি। অনেক জায়গায় অনেক কিছু দেখলুম কিন্তু ঐ বুল-ফাইটটি শুধু বাদ। শেষপর্যন্ত হয়ত বাদই থেকে যেত; যদি সেভিলিয়ায় অমন অঘটন না ঘটত।

খুঁজে খুঁজে এক কানাগলিতে এক 'পেনসিয়ন' (সস্তা বোর্ডিং হাউস) বার করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল দুটো। প্রথমত, সস্তায় থেকে খেয়ে কিছু পয়সা বাঁচানো আর দ্বিতীয়ত দিশী লোকেদের একেবারে মাঝখানে থেকে খুব কাছ থেকে ওদের জীবন-যাত্রা প্রণালী নিরীক্ষণ করা। বড় বড় হোটেলে উঠলে এ সুযোগটুকু ঘটে না। মুশকিল বাধল ভাষা নিয়ে। আমার স্প্যানিশ ভাষায় বিদ্যে একেবারে ঢুঁকিস্যু-না'র চেয়ে একটু ভালো। তাতে ব্যাপারটা দাঁড়াল অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী রূপে। পেনসিয়নের মালিককে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না আমার বক্তব্য। বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক তখন ভিতরে গিয়ে এক ইংরিজী-জানা লোককে ডেকে আনলেন দোভাষীর কাজ করার জন্যে। সব সমস্যা জল হয়ে গেল।

সঙ্গের হাত-ব্যাগটার উপর আমার নাম লেখা আছে আর তারই তলায় গোটাগোটা করে লেখা—ক্যালকাটা।

অঘটনটার শুরু হল সেখান থেকেই। দোভাষী ভদ্রলোক ব্যাগের গায়ে নজর রেখে বললেন—নিবাস তাহলে ক্যালকাটায়? আমি কিন্তু এককালে ওখানে ছিলুম।

অনেক অনেক বিদেশীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে যারা ভারতে গিয়ে কলকাতায় দু চারদিন কাটিয়ে এসেছেন। তাই ইনিও যদি ঘুরে এসে থাকেন ত আশ্চর্য হবার কি আছে! অবাক হলুম যখন শুনলুম যে, ভদ্রলোক দুটি বছর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পাঠের বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় দর্শন। নিজের টাকায় পড়তে গিয়েছিলেন। তাও কোনো পরীক্ষা পাশ

ব্যালে নাচের আসরে

করার জন্যে নয়—স্রেফ আত্মতৃপ্তির জন্যে।

নতুন বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে বাপের বাড়ির কারোর দেখা পেলে যেমন তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরে আমার অবস্থাও দাঁড়াল অনেকটা তাই। আমি খুয়ানের সঙ্গে স্রেফ লেপ্টে গেলুম। আর খুলে ধরলুম আমার প্রশ্নের ঝাঁপি। কলকাতা কেমন লেগেছিল? বাঙলা দু চারটে কথা এখনও মনে আছে কি? থাকতে কোথায়? বেহালায়?

স্পেন সম্বন্ধেও নানান প্রশ্ন করলুম। খুয়ান পণ্ডিত লোক বলতে হবে। সব প্রশ্নেরই বুদ্ধিমান জবাব দিল। আর দেবে নাই বা কেন! বিস্তর পড়াশুনো করেছে আর মালয়-ব্রহ্ম থেকে শুরু করে দক্ষিণ ইয়োরোপের কোনো দেশে যেতে বাদ রাখে নি।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর খুয়ান, বলল, বেরোবে নাকি একটু হাওয়া খেতে?

বললুম, দেশ দেখতেই ত বেরিয়েছি। আমি রেডি।

দুজনে আমরা বেরোলুম। রাস্তায় যেতে যেতে ও অনেক কথা বলল। ওর বাড়ি আসলে এখানে নয়। এখানে ও এরোড্রোমে চাকরী করে। বাড়ি হল দেশের উত্তর অঞ্চলে। ও আরও বলল, এই সেভিলিয়া শহরের ইতিহাস। প্রাচীন মুরদের কাহিনী।

রাত তখন এগারোটা। আমরা মারিয়া লুইসা পার্কে এসে হাজির হলুম। পার্ক ত নয়, যেন সাজানো বাগান। ও আমাকে এখানে এনেছিল এক প্রাসাদ দেখাতে। এক কোণে দেখি লোকে লোকারণ্য। কি ব্যাপার! না, আজ এখানে আন্তর্জাতিক ব্যালে নাচ হবে। হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডাম শহর থেকে এক নামকরা দল এসেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হবে।

খুয়ান লাফিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, দেখতে যাবে নাকি?

আমার বেশি ইচ্ছে ছিল না। ব্যালে নাচ অনেকবার দেখেছি লণ্ডনে, প্যারিসে এবং ইয়োরোপের নানান জায়গায়। ওর মধ্যে নতুনত্ব আর কি আছে! বরং যদি প্রকৃত স্প্যানিশ নাচ হত তাহলে মোটেই আপত্তি থাকত না।

কিন্তু খুয়ানকে মনের কথা খুলে বলার মত সময় পেলুম না। ঝপ করে দুখানা টিকিট ও কিনে ফেলল।

দাম কত? পঞ্চাশ পেসেতা করে? মাথায় হাত দেবার যোগাড়। মুখ কাঁচুমাচু করে মানিব্যাগ খুললুম। খুয়ান টিকিট কেটেছে। এখন আমার টিকিটের দামটা ত ওকে দিতে হবে।

খ্য়ান লাফিয়ে উঠল, আরে করো কি। আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি। তুমি দাম দিতে যাবে কেন!

আমি অপ্রস্তুত; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওকে টাকা দিতে পারলুম না। খানিকক্ষণ বাদে কথায় কথায় খ্য়ান বলল, আগামীকাল এ শহরে বুল-ফাইট হবে। যাবে নাকি দেখতে?

আবার বুলফাইট! কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে না বলা ত চলে না। ওকে নিয়ে কাল বুল-ফাইট দেখতে যেতে পারি। তাহলে আজকের ওর এই ভদ্রতার শোধ কাল দেওয়া যাবে।

এমনি পাকে পড়েই বুল-ফাইট দেখতে যাওয়া। তবে এখন বলব, গিয়েছিলুম ভালোই করেছিলুম। কারণ চোখে না দেখলে বুল-রিংয়ের আবহাওয়াটি আন্দাজ করা অসম্ভব। খবরের কাগজে যতই মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলার কথাই পড়ুন আর রেডিওয় রীলে

ষাঁড়টাকে ছুটিয়ে ক্লান্ত করতে লাগল

শুনুন—মাঠে সশরীরে হাজির না হলে আবহাওয়াটি কোনদিন আন্দাজ করতে পারবেন না।

কে গোল দিল, কে গোল খেল—এসব ত হল তুচ্ছ খবর। মাঠের আসল খেলা খেলে দর্শকরা। বুল-ফাইটের বেলাতেও তেমনটি না ঘটার ত কোনো কারণ নেই! এ খেলায় খেলোয়াড়ের চেয়ে ষাঁড়ের দাপট বেশি, তারও বেশি দাপট দর্শকদের।

আমার মনে হল ক্যালেন্ডারের বয়স যেন হাজার দুয়েক বছর পিছিয়ে গেছে। জুলিয়াস সীজারের আমলটি যেন হুবহু ফিরে এসেছে।

শ তিনেক ফিট ডায়ামেটারের বুল-রিং। ঘুরিয়ে সর্বদিকে স্টেডিয়াম। মাঝখানে ফাঁকা গোল মাঠ।

ফুটবল খেলা শুরু হবার আগে খেলোয়াড়রা যেমন বলটাকে ধাই করে লাথি মেরে মাঠে ছুঁড়ে দিয়ে কায়দার মাথায় ছুটতে ছুটতে মাঠে ঢোকে আর দর্শকরা চটাপট হাততালি দেয়, এখানেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই। কোণের দরজা খুলে দিতেই বুনো কালো ষাঁড়টা শিং দুটো তেড়ে বাগিয়ে মাঠের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। আর গোল মাঠের ধারে ধারে কাঠের পার্টিশানের আড়াল থেকে এক এক যোদ্ধা বেরিয়ে লাল কাপড় দেখিয়ে দেখিয়ে ষাঁড়টাকে ক্ষেপিয়ে একোণ-ওকোণ ছুটিয়ে ক্লান্ত করতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে মাঠে ঢুকল এক ঘোড়-সওয়ার। হাতে তার ছুঁচলো বল্লম। তাই দিয়ে সে ষাঁড়টাকে ক্ষতবিক্ষত করল। এরপর আরও কয়েকজন চালাল ছুরি আর ছোরার আক্রমণ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অত বড় শক্তিশালী জানোয়ারটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সাজানো চার-ঘোড়া এসে মৃতদেহটা টেনে বার করে নিয়ে গেল।

একটা ষাঁড়ের লড়াই দেখার পর আমি বাবু! হবে পর পর এমন ছটা।

ভাবলুম, পালিয়ে যাই। কিন্তু পালাব বললেই কি পালানো যায় নাকি! আমি বিদেশী তাই এদেশের প্রতি ভদ্রতা দেখাতে হবে না!

তাছাড়া চারিটি ম্যাচের দিন খেলা ভাঙার আগে সবুজে গ্যালারীর মাথা থেকে নেমে আসুন ত দেখি! বিশেষ করে তার কয়েক মিনিট আগেই আপনার টিম যদি গোল খেয়ে থাকে।'

অতএব আমি বসে রইলুম শেষ পর্যন্ত। বুল-ফাইট দেখার আর ইচ্ছে না থাকলেও।

কিন্তু এর সবটাই কি নৃশংসতা?

আমার এক আমেরিকান বন্ধু বলেছিলেন, এর সবটাই নৃশংসতা নয়, এর বেশির ভাগটাই হল স্পোর্ট।

স্পেন দেশের লোকেরা এটা এত উপভোগ করে, কারণ তাদের মতে এটা শুধু স্পোর্টই নয়; এটা একটা মস্ত বড় আর্ট। হয়ত তাদের কথা সত্যি। হয়ত নয়।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সবুজপাতার ডাক যখন আরম্ভ করি তখন আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রমথ চৌধুরী যে-সব চিঠি আমায় ডাক-যোগে পাঠিয়েছিলেন সেগুলিকে সামনে রেখে আমার মনের কথা বলব। ১৯১৬ সালের শেষ দিক থেকে ১৯২০ সালের মাঝামাঝি তক্ তাঁর লেখা প্রায় একশোখানি চিঠি রয়েছে। ঐ সময়কার প্রত্যেক চিঠি রাখতে পারি নি—প্রথম পত্রটিকেই তো কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে হাত-ছাড়া করে ফেলেছিলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৮ সালে ও'র একটি ফূর্তি করে লেখা আমার প্রাপ্য পত্র কিরণশঙ্কর রায়ের হস্তগত হয় এবং তিনি সে-চিঠি হারিয়ে ফেলেন। আমার চিঠি কিরণের হাতে পড়েছিল সম্ভবতঃ প্রমথবাবুর খম-খেয়ালের ফলে। যদি আমাদের দুজনকেই দুখানা চিঠি পর-পর লিখে খামের বদলা-বদলি করে থাকতেন তাহলে আমিও তো কিরণের চিঠি পেতুম, কেননা ডাকবিলির গোলমাল তখন একেবারে ছিল না বললেই হয়। আর পেলে সেটি কিরণকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিতুম। সুতরাং আমার অ-প্রাপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে এখন একটিমাত্র অনুমানের শরণ নিতে পারি। সে অনুমান হচ্ছে এই যে, প্রমথবাবু যখন চিঠি লিখছিলেন তখন আমার কথাই চিন্তা করছিলেন, কিন্তু খামে পুরে অনামনস্কভাবে কিরণের নাম-ঠিকানা বসিয়ে দিলেন। যথার্থ খামখেয়াল নয়? কথায় বলে, ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। ও'র ফূর্তির ফলে সে-খামের উদর-পূর্তি হল এবং চিঠিটি শেষ-পর্যন্ত মাঠেই মারা গেল।

এই মারা-যাওয়া চিঠির প্রসঙ্গে প্রমথবাবু সুধীন্দ্র সিংহকে ১।৭।১৮ তারিখে যে-পত্র লেখেন সে-পত্র গত-বারের ডাকে ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে একটি মূল্যবান মন্তব্য আছেঃ "সব সময়ই আমার হাত থেকে যে "সারগর্ভ" পত্র বেরোয়, তা নয়। সেদিন হারিতকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম যা খাঁটি চিঠি আর যার ভিতর ফূর্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে-চিঠিখানি পথ-মধ্যে মারা গেছে। ভুলক্রমে সেখানি কিরণ-শঙ্করের হস্তগত হয় এবং কিরণ সে-খানি খুইয়ে বসে আছেন। কিরণ অবশ্য সে-চিঠির কারিগরীর পুরো দাম দিতে পারেন নি, কেননা তিনি হারিতের চিঠি পড়েন নি। "চাপানটা" যে কি তা না জানলে "উতোরের" কৌশলটা বোঝা যায় না।'

প্রমথবাবুর পত্রাবলীর পূর্ণ রসাস্বাদ কেবল ও'র পত্র পাঠমাত্র পাওয়া যাবে না। যার চিঠির উত্তরে উনি চিঠি লিখছেন তার চিঠিও পড়া চাই। যেমন টেলিফোনে দুজনের কথাবার্তা সম্পূর্ণভাবে তৃতীয় ব্যক্তির কানে না পৌঁছোলে খানিকটা তার কাছে অবাস্তই থেকে যায়, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও প্রায় একদিককার কথাই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আমার বক্তব্য এখন বলতে গেলে সে-বক্তব্যের মধ্যে ফাঁক থাকাই স্বাভাবিক এবং এখন ও তখনের সংমিশ্রণ হলে যে-রসের সৃষ্টি হয় সে-রস সকলের প্রীতিকর হবে, এ আশা করা যায় না। দেহের মত মনেরও তো এখন-তখন অবস্থা হতে পারে!

এ-সংকট অবশ্য কেবল সেই সব চিঠির ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য, যেগুলি আমার চিঠির উত্তরে প্রমথবাবু লিখেছিলেন। অনেক চিঠি আবার এ-ধরনের নয়। কোনো কোনো পত্র উত্তরের অপেক্ষাই রাখে না। এদের বেলা এক-তরফা শোনানীতে দোষ নেই। গুণ কি আছে তার বিচারক আমি হতে চাই না। কেবল একটি কথা বলতে চাই। ও'র সঙ্গে আমার পরিচয় যে-বাড়িতে হয়েছিল, সেই ১নং ব্রাইট স্ট্রীট থেকে যত-বার আমন্ত্রণ-পত্র এসেছে, ততবারই শুনেছি সবুজ পাতার ডাক। সব ডাকে সাড়া দিতে পারি নি, সেটা ক্ষোভের বিষয়। কবে কবে ডাক দিয়েছিলেন তার পত্র-গত প্রমাণকে সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে রাখার অধিকার

আমার নেই। তার সাহিত্যিক-মূল্য-নিরূপণের চেষ্টা না করে তার ঐতিহাসিক মূল্য দিতে আমি বাধ্য। বিশিষ্ট ব্যক্তির অটোগ্রাফ্-সইয়ের যদি দাম থাকে, তবে প্রমথ চৌধুরীর স্বাক্ষরযুক্ত তাঁর স্বহস্ত-লিখিত পত্রেরও দাম থাকা উচিত। সে-সময়ে তাঁর হস্তাক্ষরযুক্ত কোনো খাম বা পোস্ট-কার্ড এলে অসীম আনন্দ পেতুম। ঘন ঘন আহ্বান যে ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক, তা কে না জানে? বয়সে উনি ছিলেন আমার বাবার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট। পিতৃদেবের মতনই উনি বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে সখ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন এবং যুব-জনের শ্রদ্ধা দুজনেই আকর্ষণ করেছিলেন।

সাহিত্যিক আদর্শেও প্রমথ চৌধুরী আমার পিতামহের মতন চলিত বাঙলার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৩ সালে ঠাকুরদাদার দেহান্ত হয়। ১৯১৬ সালে তাঁর সদানন্দ মূর্তি এবং সরস বাক্য-বিন্যাস আমার স্মৃতিপটে ম্লান হয়ে যায় নি।

যৌবনোন্মেষের প্রাক্কালেই প্রমথনাথ

কৃষ্ণনগরে 'উপেন্দ্রকৃষ্ণের চলিত-বাঙলায় লেখা উপন্যাস ("এই এক নূতন—আমার গুপ্তকথা") পাঠ করার সুযোগ পান। এ-উপন্যাসের প্রবক্তা হরিদাস, তাই এর প্রচলিত নাম "হরিদাসের গুপ্তকথা।" চলিত বাঙলায় লেখা এই প্রথম উপন্যাস পড়ে প্রমথনাথের সংকল্প হয় ভবিষ্যতে ঐ পথ অনুসরণ করে সহজ সরল ভাষায় সাহিত্য রচনা করবেন। সেই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে কোনো সংকোচ বোধ করেন নি। অথচ বাধা যথেষ্ট ছিল। প্রথমত, ঠাকুরদাদা নিজেই "গুপ্তকথা"র চলিত ভাষা ত্যাগ করে তাঁর "রঙ্গিণী"-উপন্যাসে তখনকার সাধুভাষা অবলম্বন করেছিলেন। তখনকার পণ্ডিতরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত, সুতরাং অন্যে পরে কা কথা। তথাপি কালিদাস যেমন বলেছিলেনঃ পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং, প্রমথ চৌধুরীও বলতে পেরেছিলেন জোর-গলায় যে, ওঁর সময়ের গদ্য-লেখকদের ভাষায় মুক্তকণ্ঠে ভাব প্রকাশ করা শক্ত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা আত্মাভিমানবশত চলিত ভাষার প্রচলনে বিরোধী হয়েছিলেন। অবশ্য এটা সত্য যে, গ্রাম্যতা-দোষ একটা দোষ। এ-কথা সকল দেশে সকল সময়েই শিষ্ট-সমাজে স্বীকৃত। প্রাকৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন "গাথাসপ্তশতী," এবং সাতবাহনবংশীয় রাজা হালের এই সংকলন সম্বন্ধে বাণভট্ট বলেছেনঃ

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব
সুভাষিতৈঃ।

দেশী-শব্দ আর সংস্কৃত থেকে ভাঙা শব্দ মিশিয়ে যে সমন্বয় করা হয়েছে এর মধ্যে, তার তুলনা অপর কোনো দেশের সাহিত্যে আছে কি না জানি না। সেকালের কথিত ভাষা এইরকম মিশ্রিতই ছিল এবং বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে বলেও গেছেন যে, "নাত্যন্তং সংস্কৃতেনাপি নাত্যন্তং দেশ-ভাষয়া" যদি কেউ কথা কন তিনি বহু মান পান। বৌদ্ধ সাহিত্যে "মহাবস্তু" প্রভৃতি কিছু কিছু রচনা মিশ্রিত সংস্কৃতে লেখা। কুষাণযুগের শিলালিপিতেও ভাষা-সংকর বিদ্যমান।

বাঙলা সাহিত্যের কারবারে এখন তিনটে ব্যাংক চালু—ইংরিজী, সংস্কৃত আর দেশী। সব ব্যাংকের ওপরেই আমরা চেক্ কাটছি এবং কোনো ব্যাংকেরই ফেল হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে আমরা যদি এলোপাথাড়ি চেক কেটে চলি, তাহলে আমাদের কারবার ফেল্ হতে পারে। বাঙলাদেশ মেলামেশার দেশ। কি জাতি, কি ভাষা, কি সংস্কৃতি সব কিছুতেই আমরা মিলন ও মিশ্রণ ভালবাসি। বাইরের আমদানীকে আমরা হেয় করেছিলুম একবার, যখন বিলিতী জিনিস বয়কট করি। অথচ সে-আন্দোলনের মূল মন্ত্রটি আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমদানী, কারণ "বয়কট"-নামধারী একজন আইরিসম্যানকে একঘরে করার পর থেকে ঐ-কথাটি চালু হয়েছে। এ-দেশ যখন ইংরেজদের খাস-মুলুক ছিল, তখন আমরা চোস্ত ইংরিজীতে তাদের খুঁত ধরতুম, আর এখন ইংরেজদের মতন একটা পার্লামেণ্ট পেয়ে ইংরিজী কেতাতেই পলিটিকস করছি।

ইংরিজী ভাষার গুণমুগ্ধ আমরা অনেকেই। সে-ভাষার কাব্য-সাহিত্য অতুলনীয়। এক সেক্সপীয়রকে দেখলেই বলতে হয়ঃ একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি। কিন্তু গদ্য-সাহিত্যে ফরাসী ভাষার উচ্চতর অভিব্যক্তির পরিচয় পেয়ে প্রমথ চৌধুরী সেই আদর্শকেই সম্মুখে রেখে রচনা করতেন এবং সু-মুখ ও কু-মুখ কাকে বলে সে-বিষয়েও তাঁর বিচারশক্তি ছিল। মুখের কথা তাঁকে কেড়ে নিতে হয়েছিল, নইলে মনের কথা কইবেন কি করে? ইচ্ছে থাকলেও এ-সাহস বঙ্কিমবাবুর হয় নি। তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করায় সেকালের পণ্ডিতরা তাঁর ভাষায় "গুরুচণ্ডালী" দোষ দেখাতে উদ্গ্রীব ছিলেন। রবিবাবুও তাঁর চিঠি-পত্র ছাড়া গদ্য রচনায় অনেককাল ধরে চলিত বাঙলাকে এড়িয়ে চলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সানন্দে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলেন। আগেই বলেছি এটা তাঁর পক্ষে হয়েছিল পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ। এখন বলছি, এতে আমাদের যথার্থ মুখ-রক্ষা হল। এভাবে মৌখিক ভাষা সাহিত্যে সুরক্ষিত না হলে রক্ষা পেতুম কি-না সন্দেহ।

চিঠির পাতায় আমরা আমাদের মনের ভাব বেপরোয়াভাবে কবুল করি, প্রবন্ধে বাঁধাবাঁধিটা রীতিমত থাকবার কথা, কারণ এই প্রকৃষ্ট বন্ধন যাতে নেই তাকে প্র-বন্ধ বলা চলে না। ছাপাবার উদ্দেশ্য নিয়ে চিঠি লিখলেও বাঁধন-ছাঁদন মানতে হয়। আটপৌরে আর পোষাকী পরিচ্ছদে যে প্রভেদ, পত্রে আর প্রবন্ধে কতকটা সেইরকম তফাত। পত্র চায় জনগণের কাছে আত্ম-

গর্বিত, প্রবন্ধ চায় জনসমাজে আত্মপ্রকাশ। প্রবন্ধের ইংরিজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'এসে." আর কলমের মুখে যা এসে পড়ে পত্রে আমরা তাই লিখি। সবুজ-পত্রের একজন পত্রী হিসাবে তাই আমি পত্রধর্মী হয়েছি।

কথার খেলা প্রমথবাবুর লেখায় প্রচুর। এ-খেলা তাঁর ভাল লাগত. আমারও ভাল লাগে। 'লেখা' উল্টো করে পড়লে যে 'খেলা' হয় এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সংস্কৃত সাহিত্যে এ ধরনের খেলা দেখি, তবে ওরিয়েণ্টালিস্ট সায়েবদের কাছে সে-খেলা অপ্রিয়। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ তাঁরা আমাদের অনেক উপাদেয় মিষ্টান্নকে বেশি মিষ্টি বলে পছন্দ করেন না। এ-বিষয়ে সকলেরই নিজস্ব রুচি আছে এবং সে-রুচিকে অবজ্ঞা করা অনুচিত। শ্লেষ বা pun সম্বন্ধেও তাই। ইংরিজীতে pun-এর প্রয়োগ-বাহুল্য পাই জন লিলির ইউফিউয়িসে। এর প্রভাব সেক্সপীয়ারেও দেখা যায়, তবে মাত্রায় কম। বাঙলায় ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, দাশু রায় ইত্যাদি অনেকেই শ্লেষালঙ্কার ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদের রচনা এ-অলঙ্কার ধারণ করায় শোভা-সমন্বিত হয়েছে।

"সবুজ-পত্র" ভূত হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিল "পরিচয়" পত্রিকায়। জন্মদাতা সুধীন দত্তের বাড়িতে। নামকরণ সেই আমাদের বাড়িতে এসে কথা পাড়লেন যে, একটা উঁচুদরের পত্রিকা বের করবার প্ল্যান হচ্ছে এবং সে-বিষয়ে সল্লা-পরামর্শ হবে সুধীন দত্তের বাড়িতে। নামকরণ সেই মীটিংয়েই হল—"পরিচয়" নাম রাখলেন নীরেন রায়। হপ্তায় হপ্তায় সবুজ-সভার মতন বৈঠক বসত, সাধারণত সুধীন দত্তের ওখানে। সেখানে আমার শ্লেষাত্মক কথোপকথন কারও কারও ভাল লাগত না। এবং তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ পেত আমার অভাবে। একদিন আমার মান রক্ষা করলেন সরোজিনী নাইডুর ভাই হারীন চাটুয্যে। তিনি অনেকদিন বাদে বিলেত থেকে তখন সবে ফিরেছেন এবং বহু বিশিষ্ট শ্রোতা সেদিনকার সভায় সমবেত হন, তাঁর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শোনবার জন্যে। এক একটা আবৃত্তির পর তিনি কথা বলছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং তাঁর কথায় ছিল পদে পদে শ্লেষ। উপস্থিত শিষ্ট ব্যক্তিরা যে সকলেই তাঁর শ্লিষ্ট-বাক্য শুনে খুশী হচ্ছিলেন তার প্রমাণ তাঁদের হাসির সাড়ে পাওয়া গেল। অবশ্য সে-সব ইংরিজী pun এবং সে-সময়ে ইংরেজদের এখানে দোর্দণ্ড প্রতাপ। পরিচয় পত্রিকায় আমার কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে 'পান'-এর স্থান সংকীর্ণ করে রেখেছিলুম। তার কারণ ও-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা, যেগুলি গভীর চিন্তার পরিচায়ক এবং গাম্ভীর্য রক্ষা করতে হলে হাসা বারণ, এ-নিয়মকে অতিক্রম করবার সাহস হয়নি আমার।

বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ কখনো আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতেন না বটে, কিন্তু তাঁর বৈঠকখানায় বসে নিরঙ্কুশ হাসা-রসের অবতারণা করাটা অসংগত হবে, এ-আশঙ্কা বোধ হয় অনেকেরই মনে ছিল।

ছেলেবেলায় হীরেন দত্ত সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলুম। সম্ভবত সেটা হেরম্ব মৈত্র সম্বন্ধে গল্পের মতন কল্পিত

কাহিনী। কিন্তু রস আছে। শ্যামপুকুরে একজন ব্যারিস্টার থাকতেন, নাম সংক্ষেপে 'আর-মিত্তির'। হীরেনবাবু ছিলেন এটর্নী। দুজনের বাড়ি খুব কাছাকাছি। এটর্নী হিসেবে হীরেনবাবু প্রায়ই মিত্তির সায়েবের সঙ্গে কথা কইতে যেতেন। কিন্তু মিত্তির সায়েব রসের কথা বললেও হীরেনবাবু সর্বদাই গম্ভীর হয়ে থাকতেন। রসিকতা শ্রোতার মনে রসসঞ্চার করছে না দেখে আর-মিত্তির নাকি একদিন বললেনঃ আচ্ছা হীরেনবাবু, তোমায় একটা অনুরোধ করতে চাই, তুমি কি সেটা রাখবে?—সাবধানী হীরেন্দ্রনাথ উত্তর করলেনঃ অনুরোধটা কি তা জানালে যদি রাখা সম্ভব হয় রাখতে পারি।—আর মিত্তিরের অনুরোধ এলঃ একবার প্রাণ খুলে হাসতে পারো?

শেষ বয়সে হীরেনবাবুর মুখে অনেকেই হাসি দেখেছেন। কিন্তু আমি দাবি করি যে তিনি আমারই একটা শ্লেষ শুনে প্রকাশ্যে প্রথম প্রাণ-খোলা হাসি হাসেন।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঘটনাটি ঘটে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সভাপতি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহকারী সভাপতি। সমিতির মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ, সুতরাং সর্বাধিকারেই আমার নিম্নতম স্থান। সেক্রেটারী মশায় একখানি চিঠি পড়ে শোনালেন যাতে কলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারী ক্লাশের ছাত্রদের মাথা-পিছু টাকা দিতে উৎসাহী এবং জানতে চেয়েছেন আমাদের ইস্কুলে প্রাইমারী ক্লাশের ছাত্র-সংখ্যা কত। প্রাইমারী কথাটার কি কোনো ডেফিনিশান আছে আমাদের ইস্কুলের রুলসে? এই প্রশ্ন মুদুস্বরে আমার মুখ থেকে বেরুলো। সেক্রেটারী-মশায় তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেনঃ রুল-বইটা নিয়ে এসো।—নিয়ে আসতে একটু সময় লাগলো। হঠাৎ মনে এল একটা pun—'প্রাইমারি' ছাত্র মানে যে-ছাত্রকে প্রায়ই মারি! ফিসফিস করে সে-কথাটা জানালাম আমার বাঁ-পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁর কানে কানে—অর্থাৎ আহিরীটোলার কুমার মিত্তির মশাইকে— কেননা তিনি ঠাট্টা-মস্করায় খুশী হতেন। কুমারবাবুর বাঁপাশে বসে ছিলেন প্রিয় মুখুয্যে যাঁর টেলিফোনে শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ করার কথা পূর্বে বলেছি। কুমারবাবু বাঁ কানে ফিস ফিস করে কথা কইলেন। আমার ফাজলামিটা যদি এই পর্যন্ত গিয়ে ক্ষান্ত হত, আমি বিশেষ ভয় পেতাম না। কিন্তু—সর্বনাশ! প্রিয়-বাবুর বাঁ-পাশে ছিলেন হীরেন দত্ত। জানতুম বিধি আছে যে "অংকসা বামা গতিঃ"—জানতুম না যে "শ্লেষসা বামা গতিঃ" এ-বিধি কোনো অলিখিত শাস্ত্রে থাকতে পারে। পরে বুঝলুম, বিধি বাম হলে সবই সম্ভব। দেখি প্রিয়-বাবু বাঁদিকে হেলে হীরেনবাবুর ডান কানে সন্তর্পণে কি বলছেন। নিশ্চয়ই আমার অবিমৃষ্যকারিতার কথা! ভয় ভাঙলো, যখন দেখলুম হীরেনবাবুর মুখে হাসি—খুশী হওয়ার হাসি।

শ্লেষভক্ত না হলে শ্লেষ-বহুল গাথা-সপ্তশতীর মতন প্রশংসনীয় রচনার রস গ্রহণ করা যায় না। তার কারণ প্রত্যেক গাথারই একটি শৃঙ্গাররসাত্মক ব্যাখ্যা আছে যেটা হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে শ্লেষ বোঝা চাই এবং শ্লেষকে ভালবাসা চাই। আমি কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়ী না হয়ে যদি কেবল কণ্ঠশ্লেষ-প্রণয়ী হয়ে থাকি, সেটি প্রমথ চৌধুরীর আশীর্বাদে। তাঁর সবুজপত্রে আমার স্থান হয়েছিল বলেই আমি পৈতৃক সংস্কৃতিতে কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করেছিলুম। সে সংস্কৃতির মূলে ছিল পিতৃদেবের অশোক-ভক্তি। আজ অশোকের সারনাথস্থ স্তম্ভশীর্ষ আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় প্রতীক। সবুজপাতার ডাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে পিতৃ-প্রিয় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রসঙ্গে কিছু কিছু যা বলেছি, তার পশ্চাতে ছিল প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা।

হাস্য-রসের স্পর্শ পেলেই যে ইতিহাস অতিহাস্য হবে এ-আশংকা আমার নেই। সংস্কৃত শব্দের নিরুক্তকারেরা ইতিহাস-শব্দকে ভাগ করেছিলেন তিন ভাগেঃ ইতি-হ-আস অর্থাৎ 'এইরকমই ছিল'। কিন্তু দ্বিধা-বিভক্ত বাঙলায় আমরা যদি দুভাগ করে বলিঃ ইতি-হাস অর্থাৎ "ইতি করলুম, এখন হাস" তাতে দোষ কি?

ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি, একথা তাঁরাই বলেন যাঁদের কান পাতলা এবং তাল-বোধ সামান্য। প্রতিমা-বিসর্জনের সময় ঢাকের বাজনা যে কথা কয় তা আমি শিশুকালে ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছিঃ দাদা গো দিদি গো এত্তো বড়ো প্রতিমে-খানা ভাসিয়ে দিয়ে এলুম গো, এলুম গো। এর মধ্যে রস ও ছন্দ দুই-ই আছে। ঢাকের বচনেও তাই।

সবুজপাতার ডাকে এখন বিসর্জনের পালা। প্রবন্ধ-সাহিত্যে চলিত বাঙলাকে প্রচলিত করায় প্রমথ চৌধুরী বাঙলা গদ্যে যে প্রবাহকে গতিশীলতা দিয়ে বাঙালীর প্রাণকে মুক্তির পথে নিয়ে এলেন সে-প্রবাহ এই নদী-মাতৃক দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে মানুষের মনকে চির-হরিৎ চির-সবুজ করে রাখবে, গঙ্গা যেমন শিবের জটা থেকে বেরিয়ে দেশের মাটিকে সবুজ রাখছে। প্রমথনাথের প্রায় একশত পত্র দেশ-এর কাছে ধার দিয়ে আজ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো সমাপ্ত করলুম। পত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়।

—সমাপ্ত—

বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।—"এই নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, বলেনি শুধু সেই স্বল্পবেতন ভৃত্য কেষ্টারা। বেতনের বদলে বেত পেলেও যাদের চেতনা হয় না সেই বুদ্ধির ঢেঁকিরা বলবেই বা কী আর করবেই বা কী"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

অতঃপর মাসের তিন শনিবার পুরো অফিস করিবার পর এক শনিবার সম্পূর্ণ ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।—"কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মরশুমে এই ব্যবস্থা বানচাল হ'তে বাধ্য"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

করিমগঞ্জ ও শিলিগুড়িতে চাঁদের চারিদিকে একটি চলমান শ্বেত পদার্থ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। উহা দেখিতে
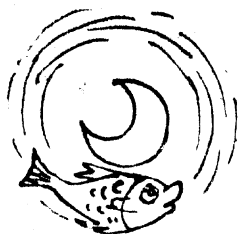
অনেকটা মাছের মত। অনেকের ধারণা, রাশিয়ার লুনিক ছাড়া কিছু নয়।—"কিন্তু আমরা তা মনে করিনে। এ নিশ্চয়ই মাছ। চন্দ্রলোকে মৎস্য প্রয়াণ না হলে বাজারে মাছ এত দুর্লভই বা হবে কেন"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পরিবহণ কর্পোরেশন সংশোধন বিলের আলোচনাকালে পরিবহণ দপ্তরের উপমন্ত্রী মহাশয় নাকি নিদ্রাসুখে মগ্ন ছিলেন। শ্যামলাল বলিল—"বিধান সভায় শুনেছি ঘুমপাড়ানি মাসী পিসিরা ডাকা মাত্রই চলে

আসেন, কেননা সেখানে বাটা-ভরা পানের অঢেল ব্যবস্থা"!!

• • •

আমরা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "চীনাংশুক" সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইলাম, শুনিলাম, মধ্য এশিয়াই চীনভূমি এবং চীনাংশুক মধ্য এশিয়ার রেশম। চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ঢক্কা নিনাদ নাকি সর্বৈব মিথ্যা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ভাবছি গবেষকগণ ভুল করেন নি তো! কেন জানি মনে হচ্ছে চীনাংশুকের সঙ্গে সুধাংশু, সীতাংশু আর হিমাংশু কিংশুকদের বুঝি কোন সম্বন্ধ আছে"!!

• • •

শ্রীনেহেরুজী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে দেশবাসীকে মার্কিন মুলুকে প্রচলিত প্রবাদটি স্মরণ রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন—"চিরজাগ্রত দৃষ্টিই স্বাধীনতা রক্ষার উপায়"।—"তা হতে পারে। কিন্তু জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে চোরকে ঘরে ঢুকতে

দেখলাম, জিনিসপত্র সরাতে দেখলাম এবং দেখার পরও বলতে লাগলাম, দেখি শালা কী করে; তা হলে জেগে থেকেই লাভ কী"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম শহর হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাকে নাকি কার্যকরী করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। "তা হলে আর দেখতে হবে না। ভাবছি এবার কলকাতা সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। কারণ এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ আর কোথাও হয় না"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী এম সি সি-র খেলোয়াড়দের সবাই নাকি দেহকে কর্মপটু রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। একজনের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁর এক দুগ্ধ ব্যবসায়ী আত্মীয়ের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ প্রতিদিন ভোরে দুগ্ধ বিতরণ করিয়া বেশ শারীরিক পটুতা লাভ করিয়াছেন।—"আমাদের দেশের ক্রিকেটার-দের দিয়ে, টেস্ট খেলার আগে, কয়েক সপ্তাহ শাক-সব্জী ফেরি করালে কেমন হয় তা কণ্ট্রোল বোর্ড পরীক্ষা করে দেখতে পারেন"—বললেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

• • •

সংবাদে প্রকাশ যুগোশ্লাভিয়ার এক গ্রামে একটি গর্দভ নাকি প্রচুর মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্যামলাল বলিল—"কে নাকি কোথায় বলেছিলেন যে, মদের বোতল ফেলে জলের বোতল খেলেই গাধা যে সত্যিই গাধা তা প্রমাণ করেছিল। কিন্তু সেদিন আর নেই। এবারে জল ফেলে মদ খেয়ে গাধা মানুষ বনে গেল"!!

• • •

রামচাঁদ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধি-নায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন।—"বনবাস ও লঙ্কাকাণ্ডের পর রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন হয়ত অনেকেরই অভিনন্দন লাভ করবে। কিন্তু ভাবছি শ্রীরাম কি সীতার পাতাল প্রবেশ রুখতে পারবেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন মানুষের ন্যায়সংগতভাবে অর্জিত সুখশান্তি বৃদ্ধি করাই আমেরিকার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।—"কিন্তু কথা হচ্ছে ন্যায়ের বিচার নিয়ে। মৎস্যাপহারীরাও যে ন্যায়ের দোহাই পাড়েন"—মন্তব্য করেন বিশু-খুড়ো।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

২৩

দরজায় পিঠ লাগিয়ে মানসী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাধুরীর দিকে চেয়ে অধীরভাবে বলল, 'কই কী বলবি বল।'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে হেসে বলল, 'বলছি। দোরে যখন একবার খিল দিয়েছি সহজে কেউ খিল ভেঙে ঘরে ঢুকতে পারবে না। দোর তোর পিঠ দিয়ে না আগলালেও চলবে। এদিকে এগিয়ে এসে শোন।'

মানসী দু'পা এগিয়ে এসে বিরক্তভাবে বলল, 'গৌরচন্দ্রিকা শোনার কিন্তু আমার সময় নেই। আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

মাধুরী বলল, 'বেরোতে আমাকেও হবে। তবু একেবারে চট করে বলে ফেলবার কথাও তো নয়। তুই তাহলে ভুল বুঝবি।'

মানসী বলল 'আমি ভুল বুঝি বা ঠিক বুঝি তা নিয়ে তোর দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।'

মাধুরী বলল 'দুশ্চিন্তা কিছু করতে হয় বৈকি। না হলে এসব কথা বলবার কোন দরকারই ছিল না। অসীমদাকেও আমি তাই বলেছিলাম। বলেছিলাম এখন কিছু বলে কাজ নেই। পরে ধীরে সুস্থে ওকে বুঝিয়ে বললেই হবে। কিন্তু অসীমদা তোকে সব কথা জানাবার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। সামনাসামনি তোকে বলবার সুযোগ না পেয়ে—।'

মানসী বাধা দিয়ে বলল, 'সুযোগ পায়নি, না সাহস পায়নি?'

মাধুরী মানসীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই যেটা ভেবে খুশী হোস। সামনাসামনি তোকে বলতে না পেরে আজই চিঠিতে লিখে রেখে যাবে ঠিক করল। সে চিঠি বোধহয় তুই পেয়েওছিস।'

মানসী অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'পেয়েছি বইকি। কিন্তু তুই যখন এতই জানিস, সে চিঠিতে কী লেখা আছে তাও নিশ্চয়ই তোর অজানা নেই। তোকেই বোধ হয় সে চিঠি আগে শোনানো হয়েছে।'

মাধুরী বলল, 'না। সে চিঠিতে কী আছে না আছে আমি কিছু জানি নে। অসীমদা হয়তো সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নেবে। কী লিখতে কী লিখবে তাতে ব্যাপারটা আরো ঘুলিয়ে উঠবে। তাই—'

মানসী মনে মনে ভাবল, 'আহা কী দরদ। অসীমদাকে বাঁচাবার জন্যে এত মমতা তোমার কিসের শুনি? অসীমদা তোমার কে? ক' দিনের?'

মাধুরী মুখ নীচু করে যেন নিজের মনেই বলতে লাগল 'তাই ভাবলাম আমারই বলা উচিত। যত লজ্জার কথাই হোক, শোনবার পর যত ঘৃণাই তুই আমাকে করিস এ যে মুহূর্তের ভুল ছাড়া কিছু নয় সে কথা তোকে আমার জানিয়ে দিতে হবে।'

মানসী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'দিদি তোকে তো আমি গোড়াতেই বলেছি ইনিয়ে বিনিয়ে ভূমিকা ফাঁদিসনে। তার সময় এখন নয়। সোজা কথায় যদি বলতে পারিস বল, না হলে কিছুই তোর আর বলে কাজ নেই। আমি বেরিয়ে পড়ি।'

মানসী দোরের দিকে পা বাড়াতেই মাধুরী ওকে বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া। আর এক মিনিট। আমি সোজা কথায় বলছি। আমরা কৌতুকের মাথায় হঠাৎ এমন এক একটা কাণ্ড করে ফেলি—। সেই কাজটা বরং সোজা কিন্তু তাকে প্রকাশ করে বলা সহজ নয়। কাল সারা দুপুর বিকেল অসীমদা তোকে খুঁজেছে। খুঁজে পায়নি। যে কারণেই হোক তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তার কী করে যেন ধারণা হয়েছে তুই ইচ্ছে করে তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছিস। সেই ভুল সন্দেহে তার মন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই নিয়ে দুজন অভিমান—।'

মানসী বাধা দিয়ে একটু হেসে বলল, 'দিদি ওকালতিটা বরং পরে করিস। দোষ কবুল করবার যদি সাহস না থাকে আমি তো বলেছি তোকে কিছুই করতে হবে না তোর কিছুই বলে কাজ নেই।'

মাধুরী হঠাৎ বেশ একটু জোর দিয়ে বলল, 'না আমাকে বলতেই হবে। কারণ দোষ আমারই। তার মনের ওই অবস্থায় তার সঙ্গে অমন ঠাট্টা তামাশা করা আমার উচিত হয়নি।'

মানসী একটু হাসল, 'ঠাট্টা তামাশাই যদি করে থাকিস তাহলে আর অত ভয় কিসের?'

মাধুরী তার নিজের কথার জের টেনে বলে যেতে লাগল, 'আমার উচিত হয়নি ট্যাকসিতে—।'

মানসী অদ্ভুত একটু হাসল, 'ট্যাকসিতে? আমি তাহলে ঠিকই অনুমান করেছিলাম। ট্যাকসিতেই কিছু একটা

কাণ্ড ঘটেছে। কী হয়েছিল বলবি দিদি? ঠাট্টার মাত্রাটা সেখানে তোরা কতখানি চড়িয়ে দিয়েছিলি সত্যি করে বলবি?'

মানসী আরো এগিয়ে এসে মাধুরীর কাঁধে হাত এবং চোখে চোখ রেখে বলল, 'সত্যি করে বলবি?'

মাধুরী নড়ল না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'সত্যি করেই বলব। সেই জল বৃষ্টির মধ্যে তার মাথার ঠিক ছিল না। আমারও বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না। সেখানে সে আমাকে চুমু খেয়েছে।'

কথাটা অনেক আগেই মানসী মনে মনে জানে। কিন্তু মাধুরীর এই নগ্ন স্বীকৃতির মধ্যে যেন নতুন করে জানল, নতুন এক বিষাক্ত শেল বুকে পেতে গ্রহণ করল।

মানসী বলতে যাচ্ছিল, 'তারপর?'

কিন্তু মাধুরীর গভীর আবেগের মধ্যে তার সেই ব্যঙ্গ আর বক্রোক্তি তলিয়ে গেল।

মাধুরী বলতে লাগল, 'কিন্তু আমাকে নয় মানসী, সত্যি বলছি আমাকে নয়। তার জেদ, প্রতিশোধ, নিরাশা, ব্যর্থতা সব কিছুকে মিলিয়ে সে যে তখনকার মত এক মূর্তি তৈরি করেছিল ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে আমি মিলে গেছি। কিন্তু ভেবে দেখ—।'

মানসী নির্মম কণ্ঠে বলল, 'আর ভেবে দেখবার কিছু নেই দিদি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে।'

মাধুরী হেসে হাতখানা ধরে বলল, 'না মানসী, সে যে ভুল করতে যাচ্ছে তুই সেই ভুল করিসনে। সে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে একটা ভুলকে যদি স্থায়ী করে রাখতে চায় তাই কি আমরা হতে দিতে পারি। মুহূর্তের ভুলের জন্যে সারাজীবনের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে যাব কেন? সে বসে, আমাকে সে অপমানিত হতে দেবে না, আমাকে সে অসম্মান করতে পারে না। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না তার এই ভুল আমার পক্ষে কত বড় অসম্মানের। তুই তাকে বুঝিয়ে বল, তুই তার ভুল ভাঙিয়ে দে। একমাত্র তুইই তা পারিস। তুই যে তাকে ভালোবেসেছিস।'

মানসী বলল, 'দিদি, ও শব্দ তুই আর মুখে আনিসনে। ও কথার আর কোন মানে নেই। ভুল হোক, ঠিক হোক ব্যাপারটা এখন তোদেরই দুজনের। নিজেদের সমস্যা তোরা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারবি। তার ওপর আমার আর কোন দাবি নেই, মমতা নেই, কোনরকম কোন সহানুভূতি নেই। তাকে নিয়ে তুই এখন যা খুশি তাই করতে পারিস। কিন্তু খুব বেশি বিশ্বাস করলে ঠকবি। আজ তোকে দেখে ভুলেছে, কাল আর একজনকে দেখে ভুলবে।'

মাধুরী বলল, 'ছিঃ এসব তুই কী বলছিস।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ আমার মনে হচ্ছে কি জানিস। শুধু নন্দুই নয়, যে যার পরীক্ষায় আমরা প্রত্যেকেই ফেল করেছি। আমরা—।'

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজায় ঘা পড়ল। 'মানসী, মাধুরী! দোর খোল, শীগগির দোর খুলে দে।'

সুহাসিনীর গলা।

মানসী এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

সুহাসিনী ভিতরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দুই মেয়ের দিকে তাকালেন।

মানসী একটু ভয় পেয়ে বলল, 'কী হয়েছে মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'কী না হয়েছে শুনি? তোমরা কী ভেবেছ বলতো? আমি কিছু বুঝি না? আমি পাশ পরীক্ষা না দিতে পারি, তোমাদের মত চাকরি বাকরি না করতে পারি, কিন্তু সব বুঝি, টের পাই। দিনের পর দিন ধরে তোমরা কী করছ না করছ, কী নিয়ে তোমাদের এই খুনোখুনি আমি সব জানি। আমার কিছু টের পেতে বাকি নেই।'

মাধুরী অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা কী বলছ তুমি। চুপ করো, চুপ করো।'

সুহাসিনী বললেন, 'এতদিন ধরে তো চুপ করেই ছিলাম। ভেবেছিলাম তোরা বড় হয়েছিস, লেখাপড়া শিখেছিস, তোদের চালচলন আচার ব্যবহার নিয়ে আমি কেন কথা বলতে যাব। যতদিন ছোট ছিলি শিখিয়েছি, এখন শেখাতে হবে কেন? কিন্তু তোদের কাণ্ড দেখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার দুঃখ রাখবার আর জায়গা নেই। ছি ছি ছি। ছোট ভাইটা সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আছে কি নেই তা কে বলবে। তা নিয়ে তোদের কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, তোরা— তোদের কাছে এখন কাড়াকাড়ি মারামারিটাই বড় হল। ছিঃ। আমি আর অসীমকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেব না।'

মাধুরী বলল, 'এসব কী বলছ তুমি।'

সুহাসিনী বললেন, 'ঠিকই বলছি। কোথায় তোরা নন্দুর খোঁজ করবি তা নয়, নিজেরা ঝগড়া করে মরছিস। যাক, তোদের কাউকে আর খোঁজ নিতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।'

দোর খুলে সুহাসিনী রাস্তার দিকে চললেন। মানসী তাঁর পিছনে পিছনে এসে ধমকের সুরে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল মা? এই রাতে একা একা তুমি কোথায় যাবে শুনি? তুমি কি একা একা বাস-ট্রামে চলতে পার? না কলকাতা শহরের জায়গা চেন? তুমি তাকে কোথায় খুঁজবে?'

সুহাসিনী বললেন 'যাক বাপু, তোমাদের আর দরদ দেখিয়ে দরকার নেই।'

মানসী বলল, 'তুমি কেন অত উতলা হচ্ছ বল তো। নন্দু কি এর আগে কোনদিন রাগ করে বাড়ির বাইরে গিয়ে থাকেনি? তাছাড়া তাকে খোঁজবার জন্যে বাবা তো বেরিয়েছেন। ওঁরা কোন জায়গা খুঁজতে বাকি রাখবে না। দরকার বোধ করলে থানা হাসপাতালেও খবর নেবেন।'

সুহাসিনী পথের মধ্যে থেমে দাঁড়ালেন, 'থাম তুই থাম। ও সব অলুক্ষুণে নাম আর মুখে আনিসনে। হাসপাতালের কথা শুনলেই আমার বুক কাঁপে।'

মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে পাঠিয়ে মানসী বাস-স্টপের দিকে এগোতে লাগল।

রাস্তায় বাস আর লরির চলাচলের বিরাম নেই। একেকটা লরির চেহারা অতিকায় জন্তুর মত। রাস্তার আলোয় সবখানি

অন্ধকার যেন কাটে নি। রাত্রির ছোঁয়ায় জায়গাটার চেহারাটাই যেন পাল্টে গেছে। না কি আতঙ্কের ছোঁয়ায় এমন হয়েছে? একটিও চেনা লোক চোখে পড়ছে না। রাস্তার ওপারে পানবিড়ির দোকানের সামনে যে কটি লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে তাদের দেখাচ্ছে অনেকটা ভূতের মত। রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে মানসী ভাবতে লাগল বাসে করে শ্যামবাজারের দিকেই যাবে, না কি এ পাড়ায় নন্দুর যে সব বন্ধু আছে তাদের বাড়িতে গিয়ে আগে খোঁজ নিয়ে দেখবে। অবশ্য কাছাকাছি জায়গায় খোঁজ-খবর নিতে বাবা নিশ্চয়ই আর বাকি রাখেন নি। নন্দু হতভাগাটা সবাইকে আচ্ছা ঝঞ্ঝাটেই ফেলেছে যা হোক। ফেল করেছিস বলে তোর একেবারে বাড়িছাড়া হয়ে থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে? কিছু বললে কী হবে, তাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলের পরীক্ষায় ফেল করা এক গুরুতর দুর্বিপাকের ব্যাপার। এমন অঘটন ঘটলে যেন কাউকে মুখ দেখানো যায় না, মেয়ের কুলত্যাগের চেয়েও যেন এতে সাংঘাতিক লজ্জা আর কলঙ্ক। মানসী ভাবল বাবাই এর জন্যে দায়ী। তিনিই নন্দুর মনে এধরনের আত্মধিক্কার আর হীনতাবোধ এনে দিয়েছেন। কিন্তু বাবাই বা এসব পেলেন কোথায়? তিনিও তো আর পাঁচজনকে দেখে শিখেছেন। চালচলনে ধারণায় ভাবনায় তাদের অনুকরণ করেছেন? তবে কি আমরা আলাদা কেউ নই? শুধু পাঁচজনের ছাঁচে গড়া!

মানসী রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে মাধুরীর গলা শুনল, 'মানু দাঁড়া আমিও আসছি।' মানসী ফিরে তাকিয়ে দেখল, মাধুরী একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধুরী বলল, 'এই রাত্রে একা একা কোথায় যাবি? চল আমিও আসছি সঙ্গে।'

আশ্চর্য দিদির গলায় সেই আগেকার স্নেহ আর বন্ধুত্বের সুর ফিরে এসেছে। একটু আগে ও যখন অসীমের ভুলের কথা বলছিল, নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করছিল, তখনো তো এত অন্তরঙ্গ সুর বাজেনি। মার কাছে দুজনে মিলে একসঙ্গে গাল খেয়েছে বলেই কি এই সমব্যথা, এই সহানুভূতি?

মানসী বলল 'দিদি তুই বরং বাড়িতেই থাক, এ সময় সবাই মিলে বাড়ির বাইরে যাওয়া কি ঠিক হবে? তুই বরং বাড়িতে থেকে মাকে আগলে রাখ। ওঁদের সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। অত অস্থির হবার কী হয়েছে বলতো?'

মাধুরী একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা তুই তাহলে ঘুরে দেখ। আমি বরং পাড়ায়—কিন্তু পাড়ায় নাকি সব জায়গায় মা খোঁজ-খবর করিয়েছেন। কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি।' ওর গলাও যেন কেমন কেমন। মাধুরীও কি ভয় পেয়েছে?

মানসীর নিজের মনেও এবার একটু উদ্বেগের ছায়া পড়ল। গেল কোথায় ছেলেটা? মনে যত সৃষ্টিছাড়া আশঙ্কা ভিড় করে আসে। তার সঙ্গে যুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই সব অযৌক্তিক

'আশংকাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মানসী জোর করে হেসে বলল 'যাই বলিস ও'রা সবাই বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠেছেন। অত ভাববার কী আছে। নন্দু বাড়ি ছেড়ে কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে।'

মাধুরী হাসল না, বরং একটু গম্ভীর-ভাবেই বলল 'কিন্তু গেছেও তো অনেক-ক্ষণ। ফিরে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার আর জো নেই।'

মানসী বলল 'তুই বরং হাত মুখটুক ধুয়ে চা'টা কিছু খেয়েনে। স্কুল থেকে ফিরে এসে কিছু তো আর মুখে দিসনি।'

নিজের কানেই কথাটা যেন কেমন শোনাল মানসীর। মাধুরী কি মনে মনে হাসছে? নিজের দিদির সংগে সে মৌখিক ভদ্রতা করতে শুরু করে দিয়েছে বলেই কি ভাবছে মাধুরী? কেন ওই সব ঘটেছে বলে সেকি তাকে খেতে বলতে পারে না? সত্যি সত্যি অসীমের সংগে যদি ওর বিয়েই হয়—বিয়েই হয়। মানসীর মনের ঈর্ষার সিন্ধু আবার উত্তাল হয়ে উঠল। যদি বিয়ে হয়, কেন বিয়ে হবেই। হবে বলেই মাধুরী নির্লজ্জভাবে ওকথা স্বীকার করতে পেরেছে। নইলে ওকথা কি কেউ মুখ ফুটে বলতে পারে? সহজভাবে বলা যায় না বলেই মাধুরী অমন একটা ভংগির আশ্রয় নিয়েছে। 'জল-বৃষ্টিতে তার মাথার ঠিক ছিল না, আমিও বাধা দেওয়ার শক্তি হারিয়েছিলাম।' এসব কথার মানে কি? একজনের মাথা খারাপ করা এবং আর একজনের হৃদয়কে দুর্বল করা ছাড়া বৃষ্টির আর যেন কোন কাজ ছিল না। অসীম নাকি বলেছে মাধুরীকে অসম্মানিত হতে দেবে না, তার মানে কি? চুমু খেয়ে

যে মান হরণ করেছে, বিয়ে করে সুদে আসলে সেই মান ফেরৎ দেবে? কিন্তু এ ধরনের অভিজ্ঞতা কি অসীমের এই প্রথম? আর-একজনকে তাহলে কত হাজার বার বিয়ে করতে হয় সে কি তা হিসাব করে দেখেছে?

মাধুরী বলল 'আমি তাহলে যাই। পাড়ার ছেলেদের কাছেই আর একবার খোঁজখবর করে দেখি। তুই যদি ঘুরে আসতে হয় ঘুরে আয়। বেশি দেরি করিসনে যেন।'

মানসী শুনেতে পেল কি পেল না। ঘাড় কাত করে সায় দিল।

নিশ্চয়ই তাই। নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে। মানসী যতক্ষণ অফিসে ছিল সেই সময়ের মধ্যে ওরা ফন্দিটা ঠিক করে ফেলেছে। কে কোন ভাষায় কোন ভংগিতে বলবে। আসল কথাটাকে কত ঘুরিয়ে, জড়িয়ে কত নিপুণ কুশলতায় এক স্বেচ্ছাকৃত লোভ আর লালসা অনিবার্যতার মহিমা পাবে, তা ওরা নিশ্চয়ই ভেবে ভেবে ঠিক করেছে ওরা জানে কথাটা শোনার সংগে সংগে মানসী পরম ঘৃণায় দূরে সরে আসবে। কোনরকম দুঃখ করবে না, ক্ষোভ করবে না, দাবি করবে না, অভি-যোগ করবে না। ভালোই হোলো। এই বন্ধন মুক্তির চেয়ে বড় কাম্য আর তার এখন নেই।

মানসী আর একবার রাস্তাটা পার হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সংগে সংগে একটা বাস এসে স্টপ ছাড়িয়ে প্রায় তার সামনে দাঁড়াল। একেবারে সব বন্ধন মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছিল। সরে যেতে যেতে নিজের মনেই হাসল মানসী।

বাস থেকে কয়েকজন যাত্রী নামলেন। তাঁদের মধ্যে মনোমোহনও আছেন। তিনি মানসীকে দেখে বললেন 'কিরে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে? সে ফিরেছে?'

মানসী বলল 'না।'

মনোমোহন বললেন 'আমি জানতাম। আমার মনই বলছিল সে ফেরেনি। দেখ কোনদিন ফেরে কিনা।'

মানসী ধমক দিয়ে বলল 'ছিঃ বাবা। ওসব তুমি কী বলছ। তুমি দেখি মার চেয়েই বাড়া হয়ে গেলে। চল ভিতরে চল।'

প্রায় জোর করেই মানসী তাঁকে ঘরে নিয়ে চলল

সাড়া পেয়ে সুহাসিনীও সামনে এসে দাঁড়ালেন। মায়া মঞ্জুরা রইল দূরে দূরে। প্রত্যেকের মুখে ভয় আর দুর্ভাবনার ছাপ। সারাবাড়ির আবহাওয়া থমথমে। যেন সত্যিই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আর একটা বৃহত্তর দুর্ঘটনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সুহাসিনী বললেন 'একা এলে যে?'

মনোমোহন বললেন, 'খুঁজে না পেলে একা আসব না কী করব?'

সুহাসিনী বললেন 'পেলে না?'

মনোমোহন বললেন 'কোথাও না।'

সুহাসিনী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ও আবার

কি কথার ছিরি। ভংগি দেখলে গা জ্বলে। খুঁজতে কোথায় কোথায় গিয়েছিলে শুনি?'

মনোমোহন বললেন, 'জানা শোনা সব জায়গায় গিয়েছি। ন্যায়রত্ন লেনে তোমার ছোটকাকার বাড়ি।'

সুহাসিনী বললেন 'সেখানে সে কোনদিন যায় না।'

মনোমোহন বললেন, 'আহা লোকে তো আত্মীয়স্বজনের বাড়িই আগে খোঁজ করে। নাকি রাস্তায় রাস্তায় প্রত্যেক বাড়ির কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করতে করতে যাব আমার ছেলে এসেছে? আমার ছেলে এসেছে? তাই করতে বলছ তুমি?'

সুহাসিনী বললেন 'আমি তোমাকে আর কিছুই করতে বলছিনে। যতখানি করে তুলেছ তার ধাক্কাই আগে সামলাই।'

মনোমোহন এবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বউবাজারে গেলাম শীতাংশু চক্রবর্তী—আরে আমার পিসতুতো ভাই শীতাংশু তার ওখানে। নন্দুর সংগে তার বেশ খাতির। একসংগে ফুটবল খেলা-টেলা দেখেছে। সেখানেও নেই।'

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন 'তুমি আর জ্বালিও না। ছেলে ফেল করে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কুটুম্বিতা করতে গেছে। কত সুখ তার মনে? অমন বুদ্ধি না হলে কি আর এমনসব গুণধর ছেলেমেয়ে জন্মায়?'

মনোমোহন একথার কোন জবাব না দিয়ে মানসীর দিকে তাকিয়ে বললেন 'তারপর অসীম বলল শংকরের কথা। নন্দ তার বাসায় ওখানে যদি গিয়ে থাকে একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়।'

মাধুরী বলল 'গিয়েছিলে?'

মনোমোহন বললেন 'গিয়েছিলাম বইকি। তোমাদের জন্যে আমার কোন অপকর্মটাই বা না করতে হোলো? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম ও কুলাংগারের বাড়িতে আমি জল-গ্রহণ তো ভালো প্রস্রাব করতেও যাব না। কিন্তু আর এক হতভাগা কুলাংগারের জন্যে যেতে বাধ্য হলাম।'

মাধুরী বলল 'দাদার সংগে তোমার দেখা হয়েছে বাবা?'

মনোমোহন বললেন 'না কোত্থেকে দেখা হবে! বাবু টিউশনিতে বেরিয়েছেন। দু-হাতে পয়সা কামাচ্ছেন আর ফুর্তি করছেন।'

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যাক, ওসব বাজে কথা রাখো। সেখানে কি নন্দু গিয়েছিল?'

মনোমোহন মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'গেলে কি আর তাকে আমি সেখানে ফেলে আসতাম? যায়নি সেখানে।'

মাধুরী বলল 'বউদি কি কিছু বলল?'

মনোমোহন বললেন 'তোমরা একালের মেয়ে। মনের মধ্যে যাই থাকুক মুখের ভদ্রতা তো খুব শিখেছ। খুব আদরযত্ন।

বাবা আপনি সুস্থ হয়ে বসুন। অত ভাবছেন কেন চা করে দিই। খাবার করে দিই। শ্রদ্ধা আর ভক্তির শেষ নেই। বললাম, মা, তোমার এখানে আমি খেতে আসিনি। সে মনের অবস্থা অমার নয়। হতচ্ছাড়া হারামজাদাটা যদি আসে, কি কোন খোঁজটোজ পাও দয়া করে একবার খবর দিয়ো। তাহলেই আমার মহা উপকার করা হবে। আর কোন উপকার তোমাদের কাছে আমি প্রত্যাশা করি না।'

সুহাসিনী বললেন, 'অসীম? সে কোথায়? সে কি সেখানেই রয়ে গেল নাকি?'

প্রশ্নটা মানসীর নিজের মনেই উঠেছিল। মার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসায় সে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হোলো।

মনোমোহন বললেন, 'সেখানে রয়ে যাবে কেন। সে এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। ছেলে বটে একটি। নিজের ছেলেও এতখানি করে না। সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। যেখানে যেতে বলেছি সেখানে গিয়েছে। বাসে ট্রামে একবারও আমাকে টিকিট কাটতে দেয়নি। সব নিজে করেছে।'

বাবার সরলতা দেখে মানসীর চোখে জল এল। মনে মনে বলল, 'ওর এই অসামান্য ভদ্রতায় তুমি মুগ্ধ হয়ে গেলে বাবা। তুমি তো জানো না লোকটি কত ছোট, কত হীন, আর কী প্রতারক।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে তাহলে গেল কোথায়?'

মনোমোহন বললেন, 'অসীমের কথা বলছ? শ্যামবাজারে নেমে গেল। আমিই বললাম থানায় একটা খবর দিয়ে রাখতে। আর হাসপাতাল টাসপাতালগুলিতে—।'

সুহাসিনী চীৎকার করে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে পাগল করে ছাড়বে? হাস-পাতালের কথা এর মধ্যে আসে কিসে?'

মনোমোহন বললেন, 'বলা যায় না। গড্ ফরবিড, যদি কোন বিপদ আপদ হয়ই লোকে তো ওইসব জায়গাতেই আগে খোঁজখবর নেয়।

সুহাসিনী ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমাদের জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব? নিজে আমি নিজের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। সেই তখন থেকে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। আমার মন কী যে বলছে আর না বলছে তা আমার অন্তর্যামীই জানেন। তারপর প্রত্যেকের মুখে অকথা আর কুকথা, অকথা আর কুকথা। আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না তোমরা, সবাই মিলে কি সেই ষড়যন্ত্র করেছ?'

তিনি আর না দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। বোধ হয় গিয়ে কাঁদতে শুরু করবেন।

বিপদের আশঙ্কাটা সংক্রামক। মানসী বেশ বুঝতে পারছে তার সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি ছাপিয়ে বাবা মার ভয়ার্ততা সবার মনে কালো ছায়া ফেলেছে। অন্ধ ভয়, অন্ধ স্নেহ, অন্ধ কামনা বাসনা। মানুষের দুটি চোখ তো আসলে চোখ নয়, চোখের ছলনা মাত্র।

মানসী আর থাকতে না পেরে বলল, 'দিদি, চল, আমরা আর একবার এগিয়ে দেখে আসি।'

মাধুরী বলল, 'চল।'

কিন্তু দুজনে বেরোতে না বেরোতেই দেখল, রাস্তার ওদিক থেকে মঞ্জু প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে।

ও যে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল বাবার কথা শুনতে শুনতে মানসী লক্ষ্য করেনি।

মানসী মাধুরী দুজনে প্রায় এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল,

'কি রে মঞ্জু?'

মঞ্জু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সেজদি, ছোড়দা এসেছে।'

মানসী বলল, 'এসেছে? কোথায়?'

মঞ্জু বলল, 'ওর যে বন্ধু বীরুদা, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন কথা বলছে। আমি দেখতে পেয়ে ছুটে চলে এসেছি। ওরা এক সঙ্গে বাসটা থেকে নামল সেজদি।'

মানসী সম্রাজ্ঞীর মত হুকুম দিল, 'নিয়ে আয়, ওর কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আয়।'

কান ধরে আনতে হল না নন্দু আস্তে আস্তে নিজেই এসে হাজির হল।

ঘরে এসে ঢুকবার পর সবাই একমুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইল। যেন কিছুই হয়নি, নন্দু তেমনি ভঙ্গিতে কারো দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সুহাসিনীই তাকে বাধা দিলেন, 'দাঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস?'

নন্দু শান্তভাবে বলল, 'ঘরে।'

সুহাসিনী বললেন, 'তোর আবার ঘর কিসের রে? তোর কি ঘর বলে কিছু আছে নাকি, ঘরের কারো জন্যে কোন চিন্তা তুই করিস? সারাবাড়ি সুদ্ধ লোক তোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কী দুশ্চিন্তায় কী দুর্ভাবনায় যে কেটেছে—'

নন্দু বলল, 'দুশ্চিন্তার কী আছে।'

মনোমোহন তেড়ে এগিয়ে গেলেন, 'হতভাগা, গাধা, শুয়োর। দুশ্চিন্তার কী আছে! দুশ্চিন্তার কী আছে তা তুই কী করে বুঝবিরে উল্লুক?'

মানসী তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'যাক, বাবা যাক। এখন আর ওসব কিছু বলে লাভ নেই।

মনোমোহন বললেন, 'লাভ নেই মানে? এত টাইম আর এনার্জি যে আমার নষ্ট হল তার দাম দেবে কে? আর উদ্বেগ! উঃ। হতভাগা এই কয়েক ঘণ্টায় আমার দশ বছরের আয়ু কমিয়ে দিয়েছে।'

নন্দু মার দিকে তাকিয়ে নিচুগলায় বলল, 'অত উদ্বেগের কী হয়েছে? তোমরা কি ভেবেছিলে আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব, না সুইসাইড করব?'

বাবাকে থামিয়েছিল মানসী কিন্তু মাকে পারল না। তিনি ধাঁ করে নন্দুর গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন, 'ফের চোপা? ফের মুখে মুখে তর্ক? লজ্জা করে না হতভাগা? তোর লজ্জা করে না? সুইসাইড করবে! তাতেও ক্ষমতার দরকার হয়, সাহসের দরকার হয়। তা করলে তো বাঁচতাম, আমার হাড় জুড়োত। আমি চিরশান্তি পেতাম।'

নন্দু আর কোন প্রতিবাদ করল না, গালে হাত বুলোতে বুলোতে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মানসী নিজের মনে হাসল। এতক্ষণ মার ভাবনা ছিল পাছে নন্দু অঘটন কিছু ঘটায়। ও নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসবার পর এখন বলছেন তেমন কিছু ঘটলেই উনি রক্ষা পেতেন। যাক বাঁচা গেছে। ভালোয় ভালোয়

ও যে ফিরে এসেছে সেই ভালো। মানসী কারো কাছে প্রকাশ করেনি, কিন্তু তার মনেও কুডাক ডাকার অন্ত ছিল না। সেই আদিম ভয় আর আদিম সংস্কার মনের চোদ্দ আনি জুড়ে আছে। বুদ্ধির আলো সেখানে জোনাকির আলোর মতই ক্ষণিক আর ক্ষীণপ্রভ।

মানসী ঘরে এসে দেখল মায়া, মঞ্জু, মাধুরী সবাই নন্দুকে ততক্ষণে ঘিরে ধরেছে। এতক্ষণ ও কোথায় ছিল তা জানবার জন্যে মানসীও কৌতূহল বোধ করল।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি করে বলতো, সারাদিন কোথায় লুকিয়েছিলি তুই?'

নন্দু জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'বাঃ, লুকোব কেন। সোদপুরে গিয়েছিলাম। সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে আমি একটা অ্যাপ্রেনটিসসিপ পেয়ে যাব মেজদি। বীরুর মামা সেখানে সুপারভাইজার। তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। সেইজন্যেই বীরুকে নিয়ে গেলাম। মামার জোর ছাড়া আজকাল তো কোন কাজ হয় না। পড়া একেবারে ছেড়ে দেব না। নাইট ক্লাসে ভর্তি হবার একটা চান্স নেব। কিন্তু তোমাদের খরচে আর নয়, তোমাদের কারো কাছে আর হাত পাতব না। তোমাদের পয়সা যথেষ্ট নষ্ট করেছি সেজদি, আর নয়।'

মানসী হেসে বলল, 'হয়েছে। আর বীরত্ব ফলাতে হবে না তোর। এবার কিছু খাবি তো খা গিয়ে।'

নন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'অসীমদা কোথায়? তিনি কি চলে গেছেন নাকি?'

নন্দু প্রথমে মানসী তারপরে মাধুরীর দিকে তাকাল। মাধুরী কোন জবাব দিল না। মানসীও চুপ করে রইল। সেই অবাঞ্ছিত অতিথির কথা আর কেন? এই পারিবারিক পুনর্মিলনে তার তো আর কোন প্রয়োজন নেই

সুহাসিনী বললেন, 'চলে যাবে কেন। সে বোধহয় সারা শহর ভরে তোকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

নন্দু এবার হেসে বলল, 'বাঃ, নিজেরা কিছু করতে না পেরে তোমরা আমার পিছনে পুলিস লাগিয়ে দিয়েছ নাকি মেজদি। কী মজা, কাল আমরা অসীমদাকে খুঁজেছি। আর অসীমদা আজ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এযেন সেই চোর চোর খেলা। তাই নয় মেজদি?'

মানসী লক্ষ্য করল কালকের প্রসঙ্গ ওঠায় মাধুরী ফের মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

সুহাসিনী ছেলেকে ধমক দিলেন, 'যাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। এবার আয়। হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাবি তো খেয়ে নে।'

নন্দু মার কথার জবাব না দিয়ে মানসীর দিকে তাকাল, 'কিন্তু আমি নিজে ধরা না দিলে আমাকে খুঁজে বের করা অত সহজ নয় সেজদি। অসীমদা তো অসীমদা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেরও সাধ্য ছিল না—।'

সুহাসিনী বললেন, 'আঃ। ফের বকবক করছিস?'

নন্দু বলল, 'তুমি যাও মা। আমি কিছু খাব না।'

সুহাসিনী বললেন, 'না খাবেন না। তুই খাবি না তো তোর ঘাড়ে খাবে। খুব কীর্তি করেছ। আর মান অভিমানের দরকার নেই। এবার দুটো গিলে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে এসো।'

চেঁচামেচির শব্দ করতে করতে মনোমোহন এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মারধোর তো যথেষ্টই করেছ। এবার একটু ভালোমুখে কথা বলে হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে যাও। আরে আজ ওর দুঃখই কি কম হয়েছে? আমি কি তা বুঝিনে? খুবই বুঝি। বুঝব না কেন। আমি নিজেও যে ওই ফেলকরাদের দলে। দুদুবার চেষ্টা করেও আই এ-র চৌকাঠ ডিঙাতে পারিনি। হতভাগা, আজ আমি তিন বারের বার ফেল করলাম। একপুরুষে নয়, দু পুরুষ ধরে ফেল করে চলেছি। আরো কত পুরুষ করব কে জানে।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে মনোমোহন সরে গেলেন। কিন্তু একখানি হাত আর একটি চোখ মানসীর চোখের সামনে যেন অনেকক্ষণ ধরে ভাসতে লাগল। ঘরে সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। একটু বাদে ফের সুহাসিনী বললেন, 'আয় খাবি আয়।'

নন্দু মায়া মঞ্জুকে একসঙ্গে বসিয়ে দিলেন সুহাসিনী। মিনু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে ডেকে তুলে খাওয়ালেন।

তারপর মনোমোহনের কাছে গিয়ে শান্ত-স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'এসো দুই মেয়েকে নিয়ে তুমিও এবার বসো এসে।'

মনোমোহন বললেন, 'কিন্তু অসীম যে এখনো এল না।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে বোধহয় আর আসবে না। রাত এগারটা হল। হয়তো কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গেছে। আর যদি এসেই পড়ে তার ভাত তো বাড়াই থাকবে—।'

মনোমোহন বললেন, 'তাহলে দিয়ে দাও।'

বাবা-মার কথাবার্তা সবই কানে গেল মানসীর। কিন্তু ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে খেতে গেল না।

মাধুরীও বলতে লাগল সে খাবে না, তার আজ ক্ষিদে নেই।

মানসী বলল, 'আমারও ক্ষিদে নেই মা। আমারও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

সুহাসিনী রাগ করে বললেন, 'ক্ষিদে না থাকবার কী হয়েছে? কী খেয়েছিস তোরা যে ক্ষিদে নেই।'

মানসী মনে মনে বলল, 'বিষ খেয়েছি মা। সুধা মনে করে বিষ খেয়েছি। তাতে ক্ষিদে মরে গেছে, প্রাণ মরে গেছে। পৃথিবীতে কিছুই আর বেঁচে নেই।'

কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বাবার পাশে তাকে আর দিদিকে জোর করে বসিয়ে দিলেন। মানসী কোনরকমে দুটি মুখে দিয়ে উঠে এল। বেশ বুঝতে পারল, বাবা ভুলে গেলেও মা ভোলেননি। তিনি অসীমকে ক্ষমা করেননি। অতিথির জন্যে আজ আর তাঁর ঘরে কোন স্থান নেই, মনে কোন দাক্ষিণ্য নেই। এই তিন দিন ধরে একজনকে ঘিরে কতজনের মনের কত পরিবর্তনই না হল।

মাধুরী বলল, 'মা তুমিও খেয়ে নাও। সে বোধহয় আর আসবে না।'

সুহাসিনী বললেন, 'আসবে না তার বাক্স বিছানা পড়ে রয়েছে যে।'

মানসী বুঝতে পারল, মা অমনি ধরে নিয়েছেন সে কোনদিনই আসবে না। নাও আসতে পারে। বাক্স বিছানা রয়ে গেছে তো কী হয়েছে? তার দাম কি এতই বেশি? আর মানসী মাধুরী? তারা বোধ হয় এখন বাক্স বিছানার চেয়েও তুচ্ছ। ভীরু কাপুরুষ। না পালিয়ে গিয়ে তার কি আর উপায় ছিল?

কিন্তু দিদি কি করে জানল যে সে আর আসবে না? তাকে কি তাহলে গোপনে বলে গেছে? যেতেও পারে। মানসীকে বলে যেতে সাহস পায়নি। চিঠি লিখে গেছে। এতক্ষণে সেই চিঠির কথা ফের মনে পড়ল মানসীর। দেখা যাক কী লিখেছে চিঠিতে। কোন অজুহাত, কোন কৈফিয়ৎ দিয়েছে।

সুটকেস খুলে মানসী চিঠিখানা বের করে আনল।

ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধুরী একখানা নভেল পড়বার ভান করে বই নিয়ে কাত হয়ে রয়েছে। মানসী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জানলার ধারে এসে চিঠিখানা খুলে ফেলল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শার্ঙ্গদেব

আমাদের সংগীতের প্রাচীনত্বের কথাটা সগৌরবে প্রচার করলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় বটে কিন্তু শুধু ঘোষণাটাই প্রমাণ নয়। আধুনিক সংগীতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের যত রকম সম্ভাব্য যোগসূত্র আছে সেগুলি নির্ণয় করে হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে পারলে যে গৌরব অর্জন করা যাবে সেইটাই হচ্ছে আসল গৌরব। এ চেষ্টাটা যে আজও হয়েছে এমন কথা বলতে পারি না। আগে এ চেষ্টার সুযোগ ছিল না এখন হয়েছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গের অবতারণা করাটা অসংগত হবে না। দিল্লিতে সংগীত নাটক একাডেমি স্থাপিত হয়েছে—বিভিন্ন প্রদেশেও বিভিন্ন সংগীত সংস্থা গড়ে উঠেছে। এঁদের কাজটা 'একাডেমিক' এঁরা অন্তত তাই বলেন কিন্তু সেই 'একাডেমিক' কীর্তির এমন কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না যা আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে কিছু কিছু কাট বিষয়ের আলোচনা যে দেখা যায় না তা নয় কিন্তু অনুমানিক উপাদানে গঠিত এই সব আলোচনার একটা তাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য নেই। সর্বাগ্রে আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যের পূর্ণতাসাধন করা প্রয়োজন।

এই উপলক্ষে স্মরণ রাখতে হবে যে এই ধরণের প্রচেষ্টাকে সর্বভারতীয় প্রচেষ্টায় দাঁড় করাতে না পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত গীতিরূপ প্রচলিত আছে সেইগুলিকে একত্র করে তাদের লক্ষণ নির্ণয় করতে হবে; অতঃপর শাস্ত্রোক্ত সংগীতগুলির সঙ্গে তাদের বর্ণনার দিক দিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে কোনটা কতখানি মেলে। এর মধ্যে যেটুকু অপূর্ণ থাকবে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে কোন কোন সূত্র ধরে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে সেগুলি নির্ণয় করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে দেখা যাবে ভারতীয় সংগীতের এমন একটি ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যার মধ্যে বিবর্তনের রূপগুলি পাওয়া যাচ্ছে। কাজটা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। আর, একাজের জন্য এমন সব ব্যক্তির প্রয়োজন যাঁদের সংগীত ছাড়াও অপরাপর বহু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে।

আমাদের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিদ্বৎ সম্প্রদায় সাধারণত সংগীতকে অত্যন্ত হালকাভাবে গ্রহণ করে এসেছেন। কিন্তু আমাদের সংগীতের ভিত্তি যাঁরা স্থাপন করে গেছেন তাঁরা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংগীতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছেন। অপরাপর আর্টের বিবর্তন যেমনভাবে হয়েছে সংগীতের বিবর্তনও সেইভাবেই হয়েছে। শিল্পের ষড়ঙ্গ নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন কিন্তু সংগীতেরও যে ষড়ঙ্গ পরিকল্পনা ছিল এ সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা আদৌ হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ ছাড়াও যদি প্রশ্ন করি সংগীত বস্তুটা কি? তাহলে তার উত্তরে কেবলমাত্র 'এন্টারটেনমেণ্ট' বলে সেরে দিলে সংগীতের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। যে কোন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতির সার সংগীতের মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত সংস্কৃতি মিলে সমগ্রভাবে একটি জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং এই সংস্কৃতির একটি প্রধান রূপ হচ্ছে সংগীত। সুতরাং সংগীত বস্তুটি লঘু নয়। সাহিত্য এবং ইতিহাসের বহু গবেষণা সহজ হয় যদি সাংগীতিক পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির বিচার করা সম্ভব হয়। দু একটা উদাহরণ দিই।

চর্যাপদ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে তুমুল আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চর্যা সম্পর্কে সাহিত্যালোচনায় রথী মহারথীগণ একবারও ভেবে দেখেন নি যে চর্যা আসলে সংগীত সুতরাং প্রাচীন সংগীতবেত্তাদের আলোচনায় চর্যা সম্পর্কে কিছু থাকতে পারে। এই সব

গবেষণামূলক সাহিত্যে চর্যার সংগীতরূপ বা সাংগীতিক উল্লেখ কিছুমাত্র নেই। ফলে এই হয়েছে যে কতকগুলি কল্পনা বা অনুমান ছাড়া আমরা আর কিছুই পাই না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এই সংগীতকে সংকীর্তনের আদিরূপ বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি কিন্তু এটা কতখানি যুক্তি-যুক্ত সেটা একবারও ভেবে দেখেন নি। এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি তাঁর কাছে উন্মুক্ত ছিল। সেখানকার শংগীতশাস্ত্রগুলি একটু উল্টে পাল্টে দেখলে চর্যার সংগীত-রূপ তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারত।

আর একটি উদাহরণ হচ্ছে—'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'। এটিও একটি গেয় বস্তু। কিন্তু, এই গ্রন্থে উল্লিখিত সংগীতের সুসংগত বিচার আজ পর্যন্ত হয় নি। এই গ্রন্থের সময় নিরূপণ হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে। সাংগীতিক উল্লেখের বিচারও যে রচনাকাল নির্ধারণের পক্ষে সহায়ক হতে পারে সেটা কেউ ভেবে দেখেন নি। শুধু তাই নয়—এটি একটিমাত্র সংগীতগ্রন্থ যাতে মধ্যযুগের সর্বভারতীয় প্রবন্ধগায়নের পরিচয় রয়েছে। এগুলি উদ্ঘাটিত করবার সামান্যতম প্রয়াসও এ পর্যন্ত হয় নি।

সংগীত জগতেও এমন পণ্ডিত ব্যক্তি কেউ কেউ আছেন যাঁরা মনে করেন যে, শাস্ত্রবর্ণিত সংগীতের বিশেষ মূল্য নেই—এগুলির অধিকাংশই কাল্পনিক। কিন্তু এ ধারণাটা যে সংগত নয় তার বহু প্রমাণ আছে। ইতিপূর্বে আমরা একটি আলোচনায় দেখিয়েছি যে মেবারের মহারাণা কুম্ভ গীতগোবিন্দের একটি চমৎকার গীতিনাট্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর বর্ণনার সংগে সে যুগের শাস্ত্রোক্ত সংগীতের যথেষ্ট মিল আছে। এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন যে বৈদিক সংগীতের কোন মূল্য নেই সেগুলি সুর করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এ ধারণাও ঠিক নয় কেননা বৈদিক সংগীতকে অবলম্বন করে বড় বড় গীতরূপ গড়ে উঠেছিল। এক-সময় আমাদের দেশে বহু গান রচিত হয়েছিল যাদের আখ্যা ছিল প্রকরণ বা বস্তু। এই সব গানে বৈদিক সংগীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সব গানে প্রযুক্ত শাখা, প্রতিশাখা প্রভৃতি শব্দ বৈদিক ঐতিহ্য থেকেই এসেছে। এছাড়া ঋক, পাণিকা, গাথা, সাম—এই সব বৃহৎ বৃহৎ গীতগুলি কেবল-মাত্র সুর করে আবৃত্তি নয়, দস্তুরমত সুরে তালে গান। পরবর্তীকালের সামগীতিতে আজকালকার মত চার পাঁচটি কলির অস্তিত্বও ছিল।

এই সব যাবতীয় গানেরই সংগ্রহ হিন্দু রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা গোলমালে এই সব গান লুপ্ত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু সবই লোপ পায় নি বহু গান নানাকারণে অসামান্যভাবে রূপ পরি-বর্তন করেছে। সব গানের খোঁজ আমরা রাখি না এবং তার কোন সংগ্রহও নেই—বিভাগ বা ক্লাসিফিকেশন তো দূরের কথা। অতএব বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় এই সংগ্রহ আরম্ভ করে সম্পূর্ণ করা দরকার। আমাদের সংগীত শাস্ত্রাদিতে শতাধিক গীতরূপের উল্লেখ এবং বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু এযুগের গীতগুলির সংগে তাদের কোন সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। প্রচলিত সব গানের নমুনা যদি একত্র করা যায় আমার বিশ্বাস তাহলে এই যোগ-সূত্রের অনেকখানি এযুগেও পাওয়া যাবে। প্রদেশ অনুযায়ী গীতগুলিকে যদি সাজিয়ে আনা যায় তাহলে দেখা যাবে একদেশের গান তার সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য দেশে যাবার প্রাক্কালে কিভাবে রূপ পরিবর্তন করেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম বা পশ্চিম থেকে পূর্ব;—অনুরূপভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ বা দক্ষিণ থেকে উত্তর—এইভাবে বিচার করে গেলেও পরিবর্তনের যে ধারা দেখা যাবে তা অত্যন্ত কৌতূহলজনক। বস্তুত এইভাবে সারা বিশ্বের সাংগীতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। পুরাতন গানগুলির নাম এবং লক্ষণের সংগে বর্তমান সংগীতের নাম এবং লক্ষণ-গুলি মিলিয়ে দেখতে দেখতে অনেকক্ষেত্রে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা যাবে এবং সেই সূত্র ধরে গবেষণা আরম্ভ হলেই সমগ্র ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। তখন বোঝা যাবে কোন দেশের সংগীত কিভাবে অপর দেশে এসেছে বা কোন সংগীত কিভাবে তার পূর্বরূপ পাল্টে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই বিবর্তনের বিচার ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, সামাজিক—এইরকম বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে করা প্রয়োজন যাতে বিচারটা সর্বাংগীন হয়।

এই যে বিশাল কাজ এর জন্য নিপুণ প্ল্যান এবং বিলক্ষণ অর্থব্যয় প্রয়োজন। অতএব শক্তিশালী সংস্থা ভিন্ন অপর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যাপকভাবে একাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা সাহায্য করতে পারেন মাত্র। এই কারণেই দিল্লির একা-ডেমিকে এই কাজে আত্মনিয়োগ করবার প্রস্তাব করছিলাম।

ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে যে কেন্দ্রীয় সংগীতনাটক একাডেমি পরিচালিত হচ্ছে তার কর্মপন্থা আমরা জানি না। তাঁরা বিভিন্ন দেশের সংগীত গ্রন্থগুলি পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন এটুকু খবর পেয়েছি। কিন্ত সেটা তো সাহিত্যসংস্থা থেকে হওয়াও সম্ভব। আসলে প্রয়োগের দিক থেকে যে সব কাজ করবার আছে সেদিকে নজর দেওয়া তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। এইরকম বহু বিশাল এবং ব্যাপক কাজ একাডেমিগুলির জন্য অপেক্ষা করে আছে। এ প্রসংগে শুধু প্রধানতম কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া গেল।

ছোট গল্প

রূপসজ্জা—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নিওলিট পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯। দাম—আড়াই টাকা।

রূপসজ্জা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থে পাঁচটি গল্প আছে: রূপসজ্জা, দ্বৈত, দুই লেখক, পাত্রী ও পুরাতনী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর শিল্পকর্মের গোড়া থেকে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে এসেছেন। পূর্বসূরী কি তাঁর সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে গল্প রচনায়, চিন্তায়, শিল্পসুষমায় তাঁর পার্থক্য অনেক। অতি সহজ ভাষায়, সরলতায় তিনি গল্প বলার অপূর্ব কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন—যা অনুভবের হৃদয়াবেগের অতি ধীর শান্ত সঞ্চালনের মত বিস্তার লাভ করতে করতে হৃদয় মন আপ্লুত করে: সৃষ্টি করে অপূর্ব স্বাদের। তাঁর শিল্পকর্মের প্রধান গুণ এবং বৈশিষ্ট্য—সংযম, মন্থরতা, এক বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি এবং পরিবেশ ও চরিত্র চয়নের অতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। সর্বশেষে তিনি গল্পটি এমন গভীরে নিয়ে শেষ করতে জানেন, যা পাঠকদের মনে ধাঁধার সৃষ্টি না করে পরিপূর্ণ এক আলোকপাতে সমর্থ হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা এবং তার ছড়ানো ছিটনো খণ্ড বিখণ্ড সৌন্দর্য নিয়ে নরেন্দ্রনাথের শিল্পসত্তা। মূলত নরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত জীবনেরই পাঁচালিকার।

রূপসজ্জা গল্পে এক উদ্বাস্তু কলোনীর সভায় প্রবীণ নাট্যকার হরবিলাস রায়কে সভাপতিরূপে দেখতে পাই। নরেন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, '......মাটির পৃথিবীতে মানুষের পদসংকেত। মোছে মিলায়, আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।......' নরেন্দ্রনাথ এখানে আশাবাদী। উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ বেদনার মধ্যেও তিনি এই আলোটুকু খুঁজে নিতে পেরেছেন। ফ্যান্সী ড্রেস প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেবার সময় যক্ষ্মারোগীর বেশধারী রমাকে হরবিলাস বাতিল করেন। জীবনের রূদ্র ভয়ংকর রূপকে তিনি ভয় পান। কিন্তু সেই রমার জীবনের আসল গল্পটুকু শোনবার পর বেদনায় তাঁর মন ভরে ওঠে। আর এক জায়গায় নরেন্দ্রনাথ বলেছেন, '......আয়ু ত অফুরন্ত নয়, জীবন ত ব্যাধি জরা দুশ্চিন্তা দুর্বিপাকমুক্ত নয় যে, মুঠে মুঠে ছড়িয়ে দেওয়া যায়......'। কিন্তু গল্পের শেষে হরবিলাসকে আরও **ঊর্ধ্বে** নিয়ে গেছেন নরেন্দ্রনাথ। **তাঁর বক্তব্য** আজকের সমাজ সমস্যার মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বৈত, দুই লেখক, পাত্রী ও পুরাতনী সুলিখিত, সুচিন্তিত। এবং সব কটি গল্প শুধু এখানে গল্প নয় বরং আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের মূল সত্য। সব কটি চরিত্রের মধ্যে আমি আমরা, আমাদের আশপাশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি এবং তার ভাবনা ও পরিণতি **পর্যন্ত** আছে।

কিন্তু একটা কথা বলবার আছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ-যুগের শক্তিশালী গল্পকার বলেই বলা প্রয়োজন মনে করি। তিনি যেন স্ব-সৃষ্ট এক বৃত্তের পরিধির মধ্যে ঘুরছেন। তাঁর গল্প বলার ধরন, ঢং, ভাষা ও রীতির কোনো পরিবর্তন না থাকায় অনেক সময় একঘেঁয়ে ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেন তার নিজস্ব শিল্প জগতের পরিধি সীমিত। আমরা আশা করি, তিনি যদি এবার প্রসারিত সীমানায় প্রতি

দৃষ্টিপাত করেন, নতুন খাতের কথা ভাবেন ও সহানুভূতিশীল হয়ে মন নিয়োগ করেন, তা হলে বাঙলা সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ হবে।

২৪৩।৫৯

উর্বশী—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ২.৫০ নঃ পঃ।

ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছুই নেই। ছোট গল্পাকার হিসেবে তাঁর স্থান কোথায় সে বিচার এই স্বল্প পরিসরে এই সামান্য কটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। তাছাড়া আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে নারায়ণবাবুর বিখ্যাত গল্পের কোনটিই নেই। কিন্তু তবুও, গল্পের রচনাশৈলীতে প্রতিমুহূর্তেই নারায়ণবাবুকে বিশেষভাবে চেনা যায়। তাঁর ভাষা, তাঁর বর্ণনা-ভঙ্গী বিস্মৃত হবার মত নয়। কত ক্ষিপ্র টানে তাঁর তুলিতে ছবি ফোটে, কত সামান্য কথায় গল্পের আবহ রচনা তিনি করতে পারেন ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ক্ষোভও মনে না জেগে পারে না যে ইদানীংকালে তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পেই শেষ রক্ষা হয় না। তিনি যত সহজ পাঠককে কাছে টানেন তত সহজেই তিনি তাদের দূরে ঠেলে দেন। একটা অনামনস্ক অস্থিরতা তাঁর সাম্প্রতিক কালের গল্পগুলির রোগলক্ষণ।

আলোচ্য গ্রন্থে এগারটি গল্প রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি গল্প মনকে সত্যিই নাড়া দেয়। রঘুনাথ গোস্বামী অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি ভালো লাগল

৩৩৬।৫৯

চুল চেরা শোধবোধ—শিবরাম চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দু' টাকা।

বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্যে লিখছেন এমন গল্পলেখকের সংখ্যাই বিরল হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, তার ওপর শুধু মাত্র ছোটদের জন্যে লিখছেন এবং ছোটদের জন্যে হাসির গল্প শুধুমাত্র হাসির গল্প লিখছেন এমন লেখক বাংলাদেশে শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া আর কে কে আছেন আমরা সঠিক করে জানি না। অথচ এই শিবরামবাবুর প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চার পথ হাস্যরসের ছিল না।

সকলেই মোটামুটিভাবে জানেন এবং একবাক্যে সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই কথাই বলেন যে, ইংরেজীতে যাকে আমরা 'পান্' বলে থাকি শিবরামবাবুর লেখার মধ্যে সেই পান দোষ বর্তমান। এবং তাঁদের মতে শব্দ নিয়ে ঐ জাতীয় খেলা করাটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। যে কেউ এমন ছেলেমানুষী করে দেখাতে পারে। এইখানেই মতদ্বৈধ আমাদের। 'ছেলেমানুষী' (সৎ অর্থে) করা যে-কোন লেখকের পক্ষে অত সহজ কথা নয়। ছোটদের চশমা যদিও বা কেউ কেউ পাই ছোটদের মন পাওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। শত চেষ্টা করেও ঐ মন জিনিসটি মেলে না, ওটা চেষ্টার এলাকার বাইরের সামগ্রী। তাই ছোট হয়ে লেখা খুবই দুর্লভ কাজ বলে আমরা মনে করি। তবে অনেক সময় শিবরামবাবুর শব্দ ভাঙা এবং জোড়া লাগানোর ব্যাপারে যে রসোচ্ছ্বাস ঘটে তা ছোটরা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে না বলে আমাদেরও মনে হয়।

চুলচেরা শোধবোধে এগারটি উপভোগ্য গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি ছোটদের ভালো লাগবে।

৪৭৭।৫৯

গবা জিজ্ঞাসা

কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল—অরুণ ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য চার টাকা।

এই জাতীয় বইয়ের জন্যে সত্যিই আমরা প্রতীক্ষা করে ছিলাম। তরুণ কবি এবং লেখকদের মধ্যে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস একেবারে কম। কিন্তু পাঠক এবং পরবর্তী-কালের লেখকদের জন্যে পূর্বসূরী হিসাবে যে তাঁদের অনেক দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব কেবলমাত্র গল্প কবিতা উপন্যাস নিয়েই পালিত হয় না, একথা কি তাঁরা উপলব্ধি করেন না? যে যে-বিষয়ে চর্চা করে চলেছেন সেই সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং স্বতন্ত্র মতামতের মূল্য রয়েছে সমকালে এবং পরবর্তী যুগে।

শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য নিজে কবি। সুতরাং কবিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর দাবী অগ্রগণ্য। প্রতিনিয়ত তিনি সৃজনকার্যে লিপ্ত থাকতে থাকতে তাঁর শিল্পকর্মের চরিত্র তিনি নবনবরূপে উপলব্ধি করেছেন, বিভিন্ন সমালোচককৃত মন্তব্য ও বিতর্কে তাঁর সর্বাঙ্গীণ অভিমত গড়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তৎপ্রকারেই নিযুক্ত করেছেন।

কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতু-বদল এই নিবন্ধ আলোচনা গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে কবিতার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রমবিবর্তন এবং চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী দ্বিতীয় অংশটিতে আধুনিক কবিতার কর্ণধারদের ওপরে সুচিন্তিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সমর সেন এই গ্রন্থের আলোচ্য কবি। কবিদের কবিতার বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গগত আদর্শ, রূপ বিচার এবং মূল্যায়ন করেছেন শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য। এই জটিল বিষয়ে কোথাও কোথাও আমাদের সঙ্গে বর্তমান লেখকের মতদ্বৈধ দেখা দিলেও তাঁর এই নির্ভীক এবং প্রশংসনীয় উদ্যমকে আমরা সম্বর্ধনা জানাই। তাঁর ভাষাটি মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর। বক্তব্য পরিবেশনের রীতিটিও সাবলীল, অন্তরঙ্গ।

গ্রন্থের নামকরণ এবং প্রচ্ছদপট আমাদের আকৃষ্ট করেছে। ভিতরের ছাপা তেমনি আমাদের পীড়া দিয়েছে।

১৬৬।৫৯

রস ও কাব্য—ডক্টর শ্রীহরিহর মিশ্র এম এ, ডি ফিল। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। ২·৫০ নঃ পঃ।

আমাদের প্রাচীন কাব্যবিচার এখনও পর্যন্ত সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রকে অবলম্বন করেই হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানকালে আমাদের সংস্কৃত জ্ঞানাল্পতাবশত সেই কাব্যব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে পাঠ করা সচরাচর ঘটে ওঠে না। সময় স্বল্পতাও এর একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু সেই নন্দনতত্ত্ব বা আনন্দের ব্যাকরণ নিজেই এক একটি কলা। তার আস্বাদন আমাদের অনেকেরই অভিপ্রেত। বাংলায় এই রসবিচার প্রণালীর সুযোগ্য আলোচনা গ্রন্থ বেশি নেই। যা আছে তার মধ্যেও বেশির ভাগ ছাত্রবোধ সুলভ সংস্করণ মাত্র। ডক্টর হরিহর মিশ্র আলোচ্য গ্রন্থে সরল ভঙ্গীতে অথচ বিস্তারিত ব্যাপক আলোচনা করেছেন। প্রথম এবং তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে রসের স্বরূপ এবং রসবিচার বিষয়ে উল্লেখ করে সুদীর্ঘ দ্বিতীয় অধ্যায়ে রসভাব প্রভৃতি উদাহরণ উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যান করেছেন।

৪২৩।৫৯

বঙ্কিম সাহিত্য

বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা—শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সূর্যভারতী, ৮৮।সি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা—১৪। মূল্য—৩·২৫ নঃ পয়সা।

বাংলা সাহিত্যের পরিণত যুগোসূচনা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে। আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাতও বঙ্কিমের হাতে, বঙ্কিম-সাহিত্য অবলম্বন করেই আলোচন, আধুনিক আলোচনার কথারম্ভ। কি উপন্যাসের ক্ষেত্রে, কি প্রবন্ধ ও রম্য-ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে বিংশশতকী বাংলা সাহিত্য যতই অগ্রগতি অর্জন করুক না কেন তার মূল অনুপ্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁকে বিস্মৃত হবার কোন উপায় নেই।

তপনকুমার বঙ্কিম-সাহিত্য অবলম্বন করে তাঁর ধর্মচেতনা, জীবন চেতনা, শিল্প-চেতনা ও সমাজ চেতনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সমালোচনা না করেও একথা সানন্দে বলা যায়, এই জাতীয় আলোচন গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের বাংলা সাহিত্যে এখনও বেশি নয়। কতকগুলি টাইপ বিষয়ে ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত, অনুবৃত্তিমূলক প্রবন্ধ রচনার চেয়ে কেবল একটিমাত্র বিষয়ে আদ্যন্তবিশিষ্ট মৌলিক চিন্তা-প্রসূত আলোচনা গ্রন্থ রচনার চেষ্টা অনেক বেশী প্রশংসনীয়। তপনবাবুকে সেকারণে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

৪২৮।৫৯

পত্রিকা

সাধনা (১৩৬৬)—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল রায়, সাহিত্যরত্ন। হুগলী। দাম—বার আনা।

এই বিশেষ সংখ্যায় নানা ধরনের প্রবন্ধ, গল্প ও রম্যরচনা যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই নতুন। কেবল কবিতায় প্রতিষ্ঠাবান অনেক কবির রচনা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

মনের মানুষ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
সাহিত্যের সত্য—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজ পাত্তর—কমলাকান্ত ঘোষ।
মনকোর জাদুকর—আলাউদ্দিন আল আজাদ।
মন ও মানুষ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
এই প্রেম—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।
সাগর সংগম—বিষ্ণু ভৌমিক।
দার্শনিক—রমেশচন্দ্র সেন।
স্বদেশ ও সমাজ ১৯৫৯—সম্পাদক শৈলেন্দ্র নাথগুপ্ত।

চন্দ্রশেখর

পাঁচমিশেলী প্রমোদোপকরণ

পাপ, প্রণয় ও পাতিব্রত্য, এবং আনুষঙ্গিক হাল্কা নাচ-গান-কৌতুকের নানাবিধ আমোদ-উপাদানের সম্ভারে আজকাল অধিকাংশ বোম্বাই-নির্মিত হিন্দী ছবির একটি বিশেষ গোত্রপরিচয় গড়ে উঠেছে। নাগিনা ফিল্মস-এর "সাট্টা বাজার"-এর সেদিক দিয়ে কোন গোত্রান্তর ঘটেনি।

এই ছবির প্রধান ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী রমেশ। ঘরে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যমুনা, প্রথম পক্ষের কন্যা কলা ও এক নবজাত পুত্র। যমুনা যখন শ্যামের সঙ্গেই কলার বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করে ফেলে, তখন কলা বুঝতে পারে যে তার সৎ-মা গর্ভধারিনীর মতোই তার প্রতি স্নেহশীলা। শ্যাম কলার প্রেমাস্পদ, রমেশের বন্ধুপুত্র।

কিন্তু রমেশের এই সুখের সংসারে ভাঙন দেখা দেয় যখন অর্থলিপ্সা তাকে ফাটকা বাজারের দিকে প্রলুব্ধ করে। এই প্রলোভনের পুরোপুরি সুযোগ নেয় ছবির খলনায়ক বদরীপ্রসাদ—যার লক্ষ্য কলাকে তার আধ-পাগলা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। পাপের জয় ঘটে অনায়াসেই। বদরীপ্রসাদের কুচক্রে আসন্ন সর্বনাশকে ঠেকাতে গিয়ে রমেশ বাধ্য হন এই কুচক্রীর ছেলের সঙ্গে কলার বিয়ে দিতে। যমুনার অশ্রুবিসর্জন আর কলার দীর্ঘশ্বাস—কোন কিছুই পারে না ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাসকে ঠেকিয়ে রাখতে।

এ ভি এম-এর আগামী হিন্দী ছবি "বরখা"-র নায়িকা কুমারী নন্দা

অন্যদিকে কলার সঙ্গে নিজপুত্রের বিয়ের কণ্টকস্বরূপ শ্যামকে আগে থেকেই এক গোপনস্থানে জোর করে আটক করে রাখে বদরীপ্রসাদ। তারপর শুরু হয় তার নতুন পাপাচার। রমেশকে সর্বস্বান্ত করে সে। পথে এসে দাঁড়ায় রমেশ ও যমুনা তাদের শিশুপুত্রকে নিয়ে। অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় তাদের ছেলেও একদিন মারা যায়। এর পর যখন একদিন রমেশ জানতে পারে যে কলা বিধবা হয়েছে, তখন শোকাবেগ সামলাতে না পেরে রমেশ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়।

কলার স্বামীর মৃত্যু ঘটে বদরীপ্রসাদেরই আরেকটি পাপানুষ্ঠানের ফলে। শ্যাম বদরীপ্রসাদের বন্দীশালা থেকে পালিয়ে আশ্রয় পায় কলারই বাড়িতে। কলার স্বামী তার পূর্বপরিচিত। এই সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে বদরীপ্রসাদ। কফির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সে শ্যামকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু এই বিষ-মেশানো কফি পান করে কলার স্বামী—বদরীপ্রসাদের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে এলিয়ে পড়ে। বদরীপ্রসাদের এই পাপকার্যের সাক্ষী থাকে তার অনুচর।

তীর্থ পর্যটনকালে যমুনাকে বদরী-প্রসাদের লালসার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টায় কেমনভাবে রমেশের পক্ষাঘাত দূর হয়, এবং অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় ও শ্যাম এবং তার বন্ধুর তৎপরতায় কি করে বদরীপ্রসাদ পুলিসের হাতে ধরা পড়ে, তাই এগিয়ে আনে চিত্রনাট্যের সুখপরিণতি—যখন দর্শকেরা রমেশের নতুন গড়ে-ওঠা

সংসার, এবং বিধবা কমলা ও শ্যামের মধ্যমিলনের পূর্বাভাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেন।

এই বহু শাখা-প্রশাখা সম্বলিত কাহিনীর বিন্যাসে প্রযোজক-পরিচালক রবীন্দ্র দাভে একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন, এবং তা হলঃ জনমনোরঞ্জন। এই লক্ষ্যের যূপকাষ্ঠে বিভিন্ন ঘটনার যুক্তি ও সঙ্গতি, এবং কাহিনীর সামগ্রিক বাস্তবতাকে যেন নিঃসংকোচেই বলি দেওয়া হয়েছে। তবে খলনায়কের পাপাচার, প্রণয়ের মাদকতা, রঙ্গ-রসিকতার আমেজ ও সতীর দুঃখ লাঞ্ছনা নিয়ে চড়া সুরের অতি-নাটকীয়তা যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে ছবিটির আবেদন অবশ্যই আছে।

বিভিন্ন শিল্পীদের সুষ্ঠু অভিনয়ই এ-ছবির একমাত্র সম্পদ। যমুনার চরিত্রটিকে মীনাকুমারী তাঁর সংবেদনশীল অভিনয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। রমেশবেশী বলরাজ সাহনীর অভিনয়ও সংযত ও স্বচ্ছন্দ। রমেশ-যমুনার কন্যার চরিত্রে বিজয়া চৌধুরী ও তাঁর প্রণয়ীর ভূমিকায় সুরেশের অভিনয় প্রাণবন্ত। খলনায়কের চরিত্রটিতে যথাযথ অভিনয় করেছেন মিওয়ালী। জনি ওয়াকারের রঙ্গ-রসিকতা ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ললিতা চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত, অসিত সেন ও নাদিরা শাকের। "টাইগার"-ছিলো সমার সদুত্তর সাহায্যে শিল্পী—এই ছবিতে কয়েকগুলি ঘটনা চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

কল্যাণজী-আনন্দজীর সুর রচনায় ছবির কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক ও অঙ্গসজ্জা প্রশংসনীয়।

চিত্রালোচনা

সিপ্পী ফিল্মসের "ভাই বহেন" এ সপ্তাহের অদ্বিতীয় ছবি। অর্থাৎ এবারকার মুক্তি তালিকায় আর কোন নতুন ছবির নাম নেই। ডেজি ইরাণী, বেবি নাজ, জনি ওয়াকার, রেহমান ও নিশি "ভাই বহেন"-এর প্রধান ভূমিকাগুলিতে রূপদান করেছেন। জি পি সিপ্পী একাধারে এর প্রযোজক ও পরিচালক। এন দত্তের সুরযোজনায় ছবির সংগীতাংশ সমৃদ্ধ।

গত সপ্তাহে একখানি ওড়িয়া ছবি কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে। ছবির নাম "মা"—চিত্রমের পতাকাতলে নিতাই পালিত এর পরিচালনা করেছেন। ইস্টার্ণ টকিজ স্টুডিওতে ছবিটি তোলা হয়েছে। ভূমিকালিপিতে আছেন চন্দনা, গৌরপ্রসাদ, লক্ষ্মী, গোবিন্দ তেজ, বিজয়কুমার প্রভৃতি।

গত সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত "ভাংরা" ছবিটি পাঞ্জাবী ভাষায় তোলা হিন্দীতে নয়।

পর পর দু'সপ্তাহ কোন বাংলা ছবি মুক্তি পায় নি। তবে আসছে সপ্তাহ থেকে নতুন ছবির মিছিল শুরু হবার কথা। বিকাশ রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত "রাজা সাজা" ও তপন সিংহ পরিচালিত "ক্ষণিকের অতিথি" এক সঙ্গেই মুক্তি পাবে আগামী শুক্রবার। তার পরের সপ্তাহে—অর্থাৎ বড়দিনের মুখে—আসছে এমকেজি প্রোডাকসন্সের "মায়ামৃগ"। ইংরেজী নববর্ষের গোড়ার দিনটিতে মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে অগ্রদূত প্রযোজিত-পরিচালিত "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"-এর। এম পি প্রোডাকশন্সের "কুহক"-এর মুক্তি আপাতত পেছিয়ে গেল। হীরেন বসুর নতুন ছবি "দেবর্ষি নারদের সংসার"-ও সম্ভবত জানুয়ারীর গোড়াতেই পর্দাস্থ হবে।

* * *

আগামী সপ্তাহে আর একটি বাংলা ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছে যার মধ্যে নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় ঘটেছে। ছবিখানির নাম "রিক্তা"—বিশ বছর আগে এই ছবিটি জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাকেই নতুন গানের মালায় সাজিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির করছেন বীণা পিকচার্স। "রিক্তা"র খ্যাতি শুনেছেন অথচ ছবিখানি দেখবার সুযোগ পান নি—এমন দর্শকের সংখ্যা আজ বিরল নয়। তাঁদের কাছে এ ছবির আবেদন নতুনের মতই। ছায়া দেবী এই ছবিতে মায়ের যে হৃদয়গ্রাহী চিত্র এঁকেছেন তা ভারতের চিত্রজগতে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সুশীল মজুমদার এই ছবির পরিচালক এবং ভারতবরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এর সুরকার। নতুন করে যাঁদের কণ্ঠস্বর এই ছবির গানগুলিকে সঞ্জীবিত করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন হেমন্তকুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, সুমিত্রা সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

* * *

নিউ থিয়েটার্স ও সরকার প্রোডাকশন্স যুগ্মভাবে যে ছবিটি তুলতে ব্রতী হয়েছেন তার কাজ অর্ধেকের ওপর এগিয়ে গেছে। গ্রামজীবনের ছবি, নামটিও মানানসই—"নতুন ফসল"। সরোজকুমার রায় চৌধুরীর একটি সুবিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ এটি। একদা যাঁরা নিউ থিয়েটার্সের পতাকাতলে দেশব্যাপী সুনাম অর্জন করেছিলেন, "নতুন ফসল"এর কলাকুশলীদের মধ্যে তাঁদের অনেকেই আছেন—যেমন পরিচালনায় হেমচন্দ্র চন্দ্র, চিত্রনাট্যে বিনয় চট্টোপাধ্যায়, সুরসৃষ্টিতে রাইচাঁদ বড়াল প্রভৃতি। ভূমিকালিপিতে অবশ্য নতুন মুখেরই প্রাধান্য। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনুপকুমার,

কাশ্মীরের তুষারাবৃত উপত্যকায় ইউ বি ফিল্মসের "মনে-মনে"র বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়। তারই একটি দৃশ্যে অরুণ চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অলোক চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল বিশ্বাস

বিশ্বজিৎ, কালী বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি। হেমন্তকুমারের কণ্ঠে দুখানি কীর্তনাঙ্গ গান এই ছবির অভিনব আকর্ষণ।

* * *

শ্রী এন সি প্রোডাকশন্সের "হাসপাতাল" ছবির কাজও পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হচ্ছে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত কাহিনীর নায়িকা শর্বরী এমন এক নারী যে সমস্ত অন্ধ সংস্কার ও ভাবালুতার নাগপাশ ছিন্ন করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চায়। সুচিত্রা সেন এই অনন্যা নারী চরিত্রের রূপায়ন করছেন। তাঁর বিপরীতে নায়ক চরিত্রে আছেন অশোককুমার। বিরল দুই নাট্যপ্রতিভার এমনিধারা একত্র সম্মেলন "হাসপাতাল" ছবিটির বিশিষ্ট আকর্ষণ। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনেতৃ সমাবেশও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিশ্বজিৎ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মজুমদার এবং পরিচালক সুশীল মজুমদারকে দেখা যাবে এর বিভিন্ন পার্শ্ব-চরিত্রে। অনল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় এতে কণ্ঠদান করেছেন লতা মঙ্গেশকর, গীতা দত্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

পরিচালক তপন সিংহের অধিনায়কত্বে ইস্টার্ণ সার্কিটের যে দলটি "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে ভূপাল, মধ্য প্রদেশের শাহপুরে ও রাজস্থানের বিকানীরে গিয়েছিলেন তাঁরা সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন ঐ সব জায়গায় তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে। ঐ সব দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। প্রথমোক্ত শিল্পীদ্বয় এ ছবির নায়ক-নায়িকা। বর্তমানে ছবিটির অন্তর্দৃশ্যের সুটিং চলছে নিউ থিয়েটার্সের দু' নম্বর স্টুডিওতে যার নতুন নামকরণ হয়েছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি। "ক্ষুধিত পাষাণ" রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে তোলা হচ্ছে। এতে সুর যোজনা করছেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ।

* * *

এ ভি এম এর নতুন হিন্দী ছবি "বরখা"-র মুক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে বড়দিনের সময়ে। "ভাবী" ছবির সাফল্যের মূলে যাঁরা ছিলেন সেই সব কলাকুশলীদেরই মিলিত প্রচেষ্টার ফল এই "বরখা"। কৃষ্ণন ও পাঞ্জু এর যুগ্ম পরিচালক। রাজেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত গানে সুরারোপ করেছেন চিত্রগুপ্ত। কুমারী নন্দা, জগদীপ, শুভা, খোটে, ডেভিড, মুকরী, অনন্ত কুমার, লীলা চিটনিশ, উল্লাস, নীলম প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

নাট্যাভিনয়

বড়দিনের মরশুমে রঙমহল থিয়েটার নাট্যামোদীদের উপহার দেবেন রহস্যঘন নাটক "এক পেয়ালা কফি"—একথা আগেই জানিয়েছি। "এক মুঠো আকাশ" এর নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগী এই নাটকটিরও রচয়িতা। তরুণ রায়ের পরিচালনায় এর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতরণ করবেন রবীন মজুমদার, ... মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ... রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়,

বিশ্বজিৎ, পিকু, দীপান্বিতা রায়, কবিতা রায়, কেতকী দত্ত এবং পরিচালক স্বয়ং।

• • •

বড়দিনের প্রাক্কালেই মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্ত রচিত নতুন নাটক "কালোসোনা" মঞ্চস্থ হবে। একটি কয়লাখনির পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকে একদিকে রূপায়িত হবে অবজ্ঞাত মানবশ্রেণীর বেদনা, বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা: অন্যদিকে মূর্ত হয়ে উঠবে এতে তাদের অপরাজিত প্রাণশক্তির উচ্ছলতা, প্রাণের হাসি ও অন্তরের প্রসন্নতা দিয়ে দুঃখজয়ের সাধনা। আঙ্গিক সুষমা ও সর্বাঙ্গীন প্রয়োগনৈপুণ্যের দিক দিয়ে নাটকটি অভিনবত্বের দাবী নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

পেশাদারী মঞ্চে পণ্ডিত রবিশংকর এই সর্বপ্রথম নাটকটির জন্য সুররচনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। লোকগীতি এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। কাওয়ালী, গোরখপুরী কাজরী, ব্রজবুলি কীর্তন ইত্যাদি গানে উনিশজন শিল্পী ব্যতীত নাটকটিতে কণ্ঠদান করবেন প্রখ্যাত লোকগীতি-শিল্পী নির্মল চৌধুরী। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন উৎপল দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে উৎপল দত্ত ছাড়া অংশ গ্রহণ করবেন শোভা সেন, মায়া চক্রবর্তী, শংকরী মৈত্র, তরুণ মিত্র রবি ঘোষ প্রভৃতি। মঞ্চ-সজ্জায় থাকবেন রবি চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল গুহ রায়।

• • •

বাংলার বিশিষ্ট ভ্রাম্যমান নাট্যসংস্থা এম জি এণ্টারপ্রাইজ সম্প্রতি বন্যার্তদের সাহায্যে বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আহবানে তাঁদের বহুপ্রশংসিত নাটক "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ" মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকের অভিনয়লব্ধ আনুমানিক ৪০০০, টাকা বাইশ পল্লী বন্যাত্রাণ সমিতি ও জুয়েলার্স এ্যাসোসিয়েসন রিলিফ ফণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত দুই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করা হয়েছে। এ বাদে এম জি এণ্টারপ্রাইজ-এর উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকগণ ক্যানিং এলাকার বন্যার্তদের মধ্যে ধুতি-শাড়ী ও কিছু নগদ টাকা বিতরণ করেন। হুদরপুর অঞ্চলের বন্যাপীড়িতদের মধ্যেও এঁরা সাহায্য-সম্ভার বিতরণ করেছেন।

• • •

গত শুক্রবার (৪ঠা ডিসেম্বর) এ, ডবলু, ফিগিস স্টাফ লাইব্রেরীর সদস্যবৃন্দের প্রযোজনায় স্টার থিয়েটারে "কেদার রায়" নাটক অভিনীত হয়। মুখার্জীবৃন্দের শিল্পীদের কৃতিত্বে নাটকটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

• • •

সংগঠনী (উদয়পুর) আয়োজিত ২৪ পরগণা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা গত ৫ই ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং আগামীকাল (১৩ই ডিসেম্বর) শেষ হবে। মোট ২৬টি নাটক সহ ২৭ পরগণার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য নাট্য-সমালোচক, নাট্যকার ও গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

• • •

গত ২৭শে নভেম্বর "বহুমুখী"র সদস্যবা বন্যার্তদের সাহায্যে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে "হীরাঝিল" মঞ্চস্থ করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের প্রশংসনীয় অভিনয়ে ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় নাটকটি সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

• • •

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা "কৃষ্টিলোক"-এর শিল্পীরা গত ২০শে নভেম্বর রঙমহলে তাঁদের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে প্রবোধ সান্যালের "হাসুবানু"-র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন।

• • •

গত ১৪ই নভেম্বর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বিশ্ব শিশু-দিবস উপলক্ষে

জে এম পিকচার্সের মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি "উত্তর মেঘ"-এর দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতার সভাগণ কর্তৃক ওভারটুন হলে কেলেজ স্ট্রীট। রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। শিশু-শিল্পীদের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে।

সি-এল-টি ফেস্টিভাল

দেখে এলাম ভাঙা দেওয়ালে রঙ চড়ানো হচ্ছে ৪৩ নম্বর চৌরঙ্গীতে। টাটা কোম্পানীর এই বাগানে ১৯ তারিখ থেকে শিশু রংমহলের ৮ম বার্ষিক উৎসব। ন' বছরে পড়েছে সি-এল-টি, কিন্তু কোথাও এর কাজে ঢিলে নেই। সৃষ্টির কাজে এমনি নিষ্ঠা কচিৎ দেখা যায়। তাই দিল্লি, বোম্বাই বা বার্ণপুর যেখানেই এরা যায় সেখানেই আনন্দের পসরা বিলিয়ে আসে।

১৯ তারিখে এবার আরম্ভ হবে শিশু রংমহলের নূতন অনুষ্ঠান "এই ভারতের পায়ে চলার গান।" সি-এল-টির সমস্ত শক্তি এটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। ন' বছরের যা কিছু অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেবে ১০ থেকে ১২ বছরের গ্রুপের ছেলেমেয়েরা। অন্যান্য বিভিন্ন বয়সের শিশুরা করবে "ভুলো কাঠবেড়ালী", "ঝগড়াটি পড়ুয়া" "রবীন্দ্র ছন্দ" ও "আবোল-তাবোল"। অপরূপ নিদর্শন হবে "কচি পায়ের ছন্দ।" এসব ছাড়া রয়েছে যা বোম্বাইকে ও দিল্লিকে মাতিয়েছে—"অবন পটুয়া", "জিজো" ও "মিঠুয়া"।

গতবছর ফেস্টিভালে চেকোশ্লোভাকিয়ার পুতুল নাচ ছিল। ওরাই কি শুধু পুতুল নাচ জানে? শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী বাংলা দেশেরই ছেলে—পুতুল নাচ নিয়ে অনেকদিন নাড়াচাড়া করেছেন। শ্যাডো ও রড পাপেট দুটোতেই এ'র সমান দক্ষতা। অল্প কদিন হল বাংলাদেশের এই কৃতী সন্তান রাজস্থানে বাংলার পাপেট দেখিয়ে তাদের হতবাক্ করে দিয়েছেন। রঘুবাবু ও তাঁর তরুণ বন্ধুরা আমাদের এ দেশে যে কত ভাল পাপেট শো হতে পারে তা আমাদের দেখাবেন এই ফেস্টিভালে। এদের সংগে [illegible] দেখাতে আসবে সুদূর [illegible] থেকে শ্রেয়স গ্রুপ। এদের [illegible] যে ১০।১১ বছরের বাচ্চারাই [illegible] পুতুল নাচিয়ে থাকে।

উড়িষ্যা থেকে কলা বিকাশকেন্দ্র আসছে নূতন নূতন নাটিকা নিয়ে। বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকেও শিশুগোষ্ঠী আসছে।

স্কুলের অনুষ্ঠানগুলির উন্নততর বিকাশ শিশুরংমহল স্থাপনের সাথেই দেখা গিয়েছে। ডায়োসিসানের "বাল্মীকী প্রতিভা", ভিক্টোরিয়ার "চড়ুইভাতি", বেথুন, অভিনব ভারতী, দৌলতরাম নোপানী ও সাউথ সুবার্বন স্কুলের অভিনীত অনুষ্ঠান দেখবার মত হবে।

মঞ্চের পশ্চাতে থেকে তাপস সেন ও তাঁর বন্ধুদের আলোর খেলা যে পরিবেশ সৃষ্টি করবে,—ঠিক তারই সমতালে চলবে যন্ত্র-সংগীত শিল্পীবৃন্দ। গানের গ্রুপের ছেলে-মেয়েরা শিশুরংমহলের সম্পদ। এরা সবাই প্রাক্তন সভ্য এবং প্লেব্যাকের সম্পূর্ণ কলা কৌশলে অভিজ্ঞ।

সি-এল-টি পক্ষতে 'মেলা'ও থাকবে।

এম-জি-এম প্রযোজিত বিরাট ঐতিহাসিক চিত্র 'বেন হুর'-এর নায়ক-নায়িকা চার্লটন হেস্টন ও হার-য়ে-রীত ছবিখানির প্রদর্শন উপলক্ষে ভারতে আসবেন

নানারকম রং-বেরঙের দোকানপাট ছোট-খাটো নির্দোষ আমোদ প্রমোদ মশগুল করে রাখবে ৪৩নং চৌরঙ্গীকে। এক কথায়, সারা বছরের ক্লান্তি অপনোদন করবার একমাত্র উৎসব চৌরঙ্গীর সি-এস-টি ফেস্টিভাল।

সার্কাসের আসরে

চেকোশ্লোভাক স্টেট সার্কাসের যে দলটি কলকাতার ময়দানে আসর জাঁকিয়ে বসেছে, ছেলেবুড়ো সকল শ্রেণীর দর্শকের কাছেই তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সার্কাসের খেলার একটা বাঁধা ছক আছে। সেই ছকের মধ্যে থেকেও পরিবেশন পদ্ধতির নূতনত্বে এই ইউরোপীয় দলটি সার্কাস-প্রিয়দের মনে একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। যেমন চমকপ্রদ এদের ট্রাপিজের খেলা, তেমনি রোমাঞ্চকর দড়ির ওপর সাইকেল চালনা ও ভারসাম্যের কসরত। মাটীর ওপরও নানা রকমের ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে চেকোশ্লোভাকিয়ার এই শিল্পী-গোষ্ঠী নিজেদের নৈপুণ্যের প্রমাণ দাখিল করেছেন।

গতানুগতিক খেলা ছাড়াও এই দলের প্রমোদ সূচীতে স্থান পেয়েছে চেকো-শ্লোভাকিয়ার কতকগুলি চিত্তাকর্ষক পল্লী-নৃত্য, ক্লাউন ইয়ানোচেকের চমৎকার বেহালা বাদন, চন্দ্রগামী স্পুটনিকের পাটাতনে নৃত্য ও কড়ন্ত পদ্মফুলের ওপর নর্তকীর শরীর সংকোচনের নানাবিধ কসরত। এই দলের ক্লাউনগুলি সবাই সমান চৌকস।

জন্তু জানোয়ারের খেলাও আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নৃত্যশীল অশ্বের অভিনয় এবং কুকুর নিয়ে কয়েকটি খেলা। বাঘ-সিংহের খেলা মামুলি ধরনের।

সমগ্রভাবে এই সার্কাস দলের আঙ্গিক নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আলোক প্রক্ষেপ, শব্দ ও বাদ্যের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ এবং সবার ওপর বিনা বিরতিতে একের পর অন্য খেলা উপস্থাপন করে এঁরা দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।

নামে কি আসে যায়!

অতি সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেই [illegible] যে চিত্রতারকা সব চাইতে বেশী আলোড়ন এনেছেন তিনি হলেন এম-জি-এম-এর বিশ কোটী টাকার ছবি "বেন-হুর"-এর নায়িকা। এই ইহুদী অভিনেত্রীর নামের সঠিক উচ্চারণ নিয়ে রসিকমহল খুবই বিভ্রাটে পড়েছিলেন। বিভ্রাটের পরিসমাপ্তি ঘটেছে নিউ ইয়র্কে গেল মাসে ছবিটির মুক্তিলাভের পর। এই ইহুদী ললনার নামের উচ্চারণ হলঃ হিয়া হার-য়ে-রীত (ইংরেজীতে এর বানান হলঃ Haya Harareet)। তাঁর নামের উচ্চারণ নিয়ে দর্শকমহলের যত দুর্ভোগই ঘটে থাকুক, 'শ্রীমতী বেন-হুর' অর্থাৎ এস্থার-এর চরিত্রে এই ইহুদী সুন্দরীর অভিনয় সকলের মনেই সুখানুভূতি এনেছে।

ছবিটির পরিচালক উইলিয়ম ওয়াইলার তাঁর ছবির নায়িকার সন্ধান পেয়েছিলেন ফ্রান্সের নীস শহরে, একটি চলচ্চিত্র উৎসবে। "ফ্রেন্ডলি পারস্যুয়েশান" ছবিটির জন্য উইলিয়ম ওয়াইলার সম্বর্ধনা সারিতে দাঁড়িয়ে যখন প্রশংসামুখর জনতাকে সম্বোধন করছিলেন তখন পাশের সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন "বেন-হুর"-এর ভাবী নায়িকা। ওয়াইলার সুন্দরী যুবতীর জন্মভূমির পরিচয় জেনে নেন প্রথম পরিচয়ে। তারপর বলেন, "ইজরাইলে যাবার ইচ্ছা আমার সব সময়েই ছিল"। সুরসিকা সাথে সাথেই উত্তর দেন, 'এ-কথা আপনারা সব আমেরিকানরাই বলে থাকেন, কিন্তু যান না কেন?"

দু'বছর কেটে যায়। এই ক্ষণিক পরিচয়ের স্মৃতি ওয়াইলারের মন থেকে মুছে যায়নি। "বেন-হুর" ছবির তোড়-জোড় যখন চলছে, তখন ওয়াইলার এই ইহুদী তনয়াকে খুঁজে বের করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। প্যারিসে মেয়েটির সন্ধান পাওয়া গেল। ওয়াইলার হিয়া হার-য়ে রীত'এর অভিনয়-ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এস্থার-এর ভূমিকার জন্য নির্বাচিত করলেন। মুখশ্রীর কমনীয়তা, নয়নের মায়া ও সুন্দর দেহবল্লরীই যে অভিনেত্রী হিসাবে হিয়া হার-য়ে-রীত'এর বড় গুণ তা নয়, ওয়াইলারের মতে অভিনয়-দক্ষতাই তাঁর শিল্পীজীবনের বড় সম্পদ।

এই ইহুদী শিল্পী রজতপটে প্রথম আত্মপ্রকাশেই রসিকজনকে সন্তুষ্ট করেছেন। তবু তাঁর নাম নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তাঁর স্বজাতীয় নামের অর্থ— 'পার্বত্য প্রাণী'। অনেকেরই প্রশ্ন হল: অভিনেত্রী কি তাঁর আসল নাম ছেড়ে অন্য কোন সহজতর ছদ্মনাম গ্রহণ করবেন? সহজতর ছদ্মনাম কি তাঁর শিল্পী জীবনের উন্নতির সহায়ক হবে না? হিয়া হার-য়ে রীত কিন্তু নিজের নাম পাল্টাবার পক্ষপাতী নন, তিনি বলেন, "আমার অভিনয়-ক্ষমতা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে নামে কিছু এসে যাবে না।"

জগৎবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রিন্স দলীপ সিংজী আর ইহজগতে নেই। ডিসেম্বরের ৫ তারিখের সকাল বেলায় বোম্বাইতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর হৃদ্‌-যন্ত্রের কাজ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। মরবার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে কারো মৃত্যু চিরদিনই বেদনাদায়ক। সেই মৃত্যু আরও বেদনাদায়ক হয় যদি মৃত্যু অকালে কাউকে গ্রাস করে। ৫৪ বছর নিশ্চয়ই পরিণত বয়স নয়। তাই দলীপ সিংজীর মৃত্যু ভারতবাসীর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হয়েছে। ভারতবাসী বলছি এইজন্য যে, দলীপ সিংজী প্রতি ভারতবাসীরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ক্রীড়াশৌর্যে বিশ্বসভায় যারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতের সম্মান, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। শুধু কি ভারতবাসীই আজ দলীপ সিংজীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত? ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সব দিকপাল ক্রিকেট খেলোয়াড়, যারা দলীপ সিংজীর সংগে ক্রিকেট খেলেছেন, তাঁর অপূর্ব খেলা দেখেছেন, তার সংস্পর্শে এসেছেন—তারাও দলীপ সিংজীর অকালমৃত্যুতে শোকাভিভূত। তাই দেশ বিদেশ থেকে আজ শোক-বাণী আসছে। কীর্তিমান খেলোয়াড়ের ক্রীড়ানৈপুণ্যের উল্লেখ করে সবাই সমবেদনা জানাচ্ছেন।

যে তিনজন ভারতবাসীর ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলার সুযোগ ঘটেছে দলীপ সিংজী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অপর দুজন হচ্ছেন রণজিৎ সিংজী ও পতৌদির নবাব সাহেব। বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট শিল্পীদের অন্যতম খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজীর কীর্তিমান ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিংজী জ্যেষ্ঠতাতের মতই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়ে ইংলণ্ডের পক্ষে সেঞ্চুরী করেন এবং জ্যেষ্ঠতাতের মতই ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড-বাসীর মন জয় করে নেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দলীপ সিংজী বেশীদিন ক্রিকেট খেলতে পারেন নি। ইংলণ্ডে তাঁর স্বল্পকালীন খেলোয়াড় জীবনে ৪৯ বার সেঞ্চুরী আর ১৫৩০৬ রাণ করেছেন। ভারতে একবার মাত্র তিনি উল্লেখযোগ্য খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ সালে বোম্বাইতে কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হিন্দু দলের হয়ে তাকে পার্শী দলের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যায়। এ খেলায় তিনি মারের অনুপম মাধুর্যে প্রথম ইনিংসে ৮৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রাণ করেন।

• • •

একলব্য

দলীপ সিংজীর খেলার কায়দা-কানুন ছিল জ্যেষ্ঠতাত রণজিৎ সিংজীর খেলার ছাঁচে ঢালা। উইকেটের চারদিকে নিপুণ হাতে মেরে খেলে তিনি অতি দ্রুত রাণ তুলতেন এবং ভিজে মাঠে স্লো বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খুবই ভাল খেলতেন। ইংলণ্ডে রণজির মত দলীপেরও জনপ্রিয়তা ছিল অসম্ভব। ক্রিকেট-প্রিয় ইংলণ্ডের অধিবাসীরা আদর করে দলীপকে 'টুইলিপ' বলে সম্বোধন করত। স্যার পেলহাম ওয়ার্নারের মত ক্রিকেট খেলোয়াড় দলীপ সম্পর্কে বলেছেন—মারের নিপুণতায় দলীপ ছিলেন প্রায় ফ্রাঙ্ক উলীর সমকক্ষ, যার চেয়ে ভাল মার তিনি চোখে দেখেননি। ভগ্ন স্বাস্থ্য দলীপের ক্রিকেট জীবনের উপর ছেদ না টানলে ক্রিকেট খেলায় তিনি কত উঁচুতে উঠতেন বলা শক্ত।

জ্যেষ্ঠতাত রণজির কাছেই দলীপের প্রথম ক্রিকেটের হাতেখড়ি হয়। তারপর তিনি ইংলণ্ডের সব ধুরন্ধর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সান্নিধ্যে আসেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে তিনি কেম্ব্রিজ ব্লু লাভ করেন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই তিন বছর ছিল দলীপ সিংজীর খেলোয়াড় জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৩২ সালে তিনি ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষ হয়ে দলীপ সিংজী মোট ১২টি টেস্ট খেলেছেন। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুইবার ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একবার

ইংলণ্ডের লর্ডস মাঠে নেট প্র্যাক্টিসের সময় দলীপ সিংজীর গৃহীত ফটো

টেস্ট খেলায় মোট তিনবার সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই ৯ বৎসরে তার ৩৩১টি ইনিংসে মোট ১৫৩০৬ রাণ হয়। এর মধ্যে সেঞ্চুরীর সংখ্যা ৪৯ আর ডাবল সেঞ্চুরীর সংখ্যা ৪। রানের গড় হিসাবে দাঁড়ায় ৪৯.৬৭। ২৩ বার দলীপ সিংজী নট আউট থাকেন।

দলীপ সিংজীর জীবনের স্মরণীয় খেলাগুলির মধ্যে লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ১৭৩ রান, ওভাল মাঠের টেস্ট খেলায় ১০৯ রান, অকল্যান্ডে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ১১৭, কেম্ব্রিজ ও মিডলসেক্সের খেলায় নট আউট ২৫৪, সাসেক্স ও এসেক্সের খেলায় ২০২, সাসেক্স ও কেণ্টের খেলায় ২৪৬, সাসেক্স ও নর্দাম্পটনসের খেলায় ৩৩৩ রান প্রভৃতি উল্লেখ করার মত। নর্দাম্পটনসের বিরুদ্ধে একদিনেই দলীপ ৩৩৩ রান করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সাসেকস দলের আর কেউ এ রেকর্ড ভাঙ্গতে পারেন নি। ১৯৩১-৩২ সালে দলীপ সাসেক্স দলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত রণজিৎ সিংজীও এই দলের অধিনায়কত্ব করে গেছেন।

দলীপ সিংজীর খেলা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এইবার মানুষ দলীপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

• • •

নবনগর রাজবংশোদ্ভূত রাজপুত খেলোয়াড় দলীপ সিংজী প্রিন্স দলীপ সিংজী নামে অভিহিত হলেও তিনি নিজে প্রিন্স খেতাব পছন্দ করতেন না। সাধারণ মানুষের মত সাধারণভাবেই জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। খেলাধুলার প্রতি তাঁর অপরিসীম আসক্তি ছিল কিন্তু সমাজ ও দেশ সেবার আগ্রহও কম ছিল না। রাজনীতিতে তিনি কোনদিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। তবু রাজনীতিতে তাঁর বিচক্ষণতা এবং অপরিসীম জনপ্রিয়তার জন স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তাঁকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে দলীপ সিংজী সৌরাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি হন। পরে সৌরাষ্ট্র রাজ্য বোম্বাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে তিনি বোম্বাই রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠিত নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থার তিনি প্রথম থেকেই সদস্য ছিলেন। ক্রীড়াসংস্থার সভাপতি ডাঃ সুব্বারায়ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেবার পর দলীপ সিংজীকে নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পদে বরণ করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে এবং বোম্বাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দলীপ সিংজীর 'হুক' মারবার ভংগী

মৃত্যুর দুইদিন আগে রাজকুমারী অমৃত কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে আয়োজিত এক ক্রিকেট শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালনা তিনি শেষ করেন। দলীপ সিংজী এক সময়ে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক এবং ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ক্রিকেট ক্ষেত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের কুচক্রে পড়ে তাঁকে নির্বাচক কমিটি থেকে সরে যেতে হয়।

• • • •

ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় লালিত পালিত এবং ইংলণ্ডের খেলার ধারায় খেলিতে অভ্যস্ত দলীপ সিংজী ক্রিকেট মাঠকে এক মহা পবিত্র স্থান এবং ক্রিকেট খেলাকে জীবনের মহাব্রত জ্ঞান করতেন। যারা দলীপ সিংজীর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকে খেলার উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেছেন তাদের কাছ থেকে শুনেছি ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের মাঠে কোন টুকরো কাগজ বা সিগারেটের বাক্স পড়ে থাকলে দলীপ সিংজী নিজ হাতে তা অপসারিত করতেন। খেলা ছাড়া স্টেডিয়ামে কোন গান বা সভা সমিতি হয় এটা তিনি পছন্দ করতেন না। আর বড় স্টেডিয়ামেরও তিনি বেশী গরজ দিতেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে অসংখ্য ছোট ছোট খেলার মাঠ তৈরী করা। শহরে শহরে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে শত শত খেলার মাঠ গড়ে উঠবে আর সেখানে হাজার হাজার ছেলে খেলার সুযোগ পাবে তবেই হবে খেলোয়াড় সৃষ্টি—তবেই বিশ্বের ক্রীড়া সভায় ভারত তার যোগ্য আসন পাবে, এই ছিল দলীপ সিংজীর অভিমত। বেশী দামের বিলেতী ব্যাটে ক্রিকেট খেলতে হবে একথা স্বীকার করতে দলীপ সিংজী রাজী ছিলেন না। তিনি বলতেন ছেলেদের হাতে যে কোন ধরনের হাতিয়ার তুলে দাও, তারপর তাদের খেলা দেখ, প্রতিভার খোঁজ দাও, তারপর দেখবে খেলাধুলায় ভারতের স্বর্ণদ্বার খুলে গেছে।

দলীপ সিংজীর ক্রিকেট খেলা শেখানর পদ্ধতিও ছিল চমৎকার। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে তিনি দলে দলে ভাগ করতেন। তারপর কয়েকজনকে নেটে ব্যাট করতে পাঠাতেন। কয়েকজনকে রাখতেন বোলিং ও ব্যাটিং দেখবার জন্য নিজের কাছে কাছে। ব্যাটিংয়ের সময় ব্যাটসম্যানের কি ভুল হচ্ছে, তার দুর্বলতা কোথায়, বোলারেরই বা কি ধরনের বল করা উচিত এইসব প্রশ্ন তিনি এক এক সময় এক একজনকে জিজ্ঞাসা করতেন, আর উত্তর ভুল হলে নিজে বলে দিতেন। আবার উত্তরদাতাদের পর্যায়ক্রমে ব্যাট করতে পাঠাতেন। তাদের ভুল ত্রুটি শুধরে দিতেন। খেলার পর হত পারস্পরিক আলোচনা। তাতে ভুল-ত্রুটি আরও ভালভাবে ধরা পড়ত।

দর্শকদের বিরক্তিজনক মন্থরধারার ব্যাটিং দলীপ সিংজী মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি নিজে অতি দ্রুত রান সংগ্রহ করতেন আর শিক্ষার্থীদেরও উপদেশ দিতেন দ্রুত রান করতে। তিনি বলতেন ক্রিকেট খেলার ব্যাট হচ্ছে বলকে আঘাত করবার জন্য, বল ব্যাটকে আঘাত করবার জন্য নয়।

আত্মপ্রচারে দলীপ সিংজীর খুবই কুণ্ঠা ছিল। খেলার ব্যাপারে কোন অখেলোয়াড় মাথা গলান এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। খেলাধুলার স্মারক পুস্তিকার পাতায় পাতায় বরেণ্য দেশনেতাদের শুভেচ্ছা বাণী ও তাঁদের ছবি দেখে দলীপ সিংজী একবার বলেছিলেন এর মধ্যে খেলোয়াড় কে? খেলার কথাই বা কোথায় লেখা?

সত্যিই আমাদের দেশের খেলাধুলার স্মারক পুস্তিকায় খেলোয়াড়ের ছবির চেয়ে রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের ছবিই থাকে বেশী। দলীপ সিংজীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর একখানা ভাল ছবি ছাপব বলে খেলাধুলার স্মারক পুস্তিকার আলমারী খুঁজেও তাঁর একখানা ভাল ছবি খুঁজে পাইনি। রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ক্রিকেট এসো-

সয়েশন অব বেঙ্গলের স্মারক পুস্তিকায়ও না। অথচ বিভিন্ন রাজ্যের রাজপাল থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী আমাত্য প্রায় সকলের ছবিই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। যাক্ সে কথা।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে স্বার্থপরতাকে দলীপ সিংজী চিরদিনই ঘৃণা করতেন। বিভিন্ন রাজ্যের ক্রিকেট কোচদের শিক্ষাকেন্দ্রে দলীপ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন অধিনায়কের পক্ষে কোন্ কোন্ গুণ থাকা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। স্বার্থপরতা না থাকাই অধিনায়কের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে যে কোচ উত্তর দিয়েছিলেন তার জবাবই নাকি দলীপের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, উঁচুদরের খেলা, খেলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব এসব গুণ তো অধিনায়কের থাকবেই। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কেউ ভাল অধিনায়ক হতে পারেন না যদি তিনি স্বার্থপরতা ত্যাগ না করেন।

দলীপ সিংজী সম্বন্ধে এত কথা লিখলাম শুধু খেলাধুলার ক্ষেত্রে যাঁরা নবাগত তাদের কাছে দলীপের একটুখানি পরিচয় দেবার জন্য। কি কি গুণ থাকলে বড় হওয়া যায় কিম্বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়, দলীপের জীবনী থেকে যদি আমরা তা অনুসরণ করি তবে এতবড় দেশ ভারতবর্ষ থেকে কি আর এক আধজন দলীপ সৃষ্টি হতে পারে না?

• • •

মহিলাদের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা—উবের কাপের এশিয়া অঞ্চলের ফাইনাল খেলায় ভারতীয় দল ৫—২ খেলায় মালয়কে পরাজিত করেছে। পরবর্তী খেলায় ভারতকে কোন্ দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এখনো তা ঠিক হয়নি। তবে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন পরবর্তী খেলা যাতে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা করছেন।

উবের কাপে ভারতীয় দলের এটা দ্বিতীয় বারের খেলা। দুই বছরের ব্যবধানে উবের কাপের আসর বসে। ১৯৫৬ সালে ভারত সর্বপ্রথম উবের কাপে যোগদান করে। সেবারও ভারত ৪—৩ খেলায় মালয়কে পরাজিত করে ইংলণ্ডের সংগে সেমি-ফাইনালে খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু ইংলণ্ডে ইংলণ্ড দলের কাছে ভারতকে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়। মালয়ের সংগে ভারতের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলা হয় কুয়ালালামপুরে। ১৯৫৬ সালে ভারতের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন এবারও তাঁদের নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে। শুধু শশী ভাটের যায়গায় এসেছেন কুমারী মীনা শাহ।

জামসেদপুরে নবনির্মিত ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে ভারত ও মালয়ের মধ্যে উবের কাপের আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভানেত্রী জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবী নতুন স্টেডিয়াম ও উবের কাপের খেলার উদ্বোধন করেন। বলা বাহুল্য, পুরুষদের ব্যাডমিণ্টন খেলায় মালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য হলেও মেয়েদের খেলায় মালয় ভারতের সংগে সুবিধা করতে পারেনি। শুধু একটি সিংগলস ও একটি ডাবলসের খেলায় মালয় বিজয়ী হয়েছে। বাকী তিনটি সিংগলস ও দুটি ডাবলসে মালয় ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। নীচে খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:—

সিংগলস

মিস টান গেক বী (মালয়) ১১—৭, ১১—৬ গেমে মিসেস সুশীলা কাপাডিয়াকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মিসেস প্রেম পরাশর (ভারত) ১১—৩, ১১—১ গেমে মিস জিন মোয়েকে (মালয়) পরাজিত করেন।

মিস মীনা শাহ (ভারত) ১১—২, ১১—৩ গেমে মিস রোসি লোকে (মালয়) পরাজিত করেন।

ডাবলস

মিসেস সুশীলা কাপাডিয়া এবং মিসেস প্রেম পরাশর (ভারত) ১৭—১৪, ১০—১৫, ১৫—১১ গেমে মিস টান গেক বী এবং মিসেস আমি হোকে (মালয়) পরাজিত করেন।

মিসেস মমতাজ কোটাওয়ালা এবং মিস সুমন আভাভালে (ভারত) ১৫—১২, ১৫—১২ গেমে মিসেস সিসিলা সামুয়েল এবং মিস ইউ চুন গীকে (মালয়) পরাজিত করেন।

মিস টান গেক বী এবং মিসেস আমি হো (মালয়) ১৫—১২, ১৫—৯ গেমে মিসেস মমতাজ কোটাওয়ালা এবং মিস সুমন আভাভালেকে (ভারত) পরাজিত করেন।

মিসেস প্রেম পরাশর এবং মিসেস সুশীলা কাপাডিয়া (ভারত) ১৫—১১, ১৫—৯ গেমে মিসেস সিসিলা সামুয়েল এবং মিস ইউ চুন গীকে (মালয়) পরাজিত করেন।

•

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ১৪ জন খেলোয়াড়ের পরিচয় ইতিপূর্বে 'দেশের' পাতায় প্রকাশ করা হয়েছে। এবার বাকী খেলোয়াড় বেরী জারমানের জীবন পরিচয় দেওয়া হল:—

বেরী জারমান

বেরী জারম্যান

অস্ট্রেলিয়া দলের দুই নম্বর উইকেট কিপার বেরী জারমানও এডিলেডের একজন সেলসম্যান। যদিও জারমান ১৯৫৭-৫৮ সালে দ্বিতীয় উইকেট কিপার হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১৯৫৭ সালে নিউজিল্যাণ্ড সফর করেছেন তবু আজ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলার আশা এর অপূর্ণ রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০টি খেলায় ইনি ক্যাচ ধরে ১৯ জনকে এবং স্টাম্প করে ১২ জনকে আউট করেছিলেন। নিউজিল্যাণ্ডেও এর উইকেট কিপিং মন্দ হয়নি। সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলসের ৪০০ রানের ইনিংসে একটিও 'বাই' রান না দিয়ে। বেরী জারমান দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ২৩ বছর। ব্যাটিংয়েও এর বেশ হাত আছে।

দেশী সংবাদ

৩০শে নবেম্বর—জামুরিয়া বাজারে বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা অদ্য রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যেই ৫১জনে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আরও অন্তত দশজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। গতকল্য বেলা সাড়ে চারটায়, বারুদের গুদামে বিস্ফোরণ ঘটায় এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ লোকসভায় সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করিলে এক জটিল পরিস্থিতি দেখা দেয়। কারণ বিলটি প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারে নাই। ইতিপূর্বে আরও সাতবার সংবিধানের সংশোধন করা হইয়াছে।

১লা ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, গত রবিবার আসানসোলের নিকটবর্তী জামুরিয়ায় বিস্ফোরণের ফলে যে সব লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সে বিস্ফোরণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে তদন্ত করা হইবে।

২রা ডিসেম্বর—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছে। উপাচার্য নাকি পদত্যাগ করিয়াছেন। বহু অধ্যাপক, কোন কোন বিভাগের সকল অধ্যাপকই পদত্যাগের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং এ-সবের মূলে রহিয়াছে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা।

যে সব লোক শিশু চুরি করিবে এবং তাহাদের বিকলাঙ্গ করিয়া ভিক্ষাকার্যে ব্যবহার করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন সংশোধনার্থ উত্থাপিত বিলটি আজ রাজ্যসভায় গৃহীত হইয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর—চীনা সৈন্যরা ভুটান এলাকায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভুটানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কর্তৃপক্ষ মহল হইতে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ জানা গিয়াছে। কাঠমাণ্ডু হইতেও নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, উত্তর ও পশ্চিম নেপালের ৫ শত মাইলব্যাপী সীমান্ত বরাবর চীনা সৈন্যের ব্যাপক সমাবেশ হইতেছে এবং কিছু সংখ্যক অস্ত্রসজ্জিত ও সুশিক্ষিত চীনা সৈন্য পশ্চিম নেপালের লুমি অঞ্চলে নেপাল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য তাঁহার মাসিক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভারতে যে সমস্ত বিদেশী বাস করিতেছে, সকলকেই আবাসিক অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। যাহারা ১৯৪৩ সালের পূর্ব হইতে এখানে বাস করিতেছে, তাহাদের ইহা প্রয়োজন নাই।

৪ঠা ডিসেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এক বে-সরকারী প্রস্তাবের মাধ্যমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত আলোচনাকালে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় অব্যবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং ঐ অব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার চক্রান্তই দায়ী বলিয়া

অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিরোধীপক্ষের বিভিন্ন সদস্য অবিলম্বে শ্রী খান্নার পদত্যাগ অথবা তাঁহার অপসারণের দৃঢ় দাবি জানান।

৫ই ডিসেম্বর—ওয়াকিবহাল মহলের নিকট জানা গেল এবং কালিম্পঙের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণও ইহা স্বীকার করেন যে, সিকিমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য সেখানকার সিকিম স্টেট কংগ্রেস, ন্যাশনালিস্ট পার্টি, স্বতন্ত্র দল ও তপশিলী জাতি লীগ এই চারিটি রাজনৈতিক দলই দায়ী।

গতকল্য বেরিলীতে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল সশস্ত্র ডাকাত এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সিভিল লাইন শাখায় ডাকাতি করিয়া প্রায় ২৫,০০০ টাকা লইয়া গিয়াছে।

৬ই ডিসেম্বর—আজ অপরাহ্নে পাঞ্চেতে শ্রমজীবিনী শ্রীমতী বুধনী মেঝেন [illegible] দামোদরের উপর চতুর্থ ও বৃহত্তম পাঞ্চেত বাঁধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং উহা জাতির সেবায় উৎসর্গ করেন। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে লইয়া একটি খাদ্যাঞ্চল গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রক্ষাকবচ প্রভৃতি সম্পর্কে উড়িষ্যার প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে নবেম্বর—আজ বুদাপেস্তে দলীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে হাঙ্গারীর কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজেনস কাদার বলেন যে, হাঙ্গারীতে রুশ সৈন্য অবস্থান করিবে। তিনি বলেন—ঘরোয়া রাজনৈতিক কারণের জন্যই রুশ সৈন্য হাঙ্গারীতে অবস্থান করিবে।

১লা ডিসেম্বর—আজ হাঙ্গারিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির ৭ম অধিবেশনে এক ভাষণ প্রসঙ্গে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীখ্রুশ্চেভ বলেন, রাশিয়া শীর্ষ বৈঠকের অভিপ্রায় বর্জন করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আদৌ সত্য নহে। সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে-কোন স্থানে যে-কোন সময়ে শীর্ষ বৈঠকে যোগদান করিতে রাশিয়া প্রস্তুত আছে।

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, কুমেরুকে চিরকালের জন্য শান্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের স্থান হিসাবে রাখার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমেত বারোটি রাষ্ট্রের মধ্যে আজ এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

২রা ডিসেম্বর—আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেন, ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত লইয়া যে বিরোধ দেখা দিয়াছে, তাঁহার আসন্ন ভারত সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর সহিত তিনি তাহা লইয়া আলোচনা করিবেন।

৩রা ডিসেম্বর—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ—পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের আয় ব্যয় এবং প্রদেশের ভিতরে ও বাহিরে পোষ্যসংখ্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিতে বলিয়া নোটিস জারী করিয়াছেন।

কয়েকটি নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ের জন্য সীমাবদ্ধ আকারে লেনদেনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আজ সকালে এক চুক্তি হইয়াছে। এই লেনদেন ব্যবস্থায় উভয় দেশের মধ্যে টাকার কোন আমদানী রপ্তানি হইবে। পাকিস্তান হাঁস, মুরগী, ডিম ইত্যাদি ভারতে চালান দিবে।

৪ঠা ডিসেম্বর—সিংহলের গভর্নর জেনারেল স্যার অলিভার গুণতিলক আজ রাত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীদাহানায়কের পরামর্শক্রমে পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন এবং ১৯৬০ সালের ১৯শে মার্চ নূতন সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিয়াছেন।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট শ্রীভরোশিলভ আগামী বৎসর ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিবেন। তিনি জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দিল্লী পৌঁছিবেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের [illegible] মুখপাত্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, লাদাক ও চীনের মধ্যবর্তী সীমান্ত রক্ষার অধিকার এবং দায়িত্ব একমাত্র ভারতের। তিনি বলেন, কাশ্মীর ভারত ইউনিয়নে যোগদান করায় কাশ্মীরের অপর অংশও আইনত ও কার্যত ভারতেরই অংশ।

৫ই ডিসেম্বর—অভিনেতা প্রযোজক শ্রীচার্লি চ্যাপলিনের (৭০) পত্নী শ্রীমতী উনা (৩৫) গত ৩রা ডিসেম্বর একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছেন। এটি তাঁহাদের সপ্তম সন্তান।

৬ই ডিসেম্বর—পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ আজ করাচীতে বলেন যে, ৮ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলাপ আলোচনার সময় তিনি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রশ্ন বিশেষভাবে কাশ্মীর সম্পর্কিত বিরোধের কথা উত্থাপন করিবেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ

২৭ বর্ষ] শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 5th December, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৫

সূচীপত্র
NMENT LIBRARY
Cooch Behar

স্মরণীয়

(সি-৭৬৪)

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রকাশ কর্মকার

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 5th December, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ ৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল উপস্থাপিত হইয়া আলোচনা চলিতেছে। উক্ত বিলের মর্ম ও উদ্দেশ্য এতদিনে সকলে জানিয়াছেন আর এ বিষয়ে বিধান সভার সদস্যগণ যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এখন সকলের পরিজ্ঞাত। এ বিষয়ে নিজেদের মন্তব্য জ্ঞাপনের আগে উক্ত বিলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল হইতে জানা যায় যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচ অনেকটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইবে। দুর্গাপুরে যে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইবে তাহা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধিকারভুক্ত হইবে। আর দুর্গাপুর, আসানসোল ও চিত্তরঞ্জনের কলকারখানাগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। বিলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সভার অধিকাংশ সদস্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংস্থা ও কলেজের পদাধিকারিগণ ও সরকার মনোনীত সদস্য, নির্বাচিত প্রতিনিধির স্থান তুলনায় অনেক কম। মোটের উপরে ইহাই বিলের সারমর্ম।

বিধান সভার আলোচনার ধারা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিলটি মোটের উপরে অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক অভিনন্দিত। অনেক দিন হইল পশ্চিমবঙ্গে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উঠিয়াছে। বিশ্বভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ভিত্তি আগে হইতেই ছিল কাজেই এ দুটি এই দাবীর ফল নয়। সুতরাং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কেই এই দাবীর প্রথম ফল বলা যাইতে পারে। সেদিক হইতে এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ক্ষুণ্ণ হইবার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ক্ষুণ্ণ হইলেও তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। নব্য ভারতের প্রাচীনতম এই বিশ্ববিদ্যালয় অধুনাকালের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জননীস্বরূপ। একশ বছরের উপরে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছে—তাহার প্রতি স্পর্ধা করা কোন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সাধ্য নয়। কাজেই মর্যাদার তর্ক অপ্রাসঙ্গিক। দেশের নূতন পরিস্থিতিতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্রায়ত বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যক। যে পরিস্থিতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর নাই। তখনকার দিনে মাছের তেলে মাছ ভাজিতে হইত, পরীক্ষার আয় আয় দিয়া খরচ নির্বাহ করিতে হইত; কাজেই বিস্তৃত এলাকা আবশ্যক ছিল। কিন্তু এখন টাকা দিবার দায়িত্ব সরকারের; তাই বৃহৎ এলাকা অনাবশ্যক। আর ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যত ক্ষুদ্র হইবে, শিক্ষাদান কার্য তত সফল হইবে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান কার্যে যে-সব অসুবিধা ভোগ করিতেছে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আশা করা যায় তাহার একটা মীমাংসা হইবে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করিলে — দুটি প্রতিষ্ঠানেরই কাজের সুবিধা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে আরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। তন্মধ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল বোধ করি প্রস্তুত হইতেছে। উত্তর বঙ্গেও নানা কারণে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অত্যাবশ্যক। ভৌগোলিক কারণ তন্মধ্যে প্রধান।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সভা প্রধানত মনোনয়নমূলক বা পদাধিকারমূলক — ইহা অনেকে সমালোচনার বিষয় মনে করিয়াছেন, তাঁহারা নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্বের দাবী তুলিয়াছেন। শিক্ষা সংস্থায় আমরা নির্বাচনের পক্ষপাতী নই — ইহাতে শিক্ষা সংস্থা রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হইয়া আসল বিষয়টাই অবহেলিত হইতে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংবিধান-পরবর্তী অবস্থা উদ্বেগের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে এহেন অবস্থায় না পড়ে, বিল সেইভাবেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, আমাদের বিশ্বাস সেইভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলটিকে সমর্থন করিতেছি এবং নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

মহীশূর সরকার স্থির করেছেন যে, আগামী শিক্ষা-বৎসর থেকে যাঁদের মাসিক আয় একশো টাকার নিচে তাঁদের সন্তান-দের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে পড়বার সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা এই সিদ্ধান্তের জন্যে মহীশূর সরকারকে অভিনন্দন জানাই এবং অনান্য সরকারকে এই সদৃষ্টান্ত অনু-সরণের জন্যে অনুরোধ করি।

আমাদের এই দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। মাসিক একশো টাকা আয়ের জনসংখ্যার শতকরা হার নিতান্ত সামান্য হবে না। অর্থাভাবে হয় এঁদের সন্তানদের পড়াশুনো বন্ধ করতে হয়, নয় এঁদের নিজেদেরই বহু ক্লেশ সহ্য করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের সংখ্যা গত কয়েক বৎসরে অনেক বেড়েছে। গ্রামে গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় না খোলা হলেও সকল গ্রামেরই দু' তিন মাইলের মধ্যে বিদ্যালয় হয়েছে। বাড়ির খেয়ে তারা পড়াশুনো করবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু স্কুলের বেতনের হার এত বেড়েছে যে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সেই বেতন যোগানোও শক্ত হয়ে পড়ে। সকল বিদ্যালয়েই ছাত্রদের বেতন প্রচুর বাকি পড়ে থাকে। তার জন্যে কষ্ট বাড়ে শিক্ষকদের। তাঁদের বেতন বাকি পড়ে যায়। সুতরাং মহীশূর সরকার যে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন তাতে একই সঙ্গে অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ উপকৃত হবেন। ছাত্রদেরও শিক্ষালাভের আগ্রহ পরিতৃপ্ত হবে।

*

ডাকবিভাগের গাফিলতি প্রায় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হতে চলেছে। অনেক স্থলে চিঠি পৌঁছুতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়, ঠিকানা ঠিক লেখা থাকলেও। যে চিঠি জেনারেল পোস্ট আফিসে ফেলা হয়েছে সে চিঠি ডাকঘরের কয়েকশত গজ দূরে পোঁচেছে তিন দিন পরে। গাফিলতির এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠেঃ কেন এমন হয়? চিঠির সংখ্যা বেড়েছে? তা যদি বেড়ে থাকে তাহলে ডাকবিভাগের আয়ও সেই অনুপাতে বেড়েছে। সেক্ষেত্রে ডাকবিভাগের কর্মচারী-সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়ানো উচিত। তা কি বাড়েনি? এর উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে সমস্যা খুব জটিল নয়। কর্মচারীসংখ্যা বাড়ালেই এর সমাধান হবে। কিন্তু যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলেই মুশকিল। কারণ তাহলে এর প্রতিকার নেই। তাহলে বুঝতে হবে স্বাধীনতা লাভের পরে আমা-দের দক্ষতা কমেছে। আমরা চাকুরী করি, কিন্তু যে-জন্যে বেতন নিই তার দিকে দৃষ্টি দিই না। গলদটা আসলে কোথায় সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোনো পরিষ্কার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এ সম্পর্কীয় অভিযোগের যে জবাব ডাকবিভাগীয় কর্তৃ-পক্ষেরা দিয়ে থাকেন, তা নিতান্তই স্তোক বাক্য। অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা। তার মধ্যে প্রতিকারের জন্যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

*

অযোগ্যতা, দুর্নীতি এবং ঢিলেমি আমাদের ক্রমেই মজ্জাগত হয়ে আসছে। সরকারের সকল বিভাগই এই শ্রেণীর ব্যাধিতে ঝাঁজরা হয়ে পড়ছে। সর্বত্র অপরাধজনক উদাসীনতা। হচ্ছে হবে। কি খাদ্য সমস্যা, কি বন্যা, কি স্বাস্থ্য, কি রাস্তানির্মাণ, কি শিক্ষাক্ষেত্র সর্বত্রই এই একই অবস্থা। অর্থের অভাব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যে অর্থ ব্যয় হয় তারও পুরো ফির্তি পাওয়া যায় না। তার ফলে সমস্যা-গুলির শুধু যে প্রতিকার হয় না, সেই অবস্থাতেই থাকে তা নয়, উত্তরোত্তর জটিল হয়ে পড়ছে। ব্যয়িত অর্থের একটা অনুপেক্ষণীয় অংশ অপব্যয়ের অতলস্পর্শ গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারা বৎসর দুর্মূল্যতায় পিষ্ট জনসাধারণ শীতকালের দিকে চেয়ে থাকে, খাদ্যমূল্য কিছুটা কমবে। শীত এল, কিন্তু গৃহস্থ-মাত্রেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন, দাম কমা দূরের কথা, অনেক জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। কেন হচ্ছে তার একটা কৈফিয়ত নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কৈফিয়ত প্রতিকার নয়। লোকে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, শীতেই যদি এই হয় তাহলে বর্ষা নাগাদ তাদের তো উপবাস করতে হবে।

*

সবচেয়ে ভয়ের কথা, মানুষের জীবন পর্যন্ত আজ নিরাপদ নয়। দিনকয়েক আগে আসানসোল ও দুর্গাপুরে যে দুটি লোম-হর্ষণ নারীহরণ ঘটে গেছে তা পড়লে স্তম্ভিত হতে হয়। প্রথম ঘটনাটি এই যে, জনৈক ডাক্তার একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে রিক্সা করে আসানসোল রেল স্টেশন থেকে আসছিলেন। রিক্সা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের কাছাকাছি আসতে পিছন থেকে একটি ট্যাক্সি এসে রিক্সা থামায়। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে তিনজন লোক নেমে মেয়েটিকে জোর করে ট্যাকসিতে তোলে। সঙ্গের ডাক্তারটি বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাঁকে সুদ্ধ জোর করে ট্যাকসিতে তোলা হয়। পরদিন মুর্গাসোলের একটি রাস্তার ধারের নর্দমায় বস্তার মধ্যে টুকরা-টুকরা অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

দুর্গাপুরের ঘটনা হচ্ছেঃ রেল স্টেশনের উত্তরে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এলাকা থেকে কয়েকজন 'অবাঙ্গালী' একটি তরুণীকে নিয়ে মোটরে দুর্গাপুর বাঁধের দিকে পালাচ্ছিল। কোক-ওভেন পল্লীর কয়েকটি যুবক মেয়েটির চীৎকার শুনে ছুটে আসে। দুর্বৃত্তদের সঙ্গে অপহৃতা তরুণীর ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে সেই সময় গাড়ির একটা দরজা খুলে যায় এবং মেয়েটি লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে। দুর্বৃত্তগণও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে তাকে পাঁজা-কোলা করে গাড়িতে তুলে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। এখনও তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

*

নৃশংসতায় এবং দুঃসাহসিকতায় এই দুটি ঘটনা 'মগের মুল্লুকে'র আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে। এবং ঘটনা এই দুটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। কিছুকাল পূর্বেকার আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ছে। এই অঞ্চলে তখন মালগাড়ি মাঝ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মাল লুঠ করা হত। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত নবনিযুক্ত কোনো পুলিশ অফি-সার এই লুঠ বন্ধ করবার নাকি চেষ্টা করেছিলেন। এর থেকে তাঁকে নিরস্ত করবার জন্যে কয়েকখানা বেনামী চিঠিও নাকি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত তাতেও তিনি নিরস্ত হতে চান নি। ফলে একদিন রাত্রে তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না। কয়েক-দিন পরে তাঁর মৃতদেহ কোথায় যেন পাওয়া গেল।

পুলিসের অদৃষ্টেই যদি এই হয়, তাহলে সাম্প্রতিক ঘটনা দুটো তো কিছুই নয়। বদমাশ লোক সর্বত্রই থাকে, অথবা থাকতে পারে। তাদের শাসন এবং সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার জন্যেই পুলিসের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন যদি সিদ্ধ না হয়, দুর্বৃত্তেরা যদি অবাধে নৃশংস এবং দুঃসাহসিক কান্ড করতে পারে, নাগরিকের মন থেকে যদি নিঃশঙ্কতাবোধ লুপ্ত হয়, তাহলে পুলিসের আর কি প্রয়োজন থাকে?

*

দুর্গাপুর থেকে পুলিসের স্বল্পতার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু আসানসোল মহ-কুমা শহর। সেখানে নিশ্চয় পুলিসের স্বল্পতা নেই। সেখানে এমন ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটছে কেন?

পুলিসের স্বল্পতারই বা কারণ কি? বিদেশী ইংরেজ শাসক যে পুলিস নিয়ে সমগ্র বঙ্গ (পূর্ব ও পশ্চিম) শাসন করতে পারতেন, জাতীয় সরকার তার তিনগুণ পুলিস নিয়ে তার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ) শসন করতে পারছেন না কেন? ত্রুটি অন্য কোথাও। এবং সেই ত্রুটি অবি-লম্বে সংশোধন করতে না পারলে নিরাপদে রেলভ্রমণ তো দূরের কথা নিঃশঙ্কে ঘরের মধ্যে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বাস করাও অসম্ভব হয়ে উঠবে।

চোখে একটা বালুকণা পড়লে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা বেরিয়ে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্বালায় যেন আর সব ইন্দ্রিয়-শক্তি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। চীন নিয়ে অনেকটা আমাদের সেই দশা হয়েছে। রগড়াতে রগড়াতেই হোক বা জলের ঝাপটা দিয়েই হোক এ বালিও একদিন বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত বিদেশ সম্বন্ধে কোনো ভাবনা মনে উঠলেই যেন তার মধ্যে চীন এসে পড়ে। এ অবস্থায় মাত্রাজ্ঞান ঠিক থাকে না, সাময়িক এবং স্থায়ীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়, কতটুকু, সেটা গুলিয়ে যায়। অবস্থাটা আরো জটিল হয় যখন কোন মোহগ্রস্ত মন হঠাৎ একটা কঠিন আঘাতে ধড়মড় করে ওঠে। কারণ একটা মোহ ভাঙলেই যে সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় দৃষ্টির স্বচ্ছতা আসবে তা নয়। অনেক সময়ে এক মোহ ভাঙলে তার জায়গায় যে বিপরীত মনোভাব প্রবল হয়ে উঠে, তা থেকে অন্য একটা মোহের সৃষ্টি হয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে দৃষ্টির স্বচ্ছতা, মাত্রাজ্ঞান কী করে সর্বদা রক্ষা করা যায়।

চীনের ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সরকারী নীতির সমালোচকদের উত্তেজিত না হয়ে মাথা ঠিক রাখতে অনবরত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন যদিও উক্ত সমালোচকদের প্রতি তাঁর নিজের উষ্মা এবং উত্তেজনা নিয়তই প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হয় যেন চীনারা যে ভারতভূমির অঞ্চল-বিশেষের উপর হামলা করে জবরদস্তি বসে আছে, তাতে জওহরলালজী যতটা ধৈর্য রক্ষা করতে পারছেন, দেশের লোকের কাছে সরকারী নীতির সমালোচনা শুনলে তিনি ততটা ধৈর্য রক্ষা করতে পারছেন না। অবশ্য একদিক দিয়ে এটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। কারণ দেশের লোককে ধমক দিয়ে আর কিছু না করলেও চলে, কিন্তু বিদেশী হানাদার-দের যদি তাড়াবার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে দূর থেকে তাদের উদ্দেশে কেবল ধমক ছুঁড়তে থাকা আরো লজ্জাকর হোত। সেখানে ধৈর্য না হোক, ধৈর্যের ভাণ আবশ্যক হয়।

কিন্তু দেশের লোক যে এত ক্ষুব্ধ হয়েছে, তার জন্য প্রধানত সরকারই দায়ী। গত কয়েক বছর ধরে চীনা সরকারের ব্যবহার সম্পর্কে ভারত সরকার যদি একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা দেশবাসীর মনে সৃষ্টি না করতেন, যদি বছরের পর বছর জন-

সাধারণের কাছ থেকে সত্য গোপন করে না রাখা হোত, তবে অবস্থাটা এতদূর হয়ত গড়াতো না, অন্ততপক্ষে তার আঘাতটা এত আকস্মিক এবং বড় বোধ হোত না। ভারতের প্রতি চীনের মনোভাব সম্বন্ধে ভারত সরকার দেশবাসীর সামনে একটি মনোরম মায়ার প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। সেটিকে যখন আর দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না, তখনই পিছনের কর্কশ বাস্তব দৃশ্য বেরিয়ে পড়ল। তার জন্যই দেশময় ক্ষোভ ও উত্তেজনার এই জোয়ার। যাঁরা জানতেন কেমন করে কয়েক বছর ধরে আসল অবস্থাটা কোনদিকে যাচ্ছে, তাঁরা চীনাদের

বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারলেও নিজেদের ধৈর্যের বাঁধটা উঁচু করে তোলার সময় পেয়েছেন, যা অন্যেরা পায়নি। যদি সত্য গোপন করাই একমাত্র দোষ হোত, তাহলেও বা কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনা সরকারের মতিগতি এবং ভারত-চীন সম্পর্কের একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক মধুর চিত্র সৃষ্টি করতে ভারত সরকার প্রয়াসী ছিলেন। কতকগুলি ছেঁদো কথাকে এক সংগে গেঁথে তাকে "পঞ্চশীল" নাম দিয়ে তদ্দ্বারা যে কুহেলিকার সৃষ্টি করা হোল, তাতে বাস্তব দৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। তিব্বতের স্বাধীনতা হরণের "বৈধীকরণ" হোল "পঞ্চশীলের" মন্ত্রপাঠ করে। যখন স্মরণ হয় যে, তিব্বত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তির ভূমিকা হিসাবে "পঞ্চশীল" লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তখন এই চিত্র মনে আসে—হত্যাকারী নিজের রক্তাক্ত হাত তুলে নিহতের জয়ধ্বনি করছে।

চীন ও ভারতের মধ্যে বিবাদ অসম্ভব এই ধারণা সৃষ্টি করার জন্য ইতিহাসকে মিথ্যা রংএ রাঙিয়ে দেখাতে আমাদের বড়কর্তারও পেছপাও হন নি। আজ সেই কর্তাদের মুখেই উল্টো সুরের কথা শোনা যাচ্ছে। কর্তারা আগে যা বলেছেন তা হয়ত নিজেরা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু জনসাধারণ কর্তাদের সেই দিনের কথা এবং সেই কথানুযায়ী নিজেদের নর্তনকুর্দন স্মরণ করে আপনাদের প্রতারিত মনে না করে পারছে না। প্রথম থেকে যদি লম্বা লম্বা প্রেমের বুলি আওড়ানো না হোত, যদি সহজভাবে বাস্তব দৃষ্টির পথ খোলা রাখা হোত, তবে এত বেশি ক্ষোভের কারণ হোত না। চীনা সরকার যা করেছেন এবং করছেন সেটা চীনের ঐতিহাসিক ধারার সংগে রাষ্ট্রের নবলব্ধ শক্তির বোধ মিলিত হলে যে-ফল হওয়া স্বাভাবিক তাই। এ সম্বন্ধে যদি কোন মিথ্যা-ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা না চলত, তবে এ নিয়ে এতো মনোকষ্ট হবার কোন কারণ থাকত না। বোধ হয় চীনের উপর আজ ভারতবাসীদের যে-রকম ক্রোধ জন্মেছে, এতটা ক্রোধও বোধহয় হোত না। তাহলে অবশ্য অনেক আগে থেকেই ভারত সরকারকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য জনমতের দাবি উঠত। লোকে যেমন রাত্রে ঘরের দোর বন্ধ করে চোর-ডাকাতের ভয়ে, সেইরকম সতর্কতা। কিন্তু এক্ষেত্রে চোর-ডাকাতের অস্তিত্বই অসম্ভব, কোনোপ্রকার সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনই নেই—এই-রকম প্রচারই চলেছে বছরের পর বছর যখন—এইটাই সবচেয়ে দুঃখ ও রাগের কারণ হয়েছে—প্রহরীদের মধ্যে কেউ কেউ জানতেন যে, চোর ইত্যাদি কেবল "নিকটেই রয়েছে" তা নয় তারা একটু একটু করে তাদের কাজও করে যাচ্ছে।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, যে-কর্তারা এখন জাগতে বলছেন তাঁরাই এক সময়ে ঘুমিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আরো মুশকিল—এই রাষ্ট্রকর্তাদের কথা শুনেই এক দেশের লোক অন্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা করতে বাধ্য হয় এবং সে ধারণা শেষোক্ত দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রকর্তাদের ব্যবহারেরই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কোনো দেশই তো কেবল সেই দেশের সরকার নয়। এমন কি চীনের মতো ডিক্টেটরশিপও দেশের সর্বাংগীণ প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না। তার কারণ এই যে, এই কম্যুনিস্ট রাজত্বও যে সাময়িক মাত্র নয় তার কী প্রমাণ আছে? সারা চীনে বর্তমানে কম্যুনিস্ট সরকারের হুকুমে যে সকলে উঠছে-বসছে তার কাহিনী শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। তবে চীনা ইতিহাসে আরো অনেকরকম আশ্চর্য অবস্থা দেখা গেছে। তাছাড়া বোধ হয় যে সাধারণ চীনার "পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট" নেই বলেই এরূপ যন্ত্রের মতো পলিটিক্যাল কর্তার হুকুম মানা তাদের পক্ষে এমন সহজ হয়েছে। কর্তা যদি বদলায় তবে তাদের ব্যবহারও তেমনি সহজে বদলাতে পারে। তার মানে, চীনের ইতিহাসে যা স্থায়ী তা চীনের পলিটিক্যাল কেন্দ্রের মধ্যে হয়ত নেই। সুতরাং চীনের প্রকৃত মূল্যায়ন চীনের সমসাময়িক পলিটিক্যাল কর্তাদের নীতির দ্বারা করা হয়ত ঠিক হবে না। চীনের বর্তমান কম্যুনিস্ট সরকারের নীতির বিরোধ আজ ভারতবর্ষকে করতেই হবে; কিন্তু একথা যেন আমরা না ভুলি যে, চীন এবং মাও-সরকারকে এক করে দেখা ছাড়া আপাতত ভারত সরকারের গত্যন্তর না থাকলেও সেরূপ দেখা ঠিক বা সম্পূর্ণ দেখা নয়।

ভারতবর্ষ চায় যে, শুধু হিমালয় থেকে নয়, তিব্বত থেকেও চৈনিক রাষ্ট্রশক্তি সরে যাক; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-ইতিহাসে চীনের অতীত এবং ভবিষ্যৎ কীর্তির প্রতি ভারত কখনো বিরূপ বা উদাসীন হতে পারে না। একদিকে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ঠকেছি বলে অন্যদিকে মাত্রাজ্ঞান না হারাই, তার জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। এটা সহজ যদি ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির উপদ্রব না থাকত। চীন সম্পর্কে ভারতবাসীর ক্রোধ এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির একটা বড়ো কারণ কম্যুনিস্ট পার্টি। কম্যুনিস্টরা মনে মনে চীনা আক্রমণের সমর্থক এবং কার্যকালে তারা চীনাদের দ্বারা ভারতের "মুক্তিদানে" সাহায্য করবে এই সন্দেহের অবকাশ যদি না থাকত, তবে চীনের উপরেও রাগটা বোধ হয় এত বেশি হোত না। "গৃহশত্রু"র ভয় ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়েছে। কিন্তু এখানেও মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করা আবশ্যক

মাথায় লাজ বর্ষণ করে নবদম্পতিকে বরণ করার প্রথা এদেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত দেখা যায়। অনুরূপ অনুষ্ঠানে শস্য বর্ষণ করার প্রথা পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই এক সময়ে ছিল, কোথাও এখনো আছে। চীনদেশে ছিল চাউল বর্ষণের প্রথা। রোমানদেরও ছিল কোনপ্রকার শস্য বর্ষণ। ইওরোপের নানা দেশেও এবং ভিক্টোরিয় যুগে গ্রেট বৃটেনে চাউল বর্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন চাউল বর্ষণের প্রথা খুব কমই দেখা যায়, তবে তার স্থান গ্রহণ করেছে কাগজের ঝুরো বা কনফেত্তি। মহাযুদ্ধের আগে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের শত শত টন কনফেত্তি কেবলমাত্র বৃটেনেই বিক্রি হত না, ওখান থেকে নানা দেশে চালানও যেত। ইদানীং এই কনফেত্তি বর্ষণের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। গির্জার তত্ত্বাবধায়করা বলে কনফেত্তি বর্ষণে তাদের কাজ বাড়ে। কারণ নব-বিবাহিত দম্পতি চলে গেলে গির্জার চতুর্দিকে ছড়ানো কাগজের ঝুরো পরিষ্কার করা তাদের একটা বাড়তি কাজ। মিডল্যান্ডের এক গ্রামের গির্জার কর্তৃপক্ষ নিয়ম করেছে যে, কনফেত্তি বর্ষণ করলে বর-বধূকে তিন পাউন্ড করে গির্জার তহবিলে দান করতে হবে। বিবাহ অনুষ্ঠান আরম্ভের আগে ঐ তিন পাউন্ড জমা রাখতে হবে, যদি কনফেত্তি বর্ষণ না হয় তাহলে টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যাবে। কেউ যদি গির্জার বাইরে এসে বর্ষণের মতলব করে তাহলে তাদের আইনের কবলে পড়তে হবে—রাস্তা নোংরা করার অপরাধে তাদের জরিমানা দিতে হবে। স্যাক্সনদের আমলে বৃটেনে ছিল ফুলের পাপড়ি বর্ষণ। একজন যাজক সেই প্রথাটিই ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর মতে "ফুলের পাপড়ি কাগজের তৈরি কনফেত্তির চেয়ে শোভনীয় এবং নির্দোষও।"

•

এক ফরাসী ডাক-পিয়নকে একবার একটি নতুন এলাকায় ডাক বিলি করতে দেওয়ায় সে দেখে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পিকাসোর বাড়িতে একটি পার্সেল দেবার আছে। বড় পার্সেলটি বেশ করে বাগিয়ে ধরে পিয়নটি গিয়ে পিকাসোর দরজায় ধাক্কা দিলে। পিকাসোর ছোট মেয়ে এসে দরজা খুলে পিয়নকে অপেক্ষা করতে

মিশরে আসোয়ান বাঁধের কাজ আরম্ভ হওয়ায় নীল নদের ধারে প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য শিল্পের বহু ঐশ্বর্য জলের নীচে ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছে। ইউনেস্কোর পরিচালনাধীনে বিশেষজ্ঞরা এগুলি রক্ষার উপায় ভেবে দেখছেন। ছবিতে আবু সিম্বেলের পাহাড় খোদাই করে তৈরী মন্দিরের অংশ—অনতিবিলম্বে রক্ষার ব্যবস্থা না হলে যা দেড়শ ফিট জলের নীচে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা

বলে রসিদটি সই করাতে নিয়ে গেল তার বাবার কাছ থেকে। পিয়ন অন্দরে অপেক্ষা করার সময় চারধারের দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখতে লাগল। পিকাসো রসিদটি সই করে নিয়ে আসতে পিয়নটি একটি ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে ছোট মেয়েটির পিঠ চাপড়ে বললেঃ "বাঃ! আপনার মেয়েটিও ছবি আঁকে দেখছি!"

*

বাপ-মা বা বন্ধু পরিজন মারফত ঠিক করে দেওয়া নয়, পাত্রের নিজেই বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোর বহু বিচিত্র উপায়ের কথা শোনা যায়। কানাডার এক কৃষক পুত্র তার প্রতিবেশী এক কন্যার প্রেমে পড়ে। কিন্তু নিজে গিয়ে মেয়েটির সামনে হাজির হওয়া বা বিয়ের প্রস্তাব করায় তার বড় লজ্জা। কার্যোদ্ধারের একটা মতলব ঠাওরায় সে। ওদের ক্ষেত থেকে একটি শুকর মেয়েটির ক্ষেতে পাঠানোর কথা—ছেলেটি সেই শুকরের পিঠে তার প্রস্তাব লিখে পাঠালে। মেয়েটি সেই প্রস্তাবে তার সম্মতি জানায় এবং ক'মাস পর তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

•

চমকপ্রদতায় ইংলণ্ডের এক সার্কাস দলের এক মল্লক্রীড়াবিদের উপায়ের বোধ হয় আর তুলনা হয় না। দলেরই একটি মেয়েকে সে ভালোবেসে ফেলে এবং একদিন দুজনে ট্রাপিজের খেলা দেখাবার সময় একশ' ফিট ঊর্ধ্বে মেয়েটির গোড়ালি ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রস্তাব পেশ করে। মুচকি হেসে মেয়েটি তার সম্মতি জানায়।

লণ্ডনের এক নামকরা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে সম্প্রতি একদিন সকালে তার ঘরে অধীরভাবে পায়চারি করতে দেখা যায়। কি যে ব্যাপার সেটা তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সুরাহা হবার নয়। হঠাৎ তার মুখের চেহারা বদলে গেল, বোঝা গেল যে—সমস্যায় তার মন উদ্বেলিত তার একটা উপায় তিনি পেয়ে গিয়েছেন। ডেস্কের সামনে বসে ঘণ্টি টিপে সেক্রেটারীকে তিনি তলব করলেন। মেয়েটি ঘরে ঢুকতে তাকে সামনে বসবার ইঙ্গিত করে বললেনঃ "একটা অতি দরকারি চিঠি আছে, এখুনি সেটা লিখতে হবে।"

মেয়েটি পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত হল। ভদ্রলোক বলে চললেনঃ "প্রিয় মহাশয়া, ঘটনাচক্রে আমরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ায়—" বলেই থেমে গেলেন। কি একটু ভেবে বললেন, "যাকে ভালবাসি তার কাছে অমন বাগাড়ম্বরপূর্ণ চিঠি লেখা বোধ হয় ঠিক হবে না, না?"

মনিবের প্রণয় সম্পর্কে অজ্ঞাত হতভম্ব সেক্রেটারী তার মনিবের কথায় সায় দিলে। ভদ্রলোক আবার বললেন লিখতেঃ "প্রিয়তমাসু, আমি তোমায় ভালবাসি, কিন্তু তোমাকে সামনে পেয়ে সেকথা বলবার সাহস পাই না। এই চিঠি মারফৎ তোমাকে জানাতে চাই যে, আমি তোমার পাণি-প্রার্থী।"

বলতে বলতে সেক্রেটারীর অনুসন্ধিৎসু চোখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক আবার থেমে গেলেন। বললেন, "ঐ পর্যন্তই টাইপ করে আন, বাকিটা আমি হাতে লিখে দেব। "কি ঠিকানা লেখা হবে?" মেয়েটি প্রশ্ন করলে। এর পর আর ভদ্রলোকের পক্ষে চেপে রাখা গেল না। সত্যি কথাটাই এবার বলতে হল। বললেন, 'চিঠিখানা তোমার উদ্দেশে

লেখা।" বলা বাহুল্য, মেয়েটি সংগে সংগেই তার সম্মতি জ্ঞাপন করলে।

গত যুদ্ধের সময় এক সৈনিক তার ভাবি বধূকে নিয়ে রেজিস্ট্রারের অফিসে উপস্থিত হয় সংগে কোন সাক্ষী না নিয়েই। রেজিস্ট্রারার তাঁর অফিসের বয়কে পাঠালেন রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমে যে দুজনকে দেখতে পাবে তাদের ডেকে আনার জন্য। ছেলেটি বেরিয়ে দু'মিনিটের মধ্যেই এক নৌবিভাগের ক্ষুদে অফিসার এবং এক তরুণীকে পাকড়াও করে নিয়ে এল। এদের দুজনের কারুর সংগে কারুর পরিচয়ও ছিল না। নির্ধারিত বিবাহটি রেজিস্ট্রী হওয়া কালে সাক্ষী দুজন পরস্পরের দিকে লক্ষ্য করতে থাকে এবং অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতে নৌসৈনিক ছেলেটি বলে অপর সাক্ষীকে, "আমাদেরও বিয়ে হলে কেমন হয়?" মেয়েটি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায় এবং তিনদিন পরই ওদের বিয়ে হয়ে যায়।

এক ফরাসী হোটেলের প্রধান পাচক তার প্রার্থিত মেয়েটিকে কোনভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবার সুযোগ না পেয়ে বড় একটা রোস্টকরা মুরগীর সংগে তার লিপিটি পাঠায়। ডিনারে বসে মেয়েটি এই প্রস্তাবের কথা জানতে পারে এবং সম্মতিও দেয়।

*

রিও দা জানেয়রোতে আলোকচিত্রশিল্পী জর্জ এনভেস দা লিমা তার একটি দেড় হাজার টাকা দামের সিংহ-চর্ম চুরি যাওয়ায় পুলিসের কাছে অভিযোগ সূত্রে বলে যে, চামড়াটির ওপর তার একটা আত্মিক টান আছে কারণ সিংহটি বেঁচে থাকতে তার এক অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ভক্ষণ করেছে।

•

বিখ্যাত ইংরাজ লেখক জ্যাক লন্ডন ১৯০৪ সনে রুশ-জাপান যুদ্ধের সংবাদ সরবরাহ করার জন্য কোরিয়াতে থাকাকালে একদিন এক স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তি তাঁর হোটেলে এসে জানায় যে, তাকে দেখবার জন্য শহরের সব লোক এসে বাইরে জমায়েত হয়েছে, তিনি যেন অনুগ্রহ করে একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

জ্যাক লন্ডন স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত হলেন প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি অতদূর বিস্তৃত হয়েছে মনে করে। জ্যাক তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু একটু পরেই জ্যাক বুঝতে পারলেন যে, সমবেত জনমণ্ডলী অবশ্যই চায় তিনি মুখ খোলেন, কিন্তু সেটা তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য নয়। ওখানকার লোকে জানতে পারে যে, জ্যাক দু' পাটি কৃত্রিম দাঁত লাগিয়ে এসেছেন এবং পাশ্চাত্যের এই অভিনব আবিষ্কারটি দেখবার জন্যেই তাদের জটলা।

আলোচনা

॥ শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্র জয়ন্তী স্মৃতিকথা ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত একত্রিশে অক্টোবর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅমল হোম লিখিত 'শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্র জয়ন্তী স্মৃতিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। শ্রীহোম প্রবন্ধটিতে যে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৯০১, দ্বিতীয় সারি দ্রষ্টব্য), সেই গ্রন্থটি সৌভাগ্যবশত আমার নিকটে আছে। ঐ পুস্তকটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। উহার ভূমিকায় লিখিত আছে, 'শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসিগণ কবির কাব্যালোচনার উদ্দেশে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-পরিচয় সভা গঠন করেন এবং কবির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বাংলা দেশের বিশিষ্ট লেখক-দের রচনা সংগ্রহ আরম্ভ করেন। সংগ্রহের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর বিশ্ব-ভারতীর উপর তাহা সম্পূর্ণ করা এবং প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শেষ কয়েক মাস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিশ্ব-ভারতী যে রচনাগুলি বঙ্গবাণীর অঙ্গনে চয়ন করিয়াছেন, জয়ন্তী উৎসবের শুভ দিবসে অদ্য তাহা কবির চরণে নিবেদন করিয়া সর্থক হইলাম।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' নামক একটি প্রবন্ধও উহাতে সংকলিত হইয়াছে। তাহা হইতে এক পংক্তি তুলিয়া দিলাম—'আমরা সমবেত হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিতে, তাঁকে সহজভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সবল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙলার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় করে।'

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে অনেক আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থটি সকল দিক দিয়াই অনন্য। ইহা একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি তৎকালীন অনেক দেশবরেণ্য-দের শ্রদ্ধার্ঘ্য সংকলন করা হইয়াছে।

আগামী শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যদি ঐ গ্রন্থটি 'বিশ্বভারতী' বা অন্য কোনো প্রকাশক পুনরায় প্রকাশ করেন, তবে বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজনা করা হইবে। নমস্কারান্তে, সুশান্ত লাহিড়ী, নতুন দিল্লি—৩।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

(৪)

মনে রাখতে হবে, তখন আমার ন'দশ বছর বয়েস। থিয়েটার দেখতে এসে বসলাম গিয়ে মেয়েদের সীটে। মনে হল যেন, খাঁচা। সামনের দিক, যেখানটা দিয়ে থিয়েটারের নাটক দেখব, সেটা একেবারে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। শুধুই কি জাল? তার সামনে আবার ঘন করে চিক ফেলা। থিয়েটার-হলের মাঝখানে ওপরের ডোম থেকে একটা ঝাড় ঝুলেছে, তার জোরালো আলো পড়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে। কিন্তু, কতটুকু আর দেখব? সেই লোহজাল আর চিক ভেদ করে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায়, তা থেকে বুঝতে পারছি নীচটা একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। সামনে, সারা মঞ্চ জুড়ে মস্ত 'ড্রপ' ফেলা আছে, তাতে ছবি আঁকা। বিরাট ছবি। কী যে ছবি, আজ তা অবশ্য ঠিক মনে করতে পারছি না।

চিকের আড়াল থেকে সব-কিছু দেখবার চেষ্টা করছি, মনে জাগছে নানান কৌতূহল, কিন্তু, সেই আলোকে উদ্ভাসিত বিচিত্র পরিবেশ আর জনসমাগম লক্ষ্য করে মাকে কোনো প্রশ্ন করতেও যাচ্ছি ভুলে, একেবারে বোবা হয়ে বসে আছি বলা চলে। নীচে থেকে অনবরতই একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে, 'পান-বিড়ি-সিগারেট! আ্যাই, পান-বিড়ি-সিগারেট!'

এমন সময়, যেমন করে আমাদের স্কুলের পেটাঘড়িতে ঘণ্টা বাজে ঠিক তেমনি করে কোথা থেকে যেন একটা ঘণ্টা বেজে উঠল, ঢং-ঢং-ঢং! ... 'পান-বিড়ি-সিগারেট'—তখনো চলেছে কিন্তু।

আবার বাজল ঘণ্টা, ঢং-ঢং করে। শুরু হলো কনসার্ট। এটা আমার কাছে তেমন নতুন লাগেনি, কারণ আগেই বলেছি বাড়িতে শুয়ে শুয়ে পাড়ার কনসার্ট-বাজনা শোনা আমার অভ্যাস ছিল। সুরটাও নতুন নয়, ঠিক এমনি ধরনের সুরই যেন শুনেছিলাম, মনে হল।

কনসার্ট একসময় থেমে গেল। আবার একটা ঘণ্টা পড়ল, ঢং-ঢং-ঢং!

এইবার দেখলাম, মাঝখানে যে ঝাড়টা ঝুলেছিল, সেটা ক্রমশ ওপরে উঠে গেল। আর, সেটা উঠে যেতেই, আলো গেল একেবারে কমে। কিন্তু, আজ চিন্তা করে এটুকু বুঝতে পারছি, তখনকার দিনে অডিটোরিয়াম একেবারে অন্ধকার করে দিত না, মৃদু একটা আলোর আভা থেকে যেত। ঝি-রা তৎক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে চোখের সামনেকার চিকগুলি গুটিয়ে তুলে দিল। রইল শুধু জাল। সেই জালের আড়াল থেকে সবই দেখি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

ওদিকে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি, তখনো লোক আসছে।

অবশেষে থামল কনসার্ট। আর, সামনেকার সেই বিরাট ছবিওয়ালা 'ড্রপ্'টি আস্তে আস্তে গুটিয়ে গুটিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। বিস্ময়াবিষ্ট দুটি চোখ মেলে দেখলাম, বড়লোকদের বাড়ির ঘরের মতই একখানি সুসজ্জিত ঘরের ছবি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেরকম উজ্জ্বল দৃশ্য ইতিপূর্বে দেখিনি। কত গাঢ় রঙ যে চোখের সামনে ঝলমল করতে লাগল তা বলার নয়। রামধনু রঙের রঙীন পোস্টার ও হ্যাণ্ডবিল্ তখন থিয়েটার থেকে ছাড়া হত, মনে হত যেন বড় বড় হরফের অক্ষরের ওপর দিয়ে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে! আজ যেন সেই রঙেরই প্রতিফলন দেখলাম মঞ্চের দৃশ্যে! সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল, এত আলো যাত্রাতেও দেখিনি। তখনকার দিনে সাধারণত বুধবারের অভিনয়-বিজ্ঞপ্তি সাদা কাগজে কালো অক্ষর ছাপা হত, কিন্তু শনি-রবিবারের পোস্টার-হ্যাণ্ডবিল ছিল রঙে-রঙে-রঙ-করা!

সেই উজ্জ্বল ঘরের দিকে স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছি, আর দেখছি মেয়েরা কথা কইছে, এমন সময় অন্তরাল থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রবেশ করলেন গিরীশচন্দ্র। 'গিরীশচন্দ্র ঘোষ' নামটা হ্যাণ্ডবিল-প্ল্যাকার্ড থেকেই বানান করে পড়ে পড়ে জেনে গিয়েছিলাম কিন্তু নামের মহিমাটা জানা ছিল না। মহিলা দর্শকদের মধ্য থেকে কয়েকজন একসঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন,—ইনি গিরীশবাবু!

গিরীশবাবু! মানে, গিরীশচন্দ্র ঘোষ!

মনে হল, এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন না, যেন প্রবেশ করলেন। এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেন 'প্রবেশ' শব্দটাই খাপ খায়। সেদিন এতটা বুঝবার কথা নয়, স্মৃতিপটে আঁকা সেদিন-কার এই দৃশ্যটিকে আজ আবার দেখতে গিয়ে এই মহিমার ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্তরের তটভূমিকাতে! মনে হচ্ছে, নাট্য-কাররা চরিত্রকে মঞ্চে আনবার প্রাক্কালে যে ব্র্যাকেটে অমুকের 'প্রবেশ' কথাটা লিখে রাখেন 'অমুকের ঢোকা বা অমুক ঢুকলেন'-এর বদলে, তার তাৎপর্য বোধহয় এই-ই! 'ঢোকা' বা 'ঢুকলেন'-এর মধ্যে যেন একটা হীনতা আছে, 'প্রবেশ'-এর সঙ্গে মিশে আছে একটা ম্যাজেস্টিক ভাব। এই ভাবের সঙ্গে সবসময়ই যে একটা রাজসিকতা মিলিয়ে থাকবে, এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী অনু-প্রবেশের একটা দ্যোতনা আছে।'

যাই হোক, গিরীশচন্দ্রের মঞ্চ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন নিমেষে স্থির হয়ে গেল। আর ঐ স্থিরতা বোধহয় সংক্রামক। শিশুদের এসব বোঝবার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য, তারাও স্থির হয়ে যেত। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, শিশুরাও চুপ করে আছে। যদি কোনো শিশু দৈবাৎ অসুবিধার সৃষ্টি করে কেঁদে উঠত, নীচে থেকে নানান মন্তব্য উঠত শিশু ও তাদের মায়েদের লক্ষ্য করে। বড় হয়ে পরবর্তী কালে যখন নিজে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি, তখনো লক্ষ্য করেছি দর্শক-মণ্ডলীর একাংশের এই অশোভনতা। অথচ, শিশু কেঁদে উঠতেই, অথবা দৃশ্য যখন ঘনীভূত হয়েছে, তখন কাঁদবার উপক্রম করতেই, ঝি তাকে তাড়াতাড়ি কোলে করে বাইরে নিয়ে গেছে।

গিরীশবাবুর অভিনয়কে সেদিন অভিনয় বলেই মনে হয় নি। অন্য লোক যখন মঞ্চে অভিনয় করছে লোকেরা তখনো কোথাও-কোথাও মৃদু গুঞ্জন করেছে; কিন্তু উনি যেই এলেন, অমনি সব গুঞ্জন মুহূর্তে গেল স্তব্ধ হয়ে। এই স্তব্ধতার যে একটা রূপ আছে, সেটা আজ বুঝি, তখন বুঝিনি, —কিন্তু তার স্পর্শ থেকে সেদিন আমি বঞ্চিত হই নি। ঐ চলাফেরা, ঐ রাশভারী ভাব, ঐ গম্ভীর কণ্ঠস্বর,—কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার করছিল মনে। আমি মায়ের কোলের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলুম। সেই সূক্ষ্ম অভিনয় বুঝবার ক্ষমতা ঐ বয়সে আমার থাকার কথা নয়, কিন্তু, শেষের দিকে যখন খালি গায়ে ছেঁড়া কাপড়ে এসে মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন, 'প্রফুল্ল' নাটকের শেষতম সংলাপ,— 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'— তখন মনে হচ্ছিল, যত সহজে কথাগুলি বলছেন উনি তত সহজ হয়ে এসে তা মানুষের মনে লাগছে না! মানুষের বুকের ভিতরটা বুঝি প্রবলভাবে গুমোট-গুমরে উঠছে! আমার বেশ মনে আছে, বাড়িতে ফিরে আসবার পর দু'তিন দিন যাবৎ কেমন যেন একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি ভালো করে খাওয়া-দাওয়াও করতে পারছি না! মনে হচ্ছিল, সেই যে 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' শুনে সমস্ত দর্শক নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে এলাম, সেই কান্না বুঝি আমার ভিতরের সবগুলি তন্ত্রীর মধ্যে তখনো ক্রমাগত বেজে চলেছে, তার আর বিরাম নেই! আজ মনে হয়, অনুভূতি ব্যাপারটাই বুঝি এই! আর্ট যেখানে বুদ্ধিকে অতিক্রম করে অনুভূতির ক্ষেত্রে এসে পৌঁছয় সেখানে সে বালক যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবারই মনে জাগিয়ে তোলে সমান তরঙ্গ! আর্টের জয় বুঝি সেখানেই!

বাড়িতে কিন্তু থিয়েটার দেখার ব্যাপার নিয়ে চুপচাপ থাকবার উপায় নেই। জীবনের প্রথম থিয়েটার দেখার লগ্নে কাকে সর্বপ্রথম দেখলাম—না, গিরীশচন্দ্র। সমস্ত থিয়ে-টারের মর্মবিন্দুটিকে যেন প্রত্যক্ষ করে এসেছি! আর যায় কোথায়, অগ্নিতে যেন ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হল। নেশা লাগল থিয়ে-টারের। আরও থিয়েটার দেখা যায় না? আমার তখনকার থিয়েটারপাগল বন্ধু ছিল

জিতেন মুখোপাধ্যায় বলে একটি ছেলে। স্বর্গত অভিনেতা ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়কে আশা করি পাঠক-পাঠিকারা মনে রেখেছেন, জিতেন ছিল তাঁরই মাসতুতো ভাই।

জিতেন এসে বললে, 'কেমন দেখলি বল দেখি?'

পরম উৎসাহে তাকে সব বর্ণনা দিতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে-ই ত আমার একমাত্র শ্রোতা নয়, আরও একজন বিচিত্র শ্রোতা যে ছিল আমার বাড়িতেই। জিতেন থিয়েটার জিনিসটা বোঝে, কিন্তু সে ত সঠিক বোঝে না! তাকে ঠিক মনের মতো করে বোঝাই কী করে? তার যে শতেক প্রশ্ন! আমি আমাদের সেই রস-পাগলা তারাপদর কথা বলছি। আমাকে বৈঠকখানার প্রান্তে টেনে এনে চুপি চুপি প্রশ্ন করত, 'কেমন দেখলে গো খোকাবাবু?' সাধ্যমতো উত্তর দিতাম।

সে বললে, 'বক্তৃতা কেমন হলো? একটু দিয়ে দেখাও দেখি।'

একবার ভাবি 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'টা ওকে একটু দেখাই পারবে জানা থাকলে ধুতিটা সেইরকম করে পরে। কিন্তু পরমুহূর্তে সেই ভাবগম্ভীর স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন মূর্তিটি মনে পড়তেই স্তব্ধ হয়ে যেতাম। তারাপদকে আর কিছু দেখাতে হত না। তারাপদকে কেন, কোনদিনই কাউকে দেখাতে পারি নি। এইখানে বলে রাখি, উত্তরকালে আমি নিজে যখন অভিনয়ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেলাম, তখন বহু বন্ধু এবং বহু মঞ্চ-স্বত্বাধিকারী আমাকে 'প্রফুল্ল'র যোগেশ করতে বলেছেন, আমি অন্য ভূমিকা, যেমন—'রমেশ' করেছি, কিন্তু যোগেশ করতে গেলেই সেই প্রথম দিনের দেখা মহৎ গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ' মনে পড়ে যেত, আমার নিজের আর অন্য যোগেশ করবার সাধ হত না, চিত্তে এমনই চিরস্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছিল সেই যোগেশের।

থিয়েটার দেখার আগ্রহ কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। দিন যায়, বছর আসে। আরও থিয়েটার দেখবার সুযোগ পেলাম। মায়ের সঙ্গেই। ক্লাসিকে দেখলাম, বিল্বমঙ্গল। অমর দত্ত মশায় 'বিল্বমঙ্গল' হয়েছিলেন। স্টারে দেখলাম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের গীতিনাট্য "রঘুবীর।" ক্লাসিকে "আলিবাবা"ও দেখলাম, পরে "পাণ্ডবগৌরব"ও দেখলাম। "পাণ্ডবগৌরব"-এ অমরবাবু ভীম, কুসুমকুমারী কৃষ্ণ। কিন্তু, তারপরেই পড়ল থিয়েটার দেখার যবনিকা। পড়াশুনার চাপ বেড়েছে আর থিয়েটার দেখা নয়। তবু কি নেশার ঘোর কাটল? আমার পড়াশুনার যে ডেস্ক-টেবিলটা ছিল, তার ওপরের ডালাটা ঢালু, সেই ঢালু ডালার নীচে থাকত বই। বেশ বড়ো ছিল সেই আমার রিডিং ডেস্কটা।

সেইখানে বসে বসে অবসর সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সব নাটক পড়তাম। নাটক এনে দেবার বন্ধু ছিল ঐ জিতেন। একবার, তখন বোধ হয় থার্ড ক্লাসে পড়ি। জিতেন বলল, 'এত ত পড়লি, এবার একখানা লিখে ফেল না।'

—কী লিখব ?

—নাটক।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নাটক লিখব ? ও বলছে কী! নাটক লেখা কি সহজ কথা! ও ছাড়ত না, আবার এসে উত্তেজিত করত। বলত, লেখ না ?

শেষ পর্যন্ত ওর প্ররোচনায় নাটক লিখেছিলাম, একখানা নয়, দু'খানা, একখানা সামাজিক, অপরখানা ঐতিহাসিক। কিন্তু সে যে কী ধরনের নাটক, কীভাবে লিখেছিলুম, কী হয়েছিল তার পরিণাম, তা এখন না বলে বলব একটু পরে। কারণ স্মৃতির গ্রন্থি মোচন করতে করতে আনমনে এমন এক যায়গায় এসে পড়েছি, যেখানে দেখছি, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। অনেক কথা বলা হয় নি, অনেক ছবি আঁকাও হয় নি, যা না বললে, যা না আঁকলে কারুর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমার মন তৃপ্ত হবে না। বার বার নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তবু বার বার খুঁজতে হয় নিজেকে!—নিজের সেই রঙীন শৈশবকে আবার তাহলে খুঁজে আনি, খুঁজে এনে দাঁড় করাই চিত্তের সামনে।

ফিরে চলে যাই আরও বালক বয়সে। ১৯০৫ সালের কথা। আশ্বিন মাসে রাখীবন্ধন হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিবেশ। বাঙালীর ঘরে সেদিন উনুনে আগুন জ্বলে নি। অরন্ধন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেনঃ—

> বাঙলার বায়ু বাঙলার জল
> বাঙলার মাটি বাঙলার ফল
> এক হউক এক হউক এক হউক
> হে ভগবান!

ছেলে-বুড়ো সবাই গান করছে—দলে দলে ভাগ হয়ে। কখনো বা বড়দের কেউ কেউ গান করছে, বন্দেমাতরম্। গান গাইছে বড়রা, কিন্তু বলবার উপায় ছিল না সহজে। যদি কেউ চেঁচিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম্! অমনি আবার অনেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। হিন্দুস্থানীরা ঠাট্টা করে বলত,—'বাঙালীর মাথাগরম!'

সভা-টভা হলে যাবার হুকুম ছিল না; কিন্তু হেঁটে হেঁটে গিয়ে যে দু'একবার না শুনেছি, এমনও নয়। এতদূরে হেঁটেছি যে, একেবারে সার্কুলার রোডের ওপরকার গ্রীয়ার পার্ক পর্যন্ত চলে গেছি। এখানে বলে রাখি, তখনকার দিনে গড়ের মাঠে কোনো সভা-টভা হত না। গড়ের মাঠে তখন গোরা সোলজাররা বেড়িয়ে বেড়াত। সন্ধ্যার দিকে একা-একা গড়ের মাঠের দিকে যাওয়া তখনকার দিনে একটা ভয়েরই কথা ছিল বলা যায়।

যাই হোক, আশ্বিন মাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চিহ্নিত দিবসে স্কুলে গেলুম শুধু পায়ে জুতো না পরে, আর গায়ে চাদর জড়িয়ে। আমাদের মধ্যেকার প্রথম ছেলেটিকে মাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

—মাতৃবিয়োগ হয়েছে।

উত্তরের তাৎপর্য প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেন নি। পরে, অন্যদের প্রশ্নোত্তর করে তবে বুঝলেন। অবশ্য কিছু বলেন নি।

টিফিনে বেরিয়ে পড়লাম সভায় যাবার জন্য সদলবলে। তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' কাগজ বেরুত প্রতি সন্ধ্যায়। সেই কাগজ ক'জনে মিলে পড়তুম অসাধারণ আগ্রহে। রাখীবন্ধনের দিনে কী-কী করতে হবে, 'সন্ধ্যা'তেই তার নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ এই রকমঃ স্কুলে খালি পায়ে যেতে হবে শুধু চাদর মাত্র গায়ে দিয়ে, জিজ্ঞাসিত হলে বলতে হবে, 'মাতৃবিয়োগ' হয়েছে। একথা অন্য কেউ শেখায়নি, শিখিয়েছিল 'সন্ধ্যা'। বিলাতী কাপড় তখন বর্জনের পালা। পার্কের কোণে কোণে, কোথাও-বা গলির ধারে ধারে

অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, বিলাতী কাপড়-পোড়ানোর ধুম প'ড়ে গেছে।

শুধু বিলাতী কাপড় বর্জন কেন, বিলাতী জিনিস পর্যন্ত। সাহেবরা কিনতে বিলাতী দেশলাই পালতোলা জাহাজ মার্কা। আমরা কিনতুম সুইডেনের দেশলাই —দোয়ানী মার্কা পয়সায় দুটো। দোয়ানী মানে, সিলভার দোয়ানী, গোল, ছোট।

সেটাও বয়কট করা হল। এল জাপানী দেশলাই—হাতি মার্কা, পয়সায় তিনটে। বিলাতী দেশলাই ছিল চার পয়সায় একটা। তুলনায় দামী বলতে হবে বই কি!

দেশলাই-এর মার্কাগুলির কথা এত মনে করে বলতে পারছি এই জন্য যে, সে সময় দেশলাই-এর বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করার একটা বাতিক ছিল আমাদের মধ্যে, জানি না, এখনকার ছেলেদের মধ্যে সেটা আছে কি না।

টালিগঞ্জের ব্রিজের ওপারে এখন যে-জায়গাটাকে বলে চারু অ্যাভিনিউ, ওখানে ছিল অনেক ধান-কল। সেই সব ধান-কলের একটাকে দেশলাইয়ের কারখানায় পরিণত করে স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠিত করলেন 'সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী'। তৈরী হতে লাগল দেশী দেশলাই। কিন্তু সে দেশলাই তেমন ভাল হল না। অবশ্য, স্বদেশী আন্দোলনের কালে তা প্রচুর লোকে কিনেছিল।

সস্তা, অথচ ভাল ছিল জাপানী জিনিস। ফলে, জাপানী জিনিসে দেশ ছেয়ে গেল বলতে পারা যায়। তা' সত্ত্বেও তেল, সাবান প্রভৃতি দেশে তৈরী হতে শুরু হল। চামড়ার বিলাতী জুতো একচেটে ছিল—চাঁদনীতে ছিল জুতোর পটি—আর ছিল চীনেবাড়ির জুতো। চীনের কাম্বিশের জুতো পাওয়া যেত সস্তায়। স্বল্পবিত্তের লোকেরা কিনতে সেই জুতো। কিন্তু, স্বাদেশিকতার প্রবল তরঙ্গে মানুষের রুচি তখন পরিবর্তনের মুখে। সেই সময় ঘোড়ার সাজ থেকে শুরু করে জুতো পর্যন্ত "নর্থ ওয়েস্ট ট্যানারী" মীরাট থেকে আসত। পরে হয়েছিল কানপুর ট্যানারী। মোমবাতিও তখন প্রচুর দেশী আমদানী হতে লাগল। তখন মোমবাতির প্রচলন ছিল খুব। ঘোড়ার গাড়ির লণ্ঠনের ভিতর দেওয়া হত দুটো করে বড় বড় মোমবাতি।

এই যখন দেশের পরিবেশ, তখন একদিন শুনলাম (তখন ১৯০৫ সালেরই শীতকাল) আমাদের অঞ্চলেই 'কংগ্রেস' হবে, স্বদেশী এগজিবিশন হবে। কোথায়? না আমাদের স্কুলেরই উত্তর-পশ্চিম দিকে—পোড়া-বাজারের মাঠে—শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট রাস্তাটার সামনে। এখন যেখানটায় ব্যালকাটা ক্লাব, সেখানে ছিল ট্রাম

কোম্পানীর এজেণ্টের বাড়ি আগাগোড়া আইভি লতায় ঘেরা। তার পিছনে ছিল ট্রাম কোম্পানীর ডিপো আর ঘোড়ার আস্তাবল। ঘোড়ার ট্রাম উঠে গেলে নোনা-পুকুরে কারখানা হয়েছিল। ফলে ট্রাম কোম্পানী জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছিল। বাড়ি ভেঙে দিয়েছিল। ওখানকার সমস্ত জায়গাটা হয়ে গিয়েছিল প্রকাণ্ড একটা চত্বরের মত। সেই চত্বরের সামনে ছিল বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠে হলো এগজিবিশন। এখন যেটা পি জি হাসপাতাল, তার যে কোয়ার্টারগুলি আছে তার পূর্বদিকে। তাহলে জায়গাটার উত্তরে পড়ল লোয়ার সার্কুলার রোড, দক্ষিণে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, পূর্বে চৌরঙ্গী। আর পশ্চিমে খানিকটা হরিশ মুখুজ্যে রোড, খানিকটা কোয়ার্টার। বড়ো বড়ো গেট হয়েছিল তিনটে। পূর্বদিকের গেটটা ছিল নেতাদের জন্য নির্দিষ্ট। সেদিকটা তখন আলেকজেন্দ্রা কোর্ট। দক্ষিণে ছিল বাড়্‌তি একটা গেট। আর উত্তরে ছিল প্রধান ফটক।

এই যে এত বড়ো জমি, এর মধ্যে ছিল আবার বড়ো একটা পুষ্করিণী। সমস্ত মাঠটা বেড় দিয়ে ঘেরাঘেরি হচ্ছে, আমরা টিফিনের সময় তা দেখতে যেতুম। দেড়-মানুষ সমান উঁচু টিনের দেওয়াল হচ্ছে। হচ্ছে তিনটে বড় বড় ফটক, যার কথা এই-মাত্র লিখলাম। এমনি করে প্যাণ্ডেল বাঁধা হলো আমাদের চোখের সামনেই। জয়পুরে স্থাপত্যরীতিকে অনুসরণ করেই তিনটি ফটক তৈরী হচ্ছে, প্রত্যেকটির ওপরে নহবৎখানা। মোটা মোটা খুঁটি দিয়ে বাইরেটায় দরমা মেরে বিছিয়ে দিল পাতলা লোহার জাল। তার ওপরে মিস্ত্রীরা করে গেল বালির কাজ। সেই বালির ওপরে করল লাল রঙ। একেবারে যাকে বলে Indo-Saraseni architecture, পাশে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় নহবতখানায়। ফটকের কাঠামো, অর্থাৎ কাঠের কাজ করত চীনে মিস্ত্রীরা। তাদের প্রত্যেকের কাঁধে নীল ঝোলা। সেই ঝোলা থেকে পেরেক বার করে ঠকাঠক ঠুকে যাচ্ছে, কোনো পেরেক বেঁকে গিয়ে খুলে পড়ে গেল বা কোনো পেরেক হাত থেকে ফস্কে গেল, সেগুলি আর ওরা তুলত না, কারণ তুলতে গেলে কাজের দেরী হবে। আমাদের কাছে সেই পড়ে-থাকা পেরেকগুলি ছিল মহা লোভের বস্তু। পরস্পরের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে কতো পেরেক যে জমা করেছিলাম, তার আর ইয়ত্তা নেই। পেরেক কুড়োতে আমাদের কেউ বারণও করত না কিন্তু।

এমনি করে করে সব-কিছু তৈরী হয়ে গেল, এইবার প্যাণ্ডেল-এর দ্বারোদ্ঘাটন হবে। উত্তেজনা কি কম? ওদিকে দেখতাম,

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল যে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মশায়ের বাড়ি, সেই বাড়িতে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে সব ডেলিগেট। তাঁরা লুঙ্গির মতো করে কাপড় পরতেন, আর নিজেরাই রান্না করতেন। খাওয়ার শেষে কলাপাতা মুড়ে যে-যার নিজের হাতে হাতে বাইরে এসে ডাস্টবিনে ফেলে দিতেন। এটা দেখতুম, আর দেখতুম ও বাড়ির বারান্দায় বসে প্রায়ই তাঁদের [illegible] করতে।

সুরেন্দ্র মল্লিক ছিলেন সিঙ্গুরের বসু-মল্লিক পরিবারের ছেলে। কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, ভালো বক্তা ছিলেন। তখন ওকালতি করতেন, পরে মিউনিসিপালিটির কমিশনার এবং তারও পরে চেয়ারম্যান পর্যন্ত হয়েছিলেন। C. I. E. উপাধিও পেয়েছিলেন পরবর্তী কালে। ইণ্ডিয়ান লিবারেলদের মেম্বার হয়ে বিলেত গিয়েছিলেন।

কে যেন আমাদের মধ্যে প্রথম বলেছিল কথাটা, 'এই এগজিবিশন হবে?'

—[illegible] ছোট ছেলে যে!

—[illegible]।

[illegible]

সুন্দর সুন্দর সব [illegible] হয়েছিল এগজিবিশনে। আর ছিল নানা রকমের জিনিস। বেনারসী কিংখাব, আমেদাবাদের কাপড়। প্রকাণ্ড একজোড়া [illegible] কাঁথা [illegible] হয়েছিল একদিকে—মানুষের সমান উঁচু—নর্থ ওয়েস্ট কোম্পানীর তৈরী দেশী জিনিস একেবারে। আর ছিল সাবান দিয়ে তৈরী [illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি, তৈরী করেছিল ওরিয়েণ্টাল কোম্পানী। ভারতবর্ষের সবরকম শিল্পের নিদর্শন দেখানো হয়েছিল। ৬ ফুট লম্বা লাউ—প্রকাণ্ড কুমড়ো—এ-ও আছে, আর আছে পূর্ববঙ্গের বিচিত্র নক্‌শা-তোলা কাঁথা, পূর্ববঙ্গের মিহি করে কাটা সুপুরী ঝুড়িতে জড়ো করা। আরেকটি মজার জিনিসের কথা মনে পড়ে। তার নাম ছিল 'লাফিং গ্যালারী'। অনেকগুলি আয়না খাটানো রয়েছে, Silvering-এর কী প্রক্রিয়া তা জানি না, কিন্তু এক-একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এখন অনেকে কার্টুন ছবি দেখে থাকেন, কিন্তু সে ছিল যেন নিজেই নিজের কার্টুন দেখা। কোনো মুখটা লম্বা—কোনোটা থ্যাবড়া—কোনোটা পানফলের আকার—বিচিত্র সব মুখভঙ্গী। লোকের ভিড় হতো ওখানে। সবাই এক-একবার করে নিজের নিজের কার্টুন দেখে আসতে চায়। দর্পণে নিজেকে মানুষ সুন্দরই দেখতে চায়, আজ ভাবি, নিজেকে অসুন্দরও কি দেখতে চায়? আকার দর্শন নয়, বিকার দর্শন। মানবমনের এ-ও এক রহস্য!

এগজিবিশন থেকে বোম্বে-আমেদাবাদের মোটা কাপড় লোকে কিনত। আমরাও কিনেছি। '[illegible] দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই!'...দেশী সাবান আর সেন্টও খুব ভালো হয়েছিল অবশ্য। জুতোর প্রচলন হল—দেশী মুচির জুতো। সেই জুতোও এগজিবিশনে প্রদর্শিত হলো। তখন চীনেবাড়িতে দেশী মুচিরা জুতো সাপ্লাই করত। আমার ধারণা আজও করে।

এগজিবিশনে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও হয়েছিল। উত্তর দিককার ফটকের কাছেই ছিল ব্যাণ্ড বাজানোর জায়গা, যাকে বলে, 'ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড'! প্রতি সন্ধ্যায় ব্যাণ্ড বাজত সেখানে। আর হয়েছিল থিয়েটার-হল। অনেক পেশাদারী দলেরাও অভিনয় করেছে এখানে অভিনেত্রী নিয়ে, আবার পারিক থিয়েটারও করেছে। এখানেই একবার অমর দত্ত অভিনয় করতে এলেন তাঁর দলবল নিয়ে। শুনে আমরা ত ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কটায় আরম্ভ হবে? দেখতে পাব ত? নাকি, বাপ-মার আদেশে তারাপদ এসে ধরে নিয়ে যাবে? কী বই হবে?

জিতেন বললেন, 'জানিস কী পালা হবে?'

—কী?

—নলদময়ন্তী। (ক্রমশ)

ভোর সাড়ে ছটা

উৎপলকুমার বসু

এক একদিন কলকাতা অনুপম উড়ন্ত মেঘের
পালিতা পাখির মতো উড়ে যায়।
যারা ফিরবে বলেছিলে—আজ কাল অথবা আগামী
যে কোনো সপ্তাহে মাসে বছরের ক্লান্ত শেষদিকে
তারা মিথ্যে বলেছিলে।
কলকাতা এক একদিন তোমাদের পুরনো প্রলাপে, লঘু
কিশোর মিথ্যেয় ভরে ওঠে।

এখনি সমস্ত নৌকো ভোরবেলা গঙ্গায়
দুতীরের পাশাপাশি অন্য শত চোখের কুয়াশা
কত তুচ্ছ জেনে যাবে।

দিন আরো স্পষ্ট হলে যাত্রী হবো দক্ষিণসাগরী।

দূরত্ব আসু

আবদুস্ সাত্তার

তোমার সম্মুখে আর আসবো না; হাতের নাগালে
থেকে যদি দূরবর্তী তা'হলে অযথা কেন আর
তোমার দু' চোখে জ্বলে নিজেকে পুড়িয়ে মারবার
এই সাধ; না, না, যাই—সম্মুখে মাঠের অন্তরালে
কী যে সুখ, গাছপালা, পশু পাখী, সুনীল আকাশ—
ঘাসের গালিচা নীচে, চাষীদের বিচিত্র জীবন
নিয়ে বসি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, যখন তখন
আমাকে জ্বালাক, আমি বুকে নেবো সেই সর্বনাশ।

তোমার সম্মুখে আর আসবো না, নিছক আমার
যে-পৃথিবী তাকে আর জ্বালাব না তোমার দেহের
না-পাওয়ার অগ্নিকুণ্ডে, এখন পেয়েছি আমি টের
কী লোভে পতঙ্গ পোড়ে। ইচ্ছে নেই পুড়ে মরবার।
দূরবর্তী হবো আমি। যদিও তোমাকে মনে আসে
নির্বিঘ্নে ফিরাবো মুখ মাঠের সবুজ ঘন ঘাসে।

তথাপি

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

অবসাদে তিন বছর কূর্মগতি
কী মন্ত্রবলে কেটে গেল, ভাবি, সখি!
চেনা আকাশেও উড়ে গেছে কতো মেঘ,
বার বার বানে ভেঙেছে নদীর পাড়,
বাশেখি বাতাস হয়েছে অসহযোগী।

অনেক শুনেছি মাঘের শীতের কথা!
চীৎকার ক'রে বলি ডেকে, থামা থামা।
পঙ্কিল কাল, আবর্জনার দেশে
ঘৃণার গুমোটে স্তব্ধ গারদ-ঘরে
মাকড়শা পড়ে পারদের ওঠা-নামা।

চিন্তা মনসা-কাঁটার মতন বেঁধে
প্রতি রোমকূপে, চিন্তা প্রেতের মতো
বিশাল ভয়ের ছায়া-নাচ জুড়ে দেয়;
চিন্তা ছড়ায় অরাজক, দাবানল,
শরীরে শিকড়ে দ্বন্দ্ব, রক্ত, ক্ষত।

জানি, যন্ত্রণা বাঁচার নামান্তর।
আশায় আশায় তবুও বাঁচতে হয়;
সে-আশা মায়াবী ঃ সতত দুলায়, টানে,
আশার অনুজ স্বপ্নও প্রতারক ঃ
কখনো তামস, কখনো হিরণ্ময়।

তথাপি তোমার বাগানে আমন্থর
এখনো সন্ধ্যা, প্রাচীন কুমুদ্বতী
চন্দ্র-চকোর চোখ তুলে চায়, ভাবি ঃ
যদি খোলে দ্বার, যদি মেলে দৈবাৎ
শুধু প্রবেশের বিষণ্ণ অনুমতি ॥

যেন ছিলা ছিঁড়ে গিয়ে রামধনুকটা তার অজস্র রঙের সম্ভার ছড়িয়ে দিয়েছে সর্বত্র।

এমনি একটা বিচিত্র বর্ণের ছাতা সারা রাস্তা উজ্জ্বল করে ধীরে ধীরে হেঁটে চলতে থাকে।

ও-রঙ চেনা, ওই ছাতাটাও খুব পরিচিত। এত চেনা সত্ত্বেও তা পুরনো হল না। ওর দিকে চোখ যাবেই।

ঐ ছাতার নীচে পরিচ্ছন্ন উল্লাস ছড়াতে ছড়াতে চলে একটা বিচিত্রিত শাড়ি। যেন সারাটা পথে রং ঢালতে ঢালতে চলেছে।

যারা নিত্য দেখে তাদের সয়ে গিয়েছে ওই রংবাহার, কিন্তু নতুন পথচারীকে হঠাৎ থমকে থেমে যেতে হয়।

পিছন থেকে ওই রংদার শাড়ি ও ছাতার ওই রংমশাল দেখলে ছুটে গিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে একবার দেখার সাধ যাবেই তার মালিককে।

কিন্তু মালিক যিনি, তিনি তরুদি—পি এন গার্লস স্কুলের পুরনো টিচার। বয়স ধরা অবশ্য কষ্ট, কিন্তু বয়স হয়েছে। বেশ ছিমছাম ও চলনসই চেহারা।

কিন্তু এমন নাকি তিনি ছিলেন না, আগে নাকি যেমন রোগা ছিলেন, তেমনি কদর্য ছিল তাঁর চেহারা, আর দাঁতগুলো ছিল নাকি তেমনি বিশ্রী—বাঁকা আর উঁচু, তার মধ্যে দু-একটা পোকায় খাওয়া।

আমরা সে-চেহারা দেখিনি, তবে সে-চেহারার ছবি দেখেছি। রিটাচের চোটে সে-ছবি থেকে আসল চেহারাটা উদ্ধার করা অবশ্য মুশকিল। এ মুশকিল সত্ত্বেও একটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছি।

কিন্তু সেই বিশ্রী হিলহিলে চেহারা এখন আর নেই। এখন নাদুশ-নুদুশ নধর-গড়নের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ হয়ে উঠেছেন শ্রীমতী তরুবালা নন্দী।

তরুবালা নন্দী আমাদের তরুদি। দিদি-দের সূত্রে তিনি দিদি হয়েছেন। দিদিরা তাঁর কাছে পড়েছেন।

তরুদি ইংরেজী পড়াতেন। ইংরেজীতে দখল তাঁর অসাধারণ উচ্চারণও তেমনি স্পষ্ট ও নিখুঁত। তাঁর মত উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছি আমরা, পারিনি।

দিদিরা তরুদির ভারি ভক্ত। বলত, "পাকা মেমসায়েবরাও তরুদির মত ইংরেজী উচ্চারণ করতে পারে না।"

পাকা মেমসায়েবদের ইংরেজী শুনিনি, কিন্তু তরুদির শুনেছি। সত্যি, প্রোনান-সিয়েশন বেশ ভাল।

কেবল উচ্চারণেই স্পষ্ট নয়, চালচলনেও

তরুদি স্পষ্ট। ইংরেজী ভাষাতেই তাঁর কেবল দখল নয়, ইংরেজী আদবকায়দাতেও তিনি খুব পোক্ত।

কেবল চেহারাতেই যা মেরে রেখেছে, তা ছাড়া অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে তরুদি একজন খাঁটি মেমসায়েব।

দিদিদের পিছনে লাগতাম যখন, তখন বলতাম, "দেখলাম রাঙাদি, তোমাদের ট্যারুদিকে, ব্ল্যাক সী-তে পড়ে গিয়েছিলেন বুঝি পা পিছলে?'

রং কালো। কিন্তু খুব মাজা। কাঁচা-কয়লায় আর কষ্টিপাথরে রঙের যা তফাত, আমাদের রঙে আর তাঁর রঙে তফাত অনেকটা ততখানি।

বঙ্গললনা তিনি, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর কম। তরুদির বাবা কি কাজ করতেন জানি নে, কিন্তু খুব বড় দরের কাজ করতেন বলে শুনেছি। তাঁকে বাইরে-বাইরেই কাটাতে হত। তরুদির শিশুকাল কাটে এডেনে, তারপর তাঁর বাবা ফিরে এলেন ভারতবর্ষে, পুণায় পোস্টেড হলেন। সেখানকার কনভেন্টে তরুদির জীবনের পাঠ আরম্ভ ও শেষ।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর খুব কম ছিল, বাঙালীর সঙ্গে মিশেছেনও খুব কম। ইংরেজী উচ্চারণ হয়তো খুবই নিখুঁত, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে তরুদি তেমন পাকা নন। কিন্তু তবুও যেটুকু বাংলা এখন বলতে পারেন, হয়তো সেটুকুও বলতে পারতেন না, যদি অকূলে তাঁদের ভাসিয়ে দিয়ে হঠাৎ তাঁর বাবা মারা না যেতেন।

দেশে ফিরে আসতে হল তাঁদের। বহু-দিন পরে তরুদির মা তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন বাংলা দেশে।

তরুদি কাজ নিলেন পি এন গার্লস স্কুলে। তাঁর বোন অরু সেই স্কুলেরই ক্লাস সেভেনে ভর্তি হল।

এসব ঘটনা অনেক দিন আগের। আমরা তখন ছোট ছিলাম, আমরা তখন ওসব কিছু শুনিনি, শুনে থাকলেও কিছু বুঝতে পারিনি।

আমার দিদিরা সকলেই তরুদির ছাত্রী। সবাই তো দিদির ভক্ত; তার মধ্যে রাঙাদিটা আবার একটু বেশি—রাঙাদি অন্ধ ভক্ত।

সব দিদিদেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, রাঙাদিরও। তারা মাঝে মাঝে যখন আসে তখন তরুদিকে না হলে তাদের চলে না। তরুদি দু-চারদিন থেকেও যান আমাদের বাড়িতে।

এইভাবে তরুদিও প্রায় আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছেন। দিদিদের কাছে তরুদির সম্বন্ধে নানা রকম ঠাট্টাবিদ্রূপ করলেও তাঁর উপর আমাদের, বিশেষত আমার, ভক্তিও কম নয়।

এখন দিদিরা এখানে থাকুক বা না থাক, তরুদি মাঝে মাঝে না এলে আমাদেরই যেন কেমন লাগে।

আমাদের বাড়ির একজনই ঠিক হয়ে গিয়েছেন তিনি। আমার বড়দির চেয়েও বয়সে তিনি বড়, কিন্তু এখনো বড় ছেলেমানুষ, বড়ই সরল ও স্বাভাবিক।

কিন্তু সাজসজ্জায় তরুদি কিন্তু আলাদা। শাড়ির পাড়ে একটু ভাঁজ পড়ে না, জুতোয় একটু দাগ নেই, হাতের চুড়ি কিংবা কাঁধের ব্রুচ ঝকঝক-তকতক করে। তার উপর আছে তাঁর হাসি, হাসিটা অদ্ভুত সুন্দর—মুক্তোর মত দাঁতে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়।

তরুদির বয়স কত জানি নে। বড়দির বড়ছেলে আর আমি সমবয়সী। বড়দির চেয়েও নাকি তিনি বড়।

এখনো তিনি পি এন গার্লস স্কুলে আছেন। এখন তিনি একেবারে একা, তাঁর মা মারা গেছেন অনেক দিন হল। তাঁর বোন অরু এই বোয়ালিয়ার কলেজ থেকে বি এ পাস করে জলপাইগুড়ির একটা ইস্কুলে চাকরি নিয়ে সেখানেই আছে।

ইস্কুলের কাছেই একটা ছোট বাড়িতে বাস করেন তিনি। বাড়িটা ছোট, কিন্তু যেন ছবি। ভারি পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছেন তরুদি।

আমাদের বাড়ি অনেকটা দূরে, কালিন-পাড়ে। এখান থেকে প্রায় এক মাইল। এতো দূরে হলে হবে কি, তরুদির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা একেবারে নিবিড়।

আমাদের সঙ্গে তরুদির মিল নেই কোন দিক থেকেই। আমরা ছা-পোষা গৃহী। একটা পৈতৃক বাড়ি পেয়েছি বলে

রক্ষে, বাড়িটাও খুব ছোট না—এইজন্যে তবু হাত-পা ছড়িয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে চলেছি। লেখাপড়াও বেশিদূর হল না, চাকরিবাকরির তাই সুবিধে বিশেষ হয় নি। এখানকার মিউনিসিপ্যাল আপিসে কাজ করি।

এই রকম সামান্য আমরা, আমাদের সঙ্গে অমন মেমসায়েবের এতটা খাতির হল কী করে, বোয়ালিয়ার অনেকের কাছেই এ একটা বিস্ময়।

বলতে কি, বিস্ময় এক-এক সময় আমারও বোধ হয়। ভাবি, সত্যি, তরুদির মনটা কি উদার। তিনি আমাদের সঙ্গে কেমন অন্তরঙ্গভাবে মেশেন।

হেনা বলে, "আশ্চর্য হওয়াই তোমার স্বভাব। কেন, উনি কি-এমন লাট করেন তো মাস্টারি। হরিচরণ পণ্ডিত-মশায়ও তো মাস্টার। তিনি মেশেন না তোমার সঙ্গে? তখন তো চমকাও না। তিনি কি তোমাদের তরুদির চেয়ে মাইনে কম পান?"

ঘাঁটাই নে, হেনার যুক্তিটা বিচার করে দেখি। সত্যি, কথা সে বেঠিক বলে নি। কত আর মাইনে পান তরুদি?

হেনা কাপড় কোঁচাচ্ছিল, আলনায় তা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "তুমি কি ক্যাবলা? তুমি যা মাইনে পাও তা ছাড়াতে তোমার তরুদির ঢের ঢের দেরি। একা মানুষ, নিজেকে নিয়েই মশগুল, দাঁড়ৌ তাই ছবি; নিজে উনি তাই পটের বিবি।"

পাখার ডাঁটি দিয়ে পিঠ চুলকাতে-চুলকাতে বললাম, "ঠিকই বলেছ। আমাদের মত দু-তিনটে বাচ্চা থাকত তাহলেই অত কায়দা বেরিয়ে যেত।"

কাপড় গোছানো সাঙ্গ করে হেনা নিজের চুল নিয়ে বসল। অজস্র চুল, চুলের যেন বন্যা। বাঁধ দিয়ে বাঁধা কঠিন। মোটা চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে সেই চুলকে সে বশে আনল। বসে বসে আমি দেখতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম বশে আনার কায়দা কেমন সুন্দর রপ্ত করেছে ও। আমি তো কোন্ ছার, এমন যে অবাধ্য চুলের গুচ্ছ, তাও হেনার হাতে পড়ে একেবারে কাবু।

চুল আঁচড়ানো সাঙ্গ করে, সিঁথিটা বের করে নিয়ে পাতা কাটল। জানলার গরাদের গায়ে আয়না দাঁড় করিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে কষে বাঁধল মাথাটা—তারপর চটপট করে বিনুনি তৈরি করতে লাগল।

আমি বসে বসে অবাক হয়ে দেখছিলাম, বললাম, "বা, ছবি!"

মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে চেয়ে সে বলল, "ওকি, হঠাৎ আবার ভাব এল কোত্থেকে?"

তাকে তোয়াজ করার মতলব বোধহয় ছিল না, বলে ফেললাম, "তরুদি এমন ফাস ক্লাস বিনুনি করতে পারবে না কিছুতে।"

হেসে ফেলল হেনা, বলল, "পারবে!"

কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। হেনা এ বলে কি? বললাম, "তাই নাকি?"

"আজ্ঞে। হ্যাঁ সার্। এই পাটিবিনুনি তরুদিই শিখিয়েছেন আমাকে।"

বার বার অবাক হতে লজ্জা করল। এবার তাই আর কোনো কথা বললাম না। চুপ করে বসে রইলাম।

হেনার মেজাজ ধরা আমার পক্ষে বড় মুশকিল। আমি যখনি তরুদির গুণ গাই, তখনি সে ফোঁস করে ওঠে; কিন্তু সে নিজে যখন গুণ গাইতে আরম্ভ করে তখন সামান্য একটু বাধা দিলেও ফণা তুলে দাঁড়ায়।

বলে, "দেখ, ভক্তিটা মাত্রার মধ্যে রেখো। তোমার রাঙাদি নাকি তরুদির অন্ধ ভক্ত, কিন্তু তোমার ভক্তিটারও তো কোনো কাণ্ড-জ্ঞান দেখি নে।"

তরুদির গুণকীর্তন করা তাই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু, চেঁচিয়ে না বললেও, চাপা গলায় এটুকু জানিয়ে রাখা দরকার যে, অমন রুচি অমন মাত্রাজ্ঞান আর অমন পারিপাট্য খুব কম দেখেছি। খুব কম দেখেছি বলছি হাতে রেখে। আর, চেঁচিয়ে যখন বলছিলেন, তখন হাতে রাখারও দরকার নেই; অনুচ্চ গলায় স্পষ্ট বলাই ভালো—অমন রুচি অমন মাত্রাজ্ঞান আমি আর দেখিনি।

যে-ছাতার জলুসে এই বোয়ালিয়া শহরের সদর রাস্তা আলোকিত ও পুলকিত করে তোলে সেই ছাতা নাকি দিন-কতক দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়। আমাদের আপিসের কয়েকটা বকাটে ছেলে এই কথা নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনা করছিল—কানে এল।

কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো কথা না

বলে বাড়িতে ফিরেই পাশের বাড়ির মেয়ে বিন্দুকে ডেকে আনলাম।

"কি কাকাবাবু?"

"তোদের ইস্কুলের খবর কি? পড়াশুনো করছিস কেমন?"

"ভালো কাকাবাবু।"

"তরুদি এখন তোদের কোন্ গল্প পড়াচ্ছেন?"

আমার কথা শুনে বিন্দু যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল, "জান না? তরুদির যে অসুখ।"

হেনা এসে বলল, "কি গো, কাকা-ভাইঝি কি কথা হচ্ছে।"

হেনার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "তরুদির অসুখ।"

আমার রকম দেখে হেনা বুঝি বিরক্ত হল, বলল, "অসুখ, তাই হয়েছে কি। অসুখ কার না হয়? সংসারে বাস করতে গেলেই রোগ-শোক থাকবে। বিন্দু এদিকে আয়।"

বিন্দুকে ডেকে নিয়ে হেনা পাশের ঘরে চলে গেল।

আমি একা বসে বসে ভাবতে লাগলাম নানা কথা। কর্তব্যে কি রকম ত্রুটি হয়ে গিয়েছে। তাঁর অসুখ, কিন্তু একটা খোঁজ পর্যন্ত নিইনি! কিন্তু খোঁজ নিতে যাওয়ার কথা বলাই এখন বিপদ।

কিছুক্ষণ পরে হেনা পাশের ঘর থেকে এসে বলল, "এই তো দরদ। এই তো দরদের নমুনা। তরুদির অসুখ, অতএব আর কি। জড়ভড়তের মত বসে থাকি। ওঠো, জামা গায়ে দিয়ে নাও। চল।"

আমি অবাক। কিন্তু বার বার অবাক হওয়া লজ্জার কথা। তাই কোনো কথা বললাম না।

তরুদির বাড়িতে পৌঁছেই হেনা প্রথম কথা বলল, "চলুন। এখানে একা পড়ে থাকবেন কেন। সেবার লোক নেই, শুশ্রূষার লোক নেই। ওখানে চলুন। আমাদের ওখানে।"

ছবির মত বাড়ি। বারান্দার কিনার ঘিরে টবে-টবে ফুল ফুটে আছে। জানলার পর্দায় হাওয়া লেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার কারুকাজ। বকের পালকের মত সাদা ধবধবে বিছানায় কোমর পর্যন্ত চাদরে ঢেকে চিত হয়ে শুয়ে আছেন তরুদি।

দেয়ালের গায়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উজ্জ্বল পালিশ করা আলমারি, আর তার ওপাশে আলনায় পাট করে রাখা আছে কয়েকটা শাড়ি ও জামা। তার পাশেই ঝুলছে ওই ছাতাটা।

আপত্তি জানালেন তরুদি। এই বাড়ি ফেলে কি করে তিনি যাবেন। বাড়ি পাহারা দেবে কে। জিনিসপত্র দেখা-শোনা—

হেনা বাধা দিয়ে বলল, "হবে হবে। সে কথা ভাবব আমরা। আপনি চলুন।"

পরের দিন পাল্কিগাড়িতে করে তরুদিকে অতি সন্তর্পণে আনা হল আমাদের বাড়িতে।

তার প্রাণপণ পরিশ্রম দিয়ে ও সম্পূর্ণ বাঁচি উজাড় করে দক্ষিণদুয়ারী ঘরটা রাতারাতি সাফ করে রেখেছিল হেনা। এই ঘরে এসে বিছানা নিলেন তরুদি।

চৌকির অদূরে ইজিচেয়ার পেতে তার সামনে একটা নীচু মোড়া রেখে দেওয়া হল। যদি বসতে ইচ্ছে করে তাঁর, তবে যাতে আরাম করে বসতে পারেন।

হেনার এক বেকার দাদা কিছুদিন হল এসে এখানেই ছিলেন, হেনা তাঁকে পাঠিয়ে দিল তরুদির বাড়িতে—অমন ছবির মত বাড়িটা কেবল বুড়ি-ঝিটার উপর ছেড়ে রাখা ঠিক না। তা ছাড়া, একা মানুষ হলে কি হবে, অত জিনিসে তাঁর কি-যে দরকার কে জানে। সারাটা জীবন ভরে তিনি জিনিসপত্রই কিনেছেন। সেসব পাহারা দেওয়াও দরকার।

তরুদি বিছানায় শুয়ে থাকেন টান হয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়, মুখখনা পরিষ্কার করা, দুটি বিনুনি বালিশের দুই পাশে ছড়ানো, আর মুখে হাসি; সে হাসি ক্লান্ত আর রুগ্ন হলেও হাসির মধ্যে জ্বলজ্বলে আছে—দাঁতগুলো চিকচিক করে।

বড়দি প্রায় বুড়ি হয়ে গেছে; কিন্তু তার টিচারের এই চেহারা দেখে ভাবি—আশ্চর্য, তরুদি জানেন আর্ট, কি করে চেহারা তাজা রাখতে হয়, সে কৌশল খুব আয়ত্ত করেছেন।

তরুদির মুখের দিকে তাকাই আর কেন যেন মনে হয়—তরুদি বাঁচবেন না। কেন যে এ-কথা মনে হয়, জানি নে। তবু মনে হয়, আর আতঙ্ক হয়। হেনা এঁকে টেনে

নিয়ে এল এখানে, হঠাৎ মারা গেলে বদনাম কিনতে হবে।

হেনা তার বাচ্চার জামায় সাবান দিচ্ছিল, সাবানটা জোরে ঘষতে ঘষতে বলল, "কী মানুষ! সুনাম তো একেবারে দেশময় ছড়ানো—বদনামের তাই ভারি ভয়। মানুষটা একা পড়ে-পড়ে মরে যাক, আর তুমি তোমার নাম ধুয়ে জল খাও।"

উবু হয়ে বসে বললাম, "সে কথা বলিনি। বলছিলাম, আমার ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে বাঁচবেন না তরুদি।"

"সরে বোসো। গায়ে ফেনা ছিটবে।" ঘটি থেকে জল ঢেলে জামাটা থুপথুপ করে কাচতে লাগল হেনা, বলল, "কেউ বাঁচব না আমরা। কেউই বেঁচে থাকার জন্যে আসিনি। সেকথা ভেবে এখন থেকে কান্না শুরু করতে আমি রাজি না।"

তরুদির ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে উঠোনে নামলাম, উঠোন থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলাম হেনা এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তরুদির ঘরের দিকে যাচ্ছে না।

উঠোন থেকে উঠে হেনার কাছে গিয়ে বললাম, "একবার যাও। দরজা বন্ধ। কি হল দেখ।"

কিছুই নাকি হয়নি। কাপড় বদলাচ্ছেন তরুদি। এ-সময় ঘরে কারো যাওয়া নাকি বারণ। অসুস্থ হলেও তিনি একাই নিজেকে নিজে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেন, সে সময় কারো থাকা পছন্দ করেন না।

হেনা বলল, "মেমসায়েব মানুষ উনি। আমরা দেশী ভূত। আমরা ওঁর সাজের কিছু বুঝিনে। ওর মধ্যে মাথা গলাতেও চাইনে।"

ডাক্তার অটলবিহারী একদিন অন্তর এসে ইনজেকশন দিয়ে যান, বলেন, "লিভারটা গেছে। সারতে সময় নেবে।"

তা নিক। কিন্তু যেন সেরে ওঠেন তরুদি। মনে মনে এই কামনা জানাই।

ইতিমধ্যে সকলের কাছেই খবর গিয়েছে এই অসুখের। দেরাদুন থেকে বড়দি উদ্বেগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। আর দুই দিদিও চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু রাঙাদি এসে হাজির হল কাঁথি থেকে।

রাঙাদি বাড়িতে পা দিয়েই বলল, "অরুদি আসেনি? খবর দেওয়া হয়েছে তাকে? অবস্থা এখন কেমন?"

ভীষণ ব্যস্তবাগীশ মানুষ রাঙাদি। গাড়ি থেকে তার জিনিসপত্র নামানো হয় নি। সে সরাসরি ছুটে চলে গেল তরুদির ঘরে।

রাঙাদি আসায় বাড়িটা জমজমাট হয়ে উঠল। তরুদির চেহারা সে নাকি ভীষণ খারাপ দেখছে। আমরা রোজ নিয়মিত দেখছি বলে বুঝে ধরতে পারছি নে, কিন্তু চেহারা নাকি খারাপ হয়েছে খুবই।

কিন্তু অটলবিহারী ডাক্তারের মত আলাদা। তিনি বলেন, অবস্থা মাঝে খুব খারাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন নাকি অনেক ভালোর দিকে। ওয়েটও নাকি গেন করেছেন অনেক।

তা যদি হয়ে থাকে ভালোই। কিন্তু রাঙাদির কথা শুনে অবধি কেবলই মনে হচ্ছে শরীর তাঁর তাহলে সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর, শুধুই মনে হয় অরুদির কথা। কাঁথি থেকে চলে আসতে পারল রাঙাদি, আর কাছের এই জলপাই-

দাড়ি থেকে অরুদিই আসতে পারলে না?

তরুদি মোড়ার উপর পা তুলে দিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসেন, তাঁর দুটি বিনুনি তাঁর দুই কানের কাছ দিয়ে নেমে এসে তাঁর বুকের উপর পড়ে থাকে।

পায়ের কাছে বসে রাঙাদি আর হেনা তাঁর সঙ্গে গল্প করে।

তরুদি বলেন, "তোরাই আমার আসল বোন রে। অরুটা এখন আমাকে ভুলে গিয়েছে—নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে ও। আজ মনে পড়ে, বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর কি বিপদেই আমরা পড়েছিলাম।"

যে দিনের কথা তরুদি বলেন, সে আমাদের মনে হয় এক প্রাগৈতিহাসিক যুগ।
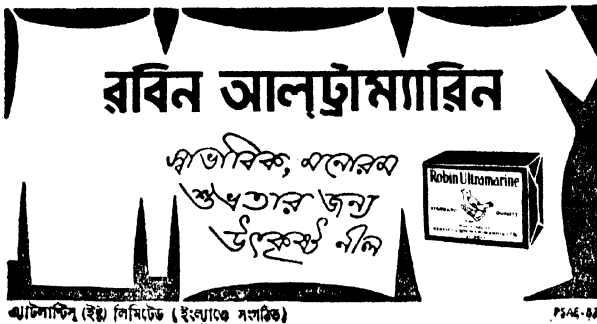
তার পর কত অজস্র বছর কেটে গিয়েছে কত ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই পৃথিবীতে।

এত বছর কেটেছে আর এত ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার উপর আছে এই অসুখ, তরুদি কিন্তু যে-কে সেই। তিনি এখনো যেন বেঁধে রেখেছেন তাঁর—

তরুদি রুগ্ন হাসি হেসে বললেন, "এর জন্যে অনেক সাধনা করতে হয় রে। অনেক চেষ্টা, অনেক যত্ন। রোজ লেগে থাকতে হয় এর পিছনে।"

রাঙাদি হাসতে লাগল, হেনা আড়চোখে আমার দিকে একবার চেয়েই চোখ নামাল।

আমি অদূরে একটা চেয়ারে বসে ছিলাম, বসে বসে দেখছিলাম ঐ গঠন আর অঙ্গের ঐ সৌষ্ঠব, এবং বিদ্যুতের ঝিলিকের মত তাঁর উজ্জ্বল দাঁতের হাসি।

সত্যি অদ্ভুত। সত্যিই আশ্চর্য।

রাঙাদি আসায় হেনার ঝঞ্ঝাট অনেক কমেছে। বাস্তবাগীশ মানুষ রাঙাদি, সব সময় লেগে আছে তরুদির তদ্বিরে। নুন থেকে চুন খসছে না।

হেনার দাদা দু-বেলা এসে তরুদির বাড়ির খবর দিয়ে যাচ্ছেন। খুঁটিনাটি করে তরুদি তার প্রত্যেকটি দরজার জানলার পর্দা, প্রতিটি আসবাবের খবর নিচ্ছেন।

হেনাকে এখন পাওয়া যাচ্ছে কাছে। মাঝে মাসখানেক তার পাত্তাই পাইনি। রাঙাদি আসায় সে এখন খানিকটা রেহাই পেয়েছে।

সে দিন রাত্রে চুপি চুপি তাকে বললাম, "দেখ। দেখে শেখো। শরীরটা কি করে রাখতে হয়—"

হেনা বলল, "ধ্যেৎ। এতটুকু রেহাই নেই? ও-ঘর থেকে একটু ছাড়া পেয়েছি, আর অমনি এ-ঘরের এই উৎপাত?"

চাপা গলায় বললাম, "চেঁচিও না। শোনো। সত্যি, দেখছ তো তরুদিকে? একটু শিখে নিতে ইচ্ছে হয় না—"

"না, না। ওসব শিখে আমার কি লাভ মশাই। যত-সব স্বার্থপরের মত কথা।"

সুতরাং ওসব নিয়ে আর কথাকাটাকাটি বাদ দিয়ে দিলাম। কিন্তু কেবল ভাবতেই লাগলাম তরুদির কথা।

মেমসায়েব হলে হবে কি। এক-এক সময় বড়ই পর্দানশীন হন তরুদি। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ঘরের মধ্যে মুখ-ধোয়ার গরম জল নিয়ে নিজেই তিনি দরজা দেন। জামাকাপড় বদলাবার সময় দরজা বন্ধ করেন।

ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে রাঙাদি, জল দিয়ে আসে, তোয়ালে দিয়ে আসে। দরজার এ-পাশে দাঁড়িয়ে তরুদির ফরমাশ শুনতে থাকে।

এই ভাবে আমাদের কাদিরগঞ্জের বাড়ির দিনগুলো কেটে চলেছে। সুখে-দুঃখে হাসিতে-তামাশায়। তার মধ্যে তরুদির জন্যে একটু দুশ্চিন্তা অবশ্য আছেই।

অটলবিহারীবাবু যতই আশ্বাস দিন, তরুদি কিন্তু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাঁর গলার স্বরেই বোঝা যায়।

"মায়ের পেটের বোন একবার খবর পর্যন্ত নিচ্ছে না। মেমসায়েবদের কাণ্ড একবার দেখ। আমরা হচ্ছি দেশী ভূত—আমরা ওসব বুঝতেই পারিনে।"

নিজের মনে কাজ করে আর মুখে বিড়-বিড় করতে থাকে হেনা।

ঘরে গরম জল দিয়ে, পেস্ট আর ব্রাশ গুছিয়ে রেখে, সাবান তোয়ালে শাড়ি ব্লাউজ হাতের কাছে রেখে দরজার এ-পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রাঙাদি। সত্যি ছাত্রী বলে একেই—কত বছর আগে এ'র কাছে পড়েছে তার ঋণ শোধ করছে যেন রাঙাদি।

আমার কোনো কাজ নেই। পায়চারি করে ঘুরতে ঘুরতে রাঙাদির কাছে এসে বললাম, "কি বলেন রে তোদের ট্যারুদি?"

রাঙাদি হেসে ফেলল, বহুদিন আগের সেই রসিকতাটা শুনে হঠাৎ রাঙাদির কাছে ধরা পড়ে গেছে বুঝি তাদের সেই পি এন গার্লস স্কুলের জীবনটা। রাঙাদি বলল, "এখন বয়স হয়েছে না? এখনো সেই ছেলেমানুষী গেল না?"

বললাম, "সারাটা জীবন ছেলেমানুষ হয়ে থাকতে পারলে ক্ষতি কি।"

আমরা কথা বলছি, ঘরের মধ্যে ধুপ করে শব্দ হল। শব্দ শুনেই চমকে উঠলাম আমরা। দরজার কাছে মুখ দিয়ে রাঙাদি ডাকতে লাগল, "তরুদি, তরুদি।"

অনেকক্ষণ পরে কাতরানির আওয়াজ পাওয়া গেল।

রাঙাদিকে বললাম, "যা! ভিতরে যা। দ্যাখ কি হল।"

দ্বিধা করতে লাগল রাঙাদি। তরুদির ছাত্রী ওরা, পারমিশন না নিয়ে ঢুকতে নেই—এ নিয়ম তারা জানে, এ ডিসিপ্লিন তারা মানে।

আবার ডাকতে লাগল রাঙাদি, এবার কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়তেই ভিতর থেকে তরুদির গলার বিকট আর্তনাদ বেজে উঠল।

হেনা ছুটে এসে আমার মুখের দিকে চেয়েই ভিতরে গেল, ভিতরে গিয়েই যেন ভয় পেয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "ব্যাপার কি। কি হল কি।"

হেনা কেঁদে ফেলেছে, বলল, "তরুদি পড়ে গিয়েছেন। নর্দমার কাছে জলে পা পিছলে। কিন্তু কি দেখলাম বল, এ তরুদি না, এ তরুদি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল রাঙাদি, "কিন্তু ওঁকে তুলতে হবে যে। আয়, আমি আর হেনা একা পারব না।"

ওরা দু-জন যদি একা না পারে, তবে অগত্যা আমাকেও যেতে হবে।

ঘরে ঢুকেই আমি পাথর হয়ে গেলাম। মুক্তোর মত ধবধবে সাদা দু-পাটি দাঁত মেঝের উপর পড়ে আছে—যেন অট্টহাসি হাসছে।

রাঙাদি ঘরে ঢোকা মাত্র তিনি আর্তনাদ করে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর চেহারা সকলে দেখে ফেলেছে এই আঘাতেই তিনি হিম হয়ে গিয়েছেন বুঝি।

তরুদির মুখের দিকে চেয়ে দেখি, এ তরুদি না—এ এক অথর্ব বৃদ্ধা। চোপসানো মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করছেন।

টেনে তুলে তাঁকে খাটে শোয়ানো হল। মুখ ফাঁকা, গালের গলার চামড়া কোঁচকানো, ভুরুর চুলে পাক ধরা।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে অপলক চোখে চেয়ে আছেন তরুদি। তাঁকে সবাই দেখে ফেলেছি, এইজন্যেই তিনি অটল আর অনড় হয়ে পড়ে আছেন কি না বুঝতে পারলাম না।

অটলবিহারী ডাক্তারের আসতে একটু দেরি হল। তিনি এসে রুগী পরীক্ষা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র রাঙাদি আর হেনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তরুদি কিছু বললেন না। তাঁর শেষ আর্তনাদ কিছুক্ষণ আগেই করা হয়ে গেছে।

গত সপ্তাহে সুনীল দাস কৃত কিছু ঘোড়ার স্কেচ এবং পেইণ্টিং-এর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। শুধু ঘোড়ার চিত্রমালার প্রদর্শনী সুকুমার শিল্পপ্রদর্শনী হিসাবে জনসাধারণের সামনে এঁর আগে আর কাউকে তুলে ধরতে দেখা যায় নি আমাদের দেশে। ঘোড়া সত্যিই একটি অতি চমৎকার আঁকবার বিষয়বস্তু। পশুজগতে সবচেয়ে সুশ্রী জীব হিসাবে ঘোড়াকেই ধরা হয়। তাই পাশ্চাত্ত্যের এবং প্রাচ্যেরও অনেক শিল্পীর আঁকবার প্রিয় বিষয়বস্তু হ'ল ঘোড়া। দাগা, তুলুজ লোত্রেক প্রমুখ পথিকৃৎ শিল্পীদেরও ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত প্রিয় আঁকবার বিষয়বস্তু। প্রাচ্যের শিল্পী জ্যু পেয়' ঘোড়া এঁকেই জগৎবিখ্যাত হয়েছিলেন। উগ্র আধুনিকপন্থী পিকাসো এবং মাতিস-এরও অনেক ছবির বিষয়বস্তু ঘোড়া। পাশ্চাত্ত্যের বহু প্রখ্যাত শিল্পী কেবল ঘোড়া এঁকেই সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন। শিল্পী সুনীল দাস-ও সংকল্প নিয়েছেন সারাজীবন শুধু ঘোড়াই এঁকে যাবেন। তাই প্রতিদিন কলেজের ক্লাস শেষ হবার পর কলকাতার বিভিন্ন আস্তাবলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইনি ঘোড়ার স্টাডী করে থাকেন। পরে এসব বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা নানান ভঙ্গিমার স্কেচগুলি এঁর হাতে পেইণ্টিং-এ রূপান্তরিত হয় তেলরঙ প্যাস্টেল এবং জল রঙেও। শিল্পী ছাত্র হলেও বেশ পরিণত অঙ্কন কৌশলের অধিকারী। শারীরস্থান এবং ড্রইং-এর জ্ঞানও বেশ পাকা। তেল রঙের কাজগুলি দেখলে বোঝা যায় এই মাধ্যমটিতে এঁর দখল অসাধারণ। এ মাধ্যমে কখনও ক্ল্যাসিকাল স্টাইলে আলো আঁধার খেলিয়ে রচনা করেছেন—যা দেখে সেকালের ধুরন্ধর পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের কথা মনে পড়ে। কখনও বা তথাকথিত ইমপ্রেশনিস্টদের রচনার মত ভাব এসেছে, কখনও বা স্প্যাচুলা এবং মোটা তুলির ক্ষিপ্রটানে সৃষ্টি করেছেন রঙ-বেরঙের খেলা, আবার কখনও বা কিছুটা অ্যাবস্ট্র্যাক্টভাবে ঘোড়ার ফর্ম রচনা করে ভারসাম্যপূর্ণভাবে কম্পোজিশন করেছেন। শেষোক্ত কম্পোজিশনগুলি একটু যেন কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। এ প্রদর্শনীতে সবসুদ্ধ ছিল ৬৭টি রচনা। শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে আমাদের 'মোশন' রচনাটি। এটি একটি ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য। একদল ঘোড়া রঙ-বেরঙের পোশাক পরা জকী পিঠে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেলে যে প্রতিচ্ছবি থেকে যায়, মনের মধ্যে অল্পক্ষণের জন্যে এটি তারই ছবি। প্রকৃত ইম্প্রেশনিষ্টিক আর্ট বলতে এই রকম ছবিই বোঝায়। গতি প্রকাশ করবার জন্যে যে অঙ্কন কৌশল ইনি প্রয়োগ করেছেন, তা একমাত্র পাকা শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব। দ্রাফ্টসম্যানশিপ-এ এঁর সঙ্গে দাগা বা তুলুজ লোত্রেক বা জ্যুপেয়'র সঙ্গে তুলনা করবার মত দুঃসাহস অবশ্যই আমার নেই তা হলেও এই তরুণ শিল্পী যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করবার মতই। 'দে আর সিক্স', 'ওয়েটিং ফর কল', 'ইমপ্রেশন অব মাইন' এবং 'কালার্স' এই রচনাগুলি বিশেষভাবে প্রশংসা পাবার মত। স্কেচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫৯ এবং ৫৯ নম্বরের কাঠকয়লার স্কেচ দুটি এবং তৈল মাধ্যমের স্কেচগুলি। প্যাস্টেলের কাজে একটু একঘেয়েমি প্রকাশ পেয়েছে। ভঙ্গিমায় এবং বর্ণিকায় বিভিন্ন ছবিতে আরও বেশী পার্থক্য থাকা উচিত ছিল।

শিল্পী সুনীল দাস অঙ্কিত চিত্র 'কালারস'

শিল্পী সুনীল দাস বর্তমানে কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ভারতের নানা প্রদর্শনীতে এঁর চিত্রকলা স্থান পেয়েছে এরই মধ্যে। এঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে গৌহাটী শহরে। এ বছর ললিতকলা আকাদেমীর প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ ড্রইং-এর জন্য নির্ধারিত নগদ টাকার পুরস্কার লাভ করে ইনি শিল্পী মহলে পরিচিত হয়েছেন। দিল্লীর মডার্ন আর্ট গ্যালারীও সম্প্রতি এঁর একটি স্টাডী খরিদ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের চিত্রপ্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর জন্য নির্ধারিত পুরস্কারটি ইনিই লাভ করেছিলেন। গত চার বছর ধরে ইনি ঘোড়াকে বেছে নিয়েছেন অঙ্কনের বিষয়বস্তু হিসাবে। এ প্রদর্শনীতে শিল্পীর যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় আমরা পেলাম। ভবিষ্যতে আরও পরিণত কাজ দেখতে পাবো আশা করি। —চিত্রগ্রীব

প্রেম আর ফুটবল

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রেম আর ফুটবল!

চোখ কপালে তুলছেন? তুলবেন না। অবাক হবার কিছু নেই।

হ্যাঁ, প্রথমটা শুনলেই অবশ্য একটু কেমন কেমন লাগে! ঠিক কথা। "নিছক কাব্য আর নেহাত গদ্য—পাশাপাশি? স্বর্গের প্রেম আর মাঠের ফুটবল—র‍্যাকেট! মাথা খারাপ?" বলতে পারেন।

বলতে পারেন আরও যে দুই হৃদয়ের এক হওয়ায় প্রেমের চরম সার্থকতা। (উদ্ধৃত করতে পারেন কবিদের উক্তি আপনার যুক্তির সমর্থনে, যেমন "লভ ইজ এ স্পিরিচুয়াল কাপলিং অব টু সোলস্; কিংবা লভ্ দ্যাট টু হার্টস মেকস ওয়ান"—ইত্যাদি) আর দুই-এর 'পায়ে' দুই-এর (অর্থাৎ ২২ জনের) কাড়াকাড়িতে ফুটবলের চরম উত্তেজনা। মিল কোথায়?

আছে—মিল আছে। আপনি ত' বেন জনসন আর স্পেন্সার কোট করেছেন। আমি আপনাকে হেরিকের লাইন স্মরণ করিয়ে দেবো—"লভ ইজ্ এ সার্কল্ দ্যাট ডথ রেস্টলেস মুভ।" কী? ফুটবলও ঠিক এই না? মিলিয়ে নিন। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে ফুটবলকে বলা হয়েছে "এ লার্জ রাউণ্ড ইনফ্লেটেড বল।" এই রাউণ্ড বলটি কি 'রেস্টলেস মুভ' করে না আপনার চোখের সামনে? তবে?

আচ্ছা আরও একটু ভেবে দেখুন। অনেক মিল পাবেন। আকৃতিগত তফাত থাকলেও (প্রেমের আকৃতি কী রকম? সেক্সপীয়র ত' প্রেমকে একেবারে ধোঁয়া করে ছেড়েছেন—"লভ ইজ এ স্মোক রেইজড উইথ দি ফিউম অফ সাইটস্") ওদের প্রকৃতিগত মিল অনেক।

উপলব্ধিটা হয়েছিল হঠাৎ। অবশ্য সকল মহৎ উপলব্ধিই হঠাৎ হয়। হঠাৎ যেন রহস্যের জাল ছিঁড়ে যায়। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ে এক ঝলক আলো। যা ছিল গোপন তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিব্যদৃষ্টি!

এই দিব্যদৃষ্টি কখন যে খুলে যায় কেউ বলতে পারে না। মহাপুরুষ যাঁরা সাধক, ঋষি, যোগী—তাঁরা ঈশ্বরের ধ্যান করতে করতে হঠাৎ সব গভীর সত্যের উপলব্ধি করেছেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে যখন ডুবে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে তাঁর গভীর দৃষ্টি সহসা খুলে যেত। মনের এই অবস্থাকে তিনি "স্যাটিসিরিন অ্যাণ্ড ব্লেসেড মুড্" বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এই সময় "উই সী ইনটু দি লাইফ্ অফ্ থিংগস্"—অর্থাৎ আমরা বস্তুকে অতিক্রম করে তার ভিতরের সত্তাকে দেখতে পাই।

প্রেম আর ফুটবল!

এদের বাইরের বিরোধিতা অতিক্রম করে ভিতরের মিল আমার চোখে ধরা পড়েছিল—সে একটি বৃষ্টিমুখর শ্রাবণের অপরাহ্নে।...ভুল করবেন না—নির্জন ঘরে একলা বসে খোলা বাতায়নপথে পাঠিয়ে দিইনি মনকে আমার মেঘের ওপারে কোনো সুদূর কল্পনার রাজ্যে...দাঁড়িয়ে ছিলুম প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে চিঁড়েচেপ্টা হয়ে প্রকাণ্ড গোলমালের মাঝে জল-কাদায় প্যাচ্ প্যাচায়মান কলকাতার ফুটবল মাঠের সবুজ গ্যালারীতে।

•

ঝুপ...ঝুপ...ঝুপ—তারপর ঝম্ ঝম্। বৃষ্টি জোরে নামলো। খেলা চলছে। বেশ জমে উঠেছে। উত্তেজনা বাড়ছে! ক্রমেই বাড়ছে। সংবাদপত্রের ভাষায় "তুমুল উত্তেজনা" বলা যেতে পারে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। মাঠে জল থৈ থৈ। জলে আর কাদায় বল বিশ মণ ভারী। সেই বল নিয়ে চলেছে লাথালাথি...মাথামাথি, খেলোয়াড়দের। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এদিকে মাতামাতি...দর্শকদের। সমস্ত মাঠের আবহাওয়া ঐ বৃষ্টির ঠাণ্ডার মধ্যেও গরম। কানের পাশে কর্ণভেদী চীৎকার—

"মেরে দাও! মেরে দাও! আর কায়দা কোরো না—মার, মার," তারপরই মর্মভেদী আর্তনাদ—"উঃ! কী কল্লে! কী কল্লে! ঐখান থেকে বাইরে মেরে দিলে! নাঃ, আজ আর কোনো আশা নেই—ধোৎ!"

চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল।

সহসা উপলব্ধি ঘটলো—প্রেম আর ফুটবল একই—

ফুটবল!

•

ফুটবল কি? চামড়ার আবরণের ভেতরে রবারের ব্লাডার। হাওয়া দিয়ে ফাঁপানো...যতদূর সম্ভব। আগে থাকে চোপ্সানো—হাওয়ার ওঠে ফেঁপে। দাও ব্লাডারের মুখটা বেঁধে, হাওয়া যাতে বেরিয়ে না যায়! হয়েছে? আচ্ছা, এইবার চামড়ার খোলসটার

মেরে দাও! মেরে দাও! আর কায়দা করো না

মুখ বাঁধ আষ্টেপৃষ্ঠে লেস দিয়ে—চামড়ার লেস। ব্যস! এই ত ফুটবল।

প্রেম?

প্রেম কি?

"লভ্ ইজ এ গোল্ডেন বাব্‌ল" বলছেন চ্যাপম্যান। ভেতরে কী? "ফুল্ অব ড্রীমস্" আচ্ছা, ও কবিদের কথা বাদ দিন। সোজা কথায় আসুন।

দেহচর্মের আবরণের নীচে একাণ্ড হৃদয়। প্রেমের হাওয়া ভেতরে প্রবেশ করলে সেই হৃদয় ফুলে, ফেঁপে ওঠে—তার আগে সে থাকে চুপ্‌সে। দেখেছেন দুই বন্ধুকে—যার মধ্যে একজন প্রেমে পড়েছে আর একজন প্রেমের ছোঁয়া পায় নি? তফাত লক্ষ্য করেছেন? দেখেছেন, একজন কি রকম বুক ফুলিয়ে চলে—লম্বা লম্বা পা ফেলে। 'ধরাকে সরাজ্ঞান' বলছেন? বলতে পারেন। কিন্তু টুল্‌টুল্ ওকে বলেছে—"আমি তোমায়—" ইত্যাদি। আর একজনকে দেখুন—যে টুলটুলদের তুলতুল কথা শোনার ভাগ্য করে নি। দেখবেন বেচারা যা, তাই আছে—মানে চুপ্‌সে আছে, না ফুলে ওঠা, না ফেঁপে ওঠা। তাইত প্রেমকে বলে "সোনার কাঠি", আরও কত কি। শতবরণের

ভাব উচ্ছ্বাস হৃদয়টিকে দিব্যি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গোলগালটি করে রাখে, ঠিক ফুটবলে পাম্প দেওয়ার মত।

তারপর সেই পাম্পের হাওয়া, মানে প্রেমের হাওয়া যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যে ব্লাডারের মুখকে, মানে হৃদয়ের মুখকে কড়া করে বেঁধে রাখা। একটু ফাঁক পেলেই হাওয়া ফস্ করে বেরিয়ে যেতে পারে। প্রেমের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কথাই ত আছে—চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। "লভ্ হ্যাথ্ উইংস্" ধরে রাখা শক্ত। তাই প্রেমের রীতি হচ্ছে অপর পক্ষকে কড়া হাতে বেঁধে রাখা। আল্গা দিয়েছ কি—ফস্!

ফুটবল নিয়ে কি হয়? দুপক্ষের লড়ালড়ি।

বল একটি, কিন্তু তাকে পায়ে রাখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে একাধিক লোক। কাড়াকাড়ি মারামারি চলছে—কখনও চলছে ভদ্রভাবে, মানে খেলোয়াড়ী মনোভাব বজায় রেখে, আবার কখনও বা অভদ্রভাবে। শেষ অবধি শুরু হয়ে যায় অবৈধ আক্রমণ—এমন কি, সময় সময় হাতাহাতি—ঘুষোঘুষি, ফাটাফাটি। রেফারী বাঁশি দেয়—"ফাউল।"

আর প্রেমের কাড়াকাড়ি—এ ত পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু থেকেই চলে আসছে। একটি মেয়েকে নিয়ে দুটি ছেলের টানাটানি বা একটি ছেলেকে নিয়ে দুটি মেয়ের [illegible]—এ কী আর বুঝিয়ে বলতে হবে? না এর নিদর্শন দেওয়ার দরকার? "প্রেমের শাশ্বত ত্রিভুজ"—এ না একটা প্রবাদবাক্যই দাঁড়িয়ে গেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে—'দি ইটারনাল ট্রায়াঙ্গল অব লাভ'—এ না হলে ত উপন্যাস, নাটক হয় না,—আর ফিল্মের কথা বাদই দিন!

একটি ফুটবল—তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি।
একটি হৃদয়—তাকে নিয়ে টানাটানি।
প্রেম আর ফুটবল:—

ফুটবলে 'ফাউল' আছে। প্রেমেও আছে। প্রকাশ্য এবং গুপ্ত—দুরকমই। ফুটবলের "চোরাগোপ্তা" দেখেন নি? রেফারীর ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সাধ্যি নেই যে ধরে! গোষ্ঠ পালের খেলা দেখেছেন?

—'কী হলো রে? ওদের সেণ্টার ফরওয়ার্ডটা......যেটা বল নিয়ে ছুটে আসছিল গোলকে কাটাবে বলে......কী হলো ওর? ওঠে না কেন?—"

—"আর উঠেছে? কাঁধ নিয়ে কাত—"

—"কে মারলে? গোষ্ঠ পাল ত ঐ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। ও আবার মারলে কখন? রেফারী ফাউল দিত না তাহলে?"

—ধরতে পারলে ত ফাউল দেবে! মেরেছে 'চোরাগোপ্তা।'

কি রকম বুক ফুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে

প্রেমের খেলাতেও 'চোরাগোপ্তা' আছে। ল্যাং মারা আছে। আপনি মনে করছেন জিৎ হার ত আপনার হাতে। মহা-আনন্দ! পেছন থেকে আপনাকে ল্যাং মারলে কি উঠে! আপনি কুপোকাত। আবার [illegible] আছে। মনে করুন—এই জগতে আমাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুটি [illegible] হয় না [illegible] এখনও [illegible]।

ফুটবলে দেখেছেন ত লাইনের ওপারে বল শুট করে ফেলে দেয়? প্রেমেও এরকম হতে পারে। একটি মেয়ে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলে নিয়ে [illegible] আপনাকে [illegible], আপনি প্রেমের [illegible] লাইনের ওপারে। আপনি তখন মাঠের বাইরে। মানে, আউট অব দি পিকচার, অর্থাৎ আপনার 'রাইভ্যাল' আপনাকে আপনার প্রিয়ার হৃদয়-ময়দান থেকে একটি সাইড-পুশ-এ বের করে দিয়েছে।

একটি ছেলেকে নিয়ে দুটি মেয়ের টানাটানি

ফুটবল নাচে খেলোয়াড়ের পায়ে।

সামাদের খেলা দেখেছেন? বলটাকে নিয়ে পায়ের ওপর নাচাতো, ওস্তাদ ঐ সামাদ্, বাজীকরের মত। আপনার প্রেয়সী যদি পাকা খেলোয়াড় হন তাহলে আপনাকেও নাচাতে পারেন তিনি তাঁর পায়ের ওপর। আবার অবশ্য মাথায় তুলেও নাচাতে পারেন, যদি আপনার ভাগ্য ভাল হয়। মোনা দত্তর 'হেড' দেখেছেন? অনায়াসে বলটাকে মাথার ওপর নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে যেতে পারতো। আপনার প্রিয়াও পারে আপনাকে মাথায় তুলে নাচাতে—যদিও মাথা থেকে পায়ে ফেলতে বেশী সময় লাগে না। মাথার বল পায়ে নিয়ে মারলে

বলটাকে নিয়ে পায়ের ওপর নাচাতো

এক শুটে—বল মাঠের বাইরে গিয়ে পড়লো এক ধারের মাঠে। প্রেমের কাড়াকাড়িতে আজ যে মাথার মণি কাল সে হয় ত নিচ্ছে ধুলোয় গড়াগড়ি। এ ত আর নতুন কথা কিছু নয়!

আবার এর উল্টো দিকও আছে। বুক-[illegible] দাঁড়িয়ে দিয়ে বলধরা মনে আছে? রবি গাঙ্গুলীকে নিশ্চয় ভুলে যান নি! অবশ্য, যদি দেখে থাকেন রবি গাঙ্গুলীর খেলা! আজকালকার খেলা দেখে ধারণা করতে পারবেন না। এখন ও-ধরনের খেলা নেই। বুকে জোর কোথা?

প্রেমের খেলাতেও বুক বাড়িয়ে দেওয়া আছে। প্রেমিকাকে বাঁচানোর জন্য বিপদের সামনে বুক বাড়িয়ে দিয়েছে তার প্রেমাস্পদ, —এ ত কত শুনেছেন, পড়েছেন। মনে নেই—"সাবধান! আর এক পা অগ্রসর হলে মৃত্যু অনিবার্য রে চোর শয়তান" এইরকম ধরনের কথাগুলো—অবশ্য দেখেছেন কি

না জানি না। আর প্রেমিকার আত্মত্যাগের উদাহরণ যে নেই তাও নয়। তবে হ্যাঁ, এ কথা অবশ্য বলতে পারেন যে আজকাল আর কই দেখা যায় এ-রকম বুক বাড়িয়ে দেওয়া প্রেমের ব্যাপারে? তা পারেন। যেমন ফুটবলেও বুক বাড়িয়ে বল ধরা উঠেই গেছে। বুকে সে জোর কোথা? ফুটবলেই বলুন আর প্রেমেই বলুন।

ফুটবলে 'বল চাপা' কাকে বলে জানেন ত?

আকাশে অনেক উঁচুতে যে বল উঠেছে তাকে মাটিতে পড়ার সংগে সংগেই পা দিয়ে চেপে ধরা (যেন পায়ে আটা লাগানো—ছোঁয়া মাত্র আটকে গেছে!) ফুটবল মাঠে আজকাল বড় একটা দেখা না গেলেও, আগে যেত। ভাবুন কুমারের খেলা! বল এসে একেবারে পায়ের নীচে লক্ষ্মী ছেলেটির মত যেন শুয়ে পড়েছে—একটু আগেই উড়ছিল। বল-কণ্ট্রোল!

প্রেমের খেলাতেও 'বল-কণ্ট্রোল' আছে। আপনার 'উনি' যদি বেশ কড়া খেলোয়াড় হন তবে আপনাকে তাঁর চরণতলে চুপটি করে পড়ে থাকতেই হবে ("তা ত' হবে", মনে মনে বলছেন ত? "শিবই পড়ে রয়েছে অমন চুপটি করে শক্তির পদতলে"!)—একটু ইদিক-ওদিক হবার যো-টি নেই। মুখবুজে, চোখবুজে, গো-বেচারাটি হয়ে থাকতে হবে পড়ে শ্রীমতীর শ্রীচরণে...ওড়া মনকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে ঐ শ্রীপাদপদ্মে (আগে যা উড়েছেন তা উড়েছেন—আর নয়)। মানে,

হার ম্যাজেস্টিস্ মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট

"হার মেজেস্টিস্ মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট"—ভাবটা এই আর কি! ফুটবলে বল-কণ্ট্রোল, প্রেমে ফুল-কণ্ট্রোল—প্রেমিকের ওপর প্রেমিকার! ফুটবলে বলে 'পায়ে আটা আছে'। প্রেমেও আটা আছে।

আচ্ছা, বল-ত চাপা হলো পায়ের তলায়। তারপর? সেই বল নিয়ে করবে কি?

প্যাটার্ন উইভিং নিশ্চয় জানেন। আজকালও বেশ দেখা যায়। বিপক্ষ কয়েকজনের পায়ের ভেতর দিয়ে বল কাটিয়ে নিয়ে দিলে একটি 'থ্রু' সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে। একটি ঠেলে শট্—গোল!

ওড়া মনকে বশে নিয়ে এসে অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা 'গোলে', অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো। ফুটবলের আক্রমণের সমাপ্তি 'গোলে'——তিনকাঠির জালের বন্ধনে; প্রেমের অভিযানের সমাপ্তি উদ্বাহবন্ধনে। এখানেও তিনকাঠি জাল, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। বল জালে জড়িয়েছে, মনও। বলের লাফালাফি শেষ হয়েছে। জালের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মনেরও আর ওড়া নেই। সংসারের জাল জড়িয়েছে এবার। একটি জায়গায় স্থিতি, মুখটি মুড়ে।

দেখেছেন ক্যালকাটা-মোহনবাগান খেলা? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে?

ফোর্টের দিক থেকে 'শট' মারছে ডবলিউ বেনেট, ক্যালকাটার ব্যাক। ইডেন গার্ডেনের দিক থেকে সেই বল আবার শট মেরে ফিরিয়ে দিচ্ছে গোষ্ঠ পাল, মোহনবাগানের ব্যাক্। বল একবার এদিক একবার ওদিক করছে। বেনেটের পা থেকে পালের—আবার পালের পা থেকে বেনেটের। কার পায়ে থাকবে বল? এ ঠেলে দিচ্ছে ওকে, ও ফিরিয়ে দিচ্ছে একে!

দেখেন নি প্রেমের ব্যাপারে এই জিনিস? মনটা দেওয়া যায় বা রাখা যায় কার পায়ে? রীণা সেন? না লীনা গুপ্ত? একবার এদিক, একবার ওদিক! প্রেমের অনিশ্চয়তা...সংশয়...মন দুলছে। রীণা বোধহয় সন্দেহ করেছে—"যাও না, লীনার কাছে...এখানে কেন?" বেনেট মারলে শট্, পালের পায়ে বল। বল্লে লীনা—"এখানে কেন? যাও না রীণার কাছে...!" মারলে পাল "রিটার্ন ভলি"—বেনেটর পায়ে বল। রীণার কাছ থেকে লীনার কাছে। আবার লীনার কাছ থেকে রীণার কাছে। যাকে বলে—ফ্রম পিলার টু পোস্ট। ফুটবলেও যা প্রেমেও তা!

আচ্ছা, এতেও যদি আপনার প্রেম আর ফুটবলের সহধর্মিতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তাহলে আরও একটি দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

গোলের সামনে বল। অনেক কায়দায় প্রতিপক্ষের পায়ের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে সেন্টার ফরওয়ার্ড বল নিয়ে সোজা চলে আসছে একেবারে পেনালটি-বক্সের মধ্যে। একটি সোজা শট—ব্যাস্—

কিন্তু দেখেছেন ত' কি অবস্থাটা হয়?

"গোল—গোল! মেরে দাও! মেরে দাও গোলের দোহাই দাদা—আর কায়দা কোরো না"—চারিধারে চীৎকার!

গোল হলো বলে! শট্—একটি শটের অপেক্ষা শুধু। গোলের মুখেই বলটা ঘুরছে, নাচছে লাফাচ্ছে। হয়—হয়—হয় না না! ট্যান্টালাইজিং! মুখের কেন, একেবারে ঠোঁটের নীচে জল! ট্যান্টালাস দাঁড়িয়ে আছে একগলা জলে, অথচ তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু নীচু হলেই আকণ্ঠ জল পান করতে পারে। কিন্তু হায় কী অভিশাপ! যেই নীচু হয় অমনি জলও অদৃশ্য হয়! আবার যেই সোজা দাঁড়ায় ঠোঁটের কাছে জল! সামনে জল অথচ কণ্ঠ শুষ্ক! সামনে গোল—অথচ স্কোর-বোর্ড শূন্য! হয়ে হয়েও হয় না! অনবরত ঘোরাঘুরিই চলছে বল নিয়ে—শট করা আর হচ্ছে না। জাল ছিঁড়ে যাবার কথা! জালের ধারে কাছেও বল ঢোকার নাম নেই?

প্রেমের খেলাতেও ঠিক এই অবস্থা... অনেক সময়।

বাজি মাত হলো বলে! সব ঠিকঠাক্! বুলবুল ত' হাতের মধ্যে...শুধু একটা দিন ঠিক হলেই...ব্যাস্। 'কফি হাউসে' বসে ও ত' নিজে কথা দিয়েছে...তবে? শুধু দিনস্থিরটা বাকী...মাঝে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক—এই তিনটে মাস কেটে গেলেই ত অঘ্রাণের প্রথম লগ্নে...সানাই, আলো, উলু...ব্যাস্! দুটি হৃদয় পরস্পরের জন্যে উন্মুখ...হাত দু'ধার থেকেই বাড়ানো হয়েছে...শুধু মিলিয়ে দিলেই হয়—

সামনে গোল—মার শুট...মার শুট...
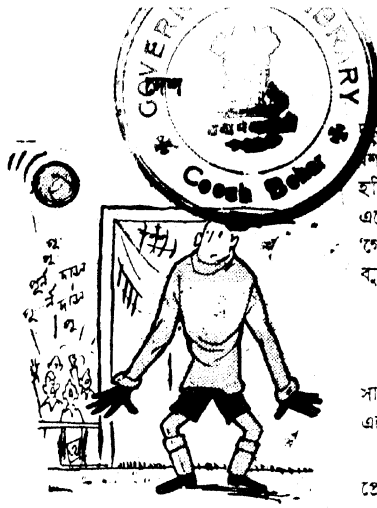
গোলে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দাস

শট্ মারা হলো—অবশেষে পূর্ণ দাস!

গোলে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ দাস। দেখেছেন পূর্ণ দাসের গোলকীপার খেলা? এরিয়ানের পূর্ণ দাস। কিছুদিন আগেও গোলের সামনে বল গিয়ে বিপদের সূচনা করলে পুরনো খেলা-দেখিয়েরা "পূর্ণ দাস" বলে চেঁচাত। পূর্ণ দাসের নামে বল পালায় গোলের সামনে থেকে। পূর্ণ দাস গোলে—

একটি 'পাঞ্চ'!

কোথায় গেল বল?

বুলবুল ত কফি হাউসে বসে কথা দিয়েছে। 'গোলে'—মানে, প্রেমের 'গোলে' পৌঁছে গেলেন আর কি! কিন্তু পূর্ণ দাস? গোললাইনে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ দাস! মানে, বুলবুলের বাবা বীরবিক্রম বল সাই! সব বাধা কাটিয়ে, অনেককে হটিয়ে, কয়েকজনকে চটিয়ে আপনি এগিয়ে এসেছেন বুলবুলের সামনে। সামনেই 'গোল'—কিন্তু গোল বাধালো ঐ বীরবিক্রম, বুলবুলের অবুঝ বাবা!

একটি পাঞ্চ!

কোথায় আপনি?

পূর্ণ দাস গোল হতে দেবে না। আপনার সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। 'গোলে'র সামনে এসে গণ্ডগোল—সব গোলমাল।

আর শেষ কথা হচ্ছে—ফুটবল গোল, প্রেমেও গোল। "প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়"—এ কথা ত অনেকবারই শুনেছেন। তা ছাড়া, প্রেম যে অনেক গোলযোগ ঘটায় তাও ত' দেখলেন। সবচেয়ে মারাত্মক যে গোলযোগ ঘটায় তা হচ্ছে মাথার গোলযোগ। এ ত' আর আমার কথা নয়। আপনাদেরই মহাকবি সেক্সপীয়র প্রেমিক আর পাগলকে এক পর্যায়ে ফেলেছেন মনে নেই? মিডসমার নাইটস্ ড্রীম-এর সেই লাইনটা—"দি লুনাটিক, দি লাভার অ্যান্ড দি পোয়েট"? মনে পড়েছে? কিংবা রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট-এর লাইন—"লাভ ইজ...এ ম্যাডনেস"—ইত্যাদি। বা "অ্যাজ ইউ লাইক ইট" নাটকে রোসালিন্ড-এর উক্তি—"লাভ ইজ মিয়ারলি ম্যাডনেস, অ্যান্ড ডিজারভস্ অ্যাজ ওয়েল এ ডার্ক হাউস অ্যান্ড এ হুইপ অ্যাজ ম্যাডম্যান ডু।"

এইবার মানবেন ত' যে প্রেম আর ফুটবল—ও একই ব্যাপার।

১৩

ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে এতক্ষণ ক্যারম খেলছিল কাকলি, এখন খেলা ফেলে রেখে, আবার এসে শুয়েছে তার খাটে। একটা উপন্যাস পড়ছিল, ভাবল সেটা আবার ধরবে কিনা। পাছে পৃষ্ঠা খুঁজতে হয় খোলা বইটা রেখে গিয়েছিল উপুড় করে। আলস্যে হাত বাড়াল সেদিকে। তক্ষুনি আবার হাতটা গুটিয়ে নিল। বইটার শেষ কী হবে তা যেন এখুনি, মাঝ পথেই বোঝা যাচ্ছে। যদি শেষই বোঝা যায় তা হলে আর পথ চলে, জীবনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে, সুখ কই?

মরবে তো একদিন। তা কে না জানে? কাল সূর্য উঠবে হয়তো, তারই মত অবধারিত। কিন্তু সে তো একটা অবস্থার শেষ, অস্তিত্বের শেষ কই? আধার ভেঙে গেল বলে কি আধেয়ও উড়ে গেল? প্রিয় চলে গেলে কি প্রেমও চলে যায়? অন্ধ হলে কি আর থাকেই না দৃষ্টিশক্তি?

দেহে, দিনে-রাত্রে প্রতি মুহূর্তে আমরা মরছি। সামর্থ্য ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কই আকাঙ্ক্ষা তো ক্ষয় হচ্ছে না। ভাসতে-ভাসতে চরে এসে উঠছি, কিন্তু পার পাচ্ছি কই? মনে হচ্ছে মৃত্যুর পরেও আছে আরো পরিচ্ছেদ। আরো কামনা করবার সহর্ষ যন্ত্রণা। কিন্তু আরো যে আছে তার প্রমাণ কী! কাল সূর্য যে উঠবে তারই বা প্রমাণ কী! আর, সুকান্ত যে সুন্দর, বরণীয়, তাই বা আমি প্রমাণ করি কী দিয়ে?

মৃত্যুই যদি শেষ হয়, বেশ, হোক। কিন্তু কিসে মরব, কবে মরব, কোথায় মরব, স্থলে না জলে, স্ববাসে কি প্রবাসে, এ জানতে দিচ্ছে না। জানতে দিচ্ছে না বলেই জাগিয়ে রাখছে, বাঁচিয়ে রাখছে। শুধু ঋণ করে ঘি খাবার কথা বলেই সরে পড়তে চাইছে না। চার্বাক এখন একবার এলে পারে। মনে-মনে হাসল কাকলি। মহাজনী আইন হয়ে যাবার পর এখন আর ঋণ কই? আর কায়ক্লেশে ঋণ যদি বা মেলে ঘি কই বাজারে? ঘৃতই তো মৃত। সে ঘি খেয়ে যাবজ্জীবন সুখে থাকা সুদূরের কথা। শুধু খাওয়া, খেতে পাওয়াই কি সমস্ত? জীবনে নেই কি সে এক শাণিত আস্পৃহা যা কোনোদিন বারিত হয় না, ব্যাহত হয় না? সব খেয়ে-পেয়েও যে সমানে পারনি বলে মাথা কোটে?

ধরবার নয়, তবু ধরবার জন্যে হাত বাড়ানো। বাঁধবার নয়, তবু বাঁধবার জন্যে বাজার থেকে দড়ি কেনা। জানবার নয় তবু নিরালায় নগ্ন হৃদয়ের উপরে কান পাতা।

তাই বা মন্দ কী! মরণের ঘাটের দিকে যেতে-যেতে জীবনের গাছতলায় বসে এই একটু চড়ুইভাতি করে নেওয়া।

ভালোবাসা এলেই বুঝি মরণকে মনে পড়ে। ভালোবাসাই বুঝি সেই এক সুখ, একান্ত সুখ, যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুর অর্থই থাকতে নেই। সেই এক ডাক যা বুঝি মৃত্যুর মতই অন্ধকার।

'কি রে, শুয়ে আছিস কেন?' গায়ত্রী জিগগেস করলেন।

'এমনি।'

'শরীর খারাপ।' সন্দিগ্ধ পায়ে গায়ত্রী কাছে এগুলো।

'না।' বাহু দিয়ে চোখ ঢাকল কাকলি।

'দেখ তো কী হল মেয়ের।' নিজের মনে বলছে না কাউকে সম্ভাষণ করছে দেখবার জন্যে কাকলি চোখ খুলল না। দিবারাত্র শুনেছে এখনো না হয় আরো কিছু বার হবে কানের পোকা। 'সবতাতেই অরুচি, সবতাতেই অনিচ্ছা। এম-এটা খারাপ হয়েছে বলে এত কী মন খারাপ করা! ফেল তো আর করিস নি।'

'এম-এ এম-এ। থার্ড ক্লাশ না কোন ক্লাশ কে জানতে আসছে! এত যে সব ডক্টর-ফক্টর দেখি তাদের কে কোত্থেকে কী ভাবে জুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিনে-কেটে এনেছে কে খোঁজ নেয়! আর যারা গালভরা উপাধি ঝাড়ে? কাব্যবিনোদ বা ভক্তিবিনোদ! কে জিগগেস করে, কে মশাই আপনাকে বিনোদ করল? কিংবা কাকে আপনি বিনোদ করলেন?'

নরনাথ—নরুকাকা এসেছে। বুঝতে পারল কাকলি। তার শোকটা যে কত ভরা-বহ তা বোঝাবার জন্যে আঁচলটা মুখের উপরে টেনে নিল। এ কালোমুখ কি কাউকে দেখানো চলে?

'বেশ তো, আরেক গ্রুপ নিয়ে পরীক্ষা দে।' গায়ত্রী রাগ-রাগ ভাব করে বললে, 'নইলে বি-টিতে গিয়ে ঢোক। ল পড়বি বলে এত তড়পোচ্ছিলি তাতে গিয়ে ভর্তি হ।'

'না, না, ওসব ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।' নরনাথও এগিয়ে এল খাটের দিকে। 'দেখছ না, ওর ভঙ্গিটা দেখছ না, ও এখন আরাম চায়। আলস্য চায়।'

'ও ওরকম মেয়ে নয়।'

'সব মেয়েই ওরকম।' পকেট হাতড়ে কি একটা বের করে সহসা গায়ত্রীর কাছে গিয়ে নরনাথ বললে, 'এই দেখ কী এনেছি। বলো কেমন দেখতে?'

সানন্দ কৌতূহলে চোখ বড় করল গায়ত্রীঃ 'কে এ?'

'আমাদের কোম্পানিতে নতুন জয়েন করেছে। স্টার্টিং-এই পাঁচশো টাকা। তারপর কোম্পানি থেকেই পাঠাবে 'ফরেনে'। বিয়ে করে একেবারে বউ নিয়ে যেতে পারবে।' ফোটোটা চশমার কাছে বাগিয়ে ধরল নরনাথঃ কেমন স্মার্ট দেখেছ?'

কাকলি কি নড়ে-চড়ে উঠল? পাশ-ফেরানো মুখটা সোজা করল? মনুথের আঁচল কি এল শিথিল হয়ে?

'স্মার্ট তো বটেই।' দূরে থেকেই আরেক-বার চোখ বুলোলো গায়ত্রীঃ 'স্মার্ট না হলে সাহেব কোম্পানিতে নেবে কেন? বয়েসও তো বেশি নয়।'

'না, না, সাতাশ-আটাশ। সুন্দর মানাবে। খাসা। আইডিয়াল।' প্রায় স্বর্গে গলা তুলল নরনাথ।

'পাশ-টাশ কদ্দূর?' মায়ের প্রাণ তো, জিগগেস না করে পারল না গায়ত্রী।

'জাতে-গোত্রে যুগ্যি, নিটোল-নিটুট চাকরি, অল্প-বয়স, সুস্থ, সুদর্শন—তার আবার বাড়তি পালকে দরকার কী!' উড়িয়ে দিতে চাইল নরনাথ।

'তবু মেয়ে তো আমার এম-এ।'

'এম-এ দিয়ে তো ধুয়ে খাবে। ঐ কে এম-এ পাশ, জহরলালকে বলেছিল দোকানদার পান্নালালের বড় ভাই, ভাবে-কে বলেছিল বাঙলা ভাষার প্রেজেণ্ট টেন্‌স, আর হর্মোনকে বলেছিল—কী যেন বলেছিল রে?' কাকলিকে লক্ষ্য করল নরনাথ।

এ অবস্থায় মেয়ের সামনে গুরুজনদের মধ্যে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের কথা উঠলে, মেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, হ্যাংলার মত বসে থাকে না। আর যদি কিছু শোনবার লালসাও হয় দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে উল বুনতে-বুনতে আড়ি পাতে। কিন্তু নরুকাকা কী অদ্ভুত ভালো, প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত। কেমন সুন্দর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছে। বাড়িতে একটা বিয়ের কথা উঠুক এই এতদিন চাইছিল কাকলি। তারই জন্যে ভাবে-অভাবে আবহাওয়া তৈরি করে চলেছিল। এরা সব ভাবছিল শূন্যতার কথা। পূর্ণতার খবর নিয়ে এই প্রথম এল নরুকাকা। প্রসঙ্গটা উঠলেই তো তবে আসঙ্গের কথাটা বলা যায়।

খুশিতে ঝলমল করতে-করতে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'হর্মোনকে বলেছিল হার্মোনিয়ামের আবিষ্কর্তা।'

'দেখলে তো বৌদি, কেমন বেজে উঠল হার্মোনিয়াম। সবগুলো দাঁত দেখা গেল, তাই না?' কাকলির দিকে তাকাল নরনাথঃ 'এক সঙ্গে সবগুলো রিড!'

অগত্যা গম্ভীর হল কাকলি। উপায় নেই, বইটা তুলে নিতে হল। অপেক্ষা করে রইল।

'জানি বাজবেই, উঠবেই বেজে। যখন যেমন গান—'

'কিন্তু কতদূর পাশ-টাশ করেছে বললে না তো—' গায়ত্রী বাকিটুকুর জন্যে উসখুস করতে লাগল।

'ক' পাশ নয়, ধ—পাস।' কাকলি টিপ্পনী না কেটে পারল না।

হাসল নরনাথ। গায়ত্রীকে বললে, 'তোমার শিক্ষার খবরে দরকার কী। তুমি মা, তুমি শুধু বিত্ত দেখবে। ছেলের মাইনে ভালো, উন্নতি যতদূর চোখ যায়। অফিসের গাড়ি পাবে, আর যা অফিসের তাই গৃহের, গৃহ মানেই গৃহিণীর, মানে স্ত্রীর,—আর স্ত্রীর হলেই শাশুড়ীর। বাড়ি আছে দার্জি-পাড়ায়, আর যা চাকরি বাগিয়েছে, বুঝতেই

পারছ, মুরুব্বির জোর কত। আজকাল যার মুরুব্বি তারই মোরব্বা।'

'তবু শিক্ষাদীক্ষার কথাটা জানতে হয়।' গায়ত্রী বললে, 'আর তা জানবার মাপ-কাঠিই হচ্ছে কী পাশ, ক'-টা—'

বইয়ে মুখ ঢাকল কাকলি। শুধু দুরন্ত দুটি চোখ বাইরে রেখে বললে, 'শুধু এপাশ ওপাশই করেছে বোধহয়—'

'তুই মেয়ে, তোর ও-খোঁজে কী দরকার? তুই শুধু রূপ দেখবি।' পকেট থেকে ফোটোটা ফের বার করল নরনাথঃ 'দেখবি? দ্যাখ না। দেখতে কী দোষ!'

কাকলি মুখ ফিরিয়ে নিল। বললে, 'বিদ্যা ছাড়া বুঝি রূপ হয়! আর যে পুরুষ বিয়ের অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে নিজের ফোটো এনক্লোজ করে দেয় সে যে কতখানি শিক্ষিত তা আর বলতে হবে না।'

'মোটেই তা নয়। আবেদনটা আমাদের, আর আমরা এনক্লোজ না করে ডিসক্লোজ করব, তাই উনি দেখতে আসবেন স্বচক্ষে। কে উনি আসছেন তারই পূর্বাভাসের জন্যে এই ছবিটা তার এলবাম থেকে তুলে এনেছি। দিতে কী চায়! অনেক পিড়া-পিড়ি ধস্তাধস্তির পর দিল। সিনিয়র অফিসার, আমাকে কি আর চটাতে পারে! বললাম, কে তুমি যাচ্ছ তাদের একটা আইডিয়া তু দিতে হয়। অন্তত, অন দি ফেস অফ ইট, তুমি যে প্রত্যাখ্যেয় নও, বরং তুমি যে নির্বাচনের, নিমন্ত্রণের, এ সম্বন্ধে তো তাদের নিঃসংশয় হওয়া চাই। ফাইন্যালের আগে একটা হিট হতে দোষ কী! ঘটনা তার ছায়া ফেলে শোননি? এও ঘটনার আগে একটু ছায়া দেখানো। কই দাদা কই, কেমন আছেন?' অন্য ঘরের দিকে পা বাড়াল নরনাথ।

মহাভারতের এখনো অনেক পর্বই বাকী, গায়ত্রী পিছু নিল। কাকলি আবার শুলো। উপরে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কতক্ষণ পরে ব্যস্ত পায়ে ছুটে এল গায়ত্রী। ঘনিষ্ঠ ষড়যন্ত্রীর সুরে বললে, 'শুনেছিস, শুধু মুরুব্বির জোরেই চাকরি পায়নি, ছেলের গুণ আছে।'

মায়ের ভর-ভর মুখের দিকে তাকাল কাকলি, কোনো কথা বলল না।

'ছেলে এম-কম, তার উপর আবার ল পাশ। শুধু নুনেই কি হয়, স্বাদের জন্যে মিষ্টিও লাগে।' ডগমগ হয়ে বলল গায়ত্রী, 'ছেলের নিজের মিষ্টি আর মুরুব্বিদের তদবিরের নুন। চৌকস ছেলে। এখন আমাদের অদৃষ্ট। তা ছেলের চোখে নরু-ঠাকুরপো মধুর ছিটে দিয়ে দিয়েছে—তবু একবার দেখুক, দেখে যাক—'

'আমাকে দেখবে?' আঁতকে উঠল কাকলি।

'আহা, এ কি সেই সরাসরি দেখা, না চুল খুলে পিঠ দেখিয়ে দাঁড়ানো? সে একটা ডিসেণ্ট কিছু হবেই। ঠাকুরপো যখন আছে তখন আর ভাবতে হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য,' গায়ত্রী আবার ছুটল ব্যস্ত পায়েঃ 'ছেলের নামটাই তো জানা হয় নি। যখন সব ভালো, নামটাই বা না কোন ভালো হবে। আর নামে কী আসে যায়—'

'লেখক তো নয়, যে নাম চলল না বলে বইও চলল না—'

'আর আজকাল তো অফিসে-বাজারে উপাধি ধরে ডাকার রেওয়াজ—চক্রবর্তী না দাশগুপ্ত—' চলে গেল গায়ত্রী।

কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এল নরনাথ। পিছনে বর্নবিহারী। ঘর থেকে বাইরে, সিঁড়ির মুখে বারান্দার কাছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে কাকলি। কী আশ্চর্য, লাঠি ছাড়াই বাবা হাঁটতে পাচ্ছেন। তাঁর পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ কম বলে মনে করছেন। যেন কী একটা কাঁটা ফুটে ছিল, খসে গিয়েছে। মুখে আর সেই ভার-ভার অবসাদের ভাব নেই। আর মা তো মুহূর্তে বয়স অনেক কমিয়ে ফেলেছেন। হালকা হয়ে গিয়েছেন।

বাঁ হাতের তালুর উপরে ডান হাতের কিল মেরে নরনাথ বললে, 'এ সম্বন্ধ হবেই। আমি জানি আমার কথা ও ফেলতে পারবে না।'

মেয়ের জন্যে অগাধ মমতা, তাই বুঝি নৈরাশ্যকেও হিসেবের মধ্যে রাখছেন বর্নবিহারী। বললেন, 'এখন পছন্দ হলে হয়!'

'পছন্দ হবে না কী!' নরনাথ চশমার কাঁচ মুছতে লাগলঃ 'এমন মেয়ে কটা পাবে কলকাতায়। যদি ঝাপসা কিছু দেখে, তা মেয়ের দোষ নয় ওর চোখের দোষ। তাই ঠিক পাওয়ারের চশমা পরিয়ে নিয়ে আসব।'

'কিন্তু মেয়ে আমার গৃহস্থ টাইপ—' বর্নবিহারী আবার মমতা ঝরালেন।

'আর উনিই বা কোন্ গৃহহীন। যেমন সাজাবে তেমনি সাজবে। বউ সাজালে বউ বিবি সাজালে বিবি। মেয়েদের কি, ছন্দ
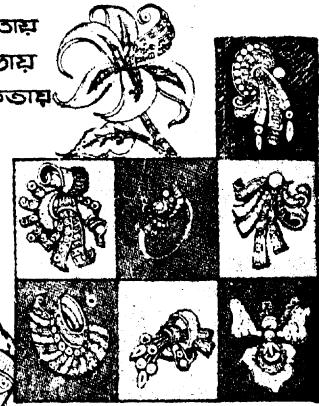
ধরে থাকলেই পছন্দ। হয় শ্বেতপাথরের গ্লাস নয়তো ডিকেণ্টার। যা বলো। চীনে মাটির প্লেট নয় কলাপাতা—'

'আমার ভয় হচ্ছে, বেশি কিছু দাবি দাওয়া না করে বসে।' গায়ত্রী মুখ শুকনো করল।

'দাবিদাওয়া না হাতি! দিলে দেবে না দিলে না দেবে—যা তোমাদের সাধ।'

'না, না, দেব।' বললেন বনবিহারী। 'কাকলির জন্যে আলাদা টাকা রেখেছি।'

'তবে সেই কথাই রইল।' নরনাথ গায়ত্রীকে মনে করিয়ে দিলঃ 'আগামী শনিবার দুপুরে দুটোয় এসে আমি তোমাকে আর কাকলিকে নিয়ে যাব। ইন্দিরাও যাবে।'

'ও পক্ষে?'

'ছেলে আর তার দিদি আর ভগ্নীপতি। মা তো নেইই বলেছি—'

'ছোট বোনটোন?'

'যদ্দুর জানি, তাও নেই।'

আরো হালকা হল গায়ত্রী। শাশুড়ী থাকবে না, অঙ্গনে নেমেই ষোল আনা কর্ত্রী হতে পারবে, আর, ননদ-ফনদের বিয়ের জন্যে টাকা জমাতে হবে না মাস-মাস, কত বড় উপশম সংসারে। চোখে ইঙ্গিত পুরে গায়ত্রী তাকাল নরনাথের দিকে। বললে, 'কাকলিকে ভালো করে বলে যাও।'

বনবিহারী দিব্যি আরো কয়েক পা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ফাংশনটা কী?'

'দেখি কী দাঁড়ায়! হয় কোনো হোটেলে চা। নয়, গঙ্গার পারে কোথাও পিকনিক। ডিটেলস পরে জানাব। হ্যাঁ, কী জানি কথাটা? খবরের কাগজে বিশেষণ হিসেবে খুব চলে। হ্যাঁ, মনোজ্ঞ—ব্যাপারটা যতদূর মনোজ্ঞ করা যায়—'

ভয়ানক কথা, হাসলেন বনবিহারী। 'আজ মঙ্গলবার—' গুনলেন হয়তো শনি-বারের দেরি কত।

নামবার আগে নরনাথ ঢুকল কাকলির ঘরে। নিমন্ত্রণের বিষয়টা বিশদ করতে চাইল।

হার্মোনিয়মের সমস্তগুলি রিড খুলে বেজে উঠল কাকলিঃ 'কিন্তু চা যেন হাই-টি হয় নরুকাকা। বেশ হেভি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে—'

এবার কাকলি নীরবে হাসল। প্রায় আধ্যাত্মিক হাসি। এ হাসিই বলে, প্রভু, এদের তুমি ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা কী করছে।

গায়ত্রী নরনাথকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। বনবিহারী অসাহায্যে হেঁটে-হেঁটে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

গায়ত্রী এল কাকলির কাছে। কতদিন তার স্বাস্থ্য-লাবণ্যের সরজমিন তদন্ত করেনি ভেবে অনুতাপ হল। মাথাভরা কত সুন্দর চুল ছিল, অযত্নে-আলস্যে উঠে যেতে বসেছে। চুলগুলি দুহাতে তুলে নিয়ে আদরে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল গায়ত্রী।

কাকলি ডাকলঃ 'মা।'

কি রকম অদ্ভুত লাগল গায়ত্রীর। কী কথা আছে সরলভাবে সরাসরি বলেই ফেল না। সম্বোধন করবার কী দরকার। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

ডেকেছিস তো কথা বলছিস না কেন?

'মা!'

'কী?'

গায়ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না এই যা শান্তি। বললে, কাকলি, 'নরুকাকাকে বলে দাও শনিবারের ফাংশন বন্ধ করে দিক।'

'কেন?' দু হাতে কাকলির চুল অচল হয়ে রইল।

'ওখানে হবে না।'

'কী হবে না?'

ঢাক-ঢাক—গুড়-গুড়ে লাভ নেই, স্পষ্ট কণ্ঠেই বললে কাকলি, 'বিয়ে।'

গায়ত্রী ভাবল, প্রত্যেক চাকরির উমেদারই যেমন সন্দেহ করে, তার বৈগুণ্য বেশি, সম্ভাবনা কম, তেমনি একটা অলস সন্দেহই কাকলিকে আচ্ছন্ন করে বসেছে। প্রত্যেক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর যেমন হয়।

'তা না হোক। তার জন্যে দেখাতে বা দেখে আসতে দোষ কী! না হয় তা ঠাকুরপো বুঝবে। আমাদের মাথা ঘামাবার কী দরকার!'

'কথাটার মানে তা নয়।'

'তা নয় মানে?'

'তা নয় মানে,' একটুও ঢোঁক গিলল না কাকলি, 'আমার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে আছে।'

গায়ত্রীর হাত থেকে চুলের গোছ আলগোছে খসে পড়ল। বিবর্ণ স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: 'কী হয়ে আছে?'

'ঠিক হয়ে আছে। মানে স্থির হয়ে আছে।'

'এখনো হয়নি তো?' সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে গায়ত্রীর।

'না, হয়নি।'

'তবে জেনে রাখো, আর হবে না।' চুলের গোছা আবার তুলে নিল গায়ত্রী।

সুকান্ত যা বলেছিল তাই করলেই ভালো হত। এত কথা কইতে-সইতে হত না। সোজাসুজি বলে দিলেই হত, হয়ে গিয়েছে, চুকে-বুকে গিয়েছে—এই দেখ সরকারী দলিল। শীলমোহর মারা। এ আর নাকচ হবার নয়। আমি নাবালক নই, আইনের কোনো বাধানিষেধের মধ্যে আমরা পড়ি না। এখন পারো তো ভোজ ডাকো।

'কেন হবে না?' ঘাড় ফেরাল মা'র দিকে।

'না, হবে না।' গায়ত্রী চুল ধরে টান মারল সজোরে: 'আমরা যাকে মনোনীত করবো তাকেই তোমার নিতে হবে।'

'তবে এতদিন করনি কেন? দাওনি কেন গছিয়ে? সাবালক করে, সাবালকের স্বাধীনতা দিয়ে এখন কেন আর তর্জন-গর্জন করবে?'

'একশোবার করব।' চুলের উপর আবার হামলা চালাল গায়ত্রী: 'কিন্তু জিগগেস করি কাকে তোর নির্বাচন?'

'তোমরা তাকে চেন।'

বুকের ভিতর যেন তীর ছুঁড়ে মারল গায়ত্রীর। 'সেই জুতোকান্ত ভেড়াকান্ত ছেলেটা?'

'না।'

'সুকান্ত না?'

'হ্যাঁ, সুকান্ত।'

'ঐ ওয়ার্থলেস অপদার্থ অকর্মণ্য ছেলেটা? ফাজিল ফক্কড় বাউন্ডুলে লোফার—' বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছে না গায়ত্রী।

'মৃগাঙ্কশেখর শিবকেও সকলে ঐ কথা বলত। সুকান্ত একটা সুস্থসবল চাকরি পেয়ে গেলেই এসব বিশেষণ বিপরীত মূর্তি ধরবে।'

'এখনো পায়নি তো।' দাঁতে দাঁত লাগল গায়ত্রীর: 'শুনেছিলাম কী জেল্লাদার ছেলে—ব্রিলিয়াণ্ট—কই ফার্স্টক্লাশ তো জুটল না—'

'না জুটুক। সেকেণ্ড ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে। রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছে। পরে ডক্টরেট পাবে। পরে নির্ঘাৎ প্রোফেসরি। এমন কী অসার জিগগেস করি!'

'কিন্তু যে পাত্র নরু-ঠাকুরপো এনেছে—'

'সে ফুটো পাত্র, মা।' চুলের উপর অত্যাচার অসহ্য হবে জেনেও কিছুতেই না বলে পারলনা কাকলি।

'চুপ কর। কিসে আর কিসে, তামায় আর সিসে। চাঁদের কাছে জোনাকি!' চুল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল গায়ত্রী। শাসনের সুরে বললে, 'তোকে বলে রাখছি, সুকান্ত-ফুকান্ত কিছুতেই চলবে না, না, চলবে না,—চলবে না—'

'তুমি যে প্রায় রাস্তার আওয়াজ তুললে।' [ক্রমশ]

কাকলি বললে পিছন থেকে, একটু বা রুক্ষস্বরেঃ 'আমারও একটা উলটো আওয়াজ ছিল। আমার দাবি মানতে হবে। দুটো আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। যা চলবে না তাই হবে, যা হবে তাই চলবে না—' কাকলিও উঠে পড়ল।

ভেবেছিল মা বুঝি সটান বাবার কাছে গিয়ে পড়বেন; না, অন্য দিকে গেলেন। বোধহয় এখনো নিচ্ছেন না মোট করে। কিংবা কে জানে হয়তো শনিবারের অপেক্ষা করছেন।

শনিবারের সকালে বেরুচ্ছে, নিচে, পথ আটকাল গায়ত্রী।

'সাত সকালে চলেছিস কোথায়?'

'নরুকাকার বাড়ি।' কাকলি এক পা দাঁড়াল।

'সেখানে কী?'

'নরুকাকাকে বলতে আজকের দুপুরের ফাংশনটা যেন বাতিল করে দেয়।' বলতে-বলতেই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

কাকলি!' রাস্তায় আর্তনাদ ছুঁড়ে মারল গায়ত্রী, একটা কণিকাও কাকলিকে স্পর্শ করল না।

তখন গায়ত্রী দ্রুত পায়ে চলে এল বনবিহারীর কাছে। বললে ইতিবৃত্ত। নদীতে বান ছিল, এবার তুফান উঠল।

চুপি চুপি পায়ে পরদা সরিয়ে নরনাথের ঘরে এসে ঢুকল কাকলি। বাবার মামাতোভাই এই নরুকাকা। সাহেবী ফার্মের বড়বাবু। সবচেয়ে বড় পরিচয়, মেজাজ সাহেবী নয়, ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মেশেন সমান হয়ে, সকলের ভালো দেখেন, ভালো করে বেড়ান।

'কি রে, ফাংশনের গন্ধে একেবারে ভোরে উঠেছিস, ভোরে ছুটেছিস?' আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল নরনাথঃ 'দাঁড়া, সকলকে, তোর কাকিমাকে ডাকি—'

'কাউকে ডাকতে হবে না।' স্বর স্তিমিত করল কাকলিঃ 'তোমার সঙ্গে গোপনে জরুরি কথা আছে আমার।'

'কি রে, কী কথা?' নরনাথও স্বর নিয়ে এল ধূসরেঃ 'বোস। এই কাছের চেয়ারটায় বোস।'

'আজকের দুপুরের ফাংশনটা বন্ধ করে দিতে হবে।'

'কেন বল তো? শরীর খারাপ? নয় তো অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'না, ওসব কিছু না।'

'তবে?'

'ওখানে আমার বিয়ে হবে না।' চোখ নামাল কাকলি।

'তবে কোথায় হবে?'

'আমার জায়গা ঠিক করা আছে।'

'ঠিক করা আছে! ভালোবাসার জায়গা?'

'হাঁ—' দুরু-দুরু ভয়ে মৃদু-মৃদু তাকাল কাকলি।

'তবে আর কথা কী! ভালোবাসার কাছে কিসের ফাংশান কিসের সাংশান! কিসের কান্ভেনশেন্টেড অফিসার! চুরি নেই ধাঁকি নেই, হিসেবের অংক কষা নেই। এ তো খুব ভালো কথা রে, সুখের কথা। কজনের ভাগ্যে জোটে এই আশীর্বাদ! ফাংশান বন্ধ হয়ে যাবে বৈকি, এক কথায় বাতিল হয়ে যাবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথঃ 'সকলকে ডাকি। সুখের সংবাদটা চাউর করে দি—'

'না, না এখন নয়।' ভিতরের দরজা বন্ধ করল কাকলিঃ 'আগে বিয়েটা ঘটিয়ে দাও, তারপর—'

কাকলি বাড়ি ফিরল প্রায় দুপুরের গা ঘেঁসে। সে বাড়ি এসেছে শুনতে পেয়েই বনবিহারী তুমুল হুংকার দিয়ে উঠলেন। ডাকো তাকে।

নীরবে কাকলি বনবিহারীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুই কোন ছোঁড়াটাকে বিয়ে করতে চাস?'

কাকলি চুপ করে রইল।

'সেই যে ইডিয়টটা কদমফুল দেখেনি তাকে?'

কাকলি কথা কইল না।

'কদমফুলে মানে কে ড্যাম ফুল—সেই নিনকম্পপটাকে?'

কাকলি চলে গেল আস্তে আস্তে।

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

মানুষের শরীরে রক্ত-চলাচল করতে করতে অনেক সময় দানা বেঁধে যায়, যার ফলে হঠাৎ একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। 'একুটাসি' বলে এক নতুন ওষুধ বের হয়েছে, যেটা রক্তের এই দানাকে সহজে গলিয়ে দিয়ে আবার স্বাভাবিক রক্ত-চলাচল করতে সাহায্য করবে।

*

'স্টারট্' এক নতুন ধরনের ক্যামেরা। এর সাহায্যে যে কোন জিনিসের খুব কাছে থেকে, যেমন ৪ ইঞ্চির মধ্যে ছবি তোলা সম্ভব হবে। ছোট মডেলের ডকটিকিট কোন নকশা, ফুল, প্রজাপতি ইত্যাদির ছবি খুব সহজেই এই ক্যামেরা দিয়ে তোলা যাবে। ক্যামেরাটি দেখতে খুবই সাধারণ অনেকটা কোডাক কোম্পানীর ব্রাউনির মত দেখতে। এত কাছ থেকে ছবি তুলতে পারার কারণ হচ্ছে এর লেন্স—খুবই ছোট এবং এটা হচ্ছে 'এফ ।৬৪'। এটা অনেকটা 'পিনহোল' ক্যামেরার মত কাজ করে। এই লেন্স ছাড়া এর আর সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজ যে, যে-কোন বক্স ক্যামেরায় যাদের ছবি তোলা অভ্যাস আছে তারাই এতে ছবি তুলতে পারবেন। ৪ থেকে ৮ ইঞ্চির ভেতর কোন ছবি তুলতে হলে এই ক্যামেরার একটা কাঁটা লাল দাগ পর্যন্ত সরিয়ে দিতে হবে, তার পর একটা লাল রংএর 'ক্লোজ-আপ লেন্স' লাগিয়ে দিয়ে শাটার টিপলেই ছবি উঠবে। এর সঙ্গে লাগান ফ্লাশের ব্যবস্থা এমন যে ঘরের ভিতরেই হোক বা বাইরেই হোক ঠিক মত ছবি উঠবে। যখন এর চেয়ে দূরে যেমন ১০ থেকে ১৬ ইঞ্চির মধ্যে ছবি তুলতে হবে তখন লেন্স এফ।৬৪ না হয়ে এফ।২৭ হবে। তারপর কাঁটাটাকে লাল দাগে না
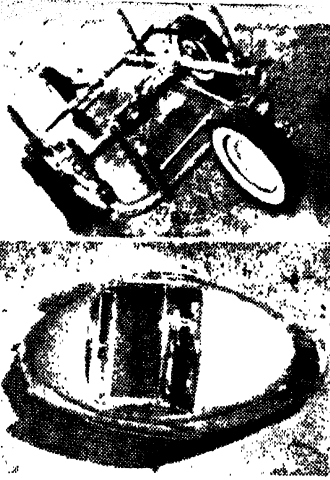
ওপরের ছবিতে গাড়ির 'চেসিস্'-এর সঙ্গে কিরকমভাবে চাকা লাগান আছে দেখান হচ্ছে। নিচের ছবিতে গাড়িটা দেখতে কেমন তাই দেখান হচ্ছে।

রেখে সবুজ দাগে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তার পর একটা সবুজ রং এর লেন্স ক্যামেরায় লাগিয়ে নিতে হবে। 'ভিউ ফাইন্ডারে' যা দেখতে পাওয়া যাবে সেটাই ধরে নিতে হবে যে ঠিক মত দেখা যাচ্ছে। এতে ১২৭নং ফিল্ম লাগান হয় এবং প্রয়োজন হলে রঙিন ছবিও তোলা যায়।

*

সম্প্রতি যুগোশ্লাভে এক নতুন ধরনের ডিমের মত দেখতে মোটর গাড়ি তৈরী করা হয়েছে। এতে ১৪ অশ্বশক্তি ইঞ্জিন লাগান আছে, আর এর গতি ঘণ্টায় ৫৫ মাইল পর্যন্ত হয়। সামনের এবং পেছনের দুটো চাকাই ঘোরান ফেরান যায়। দু ধারের চাকা গাড়ির ঝাঁকুনি সহ্য করার মত করে তৈরী করা হয়েছে।

*

জরা বা মৃত্যু কোনটাই মানুষের কাম্য নয়, অথচ অকালমৃত্যু ছাড়া জরার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কোনও মতেই সম্ভব নয়। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের চামড়া কুঁচকে গিয়ে পূর্বের কমনীয়তা মুছে দিয়ে জরার আভাস জানায়। শুধু যে চামড়া কুঁচকে যায় তা নয় অনেক সময় মেচেতা পড়ে। অনেক দেশে দেখা যায় যে, চামড়ার ওপর যে সব দাগ পড়ে সেগুলোর মধ্যে কোনওটি ক্যান্সার-গ্রস্ত হয়। তুলান য়ুনিভার্সিটির "স্কুল অব মেডিসিনের' কয়েকজন ডাক্তার মিলে এই কুঁচকোনো চামড়ার কমনীয়তা ফিরিয়ে আনার চিকিৎসার উপায় বার করেছেন। ডাঃ জেমস্, ডবলিউ বার্ক, জন, এম বুয়ার এবং মারভিন চার্নস্কি বলেন যে, তাঁরা মুখের এবং হাতের কুঁচকান চামড়া খুলে নিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চামড়াটি অসাড় করে নিয়ে তারপর একটি তারের বুরুশ ওর ওপর দিয়ে খুব দ্রুত চালিয়ে যাওয়ার পর চামড়াটি বেশ টান টান হয়ে যায় এবং মেচেতার দাগও থাকে না। লুইসিয়ানার নিউঅরলিন্স হাসপাতালের পাঁচশত জন রোগীকে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া গেছে।

*

লেনিনগ্রাডের দুজন বৈজ্ঞানিক ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধ করবার এক নতুন উপায় বার করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ভাইরাস রোগাক্রান্ত প্রাণীদের যদি অক্সিজেনের বেশী চাপে রাখা যায় তাহলে ভাইরাস আর বাড়তে পারে না। কতকগুলি ইঁদুরের ভেতরে ভাইরাসজনিত রোগ ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলোকে অক্সিজেনপূর্ণ ঘরের ভেতর রেখে দেওয়া হয়। দেখা গেল যে ইঁদুরগুলির আর রোগ বাড়তে তো পেলই না—ক্রমশ তাদের রোগ কমতে কমতে এক সময় তারা সম্পূর্ণভাবে ভাইরাস মুক্ত হয়ে গেল।

কাছের ছবি তোলবার জন্য 'স্টারট' এক ক্যামেরা
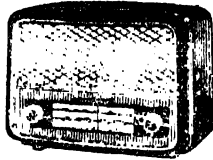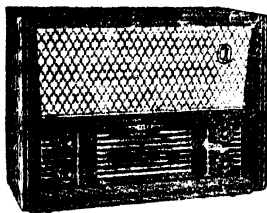
এই উৎসবের দিনগুলোয়—
সঙ্গীতে ও কৌতুকে আপনার গৃহ আনন্দমুখর
ক'রে তুলতে সুন্দর একটি
ন্যাশনাল একো রেডিও
ঘরে রাখুন
উৎসব-রঙীন দিনগুলি। এমন দিনে বাড়ীর সবাইকে একটি মনোরম অল-ওয়েভ ন্যাশনাল-একো রেডিও উপহার দিন যা তারা বহু বছর ধ'রে সানন্দে উপভোগ করবে! বাড়ীর প্রত্যেকে এতে প্রতিদিন গান ও প্রমোদ-অনুষ্ঠান শুনে খুশী হবেন; অথচ এর জন্যে খরচ খুবই কম। প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী দামের ভেতর সুন্দর সুন্দর অল-ওয়েভ ন্যাশনাল-একো রেডিও কিনতে পারেন। এসব সুদৃশ্য মডেলের ভেতর কোনটি পছন্দ এখনই দেখে নিন। আজই আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারের দোকানে আসুন।
HANDLE WITH CARE
মডেল ইউ-৭১৭ : ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড এসি বা ডিসি। বাদামী রঙের ব্যাকেলাইট কেবিনেট—২৫০৲ টাকা। ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০৲ টাকা।
মডেল বি-৭১৭ : ৪ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারী। বাদামী রঙের ব্যাকেলাইট কেবিনেট—২৫০৲ টাকা। ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০৲ টাকা।
মডেল-৭৩০ : ৬ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড, 'ম্যাগ্‌নি-ব্যাণ্ড টিউনিং'। মডেল এ-৭৩০ এসি; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি। ৪৯৫৲ টাকা।
মডেল-৭২২ : ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, মডেল এ-৭২২—শুধু এসি। মডেল ইউ-৭২২ এসি বা ডিসি। ৩৩৫৲ টাকা।
মডেল এ-৭৩১ : ৭ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড, এসি। শব্দগ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত উঁচু দরের। স্বরনিয়ন্ত্রিত আর, এফ, স্টেজযুক্ত। সমস্ত ন্যাশনাল-একো রেডিওর মধ্যে সেরা। ৬২৫৲ টাকা।
সবই নেট দাম—ট্যাক্স আলাদা
এক বছরের গ্যারান্টি।
ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা
—এগুলি 'মনসুনাইজড'
মডেল বি-৭২২ : ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারী। ৩৩৫৲ টাকা।
GRA
জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪। ফ্রেজার রোড, পাটনা। ১/১৮, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ। ৩৬/৭৯, সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর। জোগধিয়ান কলোনী, চাঁদনী চক, দিল্লী। রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ।
GRA 9567
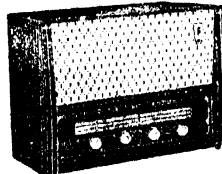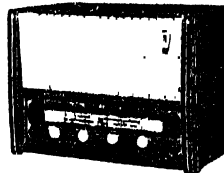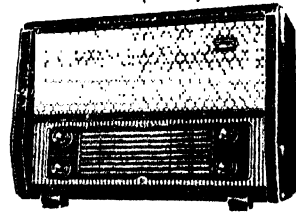
শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

॥ চৌত্রিশ ॥

তেত্রিশের ডাকে প্রমথবাবুর তিনখানি চিঠি দিয়েছি, তার একটা কারণ, তেত্রিশ এমন সংখ্যা যাকে ছেলেবেলা থেকেই বলে এসেছি 'তিন-এর পিঠে তিন।' কিন্তু যেহেতু এ-বর্ণনাতে দুবার তিন আছে, সেজন্য দ্বিতীয় কারণ দেখাতে হয়। দেখাচ্ছি। পত্র-ত্রয় ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণের পরিচায়ক। প্রথম পত্রে অনাবিল আনন্দ দ্বিতীয় পত্রে কমলালয়ে স্থিতিশীলতা, তৃতীয় পত্রে বাড়ি-গাড়ি নিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়ানো এবং সবুজ-সভা বন্ধ থাকার ক্ষোভ, যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণের দ্যোতক।

প্রথম পত্র রাঁচী থেকে লেখা। অক্টোবরের শেষাশেষি সেখানে নিশ্চয়ই তখন একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ওঁর মেজাজকে 'ফকিরী' থেকে 'আমিরী' করে তুলেছিল, কেননা হাওয়া বদলালে মেজাজও বদলে যায়। এর আটদিন আগেকার চিঠিতে উনি বলেছিলেন যে, ফকিরী মেজাজ আর আমিরী মেজাজ, এ-দুটি একই জিনিসের এ-পিঠ আর ওপিঠ। কাজেই যখন শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন তখন তাকে পিঠ ফেরাতেই হয়েছে। অল্প শীত জানান্ দেয় পিঠে। হাত ঠাণ্ডা হয়ে বলি, "শীত করে," কারণ কর মানে হাত। পা ঠাণ্ডা হলে ঐ-ভাবেই বলি, "শীত পায়।" যখন বলি, "শীত লাগে" তখন আসল বক্তব্য এই যে "শীত নাকে" এবং নাকে সর্দির প্রভাব থাকায় "নাকে'র স্থলে 'লাগে' উচ্চারিত হয়। কথাটা আমার নয় সুধীন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুহৃৎ সিংহের।

ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি সেকালের এক পণ্ডিত খুব নস্যি নিতেন। ফলে তার মুখ দিয়ে সানুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ বেরুত না। তাঁর সঙ্গে নস্য প্রতিযোগিতা চলত আর একটি পণ্ডিতের, যাঁর নাম ছিল নীলকমল। সেই নীলকমলের ব্যাখ্যানা করে এই প্রতিযোগী পণ্ডিতটি বলেছিলেন : লস্য ল্যায় লীলকবল। সে আবও বল্‌তে পারে লা, গঙ্গাও বলতে পারে লা। আবি আবও বল্‌তে পারি গঙ্গাও বল্‌তে পারি!

প্রমথ চৌধুরী বোধ হয় এ-জাতীয় নস্য-ভক্ত পণ্ডিতের সাহচর্য লাভ করেননি। নতুবা লিখছেন কেন, 'পণ্ডিত মহাশয়েরা যে নস্যের সাহায্যে নাসিকারন্ধ্র বিস্ফারিত করতেন তার উদ্দেশ্য ছিল সাধুভাষার নিষ্ক্রমণের পথ ফলাও করা'।

ফূর্তি করে লিখলে কত ভাল হতে পারে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রমথবাবুর ২৯।১০।১৯ তারিখের চিঠি। ওঁকে কে কেমন চিঠি লেখেন সে-বিষয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য জানানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। যে অমিয় চক্রবর্তীর কথা প্রথমেই বলেছেন, তিনি হচ্ছেন সবুজ-সভার পুরাতন সভ্য সোমনাথ মৈত্রের ভাগিনেয়। রবিবাবুর সেক্রেটারি হয়েও তিনি ছিলেন অনেকদিন। কবি হিসেবে এখন তাঁর বেশ খ্যাতি।

'সুধীন্দ্র সিংহের লেখবার হাত আছে, কিন্তু সে-হাত সে ছোট করেই রাখে।' প্রমথবাবুর এই মন্তব্যকে উপলক্ষ করে সুধীন্দ্রকে লেখা ওঁর একটি চিঠি দিচ্ছি।

৭

। সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা।

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

১।৭।১৮

কল্যাণীয়েষু,

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি এবং পড়ে মহা খুসি হয়েছি, তার একটি কারণ এই যে তুমি চিঠি লেখো ভাল। তোমার লেখার ভিতর স্টাইল আছে এবং সে স্টাইল তোমার নিজস্ব। আমি লেখার স্টাইল কাকে বলি জানো? যার ভিতর দিয়ে লেখকের প্রকৃতির আকৃতি ধরা পড়ে। কোমলকান্ত পদাবলী, চটকদার বাকচাতুরী দুই সমান স্টাইলহীন হতে পারে যদি তা opaque হয়। ভাল কথা opaque-এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? আমার বিশ্বাস তুমি ইচ্ছে করলেই বাংলালেখক হতে পারো এবং যত্ন করলে ভাল লেখক হতে পারো—যদি স্টাইলের আদর্শ বাইরে না খুঁজে নিজের অন্তরে খোঁজো। পরের গলা নিয়ে যেমন গান গাওয়া যায় না,—পরের কলম দিয়ে তেমনি লেখাও যায় না। আমাদের দেশে অনেকে গান শিখতে গিয়ে যে গলার মাথা খেয়ে বসে তার কারণ ওস্তাদজীর গলার আদর্শে তারা নিজের গলা তৈরী করতে যায়—যদিচ গুরু শিষ্যের

গলায় ভিতর আশমান জমিন ফারাক থাকতে পারে। আমাদের অনেক লেখকদের লেখারও যে গলোভাঙ্গা তার কারণ তারা হয় বঙ্কিম নয় রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। ভিক্টর হিউগোর একান্ত ভক্ত জনৈক ফরাসী লেখক এই বলে কলম ধরেন যে—"ভিক্টর হিউগোর লেখা অনুকরণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সে লেখা অনুকরণ না করা।"—এই সুবুদ্ধি তাঁর ছিল বলেই Vaquerie ফ্রান্সের একজন বড় লেখক হয়ে উঠেছিলেন। এ সব শুনে তুমি বলবে "সকলের বুদ্ধি ত সমান নয়, মনোজগতে সকলে নিজের জোরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না।" একথা আমি মানি। কিন্তু এ-কথাও সকলের মানা উচিত যে, পরের পায়ে ভর দিয়ে কেউ কখনো কোন জগতেই দাঁড়াতে পারে না। তা ছাড়া অধিকাংশ লোকের অন্তরে যে কতটা শক্তি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—তা অধিকাংশ লোকেই জানে না, আর অধিকাংশ লোকই পরস্পরকে তা জানতে দেয় না। সকলেই সকলকে দিবারাত্র বলে "তুমি ছোটো," "তুমি ছোটো" "তুমি ছোটো" এবং এই মন্ত্রের বলে কেউ কাউকে বড় হতে দেয় না। কেননা এ অবস্থায় কেউ যদি নিজেকে ক্ষুদ্র বলে স্বীকার করতে না রাজী হয়, তাহলে সকলে তার উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। সভ্য মানব প্রধানতঃ সামাজিক জীব সুতরাং অপর পাঁচজনের কাছে লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হবার ভয়ে নিজের শক্তিকে গুটিয়ে রাখে, ফুটিয়ে তুলতে পারে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বীরপুরুষ হওয়ার চাইতে ধীরপুরুষ হওয়া ঢের সহজ, এবং সেই সহজপন্থা আমরা সকলেই অবলম্বন করি।—এখন আমরা যদি পরস্পরকে "তুমি বড়ো" "তুমি বড়ো" "তুমি বড়ো" বলতে সুরু করি তাহলে আমার বিশ্বাস আমরা জাতকে জাত বড় হয়ে উঠব। এর থেকে অনুমান কোরো না যে আমি একটা মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন সোসাইটির সৃষ্টি করতে চাই। সে Society শুধু পরস্পরের ক্ষুদ্রত্বকেই admire করে। আমাদের সমাজ দিনের দিন যতই হীন হয়ে পড়ছে ততই তা একটা বিরাট মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন সোসাইটি হয়ে উঠছে।

প্রবন্ধ লিখে লিখে আমার এমনি একটা বদভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, পত্র লিখতে বসলে আমার হাতে তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে। এই দেখো না, তোমার চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার সূত্রে কত বড় একটা বক্তৃতা করে ফেললুম। —তবে সব সময়েই আমার হাত থেকে যে সারগর্ভ পত্র বেরোয় তা নয়। সেদিন হারিতকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম যা খাঁটি চিঠি আর যার ভিতর খবর ছাড়া আর কিছু ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে চিঠিখানি পথিমধ্যে মারা গেছে—ভুলক্রমে সেখানি কিরণশঙ্করের হস্তগত হয় এবং কিরণ সেখানি খুইয়ে বসে আছেন। কিরণ অবশ্য সে-চিঠির কাহিনীটির পুরো দাম দিতে পারেননি কেননা তিনি হারিতের চিঠি পড়েননি। "চাপাটী" যে কি তা না জানলে "উত্তরের" কৌশলটা বোঝা যায় না। সে যাই হোক সেদিন এখানে এসে গান শুনে খুসি হতে। গানের ভিতর প্রাণের প্রতিষ্ঠা আজকাল খুব কম গুণীই করতে পারেন। সন্ন্যাসীঠাকুরের গানের মহাগুণ এই যে তা প্রাণে ভরপুর। সেদিন এখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই এ-কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। ভালকথা; আমার এখানে সন্ন্যাসীর শুভাগমনের কথা শুনে তুমি আশ্চর্য হয়ে গেলে কেন? সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে যে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তার পরিচয় কি "ফরমায়েসী গল্পে" পাওনি? তাছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গেও আমার বিশেষ দহরম মহরম আছে। শুনে অবাক হবে যে "চারইয়ারী কথার" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-মহলে যে আদর আছে ইংরাজি-শিক্ষিত দলে সে আদর নেই। তার কারণ ত তুমিই বলে দিয়েছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী—'ছাত্র নিবহ নিধনে কলরতি করবানং'। আশা করি আগামী এম এস-সি যজ্ঞে বেশি ছাত্রকে বলিদান দেওয়া হবে না। শুনে সুখী হবে

মণ্টু বি এসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস পাশ হয়েছে। আশা করি, তুমিও ফার্স্ট ক্লাস পাবে। মার্তণ্ডদেব এখন মধ্যাহ্ন গগনে এসে উপস্থিত হয়েছেন অতএব এইখানেই ইতি দেই। স্নান আহার আপিস বলে তিনটে জিনিস আছে, যার দাবী সরস্বতীর চাইতে ঢের বেশি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

"কিরণশঙ্কর রায়ের চিঠিকে প্রমথবাবু টেলিগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উপমাটি আজকের দিনে উপভোগ্য মনে হয়, কারণ উত্তর-কালে কিরণ বাংলাদেশের হোম মিনিস্টার হয়েছিলেন এবং এ-জাতীয় মন্ত্রীর পক্ষে যতদূর সম্ভব মৌনী থাকাই বিধেয়, নইলে গোপনীয় কথা বেরিয়ে পড়তে পারে, আর তাহলেই সমূহ বিপদ। ১৯১৯ সালে আমরা কেউ কল্পনা করতে পারিনি যে কিরণ পুলিসের বড়-কর্তার উপরও কর্তৃত্ব পাবে। প্রমথবাবু তাই নির্ভয়ে আমায় লিখতে পেরেছিলেন যে তিনি হনুমান চরিত্র প্রভৃতি অকাল্ট সায়েন্সকে পুলিসের মতই ভয় করেন।

'সুরেশানন্দ লেখে শুধু কাজের কথা'— প্রমথবাবু এ-রিপোর্টকেও সুরেশানন্দের জীবিকা জীবনের উপর ভাষ্যরূপে গণ্য করা যায়। সুরেশানন্দ নিজে রিপোর্টারের কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে যে যা বলে তার সবটুকু টুকে নেওয়ার অভ্যাস রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এতে matter-of-fact মনোভাব হওয়া স্বাভাবিক।

"অতুলবাবু লেখেন ভালো, কিন্তু বছরে একআধবারের বেশি নয়"— প্রমথ চৌধুরীর এ-মন্তব্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ওঁর বিশেষত্ব দুটি—রসবোধ আর মনন-শীলতা। তিনি কোনো-কালেই আজ্ঞাধারী ছিলেন না। কাব্যজিজ্ঞাসায় তাঁকে সাহিত্য-রসের রসিকরূপে দেখি, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহের ভূমিকাতেও তাঁর বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় মেলে। আইনে তাঁর অতুল-পাণ্ডিত্য সকলেই জানেন।

বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোসের সম্বন্ধে প্রমথবাবুর অভিমান প্রকাশ পেয়েছে এই পত্রে। "সত্যেন্দ্র সাদা কাগজের উপর কালো আঁচড় কাটেন না বোধ হয় তার কারণ তিনি কালো বোর্ডের উপর খড়ির সাদা আঁচড় কাটাটাই তাঁর স্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন।"—সায়েন্স কিম্বা অংকশাস্ত্রে প্রোফেসারী করতে গেলে বেশি সাহিত্যিক লেখা লিখতে হয় না, সুতরাং সে লেখা-পড়ার কাজে তাঁর লেখার ভাগ কম ও পড়ার ভাগ বেশি ছিল। তবে প্রমথবাবু যেমন বাংলায় রোমান ল পড়িয়েছিলেন (১৩।১৮ তারিখের চিঠিতে সেকথা আছে)[1], তেমনি সত্যেন ন্যাশনাল প্রোফেসার হবার আগেও সায়েন্স কলেজে বাংলায় পড়ানো সুরু করেছিলেন। ঢাকা থেকে কোলকাতায় চলে আসবার পর খাঁটি বাংলায় লেকচার দিয়েছেন অনেক সভা-সমিতিতে এবং সকলেই বলেন তাঁর বক্তৃতায় অসাধারণ সৌন্দর্য। এর কারণ মন খোলা মানুষের মুখ খুললে অন্তরের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। সবুজপত্রে সত্যেনের কোনো রচনা রূপায়িত হয়নি বটে, কিন্তু তৎ প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বীরবলের প্রিয় আদর্শ আজ প্রিয়দর্শন রূপ নিয়ে বসে আছে। সেদিক থেকে বলা যায় যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান হচ্ছে সবুজপত্রের উত্তরাধিকারী এবং প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতি তর্পণ কার্যে সত্যেন বোসের পূর্ণ অধিকার। প্রমথবাবুই সত্যেনকে রবিবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং রবিবাবুর 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থটিতে সত্যেনের নাম সর্বাগ্রে আছে।

ধূর্জটির চিঠি-লেখা সম্বন্ধে প্রমথবাবুর কথা একটু আশ্চর্য ঠেকে। ধূর্জটির কথোপকথনে অনুপম ঔদার্য থাকার ফলে বোধ হয় পত্র-লেখায় কার্পণ্য এসেছিল। অতুলবাবু ধূর্জটির সঙ্গে কথা বলতে এত ভালবাসতেন যে, আমার উপরে তাঁর ঢালা হুকুম ছিল, ধূর্জটি আমাদের বাড়ি এলেই যেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে খবর দিই। নিতুনও। আড্ডা জমানোর কাজে ধূর্জটির সমকক্ষ আর কাউকে দেখিনি। প্রমথবাবু নিজে কথা কইতেন কম, লিখতেন বেশি। এ সম্বন্ধে উনি যে রবিবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করে-ছিলেন সে-কথা ওঁর পত্রে আমায় দুবার লিখেছেন।

পত্র লেখার ব্যাপারে প্রমথবাবু সবচাইতে তারিফ করেছেন সুনীতি চাটুয্যের ক্ষমতাকে। "সুনীতি দেশের মাটি থেকে সরে গিয়েই একজন পয়লা নম্বরের পত্র-লেখক হয়ে উঠেছে। তার লেখার হাত দিন দিন খুলে যাচ্ছে, আর সে যত বিলাতের দিকে এগুচ্ছে তার ভাষা তত বাংলা হয়ে উঠছে। তার শেষ চিঠির ভাষা প্রায় হরিদাসের গুপ্তকথার তুল্য হয়ে উঠেছে।"

কথাটা প্যারাডক্সের মতন শোনায় বটে, কেননা আমার ঠাকুরদাদা কোনোকালে বিলেতে যাননি। তবে এটা সত্যি যে তিনি গুপ্তকথা লেখবার আগে ও পরে বিলিতী নভেল ও হিস্টরি খুব পড়তেন এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইংরিজী নভেল না পড়লে এমন কি বঙ্কিমবাবুও বাংলায় নভেল লিখতে পারতেন না। ছোট গল্প লেখার কাজে রবিবাবু মোপাসাঁ প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকদের প্রভাব লাভ করেছিলেন কি-না তা ঠিক বলা যায় না; শুধু এইটুকুই স্মরণপথে আসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি বিশেষ

---

১ দেশ, ১৩ই কার্তিক, ১৩৬৬

স্নেহপাত্র ছিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছু কিছু মোপাসাঁর ছোটগল্প বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। আমাদের মহাভারত, কথা-সরিৎ-সাগর ইত্যাদি পড়লে ছোট গল্পের মস্ত খনি পেয়েছি বলেই মনে হয়। এগুলো সেকেলে হলেও অনেক চিরকেলে কথা সেখানে মেলে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ প্রমথ চৌধুরীর খুব ছিল। তথাপি তিনি এই পত্রে সংস্কৃত ভাষার সানুনাসিকত্ব নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন, কেবল মজা করার উদ্দেশ্যে। আমাদের অতীতকে 'ভূত' বলা চলে এবং নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত-স্থল ভারতবর্ষ। 'ভূত' শব্দ দ্ব্যর্থ-বোধক হওয়ায় প্রামথিক রীতি অনুসারে অতীত-রূপ ভূতকে বর্তমান-রূপ মানুষের ঘাড়ে চাপানো যায়। কিন্তু 'লজিকের ছাঁদন দড়ি ছিঁড়লো'-ই তবে সংস্কৃত ভাষাকে বর্জনীয় বলা যেতে পারে। সে-দড়ি যে উনি ছিঁড়েছেন, এ-স্বীকৃতি ঐ পত্রেই আছে। "সুনীতি চাটুয্যে লিখছে ভাল" এইটাই ছিল ও'র আসল বক্তব্য এবং সে-বক্তব্যকে রসাল করবার জন্যেই উনি ভূতকে নামিয়েছেন।

প্রসংগতঃ একটু ভূত-পেত্নীর কথা বলে নিতে পারি বোধহয়। অনেককেই প্রশ্ন করেছি, সদুত্তর পাইনি। পেত্নী আর শাঁখ-চুন্নীর মধ্যে ভাষার তফাৎ কি? কেউ কেউ বলে, শাঁখ-চুন্নীরা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ করে না। প্রাকৃত ভাষার যতগুলি উদাহরণ আলোচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেই ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ-বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। হালের সপ্তশতীতে যখন পড়ি : "অমিঅং পাউঅকব্বম্" তখন আমাদের বুঝে নিতে হয়, ওটির সংস্কৃত রূপ হচ্ছে : "অমৃতং প্রাকৃতকাব্যম্।"

আবার পৈশাচী প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, বর্গের তৃতীয় বর্ণের স্থানে প্রথম বর্ণের ব্যবহার—যথা 'জ'-এর বদলে 'চ'। বৃহৎকথা নাকি গোড়ায় পৈশাচীতে রচিত হয়েছিল এবং দুজন কাশ্মীরী পণ্ডিত (ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব) সেটিকে সংস্কৃত রূপ দেন। এই রূপ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কবিকল্পনাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। যদিও ক্ষেমেন্দ্রের ক্ষেত্রে মূলানুসরণ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতরা ততটা সন্দিহান নন। কিন্তু মূল পৈশাচী-রূপ এখনও আমাদের অবিদিত। বৈয়াকরণ-দের মারফতে প্রাপ্ত পৈশাচী প্রাকৃতের রূপ দেখে একথা বলা যায় না যে, ও-ভাষা বিশেষ সানুনাসিক।

সবচেয়ে সানুনাসিক ভাষা, যেটা আমাদের হাতের গোড়ায় পাই সেটা হচ্ছে চীনা। আবার, চীনদেশের প্রাচীন বিশ্বাস যেটা অর্বাচীনদের মধ্যেও আছে সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ মরে ভূত তো হয়ই উপরন্তু সে-ভূতের ক্ষুৎপিপাসা মরে না। পূর্বে বলেছি, আমাদের শ্রাদ্ধ ব্যাপারটা সম্ভবতঃ চীনাদের পূর্বপুরুষ-পূজার দ্বারা প্রভাবিত। চীনে ভূতরা পরলোকে গিয়ে স্বকীয় ভাষার প্রয়োগ করলেও সে-ভাষায় সানুনাসিকতা থেকে যাওয়া সমীচীন। হতে পারে যে, চীনে-ভূতের গল্প শুনেই আমরা ঠিক করে নিয়েছি ভারতীয় ভূত-ভাষাও অনুরূপ সানুনাসিক!

ভূত-পেত্নীর পর্যায়ভুক্ত উচ্চ শ্রেণীর যে আত্মাকে আমরা মরণোত্তর রূপ দিয়েছি, যার নাম "ব্রহ্মদৈত্য"। অনেকে বলেন, ব্রাহ্মণ মরলে ব্রহ্মদৈত্য হন। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, ব্রহ্মদেশের মানুষ মৃত্যুর পর ব্রহ্ম-দৈত্য-রূপ ধারণ করে, এই ধারণা থেকেই ঐ নাম উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে একজন ফরাসী ভদ্রলোক আমায় একবার বলেন যে, ব্রহ্মদেশের সব ভূতই গাছে থাকে, একথা তাঁর পিসিমার মুখে তিনি শুনেছেন, এবং তাঁর পিসিমা ৩০।৪০ বৎসর ব্রহ্মদেশে ছিলেন। আমাদের ব্রহ্মদৈত্যদের বাসস্থানও বৃক্ষে। ব্রহ্মদেশের সাধারণ পাদুকা কাষ্ঠ-নির্মিত এবং আমাদের ব্রহ্মদৈত্যরা খড়ম পরেই ঘুরে বেড়ান। কেবল এই দুটো মিলের উপর নির্ভর করে নির্ঘাত বলা যায় না যে, ব্রহ্মদেশের ভূতই আমাদের। ব্রহ্মদৈত্য। ব্রহ্মদেশীয় ভূতের কাহিনীর সঙ্গে এতদ্দেশীয় ব্রহ্ম দৈত্যের কাহিনী মিলিয়ে দেখা উচিত, কতটা সাদৃশ্য আছে। মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি। বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলোর সঙ্গে ঈসপ্‌স্ ফেবল্‌স্ মিলিয়ে দেখার ফলে বোঝা গেছে যে একটা থেকে আর একটা নেওয়া হয়েছিল।

বিস্ময়ের বিষয়, প্রমথ চৌধুরীর এই চিঠি পাবার অল্পদিন পরেই অনাথকাকা মারা যান। এ সংবাদ পেয়ে প্রমথবাবু আমায় চিঠি লেখেন। তারপর কয়েকদিন বোলপুরে কাটিয়ে বালিগঞ্জে ফিরে আসেন, এবং কমলালয়ে আবার সবুজ-দলের বৈঠকে আমায় আহ্বান করেন। কিন্তু যেতে আমার মন সরল না। যে বাড়িতে গিয়ে প্রমথবাবুর প্রথম প্রশ্ন শুনি : "অনাথ কেমন আছে?" সে বাড়িতে সবুজ-সভার শেষ অধিবেশনে যোগদান করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবারই কথা। অনাথকাকার মতনই সবুজ-সভার জীবনান্ত হয়ে গেল—কমলালয়ে। সে বাড়ি ছাড়বার আগে উনি আমায় পাঁচখানি চিঠি লিখেছিলেন। হয়তো বা সে-সংখ্যা সকলকেই

স্মরণ করিয়ে দেবে পঞ্চভূত লীন হবার অবশ্যম্ভাবিতা……

৯০

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২।২।২০

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে "অনাথে"র আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। এরকম এক একটা খবর যখন শুনি তখনই মনে হয় যে অতীতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র যেন ছিঁড়ে গেল। আমার মেলামেশা সবই যুবকদের সঙ্গে কেননা আমার সমবয়স্ক লোকদের মনের সঙ্গে আমার মনের তেমন খাপ খায় না—দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত সাংসারিক হয়ে পড়েছেন আর যে সংসার তাঁদের মনকে অধিকার করে বসেছে তা জগৎ-সংসার নয়—একটি অতি ক্ষুদ্র সংসার যাকে আমরা পরিবার বলে থাকি। কাজেই যারা সংসারে আজও লিপ্ত হয়ে পড়েনি, তাদের সঙ্গই আমার কাছে প্রেয় হয়ে উঠেছে। তবুও একথা আমি ভুলতে পারিনে—যে এ-জীবনে ভবিষ্যতের চাইতে অতীতের জেরটাই আমার বেশি। আমি আজও অনেক নূতন আশা মনে পোষণ করি—কিন্তু সে সব ব্যক্তিগত নয় জাতিগত অর্থাৎ যে নবযুগের চেহারা আজকের দিনে আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠেছে—সে দেশের নবযুগ। আমি নিজে অনেক সময় স্মৃতি নিয়েই থাকি।

আমি আমার সাহিত্য জীবনের পূর্ব-ইতিহাস লিখব মনে করেছি—সেই লেখার অনেকটা স্থান 'অনাথ' অধিকার করবে। আমি একটু স্থির হয়ে বসতে পারলেই সে লেখায় হাত দেব। আমি আজকাল এমন কোনও কাজকর্মে ব্যস্ত নই যে লেখা নিয়ে বসতে পারিনে। কিন্তু এই বাড়িবদল অবধি আমার মনটা একটু উতলা হয়ে আছে—উতলা কথাটা বোধহয় ঠিক হল না—বাঙলায় যাকে বলে উড়ু-উড়ু—আমার মনের অবস্থা এখন তাই। চিত্তটা অব্যবস্থিত হয়ে পড়েছে বলে সবুজপত্র সবুজদল দুয়ের কোনটির প্রতিই যথোচিত মনো-নিবেশ করতে পারছিনে। সরস্বতীর ভাসান সেই কারণে এবার বিনা উৎসবে হয়ে গেল।

আমি আসছে শুক্রবারে বোলপুর যাব ও দু'তিন দিন কলকাতা থেকে অনুপস্থিত থাকব। সুতরাং এ শনিবার সবুজসভা আমার এখানে বসবে না। আসছে হপ্তায় সবলকে ডেকে আনব। সত্যেন্দ্রর বহুকাল সাক্ষাৎ পাইনি। আশা করি সে আবার অসুখে পড়েনি।

আজ এইখানেই শেষ করি—কলম আর সরছে না। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৯১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১২।২।২০

কল্যাণীয়েষু,

উপরের ঠিকানাই প্রমাণ যে আমি বোল-পুর থেকে ঘরে এসেছি।

আসছে শনিবার বিকেলে তোমরা যদি এখানে এসে আসর জমাও ত খুশি হই। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৯২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৭।৪।২০
শনিবার

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ পাইনি। তাই কাল বিকেলে তুমি যদি এ-পাড়ায় এসো ত খুসি হই—

আমি একটা লেখা লিখছি, ছাপাখানায় পাঠাবার আগে সেটি তোমাদের পড়ে শোনাতে চাই। বীরবল বে-সামাল হলে কতদূর ভাঁড়ামি করতে পারে তার পরিচয় ঐ লেখার মধ্যেই পাবে। আজ শনিবার হলেও বাড়ি থাকব না কেননা একটা মিটিংয়ে যেতে হবে বক্তৃতা করতে। আস্তে আস্তে পলিটিক্সের আসরে যে নামছি—তার পরিচয় বোধহয় সবুজপত্রেই পেয়েছ।—

আসছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ছটায় থিয়জফিকাল হলে একটি প্রবন্ধ পড়বো। বিষয় থিয়জফি নয়—পলিটিক্স্। আগে থাকতে নোটিস দিয়ে রাখছি—সে মিটিংয়ে তোমাদের উপস্থিত থাকা চাইই চাই।

আজ এই তক্।—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৯৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৪।৫।২০

কল্যাণীয়েষু,

আসছে শনিবার আটই মে এ-বাড়িতে সবুজসভার শেষ অধিবেশন হবে। কেননা ১৫ই মে আমাকে এ-বাড়ি ত্যাগ করতে হবে

এবারকার সভার সভাপতি হবেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তারপরের দিনই বিলেত রওনা হবেন। আশা করি তুমি ও সুধীন্দ্র যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হয়ে সভার শোভাবৃদ্ধি করবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৯৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৪।৫।২০
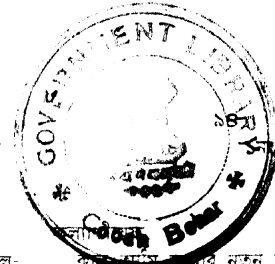
কল্যাণীয়েষু,

[illegible] নতুন আস্তানায় উঠে যাচ্ছি। পরশু থেকে আমার ঠিকানা হচ্ছে 7।1 Sunny Park Ballygunge বাড়িটে দাদার বাড়ি পেরিয়েই পাবে। যদি রবিবার বিকেলে একবার দেখা দেওত খুসি হই। যদি এসোত সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসো। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

একটি সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে পড়িলাম—চিনির দর হঠাৎ চড়িতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু কেন যে চড়িতেছে তার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না। —"সঙ্গত কারণ আছে বৈ কি। চীনাদের আসি-আসি ভাব দেখেই চিনি নিজের মূল্য বুঝে ফেলেছে। সস্তায় আর হিন্দি-চিনি চলবে না"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

কলিকাতার শীতে সার্কাসের খেলা প্রসঙ্গে সংবাদদাতা লিখিতেছেন—শ্বশুরে যদি কোন কারবারের মালিক হন তাহা হইলে পেটে বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও জামাই ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হতে পারেন। কিন্তু বিনা এলেমে ট্রাপিজের খেলা দেখাইবেন সে জারিজুরি সার্কাসে চলে না। —"কিন্তু সংবাদদাতা ভুল করছেন। সার্কাসটা তো শুধু ট্রাপিজের খেলা নিয়েই সম্পূর্ণ নয়। গাধা-ছাগলের খেলাও তো আছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

এই সার্কাসের প্রসঙ্গেই বিশুখুড়ো একটি গল্প শুনাইলেনঃ এক ধোপার গাধা এক সার্কাসের গাধাকে বলল—

"দেখ, তুই গাধা, আমিও গাধা। কিন্তু কাজের পর আমার স্বাধীনতা আছে। খোলা মাঠে চরে বেড়াই, মনের আনন্দে গান গাই। তোর সে-সব কিছুই নেই।" সার্কাসের গাধা বলল—তা সত্যি বলেছিস ভাই। কিন্তু আমি যে ভবিষ্যতের আশায় বসে আছি। সার্কাস-মালিকের মেয়ে তারের ওপর দিয়ে হাঁটার খেলাটা কিছুতেই রপ্ত করতে পারছে না। মালিক একদিন রেগেমেগে বললেন—"আর এক মাসের মধ্যে যদি এই খেলা সড়গড় না হয়, তা হলে আমি তোকে গাধার সঙ্গে বিয়ে দেবো"—সার্কাসের গাধা হেসে বলল—ঐ আমার একমাত্র আশা ভাই।" খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—ডাইরেক্টার না হলেও জামাই হওয়া যায়।

* * *

"**দণ্ডকারণ্য** রহস্য"—একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"রহস্যের এতে কিছু নেই। আমরা বহুদিন আগেই ট্রামে-বাসে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলাম—দণ্ডকারণ্য কাণ্ডের পরই লঙ্কাকাণ্ড!!"

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভা নাকি সম্প্রতি এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কলিকাতায় একটি খেলাধুলার স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হইবে। —"স্টেডিয়ামটা কোলকাতা ফুটবল মরসুমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু এ যে দেখছি—পূর্ণ শশী ঐ যে দিল হানি, হেমন্তে কোন্ বসন্তের বাণী"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

সাতাশ কোটি বছরের আগেকার মাছ কী করিয়া জল হইতে ডাঙায় উঠিয়া আসিল তারই একটি বিচিত্র সংবাদ পাঠ করতেছিলাম। —"আর সাতাশ কোটি বছরের পরের মাছ জল থেকে কী করে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল সে-ও এক বিচিত্র রহস্য"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম উজবেকিস্তানে বালির ওপর ফসল ফলানোর চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"আর উজবুগ স্থানের খবর অন্যরকম। এখানে ফলন্ত ফসলের সঙ্গে বালি মেশাবার চেষ্টা!!"

* * *

গোপাষ্টমী সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া সম্পাদক সখেদে বলিয়াছেন যে, গো-সম্পদ বাংলা নাই বলিলেই চলে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"যে-সম্পদ আছে তা দিয়ে তিন বৈতরণীর কাজ চলে যাবে। আমরা ঐহিকের চেয়ে পারত্রিকে বিশ্বাসী, সুতরাং খেদ নেই, কোন খেদ নেই"।

* * *

বিলাতে "শকট গৃহ" নির্মাণ করা হইতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। গৃহ থাকিবে শকটের উপর সুতরাং এটিকে যখন যেখানে খুশি সেখানে লইয়া যাওয়া চলিবে। —"আমাদের দেশে গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। তাই ভাবছি, শকটগৃহ যদি চালু-ই হয় তাহলে ওনরা কি শকট-গিন্নি হতে রাজী হবেন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

বিলাতে একটি বিড়াল পথের দুর্ঘটনায় পতিত হয়। সংবাদে শুনিলাম সেই বিড়ালটিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া যত্ন-

সহকারে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হয়। বিড়ালটি এখন সুস্থ আছে। —"বিলেত দেশটা সোনা-রূপোর না হতে পারে, কিন্তু সেখানের ভাগ্যে এমন শিকে ছিঁড়ত আর কোথাও ছোটে না"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

সিঙ্গাপুরের পিপল্‌স অ্যাকশান পার্টির মহিলা শাখা সরকারের নিকট দাবি জানাইয়াছেন যে কোন মহিলা পরের স্বামীকে ফুসলাইতে পারিবে না।

বিশুখুড়ো বলিলেন—"নিজের স্বামীকে ফুসলানো আরো ভয়ংকর, আরো মারাত্মক। সুতরাং মহিলা শাখা এদিকেও একটু নজর রাখবেন!"

প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে একটি করে পুরুষ বাস করে। প্রত্যেক পুরুষ নিজের বামঅঙ্গে নারী, প্রত্যেক মেয়ে নিজের দক্ষিণ অঙ্গে পুরুষ। একজনের বামের সঙ্গে আর একজনের দক্ষিণ যখন মিলে যায় সেই মিলই হয় পুরোপুরি মিল।

এসপ্লানেডে এসে বাস দাঁড়িয়েছে। এবার আর ছায়া ছায়া নয়, উজ্জ্বল আলো ঝলমল বৈদ্যুতিক শহর। জীবন্ত প্রাণচঞ্চল। মোটর গাড়িগুলি দুর্বার প্রাণস্রোতের মতই ছুটে চলেছে। মানসী একবার তাকিয়ে দেখল। জালদিবের ওই রেস্টুরেন্টটা অসীমের খুব প্রিয় ছিল। এদিকে এসেই একবার এখানে তার চা খাওয়া চাই। মানসীর প্রথম প্রথম ভালো লাগত না। রেস্টুরেন্টের গন্ধই অসহ্য মনে হত। চা আর চপ কাটলেট তো দূরের কথা। বাবার শাসনে থেকে থেকে অনেকদিন পর্যন্ত বাইরের খাবার খায়নি মানসী। বাবা শুধু নীতির নয়, স্বাস্থ্য-নীতির দোহাই দিতেন। 'জানিস যত সব বাজে মাংস, সস্তা মাংস বাজার থেকে ওরা কেনে। তাই দিয়ে তৈরি হয় বাবুদের সাধের চপ কাটলেট কোর্মা কারি। খেয়ে একবার পয়সা দাও রেস্টুরেন্টের মালিককে আর একবার পয়সা দাও ডাক্তারকে কম্পাউ-ন্ডারকে। ওসব জায়গায় খাওয়া মানেই নিজের স্টমাকটিকে খাওয়া।' মানসীরা বলেছে, 'কিন্তু বাবা, অনেকেই তো খান।' বাবা বলেছেন, 'খাবে না কেন। মুরগির ঠ্যাংএর সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যটিকেও তারা মনের সুখে চিবোন। তারপর মজা বোঝে শেষ বয়সে। এই শেষ বয়সের কথা ভেবেই প্রথম বয়স থেকে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। আচার বিচার নীতি নিয়ম সংযম সব এই জন্যে। পরকাল মানে মৃত্যুর পরবর্তী কাল নয় মৃত্যুর ঠিক পূর্ববর্তী কাল। Later life, সেই life এর কথা ডেলি লাইফে আমাদের মনে থাকে না। মনে থাকে না যৌবনের অহংকার যখন থাকবে না, ক্ষমতা যাবে, আধিপত্য যাবে তখনও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু মানুষ সে কথা মনে রাখে না, যাঁরা মনে রাখেন যাঁরা নিজের জীবনের আদি মধ্য অন্ত দেখতে পান তাঁরাই ত্রিকালদর্শী।'

সামান্য রেস্টুরেন্টে খাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে তো একেবারে ত্রিকালদর্শনে চলে যেতেন। মানসী হাসি চেপে বলত, 'কিন্তু বাবা যত সাবধানেই মানুষ থাকুক, যত হিসেব করে পা টিপে টিপেই চলুক বুড়ো তো তাকে হতেই হয়। অকালে মরে না গেলে কেউকি আর জরার হাত এড়াতে পারে?'

বাবা বলেছিলেন 'তা পারে না, কিন্তু জরার দুঃখ-দুর্ভোগ অনেক কমানো যায়। ডাক্তাররাও তাই বলেন। যারা প্রথম বয়সে যা ইচ্ছে তাই করে যা খুশি তাই খায় অনিয়ম অত্যাচারের সীমা রাখে না, শেষ বয়সে প্রকৃতি তাদের ওপর শোধ নেয়। শোধ মানে কি যে-সে শোধ? যাকে বলে চক্রবৃদ্ধি হারে, একেবারে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সুদে গুণে নেয়। যাদের ঋণ যত কম, তাদের দুঃখ তত কম। যদি দেহের চরম দুঃখ কমাতে চাও দেহের আপাত সুখ চেয়ো না। সব এই দেহতত্ত্ব। সব এই দেহের জন্যে। গাঁয়ের বৈরাগী বাউল যখন ভিক্ষে করতে আসত আমার বিধবা পিসীমা বলতেন বাবা, একখানা দেহতত্ত্বের গান শোনাও। তখন অবাক হয়ে যেতাম। পিসীমা মনের কথা না শুনে দেহের কথা শুনতে চাইছেন কেন। তখন বুঝতে পারতাম না, এখন পারি। দেহ-তত্ত্বই বড় তত্ত্ব। এই দেহদুর্গই বড় দুর্গ।

কোন প্বারের কোন প্বারী কখন যে শত্রুর কাছে দরজা খুলে দেয় তার ঠিক নেই। যেই খুলে দিলে অমনি পিল-পিল করে শত্রুসেনা ঢুকল। শাস্ত্রকাররা বলেন পাপ, ডাক্তাররা বলেন বীজাণু। কথা একই।'

বাবা নিজের মনে বিড়বিড় করতেন। মানসী এক ফাঁকে উঠে পালিয়ে আসত।

এই দেহতত্ত্বের কথাই আর এক সুরে আর এক ঝংকারে আর একজনের মুখ থেকে শুনেছিল মানসী। সে রেস্টুরেণ্টে এসে মাংসের চপ কাটলেট খেয়ে আর খাইয়ে স্বাস্থ্যনীতি ভাঙত, শুধু কি স্বাস্থ্যনীতি? কোন নীতি আর নিষেধ বাক্যের ওপরই বা তার আস্থা ছিল?

প্রথম প্রথম মানসীর ভালো লাগত না। কেমন যেন এক ধরনের ভয় আর অস্বস্তি মনের মধ্যে লেগে থাকত। পর্দা ঢাকা ছোট ছোট খুপরি। ঘরের মধ্যে ঘর। এখন একান্তে একজনের মুখোমুখি বসে থাকতে, বসে বসে খেতে লজ্জাও করত।

প্রথম দিন মানসী বলেছিল, 'আমি কিচ্ছু খাব না। তুমি খাও।'

অসীম বলেছিল, 'তাই কি হয়? একজন খাবে আর একজন খাবে না, এখানে সে নিয়ম নেই।'

মানসী বলেছিল, 'তুমি নাকি কোন নিয়মই মানো না, তবে যে নিয়মের কথা বলছ। আমার ওসব খাওয়ার অভ্যাস নেই। খেতে ভালোও লাগে না। বাবা বলেন ওসব খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়।'

অসীম জবাব দিয়েছিল—'আমাদের বয়স হলে ওসব কথা আমরাও বলব। ওঁরা বয়সে কী খেয়েছিলেন না খেয়েছিলেন, কী করেছিলেন না করেছিলেন খানিকটা ইচ্ছার জন্য, খানিকটা অনিচ্ছার জন্য। তোমার বাবার যা বয়স তাতে ওইসব কথাই ওঁর মুখে মানায়।'

মানসী বলেছিল, 'কিন্তু এমন অনেক কথা আছে যা সব বয়স, সব সময়ের পক্ষে সত্য।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'তুমি তোমাদের কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের মেম্বার ছিলে নাকি? সত্যকে মানুষ বার বার লংঘন করে একপাটিও অসত্য নয়। কিন্তু আমরা চা খেতে এসে যেসব আলোচনা করছি একটা কাটলেটের চেয়ে তা অনেক বেশি দুষ্পাচ্য। নাও খেতে শুরু করো।'

খাবারের প্লেটটা তার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল অসীম।

মানসী তবু আপত্তি করেছিল, 'ধরো, আমার যদি ভালো না লাগে, তবু খেতে হবে?'

অসীম তার জেদ ছাড়েনি, হেসে বলেছিল, 'খেতে হবে বইকি। প্রথমে আমার ভালো লাগার জন্যে খাবে তারপর তোমার নিজের নতুন ভালো লাগাও আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে। আসলে সবই তো অভ্যাস। আমরা সবাই এক অভ্যাস ছেড়ে আর এক অভ্যাস ধরি। এই প্রথা বর্জনের কাজ সারাজীবন ধরে চলে। বিশেষ করে তোমাদের মেয়েদের তো কথাই নেই। গোত্রান্তরিত হওয়ার পর তোমাদের কত অভ্যাস যে বদলাতে হয় তার কি কিছু ঠিক আছে।'

মানসী হেসে বলেছিল, 'ওই তো তোমাদের সুবিধে। তোমরা আমাদের বদলাতে বাধ্য কর তারপর বল আমরা ইচ্ছে করে বদলেছি, বদলে গিয়ে খুশি হয়েছি।'

কিন্তু যত তর্কই করুক, রেস্টুরেণ্টে খাওয়ার অভ্যাসই আস্তে আস্তে মানসীর আয়ত্তে এল। এখানকার বিশেষ এক ধরনের গন্ধভরা হাওয়া, এখানকার পরিবেশ তার আর অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল না। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট ছোট খোপের সংকীর্ণতা সহনীয় হয়ে গেল। কী খাচ্ছে, কোথায় বসে খাচ্ছে তা তুচ্ছ উপলক্ষমাত্র, লক্ষ্য একান্ত সান্নিধ্য সাহচর্য। একজনের সামনে বসে থাকতে পারার, একজনের সঙ্গে বসে থাকতে পারার, তার সঙ্গে সঙ্গে বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানোয় যে এত আনন্দ

আছে তা কে জানত? এরই নাম কি মত্ততা? ভালোবাসার মধ্যে কি কোন মাদকদ্রব্য আছে, যাতে মানুষকে এমন আবিষ্ট আচ্ছন্ন করে রাখে?

একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর বসে অসীমকেই একথা জিজ্ঞাসা করেছিল মানসী, 'আচ্ছা কেন একজনকে আর একজনের এমন ভালো লাগে বলতো?'

অসীম বলেছিল, 'কেন ভালো লাগে তার নানা ব্যাখ্যা আছে। কতজনে কত কথা বলেন, কেউ বলেন, প্রকৃতির জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এর মূলে। ভালো লাগাটা তার উপায়।'

মানসী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'যাও, কী যে বল।'

অসীম বলেছিল, 'আমি তো আমার কথা বলিনি। অন্যের কথা কোট করেছিলাম। তোমাকে ভালোবাসি আমার কাছে এই সত্যটুকুই যথেষ্ট। মানসী বলেছিল, 'কিন্তু কেন বাসো? আমার মধ্যে তুমি কী দেখতে পেয়েছ? আমি তো তোমার মত সুন্দর নই যে, চেয়ে চেয়ে দেখা যায়, চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।'

নিজের হাতের লেখা নিয়ে কোনদিন বিনয় করে না মানসী, নিজের রূপের দৈন্য নিয়েও নয়। সে ক্ষোভ নিজের মনের মধ্যেই সে পুষে রাখে। সেদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল। তাতে মানসী লজ্জিত হয়নি।

অসীম একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'তোমার মধ্যে আমি কী দেখেছি এ কথার জবাবে আমি তোমার গুণের এক দীর্ঘ তালিকা দিতে পারি। নিশ্চয়ই তার সবগুলি না হোক কোন কোন গুণ আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এখন তার তালিকা দিতেও আমার ইচ্ছা করে না, কোন একটি গুণকে আলাদা করে তুলে ধরতেও আমার দারুণ অনিচ্ছা।'

মানসী নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'গুণের কথা থাক, আমার এমন কোন্ গুণ আছে—।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'তাহলে রূপের কথা বলি?'

মানসী বলেছিল, 'তুমি এবার ঠাট্টা শুরু করে দিলে। আমার রূপ তো একেবারেই নেই।'

অসীম জোর দিয়ে বলেছিল, 'ওকথা যে বলে, সে মিথ্যে কথা বলে। আমি বলি আছে আছে আছে। একটু আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি তোমার মধ্যে কী দেখেছি, এবার অসংকোচে বলি আমি তোমার মধ্যে রূপ দেখেছি। সুরূপ নয়, কুরূপ নয়, শুধু রূপ। এই যে তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, আমার পাশে এসে বসেছ, আমাকে একান্তভাবে ভালো বেসেছ একটি রূপের মধ্যে তা সব ভরে রয়েছে, একটি বিশেষ রূপের সঙ্গে তা জড়িয়ে রয়েছে, সেই রূপ তোমার এই দেহরূপ। তোমার এই বিশেষ আকার ছাড়া ওই সব দুর্লভ গুণের আমি কল্পনা করতে পারিনে, কল্পনা যদি না করতে পারি তাকে ছুঁতে পারিনে। ধরতে পারিনে। কিন্তু তোমার দেহের মাধ্যমে সব পারি। তোমার দেহ আমার কাছে তাই বিশ্ব রূপের আধার। একই সঙ্গে আধার আর আধেয়, ফরম আর কনটেন্ট।'

আধো অন্ধকারে জলের ধারে বসে সেই অবিরাম দেহবন্দনা শুনতে শুনতে সেদিন মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মানসী। জলস্রোত আর বাণীস্রোত একই কল কল ধারায় বয়ে চলেছিল। তখনকার মত মনে হয়েছিল এই দেহের আস্বাদের মধ্যেই

জীবনের সব স্বাদ, সব পরিতৃপ্তি, সব চরিতার্থতা ধরা রয়েছে। শুধু একান্ত সান্নিধ্য-সুখ ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কিছু নেই, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আজ নদীর স্রোত সেই ধারায় বয়ে চলেছে, তার কলস্রোত বন্ধ হয় নি, কিন্তু একজনের বাক্যস্রোত হয়তো আর একজনের দেহদ্বীপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানসীর বুকের ভিতরটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল। কে জানে ওরা এখন কোথায়, কোন্ অবস্থায় রয়েছে। অভিমান করে নিজেকে সরিয়ে এনে বিনাযুদ্ধে পরাজয় মেনে মানসী তো ওদের পরম সুযোগ করে দিয়েছে। তার পুরো ব্যবহার না করে কি ওরা ছাড়বে!

শ্যামবাজারে এসে বাস বদল করবার সময় নন্দুর বন্ধু অমলকে দেখে ফের ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ল মানসীর। ওরা বোধ হয় এখনো কিছু জানে না। বেচারা নন্দু, পরীক্ষা দেওয়ার পর আর ভয়ের অন্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই ফলল। বেচারা বড় দুঃখ পাবে। অবশ্য নিজের ভুলের জন্যেই কষ্ট। কিন্তু মানুষ তো আর সেকথা মনে রাখে না। নিজের ভুল না পরের ভুল সে হিসাব দুঃখের বেদনার মধ্যে তলিয়ে যায়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় কোনদিন ফেল করে নি মানসী; কিন্তু করলেও করতে পারত। পরীক্ষা দেওয়ার পর নন্দুর মত সে-ও আশঙ্কা আর উদ্বেগ নিয়ে দিন গুণত, দুদিন আগে রেজাল্ট জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে হলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছে; কিন্তু কিছু লিখতে পারছে না, কি অনেক প্রশ্নের জবাব বাকি আছে, কিন্তু সময় আর নেই। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর নন্দুকে শাসন-টাসন করে কিছু লাভ নেই। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে হবে, 'সামনের বছরের জন্যে তুই তৈরি হতে থাক নন্দু। নিশ্চয়ই ভাল রেজাল্ট করে বেরোবি। কী এমন হয়েছে। বয়স তো আর বেশি হয়ে যায় নি। দেখ গিয়ে তোর মত কত ছেলে এখনো স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারে নি। সেই তুলনায় তুই তো—।'

ঘরের সামনে এসে কড়া নাড়তে হল না মানসীর। দোর আধখানা খোলা। তার ফাঁক দিয়ে বাবার চড়া গলা শুনতে পেল মানসী। 'বেরিয়ে গেছে যাক। যেন আর বাড়িতে না ফেরে। আমি অমন কুলাঙ্গার ছেলের মুখদর্শন করতে চাইনে।'

মানসী ঘরে ঢুকে দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিল। তারপর বাবার দিকে চেয়ে শান্তভাবে বলল, 'অমন চেঁচামেচি করছ কেন বাবা? হয়েছে কী!'

মনোমোহন দুখানা হাত নাচিয়ে বললেন, 'হবে আবার কী। তোমার গুণধর ভাই ফেল করেছেন।'

মানসী বলল, 'তা তো শুনলাম। কিন্তু এখন এই নিয়ে চেঁচামেচি করে কী আর হবে বল। হতভাগাটা গেল কোথায়?'

সুহাসিনী একটু দূরে বিষণ্নমুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে। সেই দুপুরের পর থেকে ছেলের আর দেখা নেই। নাইল না, খেল না। তারপর উনি আবার মারধোরও করলেন।'

মানসী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি আবার ওকে মারতে গেলে কেন বাবা। অত বড় ছেলের গায়ে তুমি যখন-তখন হাত তুলবে নাকি?'

মনোমোহন বললেন, 'বেশ মজা পেয়েছিস যা হোক। মেয়ে বড় হয়েছে তার গায়ে হাত তুলতে পারব না, ছেলে বড় হয়েছে তার গায়ে হাত তুলতে পারব না। স্ত্রী চিররোগা অবলা, তার গায়ে হাত তুলতে পারব না। হাতটা তুলব কার গায়ে শুনি?'

মানসী হাসি চেপে বলল, 'কিন্তু ফেল করে ও নিজেই কত দুঃখ পেয়েছে ভেবে দেখ। এর পর তোমরা যদি ওকে মারধোর কর—।'

মনোমোহন বললেন, 'সাধে কি মেরেছি। ফেল করেছিস কোথায় লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকবি, এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে আমার কতগুলি অর্থদণ্ড ঘটালি সেকথা ভেবে মরমে মরে থাকবি, তা না তো আমার মুখে মুখে তর্ক?'

মানসী বলল, 'তর্ক আবার কী নিয়ে করল?'

মনোমোহন বললেন, 'বলে কিনা আমি কি আই-এস-সি পড়তে চেয়েছি? তোমরাই তো জোর করে আমাকে সায়েন্স পড়ালে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেস্টের বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে ভর্তি করলে। কত বড় মিথ্যেবাদী তাই দেখ। ও কিন্তু বন্ধুদের দেখাদেখি নিজেই গরজ করে সায়েন্স নিল—।'

প্রলোভনটা অবশ্য মানসী মাধুরীরাই তুলে ধরেছিল। 'মায়া আই এ পড়ে পড়ুক। কিন্তু তুই কী পড়বি ভেবে দেখ। আই এ বি এ পাশ করে তো কোন প্রসপেক্ট নেই। সেই মাস্টারি না হয় কেরানীগিরি। তাও পাওয়া শক্ত। কিন্তু আই এস-সিটা পাশ করলে অনেক টেকনিক্যাল লাইন খোলা থাকে। অঙ্কটা যদি মেক-আপ করে নিতে পারিস তাহলে ভেবে দেখে।'

ভেবে দেখে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়াই ঠিক করেছিল নন্দু। কিন্তু দু মাস যেতে না যেতেই পড়াশুনোয় ওর মনোযোগের অভাব মানসী লক্ষ্য করেছিল। ফিজিকস, কেমিস্ট্রির খাতায় ও বসে বসে প্রফেসরদের মুখ আঁকত সহপাঠীদের মুখ আঁকত, দু'একজন সহপাঠিনীর মুখের রেখাও ধরে ফেলেছিল মানসী। ওকে বোধহয় আর্ট কলেজে ভর্তি করাই ভালো ছিল। কিন্তু তখন আর বদলাবার সময় নেই। তাছাড়া এদেশে আর্টিস্টেরই বা কী প্রসপেক্ট আছে?

মানসী ঘরে এসে শাড়ি বদলাল। লক্ষ্য করল মায়া সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওর যেন লজ্জার আর শেষ নেই। মানসী ওকে ডেকে হেসে বলল, 'কিরে দেখলি তো, আমার কথা কিরকম ফলল। তুই তাহলে পাশটা করে ফেললি মায়া?'

লজ্জায় মুখ নামিয়ে মায়া বলল, 'আর বোকো না সেজদি, আমার পাশ করার আর কোন মানে রইল না। যাই তোমার খাবার নিয়ে আসি।'

মঞ্জু এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করছিল। ফাঁক পেয়ে মানসীর কাছে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল 'সেজদি তোমার একটা

জিনিস আমার কাছে আছে। পরে দেব। তুমি খেয়েদেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও।'

মানসী কোনরকম কৌতূহল বোধ করল না, বলল, 'আচ্ছা দিস।' তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, তোদের অসীমদা কি চলে গেছে নাকি রে?'

মঞ্জু ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'অসীমদা বুঝি শুধু আমাদের?'

মানসী ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'বড্ড ফাজিল হয়েছিস। আর ইয়ার্কি করতে হবে না। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে।

মঞ্জু মুখ ভার করে বলল, 'তোমাদের কারো সঙ্গে একটা কথা বলবার জো নেই। সবাই একধার থেকে কেবল ধমকাচ্ছ। ছোড়দা ফেল করেছে তো আমরা কি করব?'

মানসী একটু হেসে বলল, 'তোকে কিছু করতে হবে না। শুধু আমার কথার জবাবটা জানিস তো দিয়ে যা।'

জানবে না কেন মঞ্জু সবই জানে। অসীমদা এখনো যাননি। ও-ঘরে বসে বই পড়ছেন। দুপুরের গাড়িতে যাব যাব করছিলেন। সেই সময়ে বাবা নন্দুর ফেলের খবর নিয়ে এলেন। কথায় কথায় মার সঙ্গে তাই নিয়ে তুমুল ঝগড়া। মহা হুলুস্থুল। এর মধ্যে অসীমদা যেতে পারেন নি। বাবাকে বুঝিয়েছেন মাকে বুঝিয়েছেন। ছেলেমানুষ একবার ফেল করেছে তো হয়েছে কী। তা ছাড়া এ তো প্রাইভেট সোর্সে জানা খবর। ভুল খবরও তো হতে পারে। কিন্তু বোঝালে হবে কি ঝগড়াঝাঁটি মারধোর কিছুই বাকি থাকে নি। এইসব অশান্তির মধ্যে অসীমদার আর যাওয়া হয়নি।

মানসী সব শুনে বলল, 'হুঁ। দিদি কোথায় রে? ওই ঘরে নাকি?'

বলেই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হল। ছি ছি ছি মঞ্জু কী মনে করল। কথার ধরণটা কি আর ও বুঝতে পারেনি, যা পাকা মেয়ে।

মঞ্জু বলল, 'ও ঘরে কেন হবে। মেজদি এখনো ফেরেইনি। স্কুলের পর টিউশনি আছে না ওর?'

মাধুরী যে স্কুল কামাই করেনি তা শুনে মানসী খুশি হল। সারাদিন তাহলে বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারেনি ওরা। কিন্তু বেশিক্ষণের কি দরকার হয়? সময়টা এসব ব্যাপারে বিবেচনার যোগ্যই নয়। তা যদি হত মাত্র দুদিনের মধ্যে মাধুরী কি ওকে অমন করে কেড়ে নিতে পারত? কই, মানসীর সাড়া পেয়েও তো অসীম ঘর থেকে বেরিয়ে এল না। কী এমন মহাগ্রন্থ পড়ছে সে? নন্দুর ফেলের জন্যে সে যাওয়া বন্ধ করেছে এটা বাজে কথা। লোক-দেখানো ভদ্রতা। আসলে সে প্রতীক্ষা করে আছে মাধুরীর জন্যে। মাধুরী এসে পৌঁছয়নি বলেই তার যাওয়া হয়নি।

মঞ্জু বলল, 'সেজদি তোমার জিনিসটা তাহলে এবার নাও।'

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, 'জিনিস জিনিস করে মাথা ধরিয়ে দিলি। কী জিনিস দেখি।'

মঞ্জু হেসে জামার ভিতর থেকে পুরু একখানা খাম বের করে বলল, 'এই নাও। অসীমদা চলে যাবেন ভেবে সারা দুপুর বসে চিঠিটা তোমার জন্যে লিখেছিলেন। যাওয়া হল না দেখে বার বার আমার কাছে ফেরত চেয়েছেন। কিন্তু আমি আর দিইনি। কী মজা। সেজদি এবার আমার প্রাপ্যটা আমাকে দিয়ে দাও। বেশি নয়, একখানা সিকি দিলেই হবে। এত মোটা চিঠি ডাকে এলে নিশ্চয়ই বেয়ারিং হয়ে আসত।'

মানসী ছোট বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'ফের বাঁদরামি হচ্ছে? যা এখান থেকে।'

চিঠিটা খুলে পড়ল না মানসী। স্যুটকেসের পকেটে রেখে দিল। চিঠি সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। চিঠি সে এতকাল ধরে অনেক পেয়েছে।

সুহাসিনী এসে দাঁড়ালেন, 'কাণ্ডটা কী হল বল তো মানসী। ছেলেটা সেই যে গেছে তার আর দেখা নেই। নাওয়া হলো না, খাওয়া হলো না, কোথায় আছে একটা খোঁজ পর্যন্ত তোরা করবিনে?'

মানসী বলল, 'অত ভাববার কী আছে মা। নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে। যাবে কোথায়।'

সুহাসিনী রাগ করে বললেন, 'তোরা নিজেদের সুখ-দুঃখ মান-অভিমান নিয়েই মেতে আছিস বাপু। আর মানুষের মনের দিকে তাকাবার তোদের ফুরসত কই। মনের এই অবস্থা নিয়ে নন্দু পাড়ায় আড্ডা দিতে বেরিয়েছে একথা আমি মরলেও বিশ্বাস করব না। এইসব দুঃখে কাঁচ কাঁচ ছেলে দেশান্তরী হয়, আত্মঘাতী হয় তা জানিস?'

মানসী বলল, 'অত ভেবনা মা। নন্দু তেমন ছেলেই নয়। আমি এক্ষুণি বেরোচ্ছি। নিশ্চয়ই পাড়ায় কারো বাড়িতে আছে।

কথাটা মনোমোহনেরও কানে গেছে। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'আত্মঘাতী হয় হবে। অমন ছেলের তাই হওয়াই ভালো। কুলাঙ্গার, বংশের কুলাঙ্গার। দিনরাত কেবল আড্ডা আর আড্ডা। ঘরে আড্ডা বাইরে আড্ডা। যে বাড়িতে ছোট বড় জ্ঞান নেই, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের খুনসুটি আর ফষ্টিনষ্টির সম্বন্ধ সেখানে পড়াশুনোর মত পবিত্র কাজ কি হবার জো আছে? পড়াশুনো হচ্ছে তপস্যা। তার জন্যে আলাদা অ্যাটমসফিয়ার চাই। এ বাড়ির মত এই উপবনে বসে কি আর পড়াশুনো করতে পারে?'

তারপর অসীমের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'অসীম এসো তো বাবা, এসো একটু এগিয়ে দেখি।'

'কোথায় যাবেন মেসোমশাই?'

'এই হতভাগা ছেলের জন্যে কোথায় যে যাব আর যাব না তা কি কিছু বলবার জো আছে? আমার জন্যে নয়। অমন ছেলের জন্যে আমার কোন মায়ামমতা, কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তোমার মাসীমা কেঁদেকেটে কেমন অস্থির করে তুলেছেন তাই দেখ। চল, তুমি পুলিস অফিসার মানুষ, এসব ব্যাপারের অনেক আটঘাট তোমার জানা আছে। শেষপর্যন্ত যদি থানা হাসপাতালেই যেতে হয় তুমি সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।'

অসীম বলল, 'অত ভাববার কিছু নেই মেসোমশাই। একটু এগিয়ে দেখতে চান চলুন।'

জামাটা গায়ে দিয়ে অসীম মনোমোহনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

মানসীর দিকে একবার তাকাল না, তাকে ডেকে কোন কথা বলল না। তবু মানসীর ভালো লাগল। অসীম তার বাবার সঙ্গে তারই ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। ওর এই সামান্য সৌজন্যে মানসীর মন এক অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

আটপৌরে শাড়িটা পালটে নন্দুর পাড়ার বন্ধুমহলে খোঁজ নেওয়ার জন্যে মানসীও বেরোতে যাচ্ছিল মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন খোঁচা খেল মানসী। অসীম যাঁর সঙ্গে গেছে সে তো মাধুরীরও বাবা, যার খোঁজে গেছে সে তো মাধুরীরও ভাই। অসীমের এই দাক্ষিণ্য আর সহৃদয়তার মূলে কে তা কে বলবে?

মাধুরী মানসীর দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'কোথায় বেরোচ্ছিস?'

মানসী বলল, 'নন্দুর খোঁজে। ও ফেল করেছে। দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি।'

মাধুরী বলল, 'সব আসতে আসতে শুনলাম। মা মঞ্জু মায় বাড়ির সবাই গিয়ে বাস স্টপে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা অশান্তি বাধাল ছেলেটা। চল ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমরা দুজনেই একসঙ্গে বেরোই।'

মানসী চুপ করে রইল। নাও করল না, হাঁও করল না।

·

মাধুরী একটু হেসে বলল, 'বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে বেরোতে তোর আর ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তোর সঙ্গে আমার কতগুলি দরকারি কথা আছে; চল, যেতে যেতে সব বলে নেব।'

হঠাৎ মানসী দোরে খিল দিয়ে এসে বলল, 'দিদি সেসব কথা তো পথে পথে হবে না। তোর যা বলবার আছে সংক্ষেপে এখানে এখনই বলে ফেল। শুনে তারপর বেরোই।'

(ক্রমশ)

উত্তরা

সন্তোষকুমার ঘোষ

(পাঁচ)

বুড়ো সেই বী সাহেবকে ভোলাই কি সহজ নাকি?

সিঞ্চল লেক থেকে ফিরতি মুখে কেভেণ্টারের কারখানা। সেখানে হানা দিলুম; রোদ তখন ঝর্ণাধারার মত গড়িয়ে নামছিল পাহাড়ের চূড়া থেকে।

কারখানা জাতীয় পদার্থে আমার কৌতূহল কম। ভয় ছিল, হয়ত একটি নিষ্ঠুর কসাইখানা দেখতে হবে। যেখানে যন্ত্রপাতি সজীব কিন্তু জীবগুলো নির্জীব। না, বরং উল্টোটাই দেখা গেল। প্রাণীগুলি রীতিমত পুষ্ট আর সতেজ ত বটেই, উপরন্তু পরিচয় হল প্রাণবান একটি পুরুষের সঙ্গে—নাম আগেই বলেছি বী সাহেব। প্রৌঢ় ইংরাজ—নির্মেদ সুপুষ্ট শরীর, প্রায় ছত্রিশ বছর এই কারখানার ভার নিয়ে আছেন।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে কারখানা দেখলুম। তকতকে, ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। দুধ, মাখন, চীজ থেকে শুরু করে "নিষিদ্ধ" ভোজ্য তৈরি করার কৌশল দেখা গেল।

অবশেষে "হলিউড।" আমি কিংবা আপনি হলে ভাবতুম গোয়াল, কেননা, নধর থসথসে শূকরী আর তাদের শাবকগুলিকে সগর্বে দেখিয়ে বী সাহেব আমাদের যে আটচালায় নিয়ে তুললেন, সেখানে সারি সারি সারি গাভী বাঁধা। তাদের সঙ্গে পরিচয়ও হল। "দেখুন—জেনেট ম্যাকডোনাল্ড। ইনি নর্মা শিয়ারার।" বী সাহেব বলে যাচ্ছিলেন, আমরা শুনছিলুম। গার্বোকেও দেখা গেল। ফলকে আলাদা আলাদা নাম লেখা—প্রত্যেকেই প্রখ্যাত চিত্র-নক্ষত্র।

সত্যি কথা বলতে কি, নিরীহ গোরুগুলিকে গ্ল্যামারাস চিত্রপটিয়সী বলে কল্পনা করতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু মজাও কম পাইনি। এ-ও লক্ষ্য করলুম, নামগুলো সবই বিগত কালের। বী সাহেবের এই হারেমে মেরিলিন মনরো, ব্রিজিট বার্দো একটিও নেই। বী সাহেবের শখের আকাশে শুধু মৃত নক্ষত্রের আসর। লোকালয় থেকে দূরে নিঃসঙ্গ মানুষটির কানে হয়ত কোন্ নক্ষত্রটি অস্ত গেছে, উদয় হয়েছে কোন্‌টির, সে খবর পৌঁছয়নি। উডহাউসের লর্ড এমস্‌ওয়ার্থকে চোখে দেখলুম।

ভুলব না দেওয়ালির রাত্রিটিকেও।

সরকারী প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে নেপালী লোকগীতি ও নৃত্যকলা দেখছিলুম। অংশ গ্রহণ করেছিল স্থানীয় ফৌজী ইউনিটের জওয়ানেরা। নারী ভূমিকাতেও তারাই।

কথা ভাল বুঝিনি, যদিও মাঝে মাঝে পরিচিত ভারতীয় শব্দ শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম। ওই বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো আমাদের মধ্যে ক্ষীণ একটি আত্মীয়তার সেতু. শক-হূন দলের মত এরা আমাদের সঙ্গে একদেহে লীন আজও যদি না হয়ে থাকে, একদিন হবেই. নিজের মধ্যে এই বিশ্বাসটা ফিরে পাচ্ছিলুম।

সবশেষে ওরা "জনগণমন" গাইলে। জাতীয় সংগীত। আমাদের। ওদেরও। আমাদের সকলের। জাতি শুধু ভাষায় না, ভূগোলে না, রক্তেও না। ঐক্যের অনুভবে।

সেই দেওয়ালির রাত্রেই হোটেলে ফেরার পথে দেখি লোকে লোকারণ্য। এ রাত্রিটি কি ওদের কাছে কোজাগরী? আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লুম।

ভীড় যেখানে বেশী, সেটা একটা বিলাতি হোটেল। ভিতরে নাচের ধুপধাপ, সেখানে যাদের স্থান হয়নি তারা বাইরে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে সাধারণ গৃহস্থও ছিল। সবাই

সুকিয়াপোখরি ব্লকে শিক্ষার্থিনী পাহাড়-কন্যা

উৎসুক, সবাই পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের তখন নড়ায় কার সাধ্য। কাঁদুনে গ্যাসেও কাজ হত কি না সন্দেহ, শীত ত কোন্ ছার!

টের পেতে দেরি হল না, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, ফিরিঙ্গি সেই মেয়েটি—স্বাস্থ্যবতী এবং সুকণ্ঠী। সে বাজনার সঙ্গে সুর আর গলা মিলিয়ে গান গাইছিল। কালো রঙের আজানু জামা, প্রচ্ছদে যতখানি কার্পণ্য ঠিক ততখানিই কুণ্ঠাহীনতা। কণ্ঠতটে একগাছি সুতোও নেই।

বাইরে অদৃশ্য বৃষ্টিধারার মত হিম পড়ছিল।

"ওর কি একটুও ভয় নেই", একজনকে বলতে শুনলুম, "যদি বুকে ঠাণ্ডা লাগে, সর্দি বসে, যদি ধরো নিউমোনিয়াই হয়?"

প্রশ্নটা যাকে করা তিনি সপ্রতিভ। চট করে কী ভেবে নিয়ে হেসে বললেন, "জানো না বুঝি? হোটেলের সঙ্গে ওর কনট্রাক্ট আছে যে। যদি নিউমোনিয়া হয়, তবে পেনিসিলিনের দাম হোটেল দেবে।"

কালিম্পঙের পথেও ফিরে ফিরে দার্জিলিঙেরই কয়েকটি মুখ মনে পড়ছিল। প্রচার বিভাগের সদাহাসি গিন্নি। সুকিয়াপোখরির বুদ্ধিমান কর্মী মুখতাং। লীলা গীসিং—চিত্রতারকা হিসেবে এখনও কুঁড়ি। মোটে গোটা দুই ডকুমেণ্টারিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছে। তার পিসি কমলা। সে আমাদের কলকাতায় শেখা বাংলা গান শুনিয়েছিল। আড়ষ্ট উচ্চারণ, 'স'-গুলি সব দন্ত্য, কিন্তু গলা মিষ্টি, সুর নিভুল।

আর, আর কী মনে পড়ছিল? কুয়াসায় ডুবে থাকা ভোরের লেবং, বটানিক্‌স বাগানের ক্যামেলিয়া আর রডোডেনড্রন, কবিতায় যার শাখাশিখরের ঔদ্ধত্যও প্রসিদ্ধ। আর শোবানন্দ্র উইলো।

কালিম্পংয়ের পথ। একে পথ বলব, না পথের স্বপ্ন? সংকীর্ণ, মসৃণ। পিছনে ঘুম পাহাড়ের চুলের-কাঁটা বাঁকগুলি পড়ে রইল।

আমরা পেশক্ রোড ধরে নিচে নামছি। এ-পথ কখনও ইংরেজী s-এর মত, কেবলই পাহাড়কে ঘিরে পাক খাচ্ছে। কখনও অনন্ত কালো ফিতে, কখনও বা স্পাইরাল সিঁড়ি—স্ক্রু-এর মত অত্যন্ত ছোট পরিধির মধ্যে কয়েকটি আবর্ত-বলয় রচনা করে নেমে গেছে।

আমাদের সারথির নাম কোরলা। তার হাতে স্টিয়ারিং, মুখে বুলি নেই। মনে কী ছিল বলতে পারব না। প্রকৃতির শোভা দেখে আমরা যখন হর্ষসূচক অব্যয় উচ্চারণ করছিলুম, সে কি চটছিল? হবেও বা। এ-সব পথে ড্রাইভের মুশকিলই ত ওইখানে—চমৎকৃত বা মোহিত হতে পারে একমাত্র রথীরাই। সারথির এদিক-ওদিক নজর দেবারও উপায় নেই। অন্যকে সে স্বাদ নেবার সুযোগ করে দেবে, কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে জিভে ছোঁয়ানোও মানা।

এই ছায়াকালোর বর্ণনা কী দেব! যদি বলি, পাহাড়কে এই পথ নাগপাশে জড়িয়ে রেখেছে, পুরোনো শোনাবে। দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত এরও উন্মোচন-রহস্য অনন্ত বলা চলত। কিন্তু এই উপমাটাও পৌরাণিক।

পাইনের এমন ঘন বন কোথাও দেখিনি। এই বন তার পত্রপ্রচ্ছায়ে চিররাত্রিকে পুষে রেখেছে। আর অতি সুন্দর একটি শান্তিকে। কিন্তু শুধু শান্তিকেই ত না। শ্বাপদকেও। হিংসাকে। হিংসা আর শান্তি দুইই এই বনে সহ-অবস্থিতির নীতি মেনে নিয়েছে।

মাঝে মাঝে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। মাঝে মাঝে কোন-কোন আকস্মিক বাঁকে তন্দ্রা ছুটে যায়। চোখ মেলে দেখি, বাঁ দিকের গভীর বিশাল উপত্যকা কখন প্রকাণ্ড একটা পাত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, আর সেই বিপুল আধারে স্বর্ণবর্ণ রৌদ্রাসব টলমল।

আবার চোখ বুজে খাপছাড়া সব ভাবনা বুনেছি। পাহাড়, উপত্যকা আর রাস্তা—এই তিন মিলিয়ে মনে মনে ত্রিকোণ একটা দ্বন্দ্ব খাড়া করেছি। পথ লীলায়িত বাহু-বলয় দিয়ে কেবলই জড়াতে চায় পাহাড়কে, কিন্তু পাহাড় তাকে চায় না, ক্রমাগত দূরে ঠেলে দেয়, আর সেই প্রত্যাখ্যাত পথকে লুফে নেবে বলে বিরাট উপত্যকা কতকাল থেকে কে জানে, ওৎ পেতে বসে আছে।

উৎরাই বলেই এমন উদ্ভট চিন্তা মনে এল। চড়াই হলে হয়ত এই পথটাকেই সার্বিলমেশনের, ঊর্ধ্বাভিসারী বাসনার, প্রতীক বলে ভাবতুম।

আসলে পাহাড়কে কখনই আমি জড় একটা স্তূপ বলে ভাবতে পারিনে। যদি জড়-ও হয়, তবে সে একদা অবশ্যই প্রাণময় ছিল। পাহাড়কে মৃত কোন সমুদ্রের কঙ্কাল বলে বরং কল্পনা করতে পারি, যার অন্তিম মুহূর্তের দৈহিক আক্ষেপ কয়েকটি কঠিন শীর্ষ-শিখরে চিরায়ত হয়ে আছে। শুধু আর তরঙ্গ মৌন তফাত বই!

সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায় ঘুমেরও ভাষা ধরা পড়ছিল। প্রাণী যখন ঘুমোয় তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ থাকে। সেই শব্দ আছে ঘুমের দেশেও। সেখানে গাছের চুলের মত কান পেতে থেকে হাওয়ায় নড়ে, ঝিরঝির শব্দ করে, নদ-নদী কোন পাথরে পায়ের চাপে শুকনো পাতা মচমচ করে ওঠে, এই হয়ত সন্ধ্যায় কয়েকটি ক্লীব লাফ দিয়ে মগডালে উঠে বসল। তার অনেকক্ষণ সব চুপ।

তন্দ্রার ঘোর হঠাৎ ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, গুপ্ত কনুই দিয়ে ঠেলছে। চোখ মেলে জড়িত গলায় বললুম, "কালিম্পং এসে গেল?" শুনলুম কালিম্পং নয়, ভিউ পয়েণ্ট। "ওই দেখ সিকিমের সীমানা।"

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলুম। অনেক নীচে ছোট রংগিত নদী এসে মিলেছে তিস্তায়। তিস্তার রেখাও এখানে খুব স্পষ্ট নয়—ধুলোরঙের সরু পথের মত। ভাল করে ঠাহরই হয় না, কোন্‌টা রাস্তা, আর কোন্‌টা তিস্তা।

গ্যাংটকের রাস্তাটিকেও দেখা গেল। তিস্তার ধার ঘেঁষে কালো পাড়ের মত সোজা উত্তরে চলে গেছে। বক্রসমুৎকীর্ণ পাথরের ভিতর দিয়ে সূত্রের মত তার গতি।

গুপ্ত বলল, "এখনই কী। আরও খানিক গেলে এ পথের রূপ আরও খুলবে। দেখবে, যেন একটা ঘূর্ণিহাওয়ার মত পথটা উঠে গেছে। লুপের মাথার ওপর দিয়ে লুপ। আমরা বলি, 'লুপিং দ্য লুপ'।"

(ক্রমশ)

ঘুমন্তপুরীর রূপকথা

জয়ন্তী গুহ

রাজপ্রাসাদে ছিল না ধুমধাম ও ভোগ-বিলাসের অন্ত। হাতীশালায় হাতী ছিল, ঘোড়াশালায় ঘোড়া ছিল। রাজকোষে ধন ছিল রাজসভায় ছিল মন্ত্রী আর উজিরের সারি। শত্রুর বিরুদ্ধে ছিল অযুত সৈন্য আর অস্ত্র, কয়েদখানায় ছিল বন্দীর দল। নহবৎখানায় নহবৎ বাজত, জলসাখানায় ঝাড়লণ্ঠনের আলো ঠিকরে পড়ত, কিংখাবের তাকিয়া, সুরা আর নাচিয়ে, বাজিয়ে আর গাইয়ে, কোন কিছুরই অভাব ছিল না। রানীমহলে মহিষীর অন্ত ছিল না, আর রাজ্য জুড়ে ছিল সুখী প্রজার ভিড়। তবে আর রাজার কিসের অভাব? তবুও রাজার মনে সুখ ছিল না, তাঁর ছিল না পুত্রসন্তান। তাই সব রাজার মতই পুত্রেষ্টিযজ্ঞও করলেন তিনি। কিন্তু তবুও কৃপা হল না মা ষষ্ঠীর।

রাজা বুড়ো হলেন, রানীরাও বুড়ী হলেন। চিন্তায় পড়লেন রাজা। কার হাতে তুলে দেবেন এই বিশাল রাজ্যভার? সে চিন্তায় ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন রাজা। অবশেষে হতাশ হয়ে স্থির করলেন যে, আগামীকাল ঘুম থেকে উঠেই যাকে দেখবেন, তাকেই পুত্র বলে গ্রহণ করবেন। অত্যাশ্চর্য এ প্রতিজ্ঞা!

পরদিন প্রত্যুষে রাজা যখন প্রাসাদের বাইরে তাকালেন, তাঁর চোখ পড়ল এক মুমূর্ষু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর। ব্রাহ্মণ লাঠিতে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন, রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে। দীর্ঘদেহ ব্রাহ্মণ যেন বহু-যুগের সঞ্চিত জ্ঞানের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তাঁর বর্ণ গৌর এবং প্রতিভাদীপ্ত চোখ অতীত ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের সাক্ষ্য দিচ্ছে। চিন্তাকুল রাজা তাঁকে আহ্বান করবার পূর্বেই ব্রাহ্মণ কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—

"মহারাজ! কিছু নিবেদন আছে আপনার চরণে; ভয়ে বলব, কি নির্ভয়ে বলব?"

—"নির্ভয়ে বলুন।" বিস্ময়াকুল হয়ে রাজা আশ্বাস দিলেন।

—"মহারাজ!"......অত্যন্ত কম্পিত কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বললেন, "আপনার পুত্রের অভাব দূর করবে আপনারই বিতাড়িত দুই কন্যা।" ব্রাহ্মণকে আরও কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ক্রোধে ও বিস্ময়ে মহারাজ চেঁচিয়ে উঠলেন—"সেই ডাকিনীমায়ের ডাকিনী মেয়েদের কথা বলছেন?"

মহারাজের দুয়োরানীর দুই যমজ দুহিতা তারা। অমন কুৎসিত চেহারা বুঝি মানুষের হয় না। পাহাড়ের মত উঁচু লম্বা নাক, কালো কুতকুতে চোখ, কয়লার মত কালো রঙ আর ঘন সবুজ কেশগুচ্ছ—দাঁত-গুলি যেন রক্তে রাঙা। দুয়োরানীর মেয়ে তারা; তাই রাজজ্যোতিষী এসে বললেন—"মহারাজ! এদের শীঘ্র বিতাড়িত করুন। এরা মূর্তিমতী অমঙ্গল—ডাকিনীকন্যা।"

বোধিসত্ত্ব ও বজ্রপাণি—অজন্তা

ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ—অজন্তা

কৈলাস মন্দিরের দেওয়ালে নটরাজঃ ইলোরা

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। মধ্যপ্রদেশের কোন পার্বত্য অঞ্চলে, নিবিড় বনানীর গভীরে ও বিস্মৃতির অন্তরালে তারা কবে হারিয়ে গেছে। রাজ্যের লোক পেয়েছে শান্তি, কেবল আজও দুয়োরানীর দুটি কপোল বেয়ে ঝরে পড়ে মুক্তার মত শ্বেত স্বচ্ছ দু'ফোঁটা বিষাদের অশ্রু। কেন? একমাত্র দুয়োরানীই অন্তরের অসীম স্নেহ নিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন একটি জিনিস যা আর কেউই দেখেন নি। তাঁর কুৎসিত দু মেয়ের কুতকুতে চোখের মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যাকুল দৃষ্টি অনেকদূর চলে গিয়েছিল। সেখানে নিভৃতে একটি সুন্দর মানুষ করুণা, ক্ষমা ও শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছিলেন।

কিন্তু তবুও অন্ধকারের পাশেই থাকে আলো—বিস্মৃতির ও-পিঠেই থাকে স্মৃতি। ডাইনী না থাকলে হয় না রূপকুমারীর গল্প আর শ্রীহীনতার মাঝেই রূপশ্রীর এত সমাদর এত মর্যাদা। তাই বুঝি দুয়োরানী প্রতি রাত্রে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে, ভাঙা চালের ফুটোর মধ্যে দিয়ে যে আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা দেখা যেত—তার দিকে তাকিয়ে ভাবত কত কথা—তার মেয়েদের কথা—সাতপুরা আর সহ্যাদ্রির কথা। ভাবতে ভাবতে চোখের জলের উষ্ণ স্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়ত দুয়োরানী আর ফুলে উঠত ভিজে দুটি চোখের পাতা।

ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে স্বপ্ন দেখত দুয়োরানী। তার দুই মেয়ে—সাতপুরা আর সহ্যাদ্রি। হাত ধরাধরি করে তারা চলেছে কত পাহাড়, জঙ্গল, খালবিল, নদনদী, প্রান্তর-মরুভূমি পার হয়ে। তাদের জীবনের পূর্ব দিগন্ত রাঙা করে আজ উঠছে নূতন দিনের নূতন রবি—নূতন আশা, নূতন আনন্দ আর নূতন সৌন্দর্য নিয়ে আসছে রবিরশ্মি তার নূতন ডালি ভরে। দুয়োরানী স্বপ্ন দেখছে আর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তার বেদনাক্লিষ্ট অধরোষ্ঠ আর অশ্রুসিক্ত দুটি নয়ন।

সাতপুরা আর সহ্যাদ্রি ডাকিনীর আশ্রিতা দুহিতা, তাই বুঝি আর এক ডাকিনী এলো তাদের ঘুম পাড়াতে। সে জানে যাদু, সে জানে মায়া। হাতে তার হাতুড়ি ও গাঁইতি মুখে তার আশার হাসি। সে যেন কিছু পণ করেছে। জরাজীর্ণ, মলিন ও কুশ্রী পুরাতনের মাঝে সে গড়বে নূতনের সৌন্দর্যময় নবীন স্বপ্ন। তার মনে এক দৃঢ় সংকল্প। ঐ হাতুড়ি ও গাঁইতিতে আছে এক যাদু—ও যেন যাদুকরের যাদুদণ্ড। এরই স্পর্শে সম্ভব হবে অসম্ভব। ঐ দিয়েই পুরাতনকে কেটে কেটে গড়ে তুলতে হবে নূতনকে। বিস্মৃতিকে খোদাই করে আনতে হবে চিরকালের স্মৃতি। স্বর্গ নামাতে হবে পাতালের অতলে।

যাদুকরী এসেছে তার যাদুদণ্ড নিয়ে। সে এসে বলল সাতপুরা আর সহ্যাদ্রিকে—"ছোট্ট খুকি তোমরা! ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়, লক্ষ্মীসোনা!" যাদুকরী তার আঙুল বোলাতে লাগল তাদের চোখের সামনে আর অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। আস্তে আস্তে বুজে এল তাদের ছোট্ট দুটি চোখের পাতা—ঢলে পড়ল তারা দুটি বোন যাদুকরীর দুই কোলে!......ভোরের আলোয় আর পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল দুয়োরানীর—তার সুন্দর স্বপ্ন গেল ভেঙে।

তারপরে কিভাবে যে যাদুকরী গড়ে তুলল এক সার্থক স্বপ্ন—কিভাবে যে মর্ত্যে নামিয়ে আনল স্বর্গের রূপ, রস ও মাধুর্য, তা জানে না দুয়োরানী। আবার এল আরেক রাত। তেমনি করে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে, ঘরের চালের ছিদ্রপথের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রটির দিকে তাকিয়েছিল দুয়োরানী। সেদিন ছিল মধুমাসের পূর্ণিমার রাত। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল ধরণী। দুয়োরানীর ভাঙা ঘরেও উঁকি মারছিল পূর্ণিমার চাঁদ আর মুক্তার মতনই অপরূপ শোভা পাচ্ছিল দুয়োরানীর দু-ফোঁটা অশ্রু। দুয়োরানী

ফিরে গেছে স্বপ্নের দেশে। আজও দেখল তার দুই মেয়েকে। হৃদয়ের কোন একটি গোপন কোণও খুঁজে পেল না দুয়োরানী তার আনন্দকে ধরে রাখতে। পাহাড়ের মতন খাড়া নাক হয়েছে বাঁশী মতনই সুন্দর। ঘন মোটা ভ্রূর নীচে কালো কুতকুতে চোখকে স্থানচ্যুত করেছে ইন্দ্রধনু, ভ্রূ-জোড়ার নীচে দুটি পটলচেরা ভাব ঢল ঢল মৃগনয়ন। বুকলরে পাপড়ির মতনই মনোরম অধরোষ্ঠ। দুটি ফুটন্ত গোলাপের রঙে রাঙা দুটি কপোল। আর কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল। ধরার বুকে নেমে এল যেন শাপভ্রষ্টা দুটি দেববালা।

"যা কিছু মলিন, যা কিছু কালো,
যা কিছু বিরূপ, হোক তা ভালো"—

পুরাতনের ধ্বংসের উপর গড়ে উঠল এক অভিনব নূতন মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যালোক। অমৃতলোকে মর্ত্যজীবনের পদার্পণ হল। গোবরে ফুটল কমল। সাতপুরা আর সহ্যাদ্রির কঠিন, রূক্ষ ও রুক্ষ ভূমিতে প্রস্ফুটিত হল দুটি শ্বেত ও রক্ত অরবিন্দ— ইলোরা ও অজন্তা।

ভোরের আলোয় আর পাখীর মিষ্টি গানে ঘুম ভেঙে গেল দুয়োরানীর। কিন্তু নূতন প্রভাতের নূতন আলো, নূতন অনিল, নূতন গান ও নূতন রঙ—কিছুই যেন এত নূতন বলে মনে হয় নি, এত আনন্দ দেয় নি দুয়োরানীকে যেমন দিয়েছে আজকের প্রভাত। ছেঁড়া মাদুর আর রাজশয্যা, ছেঁড়া কাঁথা আজ রাজ আচ্ছাদন, ভাঙা কুঁড়ে আজ রাজপ্রাসাদ, শতছিন্ন কাপড় আজ রাজবেশ আর চিঁড়ে-মুড়ি-খই আজ রাজভোগে রূপান্তরিত হয়েছে। আর দুয়োরানী হয়েছেন সুয়োরানী।

রাজা এসেছেন আজ দুয়োরানীর ভাঙা ঘরে। হাজার হাজার দাসীরা এনেছে সাগর-ছেঁচা মুক্তার সাতনরী হার প্রবালের দেশের নাকছাবি, স্বর্ণ-পাহাড়ের কাঙন, হীরের মান্তাসা আর বাজুবন্দ, নীলার সিঁথি আর পায়জোড় আর সোনার মেখলা। হীরকপুরের হীরকমতী রাজকন্যা প্রতি সন্ধ্যায় হীরের হার গেঁথে সাজায় তার কবরী। পরদিন বাসি হলে দাসী দিয়ে বাজারে বিক্রয় করবে লক্ষ ঘড়া মোহরের বিনিময়ে। রাজা এনেছেন সেই হীরকহার তাঁর দুয়োরানীর জন্য। রেশমনগরীর রেশমকন্যা প্রতি প্রভাতে সূর্যের রাঙা আলোয় বুনবে আসমানী রঙের রেশমী শাড়ি। মলয় বাতাসে উড়বে স শাড়ি আর রাজকুমারী খেলবেন সখীদের সঙ্গে মরুত-কাননে, সাঁঝের বেলায়। পরদিন সে বাসি শাড়ি কিনতে হবে হাজার ঘড়া মোহর দিয়ে। রাজা এনেছেন সেই শাড়ি দুয়োরানীর জন্য। রানী রূপোর পালকিতে চলেছেন সোনার

দ্বৌ-স্তম্ভ—অজন্তা

আসনে বসে, রাজপ্রাসাদে। শত দাসী চামর ঢুলাচ্ছে, আর চারিদিক ভরে দিচ্ছে আতর-সৌরভে। পথে ছড়াচ্ছে মোহরের হরির লুঠ। পথের দুধারে হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি আর বাজছে নহবৎ। দুঃখিনী দুয়োরানী আজ হয়েছেন রাজার আদরিণী সুয়োরানী।

রাজার সুয়োরানী সাতমহলা প্রাসাদে, সাত রাজার ধন নিয়ে, সাতশো দাসী পরিবৃত হয়ে ভুরু বেঁকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ডাকলেন তাঁর দাসীকে। রাজাকে চুপি চুপি বললেন— "আচাম দেখে তোর সৎ-মায়েরই রাজার দুয়োরানীকে। বললি, আমার ভেট।" দাসী তার কুটিল কালো চোখে একটি পরিতৃপ্তির দৃষ্টি হেনে বিদায় নিল।

আজ দুয়োরানীর এত আদর, কারণ আজ এসেছে তাঁর দুটি নয়নের মণি রূপে ও লাবণ্যের প্রতিমা ইলোরা ও অজন্তা। মহারাজের জন্য এনেছে তারা এক অমূল্য উপঢৌকন। এনেছে যাদুকরীর আশীর্বাদ —সারা বিশ্বের দান। এনেছে তারা বিশ্বের স্তুতি-বন্দনা আর সানন্দ আত্ম-সমর্পণ। সমস্ত পৃথিবীকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে আজ অজন্তা আর ইলোরা। দূর হয়েছে রাজার দুশ্চিন্তা, ঘুচেছে তাঁর পুত্রের অভাব।

মহারাজের রুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন—"আজ্ঞে মহারাজ! আপনার দুই কন্যাই এনে দেবে আপনার চরণে বিশ্বরাজ্য —তারাই দক্ষতার সঙ্গে পালন করবে আপনার সাম্রাজ্য। মহারাজ! আপনাকে এই শুভ-সংবাদ দানের জন্যই আমি বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণধারণ করে আছি।"

ব্রাহ্মণ শুনলেন মৃত্যুর আহবান-ভেরী, আর রাজা শুনলেন অজন্তা ও ইলোরার আগমনে বিজয়-শঙ্খ। আজও অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে অজন্তা ও ইলোরা সাতপুরা আর সহ্যাদ্রির বুকে।

[রিচার্ডসন নামে জনৈক ইংরাজ শিকারী সহ্যাদ্রি পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে চিতাবাঘের পিছনে ধাওয়া করলে, আত্মরক্ষার আশায় চিতাটি একটি গুহার অন্ধকারে ঢুকে পড়ে। সাহেবও তার পিছনে ঢুকে আবছা আলোতে আবিষ্কার করলেন ভারতের অতীত ঐতিহ্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন— অজন্তা। সাহেবটি যেমন অজন্তার স্বপ্ন-লোকের সন্ধান এনে দিয়েছিলেন, তেমনি রাজার দুই মেয়ে—অজন্তা ও ইলোরার নিমন্ত্রণের সংবাদ এনেছিলেন কাহিনীর ব্রাহ্মণ]

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জড় ও শক্তি—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ; ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ১৲।

সুবাস ও সুরভি—শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ; ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯। মূল্য—১৲।

একথা ঠিক, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলির সহিত সাধারণ লোকের পরিচিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধন মাতৃভাষার মাধ্যমে যেমন সম্ভব হতে পারে; অন্য ভাষার সাহায্যে তেমন কখনোই সম্ভব নয়। আনন্দের কথা, স্বাধীন ভারতে বাঙলা দেশের বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে আজ নিজেরাই এগিয়ে আসছেন। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "যাঁহারা বলেন, বাঙলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়, তাঁহারা হয় বাঙলা জানেন না, না হয় বিজ্ঞান জানেন না।" তাঁর প্রচেষ্টাও স্মরণযোগ্য। উপরোক্ত 'জড় ও শক্তি' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত গুহ বিজ্ঞানের গোড়ার কথা যে জড় ও শক্তি—তাদের স্বরূপ উৎস, পরমাণু শক্তির রহস্য প্রভৃতি বিষয়ে সরল ও সহজবোধ্য আলোচনা করেছেন।

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুবাস ও সুরভি' গ্রন্থে বাঙলা ভাষায় প্রায় অলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যে সুবাস আমাদের আনন্দ দেয়, স্নিগ্ধ করে তার সম্পর্কে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। লেখকের লেখার গুণে প্রকৃতিজ সুগন্ধি দ্রব্য, সংশ্লেষিত সুগন্ধি দ্রব্য, সৌরভ উৎপাদন, সুরভির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ার সময় একেকটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে।

দুইটি পুস্তকই মূল্যবান এবং দামেও অত্যন্ত সস্তা।

৩৪০।৫৯,৩৪১।৫৯

জলের রূপকথা—ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ, ডি এস-সি। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ। ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ১৲।

ধাতুর রূপকথা—ডক্টর কানাইলাল রায়, ডি-ফিল্। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা—৯। মূল্য—১৲।

মহাকাশ জয়ের রূপকথা—শ্রীঅজিত বসু। শিশুসাহিত্য সংসদ। ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—১৲

উপরোক্ত তিনটি বিজ্ঞানের পুস্তক ইউনেস্কোর সহযোগিতায় প্রকাশিত। আধুনিক যুগে বেঁচে থাকার জন্যে, সম্ভাবনাকে জয়যুক্ত করে তোলার জন্যে বিজ্ঞানের আদি এবং সম্ভাব্য রূপ সম্পর্কে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই পরিচয় আমাদের মধ্যে সহজবোধ্য হতে পারে একমাত্র আমাদের মাতৃভাষা বাঙলার মাধ্যমেই। ওপরের তিনটি পুস্তকে সেই প্রচেষ্টাই বিদ্যমান।

প্রথম পুস্তকটিতে জলের জন্ম, জল ও জীবের সম্পর্ক, নানাপ্রকারের জল, জলের ব্যবহার-গুণ ও বিভিন্ন অবস্থা এবং "ভারী" জল সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় পুস্তকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় 'ধাতু ও আধুনিক' যুগ। বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ। নিত্য নূতন যন্ত্র বের হচ্ছে। যন্ত্রে যন্ত্রে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে কিন্তু বলতে গেলে একে ধাতুর যুগই বলা উচিত। কারণ ধাতুর সাহায্যেই যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। সেই ধাতু সম্পর্কে কিছু জানতে হলে এই পুস্তক অপরিহার্য।

কবিদের কল্পনাকেও যেন হার মানিয়ে আজকাল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি মাটির চেয়ে আকাশের দিকেই বেশি ধাবমান। তৃতীয় পুস্তকটিতে সৌরজগতের কাহিনী, চলার পথে মাধ্যাকর্ষণজনিত বাধার কথা, মহাকাশ পাড়ির পথ, শূন্য পথের স্টেশন, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে অনবদ্য আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধরনের গ্রন্থ আরো প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

৩৬৯।৫৯,৩৭০।৫৯,৩৭১।৫৯

সাহিত্য-আলোচনা

(১) **বাঙলা সাহিত্যে সত্যকিংকর সাহানা**—সম্পাদনা—মণি বাগচী। ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯; থেকে প্রকাশিত। (মূল্যের কোন উল্লেখ নেই)

(২) **মহাভারতে অনুশীলন-তত্ত্ব**—সত্যকিংকর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ—প্রকাশক—ঐ মূল্য—২॥০।

(৩) **হিন্দুধর্ম**—সত্যকিংকর সাহানা; প্রকাশক (ঐ)—মূল্য—১॥০

(৪) **বিবিধ প্রবন্ধ**—সত্যকিংকর সাহানা; প্রকাশক (ঐ)—মূল্য—২॥০

(৫) **বিচিত্র প্রবন্ধ**—সত্যকিংকর সাহানা; প্রকাশক (ঐ)—মূল্য—২॥০

সর্বপ্রথমে যেটির নাম উল্লেখ করা হলো, সেটি ১৬ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকা, বিদগ্ধ লেখক সাহানা মহাশয়ের সাহিত্যিক জীবনের পরিচিতি-সম্বলিত। তার থেকে শ্রীসত্যকিংকর সাহানা সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি। জানতে পারি, তাঁর বয়স বর্তমানে ৮৫ বৎসর, বাঁকুড়া জেলার সুযোগ্য সন্তান ইনি প্রজাবৎসল জমিদারও। জানতে পারি, তাঁর প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তকাবলীর কথা। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত সংবাদই অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে মূল্যবান। কিন্তু তাঁর যথার্থ পরিচিতি, যা মনের মধ্যে ছাপ ফেলে তাঁর উপরিউল্লিখিত চারখানি গ্রন্থ পাঠ করে, তার মূল্য নিরূপণ করা সহজ নয়। সুপণ্ডিত লেখক শুধু তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করেন নি, প্রকাশ করেছেন রস। বস্তুত এমন ধরনের সরস প্রবন্ধ কদাচিৎ আজকাল চোখে পড়ে। ভাষাভঙ্গিমায় তিনি প্রাচীন, কিন্তু ভাববিন্যাস ভঙ্গিমায় নন বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক দিয়েও নন। প্রাচীন বিষয়বস্তুতে যে নূতন আলোকসম্পাত করা যায় তার প্রমাণ তাঁর মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব গ্রন্থখানি। মহাভারতের একাদশটি বিভিন্ন প্রধান চরিত্র নিয়ে তিনি যে সারগর্ভ আলোচনার পত্তন করেছেন, তার মধ্যে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি এবং স্বকীয় চিন্তাধারার সম্যক বিকাশ ঘটেছে এবং তা অনুধাবন করে পাঠক উন্নীত হন এক আনন্দলোকে। 'হিন্দুধর্ম' গ্রন্থে হিন্দুধর্মের নিরস জয়গাথা নেই, সেখানেও লেখকের অপূর্ব বিশ্লেষণ এবং নূতনতর চিন্তাধারায় অবগাহন করে পাঠকের রস-পিপাসার তৃপ্তি ঘটে। 'বিচিত্র' ও 'বিবিধ' প্রবন্ধ গ্রন্থদ্বয়ে ছোট ছোট সরস প্রবন্ধের যে সঞ্চয়ন পড়লাম, তা এক কথায় চমৎকার। 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' ও 'রাজনৈতিক হইবার সাধ' নিবন্ধ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' এবং 'কৃষিপ্রসঙ্গ' নিবন্ধ দুটিও যথেষ্ট মূল্যবান। ২২৯।৫৯, ২২৬।৫৯, ২২৮।৫৯, ২২৪।৫৯, ২২৫।৫৯।

ভ্রমণ কাহিনী

তরুণ তুর্কী—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

স্বর্গত রামনাথ বিশ্বাস এ যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারী ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিছক ভ্রমণের জন্য ছিল না। তার পেছনে ছিল ঐতিহাসিক চেতনা, দরিদ্র ও লাঞ্ছিতদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। তাই তাঁর ভ্রমণকাহিনী রাজরাজাদের সঙ্গে মেলামেশাতেই পর্যবেসিত নয়। সেখানে পাই বিংশ শতাব্দীর জনজাগরণ সম্পর্কিত একটি সাক্ষাৎদৃষ্ট ইতিহাস। আবার ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রামনাথ বিশ্বাস স্বদেশ ও স্বজাতির দৌত্যের কাজ করেছেন, আত্ম-মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তরুণতুর্কী পড়ে এসব কথাই মনে হলো। ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে গেছেন আদানার পথে, অন্ধকার পথ থেকে অন্ধকার বুকে। তারপর ইস্তাম্বুল, আর্দেন। আর এই সব জায়গার নিপীড়িত মানুষ, তাদের উত্থান পতনের কথা বলেছেন তিনি। তরুণ তুর্কীর জীবন্ত ছবি এইভাবেই তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। লেখকের অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হওয়া উচিত—ভূমিকায় লিখিত প্রকাশকের সঙ্গে আমরাও একমত। অবশ্য, স্বয়ং প্রকাশকই এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমরা আনন্দিত হব। ৩৬১।৫৯

কিশোর সাহিত্য

স্বপ্নের দেশে—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—রামকৃষ্ণ প্রকাশনী, ৩৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা—৯। মূল্যঃ দেড় টাকা।

পাতালপুরীর এক অভিনব কাল্পনিক পরিবেশে লেখক দুটি কিশোরকে নিয়ে গিয়ে সেখানকার রহস্যঘন আবহাওয়ার মধ্যে 'বঙ্গাল' দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে চেষ্টা করেছেন। ঘুমের ঘোরে দুটি কিশোর-মনের এক রহস্যময় জগতে বিচরণ, সেখানকার কাল্পনিক অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয় এবং ঘটনা সংঘাতময় অভিযান ইত্যাদির আজগুবী পরিকল্পনা কিশোরহৃদয়ে কৌতূহলের শিহরণ আনবে। বর্তমান গ্রন্থটি কিশোরোপযোগী অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী; পটভূমি রচনা মন্দ নয়, কাহিনীর একটি নিজস্ব গতি আছে; ছোটদের সেই স্বপ্নের দেশে যেতে ইচ্ছে করবে। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ অত্যন্ত সাধারণ। ২৭১।৫৯,

বাংলার ডাকাত—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (২য় খণ্ড)। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা—১২। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলার ডাকাতের আলোচ্য খণ্ডে আটারটি ডাকাতির সচিত্র গল্প স্থান পেয়েছে।

ঘটনাগুলো প্রত্যেকটিই সত্য। ইতিহাস, সরকারী প্রাচীন দলিলপত্র, বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-কলেক্টর, রাজকর্মচারী এবং দারোগা-পুলিসের বিবরণী থেকে সত্য কাহিনী সংগ্রহ করে সেগুলোই গল্পের ঢংয়ে বলে গেছেন লেখক। আর তাঁর সেই বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সজীব ও চমকপ্রদ। অপূর্ব গল্প বলার ভঙ্গীর জন্যই গল্পের একদিকে ডাকাতদের দুর্জয় সাহস, অমানুষিক শক্তি ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের উদারতা যেমন পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে, তেমনি আবার প্রতিরোধকারীদের অনমনীয় মনোবলের কাহিনীও মনকে নাড়া দেয়। সকলেরই ভালো লাগবে।

১১১।৫৯

অনুবাদ

শিল্পপতির আসন—ক্যামেরন হলি। অনুবাদক — যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—পার্ল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-১। দাম—এক টাকা।

ক্যামেরন হলি নিজে বড় ব্যবসাদার। তার উপন্যাস মার্কিন বড় ব্যবসা নিয়ে লেখা। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য, মার্কিন বড় ব্যবসায়ে আছে প্রচুর নাটকীয়তা, আর এই ব্যবসায়ে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রায়ই মানব-মিত্র, কল্যাণ-কর্মে নিবেদিত। লেখকের বুকের পাটা আছে মানতে হয়। কিন্তু 'লুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা', তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উছলে ওঠা আমাদের দেশে তো দূরের কথা, মার্কিন দেশেও এসেছে কিনা সন্দেহ। লেখকের প্রতিপাদ্য চুলোয় যাক, মুনশীয়ানায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই যে বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন মনে হতে পারে। লাঠিয়াল হলেই বাঁশুরিয়া হবে, এমন কোনো নিত্যসত্য নেই।

অনুবাদ সম্পর্কে নীরব থাকাই ভাল। তবে, প্রায় সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠা বইয়ের দাম মাত্র এক টাকা, অর্থাৎ ভয়ানক সস্তা। এটাই এই উপন্যাসের সপক্ষে একমাত্র জোরালো যুক্তি।

১০।৫৯

নাটক

ঝড়—জয়নামোহন বাগচী। প্রকাশক—বীরেন্দ্রমোহন বাগচী। চক্রবৈদ্যনাথ : নাটোর। দাম ২,

বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব নেই। প্রশান্তের সঙ্গে জয়ার পরিচয় ক্রমে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার স্তর পেরিয়ে প্রণয়ে পৌঁছয়। জয়ার দাদু উদারহৃদয় দুর্গাচরণ তাদের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রধান সহায়। কিন্তু ভাগ্যের কুটিল চক্রান্তে জয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় গেজেটেড অফিসার অমরেশের। প্রশান্ত তাকে ভুলতে পারে না। শেষাংশে অতি নাটকীয় ঘটনার মাঝে প্রশান্তকে বাঁচিয়ে জয়া আত্মহত্যা করে; ঠিক তখনি তার স্বামী অমরেশ এসে পৌঁছয় তাদের বাড়িতে। নাইট ক্লাবের দৃশ্য আছে, যেখানে প্রশান্তর বন্ধু পরিতোষ তাকে নিয়ে যায় জব্দ করার জন্যে। কিন্তু প্রশান্ত বেঁচে যায় পতিতা মোতিয়ালার মহত্ত্বে। নাটকখানিতে এমন অনেক দৃশ্য আছে—যেগুলি দর্শক সাধারণের সামনে অভিনয় করা কষ্টকর। তাছাড়া স্থানে স্থানে সংলাপ অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। নাট্যকারের কাছে আরো সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও সংযম আশা করি।

১৩৮।৫৯

শুধু ছায়া—পরেশ ধর। বিজুরি আখর, ৭, ফকির চক্রবর্তী লেন। কলিকাতা—৬; মূল্য—২·৫০ নয়া পয়সা।

দুটি অঙ্কে দুটি মাত্র দৃশ্যে এই নাটক লিখিত। চরিত্র সংখ্যাও খুব বেশি নয়। সাংবাদিক আদর্শবাদী নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক। সমীর সেন আধুনিক ফিল্ম গল্পলেখক, যিনি নিজের মতে লেখেন না, চাহিদামত

চরিত্র চিত্রণ করেন। সমেৎগলের সৃষ্ট চরিত্র, নায়ক দিলীপ, নায়িকা দীপা, তাদের পিতা যতীন, সুরেন উপনায়ক এবং তথা-কথিত ফিল্মফ্যান বিচিত্রবরণ--এরাই ছায়ারূপ ধারণ করে তাদের বক্তব্য ও মতামত পেশ করেছে। আধুনিক স্থূলে রুচি, মিথ্যাচার, বহিরাবরণ ও সাম্প্রতিক খ্যাতির মোহকে নাট্যকার তীব্র ব্যংগের কষাঘাতে নির্মমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কতটা অভিনয়োপযোগী হবে বলা যায় না, তবে পড়তে ভাল লাগবে এই নাটকখানি। তাছাড়া এটি সম্পূর্ণ নতুন আংগিকে লেখা একটি এক্সপেরিমেণ্টাল নাটক। শৌখিন নাট্যানুরাগীদের দৃষ্টি এই নাটকটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ১৫৫।৫৯

বিবিধ

খেলায় পড়া—লেখক শ্রী খেলোয়াড়। প্রকাশক শ্রীচণ্ডীচরণ দাশ অ্যাণ্ড কোম্পানি, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫০, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য—১·৫০ নয়া পয়সা।

ছড়া ও ছবির মাধ্যমে বর্ণপরিচয়ের পদ্ধতি নূতন নহে। তবে শ্রী খেলোয়াড় গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন খেলাধূলার মাধ্যমে বর্ণপরিচয়ের পাঠ শিশুদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অ, আ, ক, খ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষরের সংগে শিল্পী প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অংকিত রঙীন খেলার ছবি বইখানির প্রধান আকর্ষণ। বইখানি পড়িলে বর্ণপরিচয়ের সংগে সংগে শিশুরা পৃথিবীর নানারকমের খেলাধূলার নামের সংগেও পরিচিত হইতে পারিবে। ঈগল লিথোগ্রাফী হইতে আর্ট পেপারে ছাপা সুদৃশ্য বইখানি শিশুদের হাতে তুলিয়া দিবার মত একখানি পাঠ্য বই। ছাপা ঝকঝকে। প্রচ্ছদপটও রুচিকর।

হিন্দুরাষ্ট্রের রূপ-রেখা— শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী, ১৬২, বিপিনবিহারী গাংগুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দু' টাকা।

বর্তমান পুস্তকে লেখকের বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা-প্রসংগে কয়েকটি আলোচনা সংকলিত হয়েছে। লেখক রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং তিনি হিন্দু মহাসভার হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাসী। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন সময়কার লেখা সাতটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। লেখকের দৃষ্টির প্রসার আছে এবং তাঁর বক্তব্যে যুক্তিরও বিশেষ অসদ্ভাব নেই। 'স্বামীজী ও সাম্যবাদ' 'কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট ও হিন্দু মহাসভা', 'হিন্দু মহাসভার অর্থনীতি', 'মধ্যবিত্তের সমস্যা' ইত্যাদি আলোচনাগুলি

উল্লেখযোগ্য। প্রকাশক বলেছেন, 'পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনায় হিন্দুস্থানের যে রূপরেখা পরিস্ফুট—তাহাই ইহার বক্তব্য হওয়ায় পুস্তকের নাম হইয়াছে 'হিন্দু-রাষ্ট্রের রূপ-রেখা।' ১৫৪।৫৯

বিশ্বশান্তির সুর—শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য। প্রকাশক—রঞ্জিতকুমার মজুমদার, পি-২১, ভূপেন রায় রোড, কলিকাতা—৩৪। মূল্য দেড় টাকা।

পৃথিবীর বর্তমান জটিল আবহাওয়ায়, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে লেখক তাঁর কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে শান্তির বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন। বর্তমান শতাব্দী ও বর্তমান সভ্যতার হিংসাত্মক দিকের সমালোচনা করে তিনি মানুষে মানুষে আন্তর-প্রেম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন বর্তমান কাব্যগ্রন্থে। কবি জানিয়েছেন, বিশ্বমানবত্বই কবিতাগুলির মূল সুর। কবি শান্তিকামী এবং তাঁর এই উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। স্বল্প পরিসরে অসংখ্য ছন্দোবন্ধ পদ্যের মধ্য দিয়ে তিনি শান্তির আবেদন জানিয়েছেন। কবিতাবলীর অন্যদিক প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে আঙ্গিকের দিক থেকে কবিকে আরো সচেতন এবং যত্নবান হতে হবে; স্থানে স্থানে ছন্দের গুরুতর ত্রুটি এবং অজস্র ছাপার ভুল রয়েছে। আর একটি কথাঃ মুখবন্ধে কবি 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই বিশেষ মহাবাণীটি মহাত্মা কবীরের প্রবাদ বচন বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু যতদূর স্মরণ হয়, এই বিশেষ পদটি বাঙলা কাব্য-পাঠকের নিকট চণ্ডীদাসের মহাবাণী বলেই বিশেষ পরিচিত। এছাড়া মুখবন্ধের প্রথম অংশটি চলিত ভাষায় এবং পরবর্তী প্যারাগ্রাফ সাধুভাষায় লেখার সার্থকতা কি? ২৩৪।৫৯,

শিক্ষার ইতিহাস—অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩·২৫ নয়া পয়সা।

এই পুস্তকের লেখক হচ্ছেন বাণীপুর জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজের লেকচারার। স্বভাবতই পুস্তকটি পরীক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই লিখিত। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাবাহিক ইতিহাস এই পুস্তকে রয়েছে। প্রত্যেকটি আলোচনাই তথ্যবহুল। প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে ছাত্রোপযোগী প্রশ্নাবলী সংযুক্ত হয়েছে। ৩৩২।৫৯

তৈসার তীরের হারচা-উ—নলিনীকান্ত চক্রবর্তী; প্রকাশক—সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য, শান্তিনিকেতন; মূল্য চার আনা।

লেখক একবার পার্বত্য ত্রিপুরাধীন শিলাবাড়ি নামক স্থানে গিয়েছিলেন। শিলাবাড়িতে রিয়ং নামক একটি পার্বত্যজাতি বাস করে। রিয়ংদের মধ্যে দিন কয়েক বাস করে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানার সুযোগ লেখক পেয়েছিলেন। তারই ভিত্তিতে 'তৈসার তীরের হারচা-উ' (ছড়ার তীরের গান) রচিত হয়েছে। রচনাটি কিন্তু সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। কল্পনাপ্রসূত হলেও, রিয়াংদের জীবনের ছোট্ট একটি সুন্দর ছবি এতে ফুটে উঠেছে। ৯৮।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

তিব্বতের যাত্রাগান—গুরুদাস সরকার।
পরিবর্তন—মনোরঞ্জন ঘোষ। **নাটারূপ**—গিরি চট্টোপাধ্যায়।
বাঙলা কবিতা—জিতু গুপ্ত সম্পাদিত।
আগমনী—দিলওয়ার হোসেন।
নাজমা বেগম—শ্রীবাসব।

কবি তরু দত্ত—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য।
সামান্য ক্ষতি—অমল্যকুমার চক্রবর্তী।
My Mother—Anil Kumar Mukherjee

হাসিতে খুসিতে টৈটুম্বুর

চন্দ্রশেখর

রঙ্গ-রস বাস্তবের বিপরীত পথ ধরে চললেও দোষের হয় না যদি তা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে অর্থাৎ লোক হাসাতে পারে। যুবচিত্রের "পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট" এই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছে।

নারীই চিরকাল পুরুষের কাছে আপন ভাগ্যজয়ের অধিকার চেয়ে এসেছে। কিন্তু এই ছবির কাহিনীতে পুরুষের ভাগ্যজয়ের চাবি-কাঠি নারীর হাতে। ছবির নারী-শাসিত রাজ্যে যে পুরুষটি তার মেয়েলী নামের জোরে উন্নতির ছাড়পত্র পেয়েছে তার নাম রমাপদ গুপ্ত। খবরের কাগজের স্তম্ভে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে সে বন্ধু জয়ের পরামর্শে দরখাস্ত পাঠাল। কোন এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট খুঁজছেন। পুরুষের আবেদন গ্রাহ্য, তবে অগ্রাধিকার মহিলাদের। রমাপদ তার নামটিকে "পদ"-চ্যুত করে অর্থাৎ রমা গুপ্ত লিখে ইংরেজীতে দরখাস্ত পাঠাল।

এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃত্ব যার হাতে তার নাম রুবাণী সেন। কুমারী যুবতী রুবাণী সেনের বাবা তাঁর এই একমাত্র সন্তানের উপর যতটা নির্ভর করতে পারেন অনেক বাবা তাঁর ছেলের উপরও ততটা নির্ভর করতে পারেন না। রুবাণী সেনের প্রতিষ্ঠানে পুরুষ কর্মচারী বলতে একজনও নেই। পুরুষকে চাকরি দিতেও সে নারাজ। তাই "ইন্টারভিউ"র জন্য সে যাদের ডেকে পাঠাল তাদের মধ্যে রমা গুপ্ত'ও ছিল—যে-নামটিকে রুবাণী ইংরেজীতে ধরে নিয়েছিল "রমা গুপ্তা"। যখন দেখল রমা গুপ্ত পুরুষ তখন রুবাণীর পিছোবার পথ নেই। যোগ্যতায় রমাপদ অন্যসব মেয়ে প্রার্থীদের হারিয়ে দিল। অতএব অগত্যা বাবার পরামর্শে এবং নিজের প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষার জন্যে রমাপদকেই নিযুক্ত করতে হল তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পদে।

রুবাণীর নারী-রাজ্যে প্রথম ও অদ্বিতীয় এই পুরুষটির পদার্পণে বেশ কিছুটা আলোড়ন দেখা যায়। রুবাণী অগত্যা রমাপদকে নিয়ে আসে নিজের খাস কামরায়। চাকরির সর্ত অনুযায়ী রমাপদ রুবাণীর বাড়িতে স্থান পেয়েছিল আগেই। দিনে দিনে রমাপদ রুবাণীর ব্যবসায়িক কাজে অপরিহার্য হয়ে ওঠে—হয়তো বুঝি অনেকটা তার নিজের জীবনেও। এই সময়ে কবি মিনতি মিত্র নামের একটি মেয়ের সঙ্গে রুবাণী রমাপদ'র নিকট-সম্পর্ক আবিষ্কার করে। সে মরীয়া হয়ে ওঠে তাকে নিজের কাছে মনিবের কর্তৃত্ব দিয়ে বেঁধে রাখতে। কর্তৃত্বের অন্তরালে হৃদয়ের যে আকুতি রমাপদ তার সন্ধান তখনও পায়নি। এই অনুরাগের স্পর্শ সে পাবার আগেই রুবাণী জানতে পারে যে মিনতি মিত্র রমাপদরই মেয়েলী ছদ্মনাম। রুবাণীর অন্তরে দয়িতের শূন্যপদে তার একান্ত সচিবের পদোন্নতিতে ঘটে চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তি।

কষ্টকল্পিত কাহিনীর চিত্ররূপও সুখ-ভোগ্য হয় যদি ছবির কৌতুক রসটি দর্শকদের আকৃষ্ট রাখতে পারে। চিত্রকর পরিচালিত এই ছবিটির সেই আকর্ষণী শক্তি আছে। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের অনুবীক্ষণে ছবির কাহিনী এবং তার বিন্যাসের অনেক অসংগতি, ছোটখাটো ত্রুটি ও গোঁজামিল ধরা পড়বে। তবুও ছবিটির রংগ-রসিকতা, নানা মজার পরিস্থিতি ও প্রণয়-রস দর্শকদের হাসির খোরাক জোগায় ও দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে রাখে। সে-দিক দিয়ে আমুদে ছবি হিসাবে যুবচিত্রের এই প্রথম নিবেদন ব্যর্থ নয়।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটির মুখ্য পুরুষ-চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কাহিনীর রংগ-রসিকতার অংশে তিনি তাঁর সুনাম রক্ষা করেছেন। কিন্তু যেখানেই তিনি কৌতুক-বর্জিত ভাবের রূপ দিয়েছেন সেখানেই তাঁর অভিনয় কৃত্রিম মনে হয়েছে। রুবাণীর চরিত্রটির রূপদান করেছেন রুমা গাংগুলী। "সমর" কথাচিত্রের পর বাংলা ছবিতে তাঁর এই প্রথম আবির্ভাব অভিনন্দনযোগ্য। কারণ তাঁর মধ্যে একজন কৃতী অভিনেত্রীর পরিচয় পাওয়া গেল এই ছবিতে। তাঁর বাচনভংগী, চলাফেরা ও হাব-ভাবের কমনীয়তা দর্শকদের ভালো লাগবে। এই চরিত্রে তাঁর প্রণয়ের অভিব্যক্তি ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররূপে ব্যক্তিত্ব-আরোপ প্রশংসনীয়। রমাপদর বন্ধুর চরিত্রটিকে

কল্লোল ফিল্মসের "বাইশে শ্রাবণ" ছবির নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়।

শ্রী এন সি এ প্রোডাকশন্সের "হাসপাতাল" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও অশোককুমার

আকর্ষণীয় করে তুলেছেন তরুণকুমার তাঁর সাবলীল ও স্বচ্ছল অভিনয়ে। একটি মাসিক কাগজের সম্পাদকের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তীর রঙ্গ-রসিকতা খুবই উপভোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, অমর মল্লিক, রেণুকা রায়, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি।

নচিকেতা ঘোষের সংগীত-পরিচালনায় ছবিটি সমৃদ্ধ। ছবির প্রায় সব কটি গানই সুন্দর সুরারোপিত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুগীত। আলোকচিত্র পরিচালনায় রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং চিত্রগ্রহণে দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দু রায় ও সোনা মুখোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে দুর্গাদাস মিত্র ও দেবেশ ঘোষ, শিল্প-নির্দেশে কার্তিক বসু ও সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ প্রশংসনীয়। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক ও আঙ্গিক গঠন পরিচ্ছন্ন।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

কল্পনাপ্রসূত একটি অলৌকিক কাহিনীর ভিত্তিতে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে মিরাকল্স্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর "মর্তের মর্ত্যে আগমন' ছবিতে।

পরলোকের নরকবাসীদের মধ্যে একদা লঘু পাপে গুরুদণ্ড নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভের নায়ক বিশু, এবং তার সহকর্মী ললিতা। তাদের নেতৃত্বে আন্দোলন ক্রমশ গণ-অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। একদিন রাত্রে অগণিত নরকবাসী যমালয়ের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে মর্ত্যে ফিরে আসে।

কিন্তু তাদের প্রিয় পৃথিবীকে তারা ফিরে পেল না। প্রিয়া দেখল তার প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে নতুন প্রেয়সী, স্ত্রী দেখল স্বামী তার নববধূর রূপে-প্রেমে মুগ্ধ, স্বামী দেখল তার আধুনিকা স্ত্রী দয়িতের শূন্য স্থানটিকে পূর্ণ করে তুলেছে বিবাহ বন্ধনে আর একটি পুরুষকে বেঁধে, প্রবীণ সংগীত সাধক পেলেন নতুনদিনের পথভ্রষ্ট কলাকারদের কাছে অবমাননা, বন্ধু প্রবঞ্চিত হল বন্ধুর কাছে, শিশুর দল দেখল তাদের বাবা-মায়েরা নতুন সন্তানদের পেয়ে বিগতদের ভুলেছে। আর বৃদ্ধ পিতা দেখলেন পুত্র-পুত্রবধূর হাতে বৃদ্ধা মায়ের লাঞ্ছনা। মৃত্যুর আগে তারা যে পৃথিবীকে জানত, এ যেন সে পৃথিবী নয়। তাই এ পৃথিবীতে থাকার চাইতে নরকবাসও শ্রেয় এই বিশ্বাসে সুখের নরকে তারা ফিরে গেল।

আধুনিক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পাপ, উচ্ছৃংখলতা ও উন্নাসিকতা বাসা বেঁধেছে, তারই প্রতি তীব্র কটাক্ষ রয়েছে ছবির কাহিনীতে। এই শ্লেষের সঙ্গে মেশানো হয়েছে কৌতুকরস। ফলে ছবির কয়েকটি টুকরো টুকরো ঘটনা ও উপাখ্যান উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি আধুনিক গানের জলসা, ললিতার স্বামীর নবপরিণয়, বিশুর সঙ্গে তার স্ত্রীর সাক্ষাৎ ও বন্ধু-প্রবঞ্চিত মনোহরের কাহিনী। ছবির নাট্যরস কিন্তু সামগ্রিকভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি, এবং কাহিনীর বিন্যাসে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে অনেক।

অভিনয়ের দিক দিয়ে যাঁরা সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, তপতী ঘোষ, শিপ্রা সাহা ও জহর রায়। আদর্শবাদী সংগীতশিল্পীর চরিত্রে 'তুলসী লাহিড়ী ও বন্ধু-প্রবঞ্চিত মনোহরবেশী তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় প্রাণবন্ত।

ছায়াচিত্র পরিষদের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি "রাজা সাজা"-র একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি। বিকাশ রায় ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক

অল্পক্ষণের জন্য দর্শকের মনে দাগ কেটে যায় ললিতার নতুন সতীন ও স্বামীর চরিত্রে যথাক্রমে তপতী ঘোষ ও জহর রায়ের কৌতুকপূর্ণ অভিনয়। বিশুর স্ত্রীর চরিত্রে শিপ্রা সাহার অভিনয় প্রশংসনীয়। বিশুরূপী ভানু বন্দোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দেবার যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করেছেন। ললিতা-বেশিনী বাসবী নন্দীর অভিনয় চরিত্রানুগ। জয়শ্রী সেন নৃত্যগীতে পটিয়সী এক আধুনিক "তারকা"-র ভূমিকায় দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দোপাধ্যায় ও দীপিকা দাশ।

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন গৌর শী। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সুরজনকার কাজই মামুলি ধরনের। ছবির কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। তবে আবহ সংগীতে এর যুগ্ম-সুরকার মন্মথ দাস ও অজিত মিত্র আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ চলনসই।

চিত্রালোচনা

"কংগন", "সাট্টা বাজার" ও "ভাংরা"—এই তিনটি নতুন হিন্দী ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছে এই সপ্তাহে।

একদা "কংগন" নামে বম্বে টকিজের যে ছবিটি সারা ভারতে দর্শক-প্রশংসিত হয়েছিল, তার সঙ্গে উমাশঙ্কর প্রোডাকসন্সের "কংগন"-এর কোন সম্পর্ক নেই। দুটি ছবির মধ্যে একমাত্র মিল, অশোককুমার দুটিতেই নায়িকার হাতে কংকন পরাবার অধিকার লাভ করেছেন—অর্থাৎ দুটি ছবির তিনিই নায়ক। তবে লীলা চিটনীশের বদলে নিরূপা রায় এবার তাঁর সাথী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পূর্ণিমা, নাজির হোসেন, তিওয়ারী, ভগবান, হেলেন, নিশি, নাজ, ডেইজি ইরাণী প্রভৃতি। নানাভাই ভাট ছবিটি পরিচালনা করেছেন, সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব চিত্রগুপ্তের।

নাগিনা ফিল্মসের "সাট্টা বাজার" এক জুয়াড়ীর অবস্থাবিপর্যয়ের কাহিনী। রবীন্দ্র দাভে এর প্রযোজক ও পরিচালক। মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন মীনাকুমারী, বলরাজ সাহনী, জনি ওয়াকার, সুরেশ, বিজয়া চৌধুরী, সবিতা চ্যাটার্জি প্রভৃতি। কল্যাণজী আনন্দজীর রচিত সুর ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

পাঞ্জাবের ভাংরা নাচ আজ সর্বত্র সমাদৃত। গোল্ডেন মুভিজের "ভাংরা" তাকেই উপজীব্য করে তোলা। নিশি, সুন্দর, মজনু প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকা-লিপি। যুগলকিশোর ও হংসরাজ বেহ্‌ল যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

• • •

হালের বাংলা ছবি জনপ্রিয়তায় হিন্দী ছবিকে হার মানিয়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ছবির দীর্ঘদিনব্যাপী প্রদর্শনীতে। শ্রীমতী পিকচার্সের "ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি" তিনটি চিত্রগৃহে এক

নয়া ফিল্মসের হিন্দী ছবি "বোম্বাই-কা-বাবু"র নায়িকা অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন

সঙ্গে দশ সপ্তাহ ধরে চলছে। গৌতম চিত্রের "অবাক পৃথিবী", নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের "রাতের অন্ধকারে" এবং চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ"— এদের প্রত্যেকটি দর্শক সমাদর লাভ করেছে।

এদের তুলনায় অধিকাংশ হিন্দী ছবিকে অকাল মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। গড়ে হিন্দী ছবির আয়ু এক বা দু' সপ্তাহের বেশী নয়। এক সঙ্গে অনেকগুলি সিনেমায় মুক্তি দিয়ে তাই স্বল্পায়ুর ক্ষতি পূরণ করবার চেষ্টা চলে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন জেমিনির "পয়গম" আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে।

• • •

সত্যজিৎ রায়ের "দেবী", অগ্রদূত পরিচালিত "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন", ইস্টার্ন ফিল্ম সার্কিটের "ক্ষুধিত পাষাণ", জে এম পিকচার্সের "উত্তর মেঘ" এবং আরো দু'একটি ছবি ছাড়া বাংলা ছবির নির্মাণ ক্ষেত্রে বর্তমানে ভাঁটার টান দেখা দিয়েছে। কেবলমাত্র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন ছবির সংখ্যা অনেক। অনেক ছবির কাজ আবার কিছুদূর এগিয়ে মাঝপথে স্থগিত রয়েছে। ফিল্ম ব্যবসায়ের পক্ষে এটা সুলক্ষণ নয়।

ডিসেম্বরের মধ্যেই যাদের মুক্তি পাবার কথা তাদের মধ্যে রয়েছে "ক্ষণিকের অতিথি", "রাজা সাজা" ও "মায়ামৃগ"। জানুয়ারীর গোড়াতেই আসছে "কুহক" এবং তারপর পর্যায়ক্রমে "বাইশে শ্রাবণ", "আকাশ পাতাল", "তেরো নদীর পারে", "যাত্রী" প্রভৃতি।

এদিকে অনেকগুলি নতুন ছবির তোড়-জোড় চলছে। ইন্দ্রানী প্রোডাকশন্স নামে একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান জহর রায়কে নায়ক করে একটি হাসিকান্নায়-ভরা নতুন

ছবির কাজ শুরু করবেন এই মাসেই। সন্তোষ গুহরায় ছবিটি পরিচালনা করবেন। অগ্রগামীর পরবর্তী ছবি হবে তারাশঙ্করের "কান্না" অবলম্বনে। পরিচালক অসিত সেন রবীন্দ্রনাথের "জীবিত ও মৃত" গল্পটিকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করবেন নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের তরফে।

• • • •

ভারতী কলামন্দিরের হিন্দী ছবি "দেবর্ষি নারদ" নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সমাপ্তির মুখে। কলাকার সুরজ ছবিটি পরিচালনা করছেন। এর ভূমিকালিপিতে আছেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত অভিনেতা জীবন, কুমারী রাণী, বীণা চাঁদ, তপতী ঘোষ, রাজকুমার, নাগেশ এবং আরো অনেকে। দক্ষিণ ভারতের সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সরোজা দেবীকে এই ছবির রাসলীলা নৃত্যদৃশ্যে দেখা যাবে। এই অংশটি গেভাকলারে গ্রহণ করা হচ্ছে। গন্ধর্ব চরিত্রে প্রখ্যাত গায়ক চিন্ময় লাহিড়ীর উচ্চাঙ্গ সংগীত ছবিটির অন্যতম সম্পদ। সুরসৃষ্টি করেছেন ভি বালসারা।

লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসব

প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—এই উৎসবটি ইউরোপের সর্বশেষ উৎসব; এবং এর উদ্দেশ্য হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলির প্রদর্শন ব্যবস্থা করা যাতে লণ্ডনবাসীরা এই সুযোগে সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

এই বৎসর লণ্ডনের উৎসবে ২৪টি কাহিনী চিত্র, ৪৩টি কার্টুন এবং ৪৭টি স্বল্প দীর্ঘ চিত্র প্রদর্শিত হয়, এবং তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এস বি ফিল্মসের "ক্ষণিকের অতিথি"র একটি দৃশ্যে নির্মলকুমার ও শ্রীমান তরুণ।

আন্তর্জাতিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা সম্পর্কে জোহান স্মিট এওয়ার্ড নামে যে পুরস্কার রয়েছে তা এই বছর চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পুরস্কার লাভ করেন টি-ই-বি-ক্লার্ক তাঁর "ক্লুজেড" চিত্রের জন্য; দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন ম্যাকগ্রেগর আর্কট তাঁর "থ্রু বি বাম্বু কার্টেন" চিত্রের জন্য; তৃতীয়টি প্রদান করা হয় দুজনকে—ফিলিপ ডোমেলান এবং রালফ দা পোমেরাই-কে। তাঁরা যে ছবির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেন তা হল যথাক্রমে "মিঃ কনট্ অ্যান্ড সন" এবং "ফেয়ারওয়েল দি প্লিউমড্ ট্রুপ"।

আরও দুটি পুরস্কার হল রিচার্ড উইনিংটন এওয়ার্ড—একজন ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সমালোচকের স্মৃতি রক্ষার্থে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়; এবং সাদারল্যান্ড ট্রফি—এটি ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পৃষ্ঠপোষক ডিউক অব সাদারল্যান্ডের দান। প্রথমটি প্রদান করা হয় গত ১২ মাসে ব্রিটেনে প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসাবে বিবেচিত চিত্রটিকে এবং দ্বিতীয়টি প্রদান করা হয় ইন্সটিটিউট কর্তৃক নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রযোজককে। সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" শেষোক্ত পুরস্কারটি পেয়েছেন—এ খবর আগেই বেরিয়েছে।

নিম্নলিখিত চিত্রগুলি এই বৎসর অন্যান্য পুরস্কার লাভ করে: জাপানী চিত্র আকিরা কুরোসয়ার "দি হিডন্ ফোর্ট্রেস"; ফরাসী চিত্র ফ্রাঁসোয়া ট্রুফট্-এর "লে কোয়াত্রে সেন্টস কুপস্"; যুগোস্লাভ চিত্র ভেলজিকো বুলাজিক-এর "ট্রেন উইদাউট এ টাইম টেবল" এবং লুই বুনেল-এর মেক্সিকান ভাষার চিত্র "নাজারিন" ও ফরাসী পরিচালক মার্শেল কামুর ব্রেজিলিয়ান ভাষার চিত্র "অর্ফিউ নেগ্রো"।

জয়শ্রী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী"র দুটি প্রধান চরিত্রে ছবি বিশ্বাস ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

নাট্যাভিনয়

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর কলিকাতাবাসী একজন রুশীয় ভদ্রলোক—তাঁর নাম হেরাসিম লেবেডফ—এখন যেখানে এজরা স্ট্রীট সেইখানে প্রথম বাংলা রঙ্গালয়ের পত্তন করেন। তাঁরই লেখা দুখানি বাংলা প্রহসন এই রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। ঐ দিনটির স্মরণে গত ২৭শে নভেম্বর লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারে একটি স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ১৬৪ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ঐ সভায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশ ও লেবেডফ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনায় যোগ দেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন রায়, গোপাল হালদার প্রভৃতি।

• • •

নতুন নাটক প্রস্তুতির জন্যে মিনার্ভা থিয়েটার তিন সপ্তাহ তাঁদের অভিনয় বন্ধ রেখেছেন। যে পটভূমিকায় নতুন নাটকের কাহিনী তা বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভূতপূর্ব বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই পটভূমিকাকে যথাযথ রূপ দেবার জন্যে পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক ও কলাকুশলীর একটি দল সম্প্রতি কয়েকটি বিশেষ স্থান পরিভ্রমণ করে এসেছেন। বড়দিনের সময়ে নতুন নাটকটি খোলা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রঙমহলও বড়দিনের সময়ে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পেয়ালা কফি' নামক একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবেন। বর্তমানে তার মহলা চলছে।

• • •

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর, রবিবার, সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে দক্ষিণীর নৃত্যবিভাগের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। নৃত্যাংশ পরিচালনা করবেন গোপালকৃষ্ণ মেনন ও আদিত্য সেনা রাজকুমার। রবীন্দ্র সঙ্গীতাংশের তত্ত্বাবধান করবেন অমল নাগ। অনুষ্ঠানে দক্ষিণীর অর্ধশতাধিক শিল্পী যোগদান করবেন।

আগামী ৯ই ডিসেম্বর মহিলা ভারতীর কৃষ্টি ও কলা বিভাগের উদ্যোগে স্টার রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' অভিনীত হবে। এই নাটকে স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করবেন মহিলা ভারতীর সদস্যারা।

গত ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায়, ৩৭, পরাশর রোডস্থিত ভবনে গীতি তীর্থ কর্তৃক এক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সুরসাগর হিমাংশু দত্ত কর্তৃক সুর-সংযোজিত কয়েকটি গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুনন্দা সেন, গীতাঞ্জলি সেনগুপ্ত, গৌরী দাশগুপ্ত, জয়া সুব্রহ্মণ্যম, চম্পা মুখোপাধ্যায়, তপতী গুহ, রুবি রায়চৌধুরী ও পূর্ণা চাকী। পরিচালনায় ছিলেন রথীন চৌধুরী।

গত ৩রা নভেম্বর হোটেল সেসিলে জহর রায়ের পরিচালনায় প্রমথনাথ বিশী রচিত 'ঘৃতং পিবেৎ' মঞ্চস্থ হয়। সুগায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামলী গোস্বামী, কানুপ্রিয়া গোস্বামী প্রভৃতি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। রেখা ভট্টাচার্যের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

শ্রেষ্ঠের সম্মান

গত রবিবার রূপবাণী চিত্রগৃহে জনপ্রিয় সিনেমা-পত্রিকা "উল্টোরথ"-এর পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। "উল্টোরথ"-এর পাঠক-পাঠিকাদের ভোটে নির্বাচিত

১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্র শিল্পী, কলাকুশলী, পরিচালক, সংগীত-পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার ও মঞ্চাভিনেত্রীকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি অজিত বসু এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। অজিত বসু তাঁর ভাষণে বাংলা ছবির ক্রমবর্ধমান গৌরবের কথা উল্লেখ করেন এবং এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। প্রধান অতিথি অহীন্দ্র চৌধুরী চলচ্চিত্র শিল্প ও শিল্পীদের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রবেশপত্র-বিক্রয়লব্ধ মোট ১০০২, টাকা "উল্টোরথ" কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতি সভাপতির বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করা হয়। এই উৎসবের বিচিত্রানুষ্ঠানে শহরের প্রখ্যাত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন এবং লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ "টুয়েলফথ নাইট"-এর বঙ্গানুবাদ "দ্বাদশ রজনী" মঞ্চস্থ করেন।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

প্রত্যেক বছর চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় সম্মানের অঙ্গ হিসাবে যে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে তার সঙ্গে এবার থেকে আরও দুটি পুরস্কার যোগ করা হল। এ-বছর থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক ভারতীয় ছবিকে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও শ্রেষ্ঠ ফিল্ম স্ট্রিপকে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক দেওয়া হবে। এই শাখার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছবিগুলিকেও সর্বভারতীয় মানপত্রে ভূষিত করা হবে। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষামূলক ছবির প্রযোজক ও পরিচালককে যথাক্রমে নগদ ৪,০০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির নির্বাচন আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই সমাধা হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ধার্য করা হয়েছে ৭ই জানুয়ারী (১৯৬০ ইং)।

চিঠিপত্র

"নৃত্যের তালে তালে"

মহাশয়,

২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় "নৃত্যের তালে তালে"র সমালোচনা পড়লাম। ১৫ই নবেম্বর সকালের শোয়ে ছবিটি দেখে এলাম। (দিল্লিতে বাংলা ছবি আসে গরুর গাড়িতে ঝিমুতে ঝিমুতে। এ ছবিটি সাত তাড়াতাড়ি উড়ো জাহাজে এসেছে মনে হয়!)

সমালোচক লিখেছেন—"সুধীরবন্ধু পরিচালিত এবং তাঁরই রচিত কাহিনী অবলম্বনে তৈরি এ ছবির কাহিনীতে চমক আছে।"

সে চমক কিন্তু কোন নতুনত্বের নয়। নয় এমনটি আর দেখিনি গোছের। কাহিনীর চমক যা আছে সেটা সুধীরবন্ধুর মৌলিক কৃতিত্ব নয়। হিন্দী ছবি "নিউদিল্লি" ভোল পালটে "নৃত্যেরই তালে তালে" কথকের ছন্দে নেচে গেছে। "নিউদিল্লি" আবার ছিল দিল্লির নাট্যকার মিঃ আনন্দের মঞ্চ সফল নাটক "হ্যম্ হিন্দুস্থানী"র নকল। এ নিয়ে বছর কয়েক আগে কপিরাইটের দায়ে মামলা হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখ হয়, বাংলা সিনেমা ও সাহিত্যে আজকাল অবাধে পরস্ব অপহরণ চলছে বলে। ধরব কাকে? ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

এর একমাত্র প্রতিকার আছে শুধু সতর্ক দর্শক ও পাঠকদের হাতে। তা না হলে মৌলিকত্ব অচিরে দেশান্তরী হবে। যদুর কৃতিত্ব মধু আত্মসাৎ করে রাতারাতি বাজারে নাম কিনবে। সৃষ্টি হবে কাক বন্ধ্যা।

ইতি—পুলক দত্ত, বিনয়নগর, নিউদিল্লি।

'অবাক পৃথিবী' সম্বন্ধে

মহাশয়,—বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'অবাক পৃথিবী'র চলচ্চিত্রায়ণের পর এর নামকরণ ও আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে দু' একটা মন্তব্য করবার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলুম

হিন্দী ছবি "আপনা ঘর"-এর প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে কুমারী নন্দা

না। 'অবাক পৃথিবী' হুগোর 'লা মিজারেবল'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘটনা-বিন্যাসে (বিশেষ করে শেষাংশে) একটু নূতনত্ব থাকলেও মূল বক্তব্য ও তার প্রকাশ-ভঙ্গীমায় 'অবাক পৃথিবী' হুগোর অমর সৃষ্টির অনুকরণ মাত্র। এই বহুপঠিত গ্রন্থের সংগে 'অবাক পৃথিবী'-র মিল বড়ই চোখে লাগে। 'অবাক পৃথিবী'র অর্জুন হুগোর জাঁ ভালজার প্রতিচ্ছবি। 'লা মিজারেবল'-এর মূলকথা সমাজ ও মানুষ দোষীর দোষ-সংশোধনে সহায়তা করা দূরে থাকুক তাকে অপরাধের পঙ্কিল আবর্তে চিরনিমজ্জিত থাকতে সাহায্য করে মাত্র। 'অবাক পৃথিবী'র মূলকথাও বোধহয় তাই। তাছাড়া ঘটনা-সংস্থাপনের কোন কোন স্থানে (যেমন একটা অপরাধ কিভাবে পরবর্তী অপরাধের সাহায্যকারী হয় বা অর্জুনের দোষ-সংশোধনের জন্য খৃষ্টান ধর্মযাজকের চেষ্টা ('লা মিজারেবল' এর বিশপ) হুগোর সংগে বিধায়কবাবুর গল্পের সাদৃশ্য বড়ই প্রকট। যদিও অপরাধপ্রবণতা এবং অপরাধ-সংশোধনে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কোন বিশেষ কালের বা দেশের সমস্যা নয় এবং এই সমস্যাকে ভিত্তি করে উপন্যাস-রচনা বা চলচ্চিত্রায়ণ খুবই সময়োপযোগী ও আবেদনশীল, তবু বিধায়কবাবুর গল্পের ঘটনাবিন্যাস একটু অন্যরকম হলেই বোধ হয় আরও আবেদনময় হয়ে উঠত—বিশেষ করে যাঁরা হুগোর গল্প জানেন তাঁদের কাছে। এক্ষেত্রে কিছুদিন আগে শান্তারামের তোলা একটি হিন্দী ছবি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

পরিশেষে এর নামকরণ সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলব। 'অবাক পৃথিবী' নামে সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটা কবিতা আছে। কবিতাটির শুধু নামেই নয় ভাবেও আমাদের আলোচিত 'অবাক পৃথিবী'র সংগে মিল আছে। কবিতাটির দুটো লাইন উদ্ধৃত করলেই বোধ হয় বক্তব্য পরিষ্কার হবে। 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে আমায়—জন্মেই শুধু পদাঘাতই শুধু পেলাম'—এটা কি বিধায়কবাবুর গল্পের অর্জুনের মনের কথা নয়? বিধায়কবাবু যে ধারণার ওপর ভিত্তি করে 'অবাক পৃথিবী'র নাম-করণ করেছেন তার সংগে সুকান্তর কবিতার ভাবের কি আশ্চর্য রকমের মিল নেই?

মন্তব্য দুটো নেহাত সাবজেকটিভ্, এর অবজেক্ট নয় বিধায়কবাবুকে কুন্ডীলকতা দোষে দুষ্ট করা। অবশ্য মনে হয় হুগোর গল্পের ও সুকান্তর কবিতার জনপ্রিয়তা জেনে বিধায়কবাবু ও'দুটোকে এড়িয়ে চললেই ভালো করতেন।—সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী।

বিদেশী সমাদরের মূল্যায়ন

মহাশয়,—লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে 'অপুর সংসারের' মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে পুনর্বার প্রমাণিত হল, মহৎশিল্পের আবেদন স্থানকালের ঊর্ধ্বে, সার্বজনীন। এ প্রসংগে গত ২৩শে আশ্বিনের 'দেশে' কাকলী বসু লিখিত 'আত্মপ্রত্যয়ের অভাব' শীর্ষক চিঠির বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

আমাদের শিল্পবস্তু সম্পর্কে বিদেশের শিল্পবেত্তাদের অভিমতকে অভ্রান্ত হিসেবে মেনে নেবনা—এ সম্পর্কে পত্রলেখিকার সংগে একমত হয়েও বলতে হচ্ছে যে, চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে এতটা প্রত্যয়নিষ্ঠ আমরা এখনই হতে পারি না। বাংলার নব চলচ্চিত্র-ধারার মৌলিকত্বকে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা না করেও বলতে হবে—এই ধারাটির মূল উৎস পুরোপুরি অর্থাৎ ষোল আনাই স্বদেশীয় নয়। এ কথা আজকের নতুন চলচ্চিত্র স্রষ্টারা অস্বীকার করতে পারবেন না। আর তাই সাহিত্য সম্পর্কে আমরা যতটা স্বদেশী দৃষ্টিভংগিতে বিচার করতে পারি, ততটা একক দৃষ্টিতে বোধ করি এই চলচ্চিত্র ধারার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ণ করা যাবে না। এর ভাব স্বদেশী হলেও ভাষাটা অনেকটাই আন্তর্জাতিক। একথা বলতেই হবে, 'গীতাঞ্জলি' যে অর্থে পুরোপুরি ভারতীয় হয়েও বিশ্বজনীন, 'অপরাজিত' তা অবশ্যই নয়।

আর ছবির মূল্যায়ণে মতভেদের জন্য শুধু বিদেশী সমালোচকদের দোষ দিয়ে লাভ কি? 'পথের পাঁচালী' 'অযান্ত্রিক' প্রভৃতির জিন্দাবাদ আমি কম শুনিনি। এক 'দেশ' পত্রিকা ছাড়া 'অপরাজিত' তো প্রায় প্রতিটি পত্রপত্রিকায় অপ্রশংসিত হয়েছে। সুতরাং কোন বিদেশী 'পরশপাথর' চিনতে পারেনি তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। আর সব সময় যে চিনতে পারে না তা নয়। 'গীতাঞ্জলি', পত্রলেখিকার মতে, রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকায় স্থান হয়ত পাবে না; কিন্তু তাই বলে একে কেউ তৃতীয়শ্রেণীর রচনা বলে ভুল করবে না।

আসলকথা, মহৎশিল্পের মর্ম বুঝতে হলে উপযুক্ত অনুশীলন চাই। সংগীত, সাহিত্য, অংকনশিল্প, চলচ্চিত্র—সব শিল্প সম্পর্কেই এ কথা খাটে। ক্লাসিক আর্ট সম্পর্কে এই গোড়ার কথাটা মনে রাখি না বলেই 'নীলাম-ওয়ালা'র কানে 'বাজুবন্দ্ খুলু খুলু যায়' ভাল লাগে না শুনে আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলি।—সলিল ভৌমিক, শিবপুর, হাওড়া।

একলব্য

* * *

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় হিসাবে সম্মানিত ডেনমার্কের কীর্তিমান খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপস, যিনি গতবার পূর্বে ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিলেন, তিনি এবারও পাকিস্তানের খেলোয়াড় আক্রাম বেগকে ফাইন্যালে হারিয়ে পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। বলতে দ্বিধা নেই শোভাবাজার ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন পরিচালিত পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা এবার মোটেই জমেনি। পরিচালক এসোসিয়েশন অবশ্য প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। কোনবারই করেন না। কিন্তু কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপের সংগে রীতিমত অসহযোগিতা করে চলেছেন। এর কারণ কি? আশা করি ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে আয়োজিত পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপে এবার বাইরের খেলোয়াড়দের মধ্যে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র তিনজন খেলোয়াড়—বর্তমানে ভারতে সফররত ডেনমার্কের খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপস, পাকিস্তানের আক্রাম বেগ ও মামুদ খাঁ। এদের মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপসের সংগে কারো তুলনাই চলে না। তাই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে তাঁর কণামাত্র বেগ পেতে হয়নি। অবশ্য কপসের সংগে ফাইন্যাল খেলার সময় পাকিস্তানী খেলোয়াড় আক্রাম বেগ একবার মাটিতে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান। কিন্তু পায়ে চোট না পেলেও সুনিপুণ খেলোয়াড় কপসের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করতে পারতেন না। চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ দিনে রঞ্জিত ব্যানার্জি ও অরুণ ব্যানার্জির সংগে আরল্যাণ্ড কপস ও সুকুমার দেবের ডাবলসের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি দর্শকদের যা কিছু আনন্দ দিয়েছে। আর কোন খেলাই দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফলঃ—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল—আরল্যাণ্ড কপস ১৫-৭ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে আক্রাম বেগকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—রঞ্জিত ব্যানার্জি ও অরুণ ব্যানার্জি ১৫-৪ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে আক্রাম বেগ ও মামুদ খাঁকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস ফাইন্যাল—প্রত্যুষ বসু ১৫-০ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে জি দেকে পরাজিত করেন।

পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার তিনটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল পর পর দুটি টেস্ট বিজয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। ঢাকায় প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে পরাজিত করেছিল। লাহোরে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় পরাজিত করেছে ৭ উইকেটে। ডিসেম্বরের ৪ তারিখ থেকে করাচীতে তৃতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভের কথা।

লাহোর টেস্টে পরাজিত হলেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা ব্যাটিংয়ে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। পাকিস্তানের অধিনায়ক ফজল মামুদ অসুস্থ থাকায় দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে পারেননি। বলা বাহুল্য, ফজল মামুদের মত কৃতী বোলার এবং বিজ্ঞ অধিনায়কের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার অর্থ অনেকখানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েই পরাজয় স্বীকার করেছেন। আর একটু দৃঢ়তা দেখাতে পারলে, কিম্বা ভাগ্য একটু সহায়ক থাকলে পরম শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে এ খেলায় জয়লাভ করা সম্ভব হত কি না বলা কঠিন। অনেকেরই ধারণা ছিল ম্যাটিং উইকেটে ভাল খেলতে অভ্যস্থ পাকিস্তান দল যখন ঢাকার ম্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া দলের কাছে ৮ উইকেটে হেরে গেছে তখন লাহোরের টার্ফ উইকেটে আরও বিশ্রীভাবে হেরে যাবে। সত্য বটে, লাহোরে প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান দল ১৪৬ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও অনমনীয় দৃঢ়তার সংগে ব্যাট করেছে। এবং অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নর্মান ও'নীলের সেঞ্চুরীর প্রত্যুত্তর দিয়েছেন সয়িদ আমেদ। অস্ট্রেলিয়ার ও'নীল ও পাকিস্তানের সয়িদ আমেদ ছাড়া এ খেলায় আর কেউ সেঞ্চুরী করতে পারেননি। বোলিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার এলান ডেভিডসন ও স্পিন বোলার লিণ্ডসে ক্লিন। পাকিস্তানের পক্ষে বোলিংয়ে যার কৃতিত্ব দেখানর কথা ছিল সেই কৃতী বোলার ও পাকিস্তানের অধিনায়ক ফজল মামুদ তো খেলায় যোগ দিতেই পারেননি! ইমতিয়াজ আমেদ লাহোর টেস্টে পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব করেছেন।

'টসে' বিজয়ী হয়ে ইমতিয়াজ আমেদ প্রথম ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করেন। পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সূচনাও মন্দ হয় না। কিন্তু ৫৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়বার পর ঘন ঘন উইকেট পড়তে থাকে। ডেভিডসনের ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এক ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ ছাড়া আর কেউই বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে টিকে থাকতে পারে না। ৯২ রানের মাথায় পাকিস্তানের তৃতীয় উইকেটে পড়বার পর বাকী ৭টি উইকেটে মাত্র ৫৪ রান যোগ হয়ে ১৪৬ রানে ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ফাস্ট বোলার ডেভিসন ৪৮ রানে ৪টি ও আয়ান মেকিফ ৪৫ রানে ৩টি উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার ওয়াল্টী গ্রাউট স্টাম্পের পেছনে ক্যাচ ধরে পাঁচজন খেলোয়াড়কে আউট করেন। পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হবার পর যে ২৫ মিনিট সময় থাকে সেই সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল ১ উইকেট হারিয়ে ২৭ রান তোলে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নর্মান ও'নীলের সেঞ্চুরী সবচেয়ে উল্লেখ করবার মত ঘটনা। বিশ্ব ক্রিকেটে উঠতি খেলোয়াড় ও'নীলের এইটিই জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। যদিও ৭২ রান ও ৮৫ রানের মাথায় ও'নীল একবার করে ক্যাচ তোলেন তবু তার ব্যাটিংয়ের ভঙ্গি ছিল সাবলীল এবং দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ১৩৪ রান করে ও'নীল আউট হন। ১৯ বার ইনি বাউণ্ডারী মারেন। যাই হক দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া দল আগাগোড়াই পাকিস্তানের বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ব্যাট চালিয়ে যায়। দিনের শেষে তারা সংগ্রহ করে ৬ উইকেটে ৩১১ রান।

তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দল ৯ উইকেটে ৩৯১ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৪৫ রান পেছনে থেকে পাকিস্তানকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে তারা সংগ্রহ করে ১৩৮ রান।

একদিন বিরতির পর যখন চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হয় তখন পাকিস্তানের সম্মুখে এক দারুণ সমস্যা। ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তখনো ১০৭ রানের প্রয়োজন। হাতে অবশ্য ৮টি উইকেট। প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করে পাকিস্তানের দুই নট

আউট খেলোয়াড় সয়িদ আমেদ ও সুজাউদ্দিন দৃঢ়তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে থাকেন। ফলে সারাদিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল একটির বেশী উইকেট ফেলতে পারে না। সয়িদ আমেদ ১৫২ রান করেও নট আউট থাকেন। দিনের শেষে পাকিস্তান দল সংগ্রহ করে ৩ উইকেটে ২৪৮ রান। সয়িদ আমেদ ও সুজাউদ্দিনের সহযোগিতায় তৃতীয় উইকেটে ১৬৯ রান যোগ হয়। সয়িদ আমেদ তার দীর্ঘ ইনিংসে ১০১ রানের মাথায় একবার মাত্র পয়েণ্টে ক্যাচ তোলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বিনোড ক্যাচটি ধরতে পারেন না। খেলার আর একদিন বাকী। পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা পঞ্চম দিনেও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে পারবেন কি না এই প্রশ্নই সবার মুখে মুখে ঘুরতে থাকে।

পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা আরম্ভের সময় মাঠে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। ৩০ হাজার দর্শক পাকিস্তান খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু সয়িদ আমেদ, যিনি ১৫২ রান করে পূর্বদিন নট আউট ছিলেন তিনি ১৬৬ রান করে আউট হবার পর পাকিস্তান দলে ভাঙ্গন ধরে। কেউই লিণ্ডসে ক্লিনের বল খেলতে পারেন না। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে এক একটি করে উইকেট পড়তে থাকে। পাকিস্তানের শেষ ছয়টি উইকেটে মাত্র ৫৪ রান যোগ হয়ে মোট ৩৬৬ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। লিণ্ডসে ক্লিন মারাত্মকভাবে বোলিং করে ৭৫ রানে ৭টি উইকেট পান।

১১৫ মিনিটে ১২২ রান করতে পারলে বিজয়ী হবে—এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাটিং আরম্ভ করে এবং দ্রুত রান তুলে ৩ উইকেটে ১২২ রান সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে বিজয়ী হয়। পাকিস্তান তার স্বল্পকালের ক্রিকেট ইতিহাসে নিজের মাটিতে সর্বপ্রথম রাবার হারায়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস—১৪৬ (হানিফ মহম্মদ ৪৯; এলান ডেভিডসন ৪৮ রানে ৪ উইকেট, আয়ান মেকিফ ৪৫ রানে ৩ উইকেট, রিচি বিনোড ৩৭ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—(৯ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ৩৯১ (নর্ম্যাল ও'নীল ১৩৪, এলান ডেভিডসন ৪৭, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৪২, নীল হার্ভে ৪৩, লেস ফেবেল ৩২, ওয়াল্লী গ্রাউট ২৯, কেন ম্যাকে ২৬; হাসিব আসান ১১৫ রানে ৩ উইকেট, ইসরার আলী ২৯ রান ২ উইকেট)।

পাকিস্তান — দ্বিতীয় ইনিংস — ৩৬৬ (সয়িদ আমেদ ১৬৬, ইমতিয়াজ আমেদ ৫৪, সুজাউদ্দিন ৪৫; লিণ্ডসে ক্লিন ৭৫ রানে ৭ উইকেট, রিচি বিনোড ৯২ রানে ২ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইকেট) ১২২ (নর্ম্যান ও'নীল নট আউট ৪৩, নীল হার্ভে ৩৭, রিচি বিনোড নট আউট ২১; মহম্মদ মুনাক ৩৬ রানে ২ উইকেট)

[অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে বিজয়ী]

• • •

এলান ডেভিডসন

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ৯জন খেলোয়াড়ের পরিচয় ইতিপূর্বে 'দেশ'র পাতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সপ্তাহে ৫জনের খেলোয়াড় জীবনের খুঁটিনাটি প্রকাশ করা হ'ল:

এলান ডেভিডসন

অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বিনোডের মত চৌখস খেলোয়াড় হিসাবে এলান ডেভিডসনেরও বিশ্বখ্যাতি আছে। যেমন এ'র বলের দ্রুত গতি, তেমন এ'র ব্যাটিংয়ের চটক, তেমনই ইনি ফিল্ডিংয়ে নিপুণ। দীর্ঘদেহী ডেভিডসন ন্যাটা ফাস্ট বোলার। মন্থর ধারায় ব্যাটিং এর স্বভাববিরুদ্ধ। মারবার মত একটু সুযোগ পেলেই বলকে ইনি মারতে কসুর করেন না। ফিল্ডিং করেন সাধারণত সর্ট লেগে। পরম নির্ভরযোগ্য ফিল্ডসম্যান।

নিউজিল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেয়ে ওয়াইরাপা দলের বিরুদ্ধে বিদেশের প্রথম খেলায় ডেভিডসন এক ইনিংসের সব ক'টি উইকেট (১০টি) নিয়ে আর ১৫৭ রান করেও নট আউট থেকে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন। তারপর বহু খেলাতেই ডেভিডসন ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ইনি একজন কৃতী খেলোয়াড়। গতবার ইংলণ্ড দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় এর ব্যাটিং ও বোলিং ইংলণ্ড দলকে কম বিব্রত করেনি। গতবারের টেস্ট খেলার বোলিং অ্যাভারেজে এর স্থান ছিল তৃতীয় আর ব্যাটিংয়ে পঞ্চম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত প্রথম শ্রেণীর খেলার হিসাবে ডেভিডসন বোলিং অ্যাভারেজে লাভ করেছিলেন শীর্ষস্থান।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেলা নিয়ে ডেভিডসন এ পর্যন্ত ২৪টি টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে এর ৪৮ রানে ৪টি উইকেট ও ৪৭ রান এবং লাহোর টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪২ রানে ৪টি উইকেট পাবার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ডেভিসন নিউ সাউথ ওয়েলস দলের খেলোয়াড় এবং সিডনীর একটি ব্যাঙ্কের অফিসার। বয়স ৩০ বছর।

লেস ফেবেল

লেস ফেবেল

লেস ফেবেল অস্ট্রেলিয়া দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ পর্যন্ত তিনি ১০টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৬টি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ২টি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২টি। ঢাকায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিন্তু মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানেই একে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয়, আর দ্বিতীয় ইনিংসে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয় মাত্র ৪ রান করে। গতবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওপেনিং জুটি হিসাবে ম্যাকডোনাল্ড ও বার্ক'ই বেশী খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাই ফেবেল দু'টির বেশী টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি।

ওপেনিং ব্যাটসম্যান হলেও ফেবেলের মারের দিকে ঝোঁক বেশী। ইনিংসের

সূচনা থেকেই ইনি হাত খুলে মারতে চেষ্টা করেন। মারের ভঙ্গিও দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম শ্রেণীর খেলার ৯টি ইনিংসে ফেবেল মোট ৬৬১ রান করেছেন।

ফেবেলের বয়স ৩০ বছর। ইনি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড় এবং এডিলেডের একজন সেলসম্যান।

ওয়্যালী গ্রাউট

ওয়্যালী গ্রাউট বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় পয়লা নম্বরের উইকেট কিপার। আবার ব্যাটিংয়ে মা'রের হাতও চমৎকার। ঢাকা টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে এর নট আউট থেকে ৬৬ রান আর ক্যাচ ধরে ৬ জন ও স্ট্যাম্প করে ২ জন খেলোয়াড়কে আউট করবার ঘটনা বিশেষ-ভাবেই উল্লেখ করবার মত।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট নিয়ে

ওয়্যালী গ্রাউট

গ্রাউট এ পর্যন্ত ১২টি টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সব কটি টেস্টেই ইনি খেলেছেন। গতবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেও ৫টি টেস্টে একে দলভুক্ত করা হয়। জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলায় গ্রাউট এক ইনিংসে ৬টি ক্যাচ ধরে উইকেট কিপিংয়ের এক নতুন রেকর্ড করেছেন। ডারবানের টেস্ট খেলাতেও এর এক ইনিংসে ক্যাচ ধরে ও স্ট্যাম্প করে ৫ জন দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়কে আউট করার ঘটনা উল্লেখের দাবী রাখে। গতবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৬টি ইনিংসে গ্রাউট ১১৯ রান করেছিলেন। এর একবার করেছিলেন ৭৪ রান। ওয়্যালী গ্রাউট কুইন্সল্যান্ড দলের খেলোয়াড় এবং

কলিন ম্যাকডোনাল্ড

ব্রিজবেনের একজন অফিস কর্মী। বয়স ৩২ বছর।

কলিন ম্যাকডোনাল্ড

কলিন ম্যাকডোনাল্ড এখন অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। ১৯৫১-৫২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যখন অস্ট্রেলিয়া সফর করে ম্যাকডোনাল্ড তখন টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগ পান এবং নিজ প্রতিভায় অল্পদিনের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নেন। তারপর থেকে ম্যাকডোনাল্ড নিয়মিতভাবে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলে আসছেন আর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিভাও যেন বেড়ে চলেছে। পরম নির্ভরযোগ্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবেই ম্যাকডোনাল্ডের খ্যাতি।

গত বছর অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টের ব্যাটিং অ্যাভারেজে দুই দলের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন শীর্ষস্থানে। পাঁচটি টেস্টের ৯টি ইনিংসে ইনি করেছিলেন ৫২০ রান। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রান ছিল ১৭০। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে এর সেঞ্চুরী করবার ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। বার্কের সঙ্গে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলে গতবার এরা অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং জুটির রানের রেকর্ড ভাঙবার উপক্রম করেছিলেন। মাত্র কয়েক রানের জন্যই সে রেকর্ড ভাঙতে পারেননি। গতবার প্রথম শ্রেণীর খেলার ১৮টি ইনিংসে ম্যাকডোনাল্ড মোট ৯৯১ রান করেছেন।

কলিন ম্যাকডোনাল্ডের বর্তমান বয়স ৩১ বছর। ইনি মেলবোর্নের একজন স্কুল মাস্টার এবং ভিক্টোরিয়া দলের অধিনায়ক।

গেভিন স্টিভেন্স

২৫ বছর বয়স্ক এডিলেডের সেলসম্যান গেভিন স্টিভেন্স অস্ট্রেলিয়া দলের অন্যতম ওপেনিং ব্যাটসম্যান। তবে এই সফরের আগে স্টিভেন্স অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। লাহোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই ইনি প্রথম টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জীবনের প্রথম টেস্টে সুবিধা করতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে ৯ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ রান করে একে বিদায় নিতে হয়েছে।

গেভিন স্টিভেন্স দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। গতবার ১৫টি ইনিংসে এঁর ৬৬৮ রান ব্যাটিং দক্ষতার পরিচায়ক। পর পর তিনটি ইনিংসে সেঞ্চুরী করবার ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। অস্ট্রেলিয়ার আন্তঃ রাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ৮৫৯ রান করে ইনি গতবার ব্যাটিং অ্যাভারেজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। একবার ২৫০

গেভিন স্টিভেন্স

রান করেও নট আউট থাকেন। স্টিভেন্সের ব্যাটিংয়ের বেশ চটক আছে। ফিল্ডসম্যান হিসাবেও খ্যাতি কম নয়।

দেশী সংবাদ

২৩শে নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ এই বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত অঞ্চলে হউক বা দেশের যে কোন স্থানেই হউক—সীমান্তের অপর পার্শ্বস্থিত চীনা সৈন্যবাহিনীকে 'মুক্তি ফৌজ' আখ্যা দিয়া কাহাকেও যদি প্রচারকার্য চালাইতে দেখা যায়, তবে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

শিল্প ট্রাইবুনালের রায় কার্যকরী করার পর কলিকাতা ট্রাম কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে কর্মচারীদের মূল বেতন শতকরা পাঁচ টাকার পরিবর্তে শতকরা সাড়ে সাত টাকা বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

শিশুহরণ এবং ভিক্ষা ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবার জন্য তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিবার জন্য আজ লোকসভায় যে বিল আনা হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে সমর্থিত হয়। বিলে অপরাধীদের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন আজ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় বলেন, সীমান্তে চীনের হানা প্রকৃতই বিপজ্জনক এবং 'আমাদের সাধ্যানুযায়ী' সীমান্ত রক্ষার জন্য সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কয়েকটি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা করিবার জন্য ভারত-চেক সরকারের মধ্যে আজ নয়াদিল্লিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

২৫শে নবেম্বর—দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত উদ্বাস্তুরা আনন্দবাজার অফিসে এক তার পাঠাইয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য হইল: খান্নাজী দণ্ডকারণ্য হইতে বাঙালী উদ্বাস্তুদের ভাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের স্বার্থের জন্য আমরা শ্রী খান্নার অপসারণ এবং শ্রী ফ্লেচারের পুনর্বহাল চাই। এই তারবার্তার নীচে পাঁচজন উদ্বাস্তু নেতার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

ভারত সরকারের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোচিনে স্থাপিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহের জন্য কেরল সরকার কোচিন ভূমি-দখল আইন অনুসারে আজ এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

পৃথিবীতে একমাত্র সাদা বাঘ 'মোহন' নয়াদিল্লিতে বিশ্ব কৃষিমেলায় মধ্যপ্রদেশ সরকারের স্টলে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে স্বাগত করিবে বলিয়া আশা করা যায়। রেওয়ার মহারাজা এই তুলার ন্যায় সাদা বাঘের মালিক। বাঘটি ৯ ফুট লম্বা ও সাড়ে চার ফুট উচ্চ।

২৬শে নবেম্বর—চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব লইয়া লোকসভায় যে বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে যোগদান করিয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারত অপর দেশ হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণের বিরোধী, তবে মূল্য প্রদান করিয়া ভারত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে।

ভারত সরকার যে-রিপোর্ট পাইয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, গত ২১শে অক্টোবর লাদক অঞ্চলে ধৃত ভারতীয় টহলদার পুলিস দলের শুধু নেতাকে নয়, ধৃত প্রত্যেকটি লোককেই চীনারা ভীষণভাবে জেরা করে।

২৭শে নবেম্বর—অদ্য লোকসভায় চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে দুই দিবসব্যাপী বিতর্কের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর ৯০ মিনিটব্যাপী ভাষণের পর ভারত সরকারের নীতি অনুমোদিত ও সমর্থিত হয় এবং বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক উত্থাপিত সমালোচনামূলক সংশোধন প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আগামী বৎসরে ৯ই জানুয়ারী আসামে ব্রহ্মপুত্র সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন। ১৯৬২ সালের মধ্যে এই সেতু নির্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহা নির্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

২৮শে নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ দেশবাসীকে সকল প্রকার চরম অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য 'প্রস্তুত' থাকিতে এবং সীমান্ত সমস্যা লইয়া যদি চীনের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে, তবে 'জাতির প্রতি কর্তব্য পালন' করার আহ্বান জানান।

আজ সকালে একখানি অজ্ঞাত-পরিচয় বিমানকে অত্যুচ্চ আকাশপথে উত্তর দিক হইতে পূর্বাভিমুখে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ও হিমালয় অঞ্চলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখা যায়।

জরাপাত্রা, রতনপুর, সুতারকান্দি ইত্যাদি যে ২৯টি গ্রামের জীবনযাত্রা পাকিস্তানী সৈন্য দলের পুনঃ পুনঃ গুলীচালনার ফলে দীর্ঘকাল বিপর্যস্ত হইয়া ছিল, পাকিস্তান সেই সব গ্রামের দাবি ত্যাগ করায় সমস্ত দুঃখ-দুর্ভোগের অবসান হইয়াছে।

২৯শে নবেম্বর—অদ্য অপরাহ্ন সাড়ে চার ঘটিকায় আসানসোল হইতে ৮ মাইল দূরে জামুরিয়া বাজারের একটি বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদামে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ১১জন লোক শোচনীয়ভাবে নিহত এবং ৮৬জন আহত হয়।

১লা ডিসেম্বর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিস ও ইহার শাখাসমূহে এবং ট্রেজারি ও সাব-ট্রেজারিসমূহ হইতে ২৫ নয়া পয়সার মুদ্রা চালু হইবে। এই মুদ্রাটি বিশুদ্ধ নিকেলের তৈরী গোলাকৃতি। এই নূতন মুদ্রা চালু হইলেও পুরাতন সিকিও চলিবে।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে নবেম্বর—লণ্ডন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাহারা ভারত-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মৈত্রীর সমর্থক ও উহার পক্ষে আন্দোলনকারী ভারতীয় মহল হইতে তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, পাকিস্তান যদি ঠাণ্ডা লড়াই ত্যাগ করে এবং কাশ্মীরে বর্তমান অবস্থা মানিয়া লয়, তাহা হইলে নেহরু সরকার এই বিষয়ে আনুকূল্যের সহিত বিবেচনা করিতে পারেন।

কাঠমাণ্ডুর সংবাদে প্রকাশ যে, সশস্ত্র তিব্বতীগণ তিব্বতের সীমান্তরক্ষীদের ছদ্মবেশে গৌরীশঙ্কর অভিযানকারী জাপানীদের শিবিরে হানা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্বক খাদ্য ও অর্থ লইয়া গিয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—অদ্য ভোরের দিকে শিকাগো বিমানবন্দর হইতে এক-চতুর্থ মাইল দূরে একখানি বিমান জ্বলন্ত অবস্থায় এক সারি গৃহের উপর পতিত হয়। ফলে ১০টি গৃহে আগুন লাগিয়া যায়। অন্ততঃ ৬জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আজ 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' সংবাদ দিয়াছেন যে, কম্যুনিস্ট চীন প্রস্তাবিত শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভকে দূরপ্রাচ্যের সমস্যাবলী লইয়া কথাবার্তা চালাইতে দিতে সম্মতি দেয় নাই।

২৫শে নবেম্বর—বিদেশী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিষেধাদেশের অঙ্গ হিসাবে ইন্দোনেশিয়া গবর্নমেণ্ট পশ্চিম জাভার গ্রামাঞ্চল হইতে চীনাদের বহিষ্করণের কার্যের গতি বাড়াইয়া দিয়াছেন।

২৬শে নবেম্বর—তুসেলা ও ফেরুং পশ্চিম নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব দুইশত মাইল। এই দুইশত মাইল সীমান্ত জুড়িয়া চীনারা ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া কাঠমাণ্ডুতে সংবাদ আসিয়াছে।

রাশিয়ান ফেডারেশনের সর্বোচ্চ পরিষদ অদ্য সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীনিকোলাই ইগ্নাতেভকে উক্ত ফেডারেশনের সর্বোচ্চ পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন বলিয়া মস্কো বেতারের এক সংবাদে বলা হইয়াছে।

২৭শে নবেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান আপনাকে ভারত-চীন বিরোধে এক পক্ষ বলিয়া মনে করে।

২৮শে নবেম্বর—আজ রেঙ্গুনের এক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বৃহস্পতিবার উত্তর ব্রহ্মে শান বিদ্রোহীরা এক ট্রেন ধ্বংস করায় ছয়জন যাত্রী নিহত হইয়াছে।

পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ সোয়েব বলেন, বর্তমান বৎসরের শেষে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে খালের জল সম্পর্কিত বিরোধের সমাধানকল্পে একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

২৯শে নবেম্বর—নেপালের বিপদের মুহূর্তে ভারত আগাইয়া গিয়া নেপালকে রক্ষা করিবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আমেরিকান জনসাধারণ তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার　　সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

বর্ষ] শনিবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 28th November, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪

বিনা আয়াসে, কাপড় না আছড়ে, যাবতীয়
বস্ত্র পশম, সিল্ক, রেয়ন ও তুলো—এই সস্তা উপায়ে
আরও ভালভাবে পরিষ্কার করুন…
আরও শুভ্র করে, নতুনের চাইতে উজ্জ্বল করে।

… দীপ ব্যবহারের মধ্যে

সবরকম জিনিষ ধোওয়ার এই সাবান
দীপ ব্যবহারে একই ভাবে সূক্ষ্ম
চীনে মাটির বাসনপত্র, পোর্সিলিনের
জিনিষ, মেঝে ও পরিষ্কার করা চলে।

- বিশুদ্ধ গুঁড়ো সাবান
- অপটিক্যাল ব্রাইটনার
- সোডা বিহীন
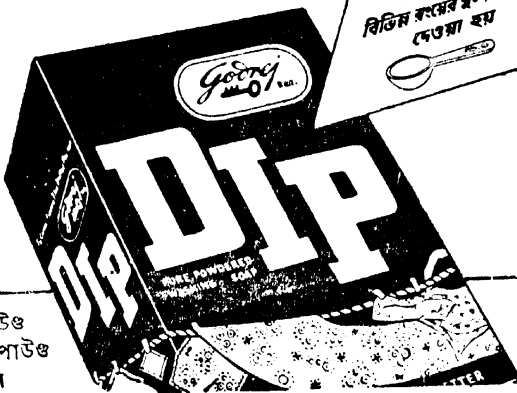
১০০% ভারতীয় পরিচালনা ও মূলধন

১ পাউণ্ড
ও ৩ পাউণ্ড
কার্টন

গোদরেজ সাবান নির্মাণে শ্রেষ্ঠ নাম

দুধ থেকে তৈরী আমুলের দ্রব্য মাত্রই সব দিক থেকে শ্রেয়

তারতম্যহীন গুণাগুণের কথাই ধরুন না....

দিনে ছয় টন মাখন···মিনিটে সত্তর টিন ঘনীভূত দুধ···
পনেরোশো পাউণ্ড গুঁড়ো দুধ প্রতিবারে···
প্রতি দফায় তিনশো পাউণ্ড ঘী···সারা বছর ধরে
আমুলের দুগ্ধজাত জিনিষের উৎপাদন এইভাবে চলে
তো চলেইই। বিভিন্ন দফায়, বিভিন্ন প্রকারে তৈরী হলেও
এসব খাদ্যের গুণাগুণের কোন তারতম্য হয় না—
তার কারণ এই জিনিষগুলির পেছনে আছে বিদেশে
শিক্ষিত ডেয়ারী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা, উৎপাদনের
প্রতি স্তরে সুষ্ঠু মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।
একথা ঠিকই যে, আমুল নামটি আজ দুগ্ধজাত
জিনিষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার প্রতীক এবং ঘরে ঘরে
আমুলের তৈরী খাদ্যদ্রব্য গৃহস্থের নিত্য সঙ্গী।
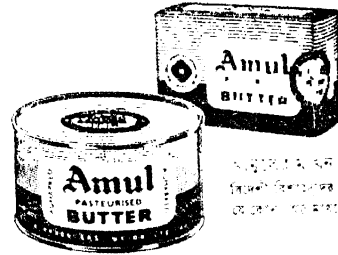
আমুলের ফুলক্রীম ঘন দুধ

আমুল—নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন

খেড়া জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক
সমিতি লিমিটেড, আনন্দ
(পশ্চিম রেলওয়ে)

PSKMP-30/59

সূচীপত্র

হাল ফ্যাশানের উলের পোশাক বুনতে—লাল-ইমলি উল চাই
লাল-ইমলি উল সব সময় মোলায়েম থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী উলের সুতোয় বিশেষ ধরনে তৈরী এই লাল-ইমলি উল—অনেক রকম রঙে পাবেন। সেরা 'কাউন্টেস' উল ৩-প্লাই, 'লেডী লেসলী' ও 'তক্ষশীলা' উল ৪-প্লাই।
দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি
ট্রেড মার্ক
'কাউন্টেস' ৩-প্লাই
'লেডী লেসলী ও 'তক্ষশীলা' ৪-প্লাই
রেডিমেড উলের পোশাক
আপনার যদি বোনার অভ্যাস না থাকে —নানা আকর্ষণীয় ডিজাইনে তৈরী লাল-ইমলী উলের রেডিমেড পোশাক ব্যবহার করে দেখুন।
লাল-ইমলি
উল
LAL 3360

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 28th November, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ ৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, ভারত সরকারই সবচেয়ে বেশি বলিয়াছেন। অনেকে মনে করেন কথা কম বলিয়া কাজ বেশি করা উচিত ছিল। কথার পরিমাণ বাড়াইবার ইচ্ছা আমাদের নাই, ভারতের রাজনীতিতে যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইল সংক্ষেপে সে বিষয়ে দু'চার কথা বলিব।

রূপকথায় শোনা গিয়াছে যে, এক রাজপুত্র এক গৈবি প্রাসাদে আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, অন্য তিন দিকে তাহার অবাধ গতি কেবল উত্তর দিক সম্বন্ধে সাবধানে থাকিতে হইবে, সেদিকের দরজা খুলিলেই সংকট দেখা দিবে। কৌতূহলী রাজপুত্র উত্তর দিকের দরজা খুলিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিল, রূপকথার শ্রোতা মাত্রেই তাহা জানেন। ভারতবর্ষকে এই প্রাসাদ, ভারতবাসীকে এই রাজপুত্র মনে করিলে অন্যায় হইবে না। হিমালয়ের পাহারায় এতকাল উত্তর দিক সম্বন্ধে সে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু আজ উত্তর দিকের দরজা অনর্গলিত হইয়াছে, আর সমূহ বিপদ আসিয়াছে চীনা আক্রমণের রূপে। আমাদের বক্তব্য এই যে, এখন হইতে ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইল উত্তর দিগন্তের সমস্যা। অতঃপর যে দলের সরকারই শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকুন না কেন তাহাকে উত্তর দিগন্তের সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকিতে হইবে, একটু অসতর্ক হইলেই সমূহ সংকট দেখা দিবে যেমন বর্তমান মুহূর্তে দেখা দিয়াছে।

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের কি পরিণাম হইবে জানি না, চীন সরকারের যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় তবে হয়তো অল্পেই মিটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যলিপ্সু নিরংকুশ চীন সরকার যে

উত্তর দিগন্তের সমস্যা

সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়া হটিয়া যাইবে তেমন আশা বড় দুরাশা। কিন্তু খুব সম্ভব পুরাদমে আক্রমণ চালাইয়া বিশ্বযুদ্ধের দায়িত্বও তাহারা গ্রহণ করিবে না। তবে তাহাদের উদ্দেশ্য কি? নেপালের উন্নয়ন মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, সুনির্দিষ্ট সীমান্ত চীনের কাম্য নহে। কেন? তাহারা ভারতের তথা নেপালের ভুটানের সিকিমের সীমান্তকে তরল অবস্থায় রাখিয়া দিতে চায়—শনৈঃ শনৈঃ সাম্রাজ্য প্রসারের উহাই অনুকূল অবস্থা। মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত এ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয় নাই—আর এই অস্পষ্টতার সুযোগ লইয়া চীন ব্রহ্মদেশকে নিরন্তর উদ্বেজিত করিয়া রাখিয়াছে। এবারে ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি আরোপ করিতে চায় চীন। লাগে তুক না লাগে তাক। চীনের কোন ক্ষতি নাই পরের ক্ষতিতেই তাহার "সমাজতন্ত্রের" চরিতার্থতা। ইহাই ভারতের উত্তর দিগন্তের সমস্যা, এখন হইতে বৃহত্তম সমস্যা, আর এ সমস্যা চিরন্তনতার ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শত্রুরাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যদি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হয় তবে সংজ্ঞার গুরুত্ব ও ভয়ের গুরুত্ব সহস্র গুণ বাড়িয়া যায়। যে সব দেশের সীমান্ত কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের সংলগ্ন তাহাদের ইতিহাস সীমান্ত-উদ্বেগের ভয়াবহতায় পূর্ণ। আবার সেই সীমান্ত যদি সুনির্দিষ্ট না হয় তবে তো কথাই নাই। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র নিজ সীমান্তে বসিয়া প্রচার, অনুপ্রবেশ, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাইতে থাকে, পার্শ্ববর্তী দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি এইসব দুষ্কার্যের সহায়, সঙ্গী ও আশ্রয়স্থল। আর বিবাদের কোন একটা উপলক্ষ্য পাইবা মাত্র গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছাইয়া দেয় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে। তখন কম্যুনিস্ট পার্টি অন্যায়, অত্যাচার, অর্থনৈতিক অপব্যবস্থা প্রভৃতির বুলি আওড়াইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে থাকে এবং "জনগণের ক্রোধের" চিহ্নস্বরূপ দেশের মধ্যে ধর্মঘট, ব্যাপক কর্মবিরতি ও অন্তর্ঘাতী কার্য আরম্ভ করিয়া দেয়। এ বিষয়ে হিটলারের নাৎসী পার্টি ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট পার্টিতে বড় ভেদ নাই, তবে সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে দীর্ঘতর পরীক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত কম্যুনিস্ট পার্টি অধিকতর পাকা। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম পরনারীর মতো দূর হইতে মধুর, ঘরে আসিলে দেখা যায় প্রচণ্ড খাণ্ডারনী। সেই বস্তু আজ আমাদের সীমান্তে ঘরের মধ্যে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়াছে—শীঘ্র নড়িবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আর সেখানে অবস্থান করিয়া প্রচার, অনুপ্রবেশ, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, গোপনে অস্ত্রশস্ত্র চালান প্রভৃতি যাবতীয় অভ্যস্ত কর্ম করিতে থাকিবে—আর এদিকে তাহাদের সহায়, সঙ্গী ও আজ্ঞাবহ সেই রাজনৈতিক দলটি যাহাদের বিশ্বাস "সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র" কখনো পররাজ্য আক্রমণ করে না। ইহাই আমাদের উত্তর দিগন্তের সমস্যার যথার্থ রূপ ও গুরুত্ব। তাই বলিয়াছি যে, ভারতের রাজনীতিতে অতিশয় গুরুতর নূতন একটি সমস্যার উদ্ভব হইল। তিব্বত সম্পর্কে ভারত সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে এই সমস্যার উদ্ভব, আর যাহাতে ভ্রান্তি না হয় শৈথিল্য ও অসতর্কতা না হয় সেদিকে ভারত সরকারের জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চীন, চীন, চীন। ক'দিন ধরে বন্যা গেল। পূজোর আগে থেকে কালীপূজো পর্যন্ত। পূজোবকাশের মরশুমে না পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা নিয়েই কেটেছে। এখন বন্যা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার খবর নয়। এখন চীন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলছেন চীনের কথা। শ্রীপন্থ এবং শ্রীমেননও। আর সেই সঙ্গে কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজনৈতিক দল, এমন কি চীনের স্বধর্মী ভারতের কমিউনিস্ট দল পর্যন্ত। চীনকে রুখতে হবে, আর যাতে চীন ভারত-ভূখণ্ডের কিছু ছোঁ মেরে নিতে না পারে। কিন্তু লাডাক এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের যা চীন দখল করে নিয়েছে, তার কি হবে? সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত সেটা পরের কথা। আপাতত নতুন কিছু না চীন দখল করতে পারে, সেইটেই প্রধান লক্ষ্য। সেটা কি করে হবে? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীমেনন আশ্বাস দিয়েছেন, সরকার চীন-ভারত সীমান্ত রক্ষার আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। ব্যস্, তারপরে আর কি বাকি রইল?

আরও বাকি রইল। শ্রীনেহরু বলেছেন, যদিচ ভারতবর্ষ সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল নয় এবং যে-কোনো আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ, তথাপি আধুনিক যুদ্ধ ভারী শিল্পের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সমরাস্ত্রের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বলেছেন, "শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে ভারতের রাজন্যবর্গ ফরাসী ও বৃটিশের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তার ফলে তাঁরা স্বাধীনতা হারালেন এবং দেশ বিদেশীর শাসনাধীন হল।" আর বলেছেন, "শুধু উৎসাহের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না, উন্নতি (অর্থাৎ অস্ত্র-নির্মাণের দক্ষতা) প্রয়োজন।"

আর বলেছেন, সংহতির কথা। কিন্তু সংহতির চেষ্টা কই? শ্রীনেহরু দুঃখ করে বলেছেন "বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শুধু নিজ নিজ দলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখছেন এবং নিজের নিজের দলের শক্তি-বৃদ্ধির কথাই চিন্তা করছেন। উৎসাহ জিনিসটা অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন তার জোয়ার কাজের চেয়ে অকাজের দিকেই প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। বাক্যবাগীশতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বলতার আবরণ। শ্রীনেহরু শূন্যগর্ভ বাক্যবাগীশতাকে কষাঘাত করেছেন।

*

বেতন কমিশনের সুপারিশ এবং সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সুপারিশের আওতায় পড়বেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় আঠারো লক্ষ কর্মচারী,

এবং সরকারের প্রায় আটত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়বৃদ্ধি হবে। এর থেকে জনপ্রতি বেতন-বৃদ্ধির পরিমাণ এখন থেকেই অনুমান করা সম্ভব নয়। শোনা যাচ্ছে, বেতন কমিশনের এখনও তিন-চারটি সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাকি আছে। অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা নির্ধারণ তার একটি। বয়স পঞ্চান্ন কি আটান্ন হবে সে নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কমিশন নাকি সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য চাকরী সম্পর্কীয় সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানে আপত্তি করেন নি। সরকার এবিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন জানবার জন্যে সরকারী মহলে আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের নতুন সুপারিশ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ অবশ্য খুবই জটিল জিনিস। কিন্তু সেদিকে কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের বিলম্ব হওয়ার কথা নয়।

সামরিক কর্মচারীরা এই কমিশনের সুপারিশের আওতায় আসেন নি। সামরিক বিভাগের অসামরিক কর্মচারীরা এসেছেন। সামরিক কর্মচারীদের জন্যে পৃথক একটি কমিটি বসেছে।

*

বোম্বাই প্রদেশকে ভাষার ভিত্তিতে বিভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিহারের অন্তর্গত বাংলাভাষাভাষী কয়েকটি অঞ্চল দাবী করে সম্প্রতি যে আন্দোলনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দাবীর যাথার্থ্য এবং সঙ্গতি সমর্থন করে আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করেছি। এই সম্পর্কে সম্প্রতি পাটনা থেকে একটি পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রপ্রেরক (সম্ভবত বাঙালী) লিখেছেন:

> "চীনের ভারতের বর্ডার আক্রমণকে নিন্দা করে বিহারের বর্ডার আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নাই। এক এবং অখণ্ড ভারতের কথাই যদি ভাবছেন তবে বিহারের অংশ দাবী করা কেন? সমস্ত বিহার বাংলা দেশের মধ্যে মিলে যেতে চেয়েছিল তখন রাজি হন নাই কেন? বৃহত্তর বঙ্গের স্বপ্ন কেন?...বিহারের সীমানায় বাংলা ভাষার অবাধ চলন ছিল, বিহার বাধা দেয় নাই, আজ কেন দিচ্ছে? কারণ বাঙালীকে ওরা আর বিশ্বাস করতে পারছে না।...চাকুরীক্ষেত্রে বাংলা দেশে উদারতা দেখান হয় কি? পূর্ব-বঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের লোককে চাকুরীতে বাহাল করে?"

প্রশ্নগুলি একেবারেই বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। অথচ এরকম যুক্তি বিহারের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে দেখান হয়েছিল এবং হয়তো এখনও দেখান হচ্ছে। সেই কারণেই এর জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

*

প্রথমত বলতে হয় যে, যে-কারণে চীন ভারত-সীমান্তের যে অংশগুলি দখল করে নিয়েছে তার ফিরে পাবার দাবী জানাই, সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ বিহারের থেকে তার ন্যায্য অংশ ফিরে পাবার দাবী তুলেছে। এর মধ্যে চীন অথবা বিহারের কাছে যদি 'মজার ব্যাপার' থাকেও, আমাদের কাছে নেই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন হওয়া উচিত। এক ভাষা এবং এক সংস্কৃতির লোকেরা একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এইটেই স্বাভাবিক। বৈদেশিক প্রশাসনিক প্রয়োজনে একটি প্রদেশের কোনো অংশ যদি অন্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেই ভুল সংশোধনের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সঙ্গত দাবীকে আত্মপ্রসারের প্রয়াস বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ বৃহত্তর বঙ্গের স্বপ্ন দেখছে না। দ্বিতীয়ত, বিহার কোনোদিন বাংলাদেশের মধ্যে মিলে যেতে চায়নি, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে নিজের জঠরগত করতে চেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ তা পছন্দ করেনি।

পত্রপ্রেরক স্বীকার করেছেন, আগে বিহারের সীমানায় বাংলা ভাষার অবাধ চলন ছিল, "তাতে বিহার বাধা দেয় নাই।" অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে তিনি স্বীকার করেছেন, সীমানার এই অঞ্চলগুলি প্রধানত বাংলা-ভাষী ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার 'অবাধ' চলন ছিল না। এগুলি হিন্দীভাষী করার সুকৌশল চেষ্টা স্বাধীনতা-লাভের পর থেকেই চলে আসছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরে পাবার দাবী ওঠাতে সেই চেষ্টা উগ্র এবং উলঙ্গরূপ ধারণ করেছে।

সর্বশেষে চাকুরী প্রসঙ্গ। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে 'ডোমিসিয়ালের' প্রশ্ন কোনোদিনই ছিল না, এখনও নেই। থাকলে অকুণ্ঠচিত্তে তার নিন্দা করতাম। কিন্তু ছোট-খাটো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যে সংকীর্ণ "আঞ্চলিক দেশপ্রেম"—তাকে সমর্থন করছি না—কিন্তু থাকা অস্বাভাবিক নয় এবং বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ অথবা দেশপ্রেমেরও গুরুতর পরিপন্থী নয়।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** * * নরেন্দ্রনাথ মিত্র * * ***

২১

এও উদ্যান। একটু আগে জন্তুর উদ্যান ছাড়িয়ে এসেছে মানসী এখন গ্রন্থের উদ্যান। জড় নয়, এও জীবন, হয়তো মহত্তর জীবন। প্রথম যেদিন আসে, জীবিকার জন্যে নয়, জ্ঞান অর্জনের জন্যে মানসী আরো দুটি সহপাঠিনীর সঙ্গে এসেছিল এখানে। কিন্তু গ্রন্থজগতের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের আগে শ্যামে সবুজে ঘেরা এর বিস্তৃত উদ্যান দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিঁড়ির ওপরে উঠে লাইব্রেরীর থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েছিল মানসী। সম্মুখ আর পশ্চাৎ দুটি চোখের সঙ্গে বাঁধা। যেদিকে তাকাও সেদিকেই সম্মুখ, সেদিকেই মুখ। সেদিন অবশ্য দুই-ই মনে হয়েছিল মানসীর, মনে হয়েছিল এই পৃথিবী [illegible] আধার। এর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, কিন্তু চার ভাগই মধু। [illegible] মধু ক্ষরিত [illegible]।

সহপাঠিনী ললিতা বলেছিল, '[illegible] যে বাইরের শোভা দেখেই মুগ্ধ হলি। ভিতরে ঢুকবিনে?'

মানসী বলেছিল, 'ঢুকব। [illegible] জায়গাটা কিন্তু বেশ ভালো। নিরিবিলি নির্জন। সেই যাকে বলে নগরের কোলাহল নাহি আসে কানে। পড়াশুনোর উপযুক্ত জায়গা।'

ললিতা বলেছিল, 'যারা [illegible] আসে কি শখের পড়া পড়তে আসে, কি পড়ার নামে বেড়াতে আসে তাদের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কিন্তু [illegible] দূরে থাকে তাদের অসুবিধে বড় বেশি। তাদের যাওয়া আসায় কতগুলি করে পয়সা লাগে আর সময়।'

সেদিন সময় আর অর্থের এমন [illegible] হিসাব ভালো লাগেনি মানসীর। ললিতার মুখে পয়সা কথাটা বড় স্থূল শুনিয়েছিল। মানুষের অর্থ-সামর্থ্যকে একেবারে পয়সার হিসাবে নামিয়ে আনলে যেন বড় বেশি নেমে আসা হয়। মানসী সেদিন বলেছিল, 'সব বিষয়েই ভালোমন্দ সুবিধে অসুবিধে দুটো দিক আছে। এখানে এই এক প্রান্তে [illegible] না এনে লাইব্রেরীকে যদি [illegible] বাজারের হাটের মধ্যে ভরে [illegible] কি ভালো হোত ভেবেছিস?' এমন প্রশান্ত জায়গা, এমন চমৎকার পরিবেশ মিলত আর কোথাও?'

দু-দিন যেতে না যেতেই অবশ্য মানসী মনে মনে ললিতার দলভুক্ত হয়েছিল। তখন তো আর চাকরি বাকরি ছিল না। ট্যুইশন সম্বল। লাইব্রেরীয়ানশিপ পড়ার খরচ নিজেকেই জোগাতে হত। মাইনে বইপত্রের দাম কিছুই বাবা কি দাদার কাছ থেকে পারতপক্ষে নিত না। সপ্তাহে এখানে একদিন কি দুদিন আসত। সেই যাতায়াতের ব্যয়টাকে মনে মনে পয়সার হিসাবেই গুনতে হত। মনে মনে, মুখে কিন্তু স্বীকার করত না মানসী। যখন ট্যুইশন থাকত না, খুবই অসুবিধায় পড়তে হত। দিনান্তে চা টোস্টের পয়সায় পর্যন্ত টান পড়ত। কিন্তু নিজের অভাব অনটনের কথা কারো কাছে মুখ ফুটে বলত না মানসী। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও নয়। কেউ কেউ টের পেয়ে বলত, 'মানসী বড় শক্ত মেয়ে। ও ভাঙে তবু মচকায় না।'

মানসী ভাবল, কেন মচকাবে? হৃদয়

ভাঙলেই পা মচকাবে কেন? মুখ শুকোবে কেন?

অ্যাটেনড্যানস খাতায় নাম সই করল মানসী। আর একটি দিনের শুরু। সে যে কাজ করতে এসেছে সেই আগমনবার্তার স্বাক্ষর। যখন ছাত্রী ছিল গুণী আর মানী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহের শখ ছিল। ছোট খাতা ভরে তুলেছিল তাঁদের নামাবলীতে। একজন লেখক সই করতে করতে মৃদু হেসে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'একদিন তুমিও হয়তো অটোগ্রাফ দেবে।'

সে আশীর্বাদ ফলেনি, হয়তো কোনদিন আর ফলবেও না। কিন্তু তাতে খুব বেশি আফশোশ হয়নি মানসীর। এক ধরনের অটোগ্রাফ সে তো রোজই দিয়ে যাচ্ছে। অফিসের এই হাজিরাখাতায় নিজের কর্ম-জীবনের সাংকেতিক স্বাক্ষর। একদিক থেকে ধরতে গেলে এই স্বাক্ষরের কোন মূল্য নেই। এই সই শুধু অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের হিসাব নিকাশের জন্যে। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে মাস মাইনের হিসাবে দৈনিক অর্থমূল্য ছাড়াও আরো বড় অর্থগৌরব এই স্বাক্ষরের মধ্যে আছে। এই স্বাক্ষর তার কর্মজীবনের প্রতীক। এই স্বাক্ষর 'প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকার' প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের মূল্য অসীম। অসীম অসীম। এই শব্দটির মধ্যে কী সীমাহীন সুখই না একদিন লুকিয়েছিল।

সহকর্মিণী অপর্ণা হাত থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে বলল, 'হল তোমার? নাম সই করছ না কবিতা লিখছ।'

মানসী হেসে বলল, 'কবিতা লিখছি।'

অপর্ণা বলল, 'ব্যাপারটা সেইরকমই মনে হচ্ছে। আমরাও সইটই করতে জানি। একেবারে নিরক্ষরা নই।'

অপর্ণার পর রেবা, সীমা, শিখা, মনীষা, পরেশবাবু, সুনীলবাবুদের সইয়ের পালা চলতে লাগল।

নিজের চেয়ারে স্থির হয়ে বসল মানসী। এই কাজের আসনই সত্যিকারের সিংহাসন। সুখাসন যোগাসন। 'দু-হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই।' শুধু মন দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে নয়। মানসী জানে সবাই সে কথা ভাবে না। কেউ কেউ আছে যাদের কাজে মন নেই, সুখ নেই। যেমন অসীম। সে কাজ থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কখনো সশরীরে কখনো শুধু মনে। এই কর্মভীরু মানুষটিকে মানসী কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারল না। যে কাজকে ভয় করে তার ভয় কিছুতেই যাবার নয়।

অসীম একদিন হেসে বলেছিল, 'কাজকে ভয় করলে হবে কি, কাজের মানুষকে ভালোবাসি, কাজের মেয়েকেও ভালোবাসি। যারা কাজ করে তাদের কথা দিয়ে বন্দনা করাই আমার কাজ।'

মনে মনে খুশি হয়েছিল মানসী। তা ঠিক। বন্দনা ও করতে জানে। ওর কথার ঝংকার সারাদিন কানে বাজে, কথার আলো সারা দিন রাত মনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে।

মানসী মুখে কিন্তু সেই মহিমা স্বীকার করেনি, হেসে বলেছিল 'বন্দনার বাংলা মানে চাটুকারিতা। যারা কাজ জানে না। কাজের মানুষকে তাদের খোসামোদ করতে জানতে হয়। তোমার বিদ্যেটা যদি যথাস্থানে খাটাতে তা সুদে আসলে বাড়ত।'

অসীম জবাব দিয়েছিল 'সেই বুদ্ধি আমি চাইনে মানসী।'

রিডিংরুমে দু-চারজন করে অধ্যয়নার্থী আসতে শুরু করেছে। এবেলায় তারা সংখ্যায় কম। দুপুরে বিকেলে এই ঘর ভরে যাবে। সবাই যে গুরুতর বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করতে আসে তা নয়। কেউ কেউ দুষ্প্রাপ্য বই খোঁজে। কেউবা এখানে এসেও সুলভ নভেল নাটকের মধ্যেই মজে থাকতে ভালোবাসে। কেউ আসে শুধু এই পরি-বেশের জন্যে, কেউ চায় বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্য সুখ। মানসীর কিছু অজানা নেই। প্রথম প্রথম সে বিরক্ত হত। যারা অনধিকারী তারা কেন অপ্রয়োজনে সত্যিকারের বিদ্যার্থীর জায়গা জুড়ে বসে থাকবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানসীর মনে সহনশক্তি এসেছে। আহা আসুক। এই বিরাট গ্রন্থশালার আশ্রয়ে আবহাওয়ায় তারা নিশ্বাস নিক। যদি সস্তা নভেল, নাটকও এখানে এসে পড়ে, পাড়ার রকে বসে আড্ডা-ইয়ার্কি দেওয়ার চেয়ে কি আরো খাটো দুষ্কর্ম করার চেয়ে তা ঢের ভাল। রুচি কি একদিনে বদলায়? একদিনে গড়ে ওঠে? পাঠের রুচি, শিল্পের রুচি, জীবনযাপনের রুচি সব রুচি সম্পর্কেই সেই কথা।

করেসপণ্ডেন্স ফাইলটা টেনে নিল মানসী। কোচবিহারের এক অধ্যাপক বাঙলার পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একখানি বই লিখছেন। তাঁর সহায়ক বইপত্রের সন্ধান মানসীকে দিতে হবে। অফিসারের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কাজ পরামর্শ নিয়ে এসেছে মানসী। আজ সেই পরামর্শকে ভাষায় রূপ দিতে হবে। শুধু কি সমাজবিজ্ঞান? দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, রসায়ন পদার্থবিদ্যা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা হাত দিয়ে না ছুঁতে হয় মানসীকে। লেখকসূচী আর গ্রন্থসূচী। মানসী এই সূচী-শিল্পের শিল্পী। ভাগ কর, সাজাও, তালিকা কর, নির্দেশ দাও, সন্ধান দাও, কোথায় কোন বই আছে, কোথায় কোন বস্তু পাওয়া যাবে। তার বেশি নয়। এই বিরাট গ্রন্থশালার দ্বার-দেশে তুমি শুধু তকমা আঁটা দ্বারী হয়ে থাকবার জন্যে এই বিপুল রসভাণ্ডারের প্রহরী, রসাস্বাদন তোমার জন্যে নয়, সেই অতল জ্ঞানসিন্ধুর গভীরে নিমজ্জন কোন-দিন তোমার সাধ্যে কুলোবে না।

মানসী এখানে এসে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এক ক্ষুদ্র আসনে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সহকর্মীদের মধ্যে কারো সঙ্গে সহযোগিতা, কারো সঙ্গে গোপনে গোপনে প্রতিযোগিতা চলে। অনেককে আদেশ মানে দু-একজনকে আদেশ দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যায়। কিন্তু আজ মানসীর হঠাৎ খেয়াল হল সব তুচ্ছ, সব বাহ্য। এই বিরাট গ্রন্থরাজ্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে সে শুধু রক্ষিণীর কাজ করে চলেছে। জ্ঞানের কোন একটি বিভাগের সে স্বাদ নিচ্ছে না গ্রহণের আগ্রহ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে।

মানুষের সৃষ্ট সংগৃহীত এই জ্ঞান আর রসের ভাণ্ডারের কথা ভেবে মানসী মুহূর্তের জন্যে নিজেকে হঠাৎ ভারি অসহায় বোধ করল। যেমন ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে রাত্রির অসংখ্য তারায় ভরা অসীম আকাশের দিকে চোখ পড়লে সেই বিপুল বিস্ময়ের কাছে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বাসনা-কামনা তুচ্ছ হয়ে যায়, তার কথা মনেই পড়ে না, এই অসংখ্য অক্ষরের তারায় খচিত জ্ঞানের আকাশও তার মনে সেই বিস্ময়বোধের আভাস এনে দিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর এ আকাশ মানুষের নিজেরই সৃষ্টি, এর তারার মালা তার নিজেরই হাতের সযত্নে গাঁথা, তার নিজেরই হাসি-কান্না ভরা। মানসীর মনে পড়ল মহাকাশ নয়, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের তুলনা দিয়েছিলেন মহাসমুদ্রের সঙ্গে। 'মহা-সমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।'

পরীক্ষার খাতায় পাঠাগার নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখবে উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করতে পারবে বলে এক সময় লাইনগুলি মুখস্থ করে রেখেছিল মানসী। সেই মুখস্থবিদ্যা কাজে আসে নি। পাঠাগার নিয়ে প্রবন্ধ তাকে লিখতে হয়নি। এই বিরাট গ্রন্থশালার মধ্যে দিনের পর দিন কাজ করতে করতে সেকথা মনে পড়েনি। কী আশ্চর্য, আজ মনে পড়ল। আজ যখন মন আর এক বেদনায় অভিভূত, আর এক বেদনায় জর্জর, তখন হঠাৎ মনে এল প্রেমের বঞ্চনার চেয়ে মূঢ়তার বেদনা আরো

বেশি, জ্ঞানের দৈন্য আরো বেশি দুঃখের আর লজ্জার। একমাত্র জ্ঞানই কি মানুষকে সব দুঃখ, সব ভয় আর ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে পারে? সব তৃষ্ণা আর বাসনার সমুদ্র পার হতে শিখায়? কিন্তু জ্ঞানের কি সীমা আছে? খানিকদূর এগিয়ে সব মানুষকেই তো শেষে একদিন সেই পরম-জ্ঞানী সক্রেটিসের মত বলতে হবে, 'কিছুই জানি না আমি, এই মাত্র জানি।' কিছুই জানি না, কিছুই জানতে পারব না এই কথা জানবার জন্যেই এই বিপুল গ্রন্থশালার সৃষ্টি, এই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের আয়োজন! কিছুই জানি না, কিন্তু জানবার চেষ্টা করি, সেই চেষ্টার মধ্যেই জীবন, সেই সন্ধানের মধ্যেই কি মানুষের সিদ্ধি আর সার্থকতা? সেই মহৎ বেদনার, মহত্ত্বের উপলব্ধির মধ্যেই কি মানুষ নিজেকে বার বার খুঁজে পায়?

হঠাৎ মানসী যেন যুগযুগান্তরের অগণিত জ্ঞানান্বেষী মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করল। তাদের জয়ের গৌরব পরাজয়ের বেদনা উপলব্ধি করল। বিদ্যা দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, শুধু বোধ দিয়ে সেই বিপুল মানব ইতিহাসকে ছুঁয়ে এল, শিশু যেমন তার দুচোখের বিস্ময় দিয়ে আনন্দ দিয়ে অসীম আকাশকে স্পর্শ করে।

মানসী চোখ তুলে দেখল রিডিং-রুমের অনেকগুলি আসন এবার ভরে উঠেছে। তরুণ জ্ঞানান্বেষীর দল। এদের অনেকের মুখ মানসীর চেনা। কারো কারো নামও জানে। শুধু নাম আর মুখ। তাতেই আনন্দ, তাতেই সুখ। মানসীর মন এক গভীর আশ্বাসে ভরে উঠল। সেবার আনন্দ, সহায়তার আনন্দ, নিজের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়ার আনন্দ। তার চেয়ে বড় আনন্দ যেন কেউ কামনা না করে। তার চেয়ে বড় কিছু নেই। এই গ্রন্থশালায় নিজের অস্তিত্বকে যেন নতুন করে অনুভব করল মানসী, নতুন সার্থকতার স্বাদ পেল।

প্রসন্ন মুখে নিজের কাজে মন দিল মানসী। কিন্তু বইয়ের তালিকা লিখতে লিখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিদ্যার্থী অসীমও এসে মাঝে মাঝে একটি আসন দখল করে বসত। কিন্তু সব দিন কি বইতে মন থাকত তার? দুটি চোখ অক্ষরের শাসন মানত?

সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি যুক্তির স্তর ভেদ করে বাসনা-রঙীন আর এক বেদনার অংকুর ফের মাথা তুলেছে। কিন্তু মানসী তাকে কিছুতেই বাড়তে দিল না। নিজের মনকে অনুশাসনে বাঁধল। ফাইল আর বইপত্রের আড়ালে সেই উদ্গত অংকুরকে অদৃশ্য করে রাখল মানসী।

তিন ঘণ্টা নিশ্ছিদ্র কাজের পর খানিক বিশ্রাম। চা খাওয়ার জন্যে ক্যাণ্টিনে এল মানসী। অপর্ণা পিছু নিল। এগিয়ে

এসে হেসে বলল, 'ব্যাপার কি? আজ যে বড় এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছ।'

মানসী বলল, 'আমি কোনদিনই বা জড়িয়ে জড়িয়ে চলি। আগেকার সেই বঙ্গললনা তো নই যে, ঘাটের পথে চলতে গিয়ে শরমে যায় পা জড়িয়ে।'

অপর্ণা বলল, 'বিয়ে-টিয়ে এখনো করনি, তাই এত বড়াই করতে পারছ। একবার শ্বশুরঘরে গিয়ে ঢুকলে বুঝতে পারবে পা জড়ায় কি না জড়ায়।'

মানসী মৃদু হাসল। অপর্ণা সম্প্রতি শ্বশুর ঘরে ঢুকেছে। সেই অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই সে শোনায়। বাপের বাড়ির মত স্বাধীনতা শ্বশুর বাড়িতে মেলেনি। বাইরের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশার ব্যাপারে শ্বশুর শাশুড়ীর অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছে। স্বামীরও সায় সেই দিকে। কিন্তু বিয়ের পর অপর্ণা চাকরি করতে পারবে না এমন কোন আশঙ্কা দেখা দেয়নি। বাপের সংসারই হোক শ্বশুরের সংসারই হোক টাকার দরকার। আর সে দরকার দিনে দিনে নিঃশ্বাসে বাড়ে। সে টাকার প্রবেশপথ যত বেশি খোলা থাকে ততই ভালো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যদিক থেকে। অপর্ণার বাবা তাঁর মেয়ের উপার্জনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। কন্যাদান করবার সময় দক্ষিণাটাও ধরে দিতে হয়েছে। ফলে টানাটানি চলছে সে সংসারে। অপর্ণার দুইকূল রক্ষা করা দায় হয়ে পড়েছে। ভাইবোনদের স্কুলের মাইনে বাকি পড়েছে শুনলে তার মন খারাপ হয়। আবার স্বামী আর শ্বশুর শাশুড়ীর অসন্তুষ্টির ভয়ও আছে। তাছাড়া ওর বাবাও আগের মত মেয়ের কাছ থেকে সহজে টাকা নিতে পারেন না। তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। ভারি মুশকিলেই পড়েছে অপর্ণা। তার পক্ষে টাকা এখন দেওয়াও কঠিন না দেওয়াও কঠিন।

অপর্ণা তার একজন পরিচিত ভদ্রলোককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানসী তার জন্যে অপেক্ষা না করে ক্যানটিনের ভিতরে ঢুকে কোণের একটি চেয়ার নিয়ে বসল। এখানে এখন জায়গা মেলাই শক্ত। আহারার্থীর দল গিজ গিজ করছে। চেনা মুখ অচেনা মুখ। কারো সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে কারো সঙ্গে নেই। কারো চোখ পরিচয়ে উদ্ভাসিত কারো চোখে অপরিচয়ের আঁধার। চা আর অমলেটের অর্ডার দিল মানসী। অপর্ণা আর এল না। বোধহয় অন্য কোথাও বসেছে। মানসী ভাবল অপর্ণার সমস্যা অনেকটা ঠিক তাদের বাড়ির মত। মানসী যদি এখন বিয়ে করে তার অবস্থাও ঠিক ওই রকমই হবে। সেও কি আর এখনকার মত বাবাকে পুরোপুরি সাহায্য করতে পারবে? মানসী হাসল। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আর তার দরকার নেই। বিয়ে আর তাকে করতে হবে না। অপর্ণার মত সমস্যা জীবনে হয়তো কোনদিনই আসবে না। মানসী পরম নিশ্চিন্তভাবে যেমন আছে তেমনি থাকবে। চাকরি করতে করতে বুড়ো হবে। বেশি বুড়ো হয়ে গেলে চাকরি আর করতে হবে না। তারপর? তারপর আর কিছু নেই। তারপর দিগন্তজোড়া অন্ধকার আর শূন্যতা। কিন্তু একী অবসাদ? একী হাহাকার তার মনে? জ্ঞানে যার আনন্দ কর্মে যার আনন্দ—এই নৈরাশ্য কি তার সাজে? মানসী কিছুতেই হার মানবে না। ভবিষ্যতের সেই সংগীহীন জীবনে যদি শূন্যতা হয় সেই শূন্যতাকেই সে বরণ করে নেবে। তবু অপমানের কাছে সে মাথা নোয়াবে না।

'মানসী!'

পুরুষের গলায় নিজের নাম শুনে মানসী চমকে সামনের দিকে তাকাল। না অসীম নয়, উৎপল রায়।

কলেজের পুরোন সহপাঠী।

'একা একাই চা খাচ্ছ?'

মানসী হেসে বলল, 'খাবে?'

উৎপল সামনের চেয়ারটা ফাঁকা দেখে তাতে বসে পড়ে বলল, 'যদি খাওয়াও তো খেতে পারি। নিজের পকেট ফাঁকা।'

মানসী বলল, 'আচ্ছা সেজন্যে ভেব না। শুধু চা? না আর কিছু খাবে?'

উৎপল বলল, 'না। শুধুই চা। বেশি ঋণী হতে ভরসা পাইনে। তোমাদের তো চিনি।'

মানসী বলল, 'চেন নাকি? এমন আত্মবিশ্বাস কোত্থেকে এল? তোমাদের মধ্যে যারা বিবরী সাহিত্যকারের জ্ঞানী তাঁরা কিন্তু বলেছেন আমাদের চরিত্র মানুষ তো ভালো দেবেরও দুর্গেয়।'

উৎপল বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু আমি সর্বস্ব খুইয়ে তোমাদের একজনকে চেনার জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করে রেখেছি।'

মানসী একটু হেসে উৎপলের দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল। ও নিশ্চয়ই গীতা সান্যালের কথা বলছে। এক সময় সমগ্লাজিন আর সংস্কৃতি শাখা নিয়ে গীতাও মেতে উঠেছিল। সেই শাখা-প্রশাখার মধ্যস্থতায় ওদের বন্ধুত্ব ফুলে-পল্লবে ভরে উঠল। হিংসুটে বন্ধুদের মুখে মুখে আরো পল্লবিত হল। সবাই ভাবল ওরা কলেজের সীমানা পার হয়েই একেবারে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে ঢুকবে। কাকে কাকে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে ডাকবে তাই নিয়েও জল্পনা কল্পনা চলল। কিন্তু পরীক্ষার ফল হল অকল্পনীয়। গীতা গণিতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়ে বেরোল আর গেজেটে উৎপল রায়ের নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। উৎপল ঠাট্টা করে বলল, 'মেয়েরা যে ভিতরে ভিতরে হিসেবী তার আর একবার প্রমাণ পাওয়া গেল।'

গীতা কিন্তু হাসল না। তার গম্ভীর মুখ দেখে সবাই দুঃখ করল 'আহা অমন প্রেমও কোনো পুরো সুখ পেল না।'

তারপর কী যে ব্যাপার ঘটল। দ্বিতীয় বছরেও উৎপল বি-এর চৌকাঠ ডিঙোতে পারল না। তারপরের বছর পরীক্ষা [illegible] আর গীতা এই [illegible] নিয়ে [illegible] না করে [illegible] একটি [illegible] ইউনিভার্সিটি থেকে [illegible] এল।

কিন্তু গীতাকে দোষ দেওয়া যায় না। ও অনেকদিন অপেক্ষা করেছিল। মানসী তা জানে। গীতা বলত, পরীক্ষার পাশ ছাড়াও জীবনের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্র পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন না কোন দিকে উৎপল সেই যোগ্যতার পরিচয় দিক। গীতা ততদিন কলেজে পড়াবে আর হাতে বসে [illegible] গাঁথবে। কিন্তু চঞ্চল চিত্ত নিষ্ঠাহীন উৎপল নানা ক্ষেত্রে চষে বেড়াল, কোথাও ফসল ফলাতে পারল না। গীতা [illegible] নির্দেশে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক বিজ্ঞানীকে বিয়ে করেছে। কেউ বলে [illegible] বর হয়েছে। কেউ বা ধিক্কার দিয়েছে প্রেমের এই অমর্যাদায়। কিন্তু ওরা যত গালাগালই দিক উৎপলকে সম্রাটের আসন দেওয়া কি গীতার পক্ষে সত্যিই সম্ভব ছিল? [illegible] করে বিয়ে যদি সে উৎপলকে করতই, অনুকম্পা আর সহানুভূতি ছাড়া আর কী-ই বা সে স্বামীকে দিতে পারত? সেই জোরে নিজের বাঁধন কতদিন শক্ত থাকত?

মানসী চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে

সে চিঠির কোন দরকার হয়নি। কোন দরকার হয়নি সেকথাও কি বলতে পারবে? এক হিসেবে চিঠিটা নষ্ট করে ভালই করেছে মানসী। ও চিঠি তো তিনি আর নিজের ইচ্ছায় লিখতে চান নি! মানসীই তাঁকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিল। সেই অনধিকার চর্চার শাস্তি মিলেছে।

আর একবার মাথা নাড়া দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছ চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল মানসী। অফিসের কাজ করতে এসে এসব অকাজকে সে কেন প্রশ্রয় দিচ্ছে? ছি ছি ছি। গ্লানি, অবসাদ, পরাজয়—সব কিছুর ওপর একমাত্র কর্মই সত্য। সে কাজ যত তুচ্ছই হোক মানুষের নিষ্ঠায় তা গৌরব পায়। মানসী সেই গৌরবেই অসামান্যা হবে। তার আর কোন কাম্য নেই।

চারটে নাগাদ ইনচার্জ ডেকে বললেন, 'মিস মুখার্জি, আপনার ফোন এসেছে।'

ফোন ধরতে গিয়ে হাত কাঁপল মানসীর, বুক কাঁপল? কাল না কি দু'তিনবার ফোন করেছিল, আজ বুঝি এতক্ষণে মনে পড়ল?

না মনে এখনো পড়ে নি। অসীম নয়, মায়া। তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে ফোন করছে। কথাগুলি শুনে নিয়ে মানসী রিসিভারটা রেখে দিল।

ইনচার্জ বললেন, 'কী ব্যাপার। কোন খারাপ খবর নাকি?'

মানসী বলল, 'না, পুরোপুরি খারাপ নয়। ছোট ভাই আর বোন দুজনেই পরীক্ষা দিয়েছিল। বোনটি পাশ করেছে ভাইটি ফেল।'

ইনচার্জ বললেন, 'যা হোক তবু তোমাদের বাড়িতে পাশের হার ফিফটি পার্সেন্ট হল—।'

নিজের টেবিলে ফিরে এল মানসী। মায়া বলেছে বাবাই আগে জানতে পেরেছেন খবরটা। বিজুদার কাছে তিনি নিজেই গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বাড়িতে বিষম কান্ড শুরু করে দিয়েছেন। মানসী যেন ছুটির পর আর কোথাও দেরি না করে সোজা বাড়ি চলে যায়।

বেচারা নন্দু। ওর হতাশ ম্লান মুখখানা মানসীর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মায়া ফোনে বলেছে, 'এর চেয়ে উল্টোটা হলে ভালো হত মেজদি। ও যদি পাশ করত, আর আমি ফেল করতাম, খুব ভালো হত। ওর মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো মেজদি।' মানসীর মনে পড়ল সকালে এই মায়াই শুধুমাত্র নিজের পাশের জন্যে আশীর্বাদ চেয়েছিল।

তাড়াতাড়ি যাবে বইকি মানসী। ছুটি হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়বে। দেরি আর কোথায় করতে যাবে মানসী? করবার কোন হেতু তো আর নেই। **(ক্রমশ)**

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

।। তেত্রিশ ।

দ্বৈতবাদ যেটা সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এই যে, সাংখ্যকার কপিল দর্শন করেছিলেন স্বয়ং-সৃষ্ট জগতে দুটি প্রধান সত্তা—পুরুষ আর প্রকৃতি। স্বয়ংসৃষ্ট বলছি এই জন্যে যে, সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর অস্বীকৃত। 'প্রমাণাভাবাৎ ঈশ্বরো ন সিদ্ধঃ'। মূল সাংখ্য-দর্শন আমাদের অনুমান করে নিতে হয় পরবর্তীকালের রচনা থেকে। তবে এটা সুনিশ্চিত যে বুদ্ধদেবের পূর্বে মহর্ষি কপিল সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রে সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত এই তিন দর্শনের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যের আভাস পেয়েছেন ঋগ্বেদে। আমি দেখছি, ঐ বেদে যোগ ও লোকায়তের কথাও মেলে। সে-প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচনার যোগ্য। এখন শুধু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করি, কেন সবুজপত্রের সবুজপাতার ডাকে আমি সাংখ্য-দ্বৈতবাদ স্মরণ করে প্রমথ চৌধুরীর দুটি চিঠি ছাপিয়েছি।

চিঠি দুটি রাঁচী থেকে লেখা—তারিখ যথাক্রমে ৮।১০।১৯ ও ২১।১০।১৯।

প্রথম পত্র দু'বার ছাপাতে বাধ্য হয়েছি—কেননা ওঁর ১৯১৭ সালের মহাষ্টমীতে লেখা চিঠি। সেও রাঁচী থেকে। আমার হাতে পড়ে ঠিক দু'বছর পরে, ১৯১৯ সালের মহাষ্টমীতে। এখানে দুই বৎসরের ব্যবধানকে দ্ব্যর্থবোধক বলা যায়। প্রমথবাবুর Pun-গুলিও দ্ব্যর্থ-বোধক। ওঁর ৮।১০।১৯-এর চিঠিতে উনি লিখছেন: 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই'। এ-উক্তিতে ওঁর তৎকালীন দৈহিক জীবনের দুটো দিক পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐ-পত্রে পুরুষ এবং প্রকৃতি, আর এক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রমথবাবু গোঁফ ফেলে ও তুলে দো-মনা ভাব প্রকাশ করেছেন ১৪।১১।১৮ তারিখের চিঠিতে, এবং স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি যে, উনি "প্রকৃতিতে শাক্ত"—অর্থাৎ ওঁর প্রকৃতি ছিল পুরুষের। উনি শাক্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে শৈশবে কৈশোরে দুর্গা প্রতিমার মুখে হাসি দেখেছিলেন—বস্তুত একটা প্রসন্ন করুণ ভাব—একথা ওঁর "বাঙালী পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌" প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, যার রচনাকাল ১৯২০। অথচ, ১৯১৯-এ উনি দুর্গাকে পাকাপাকি বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক। আমার বিশ্বাস, ওঁর অনিচ্ছা অহৈতুকী নয়। উনি দুর্গাদেবীর রণরঙ্গিণী মূর্তি পছন্দ করতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন ওঁর বৌদ্ধধর্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। রক্তপাতের দৃশ্য সইতে পারেন নি।

একটা কথা প্রসংগত মনে হচ্ছে, ... গেছি। মহিষাসুর-বধের জন্য জয়মালা প্রাপ্য কার—দেবীর না তাঁর বাহনের—এ-প্রশ্নের সমাধানকল্পে আমি পূর্বে বলেছি, মালা সিংহেরই পাওয়া উচিত। সিনেমায় এ-দৃশ্যটি যদি দেখানো যেত, আমরা অতি সহজেই দেখতে পেতুম যে পশুরাজ আর কেউ নন, স্বয়ং পশুপতি। কালীঠাকুরের প্রতিমায় যেমন দেবীর নীচে পশুপতি, দুর্গা-ঠাকুরের প্রতিমায় তেমনি দেবীর নীচে পশুরাজ। দুই প্রতিমারই রূপ-কল্পনায় শিব ও দুর্গার অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির, একত্র অবস্থান প্রতিবিম্বিত।

রাঁচী থেকে লেখা প্রমথবাবুর দুটি চিঠির মধ্যে কাজের ব্যবধান মাত্র তের দিন। দ্বিতীয় পত্রে উনি বলছেন: 'বিজ্ঞানকে আমি রাজার মত মান্য করি এবং রাজার মত ডরাই'। প্রথম পত্রে উনি বলেছিলেন: 'এ চিঠি সত্যেন্দ্রকে দেখিয়ো না, সে চটে যাবে। সায়েন্স হচ্ছে এ-যুগের মিথ-লজি'। এর পূর্বেই উনি মেনে নিয়েছেন নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা-পরম্পরা থেকে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বের করাটা হচ্ছে সায়েন্সের কাজ, আবার সায়েন্স হচ্ছে এ-যুগের মিথ-লজি। আসল কথা, সত্যমিথ্যার মিশ্রণে আর্ট ও সায়েন্স দুই-ই তৈরী হয়—এবিষয়ে মিথ্যা-লজ্জা করে লাভ নেই। পাছে, কেউ মনে করেন যে, আমি মিথ্যা-লজ্জার কথা তুলছি কেবল মিথলজির সংগে মিল খাওয়াবার জন্যে, তাই বলে রাখছি যে ওরূপ অসদুদ্দেশ্য থাকলে আমি সংস্কৃত 'মিথঃ' শব্দের শরণাগত হতুম, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান-পিপাসার পৌরুষ থেকে স্ত্রৈণ প্রকৃতির লজ্জা-রক্ষা করাটা যে প্রাকৃতিক নিয়ম, এ-যুক্তির অবতারণা করতুম।

দ্বিতীয় পত্রের একটি উক্তি বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে বোধগম্য হবে না: "এ-চিঠি ঠিক সময়ে তোমার হাতে পৌঁছবে কি-না বলতে পারিনে। যদি পঞ্জি পুঁথি তিথি-নক্ষত্র না মেনে ছোটো হয়ে থাকে ... তাহলে এ-চিঠি হয়ত শোভাবাজারেই পড়ে থাকবে।" চিঠির উপরে লিখে দিচ্ছি please redirect—কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠিটি উনি শোভাবাজারে পাঠাননি, পাঠিয়েছিলেন বাগবাজারে। খামের ওপরে বাগবাজারের ডাকছাপ আছে, কেবল তাই নয়। ঠিকানা লিখেছেন:

Srijut
Harit Krishna Deb.
C/o Sudhindra Sinha
64 Rajah Rajballav Street
Baghazar P.O
Calcutta.

বোঝা যাচ্ছে, উনি চিঠি লেখবার সময় যা ভেবেছিলেন তা [illegible] লেখবার সময় করেন নি।

ব্যাপারটা আর কিছু না। কবি সত্যেন দত্তের সঙ্গে আমি দার্জিলিং বেড়াতে যাবো, স্থির করেছিলুম। যেদিন রওনা হবার কথা, সেদিন সকালে সত্যেনবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন: সব ঠিক্-ঠাক্ হয়েছে তো?

উত্তরে আমি বললুম: স্যুটকেস্ গুছিয়ে রেখেছি, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই সিঁড়ি দিয়ে যেমন রোজ দু'ধাপ টপকে উঠি তেমনি উঠছিলুম, শুধু পায়ে, হঠাৎ হোঁচট খেয়েছি আর পায়ের বুড়ো আঙুলের একটা নখ আদ্ধেক উঠে গেছে, রক্ত পড়ছে,—এই দেখুন। জুতো না পরে তো দার্জিলিঙে যাওয়া যাবে না? আর বাধা যখন পড়ল তখন আমি না হয় নাই গেলুম, আপনি একাই যান্।

কবি বললেন: উঁহুঃ, তা কি হয়? আপনি সেরে উঠুন তারপর যাওয়া যাবে।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের তাঁবুতে সে-সময়ে রোজই সত্যেন দত্তের সঙ্গে গল্প করা যেত। সেই সূত্রেই ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাটা জমে উঠেছিল। শুধু ওঁর সঙ্গে কেন, অনেকেরই সঙ্গে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সাহিত্যিকদের মধ্যে এঁদের নামই এখন বেশি মনে পড়ছে। চারুবাবু চমৎকার ফ্যান্সি সুইমিং করতেন। ছোকরাদের ভিতরে দুজন সত্যেনবাবুর বিশেষ প্রিয় ছিলেন—সুকুমার রক্ষিত, যিনি এখন বরাকরে খনির কাজে বড় কাজী, আর প্রফুল্ল ঘোষ, যিনি সাঁতারু হিসেবে বিখ্যাত। সুধীন্দ্র সিংহ আর আমি জামার বদলে উড়ুনি গায়ে দিয়ে যেতম বলে কেউ কেউ ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু সত্যেনবাবু এটা বুঝেছিলেন যে বেশ ত্যাগ করে কস্টিউম পরে জলে নামবার আগে যদি কেউ উড়ুনির আশ্রয় নেয়, তাকে দেশত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া অনুচিত, বিশেষতঃ যখন উড়ে বেড়াবার সে-রকম সুবিধে মতন ব্যবস্থা ছিল না।

তবে আমাদের বাড়িতে সত্যেন দত্ত ছেলেবেলায় আসতেন অনায়াসে। ওঁর এক মামা ছিলেন আমার বাপ-কাকার বিশেষ বন্ধু, এবং সত্যেনবাবুর মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বাসভবনেই ছিল তাঁর বাস। আর একজনও সেখানে থাকতেন ললিতকৃষ্ণ বোস—বাবার পিসতুতো ভাই নবীনকৃষ্ণ বোসের মধ্যমপুত্র,—যিনি ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে খুব আলোচনা করতেন। ললিত কাকাকে আমরা ভালো গণৎকার বলতুম। তাঁর সংশ্রবে থাকার ফলে বাবা এবং সত্যেন দত্ত দুজনেই গণনার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।

সত্যেন দত্ত প্রায়ই খোঁজ নিতে আসতেন, আমার হোঁচটের চোট সেরেছে কিনা। সারতে কিছুদিন লাগল। সত্যেনবাবু বললেন, পাঁজিতে দিন দেখে শুভযাত্রা করাই ভাল। পাঁজি বের করলুম। উনি একটা দিন ভাল আছে বলে বাবাকেও পাঁজিটা দেখতে দিলেন। বাবার উলটো মত—দিনটা তো ভাল নয়, অমুক দোষ রয়েছে। সত্যেনবাবু বাবার মত খণ্ডন করবার জন্যে যুক্তি দেখালেন। দুজনের মধ্যে মতভেদ দেখে আমি আমাদের ফ্যামিলি অ্যাস্ট্রলজার যোগেন্দ্রচন্দ্র আচার্যকে নিয়ে এলুম। তিনি দুপক্ষ শুনে রায় দিলেন বাবার পক্ষে, এবং শাস্ত্র থেকে শ্লোক আওড়াতেই সত্যেনবাবু বললেন: সংস্কৃত শ্লোক যখন বলছেন, তখন আমি হার মানলুম।

শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডার ভয়ে সেবার দার্জিলিং গেলুম না।

প্রমথবাবুর দ্বিতীয় পত্রে অ্যাস্ট্রনমি ও অ্যাস্ট্রলজির যে সম্বন্ধ দেখান আছে সেটা ঠিক। অ্যাস্ট্রনমি হচ্ছে নক্ষত্রলোকের ফিজিয়লজি, আর অ্যাস্ট্রলজি হচ্ছে নক্ষত্রলোকের সাইকলজি। একসময়ে নক্ষত্রলোকের মধ্যে গ্রহদের ঠাঁই ছিল না কেন-না তাদের চলা-ফেরা এলোমেলো এবং একই কারণে তাদের "প্ল্যানেট" নাম দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুদের প্রাচীন পাঁজিতে তাদের স্থান নেই। শুধু সূর্য চন্দ্র আর নক্ষত্র নিয়েই সেকালের পাঁজিকা-কার-রা কারবার করতেন। মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি দ্বাদশ রাশিকে তখনকার হিন্দু জ্যোতিষীরা আমলে আনেন নি। অহোরাত্রকে তাঁরা ষাট ভাগ করে এক এক ভাগকে "দণ্ড" বলতেন। আবার দণ্ডকে ষাট ভাগ করে "পল" ইত্যাদিতে ব্যাবিলোনীয় সেক্সাজেসিমাল (Sexagesimal) প্রণালী লক্ষ্য করা যায়। চীনাদের প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অনুরূপ প্রণালী বর্তমান। এ বিষয়ে কে কার কাছে ঋণী তা নিয়ে তর্ক আছে, মীমাংসা হয় নি। [illegible] আমরা যখন গ্রীকদের মারফতে গ্রহ-পাঁজি গ্রহণ করলুম সে কথা ইতিপূর্বে সবুজপত্রের [illegible] বলেছি।[১] এখন কুরু-পাণ্ডব-সমরের তারিখ গণনা [illegible] করেছি এবং ফলে আর্যভট্টের জ্যোতিষগ্রন্থে একটি [illegible] কলিযুগারম্ভ দেখেছি যেটা এখনকার পাঁজিতে "কল্যব্দাঃ" রূপে ধারণ করে আছে। ৫০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এই জ্যোতিষগ্রন্থের রচনা হয়। আর্যভট্ট তখন একটি ২৩ বছরের ছোকরা। এর অল্পদিন পরে দেখা দেন বরাহমিহির। তিনি আবার আর একটি গ্রীকগণনাকে ভুল-শুদ্ধ গ্রহণ করার জন্য মহাভারতের কাল-নির্ণয় ব্যাপারে ভ্রামক নির্দেশ দিয়েছেন। আর্যভট্টের হিসাবে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৩১০২, বরাহমিহির বৃদ্ধগর্গের উদ্ধৃত করে বলছেন শককাল (৭৮ খৃঃ) থেকে ২৫২৬ বছর পূর্বে যুধিষ্ঠির রাজা ছিলেন। দুটি মতের মধ্যে ৬৫৩ বছরের তফাৎ। আমি একটি ইংরেজী প্রবন্ধে দেখিয়েছি[২] যে এ দুটো মতই ভুল, এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের তারিখ যেটা পুরাণে পাই সেইটাই ঠিক অর্থাৎ ও যুদ্ধ ঘটেছিল খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

অহোরাত্রকে ষাটভাগে ভাগ করে ২৪ মিনিটের "দণ্ড" লাভ করা যায়। দু-দণ্ড সবুর করবার ধৈর্য নেই যাদের, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে দু-দণ্ড (৪৮ মিনিট) হচ্ছে এক "মুহূর্ত" এবং প্রাচীনতম হিন্দু গণৎকারদের নাম "মৌহূর্তিক"।

১ দেশ, ২৩, আশ্বিন, ১৩৬৬

২ "When Kurus fought Pandavas", Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1925.

গ্রীক্ অ্যাস্ট্রলজির প্রভাব এখানে ছড়িয়ে পড়ার পর হোরা-শাস্ত্রের সৃষ্টি হল। এই "হোরা" শব্দটি গ্রীক ও ল্যাটিনে রয়েছে। একে ইংরিজীতে "আওয়ার" বলা হয়, বাংলায় "ঘণ্টা" (৬০ মিনিট) বলি, কেন-না ঘণ্টা বাজিয়ে ঘণ্টা জানানো হয়। হোরা-শাস্ত্র হচ্ছে ফলিত জ্যোতিষের সেকেণ্ড এডিশন। "হোরা" যে "অহোরাত্র"-শব্দের আগা আর গোড়া কেটে তৈরী, এই মতও বরাহমিহির উদ্ধৃত করেছেন, "ইত্যেকে" বলে! শব্দ-তত্ত্বের নিয়মকে আগাগোড়া না কেটে দিলে এ-মতের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

কাশীতে ১৯২৫ সালে আমি বন্ধুবর নীরেন রায়ের সঙ্গে একবার শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কইবার সুযোগ পেয়েছিলুম। গোপীনাথ কবিরাজ তখন কুইনস্ কলেজের অধ্যক্ষ। আশ্চর্য পাণ্ডিত্য তাঁর; তিনি বললেন আমাদের শাস্ত্রে জন্মকালে গ্রহ সন্নিবেশের সঙ্গে মানুষের কর্মফল যুক্ত আছে ঘনিষ্ঠভাবে। সে যাই হোক, আমি নিজে বেস্পতিবারের বারবেলা মেনে চলতে চেষ্টা করি, আর অশ্লেষা-মঘাও কিছু কিছু মেনে চলি মনে হয়। অনেকগুলো প্রবাদবাক্যের বিশ্লেষণ করে কি ফল পেয়েছি তা বলি। বৃষ্টিকে অ-যাত্রা বলা হয়। এ-কথা সর্বতোভাবে সমীচীন, কারণ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরুনো যায় না যদি ছাতা নিয়ে মাথা না বাঁধি। ছিটে ফিটে ছাতা ফুরিয়ে গেছে বহুকাল, এবং যখন মাত্র এক ছত্র অবশিষ্ট ছিল তখন একছত্র সম্রাজ্য লাভ হয় নি। এ-অবস্থায় পথচারী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?—বৃষ্টিকে অ-যাত্রা বলে লোকে নিজেও ধোপাকে অ-যাত্রা বলা চলে কি না, এ-সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলুম। তাঁর সারগর্ভ উত্তর লিপিবদ্ধ করা উচিত। তিনি বললেন, ধোপার আগমন অত্যন্ত শুভলক্ষণ, কেননা সে পরিষ্কার কাপড় নিয়ে আসে আর ময়লা কাপড় নিয়ে যায়।—কলা অ-যাত্রা, একথাও শোনা যায়। অথচ পূজাকার্যে কলা অপরিহার্য। আমার সন্দেহ হয়, অশোক কাঞ্চনের এই নিদর্শনটিকে সুবর্ণভাবে দেখেছেন আমাদের সমাজের দুটি স্তর। ব্রাহ্মণদের অনুকূলে বৃষ্টি পূজায় মূর্ত হয়ে আছে, এবং ইতর-সাধারণের প্রতিকূলে দৃষ্টি প্রবাদে প্রতিফলিত। কচি কলাপাতে ভাত খেতে চিরকালই আমার ভাল লাগে—তার সোনালী-সবুজ রং দেখলে মনে হয় যেন সোনার অংশ থেকেই সবুজ পাতার উৎপত্তি হয়েছিল।

প্রমথবাবুর লেখা এই একটিমাত্র চিঠিতে আস্ট্রলজির কথা পেয়েছি। উনি নিজে কতটা বিশ্বাস করতেন তা জানিনা। অকাল্ট সায়েন্স অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের মধ্যে আস্ট্রলজিকে ফেলার মানে যদি এই হয় যে, উনি ফলিত জ্যোতিষের ফল চোখে দেখেন নি, তাহলে বোধহয় সাংখ্যকারের মতন উনি বলতে চেয়েছেন, প্রমাণভাবাৎ ফলিত-জ্যোতিষ অ-সিদ্ধ। তবে আমার একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে, এ-চিঠির মধ্যে কিছু অংশ ওঁর বানানো কথা। সন্দেহের অবসর পাই এর পরের চিঠি পড়ে।

৮৭

রাঁচি

২৯।১০।১৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠির যে হাতে হাতে জবাব দিই, তার কারণ তোমাকে চিঠি লিখতে ভাল লাগে,—আর তোমাকে চিঠি লিখতে যে ভাল লাগে, তার কারণ তুমি হচ্ছ একজন চিঠি লিখিয়ে লোক—অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে একজন চিঠি পড়িয়ে লোক। উপরন্তু শ্রোতা না থাকলে বক্তার স্ফূর্তি হয় না। আর কোনো কিছু লেখবার প্রয়োজন নেই, যদি না তা স্ফূর্তি করে লেখা যায়।

আমাদের সবুজদলের ভিতর তুমি ছাড়া আর একটি মাত্র চিঠি লিখিয়ে লোক আছে। তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি-না বলতে পারিনে, কেননা সে কলকাতায় থাকে না। কে জানো? অমিয় চক্রবর্তী! ছোকরা দিব্যি লেখে। সে লেখেও ভাল, আর তার লেখা বিষয়ে কার্পণ্য নেই। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে মস্ত মস্ত চিঠি তার কাছ থেকে যখন তখন পাই।—তোমাদের দুজনকে বাদ দিলে আর বড় কেউ বাকী থাকে না, যাকে comple te letter writer বলা যেতে পারে। সন্তোষদের লেখবার হাত আছে—কিন্তু সে হাত সে ছোট করেই রাখে। কিরণের চিঠিকে টেলিগ্রাম বললেও হয়। সুরেশানন্দ লেখে শুধু কাজের কথা। অতুলবাবু

লেখেন ভালো কিন্তু বছরে এক আধ বারের বেশি নয়। বাদবাকী সকলের কালি কলমের সংগে কোনো সম্পর্কই নেই। সত্যেন্দ্র সাদা কাগজের উপর কালো আঁচড় কাটেন না, বোধহয় তার কারণ তিনি কালো বোর্ডের উপর খড়ির সাদা আঁচড় কাটাটাই তার স্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন। ধূর্জটী শুধু তখন চিঠি লেখে যখন তার "হিস্টিরিয়া" হয়। হিস্টিরিয়া জিনিসটে ত আর পালাজ্বরের মত নিয়মিত দিনে মানুষের দেহে ভর করে না,—সুতরাং তার চিঠি যে কবে আসবে, কি আকারে আসবে তার কোনই স্থিরতা নেই। ধূমকেতুও একটা নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু ধূর্জটী চলে না। ভাল কথা মনে পড়ে গেল। সুনীতি দেশের মাটি থেকে সরে গিয়েই একজন পয়লা নম্বরের পত্রলেখক হয়ে উঠেছে। এখানে এসেও তার আর একখানি চিঠি পেয়েছি। তার লেখার হাত দিন দিন খুলে যাচ্ছে—আর সে যত বিলেতের দিকে এগুচ্ছে তার ভাষা তত

যৌবন বৃন্তে

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

উত্তীর্ণকালের ঢেউ শাদা শঙ্খ তার বাহুপাশে
মুহূর্তে মোহানা পার হয়ে গেলে উষ্ণ স্রোতে মন
সন্ধানী আলোকে ধ্রুব, অতলান্ত প্রদেশে অধীর
আমার পাতাল হতে যৌবনের এক গুপ্তধন
আমার সাম্রাজ্যে এনে তাকে দেবো নব সিংহাসন।

সমুদ্র ডেকেছে কাছে যৌবনের শিরার স্রোতে
এ সাগর পাড়ি দেবো সমুদ্র মধ্যসুরে থির;
এতদিন বার বার ফিরে গেছে সামুদ্রিক পাখি
দিগচক্রবালে এসে ঘুরে ফিরে তবু প্রত্যাগত;
এ-পারে আসেনি তরী; পরাতে পারেনি তার রাখী—

তবু এই বৃন্তহীন কুসুমের মৌচাক মন
তিমিরবলয়ে জ্যোৎস্না সুরভিত স্বপ্নকাজল
আঘ্রাণে শুভ্র বুক, অনুভবে মুক্ত শতদল;
সহসা ফাল্গুনী স্পর্শ ঃ প্রাপ্তির আলো-আয়োজন,

আমার সাম্রাজ্যে এনে তাকে দেবো নব সিংহাসন॥

ফুলের প্রতীক

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি অনুপমা হলে সূর্যাস্তের রক্তিম রেখায়।
প্রাচীন কবির মতো গম্ভীর উদাস আকাশের
মায়াবী দর্পণে ভাসছে কার ছায়া? তোমার মুখের।
এক ছায়া ভেঙে পড়ে স্মৃতিবহ সহস্র ছায়ায়।

তুমি ওই সমর্পিত মেঘের মণ্ডলী, হতে পার,
অথবা মেঘের শিল্পে দূরান্তিক জ্যোৎস্নার সম্মান।
নীল দিগন্তের বুকে অলৌকিক বিমুগ্ধ প্রগাঢ়
উন্মীলিত দুটি চক্ষু ছড়িয়েছে রহস্যের গান।

তুমি সূর্যাস্তের সঙ্গী, তবে এই প্রসন্ন মাটিতে
চেনা ভঙ্গি নিয়ে কেন ফুটে আছে তিনটি সাদা ফুল।
আমি ভুল করে ভাবি এই বৃন্ত এ কার আঙুলে
স্বপ্নে জেগে থাকব আমি নিশীথে তোমার সমাধিতে

না, তুমি কোথাও নেই, কাছে দূরে [illegible] চারদিকে
পুষ্পিত শরীর কাঁপে তিনটি শুভ্র ফুলের প্রতীকে॥

একটি রাতের আগুন

চিত্ত ঘোষ

মাটি ছুঁয়ে গেছে শ্রাবণের নদী
উজান ঠেলেই আসবে।
হাল্কা পালের নৌকো ভাসিয়ে
ভোরের চোখের বাষ্পে।

উঁচু হয়ে ওঠে রোদের দেয়াল—
কে ঘুমায় তার নীচে!
স্মৃতিরা স্বপ্ন, স্মৃতিরা বিষাদ
স্মৃতিরা ঠাণ্ডা, ভিজে।

ঘামে নেয়ে ওঠে গুনটানা দিন
ছলছল্ করে নদী,
উঠোনে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার মুখ
শংখ বাজায় যদি।

একটি সকাল দূরে চলে যায়
একটি বিকেল ডাকে।
একটি রাতের গভীর আগুন
আকাশ জ্বালিয়ে রাখে।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৩

তারাপদ সেই যে মায়ের সঙ্গে দাদা-মশাইয়ের কাছ থেকে আমাদের বাড়িতে এল, সেই থেকে আমাদের কাছেই থেকে গেল। আমাকে সে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছে বলা চলে। ছোটবেলায় বাবা-মা আমাকে ডাকতেন খোকা, কেও দেখাদেখি বলত খোকাসাহেব।

খাটত সে খুব, এমন কি ঘর ঝাট দেওয়া, ঘর মোছা, এসবও সে করেছে।

আমি তার পিঠে গলা জড়িয়ে [illegible] থাকতাম, তাতে সে বিরক্ত হওয়া ত দূরের কথা, বরং খুশীই হত।

এত ভালবাসা তার ছিল। আমার ছেলে-মেয়েকেও সে ঐভাবে মানুষ করেছে।

[illegible] ... গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, [illegible] মিত্র, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, [illegible] ইত্যাদি। তাছাড়া থিয়েটারের নাম 'ক্লাসিক', 'মিনার্ভা', 'স্টার' ইত্যাদি [illegible] খুবই আকর্ষণীয় মনে হত। [illegible] উঁচু [illegible]। সবই নতুন লাগত, কিন্তু মনে যে খুব একটা [illegible] তা নয়। [illegible] বলে রাখি, তখন সারা কলকাতা আর হাওড়ার [illegible] ছিল [illegible] হিসেব ছিল তখনকার থিয়েটারের। পরে আমরা যখন থিয়েটারে ঢুকলাম, তখনো ছিল সেই দুখানা জোড়ার হিসাব। আমাদের থিয়েটার প্রায় দশ বছর কাটবার পর সেই জোড় হল আড়াই খানা।

বাড়িতে হ্যান্ডবিল বিলি করতে আসত থিয়েটারের ঝিয়েরা মেয়েদের কাছে, কিন্তু সেই হ্যান্ডবিল যদি বাড়িতে কোথাও কিম্বা আমার হাতে বাবা দেখতে পেতেন, ত তাঁর রাগের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না। হ্যান্ডবিল ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতেনই, তদুপরি প্রশ্ন করতেন, কোত্থেকে এলো এটা?

মা হয়ত উত্তর দিলেন, থিয়েটারের ঝিয়েরা এসে বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে গেছে।

— ঐসব ঝিয়েদের কখনো বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

এমনি ছিল থিয়েটারের প্রতি বাবার বিরাগ।

কিন্তু ঝিয়েদের বাড়িতে ঢুকতে না দিলেই বা কী হবে। তারা করত কী, [illegible]

থিয়েটারের ঝিয়েদের মধ্যে বন্দোবস্ত ছিল, এক-একদিকে এক-একজন হ্যান্ডবিল বিলি করে আসবে। পরে দেখেছি ব্যাপারটি শুধু কি তাই? মায়েরা যখন ছেলেপুলে নিয়ে থিয়েটারে গেল, তখন সেই ছেলে-পুলেরা ঘুমিয়ে পড়লে তাদের শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করার ভার ছিল ঐ ঝিদের ওপরে। তাছাড়া, বাবুরা নীচে থেকে ডাকলে মায়েদের ডেকে দিতও তারা। মায়েদের জন্য পান এনে দেওয়া, খাবার এনে দেওয়া, অন্যান্য সুখ-সুবিধা দেখা, এসবও ছিল ঝিয়েদের কাজ। মায়েরা অবশ্য যাবার সময় ঝিদের বকশিশও দিয়ে যেতো। সেই বকশিশের টাকা পয়সা যে যা পাবে, সব একসঙ্গে করে ঝিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। আঁচল পেতে সবাই গোল হয়ে বসেছে, আর দলের মধ্যে যিনি প্রধানা, তার পাওনা একটু বেশী, আর সবাই পাবে সমান। পয়সা গুণে গুণে সবাইকে ন্যায্যমতো ভাগ করে দিচ্ছে, এ-ও এক দেখবার মতো দৃশ্য ছিল।

আমাদের সময়ও আমরা ঐটা দেখেছি। হয়ত থিয়েটারের অভিনয়ের কাজের পর [illegible] পরে বেরিয়ে আসছি, তাকিয়ে দেখি বাইরের চত্বরে ঝিয়ের দল গোল হয়ে বসে তাদের পয়সা ভাগ করছে এক মনে।

থিয়েটারের উঁচুতলায় মায়েদের দেখবার জায়গা থেকে নীচে পর্যন্ত যে থাক থাক সিঁড়ি ছিল, তার প্রতিটি চত্বরে বসে থাকতো একটি করে ঝি। হয়ত নীচে কোন বাড়ির বাবু এসে সর্বনিম্ন চত্বরের ঝিটিকে বললেন, অমুক বাড়ির মেয়েদের ডেকে দাও ত।

অমনি সেই নিম্নতম চত্বরের ঝিটি ওপরের চত্বরের ঝিকে চেঁচিয়ে বললে, অমুক বাড়ির

মেয়েদের বাবু ডাকছেন। সে আবার ওপরের ঝি-টি অনুরূপভাবে তার ওপরের ঝিটিকে বলবে।

এমনি করে ওপর থেকে ওপর। উঠে দাঁড়ালেন সেই অমুক বাড়ির মেয়েরা। ঝি তাঁদের সঙ্গে করে নীচে নিয়ে এসে 'বাবুর' হাতে সঁপে দিলে। এই ডেকে দেওয়া ছিল তাদের কার্যতালিকার অন্যতম সূচী।

যাই হোক, ক্রমশ ঐ থিয়েটারের হ্যান্ড-বিল-প্লাকার্ড আমাকে একটু একটু করে যেন আকর্ষণ করতে লাগল। হয়ত মনের অবচেতন-স্তরের প্রতিক্রিয়া, কে বলতে পারে?

তখন মনে প্রশ্ন জাগত, থিয়েটার-থিয়েটার কানে আসছে বটে, কিন্তু থিয়েটার ব্যাপারটা কী? স্টার, মিনার্ভা সব নাম পড়ছি প্লাকার্ডে, এগুলি কি? যাত্রা সম্বন্ধে অবশ্য আবছা একটা ধারণা ছিল। আশে-পাশে কোথাও যাত্রা হচ্ছে। তা সকাল পর্যন্ত ত তখন যাত্রা চলত, তাই বায়না ধরলে তারাপদ কাঁধে চড়িয়ে তার খোকা-সাহেবকে একটু যাত্রা শুনিয়ে আসত। কিন্তু সে আর কতটুকু? জমকালো পোশাক, আর তরবারির ঝকঝকানি কী যে ভালো লাগত তা বলার নয়। সবটা দেখতে পেতাম না ব'লে মনটা ভার হয়ে থাকত বটে, তবে যাত্রার গল্প খুব শুনেছি তারাপদর কাছে। রাত নটায় শুরু হতো যাত্রা। আটটার মধ্যে আসর থেকে ফিরে এসেছি আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত শুনছি কনসার্টের বাজনা, কিম্বা দূরাগত গানের সুরধ্বনি, হয়ত বা রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতিদের বক্তৃতারও ছাড়া ছাড়া দুটো-একটা কথার রেশ! তখন ত এত মোটরগাড়ি, হৈ-চৈ, গোলমাল ছিল না রাস্তায়, তাই রাত নিঃঝুম নিশুতি হয়ে আসতে দেরি হতো না। এখন যেটা আশুতোষ মুখার্জী রোডের ডি এম মিত্র স্কোয়ার, ওটাকে বলত কোম্পানীর বাগান। চারদিকে বাগান, মাঝখানে পুকুর। তার সামনের পাড়াটাকে বলত—সরকারপাড়া। এই সরকারপাড়া, তারপর ওদিককার কাঁসারীপাড়া। এসব যায়গায় ছিল বহু শখের যাত্রার দল, তাদের কনসার্টের বাজনা প্রায়ই বাড়ি থেকে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম।

কিন্তু যাত্রা ত বুঝলাম, থিয়েটার বস্তুটা কী? একদিন শুনলাম কাছেই থিয়েটার হবে। সারাদিন ধরে তার তোড়জোড় চলছে। বিস্ফারিত চোখে সব দেখছি, আর ভিতরে ভিতরে কী যে উত্তেজনা হচ্ছে, তা আর কী বলব? এই বাঁশ আসছে, তক্তাপোশ আসছে, দড়ি আসছে, শাবল আসছে, কাটারি আসছে। থিয়েটার ক্লাবের লোকেরাই বাঁশ বাঁধছে, তক্তাপোশ বসাচ্ছে, আর পাড়ার ছেলেরা ফাইফরমাশ খাটছে। আমাদের কেউ হয়ত বললে, ঐ যে উঠোনে শাবল দিয়ে গর্ত করছে, ঐ বোধ হয় রাম সাজবে রে!

—রাম!

দুটি চোখ বড় বড় করে রামকে দেখতাম। কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত গুটোনো, খালি গা, সারা গায়ে ঘাম আর ধুলো, রাম হয়ত গলদঘর্ম হয়ে বাঁশ পোঁতার জন্য গর্ত করছে।

পরে যখন নিজেরা থিয়েটার করতাম, তখন বুঝতে পেরেছিলাম, থিয়েটারের জন্য এই বাঁশের কাঠামো গড়ে তোলা কম পরিশ্রম-সাপেক্ষ ছিল না। আর বাঁশই কি লাগত কম? প্রসেনিয়াম বা একেবারে সামনের দিককার অংশের জন্য লাগত ওপরে-নীচে আটখানা মোটা মোটা বাঁশ। ওপরে দুখানা, নীচে দুখানা; আর দু'পাশের জন্য দুটো দুটো চারটে। ছোটবেলার চোখে এই প্রসেনিয়াম বাঁধার ব্যাপারটা দেখতে মন্দ লাগত না, যেন একটা উৎসবের আমেজ এনে দিত ঐ বাঁশের চৌকো কাঠামোটা। যেন থিয়েটারের মহিমার সূচনা করছে ঐ আট-খানা বাঁশের কঙ্কাল। অনুরূপভাবে পিছনের জন্যেও লাগত মোটা বাঁশ দুখানা দুখানা এবং তারও ওপরে দুটো, হল ছ'খানা। আবার সামনে-পিছনে বাঁধন দেবার জন্য লাগত দুখানা এড়ো বাঁশ। তাছাড়া পাশে সিন বাঁধবার জন্য একমানুষ কি দেড়মানুষ উঁচুতে সিফটাররা বেঁধে রাখত এপাশে একখানা ওপাশে একখানা, এই দুখানা বাঁশ। তদুপরি আছে মঞ্চ প্রস্তুত করবার জন্য খানকতক তক্তাপোশ। তা-ও শক্ত করে লাগাবার জন্য ছোট ছোট বাঁশ দিয়ে খুঁটি করতে হত। সেই তক্তপোশের মঞ্চ যখন তৈরী হল, তখন দেখতুম, তার ওপরে বেশ করে বিচুলি বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিচুলি বিছানোর পর সারা মঞ্চ জুড়ে শতরঞ্চি টানটান করে পেতে পেরেক দিয়ে পুঁতে দিত, সখীদের নৃত্যের সময় যাতে না শতরঞ্চি গুটিয়ে যায়। এই বিচুলি দেওয়ার রহস্য ছিল এই যে, এতে করে যুদ্ধের মাতাল সময় ধপাস করে পড়লেও তেমন লাগবে না, অথবা 'পতন ও মূর্চ্ছা'রও অনেক সুবিধা হতে পারে।

কথা যখন শুরু হল, তখন আর একটু বলি। কাঠামো তৈরী হলেই থিয়েটারের সব আয়োজন শেষ হলো না, এর পরে আছে সিন-সিনারীর ব্যাপার, ড্রপ খাটানোর ব্যাপার। অনেক ক্লাবের নিজস্ব সিন ছিল না, তারা ভাড়া করে আনত। আবার অনেকের নিজস্ব সিন ছিল, এমন কি পোশাকও ছিল। ঠাকুরদালানের ওপরে চালি বেঁধে সিনটিনগুলিকে রেখে দিয়েছে, প্লের সময় সেগুলি নামাও, দেখ, কী অবস্থায় আছে তারা? দেখা গেল বিরাট বনস্পতির হয়ত সবুজ পাতা আর ডালপালা ঠিক আছে, কিন্তু গুঁড়িটাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের অলিন্দ ঠিক আছে, কিন্তু থামগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর কী! তখন জনকয়েক নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে গেল রঙ আর তুলি নিয়ে। দেখতে দেখতে আবার বনানী হয়ে উঠল উজ্জ্বল, রাজপ্রাসাদ পূর্ব গরিমায় আবার হয়ে উঠল গরীয়ান।

সিনও খাটানো হল, তারপরে আলোকের ব্যবস্থা। এসিটিলিন গ্যাসএর ফুট-লাইট

দিত, সাধারণত। যারা একটু খয়রাতি করতে পারত, অর্থাৎ মুষ্টিমেয় যে কয়টি ছিল ধনীজনপোষিত ক্লাব, তারা ভাড়া করত লাইম-লাইট, কী কায়দায় করত জানি না, কিন্তু হয়ে যেত যেন দিনের মতো ফর্সা, তীব্র সাদা আলো, পরবর্তীকালের ফোকাসের এফেক্ট আর কী!

কিন্তু এসব ধারণা ত হয়েছিল পরে, তার আগের কথাটা কী? আমাদের বাড়ি তখন ছিল চন্দ্রনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটে, রসা রোড থেকে একখানা বাড়ি পরে। সেখান থেকে থিয়েটারের নাচের বাজনা বা গানের সুর শুনেছি, কিন্তু রাত হয়ে গেছে, দেখার ত উপায় নেই! সারা সকাল আর বিকেল যেখানে 'বাঁশ-তক্তোপোশ- সিন্-ড্রপ' দেখে কাটালুম। থিয়েটার হবার আগেই বাড়িতে সেই যে বন্দী হয়েছি, সেখানে কী যে আলো-টলোমল ব্যাপার চ'লেছে, তা' আর দেখতে পাচ্ছি না! বাবাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহসই হ'ত না, মাকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে ধমক খেতুম। তখন অগত্যা অগতির গতি সেই তারাপদ। সে বলত, কলকাতার বড় থিয়েটার দেখিনি, তবে বাড়ির থিয়েটার দেখেছি। উঁচু মাচার ওপর হয়।

—সে ত দেখলুম, তক্তপোশ সাজিয়ে উঁচু করছে।

—তাতে আঁকা পট লাগায়।

—তা-ও ত বিকেলে গিয়ে দেখলুম, লাগাচ্ছে।

তারপর তখন বিব্রত হ'য়ে উত্তর দিত, ওটা এক রকমের যাত্রাই। বুঝলে না? আসরে যাত্রা গায়, থেটারে গায় না, তারা বক্তৃতা করে।

তারপর নিরক্ষর ছিল। অ্যাক্টিংকে সে বলত, বক্তৃতা। আর 'কলকাতা' বলতে সে বোঝাত, উত্তর কলকাতা। সে কেন, তখন সবাই তাই বলত।

ধরুন ভবানীপুরেই হয়ত দুই প্রতিবেশী কথা হচ্ছে, ঃ 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'...... উত্তর এলো 'এই একটু কলকাতার দিকে যাত্রা মনস্থ করেছি।'

ভবানীপুর, কালিঘাট চেতলা, খিদির-পুর, এসব হচ্ছে উপকণ্ঠ। শহর তখন লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে শুরু হ'য়ে উত্তর দিকে ছড়ানো।

যাইহোক, বাবা কখনো তেমন বকতেন না বা মারতেন না, কিন্তু ভয় করতুম বাবাকে ভীষণ। আর ভয় করতুম মার ধমককে। মা আমাকে শৈশবে এমন এক মুখভঙ্গি করে ভয় দেখাত যে ভীষণ ভয় হ'ত আমার। বলত, ঘুমুবি না, ঘুমো শীগ্‌গির। ঐ দেখ্।

মার মুখভঙ্গি দেখে দু'চোখ বুজে এই মুখভঙ্গি দেখে আমার মনে আরেক ফেলতাম তাড়াতাড়ি। তার কারণ, মায়ের বিকট মুখভঙ্গির স্মৃতি জাগরূক হ'য়ে উঠত।

, মুখে মুখোশ আঁটা, সারা গায়ে টকটকে লাল আলখাল্লা মাথায় বিরাট জটা, বিরাট বড় বড় দুটো টিনের হাত, শ্যামা পাগলী সন্ধ্যে হলেই পাড়ায় বেরিয়ে পড়ত। নাকীসুরে অদ্ভুত একটি আওয়াজ আর মুখভঙ্গী ক'রে তার টিনের লম্বা হাতটা পাততো, কখনো বা ঘুরে ঘুরে নাচতো আর "থ্যাথ" "থ্যাথ" করে আওয়াজ তুলে গানও গাইত। তার টিনের হাতে একটা কি দুটো পয়সা দিলেই হাতটা উঁচু করতো সে, আর পয়সাগুলি সেই টিনের হাতের ফুটো দিয়ে সরসর করে নীচে নেমে তার নিজের হাতের মুঠোয় গিয়ে পৌঁছত। সেই পয়সা তার আলখাল্লার ঝোলা পকেটে রেখে, আবার বাড়াত তার সেই পেল্লায় টিনের হাত। এই শ্যামা পাগলী শৈশবে আমাদের কাছে কি কম আতঙ্কের ছিল? শ্যামা পাগলী আসছে—একথা

কানে আসামাত্রই রাস্তার বা রক্-এর সব ছেলের দল একেবারে ফর্সা,—তার 'হোজ-হোজ' চীৎকার কানে আসতে-না-আসতে যে যত তাড়াতাড়ি পারছে বাড়ির ভিতরে দে-ছুট্!

অতি শৈশবে আমার হয়েছিল কী একদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় কুঞ্জবাবু মাস্টার মশাইয়ের কাছে বসে প্রথম ভাগ পড়ছি, এমন সময় ঠিক পাশের জানলার কাছেই নাকি সুরে শব্দ হ'ল, 'ঘ্যাঁঘো-ঘ্যাঁঘো!' চমকে জানলার দিকে তাকাতেই, বিকট মুখভঙ্গী!—ও, কে রে?

নিদারুণ ভয়ে চীৎকার ক'রে একেবারে কুঞ্জবাবুর কোলে মাথা গুঁজে দিলাম। এবং সেই যে দিলাম, আর ওঠাই না।

উনি যতো বলেন 'ওরে ওঠ্-ওঠ্! শ্যামা পাগলী চ'লে গেছে?' তত চোখ [illegible] কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি!

বুকের ঢিপঢিপানি যেন আর কমতেই চায় না।

এইভাবে দিন যায়। বছরও বাড়ে, বয়সও বাড়ে। যাত্রা-থিয়েটার-কন্সার্টের আকর্ষণ থাকতেও লেখাপড়ার চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকল। তখন আমার ৮।৯ বছর বয়স, চক্রবেড়ে শিশু বিদ্যালয় ছেড়ে ভর্তি হলুম গিয়ে মিশনারী সোসাইটি স্কুলে, সেভেন্থ্ ক্লাসে, অর্থাৎ এখনকার ক্লাস ফোর্-এ। কিন্তু এই বিদ্যালয়-পরিবর্তনের পিছনেও আমার এক চিত্তাকর্ষক স্মৃতি বিজড়িত আছে, তা এখানে বলেনি।

একবার গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ির মেয়েরা যাবেন দেশে, বিশেষ ক'রে আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে। গ্রামের নাম,—"বাগ্আঁচড়া।" নামের যথার্থ অর্থ বলতে পারব না। যদি ব-এ আকারের সঙ্গে "ঘ" থাকত তাহলে "বাঘ" এর সঙ্গে আঁচড়ের একটা সংযোগ ক'রে নেওয়া যেতো। কিন্তু "বাঘ" নয়, "বাগ"। ব-এ আকারের সঙ্গে "গ"এর সংযোগটা আরও স্বাভাবিক এইজন্য যে, গাঁয়ে আছে বাগদেবীর পীঠস্থান। মন্দির আছে, কিন্তু মূর্তি নেই, আছে ঘট। একটা [illegible] বেদী তৈরী করা আছে মন্দিরের ভিতরে। সম্ভবতঃ কোনো মহাপুরুষ এ পীঠে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁর সাধনায়। তাঁর স্মৃতির ক্ষীণ সূত্র ধ'রে এখানে এক সময় একটা মেলা হয়। এক সময় ওটা ছিল [illegible] জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। গ্রামের কোলে বড় একটা বিল আছে তাকে লোকে বলে বাগদেবীর বিল। এই বিল কিন্তু স্বয়ং সম্ভূত। অর্থাৎ যাকে বলে, ন্যাচারাল স্প্রিং। এ বিলের সে-ই হচ্ছে উৎস। এ-বিল বয়ে গিয়ে পড়েছে গঙ্গায়।

গ্রামটা গঙ্গা থেকে মাইলখানেক দূরে হবে। শান্তিপুর থেকে চার-পাঁচ মাইল উত্তরে। রাণাঘাটে নেমে বড় রেলের সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে বড় লাইনেরই এক শাখাপথ ধ'রে দুমাইল যেতে হ'ত চুনীঘাট পর্যন্ত। চুনীঘাটে খেয়া পার হ'য়ে পরপারের শান্তিপুরঘাট থেকে লাইট রেলওয়ের ছোটগাড়ি ধ'রে শান্তিপুর, দিগনগর হ'য়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যেতে পারা যেত। এই ছোটগাড়ি মার্টিন লাইনের ছোটগাড়ির মতো অতো সভ্য ছিল না। গাড়ির ফার্স্ট'ক্লাস ছিল না বললেই চলে, হয়ত বা একটিমাত্র থাকত ঠিক মনে নেই। কম্পার্টমেন্টের মাথায় অবশ্য টিনের চাল থাকত, কিন্তু দুপাশে দেওয়াল ছিল না, দুটি পাশই ফাঁকা। ভিতরে বেঞ্চি পাতা থাকত, অবশ্য ঠেস দিয়ে বসা যেত সেসব বেঞ্চিতে, আর ফুটবোর্ডের ওপর দিয়ে দিয়ে চলাফেরা করা যেত। আরও দুপাশে থাকত ক্যাম্বিশের পর্দা, বৃষ্টি আটকাবার জন্য। সেগুলি অর্ধেক ছিঁড়ে গেছে, পুরানো হয়ে গেছে, আর রেলগাড়ি যতো যাচ্ছে 'পো-ঘ্যাস-ঘ্যাস' করে, ঐ পর্দাও দুদিকে দুই ডানার মতো হাওয়ায় ফটপট করছে।

হয় শান্তিপুরে না গোবিন্দপুরে (এটা আরও কাছে হয়) নেমে গরুরগাড়ি করে দেশে যেতে হত। "বাগ্আঁচড়া" আমাদের গাঁ বললুম বটে, তবে ওটা আমাদের পৈতৃকবাড়ি ছিল না। বাবার ওটা মামার-বাড়ি। অর্থাৎ আমার পিতামহ এই গ্রামের বসুবাটীতে বিবাহ করেছিলেন। স্থানীয় বসুবাটী অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন বংশের ছিল। তখনকার মতো জঙ্গল এখন আর নেই, আর সেকালের ম্যালেরিয়াও নেই। তখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে লোকজন ও'গাঁয়ে ছিল কম।

প্রসঙ্গত বলে রাখি আমাদের পৈতৃক বাস ছিল, কৃষ্ণনগর থেকে হাঁসখালির পথে মেহেরিয়া বা মেহেরপুর গ্রামে। সে ভিটে আমি কখনো চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি সে ভিটে একেবারে চতুষ্পার্শ্ব ভগ্ন। [illegible] হয় [illegible] আমার মা একবার গিয়েছিলেন। [illegible] কিছুই ছিল না। [illegible] কালের কথা বলছি। [illegible] কৃষ্ণনগরে পৌঁছলাম। [illegible] গ্রামে ৫ [illegible] এক বাবা এসে [illegible] একটি [illegible] মাকে [illegible] ভিটা দর্শন করালে। এই [illegible] প্রাচীন [illegible] ছিল [illegible] একটা বড় [illegible] ঐ ইটের [illegible] প্রণাম [illegible] আবার [illegible] স্টেশনে [illegible] পড়েছি।

কিন্তু বলছিলাম আমি "বাগ-আঁচড়ার" কথা। আমার বাবার মাতামহরা ছিলেন [illegible] বড়ভাইয়ের একটি মাত্র সন্তান [illegible] সন্তান তিনি আমার ঠাকুমা। [illegible] হিসাবে বড়োতরফের সম্পত্তি পেয়েছিলেন আমার ঠাকুমা। এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সেটা আবার পেলেন আমার বাবা।

এই বাগ্-আঁচড়াতে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এক গ্রীষ্মাবকাশে যে গেলুম, সঙ্গে সঙ্গে পড়লুম এক সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ায়। কলকাতায় ফিরে এসেও [illegible] আমি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে রইলুম। পালা করে জ্বর আসত। শুকিয়ে গেলাম। দুর্বল হয়ে পড়লাম। অ্যালো-প্যাথি করে কিছুই হল না। কী-কী সব ওষুধ আর কুইনিন খাইয়ে একেবারে [illegible] করে ফেলেছিল আমাকে। শেষকালে গোপী কবিরাজ—তখনকার দিনের নামকরা কবিরাজ—তাঁর ওষুধ খেয়ে নিরাময় হয়ে

উঠলুম। মনে আছে, জ্বরের পর থেকে দিয়েছিলেন পানফলের পাতলা রুটি এবং একটু মাগুর মাছের ঝোল—শুধু হলুদ দিয়ে রান্না করা।

পরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হ'ল আমাকে যশিডিতে—সাঁওতাল পরগণায়। প্রায় চার মাস ছিলাম। জল হাওয়া এতই ভালো যে, সাতদিনের মধ্যে ডাল খেতে পারলুম। দেখতে দেখতে সুস্থ হয়ে উঠলুম। এখান থেকে ফিরে, আর 'চক্রবেড়ে শিশু বিদ্যালয়' নয়, একেবারে লণ্ডন মিশনারী স্কুল। ওরা পরীক্ষা করে আমাকে সেভেন্থ ক্লাসে ভর্তি করে নিল।

স্কুলটা ছিল পোড়াবাজারের কাছে। এলগিন রোড ও রসা রোডের সংগমস্থলের অঞ্চলকে বলেই পোড়াবাজার। ওখানে এখনো সে স্কুলটির মোটা মোটা থাম দেখতে পাওয়া যায়। এর কম্পাউণ্ড আরও বড় ছিল—এখন মার্টিন হ্যারিসনের ওষুধের দোকান হয়েছে। সামনের ট্রাম রাস্তাটা এখনকার মতো এত বড় ছিল না, আরও সরু ছিল—ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট বড় করে দিয়েছে। ভিতরে ছিল মস্ত লন—বাগান—মিশনারী শিক্ষকদের কোয়ার্টার—বোর্ডিং ইত্যাদি। এই স্কুলে সবশুদ্ধ পড়েছিলাম সাত বছর।

এই স্কুলে পড়বার প্রধান সুবিধে সব উঁচুতে [illegible] কিছু চাপা নেই। ফিরে এসে পর্যন্ত ছিল মনের মতো পরীক্ষা। নিচের ক্লাসে উঠেই ক্রমশ, সুকুমারের লেখা এসে পড়েছে। ইতিহাস, ভূগোল পড়ানো হত ইংরেজীতে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠ্য বিষয়েই আমার প্রচুর আগ্রহ ছিল। ইতিহাসে পেতাম পুরোনো আমলের, আর ভূগোলে পেতাম দেশবিদেশের খবর। বিশেষ করে ভূগোলের রহস্যময়ের বড় বড় মানচিত্রগুলি কিশোর-মনকে আকর্ষণ করত সর্বদাই। বিভিন্ন প্রদেশ বা দেশ বিভিন্ন রঙে রাঙানো বিস্তৃত মানচিত্রে ছড়িয়ে, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হত, কী সব দেশের খবর ওতে আছে। সব কী জানা যায় না?

তার অব্যবহিত পরেই ছিল মুখস্থ করে কবিতা আবৃত্তি করার ঝোঁক। একটি কবিতার দুটি চরণ এখন পর্যন্ত স্মরণ করতে পারি,—

কৈলাসপর্বত মাঝে যত ধাতু ছিল,
তার মাঝে স্বর্ণ আদি লৌহকে নির্মিল
কিন্তু, সর্বাধিক অপূর্ব জগৎ—ভূগোলে।

ইতিহাসেও। স্মরণশক্তিও ছিল। একটুও বিষয়ে ফুলমার্কই পেতাম। মিশনারী শিক্ষকরা এমন সুন্দর করে পড়াতেন যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা শুনতাম। বলা কর্তব্য, মিশনারী শিক্ষকেরা বাংলাও ভালো জানতেন। স্কুলে অবশ্য বাঙালী শিক্ষকও কয়েকজন ছিলেন।

এইরকমই একটি সময়ে, বয়স তখন ন'দশ বছর, ১৯০৩ কি ৪ সাল হবে, সর্বপ্রথম থিয়েটার দেখবার সুযোগ হল। বাবা কিন্তু ভীষণ বিপক্ষে ছিলেন থিয়েটার দেখায়। আমি ত দূরের কথা, মার পক্ষেও থিয়েটার দেখা সম্ভব ছিল না। অথচ আমার বাবা 'চন্দ্রভূষণ চৌধুরী ছিলেন তদানীন্তন রয়্যাল বেংগল থিয়েটারের একজন ডিরেক্টর, অবশ্য উক্ত থিয়েটারের শেষ অবস্থায়। শরৎচন্দ্র ঘোষ বেংগল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা এ'কথা অনেকেই জানেন। ইনি গত হবার পর প্রখ্যাত নাট্যাচার্য ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বেংগল থিয়েটার চালাতেন এবং উনিই ছিলেন লেসী। এই বেংগল থিয়েটারই রয়্যাল বেংগল থিয়েটার নাম নেয় ১৮৯১ সালে। ঐ সালে ঐ থিয়েটার দেখতে আসেন কুইন ভিক্টোরিয়ার নাতি—সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রথম পুত্র—প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর, পঞ্চম জর্জের বড়ভাই। প্রিন্স ভিক্টরেরই রাজা হবার কথা ছিল, ইনি হঠাৎ মারা যেতেই পঞ্চম জর্জ রাজা হয়েছিলেন। এই প্রিন্স ভিক্টরের উপস্থিতকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যই নামের আগে 'রয়্যাল' শব্দটির আমদানী হল 'বেংগল থিয়েটার'-এর আগে। বিহারীবাবুই লেসী ও পরিচালক ছিলেন, পরে ডিরেক্টর নিয়েছিলেন আমার বাবাকে এবং গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজনকে। ১৯০১ সালে বিহারীবাবুর মৃত্যুর সংগে সংগে রয়্যাল বেংগল থিয়েটার উঠে যায়। অন্য নামে থিয়েটার পরে চলতে আরম্ভ করলেও, বাবা আর ওখানে যাননি।

এইভাবে থিয়েটারের সংগে বাবার একটু সংযোগ থাকার জন্যই বোধহয়, তখনকার থিয়েটার জগতের কাছে বাবা সম্যক পরিচিত ছিলেন। বাবাকে ও-জগতের সবাই জানতেন "ভূষণবাবু" বলে। থিয়েটারের লোকেরা তখন নতুন পালা ধরে বা খোলা-কে উপলক্ষ্য করে কালীঘাটে আসতেন পুজো দিতে। এমনি ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সংগে দেখা করে যেতে ভুলতেন না। নৃপেন্দ্রনাথ বসু আসতেন। বাঁশী বাজাতেন ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আসতেন। আসতেন নটবিহারী বসু,—তবলাবাদক।

আমার থিয়েটার দেখার সুযোগ ঘটে ছোটমামার বিবাহ উপলক্ষ্যে। তখনকার রীতি ছিল, ছেলে পাশ করল কি নতুন বিয়ে করল, অমনি সপরিবারে একবার থিয়েটার দেখতে যাবে। অথবা, জামাইষষ্ঠী হল, জামাই যাবে শালীদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে। বলাবাহুল্য সপরিবারে থিয়েটার দেখাটা ছিল বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। ছোটমামা বিয়ে করলেন, অতএব নবপরিণীতা মামীমাকে নিয়ে ছোটমামাকে থিয়েটারে যেতে হবে। মামার বাড়ির আরও সবাই যাবে। মা-ও যাবে। মার সংগে আমিও গেলাম। যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটল মামার বাড়ি থেকে অতএব বাবা জানতে পারলেন না কিছু। ক্লাসিক থিয়েটারে সেদিন "প্রফুল্ল" অভিনয়। ক্লাসিকেই আমরা গিয়েছিলাম। 'ক্লাসিক' শব্দটা আমার ইতিমধ্যে বিশেষ জানা হয়ে গিয়েছিল। প্লাকার্ড দেখে নামটাই শুধু মুখস্থ করা নয়, নামটা আরও ভালো ক'রে আমি জানতুম। আমাদের বাড়িতে তখন বেংগল থিয়েটারের ছাপ-মারা বহু নামকরা বই ছিল। আজ অবশ্য সে সবের চিহ্নমাত্রও নেই। আর ছিল ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত একটি নাটকের ছবি। একেবারে আসল ফটো, ব্লকে ছাপানো ছবি নয়। 'সরলা' নাটকের 'সরলা'র মৃত্যুদৃশ্য—বিধুভূষণ-বেশী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আর সরলা-রূপিণী কুসুমকুমারী।

আর, এই ক্লাসিকেই আমি গেলুম জীবনে প্রথম থিয়েটার দেখতে। প্রথম থিয়েটার, প্রথম 'প্রফুল্ল' আর প্রথম-দেখার আলোকে "যোগেশ" বেশী নটভৈরব গিরিশচন্দ্র।

(ক্রমশ)

হাবড়ার সংবাদে প্রকাশ কোন এক ভদ্রলোকের একটি পোষা বিড়াল আগে মাছ-মাংস খাইত বটে কিন্তু সম্প্রতি নাকি তার মাছ-মাংসে রুচি নাই। পরীক্ষার জন্য একটি থালায় কয়েক ফালি কুমড়া রাখিয়া খাইতে দিলে দেখা গেল বিড়ালটি

নাকি মাছ ফেলিয়া কুমড়া খাইয়াছে। ইহার কী কারণ হইতে পারে তা সংবাদদাতা জানিতে চাহিয়াছেন। —"কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং আমরা তা জানি। তবু সাধারণের বিশ্বাসের জন্য উত্তরটা মৎস্য-বিভাগেরই দেওয়া উচিত"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল যে, স্ত্রীর প্রতি যিনি অবহেলা প্রদর্শন করিবেন তাঁহাকে বিভাগীয় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। —"কিন্তু বানের জলে যারা ভেসে এসেছে অর্থাৎ স্বামীরা, তাদের প্রতি অবহেলায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কোন শাস্তির ব্যবস্থাই করেন নি। অথচ "কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা" আমরা কবে কোন্ যুগ থেকে বলে আসছি। ঠিক আছে, পাঁতির পুণ্যে বখরা বসাবার বেলা দেখা যাবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

'আনন্দবাজারে'র বিশেষ প্রতিনিধি "এল যে শীতের বেলা" নিবন্ধে কলিকাতার শীতের একটি মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। কড়াইশুঁটি হইতে কালচারেল

ডেলিগেশন কোনটাই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"অবশ্য বলেছিলেন তিনি সবই কিন্তু

শীতের মোক্ষম আকর্ষণ ঘোড়দৌড়ের কথাই বলেন নি। ঘোড়দৌড় না হলে কি আর শুধু কালচারে শীতের আসর সরগরম হয়!"

• • •

জনৈক ভদ্রলোক নাকি চন্দ্রলোকে একটি কাফেটেরিয়া খোলার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। —"হকার্স কর্নারের জন্য জমির বিলি-বন্দোবস্তের ব্যবস্থাও আশা করি এখন থেকেই হচ্ছে"—মন্তব্য করিলেন আমাদের এক উদ্বাস্তু সহযাত্রী।

• • •

কলিকাতায় সম্প্রতি ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনী হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে শিল্পী স্বয়ং নাকি বলিয়াছেন যে হলঘর

ভাড়া করার টাকা তাঁর নাই এবং তিনি মনে করেন যে জনগণের আর্ট জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিতে ফুটপাথই উপযুক্ত স্থান। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তিনি আরো বলতে পারতেন যে আর্টিফিশিয়েল বস্তুর ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে মানুষ আজ এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, একটুখানি আর্টের দিকে তবু যদি চোখ ফেরে তবে সেইটেই হবে শিল্পীর মস্ত লাভ; হলঘরের চিত্র-প্রদর্শনীতে হালের মানুষ কটাই বা যায়।"

• • •

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম ভেজাল তেল খাওয়ায় মরক্কোতে প্রায় দশ হাজার লোক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"ভারত যা বহু আগেই ভেবেছে, মরোক্কো তা ভাবছে আজ। জয় হিন্দ!!"

• • •

ভাগলপুরে কামলা রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন —"কামলা রোগ কিনা জানিনে কিন্তু তারই সমগোত্রীয় এক রোগে সব-কিছুতেই পীত দেখার এক দুরারোগ্য ব্যাধি অন্য অনেক স্থানেই মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে।"

• • •

হারওয়েল গবেষণাগারে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কৃত্রিম সূর্য সৃষ্টির তোড়জোড় চলিতেছে। —"চন্দ্রসূর্য অস্ত গেল জোনাকি দেয় বাতি—এই প্রবাদ আমরা আগেও বহুবার শুনেছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—যে-সব খেলোয়াড় ইংলণ্ড সফরে গিয়াছিলেন তাঁদের জামা-কাপড় ধোলাইয়ের খরচ বোর্ড বহন করিবেন না। আমাদের জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী বলিলেন—"মাঠের ধোলাইয়ের পর লণ্ড্রির ধোলাইয়ের জন্য আলাদা খরচ করা হবে না!!"

• • •

পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের চার চারটি খেলোয়াড় তাদের প্রথম ইনিংস-এর খেলায় এল্ বি ডব্লু হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে এক সংবাদে শুনিলাম যে লিণ্ড-ওয়াল অনুরূপ উপায়ে আউট হইলে তিনি "অম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে মাঠ ত্যাগ করেন।" বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা নিশ্চয়ই এরূপ আচরণের নিন্দা করব। তবে এইসঙ্গে একথাও বলব যে, লেগ্ বিফোর-এর চেয়ে লেগ্ বিহাইণ্ড অর্থাৎ লেংগি-টা আমরা বুঝি ভালো!!"

• • •

অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে আট উইকেটে হারাইয়া দিয়াছে। সংবাদে শুনিলাম খেলা শেষ হইয়া গেলেও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা সারাদিন মাঠে প্র্যাকটিস করিয়াছে। শ্যামলাল ক্রিকেট বোঝে না। সে-ও সংবাদটা শুনিয়া মন্তব্য করিল—"ওরে মূর্খ ইহা দেখি শিখ।" কিন্তু জানি উপদেশ শুধু প্রকোপায়!!

উত্তরা

সন্তোষকুমার ঘোষ

[তিন]

মো হনার নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। একবার তারা কূলে কূলে ফুলে ওঠে, আবার ক্ষীণস্রোত হয়ে যায়। সেই নিয়ম পাহাড়ী শহরেও চালু, তাদেরও জোয়ার-ভাঁটা আছে, তবে দিনে নয়, বছরে দু-বার; এবং জলস্রোত নয়, জনস্রোত। এরা গ্রীষ্মে মোহিনী, শীতে যোগিনী। বলা বাহুল্য, দার্জিলিং ব্যতিক্রম নয়। সমতলের নগরীর মত এখানে প্রাণের নিত্যধারা নেই। এ প্রতি এপ্রিলে বেঁচে উঠে প্রতি নভেম্বরে মরে। যেটুকু বাঁচে, তা-ও যে একটানা বাঁচে, তা নয়। মাঝে বর্ষা আছে, পাহাড়ী ঢল আর ধসের ঋতু, প্রবল-প্রচুর ধারাসারের। দার্জিলিং তখন শরতের পথের দিকে চেয়ে থাকে, তার প্রতীক্ষা সফলও হয়। আকাশে-বাতাসে আগমনীর সুরটি যেই লাগে, অমনই শহরে আর তিল-ধারণের স্থান নেই, 'ম্যাল'-টি যেন খুদে বালীগঞ্জ। কিন্তু হায় রে, অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি 'টাইগার হিল'-এ সূর্যোদয় দেখার ধূমে, আর বার্চ হিল-এ চড়ি-ভাতি —কদিনই বা আয়ু এর। চিত্রাঙ্গদাকে রূপ দিয়েছিল বসন্তসখা, দার্জিলিংকে ট্যুরিস্ট। অথবা সাবিত্রীর মত তারও নিষ্ঠুর নিয়তি, বিধবা সে হবেই।

আমরা যখন দার্জিলিংয়ে গিয়ে পৌঁছলুম, তখনও তার রূপে ভাঁটার টান লাগে নি, কিন্তু লাগতে বাকীও নেই। চৌরাস্তা ইতিমধ্যেই জনবিরল, তরুশ্রেণী বোহিসেবীর মত দু-হাতে তাদের পাতার সম্পদ ওড়াতে শুরু করেছে। শবাচ্ছদের মত শুভ্র কুহেলীর আড়ালে গোটা শহরটাই উহ্য প্রায়।

তাতে অবশ্য আপশোস নেই। আমার কাছে সব চীনেম্যানের মত সব হিল-স্টেশনের মুখ কতকটা একই রকম। অবশ্য জহুরী অনেক আছেন, যাঁরা এক এক-একটিতে এক-এক রকমের স্বাদ পান। আমারই এক বন্ধু, অধুনা বোম্বাই-প্রবাসী এবং কমলালেবুর আকৃতি এই ভূমণ্ডলের অন্তত আধখানি তিনি চোখ দিয়ে চেখেছেন, কিন্তু প্রায় ফী-বছরেই একবার এসে দার্জিলিংকে দেখে যান। আমার কথা আলাদা। আমি যদি হতুম বাবা মুস্তাফা, আর, আমাকে যদি কোন মর্জিনা চোখ-বাঁধা অবস্থায় সিমলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে বলে দিত, 'এই দেখ মুসৌরী', আমি তাই মেনে নিতুম, কানা যেমন নিঃসন্দেহে বোবা টাকা হাত পেতে নেয়। অথচ আমার কাছে দিল্লিকে বোম্বাই বলে চালানো সহজ হত না। কারণ আগেই কবুল করেছি, আমি রক্তে-মজ্জায় সমতলের লোক।

শীতে উপেক্ষিতা। দার্জিলিংকে এই আখ্যা সমকালীন যে-লেখক দিয়েছিলেন, তিনি কি এই উপেক্ষার মধ্যে আমাদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করেছেন? আমাদের পছন্দ সব কিছু মাঝারি, যা কিছু চরম, তাকেই আমরা পরিহার করি। তাপমাত্রার ঈষৎ হের-ফের হলেই বিচলিত হই। নইলে, যে মাসে যাঁরা শৈলাবাসে ছোটেন, তাঁরা ছোটেন কিসের লোভে? নভেম্বরের কলকাতার মেজাজ আর আবহাওয়াটিকে সেখানে গ্রেপ্তার করবেন বলেই তো কিন্তু ভূ-তাত্ত্বিক প্রভেদটুকু ছাড়া তখন সেখানে অভিনব আর কী আছে? শৈলাবাসকে তার আপন মূর্তিতে দেখা যাবে শীতে, যখন দিগন্ত অন্ধকারে কদাচিৎ হিলকার্ট রোডে দুঃসাহসী গাড়ির চোখে ফগলাইট জ্বলে, সাপের মাথায় মণির মত। যখন তার চৌরাস্তা নকল চৌরঙ্গী নয়। আবার চৌরঙ্গীও নয় কলকাতা। যে ট্যুরিস্ট গ্রাণ্ড হোটেলে বসে ময়দান দেখবেন, তিনি হাইড পার্কের একটি অসফল নকল দেখেই ফিরে যাবেন। আসল কলকাতাকে দেখা যাবে ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে, দর্মাহাটা স্ট্রীটে, বেনেটোলায়। সেই কলকাতাকে যিনি জানতে চান, তাঁকে নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীট দিয়ে এগিয়ে গরান-হাটার গলিতে পৌঁছবার শর্টকাটটিকেও খুঁজে বার করতে হবে।

আমাদের ট্যুরিজম কাম্পেন কিন্তু সোজা রাস্তা ধরেছে। গ্রীষ্মে হিল-স্টেশন আর শীতে জয়পুর-আগ্রায় অতিথিদের হাত-ছানি দিয়ে ডেকে আনার মধ্যে ওকালতির বাহাদুরি নেই। শেষ দু-টি জায়গা দেখতে হয় জ্যৈষ্ঠে। তবে ত জানা যায় যে, বিজ্ঞানের মাপ-জোখ মিথ্যে, সূর্য কক্ষণো পৃথিবীর ন' কোটি মাইল দূরে নয়, বড় জোর মাইল নয়েক হবে! তেমনই বিদেশযাত্রীদের বলি, ধূসর য়ুরোপকে যদি প্রত্যক্ষই করতে হয়, তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী মাসে, যখন তরুশাখা কঙ্কালসার, পথে পথে বরফ-গলা কাদা, শ্বেতকায়দের দেশের মাটিও শ্বেতকায়।

তারই খানিক আন্দাজ দিতে পারে, আমাদের শৈলাবাসগুলি—শীতে। কিন্তু তখন ত তারা উপেক্ষিতা। আর শুধু কি শীতে, উপেক্ষিতা তারা ত আমাদের কাব্যেও।

দার্জিলিং-এর উল্লেখ পাই কটি বাংলা গ্রন্থে? রবীন্দ্রনাথ একবার বদ্রাওনের নবাব-পুত্রীকে এই শহরেরই বিষণ্ণ ছায়াচ্ছন্ন একটি কোণে বসিয়ে দিয়েছিলেন, মনে করতে পারছি, কিন্তু তাঁর পক্ষপাত বরং ছিল শিলং-এর প্রতি। সেখান থেকেই 'চিঠি'-তে মুড়ে ফরমাসী ছড়া, শেষের কবিতাও সেখানেই। তাঁর পরেও আমরা সবাই জলে-ডাঙায় ঘোরাঘুরি কম করিনি কিন্তু উচলে কেউ চড়লুম না।

বিহঙ্গ-চোখে শৈলপুরী

সুন্দর এই শৈলশহরটি যতদিন ছিল মাত্র সাহেবদেরই সাজানো বাগান, ততদিন এই ঔদাসীন্যের কুফল আমরা তেমন অনুভব করিনি। এর ভরণপোষণের বরাত সাহেবদের ওপর দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত ছিলুম, এবার দায় আমাদের ওপর বর্তেছে।

এ-দায়, উত্তর, উত্তরতর আর দক্ষিণ বঙ্গকে মেলাবার দায়। প্রথম কথা, এই খণ্ড বাংলায় সূচ্যগ্র মেদিনীর মূল্যও আমাদের কাছে অসীম। দ্বিতীয়ত, আমাদের ঐক্যের বীজ নিহিত আছে আমাদের 'ডাইভারসিটির' মধ্যে—বারংবার এই বুলি আওড়ানোতেও বিপদ আছে। ডাইভার্সকে ধীরে ধীরে একীকৃত করে নিতে হবে। এবং এ-কাজ যত শীঘ্র হয়, ততই শুভ।

কেবল সাংস্কৃতিক বোধ থেকে নয়, রাজনৈতিক কারণেও। আমাদের সীমান্ত-সচেতনতার পরিবর্তন দরকার।

এই সেদিন পর্যন্ত সীমান্ত বলতে আমরা বুঝেছি আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, বর্মা বেদখল হবার পর আমরা প্রথম টের পাই, পুবদিকেও একটি সীমান্ত আছে। আর এই হালে, বুঝেছি ভয় আছে উত্তর শিয়রেও
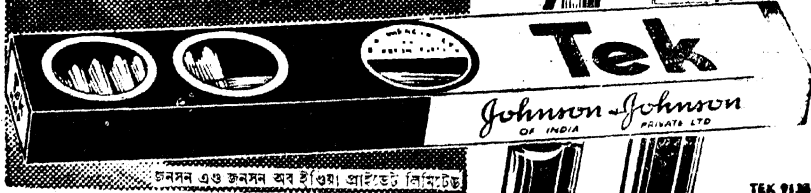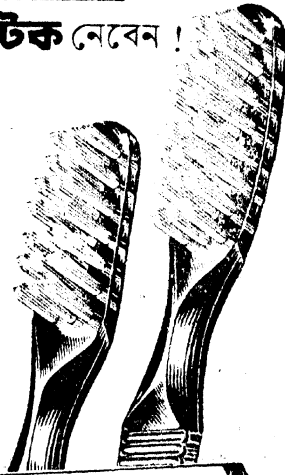
এবং 'ভাই'-এ কপালে ফোঁটা দিলেই সে-পথে কাঁটা পড়ে না, অনভ্যাসের ফোঁটা একটু পরেই চড়চড় করে।

এর দুটি দিক। এক, সামরিক। এ-বিষয়ে কিছু বলা আমাদের মত আনাড়ীর মুখে হয়ত বেমানান। রাষ্ট্রতরীর হুঁশিয়ার কাণ্ডারীরা অবশ্যই আছেন। তবু, সহজ-বুদ্ধিতে মনে হয় এ-বিষয়ে কোথাও কিছু না কিছু শৈথিল্য ঘটেছে। দীর্ঘ সীমান্ত-রক্ষা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্রভাবে গড়ে তোলা সহজ নয়, জানি; দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেখানে ঘটতেই পারে, এবং যে হেতু জয়-পরাজয় আছেই, অতএব কোন কোনটিতে আমাদের হার হতেও পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন তা নিয়ে নয়। ধন্দ লাগে তখনই, যখন দেখি, সর্বত্রই আমরা অপ্রস্তুত। ধন্দ লাগে তখনই, যখন শুনি, ওদিকে বড়বড় রাস্তা-ঘাট, এমন কি বিমানঘাটিও তৈরি হয়ে গিয়েছে। এ-সব বস্তু আলাদিনের চিরাগের প্রভাবে তৈরি হয় না; কোন 'এভিয়েলা'-জিন এগুলো চীনের হয়ে তৈরি করে দেয়নি, অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। এর জন্যে লোক লেগেছে, লস্কর লেগেছে, মাল লেগেছে, মশলা লেগেছে। সম্ভবত বেশ কিছু সময়ও লেগেছে। প্রশ্ন এই, আমাদের সীমানার অদূরেই যখন এই সব কাণ্ডকারখানা চলছিল, তখন আমাদের কর্তৃপক্ষ করছিলেন কী? তাঁদের কানে কিছু কি পৌঁছয়নি? যদি না পৌঁছে থাকে, তবে ধরে নিতে হবে আমাদের সংবাদ-সংগ্রহ ব্যবস্থায় গলদের ত্রুটি আছে। এ ভার যাঁদের ওপর ছিল, তাঁরা সযত্নে কর্তব্য পালন করেন নি। আর সব জেনে শুনেও দিল্লীর কর্তৃপক্ষ যদি 'চী নো ইন্ডিয়ান, হিন্দি নো ইন্ডিয়ান' এই নীতিই নিয়ে থাকেন, তবে তাঁদের এখন একমাত্র শ্রীহরির শ্রীচরণ ভরসা! ওদিকে সুস্পষ্ট রাস্তা, আর এদিকে? সবেধন নীলমণি সেবক সেতু! এই পথেই কালিম্পং, এই পথেই গ্যাংটক, আবার ঐ পথেই আসাম এবং পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ। সামরিক প্রয়োজন বলুন, ব্যবসায় বাণিজ্য এমন কি টুরিজমের স্বার্থেও বিকল্প রাস্তার প্রয়োজন ছিল। ধন্দ কি ওই একটাই! আরও একটার কথা বলি। তিব্বতে ভারতের স্বার্থ লিখে পড়ে দিয়ে পণ্ডিতজী পঞ্চশীল প্যাক্ট পকেটে পুরলেন, না-হয় ভালই করলেন। কিন্তু তখনও কি একবার তাঁর মনে হয়নি যে, যে-অঞ্চলটা বিনা শর্তে বিলিয়ে দিলাম সেই তিব্বতের দক্ষিণ সীমা কী, চীনের কর্তাদের কাছ থেকে সেটুকু অন্তত পরিষ্কার করে জেনে রাখি। তখনই কাগজে কলমে কবুল করিয়ে রাখলে পরবর্তীকালে এই মতান্তরটা হয়ত ঘটত না। যা ঘটবার তখনই ঘটত। এবং গুরুতর রকমের মতানৈক্য হলে, দানপত্রটা তখনই বাতিল হয়ে যেতে পারত। এই কয়েক বছর ধরে একটা ফাঁকিকে আঁকড়ে রাখার দুর্ভাগ্য ভারতের হত না। এ-পর্যন্ত যেটুকু লাভ, তা হয়েছে চীনেরই—সে 'হেডস আই উইন, টেলস ইউ লুজ'-রীতিতে জিতেছে।

এ-প্রশ্ন চীন তখন কেন তোলে নি, তার কারণ সহজেই অনুমান করতে পারি। শুধু আমাদের অদূরদর্শিতাই দুর্বোধ্য।

আজ মর্মান্তিকভাবে এটাই সত্য যে, উত্তরসীমান্তে দিশি হিমালয় নামে যে নগাধিরাজ, তাকে চীন একাই উড়িয়ে দিতে চাইছে না, উড়িয়ে দিয়েছি আমরাও। তিব্বত আর ভারতের মধ্যে পাথরের প্রাচীর হয়ত আছে, কিন্তু সংস্কৃতিগত পার্থক্যটুকুও নেই, শোচনীয় সত্য এইটেই। ওই প্রাচীন প্রাকারটিকে প্রধানমন্ত্রী যখন মুখের গ্রাস হিসাবে চীনের মুখে তুলে দিয়েছিলেন, তিনি কি জানতেন, তার লুব্ধ চোখ অতঃপর নেফার ওপরেও পড়বে? তিব্বত-সংলগ্ন ভারতীয় অঞ্চলের কোন কোন অংশ যে জাতি, ধর্ম, ভাষা, প্রথা এবং অন্যান্য দিক থেকে তিব্বতের অত্যন্তই নিকট, এ-কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে কেউ কি ছিল না? তিব্বতেই তিব্বতের শেষ নয়, যেমন মিউনিকেই মিউনিক-পর্বের অবসান হয়নি। আজ ভুটানে, কাল নেপালে বেসুরো ধ্বনি যদি শোনা যায়, তার একমাত্র কারণ কি এই নয় যে আমাদের 'প্রোটেকটিং আর্মস'-এ নেপাল বা ভুটানের তেমন আস্থা নেই—বৃটিশ বাহুর প্রতি যেমন ছিল?

মৌখিক বোঝাপড়া অথবা সামরিক প্রতিরোধ আশু সমাধান হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, যার জন্যে প্রথম প্রয়োজন সাংস্কৃতিক সমীকরণ। অকপটে স্বীকার করব, এ-কাজে আমরা এখনও বিশেষ অগ্রসর হতে পারিনি।

দার্জিলিং-এর কথাতেই ফিরে আসা যাক। বাংলা দেশেরই জেলা, এর এক দিকে নেপাল, দ্বিতীয় দিকে সিকিম, তৃতীয় দিকে ভুটান। এ জেলা শুধু ভূতাত্ত্বিক কারণেই বাংলা দেশ থেকে পৃথক নয়, পার্থক্য অনেক। শুধু উঁচুতেই অবস্থিত নয়, দূরেও। লজ্জার সঙ্গে বলব, দূরকে নিকট করার প্রয়াস আজ অবধি বিশেষ হয়নি। এই জেলার স্থানীয় অধিবাসীদের একটা বড় অংশ নেপাল থেকে আগত সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা ঠিক ততখানিই নেপালী, কানাডা বা মার্কিন মুলুকের অধিবাসীরা যতখানি ইংরেজ। অর্থনৈতিক চাপে অথবা চা-বাগানের হাতছানিতে এরা কবে পাহাড় ডিঙিয়ে এদিকে এসেছিল, কারও মনেও নেই, সে প্রায় স্মরণাতীত কালে হবে, তাদের সন্তান-সন্ততিরা আজ সর্বতোভাবেই ভারতীয়—এবং দার্জিলিংয়ে যারা আছে তারা বাঙালী। কিন্তু বাংলার সাহিত্য তার সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের কতটুকু এদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াস পেয়েছি

আমরা? ভাষার ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দেবার, দেশাচার বিনিময়ের সামান্য প্রচেষ্টাও হয়েছে কি?

উত্তর নেতিবাচকই হবে।

আমাদের বেতার এদের প্রতি উদাসীন। কলকাতার আকাশবাণী থেকে ইংরাজী এবং হিন্দী কার্যক্রম প্রচারের দরাজ ব্যবস্থা, কিন্তু নেপালী কার্যসূচী উপেক্ষিত। উত্তর-বঙ্গের জন্য আলাদা একটি বেতার-কেন্দ্রই বা হবে না কেন? একই ভাষাভাষী রাজ্যে একাধিক বেতারকেন্দ্রের নজির ত এই দেশেতেই আছে। যতদিন তা না হয়, অন্তত ততদিন হিন্দির বদলে নেপালী কার্যসূচী চলুক, কেন না হিন্দির জন্যে ত পাটনা, লখনউ, দিল্লি ইত্যাদি বহু স্টেশনই আছে, বাংলা অঞ্চলের জন্য মোটে একটিই।

আজ দার্জিলিং-এর অধিবাসীদের অনেকে তাই রেডিও খুলে 'সিলোন' শোনে। কলকাতার কাছে তাদের কিছু প্রত্যাশা নেই

[চার]

কথার স্রোতে ভেসে ভেসে অনেক দূর চলে এলাম। সেজন্যে কুণ্ঠিত নই। সাংস্কৃতিক সাম্যের প্রশ্নটা আজ কেবল রাজনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক কারণেও জরুরী। প্রত্যন্তবাসীদের 'অন্তেবাসী' করে রাখার অধিকার আমাদের নেই।

এই মানুষগুলিও যে আমাদের কাছে আসার জন্য কত উদ্গ্রীব তার পরিচয় সামান্য কয়েকদিনেই পেয়েছি। বরং সাড়া দিতে পারিনি আমরাই।

এ-লেখা তাদের হাতে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু পোখরিয়া-বং গ্রামের সরল লোকগুলির কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের জন্য তারা মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিল, কিন্তু সে-আতিথ্যের সম্মান আমরা রাখিনি। পথ দুর্গম এবং ঠিক নিরাপদও মনে হয় নি, অর্ধপথ গিয়ে আমরা বসে পড়েছিলুম। বলেছিলুম, আর এক পা নড়ছিনে। আমাদের ভয় ছিল, অবরোহণ যদি-বা সম্ভব, আরোহণ এর পরে দুঃসাধ্য হবে, বিশেষত ভূরি-ভোজনের পর। শ্বাসযন্ত্র ইতিমধ্যেই অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তখন তারা—সেই পাহাড়ী মানুষেরা, যাদের নাম মনে রাখিনি—ছ'শো সাতশো ফুট নীচে থেকে আমাদের জন্য থালে-থালে রকমারি ভোজ্যদ্রব্য ওপরে বয়ে এনেছিল। আমাদের অসৌজন্যে তারা কি কুপিত হয়েছিল? না। ক্ষুব্ধ? হয়ত। হতাশ? —অবশ্যই।

তবু তারা বারবার আমাদের ফিরে আসতে বলেছিল।

আমাদের ওরা কাছে আসতে চায়। আমাদের ওরা কাছে টানতে চায়। আশানুরূপ সাড়া দিতে পারিনে আমরাই।

চেষ্টা একেবারে হয়নি বললে মিথ্যে হবে। হাঁটি হাঁটি পা উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েছে। যেমন ব্লকগুলি। সমতলে এদের বার্থতা আজ বিদিত এবং অংশত স্বীকৃত, কিন্তু এই পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু কাজ হয়েছে বইকি। আমরা কি শহর থেকে বহু দূরে-দুর্গম লোকালয়ে রোডও-সেট দেখিনি? ছোট-ছোট শিক্ষাকেন্দ্রে সেলাইয়ের কল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখেছি গ্রাম্য মেয়েদের। তারা কৃতজ্ঞ, তারা খুসী। সরকার বিরোধী মনোভাব নগরাঞ্চলে যত ব্যাপক এবং তিক্ত, পার্বত্য এই এলাকাগুলিতে তেমন নয়, এটা লক্ষ্য করেছি।

এর একটা কারণ বোধহয় ওখানকার সমাজব্যবস্থা। পার্বত্য-অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতি উচ্চাবচ, বন্ধুর, কিন্তু সমাজে বৈষম্য কম। শিখরে আর সানুদেশে তফাতটা এমন পীড়াত্মক নয়।

এসব খটমটে কথা থাক। তার চেয়ে বরং তুলে ধরি কয়েকটি ছবি, রেখা আর মুখ, যারা ক'দিনের জন্য মনে ছাপ ফেলেছিল।

আমাদের হোটেলটি ছিল শান্ত, নিভৃত অথচ ম্যালের খুবই সন্নিকট। তবু এক চক্কর দু-চক্কর ঘোরাঘুরির পর হোটেলের কামরায় ফিরে এসে আমরা নিঃসঙ্গ বোধ করতুম। সেই নিঃসঙ্গতা আর ক্লান্তি দূর করবার একটা উপায় আবিষ্কার করতেও দেরী হল না। হোটেলের অন্য গেস্টদের আমরা লক্ষ্য করতুম, তাদের চলাফেরা, ফিসফিস আলাপের ধরন, অথবা হাসাহাসি। (লক্ষ্য অনেকেই করেন, সব অলস মগজই শয়তানের কারখানা হয়, তবে আমার মত সকলে সেটা স্বীকার করেন না)। দুপুরের খানার সময়ে যাকে দেখলুম কমলা রঙের শাড়িতে আর ফুলহাতা জামায়, বিকেলে তিনিই হয়ত স্ল্যাকস আর জাম্পারে অকুণ্ঠিত রূপে দেখা দিলেন। আমরা চমৎকৃত হয়েছি মজা পেয়েছি।

প্রথম দিন রাত্রে শীতটা একটু বেশীই পড়েছিল, অথবা বেশী লেগেছিল, সেই ভাবটা চাপা দিতে কম্বলের নীচে গিয়েও আমরা জোরে জোরে কথা বলছিলুম, হি-হি করে হাসছিলুম। হঠাৎ শুনি পাশের কামরার দেয়ালে কে টোকা দিচ্ছে ঠক, ঠক, ঠক। আমরা চুপ করতেই গম্ভীর গলায় কে ইংরাজীতে বলে উঠল, "দয়া করে একটু আস্তে কথা বলবেন?"

আস্তে নয়, আমরা অতঃপর একেবারে চুপ করেই গিয়েছিলুম।

পরদিন সকালে বেয়ারা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, পাশের ঘরের লোকটি কে? বেয়ারা ত ওখানেই তটস্থ হয়ে অনুপস্থিত ভদ্রলোককে উদ্দেশে সেলাম ঠুকে দিল। ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বলল, "জানেন না! উনি লাদকের একজন বড় অফিসার।"

পরে লাদকের এই হোমরা-চোমরা অফিসারটিকে চোখেও দেখেছি। তাঁর সঙ্গে বিদেশিনী কোন অতিথির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে রসালো গল্পও ফেঁদেছি।

এই বেয়ারাটির যে আমাদের প্রতিও ভক্তি কম ছিল এমন নয়। প্রথম দিন আমাদের দেখেই তার কেমন ধারণা হয়, আমরা সিনেমার লোক, শুটিং করতে গিয়েছি। প্রতিবাদ করেছি বটে, কিন্তু তাতেও তার সন্দেহ তিরোহিত হয়েছিল কি? বোধ হয় হয়নি। (ক্রমশ)

দোকানদার বলে, "তাই শিখুক না, দাম হবে! তা নয় পড়ে পড়ে ঘুমবে কেবল! চিরকাল চাকর খাটতে হবে তার কি কথা আছে, শিখুক না, এই তো সময়!"

দুপুরে খাবার আনতে ছুটতে হয় মালিকের। সেই কোথায় গঙ্গার ধারে বাড়ি, দু মাইল হাঁটতে হয়। টাঁমা রোদ। ঘড়ি-ধরা সময়ের এদিক ওদিক হলেই দোকান-দার কৈফিয়তের নামে বাপান্ত করে, "পা গুনে গুনে চল্লিস নাকি হারামজাদা? চড়িয়ে গাল বেঁকিয়ে দেব, রাস্তায় কার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি কর—বড্ড রস! দূর করে দেব! খিদেয় আমার নাড়ি জ্বলে গেল!" খিদে জীবনেরও পায়। কিন্তু তার হিসেব কে রাখে।

আবার ঘণ্টাখানেক পরে দোকানের কাজ-কর্ম আরম্ভ হয়। পান চিবিয়ে বিড়ি ফুঁকে কাজে বসে কারিগররা তারের যন্ত্রের বে-সুরে তোলে কান মুচড়ে আর তার বেঁধে। শিরীষ আটা আর 'লেই'—চটচট করে দোকান ঘরটা।

"ঠিক কাজের সময় শালাকে পাওয়া যাবে না, কোথায় আড্ডা মারছে।" নালিশ হয় নিত্যনৈমিত্তিক, মালিক রাধানাথ উগ্র হয়ে ফেটে পড়ে, "শালার জাতের দোষ, কলের জল পেটে পড়েছে আর রক্ষে আছে!"

জীবনের জীবন বৃত্তান্ত সবাই জানে। পাড়া গাঁর অনাথ ছেলে, রাস্তার কুকুরের মত অবস্থা ছিল, এর দোর তার দোর করে বেড়াত—কখনো জুটতো, কখনো ঢালা উপোস। রাধানাথের শ্বশুরবাড়ি সেই গাঁয়ে এক কথায় খোরাকি আর থাকার বিনিময়ে 'সুরশিল্পীতে' চাকরি হয়ে যায়। প্রথম কদিন বাড়ির কাজে তালিম দিয়ে দোকানে আনা হয়। শরীরে শাঁস এসেছে, পরনে খাকি প্যান্ট আর গেঞ্জি উঠেছে।

সবচেয়ে যে কারিগর বৃদ্ধ, তাকে রাধা-নাথ রাগ হলে বলে, "তোমরা তো দেখেছ কি ছিল, ছেলের মত শালাকে মানুষ করেছি! এখন ব্যবহারটা দেখ—কথায় কথায় কি ক্ষেতিটা করে, সেদিন অমন তানপুরা ভেঙে দিলে, কিনা যন্তরটা ঝুলিয়ে রাখতে বলা হয়েছিল। কাঁসর ভাল করতে নেই কখনো!"

দোকান ঘরের এক ধারে ছেঁড়া কাগজ জেলে 'লেই' তৈরী করে জীবন। মালিকের কথাগুলো কানে যায়। ধোঁয়ায় ঘরটা অন্ধকার। পাঁচজন কারিগর, বিশ-পঞ্চাশটা তারের যন্ত্র আর রাধানাথ সামন্ত, সবই মুছে যায়। ধোঁয়ার চোটে চোখ জ্বালা করে। 'লেই' চুঁয়ে কখন খাক হয়ে যায়। জীবন চোখ মোছে।

কারো তর সয় না। কাঠের পৈঠাটা পিঠের ওপর বসে কিল মারে। ধোঁয়া কেটে যায়।...

রাত সাড়ে আটটা কি নটার সময় রাধা-নাথ সামন্ত দাঁড়িয়ে থেকে দোকান বন্ধ করিয়ে বলে যায়, "একদম বেরবে না, লাখ টাকার জিনিস আছে—খোয়া গেলে তুইও মরবি, আমিও মরবো! খবরদার খিল এঁটে শুয়ে পড়বি।"

আঁটঘাট বন্ধ করলে বড় গরম। চোখ বুজিয়ে মনে হয়, বুকের ওপর লাখ টাকার জিনিসগুলো যেন পাথর হয়ে চেপে বসেছে। মরার কথা সত্যি বুঝি!

খিল খুলে পাল্লাটা একটু ফাঁক করে রাস্তাটা দেখে জীবন। কত লোক তখনও মোড়ের মাথায় গম গম করছে। নটার সিনেমা ভেঙেছে। দোষ নেই দরজা খুলে বসে থাকতে খানিক। ঘুম আসুক।

কতদিন টিনের চেয়ারটা দোকানের সামনে পেতে বসে লোক দেখতে দেখতে জীবনের

মনে হয়েছে, শ্যামসুন্দরপুরের নদীতে যেমন দুপুর বেলা জোয়ার আসে, দেখতে দেখতে জল অনেকটা বেড়ে যায় তেমনি। রাস্তার মোড় ভর্তি হয় লোকে, ফুটপাথে, রাস্তায় এদিকে ওদিকে। বন্ধ দোকানগুলো যেন নদীর পাড়। তারপর আধ ঘণ্টাও না রাস্তার মোড় ফাঁকা, নির্জন। কেবল ওধারে নোঙরা ফেলা টিনের কাছে নেড়ী কুকুরের বাচ্চাটা এখনো কুঁই-কুঁই করে সুর ভাঁজবার চেষ্টা করে। শুধু ময়লা আবর্জনা, খাদ্য কিছু নেই অনাথ প্রাণীটার।

লাখ টাকার জিনিসের পাহারা দেবার ভাবনায় বুঝি ঘুম আসে না। এত তারের যন্ত্র চারিধারে যেন তারের খাঁচায় তোতা পাখিটা মুক্তির আশায় বারবার দোরের কাছে ছুটে আসছে। মালিক শোনে না, দোকানেই শুতে হবে।

প্রায় সব যন্ত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল জীবনের। বাঁধা যন্ত্রগুলো সামান্য স্পর্শে কাতর হয়ে ওঠে। অদ্ভুত অনুস্বার শব্দ দোকানময়।

এক সময় কারিগর বিভূতিদার পাশে বসে সারগমটা শিখে নিয়েছিল জীবন। কোড়ি-কোমলের তফাতটাও। চার আঙুলের স্পর্শে অদ্ভুত শব্দ ব্যঞ্জনা জাগে। একটু একটু করে অনেক বাজনা বাজিয়েছে সে।

রাধানাথ সামন্ত খদ্দেরকে বলে, "নিয়ে যান একখানা যন্তর দিলুম, যা বলাবেন তাই বলাবে, ডাকে সাড়া দেবে! অর্ধেক কাজ আপনার তানপুরাতেই হয়ে যাবে। ওস্তাদকে 'সুরশিল্পীর' নাম বলাবেন, ব্যস: দেখতে হবে না—"

জীবনও কথা শিখেছে, মালিকের হয়ে বলে, "বাজনাখানা খুব ভাল আছে, বাজিয়ে দেখবেন!"

অনেক খরিদ্দার কৌতুক করে জীবনের মুখের দিকে চেয়ে বলে, "তুমি বলছো তা হলে, ভাল বাজবে? এইটেই নিই, কি বল!"

অপ্রস্তুত বোধ করে জীবন, রাধানাথ গম্ভীর হয়ে বলে, "তুই এখান থেকে যা হতভাগা! তোকে কে ডাকছে ফটফট করতে!"

কিন্তু খবরটা রাধানাথের কানে যায়। সকালে দোকানে এসে বলে, "খুব বাজিয়ে হয়ে উঠেছো যে, অাঁ! সারারাত তা হলে এই হয়? শালা দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস নেই! কর এবার একটা দোকান, খদ্দের ভাঙাও!"

অভিযোগটার অন্বয় হয় না। জীবন চেয়ে থাকে। রাধানাথ তেমনি পেঁচিয়ে বলে, "তাই খদ্দের জিজ্ঞেস করে জীবন-বাবু যদি ভাল বলে তবেই ভাল। উঃ কি নেমকহারাম সব হয়েছে আজকাল! খবরদার দোকানের একটা যন্তরে তুই হাত দিবি না, হাত কেটে দেব শয়তান কোথাকার!"

রাত ন'টার পর থেকে 'সুরশিল্পীর' মুখে বাইরে থেকে চাবিতালা পড়ে যায়। রাধানাথ পকেট থেকে দেশলাই বার করে এক টুকরো কাগজ পুড়িয়ে দোকানের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, "আমার সঙ্গে আয়!"

মানে, মনিব বাড়ি রাত্রিবাসের ব্যবস্থা অতঃপর। লাখ টাকার সম্পত্তি পাহারা দিয়ে কাজ নেই আর। ডাইনের হাতে পুত সমর্পণ!

ডান হাতের তর্জনী থেকে সেতারের জীয়ন কাঠিটাও একদিন টেনে খুলে নিয়ে রাধানাথ বললে, "ওটা আবার বাহার করতে পরা হয়েছে কেন! কত আমার ইয়ে-রে। কি আমার নূরউদ্দীন এসেছে! হাত ভেঙে দেব!"

তর্জনীতে আঠা জমে মড়মড় করে। জলে ধুলেও যায় না। হাতের চেটোয় কড়া পড়ে, দোকান থেকে ফিরে রাধানাথ সামন্তর
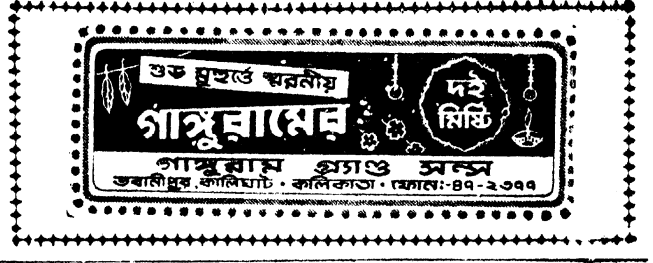
বাড়ির এ'টো বাসন মাজতে হয় জীবনকে। রাধানাথের পরিবার বড় হুঁসিয়ার, সকাল হলে দোকানের লোকটাকে দিয়ে আর ফালতু কাজ করান যাবে না। কলতলায় লম্ফ জ্বালিয়ে জীবনকে বসিয়ে দেয়। রাধানাথ খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে নাক ডাকায়। আর কোন দুর্ভাবনা নেই।

কারিগর বিভূতিদা শুনে বললে, "তুই ছেড়ে দে কাজ, মেলা কাজ আছে কলকাতা শহরে! ভাবনা কি?"

মুখচোরা ছেলেটা যেন চোর। ধরা পড়ে যেমন অবস্থা হয়। "শির চির্নোচিস তোর ভাবনা কি, একটা পেট দিব্যি চলে যাবে। শালা চামার।"

বিভূতিদা আশ্বাস দিলেও জীবনের সাহস হয় না মালিক বদলাবার। তা ছাড়া কাজের মেলা দেখাও যায় না আশপাশে। তারের চেয়ে এখন বেতারের কারবার অনেক বেশী। কর্মান্তরের সাহস বা বুদ্ধি কোথায়?...

মোড়ের মাথা জমজমাট। ওধারে পাঁচিল

ঘেরা ফাঁকা মাঠটায় কি যেন হচ্ছে কদিন ধরে, লোকজন আসছে, বাঁশের মাঁচায় সামিয়ানা-ত্রিপল টাঙান হয়েছে। কলকাতায় শীত পড়েছে। সংগীত সম্মেলনের আয়োজন সম্পূর্ণ।

'সুরশিল্পীর' সামনে দাঁড়ালে দেখা যায়, লালশালুতে সাদা অক্ষরে আমন্ত্রণ লিপি লেখা হয়েছে, টঙ-এর ওপর সকাল থেকে সানাই বাজছে, ভিড় জমেছে।

রাধানাথ বললে, "শালা কেবল পয়সা মারবার তাল। গানের ঘণ্ট হবে। ছোট, বড় আলিদের নিয়ে আদিখ্যেতা, কান ঝালা-পালা।"

যথারীতি জীবনকে সাবধান করে দিল, "খবরদার ওদিকে নজর দিবি না, বড় বিশ্রী জিনিস। গান-বাজনা না ঘোড়ার ডিম। দোকানের কাজ কর মন দিয়ে।"

তবু জীবন কাজের ফাঁকে চোখ বাড়িয়ে বারবার জায়গাটাকে দেখে—সানাই-এর সুরে অদ্ভুত একটা মূর্চ্ছনা উছলে পড়ে। মোড়ের মাথার বাড়িগুলো কাঁপে বুঝিঃ আলো-জ্বলা সন্ধ্যায় বড় রহস্য ভরা মনে হয় রাস্তার ও-মোড়টা—গাড়ি-ঘোড়ায় গমগম।

তৃতীয় দিবস অধিবেশনে দাক্ষিণপূর্ব কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের খুব খ্যাতি সংবাদপত্রে প্রচারিত হল। বহু গুণীর প্রতিকৃতি এবং সংগীতানুরাগীদের এক অংশের ছবি বড় করে ছাপা হল। উদ্যোক্তা-দের প্রশংসাও বেরল। মোড়ের মাথার নাম অনেক লোকে জানল।

আর সেই দিনই ভোর হবার আগেই রাধা-নাথ সামন্ত মোড়ের মাথায় এসে চারদিক খোঁজাখুঁজি করলে। শালার কলিতে কারো ভাল করতে নেই—কাল দোকান থেকে ফেরবার সময় ছোঁড়াটা পালিয়েছে! রাধা-নাথ পিছনে ফিরে মাঝপথে জীবনকে দেখতে পায়নি।

আবর্জনার টিনটা মোড়ের মাথা থেকে সরিয়ে একধারে রাখা হয়েছিল, নেড়ী কুকুরের বাচ্চাটা হয় গাড়ি চাপা পড়েছে, নয় আর কোথাও আস্তানা নিয়েছে। ঘুমন্ত জীবনের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে দোকানে তুলে রাধানাথ এসরাজের ছড়িটা পিঠে ভেঙে বললে, "শালা, গোল্লায় যাবার মতলব করেছো। মেরে ভূত ভাগিয়ে দেব। রাত জেগে গান শোনা।"

পঞ্চম দিবসেও সম্মেলনের সমধিক খ্যাতি প্রকাশিত হল। কণ্ঠ সংগীতের চেয়ে তারের বাদ্য-যন্ত্রের কৃতিত্বের কথাই বেশী। জনসাধারণের অনুরোধে সম্মেলনের কাল আরো দুই দিন বিলম্বিত করা হল। মোড়ের মাথার দোকানগুলোর যেন কদর বাড়ল। বিনা খরচে বিয়েবাড়ি বিয়েবাড়ি ভাব হয়ে রইল মোড়টা।

শেষ পর্যন্ত পুলিসই ডাকতে হলো। সপ্তম এবং শেষ অধিবেশন শেষে 'সুর-শিল্পী'র আর ঘুম ভাঙে না। বাইরে দাঁড়িয়ে রাধানাথ সামন্ত দরজা ঠেলে ঠেলে বিরক্ত হয়ে গেছে। রাগে আগুন হয়ে আছে, আজ দুদিন কোন খোঁজ নেই ছোঁড়াটার। দোকানের মধ্যে আবার কি আপদ জুটলো?

'সুরশিল্পীর' বাইরে সমস্ত দৃষ্টিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ। রাধানাথ সামন্ত বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'কি সর্বনাশ হলো—শালা নিজে মরলি আমাকেও মেরে গেলি। কেন, তোর কি আমি করেছিলুম?"

উদ্বন্ধনে সারবন্দি তারের যন্ত্রগুলো কড়িকাঠ থেকে স্থির হয়ে ঝুলেছে। তার মাঝে জীবনও ঝুলেছে, এতটুকু জড়াজড়ি, ঘেঁষাঘেঁষি হয়নি। তর্জনীতে মেরজাফটা এঁটে বসেছে।

গলায় দড়ি যন্ত্রগুলোর মাথা ঠেকে দেবার ইচ্ছে করে রাধানাথের। কারবারের দফা রফা।

ডুকরে ডুকরে রাধানাথ বললে "দুদিন কোথায় ছিল কে জানে, আমার সর্বনাশ করবে বলে এখানে মরতে এসেছে। দোকানের চাবি চুরি করেছিল। আমার পরিবার ঠিক বলেছিল—"

পুলিস অফিসার ধমকে বললেন, "থামুন যা জিজ্ঞেস করি তাই বলুন। মার-ধোর করেছিলেন?"

রাধানাথ কেঁদে উঠলো, "ওরে বাবারে ও যে আমার ছেলের বাড়া ছিল! উঃ!"

আবার এক ধমক দিলেন পুলিস অফি-সার। দোকান বন্ধ করে লাশ চালান দিলেন। দরজায় সিপাই বসে রইল। রাধা-নাথ সঙ্গে গেল থানা পর্যন্ত।

এ সময় এ-রাস্তার এ মোড়টায় বড় ভিড় থাকে, চারদিক থেকে গাড়ি-ঘোড়া আর মানুষ থৈ-থৈ করে। দু দুটো ট্রাফিক সামলাতে পারে না। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। অফিস টাইমে।

ইতিমধ্যে "দক্ষিণ-পূর্ব কলিকাতা সংগীত সম্মেলনে"র মণ্ডপটার ছাদ-চামড়া উঠে কংকাল বেরিয়ে পড়েছে, শামিয়ানা-শাল, ঠেলাগাড়িতে বোঝাই হচ্ছে। কাল রাতে কোন সংগীত শিল্পীর সেতারে যে সুর উঠেছিল তাকে ডুবিয়ে দিয়ে আবর্জনা আশ্রয়ে নেড়ী কুকুরটা মোড়ের মাথায় কাঁদছে থেকে থেকে।

পাস্তেরনাকের সঙ্গে দেখা হওয়াটাকে একটা দৈব যোগাযোগই বলতে পারেন।

যদিও গত সাত আট বছর ধরে আমার রুশীয় সাহিত্যে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সুযোগ ঘটেছে এবং কম্যুনিস্ট দেশের রাজনীতি, সেখানকার ঘটনাবলী এবং ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার সৌভাগ্য হয়েছে, তবুও আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ১৯৫৭র ৩রা আগস্টের আগে আমি বোরিস পাস্তেরনাকের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। আমি মনে করি রুশীয় সাহিত্য জগতের বাইরে এমন খুব কম লোকই ছিলেন যাঁরা নোবেল প্রাইজ পাবার আগে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতেন। তাই পাস্তেরনাকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকে আমি একটা দৈব যোগাযোগ আখ্যাই দেব।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই—

১৯৫৭ সালের ৩রা আগস্ট আমি মস্কো থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ইলিয়া এরেনবুর্গের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর বাসস্থানে যাই। আমার সঙ্গে ট্রিবুনের সংবাদদাতা শ্রী দত্ত এবং দিল্লির অন্য একজন সংবাদদাতা শ্রীনক্সবন্দ ছিলেন। বড় তিক্ততা অনুভব করলাম। শ্রীইলিয়া এরেনবুর্গ হয়তো কোনো প্রতিকূল মানসিক অবস্থায় ছিলেন অথবা পরিশ্রান্ত ছিলেন, কিংবা তাঁর স্বভাবটাই একটু খিটখিটে। তাই তাঁর কথাবার্তায় ভব্যতার অভাব আছে বলেই মনে হল। অনুভব করলাম আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্ন তাঁকে রাগিয়ে তুলছে এবং তাঁর প্রত্যেকটি উত্তর আমাদের কাছে প্রশ্ন হয়ে উপস্থিত হচ্ছে। যখন ফিরে আসি তখন আমাদের জিভে এবং জিভের নীচের দিকে ঠিক গলার কাছে এমন একটি স্বাদ ঠেলে এল যা রুশীয় মদ 'ভোদকার' চেয়েও কটু। আমাদের সঙ্গে একজন যুবক লেখকও ছিলেন, যিনি আমাদের দোভাষী হিসাবে কাজ করছিলেন। (এরেনবুর্গ ইংরাজী জানেন না)। এই লেখক বন্ধুও একটু অপ্রতিভ ও সংকুচিত হয়ে পড়েছিলেন। কথা শুরু করার উদ্দেশ্যেই হয়ত তিনি বললেন—

"পাস্তেরনাকের নাম শুনেছেন?"

"না তো! ইনি কে?" আমি জিজ্ঞেস করি।"

"ইনি নামকরা রুশীয় কবি।"

"অ!" উপেক্ষার সঙ্গে উত্তর দিই।

"পাস্তেরনাকের কথা আমার মনে পড়ল", আমার বন্ধু বলেন, "কারণ যে প্রশ্নগুলি আপনি শ্রীএরেনবুর্গের কাছে উত্থাপন করেছিলেন, তার উপযুক্ত উত্তর একমাত্র পাস্তেরনাকই দিতে পারেন।"

এর পরে আমার এই বন্ধুটি পাস্তেরনাক সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বললেন। কিছু দিন পূর্বেই পাস্তেরনাকের অপ্রকাশিত বই 'ডাঃ জিভাগো' সম্বন্ধে রুশীয় লেখক সঙ্ঘে (Writers' union) আলোচনা শেষ হয়েছে। তাঁর দুটি কবিতা প্রসিদ্ধ পত্রিকা "লতুরেতু গ্যাজেট"-এ প্রকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ আমাদের গাড়ি যখন মস্কো হোটেলে পৌঁছল তখন আমি পাস্তেরনাক সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। লেখক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি, "আমি কি পাস্তেরনাকের সঙ্গে দেখা করতে পারি?"

"চেষ্টা করা যেতে পারে," বন্ধু উত্তর দেন। এবং তিনি তখনই তৎপর হয়ে ওঠেন। পাস্তেরনাককে ফোন করা হল। ভাগ্যবশত তাঁকে তখনই পাওয়া গেল। লেখক-বন্ধু অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে রুশীয় ভাষায় কথা বললেন এবং শেষে ফোন আমার হাতে দিয়ে দিলেন। নমস্কারান্তে পাস্তেরনাক জিজ্ঞেস করেন, "আপনি আমার সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে দেখা করতে চান?"

"দুটো কারণ রয়েছে," আমি উত্তর দিই। "প্রথমত মহান লেখকদের সঙ্গে দেখা করা আমার একটা শখ, ঠিক বাচ্চারা যেভাবে টিকিট সংগ্রহ করতে ভালবাসে। দ্বিতীয়ত, আপনার নতুন উপন্যাস সম্বন্ধে ঔৎসুক্য।"

"তা, আমি তো এমন কোনো বড় লেখক নই।"

"তার বিচারের ভার আমার উপর থাক।"

কয়েক সেকেণ্ড চুপ থাকার পর পাস্তেরনাক বললেন, "কালকে আপনি কখন সময় পাবেন?"

"সারা দিন," আমি উত্তর দিই

বরিস পাস্তেরনাক

"তা হলে কাল ১১টার সময়ে আসুন; চার-পাঁচ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু একটি কথা", পাস্তেরনাক কিছু সতর্ক করে দেবার সুরে বলেন, "আমি সাধারণত কারো সঙ্গে দেখা করি না। বরঞ্চ বলতে পারেন, কেউ আমার সঙ্গে সাধারণত দেখা করতে আসে না। আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছি তার কারণ ভারত থেকে আগত এক যুবকের শখ আমি ভেঙে দিতে চাই না। অতএব আপনি কোন রাজনীতিক বা খবরকাগজী ইন্টারভ্যু নেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন না আসেন। এই সাক্ষাৎটা যেন শুধু শখের সাক্ষাতই হয়।"

দ্বিতীয় দিন পাস্তেরনাকের কাছে পৌঁছে গেলাম, মস্কো থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে পেরেডিল্কিনো গ্রামে। একটা ছোট্ট বাড়ি যেন পুকুরের ধারে গাছ-গাছড়ায় ঢাকা কোনো মন্দির, যার উপর অনেক দিন ধরে চুনকাম করা হয়নি। দেখে নিজের গ্রামের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। ঘরটি বেশ উঁচু জায়গায় ছিল এবং অনেকদূর থেকেই (প্রায় এক ফার্লং) ভাঙা সড়ক শুরু হয়ে যায়, অতএব চড়াইর কাছেই আমাদের গাড়ি রাখা হল।

পাস্তেরনাক যে বাড়িতে ছিলেন, রুশ ভাষায় সে ধরনের বাড়িগুলোকে 'ডাসা' বলা হয়—। এই ঘরগুলি সাধারণত নামকরা লেখক বা বিজ্ঞানীদের দেওয়া হয়। শহর থেকে বাইরে, ভিড় থেকে দূরে, এই ঘরগুলোতে লেখক শান্তিতে থাকতে পারেন। সাধারণত এই লেখকদের মস্কো শহরেও একটি ফ্ল্যাট থাকে। এই রকম ঘর এবং ফ্ল্যাট এরেনবুর্গ, শোলোকোভ, সুর্কোভ প্রভৃতির আছে। পাস্তেরনাকের আছে শুধু মাত্র একটি 'ডাসা'। মস্কো শহরে তাঁর থাকার কোনো আস্তানা নেই। তবুও 'ডাসায়' যখন থাকেন তখন এই কথাই সূচনা করে যে, পাস্তেরনাক রুশের প্রসিদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত লেখকগোষ্ঠীর একজন।

তাঁর বাড়ির সামনেই তাঁকে পেলাম। হাত জোড় করে তিনি আমার অভিবাদনের উত্তর দেন এবং হেসে বলেন, "হাত জোড় করা আমি ক্রুশ্চেবের ফোটো থেকে শিখেছি।"

পাস্তেরনাক শার্ট এবং ফুলপ্যান্ট পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। শার্ট হলুদে ডোরাকাটা মোটা কাপড়ের এবং ফুলপ্যান্টটি কালো পশমী ফ্ল্যানেলের। মাথার চুল সাদা, ক্লীন শেভ, চোখ নীলাভ উজ্জ্বল এবং শরীর হৃষ্টপুষ্ট। বয়স ৬০ এবং ৬৫-র মাঝামাঝি (সে সময়ে আসল বয়স ৬৭)। মোটের উপর চেহারার মধ্যে ব্যক্তিত্বের ছাপ সুপরিস্ফুট। শ্রীমতী পাস্তেরনাকও এসে পড়লেন। শ্রীমতী এরেনবুর্গের মত তিনিও মোটা কিন্তু আকর্ষণীয়া। দু তিনবার বলার পরেই তিনি আমার নামটাকে ধরতে পারলেন এবং শেষে যা উচ্চারণ হল তা অনেকটা 'পিল্ম কংথ তৃপ্তি'র কাছাকাছি দাঁড়ায়। ঘরের অন্য দিকের বারান্দায় তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি টেবিলের উপর 'বিনু' (হাল্কা মদ) এবং দুটো গেলাস রাখা ছিল। আমরা সেখানেই বসে পড়ি। দেওয়ালে কয়েকটা বড় বড় পোর্ট্রেট টাঙানো ছিল। তার মধ্যে একটি মুখ আমার পরিচিত, তিনি টলস্টয়। লেনিন বা স্টালিনের একখানিও নয়। ছবিগুলোর দিকে আমি তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম।

"এ ছবিগুলি আমার বাবার আঁকা। তিনি একজন ভাল আঁকিয়ে ছিলেন। সংগীতজ্ঞও।"

"এবং একজন বড় চিত্রশিল্পীও ছিলেন।" আমি বলি।

"হ্যাঁ, আমি তাঁকে মহান শিল্পী বলে মনে করি এজন্যে নয় যে তিনি আমার বাবা ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববাদী (Individulist) শিল্পী। কিন্তু......আজ... আজকের মতে তিনি একজন পেণ্টার, আর্টিস্ট নন।"

"বর্তমানের মতবাদ বলতে আপনি কি

সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমকে বোঝাতে চাইছেন?"

"আমি এ শব্দের অর্থ জানি না। তুমি হাসছ, কিন্তু যুবা বন্ধু বিশ্বাস কর, আমি এ শব্দের অর্থ বুঝি না এবং হয়ত তুমিও বোঝ না। যাক, এতে কি আসে যায়। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে শিল্পের কোনো পরিভাষা নেই এবং সীমার মধ্যে আমার বাবাকে বাঁধা সম্ভবপর নয়।"

"এবং আপনি?"

"আমি? আমি শিল্পী নই। আমি তো একটি অনুবাদক মাত্র, এবং কখনও কখনও কবিতাও লিখি। আমার কবিতা পড়েছেন?"

"মিঃ পাস্তেরনাক!" আমি বলি, "আজ থেকে দু দিন আগে আমি আপনার নাম পর্যন্ত জানতাম না। আপনার কোনো কিছুই আমি পড়িনি। আমার অজ্ঞানতাও বলতে পারেন। আমি কেন, হয়ত আমার দেশে এমন কোনো লোক নেই যে আপনার সম্বন্ধে কিছু জানে।"

পাস্তেরনাক হেসে ওঠেন, কোনো সংকোচ না করেই তিনি অট্টহাসে করে ওঠেন। এবং খিদের এক পেগ আমার দিকে বাড়িয়ে দেন।

সেদিন পাস্তেরনাকের সঙ্গে চার ঘণ্টারও বেশী আলাপ হল। ভারতের অধিবাসী এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। এই প্রশ্নগুলি আমি মনে করি ভদ্রতাবশতই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর বিশেষ কিছু রুচি লক্ষ করিনি। সোবিয়েতে যে ভারতীয় লেখকদের বই অনূদিত হয়েছে; তার ভেতরে তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন। অন্যান্যদের মুলকরাজ আনন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র, অশোক, সরদার জাফরী। নাম শুনে তিনি মুখ কুঞ্চিত করলেন।

সময় যতই যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে পাস্তেরনাকের স্বনির্মিত গাম্ভীর্যের প্রাচীর ভেঙে পড়ছিল, এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শঙ্কার পর্দা যা প্রত্যেক রুশীয় লেখকদের কবচ, তা পাস্তেরনাকের ক্ষেত্রে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল এবং তিনি দিলখোলা হয়ে পড়ছিলেন।

"আপনার প্রতি স্টালিনের ব্যবহার কেমন ছিল?" অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করে বসি।

"প্রশ্নটি কি সাহিত্যিক?"

"না! কিন্তু......"

"কিন্তু মন মানলো না? এই তো? স্টালিন, মহান স্টালিন, আমার প্রতি খুব দয়ালু ছিলেন। তিনি আমাকে জেলে পাঠাননি।"

পাস্তেরনাক কিছুক্ষণ মৌন থাকেন, যেন হারিয়ে যাওয়া মেঘগুলির দিকে তাঁর দৃষ্টি ফিরে গেছে। আবার বললেন, "তুমি হয়তো জান না যে, ৩৩ সনেও আমার কবিতা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। রুশ ভাষার প্রফেসাররা আমাকে মহান কবি ভেবে বসেছিলেন এবং আমার এক-একটি কবিতার চার চারটি মানে তাঁরা করতেন। কিন্তু অকস্মাৎ এই প্রফেসাররাই ঘোষণা করলেন যে, আমি জনগণ থেকে দূরে সরে গেছি, আমি অহংবাদী, আমি 'সিম্বলিস্ট'। বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব এখনও নাকি আমার ভিতরে বিদ্যমান। একটি কাগজ লিখল, আমি এমন কবিতা লিখি, যা শুধুমাত্র আমিই বুঝতে পারি। এবং তার পর..."

"তার পর?"

"এবং তার পর আমি আর কবি থাকলাম না। শুধু এটুকু নয়, আমি কখনও কবি ছিলামই না!"

(I no more remained a poet, not only that. I never existed as a poet.)

"তার পর আপনি কি করলেন?"

"কিছুই করলাম না। লেখা ছেড়ে দিলাম। তার পর আমি লেখকই থাকলাম না। লেখক সংঘ (Writers' union) আমাকে একটা খুব বড় কাজের দায়িত্ব দিলেন। বাকুর তৈল-মজদুর সম্বন্ধে কিছু লেখার। এই কাজ আমি করতে পারলাম না। কেন? কারণ, আমি বাকুর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, মজদুরদের সম্বন্ধেও জানতাম, কিন্তু লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, 'আমি লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।' লেখক সঙ্ঘ কৃপাপূর্বক এটা মেনে নেয় এবং আমাকে পচা ডিমের মত একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মহান স্টালিন দয়ালু ছিলেন; তিনি আমাকে জেলে পাঠাননি।"

"প্যাপেরোশে (সিগারেট)?"

"হ্যাঁ," আমি বলি!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। ভেবে দেখলাম, সোবিয়েৎ সঙ্ঘে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য লোকে এখনও স্টালিনকে দোষ দেয় না। মনে পড়ল, লেখক সঙ্ঘে একটি ৮০ বৎসর বয়স্ক লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা। এই ব্যক্তি বাইশ বছর সাইবেরিয়ার জেলে ছিলেন। ৫৫ সনে ইনি ছাড়া পান। অক্টোবর বিপ্লবে তিনি মহত্বপূর্ণ অংশ

গ্রহণ করেছিলেন। ইনি একটি প্রদেশে পার্টি সেক্রেটারী এবং গোর্কীর সহযোগীও ছিলেন। নিজেকে তিনি গোর্কীর শিষ্য বলেই মনে করতেন। নাম মাতিস্কা। ওঁকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্টালিনের প্রতি আপনার নজর কি রকম?" তখন উত্তর পেয়েছিলাম, "স্টালিন কিছুই করেনি। বোরয়াই আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল।"

আমি মৌনতা ভঙ্গ করে বললাম, "রাশিয়ায় লেখকরা কি স্বতন্ত্র?"

"তুমি তিন তিনবার রাশিয়ায় এসছ, তবু তুমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর পেলে না, আশ্চর্য! হ্যাঁ, আমি মনে করি লেখকদের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে লেখার এবং না লেখার। কিন্তু লেখক নিজের কলম দিয়ে কোনো সমাজবিরোধী কাজ করতে পারেন না, যেমন করে কোনো মোটর ড্রাইভারেরই নিজের মোটর দিয়ে কোনো লোককে মেরে ফেলার স্বাধীনতা নেই।"

বুঝতে পারলাম, পাস্তেরনাক প্রশ্নটি এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ঠিক এই প্রশ্নটিই এরেনবুর্গকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু একই প্রশ্নের উত্তর দিলেন পাস্তেরনাক মিষ্টি

হাসি দিয়ে। দুজন লেখকই মহান, কিন্তু তাদের ভিতরে একটি পার্থক্য স্পষ্ট। এরেনবুর্গ একেবারেই সহিষ্ণু নন। অথচ পাস্তেরনাকের সহিষ্ণুতা বিনম্রতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে। পাস্তেরনাকের মানবতাবাদ তাঁর এক-একটি কথায় প্রকট।

"গোর্কীর সংগে আপনার পরিচয় ছিল?"

"ভাল ভাবে।"

"প্রায়ই কি আপনারা দেখা করতেন?"

"তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেই তাঁর সংগে দেখা হয়েছিল।"

"তাঁর মৃত্যু কি স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল?"

প্রশ্ন শুনে পাস্তেরনাক প্রথমে চমকিত হলেন। তারপর হেসে ফেললেন।

"তুমি বুঝি আমেরিকার প্রোপোগাণ্ডার কবলে পড়েছ? আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। সত্যি স্বাভাবিক মৃত্যুই ছিল তাঁর। হ্যাঁ, জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি সুখী ছিলেন না। ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। (He was a broken man—a broken man)

"কেন?"

"আমি জানি না।... দয়া করে গোর্কী সম্বন্ধে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করো না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

"গত পঁচিশ বছর ধরে আপনি কিছুই লেখেননি?"

"মৌলিক কিছু নয়। তবে অনুবাদ অনেক করেছি। এবং মৌলিক বই লিখে যতটুকু আয় করতাম, অনুবাদে তার কম আয় করিনি। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান আমার কাছে রুশীয়র মত।"

"আপনি মৌলিক কিছু একেবারেই লেখেননি? না লিখেছেন, প্রকাশিত করাননি?"

"লিখিনি.....বা খুব কম লিখেছি..... এবং প্রকাশ কিছুই করিনি। বললাম না, আমার লেখার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাও কিছু না কিছু লিখেই গেছি।"

পাস্তেরনাক আবার যেন বিগত স্মৃতিতে ফিরে গেলেন অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। আমি নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। অকস্মাৎ নিজেই বলে উঠলেন, "পঁচিশ বছর ধরে না লেখার অর্থ বোঝ? কখনও কখনও মনে হয় আমি একজন ফুটবলের খেলোয়াড়। কিন্তু আমার ডান পার একটি নাড়ি ছিঁড়ে গেছে। 'কিক' মারার জন্য পা আর ওঠে না। পঁচিশ বছর ধরে আমি অন্যান্যদের খেলা দেখে আসছি। যে ছোট ছোট বাচ্চারা পা ওঠাতে জানত না, তারা নামকরা খেলোয়াড় হয়ে উঠল। যশ, অর্থ, রাজ্যাশ্রয়—সবই ছিল ওদের কাছে। তারপর আমার পা-ও ঠিক হয়ে উঠল, কিন্তু মাঠে আর নামতে পারলাম না।"

"কেন?"

"কারণ তখন খেলার নিয়মকানুন বদলে গেছে। এবং ঐ নিয়মগুলো থাকাতে আমি খেলোয়াড় থাকা পছন্দ করলাম না, যশ অর্থ, গৌরব কিছুই পাব না জেনেও।"

পাস্তেরনাক নিজের সাংকেতিক ভাষায় (প্রতীকী ভাষা) অনেক কিছুই বলে ফেললেন। মনে হল যেন আমার সব প্রশ্নের উত্তরই আমি পেয়েছি—।

"আপনি কখনও দেশের বাইরে গেছেন?"

"হ্যাঁ, দু তিনবার। ফ্রান্স খুব ভাল লাগল। আগামী বছর আমেরিকায় যাব। বিনিময় কার্যক্রমের অন্তর্গত (Under Professor Exchange Programme) হয়ে হয়ত কোনো দিন ভারতেও আসতে পারি।" (আমেরিকা যাওয়াটা শেষে বাতিল হয়।)।

"আপনি বিদেশে থাকা পছন্দ করেন?"

"হ্যাঁ, কিছু দিনের জন্য। কিন্তু বেশী দিনের জন্য আমি বাইরে থাকতে পারি না। মাদার রাশিয়া সত্যি সত্যিই আমার মা। তুমি কি তোমার দেশের বাইরে থাকতে পার?"

"ভেবে দেখিনি, হয়ত না।"

এর পর আমরা খাওয়ার জন্য উঠে পড়ি।

খাওয়া দাওয়ার পর পাস্তেরনাকের অপ্রকাশিত প্রথম (এবং হয়ত অন্তিম) উপন্যাস ডাঃ জিভাগো সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হল। তিনি বললেন যে, এই বইটি লেখক সংঘের সংগে যুক্ত সকলেই পড়েছেন। এরেনবুর্গও। এক যুবা কম্যুনিস্ট বইটির সম্পাদনার কাজও করছে। (রাশিয়ায় প্রত্যেকটি বই লেখক সংঘ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সম্পাদককে কোনো লেখক বা বিদ্বান ব্যক্তি হতে হবে এমন নয়, কিন্তু তাঁর মার্ক্সিস্ট দর্শন এবং নবীনতম পার্টি লাইনে পটু হওয়া আবশ্যক। বইটি ১৫ই অক্টোবরের ভিতরেই প্রকাশ লাভ করবে, অর্থাৎ প্রায় ২ মাস পরে। কিন্তু রাশিয়ায় এখনও বইটি প্রকাশিত হয়নি)। অকস্মাৎ আমি জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি কম্যুনিস্ট?"

"পার্টির মেম্বার নই।"

"কিন্তু আপনি মার্ক্সিস্ট বিচারধারা যে স্বীকার করেন?"

"আমার মানা না মানাতে কার কি এসে যায়। মহত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে রাশিয়ান সমাজের সংগঠন মার্ক্সিস্ট বিচারধারাকে অবলম্বন করে চলছে, এবং চলতে থাকবে।... কিন্তু হাঁ, আপন রাজনৈতিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নিজের কথার খেলাপ করছেন না?"

"আমি দুঃখিত", আমি বলি, "কিন্তু

সাহিত্যকে কি রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা সম্ভব?"

"হয়ত সম্ভব। যদি ইঞ্জিনিয়ারিংকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা যেতে পারে, সার্জারী থেকে দূরে রাখা যেতে পারে। সেক্স এবং রাজনীতিতে যদি সম্পর্ক না থাকতে পারে, তবে সাহিত্য থেকেও তাকে দূরে রাখা সম্ভব। আমার উপন্যাস ডাঃ জিভাগোতে বোধ হয় এ প্রশ্নেরই জবাব আপনি পাবেন।"

"এর আগেও আপনি উপন্যাস লিখেছেন?"

"না, গদ্যে আমার এইটিই প্রথম রচনা। আমি esoteric এবং impressionistic কবিরূপে বিখ্যাত। আমি কোনো গম্ভীর জিনিস লিখতে চেয়েছিলাম, গদ্যে। গত কয়েক বছর ধরে আমি একটি অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত। একে আপনি কলাত্মক সংকট (artistic crisis) বলতে পারেন। আমি কোনো দিন রাজনীতির দিকে পা বাড়াইনি। কিন্তু আমি কিছু দিন আগে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। আমার আত্মা ছটফট করতে লাগল। তারপর আত্মার এই পীড়াকে আমি বাইরে ঢালতে শুরু করি। এই মস্তিষ্ক বিরেচনে (catharisis of mind) আমি শান্তি পেলাম। এবং এই সবের পরিণামই হচ্ছে ডাঃ জিভাগো।"

বলতে বলতে পাস্তেরনাক কিছুটা যেন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এই কথাগুলির জন্য শব্দ খুঁজতে তিনি অনেক পরিশ্রম করলেন।

তিনি আমাকে বললেন যে, ১৯৫২ সনে স্তালিনের মৃত্যুর এক বছর আগে, তিনি উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন এবং '৫৬র শেষের দিকে লেখা শেষ হয়। তাড়াতাড়ি বইটি 'লেখক সঙ্ঘের' কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং এখন উপন্যাসটি প্রকাশিত হবে।

"আমি এই উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি, কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই, এটিও কি একটি যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস টলস্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পীসের' মত?"

"আমি এমন কোন তুলনা করতে পারি না কিন্তু এর ভেতরে রয়েছে, একটি মানুষের, একটি সাধারণ ডাক্তারের এবং তার পরিবারের গল্প। বিপ্লব এবং গৃহ-যুদ্ধে কেমন করে সে নিজের নৈতিক মানকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়, কেমন করে সে ব্যর্থ হয়, এবং শেষে তার হৃদয়বিদারক মৃত্যু হয়। সে ব্যক্তি মহান ছিল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে 'ইডিয়ট'ও বলতে পারেন। প্রত্যেক ব্যর্থ মহান ব্যক্তিমাত্রেই এই অবস্থায় ইডিয়ট হয়ে থাকে।"

"আপনার এই উপন্যাসটি কি আপনার জীবনচরিত-ভিত্তিক?"

"না। কিন্তু এটি আমার লেখক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোফেসার এবং মজদুর বন্ধুদের অনুভূতি এবং জীবনের উপর আশ্রিত।"

"উপন্যাসের পাত্রগুলি কি আপনার দৃষ্টিরই প্রতিনিধিত্ব করে?"

"এই প্রশ্নের উত্তর পাস্তেরনাক যা দিয়েছিলেন, তাঁর জবানীতেই (ইংরেজিতে) তা দিতে চাই। তিনি বললেনঃ

"There can not be oneness in art: works of art are very complex. They must not have a single aspect. A book has its own existence, characters in it say right things. Every thing they say cannot express the beliefs of the author."

"আপনার বইটি কি সোবিয়েৎ সমাজ-সংগঠনের নিন্দা করে?"

"কখনও নয়।"

"তা হলে উপন্যাসটি নিয়ে এত বাদ-বিতণ্ডা এবং প্রকাশনে বিলম্ব হল কেন?"

"এর একটি কারণ রয়েছে। রাশিয়ার অধিকারীবর্গ নিজের সমাজ-রচনা বা বিপ্লব সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা শুনতে অভ্যস্ত নয়। আমার বইটিতে এ বিষয়ে সত্যপূর্ণ আলোচনা ছিল। চাটুকারিতায় আমার বিশ্বাস নেই। ইংরাজীতে একে claptrap বলা হয়। আমার নায়ক ডাঃ জিভাগো বলেঃ—

'I don't like this claptrap in praise of revolution.... It is not the kind of thing I am good at.'

কিন্তু এখন রাশিয়ান অধিকারীবর্গের মত বদলাচ্ছে এবং কিছু পরিবর্তনের পরে বইটি শেষে প্রকাশিত হবে।"

"আপনার উপন্যাস সম্বন্ধে কি আপনি পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট?"

"হ্যাঁ, আমার খুব আনন্দ যে বইটি শেষ পর্যন্ত আমি লিখে ফেলেছি। আফসোস, শুধু এটুকু যে উপন্যাসটিতে গদ্য কম এবং পদ্য বেশী। কিন্তু কবিতাও তো আফিঙের নেশা, ধর্মের মত।" কথাগুলি বলে পাস্তেরনাক জোরে হেসে উঠলেন। রাশিয়ান লেখক এত জোরে হাসতেও পারেন, জানতাম না।

"আমার বইটি পড়ার পর মন্তব্য লিখে পাঠাবেন, আমার কিছু উপকার হবে।" পাস্তেরনাক বলেন।

"আমাকে লজ্জা দেবেন না......মন্তব্য করা তো দূরে থাক, আপনার বই যদি বুঝতে পারি, তাই যথেষ্ট হবে আমার পক্ষে।" আমি বলি।

"তা না, আমার যুবক বন্ধু, আমি—যুবকদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। রাশিয়ান যুবা-লেখকেরা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।"

আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি যে, এই কথাগুলি উনি ব্যঙ্গ করেই বলেছিলেন, না এর পিছনে কিছু সত্যও ছিল। বেদনা তো নিশ্চয়ই ছিল।

পাস্তেরনাক কিছু ভুল বলেননি। কারণ এই কিছু দিন পূর্বেই রাশিয়ার যুবক সঙ্ঘের প্রধানই পাস্তেরনাকের উপর বাক্য-বাণের প্রথম প্রহার করেছিলেন। তারা বোধ হয় পাস্তেরনাককে শেখাচ্ছিল কি করে লিখতে হয়।

পাস্তেরনাক সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা এ দেশে বিদ্যমান। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা অনুচিত হবে না।

আমার এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে আপনারা স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে পাস্তেরনাক ১৯৩০ সালে এই রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে ডাঃ জিভাগো লিখেই তিনি শ্রেষ্ঠ হয়ে যাননি। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে হয়ত উপন্যাসটি 'অহিতকর', কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিতে, চরিত্রের বিবিধতায়, কাব্যপূর্ণ ভাষা এবং প্রতীকাত্মকতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সতত প্রবহমান মানবতাবাদের দৃষ্টিতে, উপন্যাসটি এক মহান রচনা। হতে পারে, একে রাজনৈতিক মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিতে এই কীর্তি শুধু নোবেল পুরস্কারই কেন, বিশ্বের যে কোন সাহিত্যিক পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

উপন্যাসের কয়েকটি বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু বিরোধী মত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য, মানবতা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশের প্রতীক এবং পাস্তেরনাকের এই স্বাতন্ত্র্যের অধিকার রয়েছে।

যাঁরা এই উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক রোমাঞ্চ পূর্ণ উপন্যাস ভেবে পড়তে যাচ্ছেন, তাঁরা ভুল করছেন। সে রকম বইএর অভাব নেই। ডাঃ জিভাগো দার্শনিক আধারমূলক গ্রন্থ যা মার্ক্সবাদের আধারশিলার উপরেই আঘাত করে। এক জায়গায় জিভাগো বলছে—

'মার্ক্সবাদ তথ্যের উপর আশ্রিত নয়। আমি এমন প্রত্যেকটি বস্তুকে ঘৃণা করি যা সত্য-বিমুখ। ভালর দিকে মানুষ ভাল উপায়েই যেতে পারে, হিংসা দিয়ে নয়।'

উপন্যাসের শেষে পাস্তেরনাক নিজের আশাবাদিতার পরিচয় দেন। তিনি বলেন, 'মানুষের আত্মাকে কেউ ভেঙে দিতে পারে না, কম্যুনিজমও নয়।'

লোকে আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে, এমন একটি বইয়ের প্রকাশন রাশিয়ায় কিরূপে সম্ভব? রাশিয়ায় এক সময়ে (১৯৫৬-৫৭) সকলের মনে একটি 'কনফ্যুশন' ছিল। কেউ জানত না কে ঠিক এবং কে ঠিক নয়। এবং এই সময়েই এই উপন্যাসের প্রকাশনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যাপারটি এই দূরে গড়ায় যে, বিদেশে প্রকাশের অধিকার ইটালির এক কম্যুনিস্ট প্রকাশককে দিয়ে দেওয়া হয়, এবং পাণ্ডুলিপির এক কপি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে রাশিয়ার পার্টি লাইনে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তারপর এই বইটির উপর নতুনভাবে প্রহার শুরু হয়ে যায়। "লিতেরেতুর্নায়া গেজেট লেখে—"বর্তমানে যখন প্রতিক্রিয়াবাদীদের আক্রমণ আমাদের উপর বেড়েই চলছে, সে সময়ে এ বইটি তাদের সাহস বাড়াবে। এই বইটি একটি অহংবাদী মনোবিকৃতির পরিণাম।"

রাশিয়ান অধিকারীবর্গ ইটালিয়ান প্রকাশকের কাছ থেকে বইটি ফেরত পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করে। ইটালির পার্টি সেক্রেটারী তোগলিয়াত্তি তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃতও করে, কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয়। যাঁরা পাস্তেরনাক-স্থিত ঘটনাগুলির বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা নোবেল প্রাইজের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হননি। বইটি প্রকাশিত হওয়ার ছ মাস পূর্বে 'ন্যুয়ার্ক টাইমস' পাস্তেরনাককে পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেছিল। এই পুরস্কারকে পাস্তেরনাক স্বীকার করতে পারলেন না। পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তিনি লিখেছিলেন—"আমি এই পুরস্কার স্বীকার করতে পারি না, কারণ যে-সমাজে আমি বাস করি, তাতে এই স্বীকৃতির অন্য অর্থ ধরে নেওয়া হবে। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।"

পাস্তেরনাক নিজের দেশ ছাড়বেন না। তিনি সেই প্রকৃতির নন, যারা এ অবস্থায় দেশ থেকে পালিয়ে যায়। এবং আমার বিশ্বাস তিনি নিজের মতের জন্য যে কোনো ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত। তাঁর চোখের জ্যোতিই এ কথার সাক্ষী।

এই লেখাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা সচ্ছ পোল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি অ্যান্টোনিয়ো

স্বার্নিমিস্কির (৮০ বছর) লেখা। কম্যুনিস্ট লেখকদের ভিতরে পোল্যাণ্ডের স্বার্নিমিস্কিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাস্তেরনাকের প্রশংসা করেছেন। স্বার্নিমিস্কির সঙ্গে ১৯৫৫ সালে ওয়ার্সতে আমার দেখা হয়। আমার সঙ্গে হিন্দীর এক নতুন কবি শ্রীকুঁওয়র নারায়ণও ছিলেন।

শ্রীস্বার্নিমিস্কি পাস্তেরনাক সম্বন্ধে একটি লম্বা চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি নিতান্তই ব্যক্তিগত বলে প্রকাশ করতে পারলাম না। কিন্তু একটি কথা চিঠিতে বলা হয়েছে তা হচ্ছেঃ 'অকম্যুনিস্ট এবং গণতন্ত্রবাদী দেশের বিশেষত ভারতীয় লেখকদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা যেন রাশিয়ান সরকারকে অনুরোধ করে যে পাস্তেরনাকের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার না করা হয়। পাস্তেরনাককে আমেরিকানদের দয়ার উপর কিছুতেই ছাড়া যেতে পারে না।"

শ্রীমহাবীর চাচনি কর্তৃক মূল হিন্দী হইতে অনূদিত।

গম্ভীর হয়ে গেল রাজা নরক। প্রদোষের স্বল্পালোকে তার চোখে ফুটে উঠল একটা সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দিয়ে সে দেখে নিল প্রিয়তমা মহিষী বেদনার আপাদমস্তক।

বিধাতার সৃষ্টিরাজ্যে মহাঘোর নিরয়-লোকের অধীশ্বর নরক। সে পাপীর এক দণ্ডধর—দুরন্ত, নির্মম। তার নামেই অন্ধকার-ঘন অধোলোকের নাম 'নরক'। নরক অতি ভীষণ, পাপীর ভোগস্থান।

যেমন ভীষণ রাজ্য তেমনি ভয়ংকর তার রাজা। অঞ্জন পর্বতের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, জটিল পিঙ্গল কেশজটা। তদুপরি রত্নময় মুকুট—যেন সূর্যরশ্মি প্রতিঘাতী মন্দরশৃঙ্গ। বহ্নিবর্ণিত ললাটতলে তীক্ষ্ণ জ্বালাবহুল নয়ন। প্রলয় মেঘাবিম্বিত উত্তাল সাগরে বাড়বানলশ ভয়াল ক্রোধ-সংরক্ত কটাক্ষ। সে কটাক্ষ পাপাত্মার মর্মভেদ করে। নরকের কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কুণ্ডলের দোলায় নেত্রত্রাস ঔদ্ধত্য। অতি বিভীষণ সে মূর্তি।

তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মহিষী 'বেদনা'। আজ তার অদ্ভুত প্রার্থনা 'আমি নরক দেখতে চাই, আমাকে নরকে নিয়ে চল।'

নরকের মুখ আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে, দৃষ্টি হয় তীক্ষ্ণতর। সুগম্ভীর কণ্ঠে সে বলে, 'তা হয় না, নরক দেখার অধিকার সকলের নেই।'

'কেন নেই?' ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে বেদনা।

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে নরক, 'কর্ম-ফলেই স্বর্গ বা নরক দর্শন হয়। যাঁরা পুণ্যবান, প্রেমিক—সত্যবাক্, ধর্মশীল—তাঁরা যেমন সুখের পর সুখ, স্বর্গের পর অনন্ত স্বর্গ ভোগ করে—তেমনি যারা পাপী মিথ্যাচারী—তারা ভোগ করে ক্লেশ, নরক। নরক দর্শনের অধিকারও পাপীর। তুমি তো জীবনে কোন পাপ করনি!'

প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় বেদনা। অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে বলে, 'নারকীর কাতর ক্রন্দন আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি সহ্য করতে পারি না। উঃ, কি করুণ সে আর্তনাদ! আমাকে নিয়ে চল, আমি ওদের দেখি।'

নরকের স্বভাব-গম্ভীর বদনমণ্ডল আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে যেন অন্ধকার মেঘ-লোকে অসহ্য সন্ধ্যার ঘোর। রক্তচক্ষু কুটিল শকুনের মত সুতীব্র সন্ধানী দৃষ্টি তীব্রতর করে সে আবার মহিষীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে।—নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক আনন—নির্মল, নিষ্কলুষ নয়ন! আকৃতি কি অন্তরের দর্পণ নয়!

দীর্ঘ দিন ধরে দেখে আসছে নরক, 'করুণায়-কোমলতায়, যত্ন-সেবায় অতুলনীয়া বেদনা। প্রশ্নের অতীত তার শান্তি হৃদ। সপ্তর্ষি লোকের অনসূয়া অরুন্ধতীর মতই অনিন্দিতা সে—অনিন্দনীয় তার চরিত্র-গৌরব। স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে আছে সেই প্রথম দিনের স্মরণীয় ইতি-হাস, যেদিন ভীমকান্ত নরকের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল বেদনা। যেমন উদ্যত গ্রাস মেঘ-মুখে স্থির দাঁড়ায় নীল তারা, বিপুল কৃষ্ণকায় নরকের সম্মুখে তেমনি দাঁড়িয়েছিল সে। পরিপূর্ণ শ্যামাঙ্গী—যৌবনে উচ্ছল: নিখুঁত নীলকান্ত মণির মত নীলদ্যুতি, শতকুঞ্চিত ঘন নীল কেশ-কলাপ, নীলোৎপলের মত সুস্নিগ্ধ নয়ন, মমতা-মাতানো আবেশ-বিহ্বল ঈক্ষণ—যেন চারুসর্বাঙ্গী অনঙ্গলতা। এমন করে কোন নারী তার সম্মুখে দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে সাহস পায় না। নারীর বিভীষিকা নরক। নারীকে দেখে সুগম্ভীর মেঘমন্দ্রে প্রশ্ন করেছিল নরক, বীণানিন্দিত মধুক্ষরা কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল বেদনা—যেন কড়ি ও কোমলে উদাত্ত ও অনুদাত্তে সাধা সংলাপ:

'কে?'

'অপহৃতা আমি পতিংবরা।'

'আমায় অভিশাপ দিতে এসেছ, নারী?'

'তোমায় পতিরূপে বরণ করতে এসেছি আমি!'

'আমাকে? জানো আমি কে!'

'নিরয়লোকের অধীশ্বর, সম্রাট নরক।'

'আমি ভয়াল অত্যাচার—নির্মম নিষ্ঠুর।'

'তুমি শাস্তা, দণ্ডধর—নবজীবনের প্রেরণা।'

হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল রাজা নরক। এত সংবাদ কি করে জানল, ওই নীল-তারার মত ছোট্ট একটি নারী। কেনই বা পতিরূপে প্রার্থনা করছে তাকে? বিশ্বের চোখে মহাভয়াল নরক, নারী-জীবনের দুর্দৈব। কি একটা আক্রোশ অনির্বাণ অনলের মত তার বুকে জ্বলে। সেই প্রজ্বলিত ক্রোধানলের আহুতি গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধরপুরের সহস্র রমণী। অপহৃতা তারা, মলিনধ্বান্তা—তারা এক-বেণীধরা। তাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস অস্থির নরক। সহস্র মুখে তারা নরককে অভি-শাপ দেয়। এমন করে তো কেউ পতি-রূপে প্রার্থনা করে না তাকে। এ নারী কি জানে না, কি অভিশপ্ত তার জীবন। পরিত্যক্ত, মাতৃ-স্নেহ বঞ্চিত গোত্র পরিচয়-হীন সে—অতি কুৎসিত, অতি কঠোর। অসীম তার প্রতাপ কঠিন শাসন—কিন্তু অন্তরময় শূন্য হাহাকার যেন শূন্যগর্ভ অগ্নিগোলক!

কত কাল আগের কথা—সদ্যপ্রসূত অনাথ এক শিশু। নির্জন শ্মশানপ্রান্তে প্রাণ-রক্ষার তাগিদে প্রাণপণে চীৎকার করছিল সে, ক্রন্দন করছিল শুষ্ক একটা মৃত নর-কপালের ওপর মস্তক স্থাপন করে। হয়-কারণেই হয়—জননী পরিত্যাগ করেছে তাকে। হয়তো সে কানীন, হয়তো সে মাতার অবৈধ কামনার বিষফল। হয়তো

মৃত্যুই ছিল তার ললাট-লিখন। কিন্তু মৃত্যু ঘটেনি তার। অমর বিষবীজ, অমর বিষবৃক্ষ। বিশ্বতোচক্ষু বিধাতা পুরুষের দৃষ্টি পড়েছিল তার ওপর। করুণা ভরে তাকে রক্ষা করেছিলেন কমলযোনি।

আশ্রয় পেয়েছিল মাতৃত্যক্ত অনাথ শিশু। বিধাতার অভিপ্রায়ে বর্ধিত হয়েছিল স্রষ্টার অমোঘ শাস্তি—'নৈঋতো নরকো নাম ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ'। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি নিষ্ঠুর প্রকৃতি—যেমন উত্তপ্ত হাহাকারময় জীবন, তেমনি ক্রন্দন-সিসৃক্ষু শাসন। কঠিন কণ্ঠে তাকে সুকঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, জন্মের পর নরকপালে মস্তক স্থাপন করে ভূমিতে শায়িত ছিলে তুমি—তোমার নাম হল 'নরক'। তুমি ভীষণ হলেও আমার বিরাট সৃষ্টিতে তোমারও প্রয়োজন আছে। সৃষ্টি রাজ্যে যারা শৃংখলার ব্যভিচারী—যারা প্রবঞ্চক, নরঘাতী অত্যাচারী—যারা কামান্ধ, মদোদ্ধত—সেই সকল অধর্ম-বন্ধুর শাস্তি-দাতা হবে তুমি। ত্রিলোকীর দক্ষিণ ভাগে ভূ-নিম্নস্থ নিরয়লোক—আজ থেকে তুমি তার অধীশ্বর হলে। তোমার নামেই সে-রাজ্য নরক নামে অভিহিত হবে। যোজন-যোজন বিস্তৃত লক্ষ লক্ষ ভয়ংকর নরক—পাপীর শাস্তিস্থান তার ভেতর কোটি কোটি বহ্নিকুণ্ড—পাপাত্মার বিভীষিকা। এই ভীষণ নরক ও নরক কুণ্ডের রাজপদে তুমি অভিষিক্ত হলে।

শিউরে উঠেছিল বিভীষণ নরক। সে ভীষণ, কিন্তু তারো চেয়ে ভীষণ নরক; সে কঠিন, কিন্তু আরো কঠিন নরকলোক। রুদ্র শাসনে ক্রন্দনমুখর প্রজা—রৌদ্র, করুণ, বীভৎস রসের সাগরে নিমজ্জিত হয়েও পার পায় না। এমনি ভয়ংকর শাস্তি। শুষ্ক স্বরে প্রতিবাদ করেছিল সে বিভীষণ নাদে উত্তর দিয়েছিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, 'এ কর্মভার তোমারই উপযুক্ত। তুমি ভয়ংকর, করাল তোমার শাসন—তুমি নির্দয়, নির্মম তোমার পীড়ন। নরকের পতি হবে নরক—এইই কল্পের বিধান।'

তারপর একটু নীরব থেকে বলেছিলেন বিধাতাপুরুষ, 'সৃষ্টির সুর বিচিত্র, বিস্ময়কর! যাদের কান আছে, তারাই সুরের ঐকতান উপভোগ করতে পারে। অন্ধকারের বুকে ঘুমায় আলো, রুদ্রের বুকে সুখে ঘুমায় পরম শিব। কঠিন শাসন কেবল দণ্ডবিধান করে না আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। অংগারের মলিনত্ব সহজে ঘোচে না, কিন্তু সুকঠিন অগ্নিতাপে তাকে দগ্ধ কর—অংগার হীরক হয়ে উঠবে। নরকের শাসন হবে মলধৌত ধর্মজীবনের প্রবর্তক। হে নির্মম, হে অমিত্র-কর্ষণ নরক, তোমার হৃদয়হীন দণ্ডের তাড়নায় পাপীর ভোগ ক্ষয় হবে—নরকাগ্নিতে অগ্নিশুদ্ধ হয়ে নারকী হবে অভ্যুদয়-সূচক নবজীবনের অধিকারী।'

নির্বাক নরক। বিধাতাপুরুষের নির্দেশ নত মস্তকেই তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। তার হাহাকারময় করাল জীবনের একটি ক্ষত থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত হয় তপ্ত রক্ত, সেই রক্তই উত্তেজিত করে তোলে তাকে—পাগল করে তোলে তাকে। তার জীবনের সেই ক্ষত একটি অনুত্তর প্রশ্ন, কে সে? কেন সে পরিত্যক্ত? মাতার মমতা নির্মম হল কিসের অভিশাপে?

নরক পতনের পূর্বে সে শুধু সেই প্রশ্নটিই করেছিল সর্বজ্ঞ বিধাতাকে 'আমার নীরস জীবনে একমাত্র রসের নির্ঝর অপনার স্নেহ, অপরিশোধ্য আপনার ঋণ। চিরকাল কি অজ্ঞাত থাকবে আমার পরিচয়? কোনদিন কি জানব না আমি, কে আমার মাতা, কে আমার পিতা?'

প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর করেছিলেন অস্খলিত সত্যের বাঙ্মূর্তি ব্রহ্মা, 'সত্যকে প্রকাশ করতে হয় না, বৎস। সত্য স্বয়ং প্রকাশ। সময়ান্তরে এ সত্য আপনিই উদ্ঘাটিত হবে।'

আর কোন কথা বলেনি নরক। রহস্য-ঘন জিজ্ঞাসা অন্তরে রুদ্ধ রেখে সে গ্রহণ করেছিল বিধি নির্দিষ্ট কর্তব্যভার। ঊর্ধ্বে পুণ্যবানের স্বর্গ নিম্নে পাপীর নরক। এই নরকেরই অধীশ্বর হয়েছিল সে। স্বর্গ তার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বর্গের অধিবাসী তার শত্রু। স্বর্গের মহাভয় নরক—প্রাণান্তকর ব্যাধির চেয়েও ভয়ংকর, মৃত্যুর চেয়েও করাল, যমদূতের চেয়েও দুরন্ত। মাতৃস্নেহের বঞ্চনা আরো ভীষণ করে তুলেছিল তাকে। সমগ্র নারী জাতির প্রতি বিতৃষ্ণা! তার আক্রমণে সন্ত্রস্ত দেবকুল।
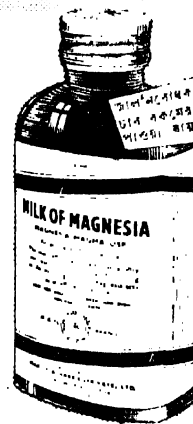
নারীকে সে করেছে নরকের দ্বার। সহস্র রমণীর দীর্ঘশ্বাস অস্থির নরক, অঙ্গনে উত্তেজিত নরক, এক বেণীধরা সীমন্তিনীর অভিশাপে উত্তপ্ত নরক। সে উত্তাল, উন্মাদ। উন্মত্ততায় কঠিন হয়ে ওঠে সুকঠিন পীড়ন, নিষ্পিষ্ট হয় কোটি কোটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ। বাইরের প্রতাপ অন্তরের ক্রন্দনকে যেন চাপা দিতে চায় কিন্তু পারে না। বাইরে দুর্দম, অন্তরে শূন্য—বাইরে ক্ষমাহীন দণ্ডপাণি, অন্তরে একান্ত অসহায়। নরক যেন অনন্ত হাহাকারে পূর্ণ একটা শূন্যগর্ভ উল্কা।

সেই নরককে—বিশ্বলোকের বিভীষিকা নারীকুলের মহাভয়, চির অভিশপ্ত সেই নরককে স্বেচ্ছায় বরণ করতে বসেছে এক নারী—যে নারী তারই কর-পীড়নে পীড়িতা, বঞ্চিতা ও লাঞ্ছিতা। সে কি নরককে চেনে না? কুৎসিত, মহাভয়াল নরকের পরিচয় কি অজ্ঞাত তার কাছে? সুন্দরকে সকলেই প্রার্থনা করে, কিন্তু যে অসুন্দর, যে অভিশপ্ত, যে মহাভয়ংকর—তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে কে!

ভ্রূভঙ্গে উত্তপ্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিল নরক, 'জানো, কোটি কোটি নারীর চোখের অশ্রু, আমি, মহা অভিশাপ।'

অশ্রুনয়ন বিস্ফার করে কোমলকণ্ঠে বলেছিল নীলনয়নী বেদনা, 'একটি নারীর নয়নের হাসি তুমি জীবনের আশীর্বাদ।'

'শোন নারী, বিরামহীন আমার জীবন ক্লান্তিহীন শাসন।'

'সেই ক্লান্তিহীন জীবনে আমি হব শান্তি।'

'তুমি কি জানো না, আমি গোত্র পরিচয়হীন, আজন্ম মাতৃ-পরিত্যক্ত, স্নেহ-বঞ্চিত?'

'জানি, জানি—' উচ্ছল হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে উত্তর দিয়েছিল মেঘবরণী, মমতাময়ী বেদনা, 'তাইতো জায়ার প্রেম দিয়ে পূর্ণ করতে চাই জননীর স্নেহ—শূন্য হৃদয়ের অভাব দূর করতে চাই মমতার মাধুর্যে।'

এর পর আর কোন কথা বলতে পারেনি রাজা নরক। প্রীতির যে শৃঙ্খলে বন্দী বিশ্বজগৎ, সেই শৃঙ্খলেই বন্দী হয়েছিল মদকলমত্ত নরকেশ্বর। বন্দী হয়ে বঞ্চিত হয়নি সে। মমতাময়ী বেদনা—করুণা ও শান্তির এক মূর্তি। বর্ষার বারিবর্ষণে যেমন সবুজ শ্যামলতায় পূর্ণ হয়ে উঠে দাবদগ্ধ, শুষ্কাতি ভৈরব গ্রীষ্ম—বেদনার স্নেহধারায় তেমনি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল নরক। নরকের জীবনে একেশ্বরী বেদনা, তার প্রিয়তমা মহিষী। ক্লান্ত জীবনে একখানি পরিপূর্ণ আরামের বিশ্রামাগার—ছায়া শীতল, প্রীতি-স্নিগ্ধ, শান্ত। স্বামীর সেবায় বেদনাও অক্লান্ত। একনিষ্ঠ পতি-ব্রতা, পতির ইচ্ছাই তার ইচ্ছা—পতির

আদেশ তার পরম আদেশ। পতির বাক্যের বিরোধিতা করে কোনদিন কোন কথা বলেনি বেদনা।

সেই পতিব্রতা আজ স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলছে সে নরক দর্শনে করবে। যতবার নিষেধ করছে নরক, ততবার জেদ করছে বেদনা; যেমন অটল নরক, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেদনা। ব্রতীর কঠিন পণ ভঙ্গ করতে চায় নরক, বলে, 'এ ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। অতি ভীষণ সে স্থান।'

'ভীষণ বলেই আমি তা দেখতে চাই।'

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি নরকের অধীশ্বর, নরকের প্রতীক। আমার এই রক্তমুকুটের চেয়েও জ্বালা করাস নরক, আমার এই কুণ্ডলের চেয়েও দাহ্যমান নরকলোক।'

'আমি সেই বহ্নিশিখাই স্পর্শ করতে চাই।'

'ভীষণদর্শন নরক-কিঙ্কর সেখানে লৌহশূর্মির আঘাতে নারকীদের শাস্তি দেয়।'

'নারকীয় বেদনায় আমি আকুল হয়ে উঠি। আমি ওই আর্তদের দেখতে চাই, বুক পেতে নিতে চাই শূর্মির আঘাত।'

বেদনায় কাঁপতে থাকে বেদনার কণ্ঠ। সসংশয় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে আবার বেদনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নরক। এবার তীব্র শ্লেষ ধ্বনিত হয় তার কণ্ঠে, 'নারকীর জন্য নরক-মহিষীর এ-অভূতপূর্ব বেদনা যেন এক নূতন বিস্ময়।'

'বেদনার সমবেদনায় বিস্ময় তো নেই কিছু—' কম্প্র কণ্ঠে বলে বেদনা। ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারে নরক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হারিয়ে যেতে চায় ধৈর্য। বজ্র স্বরে সে বলে, 'জানো, নরক-দর্শনের ইচ্ছা হওয়াও পাপ।'

'পাপ!'—করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে বেদনা।

'হ্যাঁ'—কঠিন কণ্ঠে বলে নরক। ত্বরিতে আবার মহিষীর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বলে সে, 'ভেবে দেখ, ভাল করে ভেবে দেখ। আমাকে এখনি যেতে হবে 'অসিপত্র' বনে। পৃথিবী থেকে নূতন একদল পাপীয়সী নারী এসেছে। পতিকে প্রবঞ্চনা করে মহাপাতকের ভাগী হয়েছে তারা। তাদের জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

শিউরে ওঠে বেদনা কাতরস্বরে বলে, 'আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমাকে ওদের দেখতে দাও।'

আরক্ত নয়নে তাকায় নরক। ক্রুদ্ধ গর্জনে কক্ষ পরিত্যাগ করতে করতে সে বলে, 'যদি প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই নরক-মহিষীর জন্য মুক্ত করতে হবে নরকের দ্বার। প্রতীক্ষা কর, আমি পাপীয়সীদের একটা ব্যবস্থা করে আসি।'

মত্ত পদক্ষেপ করে কক্ষ ত্যাগ করল নরক। তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে উঠেছিল, কক্ষে জ্বলে উঠেছিল উজ্জ্বল আলো। বেদনার মনে হল, উজ্জ্বল আলোর বুক থেকে একটা কৃষ্ণ বহ্নিশিখা যেন বেরিয়ে গেল সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে। ভয়ে, দুঃখে গুমরে কেঁদে উঠল বেদনা। স্বামী তার এত নিষ্ঠুর!

ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকে বেদনা। অস্থির চরণে কক্ষময় পদচারণা করে সে। দারুণ অস্বস্তি। প্রতীক্ষার মত এমন অস্বস্তিকর বুঝি আর কিছু নেই। রাজ্যের দুশ্চিন্তা ভর করে মস্তিষ্কে, রাজ্যের অশান্তি আন্দোলিত করে হৃদয়। সময় কাটে না, এক মুহূর্ত যেন এক যুগ।

সহসা থমকে দাঁড়ায় বেদনা। ঢং ঢং ঢং... দূরে যেন বাজে নরকের ঘণ্টা। রহস্যঘন দূরাগত ধ্বনি। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। বেদনা দেখেনি, কিন্তু শুনেছে, অসংখ্যবার শুনেছে—অতি ভয়ঙ্কর নরকলোক। ত্রিলোকীর দক্ষিণ প্রান্তে কালাগ্নির দুপুরের ঊর্ধ্বে ভূগর্ভস্থ নিরয়লোক। কোটি কোটি যোজন তার বিস্তার। নরকের সংখ্যাও অসংখ্য : চৌরাশি লক্ষ নরক—তার মধ্যে আবার প্রধান একবিংশতি নরক। অতি ভীতিজনক তাদের নাম : রৌরব, মহারৌরব, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্র, অপ্রতিষ্ঠ, ঘটিযন্ত্র, সন্দংশ, তপ্ত-শূর্মি, সংশোষণ, কৃমিভোজন, পূজশোণিত ভোজন, শ্বান ভোজন, বজ্রকণ্টক শাল্মলী, করম্ভসিকতা, বৈতরণী, অবীচি, সূচিমুখ ও অয়ঃপান। নাম স্মরণ করে ভয়ে শিউরে ওঠে বেদনা। কেবল নরক নয়,—একবিংশতি নরকে প্রতিষ্ঠিত ষড়শীতি নরককুণ্ড। এদের মধ্যে অতি ভয়াবহ দ্বাদশ কুণ্ড : বহ্নিকুণ্ড, উল্কামুখ, ক্ষারকর্দম, শূকরকুণ্ড, রসাকুণ্ড, লালাভক্ষ, সর্পকুণ্ড, দংশকুণ্ড, বজ্রদংষ্ট্রা, অশ্রুকুণ্ড, মসীকুণ্ড, প্রাণরোধ। পাপাত্মার অনন্তভোগী গতি এই নরক, এই নরক-কুণ্ড। রক্তলোচন, চর্মপিঙ্গল জ্বালজটা কোটি কোটি নরকভৃত্য এদের রক্ষক। নির্দয় তাদের শাসন, মর্মান্তিক পীড়ন! কি হৃদয়-বিদারক পাপাত্মার আর্তনাদ!

নিশ্চল পাষাণের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে বেদনা। সেই ক্রন্দন, সেই বুকভাঙা হাহাকার উঠছে যেন নরকের অন্ধকার বিদীর্ণ করে। 'মহারৌরব' নরক থেকে উঠছে কি এ ক্রন্দন? বেদনা জানে, যারা হিংসক, নরঘাতী—যারা

ক্ষমাহীন, নররক্তে সিক্ত করে ধরাতল—হিংসায় যারা উন্মাদ তাদেরই ভোগস্থান ভয়ঙ্কর মহারৌরব। দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এই মহানরক—তাম্রময়ী এর ভূমি। নিম্নে প্রচণ্ড হুতাশন, ঊর্ধ্বে প্রলয়সূর্যের দাহন। অনল-তাপে উত্তপ্ত তাম্রে পদক্ষেপ করামাত্র দেহ দগ্ধ হতে থাকে, ওপর থেকে অগ্নিবর্ষণ করে মার্তণ্ড। একে দাবদাহে দগ্ধ দেহ, তদুপরি বজ্রদংষ্ট্রা দংশশূকের আক্রমণ—একযোগে আক্রমণ করে কোটি দংশশূক। দহনে ও দংশনে জর্জর পাপী 'হা মাতঃ, হা পিতঃ' ক্রন্দনে আকুল করে তোলে নরকের বাতাস। উল্লাসে পৈশাচিক হাসি হাসে নরক-কিঙ্কর। ভীমদর্শন তারা, মমতাহীন—তাদের হাতে দণ্ড, অঙ্কুশ। অঙ্কুশের তাড়নায় তারা উন্মাদ করে তোলে পাপীকে। কাতর ক্রন্দন, সকাতর অনুনয়, 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্তরব। কেউ কর্ণপাত করে না। ভূমিমধ্যে স্থাপন করে নরকদাস তাদের নিক্ষেপ করে 'রুরুকুণ্ডে'। মহাসর্পের চেয়েও হিংস্র, ক্রূর, ভয়ঙ্কর রুরু। মহারুরু আরো ভয়ঙ্কর। তাদের নামেই নরকের নাম—'রৌরব' 'মহারৌরব'। কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্র এই হিংস্র রুরুর দল পাপীকে আক্রমণ করে। হিংসার শাস্তি হয় হিংসায়। [illegible] সে [illegible] পরিণাম!

কল্পনাতেও সে দৃশ্য সহ্য করতে পারে না বেদনা। কোমল অন্তরে যেন তীব্রতপ্ত শলাকার আক্রমণ, কমনীয় দেহে যেন তপ্ত অঙ্গারের অসহ্য দহন। নিজেই যেন মহারৌরবে পতিত হয়েছে সে। আতঙ্কে দুই হাতে সে নয়ন আবৃত করে। আবৃত নয়নে অনুভূত হয় যেন 'মহাতামিস্র' নরকের দৃশ্য।

ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন 'মহাতামিস্র' নরক। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। সে অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নিজের দেহটি পর্যন্ত নয়। সেই নিদারুণ অন্ধকারে হিমখণ্ডপ্রবাহী অতি শীতল বায়ুপ্রবাহ। অতি প্রচণ্ড তার বেগ। সেই বায়ুর আঘাতে মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় পাপীর অস্থি, মজ্জা। এ জগতে যারা মদান্ধ, দস্যু, ধর্মসেতু অপহরণকারী—তারাই এ নরকে প্রবেশ করে। একে মহাতামিস্রায় অন্ধ দৃষ্টি, তার ওপর হিমশীতল বায়ুর কঠিন প্রহার। চূর্ণ দেহের গলিত রক্তে হিমস্তূপ রক্ততুষারে পরিণত হয়। শুষ্ক, তৃষিত, অন্ধ পাপী স্মৃতিহারা উন্মাদের মত সেই রক্ততুষার ভক্ষণে উদ্যত হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে আসে বজ্রদণ্ডধারী নরক-রক্ষক। বজ্রদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হানে পাতকীর মস্তকে। আঘাতে আর্তনাদ করে ওঠে পরস্বাপহারী মদান্ধ। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে তারা—অন্ধকারে দিশাহারা ভ্রান্তবুদ্ধি, নষ্টস্মৃতি পাপী—অথৈ 'অশ্রুকুণ্ডে' নিমজ্জিত হয়।

আর যেন ভাবতে পারে না বেদনা। তারো চোখে উত্তাল হয় অশ্রুনদী। সভয়ে চোখ খোলে সে। নরকে নয়, নিজের প্রকোষ্ঠেই সে দাঁড়িয়ে আছে, কক্ষে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে দীপালোক। বাতায়নপথে দেখা যায় সেই অন্ধকার। কক্ষের আলো যেন আরো ভয়াবহ করে তুলেছে বাইরের অন্ধকারকে। অন্ধকার অন্ধকারই থাক। অন্ধকারই নেমে এসেছে তার জীবনে। কি প্রয়োজন প্রদীপের? উচ্চকণ্ঠে সে দাসীকে ডাকে, নিজের চীৎকারে নিজেই শিউরে ওঠে। দাসী কক্ষে প্রবেশ করে। ফিস্ ফিস্ করে সভয়ে বলে বেদনা, 'প্রদীপ নিভিয়ে দে।' দাসী ঠিক বুঝতে পারে না। দীপ নিভে না, স্তিমিত হয়। ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে যায় দাসী। আনমনে বেদনা এসে দাঁড়ায় গবাক্ষপথে। বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার-দর্পণে কি স্বামীর প্রতিবিম্ব পড়েছে? অন্ধকারে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ কাদের ওই প্রেতদেহ? একি হল বেদনার! কেউ কি সত্যই স্মৃতি হরণ করল তার? মনে হল, সে যেন 'অবীচিমৎ' নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নিস্তরঙ্গ নীরের ন্যায় মহাশূন্যে নিরালম্ব অবীচি নরক। নরক-কিঙ্কর সুউচ্চ পর্বত থেকে পাপীকে অধঃশিরায় এই নরকে নিক্ষেপ করে। তরঙ্গহীন, নিরালম্ব কঠিন 'অবীচি'—পতনভয়ে আতঙ্কে ক্রন্দন করে ওঠে জীব। প্রচণ্ড ঘূর্ণনে ঘূর্ণিত মস্তক, ঘূর্ণিত নেত্রতারকা। অনন্তশূন্যে মূর্ছিত পাপমতি!

দুই করে নিজের মস্তক তাড়না করতে থাকে বেদনা। স্মৃতিকে সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সে দেখতে চায়, এ নরকের শেষ কোথায়? ব্যাকুলভাবে সে স্বামীর প্রতীক্ষা করে। গভীর রজনীতেও নিদ্রাহীন তার নয়ন।

অতিক্রান্ত রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। এদিকে নিস্তব্ধ জগৎ। খুব কান পেতে শুনলে শোনা যায়, কিসের যেন বোঁ বোঁ শব্দ। সেই শব্দ ভেদ করে মাঝে মাঝে যেন ভেসে আসে অজ্ঞাত নরকের ক্রন্দন। সত্যিই কি এ নারকীর ক্রন্দন? না তারই হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন কোন প্রেতের আর্ত চীৎকার? বুক দুরু-দুরু করে বেদনার। সর্বাঙ্গে এক সভয় কম্পন! অন্তঃকর্ণে সে শুনতে পায়, নরক-কিঙ্করের ভৈরব গর্জন, পাপীর 'হা হতোস্মি' আর্তনাদ! বৈতরণী কি উত্তাল হয়েছে তার হৃদয়ে, নারকী কি নীড় বেঁধেছে তারই অন্তরে? অস্থির হয়ে ওঠে বেদনা।

সহসা স্তিমিতপ্রদীপ কক্ষে প্রবেশ করে

নরক। কি ভীষণ মূর্তি! পর্বতপ্রমাণ দেহে সরোষ কম্পন, ক্রোধে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে সংরক্ত নয়ন, ললাটে সহস্র কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ, কণ্ঠে সংক্রুদ্ধ গর্জন—যেন মূর্তিমান কৃতান্ত, অথবা তারও চেয়ে ভয়ঙ্কর। ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে বেদনা, 'এ কি মূর্তি তোমার! কার সর্বনাশ করে এলে তুমি?'

বিকট অট্টহাস্য করে নিশীথের মেঘমন্দ্রে বলে নরক, 'কূট সত্যভাষীদের ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করে এলাম। মিথ্যাচারী 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'—তাদের জন্য রয়েছে মহাঘোর 'অসিপত্রবন' নরক। জাজ্জ্বল্যমান অনলে পরিব্যাপ্ত সহস্র যোজন পরিমিত অভীর অরণ্য। দ্বাদশ সূর্যের তেজে অতি উত্তপ্ত সে স্থান। তারই মাঝে সন্নিবিষ্ট খড়্গফলকময় অসিপত্র বৃক্ষ। আপাতরমণীয় ছায়াতরু—দেখে মনে হয় বড় শীতল, বড় স্নিগ্ধ। ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! অসিপত্র অসির মতই ক্ষুরধার—উভয়ত তীক্ষ্ণ। তাপদগ্ধ তৃষ্ণার্ত জীব বড় আশায় সেই বনে প্রবেশ করে, আশার নেশায় ছুটে যায় অসিপত্র বৃক্ষের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবাহিত হয় অসিপত্রপাতী প্রলয়বাত্যা, শ্রাবণের ধারার ন্যায় পাপাত্মার ওপর পতিত হয় তীক্ষ্ণ-ধার অসিপত্র। মুহূর্তে উৎপলনালের ন্যায় খণ্ডবিখণ্ড দেহ, মুহূর্তে বিপর্যয়। আকুল ক্রন্দন করে ওঠে মিথ্যাচারী, বাক্-অপহারী —মিথ্যার কুহকে মিথ্যাবাদিতার নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে তারা। এইখানেই সাজার শেষ নয়। দণ্ডতাড়িত হয়ে তারা চালিত হয় 'শ্বানভোজন' নরকের দিকে। দেখতে দেখতে প্রমত্ত গতিতে ছুটে আসে ব্যাঘ্রের মত মহামুখ সারমেয়—নয়নে উল্কাদৃষ্টি, দশনে দংশন-বুভুক্ষা—লহমায় আক্রমণ করে কূট-সত্যভাষীদের। তারপর—

'আর বল না, আর বল না'—কাতর ক্রন্দন করে ওঠে বেদনা। তারই দিকে যেন ছুটে আসছে শ্বানভোজন নরকের সারমেয়, তাকেই যেন আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তারা। সভয়ে পালাতে চেষ্টা করে বেদনা। ভীম বাহু বিস্তার করে বাধা দেয় নরক। তেমনি উৎকট অট্টহাস্যে কক্ষ প্রকম্পিত করে বলে, 'তাদের মধ্যে আবার রয়েছে ছলনাময়ী পুংশ্চলী। পাপীয়সী কামিনী—তারা পতিরূপে সম্ভোগ করেছে সগোত্র সহোদরকে—

আহত, রক্তাক্ত বিহঙ্গীর মত নরকের কবলে ছটফট করে বেদনা। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে নরক, 'আরে পাপীয়সী! তাদের জন্য রয়েছে যে 'বজ্র-কণ্টক শাল্মলী'। ব্যভিচারী পুরুষ, আর ব্যভিচারী নারীর জন্য নির্দিষ্ট এই নরক। বজ্রতুল্য কণ্টকময় শাল্মলী, তপ্ত লৌহতুল্য তার কণ্টকশলাকা। নরককিংকরের অঙ্কুশ তাড়নায় জর্জর হয়ে কামাচারী লম্পট সেই শাল্মলীবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে—

গভীর যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে বেদনা। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিষ্ঠুর হাস্যে হৃদয় কম্পিত করে বলে নরক, তপ্ত-কণ্টকে বিদ্ধ রক্তাক্ত কামুক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, লৌহদণ্ডের আঘাতে তাড়না করতে করতে নরকভৃত্য তাদের নিক্ষেপ করে উত্তপ্ত 'শুক্রকুণ্ডে'—

ভয়াল দন্তপংক্তি বিকাশ করে ভয়াবহ হাসি হেসে ওঠে নরক। স্বামীর এ মূর্তি কোনদিন দেখেনি বেদনা। দুই হস্তে মস্তক পীড়ন করে গভীর আর্তনাদ করে ওঠে সে, অশ্রু-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'এ জগতে পাপ নেই কার? পাপী নয় কে? তার জন্যে এ নিষ্ঠুর পাশবিক শাস্তির ব্যবস্থা কোন্ নির্মম বিধাতার?'

বিধাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে থমকে দাঁড়ায় নরক। বজ্রমুষ্টি শিথিল করে বেদনাকে ছেড়ে দেয়। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে পলকে দেখে নেয় বেদনার পাংশু বদন। সবই নিমেষের ঘটনা। সহসা যেন বজ্র বিদীর্ণ হয় কক্ষে, নরক ডাকে, 'বেদনা!'

স্বামীর কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব এ স্বর। সভয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় বেদনা। রুদ্রস্বরে বলে নরক, 'এখনও নরক দেখতে চাও তুমি?'

মস্তক আনত করে মৌন থাকে বেদনা। গম্ভীরকণ্ঠে বলে চলে নরক, 'মনে রেখো, অনন্ত যন্ত্রণাপ্রদ নরক। পাপরূপ পাথেয় নিয়ে পাপাত্মা নিরয়লোকে প্রবেশ করে, ভোগ করে ক্লেশের পর ক্লেশ। নরকদাসের বজ্রদন্ত কাউকে রেহাই দেয় না।

'জানি, যন্ত্রণাময় নরক—ভীষণ, বীভৎস তার চিত্র। কিন্তু যে যন্ত্রণা ভোগ করছি আমি, তা নরকের চেয়েও ভয়ংকর'—অশ্রু-সজল বেদনার নয়ন, যেন নীলসাগরের সজল ঢেউ; আবেগকম্পিত স্বরে সে বলে, 'যখন জেগে থাকি, নরকের ক্রন্দনধ্বনি আমাকে আকুল করে তোলে। কোথা থেকে ভেসে আসে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' আর্ত রব—আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমারই হৃদয়ে অনুভব করি দংশশূকের দংশন, তপ্তকুণ্ডের জ্বালা।'

নরকের রক্তনেত্রে প্রখর হয়ে ওঠে উগ্র, ভয়াল দৃষ্টি। একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বলে চলে বেদনা, 'দিনে সূর্যবিম্বকে আমি রশ্মি-বিহীন দেখি, শুভ্র বস্ত্রখণ্ড আমার চোখে দেখায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মনে হয়, ছায়ার অসংখ্য কায়া ঘুরেছে আমার চারপাশে।'

নরকের বদনমণ্ডলে গাঢ় মেঘের ওপর গাঢ় মেঘ জমে। ক্রমে আরো যেন ভীষণ আকার ধারণ করে তার ঘোর কৃষ্ণ আনন। স্বপ্নালোকে সে এক রহস্যঘন ভয়াল মূর্তি। উদ্‌ভ্রান্তের মত গর্জন করে সে বলে, 'আরো কিছু?'

'আরো অনেক কিছু'—অশ্রুরুদ্ধ ভীত কণ্ঠে বলে বেদনা, 'ঘুমিয়েও শান্তি নেই আমার। অর্ধ তন্দ্রা, অর্ধ জাগরণ। সেই অবস্থায় স্বপন দেখি, রক্তকৃষ্ণ বস্ত্রধারী বিকটাকার দেহ—হাতে পাশ, বজ্রদণ্ড—আমাকে পাশবদ্ধ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে! সামনে তরঙ্গায়িত দুস্তর 'বৈতরণী'—জলস্রোতে পূয, শোণিত, মাংস, বসা—কি বীভৎস! ঘৃণায় সংকুচিত হই আমি, পালিয়ে আসতে চাই—পারি না। বজ্রদণ্ডধারী পুরুষ বজ্রদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করে মস্তকে—যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠি আমি। তন্দ্রা ভেঙে যায়। দেখি, পাশে শুয়ে আছ তুমি। তবু ভয়ে সারা হই!

সভয়ে কাঁপতে থাকে বেদনা, যেমন অসি-পত্রোপরি বায়ুর প্রহারে কাঁপে পাপাত্মা। অগ্নিকটাক্ষ নিক্ষেপ করে সিংহনাদে গর্জন করে ওঠে নরক, 'তাহলে সত্যিই নরক-দর্শনের সময় হয়েছে তোমার। শোন বেদনা, নরকের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করছি তোমার কাছে। বেদগর্ভ বিধাতার অস্খলিত সত্যের বাক্যই বেদের মত উচ্চারিত হয় জ্ঞানী, পণ্ডিতগণের কণ্ঠে। তাঁরা বলেন, 'জীবকে প্রত্যেকটি কর্মের ফলভোগ করতে হয়। 'প্রাক্তনং বলবৎকর্ম'—এ উক্তি মিথ্যা নয়, কল্পনাও নয়। অনাদি অবিদ্যার ফল দুষ্কর্ম—এই কর্মই মানুষকে তার স্বভাবের বিপরীত পথে চালনা করে, তাকে প্ররোচিত করে দোষাবহ লোকনিন্দক পাপে। এরই পরিণাম প্রকৃতি বিপর্যয়, মৃত্যু, সহস্র সহস্র নরকগতি।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে শুনে যায় বেদনা, বজ্র-মন্দ্রে বলতে থাকে নরক, 'মৃত্যুর পর স্থূল দেহ ধ্বংস হয়ে যায়, কর্মানুসারে পার-লৌকিক ভোগের জন্য থাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ। তার অনুভূতি এই দেহেরই মত—একই সংজ্ঞা, একই বোধ, একই সংবেদন। যমদূত নিষ্ঠুর পীড়নে তাড়না করতে করতে এই দেহকে নিয়ে আসে 'যম' লোকে। সেখানে হয় কঠিন বিচার। সেই চুলচেরা বিচারে যারা পাপী সাব্যস্ত হয়—'অবরোহিণী গতি' প্রভাবে তারা নিমেষে উপস্থিত হয় নরকে। শুরু হয় নরকভোগ। এ ভোগ যে কী ভয়ঙ্কর, জীবিত মানুষ তা কল্পনা করতে পারে না। কালসূত্রে দেহ খণ্ডিত হয়, অসিপত্রে শতধা ছিন্ন হয়, বহ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হয়, শোষকুণ্ডে শুষ্ক হতে থাকে। সে লিঙ্গ-দেহ তবু বিনষ্ট হয় না। ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করেও তাকে অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী কর্মফলের জন্য। জীবের পারলৌকিক নরকভোগ হয় মৃত্যুর পরে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ইহ-জীবনেই রয়েছে আর এক ভয়ঙ্কর নরক—নাম তার 'ভৌম নরক'।'

বহুদিনের বুভুক্ষু যেমন লোলুপ, উগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি, তেমনি দৃষ্টিতে নরকের দিকে তাকায় বেদনা, গ্রাস করে তার কথা। নরক বলে চলে, 'হ্যাঁ, ভৌম নরক। জীবরূপে সত্তার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার নামই 'ভৌম নরক'। আলোর জীব—শুক্রশোণিতের পিণ্ড-রূপে বর্ধিত হয় মাতৃগর্ভে, দশমাস দশদিন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে 'প্রাজাপত্য বায়ুর' আকর্ষণে মায়ার সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়—কর্ম-বশে ভ্রমণ করে 'ভবচক্র', চৌরাশি লক্ষ যোনি। কখনো হয় স্থাবর—তমোময় অন্তঃ-সংজ্ঞ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম; কখনো লাভ করে তির্যক গতি—কৃমি হয়ে, কীট হয়ে আশ্রয় করে নারকীয় যোনি। এও নরকভোগ—এ ভৌম নরকের সংখ্যা চৌরাশি লক্ষ। ভৌম নরকের মধ্যে প্রধান নর-জীবন। সূক্ষ্ম বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর তেমনি ভ্রূণস্থ সূক্ষ্ম বীজে এ দেহের উৎপত্তি। কি আকর্ষণ এই দেহের! কি অদ্ভুত তার মমত্ববোধ! প্রিয় বস্তু, প্রিয় পত্নী, প্রিয় পুত্র—এই প্রিয়জনের জন্য অন্যায় কর্মে অর্থসঞ্চয়; কামোপ-ভোগের জন্য পরকে বঞ্চনা, শোষণ; আত্ম-স্বার্থের জন্য জঘন্য পৈশুন, নরহত্যা! সুখ-সুখ করে উন্মাদ জীবকুল। কিন্তু সুখী কি হয় মানুষ?

বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে বেদনা। সেই নেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে গম্ভীর নাদে বলে নরক, 'সুখী হয় না। বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী সুখ, প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অচিরস্থায়ী যৌবন। সর্বোপরি বন্ধন-রজ্জু হস্তে ধারণ করে অপেক্ষা করে দুর্জয় কাল, সুখপ্রমত্ত মানুষ সে কাল-বৃককে দেখে না—যেমন মাংসলুব্ধ মৎস্য দেখে না লৌহ শঙ্কু। আপাতরমণীয় সুখে বিভোর হয় মানুষ। বড় মধুর পঞ্চেন্দ্রিয়, ষড়রিপুর আকর্ষণ—বড় সুন্দর কামনা-কাঙ্ক্ষা, ইন্দ্র-ভোগ! তারই বিষময় পরিণাম নরক। এ নরক পরলোকের নরক নয়, ইহলোকের নরক। চিরকাল ধরে পণ্ডিতেরা বলে আসছেন, ইহলোকেই রয়েছে স্বর্গ, ইহ-লোকেই রয়েছে নরক। মানুষের মন সেই স্বর্গ, সেই নরক। কর্মের ভোগ এই স্থূল দেহেই শুরু হয় পরলোকের নারকীয় যন্ত্রণার সূচনা হয় ইহজীবনে। মানুষের মনই দুষ্কর্মের ফলে দুশ্চিন্তার নরক

১২

'তোমার জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখে এলাম, কাকিমা।' যতদূর সম্ভব চোখে ও গলায় ফুটন্ত উৎসাহ নিয়ে বললে সুকান্ত।

যেমন পড়ছে, বিজয়া তেমনি পড়তে লাগল ম্যাগাজিন।

'বেশ বড়-বড় দুখানা ঘর, সামনে বারান্দা—'

গ্রাহ্যও করছে না। চোখ ডুবিয়ে পড়ছে তন্ময় হয়ে। কী একটা উৎকট উৎকণ্ঠার মুহূর্তে এসেছে না জানি।

'দক্ষিণ খোলা—' টেবিলের উপরে এটা-ওটা নাড়তে লাগল সুকান্ত। 'নিতে হলে এখুনি গিয়ে ধরতে হয়।'

এত তাড়া কিসের, এখানেই ঘর ছাড়ব কেন, [illegible] প্রশ্নটা করবে এ আশা সুকান্ত আশা করেনি। কিন্তু ফ্ল্যাটটা কোথায়, কোন পাড়ায়, একবারও না [illegible], প্রশ্নের মধ্যে [illegible] প্রথম ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত, তা অন্তত তো জিগগেস করবে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই বিজয়ার। চোখ [illegible] ডুবিয়েছে যে মুখ খুলতে পারছে না।

অথচ কথা বলাতে না পারলে [illegible] করে সে কথায় আসে কী করে। [illegible] কথা বলতে-বলতেই তো বিয়ের কথা বলা সহজ।

'বড় রাস্তার উপরেই ফ্ল্যাটটা—হাঁ, দোতলায়, আর ভাড়া—' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সুকান্ত।

পত্রিকার থেকে চোখ না তুলেই বিজয়া বললে, 'আমরা আর ফ্ল্যাট ভাড়া নেব না ঠিক করেছি।'

'নেবে না?' চক্ষে অন্ধকার দেখল সুকান্ত।

'না।'

'কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধে ছিল।' প্রায় যেন মিনতির সুর বেরুল সুকান্তর : 'ভাড়াও বেশ সস্তা বলতে হবে।'

'হোক গে।' মুখ তুলল বিজয়া, চোখ ফেরাল। গম্ভীরস্বরে বললে, 'ভাড়া-টাড়া আর নেব না, গোটা বাড়ি কিনব।'

'বাড়ি কিনবে? খুব ভালো, খুব ভালো।' লাফিয়ে উঠল সুকান্ত। 'আমি আজই দালাল ধরি। ক হাজারের মধ্যে? কম পক্ষে ক'খানা ঘর চাই? উপরে-নিচে ছ'খানা তো বটেই, দুটো অন্তত বাথরুম। আর সামনে একটু জমি, একটু ফুলটুল লতাপাতা—কী বলো?'

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।' বিজয়া পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাল : 'দালাল অলরেডি লাগানো হয়েছে।'

'হয়েছে? তবে এত দেরি করছে কেন? একটা ডিল হতে সাত দিন, বড়জোর দু সপ্তাহ—'

'পছন্দসই বাড়ি চাই তো—'

'তা তো একশোবার। কিন্তু যাই বলো, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব।' সাঁতরে যেন প্রায় পার ধরল সুকান্ত : 'বাড়ির বড় দুই ছেলে—দাদা থাকবে মা'র কাছে, আমি তোমার কাছে। আমি ছাড়া, আমরা ছাড়া, কে দেখবে তোমাকে? অত বড় ফাঁকা বাড়িতে দুপুর-সন্ধ্যে একা তোমার কাটবে কী করে?'

একটা সন্দেহের দৃষ্টিও ফেলল না বিজয়া। [illegible] বিছানায় হেলান দিয়ে খাটের উপর আধশোয়া [illegible] করে খাড়া করে তুলল। বললে, 'আমার বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজনের স্থান হবে না।'

'হবে না?' সুকান্তর বুকে যেন কে ছুরি [illegible], [illegible] তোতলাতে-তোতলাতে বললে, 'যদি বাড়তি ঘর থাকে—'

'তাহলেও না।' [illegible] নেই বিজয়ার। বললে, 'তাই দালালকে বলে দিয়েছি তেমন বাড়ি না পেলে খোলামেলা জমি দেখতে।'

'জমি?' কে না জানি আরো কত দূরের পাল্লা। চারদিক ধাঁধা দেখল সুকান্ত।

'হাঁ, কেন বাড়িতে অতিরিক্ত কটা ঘর কেন না থাকবে! আর বাড়তি ঘর দেখলেই

কাঁথাকম্বল নিয়ে ঢুকে পড়বে আত্মীয়ের দল। আর, দেখছি তো, একবার ঢুকলে কারু বেরুবার নাম নেই। আজকাল লাঠিই ভাঙে, ধনঞ্জয় নড়ে না। তাই ভাবছি,' পাশ ফিরল বিজয়া : 'গোড়াতেই পথ বন্ধ করে দেব।'

'কী করে?' যদি এখনো মরীচিকা দেখা যায় সংকান্ত প্রার্থনার চোখে তাকাল মরুভূমির দিকে।

'জমি যাই পাই, বাড়িটা ছোট করে তুলব। ঠিক দুজনের আন্দাজ। কোথাও এক ফালি ফালতু রাখব না। যাতে এক বেলার জন্যেও অতিথি না মাথা পাততে পারে!'

কী বিপদের মধ্যেই ফেলল কাকলি! বিয়ে করে ফেলেছি, ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে, এ বলা কত সোজা। এই দেখ আমার বউ, কাকলিকে সঙ্গে নিয়ে সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াও কিছু দুরূহ ছিল না। কিন্তু, ওগো, আমি বিয়ে করব, আমার বিয়ের জোগাড় করে দাও নাপিত-পুরুত ডাকো, গ্যাস-ব্যান্ড বায়না করো, আমাকে কনের বাড়িতে নিয়ে চলো মিছিল করে, কই আমার টোপর কই, এ একটা আস্ত-সুস্থ পুরুষ হয়ে কেউ বলতে পারে? ভূ-ভারতে বলেছে কেউ কোনোদিন? বর তুলেছে?

কী জেদী মেয়ে! যত জেদ তত যদি থাকত যুক্তি।

কাকলি বলে, তার দিকে যুক্তি আছে বলেই তো তার জেদ। কেন কিছু অপরাধ করছি যে লুকিয়ে-চুরিয়ে করব? গোপন রাখব? গায়ে চোর-চোর গন্ধ মেখে বেড়াব? সমুদ্রের পারে বসে ঘটি করে জল তুলে মাথায় ঢালব? সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে ভিজিয়ে স্নান করতে পারব না?

কিন্তু কত নিশ্চিন্ত হওয়া যেত যদি সংকান্তর পরামর্শটা শোনা হত। রেজেস্ট্রি করে বিয়েটা হয়ে থাকত, শুধু বর্তমান থাকা-খাওয়ার অসুবিধের জন্য ফুলশয্যাটি থাকত কিছুকাল পিছিয়ে। এ একটা এমন অসাধ্য কী! কত অদর্শনই লোকে সহ্য করে এ তো শুধু একটু অস্পর্শন। আগুনে পোয়াতে বসে আগুনে হাত না দেওয়া। আর কটা দিনেরই-বা এ কৃচ্ছ্র। দেখতে-দেখতে শীত যেতে-না-যেতেই, একটা চাকরি জোটাতে পারবে না? পারবে না ঘরে-দোরে প্রশস্ত হতে?

যদি না পারো? যদি চাকরি জুটলেও বলো, এটা অভাব ঠেঙাবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নয়? অর্থাৎ যদি ঝোপ বুঝলেও কোপ না মারো? পাশ কাটাও? প্রতীক্ষার দিন খালি লম্বা করো? আমি শুকিয়ে মরব? এ কাকলির কথা। যাতে কেউই পালাতে না পারি তারই জন্যে যখন বাঁধা পড়ছি, তখন যাতে বাঁধা না পড়তে পারি তার জন্যে পালিয়ে বেড়ানো কেন?

'আর শোনো অনেস্ট সাধু হওয়া ভালো।' চোখমুখ গম্ভীর করল কাকলি।

'সাধুরা কি বিয়ে করে?'

'সাধুরাই তো বিয়ে করে। এবং সেটা প্রকাশ করে। বলতে চাচ্ছি সত্যের আশ্রয়ে থাকাই শান্তি। বিয়ে যখন করছি পুরো-পুরোই করছি। নাও সব ভাবিনী ভাবের দেহী হতে পারব না। সিনান করব অথচ কেশ ভিজবে না, নীর ছোঁব না, এ অসম্ভব।'

'তার মানে ঔষধার্থে সুরা পানের মধ্যে তুমি নেই।'

হেসে উঠল দুজনে।

কিন্তু যাই বলো ছলনাটুকু থাকলে মন্দ হত না। যাই বলো, মন্দের একটু গন্ধ না থাকলে কোনো ভালোই বুঝি আলো দেয় না।

হয়তো কোনো মেলায় বা সভায়, ভিড়-ভাড়ে কোথাও তাদের দেখা হয়েছে। পরস্পর এমন মুখ করে থাকবে যে চক্ষের ঘুণাক্ষরেও কেউ কাউকে চেনে না। দেখতে কুমারী শুনতে মাধুরী, কত যুবক, গাঢ় ও প্রৌঢ়, সপ্রতিভ হয়ে ঘুরবে আশে পাশে, ঝিলিক দেবে। আর প্রতিধ্বনিতে কত রকম ঢেউ তুলবে কাকলি। কোথাও মৃদু কোথাও প্রগলভ। কোথাও বা কঠিন কোথাও বা ধূর্ত। কোথাও কুন্দলতা, কোথাও বা লজ্জাবতী। কিন্তু এক কলার ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু নিচ্ছ কুড়িয়ে, আর আমি যে দূরে, আমি যে ঘুমিয়ে, আমারই সে ষোলকলা, আমারই সে পূর্ণিমার পরমা প্রতিমা। কী গৌরব সে ভাবনায়! কী অপূর্ব সে স্বাদ-গন্ধ। অন্যের হতে-হতে-না-হয়ে সে আমার। আকাশে অনেক কিছুই ওঠে-ফোটে, কিন্তু আকাশ জানে সে শুধু সূর্যের। কারা সব তপস্যা ভাঙাবার উদ্দেশ্যে ঘুরঘুর করছে, ঐ ক্ষামমধ্যা অপর্ণার আমিই সেই মহাদেব।

দিব্যি না পড়ত কাকলি, অন্তত দু-তিন বছরের গড়িমসি, আর মক্কেল-মক্কেল চেহারায় সুকান্ত ঘুরতে পারত আশেপাশে। হঠাৎ সমস্ত ভিড়ের থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে একটু নিরালায়, রাস্তায় বা দোকানে, তার বুকের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াত কাকলি, দ্রুত তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন আছ?'

সুকান্ত বলত, 'ভালো। তুমি?'

হেসে উত্তর দিত কাকলি, 'তোমার মত।' তারপর দ্রুত পায়ে চলে যেত আঁচল উড়িয়ে।

এমন আশ্চর্য সম্ভাষণ কেউ আর কোথাও শুনেছে? যারা সমস্ত বাক্য ও ব্যবহারের আবরণ নিমেষে দূর করে দিতে পারে তাদের এ কী করুণ কার্পণ্য! যার উপর যে কোনো মুহূর্তে খাসদখল জারি করতে পারে তাকে অবলীলায় চলে যেতে দিচ্ছে সুকান্ত, পিছন থেকে একবার ডাকছে না পর্যন্ত। ও খানিকদূরে গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকায় কিনা তা দেখতেও একবিন্দু প্রতীক্ষা করছে না।

সেবার কী হল জান না বুঝি। স্বপ্ন দেখছে সুকান্ত। সেবার একটা টুরিস্ট পার্টির সংগে জুটে গিয়েছিল তারা। মুখ্যত ছাত্রছাত্রীর দল, বয়স্কেরাও কেউ আছেন অবধায়কের পর্যায়ে। ট্রেনের কামরা থেকে শুরু করে আস্তানায় খাওয়া-শোওয়ার জায়গা পর্যন্ত আলাদা। পুরুষেরা একদিকে, প্রমীলারা আরেকদিকে। শুধু বেড়াতে বেরুবার সময়, মাঠে পড়লেই, একাকার হতে পারত, দাগ-দড়ির বা দলাদলির বালাই থাকত না। তেমনি একবার মাঠে পড়ে সুকান্ত আর কাকলি হঠাৎ দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা পাহাড়ের টিলার আড়ালে বসেছিল ঘন হয়ে। কী ললাটের গ্রন্থি, ওষ্ঠাধরে একটু অসাবধান হতে চেয়েছিল। চরচক্ষু পাহাড়কেও ভেদ করে। পাথর বাতাস খেতে-খেতে আগুন লেগে গেল ক্যাম্পে, অবধায়কদের কানে উঠল। কী প্রতিকার এবং কিসে, কানের সংগে সংগে ভাবতে বসল মাথারা।

শান্তভাবে বাক্স থেকে দলিল বের করল সুকান্ত। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট। কাকলি বনে-ওড়া পক্ষীর কাকলি নয়, পাঁজর-ভাঙা বক্ষের কাকলি।

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

সেবার যা ঘটেছিল, তা আরো মারাত্মক। রাত্রে গংগায় জাহাজ দেখতে গিয়েছিল দুজনে। জাহাজ দেখে ফিরে স্ট্র্যাণ্ডে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। জল আর জাহাজ দেখলে, দেখে আবার স্থলে ফিরে এলে কার মন না উচাটন হয়! কিন্তু সংগে-সংগে সার্জন এসে ধরবে এ কে পেরেছিল কল্পনা করতে? কোনো কথাই শুনলে না একেবারে থানায় এনে উপস্থিত করলে। তখন, পকেটেই ছিল, ঘরের প্রত্যক্ষ আলোতে দলিলটা বার করে দিল সুকান্ত।

দেখে পুলিস বোকা বনে গেল।

একটা বাকতাল্লা মারছে এই এতক্ষণ ভেবেছিল পুলিস কিন্তু কুণ্ডলকবচ সংগেই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এ স্বপ্নের অতীত।

তখন ক্ষমা চাইতে পথ পায় না কর্তারা। নিজেদের গাড়িতে যার-যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে সসম্মানে।

এ সব স্বপ্ন একটুও দেখতে দিল না কাকলি। একেবারে গোড়াতেই সিঁদুরে-গয়নায় ন্যাতাজোবড়া হয়ে এসে দাঁড়াল। কুমারী-কুমারী থাকল না, থাকতে পেল না, একেবারে প্রথম থেকেই সধবা। অহল্যা মাটিতে দিল না একটু হাওয়া খেতে। মাথায় কোটেশন-চিহ্ন ও পায়ে ফ্যাটিনোট দেওয়া থাকলে কি পড়ে সুখ হয়? সিঁদুর আর আলতাতে কি আবিল হবে না সেই শুভ্রতা? যে নিদাগ অবাধ মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সে কি আর থাকবে? লালে-নীলে সর্বাংগে আণ্ডারলাইনড্ হলে সে কি অপাঠ্য হয়ে উঠবে না? সুকান্তকে কি কেউ কৌমারহর বলবে? না। বলবে, বিবাহিত ভদ্রলোক।

'ও সব বাহ্য। অন্য কথা বলো।' চপল চোখে হাসতে গিয়ে কাকলি নিষ্পলকে চেয়ে থাকে।

দুই চোখে শ্যামলসুন্দর স্নেহ, প্রশ্নহীন প্রার্থনা।

আমি কি শুধু নৈবেদ্যের থালা? এক

ভস্ম? বসনভূষণ? শুধু অন্নজলের পাত্র?

না, তুমি এক আনন্দের চিঠি। কোন এক অচেনা পোস্টাপিস থেকে তোমাকে কে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার ঠিকানা লিখে। নির্জনে বসে সেই চিঠিটি পড়ব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সেই যে তোমার প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম, খুলেছিলাম, পড়েছিলাম—তেমনি।

না, না, দাগে কি মানে কমে?

তবে এবার বৌদিকে ধরতে হয়। সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে যেমন অবতার তেমনি দেওরদের পরিত্রাণের জন্যে বৌদি।

ছন্নছাড়ার মত চেহারা করে উপরে উঠছে বন্দনা, সুকান্ত বললে, 'তোমার এত কষ্ট আর দেখতে পারি না।'

এত কষ্টেও হাসল বন্দনা। বললে, 'দেখতে তো পাচ্ছ না কিন্তু ব্যবস্থাটা কী করছ শুনতে পাই?'

'ভাবছি, তোমাকে একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দি।'

প্রস্তাবটা একবাক্যে ভূপাতিত করলে বন্দনা। বললে, 'রক্ষে করো। একা জ্বলছি, জ্বলছি, আরেকজনকে জ্বলতে দিতে পারব না।'

বাস, হয়ে গেল।

কাটা সুতো ধরবার জন্যে হাত বাড়াল সুকান্ত। বললে, 'কিন্তু জ্বালার প্রতিকারটা তো ভাববে।'

'জ্বালার প্রতিকার ঠাকুরাণী নয়, ঠাকুর, একটি বামুন ঠাকুর। যে বাঁচাবে দুবেলার এই আগুনের, উনুনের তাপ থেকে।'

'বা, ঠাকুর আমি আগামী মাস থেকেই রেখে দিচ্ছি।' কথায় অন্য মানে পুরল সুকান্তঃ 'কিন্তু মানুষের অন্য তাপও তো ছিল, যাকে বলে, সন্তাপ—'

'ছিল বৈ কি। তার জন্যে ঘরে ফ্যান দাও কিনতে না পারো ভাড়া করো।'

'বা, ফ্যানও দেব বৈকি। আজ-কালই যাচ্ছি আমি দোকানে খোঁজ নিচ্ছি।' কানের কাছটা চুলকোবার উদ্যোগ করল সুকান্তঃ 'কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গিনীর কথাটা—'

'রাখো।' ধমক দিয়ে উঠল বন্দনাঃ 'যে কুঁজো সে যেন কাত হয়েই শোয়। চিৎ হয়ে শোবার সাধ না করে। ঘর নেই বারান্দা নেই চাকরি নেই বাকরি নেই, তার আবার সঙ্গিনী। পিঁড়ি ধরে এনে তাকে আর সঙ বানিয়ো না।' হাতের কাছে মুখ ঘোরাল বন্দনাঃ 'সঙ্গিনী না সঙ পিঁড়ি!'

দু' হাত যুক্ত করল সুকান্ত। বললে, 'তোমাকে বন্দনা করি বৌদি, ক্ষমা দাও। ও নাম আর উত্থাপন করব না।'

কী অনর্থক ঝামেলার মধ্যেই না ফেলেছে কার্বলি। যদি সঙ্গিনী হতে না চেয়ে শুধু গৃহিণী হতে চাইত বড়জোর দুই বন্দনা, তা হলে বৌদির এই বক্তৃতা শুনতে হত না। মেয়েরা সকলেই এত কম বোঝে।

ও ভাবে হলে চলবে না। [illegible] করতে হবে।

সেন্টুর খবর নিল সুকান্ত।

'সেন্টু, একটা কাজ করবি?'

কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছিল সেন্টু, গম্ভীর মুখে বললে, 'কাজ-টাজ আমি করতে পারি না।'

শোনো কথা! [illegible] হলে সেন্টুও বিদ্রোহে যায়।

'শোন, কাজ করতে হবে না তোকে। শুধু একটা কথা বলবি।'

'আমার সময় কই?' তৎপর হয়ে উঠিবার সঙ্গে কাঠের টুকরো মেঝেতে ঠুকতে লাগল সেন্টু।

'শোন, তোকে সেই একটা পিস্তল দিয়ে-ছিলাম না—'

কাঠের টুকরোগুলো সেন্টুর হাত থেকে খসে পড়ল অনায়াসে। বললে, 'জানো, আমার আর ক্যাপ নেই।'

'আর পিস্তল নয়। পিস্তল পুরোনো হয়ে গেছে। তোকে এবার একটা মেশিনগান কিনে দেব।'

'সত্যি?' উঠে ছুটে এল সেন্টু। ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের উপর। চোখ বড় করে বললে, 'সেটা কী জিনিস কাকা?'

'বন্দুকের ঘোড়া টিপবি আর ঘটাঘট ঘটাঘট গুলীর আওয়াজ হতে থাকবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে গুলীর ঘরে-ঘরে জ্বলবে আগুনের চোখ—'

'কবে দেবে বলো?' সুকান্তর বুকের মধ্যে মুখ রাখল সেন্টু।

'তার আগে একটা কথা শুনবি বল?'

'শুনব।' ভারিক্কি চালে মাথা নাড়ল সেন্টু। 'কিন্তু কী কাজ বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, কাজ, ঠিক বলেছিস। ভারী লক্ষ্মী ছেলে তুই—'

'কি, পিঠ চুলকে দেব? দাঁড়াব পায়ের উপর?'

'না, ওসব নয়। কথা আর কাজ এক সঙ্গে।' চোখের উপর চোখ রেখে গলা নামাল সুকান্ত, 'তোর ঠাকমার গলা জড়িয়ে ধরবি আর কানে কানে বলবি, জানো, সেই যে একটা মেয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ি, যাকে সবাই সাবানের হিরোইন ভেবেছিল, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। কী, পারবি বলতে?'

'বিয়ে হলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়, তাই না কাকা? তবে আমার বিয়ে কবে হবে?' কান্নার সুর বের করল সেন্টু।

''আগে আমারটা হোক। তারপর তোর।'' দু হাতের মধ্যে সেন্টুর দু গাল চেপে ধরল সুকান্ত। 'বলতো কী বলবি ঠাকমাকে।'

আবৃত্তি করিয়ে করিয়ে মুখস্থ করে নিল।

মৃণালিনীর অত সোহাগ করবার সময় নেই। কোল থেকে জোর করে নামিয়ে দিল সেন্টুকে। সেন্টুর হাতে আজ মেশিন গান, সহজে সে নিরস্ত হবার পাত্র নয়। তড়বড় তড়বড় করে ছুটল সংবাদের ঝড়। হ্যাঁ, সাবানের হিরোইন, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে। কাকার সঙ্গে সাবানের হিরোইনের।

মৃণালিনী ধমকে দিয়ে উঠল।

ধমকে কি মেশিনগান থামে?

'আমি কী জানি। কাকাই তো বললে বলতে।' ভারিক্কি চাল বাড়াল সেন্টুঃ 'ওর কাকার পরেই আমার বিয়ে। আমার বউ সাবান নয়, একেবারে মেশিনগান। দেখো, সব কার কেমন আগুনের চোখ জ্বলে, আগুনের জিভ নড়ে—'

'দেখতো খোকা কী সব বলছে—'

'বারে, আমি বলব কেন কাকা বলছে।'

সুতোর পর সুতোর জট খুলে রহস্য-উদ্ভেদ করল বন্দনা। সঙ্গিনী মানে যে এই সঙ্গিন অবস্থা তা কে বুঝেছে।

'সেই যে কার্বলি বলে একটি মেয়ে এসে-ছিল, হাইকোর্ট না ছাইকোর্টের জজের মেয়ে, সে ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে বসতে চাচ্ছে। ঠাকুরপোও নিমরাজি। জাত-গোত্রের বাধা নেই। এখন আমাদের মত হলেই নৌকোতে বাদাম দেয়।'

চোখেমুখে ঝলমল করে উঠল মৃণালিনী। বললে, 'বেশ হয়। দেখতে-শুনতে বেশ মেয়ে। তারপরে এম-এ পাশ। চারটিখানি কথা নয়। যেখানে মেয়েরা একখানা খবরের কাগজ উলটে দেখে না, সেখানে এত রাজ্যের পড়া—'

এ কটাক্ষ বন্দনাকে। কিন্তু কার্বলির কৃতিত্বকে কে অস্বীকার করবে? বন্দনা তাই চুপ করে রইল।

'তারপরে কত বড় বাপ। কত দেওয়া-থোওয়া করবে না জানি।' মৃণালিনী স্বপ্নের রামধনু দেখল।

মানেটা সেণ্টু বুঝতে পেরেছে আন্দাজে। বললে, 'হ্যাঁ, বিয়ে করলেই অনেক পাওয়া যায় জিনিস। আমার জন্মদিন হয় গিয়েছে এখন আছে শুধু বিয়ের দিন। কাকা বলেছে তার আর বেশি দেরি নেই। কাকারটা চুকে গেলেই আমারটা।'

বৈঠকখানার নিরিবিলিতে ভূপেনবাবুর কাছে কথাটা ভাঙল মৃণালিনী।

লেখার থেকে চোখ তোলবারও প্রয়োজন মনে করল না ভূপেন। বললে, 'বাবুর বেটা গাড়োয়ান, ও বিয়ে করবে কী!'

'কিন্তু সম্বন্ধটা তো ভালো।'

'এই সম্বন্ধ ভালো করতে গিয়েই ঘোরা-ঘুরিতে ফার্স্ট ক্লাশটা পেল না।'

'তিন নম্বরের জন্য মিস করেছে।'

'যারা পায় না দু-এক নম্বরের জন্যেই মিস করে।'

'কিন্তু রিসার্চ স্কলারশিপ তো পেয়েছে।'

'চাল নেই তার ভাতে ভাত। সামান্য দুটো টাকা আয়। তাও কত দিন?'

'কেন ও কি অক্ষম।' ঝামটা দিল মৃণালিনী: 'ও কি পাকাপোক্ত একটা চাকরির জোগাড় করতে পারবে না?'

'সেইটি বন্দোবস্তের কাজ সম্বন্ধের দিকে গেলেই তো বুদ্ধিমানের কাজ হত।'

[illegible] বউ [illegible] করে বসেছে। [illegible] এনে ঘরে পুরেছে। [illegible] কত ভালো, কত সৎ। [illegible] করেনি, চাকরি করছে। [illegible] রেখে গেছে। আর কত বড় বাপের মেয়ে। তুমি আর বুদ্ধির লড়াই করো না। তুমি হলে কেমন বউ আনতে, কেমন বউ এনেছ—' ভূপেনের দিকে [illegible] ছুঁড়তেই তক্ষুনি সংবরণ করল মৃণালিনী। বললে, 'এ সম্বন্ধ খুব ভালো। এ সম্বন্ধই হবে।'

'বেশ তো হবে।' এতক্ষণে চোখ তুলল ভূপেন। 'কিন্তু সম্বন্ধের প্রস্তাবটা আগে আসুক। মেয়েপক্ষ থেকে প্রস্তাবটা আগে আসবে তো। সামাজিক ব্যাপার। প্রথমত মেয়ের বাপ তো একটা চিঠি লিখবে অন্তত—'

'তা তো লিখবেই।'

'নয়তো বাড়িতে এসে মৌখিক বললে। একটা সরকারী প্রস্তাব তো চাই।'

'তা চাই বৈকি।'

এ আবার আরেক ঝামেলা। আরেক কাঁটা।

এ লগ্নে বিয়ে বুঝি আর হল না। ক্ষণ গেলে ক্ষণ আসে, কিন্তু লগ্ন গেলে আর ফেরে কই। (ক্রমশঃ)

শার্ঙ্গদেব

দিলীপকুমার রায় মহাশয় আমাদের সংগীতজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন বহুদিন। তথাপি গান তাঁর জীবনের সঙ্গে সংগ্রথিত। আজ এই তেষট্টি বছর বয়সেও সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর অফুরন্ত; কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগীতের ক্ষেত্রে বা প্রকাশ্য সংগীতালোচনায় তিনি আর যোগ দিতে ইচ্ছুক নন কেননা তিনি গান করেন ভগবানের কাছে তাঁর ভক্তি নিবেদন করতে; আর কোন কাম্য বা উদ্দেশ্য তাঁর নেই। তবু এই পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির সংগীতচিন্তা আমাদের অনেকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। অতএব কলকাতায় এলে তাঁকে খানিকটা সংগীতালোচনায় যোগ দিতেই হয় —ছোটখাট ঘরোয়া কথাবার্তায় অন্তত। এতে তাঁর অবশ্য বিরক্তির লেশ মাত্র নেই—কত নতুন ইঙ্গিত, কত অভিজ্ঞতার কথা, কত নতুন রচনা দিয়ে তিনি আলোচনাকে সরস করে তোলেন।

সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুজন মার্কিন শিষ্য এবং শিষ্যা ইন্দিরা দেবী। আলোচনা প্রধানত অধ্যাত্মবিষয়ে হলেও যখনই সংগীতের কথা উঠেছে তখনই উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা অনেক বললেন—তার অনেক কিছুই সদ্যপ্রকাশিত স্মৃতিচারণ-এ রয়েছে—পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

কিছুকাল পূর্বে পত্রান্তরে লিখেছিলুম দিলীপকুমার বাংলা টপ্পার অনুরাগী নন তাঁর একটি মাত্র মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে। দেখা হতেই জানালেন প্রবল আপত্তি—"তুমি কেমন করে লিখলে আমি টপ্পার বিরোধী? রামবাবুর কাছে আমি দু-বছর টপ্পা শিখেছিলুম তা জানো?" সেই সবে দু-ঘণ্টা ভজন সেরে উঠেছেন কিন্তু ক্লান্তিকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন না। তখুনি হার্মোনিয়ম টেনে নিয়ে গাইলেন—"ননদিনী বোলো নগরে", "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে"। তারপর "নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি"—গাইলেন সুরেন মজুমদারের ঢঙে। দেখিয়ে দিলেন কিরকম ঝোঁক দিয়ে টপ্পার দানাদার তান দিতেন সুরেন মজুমদার। সহাস্যে বললেন—"সব টপ্পা গাওয়া যায় না। অনেক টপ্পাই খুব ভাল স্থানের গান নয়।" আমাদের এক বন্ধু একটি লোকসংগীত
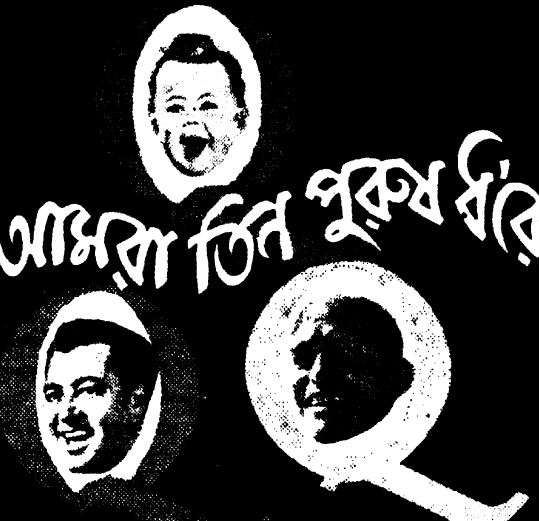
শোনালেন। সেই সূত্র ধরে বললেন—"লোক-সংগীত আমার খুব ভাল লাগে। প্রাচীন দেববর্মণের গান শুনতে বেশ ভাল লাগত।" দিলীপকুমার ভজন ভালবাসেন বলে অনেকে তাঁকে ভজনই শোনাতে চান; কিন্তু সংগীত বিষয় তিনি খুবই উদার—কোন গোঁড়ামি তাঁর নেই একথাও বললেন বারবার।

কলকাতায় তিনি আমাকে বিশেষভাবে আহ্বান করেছিলেন ইংরেজি গানে তাঁর দেওয়া দিশি সুর শোনবার জন্য। সম্প্রতি দুজন মার্কিন শিষ্যকে তিনি এই সুরগুলি শেখাচ্ছেন। এর একটা আশ্চর্য চমৎকারিত্ব আছে। মুসৌরীতে তিনি ন্যাশনাল অ্যাড-মিনিস্ট্রেসন একাডেমিতে একটি বক্তৃতাও করেন এ বিষয়ে। তার সারমর্ম আমাকে মুসৌরী থেকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন। একটু উদ্ধৃত করি—

"আমি বল্লাম বিলেতে গিয়ে সংগীত শিখতে শিখতে কীভাবে আবিষ্কার করে-ছিলাম যে শুধু যে বিদেশী সুর, ভঙ্গি ও প্রাণশক্তির আমদানি করে আমাদের সংগীতকে সমৃদ্ধতর করা যায় তা নয় আমাদের দেশী সুর ও তাল বিদেশী (অর্থাৎ ইংরাজী) গানে বসানো চলে। প্রথমটার প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ করেছেন বটে; কিন্তু বিদেশী ভাষায় আমাদের সুর বসিয়ে গান করেন নি কেউ। আমি এই কাজটি করেছি প্রথম।"

•

আর একটি চিঠি—

"দিশি সুর বিলিতি গানে ও বিলিতি সুর দিশি গানে বসিয়ে আসছি আমি অনেকদিন থেকেই—আমাদের বাংলা সংগীতকোবিদগণ এসব গবেষণার কোন খবর না নেওয়া সত্ত্বেও। তাছাড়া তিনি চারশো গানের নতুন ধরণের সুর দিয়েছি। নানা তালফের শোনাবার ইচ্ছা জাগে রসজ্ঞদের (অমিয়দার মতন—তবে তাঁর সঙ্গে দেখা কালেভদ্রে হয়) কিন্তু হয়ে ওঠে না, বাংলা দেশে আমার গমন ও স্থিতি কম বলে।"

ঘরোয়া বৈঠকে এইসব গান শোনবার সুযোগ হ'ল। বাস্তবিক বিদেশী গানে আমাদের খাম্বাজ, দরবারি কানাড়া এমন কি কীর্তনের ঢঙ পর্যন্ত কেমন সহজে মিশে গেছে। আবার আমাদের গানে বিদেশী সুরের অনেক নমুনাও দেখালেন সাগ্রহে। প্রতিভার এই অপূর্ব বিকাশ আমাদের দেশে তেমনভাবে সম্বর্ধিত হয়নি এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই সব সৃষ্টির মনোহারিত্ব উপলব্ধি করবার মত মন, পরিবেশ এবং সংগীত চিন্তা আমাদের দেশে একশোর মধ্যে একটিও পাওয়া দুর্লভ। অথচ দেখা যাচ্ছে হিন্দী, বাংলা ফিল্মে খোলা মার্কিনী গানের নকল অবিশ্রান্তভাবে হয়ে চলেছে এবং তার প্রচারও কম নয়। এ মনোবৃত্তিকে কী বলব? দিলীপকুমারকে বললাম এসব কথা। তিনি হাসতে লাগলেন—কোন মন্তব্য না করে। আসলে যাকে "স্টাডি" বলে তা না থাকলে নকল অনেকখানি বিকৃত হতে বাধ্য। অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে সব সময়ের লোককে ভোলান চলে না; কিন্তু যে সময়ের লোক ভোলে তাদের সংখ্যা আজও আমাদের দেশে কত অধিক!

"ভয়েস ট্রেনিং" সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। সকালে শিষ্যদের দেশী এবং বিদেশী পদ্ধতিতে গলা সাধবার বিভিন্ন প্রণালী শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে আবদুল করিম যে বিশিষ্ট রীতিতে গলা সাধতেন সেটিও দেখালেন। বললেন—"এই ভয়েস ট্রেনিং-এর যে গুরুত্ব কতখানি তা আমরা বুঝি না। এতে যে শুধু গলা ভাল হয় তাই নয় গলার জোর বাড়ে সেই সঙ্গে দমও বাড়ে"। দুঃখ করে জানালেন অনেককে বলেছেন এই ভয়েস ট্রেনিং নেবার জন্য দৈনিক অন্তত বিশ মিনিট তাও তিন সপ্তাহের বেশী নয়; কিন্তু তেমন আগ্রহ দেখেন নি কারুর। জার্মানিতে পাশ্চাত্য সংগীত শেখবার সময় এইসব নানা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে-ছিলেন তিনি। বললেন—"একটা সুরে কম্পনবিহীন স্থিতি আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য; ওরা এক সুরে দাঁড়াতে পারে না গলা কাঁপতে থাকবেই"। তাঁর একজন মার্কিন শিষ্যা আমাদের রীতিতে এক সুরে কণ্ঠস্থিতি কেমনভাবে আয়ত্ত করেছেন গেয়ে দেখালেন। আলোচনা প্রসঙ্গে মেলডি এবং হার্মানির প্রসঙ্গও উঠল। তিনি বললেন পাশ্চাত্য সংগীতে আমাদের মেলডি প্রয়োগ করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তিনি যেসব বিদেশী গানে দেশী সুর দিয়েছেন তা থেকেও এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হল। তার পর এই ব্যাপারে আর কেউ এগিয়ে যাবেন কিনা জানি না কিন্তু যেতে পারলে ভাল হত। সংগীতের যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন আছে নানা দেশের সংগীতে নানা দেশের প্রভাব না পড়লে সেটা বোঝা যাবে না। তবে, যাঁরা গোঁড়া রক্ষণশীল তাদের কাছ থেকে বাধা আসবে। অবশ্য রক্ষণশীলতা আর্টের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় একথা মানি কিন্তু মিশ্রণ না হলেও তো কোন আর্ট অগ্রসর হবার প্রেরণা পায় না। সবই থাকবে এবং থাকা সম্ভব যদি সমন্বয় থাকে।

সুরবিহার বা ইম্প্রভাইজেসন সম্বন্ধে তার মত জানতে চাইলুম। তিনি বললেন, আমাদের সংগীতে সুরবিহারের সুযোগ থাকা অবশ্য প্রয়োজন নইলে সে গান এক-ঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য। প্রশ্ন করলুম, "কিন্তু এতে স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হবার আশংকা থাকতে পারে।" তিনি উত্তরে বললেন, স্রষ্টার সুরের মূল কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে ঠিক। কিন্তু তার মধ্যেই শিল্পী সুরবিহারের সুযোগ খুঁজে নিতে পারেন। এটা তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা। খুব জোর দেন তিনি সুরবিহারের ওপর।

নানা বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। বিদ্যা-কাল প্যারিসে 'মনমাত' [?] নামে একটি ফিল্মের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত ছিল [illegible]। ছবিটি [illegible] এটা তিনি [illegible] [illegible]। অধিকাংশ আধুনিক শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও [illegible] দুটি [illegible] [illegible] গান শুনেছেন। [illegible] [illegible] এই [illegible] সুযোগও তার নেই। ইউরোপের নানা [illegible] তাঁর পরিচয় [illegible] করলেন। শ্রীমতী [illegible], শ্রীমতী [illegible]—[illegible] সবাই [illegible]। বিশেষ করে [illegible] উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। [illegible] গান তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

কলকাতায় এবার তিনি প্রকাশ্যে রঙমহল এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ছাড়া আর কোথাও গান করেন নি। কিন্তু একদিন রোড [illegible] মহাশয়ের [illegible] প্রাঙ্গণে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নানা বিচিত্র সংগীত পরি-বেশন করেছেন। ইংরেজী মীরার হিন্দী ভজন এবং তাঁর স্বরচিত গান ছাড়াও রাম-প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনী-কান্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সুরকারদের সংগীত [illegible] বহুক্ষণ ধরে তাঁর নিজের ঢঙে। এই সন্ধ্যাগুলি মধুময় স্মৃতি হয়ে রইল। সবশেষে এই কথা জানিয়ে গেলেন যে, তাঁর ভক্তরা যদি তাঁর আর সব সত্তাকে ছাড়িয়ে যায় তবেই তিনি ধন্য।

সুকমল শাসমল প্রায় চার পাঁচ বছর ধরে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বসবাস করে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিকের ছবি এঁকে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। ছবিগুলি তেল রং জল রং এবং প্যাস্টেলের রচনা। শ্রীশাসমল বর্তমানে গবর্নমেন্ট আর্ট কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ইনি সাধুদের আহ্বানে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পান। সাধুরা যখন বেদান্ত, ভগবদ্ গীতা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে কল্পনা করতেন এবং শিল্পী কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের দেখতেন এবং বোঝবার চেষ্টা করতেন। কতদূর ইনি এই সব সন্ন্যাসীদের বুঝেছেন বলা যায় না বটে, কিন্তু ইনি এঁদের উপস্থিতি যে বেশ অনুভব করেছেন, তার প্রমাণ এঁর এই পঞ্চাশটি রচনা। সাধু-সন্ন্যাসীদের দর্শন বা ধর্ম বা আদর্শ শিল্পী বোঝবার চেষ্টা করেননি। এঁদের সঙ্গে মিশে শিল্পীর মনে যেটুকু বাসনা জেগেছিল এর মধ্য দিয়ে এঁদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করবার, কেবল আর্ট সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়েই ইনি এসব রচনার সৃষ্টি করেছেন। [illegible] দিয়ে তাঁদের বিভিন্ন চরিত্রের রূপ প্রকাশ শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে [illegible] প্রকাশ করেছেন। এর আগে ছবির বিষয়বস্তু করে সাধু-সন্ন্যাসীদের এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুভব করেছি, সুকমল শাসমলের রচনায় আন্তরিকতা এবং গভীরতা অনেক বেশী। বয়সে নবীন হলেও শিল্পী অনেক বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গী আয়ত্ত করে ফেলেছেন এরই মধ্যে। হাতের টানটোন বেশ সাবলীল। প্রদর্শনীটি দেখে মনে হয়েছে শিল্পীর স্বাচ্ছন্দ্য তৈল মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য '[illegible] ইকো', 'প্রেয়ার মেল্টিং ইন ইনফিনিটি' 'মেডিটেটিভ মুড', 'অন দি রিলিজিয়াস হাইট', 'থিক অ্যান্ড থিন', '[illegible]' '[illegible]', 'লছমনঝোলা' এবং '[illegible]'। স্কেচগুলির মধ্যে ভাল লেগেছে 'যোগ সাধনা' এবং হরিদ্বার এবং লছমনঝোলার ছোট ছোট রচনাগুলি। [illegible] ধরে কিছুটা প্রথাগত আঙ্গিকে রচনা করলেও রসিক ভাবুক এবং শিল্পীমনের স্পর্শে রচনাগুলি যথার্থই পরিপূর্ণ, ফটোগ্রাফিক বাস্তবিকতার অনেক ঊর্ধ্বে। তবে একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি প্রত্যেক ছবিতে থাকায় সাধারণ দর্শকের কাছে প্রদর্শনীটি একটু ক্লান্তিকর লেগেছে। ভবিষ্যতে ইনি দিন-মজুরদের বিষয়বস্তুর চিত্র রচনা করবেন শুনলাম। আমার অনুরোধ, দিনমজুরের রচনার প্রদর্শনী শিল্পী যেন কোনও গ্যালারীতে না করে শহরের কোনও রাজপথের ফুটপাথে করেন। ও প্রদর্শনীর পক্ষে রাজপথ ছাড়া আর কি উপযুক্ত স্থান

অন্তরঙ্গ —সুকমল শাসমল

হতে পারে। পাশ্চাত্যে প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি শহরে ফুটপাথে ছবির মালা সাজিয়েই বেশীর ভাগ শিল্পী নিজের প্রতিভা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে থাকেন। ভবিষ্যতে জগৎবিখ্যাত শিল্পী হয়েছেন এমন অনেক শিল্পীই প্রথমে ফুটপাথে প্রদর্শনী করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এদেশেরও অনেক শিল্পী শুনেছি প্যারিস বা লণ্ডনে গিয়ে ফুটপাথে প্রদর্শনী করেছেন। কিন্তু দেশে ফিরে এসে তাঁদের আভিজাত্যে বেধেছে রাস্তায় ছবির মালা সাজিয়ে বসতে। প্রশ্ন করলে জবাব দিয়েছেন, 'যস্মিন দেশে যদাচার'। এই তথাকথিত আভিজাত্যের মূলে কুঠারঘাত করে শিল্পী প্রকাশ কর্মকার গত সপ্তাহে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন সদর স্ট্রীটের ফুটপাথে, তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে লণ্ডন বা প্যারিস এর জনসাধারণের থেকে এদেশের জনগণ বড় কম শিল্পামোদী নন। প্রকাশবাবুর দুদিনের প্রদর্শনীতে দুবেলায় চার হাজারেরও ওপর দর্শকের সমাগম হয়েছিল। আমি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি এসব দর্শকের প্রতিক্রিয়া। মুটে মজুর, খুমচাওয়ালা, জুতা পালিশওয়ালা, দারওয়ান প্রভৃতি থেকে গাড়ি-চড়া অভিজাত দর্শক সকলেই সমান আগ্রহ নিয়ে রচনাগুলি উপভোগ করেছে এবং অনুভব করেছে। ছবি বিক্রিও হয়েছে বেশ কিছু। সুতরাং তরুণ শিল্পী প্রত্যেককে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি পথে বেরিয়ে এসে প্রদর্শনী করতে। প্রদর্শনী-হল ভাড়ার টাকা যোগাড় করবার সমস্যা থাকবে না, সমঝদার দর্শকেরও অভাব হবে না। বিক্রি হবার মত ছবি থাকলে ফুটপাথের প্রদর্শনীতেই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মিউজিয়াম-এর যে রেলিং-এ প্রকাশবাবুর ছবি টাঙানো হয়েছিল, ঐ রেলিংটি সমস্ত জুড়ে এবং সারা বছর ধরে প্রদর্শনী চলুক। অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস এর সম্পাদিকা শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়, গবর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীচিন্তামণি কর, প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত, শ্রীরথীন মৈত্র এবং আরও অনেকে প্রকাশবাবুর এই ফুটপাথের প্রদর্শনীকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন। সুতরাং ঐ রেলিংএ শিল্পীরা চিত্রমালার প্রদর্শনী করলে মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় কোনও রকম আপত্তি করবেন না। পুলিস প্রকাশবাবুর ফুটপাথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে কোনও রকম বাধা দেয়নি, এঁদের এই সুবিবেচনার প্রশংসা না করে পারলাম না। আশা করি ভবিষ্যতেও এঁরা কোনও রকম আপত্তি করবেন না। আবার বলি, সংকোচ ঝেড়ে ফেলে প্রত্যেক শিল্পী পথে বেরিয়ে এসে জনসাধারণের সামনে তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরুন।

ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কোয়াই-মদো দ্বীপে বোথরপস নামে এক অদ্ভুত সাপের রাজত্ব। গর্তবাসী সাপ, ঘণ্টুরে-জাতের সাপ, কিন্তু ঢের বেশী বিষাক্ত এই বোথরপসরা, ছোট ছোট গাছ থেকে এরা ঝুলে থাকে। পৃথিবীর আর কোথাও এই জাতের সাপ দেখা যায় না এবং ঐ দ্বীপে অবস্থিত আলোকস্তম্ভের তিনটি প্রহরী এবং চতুর্থ প্রহরীর স্ত্রী এদের কামড়ে নিহত হওয়ায় ব্রাজিল গভর্নমেণ্ট আর কাউকে ওখানে পাঠান বন্ধ করে দেন। সেই থেকে এক মাইল লম্বা দ্বীপটিতে এরাই রাজত্ব করে। বেশ সুখেই এরা আছে কারণ শিকার করার যথেষ্ট সামুদ্রিক পাখি আছে এবং এদের শত্রু বলতেও কেউ নেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ এদের খুবই উজ্জ্বল এমন কথা বলা যায় না। সম্প্রতি সও পোলোর সিরাম-চিকিৎসার গবেষণাগার বুনটান্টন ইনস্টিটিউটের ডাঃ রিচার্ড হোগে জানিয়েছেন যে বোথারপস সাপ এখন যা জন্মাচ্ছে তা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়, জন্মাচ্ছে কেবল উভলিংগ সাপ।

১৯৫২ সনে ডাঃ হোগে ঐ দ্বীপ থেকে একশ চোষট্টিটি বোথারপস সাপ সংগ্রহ করেন। তার এক সহকারী একটি সাপকে ব্যবচ্ছেদ করে একটি স্ফেটিক দেখায়। ডাঃ হোগে জানান যে ওটা স্ফেটিক নয় ওটা হচ্ছে একটা অপুষ্ট ভ্রূণ। সহকারী বলে : "তা হতে পারে না, কারণ ওটা পাওয়া গিয়েছে পুরুষ সাপের অঙ্গে।" প্রকৃতপক্ষে ডাঃ হোগে এবং তার সহকারী উভয়েরই নির্ধারণ ঠিক ছিল; ঐ সাপটা একদিকে যেমন পুরুষোচিত প্রজনন অঙ্গের অধিকারী অপরপক্ষে স্ত্রী সুলভ ভ্রূণকোষও ওর দেহে রয়েছে। ডাঃ হোগে তাঁর ধরা সাপ-গুলির প্রত্যেকটি পরীক্ষা করে দেখেন যে ওদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী হচ্ছে উভলিংগ। মাত্র পনেরটি ছিল পূর্ণাংগ স্ত্রী এবং সবকটিই বন্ধ্যা। উভলিংগ সাপগুলি পুরুষ বা স্ত্রী সাপের চেয়ে আকারে বড়। এদের অধিকাংশেই পুরুষ প্রকৃতির চেয়ে স্ত্রীভাবটাই বেশী এবং সন্তানধারণে সক্ষম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে ডাঃ হোগে দেখে-ছিলেন তখন ওদের মধ্যে স্বাভাবিকত্ব আনুপাতিক হিসেবে বেশীই ছিল। সম্প্রতি তিনি আবার দ্বীপটিতে গিয়ে আটষট্টিটি সাপ নিয়ে এসেছেন এবং ঠিক করেছেন যে সেগুলিকে জোড়ে জোড়ে এক এক জায়গায় রেখে দেখবেন যে উভলিংগ সাপগুলির জোড় পুরুষ সাপের সংস্রব ব্যতিরেকে প্রজননে সক্ষম কিনা। তবে ওদের প্রজনন ক্ষমতা যেমনই হোক না কেন ওরা চার থেকে দুটি ভ্রূণধারণ করতে পারে স্বাভাবিক সাপের সংখ্যা সেখানে বিশ থেকে চব্বিশটি। ডাঃ হোগে বলেন, তাঁর মতে বোথরপস সাপ ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় অস্বাভাবিক প্রকৃতির বংশধর সৃষ্টি করে উর্বরা শক্তি ক্রমশ নাশ হতে হতে এরা একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে।

*

টোকিওতে দিনকতক আগে এক বিদেশী আণ্ডারওয়ার পরা অবস্থায় একটা ট্যাক্সী থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে রেড ক্রসের দপ্তরে ঢুকে বিস্ময়াবিষ্ট করনিকের হাতে "ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিপর্যস্তের জন্য" বলে লেখা একটা চিরকুট দেখায় এবং বাকি যাবতীয় পরিচ্ছদ খুলে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়।

*

লণ্ডনের এক টুপি নির্মাতা কর্তৃক নিয়োজিত এক বিশেষজ্ঞ ১৯৫৯ সনের মানুষের মাথার মাপ নিয়ে এক নির্ধারণে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। নানা বয়সের লোকের ছ হাজারটি মাথার তিনি মাপ পরীক্ষা করে দেখেছেন।

এই বিশেষজ্ঞের মতে বড় মাথাওয়ালা লোকে সাধারণত উচ্চাভিলাষী এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে কৃতি হয়। অধিকন্তু তিনি বলেন, বড় মাথাওয়ালা লোকে ছোটমাথাওয়ালা-দের চেয়ে নারী সংসর্গ বেশী পছন্দ করে। তিনি এটাও লক্ষ্য করেছেন যে মেয়েরা মাঝামাঝি থেকে বড় মাথাওয়ালা লোকদের বেশী পছন্দ করে।

তবে ছোট মাপের মাথাওয়ালা লোকেদের সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞ নিরাশ হবার মত নির্ধারণে পৌছাননি। তাঁর মতে যাদের মাথা ছোট আকারের তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনে তুষ্ট হয়। বড় মাথাওয়ালা লোকের চেয়ে তারা বন্ধুবৎসলও হয়।

আর একজন বিশেষজ্ঞ যিনি মাথার আকার নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন তাঁর মতে একশ বছর আগেকার লোকের চেয়ে একালের লোকের মাথা সাধারণত মাপে বড়। খুব সম্ভবতঃ এই কারণে যে, চিন্তার পরিধি এখন আগেকার চেয়ে বৃদ্ধিলাভ করেছে।

*

খৃষ্টপূর্ব ২০০০ শত বৎসর আগে কাঠের ওপর রঙ-করা মিসরীয় পদাতিক সৈন্যের পুতুল—আসিয়াউটের যুবরাজ মাসাহিতের কবর থেকে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কায়রোর মিউজিয়ামে রক্ষিত

কবিতা

চালচিত্র—চিত্ত সিংহ। সজনী, ৬৭-এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা—৩৭। দাম দেড় টাকা।

তরুণ কবিদের মধ্যে চিত্ত সিংহের নাম কাব্যক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত নয়। এই বইটিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নয়। সৃষ্টি-সঞ্চয়ে কবি অকৃপণ নন, ইতোপূর্বে প্রকাশিত তাঁর আরো দুটি কাব্যগ্রন্থেও সে স্বাক্ষর বর্তমান। এবং যেহেতু মনের প্রতিটি ঋতু-পরিবর্তন কবির গভীর অভিনিবেশ দাবী করে, সেজন্য প্রারম্ভে কবি বলেছেন, 'বিস্ময়ে পুলকে আমি সেই পরিবর্তনকে সানন্দে স্বাগত জানাই এবং চেষ্টা করি পরিবর্তনের সেই ধারাচিহ্নকে গ্রন্থাকারে ধরে রাখতে।' পুরনো পথ পরিক্রমণে তাঁর রুচি নেই, আধুনিক কাব্যের নিত্য-নব পরীক্ষায় প্রেমের সেই বিশেষ অনুভূতির সহজাত সৌন্দর্যকে কবি তাঁর প্রতিপদক্ষেপে নতুন করে আবিষ্কার করতে যত্নবান, এই কাব্যগ্রন্থে কবিমানসের সেই অস্তিত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

'চালচিত্র' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে মনে হলো, কবির মধ্যে একটি গভীর বেদনাবোধ জাগ্রত; এবং চালচিত্রের চিত্ররচনায় সেই মনোবেদনা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও 'পুরুষের অনুভবের কয়েক ছত্র' এবং 'প্রকৃতির অনুভবের কয়েক ছত্রে' অনুষঙ্গের এক আশ্চর্য বেদনাঘন রূপ লাভ করেছে। প্রেম ও বিরহ উপলব্ধির আবহাওয়া কবি রচনা করেছেন, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে মননবৃত্তির সাযুজ্য-বোধ রক্ষায় তিনি বিশেষ সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি; অবশ্য হয়নি এই কারণেই যে, জীবন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টির আলোক ততোখানি ব্যাপক হতে পারে নি বলেই। তবু বলবো কাব্যধর্মকে স্বীকার করেন বলেই কবির মধ্যে এ ঋজু ভবিষ্যৎ বর্তমান। শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস এবং ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক পরিমণ্ডল রচনা করেছেন এবং অলংকার প্রয়োগে মাঝে মাঝে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অনুপ্রাসের বিশেষ ব্যবহার 'চালচিত্রের' পদ্যাত্মক আঙ্গিকে নতুন সুর এনে দিয়েছে; এগারো নং কবিতায় প্রথম পর্বে 'অধরাকে ধরতে গিয়ে অধরার অধরে অধর পেতে উন্মুখ আমি' ইত্যাদির অর্থবহ শব্দ-সংযোজন মন্দ নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে চমকপ্রদ বিশেষণ প্রয়োগ একটু বেশী পরিমাণেই 'পরীক্ষামূলক' বলে বোধ হলো।

৩৩৯।৫৯

শালবনের কান্না—হীরেন কুণ্ডু। প্রকাশক—শ্রীশংকরীভূষণ নায়ক, ১১৪ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা--১০। মূল্য—এক টাকা।

নতুন কবির নতুন কবিতার বই 'শালবনের

কান্না'। নানাকারণেই দুর্গাপুর এখন ভূগোলে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। যেখানে একদা শাল-মহুয়ার বনমিছিল প্রকৃতির বুকে আপন খেয়ালে খুশী ঝরাতো, সেখানে আজ 'লক্ষ গাইতির শপথে' এক শিল্পনগরী সৃষ্টি হতে চলেছে—আঠারোটি কবিতার মধ্য দিয়ে দুর্গাপুরের বিচিত্র পরিবেশকে নিয়ে কবি স্বপ্ন দেখেছেন। কবির মধ্যে একটি সহজ অনুভূতি আছে—কিন্তু 'মিনার', 'টাউনশিপ', 'সৃষ্টি' ইত্যাদি কবিতাগুলি সাময়িক আবেদনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। কবি গদ্যছন্দে তাঁর 'প্রাণের আবেগকে ভাষা দিয়েছেন।' ৩১০।৫৯

চৈতালী—'শ্রীপুষ্পেল'। সম্পাদনাঃ শ্রীমতী আভা চক্রবর্তী। লাঁভিড়ো প্রেস প্রকাশনী, চিরিমিরি, মধ্যপ্রদেশ। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীপুষ্পেলের বিভিন্ন সময়ে লেখা নানা সুরের ছাব্বিশটি কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রীতির দিক থেকে কবি প্রাচীন পন্থী, এবং অনেক কবিতায় তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত অপরিণত থেকে গেছে। পৃথিবীর এই ব্যথাহত জীবনে কবি ঝরাপাতার গান গেয়ে সম্ভাবনাময় নতুন দিনকে আহ্বান জানাতে চেষ্টা করেছেন। 'চৈতালী', 'সোনার বাংলা', 'আজি হতে শতবর্ষ পরে', চিরিমিরি-১, কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। চৈতালীর ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ পরিকল্পনা পুরানো দিনের স্বাক্ষর বহন করে। ৫২১।৫৮

নী ল পা তা—জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থভবন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—এক টাকা॥

আটত্রিশটি কবিতা সংকলিত বর্তমান ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকাটি মনে হয় কবির প্রথম প্রচেষ্টা। জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রোমান্টিক কবি; বর্তমান কাব্যসংকলনের কবির মধ্যে একটি সহজ কবিমন আছে, কিন্তু কল্পনা-বৈচিত্র্যের অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কলাবিধিতে সতর্কতার অভাব, আঙ্গিক রচনায় একটি নিস্পৃহ গতানুগতিক পদ্ধতিই মোটামুটিভাবে 'নীলপাতা'র স্বাভাবিক রস গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করেছে। কবি হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অবশ্যই আছে; কিন্তু উত্তরকালীন সাধনায় কবিকে আরো সতর্ক এবং মনোযোগী হতে হবে।

'নীলাপাতার' অঙ্গসজ্জা সাধারণ; প্রচ্ছদটি স্বয়ং কবি কর্তৃক অঙ্কিত। ৫২৪।৫৮,

সঙ্গ অভ লাভ—শ্রীকুমুদবন্ধু। শ্রীরণেন্দ্রনারায়ণ দত্ত এবং শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ দত্ত কর্তৃক ৫।১ দমদম রোড, কলিকাতা ৩০ থেকে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা॥

আলোচ্য গ্রন্থটিতে চারটি পর্বে মোট দু'শ পনেরটি ছোট ছোট কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে গীতিকবিতার মিষ্টিমধুর সুরের অনুরণন বর্তমান—কবিতার হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করবে। কবি প্রেমিক; তিনি শান্তি কামনা করেন; তাঁর মানসিক অভিব্যক্তি কোনো গণ্ডিকে আশ্রয় করে নয়,

বিশ্বপতির বিপুল প্রেমের নিবিড় সৌন্দর্য-সাধনায় কবি মগ্ন হতে চান। শ্রীরাজ-রাজেশ্বরী দেবী বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। ২০৫।৫৯

ভূতের পাঁচালি—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। (দ্বিতীয় সংস্করণ) শান্তি লাইব্রেরী, ১০বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। আড়াই টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে অতি প্রাকৃত কাহিনীর একটি বিশেষ নিজস্ব স্থান আছে। এক শ্রেণীর কিশোর বৃদ্ধ পাঠক আছেন যাঁদের কাছে ভূতের গল্প একটি লৌকিক বিশ্বাস ও ছায়া-কালো রহস্যের বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত। বর্তমান গ্রন্থে লেখক একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে ভূতকে উপলক্ষ্য করে কতগুলি কৌতুকময় কাহিনী পরিবেশন করেছেন। রচনাগুলির মধ্যে একটি নাটকীয় পরিণতি আছে, প্রতিটি কাহিনীই রচনা গুণে শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই সমানভাবে কাছে টানে। ভূতের [illegible], ভূতের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া, সাহেব ভূত, পাড়াগেঁয়ে ভূতের কলিকাতা দর্শন, বৈতরণীর ওপারে ইত্যাদির মধ্যে লেখকের বিচিত্র [illegible] এবং অভিজ্ঞতার [illegible] পাঠককে মুগ্ধ [illegible] সহজ [illegible] বলবার মত [illegible] ভূতের গল্প বলার এই যে বিশেষ [illegible] ভূতের গল্প [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] মধ্যে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ৪০৩।৫৯

ছোটগল্প

সপ্তপর্ণী—শ্রীশশাঙ্কভূষণ রায় (ভুজঙ্গ-ধর)। প্রকাশক—শ্রীঅনিলকুমার সেনগুপ্ত, [illegible] প্রেস, আসানসোল। মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ, সপ্তপর্ণী গল্পের লেখক শ্রীশশাঙ্কভূষণ রায় দীর্ঘদিন বিহার সরকারের [illegible] অধিষ্ঠিত ছিলেন; বর্তমানে [illegible] অবসর গ্রহণ করেছেন। মনে হয় সেই চতুর্থ প্রহরের [illegible] সংক্ষিপ্ত করে [illegible] উদ্দেশ্যে লেখকের কলম ধরেছেন। ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের গ্রন্থে মোট সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। আধুনিক-কালের ছোট-গল্প বিষয়বস্তুতে নবত্ব এবং আঙ্গিক প্রকরণে যে পরিবর্তন এসেছে সেদিক থেকে সপ্তপর্ণীর গল্প-গুলি বিশেষ চিহ্নিত না হলেও প্রত্যেকটি গল্পে লেখকের ঘরোয়া মেজাজ এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে গল্পগুলি বলবার চেষ্টা করেছেন; **'শক্তের ভক্ত, প্রবঞ্চনা,**

তোষণনীতি, আকবর বীরবল সংবাদ' ইত্যাদি গল্পে লেখকের সরস একটি মনের পরিচয় এবং সমাজে তোষণ-ব্যবস্থা লালনপালনে পারদর্শী এক শ্রেণীর লোকের প্রতি লেখকের নির্মম বঙ্কিম কটাক্ষ লক্ষ্যণীয়। রচনায় গুরুচণ্ডালী দোষ স্থানে স্থানে গল্পপাঠের আমেজকে ব্যাহত করে; পুস্তকটির ছাপা ও অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর বটতলার পুস্তক-গুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ২০১।৫৯,

গল্পের মতো গল্প—শ্রীঅশোককুমার ভঞ্জ চৌধুরী। নব ভারত প্রকাশনী, ১২।১ চৈতন সেন লেন, কলিকাতা-১২। দাম ১৷৹

চারটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি ছোট-দের জন্য লিখিত মনে হলেও বড়রাও প্রত্যেকটি গল্পের রূপকের আড়ালে বিচিত্র আস্বাদ পাবেন। ৬২৭/৫৮

উপন্যাস

পুতুল নিয়ে খেলা—সুশীলকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। বলাকা প্রকাশনী, ১৮।১।এ, সিমলাইপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলকাতা ২। তিন টাকা।

অভিশপ্ত উদ্বাস্তু জীবনের সংঘাতময় পট-ভূমিতে কাহিনী শুরু হয়েছে। মুমূর্ষু সংসারের প্রতিকূল অবস্থাকে মানিয়ে নিতে

গিয়ে এক সরলা ছিন্নমূলে বালিকার করুণ পরিণতিকে লেখক গভীর দরদ দিয়ে অঙ্কন করেছেন। কাহিনীটি উদ্দেশ্যমূলক, বর্তমান সমাজে একদল মুখোশপরা শিক্ষিত গণ্যমান্য তথাকথিত দেশসেবক আছেন, যাঁরা মানুষের এই হতভাগ্য ছন্নছাড়া জীবনের বেদনাঘন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দুর্যোগের দিনে দরদী বন্ধুর ভান করে, গায়ে প'ড়ে সাহায্যদানের আশ্বাস দেয়, সমাজসেবার নামে নানা কথায় মুখর হয়, নারী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে, নেতৃত্ব করে, সমাজে বাহবা পায় এবং সংবাদপত্রে তাদের কর্মপদ্ধতির সাধুবাদও ধ্বনিত হতে দেখা যায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা একটি বিশেষ শ্রেণীর শিকারের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ভেতরে ভেতরে তাদের শিকার-পদ্ধতির বিষক্রিয়া কতো নিরীহ ও সরলা মেয়েদের জীবনবাঁধার স্বপ্নকে, কুমারী জীবনের মাধুর্যকে তছনছ করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই কাহিনীর সন্তোষ বসুর মতো সমাজসেবী, জয়ন্ত মুখুজ্যের মতো দেশবিখ্যাত দরদী ডাক্তার, প্রেমানন্দ-বাবুর মতো প্রতারক অফিসার, ইন্দ্রজিৎ রায়ের মতো দেশনেতা, নারী-সমবায় সংঘের মতো নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লেখক বর্তমান সমাজের বিশেষ চরিত্রের এক শ্রেণীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের মুখোশ একেবারে খুলে দিয়েছেন। প্রারম্ভে লেখক বলেছেন, 'ইহা নিছক গল্প। গল্পের চরিত্রগুলিকে কাল্পনিক বলে মনে করবেন।' কাহিনীর মিছিলে অনেক চরিত্রের ভিড় হয়েছে; সুশীল-বাবু দক্ষতার সঙ্গে সাবিত্রীর চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু চরিত্রটির আশ্চর্য পরিণতিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি বলেই পাঠকের মনে অতৃপ্তি থেকে যায়। মাস্টারনী দিদি, হেম, দোকানী দাদা ইত্যাদির ভিন্নমুখী চরিত্রলিপি উল্লেখ-যোগ্য। মনে হয় লেখক সম্ভবত নবীন; কাহিনীর খণ্ড চিত্র রচনার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতার স্পর্শ বর্তমান; ঘোষিত উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, অসহায়া নারীদের নিয়ে এক শ্রেণীর ভদ্রবেশীদের পুতুল পুতুল খেলা, সমাজের এক শ্রেণীর নরপশুদের উদগ্র লালসার বিস্তৃত বিবরণ প্রসঙ্গে গ্রন্থের অমার্জিত বর্ণনাপদ্ধতি লেখকের সমস্ত উদ্দেশ্যকেই ধূলিলুণ্ঠিত করেছে। রস-নিবেদনের সে পরিচ্ছন্ন পরীক্ষায় লেখককে আরো সংযমী এবং ব্যঞ্জনাময় হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

৩০৫।৫৯

খেলাধুলা

ক্রীড়াজগতে দিক্‌পাল বাঙালী—অজয় বসু। দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানী। ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। ৩টাঃ ৫০ নয়া পয়সা।

জীবন ও জগতের বিভিন্ন দিকে বাঙালী প্রতিভার স্ফুরণ বিস্ময়করভাবে ঘটলেও ক্রীড়াক্ষেত্রেও তার প্রকাশ কিছু কম উল্লেখ-যোগ্য নয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জনকারী বাঙালী মাত্রেই আমাদের গর্ব ও গৌরবের কারণ। হয়ত সে-কারণে বাঙালী ক্রীড়া-সাধকদের বিষয়ে আমাদের কৌতূহলও অনির্বাণ। বর্তমান বইটিতে বাঙালী ক্রীড়া-প্রতিভাধরদের জীবনী নাতিদীর্ঘ পরিসরে লেখক দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিস্মৃতির ধূলোবালুপে যে-সব নাম বিবর্জিত, যে কৃতিত্ব ও স্মরণধর্ম বিষয়গুলি মুছে যাচ্ছিল—লেখক সযত্নে তাদের বাছাই করেছেন—সত্য দৃষ্টান্তের নানা রঙে তাদের আলেখ্য রচনা করেছেন—যার ফলে ক্রীড়ামোদীদের চিত্তপটে সেই নামগুলি নবরূপে আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে।

সাধারণত খেলাধুলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও ক্রীড়াজগত সম্পর্কে উৎসাহী, সচেতন ব্যক্তির সংখ্যা অগণন। কিন্তু তাঁদের নির্ভুল জ্ঞান-বিস্তারে সহায়ক পুস্তকাবলীর সংখ্যা খুব বেশি নেই মাতৃভাষায়। অবশ্য ইদানীং কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে এ-কথা সত্য। স্বল্পসংখ্যক পুস্তকগুলির মধ্যে এই বইটির বিশেষ মূল্য এই কারণে যে, লেখক দেশ ও স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ও বাঙালী ক্রীড়া-সাধকদের তত্ত্ব-সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্মরণীয় ক্রীড়াবিদদের কাহিনী ঘরোয়া পরিবেশ,

আত্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার মাধ্যমে ফোটানো হয়েছে। সন্দেহ নেই ক্রীড়োৎসাহীদের 'ক্রীড়া-জগতে দিকপাল বাঙালী' আনন্দ দেবে, প্রেরণার খোরাক হবে। ১২৭।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

Our Hearts—Maupassant.
Jawaharlal Nehru—Frank Moraes.
The Invisible Man—H. G. Wells.
Chitralekha—Bhagwati Charan Verma.
Dawn or Darkness?—R. K. Karanjia.
Problem of Indian Defence.

প্রজাপতির রঙ—প্রবোধবন্ধু অধিকারী।
অনেক পাপড়ি ছুঁয়ে—দিলীপ দাশগুপ্ত।
শিল্পদর্শনের ভূমিকা—শচীন্দ্র ঘোষ।
প্রিয়াল লতা—সত্য ভট্টাচার্য।
বধূ আমড়া—রবীন্দ্রনাথ দত্ত।
সুধাময়—বিমল কর।
বন্ধন ও মুক্তি (একাঙ্ক নাটক)—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী।
বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মের পরিক্রমা (১ম খণ্ড)—শ্রীদীপা দাস।
তৃষিত-দেবতা—আনাতোল ফ্রাঁস। অনুবাদক বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়।
কোসেকদের গল্প শোন—বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
খোকনবাবু—কল্যাণী প্রামাণিক।
আমাদের নেহরু—নির্মল সেন।
বাঘের চোখ—নীহার মজুমদার।
ড্রাগনের নিঃশ্বাস—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
আগামীকালের প্রান্তে—টমাস এ ফুল—অনুবাদিকা—মায়া ভদ্র।
আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক মানুষ—জেমস বি কোনান্ট, অনুবাদিকা—সাধনা দেবী।
আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ তথা, সংকট ও সম্ভাবনা—এডওয়ার্ড টেলার ও আলবার্ট এল ল্যাটার; অনুবাদক—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
রক্ত পলাশ—ক্যাথেরিন এ্যান পোর্টার; অনুবাদিকা—জ্যোতি মজুমদার।
ভীতি-শৃঙ্খল—এন লায়োকস; অনুবাদক—খসরু বিশ।
নতুন স্বাদ—হেজেল সেলার; অনুবাদক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
এব্রাহাম লিঙ্কন—লর্ড চার্নউড, অনুবাদক—আশু চট্টোপাধ্যায়।
আবার রাশিয়ায়—লুই ফিসার; অনুবাদক—কান্তিপ্রসাদ চৌধুরী।
পরিবর্তন (নাটক)—মনোরঞ্জন ঘোষ নাট্যরূপ বীরু চট্টোপাধ্যায়।

জীবনের প্রতিচ্ছবি

কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার-পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র চলচ্চিত্রের কথাবস্তু, আঙ্গিক ও ভাষায় এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছিলেন "একদিন রাত্রে" ছবিতে। চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার পতাকাতলে নির্মিত তাঁদের নব চিত্রসৃষ্টি "শুভ বিবাহ" এই শুভ প্রয়াসেরই নবতম দৃষ্টান্ত।

"একদিন রাত্রে"র কাহিনীরূপের মতো, এ-ছবিতেও রয়েছে একের কাহিনীর ভেতর দিয়ে অনেকের কাহিনী, আর একদিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বহুদিনের বহু ঘটনার ভিড়। একটি অভিজাত যৌথ পরিবারের একমাত্র শিক্ষিতা মেয়ে গায়ত্রীর শুভ বিবাহের দিনটিকে কেন্দ্র করে ছবিতে বহুজনের কাহিনী ও বহুদিনের ঘটনা বিস্তার লাভ করেছে।

চন্দ্রশেখর

এই শুভ বিবাহের দিনটির মতো অশুভ দিন গায়ত্রীর জীবনে আর আসেনি। যাকে নিয়ে সে এতকাল সুখনীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেই অরুণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পুরুষের আবির্ভাব ঘটতে পারে না তার জীবনে। তাই শুভবিবাহের দিনের দিনমণি উদিত হবার আগেই গায়ত্রী বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়।

গায়ত্রীর অভিভাবকেরা এই পারিবারিক কলংক চাপা দেবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠেন। নির্দিষ্ট লগ্নে তাকে খুঁজে এনে নির্দিষ্ট পাত্রের সংগে বিয়ে দিতে না পারলে পরিবারের মান-সম্মান আর থাকে না। তাকে খুঁজে বের করবার জন্য পুলিসে খবর দেওয়া হয়।

গায়ত্রীর এই অন্তর্ধান নিয়ে বাড়িতে যে চাপা আলোড়ন ও উত্তেজনা দেখা দেয়, তারই মন্থনে এই পরিবারের অদূর অতীত ইতিহাসের হলাহল নিঃশেষে বেরিয়ে আসে, যে হলাহল আকণ্ঠ পান করেছে এ-বাড়ির বাপ-মা-মরা ভাগ্নী সন্ধ্যা। সন্ধ্যা তার প্রেমের মল্লিকাবনের প্রথম কলি অঞ্জলিভরে নিবেদন করেছিল তরুণ অধ্যাপক নীরেনকে। তার প্রেম-অভিসারের পথে বিধি-নিষেধ ও শাসনের কাঁটা মাড়িয়ে সে প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। রক্তাক্ত বেদনায় সে মেনে নিয়েছে পরিবারের নির্মম বিধান। মাতুলদের পছন্দ-করা পাত্রের সংগেই তার বিয়ে হয়, এবং বিয়ের দুই বছর পর তার সীমন্তের সিঁদুর মুছে যায়। বিধবার বেশ নিয়ে সন্ধ্যা মাতুলালয়ে ফিরে আসে।

গায়ত্রীর জীবনের এই সংকট-লগ্নে সন্ধ্যাও দিশেহারা হয়ে পড়ে। গায়ত্রীর ব্যথা সে অনুভব করে সমস্ত অন্তর দিয়ে। গায়ত্রীর ব্যথা বুঝতে পারেন আরেকজন— তিনি তার মেজকাকা। [illegible] এই মানুষটিও ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু পরে তার জীবনের সব কিছুই যেন গোলমাল হয়ে যায়। সুযোগ পেলে তিনি জীবনের হারানো সুরটিকে ফিরিয়ে আনতে চান।

অভিভাবকের রক্তচক্ষু কঠোর, নির্মম। গায়ত্রীর ছোট মামা [illegible] সংবাদ অনুযায়ী ছোট মামা সন্ধ্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে নীরেনের বাড়ি থেকে গায়ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। গায়ত্রী ও অরুণ তখন বিরহ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের পূর্ণ করে তুলতে চায়। ছোটমামা তাদের মিথ্যা আশ্বাস দেয় যে বাড়িতে এলে তারা গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবে।

কিন্তু আশীর্বাদ তো দূরের কথা, গায়ত্রীর জীবনে অভিশাপের পালা শেষ হতে তখনও কিছু বাকী। যে সন্ধ্যাকে নির্মমভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে নীরেনের কাছ থেকে, সেই নীরেনেরই বাড়িতে তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ধ্যা গায়ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে। পরে যখন দেখল শাসন, [illegible] আর অশ্রুবিসর্জনের যে অস্ত্র তার প্রতি একদিন প্রয়োগ করা হয়েছিল গায়ত্রী ও অরুণ সেই অস্ত্রে জর্জরিত ও দিগভ্রান্ত, তখন সন্ধ্যা আর নীরব থাকতে পারল না। জীবনে পূর্ণতার মন্ত্রটি সে শুনিয়ে দেয় তাদের। গায়ত্রী ও অরুণ নিঃশংকচিত্তে তাদের আশা-অভীপ্সাকে রূপ দেবার সংকল্প গ্রহণ করে। গায়ত্রী ও সন্ধ্যা তাদের

যুবাচিত্রের "পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট"-এর একটি দৃশ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ-কুমার ও তুলসী চক্রবর্তী।

আজন্ম পরিবেশ ছেড়ে অরুণ ও নীরেনের সঙ্গে গিয়ে ওঠে অপেক্ষমান ট্যাক্সীতে। যারা এগিয়ে যেতে চায় তাদের নিরস্ত করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেন গায়ত্রীর বাবা ও মা। দূর থেকে তাঁরা নতুন জীবন-পথের পথিকদের আশীর্বাদ করেন।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত এই কাহিনীর পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার ফাঁকে ফাঁকে এর নাটকীয় বিভিন্ন চরিত্রকে ঘিরে সুন্দরভাবে দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু এই কাহিনীর বহুকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্ন নাট্যপরিস্থিতির মধ্যে নাট্যরসের যে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো হয়েছে তাতে মূল নাটক যেন অনেকটা কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছে।

ছবিটিতে নাট্যমর্ম বহুধাবিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক চরিত্র আর অনেক ঘটনার মধ্যে। ফলে কতকগুলি আলাদা আলাদা জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে ছোট ছোট নাটকের মালা যেন রচিত হয়েছে ছবিটির চিত্রনাট্যে। বহুর মধ্যে এক অথবা একের মধ্যে বহুর প্রকাশ রূপ নেয়নি ছবির কাহিনীতে।

তবুও ছবিখানির নাটক ব্যর্থ হয়নি। সংগ্রথিত চিত্রনাট্যের গুণে মুখ্যচরিত্রদের ঘিরে রচিত উপাখ্যানরাজি সামগ্রিকভাবে ছবিটিকে নাট্যরসে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু নাট্যরসের আস্বাদ গভীর ও স্থায়ী হয়ে দেখা দেয় না। তার কারণ সন্ধ্যা ও নীরেন, গায়ত্রী ও তরুণ এবং মেজকর্তা ও মেজ-গিন্নীর মরমী উপাখ্যানগুলির মধ্যে কাহিনীর ঘন ঘন দৃশ্য-পরিবর্তনের ফলে দর্শকমন বহুনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এ-বাদেও ছবিতে আরও চারটি প্রধান চরিত্র রয়েছে—গায়ত্রীর বাবা, মা, ছোটকাকা ও তার সহধর্মিণী—যাদের আবেদন দর্শকের অনুভূতির কাছে মোটেই গৌণ নয়।

সুখের বিষয়, কাহিনীর মর্মবাণী অনেকাংশে বাণীবহ হলেও এর প্রধান চরিত্রগুলি শুধুই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের অবয়ব হয়ে ওঠেনি, নাট্যব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য কাহিনীতে যে গূঢ় ও ব্যাপক সামাজিক সমস্যার অবতারণা রয়েছে তার কোন সুগ্রাহ্য সমাধান মেলেনি ছবিতে। ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্র বাস্তব জীবনায়নের সহজগ্রাহ্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে বাড়ির মেজকর্তাকে দর্শকদের নিঃসন্দেহে খুবই ভালো লাগবে। অধ্যাপক নীরেনকে মনে হয়েছে সে যেন জগৎবিচ্ছিন্ন কোন এক বুদ্ধিলোক অথবা ভাবলোকের বাসিন্দা।

চিত্রপরিচালনায় সর্বাংগীনভাবে পরিচালকদ্বয় পরিমিতিজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিতে ব্যঞ্জনা ও প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে অনেক জায়গায়। ব্যঞ্জনা ও প্রতীককে দর্শকের নজরে আনবার অত্যধিক আগ্রহ এগুলির সার্থকতা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করে দেয়। সেদিক দিয়ে কতকগুলি ব্যঞ্জনা ও প্রতীক আশানুরূপ বাঙময় হয়ে উঠতে পারেনি। ফ্ল্যাশব্যাকে সন্ধ্যার অতীতের কাহিনীর উদ্ঘাটনের সময় বাঁশ কাটার দৃশ্যটি ব্যঞ্জনাময়। মনে হয় বাঁশ কাটার মতোই নির্মম আঘাতে আঘাতে সন্ধ্যার অন্তরটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করা হচ্ছে তার বিয়ের আগে। ফ্ল্যাশব্যাকের দৃশ্যগুলি এলোমেলোভাবে দেখানোটা সুচিন্তিত, কারণ মনের চিন্তাগুলো ক্যালেণ্ডারের তারিখ অনুসরণ করে আসে না।

ছবিতে প্রশংসনীয় প্রয়োগধারার সংগে সংগে ছোট-খাট অবাঞ্ছিত বৈসাদৃশ্যও নজর এড়ায় না। গায়ত্রীর ছোটকাকার পক্ষে তার স্ত্রীকে চড় মারার দৃশ্যটি দর্শকেরা সহজভাবে নিতে পারবেন না। অধ্যাপক নীরেন ও মেজগিন্নীর গায়ের রং ফর্সা দেখাবার জন্যে "মেক-আপ"-এর কৃত্রিম কৌশলটি চোখে লাগে। সুষ্ঠু রূপ-সজ্জার অভাবে ও বারে বারে 'ক্লোজ-আপে'র দরুণ কোন কোন দৃশ্যে বিধবা সন্ধ্যাকে দেখতে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাণহীন ও রুক্ষ লেগেছে। ছবিতে গায়ত্রীকে অরুণের প্রথম দেখার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটিও অস্বাভাবিক।

ছবিটির বিশেষ সম্পদ এর সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য। সন্ধ্যার চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র আগাগোড়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ছবির শেষ দৃশ্যটি তাঁর অননুকরণীয় অভিনয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গায়ত্রীর মেজকাকার চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল প্রাণবন্ত অভিনয়-কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করেছেন। চরিত্রটিকে তিনি দরদ ও নিষ্ঠা দিয়ে দর্শকদের কাছে আদরণীয় করে তুলেছেন। ঔষধের শিশিতে মদ ঢেলে পকেটে রাখা ও ক্ষণে ক্ষণে পান করার ব্যাপারটি বাংলা সামাজিক ছবিতে খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবুও এ-ঘটনার মধ্যে যে কৌতুকরস আছে শ্রীসান্যাল তার সদ্ব্যবহার করেছেন। গায়ত্রীর ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। তাঁর প্রণয়ীর চরিত্রে শান্তি দত্তকে দর্শকদের ভালো লাগবে। গায়ত্রীর ছোটকাকার চরিত্রটি অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু অভিনয়ে সমৃদ্ধ। মেজগিন্নী ও ছোটগিন্নীর ভূমিকায় যথাক্রমে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মোটামুটিভাবে প্রশংসনীয়। সন্ধ্যার প্রণয়ী অধ্যাপক নীরেনের চরিত্রটিতে শম্ভু মিত্র ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু তাকে প্রাণবান করে তুলতে পারেননি। গায়ত্রীর মা'র বেশে ছায়াদেবী বহুদিন পর এ-ছবিতে দর্শকদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবেন। তাঁর হতাশা ও সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তার অভিব্যক্তি মনে রেখাপাত করে। ছবি বিশ্বাস তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রমাণ দিয়েছেন গায়ত্রীর বাবার চরিত্রে। অন্য দুটি বিশেষ ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গঙ্গাপদ বসু ও নবাগত পঙ্কজ মিত্র।

সংগীত পরিচালনায় ভি বালসারা ও শ্যামল গুহ আমাদের হতাশ করেছেন। ছবিতে বিভিন্ন দৃশ্যের সংগে ভাবানুগ সুরারোপের যে অবকাশ ছিল সংগীত পরিচালকদ্বয় তার যথাযথ সুযোগ নিতে পারেননি।

আলোকচিত্রে দেওজীভাই, সম্পাদনায় গোবর্ধন অধিকারী এবং শব্দানুলেখনে শ্যামসুন্দর ঘোষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগ ও অংগসজ্জা পরিচ্ছন্ন।

অপয়া মেয়ের কাহিনী

মানুষের অন্ধ সংস্কার ও গোঁড়ামি এক নারী-জীবনে যে নিদারুণ অভিশাপ নিয়ে আসে এবং অনেক অশ্রুবিসর্জনের মধ্য দিয়ে কিভাবে এর নিরসন ঘটে তারই এক মামুলী কাহিনী নিয়ে তৈরী মার্স এ্যাণ্ড মুভীজ-এর হিন্দী ছবি "অর্ধাংগিনী"।

কাহিনীর নায়িকা ছায়া। ছায়ার জন্মের সময় তার গর্ভধারিণীর মৃত্যু ঘটে এবং তার জন্মের পর সেই লোকালয়ে অনেক অমংগল-জনক ঘটনা ঘটতে থাকে। সকলেই ধরে নেয় ছায়া একটি মূর্তিমতী অলক্ষ্মী, অপয়া। ছায়ার ছায়া কেউ মাড়ায় না।

বাড়ির দরজা থেকেই দূর দূর করে সবাই তাকে তাড়িয়ে দেয়। বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠে একদিন ছায়া। মেয়ে পছন্দ হলেও ছেলের মার কানে ওঠে ছায়ার এই অশুভ পরিচয়। বিয়ে ভেংগে যায়। এই শোক সামলাতে না পেরে ছায়ার বাবার মৃত্যু ঘটে।

ছায়ার আশ্রয় মেলে বাল্যসখী লীলার শ্বশুর বাড়িতে। লীলা ও তার স্বামীর ছোটর পাইলট প্রকাশের সংগে ছায়ার পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের পর প্রণয় এবং প্রণয়ের পর পরিণয় ঘটে যায় অল্পকালের মধ্যেই।

এর আগেই ছায়া জানতে পেরেছিল যে প্রকাশের মা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে একমাত্র ছেলের সংগে তার বিয়ে ভেংগে দিয়েছিলেন। সব কথা ছায়ার কাছ থেকে জেনেই প্রকাশ বিয়ে করল তাকে। বউকে যেদিন বাড়ি নিয়ে গেল প্রকাশ, সেদিন থেকেই ছায়ার জীবনে শুরু হল নতুন দুঃখের পালা।

শাশুড়ীর কুসংস্কার, কুসংস্কার-প্রসূত বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষজনিত অত্যাচার নীরবে সয়ে সয়ে শেষ পর্যন্ত ছায়াকে একদিন স্বামীর ভিটে ছাড়তে হয়। প্রকাশের মরণাপন্ন অসুখের সংবাদে সে একদিন ফিরে আসে। এরপর একদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে আপন পবিত্রতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ছায়া। শাশুড়ী পুত্রবধূকে বুকে তুলে নেন। ছায়ার জীবনেও দুঃখের অবসান ঘটে।

মানুষের অবমাননা ও অত্যাচারের ভেতর দিয়ে নারী-জীবনের অন্তহীন না হলেও অবিচ্ছিন্ন ব্যথা-বঞ্চনাকে উপজীব্য করে এ-ছবির যে কাহিনী তাতে বাস্তবের সংগে কষ্টকল্পনার গরমিলটি পদে পদেই উগ্র হয়ে ওঠে। প্রযোজক-পরিচালক অজিত চক্রবর্তী কাহিনীর বিন্যাসে হিন্দী ছবির চড়া সুরের "মেলোড্রামা"র গতানুগতিক ও বহু ব্যবহৃত উপাদান সযত্নে অনুসরণ করে গেছেন। আগা ও শুভা খোটেকে নিয়ে ছবিতে যে কৌতুক রসের বিস্তার রয়েছে দর্শকের শুষ্কমনে তা কিছুটা রসসিঞ্চন করে।

মিরাক্যালস্ ইণ্ডিয়ার "মৃতের মর্তে আগমন" চিত্রের একটি দৃশ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর মল্লিক।

ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ নায়িকার চরিত্রে মীনাকুমারীর অভিনয়। চরিত্রটির দুঃখ-বঞ্চনা তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর পরেই প্রশংসা পাবার যোগ্য স্বামী-স্ত্রীরূপে আগা ও শুভা খোটে। তাঁদের প্রাণোচ্ছল অভিনয়ে ছবিটি সমৃদ্ধ। নায়করূপী রাজকুমারের অভিনয় মনে দাগ কাটবার মতো না হলেও কাহিনীর চাহিদা তিনি মিটিয়েছেন।

নায়িকার শাশুড়ীর চরিত্রের স্বল্পতার রূপে দুর্গা খোটে ভালোই ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য শিবরাজ, সি এস দুবে, রাজা প্রবীন পাল ও দুরাণী। সংগীত পরিচালনায় বসন্ত দেশাই আবহসংগীতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গোপীকৃষ্ণ ও নাজের একটি নৃত্যাংশ উপভোগ্য। ছবিখানির টেকনিক্যাল কাজ প্রশংসনীয়।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে চারখানি নতুন ছবির মুক্তি। বাংলায় যুবচিত্রের "পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট" ও মিরাকল্‌স্‌ ইণ্ডিয়ার "মৃতের মর্তো আগমন"। হিন্দীতেও দুখানি—স্টারল্যাণ্ড প্রোডাকসন্সের "ডাকা" ও ফিল্মিস্তানের "চাঁদ কি দুনিয়া।"।

হরিনারায়ণ ভট্টাচার্যের একটি হাসির গল্পকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের হাসির ছবি "পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট"। চিত্রকর নামে একদল কলাকুশলী পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা গাঙ্গুলী এর মুখ্য ভূমিকা দুটিতে কৌতুকের স্রোত বইয়েছেন। তাঁদের সংগে আছেন তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, অমর মল্লিক, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নচিকেতা ঘোষ এতে সুরযোজনা করেছেন এবং গানগুলি গেয়েছেন হেমন্তকুমার।

মিরাকল্‌স্‌ ইণ্ডিয়ার প্রথম নিবেদন "মৃতের মর্তো আগমন"-এর মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের প্রচুর সমাবেশ করা হয়েছে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এরও নায়ক। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে আছেন বাসবী নন্দী, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, তপতী ঘোষ, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবির কাহিনী [illegible] পরিচালনা করেছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

অশোককুমার অভিনীত "ডাকা"-র কাহিনী একটি বালক ডাকাতকে কেন্দ্র করে। হিন্দী ছবিসুলভ উত্তেজনাময় মুহূর্তের অভাব নেই এর মধ্যে। নিরূপা রায়, শ্যামা বিশ্বাস, মারুতি ও প্রাণ অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নানাভাই ভাট ও চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

"চাঁদ কি দুনিয়া" ফিল্মিস্তানের রূপক ছবি। মোহন সিংহের পরিচালনায় ও নির্মলকুমারের সুরযোজনায় ছবিটি গৃহীত হয়েছে।

• • •

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকেই এম বি ফিল্মসের "ক্ষণিকের অতিথি" মুক্তি পাবে। তপন সিংহ এই ছবিতে তাঁর পরিচালক জীবনের সমস্ত কাজ অতিক্রম করেছেন বলে প্রকাশ। নির্মলকুমার, রুমা গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজনকেও বিশেষ করে ভালো লাগবে এই ছবিতে।

তারপরই আসছে ছায়াচিত্র পরিষদের "রাজা সাজা"। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এর নায়ক-নায়িকা। প্রযোজনা

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "দেবী"-র নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর

ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন বিকাশ রায়—একটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন।

বড়দিনের নতুন আকর্ষণ এমকেজি প্রোডাকসন্সের "মায়ামৃগ"। নীহাররঞ্জন গুপ্তের মঞ্চ-সফল নাটকের চিত্ররূপ এটি। উত্তমকুমার, সন্ধ্যারাণী, বিশ্বজিৎ, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, সুনন্দা-দেবী, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর তারকাদীপ্ত ভূমিকালিপি। পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু।

অসামান্য প্রামাণ্য চিত্র

এই সপ্তাহে (২৭শে নভেম্বর থেকে) ফিল্মস ডিভিসনের মাধ্যমে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে আশীষ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত "মুর্শিদাবাদ" নামে একটি অসামান্য ঐতিহাসিক প্রামাণ্য চিত্র মুক্তিলাভ করেছে।

ঐতিহাসিক জনপদ মুর্শিদাবাদের উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্যে বাঙলার ইতিহাসের যে অধ্যায়টি অমর, অক্ষয় হয়ে আছে,—তাই রূপে-বর্ণে-রসে-ভাবে সুরমূর্ছনায় আশ্চর্য, সুন্দর ভাবরূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্রে। সুদৃশ্য প্রতিকৃতির সাহায্যে রূপকার ইতিহাস-পুরুষ মুর্শিদ কুলী খাঁ, নবাব আলিবর্দি ও নবাব সিরাজউদৌল্লাকে চিত্রটির বর্ণোজ্জ্বল রূপ-গরিমার মধ্যে শরীরী করে তুলেছেন। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, অস্ত্রাগার ও দর্শনীয় সব কিছুই ছবিটিতে নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে। জয়দেব বসু রচিত সাহিত্যরস-মণ্ডিত ভাষ্য পাঠ করেছেন সব্যসাচী। সব্যসাচীর আবেগমধুর নেপথ্যভাষণ ও শম্ভো গুহঠাকুরতার অনবদ্য সুরারোপ এই প্রামাণ্য চিত্রটিকে এক নিরুচ্ছ্বাস
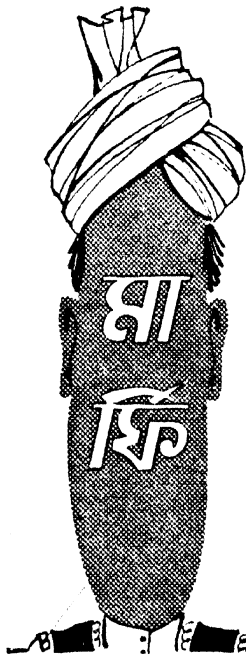
গীতিময়তায় অপূর্ব করে তুলেছে। প্রযোজক-পরিচালক আশীষ মুখোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যে তথ্য ও রস সমানভাবে পরিবেশিত। আলোকচিত্র এবং সম্পাদনায় যথাক্রমে কানাই দে ও মণি অধিকারী তাঁদের স্বকীয় কৃতিত্বে ছবিটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। প্রামাণ্য চিত্রটির আরও অনেক গুণ যা অনুক্ত রইল এবং যা-কিছু ব্যক্ত হল—এই সব কিছু নিয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় প্রামাণ্য-চিত্র প্রযোজনা-পরিচালনায় আশীষ মুখোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয় স্রষ্টা বিরল।

শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর গুণী সহকর্মীদের নিয়ে "কাঁসারি" ও "রেশম শিল্প" নামে আরও দুটি প্রামাণ্য-চিত্র তৈরী করেছেন। ফিল্মস ডিভিসনের মাধ্যমে এ-দুটি চিত্রও অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে। "রেশম শিল্প"-এর ভাষ্যপাঠে আছেন সবিতাব্রত দত্ত।

বিদেশী প্রমোদ অনুষ্ঠান

প্রতি বছর শীতের মরসুমে শহরের প্রমোদসূচী একাধিক ভ্রাম্যমান বিদেশী দলের আগমনে সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। এ বছরে এমনিধারা অনেকগুলি নামকরা দলের আগমন ঘোষিত হয়েছে এবং কয়েকটি দল ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রমোদ-আসর বসিয়েছেন কলকাতায়।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য আমেরিকান "ড্যান্স জুবিলী" দলের নাম। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রবর্তিত সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী এঁরা মধ্য প্রাচ্য ও এসিয়ার বড় বড় শহরগুলিতে অভিনয় করবার সংকল্প নিয়ে এসেছেন। চারদিন ধরে এঁরা অভিনয় করলেন এখানে—ক্যালিপসো কার্নিভ্যাল ও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে দুদিন এবং নিউ এম্পায়ার মঞ্চে দুদিন। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার আধুনিকতম জনপ্রিয় নৃত্য-গীতের একটি চমৎকার ধারাবাহিক বিবরণী পাওয়া গেল এঁদের প্রমোদ অনুষ্ঠানে। এগারোজন নৃত্যশিল্পী ও পাঁচজন সংগীত-শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত এই দলের নেতা রড অ্যালেকজাণ্ডার একজন উঁচুদরের নৃত্যশিল্পী, নাচগুলিও তাঁরই পরিকল্পিত। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পিছনে যে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল, এদেশের নৃত্যানুরাগীদের সেইটাই সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি দিয়েছে।

ইদানীং বিদেশী সার্কাসের ভারত সফর প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এবারে চেকোস্লোভাক স্টেট সার্কাসের আগমনে সে অভাব খানিকটা মিটেছে। গত সোমবার থেকে ইডেন উদ্যানের বিপরীতে গড়ের মাঠে এঁদের খেলা শুরু হয়েছে। এই দলে শিল্পীর সংখ্যা ৮০ জন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার বংশানুক্রমে সার্কাসের খেলোয়াড়। ট্রাপিজের দুঃসাহসিক খেলায় এঁদের খ্যাতি সারা ইউরোপ-জোড়া। চেকোশ্লোভাকিয়ার নৃত্য-গীতও এঁদের প্রমোদ-সূচীর অন্তর্গত। বাঘ, সিংহ, ঘোড়া ও কুকুর প্রভৃতির খেলাও বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

বিশ্ববিখ্যাত চেক ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রাও কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। আজ (২৮শে নভেম্বর) ভারতে তাঁদের প্রথম কনসার্টের উদ্বোধন হবে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। এই দলে আছেন চেকোস্লোভাকিয়ার ১২০ জন সুখ্যাত সংগীতজ্ঞ। কারেল আনসার্ল ও লাডিসলাভ স্লোভাক যুগ্মভাবে অর্কেস্ট্রার পরিচালনা করেন। এত বড় অর্কেস্ট্রা ভারতে এর পূর্বে আর কখনও আসে নি। কলকাতার অনুষ্ঠান শেষে এঁরা যাবেন বোম্বাইতে—তারপর দিল্লী। সেখান থেকে ৫ই ডিসেম্বর দলটি সোভিয়েট ইউনিয়ন অভিমুখে যাত্রা করবে।

অক্সফোর্ড প্লে-হাউস কোম্পানীও ভারতে এসে পৌঁছেছেন। এঁদের ভারত সফর শুরু হয়েছে পুনায়। তারপর বোম্বাইতে অভিনয় করে দলটি বর্তমানে সিংহলে গেছে। ৮ই ডিসেম্বর এঁদের মাদ্রাজে পৌঁছবার কথা। বাংগালোর, হায়দ্রাবাদ ও নাগপুর ঘুরে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটিতে এঁরা কলকাতায় আসছেন। এখানে পুরো একটি সপ্তাহ এঁদের অভিনয় চলবে। সেক্সপীয়র, শ' ও অন্যান্য আধুনিক নাটককারের রচনা এঁদের নাট্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

একলব্য

বোম্বাইয়ের গান্ধী মেমোরিয়াল সুইমিং পুলে ভারতের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবার ৬টি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলার কোন কৃতিত্ব নেই। থাকবেই বা কি করে? বাংলার যে মেয়ে সাঁতারুর তিনটি কি চারটি নতুন রেকর্ড করবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সাঁতার পটিয়সী সন্ধ্যা চন্দ্র এবার বাংলা দলের সঙ্গে বোম্বাই যাননি। ভারতীয় সাঁতার ক্ষেত্রে সন্ধ্যার সমকক্ষ আর কোন মেয়ে সাঁতারু না থাকায় মেয়েদের বিষয়েও কোন নতুন রেকর্ড হয়নি। ৬টি নতুন রেকর্ডই হয়েছে পুরুষদের সাঁতারে। এর মধ্যে পাঁচটি রেকর্ডই করেছেন সামরিক বিভাগের সাঁতারুরা বাকী রেকর্ড করার কৃতিত্ব বোম্বাইয়ের সাঁতারুদের। পুরুষদের সাঁতারেও বাংলার যে সাঁতারুর রেকর্ড করবার কথা ছিল এবং যিনি গতবার ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে নতুন রেকর্ড করেছিলেন সেই অরুণ সাহা অসুস্থ থাকায় তাকে দলভুক্ত করা হয়নি। সুতরাং বাংলার সাঁতারুরা এবার কোন রেকর্ড করতে পারেনি। তবু মেয়েদের সাঁতারের ৬টি বিষয়ের মধ্যে রিলে রেস প্রতিযোগিতা না করেও বাংলার মেয়েরা তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে, এটা কম গৌরবের নয়। কল্যাণী বসু প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে আর মীরা কাঞ্জিলাল প্রথম হয়েছেন ১০০ মিটার ব্যাক সাঁতারে। প্রতিযোগীর অভাবেই বাংলার মেয়েরা রিলে রেসে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। আর তার ফলেই বোম্বাইয়ের মেয়েরা লাভ করেছে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ।

পুরুষদের সাঁতারে ছয়টি নতুন রেকর্ডের মধ্যে পাঁচটি রেকর্ডই করেছেন আমাদের সামরিক বিভাগের সাঁতারুরা এ কথা আগেই বলেছি। সামরিক বিভাগের আরও কৃতিত্ব মোট ১৭টি বিষয়ের মধ্যে ১০টি বিষয়েই তাদের প্রতিনিধি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন রাম সিং ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে আর রামদেও সিং ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে। ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে বোম্বাই দল এবং ৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সামরিক দল আগের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সামরিক বিভাগের রাম সিং ও রামদেও সিংয়ের প্রতিষ্ঠিত নতুন রেকর্ড আগের রেকর্ডকে ম্লান করে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ভারতীয় সাঁতারেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবু বলি আন্তর্জাতিক সাঁতার মহলের তুলনায় এখনো আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। অলিম্পিকের মেয়েদের প্রতিটি বিষয়ের রেকর্ডও আমাদের পুরুষদের জাতীয় রেকর্ডের চেয়ে অনেক উন্নত।

তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—ভারতীয় অলিম্পিক কমিটি আমাদের কোন সাঁতারুকে রোম অলিম্পিকে পাঠাবেন না বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা অযৌক্তিক। কারণ অলিম্পিক থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন যে কোন

সাঁতার পটিয়সী কল্যাণী বসু

স্পোর্টসম্যানের ভবিষ্যৎ উন্নতির কম সহায়ক নয়। এর আগেও অলিম্পিকে সাঁতারু দল পাঠান হয়েছে। তখন আমাদের মান আরও নীচু ছিল। ১৯৫২ সালে আরতি সাহাকে যদি হেলসিংকি অলিম্পিকে না পাঠান হত তবে কি তিনি সাঁতারে অত তেমন অনুপ্রেরণা পেতেন? তাছাড়া অলিম্পিকের আদর্শ হিসেবেও প্রতি দেশের প্রতি বিভাগের ক্রীড়ানুশীলনদের অলিম্পিকে যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। জাতীয় সাঁতারের পর ভারতের সুইমিং ফেডারেশন কয়েকজন সাঁতারু ও দু'জন ডাইভারকে রোমে পাঠাবার জন্য অলিম্পিক কমিটির কাছে আবেদন করেছেন। আশা করি অলিম্পিক কমিটি সহানুভূতির সঙ্গে এর আবেদন মঞ্জুর করবেন।

• • •

দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় হায়দরাবাদ সেণ্ট্রাল পুলিস দল ১—০ গোলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ফাইনাল খেলায় মোটেই উচ্চাংগের ক্রীড়াধারা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। দুই দলের প্রায় তুল্যমূল্য খেলায় হায়দরাবাদ দল কোনভাবে একটি গোল করে 'ট্রফি' লাভ করেছে। অবশ্য দুই দলের খেলার তুলনামূলক বিচারে হায়দরাবাদ পুলিস দলের জয়লাভ একেবারে অসংগত হয়নি। কারণ আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের সংখ্যা সমান থাকলেও হায়দরাবাদের আক্রমণের ধারা ছিল একটু বেশী। মাঝ দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা না করে দুই পার্শ্বে খেলোয়াড়কে দিয়ে আক্রমণ চালাবার ফলেই তাদের খেলায় এই ধার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের খেলোয়াড়রা মাঝখান দিয়ে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন। ফলে হায়দরাবাদ পুলিসের রক্ষণভাগের পক্ষে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা তেমন কষ্টসাধ্য হয় না। খেলার একমাত্র গোলটি হয় খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে। একটি কর্ণার কিকের পর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের পা থেকে হায়দরাবাদ দলের রাইট আউট ফজলের পায়ে বল এলে তিনি বলটি গোলে শট করতে কোনই ভুলচুক করেন না। এই গোলেই এবার দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা টানে।

কলকাতা থেকে এবার চারটি ক্লাব দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলায় যোগ দিয়েছিল। এই চারটি ক্লাব হচ্ছে জর্জ টেলিগ্রাফ, এরিয়ান, ইস্টার্ণ রেলওয়ে ও মহমেডান স্পোর্টিং। জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবকে প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই দিল্লীর স্কুল একাদশের কাছে ২—১ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। এরিয়ান ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় ৪—০ গোলে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করে আম্বালা ফিরোজ দলের কাছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ২—০ গোলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের কাছে পরাজিত হয় আর কোয়ার্টার ফাইনালের অপর খেলায় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দল ২—১ গোলে পরাজিত করে গতবারের দিল্লী ক্লথ মিল ট্রফি বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে।

• • •

ঢাকায় পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল ৮ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। এখানে বলা প্রয়োজন পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রথম যে টেস্ট খেলা হয়েছিল সে খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

ম্যাটিং উইকেটে পাকিস্তান খুবই ভাল খেলে। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা

ম্যাটিংয়ে খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। তাই ঢাকার ম্যাটিং উইকেটে পাকিস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দল কেমন খেলে তা জানবার জন্য ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীদের যথেষ্টই আগ্রহ ছিল। ঢাকা টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলের সহজ সাফল্যের পর স্বাভাবিকভাবে সে আগ্রহের উপর যবনিকা পড়েছে। অবশ্য ঢাকা টেস্টে কোন দলের ব্যাটসম্যানরাই সামগ্রিক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। দুই দলেরই দু'একজন করে খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষে ভাল ব্যাটিং করেছেন হানিফ মহম্মদ ও নতুন খেলোয়াড় ডানকান শার্প আর অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভাল খেলেছেন নীল হার্ভে ও ওয়ালী গ্রাউট। কেউ-ই সেঞ্চুরী করতে পারেননি। কোন দলের রানও বেশী ওঠেনি। তাই খেলাটিকে লো-স্কোরিং টেস্ট বলা যেতে পারে। প্রতি-দিনের খেলায় ব্যাটসম্যানের উপর বোলার-দেরই প্রাধান্য প্রকাশ পেয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বিনোড টসে জিতেও প্রথমে ব্যাটিং করবার ঝুঁকি নেননি। একে বিজ্ঞ অধিনায়কের বিজ্ঞোচিত কাজ বলা যেতে পারে। ম্যাটিং উইকেটে তাদের বল কেমন পড়ে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরাই বা তাদের বল কেমন খেলেন এটাই বোধ হয় বিনোডের প্রথম দেখার ইচ্ছে ছিল। মোটের উপর তিনি চেয়েছেন অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে চলতে। প্রথম টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হক ক্ষতি নেই, হার না হয় বোধ করি এই ছিল বিনোডের মনোমত ইচ্ছা।

যাই হক পাকিস্তান দল প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে প্রথম দিনের খেলায় ৪ উইকেটে ১৪৬ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেন না। ৩০০ মিনিটের খেলায় মাত্র ১৪৬ রান টেস্ট খেলার পক্ষে খুবই কম রান। খ্যাতনামা ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ সাইদ আমেদ ও টেস্টে নবাগত ডানকান শার্প ছাড়া পাকিস্তানের আর কেউই অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে টিকতে পারেন না।

দ্বিতীয় দিন বাকী ৬টি উইকেট আর ৫৪ রান যোগ করে পাকিস্তান দল মোট ২০০ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করবার পর অস্ট্রেলিয়া দল ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান তোলে। অস্ট্রেলিয়ারও এক নীল হার্ভে ছাড়া আর কেউ পাকিস্তানের আক্রমণের মুখে বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে টিকতে পারেন না। এর মধ্যে লেস ফেভেল ও পিটার বার্জ কোন রান না করেই প্যাভেলিয়নে ফিরে যান। নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নরম্যান ওনীল প্যাভেলিয়নে ফিরে যান মাত্র ২ রান করে। দ্বিতীয় দিনে ১৭৯ রানের মধ্যে দুই দলের ১১টি উইকেট পড়ে যায়। এ হিসাব ব্যাটসম্যানদের উপর বোলারদের সুনিশ্চিত প্রাধান্যেরই পরিচয়। অবশ্য নীল হার্ভে এর ব্যতিক্রম। কীর্তিমান ব্যাটসম্যান চমৎকার ভঙ্গিতে খেলে খেলে রান সংগ্রহ করতে থাকেন, দিনের শেষে ৮০ রান করেও তিনি থাকেন অপরাজিত। এই দিনের খেলায় পাকিস্তানের তরুণ স্পিন বোলার নাসিমুল গনির ২৫ রানে ৩টি উইকেট পাবার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

তৃতীয় দিন ৯৬ রানের মাথায় যখন নীল হার্ভে ফজল মামুদের বলে আউট হয়ে গেলেন এবং ১৫১ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৮টি উইকেট পড়ে গেল, তখন কেউই আশা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ওয়ালী গ্রাউটের দৃঢ়তাপূর্ণ এবং চমকপ্রদ ব্যাটিংয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়া ২৫ রান বেশী করে ২২৫ রানে প্রথম ইনিংসে খেলা শেষ করবে। গ্রাউট ৬৬ রান করেও অপরাজিত রইলেন। পরে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের চারটি উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৭৪ রানে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হলে দেখা গেল রিচি বিনোড ও কেন ম্যাকের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে ১৩৪ রানে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেছে। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া করেছে ১ উইকেটে ৬৪ রান। জয়লাভের জন্য তাদের আর প্রয়োজন মাত্র ৪৬ রানের। হাতে ৯টি উইকেট। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক বিনোডের ৩৯.৩—২৬—৪২—৪ উইকেট ও কেন ম্যাকের ৪—২৬—৪২—৬ উইকেট লাভের হিসাব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বিনোড এক সময় এমন মারাত্মকভাবে লেগ স্পিন দিচ্ছিলেন যে, ৯ ওভারে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানেরা একটিও রান করতে পারেননি।

পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলায় তার কোনই আকর্ষণ ছিল না। এক ঘণ্টার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া দল আর একটি উইকেট হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ৮ উইকেটে জয়লাভ করে। নির্দিষ্ট সময়ের ৪ ঘণ্টা আগে খেলাটি শেষ হয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়া দলের সহ অধিনায়ক নীল হার্ভে

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস—২০০ (হানিফ মহম্মদ ৬৬, ডানকান শার্প ৫৬, সাইদ আমেদ ৩৭; এলান ডেভিডসন ৪১ রানে ৪ উইকেট, রিচি বিনোড ৬৯ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—২২৫ (নীল হার্ভে ৯৬, ওয়ালী গ্রাউট ৬৬; ফজল মামুদ ৭১ রানে ৫ উইকেট নাসিমুল গনি ৫১ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান— দ্বিতীয় ইনিংস— ১৩৪ (ডানকান শার্প ৩৫, ইজাজ বাট ২০; কেন ম্যাকে ৪২ রানে ৬ উইকেট, রিচি বিনোড ৪২ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(২ উইঃ) ১১২ (কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৪৪, নীল হার্ভে ৩০, নর্মান ওনীল ২৬)

(অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী)

• • •

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ৫ জন খেলোয়াড়ের পরিচয় গত সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। এবার আর ৪ জনের পরিচয় দেওয়া হল:—

নীল হার্ভে

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের সহ অধিনায়ক নীল হার্ভে বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যাট খেলোয়াড়দের অন্যতম। যেমন সাবলীলভাবে জোরে খেলে ইনি রান সংগ্রহ করেন তেমনই এর ব্যাটিংয়ের নিপুণ ভঙ্গিমা, অথচ ফিল্ডসম্যান হিসাবেও বিশ্ব ক্রিকেটে নীল হার্ভের জুড়ি কম। হার্ভে আগে 'কভারের' পরম নির্ভরযোগ্য ফিল্ডস-ম্যান ছিলেন। এখন ফিল্ডিং করেন স্লিপে এবং যে ক্যাচ ধরা এক রকম অসম্ভব, তাও হার্ভের হাতে এসে যায়। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ অনেকের অভিমত: শুধু ফিল্ডিংয়ের জোরেই হার্ভে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দলে স্থান পেতে পারেন। ব্যাটিংয়ের তো কথাই নেই।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় হার্ভে এ পর্যন্ত ৫২ বার সেঞ্চুরী করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে স্যার ব্র্যাডম্যান ও হ্যাসেট ছাড়া আর কেউ এত বেশীবার সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ১৯৪৭-৪৮ সালে নীল হার্ভের বয়স যখন মাত্র ১৯ বছর, তখন অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান এবং মেলবোর্ন টেস্টে ১৫৩ রান করেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এইটিই তার জীবনের প্রথম

সেঞ্চুরী। পরের বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে হার্ভে সেঞ্চুরী করে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ক্ষেত্রে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুইটি টেস্ট সমেত এ পর্যন্ত ৫৯টি টেস্ট খেলায় হার্ভে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

গত বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ৯টি ইনিংসে হার্ভে করেছেন ২৯১ রান। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী রান হচ্ছে ১৬৭। তিনটি ইনিংসে হার্ভে নট আউট ছিলেন। ব্যাটিং অ্যাভারেজে হার্ভের স্থান ছিল তৃতীয়।

হার্ভে সিডনীর এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। বয়স ৩১ বছর। আগে ভিক্টোরিয়ার খেলোয়াড় ছিলেন। এখন নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলোয়াড়। নীল হার্ভে হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিংয়ের এক প্রধান আকর্ষণ।

লিণ্ডসে ক্লীন

ন্যাটা স্পিন বোলার লিণ্ডসে ক্লীন [illegible]-বোলের একজন সেলসম্যান। এর বলের লেংথ এবং ডিরেকশন দুই-ই চমৎকার।

স্পিন বোলার লিণ্ডসে ক্লীন

১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলে ক্লীন সর্বপ্রথম স্থান পান এবং চারটি টেস্ট খেলায় ১৫টি উইকেট দখল করে বোলিং অ্যাভারেজ তালিকায় শীর্ষস্থান পান। কিন্তু গত বছর নিজের মাটিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ক্লীন মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এর সাফল্য দেখেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি টেস্টে ক্লীনকে দলভুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু দুটি টেস্টে একটিও উইকেট পাননি। অবশ্য একে দিয়ে বলও করান হয়েছে কম। দুটি টেস্টে ২৫ ওভারের মধ্যে ৭৭ রান দিয়ে ৬টি 'মেডেন' পেয়েছেন। গতবার অবশ্য প্রথম শ্রেণীর খেলায় ক্লীন দখল করেছেন ৩৪টি উইকেট। তবে এর জন্য যথেষ্টই মূল্য দিতে হয়েছে। ৩৪টি উইকেট পেতে একে রান দিতে হয়েছে ১২৫৫। লিণ্ডসে ক্লীন ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড়। বয়স ২৫ বছর।

কেন ম্যাকে

কেন ম্যাকে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে পারদর্শী একজন চৌখস খেলোয়াড়। অবশ্য

চৌখস খেলোয়াড় কেন ম্যাকে

বোলিংয়ের চেয়ে ব্যাটিংয়েই ম্যাকের নাম ডাক বেশী। কিন্তু ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাকের ৪২ রানে ৬টি উইকেট লাভের ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। ম্যাকে একজন ন্যাটা ব্যাটসম্যান, ডান হাতের মিডিয়াম পেস বোলার এবং সাধারণতঃ 'ডিপ'-আউটের ফিল্ডসম্যান। একে অস্ট্রেলিয়া দলের [illegible] কিন্তু [illegible] ব্যাটসম্যান হিসাবেও [illegible] [illegible] কারণ ইংলণ্ডের টেস্ট [illegible] ইনি উইকেটে [illegible] থাকতে পারেন। তবে এর [illegible] রান [illegible] কম। [illegible] প্রয়োজন হলে [illegible] খেলাতেও পারেন।

ভারত ও পাকিস্তান সফরে আসার আগ পর্যন্ত কেন ম্যাকে ১৬টি টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫৬ সালে ইংলণ্ডে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইনি সর্বপ্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান, কিন্তু সুবিধা করতে পারেন না। ১৯৫৭-৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট খেলার ব্যাটিং অ্যাভারেজ তালিকায় ম্যাকে পেয়েছিলেন শীর্ষস্থান। গত বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি ইনিংসে ২৩·৬ রানের অ্যাভারেজে ম্যাকে ১১৮ রান করেছিলেন।

কেন ম্যাকে বিসবেনের এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ইনস্পেক্টর। কুইন্সল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়। বয়স ৩৩ বছর।

আয়ান মেকিফ

ন্যাটা ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফ গত বছর অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান টেস্টের বোলিং অ্যাভারেজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। মেকিফ একজন আক্রমণাত্মক বোলার। যেমন এর বলের তীব্র গতি, তেমনই এর বল বাতাসের মধ্যেই ঘুরে গিয়ে উইকেট আক্রমণ করে।

আয়ান মেকিফ সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ পান। ভারত ও পাকিস্তান সফরের আগে পর্যন্ত মেকিফ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৮টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ৪টি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এবং ৪টি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। গতবার ইংলণ্ডের কোন ব্যাটসম্যানই মেকিফের বলে সুবিধা করিতে পারেননি। টেস্টে ইনি ১৭·১ রানের অ্যাভারেজে ১৭টি উইকেট দখল করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে মেকিফ নিউজিল্যাণ্ডও সফর করেছেন। তবে সেখানে টেস্ট খেলেননি। সেখানে প্রথম শ্রেণীর খেলায় ইনি ১১·৬ রানের অ্যাভারেজে ২০টি উইকেট দখল করে প্রথম শ্রেণীর খেলায় বোলারদের তালিকায়

ন্যাটা ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফ

শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন। ফিল্ডসম্যান হিসাবেও এর খ্যাতি আছে।

আয়ান মেকিফের বয়স ২৪ বছর। ইনি ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড় এবং [illegible]-[illegible] একজন সেলসম্যান।

দেশী সংবাদ

১৬ই নভেম্বর...প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহর, আজ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে বলেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু এন লাই যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা "আমাদের নিকট কার্যে পরিণত করার অযোগ্য" বলিয়া মনে হইয়াছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীসাদাত আলি খাঁ অদ্য লোকসভায় বলেন যে, কন্‌সাইজ অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারীতে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশরূপে যে উল্লেখ করা হইয়াছে, অক্সফোর্ডস্থিত ক্ল্যারেণ্ডন প্রেস তাহা উঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন।

১৭ই নভেম্বর—কাছাড় জেলার টুকেরগ্রাম নামে একটি ভারতীয় গ্রাম গত পনের মাস যাবৎ পাকিস্তানীরা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। অদ্য টুকেরগ্রাম পাকিস্তানীদের কবলমুক্ত হইয়াছে। অদ্য ভোরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর নওজোয়ান তে-রঙা পতাকা হাতে ঐ গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসার শ্রীসাদিক আলী আজ জানান যে, অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির নাম অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৮ই নভেম্বর—চীনা সেনাবাহিনী যে কোন মুহূর্তে ভুটানে প্রবেশ করিতে পারে। শিলিগুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ—ভুটানের দিকে সমগ্র ভুটান-তিব্বত সীমান্ত অরক্ষিত অবস্থায় আছে। এই সীমান্তে ভুটানের মোট ১৪টি পরীক্ষা ঘাটিই সম্পূর্ণ অরক্ষিত রহিয়াছে। সীমান্তের অপর দিকে চীনা সৈন্যের অতি বৃহৎ সমাবেশ পরিলক্ষিত হইতেছে।

১৯শে নভেম্বর—শিয়ালদহ স্টেশন উদ্বাস্তু-মুক্ত করার জন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর এক নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টেশন ত্যাগ করিবেন তাঁহাদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এক থোকে ৫০০, টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের কয়েকটি বাড়িতে হানা দিয়া পুলিস অদ্য প্রায় ৫০টি পাকিস্তান যাওয়ার জাল ছাড়পত্র, ২টি ক্যামেরা, ছাড়পত্রের অনেকগুলি ফটো ইত্যাদি নানা জিনিস উদ্ধার করে এবং এই সম্পর্কে চারিজনকে গ্রেপ্তার করে।

দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সীমান্তবর্তী আরও দুই একটি এলাকায় চীনা গুপ্তচর ও এজেণ্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, কালিম্পংই ইহার প্রধান ঘাটি।

২০শে নভেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু উভয় দেশের মধ্যে সীমান্তের সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে চু এন লাইয়ের প্রস্তাবের বিকল্প প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রথম কথা হইতেছে চীনা সৈন্যকে ভারতীয় এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত উভয়পক্ষই সীমান্ত ঘাটি হইতে অগ্রবর্তী টহলদার বাহিনী প্রেরণে বিরত থাকিবেন।

দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির পর বিদ্রোহী নাগা নেতা শ্রী এ জেড ফিজো নাগাভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন বলিয়া বে-সরকারী সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গতকল্য শেষ রাত্রে আসানসোলে জামুরিয়া থানার অন্তর্গত শ্রীপুরে কোলিয়ারীতে এক শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলে ৭ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং আরও ৪ জন গুরুতররূপে আহত হয়।

২১শে নভেম্বর—অদ্য সেক্রেটারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, দণ্ডকারণ্যের মুখ্য পরিচালক শ্রীক্ষেত্রের পরিবর্তে যে নূতন একজন পরিচালক নিযুক্ত হইতেছেন তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছেন। এক অসমর্থিত সংবাদে ইহাও প্রকাশ যে, শ্রীখান্নাকেও পুনর্বাসন দপ্তর হইতে সরিয়া যাইতে হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন খাতে যে টাকা বরাদ্দ ছিল, তাহা পাঁচ বৎসর মেয়াদের সঙ্গে তাল রাখিয়া আশানুরূপভাবে ব্যয় করা হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আর দেড় বৎসর বাকী, কিন্তু প্রকাশ, মোট বরাদ্দ ১৫৭ কোটি টাকার শতকরা ৫৬ ভাগ এখনও অব্যয়িত পড়িয়া আছে। বাকী সময়ের মধ্যে বাকী টাকা ব্যয় করা কঠিন হইয়া পড়িবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন।

২২শে নভেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য ঘোষণা করেন যে, চীনাগণ কর্তৃক সীমান্ত আক্রমণের বিপদ ভারতে দৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর ভারি শিল্প স্থাপনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যায় হাজরা পার্কে ভারতভূমিতে চীনা আক্রমণের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে চীন কর্তৃক ভারতভূমি আক্রমণে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং আক্রমণকারীর সহায়তায় পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপে লিপ্ত দেশদ্রোহী কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে দেশবাসীকে সদা সজাগ থাকিবার জন্য আহ্বান জানান।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই নভেম্বর—আজ ব্লেমাটে নূতন সাধারণতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট জেনারেল দ্য গলের আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি পুরাপুরি সমর্থিত হয়।

১৭ই নভেম্বর—আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষমূলক নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ৬২টি রাষ্ট্র প্রস্তাবের অনুকূলে ও ৩টি বিপক্ষে ভোট দেয় এবং ৭টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে।

শ্রীনেহরুর জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গতকল্য রাত্রে লণ্ডনে এক ভোজসভায় অতিথিরূপে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রীনেহরু দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শবাদের মধ্যে যোগসূত্র। এই যোগসূত্র ছিন্ন হইলেই আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন দেখিতে পাইব।

১৮ই নভেম্বর—গতকল্য রাত্রিতে ভোকাশিতে এক বক্তৃতায় শ্রীখ্রুশ্চেভ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি এমন একটি সোভিয়েট কারখানা পরিদর্শন করিয়াছেন, যেখানে হাইড্রোজেন বোমাবর্ষী আন্তর্মহাদেশিক রকেট প্রতি বৎসর উৎপাদিত হয় এবং তিনি দম্ভের সহিত বলিয়াছেন : "বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমরা এই সমস্তই সমুদ্রের জলে ডুবাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

১৯শে নভেম্বর—[illegible] সম্পর্কে পুলিস [illegible] মন্ত্রী শ্রীমতী [illegible] ও [illegible] শ্রীগোয়েঙ্কা [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২০শে নভেম্বর—[illegible] কার্যকলাপ [illegible] সরকারের [illegible] করিয়াছেন।

পিকিং এর [illegible] কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এক সংবাদে জানা যায় যে, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০০০০০০ জন। এই সংখ্যা রাশিয়া সহ সকল সোভিয়েট জোটের মোট সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

২১শে নভেম্বর—রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [illegible] বিজ্ঞান, [illegible] শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক দুই বৎসরের জন্য এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। [illegible] সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান [illegible] কর্তৃক আজ এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

অদ্য রাত্রে [illegible] যাইবার জন্য বিমানবন্দর ত্যাগ করিবার অল্পক্ষণ পরেই [illegible] বিমানবন্দরের নিকট ভূপতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার ফলে ২৯ জন নিহত ও ৩ জন আহত হইয়াছে।

২২শে নভেম্বর—স্থায়িভাবে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কে জেনেভা বৈঠক দ্রুত ঐকমত্যে পৌঁছিবার জন্য আণবিক শক্তির অধিকারী তিনটি রাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানাইয়া অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্পাদক—**শ্রীঅশোককুমার সরকার** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সহরের কারসাজী

ভুতোদা: আহাহা কি রান্না! কি স্বাদ! কিরে বিমলা বল বল।

বিমল: সত্যিই অপূর্ব রান্না! আমাকে আর একটু মাছের ঝোল দিনতো।

বিনয়: আমাকেও আর একটু চচ্চড়ী। সত্যিই ডালনা, মাছ, তরকারী মাংস সবই অপূর্ব।

ভুতোদা: ভাগ্যিস সেদিন মেনিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তানাহলে এই পোড়া সহরে কি এমন রান্না খাওয়া যায়। মেনিদি ৪ মাস আগে তোমার মধুপুরের বাড়ীতে খেয়েছি সে রান্নার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মেনিদি: কি যে বল ভুতো। এত বিরাট সহর-এত লোক-জন এখানে ভাল রান্নার আর অভাব কি?

বিমল: আপনাকে যে এত ভাল ভাল হাতের রান্না খাওয়ালাম!

ভুতোদা: ছ্যা:! এ সহরের লোকজনের তাড়াহুড়ো করেই জীবন কেটে যায়। রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করবে কখন?

বিনয়: তার মানে?

ভুতোদা: সবসময় পথে ঘাটে প্রান হাতে করে চলা। মেনিদি, সেদিন তোমার বাড়ী আসার জন্য প্রান হাতে করে তো এক বাসে উঠে পড়লাম। গাদাগাদি ভীড়। চৌরঙ্গীর কাছে, আমার পেছনের ভদ্রলোক পিঠে খোঁচা মেরে হাতঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন" আপনি আমার পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ৯ টা ৪৫ মি: এখন সোয়া দশটা-দয়া করে যদি নামেন তাহলে আমি অফিস যেতে পারি।

বিমল: হ্যা: হ্যা: হ্যা:

ভুতোদা: হাসছিস কি! এরকমভাবে বাঁচলে কখনও ফাইন আর্ট্ বাঁচে? রান্না খাওয়া এগুলো ফাইন আর্ট। অনেক সময় লাগে, অনেক যত্ন লাগে। মেনিদি, যদি এই পোড়া শহরে বেশিদিন থাকেন, তাহলে এরকম রান্না করতে পারতেন?

বিনয়: কেন না? তাড়াহুড়ো তো আমরা করছি। রান্না তো করে মেয়েরা, তাদের আর তাড়াহুড়ো কোথায়?

ভুতোদা: ইকনমিক্স পড়েছিস? ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা জানিস? যারা খাবে তারা যদি ভাল খাবার না চায় তাহলে যারা রান্না করে তাদের ভাল খাবার করার উৎসাহ থাকে? আর সারাদিন বাসে ট্রামে আফিসে দৌড়ঝাঁপ করে আর ভাল খাবার সম্বন্ধে তাহার উৎসাহ কোথায়?

বিমল: আপনি বলতে চান যে এখানে ভাল রান্না হতে পারেনা?

ভুতোদা: হয় তো হতে পরে কিন্তু আমাদের মধুপুরের মত নয়। ওখানে দৌড়ঝাঁপ নেই-লোকে মনের আনন্দে খায়, মেয়েরা সবসময়ই নতুন নতুন খাবারের কথা ভাবে। এই মেনিদির রান্নাই দ্যখনা।

মেনিদি: কেন বারে বারে আমার রান্নার কথা বলছো ভুতো। রান্না সম্বন্ধে আমরা কি সহরের কাছ থেকে কম শিখেছি।

বিমল: দেখুনতো মেনিদি। নতুন জিনিষতো সহরেই আগে আসে তারপর যায় মফস্বল গ্রামে। ইলেট্রিক, গ্যাস, এ্যালুমিনিয়াম সবইতো সহরে প্রথম এসেছিল।

বিনয়: আপনি রান্না বান্নার কথা বলছেন তো "ডালডা"র কথাই ধরুননা। "ডালডা" এখন সহরে গ্রামে লক্ষ, লক্ষ পরিবারে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু "ডালডা" প্রথম এসেছিল কোলকাতা সহরেই বাজারে।

ভুতোদা: তুমিও কি "ডালডা" ব্যবহার কর নাকি মেনিদি?

মেনিদি: নিশ্চয়ই। আজকের সব রান্নাই তো "ডালডা"য় হয়েছে।

ভুতোদা: এ্যাঁ:! ডাল, চচ্চড়ি, শুক্তো,মাছ, সবই "ডালডা"য়? আমিতো জানতাম "ডালডায়" শুধু ভাজাভুজিই হয়।

বিমল: কেন ভুতোদা আপনাকে তো আমরা আগেই বলেছি যে "ডালডা" সব রান্নার পক্ষেই ভাল এবং পুষ্টিকর। সেইজন্য এখন লক্ষ লক্ষ বাড়ীতে "ডালডা" ব্যবহার হচ্ছে।

ভুতোদা: ও: সেজন্যে! মেনিদি, আমি তাই ভাবছিলাম যে তোমার মধুপুরের বাড়ীর রান্নাটা এত বেশী ভাল হয়েছিল কেন। এতক্ষনে বুঝলাম।

মেনিদি: আমার মধুপুরের বাড়ীতেও সব রান্নাই "ডালডা"য় হয়। তুমি যেদিন খেয়েছিলে সেদিনও সব রান্নাই "ডালডা"য় হয়েছিল।

বিমল: কি ভুতোদা, আর সহরের নিন্দে করবেন?

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই।

DL/P.3-X54 BG

REG. NO. C. 2109

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা-৯

৭ বর্ষ] শনিবার, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 21st November, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৩
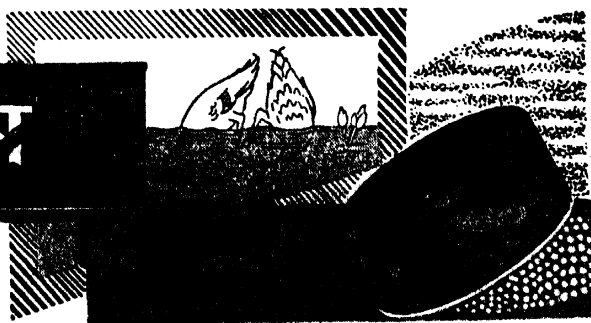
ব্রীজ্
Breeze
Breeze

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক সংকলিত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

ভূমিকা ও মুখবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর

প্রথম ভাগ — প্রথম খণ্ড ॥ দাম—সাত টাকা

পরশুরামের নতুন বই

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প

দাম—তিন টাকা

বুদ্ধদেব বসুর নতুন উপন্যাস

শোণপাংশু

দাম—চার টাকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন

টোপ ও টোপর

দাম—দু' টাকা

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন মিশর

বহু চিত্রে সমৃদ্ধ। দাম—৫.৫০

অপূর্বরতন ভাদুড়ীর

মন্দিরময় ভারত

দ্বিতীয় খণ্ড। দাম—৬.০০

অজিত দত্তর কবিতার বই

জানালা

দাম—দু' টাকা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

জাপানে

বাংলা সাহিত্যের অসামান্য বই

দাম—৬.৫০

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

আধুনিক বাংলা কবিতা

সুমুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণ

দাম—৬.০০

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

কাব্য দীপালি

দাম—৭.০০

নবনীতা দেব-এর কবিতার বই

প্রথম প্রত্যয়

দাম—১.৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

= মিত্র ও ঘোষের সাহিত্য-সম্ভার =

নিরুপমা দেবীর নূতন উপন্যাস

প্রত্যর্পণ ৩

শ্যামলী ৫, অনুকর্ষ (যন্ত্রস্থ)

আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস

ছাড়পত্র ৪॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চিরনূতন উপন্যাস

দেবযান ষষ্ঠ মুদ্রণ **৫**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সর্বাধুনিক উপন্যাস

উত্তর ফাল্গুনী ৬॥

হীরাচুনি পান্না নূতন সং **৪॥**

প্রবোধকুমার সান্যালের

শ্রেষ্ঠ গল্প

তৃতীয় সংস্করণ—পাঁচ টাকা

সন্মথনাথ ঘোষের

পরপূর্বা ৪॥

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

অনন্যসাধারণ রম্য-রচনা

অকারণের পথ

"এক কথায় বলতে গেলে একে ভ্রমণ-কাহিনীই বলতে হয়। বলতে হয় কারণ ভ্রমণ যেখানে সহজ স্বতোৎসারিত গতিতে কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়, আর কাহিনীর রস যেখানে ভ্রমণের প্রতি পদক্ষেপ পুষ্ট করে তোলে—সেরকম বইয়ের জন্য পৃথক কোন নাম এখনো স্থির হয়নি। ভ্রমণের নেশা, সূক্ষ্মদৃষ্টি, পরিবেশনচাতুর্য ও লিপি-কুশলতা, সংবেদনশীল গভীর অনুভূতি এবং কাহিনী গঠনের নিপুণ দক্ষতা—এতগুলি উপকরণের সমন্বয় আর সার্থক সহযোগিতার দ্বারাই শুধু এ ধরনের গ্রন্থ রসোত্তীর্ণ করে তোলা সম্ভব। 'অকারণের পথ'-এ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই সরকটি চিত্তবৃত্তি আর রচনবৈচিত্র্যের শিল্পনিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন।...বার বার তিনি সেই একই পথে একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসেছেন—পথ আর প্রকৃতি দেখেছেন, মানুষ আর মানুষের অন্তরের খুঁটিনাটির মধ্যে অজস্র বিস্ময়, অজস্র হৃদয়ের সম্পদ আহরণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ আর প্রতিটি দেখা সৃষ্টিরই নামান্তর।...পাঠকের চিত্তমন ভরে দেবার মতই বই 'অকারণের পথ'। পড়তে পড়তে হাসি কৌতুক বেদনা মাধুর্য বিস্ময় কোন্‌টা কখন কার গায়ে গিয়ে পড়ে ঠিক নেই।" —যুগান্তর

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

প্রফুল্ল রায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

নাগমতী নূতন সংস্করণ পাঁচ টাকা

তটিনী তরঙ্গে নূতন উপন্যাস যন্ত্রস্থ

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ব্রিটানিয়া

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতন ভালো জিনিস আর হয়না। অতিরিক্ত ভিটামিন ও পুষ্টিকর জিনিসে তৈরী ব'লে দৈনন্দিন খাদ্যে পুষ্টির অভাব মেটায়, স্বাস্থ্য ভালো করে ও শক্তি বাড়ায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে এত ভালো যে বাচ্চারা ব্রিটানিয়ার লোভ সামলাতে পারে না।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট বড়দেরও ভারি প্রিয় জিনিস। ভালো জিনিস ছাড়া যাঁদের চলেনা তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই চান — স্বাদে ও গন্ধে অপূর্ব এ বিস্কুট।

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

BC 3825

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

কেশরাশি
কি ক'রে
সুন্দর হ'ল ...

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 21st November, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ ৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য

বিশ্বভারতীর নূতন উপাচার্য মহোদয়কে আমরা স্বাগত জানাইতেছি আর সেইসঙ্গে প্রার্থনা করিতেছি যে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য তাঁহাকে শুভ ইঙ্গিত দান করুন, যাহাতে তিনি কর্তব্য সাধনে শক্তিলাভ করেন। শ্রীযুক্ত দাশের উপাচার্য নির্বাচিত হওয়াতে দেশের লোকে আশ্বস্ত আর শান্তি-নিকেতনিকগণ আনন্দিত হইবেন নিঃসন্দেহ।

গত কয়েক বৎসর বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনায় বড়ই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল, শেষ পর্যন্ত তাহা কানাকানির আসর অতিক্রম করিয়া সংবাদপত্রের সমালোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতে বাঙালী সমাজ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল কেননা অনেকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের চাক্ষুষ প্রতীক বলিয়া মনে করেন। সেই সব শোচনীয় ইতিহাসের মধ্যে এখানে প্রবেশ করিবার কারণ দেখি না, শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখন বিশ্বভারতীর সুনাম ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছিল, যখন যোগ্য উপাচার্যের উপরে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করিবার জন্যে সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল সেই সময়ে, সেই সঙ্কটময় সময়ে শ্রীযুক্ত দাশ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সকলকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন।

আমরা দূর হইতে যতদূর বুঝি বিশ্বভারতীর সমস্যা সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সমস্যা নয়। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়, ইহার নির্ভর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের উপরে, ইহার পোষণ রবীন্দ্রনাথের মনীষায়। সেই আশ্রমগুরু যখন তিরোহিত হইলেন তখন আশ্রমটি অসহায় হইয়া পড়িল। কে সেই মহার্ঘ স্থান অধিকার করিবে? তাহা তো মানুষে সম্ভব নয়। তবে বিশ্বভারতীর আশ্রয় হইবে কি? ব্যক্তিত্বের উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া উহাকে ব্যবস্থাপনার উপরে স্থাপন করা ছাড়া আর তো উপায় রহিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কাজটিই সম্ভব হইয়া উঠিল না। ব্যক্তিত্বের আশ্রয়চ্যুত প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার আশ্রয় লাভ করিল না ফলে দোদুল্যমান হইয়া নিরন্তর আন্দোলিত হইতে থাকিল। দূর হইতে এই আন্দোলনটাই বিশৃঙ্খলা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের বেলায় এই সমস্যা নাই। এক উপাচার্য বিদায় নিলে ঘড়ির কাঁটার মতো আর এক উপাচার্য আসেন, কারণ ইহাদের সৃষ্টি আইনের বলে, কাহারো ব্যক্তিত্ব হইতে নয়। এসব প্রতিষ্ঠান অনেকটা যান্ত্রিক ব্যাপার। বিশ্বভারতী কোন কালেই যান্ত্রিক ছিল না, সব অভাব পূরণ করিতেন আশ্রমগুরু স্বয়ং। কিন্তু তাঁহার অভাবে এখন স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ব্যবস্থাপনার ভিত্তিটা বেশ পাকা করিয়া গড়িতে হইবে। ইহাই এখন শ্রীযুক্ত দাশের সম্মুখে একমাত্র কর্তব্য না হইলেও সবচেয়ে কঠিন কর্তব্য।

কিন্তু যন্ত্রটাই প্রতিষ্ঠানের সব নয়, উহার একটা অন্তরের দিক, একটা দরদের দিক আছে—যাহা মানুষকে মানুষ বলিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। এই অভাবটা পূরণ করিবার ক্ষমতা শ্রীযুক্ত দাশের আছে, তাঁহার সহিত যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁহারা সকলেই জানেন। সব দিক বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। পরিণত বয়সে আশ্রমজননীর সেবা করিবার যে অধিকার তিনি লাভ করিলেন—সেই অধিকার সার্থক হইয়া উঠিয়া তাঁহার জীবন আনন্দময় ও গৌরবময় হোক ইহাই আমরা কামনা করি।

ছাত্রদের কর্তব্য কি, তারা রাজনীতি করবে কিনা, এ নিয়ে গবেষণা আজ থেকে নয়, অনেকদিন থেকেই হচ্ছে—সেই ইংরেজ আমল থেকেই। তখন রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন যে সমস্ত শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁরা এবং রাজপুরুষেরা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করবারই উপদেশ দিতেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রয়োজনে বারে বারে ছাত্রদের ডাক দিয়েছেন। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে ছাত্রদের 'গোলামখানা' (বিদেশী শাসকের পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি 'গোলামখানা' আখ্যা দিয়েছিলেন) ত্যাগ করবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের ডাকে অসংখ্য ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিল। মিছিল করেছিল, পুলিসের লাঠি খেয়েছিল, পুনঃ পুনঃ কারাবরণও করেছিল। আজ ইংরেজ নেই। ভারত স্বাধীন হয়েছে কংগ্রেসের হাতে শাসনভার। আজ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বলতে আরম্ভ করেছেন, ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই উচিত। অধ্যয়নই তাদের তপস্যা।

কথাটার উপর ছাত্রেরা খুব গুরুত্ব আরোপ করতে পারছে না। তারা দেখছে, যাদের হাতে শাসনভার আসে, তারাই ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান পছন্দ করছেন না। তারা সন্দেহ করছে, ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান শাসকের পক্ষে অসুবিধা-জনক বলেই একথা বলা হচ্ছে। আবার এও দেখছে কলেজে-স্কুলে-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির ভিত্তিতে ছাত্র-সংস্থা গঠনে প্রত্যেক দলই অনলস। তার ফলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান শুধু ছাত্রদের পক্ষেই নয়, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর।

*

সম্প্রতি কলিকাতায় যে নিখিল বঙ্গ ছাত্রসম্মেলন হয়ে গেল তাতেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাধ্যক্ষ মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়। তিনি রাজনীতির লোক নন। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে এবং জাতিগঠনের চেষ্টাও নিশ্চয়ই হচ্ছে। তথাপি দুঃখ, দারিদ্র্য এবং দুর্দশা অন্তর্হিত হয়নি। ছাত্রদল জাতির স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। খ্যাতি অথবা পুরস্কারের প্রত্যাশা না রেখে নিঃশব্দে জাতির দুর্দশা মোচনের ভার গ্রহণ তাদের করতে হবে। নিজেদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে অবশ্যই তারা সচেতন থাকবে। তার জন্যে তারা আন্দোলনও করতে পারে। কিন্তু তা তারা করবে ছাত্র হিসাবেই, কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য অথবা অনুচর হিসাবে নয়। তিনি আরও বলেছেন, যেসব রাজনৈতিক নেতা ছাত্রসমাজকে উত্তেজিত করে মিছিল, ধর্মঘট, প্রায়োপবেশনে যোগদানের আহ্বান জানান তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের অনিষ্টই করেন।

খুবই খাঁটি কথা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত জটিল দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। যে কথা দাশ মহাশয় বলেছেন তার সত্যতা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও বোঝেন এবং ছাত্রেরাও যে একেবারে বোঝে না তা নয়। কিন্তু ছাত্র ছাড়া আন্দোলন চলে না। সুতরাং দেশের মধ্যে আন্দোলন যতদিন থাকবে ততদিন রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের কাছে তাদের প্রয়োজনও থাকবে এবং রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দূরে থাকতে দেবে না। আর কিছু না হোক, অন্তত ছাত্রদের অভাব অভিযোগ ও অধিকার থেকে উদ্ভূত আন্দোলনের সুযোগ নিয়েও তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সংযোগটা রেখে চলবে।

*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ছাত্র-সমাজের সঙ্গে তাঁর কয়েক বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা যাচ্ছে তার জন্য তিনি একশ্রেণীর শিক্ষকদেরই দায়ী করেছেন। এই অভিযোগ আরও অনেকে করেছেন। তাঁদের ধারণা, রাজনৈতিক সংস্রবযুক্ত এক-শ্রেণীর শিক্ষকদের কাছ থেকেই ছাত্রেরা শৃঙ্খলাভঙ্গের প্ররোচনা ও প্রশ্রয় পেয়ে থাকে।

আসল কথা হচ্ছে ছাত্রেরা করবে কি? ক্লাসে পড়াশুনা হয় না। অধ্যয়নই যে তাদের একমাত্র তপস্যা, শিক্ষায়তনে তাদের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টাই হয় না। এবং পড়াশুনা যে হয় না সে সম্বন্ধেও পরীক্ষার ফলপ্রকাশের সময় বৎসরে একবার মাত্র সচেতন হই। তখন একবার হৈ চৈ হয়, তারপরেই আবার চুপচাপ। বিচারপতি দাশ মহাশয় বলেছেন, "শিক্ষাদান ব্যাপারটা ঠিক বাজারের পণ্যবিক্রয়ের মতো নয়।" শিক্ষকের শিক্ষানুরাগ যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত না হয় তাহলে শিক্ষালাভ পণ্য-ক্রয়ের মতোই দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎ জীবনে তা কোনো কাজেই আসে না। স্বাধীনতা লাভের জন্যে আন্দোলনের প্রয়োজন আজ আর নেই। ছাত্রদের সামনে আজ গুরুত্তম কর্তব্য দেশকে সুন্দর, মহৎ, শক্তিমান এবং সমৃদ্ধ করে তোলা। রাজনৈতিক ভলাণ্টিয়ারী করার জন্যে জ্ঞানের আবশ্যক করে না। কিন্তু জাতিগঠনের ভিত্তিই হল জ্ঞানের প্রসার।

কিন্তু সে কাজটা হবে কি করে, যদি না ছাত্রদের মনে শিক্ষানুরাগ এবং জিজ্ঞাসা জাগাতে না পারা যায়? আর পাঠে যদি ছাত্রদের অনুরাগ না জাগে তাহলে রাজনীতি ছাড়া তারা করবে কি? এ বয়সটা নিশ্চিন্ত বসে থাকবার বয়স তো নয়। স্কুল-কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি, বড় বড় বাড়ি তৈরি, শিক্ষকদের (এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদেরও) বেতনবৃদ্ধি, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন, সরকারী শিক্ষাবিভাগ সবই যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মূল ব্যাপারটিতে দৃষ্টি দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না।

*

আমাদের উৎসাহ দপ্ করে জ্বলতেও যতক্ষণ, ফস্ করে নিভতেও ততক্ষণ। বন্যা, বন্যা, বন্যা। কদিন ধরে খবরের কাগজে বন্যা ছাড়া আর প্রসঙ্গ ছিল না। খবরের ছবিতে কাগজ ভর্তি। কত করুণ খবর ও ছবি। খবর আজও আসে মফঃস্বল থেকে, ছাপাও হয়। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টি সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে বলেই মনে হয়। ছবিও ছাপা হয়, কিন্তু বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল, কি বন্যাপীড়িত মানুষের নয়, এমন কি সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী নতুন নতুন দালান বাড়ি তৈরিরও নয়। ছবি ছাপা হয় মন্ত্রীদের হাতে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে চেক এবং টাকার থলি দানের। কিন্তু সেই সাহায্য কোথায়, কাদের এবং কিভাবে বিতরণ করা হচ্ছে তার বিবরণ কিংবা সাহায্য গ্রহীতাদের হিসাব কোথাও চোখে পড়ে না। অথচ মফস্বল থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসছে তা অভাব এবং বিশৃঙ্খলার। অনেক স্থানে সেই যে এক-বার বন্যার প্রথম চোটে সাহায্য গেছে, তার-পর আর যায়নি। কোথাও সবাই যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অনেকে সাহায্য পাচ্ছে না, পাচ্ছে যাদের অভাব সবাই নেই তারা। আর শোনা যাচ্ছে আগামী নির্বাচনের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়াসের সংবাদ। অন্য দিকে যে কারণে বারে বারে বন্যার আক্রমণ হচ্ছে তার প্রতিকারের জন্যে কি করা হচ্ছে তার কোনো আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না।

বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে জনসাধারণ অকাতরে অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্য দান করেছে। সরকারী এবং ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও অনেক টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কোথায়, কিভাবে এবং কার মারফত সেই অর্থাদি ব্যয়িত হচ্ছে পক্ষান্তে তার একটা করে হিসাব জন-সাধারণের সামনে পেশ করা কি বিভিন্ন বন্যাত্রাণ সমিতির উচিত নয়?
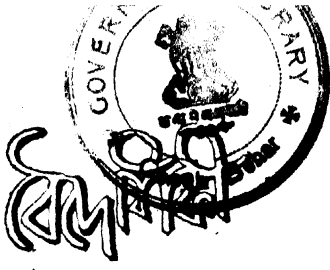
যে-কোনো আন্তর্জাতিক বিবাদে, ন্যায় অন্যায় বিচার না করে, নিজের দেশের গভর্নমেণ্টের নীতির সমর্থনে যে স্বাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে কিন্তু স্বদেশপ্রেমের পার্থক্য আছে। নিজেদের দেশের গভর্নমেণ্ট যদি অন্যায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হয় বা অপর জাতিকে আঘাত করে নিজের কোনো অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে তখন সেই নীতির সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণে দেশপ্রেম লঙ্ঘিত হয় না, বরঞ্চ তাতে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া হয়। কোনো মহৎ আদর্শ পৃথিবীর যেখানেই উদ্ভূত হোক না কেন তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনও দেশপ্রেমবিরোধী নয়।

বুয়োর যুদ্ধের সময়ে অনেক ইংরেজ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। কেউ কেউ বুয়োরদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে এমন কি যুদ্ধে বুয়োরদের জয় হোক এমন আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও অনেক ইংরেজ বৃটিশ-গভর্নমেণ্টের নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। ভারত-বৃটিশ ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক স্তরেই কিছু ইংরেজ বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচক ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের গালাগাল দিয়েছে, কিন্তু কোনো সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি তাঁদের দেশপ্রেমে কোনোদিন অবিশ্বাস প্রকাশ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশের সরকারী নীতি যেখানে ধর্মবুদ্ধির বিরোধী সেখানে সেই নীতির অকুণ্ঠ সমালোচনা বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের পরিচায়ক। কারণ কর্মবুদ্ধিসংগত আদর্শের বিরোধী কোনো কর্মনীতির দ্বারা কোনো জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থ, তার চিরন্তন কল্যাণ সংরক্ষিত হতে পারে না। সেইজন্য 'জাতীয় স্বার্থ' বা 'রাজ্যরক্ষা'র নামে সরকার যে-কোনো নীতি চালাবেন তাই বিনাবিচারে সমর্থন করতে হবে, না করলে তাতে দেশপ্রেমের ব্যত্যয় ঘটবে এরূপ মনে করা উচিত নয়। কেউ কেউ বলেন যে, আভ্যন্তর বিষয়াদিতে যতো মতান্তরই থাক, বৈদেশিক নীতির বেলায় দেশের সকলের একমত, একপ্রাণ হওয়া দরকার। সরকারী নীতি যদি ধর্মবুদ্ধিসম্মত হয় অথবা জাতির জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে একথা খাটে। কিন্তু ক্ষেত্র এবং ন্যায় অন্যায় নির্বিশেষে
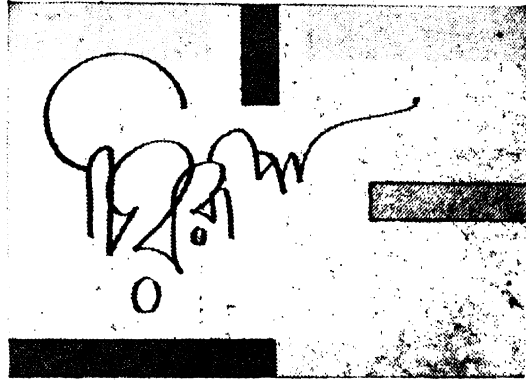
সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে-কোনো বৈদেশিক নীতিই সমান প্রশংসার একথা মানা যায় না। সুতরাং সমর্থন করার পূর্বে যে-কোনো সরকারী নীতি তা সে আভ্যন্তর বা বৈদেশিক যে-কোনো ব্যাপার সংক্রান্তই হোক না কেন, তা সমর্থন করার পূর্বে বিচার করে দেখার অধিকার ব্যক্তি বা দল সকলেরই আছে।

কিন্তু বিচারের মানদণ্ড যদি মূলেই দুষ্ট হয় তবে সে বিচারের কোনো মূল্য থাকে না, সেটা বিচারই হয় না। এর একটি চরম উদাহরণ পাওয়া যাবে ভারত-চীন প্রশ্নের উপর কম্যুনিস্ট পার্টির গৃহীত প্রস্তাবে। পিছনে ন্যায়বুদ্ধি বা মহৎ আদর্শের যে-প্রেরণা থাকলে স্বদেশের গভর্নমেণ্টের, এমন কি স্বদেশী জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও বিদেশীর পক্ষ হয়ে কথা বলা যায় তার কণামাত্রও কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাবের পিছনে নেই। নিছক চীনা সরকারের দোষ ঢাকা এবং কম্যুনিস্ট মতলব হাসিলের চেষ্টা ছাড়া কম্যুনিস্ট প্রস্তাবে আর কিছু নেই। আর কিছু থাকবে এমন আশা যদি কেউ করে থাকেন তাঁরা ভুল আশা করছিলেন। কারণ, যদি অন্য কিছু থাকত তবে সেটা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাবই হত না।

চীনারা যে অন্যায় কিছু করেছে তার কোনো ইংগিত পর্যন্ত প্রস্তাবে নেই, যেন গোলমালটার জন্য দুপক্ষেরই সমান দায়িত্ব! ম্যাকম্যাহন লাইনের স্বীকৃতি একটা ধোঁকা-বাজির সামিল। আগে তারা যাই বলে থাকুন না কেন, চীনা সরকার ভারত গভর্নমেণ্টের পরবর্তী চিঠিপত্র এবং ভাব-গতিক দেখে বুঝেছেন যে ম্যাকম্যাহন লাইন অতিক্রম করে দক্ষিণে আপাতত এগুনো সম্ভব নয়। পাকা ধুরন্ধর কম্যুনিস্টদের কাছে কোনো সীমানাই চিরস্থায়ী নয়, সুবিধামতো আজ যা স্বীকার কাল তা অস্বীকার করা যেতে পারে। আপাতত ম্যাকম্যাহন লাইন স্বীকার-অস্বীকারে বিশেষ কিছু আসে যায় না, কারণ কার্যত সেই সীমানা অতিক্রম করে চীনাদের আপাতত এগোবার ইচ্ছা থাকলেও বোধহয় সাধ্য নেই। ম্যাকম্যাহন লাইন অঞ্চলে চীনারা ভারতীয় এলাকার মধ্যে তেমন বেশি পরিমাণ জায়গা বোধ হয় দখল করে নি, যেরকম করেছে লাদাকে। লাদাক সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে চীনের পক্ষে। কারণ লাদাক সম্পর্কে প্রস্তাবের অর্থ এই যে, যে-সব জায়গা চীনারা দখল করে বসেছে সেখান থেকে তাদের সরে যাবার জন্য তাগিদ দেবার দরকার নেই। সেই জন্যই কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে আপোসমীমাংসার আলোচনা আরম্ভ হবার পূর্বে কোনো শর্ত আরোপ করা উচিত হবে না। তবে, চীনা সরকার যে 'সীমানা' থেকে দুপক্ষেরই সৈন্যসামন্ত ১২। মাইল সরাবার প্রস্তাব করেছেন সেটা খুব উত্তম প্রস্তাব। অর্থাৎ যাতে অনেকখানি জায়গায় ভারত সরকারের দখল আরো একটু আলগা করার প্রস্তাব।

কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে "সোস্যালিস্ট চীনের কখনও ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের অভিসন্ধি থাকতে পারে না যেমন স্বাধীন ভারত চীনের সঙ্গে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে না।" চীনা সরকার যদি ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন তবে স্বাধীন ভারত চীনের সঙ্গে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে কেন পারবে না, বস্তুতপক্ষে ওরূপ অবস্থায় সে চিন্তা করা ছাড়া ভারতের উপায় কী থাকবে? কিন্তু 'সোস্যালিস্ট চীন' কখনই ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের অভিসন্ধি পোষণ করতে পারে না—ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি এই আশ্বাস দেবার কে এবং এ আশ্বাসে বিশ্বাসই বা কে করবে? অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টির ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী একথা স্বতঃসিদ্ধ। চীনের সরকার যখন কম্যুনিস্ট ধর্মশাস্ত্রানু-যায়ী 'সোস্যালিস্ট' তখন চীন সরকার অন্য দেশের উপর সশস্ত্র হামলা করলেও তা সশস্ত্র হামলা বলে মনে করা ভুল হবে, সেটা কোনো একরকমের 'মুক্তি'র প্রলেপ বলে ধরতে হবে। এইজন্যই কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাবে চীনা কম্যুনিস্ট সর-কারের কোনো কার্যের নিন্দা নেই, ভবিষ্যতেও চীনা সরকার যাই করুক তারও কোনো নিন্দা ভারতের কম্যুনিস্ট-পার্টির কোনো প্রস্তাবে থাকবে না।

সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টির মিটিংএ কী হয় কী হয় ভেবে যাঁরা নানা জল্পনাকল্পনা করছিলেন তাঁরা নিরর্থক চিন্তা করছিলেন। তবে সেটা কম্যুনিস্ট পার্টির স্বার্থের দিক থেকে নিরর্থক ছিল না। কারণ এই-রকম একটা জল্পনা-কল্পনার আবহাওয়া সৃষ্টি করা কম্যুনিস্ট পার্টির দরকার ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে, এই নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে খুব একটা তর্কবিতর্ক চলছে, যেন যেটা সিদ্ধান্ত হল সেটা অনেক 'স্বাধীন' আলোচনার পর হয়েছে—এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করা কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে একান্ত দরকার। তা না হলে এই প্রস্তাবের দ্বারা ভারতের লোকদের ভোলানো সম্ভব তারাও ভুলবে না।

কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাবে পণ্ডিত নেহরুকে দলের থেকে আলাদা করে নিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ নীতি ও কোনো সামরিক জোটে যোগ না দেওয়ার দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রশংসা সমর্থন জানানো হয়েছে। শ্রীনেহরুকে নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির এটা একটা পুরানো কায়দা। এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এ সব ফাঁকি। খাঁটি সত্য কথা। কম্যুনিস্ট পার্টি যা বলছে শ্রীনেহরুও তাই বলছেন, জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। অপপ্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করার কার্যকলাপ এবং মনোভাব সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর মত ও বাক্য এবং কম্যুনিস্ট পার্টির প্রস্তাবের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। নিরপেক্ষ নীতি সম্বন্ধেও পণ্ডিত নেহরু ও কম্যুনিস্ট পার্টির প্রকৃত মনোভাব সম্পূর্ণবিরোধী। কম্যুনিস্ট পার্টি মোটেই নিরপেক্ষ নয় হতে চায়ও না হতে পারেও না। ভারত সরকারের নিরপেক্ষ নীতিকে নষ্ট করে যখনই সম্ভব কম্যুনিস্ট ব্লক ঘেঁষা করবার স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন চেষ্টা কম্যুনিস্ট পার্টি নিরন্তর করে আসছে। এ বিষয়ে সাময়িকভাবে কিছুটা সাফল্য-লাভও তারা যে করে না, তা বলা যায় না। তা না হলে হিমালয় অঞ্চলে চীন-সরকারের কার্যাবলীর লক্ষ্য ও নীতি সম্বন্ধে পার্লা-মেণ্ট ও জনসাধারণকে এতদিন অজ্ঞ রাখা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল?

১৬।১১।৫৯

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ

দেবপ্রসাদ সন্যাল

১৯২৭ সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের একটি উ'চু ক্লাসের ছাত্রকে পদার্থবিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক এনরিকো ফের্মি আর ফ্রাঙ্কো রাসেত্তির সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হওয়ার কথা সে ভাবছে কিন্তু মন স্থির করতে পারছে না। ফের্মি আর রাসেত্তি তখন বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের তৎকালীন নতুন আবিষ্কারগুলি নিয়ে তাঁরা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আলোচনা বৈঠক বসাতেন। সেই সব বৈঠকে গিয়ে ছাত্রটি ক্রমে ক্রমে নতুন বিষয়টির দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলো। ঐ বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে কোমোর মনোরম হ্রদের ধারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পরমাণুবিজ্ঞানী-দের একটি বিরাট অধিবেশন বসে। ফের্মি আর রাসেত্তির সঙ্গে আমাদের ছাত্রটিও সেখানে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রথিতযশা সব বিজ্ঞানীদের দেখে তার মনে কি ভাব উদিত হয়েছিল জানা নেই। সম্ভবত সে ফের্মিকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'কোমল চোখের দৃষ্টি, উচ্চারণ কিছুটা অস্পষ্ট, ঐ ভদ্রলোকটি কে?'

'উনি ডেনমার্কের নীলস্ বোর', ফের্মি উত্তর দিলেন।

'নীলস্ বোর কে?' ছাত্রটি ফের জিজ্ঞাসা করল।

রাসেত্তি ধমকে উঠলেন 'আশ্চর্য! নীলস্ বোর কে তা জান না। উনি পরমাণুর গঠন নিয়ে গবেষণা করছেন। ১৯২২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।'

ফের্মি ছাত্রটিকে বোরের গবেষণার বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর ছাত্রটি অন্য বিজ্ঞানীদের ও তাঁদের কাজের পরিচয় জানতে চাইলো। অধ্যাপক দুজনের কাছে শোনা গেল 'উনি হলেন হল্যাণ্ডের লরেন্জ, ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণা করেছেন ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। উনি জার্মানীর ম্যাক্সপ্ল্যাংক, কোয়াণ্টাম তত্ত্বের প্রবর্তক, ১৯১৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। উনি আমেরিকার আর্থার কম্পটন, কম্পটন এফেক্ট আবিষ্কার করেছেন,

রাসেত্তি, ফের্মি ও সেগ্রে

সম্ভবত এ বৎসর নোবেল পুরস্কার পাবেন।' ছাত্রটি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতে লাগলো। বাড়ি ফিরে নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়লো।

কোমোর আন্তর্জাতিক অধিবেশনের বত্রিশ বৎসর পরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত বিজ্ঞানীদের নামের সঙ্গে আমাদের এই ইঞ্জিনীয়ারিং-পড়া-ছেড়ে আসা ছাত্র এমিলিও জিনো সেগ্রের নাম যুক্ত হ'ল। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ও তাঁর সহকর্মী ওয়েন চেম্বারলেন অ্যাণ্টিপ্রোটন আবিষ্কারের জন্য ১৯৫৯ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলে সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে।

অ্যাণ্টিপ্রোটন জিনিসটি কি বোঝার আগে আমাদের কিছুটা পুরোন ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। পারমাণবিক বোমার দৌলতে একথা আজকাল সকলেই জানেন যে বিশ্বের যাবতীয় জড় পদার্থ কতকগুলি অতি ক্ষুদ্রাকার পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি ভারী নিউক্লিয়াস যার উপাদান হ'ল ধন-তাড়িৎবিশিষ্ট কণা প্রোটন আর তাড়িৎবিহীন কণা নিউট্রন। নিউক্লিয়াসের চারধারে অনবরত ঘূর্ণায়মান রয়েছে ঋণ-তাড়িৎবিশিষ্ট কণা ইলেকট্রনের দল। প্রোটন আর ইলেকট্রনের তাড়িৎ বিপরীতধর্মী হলেও পরিমাণে সমান। কিন্তু একটি প্রোটন ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় আঠারোশ গুণ বেশী ভারী।

প্রোটন ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণাদের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে এরা প্রাচীন বলবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে না। এদের জন্য নতুন কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রবর্তন করেন ডি ব্রগলী, শ্রডিংগার, বর্ণ, হাইসেনবার্গ, পাউলি ডিরাক প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ইলেকট্রনের গতিসংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণা করে ডিরাক ১৯৩০ সালে ইলেকট্রনের অনুরূপ আর একটি কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করলেন। ১৯৩২ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে অ্যাণ্ডারসন মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে ডিরাক ঘোষিত এই কণাটির সন্ধান পেলেন এবং তার চলার পথের ফোটোগ্রাফ নিতেও সক্ষম হলেন। এই নতুন কণাটির নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। এটি ধন-তাড়িৎবিশিষ্ট কিন্তু এর তাড়িতের পরিমাণ এবং ভর ইলেকট্রনের সঙ্গে সমান। পজিট্রনকে ইলেকট্রনের বিপরীত কণা বা অ্যাণ্টি ইলেকট্রন (Anti Electron) বলতে পারি। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি বা তাড়িতায়িত কণা জড়পদার্থের ভেতর দিয়ে চলার সময় ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের জন্ম দেয়।

এখানে জড় ও শক্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছুটা আলোচনা করা সমীচীন। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্বে দেখিয়েছেন জড় ও শক্তি আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ, আর তাদের একটির আর একটিতে রূপান্তর হতে পারে। ইলেকট্রন-পজিট্রনের জড়সত্তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তার থেকে শক্তি আহরণ করা যেমন সম্ভব, শক্তির বিনাশে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্ম হওয়াও তেমনি সম্ভব। জড়ের পরিমাপের জন্য অনেক রকম একক রয়েছে, সের, পাউণ্ড, গ্রাম প্রভৃতি। শক্তির পরিমাপের জন্যও বিবিধ একক প্রচলিত। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ইলেকট্রন ভোল্ট নামের এককটি ব্যবহার করব। ভোল্ট শব্দটি সকলেরই পরিচিত। টর্চ বাতিতে সাধারণত দেড় ভোল্টের সেলগুলি ব্যবহার করা হয়। মনে করা যাক একটি এক ভোল্টের সেল নিয়ে তার নেগেটিভ প্রান্তে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া হল। ইলেকট্রনটি চলতে আরম্ভ করবে এবং শেষপর্যন্ত গিয়ে পজিটিভ প্রান্তে পৌঁছাবে। এই চলার ফলে সে যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করবে তাকে বলা হয় এক ইলেকট্রন-ভোল্ট। একজোড়া স্থির ইলেকট্রন-পজিট্রনের বিনাশে প্রায় দশলক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। বিপরীতপক্ষে অন্ততঃ দশলক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি বিলুপ্ত না হলে এক জোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্ম হতে পারে না।

উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি বা তাড়িতায়িত কণা জড় পদার্থের ভেতর দিয়ে চলার সময় যদি তার খরচ করার মত দশলক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি থাকে তবেই ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। মহাজাগতিক রশ্মির যে বিরাট শক্তিভাণ্ডার রয়েছে, তাতে তার পক্ষে অসংখ্য ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্মদাতা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষও অনেকদিন হল দশ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে বেশী শক্তি দান করার উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, কাজেই তার গবেষণাগারেও অনেক ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের জন্ম হয়েছে। ডিরাকের মস্তিষ্ক উদ্ভূত কণা পজিট্রন আজ আর তাই কোন নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে না।

ইলেকট্রনের সম্পর্কে ডিরাক যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, প্রোটনের গতিপ্রকৃতি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। বস্তুতঃ পক্ষে প্রোটনের সব কটি ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে এরকম কোন তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানীরা আজও দিতে পারেন নি। কিন্তু বহু দিন ধরেই তাঁরা একমত যে, ইলেকট্রনের মত প্রোটনেরও একটি বিপরীত কণা আছে। এর ভর ও তাড়িতের পরিমাণ হবে প্রোটনেরই মত, কিন্তু এটি হবে ঋণ-তাড়িৎবিশিষ্ট। এর নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাণ্টিপ্রোটন (Antiproton)। হাতেনাতে ধরতে না পারলেও এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু কেবল সন্দেহ না থাকলেই তো হবে না, অ্যাণ্টিপ্রোটনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ চাই। সেগ্রে ও তাঁর সহকর্মীরা কিভাবে সে প্রমাণ দিয়েছেন, তার বিবরণ দেওয়ার আগে অ্যাণ্টিপ্রোটন কেন পজিট্রনের মত সহজলভ্য নয়, তার কারণ বিশ্লেষণ করব। আমরা আগেই দেখেছি পর্যাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট গামারশ্মি বা তাড়িতায়িত কণা জড়পদার্থের ভেতর দিয়ে চলার সময় ইলেকট্রন-পজিট্রন যমজের জন্ম দেয়। একইভাবে প্রোটন-অ্যাণ্টিপ্রোটন যমজের জন্ম হতে পারে। কিন্তু প্রোটন-

অ্যাণ্টিপ্রোটনের স্তর ইলেকট্রন-পজিট্রনের স্তরের চেয়ে প্রায় আঠারো শ গুণ বেশী। কাজেই এদের জন্মের জন্য অন্তত একশ আশি কোটি (দশ লক্ষ × আঠারো শ) ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি বিলুপ্ত হওয়া দরকার। যে বিপুল শক্তির ভাণ্ডার হাতে থাকলে এই পরিমাণ শক্তি খরচা করে প্রোটন-অ্যাণ্টিপ্রোটন যমজ সৃষ্টি করা যায় ১৯৫৫ সালের আগে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। অবশ্য মহাজাগতিক রশ্মির পক্ষে প্রোটন-অ্যাণ্টিপ্রোটন যমজের জন্ম দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কাজেই ১৯৫৫ সালের আগে পদার্থবিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যেই অ্যাণ্টিপ্রোটনের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। কেউ কেউ অ্যাণ্টি-প্রোটন পেয়েছেন বলে দাবিও জানিয়েছেন, কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির নানাবিধ জটিলতার জন্য ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কাজ করার সুযোগের অভাবের জন্য তাদের দাবির স্বপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ দিতে কেউই সক্ষম হন নি।

ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে রেডিয়েশন ল্যাবরেটরীতে পঁচানব্বই লক্ষ ডলার ব্যয় করে একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে একটি প্রোটনকে ছ শ কুড়ি কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন করা সম্ভব। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে বীভাট্রন (এক শ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট বা এক Billion Electron Voltকে সংক্ষেপে এক BEV বলা হয়। যন্ত্রটি এক BEV-এর চেয়ে বেশী শক্তি দিতে পারে বলে এর নাম Bevatron)। বীভাট্রনের সাহায্যে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন অথচ প্রোটন অ্যাণ্টিপ্রোটন যমজ সৃষ্টি করার মত পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের ঝাঁক পাওয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল কিভাবে অন্যান্য কণাদের থেকে অ্যাণ্টি প্রোটনদের আলাদা করে বেছে নিয়ে তাদের জন্মের নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া যাবে। এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করার জন্যই সেগ্রে ও চেম্বারলেনকে ১৯৫৯ সালের পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এঁরা ও এঁদের দুজন সহকর্মী ক্লাইড ভিগাণ্ড এবং টমাস ইপসিল্যাণ্টিস ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিখ্যাত Physical Review পত্রিকার সম্পাদককে একখানা চিঠি লেখেন। যে সমস্ত পরীক্ষার সাহায্যে তাঁরা অ্যাণ্টি-প্রোটনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছিলেন তারই বিবরণ এই চিঠিতে দেওয়া হয়েছে। ১লা নভেম্বরের Physical Review-তেই চিঠিখানা ছাপা হয়। মোটামুটি এই চিঠিখানা অনুসরণ করে আমরা সেগ্রে-চেম্বারলেনের পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

বীভাট্রন থেকে পাওয়া ছয় কুড়ি কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের ঝাঁকটির পথে একটি তামার টুকরো রাখা হয়। তামার পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত কণাগুলির কারও কারও সঙ্গে আক্রমণকারী প্রোটন দলের বাধে প্রচণ্ড সংঘাত। কোন কোন দ্বৈত সংঘাতে প্রায় একশ আশি কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গায় একজোড়া করে প্রোটন-অ্যাণ্টি প্রোটন জন্ম নেয়। ঘটনাটা যদি কেবল এইতেই সীমাবদ্ধ থাকতো তা হ'লে অ্যাণ্টি-প্রোটনকে খুঁজে বার করা অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটনেরা তামার টুকরোতে আঘাত করার ফলে আর একরকমের কণা হাজারে হাজারে

উৎপন্ন হয়। এদের বলা হয় পাইমেসন। ওজনে এরা এক একজন ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দুশ পঁচাত্তর গুণ ভারী। তামার টুকরো থেকে বেরিয়ে আসার পর বীভাট্রনের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া আরও দুটি চুম্বকের সাহায্যে ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট কণাগুলিকে আলাদা করে নিয়ে সিণ্টিলেশন কাউণ্টার (Scintillation Counter) নামে একটি যন্ত্রের ওপর ফোকাস করে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রে তাদের উপস্থিতির কথা ধরা পড়ে। সিণ্টিলেশন কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে কণাগুলি আবার দুটি চুম্বকের সাহায্যে ফোকাস হয়ে এবং বেঁকে দ্বিতীয় একটি সিণ্টিলেশন কাউণ্টারের ওপর গিয়ে পড়ে। এবার দ্বিতীয় কাউণ্টারে তাদের উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় কাউণ্টার সাধারণত কয়েকটি অ্যাণ্টিপ্রোটন আর তার প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী পাইমেসন (ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট) আসতে পারে। শুধু তাই নয় এই পথের মধ্যে যে কোন একটি অ্যাণ্টিপ্রোটনের ভর ও বেগের গুণফল অন্য যে কোন পাইমেসনের অনুরূপ গুণফলের সঙ্গে সমান। অ্যাণ্টিপ্রোটন যখন পাইমেসনের চেয়ে ওজনে ভারী তখন তার গতিবেগ পাইমেসনের তুলনায় কম হবে। হিসেব করে দেখা গেছে প্রথম কাউণ্টার থেকে দ্বিতীয় কাউণ্টারের মধ্যবর্তী ৪০ ফুট রাস্তা অতিক্রম করতে অ্যাণ্টিপ্রোটনের লাগবে এক সেকেণ্ডের দুকোটি ভাগের একভাগ সময় আর পাইমেসনের লাগবে তার চেয়ে কিছু কম,—এক সেকেণ্ডের আড়াই কোটি ভাগের একভাগ সময়। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন কণার প্রথম থেকে দ্বিতীয় কাউণ্টারে যেতে কতখানি সময় লাগছে তা পরিমাণ করে বলে দেওয়া যায় সেটিই পাইমেসন না অ্যাণ্টিপ্রোটন। সেগ্রে ও তার সহকর্মীরা তাদের প্রথম পরীক্ষাতে ৬০টি অ্যাণ্টিপ্রোটনের আগমনবার্তা ধরতে পেরেছিলেন।

অ্যাণ্টিপ্রোটনের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার জন্য সেগ্রে আর চেম্বারলেন দ্বিতীয় সিণ্টিলেশন কাউণ্টারের পরে পর পর দুটি সেরেনকফ্ (Cerenkov) কাউণ্টার বসিয়েছিলেন। এদের প্রথমটিতে ঘণ্টায় ১৪৬৯৪০ মাইলের চেয়ে বেশী গতিবেগসম্পন্ন তড়িতায়িত কণারাই কেবল তাদের উপস্থিতি জানাতে পারে। আর দ্বিতীয়টির সাহায্যে ঘণ্টায় ১৩৯৫০০ মাইল থেকে ১৪৫০৮০ মাইল পর্যন্ত গতিবেগসম্পন্ন যে কোন তাড়িতায়িত কণার এসে পৌঁছানোর খবর ধরতে পারা যায়। দ্বিতীয় সিণ্টিলেশন কাউণ্টার পার হয়ে এসে দ্রুতগতির পাইমেসনগুলি কেবল প্রথম সেরেনকফ্ কাউণ্টারটিতে এবং অপেক্ষাকৃত ধীরগতির অ্যাণ্টিপ্রোটনগুলি কেবল দ্বিতীয় সেরেনকফ্ কাউণ্টারটিতে ধরা পড়বে। বিপরীত পেক্ষে প্রথম সেরেনকফ্ কাউণ্টারে যদি কোন সাড়া না পাওয়া যায় অথচ দ্বিতীয়টিতে যদি কোন কণার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় তাহ'লে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, এটি একটি অ্যাণ্টিপ্রোটন। সেগ্রে ও চেম্বারলেনের পরীক্ষার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হ'ল অজস্র পাইমেসনের উপস্থিতি। আগেই বলেছি অ্যাণ্টিপ্রোটনদের সংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী পাইমেসন এসে কাউণ্টারগুলির ওপর পড়ে। নানারকম যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে এই পাইমেসনের গাদা থেকে অ্যাণ্টিপ্রোটনগুলিকে বেছে নিতে হয়েছে। সেগ্রে ও চেম্বারলেনের এইখানেই কৃতিত্ব।

প্রোটন আর অ্যাণ্টিপ্রোটন মিলিত হলেই পরস্পরকে বিনষ্ট করবে আর ফলে অন্তত একশ আশী কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি মুক্তি পাবে। এই শক্তির পরিমাপ করেও অ্যাণ্টিপ্রোটনের অস্তিত্বের দৃঢ় প্রমাণ দেওয়া যায়। বীভাট্রেনে বসানো তামার টুকরোটি থেকে যে ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট কণাগুলি পাওয়া যায় সেগ্রে ও চেম্বারলেন তাদের পথে বিশেষ একধরনের ফোটোগ্রাফিক প্লেট বসিয়ে এক্সপোজার দেন। এক্সপোজার দেওয়ার পর কয়েকটা প্লেট ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে ল্যাবরেটরীতেই পরীক্ষা করা হয় আর কয়েকটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় রোমে। সেখানে সেগ্রের পুরোন দিনের সহকর্মী আমালডির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী প্লেটগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্লেটের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে একটি অ্যাণ্টিপ্রোটন হঠাৎ এক জায়গায় রূপো অথবা ব্রোমিন পরমাণুর (ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলি রূপো আর ব্রোমিনের রাসায়নিক মিশ্রণ দিয়ে তৈরী) কেন্দ্রে বন্দী হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর সেখান থেকে পনেরো বিশটা বিভিন্ন ধরণের কণা বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে গেছে। এই বিক্ষিপ্ত কণাদের চলার পথগুলো ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর তারকা চিহ্নের আকারে ধরা পড়ে। বিশেষ উপায়ে বিজ্ঞানীরা কণাগুলির মোট শক্তির পরিমাপ করে দেখলেন যে, অ্যাণ্টিপ্রোটনের একলার পক্ষে এতটা শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। রূপো অথবা ব্রোমিন পরমাণুর কেন্দ্রের একটি প্রোটন আর বন্দী অ্যাণ্টিপ্রোটনের যুগ্মসত্তার বিনাশেই কেবল এই পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব। ফটোগ্রাফিক প্লেটের তারকাচিহ্নটি তাই অ্যাণ্টিপ্রোটন-প্রোটনের বিলোপই সূচিত করে অর্থাৎ প্লেটে প্রবেশকারী কণাটি যে অ্যাণ্টিপ্রোটন তার স্বপক্ষে দৃঢ় প্রমাণ দেয়।

সেগ্রে আর চেম্বারলেনের আবিষ্কারের ফলে মৌলিক কণা-র রাজ্যে প্রতিসাম্য ফিরে এল। ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট প্রোটনের বিপরীত রইলো সমভরের ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট পজিট্রন। আমাদের চেনা সবকটি পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন আর বাইরে ঘুরছে ইলেকট্রন। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের সৌরজগৎ ও গ্যালাক্সির (Galaxy) সমস্ত জড়পদার্থই এই প্রোটন-ইলেকট্রন শাসিত পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে এরকম গ্যালাক্সি থাকতে পারে যেখানে জড়পদার্থের পরমাণুগুলির কেন্দ্রে অ্যাণ্টিপ্রোটনেরা রাজত্ব করছে আর বাইরে ঘুরছে পজিট্রনের দল। এই গ্যালাক্সির জড়পদার্থগুলিকে আমাদের চেনা জড়পদার্থের বিপরীত বলে ভাবতে পারি, ইংরেজীতে এদের নাম দিতে পারি অ্যাণ্টিমেটার। গ্যালাক্সিটি থেকে কোন অ্যাণ্টিমেটার এসে যদি আমাদের চেনা জড়পদার্থের ওপর পড়ে তাহ'লে প্রোটন-অ্যাণ্টিপ্রোটন, ইলেকট্রন-পজিট্রন কাছাকাছি আনার দরুন তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে প্রচণ্ড শক্তির জন্ম দেবে অর্থাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি করবে। এরকম কোন বিস্ফোরণের সংবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও পাননি কাজেই অ্যাণ্টিমেটারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা এখনও সম্ভব নয়।

১৯০৫ সালে ইতালীর টিভোলিতে সেগ্রের জন্ম। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া ছেড়ে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্তি হবার পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৯২৮ সালে উনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। রোম এবং পালের্মোতে প্রায় দশ বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৯৩৮ সালে আমেরিকা চলে আসেন এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে গবেষণা কর্মী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং ১৯৪৬ সাল থেকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গবেষণা কর্মের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। দু ভল্যুমে 'Experimental Nuclear Physics' নামে একখানা বই লিখেছেন, এটি নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ও কর্মীদের অবশ্য পাঠ্য।

চেম্বারলেন অবশ্য পুরোপুরি আমেরিকান। ২৯ বৎসর বয়সে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করার সময় থেকে উনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছেন। নিউক্লিয়ার ফিসন, অ্যালফা কণা, নিউট্রন, নিউক্লিয়ন স্ক্যাটারিং প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে সেগ্রের সঙ্গে অ্যাণ্টিপ্রোটন আবিষ্কারের কাজই এখনও পর্যন্ত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে ধরা যেতে পারে।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২

১৯১৩ সাল পর্যন্ত বড়দিন দেখার কথা বলা হল। কিন্তু এই দেখার ব্যাপারেও ছোটবেলার সেই বড়দিনের সমারোহ দেখার আশ্চর্য চমক,—সেই যে সব চোখধাঁধানো দৃশ্যাবলী—তার আবেদন সেদিনকার কিশোর-মনে যে অপূর্ব আলোকরেখা ফেলেছিল, তা কি কখনো ভুলবার? আরও ভুলবার নয় আর-একটি দিনের কথা। সমারোহের দিক থেকে আমাদের কাছে তা প্রকৃত বড়দিন বলেই মনে হয়েছিল।

মহারানী ভিক্টোরিয়া মারা যাবার পর, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন-প্রাপ্তির উৎসবও সমাপ্ত হয়ে গেছে। রাজবংশীয় কোন এক পুরুষ—নামটা ঠিক আজ মনে পড়ছে না—বোধ হয় ডিউক অব কনট (সম্ভবত সম্রাট এডোয়ার্ডেরই ভাই) তিনি এসেছিলেন কলকাতায় বেড়াতে। সে উপলক্ষ্যে অভূতপূর্ব আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল মহানগরী, হয়েছিল বিচিত্র ও বিপুল আতসবাজীর বন্দোবস্ত। অন্যান্য আমোদপ্রমোদও ছিল।

রাজপুরুষ সেদিন রাত্রে 'বেঙ্গল ক্লাব' থেকে ভোজ শেষ করে আবার ফিরে আসবেন রাজভবনে। সেই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ উপলক্ষ্য করেই আলোকমালায় সাজানো হল সমগ্র চৌরঙ্গী ডালহাউসী স্কোয়ার এবং হাইকোর্টের সমুচ্চ সৌধশিখর। আলো আলো আর আলো। যেন ইন্দ্রপুরী। ভট্টিকাব্যের সেই উপমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রাসাদাবলীর আলোকসজ্জায় অযোধ্যাপুরী যেন স্বর্গের অলকাপুরীকেও লজ্জা দিচ্ছে। ভট্টিকাব্যের উপমা সেই বয়সে মনে পড়ার কথা নয়, কিন্তু আজকের চোখ দিয়ে সেদিনকার সেই হারানো দৃশ্যকে পুনর্দর্শন ধরতে গিয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গির কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায়। সারা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ভিতরটা, ধর্মতলা, লিন্ডসে স্ট্রীট অঞ্চলের বিভিন্ন জাতীয় আলোকসজ্জা, সারা বাঙালীটোলার আলোকসজ্জা সে এক আশ্চর্য মোহের সৃষ্টি করেছিল সেদিনকার কলকাতাবাসীর মনে। সত্যিই সে এক বিচিত্র উন্মাদনা জাগিয়ে তোলার মতো দীপান্বিতার রাত্রি! কত লোক যে সেদিন সেই আলো দেখবার জন্য পথে পথে বেরিয়ে এসেছিল, তার আর ইয়ত্তা নেই। সেই অভাবিত লোকারণ্যকে সে যুগের এক মনে রাখবার মতো বিশালকায় শোভাযাত্রা বলা যেতে পারে। কেউ হেঁটে গেছে, কেউ ফিটিংগাড়ি করে গেছে, কেউ পাল্কীগাড়ি চড়ে গেছে।

আমরাও গেছি। আমরা বসেছি গাড়ির মাথায় কম্বল বিছিয়ে, মেয়েরা ভিতরে। এইরকম লাইন দিয়ে ঘোড়ারগাড়ির সার চলছে ত চলেছেই। একের পর আর।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে সব লালমুখো সার্জেন্ট। লোয়ার সার্কুলার হয়ে চৌরঙ্গী ধরে এসপ্ল্যানেড। তারপরে হাইকোর্ট হেস্টিংসের ভিতরের দিকে—স্ট্র্যান্ডে সার-বাঁধা জাহাজগুলির আলোকমালা দেখে ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশ দিয়ে দিয়ে তারপরে ফিরে এসেছিলাম ভবানীপুরে। সেই সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে রাত একটা হল। আমি ততক্ষণে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

এক এক মোড়ে গাড়িকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত পাশের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য। যদি কোন গাড়োয়ান এগিয়ে যাবার অতি আগ্রহে লাইন ভাঙার চেষ্টা করত তাহলে সার্জেন্টরা ঘোড়ারগাড়ির গাড়োয়ানের কাছ থেকে ছপটি কেড়ে নিয়ে বেদম মার মারত তার পিঠে। গাড়ির ছাদের অন্য আরোহীদের ওপরও পড়ত ছপটির বাড়ি। কিন্তু তাতে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ থাকত না। যেমন মনে পড়ে, মোহনবাগান শীল্ড নেবার পর থেকে ফুটবল মাঠে যখন দুর্দান্ত ভিড় হতে লাগল, তখন মাউণ্টেড পুলিস ভিড় সামলাতে না পেরে এলোপাথাড়ি চাবুক চালাতো। এ-ও অনেকটা সেইরকম ব্যাপার আর কী! তবু আলো দেখতে হবে, পিঠে চাবুক পড়লেও দেখতে হবে।

আলো দিয়ে বাড়ি সাজাবার যে পদ্ধতি ছিল তখনকার তা-ও কম চিত্তাকর্ষক নয়। যেগুলি সরকারী বাড়ি—যাদুঘর থেকে

রাইটার্স বিল্ডিং, কাউন্সিল হাউস, হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট প্রভৃতি সব সেদিন সাজানো হত ফুঁকো শিশি দিয়ে। সেগুলি কিন্তু শিশি আদৌ নয়, অনেকটা ফুলদানির মতো, মোটা কাঁচের, রঙীন। তাতে তার বেঁধে বাড়ির দেওয়ালে পেরেক ঠুকে সেগুলি টানিয়ে দিত। এতে দিত রেড়ির তেল, সলতেও দেওয়া থাকতো। আলো জ্বালালে চার-পাঁচ ঘণ্টা জ্বলত, হাওয়ায় নিভতো না।

তখন ফ্লাড লাইটিং বা ইলেকট্রিসিটির প্রচলন তত ছিল না। দু'একটি দোকান, যেমন কুক কেলভিল বা হ্যামিলটনের বাড়ি ইলেকট্রিক আলো দিয়ে সাজাতো মাত্র। আর অন্যত্র ছিল ঝাড়ের কলস, কৃস্টাল ড্রপস্ কলস বা তারা। তাতে তার দিয়ে দিয়ে এক একটি চমৎকার ডিজাইন হত। বিশেষ করে রাজবংশের এমারেল তৈরী করে দিতো—"Ich-Dien"-এর ভিতরে আলো দিয়ে জ্বালানো হত। মনে হত যেন অসংখ্য রত্নরাজি আশ্চর্য বিভায় ঝলমল করছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এইরকম জিনিসেরই তৈরী বড় একটা তারা, তার ব্যাস হবে পাঁচ থেকে আট ফুট,—তারার ফলকগুলি বেঁকানো বেঁকানো, পুরোনো স্টার থিয়েটারের মাথায় জ্বলতো। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন তা একটা দেখবারই বস্তু ছিল বটে।

ফুঁকো শিশিরও বাহার বড় কম ছিল না। ইলেকট্রিকের ঔজ্জ্বল্য তাতে ছিল না বটে, কিন্তু স্নিগ্ধতা ছিল।

এইসব জাঁকজমকের পাশাপাশি আরও একটি উৎসবের ছবি আবছা মনে পড়ে। এতো সমারোহের উৎসব সেটা অবশ্য নয়, কিন্তু সেই বালকবয়সে আমাদের কাছে সেটাই লাগতো বড় হয়ে।

এ উৎসব হচ্ছে একেবারে দেশী উৎসব, চড়কের আগে নীল-উৎসব ও চড়কপুজো। এই নীল উৎসব হত চড়কের আগের দিন। এক মাস ধরে যারা শিবের 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করত তারা যোগ দিত এই-দিন গাজনে। বিচিত্র মুখোশ পরেছে কেউ, কেউ করেছে অদ্ভুত সাজসজ্জা, কোনও দলের সঙ্গে ঢাক-ঢোল কোন দলের সঙ্গে বা ঝিঁঝিট বাজনা। রাস্তার ওপর দিয়ে সে এক বর্ণিমাত মিছিল। দেখতাম দলের পর দল চলেছে উত্তর কলকাতা থেকে হেঁটে—হাতে তাদের তালপাখা—কালিঘাটে নকুলেশ্বর শিবের পুজো দিতে। শিবের মাথায় জল দিয়ে পুজো শেষ করে কালি-ঘাটেরই পোটোপাড়ায় এসে ঢুকত সং সাজতে।

ভবানীপুরের রসা রোড তখন ছিল চন্দ্রনাথ চাটুজ্যের গলির সামনে। এখনও আছে। কিন্তু তখন রসা রোড এখনকার মতো এতো চওড়া ছিল না। তখনকার গলির মাথা বলতে যে জায়গাটা আমি বোঝাতে চাই, সেটির অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত হয়ে মিশে গেছে বিস্তৃত রসা রোডের গর্ভে। এই যে গলির মাথা, এখানকার এক স্বর্ণকারের দোকানে বসে আছি, বাইরে যাওয়া বারণ। দেখছি, উত্তর কলকাতার দিকে—এখন যেমন সর্বজনীন পুজোর বিভিন্ন দল রাস্তা দিয়ে সমারোহসহকারে দল বেঁধে হেঁটে যায়,—ঠিক তেমনি বিভিন্ন সন্ন্যাসীর দল আসছে আর চলে যাচ্ছে কালিঘাটের দিকে। হাতে অনেকের আবার লালসালুতে লেখা তাদের নাম, যেমন—আহিরীটোলা, চোরবাগান ইত্যাদি। পোটোরা তাদের মুখে-গায়ে রঙ মাখিয়ে দিত কেউ কেউ পরতো মুখোশ। কেউ

কেউ আবার সাজতো সাহেব আর বিবি,—সেজে, পথের ওপর দিয়ে নির্বাক অভিনয় করতে করতে চলেছে,—কত রকমের ব্যঙ্গ-কৌতুক যে আসতো তখন। ঠিক এই ধরনের সব ব্যঙ্গকৌতুক বা রঙ্গতামাশা উত্তর কলকাতার বিখ্যাত জেলেপাড়ার সং-এ প্রাচীনেরা হয়ত অনেকে দেখে থাকবেন।

এইরকম ভিড় চলত সকাল থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত। আমরা অবশ্য দুটো পর্যন্ত দেখতে পেতাম না, বারোটা কি বড়জোর একটা পর্যন্ত এসব দেখা চলত। ততক্ষণে বাড়ি থেকে বহুবার ঘন ঘন ডাক এসে গেছে, ওরে বাড়ি আয়।

কে কার কথা শোনে! শেষে চাকর এসে জোর করে বাড়ি নিয়ে যেত।

আর ছিল নীল-উৎসব। চড়কের মেলা। চড়ক গাছ ঘোরা। তার পরের দিনই আবার পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ হালখাতার সমারোহ। দোকানে দোকানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি আর গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। তার পরে হাতে দিচ্ছে এক-একখানি করে খাবারভর্তি সরা। সকালবেলা কালীঘাটের মন্দিরে ভয়ানক ভিড় আজকের মতোই অবশ্য।

নীল উৎসবের সং-এর বর্ণনা আমার মনে অদ্ভুত ছাপ রেখেছিল। এই সংয়ের যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করতাম তা যেন আবার আমার স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সকালে ছিল ঐ যা বললাম, নানান ধরনের সাজ আর ব্যঙ্গকৌতুক। সন্ধ্যায় ছিল শিব-পার্বতী সাজবার পালা। শিব-পার্বতী সেজে গান গাইত তারা, ছড়া কাটত। আর থাকত কনসার্ট বাজনা। ভবানীপুরে তখন ছিল তিন-চারটে কনসার্ট পার্টি। তারা ঐ শিব-পার্বতীর পিছনে পিছনে খোলামাথা ঘোড়ার গাড়িতে বসে কনসার্ট বাজাতে বাজাতে যেত। শিব-বিবাহের গানও চলত সঙ্গে সঙ্গে।

আড়গড়াতে তখনকার দিনে কনসার্ট যাবার জন্য দু'ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত। তার মাথাটা খোলা, ভিতরে আট-দশজন পর্যন্ত বসত। বড় বড় বিবাহ-উৎসবে গোরোর ব্যাণ্ড যেতো অন্য সব উপলক্ষ্যে ছোট ছোট কনসার্টও ছিল। এই এইসব ঘোড়ার গাড়িকে বলতো ক্যারাভ্যান; ধর্মতলাতে 'আড়গড়া' ছিল ঐসব ভাড়াটে গাড়ির আড্ডা। কুক, হার্ট মিল্টন এই ছিল সেই সব কোম্পানীগুলির নাম, যারা ক্যারাভ্যান ভাড়া দিত।

তখনকার দিনে সবের মধ্যেই 'সং-রং-ঢং' যে-রকমটি দেখা যেত আজ তা নেই। আরও একটি জিনিস তখন ছিল যার অপভ্রংশ এখনও হয়ত কলকাতার আশেপাশে কোথাও কোথাও কেউ দেখে থাকবেন। জিনিসটা হচ্ছে, পুতুলখেলার অভিনয় বা চলতি কথায় যাকে বলে পুতুল নাচ। রথের সময় যেমন সমবেত সংগীত দেখা যেত,

রাসের সময় তেমনি ছিল ঐ পুতুল-নাচ বা বলা ভাল, পুতুল-নাটা। পুতুল দিয়ে নাচিয়েরা এক একটি কাহিনীকেই ব্যক্ত করত, পৌরাণিকই বেশী, কখনও বা সামাজিক।

গাজনের উৎসব আমার ভবিষ্যতের শিল্পী-জীবন গড়ে ওঠার মূলে কাজ করেছে অনেকখানি। এই যে নীলোৎসব, এর সঙ্গে বাঙলার আদিকালের শিবের গাজন উৎসবের একটা ঐতিহ্যগত পরম্পরা ছিল। পল্লীতে পল্লীতে 'সন্ন্যাসী'দের দ্বারা এই উৎসব বিচিত্র এক প্রাণোচ্ছল রূপ ধারণ করত। তার সঙ্গে ছিল গান, ছড়া, আর অভিনয়। এ চলে আসছে বাঙলার সেই কোন্ অতীত যুগ থেকে। আমি তার অনেক টুকরো টুকরো জীবন্ত চিত্র শৈশবে দেখেছি বলে গর্ব অনুভব করি। সেযুগে যেমন প্রাচীন বাঙালীরা নানা দেবদেবীর গাজনে, নৃত্য-গীতে মেতে উঠতেন তেমনি আমাদের যুগেও দেখেছি শিশু বা কিশোররাই শুধু নয় যুবক ও প্রৌঢ়রাও সমান আনন্দে মেতে উঠতেন। বর্ধমানে বোড়ো গ্রামে আঠারো হাত বলরামের মূর্তি আছে, চাষী গ্রাম আছে, হলধরের গাজন হয়। শক্তিগড়ে নেমে দামোদর পার হয়ে যেতে হয়। ওই বোড়ো গ্রামের গাজন-উৎসব ছিল সুবিখ্যাত। এই গ্রামেরই লোক, তারাপদ কোঙার তার নাম, সে ছিল আমাদের গৃহভৃত্য। তার কথা পরে আরও আসবে। সে ছিল যাত্রা দলের প্রাক্তন ব্যক্তি। তার মুখে মুখে এই গাজন-উৎসবের কত বর্ণনা যে সেই বয়সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বোধ হয় সেটা ১৯০২ সাল। ঘোড়ার ট্রাম উঠে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ইলেক-ট্রিকের ট্রাম হয়! ঐ যে আগে স্বর্ণকারের দোকানের কথা বলেছি, সেই দোকানের সামনে টুল পেতে ব'সে আছি ট্রাম দেখতে। নতুনট্রাম আসবে তাই দেখব।

বাড়ি থেকে ঘন ঘন ডাক আসছে, ওরে খেতে আয়, খেতে আয়।

—না, যাব না। ঐ ট্রাম আসছে।

মোটা তার, তামার। একেবারে ঝক ঝক করছে। কখনো ওপর দিকে তাকিয়ে সেই তার দেখছি, কখনো নীচে লাইন দেখছি। ভাবছি কোথা দিয়ে ট্রাম যাবে? ঐ ওপরের তার দিয়ে, না নীচের লাইন দিয়ে?

সমবয়সীরা বসে বসে তর্ক করছি, ওপর দিয়ে যাবে না নীচ দিয়ে যাবে?

রাস্তার দু'পাশে তখন কাতারে কাতারে লোক।

হঠাৎ এক সময় শোনা গেল সেই উন্মুখ জনারণ্যের মধ্যে এক বিপুল উল্লাসধ্বনি।

দূর থেকে দেখলাম, দুখানা গাড়ি ঢং-ঢং করতে করতে কাছাকাছি এলো, এসে, সামনে দিয়েই চালিয়ে নিয়ে গেল। সে দেখে কী যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম সেদিন, তা আজও অনুভব করতে পারি। চিন্তার অবসান হয়েছিল, ওপর দিয়ে নয়, নীচের লাইন ধরেই ট্রাম গিয়েছিল বটে!

দেখবার আরও একটা জিনিস ছিল। সে হচ্ছে, সেকালের বর-বউ। 'বর-বউ' নিয়ে শোভাযাত্রার সমারোহ। 'মহাপায়া' বলে এক ধরনের পাল্কি ছিল, নৌকোর মতন, হাঙরমুখী। বাহকেরা রীতিমত পোশাক পরা। 'মহাপায়া' কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে সার দিয়ে আর বউ বসে আছে ভিতরে। তখন বউ যেতেন আলাদা, বর থাকত অন্য পাল্কিতে। 'মহাপায়া'য় বউ বসে আছে, টকটকে লাল বেনারসী পরে, পাতলা চাদর বা ওড়নায় ঢাকা তার আনত মুখখানি,মাথায় সিঁথিমৌর। পাল্কির দু'পাশ খোলা, তাতে ঝালর দেওয়া। বউয়ের দু'দিকে দুই ঝি হেঁটে চলেছে পাখার বাতাস করতে করতে। বউয়ের বয়স দশ, কি বারো বছর। বউ শ্বশুরবাড়ি যেত সাধারণত দিনের বেলা, অতএব, আলোর প্রশ্ন আসে না। এই বউ-দেখার আগ্রহ ছিল মানুষের প্রচুর। কারণ, এই বউ-দেখাও ত একমাত্র একটি দিনের জন্য। এই যে সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করবে, এর পরেই ত সে চলে যাবে একেবারে চিক-এর অন্তরালে, তারপরে আর কেউ ত তাকে দেখতে পাবে না!

—কাদের বউ যাচ্ছে গা? হয়ত কৌতূহলী কেউ উন্মুখ হয়ে চলমান ঝি টিকে প্রশ্ন করল।

—অমুক বাড়ির বউ। উত্তর আসছে।

—আহা, বেঁচে থাক মা, সাবিত্রী-সমান হও।

বালিকা বধূর আনত মুখখানি কিন্তু স্থির হয়ে আছে যেন পুতুলের প্রতিমা, প্রাণস্পন্দন আছে কি নেই!

আর, বর যেত শোভাযাত্রা করে সন্ধ্যে-বেলা। বউ আসছে শোভাযাত্রা করে, সে ত বিয়ের পর। আর বরদের বেলা শোভাযাত্রার আধিক্য ছিল বিয়ে করতে যাবার সময়। বিরাট আলোকসজ্জা হত। বরেরা পরতও তখন অদ্ভুত জমকালো পোশাক, ড্রেস-ভেল্টের সাজ্জা পোশাক—মাথায় তাজ, চতুর্দোলার ওপরে বসে আছে যেন ঝলো-মলো সিংহাসনের ওপরে রাজপুত্তুরটি! সেই সিংহাসন বয়ে নিয়ে চলেছে বাহকেরা। বরের দুপাশে দাঁড়িয়ে সুবেশা ইহুদী মেয়েরা চামর দোলাচ্ছে সে এক দেখবার মতই দৃশ্য ছিল বটে! তখন ঐরকম শোভাযাত্রায় চামর দোলাবার জন্য ইহুদী মেয়ে ভাড়া পাওয়া যেত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কেউ কেউ ইহুদী মেয়ে ভাড়া করার বদলে মাহাদাসের ছোঁড়া ধরে সখি সাজিয়ে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এ-ও দেখা যেত।

এই আলো আর সিংহাসন, তার সঙ্গে ছিল আবার বাজনার সমারোহ। আগে যে গাজনের কথা বললাম, তাতেও বাজনার প্রাচুর্য ছিল, কোনো কোনো দলের সঙ্গে গোরাবাজনা থাকত। গাজনের মত বিবাহের শোভাযাত্রাতেও গোরাবাজনা আনা হত, বরং আরও বেশী সমারোহের সঙ্গে বলা যেতে পারে। এই গোরাবাজনা ছিল প্রকৃতপক্ষে মিলিটারী ব্যাণ্ড, ফোর্ট থেকে ভাড়া করে আনা যেত। তবে উৎসব বলে কথা, ঠিক নিয়ম না থাকলেও বাজিয়ে-সাহেবদের মদ্যপান করতে দিতে হত। কিন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতে লাগল, তারা ক্রমশ বেসামাল হয়ে পড়ছে। তাই একদিন ফোর্টের কর্তৃপক্ষ এটা বন্ধ করে দিলেন। গোরাসাহেবদের বদলে আসতে লাগল ইণ্ডিয়ান ইনফেন্ট্রি ব্যাণ্ড রাজপুত জাঠ মারাঠা শিখ—এই সব সৈনিকদের সম্মিলিত ব্যাণ্ড-বাদ্য।

বিবাহ উপলক্ষে মাত্র শোভাযাত্রা করে যে কী বিরাট আড়ম্বর ছিল, আর কী বিপুল যে ছিল তার ব্যয়বাহুল্য তা আজকের দিনে ঠিক বোঝা যাবে না। তখনকার দিনে লক্ষ টাকা খরচা হত এক-একটা সমারোহে, আজকের দিনে সেই লক্ষ টাকারই বা মূল্য কত! কথায় বলতো—'বাঁধা রোশনাই'। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যন্ত বাঁধা রোশনাই—পর পর লোক দাঁড়িয়ে থাকত আলোর মালা হাতে নিয়ে। তবে, দূরে-দূরে বিয়ে হলে এটা অবশ্য সম্ভব হত না। পরবর্তী কালে কলকাতার 'ট্রাফিক ব্যবস্থা'-এর সম্প্রসারণের ফলে বাঁধা রোশনাই-এর চলন উঠে গিয়েছিল। 'বাঁধা রোশনাই' আমিও চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি। এসিটিলিন-এর গ্যাসের আলোর 'চলমান রোশনাই' অবশ্য প্রচুর দেখেছি। আলো দেওয়া চলমান বড় গেট ছোট গেট হত—পাঁচ ছ'টি ঘোড়সওয়ার সামনে যেত। 'আড়গড়া' থেকে ঘোড়সওয়ার ভাড়া পাওয়া যেত, তারা যেত শোভাযাত্রার আগে আগে। তারপরে, ফিটন গাড়ি, ল্যাণ্ডো গাড়ি। কখনো বা চার কিম্বা ছ'ঘোড়ায় টানা ল্যাণ্ডো গাড়িও দেখা যেত। মাঝে মাঝে তুবড়ি জ্বালানো হচ্ছে, দীপক তারাবাজি লাল আলো নীল আলো—হয়ত বা এক সময় একটা হাউই হুশ করে আকাশে উঠে গেল। আর ছিল শোভাযাত্রার মধ্যে বিরাট-কায় নকল হাতি, নকল উট, কৈলাস পাহাড়। আরও কিছু ছিল। ছিল চলতি পুতুলনাচ। পিছনের দিকে থাকত বরযাত্রীর দল, বরের জুড়ি গাড়ি বা পাল্‌কি-গাড়ি চড়ে। একেবারে শেষের দিকে থাকত ভাড়া-করা গাড়িগুলো।

এই যে সব বিবাহকালীন বিপুল সমারোহের শোভাযাত্রা, এ দেখতে জনসাধারণের পক্ষে আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'বর

আসছে' 'বর আসছে' শুনলেই যে লোক ছুটে গিয়ে রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে ভিড় জমাবে, এ আর বিচিত্র কী! বাড়িতে-বাড়িতে চিকের আড়াল, সেখানে মেয়েদের ভিড়!

জয়পুরে দেখেছি, হাতিতে বর যাচ্ছে, সামনে রাস্তায় চলেছে বাঈনাচ খেমটানাচ। এটা অবশ্য কলকাতায় কখনো চোখে পড়েনি।

যাই হোক, অনুরূপভাবে রাজপুত্তুরের বেশে শোভাযাত্রা করে বিবাহ করতে যাওয়া ক্রমশ নতুন বরেদের পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল বোধ হয়। তাই বরেরা একদিন বেঁকে বসল। প্রথমেই বিদ্রোহ করল তারা এই রাজপুত্তুরের থিয়েটারি পোশাক নিয়ে। পরে ঐভাবে 'বাহিত' হওয়া নিয়ে। ফলে বরেদের দেখা যেতে লাগল ধুতি-পাঞ্জাবি পরে জুড়িগাড়ি করে প্রথমে আগের মতই একা-একা, পরে খরচ কমাবার জন্য বউ নিয়ে বাড়ি ফিরত। আজ দেখি, জুড়ির জায়গায় হয়েছে মোটরগাড়ি। সেদিনকার
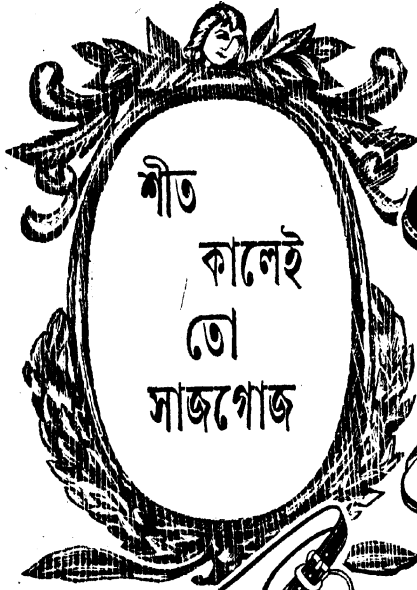
জুড়িগাড়িকে যেমন সাজানো হত, তেমনি ফুল দিয়ে সাজানো আজকালও হচ্ছে অনেক মোটরগাড়িকে। কিন্তু ব্যতিক্রমও দেখছি। সম্ভবত ফুল-দিয়ে-সাজানোর ব্যাপারটা আর দেখতে পাব না বলে মনে হচ্ছে।

এবার আবার নিজের কথায় আসি। যখন পাঁচ বছরে পড়লাম, সেই সময়কার কথা। স্কুলে ভর্তি হবার আগে হাতে-খড়ি হবে। সে-ও এক অনুষ্ঠানের পর্ব।

খবর গেল পুরোহিত-বাড়িতে। পুরোহিত এসে পাঁজি দেখে দিনস্থির করে ফর্দ করে দিয়ে গেলেন। সাধারণত সরস্বতীপুজোর দিনই ছিল হাতে-খড়ি দেবার প্রশস্ত দিন। অবশ্য পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে যায়-যায়, অথচ সামনে সরস্বতী-পুজোর দিন নয়—সে ক্ষেত্রে পুরোহিতই স্থির করে দিতেন বিদ্যারম্ভের দিন। অবশ্য আমি পেয়েছিলাম সরস্বতীপুজোর দিন। পুজোর নানা উপচার, পণ্ডিতজীর আসনে ঘটস্থাপনা করে মা সরস্বতীর পুজোর ব্যবস্থা হল, ধূপধুনো মালা চন্দন নৈবেদ্য ইত্যাদি।

ঘুম থেকে ওঠামাত্রই মা বললেন, কিছু খাবে না, আজ তোমার হাতে খড়ি।

আমাকে নিয়ে স্নান করিয়ে, নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দিলেন। কপালে দিলেন চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা। এইভাবে সেজে পুরুতঠাকুরের পাশের আসনে গিয়ে বসলাম।

পুরোহিতমশায় নিজের পুজো-অনুষ্ঠান শেষ করে আমাকে মন্ত্র পাঠ করালেন, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ালেন। তারপরে শ্লেটে রামখড়ি দিয়ে 'অ-আ-ক-খ' সমস্ত লেখালেন হাত ধরে। সেটা মুঠো করে ধরে আবার খড়ি দিয়ে কয়েকবার বুলোলাম। সেই হল আমার বিদ্যারম্ভ। ছেলে তখন হয় উলঙ্গ থাকবে আর নয়ত কাপড় পরবে, হাফ-প্যাণ্ট পরতো না। তবে, স্কুলে যাবার সময় ধনী ঘরের ছেলেরা প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট পরত।

তারপরে ভর্তি হলাম স্কুলে, চক্রবেড়িয়া শিশু-বিদ্যালয়। সেটা আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দশ মিনিটের পথ। জগুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে চক্রবেড়ের মোড়ে, যেখানে নফরচন্দ্র কুণ্ডুর স্মৃতিস্তম্ভটি আছে, সেইখানটায় ছিল ঐ শিশু-বিদ্যালয়ের ভবন।

নফরচন্দ্র কুণ্ডুর কাহিনী হয়ত অনেকেরই জানা। রাস্তার ড্রেনের ম্যানহোল খুলে নীচে নেমে কুলীরা ময়লা সাফ করত। তেমনি একদিন একটি কুলি নেমেছে, কিন্তু আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেনে তখন জমা ময়লার দরুন তৈরী হয়েছে বিষাক্ত গ্যাস। সেই গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে গেছে অসহায় লোকটি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে পারছে না। ওপর থেকে গোঁ-গোঁ একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। নফরচন্দ্র ঠিক সেই সময় যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। তিনি শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন, তারপরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিজেই নেমে পড়লেন ড্রেনের মধ্যে লোকটিকে তুলে আনবার জন্য। লোকটিকে কোনক্রমে তুললেন বটে, কিন্তু নিজে পড়লেন সেই বিষাক্ত গ্যাসের কবলে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। এই

মহাপ্রাণ ব্যক্তির উদ্দেশে একটি স্মৃতিস্তম্ভ করে দিয়েছিল কর্পোরেশন।

এই স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের কাছে আরও এক স্মৃতি বহন করে। কারণ, এর কাছেই ছিল আমাদের স্কুল-বাড়িটা। একতলা বাড়ি—উঁচু ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। রাংচিত্তিরের বেড়া দেওয়া সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ছেলেদের সেটা খেলাধুলো করার স্থান।

সেই স্কুলে যাওয়াই হল আমার বাইরের রাস্তাঘাট ভালভাবে দেখা। প্রকৃতপক্ষে বহির্জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচিতি। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কথাটা সত্যি। এর আগে বাইরে বেরুবার সুযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি মামাবাড়ি, কি সার্কাসে, কি থিয়েটারে, সব সময়ই ঘোড়ার গাড়ি করে জানালার সব পাখি বন্ধ করে।

কিছু আগে তারাপদ কোঙারের নাম করেছি। সে প্রথমে ছিল মামাবাড়ির বিশ্বস্ত এক ভৃত্য। সে শুধু আমাকেই যে কাঁধে করে স্কুলে নিয়ে গেছে তা নয়। আমার মার ছোটবেলায় মাকে নিয়ে গেছে স্কুলে, মাসিমাদের নিয়ে গেছে, মামাদেরও নিয়ে গেছে। পূর্বেই বলেছি, তার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার বোড়ো গ্রামে, দামোদরের তীরে। তার ভীষণ শখ ছিল যাত্রাগানের। তার ছোটবেলা থেকে গ্রামের যাত্রাদলে ঢুকে সে করত যাত্রাগান। কিন্তু সেখানেই তার সেই দুর্দান্ত শখ সীমারেখা মানেনি। এখন হয়েছে কী, কী-এক যাত্রাদল তখন কলকাতা থেকে গেছে তাদের গ্রামে পালাগান করতে। তাদের অভিনয় আর জাঁকজমক দেখে তারাপদ গেল একেবারে মুগ্ধ হয়ে। সে করল কী, এই যাত্রাদলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে একেবারে পালিয়ে এল কলকাতায় তাদের সঙ্গে। আমার মামাবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হত এবং সেই উপলক্ষে হত যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি। এ ছাড়া, মামাবাড়ির একশো গজের মধ্যে ছিল বারোয়ারীতলা, সেখানেও যাত্রা হত। তারাপদদের দল ওখানে একবার এসেছিল যাত্রা করতে। কিন্তু, যাত্রার দলে ঢুকে তারাপদর খাওয়া-দাওয়ার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এবং হওয়াটা অন্তত তখনকার দিনে অস্বাভাবিক ছিল না। একটা প্রচলিত ছড়াই ছিল :

'তেল মাখবে থাবা থাবা,
পাশ ফিরে শোবে বাবা।
খোঁদল দেখে পাতবে পাত,
তবে খাবে নীলকমলের ভাত।'

'নীলকমল' হল, যাত্রার যিনি অধিকারী। 'নীলকমল' নামটা বিখ্যাত প্রাচীন ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'স্বর্ণলতা', যার নাট্যরূপ 'সরলা' একদা বাঙলার নাট্যমঞ্চে প্রভূত সাফল্য এনে দিয়েছিল, সেই বইয়ের বিশিষ্ট চরিত্র। 'নীলকমল' নাম থেকে প্রেরণাসম্ভূত কি না, কে বলতে পারে! এখন, এই যে 'নীলকমল', অর্থাৎ যাত্রার অধিকারী, তিনি দলের ছেলে-ছোকরাদের শিক্ষা দিতেন এই বলে যে, যখন দলের পাচকঠাকুর স্নানের জন্য সরা করে সবাইয়ের জন্য তেল দিয়ে যাবে, তখন সেই তেল ধীরেসুস্থে হাতে-পায়ে-গায়ে মাখতে গেলে আর পিঠে-মাথায় কুলোবে না কারণ সবাই একসঙ্গে সরাতে হাত ডোবাবে সব তেল ফুরিয়ে যাবে; অতএব থাবা থাবা করে আগে গায়েমাথায় তেল লাগিয়ে নিয়ে পরে ঘষে ঘষে গায়ে-পিঠে মাখো। আর পাশ ফিরে শোওয়া মানে, একটা গোয়াল-ঘরের একপাশে বা একটা চালার নীচে যাত্রাদলের অতোগুলো লোককে হয়ত শুতে হবে, চিত হয়ে আয়েস করে শুতে গেলেই পাশের লোক গুঁতো মেরে আবার দেবে পাশ ফিরিয়ে। এবং ফের পাশ ফিরতে গেলে, প্রায় দাঁড়িয়ে তবে পাশ ফিরতে পারা যাবে এমন সংকীর্ণ জায়গা। অতএব নীলকমল বলছেন—'বাবা সকল পাশ ফিরে একভাবে শুয়ে থাকার অভ্যেসটা কর। এবার 'খোঁদল দেখে পাতবে পাত।' খোঁদল মানে গর্ত। অর্থাৎ খাবার জন্য মাটির ওপর পাতা পেতে দিয়ে গেলে সেই পাতা মাটিতে গর্ত বা নীচু মতন দেখে তার ওপরে পাতবে—তা হলে সেই খোঁদলে তবু একটু ডাল-ঝোল জমা হবে, কারণ গর্তের ভিতর পাতাটা নেমে গেলেই বাটির মত হবে জায়গাটা।

এর থেকে অন্তত বোঝা যাচ্ছে যে, তখনকার দিনে যাত্রাদলের লোকদের কী কষ্টই না করতে হত 'যাত্রা' করার জন্য!

তারাপদ মামাবাড়িতে যাত্রা করতে এসে একদিন কথায় কথায় কী করে যেন আমার দাদামশাইয়ের কাছে তার দুঃখের কথাটা জানিয়েছে। শুনে দাদামশাইয়ের মনে খুব দয়া হল। ছেলেমানুষ ও, দলে মিশে বড় কষ্ট পাচ্ছে ত?

—কাজ করবি? বাড়ির কাজ? দাদামশাই প্রশ্ন করলেন।

—করব।

সেই থেকে তারাপদ স্থান পেয়েছিল মামাবাড়িতে। বয়সে ছেলেমানুষ, কী আর করবে, তামাক সাজত, আর বাড়ির ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেত স্কুল থেকে নিয়ে আসত।

আমি যখন হলাম, মা যখন মামাবাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে এলেন বাড়ি, দাদামশাই বিশ্বাসী আর ভাল লোক দেখে তারাপদকে দিলেন আমাদের সঙ্গে, মায়ের সুবিধার জন্য, ছেলে মানুষ করার জন্য।

এই তারাপদ, আমায় শৈশবকালের স্মৃতিতে এক মোহময় স্থান অধিকার করে আছে, তাকে আমি কেমন করে ভুলব?

(ক্রমশ)

উত্তরা

সন্তোষকুমার ঘোষ

[১]

কবির কথায় কান না দিয়ে এই সেদিন পর্বতমালা দেখে এলুম। নিতান্ত স্বেচ্ছায় বলব না, বরং প্ররোচনায়। চড়াই-উৎরাইয়ে আমার উৎসাহ কম, সম্ভব হলে এই সমতলে বসেই একটি ঘাসের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু দেখব বলে নয়ন মেলে বসে থাকতুম। কিন্তু এই কলকাতা শহরের গলিতে না আছে আকাশ, না মাটি। এখানে ঘাসের শিষে শিশিরবিন্দু দেখার শখ মেটানোই সহজ নাকি!

উত্তরতর বাংলা যে ঘুরে এলুম, শিরো-নামাতেই তার ইঙ্গিত আছে। উত্তরের পরে এই 'তর' প্রত্যয়টা কেন? কারণ আছে। বাংলার আসল সীমানা নিয়েই আমার মনে কিছু খটকা। একালের কবি পরিহাস করে বলেছেন 'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই।' আমার মনে এখানে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি দোষ ঘটেছে। দক্ষিণের সুন্দরবন সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জ্ঞান ভূগোলের পাতা ছাড়ায়নি, আর উত্তরের তরাই পার হবার সুযোগও কম লোকেরই ঘটেছে। বঙ্কিমের গানে যে-মায়ের বর্ণনা, তিনি সুজলা সুফলা এবং অনুমান করি, সমতলা। রবীন্দ্রনাথ একবার শুভ্র তুষার কিরীট পরিয়ে দিয়ে এ-দেশটাকে 'ভুবন-মনোমোহিনী' করে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু এটিকেও ব্যতিক্রম বলেই ধরব। তাঁর কাব্যেও সুখাত পদ্মাতীরের শান্তি নতুবা আদিগন্ত প্রান্তরের উদারতা। আমাদের কাব্যে বঙ্গপ্রকৃতিতে বন্ধুরতা এবং উদ্বেলতা, দুইই অনুপস্থিত। এ-কথা উল্লেখ করার কারণ, এর মধ্যে আমাদের ভূগোল-মানসের আভাস আছে।

সমতলে ফিরে আসার সাতদিন পরে সাত দিন ধরে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরির কথা লিখতে বসে দেখি, এরই মধ্যে সব স্মৃতি কেমন অনুজ্জ্বল আর অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আসলে ভ্রমণ বিষয়ে কিছু লেখাতেই আমার বোধহয় অরুচি। নইলে বছর দুই আগে বিলেত দেশটির কিনা সেটা চাক্ষুষ করে আসারও ত সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে এক বর্ণ লেখা হয়ে ওঠেনি। আমার প্যারিস, আমার ভিয়েনা, আমার রোম আর কায়রো, জেনীভা আর লণ্ডন আমার মনেই রইল। কাউকে তার ভাগ দেওয়া হল না। অনেক ভেবে চিন্তেও ঠিক করতে পারলুম না, কী লিখব। রাস্তা-ঘাট, হোটেল ইত্যাদির গণনা? সে ত যে-কোন ট্যুরিস্টস গাইড-বুকেই লভ্য। ছোটখাট অভিজ্ঞতা? সেগুলো হয় অকিঞ্চিৎকর, নয়ত অপ্রকাশ্য। ক্ষণিকের বন্ধু বা বান্ধবীদের নিয়েও রীতিমত রোমান্টিক গল্প ফেঁদে বসতে দেখি অনেককে। ভ্রমণকে যে এদেশে "ভ্রমণ-কাহিনী" বলা হয়, সে নিতান্ত অকারণে নয়। সেইজন্যই বোধহয় যাঁরা খাঁটি কথা লিখতে চান, তাঁরা ভ্রমণ-কাহিনীর আগে "সত্য" উপসর্গটি জুড়ে দেন।

সার কথা এই যে, ভ্রমণে নিজের স্বাস্থ্যের কিছু উপকার হতে পারে, হয়ত মনের প্রসারও। কিন্তু অপরকে তার বখরা দেবার প্রয়াস বৃথা। দু-চার দিন, দু-চার মাস এমনকি, বছর কয়েক প্রবাসে বাস করেও সে-দেশ সম্পর্কে গভীর কিছু লেখা সম্ভব নয়। যা লেখা সম্ভব, তা সে-দেশে না গিয়ে বিবিধ বিবরণ থেকে সংগ্রহ করেও হতে পারে। জাতীয় জীবনের ধারায় নিমজ্জিত না হলে সেখানকার বিষয়ে কিছু লেখা পল্লবগ্রাহিতা বা ভাষা-বিলাস মাত্র। ওরা এদেশে এসে যেমন যোগী, সাপ আর দড়ির কসরতের কথা লেখে, আমরাও তেমনি

"শুভ্র তুষার কিরীটিনী"

ওদেশের বাইরের চাকচিক্য দেখে হকচকিয়ে যাই।

কিন্তু দার্জিলিং প্রসঙ্গে এত কথা বোধ হয় অবান্তর। সে ত আমাদেরই চৌহদ্দির মধ্যে—"দূর অস্ত্" নয়। কিন্তু শুরু করি কোথায়। ইস্কুলের পড়ুয়া যখন ছিলুম তখন এত ভাবনা ছিল না। মাস্টার মশাই হুকুম দিলেই "মাই ফর্স্ট রেলওয়ে জার্নি" নামধেয় রচনাটি অনায়াসে লিখে ফেলতে পারতুম। এবারেও তাই করব নাকি? একেবারে শিয়ালদা স্টেশনে সিটি-বক্সা থেকে শুরু করব? শহুরে সীমানা পেরোতেই দুধারে ধানের খেত—এই স্থির-ঘুমন্ত গালিচা, এই—হাওয়ার ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই—অস্থির-ঢেউ নিপার নদী। মনে আছে, বাংলার বেড়া টপকাতে না টপকাতেই ঝাঁক ঝাঁক ক্ষুদে পাখির-মত বৃষ্টি আমাদের গাড়ির ওপর আছড়ে পড়েছিল, আমাদের বন্ধ কামরার জানালায় ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাচ্ছিল। আমাদের কামরা খানিক পরে জলে ভেসে গিয়েছে। (অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, কামরাটা উচ্চ শ্রেণীর। এই গণতান্ত্রিক যুগে সকলেই সমান, জানি; উচ্চ-নীচে ভেদ নেই। কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভাড়ার ব্যাপারে উচ্চ-নীচ ভেদ বিলক্ষণ আছে। ওটা তুলে দিলে আমাদের কিছুমাত্র অভিযোগ থাকত না। ক্লাসলেসনেস তাঁদের লক্ষ্য হয় যদি হোক, তবে উঁচু ক্লাসের আরামকে নীচে টেনে না নামিয়ে নীচু ক্লাসকে ওপরে তোলাই বোধহয় যুক্তিসম্মত।)

খেয়াপারাপারের কথাটা বোধহয় এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। স্টীমারে প্রচণ্ড ভীড়, রাতের খানা জোটে কি না জোটে, এমন সংশয়। খানা যদি-বা জুটল জলের গ্লাস নিয়ে কাড়াকাড়ি। চারটে গ্লাস বসিয়ে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমাদের সহযাত্রী এক বন্ধু হঠাৎ দেখেন, সে-গ্লাসটি বেহাত। টেবিলের ওদিক থেকে এক যাত্রী সেটায় চুমুক দিচ্ছেন।

বন্ধু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ওটা আমার গ্লাস।"

রূঢ় জবাব এল, "নাম লেখা আছে নাকি?"

বন্ধুকে এবার ঢোক গিলতে হল, কিন্তু একটু পরেই সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "না, তবে ওটা থেকে আমি জল খেয়ে নিয়েছি কিনা! দেখুন না, এখনও এতে আমার ঠোঁটের এঁটো লেগে আছে।"

জবাবটা সত্যি কি মিথ্যে জানি না, হয়ত ওটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই হবে। কিন্তু কথাটায় ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ হয়েছিল। নিমেষে অপর যাত্রীটির মুখ চুন হয়ে যেতে দেখেছি। তাঁর পাকস্থলীতে কথাটার কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বলতে পারব না।

পথের অসুবিধার কথা এত যে সাত-কাহন করে বললুম, উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এইটেই দেখানো যে, এইজন্যই—দূরত্ব আর নানা ঝঞ্ঝাটের জন্যই—বাংলার উত্তর আর দক্ষিণ ভাগ স্বাধীনতার এক যুগ পরেও এতটা আলাদা হয়ে আছে। ফরাক্কার ফুল কবে ফুটবে কারও জানা নেই। আদৌ ফুটবে ত? না ফুটলে এ-অঞ্চলে টুরিজ্‌মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ ভরসা দেখছিনে। সরকারী প্রচারের সব বাহাদুরি মাঠে মারা যাবে।

[২]

নীলাঞ্জনছায়া দিগন্ত। শিলিগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে দেখে দেখে 'আঁখি না ফিরে।' পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। তুষারমৌলি নীল হিমাদ্রি স্বয়ং নন, তিনি ত আছেন স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে। এরা পারিষদ বা পার্শ্বচর। সম্রাটকে পাহারা দিচ্ছে, না এগিয়ে এসেছে আতিথেয় স্বাগত জানাতে, বলা মুশকিল।

তার চেয়ে বরং বলি, এরা গানের আলাপের মত। মনে সুরটির আমেজ দেয়। কিন্তু সাড়াই দেয় কি? অভ্রভেদী গিরি-চূড়ার শুভ্রতা নাই এদের কোনো। এরা উন্মুখ, এবং সবুজ।

পাহাড় আমাকে বরাবরই অভিভূত করে এবং আতঙ্কিত। বছর কুড়ি আগেকার আর্দ্র সেই শীতের সন্ধ্যাটিকে ভুলব না। যখন জি টি রোড দিয়ে পায়ে হেঁটে নিমিয়া-ঘাট স্টেশনের দিকে এগোতে এগোতে পাশে পরেশনাথ পাহাড়টির ধূসর রূপ দেখে চমকে উঠেছিলাম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে একবার গয়া স্টেশনের বাইরে যে পাহাড়টির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সেও অবিস্মরণীয়। ঝাঝার ছোট পাহাড়টিও একদা অর্ধরাত্রের জন্য আমাকে চকিত করেছে। ছোটবেলায় হরিদ্বারের প্ল্যাটফর্মে পা রাখার রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে কলমের মুখে কী করে ফোটাব! কালকার অনতিদূরে শিবালিকের গম্ভীর প্রহরীকেও ভুলিনি। কাঞ্চনজঙ্ঘার কিরণ-কিরীট আর আল্পসের শ্বেত ফেনায় মাখামাখি চূড়া—দুই-ই দেখেছি। আল্পসকে দেখেছি বিমান থেকে, যখন আকাশটা একটা প্রকাণ্ড ওল্টানো গামলার মত হয়ে যায়। এরা আমার মনে শ্রদ্ধা, ভয়, বিস্ময়, সবই সৃষ্টি করে। আবার দুমকা আর পঞ্চকোটের পোষমানা পাহাড় দুটিকেও ভালবাসি। রাজমহলের অশ্বচক্র-নিভ রেখাকেও।

মূলে সমতলের মানুষ বলেই সম্ভবত এই আকর্ষণ। পৃথিবীর তিনভাগ যদি জল আর একভাগ স্থল হয়, তবে সেই স্থল-ভাগের আবার তিনভাগই হয়ত পাহাড়, অন্তত বন্ধুর। এই জ্ঞান আমাদের আনাগোনার অভিজ্ঞতায় থাকে না।

শিলিগুড়ি থেকে চড়াইয়ের পথে যেতে

যেতে সেদিন আবার নতুন করে পাহাড়কে ভালবাসলাম। ভালবাসলাম সানুদেশে আশ্রিত পাইনের মন্দিরোপম চূড়াগুলিকে। প্যাগোডার স্থাপত্য পাইনের কাছ থেকে ধার করা কিনা কে জানে।

কবি নিস্তব্ধ গিরিরাজের অভ্রভেদী সংগীতের কথা বলেছেন। আমার মনে হয়েছিল, সংগীত, না মৌন স্বরলিপি? আঁকাবাঁকা রেখায় লেখা রয়েছে—সাংকেতিক চিহ্নের মানে যে জানে, একমাত্র তার কানেই গম্ভীর-মহিম অনাহত সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

তিনধরিয়াতে এসেও টের পাইনি। কিন্তু কার্শিয়াংয়ে পৌঁছে সুটকেশ খুলতেই হল। শীতের অদৃশ্য-নিঃশব্দ শত চর বল্লম হাতে ফিরছে। পশমী বর্ম এঁটে না নিলে আত্মরক্ষার উপায় নেই।

গলা ভেজানোও চাই। কার্শিয়াং স্টেশনে ঢোকা গেল। সেই 'টয় ট্রেনটাকে' কত পিছনে ফেলে এসেছি! সে হয়ত পথের কোন বাঁকে, কোন অতল খাদের ধারে, অনেক নীচে, জোরে জোরে শ্বাস টানছে, জিরিয়ে নিচ্ছে। আমাদের জীপ খাড়া রাস্তায় সটান উঠে এল।

পরে, সপ্তাহখানেক ধরে, এই 'ফোর-হুইলস ড্রাইভ' জীপের আরও অনেক কেরামতি দেখেছি। ভাঙাচোরা সংকীর্ণ রাস্তা, এক পাশে পাহাড়ের দেয়াল, অন্যদিকে অতলস্পর্শী অসহায়তা হাঁই তুলেই চলেছে, কিন্তু অবিচল জীপ শান্তমনে একটা পর্বতকে গৌরবভূমির জোরে সোজা ষাট-সত্তর ডিগ্রী ঢালে উঠে গেল। ড্রাইভারের নির্ভীক-নিষ্কম্প হাত স্টিয়ারিংয়ে, মুখে 'কেয়া হোয়েগা' ভাব।

আমার ত মনে হয়, প্রয়োজন হলে এই ফোর-হুইলস্-ড্রাইভ্ গাড়িগুলি গাছে চড়তেও পারে। তবে, সত্যি বলব, এ-জাতীয় কোন জীপকে কখনও গাছে চড়তে দেখিনি।

কার্শিয়াং স্টেশনের টী-রুমে। সহযাত্রী বন্ধু এখানে আগেও এসেছেন, একাধিকবার। সে এক যুগেরও বেশি হয়ে গেল। তিনি বারবার এদিক-ওদিক চাইছিলেন। হাওয়া শুঁকলেন একবার। টেবিলের চামচটা তুলে নিয়ে টুংটাং বাজালেন। "এ-সবই আমার চেনা। এখানে এসেছি কতবার। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।"

কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। চুপ করে শুধু শুনেছিলাম।

"বুড়ো এক পার্শি ম্যানেজার ছিল।" বলেই বন্ধু হঠাৎ কী দেখে বিস্ময়ে থমকে গেলেন। তার পরেই উৎফুল্ল গলায় তাঁকে বলতে শুনলুম, "আরে, সে যে এখনও আছে দেখছি।"

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও দেখতে পেলুম। ভিতরে একটি খুপরিতে ডেস্কে বসে এক ভদ্রলোক মাথা নীচু করে খাতাপত্র দেখছেন। হিসাব মেলাচ্ছেন। পাকা বাতাবি লেবুর মত একটি মাথা, কেশহীন, রোমহীন, ভাবলেশহীন। একবার উঠে দাঁড়ালেন। এদিকে উঁকি দিলেন। আবার ফিরে গেলেন আপন আসনে। বাইরে স্টেশনটা তখন গমগম করছে, সেই খেলনা গাড়িগুলোরই একটি হয়ত এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রবীণ পার্শি ম্যানেজার তার জন্যে একটুও ব্যস্ত বা বিচলিত নন। মাথা নামিয়ে হিসাবের খাতা দেখছেন ত দেখছেনই। এমন সহস্র সহস্র গাড়ির আনাগোনা তাঁর দেখা আছে, লক্ষ লক্ষ যাত্রীও। এরা তাঁর স্থৈর্যের সরসীতে ছোট একটি ঢেউও তাই আর তোলে না।

"লোকটা ঠিক তেমনই আছে, একটুও বদলায়নি, আশ্চর্য!" বন্ধু অস্ফুট স্বরে বললেন।

তাঁর চোখে বিস্ময় ছিল, সেই সঙ্গে একটুখানি খেদও। বিস্ময় কেন, সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু খেদ কেন, তাও বুঝি অনুমান করতে পেরেছিলুম।

দেয়ালের আয়নায় বন্ধু নিজেকে দেখে থাকবেন। আর সেই মুহূর্তেই তিনি হয়ত টের পেয়েছিলেন, এক যুগ বা তারও বেশি আগে যে যুবকটির কার্শিয়াং স্টেশনে বারবার আসা-যাওয়া ছিল, ঠিক সে-ই ফিরে আসেনি। সেই যুবকটি আর নেই।

অথচ বৃদ্ধটি আছে।

বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও কি টের পেয়েছিলেন যে, যুবকেরা যদিও যুবক থাকে না, কিন্তু বুড়োরা থাকে, এবং আর বুড়ো হয় না? —বড়ো জোর একদিন চলে যায়।

তাঁর দীর্ঘশ্বাসও হয়ত পড়েছিল। জানতে পারিনি।

এরপর ঘুম। অবশেষে দার্জিলিং।

(ক্রমশ)

অশ্বত্থ

বিষ্ণু দে

গাছের স্তব্ধতা গড়ি দেহে মনে,
মহাপিপুলের, আকাশে রোমাঞ্চ মেলে রাখে
সহস্রাক্ষ যে পিপুল, অটল স্তব্ধতা দেখি তার সনাতনে,
মনে মনে গড়ি,
রাঢ়ের রুক্ষতা জয় করে যে পল্লবে
লক্ষ লক্ষ প্রাণময় সবুজ পল্লবে ঢাকে
আপন হৃদয়,

কঠিন সংহত স্থির সারাটা প্রান্তরে প্রাণের গঠন,
অজেয় উৎসবে কোনও উমার সন্ধানে
যেন বা এসেছে দেশে সতীর গিরিশ।

পিপুলে তন্ময় দেহমন।

ওদিকে তুলেছে কারা মহানিম আমজাম ছাতিম শিরীষ
নানা ফুল ফলগাছ নানা শব্দ গানে
ঝিরিঝিরি নানা নাচে
নরম হাওয়ায়,
সব ভালো খুব ভালো, মধুর মধুর, আনন্দ আরাম তৃপ্তি;
তবু অতুলন এই বয়স্ক পিপুল, রৌদ্রে স্থির,
পৃথুল প্রবীণ পৃথিবীর বিপুল প্রণয়ে স্তব্ধ।

কখনও বা অনেক কূজনে কচি কচি লক্ষ লক্ষ কোমল সবুজ
হাতে হাতে মৃদু পাতা শিহরে শিহরে দোলে,
যেন কোনও আন্দোলনে পরগনার সমস্ত মাতার
কোলে কোলে স্পষ্টে আর অস্পষ্টে অবুঝ শিশুদের ভিড়,
কখনও বা ঈশানের ঝড়ে
উদ্দাম উন্মাদ রাগে হাহাকারে মারে মরে
নুয়ে বেঁকে পড়ে, বাসা ছাড়ে, তালে তার তাল দেয়—
পাখায় পাখায়,

ভাঙে না, কারণ তার আবিশ্ব শিকড়ে সনাতনে
গভীর কঠিন প্রাণ, বড় জোর বহুদূরে পাঁচিলের ভিড়ে
উপড়িয়ে ওঠে তার দুর্মর আবেগ, ফাটল ধরায়,
ধসায় দেয়াল, বড় জোর ঝরায় পল্লব কিছু,
কিছু বা খসায় ডাল,

তারপরে আবার আশ্রয়,
আকাশ ও নীড়,
স্তব্ধ স্থির আমাদের মাঠে আশ্চর্য অশ্বত্থ গাছ ॥

ঘড়ি চলে অবিরাম টিক্ টিক্ টিক্

বরুণেন্দ্র গুপ্ত

পদ্যে আমরা তাই পড়েছি বটে কিন্তু সে ঘড়ি সত্যিই অবিরাম চলতে পারে না। দম ফুরিয়ে গেলেই থেমে যায় টিক্ টিক্ আর শোনা যায় না।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এমন একটা ঘড়ি তৈরি করেছেন, যে ঘড়ি দম না দিলেও চলবে। শুধু চলবে তা নয়, নিখুঁত সময় দেবে। হাজার বছর ধরে চললে হয়ত এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হবে। ঘড়িটির ওজন ৩০ পাউণ্ড, রিস্টওয়াচের মতো কব্জিতে বেঁধে ইচ্ছেমতো ঘোরা যাবে না। তবে এমন ঘড়ি কি কাজে লাগবে? কাজে লাগবে বলেই ও তৈরি করা হয়েছে।

এই ঘড়িটিকে আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে সে কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। ঘড়িটি অন্ততঃ যাতে তিন সপ্তাহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সময়ে সে প্রতি সেকেণ্ডে ২৪ বিলিয়ন বার টিক টিক করবে। হাজার মিলিয়নে হয় এক বিলিয়ন আর এক মিলিয়ন হল দশ লক্ষ। ঘড়িটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার সময় শুধুই টিক্ টিক্ করবে না। সে পৃথিবীর জ্যামিতিক আকৃতি মাপবে, আলো আর বেতার তরঙ্গও মাপবে আর নির্দেশ করবে পৃথিবীর সর্বদিকেই শূন্য বা দেশের ব্যাপ্তি সমান কি না।

ঘড়িটিকে ঊর্ধ্বাকাশে পাঠাবার মূল কারণ হল বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আইনস্টাইনের একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা, যা তিনি তাঁর থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা-বাদের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। সিদ্ধান্তটি শুনলে রূপকথার কল্পনা বলেই মনে হবে। আইনস্টাইন প্রচারিত সময়ের এই সিদ্ধান্তটি এই রকম। মনে করা যাক আপনি জেট্ চালিত বা অ্যাটমীয় শক্তি দ্বারা চালিত এমন একটা বিমানে চাপলেন, যে বিমানের গতি প্রায় আলোর গতির সমান। অবশ্য এসব কাল্পনিক, কারণ আলোর গতি হল প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। আপনার হাতে একটা রিস্টওয়াচ বাঁধা আছে। আপনি মজা করে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ঘড়ি দেখছেন। আপনার ঘড়ির হিসেব অনুযায়ী আপনি বিশ বছর ঘুরলেন। ধরে নিতে হবে যে প্লেনটি
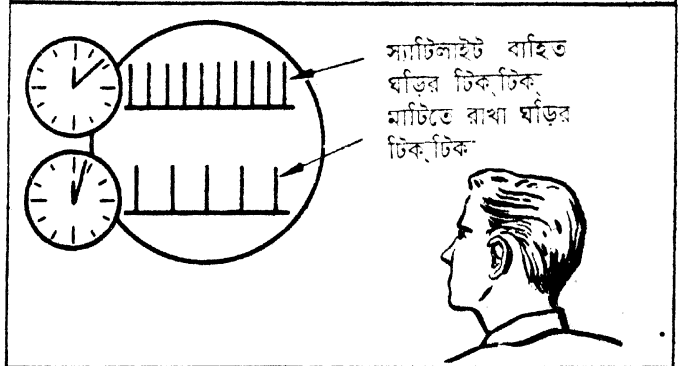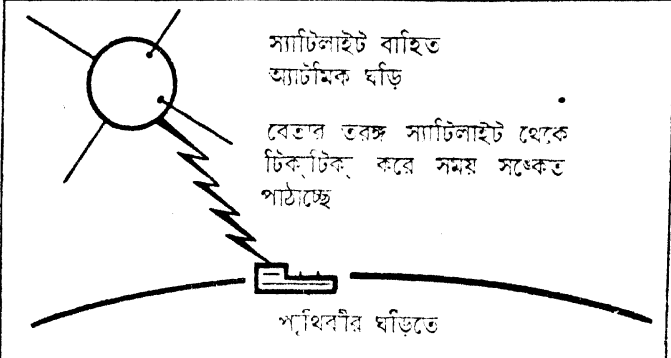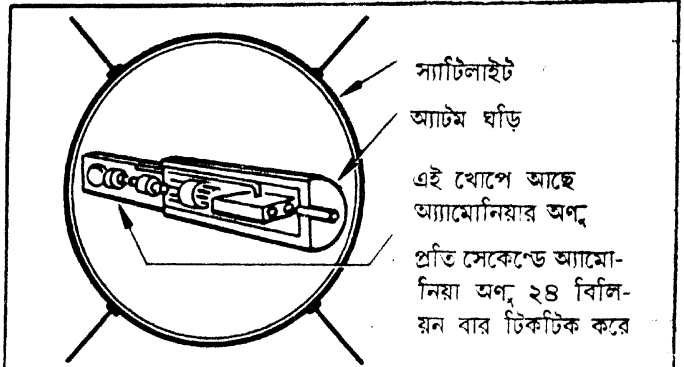
ওপরে স্যাটিলাইটটি দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে অ্যাটমিক ঘড়িটি থাকবে। অ্যাটমিক ঘড়িটি প্রতি সেকেণ্ডে ২৪ বিলিয়ন বার টিক্‌টিক্ করবে। তার সেই টিক্‌টিক্ শব্দ ৮০০০ মাইল দূর থেকে শোনা যাবে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, বেতার তরঙ্গ সেই টিক্ টিক্ শব্দ বহন করে নিয়ে আসছে। ঊর্ধ্বাকাশের ঘড়ি আর মাটিতে রক্ষিত ঘড়ি, এই দুইয়ের টিক্‌টিকের, তফাৎ হিসেব করে দেখা হবে মহাশূন্যে সময়ের গতির হার কি আরও দ্রুত?
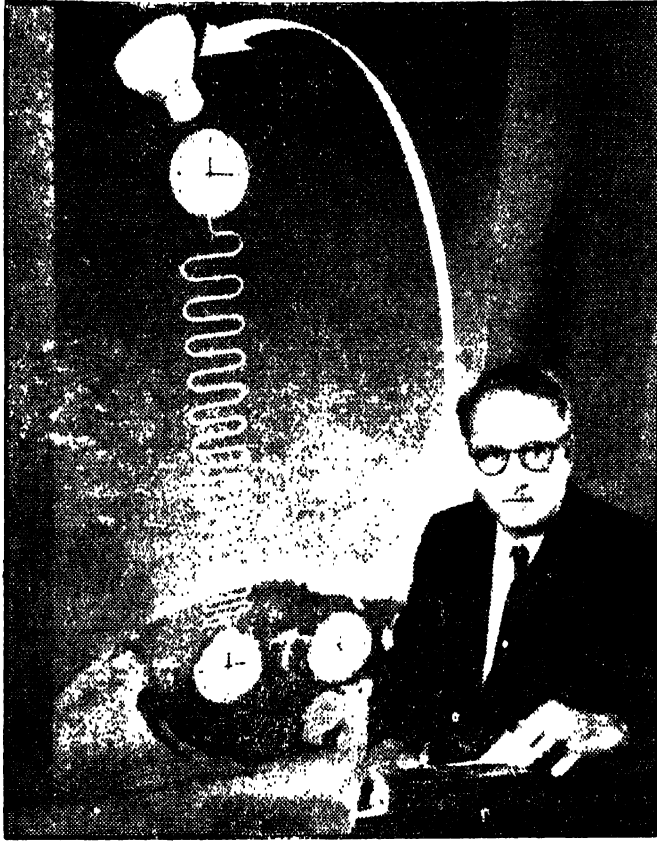
দুটি যমজ অ্যাটমিক ঘড়ি, একটি আছে ৮০০০ মাইল দূরে, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে আর অপরটি মাটির বুকে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই দুই ঘড়িতে সময়ের তফাৎ ধরা পড়ে কিনা এবং কতখানি তারই হিসেব নেবেন। ওপরের ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ বেতার তরঙ্গে চেপে পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। বিজ্ঞানী সেই সময়ের তফাতের হিসেব নিচ্ছেন

না থেমে বিশ বছর চলেছে আর আপনার সঙ্গে বিশ বছরের মতো খাবার ছিল।

যাই হোক বিশ বছর পরে আপনি পৃথিবীতে ফিরে আসা স্থির করলেন এবং একদিন ফিরেও এলেন। ল্যাণ্ড করবার আগে আপনি হয় ভাবছেন যে আপনার বন্ধু-বান্ধবেরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ফুলের মালা নিয়ে আপনার জন্যে দমদম বিমান ঘাঁটিতে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু হায়! দমদম বিমান ঘাঁটিটাই আপনি চিনতে পারলেন না। কি করেই বা চিনতে পারবেন বলুন, কারণ আপনার অনুপস্থিতির বিশ বছরে পৃথিবী কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে।

অন্যান্য আরও অনেক সিদ্ধান্তের মতো আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্তও অনেক বিজ্ঞানী যাঁরা বুঝতে পেরেছেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন কিন্তু উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতির অভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি এতদিন।

ঐ ঘড়ি, যার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাটমিক ক্লক, যদি আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারে তাহলে যা ছিল কল্পনা তা হবে বাস্তব, সমগ্র চিন্তাধারায় এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করবে, যার সুদূরপ্রসারী ফল অবশ্যম্ভাবী।

অ্যাটম ঘড়ির টিউব যার মধ্যে অ্যামোনিয়ার অণু সর্বদা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাঁপছে। এই অ্যাটমিক ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডক্টর হ্যারল্ড লিয়নস্। অ্যাটম ঘড়ির পরীক্ষা সফল হলে মহাকাশে সময় সম্বন্ধে আইনস্টাইনের চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তটি প্রমাণিত হবে

আগেই বলা হয়েছে, অ্যাটমিক ক্লক আপনার রিস্টওয়াচটির মত নয় এমন কি আপনার টাইমপিস বা দেওয়াল ঘড়িটির মতও নয়। তার যন্ত্রপাতিও সেরকম নয়। আপনার ঘড়ির আসল জিনিসটি যেমন সূক্ষ্ম স্প্রিং এই অ্যাটম ঘড়ির আসল জিনিসটি হল এক ফুট লম্বা একটি ইলেক্ট্রন টিউব।

টিউবের মধ্যে আছে অ্যামোনিয়া গ্যাসের অসংখ্য অণু। অণু বলতে কি বোঝায় তা এতদিনে নিশ্চয় আপনারা জেনে গেছেন। টিউবের মধ্যে এই অণুগুলি সর্বসর্বদা কম্পমান অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটি কম্পন অ্যাটম ঘড়ির এক একটি টিক্।

আইনস্টাইন বলতেন যে শূন্যে যেখানে কোনো গ্রহের আকর্ষণ অনুভূত হয় না, সেখানে সময়ের গতির তার আকর্ষণশীল এলাকা থেকে তফাত হবে। তাহলে অনুমান করা হচ্ছে যে, অ্যাটম ঘড়িটি শূন্যে যখন সেই এলাকায় পৌঁছবে যেখানে কোনো গ্রহের কোনো আকর্ষণ, বিকর্ষণ অভিকর্ষ বা মহাকর্ষ কোনো কিছুই নেই, সেখানে ঘড়ির টিউবের মধ্যে অবস্থিত অ্যামোনিয়া অণুর কম্পনের অর্থাৎ তার ঘড়ির টিক্-টিকের নিশ্চয় পার্থক্য হবে।

এই অনুমান ঠিক কি বেঠিক তা স্থির করবার জন্যে ঐ অ্যাটম ঘড়িকে শূন্যে ৮০০০ মাইল দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই দূর থেকে সে নিজের কক্ষপথে ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। ঘড়ি ঘোরবার সময় তার কম্পনগুলি 'পিপ্ পিপ্' করে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠাবে। পৃথিবীতেও ঐ রকম একটি ঘড়ি থাকবে। দুটি ঘড়ির টিক্ টিক্ সুদক্ষ বিজ্ঞানীরা মেপে শূন্যে ও পৃথিবীতে সময়ের পার্থক্য হিসেব করবেন।

গত শানবার সদর স্ট্রীটের ফুটপাথ-এ মিউজিয়াম-এর রেলিং-এ একটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রদর্শনীটি রবিবারেও চলেছিল। ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায় এই প্রথম। রচনাগুলি একজনেরই সৃষ্টি। সবসুদ্ধ ছিল ১৪টি রচনা। শিল্পীর নাম প্রকাশ কর্মকার। যে কজন মুষ্টিমেয় শিল্পী মডার্নিস্টিক আর্টে সত্যিকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রকাশ কর্মকার আমাদের ধারণায় অন্যতম। ইনি বিদেশে কখনও যাননি। বিদেশে না গিয়েও যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ কর্মকারের রচনা। এ'র চিন্তাধারা, এ'র প্রথাপ্রকরণ, এ'র দৃষ্টি-

পথ চিত্র-প্রদর্শনী। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার ও রেলিংয়ে টানানো তাঁর রচনা

ভঙ্গী সবই স্বকীয়। কিছুমাত্রও বিদেশ থেকে আমদানী নয়। ভগবানের আশীর্বাদ যে ইনি বিদেশে আর্ট শিক্ষা করবার জন্য কোনও বৃত্তি এখনও পাননি। দেখতে পাই, যে কজন বিদেশে গিয়েছিলেন আর্ট ট্রেনিং নিতে, তাঁরা প্রায় সকলেই জাতিগত স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে দেশে ফিরেছেন। প্রকাশ কর্মকারের চিত্রকলা মডার্নিস্টিক হলেও বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টা নয়। অত্যুক্তি আছে, কিন্তু তা অপ্রাসঙ্গিক বা অসংগত নয়। প্রত্যেকটি রচনাতেই ইনি কিছু বলতে চেয়েছেন, শুধু মাত্র দর্শনেন্দ্রিয়কেই আনন্দ দেবার জন্যে প্যাটার্নের সৃষ্টি করেননি। কতকগুলি অতি নির্মম সত্য ইনি চিত্রে তর্জমা করেছেন স্বকীয় মানবত্বের প্রেরণায়। এ'র রচনার সঙ্গে জার্মান শিল্পী জর্জ গ্রস্‌ৎস্‌ অথবা কেট কল্‌উৎস্‌-এর রচনার তুলনা করা চলে। গ্রস্‌ৎস্‌-এর মত অতটা তিক্ততা না প্রকাশ পেলেও এ'র যে শ্লেষাত্মক ভাষা তাও বড় কম মর্মভেদী নয়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার ক্ষমতাও এ'র অসাধারণ। যে নিদারুণ গাথা ইনি রচনা করেছেন, তা ঘটনাবহুল একটি যুগান্তরের গান। রচনাগুলির আবেদন অগ্রাহ্য করা অসম্ভব, বিশেষ করে 'অ্যানাদার ডেথ', 'ডেসটিনী', 'অ্যাগনী', 'পেট' এবং 'ট্রায়ো' এ কটি রচনার। 'হরতাল', 'ন্যুড', 'ইনোসেন্স' এবং 'ইজ-নেস' এ কয়টি রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলির মধ্যে চারটি তৈল মাধ্যমের কাজ, একটি জল রঙের কাজ এবং বাকি সব একটি বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকৌশলে অঙ্কিত। এই নতুন পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বর্ণের জৌলুস এতে নষ্ট হয় না, এবং অদ্ভুত রকমের টেক্সচারের সৃষ্টি হয়ে ছবির আবেদন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রকাশবাবুকে জিগেস করলাম, "ফুট-পাথে প্রদর্শনী করবার খেয়াল চাপল কেন?" জবাব দিলেন, "কারণ তিনটি—প্রথম, প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট কোনও হলঘর ভাড়া করবার মত আমার টাকা নেই, দ্বিতীয়, আমি মনে করি আমার আর্ট জনগণের আর্ট, তাদের সামনে এ আর্টকে তুলে ধরবার মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? তৃতীয়, শিল্পী সমাজে যে তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বর্তমানে দেখা দিয়েছে, তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাই।" একথা সত্যি যে, বহু শিল্পী আছেন যাঁরা প্রতিভা-বান, কিন্তু অর্থাভাবে হল ভাড়া করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন না। প্রকাশ-বাবুর এই প্রদর্শনীর পর নিশ্চয় তাঁদের সংকোচ দূরীভূত হবে এবং তাঁরাও ভবিষ্যতে এভাবে ফুটপাথে চিত্রমালা সাজিয়ে জন-সাধারণের সামনে তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করবেন। এতে অবমাননার কিছু নেই। পাশ্চাত্যে প্রায় সব বড় বড় শহরেই 'স্ট্রীট একজিবিশনের' রেওয়াজ আছে। ওদেশে শীর্ষস্থানীয় অনেক শিল্পীই এই 'স্ট্রীট একজিবিশন' করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ দেশেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? আমরা ফুটপাথে চিত্রপ্রদর্শনীর রেওয়াজকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই। পরিশেষে শিল্পী প্রকাশ কর্মকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই এদেশের সর্বপ্রথম ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনকারী শিল্পী হিসাবে!

আগামী ২১শে এবং ২২শে নভেম্বর ঐখানেই প্রকাশবাবুর প্রদর্শনী পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

—চিত্রগ্রীব

নাম কবুতরী, স্বভাবে বাঘিনী। মিশিরজীর মুখে নামটা তারা আগেই শুনেছিল। স্বভাব বুঝতে অনেক সময় লাগল।

তারা অর্থাৎ ভগলু আর পতিয়া।

ভগলু আর পতিয়া বচপন কালের দোস্ত।

এখনও, এই জোয়ান বয়সে তাদের বচপনী বন্ধুত্বটা অটুট আছে। একই সঙ্গে তারা খায়, একই খাটিয়ায় ঘুমোয়, একই সঙ্গে চলে ফেরে। একই কারখানায় একই কাজ করে। আশ্চর্য! দুজনের রুচি, মনের গঠন হুবহু এক। দুজনের আশা-নিরাশা, ব্যথা-যন্ত্রণা অভিন্ন।

দুজনে মিলে একটা অখণ্ড সত্তা। একটা আস্ত জিন্দগীকে দুটো সমান মাপে ভাগ করলে, এক ভাগ হবে ভগলু, আর এক ভাগ হবে পতিয়া।

দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং গাঢ় পেয়ারের সম্পর্ক।

এখানে শহরতলীর এই আকাশটাকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে রাশি রাশি কারখানার চোঙা। এখানে কত যে কল কত যে কারখানা লেখাজোখা নেই। চটকল, পাটকল, [illegible], ঢালাইয়ের কারখানা, মোটর মেরামতের কারখানা।

গত শনিবার সদর স্ট্রীটের ফুটপাথ-এ মিউজিয়াম-এর রেলিং-এ একটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রদর্শনীটি রবিবারেও চলেছিল। ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায় এই প্রথম। রচনাগুলি একজনেরই সৃষ্টি। সবসুদ্ধ ছিল ১৪টি রচনা। শিল্পীর নাম প্রকাশ কর্মকার। যে কজন মুষ্টিমেয় শিল্পী মডার্নিস্টিক আর্টে সত্যিকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রকাশ কর্মকার আমাদের ধারণায় অন্যতম। ইনি বিদেশে কখনও যাননি। বিদেশে না গিয়েও যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ কর্মকারের রচনা। এঁর চিন্তাধারা, এঁর প্রথাপ্রকরণ, এঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী সবই স্বকীয়। কিছুমাত্রও বিদেশ থেকে আমদানী নয়। ভগবানের আশীর্বাদ যে ইনি বিদেশে আর্ট শিক্ষা করবার জন্য কোনও বৃত্তি এখনও পাননি। দেখতে পাই, যে কজন বিদেশে গিয়েছিলেন আর্ট ট্রেনিং নিতে, তাঁরা প্রায় সকলেই জাতিগত স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে দেশে ফিরেছেন। প্রকাশ কর্মকারের চিত্রকলা মডার্নিস্টিক হলেও বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টা নয়। অত্যুক্তি আছে, কিন্তু তা অপ্রাসঙ্গিক বা অসংগত নয়। প্রত্যেকটি রচনাতেই ইনি কিছু বলতে চেয়েছেন, শুধু মাত্র দর্শনেন্দ্রিয়কেই আনন্দ দেবার জন্যে প্যাটার্নের সৃষ্টি করেননি। কতকগুলি অতি নির্মম সত্য ইনি চিত্রে তর্জমা করেছেন স্বকীয় মানবত্বের প্রেরণায়। এঁর রচনার সঙ্গে জার্মান শিল্পী জর্জ গ্রস্‌ৎস্‌ অথবা কেট কল্‌উইৎস্‌-এর রচনার তুলনা করা চলে। গ্রস্‌ৎস্‌-এর মত অতটা তিক্ততা না প্রকাশ পেলেও এঁর যে শ্লেষাত্মক ভাষা তাও বড় কম মর্মভেদী নয়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার ক্ষমতাও এঁর অসাধারণ। যে নিদারুণ গাথা ইনি রচনা করেছেন, তা ঘটনাবহুল একটি যুগান্তরের গান। রচনাগুলির আবেদন অগ্রাহ্য করা অসম্ভব, বিশেষ করে 'অ্যানাদার ডেথ', 'ডেসটিনী', 'অ্যাগনী', 'পেট' এবং 'ট্রায়ো' এ কটি রচনার। 'হরভাস', 'ন্যুড', 'ইনোসেন্স' এবং 'ইজ-নেস' এ কয়টি রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলির মধ্যে চারটি তৈল মাধ্যমের কাজ, একটি জল রঙের কাজ এবং বাকি সব একটি বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকৌশলে অঙ্কিত। এই নতুন পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বর্ণের জৌলুস এতে নষ্ট হয় না, এবং অদ্ভুত রকমের টেক্সচারের সৃষ্টি হয়ে ছবির আবেদন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

পথ চিত্র-প্রদর্শনী। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার ও রেলিংয়ে টানানো তাঁর রচনা

প্রকাশবাবুকে জিগেস করলাম, "ফুট-পাথে প্রদর্শনী করবার খেয়াল চাপল কেন?" জবাব দিলেন, "কারণ তিনটি—প্রথম, প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট কোনও হলঘর ভাড়া করবার মত আমার টাকা নেই, দ্বিতীয়, আমি মনে করি আমার আর্ট জনগণের আর্ট, তাদের সামনে এ আর্টকে তুলে ধরবার মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? তৃতীয়, শিল্পী সমাজে যে তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বর্তমানে দেখা দিয়েছে, তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাই।" একথা সত্যি যে, বহু শিল্পী আছেন যাঁরা প্রতিভা-বান, কিন্তু অর্থাভাবে হল ভাড়া করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন না। প্রকাশ-বাবুর এই প্রদর্শনীর পর নিশ্চয় তাঁদের সংকোচ দূরীভূত হবে এবং তাঁরাও ভবিষ্যতে এভাবে ফুটপাথে চিত্রেলা সাজিয়ে জন-সাধারণের সামনে তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করবেন। এতে অসম্মানের কিছু নেই। পাশ্চাত্যে প্রায় সব বড় বড় শহরেই 'স্ট্রীট একজিবিশনের' রেওয়াজ আছে। ওদেশে শীর্ষস্থানীয় অনেক শিল্পীই এই 'স্ট্রীট একজিবিশন' করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ দেশেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? আমরা ফুটপাথে চিত্রপ্রদর্শনীর রেওয়াজকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই। পরিশেষে শিল্পী প্রকাশ কর্মকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই এদেশের সর্বপ্রথম ফুটপাথে চিত্র-প্রদর্শনকারী শিল্পী হিসাবে!

আগামী ২১শে এবং ২২শে নভেম্বর ঐখানেই প্রকাশবাবুর প্রদর্শনী পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

—চিত্রগ্রীব

নাম কস্তুরী, স্বভাবে বাঘিনী। মিশিরজীর মুখে নামটা তারা আগেই শুনেছিল। স্বভাব বুঝতে অনেক সময় লাগল।

তারা অর্থাৎ ভগলু আর পতিয়া।

ভগলু আর পতিয়া বচপন কালের দোস্ত।

এখনও এই জোয়ান বয়সে তাদের বচপনী বন্ধুত্বটা অটুট আছে। একই সঙ্গে তারা খায়, একই খাটিয়ায় ঘুমোয়, একই সঙ্গে চলে ফেরে। একই কারখানায় একই কাজ করে। আশ্চর্য! দুজনের রুচি, মনের গঠন হুবহু এক। দুজনের আশা-নিরাশা, ব্যথা-যন্ত্রণা অভিন্ন।

দুজনে মিলে একটা অখণ্ড সত্তা। একটা আস্ত জিন্দগীকে দুটো সমান মাপে ভাগ করলে, এক ভাগ হবে ভগলু, আর এক ভাগ হবে পতিয়া।

দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং গাঢ় পেয়ারের সম্পর্ক।

এখানে শহরতলীর এই এলাকায় ফুঁড়ে ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে রাশি রাশি কারখানার চোঙা। এখানে কত যে কল কত যে কারখানা লেখাজোখা নেই। চটকল, পাটকল, লোহাঢালাই কারখানা, মোটর মেরামতের কারখানা।

দিনরাত চোঙাগুলি গাঢ়, কালো ধোঁয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে শহরতলীর আকাশটাকে বিষিয়ে রাখে।

কল আর কারখানাগুলিকে ঘিরে আছে দোকান-বাজার, ধোঁয়া-ধুলো, ঠাসবোনা বস্তি, রেণ্ডিপাড়া, দেশী মদ আর চাটের দোকান। হালফিল একটা সিনেমা হলও বসেছে।

এখানে গিজগিজ, গাদাগাদি ভিড়। চিৎকার - হল্লা। ফড়ে - দালাল - মজুর- আড়কাঠি—নানান জাতের মানুষ এখানে ফিকিরে ঘুরেছে।

শহরতলীর আরো একটা দিক আছে। সেখানে রেলের লাইন। সেখানে জলা ডাঙা, এঁদো ডোবা, চোঁচো ঘাস, কচু আর গেমো বন। আর আছে পচা পচিবোর্ড, কাটা টিন, ছেঁড়া চট, লোহা এবং সীসের টুকরোর স্তূপ। কল-কারখানার যত বাতিল আবর্জনা এখানে এনে ফেলা হয়।

রেললাইনের ওপারে ভগলু আর পতিয়া একটা ঢালাইয়ের কারখানায় ক্লীনারের কাজ করে। থাকে ওপারের জলা ডাঙায়। চট-পচিবোর্ড-পেটা টিন দিয়ে তারা একটা ঝুপড়ি মত বানিয়ে নিয়েছে।

এটা মধ্যম ঋতুর শেষ মাস।

সবে মাত্র দিনটা মরেছে। দিন মরেছে কিন্তু দিনের রেশটা মরে নি। আকাশে মেটে সিঁদুরের রং ধরেছে। শুধু কি মেটে সিঁদুরের রং, তেলতেলে হলদে, টকটকে লাল, বাদামী নারংগী রং—মধ্যম ঋতুর দিনান্ত আকাশটাকে কত রঙে যে রাঙিয়েছে অত হিসেব কে রাখে? রঙের যত ঘটা, আকাশে তার ছিটেফোঁটা বাহারও যদি থাকত।

একটু আগে কারখানা ছুটি হয়েছে।

কারখানা ছুটি হলেই রেললাইন পেরিয়ে, তেল-কালি মাখা ক্লান্ত শরীর টানতে টানতে ভগলু আর পতিয়া প্রথমে এঁদো ডোবাটায় চলে আসে।

ডোবার পারেই তাদের ঝুপড়ি।

ডোবার জল শুষনি এবং সবুজ পানার নীচে কালো আর ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঠাণ্ডা, হিম হিম জলে গা জুড়িয়ে, তেল-কালি ধুয়ে তারা ঝুপড়িতে ঢোকে।

রোজকার মত আজও তারা ডোবাটার পারে এল। এসেই চমকে উঠল।

খেজুর গাছের একটা ঘাটলা ডোবার জলে নেমে গিয়েছে।

চান করে এক জোয়ানী ঘাটলায় দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ছে।

ভিজলে পাখিনী চুপসে যায়। কিন্তু মানুষী? ঠিক মানুষী না, জোয়ানী! কাপড়ের তলায় যা থাকে অস্ফুট, অজান মাত্র, হাজারটা ধারাল রেখায় তা ফুটে বেরোয়।

জোয়ানীটা পিছন ঘুরে চুল ঝাড়ছে। তার মসৃণ, উদাম পিঠটা দেখা যাচ্ছে। চকচকে, তামাটে, টান-করা চামড়া। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত—হাতের নিটোল অংশটা নড়ছে। কাঁধ, পিঠ, সরু চিকণ মাজা, মাজার নীচ চুল ঝাড়ার তালে তালে তির তির করে কাঁপছে।

জোয়ানীটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। আকাশের মেটে সিঁদুরের রং তার সারা দেহে এসে পড়েছে। পুরু পুরু ঠোঁট, চ্যাপ্টা থ্যাবড়া নাক, গোল গোল ধক ধক চোখ। চোখের তারা দুটো খাঁচার পাখির মত ছটফট করছে। অস্বাভাবিক পুষ্ট বুক, খাটো শাড়িতে ভাল মত আবরণ পায় না। তার মুখে চোখে, সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক বন্যতা।

এক মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোয়ানীটা।

ফিস ফিস করে ভগলু বলল, 'মিশির-জীর বিটিয়া!'

একই রকম শব্দ করে পতিয়া বলল, 'কবুতরী!'

সরু জিভ বার করে পুরু ঠোঁট দুটো একবার চাটল জোয়ানীটা। সাপের মত হিসিয়ে হিসিয়ে একটু হাসল। বলল, 'হাঁ, মিশিরজীর বিটিয়া—আমি কবুতরী। তুমরা তো ভগলু আউর পতিয়া।'

ঘাড় কাত করে দুজনে সায় দিল।

কবুতরী আর দাঁড়াল না। চিকণ কোমরে লচক খেলাতে খেলাতে, হাতের কাঙনা বাজাতে বাজাতে চলে গেল।
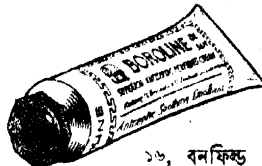
এখানে, ডোবাটার এপারে ভগলু আর পতিয়ার ঝুপড়ি। ওপারে আরো একটা ঝুপড়ি আছে। সেটার বাসিন্দা মিশিরজী।

মিশিরজীর বেশ বয়স হয়েছে। বয়সের উপদ্রব তো আছেই। তা ছাড়া, হাঁপানি, অর্শ—নানা জাতের ব্যারাম তার দুর্বল, পংগু শরীরটাকে দিনে দিনে কাবু করে ফেলছে।

মিশিরজী চটকলে কাজ করে। গাঁও-মুলুক ছেড়ে এতদূরে একা একা অশক্ত, কাবু শরীর নিয়ে নোকরি করতে ভরসা হয় না। ক'দিন ধরেই সে বলছিল, দেহাত থেকে বিটিয়া অর্থাৎ কবুতরীকে আনিয়ে নেবে। ভুখের মুখে রোটিটা যদি সেঁকে দেয়, হাঁপির টানের সময় বুকটা যদি ডলে দেয়, মিশিরজীর কত আসান!

তাই কবুতরীকে আসতে হ'ল।

পরের দিন সকালেই কবুতরী ভগলু আর পতিয়ার ঝুপড়িতে এল।

ভোরে উঠেই মিশিরজী চটকলে চলে যায়। তাকে রোটিভাজি পাকিয়ে দিয়েছে। আপাতত কবুতরীর আর কাজ নেই। এখন তার অফুরন্ত ফুরসত।

তখনও ঘুম ছোটে নি। দড়ির খাটিয়ায় ভগলু আর পতিয়া জড়াজড়ি করে পড়ে ছিল।

দুয়ার-কপাট এমন কি একটা ঝাঁপ পর্যন্ত নেই। সামনের দিকটা হাঁ-খোলা।

কবুতরী ঝুপড়িতে ঢুকে দু জনকে ঝাঁকাতে শুরু করল। চিল্লাতে লাগল, 'এ মরদানা, আভী তুমাদের নিদ টুটল না! ধুপ উঠে গেল। এ মরদানা—'

ঝাঁকানিতে ধড়মড় করে দু জনে উঠে পড়ল। চোখ মেলেই দেখল, খাটিয়ার পাশে কবুতরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফিস ফিস করে তারা বলল, 'কা হৈল?'

'কা আবার হবে? উঠারো উঠারো!'

লাফ মেরে দু জনে নেমে পড়ল। খাটিয়ার উঠে বসল কবুতরী। বসে বসে পা নাচাতে লাগল। বলল, 'কা আবার হবে? বাপ তো কামে চলে গেল। একা একা আমি ডেরায় পড়ে থাকব নাকি?'

ভগলু আর পতিয়া জবাব দেয় না।

একাই সব কথা বলে যায় কবুতরী। মিশিরজী কামে যাবার পর এই জায়গাটা একবার চক্কর মেরে ঘুরে দেখেছে সে। এমন খারাবী, বদখত জায়গা নাকি জিন্দগীতে তার আঁখে আর পড়ে নি। একটা আদমী নেই, যার সংগে একটু কথা বলা যায়।

অগত্যা কী করে কবুতরী? ভগলু আর পতিয়ার ডেরায় এসে উঠেছে। এখানে আসার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তবু আসতে হ'ল।

এসে কী ফায়দা হ'ল, কিছুই না।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল কবুতরী, 'তা তুমরা কী আদমী! এক একটা ভইস। ভঈসের মাফিক পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছ!'

ভগলু আর পতিয়া মাথা তোলে না। কথা বলে না। ভঈসের মত ঘুমোনোর অপরাধে তারা জুজু হয়ে আছে।

কবুতরী সমানে বকে আর পা নাচায়।

মাথা না তুলেই ভগলু আর পতিয়া চৌরিয়ে চৌরিয়ে চায়। কাল নিবু নিবু আবছা আলোতে যা যা চোখে পড়ে নি, আজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে সব দেখে। কবুতরীর ডান ভুরুটার উপর একটা গভীর কাটা দাগ। হাতে উল্কি আঁকা। কোমরে রুপোর পৈছেতে পায়ের নখ আঁটা। হাসলে তিনটে উঁচু উঁচু চোখা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। নাকের বাঁ পাশে মেটে রঙের একটা জড়ুল।

কবুতরী মুখিয়ে উঠল, 'এ বেশরম মরদানা, চৌরিয়ে চৌরিয়ে কী দেখছিস!'

বলেই হিসিয়ে হিসিয়ে হাসতে লাগল। হাসির দাপটে খাটো কাপড়ের তলায় তার শরীর ঢেউয়ের মত কাঁপতে লাগল।

বাইরে রোদ উঠেছে। তীব্র, ধারাল, উত্তেজক রোদ। মধ্যম ঋতুর রোদে তেজো কম, তাত বেশি।

কবুতরী আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চাজাইয়ের কারখানার পয়লা ভোঁ-টা বেজে উঠল।

ভগলু আর পতিয়া চমকে উঠল। চোখের পাতা পড়ার আগেই গামছা নিয়ে ডোবাটার দিকে ছুটল। একটুক্ষণ পরেই গা মুছতে মুছতে তারা ঝুপড়িতে ফিরল।

কবুতরীর যাওয়ার নাম নেই। খাটিয়ায় বসে বসে সে সমানে পা নাচায়।

কবুতরীর মনে কি আছে কে জানে।

ভগলুদের দেখে কবুতরী বলল, 'কামে যাবে?'
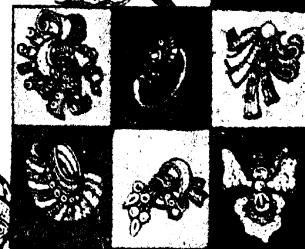
'হাঁ।'

কি ভেবে কবুতরী চলে গেল।

কারখানার দোসরা ভোঁটা বাজল। তিসরা ভোঁ বাজার আগেই তাদের কামে লাগতে হবে। তড়বড় করে ভিজা কাপড় ছেড়ে শুখা কাপড় পরে নিল দুজনে।

এ-পাশে গেমো বন, ও-পাশে কচু বন। মাঝখান দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ।

ভগলু আর পতিয়া ছুটতে ছুটতে চলেছে।

আচমকা গেমো বনের পাশ থেকে কে যেন খিলখিলিয়ে ডাকল, 'আইও—মরদানা'—

দুজনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গেমো বন ঠেলে কবুতরী বেরিয়ে এল। গোল গোল চোখের তারা দুটো খাঁচার পাখির মত কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হ'ল।

হাতের ইশারায় ভগলুকে ডাকল কবুতরী। খানিকটা দূরে নিয়ে তাকে বলল, 'তুমাদের এখানে আর্শি আর কাকুই মেলে?'

'হাঁ—হাঁ—'

'আমার জন্যে লিয়ে এস।'

ভগলু চলে যাচ্ছিল। কবুতরী তাকে ফেরাল। বলল, 'শোন, এ বাতটা তুমার দোস্তকে বলবে না। সমঝা?'

ভগলু মাথা নেড়ে চলে গেল। কবুতরী আবার গেমো বনে ঢুকল।

চলতে চলতে পতিয়া জিগ্যেস করল, 'চোরি চোরি কবুতরী তুহকে কা কহল?'

একটু কি যেন ভাবল ভগলু। গুজ গুজ করে একটু হাসল। তারপর বলল, 'কুছ না, কুছ না—'

পতিয়া আর কিছু বলল না। গুম মেরে গেল।

জীবনে কোন কথা, কোন ব্যাপার তাদের মধ্যে গোপন নেই। কিছুই তারা ঢাকা-ঢাকি করে না। লুকোয় না। দুজনের সব কথা, সব দুঃখ, সব যন্ত্রণা পরস্পরকে শুনিয়ে, পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে স্বস্তি পায়। তাদের একার বলতে কিছুই নেই। না কোন কথা, না কোন ব্যাপার।

এই প্রথম একজনের কথা আর একজনের কাছে গোপন হ'ল।

সন্ধ্যার ঠিক মুখে মুখে আবার এল কবুতরী।

ঢালাইয়ের কারখানা থেকে ফিরে, ডোবার জলে শরীরের তেলকালি ধুয়ে খাটিয়াটার উপর চুপচাপ, পাশাপাশি বসে আছে দুজনে ভগলু আর পতিয়া।

ঝুপড়ির এক কোণে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। ডিবে থেকে যত না আলো পাওয়া যায়, তার হাজার গুণ বেশি মেলে ধোঁয়া। চটপটিয়েছে ডিবের ঝুপড়িটা কেমন যেন আলো আলো অবস্থা আছে।

বাইরের রোদ কেউ যেন গুটিয়ে নিয়েছে। ছোঁয়া রঙের একটা পর্দা সামনের জলা, ওপারে মিশিরজীর ডেরা দূরের গোটা বস্তীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না। নরম কাঁচের এই সন্ধ্যাটা কেমন যেন লজ্জায়, দুর্বোধ্য।

হঠাৎ কবুতরীর গলা শোনা গেল, 'আইও মরদানা—'

ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ল কবুতরী। ভগলুকে [illegible]—'

কবুতরীর পিছু পিছু ভগলু ডোবাটার পাড়ে এসে দাঁড়াল। কাপড়ের তলায় আর্শি আর কাকুই লুকিয়ে এতক্ষণ বসেছিল সে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এই লেও তুমার—'

আর্শি-কাকুই নিয়ে ভগলুর গালে একটা খোঁচা মেরে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল কবুতরী। বলল, 'তুম বহুত দিলবালা মরদানা—'

কবুতরী মিশিরজীর ডেরায় চলে গেল। ভগলু নিজেদের ঝুপড়িতে ফিরে পতিয়ার পাশে গিয়ে বসল।

খানিকটা পর আবার এল কবুতরী। ডাকল, 'আইও মরদানা—'

ভগলু উঠতে যাচ্ছিল। হাতের ইশারায় তাকে বসিয়ে বলল, 'তুম নেহী, পতিয়া—'

পতিয়াকে নিয়ে ডোবা পেরিয়ে গেমো বনের কাছাকাছি চলে এল কবুতরী। এখানে একটা বাজে পোড়া তালগাছ ধরাশায়ী হয়ে আছে। তার উপর দুজনে বসল।

ধোঁয়ারঙের পর্দাটা এখন আর নেই। গাঢ় অন্ধকারের নীচে গেমো বন, শহরতলীর এই বাতিল, নোংরা জায়গাটা তলিয়ে আছে। চারপাশ থেকে ভিজে মাটির গন্ধ, কচুবনের গন্ধ, গেমো ফুলের গন্ধ উঠে আসছে।

সীসের টুকরো, লোহার টুকরো, ছেঁড়া চট, পচা পাঁচবোর্ড স্তূপাকার হয়ে আছে। সেই স্তূপগুলোর উপর ঘন অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে জোনাকিরা জ্বলছে আর নিবছে।

কবুতরীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে আছে দুজনে। হঠাৎ [illegible] বলল, '[illegible] বলবে?'

'হাঁ হাঁ—'

'তোমাদের এ জায়গাটা বহুত বদখত—'

'কী ঠিক?'

'এখানে কিছু মেলে না।'

অন্ধকারে চোখ দেখা যায় না। যদি যেত, পতিয়া দেখতে পেত, কবুতরীর চোখ দুটো [illegible] ঝিকমিক করছে।

পতিয়া খিঁচিয়ে উঠল, 'কী মেলে না এখানে? সব তো মেলে।'

'[illegible] চুড়ি মেলে?'

'[illegible]'

'তো ভগলু [illegible] তোমাকে এনে দেবে [illegible]?'

পতিয়া ঘাড় নেড়ে [illegible] হায়রে। কবুতরী বলল, '[illegible] চুড়ির কথা ভগলুকে বলবে না।'

'আরে দেখি দিদি—'

কবুতরী চলে গিয়েছে। অদ্ভুত এক খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে পতিয়া ঝুপড়িতে ফিরছে। ঝুপড়ির কাছাকাছি আসতেই ভগলুর মুখোমুখি পড়ে গেল।

অন্ধকারে এদিক সেদিক উঁকিঝুঁকি মেরে কি যেন খুঁজছে ভগলু। পতিয়াকে দেখেই একটা হাত চেপে ধরল। বলল, 'কবুতরীর সাথে এতক্ষণ কী বলছিলি?'

'কিছু না।' বলে আস্তে পতিয়া বলল।

'কবুতরী কী বলল?'

শব্দ করে একটু হাসল পতিয়া। ফিস ফিস করে বলল, 'কিছু না রে।'

পতিয়ার হাতটা ছেড়ে দিল ভগলু। দাঁতে দাঁত চেপে হিসিয়ে উঠল 'শালে'— তারপর ঘাড় গোঁজ করে ঝুপড়িতে গিয়ে ঢুকল।

দুজনের মধ্যে কোথায় যেন একটা চিড় ধরেছে।

সকাল-সন্ধ্যে ছুটির দিনে দুপুরেও ভগলু আর পতিয়ার ঝুপড়িতে আসে কবুতরী।

মধ্যম ঋতুর শেষাশেষি একদিন কবুতরী এখানে এসেছিল। এটা বছরের ষষ্ঠ ঋতু।

ভগলু আর পতিয়া এর মধ্যে আশ্চর্য বদলে গিয়েছে। কবুতরী প্রথমদিন এসেই তাদের ভিতর চিড় ধরিয়েছিল। চিড়টা দিনে দিনে বেড়ে দুজনের মধ্যে বিরাট একটা ফারাক তৈরি করল।

এতদিন তাদের সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বের, পেয়ারের এবং বিশ্বাসের। এখন সেখানে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং রেষারেষি দেখা দিয়েছে।

এতদিন তাদের জীবন ছিল নারীসংগহীন, নিরুৎসব। তখন তাদের আলাদা-আলাদাভাবে নিজস্ব কিছু ছিল না। এই ঝুপড়ি, লোটা, খাটিয়া, জামা-কাপড়, জীবনের সমস্ত কিছুর উপর তাদের যৌথ অধিকার ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন কবুতরী এসে পড়ল।

ভগলু আর পতিয়া আজকাল একটু একটু করে একটা কথা বুঝেছে। জীবনে এমন এক একটা ব্যাপার আছে, যেখানে যৌথ অধিকার খাটে না। পুরোপুরি সমস্তটুকু দখল করতে না পারলে শান্তি নেই। কবুতরী এসে সেই কথাটা শিখিয়েছে।

আজকাল পারতপক্ষে একজন আর একজনের সংগে কথা বলে না। এক খাটিয়ায় শোয় না। এক সংগে খায় না। এক সংগে কারখানায় যায় না।

একজন আর একজনের মুখে পড়লে, দুজনেই কটমট করে তাকায়। দাঁতাল শুওরের মত গজরায়। বচপন কালের দুই দোস্ত এখন দুই প্রবল প্রতিপক্ষ।

দুজনের মাঝখানে এখন বিরাট ফারাক। তবু তাদের মধ্যে আশ্চর্য একটা মিল আছে।

ভগলু যদি কবুতরীকে কাঙনা কিনে দ্যায়, পতিয়া দ্যায় বুটিদার শাড়ি। পতিয়া যদি কবুতরীকে দুটো পেয়ারের কথা শোনায়, ভগলু শোনায় বিশটা।

নামে কবুতরী, স্বভাবে বাঘিনী। দুই থাবায় ভগলু আর পতিয়া নামে দুটো জোয়ান মরদানাকে সে সমানে খেলিয়ে যায়।

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ দশ রোজের ছুটি নিল ভগলু। তার মানে কি আছে, পতিয়া জানে। পতিয়াও ছুটি চেয়েছিল। কিন্তু মেলে নি। আর মেলে নি বলেই অবুঝ এক যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে আছে।

আজকাল তারা এক সংগে শোয় না। একটা মাত্র খাটিয়া। সেটা আগে যে দখল করতে পারে তারই হয়। অন্যজন মাটিতে চট বিছিয়ে শোয়।

আজ ভগলু খাটিয়াটা দখল করেছিল। পতিয়া নীচে শুয়েছিল।

এখন সকাল। কড়া রোদ উঠেছে।

বয়সের শেষ ঋতুর রোদে যেমন জবালা তেমন জেল্লা।

দুজনেই উঠে বসেছে। খাটিয়ার উপর বসে বসে ঠ্যাং নাচাচ্ছে ভগলু। বিচিত্র এক খুশীতে তার চোখ দুটো চিকচিক করছে। পতিয়া দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুজে একদৃষ্টে ভগলুর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো লালচে; বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং অসহ্য রাগে ঝিক ঝিক করছে। তাকে দেখলে মনে হয়, একটা জখমী জানোয়ার ওৎ পেতে আছে। সুযোগ পেলেই ভগলুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পতিয়া গজরায়, 'শালে, হারামী—'

ভগলু জবাব দ্যায় না। ঠোঁট টিপে টিপে হাসে।

মিশিরজীকে চটকলে পাঠিয়ে এক সময় কস্তুরী এসে পড়ে। লাফিয়ে খাটিয়া থেকে নীচে নামে ভগলু। জুত করে খাটিয়ায় বসে কস্তুরী পা নাচায়। পতিয়াকে বলে, 'তুমার ছুটি তো না মিলল।'

দাঁতে দাঁত চাপে পতিয়া। বিড় বিড় করে কি বলে, বোঝা যায় না।

সরু জিভ বার করে পুরু পুরু ঠোঁট

দুটো চাটে কবুতরী। বলে, 'আভীই তো তুমাকে কামে যেতে হবে।'

কবুতরীর কথার মধ্যেই কারখানার পয়লা ভোঁটা বেজে ওঠে। গামছা নিয়ে ডোবার দিকে চলে যায় পতিয়া।

পতিয়া যখন কারখানায় রওনা হল, তখনও বসে বসে পা নাচাচ্ছে কবুতরী। হেসে হেসে, মেতে মেতে, ঢলে ঢলে ভগলুর সঙ্গে কথা কইছে। এক একটা তামাশার কথা বলছে কবুতরী। সঙ্গে সঙ্গে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠছে ভগলু।

বুকের ভিতর সাংঘাতিক আক্রোশ, মাথায় অসহ্য জ্বালা পুরে কারখানায় চলে গেল পতিয়া।

দশ রোজের ছুটি খতম হয়ে গেল।

সকালে উঠেই ডোবা থেকে চান করে এসেছে ভগলু। ঝুপড়িতে ফিরে দেখে খাটিয়ায় টান টান হয়ে শুয়ে আছে পতিয়া। উঠবার নাম নেই।

ভগলু একবার ভাবল, পতিয়াকে ডাকে। আবার ভাবল, থাক, হারামীটা যত পারে ঘুমোক। দেরী করে কারখানায় গেলে ওরই তলব কাটা যাবে। ভগলুর আর কী?

কবুতরী এসে পড়ল। ভগলুকে বলল, 'আজ থেকে তো তুমার কাম শুরু?'

'হাঁ—'

'পতিয়া কামে যাবে না। আভী ওক দিন যাচ্ছে।'

'যাবে কী যাবে না, রামজী মালুম।'

খাটিয়াটার কাছে এসে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ঘুম ছুটিয়ে দিল কবুতরী। ধড়মড় করে উঠে বসল পতিয়া। বলল, 'হুম!'

'হুঁ আমি। আমি কী, নয়? আমি তো রোজ তুমাদের ঝুপড়িতে আসছি।'

কি ভেবে কবুতরী বলল, 'কামে যাবে না পতিয়া?'

'না। কাল কাম ছেড়ে দিয়েছি।'

'বড় আচ্ছা, বড় আচ্ছা—'

হিসিয়ে হিসিয়ে হাসতে হাসতে পতিয়ার পাশে ঘন হয়ে বসে পড়ল কবুতরী। বলল, 'বড়া আচ্ছা কিয়া। তুমাদের এখানে একটা আদমী নেই—পুরা দুপুরটা কা কায়সা কাটে! যাক, দুপুরে তুমাকে সাথী পাওয়া যাবে।'

শুখা কাপড় পরে কারখানায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল ভগলু। পতিয়া আর কবুতরীর কথাগুলো শুনে তার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

চালাইয়ের কারখানায় পর পর দুটো ভোঁ বেজে গিয়েছে। অগত্যা টলতে টলতে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ভগলু। বুকের মধ্য থেকে একটা নিরেট কান্না পাক খেয়ে খেয়ে কণ্ঠার কাছে এসে আটকে গেল। কান্নাটা নামেও না বেরোয়ও না।

কারখানার ছুটির পর ঝুপড়িতে ফিরল না ভগলু। সরাসরি মিশিরজীর ডেরায় এসে উঠল।

মিশিরজীর হাঁপির টান উঠেছিল। কবুতরী তার বুকটা ডলে দিচ্ছিল।

মিশিরজী একটু সামলে উঠলে ভগলু বলল, 'তবিয়ত ক্যায়সন জী?'

ঠান্ডা লেগে বুকে কফ জমেছে। টেনে টেনে অনেক্ষণ, ঘড়ঘড়ে গলায় খুব একচোট কাশল মিশিরজী। কাশির দাপটে তার অস্থিসার, জিরজিরে বুকটা তোলপাড় হতে লাগল। মিশিরজী বলল, 'আর তবিয়ত!'

'কাম কেমন চলছে?'

'ভাল না। তবিয়তটাই আচ্ছা নেই।'

মিশিরজী বলতে লাগল, 'রোজ রোজ সাহাবের গালি খাচ্ছি। এক রোজ জরুর নোকরি খতম হয়ে যাবে। কী আর করব! এই তবিয়তটার জন্যে জিন্দগীতে কুছ করতে পারলাম না।' গলাটা কেমন যেন হতাশ, বিষণ্ণ শোনাতে থাকে, 'তবিয়তটা আমাকে খতম করেছে; এক রোজ আমার নোকরিটাও খতম করবে।'

মিশিরজীর কথায় কান নেই ভগলুর। একদৃষ্টে সে কবুতরীর দিকে তাকিয়ে আছে। কবুতরী তার দিকে পিঠ দিয়ে মিশিরজীর বুক ডলে দিচ্ছে।

ডেরার এক কোণে একটা হ্যারিকেন জবলছে। হ্যারিকেনের কাচ অনেকদিন মোছা হয় নি। নোংরা নোংরা আবছা আলোতে ডেরার কিছুই স্পষ্ট নয়।

কব্‌তরীর চকচকে, উদোম পিঠ, গলার খাঁজ, পাখির পালকের মত একটু ভুরু, ডান গাল এবং থুতনির ডগাটা দেখা যাচ্ছে।

ভগল্‌ উসখুস করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর ঘুরে বসল কব্‌তরী। ভগল্‌ চোখের ইশারা করে বাইরে চলে গেল। একটু পর কব্‌তরীও বাইরে এল।

অন্য অন্য রাতের মত অন্ধকারকে বি'ধে বি'ধে জোনাকি জবলছে।

ফিস ফিস করে কব্‌তরী বলল, 'কী মতলব?'

'দুপুরে পতিয়ার সাথ খুব মজা লটলে তো?'

'এই বাতাতেই এসেছিলে?'

'হাঁ।'

'তবে শোন, পতিয়া আমার জন্যে নোকরি ছেড়েছে। দুপুরে একা একা থাকি। বাতচিত করার মত একটা আদমী নেই এখেনে। পতিয়ার দিলে—'

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল কব্‌তরী। তাকে থামিয়ে ভগল্‌ বলল, 'আমিও নোকরি ছাড়তে জানি। দেখতে চাও?'

কব্‌তরী জবাব দিল না। খিসখিসিয়ে হেসে উঠল। তারপর মিশিরজীর ডেরায় গিয়ে উঠল।

ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইল ভগল্‌।

দিন তিনেক পরেই ঘটনাটা ঘটল।

ঠিক ছিল বিকেলে কব্‌তরীকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে পতিয়া। কিন্তু তার আগেই ভগল্‌ এসে পড়ল।

এখন দুপুর।

শহরতলীর মাথায় ষষ্ঠ ঋতুর আকাশটা জবলছে। সীসে আর লোহার পাতের স্তূপগুলি চিক চিক করছে। সেমোবনে এক ঝাঁক শামকল পাখি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুন হচ্ছে।

কব্‌তরী রোটি আর ভাজি নিয়ে খেতে বসেছিল। ভগল্‌ সামনে এসে দাঁড়াল।

এমন যে ডাকাবুকো কব্‌তরী, ঝিম দুপুরে ভগল্‌কে দেখে তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে ভগল্‌। তামাটে মুখটা এখন টকটক করছে। চোখ দুটো গাঢ় লাল; যেন দু পিণ্ড তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। উত্তেজনায়, অনেকটা পথ হেঁটে আসার ধকলে জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ভগল্‌।

একটু যেন ভয় পেয়ে গেল কব্‌তরী। কাঁপা গলায় বলল, 'ভগল্‌—তুম!'

'হ। নোকরিটা ছেড়ে দিয়ে সিধা তুমার কাছে এলাম।'

কি একটু যেন ভাবল কব্‌তরী। একটু আগের ভয়টা মুহূর্তে উবে গেল। পরমুহূর্তে, ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ঝিক করে উঠল। সে বলল, 'নোকরি ছেড়েছ, সচ?'

'হাঁ হাঁ জরুর।'

সামনের একটা চৌপাইতে বসে পড়ল ভগল্‌। বলল, 'আজ তুমাকে কলকাত্তা শহরে নিয়ে যাব। বহুত বড়া শহর, দুনিয়ামে ইতনা বড়া শহর নেই। বহুত বহুত তাজ্জব আছে সেখানে। যাবে কব্‌তরী?'

কব্‌তরী উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'যাব—' তারপরেই গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে বলল, 'লেকিন—'

'লেকিন আবার কী?'

'পতিয়া সিনেমা দেখাবে বলছিল।'

'আমিও দেখাব। এখনকার পচা সিনেমা না। কলকাত্তা শহরের সিনেমা।'

কব্‌তরীর দ্বিধাটা ঘুচল। ভগলুর ইচ্ছা জয়ী হল।

ঝিম দুপুরে ষষ্ঠ ঋতুর ঝলসানো আকাশের তলা দিয়ে মাজা নাচাতে নাচাতে ভগলুর সঙ্গে আজব শহর কলকাতায় চলল কব্‌তরী।

কব্‌তরী কি ভগলু দেখতে পেল না, ডোবার ওপাশের একটা ঝুপড়ি থেকে এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ একদৃষ্টে তাদের দেখছে। সেই চোখ জোড়া যার, তার বুকের ভিতর রাগ, আক্রোশ এবং অসহ্য এক হতাশা কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

বেশ খানিকটা রাত করেই শহর থেকে ফিরল ওরা। কব্‌তরী মিশিরজীর ডেরায় চলে গিয়েছে। ভগলু তাদের ঝুপড়িতে এসে ঢুকল।

ঠিক মাঝখানে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে একটা কেরাসিনের ডিবে জ্বলছে। ডিবেটার চারপাশে একটা জখমী জানোয়ারের মত পাক খেতে খেতে পতিয়া গজরাচ্ছে, শাসাচ্ছে, চাপা গলায় ফুঁসছে। ভগলুকে দেখে সে গর্জে উঠল, 'শুয়োর কো বাচ্চা—'

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ভগলু। তারপর চিল্লাল, 'কুত্তীর বাচ্চা—'

ক্রুর চোখে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। যেন দুটো দাঁতাল শুওর পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

তাদের এতকালের বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং পেয়ারের সম্পর্কটা ঘুচে গিয়েছে। একটা আওরত দুটো জোয়ান মরদানাকে আদিম, বর্বর এবং উন্মাদ করে তুলেছে।

ভগলু শাসায়, 'আর না, বহুত সয়েছি।'

পতিয়া গর্জায়, 'কুত্তীর বাচ্চাকে খতম করে ফেলব।'

খুব খানিকটা খিস্তিখেউড়, শাসানি এবং গর্জনের পর ভগলু পতিয়ার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তিতে ডিবেটা উল্টে গেল।

অন্ধকারে দুটো বন্য জানোয়ার পরস্পরের সঙ্গে সমানে যুঝছে। একজন আর একজনকে কামড়ায়, খামচায়, ঘুষি মারে।

হঠাৎ এক সময় লাথি মারতে মারতে পতিয়াকে ঝুপড়ির বাইরে বের করে দিল ভগলু। চিল্লাতে লাগল, 'ভাগ্‌, হিঁয়াসে ভাগ- হারামী—'

ফুঁসতে ফুঁসতে হাঁপাতে হাঁপাতে পতিয়া শাসাল, 'অভী যাচ্ছি, ফিন তোর সাথ দেখা হবে—'

রেললাইনের এপারে কারখানাগুলির গা ঘেঁষে ঘিঞ্জি, গাদাগাদি বস্তি। সেখানে এসে উঠল পতিয়া।

সেদিন মারপিটের পর জ্বর হয়েছিল। ক'দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল পতিয়া।

আজ জ্বর ছেড়েছে। জ্বর ছাড়লেও শরীরটা বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে। তবু ধুঁকতে ধুঁকতে মিশিরজীর ডেরার দিকে রওনা হল পতিয়া।

যখন পৌঁছল, তখন বিকেল। বাইরে থেকে পতিয়া ডাকল, 'কব্‌তরী—'

জবাব মিলল না।

এবার পতিয়া মিশিরজীকে ডাকল। এবারও কেউ জবাব দিল না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ডেরাটার ভিতরে ঢুকল পতিয়া। আর ঢুকেই চমকে উঠল।

ডেরায় কেউ নেই। না মিশিরজী, না কব্‌তরী। মানুষ তো নেইই, বিছানা-পত্তর লটবহর, বোঁচকা-বুঁচকি—কিছুরই চিহ্ন নেই। ডেরাটা ফাঁকা, শূন্য, খা-খা।

বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল পতিয়া। ডাকাডাকি করল, 'কব্‌তরী—'

কিন্তু না, কব্‌তরী নেই।

পতিয়া ঠিক করল, রেললাইনের ওপারের বস্তিতে ফিরে যাবে। গেমো বনের পাশ দিয়ে সে চলতেও শুরু করল। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে ফিরে এল সে। নিজের অজান্তে কখন যে পুরনো ঝুপড়িতে চলে এসেছিল, পতিয়ার হুঁশ নেই।

খাটিয়ার উপর দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঝিম মেরে বসে আছে ভগলু। পায়ের শব্দে সে মুখ তুলল। লাল লাল, ফোলা ফোলা চোখে আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপরেই আবার মাথাটা হাঁটুর ফাঁকে গুঁজল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পতিয়া।

এমনিতে শরীরটা জ্বরে কাহিল হয়ে আছে। মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করছে। কপালের দুপাশে রগগুলো চিন চিন করে ফেটে পড়ছে।

কি বুঝল পতিয়াই জানে। আস্তে আস্তে ভগলুর পাশে এসে বসল।

মাথা তুলল না ভগলু। ফিস ফিস, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, মিশিরজীর তবিয়ত বহুত খারাপ হল। চটকলের সাহেব তার নোকরি খতম করে দিল। কব্‌তরীকে নিয়ে কাল দেহাতে চলে গিয়েছে মিশিরজী।'

কব্‌তরী চলে গিয়েছে।

কব্‌তরীকে পাওয়ার যে সুখ সেই সুখটাকে ভাগাভাগি করতে কেউ রাজী না। না পতিয়া, না ভগলু।

আশ্চর্য! কব্‌তরীকে না পাওয়ার যে দুঃখ, সেই দুঃখটার শরিক হতে তাদের আপত্তি নেই।

রুমাল তোয়ালে ইত্যাদি যত বেশী জীবাণুদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অন্যান্য বস্ত্রাদি অত তাড়াতাড়ি জীবাণুদুষ্ট হতে পারে না। এর জন্য একের রুমাল বা তোয়ালে অন্যের পক্ষে ব্যবহার করা খুব নিরাপদজনক নয়। অবশ্য আজকাল যে সব জীবাণু প্রতিরোধকারী রুমাল বাজারে চালু হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, সেগুলোতে অত ভয়ের কারণ নিশ্চয় থাকবে না। শোনা যাচ্ছে যে, 'এভার্সন' নামে একটি জীবাণু প্রতিরোধকারী কাপড় তৈরী করা হবে। ঐ কাপড়ের সমস্ত আঁশের কণা অনুকণা-গুলি স্থায়ীভাবে জীবাণু প্রতিরোধকারী ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য ঐ কাপড়ের আঁশের একটি উপাদান হিসাবে জৈব জিংক মেশান হয়। এর দরুন সুতোর নিজের রং কোনও রকম বিকৃতও হয় না, সুতোয় কোনও রকম রংও ধরে না এবং কোনও গন্ধও থাকে না। যারা এই কাপড় বার করেছেন তাঁরা বলেন যে, এই এভার্সন কাপড় যতবার শুধু জলে অথবা সাবান জলে ধোয়া হোক না কেন এর ঐ ক্ষমতা নষ্ট হয় না, এমন কি ব্লিচিং পাউডার কিংবা ক্লোরিনে ধুলেও কোনও ক্ষতি হয় না। শোনা যাচ্ছে এভার্সন হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য চাদর ইত্যাদি, কারখানায় কাজের কাপড় চোপড় এবং তোয়ালে রুমাল এবং অন্যান্য কাপড় তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের "আওন এক্সচেঞ্জ এবং কেমিক্যাল কর্পোরেশন" এভার্সন বার করেছেন।

•

ধূমপায়ী ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের সিগারেটের কৌটাটি সম্বন্ধে যত সচেতন দেশলাই বা সিগারেট লাইটার সম্বন্ধে ঠিক অতখানি সচেতন সব সময় হতে পারেন না। বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় যে, হয়তো অন্যের লাইটারটি নিজের পকেট জাত করে নিয়ে এসে বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়েছেন, আবার না হয়তো অন্যের বৈঠক-খানায় নিজের লাইটারটি ফেলে ঘরে এসে আফসোস করছেন। এ হেন ভুলো ব্যক্তিদের জন্য সিগারেট ধরানর একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারলেই বেশ ভাল হয়। ছোটখাট কোনও রকম লাইটারের পাট উঠিয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে টেবিলের মাথায় লাগান লাইটারের ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় আর ধূমপায়ীদের অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। নতুন রকম এক ইলেকট্রিক লাইটার বার হয়েছে, সেটি টেবিলের সংগে আটকে রাখা হবে আর দরকার মত প্লাগের সংগে আটকে দিলে অনায়াসেই সিগারেট ধরান যাবে। এই লাইটারে কোনও রকম

চক্রদত্ত

জ্বালানি তেলের দরকার হয় না এমন কি সাধারণ পকেট লাইটারে যেমন পাথরের টুকরোর দরকার এক্ষেত্রে তারও দরকার হবে না। কোনও রকম পলতে অথবা ব্যাটারীরও দরকার হয় না। শুধু একটি ছয় ইঞ্চির কর্ড থাকে আর বোতাম টিপলেই জ্বলে ওঠে।

•

বালিতে কোনরকম ফসল ফলান সম্ভব নয় বলেই আমরা জানি। সারা পৃথিবীতে এই বালুকাময় জমি অনেক। এগুলো আজ পর্যন্ত মানুষের কোন উপকারেই আসেনি। সম্প্রতি উজবেকিস্থানে বালির ওপর কি করে ফসল ফলান যায়, তার এক পরীক্ষা চলেছে। বৈজ্ঞানিকরা বালির ওপর 'পলিএক্রাইলিমাইড' ছড়িয়ে প্রথমে এটাকে স্থায়ী করে নিচ্ছেন—যার ফলে পরে এটা ভাল জমিতে পরিণত হচ্ছে। এই পলি-একরাইলামাইড শুধু বালিকে স্থায়ীই করে না এটা সারেরও কাজ করে। পলিএকরাইলা-মাইড বালির ওপর ছড়াবার সংগে সংগে একটা পাতলা চাদর বালিকে ঢেকে ফেলে এবং জমিতে স্থায়ী করে দেয়, আর সেই সংগে বালি খুব তাড়াতাড়ি আদ্রতা সংগ্রহ করে, যার সংগে প্রয়োজনীয় সারজাতীয় বস্তু এতে জমা হতে থাকে।

•

মহাশূন্যে ভ্রমণ যে অদূরভবিষ্যতে এক-দিন সম্ভব হবে তা নিয়ে আর সন্দেহ নেই। এর জন্য আমেরিকা এবং রাশিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে চলেছে। অবশ্য মানুষ যখন এই মহাশূন্যে ভ্রমণে যাবে, তখন তার অনেক কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর কথা এখন থেকেই চিন্তা করা দরকার। খাদ্য ছাড়াও মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন অক্সিজেন। যে যানে করে ভ্রমণ করা হবে তার মধ্যে কি করে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন পাওয়া যায়, তার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা সবরকম পরীক্ষা করে দেখছেন। উদ্ভিদ-জগতের ক্ষুদে উদ্ভিদ হচ্ছে 'এলগি'। আশা করা যাচ্ছে এলগিই মানুষকে এর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারবে। উদ্ভিদরা, মানুষ এবং প্রাণীরা যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ছাড়ে সেটাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে শুদ্ধ অক্সিজেন তৈরী করে। এর মধ্যে দেখা গেছে যে, এলগি জাতীয় উদ্ভিদ অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশী অক্সিজেন ছাড়ে। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকরা এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে কাঁচের জারের মধ্যে এলগির সঙ্গে সাদা ইঁদুর রেখে খুব ভাল করে মুখ বন্ধ করে পরীক্ষা করে দেখছেন।

•

টাসখান্দের পোলিমার কেমিস্ট্রী ইনস্টি-টিউট এক নতুন উপায়ে তুলোর আঁশ থেকে ঠিক উলের মত দেখতে একরকম বস্তু তৈরী করেছে। এটা তুলোর আঁশের সেলুলোজ অংশকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে উন্নত করে করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, এই নতুন উপায়ে তৈরী উল খুব শক্ত এবং সহজেই যে কোন রং-এ ছোপান যায়। বর্তমানে এক ঘন্টায় প্রায় ৩০০ মিটার আঁশকে উলে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে।

•

আমরা আজকাল মশা, মাছি, আরশোলা ইত্যাদি কীটপতংগ তাড়াতে হলে ইন-সেকটিসাইড ব্যবহার করি। সম্প্রতি জেনেভাতে যে 'ওয়ার্লড হেলথ অরগানিজে-শনের বৈঠক হল, তাতে এই পোকামাকড়ের ওপর ইনসেকটিসাইডের ফলাফল নিয়ে এক আলোচনা হয়ে গেল। এই আলোচনায় বলা হয়েছে যে, খুব কম করলেও ৫০টি মানুষের ক্ষতিকারক কীটপতংগের ইন-সেকটিসাইডের প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে। যার ফলে অদূরভবিষ্যতে এই ইনসেকটি-সাইড এদের আর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এর ফলাফল অবশ্য ভীতি-জনক—কারণ আবার পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের কীটপতংগবাহী অসুখ মানুষের এবং গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে দেখা দেবে। আলোচনায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা দু'প্রকারে এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। একরকম শারীরিক আর একরকম নতুন জীবনযাত্রা প্রণালী। আর এই বদল বংশানুক্রমে দেখা দিচ্ছে। যেমন মশা, কোথাও ডি ডি টি ছড়ানমাত্রই সেখান থেকে সরে পড়ে। আগে ডি ডি টির কাছ থেকে সরে পড়তো না। আবার অনেক কীটপতংগ যে সমস্ত দেশে বেশী ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করা হয়, সেই দেশের থেকে বাস উঠিয়ে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে দেয়।

জল থেকে ডাঙ্গা

সীমানন্দ অধিকারী

শাস্ত্রে বলেছে "চরৈবেতি"—এগিয়ে চল। কবি গেয়েছেন, 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।' গতির একটা নেশা আছে—যতির যেমন আছে আয়েস। এই গতির নেশাই মানুষকে যুগ যুগ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ঘর থেকে ঘরের বাইরে। ঘরের দেওয়ালের ঘেরাটোপ ভেঙে তাই সে বারবার উদ্ভ্রান্ত উচ্ছলতায় ছুটে চলেছে দিগন্তের অচঞ্চল শ্যামলিমা পেরিয়ে দুর্গম মরুর রুক্ষতায়—অভ্রংলেহী গিরির চূড়ায় অথবা অতলান্ত সমুদ্রের অতলে। যারা বাতাসের ফিসফিসানিতে নিরন্তর শুনেছে এই মন্দ্র-মন্দ্র আহ্বান তাদের অনেকেই আর ঘরে ফেরেনি—কিন্তু যারা ফিরেছে, মানুষের গড়া ইতিহাস তাদের দিয়েছে জয়মালা। কালের কপোলতলে জোনাকির জ্যোতি নিয়ে তারা দীপ্যমান। এ তো গেল মানুষের কথা। কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও দেখা গেছে এমনি একটা গতির নেশা। চেনাগণ্ডির সীমা-রেখা ছাড়িয়ে তারাও কেউ কেউ অজানার অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়িয়েছে। সেদিন তারা কেউ কল্পনাও করেনি (কল্পনা শক্তি তাদের ছিল কি?) যে লক্ষ কোটি বছর পরে তাদের সেই কালজয়ী অভিযান এত আলোড়ন তুলবে সেই মানুষের মনে—যারা বিবর্তনের সোপান শ্রেণীতে তাদের চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ উঁচু। বীজের মধ্যে নিহিত থাকা ভবিষ্যত মহীরুহের বিশালতার মত তাদের সেই অভিযানে ছিল আগামী সম্ভাবনার আশ্চর্য ইঙ্গিত। তাই আজকের মানুষ চাতকের মত ঊর্ধ্বমুখী হয়েও তাদের চেয়ে সর্বাংশে ইতর কয়েকটা প্রাণীকে জানায় অন্তর উজাড় করা সম্মান। সেই অভিযানের ইতিবৃত্ত যেমন রহস্যময় তেমনই রোমাঞ্চকর।

জীবন-নাট্যের যবনিকা উঠেছিল আজ থেকে প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে। সেদিন কতকগুলো মৌলিক পদার্থের আকস্মিক সহযোগিতায় জীবনের যে বুদ্বুদ প্রথম ভেসে উঠেছিল সমুদ্রে তা আজ পরিব্যাপ্ত হয়েছে সমুদ্রের মত বিশালতায়। এই সহযোগিতা নেহাতই দুর্ঘটনাপ্রসূত; তবু পণ্ডিতেরা বলেন, সৌর-বিকিরণ আর বজ্রপাত ছিল সে নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ের ব্যবস্থাপক। এক কথায় সৌর-বিকিরণ আর বজ্রপাত সেদিনের জটিল জৈবিক পদার্থ সৃষ্টির একটা কারণ। জীবনের সেই আদি প্রাণপদার্থটুকু আকস্মিকভাবেই এসে গিয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সে লাভ করেছিল আশ্চর্য একটা ক্ষমতা। পরিপূর্ণ পুষ্টির পরই সে নিজেকে দুভাগে ভাঙতো। পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে আত্মহত্যার মত করে নয়—ভাঙতো অতি সহজ আর সাবলীল ভঙ্গীতে, একটা থেকে দুটো পৃথক সত্তা সৃষ্টির আনন্দে। এ কাহিনীর শুরু হচ্ছে সৃষ্টির ইতিহাসে ২৫ কোটি বছর কেটে যাওয়ার পর। এই ২৫ কোটি বছর ধরে এসেছে রূপের কি বিচিত্র সমারোহ। বিবর্তনের ধাপ বেয়ে এসেছে অসংখ্য প্রাণী—আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার—সবের মধ্যেই যাদের বিরাট প্রভেদ।

প্রকৃতির এই ক্রীড়ামঞ্চের প্রথম ডিভিশনে তখন মৎস্যশ্রেণীর প্রতিনিধিরা। এরা প্রত্যেকেই চ্যাম্পিয়ন ছিল না। পণ্ডিতদের মতে এই মৎস্যকুলের মধ্যে যাদের হাড়গোড়-গুলো ছিল পাকালো তারাই ছিল তখনকার চ্যাম্পিয়ন অর্থাৎ এখনকার মোহনবাগান। কলকাতার মাঠে আমরা প্রায়ই দেখি একটা বিশেষ দলের প্রাধান্য ভাঙতে বাঙ্গালোর, মাইশোর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে খেলোয়াড় আসছে। প্রাকৃতিক ক্রীড়ামঞ্চেও ঘটেছিল ঠিক এমনি ঘটনা। চ্যাম্পিয়নশিপের পাল্লায় এসেছিল কতকগুলো বিশেষত্ব-ওয়ালা মাছ—ফুটবল খেলোয়াড়দের মত যাদের পায়ে ছিল বোমার মত শট্—মাথায় ছিল আগুনের মত 'হেড'। পণ্ডিতেরা এই মাছগুলোকে বললেন 'ফুসফুসওয়ালা মাছ' (লাং ফিস্)। তারা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আর ব্রেজিলে। ২৫ কোটি বছর আগেকার 'ফুসফুসওয়ালা মাছ'রা আজো আছে। 'ফুসফুসওয়ালা মাছদের' বিশেষত্ব কি—না 'ওরা বরের ঘরের মাসী আর কনের ঘরের পিসী'। অর্থাৎ ওরা জলে আর স্থলে (দুলো জায়গায়) দু'জায়গায়ই থাকতে পারে। এতাবৎকাল মাছেরা জলে গোলা অক্সিজেন দিয়েই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালিয়ে পরমানন্দে
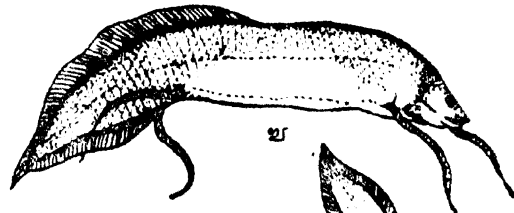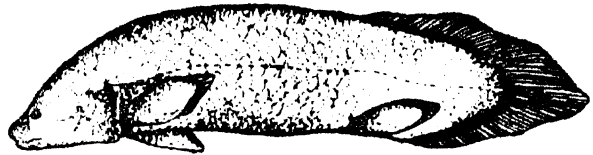
ফুসফুসওয়ালা মাছ:—(ক) নিওসেরাটোডাস্ (অস্ট্রেলিয়া), (খ) প্রোটোপ্-টেরাস্ (আফ্রিকা), (গ) লেপিডোসাইরেন (আমেরিকা)

ওয়ালা মাছদের কেউ কেউ বাঁচার জন্য বেশি জলওয়ালা জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। কালক্রমে তাদের মধ্যে কেউ কেউ জলবাসী থেকে স্থলবাসী হয়ে যায়। এ মতবাদ অবশ্যই যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে। সে যাই হোক, আসল কারণ হচ্ছে খাদ্যের টানাটানি। আমরা খাবার জন্য বাঁচি না বাঁচার জন্য খাই, এ চিন্তা দার্শনিকরা করুক। কিন্তু একথা সত্যি যে, বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবেই। জলে যখন জীবের সংখ্যা হয়ে উঠল অগণন, অথচ খাওয়ার যোগ্য খাবার রইলো সীমিত—তখনই খাওয়ার জন্য শুরু হলো হানা-হানি। এই পোড়া পেটের জন্যই মাছেরা
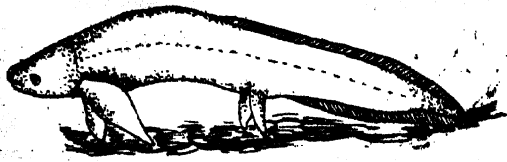
গুটি গুটি ডানা-ডানা—নিওসেরাটোডাস্, এরা ডানা দিয়ে চলতে পারে

সাঁতার কেটেছে। কিন্তু এই 'ফুসফুস্-ওয়ালা মাছ'গুলো শুধু বাতাসের শরিকানা দাখিল করেই ক্ষান্ত হয়নি—এরা নাকি জলের তলায় ডানার সাহায্যে গুটি গুটি করে হাঁটতেও শিখেছিল। কিন্তু 'ফুস্-ফুস্ওয়ালা মাছের' অভ্যুত্থান ঘটলো বেজায় তাড়াতাড়ি। তাই পণ্ডিতেরা বললেন—'ফুসফুসওয়ালা মাছেরা' জল থেকে ডাঙায় ওঠার প্রথম সূচনা করেছিল ঠিকই—কিন্তু ওদের দিয়ে কোন কাজ হয়নি—যেহেতু ওরা ছিল বেজায় রকম এঁচোড়ে পাকা। আসলে জল থেকে ডাঙায় অভিযান চালাবার জন্য যারা ধীরে ধীরে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রস্তুত হচ্ছিল তারা হচ্ছে ভাগ করা পাখনা-ওয়ালা (Lobe fins or Crossoptery-gians) একদল মাছ। তাদের মধ্যে যাদের বলা হয়েছে 'অস্টিওলেপিস' তারাই ছিল ২৭ কোটি বছর আগেকার ডেভোনিয়ানের দল।

এই ধুলোর ধরণীতে প্রথম পায়ের ছাপ পড়েছিল ২৭ কোটি বছর আগে—এর কাছে বুদ্ধের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগেকার দিনটি কয়েক মুহূর্ত আগেকার ঘটনা মাত্র। সেদিন গাছ ছিল—কিন্তু গাছেতে ফুল ছিল না। মাটি ছিল, কিন্তু মাটিতে হাড়ের কাঠামোওয়ালা চলমান জীবন ছিল না।

সে দিনের সেই অভিযাত্রী 'ইক্থাওস্টেগিড'-এর দল দুচোখে আলোর অঞ্জন মেখে ভেবেছিল তারাই এই দুনিয়ার সম্রাট। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক বা রবিনসন ক্রুশোও ভেবেছিলেন এই কথা।

দেশ আবিষ্কার বা জগৎজোড়া খ্যাতির
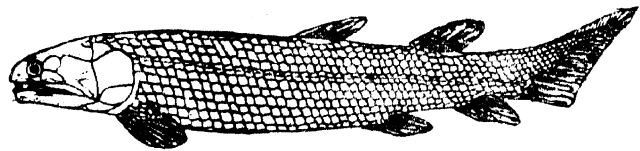
অস্টিওলেপিস্—জল থেকে ডাঙায় ওঠার প্রথম উদ্দীপনা এদের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল

[illegible] দূরে থাক—সে যুগের যে অভিযাত্রী-দের জানাই ছিল না জলের বাইরে কি আছে। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে—কিসের উদ্দীপনায় সেদিনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহেব এ এক [illegible] বললেন, [illegible] [illegible] [illegible] হতে—প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তাই ভাগ করা পাখনা-

[illegible]

তার ফিরিস্তি তৈরী হয়—যেটা দৈর্ঘ্যে ঠিকুজির সমতুল্য। কড়া-খুন্তি, হাতা-বেড়ি থেকে শিল-নোড়াও সেই ফর্দে স্থান পায়। শুনেছি কেউ কেউ নাকি দুধ-মেশানো জল পয়সা দিয়ে কেনবার ভয়ে বাড়ির সবৎসা গরুটিকেও নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করেন। এক্ষেত্রে যা হবার তাই হয়—নুন আনতে পান্তা ফুরায় অর্থাৎ খাওয়া আর শেষ পর্যন্ত হয় না। সে হিসাবে ২৭ কোটি বছর আগেকার সেই অভিযাত্রী-দের ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ তারা কোন-রকম যোগাড়যন্ত্র না করে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যেই অভিযান শুরু করেছিল। প্রস্তুতি ছিলই, তবে সেটা অন্তরের।

জল থেকে ডাঙার দূরত্ব আপাতদৃষ্টিতে খুব বেশি নয়। কিন্তু জল আর ডাঙার জীবনের যে বিন্যাস তার মধ্যে দুই মেরুর পার্থক্য। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ডাঙার নতুন পরিবেশে অভিযাত্রীরা কেমন করে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিলো? মাছদের ব্যাং হবার প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো শ্বাসযন্ত্রের ভিন্নমুখিতা। মাছেরা ফুলকোর সাহায্যে জলে গোলা অক্সিজেন নেয়, আর ব্যাঙেরা ফুসফুস দিয়ে নিশ্বাসে অক্সিজেন নেয়। কিন্তু আগেই বলেছি বিবর্তনের প্রয়োজনে দেখেছিল কতকগুলো মাছ—যাদের ফুলকো তো ছিলই আর ছিল ফুসফুস, যা বিপৎকালে তাদের শ্বাসকার্য চালাতে সাহায্য করতো। অভিযাত্রী ক্রসোপ্টেরিজিয়ানরা ছিল এই ফুসফুস-ওয়ালা মাছদের খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই। জল থেকে ডাঙায় এসে আর একটা অসুবিধে হচ্ছে রোদ্দুর কিরণ। যতক্ষণ মাছ জলে রইল, ততক্ষণ সে নিরাপদ। কারণ রোদ্দুর কিরণ তার দেহের অভ্যন্তরের জলীয় পদার্থের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যেই সে ডাঙায় উঠল, অমনি দেখা দিল শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। খুব সম্ভব সেই কারণেই ব্যাঙের আদিপুরুষের গায়ে ছিল আঁশের বর্ম, সূর্যকিরণের তেজ থেকে যা রক্ষা করত। অবশ্য পরবর্তী-কালে দেখা যায় যে, আঁশ নেই বটে, কিন্তু চামড়ার তলায় আছে হাড়ের আস্তরণ। মাছ থেকে ব্যাঙের বিবর্তনের তৃতীয় অসুবিধা হলো ভূমধ্যাকর্ষণ। মাছের বেলায় এই আকর্ষণটা একটু কম—যেহেতু জলের ঘনত্ব এই আকর্ষণকে কিছুটা প্রতিহত করে। কিন্তু স্থলচারীর কাছে এই আকর্ষণ বেজায় বেশি। তাই একটু বাঁ-ডানের তফাত হলেই একেবারে পপাত ধরণীতল—পতন ও মূর্ছা। পতন যদিও চিরকাল তলার দিকে হয় তবুও আমরা দেখি এই অধঃপতন রোধের একটা প্রচেষ্টা। ব্যাঙের আদিপুরুষদের মধ্যে আমরা দেখি একটা মজবুত হাড়ের কাঠামো। এই হাড়ের কাঠামোটা প্রধানত মেরুদণ্ড, অংসফলক,
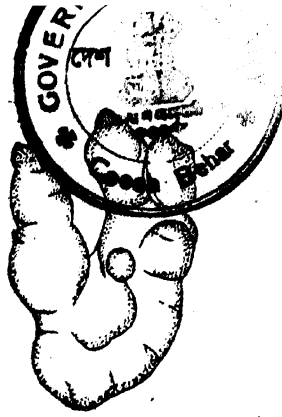
চতুষ্পদ প্রাণীর পায়ের প্রথম পাওয়া জীবাশ্ম (থাইনোপাস্ অ্যান্টিকুয়াস্)

উরঃফলক, পঞ্জর আর শ্রোণীচক্র দিয়ে তৈরী। মেরুদণ্ডের হাড়গুলো এমনভাবে সংযোজিত যে এর নড়াচড়া স্বাচ্ছন্দ্যগতিতে সহজেই সম্ভব। অংসফলক আর শ্রোণী-চক্রাস্থির সঙ্গে যথাক্রমে লাগানো রয়েছে হাত আর পা—যার সাহায্যে দেহকে মাটির ওপর তুলে ধরা যেতে পারে।

নিরবধিকাল—বিপুলা এই পৃথিবী। এই কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে প্রাণের অফুরন্ত প্রবাহ—যুগ থেকে যুগান্তরের নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়। এই প্রবাহে দিগন্ত পাপক্ষয়ের গতানুগতিকতা নেই, আছে বৈচিত্র্যের বিশালতা। বিবর্তনের প্রয়োজনে এ প্রবাহে লেগেছে বৈচিত্র্যের কারিকুরী—রূপের কি অপরূপ রূপান্তর। জল থেকে ডাঙায়—জীবনের প্রাচুর্যের জায়গা থেকে চলমান জীবনশূন্য জায়গায় আসতে লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর। তবু সে-দিনের সেই দুর্বল সূচনা প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ্য করে এনে দিয়েছিল নব-জীবনের অরুণোদয়। এত কোটি বছর বাদেও মানুষ অবাক বিস্ময়ে ভাবছে রূপান্তরের সেই আশ্চর্য সকালের কথা।

১১

'আমাদের যারা দেখছে তারা আমাদের কী ভাবছে বলো তো।' হাসিমুখে জিগগেস করল কাকলি।

'এসকেপিস্ট ভাবছে।' বললে সুকান্ত। ফল বেরিয়ে গেছে পরীক্ষার। এখন তাই আরো ফলের দিকে, স্থূলের দিকে যাত্রা।

'না আমি এসকেপিস্ট নই। যুদ্ধ থেকে আমি পালাব না।' ছুরিবেঁধা মাংসের টুকরোটা মুখে তুলল সুকান্ত। বললে, 'নিধিরামও যুদ্ধ-পলাতক ছিল না।'

'কে নিধিরাম?' প্লেটের আলুটাকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করছিল কাকলি, তার আগে চোখই সে আলু করে তুলল।

'সে কি, নিধিরামকে চেন না?'

'তোমার সব বন্ধুকেই কি আমি চিনি?'

'আহা, শুধু আমার বন্ধু হতে যাবে কেন? সকলের বন্ধু। জগজ্জনের বন্ধু।'

'সে আবার কে?' আলুটা মুখে পুরল কাকলি।

'আমাদের সেই নিধিরাম সর্দার। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। অথচ ইয়া গালপাট্টা ইয়া শুঁড়তোলা নাগরা ইয়া কোমরবন্দ।' ছুরিতে-কাঁটায় টুং-টাং শব্দ তুলল সুকান্ত। 'সাজসজ্জার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিস্মিন্ময় গদগদ। ঢাল-তলোয়ারই নেই।'

'তুমি কি নিধিরাম?'

'তা ছাড়া আর কী!'

'তুমি কি নিরস্ত্র? নিরন্ন? প্রতিশ্রুতি শূন্য?' কোল থেকে ন্যাপকিন তুলে ঠোঁটের প্রান্ত দুটো মুছল কাকলি।

'কিন্তু বর্তমানটা তো দেখবে। রূঢ় বাস্তব বর্তমান।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্তমানই দেখছি।'

'দেখছ?' কাকলির চোখের মধ্যে চোখ ফেলতে চাইল সুকান্ত।

দু'চোখের পাতা সবসে বন্ধ করে কাকলি বললে, 'আদ্যোপান্ত দেখছি।'

'অতক্ষণ চোখ বুজে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' হেসে ফেলল সুকান্ত। 'বর্তমান দেখতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎও না দেখে ফেল সেই সঙ্গে।'

'ভবিষ্যৎ থাক ভবিষ্যতের জায়গায়।' চোখ খুলল কাকলি: 'আমার এই বর্তমানই সুন্দর।'

'সুন্দর? আমার চাকরি নেই—এখনো হয়নি, আর ঐ আমাদের বাসা। তুমি সুন্দর বলো?'

'বলি।' চিবোতে চিবোতে থামল কাকলি। রসাল মুখে বললে, 'যেখানে তুমি সেখানেই আমার সুন্দর।'

'এটা কোনো কাজের কথাই নয়।' গম্ভীর হল সুকান্ত। 'মনে রেখো কাব্যের কথা ছেড়ে আমরা এখন কাজের কথায় নেমেছি।'

'তার মানেই হৃদয় থেকে উদরে নেমেছি।' নিটোল হাঁ করে দিব্যি এক গ্রাস মুখে তুলল কাকলি। 'নামলামই বা। দিব্যি পেট ভরবে। হিসেবে ভুল হবে না।'

'হবে না?' কাকলি কি দয়া করে বলছে এমনি করুণ জিজ্ঞাসায় তাকাল সুকান্ত।

'না। যা হোক তোমার কিছু একটা আয় আছে, আয়ের পথ আছে—এম-এ হবার পর তোমার টিউশানির বাজার তেজী হবে নির্ঘাৎ—'

'তুমি কী বলছ? এ একটা আয়?'

'চরিত্র যাই হোক চেহারাটা আয়ের মতই। আর কে না জানে, তিল কুড়িয়েই তাল, হাঁটি-হাঁটি করেই হাওয়া গাড়ি—'

'হাওয়াগাড়ির মধ্যে নয়, হাওয়াগাড়ির তলায়।' হাসল সুকান্ত।

'আজ্ঞে নয়, অত পঙ্গুতো দেখিয়ো না।' সস্নেহ শাসনের চোখে তাকাল কার্কলিঃ 'তা ছাড়া তুমি একটা রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছ। দুজনের পক্ষে বেশ একটা মোটা টাকা দিয়ে দিতে পারবে সংসারে।'

'দুজনের পক্ষে।' কথাটা মৃদুগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করল সুকান্ত। একটু বুঝি বা চিন্তাকুল শোনাল।

'যখন বর্তমান নিয়ে কথা বলছ, আপাতত তো দুজনই।' হাড়টা শেষ পর্যন্ত ছুরির অধীন থাকবে না হাতে করে ধরতে হবে, কার্কলি বললে চোখ নামিয়ে।

'কত টাকাই বা স্কলারশিপ। সবটা দিয়ে দিলেও মোটা টাকা হয় না। তবে, যখন দুজন, দুজনের ব্যাপার, তখন তুমিও যদি হাত লাগাও—'

'তার মানে?' হাড়টা হাতে করেই তুলল কার্কলি; 'আমাকেও চাকরি করতে বলছ?'

'মন্দ কি।'

'ওসব হবে না।' চুলভরা সুন্দর মাথাটা মৃদু মৃদু নাড়াতে লাগল কার্কলিঃ 'ওসব মনের কোণেও স্থান দিও না। বিয়ের পর চাকরি করতে পারব না বলে রাখছি। এক জীবন অনবরত পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে, আরেক জীবন অনবরত পারব না চাকরি নিয়ে। জানো পেট পুরে খেতে পারিনি এ পর্যন্ত। এই স্কুলের বাস, ঐ কলেজের ঘণ্টা, এই ক্লাসের রুটিন ঐ পরীক্ষার নোটিস—দিন-রাত চড়কে চড়িয়ে রেখেছে। বিয়ের পর আবার আফিস নিয়ে, ট্রাম-বাসে ওঠা-নামা নিয়ে, পাগল হতে রাজি নই। বিয়ে মানেই বিশ্রাম। বিয়ের পরে স্রেফ বিশ্রাম করব।'

'বিশ্রাম করবে?'

'জানো, বাড়ির সমস্ত রান্না শেষ হয়ে যাবার পর কোনোদিন খাইনি। এবার খাব।' হাসতে লাগল কার্কলি। 'চচ্চড়ির ডাঁটা খাব চিবিয়ে চিবিয়ে। মাছ-পাতুরির ল্যাজা খাব চুষে চুষে। কত চাটনি আচার, কত কুলচুর আমচুর। পান খাব গাল পুরে। তারপর গা ঢেলে ঘুমুব দুপুরবেলা। উঃ, কতদিন ঘুমুইনি নিশ্চিন্ত হয়ে। আর খারাপ হবার ভয় নেই, এর-ওর-তার এন্তার উপন্যাস পড়ব। বিকেলবেলা আলতাউলি আসবে,—শোনো, আর নাপতেনি বলা চলবে না—ঝামা দিয়ে পা ঘষে মোটা করে আলতা পরিয়ে দেবে। সিনেমায় যাব।'

'জীবন সার্থক করবে।' গদগদ হবার ভাব করল সুকান্ত।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করব। নইলে শুধু শুধু এত পরিশ্রম কেন?'

'প্রেম প্রচণ্ড এক পরিশ্রম ছাড়া আর কি।' ইতিমধ্যে বয় চা দিয়ে গিয়েছে, নিজের কাপে চামচ নাড়তে লাগল কার্কলিঃ 'মজুরি ছিল বলেই মেহনত, তেমনি বিয়ে ছিল বলেই প্রেম। বিয়েই হচ্ছে প্রেমের রোজগার। বিয়ে হবে না অথচ প্রেম করো, এ যেন ঘোড়া নেই তবু চাবুক হাঁকড়াও। ওসব ফাঁকা আওয়াজে আমি নেই মশাই। আমার কাছে সাফ কথা, ফেল কড়ি মাখো তেল। বিয়ে করতে রাজি আছ তো এস প্রেম করতে। নচেৎ দূরে হও, অর্থাৎ দূরে থাকো।'

কী সুন্দর কথা বলছে কার্কলি, যেন

একটা ফোয়ারা খুলে গিয়েছে, সানন্দ চোখে তাই দেখছে সুকান্ত। দেখতে দেখতে বললে, 'তুমিই ঠিক বুঝেছ।'

'আর এও বুঝেছি যিনি প্রেম করছেন অর্থাৎ যিনি স্বামী হবেন তাঁরই পুরোপুরি দায়িত্ব স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেবার, ঘরবাড়ি দেবার। স্ত্রীর দায়িত্ব নেই যে, স্বামীকে খাওয়াবে, পরাবে, বসবাসের সুবিধে করে দেবে। ঘুরে ঘুরে দেখে এস দেশবিদেশ। সর্বত্র এক বিধি এক ব্যবস্থা। স্বামীর ঘাড়েই স্ত্রীর পড়া। সুতরাং আমার মুখের দিকে দীন নয়নে তাকিয়ো না। তোমাকেই একা-একা সমস্ত বহন করতে হবে, পালন করতে হবে—পালিয়ে যাবার, এস্কেপিস্ট হবার আর উপায় নেই।'

'কিন্তু বাড়িতে যে ঘরে তুমি থাকবে তা তুমি দেখেছ?' ভয়ে ভয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল সুকান্ত।

'আমি থাকব মানে? আমরা দুজনে থাকব।' কাকলি প্রায় বিদ্রোহিণীর ভঙ্গি করল।

'ঐ হল। দুজনের ঘর। দেখেছ?'

'দেখেছি বৈ কি। ঘরটা ছোট। দুজনের পক্ষে না হলেও স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে ছোট। তাছাড়া সুধীরকে সরতে হবে। কোথায় হবে আর কোথায় তোমার মায়ের ঘর, নতুন টাকা দরকার। উপায় নেই। কিন্তু' কাকলি পেয়ালার উপর ঠোঁট রেখে: 'এবার এতদিনে, তোমার কাকা কাকিমা সরবেন না?'

'সরা তো উচিত।'

'সরলে ঐ ঘরটা আমরা নিয়ে নেব। সব আসবাব আমাদের কুলিয়ে যাবে।'

'কিন্তু যদি না সরেন।'

'সরাবার চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ।'

'তবু যদি না পারি?'

'থাকবে। থেকে যাবে। আমাদের এই ব্যবস্থাটাই বা কদিনের জন্যে! যতদিন তোমার না একটা চাকরি হয়। একটা অস্ত-সুস্থ চাকরি পাওয়া মানেই বড় একটা অধিকারের মালিক হওয়া। তখন ইচ্ছে হলে বেশি দামের টিকিট কেটে সংসারের প্রথম লাইনের উঁচু আসনে সোজা গাঁট হয়ে নয়তো কেটে পড়া, অন্যত্র তাঁবু ফেল।'

'সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ একটি শাঁসালো মজবুত চাকরি দরকার।' নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

'সেটা কে না বুঝছে? কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়টাতে কী হবে সেইটেই প্রশ্ন।'

বিল এনেছে বয়। দুজনে একসঙ্গে হাত রাখল—সুকান্ত তার মনিব্যাগে, কাকলি তার বটুয়ায়।

শাসনরক্ত চোখে তাকাল সুকান্ত।

'ও, হাঁ, তুমিই তো দেবে। তোমারই তো একার দায়িত্ব।' হাত সংবৃত করল

কাকলি। দুজনে বেরিয়ে এল রেস্টুর‍্যাণ্ট থেকে। হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। খানিকক্ষণ কথা কইল না কেউ। আবছায়ায় চুপচাপ হাঁটাতেই শান্তি মনে হল।

'চলো জলের ধারে গিয়ে একটু বসি।' বললে সুকান্ত। 'মনে যখন কোন আলোড়ন আসে তখন জল দেখতে খুব ভালো লাগে।'

সম্প্রতি যে আলোড়ন এসেছে এতে জল-মাটি আলো-আঁধার লোকজন ইট-পাথর ট্রাম-বাস ট্যাক্সি-রিকশা সমস্ত ভালো লাগছে। যেন রহস্যের দেশে অপূর্বের পোশাক পরে দাঁড়িয়েছে সকলে। স্বয়ং নিধিরামকেও মনে হচ্ছে হাদিরাম।' হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'রাত বেশি হয়নি তো? চলো তবে। আরেকটু বসি।'

'কথাটা শেষ করি।'

অনেক খুঁজে পেতে জলের কাছাকাছি ঘাসের উপর বসল দূরে-দূরে। যেন সহসা সন্দেহের না ছায়া পড়ে। কিন্তু দূরে বসলেও মনে হয় কত কাছে, কাছে বসলেও মনে হয় কত দূরে। এ যেন বিরহের পর মিলন বা মিলনের পর বিরহ নয়, এ যেন মিলন-বিরহ একই পাঁথা।

কারু মুখে কোনো কথা নেই।

কৌতূহলে কত সজাগ ছিল কাকলি, সে দেখবে কুঁড়ি কি করে ফুল হয়ে ফোটে। কুণ্ঠার কপাট খুলে কি করে প্রথমে কথা আসে। কি করে ইচ্ছা তার আড়াল ভাঙায়। মাঝখানে কাকলি ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল টের পেল না। সহসা চোখ চেয়ে দেখল এক রাশি গোলাপ, এক গুচ্ছ পাখি এক হৃদয় উত্তাল-তরঙ্গের শব্দ। আর বাসনা রক্তের ছোঁয়া পেয়ে সোণার রঙ ধরা।

আর সুকান্তকে কে বিশ্বভুবনের আনন্দের খনির মালিক করে দিয়েছিল এক মুহূর্তে। বলেছিল যত পারো, যত ধরে, যত ভরে, তুলে নাও দু হাতে। সুকান্তও যত পেরেছে উন্মাদের মত তুলে নিয়েছে বুকে করে। সেই একস্তূপ সুখকেই এখন সে বসিয়েছে ঐ ঘাসের উপর, তার চোখের সামনে, তার আকাঙ্ক্ষার এলেকায়।

'তোমার কথা তো বললে, কিন্তু আমারও একটা বিকল্প প্রস্তাব ছিল।' নতুন করে কথা পাড়ে সুকান্ত।

'তোমার আবার কোন বিষয়ে প্রস্তাব?' লঘু করতে চাইল কাকলি।'

'ঐ একই বিষয়ে। অন্তর্বর্তী সময়টা কী ভাবে যাবে সেই সম্পর্কে।'

'তোমার প্রস্তাব তো জানা।'

'জানা?'

'হ্যাঁ, মান্ধাতার আমলের সেই মামুলি প্রস্তাব। ধৈর্যের প্রস্তাব। এ কে না জানে?' এলানো ভঙ্গি ঋজু করল কাকলি: 'তার মানে যত দিন তোমার সুস্থ-সমর্থ চাকরি না জোটে ততদিন আমি বাপের বাড়িতে ভাত মারি আর তা-না-না-না করে দিন কাটাই। তুমি চাকরির জন্যে ঘোরো আর আমি ঘুরি তুমি চাকরি পেলে কিনা সেই সংবাদের জন্যে। দিনের পর দিন দিনমণি অস্ত যাক।'

'মন্দ কি।'

'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বের কাছে খেলো করে দিতে চাও?'

'না, খেলো করে দিতে চাইব কেন?'

'তা ছাড়া আর কি। জগৎ সমক্ষে তুমি এই প্রমাণ করতে চাও যে আমি একটি বাঙালী মেয়ে যতই কেননা ভালোবাসি আমার পুরুষকে, যেহেতু সেই পুরুষ রোজগারে কমজোর, যেহেতু তার কোনো এখনো ঝাপ্টপুষ্ট চাকরি, খোলামেলা বাড়ি-ঘর, আমি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নই। যেন আমার সম্মতির শর্তই এই যে, তুমি আমাকে আরাম দেবে, প্রাচুর্য দেবে, বিলাসের জীবন দেবে। আর যতদিন তা না দেবে ততদিন আমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকব। আমার সাধের যৌবন ভেসে যাবে। কোনো, আমি অত সস্তায় বিকিয়ে যেতে আসিনি।'

'কিন্তু পুরুষের চালচুলোটা দেখবে তো।' হাসল সুকান্ত: 'পুরুষ যখন, তখন, মিহি নয়, পুরু, কারই দেখতে হবে। যে পুরু নয় সে এখনো পুরুষ নয়।'

'থাক দেখেছি। কিন্তু ধরো, বসে আছি, এক বছর গেল দু বছর গেল, তোমার তেমন চাকরি কিছু জুটল না, পারলে না পুরু হতে, তখন কী হবে? মিহি হতে হতে মিলিয়ে যাব আমি, মিলিয়ে যাব আমি? আমাকে তুমি ছেড়ে দেবে? চলে যেতে বলবে?' যেন কথায় একটু কান্নার ছোঁয়াচ লাগল কাকলির।

'অত সোজা নয়। শোনো সরে এস।' চোখের ইশারা করল সুকান্ত।

'কেন এখান থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি।'

সুকান্তই এগিয়ে গিয়ে বসল। বলল, 'আমার প্রস্তাবটা, তুমি যেমন বলছ, অতটা সেকেলে নয়।'

'কিছু নতুনত্ব আছে?'

'নিশ্চয়ই। নইলে অসংলগ্ন তুমি গালে হাত দিয়ে বাপের বাড়ি বসে থাকবে আর আমি পথে-পথে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াব ব্যাপারটা মোটেই সুখেরও হবে না, গৌরবেরও হবে না। তা ছাড়া গালে হাত আর কদিন থাকবে? গালের হাত শেষে কপালে এসে উঠবে। আমাকে ফ্যা-ফ্যা করতে দেখে শতমুখে ছ্যা-ছ্যা করতে থাকবে। আর, ফিকির বুঝে সটকান দেবে খিড়কি দিয়ে।'

'আমি?' নিজের বুকের উপর হাত রাখল কাকলি।

'ভয় শুধু আমার দিক থেকে নয়, দুদিক থেকেই। ভয় ভাঙ—সময় ফেলে রাখাই

ভীর। সময় বয়ে যেতে দেব না। দু দিক থেকেই তার পথ আটকাব।'

'তার মানে?'

'এক্ষুনি—এক্ষুনি বিয়ে করব।'

'মানে, এই মুহূর্তে? অন দিস্ স্পট?' কাকলির উল্লাসের মধ্যে আতংক এসে মিশল।

'মানে যৎপরোনাস্তি শিগগির। জোড়-জোড়ে অন্তত মাসখানেক তো লাগবেই।' আশ্বস্ত করল সুকান্ত। বললে, 'বিয়ে করব কিন্তু ইনটেরিম পিরিয়ডটা, মানে, অন্তর্বর্তী সময়টা—আমার চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত—আমরা আলাদা-আলাদা থাকব। তুমি তোমার বাপের বাড়িতে আমি আমার মায়ের হাঁড়িতে।'

'আলাদা-আলাদা?' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল কাকলিঃ 'বিয়ে হবে অথচ একত্র হব না? মানুষে বলবে কী!'

'মানুষে জানতেই পারবে না।'

'জানতেই পারবে না? সে কী কথা!'

'বিয়েটা গোপনে হবে। রেজেস্ট্রি করে হবে।'

'গোপনের কী দরকার!' গম্ভীর হল কাকলিঃ 'তাতে কী সুবিধে?'

'সুবিধে অনেক। তোমার-আমার বাড়ি দুইই সন্দেহের বাইরে বসে ঘুমুবে, আমরা যে যার মনে থাকতে পারব, চলতে পারব এদিক ওদিক। আমি কাজের চেষ্টায়, তুমি না হয় আরো পড়ার চেষ্টায়। দুজনের ঘন-ঘন দেখা হবারও কোনো দরকার পড়বে না। তেমন কোনো অসুবিধের জায়গায় যদি দেখা হয় এমন ভাব করলে চলবে যেন আমাদের মুখ চেনা। নির্ঝঞ্ঝাটে দিন যাবে। পাকা দলিল হয়ে থাকবে, কারু ফরকে বা ফসকে যাবার পথ থাকবে না। আর এ দলিল শুধু বিয়ের দলিল নয়, আমার গৌরবের দলিল—আমাকে অকৃতী জেনেও তুমি আমাকে দিয়েছ বরমাল্য। জগৎ সমক্ষে সেই বাঙালী মেয়েটিকে আমি খেলো হতে দিইনি, তার হাত থেকে নিয়েছি রাজটীকা। তারপর যখন চাকরি পাব, আসবে সে প্রার্থিত মুহূর্ত, ছদ্মবেশ খুলে ফেলব, সগর্বে নিয়ে যাব তোমাকে, স্থানে-মানে দেব অনেক স্বচ্ছলতা। কোথাও কোনো হৈ-চৈ হবে না, সব সুন্দরে শেষ হবে।'

করুণ করে তাকাল কাকলি। বললে, 'তোমার কষ্ট হবে না ছেড়ে থাকতে?'

এক মুহূর্ত হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল সুকান্ত। পরে বললে, 'কিন্তু এখুনি যদি তুমি আমাদের বাড়িতে চলে আস এই আয়হীন স্থানহীন সংকীর্ণতার মধ্যে, সে কষ্ট আরো কঠিন হবে।'

'হোক। তবু বিয়ের পর, স্বামী বর্তমানে, থাকতে পারব না বিধবার মত।' সশব্দে হেসে উঠল কাকলিঃ 'কী অপরূপ ব্যবস্থা! সর্বাঙ্গে দগ্ধ হয়ে বসে থাকো সমুদ্রের পারে কিন্তু খবরদার, স্নান করে স্নিগ্ধ হতে পারবে না। এতে আমি রাজি নই। আর এ সমুদ্র আমার অস্তিত্বের সমুদ্র, অমৃতের সমুদ্র। আর স্নানে শুধু স্নিগ্ধ হওয়া নয়, শুদ্ধ হওয়া, স্নানান্তে জীবনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করা—'

দুজনে উঠে পড়ল।

'চলো একটা ট্যাক্সি পাই কিনা দেখি।' সুকান্ত বললে।

'তুমি রেজেস্ট্রি করার কথা ভাবছিলে কেন? আমরা কি আলাদা জাত, আলাদা দেশ, আলাদা ধর্ম?'

'না, না, তার জন্যে নয়। যেখানে কোনো বাধা নেই তেমনি সাধারণ বিয়েও রেজেস্ট্রি করে করা যায়। রেজেস্ট্রি করায় হাঙ্গামা কম। খরচ কম। নেমন্তন্নপত্রও ছাপাতে হয় না। তারপর যদি একটু গোপন করে রাখতে হয় রেজেস্ট্রিই প্রশস্ত।'

'না, আমার তো কিছু হচ্ছে না, কোনো অর্থেই নয়।' চলতে-চলতে বললে কাকলি, 'তবে কেন গোপন করতে যাব? তারপর সাজন-গুজন না, লোকজন আসবে না, আলো জ্বলবে না, সানাই বাজবে না, আসর-বাসর বসবে না—সে আবার একটা বিয়ে কী! বাপ জানে না মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে—তাতে আমি রাজি নই।'

'বাবা-মাকে বলবে?'

'নিশ্চয় বলব। যাতনা যখন বাছিয়েছি, তখন মিউজিক ফেস করব।'

অন্ধকারেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে কাকলির মুখ। সুকান্ত বললে, 'যদি অনুমতি না পাও?'

যেন হোঁচট খেল কাকলি। বললে, 'তখন দেখা যাবে। কিন্তু তুমি? তুমি যদি না পাও।'

'আমার ভয় কি! আমি তো এসকেপিস্ট নই।' মুঠ করে কাকলির ডান মণিবন্ধটা ধরল সুকান্তঃ 'আমি রণমুখো সেপাই।'

ট্যাক্সি ডাকতে হল না। কাছেই দাঁড়িয়ে-ছিল অপেক্ষায়। উঠল দুজনে।

কাকলি বললে, 'হ্যাঁ, লড়ব, দাঁড়াব, তৈরী করব। আমি তোমার চিত্রাঙ্গদা।'

(ক্রমশ)

॥ বত্রিশ ॥
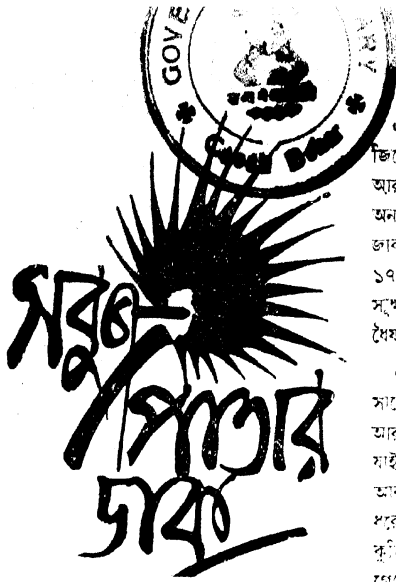
সাংখ্য-দর্শনের সব কথা স্বীকার না করলেও আমরা সংখ্যা মেনে চলি। সাংখ্য-যোগ আমাদের নিত্যই করতে হয়। পাঁজিতে জ্যোতিষ-বচনার্থ প্রসঙ্গে বত্রিশের ঘর পূরণ করার বিধি দেখেছিলুম বাল্য-কালে, এখন ভুলে গেছি; সুতরাং আমার অবস্থা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সত্যেন বোসের কাছে শুনেছি, তাঁর এক ছাত্র এই ধরনের ম্যাজিক স্কোয়ার নিয়ে রিসার্চ করেছে। আর তিনি ১৯২৯ সালে ঢাকায় বসে আমায় বলেছিলেন যে, সংখ্যা-রহস্য নিয়ে এখনও অনেক অঙ্ক-শাস্ত্র-বিদের মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কথাটা উঠেছিল এই প্রসঙ্গে—কেম্ব্রিজে ছাপানো একটি গ্রন্থে দেখলুম, রামানুজমের কতকগুলো অংকশাস্ত্রীয় গবেষণা, যা পূর্বে মুদ্রিত হয় নি। একজন সায়েবের লেখা রামানুজমের স্মৃতিকথা সে-বইয়ের গোড়ার দিকে আছে। সায়েব গল্প বলছেন। "কেম্ব্রিজে যখন রামানুজম রোগশয্যায় শয়ান, তখন আমি তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে যেতুম। একদিন—সেদিন রোগীর রোগ একটু কমার দিকে—আমি তাঁকে বলি, যে-ট্যাক্সি করে তাঁর ওখানে সেদিন গিয়েছিলুম, সে-ট্যাক্সির সংখ্যাটা বড় মজার—১৭২৯। এ-সংখ্যা হচ্ছে ৭×১৩× ১৯, অর্থাৎ তিনটি অবিভাজ্য সংখ্যার গুণ-ফল। রামানুজম বিছানায় শুয়েছিলেন, একথা শুনে উঠে বসলেন আর বললেন: ও-সংখ্যাটির মধ্যে আরও একটি মজা আছে—

অর্থাৎ, ১৭২৯=১০০০+৭২৯

$=১০^{৩}+৯^{৩}$

আবার ১৭২৯=১৭২৮+১

$=১২^{৩}+১^{৩}$

এই গল্পটি সত্যেনের নজরে এনে জিজ্ঞেস করলুম: ১৭২৯-এর ঠিক ওপরে আর কোন্ সংখ্যার ঐ-গুণ আছে? তিনি অন্য কাজ ফেলে রেখে ছাঁকা দু'ঘণ্টা জাবদা কষে একটা সংখ্যা বের করলেন, যেটা ১৭২৯-এর চেয়ে ঢের বড়। দেখলুম, নিজে সূক্ষ্ম বিচারে বিচক্ষণ হয়েও জাবদা-কষায় ধৈর্য হারালেন না।

এ-ঘটনার দশ বৎসর আগে, ১৯১৯ সালে সত্যেন, সুধীন (সুধীন্দ্র সিংহ) আর আমি উড়িষ্যার মন্দির দেখতে যখন যাই, তখনও লক্ষ্য করেছিলুম সত্যেনের আর একটা ধৈর্য-গুণের। সমস্ত রাত ধরে পুরী থেকে কোণারক পর্যন্ত প্রায় কুড়ি মাইল পথ বালির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, কেননা আমাদের গোরুর-গাড়ির গাড়োয়ান বার-বার বলছিল সত্যেনকে: আপনি সামনের দিকে এগিয়ে বসুন, নইলে গোরুর কাঁধ থেকে জোয়াল খুলে যাচ্ছে! সুধীনের আর আমার ছিপ্‌ছিপে চেহারা দেখে অনুরূপে অনুরোধ না করার বোঝা গেল গো-যান-বাহকের বুদ্ধি স্থূলে। অগত্যা সত্যেনের নেমে গিয়ে সমস্ত রাস্তাটি পদব্রজে অতিক্রম করা ছাড়া আর উপায় রইল না। কৃচ্ছ্রসাধনে সত্যেন ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত। অবশ্য এ-বিষয়ে কেউ তাঁকে মাথার দিব্যি দেন্ নি। সম্পূর্ণ স্ব-ইচ্ছা-প্রসূত এ-সাধনা। ভোর হবার পর আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে সত্যেনের সহগামী হলুম, আর আমরা সবুজপ্রভার তিন বন্ধুতে মিলে সূর্যোদয়ের অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করে বুঝলুম, কি জন্য কোণারকে সূর্যদেবের অত চমৎকার মন্দির গড়া হয়েছিল। সে-দৃশ্য আমার চোখে লেগে আছে আজও। কারু-কার্যে উড়িষ্যাবাসীরা ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার যোগ্য, যেমন ইউরোপে ইটালীয়েরা। তবে ওড়িয়া-শিল্পের 'মডেলিং' বোধ হয় পাল-রাজাদের সময়ের বাঙালী-শিল্পের কাছে ঋণী। চিত্র-বিচিত্রিত হরিণের পাল বালুকাময় পথে সাবলীল গতিচ্ছন্দে বিচরণ করছে, দেখে-ছিলুম সেদিন। তাদের চোখ দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন অশোকের অনুকম্পা সেখানকার মৃগ-জাতিকে জাতিস্মর করে রেখেছে।

১৯১৮ সাল ছেড়ে ১৯১৯ সালে পৌঁছানোর পূর্বে যে ট্রানজিসান্যাল পিরিয়ড গেল, তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর বহিরঙ্গ সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তাঁর মুখস্থ গুম্ফের উপর। সে-সমালোচনার অন্তরঙ্গ পরিচয় ওঁর ১৪।১১।১৮ তারিখের পত্রে আছে। উনি কোন্ তারিখে

বিবাহে বিশ্বাসী ছিলেন। গার্হস্থ্যধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা ওঁর ৯।৮।১৭ তারিখের চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, উনি বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবিরোধে গার্হস্থ্য-ধর্মের পক্ষপাতী। বর্ণ-সংকর সামাজিক বিপ্লব এনেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য হচ্ছে এই যে, যতদূর সম্ভব বিবাহটা স্বজাতির মধ্যেই গণ্ডী-বাঁধা হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে বর-কনের শুভদৃষ্টির পূর্বে চার-চোখে মিল হওয়ার বিপক্ষে উনি ছিলেন না। আমরা ওঁর "কমলালয়" বাসভবনেও যখন সবুজ-সভায় সমবেত হয়েছি, তখন সাধারণত ওঁর আপিস-ঘরেই সভা বসেছে এবং কোনোদিন সেখানে স্ত্রীসমাগম দেখিনি। কচিৎ কখনও গান-বাজনা উপলক্ষে ড্রয়িং-রুমে সভা বসলে মেয়েদের দেখা যেত। ওঁর সদরটা র‍্যাডিক্যাল আর অন্দরটা যে কনসারভেটিভ, একথা উনি নিজেই বলেছেন ওঁর ১।২।২৮ তারিখের চিঠিতে।

যাঁর মনের ভিতর সদর-মফস্বল নেই, সেই ধূর্জটির বিবাহবিষয়ক সংবাদ প্রমথ চৌধুরীর ১৬।৫।২৯ তারিখের পত্রে পাওয়ার পর আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে, [illegible] প্রথম ভাগ পর্যন্ত পড়া [illegible] সহকর্মী ধূর্জটিকে [illegible] করেছেন। কিন্তু [illegible] আগে আমি ধূর্জটি ও তাঁর সহধর্মিণীর এই ছবি পড়তে দিয়ে [illegible]। ভুরু-কামানোর পর রং দিয়ে আঁকা ভুরু নিয়ে [illegible] কেউ কেউ [illegible]। কিন্তু সে-সময়ে [illegible] না থাকায় [illegible] ধূর্জটির বাড়ির কর্ত্রীরা [illegible] পর্যন্ত মনোনয়ন করেন নি। [illegible] যিনি এ-কালেও সতীর মতন পতিব্রতা হয়ে ধূর্জটি-গেহে মগ্ন আছেন সেই ছায়া-দেবীর ধূর্জটিকৃত বর্ণনায় একটি কথা পাই, যা ভুলতে পারি নি: অনিন্দ্য সুন্দরী, আমার বউ-এর চেহারা দেখলে মনে হয় যেন Botticelli-র আঁকা ছবি থেকে বেরিয়ে এসেছে। —এই ইতালীয় শিল্পীর নাম আমার কানে বেশ লেগে গেছে, যেন [illegible] তাঁর তুলিকে আশিস করেছিল। [illegible], ছায়া দেবীর তুল্য গুণসম্পন্না অপর কোনো বন্ধুর স্ত্রীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মাধুর্য সকল কানকেই টানে। অথচ, লক্ষ্ণৌতে যখন আমি তাঁর প্রথম আতিথ্য লাভ করি, অবশ্য ধূর্জটির আহ্বানে, তখন উনি আমার আড়ালে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'এ লোকটিকে পেলে কোথায়?' আমি যে ধূর্জটির মুখেই তাঁর প্রশ্নের কথা শুনবো, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। সুতরাং তিনি খুব অপ্রতিভ হলেন, যখন আমি হঠাৎ বললুম: গোলব-রায় আমি কোনোমতেই নই, কারণ আমি রোজ দাড়ি কামাই। ধূর্জটির অনেক কথাই মনে পড়ে, সব লেখার এখন সময় নেই। সবুজ-সভায় সখ্য বন্ধুদের মধ্যে তারই সঙ্গে আমার তুই-তোকারী চলেছে আজও পর্যন্ত। শুধু একটা কথা না বললেই নয় তাই বলছি। তার একমাত্র সন্তানের নাম 'কুমার' রাখায় আমি কুষাণ-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে নতুন আলোর সন্ধান পাই, যেটা হোমশিখা পত্রিকার গত বৎসরের পূজো-সংখ্যায় ফলাও করে লিখেছি।

সাংখ্যের দ্বৈতবাদ স্মরণ করে প্রমথবাবুর দুটি চিঠি দিচ্ছি।

রাঁচি
৮।১০।১৯

৮৫*

কল্যাণীয়েষু,

কার্যান্তে আগে, তোমাকে আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে পরে জানাচ্ছি যে, তোমার চিঠি কাল পেয়েছি।

দু-বৎসর পূর্বের অষ্টমীতে লেখা আমার পত্র দু-বৎসর পরে আর এক অষ্টমীতে যে তোমার হাতে পৌঁচেছে এটা অবশ্য আশ্চর্য ব্যাপার বটে। তুমি জিজ্ঞেস করেছ যে, এর পর দুর্গায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না? আমার উত্তর এই রকম কয়েনসিডেন্স-এর বলেই যদি "দুর্গা"র উপর বিশ্বাস পাকা করতে হয় তাহলে বিশ্বাসী খুঁজতে গিয়ে আমাদের শেষটা বলতে হবে "লাখে না মিলল এক"। সে যাই হোক, এ ঘটনার মধ্যে একটু মজা আছে। আমাদের চারপাশে যা ঘটে, তা এমনি নিয়মমতই ঘটে যে মানুষ ঘটনা সকলের মধ্যে একটা কার্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করে উঠতে পেরেছে, অর্থাৎ মানুষের মগজ থেকে সায়েন্স বলে একটা বিদ্যে বেরিয়েছে। এর ফলে আমাদের কাছে কোনও জিনিসই আর নতুন ঠেকে না। যার কারণ জানি তার কার্যের ভিতর নূতনত্ব আর কি থাকতে পারে, এর একটি ত আর একটির ফল মাত্র। যেদিন থেকে আমরা এ-বিশ্বের ভেদ মেনে নিয়েছি সেদিন থেকে মানুষে আর কিছুতেই আশ্চর্য হয় না—কেননা তার বিশ্বাস যে এই আইন-শাসিত বিশ্বে কোনরূপে আশ্চর্যকর অর্থাৎ বেআইনী ঘটনা ঘটতেই পারে না। অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে এইরূপ তখন যদি এমন ঘটনা চোখে পড়ে যা নিতান্তই খাপছাড়া, যার কোনও হিসেব পাওয়া যায় না—তখন মনটার ভিতর বিস্ময় আপনা হতেই জন্মায়। এই দেখ না কেন, আমরা গরুর প্রতি ভুলেও দৃষ্টিপাত করিনে, কিন্তু বৈদ্যনাথের গরু পয়সা দিয়ে দেখি, কেননা সে গরু চারপেয়ে নয় পাঁচপেয়ে—আর আমরা জানি যে, বৈজ্ঞানিক গরু চতুষ্পদ। এ চিঠি সত্যেন্দ্রকে দেখিয়ো না,—সে চটে যাবে। বিজ্ঞান হচ্ছে এ যুগের মিথলজি। সুতরাং তার উপর ঠাট্টাবিদ্রূপ ভক্তের দল সইতে পারে না। সে যাই হোক, যে সব জিনিসের অর্থ বোঝা যায় না সে সব জিনিসের অনুরক্ত হওয়াটা আমার ধাতে নেই, আর যার আছে তার ধাত বদলাবার জন্য চিকিৎসা করা প্রয়োজন। যা আশ্চর্যজনক তা একসেপসান বলেই গ্রাহ্য। দেশসুদ্ধ গরু যদি বৈদ্যনাথের গরু হয়ে ওঠে, তাহলে চারপেয়ে গরুই একটা ফ্রিক অব নেচার হয়ে উঠবে। এই মোটা কথাটা উপেক্ষা করেই বাঙলা দেশের গল্প-লেখকেরা সাহিত্যজগতে একধার থেকে বৈদ্যনাথের গরু সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। তাঁদের এ কার্যের প্রতিবাদ করলে দেশসুদ্ধ লোক চীৎকার করে বলবে—"বাঙালীজাত রোম্যাণ্টিক—অতএব সাহিত্যরাজ্যে সে তার স্বধর্ম পালন করেই চলেছে।" স্বধর্মে নিধন যে শ্রেয়—একথা ত স্বয়ং ভগবান বলে গেছেন, সুতরাং আমি কাউকেও তাঁর স্বধর্মচর্চা হতে নিবৃত্ত হতে বলছি না। বলতে চাই শুধু এইটুকু যে ও চর্চার ফলে নিধন শ্রেয় হোক আর না হোক, নিধন নিশ্চিত।

কি কথা থেকে কি কথায় এসে পড়লুম? একেই বলে বাজে বকুনি—যে বিষয়ে আমি চতুর্মুখ। এখন বিশ্ব ছেড়ে ঘরে ফিরে আসা যাক। এখানে দিব্যি শান্তিতে আছি, ফলে এতটা শান্ত হয়ে পড়েছি যে জড় পদার্থের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি। কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই, তবে দুই সমান মাত্রায় নয়—খাই কম শুই বেশি। লেখাপড়ার হিসেব এই। চিঠি লিখি আর পড়ি, হাতের গোড়ায় যা পাই তাই অর্থাৎ বিশেষ কিছু না। আজ এ-বইয়ের দুপাতা কাল ও বইয়ের তিন-পাতা—এই হচ্ছে আমার দৈনিক বরাদ্দ। শুক্লপক্ষটা এইভাবেই কাটাব। ইচ্ছে আছে পক্ষান্তরে কালিকলম নিয়ে বসব। আমার বিশ্বাস মনের জমিও মাঝে মাঝে পতিত রাখা দরকার।

এখানে এসে সুনীতির আর একখানি চিঠি পেয়েছি। সে যে মহা ফুর্তিতে আছে তার পরিচয় তার চিঠির প্রতি অক্ষরে ফুটে উঠেছে। এইত চাই। সুনীতির মহা-গুণ যে আধমরা লোক নয়। যেমন শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর ছেলে হয়ে থাকে। কাল তাকে আটপাতা পুরে একখানি চিঠি লিখেছি। তবে তেমন যত্ন করে লিখতে

* ৮৫নং চিঠিটি ৫০ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে

পারিনি। হালে আমার মনটা বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল আছে, তার কারণ বর্তমানে আমি "গৃহহীন"। রবিবাবু তাঁর একটা গানে দুঃখ করে বলেছেন "হায় গৃহহীন হায় পথহারা।" "গৃহহীন" ব্যক্তি যে কতটা কৃপার পাত্র সে সত্যের সম্যক উপলব্ধি ইতিপূর্বে আমি কখনও করতে পারিনি। তবে ভরসার কথা এই যে, আমি "পথহারা" নই এবং সম্ভবতঃ কখনও হব না। আমি জীবনে আমার একটা পথ ধরে নিয়েছি এবং ধীরে ধীরে হোঁচট খেতে খেতে সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি—এর চাইতে অবশ্য ঢের বড় বড় পথ আছে—যথা ধনের পথ, মানের পথ ইত্যাদি—কিন্তু আমি ঐ মনের পথ ধরেই চলব। এ পথের পথিকদের কপালে ঘরে বাইরে পুরস্কারের চাইতে তিরস্কারই জোটে বেশি, তাতে যারা ডরায় তাদের পক্ষে ধনের পথ ধরাই উচিত—কেননা ধনের পিছনে মান আসে। তবে তাঁরা দাবী করেন যে তাঁদের মনও খুব বড় এবং দেশসুদ্ধ সে দাবী সাগ্রহে মঞ্জুর করেন। যাক ওসব কথা—সুরেশ চক্রবর্তীর জীবনস্মৃতি প্রসঙ্গ কি রকম লাগল? ও ভদ্রলোকের কলমের মুখে আর কিছু থাক আর না থাক্ "কিন্তু কিন্তু" নেই। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৮৬

রাঁচি

২১।১০।২১

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি কাল বিকেলে পেয়েছি আর আজ সকালেই যে তার জবাব দিতে বসেছি তার কারণ তোমার চিঠি পড়ে আমার মনের ভিতর যে 'উষ্মা' জন্মেছে—দুদিন দেরি করলে হয়ত তা জুড়িয়ে যাবে।—

বাড়ি বিক্রী করছি শুনে তুমি যে উষ্মা প্রকাশ করেছ তাতে আমি যারপর নেই খুসি হয়েছি। কেন জানো? এই দেখে যে তোমরা তোমাদের মনের কথা আমাকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতে সঙ্কোচ করো না। —যদিও আমি বয়েসে তোমাদের চাইতে ঢের বড়—তবু যে তোমরা আমার সঙ্গে সমানে সমানে ব্যবহার করো—এর চাইতে আরামের কথা আমার পক্ষে আর কি হতে পারে?—তোমরা যে আমাকে তোমাদের গুরুদেব করে তোলোনি—কিন্তু সতীর্থ হিসেবে দেখো—তার জন্য বাহাদুরী নিতে পারি আমি। আমি যদি তোমাদের উপর গুরু-গিরি শুরু করতুম—তাহলে তোমরা বহুকাল পূর্বে আমার কাছ থেকে সরে পড়তে।

আমাকে তুমি সন্ন্যাসী বলেছ—কিন্তু আমি সে জাতের সন্ন্যাসী নই—যারা চেলা তৈরি করে। ভাল কথা! তোমার চিঠি পড়ে আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন যে—"তুমি আবার সন্ন্যাসী হলে কবে থেকে?" আমি উত্তর করলুম—"যতদিন থেকে জ্ঞান হয়েছে ততদিন থেকে।" এ-জবাব শুনে তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে চাহনির উত্তরে আমি বললুম,—"ফকিরী মেজাজ ও আমিরী মেজাজ, দুই যে একই জিনিষের এ-পিঠ আর ও-পিঠ এ ধারণা কি তোমার নেই?" এ-প্রশ্নের তিনি আর কোনও জবাব করতে পারলেন না। অতএব তোমার কথাই রইল।

আমি যে কেন বাড়ি বেচেছি—সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ "সবুজসভায়" দেব। আমি জানি যে এবিষয়ে "সবুজদলে"র কাছে আমার একটা জবাবদিহি আছে। —ও বাড়ি হস্তান্তর করাটা যে তোমাদের কারও মনঃপূত হবে না—সে কথা আমি জানতুম। —এ-সংবাদ শুনে অতুলবাবু ত মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। তবে এই কথাটি জেনো যে এ ব্যাপারের ভিতর বিষয়বুদ্ধি থাকলেও বণিকবুদ্ধি নেই। আমি আর যা হই আর না হই—বেনে নই। তা যদি হতুম তাহলে আমার হাতে সবুজপাতা থাকত না, থাকত হয়তো ধাতু এবং তাও হত যথার্থ খাঁটি মাল। জেনো রেখো যে আমার কাছে কেউ পিতল চালিয়ে দিতে পারে না—তার পরিচয় ত সাহিত্যের কারবারেই পেয়েছ। সে যাই হোক—আমার জবাবদিহিটা এখন মুলতুবি রইল।

এ-চিঠি ঠিক সময়ে তোমার হাতে পৌঁছবে কি-না বলতে পারি নে। যদি পাঁজিপুঁথি তিথি-নক্ষত্র না মেনে হোঁচট খেতে খেতে দার্জিলিং পর্যন্ত যাও তাহলে এ-চিঠি হয়ত শোভাবাজারেই পড়ে থাকবে। যদিও উপরে লিখে দিচ্ছি 'লিভ্স্ রিডাইরেক্ট'। আমি এক সময়ে "সনৎকার" বলে নিজের পরিচয় দিই এবং সেই সঙ্গে বলি যে, আমি "নহি গণৎকার"। এ-কাজ অবশ্য করি মিলের খাতিরে—কিন্তু কথাটা সত্য। সুতরাং এ-ফেরা "গণৎকার"কে তুমি বোকা বানিয়ে দিলে আমার আর আনন্দের সীমা থাকবে না। সত্যেনের ১ যে "গণৎকারে"র উপর একটু মায়া আছে, তার কারণ সত্যেন গণনা মাহাত্ম্য বোঝে। অ্যাসট্রোনোমার এবং অ্যাসট্রোলজার-এর ভিতর প্রভেদ কি জানো? প্রথমটি হচ্ছেন নক্ষত্রলোকের ফিজিওলজিস্ট আর দ্বিতীয়টি হচ্ছেন তার সাইকোলজিস্ট, অতএব এ-উভয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনের একটু টান থাকা আশ্চর্য নয়। আমি কালি-কলমে কবুল করেছি যে, আমি "বিজ্ঞানকে রাজার মত মান্য করি এবং রাজার মত ডরাই" (ইংগ সবুজপত্র)—সেই সঙ্গে আমি একথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত নই যে, আমি সামুদ্রিক বিদ্যা হনুমান বিদ্যা ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতিকে পুলিসের মত মান্য করি এবং পুলিসের মতই ডরাই—কেননা এ-সব বিদ্যা হচ্ছে অকাল্ট, ফলে অকাল্ট সায়েন্সেস গুপ্ত পুলিসের মতই আমাদের মনোরাজ্যকে টেরোরাইজ করে রেখেছে। আর যার ভয়ে আমরা তটস্থ হয়ে রয়েছি তাকে মানিনে, এ-কথা কোন্ মুখে বলব? আমি আর যা হই আর না হই ক্ষুদ্র নই। যাক্ ওসব কথা—এখন আমার হালখবর শোনো।

এখানে এসে অবধি চিঠি ছাড়া আর কিছু লিখি নি এবং লেখবার কোনোরূপ অভিপ্রায় নেই। —রামপ্রসাদ বলে গেছেন—

---

১ সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"এমন মনের জমিন আবাদ করলে?
পতিত রাখলে ফল্‌ত সোনা॥"

সেকালে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এ-কথাটায় বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু কথাটা যে কতটা সত্য তার এখন প্রত্যক্ষ পরিচয় পাচ্ছি। এই দেখ না বাঙলাদেশের যারা ধর্মে কর্মে পলিটিক্‌সে সাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়, তাঁরা কেউ ভুলেও কখনো মনের জমিন আবাদ করেন নি এবং তাঁদের হাতে সোনা ফল্‌ছে। মনকে যদি খাটাও তাহলে বাঙলা একদম বাংলা হয়ে যাবে—তখন আর তা সোনার বাংলা থাকবে না। মনের চর্চা না করার দরুণই বিক্রমপুর সেকালে "হোনার" গাঁও হয়ে উঠেছিল। এই সব জ্ঞান লাভ করে আমি কালি-কলমের সংস্রব ত্যাগ করেছি।

এখানে সরোজ এসেছে। আমি গল্প করি সে গান করে—তাতেই দিন কেটে যায়। স্নানের জল জুড়িয়ে যায়—অতএব এখন উঠি। ইতি—
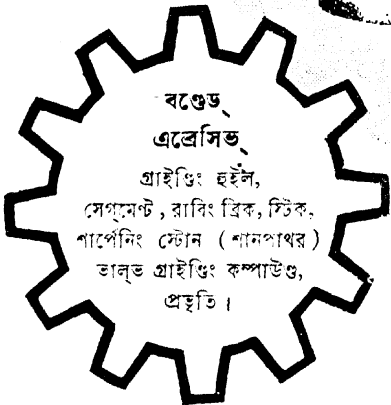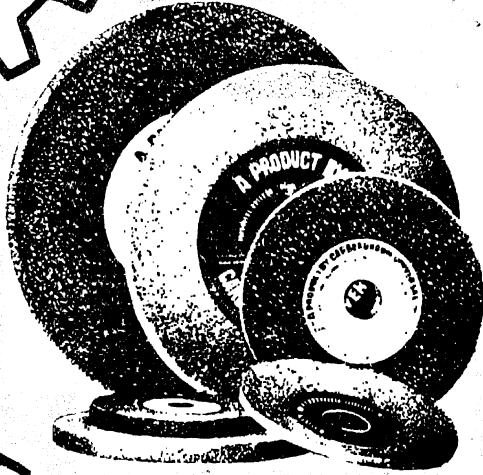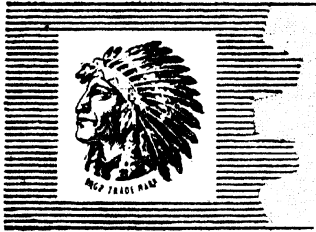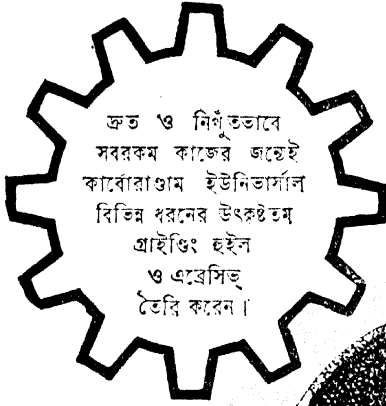
(ক্রমশ)
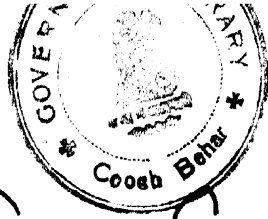
তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

২০

বাইরে রোদ কিন্তু ঘরে তো ছায়া। তবু ঘরের ভিতরে যে ঘর সেখানে যদি আগুন জ্বলে, চারদিকের দেয়াল আর মাথার ওপরে ছাদ একটু রইল কি না রইল তা নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়।

মানসী ঘরে এসেও জ্বলতে লাগল। যে প্রচণ্ড ক্রোধে যে তীব্র হিংস্রতায় অসীমের ফিরিয়ে দেওয়া চিঠিখানা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে ঠিক সেইভাবে এই গোটা দুনিয়াটাকেই যদি অমন কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারত তাহলে যেন বেঁচে যেত মানসী। কিন্তু তা তো আর পারা যায় না। না পেরে নিজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে যে দুনিয়াটা আছে মানুষ মাঝে মাঝে তাকেই ভেঙেচুরে পুড়িয়ে পুড়িয়ে জগৎ ধ্বংসের সাধ মেটায়।

হাতের কাছে কোন কাজ না পেয়ে মনের কাছে কোন অবলম্বন না পেয়ে মানসী নিজের ট্রাংকটা এসে খুলে ফেলল। বড়দির বেবার বিয়ে হয় বাবা তাকে শাড়ি গয়না ট্রাংক সুটকেস যৌতুক দেওয়ার সময় মাধুরী আর মানসীকেও একটা করে মাঝারি ধরনের ট্রাংক দিয়েছিলেন।

মা হেসে বলেছিলেন 'ও আবার কি, তুমি কি একসঙ্গে তিন মেয়ে পার করতে চাও নাকি।'

বাবা বলেছিলেন, 'কী যে বল। একসঙ্গে তিনজনের বিয়ে দেবার সাধ্য থাকলেও আমি তা দিতাম না। আমার ঘর খালি হয়ে যেত না তাহলে?'

বাবার তখন চাকরি ছিল, বয়স এখনকার চেয়ে কম আর মনের মায়ামমতা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'ওদের তো জিনিসপত্র রাখবার আলাদা জায়গা নেই। এই ট্রাংকে রাখবে।'

সেই থেকে ট্রাংকটা আছে। মানসী ইচ্ছা করলে বদলাতে পারত, বড় ট্রাংক একটা কিনতে পারত, কিন্তু কিনি কিনি করে কেনা আর হয়নি। কিনলেতো আর একটা কিনলে হয় না। দিদির জন্যেও কিনতে হয়। দিদিকে মানসী কিসের ভাগই বা না দিয়েছে। কিন্তু দিদি যে আরো বেশি চাইবে তা কে জানত।

ট্রাংকের ভিতরের গন্ধটা বড় ভালো লাগে মানসীর। এ কি শুধু শাড়ি ব্লাউস ন্যাপথালিনের গন্ধ? এ কি শুধু পিতৃস্নেহের প্রতীক? তাও নয়। এই ট্রাংকটার মধ্যে যেন আরো অনেক কিছু আছে। অনেক স্মৃতি, অনেক রূপকথা, যে রূপের কথা বলা যায় না, বর্ণনা করা যায় না। বাবা একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আগেকার দিনের বউ-ঝিদের এই ট্রাংকের মধ্যেই সব থাকত। সেইরকম তোর মায় ট্রাংকটা? যত বিষয় সম্পত্তি সব ওর মধ্যে। কত যে রহস্য কত যে গোপন করবার আছে তোর মার—।'

মা বলেছিলেন, 'আমার আবার গোপন করবার কী আছে। সেই চোদ্দ বছর বয়সে তোমার সংসারে এসেছি। তারপর থেকে কোন্ কথাটা তোমাকে লুকিয়েছি বল? কোন কথাটা তোমার অজানা?'

তা ঠিক। অত কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মার কিছু লুকোবার দরকার হয়নি। কিন্তু মানসীর বেলায় তো আর তা ঘটেনি। তার জীবনে ধীরে ধীরে লুকোবার বস্তু এসে জমা হয়েছে। এই যে রঙীন ফিতেয় বাঁধা রঙীন খামের চিঠির তাড়া, এই যে দু তিন খণ্ড ডায়েরী, নিজের ডায়েরী আর অসীমের ডায়েরী, এগুলিকে তো বাইরে ফেলে রাখবার সাহস হয়নি মানসীর, এগুলি তাকে লুকিয়েই রাখতে হয়েছে। ট্রাংকে লুকিয়ে রেখেছে রাশ রাশ চিঠি আর চিঠির মধ্যে লুকোনো রয়েছে একটি সম্পর্কের মধুর ইতিহাস। রাশ রাশ চিঠি ফের যদি খুলে পড়ে মানসী—সেই পুরোনো দিন আবার মৌমাছির মত গুন গুন করে উঠবে। কিন্তু এই গুনগুনানির কোন মানে আর নেই। তা আজ মিথ্যে হয়ে গেছে। কাল যা সত্য ছিল আজ তা মরীচিকা। কাল যা জীবন্ত ছিল আজ তা যাদুঘরের মরা হাড়। কী হবে এই হাড়ের মালা গলায় পরে? এই পরাজয়ের কাহিনীকে বাক্সবন্দী করে রেখে? প্রিয়গোপালবাবুর সুপারিশ চিঠি যেমন ছিঁড়ে ফেলেছে মানসী, অসীমের এই রাশ রাশ চিঠিও সে তেমনি নষ্ট করে ফেলবে। না কি অসীমকে সব ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, 'নাও, তোমার মিথ্যে কথার বেসাতি নিয়ে যা করবার তাই করো। এগুলি তোমার কাজে লাগবে। যখন আর কাউকে চিঠি লিখবে এইসব কথাই তুলে তুলে দিতে পারবে।'

'মানসী তুই কি আজ অফিসে যাবি নে?' মা এসে দাঁড়িয়েছেন।

মানসী তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করল। বলল, 'হ্যাঁ যাব।'

'তাহলে ওঠ। নাইতে টাইতে যা। আমার রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আমার জন্যে তোমাদের দেরি হয়ে গেল একথা কিন্তু বলতে পারবে না।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'না মা, তা বলব না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।'

সুহাসিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মানসী তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'বেশ তো, কর না।'

'ঠিক জবাব দিবি তো?'

'তোমার জিজ্ঞাসাটা আগে শুনি।'

সুহাসিনী বললেন, 'কাল থেকে তোর কী হয়েছে বল তো? মুখখানা যেন একেবারে কালিমাখা। কী হয়েছে তোর?'

মানসী মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে বলল, 'কিছু হয়নি মা। তোমার দেখবার ভুল।'

সুহাসিনী বললেন, 'আমাকে ভোলাচ্ছিস কেন মানসী। তুই কি তা পারবি? আমি তোর পেটে হয়েছি না তুই আমার পেটে হয়েছিস? ওরে তোদের মুখ দেখলেই তোদের মনের অশান্তির কথা আমি টের পাই। তোরা খুলে কিছু বলিস আর না বলিস, আমি বুঝতে পারি।'

মানসী ভাবল সত্যিই কি তাই? মা কি কিছু টের পেয়েছেন? তার লজ্জাকর পরাজয়ের কাহিনী বুঝতে পেরেছেন? ছি ছি ছি। মানসী তা মরলেও স্বীকার করবে না। হোক মা। তবু ওর কাছে নিজের অগৌরবের কথা প্রকাশ করবে না। নালিশ করবে না নিজের দুঃখ নিয়ে। কিন্তু জানাতে

পারলে যেন ভালো হত। এমন সহানুভূতি এমন আন্তরিক সমবেদনা সে আর কার কাছে পাবে? মানসী ছেলেবেলায় ভাবত, মা দিদিকেই বেশি ভালোবাসেন। সে ঘর-সংসারের কাজ করতে পারে বলে তার ওপরই মার বেশি পক্ষপাত। বড় হবার পর সেই হিংসুটে ভাব আর নেই। মানসী দেখেছে সংসার চালাবার ব্যাপারে টাকা পয়সার হিসেবের সময় মা মানসীর ওপরই বেশি নির্ভর করেন। মাসের শেষে হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে সব ব্যবস্থা করবার ভার মানসীর ওপর ছাড়া মা আর কারো ওপর দেন না। তার বুদ্ধির ওপর কর্মশক্তির ওপর এই নির্ভরতা মানসীর ভালো লাগে। এই নির্ভরতার ভিতর দিয়ে মা যেন আরো কাছে আসেন। আরো আপনার হয়ে পড়েন। মার মত আপন কেউ নেই। তবু বড় হয়ে গেলে সব কথা তাঁকেও জানানো যায় না। বরং অনেক কথাই গোপন রাখতে হয়। না হলে শুধু ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

সুহাসিনী রান্নাঘরে ফিরে যাওয়ার সময় বললেন, 'বেশ না বলতে চাস না বলবি। তবু আমি একটা কথা তোকে বলে যাই মানসী। আমি তোদের মুখ্যুসুখ্যু মা। তোদের মত লেখাপড়া শেখার সুযোগ সুবিধে কিছু পাইনি। তবু আমার কথাটা একটু ভেবে দেখিস। মানুষের দোষত্রুটি ভুলচুকটাকেই সব সময় বড় বলে ধরে রাখিসনে। মানুষমাত্রেরই ভুল ত্রুটি হয়, যারা আপনজন তারা যদি সেই ভুল শুধরে না নেয় তো আর কে শোধরাবে?'

সুহাসিনী চলে গেলেন।

মানসী ভাবল, ও সব কথা বলা সহজ। কিন্তু সত্যি সত্যি ক্ষমা করা সহজ নয়, বোধহয় উচিতও নয়। এমন অনেক ভুল আছে আপনই হোক আর পরই হোক কেউ তা সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া ভুল বলে তো ব্যাপারটাকে ওদের কেউ স্বীকার করেনি। অসীমকে কোন কথা বলতে না বলতেই মাধুরী বাঘিনীর মত ছুটে এসে মাঝখানে পড়েছে। বলেছে বটে সব অপরাধ তার। কিন্তু অপরাধিনীর লজ্জা সংকোচ কি তার কথার মধ্যে ছিল? মানসীর তা মনে হল না। বরং চাপা উল্লাসই ছিল মাধুরীর গলার স্বরে, চোখের দৃষ্টিতে। ছিল বিজয়িনীর গৌরব। আর অসীম? সে একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না, একটু শব্দ পর্যন্ত নয়। বিনা-বাক্যে মেনে নিল সে বিজিত হয়েছে। অধিকৃত হয়েছে। তার হৃদয়ের ওপর আর এক নারী তার জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। চুপ করে থেকে অসীম সবই স্বীকার করে নিয়েছে। এর পর আর মানসীর আশা করবার কী থাকতে পারে?

কালকের মত আজও তাড়াতাড়ি নাওয়া খাওয়া শেষ করে নিল। কালও সে মনে রাগ নিয়েই বেরিয়েছিল। অসীম নিজের নিশ্চেষ্টতার অভ্যাসকে বদলাতে রাজী নয়, সেইজন্য রাগ। প্রিয়গোপালবাবুর ওপর তার অহেতুক ঈর্ষা আছে এবং তার হাসি তামাসা ভদ্রতার সীমা পার হয়ে গেছে সেইজন্য রাগ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি রাগ হয়েছিল মাধুরীর ওপর তার মনোভাবের পরিচয় পেয়ে। মানসীকে এড়িয়ে এড়িয়ে অসীম তার সঙ্গে গল্প করছিল, হাসাহাসি করছিল। তার চোখ লোভ আর বাসনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। মানসী কি এতই কম বয়সী কাঁচা মেয়ে যে অসীমের সেই উন্মুখতার অর্থ সে বুঝতে পারবে না?

তবু কালকের রাগের মধ্যে একটা আশা ছিল। মানসী ভেবেছিল তার রাগ আর অভিমান অসীম নিজেই ভাঙাবে। প্রিয়-গোপালবাবুর কাছ থেকে সুপারিশ চিঠি এনে সে অসীমকে বিস্মিত করে দেবে। মুখে যাই বলুক, অসীম মনে মনে খুশীই হবে। মফস্বল থেকে কলকাতায় আসতে কে না চায়। বিশেষ করে মানসীকে যখন কলকাতায় থাকতেই হবে। সে তো আর বদলী হতে পারে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে শ্যামও রাখতে হবে কুলও রাখতে হবে। চাকরিও রাখতে হবে সংসারও রাখতে হবে। তাই অসীম কলকাতায় আসবার সুযোগ পেলে সব সমস্যার সমাধান হবে এই কথাই ভেবেছিল মানসী। ভেবে-ছিল অসীম তাতে সুখী হবে।

কিন্তু একদিনের মধ্যে কী এমন ওলট পালট হয়ে গেল যাতে মানসীর হিসাব নিকাশ ভাবনা ধারণা কোন কাজেই এল না।

ঝোল দিয়ে ভাত মেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিল মানসী। সুহাসিনী বললেন, 'একটু

আস্তে আস্তে খা। যদি খানিকক্ষণ আগে এসে বসিস তাহলে আর এমন নাকে মুখে গ‍্‌জতে হয় না। তোদের সবই এক সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড।'

মানসী কোন জবাব দিল না।

সুহাসিনী বললেন, 'অসীম নাকি এ-বেলাই চলে যাবে। সেও তো নেয়ে খেয়ে নিতে পারত। গেল কোথায় সব?

মায়া বলল, 'ও'রা যেন কোথায় বেরোলেন মা। এক্ষুনি নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। মেজ-দিরও তো স্কুল টিস্কুল আছে।'

মানসী একটা বিষম খেতে খেতে বে'চে গেল। কাল ট্যাকসিতে করে রাত দুপুর পর্যন্ত বেরিয়েও সাধ মেটেনি? আবার আজ দিনদুপুরে বেড়াতে বেড়িয়েছে? এখন আর লজ্জাসংকোচের বালাই নেই ওদের, এখন কোনরকম আড়াল রাখবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন ওরা সকলের চোখের ওপরেই যা খুশি তাই করতে পারে। ওরা কি মন স্থির করে ফেলেছে? ভেবেছে পথের কোনরকম বাধা ওরা রাখবে না? সব কাঁটা তুলে নেবে? তাই ওদের আর কোন ভয় নেই লজ্জা নেই, সংকোচের সব সীমানা ওরা পার হয়ে গেছে?

মানসী বেরিয়ে এসে বাস স্টপে দাঁড়াল। এরই মধ্যে অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটি চেনা মুখ চোখে পড়ল। একই পাড়ায় এ'রা থাকেন। রোজ দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আলাপ পরিচয় নেই। কারো কারো অপলক দৃষ্টি দেখে মানসী বিরক্ত হল। অন্যদিন মানসী সহযাত্রীদের কাণ্ড দেখে নিজের মনেই হাসে। কিন্তু আজ তার ধৈর্য স্থৈর্য সহনশীলতার লোপ পেয়েছে।

এক ভদ্রলোক একেবারে কাছ ঘে'ষে দাঁড়িয়েছেন দেখে মানসী বিরক্ত হয়ে

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। অসীম। মানসী ভাবে যাদের চক্ষুলজ্জা নেই তাদের পক্ষে এই এক সুবিধে। তারা সব পারে। একজনকে নিয়ে পার্কে হাওয়া খেয়ে এসে অন্তরঙ্গ-ভঙ্গিতে আর একজনের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে তাদের বাঁধে না। মানসী কোন কথা না বলে একটু সরে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল। যেন আরো পাঁচটা অচেনা যাত্রীর সঙ্গে অসীমের কোন তফাত নেই।

অসীম মৃদু স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। তুমি আজ নাইবা অফিসে গেলে।'

মানসী বলল, 'মাফ করো। একজনের একটা কথা শোনবার জন্য অফিস আমাকে ছুটি দেবে না। আমার সে ছুটির দরকারও আর নেই।'

অসীম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ তুমি ছুটি নিতে না চাও না নিলে। আমি আসছি তোমার সঙ্গে।'

মানসী রূঢ়স্বরে বলল, 'না সে চেষ্টা কোরো না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে জোরাজুরি হবে। তুমি তো আমাকে চেন।'

[illegible] একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছিল। মানসী আর কোন কথা না বলে [illegible] উঠে পড়ল। পিছন ফিরে [illegible] দেখল অসীম একেবারে [illegible] পিছিয়ে গেল। [illegible] মানসীর [illegible] একটা [illegible] নিজের মনেই হাসল। খুব খুশি হল মানসী। আর কিছু না হোক অন্তত এইটুকু [illegible] করতে পেরেছে এইটুকু [illegible] দিতে পেরেছে। এতেও যদি ওর [illegible] না লাগে তাহলে [illegible] না অসীম। [illegible] হয়েছে। মানসী এক পরম পরিতৃপ্তির [illegible] এই অপমান অসীমকে নিঃশব্দে হজম করতে হবে। [illegible] করবার মত মানসীর হাতে নিজের এই লাঞ্ছনার কথা সে কারো কাছে বলতে পারবে না। মুখ চুন করে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, না ঘরে গিয়ে মাধুরীর কাছে নালিশ করবে? মানসী হাসল। কিন্তু সেই নালিশ যদি মাধুরী শোনে? যদি সান্ত্বনা দেয়, আশ্বাস দেয়, আরো আপনার করে কাছে টেনে নেয়? নিশ্চয়ই তাই নেবে! নিশ্চয়ই মাধুরীর মত মায়াবিনী মেয়ে এই সুযোগ হারাবে না। তাহলে তো [illegible] ভুল করেছে মানসী। ইচ্ছা করে নিজের জোরে নিজেই অনিষ্ট করেছে। রাগ করে অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনে ওদের কাছাকাছি হবার সুবিধে করে দিয়েছে। ছি ছি ছি এমন ভুল মানসী কেন করতে গেল? এতো অপরাধীদের শাস্তিদান নয়, বিচারকের নিজের ওপরই দণ্ডবিধান। বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিবাদে মানসী পিছিয়ে এল, ভীরুর মত এককথায় ছেড়ে দিয়ে এল সসাগরা সাম্রাজ্য। এ কী কাণ্ড করল মানসী? নিজের মূঢ়তার জন্য এবার তার অনুশোচনা হতে লাগল। অন্ধ ক্রোধ আর জেদ তাকে ঠিক পথ দেখায় না, বার-বার বিভ্রান্ত করে অন্য পথে নিয়ে যায়। যে পথে হাঁটলে মানসীর নিজেরই ক্ষতি, নিজেরই দু পা অসংখ্য কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়। সব জেনেও নিজেকে বদলাতে পারে না মানসী। বার বার একই ভুল করে। আর পরীক্ষক সেই ভুল লালকালির আঁচড়ে কাটতে কাটতে চলেন। নিজের রোগ চেনা যত সহজ চিকিৎসা তত সহজ নয়। কার কথা যেন? অসীমের? চিঠি ভরে অসীমের এইসব জ্ঞানগর্ভ কথা ছড়ানো। জেনারালাইজ করতে পারলে অসীম আর কিছু চায় না। মানসী হাসল। তারপর মুহূর্তের জন্য সব বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কোন প্রসঙ্গে কোন চিঠিতে অসীম কথাটা লিখেছিল মানসী তা মনে করতে চেষ্টা করল।

শ্যামবাজার থেকে বাস বদলী করতে হল। দেখে স্বস্তি বোধ করল মানসী; এ বাসে সেই উপচে পড়া ভিড় নেই। লেডীজ সীটে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। মানসীকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মানসী তাঁকে আসনের অর্ধাংশ দিয়ে উদারতা দেখাল।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার বাসের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। সার্কুলার রোড দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে গাড়ি। এই বেগ মানসীর ভালো লাগল। গাড়ি যদি আস্তে আস্তে চলে, কি কোথাও এসে বেশ কিছু-ক্ষণ থেমে থাকে সে বড় বিরক্ত হয়। গাড়ি কেন থামবে। গাড়ি কেন আস্তে আস্তে চলবে। গাড়ি আর দ্রুতগতি যেন সমার্থক। জীবনও কি তাই? মানসী নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, জীবন মানেই কি দ্রুতগতি? সব সময় দ্রুতগতি নয়, কখনো কখনো দুর্গতিও। তবু গতি নিশ্চয়ই। জীবন মানে থেমে থাকা নয়, নিশ্চলতা নয়। এই নিয়ে অসীমের সঙ্গে একদিন তর্ক হয়েছিল। এই বাসে করে যেতে যেতেই। অসীম বলেছিল, 'জীবনের গতি আছে বইকি কিন্তু সে গতি সব সময় চোখে দেখা যায় না।'

মানসী বলেছিল, 'চোখে দেখা না যাক, অনুভব তো করা যায়।'

অসীম জবাব দিয়েছিল, 'কে অনুভব করছে তার ওপর নির্ভর করে। অনুভূতির শক্তি তো সবাইর সমান নয়। কেউ কেউ হয়তো মনে করে ক্লাস প্রমোশনের মত চাকরি বাকরিতে, গাড়ি বাড়িতে প্রমোশন পাওয়াই একমাত্র গতি। গতি মানে ওই একই ধরনের ঊর্ধ্বগতি।'

মানসী বলেছিল, 'কেউ কেউ মানে তো আমি? হ্যাঁ আমি তা মনে করি। ঐহিক উন্নতিটা আমার মতে গতিরই মধ্যে। যিনি সন্ন্যাসী, যিনি অধ্যাত্ম সাধক তাঁর কথা আলাদা। তিনি আমাদের আলোচনার বাইরে। কিন্তু যিনি সংসারী, গৃহী তাঁর গতির অন্য কি অর্থ হয় বল? চুরি ডাকাতি না করে নীতি নিয়ম মেনে তিনি যদি নিজের শক্তি আর সম্পদ বাড়াতে পারেন তাতে শুধু তাঁর নয় সমাজেরও উন্নতি। তাতে আর পাঁচজনে তাঁর কাছে সাহায্য পায়। কিন্তু তিনি যদি তা না করেন তিনি যদি দুর্বল আর দরিদ্র হয়ে থাকেন তাহলে সারাজীবন তাকে আর পাঁচজনের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়। সেও একধরনের গতি। তবে আমার মতে সেটা অধোগতি।'

অসীম বলেছিল, 'তোমার মত আমি জানি। কিন্তু কথা হচ্ছে নীতি নিয়ম মেনে নিজের ব্যক্তিত্বকে অবিকৃত আর অবিকৃত রেখে সেই ধরনের ঊর্ধ্বগতি সবাইর পক্ষে সম্ভব কিনা। যাদের পক্ষে তা সম্ভব নয় তারা নিশ্চয়ই অন্যপথ বেছে নেবে। জীবনের সার্থকতার অন্য মানে খুঁজবে। তাদের গতি বাইরে থেকে বোঝা যাবে না, চেনা যাবে না, তবু তাদের জীবন একেবারে গতিহীন নয়। হয়তো একখানা বই পড়ে তারা যে আনন্দ পাবে তার মধ্যে সেই গতির সঞ্চার থাকবে পাতায় পাতায়, পংক্তিতে পংক্তিতে লেখকের. চিন্তাস্রোতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে যেতে সেই গতিবেগ তারা অনুভব করবে। হয়তো নিজের মনে যে নতুন চিন্তা, নতুন রসের উদ্রেক হবে তার সেই আনন্দের মধ্যে তারা গতির স্পন্দন পাবে। ফুলের মধ্যে গতি, মেঘের মধ্যে গতি, চিন্তার মধ্যে গতি। গতি নানাদিকে নানা দেশে নানা স্তরে। গতির অর্থ শুধু অর্থ নয়।'

মানসী হেসে বলেছিল, 'তা তো নয়ই। কিন্তু সাংসারিক জীবনে অর্থকে বাদ দিয়েও কিছু হয় না। সেই বই পড়ার শান্তি, ফুল আর মেঘ দেখার শান্তি চিন্তার স্বাধীনতা কিছুই দরিদ্রের জন্যে নয়। দারিদ্র্য যে কী তা আমি জানি। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম কাকে বলে তা মানুষকে কতখানি নিচে নামিয়ে আনতে পারে তা আমি বাবাকে দেখে জেনেছি। দরিদ্রের একটি-মাত্র চিন্তাই আছে, তার নাম অন্নচিন্তা।'

অসীম বলেছিল 'তেমনি ধনীর একটি মাত্র চিন্তাই আছে তার নাম অর্থচিন্তা। ক্ষমতাবানের একটিমাত্র চিন্তাই আছে—আধিপত্য বৃদ্ধির চিন্তা। অন্য সবরকম ঐশ্বর্যের উপভোগ থেকে সে বঞ্চিত। তা ছাড়া দারিদ্র্য কথাটা রিলেটিভ। তুমি যাকে দারিদ্র্য বল, আমি হয়তো তাকে দারিদ্র্য বলি না। প্রেমের জন্য তোমার হয়তো একটি প্রাসাদের প্রয়োজন কিন্তু আমার কাছে প্রেমই প্রাসাদ।'

মাধুরীর সঙ্গেও এই নিয়ে মানসীর অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। শুধু ঘরে নয়, ছাদে নয়, পার্কে নয়, সিনেমা হলে নয়—স্কুলের লম্বা ছুটির দিনে মাধুরী কতদিন তাকে বাসে করে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। নানা আলোচনার মধ্যে এসব আলোচনাও হয়েছে তার সঙ্গে। মানসী লক্ষ্য করেছে অসীমের মতের সঙ্গে মাধুরীর মোটামুটি মিল আছে। মাধুরীও বলে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা থাকলে কুঁড়ে ঘরে থেকেও শান্তি। নামে দরকার নেই, ধামে দরকার নেই, কর্মে প্রয়োজন নেই, শুধু প্রেম। কিন্তু মানসী এই নিরবয়ব প্রেমে বিশ্বাস করে না। অমূলে তরু দু-দিনেই শুকিয়ে যায়। অসীম তুমি ভুল বুঝেছ। প্রেম মানে আমার কাছে শুধু প্রাসাদ নয় প্রেম মানে পৌরুষ। সেই পৌরুষ কখনো কখনো প্রাসাদও গড়ে। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে ব্যবসা বাণিজ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই পৌরুষ আপনার জায়গা খুঁজে নেয়। আর তাতেই সভ্যতা এগোয়, সংস্কৃতির বিস্তার হয়। সব কিছুর মূলে

অপরাধ করেছে, অথচ অপরাধী এমন স্মৃতিভ্রষ্ট যে মনে করতে পারে না কি অপরাধ করেছে। সম্প্রতি এমনি একটি বিচিত্র অপরাধীর বিচার নিয়ে পড়তে হয়েছিল লণ্ডনের আদালতকে। সমগ্র 'ইংলিশ ল'-র ইতিহাসে এমন একটি অপরাধীর মামলা ঘটেনি এবং ঘটনাটি সারা পৃথিবীর আইনবিদ্ মহলে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল।

তিরিশ বছর বয়সের আসামী জার্মানীতে জাত কানাডা প্রবাসী গান্থার ফ্রিক্ত পোদোলার বিরুদ্ধে লণ্ডনের একটি পুলিসকে খুন করার অভিযোগ ছিল। ঘটনার তিনদিন পর পুলিস ওর দক্ষিণ কেনসিংটনের বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসার সময় ওকে অত্যন্ত ভেঙে-পড়া অবস্থায় দেখা যায়। দুজন পুলিস ওকে একরকম টেনেহিঁচড়েই গাড়িতে যখন তোলে, ওর মাথাটা ছিল একটা থলি দিয়ে ঢাকা।

পার্লামেণ্টে এবং সংবাদপত্রে এই নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়। হাউস অফ কমন্সের শ্রমিকদলের সদস্য রেজিনাল্ড পেজেট প্রশ্ন তোলেনঃ "পোদোলাকে প্রহার করে যারা অচৈতন্য করে ফেলেছিল তাদের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন?" সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা পোদোলার পক্ষ নিয়ে মামলা চালাবার জন্য চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মামলা উঠতে পোদোলার পক্ষের উকিল অপরাধ করার সময় না পোদোলার পাগলামী, আর না পুলিসের প্রহার—এ নিয়ে কোন কথা উত্থাপন করলেন না। তৎপরিবর্তে আসামী পক্ষের উকিল ফ্রেডরিক লটন এইটেই সাব্যস্ত করতে চাইলেন যে, গ্রেপ্তার হয়ে আতংকগ্রস্ত হওয়ার ফলেই তার মক্কেলের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে।

এই উক্তির পর পোদোলা সত্যিই স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে কিনা যাতে সে খুনের অপরাধ স্বীকার বা অস্বীকার করায় অক্ষম সেটা পরীক্ষা করার জন্য মামলাটি প্রাক্-বিচার জুরীর সমক্ষে শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়। শুনানীকালে গোয়েন্দা এলবার্ট চেম্বার্স বলেন, পোদোলাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দরজায় ধাক্কা দেন এবং পোদোলাকে ধরাশায়ী করে তার ওপরে সটান পড়ে যান। তিনি বলেন, পোদোলা জ্ঞান ফিরে পেতে ওর সারা দেহে একটা অদ্ভুত কম্পন, ঝাঁকুনি এবং পেশী-সংকোচন পরিলক্ষিত হয়।

পরে চেলসা পুলিস থানায় চেম্বার্স বিবৃতি দেন যে পোদোলাকে বড় করুণ দেখাচ্ছিল; ওর আচরণটা বড় বিচিত্র। পুলিস সার্জেণ্ট শানাহান সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে পোদোলাকে পরীক্ষা করার সময়

ওর ব্যক্তিসত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুলিস বিভাগের অন্যান্য ডাক্তাররা জানান কিভাবে পোদোলা ধীরে ধীরে সুস্থ হতে আরম্ভ করে এবং এমন কি টুকরো টুকরোভাবে তার নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু জানিয়ে দিতে পেরেছে। যেমন, রুথ নামক একটি স্ত্রীলোকের বিষয় আবছা আবছাভাবে, এবং মিকি নামের একটি শিশুর কথা যাদের, সে বলে, তার মনে হয় নিজের জন। স্মরণশক্তি অবদমিত হওয়া দেখে একজন ডাক্তার বলেন যে, পোদোলা বারান্দা দিয়ে যেতে দেয়াল ঘেঁষে যাওয়া পছন্দ করে। বিচারপতি ডেভিস মন্তব্য করেন বিশিষ্ট পণ্ডিতরা যে দেওয়ালের ধার দিয়ে যাওয়া পছন্দ করে সে ত জানা কথাই।

পোদোলাকে কাঠগড়ায় হাজির করতে তখনও তার চোখে কালশিরার ছাপ থাকলেও ওকে দেখায় ধীর, বেশ স্বাচ্ছন্দভাব কিন্তু কেমন একটা উদাসীন ভাব। প্রশ্নের জবাবগুলো এমন স্বরে দেয় যেন ওর জীবনের সঙ্গে সেসবের কোন সংস্রব নেই। সরকারী অভিশংসক ম্যাক্সওয়েল টার্নারের "ইংলণ্ডে নর-হত্যার শাস্তি কি জান?" প্রশ্নের উত্তরে নীরস কণ্ঠে পোদোলা জবাব দেয়, "জেলের ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। হয় ছাড়া পাব নয়তো"—বলেই কনুই থেকে হাতটা দুলিয়ে বলে "ফাঁসি হবে।" এবং কোনরকম কায়দা করেও পোদোলাকে একবারও স্মরণ-শক্তি প্রয়োগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। মাঁন্ট্রিল ফরাসী এবং ইংরাজী উভয় ভাষায়ই চলে, পোদোলা এমন একটি উক্তি করেছে বলে একজন সাক্ষীর জবানবন্দীর কথা উত্থাপিত করতে বলেঃ "কি করে জেনেছি আমি জানি না। তবে আমি জানি।"

স্নায়ুবিজ্ঞানী কলিন এডওয়ার্ড আসামী পক্ষ সমর্থনে বলেন যে, পোদোলার সামঞ্জস্যহীন জ্ঞান প্রকৃত স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সংগতিহীন নয়, এবং কদাচিত দেখা যায় এমন সব লক্ষণ সম্পর্কে অতি বিশেষজ্ঞ না হলে কেউ পোদোলার যে আচরণ তা অনুসরণ করতে পারে। তিনি বলেন, পোদোলা এমনিতে প্রকৃতিস্থ কেবল যা স্মৃতিতে কিছু প্রতিফলিত করতে পারে না এবং ও ভুগছে স্মৃতিবিলোপ হিস্টিরিয়াতে

যে অবস্থাটা আসে আবেগ সংক্রান্ত কারণে কোন একটা স্মৃতিকে অচেতনভাবে অবদমন করার প্রচেষ্টা থেকে। বিচারপতি ডেভিড জানতে চান, এই অচেতন অবদমন ভাব কবে দূর হবে। ডাঃ এডওয়ার্ডস জানান যে, সেটা নির্ভর করে কিভাবে স্মৃতিবিলুপ্তি বা স্মৃতি ফিরে পাওয়া ওর ভাগ্যকে প্রভাবিত করে তার ওপর।

ডাঃ এডওয়ার্ডস বলেন, পোদোলার ব্যাপার যদি স্কিজোফ্রেনিয়া হতো তাহলে ও সব ব্যাপারে এবং সকলের সম্পর্কেই উদাসীন হতো। কিন্তু ওর বেছে বেছে অতীতের কিছু কিছু স্মরণ করার রীতি দেখে ও স্মৃতিবিলোপ হিস্টিরিয়াতে ভুগছে বলেই প্রতীতি জন্মে। এডওয়ার্ড বলেন, পোদোলার যা রোগ সেটাকে, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকরা যাকে বলে "কোন কোন ব্যাপারে উদাসীন-না-হবার মত আচরণ কিন্তু সব ব্যাপারে নয়।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাঃ এডওয়ার্ডস বলেন, পোদোলা ফাঁসি যাওয়া বলতে হাতের যে ভঙ্গী করে সেটা "আবেগসচেতন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।"

ব্রিক্সটন জেলখানার ডাঃ ফ্রান্সিস ব্রাসার পোদোলার স্মৃতিবিলুপ্তি সত্যি নয় ঘোষণা করে বলেন, যদি সত্যিই তাই হতো তাহলে কি করে খেলতে হয় দেখিয়ে না দেওয়া সত্ত্বেও পোদোলা তার প্রহরীদের সঙ্গে দাবা খেলতে পারতো না। তিনি বলেন, পোদোলা ডাঃ এডওয়ার্ডস ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের প্রবঞ্চিত করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতদ্বৈধতা দেখা দিতে নদিন বিচার স্থগিত রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত জুরী সাব্যস্ত করেন যে, পোদোলা বিচারে দাঁড়াবার মতো সম্পূর্ণ সুস্থ। বিচার চলতে পোদোলা সেই একই কথাই বলেঃ "কিসের অপরাধে যে আমাকে অপরাধী করা হয়েছে তার আমি কিছুই মনে করতে পারি না।"

জুরী মাত্র আটত্রিশ মিনিট সময় নেন তাঁদের রায় দিতে এবং তারপর বিচারপতি এডমাণ্ড ডেভিস পোদোলাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল যে বিচারপতির রায় শেষ হতে অন্য কেউ আসন ত্যাগ করার পূর্বেই পোদোলা দ্রুত এবং নিষ্কম্পপদে কাঠগড়া থেকে নেমে নীচের গারদে প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত ওর সেই উদাসীন ভাব এবং সবেমাত্র যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে সেটা ওর চেহারায় কোথাও বা কোন আচরণে তা প্রকাশ পায়নি—কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব। গত অক্টোবর মাসে পোদোলার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। বৃটিশ আদালতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন একজন বিচিত্র আসামী কখনও দেখা যায়নি।

সংবাদে বলা হইয়াছে, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রেরণার উৎস ভারতের বাহিরে

অবস্থিত। বিশুখুড়ো প্রশ্ন করিলেন—"সেটা কি গোমুখী?"

• • •

এই প্রসঙ্গেই শ্রীনেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতের ব্যাপারে কম্যুনিস্ট পার্টি কোন ভূমিকা গ্রহণ করে এটা তাঁর অভিপ্রেত নয়। আমাদের শ্যামলাল বলিল, —"প্রধান ভূমিকা না হলেও পার্শ্ব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কী অভিমত? যদ্দুর মনে পড়ে আগেকার দিনে মৃত-সৈনিকের পার্টও ছিল!!"

• • •

সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা মানুষের পরমায়ু সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন যে ২০০৯ সালের মধ্যে মানুষের পরমায়ু দেড় হইতে দুই শত বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। —কিন্তু যাঁদের প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত এবং দিনগত হলে পাপক্ষয় মনে করেন তাঁরা কি দু'শ বছরের পরমাই কামনা করবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •
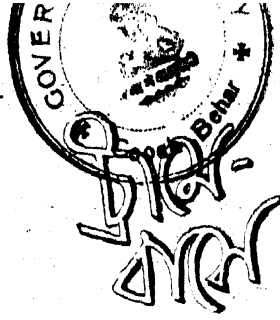
আমরা সম্প্রতি অনেক ইঁদুরের উৎপাতের সংবাদ পাইতেছি। প্রথম সংবাদ আসিয়াছে বিদেশ হইতে, সংবাদ সিডনির। তারপর শুনিলাম একটি ইঁদুরে একটি ট্রেন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তারপরের উৎপাতের সংবাদ আসিয়াছে লুসাই পাহাড়ের মিজো জেলা হইতে। সবশেষ সংবাদ পাইলাম জামালপুর (বিহার) হইতে। —"তাহলে ধরে নেওয়া যায় এতদিন ধরে এত পন্ডিত যে মুষিক প্রসব করেছে তারা দীন হলেও হীন নেহাত নয়" — মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল ডক্টর বি আর সেন খাদ্য সমস্যা দূরীকরণের জন্য সমস্ত দেশ কর্তৃক সাহসিক

ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আহ্বান জানান। —"এই সঙ্গে ডক্টর সেন যেন অখাদ্য সমস্যা দূরীকরণের কথাটাও ভেবে রাখেন। বাজারের হালচাল দেখে মনে হয়, অখাদ্য সমস্যাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত—" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়াম সিণ্টন একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ জীবনের ব্যাপক অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন।—"তাহলে আর তরিতরকারির জন্য ধাপার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম যুদ্ধোত্তর বৃটেনে নাকি জীবজন্তু পোষার ঝোঁক খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনোবিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ঝোঁক প্রভুত্ব করার মনোবৃত্তিরই প্রকাশ। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাঁদের যুক্তি হয়ত মিথ্যে নয়। যুদ্ধপূর্ব যুগে জন্তু জানোয়ারের ওপর প্রভুত্ব করার শখ বুঝি এখনো মেটেনি!!"

• • •

কৃষি উপমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণাপ্পা বলিয়াছেন যে, পাঁচ একর জমিতে যে আয়, কাজ ও সুখ পাওয়া যায় একটি গরুতে সেই একই

সুবিধা পাওয়া যায়। শ্যামলাল বলিল—"হিসেবে বোধহয় একটু ভুল হলো, একটি গরু নয়, এক জোড়া বলদ!!"

• • •

পাকিস্তানের সংবাদে শুনিলাম সেখানে বাংলা বই আমদানী বন্ধের ফলে অনেকে রাতারাতি গ্রন্থকার সাজিয়া গিয়াছেন।—"আশ্চর্য কিছু নয়; কথায় বলে নেই বাঘ চরে হরিণ"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

মানুষ কত মিথ্যা বলে তাই লইয়া গবেষণা চলিতেছে। গবেষকবর্গ বলেন —সাধারণত সত্যভাষী বলে যাদের গণ্য করা হয় তাঁরা হইলেন বৈজ্ঞানিক, অনুশীলনবিদ, রসায়নশালার কর্মী, স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ার। —"হয়ত তাই। আমরা কতই বা জানি। তবে এটা ঠিক যে তালিকাভুক্ত সত্যভাষীরা বিবাহিত হলে গবেষণার ফল অন্যরূপ হতে বাধ্য। বিয়ের আগে যারা মানসীকে বলেছেন—তোমায় কত ভালোবাসি—বিয়ের পর তাঁরাই গিন্নিকে বলেছেন জীবনে যাকে প্রথম ভালোবেসেছি সে হলে তুমি"—বলেন খুড়ো, বুড়ো খুড়ো।

• • •

কয়ের ম্যাটিং-এ খেলা কেমন হয় তা দেখবার জন্যই নাকি রিচি বিনদ টসে জিতেও পাকিস্তানকে আগে ব্যাট করিতে দিয়াছেন। "কিন্তু ভালো করে দেখতে হলে নারকেল কাড়াকাড়ি খেলাটাও দেখে নিতে হয়, শুধু ছোবড়া নয়, গোটা নারকেল। রিচি বিনদ বোধহয় তা জানেন না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবু তাঁর জীবনকাহিনীর এমন এক আবেদন আছে, যা পাঠকমনকে বারবার মুগ্ধ করে। এজন্যেই তাঁর লীলাময় জীবন সম্পর্কিত রচনা ভক্তজন ছাড়াও সাধারণ্যে যথেষ্ট আদৃত। অজাতশত্রু ছদ্মনামের অন্তরালে নিজেকে গোপন রেখে কোন ভক্ত লেখক আলোচ্য গ্রন্থটি লিখেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-কালের নাম গদাধর। এই গ্রন্থে তাঁর বাল্যজীবনের কাহিনীই লিখিত হয়েছে। প্রধানত শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও শ্রীঅক্ষয়কুমার সেনের গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। তবে স্বীয় কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করেছেন লেখক। তবে সে কল্পনা যুক্তিধর্মী। ভাষা সুন্দর, রচনাভঙ্গি সাবলীল, সেজন্যে

জীবনচর্যা

বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। সাহিত্যসদন, এ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৭৫ নয়া পয়সা।

ভবভূতি যথার্থই বলেছেন যে, 'মহাপুরুষগণের চরিত্র বজ্রের চেয়ে যেমন কঠিন, আবার কুসুমের চেয়েও তেমনি কোমল।' পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের চরিত্রে সেকথার অসদ্ভাব নেই। যাঁরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহসান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আরো একটি বিশেষধারা আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়েছেন—সেটি হলো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্মলশুভ্র পরিহাসপ্রিয়তা। মনের মানুষ বিদ্যাসাগরের মহান আদর্শকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই ত্রিধারার উৎস-সন্ধান আবশ্যক। ঘরোয়া জীবনে তিনি অত্যন্ত পরিহাসমধুর ছিলেন; এবং তাঁর নিভৃত হৃদয়ের মধ্যে হাস্যরসের একটি নিরন্তনির্ঝর বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের রসবসিকতা এমনই এক নির্মল ও কৌতুক রসাশ্রিত ছিল যে, শ্রোতা সেই বক্তব্য, এবং বক্তার বাচনভঙ্গীর মধ্যে এক আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে সে সকল কাহিনীর উল্লেখ আছে এবং তাঁর আজীবন হাস্যরস প্রসঙ্গে প্রচলিত অনেক কাহিনীও পাঠকের অজানা নয়। লেখক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় বর্তমানগ্রন্থে বিদ্যাসাগরের জীবনের সেই হাস্যমধুর ধারাটিকে একটি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের সব কাহিনীই যে রসিকচিত্তকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে তা বলা যায় না; কেননা হাস্যরসের নামে কয়েকটি নিছক 'জোলো' কাহিনীও এই গ্রন্থে অনধিকার প্রবেশ করেছে বলেই মনে হলো। তথাপি 'বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প' পড়ে সর্বশ্রেণীর পাঠক বিশেষ আনন্দিত এবং উপকৃত হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ৩৩৭ '৫৯

গদাধর (২য় খণ্ড)—অজাতশত্রু। কল্পতরু প্রকাশনী। ৮, কে কে রায়চৌধুরী রোড (বড়িষা), কলিকাতা—৮। মূল্য—৫·৫০ নয়া পয়সা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন সম্পর্কিত

পড়তে ভাল লাগে। গদাধরের গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতা আসার প্রস্তুতিতেই কাহিনী শেষ হয়েছে।—অর্থাৎ সেখানে 'গদাধর জীবনের পরিসমাপ্তি বলা চলে।

৩০৫।৫৯

উপন্যাস

শ্বেতবাহু—রাইমোহন সাহা। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। চার টাকা।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে পদ্মা-পাড়ের একটি গ্রামের এক প্রান্তের দরিদ্র অস্পৃশ্য ঘরের সন্তান স্বর্ণকমল বা সনুর বাল্য ও কৈশোর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসখানি। তার কঠোর জীবনসংগ্রাম, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয় লেখকের সংবেদনশীল মনের ছোঁয়ায় একটি সুন্দর কাহিনীর সৃষ্টি করেছে যা পাঠকমাত্রেরই ভালো লাগবে। মূল চরিত্রের আশেপাশে মেহেরালি, শিবু, গগন, সোনাতন প্রভৃতি যেসব চরিত্র ভিড় করে এসেছে, তারাও তাদের ভালোমন্দ সব কিছু মিলিয়ে সার্থক হয়েছে নিঃসন্দেহে। সনুর কাহিনী এই বইতে শেষ হয়নি, কিশোর স্বর্ণকমলের ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ জীবনের ছবি দেখার ঔৎসুক্য পাঠকমনে জাগিয়ে দিয়েই বইখানি সমাপ্ত হয়েছে। আর এই ঔৎসুক্য জাগানোতেই বইখানির সার্থকতা।

লেখকের লিখবার ভঙ্গীটি ভালো। কিন্তু পদ্মাপাড়ের কথ্যভাষাকে ও বাচন-ভঙ্গীকে কথোপকথনে প্রয়োগে তিনি সার্থক হয়েছেন, সে কথা বলা চলে না। স্থানে স্থানে যেমন এই কথ্যভাষা চলতি ও সাধুভাষায় মিশে গেছে, তেমনি স্থানে স্থানেই এই মিশ্র ভাষার আড়ষ্টতা কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করেছে।

৩৩৩।৫৮

অন্যদৃষ্টি—সুনীল ঘোষ। ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৬৲।

নায়ক অশোক কারখানায় ড্রাফট্‌স্‌ম্যানের কাজ করে, কিন্তু সাহিত্যসেবাও করে অবসর সময়। সেই অশোকের দৃষ্টির আলোকে এই গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র পাঠকচক্ষে ধরা দেয়। সমাজবিরোধী নন্টু মজুমদারের ঘৃণ্য জীবন থেকে মহত্তর সামাজিক জীবনে উত্তরণের কাহিনীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে। কারখানার শ্রমিক-মালিক বিরোধের চিত্র কিছুটা ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। নায়িকা অনুরাধার জীবনের দ্বন্দ্ব আমাদের মন ভারাক্রান্ত করে। মিসেস সরকার, ফাডুকে দম্পতি, নিরঞ্জন সেন পার্শ্বচরিত্র হলেও মনে ছাপ রাখে। লেখকের ভাষা সহজ সাবলীল।

৩২৭।৫৯

নাটক

দুই মহল—কাঞ্চন মজুমদার। প্রকাশক: শ্রীপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯।২ বলরাম বসু ঘাট রোড, কলিকাতা-২৫। দুই টাকা।

বর্তমান নগর জীবনের মধ্যে যে ছদ্ম-বেশী শোষণ এবং প্রকারান্তরে নরহত্যা চলেছে তারই মুখোশ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন নাট্যকার তাঁর কাহিনীর মধ্য দিয়ে। সমাজের উপরতলা এবং নিচুতলা এই আকাশ এবং পাতাল মিলিয়ে তাঁর বক্তব্যের পটভূমি। হঠাৎ বড়লোক, সমাজে টাকার জোরে যাদের শিল্প-সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে উঠতে এক রাতের বেশি সময় লাগেনি, রাতের অন্ধকারে সেই সব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরই অন্য চেহারা এখানে উপস্থাপিত।

ভিখিরী সমস্যা রাজধানী কলকাতার রাজপথের একটি প্রকট সমস্যা। এই অবৈধ অমানুষিক জীবনধারার পিছনে যে কদর্য বাণিজ্য রহস্যজাল বিস্তার করে বসেছে তা এতই বাস্তব যে সংবাদপত্রেও তদন্তনীয় বিষয়। সুতরাং বিষয় নির্বাচনে নাট্যকার আধুনিক সমস্যার গায়েই হাত দিয়েছেন।

নাটকটি দুই অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে সাতটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে মাত্র দুটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্ক মন্থরগতিতে এগিয়েছে, দ্রুততা যা কিছু এসেছে সে পরবর্তী অঙ্কে।

সংশ্লিষ্ট না হলেও দুটি মহল দুটি স্বতন্ত্র অংক জুড়ে রয়েছে। কাহিনী সমতল রেখায় গড়িয়ে গেছে, বক্তব্যে নাটকীয় সংঘাত নেই বললেই চলে। বারীনের চরিত্রটি অবস্তর। রঞ্জনের চরিত্রটি অতিনাটকীয়, বস্তুবপ্রধানতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। অনর্থক প্রেমের উপাখ্যান টেনে তার পাশাপাশি নিচের মহলের সমাজ অস্বীকৃত মিলনের এবং অসহায় বাংলাদেশার ট্র্যাজেডি না দেখালেই কি চলত না। নাট্যকারের বক্তব্য কি তার চেয়েও বড় কিছু ছিল না। একমাত্র ছোটলোকদের ভাষায় দক্ষতা ও যথার্থতা ফুটেছে।

১৪৬।৫৯

শারদ সাহিত্য

মানুষ—সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীকমলারঞ্জন ভট্টাচার্য। ত্রিপুরা। দাম ৮০।

এই সংখ্যাটিতে স্থানীয় লেখক-লেখিকারাই বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা লিখেছেন।

প্রগতি—প্রগতি পরিষদ, নবদ্বীপ। শ্রীকুমার রায়, জগদীশ কর, রমেন সরকার এই তিনজন সম্পাদকমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় এই বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। দাম ।০।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও একটি নাটিকা লিখেছেন এখানকারই কয়েকজন লেখক।

জোনাকি—সম্পাদক শ্রীশান্তিপ্রসাদ বসু। কৃষ্ণনগর।

এবারের পূজাসংখ্যায় অনেক নতুন লেখক যোগ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীন্দ্রপ্রসন্ন চাটুয্যে, গোপাল ভৌমিক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি।

সংকেত—মুর্শিদাবাদ।

ত্রৈমাসিক পত্রিকার এই শারদীয় সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে।

সরসীজ—২৯, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯। দাম—।।০।

ছোট্ট একটি সিনেমা পত্রিকা। এতে সংবাদ, গল্প ও কবিতা আছে।

যুগ ও জীবন—সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, ৯, রমেশ মিত্র রোড, কলি-২৫। মূল্য ১।

এই শারদীয়া সংখ্যাটিতে বহু স্বল্পখ্যাত ও কয়েকজন খ্যাত লেখকের রচনা স্থান পেয়েছে। অনেকগুলি লেখাই ভাল লাগবে।

জি টি রোড—সম্পাদক শ্রীদিনকৃষ্ণ ঘোষ, আসানসোল। মূল্য—১।।০।

শারদীয়ার এই পত্রিকাটির কাগজ ভাল। স্থানীয় লেখকেরাই প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, রসরচনা লিখেছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

ভানুমতীর বাঘ—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
এলেম নতুন দেশে—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য।
রাজা ও মালিনী—বারীন্দ্রনাথ দাশ।
শান্দ্রবের মৃচ্ছকটিক—শরদিন্দু দাশগুপ্ত।
নয় ছয়—শামসুল হক।
উপন্যাসের শিল্পরূপ—রমেন্দ্র দাশগুপ্ত।
সেদিন পলাশপুরে—তার দাস।
হিন্দুস্থান চরে—বেদুইন।
চরৈবেতি—মৈনাক চট্টোপাধ্যায়।
হুতুজননী—সুধানন্দ বিরচিত।
সোনা ভরা মিঠে মাটি—প্রফুল্ল রায়।
বেলকুঁড়ি—বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
ক্রিকেটের রাজকুমার—শ্রীশৈলেশ্বর।
শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা—শ্রীমৎ কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।
মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত।
শিবানী—ডাঃ পুরুষোত্তম শর্মা।
শুনে পাপদান—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
অজানা রূপকথা—রবিদাস সাহারায়।
শংখবতী—শ্রীমন্ত মজুমদার।
ওদের কথা—কেশবরঞ্জন চক্রবর্তী।
ঝড়ের পালক—বিমল ঘোষ (মৌমাছি)।
রাজা নয় রাণী নয়—আশাপূর্ণা দেবী।
ডাইনীর মায়া—অমলেন্দু ভট্টাচার্য।
একটি রাত তিনটি সকাল—মানিক মহেন্দ্র।
নন্দী মহুর্ত—আবদুর রশিদ খান।
Tales from Kalidasa—Suna K. Survegor. The Role of Joint-Stock Companies in India's Economic Progress.

চন্দ্রশেখর

সুরকারের সফর : অপবাদের প্রতিবাদ

জনপ্রিয় গায়ক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় দু'মাসব্যাপী বিদেশে সফরের পর সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের আমন্ত্রণে তিনি পূর্ব আফ্রিকার ও গ্রেট ব্রিটেনের কয়েকটি শহরে গানের আসর বসিয়েছিলেন। বাংলার এই কৃতী সন্তান যেমন গান গেয়ে সাগরপারের সম্মান কুড়িয়ে এনেছেন, তেমনি বিদেশী শিল্পরসিকদের কাছে এদেশের লোকপ্রিয় সংগীতকলার মর্যাদাও বাড়িয়ে এসেছেন।

আফ্রিকা ও, ইউরোপের যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই কলারসিকরা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। গত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শিল্পী সপত্নীক বিদেশ যাত্রা করেন। এডেন শহরে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সংগীতানুষ্ঠানে তিনি প্রথম গান করেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সুগায়িকা সহধর্মিণী বেলা মুখোপাধ্যায় সেখান থেকে নৈরোবি এবং পরে কেনিয়া, উগাণ্ডা ও টাংগানিকায় তিন সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করেন। এই সব অঞ্চলে তিনি

লণ্ডন বি বি সি-তে গান গাইছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করে বিদেশী ও প্রবাসী ভারতীয়দের প্রচুর আনন্দ দেন।

বিদেশ ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরে তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'ভারতের বাইরে যেখানেই গেছি সেখানেই লক্ষ্য করেছি এদেশের গায়ক ও গানের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বিদেশীদের কি আকুল আগ্রহ।' সাংবাদিকদের কাছে বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পী বলেন, 'আফ্রিকায় দ্রুত লয়ের রম্যগীতির সমাদর বেশী হলেও ইংরাজ শ্রোতারা বেশী পছন্দ করেন রবীন্দ্র-সংগীত'।

সেপ্টেম্বরের প্রথমে শ্রীমুখোপাধ্যায় ইউরোপে যান। রোম, জুরিখ, জেনেভা, ফ্র্যাংকফুর্ট, পারি ঘুরে তাঁরা লণ্ডনে গিয়ে ওঠেন। ইউরোপ সফরের বেশীর ভাগ তাঁরা কাটিয়েছেন লণ্ডনেই। বি বি সি'র ছটি অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া এশিয়ান ফিল্ম সোসায়েটির উদ্যোগে লণ্ডন ও বার্মিংহামে তাঁকে নিয়ে বিশেষ গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সাংবাদিক বৈঠকে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (যিনি ইউরোপে হেমন্তকুমারের সঙ্গে মিলিত হন) বলেন, 'ওদেশে হেমন্তবাবুর জনপ্রিয়তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।' নৈরোবিতে থাকাকালীন একজন ইংরাজ মহিলা-সাংবাদিক হেমন্তবাবুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ 'সানডে কুরিকল'য়ে প্রকাশ করেন। ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রেও সাংবাদিকগণের সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সাক্ষাৎকারের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়।

সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, পাকিস্তান ফিল্ম সোসায়েটি আয়োজিত ও ব্রাডফোর্ডে অনুষ্ঠিত একটি সংগীতানুষ্ঠানে গান করে তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে তাঁকে ৩৫টি গান গাইতে হয়েছিল। সব অনুষ্ঠানেই হেমন্তবাবু কিছু রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেছেন বলে সাংবাদিকদের জানান। যে রবীন্দ্র-সংগীতগুলি তিনি বিদেশ-ভ্রমণকালে বিশেষভাবে পরিবেশন করতেন সেগুলি হলঃ 'অরূপ তোমার বাণী' 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়', 'এলেম নতুন দেশে' ও 'তোমায় চিনি গো চিনি'। হেমন্তবাবুর গাওয়া যে-কয়টি আধুনিক গান বিদেশে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার মধ্যে 'দুরন্ত ঘূর্ণীর', 'ধিতাং ধিতাং' (শিল্পী-দম্পতির দ্বৈত সংগীত) 'নীল আকাশের নীচে' এবং 'ও নদীরে'।

শ্রী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সাংবাদিকগণকে দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, বিদেশে থাকাকালীন তিনি একটি মিথ্যা গুজব শুনতে পান। কোন একটি বাংলা ছবিতে তাঁর দেওয়া একটি গানের সুর নাকি এক বিদেশী ছবিতে ব্যবহৃত সুর থেকে নেওয়া। এই কারণে নাকি তাঁকে দু-বছরের জন্যে

বোম্বাই চলচ্চিত্রে কাজ করতে না-দেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে। এই সম্পর্কে শিল্পী সাংবাদিকগণের কাছে একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করেন, এবং তাতে বলেন 'কোন প্রতিষ্ঠান আমার কাজের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। এই গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত।'

আমাদের একজন প্রিয় ও প্রখ্যাত শিল্পী যখন বিদেশে ভারতীয় আধুনিক সংগীত-কলার সমাদর বাড়িয়ে শহর থেকে শহরান্তরে সফর করে বেড়াচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে নিয়ে স্বদেশে এই কুৎসা রটনা যে একান্ত পরিতাপের সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এই ঘৃণ্য অপবাদের বিরুদ্ধে হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্ভীক, স্পষ্ট জবাব আনন্দের সঙ্গে দেশবাসীর কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

ভারতের সঙ্গে যুগ্ম-চিত্রপ্রযোজনা

পূর্ব জার্মানীর বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা হানস্ পিটার মিনেট্টি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন, ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে ভারত ও পূর্ব জার্মানীর যুগ্ম-প্রযোজনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই জার্মান চিত্রাভিনেতা [illegible] ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি বলেন, ভারতের নেতৃস্থানীয় প্রযোজক ও অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ভারত-পূর্বজার্মানী যুগ্ম চিত্র-প্রযোজনার সম্ভাবনাকে প্রশস্ততর করাই তাঁর ভারত-পর্যটনের অন্যতম উদ্দেশ্য। উভয়ের দেশের কাছে আদরণীয় হতে পারে এমন বিষয়বস্তু ও উভয় দেশের শিল্পীদের নিয়ে এই প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করে তোলা যায় বলে তিনি মনে করেন। অবশেষে তিনি বলেন, পূর্বজার্মানী থেকে একটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল শীঘ্রই ভারত-ভ্রমণে আসছেন।

পাক-ভারত যুগ্ম চিত্রপ্রযোজনার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সম্প্রতি পাকিস্তানের চিত্রপরিবেশক গফফার দানাওয়ালা ও বোম্বাইয়ের চিত্রপরিচালক কমলনের মধ্যে। ভারত ও পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিল্পীরা এ-ছবিতে অংশ গ্রহণ করবেন। পাকিস্তানের বিখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক কয়ুরাতুল আয়নি-র একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি তোলা হবে। জনপ্রিয় পাকিস্তানী চিত্র-পরিচালক শওকত হুসেন রিজভি সম্ভবত ছবিখানি পরিচালনা করবেন।

যুগ্ম-প্রযোজনা সম্পর্কে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার অন্যতম শর্ত হল যে ভারতে চিত্রগ্রহণের যাবতীয় খরচ ও শিল্পীদের পারিশ্রমিক বহন করবেন ভারতীয় অংশীদার। পাকিস্তানী অংশীদার অনুরূপভাবে প্রয়োজনাকালে পাকিস্তানে যাবতীয় ব্যয় বহন করবেন। ছবিটির ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর ব্যাপারেও ভারতে পরিবেশনের দায়িত্ব থাকবে ভারতীয় অংশীদারের। বিদেশ-প্রদর্শনীতে ছবির লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে।

কলিকাতায় 'ড্যান্স জুবিলী' দল

'ড্যান্স জুবিলী' নামে এক বিখ্যাত আমেরিকান ভ্রাম্যমাণ নাচের দল সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। এঁদের দুই মাসব্যাপী সফর তালিকায় রয়েছে বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও কলকাতা ইত্যাদির নাম। এগারজন নৃত্যশিল্পী ও পাঁচজন সঙ্গীত-শিল্পী সম্বলিত এই দলের প্রযোজক-পরিচালক-নর্তক রড আলেকজাণ্ডার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতে আসতে পেরে খুবই আনন্দ অনুভব করছি।'

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের 'সাংস্কৃতিক বিনিময়' পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে এই শিল্পী দল মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দেশগুলিতে শুভেচ্ছা-সফরে বেরিয়েছেন। 'ড্যান্স জুবিলী' দল তাঁদের ভারত-ভ্রমণের

পথে প্রথম বাঙ্গালোরে অভিনয় করেন। এর পর মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদ ঘুরে তাঁরা কলিকাতায় এসে পেশছেছেন।

কলিকাতায় নৃত্য-প্রদর্শনীর পর এই দল নাগপুর, বোম্বাই, বরোদা, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লিতে যাবেন।

চিত্রালোচনা

বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম-প্রযোজনা ও পরিচালনায় তোলা 'শুভ বিবাহ'—চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার প্রথম ছবি। কারলভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসবের 'গ্র্যান্ড প্রিক্স' বিজয়ী 'একদিন রাত্রে'-র পর চিত্রজগতে এইটাই এ'দের দ্বিতীয় অবদান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী—রচয়িতা এ'রা দুজনেই। ছবিতে শিল্পী সমাবেশও লক্ষ্য করবার মত। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তৃপ্তি মিত্র, ছায়া দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু ও অমর গাঙ্গুলি। ভি বালসারার সুরযোজনা ও দেওজীভাইয়ের আলোকচিত্র গ্রহণ ছবিটির নাটকীয় সম্পদ অনেকাংশে বাড়িয়েছে।

* * *

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ"-এর একটি মুখ্য চরিত্রে শম্ভু মিত্র

তিনটি নতুন হিন্দী ছবিও এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—মার্স এন্ড মুভিজের 'অর্ধাঙ্গিনী', জার প্রোডাকশন্সের '৪০ দিন' ও ফিল্মিস্তানের 'দীপ জ্বলতা রহে'।

স্বর্গত অমিয় চক্রবর্তীর অনুজ অজিত চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠের প্রতিষ্ঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে তুলেছেন 'অর্ধাঙ্গিনী'। মীনাকুমারী, রাজকুমার, শুভা খোটে ও আগাকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন বসন্ত দেশাই।

'৪০ দিন'-এর ভূমিকালিপিতে আছেন প্রেমনাথ, শাকিলা, কে এন সিং, মারুতি, শাম্মী, নিশি প্রভৃতি। পরিচালনা ও সুর সৃষ্টির কৃতিত্ব যথাক্রমে দ্বারকা খোসলা ও বাবুলের।

ফিল্মিস্তানের 'দীপ জ্বলতা রহে' এ'দের অধুনাতন অন্যান্য ছবিগুলির মতই তারকা-বর্জিত। দত্তা ধর্মাধিকারী পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। রোশন এর সুরকার।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় ইতি-মধ্যেই তাঁর নতুন ছবি 'দেবী'-র অর্ধেকের ওপর চিত্রগ্রহণ শেষ করে ফেলেছেন। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের যে গল্পটি অবলম্বন করে ছবিটি তোলা হচ্ছে, তার মুখ্য চরিত্র অত্যন্ত গোঁড়া এক জমিদার পরিবারের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ দয়াময়ী। কালীভক্ত জমিদার কালিকিংকরের একদা বিশ্বাস জন্মাল যে দয়াময়ীর মধ্যে তাঁরই আরাধ্যা দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তার ফলে পারি-বারিক জীবনে যে ওলট-পালোট ঘটল, ছবির নাট্য পরিণতির মূল সূত্র সেইটি। ছবি বিশ্বাস কালিকিংকরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। শর্মিলা ঠাকুর রূপ দিচ্ছেন দয়াময়ী চরিত্রটির। তাঁর স্বামীর ভূমিকায় আছেন সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়। ভূমিকালিপিতে আরো যাঁদের নাম আছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ও শিশু-অভিনেতা অর্পণ চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।

* * *

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত তারকা অশোককুমার কলকাতায় এসেছেন শ্রী এন সি এ প্রোডাক-শন্সের বাংলা ছবি 'হাসপাতাল'-এ অভিনয় করতে। পনেরো বছর আগে তিনি আর এক-বার এসেছিলেন 'চন্দ্রশেখর'-এর নায়ক চরিত্রে রূপ দিতে। সেবার তাঁর বিপরীতে ছিলেন কানন দেবী—তদানীন্তন বাংলার সবচেয়ে নামকরা অভিনেত্রী। এবার আছেন সুচিত্রা সেন—যিনি আজ খ্যাতির সর্বোচ্চশিখরে আসীন। অশোককুমার কিন্তু আজও একমেবাদ্বিতীয়ম্। ছবিটি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, আরতি মজুমদার, কমলা মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন ও পরিচালক স্বয়ং।

* * *

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক নিজের প্রযোজনায় যে ছবি তুলছেন প্রথমে তার নাম রাখা

বোম্বাইয়ের বিমানঘাটিতে আমেরিকার "ড্যান্স জ্যুবিলি" নাচের দল। এ'রা বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শহরে নৃত্য প্রদর্শন করছেন।

হয়েছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'—বর্তমানে তার নতুন নামকরণ হয়েছে 'চেনামুখ'। সম্প্রতি শিলং অঞ্চলে বহিদৃ'শ্য গ্রহণ করে পরিচালক ঘটক টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে ছবির অন্যান্য দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ শুরু করেছেন। এর মুখ্য ভূমিকা দুটি রূপায়িত করছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। গত সংখ্যায় ভুলক্রমে অসীমকুমারের নাম উল্লিখিত হয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় আছেন নিরঞ্জন রায়, গীতা ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দে, দ্বিজু ভাওয়াল প্রভৃতি।

দ্বিকেন্দ্রিক সামাজিক কাহিনী

গত বছরের ভারতীয় ছবিগুলির মধ্যে গুণানুক্রমে তৃতীয় স্থান অধিকার করে যে কানাড়ী ছবিটি রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছে, পদ্মিনী পিকচার্স-এর 'স্কুল মাস্টার' তারই হিন্দী রূপ।

ছবির মূল চরিত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শবাদী ও সত্যনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক। গ্রামের এই বিদ্যালয়ের পরিচালক কুচক্রী ও স্বার্থান্বেষী স্থানীয় জমিদার। শিক্ষকের আদর্শপ্রীতি ও জমিদারের স্বার্থপরায়ণতার সংঘাত শুরু হয় অবশ্যম্ভাবীরূপে। আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা এই শিক্ষক সহজেই কিভাবে তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর জয় করে নেন, এবং অশেষ দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে খলনায়কের সকল দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বীয় আদর্শের রূপদান করেন তা-নিয়েই চিত্রনাট্যের প্রথম ভাগ রচিত।

ছবির দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ঘাটিত হয় শিক্ষক ও তাঁর পত্নীর শেষ জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী। তাঁদের দুই ছেলে বড় হয়ে নিজেদের পছন্দমতো মেয়েকে বিয়ে করে। বিবাহিত জীবনে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে ছেলেরা পিতামাতার সাধ-আহ্লাদ কিভাবে ধূলিসাৎ করে, এবং বৃদ্ধ দম্পতিও জীবনসন্ধ্যায় কেমনভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়, তা-নিয়েই চিত্রনাট্যের শেষার্ধ রচিত। বৃদ্ধ দম্পতিকে কিছুটা সুখ ও সোয়াস্তি দিতে চেষ্টা করে তাদের সদারসিক মেয়ে-জামাই। শেষ পর্যন্ত তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার পিতা-মাতার চরণতলে

এসে আয়ার জেল্লা। শিক্ষক দম্পতির জীবনের সকল দুঃখের অবসান ঘটে।

প্রযোজক-পরিচালক বি আর পন্থালু—যিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন—আদর্শবাদ ও জাতীয়-চেতনার সুরটিকে অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছেন চিত্রনাট্যের প্রথম ভাগে। দ্বিতীয়ার্ধে যে পারিবারিক 'মেলোড্রামা' রূপ নিয়েছে তাতে শেষ জীবনে পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে শিক্ষক দম্পতির মধুর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া ও তাদের পরস্পরের কাছ থেকে নিদারুণ-ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় উপাখ্যানটি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। শিক্ষকের মেয়ে-জামাই ও শ্বশুরকে নিয়ে রঙ্গ-রসিকতাও দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেবে। তবে ছবির চিত্রনাট্যটি বহুবিস্তৃত, এবং এতে পরিচালক ও কাহিনী-কার দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য শঠতা, প্রণয় ও নাচ-গানের যে আয়োজন রেখেছেন, সেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই কষ্টকল্পিত, এবং মোটেই সুবিন্যস্ত নয়। ফলে সর্বাঙ্গীন-ভাবে ছবিটি উঁচুদরের হয়ে উঠতে পারেনি।

শিক্ষকের সহধর্মিণীর ভূমিকায় এম ভি রাজাম্মার অনবদ্য অভিনয় এ-ছবির বিশেষ সম্পদ। তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত অভিনয় চরিত্রটিকে একান্ত স্বাভাবিক করে তুলেছে। মুখ্য-চরিত্রের রূপায়ণে বি আর পন্থালু যথাযথ সংযম ও ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছেন। পিতা-পুত্রের বিশেষ ধরনের চরিত্রে ভেঙ্কিড ও রাজা গোসাবি দর্শকদের সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখেন। খলনায়কের চরিত্রে উল্লাসের অভিনয় অতিশয়াদুষ্ট। শিক্ষকের দুই ছেলের ভূমিকায় জহর কাউল ও কমল দেওয়ান এবং তাঁদের পত্নীরূপে কামিনী কদম ও শাকিলা পরিচালকের দাবি মিটিয়েছেন মাত্র। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বি সরোজা দেবী, ললিতা পাওয়ার, রাধাকিষণ, অচলা সচদেব ও শিবাজী গণেশন।

বসন্ত দেশাই রচিত আবহসংগীত ও গানের সুর শ্রুতিমধুর। কলা-কৌশলের সব বিভাগের কাজই কৃতিত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসব

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা-তাণ্ডবের দরুন আন্ত-র্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসবের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই উৎসবের কর্ম-কর্তারা জানাচ্ছেন, এবারের আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসব কলিকাতায় ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৫৯) থেকে ১৬ই জানুয়ারী (১৯৬০) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম-বঙ্গের জেলায় জেলায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৫ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত। যোগদানের শেষ তারিখ ধার্য হয়েছে ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৫৯)।

এবারের উৎসবের প্রথম দিন কলিকাতার শিশু শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানানো হবে। শিশুচিত্রের ভারতীয় সমস্যা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে একটি আলোচনা-চক্রেরও ব্যবস্থা করা হবে উৎসবের শেষ দিনে।

শিশুদের জন্য উন্নততর ছবি তৈরীর উৎসাহ দেওয়া এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য। এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় ও শিশু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রার্থনা করে উৎসব-সমিতি একটি বিবৃতি দান করেছেন। যে-কোন ব্যক্তি ২ টাকা চাঁদা দিয়ে এই উৎসবের সভ্য হতে পারেন। উৎসব সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য কার্যকরী সমিতির কার্যালয়ে (১০৭ লোয়ার সার্কুলার রোড) বৈকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত যোগাযোগ করা যেতে পারে।

নাট্যাভিনয়

'সুন্দরম্' নাট্য সংস্থা গত ১৪ই ও ১৫ই নবেম্বর থিয়েটার সেণ্টারে তাঁদের প্রথম বার্ষিক একাংক নাট্য উৎসব ও

বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন সার্থকভাবে সুসম্পন্ন করেন। প্রথম দিন মনোজ মিত্রের বলিষ্ঠ বক্তব্যমূলক নাটক "মৃত্যুর চোখে জল" এবং দ্বিতীয় দিন অতনু সর্বাধিকারীর মনস্তত্ত্বমূলক নাটক "সিঁড়ি" মঞ্চস্থ হয়। প্রথমটি থিয়েটার সেন্টার প্রতিযোগিতায় এবং দ্বিতীয়টি বিশ্বরূপা গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় উচ্চ প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। দুটি নাটকের দলগত অভিনয় এবং বাস্তিকতা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে শিল্পায়নে সুরেন চক্রবর্তী এবং রূপসজ্জায় অনন্ত দাস-এর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। অভিনয়াংশে মনোজ মিত্র, অমিয় মুখার্জী ('মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে) এবং পার্থ-প্রতিম, দিলীপ বন্দ্যোঃ, সুনন্দা মজুমদার, বাদল চ্যাটার্জী ('সিঁড়ি'তে) অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দুটি নাটকের নির্দেশনায় পার্থপ্রতিম চৌধুরীর কুশলতা অনস্বীকার্য।

• • •

হাওড়া যুব সভা আয়োজিত আট দিন-ব্যাপী নাটক সম্মেলন গত ৮ই নবেম্বর থেকে ১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১৪টি নাট্য সংস্থার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও সংস্থা-গুলি পুরস্কৃত হয়। নাট্যকারঃ ১ম—সন্তোষ রাহা (মরীচিকা), ২য়—সুধীন বসু (মুখোস)। সমষ্টিগত অভিনয়ে ১ম—সব্যসাচী, ২য়—বিবর্তনী। রূপসজ্জায় ১ম কেশব চক্রবর্তী (বিবর্তনী), ২য়—সব্যসাচী। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী—সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় ও দেবশ্রী চট্টোপাধ্যায় (সব্যসাচী)। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রী—তিনু ঘোষ (কৌতুকচক্র) ও লতিকা বসু (কণ্টকচক্র)। শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালক—সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবর্তনী)। ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই নবেম্বর রূপতীর্থ, যুব-সভা ও তরুণ শিল্পী সংসদ কর্তৃক যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', অমৃত-লালের 'কৃপণের ধন' ও সুকুমার রায়ের 'চলচিত্ত চঞ্চরী' সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। ১৩ই ও ১৫ই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ। ১৫ই পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করেন যুব-সভার সভাপতি প্রফুল্লকুমার সরকার।

• • •

গত ১৫ই নভেম্বর রামরাজাতলায় হাওড়ার অন্যতম প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা হাওড়া আমেচার্স গোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত "ঠাকুর্দা" ও রমেন লাহিড়ী রচিত "রাজ-রোটক" নাটক দুটি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করেন। অভিনয়ে গোপাল মুখার্জি, নারায়ণ লাহিড়ী, অনিল লাহিড়ী, জীবন কর্মকার ও স্বর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। অন্যান্য ভূমিকায় বরীন, কানাই, হীরেন ও মানিক মৈত্র সু-অভিনয় করেন। এই উপলক্ষে সংগৃহীত ৩১২, টাকা বন্যাত্রাণে দান করা হয়।

• • •

অভিনেতৃ সংঘের সম্পাদক মিহির ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশার্থে পাঠিয়েছেন:

অভিনেতৃ সংঘ বন্যাত্রাণ তহবিলে ইতি-মধ্যেই আমাদের কিছু সংখ্যক দরদী শিল্পীর নিকট হতে ভালই অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। যে সকল শিল্পী এই মহৎ দান-কার্যে এখনও নীরব আছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে সংঘের অফিসে তাঁরা যেন তাঁদের সাধ্যমত অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দেন।

বিবিধ সংবাদ

গত সোমবার রঙমহলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর "এক মুঠো আকাশ"-এর শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। এতদুপলক্ষে সংগীতসাধক শ্রীদিলীপকুমার রায় ও তাঁর শিষ্য-শিষ্যার সংগীতানুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেদিনকার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ এবং শিল্পী ও কর্মীদের দেয় পারিতোষিকের সমুদয় টাকা—একুনে ৩,১২৬ টাকা ৩৩ নয়া পয়সা—ভারত সেবাশ্রম সংঘের বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে দান করা হয়। শ্রীতরুণ রায় ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই রঙমহলে মধ্য-সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসাবে নতুন নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করা হবে।

* * *

দিল্লির সংগীত কলামন্দিরের উদ্যোগে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব গ্রাউণ্ডে গত ১৩ই নভেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী "রামলীলা" অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। খোলা জায়গায় বিরাট এক মঞ্চের ওপর এই ধরনের অনুষ্ঠান কলকাতায় এই প্রথম। সমগ্র রামায়ণের কাহিনী সতেরোটি দৃশ্যে রূপায়িত করা হয় নৃত্য গীত ও নেপথ্য-আবৃত্তির মাধ্যমে। প্রয়োগ-নৈপুণ্যে "রামলীলা"র এই অভিনব অনুষ্ঠান মনে রাখবার মত। গুরু গোপীনাথ নৃত্য পরিচালনা করেন। যন্ত্র সংগীত ও কণ্ঠ সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন যথাক্রমে সুশীল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। প্রধানমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

* * *

আগামী ২৯শে নবেম্বর সকাল ৯টায় রূপবাণীতে "উল্টোরথ" পত্রিকার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে "উল্টোরথ" পাঠকদের ভোটে ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে যাঁরা শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীর সম্মান পেয়েছেন তাঁদের "উল্টোরথ" পুরস্কার দেওয়া হবে। এই সঙ্গে একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বি এন পি এ সভাপতির বন্যার্ত সাহায্য তহবিলে দেওয়া হবে।

নতুন রেকর্ড

এবার "হিজমাস্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া যে সমস্ত রেকর্ড প্রকাশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

"হিজমাস্টার্স ভয়েস"

এন ৮২৮৪০ মান্না দের কণ্ঠে আধুনিক গান। এন ৮২৮৪১ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান। এন ৮২৮৪২ শ্রীমতী উৎপলা সেনের দুখানি আধুনিক গান। এন ৮২৮৪৩ দুখানি পল্লীগীতি গেয়েছেন সনৎ সিংহ। এন ৮২৮৪৪ শ্যামল মিত্রের আধুনিক ও পল্লীগীতি। এন ৮২৮৪৫ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান। এন ৮২৮৪৬ মহম্মদ রফির গাওয়া আধুনিক গান। এন ৮২৮৪৭ বাসবী নন্দীর কণ্ঠে আধুনিক গান। এন ৮২৮৪৮ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ ও পবিত্র মিত্র অভিনীত কৌতুক নক্সা। এন ৮২৮৪৯ শ্রীমতী ইলা [illegible] (বসু) দুখানি আধুনিক গান।

কলম্বিয়া

জি ই ২৪৯৬৬ দুখানি আধুনিক গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। জি ই ২৪৯৬৭ আশা ভোঁসলের আধুনিক গান। জি ই ২৪৯৬৮ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান। জি ই ২৪৯৬৯ আধুনিক গান—গেয়েছেন গীতা দত্ত (রায়)। জি ই ২৪৯৭০ পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে শ্যামা সংগীত। জি ই ২৪৯৭১ গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কীর্তন গান। জি ই ২৪৯৭২ দুখানি আধুনিক গান গেয়েছেন শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর। জি ই ২৪৯৭৩ গায়িত্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পল্লী ও আধুনিক গান। জি ই ২৪৯৭৪ তালাত মাহমুদের গাওয়া আধুনিক গান।

একলব্য

পাকিস্তান সফর শেষ করে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারত সফরের জন্য ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে দিল্লিতে এসে পৌঁছুচ্ছে। ১৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে গড়া অস্ট্রেলিয়ান দল ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে সমশক্তিসম্পন্ন এবং সু-গঠিত একটি ক্রিকেট দল। দলের ম্যানেজার স্যাম লক্সটন ভিক্টোরিয়া পার্লামেণ্টের একজন সদস্য এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড়।

ইংলণ্ডের কাছ থেকে 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধারে গতবার অস্ট্রেলিয়ার যে সব খেলোয়াড়ের অবদান ছিল বেশী সেইসব খেলোয়াড়কে নিয়েই ভারত ও পাকিস্তান সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দল গঠন করা হয়েছে। সুতরাং এঁদের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের শক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। এমন শক্তিসম্পন্ন কোন দল এর আগে ভারত সফর করেছে কি না সন্দেহ। যে ইংলণ্ড দলের কাছে এবার আমরা পাঁচটি টেস্টেই হার স্বীকার করেছি সেই ইংলণ্ড দলকেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে চারটি টেস্টে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, একটি খেলার ফলাফল ছিল অমীমাংসিত। বোধ-করি অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংলণ্ড টীম ছিল আরও শক্তিশালী। অর্থাৎ আমরা ইংলণ্ডের যে টীমের কাছে হেরেছি সে টীম কিছুটা হেলাফেলা করেই গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টের মর্যাদার লড়াইয়ে ইংলণ্ড গঠন করেছিল তার শ্রেষ্ঠ টীম। সেই ইংলণ্ড দলও অস্ট্রেলিয়ার হাতে পার পায়নি। সুতরাং আমরা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কেমন খেলব আগে থেকেই তার একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। তবু ক্রিকেট ইজ এ গেম অব গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটি। মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার বিশেষত্ব। তা ছাড়া সমালোচক-দের সমালোচনার উপরে আর সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনার আগুনে ভারতীয় ক্রিকেটের মরা খাদ অনেকখানি জ্বলে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের নিজেদের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। একটু আত্মপ্রত্যয় এবং একটু দৃঢ়তা নিয়ে খেললে হয়তো আমাদের খেলোয়াড়দের তেমন হাস্যাস্পদ হতে হবে না, যেমন হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে ইংলণ্ডে।

যাই হক অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়-দের কথাতেই ফিরে আসা যাক। বেরী জারম্যান এবং গেভিন স্টিভেন্স ছাড়া অস্ট্রেলিয়া দলের সমস্ত খেলোয়াড়েরই টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। গর্ডন রোরকে এবং নরম্যান ওনীল হচ্ছেন দলের দুই কনিষ্ঠ খেলোয়াড়। বয়োঃজ্যেষ্ঠ হচ্ছেন রে লিণ্ডওয়াল। ১৫ জন খেলোয়াড়ের গড় বয়সের হিসাব ২৮ বছর ৩ মাস।

আগেই বলেছি অস্ট্রেলিয়া দল সমশক্তি সম্পন্ন এবং সুগঠিত একটি শক্তিশালী ক্রিকেট দল। দলের ৪ জন ফাস্ট বোলার হচ্ছেন—এলান ডেভিডসন, রে লিণ্ডওয়াল, গর্ডন রোরকে ও আয়ান মেকিফ। অধিনায়ক রিচি বিনোড ও লিণ্ডসে ক্লিন দুই খ্যাত-নামা স্পিন বোলার। ওয়ালী গ্রাউট ও বেরী জারম্যান দুই উইকেট কীপার। প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান হিসাবে যাদের খ্যাতি আছে, তারা হচ্ছেন কলিন ম্যাকডোনাল্ড, নরম্যান ওনীল, নীল হার্ভে, কেন ম্যাকে, গেভিন স্টিভেন্স, লেস ফেভেল ও পিটার বার্জ। ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়াল এবং দুই উইকেট কিপার গ্রাউট ও জারম্যানেরও ব্যাটসম্যান হিসাবে খ্যাতি আছে। অধিনায়ক বিনোড এবং ডেভিডসন বিশ্বের দুই কীর্তিমান অলরাউণ্ড খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাত। প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান ছাড়া ম্যাকে এবং ওনীলের বোলিংয়েও হাত আছে।

অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অধিনায়ক রিচি বিনোড, কলিন ম্যাক-ডোনাল্ড, এলান ডেভিডসন, রে লিণ্ডওয়াল, নীল হার্ভে, পিটার বার্জ ও কেন ম্যাকে ১৯৫৬ সালে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফেরবার পথে ভারত সফর করে গেছেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতার দর্শকরা এদের খেলা দেখারও সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু অস্ট্রে-লিয়া দলের বাকী ৮ জন খেলোয়াড় ভারতে নবাগত। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নরম্যান ওনীলের খেলা দেখার আকর্ষণই সবচেয়ে বেশী। দুই ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফ ও গর্ডন রোরকের আকর্ষণও কম নয়। পাকিস্তান ও ভারতের সবাই আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে এদের খেলা দেখবার জন্য।

ক্রিকেট খেলা অস্ট্রেলিয়াবাসীর সমাজ-জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ১৮০৩-০৪ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে এরও আগে। এ কথা ধারণা করা অসংগত নয় যে ১৭৮৮ সালে ইংলণ্ড থেকে নতুন দেশে যাঁরা বসতি স্থাপন করতে এসেছিল তারা সঙ্গে করেই এনেছিল ক্রিকেটের ব্যাট, বল আর স্ট্যাম্প।

*   *   *

অস্ট্রেলিয়ায় এখন এক কোটি লোকের বাস। এর মধ্যে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। কলকারখানার মজুরও অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলে। তাদের সংখ্যাও হাজার হাজার। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রথম একটি ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফর করতে যায় ১৮৬৮ সালে। কিন্তু এ দলের খেলা টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা পায় না। ১৮৭৬ সালে লিলিহোয়াইটের ইংলণ্ড টীমের অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার সূত্রপাত হয়। ক্রিকেটের মহা-গ্রন্থ 'উইসডেন' অনুযায়ী ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৭৮টি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে অস্ট্রে-লিয়া জিতেছে ৭৪টি খেলায়, ইংলণ্ড ৬২টিতে, ৪২টি খেলার জয়পরাজয় মীমাংসিত হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া খেলেছে ৩৯টি টেস্ট। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ২৭টি খেলায়, দক্ষিণ আফ্রিকা ৩টিতে, ৯টি টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৫টি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ১১টি টেস্ট খেলায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে দুটিতে, দুটি খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি হয়নি। এ সফরের আগে পাকি-স্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া যে একটি টেস্ট খেলেছে সে টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারত খেলেছে ৮টি টেস্ট—অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচটি ও ভারতে তিনটি। এর মধ্যে ভারত একটি খেলাতেও জিততে পারে নি। অস্ট্রে-লিয়া জিতেছে ৬টি খেলায়। দুটি খেলার জয়পরাজয় মীমাংসিত হয়নি।

•   •   •

পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া দলের টেস্ট খেলা আরম্ভের সংগে সংগে ভারতেও ক্রিকেট সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। তাই এ সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই লেখা শেষ করছি। সব খেলোয়াড়দের জীবনের খুঁটিনাটি এক সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই পর পর সংখ্যায় সমস্ত খেলোয়াড়দের জীবনী প্রকাশের ইচ্ছে রইলো।

রিচি বিনোড

বিশ্বের খ্যাতনামা চৌখস খেলোয়াড় রিচি বিনোডের বয়স মাত্র ২৮ বছর। ইনি সিডনীর একজন সাংবাদিক। ইংলন্ডের

অধিনায়ক রিচি বিনোড

বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচিত অধিনায়ক আয়ান ক্রেগ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে ইংলন্ডের প্রবল পরাক্রান্ত ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে অধিনায়কত্ব করবার জন্য রিচি বিনোডের ডাক পড়ে। বিনোডের অধিনায়কত্বে ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার হয়। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংলন্ড পরাজিত হয় চারটি খেলায়। যোগ্য এবং আক্রমণমুখী অধিনায়করূপে বিনোড দেশে বিদেশের ক্রীড়াপণ্ডিতদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

অস্ট্রেলিয়ার সমাজ জীবনের সংগে ক্রিকেট খেলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইংলন্ডের মত অস্ট্রেলিয়াবাসীর রক্তের সংগেই মিশে আছে ক্রিকেটের নেশা। কথাটা বোধ করি অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বিনোডের ক্ষেত্রে বেশী করেই প্রযোজ্য। কারণ রিচির বাবা লু বিনোডও ছিলেন একজন নামকরা খেলোয়াড়। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তাঁর টেস্ট খেলার সুযোগ ঘটেনি। তবে সিডনীর নিকটস্থ 'এমু প্লেনে' আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে লু বিনোডের বোলিংয়ের যে রেকর্ড আছে বিশ্বের মাত্র দু' একজন বোলারের পক্ষেই সে রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে। এ খেলায় লু বিনোড একাই দু' ইনিংসের ২০টি উইকেট দখল করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ৩৩ রানে ১০টি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন ৩৫ রানে ১০টি উইকেট। বাপ ও ছেলে 'লু' ও 'রিচি'কে এখনো সিডনীতে এক সংগে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়। অবশ্য ছেলে অংশ গ্রহণ করেন প্রথম শ্রেণীর খেলায়, বাবা দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলায়।

লু বিনোডের অধিনায়কত্বে তাঁর স্কুল সর্বপ্রথম স্কুল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছিল। ২৩ বছর পর 'রিচি'র অধিনায়কত্বে সেই স্কুল আবার চ্যাম্পিয়ানশিপ পায়। স্কুল-জীবনের শেষ বছরে রিচি বিনোড নিউ সাউথ ওয়েলসের জুনিয়ার টীমে খেলার সুযোগ পান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। দু' বছর পরে শেফিল্ড শীল্ডে কুইন্সলান্ড দলের বিরুদ্ধে তিনি নিউ সাউথ ওয়েলসের সিনিয়ার টীমে খেলবার অধিকার পান। ভিক্টোরিয়ার সংগে পরের খেলায় বিনোড ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করবার সময় মাথায় এমন আঘাত পেয়েছিলেন যে আঘাত তাঁর ক্রিকেট জীবনের উপর ইতি টানবার উপক্রম করেছিল। হাসপাতালে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। কয়েক সপ্তাহ অসুস্থ থাকবার পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

১৯৫১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বিনোড সর্বপ্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। এবারের পাক-ভারত সফরের আগে পর্যন্ত বিনোড অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩৭টি টেস্ট খেলেছেন এবং উইকেট পেয়েছেন একশ তিরিশের বেশী আর রান করেছেন এক হাজার একশ তিরিশের উপর। ব্যাটসম্যান অপেক্ষা বোলার হিসাবেই বিনোডের খ্যাতি একটু বেশী। এর লেগ স্পিন খেলা খুবই কষ্টকর। গতবার ইংলন্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় বিনোডই উইকেট পেয়েছেন (৩১টি) সবচেয়ে বেশী। অবশ্য বোলিং অ্যাভারেজে এর স্থান ছিল দ্বিতীয়। রিচি বিনোড বন্ধুবৎসল, সদালাপী এবং সুন্দর স্বভাবের একজন বিশ্বখ্যাত চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়।

নরম্যান ও'নীল

উঠতি খেলোয়াড় নরম্যান ও'নীল অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নামে অভিহিত। ১৯৫৭-৫৮ সালে ও'নীলের বয়স ছিল যখন মাত্র ২০ বছর তখন শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় হাজার রান পূর্ণ করলে অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় বিল ও'রেলী ও'নীলকে নতুন "ব্র্যাডম্যান" নামে অভিহিত করেন। ও'নীলের আগে বা পরে একমাত্র ডব্লিউ পনসফোর্ড ও ব্র্যাডম্যান ছাড়া এক মরসুমে শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় আর কেউ হাজার রান পূর্ণ করতে পারেন নি। এ বছরের ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিষয়েই ও'নীলের নাম ছিল সবার আগে।

'অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট পণ্ডিতদের অভিমত: বহু খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়ের জন্মভূমি অস্ট্রেলিয়ায় ও'নীলের মত সুনিপুণ ব্যাটসম্যান খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেনি। এর ব্যাটিংয়ের যেমন জোর তেমনই চটক।

নতুন 'ব্র্যাডম্যান' নরম্যান ও'নীল

স্পিন বোলিংয়েও চমৎকার হাত আছে। আর ফিল্ডিং? নিপুণ ফিল্ডসম্যানদের মধ্যে ও'নীল একজন সুনিপুণ ফিল্ডসম্যান। নীল হার্ভে ও ও'নীলের একত্রে 'কভারে' ফিল্ডিং করবার দৃশ্য জীবনে কারো ভোলবার কথা নয়।

গত বছর ইংলন্ডের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়ার 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের মূলে ও'নীলের অবদান বিশেষভাবেই উল্লেখ করবার মত। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টের ৭ ইনিংসে খেলার সুযোগ পেয়ে ও'নীল ২৮২ রান করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রান ছিল ৭৭। দু'বার ও'নীল নট আউট ছিলেন। গত বছর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ২১টি ইনিংসে ও'নীল ৯৮২ রান করেছেন। অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার ব্যাটিং অ্যাভারেজে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এ'র স্থান ছিল দ্বিতীয়।

নরম্যান ও'নীল সিডনীর একজন সেলসম্যান। বয়স মাত্র ২২ বছর। দীর্ঘ কান্তি, প্রিয়দর্শন যুবক। নিউ সাউথ

ওয়েলস দলের খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়া এর উপর অনেক আশা রাখে।

গর্ডন রোরকে

মনম্যান ও'নীলের মত গর্ডন রোরকেও নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলোয়াড় এবং সিডনীর একজন সেলসম্যান। বয়সও ২২ বছর। কিন্তু ও'নীলের সঙ্গে রোরকের আকৃতিগত পার্থক্য অনেকখানি। রোরকের দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। অস্ট্রেলিয়া দলের সবচেয়ে দীর্ঘদেহী বোলার। চুলের রং কটা।

রোরকে ডান হাতের ফাস্ট বোলার। এত ফাস্ট যে বল চোখে দেখা কষ্টকর। কিন্তু

দীর্ঘদেহী ফাস্ট বোলার গর্ডন রোরকে

রোরকে এত জোরে বল করলেও বেশী দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করেন না। মাত্র কয়েক পা দৌড়ে এসেই আকাশ থেকে বল ছেড়ে দেন, আকাশেই বল সুইং করে মাটিতে পড়ে এবং ব্যাটসম্যানের পায়ের দিকে চলে যায়। রোরকের বল খেলা বেশ শক্ত।

গত বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেই রোরকে প্রথম টেস্টে খেলার সুযোগ পান। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইনি দু'টি টেস্ট খেলেছিলেন এবং ১৬৫ রানে দখল করেছিলেন ৮টি উইকেট। বোলিংয়ের অ্যাভারেজ হয়েছিল ২০·৬।

রে লিণ্ডওয়াল

ব্রিসবেনের ৩৮ বছর বয়স্ক ফাস্ট বোলার রে লিণ্ডওয়াল ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়। শুধু বয়সেই জ্যেষ্ঠ নয়—

অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলার রে লিণ্ডওয়াল

অভিজ্ঞতায়ও পরিপক্ক। আজ পর্যন্ত লিণ্ডওয়াল যত উইকেট দখল করেছেন বিশ্বের কোন ফাস্ট বোলার টেস্ট ক্রিকেটে এত উইকেট দখল করতে পারেন নি। ৫৭টি টেস্ট খেলায় লিণ্ডওয়াল পেয়েছেন ২১৯টি উইকেট; বিশ্বের একজন মাত্র বোলার টেস্ট খেলায় এর চেয়ে বেশী উইকেট দখল করেছেন। ইনি হচ্ছেন ইংলণ্ডের এলেক বেডসার। বেডসার দখল করেছেন ২৩৬টি উইকেট। অবশ্য পাকিস্তান ও ভারত সফরের ৮টি টেস্ট খেলায় লিণ্ডওয়াল বেডসারের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারবেন বলে আশা রাখেন।

গত বছর ইংলণ্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার জন্য প্রথমে লিণ্ডওয়ালের ডাক পড়েনি। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকমণ্ডলী মনে করেছিলেন, লিণ্ডওয়ালের বোলিংয়ের গৌরবময় অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে শেষ দু'টি টেস্টের জন্য লিণ্ডওয়ালের ডাক পড়ে এবং তিনি ২০৯ রানে ৭টি উইকেট দখল করেন। মারমুখী ব্যাটসম্যান হিসাবেও লিণ্ডওয়ালের খ্যাতি আছে। টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত লিণ্ডওয়াল হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেও করেছেন একবার শতরান।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে লিণ্ডওয়াল ও কিথ মিলারের ফাস্ট বোলাররূপে একত্রে আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। ক্রিকেট পণ্ডিতদের মতে এ রকমের দুজন ফাস্ট বোলারের একই দলে সমাবেশ খুব বেশী ঘটেনি। লিণ্ডওয়াল এখন নিউ সাউথ ওয়েলস দল ছেড়ে কুইন্সল্যাণ্ডে এসেছেন। ইনি কুইন্সল্যাণ্ডের অধিনায়ক।

পিটার বার্জ

২৭ বছর বয়স্ক ব্রিসবেনের এ্যাকাউণ্টেণ্ট পিটার বার্জ কুইন্সল্যাণ্ডের দীর্ঘদেহী ব্যাটসম্যান। এর হাতে সবরকমের মার আছে। মারের জোরও ফিল্ডসম্যানের পক্ষে ভয়ের কারণ। পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে বার্জ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। অবশ্য নিজের দেশে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইনি বেশী টেস্ট খেলেন নি। গতবার একটি এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে একটি খেলায় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একে অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বিদেশে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইনি খেলেছেন তিনটি টেস্ট, ভারতের বিরুদ্ধে

উদীয়মান ব্যাটসম্যান পিটার বার্জ

তিনটি আর দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি করে টেস্ট। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার আন্তঃ রাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যাটিং অ্যাভারেজে বার্জের স্থান ছিল চতুর্থ। ১৩টি ইনিংসে সর্বোচ্চ ১৭১ রান সমেত বার্জ করেছিলেন ৭১৯ রান। ১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৫৪·৪৫ রানের অ্যাভারেজে বার্জের মোট ৫৯৯ রান লাভের বিষয় উল্লেখযোগ্য। ফিল্ডসম্যান হিসাবেও পিটার বার্জের বেশ খ্যাতি আছে। মারের চটক দর্শকচোখের আনন্দদায়ক।

দেশী সংবাদ

৯ই নবেম্বর—ভারত-চীনের সীমারেখা ম্যাক-মেইন লাইনের দুই দিকে ২০ কিলোমিটার (প্রায় ১২ মাইল) দূরে নিজ নিজ দেশের সৈন্যদল সরাইয়া লওয়ার জন্য চীন ভারতের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া নিউ চায়না এজেন্সির এক সংবাদে আজ জানানো হয়।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পাইল নির্মাণ সম্পর্কে গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতির খবর প্রকাশিত হইবার পর কেন্দ্রীয় সরকার এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐ কমিটির রিপোর্টের ফলে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্যে নিযুক্ত বিদেশী কোম্পানীর অন্যতম প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

১০ই নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ আগ্রায় বলেন যে, ভারতীয় এলাকার যে বৃহৎ অংশ চীন দাবি করিয়াছে ভারত তাহা মানিয়া লইতে পারে না। তিনি বলেন, "আমরা চীনকে আমাদের বুকের উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইতে দিব না।"

কৃষক নামে এক নূতন ধরনের বিমান নির্মাণের ফলে হিন্দুস্থান বিমান নির্মাণ কারখনায় বিমান নির্মাণ এক নূতন পর্যায়ে পৌঁছাইল।

১১ই নবেম্বর—মহানগরী কলিকাতায় মানুষের প্রাণ লইয়া কি রকম উন্মত্ত ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে—তার প্রমাণ পাওয়া গেল অদ্যকার দুইটি ঘটনায়। অদ্য দুপুরের দিকে চিত্তরঞ্জন এভেনিউর একটি জনবহুল স্থানে কোন অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে এক মাদ্রাজী রেস্তোরাঁর মালিক প্রাণ হারান। রাত্রিকালে ডাফ স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ-স্থলে বোমা মারিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ আর এন চৌধুরীর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়।

১২ই নবেম্বর—ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনা সুগম করার জন্য শ্রী চু এন লাই সীমান্ত বাহিনী অপসারণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন ভারত সরকার সম্ভবত তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মিশনের পক্ষ হইতে বৃহত্তর কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জল সরবরাহ, আবর্জনা পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণাদি ব্যবস্থা। সংক্রান্ত ব্যাপারে এক শত কোটি টাকার এক পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে।

১৩ই নবেম্বর—কেন্দ্রীয় সহকারী অর্থমন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ আজ তেজপুরে বলেন যে, সরকারের কর নির্ধারণ নীতি "সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত" এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা-সমূহের সাফল্য সুনিশ্চিত করাই উহার উদ্দেশ্য।

অদ্য ভিলাই ইস্পাত কারখানায় ব্লুমিং মিলগুলির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ব্লুমিং মিলগুলি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিলাই ইস্পাত কারখানার তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হইল।

১৪ই নবেম্বর—কর্তৃপক্ষ মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, অদ্য সকাল ১০টায় হট স্প্রিং-এর নিকটে চীনা সৈন্যদল একদল ভারতীয় সীমান্ত পুলিসের নিকট পুলিস অফিসার শ্রীকরম সিং সহ দশজন বন্দী ভারতীয় পুলিস এবং নয়জন নিহত পুলিসের মৃতদেহ প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

কম্যুনিস্ট পার্টি আজ মীরাটে ম্যাকমেহন লাইনকেই ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমারেখা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কেও পার্টি নেহরু সরকারের নীতি সমর্থন করিয়া বলিয়াছে, এক্ষেত্রে চিরাচরিত সীমারেখাই মানিয়া লওয়া উচিত।

১৫ই নবেম্বর—অদ্য কলিকাতায় মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীহেমন্তকুমার বসু ঘোষণা করেন যে, অতঃপর ফরওয়ার্ড ব্লক ভারতীয়-কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত একযোগে আর কোন আন্দোলনে যোগ দিবে না।

আসামের উত্তরাংশে ম্যাকমেহন লাইন বরাবর চীন কর্তৃপক্ষের তৎপরতার ফলে তাহাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তথা সমগ্র আসামের জনগণের মধ্যে শংকা ও সন্দেহ দেখা দিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৯ই নবেম্বর—উত্তর জাপানের নিগাটাকান অঞ্চলের ৮২ বৎসর বয়স্ক চাষী মাসিমুরীর দাঁত ও মাথার চুল উভয়ই দুই বৎসর পূর্বে পড়িয়া যায়। কিন্তু এখন তার ১২টি নূতন দাঁত গজাইয়াছে এবং মাথায় নূতন চুলের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া উহা ঘটে নাই। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইহা ঘটিয়াছে।

বিশিষ্ট মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর উইলিয়াম সিণ্টন একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ জীবনের ব্যাপক অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন। মঙ্গলগ্রহের বৃক্ষলতা পৃথিবীর বৃক্ষলতা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র এবং সম্ভবত উন্নত ধরনের।

১০ই নবেম্বর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন, সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদামীর কৃষ্ণসাগরীয় গবেষণা পরিষদ ভূমধ্যসাগরের সর্বাধিক গভীরতা ১৫৭৫০ ফুট বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

পশ্চিম তিব্বতের বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার থলিংগ মঠের প্রধান লামাকে গ্রেপ্তার করিয়া গড়গুন্সায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মঠের অন্যান্য লামাগণ পলাইয়া ভারতে উপনীত হইয়াছেন।

১১ই নবেম্বর—ওমডারমান বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, একদল সামরিক অফিসার সুদান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেতারে আরও প্রকাশ, একটি পদাতিক বাহিনীর শিক্ষণালয়ের ছাত্রদের সহায়তায় বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অন্যান্য সেনারা তাহা কঠোর হস্তে দমন করে।

১২ই নবেম্বর—সোভিয়েট সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন যে, আগামী ২২শে ডিসেম্বর হইতে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীফুজিয়ামা পার্লামেণ্টে বলেন যে, জাপানের কোন এলাকার উপর যদি সশস্ত্র আক্রমণ ঘটে, তবে প্রস্তাবিত জাপ-মার্কিন নূতন নিরাপত্তা চুক্তি অনুযায়ী তাহা প্রতিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিবে।

১৩ই নবেম্বর—মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব শ্রীক্রিশ্চিয়ান হার্টার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র স্বভাবতই মনে করে যে, চীনের সহিত সীমান্ত বিরোধে ভারতের দাবি সম্পূর্ণ বৈধ।

ভারত আজ তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর সরকার কর্তৃক জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পাকিস্তান অধিকৃত এলাকায় কতকগুলি সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করার সংবাদের প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—ভারতে ২৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ডলারের উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য বিক্রয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে প্রধানত আটা ও গম বিক্রয় করিবে।

১৫ই নবেম্বর—মরক্কোর স্বাস্থ্য দপ্তর ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিমানের তৈল মিশ্রিত রান্নার তৈল ব্যবহার করার ফলে প্রায় দশ হাজার মরক্কোবাসী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। অসুস্থদের মধ্যে ছয় হাজারের অধিক লোক পায়ের আংশিক পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

দেবতার কাছাকাছি...

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা ওঁর কাছে প্রায় ধর্ম্মের সামিল। পূজার্চ্চনায় যাবার আগে গোদরেজ স্যাণ্ডেল দিয়ে স্নান করা ওঁর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। গোদরেজ স্যাণ্ডেল ছাড়া অন্য কোন সাবানই উনি ব্যবহার করেন না, কেননা ওটা নিশ্চিত-ভাবে জান্তব চর্ব্বি থেকে মুক্ত।

কোমলকারক ভেজিটেবল অয়েলের সাবানে বিশুদ্ধ মহীশূর স্যাণ্ডেলউড অয়েল যুক্ত হয়ে গোদরেজ স্যাণ্ডেল সাবানকে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। ভেজিটেবল্ অয়েল টয়লেট সাবানের প্রস্তুতকারকদের অগ্রগামী কর্ত্তৃক তৈরী এই সাবানে চটপট প্রচুর ফেনা হয় যা শীতল ও স্নিগ্ধ করে এবং এর খাঁটি চন্দনের গন্ধটি অনেকক্ষণ থাকে...

গোদরেজ স্যাণ্ডেল আপনাকে দামের পুরো মূল্য দেয়।

সাবানের
জগতে
সেরা
নাম।

বর্ষ] শনিবার, ২৭ কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 14th November, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা
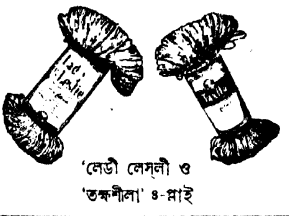
লাল-ইমলি উলের পোশাকে ফ্যাশানদুরস্ত দেখাবে
—আরাম পাবেন
বাড়ীর সবার জন্তে তুলোর মত
কোমল ও মোলায়েম লাল-ইমলি
উলের পোশাক বুমুন।
বিদেশ থেকে উল সুতো আনিয়ে
বিশেষ ধরনে তৈরী লাল-ইমলি
উলের মসৃণ ও নরম পোশাক
সব্বার পছন্দ হবে।
তার চেয়েও বড় কথা, লাল-ইমলি
উলের আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর রঙের
কথা ফ্যাশন দুরস্ত মহলে
এখন সবার মুখে মুখে। নানান
ধরনের উল পাবেন—মিহি
'কাউন্টেস' উল ৩-প্লাই আর
'লেডী লেস্‌লী' ও
'তক্ষশীলা' উল ৪-প্লাই।
লাল-ইমলি
উল
'কাউন্টেস
৩-প্লাই
'লেডী লেস্‌লী ও
'তক্ষশীলা' ৪-প্লাই
রেডিমেড উলের পোশাক
বুনবার সময় পান না?
কিন্তু হাল-ফ্যাশানের চমৎকার
উলের পোশাক পরতে হয়তো
আপনি ভালবাসেন।
লাল-ইমলি উলের হরেক রকম
রেডিমেড পোশাক পাওয়া যায়
—পছন্দ মতো বেছে নিন।
ট্রেড মার্ক
দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি

LAL 3361

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমাহারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারীত্রাতা মোহন (১২) রহস্য-সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোশ মোহন (১৪) মোহনের আর্তনাদ (১৫) মোহন ও জল্লাদ (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহান্ত দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত সংঘর্ষ (২০) গেষ্টাপো যুদ্ধে মোহন প্রভৃতি ২০৪ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ২৲

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েকখানি বিখ্যাত রহস্যোপন্যাস। প্রত্যেকটি ২।০

চীনের নব-নায়ক

জুলের হীরার হুল

মুগুরে দাওয়াই

অদৃশ্য সংগ্রাম

সাংঘাতিক উইল

আর্ম্মেনিয়ার মর্ম্ম ভেদ

ভীষণ বিভীষিকা

নরপশু ও নাতালী

শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবীর উপন্যাস

নতুন দিনের আলো

ব্রিটিশ রাজ্যেক্রান্ত আদেশ প্রত্যাহৃত! ৩৲

রণাঙ্গনী নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্তের

অরুণ-মহল (রহস্যোপন্যাস) ২৲

বাঙলার মেয়ে—আশালতা ২৲

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নবতম

মরণের পরে

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, কেমন থাকে, তার চিত্তবৃত্তির কোন পরিবর্তন হয় কি না...গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত এই সব বিবরণ পড়লেই জানতে পারবেন। পড়ুন—মিনার্ভা থিয়েটারে স্বর্গীয় গিরিশ-চন্দ্র ও দেবকণ্ঠ বাগচীর সম্মুখে ব্রহ্মদৈত্য ...মহারাজা নন্দকুমারের পৌত্র কর্তৃক সঙ্গীতে অপূর্ব সুর-সংযোজন, নিশীথ রাত্রে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দরী তরুণী ছায়ামূর্তি ধরিবার বৃথা চেষ্টা, মহর্ষি বিজয়কৃষ্ণের সমক্ষে মনোরঞ্জন গুহের অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মূল্য ২·২৫।

ওপারের আলো

পরলোক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা তো আছেই, তদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক ও মিডিয়াম কর্তৃক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সংঘটিত বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ পড়ুন। ২·২৫

অঘটন যা দেখেছি

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। এই সব অলৌকিক কাহিনী পড়তে পড়তে আপনি বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। মূল্য ২।০

শ্রীশৈলেশ বিশী বি-এল রচিত

শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের জীবন ছড়িয়ে রয়েছে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে। কোন চরিত্র কখন কি করে শরৎচন্দ্রের জীবনে এসে দেখা দিয়েছিল, তা জানতে পারবেন এই গ্রন্থে। ৪৲

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

শ্রীকান্ত, অভয়া, কমল, অচলা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলির মূল কোথায়? সর্বোপরি বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন—রাজলক্ষ্মী, পিয়ারী বাইজি কি তাঁর জীবনের মূলাধার? সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন এই গ্রন্থে। ২৲

সুভাষ-স্মৃতি ২৲

বিশ্ব-গল্পিকা গ্রন্থমালা

(বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন)

ফরাসী শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ২৲

জার্মানীর শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১॥০

ইংরাজী শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১॥০

ইটালীর শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১॥০

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১॥০

রুশ-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১॥০

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প, ১॥০

বালজাকের শ্রেষ্ঠ গল্প, মূল্য ১॥০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নবতম

ওপার থেকে আসেন

জড়জগতে এসে আত্মাদের বিচিত্র সব কার্যকলাপ—দেশী, বিদেশী দৃষ্টান্ত দ্বারা অজ্ঞাত জগতের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত। ২।০

মৃত্যুহীন-প্রাণ

দেহাবসানেই যে মানুষের সব শেষ হয় না, তার পরেও যে জড়-জগতের সঙ্গে যোগা-যোগ কত অদ্ভুত উপায়ে হয়ে থাকে, তার বহু বিচিত্র আখ্যান পড়ুন। ২·২৫

ভূতে পাওয়ার কাহিনী

দেশী প্রথায় তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ভূত তাড়ানর অদ্ভুত সব কাহিনী ছাড়াও বিলাতে বিজ্ঞানীরা তাদের তাড়াবার বিধিব্যবস্থা কতখানি সার্থক করেছেন তারও বহু বিচিত্র কাহিনী পড়ুন। মূল্য ২।০

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরলোকের গল্প

গল্পগুলি সত্য হলেও রোমাঞ্চকর ও অপূর্ব রহস্যময়। গ্রন্থদ্বয়ে বাঙলার বহু বিখ্যাত লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা পড়ুন। প্রতিটি ২।০

শরৎচন্দ্রের জাবন রহস্য

শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা হতে আরম্ভ করে শরৎচন্দ্রের রহস্যময় জীবনের বহু অপ্রকাশিত তথ্য উদ্ঘাটিত। ২।০

রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩॥০

শেষ পর্য্যন্ত ৩৲

স্ত্রী-ভাগ্যে ২৲ কাঁচা ও পাকা ৩৲

মোপাসার এ লেডিজ ম্যান ৩৲

বাবলা ২।০ ভাঙন ২॥৵০ সহসা ২৷০

স্রোত বহে যায় ৪৲

বঞ্চিতা ৩৲ দুর্জ্জয়ময়ী ১৷০

সোনার কাঠি ২৲ আলো-ছায়া ২৲

মেঘ কজ্জলী ২৲ কালরাত্রি ১॥০

কাশী ডাক্তার ১৷০ বধূ-বিপ্লব ১৷০

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

রূপলোকের নরনারী ২৲

ছায়ালোলোকের শ্রীমতীরা

১ম পর্ব ১॥৵০ ২য় পর্ব ১৷৵০

সিনেমা ও থিয়েটারের তারকাবৃন্দের বৈচিত্র্যময় কাহিনী। বহু চিত্র পরিশোভিত।

সাধারণ পাঠকেরা অন্যূন দশ টাকার বই ভি, পি-তে নিলে ডাক-ব্যয় লাগবে না।

শিশির পাবলিশিং হাউস ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ব্রুক বণ্ড চা
Brooke Bond Tea
Brooke Bond
A-1
Dust Tea
বাজারের সেরা
ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
BB 331 A-1

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ রামকিঙ্কর

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 14th November, 1959.

২৭ ॥ সংখ্যা ২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

নেহরুর জন্মদিন

যে-সব ব্যক্তি আমাদের জীবনের সহিত অষ্টপ্রহর জড়িত হইয়া আছেন, যাঁহাদের চিন্তা আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করিতেছে, যাঁহাদের নেতৃত্ব আমাদিগকে চালিত করিতেছে, অতি-নৈকট্যবশত তাঁহাদের আমরা একরকম জানি না বলিলেই চলে। জানার জন্য যে ব্যবধান অত্যাবশ্যক, এখানে তাহারই একান্ত অভাব। তাই মাঝে মাঝে কোন একটা উপলক্ষে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে হয়, একটু দূরে, একটু উপরে রাখিয়া তাঁহাদের স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা করিতে হয়। এমনভাবে দেখিতে পারিলে নিত্যকার চেনা মানুষটির মধ্যে তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবার আশা থাকে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর জন্মদিনটিকে আমরা এই রকম একটি উপলক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

নেহরুজী ত্রিশ বৎসরের উপর ভারত-বাসীর জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতাযুদ্ধের কালেও তিনি নেতৃগণের অগ্রণী ছিলেন, আর এখন বোধকরি তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহাকে দলনির্বিশেষে লোকে ভারতীয় নেতা মনে করিবেন। কংগ্রেস দল তাঁহার প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইলেও ভারতীয় পটভূমিই তাঁহার যথার্থ আশ্রয়। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার চিন্তা চেষ্টা বাক্য দ্বারা দেশের চিত্ত নিরন্তর প্রভাবিত হইতেছে। দেশের মননচক্ষে তিনি সদাজাগ্রত। কিন্তু এই দুরূহ সৌভাগ্যের জন্য তাঁহাকে গুরুতর মূল্য দিতে হইতেছে। সেমূল্য এই যে, সততপ্রত্যক্ষ এই লোকটির স্বরূপ জনসাধারণের প্রায় অগোচর।

একটা বৃহৎ দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বহন করিতে গেলে মানুষকে একসঙ্গে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। রাজনীতিক, কূটনীতিক, স্টেটস-ম্যান, জনপরিচালক নেতা ও বাগ্মী, সময়-বিশেষে আরও অনেক ভূমিকা। বলা বাহুল্য নেহরুজী এই সমস্ত ভূমিকাতেই অল্পবিস্তর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়—নেহরুর স্বরূপ কি এইসব ভূমিকায় ধরা পড়িয়াছে, না, ইহাদের অতিক্রম করিয়া গূঢ়হিত অবস্থায় আছে তাঁহার আসল রূপটি।

আমাদের বিশ্বাস নেহরুজীর ব্যক্তিত্বের সত্যতম রূপ হইতেছে ভাবুকতা ও আদর্শনিষ্ঠা। তিনি ভাবুক ও আদর্শ-বাদী। সত্য বটে ভাবুক ও আদর্শ-বাদীর পক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনীতি চর্চা সব সময়ে সম্ভবপর হয় না, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ চরিত্রবলে নেহরুজী ভাবুকতা ও আদর্শবাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছেন। আর এই বি-সমের যোগাযোগের ফলে ভারতের রাজনীতি কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্য দেশ যখন শান্তির কথা কথা বলে (কোন্ দেশ না বলে!) তখন খুব সম্ভব সে দেশ মনে মনে ভিন্ন বস্তু কামনা করে। কিন্তু নেহরুজী যখন শান্তির কথা বলেন তখন তিনি মনে মুখে এক। এই কথাটা চীনদেশ জানিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু চীনদেশ তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ জানিতে পারিলে এমন অবিমৃষ্যকারিতা করিত না। তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, শান্তিকামী আদর্শবাদী পুরুষ যখন দেখে যে, শত্রুর তরবারির ছায়া আদর্শের উপর পড়িয়াছে, তখন সে যুদ্ধে নামিতে দ্বিধা বোধ করে না। এব্রাহাম লিঙ্কন যুদ্ধে নামিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। নেহরুর শান্তি কামনা যেমন সত্য, তাঁহার আদর্শনিষ্ঠাও তেমনি সত্য, আবার তেমনি সত্য তাঁহার কল্পনাপ্রবণ ভাবুকতা। আজকার দিনে ভারত গুরুতর সংকটের সম্মুখীন, এমন সঙ্কটের নজীর তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিরল। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, নেহরুজীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এমন একটি বিচিত্র উপাদানে গঠিত—যাহাতে অনায়াসে, নির্ভয়ে তিনি বিপদের সম্মুখীন হইতে পারিবেন। গতানুগতিক রাজনীতিক ও কূটনীতিক হইলে কি হইত বলা যায় না। চরিত্রের আধারে অনেক সময়ে এমন সব শক্তি থাকে, নিত্যকার প্রয়োজনের পক্ষে যাহা বাহুল্য, কিন্তু হঠাৎ এমন সংকট আসে, তখন ওই শক্তিই রক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়। শান্তিকামী আদর্শবাদীর পক্ষে আজ একটা সংকটক্ষণ—কিন্তু তাঁহার স্বরূপ জানিলে উদ্বেগের কারণ থাকে না। তাই জন্মদিন উপলক্ষ্যে কিছু বিস্তারিত-ভাবে নেহরুর স্বরূপের ব্যাখ্যা করিলাম।

নেহরু দীর্ঘজীবী হইয়া দেশবাসীর সহায়তায় ভারতকে সংকট হইতে মুক্তির পথে, দারিদ্র্য হইতে ঋদ্ধির পথে দীনতা হইতে আনন্দের পথে এবং পরানুকরণ হইতে আত্মোপলব্ধির পথে চালিত করুন।

জয় হিন্দ্

বোম্বাইতে প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের যে সম্মেলন হয়ে গেল তাতে কংগ্রেস সম্পর্কে প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের অভিমত অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের সভাপতি শ্রীঅশোক মেহতা অনেকদিন ধরেই কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করে আসছেন। কেরলে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস, প্রজা-সোস্যালিস্ট দল এবং মুসলীম লীগের মধ্যে নির্বাচনী মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের সম্মেলনে 'সর্বসম্মতিক্রমে' প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, উভয় দলের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত "নীতিগত এবং সেই নীতি কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে" মতভেদ থাকবে ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না।

এই প্রস্তাবের উপর দুটি সংশোধনী উঠেছিল। একটি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক। অপরটি মূল প্রস্তাব থেকে অসহযোগিতার অংশটি তুলে দেবার জন্যে। প্রথমটিতে ভোটের ফল ৩১৫-৪০৯, অন্যটিতে ৩০২-৪১৯। এর থেকে বোঝা যায়, সম্মেলনে কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধীর সংখ্যা ৩১৫, অল্প বিরোধীর সংখ্যা ১০৪ এবং সহযোগিতাকামীর সংখ্যা ৩০২।

যাঁরা সহযোগিতা চান না তাঁদের একাংশ কেন সহযোগিতা চান না—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর বক্তৃতায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, প্রজা-সোস্যালিস্ট সহযোগিতা নিতে চাইলেও কোনো কংগ্রেসী তা গ্রহণ করতে সম্মত হবেন না!

*

চীন নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট দল মহা মুশকিলে পড়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তাঁদের আনুগত্য ভারতবর্ষের চেয়ে বৈদেশিক কমিউনিস্ট দেশগুলির কাছেই বেশি। এতদিন পর্যন্ত তাঁরা এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে জানিয়ে আসছিলেন যে, বাইরের কোনো কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কাছেই তাঁদের আনুগত্য নেই। একমাত্র ভারতবর্ষের কাছেই তাঁদের আনুগত্য। আজ চীনের ভারতীয় সীমান্ত আক্রমণের ফলে তাঁদের প্রতিবাদ যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য তা প্রমাণিত হয়েছে।

একদল কমিউনিস্ট নেতা অবশ্য বুঝেছেন যে, এই সময় ভারতের অত্যন্ত সঙ্গত দাবীর বিরুদ্ধে চীনকে সমর্থন করতে যাওয়া মারাত্মক ভুল হবে। তাঁরা ম্যাকমোহন লাইন স্বীকার করে নিয়েছেন এবং দলের স্বীকৃতিও আদায় করেছেন। কিন্তু লাডাক নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট অভিমত এড়িয়ে চলেছেন। তাঁদের এই সন্দেহজনক মনোভাবে শুধু সরকারই নয়, জনসাধারণও চিন্তিত হয়েছেন। চীনের সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাধে—হয়তো বাধবে না শেষ পর্যন্ত তখন ভারতের ভিতর থেকে কমিউনিস্ট দল কি কর্মনীতি অবলম্বন করবেন?

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট দলের সেই উগ্রপন্থীদের মধ্যে যাঁরা ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে চীনের স্বার্থই সমর্থন করেন—শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে এঁদের সম্বন্ধে বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছেন। অবস্থা বিশেষে কমিউনিস্ট দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রয়োজনও হতে পারে। ভুল নেতৃত্বের ফলে কমিউনিস্ট দল আজ সর্বনাশের পথে ছুটে চলেছেন এবং ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অনেকখানি হারিয়েছেন।

একথা নিশ্চিত যে, চীনের আচরণে ভারতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, কমিউনিস্ট দলের প্রস্তাবে তা শান্ত হবে না। বরং তা ভারতীয় কমিউনিস্টদের তথা পৃথিবীর কমিউনিস্টদের পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে। একথা মিঃ খ্রুশ্চেভ উপলব্ধি করেছেন এবং সেইজন্যে এই বিরোধ মীমাংসার জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

*

লাডাক দুর্ঘটনা সম্পর্কে ২১শে অক্টোবর চীন গভর্নমেণ্ট যে পত্র দিয়েছিলেন, ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে ৪ঠা নভেম্বর তার কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে। চীন গভর্নমেণ্টের প্রত্যেকটি অভিযোগের শুধু উত্তরই দেওয়া হয়নি, তা যেমন মিথ্যা এবং অন্যায় তাও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা হয়েছে। চ্যাং চেনমো উপত্যকা কোনো দিন চীনের শাসনাধীন ছিল না এবং তা ভারত-চীন সীমান্তের অনেক অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেখানে প্রহরারত রাইফেলমাত্র সম্বল ভারতীয় দল শ্রেষ্ঠতর সমরাস্ত্রসজ্জিত সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনা সৈন্যদলকে আক্রমণ করবে তা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। ভারতবর্ষের সীমান্ত লঙ্ঘন করে আক্রমণ চীনের পক্ষে এই প্রথমও নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অতর্কিতে ছোঁ মেরে কিছু কিছু অংশ ভারত থেকে ছিনিয়ে নেওয়াই চীনের উদ্দেশ্য।

*

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সমীচীনতা সম্বন্ধে বোধ করি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ছাড়া আর সকলেই সচেতন হয়েছেন। তাঁদের চাপের ফলে শুধু যে মানুষের অসুবিধা বাড়ছে তাই নয়, অন্যায় জবরদস্তির ফলে প্রাদেশিক বিরোধেও ইন্ধন জোগান হচ্ছে। ১৯৫৬ সালের প্রবল আন্দোলনের ফলে মানভূম ও পূর্ণিয়ার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও বাংলাভাষী অনেক অঞ্চল বিহারের মধ্যেই রয়ে গেছে। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। তাঁদের দাবির ফলে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘিষ্ঠ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার সম্প্রতি মানভূমের চাষ, চন্দনকিয়রকরী, চাণ্ডিল, পতমদা ও পাঁচকুম এই পাঁচটি থানার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে এসেছিলেন। ধলভূম মাতৃভাষা সংরক্ষণ সমিতির পক্ষ থেকে অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনারের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে হিন্দী প্রচলনের ফলে খাজনার রসিদ, জমির স্বত্ব-সংক্রান্ত দলিলপত্র, পঞ্চায়েৎ আদালতের নোটিশ সমস্তই হিন্দীতে হচ্ছে। অথচ এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙলাভাষী; মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত ঘটছে, যেখানে মামলাকারী বাঙলাভাষী, উকিল উড়িয়াভাষী এবং বিচারক হিন্দীভাষী। সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার, চাকুরির ক্ষেত্রে বাঙলা-ভাষীদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে এবং শিল্পক্ষেত্র থেকে বাঙালীর বিতাড়নের চেষ্টাও চলছে।

*

শুধু ধলভূম এবং পুরুলিয়ার কয়েকটি থানাই নয়, সাঁওতাল পরগনার অবস্থাও একই রকম। সেখানেও বাঙলা ভাষা যথেষ্ট চলে এবং গ্রামাঞ্চলে আরও যে ভাষা চলে তা বাঙলাও নয়, হিন্দীও নয়, মাঝামাঝি একটা ভাষা। ভাষা ছাড়াও আরও একটি কারণে সাঁওতাল পরগনার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষীর যে বাঁধ বাঁধা হয়েছে, তাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থাই সম্ভব হয়নি, যার ফলে ময়ূরাক্ষীর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে পুনঃ পুনঃ বন্যার তাণ্ডব। সম্ভব হয়নি এই জন্যে যে, যত দূরের জল এখানে এসে জমে তা সাঁওতাল পরগনার অন্তর্ভুক্ত এবং বিহার বাঙলাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। আমরা এক এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা মুখে বলে থাকি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয় কমই পাওয়া যায়। প্রাদেশিক স্বার্থবোধই তখন প্রবল হয়ে ওঠে। বিগত বন্যা সম্বন্ধে যে তদন্ত হবে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। কানাড়া-বাঁধ সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা আশা করি, এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করতে পারবেন।
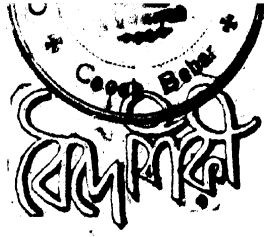
প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিন-চারদিনের জন্য ভারতে আসছেন। আমন্ত্রণ বহুদিন থেকেই জানানো ছিল, আমন্ত্রণ গৃহীতও হয়েছিল, তবে আসার সুবিধা কবে হবে, সেটা স্থির ছিল না। এতোদিনে সেটা স্থির হলো। ১৯ তারিখ থেকে প্যারিসে পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিদের একটি শীর্ষ-সম্মেলন হচ্ছে। তাতে যোগ দেবার পূর্বে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ইতালী, তুরস্ক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, ইরান, গ্রীস ঘুরে যাবেন। ফ্রান্স থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মরক্কোতে অল্প সময়ের জন্য অবতরণ করবেন। ৪ঠা ডিসেম্বর আমেরিকা থেকে রওনা হয়ে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার মোট ১৮ দিন বিদেশে সফর করবেন।

ভারতের প্রতি চীনা সরকারের জুলুম-বাজি ও দুর্ব্যবহারের জন্য ভারতের মন চীনা সরকারের প্রতি বর্তমানে খুবই অপ্রসন্ন। চীনা সরকারের মতিগতি যেরূপ দেখা যাচ্ছে, তাতে এই অপ্রসন্ন ভাব শীঘ্র দূর হবে, এরূপ সম্ভাবনা অল্প। পিকিং সরকার চাপে পড়ে অথবা নিজেদের কার্য-প্রণালী সম্পর্কে একটা নূতন ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়ত সাময়িকভাবে একটা নূতন ভাব দেখাতে পারেন, কিন্তু যা ঘটেছে, তারপর ভারতের মন থেকে চীনা সরকারের উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহ শীঘ্র যাবে না, ভারতের পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সতর্কভাব অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী।

এই অবস্থায় স্বভাবতই চীনের সমালোচকদের প্রতি আগে ভারতে অনেকের মনে যেরূপ উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, সেটা কিছুটা নরম না হয়ে পারে না। কিন্তু চীনাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের উদ্ভব হওয়াতে ভারতের পক্ষে দুই ব্লকের সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি অকেজো হয়ে গেছে। এখন ভারতের নিজের নিরাপত্তার খাতিরে এক ব্লকের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত, এরূপ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। ভারত সরকারের চীন সম্পর্কিত নীতির বিফলতার মূলে নিরপেক্ষতার নীতি নয়। বরঞ্চ বলা যায় যে, নিরপেক্ষতার নীতির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ আনুগত্যের অভাবই বর্তমান অবস্থাগুলির সহায়তা করেছে। নিরপেক্ষতার নীতি যদি পরিপূর্ণভাবে পালিত হতো, চীনা কার্যকলাপ যদি ঠিকভাবে বিচার করে কর্তব্য স্থির করা হতো, মতলববাজ বা অপদার্থ "বিশেষজ্ঞ" এবং পরামর্শ-দাতাদের কথা শুনে চীনা সরকারের দোষ দেখেও না দেখা বা জেনেও উপেক্ষা করা যদি না হতো, তাহলে চীনা সরকারের দুষ্কার্যে এতদূরে এগুতে পারত কিনা সন্দেহ। সুতরাং ক্ষতি যা হয়েছে, সেটা নিরপেক্ষতার নীতি মানার জন্য হয়নি, সেই নীতি লঙ্ঘন করার জন্যই হয়েছে।

চীনের সঙ্গে ভারতের পুরোদমে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা এখনো উপস্থিত হয় নি। একটু শক্ত হাতে হিমালয়ে চৈনিক উপদ্রব দমন করার অভিপ্রায় ভারত সরকার যদি কার্যত সুস্পষ্ট করে তোলেন, তাহলে সে সম্ভাবনা আরো দূরে যাবে, বরঞ্চ ভারত সরকার কার্যত নরম ভাব দেখালে চীনা নীতির যে-দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা তাতে অদূরভবিষ্যতে সর্বাঙ্গীণ যুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের প্রভাব চীনা সরকারকে সংযত করবে, এরূপ আশা অনেকে করছেন; ভারত সরকারের মনেও হয়ত এই আশা আছে। সোভিয়েট সরকারের এ বিষয়ে যে-ভাবটা দেখা গেছে, সেটা মোটের উপর ভালো বলা যায়: তবে ভারতবর্ষের ন্যায় এবং চীনের অন্যায় বুঝে সোভিয়েট সরকার কোনো একটা ধারণা করেছেন, এরূপ কোনো প্রমাণ নেই। সোভিয়েট সরকার বর্তমানে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া শান্ত দেখতে চান, সে পক্ষে চীনা সরকারের সঙ্গে ভারতের বিরোধ একটি বিপরীত কাণ্ড। সোভিয়েট সরকার চান যে, এই গোলযোগটা না বেড়ে থেমে যায়।

কিন্তু প্রকৃত মীমাংসার পক্ষে সোভিয়েট প্রভাব কতটা কার্যকর হতে পারে, তা বলা কঠিন। সাক্ষাৎ সশস্ত্র সংঘর্ষ হতে না থাকলেও চীনা সরকারের মতিগতি দেখে এই ধারণাই হয় যে, হিমালয় অঞ্চলে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় একটা অস্থিরতা জাগিয়ে রাখা পিকিং সরকারের অভিপ্রায়—যাতে নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি অঞ্চলে চীনা প্রভাবের অনুপ্রবেশ চলতে থাকে। ভারতের পক্ষে এরূপ অবস্থা সহনীয় নয়। এই বিষয়ে সোভিয়েট সরকারের পরামর্শ কী হবে এবং তা যদি এমন হয়, যাকে ভারতের দিক থেকে কাম্য বলা যায়, তাহলে চীন সরকার সে পরামর্শ মানতে রাজী হবেন কিনা, সে বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। সীমান্ত-সংঘর্ষ বন্ধ করতে রাজী হলেও হিমালয় অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চীনা সরকার যে বন্ধ করতে সহসা রাজী হবেন তা মনে হয় না, সোভিয়েট সরকারের অমত হলেও বোধ হয় নয়। অথচ সেটা বন্ধ না হলে ভারতের পক্ষে কোন মীমাংসাকেই মীমাংসা বলা যাবে না। সুতরাং সীমান্ত সংঘর্ষ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও ভারতের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা উচিত হবে না। ভারত সরকার যদি আরো গম্ভীরতর বিপদে ভারতকে না ফেলতে চান তাহলে তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতেই পারেন না। সুতরাং সোভিয়েট সরকারের বন্ধুসুলভ মধ্যবর্তিতা যদি পাওয়াও যায়, তাহলেও তার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হবে। প্রকৃতপক্ষে শুধু সীমান্ত উৎপাত বন্ধ করার জন্য কারোর সহায়তারই প্রয়োজন নেই, ভারত সরকারের যে শক্তি আছে তাই সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করলেই সেই উৎপাত নিবারিত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু চীনা সরকার সারা হিমালয় অঞ্চলে যে রাজনৈতিক উৎপাত সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন, তার প্রতিরোধ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং দীর্ঘদিনের কাজ। এ ব্যাপারে সোভিয়েট প্রভাব কতটুকু কাজে আসতে পারে বলা যায় না। অবশ্য নায় যে ভারতের পক্ষে এই ধারণা যদি পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে দৃঢ় হয় তবে তার নৈতিক মূল্য আছে এবং সেটা উপেক্ষণীয় নয়।

জওহরলালজী মনে করেন যে, বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি ইচ্ছা না করে, তবে কোনো বড়ো যুদ্ধই সম্ভব নয়। বড়ো যুদ্ধের অর্থ যদি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তবে একথা ঠিক, অথবা একথা বলারই দরকার হয় না। কিন্তু ছোটোখাটো যুদ্ধ সম্বন্ধে একথা যে খাটে না, তা পণ্ডিতজী নিজেই বলেছেন। চীনের সঙ্গে যদি ভারতের পুরোপুরি যুদ্ধ কোনদিন বাধে, সেটা কি বড়ো যুদ্ধ হবে না? কিন্তু সে যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবেই, একথা নিশ্চিত নয়। ভারত-চীন যুদ্ধ বাধলে সোভিয়েট এবং আমেরিকাকে লিপ্ত হতেই হবে তার কোনো কথা নেই। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের সামরিক চুক্তি আছে, কিন্তু একক ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে এবং তাতে আমেরিকা যদি এসে ভারতের পক্ষে যোগ না দেয়, তবে সোভিয়েটও চীনের পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকতে পারে। কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক ভারতবর্ষ দখলীকৃত হওয়া বা বিজয়ী চীনের সাহায্যে ভারতে কম্যুনিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনার যদি উদ্ভব না হয় তাহলে ভারতবর্ষও আমেরিকাকে ডাকবে না এবং আমেরিকাও আসবে না, যদি ও-পক্ষে রাশিয়া যোগ দিতে অগ্রসর না হয়। কিন্তু উল্লিখিত সম্ভাবনা অর্থাৎ চীনের সামরিক শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষের পর্যুদস্ত হওয়া অথবা সেই শক্তির সহায়তায় ভারতে কম্যুনিস্ট রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কোনটাই কল্পনা করা যায় না। আর ভারতবর্ষের চীন দখল করার কোনো অভিপ্রায়ই যখন থাকতে পারে না এবং তিব্বতের কথা বাদ দিলে চীনে যে তন্ত্রেরই রাজত্ব হোক তাতে যখন ভারতবর্ষের কিছু আসে যায় না, তখন ভারত-চীন দ্বন্দ্ব থেকে সোভিয়েট এবং আমেরিকা কেন দূরে থাকতে পারবে না, যদি ওরা বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে মনস্থ করে?

যাই হোক, অনেকের এই ধারণা হতে পারে যে, মার্কিন গবর্নমেণ্ট মনে করছেন যে, বর্তমান সময়টা প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের ভারতে আসার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার চীনের প্রতি ভারতের বর্তমান রুষ্ট মনোভাবের সুযোগ নেওয়ার দিকে লক্ষ্য করে ভারতে আসছেন, এরূপ মনে করলে মার্কিন গবর্নমেণ্টের বুদ্ধির তারিফ করা হবে না। সোভিয়েটের সঙ্গে একটা মিটমাট প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার চান, এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তিনি চীনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে উস্কানোর কোনো চেষ্টার সঙ্গে জড়িত আছেন, এরূপ ধারণা বর্তমানে যদি সৃষ্টি হয় তাহলে সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের উপর তার কী প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়; সেটা নিশ্চয়ই প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের সোভিয়েট সম্পর্কিত নীতির বিরুদ্ধে যাবে।

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের সফরের উদ্দেশ্য বোধ হয় অন্য। আসন্ন পশ্চিমা শীর্ষ-সম্মেলনের সাফল্য অত্যন্ত অনিশ্চিত। পশ্চিম জার্মানী এবং ফ্রান্স ইতিমধ্যে যে-সব কথা বলতে আরম্ভ করেছে, সেগুলি সোভিয়েট সম্পর্কিত বর্তমান আইজেনহাওয়ার নীতির বিরুদ্ধে বলা যায়। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট পৃথিবীতে মার্কিন-সোভিয়েট প্রাধান্যের নীতি মেনে নিয়েছেন। আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে যে ধরনের মিটমাটই করুক, তাতে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট সম্মত আছেন। কিন্তু ডক্টর অ্যাডেনয়ের এবং জেনারেল দ্য গল তাতে রাজী নন। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার যে এতগুলি দেশে সফরে আসছেন, তার একটা প্রধান কারণ হয়ত ডক্টর অ্যাডেনয়ের এবং জেনারেল দ্য গলের সামনে উপস্থিত হবার পূর্বে নিজের নৈতিক প্রতিষ্ঠা আর একটু জোরালো করে নেওয়া। এই সব দেশে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার যে-সম্মান এবং অভ্যর্থনা লাভ করবেন, তাতে প্যারিসে তাঁর কাজের একটু সুবিধা হতে পারে।

৯।১১।৫৯

শার্ঙ্গদেব

সৃষ্টির সব কিছু মহত্ত্ব দেব-দেবীর হাতে ছেড়ে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। এই কারণে নাদব্রহ্ম থেকে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী পর্যন্ত সবই আমরা পেয়েছি দেবদেবীর কৃপায় এই বিশ্বাসটা দীর্ঘকাল থেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাস্ত্রকারগণ ঐশ্বরিক লীলাপ্রচারে কোনদিনই বিরত হন নি; কিন্তু চেষ্টা করেন নি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিষ্ঠায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যখনই কোন অপার্থিব ব্যাপারের খোঁজ পাওয়া গেছে, তখনই আমরা সেটা খুব বড় করে দেখেছি; কিন্তু সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ধারা অনুযায়ী সাঙ্গীতিক বিবর্তনকে আদৌ স্বীকার করি নি। অমুক রাগ সাক্ষাৎ মহাদেবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে বা অমুক রাগের ধ্যানমূর্তি হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবতী—এটা প্রচার করতে আমাদের খুব উৎসাহ কিন্তু এই রাগ এই যুগে অমুক দেশে প্রচলিত ছিল, তারপর অমুক অমুক দেশের প্রভাবের ফলে এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে এল—এই ধরনের আলোচনা আজ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। অতএব নিঃসংকোচেই বলা যায় যে, সংগীতে ইতিহাস আজ পর্যন্ত অবহেলিত রয়ে গেছে—অথচ সংগীতের বিবর্তনও অপরাপর বস্তুর মত ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক ধারায় ঘটে এসেছে।

রাগ-রাগিণীর বিবিধ রূপে পরিকল্পনার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই। সৌন্দর্যের আবেদন এক একজনের কাছে এক একরকম। জলের রং যেমন পাত্রের রঙের সঙ্গে বদলায়, তেমনি যে মাধ্যমে রাগসংগীতের প্রকাশ হবে, সেইভাবে বিকশিত হবে তার রূপ। একটি রাগ শুনে যদি আমার মনে করুণ ভাবের উদয় হয়, তাহলে আমি কল্পনা অনুযায়ী যে কোন করুণ ছবির সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু এ হ'ল কল্পনার খেলা—সুতরাং শিল্পীর "ইমাজিনেসন" হিসাবে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু এইটুকু স্বীকার না করে যদি আমি এই বিশ্বাসটি চাপিয়ে দিতে চাই যে, অমুক রাগে কেবলমাত্র অমুক দেবতা অধিষ্ঠিত রয়েছেন—তাহলে সেটা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি বিকৃত চিন্তার পরিচায়ক। অথচ এইটাই ঘটে আসছে। ভৈরবী শুনে আমার আপনার মনে নানারকম চিত্র ফুটে উঠতে পারে, কিন্তু কৈলাস-শৃঙ্গে মহেশের স্ত্রী ভৈরবীকেই যে একমাত্র ভৈরবী রাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মেনে নিতে হবে এমন কথায় কিছুতেই রাজি হওয়া যায় না। গায়ক সমাজে অন্তত এইরকম পৌত্তলিক বিশ্বাসের উচ্ছেদ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রাগ-রাগিণীর নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কেও আমাদের এই ধরনের গোঁড়ামি আছে। এই

গোঁড়ামি তবু ভাল, কেননা সত্যিই সময় অনুযায়ী রাগের একটা বিশেষ প্রভাব মনের ওপরে পড়ে; কিন্তু এইটাই যে একমাত্র বাঁধর বিধান এমন নয়। আসলে শেষ পর্যন্ত রাগ-রাগিণীর মিশ্রণটা এমন বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এইরকম একটা কিছুকে আশ্রয় করে শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ঠাট-মেল হিসাবেও শ্রেণীকরণ আবশ্যক হয়েছিল এই কারণেই। উৎপত্তির মূলে কারণকে যেহেতু আমরা খুঁজে পাইনি, সেহেতু চোখের ওপরে যে ধারাটি প্রতীয়মান হয়েছে, তা থেকেই শ্রেণীবিভাগের সূত্রপাত করা হয়েছে। কিন্তু মূলে যে সমূলেই বিনষ্ট হয়েছে এমন নয়; অন্তত প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকেও এই ঐতিহাসিক ধারার কিছুটা পর্যবেক্ষণ করা যায়। সেটা কিরকম খুব সংক্ষেপেই বলা যাক।

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিকাশ যে অঞ্চলে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য দুর্লভ, কেননা তার অধিকাংশই প্রচলিত কাব্যের মধ্যে রয়ে গেছে—বাস্তব প্রমাণের অন্তর্গত হয় নি। ইতিহাস আরম্ভ হচ্ছে মগধের সভ্যতা থেকে। সংগীতের ইতিহাসও এইখান থেকেই আরম্ভ। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদিতে মাগধী, অর্ধমাগধী সংগীতের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আমরা যে সংগীতের উদাহরণ এবং উল্লেখ পাই, তা হচ্ছে জাতি-গায়ন। বর্তমান রাগ-গায়নের ওপর জাতির প্রভাব অসামান্য। মগধ অঞ্চলে প্রচলিত বড় বড় বৈঠকী গান এই জাতি অবলম্বনেই গাওয়া হ'ত। এক একটি স্বরের প্রাধান্য নিয়ে এক একটি জাতি গঠিত হয়েছিল। পরে তার মধ্যে নানাবিধ মিশ্রণ এসে বিবিধ মিশ্ররূপের উদ্ভব হ'ল।

জাতি-গায়নের পরেই এল রাগ গায়নের যুগ। মূল রাগগুলি গ্রামরাগ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশের প্রচেষ্টায় বর্তমান রাগসংগীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সৌবীরী, গান্ধার, বোট্ট, মালব, টক্ক, শক, নর্ত, ককুভ, গৌড় প্রভৃতি বিবিধ দেশ এবং জাতি কর্তৃক আমাদের সংগীত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে। প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতির এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল—সেটি এইসব সংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র হিসাবেও বিভিন্ন দেশের সুরকার প্রভাবিত হয়েছেন। কেউ হয়ত ঊষার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে একটি সুর সৃষ্টি করেছেন—কেউ হয়ত সন্ধ্যার রূপে মোহিত হয়ে আর একটি সুর সৃষ্টি করলেন। এইভাবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পরিবেশে এবং বৈচিত্র্যে সংগীত সৃষ্টি করে চললেন। সেগুলি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে—নাট্যে, সাহিত্যে পরিবেশিত হতে লাগল। পরবর্তীকালে সময় অনুসারে যে রাগের শ্রেণীকরণ হয়েছে, তার মূলে হচ্ছে এসব যুগের সৃষ্টি।

তারপরে দেখা গেল এই গ্রামরাগগুলি অপরাপর দেশের সংস্পর্শে এসে মিশ্ররূপ ধারণ করেছে। এই নতুন রূপগুলির নাম হল—ভাষা। আলাপের পরিবর্তনে অর্থাৎ গায়ন-বৈশিষ্ট্যের ভেদে মূলের যে পরিবর্তিত রূপ হয় তাকেই বলা হয়েছে—ভাষা। দেখা যাচ্ছে সৌবীরীর ভাষা গান্ধারী; টক্কের ভাষা সৈন্ধবী; সৌরাষ্ট্রী; পঞ্চমের ভাষা আভিরী, গুর্জরী, দাক্ষিণাত্য, আন্ধ্রী; হিন্দোলের ভাষা গৌড়ী, মালব-কৈশিকের ভাষা বঙ্গালী—এই ধরনের। এবারে আমরা দেখছি—এক দেশের গান দেশান্তর থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এইসব মিশ্র রূপ গান্ধার থেকে দাক্ষিণাত্য এবং মালব গুর্জর থেকে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই আরও মিশ্রণ চলল। ক্রমে ভাষা থেকে বিভাষা এবং বিভাষা থেকে অন্তর ভাষার সৃষ্টি হ'ল। মিশ্রণ এইখানেই থেমে থাকবার কথা নয়! ক্রমাগত বিভিন্ন সৃষ্টির ফলে জাতিগত বা দেশগত বৈশিষ্ট্যের আর খুব কমই অবশিষ্ট রইল। তখন রয়ে গেল বিরাট রাগের সমষ্টি। এই সব রাগের বিভাগ পরবর্তীকালে প্রায় ইচ্ছানুযায়ী করা হয়েছে। পূর্বে যে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তা একেবারেই লোপ পেয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারাটি রক্ষা করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা ছিল, তারপরেই নানা মুনির নানা মতের আড়ালে ইতিহাস আত্মগোপন করেছে।

এই ঐতিহাসিক বিবর্তন অনুসরণ করলে আমাদের প্রাচীন গৌড়ীয় গীতির চিত্তাকর্ষক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। গৌড়ী নামক একটি রাগ ছিল মালবকৈশিক নামক গ্রামরাগের ভাষা। এছাড়া বঙ্গাল নামক আর একটি মালবকৈশিকের ভাষা রাগেরও অস্তিত্বও ছিল। এই দুটি রাগে পার্থক্য থাকলেও মালবকৈশিকের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল। নানা দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় বাঙলা থেকে সোজা পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে রাগসংগীতের প্রচার এবং প্রসার বিশেষভাবে হয়েছে। সৌরাষ্ট্রের আগে গুর্জর তার আগে মালব। এই মালব এবং উজ্জয়িনী ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। অতএব মালবে প্রচলিত সংগীত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বিভিন্ন ভাষা রাগ সৃষ্টি করেছে। বাঙলা দেশ গৌড়ী ভাষার জন্য মালবের কাছে ঋণী।

এই যে সংগীত এই হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন জাতির প্রচেষ্টায় গঠিত ভারতীয় সংগীত। এই সব রাগ-রাগিণীতে দেব-দেবীর মূর্তির চেয়ে এক একটা জাতির মনোভাব বা চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ যদি এই ঐতিহাসিক বিবর্তনটি বরাবর রক্ষা করবার চেষ্টা করে যেতেন, তাহলে আমাদের সংগীত সংস্কৃতির ইতিহাস কত স্পষ্ট এবং সত্য হ'ত;—এক একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় কত গৌরবজনক হ'ত। আশ্চর্যের বিষয়, এই সত্য পরিচয়কে স্থায়ী করে রাখবার একটা পরিকল্পনা হওয়া সত্ত্বেও তার গুরুত্ব অধিকাংশ শাস্ত্রকারই বুঝতে পারেন নি। ত্রয়োদশ শতকে রচিত সংগীত-রত্নাকর-এ এই চিন্তার চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে; কিন্তু তার পরে সেই চিন্তাসূত্রকে আর টেনে নিয়ে যাওয়া হয় নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিংশ শতকের কৃতবিদ্য গায়ন সমাজেও এই মানবীয় প্রচেষ্টার স্বীকৃতি নেই—এখনও নানাবিধ কুসংস্কারের প্রবল আধিপত্য চলেছে। মধ্যযুগের অবস্থা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আজও আমরা পড়ে আছি। কোন সুরের ওপর কোন দেবতার লীলা চিহ্নিত হয়ে আছে, সেটা আমরা বলতে পারি, কিন্তু কোন যুগে কোন জাতি একটা সুরের পরিকল্পনা করেছিল এবং তার পরে কোন কোন দেশ বা জাতি তাকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করেছিল তার কথা আমরা বলতে পারি না এবং সে খবরও রাখি না।

সাধারণত হাঙরকেই সবচেয়ে ভয়ানক জলজীব বলা হয়, কিন্তু আমেরিকার ধীবরদের মতে পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সমুদ্রচারী বিরাট বাণমাছের আকৃতিতুল্য অতি হিংস্র প্রকৃতির বারাকুদা মাছই জলের সবচেয়ে ভয়াবহ জীব। এদের বিশেষ লক্ষ্য যেন মানুষের দিকেই এবং একবার আক্রমণ করলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘটায়; অন্তত অঙ্গহানি না ঘটিয়ে ছাড়া পাবার জো নেই। ক্যারিবিয়ান উপসাগর অঞ্চলের অধিবাসীরা এই বারাকুদা মাছকে হাঙরের চেয়ে বেশী ভয় করে চলে।

ছ' থেকে সাত ফিট পর্যন্ত লম্বা, ক্ষুরের মতো ধারালো দাঁত এদের। বাঘের মতো হিংস্র এই মাছ। সমুদ্র অঞ্চলের অধিবাসীরা কোঁটাযুক্ত বর্শাবিদ্ধ করে এই মাছ ধরে। এইভাবে একবার একটি বারাকুদাকে জীবন্ত ধরে একটা ছোট জাহাজের জলাধারে রেখে দেওয়া হয়েছিল। জাহাজ-কর্মীদের একজন ঐ ভয়াবহ জীবটির অস্তিত্বের কথা ভুলে জলাধারে নামতেই মাছটি তাকে জানুদেশে এমন কামড় দেয়, যার ফলে লোকটিকে সারাজীবনের জন্য খোঁড়া হয়ে পড়তে হয়।

জলের, আর একটি ভয়ংকর জীব হচ্ছে এক ধরনের বিরাটকায় হেরেওয়াল-মাছ, যার পিঠে চার-পাঁচ ফিট উঁচু কিস্তৃত ডানা থাকে। কোঁচ দিয়ে এদের বিঁধলে এরা শিকারীদের নৌকাটিকেই নিয়ে পড়ে এবং তীরবেগে আক্রমণ করে নৌকা ডুবিয়ে দেয়।

*

যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরের জে হাওয়ার্ড জনসন দীর্ঘদিন ধরে গরহাজির থাকা এবং ঢিমেতালে কাজ করার অভিযোগে বরখাস্ত হওয়ায় অবিলম্বে কাজে পুনর্বহাল করার জন্য সিভিল সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন জানায়। আবেদনে সে বলে, তার জন্মরাশিই হচ্ছে ধনু; কাজেই তারই ফলে সে এক স্থানে অধিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

*

মানুষ মিছে কথা কেন বলে এবং মিথ্যা বলার স্বভাব সম্পর্কে অনুশীলনকারী বিশেষজ্ঞদের মতে গড়পড়তায় মানুষ জন-পিছু দৈনিক তিনটি বা বছরে সহস্রাধিক মিছে কথা বলে। তবে বেশীর ভাগ মিছে কথাকে তারা 'নির্দোষ', 'রসপুষ্ট', এমন কি কোন কোনটির একটা সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন।

অনুশীলনকারীদের একজন বলেন যে, নীতির দিক থেকে যে কোন মিথ্যাভাষণই অন্যায় কিন্তু এ অভ্যাস থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। কারণ এমন কতকগুলো সংকটের মধ্যে মানুষকে পড়তে হয় যখন মিথ্যে না বলে রেহাই পাওয়া যায় না। যেমন স্ত্রী কোন জিনিস পছন্দ করে কিনে আনলে সেটা যতোই খারাপ মনে হোক স্বামীর পক্ষে (অবশ্য পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে গেলে) সরাসরি নিজের অপছন্দ হওয়াটা জানানো সম্ভব হয় না—গুছিয়ে একটা মিথ্যা কথা বলতেই হয়। কিংবা অফিসে পৌঁছতে প্রায়ই দেরী হতে থাকলে কে আর রোজ রোজ সত্যি কথাটা বড়বাবুকে বলে! আবার, শিশুর কোন

আফ্রিকায় নাইজিরিয়ার অধিবাসী ইওরুবাদের তীর্থভূমি ইফে শহরে সম্প্রতি বৃটিশ ভূতত্ত্ববিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত সাত-আট শত বৎসর পূর্বেকার পোড়ামাটির তৈরী শিল্প নিদর্শন। আহুতির বেদী সাজাবার জন্য তৈরী এই মুণ্ডগুলিতে ইওরুবা শিল্পীদের বাস্তবের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করবার ম তো

পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ঘটলে মৃতজন কোথাও গিয়েছে বলে শিশুকে ভোলাতে হয়—এও এক ধরনের মিছে কথা।

বস্তুত সৃষ্টির আদিকাল থেকে মিছে কথার প্রচলন। তবে মনরোগ চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং শারীরবিদদের এব্যাপারে অনুশীলন আরম্ভ হয়েছে হাল আমলে। তারা দেখেছেন যে সত্যভাষণ ব্যাপারে রাজনীতিক, অভিনয়শিল্পি প্রচারবিদ, মর্মরশিল্পি, সাহিত্যসেবী এবং সংগীতবিদ্দের হার নিচু, স্বভাবতই এটা হয় তাদের অতি সম্পুষ্ট কল্পনাপ্রবণতার জন্য।

লেয়ডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের আবেগ বা অনুভব শক্তির সুস্থতার সংগে কিছু বানিয়ে বলার প্রবণতা অনেকাংশে কার্যকর। একজন ওলন্দাজ অনুশীলনকারী বলেনঃ মিথ্যা বলা একটা সমস্যা বলে স্বীকার করে এমন লোকের মধ্যে শতকরা আশি জনকে দেখা গিয়েছে স্নায়বিক দুর্বল, খিটখিটে মেজাজের এবং সহজেই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। যার যে রকম কাজ তদনুযায়ী মিছে কথা বলার প্রবণতাও তার মধ্যে গড়ে ওঠে। সাধারণত সত্যভাষী বলে যাদের গণ্য করা যায় তারা হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক, অনুশীলনবিদ রসায়নশালার কর্মী, স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়াররা—এমন সব ব্যক্তি যাদের নির্ভুল মাপামাপির কাজ নিয়ে থাকতে হয় এবং এ-সব ক্ষেত্রে এক ইঞ্চি বা এক মিলিমিটারও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

*

আগামী দু বছরে চেকোশ্লোভাকিয়ায় একটি সম্পূর্ণ শহর এবং তার তিন হাজার অধিবাসীকে স্থানান্তরিত হতে হবে। কারণ তারা যে জমিতে রয়েছে তার নীচে রয়েছে মূলবান কয়লা। শহরটির জমির নীচে প্রতি বর্গগজে এক টন কয়লা রয়েছে বলে হিসেব করা হয়েছে যা খনন করে ওপরে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে। শহরটি হচ্ছে প্রাগ থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে, নাম এরভিন্স।

বছর তের আগে জার্মানীতে এরকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। একটা গ্রামের নীচে বাহান্ন ফিট পুরু কয়লার স্তর আবিষ্কৃত হওয়ায় গ্রামকে গ্রাম উপড়ে নিয়ে পাঁচ মাইল দূরে পুনর্সংযোজিত করে নেওয়া হয়।

এক জায়গা থেকে বসতি উপড়ে নিয়ে অন্যত্র ঠিক তেমনটিই পুনর্প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে নিউইয়র্কের নর্মাণ্ডি এপার্টমেণ্ট নামক আট হাজার টন ওজনের একটি বিরাট অট্টালিকাকে রোলারের সহায়তায় টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সবচেয়ে চমকপ্রদ কৃতিত্ব বলে পরিগণিত। দশ সপ্তাহ সময় লেগেছিল কাজটি সম্পন্ন করতে। কণ্ট্রাক্টরের সংগে চুক্তি ছিল যে অট্টালিকাটি সরাতে সরাতে কোন ক্ষতি হলে তার জমা ন লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। কাজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন ক্ষতি হয়নি অট্টালিকাটির।

১

শিশুটি পড়ল পাঁচ বছরে, লোকে বললে, —ওর জ্ঞান হলো।

কথাটা আমরা খুব শুনি; কথাটা খুব স্বাভাবিক। এতোটা স্বাভাবিক যে ওর ভিতরে যে একটা আশ্চর্য অনুভূতির স্পর্শ জড়িয়ে আছে, সে-কথা আমরা ভুলে যাই।

আজ জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে, নিজের শৈশবের কথাটা ভাবতে গিয়ে, সেই অনুভূতিরই আশ্চর্য মহিমাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছি। বিশ শতকের একেবারে গোড়াকার বছরটি থেকেই সব কথা স্মরণ করতে পারি। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স। কিন্তু তার আগেকার পাঁচটি বছর একেবারে ঘোর তমসায় আবৃত—কিছুই মনে পড়ে না।

তাই বলছিলাম, জ্ঞানোন্মেষ বোধহয় এরেই বলে। হঠাৎ যেন নাটকীয়ভাবে সমগ্র চেতনার একদিন ঘুম ভাঙে, তাকিয়ে দেখি, —বিশেষ একটা ঘর, বিশেষ একটা বাড়ি, বিশেষ একটা রাস্তা, বিশেষ একটা পরিবেশ, বিশেষ কয়েকটি লোক। এদের চিনে ফেলি। রূপ-রস আর গন্ধে বিশেষ একটা জগৎ গড়ে ওঠে শিশুর চারপাশে।

আজ সেই জগৎ হয়েছে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। কতো মানুষ দেখেছি, কতো দেশ দেখেছি, দেখেছি কতো বিচিত্র ভাব ও চরিত্রধারার আবর্তন। তারা আর আমি যেন প্রবল এক স্রোতের ঘূর্ণিতে ঘুরে মরছি। আমার স্মৃতিপথে তারাও আছে, আমিও আছি—যে 'আমি'কে আমার আজকের এই পরিণত বিস্তৃত জগতের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু, আজ যা পরিণত, তারও তো একটা শুরু ছিল?

জীবনের সেই শুরুর কথাই তো ভাবছি। ভাবতে ভাবতে আজ মনে হচ্ছে কিসের থেকে কি হলো? কিভাবে শুরু হয়েছিল, কিভাবে হবে এর শেষ? হয়ত এর একটা ছন্দ আছে, হয়ত এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, হয়ত এর সমস্ত ফুলের মধ্যে একটা লুকোনো সুতোও আছে, নইলে এই জীবন-মন-মালা গাঁথা হয়ে উঠেছিল কেমন করে?

খুঁজছি সেই সুতোকে সন্ধান করছি সেই পথিক আমার—বহুদিন থেকে যে চলা করেছে শুরু। তার চলায়-চলায় কাল বদলেছে, পোশাক বদলেছে, চেহারা বদলেছে—যা বদলায়নি সেটা হচ্ছে মন।

এই মনটা করেছে কী? ক্রমাগত আত্ম-সন্ধান করেছে। প্রতিটি শিল্পীর মনই তো আত্মসন্ধান করে, অভিনেতাও করে। নানান মেক্-আপ আর নানান সংলাপের মধ্য দিয়ে বারবার আমরা নিজেকে দেখি—আর সেই দেখা যদি নিজের মনোমত হয়, যদি নিজেকে নিজের মুহূর্তকালের জন্যও সুন্দর বলে মনে হয় তো সে আনন্দের তুলনা নেই, মুগ্ধ ভক্তের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়।

কিন্তু, নিজের কাছে নিজেকে সুন্দর লাগা কি অতই সহজ? তাই মঞ্চে সহস্র দর্শকের করতালিও এক-একদিন অভি-নেতার কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়, মনে হয়—এত করেও খুঁজে পাচ্ছি না কেন?

জীবন সম্বন্ধেও সেই কথা। সবটা জানতে পারছি না কেন? অনেকটা মনে পড়লেও, সবটা মনে পড়ছে না কেন? চার বছরের শিশু, আর পাঁচ বছরের শিশু, মনের দিক থেকে তফাত কতটুকু? অথচ চার বছর বয়সের কথা কিছু মনে নেই, মনে আছে পাঁচ বছর বয়সের কথা। এ এক অদ্ভুত রহস্যের অনুভূতি নয়? পাঁচের আগে জ্ঞান মানুষের হয়, কিন্তু বোধ হয় উন্মেষ হয় না। তাই তার স্মৃতিতে সব ধরে রাখতে পারে না। সুখাদ্য অখাদ্য আছে টের পাচ্ছি, মা-বাবা আদর করছে, বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনটা কি, কোন খাদ্যের কী বিশেষ স্বাদ পেয়েছিলাম, অনুভূতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আজ আর তার কোন রেখাপাত নেই।

শিশু বয়স, প্রথম যেটা মনকে আকর্ষণ করেছিল সে হচ্ছে উৎসব। আর বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব, পুজো। এখনকার পুজোর সঙ্গে তখনকার পুজোর চেহারার তফাত ছিল অনেক। জাঁকজমক তখনও ছিল, কিন্তু তার প্রকাশটা ছিল অন্যরকম। জন-উদ্দীপনার একটা শোভনতার ভঙ্গিও বোধ হয় ছিল। শিশু বয়সে আমাদের সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল, বেড়াতে যাব, প্রতিমা দেখতে যাব, নতুন নতুন জামা-কাপড় পরব, যা আজকে শিশুদের আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। শিশুরা চিরকালই এক। সামান্যতেই তারা খুশী হয় নতুন-কিছু পেলে বা দেখলে তাদের আনন্দের আর অবধি থাকে না

কেনা-কাটার পর্যায়ে ছিল জুতো কেনা। বড়দের সঙ্গে যেতাম। প্রথমেই ঘোড়ার

গাড়িতে করে রাস্তা দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে গাড়োয়ান আমাদের নিয়ে যেত চাঁদনীর বাজারে ডসনের বিলিতী জুতোর তখন খুব আদর ছিল। পাম্পশু বা টাই শু। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট তখন সরু একটা রাস্তা, দুপাশে চীনেদের দোকান। চীনে-বাড়ির জুতোরও নামডাক কম ছিল না। লাল চামড়ার গ্রীশিয়ান স্লিপার—কালো চামড়ার বর্ডার দেওয়া—সে আমাদের সেদিনকার কম ভালো-লাগার বস্তু ছিল না।

ধুতির নামডাক ছিল ফরাসডাঙার, সিমলের আর শান্তিপুরীর। বিলেতী কাপড়ের আমদানী হয়েছে, কোরা-ই বেশী দেখা যেত, ধোয়াও ছিল। তবে ব্যবহারের দিক থেকে খানদানী ছিল ঐ ফরাসডাঙা—সিমলে আর শান্তিপুরীর। ধুতির ক্ষেত্রে রুচির দিক থেকে আজকের দিনে ততটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্যে পড়ে না, যতটা পড়ে জামার দিক থেকে। তখন আমরা পরতাম রামধনু রঙের পাঞ্জাবি। আজকের পুজোর দিনে সাজগোজ করা বালকদল ঘুরছে দেখি,

কিন্তু সেই বিশেষ রঙের, বিশেষ ধরনের ঝিনুক-বোতাম লাগানো পাঞ্জাবি গেল কোথায়? আর সেই জাপানী সিল্কের রুমাল, কখনও আসমানী রঙের, কখনো সোনালী রঙের! মেয়েদের জন্য শাড়ির পাড় জুড়ে দেওয়া। সংগে সলমা-চুমকির কাজ করা বা সাঁচ্চা জরি বসানো ভেলভেটের জামা। ভেলভেটের জরির কাজ করা—ফ্যাশান ছিল বেনারসীর, আজও আছে। কিন্তু, যা তেমন নেই, সেটি হচ্ছে—পার্শী শাড়ি—সিন্ধীদের কাজ করা। আলাদা জরির কোট-পরা আমার একটি ছবি ছিল মায়ের সংগে তোলা। সেই কবেকার ছবি! ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে গেল। কোথায় যে বাঁধাতে দিলুম, হারিয়ে গেল। অবশ্য, ছবিটি মনে আছে। নেকারবোকার প্যাণ্টের ওপর কোট আর মাথায় টুপি,—টুপিটা বাঁকা—ন্যাজ ঝুলন্ত—তখনকার সোলজারদের জমকালো পোশাকের টুপির মতো।

সময় বদলায়, রুচিও বদলায়। সেই নিয়মে আজও বদলেছে। কিন্তু, সেই ছোট বয়সের প্রথম চোখে দেখা সেইসব ঝলমলে পোশাকের রঙ আজো যেন মন নিজের অজান্তেই খুঁজে বেড়াতে চায়। দেখতে পেলে খুশী হয়। একটু রঙের মধ্যেই সে যেন তার কৈশোরের সমস্ত রঙটাকেই খুঁজে পায়। তাই, সেদিনকার শৈশবের সেই ভেলভেটের কোটের সেই জমকালো রঙটাকে মনে পড়ে। আর মনে পড়ে, বড়দের বহর-মজুরী গহনের কথা মায়েদের লালপেড়ে গরদের শাড়ির কথা।

পুজো এত সর্বজনীন ছিল না তখন। পুজোর আনন্দ সমস্ত দেশটা জুড়ে সমানেই হত, প্রতিটি ঘরেই হত। কিন্তু প্রতিমা তখন আজকের মত পথের আনাচে-কানাচে শামিয়ানা আর তিনদিক ঘেরা কাপড়ের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যথা-তথা শোভমানা হতেন না। বড়-বড় বর্ধিষ্ণু লোকের বাড়িতে পুজো হত। জনাইয়ের মিত্তিরদের বাড়ির পুজোর কথা মনে আছে। ডাকের সাজের প্রতিমার কথা মনে আছে।

বড়রা শৌখিন ছিলেন, হয়ত আজকের তুলনায় একটু-বা বেশী শৌখিন ছিলেন (একালের ছেলেদের মতো স্নো বা পাউডার তাঁরা মাখতেন না। সে যুগে ওটা মেয়েদেরই প্রসাধন সামগ্রী ছিল)। আর যাই হোক, তাঁদের মধ্যে আতর, গোলাপজল আর জল সোডার ব্যবহারের প্রাচুর্য ছিল। কেওড়া দেওয়া, বরফ দেওয়া জল প্রীতির বস্তু ছিল। কিন্তু আসল কথা পুজোর ব্যাপারে একটা নিষ্ঠার ভাব প্রকাশ পেতো। নিষ্ঠাও বটে, শোভনতাও বটে।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের অঞ্চল থেকে বামুনঠাকুর আসত, আসত পাচকই শুধু। রান্নার কাজের জন্য বিরাট বিরাট কড়াই হাঁড়ি আর হাতা-খুন্তি। পিঁড়ি আর বারকোশ। আর মাটি খুঁড়ে তৈরী করা বড় বড় উনুন। আজও অবশ্য তা-ই দেখা যায় কিন্তু রসুই-করেরা বিষ্ণুপুরী ব্রাহ্মণ কিনা জানি না।

পুজোর প্রধান প্রমোদ ছিল তখন যাত্রার পালা-গান। থিয়েটারও যে হত না তা নয়। পাবলিক থিয়েটার হত কলকাতায়। বড়রা দেখতে যেতেন মাঝে মাঝে। কিন্তু পুজোর সময় পুজোবাড়ির প্রাঙ্গণে কখনও-সখনও থিয়েটার হলেও যাত্রারই সমাদর ছিল সর্বাধিক। সেই তখনকার দিনে মেয়ে-পুরুষে মিলেই কিছু কিছু শখের থিয়েটার দল করেছিল, প্রাইভেট থিয়েটার ছিল সেগুলির নাম। পাবলিক থিয়েটারের শো ভাঙলে অধিক রাত্রে শুরু হত তাদের অভিনয়, পাবলিক থিয়েটারের শো দেখে উত্তর কলকাতার বহু দর্শক ওখানে গিয়ে ভিড় করতো।

আমাদের ভবানীপুরে কিন্তু ঠিক তেমনটি ছিল না। দক্ষিণ কলকাতায় তখন কোন পাবলিক থিয়েটার ছিল না, অতএব অধিক রাত্রে শখের থিয়েটারের পালা শুরু হবারও কোন কারণ ছিল না। এই শখের থিয়েটার ছাড়া যেটা সর্বাধিক প্রচলিত ছিল, সে হচ্ছে, যাত্রা।

তখনকার পুজোর সময় এই যাত্রার ধুম ছিল খুব। বাড়ির কর্তারা পুজোর উৎসবে থিয়েটারের আয়োজনের থেকে যাত্রার আসর পাড়ে তোলবার দিকেই মনোযোগ দিতেন বেশী। বাঙালীর সাধারণ জীবনে প্রমোদ হিসাবে এই যাত্রার স্থান যে তখন কোথায় ছিল, তা আজকের দিনে ঠিক বোঝা যাবে না।

পুজোর সময় বাড়িতে থিয়েটার দিলে অভ্যাগত দর্শকবৃন্দের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত করতে হতো, লোকও বেশী ধরত না। পাড়ার লোক সবাইকে বলা যেতো না, অথচ মাত্র বিশিষ্ট কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত মহল এবং বাড়ির লোক নিয়ে থিয়েটার দেখা তখনকার আমলের কর্তাদের পছন্দসই ছিল না। তখনকার কর্তাদের এই মানসিক ঔদার্যের কথাটা বোঝা দরকার। আমার বাড়িতে যে উৎসব, তাতে পাড়া-পড়শী, অতিথি, অভ্যাগত—সবারই অংশ থাক, সবাই মিলে আনন্দ করুক এসে আমার

আঙিনায়—এইরকম একটা উদার মনোভাব প্রকাশ পেতো তাঁদের আচরণে। আজকের দিনে, যেখানে অনুষ্ঠান আর উৎসব নিয়ন্ত্রিত হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী-গঠিত পুজো কমিটির মেম্বারদের দিয়ে, সেখানে সেদিনকার একক গৃহস্বামীর কর্তৃত্বের ব্যাপারটাকে কেউ যদি অহংকার আখ্যা দেন তো আমি সেকথা অস্বীকার করব না—কিন্তু এও বলব, যদি অহংকারই হয় তো তার প্রকাশে সচরাচর উগ্রতা ছিল না—কোনো অশোভনতা ছিল না।

যাই হোক, এইসব বিবেচনা করেই বাড়ির কর্তা যাত্রার দিকে ঝোঁকটা দিতেন বেশী। যাত্রায় দর্শকবৃন্দের মাঝখানে হয় আসর, তার চারপাশে শতরঞ্চি বিছানো থাকত ঢালাও করে—দরজা থাকত খোলা, সবারই জন্য সেদিন অবারিত দ্বার। যার খুশী এসো, স্থান থাকে বসো, শুনে যাও যাত্রার পালাগান। টিকিটের কোনো প্রয়োজন নেই। থিয়েটার হলে অবশ্য টিকিট দরকার, নইলে দর্শনার্থী জনসাধারণের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কী করে?

শৈশবে শখের ও পেশাদারী, উভয় দলেরই যাত্রা দেখেছি, তবে, সে দেখাটা ছিল শিশুর চোখ দিয়ে দেখা। সেদিনকার সেইসব জমকালো-পোশাক-পরা রাজা-মন্ত্রী আর সেনাপতিরা আজ হয়ত চোখের সামনে তেমন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারবে না, যেমনটি ঠিক সেদিন তারা করেছিল! কোথায় গেল সেদিনকার সেইসব রাজা-উজিরের দল—কিন্তু শৈশবের চোখ-দিয়ে-দেখা তাদের সেই গাম্ভীর্যপূর্ণ চলাফেরা আর জমকালো পোশাকের ছবি আমার এই পরিণত মন তো আজও ধরে রেখেছে!

তখনকার যাত্রা অনেক সময় সন্ধ্যা থেকে হতো না, ভোর থেকে শুরু হতো—তা প্রায় তিন-প্রহর-দিন পর্যন্ত চলত। পেশাদারী দলের লোকেরা অবশ্য সাধারণত শুরু করতো রাত নটা-দশটা থেকে, চালাতো একেবারে সেই ভোর হওয়া পর্যন্ত। আবার পালা বড় হলে কখনো-কখনো সকালেও তার জের চলতো। শখের দলেরা ভোর থকে শুরু করে একেবারে বেলা একটা-দুটো, এমন কি তিনটে পর্যন্ত পালা চালাতো। দর্শক-দল এত বেলা পর্যন্ত কিন্তু সমান আগ্রহে যাত্রা শুনে চলেছে সে এক লক্ষ্য করবার মতো বিষয়! যাত্রা শুনতে-শুনতে কেউ কেউ উঠে দাঁড়ালো, চলে গেল বাইরে, তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে তার জায়গা রাখতে বলে। বাইরে গিয়ে হয়ত কিছু খেয়ে নিলো, তারপরে আবার এলো স্বস্থানে—এবার বাইরে গেল হয়ত তার বন্ধু। এইরকম 'যাচ্ছে-আর-আসছে'-র ব্যাপার অনুক্ষণ চলছে দর্শকদের মধ্যে, কিন্তু, তাতে কোনো শোরগোল হত না, অভিনয়ের পক্ষে কোনো বাধাও ঘটত না।

আর-একটা লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল সাজানো আসরটা। চারপাশে মানগণ্য ব্যক্তিরা বসেছেন আসরটাকে ঘিরে গোলাকারে; চাকর-বাকর আর বেয়ারারা বাঁধানো হুঁকো আর গড়গড়ায় তামাক দিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বদল করে দিচ্ছে তামাক, কখনো বা থালায় করে দিয়ে যাচ্ছে তবক-দেওয়া পান। যাত্রাও চলছে, বেয়ারা-চাকরদেরও আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কিন্তু, তাতেও কোনো শোরগোল নেই, অভিনয়ের কোনো ব্যাঘাত নেই। বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা ঠিক আসরে এসে বসতেন না, হয়ত বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে দু'তিন ঘণ্টা পালা শুনতেন, তারপরে চলে যেতেন ভিতরে। ঐ দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে পালা শোনাও বটে, অভ্যাগত দর্শক-দের বসবার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা, কিংবা আরও যে দর্শক বাইরে ভিড় করছে, তাদের কোনোপ্রকারে ভিতরে এনে কোথাও বসানো যায় কিনা, এ সব তদারকি করতেও ভুলতেন না কখনো।

যাত্রা হবে, সন্ধ্যা-হবো-হবো-র মুখে আসর-সাজানোর পালা শুরু হতো। আমাদের শৈশবে সে এক মহাসমারোহের ব্যাপার। বিস্ময়ের ব্যাপারও বটে, আনন্দের ব্যাপারও বটে। শিশু-মন যাত্রার দিকে কেন ঝুঁকত বেশী, তার কয়েকটা কারণ ছিল। প্রধান কারণটাই ছিল এই যে, থিয়েটার যদিও বা স্থানীয় শৌখিন দল কখনো-সখনো করত, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই শোনা হতো না, কারণ, তা এত রাত্রে আরম্ভ হতো যে, আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম।

তাই, যাত্রা আর যাত্রার আসরের সঙ্গেই আমাদের শৈশবের যোগটা ছিল অধিক বিজড়িত। আসর সাজানো হচ্ছে, আমাদের হৈ-হৈ-র আর সীমা নেই! একটি-একটি করে কাজ এগুচ্ছে, আর আমাদের আগ্রহ বাড়ছে সমানে। বড়-বড় ছবি চারিদিকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঝুলছে আলোর

ঝলমল-করা ঝাড় লণ্ঠন, তারই আলোয় অদ্ভুত মোহময় হয়ে উঠেছে সমস্তটা পরিবেশ। লোকজন তখনো এসে জোটেনি, শতরঞ্জি আর বড়-বড় ফরাশ পাতা হয়েছে, তার ওপর মাঝখানে জাজিম আর তাকিয়া শোভা পেতো।

আমাদের কিন্তু বড় ভালো লাগত এই ফরাশের ওপরে গড়াগড়ি খেতে। ফরাশের ওপরে সমবয়সী কয়েকজন মিলে গড়াগড়ি দিয়ে আমরা সেদিন যে আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি, তা আজও ভুলবার নয়!

সেসব দিন কেটে গেছে। শৈশবের সেই তন্ময় হয়ে যাত্রা দেখার দিনও আজ নেই। দেখতে দেখতে ক্রমশ ঘুমে ঢলে আসত চোখ, এক সময় ঘুমিয়েই পড়তাম। হঠাৎ এক সময় পেতাম অপেক্ষাকৃত বড়দের কারুর করস্পর্শ—'এই যুদ্ধ হচ্ছে দেখ দেখ!'

ধড়মড় করে উঠে বসতাম তাড়াতাড়ি। ঘর ঘর ঢোলের আওয়াজ হচ্ছে—তার মানে যুদ্ধের বাজনা। আর ঝলমলে পোশাক-পরা দুটি লোক ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ঝকঝকে-ওঠা দুটি তরবারি হাতে তুলে নিয়ে আস্ফালন করছে পরস্পরের প্রতি, দেখাত কেমন আতঙ্ক হতো আবার ভালও লাগত। ভাল লাগত যাত্রার একক পালা-গুলি, আর ভাল লাগত পাত্রপাত্রীদের সমস্ত চুমকি দেওয়া বিচিত্র পোশাক! তাদের বক্তব্যের মানে বুঝতাম না, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গী ও শব্দ বিন্যাসে যে একটা মোহ সৃষ্টি হতো—শিশুমনকে তা-ও আকর্ষণ করত কম নয়!

আজকে নিজেকে সন্ধান করতে করতে মনে হয় যে, সেদিন সবাই আমরা যাত্রার ফরাশে গড়াগড়ি দিয়ে যে আনন্দ পেতাম, পরবর্তীকালে আমার জীবনের সঙ্গে যাত্রার যে একটা নিবিড় সংযোগ গড়ে উঠবে—সে বুঝি তারই পূর্বাভাস।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে পড়ছে। বেলেঘাটা-মাণিকতলার ওপারে ছিল পাড়া-নারিকেলডাঙা। সেই পাড়ায় ছিল আমার মামাবাড়ি। এই মামাবাড়িতে প্রায়ই যেতাম, সেইজন্য মামাবাড়ির পরিবেশ আমার মনে বিশেষভাবে গাঁথা হয়ে আছে। মামা-বাড়ির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঐ যাত্রা। বারোয়ারি হতো। মামাবাড়ি থেকে একফালা হাতের মধ্যে—প্রকাণ্ড চালার নীচে যাত্রা বসত। মামাবাড়িতে যাত্রা দেওয়া হচ্ছে, এ খবর ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে পৌঁছানোমাত্রই আর দেরী নয়—মামা-বাড়ি আমরা যাবই। মা-ও যাবেন। যাত্রার প্রসঙ্গে মামাবাড়ির কথাটা এসে যখন পড়লোই, তখন কথার ফাঁকে জানিয়ে রাখি, মামাবাড়ির প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল নানা কারণে। একটা হচ্ছে ভবানীপুরের বাড়িতে আমার বয়সী আমি একা, মামা-বাড়িতে অনেক ছেলে—হৈ হৈ-এর সুবিধা ছিল। মামাবাড়ির সামনে পুকুর—চারধারে দিব্যি বনজঙ্গল,—এর আকর্ষণ কম নয়! সেই সব জঙ্গলে খুব জোনাকি হতো সন্ধ্যার সময় থেকে। আমাদের প্রধান আমোদ ছিল ঐ জোনাকি ধরা। তখনকার দিনে তো আজকের মতো হাফপ্যাণ্ট পরার রেওয়াজ ছিল না, ছোট থেকেই কাপড় পরতুম। কোঁচা ফুলিয়ে জোনাকি ধরে সেই কোঁচাটা কায়দা করে শক্ত করে ধরে রাখতুম হাতে, সেই ফোলানো—ফাঁপানো কোঁচার মধ্যে থেকে পিট পিট করে জ্বলত সেই বন্দী জোনাকিগুলো। সে বড়ো আমোদের প্রিয় জিনিস ছিল। এই জোনাকি ধরার ব্যাপার নিয়ে কি সে সময় কম বকুনি খেয়েছি!

মামাবাড়িতে যাত্রা শুধু সেই বারোয়ারী-তলাতেই হতো না—বাড়ির একেবারে উঠোনে—ঠাকুরদালানে হতো জগদ্ধাত্রী-পুজোর সময়। প্রসঙ্গত এ-ও বলে রাখি, মামাবাড়িতে হাতে আঁকা একটি অপূর্ব পট ছিল জগদ্ধাত্রী মূর্তির। সে পট বহু পুরনো। দিদিমাও বলতে পারতেন না—কবেকার। বলতেন, এটা দেখেই আসছি ছোট থেকে। পটটি এত সুন্দর আঁকা যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাছাড়া, ঠিক ও ধরনের পট আর কোথাও কখনো দেখিনি। অতি প্রাচীন কোন শিল্পীর আঁকা। মামা-বাড়ির পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই দেবী জগদ্ধাত্রীর ভক্ত ছিলেন, নইলে অমন যত্ন করে পটটিকে রক্ষা করতেন না। মামাবাড়ি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেলেও পুরনো দিনের স্মৃতি—খানদানী জিনিস—ঐ একটিই আছে,

সে হচ্ছে ঐ পট—দেড়শো বছর, কি তারও বেশী পুরোনো। পট গেছে জীর্ণ হয়ে—তার রঙ গেছে বিবর্ণ হয়ে—তবু তার যেটুকু আছে, বেঁচে আছে যে রেখাঙ্কন, তার শিল্পমূল্য কম নয় বলে আমার ধারণা। বড়ো লোভ ছিল ঐ পটটির ওপরে—বড়ো ইচ্ছা হতো ঐটিকে এ বাড়িতে আনবার, কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন কারুর কাছে তা চাইতে পারিনি—সাহসও হয়নি। কারণ, বোধ হয় ওটি ওঁদের কুলের ভক্তদের বস্তু। সেকালের ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি আজও আছে কি না জানি না, কিন্তু মার্বেল পাথরের বড় বড় মূর্তিগুলি আছে। তবে আজকের যে পরিবেশ, তাতে ঐ মূর্তিগুলি আর মানায় না।

তখন মানাতো, পরিবেশ ছিল অন্যরকম। একদিকে পুকুর, ঝোপ-জঙ্গল। অন্যদিকে রাস্তায় তখন জ্বলত শুধু তেলের আলো। অবশ্য খাস কলকাতার ছোট ছোট রাস্তায়ও ছিল তেলের আলো, একটু বড় রাস্তায়—গ্যাসের আলো। এই গ্যাসের আলোর সাপ্লাই ছিল ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর। কী প্রতিষ্ঠা তখন তাদের! বহু বাঙালী এর থেকে চাকরি করে খেতো। সাধারণ লোকের সন্তুষ্টি ছিল ঐ তেলের আলোতেই। শুধু পদমর্যাদা রক্ষা করবার জন্য বড়লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়িতে বিদ্যুৎ নিয়েছেন। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে তখনকার মানুষের মধ্যে তখনও কোন বিলাসিতা ছিল না। বিদ্যুতের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে গেল বটে, বিদ্যুৎ তখন রাস্তায় ছিল না। হগ্ সাহেবের বাজারের আশেপাশে ইংরাজ-পল্লীর দোকানে, অফিসে, অথবা বড় বড় সাহেবদের বাড়িতে বিদ্যুৎ দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সাধারণ বড়লোক বাঙালী তো বটেই, ছোট ছোট সাহেবরাও মোমবাতি জ্বালাতো। আমাদের বাড়িতেও কি তখনকার দিনে কম মোমবাতি জেলেছি আমরা! কিন্তু থাক্ সে কথা।

পূর্বেই বলেছি, শৈশবের বড় আকর্ষণ হচ্ছে উৎসব। আমাদের জাতীয় উৎসব, পুজো ছাড়া, সেদিনকার কলকাতার 'বাবু-সমাজ' যে-উৎসবে উৎসাহ বোধ করতেন, অথবা জনসাধারণ যার বিচিত্র সমারোহ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতো—তা হচ্ছে বড়দিনের উৎসব। আমরা বলতাম, বড়দিন। কিন্তু চৌরঙ্গী অঞ্চলের কোচওয়ান, মুটে কিম্বা খানসামা-চাপরাসির দল বলত—'কিসমিস'!

ক্রিসমাসকে বলতো—'বাড়া কিসমিস', আর নিউ ইয়ার্স ইভকে বলত—'ছোট কিসমিস'!

এই 'কিসমিস' উপলক্ষে সেদিনকার মহানগরী যে বিচিত্র উৎসব-সজ্জা ধারণ করত, অর্থাৎ যা আমরা শিশুবয়সে দেখেছি, তা আজকের দিনের শিশুরা কল্পনাও করতে পারবে না। সে তুলনায় আজকের বড়-দিনের উৎসব যা দেখা যায়, তা তো কিছুই নয়।

সাহেবপাড়ার বড়দিনের উৎসব দেখবার সুযোগ পেতাম আমাদের দোকানে বসে। আমাদের দোকান—"শম্ভু আণ্ড গ্রাণ্ড-সন্স"—রাধাবাজার থেকে উঠে এসেছে লীণ্ডসে স্ট্রীটে। সেকালের লীণ্ডসে স্ট্রীটের সমারোহের সঙ্গে আজকের মিল মেলে না। ইহুদী আরমানীদের সাজানো-গোছানো সব দোকান, আর দেশীদের মধ্যে সিন্ধী দোকানদার ছিল অনেক, কিছু কিছু বাঙালীও। বড়দিনের সময় ফুলে-ফলে কি সুন্দর করে দোকান সাজাতো, আলোর মেলা, আর সাহেব-মেমদের ভিড়! অবশ্য আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্তই দেখা যেতো ভদ্র সাহেব আর মেমদের, তারপরে দলে দলে আসত গোরা-সোলজার আর জাহাজের সেলাররা।

এদের মধ্যে উন্মত্ততা দেখা যেতো বটে সেদিন, কিন্তু কখনো কারুর সম্পত্তির ওপর হামলা করতো না। কুলিরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সেলাম করছে—খুশী হয়ে হয়ত এক টাকা পর্যন্ত বকশিশই করে দিলে।

বড় বড় সাহেবরা কেউ যেতো হোটেলে, মাথায় নানারকম বিচিত্র ক্রাউনের টুপি—হাতে নানারকম বেলুন, ক্রেপ কাগজের লতা-জড়ানো। তাদের বাড়িতেও বড়দিন উপলক্ষে নাচ-গান হতো—সমগ্র সাহেব-পল্লী সেজে উঠতো অপূর্ব এক সাজে। কিন্তু, একথা বলতে হবে, চৌরঙ্গী অঞ্চলের যে সমবেত উৎসব-সমারোহ দেখা যেতো—তার তুলনায় সে সাজ বা সে আলোকসজ্জা অনেক ম্রিয়মান।

গোরা সোলজার আর সেলাররা সমবেত গান ধরেছে রাস্তায়—চারিদিকে ভিড় আর ভিড়—সব মিলিয়ে একটা বিশৃঙ্খলার ছিটে বটে, তবু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা সৌকর্য ছিল। যদি তাদের উন্মত্ততার কথাই বলতে হয় তো এর উন্মাদনা জেগে উঠত যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা জাপানী নরনারীরা পর্যন্ত বেরুতো দলবদ্ধ হয়ে। কিন্তু তবু বলব, সে উন্মাদনারও একটা মাত্রা ছিল, একটা সীমারেখা ছিল। তার ছিল বলেই সেই সময়ের উৎসব-সমারোহে সোলজার-সেলারদের ভিড় করে দাঁড়ানও একটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করত, যা আমার কিশোরমনকে মুগ্ধ না করে পারে নি।

বড় দিন উৎসবের এই যে বিপুল জন-সমাবেশ লক্ষ্য করেছিলাম সেই বয়সে—আজকের কোন উৎসবে—সর্বজনীন পুজো-মণ্ডপে বা মিছিলের জমায়েতে—তার তুলনায় কিছুই ভিড় হয় না। তবু যে অনেক সময় পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবকের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিন্তু সেদিনকার সমারোহে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নই ওঠেনি। তারা ছিল সকল নিয়মিত দল—সারি সারি রাস্তার ওপর [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯১০ সাল পর্যন্ত [illegible] এই উৎসবের [illegible] [illegible]। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "Territorial Force" [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ছিল তারাও [illegible]—তাদের [illegible] ছিল না। সবচে একটা জিনিস তাদের মধ্যে আমরা সেদিন লক্ষ্য করে-ছিলাম যে জিনিসটা তাদের [illegible] [illegible] [illegible]—ইংরেজ মাত্রেরই মধ্যে একটা [illegible] ছিল। তারা যে বিদেশে পড়েছে—এ বোধ ছিল তাদের সর্বক্ষণ, সেইজন্য সেদিন তাদের সবকিছুর মধ্যেও একটা গাম্ভীর্য ছিল বিরাজমান। বাঙালীর দোকানগুলিও সেদিন নানা-ভাবে সাজানো হতো ফুল-লতা-পাতা দিয়ে, তার মধ্যে শোভা পেতো ইংলণ্ডের রাজা-রাণীর ছবি। এই রাজারাণীর ছবি যেন তাদের আরও আকর্ষণ করত দোকানে উঠে আসতে—এটা-ওটা নেড়ে-চেড়ে জিনিসপত্র কিনতে। (ক্রমশ)

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

১১

চায়ের টেবিল ছেড়ে মানসী নিজের ঘরে চলে এল। ভাগের ঘর। নিজের ঘর বলে কি আর আলাদা একটু জায়গা মানসীর আছে? ঘরে আর কেউ নেই। মায়াকে নিয়ে মা সব বিছানা তুলে ফেলেছেন। ঘরখানা ফাঁকা। হঠাৎ মানসীর মনে হল সমস্ত জগৎটাই যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। তার কিছু করবার নেই, বলবার নেই, নিঃস্ব আর নিষ্কর্মা হয়ে সে যেন এক নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা তাড়াতাড়ি পড়াতে বেরিয়ে গেলেন; মঞ্জু আর মিনু স্কুলে ছুটল। নিজের ঘরে বসে সবই টের পেল মানসী। নন্দু মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেল। ঠিক [illegible] বসল। অন্যদিনের মতই আজও সংসারযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। শুধু মানসীই যেন থেমে আছে। চলবার মত পায়ের জোর নেই, মনে উৎসাহ নেই, সামনে পথের নিশানাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

আর মাত্র দু'দিন সময়। তার পরেই অফিসের কাজের উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দিতে পারবে মানসী। অফিসে গিয়ে একেবারে কাজের মধ্যে যদি নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে তাহলে আর কোন ভাবনা নেই। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে কাজই তাকে মুক্তি দেবে। কিন্তু এই দু'দিন কী করে কাটাবে মানসী? এর প্রতিটি মিনিট-সেকেণ্ড সীসার মত ভারি হয়ে রয়েছে। অচল ঘড়ির মত সময় তার গতি বন্ধ করে রেখেছে।

মা আর মায়া রান্নাবান্নার যে আয়োজন করছে মানসী গিয়ে সে কাজে হাত দিতে পারে। কিন্তু মা অবাক হয়ে যাবেন। মানসী তো ঘরের কাজ বড় একটা করে না। মা তাকে আজও হয়তো কিছু করতে দেবেন না। আগে আগে তিনি এই নিয়ে তাকে কথা শোনাতে ছাড়তেন না। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ জানিয়ে বলতেন 'ঘর-সংসারের কাজ যে মোটে হাত দিয়ে ছুঁতেই চাসনে, পরিণাম কি হবে বলতো?'

মানসী পরম নির্ভাবনায় বলত, 'কী আবার হবে!'

মা বলতেন, 'নিজের ঘর-সংসার তো একদিন করতে হবে। তখন তো আর আমি সঙ্গে যাব না, বোনরাও কেউ সঙ্গে যাবে না।'

মানসী হেসে বলত, 'অত ভাবছ কেন, গণ্ডা কয়েক দাসদাসী ঠাকুর-চাকর রেখে দেব। তারাই সব করে দেবে।'

মা বলতেন, 'ইস্, কত বড় নবাবের বেটি। তেমন ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে কিনা।'

মাধুরী একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ওর জন্যে ভেব না মা। মানসীর সংসার কি আর তোমার মত সংসার হবে? ওর সংসারের একটা দিক তুলে নেবে ঠাকুর-চাকর আর একটা দিক কাঁধে নেবে স্বামী। আর যদি দশ নম্বর ফ্ল্যাটের অবস্থাটা করে নিতে পারে, তাহলে তো কোন কথাই নেই।'

মা জানতে চেয়েছিলেন, 'সে আবার কি?'

মাধুরী বলেছিল, 'জানো না বুঝি? দশ নম্বর ফ্ল্যাটের অরুণবাবু, তাঁর স্ত্রীর সব কাজ করে দেন। বিছানা পাতেন, মশারি টানান, স্ত্রীর ভিজে শাড়িখানা পর্যন্ত মেলে দিয়ে আসেন। সবাই অরুণবাবুকে বলে অরুণা দেবী, আর তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমাদিকে বলে পূর্ণবাবু। আমাদের মানসীও যদি অমন মানসকুমার হতে পারে—।'

মায়া-মঞ্জু সবাই হেসে উঠেছিল।

মানসী প্রথমে হাসলেও শেষে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দিদির ঠাট্টা হজম করতে পারেনি।

মা বসে বসে চন্দ্রপুলি পিঠে তৈরি করছিলেন। তিনি সস্নেহে মানসীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'তা তোমরা যতই বল, কাজকর্মের জন্যে ঘরসংসার কারো আটকে থাকে না। বাপের বাড়ি থেকে আমি যখন তোমাদের সংসারে এলাম, সব কাজ কি আর শিখে এসেছিলাম? না কি মাথার ওপর শেখাবার মত কেউ ছিল? সব নিজের দরকারে নিজের আন্দাজ আর পছন্দমত আস্তে আস্তে শিখে নিয়েছি। তোমরাও তাই শিখবে। ভগবান যদি মুখ তুলে তাকান, ঘরসংসারের সুখ তোমাদের ভাগ্যে যদি থাকে, তোমরাও যার যার নিজের সংসার নিজের মত করে গড়ে নেবে। সবাইর হাতের রান্না যেমন একরকমের হয় না, সবাইর পাতা সংসারও তেমনি একরকমের নয়।'

অদ্ভুত মায়ের স্বভাব। তিনি দিদিকে আর মায়াকে ভালবাসেন ঘরের কাজ করতে দিয়ে, আবার মানসী আর মঞ্জুকে ভালবাসেন ঘরের কাজ না করতে দিয়ে। মানসী যা ভালবাসে, তাই করুক, অফিসের কাজ-কর্ম চিন্তা-ভাবনা নিয়ে থাকুক, মঞ্জু যখন সাজসজ্জা ভালবাসে, সে না হয় তার সাধ-আহ্লাদ খানিকটা মিটোক। তিনি শাসনও করেন, খোঁটাও দেন, আবার গোপনে গোপনে আস্কারাও দিয়ে থাকেন। এক এক মেয়ের ভিতর দিয়ে যেন এক এক রকমের সাধ মিটোতে চান মা। চাকরি করবার সাধ, সাজ-সজ্জা করবার সাধ, স্বাধীনভাবে ভালবাসবার সাধ, সব সাধই মার কোন না কোন মেয়ের ভিতর দিয়ে পূর্ণ হতে চায়। মানসী হাসল। ভালবাসবার সাধ; কিন্তু ভালবেসে কি সাধ মেটে? মেটে না, মেটে না। কখন যে কিভাবে সে সাধ বাদ পড়বে, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখবার জো নেই। নইলে তার নিজের দিদি কিনা—। অথচ এই দিদির জন্যে সে কী না করেছে? বাবার যুক্তিহীন শাসনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে, অনুপযুক্ত কোন পাত্রের হাতে তাকে

গছিয়ে দেবার চক্রান্ত ভেদ করেছে। নিজের জীবনের কোন কথা গোপন করেনি। অসীমের সঙ্গে তার সম্পর্কের আগাগোড়া কাহিনী বলেছে, অনেক চিঠিপত্র দেখিয়েছে, অসঙ্কোচে অসীমের সমালোচনা করেছে। কে জানে, সেই সব কথা অসীমকে লাগিয়ে লাগিয়েই দিদি হয়তো ওর কান ভারি করেছে, মানসীর ওপর চরম বিরূপতা, বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। সে মাঝে মাঝে অসীমের নিন্দা করেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যে অভিমান ছিল, অতিশয়োক্তির কৌতুক ছিল, বলবার সময় মাধুরী নিশ্চয়ই তা বাদ দিয়ে বলেছে।

সেই নির্জলা নিন্দায় কোন রঙও নেই, রসও নেই। সহানুভূতির গোপন বেদনাই কি তাতে আছে?

'মানসী?'

মাধুরীর গলা টের পেয়েও মানসী মুখ ফিরাল না; যেমন জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধুরী বলল, 'একা একা কী করছিস এখানে?'

মানসী বলল, 'কী আবার করব?'

মাধুরী আরও একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

মানসী নিজের মনেই হাসল। কথা মানেই তো একরাশ মিথ্যা কথা। একটি নগ্ন-সত্যকে ঢাকবার জন্যে পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যার পত্রপল্লব। মাধুরী এখন কত বানানো কৈফিয়তই না দেবে। কত রকমের কত জবাবদিহি। কিন্তু কৈফিয়ত তো মানসী চায়নি। সে জানে কৈফিয়ত চাওয়া নিষ্ফল। মানসী যা নিজের চোখে দেখেছে, অনুভব করে জেনেছে, আর একজনের মুখের বানানো কথায় তার চেয়ে কি কিছু বেশি জানবে?

'বেশ তো, কথা যদি থাকে বললেই হয়।'

মাধুরী একটু হাসল, 'হঠাৎ ভাববাচ্য শুরু করে দিলি যে! এখানে সব কথা বলা যাবে না। কেউ হয়তো এসে পড়তে পারে। চল্ না, বরং ছাদ থেকে আমরা একটু ঘুরে আসি। কি পার্কেও যাওয়া যায়। কালকের বৃষ্টিবাদলার পর আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেমন রোদ উঠেছে, তাই দেখ্।'

মানসী মনে মনে বলল, 'তুমি তো রোদের ঝিলিমিলি দেখবেই। দিনের বেলায় চাঁদের আলো দেখলেই বা আজ তোমাকে আটকায় কে? কিন্তু আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।'

মাধুরী আবার বলল, 'কিরে যাবি?'

মানসী বলল, 'না। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। যদি কিছু বলতে হয় এখানেই বল।'

মাধুরীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল একটু। কিন্তু মনের কথাকে কেন মুখে আনবে না মাধুরী? আনুক, আনুক। এমন দু-একটা কথা বলুক যার প্রতিবাদে মানসী মনের সাধ মিটিয়ে ঝগড়া করতে পারে। যত ক্ষোভ, যত আক্রোশ সেই কথার স্রোতে স্রোতে ভেসে যাক। জলন্ত আগ্নেয়-গিরিকে বুকের মধ্যে পুষে রাখতে মানসী আর পেরে উঠছে না।

মাধুরী বলল, 'বেশ, তাহলে আর এক সময় বলব।'

মানসী বলল, 'তোমার যা খুশি।'

মাধুরী চলে যেতে যেতে ফিরে তাকাল, 'কাল বুঝি তুই প্রিয়গোপালবাবুর ওখানে গিয়েছিলি?'

মানসী বলল, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তাতে কি!

মাধুরী বলল, 'না কিছু না। তোকে আমরা ফোন করে করে পাইনি, তাই বলছিলাম।'

মানসী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আমরা মানে?'

মাধুরী যে আরক্ত হল, অপ্রতিভ হল তা মানসীর চোখ এড়াল না।

মাধুরী বলল, 'আমি বিকেলের দিকে একবার ফোন করেছিলাম। আরও মানে অসীমদা নাকি দুবার—।'

মানসী অদ্ভুত একটু হাসল, 'যাক্ দ্বিবচনের মানেটা এবার বোঝা গেল। কিন্তু আমি অফিসেই ছিলাম। কাজ ফেলে রেখে কোথাও বেরোইনি। হয়তো দু-চার মিনিটের জন্যে অন্য কোন ঘরে গিয়ে থাকব। প্রিয়গোপালবাবুর বাড়িতে গিয়েছি অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরে। সে-ও একটা কাজেই গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি? কী কাজ?' মাধুরী একটু কৌতূহলী হল।
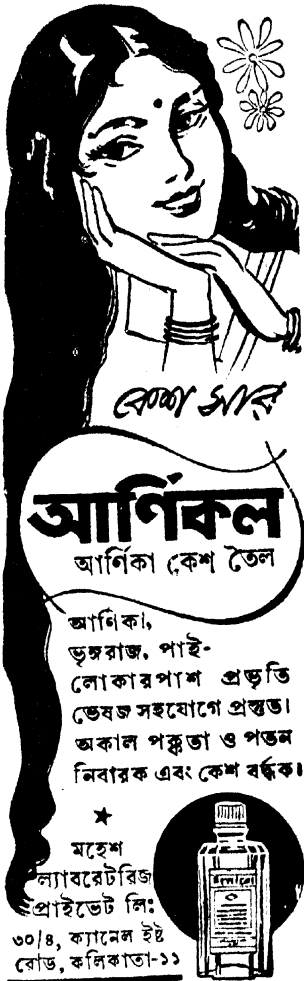
মানসী বলল, 'সে এখন অকাজ হয়ে গেছে। তোর শুনে কোন লাভ হবে না।'

মাধুরী আরও একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ও চলে যাওয়ার পর নিজের বোকামির জন্যে মানসীর ভারি অনুশোচনা হল। মাধুরীর সঙ্গে গেলেই হতো। ছাদে কি পার্কে—যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই না হয় কিছুক্ষণের জন্যে যেত মানসী। গেলে মাধুরী কী বলে তা শুনতে তো পেতো! বানানো কথা, মিথ্যা কথা হোক, ব্যাপারটাকে কীভাবে সাজায় তা তো মানসী দেখতে পেতো। সুযোগটা হাতের কাছে পেয়ে সে হারিয়েছে। নিজের ভুলের জন্যে নিজের ওপরই এবার রাগ হতে লাগল মানসীর। এখন আর ওকে ডাকা যায় না। এখন আর বলা যায় না, 'চল, তোমার যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে চল। তুমি যা বলবে তাই কান পেতে শুনব। তোমার কাহিনী যত সাজানো আর মিথ্যেই হোক, কোথাও প্রতিবাদ করব না।'

এখন আর তা বলবার জো নেই। বললে মানসীর আর কোন মর্যাদা থাকবে না। মাধুরীর কাছে আর এক দফা হার হবে তার।

মাধুরী আর অসীম তাহলে প্রিয়গোপাল-বাবুর কথাও তুলেছে। এই প্রৌঢ় হিতৈষী অধ্যাপকের ওপর যে অসীমের চাপা ঈর্ষা আছে, মানসী তা জানে। কিন্তু সেই ঈর্ষাকে সে আমল দেয়নি। বরং তা নিয়ে মাঝে মাঝে কৌতুক করেছে। ব্রজবাবুকে নিয়ে মাধুরীর সঙ্গে যেমন ঠাট্টা-তামাসা করে মানসী, মাধুরীও তেমনি তার শোধ

নেয় প্রিয়বাবুকে এনে। যদিও ব্রজবাবু আর প্রিয়গোপালবাবু এক প্রকৃতির নন, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি মর্যাদাতেও অনেক তফাত। প্রিয়গোপালবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গুণী, কৃতী পুরুষ। ব্রজবাবুকে নিয়ে মাধুরী শুধু ঠাট্টাই করতে পারে, বড় জোর কিছুটা সহানুভূতি আনতে পারে তাঁর ওপর, কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু শ্রদ্ধার দাবি রাখেন। মানসী অসীমের কাছে তাঁর কথা মাঝে মাঝে লিখেছে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা, মানসীর সঙ্গে তাঁর স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কের কথা সে অসীমকে জানিয়েছে। অবশ্য মাধুরীর মতই অসীম সেই সম্পর্ক নিয়ে কৌতুক করেছে, হেসে বলেছে 'আমি কি ও'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব?—বিদ্যাবুদ্ধির ওই সাগরকে ছেড়ে তুমি কি আর আমার মত খাল-বিলের ধারে আসবে?' প্রিয়গোপালবাবু অবিবাহিত বলে এই কৌতুকের সুযোগটা আরো বেশী করে পেয়েছে অসীম। অবশ্য কৌতুক সব সময় শুধু কৌতুকই থাকেনি। মাঝে মাঝে সত্যিকারের ঈর্ষ্যা তার ভিতর থেকে উঁকি দিয়েছে। সব হাসি পরিহাসের মধ্যেই কি কিছু না কিছু সত্যের আভাস থাকে? প্রিয়বাবুর পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তার কথা, তাঁর স্নেহ-প্রীতি বন্ধুত্বের কথা কেন লিখত মানসী? অসীমের ঈর্ষার উদ্রেক করবার জন্যে? ঠিক তা নয়। অসীমকে ঈর্ষান্বিত করে তার লাভ কি? পৃথিবীতে নিজের গণ্ডির মধ্যে সার্থক, সুস্থ, নিজের ওপর আস্থাশীল মানুষও যে দু'চারজন খুব ধারে-কাছেই বাস করেন, এই কথাই মানসী বুঝাতে চেয়েছিল। অসীম যে প্রিয়গোপালবাবুর মত হবে এমন আশা অবশ্য মানসী করেনি। সে তো আর পাগল নয়! একই কর্মক্ষেত্রে, একই গুণপনার ক্ষেত্রেই একজন আর একজনের মত হয় না, অসীম আর প্রিয়গোপালবাবুর মধ্যে একজন পুলিস কর্মচারী এবং একজন খ্যাতিমান অধ্যাপকের মধ্যে তুলনার কথা তো উঠতেই পারে না। কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নিজের ইচ্ছামত, রুচিমত নিজের পথ নিজে কেটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এসব তো মানুষের সাধারণ লক্ষণ। অসীমের কাছে মানসীর দাবি সেই সাধারণ হবার ন্যূনতম দাবি। অসীম অসাধারণ নাই-বা হতে পারল, নিম্নসাধারণ কেন হবে। সে তো অক্ষম নয়, অশিক্ষিত নয়, শুধু অসন্তুষ্ট। এক ধরনের অসন্তুষ্টি আছে যা মানুষকে উন্নত করে, শক্তিতে, সামর্থ্যে, কীর্তিতে, সম্পদে ধাপে ধাপে তাকে উঁচু থেকে আরও উঁচু সিঁড়িতে তুলে দেয়। সেই অসন্তোষ শিল্পীর, গুণীর, বিদ্বানের, বিত্তবানের যে কোন উচ্চাভিলাষী, জীবনাভিলাষী মানুষের। কিন্তু অসীমের অসন্তুষ্টির জাত আলাদা। সেই অসন্তোষ কখনো তার রোগ, বাতিক, কখনো বা বিলাস। তা অসীমকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, নৈরাশ্যে নৈষ্কর্মে নিমজ্জিত করে রাখে। এসব কথা মানসীর নিজের কথা নয়। চিঠিপত্রে আলাপ-আলোচনায় অসীম এভাবে নিজেই আত্মবিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু মানসী যখন অসীমের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে, আশ্চর্য, ও তখন রেগে যায়। অসীম আত্মনিন্দা ভালবাসে, কিন্তু পরের মুখে নিজের নিন্দা সহ্য করতে পারে না। সে পর যদি পরম বন্ধু হয়, তাহলেও না। তাই মানসীর মুখে এসব কথা শুনলে, কি চিঠিতে কোন উল্লেখ উদ্ধৃতি দেখলে অসীম ক্ষেপে যায়। বলে, 'তুমি প্রিয়গোপালবাবুর কথা মুখস্ত করে লিখেছ। তোমার চিঠিগুলি তাঁরই কণ্ঠস্বরের রেকর্ড'। মানসী যতই তাকে বুঝাতে চেষ্টা করুক, 'রেকর্ড যদি হয় তাঁর নয়, তোমারই।' অসীম তা কিছুতেই স্বীকার করবে না। অসীমের ঈর্ষা কি শুধু প্রিয়গোপালবাবুকে? সবাইকে, পৃথিবীর সবাইকে। মানসী কোন কৃতী অধ্যাপকের নাম করুক অসীম তাকে হিংসা করবে। কোন লেখক, গায়ক, অভিনেতা কি খেলোয়াড়ের নাম করুক, অসীম ভিতরে ভিতরে তাঁদের কাউকে সহ্য করতে পারবে না। কৃতী ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে কর্মহীন, কীর্তিহীন পুরুষের যোগাযোগ রাখবার একটিমাত্র সেতু। সেই সেতুর নাম ঈর্ষা। আধা পরিহাসের আড়ালে অসীম নিজেই একথা স্বীকার করেছে। 'সত্যি মানসী, তোমার আশেপাশে আর কাউকে আমি সহ্য করতে পারিনে। তুমি যদি আর কারো সঙ্গে কথা বলো কি আর কারো দিকে তাকিয়ে হাসো, আমার মনে হয় সেই হাসি সেই কথা কটি থেকে আমি বঞ্চিত হলাম, অখণ্ড তোমাকে আর পেলাম না। আমি যদি সে যুগে জন্মাতাম, তোমাকে অসূর্যম্পশ্যা করে রেখে দিতাম।'

মানসী হেসে বলেছে, 'আমার বহু ভাগ্য যে, সে যুগে জন্মাইনি। জন্মালেও আমি সেই যুগের বাঁধন ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতাম। কোন পুরুষই আমাকে আটকে রাখতে পারত না। তা সে যত বড় জাঁদরেল পুরুষই হোক, আর সমাজ-শাসনের যত কড়া কড়া নিয়মকানুনই তার হাতে থাকুক।'

অসীম জবাব দিয়েছে, 'বলছ বটে; কিন্তু সেকালে জন্মালে তুমি এ যুগের মনও পেতে না, এ যুগের ভাষাও পেতে না। বারো বছরে তোমার বিয়ে হয়ে যেত। আরো বারো বছরের মধ্যে সাত-আটটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে পর্দার আড়ালে দিব্যি সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করতে। গ্রাম অঞ্চলে কি সমাজের অন্য কোন স্তরে এখনও সে ধরনের সুখিনী গৃহিণীর অভাব নেই। তুমিও তেমনি সুখী হতে। এত সব বড় বড় কথা তোমার মনেও আসত না, মুখেও জোগাত না।'

আর কিছু না হোক, কথা অসীমের মুখে খুব জোগায়। সেদিনের আলাপের কথা মনে পড়ায় মানসী মৃদু হাসল।

'সেজদি!'

মানসী ফিরে তাকাল, 'কি রে নন্দু।'

'বাজার থেকে আজ পোনামাছের ভাগ নিয়ে এলাম।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'বেশ করেছিস।'

নন্দু বলল, 'কিন্তু দেখ কাণ্ড, অসীমদা এখনই চলে যেতে চাইছেন। না খেয়ে না দেয়ে—।'

মানসীর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'সেকি!'
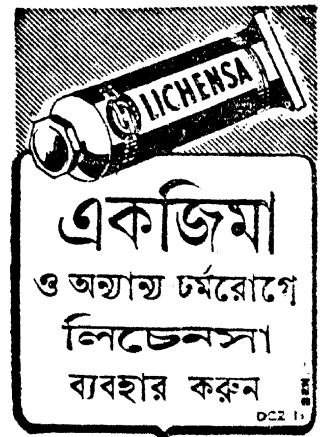
কিন্তু সংগে সংগেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তার যদি দরকার থাকে যাবেই তো।'

নন্দু হেসে বলল, 'খুব নাকি জরুরী দরকার। চাকরি বাকরি সংক্রান্ত—।'

মানসী বলল, 'হুঁ, জরুরী কাজ তো এই দুদিন ধরে করে একেবারে উল্টে দিচ্ছেন। সবই জানা আছে আমার।'

হঠাৎ মানসীর কি একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলল, 'নন্দু, দাঁড়া। তোর হাতেই চিঠিখানা দিয়ে দিই।'

'কিসের চিঠি সেজদি।'

'ও'রই ওই সব জরুরী কাজের চিঠি।'

ব্যাগের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করে মানসী একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা যা, বল গিয়ে আমিই আসছি। আমার সংগে দেখা না করে যেন চলে না যায়।'

নন্দু মুখ টিপে হাসল, 'সেজদি?'

'কী বলছিস।'

'চিঠিখানা নিজে লিখে নিজের হাতেই ডেলিভারি দেবে?'

মানসীও হেসে ফেলল, 'অসভ্য কোথাকার। এত ফাজিল হয়েছিস তুই! আমার লেখা চিঠি তোকে কে বললে?'

'তবে?'

'প্রিয়গোপালবাবুর লেখা সুপারিশ চিঠি।'

নন্দু বলল, 'ও তাই বল। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি অসীমদার সংগে কথা বন্ধ করে চিঠিতে চিঠিতে মসীযুদ্ধ চালাচ্ছ।'

মানসী ছোট ভাইকে সস্নেহে তাড়া দিয়ে বলল, 'যা এখান থেকে। বাঁদর কোথাকার।'

নন্দু হাসতে হাসতে ছুটে পালাল। আর সেই সংগে মানসীর মনের পুঞ্জীভূত মেঘও যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

হ্যাঁ নিজের হাতেই চিঠিখানা দেবে মানসী। ছুটির পর কেন যে আলিপুরের প্রিয়গোপালবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল, সেখানে কেন যে অত দেরি করেছিল নিজের হাতে তার কারণ দেখাবে। প্রিয়গোপালবাবু সহজে কাউকে এ ধরনের কোন চিঠি দিতে চান না। নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও অন্যের সামান্য অনুগ্রহ-প্রার্থী হওয়া তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। অনেক কষ্টে, অনেক কৌশলে কথাটা তাঁর কাছে পাড়তে হয়েছে মানসীর। প্রস্তাবনাটা সেরে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রিয়গোপালবাবুর জবাব পাওয়ার জন্যে। মনে মনে ভয় হয়েছে যদি 'না' বলেন তাহলে আর মান থাকবে না। তাহলে শিগগির আর ও'কে মুখ দেখাতে পারবে না মানসী। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ইতিহাসের গবেষক অধ্যাপকের মুখ আরও গুরুগম্ভীর এবং দূর যুগের রহস্যাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে।

মানসী অস্ফুট স্বরে বলেছে, 'অবশ্য আপনার যদি অসুবিধে হয় তাহলে থাক।'

প্রিয়গোপালবাবু হঠাৎ নিজের নামাঙ্কিত প্যাডটা টেনে নিয়ে বলেছেন, 'না, থাকবে কেন, দিচ্ছি লিখে। দেখ যদি কোন কাজ হয়।' বলে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলেন প্রিয়গোপালবাবু, 'তাহলে তোমাদের বিরহবেদনার অবসান হবে।'

মানসী লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

কতদিন তার মনে হয়েছে প্রিয়গোপালবাবুর কাছে অসীমের অস্তিত্বের কথা একেবারে গোপন করে যাবে। কেন যেন মনে হয়েছে অসীমের কথা শুনলে তিনি খুব খুশি হবেন না। কিন্তু মানসীর এই গোপন আকাঙ্ক্ষাকে কী করে যেন টের পেয়েছেন প্রিয়গোপালবাবু। আর তার ফলে তাঁর সহজ হবার আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। সহজ ব্যবহারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টার যেন সীমা থাকেনি। তিনি সমবয়সী বন্ধুর মত খুঁটে খুঁটে মানসীর কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছেন। অসীমের সংগে তার প্রথম আলাপের কথা, সেই আলাপ কী করে ধীরে ধীরে বন্ধুত্বে পৌঁছল তার বিবরণ, তাদের চিঠিপত্র বিনিময়ের কথা, তাদের মিল অমিল, রুচি আদর্শের বিভিন্নতার সমস্যা —কিছুই যাঁর কাছে গোপন রাখতে পারেনি মানসী। গবেষক যেন পণ করেছেন, তিনি মানসীর জীবন পুঁথির সমস্ত অস্পষ্ট সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করে নেবেন। পাঠক হিসাবে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন তা মানসীর বুঝতে বাকি থাকেনি। পঠিত হওয়ার মধ্যেও যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ আছে তাও কি মানসী স্বীকার না করে পারে?

গল্পে গল্পে পুরো একটি সন্ধ্যা কাটিয়ে দেওয়ার পর কোন কোনদিন মানসী হয়তো বলেছে, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম।'

প্রিয়গোপালবাবু স্মিতমুখে জবাব দিয়েছেন, 'কিসের সময়? ইতিহাস চর্চার? তুমি কি ভাব আমি শুধু ইতিহাসই পড়ি? তোমাদের একালের নভেলটবেল কিছু পড়িনে?'

মানসী হেসে বলেছে, 'কই আর পড়েন? আমি তো দেখতে পাইনে।'

তিনি বলেছেন, 'তুমি না পেলে কি হবে আমি ঠিকই পড়ে যাচ্ছি। শুধু একটি জীবনের উপন্যাস নয়, একখানি জীবন্ত উপন্যাস। পাঠক মাঝে মাঝে তাঁর পুঁথির সংগে যে একাত্মতা বোধ করে আমিও তাই করছি।'

শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছিল মানসী। মনে হয়েছিল তিনি যেন তাকে স্পর্শ করেছেন। কথার ধ্বনিতরংগ শুধু কি শ্রুতিকে নয়, ত্বকেও স্পর্শের অনুভব নিয়ে আসে?

সেই থেকে বন্ধুত্ব। বয়সে মিল নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মিল নেই, প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় মিল নেই তবু একজনের মননের সংগে আর একজনের মনের মিল হয়েছে। এই বন্ধুত্বকে ঠিক স্নেহ বলা চলে না, তার চেয়ে গাঢ়, প্রীতি বলতেও মন সরে না, তার চেয়েও প্রগাঢ়, তবু প্রেমের সংগে এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। মানসী অসীমের সংগিনী আর ঐতিহাসিকের হাতে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। নিজেকে একজন রসিক পাঠকের হাতে বই হিসাবে কল্পনা করতে অদ্ভুত লেগেছিল মানসীর। সেই অভিনবত্বের স্বাদ মাধুরী ভাবতে পারে না, অসীমও না।

রান্নাঘর থেকে মায়া এসে হাজির হল, 'সেজদি।'

প্রথম দৌবারিককে মানসী ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে এবার দ্বিতীয়া।

'কী ব্যাপার।'

'দেখ এসে নন্দুর কাণ্ড। অসীমদা চলে যেতে চাইছেন, আর নন্দু তাঁর বিছানা স্যুটকেস কেড়ে রেখেছে।'

মানসী হেসে বলল, 'কাণ্ডটা তাহলে একজনের নয়, দুজনের।'

কিন্তু মানসীর সংগে দেখা না করে, তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই অসীম সব নিয়ে চলে যাবে? এই বা কি রকম? মানসী তাড়াতাড়ি অসীমের ঘরে এল।

পাটভাঙা জামা কাপড়ে অসীম সত্যিই যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েছে। আর নন্দু তার বিছানা স্যুটকেসের সম্পত্তি আগলাচ্ছে। মা আর মায়া এসে দাঁড়িয়েছে জানলার কাছে। শুধু মাধুরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মানসী চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নন্দুকে শাসনের সুরে বলল, 'ছিঃ, ওকি হচ্ছে। সরে এসো। আর তুমি একটু বাইরে যাও নন্দু। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

কি করে আদেশ দিতে হয় মানসী তা জানে। শুধু নন্দু নয়, মায়াকে নিয়ে সুহাসিনীও সরে গেলেন।

মানসী এক মুহূর্তে অসীমের দিকে তাকাল। মনে হল যুগযুগান্তরের বিচ্ছেদের পর মানসী যেন নতুন করে নিজের ঈপ্সিতকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু অসীম তার দিকে যেন ভালো করে তাকাতে পারছে না, তার চোখ যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে অসীম। মানসী মনে মনে বলল, 'ওগো ভীরু, আমি তোমার সব দোষ ক্ষমা করলাম। সব ত্রুটি দুর্বলতা ধুয়ে [illegible]।'

কোন প্রকার ভূমিকা করল না মানসী, কোন প্রশ্ন করল না, কোন কৈফিয়ত চাইল না। যেন কালকের রাত্রিটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। এখন ভোরের সূর্য [illegible] সঙ্গে সঙ্গে যেন তা [illegible] মিলিয়ে গেছে। মানসী বলল, 'তোমার একটা চিঠি আছে।'

'কিসের চিঠি?' অসীম হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে খামের ওপরের নাম ঠিকানায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু এ চিঠি তো আমার নয়।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'তোমার নয়, কিন্তু তোমারই জন্য। তোমাদের ডেপুটি মিনিস্টার আর প্রিয়গোপালবাবু একই সঙ্গে [illegible]। সেই [illegible] তোমার সম্বন্ধে উনি চিঠি দিয়েছেন। আজই গিয়ে দেখা কোরো। মনে হয় একটা সুরাহা হয়ে যাবে।'

অসীম এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল, 'এ চিঠি তো আমার আর কোন দরকার নেই। এ চিঠি আমি নিতে পারব না মানসী।'

'নিতে পারবে না! কেন?'

দুটি প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় আর আর্তি মাখামাখি হয়ে রইল।

অসীম সেই একই নেতিবাচক উত্তরের পুনরাবৃত্তি করল, 'না, তোমার এ চিঠি আমি নিতে পারব না।'

মানসী এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে অসীমের দিকে তাকিয়ে রইল। তার গহন মনের গভীরে গিয়ে যেন বুঝতে চেষ্টা করল এই নিতে না পারার অর্থটা কি।

তারপর পরম ঘৃণায় অসীমের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কাগজগুলি দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'তুমি যখন নিতে পারবে না, এ চিঠি দিয়ে আর কী হবে।'

'মানসী!'

মাধুরী কখন এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে। মানসী মুখে কোন সাড়া দিল না, শুধু চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য সাহস মাধুরীর। মানসীর সেই চোখকে ভয় করল না, লজ্জা করল না। বরং দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আরো কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল, তারপর মৃদু কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল, 'মানসী, যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বল। আর কারো কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার, সব অপরাধ আমার—।'

মানসীর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল, যেন নতুন করে ধাক্কা খেল একটা। এই কথা বলবার জন্যেই কি মাধুরী আড়াল খুঁজেছিল? প্রাণভরে পেতে চেয়েছিল এই ত্রুটি স্বীকারের গৌরব? কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল মানসী। বিদ্রূপভরা দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে মাধুরীকে স্তব্ধ করে একটু হেসে বলল, 'চুপ কর দিদি, চুপ কর। এ তো নিরালা ছাদ নয়, নির্জন পার্ক নয়, বাড়িতে নন্দু মায়া আছে। তারা কেউ শুনে ফেলবে। তুই চুপ কর।'

ওদের কাউকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে মানসী দোর ঠেলে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে এখন আর শুধু ঝিলিমিলি নয়, মেঘান্তরিত রোদ এবার প্রখর হতে শুরু করেছে। ক্রমশ

এশিয়ার ধর্মজীবনের আদিম রূপ

ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

এশিয়ার আদিম মানুষ তার ধর্মজীবনের ইতিহাস লেখবার কোনই মালমশলা রেখে যায়নি। সামান্য যে দু-একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি ইতিহাসের ক্ষেত্রে নেহাতই অকেজো। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে তাঁদের একটা নিজস্ব ধারা অনুসরণ করেন। আধুনিক যুগে যেসব আদিমবাসী (অ্যাবওরিজিনালস) এশিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, তাদের ভাবধারার এবং রীতিনীতির তালিকা প্রস্তুত করে এবং সেগুলি পরস্পর তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যায় যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তকে ইতিহাসের খোপে টোকানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ, এই সব আদিবাসীদের অনেকেই কোন না কোন সময়ে সভ্য জাতির কিছুটা সংস্পর্শে এসে তাদের নিজস্ব রীতিনীতির খানিকটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের একটি এইরকম আদিবাসীর কথাই ধরা যাক। ছোটনাগপুর অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে যে বিরহোর জাতি বাস করে তাদের কথা প্রথম যখন জানতে পারা গেল, তখন অনেক পণ্ডিতই মনে করেছিলেন, এদের মধ্যে আদিমতার ছাপ এত বেশী যে, এদের রীতিনীতির পর্যালোচনা করে আদিম মানুষ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জোগাড় করা যাবে। নূতন তথ্য এরা যে জোগায়নি তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা গেল যে, এদের মধ্যে রাম-সীতা প্রভৃতির পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। এ থেকে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, যদিও অনেকাংশে এরা আদিম, তবু এদের উপর খানিকটা সভ্য-জগতের ছাপ পড়েছে। তবে একথাও ঠিক যে, আধুনিক যুগের আদিবাসীদের জীবনধারা আলোচনা করলে আমরা সেই সুপ্রাচীন যুগের ধর্মমতের খানিকটা প্রতিচ্ছবি পাব। কারণ, ধর্মমত এমন একটা জিনিস যে, এর বিশেষ কোনও একটা রূপ একবার গ্রহণ করলে মানুষ তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না এবং বংশানুক্রমে সেই একই মত চলে আসতে থাকে।

এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্মমত আলোচনা করার আগে প্রাচীন যুগে এশিয়ার জনবিন্যাস সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে পারলে বিশেষ সুবিধা হ'ত। কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এত মতভেদ যে, স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আবার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলগুলির মধ্যে আন্তর্বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা এমন একটা সংমিশ্রিত অথবা আর্য ঋষিদের ভাষায় "বর্ণসংকর" জাতের উদ্ভব হয়েছে যে, এশিয়ার বোধ হয় কোন লোকই আজ জোর করে একথা বলতে পারে না যে, সে একেবারে খাঁটি আর্য, অথবা দ্রাবিড়, অথবা মঙ্গোলীয় অথবা অন্য কিছু। কিন্তু বহু প্রাচীন যুগে এমন একটা দিন নিশ্চয়ই ছিল, যখন এই সব জাতির সংমিশ্রণ ঘটেনি। সেটির ছবি আজ মসীলিপ্ত তার স্পষ্ট কোনও আভাসই আজ পাওয়া যায় না। কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মনে করেন যে, মানুষের ক্রমবিকাশের প্রথম যুগে এশিয়াতে তিনটি জাতি ছিল—শ্বেতকায় জাতি, যাদের বংশধরেরা আজ পশ্চিম এশিয়া, পারস্য রুশ-তুর্কীস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসী; পীতকায় জাতি, যাদের অস্তিত্ব চীন-তুর্কীস্তান, মঙ্গোলিয়া, চীন, পূর্ব হিমালয় প্রদেশ, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়, কৃষ্ণকায় জাতি, যারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে আজও বাস করছে।

এইরকম বিভাগ যে কতটা রীতিসংগত, তা নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে দস্তুরমতো মতভেদ আছে। ভারতের কৃষ্ণকায় জাতির কথাই ধরা যাক। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এদের মধ্যে আমরা অন্তত তিনটি দলের সন্ধান পাই—

নিগ্রয়েড জাতি, যাদের বংশধরেরা আজ অনেকেই পাহাড়ে, জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে;

অস্ট্রোলয়েড জাতি, যাদের বংশধর সাঁওতাল, কোল, ভীল, গণ্ড, ওরাও প্রভৃতি; এদের অস্তিত্ব এমন কি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে এবং মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়;

দ্রাবিড় জাতি, যারা এখন ভারতে তামিল, তেলেগু, মলয়ালম প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করে।

তেমনি শ্বেতকায়দের মধ্যে আবার সেমিটিক আরব জাতি এবং ইরানী প্রভৃতি আর্যজাতি যে একই গোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন, এ-কথাও অনেকে স্বীকার করেন না। এছাড়া তুর্কী-মঙ্গোল, উত্তর জাপানের আইনু প্রভৃতি জাতির সমস্যাও রয়েছে।

সুতরাং আমরা একথা ধরে নিতে পারি যে, গায়ের রঙের ভিত্তিতে ভাগ করে এশিয়াবাসীদের মূল পূর্বপুরুষ নির্ধারণের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হবে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, তা দিয়েও আমরা যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব, তা মনে হয় না।

এশিয়ার আদিম মানুষের ধর্মের ইতিহাস রচনা করতে গেলে আমরা শ্বেতকায় আর্য জাতি এবং পশ্চিম এশিয়ার সেমিটিক জাতিকে আমাদের তালিকা থেকে বাদ দেব। কারণ, আদিম যুগের সভ্যতার বিশিষ্ট কোনও নিদর্শনই এদের মধ্যে এখন পাওয়া যায় না এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় এদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি যে, এরা সুসভ্য এবং বহুদিন পূর্বেই কোন অজানা অন্ধকারে এরা এদের আদিম অভ্যাসগুলি রেখে এসেছে। নিগ্রয়েড জাতি তাদের আদিম রীতিনীতি ত্যাগ করেনি, কিন্তু আধুনিক যুগে এশিয়া ভূখণ্ডে এদের সংখ্যা এত অল্প যে এদের ইতিহাসের কারখানাতে কোনই কাজে লাগান যায় না। দ্রাবিড় জাতিকে নিয়ে আবার মুশকিল অন্য দিকে। এরা সভ্যতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং এদের ধর্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতির মধ্যে কোনটা সুপ্রাচীন এবং কোনটা অর্বাচীন, তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা আপাতত সম্ভবপর নয়।

সুতরাং এশিয়ার আদিমবাসীদের ধর্মমত সম্বন্ধে কিছু বুঝতে হলে সামান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়া আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে সেই সব অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলীয় এবং অন্যান্য অধিবাসীদের উপর, যাদের জীবনপ্রণালী এখনও সভ্যতার ছাঁচের আকার নেয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এজাতীয় গবেষণা হবে একপেশে। কিন্তু উপায় নেই, রীতিমাফিক অগ্রসর হতে হলে এইভাবেই এগুতে হবে, তার ফল যত অকিঞ্চিৎকর, একঘেয়ে এবং সীমাবদ্ধ হোক না কেন।

ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপারে আমরা জগতের সব আদিবাসীর মধ্যেই একই ছাঁচের রীতিনীতি এবং চিন্তাধারা দেখতে পাই। এ থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যেতে পারে যে, এগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। শুধু যে চলে আসছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই সব চিন্তাধারা

সভ্য মানুষের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তার ফলেই নূতন নূতন ধর্ম এবং দর্শনের তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা বিষয় ধরা যাক। প্রায় সব আদিবাসীরাই বিশ্বাস করে যে, চেতন ও অচেতন, স্থূলে ও সূক্ষ্মে, সব জিনিসেই প্রাণশক্তি ও ঐশীশক্তি বিদ্যমান। এ শক্তি এত বিরাট এবং ব্যাপক যে, তার কাছে মানুষের মাথা নোয়ান ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই শক্তিকে খুশী করতে পারলে জীবনের সব কিছু কামাই পাওয়া যাবে এবং বিরূপ হলে এই শক্তি আবার সর্বপ্রকারে ধ্বংস নিয়ে আসবে।

এই তথ্যের প্রতিচ্ছবিই আমরা পাই প্রহ্লাদের যে গল্প প্রচলিত আছে তার মধ্যে। প্রহ্লাদ তাঁর অবিশ্বাসী পিতাকে বার বার এই কথাই বোঝাতে লাগলেন যে, ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান, এমন কি রাজপ্রাসাদের স্তম্ভের ভিতরেও। প্রহ্লাদের পিতা স্তম্ভকে আঘাত করতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন নৃসিংহমূর্তি। এই নৃসিংহ-মূর্তির আবির্ভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়। কারণ, সর্ব দেশে সর্ব যুগে আদিমবাসীরা বৃক্ষ, প্রস্তর এবং বিভিন্ন জীবজন্তু পূজা করে থাকে। আবার কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে মানুষ এবং জন্তুর মিশ্রিত আকারের দেবদেবীর পূজা চলে। নৃসিংহমূর্তিটি যে এই রকম একটি শ্রেণীর অন্তর্গত, একথা পণ্ডিতেরা অনেকেই অনুমান করে থাকেন এবং এই মূর্তিটির মধ্যে আমরা আদিম এবং আর্য-ধর্মের একটি সমন্বয় দেখতে পাই।

চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সব জিনিসই প্রাণবন্ত, এই যে সাধারণ বিশ্বাস আদি-বাসীদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা ফুটে ওঠে তাদের গাছ, পাথর ইত্যাদি পূজার মাধ্যমে। পাঞ্জাবের কাঁকরা উপত্যকায় কিছুদিন পূর্বেও একটি পুরাতন গাছকে পূজা করা হত এবং প্রতি বৎসরই এই পূজায় একটি করে বালিকাকে বলি দেওয়া হত। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার দিয়েরি উপজাতি বিশ্বাস করে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের মধ্যে বাস করছে এবং এই কারণেই কেউ গাছ কাটলে তারা বিশেষ রুষ্ট হয়। এই ধরনের বিশ্বাস ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কোরিয়ার লোকেরা মনে করে যে, যে সব স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময়ে প্রাণ হারায় অথবা যারা মহামারী কিংবা অপঘাতে মৃত্যু বরণ করে, তাদের আত্মা গাছে গিয়ে বাস করে। এই কারণে কোরিয়ানরা মদ, কেক প্রভৃতি দিয়ে গাছের পূজা করে। সুপ্রাচীন যুগ থেকে চীনাদের মধ্যে কবরের উপর বৃক্ষ-রোপণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস যে এতে মৃতের আত্মা প্রসন্ন থাকবে। দক্ষিণ এবং পশ্চিম চীনদেশে মিয়াও-কিয়া নামে একটি উপজাতি বাস করে এবং এদের প্রত্যেকটি গ্রামে ঢোকবার রাস্তায় একটি করে বড় গাছ থাকে। এরা বিশ্বাস করে যে, এই গাছে তাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করছে এবং তারাই তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। যদি গাছের কোনও ডাল ভেঙে পড়ে, তাহলে এরা প্রথমে যথারীতি সেই ডালটির পূজা করে এবং পরে সেখান থেকে সেটিকে সরিয়ে ফেলে। সিয়াও-এর অধিবাসীদের মধ্য প্রচলিত ধারণা যে, বনের ভিতরে নির্জন গাছের উপরে উপদেবতারা বাস করেন এবং পূর্ণিমার দিনে তাঁরা গাছ থেকে নিচে নেমে আসেন। তাই পূর্ণিমা তিথিতে এরা বনের মধ্যে গিয়ে খুব ঘটা করে এই সব উপদেবতাদের পূজা লাগিয়ে দেয়। সুমাত্রার ম্যাণ্ডেলিং উপজাতীয়েরা গাছ কেটে এই সব উপদেবতাদের খামকা রুষ্ট করার বিরোধী এবং এ বিষয়ে তারা ওলন্দাজ জাতিকে বিশেষ দোষ দেয়। এদের বিশ্বাস যে, ওলন্দাজরা এসে তাদের দেশের গাছ কেটে তাদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। পশ্চিম এশিয়াতেও সুপ্রাচীন যুগে যে এই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল, তার দু-একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। হিব্রু এবং কানা-নাইটরা সবুজ গাছের নীচে ভগবানের অস্তিত্ব বিরাজমান বলে স্বীকার করত এবং প্রাচীন ব্যাবিলনের যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যেও আমরা এই ধরনের বিশ্বাসের আভাস পাই। এখানে পাওয়া মোহরে এবং দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবিতে আমরা দেখতে পাই যে, গাছের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ পূজায় রত রয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত পশ্চিম এশিয়ার এই নিদর্শনগুলির অন্যরকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সেই সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহাসিক কচকচির মধ্যে আমাদের না ঢোকাই ভাল।

আদিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা চিরদিনই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, গাছের দেবতা রুষ্ট হলে বৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দেন। উত্তর ব্রহ্মদেশে কোন কোন গ্রামের অধিবাসীরা বৃষ্টি নামাবার জন্য গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে তেঁতুলগাছ, তার ভিতর অধিষ্ঠিত উপদেবতাকে জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা করে। পূজার শেষে তিনজন স্ত্রীলোক বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নেচে নেচে বৃষ্টির গান আরম্ভ করে দেয়। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসীদের বিশ্বাস যে, গাছের দেবতা খুশী থাকলেই উত্তম শস্য উৎপন্ন হবে। শুধু শস্য নয়, গাছের দেবতা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই মানুষকে দিতে পারেন। কিরগিজ উপজাতীয়দের মধ্যে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা আপেল গাছের তলায় গিয়ে গড়াগড়ি দেয় এবং সন্তান কামনা করে। আমাদের দেশেও ষষ্ঠীতলায় এই-রকম গড়াগড়ি দেবার প্রথা আছে।

বিভিন্ন গাছগাছড়ার পূজা আদিবাসীদের কাছ থেকে সভ্য-সমাজেও প্রবেশ করেছে। আমাদের দেশে অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি পবিত্র বৃক্ষ এবং প্রায়ই তাদের পূজা করা হয়। পল্লীগ্রামে দেখা যায়, সন্ধ্যার সময়ে মেয়েরা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে গলায় শাড়ির আঁচলটুকু জড়িয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করে:—

তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন

আদিম মানুষের গাছগাছড়ার পূজার সঙ্গে আর্যদেবতা নারায়ণের এই যে সংযোগ তা এই মহামানবের সাগরতীরে বৃহত্তর পরিধিতে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের একটা ছোট্ট নিদর্শন।

এইরকমভাবেই এই মিলনের যোগসূত্র ধরে সম্ভবত আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনের আবির্ভাব। আদিমবাসীরা জন্তু-জানোয়ারের পূজা করত এবং তাদের সঙ্গে যখন আর্যদের মিলন হল তখন তাদের এই পশুরূপী দেবতাদের সঙ্গে আর্য দেব-দেবীদেরও মিলন ঘটল।

অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যেই এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, যেমন গাছ-গাছড়ার মধ্যে তেমনি জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও দেবতারা অথবা মৃতলোকের আত্মা বাস করছেন। শুধু তাই নয়, এক একটি গোষ্ঠী যে এক একটি এইরকম জন্তুরই বংশধর, এই ধারণাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সেই পশুরূপী পূর্বপুরুষের চিহ্ন বহন করে। এই ভাবধারাকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা টোটেম সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন। এশিয়া ভূখণ্ডে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন যুগে সিংহ, হাতী, ভাল্লুক, ঘোড়া, ষণ্ড, কুকুর, শূকর প্রভৃতির পূজা হত। প্রাচীন পারসি গ্রন্থের (নিদেশ) বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ

শতকে ভারতবর্ষেও বহু পশুর পূজো প্রচলিত ছিল। এখনও আমরা দেখতে পাই বাঙলার সাঁওতালরা বাঘের পূজো করে এবং নাগা ও গণ্ডরা সাপের পূজো করে থাকে। কিছুদিন আগেও টোডারা ষাঁড়ের পূজো করত।

পূর্বেই বলেছি যে, মানুষ এবং পশুর মিলিত ছবি—নৃসিংহদেব যার প্রতীক—আদিমবাসীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় একদল আদিবাসী বিশ্বাস করে যে, এইরকম একজন দেবতাই তাদের দেশ নির্মাণ করেছিলেন এবং তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির প্রচলন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে চীনের ড্রাগনের কথা স্বভাবতই মনে হয়। চীনাদের ধারণা, বাতাস, জল এবং পর্বতের উপদেবতা একত্রিত হয়ে এই অনেকটা সর্পাকৃতি ড্রাগনের মধ্যে বাস করছেন। এই দেবতাকে খুশী করতে পারলেই মানুষের সব অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ড্রাগন নিয়ে অনেক আলোচনা পণ্ডিতদের মধ্যে হয়ে গেছে এবং সবিস্তারে সে-সব এখানে লেখা সম্ভব নয়।

আদিম মানুষ যেমন পশুদের পূজো করত, তেমনি আবার পশু বধ করতেও তারা দ্বিধা বোধ করত না। এই দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারার মধ্যে তারা একটা সামঞ্জস্য করারও চেষ্টা করেছিল। এর দু একটা উদাহরণ আধুনিক যুগের আদিবাসীদের আচার-ব্যবহার থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কাম্বোডিয়ার একটি উপজাতি যে-কোনো পশু হত্যা করার আগেই তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলিদ্বীপে ধানচাষের সময়ে মাঠে বড় ইঁদুরের উৎপাত হয়। বলিদ্বীপবাসীরা ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুরদের ধরে এবং তার পর তাদের হত্যা করে ঠিক যেভাবে শবদাহ করা হয় সেইভাবে দাহ করে। কিন্তু ধৃত ইঁদুরের মধ্যে দুটিকে তারা রেখে দেয় এবং এই দুটিকে প্রথমে ভক্তিভাবে প্রণাম জানিয়ে পরে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়।

দৃষ্টান্তের সংখ্যা এভাবে অনেক বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু মোট কথা হল এই যে, আদিবাসীরা একদিকে যেমন জীবজন্তুদের পূজো করে, অন্যদিকে আবার তেমনি তাদের হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আধুনিক যুগে আমাদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যারা ভক্তিভরে বিষ্ণুর মীন-অবতারকে প্রণাম জানান এবং তৃপ্তিভরে মৎস্য ভক্ষণ করেন। হ্যামের কথাটা আর তুলতে চাই না, কারণ যারা হ্যাম খান, তারা হলেন আমাদের মতে নাস্তিক, ভগবানের বরাহ-অবতারের কথাটা একেবারে স্বীকার করেন না।

আদিবাসীদের মধ্যে এই একটা প্রচলিত ধারণা যে, পাথরের মধ্যে ঐশীশক্তি বিদ্যমান এবং তাই বিভিন্ন আকারের পাথর এবং পর্বত তাদের উপাস্য। আদিবাসীরা তাদের গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একখণ্ড পাথর রেখে দেয় এবং ভক্তরা যেমন শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গের সামনে বসে তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভের আশায় প্রার্থনা জানায়, ঠিক তেমনি করেই তারা তাদের দেবরূপী শিলাখণ্ডের সামনে বসে তাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে এই পাথর দিয়ে অনেক অঘটন ঘটান যেতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোর্নিওতে একটি উপজাতির মধ্যে কোনো নারীর প্রসববেদনা উপস্থিত হলে একজন ওঝা ঘরের বাইরে পেটে একটি পাথর বেঁধে শুয়ে পড়েন, তাঁর যেন প্রসববেদনা হয়েছে, এই ভান করে। পরে তিনি পাথরটিকে আস্তে আস্তে পেট থেকে নামিয়ে দেন, এবং এরা বিশ্বাস করে যে, এতেই রমণীটির নির্বিঘ্নে প্রসবকার্য সমাধা হবে। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে যে গ্রহরত্ন ধারণের ব্যবস্থা আছে তাকে এইরকম ধারণারই একটু উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

পর্বতমালা চিরদিনই আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। আমাদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউই নেই, পর্বতের দৃশ্যে যার মন একটা অব্যক্ত চিন্তাধারায় হিল্লোলিত না হবে। প্রাচীন যুগে আদিম মানুষের মনেও ঠিক এইরকম হিল্লোলের সৃষ্টি হত। তাই ব্যাবিলন দেশের একুর আববদের অরফত, হিব্রুদের নেবোকার্মেল এবং হারমন পবিত্র পর্বত। প্রাচীন যুগে চীনদেশেও পাঁচটি পবিত্র পর্বতমালার নাম আমরা পাই:—

(১) সানটুঙ্-এর তাই-সান্
(২) সেন-সির হুয়া-সান্
(৩) সান্-সির হেঙ্-সান্
(৪) হু-নান-এর নান্-য়ো-সান্, অথবা হেন-সান্
(৫) হো-নান-এর সুঙ্-সান্

এই সব পবিত্র পর্বতমালার অস্তিত্ব কতখানি আদিবাসীদের কাছ থেকে সভ্য মানুষ পেয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত যে আদিমবাসীরা নিশ্চয়ই পর্বতমালায় দেবতার অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করত এবং পর্বতের পূজো করত। এ পূজো আমরাও করে থাকি। নগাধিরাজ হিমালয় অন্ততঃ আমাদের কাছে পূজনীয়।

একটা প্রশ্ন নিয়ে গবেষকরা প্রায়ই মাথা ঘামান। আদিম মানুষের মধ্যে কোনো প্রধান দেবতা (সুপ্রীম গড) সম্বন্ধে ধারণা ছিল কিনা। আফ্রিকার পিগমিদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে এইরকম ধরনের একটা বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। তারা মনে করে যে, প্রথমে এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এই জগতেই ছিলেন এবং তিনিই প্রথম মানুষকে আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি শিক্ষা দেন। পরে এই প্রধান দেবতা আকাশের উপরে চলে যান এবং সেইখানে তিনি এখনও বাস করছেন। তিনি আদি, অনন্ত এবং স্বয়ংসৃষ্ট। কোনো কোনো উপদলীয়দের মধ্যে এই আদি-দেবতার উদ্দেশ্যে পূজো ইত্যাদি করা হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ আদিবাসীরই বিশ্বাস যে তিনি নির্লিপ্ত। মানুষ কি করছে না করছে, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। মানুষের ভালমন্দ দেখবার জন্য এবং তাদের ভাল কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের শাস্তি দেবার জন্য কতকগুলি একটু নীচু স্তরের দেবতা, উপদেবতা বা অধি-দেবতা আছেন এবং আমরা যদি এদের স্তবস্তুতির দ্বারা তুষ্ট করতে পারি, তাহলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এখানে একটি বিষয় বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাংখ্যদর্শনের মধ্যেও, আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, এই ধরনের একটা চিন্তাধারা দেখতে পাওয়া যায়। পরমাত্মা হলেন নির্বিকার এবং নির্বিকল্প, তিনি কিছুতেই লিপ্ত নন। আর ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতারা হলেন ক্রমান্বয়ে তাঁর নিচে। ঠিক এই ধরনের পরিকল্পনা আদিম মানুষের কর্মবিকাশের কোন্ স্তরে এসে হাজির হয়েছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কাজটা পণ্ডিতদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

পল রাডিন এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণার পর বলেছেন:—

"As far as our present actual knowledge goes, it can be said that the most typical instances of an aboriginal belief in a Supreme Deity are to be found among the simplest and among the most complex of primitive civilisations."

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা প্রথম যখন চীনে আসেন, তখন তাঁরা প্রাচীন চৈনিক সাহিত্যে দুটি শব্দ দেখে আশ্চর্য হয়ে যান—সাং-তী এবং তিয়েন। প্রথম শব্দটির অর্থ হল প্রধান শাসক বা দেবতা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ স্বর্গ। এ থেকে স্বভাবতই এই অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাচীন চৈনিকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, স্বর্গে একজন প্রধান দেবতা বাস করেন। ঠিক অনুরূপ ধারণা আমরা দেখতে পাই আন্দামানবাসী এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে।

নিম্নস্তরের দেবতারা বেশীর ভাগই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ। আন্দামান দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে আছে এইরকম দুটি দেবতা—বিলিকা ও টোরিয়া। টোরিয়া হলেন বৃষ্টির দেবতা এবং বিলিকা ঝড়ের দেবী, সাগরে ঘেরা আন্দামান দ্বীপবাসীর কাছে ঝড় ও বৃষ্টি, এ দুটোই হল প্রকৃতির প্রধান রূপ এবং এ দুটো রূপেরই তাই তারা

পুজো করে। উত্তর চীনের আদিবাসীদের মধ্যে এইরকম পাঁচটি প্রাকৃতিক দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়—বৃষ্টির দেবতা, মেঘ এবং বজ্রের দেবতা, নদী এবং পর্বতের দেবতা, গাছগাছড়ার দেবতা এবং মৃতের দেবতা। চীনারা এই সব দেবতার নৃত্য এবং সংগীতের দ্বারা পুজো করে থাকে। উত্তর চীনের সেন্-সি প্রদেশে গেলে এরকম ধরনের পুজো আজও দেখতে পাওয়া যায়।

আদিম মানুষ এই সব দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল—ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের আশ্রয় গ্রহণ, পশুবলি এবং পুজো এবং কতকগুলি বিশেষ বিধিনিষেধ মেনে চলা।

ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের ব্যবহার প্রায় সব আদিবাসীদের ভিতরেই দেখা যায়। এর জন্য বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ্ধতি তারা অনুসরণ করে এবং তাদের নিজস্ব মন্ত্রও আছে। এর সাহায্যে তারা দেবতাদের সঙ্গে দরকার হলে লড়াই করে তাদের পরাস্ত করবার চেষ্টা করে, আবার দরকার হলে তাদের তোষামোদ করে। এইরকম ইন্দ্রজালের প্রভাব প্রাচীন আর্যঋষিদের উপরেও পড়েছিল এবং বোধহয় বিশ্বাসকেই কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল অথর্ববেদ।

এই ইন্দ্রজালবিদ্যায় পারদর্শী একদল লোক আদিম সমাজের ভিতরে বিশেষভাবে সমাদৃত হত। কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা অথবা কোনো বিপদ এসে হাজির হলে এদের ডাক পড়ত এবং এরা দৈবী শক্তিবলে মানুষকে এই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করত। আদিম সমাজে একাধারে এরা গুরু এবং চিকিৎসক।

আদিম মানুষ প্রায়ই লক্ষ্য করত যে, এইসব ইন্দ্রজালের সাহায্য নিয়েও তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না। তখন তারা এই সব দেবতার পূজা, স্তবস্তুতি আরম্ভ করত এবং নিজেরা যে সমস্ত জিনিস ভালবাসে, দেবতাদের খুশী করবার জন্য সেই সব দান করত। তাদের ধারণা ছিল, দেবতারা ঐ সব জিনিসই ভালবাসেন এবং ঐ সব পেলে তাঁরা খুশী হবেন। মাংস আদিম মানুষের কাছে বিশেষ প্রিয়, তাই তারা পশুবলি দিয়ে দেবতাদের খুশী করবার চেষ্টা করত। এ সবের জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান নির্বাচিত হত এবং পরবর্তী যুগে এরই সুসভ্য সংস্করণ হল বিভিন্ন স্থানে মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ।

বলির ব্যাপারে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রথা দেখা যায়। উত্তর চীনে আদিবাসীদের মধ্যে মানুষ বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের চীনা পুস্তকে এই প্রথাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে বলি মানুষের মঙ্গলের জন্য; মানুষকে যদি বলি দেওয়া হয় তবে সে মঙ্গল ভোগ করবে কে? পরবর্তী যুগে আমরা প্রথম সন্তানকে বলি দেওয়ার প্রথা দেখতে পাই, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায়। এর তাৎপর্য,—বৃক্ষের প্রথম ফল যদি দেবতার প্রাপ্য হয়, মনুষ্যবৃক্ষেরও প্রথম ফল দেবতার প্রাপ্য।

অনেক রকমের বিধিনিষেধ, যেগুলোকে আজ আমাদের কাছে কুসংস্কার বলে মনে হয়—আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আদিবাসীরা এখনও বিশ্বাস করে যে, কতকগুলি জিনিস হচ্ছে মঙ্গলকারক এবং কতকগুলি অমঙ্গলকারক, পয়া বা অপয়া। যেমন একটা বিচিত্র ধরনের পাথর বা একটা হাড়ের টুকরা অথবা এই ধরনের কোনো জিনিসকে তারা প্রায়ই ঘরে রেখে দেয় এবং তাদের ধারণা এটি ঘরে থাকলে শত্রুনাশ হবে, শারীরিক সুস্থতা আসবে, গৃহে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ঘটবে। এরই একটু উপরের স্তরে গিয়ে সুসভ্য মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কবচ, তাবিজ ধারণের বিধি। ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এগুলি আদিম মানুষের অভ্যাসের সুসভ্য সংস্করণ ছাড়া কিছুই নয়। দৈনন্দিন জীবনেও এদের মধ্যে অনেক বিধিনিষেধ দেখা যায়। পূর্বে উল্লিখিত ছোটনাগপুরের জঙ্গলের বিরহোর জাতির কথাই ধরা যাক। এদের ধারণা যে যদি কেউ আকাশে রামধনুর দিকে আঙুল তুলে দেখায়, তাহলে তার আঙুল হয় পচে যাবে নয় বেঁকে যাবে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ এক চোখ দেখালে সেদিনটা খারাপ যাবে এবং সেদিন কোনো শিকার মিলবে না। এটা কাটাবার জন্য যে এক চোখ দেখিয়েছে তাকে দুচোখ বন্ধ করে আবার দুচোখ খুলে চাইতে হবে। কোনো শুভ কাজে বিশেষ করে শিকারে যাবার সময় বাড়ির দিকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখা অমঙ্গলজনক। বাড়ির বাইরে কোনো ধাতুনির্মিত বাসন রাখলে তাতে বাজ পড়ার সম্ভাবনা। এইভাবে তালিকা দীর্ঘ না করে এই কথাটা শুধু বলা যেতে পারে যে, এরকমের অনেক বিশ্বাসই এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা অনেকেই মুখে হাসি এবং ঠাট্টা করে বলি যে এগুলো কুসংস্কার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আবার মেনেও চলি। অর্থাৎ সভ্যতার কাঠামোর ভিতর থেকে আমাদের অন্তরের আদিম মানুষ এখনও উঁকি দেয়।

আদিম মানুষ চাষবাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই বিধিনিষেধ মেনে চলত। ব্রহ্মদেশে ধান না জন্মালে ধানক্ষেতে গিয়ে অনেক রকম পুজো করা হয়। পূর্ব এশিয়ার আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, চাষের দেবতাকে খুশী করতে না পারলে ফসল ভাল হবে না। কোনো কোনো উপজাতিদের মধ্যে আবার প্রথা আছে যে, যেদিন মাঠে বীজ ছড়ান হবে, সেদিন ভূস্বামী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে ঐ মাঠে রাত্রে বাস করবেন। এদের ধারণা যে এতে মাটির উর্বরতাশক্তি বেড়ে যাবে। আবার কোনো কোনো উপজাতি এর ঠিক বিপরীত মত পোষণ করে। যেদিন বীজ বপন করা হয়, সেদিন ভূস্বামী আর তাঁর স্ত্রীকে একেবারেই স্পর্শ করেন না, কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। সময়ে সময়ে এই চাষবাসের বিধিনিয়ম যে কত ভয়াবহ আকার ধারণ করে তার দু একটি নমুনার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগেও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চাষ করার আগে একটি করে মানুষ বলি দেওয়া হত। ভারতের পূর্ব সীমান্তে নাগাদের মধ্যে, ছোটনাগপুরে ওরাঁও এবং গণ্ড প্রভৃতি উপজাতির মধ্যেও চাষের পূর্বে মানুষ বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। এগুলি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আদিম জাতিদের জীবনের যত সব বাধানিষেধ, যাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'টাবু' সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তার মূলে রয়েছে সেই চিরন্তন বিশ্বাস, যে একটা অদৃশ্য শক্তি সর্বদাই আমাদের বাইরে কাজ করছে এবং আমাদের সব সময়েই সতর্ক হয়ে চলতে হবে পাছে সেই শক্তি আমাদের উপর বিরূপ হয়। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন 'বিলিফ ইন মানা'। মানা শব্দটি মেলানেশীয় জাতিরা ব্যবহার করে এই শক্তিকে বোঝাবার জন্য, এবং এই শক্তির তুষ্টিবিধানার্থে যত বিধিনিষেধের উৎপত্তি। কোনো কোনো আদিবাসীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, শিকারী, জেলে, হত্যাকারী, নবজাত শিশু, সদ্যবিধবা নারী প্রভৃতি অস্পৃশ্য। এই ধরনের অস্পৃশ্যতা আমাদের ধর্মশাস্ত্রেও দেখতে পাই এবং তার জন্য আমরা অভিশাপ দিই পূর্বতন ব্রাহ্মণদের, যে তাঁরা অস্পৃশ্যতা দেশে ঢুকিয়ে জাতির সর্বনাশ করে গেছেন। এখন একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, যদিও অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্যতাকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে সুবিধা করে নেবার চেষ্টা করেছেন, মূলত কিন্তু এগুলি এসেছে আদিম সমাজ থেকে। আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে অন্তত এই দিক দিয়ে যে অনার্যরা আর্য ঋষিদের প্রভাবান্বিত করেছিল, আশা করি প্রত্যেক ঐতিহাসিকই তা স্বীকার করবেন।

এই সমস্ত বিধিনিষেধ পুরোপুরি ভাবেই মেনে চলতে হবে এবং যদি কেউ তা লঙ্ঘন করে সে যে শুধু নিজের বিপদই ডেকে আনবে তা নয়, সমগ্র গোষ্ঠীই মহা বিপদে পড়বে। তাই এসব বিধিনিষেধ ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির এমন কি মৃত্যুদণ্ডেরও ব্যবস্থা আদিবাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে। গ্রামের মোড়লরা যেমন এসে বিচার করে

তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, উপজাতীয়দের মধ্যে ঠিক সেইরকম ভাবেই দলপতি এসে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। শুধু এই বিধিনিষেধ ভঙ্গ করা নয়, অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ বা অস্পৃশ্য ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগস্থাপনের দ্বারাও মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়, এই ছিল আদিবাসীদের ধারণা।

এইভাবে বিধিনিষেধ ভঙ্গকারীর দোষ মাফ করবার ব্যবস্থাও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তারা বিশ্বাস করে যে, উপবাস, মাথা কামান, নখ কাটা, জলে শরীর ভাল করে ধুয়ে ফেলা, ইত্যাদি উপায়ে মানুষ পবিত্রতা লাভ করে। রক্তের সঙ্গে শরীরের অপবিত্রতাও বেরিয়ে চলে যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সময়ে সময়ে এরা নিজের দেহ কেটে রক্ত বের করে দেয়। একটা কথা এখানে মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে এদের মতে এই অপবিত্রতা নিজে থেকে আসে না, উপদেবতারা এই সব মানুষের দেহে সঞ্চারিত করে দেন। কাজেই এই সব বিধিনিষেধ এবং প্রায়শ্চিত্ত—আদিম মানুষের কাছে সবই ধর্মের একটা অঙ্গ।

সব যুগেই আমরা দেখতে পাই যে মৃত্যুর সঙ্গে ধর্মের একটা বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, অথচ এ অনিবার্য ঘটনাকে এড়াবার কারও সাধ্য নেই। আজও আমরা একটি মৃতদেহ দেখলে মনের মধ্যে স্বভাবতই একটি অস্বস্তি বোধ করি। এই মৃত্যুর ভয়কে আশ্রয় করেই ধর্মের একটা বড় দিক গড়ে উঠেছে।

সেই আদিম যুগের মানুষের ধর্মের উপরেও আমরা মৃত্যুর একটি বিশিষ্ট প্রভাব দেখতে পাই। যে আমাদের চির আপনার, স্নেহ অথবা ভক্তি দিয়ে যাকে আমরা এতদিন আঁকড়ে রেখেছি, এক মুহূর্তেই সে একেবারে পর হয়ে যাবে, একেবারে তার সব চিহ্ন লোপ পেয়ে যাবে, একথা আমরাও যেমন সহজে ভাবতে পারি না, তাহারাও ঠিক তেমনি ভাবতে পারত না। তারা ভাবত যে, মৃতেরও একটা জগৎ আছে এবং মানুষ মৃত্যুর পর সেই জগতে গিয়ে বাস করে। আত্মার অস্তিত্বে এরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই আমরা এদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতভাব ধর্মমতের অভ্যুত্থান দেখতে পাই। তার দু-একটা নিদর্শন এখানে দেব।

আদিম চীনাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বপুরুষের আত্মা তাদের বংশধরদের মঙ্গল কামনায় চিরদিনই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই আত্মাকে একটু খুসী করতে পারলেই এরা আমাদের অনেক উপকার করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই চীনারা তাদের পূর্বপুরুষের পূজো করে। এখনও এই পূজায় অনেকরকমের জাঁকজমক হয় এবং প্রাচীন চীনা-গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে যুগে এই সব পূজায় প্রায়ই পশুবলি দেওয়া হত। যুদ্ধযাত্রা করবার আগে রাজা এবং সামন্তেরা পূর্বপুরুষের পূজো করতেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন। পরবর্তী যুগে মধ্য-এশিয়ার ইউ-চি জাতির মধ্যেও এই প্রভাব বিস্তারিত হয় এবং তারা ভারতেও এই প্রথা প্রচলন করে। কুফান রাজাদের বিবরণীতে আমরা দেবকুলের উল্লেখ পাই যেখানে সম্ভবত পূর্বপুরুষের প্রতিকৃতি রাখা হত এবং এই কফান প্রভাব আমরা আরও লক্ষ্য করি কবি ভাসের "প্রতিমা নাটকে।" প্রাচীন চীনা সাহিত্য থেকে আরও জানা যায় যে, প্রত্যেক দলপতি তাঁর নিজের এলাকায় পূর্বপুরুষদের পূজার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন এবং পরবর্তী যুগে এই সব স্থানে মন্দিরাদি নির্মাণ করা হয়েছিল। এইসব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও ভূগর্ভ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বার করছেন।

কোন কোন আদিমজাতির মধ্যে আবার এই ধারণা ছিল যে, মৃতের আত্মা মানুষের ক্ষতিই করে থাকে। কবর থেকে এই আত্মা সুবিধা পেলেই বেরিয়ে পড়ে এবং তার রাগ মানাবার জন্য তখন নানারকম ধর্ম প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আত্মা যাতে এইভাবে অনিষ্টসাধন না করতে পারে, তার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হত। আজকালকার আদিবাসীদের জীবন-প্রণালীর দু-একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কখনও সোজা রাস্তা দিয়ে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয় না। শববহনকারীরা আঁকাবাঁকা পথে চলে, কারণ এইভাবে আঁকাবাঁকা পথে চললে মৃতের আত্মা আর পথ চিনে ফিরে আসতে পারবে না। যাতে ফিরে এসে এরা কোন অনিষ্ট না করতে পারে, তার জন্য এশিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে অনেকপ্রকার অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানগুলি বেশীরভাগই হয় মাঠ থেকে চাষের পর শস্য তোলবার সময়ে, কারণ মৃতের আত্মা ভূত হয়ে তখন এই সব শস্যক্ষেতে আসে এবং এদের তাড়াতে না পারলে মানুষের যে বিপদ এসে হাজির হবে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব ভারতের মুণ্ডারি জাতির মধ্যে এই ধরনের উৎসব দেখা যায়। হিন্দুকুশের, বিশেষ করে চিত্রলের উপজাতিদের মধ্যে এই উৎসবকে বলা হয় "ভূত-তাড়ানো" উৎসব। ভারতের খন্দদের মধ্যে আবার এ রকম উৎসব হয় মাঠে বীজ বপন করবার সময়ে। বলিদ্বীপে নবম মাসের আমাবস্যায় এবং কাম্বোডিয়ায় মার্চ মাসে এ উৎসব হয়ে থাকে। থাইল্যাণ্ডে বছরের শেষ দিনে এইরকম একটা মজার অনুষ্ঠান হয়। রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বন্দুক ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হয়। তারপর কিছুদূর অন্তর অন্তর একটি করে বাড়ি থেকে বন্দুক ছোঁড়া হতে থাকে এবং এই একই পদ্ধতির অনুকরণ গ্রামের সর্বশেষ বাড়ি পর্যন্ত চলে। থাইবাসীদের বিশ্বাস যে, এইভাবে ভূতকে গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এইসব আদিবাসীদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, সব ভূতই কিন্তু ক্ষতি করে না। যে অপঘাতে মরেছে, যার আত্মা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে চলে গেছে, যে অতি নিকৃষ্ট প্রণালীর জীবনযাপন করে, এইরকম মানুষের আত্মাই ভূত হয়ে মানুষের অপকার করবার চেষ্টা করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের চিন্তাধারা আজও আমাদের সুসভ্য সমাজে অনেকে পোষণ করেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ জিনিসটি আমরা আদিমবাসীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি।

দুষ্ট আত্মার দমন এবং শান্ত আত্মার গ্রহণ—এই দুটি চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে আদিমজাতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধর্মকর্মের প্রচলন হয়েছিল। আধুনিক জগতে ভূতের ওঝা ও শ্রাদ্ধের পুরোহিত এই দুটি বিভিন্ন ভাবধারারই পরিচায়ক।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এশিয়ার ধর্মজীবনের এই যে আদিম রূপ, এটা মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে জীবটা কিরকম ছিল, সেটা আজ গবেষণার বিষয়। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এ গবেষণার অনেকটাই হবে কাল্পনিক। সেটা ঠিক ইতিহাস হবে না, সেটা হবে কাব্য।

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল! কাম, ক্রোধ ও জিগীষার এই ভয়ঙ্কর অশান্তিকে তুমি জয় করেছ। রাম,—বিপুল, বিস্ময়কর তোমার কীর্তি! কিন্তু বৎস, তুমি বিনাশ করেছ বাইরের রাবণকে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সুপ্ত রয়েছে রাবণ, বুকে বুকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রাক্ষসরূপী দুর্জয় কাম, ক্রোধ, লুব্ধতা। তাদের বিনষ্ট করতে হবে। কল্যাণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় জাগিয়ে তুলতে হবে রাবণ-মুক্ত মঙ্গলের আদর্শ। মনে রেখো, দশগ্রীব রাবণকে নিহত করে তুমি অর্ধ-রাক্ষসকে মাত্র নিহত করেছ।'

'অর্ধ রাক্ষস! তার অর্থ?'—সহস্র কৌতূহলী প্রশ্ন উঠল সভায়।

ধীরে বললেন অগস্ত্য, 'রাবণ তো পূর্ণ রাক্ষস নয়। তার পিতা ঋষি, মাতা রাক্ষসী অর্ধরাক্ষস রাবণ। তার পিতামহ প্রজাপতি পুলস্ত্য—ব্রহ্মার মানস-সন্তান; পিতা

লোল অগ্নির মত সে তৃষ্ণা। উগ্র ক্ষুৎপিপাসায় পাগল হয়ে তারা ছুটল ব্রহ্মার প্রতি—ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করবে তারা। কাতরকণ্ঠে প্রাণপণ চীৎকার করে উঠলেন কমলযোনি, 'ভক্ষণ করো না, রক্ষা কর। আমি তোমাদের পিতা।'

ক্ষুধার বিবেক নেই, বিচার-মূঢ় ক্ষুধা। চির অনিয়ত, বিবৃতবদন, ক্রোধবশ। 'দহ্যতে ক্ষীয়তে মূঢ়ঃ শুষ্যতে ক্ষুধয়ার্দিতঃ'। ব্রহ্মার কথায় বিকট চীৎকার করে উন্মাদের মত একদল বলে উঠল, 'ভক্ষণ কর, ভক্ষণ কর।' আর একদল পিঙ্গাক্ষ প্রজা প্রমত্ত শেলযে ঘোর অট্টহাস করে উঠল 'রক্ষা কর রক্ষা কর।' অতি বক্র, অতিশয় কুটিল সে শ্লেষ! তারপর ভীমবেগে অগ্রসর হল তারা।

সভয়ে আবার আর্তনাদ করে উঠলেন ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষে আবার উচ্চারিত হল অভয় বাণী, 'ভয় নেই। হে ব্রাহ্মণ, তুমি অশুচি ব্রত, অশুচি তোমার তনু। শীঘ্র তনু ত্যাগ কর। মনে রেখো, তামস মনোভাবে তামসী সৃষ্টিই সম্ভব হয়, সে সৃষ্টি কল্যাণের অন্তরায়।'

লজ্জিত হলেন ব্রহ্মা। নিমেষে তামসী তনু ত্যাগ করলেন তিনি। এই তনুকে বলে রাত্রিরূপিণী 'দোষা'। দোষা কৃষ্ণবর্ণা, মদোদ্ধতা, মায়াবিনী। আশ্চর্য তার মোহিনী শক্তি! নিদ্রুটিমন্ত্রে জীবের চোখে নিদ্রা সঞ্চার করে সে। দোষার মায়ায় ক্ষুধা ভুলে গেল ক্ষুধাতুর, তাকে গ্রহণ করে শান্ত হল উদ্রান্ত বাহু।

ক্ষুধাবশে যারা ব্রহ্মাকে বলেছিল, 'যক্ষামঃ অর্থাৎ ভক্ষণ করব—তারা 'যক্ষ', বিশ্বের আদি যক্ষ—স্বার্থপর, কৃপণ, অর্থগৃধ্নু। আর যারা বলেছিল 'রক্ষামঃ—রক্ষা করব, তারা 'রক্ষ'—বিশ্বের আদি রাক্ষস: কামচারী, ক্রোধকুটিল, ক্ষুধাতুর। দোষা এদের প্রিয়, তাই এদের বলা হয় 'প্রিয়দোষ' বা নিশাচর। নির্ঋতি থেকে উৎপন্ন বলে এরা নৈর্ঋত রাক্ষস নামেও পরিচিত।

একটু থামলেন ঋষি অগস্ত্য। আতঙ্কিত সভাতল। অতি ভয়াবহ এই তামসী সৃষ্টির ইতিহাস। বিকৃত ক্ষুধা-কামনার এ কাহিনী যেন পুরাণের চেয়েও পুরাতনী, এ যেন ভয়াল রোমাঞ্চ! বাণ জিজ্ঞাসায় বিস্ফারিত সকল নয়ন, মুখে শিশুর মত কৌতূহলী প্রশ্ন, 'তারপর!' প্রাচীনেরো কুম্ভজন্মা অগস্ত্য। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন তারপরের ইতিহাস, 'এরাই আদি রাক্ষস। 'পরদারাবমর্শিত্বং পারক্যার্থে চ লোলুপাঃ' এদের স্বভাবধর্ম। উগ্র বাভিচারী এদের কামনা, অতি ভীষণ এদের পরার্থলোলুপতা। এই কামনা-লুব্ধতাই রাক্ষসী ক্ষুধা। এ ক্ষুধা শুধু দেহের নয়, এ ক্ষুধা মনের—এ ক্ষুধা প্রতিটি রক্তকণিকার। এই রক্ষোবৃত্তি কেবল রক্ষোবংশেই নয়, বিশ্বের প্রতিটি মোহান্ধ মানুষ এই বৃত্তির বশ। এরই বিষক্রিয়ায় দূষিত রক্ত, এরই প্ররোচনায় উদ্বেলিত জগৎ। বিশ্বের বুকে অত্যাচার ও অনাচারের দাবানল সৃষ্টি করে কে?—এই রাক্ষসী ক্ষুধা। রাম, তুমি কি শোননি আর্তের করুণ ক্রন্দন? দেখনি কি অনাথা নারীর, অসহায় শিশুর নয়নাশ্রু? সে ক্রন্দন, সে অশ্রু রাক্ষসী ক্ষুধার সৃষ্টি। কামান্ধ, দর্পিত রাবণ সেই ক্ষুধার করাল মূর্তি। কিন্তু তারো চেয়ে আরো ভয়ংকর রক্ষোবংশের আদিমাতা 'সালকটঙ্কটা'—কামনার কদর্য মূর্তি, যেন একটি বীভৎস, অতি কুটিল কামনার গ্রাস। তার কাহিনী

শুনলে আতঙ্কে, ঘৃণায় মুখ ঢাকবে তুমি।'

ঘৃণায় নিজেই দেহ কুঞ্চিত করেন চির অমর্ষ অগস্ত্য। সভাকক্ষে ওঠে সহস্র কণ্ঠের কলগুঞ্জন। সেই গুঞ্জনকে শুব্ধ করে ঋষি বলে চলেন রাক্ষসী 'সালকটঙ্কটা'র কাহিনী।

তিন

নিবিড়, নির্জন বনতলে তৃণাস্তৃত শ্যামল ভূমিতে শঙ্খ ধরেছে একটি কালনাগ ও একটি কালনাগিনী। নিকষ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ যেমন পরস্পর বেষ্টন করে একবেণী রচনা করে, তেমনি নাগ-নাগিনীর আবদ্ধ পুচ্ছ-ভাগ একবেণী রচনা করে চক্রাকারে ভূমিতল আশ্রয় করেছে। ঊর্ধ্বে মুখোমুখি দুটি উন্নত ফণা, আবেশ-বিহ্বল নির্নিমেষ নয়ন। কি সুগভীর প্রীতির আলোকন! কি সুখকর মৃদুমন্দ আনন্দ-দোলা! অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মিলনে নিখিল হারা নায়ক-নায়িকা, সম্ভোগ-বাসরে লুপ্ত বিশ্ব।

নাগ-নাগিনীর এই সানন্দ-সম্ভোগ অতৃপ্ত তৃষিত দৃষ্টিতে লক্ষ করছে কালনাগিনীর মতই কৃষ্ণবর্ণা এক কুমারী নারী। ঘন নীলবরণী কামিনী বিস্রস্ত কুন্তলে সুনীল আনন, যেন নীলজলে প্রস্ফুটিত নীলোৎপল। কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ-চমক জাগে দেহে! সির্ সির্ অঙ্গ-বিধূনন, রোমমুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ! তারো পলকহীন নয়নে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—তৃণ, বৃক্ষ, বনভূমি, লুপ্ত সমগ্র বিশ্ব।

সহসা তন্ময়তা ভেঙে যায়। কিসের শব্দে চমকিত হয়ে বরাঙ্গনা পিছন ফিরে তাকায়, অবাক বিস্ময়ে দেখে,—সামনে দাঁড়িয়ে এক বিশালদেহ যুবক। প্রাবৃট্-কালের রাত্রিও সন্ধ্যাভ্রের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, দেহভরা পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গ। করিকর সদৃশ উরু, লৌহভীম বাহু, প্রশস্ত বক্ষ। দীপ্ত নয়নে সুতীব্র সকাম চাহনি।

মুগ্ধা, বিহ্বলা কুমারী কন্যা। চকিতে এদিকে তাকিয়েই আবার ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে। কখন যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছে সম্ভোগী ভোগিযুগল। নির্জন অরণ্যে একা পুরুষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একা কামিনী। লজ্জাই এস্থলে স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম স্মরাতুরা নারী। বিস্ফারিত, উদগ্র চক্ষু। পুরুষের দেহ-দর্পণে নির্নিমেষ নয়নে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করে আত্মভোলা কামিনী। তন্ময় হয়ে সে ভাবে—মেরুমন্দর সদৃশ এমন বলিষ্ঠ, কে এই পুরুষ?

পুরুষও উদাসীন নয়। ক্ষুধার চঞ্চল নৃত্য তার রক্তকণায়, সহস্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তার দেহে। দৃষ্টিভোগে সুতীব্র উত্তেজনা। উদভ্রান্ত চিত্তে সেও ভাবে,—অঙ্গে প্রদোষের ছায়া, নয়নে মায়ার আঁধার-কাজল, ত্রিবলিতরঙ্গে অলংকৃত নাভি—কে এই সুন্দরী?

'কে তুমি!'

'কে তুমি!'

একই সঙ্গে দুই সোৎসুক কণ্ঠের দুই পূর্বপক্ষ, যেন কড়ি ও কোমলে ঝংকৃত দুইটি বীণা-তন্ত্রী। মদবিহ্বল কণ্ঠে বলে কামদর্পিত পুরুষ, 'অমিতপ্রভ রক্ষোবংশে পরাক্রান্ত হেতি-পুত্র আমি—বিক্রান্ত বিদ্যুৎকেশ!'

বিদ্যুৎকেশ! রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ! যার দুর্জয় প্রতাপে ত্রস্ত ত্রিভুবন! শাসনে ও শোষণে অদ্বিতীয় সেই বিদ্যুৎকেশ!—বিদ্যুৎ-চাঞ্চল্য খেলে যায় কুমারীর দেহে, আশার আলো চমক দিয়ে যায় নয়নে। পুষ্পধনুর মত ভ্রূ দুটি বাঁকিয়ে, কটাক্ষে পুষ্পশর নিক্ষেপ করে, সহাস্যে মদস্খলিত কণ্ঠে সে বলে, 'অসুরীপ্রিয়া প্রতাপশালিনী সন্ধ্যার নন্দিনী আমি—সালকটঙ্কটা।'

সালকটঙ্কটা! মেঘদ্যুতি সন্ধ্যা-নন্দিনী সালকটঙ্কটা! রূপসী মায়াবিনী,—অসুর-সমাজে যে দ্বিতীয়া রতি?—অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে অমিতপ্রভ রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ। সহসা কি মাতাল হয়ে উঠল পলাশের বন?

শক্তিদর্পে দর্পিত রাক্ষস। সে জানে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরভোগ্যা যে-কোন কামিনী। ইচ্ছাই শক্তের প্রাপ্তি। স্বয়ং প্রতিগ্রাহী হলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করবে কে? উগ্র কামের ভূমিকা নেই, দুর্জয় দম্ভের নেই ধৈর্য। শালীনতা, সৌজন্য ভীরুর ভূষণ। সুদীর্ঘ লোলুপ বাহু প্রসারিত করে বলে কামার্ত রাক্ষস, 'আমি তোমার পাণি-প্রার্থী।'

অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করে সালক-টঙ্কটা। অদ্ভুত শক্তিমানের যাচ্ঞা! বুক-ভরা পুলক, সর্বদেহে রোমাঞ্চ! কেমন যেন সভয় আনন্দ-কম্পন! ধীরে এক পা এক পা
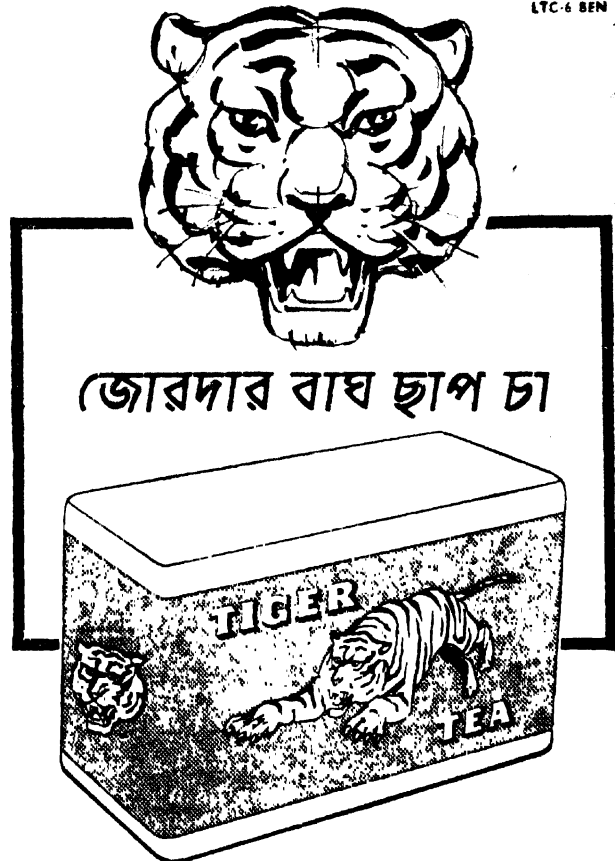
করে পিছিয়ে যায় সে—যেমন আক্রমণোদ্যত মহামুখ ব্যাঘ্রের চোখে সুতীক্ষ্ম, স্থির দৃষ্টি রেখে সতর্কতার সংগে পিছিয়ে যায় কুশলী শিকারী। তারপর সহসা অতর্কিতে বিদ্যুৎগতিতে বনান্তরালে অদৃশ হয়ে যায় চঞ্চলা। বিশাল অরণ্য অনুরণিত হয় এক অদ্ভুত চপল কলহাস্যে।

অস্থির হয়ে ওঠে বিদ্যুৎকেশ। আশ্চর্য মায়াবিনী! উন্মাদের মত সে ডাকে, 'সালকটংকটা!'

অদৃশ্য বনতলে ধ্বনিত হয় আবেগ-কম্পিত মায়াকণ্ঠ, 'আমিও তোমাকে কামনা করি বিদ্যুৎকেশ! কুমারী স্বাধীন নয়। মাতা সন্ধ্যার কাছে আমাকে প্রার্থনা কর তুমি।'

নির্জন অরণ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে, 'আমাকে প্রার্থনা কর তুমি......

আর্যেতর জাতির সংসারের নেত্রী জননী। জননীই সেখানে সমাজের নিয়ন্ত্রীশক্তি, মাতৃগোত্রেই বংশের পরিচয়। কন্যার পাণি-প্রার্থী হয়ে রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ স্বয়ং এসে দাঁড়াল সায়ন্তনী সন্ধ্যার দ্বারে। আড়ালে কান পেতে শুনল সালকটংকটা, বিদ্যুৎকেশ বলছে, 'হেতিপুত্র আমি, বিদ্যুৎকেশ। আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।'

দুরু দুরু কাঁপছে সালকটংকটার বুক—আশা, উদ্বেগ, আশংকা! মায়ের কি অভি-মত? পূর্ণ কি হবে না তার মনস্কাম?

গভীরভাবে মনে মনে বিচার করছেন বিদুষী সন্ধ্যা। তিনিই একাধারে কন্যার পিতা, মাতা, বান্ধবী। পিতা বরের গুণাগুণ বিচার করেন, মাতা কামনা করেন বরের বিত্ত। পিতার মতই ভাবলেন তিনিঃ বংশমর্যাদায় অতুল রক্ষোবংশ। বিদ্যুৎ-কেশের পিতা হেতি, সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যের রথে তার অবস্থান। মানব, দানব, এমন কি রুদ্র-শূলে, বিষ্ণুচক্রেরও অবধ্য তিনি। মাতা 'ভয়া'ও কালের ভগিনী। দুই কুলে ধন্য বিদ্যুৎকেশ। সে নিজেও অমিতবিক্রম। তার প্রতাপে অস্থির সুরাসুর। কন্যাকে তো অপরের হস্তে সম্প্রদান করতে হবেই। সৎপাত্রেই তাকে অর্পণ করা সংগত। বিদ্যুৎকেশ অবশ্যই সৎপাত্র।

আবার মাতার মত চিন্তা করলেন ব্রহ্ম-তনুজাঃ ঐশ্বর্য ও সম্পদে প্রতিষ্ঠিত রাক্ষসকুল। বিদ্যুৎকেশে কন্যা সমর্পিতা হলে, কন্যা অদী না হয়ে রাজৈশ্বর্য ভোগের অধিকারিণী হবে। মাতার চিরকালের কামনা, কন্যা আমার রাজরাণী হক। আবার একটু ভয়ও হল তাঁর। শক্তিদর্পে উদ্ধত রাক্ষস। তার প্রার্থনা পূর্ণ না হলে হয়তো বলপূর্বক বীর্যশুল্কেই এ কন্যাকে হরণ করে নেবে।

—নানাদিক থেকে বিচার করে বিদ্যুৎ-কেশের হস্তেই কন্যাকে সমর্পণ করবেন স্থির করলেন সন্ধ্যা, মুখে বললেন, 'আমার কন্যা তোমার পাণিগৃহীতা হবে—এ আমার কুলের পরম সৌভাগ্য! তুমি কুলীন, রক্ষোবংশের গৌরব। আমি সানন্দে এ বিবাহে সম্মতি দিচ্ছি।'

মাতার বাক্যে উল্লাসে উল্লসিত হল সালকটংকটা। মনে মনে আশার আনন্দ-বাসর রচনা করে কামার্তা। বুকের অতলে কি অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য! বরের রূপ-চিন্তায় বিভোর ভাবী বধূ, অন্তরভরা রূপানুরাগ। 'অহো রূপম্ অহো ধৈর্যম্ অহো সত্ত্বম্ অহো দ্যুতিঃ'—আহা, কি অপরূপ রূপ-মাধুরী, আহা কি ধৈর্য, আহা কি অসীম শৌর্য! কি অমেয় দ্যুতি, কি প্রচণ্ড শক্তি বিদ্যুৎকেশে! এই শৌর্যের নিয়ন্ত্রী হবে সে। বিরাট সুন্দর বাঁধা পড়বে তারই ভুজ-বন্ধনে! কি সুখ, কি তৃপ্তি! বনতল এমন রক্তরাগে রঞ্জিত হল কোন্ ক্ষণে!

কামনার রঙ যার বুকে, কামনার নেশা যার চোখে—তার কাছে চিররঙীন ভুবন। সেই ভুবনে কল্পনায় রাঙা হয়ে ওঠে কৃষ্ণা অসুর-কন্যা।

এও একপ্রকার রাজ-যোটক। লগ্ন-রাশি মিলিয়েই শুধু রাজযোটক হয় না। বর যেখানে স্বয়ংযাচক, কন্যা যেখানে স্বয়ং-যাচিকা, অভিভাবক যেখানে অনুকূল—সেখানে মহা রাজ-যোটক। এ যেন যুক্ত-বেণীর মধুর সংগম। যোগ্যের সংগেই মিলিত হল যোগ্যা। বিদ্যুৎকেশের সহিত মিলিত হল সালকটংকটা, রাক্ষস-শক্তির সহিত যুক্ত হল আসুরিক তেজ। ক্ষুধা ও কাম একাধারে মিলিত হল, যেন অনলের সহিত যুক্ত হল অনিল, যেন উন্মত্ত সিন্ধুতরঙ্গ নিপুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করে উর্মির সাথে হাত মিলাল প্রলয়-ঝটিকা।

দৈত্যদের আকণ্ঠ শুধু আসুরে ভাব। তাদের রক্তে দেবতার চিরবৈরী। দম্ভ, দর্প, মদ—ক্রোধ, পারুষ্য, অতিলোভিত্ব—

যা কিছু আসুরিক ভাব, তাদের মূল কদর্য কাম। কাম আর ক্ষুধা ভিন্ন নয়, ভিন্ন নয় অসুর ও রাক্ষস। এক পাপের দুই মূর্তি, এক বিষবৃক্ষের দুই বিষফল। বিশ্বের যাবতীয় অনাচার এই ক্ষুধা-কামনার সৃষ্টি। ক্ষুধাতুর বিবৃতবদন, উগ্র, উদ্যতবাহু—ক্ষুধাকাতর জীব অন্ধ, বধির। তার পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব-অধঃ—দিগ্-বিদিক্ জ্ঞান নেই। দিগ্‌ভ্রান্ত ক্ষুধিত। ক্ষুধায় বুদ্ধি-বৈকল্য। শুধু কি তাই? মায়া, মমতা, স্নেহ—সব ভুলিয়ে দেয় ক্ষুধাঃ

জনকং জননীং পুত্রান্ ভার্যাং
দুহিতরং তথা।
ভ্রাতরং স্বজনং বাপি ত্যজতি
ক্ষুধয়ার্দিতঃ॥

যেমন ক্ষুধা, তেমনি কাম। শান্তির নীড়ে অশান্তির বহ্নিশিখা, সন্তোষের নিলয়ে চির অসন্তোষ—কামনাও অন্ধ, বধির, নিষ্ঠুর।

দুর্দান্ত ক্ষুধা-কামনার ভীষণ মূর্তি রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ, অসুর-নন্দিনী সালক-টংকটা। মানুষের ভাষা সে ক্ষুধাকে বর্ণনা করতে পারে না। নির্দয় রাক্তবুভুক্ষ, অতি নির্মম তার রূপ! মনে হয়, জগতে আর কেউ নেই, আর কিছু নেই—আছে শুধু সম্ভোগ আর সম্ভোগ।

এই সম্ভোগেই প্রমত্ত হল নরকপুরী। নরবধূ তুলসীমূলে প্রদীপ জ্বালল না, সন্ধ্যায় [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] করল না [illegible]। [illegible] স্পর্শে হল ভোগের লীলাপীঠ। সম্ভোগের [illegible]। প্রজার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে [illegible] হল রাজার ভোগ। ক্রন্দন করে উঠল ধর্ম, ক্রন্দন করে উঠল সারা প্রকৃতিপুঞ্জ। [illegible] [illegible] দুর্ভিক্ষের দিল প্রজার গায়ে। চতুর্দিকে অশান্তি, চতুর্দিকে হাহাকার। বিদ্যুৎকেশ-সালকটংকটার প্রমোদ-ভবন তখন মদনোৎসব।

প্রমোদের তরঙ্গ কেবল প্রাসাদ-সীমায় আবদ্ধ রইল না, বিস্তৃত হল নদীতটে, সরোবরে, সাগরে; বিস্তৃত হল কুঞ্জকাননে ও নির্জন অরণ্যে। আন্দোলিত হল শৈলের শিখর, সানুদেশ, কন্দর। দিন নেই, ক্ষণ নেই, পরিকালাকাল বিচার নেই। উষায়-পূর্বাহ্ণে-মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে-গোধূলি-লগ্নে, গভীর নিশীথে—কামনার নহিলে নরনারীর মুখচন্দ্রিকা।

অরণ্যের সুন্দর শোভার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে সালকটংকটা, 'ঐ দেখ, কি মনোরম সরোবর, কি সুন্দর হংসলীলা, কি নয়ন-হরণ শ্যাম দূর্বাদল, কি চমৎকার বেতসী লতার বন্ধন।

হেসে উত্তর দেয় বিদ্যুৎকেশ 'প্রাণবল্লভে! তোমার নয়নের আচ্ছাদনটেই সরোবর, কটাক্ষ হংসলীলা; তোমার সবুজ মেখলা শ্যামল দূর্বাচটি, কোমল বাহুই বেতসী-লতার বন্ধন।'

খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ে সালকটংকটা, প্রতি অঙ্গরেখায় যেন কিন্নরীর নৃত্য। বিদ্যুৎকেশের রক্তে উত্তপ্ত উন্মাদনা!

মাতালের মত উন্মাদনা! উন্মাদ রাক্ষস, উন্মাদিনী অসুরনন্দিনী। প্রমত্ত বুঝি সমগ্র প্রকৃতি। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ বেলাবলয়ে বেষ্টিত হয়—চঞ্চল হয়ে ওঠে বিদ্যুৎকেশ; সাগর-দিগন্ত দিগ্‌বধূ আলিঙ্গন করে সমুদ্র-কটি—চঞ্চল হয়ে ওঠে সালকটংকটা। সমীরণ এসে স্পর্শ করে নদীজল, শিউরে ওঠে সরিৎ-তরঙ্গ—শিউরে ওঠে বিদ্যুৎকেশ; কলমুখর হয়ে স্রোতস্বিনী নটিনীর মত নেচে নেচে সাগরে প্রবেশ করে—অস্থির হয়ে ওঠে সালক-টংকটা। সরোবরে চক্রবাক-চক্রবাকী, রাজ-হংস-রাজহংসীর মিথুন-চেষ্টা ওদের পাগল করে তোলে।
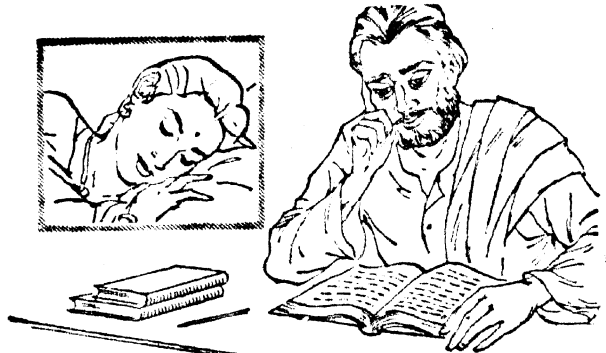
গিরিশিখরে এসে দাঁড়ায় ওরা—দেখে, উদার পশ্চাতে সবেগে ছুটেছে অরুণ। রাঙা অরুণের কামনার রাঙে রক্তমুখী সন্ধ্যা উষা। আনন্দের ভারে শিথিল তার সংকোচ-

আবরণ, তর্জনী-হেলনে প্রণয়-রোষের ভান, বাঁকানো মুখে আত্মনিবেদনের হাস। কোথায় উষা? অরুণ বক্ষে আনন্দলীলা অরুণ-প্রিয়া।

ওই মত্ত দিগ্‌গজের মত ছুটেছে মেঘ! ওই উত্তাল হয়ে উঠেছে সিন্ধুতরঙ্গ। প্রলয়মেঘ সবলে আকর্ষণ করছে সিন্ধুকে, উত্তরঙ্গ সাগর প্রচণ্ডবেগে আকর্ষণ করছে মেঘকে। জলস্তম্ভ সৃষ্টি হয়েছে সাগরে। একাকার মেঘ ও জলধি।

নিদ্রাহীন উদগ্র কাম, তন্দ্রাহীন উদ্দাম সম্ভোগ কোথা দিয়ে চলে যায় দিন, কোথা দিয়ে চলে যায় রাত্রি। এক যুগ যেন একটি নিমেষ। তৃপ্তিহীন, শ্রান্তিহীন, শান্তি-হীন ক্ষুধা—বিরতিহীন তৃষ্ণা। প্রমত্ত বিদ্যুৎকেশ যেন তপ্তসলিল সাগর—চির-স্ফীত, চিরতরঙ্গিত, চিরগর্জিত। তার নয়ন রক্তবর্ণ, বিঘূর্ণিত মস্তক মুখে গজ-রাজের মত মদস্রাব। অনঙ্গরঙ্গে মত্ত অসুর কন্যা যেন বহ্নির লেলিহান শিখা; কৃষ্ণকুঞ্চিত, গর্জমুখর, সর্বগ্রাসী। তার

লোচনদ্বয় মদঘূর্ণিত, আরক্ত—বিপর্যস্ত বিভূষণ, বক্ষে ঘনশ্বাস! অগ্নি-উচ্ছ্বাস গর্জন করে ওঠে আগ্নেয় পর্বত, মাতাল ঝড় ওঠে বনে, নদীর বুকে জাগে রাক্ষসী বন্যা। কত আগুন আর যতুগৃহে! প্রলয়ে কি এত উদ্দাম হয় ঝড়? বক্ষে বক্ষে সঘন ঘর্ষণ, মাটির বুকে অনলশ্বাস। বন্যার জল লাল হয়ে ওঠে কামিনীর অঙ্গরাগে।

নিষ্ফলা নয় উদ্দণ্ড ক্ষুধা, ব্যর্থ হয় না মত্ত ঝড়ের আবেগ। তারা রিক্ত করে, পূর্ণও করে। রিক্ত করে পরকে, পূর্ণ হয় নিজে। অগ্নি যেমন হবি থেকে অমোঘ রুদ্রতেজ গ্রহণ করে, ঊর্মিমুখে সংজ্ঞা যেমন গ্রহণ করে সূর্যের শক্তি—তেমনি বিদ্যুৎকেশের রাক্ষসী তেজ ধারণ করল অসুরনন্দিনী সালকটঙ্কটা। ক্রমে প্রকাশিত হল দৌহৃদ লক্ষণ। ক্ষীণ দেহ, পাণ্ডুর বদন—আবার দিনে দিনে সুপুষ্ট দেহ, সুন্দর কান্তি।

আর্যধর্মে গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের দশবিধ সংস্কার—প্রত্যেকটি ক্রিয়া ধর্মের সংযত শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। সেখানে অতি কঠিন গর্ভিণীর দায়িত্ব, অতি কঠোর স্বামীর কর্তব্য। সন্তান—সে তো সম্ভোগের পরিণাম নয়, নয় উদ্ধত কামনার বুদ্বুদ। সন্তান ধর্মযজ্ঞের পুণ্যফল, অলকনন্দার আনন্দধারা। সে যজ্ঞফল লাভের নিয়ম আছে, সংযম আছে, মন্ত্র আছে।

কিন্তু ক্ষুধাতুর রাক্ষস, কামাতুরা অসুরনন্দিনী। নিয়মে তারা অনিয়ম, শৃঙ্খলায় ব্যতিক্রম। দৈহিক লালসায় অসংযত লিপ্সায় আরো উদ্দাম হয়ে উঠল তারা। অন্ধ ইন্দ্রিয়সেবায় যারা নিত্য প্রমত্ত, তাদের পান-ভোজন, হাস্য-রোদন, অবস্থান-গমন একসূত্রে গাঁথা তেমনি একসূত্রে বাঁধা বিদ্যুৎকেশ সালকটঙ্কটা। ক্ষণেকের তরে বিদ্যুৎ মেঘমুক্ত হলে যেমন গভীরভাবে গর্জন করে ওঠে মেঘ, তেমনি মুহূর্তের তরে ভার্যা চোখের আড়াল হলে ঘোর গর্জন করে ওঠে বিদ্যুৎকেশ। সালকটঙ্কটা মদিরা পান করে বিদ্যুৎকেশকে প্রসাদ দেয়, বিদ্যুৎকেশ সেই সুধা পান করে খলখল হেসে ওঠে; বিদ্যুৎকেশ তাম্বুল চর্বণ করে অর্ধচর্বিত তাম্বুল সালকটঙ্কটার মুখে অর্পণ করে—সেই তাম্বুল-রাগে মদমত্তা করিণীর মত ভীষণা হয়ে ওঠে মুক্তকেশী। তারায় বাজে মেঘমল্লার।

জলভারে নমিত বর্ষার ঘন মেঘ, জলভারে পূর্ণা বর্ষার তরঙ্গিণী। কি উত্তাল ঝড়ের আবেগ। সে ঝড়ে চঞ্চল হয় মেঘ, চঞ্চলা হয়ে ওঠে পূর্ণা তটিনী। জল-ঝরানো তার প্রমত্ততা, তীর-ছাপানো তার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস। ঝড়ের বুকে আরো উচ্চগ্রামে দ্রুতলয়ে বাজে যেন মল্লার রাগ।

সেদিন রুদ্রাধিকারভক্ত রাক্ষসী মুহূর্তে সালকটঙ্কটা বন্ধ ছিল বিদ্যুৎকেশেরই বাহুপাশে। সহসা দ্রুত্তে আলিঙ্গন-মুক্ত হল সে। ভীতা, চকিতা যেন বন-করিণী। অবাক হয়ে গেল বিদ্যুৎকেশ, সভয়ে দেখল, ঘননীল হয়ে গেছে সালকটঙ্কটা। গভীর এক অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন চোখে-মুখে, মুহুর্মুহু কুঁকড়ে যাচ্ছে দেহ। কোন কথা বলার পূর্বেই, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শৈল-কাননান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

উন্মাদের মত ডাকল বিদ্যুৎকেশ, 'সালকটঙ্কটা!'—আহ্বান যেন প্রমত্ত বৃংহণ। বনতলে রি রি করে উঠল সেই নিষাদ নির্ঘোষ।

শৈল-সানুদেশ থেকে ধ্বনিত হল বেদনা-খিন্ন বিহ্বল প্রত্যুত্তর, 'মুহূর্ত অপেক্ষা কর।' প্রস্তরশৈলের আঘাতে প্রতিধ্বনিত হল বিকট সেই রাসভী ধ্বনি।

মদান্তীঙ্করের মত অস্থির বিদ্যুৎকেশ। চঞ্চল চিত্ত, চঞ্চল স্নায়ু—যেন সহস্র বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলছে তার দেহে। শঙ্কাব্যাকুল উতলা প্রতীক্ষা। মুহুর্মুহু ব্যাকুলতার গর্জিত আহ্বান, 'সালকটঙ্কটা! সালকটঙ্কটা!'

অলক্ষ্য শৈলকাননে তেমনি উত্থিত হয় বেদনাকাতর, কান্নাবিহ্বল কণ্ঠস্বর, 'একটু অপেক্ষা কর বিদ্যুৎকেশ!'—অরণ্যে জাগে স্বরের অনুরণন।

বনবন করে ঘোরে যেন সারা বন। ভীষণ কম্পন! ব্যগ্র প্রতীক্ষার আবেগ-কম্পন, অব্যক্ত বেদনার আকুল কম্পন! বুকের অতলে কম্পিত রক্তসিন্ধুর রক্তবিন্দু, নয়নের আচ্ছাদনপটলে কম্পিত হারাবিন্দু। বিপুল সম্ভাবনায় সভয়ে স্পন্দিত সুকঠিন বেদনা! কম্পিত শৈল, সরোবর, কানন, কন্দর। গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় কাঁপছে সহস্র ত্রসরেণু, প্রদোষের ছায়ায় কাঁপছে আবছা অন্ধকার!

সহসা দেখা যায়, সন্ধ্যার অন্ধকারকে আলোড়িত করে বিজয়িনীর মত কলহাস্যে ছুটে আসছে কামোন্মত্তা সালকটঙ্কটা, আলিঙ্গন-লিপ্সু হয়ে ছুটে আসছে মদস্খলিতা করিণীর মত রক্তঃস্নাতা সদ্য-প্রসূতি—যেন উগ্রভীষণ ক্ষুধার গ্রাস আর একটা নিষ্ঠুর অন্ধ ক্ষুধা।

তখন শৈল-সানুদেশ প্রকম্পিত করে প্রাণপণে ভৈরবরবে চিৎকার করছে একটি পরিত্যক্ত, অসহায় সদ্যোজাত শিশু—মমতাহীন কুৎসিত কামনার বিষফল সে—রাক্ষস সুকেশ, রাবণের প্রমাতামহ।

নীরব হলেন অগস্ত্য—নীরব হল একটি ক্ষুব্ধ, রুষ্ট কম্পিত কণ্ঠ। বজ্রাহতের মত স্তব্ধ সভাকক্ষ। রত্নসিংহাসনে নিস্তব্ধ রাক্ষসবিজয়ী রাম—বেদনায় সজল কমলনয়ন, ক্ষোভে স্ফুরিত কোমল ওষ্ঠাধর। তিনি ভাবছেন, 'এই উৎকট ক্ষুধা-কামনা-রূপী নির্দয় রাক্ষসের বুভুক্ষা-গ্রাস থেকে রামরাজত্ব মুক্ত হতে পেরেছে কি?'

ভবিষ্যোত্তর কালের কণ্ঠেও জাগে যেন একই প্রশ্ন, 'উৎকট ক্ষুধা—কামনারূপী রামরাজ্য মুক্ত হতে পেরেছে কি?'

ঘন, সতেজ ও পরিপাটী

কেশগুচ্ছের জন্য

টাটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

১০

কী সেই দুর্জ্ঞেয় গহন শক্তি যে এমনি করে রোদে-বৃষ্টিতে ঘরের বার করে আনে। অসাধ্যকে সাধ্য করার মন্ত্র শেখায়। আশ্চর্যের চোখে অসম্ভবকে দেখতে বলে। অণু থেকে অণিষ্ঠ গুরু থেকে গরিষ্ঠ সে-শক্তির নাম কী। কোনখানে তার বাসা? কী চায় সে আমাদের কাছে?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর ফটকের সামনে দেখা হল দুজনের।

কাকলিই পরে এল।

'ভাবলাম এলেই না বুঝি।' এক পা এগিয়ে এল সুকান্ত।

'ওরকম সকলেরই ভাবতে হয়।' কাকলি হাসল। 'আমিও ভাবছিলাম গিয়ে তোমাকে দেখতে পাব না। তবু, ছেলে দাঁড়িয়ে থাকলে বড় জোর বোকা বোকা দেখায়, কিন্তু মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে—ও, হোপলেস—চলো কোথাও একটু বসি।'

'এখানে নয়।' চলতে চলতে সুকান্ত বললে।

'এলাম এখানে অথচ এখানে নয় কেন?' দুই কালো চোখে এক ঝলক আনন্দের রোদ নিয়ে তাকাল কাকলি: 'চারদিক বেশ ফাঁকা—'

'কিন্তু বড় সেকেলে-সেকেলে ঠেকছে না?'

'সেকেলে?'

'সেকেলে বলতেই বলে দেব, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইডেন গার্ডেন। কোনো একটা নতুন জায়গা ভাবা যাক। তা ছাড়া এখানটা কেমন একটা খাঁচি-খাঁচি দমবন্ধ-দমবন্ধ ভাব—চারদিকে আবার দেয়ালের বন্ধন—'

'এর চেয়ে ভালো জায়গা কোথায়?' অসহায় চোখে অনুসন্ধানে তাকাল কাকলি।

'আছে ভালো জায়গা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না।'

'কোথায়?'

'বাইরের ঐ মাঠ। গড়ের মাঠ। ঐ অঢেল মুক্তি। বৃষ্টির পরে কী ঘনসবুজ ঘাস হয়েছে দেখছ!'

'মাঠে গিয়ে বসব!' হাঁ হয়ে রইল কাকলি।

'প্রায় পথে বসার মত মুখ করছ দেখছি। কিন্তু কী সুন্দর মাঠ বলো তো। জগতে আর কোথাও আছে বলে শুনিনি। এত বড় মাঠ, কিন্তু আশ্চর্য, কারু মাথায় আসে না।'

'রাতে মাঝে মাঝে পুলিসের মাথায় আসে বলে শুনি।' কটাক্ষে হাসল কাকলি।

'কিন্তু আমরা তো অন্ধকারে আসিনি, দিনে এসেছি, রোদ্দুরে এসেছি। পুলিসের-এড়িয়ে নয়, সকলের চোখের উপর দিয়ে। জানিয়ে-শুনিয়ে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

কথাটা তিরস্কারের মত শোনাল না, মমতার মত শোনাল।

'তা একটু যে না হয়েছে তা বলি কি করে? কিন্তু' মমতার চোখে সুকান্তও তাকাতে জানে: 'তোমার মাথাও খুব সুস্থ নেই।'

গম্ভীর হল কাকলি। বললে, 'কিন্তু সব কিছুরই মাত্রা আছে।'

'আনন্দের মাত্রা নেই, ভালবাসার মাত্রা নেই। চলো রেসকোর্সটার পাশে চলো, নয় তো চলো ওদিকে, গাছের নিচে কেমন আঁচল-ছড়ানো ছায়া, দুজনে বসি গিয়ে সেখানে—'

'এখন তো অফিসটাইম। রাজ্যের গাড়ি যাচ্ছে রেড রোড দিয়ে। তারা সব দেখুক।'

'দেখুক। শিখুক।'

'শিখুক?' চমকে উঠল কাকলি: 'কী শিখবে?'

'কেমন করে দেখাতে হয়। সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য তো দেখাবার জন্যে। সূর্য থেকে ঘাস সকলেরই সেই এক চেষ্টা, এক পাগলামো। তেমনি কোথাও যদি ঠিক ঠিক ভালবাসা জন্মায়, তাহলে তাকে রাখতে হবে লুকিয়ে? পারা যাবে রাখতে? কাপড় দিয়ে ঢাকা যাবে আগুন? ঢাকা যাবে যৌবন? জগজ্জনে দেখুক না একটা ছবি। শুনুক না একটা গান।'

'পুলিসে খবর না দিক', হাসল কাকলি: 'খবরের কাগজের আফিসে খবর দেবে। চলে আসবে স্টাফ রিপোর্টার।'

'আসুক। এসে দেশের সুন্দরবস্তুটা দেখে যাক স্বচক্ষে।'

'দুরবস্থা ?'

'হ্যাঁ, দেখে যাক, বাঙালী পরিবারের ঘরে ছাত্রছাত্রীদের কী নিদারুণ স্থানাভাব। পড়বার জন্যে সূচ্যগ্র জায়গা পাচ্ছে না, পাচ্ছে না তিলার্ধ নিরিবিলি। তারই মধ্যে যারা অধ্যবসায়ী, শ্রমনিষ্ঠ, তারা কেমন দুপুর-বেলায় গড়ের মাঠে চলে এসেছে, গাছের ছায়ার নিরিবিলিতে বসে পড়ছে একমনে—'

'তবু যদি সঙ্গে একখানা বই থাকত!'

'সে কি ?' চলতে চলতে দাঁড়াল সুকান্তঃ 'সঙ্গে যে একটা ঝোলা এনেছ তার মধ্যে একখানাও বই নেই ?'

'আমার কী আছে না আছে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বলি, তোমার তো কিছু নেই। তুমি তো রিক্ত।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো বটে। আমি রিক্ত।' স্বর দৃঢ় করল সুকান্তঃ 'রিক্ততাই আমার শক্তি।'

'কিন্তু আমার যদি থাকে তাহলে তোমারও আছে।' স্বর গাঢ় করল কাকলি। পরে লঘু হবার চেষ্টায় বললে, 'কেন, এক বই পড়ে না দুই জনে? এক বই লেখে না? এক নৌকোয় একজন হাল ধরলে আরেকজন টানে না দাঁড় ?'
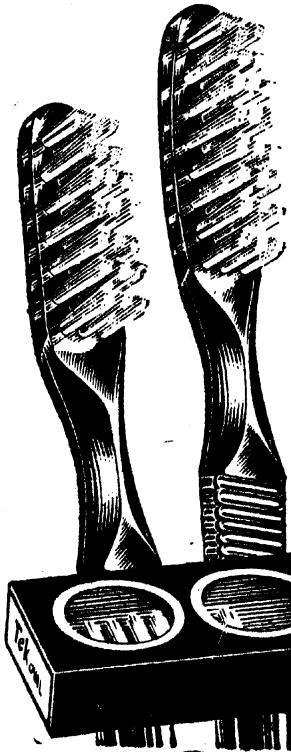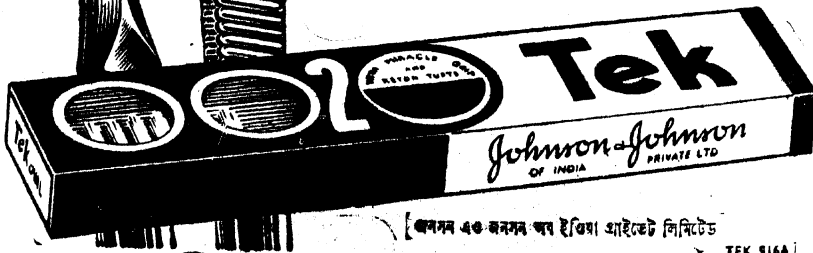
'তবে চলো, হাঁটি। বসে দরকার নেই। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি।'

দুজনে হাঁটতে লাগল।

'তোমার ঝোলাটা আমাকে দেবে নাকি?' হাত বাড়াল সুকান্ত।

'এত সামান্য ভার নিয়ে তুমি কী করবে? তোমার শক্তি আরো গুরুতরের জন্যে প্রস্তুত।' চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি।

'হাঁ, প্রস্তুত।'

গল্পই করছে দুজনে। আজেবাজে কথার ভুরভুরি তুলছে। কিন্তু দুজনেই কান পেতে আছে গল্প কখন সংবাদ হয়ে ওঠে, কল্পনা কখন ইতিহাসের মাটি ধরে। খনির সোনা কখন যায় বাজার দরে যাচাই হতে।

কত কথা বলার পর, কোন কথার পিঠে, কত পথ হেঁটে এসে, কোন ভঙ্গিতে শ্রান্ত প্রাণকে বিশ্রাম দিতে দিতে বলা হবে সেকথা, আদিম আহূতির কথা। কে পাড়বে, কাকলি না সুকান্ত! কী ভাবে পাড়বে! কী রকম প্রথম লাগবে না জানি শুনেতে!

আমার কী স্পর্ধা, আমি কী করে বলি, কথার ধার দিয়েও কেউ ঘেঁষছে না। তবু, এক সময় তো কথাটা উঠবেই, ফসল পাকলে ফসল তোলবার কথা, সেই আশায় বসে আছে দুজনে। কে না-জানি আগে বলে! আর না-জানি, কখন!

সন্ধানে কে না-জানি আগে ছোঁয়। আমার কী দরকার, কী না-জানি হয়ে করবে, নিজের চৌকাঠের বাইরে একটি আঙুলও বাড়ায় না কেউ। যার সেই কোর্ট তাকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। তবু সজাগ রেখেছে চোখ, কখন না জানি শাদা কাগজে স্বাক্ষর পড়ে, কে না প্রথম নিঃশব্দে করে দাগ দিয়ে।

চোখ আর কানের পাহারায় সাহারা জাগিয়ে রেখে কথা বলে চলেছে দুজন।

আর হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্তহীন পথ যেন চলে যেতে পারে অনন্ত। রোদে এতটুকু কষ্ট নেই, চলায় নেই ক্লান্তি। চেতনার কোন গভীরতর ধামে এসে উপস্থিত হবে প্রতিপদে তার প্রত্যাশা। যেন কাছেই আছে কোন মৌনী সমুদ্র, প্রতি নিশ্বাসে শুনছে তার নৈঃশব্দ্য।

'এই বোধ হয় ঠিক জায়গায় এলাম এতক্ষণে।' উৎসাহী স্বরে বললে সুকান্ত।

'ওমা, এ তো জু। চিড়িয়াখানা।' কাকলিও কম চঞ্চল হল না। বললে, দাঁড়াও কিছু কলা আর বাদাম কিনি।'

'বাদাম আবার কার জন্যে?'

'হরিণের জন্যে। কী সুন্দর ছল ছল বড় বড় চোখ হরিণের!'

কেনাকাটা করে এগিয়ে এসে জানোয়ারের এলাকার দিকে যাচ্ছিল কাকলি, সুকান্ত বাধা দিল। বললে, 'ওদিকে গিয়ে আর কী লাভ? এসো ঐ জলের ধারে ছায়াতে বসি।'

'বা, এগুলো কী হবে?' হাতের ঠোঙার দিকে লক্ষ্য করল কাকলি।

'যা খিদে পেয়েছে, এগুলো আমরা নিজেরাই সদ্ব্যবহার করতে পারব।'

'আমরা?'

'হাঁ, বাদামটা না হয় তুমিই খেয়ো, আর কলা—বুঝতেই পারছ—ও আমার প্রাপ্য।' অসংকোচে সারলো হাসল সুকান্ত।

দুজনে বসল ঘাসের উপর।

বাদাম ছাড়িয়ে খেতে খেতে কাকলি বললে, 'ওদের খাবা খাচ্ছি দেখে লোকেরা না আমাদের ভুল করে।'

'লোকেরা ভুল করবে না। যেরকম বাগ-বাচ্চু হয়ে দেখছে আমাদের, ঠিক ঠিক মৃগ-মর্কটই ভাবছে। আমার ভয় হচ্ছে জু-র কর্তাব্যক্তিদের—'

'কেন, ভয় কেন? পাছে ভগবানের মত করে খাঁচায় পুরে ফেলে।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু এমন আসান কি হবে যে দুজনকে এক খাঁচায় পুরবে?'

'ওরা না পুরুক কিন্তু সংসার তো পুরতে পারে।' বলেই চমকে উঠল কাকলি। এ কি, অগোচরে কাকলিই প্রথম কথা পাড়ল নাকি?

নিত্যতরঙ্গায়মান তৃষ্ণার ইঙ্গিত সেই আসল প্রথম?

যাক, বেঁচেছে, কথাটা ঘুরিয়ে নিল সুকান্ত। মুখ গম্ভীর করে বললে, 'আমি খুব খেলো হয়ে যাচ্ছি তাই তোমার মনে হচ্ছে না? খুব হালকা, লঘু, যাকে বলে অর্বাচীন।'

জলে ছায়া দেখতে দেখতে কাকলি বললে, 'তাই তো ভালো। গভীর কথা গম্ভীর করে বলতে গেলে মানে পায় না। হালকা হাসির পাখায় উড়িয়ে দিলে ঠিক প্রজাপতির মত হৃদয়ের উপরে এসে বসে।'

'কিছুতেই শালীন হতে পারি না।' মুখভার কাতর করল সুকান্ত।

'শাল গায়ে না দিলে শালীন হওয়া যায় না।' কাকলি হেসে উঠল।

'খালি গায়ে থাকি—দেখছ তো—তাই খেলো চালি খেলো বলি—'

'তাই ভালো, খোলাখুলিই ভালো। কপট না রাখাই অকপট হওয়া।'

'তার মানে, বলতে চাও অকপটই অকপট।'

কী সুন্দর কথা বলতে, কী সুন্দর কথা না বলতে! কথা বানাতে কথা ভুলে যেতে! রোদ দেখতে, জল দেখতে, জলের ছায়া

দেখতে। উপস্থিতি দিয়ে অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে। সময়ের কারখানায় দেউলে হয়ে যেতে। নানা জাতের পাখির কলরব শুনতে। গাছের উপর থেকে একটা উল্লুক যে উল্লু-উল্লু করছে—তাও কত আনন্দের!

জীবনে কেন এত উচ্চারিত আনন্দ, কেন এত অব্যক্ত আরাম!

কে একজন এদিকে আসছে। সঙ্গে কটি ছেলে-মেয়ে।

'আরে, দীপংকর যে। কতদিন তোমাকে খুঁজছি। কোথায় আছ আজকাল? এরা কারা?' উঠে দাঁড়াল সুকান্ত।

'মেস ছেড়ে দিয়েছি। বাসা নিয়েছি আলাদা। বাসা মানে একতলার একটা এঁদো ছোট কুঠুরি। পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছি মা-ভাই-বোনদের। আমার চাকরি হয়েছে জানো বোধ হয়।'

'জানি। বরেনদের ওখানে তো?'

'হ্যাঁ, তোমার সেই স্কুলের পুরোনো বন্ধু, স্থায়ী বন্ধু বরেন। কিন্তু ভাই চাকরিটা অস্থায়ী, টেম্পরারী।' শীর্ণ মুখে হতাশার রেখা ফোটাল দীপংকর।

'সমস্ত কিছুই অস্থায়ী।' এই প্রসঙ্গে উচিত ছিল না, তবু কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'এই জীবনটাই স্বল্প মেয়াদের ইজারা। ইজারা শেষ কি বিনা নোটিসে উৎখাত।'

'অত সহজ নয়।' হাসল বটে দীপংকর কিন্তু চোয়ালের হাড় দুটো যেন কঠিন দেখাল।

'আমি বলব বরেনকে।'

'বোকো।' নরম হল চোয়ালের হাড়।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি শ্রীমতী কাকলি, আর ইনি আমার বন্ধু দীপংকর। দীপংকর মানেই ইস্পাতের কথা। যে ইস্পাত শুধু অস্ত্র নয়, যন্ত্রও। তলোয়ার যেমন লাঙলও তেমনি।'

'ঠিক বলেছ। শুধু তলোয়ারই কাটি না, লাঙলও চালাই।' হাসল দীপংকর।

'ইস্পাত ইচ্ছে হলে কঠিন, ইচ্ছে হলে নরম। এই দেখনা, সকলকে নিয়ে একার সঙ্গে বাসা করেছে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে এসেছে চিড়িয়াখানার।'

যাই বলো, পাকাপোক্ত লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না কাকলির।

ঠিকানা দিল দীপংকর। সুকান্তকে বললে একদিন বেড়াতে যেতে। স্বচক্ষে দেখে আসতে মানুষ কীভাবে থাকে, কীভাবে রাস্তাকে বাড়ির শামিল করে নেয়, নিতে হয়, কীভাবে বাড়ির লোক রাস্তার লোক হয়ে যায়।

'যাব একদিন।' চলে যাচ্ছে দীপংকর, হেঁকে বললে সুকান্ত।

'এবার তবে আমরাও উঠি।' কাকলি উদ্যোগ করতে চাইল। 'ওকি, তুমি আবার বসছ যে।'

'বসছি মানে? শুয়ে না পড়ি?'

'কেন, কী হল?'

'ভীষণ মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরেছে তো তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো। বাইরে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাব।'

তবু চঞ্চল হয় না সুকান্ত। বললে, 'সাবিত্রীর সঙ্গে বনে কাঠ কাটতে এসে সত্যবানের এমনি মাথা ধরেছিল—'.

'এমনি?'

'মাথা ধরতেই সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সত্যবান।'

'পড়ুক। কিন্তু এটা বন নয়, আর কেউ এখানে কাঠ কাটতেও আসেনি।'

'কিন্তু যাই বলো', ঘাসের উপর গা

এলিয়ে দেবার ভঙ্গি করল সুকান্ত, 'সাবিত্রী খুব ভালো মেয়ে। অন্তত খুব ভালো উকিল।'

'জানো পাশ করে আমি ল পড়ব, উকিল হব।' মুখে-চোখে দীপ্ত হয়ে উঠল কার্কলি: 'কী সুন্দর দেখতে হয় মেয়ে-উকিলদের! মাথায় খোঁপা, কালো শাড়ির উপরে কালো গাউন, গলায় শাদা ব্যাণ্ড ঝোলানো। যেন কৃষ্ণকলংকসায়রে শ্রীরাধিকা। মাথায় খোঁপা, মুখে চোপা—সে এক দেবতাদের দেখবার মত। দেখো আমি ঠিক উকিল হব।'

'কিন্তু সাবিত্রীর মত হতে পারবে না। সওয়ালজবাবে কেমন ঘায়েল করল যমকে। মরা স্বামীকে ফিরিয়ে আনল।'

'ফিরিয়ে আনল সে সাবিত্রীর ওকালতির জোরে নয়, যম নিতান্ত ভালোমানুষ ছিল বলে।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই। একটার পর একটা বর দিয়ে যাচ্ছে যম। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বললে, আমার একশো পুত্র হোক। যম বললে, তথাস্তু।'

'তথাস্তু। তাতে কী?'

'তখন সাবিত্রী প্যাঁচ কষতে লাগল। বললে, আমার স্বামী ছাড়া আমার শত-পুত্রের পিতা হবে কি করে? সুতরাং আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন। যম হাবা-গোবার মত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে, তথাস্তু।'

'এ ছাড়া আর কী বলতে পারত যম?' উদ্ভ্রান্তের মত মুখ করে তাকাল সুকান্ত।

'যম যদি টেকনিক্যাল হত, বলতে পারত, তুমি শতপুত্র চেয়েছ নাও শতপুত্র। তাতেই পরিতৃপ্ত হও। ঐ বরের সিদ্ধির জন্য সত্যবানকে না হলেও চলবে।'

'যমটা বোকা।'

'অন্তত উকিল হিসেবে অনাড়ি।' খিলখিল করে হাসল কার্কলি। বললে, 'সুতরাং যমকে ডর নেই। আমি কি যমের ডরাই, যে বাঁচাচ্ছে সে ঠিকই বাঁচাচ্ছে।'

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিল দুজনে।

মাঝামাঝি একটা মোড় এসে দুজনে ছাড়াছাড়ি হবে।

তার আগেই প্রায় হয়ে উঠেছিল। পাশ থেকে একটা ছুটন্ত জিপ হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়েছিল ট্যাক্সির উপর। ভাঙা সেকেণ্ডের ডগায় ব্রেকটা সজোরে কষতেই বেঁচে গেল ট্যাক্সি।

নিজের সিটের সীমার মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে সুকান্ত বললে, 'কী কেলেংকারীটাই হত বলো তো য়্যাকসিডেণ্ট হলে।'

অনুরূপ সমতায় কার্কলিকেও প্রত্যাবৃত্ত হতে হল। বললে, 'য়্যাকসিডেণ্টের চেয়েও কেলেংকার।'

'এবার ঠিক আসত স্টাফ রিপোর্টার। খবরের কাগজে ঠিক দুজনের ছবি বেরুত।' সুকান্ত তাকাল কার্কলির দিকে: 'আর আমাদের জন্যে তো যম নয়, যমদূত আসত, তখন তোমার শত তর্কেও কিছু হত না।'

'দুজনে একসঙ্গে সাবাড় হয়ে গেলে কে মিথ্যিমিছি তর্ক তুলত।' এততেও কার্কলি হাসছে। 'জখম হয়ে নিষ্পন্দ পড়ে থাকলেই বিপদ। তখন নর্দানি বলো নগরে ফুরেছে রাই-রাজনন্দিনী—' মাথার চুলটা ঠিক করল কার্কলি।

তারপর, পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, দুজনে সন্ধ্যার শোতে এল এক সিনেমাঘরের দরজায়। একটা বাজে ঘর, আর একটা পচা ছবি।

'এ তোমার মর্যাদাহানি হয়ে যাচ্ছে না?' আশঙ্কাভরা চোখে তাকাল কার্কলি।

'বোধহয় নয়। একটু আশ্চর্যের আলো জ্বলবে হয়তো কোথাও।'

উপরে, ব্যালকনির দুটো টিকিট মিলেছে। শেষ লাইনে কোণের দুটো চেয়ার।

উপরে আর জনমানিষ্যি নেই। ঢালা শূন্যতায় অঢেল অন্ধকার।

'এ কি, আর একটাও লোক নেই?' কার্কলি কলধ্বনিত হয়ে উঠল।

'যারা পাসে দেখে তারাও আজ পাশ কাটিয়েছে। হাউসের ঐ টর্চওলা লোকটা যদি বিরক্ত না করে, শান্তিতেই দেখতে পাব ছবি।'

'অন্ধকার দেখ।'

'অন্ধকার?'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যের আলো।'
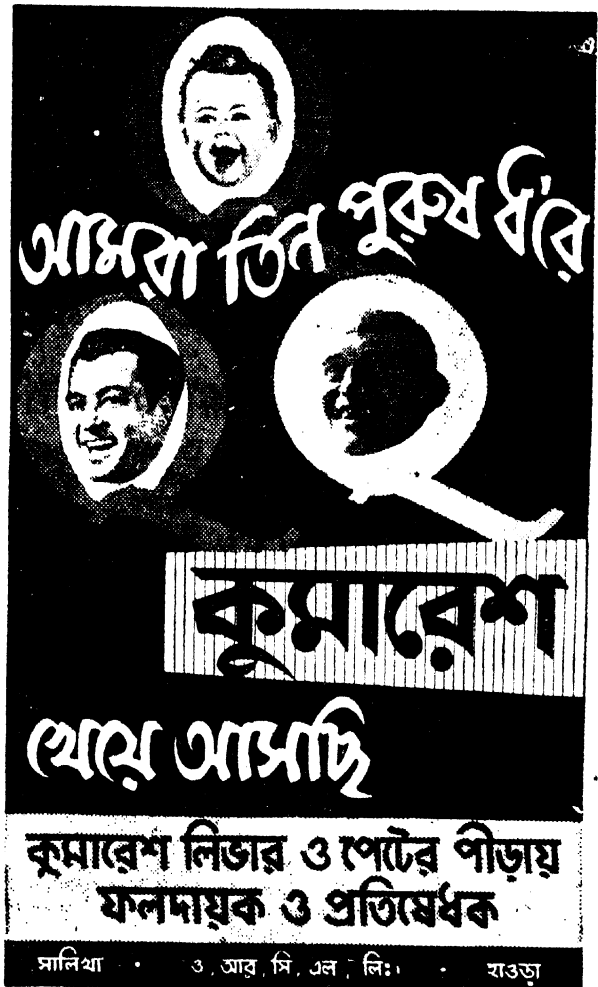
শানানো ক্ষুরের ধারের উপরে বসে আছে পাশাপাশি। যে নড়বে সেই কাটা পড়বে।

কে আগে নড়ে।

কে প্রথম হয়!

(ক্রমশ)

বাঙলার ধাতু শিল্পকর্ম

প্রভাতকুমার দত্ত

নদীবহুল হওয়ার দরুণ বাঙলাদেশে নরমমাটি খুবই সহজলভ্য। একতাল নরম মাটির উপর লোকশিল্পীর লোভ অসীম। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সেই মাটির তাল থেকে রূপসৃষ্টি না করতে পারছে ততক্ষণ তার হৃদয়-মনের শান্তি নেই। অবশ্য মাটি থেকে রূপসৃষ্টি করে তাকে আর নরম রাখলে চলে না। সেইজন্যে বাঙলাদেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন পোড়ামাটির শিল্পবস্তুগুলির কথা বাদ দিয়েও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাঙলার ইঁটের মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের প্রসার ঘটে। এই ভাস্কর্য কাজগুলি বাঙলার শিল্প অধ্যায়ে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাঙলাদেশে মাটি যতটা সহজলভ্য ধাতু ততটা নয়। কিন্তু তাই বলে বাঙলাদেশে ধাতু শিল্পকলার যে কোন বিকাশ হয়নি তা মোটেই নয়। হয়ত বাঙলার ধাতুর তৈরী শিল্পগুলিকে দক্ষিণ ভারতের পৃথিবীবিখ্যাত ব্রোঞ্জমূর্তির সঙ্গে তুলনা করতে পারি না। তা হলেও বাঙলার ধাতু শিল্পকলার নিজস্ব একটা ধারা আছে এবং তার নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যও আছে। তার এই ধারা এবং তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা মোটেই অবজ্ঞা করতে পারি না। কারণ তাহলে আমাদের লোকশিল্পীর শিল্প-প্রতিভাকে ছোট করে দেখা হবে।

ধাতুর তৈরী শিল্পবস্তু নানারকমের হতে পারে- সোনা-রূপা, লোহা, পেতল-কাঁসা বা তামার। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সোনা-রূপার তৈরী জিনিসের কোন আলোচনা করব না। কারণ বাঙলাদেশে যাদের স্বর্ণকার বলা হয় তাদের সংখ্যাও বেশী নয় এবং তাদের কার্যক্ষেত্রও বাঙলার খুবই নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে বাঙলাদেশে পেতল-কাঁসা ও তামার সাহায্যে শিল্পবস্তুগুলি সবচেয়ে বেশীসংখ্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য তামার ব্যবহার গোড়াতে আসে। বাঙলাদেশে বারোমাসে তের পার্বণ আর পূজো-অর্চনায় তামার পাত্র ছাড়া চলে না। দেব-পূজার উপযোগী এই বস্তুগুলিকে ধাতুশিল্পীরা মোটেই অবহেলা করেন নি। বাঙলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বনেদী ঘরে মাঝে মাঝে এমন অনেক তামার বাসনপত্র লক্ষ্য করা যায় যার কারুকার্য এবং গড়ন-সৌষ্ঠব দেখে আমাদের মুগ্ধ হতে হয়। এরপর আসে পেতল-কাঁসা। তামার চেয়ে কাঁসা ইত্যাদি ধাতুগুলি দামে সস্তা। তাছাড়া, তামা দিয়ে শিল্পসম্মত বস্তু সৃষ্টি করার নানা অসুবিধা আছে। পেতল-কাঁসার সাহায্যে যত সহজে ফর্ম সৃষ্টি করা যায় তামার দ্বারা ততটা নয়। তাছাড়া পূজো-অর্চনার জন্যই শুধুমাত্র তামার প্রয়োজন। অথচ পূজো-অর্চনা ছাড়াও আরো কত প্রয়োজনে মানুষের ধাতুদ্রব্যের প্রয়োজন। তাই পেতল-কাঁসার এত চাহিদা। পেতল আর কাঁসার মধ্যে অবশ্য কাঁসার প্রচলন হয় সবশেষে।

বাঙলাদেশে ধাতুদ্রব্য তৈরীর ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতিকে ইংরাজীতে বলা হয় cire per-due পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ব্যবহার বাঙলাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে কোন কিছু করতে গেলে প্রথমে মাটি দিয়ে শক্ত করে একটা ছাঁচ করা হয়। পরে এই ছাঁচের উপর মোটা করে মোম লাগিয়ে দেওয়া হয়। মোম লাগাবার পর সবশেষে সমগ্র জিনিসটাকে আবার মাটির আস্তরণে আবৃত করা হয় এবং এই সঙ্গে উপর-নীচে থাকে দুটি ফুটো। এই ফুটো দিয়ে গলিত ধাতু ঢেলে

হস্তী মূর্তি

ময়ূর (তেলের কুপি)

দেওয়া হয় ধাতুর সংস্পর্শে আসার পর মোমগুলি গলে তলার ফুটো দিয়ে পড়ে যায়। আর ঐ শূন্যস্থানে ধাতু জমে যায়। এখন উপরকার আস্তরণ এবং ভেতরকার মূল ছাঁচ খসিয়ে নিলে ধাতুর মূল জিনিসটি পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে অনেক পেতল-কাঁসার শিল্পবস্তু এইভাবে নির্মিত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হোল Hammering পদ্ধতি। এখানে ছাঁচ ব্যবহারের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই পদ্ধতিতে ধাতুর পাত প্রয়োজন মত কেটে নিয়ে তাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন বস্তুর আকারে পরিণত করা হয়। বর্তমানে বাঙলাদেশে ধাতুশিল্পকলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতির প্রচলন বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সাধারণত ধানের কুনকে, ঘণ্টা এবং অদ্ভুত ধরনের ছোট ছোট মূর্তি ইত্যাদি তৈরী করা হয়ে থাকে। বাকি জিনিস দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে নির্মিত হয়। অদ্ভুত ধরনের ছোট ছোট মূর্তি সম্পর্কে এখানে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাঙলা-বিহার সীমান্তে যে সমস্ত আদিবাসী বাস করে তারা বিচিত্র এক প্রাচীন উপায়ে ধাতুর ছোট ছোট মূর্তি বানায়। এগুলি আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত ম্যাজিকের প্রতি বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর নির্ভর করেই তৈরী করা হয়। আদিবাসীদের কাজ হিসাবে এগুলির সামগ্রিক গড়ন-সৌষ্ঠব এবং অলঙ্করণ খুবই উঁচুদরের। এগুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ধাতুমূর্তি প্রচলনের আগেকার বাঁশ ও বেতের তৈরী মূর্তির সম্পর্ক আছে। কাঠ ও বাঁশের স্থাপত্য যেমন পরবর্তিকালে পাথর ও ইঁটের স্থাপত্যে পরিণত হয়েছে, এও ঠিক তাই। বাঙলার ধাতুশিল্পকলার আলোচনায় এই আদিবাসী অবদানকে মোটেই বিস্মৃত হতে পারি না।

প্রদীপদান

জীবনের নানা জটিলতা বাড়ার দরুণ আজকালকার মানুষের কাছে শুধু প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাদামাটা ধাতুপাত্র হলেই হলো তাতে নাই বা থাকলো কারুকার্য। আগেকার দিনে কারুকার্য করা ধাতুদ্রব্যগুলি ছিল ওজনে ভারী। কিন্তু বর্তমানে মানুষও যেমন হাল্কা হয়ে পড়েছে তেমনি তার তৈজসপত্রাদি। তাছাড়া কাঁচের আর প্লাস্টিকের পাত্র প্রবর্তিত হওয়ায় কাঁসা-পেতলের কদর কমেছে। অথচ আগেকার দিনে মানুষ প্রত্যেকটি দৈনন্দিন ব্যবহারের ধাতুদ্রব্যকে কোন না কোনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করত। আর সেগুলির ব্যবহার হতো সাধারণ গরীব গেরস্ত ঘরেই। আজকাল বড়করা মাটির ভাঁড়ে পয়সা জমাবার রীতি আছে। কিন্তু সেকালে হুবহু মৎস্যের আকারে পেটি তৈরী করা হোত যার উপরে একটা গর্ত দিয়ে পয়সা ভেতরে রাখা যায়। প্রয়োজন আর শিল্পরুচির কি অপূর্ব সমন্বয়। ধাতুনির্মিত এই মাছগুলি এত চমৎকারভাবে তৈরী যে, শুধু জিনিসটিকে কোথাও বসিয়ে রাখলে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয়। তারপর ধরুন তেলের কুপি —অতি সাধারণ একটি জিনিস। কিন্তু তাকেও এমন রুচিপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আসলে তেলের কুপিই হোক আর পয়সা রাখার পেটিই হোক, এগুলি সবই উপলক্ষ্য মাত্র। শিল্পীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রূপসৃষ্টি। এরপর ধরুন পানের ডাবর বা সামান্য জাঁতি। সমগ্র জাঁতিটাই হয়ত একটা পাখির আকারে নির্মিত। জিনিসটি মোড়া অবস্থায় পড়ে থাকলে দূর থেকে জাঁতি বলে মনেই হয় না। পানের ডাবরের গায়েই না কি অলঙ্করণের প্রাচুর্য। অবস্থার চাপে নিষ্পেষিত হয়ে এখনকার মানুষের মন থেকে জিনিসটাই লোপ পাচ্ছে। আমাদের চারপাশে রুচির কোন ছাপই আমরা রাখতে পারছি না। অথচ সেকালে মানুষ ছোটখাট জিনিসের উপরও কত না নজর দিত। কারণ তারা জানতো, দৈনন্দিনতার মধ্যেও মনের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা যায়। ধানের কুনকের কথাই বিচার করুন না কেন। এর চেয়ে নিছক প্রয়োজনের জিনিস আর কিছু হয় না। তবু তার গায়ে ধাতুর উপর কি সুন্দর নক্সা করা থাকত। এখনকার দিনে শিল্প মানুষের জীবন থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যে, তাকে আমরা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখতে শিখেছি। অতীতে কিন্তু শিল্প আর প্রয়োজনে বিশেষ ভেদাভেদ ছিল না। এ জিনিসটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না বলেই

আগেকার দিনের প্রয়োজনের জিনিসগুলি এভাবে শিল্পমণ্ডিত দেখে অবাক হই।

এবারে আমাদের ধাতুশিল্পদ্রব্যের নকশা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। অনেক ধাতুদ্রব্যে আমরা আলপনার নকশা লক্ষ্য করি। আলপনা জিনিসটা আমাদের দেশে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বাঙালীর বহুকালের পুরনো ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কারের প্রকাশ আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই। প্রাচীনত্বের দরুণ আলপনার বহু নকশা এখন বিশেষ এক সাংস্কৃতিক মূল্য অর্জন করেছে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এর প্রভাব বাঙলার ধাতুশিল্পকলার উপর পড়বে। অনেক ধাতুদ্রব্যে ফুল লতাপাতার জগৎ থেকে 'ফর্ম' গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কাজললতা কৌটা সমেত ফলের আকারে নির্মিত। ছুরি বা কাঁচির আকার পাতা বা বড় বীজ থেকে গৃহীত। আমাদের দেশে বলিদানের জন্য যে বিচিত্ররূপী খাঁড়া ব্যবহার করা হয় তা দীর্ঘ 'অপরাজিতা' ফলের বীজের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। সোনা-রুপোর গহনার নক্সা প্রধানত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন সাপ, প্রজাপতি, ময়ূর, পাখি, শাঁখ, মাছ, লতা, ধানের শীষ প্রভৃতির নকশা আমাদের অলংকারগুলিতে রূপায়িত হয়েছে। চাঁদমালা আমাদের একটি অতি জনপ্রিয় নকশা। ঘন কৃষ্ণ-বর্ণের আকাশে উদ্ভাসিত চন্দ্র ও তারা সমষ্টির ভাবরূপকেই চাঁদমালায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত ধাতুর তৈজসপত্রাদি লক্ষ্য করা যায় সেগুলিতে কোন অলংকরণ না থাকলেও তাদের আকার কোন না কোনভাবে প্রাকৃতিক জগত থেকে নেওয়া। আসলে মানুষের চারপাশে যে সমস্ত দ্রব্য রয়েছে তাদের কোনটারই ফর্ম একেবারে মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কে এসেছে এবং তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে দেওয়া নেওয়ার কাজ। প্রকৃতিতে রূপের অবধি নেই। এটিই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময়। আর এই বিস্ময়ের বিমুগ্ধতা থেকেই প্রাকৃতিক 'ফর্ম' বস্তুজগতে পরিস্ফুট হয়েছে।
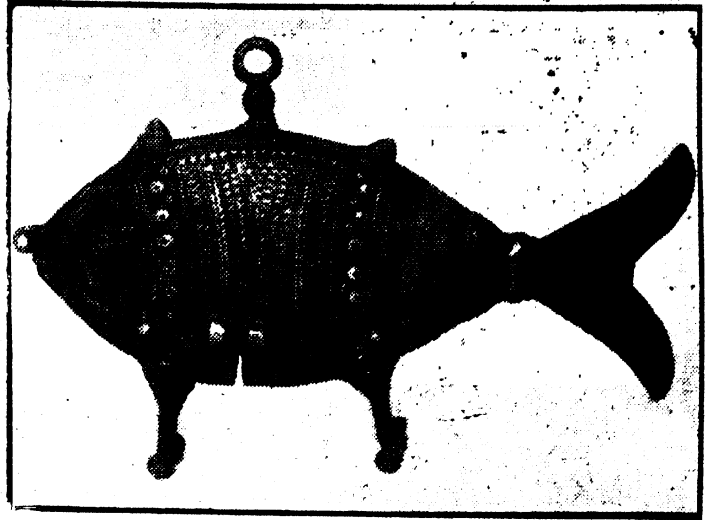
মাছ (পয়সা রাখার পেটি)

বাংলাদেশে সোনা-রুপো, লোহা এবং পেতল-কাঁসার শিল্পদ্রব্যগুলি নির্মাণের পৃথক পৃথক কেন্দ্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাংলাদেশে স্বর্ণকারদের কেন্দ্র হচ্ছে কলকাতা, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ। কর্মকার অর্থাৎ যারা লোহার কাজ করে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, যশোর এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে। আর কাংসকারদের প্রধান কর্মস্থল হচ্ছে তমলুক, খাগড়া, বিষ্ণুপুর, নবদ্বীপ এবং মেটিয়ারী। বাংলাদেশে তিন ধরনের ধাতুদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র পেতল-কাঁসা শিল্পেই পুরুষ ও মহিলা সংযুক্তভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষেরাই অংশ গ্রহণ করে।

চিজব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক (সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

একত্রিশ

দশমিক প্রথা দেশে যে-ভাবে চালু করা হচ্ছে, তার সংগে তাল রেখে চলতে গেলে আমারও উচিত, দেশের ও দশের কথা স্মরণ রাখা। সবুজপত্রের ডাক যখন তিরিশবার দিয়েছি, আর সাড়ে চুয়াত্তরের দিব্যি আমায় কেউ দেয়নি তখন পঁচাত্তর নম্বর থেকে স্টার্ট দিতে কোনো বাধা নেই, এবং এবারের ডাকে প্রমথ চৌধুরীর দশখানি চিঠি ছাপানো সমীচীন। এই দশের ঘর পূর্ণ করছি আমায় লেখা আটখানি চিঠির সংগে সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা দু'খানি চিঠি যোগ দিয়ে, সময়ের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রেখে। এই সুযোগে আমার একটা ভুল শুধরে নিই। সুধীন্দ্র ১৯১৮ সালে M. Sc. পাশ করেন—১৯১৭ সালে নয়।

৭৫

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২১।৬।১৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রবন্ধ ছাপতে দিয়েছি, অবশ্য একটু কাটছাঁট করে। প্রুফটা কাল আনিয়ে রাখব—তুমি বিকেলে এলে সেটি দেখতে পাবে। প্রথম প্রুফটা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি আর সেটি তুমি সুকুমারদের ক্লাবে পড়তে পারো।

"পত্র" লেখা সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ ত তুমি আমার হাতে দেওনি? তোমার লেখার মধ্যে শুধু একটা গল্প আমার হাতে আছে, আর কোনও লেখা নেই।

কাল বিকেলে এসো—মুখে কথা হবে।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

৫

(সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা)

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৭।৭।১৮

কল্যাণীয়েষু,

জানি এই M. Sc. পরীক্ষার মুখে তোমাকে বালিগঞ্জ এসে আড্ডা দিতে বলা বৃথা, বিশেষত এই ঘোর বর্ষার দিনে। তবুও জানিয়ে রাখছি যে, আসছে শনিবারে আমার এখানে জনৈক সন্ন্যাসী গান গাইতে আসবেন, যদি গান যথার্থই শোনবার মত জিনিস। গাইয়ের যা থাকা উচিত—সুকণ্ঠ ও সুশিক্ষা, দুই-ই তাঁর যথেষ্ট আছে।—সেদিন বিকেলে তুমি এখানে উপস্থিত থাকলে আমি যে খুশী হব সেকথা বলা বাহুল্য। আমার বিশ্বাস, তুমিও খুশী হবে। এগজামিন যখন সুমুখে তখন মাঝে মাঝে দু' একদিন পড়া ছেড়ে আড্ডা দিলে পাশের যে ব্যাঘাত ঘটে না সে বিষয়ে আমি সাক্ষী দিতে পারি। পরীক্ষার দিন মনকে হালকা রাখতে চাও তবে আগে তাকে ছুটি দিতে হয়।—এ Paradox নয়—পরীক্ষিত সত্য। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৬

[সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা]

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৬।৯।১৮
শুক্রবার

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি ঠিক সময়েই পেয়েছি। অর্থাৎ ও-চিঠি না পেলে আজ বিকেলে আমাকে বৃথায় বাগবাজার পর্যন্ত যেতে হত। দুঃখের বিষয় শুধু এইটুকু যে সত্যেন্দ্র আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে—অথচ আমার সাক্ষাৎ পাবে না।

পরীক্ষারূপে পাপ থেকে অতঃপর তুমি যে মুক্তিলাভ করেছ এটা অবশ্য শুধু তোমার পক্ষে নয়—তোমার বন্ধুবান্ধবদের পক্ষেও সুখবর।—বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করেছি কি করিনি, তার পরীক্ষা ত জীবনে দিতে হবে—মঞ্চ থেকে মাস্টার মহাশয়দের কাছে দেবার যে কি সার্থকতা তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারলুম না। বিশ্বটা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বড়—এই সোজা কথাটা ভুলে গিয়েই মানুষে শিক্ষা জিনিসটাকে একটা উপদ্রবের সামিল করে তুলেছে।—তবে এসব কথা বলে কোনও ফল নেই। যাক্ ওসব কথা।—কাল বিকেলে যদি আমার এখানে এসো ত খুসি হই।

আমার সঙ্গে দেখা করতে তোমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তোমাদের ওখানে উপস্থিত হলে আমি যে কথা উত্থাপন করতুম—আমার এখানে তুমি উপস্থিত হলে সে কথার নামগন্ধও উঠবে না। কাল বিকেলে আমার একটি বন্ধু সেতার বাজাবেন, সে সেতার শোনবার মত জিনিষ। —এই সঙ্গে হারিতকেও চিঠি লিখে দিচ্ছি —পারো ত দুজনে একসঙ্গেই এসো। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৭৬

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৪।১১।১৮

কল্যাণীয়েষু,

কাল রাঁচি ছাড়বার মিনিট পাঁচেক আগে তোমার চিঠি পেলুম এবং ট্রেনে উঠে তা পড়লুম। উপরের ঠিকানা থেকে দেখতে পাচ্ছ যে অতঃপর বালিগঞ্জে এসে পৌঁচেছি।

এবার পুজোর ছুটিটে যে আমি অজ্ঞাতবাসে কাটিয়েছি, ঠিক তা নয়। তবে এ বছর পুরোপুরিই ছুটি নিয়েছিলুম। অর্থাৎ কালিকলমের সম্পর্ক বড় বেশি রাখিনি। প্রবন্ধ লেখা ত দূরে থাক চিঠি পর্যন্ত কাউকে লিখিনি। কেউ চিঠি লিখলে তার জবাব অবশ্য দিয়েছি, তার বেশি আর কিছু করিনি।

আসছে শনিবার বিকেলে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে করে এপাড়ায় যদি একবার দেখা দেও ত সুখী হই। ভাল কথা সুধীন্দ্র কোন্ ডিভিসনে পাশ করলে, সে খবর ত সে আমাকে দিলে না।

সুধীন্দ্রের সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা হয়, সেদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, বাংলা ভাষার উপর একটু পাকা রকমের দখল লাভ করতে হলে, কি কি বই পড়া দরকার? ঐ একই প্রশ্ন আরও দু-একজন লোক আমাকে করে। এই প্রশ্নের জবাবে আমি একটি লম্বা প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি। এবারে নবাবী আমলের বাংলা সাহিত্যের কতকটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। পরে বৃটিশ যুগে আসা যাবে। মুসলমান যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আমার মত আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলবে। লাঠা-লাঠি বাধবে অবশ্য আধুনিক সাহিত্য নিয়ে।

শনিবারে এখানে এলে একটা নতুন জিনিষ দেখতে পাবে। দেখবে যে সবে আমার গোঁফ উঠছে। যদি জিজ্ঞেস করো যে গোঁফ ফেললুমও বা কেন, আর তুলছিই বা কেন? তা হলে তার উত্তর পরে দিচ্ছি।

লোকে বলে আমার গুম্ফ পরিত্যাগের কারণ—বাছুরের দলে মিশলে শিঙ ভাঙতে হয়—আমি বলি তা নয়—ও কতুটা

আমার যৌবনের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছিল, তাই ওটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলুম, আমার ঠোঁটে ওরূপ মিথ্যাবাদ শোভা পায় না। হোকনা সেটা white lie.

আবার যে রাখছি তার কারণ—গোঁফ ত্যাগ করাতেও আমার চেহারায় বৈষ্ণবীভাব কিছুতেই এলো না। প্রকৃতিতে আমি যেমন শাক্ত, আকৃতিতেও তেমনি শাক্তই থেকে গেলুম। বিগুম্ফ এবং সগুম্ফ এই দুটো অবস্থার মধ্যে transitional periodটা বিশেষ সুদৃশ্য নয়, কিন্তু তা বলে ত আর পর্দানশীন হওয়া যায় না। সুতরাং ভদ্র-সমাজে এমুখ দেখাতেই হবে, হোক না তা হাস্যরসাত্মক। পাছে আমাকে চিনতে না পারো, এই কারণেই এ খবরটা দিয়ে রাখলুম। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৭৭

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২২।১২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

হাফ্ আখড়াই দেখতে ও শুনতে আসতে পারো। দাদাকে যদি দেখতে চাও ত যে কোনদিন রোজ সকালে ৮—৯ টার মধ্যে গেলেই তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। রবিবার ছেড়ে দেখে-হয় যাওয়া ভালো।

কাল বিকেলে পারো ত সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এলে খুসি হব। তবে তোমরা আমাকে দেখে খুসি হবে কিনা সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। গোঁফ কামিয়ে আমার মুখটা ট্র্যাজিক হয়েছিল, এখন তা কমিক হয়ে উঠেছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৭৮

১নং ব্রাইট ষ্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৬।১২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলুম। সবুজসভা বসছে না বলে অবশ্য দুঃখিত আছি—তবে যে কারণে বসছে না সেই কারণেই বিশেষ দুঃখিত। এ দলের দু-চারজন বিছানায় পড়ে—যথা—সত্যেন্দ্র, ধূর্জটি ইত্যাদি, বাদবাকী অনেকেই বাড়ির অসুখ বিসুখ নিয়েই বিব্রত, যথা—কিরণ, অতুলবাবু প্রভৃতি। এবছরটা দেখছি এই ব্যারামের গোলমালে কেটে গেল। যুদ্ধ চুকল বটে কিন্তু যুদ্ধের পাপের শাস্তি আরও অনেক-দিন আমাদের ভুগতে হবে। লোকে বলছে যে এই যুদ্ধের ফলে নতুন সভ্যতা জন্মাবে—সম্ভবত সেই জন্যই পুরোনো সমাজের আগে মরা দরকার। সুতরাং নূতন সভ্যতার পথ পরিষ্কার করবার জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা এ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। সে যাই হোক যুদ্ধও বন্ধ হল আর সঙ্গে সঙ্গে সবুজ সভাও বন্ধ হল, এর মানেটা কি বলো দেখি। সবুজপত্রের ভিতর কি কিছু লড়াকে ভাব ছিল?

বাংলা ভাষাকে তোমার অনাথকাকা বলে-ছিলেন—আমার ভাষা—আমি উত্তরে বলি তোমাদের ভাষা। বাংলা ভাষাটা যে আমার একার সম্পত্তি এ অপবাদ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনে। তারপর একথাও সম্পূর্ণ সত্য যে বাংলা ভাষাকে বাংলা সাহিত্যে প্রথমে তোমরাই প্রমোশন দাও—আমি একেবারে সেটিকে ডবল প্রমোশন দিতে চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস এবিষয়ে আমি কতকটা কৃতকার্যও হয়েছি। চলতি ভাষার আদর যে দিন দিন বাড়ছে সে বিষয়ে আর চোখবুজে থাকা চলে না। চলতি ভাষার পক্ষে যোদ্ধার দল নিত্য বেড়ে যাচ্ছে—তা ছাড়া এদল চারদিকে তাদের অধিকার বিস্তার করছে। মাসিকপত্র মাত্রেই এখন বাংলা ভাষাকে তাদের বক্ষে স্থান দিতে বাধ্য হচ্ছে। আর একথাও অস্বীকার করবার যো নেই যে নতুন লেখকদের মধ্যে যারা ভাল লেখক তারা এই ভাষাতেই লিখছে। সুনীতির সাধুভাষার উপর আক্রমণটা সকলেই বলছে জবর হয়েছে। সুনীতি যা সুরু করেছে তার ইংরাজি নাম হচ্ছে Scientific warfare.

"বাংলা কি পড়ব" প্রবন্ধটা তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুসি হলুম। সুধীন্দ্রের জন্যই আসলে এ প্রবন্ধটি লেখা। আশা করি এটি তার কাজে লাগবে। ভাল কথা, আমার "রামশ্যামের" বিষয় কিছু লেখনি কেন? ঐ গল্পটা নিয়ে আমার পরিচিত রাজনীতির দলে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। অপরপক্ষে সাহিত্যের দল রামশ্যামের খুব তারিফ করছেন। আমি এই গল্প সম্বন্ধে রবিবাবু মহাশয়ের কাছ থেকে এমন এক-খানি সার্টিফিকেট পেয়েছি—যা পেলে যে কোনও লেখক হাতে চাঁদ পেয়েছি মনে করতে পারেন।

এত শীতে বালিগঞ্জ আসা তেমন কষ্টকর ব্যাপার না হলেও, বালিগঞ্জ থেকে ফেরা অবশ্য একটু মুস্কিলের কথা। সুতরাং শীতভীত লোকদের এ অবস্থায় এখানে আসতে বলতে সাহস হয় না। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আসছে রবিবার বিকেলে যদি এপাড়ায় এসে চা-পান করো ত খুসি হই। একটু বেলা থাকতে এলে সকাল সকালই ফিরতে পারো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
(১৪।৩।১৯)
শুক্রবার

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন তোমাদের সাক্ষাৎ পাইনি। কাল বিকেলে স-সুধীন্দ্র যদি এ-পাড়ায় এসো ত খুসি হই। সুধীন্দ্রকে স্বতন্ত্র পত্র লিখছি। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৮১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৪।৪।১৯

কল্যাণীয়েষু,

কাল সন্ধ্যায় জনৈক উদীয়মান সাহিত্যিক আমাদের আসরে চিত্রাঙ্গদার উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন। আশা করি তুমি এ-বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করে আগন্তুক সমালোচকের উৎসাহ বর্দ্ধন করবে। সুধীন্দ্রকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৮২

বালিগঞ্জ
৮।৫।১৯

কল্যাণীয়েষু,

কাল সন্ধ্যায় গোধূলিলগ্নে, আমার ডাক্তার ভাইয়ের বড় মেয়ের বিবাহ হবে। তুমি যদি বিবাহসভায় উপস্থিত থাকো ত আমরা সকলেই বিশেষ খুসি হই। স্থান—দাদার বাড়ি, সময়—সাড়ে ছটা। ছটার ভিতর আমার এখানে এলে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৮৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৬।৫।১৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে আমি চিঠি লিখতে যাচ্ছি এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। আমি কুচবিহার যাইনি। কেননা কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ সেখানে এখন এত বেশি যে সাহিত্যসভা তার "দরজা বন্ধ" করতে বাধ্য হয়েছে। মহামারীর সময় লোকে সরস্বতীর পূজো করে না, করে রক্ষাকালীর। একথা বীরবল বহুকাল পূর্বে বলে রেখেছেন।

সেদিন আমাদের বাড়ির বিয়ে যে দেখতে পাওনি, তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতিগ্রস্ত হওনি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিয়ে হিন্দু

বিয়েরই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নূতনত্বের মধ্যে আছে এই যে বৈদিক মন্ত্রগুলিকে প্রথমে সংস্কৃতে আবৃত্তি করে তারপরে সেগুলিকে ভাষায় অনুবাদ করে বলা হয়। আশা করি তাতে মন্ত্রশক্তি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। লোকের বিশ্বাস অবশ্য অন্যরূপ। লৌকিক মতে যার ভিতর অর্থ আছে তা ধর্ম হতে পারে না—আর বিবাহটা হচ্ছে এদেশের একটা ধর্মকার্য, সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। দেশের লোকের ইংরাজী পড়েও যে ধর্মবুদ্ধি একতিলও নষ্ট হয় নি তার প্রমাণ গত বৈশাখ মাসে দেদার পাওয়া গেছে। পয়লা থেকে সুরু করে ২৯শে পর্যন্ত লোকে নাগাড় বিয়ে করেছে। এর ফলে আর কিছু হোক আর না হোক দেশের যে প্রজাবৃদ্ধি হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আর ভারতবর্ষে যে রকম মড়কের ধুম পড়ে গিয়েছে তাতে করে প্রজাবৃদ্ধি করবার আবশ্যকতাটা ঢের বেড়ে গিয়েছে। দেশসুদ্ধ ছেলেবুড়ো যখন তাদের কর্তব্য পালন করছে তখন যুবক তুমিই বা কেন আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? এই দেখনা কেন আমাদের সবুজসভার সভ্যেরা সব একে একে সমাজের কাছে দাসখত লিখে দিচ্ছে। এখন বাকী আছে শুধু তুমি, কেননা ধূর্জটির বোধহয় ইতি-মধ্যে Contract পাকা হয়ে গিয়েছে—এই মাসেই তার Specific performance হবে। ধূর্জটি বেচারা মধ্যে বড় মুস্কিলে পড়েছিল। দুটি মেয়ে তার কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল—একটি রূপে লক্ষ্মী আর একটি গুণে সরস্বতী। যেহেতু বহুবিবাহ সেকেলের শাস্ত্র-সঙ্গত হলেও একেলে আচার-সঙ্গত নয়—সে কারণ তাকে যথার্থই উভয়সংকটে পড়তে হয়েছিল। শেষটা সে সরস্বতীকেই স্বয়ম্বরণ করতে স্বীকৃত হয়েছে। পয়লা নম্বরের সুন্দরীর বিদ্যে দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত এগিয়েছে আর দোসরা নম্বরের সুন্দরীর বিদ্যে Royal reader প্রথম ভাগ পর্যন্ত এগিয়েছে। কাজেই বেচারা ধূর্জটিকে ঐ দোসরা নম্বরের স্বপক্ষেই রায় দিতে হল। দেখতে পাচ্ছ দেশে স্ত্রীশিক্ষার আদর ও কদর কি রকম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ভাল কথা, ধূর্জটি এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিল এবং তার মনস্থির করবার পক্ষে আমরাও কতকটা সাহায্য করেছি। যিনি রূপে লক্ষ্মী তাঁর ঘরে সরস্বতীও নেই লক্ষ্মীও নেই সুতরাং তার সঙ্গে বিবাহ হয় Love নয় Eugenics ছাড়া অপর কোনও কারণে সমর্থন করা যায় না। আর জানইত Loveএর যথার্থ স্থান হচ্ছে কাব্যে আর Eugenicsএর বিজ্ঞানে—অর্থাৎ জীবনে নয় পুঁথিতে। এ বিষয়ে আলোচনা এইখানেই থামিয়ে দেওয়া যাক নইলে কত যে বাজে বকব তার আর ঠিক ঠিকানা নেই।

কিরণ এখন তেওতায় এবং তাঁর নিমন্ত্রণ এখনও তামাদি হতে দেরি আছে। সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার দিনস্থির আমাদের করতে হবে। কাল বিকেলে এখানে এসো—পরামর্শ করে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে। তবে তোমাকে অতিথি করতে কিরণ ঈষৎ ভয় পায়। তার ধারণা, স্বপাক পরিপাক হতে পারে, কিন্তু সুপাক হয় না। তার রন্ধন সম্বন্ধে Style-এর জ্ঞান কিরণের যথেষ্ট আছে। অতুলবাবু বলেন সে তার শালক খানারদের একজন যথার্থ রসিক। সে যাই হোক, কাল বিকেলে যদি ঝড় জল না হয় তাহলে নিশ্চয়ই এসো। তোমার লেখাটার কি গতি হবে কালকে তোমাকে জানাব।

সবুজপত্র এখনও আকাশপত্র হয়ে রয়েছে অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর মত সেটি আজও মাঝ আকাশে ঝুলছে, ভূমিষ্ঠ কবে যে হবে তা বলতে পারিনে।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৮১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৩।৬।১৯

কল্যাণীয়েষু,

পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আমার এখানে একটি ছোকরা আমাদের তার স্বরচিত কীর্তন শোনাতে আসবে অবশ্য সুর সংযোগে। তুমি নিশ্চয়ই এসো। সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসো, কাল আপিসে তাকে মুখে বলব। খুব সম্ভবত রবিবাবু মহাশয় সভায় উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ করে বৃহস্পতিবার স্থির করবার কারণ শুক্রবার রাত্তিরে তেওতা রওনা হব এইরূপ অভিপ্রায় আছে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

(ক্রমশ)

বিয়ের আগে অমিতা বলত, 'কই লিখলে না? এতো গল্প শেষ আর এটার বেলাতেই—. বেশ, বেশ. একটা স্মৃতি-চিহ্ন রাখা এই আর কি! তা তুমি যখন চাও না তখন—'

সুধাময় মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলত, 'আমি তোমাকে ভালবাসি। এটা কি পাঁচ-কান করার জিনিস? তাই তো আমি—'

অমিতে অবাধ্য ছাত্রীকে অনেকবার সাতার লেড়ে বেণী দুটোকে অযথা চঞ্চল করে দিয়ে আরক্ত ঠোঁট দুটি কামড়ে অস্থির ভাবে বলতো, 'বুঝেছি বুঝেছি। কোন কিছুই আর রাখতে চাও না। কোন স্মৃতিচিহ্ন। আমাকেও বাদ দিতে চাও। তা সেটা আর ঘুরিয়ে না বলে—'

সেকথা শুনে সুধাময় উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠতো, বলত, 'বাপ রে!, এখন থেকেই এই! না, না। লিখবো বইকি। তবে এখন নয়। সে লেখার সময় এখনো আসেনি।'

অমিতা অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে ওর রাগ পড়ে যেত। ও বলত, 'লেখার ব্যাপার আমি কি বুঝি? তবে লিখো কিন্তু যেদিন হোক। লেখা চাই।'

বেশ কিছুদিন গেল। সুধাময় তখনো কিন্তু লেখেনি।

অমিতা বলার না বলার না করেও বলে ফেলল, 'কই, আরম্ভ করলে না? বললে, দিনকতক যাক। গেল তো অনেক-দিন।'

তারপর হঠাৎ সুধাময়ের কৌতুক কলহাস্যে চোখ দুটি দেখে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে অমিতা আস্তে আস্তে বলত, 'অবশ্য লেখার আমি কি বুঝি?'

লেখাটা যে দরকার তা সুধাময় স্বীকার করত। একদিন অনিবার্যভাবে ভালবাসা উবে যাবে। সমান এগিয়ে আসবে সংসার নামক একটি অজগর। সে এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে। সমস্ত রস নিঙড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেবে রাতারাতি। সুতরাং লিখে রাখা দরকার। জীবন যাকে জায়গা দেবে না শিল্প তাকে জায়গা দিক।

কিন্তু তবু সময় যাক। গল্পটি ভালো করে লিখতে গেলে আবেগ একটু নাবুক। এখনো যে ছাপাছাপি জল।

বিয়ের পর অমিতা আর লিখতে বলত না। কিন্তু কি লিখবে তা মনে করিয়ে দিত। কেননা, যা ভুলো মন সুধাময়ের।

কোথায় কোন মেলায় কে এক হরবোলা আড়বাঁশীতে কি সুর ধরেছিলো অনেকদিন হয়ে গেলেও তা আজো অবিকল মনে আছে সুধাময়ের। কিন্তু আজ এইমাত্র কি কি পদ দিয়ে ভাত খেল ঠিক ঠিক বলুক দেখি সুধাময় একটাও এদিক-ওদিক না করে?

অমিতা তাই বলত, লিখো তুমি যেদিন ইচ্ছে। কিন্তু কয়েকটা কথা তোমায় মনে করিয়ে দি। সেই যে সেই—, সেই তুমি—'

সুধাময় বেশ মজা পেত। মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলত, 'সেই যে সেই তুমি—কি?'

অমিতা পড়ে যেত ভীষণ লজ্জায়। তারপর আনতো কৃত্রিম রাগ। 'আহা সব জেনে-শুনে ইয়ে সাজা হচ্ছে! ঢং! বুঝি না যেন, আমাকে দিয়ে সব বলাতে চাইছো? বেশ, বেশ। বলছি। ভাবছো, বলতে পারবে না? ইস- তাই বুঝি!'

দারুণ কৌতুকে চোখ দুটি নাচিয়ে সুধাময় মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলত—'তাই তো! বলতে তো পারলেই না। কই, বলো না দেখি?'

তারপর অবশ্য রেগে মেগে সবটাই বলে ফেলতো অমিতা।

প্রথম প্রথম কথা বলতে গিয়ে লজ্জায়

কেমন গলা জড়িয়ে যেতো সুধাময়ের। কী ভীষণ থতমত খেত। অমিতা কত কষ্ট করে, কত লজ্জায় চোখের পাতা দুটি তুলতো। কত ভয়। কত উত্তেজনা। তারপর সেই বই। সোনাদানা নয়। মানিক নয়। তবু সোনা। তবু মানিক। চিঠি। একটা অবিস্মরণীয় চিঠি। প্রথমটায় মন ঘেন্নায় এতটুকু হয়ে গেল। তারপর কিন্তু কোথা থেকে উড়ে এসে ঐ চিঠি জুড়ে বসলো লক্ষ্মীছাড়া একটা প্রজাপতি। আর সমস্ত মনটা কিসের একটা আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠলো। বুকে চেপে ধরলো অমিতা চিঠিটা। ওর চোখ দিয়ে টপ টপ্ করে জল পড়লো। তা যতখানি বেদনার, ততখানি আনন্দের।

বলতে বলতে আবেগে গলাটা বুজে আসত অমিতার। চোখ দুটি ছল ছল করে উঠত। আর ভেতরে ভেতরে কেমন করে কৌতুক থেকে কান্নায় চলে যেত যেন সুধাময়।

তবে কি, তবে কি, না, না। না। তা হতেই পারে না। অত সুন্দরী আর অত গুণের মেয়ে—তাই কখনো হয়? কিন্তু হবে না-ই বা কেন? অমিতও কি একেবারে যা তা! কিন্তু—সে যাই হোক গল্পটি কিন্তু তখনো লেখা হল না। তার আর অমিতার গল্প। সময় নাকি তখনো আসেনি। হায়রে সময়!

তাই বলে সুধাময়ের কলম কিন্তু থেমে নেই।

নিজের গল্প লেখা হচ্ছে না বটে কিন্তু কত অসংখ্য মানুষের কত বিচিত্র গল্পে বইএর পাতাগুলো ভরে উঠছে।

তবু এক একদিন বুকের ভেতরটা টন-টন করে উঠতো সুধাময়ের। সেই যে সেই মেয়েটি—জানলায় এসে দাঁড়ালো যখন সেই প্রথম কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলল যেদিন—সেই রক্ত তোলপাড় দ্রুত নিশ্বাস ওঠানামা, তারপর সেই পাখিটা দাঁড়ে এসে বসলো। আহা যৌবনের, রাঙা যৌবনের হীরেমন পাখিরে!

সুধাময়ের নাম হয়েছে বাজারে। বাজারই বটে। বুকের রক্ত দিয়ে লেখা বই পোকায় কাটে। আর লজেন্সের গায়ে চিনির সোহাগ মেশানো গল্প হু হু করে বিক্রী হয়ে যায়। আক্ষেপ করে লাভ নেই। এই অবস্থা সব দেশেরই। সিনেমাতেও দু' একখানা বই উঠেছে সুধাময়ের।

ইতিমধ্যে অমিতার দাঁতগুলোয় আতা ফলের বীচির মতই কালো ছোপ ধরেছে। চোখ দুটি আর চোখ টানে না। ঠোঁট দুটিও টানে না ঠোঁট। গালে যৌবনের রং নেই। চারদিকে নেই নেই হাহাকার। সুধাময়ের মাথায় সম্রাটের মত চুলের সে ঐশ্বর্য নেই। সামনের দিকে বেশ খানিকটা চন্দ্র-ক্ষেত্রের মত হয়ে গেছে। কানের দুটি পাশে পাক ধরেছে অল্প অল্প। চোখে সে ভুবনজয়ী কৌতুক নেই। গলার স্বরে সে মিষ্টতা নেই।

বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে বইকি অমিতার। তিনটি। তিনটিই ছেলে। চোখজোড়া পিচুটি। পেটজোড়া পিলে। হাড় জিরজিরে চেহারা। একরাশ মাদুলি। কালী বাড়ির চরণামৃত। অসংখ্য ষষ্ঠী-পুজো। লাখখানেক তাবিজ। অজস্র ঝাড়ফুঁক। এই চলেছে।

অমিতা কিন্তু এখনো অদ্ভুত।

মাছের বাজারে সুধাময় আজো ঘেঁষতে পারে না। মাছের আঁশ কিনে নিয়ে বাড়ি আসে। নিয়ে এসে বলে, 'টাটকা ইলিশের মত ভাজতে হবে।'

অমিতা তাই ভাজতে ভাজতেও আজো পুরোনো দিনের ভুলে যাওয়া ফিকে, জব-জবে গান গায়।

অমিতা বিচিত্ররূপিণী। আর একটা দুঃসংবাদের খবর আসছে।

তবু খুশী খুশী মুখে অমিতা বলে, 'একটাও মেয়ে হল না গো আমাদের। ভারী আপসোস আমার। হে ভগবান—এবার একটা মেয়ে দাও। বাপ্পা টুকটুকে মেয়ে। মেয়ে বড়ো হবে। বড় হয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখবে। চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গাইবে। স্বপ্ন— বলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সুধাময়ের দিকে একটুক্ষণ অপলকে চেয়ে

আবার রহস্য করে বলত, 'শেষে একজন লেখককে ভালোবেসে বিয়ে করবে।'

অমিতা এখনো অদ্ভুত।

দুটি ছল ছল চোখে আজো সংসারের সমস্ত মিনতি জড়ো করে থেকে থেকে অমিতা বলে, 'লিখলে না তো? বেশ। বলেছিলে কিন্তু। কথা দিয়ে কথা না রাখা এ কিন্তু ভালো নয় লেখক।'

সুধাময় অবাক হয় এইসব মুহূর্তে। চেয়ে চেয়ে দেখে অমিতাকে। কতদিন হয়ে গেল তবু ভুলতে পারে না তো অমিতা! ভুলতে তো চায় না!

বিচিত্রা হে বিচিত্রা!

সুধাময় কিন্তু এখন আর পারে না। ও চেয়েছিলো আবেগ নেমে যাক। আবেগ তো নেমে গেছে। ও চেয়েছিলো ফেনা ফেটে থাক। গেছে তো ফেনা ফেটে। ও চেয়েছিল বন্ধুদের এই রাঙন ছলনা চূর্ণ হোক। সেই ছলনা তো আজ চূর্ণ। তবু সেই গল্পটি তো লিখতে পারছে না সুধাময়।

একটু কোথায় যেন ভুল হয়েছিল। ওসব গল্প লেখার একটা বয়েস আছে। সে বয়েস তো সুধাময়ের আজ আর নেই। মিষ্টি আর মিছরি নিয়ে এখনো তার চল্লিশ-ছাপ্পান্ন বন্ধুরা একেবারে অবলীলায় এবং বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই লেখে বটে। কোন কোন লেখক বন্ধু এখনো অতো চটচটে লজেন্স খেতে ভালবাসেন। তাঁরা নমস্য। তাঁরা ধন্য। মুশকিল হচ্ছে এই যে, সুধাময় এখন আর ওসব পারবে না।

অথচ ভাগ্যের এমনি পরিহাস একদিন সুধাময়কে ঐ গল্পই লিখতে হল।

'কাঞ্চন' মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক অবলাবাবু জোর তাগাদা দিয়েছেন। চিঠিতে বলেছেন, আপনার পেছনে অনেক ঘুরেছি মশাই। এবার একটু পাত্তা দিন। একদিন তো এইখান থেকেই আপনার অভ্যুদয় হয়েছিল। আজ উঁচুতে উঠে পায়ের তলায় মাটিটাকে ভুলে যাচ্ছেন স্যার।

অতএব—

কিন্তু অনেক সাধাসাধনা করেও কোন গল্প বার করতে পারল না সুধাময়। এই অবস্থায় যা হয়। সুধাময় অমিতাকে ডাকলো। বলল, 'এই তো ব্যাপার। এখন কি করি বল তো?'

অমিতা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, 'অতো ভাবছো কেন? আমাদের সেই গল্পটাই লিখে দাও না? এই ফাঁকে লেখাটা হয়ে যাবে।'

সুধাময় অমিতার দিকে তাকালো। কিন্তু এ কোন অমিতা? এই অমিতাকে সাত আট বছর আগে সুধাময় ভালবেসেছিল? অসম্ভব। এ হতেই পারে না। এ সেই বটে, তবে এ যেন সে নয়। যাকে দেখে সুধাময় মুগ্ধ হয়ে ভাবাবেগে আবৃত্তি করেছিল:—

'থির বিজুরী বরণ গৌরী পেখলু
ঘাটের কূলে,
আড় নয়ানে ঈষৎ হাসিয়া বিকল
করিল মোরে—'

এ তো সে নয়। সুতরাং কেমন করে সুধাময় লিখবে? তবু লিখে ফেলি। প্রায় কিছুই মনে নেই। অমিতার না অহঙ্কার ছিলো? তার নাকি সব মনে থাকে? কিন্তু আজ এতদিন পর দেখা গেল, সে সব কিছুই মনে নেই অমিতার। হায়রে, মনে ধরে রাখবার ছেলেমানুষি অহঙ্কার।

রূপ যায়, যৌবন যায়, ইচ্ছের তেজ যায়। আর স্মৃতি! সে-ই শুধু যাবে না? কে না বাঁশি বায়ে বড়াই সে না কোন জনা? কেউ না। কোথাও না। কেউ বাঁশী বাজায় না। হৃদয় বৃন্দাবনে সে প্রেমিক নেই!

কিছুই বলা গেল না। মুখে জোগাল না। অবলাবাবু মুখ কাচুমাচু করলেন। বারকতক রুমাল দিয়ে অযথা ঘাড় মুছলেন। বয়সের দোহাই দিলেন। শেষে মরিয়া-হেসে বললেন, 'গল্পটি ভাই আমি হারিয়ে ফেলেছি। আর একটি দিও। গত পনের বছরের মধ্যে এরকম কাণ্ড আর কখনো হয়নি।'

অতো কথা শোনার ধৈর্য সুধাময়ের ছিল না। ও সোজা ট্যাক্সি চেপে গিয়ে ট্রেনে চেপে বসলো।

কতদিন হল, কতবার, পই পই করে অমিতা বলে আসছে, লেখ। লিখে ফেল আমাদের গল্প। আজ সেই গল্প লেখাও হল। আর তাই কিনা গেল হারিয়ে? তার আর অমিতার গল্প হারিয়ে গেল। সে আর অমিতা...চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসে বুকে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করলো সুধাময়।

বাড়িতে এসে সুধাময় অমিতার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল। অমিতা বইটিটা কাত করে রেখে বলল, 'কি হয়েছে? অতো চুপচাপ যে!'

'কই, তেমন কিছু তো—'

অমিতার কি মনে হল। ও দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। দেখি তোমার গা?'

সুধাময় হাসল। 'দেখলে তো? বললাম কিছু হয়নি।'

সত্যি গায়ে কিছু নেই। কিন্তু ঐ রকম হাসি দেখলে কেউ কি চুপ করে থাকতে পারে?

অমিতা ভাল করে সুধাময়ের দিকে চেয়ে বললো, 'সত্যি করে বল ত' কি হয়েছে?'

সুধাময় এইবার পরিপূর্ণ চোখে তাকাল অমিতার দিকে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না। কেমন থতিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করল। একবার আড়চোখে তাকাল। আর চেপে রাখতে পারল না সুধাময়। হঠাৎ বুকটা যেন খালি হয়ে গেল। জড়ানো জড়ানো গলায় বলল, 'লক্ষ্মীটি, কিছু মনে করো না। গল্পটা অবলাবান্ধববাবু হারিয়ে ফেলেছেন।'

অমিতা স্তব্ধ হয়ে গেল কথাটা শুনে। একেবারে পাথর।

কতোক্ষণ পর পাথর কিন্তু নড়ে উঠল। সে এক বিচিত্র সংবাদ। সাত আট বছর আগে জানলায় দাঁড়িয়ে ঠোঁট টিপে যেমন গভীর লাল রঙের হাসি হাসত, অবিকল সেই ভঙ্গিতে, না, আরো গভীর আরো মধুর আরো অপরূপ ভঙ্গিতে হেসে অমিতা মুখটায় আরো লজ্জা জড়ো করে কেমন ভীরু ভীরু চোখ তুলে বলল 'হারায় নি তো গল্পটা। আমাদের গল্প কখনো হারায়?' বলে থামল অমিতা। থামাটা যেন কেমন এক অদ্ভুত ভাবময় স্তব্ধতা। থেমে থেকে, স্বামীকে দেখতে দেখতে শেষে বলল আবার, 'আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার মুখেই গল্পটা আগাগোড়া লেখা আছে।'

সুধাময়ের কি মন ভরে গেল! সত্যি? সেই পাখিটা তাহলে কি ফিরে এসেছে?

সুধাময় ধীরে ধীরে অমিতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাত দুটি তার কাঁধের ওপর রাখল। বলল, 'আয়না দেখতে হবে কেন? তোমাকে দেখেই কি বুঝতে পারছি না?'

আহ্বান

মঞ্জুলিকা দাশ

এ ভাঙা শপথে দাম কী বা বলো কাণাকড়ি ?
তোমার কাছে আবার আমায় নেবে টেনে, নাও না টেনে,
অভিমানের বাড়াবাড়ি
সারাজীবন তোমার আমার জীবন দিয়ে ক্ষণিক ভুলের
মাশুল তুলি !
ভোলা কী যায় অনুরাগে, কেমন করে পরস্পরের কথা ভুলি ?
এসো না আজ রাত্রিবেলা ঝিঁ ঝিঁ ডাকা বনের ধারে,
জলো মাঠে জোনাকিরা পথের দিশা দিতেও পারে।
না হয় ব্যথা দিয়েছিলাম,—ভুলতে তুমি পারো নাকি।
দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দিয়েও সেই তোমাকেই আবার ডাকি।
জোনাকিরা প্রদীপ জ্বালায় নীরন্ধ্র এই বনতলে,
দুজনে যাই মিশে যাবো দুজনেরই অশ্রুজলে।

রাত্রি

কবিতা সিংহ

সাধে কি দিনের লাল উজ্জ্বল কর্দম দেহে মাখি
অবারিত দিবালোকে পথ হাঁটি মলিন বসনে,
রাণীর মত যে-বুকে, রাত্রির নীলকান্ত রাখি।

ছেঁড়া তাঁবু ফুটো দিয়ে রোদের নিলাজ মারে উঁকি
আমার জীবনগতি অনুবীক্ষণের চোখে চেরে,
তবু বাঁচি, বুকে কাঁপে, রজনীর নীল ধুক্ধুকি।

মাটির পাত্রেও ফুটো, গলে যায় পূতিগন্ধ জল
দুমুঠো এলানো অন্নে হুড়োহুড়ি : দিবাসহচর,
সান্ত্বনা, রাত্রিতে পাব, নীলমদ বুকে টলটল।

ফরিয়াদ

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

ওগো, বল, পৃথিবীতে সব কথা হয়েছে পুরনো
নতুন কিছুই নেই বলবার,—পুরনো পূর্ণিমা,
সমুদ্র আবেগে তাই নেই আর স্বপ্নমধুরিমা,
গা-সওয়া সে নিতান্তই বৈচিত্র্যের ফোঁটা নেই কোন ?
দুটি পাখি কথা কয় আজো কত তবু ওই শোন,
ঠোঁটে ঠোঁটে কত কথা—মানে না তো যতিচিহ্ন সীমা—
চোখে আলো, বুকে বুকে জীবনের অনন্ত মহিমা ;—
পৃথিবীতে ওরা আছে—আর বুঝি নেই একজনো।
ওগো, তবে কেন বল আর কিছু নেইকো বলার :
আমরা তো আছি ওগো, তুমি আছ আর আছি আমি,
তেমনি ব্যাকুল মুগ্ধ, চোখ রেখে তোমার চোখেতে !
বিদ্যুৎ নিভে কি গেছে, হিমস্তব্ধ গতি কি চলার,
অন্তর-বিলাসী ওগো, আর তুমি নেই অন্তর্যামী,
তাই বুঝি কথা নেই, যোগ খোঁজ দূরে চলে যেতে ?

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ অধুনা বিস্মৃত ক্যালকাটা গ্রুপ-এর শিল্পী শ্রীহেমন্ত মিশ্রের একটি চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীমিশ্রর শক্তি সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম এঁর প্রথম বারের একক প্রদর্শনী দেখেই। তখন এঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ফরাসী ইমপ্রেশনিস্টদের মতন। মৌলিক বর্ণের ছোট ছোট টানটোন এবং বিন্দু প্রয়োগে ইনিও তখন বর্ণের নিজস্ব মূল্য এবং বিশেষত্ব প্রকাশ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। এই সাত বছরে এঁর চিত্রধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। পুরোনো কাজ নতুন কাজ সব মিলিয়ে ইনি সাতাশটি ছবি নিয়ে এবারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সাত বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষণের পর ইনি বিভিন্ন ধরার প্রভাব কাটিয়ে বর্তমানে যে আর্টের সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়। যদিও কিউবিজম এর কিছুটা ছাপ পাওয়া যায় তা হলেও রচনাগুলি অভিনব। কিউবিস্ট-দের মত রেখা ও গঠনের সংস্কারকে একেবারে বিসর্জন ইনি কোথাও করেন নি। কোনও অসংগত ভঙ্গু টানে ছন্দকেও বিসর্জন দেন নি। বরং ছন্দটাই এঁর রচনায় অতি স্পষ্ট। 'ফ্লাওয়ার কর্নার' রচনাটিই আমার ব্যক্তিগত ধারণায় এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যদিও শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিমত এঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ট্রাপীজ'। কোন কোন রচনায় ইনি কেবল আলংকারিক নক্সা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের রচনাগুলির মধ্যে 'ডিফারেন্ট ফেসেস' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি বিদেশী প্রথা-প্রকরণ ব্যবহার করলেও এঁর রচনাকে কোনও বিদেশীর রচনা বলে ভ্রম হয় না। এটা এঁর সবচেয়ে বড় গুণ। বিদেশ থেকে প্রথা প্রকরণ আদায় করে তা কাজে লাগিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধি প্রকাশ করতে। বিদেশীর মেজাজকে অনুকরণ করেন নি। এদেশের প্রথাতে অনেক শিল্পীর মধ্যেই কিন্তু এ দোষটি অত্যন্ত প্রকট ভাবে প্রকাশ পায়। 'হুইলিং ফিশেস', 'ফোর আর্টস', 'সিটান', 'সিটী টু সার্ভ', 'স্ফিংকস' এবং 'ট্র্যাপ' এ কয়টি রচনাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দু একটি রচনা একটু যেন কষ্টকল্পিত এবং আড়ষ্ট মনে হলেও, আমরা প্রদর্শনীটি উপভোগ করেছি যথার্থই। বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রশিল্পে ক্যালকাটা গ্রুপের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু আজ এই গ্রুপটির নাম লোকে প্রায় ভুলতে বসেছে। আমরা এই গ্রুপটির পুনরুজ্জীবন কামনা করি।

*

গত সপ্তাহে 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' ভবনে (১, সদর স্ট্রীট) শিল্পী কে এম সেনয়-র একটি চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। শ্রী সেনয় কোন স্কুল বা শিক্ষকের কাছ থেকে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন নি। এইটিই এঁর প্রথম প্রদর্শনী। এঁর সাদা-কালো ধরে অঙ্কিত স্কেচগুলিই আমার বেশী রসোত্তীর্ণ মনে হয়েছে, বিশেষ করে ছাগল, মহিষ প্রভৃতি স্কেচগুলি। কিছু ফিগার স্কেচ-এ অতিরঞ্জনও লক্ষ্য করলাম। রচনাগুলি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। জল রঙের রচনা সব কয়টিই মডার্নিস্টিক জাতের। দু একটি ছবি সত্যিই প্রশংসনীয়, যেমন 'ডীপ ইন স্লীপ', 'ইয়োলো ফিশ', 'দি নুন', 'বার্ডস' এবং 'অফ ডিউটি'। শেষোক্ত ছবিটি এঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে আমার বিশ্বাস। এটির বিষয়-বস্তু একটি দড়ির খাটিয়া দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালের গায়ে। ছবিটি দেখে ভান গখ্-এর 'চেয়ার'-এর কথা মনে পড়ে। শ্রী সেনয়র কম্পোজিশন-জ্ঞান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'দে অ্যাণ্ড দেয়ার শ্যাডোজ'-এ শিল্পী কয়েকটি ঘন কালো ক্রস এবং অপেক্ষাকৃত হাল্কা কৃষ্ণবর্ণে সেগুলির ছায়া দেখিয়ে যে কম্পোজিশন করেছেন তা অপূর্ব। এঁর সেল্ফ পোরট্রেট-টিও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছি। ভবিষ্যতে ইনি নামকরা শিল্পী হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। প্রদর্শনীটি 'অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস'-এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্পী হেমন্ত মিশ্র

ভারত ভূখণ্ডে চীনের হামলা লইয়া অনেকে অনেক রকম টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশু খুড়োর টীকা হইয়াছে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। তিনি

বলেন—"আমাদের হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই কথাটা চীন ভুলতে পারেনি বলেই এই ভাই ফোঁটার পার্বনে তাদের এই যাতায়াত, দুষ্ট লোকেরা বলে হামলা।"

• • •

চীন প্রসঙ্গেই একটি সংবাদ-শিরোনামা পাঠ করিলাম—"কেদার-বদরীর উপর চীনের লোলুপ দৃষ্টি।" জয় কঠিন কেদারনাথ, তোমার মাহাত্ম্য চীনের কাছেও আর অ-চিনা নয়"—ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চীন ভারত ভূখণ্ডে আক্রমণ করে নাই, যে হেতু কোন সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র কখনো আক্রমণকারী হইতে পারে না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"মোক্ষম যুক্তি। শাস্ত্রকে তাহলে শুধু গোপাল ঠাকুরই চেনেন নি!!"

• • •

সংবাদে প্রকাশ—স্টেট বাস কর্তৃপক্ষ নাকি ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। —"প্রতিক্রিয়া আর কি; স্বভাবদোষে একটু আধটু আপত্তি করি, আবার স্বভাবগুণেই বাড়তি ভাড়াটা কনডাক্টরের হাতে তুলে দিই। স্টেট বাস্ ভাড়া বাড়িয়ে দিলে সে ক্ষেত্রেও এর বেশি আর আমরা কী করব। সুতরাং যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে নাপে সুখমস্তিত আদর্শ ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন নেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

হার্টম্যান নামক জনৈক আফ্রিকান যুবক নাকি একটি থলের সাহায্যে আকাশে উড়তে সক্ষম হইয়াছেন।—

"কিন্তু এ সব বড় কথা কী। হার্টম্যান না হয়েও শুধু হাত দিয়ে আমরা কতবার আকাশে উড়েছি, এখনো উড়ছি"—বলেন জনৈক যাত্রী।

• • •

কোন একটি সংস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুকে আহ্বান করা হইয়াছিল। সংবাদে শুনিলাম নেহরুজী সেই অনুষ্ঠানে দশ মিনিট লেট করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তার জন্য দুঃখ প্রকাশও করিয়াছেন।—"কিন্তু দুঃখ করার কিছু নেই—অফিসের হাজিরাতে দশ মিনিট গ্রেস দেবার নিয়ম প্রায় সর্বত্রই চালু আছে। নেহরুজী যদি মন খুঁত খুঁত করে তাহলে আসন্ন লোকসভার অধিবেশনে সভা-সমিতিতে উপস্থিত জন্য দশ মিনিট গ্রেস পাস করিয়ে নিলেই চলবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

শ্রীমতী আরতি সাহা ও ডাঃ চন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সর্বগ্রাসী বন্যায় সাঁতারের কৌশল শেখার প্রয়োজনকে আজ আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। "দুঃখ সাগর সাঁতারি পার" হবার দুর্দিন বুঝি আমাদের এখনো শেষ হয়নি।"

• • •

ইংল্যাণ্ডে নির্বাচন প্রসঙ্গে জনৈক যুবক তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার নিজের দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বলায় স্ত্রী রাগিয়া স্বামীর মুখ আঁচড়াইয়া দিয়াছেন এবং কণ্ঠদেশ কামড়াইয়া দিয়াছেন। স্বামী এখন হাসপাতালে আছেন।—"পৃথিবীতে শুধু রমণীর লাবণ্যই ধিক্ নয়, ধিক্কারের বস্তু আরো আছে। কিন্তু চেপে যান দাদা। শুধু বলব—সাধু সাবধান"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশ, উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে শতকরা মাত্র ছেচল্লিশজন পুরুষ বিবাহিত। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বিবাহের চেয়ে বড়-র পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই বলে মন্তব্য করা শক্ত।"

• • •

শুনিলাম অস্ট্রেলিয়াতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর বিড়াল তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে।—"আশা করি ইঁদুর [illegible] সংবাদটা পড়ে হাসতে যাননি। ক্রিকেটের মাঠে ইঁদুর চিরকালই ইঁদুর, বেড়াল দেখে তারা গর্তে ঢুকেছেই"—বলে শ্যামলাল।

• • •

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় জানিলাম প্যারিসের মেয়েরা নাকি দুশ্চিন্তাতেই মোটা হয়।—"গিন্নির দড়ি পাকানো চেহারা দেখে কতদিন দুঃখ করেছি, হয়ত ঠিকমতো

খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না বলেই গিন্নি লিক-লিকে পাকাটি হয়ে যাচ্ছেন। এখন দেখছি তা নয়। পতির কাঁধে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গিন্নি পরমানন্দে তন্বী সেজে বসে আছেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

আমাদেরই কাগজ আনন্দবাজারের ক্রোড়পত্র—"পর্যটকের আনন্দভূমি ভারত" পাঠ করিলাম। কিন্তু দুঃখ হইল ইহাতে কলিকাতার কথা কিছু বলা হয় নাই। অথচ এই কলিকাতার চিড়িয়াখানা দেখিয়া জনৈক অখ্যাত কবি-পর্যটক মনের আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—"উল্লুকের কী আমদানী, মহারাণী, ধইন্য তোমার জমিদারী"!!

সাহিত্যিক জীবনপর্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। সাহিত্যসদন, এ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.৫০ নয়া পয়সা।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অন্যতর আর একটি পরিচ্ছেদ হলো তাঁর বিচারক জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যসম্রাট-ই ছিলেন তা নয়, তাঁর সাহিত্য বা সাহিত্যিক জীবনের পাশাপাশি আর একটি আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় জীবনপর্ব হলো এই বিচারক জীবন। তিনি বিভিন্নস্থানে সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে তাঁর বিচারকজীবন অতিবাহিত করেন—বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের একটি বিশেষ নিজস্ব পদ্ধতি ছিল, আশ্চর্য উপস্থিতবুদ্ধি এবং অপূর্ব ধীশক্তির সমন্বয়ে তিনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে শুভফললাভ করেছেন তা সত্যই অভাবনীয় এবং বিচারের ইতিহাসে সে সকল কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠ তেজস্বী বিচারক ছিলেন—তাঁর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের নিকট কোনো অন্যায় বা অবিচার কোনোদিনই প্রশ্রয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি; তাঁর বিচারক জীবন যে কতো বৈচিত্র্যময়, রোমাঞ্চকর এবং নির্মল পরিহাসরসিকতাময়, অপর দিকে শিক্ষাপ্রদ তা এই গ্রন্থখানি পড়লেই অনেক জানা যাবে। যদিচ বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের কিছু কিছু কাহিনী অন্যান্য কয়েকজন লেখকের কাছ থেকে ইতিপূর্বে বিভিন্নভাবে জানা গিয়েছিল, তথাপি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় বহু পরিশ্রম করে সেই কাহিনীগুলি একটি গ্রন্থে চয়ন করে বঙ্কিমজীবনের একরকম অজ্ঞাত একটি অধ্যায়ের উন্মোচন করেছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সাহিত্যসম্রাটকে জানতে হলে, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে তাঁর বিচারজীবনের বৈচিত্র্যময় কাহিনী আমাদের জানা দরকার-সেদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ইতিপূর্বেও আমাদের কাছের মানুষের কাহিনী সংকলনে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর রচনার বড় বৈশিষ্ট্য যে ঘরোয়া মেজাজ, সেই বিশেষরচনাভংগির আন্তরিক যোগাযোগ বর্তমান গ্রন্থে কিছুটা অনুপস্থিত বলেই মনে হল। তথাপি 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবন' পাঠকসাধারণের ভালো লাগবে। গ্রন্থের প্রচ্ছদসজ্জা বেশ ভালোই।

৩৩৮।৫৯

মধুসূদনের কবিমানস — শিশিরকুমার দাশ। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। ২.৫০ নয়া পয়সা।

চিরকালই কবির কাছেই আমরা কাব্যের আলোচনা আশা করে থাকি, তার কারণ কবিতার জন্মরহস্য সাহিত্যের অপরাপর শাখার তুলনায় একটু বঙ্কিম। বাইরে থেকে কবিকে এবং তাঁর কাব্যকে আমরা বিদ্যা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে নানাভাবেই বুঝতে চেষ্টা করি, তবু কবিতার সম্পূর্ণ রহস্য আমাদের এই ত্রিবিধ চেষ্টার মধ্যেও ধরা দেয় না। সুতরাং কবির শরণাপন্ন হতে হয়, শুধু তাঁর স্বরচনার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্যই নয়, পূর্বসূরি এবং সমকালীন কবির মর্ম উদ্ঘাটনের ব্যাপারেও। কিন্তু সম্প্রতি কালের তরুণ কবিরা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণেই বিগতস্পৃহ। কবিতা প্রসংগে তাঁদের যে দ্বিতীয় কোন দায়িত্ব রয়েছে একথা তাঁরা বিস্মৃতপ্রায় হতে চলেছেন।

তরুণ কবি শিশিরকুমার দাশ তাঁর পূর্বসূরি যে-কবির মানস উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি এ-যুগে প্রায় অবহেলিত সুদূরপুরুষ মাত্র। তাঁর কাব্যের যথার্থ মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয়নি। সিদ্ধিলাভের কথা না তুলেও যে দুরূহ মানস বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, তার জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য একথা বলবো। অবশ্য তিনি এ পথের প্রথম পথিক নন, তাঁর পূর্বেও একাধিক রসজ্ঞ সমালোচক মধুসূদনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ জীবনীকেন্দ্রিক আলোচনা করেছেন, কেউবা মধুসূদনের কাব্যধারাকে শুধু মাত্র বুদ্ধির প্রাখর্যে বিচার করতে বসেছেন, সশ্রদ্ধ হৃদয়কে যুক্ত করে দেখেননি। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিশিরবাবু শুধু যে মধুসূদনের অন্তর্মহলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন তা নয়, তাঁর নিজের কবিহৃদয়কেও যুক্ত করে দিয়েছেন সব দেখার মাঝখানে। ভাষা মধ্যে মধ্যে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছে, এ-জাতীয় গ্রন্থের পক্ষে সেটি দূষণীয়।

২৪৭।৫৯

কিশোর সাহিত্য

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ—প্রশান্ত চৌধুরী। বলাকা প্রকাশনী, ২৭-বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দামঃ এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

নাচ গান ছড়া—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। কিশোর ভারতী, ৯, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দামঃ এক টাকা বারো নয়া পয়সা।

বাংলা শিশুসাহিত্যের পাঠক যদি একথা উচ্চারণ করেন যে, নেহাত ছোটদের উপযোগী অভিনয়যোগ্য নাটিকার যথেষ্ট অভাব আজকেও বিদ্যমান, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই; কেননা, কথটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, মৌমাছি ও স্বপনবুড়ো ইত্যাদির পরে এ বিভাগটিতে তেমন কোনো যত্নশীল রচনা এবং উল্লেখযোগ্য লেখকের আবির্ভাব ঘটেনি। সেদিক থেকে আলোচ্য দুটি গ্রন্থের বিশেষ তাৎপর্য বর্তমান।

রামায়ণের একটি কৌতুককর ঘটনা—কুম্ভকর্ণের নিদ্রাকে কেন্দ্র করে এই শিশুনাটকটি রচিত। পরিকল্পনা এবং নাটকটির ঘটনাবিন্যাসে লেখক প্রশান্ত চৌধুরী এক আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়
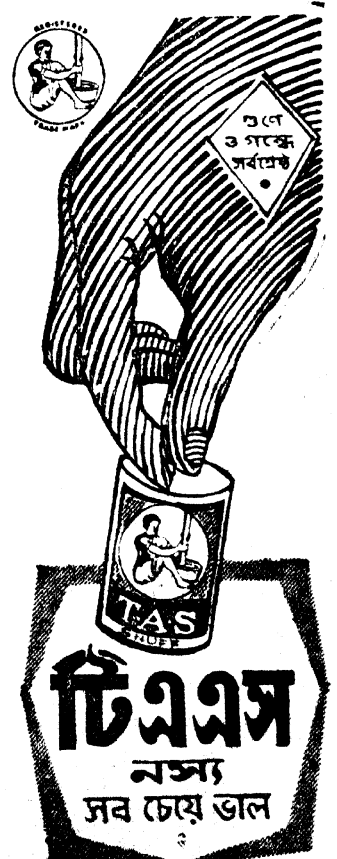
দিয়েছেন। নাটকটির সবচেয়ে বড় কথা সময়তামিক্ত আবহাওয়া, ছোটরা অভিনয় করে এবং পড়েও যথেষ্ট আনন্দ পাবে। অথচ্য ক্ষেত্রে বড়দের আকর্ষণও কম থাকবে না। কয়েকটি চরিত্র পরিকল্পনায় এবং সংলাপের সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রকরণে সুকুমার রায়ের আদর্শকে লক্ষ্য করে পাঠক প্রীত হবেন। 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' পেয়ে ছোটরা নিঃসন্দেহে খুশী হবে। তবে একটি কথা; দ্বিতীয় দৃশ্যে লেখক কোকিল ও পাপিয়ার কণ্ঠে সুপরিচিত আধুনিক গান এবং অন্যত্র রাবণের সঙ্গে হেডমিস্ট্রেস সংলাপে কিছুটা সংযম প্রকাশ করলেই ভাল করতেন।

নাটকখানির প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত এবং সেজন্য তিনি যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

শিশু-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। 'নাচ-গান-ছড়া'র মধ্যে তিনি পরিচিত তিনটি দেশী-বিদেশী রূপকথাকে ছোটদের অভিনয়ের উপযোগী করে নাট্য-'রূপকথার রাজপুত্র' ও নিদ্মহলের রাজ-বেতার রূপায়ণ হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। 'রূপকথার রাজপুত্র' ও নিদ্মহলের রাজ-কন্যা' নাটিকা দুটি অভিনয় করতে ছোটদের খুব ভালো লাগবে। লেখক গ্রন্থের প্রারম্ভে একস্থানে বলেছেন, 'নিছক গদ্য ছোটদের মুখস্ত করতে বাধবে, তাই সবটুকু ছড়ায় রূপান্তরিত করেছি।' নাট্যকারের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু সবটুকু ছড়ায় রূপান্তরের নামে তথাকথিত রস-সৌন্দর্যহীন নিছক পদ্যকেও সংলাপ হিসাবে তিনি চালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ছন্দের ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে দুর্বলতা অনুভব করা যায়। যা হোক, তবু বলবো ছোটরা দেশী, বিদেশী রূপ-কথার এই নাট্যরূপ হাতের কাছে পেয়ে অভিনয়ে তৎপর হবে। 'নাচগান ছড়া'র অঙ্গসজ্জা বিশেষ আকর্ষণীয়।

৩১৫।৫৯; ৩২৬।৫৯,

রসরচনা

ফাংশন—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—৩্।

আধুনিক বাংলা গল্পসাহিত্য যতোই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক না কেন, সব গল্পই গম্ভীর চালে চলে না। গল্পকে উপজীব্য করে হাস্যরসের অবতারণার দ্বারা কয়েকজন খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'ভাস্কর' এই পথেই খ্যাতিমান। তাঁর 'ফাংশন' গ্রন্থটি বারোটি রস-রচনার সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পেই জগৎ ও জীবনের অসংগতিকে নিকপটভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পে অঙ্কিত অনেক চরিত্র যেন আমাদের পরিচিত। কিন্তু লেখক তাদের কাউকে অযথা আঘাত করেন নি। 'এক তরফা' গল্পের নায়িকা নতু, 'প্রেম ও মশা' গল্পের নায়ক অরুণ যেন আমাদেরই এক একজন। এই সংকলনের প্রথম রস-রচনাটির নাম হচ্ছে 'ফাংশন'। যদিও 'ফাংশন' গল্পটি ফাংশন সম্পর্কিত একটি সুন্দর রস-রচনা, তবু এই ফাংশন-বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি গল্পেই সুন্দর ফুটে আছে। 'ভক্তকথা' গল্পটি 'ফাংশন' গল্পটির সমধর্মী হলেও ছোট-বৈচিত্র্যে নতুনত্বর বলা যায়। 'ফান' গল্পটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লিখিত। সংলাপ তার উপভোগ্যও রয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই বাক্যলাপ ও চমৎকার।

৩২২।৫৯

ঐতিহাসিক ঘটনা

ভূস্বর্গের অভ্যন্তরে—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। সবিতৃকা পরিবেশক: ২-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য : ৩্।

বাংলার বরেণ্য সন্তান শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে কোনো তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি। এ কারণে জন চিত্তে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে এই পুস্তকে। শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর-গমন, তাঁর অসামান্য দেশপ্রেম অপরিসীম সাহসের পরিচয় এবং কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ অনেক অজ্ঞাত বিষয়ের ওপরও সন্ধানী লেখক নতুন আলোকপাত করে ছেন। গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য করার জন্য ইতিহাসের ... ধারায় প্রকাশ করেছেন। ... সঞ্জীবিত ... দেশবাসী এই পুস্তকে বর্ণিত ঘটনার ধারা

যথাসম্ভব সত্যের সন্ধান পাবেন, আশা করা যায়। ২৭৫।৫৯

কবিতা

অঙ্কুরের মুখ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)—কৃতী সোম। প্রকাশকঃ শতদল গোস্বামী, ৩৫।ডি কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কৃতী সোম নবাগত হলেও অল্পকালের মধ্যে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ যে দ্বিতীয় মুদ্রণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে তা বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রথম মুদ্রণে যে কবিতাগুলি ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে অপরিণত হাতের ছাপ ধরা পড়েছিল, কবিতাগুলির নির্বাচন এবং সংযোজনেও আগাগোড়া সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু সুখের বিষয় দ্বিতীয় মুদ্রণে কবি গ্রন্থের আমূল সংস্কার করেছেন। অনেকগুলি কবিতাই বর্জন করেছেন এবং অধিকাংশের সংস্কার করেছেন। তাছাড়া কিছু কিছু নতুন কবিতাও এতে সংযুক্ত করেছেন। অঙ্কুরের মুখের এই নতুন সংস্করণের কবিতাগুলির মধ্যে কবির একটি সহজ স্বচ্ছন্দ হৃদয়ের সৌন্দর্য-উল্লাসের প্রকাশ রূপায়িত হয়েছে। এই কৈশোর যুগে এই তরুণ কবিচিত্তের রূপদক্ষ চেতনা ও আশাবাদী উপলব্ধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আঙ্গিক-প্রকরণের দিকে মনোযোগ রেখে স্বপথে নিষ্ঠাবান থাকলে কৃতী সোমের ভবিষ্যৎ-সিদ্ধি আশা করা যায়। প্রচ্ছদপট এবং মুদ্রণে সুরুচির পরিচয় আছে। ১৬৩।৫৯

ছোটগল্প

সেই চিরকাল—দেবেশ দাশ। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

কথাসাহিত্যিক হিসাবে শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশের নাম বাঙালী পাঠক সমাজে শুধু যে অপরিচিত নয় তা নয়, বিশেষভাবে পরিচিত। পটভূমি এবং বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর একাধিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সাড়া এনেছিল।

'সেই চিরকাল' অবশ্য উপন্যাস নয়, গল্প গ্রন্থ। এবং সেগুলিও মূলত প্রেমের গল্প, অংশীভূত বিরহ। কিন্তু দেবেশ দাশের চরিত্র অনুযায়ী বর্তমান গল্পগুলিও বাংলাদেশের মাটিতে গতানুগতিক পরিবেশে গ্রথিত নয়। স্থানকালপাত্রপাত্রী সমস্তই বিচিত্র ধরনের। কাহিনীগুলির শুরু এবং শেষ খানিকটা নাট্যধর্মী কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পই অভিনবত্বে স্বতন্ত্র।

ক্ষণকালের উদ্ভাসে যে চিরকালের মূর্তি ফুটে ওঠে, হৃদয়ের যে শাশ্বত সৌন্দর্য বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তাই অনবদ্যভঙ্গীতে চিত্রিত করেছেন লেখক। প্রতিটি রচনাই সুখপাঠ্য, সহজরীতিতে লেখা।

কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে কোন নতুনত্বের উদাহরণ নেই, রচনাশৈলী পুরাতন, ভাষাভঙ্গীর চমৎকৃতি মিশলে গল্পগুলির সৌন্দর্য বাড়তো। ১৬০।৫৯

ছড়া সংকলন

ছোটদের ছড়া সংকলন—শ্রীপ্রভাত বসু ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিমিটেড, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিঃ ৯। মূল্য আড়াই টাকা।

ছোটদের কবিতা এবং যথার্থ ছড়া লেখার মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য বর্তমান। ছোটদের জন্য সত্যিকারের ছড়া লেখা যে কতো কঠিন সে সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন—'ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন; সহজের প্রধান লক্ষণ এই।' সুতরাং সেদিক থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন প্রচলিত ছড়া ছাড়া বাঙলাদেশে খুব বেশী সত্যিকারের ছোটদের ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়নি—অধিকাংশই আমরা পেয়েছি ছোটদের কবিতা, ছড়ার নামে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

এবং এই অন্যতম কারণেই উল্লেখযোগ্য একটি ছড়া-সংকলনে ইতিপূর্বে অনেক বাধা দেখা দিয়েছে। সেদিক থেকে সম্পাদকগণের দায়িত্ব অবশ্য অনেকখানি। এক্ষেত্রে কিন্তু বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য 'ছড়া-সঞ্চয়নের' সম্পাদকদ্বয় ছোটদের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক ছড়া সংকলন ব্যাপারে অনেকখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সংকলনটির প্রথম পর্বে সুপরিচিত প্রাচীন ছড়া এবং দ্বিতীয় পর্বে আধুনিককালের রবীন্দ্রনাথ, অবন ঠাকুর, সুকুমার থেকে সুনির্মল বসু, অন্নদাশংকর, মৌমাছি প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা ছড়া লিখিয়ের মিষ্টিমধুর দোলানো ছন্দের ছড়া স্থান লাভ করেছে। প্রতিটি ছড়াই ছোটদের মন কেড়ে নেবার মতো এবং শিল্পী সমর দে'র রঙিন সুন্দর ছবিতে ভরপুর। সংকলিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করে, শুনে ও ছবি দেখে শিশুদের মন এক নতুন রঙে রসে যে ভরপুর হবে উঠবে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুসম্পাদিত, সুমুদ্রিত ছড়া সঞ্চয়নের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

ভ্রমণস্মৃতি

আমার দেখা চীনের গণ-কমিউন—গীতা মুখোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৬৫ নঃ পঃ।

কমিউন জিনিসটা কি, কেমন করেই বা এই সংগঠন গড়ে উঠল, কি কর্মধারাই বা এতে গৃহীত হয়েছে, জনজীবনে কি পরিবর্তনই বা এ নিয়ে এল—এমনি সহস্র প্রশ্নে উৎসুক মন নিয়ে লেখিকা আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয়বার চীনে যান। লেখিকা আগেই পড়েছিলেন, অনেকগুলো সমবায় মিলিয়ে কমিউন জিনিসটা তৈরী হয়েছে। সমবায় অপেক্ষা কমিউন-এর উপকারিতা উপলব্ধি করেন লেখিকা সব কিছু স্বচক্ষে দেখে। কমিউনের কার্যক্রম শুধু কৃষি উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করা নয়, তার চাইতে অনেক বেশি। লেখিকা তাই কমিউনের বহুমুখী সাফল্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া নোতুন চীনের মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনাও আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে। ৩৪৪।৫৯

জীবনী-সাহিত্য

অর্ঘ্য। প্রকাশিকা — শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য—দেড় টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানসকন্যা গৌরীমাতার অলোকসামান্য জীবন এবং তাঁর লীলা-মাহাত্ম্য জীবনইতিহাসের এক আশ্চর্য অমূল্যসম্পদ। একদা গৌরীমাতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে বলেছিলেন, 'গৌর মা কোথা? এক হাজার গৌর মার দরকার—ঐ 'noble stiring spirit.' কিছুদিন পূর্বে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শতবর্ষ জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম কর্তৃক এই মূল্যবান শ্রদ্ধার্ঘটি প্রকাশিত হয়েছে। গৌরীমাতার অলোক-সামান্য জীবন এবং শুচিশুভ্র আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ এবং কবিতা এই 'অর্ঘে' সংকলিত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য, কালিদাস রায়, সরলাবালা সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অনুরূপা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির রচনা থেকে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ পাঠক শ্রীশ্রীগৌরীমাতা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পেরে বিশেষ উপকৃত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ১৩৬।৫৯

শারদ সাহিত্য

প্রভাত—সম্পাদনা—পুলিনবিহারী নন্দ। ২সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য ৫০ আনা।

প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বহু লেখক লেখিকার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতিতে পূর্ণ আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। লেখক লেখিকার মধ্যে প্রবন্ধে ডক্টর কুমারী ইন্দিরা সরকার, শ্রীপ্রহ্লাদ দাস—গল্পে হুমায়ুধ, শ্রীমুকুল রায়—কবিতায় শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ এবং রস-রচনায় শ্রীসুশীল-কুমার দের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদ ফটোখানি বেশ মানানসই হইয়াছে।

স্টেটবাস—সম্পাদক—শ্রীরমেশ মুখোপাধ্যায়। ৩, কালাচাঁদ সান্যাল লেন, কলিকাতা—৪। মূল্য ৩৭ নয়া পয়সা।

কয়েকটি মনোরম ছোট গল্প ও কবিতা এবং সুচিন্তিত গুটিকয়েক প্রবন্ধ-সম্ভারে পূর্ণ আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া আশা করি। গল্পে সুভাষ ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল দত্ত, মণ্টু সাহা, সৌরাংশু দত্ত—প্রবন্ধে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বরিস বুরেকফ, সুশীল রায়, অশোক দত্ত, রমাপ্রসাদ বাগচী ও কল্যাণ দত্ত এবং কবিতায় রমেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, দেবু পাত্র ও নগেন্দ্রবিজয় নাগের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ মনোরম।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

শুধু হাসির গল্প—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত।
হাওয়া বদল—জয়ন্ত চৌধুরী।
শ্রীশ্রীচণ্ডী (বাংলা অনুবাদ)—শ্রীশশাঙ্ক-সান্যাল সম্পাদিত।
রূপবাণী—শ্রীবিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।
সংক্রান্তি—বীরু মুখোপাধ্যায়।
হবু রাজার দেশে—সুনীল দত্ত।
ফুলঝুরি—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।
সাহিত্যের কথা—গুরুদাস ভট্টাচার্য।
প্রফেসর হোঁদারামের ডায়েরী—অজিত-কৃষ্ণ বসু।
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন—ডেল কার্নেগি, অনুবাদক—হিমানীশ গোস্বামী।
প্রতিপত্তি ও বন্ধু লাভ—ডেল কার্নেগি, অনুবাদক—হিমানীশ গোস্বামী।
ভয়ংকর আফ্রিকা (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস।
বাঙলা ও বাঙালী (১ম পর্ব)—চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
অমৃত মন্থন—অজিত মুখোপাধ্যায়।
বিকালের রঙ—আনন্দ বাগচী।
রূপকথার দেশে—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
মানুষের ঠিকানা—অমল দাশগুপ্ত।
পার্বতী—শ্রীমতী নলিনী দেবী।
Modern Bengal—Nirmal Kumar
পরিব্রাজকের ডায়েরী — শ্রীনির্মলকুমার বসু।
মানব বিকাশের ধারা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী।
মধুমিতা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী।
নাগিনী মুদ্রা—অমরেন্দ্র ঘোষ।
চিত্র দর্শন—কানাই সামন্ত।
ঠান-দিদির ঝুলি—শ্রীসরোজবন্ধু ভট্টাচার্য।
নীল সাগরের নাবিক—ভিক্টর হুগো, অনুবাদক—শ্রীস্বপনকুমার।
শিবরামের ভালো ভালো গল্প—শিবরাম চক্রবর্তী।

চন্দ্রশেখর

আর্তের সেবায় শিল্পব্রতীর দল

পশ্চিম বাংলায় সর্বনাশা বন্যা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে গৃহহীন করেছে। বন্যার্তদের সাহায্যে দেশবাসীর উন্মুক্ত দান-যজ্ঞ আর বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের অতন্দ্র, অক্লান্ত ত্রাণকার্য মানবতার এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। এই অধ্যায়-রচনায় সরকার এবং বহু জনকল্যাণ সমিতি ও ধর্মাশ্রম সঙ্ঘের অবদান শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে বিস্ময়ের সূচনা করেছে দুর্গত দেশবাসীর ত্রাণে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রশাসনিক সংস্থা বি-এম-পি-এ'র জনকল্যাণ ভূমিকা। বি-এম-পি-এ'র এই প্রশংসনীয় মানবিক আদর্শ-বোধ সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা শুধু যে তাঁদের নিজস্ব শিল্পের উন্নতি ও প্রসার নিয়েই ব্যস্ত নন, তাঁরাও যে কল্যাণকৃৎ, এই প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন বন্যার্ত-ত্রাণ সম্বন্ধে তাঁদের নতুন সংকল্পের কথা ঘোষণা করে।

বি-এম-পি-এ (বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশন) সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা শুধু সাহায্য সংগ্রহই নয়, বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে নিজেরা গিয়ে অসহায় দেশবাসীর ঘরে ঘরে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, জীবনধারণের অন্যান্য উপচার ও অর্থ পৌঁছিয়ে দেবেন।

তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হাওড়া জেলার আমতা এলাকার দুটি গ্রামে বন্যাপীড়িত, ছিন্নমূল অসহায় নরনারীর পুনর্বাসন ও সেবার গুরু দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের স্কন্ধেই তুলে নেবেন। গত ৬ই নবেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে বি-এম-পি-এ'র পক্ষ থেকে প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা বিকাশ রায় এই কথা ঘোষণা করেন। শ্রীরায় আরও জানান যে, এই দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম দুটিতে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা অবশ্য আছে; কিন্তু এই অঞ্চলে সেবা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। সরকার ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের ত্রাণকার্যের পরিধি অনেক বেশী পরিব্যাপ্ত। অতএব তাঁদের পক্ষে সব অঞ্চলে সাহায্যার প্রয়োজন সমান-ভাবে মেটানো সম্ভব নয়। তাই বি-এম-পি-এ এই দুই গ্রামেই তাঁদের সেবাকেন্দ্র স্থাপিত করতে চান। বি-এম-পি-এর এই সেবা-কার্য আরম্ভ হয়েছে গত সোমবার (৯ই নবেম্বর) থেকে। দুই মাস ধরে চলবে বি-এম-পি-এ'র এই অক্লান্ত দুর্গতসেবা।

বি-এম-পি-এর কার্যক্রম অনুযায়ী প্রথমে

শ্রীমতী রুসেটি রেনশ বিভিন্ন দেশের সংগীত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। সম্প্রতি ইউনেস্কো ও ভারত গভর্নমেন্টের উদ্যোগে তিনি এদেশে এসেছেন। বাংলা ছবি "সুরের পিয়াসী"-র গান শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, কানাডার টেলিভিশনে তা প্রচার করতে তিনি চুক্তি করেছেন। শ্রীমতী রেনশকে ছবিটির প্রযোজক, পরিচালক ও পরিবেশকের সংগে আলাপরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের (সংখ্যায় মোট প্রায় ২০০০) মধ্যে অতি আবশ্যক জিনিস বিতরণ করা হবে, যেমন বস্ত্র, গরু-বাছুরের জন্য খড় বিচালি, চাল-ডাল-নুন-তেল প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যাদি বিতরণ ব্যতীত ছাত্রদের বেতনের টাকাও দেওয়া হবে। কৃষিজীবীরা যাতে ঠিকভাবে পুনর্বাসিত হতে পারেন, তাও বি-এম-পি-এর সেবাকার্যের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে। তাঁদের ধানের বীজ, সার, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, গৃহ নির্মাণের উপকরণ ইত্যাদি প্রয়োজনমতো বিতরণ করা হবে।

আনতা অঞ্চলে এই সেবাকার্যের সঙ্গে বি-এম-পি-এ সেবাদল নদীয়া জেলার দুই একটি বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামেও ত্রাণকার্য চালাবেন।

বি-এম-পি-এ'র এই ব্যাপক আর্তত্রাণ কার্যে আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা খরচ হবে। বাংলা চিত্রশিল্পের প্রযোজক পরিবেশক, প্রদর্শক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে অনেকেই বি-এম-পি-এ সভাপতির বন্যার্ত তহবিলে অর্থ দান করেছেন। তাছাড়া চ্যারিটি শো ও অন্যান্য ব্যবস্থায় যে অর্থ সংগৃহীত হবে, তার দ্বারা বি-এম-পি-এ'র সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব হবে বলে শ্রীরায় আশা প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ ও উত্তর-কলিকাতায় চলচ্চিত্রসেবীদের পথ-পরিক্রমায় যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা থেকে ১০,০০১ টাকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বন্যার্ত তহবিলে দান করা হয়েছে। এর আগে বি-এম-পি-এ পৌর-পাত্রের বন্যার্ত সাহায্য তহবিলে ২,৫০১ টাকা দান করেছেন।

বন্যার তাণ্ডবে একদিক ভেসেছে—অগণিত দেশবাসী সহায়-সম্বলহীন গৃহহারা হয়ে পড়েছে। কিন্তু অন্যদিকে গড়ে উঠেছে মানুষের জন্য মানুষের অপরিসীম সহানুভূতি অবিচ্ছিন্ন একাত্মতা। যাঁরা শিল্প ও তার মাধ্যমে জনমনোরঞ্জন ও ব্যবসায় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাদা এক দুনিয়া গড়ে তুলেছেন বলে জনসাধারণের যে ধারণা, আজ তা ভেঙেছে। আমোদের পশরা যাঁরা সাজিয়ে এসেছেন এতদিন, সাহায্যের ডালা ভরে আজ তাঁরা দুঃস্থের দ্বারে উপস্থিত। তাঁদের এই পুণ্যব্রত সফল হোক। আর্তের সেবায় তাঁদের এই মহান উদ্যম চিরকালের খাতায় সোনার আখরে লেখা থাকবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চিত্রালোচনা

দুখানি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহের নতুন আকর্ষণ। বাংলা একখানিও নয়। তবে আসছে সপ্তাহে মুক্তি পাবে চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ"।

হিন্দী ছবি দুটির নাম—"মোহর" ও "টিন-টিন-টিন"। নামেই প্রকাশ কি ধরনের ছবি এ দুটি।

"মোহর"-এর নির্মাতা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট মুভিজ। প্রবীণ অভিনেতা জয়রাজ ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ভূমিকালিপিতে আছেন গীতাবালী, শাম্মী কাপুর, তিওয়ারী, কুলদীপ কাউর, রণধীর, মিনু মমতাজ, ললিতা পাওয়ার ও ভগবান। গান লিখেছেন রাজেন্দ্রকৃষ্ণ এবং তাতে সুরারোপ করেছেন মদনমোহন।

কিরীট ফিল্মসের "টিন-টিন-টিন" একটি কুকুরের কাহিনী। সীজার নামক একটি সারমেয় এর প্রধান 'স্টার'। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন নীলোফের, সমর রায়, মীর্জাফর, হবিব, রাজেন কাপুর ও টুনটুন।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন বি জে প্যাটেল। ফুলো সি রাণী এর সুরকার।

• • •

নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত "মায়ামৃগ"-র মঞ্চাভিনয় দীর্ঘকাল নাট্যামোদীদের আনন্দ দিয়েছে। এম কে জি প্রোডাকসন্সের আগামী নিবেদন "মায়ামৃগ" এই সফল নাটকেরই চিত্ররূপ। এই ছবিতে অনেকদিন পর সন্ধ্যারাণীকে একটি বিশিষ্ট স্ত্রী চরিত্রে দেখা যাবে। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সুনন্দা দেবী, সন্ধ্যা রায়, তরুণকুমার, জহর রায় প্রভৃতি। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু এবং সুর সংযোজনায় রয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

• • •

মালা প্রোডাকশনের প্রথম নিবেদন "দুই বেচারা" মুক্তিপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। হাসি ও গানে ভরা এই ছবির মূল চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বাসবী নন্দী ও সন্ধ্যা রায়। বিশিষ্ট পার্শ্ব ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ বসু ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং ভূপেন হাজারিকা এর সংগীত পরিচালক।

• • •

অগ্রদূত পরিচালিত এম. পি-র "কুহক" আগামী আকর্ষণের তালিকায় পুরোভাগে। সমরেশ বসুর একটি নাট্যসমৃদ্ধ কাহিনীর চিত্ররূপ এই ছবি। ছবির মুখ্য চরিত্রের রূপদান করেছেন উত্তমকুমার। পার্শ্ব-চরিত্র গুলিতে রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু বসু, তুলসী চক্রবর্তী, আশা দেবী, মাঃ দীপক ও মাঃ সুশান্ত।

একটি ভিন্নধর্মী কাহিনীর ভিত্তিতে ভ্রাম্যমান সার্কাস দলের পটভূমিতে তোলা হচ্ছে রামধনু পিকচার্স-এর "তেরো নদীর পারে।" বহির্দৃশ্য সম্বলিত এই ছবিটি পরিচালনা করছেন বারীন সাহা। ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়ম হাজারিকা।

• • •

ইউরেকা পিকচার্স-এর প্রথম প্রয়াস "মায়ের গলার হার।" এই শিশু চিত্রটিতে উদ্ঘাটিত হবে এক কিশোরের অশ্রুসজল দুঃসাহসিক কাহিনী। ছবির কাজ অনতি-বিলম্বেই সুজিতকুমার নাগের পরিচালনায় আরম্ভ হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় মাঃ দীপক, মধুছন্দা, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, সুচেতা সিংহ, স্বদেশ-কুমার, তপতী ঘোষ প্রভৃতি শিল্পীদের দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

• • •

পরিচালক মৃণাল সেন কল্লোল ফিল্মস-এর "বাইশে শ্রাবণ"-এর বহির্দৃশ্য-গ্রহণের কাজ সমাপ্ত করে সম্প্রতি ছবিটির অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে হাত দিয়েছেন কয়েক দিন [illegible]। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-য়ে [illegible]বিটি এখন সমাপ্তির পথে। এক প্রৌঢ় দম্পতীক এই ছবির প্রধান পুরুষ। ২২শে শ্রাবণ তার বিয়ের দিনটিকে উপলক্ষ্য করে ফ্ল্যাশব্যাক ছবিতে উদ্ঘাটিত হবে বিশ বছর আগে তার নব-বিবাহিত জীবনের প্রণয়-মধুর দিনগুলি। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের রূপায়ণে আছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

• • •

ইউ. বি. ফিল্মস-এর "মনে মনে" ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে সম্প্রতি একটি নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ছবিটির পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র সম্প্রতি তাঁর দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীনগরের অনতিদূরে কোলহাই অঞ্চলে বরফের উপর ছবির

কয়েকটি বাইরের দৃশ্য তুলে আনতে। বরফের উপর থেকে পা পিছলে পরিচালক শ্রী মৈত্র এবং অভিনেতা নির্মল বিশ্বাস প্রায় দেড়শো ফুট নীচে গিয়ে পড়েন এবং গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের সংগে সংগেই শ্রীনগরে নিয়ে আসা হয়।

• • •

ন্যাশনাল পিকচার্স-এর পরবর্তী ছবি "মরেও যারা মরে না"-এর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ছবির পরিচালক মংগল চক্রবর্তী সম্প্রতি চিত্রনাট্য রচনায় ব্যাপৃত আছেন। ছবির কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় থাকবেন উত্তমকুমার, এবং সুরারোপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ঋত্বিক ঘটকের নির্মীয়মান চিত্র "চেনা মুখ"-এর দুটি প্রধান চরিত্রে অসীমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

• • •

আলোছায়া প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন "সপ্তপদী"র কাজ অজয় করের পরিচালনায় এ-মাসেরই শেষের দিকে আরম্ভ হবে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এটা জানা গেল, ছবিটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অবতরণ করবেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বহুপঠিত কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হচ্ছে।

• • •

টাইম ফিল্মস-এর দ্বিতীয় ছবি "স্মৃতি-টুকু থাক।" ভিন্নধর্মী একটি প্রণয়-কাহিনীর এই চিত্ররূপে সুচিত্রা সেনকে একটি দ্বৈতভূমিকায় দেখা যাবে। "চাওয়া-পাওয়া"-খ্যাত যাত্রিক পরিচালকগোষ্ঠী এই ছবি পরিচালনা করবেন। ছবিটির সুরকার নির্বাচিত হয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

অন্ধকারের অন্তরালে

কলিকাতার রাত্রির রহস্য গভীর। এই মহানগরীতে যামিনীর প্রতি যাম যেন গোপন পাপাচারের গ্রন্থিতে বাঁধা। এমনি কোন এক বিচিত্র পাপানুষ্ঠানের গ্রন্থি-উন্মোচনের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স-এর 'রাতের অন্ধকারে'।

কলিকাতার 'লাল আলো' এলাকায় এক বাঈজীর রহস্যজনক হত্যাকে কেন্দ্র করে মূলে কাহিনীর সূত্রপাত। পুলিস তার ঘরে পায় জয়ন্ত নামক এক বিজ্ঞানের ছাত্রের ল্যাবরেটরীর নোট বুক।

চোরাকারবার ও নানারকম পাপচক্রের সংগে জড়িত ব্যোমকেশ নামক এক লম্পট যেত এই বাঈজীর কাছে। বাঈজী তাকে আমল দিত না। বাঈজী যেদিন খুন হয়, সেদিন সন্ধ্যায় ব্যোমকেশকে দেখা যায় তার ঘর থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেরোতে।

এদিকে ল্যাবরেটরীর নোট বুকের সূত্র ধরে পুলিস জয়ন্তকে গ্রেপ্তার করে।

জয়ন্তের প্রণয়িনী ধনকুবের নীতীশ মজুমদারের একমাত্র মেয়ে রমা বিশ্বাস করে না যে, জয়ন্ত এমন কাজ করতে পারে। পুলিস যখন জয়ন্তকে জেরা করে, তখন সেও ভেবে পায় না, যে-নোটবুক সে রমাকে দিয়ে-ছিল, তা বাঈজীর ঘরে গেল কেমন করে। রমাকে এ-ব্যাপারে জড়াবে না বলে জয়ন্ত সে তথ্য চেপে যায়। কিন্তু নোটবুকে জয়ন্তের আংগুলের ছাপের সংগে নিহত বাঈজীর ঘরের কাঁচের গ্লাসের আংগুলের ছাপের মিল না থাকায় জয়ন্ত ছাড়া পেল। এই কাঁচের গ্লাসে মদের সংগে পটাসিয়াম সায়নাইড মিশিয়ে বাঈজীকে হত্যা করা হয়েছে বলেই পুলিসের সন্দেহ।

জয়ন্ত নোটবুক দিয়ে চলে যাওয়ার পর রমার পড়ার ঘরে তার বাবা ও কুমার কমলেশনারায়ণ ছাড়া আর কেউ ঢোকেনি। তবে এই নোটবুক বাঈজীর ঘরে গেল কেমন করে? রমা সন্দেহ করে, কমলেশই প্রকৃত অপরাধী।

কুমার কমলেশনারায়ণ বিপুল ধনসম্পদের মালিক। রমার বাবার ইচ্ছা কমলেশের সংগেই মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু রমা কমলেশকে

পছন্দ করে না। তার দৃঢ় ধারণা, কমলেশই তার পড়ার ঘর থেকে নোটবুক সরিয়েছে। সে কমলেশকে তার বাবার সামনেই একদিন দুশ্চরিত্র, খুনী বলে অপমান করে। এদিকে জয়ন্তর সংগে অন্তরংগ মেলামেশার জন্য রমাকে তার বাবার কাছে গঞ্জনা সইতে হয়। জয়ন্তকে সহ্য করতে পারেন না রমার বাবা। তিনি তাকে অপমানও করেন। জয়ন্তর অপমানে রমা বাড়ী ছেড়ে চলে যায় চাকুরি জীবন থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক নিঃসংগ ভদ্রলোকের গৃহে। রাস্তায় এক মোটর দুর্ঘটনা উপলক্ষ্য করে তাঁর সংগে রমার পরিচয়। রমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালোবাসেন। রমাকে দেখলে নিজের হারিয়ে যাওয়া মেয়ের কথা তাঁর মনে হয়।

জয়ন্তই রমার গুপ্ত ঠিকানা কর্তব্যবোধে জানায় নীতীশবাবুকে। নীতীশবাবুর অনুরোধে গোয়েন্দা অসীম ও জয়ন্ত আসে রমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। রমা অসীমের কাছে বলে তার সন্দেহের কথা। কমলেশই তার পড়ার ঘর থেকে জয়ন্তর নোটবুক সরিয়েছে এবং বাঈজীর হত্যাকারী রমার মতে কমলেশই।

ইতিমধ্যে অসীম অনেক কৌশলে ব্যোমকেশকে গ্রেপ্তার করেছে। রমার কাছে কমলেশ সম্পর্কে নতুন তথ্য পেয়ে অসীম যেন নতুন আলোর সন্ধান পায়। এদিকে রমাকে নিতে আসেন তার বাবা। তিনি রমার আশ্রয়দাতার অতীত কর্মজীবনের ছবি দেখে কেমন যেন মুহূর্তের জন্য বিচলিত হন এবং তাঁর সংগে দেখা না করেই চলে যান। অসীম এটা লক্ষ্য করে এবং পরে ছবিটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যায়।

এই ছবিই অসীমকে পাপ-রহস্য ভেদ করতে সাহায্য করে এবং পরে রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্য দিয়ে অসীম প্রকৃত অপরাধীর স্বরূপ ফাঁশ করে কিভাবে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়, তা নিয়েই গড়ে উঠেছে এই অপরাধ-নাটকের নাট্য পরিণতি।

রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরি। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ পুলিস জীবনে বহু বিচিত্র পাপী ও পাপাচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই কাহিনীর উপাদান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। ফলে অপরাধ-নাটকটি সম্পূর্ণভাবে না হলেও অনেকাংশে কষ্টকল্পনা থেকে মুক্ত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত এই ছবির চিত্রনাট্যের বড় গুণ হলো যে এতে অপরাধ-নাটকের মূল রস অর্থাৎ 'সাসপেন্স' শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে। কাহিনীর প্রকৃত খলনায়কের পরিচয় জানবার জন্যে দর্শকদের কৌতূহল সব সময় যেমন বজায় থাকে, তেমনি প্রকৃত অপরাধীর পরিচয়

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "মৃতের মর্ত্যে আগমন"-এর একটি দৃশ্যে জহর রায় ও তপতী ঘোষ

পেয়ে তাঁদের বিস্ময়ও যায় বেড়ে। এটাই 'ক্রাইম' ছবির সাফল্যের প্রমাণ। এবং এর জন্য ধন্যবাদার্হ শুধু চিত্রনাট্যকার একাই নন, অগ্রণী পরিচালকগোষ্ঠীও। ছবিটিতে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ রসের বিস্তারেও পরিচালকবৃন্দ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাহিনীর মূল অপরাধ-উপাদানের সংগে সংগে রমা ও জয়ন্তর প্রণয়োপাখ্যানটিও চমৎকারভাবে মিলেছে। পাপের পঙ্কিল আবর্তে প্রেমোপাখ্যানটি যেন পংকজেরই সুরভি নিয়ে আসে।

কিন্তু ছবিটিতে অবাঞ্ছিতরূপে কিছু পরিমাণে বিকৃত রসও পরিবেশন করা হয়েছে। যে সমস্ত আমোদ-উপকরণ হিন্দী 'ক্রাইম' ছবিতে বেশ মানিয়ে যায়—যেমন হোটেলে নর্তকীর নিম্ন প্রবৃত্তি উত্তেজক নাচ-গান ও তাকে কেন্দ্র করে অভব্য আবহাওয়া—বাংলা ছবিতে তা এখানকার দর্শকদের পীড়াই দেয়। বিশেষতঃ অপরাধ-নাটকটির সংগে এই হোটেল নর্তকীর কাহিনীগত কোন সম্পর্ক মোটেই নেই। রমার কমলশনারায়ণের প্রতি তার প্রণয়-নিবেদনও একটি অর্থহীন ও নাট্যপরিণতি-বিহীন সাজানো ব্যাপার বলে মনে হয়েছে।

ছবির অন্যতম বড় বৈসাদৃশ্য কমলেশের চরিত্রটি। রমার প্রতি তার এমন কোন অনুরাগ দেখানো হয়নি যে, রমার কাছে অপমানিত হয়ে তাকে মাতাল হতে হবে এবং প্রলাপ বকতে হবে। আবার রমার প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও হোটেল নর্তকী

তন্দ্রাকে তাঁর উপহার দান ও তার সংগে মধুসন্ধ্যা যাপন যেন আরও বেশী কল্ট-কল্পিত। কারণ দুশ্চরিত্র বহুবল্লভা রূপেও তাকে দেখানো হয়নি। অন্যদিকে তার ওপর রমা ও গোয়েন্দার সন্দেহকে কেন্দ্র করে আশানুরূপ কোন 'সাসপেন্স' গড়ে তোলা হয়নি। ছবিতে প্রকৃত অপরাধীকে দেখানো হয়েছে হাসপাতালে আহত অবস্থায়। সে-ই যে প্রকৃত অপরাধী, দর্শকেরা তখনই তা জেনে বিস্মিত হন। কিন্তু কাহিনীকারের বক্তব্য বিশ্বাস করেই দর্শকদের অবাক হতে হয়। অথচ মোটর দুর্ঘটনার পরিবর্তে যদি শেষ সংঘর্ষে সে অসীমের হাতে পাপীর বেশেই ধরা পড়ত, তাহলে এর পরের দৃশ্যে আসল তথ্যের উদ্ঘাটন আরও বিশ্বাস-যোগ্য হত এবং দর্শকদের বিস্ময়ের ও রোমাঞ্চের দোলা লাগতে পারত।

অভিনয়ের দিক দিয়ে ছবিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায়। ধনীকন্যা রমার চরিত্রে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় প্রণয়ের আবেগ ও প্রিয়জনকে না-পাওয়ার ব্যথা সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রণয়ীর ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। খোলা ছাতের ওপর একটি নেপথ্য সংগীতের সময় তাঁর অস্ফুট ব্যথার অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়। গোয়েন্দা অসীমের চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায়ও চমৎকার অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গোয়েন্দা চরিত্রের কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তাঁর চরিত্রায়ণে পরি-স্ফুট।

একটি লম্পট ও দুর্বৃত্তের ভূমিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিকতা আরোপ করেছেন। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর বেশে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় বেশ চরিত্রোচিত। রমার সংগে স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়া এক প্রৌঢ়ের চরিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রেখাপাত করে। কমলেশরূপী অসীমকুমার তাঁর চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেননি। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশংসা পাবার মতো অভিনয় করেছেন তমর মল্লিক, চন্দ্রাবতী, শুক্লা সেন জহর রায় ও ডাঃ হরেন। সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই) হোটেল নর্তকীর চরিত্র ও তার হাস্য-লাস্য ভালোই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কমলেশের প্রণয়িনীরূপে তাঁর অভিনয় নিষ্প্রভ। হেলেনের একটি নৃত্যাংশ আকর্ষণীয়।

সংগীত পরিচালনায় ভি বালসারা আবহ-সংগীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী। রমার ব্যথার মুহূর্তের নেপথ্য সুর মূর্চ্ছনা মনে নাড়া দেয়। গানগুলি সুন্দর, সুরারোপিত ও সংগীত। আলোকচিত্র, শব্দ গ্রহণ ও সম্পাদনার কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন বিমল গুপ্ত, জে ডি ইরাণী ও গোবর্ধন অধিকারী। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক ও আংগিক সজ্জা পরিচ্ছন্ন।

পরলোকে নিরঞ্জন পাল

গত সোমবার বোম্বাইতে সুবিখ্যাত চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক নিরঞ্জন পাল ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে ভুগছিলেন, মৃত্যুর কারণও ঐ রোগ।

বাগ্মী ও মনস্বী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। কৈশোরে তিনি পিতার সংগে ইংলণ্ডে যান এবং সেইখানেই শিক্ষা-জীবন শেষ করে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কিংস্ কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে পড়তে তিনি তা ছেড়ে চলচ্চিত্র শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঠিক সেই বছরেই ভারতের প্রথম পূর্ণাংগ চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' মুক্তি পায় বোম্বাইয়ের করোনেশান থিয়েটারে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক আখ্যাধারী ডি জি ফালকে তার নির্মাতা।

যুবক নিরঞ্জন প্রথমে যোগ দেন ন্যাচুর্যাল কলার কিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানীর সুরবিটন স্টুডিওতে অবৈতনিক শিক্ষানবীশ হিসাবে। সে যুগে রঙীন ছবির সেরা প্রতিষ্ঠান ছিল এই কোম্পানী। তারপর ওদেশের নানা স্টুডিওতে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে অবশেষে তিনি নিজের বৃত্তি বেছে নেন চিত্রনাট্যকার রূপে।

নিরঞ্জন পালের প্রথম চিত্রনাট্য "দি ফেথ্ অফ এ চাইল্ড" (শিশুর বিশ্বাস) নামে চিত্রাকারে রূপান্তরিত হয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গমো-ব্রিটিশ-এর প্রথম ছবি "এ জেন্টেলম্যান অফ প্যারিস"-এর চিত্রনাট্যও লেখেন তিনি।

নির্বাক ছবির যুগে ইংলণ্ডের চলচ্চিত্র মহলে নিরঞ্জন পাল সহজেই চিত্রনাট্যকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

স্বর্গত হিমাংশু রায় যখন জার্মানীর এমেলকা কোম্পানীর সহযোগিতায় "লাইট অফ এশিয়া" (১৯২৫) ছবিটি তোলেন, তখন তিনি নিরঞ্জন পালকে আহ্বান করেন তার চিত্রনাট্য লিখতে। এই ছবিটি ইউরোপে প্রচুর সমাদর পায়। প্রতীচ্যে ভারতীয় চিত্রে এমনিধারা জনপ্রিয়তা লাভ এই প্রথম। তারপর শ্রী পাল হিমাংশু রায়ের পরবর্তী ছবি "সিরাজ" (১৯২৭) ও "থ্রো অফ এ ডাইস" (১৯২৮)-এর চিত্রনাট্যও লেখেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নিরঞ্জন পাল ভারতে ফেরেন এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অরোরা ফিল্ম করপোরেশানের একাধিক বাংলা ও তামিল-তেলেগু ছবির পরিচালনাও করেন। হিমাংশু রায় যখন বম্বে টকিজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর আহ্বানে তিনি বোম্বাইতে গিয়ে বসবাস করেন। বম্বে টকিজের তদানীন্তন ছবিগুলির চিত্রনাট্য তাঁরই লেখা।

গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে বোম্বাইয়ের গিরগাঁও অঞ্চলে বসবাস করছিলেন। তাঁর পত্নী ও একমাত্র পুত্র বর্তমান।

ভগবান শোকসন্তপ্ত পরিজনদের শান্তি দান করুন।

বাংলা রংগমঞ্চের প্রগতি

আমেরিকার বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলিতে নাটক ও অভিনয় নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলে। প্রগতিশীল কলেজগুলির প্রত্যেকটিতে এই সব বিষয়ে অধ্যাপনার জন্যে যেমন বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তেমনি প্রত্যেকটির সংলগ্ন একটি করে থিয়েটার আছে যেখানে নাট্যানুরাগী ছাত্রের দল নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ পান।

নিউ ইয়র্কের হাণ্টার কলেজ এমনিধারা একটি প্রগতিশীল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সেখানকার নাট্যশাস্ত্রের অধ্যাপক ও থিয়েটার ওয়ার্কশপের ডিরেক্টর চার্লস এলসন ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। এই বৃত্তির সর্ত অনুযায়ী তিনি এখানে ছ'মাস নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টস ও দিল্লীর ন্যাশন্যাল স্কুল অফ ড্রামা এই দুটি প্রতিষ্ঠানে। এছাড়া তিনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়েও যাবেন, কারণ নাট্যশিল্প এখানকারও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যাপক এলসনের সফর-সূচীর মধ্যে কলকাতার নাম ছিল না। কিন্তু এখানে রংগমঞ্চ যেমন জীবন্ত তেমনি প্রতিপত্তিশালী—তাই শুনে তিনি গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। এসে তিনি শুধু বিভিন্ন থিয়েটারের চলতি নাটকগুলি দেখেই ক্ষান্ত হননি, এখানকার শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন অভিনেতা, প্রযোজক, সংগীত-শিল্পী ও কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিনিধির সংগে আলাপ-আলোচনাও করেছেন।

যাবার আগে তিনি এখানকার নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন তার সারাংশ এখানে দেওয়া হল। অধ্যাপক এলসন বলেন যে তাঁর কলকাতায় আসা সার্থক হয়েছে। এখানকার থিয়েটার দেখে তাঁর ধারণা হয়েছে যে বাংলা নাটক বা অভিনয়ের মান প্রতীচ্যের মতই উন্নত। তিনি বলেছেন যে কলকাতার অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীরাও যেমন সুদক্ষ, তেমনি চমৎকার এখানকার দর্শকবৃন্দ। তিনি এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন—"আপনাদের রংগমঞ্চ প্রাণশক্তি বিশিষ্ট, এর মধ্যে এমন সব উপাদান রয়েছে যা আপনাদের জাতীয় কৃষ্টির অংগীভূত হতে পারে অনায়াসে।"

সাংবাদিকদের সংগে আলোচনা প্রসংগে অধ্যাপক এলসন বলেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাট্যমঞ্চ দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পেশাদারী অপেশাদারী, ছাত্র-সংস্থা ইত্যাদি সবরকম জড়িয়ে ওদেশে থিয়েটারের সংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ। এবং এই দু'লক্ষ থিয়েটারের জন্যে নাটক লেখাও হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রাণ্তিক শাখা আগামী ১৬ই নবেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বরূপা মঞ্চে তাঁদের পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক "সংক্রান্তি"-র অভিনয় ব্যবস্থা করেছেন বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে। নাট্যরচনা, পরিচালনা ও আলোকসম্পাতে যথাক্রমে বীরু মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও তাপস সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

* * *

আগামী সোমবার রঙমহলে "একমুঠো আকাশ"-এর শততম অভিনয়পূর্তি উপলক্ষে যে স্মারক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, তার প্রধান আকর্ষণ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বনামধন্য পুত্র দিলীপকুমার রায়ের এক ঘন্টাব্যাপী সংগীতানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আরো থাকবেন দিলীপকুমারের কন্যা-শিষ্যা ইন্দিরা দেবী ও দু'জন আমেরিকান শিষ্য—রিচার্ড মিলার ও ডন ট্যাঙ্কে। এঁরাও দিলীপকুমারের সংগে বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান গেয়ে শোনাবেন। সংগীতানুষ্ঠানের পর ধনঞ্জয় বৈরাগীর বাস্তবধর্মী নাটক "এক মুঠো আকাশ" পুনরভিনীত হবে। এই অভিনয়ের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দান [illegible]।

একলব্য

কলকাতার ক্রিকেট মরসুম ঢিমে তালে আরম্ভ হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ বছরের অতিবৃষ্টিই ক্রিকেট মরসুমের আশু সূচনায় এক বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ক্রিকেট বিজ্ঞানসম্মত খেলা। খেলায় যেমন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন, তেমন বৈজ্ঞানিক প্রথায় খেলার জন্য মাঠ তৈরীরও প্রয়োজন। ফুটবলের দাপটে ক্ষতবিক্ষত মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করে তুলতে হলে মাঠকে প্রায় ঢেলে সাজতে হয়। নতুন মাটি ফেলতে হয়, নতুন ঘাস তৈরী করতে হয়। তাতে জল সিঞ্চন—করে, তাকে ডলাইমালাই করে একখানি সবুজ কার্পেটের মত করতে হয়। যাতে কোথাও অসমান না থাকে। আবার শুধু পরিপাটি মাঠ হলেই ক্রিকেট খেলা জমে না। ক্রিকেটের জন্য চাই শীতের আমেজ আর মিঠে রোদ। একটু একটু করে শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। এদিকে মাঠও প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। সুতরাং অল্প-দিনের মধ্যেই পুরোদমে আরম্ভ হবে কলকাতার ক্রিকেট মরসুম। কিন্তু শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের পাক-ভারত সফরের জন্য কলকাতার ক্রিকেট কারো মন টানবে কি? সবারই আগ্রহভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে অস্ট্রেলিয়ার খেলার খবরের দিকে। যে সব খেলোয়াড় নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল এবার এই উপ-মহাদেশ সফর করছে—এমন সব গুণী খেলোয়াড় সমন্বয়ে গড়া কোন দল এর আগে এ দেশ সফর করেছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ১৯৫৬ সালেও ইংল্যাণ্ড সফর শেষে অস্ট্রেলিয়া দল দেশে ফেরবার মুখে ভারতে তিনটি ও পাকিস্থানে একটি টেস্ট খেলেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সে দলটি ছিল ইংলণ্ডের কাছে হারা দল। আর এবার সফর করছে ইংলণ্ডজয়ী পরম শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দল। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে আজ যারা বিশ্ব-ক্রিকেটের পুরোভাগে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বিনোডও বলেছেন, তাঁরা দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক ক্রিকেট খেলারই অবতারণা করবেন। ক্লেশদায়ক ঠুকঠাক ক্রিকেট তাঁদের চরিত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং ভারত তথা পাকিস্থানের ক্রীড়ামোদীরা মাস আড়াই অস্ট্রেলিয়া দলের সফর এবং সফরের আলোচনা নিয়েই মশগুল হয়ে থাকবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

* * *

আগামী ১৩ই নবেম্বর থেকে ঢাকায় আরম্ভ হচ্ছে পাকিস্থানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা। পাকিস্থানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার যে তিনটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হয়, তার মধ্যে ঢাকা ও করাচীর টেস্ট খেলা হবে নারকেলের দড়ির তৈরী ম্যাটিংয়ে, লাহোরের টেস্ট খেলা হবে ঘাসের উইকেটে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা ম্যাটিংয়ে খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। প্রথমে কথা হয়েছিল পাকিস্থানের তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটি খেলা হবে ঘাসের উইকেটে, একটি ম্যাটিংয়ে। এখন উল্টো ব্যবস্থা হওয়ায় সাধারণভাবেই অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহল মনোক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ নিয়ে কাগজে কাগজে লেখালেখিও কম হয়নি। ম্যাটিংয়ে পাকিস্তান খুবই ভাল খেলে। বিশেষ করে পাকিস্তানের অধিনায়ক ফজল মামুদের বল খেলা ম্যাটিং উইকেটে হয় রীতিমত মারাত্মক। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া দল ম্যাটিংয়ে খেলতে অভ্যস্ত তো নয়ই, তাদের মধ্যে অনুশীলনেরও অভাব আছে। ৬ মাস ধরে দেশে একটু-আধটু অনুশীলন করেই তারা সফরে বেরিয়েছে। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাটিং উইকেটে তাদের খেলার ফলাফল কি হবে বলা শক্ত। তাই এ সম্বন্ধে এখন কিছু না বলাই ভাল।

তবে পাকিস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া যেমনই খেলুক, ভারতের তুলনায় তারা যে প্রবল পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাঁচটি টেস্ট খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ভারতেও প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে। ইংলণ্ড থেকে সদ্য-প্রত্যাগত ও পরাভূত ভারতীয় খেলোয়াড়দের অবশ্য অনুশীলনের খুব বেশী প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে মনোবল সঞ্চয়ের, আর প্রয়োজন আছে আস্থা অর্জনের। আগামী ১৩ই নবেম্বর [illegible] ভারতীয়

ভারত ও পাকিস্তান সফরকারী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল। অস্ট্রেলিয়া থেকে ঢাকা যাবার মুখে দমদম বিমানঘাটিতে এই ছবি তোলা হয়

কুমারটুলী পার্কে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন কুমারী আরতি সাহার গলায় উপহারস্বরূপ শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ প্রদত্ত সোনার হার পরিয়ে দিচ্ছেন; পেছনদিকে বসে আছেন ডাঃ বিমলচন্দ্র

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন বসছে। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অনাচারের অনেক তথ্য এবং অনেক রহস্য এই সভায় উদ্ঘাটিত হবার সম্ভাবনা আছে। আবার সব ব্যাপার ধামাচাপা দিয়ে একটা গোঁজামিলের চেষ্টা চলছে বলেও কানে খবর এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্ধারণের এক বড় সমস্যাও আছে। কে অধিনায়ক হবেন? কে যোগ্য-ব্যক্তি? এই সম্পর্কে ক্রিকেট মহলে আলাপ আলোচনার অন্ত নেই।

কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু অনেকগুলি। তার মধ্যে একটি অধিনায়কের ভোটাধিকারের প্রশ্ন। বেংগল ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই প্রস্তাবের উত্থাপক। এতদিন খেলোয়াড় নির্বাচন সম্পর্কে অধিনায়কের কোন ভোট ছিল না। এইবার বেংগল ক্রিকেট এসোসিয়েশন অধিনায়ককে ভোটাধিকার দিবার জন্য এক প্রস্তাব তুলেছেন। দল গঠনের ব্যাপারে অধিনায়কের ভোটাধিকার থাকা খুবই উচিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য ও তাঁর খেলার খুঁটি-নাটি বিচার করার সুযোগ অধিনায়কের যতটুকু থাকে, নির্বাচকমণ্ডলীর ততটুকু থাকে না। তাছাড়া দলের প্রতি খেলোয়াড় অধিনায়কের আস্থাভাজন হলে তার ফলও ভাল হয়। খেলার ফলাফল এবং ভাল-মন্দের বিরাট দায়িত্ব অধিনায়কের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন অর্থ হয় না। দল নির্বাচনে তোমার কোন কথা খাটবে না, অথচ দায়িত্ব পুরোপুরি তোমার, এ কেমন ব্যবস্থা? তাই ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সদস্যরা সি এ বি'র প্রস্তাব মেনে নিয়ে যদি অধিনায়ককে ভোটাধিকার দেন, তাতে ক্রিকেটের উন্নতিই হবে। এই প্রসংগে সি এ বি'র নিজের কথাটাও একবার ভাবা দরকার। আজ বোর্ডের সভায় অধিনায়কের ভোটাধিকারের জন্য তাঁরা প্রস্তাব তুলেছেন —তাঁদের নিজেদের এসোসিয়েশনে অধি-নায়কের ভোটাধিকার আছে কি?

• • •

নবেম্বরের ১২ তারিখ থেকে বোম্বাইতে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে। জাতীয় সাঁতারে যোগদানের জন্য বাঙলার সাঁতারু এবং ওয়াটারপোলো দলও বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছে। অবশ্য ঘরোয়া কোঁদলের জন্য স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবের কয়েকজন নামকরা সাঁতারু প্রথমে বোম্বাই যাননি। পরের দিন তাঁরা বোম্বাই যাত্রা করেছেন। কিন্তু সাঁতার পটিয়সী সন্ধ্যা চন্দ্রের যাওয়া সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যা এবার জাতীয় সাঁতারে যোগ দিলে মেয়েদের বিভাগে গতবারের দলগত চ্যাম্পিয়ন বাঙলার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ ছিল না। শুধু কি চ্যাম্পিয়নশিপ? কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্রের তিন চারিটি বিষয়ে এবং রিলে রেসে বাঙলার মেয়েদের এবার নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু ঘরোয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সব সুযোগই নষ্ট হয়ে গেল। নিজেদের কোঁদলের যূপকাষ্ঠে ক্লাব বিশেষের কর্ম-কর্তারা আজ বাঙলার সম্মানকে বলি দিলেন।

খোঁজ-খবর নিয়ে যতটুকু জানা গেছে, তাতে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ খুব বেশী গভীর নয়। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের অভিযোগঃ গতবার দিল্লীতে জাতীয় ওয়াটারপোলো খেলায় বাঙলার অধিনায়ক ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য ভুবনেশ্বর পাণ্ডে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের বেশী সভ্যকেই বাঙলা দলে স্থান দিয়েছিলেন। তাই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের দাবি ছিল ওয়াটারপোলো খেলার জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে কারা প্রথম দলে স্থান পাবেন, সেকথা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হোক। সাঁতার ও ওয়াটারপোলো দলের জন্য এবার কোন অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়নি। অধিনায়ক নির্বাচন করার জন্যও সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব দাবি করেছিল, তা ছাড়া তাদের বক্তব্য, সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য অমল কুঠারীরই এবার অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এবার কোন অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়নি। স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবের অভিযোগঃ তাদের নামকরা সাঁতারু বেণীমাধব তালুকদার ওয়াটারপোলো খেলায় সুপটু হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কেন ওয়াটারপোলো টীমে স্থান দেওয়া হয়নি? এ ছাড়া ছোটখাটো আরও

কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে। মোটের উপর এই সব তুচ্ছ কারণেই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব এবং স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাব বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের সঙ্গে অসহযোগিতা করে প্রথমে দূরে সরে ছিল। একটা মিটমাটের জন্য যথেষ্টই চেষ্টা করা হয়েছিল। বাঙলার মহিলা সাঁতারু দলের ম্যানেজার বিধানসভার সদস্যা শ্রীযুক্তা সুধারাণী দত্ত এবং পুরুষ দলের ম্যানেজার স্বনামধন্য খেলোয়াড় ডাঃ মন্মথ দত্তও মিটমাটের চেষ্টা করেন নি এমন নয়: কিন্তু কোন চেষ্টাই কার্যকরী হয় নি। পরে শুভ-বুদ্ধির উদয় হওয়ায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্লাবের সাঁতারুরা বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কে কতটুকু লাভবান হবেন বলা শক্ত। কিন্তু বাঙলার সাঁতারের যে লোকশান অনেকখানি, সেকথা সর্ববাদিসম্মত। বিশেষ করে একটা উঠ্‌তি মেয়ে, যার আজ ভারতীয় সাঁতারে চারটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁকে দূরে সরিয়ে তাঁর সাঁতারের অভিভাবকেরা মোটেই সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি। ভারতীয় সাঁতারে ডলি নাজিরের দেশজোড়া নামডাক। কুমারী সন্ধ্যা ডলি নাজিরের সব রেকর্ডই হয়তো এবার ভেঙে দিয়ে এক নতুন কীর্তির অধিকারিণী হতেন। কিন্তু সন্ধ্যার সে সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। আগামীবার সন্ধ্যা চন্দ্রের এ নৈপুণ্য বজায় থাকবে কি না কে জানে! যদি না থাকে তবে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্রই কি তাঁর তথাকথিত সাঁতারের অভিভাবকদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবেন? আমার মনে হয় ক্লাবের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয়েরা সব দিক বিচার করে না দেখেই বাঙলা দলের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। নির্বাচনে ত্রুটি থাকতে পারে। আবেদন প্রতিনিধি প্রতিনিধিদের সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত সেটা নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। বাইরে যাতে ঘরের সুনাম নষ্ট না হয় সেইভাবেই সবার কাজ করা উচিত। আগে বাঙলার সম্মান তার পর নিজের এবং ক্লাবের সম্মান।

• • •

এবার জাতীয় সাঁতারে মেয়েদের বিষয়ে কোন নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কারণ সন্ধ্যা চন্দ্র, যিনি ডলী নাজিরের ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকের রেকর্ডের সময় ইতিপূর্বেই ম্লান করে দিয়েছেন তিনি যখন দূরে সরে রইলেন এবং আর কোন মেয়ের সাঁতার-মানও তেমন উন্নত নয় তখন জাতীয় সাঁতারে মেয়েদের বিভাগে নতুন রেকর্ডের আশা সুদূরপরাহত।

তবে পুরুষদের বিভাগে অনেক বিষয়েই যে এবার নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ সামরিক বিভাগের সাঁতারুরা সম্প্রতি তাদের সাঁতার প্রতি-যোগিতায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। অনেক বিষয়েই এরা আগের রেকর্ডকে পেছনে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। এখানে কিছু কিছু বিষয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

২০০ মিটার বুক সাঁতারে ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ডের রামদেও সিংয়ের ভারতীয় রেকর্ড ছিল ২ মিনিট ৪৯·৭ সেকেণ্ড। ২০০ মিটার বুক সাঁতারে এখন রামদেও সিংয়ের সময় ২ মিনিট ৪৪·৫ সেকেণ্ড। ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের রাম সিং ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে শ্রীচাঁদ বাজাজের ভারতীয় রেকর্ডকে ৭·৮ সেকেণ্ডে এবং ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নিজের রেকর্ডকে ৩·১৮ সেকেণ্ডে উন্নত করেছেন। ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের রূপচাঁদের নিজের রেকর্ডের উন্নতি হয়েছে ২·৬ সেকেণ্ড। ২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে বোম্বাইয়ের সুভাষ নাঠের ভারতীয় রেকর্ডকে (২ মিঃ ৫৯ সেঃ) পেছনে ফেলে সাদার্ন কম্যাণ্ডের লেঃ নায়ক মুরুগম ২ মিঃ ৪৯·১ সেকেণ্ডে উন্নত করেছেন। ৪×২০০ মিটার রিলে রেসে ভারতীয় রেকর্ড সময়ের চেয়েও ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের সময় প্রায় ১০ সেকেণ্ড কম। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়েই নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। দেখা যাক্ কে কতটা উন্নতি করতে পারেন।

• • •

কুমারী আরতি সাহা ও ডাঃ বিমল চন্দ্র ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে দেশে ফিরে এসেছেন। দমদম বিমানঘাটিতে ক্রীড়া-উৎসাহী ও সাঁতারের পূজারীরা এদের যেভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন তা যে কোন খেলোয়াড়ের জীবনের দুর্লভ সম্মান বলা যেতে পারে। বিমান থেকে অবতরণের পরই আরতি ও বিমলের বীর-পনার অনুরাগীরা ফুলের মালা ফুলের তোড়ায় দুই সাঁতারুকে ঢেকে ফেলেন। তারপর বিপুল দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তির মধ্যে শোভাযাত্রা করে দুই সাঁতারুকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। পত্রপুষ্প এবং আল্পনায় সুন্দর শোভিত সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ভবনে নহবতের সানাইয়ের সুরের মধ্যে ডাঃ বিমল চন্দ্র নিজ ক্লাবে পদার্পণ করেন। কুমারী আরতি সম্বর্ধনা পান তার নিজ প্রতিষ্ঠান হাটখোলা ক্লাব ভবনে।

কলকাতায় আসবার পর প্রায় প্রতিদিনই এরা এখানে ওখানে এ ক্লাবে ও ক্লাবে সম্বর্ধনা পাচ্ছেন আর সব জায়গাতেই বলছেন দেশবাসীর আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদই তাদের জয়যাত্রা এবং অভিযান সার্থক করে তুলেছে। অপরদিকে যারা সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন তারা বলছেন ঐকান্তিক আগ্রহ, অদম্য মনোবল এবং দৃঢ় সঙ্কল্পই আরতি ও বিমলের সাফল্যের সোপান। সত্যিই আগ্রহ, মনোবল এবং দৃঢ়সংকল্প না থাকলে যে কোন কষ্ট-সাধ্য বড় কাজ করা যায় না। আরতি ও বিমলের সাফল্য তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরতি অতি সাধারণ ঘরেরই একটি মেয়ে। বিমল চন্দ্রও সাধারণের উপরে নয়। অবশ্য দুজনেরই সাঁতারে সুনাম ছিল। কিন্তু বিমল চন্দ্র সাঁতার একরকম ছেড়েই দিয়ে-ছিলেন। আরতিরও সাঁতারুজীবনের গৌরবোজ্জ্বল লগ্ন অতীত হয়ে গিয়ে-ছিল। সেই আরতি ও বিমল ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেলের হিমশীতল জল এবং উত্তাল ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে সাঁতার কেটে চ্যানেল জয় করেছেন, যাকে জয় করা চ্যানেলের কোলে লালিত পালিত বহু দক্ষ সাঁতারুর পক্ষে সম্ভব হয় নি। দুই সাঁতারুর অটুট সংকল্প ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না। কোন বড় সাফল্য অর্জনের পক্ষে কোন বাধাই যে প্রতিবন্ধক নয় এরা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। আর কুমারী আরতি বাড়িয়েছেন সমগ্র এসিয়ার নারী জাতির সম্মান।

সুদীর্ঘ কাহিনী ভাঙার বীরপনা অব-হেলিত নারীজাতির প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য ও নীতির কতখানি পরিবর্তন করতে পারে চ্যানেল বিজয়িনী আরতি ও প্যারাস্যুট জাম্পার গীতা চন্দ তার প্রমাণ। যদিও মেয়েদের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার কোন আইনগত বাধা নেই তবুও ইঞ্জি-নীয়ার হিসাবে চাকরী লাভের ব্যাপারে মেয়েরা ছিলেন অপাংক্তেয়। সরকারী নীতিই ছিল ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কোন মেয়েকে নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় এই নীতির পরিবর্তন করে এক ফতোয়া জারী করেছেন। তিনি বলেছেন আরতি যদি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারে আর গীতা যদি পারে প্যারা-স্যুট বেঁধে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়তে তবে ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে মেয়েদের নিয়োগ করতে বাধা কোথায়? সাবাস আরতি, সাবাস গীতা। ধন্যবাদ ডাঃ রায়কে। বীরত্বের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, আবার সেই বীরত্বের যথাযথ স্বীকৃতি দানও ঔদার্যের লক্ষণ।

দেশী সংবাদ

২রা নভেম্বর—খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও স্বাধীন ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ জন মাথাই আজ বেলা ১২টার সময়ে বোম্বাইয়ে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যকৃতে ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন।

৩রা নভেম্বর—ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে বর্তমানে এমন কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পৌঁছিয়াছে, যাহাতে বোঝা যাইতেছে যে, চীনা সরকার নিয়োজিত গুপ্তচরগণ দার্জিলিং জেলার এক শ্রেণীর পাহাড়ীদিগকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কানপুরের কালেক্টরগঞ্জ থানায় পুলিসের এক হেড কনস্টেবল জনৈকা স্ত্রীলোককে নিগৃহীত করে বলিয়া সংবাদ প্রচারের পরেই আজ অপরাহ্নে কয়েক সহস্র লোকের এক উত্তেজিত জনতা ইষ্টকাদি লইয়া কালেক্টরগঞ্জ পুলিস থানা আক্রমণ করিলে পুলিস গুলি চালায়। এই ঘটনায় ১১ জন নিহত ও ১৩৭ জন আহত হইয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর—প্রায় চারি সহস্র ছাত্র অদ্য সকালে দিল্লিতে চীনা দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া চীন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত "চায়না টু-ডে" নামক এক প্রচারপত্র ভস্মীভূত করে। এই পত্রে এক মানচিত্রে কয়েক সহস্র মাইল ভারতীয় অঞ্চলকে চীনের অংশ বলিয়া দেখান হইয়াছে।

৫ই নভেম্বর—কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলী যাদবপুর, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং উত্তর শহরতলী বরাহনগর, সিঁথি বনহুগলী ও দমদমের বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু সমাজ-বিরোধী দুর্বৃত্তশ্রেণীর লোক আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বিভিন্নসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

'যে আগে আসিবে সে আগে সুবিধা পাইবে'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের জমি ও গৃহ বণ্টনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

৬ই নভেম্বর—অমৃতসর পুলিস স্থানীয় অলঙ্কার ব্যবসায়ী মোহন সিংয়ের নিকট হইতে একটি দুর্লভ বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার করিয়াছে। এই বুদ্ধমূর্তির মূল্য ৫ লক্ষ টাকারও অধিক। একখণ্ড অতি মূল্যবান সবুজ পান্নায় নির্মিত এই মূর্তির আয়তন ১০ ইঞ্চি, ওজন ১০৩ তোলা। এক ব্যক্তি এই অলঙ্কার ব্যবসায়ীর নিকট মাত্র ২৭০, টাকা মূল্যে এই মূর্তিটি বিক্রয় করে।

সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ উত্তর বোম্বাইয়ে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের রজত জয়ন্তী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণে ভারত তাহার অহিংসনীতির চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্র নীতিই ভারতে চীনের আক্রমণ ডাকিয়া আনিয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

৭ই নভেম্বর—গত বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য হইতে তৈলবাহী পাইপের প্রথম চালান কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছায় আসামে অয়েল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃর ৭২০ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন বসাইবার প্রাথমিক কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

শ্রমিকদের জন্য মালিকরা গৃহ নির্মাণ করেন, তার জন্য আইনের মারফত বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনার জন্য চতুর্থ গৃহমন্ত্রী সম্মেলন সুপারিশ করিয়াছেন।

৮ই নভেম্বর—লৌহ ও ইস্পাতের কোটা বা বরাদ্দের চোরাকারবারে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কলিকাতা এনফোর্সমেণ্ট পুলিস গতকল্য একটি চা-বাগিচা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও অন্য কয়েকটি ব্যবসায়ী ফার্মের ডিরেক্টরস্থানীয় একজন বড় ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিলে, বড়-বাজারের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নির্ভরযোগ্য মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, সিকিম সীমান্ত বরাবর বিপুল চীনা সৈন্যের সমাবেশ করা হইতেছে। ঐ সব এলাকা হইতে আগত লোকেদের নিকট হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, চীনাগণ তথায় বিরাট ঘাটি ও পরিখাসমূহ খনন করিয়াছে এবং সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২রা নভেম্বর—আলজিরীয় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকারীরা বলিয়াছেন যে, ফ্রান্স যদি সামরিক তৎপরতা বন্ধ না করে তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করার জন্য তাঁহারা আরবের স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান জানাইবেন। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ জাতীয়তাবাদীরা সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন।

গতকাল রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রাপ্ত এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের সিকিয়াং প্রদেশের সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব হুনসায় পাকিস্তান এলাকায় সংপ্রতি চীনা সৈন্যগণকে দেখা গিয়াছে।

৩রা নভেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের মূল রাজনৈতিক কমিটিতে কোনরূপ ভোট গ্রহণ না করিয়াই নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ৮২টি রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আজ ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, আগামী ১১ই ডিসেম্বর তিনি নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক কৃষি মেলায় মার্কিন প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন।

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষ ১৯৫৯ সালের ৩য় তিনমাসে রকফেলার ফাউণ্ডেশন হইতে সাহায্য ও বৃত্তিবাবদ প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার পাইয়াছে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে নয়াদিল্লিস্থ ইণ্ডিয়া ইণ্টার-ন্যাশনাল সেণ্টারকে ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার দেওয়া হইয়াছে।

৫ই নভেম্বর—অদ্য ওসলোতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিকদলের সদস্য শ্রীফিলিপ নোয়েল বেকারকে শান্তির জন্য এবারকার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইল।

একজন সোভিয়েট বিমান চালক এক ইঞ্জিনযুক্ত একটি জেট বিমানে করিয়া ঘণ্টায় ১৪৩৪ মাইল বেগে উড়িয়া যান। এই কৃতিত্বকে বিশ্বে বিমান চালনার ক্ষেত্রে "রেকর্ড" হিসাবে গণ্য করার জন্য রাশিয়া আবেদন করিয়াছেন বলিয়া 'তাস' এক সংবাদ প্রচার করিয়াছেন।

৬ই নভেম্বর—গৌরীশঙ্কর অভিযানকারী সমগ্র জাপানী অভিযাত্রী দল গত তিন সপ্তাহ যাবৎ নিখোঁজ। তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং সম্ভাব্য চরম পরিণতির আশঙ্কা করা হইতেছে। এই দলে মোট ৩২ জন লোক ছিল।

জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী আজ এরূপ আভাস দেন যে, রাশিয়ার রকেটসমূহ সম্ভবত শীঘ্রই মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবীর নিকটতম সৌরলোকের অন্যান্য গ্রহের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া সেই আলোকচিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইবে।

৭ই নবেম্বর—শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত শ্রীনোয়েল বেকার ঘোষণা করেন যে, তিনি নোবেল পুরস্কারের টাকা আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ আদর্শ রূপায়ণের জন্য ব্যয় করিবেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারের অর্থ ব্যয় করিবেন।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ফাউণ্ডেশন হইতে ভারতকে মোট ২৫,৩৭,৪৫০ ডলার অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৮ই নভেম্বর—জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ২০০৯ সালের মধ্যে মানুষের পরমায়ু দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে। ঐ সময়ের মধ্যে সোভিয়েট হাসপাতালগুলিতে প্রধানত মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তিদেরই দেখা যাইবে। হাসপাতালগুলিতে তাহাদের জীর্ণ হৃদপিণ্ড ফুসফুস প্রভৃতি দেহযন্ত্র-গুলিকে যন্ত্রণাহীনভাবে সরাইয়া ঐগুলির স্থানে তরুণতর যন্ত্র বসান হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০,, ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

৭ বর্ষ] শনিবার, ২০ কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 7th November, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১

একটুখানি 'ভিম' দিয়ে তাই করুন পরখ আজ এখুনি! 'বেসিন' বাসন ঘড়াবাটি, কাঁচের জিনিষ চীনেমাটি হেকনা কেন

ভিম 'কবিতা' প্রতিযোগিতায় যোগদান করুন!

১২,০০০ টাকার বিভিন্ন মূল্যবান পুরস্কার!

আপনিও এই চমকপ্রদ পুরস্কারগুলোর যে কোন একটি পেতে পারেন

৩টি প্রথম পুরস্কার
রেফ্রিজেরেটর অথবা নগদ ২০০০, টাকা
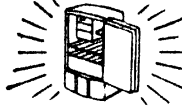
৩টি দ্বিতীয় পুরস্কার
ফিলিপসের ৬ ভাল্বের অলওয়েভ রেডিও

৬০টি যোগ্যতার পুরস্কার
পার্কার জুনিয়ার ফাউন্টেন পেন

আপনি শুধু দুই বা ততোধিক ছত্রে বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে ছন্দমিল রেখে ভিমের ওপরে একটি কবিতা লিখুন। কবিতাটিতে ভিমের নানাগুণ ও পরিষ্কার করবার ক্ষমতার কথাও বলতে হবে।

যেমন—'বেসিন' বাসন ঘড়া ঘটি, কাঁচের জিনিষ চিনেমাটি
হোকনা কেন ঘরের মেঝে, রান্না ঘরের থালা বাটি,
সব কিছুতে চকমকানি দেখতে যদি চান আপনি
একটু খানি 'ভিম' দিয়ে তাই করুন পরখ আজ এখুনি।

আপনি যতগুলো খুশী কবিতা পাঠাতে পারেন। বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজীতে। তবে মনে রাখবেন প্রতিটি কবিতাই আলাদা আলাদা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে পাঠাতে হবে। এবং প্রতিটি কবিতার সঙ্গে ভিমের কৌটোর ওপর থেকে 'ভিম' হিন্দি ছাপটি কেটে পাঠাতে হবে। গঠন এবং ছন্দমিলের গুণাগুণ দেখে কবিতার বিচার করা হবে। এবং আরও দেখা হবে কবিতাটিতে 'ভিমে'র বিভিন্ন ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে কিনা।

প্রতিযোগিতার নিয়মগুলো ভাল করে পড়ুন: (১) প্রতিটি কবিতা বড় অক্ষরের পুরো নাম ঠিকানা সহ সুন্দর করে কালি দিয়ে আলাদা আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। (২) প্রতিটি কবিতার সঙ্গে ভিমের কৌটোর ওপর থেকে 'ভিম' হিন্দি ছাপটি কেটে পাঠাতে হবে। (৩) সব কবিতাই সোমবার, ৯ই নভেম্বর ১৯৫৯ বেলা বার টার ভেতর, "ভিম রাইম কন্টেষ্ট", পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০০৫ বোম্বাই—১ এই ঠিকানায় পৌছনো চাই। (৪) কোন কবিতা হারিয়ে গেলে, দেরীতে পৌছুলে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য কোন দায়িত্ব নেওয়া হবেনা। এবং এ বিষয়ে কোন পত্রালাপও চলবে না। (৫) কবিতাগুলো যে সব বিচারকরা দেখবেন তাঁদের মতামতই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। (৬) এই প্রতিযোগিতায় হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড অথবা তাঁদের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছাড়া ভারতের সমস্ত অধিবাসীই অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। (৭) যে সব দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ভিম কবিতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে—প্রতিযোগিতায় ১ম এবং ২য় স্থান অধিকারীদের নাম সেই সব পত্রিকা মারফত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯ নাগাদ প্রকাশ করা হবে। অন্যান্য পুরস্কার যারা পাবেন তাঁদের ডাক মারফত জানানো হবে। (৮) একটির বেশী পুরস্কার কোন বিজয়ী প্রতিযোগীকেই দেওয়া হবে না।

শিগগির করুন! যোগদানের শেষ তারিখঃ ৯ই নভেম্বর ১৯৫৯

V.102-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

ব্রীজ
Breeze
Breeze

সূচীপত্র

সূচীপত্র

একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তিসম্পন্ন*

ম্যাকলীন্স্

পেরক্সাইড টুথপেস্ট

সব চেয়ে বেশী
* পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর শ্লেষ্ম-পদার্থের অপরিচ্ছন্ন যে আচ্ছাদন পড়ে ম্যাকলীনস্ এর একান্ত নিজস্ব 'রিপয়েড' সলিউশন তার প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজন মত ফেনা দিয়ে এই আচ্ছাদন বিচ্ছেদ করে আপনার দাঁতকে আরও ফলপ্রদ ভাবে পরিষ্কার করে।

সব চেয়ে বেশী
* সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর সুবিখ্যাত 'পেরক্সাইড' দাঁতের বিশ্রী দাগ ও বদ রং তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।

৩

সব চেয়ে বেশী
* রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীনস্ এর অপূর্ব্ব তাজা আঘ্রাণ দাঁতের মাড়িকে শক্তিমান করছে এবং ক্ষয়কারী বীজাণুকে রোধ করছে।

সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীনস্ কিনুন।

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 7th November, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

আমাদের নববর্ষ

দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর বঙ্গ ভারতীর সেবা করিয়া 'দেশ' পত্রিকা সাতাশ বৎসরে পদার্পণ করিল। আমাদের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্য। যাঁহাদের সহানুভূতি, অনুরাগ ও সহযোগিতা আমাদের আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভবিষ্যতেও ইঁহাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইব না—এই ভরসা রাখি।

প্রায় তিন দশক হইতে চলিল, 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হইতেছে। একটি বাঙলা সাপ্তাহিকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। সম্ভবত বাঙলা সাপ্তাহিকের ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণ আর নাই। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে যখন 'দেশ' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরা এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল : "সাহিত্যিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক—সকলের সাহচর্যে মানবগোষ্ঠির সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারে বর্তমান জগতের চিন্তা-মন্থ প্রবাহের সহিত দেশের আপামর সাধারণের পরিচয় সাধন......"। তাঁহাদের এই আদর্শই আমাদেরও অনুপ্রেরণা।

সেদিন পত্রিকাটির উদ্দেশ্যের ভিতর একটি রাজনৈতিক চেতনাও প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রয়োজন বশে এই চেতনার প্রতি হয়ত তখন বেশি দৃষ্টি দেওয়া হইত। কিন্তু ইহা সত্য যে, কেবলমাত্র রাজনীতি 'দেশ' পত্রিকার আদর্শ ছিল না। জাতীয় জীবনের—বিশেষত বাঙালীর সংস্কৃতি-মূলক সকল বিষয়ে আলোকপাত করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার সমৃদ্ধি সাধনে 'দেশ' পত্রিকা সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চলিতেছে।

অতীতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। রাজরোষ তাহাকে মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করিয়াছে, কখনও বা সংস্কার-পন্থীদের রক্তচক্ষু ইহাকে ভীত করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা যে-পথ ন্যায় ও নীতিসঙ্গত বলিয়া ভাবিয়াছি, সেই পথে চলিয়াছি—পথভ্রষ্ট হই নাই। জনসাধারণের সহিত আমাদের মানসিক বৈষম্য যদি তেমন উৎকট হইত, তবে আজ ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া এই পত্রিকা দিনে দিনে অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিত না। অন্তত এই একটি মাত্র লক্ষণ হইতেই বলিতে পারি, ভিন্ন রুচি বাঙালী পাঠকের পাঠতৃষ্ণা মিটাইবার আয়োজনে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

প্রসঙ্গত আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। 'দেশ' পত্রিকার ছাব্বিশ বৎসরের সাধনায় বাঙলা সাহিত্যের কতখানি সমৃদ্ধি হইয়াছে—তাহার হিসাব দাখিল করা আমাদের কর্তব্য নয়। কিন্তু এই ছাব্বিশ বৎসরের ইতিহাস অন্তত এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারে যে, যে-সকল প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক আজ বঙ্গভাষার গৌরব—তাঁহাদের অধিকাংশের রচনা প্রকাশের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। অধুনা যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ভবিষ্যতে ইঁহারাও বঙ্গভাষার গৌরব হইতে পারেন।

'দেশ' পত্রিকা কখনও কোনো দলগত আধিপত্যের সুযোগ দেয় নাই, কোনো সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়াও তাহার নীতি নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা দলমতনির্বিশেষে নিরপেক্ষ। দেশের ও দশের যাহা কল্যাণকর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি, নির্দ্বিধায় তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না—ভবিষ্যতেও হইব না। সাহিত্য বিষয়েও আমাদের যুক্তিহীন গোঁড়ামি নাই। বিশ্বের অন্যান্য দেশে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে যে-সকল নতুন চিন্তা ও ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করিতেছে, আমরা সে-বিষয়ে যথাসাধ্য অবহিত থাকিতে চেষ্টা করি ও শিল্প-সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষায় উৎসাহ দান করিয়া আসিতেছি।

আধুনিক মানুষ বর্তমান বিশ্বের নব নব বিস্ময় ও আবিষ্কার সম্পর্কে সদাকৌতূহলী। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজগঠন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠকের উৎসাহ অপরিসীম। বিস্তৃত পাঠক সম্প্রদায়ের মানসিক চেতনাকে যুগোপযোগী করার প্রয়াসে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হই না।

'দেশ' পত্রিকার নববর্ষে আমরা আমাদের প্রয়াসের বিষয় নিবেদন করিলাম। আমাদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণার ইঙ্গিতও দিয়াছি। ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের কর্তব্যকর্ম আরও সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারি, আজ পত্রিকার নববর্ষে তাহাই কামনা করি।

বিজ্ঞপ্তি

প্রখ্যাত নট ও বংগ-রংগমঞ্চের প্রবীণ শিল্পী শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর শিল্প-জীবনের নানা প্রশ্ন ও সমস্যা-জড়িত স্মৃতিকথামূলক রচনা 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—দেশ

চীনা সৈন্য কর্তৃক ভারতীয় পুলিস দলের উপর অতর্কিত গুলীবর্ষণের ফলে সতেরোজন ভারতীয় নিহত এবং আরও অনেকজন ধৃত হয়েছে। এই সংবাদে ভারতবর্ষে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ লাডাকে ভারতীয় সীমানার অভ্যন্তরে ৪০ মাইল প্রবেশ করে তারা এই কাণ্ড করে গেছে। ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন এবং ভারতীয় প্রহরীদলের উপর আক্রমণ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেই তারা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে লোংজু এবং উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বড়া হোটি ও গুনসা গোচারণ ভূমি দখল করে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে যথারীতি প্রতিবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়নি। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের শ্রীঅজয় ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন নেতা চীনের মাও সে তুং, চৌ-এন লাই প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনান্তে ফিরে এসে যখন আশ্বাস দিলেন, চীন আপোস-আলোচনায় আগ্রহশীল, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার অভিপ্রায় তার নেই এবং আর নতুন কোনো সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই, ঠিক সেই সময়েই এই অতর্কিত আক্রমণ ঘটল।

লাডাক অঞ্চলে চীন সীমানার অভ্যন্তরে বৎসর দুই আগেই চীনারা রাস্তা তৈরি করেছে নিশ্চয়ই সামরিক উদ্দেশ্য নিয়েই। ভারতীয় কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে চীনের আক্রমণাত্মক নীতি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শান্তি কামনার মিথ্যা স্তোকবাক্যের অন্তরালে এই নীতি নির্বিবাদে কাজ করে চলেছে। কখনও উত্তর-পূর্বে, কখনও উত্তর-পশ্চিমে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সৈন্যবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিচ্ছে। এদিকেও সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হবে নিশ্চয়ই। তখন চীনের দৃষ্টি কোথায় পড়বে কে জানে! হয়তো স্তোকবাক্য ও শান্তি কামনার আবরণ তখন ছিঁড়ে যাবে।

এই রকম একটা সম্ভাবনার আশঙ্কা ভারতবর্ষের জনসাধারণের এবং সকল রাজনৈতিক দলের মনেই জেগেছে। বাদে অবশ্য কমিউনিস্ট দল। কিন্তু সেই দলেরও একটা প্রবল অংশ এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়েছেন। দলের মধ্যে ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উভয় অংশের বিভিন্ন নেতার বিবৃতি থেকে আশা হচ্ছে, অন্য অংশ বৈদেশিক কমিউনিজম্ ভ্রাতৃত্বের স্তোকবাক্য কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত হয়তো দলের ঐক্যরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হবেন। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, শ্রীনেহেরুর দুর্বল নীতি চীনের আক্রমণাত্মক নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ফাঁকা হুঙ্কারে কাজ হবে না।

সুখের বিষয় ভারতের পূর্ব সীমান্ত নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘকাল থেকে যে বিরোধ ও ছোট-খাটো সংঘর্ষ চলছিল তার আপোস-মীমাংসা হয়ে গেছে। সর্দার স্মরণ সিং এর জন্যে লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল শেখের প্রশংসা করেছেন এবং লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল শেখ সর্দার স্মরণ সিং-এর। এর ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আপোস দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। এই আপোসে আমরা টুকেরগ্রাম ফিরে পেয়েছি, কিন্তু বেরুবাড়ির অর্ধেকটা এবং পাথারিয়া জঙ্গল পাকিস্তানের মধ্যে চলে যাবে।

কিন্তু এই আপোসে লাভ-লোকসানের প্রশ্নের চেয়ে বড় হচ্ছে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। এবং সম্প্রীতির বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে চীনের পররাষ্ট্রনীতির জন্যে। এই নীতি পাকিস্তান এবং ভারত উভয়ের পক্ষেই আশঙ্কাজনক। এ ছাড়া এর পরে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে যে গোলযোগ চলছে তারও আপোস-মীমাংসার আয়োজনের কথাও শোনা যাচ্ছে। বর্তমান আপোসের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ভবিষ্যতে যাতে আর বিরোধ না বাধে অথবা বাধলেও অতি দ্রুত তার যাতে মীমাংসা হয় তারও নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত কোনোদিনই বিরোধ চায়নি। দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র (এবং যা একদিন একই রাষ্ট্র ছিল) যাতে শান্তির মধ্যে নিজ নিজ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে সেই কামনাই করেছে। তাই আপাত লাভ-লোকসানের হিসাব না করে এই আপোসকে অভিনন্দন জানিয়েছে। অবশ্য রাজনীতি ক্ষেত্রে আপোসের মূল্য সম্বন্ধে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। আজকের আপোস কাল ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পরিণত হতে পারে। তবু আশা করব, নিজের নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই উভয় রাষ্ট্র উত্তরোত্তর অধিকতর সখ্যের পথে অগ্রসর হবে।

*

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই নাগারা সমস্ত নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাধীনতা দাবী করেছিল। এই নিয়ে যথেষ্ট অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ বাধছিল। এবং তাদের উস্কানি দেবার লোকেরও অভাব ঘটেনি। মোককচোঙে সম্প্রতি নাগা জাতি সম্মেলনে তিন হাজার প্রতিনিধির সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে নাগা পাহাড় ও টুয়েনসাং অঞ্চলটিকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই অঞ্চল এখন আসামের অন্তর্গত।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে এখানেও ভারতের অন্তর্গত অন্যান্য রাষ্ট্রের অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হলে সেই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বাহ্নে বিভিন্ন নাগা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠিত হবে। সেই সমিতির ব্যবস্থা মত নির্বাচন পরিচালিত হবে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো আইন সভা ও মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্যে শীঘ্রই নাগা প্রতিনিধিদের একটি দল দিল্লি যাচ্ছেন। অবশ্য ফলে সমস্ত নাগা উপজাতি এই শাসনব্যবস্থার মধ্যে আসছে না। কয়েকটি উপজাতি এজন্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থায় সম্মত হলে অবশিষ্ট অঞ্চলেও এই শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে অসুবিধা হবে না, অবশ্য যদি তাঁরা বিদ্রোহী মনোভাব পরিত্যাগ করেন।

*

উত্তর প্রদেশের কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ এই পাঁচটি শহরে এখন থেকে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হল। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনেকদিন গৃহীত হলেও নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছিল। সম্প্রতি এর নির্বাচন ফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, লক্ষ্ণৌ ছাড়া অন্য চারটি শহরে কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। লক্ষ্ণৌতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে জনসংঘ। কয়েকজন স্বতন্ত্রের সাহায্য পেলে জনসংঘ লক্ষ্ণৌ কর্পোরেশনের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করতে পারে। উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহরে জনসংঘ দলের সদস্যেরা জয়ী হবেন এ কল্পনা কয়েক সপ্তাহ আগেও কেউ করতে পারেনি।

কমিউনিস্ট দল এবং প্রজা-সোস্যালিস্ট দল কোথাও খুব সুবিধা করতে পারেনি। স্বতন্ত্রেরা খুব অধিক সংখ্যায় সর্বত্রই জয়লাভ করেছেন। যে চারটি শহরে কংগ্রেস বিজয়ী হয়েছে সেখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব বেশি নয়। সুতরাং পাঁচটি শহরেই কর্পোরেশনের পরিচালনাভার পেতে হলে কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থন পাওয়া দরকার। বলা বাহুল্য কংগ্রেসের এই অবস্থার জন্যে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ অনেকখানি দায়ী।

কৃষি-সমবায় ও উন্নয়ন-পরিকল্পনা

গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

পরিকল্পনার কথা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি রচনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন নির্মাণ-কার্যের লক্ষ্য স্থির করা হচ্ছে। বিভিন্ন উৎপাদন, নির্মাণ-কার্য এবং হিতসাধন বিভাগের মধ্যে নিজ নিজ উন্নয়নের লক্ষ্যানুসারে অর্থবিনিয়োগের বরাদ্দও হচ্ছে। খুব সাধারণ সত্য হলেও এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি বা শিল্প পণ্যের উৎপাদনের বেশীর ভাগ দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত এদেশে বে-সরকারী হাতেই ন্যস্ত আছে। দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অগণিত শিল্প-সংস্থার হাত দিয়েই নানাপ্রকার শিল্প পণ্যের জোগান হয়। দেশের অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের খামার থেকেই আহরণ করতে হয় আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য। লোহা, বিদ্যুৎ, সারোপকরণ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র পণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকার প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং জাতির বিভিন্ন উৎপাদন বিভাগে যে সমস্ত লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তার পরিপূরণ নির্ভর করছে বে-সরকারী বা জনসাধারণের স্বাধীন উদ্যমের উপর; সরকার শুধু জোগাবে প্রেরণা, বৈজ্ঞানিক পথনির্দেশ, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং অর্থসাহায্য। এখানে কৃষি-উৎপাদনের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

খাদ্য-সমস্যা ও উদ্বৃত্ত খাদ্য

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতি কৃষকের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। এটা যে শুধু খাদ্যের জন্যই, একথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না। কৃষকের নিকট হতে খাদ্যের জোগাড় হয়, সুতরাং তাদের নিজেদের খোরাক বাদে যত বেশী খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকবে, যারা খাদ্য তৈরী করছে না—ঘরবাড়ি, রাস্তা, পথ প্রভৃতির নির্মাণকার্য অথবা যন্ত্রপাতি শিল্প-পণ্যাদির উৎপাদনে নিযুক্ত, তাদের পক্ষে খাদ্য পাওয়া ততই সুবিধাজনক হবে। কৃষক যদি উদ্বৃত্ত খাদ্য সৃষ্টি না করে, অন্য লোকেদের প্রয়োজনমত খাদ্য জোগান দিতে সমর্থ না হয়, তা হলে শিল্প-পণ্যাদির উৎপাদন বা যাবতীয় নির্মাণকার্য সুশৃঙ্খলভাবে এগোতে পারবে না। উদ্বৃত্ত খাদ্যই আজ হবে দেশের মূলধন। একদিকে দেশের নানাবিধ সংগঠন কার্যে নিযুক্ত

শ্রমিকের প্রয়োজন মিটিয়ে অন্য দিকে কৃষকের হাতে অধিকতর অর্থ এনে দিয়ে—শহরজাত শিল্প-পণ্যাদির অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি করে কৃষকের উদ্বৃত্ত খাদ্য দেশের শিল্প-সংগঠনের পথ প্রশস্ত করে তুলবে।

কৃষি-উৎপাদনের উদ্বৃত্তের কথা ভাবতে গিয়ে অনেক কিছু সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। মোটের উপর, যত দিন যাচ্ছে, ততই একটা ধারণা আজ মনের মধ্যে বদ্ধমূল হচ্ছে, তা এইঃ উন্নত বীজের ব্যবস্থা, সারের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা আর কর্জের ব্যবস্থা করলেই কৃষি-সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু এই ধরনের কাজের মধ্যে কৃষি-উৎপাদনের স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা—বিশেষ করে মূলধনসৃষ্টিকারী ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্তের সম্ভাবনা কোনো দিনই কার্যকরী হবে না। আজ কৃষকের যথোচিত সংগঠন-ব্যবস্থার মধ্যেই কৃষি-উৎপাদনের অগ্রগতি অন্তর্নিহিত রয়েছে।

কৃষি-সমবায়ের অর্থনীতি

আজ জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় মধ্যে জমি একত্রিকরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমবায়-কৃষি-ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, যদিও এ বিষয়ে এখনও দেশের মধ্যে সংশয়ের সম্পূর্ণ অবসান হয়নি। একত্রিত কৃষি সম্পর্কে সন্দিহান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অভাব নাই। সমবায় সম্পর্কে সংশয়ের মীমাংসা হলে উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে তার স্থান সম্প্রসারিত হবে। এখন তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করা যাক, সমবায়-কৃষির সুবিধা বা সার্থকতা কী? আগেই বলা দরকার, সমবায়ের ভিত্তি হল জমির একত্রিকরণ। সুতরাং এখানে জমির একত্রিকরণ থেকে কি অসুবিধা আসতে পারে, তারই বিবেচনা হওয়া দরকার; তার কারণ জমি একত্রিত না করেও অন্য ধরনের সমবায় যথা ঋণদান সমিতি, জলসেচ সমিতি, ক্রয়বিক্রয় সমিতির মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নমূলক সুবিধা লাভ হতে পারে। একসংগে অনেকখানি জমি ধরে বড় বহরে চাষ করলে তার যদি কোনো সুবিধা থাকে, তা-ই হবে কৃষি-সমবায়ের নিজস্ব সুবিধা।

এখন দেখা যাক, বড় বহরের উৎপাদনের সুবিধা কেমন করে আসে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, উৎপাদনের এমন কতকগুলি উপাদান আছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ বা বহর বাড়ালেও তাদের পরিমাণ বাড়াতে হয় না—তারা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তারা অবিভাজ্য পরিমাণেই নিযুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ উৎপাদনের বহর কমানোর দরুণ তাদের কোনো ভগ্নাংশকে উৎপাদন থেকে অপসারিত করা যায় না অথবা কোনো একটি উপাদানের এককের একটি ভগ্নাংশবিশেষ নিয়ে কম বহরের উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় না। উৎপাদনের একটি বিশেষ অবস্থায় যে-কোনো উপাদানই অ-পরিবর্তনীয় উপাদানরূপে দেখা দিতে পারে—তবে সাধারণত যে উপাদানগুলিকে বিশেষ করে অ-পরিবর্তনীয়রূপে দেখতে পাই তা হচ্ছে যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন-পরিচালকের কর্মকুশলতা। কোনো একটি যন্ত্রের অংশবিশেষ অথবা তাজো একজন উৎপাদন-পরিচালকের অংশবিশেষ নিয়ে পরিপূর্ণ উৎপাদনের পরিবর্তে আংশিক উৎপাদনের কথা ভাবা যায় না। এদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে—সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের ব্যবহার যত অধিক হবে ততই উৎপাদনের সুবিধা বা ব্যয়সংকোচ হবে। অধিক বহরের উৎপাদন সম্পদের অনেক অপচয় কমে যায় —শ্রমশক্তি বেঁচে যায়—তাদের নূতনতর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগানো যায়।

কৃষি-সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদনের দক্ষতা-বৃদ্ধির কিরূপ সুযোগ আছে, তার হিসাব নিতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভেবে দেখা দরকারঃ

(১) অপচয় থেকে নিবৃত্ত শ্রমশক্তি;
(২) উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির প্রয়োগের দ্বারা নূতনতর পণ্যোৎপাদন;
(৩) সমবায়ের মাধ্যমে নূতনতর উৎপাদনের মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ।

যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থা বাদ দিয়েও আমরা একত্রিত চাষের সুবিধার কথা ভাবতে পারি। হাল-বলদ, বীজবহন, জলসেচ-ব্যবস্থা ও শস্যগোলার সম্পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়, যখন অনেকখানি জমি একত্রিতভাবে চাষ হয়। এই সমস্ত উপাদানের অবিভাজ্য পরিমাণগুলি আমাদের হিসেব করে দেখা উচিত।

কোনো কৃষকের জমির বিঘা-প্রতি উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি হলেই তার কৃষি-ব্যবস্থা যে সর্বাধিক দক্ষতা লাভ করেছে, একথা বলতে পারি না। কারণ এই উৎপাদনের পিছনে খরচ অনেক বেশী হয়ে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের একক প্রতি গড় ব্যয় যদি ন্যূনতম হয়, তবেই আমরা বলতে পারি, সেই উৎপাদন সর্বাপেক্ষা দক্ষতার সংগে সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা এবং ন্যূনতম গড় ব্যয় যে একই সংগে ঘটবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। বস্তুত ন্যূনতম ব্যয়ের পরিমাণও পরিবর্তনশীল। একটি নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট জোতের একটি নিজস্ব দক্ষতম উৎপাদনের সীমা আছে; পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির যথাযথ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের সর্বোচ্চ দক্ষতার শিখরে উপস্থিত হতে পারে। এছাড়া সমস্ত প্রকার আয়তনের জোতের মধ্যে এমন একটি বিশেষ আয়তনের জোতের বিষয় আমরা কল্পনা করতে পারি যা দক্ষতম উৎপাদনের শিখরগুলির মধ্যে উচ্চতম শিখরে উপস্থিত হতে পারে, যদি অবশ্য তার বিভিন্ন উপাদানসমূহের জোগান পেতে কোনোরূপ বাধা না থাকে।

অনেক সময় ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র জোতেও বিঘা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল পাওয়া গেছে; কিন্তু তা সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফার পরিচায়ক নয়। এমনও অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষুদ্র কৃষক তার ক্ষুদ্র জোত থেকে ন্যূনতম খরচে ফসল উৎপাদন করে বিঘা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা ভোগ করেছে। এই দিক থেকে বিচার করলে কৃষি-সমবায়ের পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন তোলা যায়ঃ বিঘা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফার সংগে সংগে কৃষকেরা মাথাপিছু মুনাফাও কি সর্বোচ্চ পরিমাণে লাভ করবে? বিঘা-প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা বা ন্যূনতম ব্যয় কি নিরবচ্ছিন্ন কৃষি-উন্নয়নের স্থায়ী রসদ জোগাতে সমর্থ হবে? ক্ষুদ্র কৃষকের বিঘা-প্রতি মুনাফা সর্বোচ্চ হলেও তা কি তার নিজস্ব খোরাকেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না?

প্রকৃতপক্ষে কৃষকের মাথাপিছু উদ্বৃত্তই হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রসদ। কৃষি-সমবায় শ্রমশক্তির অপচয় বন্ধ করে কৃষকদের মাথাপিছু উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।

একটা কথা আজকাল আমাদের কাছে খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, যে এই সব ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র জোতেই শ্রমশক্তি নিয়োজিত হয় বেশী, এমন হতে পারে, কৃষক-পরিবারের নিজ-শ্রমিকেরা নিজ জোতে প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে কাজ করে থাকে, অন্য দিকে বড় কৃষকদের পরিবারভুক্ত লোকেরা শহরে অধিক সাচ্ছল্যের উপযোগী রোজগার অর্জন করতে পারে। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে ক্ষুদ্র কৃষক গৃহস্থের মাথাপিছু উদ্বৃত্ত হার অত্যন্ত কম—তা থেকে নতুন উৎপাদন বা উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী মূলধন বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, যদিও তাদের ক্ষেত্রে অধিক শ্রম নিয়োগের ফলে বিঘা-প্রতি উৎপাদন অধিক হতে পারে। কিন্তু পারিবারিক জোত-গুলিকে একত্রিত করে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করলে শ্রমশক্তির কাজ-সংকোচের দরুণ উদ্বৃত্ত বা কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং সমবায়ভুক্ত কৃষক-গৃহস্থ সমূহের মাথাপিছু আয় বাড়বে না। এটা অবশ্য কৃষক-পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের সমস্যা, যার সমাধান কেবলমাত্র কৃষি-সমবায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিভিন্নরূপ কর্মপন্থার মধ্য দিয়েই এই সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে হবে। অবশ্য আমরা আশা করতে পারি, কৃষি-

সমবায় নানাবিধ নূতন উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। সমবায়ের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড জমিগুলি সংলগ্নীকৃত হয়ে একটি বিস্তৃত জমিতে রূপান্তরিত হবে; জমির মধ্যবর্তী আলগুলি লুপ্ত হয়ে জমির অপচয় দূর করবে, ক্ষেত থেকে ক্ষেত্রান্তরে যানবাহনের পথ বাধামুক্ত হবে, জলসেচের সুব্যবস্থা করা সহজসাধ্য হবে, বিভিন্ন প্রকার শ্রম ও কর্মকুশলতার অধিকতর সমন্বয় হবে, উৎপাদন পরিকল্পনার সঙ্গে জমি ও শ্রম-শক্তির অধিকতর সামঞ্জস্য হবে।

সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে ক্রমাগত একত্রিত কর্মধারার মধ্য দিয়ে একটি সঙ্ঘ-সত্তা গড়ে উঠবে—যার ফলে অর্থনৈতিক দক্ষতা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। পরিচালনার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হওয়ায় মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে, নব নব উৎপাদন পদ্ধতির পথ উন্মুক্ত হবে, ফসল বিক্রয় ও চাষের নিজস্ব দরকারী জিনিসের খরিদ ব্যবস্থার মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তনের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে, অধিকতর কতকগুলি সুবিধার সৃষ্টি করবে; তাছাড়া উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করে মূলধন গড়ে তোলা উৎপাদন-পরিকল্পনার অপরিহার্য নীতি-রূপে অনুসৃত হবে, এতে পল্লীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হবে।

প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের দক্ষতা কতখানি বাড়িয়ে দিচ্ছে, উন্নয়নের মূলধন সঞ্চয়ে কতখানি সাহায্য করছে, আদর্শগত ঐক্য-সাধনে প্রগতিমূলক চিন্তাধারা এবং নব নব উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি বা সংগঠন-ব্যবস্থার অনুসন্ধানে কতখানি সহায়তা করছে, তাই দিয়েই কৃষি-সমবায়ের সাফল্য বিচার করতে হবে।

ব্যাপকভাবে কৃষি-সমবায় চালু হলে কৃষকদের মধ্যে উন্নত কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ অধিকতর সাফল্য লাভ করবে। বর্তমানে জাতীয় কৃষি-শিক্ষা-সম্প্রসারণ বিভাগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত কৃষকের দুয়ারে দুয়ারে নিয়ে যেতে হয় তাদের বিদ্যার পসরা। দেশের সমস্ত কৃষি-উৎপাদনের পরিচালনার দায়িত্ব একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত হলে কৃষি-শিক্ষার আন্দোলন একটিমাত্র পরিচালকের সম্মুখীন হবে এবং নিজেকে একটিমাত্র কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে নিজের সাফল্যের মাত্রা বহুগুণ পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

আজ আর-একটা সত্য ক্রমশই পরিস্ফুট হচ্ছে তা এই যে, কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণসমূহে যদি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত হত, তা হলে কৃষি ঋণদান সমবায়ের কার্যকারিতা বেড়ে যেত। উৎপাদনের সঙ্গে কৃষি-কর্জের যোগাযোগ দৃঢ় হতে পারে, যদি কৃষি-সমবায়কে কেন্দ্র করেই কৃষি ঋণদান সমিতিগুলি গড়ে উঠে। একথা কর্জ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রযোজ্যতা কম নয়। উৎপাদন, কর্জ, ক্রয়বিক্রয়, কোনোরূপে যান্ত্রিক ব্যবস্থা—সব কিছুই পরস্পরকে শক্তিশালী করতে পারে, যদি তারা সমবায়িক পরিচালনার মধ্যে একত্রিত হয় এবং কৃষি-সমবায়ের ন্যায় একটি মূল সংস্থার সহিত সংযুক্ত হয়।

পারিবারিক-কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষি-সমবায়

কৃষি-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষি-

গৃহস্থের সংগঠন ক্ষুণ্ণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার কয়েকটা নিজস্ব সুবিধা আছে—তা এইঃ এখানে স্বার্থের ঐক্য অনেক বেশী, সুতরাং পরিবারের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কর্ম-বিভাগ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; কায়িক পরিশ্রমে বিমুখতা থাকে না; উৎপাদনে দায়িত্ববোধ অত্যন্ত সুদৃঢ় থাকে; এখানে ব্যক্তিগত মালিকানা আর ব্যক্তিগত দায়িত্বের দরুণ উৎপাদনে যে আত্মতৃপ্তি ও তদানুষঙ্গিক উৎসাহের সঞ্চার হয়, তা অন্যত্র দুর্লভ। কৃষি-সমবায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলে পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার সুবিধাগুলি লুপ্ত হবে। ক্ষতিপূরণস্বরূপ এমন সমস্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংস্কৃতি সমবায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, পারিবারিক কৃষি-ব্যবস্থার অনুরূপ শ্রম-বিভাগ, কায়িক পরিশ্রমে উন্মুখতা এবং কর্মের উদ্দীপনা সেখানেও প্রবর্তিত হয়। তা না হলে কৃষি-সমবায়ের সুবিধাগুলি পারিবারিক-কৃষি-ব্যবস্থার অবসানজনিত ক্ষতির মধ্যে হারিয়ে যাবে।

সমবায়ের পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমান জেলায় অনেক কৃষি-সমবায় গড়ে উঠেছে। তাদের সমস্যা অনেক; এখানে সবকিছু আলোচনার স্থান সংকুলান হবে না। তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কৃষি-সমবায় সম্পর্কে যে কয়েকটি মূল সত্য অনুভব করেছি, তাই এখানে লিপিবদ্ধ করছিঃ

সামাজিক বৈষম্য এবং জোতসমূহের অসংলগ্নতা কৃষি-সমবায়ের প্রতিবন্ধকরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য সমবায়গুলিকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অসংগত হবে না। অল্পসংখ্যক সভ্য এবং অল্প পরিমাণ জমি নিয়ে গঠিত সমবায়ের মধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতির উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ট্রাক্টর-চালিত কৃষি-সমবায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নীতি প্রযোজ্য হবে না; কারণ সেখানে জমির পরিমাণ বেশী না হলে ট্রাক্টরের সম্পূর্ণ ব্যবহার না হয়ে ব্যয়বাহুল্য দেখা যায়।

কৃষি-মজুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবায়ের মধ্যে অকর্ষিত জমির কৃষি-ব্যবস্থার দৃষ্টান্তও খুব বিরল নয়। এই সমস্ত সমিতির সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ নাই। পরিকল্পনার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হবে সমবায় মারফত ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে নূতন জমি বণ্টন ও নূতন জমি কর্ষণের ব্যবস্থা। যে সমস্ত কৃষকের জমি আছে, তারাও সমবায় মারফত তাদের জোতের পরিমাণ বাড়াতে পারে। নিজস্ব পারিবারিক চাষ ছাড়াও তারা কিছু জমি সমবায় মারফত চাষ করতে পারে।

যে গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, সেখানেই যে কৃষি-সমবায় বিশেষ করে সফল হয়ে উঠেছে, তার কোনো নজির আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার না হলে কৃষি-সমবায় ঠিকমত গড়ে উঠবে না—এ ধারণা সত্য নয়, কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে নৈতিক উৎকর্ষের দিকে মনোযোগ দিলে তার থেকে যে শিক্ষার আলো উৎসারিত হয়, তারই কার্যকারিতা বেশী। জাতীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ এইরূপ শিক্ষাবিস্তারের দিকে অধিকতর মনোযোগী হলে তাদের চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

সমবায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার উপযোগিতা যথেষ্ট হলেও কৃষি-সমবায় সবচেয়ে ভালোভাবে গড়ে উঠেছে কোনো একটি আর্থিক উন্নয়নের যান্ত্রিক পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেঃ দৃষ্টান্তস্বরূপ ট্রাক্টর দ্বারা চাষ অথবা জলসেচ-যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যখনই জনসাধারণ উন্নয়নের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছে এবং বুঝেছে সমবায় ছাড়া এটা সম্ভব নয়, তখনই তারা সফলকাম সমবায় গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মজুরের অনটন থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে ট্রাক্টর অবলম্বন করেই বর্ধমানের অনেক কৃষক সমবায় গড়ে তুলেছে; ব্যক্তিগত-ভাবে কোনো কৃষকই ট্রাক্টর পোষণ করতে সমর্থ হত না। চাষের সঙ্গে চাল-কোটা কলের সংযোগও অনেক ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বাড়িয়ে তুলেছে।

নিজেদের আর্থিক উন্নতিকল্পে ব্যক্তিগত সাধ্যের অতীত কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধা নেবার জন্য সমবায় স্থাপনের উপযোগিতা কৃষকদের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি হলেই সবচেয়ে ভালোভাবে সমবায় গড়ে উঠতে পারে। যদি কোনো জেলায় সমবায় ভিত্তিতে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে, তা হলে সেই জেলার জেলা-উন্নয়ন-সংস্থার কাজ হবে এমন এক অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করা, যাতে উক্ত কৃষি-পদ্ধতির বিস্তার হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ট্রাক্টর মেরামতের কারখানার কথা বলা যেতে পারে; নিকটেই ট্রাক্টর মেরামতের সুবিধা না থাকলে ট্রাক্টর-চালিত কৃষি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে—এই ধরনের সুবিধা জেলার মধ্যেই জনসাধারণের আয়ত্তাধীন হলে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির ভিত্তিতে সমবায়-সংগঠন

খুবই প্রেরণা লাভ করবে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, কৃষি-সমবায়ের উপরই ভারতীয় কৃষির তথা অর্থনীতির উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপিত হবে। এদেশে উন্নয়নের মূলধন গড়ে তুলবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হবে কৃষি-সমবায়। কৃষি-সমবায় তার নিজস্ব আয়ের কিছু অংশ সভ্যদের মধ্যে বিলি না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উৎপাদনকে সরাসরিভাবে মূলধন সংগঠনের পথে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মূলধন গড়ে তোলা অসম্ভব; আর কিছু না হোক, ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যর্থ হয়ে যায় তার বিনিয়োগের উপযুক্ত সুযোগের অভাবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হয় যখন তারা একটি সংস্থার মধ্যে সম্মিলিত হয়ে একটি বৃহৎ প্রবাহে রূপান্তর লাভ করে। সমবায় সঞ্চয় প্রচেষ্টাকে মানুষের সাধারণ ভোগেচ্ছা থেকে মুক্ত করে বাস্তবরূপে গ্রহণের পথে এগিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র কৃষকের ব্যক্তিগত উদ্যমের মধ্য দিয়েও উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু চিরকালীন উন্নয়নের জন্য মূলধন গড়ে উঠতে পারে না। এদিক থেকে বিচার করলে সমবায়ের উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে। সমবায়িক ক্ষেত্রে কৃষি-সমবায়ের সংগঠন কার্যকারিতা জ্ঞানগোচর হয়েছে তা থেকে যদি সমবায়ের মূলধন সঞ্চয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। যারা নিজ হাতে চাষ করে না এমন ব্যক্তিও যদি কৃষি-সমবায়ের সভ্যতালিকাভুক্ত হন তা হলেও এই সত্যের ব্যতিক্রম হবে না।

কৃষি-সমবায় সংগঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সমবায়ের পরিচালনার মধ্যে কৃষকদের আস্থা স্থাপন। সাধারণত কৃষকেরা সমবেত কোনো প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। পরিচালকবর্গ কর্তৃক প্রতারিত হবার একটি আশঙ্কা তাদের মনের মধ্যে সব সময়েই থাকে। জমি-একত্রিকরণের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা হারাবার আশঙ্কা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সমবায়ের গঠনতন্ত্র যতদূর সম্ভব এমন হওয়া উচিত যাতে এই ধরনের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। বিহারের কৃষি-সমবায়ের ক্ষেত্রে জমি-একত্রিকরণ হলেও গঠনতন্ত্রে সভ্যতালিকাভুক্ত কৃষকদের জমির ব্যক্তিগত স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। ইচ্ছা করলে কোনো সভ্য সমবায় থেকে নিজের জমি পারিবারিক চাষের জন্য ফিরিয়ে নিতে পারে। গঠনতন্ত্রে এরূপ নিয়ম না থাকলে সেখানে সমবায় গড়ে তোলা কঠিন হত।

বর্ধমান জেলার কৃষি-সমবায়ের ক্ষেত্রে ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ জমির ক্ষতি নির্ধারণের আগেই সভ্যকৃষকদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা আছে। সভ্য-কৃষকদের জন্য একটা নিশ্চিত আয়ের সংস্থান করে এই ব্যবস্থা পরিচালকবর্গের উপর সভ্য-কৃষকদের আস্থা সৃজনে সহায়তা করেছে। তবে এই ব্যবস্থা সমবায় নীতিবিরোধী। উৎপাদনের সমবেত উদ্যোগের বিপত্তি থেকে মুক্ত থাকার দরুণ সভ্যেরা খাজনা-ভোগী-শ্রেণীতে পরিণত হবে। সুতরাং এইরূপ অভ্যাংশকে ফসলের শতকরা ২০ ভাগের বেশী হতে দেওয়া উচিত নয়। মোটের উপর কৃষি-সমবায়ের গঠনতন্ত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে ব্যক্তিগত অধিকার এবং সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। এর উপরেই সমবায়ের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করবে।

চক্রদত্ত

পশ্চিম জাপানের কিয়োটো য়ুনিভার্সিটির ইলেকট্রোনিক বিভাগ একটি বিশেষ উন্নত ধরনের টাইপরাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা সাধারণভাবে মানুষের কথাবার্তা রোমান অক্ষরে লিখিত হবে। কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ঐ টাইপরাইটার যন্ত্রে প্রথমে মানুষের কথাবার্তার শব্দতরঙ্গগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্তিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ রোমান হরফে পরিণত হয়ে লিখিত হয়। ঐ য়ুনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষরা বলেন যে, ১৯৫৩ সাল থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী ঐ টাইপরাইটারে কাজ করছেন।

*

এক খবরে প্রকাশ যে, কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট অ্যান্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন' কুষ্ঠ রোগীর জীবাণু পরীক্ষার এক উপায় বার করেছেন। এই নতুন পদ্ধতিতে রোগের কোন বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও রোগ ধরা সম্ভব হবে। এই নতুন পদ্ধতির ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যাদবপুরে একটি ছয়তলা গবেষণাগার তৈরী করা হবে।

*

অদ্ভুত জিনিস এই টায়ারটি। সত্যিই যেদিন এ টায়ার বাজারে চালু হবে সেদিন আর টায়ার ফেটে যাওয়ার দরুণ কোনও মোটরচালক বা মোটর-আরোহীকে রাস্তায় আটকা পড়তে হবে না। ডেইটন রবার কোম্পানি বলেন যে, এ টায়ার সবরকম উৎপীড়ন সহ্য করতে পারে। সহসা পথিমধ্যে একটা পেরেক বা কোনওরকম লোহা-লক্কড়ের খোঁচায় ফেটে তো যাবেই না, এমন কি বন্দুকের গুলী লাগলে, করাত দিয়ে কাটলে বা গর্ত করার যন্ত্র দিয়ে ফুটো করলেও এর কোনও ক্ষতি হবে না। এর মধ্যে হাওয়া ভরা থাকে না, হাওয়ার বদলে পলিইউরেথিনের ফেনায় ভরা থাকে। এ যেন কোনও দেবতার বরে অভেদ্য হয়ে থাকে।

*

"সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে" এ নীতি আমাদের জানা থাকলেও আমরা বেশী ঘুমুলে কোনও ক্ষতি হয় না বরং শরীর ভাল হয়। কিন্তু সম্প্রতি ডিউক য়ুনিভার্সিটির ডাঃ সিকার প্রচার করেন যে, অতিরিক্ত ঘুম মৃত্যুকে এগিয়ে দেয়। সাধারণভাবে মানুষ যখন ঘুমোয় তখন খুব ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, ফলে রক্তমধ্যস্থ জমা করা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সম্পূর্ণ বার হতে পারে না অথচ জাগ্রত অবস্থায় এটা অনায়াসে ত্যাগ করা যায়। সাধারণত মানুষ দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানর দরুণ যতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হয় তাতে শরীরের খুব বেশী ক্ষতি হয় না; কিন্তু এর চেয়ে বেশী ঘুমোলে বিশেষত দিনে ১৫।১৬ ঘণ্টা ঘুমোলে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়। কারণ, অতটা ঘুমের দরুণ যে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শরীরের মধ্যে জমা হল, জেগে ওঠার পর শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে অতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে মুক্তি পায় না; উপরন্তু তার আরও ঘুম পেতে থাকে, কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অজ্ঞান করার কাজেও লাগে, সুতরাং অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডে অতিরিক্ত ঘুমে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এভাবে শরীরের প্রাণশক্তি ক্রমশ কমে যাবে।

*

একটি পলিইউরেথিন ভরা টায়ার। বাঁদিকের ছবিতে বিভিন্ন উপায়ে টায়ারটির উপর নিপীড়ন করা হচ্ছে এবং ডানদিকের ছবিতে নিপীড়িত টায়ারের অবস্থা দেখান হয়েছে

জাপানে 'থিনওলট ভি টু' নামে এক নতুন ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম ক্যামেরা তৈরী করা হয়েছে। এই ক্যামেরা শাটার ১।২০০০ সেকেণ্ডে ছবি তুলতে পারে। এই ক্যামেরার শাটারই হচ্ছে এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুত শাটার।

দ্রুত শাটারওয়ালা ক্যামেরা

*

বড় বড় শহরে অফিস অঞ্চলে মোটর গাড়ি—'পার্ক' করে রাখবার খুব অসুবিধা হয়। ইংলণ্ডে এই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটি ৯।১০ তলা উঁচু মোটর পার্ক তৈরী করা হচ্ছে। এখানে গাড়ি উপর এবং নিচে করার কাজটি স্বয়ংক্রিয় এবং এক সঙ্গে ৫০০টি গাড়ি রাখা চলবে। এই ধরনের পার্ক ইংলণ্ডেই প্রথম তৈরী করছে। এটি লণ্ডনের সাউথ—ওয়ারক ব্রিজের কাছে তৈরী করা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এটি ১৯৬১ সাল থেকে চালু হবে।

*

দশফুট উঁচু এবং চারফুট চওড়া টায়ারটিকে এখন পৃথিবীর বৃহত্তম টায়ার বলা যায়। এই টায়ারে এতখানি রবার আছে যে ঐ দিয়ে তিন হাজার দুশোখানি যাত্রীবাহী গাড়ি এবং সাত হাজার মহিলার জন্য চোদ্দ হাজার মোজা তৈরীর উপযোগী নাইলনের কর্ড তৈরী হতে পারে। গুড-ইয়ার রাবার কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবেই এই টায়ারটি তৈরী করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে বড় বড় যন্ত্রপাতিতে বিশেষ কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করা যায়। এরা বলেন যে, এই টায়ার চালিত গাড়ি ৩০ টনের বেশী ওজন ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে নিয়ে যেতে পারবে।

জাতীয় উন্নয়নে জলপথ

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

অতীতে মানবসভ্যতা জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল ছিল—সে কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। মিশর, ভারত এবং চীন সভ্যতা বিস্তারে যথাক্রমে নীল, গঙ্গা ও ইয়াংসিকিয়াং-এর অবদান আমাদের অজানা নেই। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রসারকল্পে ভারতীয় নৌবহরের যে অসামান্য কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়—আজও তার স্বাক্ষর মেলে জাভা, বরভূধরের মন্দিরে। পরবর্তীকালে জলপথে প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না।

ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও আধুনিক যুগে আমাদের সমাজ-জীবন জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল এবং শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জলপথে আমদানি-রপ্তানি জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তারই আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তার ফলে ইউরোপে সাধারণ জীবনযাত্রার মান আজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত এশিয়া, আফ্রিকা অথবা ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যে অসম্ভব—সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথচ শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা অথবা মজুত মাল আমদানি-রপ্তানির যে প্রয়োজন দেখা যায়, তার জন্য সাফল্যজনক পরিবহণব্যবস্থা অপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়। শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াসহেতু আমদানি-রপ্তানির কাজে জলপথে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তা জাতীয় উন্নয়নে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে বৃটেন এবং ফ্রান্সের সম্মিলিত মিশর আক্রমণে। শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মান উন্নতই নয়, তার সংরক্ষণকল্পেও এই জলপথের প্রয়োজনীয়তা কত সুদূরপ্রসারী তা বর্তমানে ইস্পাতের কারখানায় ধর্মঘটহেতু আমেরিকা কর্তৃক ইউরোপ এবং জাপান থেকে ইস্পাত আমদানির ব্যাপারে সহজেই বোঝা যায়।

কেবলমাত্র নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কাঁচা মাল আমদানি বা মজুত মাল রপ্তানির কাজে বহির্দেশীয় জলপথে বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় তাই নয়, অপরাপর দেশের জন্য আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থায় অথবা যাত্রীবাহী জাহাজ পরিচালনায় বৃটেন, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, ইটালী প্রভৃতি দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ অবশ্যই লক্ষণীয়। জাহাজ পরিচালনায় ইউরোপের প্রায় সব দেশই নিজের দেশের জাহাজ কোম্পানীদের যেমন নানারকম সুবিধা দিয়ে থাকেন, তেমনই বৈদেশিক জাহাজের ওপর নানারকমের বাধা-নিষেধ আরোপ করেন—আপন আপন এলাকায়। তাছাড়া যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণে নিয়মিত বড় রকম অঙ্কের অর্থ-সাহায্য করা হয়। এই সম্পর্কে বৃটেনের কুইন এলিজাবেথ এবং কুইন মেরী, নেদারল্যান্ডের রটারডাম, ইটালীর আন্দ্রে দোরিয়া এবং ফ্রান্সের ইল্ দ্য ফ্রান্সের নাম উল্লেখ করা যায়। জাহাজ পরিচালনায় বর্তমানে কোন কোন দেশে নানারকমের সুযোগ-সুবিধা এমনই আকর্ষণীয়, যে অনেক বিদেশী জাহাজ কোম্পানীও সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

বহির্দেশীয় বাণিজ্য ব্যাপারে শুধু নৌপোত নির্মাণই নয়, কৃত্রিম জলপথ নির্মাণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুয়েজ, পানামা বা জার্মানীর কীল খাল খননের সাহায্যে যেমন জলপথে দূরত্ব হ্রাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে—তেমনই গত জুন মাসে রানী এলিজাবেথ কর্তৃক উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স সাগরপথের উদ্ঘাটনে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার ডেট্রয়েট, মণ্ট্রিল, শিকাগো প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প অঞ্চলগুলির সঙ্গে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে জলপথে সরাসরি সংযোগসাধন বাস্তবিকই অভিনব।

এখন আন্তর্দেশীয় জলপথের ব্যবহার বলতে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, নদী, খাল সাগরতীরের অগভীর জলপথে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জলযান চালনার ব্যবস্থা। তবে ইউরোপের রাইন নদীতে অবশ্য সাড়ে

ভারতীয় নৌবহরের প্রথম তদারকী জাহাজ 'আই-এন-এস দর্শক'—বিশাখাপট্টমে নির্মীয়মান অবস্থায়

চক্রদত্ত

পশ্চিম জাপানের কিয়োটো য়ুনিভার্সিটির ইলেকট্রোনিক বিভাগ একটি বিশেষ উন্নত ধরনের টাইপরাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা সাধারণভাবে মানুষের কথাবার্তা রোমান অক্ষরে লিখিত হবে। কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ঐ টাইপরাইটার যন্ত্রে প্রথমে মানুষের কথাবার্তার শব্দতরঙ্গগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্তিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ রোমান হরফে পরিণত হয়ে লিখিত হয়। ঐ য়ুনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষরা বলেন যে, ১৯৫৩ সাল থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী ঐ টাইপরাইটারে কাজ করছেন।

*

এক খবরে প্রকাশ যে, কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন' কুষ্ঠ রোগীর জীবাণু পরীক্ষার এক উপায় বার করেছেন। এই নতুন পদ্ধতিতে রোগের কোন বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও রোগ ধরা সম্ভব হবে। এই নতুন পদ্ধতির ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যাদবপুরে একটি ছয়তলা গবেষণাগার তৈরী করা হবে।

*

অদ্ভুত জিনিস এই টায়ারটি। সত্যিই যেদিন এ টায়ার বাজারে চালু হবে সেদিন আর টায়ার ফেটে যাওয়ার দরুণ কোনও মোটরচালক বা মোটর-আরোহীকে রাস্তায় আটকা পড়তে হবে না। ডেইটন রাবার কোম্পানি বলেন যে, এ টায়ার সবরকম উৎপীড়ন সহ্য করতে পারে। সহসা পথিমধ্যে একটা পেরেক বা কোনওরকম লোহালক্কড়ের খোঁচায় ফেটে তো যাবেই না, এমন কি বন্দুকের গুলী লাগলে, করাত দিয়ে কাটলে বা গর্ত করার যন্ত্র দিয়ে ফুটো করলেও এর কোনও ক্ষতি হবে না। এর মধ্যে হাওয়া ভরা থাকে না, হাওয়ার বদলে পলিইউরেথিনের ফেনায় ভরা থাকে। এ যেন কোনও দেবতার বরে অভেদ্য হয়ে থাকে।

একটি পলিইউরেথিন ভরা টায়ার। বাঁদিকের ছবিতে বিভিন্ন উপায়ে টায়ারটির উপর নিপীড়ন করা হচ্ছে এবং ডানদিকের ছবিতে নিপীড়িত টায়ারের অবস্থা দেখান হয়েছে

*

"সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে" এ নীতি আমাদের জানা থাকলেও আমরা বেশী ঘুমুলে কোনও ক্ষতি হয় না বরং শরীর ভাল হয়। কিন্তু সম্প্রতি ডিউক য়ুনিভার্সিটির ডাঃ সিকার প্রচার করেন যে, অতিরিক্ত ঘুম মৃত্যুকে এগিয়ে দেয়। সাধারণভাবে মানুষ যখন ঘুমোয় তখন খুব ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, ফলে রক্তমধ্যস্থ জমা করা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সম্পূর্ণ বার হতে পারে না অথচ জাগ্রত অবস্থায় এটা অনায়াসে ত্যাগ করা যায়। সাধারণত মানুষ দিনে আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানের দরুণ যতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হয় তাতে শরীরের খুব বেশী ক্ষতি হয় না; কিন্তু এর চেয়ে বেশী ঘুমালে বিশেষত দিনে ১৫।১৬ ঘণ্টা ঘুমালে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়। কারণ, অতটা ঘুমের দরুণ যে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শরীরের মধ্যে জমা হল, জেগে ওঠার পর শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে অতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে মুক্তি পায় না; উপরন্তু তার আরও ঘুম পেতে থাকে,

কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অজ্ঞান করার কাজেও লাগে, সুতরাং অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডে অতিরিক্ত ঘুম পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এভাবে শরীরের প্রাণশক্তি ক্রমশ কমে যাবে।

*

জাপানে 'থিনওলট ভি টু' নামে এক নতুন ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম ক্যামেরা তৈরী করা হয়েছে। এই ক্যামেরা শাটার
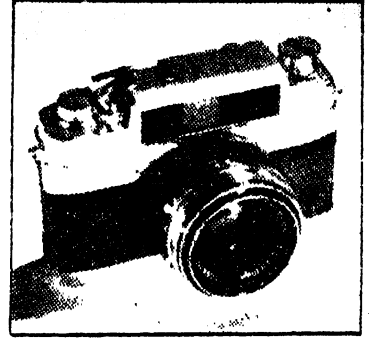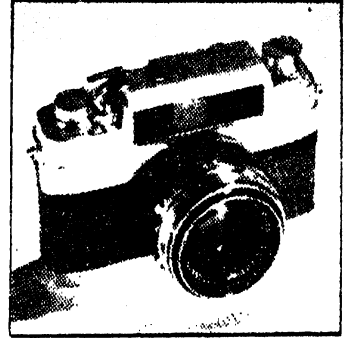
দ্রুত শাটারওয়ালা ক্যামেরা

১।২০০০ সেকেণ্ডে ছবি তুলতে পারবে। এই ক্যামেরার শাটারই হচ্ছে এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুত শাটার।

*

বড় বড় শহরে অফিস অঞ্চলে মোটর গাড়ি—'পার্ক' করে রাখবার খুব অসুবিধা হয়। ইংলণ্ডে এই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটি ৯।১০ তলা উঁচু মোটর পার্ক তৈরী করা হচ্ছে। এখানে গাড়ি ওপর এবং নিচে করার কাজটি স্বয়ংক্রিয় এবং এক সঙ্গে ৫০০টি গাড়ি রাখা চলবে। এই ধরনের পার্ক ইংলণ্ডই প্রথম তৈরী করছে। এটি লণ্ডনের সাউথ—ওয়ারক ব্রিজের কাছে তৈরী করা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে এটি ১৯৬১ সাল থেকে চালু হবে।

*

দশফুট উঁচু এবং চারফুট চওড়া টায়ারটিকে এখন পৃথিবীর বৃহত্তম টায়ার বলা যায়। এই টায়ারে এতখানি রবার আছে যে ঐ দিয়ে তিন হাজার দুশোখানি যাত্রীবাহী গাড়ি এবং সাত হাজার মহিলার জন্য চোদ্দ হাজার মোজা তৈরীর উপযোগী নাইলনের কর্ড তৈরী হতে পারে। গুড়-ইয়ার রাবার কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবেই এই টায়ারটি তৈরী করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে বড় বড় যন্ত্রপাতিতে বিশেষ কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করা যায়। এরা বলেন যে, এই টায়ার চালিত গাড়ি ৩০ টনের বেশী ওজন ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে নিয়ে যেতে পারবে।

জাতীয় উন্নয়নে জলপথ

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

অতীতে মানবসভ্যতা জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল ছিল—সে কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। মিশর, ভারত এবং চীন সভ্যতা বিস্তারে যথাক্রমে নীল, গঙ্গা ও ইয়াংসিকিয়াং-এর অবদান আমাদের অজানা নেই। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রসারকল্পে ভারতীয় নৌবহরের যে অসামান্য কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়—আজও তার স্বাক্ষর মেলে জাভা, বরভূধরের মন্দিরে। পরবর্তীকালে জলপথে প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না।

ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও আধুনিক যুগে আমাদের সমাজ-জীবন জলপথের ওপর কতখানি নির্ভরশীল এবং শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জলপথে আমদানি-রপ্তানি জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তারই আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তার ফলে ইউরোপে সাধারণ জীবনযাত্রার মান আজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত এশিয়া, আফ্রিকা অথবা ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা যে অসম্ভব—সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথচ শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা অথবা মজুত মাল আমদানি-রপ্তানির যে প্রয়োজন দেখা যায়, তার জন্য সাফল্যজনক পরিবহণব্যবস্থা অপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়। শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াসহেতু আমদানি-রপ্তানির কাজে জলপথে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তা জাতীয় উন্নয়নে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে বৃটেন এবং ফ্রান্সের সম্মিলিত মিশর আক্রমণে। শুধু-মাত্র জীবনযাত্রার মান উন্নতই নয়, তার সংরক্ষণকল্পেও এই জলপথের প্রয়োজনীয়তা কত সুদূরপ্রসারী, তা বর্তমানে ইস্পাতের কারখানায় ধর্মঘটহেতু আমেরিকা কর্তৃক ইউরোপ এবং জাপান থেকে ইস্পাত আমদানির ব্যাপারে সহজেই বোঝা যায়।

কেবলমাত্র নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কাঁচা মাল আমদানি বা মজুত মাল রপ্তানির কাজে বহির্দেশীয় জলপথে বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় তাই নয়, অপরাপর দেশের জন্য আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থায় অথবা যাত্রীবাহী জাহাজ পরি-চালনায় বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, ইটালী প্রভৃতি দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ অবশ্যই লক্ষণীয়। জাহাজ পরিচালনায় ইউরোপের প্রায় সব দেশই নিজের দেশের জাহাজ কোম্পানীদের যেমন নানারকম সুবিধা দিয়ে থাকেন, তেমনই বৈদেশিক জাহাজের ওপর নানারকমের বাধা-নিষেধ আরোপ করেন—আপন আপন এলাকায়। তাছাড়া যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণে নিয়মিত বড় রকম অঙ্কের অর্থ-সাহায্য করা হয়। এই সম্পর্কে বৃটেনের কুইন এলিজাবেথ এবং কুইন মেরী, নেদারল্যাণ্ডের রটারডাম, ইটালীর আন্দ্রে দোরিয়া এবং ফ্রান্সের ইল্ দ্য ফ্রান্সের নাম উল্লেখ করা যায়। জাহাজ পরিচালনায় বর্তমানে কোন কোন দেশে নানারকমের সুযোগ-সুবিধা এমনই আকর্ষণীয়, যে অনেক বিদেশী জাহাজ কোম্পানীও সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

বহির্দেশীয় বাণিজ্য ব্যাপারে শুধু নৌ-পোত নির্মাণেই নয়, কৃত্রিম জলপথ নির্মাণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুয়েজ, পানামা বা জার্মানীর কীল খাল খননের সাহায্যে যেমন জলপথে দূরত্ব হ্রাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে—তেমনই গত জুন মাসে রানী এলিজাবেথ কর্তৃক উত্তর আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স সাগরপথের উদ্ঘাটনে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার ডেট্রয়েট, মণ্ট্রিল, শিকাগো প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প অঞ্চলগুলির সঙ্গে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে জল-পথে সরাসরি সংযোগসাধন বাস্তবিকই অভিনব।

এখন আন্তর্দেশীয় জলপথের ব্যবহার বলতে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, নদী, খাল সাগরতীরের অগভীর জলপথে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জলযান চালনার ব্যবস্থা। তবে ইউরোপের রাইন নদীতে অবশ্য সাড়ে

ভারতীয় নৌবহরের প্রথম তদারকী জাহাজ 'আই-এন-এস দর্শক'—বিশাখাপট্টমে নির্মীয়মান অবস্থায়

তিন হাজার টন পর্যন্ত জলযান নিয়মিত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বিষয়ে জলপথ ব্যবহার প্রসঙ্গে রেল বা মোটরপথের কথা সহজেই মনে পড়ে। রেল অথবা মোটরপথের সঙ্গে জলপথের প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক হলেও বর্তমান শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই কাম্য নয়। বরঞ্চ জলপথ, রেল এবং অন্যান্য স্থলপথের সম্পূরকমাত্র এবং জাতীয় উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের সহযোগিতা একান্তই বাঞ্ছনীয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস এবং যুদ্ধজনিত বিপর্যয়হেতু ইউরোপের জনাকীর্ণ দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান উন্নতিকল্পে যেসব সমস্যা দেখা যায়, তার সমাধানের জন্য সবরকমের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা একান্তই অপরিহার্য। এই কারণেই শিল্পজগতে উন্নতিশীল জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সে রেল অথবা মোটরপথের ব্যবহার সাফল্যজনক বলে মনে হলেও, নিম্ন এবং মধ্যমজাতীয় বাণিজ্যের জন্য জলপথের ব্যাপকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এদিকে এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণ বা রেললাইন স্থাপন ব্যয়সাধ্য বলে বিবেচিত হয়, সেখানে অন্তর্দেশীয় পরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে জলপথের ব্যবহার একান্তই সমীচীন। এখানে ইউরোপের রাইন, ডানিয়ুব, ভেসার নদীর যে সাফল্যজনক ব্যবহার দেখা যায়, সে তুলনায় আমাদের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অথবা কাবেরী নদী সরকারী অসহযোগিতা এবং জনসাধারণের অমনোযোগিতায় আমাদের আর্থিক জীবনে নিতান্তই নগণ্য স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু একথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, উপযুক্ত জলযানের সাহায্যে জলপথে পরিবহণ-ব্যবস্থা অর্থকরীভাবে সর্বাপেক্ষা লাভজনক। ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি-রপ্তানির কাজে সবচেয়ে সুবিধাজনক এই জলপথের ব্যবহার অস্বীকার করা নিতান্তই অদূরদৃষ্টির পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, জলপথ ব্যবহারে উন্নতিসাধনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়নি। জলপথের সম্প্রসারণ কেন, বর্তমান জলপথগুলির সংরক্ষণ ব্যবস্থাও তেমন আশানুরূপ নয়। আসাম ব্যতীত পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জলপথ ব্যবহারে এখনও উদ্যোগী, তাঁদের পক্ষে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে অন্তর্দেশীয় জলযান পরিচালনা আদৌ সম্ভব কিনা—সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা মোটেই অন্যায় হবে না।

ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্দেশীয় জলপথের প্রসার, প্রতিযোগিতামূলকভাবে সাগরে জাহাজ পরিচালনা, জাহাজ এবং জাহাজের এঞ্জিন নির্মাণের সঙ্গে বন্দরসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, নতুন বন্দর নির্মাণ, সকলপ্রকার জলযানে মাল বোঝাই এবং খালাস ব্যবস্থার আধুনিককরণ এবং জাহাজ চালনায় আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উপকরণের ব্যবহার জাতীয় স্বার্থের খাতিরে যে একান্তই অপরিহার্য সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

অন্য সকল পরিবহণ ব্যবস্থা অপেক্ষা জলপথে আমদানি-রপ্তানি কেন অধিকতর লাভজনক, তা এখন আলোচনা করা যাক।

(১) কয়লা, খনিজপদার্থ, কাঠ, শস্য, তেল, বড় প্যাকেট প্রভৃতি নিকৃষ্ট ও মধ্যম শ্রেণীর বাণিজ্যবস্তুর পরিবহণ ব্যবস্থায় যে ব্যয় হয়, তা বিক্রয়মূল্যের অনুপাতে খুবই বেশী। অথচ এইসব মাল চলাচলের ব্যাপারে দ্রুতগতির কোন দরকার হয় না। অল্পশক্তিবিশিষ্ট জলযানের সাহায্যে এইসব মাল চালানের ব্যবস্থা করলে এঞ্জিনের জ্বালানি বাবদ নামমাত্র খরচের সম্ভাবনা।

(২) দু হাজার টনের বার্জ বা লাইটার নির্মাণে অথবা ভাড়াকে যে খরচ হয়, তার অনুপাতে ৫০ টন বহনের উপযোগী চল্লিশটি মালগাড়ী কিংবা ৫ টন বহনের উপযোগী চারশোটি ট্রাকের খরচ হয় বহুগুণে বেশী। তাছাড়া অনুপাতে জলযানের জীবনীশক্তিও অনেক বেশী।

(৩) খুব বড় একটিমাত্র আধার পরিচালনায় বা মাল বোঝাই এবং খালাসের কাজে

শ্রমিকের মজুরি ছোট ছোট অনেকগুলি আধার অপেক্ষা অনেক কম।

(৪) জরুরী চালান ব্যবসায় রেল অথবা মোটরপথে যে বিশেষ মূল্যাধার্যের ব্যবস্থা আছে, অল্পগতিসম্পন্ন জলযান অপরাপর জলযান চালনায় কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে না বলে, জলপথে মাল চালানের জন্য সর্বত্র একই মূল্য ধার্য করা সম্ভব।

(৫) জলপথের দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে, প্রতি টন মাইল পিছু পরিবহণ ব্যয় তদনুসারে কম হবে।

(৬) সংরক্ষণ হেতু রেলপথ বা রাস্তাঘাট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সে তুলনায় জলপথের তত্ত্বাবধানে খরচ অনেক কম হয় বলে বিবেচনা করা হয়।

(৭) সরকারী প্রচেষ্টায় বর্তমানে বহু উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী যে সব খাল করা হচ্ছে, সেগুলি মালপত্র চলাচলের জন্য সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব এবং নতুন নতুন শিল্পের জন্য কলকারখানা এইসব জলপথের তীরে নির্মাণ করা হলে জলপথের সাহায্যে অপরাপর শিল্পাঞ্চলের সংগে সরাসরি যোগাযোগ সাধন সম্ভবপর।

(৮) পশ্চাদভূমি হতে শিল্পাঞ্চল এবং সেখান হতে বন্দরে আমদানী রপ্তানী ব্যবস্থায় রেল অথবা অন্যান্য স্থলপথের ওপর যে স্বাভাবিক চাপ পড়া সম্ভব, জলপথের ব্যবহারে তার উপশম আশা করা যায়।

অতএব জলপথের ব্যবহারে যে বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান, জাতীয় উন্নতি প্রচেষ্টায় তা যে কতখানি তৎপর্যপূর্ণ সে কথা আশা করি আমাদের অর্থনীতিবিদগণ মোটেই বিস্মৃত হবেন না। এখন জলপথের সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক, তা নীচে উল্লেখ করা হল।

(ক) অন্তর্দেশীয় জলপথ—

(১) দেশের যে সকল জায়গায় যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য রয়েছে, সেই সকল স্থানে জলপথ নির্মাণে আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত। বর্তমানে যেসব নদী, খাল বা অন্য সকল প্রকারের জলাশয় নৌ চলাচলের পক্ষে অনুপযোগী, ড্রেজিং, ক্যানালাইজিং অথবা রেগুলেশনের সাহায্যে সেইসব জলাশয় জলপথরূপে ব্যবহারের প্রচেষ্টা করা দরকার। নৌ চলাচলের উপযোগী বর্তমানে ব্যবহৃত নদী অথবা খালগুলির সহিত সংযোগ সাধনের জন্য যোগাযোগ-খাল খননের দরকার। তাছাড়াও বর্তমান খালগুলির সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। একই জলযানের পক্ষে অধিক সংখ্যায় জলপথের ব্যবহার হেতু নদী, খাল এবং অন্যান্য জলপথে নির্দিষ্ট গভীরতা এবং প্রস্থ নির্ণয়ের জন্য মনোযোগী হওয়া দরকার।

(২) জলপথগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৩) বন্যার জল যাতে জলপথের কোনরকম ক্ষতিসাধন না করে, তার জন্য স্থানে স্থানে লক-গেট নির্মাণে যত্ন নেওয়া কর্তব্য।

(৪) জলপথ বাণিজ্যের প্রসারে সবরকম আবহাওয়ায় দিনরাত্রি সকল সময়ে নৌ চালনার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার।

(খ) বহির্দেশীয় জলপথ—

(১) ভবিষ্যতের উপযোগী বৃহদায়তন জাহাজ যাহাতে সহজেই বন্দরে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়, তার জন্য বন্দরের সন্নিকটে জাহাজ পথের গভীরতা বৃদ্ধির
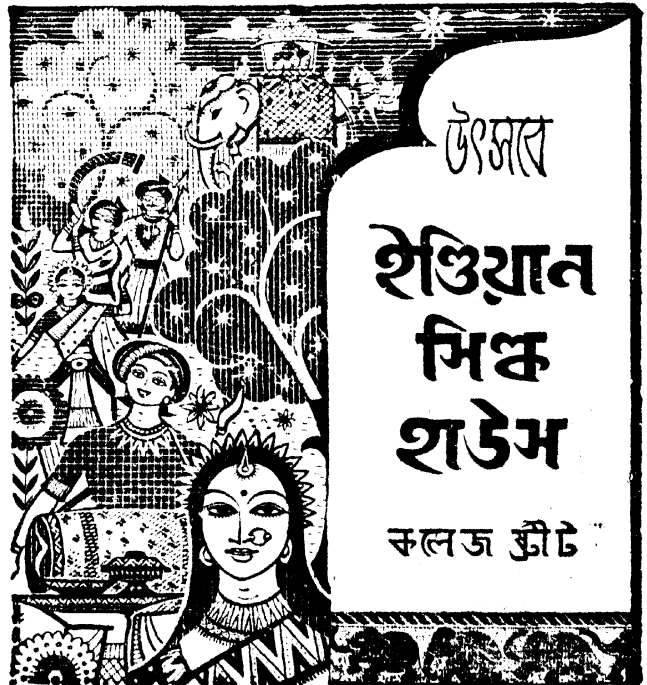
প্রয়োজন। পলিমাটি, বালি বা অন্যান্য কারণে যেখানে জলপথের গভীরতা হ্রাসের সম্ভাবনা, উপযুক্ত প্রতিকারের দ্বারা সেখানকার নির্দিষ্ট গভীরতা রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এছাড়া স্রোত, ঢেউ, হাওয়া অথবা বালির চলাচলের জন্য জল-পথের ওপর যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সে সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

(২) জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য বালির চড়ায় আটকে যাওয়া অথবা নিমজ্জিত জাহাজসমূহের উত্তোলন অথবা স্থানান্তরকরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৩) সাগর উপকূলে অথবা নদী মোহনায় কিংবা জোয়ার ভাঁটায় প্রভাবান্বিত জলপথে বালি এবং পলিমাটি চলাচলের সঠিক পরিমাণ নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিকারকল্পে সকল রকমের আধুনিক বন্দোবস্ত যেমন, রেডিও আইসোটোপ, লুমিনাফোর ইত্যাদির প্রয়োগ বিশেষ যুক্তিযুক্ত।

জলপথের ব্যবহার প্রসঙ্গে বন্দরসমূহের আধুনিককরণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাহাজে মালপত্র বোঝাই বা খালাসের নিমিত্ত ভারতের যে কোন বন্দরে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই হিসাবে ইউরোপের বন্দরগুলির কার্যব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা অবশ্যই ন্যায়সংগত।। নানা কারণে কলকাতা বন্দরে 'কী' (quay)তে স্থান পাবার জন্য যখন কোন কোন জাহাজকে সপ্তাহ কালব্যাপী অপেক্ষা করতে হয়, তখন জার্মানীর হামবুর্গ বন্দরে লাসে গড়পড়তা ১৪৭০খানি জাহাজের মাল বোঝাই হয়ে সাগরপথে যাত্রা বাস্তবিকই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উপকরণের সাহায্যে গড়ে প্রতি তিরিশ মিনিটে এক-খানি সম্পূর্ণ জাহাজের মালবোঝাই শুধু-মাত্র হামবুর্গ বা রটারডার্ম বন্দরেরই একচেটিয়া তাই নয়। পরন্তু রাইন, ড্যানিয়ুব নদীর অন্তর্দেশীয় বন্দর-গুলিতেও সমপরিমাণ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়লা, খনিজ পদার্থ, গম অথবা তেল ইত্যাদি বোঝাই এবং খালাসের জন্য এদেশের সব ছোটবড় বন্দরগুলিতেই 'স্বয়ংক্রিয়তার' বা অটোমেশনের প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া জলযান থেকে যুগপৎ মালগাড়ি, ট্রাক অথবা লাইটের মাল-বোঝাই এবং খালাসের যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, অর্থকরীভাবে তার কার্যকারিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। অতএব বন্দর-গুলির সংস্কারার্থে সাধারণভাবে যে যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন, তা হচ্ছে—

(১) আধুনিকতম ক্রেনের প্রচলন।

(২) 'স্বয়ংক্রিয়তা' বা অটোমেশনের পরি-প্রেক্ষিতে মাল বোঝাই এবং খালাসের ব্যবস্থা।

(৩) তেলের জাহাজের জন্য বিশেষ পাইপ লাইন নির্মাণের আবশ্যকতা।

(৪) মাল মজুতের জন্য গুদামঘরের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন।

(৫) অপরাপর স্থলপথ এবং রেল-পথের সহিত সরাসরি সংযোগসাধন।

(৬) জলযান এবং মেরিন এঞ্জিনের মেরামত ব্যবস্থা।

(৭) জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শ্রমিক সঙ্ঘের আন্তরিক সহযোগিতা। জলপথের সাফল্যজনক ব্যবহার প্রসঙ্গে 'জলযান'এর প্রসঙ্গ কোনমতেই বাদ দেওয়া চলে না। পাঁচ হাজার মাইল দীর্ঘ সাগরতীরের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জাহাজ বা তার এঞ্জিন নির্মাণে কোন বিশেষ সুব্যবস্থা আমরা এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। তথাকথিত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ভিজাগাপট্টমের জাহাজ কারখানায় জাহাজ নির্মাণের চরম ব্যর্থতার কাহিনী শুধু ভারতে কেন, ভারতের বাইরেও সুবিদিত। অথচ ইউরোপের জার্মানী, যুগোস্লাভিয়া, নেদারল্যান্ড কিংবা জাপানের কাছ থেকে জাহাজ কেনা বাবদ যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় তাও নিতান্ত সামান্য নহে। এদিকে জাহাজ নির্মাণে যদিও বা সূচনা দেখা যায়, জাহাজের এঞ্জিন নির্মাণের কোন সম্ভাবনাই এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। জাহাজ ও জাহাজের এঞ্জিনের জন্য আমরা যে কোটি কোটি টাকা বিদেশে ব্যয় করি, তার প্রতিকার-কল্পে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হচ্ছে না—ভাবতেও অবাক লাগে।

অন্তর্দেশীয় জলপথের জন্য ইউরোপে যেসব অভিনব আবিষ্কার দেখা যায়, তার অনুকরণে জলপথ এবং স্থলপথে ব্যবহারের জন্য amphibious containers বা উভচর আধারের প্রচলন করা দরকার। খনিজ দ্রব্য কোক অথবা কয়লার জন্য জার্মানীতে ভেস্টফাল রাফট্ (খড়্গপুর টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডাঃ ভেস্টফালের নিজস্ব আবিষ্কার) বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। কৃষিজাত যেসব জিনিস নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তার পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য রেফ্রিজারেটেড বার্জের ব্যবহারও বিশেষ কার্যকরী। এদিকে এক বা ততোধিক বার্জ বা লাইটার ইত্যাদি ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য সম্প্রতি 'ঠেলাবোটের' প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাগবোটে করে 'গাধাবোট' টেনে নিয়ে যাওয়া অপেক্ষা পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত অনেক সরল বলে নির্মাণ প্রকারণে এবং পরিচালনা হেতু প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জনবলের প্রয়োজন হওয়ায় একই পরিমাণ মাল চালনায় 'টানাবোট' মারফত যে খরচ হয়, ঠেলাবোটের ব্যবহারে সেই খরচের পরিমাণ অনেক কম। আমেরিকায় এবং সম্প্রতি ইউরোপের সর্বত্র বিশেষ করে রাইন নদীতে 'ঠেলাবোটের' জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বাল্টিমোর শহরে 'আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিচালনা' বিষয়ে আলোচনার জন্য যে অধিবেশন হয়, সেখানে অন্তর্দেশীয় জল-পথে ব্যবহারের জন্য 'ঠেলাবোটের' অর্থকরী কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে।

যাই হোক, জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আর্থিক বিষয়ে যে সবরকম প্রচেষ্টার দরকার, তা অনস্বীকার্য। অথচ বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় জলপথের সাফল্যজনক ব্যবহারে কোটি কোটি টাকা সঞ্চয়নের যে সম্ভাবনা বর্তমান সে সম্পর্কে সরকারী অমনোযোগিতা বাস্তবিকই পরি-তাপের বিষয়। ইউরোপের পশ্চিম জার্মানী বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড এবং ফ্রান্সে সরকারী সহযোগিতায় বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় জলপথের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা যে চরম অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াস দেখা যায়, তার সার্থক অনুকরণে ভারতের জলপথ বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারে যে সচেষ্ট হওয়া দরকার, সে কথা আমরা যেন কোন মতেই বিস্মৃত না হই।

মনোহরদাস তড়াগ-এর উত্তর তীর ধরে ময়দানের মধ্যে এক শিবিরের দিকে সেদিন বিকেলে যাচ্ছিলাম কোন এক ক্রীড়াবিদ্ বন্ধুর সন্ধানে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের এই মনোহরদাস তড়াগটি পথশ্রান্ত পথিকের পিপাসা-নিবারণার্থে, একদা প্রস্তুত হলেও, আজ তা কজনের তৃষ্ণা নিবারণ করে জানি না, তবে এর চারপাশের চারটি গম্বুজ যে বহু ভবঘুরেকে আশ্রয় দান করে, এটা জানা ছিল। উত্তর দিকের প্রথম গম্বুজ, যেটি ট্রাম রাস্তার ধারে, সেটাও পার হয়ে দ্বিতীয়টির কাছাকাছি হয়ে, ক্রমে সেই গম্বুজটিও ছাড়িয়েছি, এমন সময়, কে যেন পিছন থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল আমার পদবী ধরে। পদবী ধরে সম্বোধন করলেই যে নিশ্চিতরূপে সে লক্ষ্য আমি, একথা মনে করার কারণ নেই, তবু স্বাভাবিক নিয়মেই থমকে দাঁড়ালাম। গম্বুজের মেঝে থেকে লোকটি তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কালো ছিট দেওয়া ছিটের একটা সার্ট আর ঘন নীল রঙের ট্রাউজার্স পরণে, মধ্যবয়সী লোকটি ধীরে ধীরে আমারই কাছে এসে দাঁড়াল মুখে খুশি হওয়া একটু হাসির রেখা—বললে, "চিনতে পারেন?"

একটু অবাক হয়েই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। [illegible] মাথার চুলগুলি ছাঁটা, [illegible]—পরিষ্কারভাবে দুটি গাল [illegible]—এমন [illegible] রেখাগুলি [illegible] শরীর হয়ে, [illegible]—হয়তো। আমাকে নিরুত্তর দেখে লোকটি অল্প একটু হাসল, বললে, "আমি কিন্তু চিনেছি। আপনি পারবেন না? বোস। ডি কে বোস। আন্দামানের। মনে নেই?"

চোখের দিকে একবার তাকাবার পরে আর কথা সরছিল না। আমার আন্দামানের অভিজ্ঞতা ১৯৪৯ সনের। তারপরে কেটে গেছে দশ-দশটা বছর। পরিবর্তনের প্রাথমিক স্রোতটা লক্ষ্য করেই এসেছিলাম, কিন্তু তারপর আরও কত সম্প্রসারণ হয়েছে জনপদের, আরও কত নতুন মানুষ ওখানে গিয়েছে তাদের সঠিক সংবাদ আমি জানব কেমন করে? কিন্তু যাদের প্রত্যক্ষ করে এসেছিলাম, তা ত ভোলবার নয়। এবং সেই ভুলতে-না-পারা মানুষগুলির মধ্যে এবার্ডিনের এই ডি কে বোস অন্যতম। আমি যে কাজ নিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম, তা সাময়িক, কিন্তু ডি কে বোস গিয়েছিল চাকরী নিয়ে, আমি যাবার ঠিক আগের বছরটিতে। [illegible] লাইনের ব্যাচেলার-মেসটিতে সে থাকত। ঘোরাঘুরির নেশা ছিল, থিয়েটারের বাতিকও ছিল। মোটামুটি হৈ হৈ-করা প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তাকে আমার বিশেষভাবে মনে রাখবার কারণ ছিল

অন্য। কোন-কিছু ঘটনা বর্ণনা করার ভঙ্গি ছিল তার অদ্ভুত। শোনা কথাও সে চোখ বড় বড় করে, হাত নেড়ে এমনভাবে বলত, যে মনে হত, সবই সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। জাপানীরা ওখানে শেষ যে বাঙালী ভদ্রলোকটিকে মাত্র গুপ্তচর সন্দেহ করে সেলুলার জেলে ফাঁসি দিয়েছিল, তাকে সে নিজে প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু তার মানসিক অবস্থা, তার বেঁচে থাকবার অদম্য বাসনা, তার ফাঁসির দড়ি দেখে আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠা, এসব সে সেদিন এমনভাবে বর্ণনা করেছিল, যে মনে হচ্ছিল, সেই বাঙালী ভদ্রলোক, মিস্টার ব্যানার্জি তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!

এ ছাড়া, আরও একটা কারণে ডি কে বোসকে আমার ভোলা উচিত নয়,—সেটা হচ্ছে, ওর এক বিচিত্র মানসিকতা। এখানে জনান্তিকে বলে রাখা ভালো, ওর অবাঙালী বন্ধুবান্ধব, যাদের সঙ্গে ওর প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ, যাদের সঙ্গে ওর এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ সুযোগ বুঝে ঘুরে বেড়ানো, তারা প্রায় সকলেই ব্যাচেলার হলেও নারীসঙ্গ-বিবর্জিত ছিল না। কিন্তু ভিন্ন ধরনের লোক ছিল ডি কে বোস। বলত, "হাতে কিছু পয়সা জমুক, চাকরির একটু উন্নতি হোক, একেবারে দেশ থেকে বিয়ে করে মেয়ে নিয়ে আসব। ভালো মেয়ে। মনের মত মেয়ে। তার আগে দেহটাকে অপবিত্র করব না।"

বন্ধুরা হেসে উঠত। কেউ-বা বলে উঠত, "তা বিয়েই কর না? এটা দ্বীপান্তর বলে কি এখানে মেয়ে নেই?"

"না, নেই", ডি কে বোস বলত, "আমি বিয়ে করব কলকাতায় গিয়ে। কলকাতার মেয়ে নিয়ে আসব, রীতিমত পড়াশুনো-করা মেয়ে।"

যাই হক, ওকে দেখে একমুহূর্তকালের মধ্যে আমার সব-কিছু মনে পড়ে গেল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলাম,—"আরে, ডি কে! তুমি এখানে?"

একটু হেসে বললে,—"এসেছিলাম। চলে যাচ্ছি।"

"মানে?"

বললে,—"হ্যাঁ। আমার ত কেউ ছিল না, এক জেঠামশায় ছাড়া। তাঁর ওখানেই এসে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ চলে যাচ্ছি।"

"ছুটি নিয়ে এসেছিলে বুঝি? ফুরিয়ে গেল ছুটি?"

"না," বললে, "ছুটি এক মাসের। এখনও দশ দিন বাকি। কিন্তু তার আগেই যেতে হচ্ছে।"

"কেন?"

বললে, "শুনতে চান? তাহলে আমার সঙ্গে জাহাজে চলুন। চাঁদপাল ঘাটে এম-ভি আন্দামানস্ দাঁড়িয়ে আছে। কাল ভোরে ছাড়বে।"

বললাম, "আমার একটু কাজ ছিল। আচ্ছা, তা হক, চল তোমার সঙ্গেই যাই। তা তোমার চেহারা এমন হলো কেন? কী সুন্দর চেহারা ছিল তোমার! অথচ......"

ম্লান একটু হেসে বললে, "বুঝেছি এই-জন্যই চট্ করে চিনতে পারেননি! তা চেহারায় আর কী হবে? এগার বছর ওখানে থাকতে থাকতে একেবারে জংলী হয়ে গেছি।"

"এর মধ্যে একবারও আর দেশে আসনি?"

"না।"

"বিবাহ?"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ময়দানের সেই স্তম্ভটার কাছে এসে পৌঁছেছি ততক্ষণে, যার সামনে, দুটি সৈনিকের মূর্তি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এদিক ওদিক লোকজন বসে আছে। ওরই মধ্যে একটু নিভৃতি খুঁজে নিয়ে বললাম, "জাহাজে একটু পরে যাচ্ছি। ততক্ষণ এখানে একটু বসে নিলে হয় না?"

"বেশ।"

অতএব স্তম্ভের ধারে বসলাম দুজনে। একটুক্ষণ থেমে থাকবার পর একটু ম্লান হেসে একসময় বললে,—"এগার বছর পরে ঐ বিবাহ করতেই আসা।"

উৎসুক হয়ে বলে উঠলাম,—"তারপর?"

বললে,—"তারপর আর কী? জেঠাইমার উদ্যোগই বেশী। তাঁর দূরসম্পর্কের ভাইঝি বুঝি। হল সম্বন্ধ। চিঠি পেয়ে ছুটিছাটা নিয়ে আমিও এলাম। পাকা দেখার কথা ছিল কাল। আমারই যাবার কথা ছিল। শুনেছি ভালোই দেখতে মেয়েটিকে। আই-এ পড়ছে। কিন্তু যত কাছে আসতে লাগল তাকে দেখার মুহূর্ত, তত ভিতরে-ভিতরে একটা আতঙ্ক জাগতে লাগল ভেতরে। মনে হল, আমি কি সভ্যজগতের কেউ? এ মেয়ে কি ওখানে গিয়ে সুখী হবে? তাই, আজ চুপি চুপি এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে, সব বন্দোবস্ত করে, জাহাজে উঠে বসেছি। ওরা কেউ এখনও জানে না যে আমি পালাচ্ছি। জাহাজ থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এতদূর এসেও ট্রাম লাইনের ওদিকে যেতে পারছিলাম না, চেনাশোনা যদি কারুর সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়। চেনাশোনা মানে, বিয়ের এই ব্যাপারের সঙ্গে যারা জড়িত। আপনার মত লোকের কথা নয় অবশ্য।"

বললাম, "কিন্তু, এ পলায়নের কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। এতে ঠিক পালাবার মতো কী অবস্থা হল?"

বললে, "এগার বছর পরে কলকাতা এলাম। দেখি সব বদলে গেছে। মানুষ-গুলোও। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই, স্বার্থ নিয়ে টানাটানি, হানাহানি। মানুষের মন যেন আরও ক্ষুদ্র, আরও নীচ হয়ে গেছে। চারিদিকে, মানুষের আচারে-ব্যবহারে অদ্ভুত একটা কৃত্রিমতা। আমি হাঁপিয়ে উঠলাম।"

বললাম, "বুঝেছি তোমার কথা। কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে না-করার কী সম্বন্ধ? এভাবে পালানইবা কেন চুপিচুপি?"

ও স্থির মনে কথাগুলি শুনছিল আমার। একসময় বলল,—"আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গেলে আপনাকে একটা গল্প শোনাতে হয়।"

"গল্প?" ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে উঠলাম, "কী গল্প? বেশ শোনাও।"

হঠাৎ এই সময় ঘূর্ণি একটা হাওয়া জাগল। আমরা মাথা নিচু করে থেকে, সেটাকে পার করে দিয়ে আবার স্থির হয়ে বসলাম দুজনে।

ও বললে,—"কার নিকোবরের কথা আপনার মনে আছে? যাকে আমাদের প্রাচীনেরা নাম দিয়েছিলেন, নগ্নদ্বীপ? যেখান থেকে দ্বীপের অধিবাসীর দল চল্লিশ মাইল সমুদ্রের ঢেউ ঠেলে ঠেলে নৌকো করে যায় চাওড়াদ্বীপে?"

বললাম,—"তা হবে। কিন্তু কী বলতে চাও?"

ডি কে বললে, "কার-নিকোবরের সমুদ্র-তীরবর্তী একটা গ্রাম, নাম, ধরুন, লাপাতি। এই লাপাতি গ্রামের একটি মানুষের কথা আমার আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে। তার কথা যখন এবার্ডীনে বসে প্রথম শুনি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে, তখন নিছক একটা কাহিনীই শুনে গেছি, কিন্তু আজ, তার মধ্যে একটা তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছি। এই যে এই শহরে এত মানুষ পথ দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে, এদের মুখের ভাব—এদের চলাফেরা—এদের সব-কিছু, এত কৃত্রিম,—এত ছকে-ফেলা,—যে, তা আপনাদের চোখে পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে বড় লাগে। বড় মেকী মনে হয়।"

অবাক হয়ে ডি কে-র কথা শুনে

যাচ্ছিলাম। এবার্ডিনে ওর সংগে যখন মিশেছি, তখন ওকে দেখেছিলাম অন্য মানুষ, তুচ্ছ মান-অভিমান কিংবা ছোট-ছোট আঘাত আর দুঃখ, যা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় মানুষের সংগে মানুষ থাকলেই এসে পড়তে বাধ্য,—সেসব ও কোনও দিন গায়ে মাখত না, বহু মানসিক আঘাত অথবা বঞ্চনার স্পর্শ ও হেসেই সেদিন উড়িয়ে দিয়েছে বলা চলে। কিন্তু আজ ওর কথার ধরন অন্যরকম। কী এক অভাবনীয় আত্ম-মগ্নতায় ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অবশ্য এগার বছরের ব্যবধান, এর মধ্যে মানুষের জীবনে কতরকমই না পরিবর্তন আসতে পারে! ওর চেহারারও কি পরিবর্তন এসেছে কম? এখন দেখলে মনে হয়, ও বুঝি বাঙালীই নয়, অন্য দেশের মানুষ।

ডি কে একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে শুরু করলে, "দ্বীপান্তরে থেকে যে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের জন্য মন কাঁদত, কলকাতায় এসে দেখি, তারা ভিন্ন মানুষ। তদের সংগে আমার সমস্ত সংযোগের সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে কে যেন কখন সবার অজ্ঞাতে হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়েছে! যে-সব পরিবারে আমার আগে অবারিত দ্বার ছিল, সেখানে কেমন-যেন একটা সতর্কতার ভাব। মেয়েরা, অর্থাৎ আমার বোন, বৌদি, মাসি-পিসীর দল,—যারা সবক্ষণ আমাকে ঘিরে একদিন গল্পগুজব করত,—আজ তারা কাছে আসতেও যেন ভয় পায়! কতজন ত সামনেই এল না!"

ডি কে থেমে গেল। আমিও চুপ করে বসে আছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে নেমে এলো অন্ধকার।

এক সময় ডি কে আবার বলে উঠল, "আপনাকে দেখে ভয়ানক আনন্দ হল, পিছন থেকে ডেকেও উঠলাম, কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হল, মনে হল, যদি আপনিও মুখ ফিরিয়ে চলে যান!"

বললাম, "এটা তোমার বুঝবারও ভুল হতে পারে। আজ যারা সহজেই তোমার কাছে আসতে পারেনাম, বহুদিনের অদর্শনের জন্য তাঁদের পক্ষে সামান্য একটু লজ্জা অথবা সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক। আরও দিন কয়েকের পরিচয়ে হয়ত এ জড়িমাও কেটে যেতে পারত।"

"না-না!" ডি কে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "সেটা আমিও ভেবেছিলাম। তাই মিশতে গিয়েছিলাম আরও আপনার হয়ে। কিন্তু আমাকে ওরা কেউ ভাবতে পারছে না আপনার বলে। অথচ আমার স্বপ্ন ছিল, কলকাতায় আসব, এখানেই বিয়ে করব।"

বললাম, "হ্যাঁ তা আমি জানতাম। তুমি বলেছিলে।"

বললে, "বিশ্বাস করুন, আমার দেহ আজও পবিত্র। আমি এই বিবাহ করব বলে কখনও কুসংসর্গ করিনি, কুকাজ করিনি, কোন নেশা পর্যন্ত ছিল না আমার।"

বললাম, "কিন্তু এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, সেই বিবাহ যখন স্থির হল, তখন সে কাজ শেষ না করে তোমার এভাবে চলে যাবার অর্থ কী?"

ডি কে চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললে, "তাহলে কার-নিকোবরের লাপাতি গ্রামের সেই আদিবাসী মানুষটির কথাই শুনুন। নারিকেল-বন ঘেরা সেই ছোট্ট দ্বীপ, চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত উধাও সমুদ্র। সেই সমুদ্রপথে একদিন গ্রামের ধারে এসে লাগলে দুটি ছোট্ট মোটর-লঞ্চ, একটা খাড়ির মধ্যে বোটগুলি রেখে, বোটের সেই অচেনা মানুষগুলি গ্রামের ভিতরে চলে গেল গাঁওবুড়োর সংগে কথাবার্তা বলার পর।"

একটু দূর থেকে এসবই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল সেই লোকটি। মাথায় ছোট-ছোট কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, কোমরে লেংটির মত একটু করে কাপড় ছাড়া আর কোথাও কোন আবরণ নেই দেহে। মিশ্‌কালো ন্যাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা।

গাঁওবুড়ো আর তার দলবল আগন্তুক-দের নিয়ে গাঁয়ের অভ্যন্তরে মিলিয়ে যেতেই, লোকটি নিম্নকণ্ঠে ডেকে উঠল, "গাং?"

কাছেই যে বারোয়ারী ঘরটি রয়েছে কয়েকটি মোটা মোটা খুঁটির ওপরে আশ্রয় করে, যার নাম, এল্‌পানাম, যার নীচে রাখা আছে গাঁয়ের নৌকোখানা, তার পাশ থেকে উঠে এল অনুরূপ বর্ণেরই একটি লোক। কাছে এসে বললে, "কী? ডাকলে কেন?" গাং-এর চেহারা ঐ লোকটির থেকে অনেক মজবুত। বয়সে সে যথেষ্ট তরুণও বটে। তারদিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে লোকটি বললে, "গাঁয়ে আবার নতুন 'তারিক' এল, দেখলি ত?"

"হ্যাঁ দেখলাম। কিন্তু 'তারিক' কোথায়? ওদের আমাদের মত হাত-পা মাথা বলে কি

ওরা আমাদের মত 'তারক'? ওদের পোশাক-আশাক দেখলি না? ওরা 'লাও',—শয়তান!"

"শয়তান, ত, গাঁওবুড়ো অত খাতির করে ওদের ভিতরে নিয়ে গেল কেন?"

গাং বললে, "খাতির না করে উপায়? ওরা রেগে গেলে কি আর রক্ষে আছে?"

"কেন?"

গাং এবার বিরক্ত হলো। বললে, "সেসব দেখবার আমাদের দরকার কী? গাঁওবুড়ো যা করবে, আমাদের ভালোর জনাই করবে। আমরা যে-কাজে লেগে আছি সে কাজেই থাকি। আয়, সাঁঝ হয়ে এল!

লোকটির নাম মারো। মারোর দেহের মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছে, মুখেও বলি রেখার চিহ্ন। বয়স কোন না ষাটের কাছাকাছি? কিন্তু এসব নিয়ে ওরা তেমন মাথা ঘামায় না।

'এল্-পানাম' বা বারোয়ারী ঘরের কাছে সমুদ্রের দিকটা ঘেঁষে কাণ্ড আর পাতাসুদ্ধ একটা বাঁশ পোঁতা আছে, তার কাছে গিয়ে ওরা হাঁটু গেড়ে বসল। মাথা নীচু করে দুটি হাত বুকের উপর রেখে চুপচাপ বসে রইল ওরা বহুক্ষণ। এই পাতাসুদ্ধ বাঁশ ওদের কাছে দেবতার প্রতীক। ইনি ওদের সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কুটিরের কাছে কাঠের গুঁড়ি জড়ো করে দিনের বেলাতেই আগুন জেলে রাখা হয়েছিল। এই আগুন আনা হয়েছিল গ্রামের ভিতর থেকেই। সেই আগুনের শিখা রাত্রের অন্ধকারে আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। ইতিমধ্যে আরও একটি ছায়ামূর্তি এসে সেই আগুন থেকে আগুন জ্বালালো একটি ডাবের খোলের মধ্যে সঞ্চিত চর্বিতে। তারপরে প্রদীপের মতো সেই শিখায়িত ডাবের খোলা নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেল বারোয়ারী ঘরের দিকে।

মারো আর গাং এল এবারে বারোয়ারী ঘরের নীচে, তাদের সযত্নে রক্ষিত নৌকোটার কাছে। হাতে ছোট্ট মশাল। সেটা একটু দূরে বালিতে পুঁতে রেখে, তারই আলোয় তারা ভালো করে দেখছিল নৌকোটিকে। এই বিচিত্র নৌকোটি করেই তারা বছরে একবার করে তীর্থযাত্রার মত 'চাওড়া' দ্বীপে যায়। এই নৌকোটির সঙ্গে বহু স্মৃতি তাদের বিজড়িত।

এক সময় নৌকোর পাশেও ওরা অনুরূপভাবে হাঁটু মুড়ে বসে রইল কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নৌকো ওদের 'ইয়োম'। অর্থাৎ পিতামহ। নৌকোরও প্রাণ আছে, নৌকোও জীবন্ত। ওঁর রীতিমত পরিচর্যা করতে হয়।

সন্ধ্যাকালীন সেই পরিচর্যার পালা শেষ করে ওরা আবার এসে বসল ওদের সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে। সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে মিশে একটানা একটা দুম্-দুম্ শব্দ ভেসে আসছে এতক্ষণে। ওরা নীরবে ওদের খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ করল। সে খাদ্য তালিকায় ওদের অতি প্রিয় 'কাঁকড়া' নেই। কারণ, কাঁকড়া খাওয়া ওদের এখন নিষেধ। ওরা এখন হচ্ছে 'ইয়োম-আব', অর্থাৎ নৌকোর পরিচর্যাকারী। ওরা নৌকো ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না, 'কাঁকড়া জাতীয়' কিছু খেতে পারবে না, এমনকি কাঠও চিরে নিতে পারবে না, কারণ তাতে 'ইয়োম' বা নৌকো'র অমঙ্গল হতে পারে।

মারো প্রশ্ন করল, "ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না? দুম-দুম-দুম? তাহলে 'কা-না-আনহাউন' আরম্ভ হল, কী বলিস?"

গাং বললে, "হাঁ, তা হল।"

'কা-না-আন-হাউন' বা 'কান-হাউন' ওদের জীবনের সব থেকে বড়ো উৎসব। প্রত্যেক নিকোবরী পল্লীর 'টুহেট' বা সারি সারি কুটিরগুলির সামনে দেখা যাবে, বিরাট একটা কাঠের গুঁড়ি সোজা দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে, আর তাতে ক্রুশের মত করে পর-পর কাঠের বা বাঁশের টুকরো বাঁধা আছে ওপর থেকে একেবারে নীচ পর্যন্ত। সেই ক্রুশ-এর বাহুগুলিতে ঝুলছে নানারকম বিশুষ্ক খাদ্যদ্রব্য, শুকনো শুয়োরের মাংস বা নানারকম শুকনো ফল। মাথায় ত্রিশূলের মত তিনটি কাঠি। একে ওরা বলে, 'ন্যায়া-আনু-কু-পা' অতি পবিত্র বস্তু। গাঁয়ের যারা মারা যায়, তাদের উদ্দেশে ঐ ক্রুশে ঝুলিয়ে রাখা হয় খাদ্যদ্রব্য। বছরের শেষে এই 'কান-হাউন' উৎসবে ওগুলিকে নামানো হয়, নামিয়ে নতুন খুঁটি পোঁতা হয়। আর পুরনো দিয়ে শুরু হয় উৎসব। আসলে ওটি মৃত আত্মাদের স্মরণোৎসব। কিন্তু, এর নৃত্যগীত ও ভোজের আয়োজন যে-কোন নিকোবরীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এবং এজন্য গাঁয়ের প্রতিটি নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ গিয়ে যোগ দেয় এই উৎসবে। একমাত্র 'ইয়োম্-আব' ছাড়া। ঢাকের 'দুমদুম-দুম-দুম' শব্দ ওদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করলেও, ওদের ওখানে কোনও-রকমে যাওয়ার উপায় নেই। 'ইয়োম' ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তাতে আগামী 'চাওড়া' যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর, চাওড়া-যাত্রার সঙ্গে প্রত্যেকটি নিকোবরী যুবকের ভাগ্য বিজড়িত। চাওড়ায় যে যায়নি, এমন যুবকের হৃদয়ের আবেদন কোনো নিকোবরী রমণীর হৃদয় স্পর্শ করে না।

মারো বললে, "বেনোবুড়ীকে একবার ডাক না?"

"কেন?"

"জিজ্ঞাসা করি, তিরিন্ কেমন আছে? বাচ্চা হল কিনা?"

গাং অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, "তিরিনের বাচ্চা হলে কি আর বেনোবুড়ি ছুটে আসবে না খবর দিতে?"

মারো মুখ তুলে 'এল্-পানাম' বা বারোয়ারী ঘরটার দিকে তাকাল। কোনও সাড়াশব্দ নেই, শুধু দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে দুম-দুম-দুম-দুম!

মারো বললে, "বেনোবুড়ি সাঁঝের বেলা আগুন নিয়ে একবার ঘরে গেল না?"

"তা গেল।"

মারো হেসে উঠল, "ঠিক হয়েছে, বুড়িও আজ আচ্ছা জব্দ, কান-হাউন এ যেতে পারল না!"

গাং বললে, "বেনো ত বুড়ি। কিন্তু তিরিনের কী অবস্থা। বল? যুবতী মেয়ে, কোথায় গিয়ে নাচের আসরে পা ছড়িয়ে বসে গানের ধুয়া ধরবে, 'লে-লে-লে-লে!' তা না, এল্ পানামে আটকে রইল।"

মারো বললে, "তাতে কী! বাচ্চা আসছে না! আচ্ছা, কী বাচ্চা ওর হবে বলত? ছেলে, না মেয়ে?"

গাং বললে, "তা নিয়ে তোর অত মাথা-ব্যথা কেন? তিরিনের মরদ ওদিকে কান-হাউনে গিয়ে মেতেছে, তার কোনও খেয়াল নেই, আর ইনি করছেন এখানে বসে মাতব্বরী! বুড়ো হলে মানুষের এই দশাই হয়!"

চটে উঠল মারো, বললে, "এই খবরদার! বুড়ো বলবি না!"

"না, বলব না! নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখেছিস! চামড়া ঝুলে পড়েছে। বেনোবুড়ির দশা হল বলে!"

কী এক অদ্ভুত আবেগ এসে হঠাতই কণ্ঠরোধ করল মারোর, প্রথমে ইচ্ছা হল, গাং-এর টুঁটি টিপে ধরে। কিন্তু ও জোয়ান, ওর সঙ্গে শক্তিতে ও পারবে কেন? পরক্ষণেই মনে হল, কী-এক অব্যক্ত

হাহাকার যেন বুকের মধ্যে দাপাদাপি করে মরছে!

ওকে নিরুত্তর দেখে, গাং-এর মনটাও নরম হল। গাং বললে, "কত বয়স হল?"

"কে জানে! তিন কুড়ি হবে হয়ত। এমন আর কী!"

আবার সব চুপচাপ। সমুদ্রের ঢেউ কিন্তু অক্লান্তভাবে তীরভূমিতে এসে ক্রমাগত ভেঙে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে মারোই ভঙ্গ করল ওদের নীরবতা। বললে, "আমি কতবার চাওড়া গেছি বলত? আট-আটবার। আমার কি বিয়ে করার কোনও বাধা ছিল? কোনও মেয়ের মন পাওয়া কি কঠিন ছিল আমার পক্ষে? এই বেনো-বুড়ি, বুড়ি তখনও সে হয়নি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কতবার। আমি রাজী হইনি"

"কেন? সারাজীবন বিয়ে না করে কাটালিই বা কেমন করে?"

মারো বললে, "সারাজীবন কাটালাম কোথায়? এখনও কি বিয়ে করতে পারি না? খুব পারি।"

"তাহলে করছিস না কেন?"

হঠাৎই চুপ করে গেল মারো। মাথাটা নীচু করে কী এক প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল সে। যেমন প্রতিটি নিকোবরী তরুণ যথানিয়মে বিয়ে করে, তেমনি মারোও হয়ত বিয়ে করত, যেমন সবাই জীবন কাটায়, তেমনি জীবন কাটাত। কিন্তু, হঠাৎ তার মনে জাগল অদ্ভুত এক অভিলাষ!

তখন টুপি মাথায় শাদা চামড়ার মানুষগুলি এলদ্বীপে আসতে আরম্ভ করেছে। কত কী উপহার নিয়ে আসত তারা! এখনও পুরনো নিকোবরী ঘরে সেসব জিনিস সযত্নে রক্ষিত আছে, দেখা যায়।

একদল তরুণ ক্ষেপে গিয়েছিল, বলেছিল, "ওরা 'তারিক' বা 'মানুষ' নয়, ওরা 'লাও', শয়তান। কচ্ছপ-মারা বর্শা দিয়ে ওদের বিঁধে ফেলব!"

গাঁও-বুড়ো ধমকে উঠেছিল, "ওদের হাতে কী রয়েছে দেখছিস না? চোখের কাছে উঠিয়ে দারুণ শব্দ করে, আর পাখিগুলো কিম্বা বুনো শুয়োরগুলো ছটফট করে মরে যায়। তোরা ঐসব বর্শা আর তীরধনুক দিয়ে ওদের সঙ্গে যুঝবি কতক্ষণ? আর, তাছাড়া, লোক ত ওরা খারাপ নয়। ওরা ত বন্ধু! তোদের কোনও ক্ষতি করছে না ওরা!"

এইরকম, তখন, তিন-চারবার এসেছিল সেই সাদা চামড়ার লোকগুলি। তাদের গাঁয়ে দু-তিন দিন থেকেও যেত।

দিন যায়। একদিন গাঁয়ের একটি মেয়ে এল এল-পানামে। সেদিন আজকের মতই 'ইয়োম-আব' হয়েছিল মারো। শেষ রাত্রের দিকে কান্না শোনা গেল কচি কণ্ঠের। সকালবেলা, গাঁওবুড়োর সঙ্গে কুটিরের ওপরে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে সেই বাচ্চাটিকে দেখে মারোর দুচোখে আর পলক পড়তে চায় না। বাচ্চাটা মেয়ে সন্তান। কিন্তু কী চমৎকার নাক, আর চোখ-মুখের গড়ন। গায়ের রঙ লালচে নয়, বেশ সাদা, ধবধবে।

সেই থেকে মনে মনে অদ্ভুত এক অভিলাষ জেগে উঠেছিল মারোর মনে। তখন তার এক কুড়ি বছর বয়স, সবে একবার 'চাওড়া' ঘুরে এসেছে, বেনোর মত কত মেয়ে তার ঘর করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হয়নি। মনে মনে তখন সে স্থির করেছিল, ঐ মেয়ে বড়ো হোক, ওকেই সে বিয়ে করবে।

বড়ো হল মেয়ে। ওরা নাম দিল, হানা। কিন্তু তার কাছে ঘেঁষবে, সাধ্য কার? গাঁওবুড়ো তাকে সযত্নে কাছে কাছে চোখে-চোখে রাখে। কতো নিকোবরী তরুণের ইচ্ছা তাকে বিয়ে করে। মারোও আকারে ইঙ্গিতে গাঁওবুড়োকে জানিয়েছিল তার মনের কথা। কিন্তু, সবার সব কথাই বুড়ো হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, সাদা মেয়ে আরও একটু বড়ো হোক, তখন ভাবব বিয়ের কথা।

হানা আরও বড়ো হল। এক কুড়ি বয়স হল তার। কিন্তু কেউ তাকে পেল না। আজকে ঐ যে 'যন্ত্রের নৌকো' এসেছে, ঐরকম একটা নৌকো এসে দ্বীপে লাগল, এল সব সাদা চামড়ার দল, তাদের সঙ্গে যন্ত্রের নৌকো করে কোথায় যেন চলে গেল হানা।

মারোর তখন দু-কুড়ি বয়েস। ইতি-মধ্যে সেইসব সাদা মানুষগুলো আরও আসতে লাগল দ্বীপে। এল-পানামে আরও একটি প্রসূতির বাচ্চা হল। এটিও সেই-রকম সাদা-ধবধবে, এটিও মেয়ে। এটিকে দেখে এবারও প্রতিজ্ঞা করল মারো, বিয়ে যদি করতেই হয়, একেই সে করবে।

এইভাবে, তিন কুড়ি বয়সে এসে পৌঁছেছে মারো। আর, সেই সাদা মেয়েটি তার নাম ওরা রেখেছে, 'বালা' একধরনের পাখির নামে নাম, সেও আজ বিশ বছরের তরুণী। অন্য সবার মত মাথা কামানো নয়, কাঁধ পর্যন্ত তার মাথার চুল। কী সুন্দর দুটি চোখ, নাক, আর ঠোঁট? এটি যেন আগেরটির থেকেও সুন্দর।

সেই পুরানো গাঁওবুড়ো আর নেই, নতুন গাঁওবুড়ো সেই বুড়োরই ভাই। তাকে সে

মনের কথা খুলেই বলে রেখেছে। বালাকে তার চাই-ই।

বালার মন জয় করবার জন্য সে আরও কয়েকবার 'চাওড়া' গিয়েছে, বালাকে সে এনে দিয়েছে কচ্ছপের খোল, নানান রকমের ঝিনুক, শংখ, আরও কত কী।

গাং বললে, "কী চুপ করে আছিস যে?"

মারো বললে, "বিয়ে করব বালাকে।"

গাং হেসে বললে, "সে ত গাঁওশুদ্ধ সবাই জানে।"

মারো বললে, "গাঁওবুড়ো বলেছে, তার আপত্তি নেই। বালা রাজী হলেই হয়।"

"তা বালা কি রাজী নয়?"

"কে জানে? যতবার বলি, সে শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।"

গাং পরামর্শ দিলে, "তুই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর।"

মারো বললে, "ছিঃ! তা কখনও হয়! ওরা মন না দিলে ওদের পেতে নেই।"

গাং বললে, "বাজে কথা। বিলিকু যখন প্রথম মানুষ 'মিথে'কে সৃষ্টি করলেন, মিথে মাটি দিয়ে একটা পুতুল তৈরী করেছিল। সেই পুতুল আগুনের তাত পেয়ে হল মানুষ। মেয়েমানুষ। সে প্রাণ পেয়ে মিথের দিকে চেয়ে একটু হেসেছিল। বলেছিল, তুমি আমাকে তৈরী করেছ, তুমিই আমাকে নাও। আমাতে তোমারই অধিকার শুধু। মিথে গ্রহণ করেছিল তাকে, কিন্তু তখন কি মিথে তার মনের সত্যিকার কথাটা ভেবেছিল?"

মারো বললে, "সে ত মিথের নিজের হাতের তৈরী। বালা ত আমার হাতের তৈরী নয়। ওর মনের ওপর আমার কি অধিকার?"

ওরা কথা বলছে, এমন সময় দূর থেকে ঢাকের 'দুম-দুম-দুম' শব্দের সংগে মিশে এক সংগে অনেকগুলি লোকের মাটিতে পা ফেলার ধুপধাপ শব্দও শোনা গেল। সংগে কী এক তীব্রস্বরের গানের সুর। একটুক্ষণ চলে একটানা সেই সুর, তারপরেই ভেসে আসে মিশ্রিত স্ত্রী-কণ্ঠের গানের ধুয়া, 'রে-লে-লে-লে!'

কিছুক্ষণের জন্য ওদের বুঝি অভিভূত করে দিল ওদের সেই চিরপরিচিত সংগীত। ওরা চুপচাপ বসে বসে শুনতে লাগল।

একটুক্ষণ পরে মারো বললে, "বালার গলার স্বর ভেসে আসছে না?"

গাং বললে, "স্বপ্ন দেখছিস নাকি? এক-সঙ্গে মেয়েগুলি চেঁচাচ্ছে, তার মধ্যে বালার গলার স্বর কোনটা, চিনে বার করবে কে?"

"ওর মা এই গাঁওবুড়োর মেয়ে। তাই বালা গাঁওবুড়োর কাছে থাকে। অন্য কারুর বাড়িতে থাকলে আমি ঠিক ভাব জমিয়ে নিতাম।"

গাং বললে, "তুই যা না লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁয়ের মধ্যে। আমি আছি। দেখে আয় কী করছে বালা।"

"ছিঃ!" মারো বললে, "আমি ইয়োম-আব। নৌকো ফেলে কখনই যাবো না।"

গাং বললে, "তুই আচ্ছা বোকা কিন্তু। বালার জন্য বিয়েটা পর্যন্ত করলি না? সারাটা জীবন এমন একা-একা কাটিয়ে দিলি?"

মারো একটু হাসল, বললে, "বোকা নই, আমিই চালাক। আমার কথা ত সবাই জানে। কে আমার মত বিয়ে-না-করে দিন কাটাতে পেরেছে? তুইত আমার সবই জানিস। হানা বোঝেনি, কিন্তু বালা ত বুঝবে? বালা ত বুঝবে, আমি কী মন নিয়ে তার জন্য বসে আছি।"

"কিন্তু, আজ যারা যন্ত্রের নৌকোয় এসেছে, তারা?"

মুহূর্তে একটা কালো ছায়া খেলে গেল মারোর মুখের উপর দিয়ে। সে একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে, "জামাকাপড় সেইরকম পরলেও ওরা ঠিক সেই সাদা 'লাও'দের মত নয়। তাই না?"

"হবে। কিন্তু, বালাকে নিয়ে যদি ওরা চলে যায়?"

উত্তেজিত হয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল মারো, বললে, "তাহলে সত্যি বলছি গাং, আমার ঐ মাছ-মারা বর্শা দিয়ে আমি ওদের মেরে ফেলব একেবারে! গাঁওবুড়োর কোনও নিষেধ আমি শুনব না!"

বলতে বলতে গলাটা ধরে এল মারোর। ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে। তারপরে অদ্ভুত করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, "ঠিক এই কথাটাই আমি ভাবছি গাং। মেয়েদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই যেতে চায় না গাঁয়ের মাতব্বররা। বালা যদি বলে, সে ওদের সংগে যাবে, তাহলে? গাঁওবুড়ো ত বাধা দিতে পারবে না!"

"হানা কি এমনি করে নিজের ইচ্ছায় চলে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। পুরানো গাঁওবুড়ো ত আমাকে তাই বলেছিল।"

"তাহলে?"

মারো বললে, "ওরা কান-হাউনে সবাই মত্ত। ঐ নতুন মানুষগুলো বালাকে নিয়ে কী করছে কে জানে! কী তাকে বোঝাচ্ছে কে জানে! আমি এখন যেতাম ত বাজ-পাখির মত ছিনিয়ে নিয়ে আসতাম।"

"তাই যা না?"

"কী করে যাব? আমি যে ইয়োম-আব!"

বলে দু-হাতে মাথা গুঁজে স্থাণুর মত কিছুক্ষণ বসে রইল মারো।

গাংয়ের মনটা দেখতে দেখতে করুণায় ভরে গেল। সে বললে, "আমি যাব? দেখে আসব?"

মুখ তুলল মারো, বললে, "তুই কি করে যাবি! তুইও ত ইয়োম-আব। না-না, নৌকোর দেবতাকে চটিয়ে সারা গাঁয়ের অমংগল ডেকে আনিস না!"

কিছুক্ষণ আরও কেটে গেল নীরবে। এক সময় মারো বললে, "দেখ, হানায় ঘটনার পরে বিশ বছর কেটে গেছে। ঐ নতুন মানুষগুলি আগের চেয়ে আরও সভ্য হয়েছে না? হয়ত ওরা এবার কিছুই করবে না।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে গাং বলে উঠল, "তুই ত আচ্ছা মানুষ! নিজে কালো, সাদা মেয়ের দিকে ঝোঁক কেন?"

"কে বললে সাদা মেয়ে।" মারো বললে, "ও ত আমাদের মেয়ে। আমাদের দ্বীপের মেয়ের গর্ভে জন্ম। ঐ এল-পানামে।"

রাত্রি বোধ হয় তখন শেষের দিকে। হঠাৎ এল-পানাম থেকে ভেসে এল একটি শিশুর কলকণ্ঠ।

গাং চমকে উঠে বললে, "বাচ্চা হল বুঝি তিরিনের।"

রেলোবুড়ি ছুটতে ছুটতে এল একটু পরেই। বললে, "মেয়ে হয়েছে গো, মেয়ে। আমি গাঁয়ে যাচ্ছি মেয়ের বাপকে খবর দিতে। গাঁওবুড়োকে খবর দিতে।"

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল রাত। গাঁয়ের মধ্যের উৎসব ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে সমুদ্রের ধারে আসতে লাগল লোকজন।

ভোরের বাতাসে ওরা দুজন বোধহয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ রোদ্দুর তেজ মুখে অনুভব করে ধড়মড় করে উঠে বসল গাং, তারপরে অদূরের মোটর-বোটের ওপর চোখ পড়ায় কী দেখে বুঝি অবাকই হয়ে গেল গাং।

পরক্ষণে সম্বিৎ ফিরে আসতেই তাড়া-তাড়ি টেনে তুলল নিদ্রিত মারোকে। বললে, "ঐ দেখ?"

কী দেখল মারো? সেই নতুন মানুষ-গুলি গাঁওবুড়োর হাত থেকে বালাকে নিয়ে তাদের নোকোয় গিয়ে উঠল। নোকো নোঙর
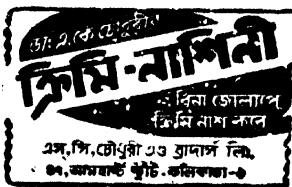
তুলে শব্দ করতে করতে মুখ ফিরিয়ে খাড়ি থেকে এখুনি সমুদ্রে পড়বে।

তীর বেগে গাঁওবুড়োর কাছে ছুটে এলো মারো। বললে, "একী করলে! বালাকে ওদের হাতে সত্যিই তুলে দিলে?"

গাঁওবুড়ো ওর দিকে মুখ ফেরাল, বললে, "তুলে দিলাম, না ওরা নিয়ে গেল? পারব আমরা ওদের সংগে জোরে? আমাদের ওরা মেরে ফেলবে না?"

ইচ্ছা করছিল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোর গতির মুখ সে আটকায়! একটা চিৎকার করে সে বোধহয় জলে ঝাঁপও দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু চারিদিক থেকে লোকজন এসে ধরে ফেললে তাকে।

কিছুক্ষণ পাগলের মত ঝটাপটি করে অবশেষে শান্ত হয়ে গেল মারো। কাকে সে আটকাবে? কাকে সে ধরবে? ওদের যন্ত্রের নৌকো তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে। নির্জীবের মত বসে পড়েছে মারো। কী করবে সে? তারা সেণ্টিনেলিজ বা জারোয়াদের মত দুর্দর্ষ নয়, তারা শান্তিপ্রিয়, অপেক্ষাকৃত নিরীহও বটে।

এমন সময় বেনোবুড়ি এসে ডাকল গাঁওবুড়োকে।

"এক পালামে আয়। তিরিনের বাচ্চা হয়েছে যে।"

সবাই ছুটে গেল নবজাতককে দেখতে। গাঁবুড়ো জোর করে মারোকেও টেনে নিয়ে গেল। ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটি। মেয়ে। মারো বিস্মিত-বিমুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল, কী সুন্দর চোখ, কী সুন্দর টিকোলো নাক, কী সুন্দর ঠোঁট। আর, গায়ের রঙও কালো নয়, ধবধবে সাদা।

দরজার কাছ থেকে নীচে এসে গাংকে সংগে করে আবার সে এসে বসল সমুদ্রের ধারে নারিকেলপাতার ছায়ায়। সমুদ্রের ঢেউ তেমনি অকারণে তীরভূমিতে এসে ভেঙে পড়ছে। সেইদিকে তাকিয়ে মারো বললে, "ঠিক হয়েছে। বালা গেছে যাক। এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব। ও যখন বড়ো হবে।"

গাং কী বলতে গিয়েও বলতে পারল না। সে বলতে চাইছিল, এ মেয়ের বয়স যখন এক কুড়ি হবে, তখন তোমার বয়স হবে কত? তখন তুমি বেঁচে থাকবে কী? বেঁচে থাকলেও নতুন করে ঘর পাতবার সামর্থ্যও আর তোমার থাকবে কী?

কিন্তু ওর দুটি স্বপ্নিল চোখের দিকে তাকিয়ে গাং তা আর বলতে পারল না। সে বললে অন্য কথা। বললে, "তখনও যদি এই ঘটনা ঘটে? নতুন লোক এসে এইভাবে ওকে নিয়ে যায়?

কী-এক আবেগে আবার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল মারোর। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা বলতে পারল না। তারপরে, অনেক পরে নিজেকে কোনক্রমে সামলে নিয়ে সে বললে,

"তখন? তখন কী হবে জানিস? ঐ নতুন মানুষগুলি আরও—আরও সভ্য হয়ে যাবে, তারা এভাবে মানুষ হয়ে মানুষের ওপর আর অত্যাচার করবে না!"

সেই স্তম্ভ, যার সামনে দুপাশে দুটি পাথরের সৈনিক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে বসে বসে ওর কাহিনী শুনতে শুনতে ওর সর্বশেষ কথাটা কানে আসতেই চমকে উঠলাম।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ডি কে। বললে, "রাত হয়েছে। বাড়ি যান। আমিও জাহাজে যাই।"

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। বললাম, "তোমার কী হল? তুমি অত্যাচারিত হলে কোথায় যে, এভাবে চলে যাচ্ছ?

ম্লান হেসে ডি কে বললে, "বোঝানো শক্ত। তবুও বোঝাতে হবে। এখানে থাকতে থাকতে আমিও বুঝি দ্বীপান্তরের মানুষ হয়ে গিয়েছি। এগার বছর পরে কলকাতায় ফিরে এসে দেখছি, আমার বিয়ের সত্যিকার লগন আসেনি, যে-পাওয়া মানুষের কাছে পরম পাওয়া, সে পাওয়ার স্বর্ণ মুহূর্তে আজও আসেনি আমার জীবনে। এখানে এসে কী দেখলাম জানেন? মারোর অনুমান মিথ্যা। মানুষ আজও সভ্য হয়নি। তার সমস্ত আদিম বৃত্তিগুলিই রয়ে গেছে। এত শিক্ষা, এত সামাজিকতার মধ্য দিয়েও তা ঢাকা পড়েনি। পাগল মারোর সেই প্রেয়সী যখন বড়ো হবে, তখন আবারও যাবে আরেক নতুন দল নগ্নদ্বীপে, নিজেদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি নয়, তার অদ্ভুত চরিত্রটিই আমাকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে আসতে!......"

চলে গেছে ডি কে। কিন্তু তার কথাগুলি নয়, তার অদ্ভুত চরিত্রটিই আমাকে দোলা দিয়ে গিয়েছে সব থেকে বেশী। সে আর তার পাগল 'মারো', একই ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ এক হয়ে গিয়েছে আজ, কোথাও। কোনও প্রভেদ পাচ্ছি না খুঁজে।

চো ওউ. ১৭ই অক্টোবর, '৫৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তোমরা তো সহজেই দুর্বোধ পাথরে বাঁধো রাখী।
তোমরা তো পাহাড় ডিঙিয়ে যাও মুক্তক ডানায়
আমরা পাহাড় গড়ি; আর তোরা ধরিত্রীর পাখি
সূর্যে উপনীত, যবে পুরুষেরা পাহাড় বানায়।

কে বলে সমানভূমি? উঁচুনীচু প্রাচী ও প্রতীচী;
শান্তি, তরুলতা, দিবারাত্রি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা
ছত্রখান হ'য়ে প'ড়ে আছে, আর স্বপ্নের দধীচী
বিপর্যস্ত, দিনে-দিনে বেড়ে চলে বস্তুর অছিলা।

অথচ নিকটে এসে ভালোবাসো যখনি ক্বচিৎ,
আমরা সৈনিক হই, কেউ কবি, অথবা স্থপতি,
কেউ-বা তেনজিং নোরকে; আর কেউ নিঃশব্দ শহীদ;
বনানী সবুজ ক'রে চ'লে যায় কতো যে দম্পতি।

হৈমবতী! বিশ্বকর্মা শিরে দিল নীল জলনিধি,
অমল কমলমালা অভেদ্য কবচ বক্ষোদেশে,
রোমকূপে আদিত্যের নিস্তব্ধ কিরণ, মৃত্যু এসে
অর্পিল নির্মল বর্ম। ঈশ্বরের করতলে সিঁথি।

তবে কেন তেইশ হাজার ফুট গিরিশৃঙ্গ 'পরে
চতুর্থ শিবিরে দেহ রাখো, নারী অভিযাত্রীদল?
কামার্ত তুষার ঐ তোমাদের ডানায় বিহ্বল!
আমরা প্রত্যহ ম'রে বেঁচে থাকি মস্ত খেলাঘরে॥

সূর্য নেই

জ্যোতির্ময় [illegible]

ওইখানে শুয়েছিলো ছায়াগুলি, তা'রা
আর নেই, উঠে হেঁটে চলে গেছে ধীরে;
গাছগুলি যে যেখানে ছিলো, সারা
দিন সারা রাত ঠিক আছে তেমনি সেখানে। কা'রা
যেন দ্রুত হাতে মুছে দিলো, এইমাত্র ছিলো যে ছায়ারা।
ডালপালা-মেলা বড়ো গাছগুলি ছোট হলো, কেমন অচিরে;
চকিতে পড়েছে মনে, মাথার ওপরে নেই সূর্যের পাহারা;
ছায়াগুলি চুরি করে ডুবে গেছে আকাশের ছড়ানো আবিরে।

পাখিদের কণ্ঠস্বরে ভরেছিলো, ছায়াঞ্চল যতো।
আলোর আকাশ থেকে সূর্যের ছুটি-নেওয়া প্রথামতো
ওদের নীরব করে রেখে গেলো পাতা-ঢাকা শাখার আড়ালে,
স্থান কাল অদৃশ্য নিঃশব্দ থেকে, কী যেন হারালে।
গাছেদের ছায়া নেই, পাখিদের কণ্ঠ নেই আর,
এতোক্ষণে মনে পড়ে, বন্ধ হলো সূর্যের দ্বার——
হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে খোলা পথে ঢুকে পড়ে অন্ধ অন্ধকার॥

স্বর্গের পাহাড় : হারেম এল-শেরীফ

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম ও আল্লাহ্ দুটো শব্দ জুড়ে রামাল্লা কথাটির সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ-মুল্লুকে কেউ জানে না, কিন্তু জেরুজালেমের পাশেই এই মনোরম ছোট্ট শহর রামাল্লা দেখে সত্যিই রাম অথবা আল্লাহের কথা স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। পাহাড়ের বুক চিরে কালো কুচকুচে পথ। লম্বা আকাশ-চুম্বী গাছের ভিড়। পথের বাঁদিকে ইহুদীদের সৃষ্টি নতুন রাষ্ট্র ইজরাইল। ডানদিকে আরব জর্ডান। রাজনৈতিক হিসেবে পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান।

আরবী বন্ধুরা কিন্তু বলেছিল উদাহরণটা ঠিক হয়নি। পাকিস্তান হিন্দুস্থানে কূটনৈতিক সম্বন্ধ আছে। ইজরাইল আরব দুনিয়াতে নেই। পাকিস্তানী হিন্দুস্থানীতে খানাপিনা আজও আছে। ইজরাইল আরবীতে মুখ দেখাদেখি নেই, নেই হুঁকোপানি আজন্ম।

রামাল্লার শিরশিরে সরু পথটা নেমে গিয়েছে ইজরাইলের ধার ঘেঁষে আরব জেরুজালেমে। চার হাজার ফিট উঁচু পথ থেকেই দেখা যায় পুবের আকাশ জুড়ে বিরাট এক গম্বুজ। পাহাড়ী দেশের ঐ গম্বুজের ভিতর বন্দী 'স্বর্গের পাহাড়'—দ রক্ অব প্যারাডাইস, যার বিলেতী নাম দ ডোম্ অব রক্। যাদের জিনিস তারা কিন্তু ওকে বলে হারেম এল-শেরীফ।

রোমান যুগে সব পথই যেমন রোমে যেত তেমনি আজকের জেরুজালেমের সব গলিই যায় হারেম শেরীফে। হজরত মহম্মদ হারেম শেরীফের গম্বুজে ঐ বন্দী পাহাড় থেকে অশ্বারোহে সোজা গিয়েছিলেন বেহেস্তে। তাই ঐসলামিক মাহাত্ম্যে মক্কার কাবা তীর্থস্থানের পরেই মুসলমানদের কাছে হারেম শেরীফ। কিন্তু সেইখানেই এর ইতিহাস শেষ নয়। ইতিহাসের পিছনে আছে আরো ইতিহাস। তারও পিছনে ইতিকথা।

পারস্যের মহাতীর্থ কুম-এ গিয়েছিলাম নাম বদলে। ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ কারবেলায় বগদাদী বন্ধুরা আমায় নিয়ে গিয়েছিল ইসলামী নামের ছাপ দিয়ে। তাই জর্ডান রাজ্যের হর্তাকর্তা বিধাতা জেনারেল আলি আবু নাওয়ার রামাল্লার গ্রাণ্ড হোটেলে আমার ঘরে বসে যখন বললেন, পিতৃদত্ত নামেই আমি হারেম শেরীফে যেতে পারি তখন খুশী কম হইনি। খুশী হয়েছিলাম আরও—কারণ, অবাক করলেন প্যারিসে শিক্ষিতা বে-বোরখা মিসেস নাওয়ার আমার গাইড হবেন ঘোষণা করে। উনি আমাকে একবার ডেড্-সীতে চব্বিশ ঘণ্টার পিকনিক করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু খোদ খোদার ঘরে মুসলমান নারী গাইড? হজরত দুনিয়া বদল রহা হায়—মার্শাল ল'র নাম বাবাজী। আর জেনারেল আলি আবু নাওয়ার মানে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বৃটিশ সিংহ জেনারেল স্যার জন ব্যাগট গ্লাব 'পাশা'কে তাড়ানোর মোসাদ্দেক!

পথ চলতে চলতে জেনারেলের তন্বী তরুণী ভার্যা বললেন—সাংবাদিকরা ত' সব-জানতা জীব; আচ্ছা বলুন তো হারেম শেরীফে ইহুদীরা কাঁদতে কেন আসে?

ভাবছিলাম তখন অন্য কিছু, কিন্তু বললেন—আপনাদের ইতিহাসের হদিস তো আপনারাই আমাকে দেবেন।

জীপ্ গাড়িটাকে আমরা সিটাডেলের পাশ দিয়ে নিয়ে গেলাম একটা পুরনো পাঁচিলের মেশিন-গানের গুলিতে ঝাঁঝরালো দরজায়। ফাটকের মধ্যেই জেরুজালেম শহর। কাশীর গলিঘুপ্চি এর কাছে নস্যি। শুনেছিলেম, সন্ধ্যার পর এখানে নাকি গুণ্ডার রাজ্য। পাশ্চাত্য লেখকদের বইয়ে পড়েছি, রাতে নাকি এখানে প্রবেশ

হারেম এল শেরীফ
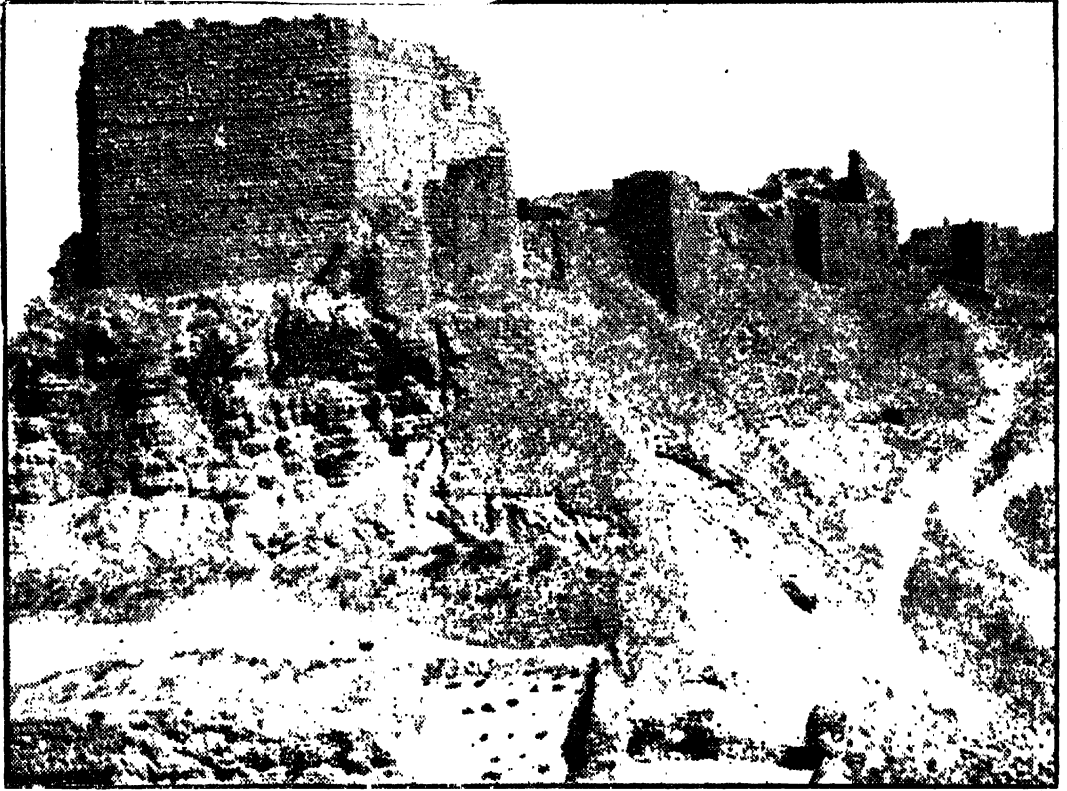
হারেম এল শেরীফের পাশে স্যালাদীনের দুর্গ

মারাত্মক। মধ্যরাত্রেও একা একা এসব গলি-ঘুপ্‌চির মধ্যে চলাফেরা করেও আমি দেখেছি, পাশ্চাত্ত্য বর্ণিত বিশেষণের অপরপিঠ। তবে হ্যাঁ, মিলিটারি পুলিস ঘন ঘন সেলাম ঠুকবে। ছবি-সাঁটা পরিচয়-পত্র চাইবে। অভিজ্ঞান না থাকলেই ইজরাইলী গুপ্তচর বলে বিনা বাক্যব্যয়ে সকালের মত নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রীঘরে পুরবে।

বড় গলি, কুচো গলি, নানা সুড়ঙ্গ পার হয়ে এলাম আমরা প্রশস্ত একটা প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের উপরে নীল আকাশ। বাইরে মাউণ্ট অব অলিভস্‌। কিন্তু ততক্ষণে হারেম শেরীফের প্রধান মোল্‌হা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভিসিটরস্‌-বুকে 'শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' লিখেছি। 'শিবদাস' যে হিন্দু ভগবানের সেবক তার ব্যাখ্যা দিয়ে মোল্‌হা-জীর মুখের দিকে তাকালাম। কারবেলা-কুমে ঢুকেছিলাম প্রাণ হাতে নিয়ে; এই মহাতীর্থে ঢুকলাম রংচঙে স্কার্ট পরিহিতা ঠোঁট-রঙানো সঙ্গীনীর বাঁ-হাতখানি হাতে নিয়ে।

পৃথিবীর লেখা ইতিহাসের শুরু যেখানে তার প্রায় কাছাকাছি এবার আমরা প্রবেশ করেছি। ব্যাবিলনের মৃদুমন্দ বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। মহাকালের পুঁথিতে অনেক কিছুই জট পাকিয়ে রয়েছে। হেলেনীয় মানুষ তখনও সভ্যতার সূতিকাগারে পৌঁছয়নি। হামুরাবি বহু শতাব্দী হয় মারা গেছেন। উপনিষদ তখনও জন্মায়নি। ঋগ্বেদের রচনাকালেরও আগে। ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাডনেজার ধরে নিয়ে গেলেন পরাজিত লাঞ্ছিত জেরুজালেম থেকে কয়েক লক্ষ বন্দী ইহুদী। ইংল্যাণ্ড তখন সবে প্রস্তর যুগ থেকে এগুচ্ছে। সম্রাট নেবুকাডনেজার পুড়িয়ে দিয়ে গেলেন জেরুজালেম শহরটা। যাদের তিনি বন্দী করেন নি তারা একটা ছোট্ট পাহাড়ের পাশে বসে দিনরাত কাঁদতে লাগল। কাঁদলো ঐ ভাগ্যহীন ইহুদীরা। পাঁচ হাজার বছর ধরে কাঁদলো আর কান্না না থামতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সৃষ্টি করল একটা ইহুদী রাজ্য। ওরা যেখানটায় বসে অশ্রুমোচন করলো, গড়ে উঠলো সেখানে একটি প্রাচীর। নাম পড়লো তার 'কাঁদুনে-দেওয়াল'—দা ওয়েলিং ওআল, আজ যা ইহুদীদের কাছে একাধারে কাশী-বৃন্দাবন-গয়া। সামনের ঐ ছোট্ট পাহাড়টায় বসে মেষ-পালক বালক ডেভিড সঙ্গীদের অপূর্ব সব জ্ঞানের কথা শোনাতে শোনাতে হঠাৎ একদিন তাদের রাজা হয়ে ইহুদীদের মধ্যে এনে দিলো অশোকের সুবর্ণ যুগ। ঐ পাহাড়টাকে ঘিরে, ডেভিডেরও অনেক পরে, রাজা সলোমন তৈরী করলেন তাঁর বিশাল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মন্দির। সময় ছুটে চলে। শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে তাঁর কুমারী মা শরণ নিলেন ঐ পাহাড়ের বুকে। নক্ষ-পরিচ্ছদ মনের বাইরে অনেক ঐশ্বরিক গুণাগুণ দেখা দিয়েছে তখন ঐ পাহাড়ে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আরও অনেক রথী মহারথী এলো গেলো। ব্যাবিলন কবে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। রোম তখন তার সভ্যতার শিখরে বসে আসিরিয় সাম্রাজ্যের সবকিছুই লুটে দখল করে নিয়েছে। তারপর "বর্বর" বেদুইন আরব মরুভূমিতে উঠল একদিন একটা বড় ঝড়। মক্কায় ঘূর্ণিপাক দিতে দিতে সেই ঝড় ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম এসিয়ার উপকূলে। সে ঝড়ের উপর বসে যিনি দুনিয়ার ইতিহাসটাকে একেবারে উল্টে-পাল্টে দিলেন তাঁর নাম হজরত মহম্মদ। তিনিও গেলেন স্বর্গে। ইহুদী ডেভিডের ঐ ছোট্ট পাহাড়ের উপর যা ছিল একদিন রাজার সিংহাসন, সলোমনের দেবালয়, কালে তা পরিণত হলো মুসলমান দুনিয়ার হারেম এল-শেরীফে।

তিন হাজার বছর ইতিহাসের দুর্গম

পথের অলিগলির সন্ধান দিয়েছিলেন আমায় বিশ্বশ্রুত আরবী ঐতিহাসিক অধ্যাপক ফিলিপ হিট্টি। শ্রীমতী নাওয়ারও আমায় অবাক করলেন তাঁর ইতিহাসের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচন করে। ততক্ষণে আমরা এসে পড়েছি মসজিদের চত্বরে যেখানে এই সেদিন হজরত মহম্মদের বংশধর স্বয়ং রাজা আবদুল্লাহকে ওরা তিন-তিনটে গুলিতে করলো বিদ্ধ। মারলো প্রাণে। ফাতোয়া দিল, "পাশ্চাত্ত্য বন্ধুরো, বিদায়।"

রাজা আবদুল্লাহর ইংরেজপ্রীতি সৃষ্টি করেছিল আরব-বেদুইন জর্ডান রাজ্য। সৃষ্টি করেছিল আরব ভেদনীতি। সৃষ্টি করেছিল গ্লাব 'পাশা'। সৈনিক আলি আবু নাওয়ারকে গ্লাব তাড়িয়েছিল প্যারিসে। রাজধানী আম্মান ফেরত নাওয়ার অবাক করলো হোয়াইটহলকে। বিলম্ব তখন হয়ে গেছে প্রচুর। পালাতে গিয়েও পালাবার পথ তখন বন্ধ। প্রাণের বদলে চব্বিশ ঘণ্টার আল্টিমেটামে স্যর গ্লাব, 'পাশা'-মুক্ত, গেলেন আকাশপথে লণ্ডনে। আর ফিরলেন না। ফিরবার পথ তখন বন্ধ।

গ্লাবের পাঁচালি শুনেছিলাম নতুন জর্ডানের সৃষ্টিকর্তা জেনারেল আলি আবু নাওয়ারের কাছে। শিখণ্ডি বালক রাজা হুসেনের নিজ মুখে। তরুণী রাণী ডায়নার বৈঠকে। আজ শ্রীমতী নাওয়ারের মুখে শুনলাম হারেম শেরীফে রাজা আবদুল্লাহর হত্যার কাহিনী। অবাক হলাম আর ভাবলাম, মসজিদ শুধু প্রার্থনারই কাজে ব্যবহৃত হয় না। রাজনীতিক হত্যার কাজেও। তেহরানে বড়ো মসজিদে দেখেছিলাম ইংরেজপ্রেমী এক প্রধানমন্ত্রীর হত্যাস্থান। এখানেও দেখলাম।

শ্রীমতীর দেশের [illegible] দেখে ভাবলাম— কি ভাবছেন এই দেশপ্রেমিক [illegible]?

[illegible] হঠাৎ [illegible] উঁচু হয়ে গেলেন। বললেন [illegible] মুখেই [illegible] হয়। [illegible] আবদুল্লাহর হত্যাই কি জর্ডানের শেষ রাজ হত্যা?

([illegible] আশ্চর্য এক উপন্যাসের চরিত্রের চেয়েও চমকপ্রদ রাণী ডায়না এখন আর রাণী নন, শ্রীমতী নাওয়ার এখন জর্ডানে নেই—কিন্তু তাঁরা আমার বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নন।)

ততক্ষণে আমরা কাঁদুনে দেওয়াল পেরিয়ে গিয়েছি। মখমলে সবুজ ঘাসভর্তি নব্বই একরের বিশাল প্রাঙ্গণ। মরুভূমির বুকে সবুজের মেলা। রঙ-বেরঙের ফুলের বাগিচা। ওধারে দুলছে আরব শিল্পের কারুকাওয়াজ। মসজিদের প্রাঙ্গণে [illegible] ডাকসাজ। স্বর্গের দুয়ারে মৃত্যুর ডাক। সংঘর্ষের মাঝে একখানি ছবি।

অবাক হই গম্বুজের প্রবেশপথে। রঙের আতশবাজী। বিশাল হলের সুউচ্চ রং-বেরঙের ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যালোকে প্রতিফলিত হয়েছে সিন্দুর বরণের ধোঁয়া। নীল রঙের ছায়া। সোনালী হলুদ সবুজের আকুলি বিকুলি। রাজা ডেভিডের পাহাড়, হজরত মহম্মদের স্বর্গের পথে বিশ্রামক্ষেত্রে, পড়েছে অযুত রঙের অলস ছোঁয়াচ। আট-কোনা গম্বুজময় বাড়িটাকে আজ প্রথম দেখলাম স্বচক্ষে ও বুঝলাম কেন উমায়েদ খালিফা আব্দুল এল মালিকের সৃষ্টি হারেম শেরীফকে লোকে বলে অত্যাশ্চর্য এক মসজিদ!

গম্বুজের মধ্যে অবাক কাণ্ডের শেষ নেই। মৌলানা ইতিহাস বলে চলেছেন আরবী ভাষায়। শ্রীমতী অনুবাদ করছেন খাশ ইংরেজী-ফরাসীতে। আমি দেখছি, ঐতিহাসিক এই হারেম এল শেরীফ যা একদিন ছিল মসজিদ, পরে হলো

হজরত মহম্মদ যেখান থেকে বেহেস্তে গিয়েছিলেন তার স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ক্রুসেডরদের অধিকৃত গির্জা ও আরও পরে আবার হলো মসজিদ। ভাগ্যের হেরফের। ধর্মের তাড়না। একটা কথা মিসেস নাওয়ারকে না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম—ইতিহাসের হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে মারধর, খুনোখুনি করেছে প্রচুর। কিন্তু কখনও কারু মসজিদ গির্জাকে ভেঙেগ তারা মন্দির করেনি সৃষ্টি। ধর্মের নামে অন্যের ধর্মে দেয়নি তারা হানা।

শ্রীমতীর দুর্মর তারুণ্য আমার বক্তব্যের মধ্যে প্রশ্নের ইঙ্গিতটিকে এড়িয়ে গেল।

হারেম শেরীফের ইতিহাস ইতিহাসের পুরনো পাতাতেই ধরাবাঁধা নেই। মধ্যযুগেও এর উপর প্রবাহিত হয়েছে ঝড় তুফান ও বন্যা। খৃশ্চান ক্রুসেডরস্‌রা একশ বছর ধরে এর পরে চালিয়েছে নানা বর্বরোচিত অভিযান। যত যুদ্ধ বাগ-বিতণ্ডা ও হত্যাকাণ্ড রচিত হয়েছে এই গম্বুজের মালিকানা নিয়ে তার সিকি ভাগও ক্রুসেডরস্‌রা অন্য কোথাও করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইজরাইল সৃষ্টির সময়েও দুদলের মধ্যে ঐ ক্রুসেড প্রবৃত্তিই ছিল প্রবল। ধর্মের নামে যেখানে অনুষ্ঠিত হয় যুদ্ধ, ধর্মের নামে যেখানে সৃষ্টি হয় নতুন এক রাজ্য, তিক্ততার নেই সেখানে শেষ। কিন্তু তবু ধর্মের কল বাতাসে নড়েনি।

গম্বুজের ভিতরে চারিদিকে আরবী ভাষায় সুলতান সালাদিনের বীরত্ব কাহিনী লেখা সুন্দর হস্তাক্ষরে। অদ্ভুত সুন্দর সে লেখা। ক্রুসেডরস্‌ সেনাপতি রীচার্ড "দ্য-লয়েন-হার্টেড"কে পরাজিত করলেন আরব জেনারেল সালাদিন। তাড়ালেন ওদের জেরুজেলাম থেকে চিরতরে কিন্তু তবু তিনি প্রতিশোধ নিলেন না ওদের শত বছরের অভিযানের। আগুন, হত্যা, পাশবিক অত্যাচার সবকিছু ক্ষমা করে সালাদীন দিলেন ওদের বিনাশর্তে মুক্তি। ওরা চেয়েছিল যিশুর জন্মস্থানের "মুক্তি"। কিন্তু সালাদিন পাল্টা মুক্তির বাণী ছড়ালেন আরব দুনিয়াতে। আরব ইতিহাসে এই দুর্দর্শ সেনাপতির বীরত্বের কথা সোনার অক্ষরে রইল গাঁথা।

সীজরের কথা আমরা পড়েছি। আলেক-জাণ্ডারের কথা পড়েছি। নেপোলিয়নের কথা আমরা পড়েছি। পড়েছি কেননা তাঁরা "বীর" ছিলেন লুণ্ঠনে, নারী ধর্ষণে। বিজাতীদের ওঁরা দিয়েছিল পরাধীনতা ও অপমানের টিকা। সালাদিনের সেনাপতিত্বের মধ্যে লুণ্ঠন নারীধর্ষণের কথা কখনও আমি পড়িনি। তাঁর বীরত্ব নেপোলিয়ন-সীজারের অপেক্ষা কিছু কম ছিল বলে জানি না। কিন্তু তাঁর ইতিহাস আমরা কতটুকু জানি? ইতিহাসলেখক কারা? আমরা পরাধীন দেশকে দেখি ইউরোপীয় বিজেতার চোখ দিয়ে। তাই বিশাল আরব দুনিয়াতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে পিছনে পড়ে থেকেছি আমি অক্ষমনীয়ভাবে। বারবার ভেবেছি, আমি কিছুই জানি না। কিছুই বুঝি না। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আরব দুনিয়াকে বুঝবার ক্ষমতা আর যারই থাকুক না কেন আমার নেই।

চারচারটে ঘণ্টা ঘুরলাম হারেম এস শেরীফে। আবার গেলাম হারেম এস শেরীফে। গেলাম বারবার। ইসলাম ধর্মে মক্কার কাবার পরই যে মহাতীর্থস্থান তার দরজায় বাজে বাজনা। আরবী প্রার্থনারত মুসলমানদের হয় না তাতে প্রার্থনায় ব্যাঘাত। খানাপিনা নিয়ে এখানে চলে না খুনোখুনি। এরা কোরান শেরীফ পড়ে। এরা হজরত মহম্মদের পায়ের ছাপের কাছে বসে। তবু এরা আল্লাহকে রাজনীতির মধ্যে খোঁজে না। এরা পৃথিবীর মুসল-মানকে ভাই বলে। কিন্তু পাকিস্তানকে বোঝে না। ভারতের হিন্দুকে বুকে জড়ায়। হারেম শেরীফে আমার পরিচয় ছিল আমি হিন্দুস্থানের হিন্দু, আমি মানুষ।

ইতিহাসের এই অমর তীর্থস্থানে স্বর্গের পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি ভাবলাম, আমরা দূরের পাশ্চাত্যকে চিনবার জন্য কাড়াহ্যাচড়া করি। কিন্তু নিকটের আরবী ভাইদের চিনি না। চিনবার চেষ্টাও করি না।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

১৮

যত বেশি রাত্রেই শুতে যাক আর যত বেশি রাত্রেই ঘুম আসুক মানসীর সেই ঘুম রোজ একই সময়ে ভাঙবে। আজও তাই ভাঙল। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। আজও ভোর পাঁচটার সময় যখন ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে, মার, ছোট বোনদের, মাধবীর গভীর ঘুমের নিশ্চিন্ত শ্বাস প্রশ্বাস বয়ে চলেছে মানসীর ঘুম ভেঙে গেল। কিছুদিন আগে একবার ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হয়েছিল মানসীর। ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গায়ে সে কী ব্যথা। না পারে এ-পাশে ফিরতে না পারে ও পাশে। আজও সেই ব্যথাটা অনুভব করল মানসী। তফাত এই, গায়ের ব্যথা না, অন্তরের ব্যথা না। এ ব্যথার কোন নাম দেওয়া যায় না, বর্ণনা দেওয়া যায় না, এ ব্যথা শুধু সারা মন অসাড় আর আচ্ছন্ন করে রাখে। রোজ ঘুম যখন ভাঙে, একটি নতুন দিন এক নতুন জগতের প্রবেশ পথ খুলে দেয়। কিন্তু আজ সেই পথ বন্ধ। আজ সেই পথের মধ্যে প্রকাণ্ড এক পুরী হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই বিশাল প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কত স্নেহ, কত প্রীতি, কত বিশ্বাস আর তৃপ্তির মধ্যে সে ঘুমিয়ে রয়েছে। নিমেষের ভূমিকম্পে সেই সৌধ আজ ধূলিসাৎ হয়েছে।

মানসী মুখ ফিরিয়ে মাধুরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকাল। পরম শান্তি আর তৃপ্তির মধ্যে সে ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘুমোবে না কেন? মানসী যা হারিয়েছে তাই যে পেয়েছে মাধুরী। পেয়েছে না ছিনিয়ে নিয়েছে? দিদির ঘুমন্ত মুখখানা এখন কী শান্ত নিরীহ আর নির্দোষই না দেখাচ্ছে। ঘুম কি টয়লেটের মত? স্নো আর ক্রীমের মত তা মুখে স্নিগ্ধতা আনে? চোর ডাকাত লম্পট ঘাতক ঘুমিয়ে পড়লে তাদের মুখও কি এমন নিরীহ নিরীহ দেখায়? আর এক বিশ্বাসঘাতক তো এই বাড়িতেই ঘুমিয়ে রয়েছে। ঝুঁকে পড়ে দেখলে হত এই মুহূর্তে সেই মুখখানা কেমন দেখাচ্ছে। কেমন আর দেখাবে? নিরীহ মুখ ঘুমের প্রলেপে আরও নিরীহ হয়েছে। কিছুই ধরতে পারবে না মানসী, খুঁজতে পারবে না। যাতে ধরা যায় সেই দুটি চোখ যে বুজে আছে। আসলে মুখ না, চোখই মনের সূচীপত্র। চোখ সমস্ত লোভ লালসা অসাধুতা অশুচিতা ধরিয়ে দেয়। অসীম জানে না যে চোখ চিরকাল বিশ্বাসঘাতক। মানসী গত ছ' দিনের মধ্যে কতবার যে সেই চোখের চুরি ধরে ফেলেছে তা তস্কর টের পায়নি। কি ধরা পড়লেও স্বীকার করেনি। সেই চোখ যখন মঞ্জুকে দেখেছে, কিশোরীর সেই পুষ্টাঙ্গ দেখে উল্লসিত হয়েছে, আবার যখন মাধুরীকে দেখেছে, তার আর কোন অঙ্গ তেমন সুন্দর না হলেও দুটি মাত্র প্রত্যঙ্গে মুগ্ধ হতে বিদ্ধ হয়ে থাকতে তার বাধেনি। আর সেই তীর বেঁধা দুটি পাখিকে নিয়ে মাধুরী দিনরাত খেলেছে। খেলেছে আর খেলেছে। কিন্তু হৃদয়হীন পুরুষের চোখ কি শুধু যে কোন হৃদয়চূড়ায় বিঁধে থাকবার জন্যে? তা কি সেই হৃদয় সমুদ্রে কোনদিন স্নান করবে না, যে সমুদ্র অতল আর গভীর যেখানে তরঙ্গভঙ্গের শেষ নেই। রসিকের সেই রহস্য সন্ধানী দৃষ্টি শুধু ভালোবাসারই বোধ হয় দেয়। সেই ভালোবাসার কাছে দেহের কুরূপ, তার শ্রীহীনতা বাধা হয় না। সেই ভালোবাসা এত নতুন রূপের পৃথিবী, রসের পৃথিবী সৃষ্টি করে নিয়ে সেখানে চিরকালের জন্যে বাসা বেঁধে থাকে।

মানসী হেসে মাথা নাড়ল। মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা। এসব ওই আদর্শবাদিনী মাধুরীর বই মুখস্ত করা বুলি। সে আদর্শ যে কত ভুয়ো, সে বুলি কত ফাঁকা মানসী তা জানে, মর্মে মর্মে টের পেয়েছে। এখানে প্রেম নেই, প্রীতি নেই, স্নেহ নেই বিশ্বাস নেই, আছে শুধু এক বিশ্বব্যাপী দেহের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধার কাছে আজকের খাদ্য কাল বাসি, আজকের আহার্যে কাল অরুচি। সমস্ত জগৎ এই অনিত্য দেহবাদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মুখে এক বাঁধা গৎ আওড়াচ্ছে —দেহ বাদ দাও, দেহ কিছু নয়। মানসী ভাবল আসলে দেহই সব, দেহই আসল। রুচি প্রবৃত্তি, স্নেহ প্রীতি বিশ্বাস ভালোবাসা, রীতিনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি সব সেই মদের গ্লাসের বুদ্বুদ। সেই মাতালের অর্থহীন অসংলগ্ন প্রলাপ।

কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে সব

মানুষের দেহের স্বাদ তো একই রকম। সাধু আর দুর্বৃত্তের দেহের স্বাদ তো আলাদা হবার কথা নয়। মানসী মনে মনে হাসল। পরীক্ষা করে দেখলে হয়। একদিন কোন সাধুকে শয্যাসঙ্গী করে আর একদিন কোন এক চোরের বিছানার সঙ্গিনী হয়ে পরখ করে দেখলে হয় তাদের দেহে কোন স্বাদ বৈষম্য আছে কিনা। যতদূর মনে হয় তা নেই। বালক আর যুবকের মধ্যে আছে, যুবক আর বৃদ্ধের মধ্যে আছে, কিন্তু সৎ আর অসতের মধ্যে নেই, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে নেই, ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে নেই, এমনকি রাত্রির অন্ধকারে সুন্দর কুৎসিতের মধ্যে নেই। মানসী হাসল 'এখানে আসিলে সকলেই সমান হয়।' শুধু শ্মশান শয্যায় আর ফুলশয্যায় সাম্যের রাজত্ব। কিন্তু তাই যদি হয়, সব দেহই যদি মোটামুটি একই স্বাদের আধার হয়, তাহলে মানুষ কেন দেহের মধ্যেই যত নতুনত্ব, যত বৈচিত্র্য খোঁজে?
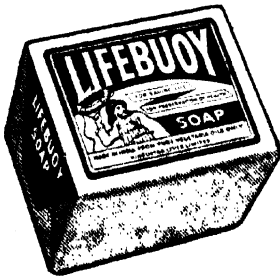
সে কি বোঝে না আসল বৈচিত্র্য মনে, আসল সম্পদের আধার মন? তাই দেহে একাকার হয়েও সেই মনের বৈষম্যেই মানুষ ইতর আর বিশিষ্ট? মন শুধু দেহকে সাজায় না, দেহকে স্বাদযুক্ত করে। কিন্তু লোভ আর লিপ্সার জন্যে শুধু দেহকে দায়ী করে লাভ কি, শুধু চঞ্চল দুটি আঁখিকে নিন্দা করে লাভ কি, সেই দুটি পাখির যে মালিক যার হাতে চালাবার সুতো, নিন্দা যদি করতে হয় তাকেই করা উচিত। নিন্দনীয় সেই হৃদয়হীন পুরুষ, যে সব ভুলে দুটি চোখকেই সর্বস্ব করেছে, আর সেই মায়াবিনী মেয়ে যে তাকে ভুলিয়েছে, বড় বোন হয়ে ছোট বোনের সর্বস্ব ছলনা করে কেড়ে নিয়েছে, দিদি হয়ে যে এমন অপরাধ করতে পারে, সে না পারে কী। মানসী কি ওদের ক্ষমা করবে, হার মেনে সরে আসবে না শাস্তি দেবে? এমন শাস্তি যা ওরা কোনদিন ভুলবে না, যা ওদের মারবে না কিন্তু জীবন্মৃত করে রাখবে? সে শাস্তি কী হতে পারে হঠাৎ মাথায় এলনা মানসীর।

মা উঠে পড়েছেন। মশারির দড়ি খুলছেন। মানসীকে শুয়ে থাকতে দেখলে এদিকে আর এগোতেন না। এর আগে আগে মা তাদের ছেলেবেলায় মানসী শুয়ে থাকতে থাকতেই তাদের মশারির দড়ি খুলে দিতেন। মশারিটা নাকের ওপর পড়লেই ঘুম ভেঙে যেত মানসীর। ঘুম ভাঙাবার ওই এক ধরন ছিল মার। মানসীর ঘুম ভাঙত, কিন্তু মাধুরীর ঘুম ভাঙত না। ও চিরকালই লেট রাইজার। ওর সবই দেরিতে। সবই দেরিতে। নষ্ট হবার নষ্ট করবার দুর্বুদ্ধিও ওর কত দেরিতেই না এল। মানসী হাসল। নষ্ট হওয়া আর নষ্ট করা আবার কি। ওসব সেকেলে ধারণায় তার বিশ্বাস নেই। দেহ নষ্ট হয় জড়তায় দেহ নষ্ট হয় ব্যাধিতে। মৃত্যুতে তার বিলোপ হয়। আর কোন রকম নাশে সে বিশ্বাস করে না। মাধুরী নষ্ট করেছে একটি অতি মধুর সম্পর্ককে। সে আর কিছু খোয়ায়নি।

মানসী মশারি সরিয়ে বাইরে এল।

সুহাসিনী বললেন, 'এরই মধ্যে উঠে পড়লি মানু? আর একটু শুয়ে থাকলেই পারতি।'

মানসী বলল, শুয়ে থেকে কি লাভ মা। আমার ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে।

সুহাসিনী একটু হেসে বললেন, 'এদিক থেকে তুই একেবারে আমার মত হয়েছিস। আমিও ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারিনে। পিঠে ব্যাথা ধরে যায়।'

এই হল মার স্নেহ আর সহানুভূতি জানাবার ধরন—তুই আমার মত হয়েছিস। এইটুকু মিলের কথা উল্লেখে মা যেন তাকে একেবারে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে চান। ছোট মেয়ের মত বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চান। না হলে মানসী জানে মার সঙ্গে তার সামান্যই মিল আছে। দুজনেই তারা ভোরে ওঠে শুধু এইটুকু মিল, দুজনেই তারা কাজকে ভালোবাসে, কাজ ফেলে রেখে আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় না শুধু এইটুকু মিল। আর কোন মিল তাদের মধ্যে নেই।

'মা আমি কি বোনদের বিছানা তুলে দেব? দিইনা মা।'

সুহাসিনী বললেন, 'না না এখন থাক। ওরা ঘুমুচ্ছে, আর একটু ঘুমোক। ঘরে এসে আমিই সব তুলে নেব।' তিনি একটু হাসলেন, 'তুই ঠিক পারবিনে। তুই যা, হাতমুখ ধুয়ে নে গিয়ে।'

মানসী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বাথরুমে এসে ঢুকল। আগে আগে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে, কি বাঁ হাতের তেলোয় পাউডার রেখে আঙুলের ডগা দিয়ে দাঁত মাজত মানসীরা। দাঁতন কি টুথব্রাশ ব্যবহার করতে দেখলে বাবা খুব রাগ করতেন। বলতেন, 'ওকি পুরুষালি স্বভাব? মেয়েরা আবার দাঁতন করবে কেন? ব্রাশ করবে কেন? তারা ছাই দিয়ে দাঁত মাজলেই সেই দাঁত মুক্তোর মত ঝক ঝক করে।'

বাবা বলেন, 'এখনকার মেয়েগুলি অতিরিক্ত পুরুষালি হয়ে গেছে বলেই ছেলেরা চট করে তাদের পছন্দ করে না। করবে কেন? এখনকার মেয়েরা সব শাড়িপরা পুরুষ। ছেলেরাও যা করবে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েরাও তাই করবে। নিজেদের জন্যে আলাদা কোন আব্রু রাখবে না, আড়াল রাখবে না। তাদের সামনেই দাঁত মাজবে, খাবে, আঁচাবে। এর ফলে ছেলেরা ওদের খারাপ খারাপ পোজগুলি দেখে আর তাদের মন থেকে সমস্ত রোমান্স নষ্ট হয়ে যায়।'

বাবা তাহলে রোমান্সের ভাবনা ভাবেন। এই নিয়ে দিদির সঙ্গে কত হাসাহাসি করেছে মানসী। কিন্তু বাবার সঙ্গে কিছুতেই একমত হয়নি। নারী পুরুষের আকর্ষণের ভিত্তি কি অতই কাঁচা অতই ঠুনকো যে একটু এদিক ওদিক হলেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? আব্রুর মাহাত্ম্য যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে তো ফের সেই নাকের ডগা অবধি ঘোমটা টেনে পর্দার আড়ালে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। কিন্তু মেয়েরা আর কিছুতেই আড়ালে চলে যাবে না, বরং তারা আরো বেশি করে, বেশি সংখ্যায় পুরুষের চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে। তারা পুরুষের সঙ্গে ঘুরবে, বেড়াবে, ঝগড়া করবে, বন্ধুত্ব করবে, কাজ করবে,

চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি পাশাপাশি থাকবে। তবু পরস্পরের মোহ দূর হবে না। তারা একজন আরেকজনকে যত জানবে তত জানার আগ্রহ বাড়বে। মেয়েরা কী ভাবে হাঁটে, কী করে খায়, কীভাবে আঁচায় সেই জন্যই কি পুরুষের পক্ষে সবকিছু জানার চরম। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও মানসী ব্রাশ আর টুথপেস্টের ব্যবস্থা করেছে। বাবার চোখের সামনে অবশ্য দাঁত মাজে না। কিন্তু তিনি জানেন মানসী টুথব্রাশ ব্যবহার করে। চাকরি বাকরি পেয়ে সংসারে সবচেয়ে বেশি টাকা দেয় বলেই হয়তো বাবা তার মুখের সামনে এই সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু মানসী জানে আড়ালে আবডালে তিনি এই নিয়ে এখনো গজ গজ করেন। স্বাস্থ্য রক্ষার দোহাই দিয়ে বলেন, ব্রাশ বেশি ব্যবহার করলে দাঁতের মাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শুধু কি এই পরিবারে একটা টুথব্রাশেরই প্রচলন করেছে মানসী? বাবার মতের বিরুদ্ধে মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা উপার্জন করবার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেনি? দিদি পাশ করবার পরেও বছরখানেক বসেছিল। বাবা কিছুতেই তাকে চাকরিতে ঢুকতে দিতে চাননি। বলেছিলেন চাকরি করলে মেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, চেহারা খারাপ হয়, কেমন একটা শক্ত শক্ত পুরুষালি ভাব আসে। মেয়েদের নাম গৃহলক্ষ্মী, অফিসলক্ষ্মী নয়। আর মাস্টারি যারা করে, অনর্গল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের গলা মিষ্টতা হারায়, দুতিন বছরের মধ্যেই তাদের মুখে পেশার ছাপ পড়ে।

তখন দাদার সঙ্গে বিবাদ হয়নি। বউদি আসেনি। তখন দাদা মাইনের পুরোটাকাই বাবার হাতে দিত। তাই মেয়েদের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যকেই প্রথম বিবেচ্য করে তুলেছিলেন বাবা। কিন্তু বেশিদিন সেই বিবেচনা রাখতে পারেননি। সংসারের হালচাল বদলে গেল, দাদা আলাদা হল, আর মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে বাবার সঙ্গে মানসী সমানে তর্ক চালাতে লাগল। তারপর মাধুরী—আর মানসী দুজনেই চাকরিতে ভর্তি হল। মাসিক খরচার টাকা আগে বাবাই রাখতেন, তিনিই বণ্টন করতেন। তাতে অব্যবস্থার চূড়ান্ত হত। তাই সব মায়ের হাতে তুলে দিল মানসী। জমা খরচের খাতাখানা পর্যন্ত। বাবা আপত্তি করে বসলেন, 'তোর মা হিসেব মেলাতে পারবে না, যোগ বিয়োগে ভুল করবে।'

মানসী বলল, 'করুক, আমরা চেক করে দেব। তহবিল তছরুপের ভয় তো আর নেই বাবা। না হয় একটু গরমিল হলই।'

সাংসারিক ব্যাপারে মায়ের পরামর্শ আগে আগে বাবা প্রায় শুনতেই চাইতেন না, এখন না শুনে পারেন না। শুধু ভাঁড়ার নয়, ধোয় বরাদ্দের ব্যবস্থাও এখন মার হাতে। ওঁদের সেই ঝগড়াও কমে গেছে। অন্তত আগের সেই প্রচণ্ডতা কমিয়ে এনেছে মানসীরা। আগে আগে বাবার হাতে মা মার পর্যন্ত খেয়েছেন। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। ঝড় উঠলে যেমন ভয় করত, বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া লাগলেও তেমনি ভয় পেত মানসী। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলেও ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে থাকত মানসী। ঘুমের ভান করে পাশ বালিশ জড়িয়ে ধরে চুপ করে পড়ে থাকত। চোখ মেলতে সহসা পেত না। ভাবনা হত ঝড়ের দাপটে তাদের ছোট পাখির বাসা ছিঁড়ে উড়ে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর তারা ছোট ছোট বাচ্চারা গাছতলায় মরে পড়ে থাকবে। গাঁয়ের বাড়িতে একবার ঝড়ের পর কয়েকটি পাখির বাচ্চাকে অমনি পড়ে থাকতে দেখেছিল মানসী। তাদের মাথা নাড়বার শক্তি নেই, ডানা নাড়বার শক্তি নেই, ছেঁড়া পাতার মত কাদা মাটির সঙ্গে মিশে পড়ে আছে।

কিন্তু মানসীদের আমলে তেমন ঝগড়া আর লাগবার জো নেই। সেবারেও বাবা

খুব খানিকটা বকাবকি করে মার গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিলেন। সংগে সংগে মানসী এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মাঝখানে। কঠিন স্বরে বলেছিল, 'ফের যদি তুমি অমন কর বাবা, মাকে নিয়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। তুমি একা থেকো তোমার সংসারে।'

বাবা আর কথা বলেননি, মাথা তোলেননি, অপরাধী হাতখানা ফতুয়ার পকেটে লুকিয়ে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিলেন। তারপর অমন কাণ্ড আর কোনদিন হয়নি।

সংসারে মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে মানসী। বাবার অতিরিক্ত শাসন থেকে ছোট ভাইবোনদের মুক্তি সেই দিয়েছে। আগে বাবাই সব ঠিক করে দিতেন—ওরা কোন নাপিতের কাছে চুল ছাঁটবে, কেমন করে টেরি কাটবে, টেরি কাটবে কি কাটবে না, কোন রঙের জামা পরবে, তার ঝুল কতটুকু থাকবে। সব ঠিক করবার বেলায় বাবার সৌন্দর্যবোধই ছিল চূড়ান্ত মাপকাঠি। মানসী সেই কাঠি বাবার হাত থেকে কেড়ে নেয়নি, তাঁর কাঠি তাঁর হাতেই আছে। শুধু রুচিবিচারের আরো কয়েকটি নতুন কাঠি চালু করে দিয়েছে মানসী।

সংসারে মেয়েদের আসর অধিকার, বায়ের অধিকার, ইচ্ছামত পোশাক পরিচ্ছদ পরবার অধিকার ছাড়া কি আরো কোন অধিকার আনেনি মানসী? সেই অধিকারই সবচেয়ে বড়, সেই স্বাধীনতার তুলনা নেই। নিজের পছন্দমত ছেলের সংগে বন্ধুত্ব করবার অধিকার, তারপর সেই বন্ধুত্বের জমির ওপর আস্তে আস্তে ভালোবাসার ফুল তুলে যাওয়ার স্বাধীনতা। তার তুলনা হয় না, তুলনা হয় না, সে সুখের তুলনা হয় না।

বাবা মা কি টের পেতেন না? আপত্তি করতেন না? আকারে ইংগিতে শাসন করতেন না। করতেন বইকি। কিন্তু মানসী সব শাসন মানবে কেন? সে কি বড় হয়নি? তার কি ভালো মন্দ বোঝবার ক্ষমতা হয়নি? নিজের হাতে অর্থ উপার্জনের অধিকার আসেনি? মানসী যেমন ভয়ে চোখ বুজে থাকত, ওঁরাও তেমনি সব দেখে শুনে টের পেয়েও চোখ বুজে থাকতে লাগলেন। যে বাতাস নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত আস্তে আস্তে বইছে, বড়জোর মলয় বায়ুর মত মাঝে মাঝে সুবাসিত হচ্ছে, পাছে তা প্রবল হয়, পাছে আরো বড় হয়ে ঝড় আসে।

মুখ ধুয়ে আয়নার দিকে তাকাল মানসী। এই সেদিনও মাধুরী আর সে এক সংগে দাঁত মেজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখেছে। পাউডারে দাঁত বেশি পরিষ্কার হয় না পেস্টে তাই নিয়ে তর্ক করেছে। দিদি আবার পেস্ট করতে পারে না। অদ্ভুত বাতিক। নরম পেস্ট দেখলে তার নাকি গা ঘিনঘিন করে। ব্রাশ ব্যবহার করতেও দিদি অপটু। ওর মাড়ি ভারি নরম। একটু ব্রাশ করলেই রক্ত বেরোয়। মানসীর সবই শক্ত। আয়নায় মুখ দেখল মানসী। সমান সুগঠিত সুন্দর দাঁতের পংক্তি দেখল। অনেকদিন আগে দূর সম্পর্কের এক জেঠিমা মানসীদের বাড়িতে এসে কিছুদিন ছিলেন। মানসী তাঁকে কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে এনেছিল। তাই তিনি তাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি মাকে বলেছিলেন, 'সুহাস তোমার মানসী বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, 'ওর এক দাঁতের বুদ্ধিও মাধুরীর নেই।' শুনে মানসী হেসে বলেছিল, 'জেঠিমা, মানুষের বুদ্ধি কি দাঁতের গোড়ায় থাকে না মাথার কোষে?' জেঠিমা বলেছিলেন, 'কোথায় থাকে তা জানিনে বাছা। মাঠাকুরমার মুখে যা শুনেছি তাই তোমাকে বললাম।'

দাঁতে বুদ্ধি না থাকুক, সৌন্দর্য আছে। এ কথা অনেকেই বলেছে মানসীকে। বিশেষ করে একজন তো বারবার বলেছে। অসীম বলেছিল, 'দশন মুকুতার পাঁতিরে।' তোমার দাঁত দেখলে বৈষ্ণব কবির সেই উপমা মনে পড়ে।'

মানসী হেসে বলেছিল 'ওই পুরোন উপমা ছাড়া তুমি আর কিছু খুঁজে পেলে না?'

অসীম বলেছিল, 'এখনকার কবিরা দাঁতের সঙ্গে আর কিসের তুলনা দিয়েছেন ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু মুক্তার পাঁতি অমর। সোজা কথায় বলি, তোমার দাঁতের জন্যে যে কেউ প্রাণপাত করতে পারে।'

মানসী বলেছিল, 'পাত করে দরকার নেই। প্রাণটা যেখানে রেখেছ সেখানেই নিরাপদে থাক। দেখ সব বাদ দিয়ে তুমি কেন আমার দাঁতের সুখ্যাতি কর—আমার বড় ভয় হয়।'

'কেন ভয় কিসের?'

মানসী বলেছিল, 'আমি কি শুধুই আমার দাঁত? আমি তো সত্যিই আর টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মত আমার দাঁতগুলি সব সময় তোমার চোখের সামনে মেলে রাখতে পারব না।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'সব সময় কেন রাখবে? তা ওই কমার্শিয়াল আর্টিস্টের আঁকা বিজ্ঞাপনের ছবিতেই মেলে রাখুক। তুমি ফাইন আর্টিস্টের ললিতকলা। তুমি যখন হাসো মানসী, তুমি জানোনা তোমাকে কি সুন্দর দেখায়। যে অমন করে হাসতে জানে তার আর কিছু না জানলেও চলে।'

মানসী লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।'

অসীম প্রতিবাদ করে বলেছিল, 'মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। তোমার হাসি বড় মিষ্টি। আর এই হাসির জন্যেই তোমার দুটি দন্তপংক্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

অমন সরাসরি কেউ যদি সুখ্যাতি করে, অস্বস্তি লাগে না? সেই অস্বস্তি মানসী তাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, 'বল কি সংসারে আমার দন্তপংক্তির কি আর কোন কাজ নেই? সেদিন রেস্টুরেন্টে দুজনে মিলে যে দিব্যি ফাউল কাটলেট খেলাম দাঁত ছাড়া কি তা সম্ভব হত?'
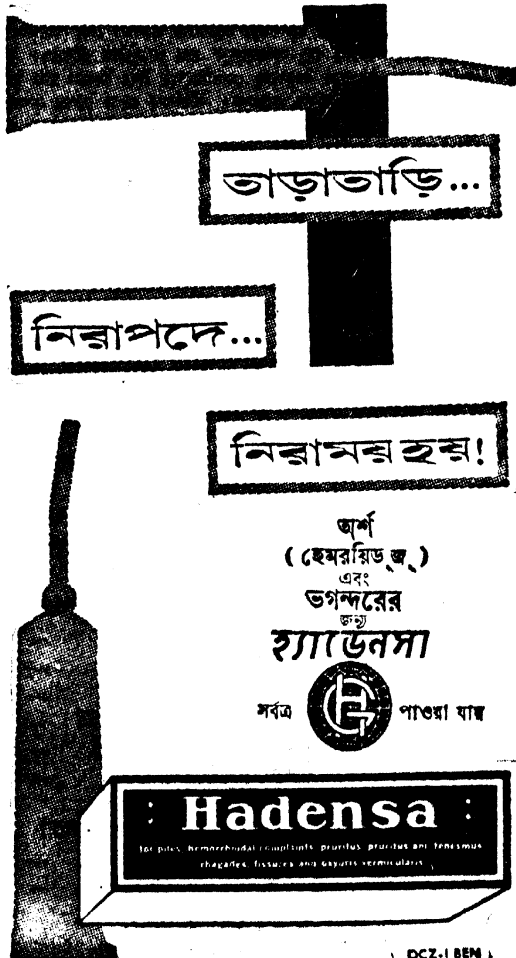
অসীম বলেছিল, 'তুমি যতই চেষ্টা কর তোমার হাসির মহিমা তাতে চাপা পড়বে না বরং আঁচল চাপা দিলে তা আরো বাড়বে।'

আর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ে। অসীম তাতে লিখেছিল, 'কতদিন তোমাকে দেখিনে। তোমার হাসি দেখিনে। আমার মন বিষাদের অন্ধকারে ঢাকা পর্বত কন্দরের মত। তার কোন কোন রন্ধ্র দিয়ে তোমার হাসির জ্যোৎস্না যখন এসে পড়ে, সেই পাহাড় নবজন্ম পায়। অচল গিরি হয়, রজতগিরি। রূপেই তার চাঞ্চল্য রূপেই তার সচলতা। নাকি আবার একটা কাঁচা উপমা দিয়ে বসলাম? জ্যোৎস্নার একই বরণ, একই ধরন স্বভাবে একই স্নিগ্ধতা। তোমার হাসি সব সময় স্নিগ্ধ নয়। তাতে কখনো বা বুদ্ধির দীপ্তি।'

ছাই বুদ্ধি। আবার সেই জ্যোৎস্নার দাঁতের বুদ্ধি। বুদ্ধি দিয়ে মানসী কি মানুষকে চিনতে পারল, তার রাশ রাশ কথার রাশ রাশ চিঠির অসত্যতা ধরতে পারল, বুদ্ধি দিয়ে সে কি কাউকে ধরে রাখতে পারল? তার বুদ্ধিরও কোন দাম নেই, হাসিরও কোন দাম নেই। মানসীর হাসি সেই মুগ্ধ দর্শকের কাছে আজ চিরদিনের মত বাসি হয়ে গেছে।

ভালোবাসার স্বাধীনতাকে একদিন সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা বলে ভেবেছিল মানসী। 'ভুল ভুল' ভালোবাসা স্বাধীনতা নয়, পরাধীনতা। পরের চাকরি করা যেমন দাসত্ব পরকে ভালোবাসাও তেমনি পরম দাসত্ব। যাকে ভালোবেসেছ তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে এই হলো দাসত্বের শর্ত। সে তোমার দিকে না তাকালে তোমার দিনের আলো নিভে যায়, তোমার জ্যোৎস্না রাতে অমাবস্যা নামে, সে তোমার দিকে না চেয়ে হাসলে তোমার পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যায়, সে তোমাকে বুকে টেনে না নিলে পৃথিবীর কোন আকর্ষণের কোন মানে থাকে না। এমন অধীনতা আর কিসে আছে? আগেকার দিনে মেয়েরা নিজেদের নামের সঙ্গে দাসী জুড়ে দিত। নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় তারা জানত, ভালোবাসার পরিণাম তারা জানত। আমি ভালোবাসি একথা বলা যা, আমি দাসী একথা বলাও তাই। যখন প্রতিদান মেলে তখনই সমানাধিকারের গৌরব। যখন কম করে মেলে কি একেবারেই মেলে না তখন অর্ধাধিকারিনীর অখ্যাতি অনেক নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়। হতাশা নিরাশা গ্লানি

আর অপমানের কারাগারে চিরদিনের মত তোমাকে বন্দিনী করে রাখে। এই বন্ধনদশা কি কাটাতে পারবে না মানসী? এই দাসত্বের দড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারবে না?

মুখ হাত ধুয়ে মানসী ফিরে এসে দেখল নন্দরা উঠে পড়েছে। কি মা-ই তাদের ডাকাডাকি করে তুলে দিয়েছেন। কালকের মত আজও দেয়াল ঘেঁষে সেই চায়ের টেবিল পাতা হয়েছে। তাদের চেয়ার-টেবিল, কাপ-ডিশ, ঘটি-বাটি কাল যা ছিল আজও তাই আছে। কোন একটা জিনিস ভাঙেনি, নষ্ট হয়নি, চুরি যায়নি। যা যাবার শুধু মানসীরই গিয়েছে।

মায়া এসে বলল, 'সেজদি, ও'রা ততক্ষণে আসুন। কালকের মত তোমাকে আগে এক কাপ চা করে দিই। তুমি সেকেন্ড কাপ সবাইর সঙ্গে খেয়ো।'

মানসী প্রথমে নিষেধ করল, 'না না থাক।' তারপর বলল, 'আচ্ছা দে।'

আজ আর দ্বিতীয় কাপের অপেক্ষায় থাকবে না মানসী। প্রথম কাপ খেয়েই চলে যাবে। আজ আর সবাইর সঙ্গে বসে গল্প করবার রুচি নেই তার।

একটু বাদে চায়ের কাপ সামনে এনে মায়া বলল, 'খালি পেটে চা খাবে সেজদি? একখানা বিস্কুট টিস্কুট এনে দিই, তাই দিয়ে খাও।'

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, 'যাক, তোর আর ডাক্তারি করতে হবে না।'

মায়া মুখ ম্লান করে চলে যাচ্ছিল, মানসী ফের ডাকল, হেসে বলল, 'আচ্ছা, দে এক-খানা বিস্কুটই দে।'

তারপর ছোট বোনের পিঠে হাত রেখে একটু আদর করে বলল, 'মায়া, তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো।'

মায়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'কেন সেজদি, তোমরাও তো ভালো।'

মানসী বলল, 'না। তোর মত অত ভালো আমরা কেউ নই। তোর মত অত সুখী আমরা কেউ নই। সুখী হওয়ার একমাত্র উপায় বোধ হয় ভালো হওয়া। তুই ঠিক পথ বেছে নিয়েছিস মায়া।'

মায়া বলল, 'কী যে বল সেজদি!'

'আমি বলছি তুই আরো সুখী হবি।'

মায়া একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টটা কিছুতেই জানা গেল না সেজদি। বিজুদা যে বল-ছিলেন জানাবেন। কেউ কেউ কিন্তু জেনে গেছে।'

মানসী বলল, 'আমরাও জানব। বিজুদা তো কখনো কথার খেলাপ করেন না। জানতে পারলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। কি নিজেও চলে আসতে পারেন। অত ভাবছিস কেন। তুই পাশ করে যাবি।'

মায়া হেসে বলল, 'সত্যি বলছ সেজদি? তোমার কথা যেন ফলে।'

খুশী হয়ে চলে গেল মায়া। যেন অমোঘ বর পেয়েছে দিদির কাছ থেকে।

বোকা মেয়ে। ও ভেবেছে জীবনের সব সুখ পরীক্ষার পাশ ফেলের ওপর নির্ভর করে। গোটা কয়েক পাশ তো মানসীও করেছিল। তাতে হল কী।

মানসী একা একা বসে চা খেতে লাগল। এতক্ষণে বাড়ির সবাই উঠে পড়েছে। কেউ বাথরুমে ঢুকেছে। কেউ বা বসে জড়তা ভাঙছে। এখনো মানসীর সামনে কেউ আসেনি, পাশেও না। সে এখন সম্পূর্ণ একা। একা থাকাই সবচেয়ে ভালো। নিজের কাজে নিজে মগ্ন হয়ে থাকার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই। আত্মপ্রেমই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রেম। ছলনা প্রতারণা প্রত্যাখ্যানের ভয় নেই।

বাবা এসে বসলেন। আজ বোধ হয় আর মর্নিংওয়াকে বেরোননি। মুখখানা গম্ভীর। নন্দ, মঞ্জু, মিনু এল। এল মাধুরী। মানসী একবার ওর দিকে আড়-চোখে তাকাল। ওর মুখখানাও কি ভার ভার? না মানসীর দেখবার ভুল? পুরো একটি রাত্রির সুখনিদ্রার পর মুখ অমন ফোলা ফোলাই দেখায়। মাধুরী। শব্দটা উচ্চারণ করে মানসী মনে মনে হাসল। ছেলেবেলায় সে ওকে কিছুতেই দিদি বলতে চাইত না। নাম ধরে ডাকত। বলত, 'ইস্, দেড় বছরের বড় আবার বড় নাকি?'

কিন্তু বাবা খুব শাসন করতেন, মা খুব বকতেন। তাই দিদি বলতে শুরু করল। এখন ওকে ফের নাম ধরে ডাকতে পারে মানসী। দিদি হয়ে যে ছোট বোনের লাভারের সঙ্গে প্রেমে পড়ে বয়সে বড় হলেও সে পর্যায় ছোট, অন্তরে ছোট।

কিন্তু সত্যিই যে ওদের মধ্যে কিছু হয়েছে তা কী করে জানল মানসী? সে তো
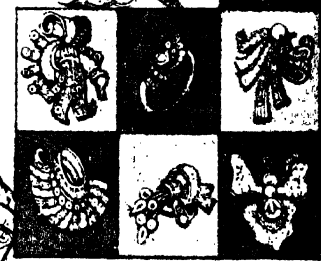
নিজের চোখে কিছু দেখোন, নিজের কানেও কিছু শোনেনি। তা অবশ্য শোনেনি। কিন্তু মনে অনুভব করেছে। সেই অনুভবই সবচেয়ে বড়। চোখের চেয়ে বড়, কানের চেয়ে বড়। চোখে কতটুকুই বা দেখা যায়, কানে কতটুকুই বা শোনা যায়। অঘটন যখন কিছু ঘটে, সবচেয়ে আগে জানান দেয় মনে। মানসী দেখেছে সেই জানাই নির্ভুল জানা। কাল ওরা সারাদিন চোখে-চোখে লুকোচুরি খেলেছে, সারাদিন মানসীর চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, আর কাল দুপুর রাত্রে ট্যাক্সি করে পালিয়ে যেতে তো মানসী নিজের চোখেই দেখল। তারপর নিজেদের বাড়ির সামনেই দেখতে পেল যুগল আসামীকে। অপরাধীর মুখ দেখলেও ধরতে পারবে না, মানসীর দৃষ্টি কি এমনই ক্ষীণ? বুদ্ধি কি এমনই নিষ্প্রভ?

নন্দু বলল, 'এ কী, অসীমদা এখনো এলেন না যে। বাড়ির গেস্টই অনুপস্থিত। এ কী ব্যাপার।'

মনোমোহন ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করতো একটু। তুই সব সময় বড় বাচালতা করিস। এমন বদ অভ্যাস হয়েছে তোর।'

নন্দু একবার মানসীর দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। ও হয়তো ভেবেছে সেজদি তার পক্ষ নিয়ে দু একটা কথা বলবে। কিন্তু সব সময় কি আর তা বলা যায়? সব সময় কি আর বাদ-প্রতিবাদ করতে মন চায় কারো।

সুহাসিনী খাবারের থালা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'ওমা তাইতো। অসীম যে খেতে উঠতে এল না এখনো।'

মঞ্জু বলল, 'আসবেন কি, অসীমদা এখনো ওঠেনইনি। আমি ডেকে এলাম। অসীমদা বললেন, তোমরা এখন খাও গিয়ে। আমি খাব না। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নি। কথা শোন সেজদি। উনি খরগোশের মত চোখ খুলে ঘুমোবেন। আমি পরিষ্কার দেখলাম, অসীমদা মোটেই ঘুমোচ্ছেন না। মশারির চাঁদার দিকে তাকিয়ে হয়রান হয়ে পড়ে আছেন।'

নন্দু বলল, 'বাবা, কই মঞ্জুকে তো তোমরা কেউ ধমকাচ্ছ না। ও কথা বললে বুঝি বাচালতা হয় না। যত দোষ আমার বেলায়?'

মনোমোহন আবার ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ। ফের গোলমাল করছিস?'

তারপর নিঃশব্দে চা খেতে লাগলেন। তাঁর গোঁফের আগা চায়ের কাপের মধ্যে এসে পড়েছে। বিশ্রী লাগছে দেখতে।

হঠাৎ মানসীর মনে হল, একা ঘরে পেয়ে বাবা ওকে মারধোর করেননি তো? কিংবা মারের চেয়েও বাড়া চূড়ান্ত কোন অপমান? উনি সব পারেন। যদি তেমন কিছু করে থাকেন, মানসী ওঁকে ছেড়ে দেবে না, বাপ বলে খাতির করবে না। অসীমকে যদি শাস্তি দিতে হয়—মানসী নিজেই দেবে। তাকে আর কারো কিছু বলবার কোন অধিকার নেই।

সুহাসিনী বললেন, 'বেশ তো, এখন না উঠতে চায় না উঠল। এক কাপ চা বরং তোরা ওকে কেউ দিয়ে আয়।'

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন বাজে বকছ মা? সে কি কোনদিন বেড টি খায় যে আজ খাবে?'

মাধুরী এতক্ষণে কথা বলল: 'কোনদিন না খেলেও একদিন খেতে তো বাধা নেই। চায়ের কাপটা তুই-ই দিয়ে আয় না মানসী।'

মাধুরীর কথার মধ্যে কোন ব্যঙ্গ আছে কিনা, বিদ্রূপ আছে কিনা বুঝে দেখতে চেষ্টা করল মানসী। ঠিক ধরতে পারল না। না চোখের দৃষ্টিতে, না গলার স্বরে, না মুখের ভাষায়। বড় মায়াবিনী মেয়ে। ওকে ধরা ভারি শক্ত।

মানসীও কথার সুরে ধরা না দিয়ে বলল, 'তুমিও তো দিয়ে আসতে পার দিদি।'

মাধুরী কোন জবাব দিল না।

জবাব দেওয়ার আছে কী যে দেবে। চায়ের কাপের ওপর মুখ নামালেই কি সব ঢাকা পড়ে?

নন্দু বলল, 'আজ বোধ হয় অসীমদা চলে যাবেন।'

হঠাৎ কেউ কোন কথা বলল না।

মনোমোহন বললেন, 'যাবেন বই কি। তার কি আর কোন কাজকর্ম নেই যে এখানে দিনের পর দিন পড়ে থাকবে?'

মানসী বাবার দিকে তাকাল, 'তুমি বলেছ নাকি কিছু?'

মনোমোহন উষ্ণ হয়ে বললেন, 'আমি আবার কি বলব! বলতে হবে কেন? তার কি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই?'

কেউ কোন কথা বলল না। চায়ের টেবিল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। কারো খাওয়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

একটু বাদে মাধুরী বলল, 'চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। মঞ্জু তুই-ই বরং যা। চা-টা দিয়ে আয়।'

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাচ্ছি সেজদি।'

মানসী মনে মনে বলল, 'আহা কী দরদ! কী গরজ!'

মঞ্জু চলে যাওয়ার পর তার মনে হল, এই সুযোগটা সে নিলেও পারত। চা দেওয়ার উপলক্ষে সোজাসুজি তার সামনে গিয়ে তার চোখের দিকে তাকানো যেত। শোনা যেত সে কী বলে, কোন্ কৈফিয়ত দেয়।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, ছিঃ। তার কি আত্মসম্মান বলে কিছু নেই? সে কেন আগে থেকে যাবে? সে কেন নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে? দরকার হয় সে নিজেই বলবে। নিজেই বেরিয়ে আসবে। মশারির আড়ালে সারাদিন তো আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

(ক্রমশ)

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

তেত্রিশ

বরদাবাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের সত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধিমন্তরা সন্দেহ করতে পারেন, বলতে পারেন যে, বরদাবাবু কোনো রকমে জেনে নিয়েছিলেন আমার হার্নিয়ার কথা। কিন্তু জানবেন কী করে? আমি তাঁর কাছে যাব কোনোদিন ভাবি নি, হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছিলাম এক বন্ধুর অনুরোধে, যাকে আমি আভাস পর্যন্ত দিইনি—শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ও সম্বন্ধে কী লিখেছিলেন। কথা উঠতে পারে বরদাবাবু ধ্যানে জেনেছিলেন আমার রোগটা আছে। তা হলে মিথ্যা বললেন কেন? শ্রীঅরবিন্দের মহিমা বাড়াতে? তিনি শুধু শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ছিলেন না, বরদাবাবু ছিলেন বেপরোয়া মানুষ, যা মুখে আসত বলে দিতেন—কখনো কখনো কেউ প্রগলভতা করলে তাকে সাজা দিতে যোগবিভূতিও দেখাতেন। তাই আমাকে সেদিনই তিনি বলেছিলেন, এক আত্মম্ভরী অধ্যাপক তাঁর সামনে যোগবিভূতিকে আষাঢ়ে গল্প বলে হাসাহাসি করাতে একঘর লোকের সামনে তাকে ভালোমানুষের মতন প্রশ্ন করেছিলেন, অমুক জায়গায় তাঁর গুপ্ত রক্ষিতাটি তাঁকে ছেড়ে আর একজনকে রক্ষক করল কী দুঃখে—তিনি কি তাকে যথেষ্ট গহনাগাটি দিতেন না?

য়ুরোপে গত পঞ্চাশ বৎসর এই শ্রেণীর মনঃশক্তি নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং গবেষকদের মধ্যে একাধিক খ্যাতনামা মনীষী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ-সব অতীন্দ্রিয় বোধ (extra-sensory perceptions) অপ্রতিপাদ্য সত্যের কোঠায় পড়ে। কিন্তু তবু আজও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিকেরা এজাতীয় অতীন্দ্রিয় দর্শনাদিকে পাশ কাটিয়ে যান যুক্তিবাদী বুদ্ধির মান বাঁচাতে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান গবেষক রাইন সাহেব (J. B. Rhine) ১৯৩৭ সালে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত Frontiers of the mind বইটিতে এ-জাতীয় মনঃশক্তি নিয়ে তাঁর বহু গবেষণা প্রকাশ করে বহু বুদ্ধিবাদীর কাছেই উৎসাহিত হন। কিন্ত তার পরে এ ত্রিশ বৎসরে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে আজ য়ুরোপে খ্যাতনামা মনীষীদের মধ্যে অনেকে আবার বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধিবাদীদের বিদ্রূপ করে শোধ তুলছেন এই বলে যে, অতীন্দ্রিয় বোধ যে ইন্দ্রিয়বোধের চেয়ে কম সত্য নয়, একথা অস্বীকার করা যায় এক গাজোয়ারি (dogmatic) মূঢ়তার বলে। কিন্তু তবু গড়পড়তা মানুষ এ-ধরনের সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হলে বলেন, "যেতে দাও"। রাইন সাহেব এ-জাতীয় পলাতক মনোবৃত্তিকে নিয়ে খেদ করে শেষে মন্তব্য দিচ্ছেন যে, এসব অধুনাতন আবিষ্কারের মাধ্যমে 'আমরা দৃঢ়মূল বস্তুতান্ত্রিকতার সম্ভব-অসম্ভবের ধারণাকে দীর্ণ করে মানুষের ব্যক্তিরূপের ভবিষ্যৎ চর্চার জন্য সুদূর-বিস্তীর্ণ নব-নব সমস্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি'—যার ফলে—'বস্তুবিশ্বের সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় স্থৈর্য আসতে পারে এবং আমাদের জীবনযাত্রার একটি মহত্তর ভিত গড়ে উঠতে পারে।'*

মন্তব্যটি যে সুচিন্তিত, তার একটি প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি। বরদাবাবুকে ঠিক এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ অলৌকিক দর্শন দিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে বলেছিলেন শুধু এইজন্য যে, এ-ধরনের অলৌকিক দর্শন বা অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি তখনো আমার মধ্যে উন্মেষিত হয়নি। তাই তাঁর মাধ্যমে তিনি আমাকে নিরস্ত করেছিলেন অভেদানন্দ স্বামীকে গুরুবরণ করতে। যদি না করতেন তাহলে আমার অধ্যাত্ম জীবনের ভিত 'খর্বতর' হত, কেননা, আমি শ্রীঅরবিন্দের মতন লোকোত্তর মহাপুরুষের অন্তরঙ্গ শিষ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারতাম না। শ্রীঅরবিন্দের মতন মহা-ঋষির স্নেহভাজন অন্তরঙ্গ হবার মতন সৌভাগ্য আমি কল্পনাই করতে পারি না। তাই বরদাবাবুর কাছে আমি চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকব তাঁর অলৌকিক দর্শনের বলিষ্ঠ অভিঘাতে আমাকে তিনি শ্রীঅরবিন্দের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন বলে।

এ প্রসঙ্গে আমার আর-একটি বক্তব্য আছে। সেটি এই যে, বরদাবাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন বলেই যে তিনি আমাকে শ্রীঅরবিন্দের বাণী দেন—শ্রীঅরবিন্দের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশে নয়—একথার প্রমাণ এই যে, শ্রীঅরবিন্দকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করলেও শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেও তাঁর বাধত না। সেদিন ও পরে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় তিনি আমাকে বেপরোয়া হয়েই বলেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের সুপ্রামেন্টাল দর্শন সত্য হলেও এ-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন না একটি বিশেষ কারণে। সে-কারণটি আমি আজ প্রকাশ করতে চাই না—কেবল বলব যে, ১৯৫০ সালে যখন শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ দেহরক্ষা করলেন, তখন আমার মনে পড়েছিল সর্বপ্রথম বরদাবাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি—আর অনুতাপ এসেছিল তাঁর সত্যভাষণের জন্যে রাগ করেছিলাম বলে। তাছাড়া বরদাবাবু যে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁর বাণীবাহ হয়ে আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে, সময় হলে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডেকে

* "....we have broken through the speculative position of entrenched matevialism and have opened up for the future study of personality a whole area of new problems.... that may bring balance into our conception of things and a better foundation for living."....Chapter XVII.... New Frontiers of The Mind.
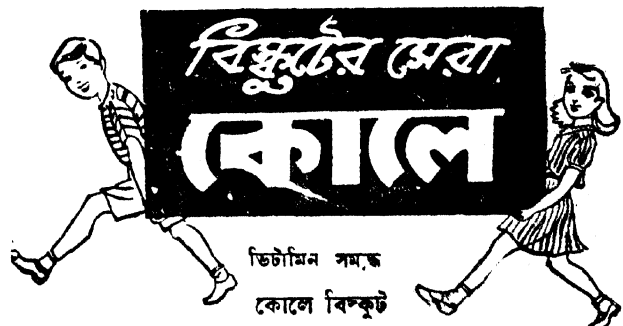
নেবেনই নেবেন, তাঁর এ-ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে ফলেনি কি? আর শুধু ফলাই তো নয়, কীভাবে ফলেছিল ভাবতে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সে-অবিশ্বাস্য তথা অকাট্য কাহিনী পেশ করবার সময় এসেছে, কেবল তার আগে বরদাবাবুর প্রসঙ্গ শেষ করে নিই।

বরদাবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় বছর দশেক পরে কলকাতায় যখন আসি পণ্ডিচেরী থেকে মাসকয়েকের জন্যে। সেই সময়ে তিনি যখন আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করেন, তখন আমি তাঁকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কবে আমি আমার ইষ্টের দর্শন পাব। তিনি হেসে বলেছিলেন মনে আছেঃ 'পাবে গো পাবে—তবে পণ্ডিচেরীতে নয়। এক মহীয়সী অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে। তিনি যখন তোমার শিষ্যা হয়ে এসে তোমার যত বাধার জঞ্জাল সাফ করে দেবেন, তখনই তোমার হবে বস্তুলাভ—তার আগে নয়।' আমি খুশি হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিঃ 'কিন্তু সে-সুদিন আসবে তো?' বরদাবাবু জবাব দেনঃ 'এখনো অবিশ্বাস? আমি তোমাকে যা-যা বলেছিলাম ফলেনি কি?' আমি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইতে তিনি বললেনঃ 'না গো, অজ্ঞান জানে না বলেই অবিশ্বাস করে—এতে রাগ করে যে, সে জ্ঞানী নয়।'

এরও দশ বৎসর পরে ১৯৪৯ সালে যেদিন ইন্দিরা আমার কাছে এসে সত্যিই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেয়, সেদিন আর একবার আমি বরদাবাবুর কথা স্মরণ করে তাঁকে মনে মনে প্রণাম করেছিলাম—শুধু কৃতজ্ঞচিত্তেই নয়, বিস্মিত পুলকেও বটে। তারপর (বরদাবাবুর ভাষায়) এ-'মহীয়সী'-র ইন্দিরার মাধ্যমে যোগবিভূতির আরো যেসব খেলা দেখেছি, তাতে চোখের ঠুলি গেছে খসে, দেখতে পেয়েছি ঠাকুরের কৃপা কবিকল্পনা নয়, জাজ্জ্বল্যমান সত্য, অঘটনের যুগ গত নয়, ভক্তের জন্যে ভক্তবৎসল অনেক অঘটন ঘটান, তেমনি করুণায়, স্নেহে, প্রেমে যেমন ঘটাতো পুরাকালে ভক্তের সংকটমোচন করতে। সে-ইতিহাস হয়ত বলব কোনোদিন—এখন এ-প্রাক্‌যোগ পর্বের সমাপ্তি টানার সময় এল।

বরদাবাবুর কাছ থেকে ফিরে আসার পরে প্রায়ই ইচ্ছা হত কৃষ্ণপ্রেমের কাছে ছুটে যেতে, কিন্তু সে ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ করছে সুদূর আলমোড়ায়—ভাবতেও ত্রস্ত হয়ে উঠতাম। ভাবতাম ঠাকুরকেঃ 'দেখো ঠাকুর, আমারও যেন এ-দশা না হয়।' কেবল মনে আমার অনুযোগ-অভিযোগ উঠত ফুলে ফুলে—কেন ঠাকুরকে পেতে হলে কাঁটাপথেই চলতে হবে প্রতি সাধককে? জটাধারণ, কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস, অভোজ্য ভোজন, সৌন্দর্য-বিরাগ, কৌপীনবাদ—এসব কেন? সহজিয়া ছন্দে আনন্দের কমনীয় আলোয় ভক্তির রমণীয় পথে কেন অমন মুক্তিমোহনকে মেলা অসম্ভব হয়ে উঠল? এ-প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি পরে দিনে দিনে বহু দুঃখের পরীক্ষায়—কিন্তু সে অন্য কথা—সাধনার কথা—হয়ত কোনোদিন বলব—ঠাকুরের ইচ্ছা হলে। কারণ আজ আর কিছু বুঝি না বুঝি, এটুকু বুঝবার কিনারায় এসেছি যে, ঘটার মত কিছু ঘটে কেবল ঠাকুরেরই ইচ্ছায়। আমাদের অজ্ঞনা-উদ্বুদ্ধ ইচ্ছায় ঘটে শুধু দুর্ঘটনা।

বরদাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম ঔৎসুক্য নিয়ে, তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলাম শুধু ভক্তি নিয়ে নয়, যোগশক্তি সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে। তা হলে তো যেসব অঘটনের কথা আমি এযাবৎ আষাঢ়ে গল্প বলে বরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি, সে-সব সত্যভিত্তি হতেও পারে! কয়েক বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে দিনের পর দিন নানা পত্রে এবিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফলে আমি কতকটা বুঝতে শিখি, কেন এসব যোগবিভূতিকে যোগীরা সাধকরা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-আলোচনা এ-স্মৃতিচারণে অবান্তর বলে ঘটনার প্রকাশ্যালোকে ফিরে আসি ফের।

লালগোলা থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর স্বামী অভেদানন্দের চরণে দীক্ষা নেওয়ার সংকল্প ছেড়ে বরদাবাবুর কথা মেনে শ্রীঅরবিন্দের ডাক দেওয়ার পথ চেয়ে রইলাম। ফের চেষ্টা করা শুরু করলাম ঠাকুরকে ডাকাডাকি করবার। কিন্তু হায়রে, ডাকব বললেই কি ডাকা যায়। যে-মন শৈশবের সরল বিশ্বাসে সুরধামের ছন্দের
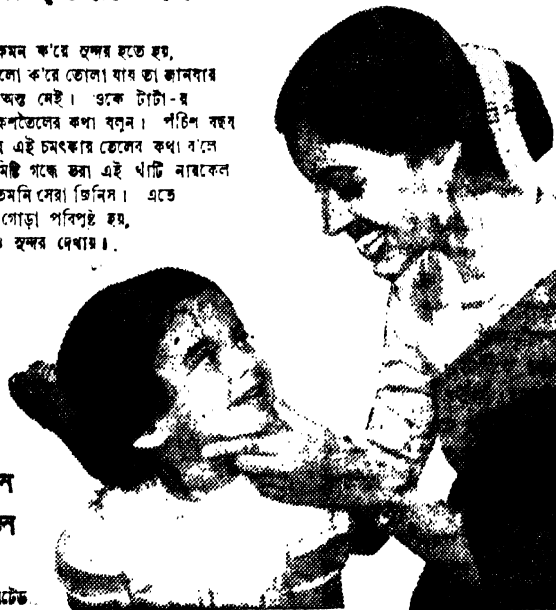
কুঠুরিতে বসে কথামৃত পড়ে উজিয়ে উঠত, ঠাকুরকে সরল বিশ্বাসে দেখা দাও বলে চোখের জল ফেলত, সে তো আর নেই— সাধনায় মন বসাই কী করে? তাছাড়া সময়ই বা কই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের? শুধু মাঝে মাঝে কান্ত কবির অপরূপ গান গাইতাম আকুল হয়েঃ

আজ লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
আমি জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল পাথারে,
প্রভু বিশ্ববিপদ হন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে
তুমি নির্মল কারো মংগল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে।

কিন্তু কখনো কখনো ভক্তির আবেশে মনে ক্ষণিক শান্তি এলেও আমার হাজারো স্বরচিত দায়িত্বের জগতে ফিরে আসতে না আসতে বৈরাগ্যের মধ্যে অনুরাগটুকু সুপ্ত হয়ে বেঁচে-বর্তে থাকত শুধু সর্বকিছুতে বিতৃষ্ণা।

এই সময়েই আমি বেঁধেছিলাম আমার একটি গান, যেটির ছন্দ-ভাব নিয়ে অতুলদা বাঁধেন তাঁর বিখ্যাত—

'কত গান তো হল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও।'

আমি গানটিতে নিজের এ সময়কার হৃদয়ের যে-ছবি এঁকেছিলাম, সেটি পেশ করতে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করিঃ

যদি দিন না দেবে তারে
এত ব্যথা কেন দাও?
যদি নাথ, আশা না রবে—
মিছে ফোটা কেন হও!
যদি দেবে বাঁধন খেলা
শুধু ক্ষণিক লীলাখেলা,
কেন বাঁধলে এই প্রাণ সে-বাঁধে
সকাল সন্ধ্যাবেলা!

এর পরের চরণগুলি 'অনামী'তে আছে— পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক আরো এইজন্যে যে, এ-বৈরাগ্য খানিকটা মামুলিই বলব। সংসারে যখনই আমাদের নানা আশা ও স্বপ্ন ভেঙে মন খান খান হয়ে যায়—মন বলে ওঠেঃ 'চলো নিজ নিকেতনে।' এ-বৈরাগ্য পথ দেখায় তখনই, যখন সে ভগবানে অনুরাগ জাগিয়ে তোলে। 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' বলতে ভর্তৃহরি বুঝেছিলেন এই ভগবদনুরাগী বৈরাগ্য—শুধু সংসারে বিতৃষ্ণা নয়।

তবু সত্যের খাতিরে না মেনে উপায় নেই যে, অন্তত প্রথম দিকে সংসারে খানিকটা বিরাগ এলে ভগবানে অনুরাগ মনের কোণে ঠাঁই পায় না। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এ-বাণী সাজে তাঁরই মুখে, যার মনে ভক্তি, প্রেম, নিষ্ঠা খানিকটা থিতিয়ে গেছে। অবোধ রাম, শ্যাম, যদু মধু কথায় কথায় সন্ন্যাসী বৈরাগ্যকে নিয়ে যে হাসাহাসি করে, সে অজ্ঞানের প্রগল্ভতা।

বরদাবাবুর কাছ থেকে ফিরে এইটুকুই আমার সত্য লাভ হলঃ বৈরাগ্যের মধ্যে যে ভগবৎ-করুণা নিহিত তার সঙ্গে যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল সবে-জানা বিষাদের অঙ্গনে।

কিন্তু বাইরে কেউ জানতে পারেনি। জানবে কোত্থেকে? আমি বললে তো জানবে। আমি যে বলতে চাইতাম না, তা নয়, কিন্তু বিষাদের কি মুখ ফোটে, যদি সে জানে যে, তার বিষাদের কারণ শুনে সবাই হাসাহাসি করবে? আমার বন্ধুরা যে সবাই বেদরদী ছিলেন এমন ইংগিত করছি না, আমি বলতে চাই শুধু এই কথা যে, প্রবল বৈরাগ্যের অনুভূতি যাদের হয়নি, তারা কখনই বুঝতে পারে না, তার ফলে বৈরাগীর ঠিক কী দশা হয়। সংসারে আমার কেবল একটিমাত্র দরদী ছিল যে বুঝত: কৃষ্ণপ্রেম। কিন্তু হায়রে তখন সে নাগালের বাইরে— গুরুর নির্দেশে সন্ন্যাস নিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করছে। এ আর এক জ্বালা— তাকে চিঠি লিখেও যে সদুত্তর পাব, তার পথও বন্ধ: ধরো যদি সে বলে—চলে এসো আলমোড়ায়, দু ভাইয়ে ভিক্ষা করে ঠাকুরের প্রসাদ উড়িয়ে দিই! ঠাকুরের প্রসাদ আমার মাথায় থাকুক—ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করব ভাবতেও আমার বুকের মধ্যে রক্তের ভরসা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসত! সে যে কী অবস্থা জানে এক ভুক্তভোগী।

দুরন্ত মনঃকষ্টে একদিন সোজা বোলপুরে গিয়ে হাজির। কবি আমাকে গভীর স্নেহ করতেন, আমার মুখ চোখের চেহারা দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে? আমি সব কথা খুলে বলবার ভরসা না পেয়ে এক কথায় জানালাম—কৃষ্ণপ্রেমের কথা উল্লেখ করে তাঁকে শোনালাম আমার একটি সুর-বাঁধা গানঃ

বলো লীলাময়, এ কী ছলনা!
রূপে দাও রসে কেন এ ছলনা...ইত্যাদি

গানটি মোটেই ভাল হয়নি—কিন্তু গাইতে আমার ভালো লাগত। আমার মনের ছবিটি ফোটে উঠেছিল বলে। গানটি গাইতে গাইতে আমার চোখে জল ভরে এল। আমি কোনোমতে অশ্রু গোপন করলাম।

কবি বিচক্ষণ দ্রষ্টা তো, এক আঁচড়ে বুঝে নিলেন। বললেন আশপাশের দু-চারজনকে একটু বাইরে যেতে। তারপর আমাকে কাছে ডেকে বসিয়ে, আমার কাঁধে হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালেন। তাঁর ভাষা অবশ্য আমার মনে নেই, কিন্তু সান্ত্বনার সারমর্মটি তো ভুলবার নয়। যদি নিজের মতন করে —রিপোর্টের যাথার্থ্য সম্বন্ধে হলপ করে বলতে পারি শুধু একটি কথাঃ যে, ভাষা ও ভঙ্গি আমার হলেও যা তিনি বলেছিলেন, আমি ভুলিনি বা ভুল বুঝবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি বলেছিলেন থেমে থেমে একটি কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেঃ 'রঙ রস রূপ এরা মায়া নয় বন্ধন নয়। অরূপ আবহমানকাল নিজেকে এদের মধ্যে দিয়েই জানান দিয়েছেন। যে রসে বাঁধে তার নাম আসক্তি। তাই বর্জনীয়—রূপ নয়, রূপের মোহ। কিন্তু মোহকে কাটাতে হবে বলে প্রাণের দোললীলাকেও পাশ কাটিয়ে নিস্তরঙ্গ নীরস শূন্যে মুক্তি চাইলে আমরা দেবতার দানের অমর্যাদা করে শুধু যে অপরাধী হব তাই নয়—আত্মঘাতী হব।' বলে শেষে হঠাৎ বললেনঃ 'আমার নৃত্যের তালে তালে নটরাজ গানটি শুনেছ কখনো?'

আমি বললামঃ 'শুধু শোনা নয়, ও-গানটি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। বলতে কি আপনার তিনটি গান আমার সবচেয়ে প্রিয়,

---

আমি গেয়ে কী যে আনন্দ পাই—জীবনে যত পূজা হল না সারা, আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, আর এই গানটিঃ নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্দ।'

কবি প্রসন্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'খুব ভালো কথা। কিন্তু এ-গান তিনটিতেই আমি কী বলতে চেয়েছি ভেবে দেখেছ কখনো?'

আমি সকুণ্ঠে বললামঃ দেখেছি—কিন্তু...

কবি বাধা দিয়ে হেসে বললেনঃ 'কিন্তু শুনলে আমার ভয় করে। তাই ভয় কাটাতে গান শোনাই শোনো—'

বলে তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ধরলেনঃ

'নৃত্যের তালে তালে নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে
তোমার চরণপবন পরশে
সরস্বতীর মানস-সরসে
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও
অমলকমল গন্ধ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙল, যখন কবি এইটুকু গেয়েই থেমে গেলেন, বললেনঃ 'এই-ই হল মানুষের চিরদিনের কামনা, চিরদিনের সাধনা—মুক্তি চাইতে হবে দুরন্ত বাঁধন থেকে, জেগে উঠতে হবে ঝিমন্ত অজ্ঞান থেকে, কিন্তু সুর তাল ছন্দ নৃত্যকে অস্বীকার করে নয়—অঙ্গীকার করেই। আনন্দ মায়া নয়, আনন্দের আলো-হাওয়াই তো সৃষ্টি—আনন্দ মায়া হলে সৃষ্টি দাঁড়ায় কোথায়? তাই তো আমাদের প্রাণ যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে চেয়েছে শিবের নৃত্যকে মঙ্গলময় বলে বরণ করতে, গেয়েছে—(গুন গুন করে)—তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম।'

সেদিন কবি অনেকক্ষণ ধরে এই কথাটির ভাষ্য করেছিলেন যে, আমাদের মামুলি বৈরাগ্য নঙর্থক—সদর্থক বৈরাগ্যের প্রসূতি শুধু সেই দৃষ্টি যে দেখতে শিখেছে, সে ভগবানের লীলা না-র মধ্যে দিয়েই পৌঁছেছে হাঁ-তে। কবির দর্শন আমি জানতাম, কাজেই তাঁকে যে ভুল বুঝিনি, এ ধ্রুব।

মনের আঁধার কেটে গেল বৈকি—কিন্তু ঐ তখনকার মতন। এ-উপলব্ধি আমার একবার নয় বহুবারই হয়েছেঃ বিষাদ নিয়ে গেছি কবির কাছে—তাঁর অমল স্নেহে, স্নিগ্ধ রসিকতায়, সর্বোপরি আনন্দদীপ্ত ব্যক্তিরূপের আলোয় মনের আঁধার কেটে গেছে। আজও মনে পড়ে তাঁর মুখের আশ্চর্য সৌম্যপ্রভা, যাকে কালজয়ী বললে অত্যুক্তি হয় না। মনে পড়ে বৎসরের পর বৎসর তাঁর বিকাশ চাক্ষুষ করে আনন্দের পাথেয় পাওয়া—ভরসা পাওয়া যে তবে সংসারের হাজারো ধুলো বালি কাদা কালির মধ্যে থেকেও আমাদের মৃন্ময় চেতনা চিন্ময়ের দিশা পেতে পারে। কবিকে আমি ভালোবেসেছিলাম সত্যিই—তাই হয়ত তাঁর মহিমার স্বরূপের কিছুটা চিনতে পেরেছিলাম আমার নাবালক দৃষ্টির শোকাবহ দৈন্য সত্ত্বেও।

কিন্তু তবু এটুকু বুঝতে আমার বেগ পেতে হয়নি যে, তাঁর স্বধর্ম আর আমার স্বধর্ম এক নয়। তছাড়া শ্রীঅরবিন্দের 'সিন্থেসিস অফ যোগের' একটি কথা আমার অ-প্রতিবাদ্য মনে হত সে যুগেওঃ যে প্রতি মানুষকেও খুঁজে বার করতে হবে তার জীবনের পূর্ণযোগটিকে। অর্থাৎ একজনের বিকাশের চরিতার্থতা যে-পথে, সে-পথ শুধু তারই—আর কারুর নয়। এক কথায় নর-মানুষের অন্তিম লক্ষ্য এক হলেও প্রতি মানুষকেই সে-লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে তার নিজের নিজের পথে, নিজের নিজের ছন্দে।

বোলপুর থেকে ফিরতে না ফিরতে আমার মন যে তিমিরে সেই তিমিরে। এমন কেন হল সত্যিই ভেবে পেলাম না। শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সালে বলেছিলাম বটে যে, আমি সব ছাড়তে রাজি কেবল গান ছাড়া। কিন্তু তাঁর ওখান থেকে ফিরে এসে দেখি যে, ক্রমশ গানও আমার কাছে বিস্বাদ না হক অতৃপ্তিকর হয়ে উঠছে। শৈশবের বৈরাগ্য ফের আমাকে ছেঁকে ধরল। উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একাধিকবার লিখেছিলেন যে, আমার বৈরাগ্যপ্রবণতার মূলে ছিল আমার জন্মান্তরের সংস্কার। বৈরাগ্য শ্রীঅরবিন্দ পুরোপুরি পছন্দ করতেন না, বলতেন তিনি অনাসক্তিরই পক্ষপাতী। কিন্তু আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে যে, বৈরাগ্য আমার ক্ষেত্রে প্রবল না হলে আমি আমার নানা আসক্তির মায়া কাটাতে পারতাম না।

কিন্তু একথা তখন জানতাম না তো—তাই মনে মনে ভারি দুঃখ হত এই ভেবে যে, বিধাতা আমাকে ভোগের জন্যে গড়ে, অজস্র ভোগশক্তি দিয়ে একী নিষ্ঠুর ঠাট্টা করলেন—ভোগের ক্ষমতাকে রেখে রুচিকে কেড়ে নিয়ে? সে কত ওঠা-পড়া, কত ভাবনা-চিন্তা, কত আগু-পাছু—একবার ভাবি যাই চলে পণ্ডিচেরী সব ছেড়ে, তার পরেই ভাবি—যদি সে পাঁচের নীরস আবহে টিঁকতে না পারি? শ্রীঅরবিন্দের দীপ্ত

ধ্যানমূর্তিরূপ আমার মন টানে। কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ হাসিহীন গতানুগতিক গুরুবাদীর শুকনো মুখ ভাবি আর বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে—আমিও হয়ত অমনি শুকিয়ে যাব হাসতে গাইতে মিশতে ভুলে গিয়ে!

এই সময়ে ত্রিবান্দ্রম থেকে নিমন্ত্রণ এল এক মস্ত সংগীত কনফারেন্সে সভাপতি হতে হবে। আনন্দ হল, কিন্তু ক্ষণিক। যশের স্বাদ তো পেয়েছি কিন্তু মন ডরাচ্ছে কি? তবে? কেন এ-বিড়ম্বনা? কী হবে ত্রিবান্দ্রমে সংগীত-সভার সভাপতি হয়ে? কিন্তু তবু পারলাম না এ-মহৎ সম্মান প্রত্যাখ্যান করতে। রুচি নেই, তবু লালসা আছে—এ যে কী বিশ্রী আশা, বোঝানো যায় না—জানে কেবল ভুক্তভোগী।

ডিসেম্বরে (১৯২৮) ত্রিবান্দ্রমে সভাপতিত্ব করতে হবে। নভেম্বরের গোড়ায় গেলাম কাশী। আমার বড়মামা গংগার কাছে এক বাড়ি কিনেছিলেন—দারুণ গলির মধ্যে। কিন্তু কাশী তো—তার উপরে গংগা। সাগ্রহে গেলাম সেখানে।

সেখানে এক বন্ধুর সংগে দেখা। গানের সমজদার—বিশেষ ঠুংরির। 'রইস' যাকে বলে। সে নিয়ে গেল বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী বাঈয়ের কাছে। এ-বিখ্যাত বাঈজীটি সে-সময়ে বন্ধুর প্রতি আসক্ত তাই বন্ধু যেতেই সাগ্রহে আমাদের অভ্যর্থনা করে গান শোনালেন।

মুগ্ধ হলাম, কিন্তু ঐ তখনকার মতন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে না ফিরতে ফের মনের মধ্যে সেই করুণ টানাটানি—সংসার ভালো লাগে না অথচ সন্ন্যাস নেবার কথা ভাবতেও ডরিয়ে উঠি! জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'..... একেবারে অন্ধকারে অন্ধকারে। তাহলে থাকব কী নিয়ে? দিন কাটবে কেমন করে?

করুণার অঘটনের কথা বলেছি। এ আমার পুঁথিপড়া বুলি নয়, বারবারই দেখেছি—যখনই কাতর হয়ে ঠাকুরকে ডেকেছি, এসেছে সহায়, কেটেছে আঁধার মিলেছে দিশা, জুটেছে পাথেয়। কাশীতে ঠাকুরকে কেঁদে ডেকেছিলাম: 'পথ দেখাও বলে।' ঠাকুর এলেন দেবদূত হয়ে।

তিনি—সর্বজনশ্রদ্ধেয় পুণ্যচরিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। সে-দিনটিও আমার জীবনে অবিস্মরণীয় থাকবে চিরকাল: ৫ই নভেম্বর, ১৯২৮, সকাল সাড়ে নটা। কবিরাজ মহাশয় একঘর বইয়ের মধ্যে একা বসে। চোখের সে কী গভীর দৃষ্টি—শান্ত উজ্জ্বল অনাসক্ত। শুনেছিলাম, সারা ভারতে তাঁর মতন মহাপণ্ডিত দু-চারটির বেশি নেই। যত শাস্ত্র তাঁর নখদর্পণে। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও পেলাম বৈকি—কত শাস্ত্র, কত শ্লোক, কত কাহিনী! কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠল তাঁর অসামান্য ব্যক্তিরূপ—সৌম্য, অচঞ্চল, আত্মসমাহিত। তাঁকে বললাম সব কথাই—খোলাখুলি। রবীন্দ্রনাথকে বলতে পারিনি, তিনি বৈরাগ্য-বিমুখ জানতাম বলে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় গৃহস্থাশ্রমে থেকেও যোগ-সাধনায় শিখরচারীদের সতীর্থ শুনেছিলাম—তাছাড়া তাঁর স্নিগ্ধ সরল সম্ভাষণে মনের সব অশ্রুতারগুলিই একসংগে বেজে উঠল যেন, নইলে হয়ত বলতে পারতাম না সব কথা কিছুই বাদ-সাদ না দিয়ে।

খুব মন দিয়ে শুনলেন তিনি। তারপরে বললেন অনেক কথা। সে-কথালাপের একটি রিপোর্ট তাঁকে পরে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় কোনো উত্তর না দেওয়ায় প্রকাশ করিনি। আজ সেসব কথা ফলিয়ে বলার দরকার দেখি না তবু বলব তিনি সবশেষে আমাকে যে-উপদেশ দিয়েছিলেন।

কবিরাজ মহাশয় বললেন: 'আপনার গান শুনে প্রথম দিনই আপনাকে আমি চিনেছিলাম। তাই আপনার খবর রাখতাম। আপনাকে কী বলব—শুধু এই ছাড়া যে, আপনি মহাভাগ্যবান। নইলে শুধু যে আপনার মনে এ-বৈরাগ্য স্থায়ী হতে পারত না তাই নয়—আপনি কখনোই পেতেন না শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাগুরুর কৃপা।

আমি ক্লিষ্টকণ্ঠে বললাম: 'কিন্তু তিনি আমার গুরু, একথা বরদাবাবুর আশ্বাসেও যে আমার বিশ্বাস হয় না!'

কবিরাজ মহাশয় হেসে বললেন: 'হবেই হবে—গুরুশক্তি আর-একটু প্রকট হলে। হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে জানি বলেই বলছি যে, গুরুশক্তির মতন মহাশক্তি আর নেই। ভগবান গুরুর মধ্যে দিয়েই সাধককে ডাক দেন—গুরুর মধ্যে দিয়েই পাইয়ে দেন, যা পাওয়ার। আচার্য শংকর তাঁর বিবেকচূড়ামণিতে বলেছেন:

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ শুধু ভগবানের করুণায়ই এই তিনের যোগাযোগ হয়: মানব জন্ম, মুক্তির তৃষ্ণা ও মহাপুরুষের সংস্পর্শ। তাই আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা। আপনাকে কেবল একটি কথা বলব: আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি গুরুশক্তি আপনার অন্তরে অলক্ষ্যে কাজ করছে। নইলে তাঁর সংগে সাক্ষাৎকারের ঠিক পর থেকেই আপনার মনে বৈরাগ্য এভাবে প্রবল হয়ে উঠত না। তাই আপনি এমন কথা মনেও ঠাঁই দেবেন না যে, আপনাকে এ-বৈরাগ্য বিপথে নিয়ে যাচ্ছে—বিশ্বাস করুন, এ অতি শুভ লক্ষণ। সাধনার

দিকে মনকে ফেরাতে চেয়েই বৈরাগ্য আসে তাকে অনাসক্তির দীক্ষা দিতে। তাই আপনাকে শুধু আমি একটি অনুরোধ করতে চাই আজ: আপনি আর একটু নির্জনে থাকবার চেষ্টা করুন—লোকসঙ্গের মায়া কাটিয়ে। কারণ গুরুশক্তি, খানিকটা সাধনার অপেক্ষা রাখে। গান করেন করুন—খুব ভালো কথা, কেবল কিছুদিন একলা একলা গান করা অভ্যাস করলে মন্দ কি? দেখবেন একলা ঠাকুরকে গান শোনালে মনে শক্তি পাবেন, বিপদ কাটবে। কিন্তু ফের বলছি, এ-বৈরাগ্য অতি শুভ চিহ্ন, আর গুরুশক্তি মহাশক্তি—সাদরে বরণীয়।'

আরো অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন কিন্তু যেসব প্রসঙ্গের অবতারণার আর প্রয়োজন নেই। যেটুকু সংক্ষেপে লিখলাম তা থেকে আশা করি, কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশের সারবত্তা ও ব্যক্তিরূপের কিছু আভাস দিতে পেরেছি। তাঁকে যে-রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলাম, সেটি ত তিনি প্রকাশ করতে অনুমতি সেদিন সম্ভবত এই জন্যেই যে আমি তাঁর গুণগানে অত্যধিক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। কবিরাজ মহাশয় স্বভাবে পরম বিনয়ী, তাই হয়ত তাঁর গুণগানে আমার পঞ্চমুখ হয়ে ওঠায় ঈষৎ বিব্রত হয়ে থাকবেন।

এর পরেই এল আমার জীবনের গভীর সন্ধিক্ষণ। যা ঘটেছিল, বলবার ভাষা সত্যিই খুঁজে পাওয়া ভার। তবু আমার সংসার জীবনপর্বে ছেদ এল কেমন করে ও কীভাবে তার কিছু আভাস না দিলে এ-স্মৃতিচারণের শেষরক্ষা হবে না। তাই চেষ্টা তো করি আঁকতে এ আশ্চর্য অধ্যায়ের ছবি—দেখি ফল কী দাঁড়ায়।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশে আমার হৃদয় শুধু যে পুরোপুরিই সায় দিল তাই নয়, সে-সাড়ার স্পন্দন থামতে চায় না, আমাকে বলে কেবলই: 'সাধুর কথা শোনাই যথেষ্ট নয়, সেই অনুসারে কাজ করা চাই।' মনে পড়ল ঠাকুরের কথা: যা [illegible] [illegible] গান শোনায়, যে ভগবান ভগবান করে ঘড়ি ঘড়ি চেঁচিয়ে ওঠে সে আমার প্রিয় নয়, আমার প্রিয় সে-ই যে তাঁর বাণীকে জীবনে ফলিয়ে তুলতে চায়। সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে শেষে স্থির করলাম—কিছুদিন লোকালয় ছেড়ে দিয়ে কোনো নির্জন দেশে গিয়ে একা কাটাব। নির্জনতা পেতে হলে একটু সরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ভেবে ঠিক করলাম যে, ত্রিবান্দ্রমে সভাপতিত্ব করে কাছাকাছি কোনো সাগরতীরে একটি কুটির নিয়ে মাসখানেক থাকব একলাটি—কারুর সঙ্গে না মিশে। শ্রীঅরবিন্দের গুরুশক্তি আমার উপর আরো সক্রিয় হয়—আপত্তি নেই, কিন্তু গুরুশক্তিই যে আমার মনকে হঠাৎ বৈরাগ্যের দিকে ফের রওনা করে দিয়েছে, একথা ভাবতে আমার আদৌ ভালো লাগত না। আমার আশৈশব দীক্ষা যৌবনে য়ুরোপের শিক্ষার স্থূল হস্তাবলেপে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছিল: ফলে আমি যা কিছুই ঘটুক না কেন, তার একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাই খাড়া করতে চাইতাম—গুহা শক্তিতত্ত্বের তাত্ত্বিক হবার না ছিল আমার ভাগিদ না সময়। তাছাড়া নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে খানিকটা ক্লান্ত হয়েই আমি মৌনী হতে চেয়েছিলাম গীতার 'বিবিক্ত-দেশসেবিত্বং অরতির্জনসংসদি' মন্ত্র জপ করে। এ-শ্লোকটির পানেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বয়ং কবিরাজ

মহাশয়। তাঁর কাছ থেকে ফিরে ফের গীতা ও কথামৃত পড়া শুরু করলাম। একেই তো শাস্ত্রে বলে স্বাধ্যায়—সাধনার একটি প্রধান অংগ।

কিন্তু কাশীতে আমার সেই বন্ধুটি মাঝে মাঝেই হানা দিয়ে আমাকে এখানে ওখানে টেনে নিয়ে যেতে চাইত গান গাইতে ও শোনাতে। গান যে আমার সত্যিই আর ভালো লাগছিল না, একথা তাকে বার বার বলা সত্ত্বেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার দোষ দেবই বা কেমন করে। আমার যে এমন দুরবস্থা হতে পারে দুদিন আগে কি আমিই ভাবতে পারতাম?

ওদিকে অতুলদা আমি লক্ষ্ণৌ এসেছি শুনেই একদিন সকালে এসে হাজির শশব্যস্ত হয়ে। তাঁকে আমি লিখেছিলাম লক্ষ্ণৌ যাব না এবার। তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর গভীর স্নেহে বিশেষ আরাম পেলাম বৈকি—কিন্তু আরাম আর শান্তি তো সমার্থক নয়। লক্ষ্ণৌয়ে এসে মনের অশান্তি কাটল না—আরো এই জন্যে যে হবি তো হ—১৯২৮-এর নবেম্বর মাসে ঠিক এই সময়েই লক্ষ্ণৌয়ে আমার দুই জ্ঞেঠতুত ভাই হেমেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রলালের সংগে দেখা। ওদের দুজনকে আর অম্বিকা মজুমদার বলে একটি মেধাবী গায়ককে আমি মাসে মাসে সব জড়িয়ে দেড়শ টাকা বৃত্তি দিয়ে লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে গান শিখতে পাঠিয়েছিলাম ও দুই বৎসর এই বৃত্তি জুগিয়েছিলাম। এরা তিন জনেই পুরো পাঁচ বৎসর মরিস কলেজে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের কাছে গান শিখে সংগীতের ডিগ্রি নিয়ে কলকাতা ফেরে। আমার সে সময়ে ইচ্ছা ছিল ওদের তিনজনের সহযোগে কলকাতায় সংগীত আকাদেমির পত্তন করার। আমার সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করে একটি নিখিল ভারতীয় গীতভবন গড়ে তুলব, যেখানে ভারতের বড় বড় ওস্তাদদেরই একের পর এক অতিথি করে রাখা হবে আর এসবের খরচ তোলা হবে, সেই ভবনেরই নিচের তলার কন্সার্ট হলে—এই ধরনের নানা জল্পনা কল্পনা নিয়ে আলোচনা করতাম পরমানন্দে সুভাষের সংগে, সেও সোৎসাহে সাড়া দিত। যদি আমি আর চার পাঁচ বৎসরও কলকাতায় থাকতাম, তবে জাতীয় সংগীত সদনের মত অতবড় সদন না হোক একটা ছোটখাট আন্তঃপ্রাদেশিক সংগীত প্রতিষ্ঠান কলকাতায় গড়ে উঠতই উঠত। কিন্তু হায় রে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!—

লক্ষ্ণৌয়ে এসে আমারই প্রেরিত ভ্রাতৃযুগল ও বন্ধুর লক্ষ্ণৌয়ে থাকা ও গান শেখার ব্যবস্থা করতে আমাকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল। তিনজনেই মেধাবী গায়ক, তার উপরে আমার স্নেহভাজন, ভালো লাগল বৈকি। আর এক শুভ যোগাযোগ ঘটল: বিখ্যাত চিত্রনট পাহাড়ী সান্যালও সে সময়ে মরিস কলেজে রতনজনকরের কাছে গান শিখছিলেন। পাহাড়ী সে সময়ে অতি সুকণ্ঠ ছিল যদিও নট হবার পরে গানের চর্চা রাখতে পারেনি। সে যাই হোক হেমেন, রবি, অম্বিকা ও পাহাড়ী এই চতুরাননের স্নেহসম্ভাষণে আমার মনের অশান্তি তখনকার মতন চাপা পড়ে গেল। তাছাড়া ধূর্জটি, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, রাধাকমল, রাধাকুমুদ প্রমুখ প্রবীণ বন্ধুদের সংস্পর্শেও কিছু স্বস্তি পেলাম—সর্বোপরি অতুলদার নিত্যনূতন গান বাঁধা দশচক্রে ভগবান ভূত হন কিনা জানি না, তবে সবে জাগা বৈরাগ্য ঘুমিয়ে না পড়লেও একটু যে ঝিমিয়ে পড়ে এ নিশ্চয়। আমুন বক্স তখন লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর আমার অনুরোধে আমাকে সাদরে কয়েকটি অপ্রচলিত গান শেখালেন: দেবগান্ধার, দেওগিরি, মেঘরঞ্জনী, দেশী ইত্যাদি।

কিন্তু বিধাতা যখন বাদ সাধেন, তখন হা হতোস্মি বলা ছাড়া উপায় কি? আমার মনে ফের দারুণ ঘা লাগল ঠিক এই সময়েই কৃষ্ণপ্রেমের এক চিঠি পেয়ে। সে লিখেছিল যে, সব ছেড়েছুড়ে ঠাকুরের প্রসাদে পরম শান্তি পেয়েছে।

সে-চিঠি নিয়ে আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেলাম, যাঁর নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি করুণ হেসে বললেন, কৃষ্ণপ্রেম যে শান্তি পেয়েছে, এখবর তিনি পেয়েছেন অনেক আগেই। সংগে সংগে ফের কে যেন আমার মনকে ধমকে উঠল, 'লক্ষ্ণৌয়ে আসতে না আসতে গোপীনাথ কবিরাজ কি বলেছিলেন ভুলে গেলে? ভিড়ের মধ্যে কে কবে মনের মানুষের খবর পেয়েছে?'

অতুলদা ধূর্জটি, পাহাড়ী, হেমেন্দ্র, রবীন্দ্র, অম্বিকা এরা কেউই জানত না আমার দিন কী অসহ অশান্তিতে কাটছে। তবে বাইরে ঠাট বজায় রাখতে হবেই হবে—পণ নিয়েছিলাম আমি। কাজেই আমার ভাবান্তর এক জয়দা ছাড়া আর কারোরই চোখে পড়েনি।

১৪ই নভেম্বর অতুলদা গেলেন ঝাঁসিতে এক মামলায়। আমাকে বললেন, 'তুমি দিলীপ, রাজার হালে থাকো আমার বাড়িতে গদিয়ান হয়ে, আমি দু তিন দিনের মধ্যেই ফিরছি—তখন ফের দু ভায়ে মিলে ফের গানে মেতে ওঠা যাবে। কিন্তু কোথাও পালিও না যেন—না, কথা দাও। তোমাকে নিয়ে আবার হয়েছে আমার এক জ্বালা—বলেই—ধরে দিলেন—'আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি, তবে যে পরাণে মরি—হা হা হা!'

আমিও একগাল হেসে পাদপূরণ করলামঃ 'চণ্ডীদাস বলে অতুলরতন গলায় বাঁধিয়া পরি—হো হো হো।'

মনের ভার কত সময়েই না হাল্কা করেছি এইভাবে অকারণ হেসে। এখনো মনে পড়ে আমার সংসার জীবনের শেষ অধ্যায়ে কী ভাবে অতুলদার ও আর সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সমানে হাসি-মস্করায় কাল কাটাতাম মনের দুঃখ চেপে রেখে। কাউকে বুঝতে দিইনি একটিবারও আমার মনে কী দুঃসহ দ্বন্দ্ব চলেছে—একটা সুর ডাকে সব ছাড়তে, আর-একটা সুর ভয় পেয়ে বলেঃ 'চুপ চুপ, অমন অলক্ষুনে কথা বলে না—আনন্দের এ খোলা আলো-হাওয়া ছেড়ে যাবে পণ্ডিচেরির গানহীন হাসিহীন কারাগারে! পাগল না ক্ষ্যাপা!'

অতুলদা এই সময়ে ঝাঁসি চলে যেতে আমার মন আরো যেন খারাপ হয়ে গেল। ১৪ই রাতে জয়দার ওখানে গিয়ে হেসে বললাম, 'আজ তোমার গুণের দ্বারে অতিথি সুন্দর!' জয়দার চিত্রাঙ্গদা পড়া ছিল বললেন, 'আর আমি তোমার গানের দ্বারে—যদিও রূপও যে তোমার নেই তা নয়।' এই ধরণের সে কত হাল্কা হাসি, ঠাট্টা, কাব্যকথা চলত জয়দার সঙ্গে। বড় স্নিগ্ধ সুন্দর দরদী মানুষ ছিলেন জয়দা।

সন্ধ্যায় জয়দা বললেন, 'গান শোনাও ভাই—না না ভিড়ের গান নয়—তোমার পিতৃদেবের ঐ গানটি গাও, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে!

যখন সঞ্চারী ধরলাম—

'কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে?
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে?
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ
ইন্দু পরকাশে
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয়
চলে আয় আমার কাছে'

তখন এই ধরণের আঁখর জুগিয়েছিল—
মায়ার খেলা—সে কিনা সব ছায়ার মেলা
আঁধার নিয়ে মাতিস কেন—যার যে
বেলা যায় যে বেলা...

গাইতে গাইতে চোখে জল এল। মন ভরে উঠল বেদনার পরমানন্দে।

* * *

গান শেষ হতে জয়দা আমাকে আলিঙ্গন করলেন জলভরা চোখে। বললেন, 'সত্যিই বলেছ ভাই—যায় যে বেলা, যায় যে বেলা।'

তারপর তাঁকে বললাম সব খুলে, যা যা বলেছিলাম কবিরাজ মহাশয়কে। শেষে বললাম কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশঃ কিছুদিন জনসঙ্গ ছেড়ে নিঃসঙ্গ হতে হবে পরমসঙ্গের দিশা পেতে।

জয়দা বললেন অনেক কথা। বললেন, 'জানো তো আমি বাগান কী ভালোবাসি। কত অজানা ফুলের গাছ বসিয়েছি আমার বাগানে। একসময়ে মনে হত ফুল নিয়ে চিরকাল পরমানন্দেই কাটবে। কিন্তু ভাই কৃষ্ণপ্রেম চলে যাওয়ার পর থেকে আর ফুলে যে ফুল তাও ভালো লাগে না—বিশ্বাস কোরো।'

আমি বললাম হেসে, 'তবে যাও না কেন তার কাছে?'

জয়দা হেসে বললেন 'এখনো মনের মধ্যে যে-জোর পাইনি, তবে পাব যদি—' বলে হঠাৎ বলে বসলেন—'তুমিও যাও ঐ পথে।'

আমি চমকে উঠলাম, 'ঐ পথে?'

জয়দা হেসে বললেন, 'ঐ পথে চলতে চমকিয়ে উঠলে কেন? কীই বা এমন পরম শান্তিময় পথে আমরা চলেছি বলো তো?'

আমি বললাম, 'কিন্তু সেখানে যেতে ভরসা হয় না যে। যদি শান্তি না পাই? সেখানে যে কেউ হাসে না রে ভাই।'

জয়দা বললেন, 'না-ই হাসল—তুমি যাচ্ছ তোমার গুরুর কাছে, গুরুভাইয়ের কথা নিয়ে মাথা বকাও কেন? শোনো দিলীপ, আমি তোমাকে কালই একটি টিকিট করে দিই- তুমি যাও চলে সোজা তোমার গুরুর কাছে—নেও তাঁর চরণে আশ্রয়—যেমন কৃষ্ণপ্রেম নিয়েছে যশোদা মার চরণে। এছাড়া আর পথ নেই।'

আমি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম, 'ওষুধের আগে রোগের নিদান তো পাওয়া চাই।'

জয়দা ডাক্তার তো—বুঝলেন বললেনঃ 'নিদানের প্রশ্ন কেন ভাই?'

আমি এড়িয়ে গিয়ে বিষণ্ণ সুরে বললাম, 'জানি না ভাই, সব থেকেও কিছুই ভালো লাগে না কেন। জানি শুধু এইটুকু মাত্র যে, আমি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি—আমার গুরুদেব আমাকে এমন কিছুই দেননি, যাকে 'পাওয়া' বলা চলে। তাঁর সঙ্গে দেখার ফল শুধু এইটুকু হয়েছে—যে সব কিছু

বিস্বাদ হয়ে গেছে, এমন কি গান যে গান তাও ভালো লাগে না আর।'

জয়দা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কবিরাজ মহাশয় তোমাকে ঠিকই বলেছেন, কৃষ্ণপ্রেম থাকলে সেও বলত এই কথাই যে, এ শুভ লক্ষণ। তাই তো বলছি ভাই, তুমি আর কাল বিলম্ব না করে যাও চলে পণ্ডিচেরি। গান খুব ভালো জিনিস, ফলও চমৎকার। কিন্তু দুইই কি খতিয়ে ইন্দ্রিয়বিলাসই দাঁড়ায় না? বুকে হাত দিয় বলো তো?'

আমি আহত হ'য়ে 'ইন্দ্রিয়বিলাস!' বলতেই জয়দা বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝছ কেন—স্থূল বিলাস নয়—সূক্ষ্ম বিলাস, তবু কানের মধ্যে দিয়েই ওকে মরমে পশতে হয় না কি? কৃষ্ণপ্রেম এ-সুখের পসারী হয়নি। তাই সে পেয়েছে শান্তি—অতীন্দ্রিয়ের ছোঁওয়া পেয়ে, সব ছেড়েছে, এককথায় বলে।'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'কথাটা ভাববার—মানি। কিন্তু আমার হয়েছে কি বলব? আমি যে গুরুর কাছ থেকে পাওয়ার মতন কিছুই পাইনি ভাই! সব ছাড়তে আমিও পারি, কিন্তু কিছু পেলে তবে—তার আগে না।'

মুহূর্তে জয়দার মুখে মেঘ ছেয়ে গেল, একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'দিলীপ, তোমাকে আমি যা ভেবেছিলাম তুমি তা নও। তুমি শেষে কিনা দরদস্তুর শুরু করলে ঠাকুরের সংগে—কিছু পেলে তবে সব ছাড়বে? যারা ঠাকুরের জন্যে সব ছেড়েছে, তারা এভাবে আগুপাছু ভাবেনি। তুমি পারবে না। এসো আমরা অন্য কথা কই।'

শুনেছি লালাবাবু বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলায় একটি কথা শুনে। এক গংগাস্নানার্থী পথে তার সংগীকে বলেছিল, 'বেলা যায় ভাই, চল যাই গংগায়'। 'বেলা যায়'—এই সামান্য কথাটি লালাবাবুর মনে বেজে উঠেছিল বাঁশির ডাক হয়ে। তিনি ধনসম্পত্তি ছেড়ে ভেকধারী বৈষ্ণব হন সেই দিনই।

কিন্তু আমার বুকে জয়দার 'দরদস্তুর করার অভিযোগ' বেজেছিল শুধু বাঁশির ডাক হয়ে নয়—দারুণ শেল হয়ে।

সারা রাত আমি ঘুমতে পারিনি। সত্যিই মনের মধ্যে কে যেন চাবুক মারতে থাকে: আমি ঠাকুরের সংগে শুধু দরদস্তুরই ক'রে এসেছি এতদিন!

ভোরে উঠে বসলাম ধ্যানে। গুরুদেবকে ডাকলাম, ঠাকুরকে ডাকলাম চোখের জলে: আমাকে বল দাও, সব ছাড়বার বল দাও, দরদস্তুর করার গ্লানি থেকে বাঁচাও, আমি নিজের চোখে ছোট হয়ে গেছি।' চোখের জলে বুক ভেসে গেল...অমন কান্না বহুদিন কাঁদিনি।

হঠাৎ বুকের মধ্যে কী যেন খুলে গেল—কী একটা পদ্ম মতন—অত্যন্ত ঝাপসা অনুভূতি, ঠিক কী যে হল, আজো জানি না—কেবল এইটুকু জানি যে, এক মুহূর্তে দৃশ্য বদলে গেল ঠিক যেমন ঘোরানো রঙ্গমঞ্চে বদলে যায়—যেখানে ছিল মরুভূমি, জেগে উঠল নীল ঝরনা, বিষাদের মরণ আনল এক অসহ আনন্দের নবজন্ম—সেই সংগে শক্তি: 'আমি পারব পারব পারব—আমার যে না পারলেই নয়। বাঁচতে হলে যে আমাকে পারতেই হবে—ছাড়তেই হবে এই দিনগতপাপক্ষয়ের অর্থহীন গতানুগতিকতা।'

উঠে টাইম টেবল দেখলাম, মেল ট্রেন এক ঘণ্টা বাদে লক্ষ্ণৌয় আসবে। একটি বাক্স ও বিছানা প্যাক করে পনের মিনিটের মধ্যেই রওনা হলাম বম্বে—যেখান থেকে যাব পণ্ডিচেরি। গুরুদেবকে স্টেশন থেকে তার করে দিলাম: 'আমাকে গ্রহণ করতেই হবে—আমি সব ছাড়তে রাজি।' লক্ষ্ণৌ স্টেশনে জয়দাকে একটি পোস্টকার্ড লিখে ডাকে দিলাম: 'দরদস্তুর আর করব না জয়দা—পথ দেখতে পেয়েছি তোমারই কৃপায়। তোমাকে প্রণাম প্রণাম প্রণাম। ড্রামা ইন রিয়াল লাইফ যাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। ধূর্জটিকেও লিখে দিলাম আমার বিবাগী হওয়ার কথা।

সারা ট্রেন বুকের মধ্যে কেবল আলোই ঝলকে উঠতে থাকে, থেকে থেকে অকারণে চোখে ঝরে আনন্দাশ্রু—মনে বিষাদের, আঁধারের, সংশয়ের আর চিহ্নলেশও নেই। ঠাকুর ডাকলে সাড়া দেন না, চাইলে নির্দেশ দেন না, অঘটন এ-যুগে ঘটে না আর—কে বলে?

* * *

এবার উপসংহারের পালা। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে তার করেছিলেন আমার পত্র পেয়েই।

পণ্ডিচেরি পৌঁছে মনে হল বাইবেলের 'প্রডিগাল সন'এর কথা যে অনেক ঘাটের জল খেয়ে পিতৃগৃহে ফিরে তবে পেয়েছিল শান্তির নোঙর।

এ-শান্তির তবু ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু এর পরে আমার যে-অপূর্ব অনুভূতির আমি আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পাইনি—ইংগিতে তার একটু আভাস দেওয়ার জন্যেই এ-উপসংহারের অবতারণা। ইংগিত আভাস জাতীয় বিশেষ্যের প্রয়োগ করছি, শুধু জানিয়ে রাখতে যে, সে-উপলব্ধিটি যখন হয়েছিল, তখন তার নিবিড়তা ও দীপ্রতার পাশে আমার দৈনন্দিন সব ইন্দ্রিয়বোধই হয়ে গিয়েছিল তেমনি পাণ্ডুর, যেমন পূর্ণচন্দ্রের কান্তি হয় সূর্যোদয়ের পরে। আমরা আমাদের গভীর অনুভূতির কথা বলতে চাই পঞ্চাননের মতনই পঞ্চমুখে, কিন্তু শতাননের উপস্থিতি অত্যুক্তিতেও কি প্রকাশ করা যায় এ-জাতীয় আত্মিক অনুভূতি? তবু একটা অনুলিপি থাকুক—তাদের জন্যে যাদের অনুভবের পরিধির মধ্যে এসেছে এ-জাতীয় অতীন্দ্রিয় অনুভব—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"=বচন ও মন যার নাগাল পাবার কাঙাল হয়েও ফিরে ফিরে আসে। আমি জানি, আমি শুধু যোগীই নই, তার উপরে শিল্পী, কবি ও গায়ক—প্রকাশ না ক'রে যার নিস্তার নেই। তাইতো এ-আকুলি-বিকুলি চিরদিনই আমাকে অশান্ত করেছে: কেমন ক'রে বলব যা বলাও যায় না—আবার না ব'লে থাকাও যায় না?

বেশ মনে আছে সে অবিস্মরণীয় দিনটি। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পাবার পরেই কী যেন হয়ে গেল—অজ্ঞানতিমিরান্ধ নয়নে যেন ফুটে উঠল এক অপরূপ দৃষ্টি যা ছিল দেড়দিন। কী দেখেছিলাম এ-দৃষ্টি দিয়ে? জানি, বলতে পারব কিনা জানি না, তবু বলতে চেষ্টা করব—"বুঝে কোক যেজানো সন্ধান" মন্ত্র জপ ক'রে।

মনে সেদিন কেবলই গুনগুনিয়ে উঠেছিল ঋগ্বেদের:

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
ঝরায় পবন মধুধারা, সিন্ধু হ'তে
মধু ক্ষরে,
দিবস রজনী মধু, মধু ঝরে পৃথ্বী-
ধূলি 'পরে।

যেদিকে তাকাই মনে হয়, মধু ঝরছে—গাছপালা, ইঁটকাঠ পাথর, পার্থিব রজঃ পর্যন্ত—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! কাক যে কাক তাকেও দেখি অন্য চোখে—মনে হয়, আনন্দে সে ওতপ্রোত—তার কর্কশ কণ্ঠে ঝরছে অবিমিশ্র আনন্দ......জগতে নিরানন্দ কোথায়, কোথায় কদর্যতা, বন্ধুরতা, গরল? সবই তো মনোরম, স্নিগ্ধ, মধুময়—আকাশ বাতাস আনন্দ মধুতে গলে পড়ছে যেন পরম স্নেহে, বলছে যেন "ওরে ভয় কি? আমি কি নেই? বিষাদ তো মায়া—আনন্দই সত্য। বিষ মায়া—সুধাই সত্য।"

মনে হ'ল আমার সত্তার কানায় কানায় উপছে পড়ছে বিশ্বব্যাপী মধু, আমার তনুর প্রতি অণু শিউরে উঠছে কার প্রেম-সম্বোধনে। অথচ কাউকেই আমি দেখি নি, কোনো স্বরই শুনি নি—কত সাধকের কত কী দর্শন হয়, আমার কোনো দর্শনই হয় নি—অথচ এ কী অভূতপূর্ব অনুভব!...প্রতি রোমের মধ্যে যেন সংগীত জেগে উঠল! মনের প্রফুল্ল অবস্থায় এ-জগতকে কার না ভালো লাগে? কিন্তু আমার সেদিন যে-অনুভব হয়েছিল ও প্রায় দেড়দিন ছিল, সে তো ভালো লাগার অনুভব নয়—সে যে জগতকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখার রোমাঞ্চ! অথচ এমন কিছুই তো হয় নি যার ফলে চেতনার মধ্যে এ-আলো নামতে পারে! না ছিল আমার জ্ঞানের ধ্যানের সম্পদ, না সাধনার, ভক্তির ঐশ্বর্য। আমি শুধু শ্রদ্ধা নিয়ে গিয়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে ও দেখেছিলাম তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি, শান্ত সৌম্য আনন—কিন্তু সে তো এর আগেও কয়েকবার দেখেছি (পরেও) কিন্তু এমন সর্বব্যাপী আনন্দের অনুভব তো হয় নি! কোত্থেকে এল এ-অহেতুক আনন্দ—না, শুধু আনন্দই তো নয়, এমন এক দৃষ্টি যার ক্ষণাভাষও আমি এর পূর্বে কোনোদিন পাই নি জীবনে! নানা সাধকের লেখায় পড়েছি এ-আনন্দের বর্ণনা কিন্তু আমার মনে হ'ল, আমার অনুভবের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই বুঝি! বোধহয় প্রতি অনুভবের মধ্যেই কোনো না কোনো অদ্বিতীয় উপাদান আছে ব'লেই আমার এরকম মনে হয়েছিল। আরও কত কী মনে হয়েছিল—সে কত রকমারি চিন্তা শিহরণ জল্পনা কল্পনা মনে নেই আজ। কেবল একটি মূল অনুভব চিরদিনই আমার কাছে অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে যে, আমার মনে হয়েছিলঃ শুধু যে জগতের রূপান্তর হয়েছে তাই নয়, আমাকেও কে যেন ঢেলে সাজিয়েছিলঃ যে-দিলীপ শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে সে-দিলীপের কোনো মিলই ছিল না যে তাঁকে দর্শন ক'রে ফিরে এসে সমুদ্রের ধারে বালির উপরে একলা বসে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিল "মধুবৎ পার্থিবং রজঃ"—শিউরে উঠছিল সমগ্র জগত আনন্দে বিধুত দেখে। দুজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ—একজন আর এক-জনকে জানলেও চেনে না। সে উচ্ছ্বাসের উলুধ্বনি, পুলকের প্লাবন, বিস্ময়ের ব্যাপ্তি কেমন ক'রে ভাষায় প্রকাশ করব?

অথচ আশ্চর্য—একটি কথা ভুলতে পারি নি আজোঃ যে, আমার মনে প্রশ্ন জাগল—(একেবারেই আকস্মিকভাবে, কেন জানি না)—"যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন কী দেখলে তুমি—কী বুঝলে—কেমন ক'রে বর্ণনা করবে তোমার এ-অনুভূতিকে—তাহ'লে তুমি কী উত্তর দেবে শুনি?" প্রশ্নটি জাগতে না জাগতে আমার গহন অন্তর থেকে একটি স্বর উঠল, আমি যেন শুনছি সাক্ষী হ'য়েঃ

একটি স্বরঃ মানুষ সংসারে সবচেয়ে কী ভালোবাসে?

আর একটি স্বরঃ আলো ও হাওয়া।

প্রথম স্বরঃ তাহ'লে তুমি তোমার বন্ধুকে এ-অনুভবের বর্ণনায় এই জবাব দেবেঃ "আমাকে যদি এক অন্ধকূপে বাস করতে হয় তাহ'লেও আমি একবারের জন্যেও আলো কি হাওয়ার অভাব বোধ করব না—এমনি অহেতুক আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত থাকব শেষ পর্যন্ত।"

এ কী আশ্চর্য প্রশ্ন, আর ততোধিক আশ্চর্য উত্তর! মনস্তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিকরা হয়তো বিজ্ঞ হেসে বলবেনঃ এ আর এমন কী—আমাদের বিচিত্র মনেরই নানা সচিত্র জল্পনা কল্পনা—যেমন স্বপ্নে দেখি না শুনি......ইত্যাদি।

মরুক গে। আমার কোনো মাথাব্যথাই নেই কোন্ টীকাকার পণ্ডিত কী ব্যাখ্যা দেবেন তা নিয়ে। আমি শুধু জানি যে, আমার জীবনে একবার অন্ততঃ এসেছিল একটি অপরূপ আনন্দের উপলব্ধি যার ছোঁওয়ায় আমি কৃতকৃতার্থ বোধ করেছিলাম—হোক না সে ক্ষণিকের জন্যে, কিন্তু এমন একটি চেতনার উদ্ভাস আমার অধিগম্য হয়েছিল যার প্রসাদে আমার মনে হয়েছিল, আমি ধন্য হয়েছি।

সে-অনুভব প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা ছিল। যখন চ'লে গেল তখন আবার সে যে কী এক অসহ বিষাদে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম তারও বর্ণনা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। শুধু ভাগবতের একটি উপমা দেওয়া চলে—যখন কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বলেছিলেনঃ

রয়েছে সবই সেই রথ ধনুর্বাণ
অশ্ব গজ ধন—শুধু সে বিনা
তারই আবৃত্তির সম যে সব রীতি
আজিকে মনে হয় অর্থহীনা।

হোক। তবু বলব যে, এ-অনুভবের পরে আমার মনে অন্ততঃ একটি বিষয়ে আর সন্দেহ আসে নি কোনোদিনইঃ যে, এমন এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার পরশ আমি সেদিন পেয়েছিলাম যার স্তবে আমার কণ্ঠ গেয়ে উঠেছিল ঝংকৃত কীর্তনেঃ

তারি চেতনায় চিন্ময় বিগ্রহ,
নিরাকারে তারি উদারের সমারোহ,
বন্ধনে সে-ই নিবিড়তা—সে-অতনু,
কল্পনায় সে চঞ্চল জলধনু,
জীবনে সে জয়-অভিযান,
মরণে সে বরাভয়,
মেঘ শুধু তার অভিমান,
রবি যার পরিচয়।

সমাপ্ত

৯

পড়তে-পড়তে কাকলি তাকাল জানলা দিয়ে। আবার মেঘ! সকালবেলায়ই মেঘ কেন? সেদিন তো বিকেলবেলা করেছিল।

বিকেলবেলা বৃষ্টি হলে সকালবেলা হতে পারবে না? রাত্রে ভালোবাসা এসেছিল বলে কি আসবে না ভোর হলেও?

আসুক বৃষ্টি। নামবার আগেই ঠিক বেরিয়ে পড়বে কাকলি। ভিজবে। কৃপণ আত্মরক্ষার জন্যে ছুটোছুটি করবে না। মন ভাসিয়ে দিয়ে শুধু মাথা বাঁচাতে চাইবে না। বৃষ্টি না হলে যেমন যা করত বৃষ্টি হলেও তেমনি তাই করে যাবে। শান্ত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে, ভিজতে-ভিজতে, বাস নেবে। ভিজতে-ভিজতে, শান্ত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছুবে তার গন্তব্যে। সর্বাঙ্গীণ শীতলতা হয়ে দাঁড়াবে সামনে।

তারপর?

জানি না। মনে মনেই একটু হাসল বুঝি কাকলি।

না, জানি। সোনা-ঢালা রোদ উঠবে। গায়ে-গায়েই শুকিয়ে নেব শাড়ি জামা। ভদ্র হতে সুস্থ হতে তপ্ত হতে পালাবনা বাড়ি, নিভৃতির বদ্ধ গুহায়। থাকব আকাশের নিচে। উন্মুক্তির দরবারে। যে আকাশ ভিজিয়েছে সে আকাশই শুকিয়ে দেবে।

যে প্রেম ঘরছাড়া করেছে সে প্রেমই মিলিয়ে দেবে ঘর।

সেদিন সুকান্ত কী রকম ভিজেছিল! ছি ছি, এমন অবস্থায় কেউ আসে? সিনেমার টিকিট কাটা থাকলেও কেউ আসে না। বাতিল করে দেয়।

কিন্তু, যাই বলো, সুকান্ত এসেছিল সত্যের টিকিট কেটেছিল বলে। কথা যখন দিয়েছে, রেখেছে কথা। বৃষ্টি আগুন, বজ্র-বন্যা, কিছুই গ্রাহ্য করেনি। আগাপাশতলা জলের মধ্যে সত্যের মত পূর্বের মত এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যি, কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাতে হয়েছিল সুকান্তকে। মাথার চুলের কতকগুলি ভিজে রেখায় নেবে এসেছে কপালে, কপাল ছাপিয়ে চোখের উপর, ঠোঁটের কিনারে জল, দুই চোখের পালকে, চিবুক বেয়ে কানের লতি বেয়ে ঝরছিল ফোঁটা-ফোঁটা। জামা আর পরনের ধুতি জায়গায়-জায়গায় লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে—কী অম্লান সুন্দর দেখাচ্ছিল সুকান্তকে, কী দুর্ধর্ষ স্বাভাবিক! কাকলি যে কাছে যায়নি, দূরে ভিড়ের আড়ালে লুকিয়েছিল, সে শুধু ভয়ে। ভয়ও একটা সুখ! কিন্তু যাই বলো, অমন একটা জলজ্যান্ত সমস্যার সামনে কী মীমাংসা নিয়ে দাঁড়াতে পারত সে! কী সান্ত্বনা ছিল তার সঙ্গে, কী তাপভাণ্ড! কিন্তু এ কথা ভোলা যায় কি করে, তার জন্যেই তো ভেজা। সারারাত কী কষ্টের মধ্য দিয়েই কেটেছে কাকলির। তারপর, কে জানে, ঠাণ্ডায় যদি অসুখ করে! কাকলি জানতেও পারবে না। যদি বাড়াবাড়ি হয়! কে বলে দেবে তার ঠিকানা। কে বা মনে করে রাখবে সেই বিদঘুটে প্লট নাম্বার! কে বা লিখবে। আর লিখবেই বা কেন?

টুক করে কাছে এসে দেখা দিলে কী এমন অশুদ্ধ হত! বরং দেখা না দেওয়ার দরুন সুকান্ত কী ভাবল তাকে? মিথ্যাবাদী ভাবল, নয়তো ভাবল, অসহায়, নিরুপায় পরাধীন অপোগণ্ড। নাবালক ভাবল। ছি ছি, কী স্বার্থপর কাকলি! নিজে কেমন অপলক চোখে দেখে নিল অপরূপকে, অথচ সুকান্তকে জানতেই দিল না। জলের মরুভূমির মধ্যে কোথাও রয়েছে একটি ফসলের খেত, তার সন্ধানের অদূরেই সোনার স্বীকৃতি। কেমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল গোবেচারার মত। মা-হারা শিশুর মত। অন্তত দেখা দিয়ে ওর মুখে আনতে পারত তো একটু তৃপ্তির রং। আর কিছু না হোক তাকে দিতে পারত তো একটু কথার উত্তাপ, একটু বা চোখের দৃষ্টির সেঁক। তাই নিয়ে রাজা হয়ে ফিরে যেতে পারত বাড়িতে। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে এত ভিজল অথচ মনই ভেজাতে পারল না একটুকু। ও চলে গেলে ...,

বৃষ্টি থামবার পর, বাড়ি ফিরতে কাকলিও কম কাঙালিনী সাজেনি। কাউকে বঞ্চিত করলে নিজের জন্যেও বুঝি কিছু সঞ্চিত থাকে না।

সাধে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকার কথা বলেছিল সেদিন বানিয়ে? সুকান্তর কাছে সে ঋণী হয়ে আছে না? শঠের ঋণ শাঠ্য দিয়েই শোধ করা উচিত কিনা জানি না কিন্তু হঠকারীর ঋণ তো হঠ দিয়েই শোধ করতে হয়। আর, কেমন অসম্ভব সুন্দর ভাবে সে এল! সেই বৃষ্টিতে আসার চেয়েও সুন্দর। কাউকে জানতে দিল না। বুঝতে দিল না। প্রস্তুত হতে দিল না, যেমন ঘুমের মধ্যে মৃত্যু আসে, তেমনি সহজের মত অবধারিতের মত এল। কোনো বিধি কোনো নিষেধ মানল না, খাটলও না বুঝি। সবাইকে চটিয়েও কেমন সাঁটিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। বাবা ভঙ্গ দিয়ে শুলেন গিয়ে ঘরে। মা প্লেট সাজালেন খাবারের। জল খাবার পর কোথাও ভর্ৎসন-তিরস্কার হল না। পরিবেশটি মিঠে হয়েই রইল। শুধু ছাদে নয়, ঘরে, সিঁড়িতে-বারান্দায়, কদমফুল রেখে গেছে তার নিশ্বাসের জাদু।

কাকলিও প্রতিশোধ নিতে জানে। কেমন অসাবধানের মধ্যে ধরে ফেলেছি বলো। অফিসটাইমে কর্তাব্যক্তিদের বেরিয়ে যাবার পর, এলোমেলো সংসারের মাঝখানে কেমন চলে এসেছি ফিরিওলা সেজে। বাবুরা বেরিয়ে গেলেই তো ফেরিওয়ালা আসে। কিন্তু আমার আসা মেয়েদের কাছে নয়, আরেকজনের কাছে। আর এ ফেরি বেচবার নয়, অমনি দিয়ে দেবার।

এখন তোয়ালে দিয়ে মুখের সাবান মুছলেই বা কি, গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়ালেই বা কি, আমি দেখে নিয়েছি। কী দেখে নিয়েছ? আমার অপরিচ্ছন্নতা? আমার দারিদ্র্য? মোটেই তা নয়। দেখে নিয়েছি তুমি ছোট একটি শিশুর মতই

সরল হয়েও দুরন্ত, চঞ্চল হয়েও অসহায়। নইলে এখন তোমার মা, মৃণালিনী উপরে উঠছেন , হয়তো বা তোমাকে মোকাবিলা করতে, তাই দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলে। কি আশ্চর্য, মাকে অমন ভয় ?

টেবিলের সামনে তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খাতা মেলে ধরে কলম উদ্যত করল সুকান্ত। চেঁচিয়ে বললে, 'বলুন প্রশ্নগুলো।' তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে যোগ করল : 'যা হয় কিছু বানিয়ে-টানিয়ে বলো। একটা পড়াশোনার অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করো। খবরদার, হাসি-হাসি মুখ নয়, সিরিয়স মুখ করো। মাস্টারি মুখ। যা পশ্চাৎ হবে তারই প্রাকছায়া আনো।'

'তা হলে হাসি-হাসিই রাখতে হয়।' হাসল কাকলি।

মৃণালিনী দরজার কাছে এসে থামলেন, ভিতরে ঢুকলেন না। সুকান্তকে গম্ভীর মুখে ডেকে নিলেন বাইরে।

কী না জানি আদেশ হয় তার। হয়তো সংগচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে বাজারে পাঠিয়ে বসবেন। শুধু স্বর্গ থেকে বিদায় নয়,

নরকে বদলি। যা, ঠোঙায় করে সিঙাড়া সন্দেশ নিয়ে আয়।

বাইরে, বারান্দায়, বেশ খানিক দূরেই মৃণালিনী টেনে নিলেন সুকান্তকে। গলা খাটো করে বললেন, 'ও কার মেয়ে?'

'কার মেয়ে মানে? ভদ্রলোকের মেয়ে।' সুকান্ত অবাক হয়ে রইল।

'না, না সে কথা নয়। বলছি ওর বাবা কী করে? কোনো বড় চাকরি? বড়ো ব্যবসা?' গলা খুব খাদে রাখতে পারল না মৃণালিনী।

'ওর বাবা কী করে তা দিয়ে কী হবে?' সুকান্ত বিরক্তির ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। 'ও আমার সঙ্গে পড়ে, এক ক্লাসে, এক সঙ্গে পরীক্ষা দেব এ বছর, এই ওর যথেষ্ট পরিচয়। ওর বাবাতে কী দরকার?'

'আহাহা সেই কথা নয়।' চোখে মুখে অপ্রস্তুতের ভাব আঁকল মৃণালিনী। 'আমাদের মধ্যে একটা কথা উঠেছে, প্রায় বাজি ধরার মত। আমি আর বৌমা একদিকে আর বিজয়া, তোর কাকিমা আরেক দিকে। আমরা বলছি ওর বাবা নিশ্চয়ই কেউ হোমরাচোমরা হবেন আর বিজয়া বলছে, হেঁজিপেঁজি, আফিসবাবুর বেশি হবে না। তুই জানিস?'

'জানি বৈ কি।'

'কী? উকিল, কেরানি, মাস্টার?'

'না না, চুনোপুঁটির কেউ নয়, বাঘ-সিংহ। জজ ম্যাজিস্ট্রেট।'

উজ্জ্বল চোখ বিস্ফারিত করে নিচে নামতে গেল মৃণালিনী। সিঁড়িতে বন্দনার সঙ্গে দেখা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে জজটাই তার পছন্দ হল। যার প্রতাপে তার ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে সে-ই নিশ্চয় মহা-মহিম। বন্দনাকে বললে, 'বলো গে বিজয়াকে, জজসাহেবের মেয়ে।'

আর সেইটেই বাড়িয়ে বন্দনা বললে, 'শুনেছেন কাকিমা, যে-সে নয়, হাইকোর্টের জজের মেয়ে।'

শুয়ে শুয়ে হাই তুলছিল বিজয়া। বললে, 'হ্যাঁ, এমনি হাই-তোলা কোর্টের জজ। আর বিদ্যে ফলিও না বৌমা। সত্যিকার হলে বাড়ির গাড়ি করে আসত, পায়ে হেঁটে আসত না।'

'কেন, গাড়ি তো ওদের আছে।' এমনি ভাবে বললেই কথাটা জমে তাই বললে বন্দনা।

'হ্যাঁ, জানি, আছে, কারখানায় আছে। যখনই জিগগেস করবে গাড়ি কোথায়, শুনবে কারখানায়।' খাটে ম্যাগাজিন-হাতে উঠে বসল বিজয়া। 'গাড়ি না হয় হল, কিন্তু শাড়ি কোথায়? শাড়ি বুঝি শালকরের দোকানে।'

'কেন, যেটা পরে এসেছে সেটা শাড়ি নয়?'

'ওটা কাপড় নিশ্চয়ই, আর যখন চওড়া পাড় আছে বয়ে-সয়ে বলা যায় শাড়ি। কিন্তু আটপৌরেরও একটা সীমা আছে।'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, ও ছাত্রী।'

'ছাত্রীদের চিনতে আর বাকি নেই। চিকনচাকন দিতে পারলে কেউ ছাড়ে না। তুমি যা বললে, ওই সজন-সজ্জনের মেয়ে হলে দেখতে কেমন জলে ঢেউ দিত। বলতাম নেহাতই গরিব গুরবো, অল্প-পুঁজি—'

প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের পরেও এই কথা। অসহ্য লাগল বন্দনার অকারণে পরনিন্দা, পিতৃনিন্দা, ঝাঁজিয়ে উঠল মুখের উপরঃ 'যত পুঁজি আপনার। যত বিদ্যেবুদ্ধি সমস্ত আপনার একার পেটে।'

এখন আবার এই বউটার সঙ্গে ঝগড়া করো। বিজয়া বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। ম্যাগাজিন হাতে আবার হেলান দিল বালিশে।

এদিকে একটা হাতপাখা কুড়িয়ে নিয়ে মৃণালিনী সুকান্তর ঘরে ঢুকল।

সুকান্ত কাকলিকে লক্ষ্য করে বললে, 'হ্যাঁ, বলুন, তারপর—'

'তুই কী!' সুকান্তর উদ্দেশে শাসনের ভঙ্গি করল মৃণালিনী। 'তুই ওকে ন্যাড়া তক্তপোশে বসিয়ে নিজে চেয়ার নিয়েছিস!'

'উপায় কী! আমি যে লিখছি টেবিলে। উনি তো লিখছেন না, লেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, তারপর বলুন, কোশ্চেন নাম্বার ফোর—'

'এ ঘরটায় হাওয়া নেই।' কাকলিকে মৃণালিনী মৃদু-মন্দ হাওয়া করতে লাগল।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কাকলি। 'কী সর্বনাশ!' হাত থেকে প্রায় জোর করে কেড়ে নিল পাখা। উলটে মৃণালিনী-কেই হাওয়া করতে লাগল।

মৃণালিনী সরল ঘরের বাইরে। বললে, 'কী দেব তোমাকে? সরবৎ না চা?'

'যা আপনার খুশি।'

'বাতাস দিয়ে মাকে তাড়ালে।' বললে সুকান্ত, 'এবার তবে একটু আমাকে দাও। পরিশ্রম তো আর কম হচ্ছে না।'

'বয়ে গেছে। এই সুযোগে আপনি সেবা পাবার চালাকি, তা বুঝি আমি বুঝি না?' কাকলির চোখের সাদায় কালো তারা দুটি টল টল করে উঠল। 'বরং তুমি যদি দাও—'

'দেব?' উঠি-উঠি করল সুকান্ত।

'আমি তাড়ালাম মাকে, তুমি তাড়াও আমাকে।'

'রক্ষে করো। দরকার নেই পাখা। অন্ধ-বন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।' হাসল সুকান্ত। 'কিন্তু দেখলে তো আমার মা কত মিষ্টি। চা চাইলে চা সরবৎ চাইলে সরবৎ।'

'সব মা-ই মিষ্টি। তুমি আমার মার হাত থেকে নিলে না কেন খাবারের প্লেট?'

'মজুতুবি রেখে এলাম। আর, জানো তো, ময়রার মিষ্টি নয়, আমি গাছের ফল চাই। টাটকা ফল। আর সে ফল ধৈর্যের ফল।'

'তার মানে, চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি, 'বলতে চাও সবুরেই মেওয়া ফলে।'

চলে যাবার সময় আবার এক চালাকি করল কাকলি। বললে, 'বড় রাস্তার শর্টকাটটা বলে দিন। আসবার সময় কত যে ঘুরেছি এদিক ওদিক তার ঠিক নেই।'

শর্টকার্ট বন্দনাও বলে দিতে পারে কিন্তু যদি কেউ জেগেও চোখ বুজে থাকে, সরলকে জটিল করে দেখে তা হলে কার কী সাধ্য!

মৃণালিনী বললে সুকান্তকে, 'তুই যা না, একটুখানি দে না এগিয়ে।'

বাইরে রোদের দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'এই রোদে বেরুলে ঠিক মাথা ধরে যাবে।' তারপর কাকলির দিকে তাকিয়ে বললে, 'যদি আসতে পারেন যেতেও পারবেন। বরং আসার চেয়ে যাওয়াটাই সোজা। চলে যান নাক ধরে—'

'তুই কী!' মৃণালিনী গঞ্জনা দিল। 'তোর জন্যে দরকারি প্রশ্ন নিয়ে এল বাড়ি বয়ে আর তোর একটুকু কৃতজ্ঞতা নেই। দু পা এগিয়ে দিতে পারিস না?'

'মাথা ধরে যে।'

'বেশ আমি ছাতা দিচ্ছি।' বন্দনাও কাকলির দিকে।

'থাক, একধারে ছিল মাথা, আরেক ধারে হবে ছাতা।' মুখভরা অনিচ্ছা নিয়ে কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, 'বাজিহারি

আপনাদের। তাল্লুক-মুলুক চ'ড়তে পারেন একা-একা বাড়ির রাস্তায় গাইড চাই। ঐ যে বলেছে সারা ঘর লেপে এসে দুয়ারে আছাড়—আপনাদেরও তাই হয়েছে। চলুন—'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কয়েক পা এগতেই কাকলি বললে, 'উঃ, তুমি কী মিথ্যে কথাই যে বলতে পারো। মুখে এতটুকু বাধে না।'

'আর তুমি? চালুনির কাছে ধচুনি।'

'দুজনেই সমান।' হেসে ফেলল কাকলি।

'কার নিন্দা করো তুমি, এ আমার এ তোমার পাপ।'

'খুব পাপ হচ্ছে, তাই না?' চোখ মুখ আর্ত করল কাকলি।

'মোটেও না। এ ব্যাপারে মিথ্যে দোষের নয়।'

'কোন ব্যাপারে?'

'প্রণয় ব্যাপারে'

'কে বলেছে?'

'শাস্ত্র।'

'না, না, সে কথা নয়। কে বলেছে তোমাকে যে এ ব্যাপারটা প্রণয়?'

'না, না, কেউ বলেনি। তবে তো নিঃসংশয় মিথ্যে। বিনিশ্চিত পাপ। নির্ঘাত নরকবাস।' চোখমুখ কালো করল সুকান্ত।

'দুজনে একসঙ্গে তো?' হেসে ফেলল কাকলি।

কতক্ষণ চলবার পর সুকান্ত বললে, 'সাত পার বেশি হাঁটলাম একসঙ্গে। সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে কী হয়?'

'কিছুই হয় না। বড়জোর একটা স্ট্রেট লাইন হয়।'

'শাস্ত্রে যে বলে—'

'আবার শাস্ত্র! শাস্ত্রীয় কিছু হতে হলে একটা মণ্ডলের চারপাশে ঘোরা চাই।'

আবার হাসি।

জানলা দিয়ে আবার তাকাতেই কাকলি দেখল মেঘ নেই। রোদে পথঘাট দোকান-বেসাত ট্রাম-বাস লোকজন সব ঝলমল করে উঠেছে।

তোড়জোড় করে বেরুচ্ছে, বেলা প্রায় দশ, বিনতা এসে হাজির। বিনতা কাকলির চেয়ে দু বছরের অগ্রণী, বি-টি পাশ করে চেতলায় কোন মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি করেছে। বয়সে বড় হলেও হৃদ্যতায় সমান-সমান। সমস্ত নির্জন-গোপনের অংশীদার।

'এ কি, বেরুচ্ছ? কোথায়?' বিনতা প্রশ্ন করল ব্যস্ত হয়ে।

'ছাত্রীবন্ধুর বাড়ি।' মুখ টিপে হাসল কাকলি। বললে, 'সকালের দিকে হলে ছাত্রীবন্ধু, দুপুরের দিকে হলে লাইব্রেরি, সন্ধ্যের দিকে হলে প্রোফেসর। তার মানে, বুঝতেই পাচ্ছ—'

'কী বুঝতে পারব?' হাঁ হয়ে রইল বিনতা।

'তার মানেই মিট করতে যাচ্ছি।'

'কার সঙ্গে মোকদ্দমা?'

সশব্দে হেসে উঠল কাকলি। বললে, 'এ বাংলা মিট নয়, ঝগড়ার নিষ্পত্তি নয়, ঐ ইংরিজী মিট, এর মানে নিভৃত-সাক্ষাৎ—'

'কার সঙ্গে?'

'এ জেনে তোমার লাভ নেই।'

'ভেট কোথায় হবে? কোন কুঞ্জে?'

'এও অবান্তর।'

'তোমাদের পরীক্ষা কবে শুনি?'

'একমাসও আর নেই।'

বক্তৃতা জুড়ল বিনতা। পরীক্ষাকে এত কাছে রেখে সময় নিয়ে হেলাফেলা করার কোনো মানে হয় না। আগে পরীক্ষা পরে প্রেম। আগে কেরিয়র পরে আর সব। প্রেম একটা যায় আরেকটা আসে কিন্তু কেরিয়র একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর তার সংশোধন চলে না। মনোবিলাসের জন্যে ফাঁকা মেঘ না কুড়িয়ে দৃঢ় ভূমির উপর মজবুত বাড়ি তৈরির জন্যে শক্ত ইট কাঠ লোহা লক্কড়ের দরকার।

'সব সত্যি কথা।' বললে কাকলি, 'কিন্তু তোমার তো এখনো জোটেনি, তুমি কী বুঝবে বলো।'

'জোটেনি তো জোটেনি।' রাগ করে উঠল বিনতা। 'জোটাবার জন্যে আমি ফোটান্মা ফুল হয়ে মৌমাছি ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়াই না। জীবনে প্রেমই সর্বস্ব নয়। তার চেয়েও বড় জিনিস আছে। তা হচ্ছে কর্তব্য, তা হচ্ছে সংগ্রাম—'

'হবে হয়তো। কে জানে প্রেমই আবার মহত্তম কর্তব্য কিনা, সংগ্রাম কিনা। তবু প্রার্থনা করি।' বিনতার দিকে করুণ চোখে তাকাল কাকলি : 'জীবনের সে আশ্চর্য অনুগ্রহ তোমার হাতে একবার অন্তত আসুক। সে প্রসাদের স্বাদ পেয়ে তারপর তুমি কথা বলো।'

কে জানে কী করে আসে! বিনতার একটা শখ হচ্ছে গণ্যমান্যদের সঙ্গে, বিশেষত সংস্কারমুক্ত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে চিঠি লিখে-লিখে আলাপ করা, এবং দৈবী কৃপা যদি ঘটে কারু সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, শেষ পর্যন্ত বা সর্বাধিক হওয়া।

তরুণতম ভাবের তীব্রতম কবি, বর্তমানে, 'অনিরুদ্ধ।' চিঠি লিখে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল বিনতা। দেখল বাইরের ঘরে একটি সুদর্শন যুবক ইজিচেয়ারে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে।

'আপনিই কি অনিরুদ্ধ?' রক্তের মধ্যে আনন্দের রুনুঝুনু তুলে জিগ্গেস করল বিনতা।

সাতাশ-আটাশ বছরের যুবকটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'বসুন। বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।' যুবক চলে গেল ভিতরে।

বিনতা প্রায় ধুলোর উপর বসে পড়ল।

'যেমন ধরো রসবোধ। সাহিত্যে-শিল্পে রসবোধ। সে কি সকলেরই আসে? কিন্তু কেন যে কার আসে কেউ বলতে পারে না।' বলতে লাগল কাকলি। 'কিন্তু যার আছে ঐ রসবোধ সে কি জীবনকে বেশি করে উপভোগ করে না? তেমনি যার জীবনে এসেছে সেই দুর্গমের ডাক—সেই অজ্ঞেয়ের স্পর্শ—তুমিই বলো সে কি জীবনকে একটু বেশি করে পায় না? আর বাঁচতে এসে কার না বেশির প্রতি লালসা?'

বনবিহারীর ঘরে কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'একটি ছাত্রীর বাড়িতে বাবা।'

'তোর দাদার খোঁজ পেলি?'

'পেয়েছি। মা তোমাকে বলেনি?'

'কই না তো। কোথায় দেবনাথ?'

'শ্রীরামপুরে স্টেশনে ধরা পড়েছে। ডবলিউ-টি উইদাউট টিকেটে ট্রাভেল করছিল। ধরা পড়তে ফাইন হয়েছে বিচারে। জরিমানা দিতে পারেনি। জামিন দাঁড়াবারও লোক পায়নি কোথাও। তাই সাত দিনের জেল। নরুকাকাকে মা পাঠিয়েছেন শ্রীরামপুরে।'

উত্তেজনায় উঠে বসেছিলেন বনবিহারী, আবার শুয়ে পড়লেন।

কাকলির সঙ্গে-সঙ্গে বিনতাও বাইরে এল।

'তুমি তো অনাদিকে।' রুক্ষ মুখে বলল বিনতা।

'হ্যাঁ,' স্মিতস্নিগ্ধ মুখে বলল কাকলি, 'প্রেমের দিকে। আর তুমি কর্তব্যের দিকে, বিধেয়ের দিকে। যার যেমন বুঝ। যার যেমন মতি। আর যদি ডাক্তারি কথায় বলো, যার যেমন এলার্জি।'

(ক্রমশ)

সবুজপত্রের ডাক

ত্রিশ
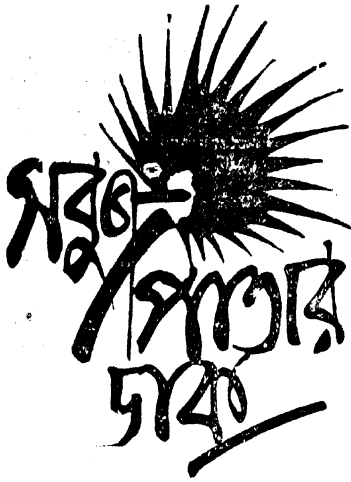
এ পর্যন্ত সবুজপত্রের ডাকে যা বলে এসেছি, তার ভিতর ডাকযোগে প্রাপ্ত সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর লেখা চিঠির কথা নেই, যদিও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কথা ও প্রসঙ্গ আছে। ওঁরা দুজনে সই করে কোনো চিঠি আমায় লেখেন নি বটে, কিন্তু একটি চিঠি আমার পত্র-সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে, যাতে ওঁদের দুজনের হাতের লেখা দেখা যায়।

৫° বং সং

আনন্দসভা

নব-বর্ষের সাদর অভিনন্দন।

শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব

মান্যবরেষু,

আগামী ১লা বৈশাখ, রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় আমাদিগের বাটীতে নব-বর্ষের উৎসব হইবে। আপনারা সকলে যোগদান করিলে আনন্দিত হইব।

স্থান—৪৭নং ওল্ড বালিগঞ্জ (৬নং সানি পার্ক), সংগীত সংঘের ছাত্রীগণ কর্তৃক গীতবাদ্যাদি ও ভবানীপুর ক্লাব কর্তৃক নাট্যাভিনয়।

নিঃ
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
শ্রীপ্রতিভা দেবী

এ-পত্রের কায়া মুদ্রণযন্ত্র প্রসাদে, কেবল 'আনন্দসভা' অংশটি প্রমথ চৌধুরীর হস্ত-লিখিত আর 'শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব' অংশে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর হস্তাক্ষর বর্তমান। কোনো তারিখ নেই। খামের ডাকছাপ দেখে বোঝা যায়, ১১।৪।১৮ তারিখে বালিগঞ্জ ডাকঘর থেকে বেরিয়ে ১২।৪।৫৮ তারিখে হাটখোলা ডাকঘরে এসেছিল। খামের ওপর আমার নাম ও ঠিকানা ইংরিজীতে প্রমথ চৌধুরীর হাতে লেখা, যেমন অন্য সব চিঠিতেও থাকত।

বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা করলে এ-পত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা যায় যে :—

১। প্রমথ চৌধুরীর দাদা আশু চৌধুরী সবুজ-পত্র আন্দোলন সত্ত্বেও চলিত বাংলার চেয়ে সাধু বাংলাকেই পরোচিত ভাষা মনে করতেন—এমন কি, 'আমাদের' না লিখে 'আমাদিগের' লিখেছেন।

২। চিঠিতে তারিখ দেওয়াটা তাঁরা প্রয়োজন বিবেচনা করেন নি, কিম্বা দিতে ভুলে গেছেন।

৩। মুদ্রিত অংশে রয়েছে—"আপনারা সকলে যোগদান করিলে বাধিত হইব।" এ-বাক্যটি সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে বহু-ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী যখন পত্রাবরণে কেবল আমার নামটি হাতে লিখে দেন, তখন নিশ্চয়ই চিন্তা করেন নি যে, এখানে "আপনারা সকলে" কেটে দিয়ে "আপনি" লিখলে ব্যাকরণসম্মত হয়।

৪। প্রমথবাবু আমায় "কল্যাণীয়েষু," পাঠ লিখে পত্র প্রেরণ করতেন, এ-ক্ষেত্রে তাঁর দাদা ও বৌদিদি "মান্যবরেষু," পাঠ লিখেছেন দেখলে আমি যে একটু অপ্রস্তুত হতে পারি, সে ভাবনা বোধ হয় কারও মনে আসে নি।

এত কথা তখন আমার চিন্তাধারায় ছিল না। খামের ওপর প্রমথবাবুর পরিচিত হস্তাক্ষর দেখেই ঠিক করলুম, ঘরের কোণে একলা বসে না থেকে ১লা বৈশাখ "আনন্দ সভায়" যাওয়াই ভাল। গিয়ে দেখলুম, সত্যি ভাল করেছি। আশু চৌধুরীর বাড়ির আসবাব দেখলে যে কেবল চোখের সুখ হয় তা নয়। নাকের সুখও হবে, কেননা ওঁর বড় ঘরে যে চৌকোণ ঢাকা দেওয়া পার্টিশন ছিল সেটির সবটা চন্দন-কাঠের তৈরী জাফ-কাজের কাজ-করা, সুতরাং তার গা থেকে ভুর-ভুর করে চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে আর হাওয়ায় সে গন্ধ ঘর-ময় ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়ির 'গন্ধ-বহ'-নাম সর্বতোভাবেও সার্থক হয়েছে। কানের সুখও প্রচুর পাওয়া গেল, সংগীত-সংঘের কল্যাণে। সৌজন্যের জন্যে আশু চৌধুরী বিখ্যাত ছিলেন, এবং তার প্রমাণ এই আনন্দ সভায় পদে পদে পেলুম। জানতুম, তিনি চমৎকার ইংরিজী লিখতেন। তবু বাংলা দেশের নববর্ষারম্ভ পয়লা বৈশাখকে আনন্দ-মিলনের উপলক্ষ করে-ছিলেন, তার কারণ বোধ হয় তাঁর আন্তরিক দেশপ্রীতি। শুনেছি তিনি বিলেত থেকে এসে বাংলায় 'ভিজিটিং কার্ড' ছাপিয়ে-ছিলেন। তাঁর কাছে দেশ মানে বঙ্গদেশ, জাতীয় ভাষার অর্থ বঙ্গভাষা। প্রমথ চৌধুরীর "বাঙালি পেট্রিয়টিজম্" প্রবন্ধ পড়লে দেখা যায় ঐ একই মনোভাব, এবং সে-প্রবন্ধের রচনাকাল বঙ্গাব্দ ১৩২৭—অর্থাৎ উক্ত নববর্ষ উৎসবের মাত্র দু' বৎসর পরে।

পয়লা বৈশাখে কাল-বৈশাখীর প্রকোপ শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু আজকাল শাসন মেনে ঋতুগুলো চলে না—স্বায়ত্তশাসন তারাও চায়। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বরুণ-পবনের খামখেয়াল যে ছিল না তা নয়, তবে এখন সেটা বড্ড বেড়ে গেছে। বৈশাখে শোভাবাজার থেকে বালিগঞ্জ যেতে হলে তখন ধুলোয় ধূসরিত হবার সম্ভাবনা ছিল বেশ। প্রমথ চৌধুরীর পত্র তার প্রমাণ।

৬৭

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৫।৪।১৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলুম। কাল যে বৈশাখী সে তো প্রত্যক্ষ এবং একালে শোভাবাজার

থেকে বিকালে বালিগঞ্জ আসা যে কষ্টজনক সে কথাও নিঃসন্দেহ। তবু আসছে শনিবার বিকেলে এখানে যদি উপস্থিত হতে পারো ভালো হয়। সুধীন্দ্রকে বলো, সেদিন রবিবাবু মহাশয়ও উপস্থিত থাকবেন, তোমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করবার জন্য।—আজ বারেন্দ্র সমাজের একটা বড় বিয়ে আছে—খুব সম্ভবত বিবাহ সভায় সুধীন্দ্রের সংগে সাক্ষাৎ হবে—তাহলে তাকে মুখেই বলব—নইলে তোমার উপর বরাত দিয়ে খালাস হলুম। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।
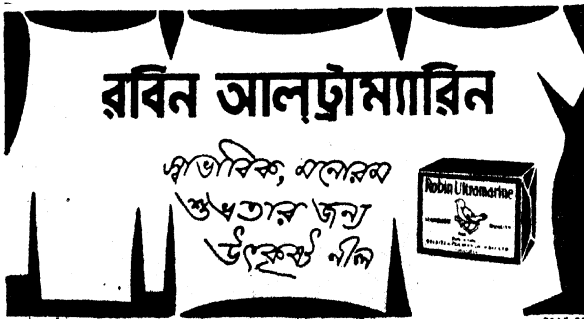
তখনও ইউরোপের মহাযুদ্ধ শেষ হয় নি, সুতরাং war-economy-র দিকে আমাদেরও নজর রাখতে হয়েছিল, কারণ আমরা তখন ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন, এবং ইংলণ্ডের সংগে জার্মানীর যুদ্ধ হলে আমাদের নিরপেক্ষ থাকার অধিকার ছিল না—যেমন ডোমিনিয়ান-স্টেটাস্ পাবার পর এখন আমাদের আছে। কাগজের টানাটানি এখনকার চাইতে তখন বেশি হয়েছিল, কারণ এ-দেশে কাগজ তৈরী হতো খুব কম। কিন্তু ওয়ার-ইকনমির সংগে কালচার-ইকনমির দরকার, এটা প্রমথবাবু বুঝেছিলেন, শুধু 'কাল-চার' শব্দটির সংস্কৃত ব্যাখ্যা দেন নি, অর্থাৎ বলেন নি যে, 'কাল'-এর 'চার' অর্থাৎ গতির মন্থরতা হতে পারে।

৬৮

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৩।৫।১৮

কল্যাণীয়েষু,

আমাদের কালকের সবুজসভায় গান থাকবে না, বাজনা থাকবে না, আবৃত্তি থাকবে না, অভিনয় থাকবে না। যদি পারো ত এসো—গল্প করা যাবে। war economy প্রথমে এই কাগজের উপর দিয়েই অভ্যাস করা যাচ্ছে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

যুদ্ধ-রত ইংরেজরা তখনও ভারতবর্ষকে শাসন করছিলেন, তথাপি ইংরেজদের আঁচল-ধরা ভারতবাসীরা অন্নাভাবে বড় একটা মারা যান নি। তখনকার ইকনমি আমাদের শিক্ষা দিত না যে খাওয়া কমানো উচিত। ফলে আহার নিয়ন্ত্রণ জিনিসটা ছিল প্রত্যেকের স্বায়ত্ত-শাসন-নিয়মিত। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রথীদের মধ্যে যে সব-চেয়ে বড় তাকে রথীন্দ্র বলা প্রাচীনকালে সংগত মনে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু স্ব-পাক-শাসন-রীতি অনুসরণ করেই তাঁর "পাক-শাসন" নাম হয়েছিল, এ-কথা বলা যায় না। আপ-রুচি খানা—এই প্রবাদবাক্যকে স্বীকার করে প্রমথবাবু আমায় লেখেন যে, আমি যেন রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করি।

৬৯

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৬।৫।১৮

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম এবং এইমাত্র তার জবাব দিচ্ছি, বিশেষ করে একটি কথা বলবার জন্য।

আসছে বুধবারে রথীর নিমন্ত্রণ রক্ষা

করো। এ নিমন্ত্রণের একটা বিশেষ উপলক্ষ আছে এবং এ নিমন্ত্রণ সকলকে করা হয় নি। আসলে এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার, শুধু জনকতক বন্ধুবান্ধবদের বেছে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রথমে আছে গান-বাজনার মজলিশ—তারপর আহার। আহার না করতে চাও সভাভঙ্গ হলেই বাড়ি চলে যেতে পারো। অন্য কথা দেখা হলে মুখে হবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

এর পরবর্তী পত্রগুচ্ছ কোনো ভাষ্যের অপেক্ষা রাখে না। তার ভিতর প্রমথ চৌধুরীর যে-মন্তব্য আছে সে-মন্তব্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কেবল দুটো কথা বলে রাখি। 'অমৃতলাল বসুর কোনো লেখাই আমি সবুজপত্রে ছাপাবার জন্যে জোগাড় করতে পারি নি। এবং Manchester Guardian-এ প্রমথবাবুর যে ইংরিজী প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, সে-প্রবন্ধের কথা ইতিপূর্বে সবুজপাতার ডাকে বলেছি।

৭০

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১০।৫।১৮

কল্যাণীয়েষু,

নানা কারণে এ-বছর থেকে সবুজপত্র বন্ধ করে দেব মনে করেছিলুম কিন্তু সবুজদলের অনুরোধে তা চালাতে স্বীকৃত হয়েছি। এর পর সবুজপত্রের জন্য লেখা সবুজদলের যে নিতান্ত কর্তব্য সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। অতএব তোমাদের প্রতিজনকে আমি এ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তিনচার পাতায় যা হয় হাল্কা একটা কিছু লিখে দিয়ো। আমি বিশেষ করে হাল্কা লেখাই চাই, কেননা, আমার নিজের লেখা যে ক্রমে ভারি ও কাটখোট্টা গোছের হয়ে উঠছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ এ-মাসের কাগজে পাবে।

অমৃতবাবুর লেখা আমি অবশ্য পেলে খুব খুশি হব,—তবে কোনও বিশেষ লেখা ছাপাতে পারব কিনা, তা সে লেখা না দেখে বলতে পারি নে। তাঁর লেখায় যে যথেষ্ট পরিমাণে হাসারস আছে, তা আমি জানি। তবে কথা হচ্ছে এই যে, ও'রা সকল সময়ে রসিকতার line আমরা যেখানে টানি, সেখানে টানেন না। একথা অবশ্য তোমার কানে কানে বললুম।

তুমি কাল বিকেলে এখানে যদি এসো ত এ বিষয়ে কথা মুখেই হবে। 'শতং বদ মা লিখ' এ বিধি না মানলে নিরাপদে পরচর্চা করা যায় না। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

৭১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৭।৫।১৮

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। এ-দানিক দেখছি নিমন্ত্রণ খাওয়াটাই হয়েছে তোমার প্রধান কাজ। যে স্বপাক খায়—নিমন্ত্রণ খেলে যে তাকে বিপাকে পড়তে হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব এক একটা নিমন্ত্রণ রক্ষার পর হপ্তাভর যে তোমাকে আত্মরক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয় একথা শুনে আশ্চর্য হলুম না।

তুমি নিজে লিখবে ও আমার জন্য লেখা সংগ্রহ করবে একথা শুনে খুশী হলুম। গত মাসের কাগজের বেশির ভাগ আমি লিখেছি। এবারও একটা প্রবন্ধ ধরেছি যা সম্ভবত তিন ফর্মার কমে শেষ হবে না। এর চাইতে বেশি লিখলে সে লেখা কেউ পড়বে না। তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু সর্বনাশ হবে আমার অর্থাৎ আমি Journalist হয়ে উঠব। এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র সবুজসভাদল। অমৃত-বাবুর লেখা তুমি বাছাই করে আনলে আমি তা মন দিয়ে পড়ব এবং খুব সম্ভবত সবুজপত্রে প্রকাশ করব। অমৃতবাবু লেখক এবং তুমি সমালোচক, এই দুয়ের যোগা-যোগের উপর অনেকটা নির্ভর করতে পারা যায়।

কাল বিকেলে দেবতা যদি অনুকূল থাকেন আর তোমার দেহ যদি সচল থাকে তাহলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এ অঞ্চলে একবার দেখা দিয়ো।

একটি দুঃসংবাদ দিই। রবিবাবু মহাশয়ের বড় মেয়েটি কাল সকালে মারা গিয়েছে।—শুনেছি তিনি এতে বিচলিত হবার কোনই বাহ্য লক্ষণ দেখাচ্ছেন না— এই ত আসল ভয়ের কারণ। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

৭২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৯।৫।১৮

কল্যাণীয়েষু,

আমার কলিকাতাবাসী বন্ধুবর্গের মধ্যে তুমি হচ্ছ একমাত্র লোক যার চোখে দেখা না পেলেও বাঁশি শুনতে পাই। সাদা কথায় বলতে গেলে অন্তত পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তুমি কখনও ভোলো না। আমার নববন্ধুর মধ্যে এমন দু'এক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা থেকে থেকেই এই কলিকাতা শহরের লোকারণ্যের মধ্যে এমনি গা-ঢাকা দেন—যে তখনকার মত তাঁদের সম্বন্ধে "অস্তি" "নাস্তি"র সমস্যায় পড়ে যেতে হয়। চিঠি লেখবার অভ্যাসটা তাঁদের থাকলে এসব তর্ক আমার মনে উঠত না। সে অভ্যাস আমারও ছিল না। তুমিই আমাকে এ ব্যাপারে দীক্ষিত করেছ। তার জন্যে তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ আছি। এই পত্রযোগেই আমি নবীন বন্ধুদের লাভ করেছি। পৃথিবীর কোন জিনিসই নিছক ভালো নয় সেই কারণে এই চিঠি লেখবার অভ্যাসটাও পুরোপুরি ভালো নয়—শেষটা ওটা একটা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আমার ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। এখন প্রবন্ধ লিখতে বসলেই তা হয়ে ওঠে পত্র। এর পরিচয় বৈশাখ মাসের সবুজপত্রেই পেয়েছ। আবার জ্যৈষ্ঠ মাসেও পাবে। চিঠি লেখবার ভিতর কোনও দায়িত্ব নেই। এ

ব্যাপারে কলমের মুখের লাগাম খুলে দেওয়া যায় আর তার ফলে মনোজব অশ্বের মত তা যেখানে খুশি সেখানে চলে যায়, দেশ হতে দেশান্তরে লাফিয়ে পড়ে—মধ্যে মধ্যে পক্ষীরাজের মত আকাশে উড়তেও চেষ্টা করে, তারপর 'মগে' গিয়ে এমন এক জায়গায় 'জমে' যায় যেখানে যাত্রা শেষ করবার অভিপ্রায় যাত্রীর মোটেই ছিল না। সাধুকথার অভাবে, দুটি একটি আস্তাবলী বুলি ব্যবহার করতে বাধ্য হলুম—নিজগুণে তাকে সংস্কৃত করে নিয়ো।

এতকথা বলবার উদ্দেশ্য—আগেভাগেই তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে আসছে বারের সবুজপত্রে বীরবলের পত্রের কোনও মাথামুণ্ডু নেই, আছে শুধু পদসম্পদ, ভাষায় যাকে বলে কথা আর কথা। এ-লেখার ভিতর মাল কিছুই নেই—মশলা কিছু থাকতে পারে। লেখায় মালের চাইতে মশলার ভাগ বেশি হলে তা মুখ-রোচক হতে পারে—কিন্তু তাতে উদর-পূর্তি হয় না। সে যাই হোক এসব পত্র তোমাদের উদ্দেশেই লেখা—কেননা—আমার এ ভরসা আছে যে তা পড়ে তোমরা

বলবে—'clever' কেননা তার ভিতর কলা না থাক কৌশল আছে। আমাদের দেশের পাঠকসাধারণের দোষই এই যে, যার রসনায় শুধু কৌশল আছে তাঁর কাছ থেকে তাঁরা কুশল বার্তা শুনতে চান। দেখতে পাচ্ছি নিজের লেখার উপর একটা এক বিঘৎ সমালোচনা লিখে ফেললুম। আমি যদি নাটক লিখতুম তাহলে Bernard Shawর নাটকের মত বোধহয় তার ঘটনার চাইতে প্রস্তাবনা ভারী হত।

যাক ও সব কথা। আমি Indian Literature-এর উপর ইংরাজিতে যে ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধটি লিখি সেটি Manchester Guardianএ প্রকাশিত হয়েছে। হয়েছে যেদিন সেটি আমি সবুজসভায় পাঠ ক'রি সেদিন তুমি সে-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলে কিনা মনে নেই। আসছে শনিবার বিকেলে যদি এখানে এসো তাহলে সেটি এবং রবিবাবু মহাশয়ের আর একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনাবো। আমার প্রবন্ধের ভিতর বিশেষ কিছু নেই—তবে একটু আর্ট আছে—miniature আঁকবার আর্ট।

আমার নিজের খবর এই যে, ল-কলেজের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে না বলে—আমি লেখায় মন দিয়েছি। ভাল হোক মন্দ হোক লিখে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে কলেজ খোলবার আগে অন্তত দু'মাসের কাগজের খোরাক তৈরী করে রাখব। আজ তবে এইখানেই শেষ করি। কেননা কাগজেরও সীমান্ত প্রদেশে পৌঁচেছি। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পুঃ—পারো যদি অমৃতবাবুর দুটো একটা লেখা সংগে নিয়ে এসো—সকলে মিলে পড়া যাবে।

৭৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৬।৬।১৮

কল্যাণীয়েষু,

কৈ, গেল হপ্তায় ত অমৃতবাবুর লেখা আনলে না? যদি সেগুলো তোমার হস্তগত হয়ে থাকে ত আসছে শনিবারে সংগে নিয়ে এসো। সবুজপত্রের ভিতর ইংরাজিকে যাকে বলে 'টাট্‌কা রক্ত' তার এখন প্রয়োজন হয়েছে। লোকে বলে আমাদের লেখা সব ঝিমিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং সবুজপত্রের লেখাকে জাগিয়ে তোলবার ভার অপর হস্তে ন্যস্ত করতে হবে।

যদি পারোত সুধীন্দ্রকে সংগে নিয়ে এসো। তার সংগে আমার কিছু কথা আছে। অবশ্য একথা আগে ফাঁস করলে সে ঐ অঞ্চলের দিক দিয়ে যাবে না। তুমি শুধু তাকে জানিয়ো যে সে এলে, আমি খুসি হব। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৭৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১১।৬।১৮

কল্যাণীয়েষু,

চিঠিতে চিঠি টানে, তাই তোমাকে যত চিঠি লিখেছি, এত বোধহয় আর কাউকে লিখিনি, অন্তত অত লম্বা লম্বা চিঠি আমার কাছ থেকে আর কেউ পাননি। এ কাগজে কালি চুপসে যাচ্ছে অথচ এতেই লিখতে হবে, কেননা বাড়িতে আজকাল চিঠির কাগজের দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সে যাই হোক, গেল পুজোর ছুটিতে যেমন চিঠি লিখে কাটিয়েছিলুম, এই গ্রীষ্মের ছুটিটে তেমনি প্রবন্ধ লিখে কাটাচ্ছি। অভিপ্রায়—সবুজপত্রের মাস তিনেকের খোরাক জোগাড় করে রাখা। ফলে লেখক হিসেবে আমার আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আজকাল পত্র আকারে যে সব প্রবন্ধ লিখছি, সেসব ইচ্ছে করেই এলোমেলো করে লিখছি—অথচ তার ভিতর প্রবন্ধের ধাঁচটা থেকেই যাচ্ছে কেননা এক কথা ছেড়ে আর এক কথায় যাওয়া আমার মনের স্বভাব নয়। তোমাদের জন্য লিখতে বসলেই তা চিঠি হয়—পাঠক সমাজের জন্য লিখতে গেলে, অজ্ঞাতসারে তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে ঃ অর্থাৎ তার বাঁধাবাঁধিটে একটু প্রকৃষ্ট রকমই হয়। সুতরাং হাত বদলে নেবার জন্যও আমার পক্ষে মাঝে মাঝে চিঠি লেখা দরকার। আমি কিন্তু আসলে চিঠি লিখিয়ে লোক নই—সে লোক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি কলম হাতে নিলেই তার মুখ দিয়ে আগুন আর আলো ঠিকরে বেরয়। এবার 'সবুজপত্রে' তাঁর দুখানি চিঠি বার করেছি—পড়ে দেখো—একখানি ছোট চিঠির কাগজের ভিতর মানুষে কতটা রস ও মাল পুরে দিতে পারে। আমাদের লেখা রঙিন কালিতে লিখলেও জ্বলজ্বল করে না। তা বলে কি করা যাবে, লেখা ত আর ছাড়া যায় না। ওয়ে একটা নেশা।

আজকাল দেবতা যেরকম অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দিচ্ছেন—"ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে" হচ্ছেন তাতে ভদ্রসন্তানকে এতদূর আসতে বলতে ভরসা হয় না। কায়ঃক্লেশে যে কাজ করতে হয়, তা নিজে করাই ভাল অপরকে তা করতে বলা আমার মুখে শোভা পায় না, কেননা আমি শরীরকে কষ্ট দিতে স্বতঃই নারাজ। কারও ভাল করতে হলে, তার মনে কষ্ট দেওয়া দরকার। কথাটা Lord Henry Wotton-এর মত হলো। Falstaffএর মত কোনও কথা জোগালো না বলে Wottonএর অনুসরণ করলুম। তুমি ঠিক বলেছ যে এঁদের একজনের কথা যদি immoral হয় আর একজনের কথাও তাই। আসল ব্যাপার এই মানুষে যদি সত্যকথা ছাড়া আর কিছু বলব না, এই প্রতিজ্ঞা করে বসে, তাহলে বিজ্ঞান লিখতে হয়। অর্থাৎ সেই কথা লিখতে হয় যা মেপে নিতে ওজন করতে পারা যায়, অর্থাৎ সত্যকে নেহাৎ ছোট করে আনতে হয়। তারপর নীতি জিনিষটে মুখের জিনিষ নয়,—কাজের জিনিষ। ও বস্তুর প্রয়োগ যেমন কঠিন, শিক্ষা তেমনি সহজ। নীতিবিদদের শিক্ষায় আর প্রয়োগে এতটা গরমিল হয় যে যার একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে, সেনীতির কথা মুখে আনতে ভয় পায়। যিশু খৃষ্টের দশ আদেশের ইউরোপে কিরকম দশাদশা হয়েছে তা ত সকলেই জানে। অতঃপর দেশে ফিরে আসা যাক। আমি একটি প্রবন্ধ লিখি, যে, সেকালে বেদান্ত পড়ে লোকে নেংটি পরে বনে যেত, আর একালে বেদান্ত পড়ে লোকে চাপকান পরে আপিসে যায়। শুধু তা হলেও ত বাঁচতুম। সেদিন একটি ভদ্রলোক একটি সভায় বেদান্ত সম্বন্ধে মহা বক্তৃতা করে, দেশসুদ্ধ লোককে "কামিনীকাঞ্চন" ত্যাগ করবার উপদেশ দিয়ে, সভাত্যাগ করে কোথায় গেলেন? নিজের ঘরে? না তা নয়। নিজের কামিনী ত্যাগ করে, নিজের কাঞ্চন অন্যত্র ব্যয় করতে চলে গেলেন। লোকে বললে, কি সাধুপুরুষ! এ আমার বানানো কথা নয়। তবে সে মহাত্মার নাম করতে পারব না। সাধে কি মানুষ Poradox বানায়!

ভালকথা কথা নীরেনের* পদ্য তোমার পত্রাভ্যন্তরে আসেনি। আসছে শনিবার তোমার নিমন্ত্রণ ত রইলই। তা ছাড়া নীরেনকে আসতে বলো। তার সংগে একটু কাজ আছে। আজ তাহলে এখানেই ইতি করি।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

---

* বংগবাসী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়। রুশ দেশে বংগভাষা-শিক্ষাদান করে ইনি সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

(ক্রমশ)

ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভুতোদা পট্ পট্ করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

"তিনমাস ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে।" বিমল হন্ত দন্ত হয়ে দৌড়ে এল—

"আহা হা করছেন কি ভুতোদা।"

ভুতোদা: "করব না তো কি?"

বিনয়ঃ দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে?

ভুতোদা: তার মানে!

বিনয়: তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভুতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে): হ্যাঁঃ যতসব কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিমল: সে কি ভুতোদা? গাছ যে মানুষেরই মত, সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মানুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি!

ভুতোদা: যাঃ যাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয়: নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে?

ভুতাদা: তাই বলেই কি আমায় মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল?

বিনয়: নিশ্চই! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল: 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা: কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয়?

বিমল: মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয়: আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা: দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্য-গুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয়: একটুও না। পুষ্টি বিশারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা: আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে?

বিমল: আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয়ঃ তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল: এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে?

ভুতোদা: কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলকুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।

কোন প্রতিনিধি পরিষদের বিসদৃশ আচরণ দেখলে বিদ্রূপ করে লোকে সদস্যদের গরু গাধা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে সত্যিই কেউ গাধা গরুকে সদস্য নির্বাচন করে পাঠায় না। ব্রাজিলের লোকে কিন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপের ধার ধারে না— সত্যিই তারা সদস্যরূপে জানোয়ারকে নির্বাচিত করে। চার বছর আগে ব্রাজিলের রাজধানী রিও দ্য জেনারিওর সাড়ে এগার শ মাইল উত্তরে জাবোয়াটাও শহরের পৌরসভায় ফ্রাগরান্ট নামক এক ছাগলকে সদস্যপদে নির্বাচিত করে জনসাধারণ তখনকার কর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। গত অক্টোবর মাসে ব্রাজিলের বৃহত্তম শহর সও পওলোর (অধিবাসী-সংখ্যা সাড়ে ছাত্রিশ লক্ষ) পৌরসভায় সদস্য নির্বাচন সূত্রে ভোট গণনাকালে দেখা যায় এবারও ভোটদাতারা এক চতুষ্পদ জীবকে নির্বাচন করেছে। পৌরসভার পঁয়তাল্লিশটি আসনের জন্য নির্বাচন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ পাঁচশ চাল্লশ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক ভোট (এক লক্ষ) পেয়েছে সও পওলো পশুশালার অধিবাসী পাঁচ বছর বয়সের কাকারেকো নামক এক স্ত্রী-গণ্ডার যার দৈনিক গ্রাস হচ্ছে সত্তর পাউণ্ড সব্জী। অধিবাসীদের একজন মন্তব্য করে যে, গাধার চেয়ে গণ্ডার ভাল।

*

কলনাতোর ভাব মানুষের মনে কখন কি রূপ নিয়ে উদয় হয় তা কেউ বলতে পারে না। গত বছর গরমকালে আমেরিকা প্রবাসী চীনা পরিব্রাজক রিচার্ড সি কাও কায়রোর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বসে বসে এক কাগজ ফিরিওয়ালা মিশরী ছেলের দিকে লক্ষ্য করছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে একখানিও কাগজ বিক্রি করতে না পেরে ছেলেটিকে রেস্তঁরার টেবিল থেকে এক টুকরো রুটি সরিয়ে নিতে উদ্যত হতে দেখেই কাও ঠিক করলেন তিনি বরং একখানি কাগজ কিনে ছেলেটিকে সাহায্য করবেন। এই অভিপ্রায়ে কাও ছেলেটির কাছ থেকে একখানি কাগজ নিয়ে পাঁচ পাউণ্ডের একটি নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি খুচরো করে এনে কাওয়ের হাতে দিতে তিনি গুণে দেখেন যে, ছেলেটি তা থেকে কাগজের দাম বাবদ কিছুই গ্রহণ করেনি। জিগ্যেস করতে ছেলেটি উত্তর দেয় যে, অমন দয়ালু পরদেশী ভদ্রলোকটির কাছে ঐ একখানি মাত্র নোটই সম্বল সে বুঝতে পেরেছিল তাই কাগজখানি বিনামূল্যেই দিয়েছে।

সম্প্রতি সেই পনের বছরের ছেলেটি আবদুল রসিক হেফনি তার সে উপকারের প্রতিদান লাভ করেছে। অনাথ ছেলে

আবদুলের থাকবার মধ্যে এক ছোট ভাই এবং কোনক্রমে দৈনিক খুব বেশী হয়তো টাকা তিনেকে মতো কাগজ বিক্রীর রোজগার। দুভায়ের কোনক্রমে চলছিল। কিন্তু এখন সে কায়রোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ লাভ করেছে। এক বছর আগে রিচার্ড কাও বিনা পয়সার কাগজ পাওয়ার কথাটি ভুলে যাননি। তিনি নিজে আমেরিকার ইলিনয়স বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রে পি-এচ-ডি এবং অধ্যাপনা তার বৃত্তি। নিজে ধনী না হলেও রিচার্ড কাও বলেন যে, আবদুলের লেখাপড়া শিখতে বছরে হাজার সাড়ে তিন টাকা লাগবে। সে টাকাটা তিনি অধ্যাপনা থেকেই তুলে নিতে পারবেন। এইভাবে একটি দুঃস্থ ছেলেকে সাহায্য করা নিয়ে লোকে কৌতূহলী হয়েছে দেখে রিচার্ড কাও বিস্ময়বোধ করেন। তিনি বলেন, "একজন আরেকজনকে সাহায্য করবে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন কেন ওঠে তিনি বুঝতে পারেন না। সামর্থ্য থাকে লোককে সাহায্য করো, এছাড়া আবার কি!"

*

নৈতিকতার দিক থেকে উচ্ছন্নে যাবার শহর বলে প্যারিসের যে নাম ছিল, মহাযুদ্ধের পর লণ্ডন সেই 'খ্যাতি' ছিনিয়ে নিলেও আমোদোচ্ছল ফরাসী রাজধানীটি এখনও কিন্তু সুগন্ধী প্রস্তুতের সেরা কেন্দ্র হয়ে আছে। ১৯৫৪ সনে প্যারিসে তার ভূগর্ভস্থিত সমগ্র রেলপথকে সুরভিত করে তার সে খ্যাতির পরিচয় দেয়। বর্তমানে ট্রেনের পিছন থেকে নল দিয়ে সুগন্ধী স্প্রে করে দেবার এমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, যাতে এক একটা স্থান অনুযায়ী গন্ধের তারতম্য ঘটানো সম্ভব হয়।

এব্যাপারে ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছে (বিরাটভাবে সব কিছু পরিকল্পনা না করলে যাদের মন ওঠে না) আমেরি[illegible]র এক সুগন্ধী ব্যবসায়ী। তার [illegible]ল্পনা হচ্ছে আগামী বড়দিনে সমগ্র [illegible]নকে সুরভিত করে তোলা। তার কোম্পানীর অভিপ্রায় হচ্ছে উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী গাল্ফ স্ট্রীম উপসাগরে দশ গ্যালন সুরভিত তেল ঢেলে দেওয়া। এই তেল গাল্ফ স্ট্রীমের প্রবাহে তাড়িত হয়ে আটলাণ্টিক অতিক্রম করার সময় তার সঙ্গে তিন শ পাউণ্ড রঙ মিশিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সুগন্ধী তেল ঠিকভাবে প্রবাহিত হয়ে বৃটেনের দিক যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য নিয়োজিত বিমানের সতত লক্ষ্যপথে থাকায় কোন অসুবিধা না হয়। গাল্ফ স্ট্রীম থেকে প্রবাহিত ঢেউয়ের গতি নির্ধারণ করে সুগন্ধী তেল জলে ঢালবার তারিখ নির্দিষ্ট করা হবে, যাতে ঠিক বড়দিনেই বৃটেনের উপকূলে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

সুরভিত বায়ুর প্রথম আস্বাদ পাওয়া যাবে স্কাই দ্বীপ ও আয়র্ল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে এবং স্থানীয় জল ও বায়ুপ্রবাহের গতি অনুসারে ঐ সুগন্ধী তেল হয় উত্তরের দিকে উপকূলে গিয়ে ঠেকবে, নয়তো ধীরে ধীরে আইরিশ সাগর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বৃটেনের বড়দিনকে সুরভিত করে তুলবে।

*

উত্তর মেক্সিকোর সান্তা ফে শহরে এক ব্যক্তি ওখানকার দৈনিক পত্রিকা 'নিউ মেক্সিকান'কে টেলিফোন করে নিজের পরিণয় বিজ্ঞপ্তিটির প্রকাশ বন্ধ করার জন্য বলতে গিয়ে উত্তর পায় বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গিয়েছে। তা শুনে সে মন্তব্য করে: 'আচ্ছা তাহলে তো ওকেই বিয়ে করতে হয়!'

*

লণ্ডনের এক অবিবাহিত যুবক এক যুবতীকে বিবাহ করার জন্য উনিশ শ' একত্রিশ বার প্রস্তাব পেশ করে, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর পর সপ্তাহখানেক সে চুপচাপ থাকার পর মেয়েটিই উৎসুক হয়ে ওঠে প্রস্তাব পেশ বন্ধ হবার কারণ জানবার জন্যে। লোকটিকে প্রশ্ন করতে সে তার ডায়রীর পাতা উল্টে উল্টে জানায় যে, উনিশ শ' একত্রিশ বার সে প্রস্তাব করেছে এবং প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মেয়েটি তখন আর একবার তাকে প্রস্তাব করতে বলে এবং এইবারের প্রস্তাবের পরেই মেয়েটি রাজী হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েদের বিবাহের জন্য প্রস্তাবের নানা বিচিত্র কাহিনী শোনা যায়।

একবার একটি জার্মান তরুণীর ছবি এক মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তার কাছে তিন হাজারটি বিবাহের প্রস্তাব এসে পৌঁছয় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে। কিন্তু মেয়েটি সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে লোকটি তার ছবিটি তুলেছিল সেই ফটোগ্রাফারকে বিবাহ করে। একাকিনী সমগ্র ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণের কৃতিত্বসম্পন্না এক মার্কিন মেয়ের কাছে এক হাজারটি বিবাহের প্রস্তাব আসে যার মধ্যে কয়েকজন রাজকুমারও ছিল। পঞ্চাশটি প্রস্তাব ছিল ভিন্ন ভাষাতেই। এক স্পেনীয় ষণ্ড-যোদ্ধা এমন নাছোড়বান্দার মতো বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতে থাকে যে শেষপর্যন্ত মেয়েটি তাকেই গ্রহণ করে। অনেক সময়ে কোন ব্যাপারে বিশেষ বাহাদুরী প্রকাশ করলে মেয়েরাই উপযাজিকা হয়ে প্রস্তাব পাঠায়। এক সুপুরুষ ফরাসী চল্লিশ দিন এক কাঁচের শো-কেসে প্রায়োপবেশন করার কৃতিত্ব দেখাতে ষাটটি মেয়ে তাকে বিবাহ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ভদ্রলোক অবিবাহিত থাকাই সিদ্ধান্ত করেন।

*

মিস ক্যারিন হলবার্গ নামে এমন একজন সুইডিস মহিলার কথা জানা গেছে যিনি পৃথিবীর বিচিত্রতম চাকরি করেন বলে দাবি জানিয়েছেন। তিনি উল্টনাস্থ প্ল্যাণ্ট সাইকলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে সুখেই চাকরি করছেন।

তাঁর কাজ কি জানেন? আলপিনের মাথার মত বড় গাছের পাতার একরকম পোকার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে অন্য পোকার দেহে সঞ্চালন। কন্দজাতীয় গাছের পাতায় এই জাতীয় পোকার চাষ করে তিনি প্রচুর আনন্দ পান। এই ধরনের পোকা গাছের পাতার কি ক্ষতি করে তাও তাঁর লক্ষ্যণীয় বিষয়। তিনি একের দেহ থেকে আনুবীক্ষণিক ফোঁটার এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে অপর দেহে সঞ্চালন করে দেন।

তিনি আশা করেন এই প্রক্রিয়া দ্বারা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায়, রক্তের মাধ্যমে না সংস্পর্শে তা তিনি বের করতে পারবেন।

এই পোকাগুলো কত বড় জানেন? এগুলো এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের ১ ভাগ মাত্র লম্বা। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এই পোকাগুলোকে রেখে একের দেহ থেকে রক্ত নিয়ে অপরের দেহে চালিয়ে দিতে হয়। মিস হলবার্গ এ কাজে এমনই অভিজ্ঞ হয়ে গেছেন যে প্রতিঘণ্টায় তিনি অন্তত ত্রিশটি পোকার দেহে রক্ত সঞ্চালন করতে পারেন। এই রক্ত সঞ্চালনে মাত্র শতকরা ৫টি পোকার মৃত্যু ঘটে। পোকাগুলি তাদের অবসাদ খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে পারে।

শ্রী নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন, বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যের দায়িত্ব সমগ্র ভারতের। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য মন্তব্য তিনি করেছেন। কিন্তু আমরা ভাবছি, ভাগের মা শেষ পর্যন্ত গংগা পাবেন তো!!"

• • •

কমুানিস্ট পার্টির মধ্যে ভাংগন ধরিয়াছে বলিয়া যে রটনার কথা আমরা শুনিতেছিলাম, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ তাহা

অস্বীকার করিয়াছেন। —"কিন্তু সাম্প্রতিক বন্যার সঠিক খবর যারা রাখেন, ভাংগন সম্বন্ধে তাঁদের মত কিন্তু অন্যরূপ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ, চীনারা তিব্বত হইতে নেপাল পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী একটু "কাব্য" করিয়া মন্তব্য করিলেন—"কিন্তু আমরা শুনেছি সে পথের শেষ তিব্বত-ই নয়, সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে, মানসলোকে, গানের শেষে!!"

• • •

আমাদের কাগজ "আনন্দবাজার"এ আমরা "ছেঁড়া কাগজের দাম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। ছেঁড়া কাগজ কী কী কাজে লাগে, সেই সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা হইয়াছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"জনসাধারণের চেয়ে দেশের সরকার এবিষয়ে অবহিত হলে একটা কাজের কাজ হয়। জনসাধারণের আবেদন নিবেদনের আরজিগুলো সরকারী দপ্তরে পৌঁছামাত্র ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়। সুতরাং ছেঁড়া কাগজের কারবারে সরকার বেশ দু'পয়সা কামাতে পারেন।"

• • •

শুনিলাম চার্চ অব ইংলণ্ড মানুষের আত্মহত্যার অধিকার সমর্থন করিয়াছেন। —"মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের কথা ছেড়ে দিলেও জাতিতে জাতিতে আজ দেখছি আত্মহত্যার তোড়জোড় চলছে। সুতরাং আত্মহত্যার সমর্থন সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে যুগধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই, চার্চ অব ইংলণ্ড নিমিত্ত মাত্র"—মন্তব্য—বিশুখুড়ো।
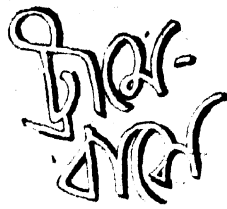
• • •

সাম্প্রতিক রাজ্যপাল সম্মেলনে জাপানী প্রথায় নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"কিন্তু নির্বাচনের মতো বেরং কমে খরচপত্রেরই যদি না হবে, তবে আর জলুস কোথায়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

লণ্ডনে দেওয়ালী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"লণ্ডন সরকার ছুঁচোবাজি

নিষিদ্ধ করেছেন কিনা, সে সংবাদ পাইনি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

নদীয়া জেলার প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, গবাদি পশুর জন্য সরকার যে খাদ্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সংগে এই নির্দেশ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই খাদ্য শুধু বলদের জন্য। বিশুখুড়ো বলিলেন—"গাই মোষ ষাঁড় বকনাদের কথা না বলে শুধু বলদের জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হলো, তা বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত এটা "জোড়া বলদের" প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র, কে জানে!!"

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম, সাদা হরিণ একমাত্র ভারতবর্ষেই ছিল। সেই সাদা হরিণ প্রথমে চেকদের দেশে রপ্তানি করা হয়। সাম্প্রতিক খবর—সেই চেক দেশ হইতেই আবার ভারতে সাদা হরিণ আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে।—"সাদা হাতী পোষার দেশ ভারত, সুতরাং মোরা কি ডরাই সখি ভিখারী হরিণে"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

পাকিস্তানের প্রথম বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে জেনারেল আয়ুব খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন,—গণতন্ত্র জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশু-

খুড়ো বলিলেন—"আশা করি, গণতন্ত্র রেজিস্টার্ড ডাকে উইথ একনলেজমেণ্ট ডিউ করেই পাঠানো হয়েছে!!"

• • •

সাম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পুলিস কমিশনারের সংগে এরিয়ান-মহমেডান ক্লাবের মাঠে উপস্থিত হইয়া দুই ক্লাবেরই কর্মকর্তাদের ডাকিলেন। সবাই ভাবিলেন, এবারে তাহা হইলে হয়ত স্টেডিয়ামের ব্যাপারে একটা এস্পার-ওস্পার হইয়া যাইবে। কিন্তু পরে মন্ত্রী মহাশয়ের বাচনিক জানা গেল যে, স্টেডিয়াম নয়, তিনি "রামলীলার জন্য স্থান নির্বাচনে বাহির হইয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাই বল, কোথায় রাম, আর কোথায় রামছাগল!!!"

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রা হাউস-এ ১প-১৫, দরগা রোড, পার্ক সার্কাস-এর আর্ট অ্যাকাডেমীর সভ্য সভ্যাদের উদ্যোগে একটি চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। উক্ত অ্যাকাডেমীর সভ্য সভ্যাদেরই চিত্রকলা সাজিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অ্যাকাডেমীর সভ্য সভ্যারা চিত্রকলা শিক্ষা করেন শ্রীমতী নমিতা দত্ত এবং চন্দ্রনাথ দে এই দুজন শিল্পীর কাছ থেকে। শ্রীচন্দ্রনাথ দের চিত্রকলার কোনও প্রদর্শনী আমরা পূর্বে দেখি নি। ইনি সত্যই শক্তিমান শিল্পী। এঁর প্রতিটি চিত্র থেকেই পরিণত কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর রচনা অনুকারক নয় ব্যঞ্জক এবং ছান্দসিক। এঁর ছাত্রছাত্রীদেরও রচনা এই জাতের।

শ্রীমতী নমিতা দত্তের রচনা আমরা এর আগে দেখেছি এবং প্রশংসাও করেছি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিণত কলা-কৌশল দেখিয়েছেন নিলুফার আবদুল্লা। নিলুফার আবদুল্লার মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এঁর রসবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। তুলি এবং বর্ণের ওপর এঁর দখল পরিণত শিল্পীদের মতনই। 'ইভনিং প্রেয়ার' রচনাটিই এঁর রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। এছাড়া, 'ফিশারম্যান অ্যান্ড জেনাই', 'পশারিনী' 'হ্যান্সেল অ্যান্ড গ্রেটেল' এবং 'হিলশা ফিশ' এ ক'টি রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতসী রায়ের মহিষমর্দিনী, বিভা রায়ের 'স্টিল লাইফ', সোফিয়া সুজার 'বাসবদত্তা' অনুপা করের 'ক্রুসিফিকেশন', সপ্রা রায়ের 'অ্যালিস', মায়া ঘোষের 'কাশ্মীর মহিষী করুণা' এ ক'টি চিত্রকলাও ছাত্রছাত্রীদের রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রনাথ দের 'মেলডী অব স্প্রিং' ছবিটি আমার ব্যক্তিগত বিচারে এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ রচনা। এমন উচ্চমানের মিনিয়েচার খুব কমই দেখা যায়। এছাড়া, 'হোলী', 'পৃথিরাজ ও সংযুক্তা' এবং 'পার্থ সারথী' এই ক'টি ছবিও প্রশংসনীয় রচনা। নমিতা দত্তের তিনটি রচনার মধ্যে 'চেস প্লেয়ার' রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই আর্ট অ্যাকাডেমীতে লক্ষ্য করা গেল কেবলমাত্র ভারতীয় ধারা ছাড়া অন্য কোনও রকম চিত্রবিদ্যা চর্চা করা হয় না। ভারতীয় ধারা যথার্থই মহান সেকথা স্বীকার করলেও একালকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সেকালকে আঁকড়ে ধরে থাকার স্বপক্ষে কোনও যুক্তি আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করতে পারি না। সেকালের ভিত্তির ওপর একালের আর্টের প্রতিষ্ঠাই হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। সেকালের আর্ট-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনভাবে একালের উপযোগী আর্ট রচনা যে শিল্পী করতে পারেন তাকেই রসিকেরা সার্থক শিল্পী বলে আর্টের দরবারে আসন দেন। সেকালের আর্টকে অনুকরণ করে চলায় সার্থকতা কি? শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তবে একটা সার্থকতা আছে লক্ষ্য করা যায়—এইসব প্রাচীন ধারায় রচনা করলে ছবি বিক্রী হয় বেশ। বিদেশী খরিদ্দার যাঁরা আসেন এখানে ভারতীয় 'কিউরিও' সংগ্রহ করতে তাঁরা তো খরিদ করেনই, তাছাড়া কিছু ফ্যাশনেবল ভারতীয়ের ঘরে গিয়েও ওঠে এসব ছবি। কিন্তু জাতীয় শিল্পের প্রগতির কাজে এ আর্ট কতটুকু লাগে? পাশ্চাত্য আর্টকে অনুকরণ করা যতটা বোকামি ভারতশিল্পের পুনরাবৃত্তিও ততটাই বোকামি বলে মনে করি আমরা। স্বাধীনভাবে রচনা করার স্বাভাবিক আনন্দও পাওয়া যায় না এতে।

যাই হোক, আশা করি ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন ধারার চিত্রকলা দেখতে পাব। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি সুতরাং এমন কিছু শিল্প যা একালের ভারতের শিল্প ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারে তা এঁরা ভবিষ্যতে দিতে পারবেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

ক্রুসিফিকেশন —অনুপা কর

গত রবিবার দিল্লিতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী তাঁর যে-বক্তৃতা করেছেন তাতে সীমান্তে ভারতের উপর চীনা আক্রমণ সম্পর্কে অনেক কথা ছিল, কিন্তু নূতন কথা বিশেষ কিছু ছিল না। ভারতের কোনো অংশে বিদেশীরা এসে গেড়ে বসবে এটা কখনই আমরা সহ্য করব না। ভারতভূমিকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে। ভারত কারো ভয়ে তার কোনো ন্যায্য দাবি কখনই ছাড়বে না—ইত্যাদি কথা পূর্বেও অনেকবার শুনো গেছে। বস্তুতপক্ষে ভারত যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনুরূপ অবস্থায় পড়লে যে-কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষই এইরকম কথা বলতেন। চীনাদের হাতে ভারতভূমির অংশবিশেষ থেকে আমরা বেদখল হয়ে যাব এবং তার জন্য আমরা কিছু করব না—এমন কথা আমাদের সরকারী কর্তারা কখনো বলবেন এরূপ কেউ কোনোদিন ভাবে নি বা ভাবে না। "মারবে মারবে, তাই বলে ধাক্কা দিচ্ছ কেন?" বলে যারা পশ্চাৎপদ হয় তারাও কখনো বলে না যে, তারা দেশরক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর নয়। দেশের ভূমির জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দরদ আর কারোর চেয়ে কম এরূপ সন্দেহ করারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে—আক্রমণকারী চীনাদের ভারতভূমি থেকে হটিয়ে দেবার কী ব্যবস্থা হচ্ছে? কর্তাদের ইচ্ছা কী তা নিয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন, ধরে নেওয়া গেল যে সাধারণ অসাধারণ সকলেই ভারতভূমি রক্ষা যে কর্তব্য এ বিষয়ে একমত। সেই কর্তব্য কীভাবে পালিত হচ্ছে সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। দুঃখের বিষয়, এই প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলতে গেলেই জওহরলালজী চটে উঠছেন। শুধু চটে উঠছেন না, চটে উঠে এমন সব কথা বলছেন যেসব কথা ছেলেমানুষদের ঝগড়ায় শোভা পেতে পারে কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারের মুখে সেটা অত্যন্ত বেমানান ঠেকে। চীনারা এসে যেসব জায়গা দখল করেছে সেগুলো দুর্গম জায়গা, সেখানে যুদ্ধ করা সহজ কাজ নয়। একথা সকলেই জানে, কিন্তু তাই বলে এ কেমন কথা যে, চীনাদের হটাবার জন্য এদিক থেকে আরো চাপ দেওয়া হচ্ছে না কেন, এরূপ প্রশ্ন করা মাত্রেই জওহরলালজী চটে উঠে প্রশ্নকারীর উদ্দেশে বলবেন যে, নিজেকে যুদ্ধে যেতে হবে না বলেই ঐরকম দুর্গম স্থানে যুদ্ধ করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এই যদি স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকারী সমালোচনার প্রতি সরকারী কর্তাদের গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতার নমুনা হয় তবে "বল্ মা, তারা, দাঁড়াই কোথা?" চীনারা যে জায়গায় এসে ঘাঁটি করতে পেরেছে সে-জায়গা ভারতীয় সৈন্যের পক্ষে অগম্য কেন হবে বুঝা যাচ্ছে না। একটু তলিয়ে দেখলে দেখব যে, পণ্ডিতজী যা বলেছেন তাতে সমালোচকদের যতটা উপহাস করার চেষ্টা হয়েছে তার চেয়ে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে বেশি অপমানিত করা হয়েছে, যদিও মনে হবে যেন সৈন্যদের প্রতি দরদের জন্যই কথাগুলি বলা হয়েছে। চীনা সৈন্যরা যা পারছে ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে সেটা করা কষ্টকর এরূপ ইঙ্গিত যে-কথার ভিতর থেকে বার করা যায় সেটা ভারতীয় সৈন্যদের

পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়। আর যদি ষোল সতেরো হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে কর্তব্য পালনের কষ্ট থেকে আমরা ভারতীয় সৈন্যদের বাঁচাতে চাই তাহলে অত উঁচু সব জায়গার দাবি রাখাই বা কেন? বলে দিলেই তো হয়, ৭।৮ বা ১১।১২ হাজার ফুটের চেয়ে কোনো উঁচু জায়গা আমরা রাখতে চাই না, যে-চাও নিয়ে যাও। আসলে কর্তৃপক্ষ এমন কোনো আলোচনাই চান না যাতে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণগুলি ধরা পড়তে পারে। চীনারা লাদাকের মধ্যে হঠাৎ এসে ঢুকে পড়ে নি, কয়েক বছর ধরে তারা এখানে সেখানে ঢুকেছে এবং গেড়ে বসার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে। তৎকাল ভারত সরকার কী করেছিলেন? ভারতীয় সৈন্যদের দুর্গম স্থান রক্ষা করার ক্ষমতা অক্ষমতার কথাই ওঠে না। চীনা সৈন্যরা যা পারে ভারতীয় সৈন্যরা নিশ্চয়ই তা পারে। কিন্তু তাদের সে কার্যে লাগালে তো তারা তা পারবে! এখানে দায়িত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণ সরকারের—দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক ব্যাপারাদির কর্তৃত্ব যে-মন্ত্রীদের হাতে তাঁদের। চীনারা যদি হঠাৎ এসে একদিন লাদাকে ঢুকে পড়ত তাহলেও বা একটা কথা ছিল। কিন্তু ঘটনা তো তা নয়। চীনারা তো কয়েক বছর ধরে একরকম "নোটিস" দিয়ে দিয়ে এগিয়েছে। আমাদের সরকার যদি সে "নোটিস" দেখেও না দেখে থাকেন, অথবা ভাষার উল্টো ব্যাখ্যা করে নিশ্চিন্ত থাকেন তবে সে দোষ কার?
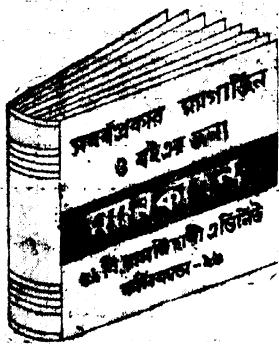
গত রবিবারের বক্তৃতায় পণ্ডিতজী একটি কথা বলেছেন, যেটি তাঁর মুখে অদৃষ্টের পরিহাসের মতো শুনায়। জওহরলালজী পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীর সকলে আজ শান্তির দিকে চলেছে, কেবল চীন ছাড়া! আর এই চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং জওহরলালজী ছিলেন পাঁচ বছর আগে "পঞ্চশীলের" যুগ্ম প্রচারক। আজ ভারতের সম্মুখে যে-সমস্যা উপস্থিত সেটাকে একদিক দিয়ে "পাপের ফল" বলা যায়। কারণ স্মরণ রাখতে হবে যে, "পঞ্চশীলের" প্রথম আবির্ভাব হয় ১৯৫৪ সালের তিব্বত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তির মুখবন্ধরূপে। অর্থাৎ "পঞ্চশীল" উচ্চারণ করে ভারত সরকার তিব্বতকে চীনের অংশ বলে স্বীকার করে নেন। তারপরের ঘটনাবলী সর্বজনবিদিত। সেইজন্য মনে হয় যে, "পঞ্চশীলের" জন্মের মূলে পাপ! পাপ যদি গোপন রাখার চেষ্টা হয় তাহলে তার বিষক্রিয়া আরো বাড়ে। ১৯৫৪ সাল থেকে অর্থাৎ যে-কালে তিব্বত-সম্পর্কিত চুক্তি হয়েছে সেই সাল থেকেই ভারত-তিব্বত সীমান্তে চীনারা গোলযোগ শুরু করেছে। চীনাদের কার্যে যে-কোনো গভর্নমেণ্ট সচেতন হয়ে উঠতেন এবং প্রতিষেধকের ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিতেন। কিন্তু আমাদের সরকার যে চীনের মুখে "পঞ্চশীলের" ভিত্তিতে তিব্বতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জলাঞ্জলির মন্ত্র পড়েছেন। চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই কোন মুখে বলেন যে, চীনারা তিব্বত পেরিয়ে ভারত-ভূমিতেও ঢুকতে আরম্ভ করেছে। মনে রাখতে হবে, সে সময়ে বান্দুং সম্মেলন পর্যন্ত হয়নি। তার আগেই চীনারা লাদাকে থাবা মারতে আরম্ভ করেছে। ভারত সরকার সব চেপে গিয়েছেন, জনসাধারণ তো বটেই, পার্লামেণ্টকে পর্যন্ত বছরের পর বছর কিছু জানতে দেওয়া হয়নি। পণ্ডিতজী চীন প্রধানমন্ত্রীকে গত ২৬ সেপ্টেম্বরের পত্রে লিখেছেন যে, উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাতে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়, যাতে দুই গভর্নমেণ্টের মধ্যে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিবাদগুলি নিষ্পত্তি হতে পারে এই আশাতেই ভারত সরকার পার্লামেণ্টের কাছ থেকে এইসব ব্যাপার গোপন রেখেছিলেন! তিব্বত চুক্তির ফল এবং "পঞ্চশীলের" ব্যর্থতা ঢাকাও ভারত সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বলে অনুমান করা আরো অনুচিত হবে না। সেইজন্যই বলছিলাম যে, ভারত সরকার পাপ গোপন করে তার বিষক্রিয়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। যে-সব ঘটনা ভারত সরকার গোপন রেখেছিলেন সেগুলো চীনের মুখোশমাত্র নয়, সেগুলো প্রকাশ হলে ভারত সরকারের তিব্বত সম্পর্কিত নীতি এবং "পঞ্চশীল" বুলির পিছনে যে মিথ্যা ছিল সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ত। ভারত সরকার সেই লজ্জা যতদিন পেরেছেন চেপে রেখেছেন, তাতে পাপের ফল আরো বিস্তৃত হয়েছে। তাই এই পাঁচ বছরের হিসাবের দাবি ঘেঁষে কোনো প্রশ্ন কেউ করলেই আজে-বাজে এবং অশিষ্ট কথা বলে তা চাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

২।১১।৫৯

সাহিত্য প্রসঙ্গ

চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ—সত্যকিঙ্কর সাহানা। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা—২৯; দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

চণ্ডীদাস একজন, কী একাধিক, তাঁর বাসস্থান বাঁকুড়ায় কী বীরভূমে—এই প্রশ্ন বহু বিতর্কিত। আলোচ্য গ্রন্থে সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় বাঁকুড়ার অনতিদূরস্থ ছাতনায় চণ্ডীদাস কিংবদন্তীর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। একদিকে কিংবদন্তী অন্যদিকে পুঁথিগত প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসই আদি চণ্ডীদাস। পরে "তাঁর খ্যাতি বহুদূরে প্রসারিত হইবার পর বহু কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং পদের ভণিতায় আদি চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ-চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া মেকী পদগুলিকে খাঁটি চণ্ডীদাসের পদরূপে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" আর এই চণ্ডীদাসের বসতি ছিল ছাতনায় এবং তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিলেন ঐ গ্রামেরই বাসলী দেবী। এই প্রসঙ্গে রামী রজকিনী ও বড়ু শব্দ সম্বন্ধে সাহানা মশাই যা লিখেছেন তা-ও প্রণিধানযোগ্য। "বড়ু শব্দটি চণ্ডীদাসের যেমন প্রিয় ছিল তাহাতে মনে হয় তিনি উহা বটু, শব্দের অপভ্রংশ এবং ব্রহ্মচারী অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।" অন্যত্র, "রামী রজকিনীর সহিত চণ্ডীদাসের সহজসাধনার কাহিনীকে পরবর্তীকালের কোন কোন লোকের কল্পনা-কল্পিত নিছক রূপকথা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারা যায় না।"

চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গে সাহানা মশাই যে বিচিত্র তথ্যসম্ভার ও যুক্তিমালা উপস্থিত করেছেন, তা চণ্ডীদাস কিংবদন্তী সম্বন্ধে পাঠকমাত্রেরই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

২২৩।৫৯

শকুন্তলা রহস্য—সত্যকিঙ্কর সাহানা। জিজ্ঞাসা—কলিকাতা—২৯। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের মননশীল ব্যাখ্যা সহযোগে সহজ সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ আলোচ্য গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু। এ একাধারে সাহানা মশাইয়ের পাণ্ডিত্য ও মনীষার এবং তাঁর সরস প্রকাশভঙ্গী ও রচনাশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শন। মূল কাব্যের কবিত্বমাধুর্য ও ভাবগৌরব এই অনুবাদে যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে, সে কথা অসংকোচে বলা যায়।

বইখানির পরিশিষ্টে "কালিদাসের ফুল" শীর্ষক যে নিবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়েছে, সেটি বইখানির একটি বড় আকর্ষণ। পণ্যবাণ ও ঋতুকুসুম এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে কালিদাসের রচনায় উল্লিখিত ফুলগুলোর যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন, বাঙলার বনেবাদাড়ে তাদের যে সন্ধান তিনি আমাদের জানিয়েছেন, তা তাঁর অপূর্ব মৌলিকতার সাক্ষ্য বহন করছে।

২২৭।৫৯

সাহিত্য ও পাঠক। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। কল্লোল প্রকাশনী, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

অনেকের ধারণা বৈজ্ঞানিক বিষয়কে অধিগত করার জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন আছে, সাহিত্য পাঠের জন্য সে রকম কোনো প্রস্তুত শিক্ষার দরকার নেই। সাহিত্য সকলেরই উপভোগের বস্তু—এ কথা সত্য হলেও সাহিত্যভোগের মাত্রাভেদ নিশ্চয়ই আছে। একটি লোমহর্ষক উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠের আনন্দ নিশ্চয়ই একজাতের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দিষ্ট সাহিত্যপাঠের পদ্ধতিতে শৌখিন-রসিকরা যতই অবজ্ঞা করুন না কেন বিশেষ শিক্ষা পাঠকমনকে মার্জিত, শাণিত এবং গ্রহণক্ষম করে তোলে, যার ফলে সূক্ষ্ম এবং স্থূলের প্রভেদ বুঝতে পারা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। ছাত্র প্রস্তুত করবার পদ্ধতি হয়তো বহু ব্যবহারে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে তবু এই পদ্ধতির যে মূল্য আছে—এ কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য গোপন রাখেননি। বিশেষ করে ছাত্রদের জন্যই যে বইখানি রচিত এ কথা ভূমিকাতেই বলে দিয়েছেন। তাঁর এই অকপট উক্তির প্রশংসা করি। অবশ্য ছাত্র বলতে কলেজে অধ্যয়নরতদের কথাই শুধু বলছি না—যাঁরা সত্যই সাহিত্যের রসরহস্য জানতে চান অলংকারের ভাষায় যাঁরা 'সহৃদয়' হতে চান—তাঁদের সকলেরই এই বইটি কাজে লাগবে। দুটি প্রধান ভাগ 'সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ' এবং 'সাহিত্যের নানা বিভাগ' এই দুই পর্যায়ে লেখক সাহিত্যের প্রায় সব দিকই আলোচনা করেছেন। আলোচনাপদ্ধতিতে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় দু রকম সমালোচনা ধারাকেই সমান মূল্য দিয়ে ছাত্রদের জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মোটামুটি লেখক আধুনিক সমালোচনারীতিরই পক্ষপাতী—সাহিত্যের বৈচিত্র্যসন্ধান, বিভিন্ন সমস্যার উত্থাপন এবং আলোচনায় সেটা বুঝতে পারা গেল। সাহিত্যজিজ্ঞাসায় দীক্ষিত করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। কিন্তু উপরি পাওনাও আছে—লেখকের উদার দৃষ্টি। ব্রজেনবাবুর দিক্‌নির্দেশে প্রাচীন এবং আধুনিক কোনো সাহিত্যের পথে যেতেই বাধা ঘটবে না।

৩২৯।৫৯

উপন্যাস

পলিমাটি নোনাজল॥ যজ্ঞেশ্বর রায়। পরিবেশণাঃ কারেণ্ট বুক সপ, ৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্যঃ ২·২৫ ন প।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র একটি চরের পরিবেশকে কেন্দ্র করে উপন্যাসখানি রচিত। স্বভাবতই উপন্যাসের মধ্যে যে সব চরিত্র চলাফেরা করে বেড়িয়েছে তাদের অধিকাংশদের সাথে বাঙালী পাঠকের পরিচয় নিতান্ত অল্প। অপরিচিত জগৎ, অপরিচিত পরিবেশ, কিন্তু মানুষের চিরন্তন সত্য একই খাতে বর্তমান। সুখ-

দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালবাসা সব কিছু মিলিয়ে যে মানুষ, সেই মানুষ আদৌ অপরিচিত নয় এখানেও। লেখকের সার্থকতা এখানেই। কেবলমাত্র অপরিচিত জগতকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে দেওয়াটাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, প্রমাণ তার কাহিনীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে স্পষ্ট।

কোন এক বিদেশী সার্ভেয়ারের নাম অনুসারে উপরিউক্ত চরের নাম চর নিউটন। এর অধিবাসীরা সকলেই বহিরাগত। কেউ এসেছে সুদূর মগ মুল্লুক থেকে, কেউ মারোয়াড়, কেউ বা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। মাশোয়ে এমনি এক মগ-কন্যা, কাহিনীর কেন্দ্রমণি। মাশোয়ের নারীত্ব হল সেবা, প্রেম এবং স্নিগ্ধ কোমলতায়। সমস্ত আখ্যানবস্তু জুড়ে এই চরিত্রটি তাই উজ্জ্বল, সার্থক। অন্য দিকে রতনলাল এবং রমজান আলি। রতনলাল কলকাতার কলেজে শিক্ষিত এক যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র যুবক। সভ্য জগৎ থেকে ছিটকে এসে মাশোয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। রমজান আলি অশিক্ষিত এক শুলুকের সারেঙ। মাশোয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষী। সুস্থ, পরিশ্রমী, বীর। ভোগের ইচ্ছা থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি সারেঙ, কিন্তু রতনলালের হাত থেকে কৌশলে মাশোয়েকে ছিনিয়ে নেওয়ার পরও তার ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে অজস্র প্রতিবন্ধক এসে দাঁড়ায়। শুধু রমজান কেন, মানুষের জীবনের চরম ট্রাজেডিই তো এই। যে পলিমাটির ওপর সোনার ফসল ফলাবার আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হয় মানুষ, তার চতুর্দিকে সহস্র জিহবায় লেলিহান হয়ে থাকে লোনাজলের অস্থির আক্রোশ। পলিমাটি লোনাজলের নামের সার্থকতা এখানেই।

যজ্ঞেশ্বর রায় সাহিত্য জগতে সম্প্রতি পরিচিত। এই উপন্যাসটি পাঠ করে আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

৩৩৪।৫৯

নাটক

অপরূপের নকসা—(একাঙ্কিকা প্রহসন) শ্রীঅপরূপ। প্রকাশিকাঃ বীণাপাণি দেবী; ১৯, টউ দমদম রোড, কলিকাতা—৩০ ১-৫০ নয়া পয়সা।

স্বভাবতই কৌতুক নাটিকার প্রতি আমাদের আকর্ষণ প্রবল। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনখানি আমাদের আশা সফল করতে পারে নি। তনুশ্রীর বিবাহের জন্যে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন একের পর এক ব্যারিস্টার, হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, দার্শনিক, অভিনেতা, কবি ইত্যাদি। কিন্তু কেউ মনোমত নয়, তাই অবশেষে তনুশ্রী তার দাদু রামতনুর গলাতেই মাল্যদান করে। অনেক সুযোগ ছিল এই প্রহসনে। সংলাপ আরো তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিপ্রসূত হওয়া প্রয়োজন ছিল। পরিণতিও সুসংগত হয় নি।

২৬৯।৫৯

জেবউন্নিসা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০ মূল্য—১-২৫ নয়া পয়সা।

ঔরংগজেবের কন্যা জেবউন্নিসার জীবন-কাহিনী এই নাটকের উপাদান। তাছাড়া, এই নাটকে বিশেষভাবে ঔরংগজেবের কূট রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাই। মাঝে মাঝে তার পিতৃহৃদয় উঁকি দেয় বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে কর্তব্যনিষ্ঠ, হিন্দুবিদ্বেষী, অত্যাচারী ইসলামধর্ম-রক্ষক মূর্তি প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, বীর কিষণচাঁদ ও তার প্রণয়িনী লছমীর অপূর্ব চরিত্র আমাদের মুগ্ধ করে। ফুলজানি, কমলাবাই প্রভৃতি চরিত্রও মনে ছাপ রাখে। মেহেবউন্নিসা পাঠকচিত্তে স্নিগ্ধ ভাব জাগায়। সর্বোপরি দেখতে পাই মহীয়সী সেবাপরায়ণা নিষ্ঠাবতী নারী কবি জেবউন্নিসাকে। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে গ্রন্থখানি সার্থক।

৩০৪।৫৯

বক-বধ পালা—লীলা মজুমদার। বলাকা প্রকাশনী; ২৭ সি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ১-২৫ নয়া পয়সা।

বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার স্বনামধন্যা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যে জাজ্বল্যমান। তাঁর লেখনী-স্পর্শে তুচ্ছ ও সামান্য বিষয় যেমন মহনীয়তা লাভ করে, তেমনি কল্পনার গুণে তিনি পাঠক-হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

মহাভারতের একটি সামান্য কাহিনীকে বেছে নিয়ে শ্রীযুক্তা মজুমদার ছোটদের উপযোগী করে বক-বধ পালা নাটকখানি লিখেছেন। ভীম বকরাক্ষসকে কিভাবে বধ করেছেন, এই হচ্ছে কাহিনী। কিন্তু লেখিকার রচনাশক্তির ঐশ্বর্যে এটি একটি চমৎকার নাটক হয়ে উঠেছে। ছোটদের অভিনয় তো ভাল লাগবেই, বড়রাও তা দেখে এবং কেবলমাত্র নাটকখানি পাঠ করেও অপরিসীম আনন্দ পাবেন। তাছাড়া কবিতা, গান, সংলাপ সব দিকেই শ্রীযুক্তা মজুমদারের কৃতিত্ব মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। পঞ্চ-পাণ্ডব, কুন্তী, হিড়িম্বা ও রাক্ষসেরা যথেষ্ট আমোদ সৃষ্টি করে। শ্রীযুক্তা মজুমদারের কাছে এই ধরনের ছোটদের নাটক আরো প্রত্যাশা করি।

৩১৪।৫৯

শ্রীচৈতন্যবিজয় বা নাম মহিমা—শ্রীভবানী ভট্টাচার্য। লেখক কর্তৃক ১৬, চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন, কলিকাতা-২ হইতে প্রকাশিত। দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ধর্মমূলক নাটক। এই নাটকে ভক্ত হরিদাসের চৈতন্যপ্রীতিকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। মূলত নাটকটি স্ত্রীভূমিকা বর্জিত। কিন্তু শৌখিন বা পেশাদারী নাট্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কয়েকটি পরিশিষ্ট দৃশ্য যোজনা করে লেখক স্ত্রীভূমিকা স্থান দিয়েছেন। এই নাটকের সংলাপাংশ স্থানে স্থানে এতো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যে এটি কতোটা অভিনয়োপযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে।

৫০৫/৫৮

শারদ-সাহিত্য

উন্মেষ—কান্তি গুপ্ত কর্তৃক 'উন্মেষ সাহিত্য আসর' সি আই টি বিল্ডিংস, কলিকাতা—১০ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

'উন্মেষ'র শারদীয়া সংখ্যায় খ্যাত-অখ্যাত অনেক লেখকের লেখা স্থান লাভ করেছে। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'প্রাচীন ভারতে শিল্প-সাধনা' প্রবন্ধটি এবং পরিমল গোস্বামী, মিহির সেন, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প কৃষণ চন্দরের রস নক্সা এবং কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ রায়, ধনঞ্জয় দাশ, তরুণ সান্যাল প্রভৃতির কবিতা এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা।

শারদীয়া বিশ্ববার্তা—সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ৪৪।১, গড়চা রোড, কলিকাতা—১৯। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

গল্প কবিতা, প্রবন্ধ এবং রম্য রচনায় বিশ্ববার্তার শারদীয়া সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ কালিদাস নাগ, প্রমথ বিশী, মনোজ বসু, ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, কালিদাস রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনায় বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। দু'একটি কবিতা ছাড়া অন্যান্য কবিতাগুলির মোটেও প্রশংসা করা গেল না।

গন্ধবণিক—শ্রীনারায়ণ কুণ্ডু ও শ্রীহারাধন দত্ত সম্পাদিত। ৬৭।১।১, হ্যারিসন রোড, কলিঃ—৯ থেকে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা

এটি গন্ধবণিক সভার মুখপত্র। পরিচিত ও অপরিচিত অনেক লেখকের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস রায়, ভারতী দত্ত ও বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা উল্লেখযোগ্য।

সোসাইটি—সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু ঘোষ ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ১৮, বাবুরাম শীল লেন, কলিকাতা ১২। মূল্য দু' টাকা। সম্পাদক, সহঃ সম্পাদিকা, পরিচিত

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কতক এমেচার অভিনয়-শিল্পীর সংগে কিছু চিত্রতারকার ছবি এবং দু একজন পরিচিত, স্বল্পপরিচিতদের বিভিন্ন রচনা এবং নরেশনাথ মৈত্রের "শাশ্বতী" উপন্যাস সংখ্যাখানির আকর্ষণ।

জনমত—সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ী। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

এই শারদীয় সংখ্যাখানি মফঃস্বলের সাহিত্যসেবীদের নিষ্ঠা ও উৎসাহের পরিচায়ক। লেখকদের সকলেই স্থানীয় অধিবাসী এবং এদের মধ্যে সম্ভাবনাপূর্ণ কৃতিত্ব কয়েকজনের মধ্যে পাওয়া যায়।

জেনা—সম্পাদক শ্রীশিবভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহামায়া সাহিত্য মন্দির, ৬, চাটার্জিপাড়া লেন। সেওড়াফুলি, হুগলী। মূল্য [illegible]।

সম্পাদকের এই শারদীয়া সংখ্যাটিতে নবীন ও স্বল্পখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা আছে।

জাগৃহি—সম্পাদক জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible], [illegible]। মূল্য—১[illegible]।

[illegible] এই সংখ্যাটির প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি রচনাগুলিই সমৃদ্ধ। নবীনদের সাথে [illegible] সব প্রতিষ্ঠাবান [illegible] এবং [illegible] তাঁদের [illegible]—[illegible], নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, [illegible] মিত্র, আশা দেবী, নরহরি কবিরাজ প্রভৃতি।

রবিবারের আড্ডা—সম্পাদিকা [illegible]। [illegible] লেন, কলি—২৬। মূল্য ২·৫০ নঃ পঃ।

এই শারদ সংখ্যাটিতে নবীনদের সাথে যে সব প্রবীণ লেখকের বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে তাঁরা হলেন—কুমারেশ ঘোষ, গোপাল ভৌমিক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, [illegible] বসু, [illegible] মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ সেন, রেজাউল করিম প্রভৃতি। এদের সূচীতে দেখা গেল রচনারই নাম, লেখকদের নাম নয়।

আরোগ্য (আশ্বিন ১৩৬৬)—সম্পাদক ডাঃ সুশীলকুমার বসু। ১৩৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৫০ নঃ পঃ।

রোগের উৎপত্তি ও তাহার চিকিৎসা, খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানাবিধ গবেষণামূলক প্রবন্ধে আলোচ্য সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডাঃ কমলাময় ভট্টাচার্য, ডাঃ নিরঞ্জন ভদ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্‌গণের কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফসল—সম্পাদক—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া হাওড়া থেকে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি—[illegible] গুহ, শিবনারায়ণ রায়, গুরুদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতির প্রবন্ধ, বিষ্ণু দে, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, আনন্দ বাগচী প্রভৃতির কবিতা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প এবং ইহা ছাড়া বহু উদীয়মান লেখকের প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পসম্ভারে বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে। [illegible] বসু ও ইন্দু দুলালের [illegible] উল্লেখযোগ্য। [illegible] প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অংকন প্রশংসনীয়।

নবান্ন—সম্পাদক [illegible] ভট্টাচার্য। ১০।১, ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা—৩৬। মূল্য এক টাকা।

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডাঃ [illegible] ভট্টাচার্য এবং [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, [illegible] ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, [illegible] বসু, [illegible]প্রসাদ ভট্টাচার্য, [illegible] সরকার এবং অন্যান্য লেখকের ২৫টি কবিতা, [illegible] আচার্যের একটি গল্প ও একটি নাটিকা বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় স্থানলাভ করিয়াছে।

বীথিকা—সম্পাদকমণ্ডলী—[illegible], অমরী পাল, গোপালচন্দ্র [illegible], সুধীর [illegible] ও [illegible] চক্রবর্তী। [illegible] হইতে প্রকাশিত। দাম আট আনা।

[illegible] লেখকের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, রম্যরচনা এবং নাটকের সমাবেশে এই শারদীয়া সংখ্যাখানি [illegible] পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। লেখকগণের মধ্যে প্রবোধ [illegible] বসু, [illegible]নাথ সাহা—গল্প অবনীমোহন পাল, তারাপদ চক্রবর্তী—কবিতায় শুভেন্দু বসু, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও চিত্তরঞ্জন সাহা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রচ্ছদ ফটো মনোরম।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

পুষ্পলাবী—[illegible] বসু।
পাড়ি—সুশীল সিংহ।
লীলা-কমল—শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার।
পথ আরও দূর—রণজিৎকুমার সেন।
টাপুর-টুপুর—শ্রীমোহিত ঘোষ।
বড় সাহেব—পরিব্রাজক।
রাত্রি-বিলাপ—পরিব্রাজক।
হাসির গল্প—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।
অন্য কোনখানে—সৌরীন সেন।
গীত সঞ্চয়ন—শ্রীহরিহর রায়।
প্রেমের গল্প—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রচ্ছদ পট—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
মানুষ এলো কোথা থেকে—শ্রীঅমলেন্দু সেন।
ম্যাজিক করা কঠিন নয়—যাদুরত্নাকর—এ সি সরকার।
শিবরামের কিশোর নাটিকা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী।
সানাই বাঁশীর মাঠ—শ্রীবিষ্ণু।
সমুদ্র রূপসী—গিরিশংকর।
গীতি-মধুর ভিয়েনা—[illegible] নন্দী।
নয়া চীনের কারাগারে—ফাদার [illegible]। অনুবাদক—অক্ষয় চক্রবর্তী।
অবাক পৃথিবী—[illegible] রাজগুরু।
সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি—নারায়ণ চৌধুরী।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ (১৮০১—১৮৬০)—শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত।
রামায়ণী কথা (সৌরভ পর্ব)—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী।
অদ্বিতীয় ঘনাদা—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
গোয়েন্দা ভূত ও মানুষ—শ্রী[illegible] রায়।
গাঁপির গাপ্ত যাত্রা—[illegible] মজুমদার।
চলচেরা লোমবোধ—শিবরাম চক্রবর্তী।
টাইবুড়োর পুঁথি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রশেখর

ভিন্নতর ভূমিকায় উত্তমকুমার

বাংলা ছবিতে রমণীবল্লভ নায়কের রূপে যে প্রিয়দর্শন অভিনেতার জুড়ি নেই, সেই লোকপ্রিয় উত্তমকুমারকে বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা হিসাবে আজ অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাবার সময় এসেছে। ভিন্নতর ভূমিকায় —দয়িতের বেশ ছেড়ে শিশুর দোসর হয়ে এই শক্তিধর অভিনেতা তাঁর লোকরঞ্জন-ক্ষমতার নতুন প্রমাণ দিয়েছেন গৌতম চিত্রমের "অবাক পৃথিবী" ছবিতে।

কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের একটি কাহিনী অবলম্বন করে এই ছবি। তার নায়ক অর্জুন। বাবা মারা যাবার পর রোগার্ত ছোট ভাইকে মরণের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য সে একদিন মুহূর্তের ভুলে চুরি করে ফেলে কন্যাদায়-গ্রস্ত এক ভদ্রলোকের টাকা ও গয়না ভর্তি এক স্যুটকেস। চুরি করার পর তার অন্তরে বিবেক জেগে উঠতেই সে স্যুটকেসে পাওয়া ঠিকানা অনুসরণ করে ফেরত দিতে যায় ভদ্রলোককে অপহৃত দ্রব্য। ভদ্রলোক তাকে ক্ষমা করেন না, চালাকি করে ধরিয়ে দেন পুলিসের হাতে। অর্জুনের জেল হয়।

পাপের পথে এমনিভাবেই অর্জুন দীক্ষা পায় দয়াহীন সংসারের অবিচার ও অবহেলার মধ্য দিয়ে। মানুষেরই নির্দয়তা একদিন তাকে বঞ্চিত করেছিল শিক্ষিত হবার ন্যায্য অধিকার থেকে। এই বঞ্চনাই তার মনে ধরিয়ে দেয় অপরাধের নেশা। লোকের পকেট মারা হয় তার বৃত্তি, আর জেলে যাওয়া তার বেতন।

জীবনের এই ভ্রষ্টলগ্নে একদিন জেল থেকে বেরিয়ে অর্জুন শোনে তার মা আর বেঁচে নেই। আজীবন বঞ্চিত জীবনে এই ব্যথার প্রতিক্রিয়া তাকে বিদ্রোহী করে তোলে, তার মনুষ্যত্বের শেষ পুঁজিটুকুও যেন কেড়ে নিতে চায়। এমনি দিনে তার অপরাধ-জীবনের এক পূর্বতন গুরুর কাছ থেকে সে পায় ভালো হবার প্রেরণা। ভালো সে হতে চায়, কিন্তু ভালো তাকে হতে দেয় না মানুষের ঘৃণা আর অবিশ্বাস।

শেষ পর্যন্ত তার পাপ-জীবনের কাহিনী শুনেও যিনি তাকে বিশ্বাস করেন, তার জন্য অনুকম্পা প্রকাশ করেন, তাকে সুস্থ-ভাবে বাঁচবার অধিকার দেন, তিনি এক খৃষ্টান ধর্মযাজক। তাঁরই পরিচালিত শিশুদের এক আবাসিক বিদ্যালয়ে অর্জুনের কাজ জোটে। শিশুদের দেখাশোনা করা, তাদের আনন্দ দেওয়া, খেলাধূলো শেখানোর ভার পড়ে তার ওপর। অর্জুন মুক্তি পায় তার ঘৃণ্য জীবনের বিষাক্ত অভিশাপ থেকে। স্নেহের টানে সে আপন করে নেয় শিশুদের, তারা এই নতুন সাথীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে সহজেই।

কিন্তু এক দাগী অপরাধীর হাতে নিষ্পাপ শিশুদের ভার ছেড়ে দেওয়াতে ক্ষুন্ন হন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাদের মধ্যে একজন যুবতী শিক্ষিকা

দাগ কাটে। কাহিনীর এই মৌলিক রস ও অভিনয়ের জন্যই ছবিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছে। রঙ্গরসের দিক দিয়েও ছবিটির আবেদন অনস্বীকার্য। এর সংলাপও বেশ রসাল। ছবির শেষের দিকে আদালত দৃশ্যের অবতারণা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। নাট্যপরিণতির দিক দিয়েও এই দৃশ্যটি রসহানি ঘটিয়েছে।

বিশু চক্রবর্তী তাঁর প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনায় এ-ছবিতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাহিনীর বিন্যাস পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিপূর্ণ। পরিচালক অর্জুন ও যুবতী শিক্ষিকার অবাঞ্ছিত সম্পর্ক যে সংযমের মধ্য দিয়ে এড়িয়ে গেছেন এবং পরস্পরের সান্নিধ্য বিন্যাসে যে রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। অর্জুনের অপরাধ-জীবনকে কেন্দ্র করে যে ঘৃণ্য পাপচক্র ছবিতে দেখানো হয়নি তাতেও ছবিটির মর্যাদা বেড়েছে। সর্বোপরি অর্জুনকে মধ্যমণি করে শিশুদের হাসি-গান, খেলাধুলো ও গল্পগুজব এবং ছোট্ট একটি শিশুর সংগে নায়কের মধুর সম্পর্কের যে সুন্দর বিন্যাস রয়েছে ছবিতে, তা সত্যিই এক নতুন রসের আস্বাদ দিয়েছে দর্শকদের। ছবির কতকগুলি দৃশ্য ও পরিস্থিতির বিন্যাসে পরিচালক অবশ্য মামুলী ধারা অতিক্রম করতে পারেননি। খৃষ্টান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার পক্ষে বন্ধুর সংগে রেস্টুরেণ্টে চা-খেতে আসাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। এবং অর্জুনের সংগে রেস্টুরেণ্টে তার প্রথম সাক্ষাৎ মামুলী প্রণয়োপাখ্যানেরই যেন একটি উপক্রমণিকা যার সংগে পরবর্তী কাহিনীধারার কোন যোগ নেই। কাহিনীর পরিবেশ-রচনায়ও পরিচালক যথাযথ বাস্তব-নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেননি। যে বিদ্যালয়ের পটভূমিতে কাহিনীর মূল ঘটনাগুলি বিস্তারলাভ করেছে, সেই প্রতিষ্ঠানটি নাম-গোত্রহীন। ছবির প্রথমভাগে নায়ক অর্জুনের মনের প্রতিক্রিয়া দেখাবার জন্য কতকগুলি দৃশ্যের পরিকল্পনা—যেমন একটি মেয়ের গায়ে আচমকা ধাক্কা লাগায় তার অপমানিত হওয়া ও পরে তার কাপড়ের দোকানের কাঁচ ভাংগা—খুবই কৃত্রিম মনে হয়।

তবে ছবির অনেক ছোট-খাটো দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায় নায়ক উত্তমকুমারের অনবদ্য অভিনয়ে। অর্জুনের চরিত্রটি যেভাবে কল্পিত, শিল্পী তার পুরোপুরি মর্যাদা রেখেছেন তাঁর অনিন্দ্য চরিত্রাভিনয়ে। ব্যথা, হতাশা, অভিমান, অন্তর-বিদ্রোহ, অস্পৃহা, শিশুদের জন্য দরদ ও সব শেষে মনের প্রশান্তি তিনি যে সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন তা বাংলা ছবির পর্দায় অতুলনীয়। ফাদারের কাছে নিজের অতীত জীবনের কাহিনী বলার সময় তাঁর অভিনয় দর্শকরা কোনদিনই ভুলবেন না। অভিনয়ে তাঁর পর অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী উত্তমকুমার অনুজ তরুণকুমার। ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান যাজকের চরিত্রটিতে তিনি যে ব্যক্তিত্ব ও সমবেদনা আরোপ করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। বিদ্যালয়ের নবীনা শিক্ষিকার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সংযত ও সাবলীল। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেশ্বর সেন, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। কয়েকজন শিশু-শিল্পী এ-ছবিতে সুন্দর অভিনয় করেছেন; অবশ্য তাদের মধ্যে দর্শকদের মন জয় করে নেয় সব চেয়ে বেশী শ্রীমান টুকাই।

সংগীত পরিচালনায় অমল মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম স্বাধীন দায়িত্ব কৃতিত্বের সংগে সম্পাদন করেছেন। বিভিন্ন দৃশ্যে ছবির আবহসংগীত প্রশংসার দাবী রাখে। ছবির গানগুলিও সুন্দর সুরারোপিত ও শ্রুতিমধুর।

অগ্রদূত চিত্রের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"-এ ভৃত্য রাইচরণের রূপসজ্জায় উত্তমকুমার।

আলোকচিত্র পরিচালনায় ও চিত্রগ্রহণে যথাক্রমে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন বিশু চক্রবর্তী ও কে রেজ্জা। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক ও সর্বাংগীণ অংগসজ্জা পরিচ্ছন্ন।

প্রমোদের পশরা

জেমিনীর ছবি বলতে বোঝায় আমোদ ও আড়ম্বর। তাঁদের নবতম সামাজিক ছবি "পয়গম"-এ এই দুই উপাদানের অতিরিক্ত যা রয়েছে তা হলো শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও শ্রমের মর্যাদা নিয়ে সুলেখিত বাণী।

ছবিটির কাহিনী জেমিনীর "স্টোর ডিপার্টমেণ্টে" তৈরী। এই কাহিনীর নায়ক রতনলালের গুণের শেষ নেই। রিকশা চালিয়ে সে "টেকনোলজি" স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং সেই বিদ্যার জোরেই একটি কাপড়ের মিলের এক বিকল যন্ত্র—যা এদেশে সারানো সম্ভব নয় বলে সকলের ধারণা—সে অনায়াসেই সারিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। সুদর্শন ও গুণবান এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয় মিল-মালিকের কন্যা। নায়কের চাকুরী জুটে যায় সেই মিলে। কিন্তু তার প্রণয়লাভে যে সমর্থ হয় সে ঐ মিলেরই নতুন টাইপিস্ট মঞ্জু। মঞ্জুর সংগে রতনলালের পরিচয় ছিল আগে থেকেই—শহরের একজন রিকশা-চালক হিসেবে।

রতনলালের বড় ভাই রামলালও ঐ মিলেরই ফোরম্যান। বাড়িতে তাদের বৃদ্ধা মা। পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে রামলালের স্ত্রী, বিবাহযোগ্যা মেয়ে ও এক পুত্র। এই সুখের পরিবারে অশান্তি দেখা দেয় যখন রতনলাল মালিকের শোষণ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করবার জন্যে মজদুর ইউনিয়ন গড়ে তোলে। মিলের পুরনো শ্রমিক রামলালের কাছে পরিবারের স্বার্থ আগে। তার বাগদত্তা মেয়ে কমলার বিয়ের সমস্যায় সে জর্জরিত। তাই শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষে যোগ দিয়ে সে তার নিশ্চিত জীবন-যাপনে কোন বিপদ ডেকে আনতে রাজী নয়।

রতনলাল একনিষ্ঠ আদর্শবাদী এবং লক্ষ্যসাধনের পথে যে-কোন ক্ষয়-ক্ষতি সে মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। শ্রমিকদল তাকে অনুসরণ করে, আর তাঁর কাজের সহায় হয়

এস এম ব্যানার্জী ও প্রতিমা দেবী। জমি ওয়াকার তাঁর কৌতুকাভিনয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। তাঁর উপযুক্ত দোসরের চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন মিস্ মমতাজ।

সি রামচন্দ্রের সংগীত পরিচালনা ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। গান ও আবহসংগীত এর বিশেষ আকর্ষণ।

আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনার দিক দিয়ে ছবিটি উঁচুদরের। আঙ্গিক আড়ম্বরের দিক দিয়েও ছবিটি জেমিনীর ঐতিহ্য রক্ষা করেছে।

চিত্রালোচনা

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর অপ্রত্যাশিত অতিবর্ষণের মত এ সপ্তাহে এক সঙ্গে দু'খানি বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে দু'খানি হিন্দী ছবিও।

প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের নবতম অবদান "রাতের অন্ধকারে" সমাজ জীবনের একটি অন্ধকার দিক উদ্ঘাটিত করেছে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। একদিকে ক্রাইম-ড্রামাসুলভ রহস্য-রোমাঞ্চ, অন্যদিকে প্রমোদ উপাদানে ভরা একটি সুষ্ঠু কাহিনী—এই দুয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের এই নতুন ছবিটিতে। রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুলিস বিভাগে তাঁর কর্মজীবন কাটিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই কিছুটা তিনি পরিবেশন করেছেন তাঁরই লেখা এই গল্পে। তাকে চিত্রনাট্যের আকারে গেঁথেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কয়েকজন কলাকুশলী "অগ্রণী" ছদ্মনামে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, অসীমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, শুক্লা সেন, জহর রায়, নবদ্বীপ, হলুয়া, নীতীশ মুখোপাধ্যায় এবং বোম্বাইয়ের উদীয়মান তারকাদের অন্যতম সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও হেলেনকে নিয়ে ছবিটির ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন ভি বালসারা।

• • •

"অবাক পৃথিবী", গৌতম চিত্রমের প্রথম প্রয়াস। অভিনেতা তরুণকুমার ও আলোকচিত্রশিল্পী বিশু চক্রবর্তীর-ও এটি প্রথম প্রয়াস চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে। এঁদের নতুন প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে; তার পরিচয় ছবিটির সমালোচনায় আমরা দিয়েছি। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত কাহিনীর এই চিত্ররূপে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের পুরোভাগে আছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, বীরেশ্বর সেন, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শ্রীমান টুকাই ও তরুণকুমার। অমল মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার। এক্ষেত্রে এঁরও এই প্রথম পদক্ষেপ।

• • •

হিন্দী ছবি দুটির মধ্যে "স্কুল মাস্টার" মাদ্রাজের পদ্মিনী পিকচার্সের নবতম নিবেদন। যে কানাড়ী ছবিটি সর্বভারতীয় বিচারে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এই বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে, তারই হিন্দী সংস্করণ এটি। বি আর পান্থালু একাধারে এর প্রযোজক, পরিচালক ও নায়ক। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজম্মা, বি সরোজা দেবী, শকিলা, কামিনী কদম, ললিতা পাওয়ার, অচলা সচদেব, করণ দেওয়ান, জওহর কাউল, রাধাকিষণ, উল্লাস, ডেভিড, রাজা গোসাভি, শিবাজী গণেশ প্রমুখ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বাছা-বাছা শিল্পীরা। ছোটদের দ্বারা অভিনীত রামায়ণ নৃত্যনাট্য—যা গেভাকলারে রঞ্জিত—এই ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। বসন্ত দেশাই এতে সুরযোজনা করেছেন।

অপর হিন্দী ছবিটির নাম—"চাচা জিন্দাবাদ"। এটি লাইট এণ্ড শেডের নিবেদন। কিশোরকুমার ও অনিতা গুহ এর নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন জগদীপ, মনোরমা, টুনটুন, অনুপকুমার, ভগবান ও ওম প্রকাশ। শেষোক্ত জন প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্বও বহন করেছেন। রাজেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত গীত ও মদন মোহনের সুরযোজনায় ছবিটি সমৃদ্ধ।

• • • •

এস বি ফিল্মসের "কণিকের অতিথি" আশু মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। যৌবনের যে প্রেম মিলনে পরিণতি লাভ করল না, তাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। মেয়েটির বিয়ে হল অন্য একজনের সঙ্গে, ছেলেটি ডাক্তারি পাশ করে নিজেকে নিয়োজিত করল পরের সেবায়। পরস্পরের কাছে তারা যখন স্মৃতি মাত্র, তখন আবার দেখা হল তাদের। এমনি এক নাটকীয় পরিস্থিতির মাধ্যমে প্রেম ও বিরহের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী রূপ নিয়েছে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন রুমা গঙ্গুলী ও নির্মলকুমার। তাঁদের সঙ্গে আছেন ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অতনুকুমার, শ্রীমান তরুণ প্রভৃতি। রচনা ও পরিচালনার কৃতিত্ব তপন সিংহের। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ছবি "মৃতের মর্তে আগমন"-ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিগুলির অন্যতম। এর মধ্যে যে হাস্যরসের প্রাধান্য তা এর নামেই প্রকাশ। ভূমিকালিপিতেও কৃতী শিল্পীদের মেলা। তাঁদের মধ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, শিপ্রা সাহা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মিরাক্লস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের পতাকাতলে ছবিটি তোলা হয়েছে।

• • •

এম পি প্রোডাকসন্সের পরবর্তী আকর্ষণ "কুহক"-এর চিত্রগ্রহণও শেষ হয়েছে। এক সংঘাতপূর্ণ জীবনের অপূর্ব আলেখ্য এঁকেছেন উত্তমকুমার এর প্রধান চরিত্রে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু এবং তুলসী চক্রবর্তী এ ছবিতেও তাঁর সহশিল্পী। "কুহক" পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত পরিচালকবৃন্দ। সমরেশ বসু এর লেখক এবং হেমন্তকুমার এতে সুরসৃষ্টি করেছেন।

সাগরপারের সম্মান

ভেনিসের ভুল লণ্ডনে সংশোধিত হল এতদিনে। লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে সাধারণত সেই সব ছবি দেখান হয় যেগুলি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার"-এর বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ভেনিসে প্রত্যাখ্যাত হয়েও, বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বিশেষ আমন্ত্রণে ছবিটি লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবার গৌরব লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, উৎসবের শেষ অনুষ্ঠানে "অপুর সংসার"কে দেওয়া হয়েছে সাদারল্যাণ্ড ট্রফি—উদ্যোক্তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কোন পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা নেই। সাদারল্যাণ্ড ট্রফি দিয়েছেন বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবের যাঁরা অন্যতম উদ্যোক্তা। "অপুর সংসার"-এর গুণ বিচারের ক্ষেত্রেও উক্ত উৎসবের পরিধির বাইরে প্রসারিত। তাই ছবিটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে "গত বারো মাসে ন্যাশানাল ফিল্ম থিয়েটারে ইংরেজ দর্শকদের সামনে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ও ভাব-সমৃদ্ধ ছবি" হিসেবে।

"অপুর সংসার" ওখানকার দর্শক-সাধারণের আগ্রহ কি পরিমাণে আকর্ষণ করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় এর পর পর তিনটি নৈশ প্রদর্শনীর ব্যবস্থায়। উৎসবে সাধারণত একটি প্রদর্শনীরই ব্যবস্থা থাকে প্রতিটি ছবির জন্যে।

"অপুর সংসার"এর এই সম্মানে ভারতীয় ছবির অনুরাগী মাত্রেই গৌরব বোধ করবেন।

সাদারল্যাণ্ড ট্রফি বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষক ডিউক অফ সাদারল্যাণ্ড কর্তৃক প্রদত্ত। রূপোর উপর জেরাল্ড বেনির কারুকার্যখচিত এই ট্রফিটি গত বছর পায় জাপানী ছবি "দি টোকিও স্টোরি।"

মল্লার পরিবেশিত 'ভুজঙ্গবর্গ'

গত রবিবার রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে একটি অভিনব নৃত্যনাট্যের প্রয়াস দেখা গেল। নৃত্যনাট্যের নাম 'ভুজঙ্গবর্গ'; উপস্থাপন করেন 'মল্লার' শিল্পিগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র অন্তর্গত একটি কথিকা 'ভুজঙ্গবর্গ'তে কবি তাঁর একটি উপলব্ধি ফুটিয়ে তুলেছেন। তা হল এই: কর্মহীন অবকাশের মধ্যে মানুষ আপনাকে জানার সে-সুযোগ পেয়ে পরম আনন্দের অধিকারী হতে পারে, কর্মের বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে সে-সুখ তার মেলে না। নৃত্য আর রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে কাহিনী ও তার বক্তব্য শিল্পীরা পরিস্ফুট করতে প্রয়াস পেয়েছেন। নৃত্য পরিকল্পনার কৃতিত্ব রবি দত্তর। প্রধান দুটি ভূমিকায় শ্রীমতী দত্ত ও কুসুমিকা বাগচী অংশ গ্রহণ করেন। গানগুলি পরিবেশন করেন দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, পূরবী মুখোপাধ্যায়, পূরবী সরকার প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য থেকে কাহিনীর সূত্রধারকের কাজ করেন সুবোধ বসু, সুকুমার দাস ও মীরা মিত্র।

সরকার প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি "নতুন ফসল"-এর বিশিষ্ট চরিত্র রসময়ের ভূমিকায় বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী

চিঠিপত্র

"হেড মাস্টার" প্রসংগে

মহাশয়,

"হেড মাস্টার" দেখে এলাম। জানি না, পরিচালক অগ্রগামী কে বা কাদের নিয়ে গঠিত। তবে তাঁদের সূক্ষ্ম শিল্প-রস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় এই ছবিটিতে। আশা করা যায়, তাঁরা বাংলা চিত্রজগতে অনেক কিছু দিতে পারবেন।

দুশ্চিন্তার কথা এই যে, সরকার যদি এই ধরণের উচ্চ শিল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রযোজক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য না করেন, তবে ভবিষ্যতে এঁরা হয়তো ব্যবসায়িক সাফল্যের লোভে অন্য ধরণের ছবি করবার দিকে ঝুঁকবেন।

"হেড মাস্টার"-এর একটি ত্রুটির উল্লেখ করব এখানে। আর পাঁচটা ছবির মত এ চিত্রেও আবহ সংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নি। আবহ সংগীতের কাজ ছবির ভাব পরিস্ফুটনে সহায়তা করা। তাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যে দর্শক যেন বুঝতে না পারে কখন আবহ সংগীত সুরু হল এবং কখন হল শেষ। তবেই তার সার্থকতা। অধিকাংশ ছবিতেই দেখা যায় যে আবহ সংগীতের উৎকট প্রয়োগ বা যথাযথ প্রয়োগের অভাবে ছবির ভাব দর্শকদের মনে সার্থকভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে না। এবিষয়ে সংগীত পরিচালকদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

শ্রীসঞ্জয়কুমার সেন,
কলিকাতা-৪০

আপত্তিকর ইংগিত

মহাশয়,

সুশীল মজুমদার পরিচালিত "অগ্নিসম্ভবা" দেখলাম। একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শকে গড়ে তুলতে সিনেমা অনেক সাহায্য করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সার্থক আবশ্যকীয় ছিল যে কখনই সিনেমা সংলাপের মুখে বাঁধা বক্তৃতার মঞ্চ নয়—পরিতাপের বিষয় চলচ্চিত্রের এই সরল-বোধও পরিচালকমশাই সেটা ধরতে পারেন নি।

ছবিটির সামগ্রিক বার্থতা নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু দুটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই এই জন্যে যে ছবিটি বিদেশে প্রদর্শিত (এবং আশ্চর্য, পুরস্কৃতও)।

মালা চাকরির খোঁজে বেরিয়ে সুজন বড়কর্তার সংগে সাক্ষাৎ করালো। তারপরই একজন সরকারী অফিসের প্রতিনিধি হয়ে একজন ভদ্রমহিলার প্রতি অশিষ্টতাসূচক রকম যে সব অভব্য মন্তব্য প্রয়োগ করলেন, আর শিক্ষিতা "অগ্নি-সম্ভবা" মালাকে দিয়ে বিনা প্রতিবাদে যেভাবে সেই দুর্ব্যবহার ও কুৎসিত মন্তব্যগুলোকে হজম করানো হল তাতে পরিচালক মশাই সস্তা হাততালির লোভে যুগপৎ ভারত সরকার ও ভারতের গণসম্মানবোধকে বিদেশের ধুলোয় লুটিয়ে দেননি কি?

আর পরিশেষে মালার মুখ দিয়ে বলিয়ে তিনি কি এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন—ভারতের মহিলারা যাঁরা অফিসে চাকরি করেন, তাঁরা সেটা তাঁদের দেহের (বিকল্পে মর্যাদা বোধের) বিনিময়েই করে থাকেন? ইতি—

সঞ্জয় ঘোষ,
কলিকাতা-৩২

একলব্য

এওগীর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা পড়েছে এবং গতবারের বিজয়ী বাংলা দল ফাইন্যালে বোম্বাইকে ৩—১ গোলে হারিয়ে দিয়ে এবারও 'সন্তোষ ট্রফি' লাভ করেছে। বাংলাকে শুধু গতবারের বিজয়ী বললে জাতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলার অনেক কিছুই বাকী থাকে। জাতীয় ফুটবলের ১৬ বারের অনুষ্ঠানের মধ্যে এবার নিয়ে বাংলা দল ১০ বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে বললে ভারতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মেলে। এ ছাড়া, তিনবার রানার্সের পুরস্কার লাভও শ্রেষ্ঠত্বের আংশিক পরিচায়ক।

যাই হোক, ফাইন্যালে বাংলার খেলোয়াড়রা উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। তবে ৩—১ গোলে হার স্বীকার করলেও বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রা খারাপ খেলেছেন, একথা বলা যায় না। বাংলার সংগে তীব্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই তারা হার স্বীকার করেছে এবং জাতীয় ফুটবলের ফাইনালের ক্রীড়ামান হয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলারই অনুরূপ। হবেই বা না কেন? ভারতীয় ফুটবলে অন্ধ্র রাজ্য সম্প্রতি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও বাংলার পরেই বোম্বাইয়ের স্থান। বাংলা যেমন ১৩ বার জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বোম্বাই তেমন এবার নিয়ে ৫ বার ফাইনালে খেলেছে। তন্মধ্যে একবার ছাড়া বোম্বাই কোনবার 'সন্তোষ ট্রফি' ঘরে তুলতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, 'সন্তোষ ট্রফির' ফাইনালে বোম্বাই ও বাংলার এটা [illegible] চতুর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর আগেও তিনবার বাংলার কাছে বোম্বাইকে হার স্বীকার করতে হয়েছে, এবারও হার স্বীকার করতে হল।

জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আগের সপ্তাহের 'খেলার' পাতায় করা হয়েছে। এবার সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যালের আলোচনা করছি।

বোম্বাই (২) — অন্ধ্র (০)
(ডেরিক ডি'সুজা ও ডি'সা)

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলায় দ্বিতীয় গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান বোম্বাই ও প্রথম গ্রুপের রানার্স দলের মধ্যে প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় বোম্বাই যোগ্য দল হিসাবেই শক্তিশালী অন্ধ্র দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে ওঠে। বিরতির আগেই একে একে দুটি গোল করে বোম্বাই বিজয়ের পথ সুগম করে রাখে। দ্বিতীয়ার্ধে অন্ধ্র দলের খেলায় যথেষ্টই উন্নতি দেখা গিয়েছিল এবং এক সময়ে মনে হয়েছিল, অন্ধ্রের খেলোয়াড়রা বুঝি দুটি গোলই শোধ করে দেবে। কিন্তু বোম্বাই রক্ষণভাগের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য অন্ধ্র দলের পক্ষে কোন গোল করা সম্ভব হয়নি। বিজয়ী দলের ব্যাক লতিফ এবং স্টপার শেখর অন্ধ্র দলের সুনিয়ন্ত্রিত আক্রমণধারা বার বার ব্যর্থ করে দেন। এ ছাড়া, দুই ইন খেলোয়াড় চার্লস এবং জাফরও দ্বিতীয়ার্ধে পিছনে পড়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

অন্ধ্র দলের পরাজয়ের মূলে কিছুটা দুরদৃষ্ট ছিল না, একথা বলা যায় না। কারণ সূচনায় সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুলজারের একটি দর্শনীয় হেড ক্রসবারের মধ্যভাগে লেগে ফিরে আসায় অন্ধ্র দল একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেও কোন গোল করতে পারে না। তবু বলব, বোম্বাইয়ের জয়লাভ ক্রীড়াধারার সংগতি-সূচক ফলাফল। কারণ প্রথমার্ধে তারাও কম আক্রমণ করেনি এবং আক্রমণের ফসলও তুলে নিয়েছে। তাছাড়া, দ্বিতীয়ার্ধে অন্ধ্রের আক্রমণের মধ্যেও বোম্বাই রক্ষণভাগের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা বেশী করে চোখে পড়েছে। বোম্বাইয়ের পক্ষে প্রথম গোল করেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডেরিক ডি'সুজা প্রথমার্ধের পনেরো মিনিটের সময়। তিন মিনিট পরে রাইট আউট ডি'সা প্রায় একক কৃতিত্বে দ্বিতীয় গোলটি করেন।

বাংলা (২) — সার্ভিসেস (১)
(পি কে ব্যানার্জি ও দামোদরন) — (পূরণ বাহাদুর)

জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় সেমি-

জাতীয় ফুটবলের বিজয়ীর পুরস্কার 'সন্তোষ ট্রফি' হাতে বাংলার অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জী। সামনের দিকে দাঁড়িয়ে রামবাহাদুর, চুণী গোস্বামী ও রহমান

ফাইন্যাল খেলাটি হয় প্রথম গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংগলা ও দ্বিতীয় গ্রুপ রানার্স সার্ভিসেস দলের মধ্যে। সবারই জানা আছে বাংগলা গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং সার্ভিসেস রানার্স। সুতরাং এ সেমি-ফাইন্যাল খেলাকে গতবারের ফাইন্যাল খেলার পুনরানুষ্ঠান বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তীব্র গতিবেগ এবং চমৎকার যোগাযোগের মধ্যে খেলা আরম্ভ করে সূচনাতেই বাংগলার খেলোয়াড়রা সামরিক দলের খেলোয়াড়দের নাস্তানাবুদ করে তোলে এবং বাংগলা দল বিশ্রাম সময়েই ২—০ গোলে এগিয়ে থাকে। নৈপুণ্যগত উৎকর্ষতায় এঁটে উঠতে না পেরে সার্ভিস দলকে বেশ কিছুটা দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতে দেখা যায়। ফলে বাংগলার দুইজন খেলোয়াড় রহমতুল্লা ও বলরাম আহত হন। দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় আঘাতের ফলে বলরামকে তো মাঠ ছেড়েই চলে যেতে হয়। ফলে দ্বিতীয়ার্ধের বেশীর ভাগ সময় বাংগলা দল ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এই সময়ে সার্ভিস দলও খেলার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু আধিপত্য বিস্তার করলে কি হবে। স্টপার জারনেল সিং ও গোলরক্ষক সনৎ শেঠের অপূর্ব দৃঢ়তা সার্ভিস দলের গোল লাভের ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা দেয়। অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে দশজনে খেলেও বাংগলা দল কম আক্রমণ করেনি।

প্রথমার্ধে বাংগলার খেলোয়াড়রা যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তাদের আরও গোল করা উচিত ছিল। অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জি, দামোদরন ও বলরামের যোগাযোগপূর্ণ আক্রমণধারা দর্শকে চোখের খুবই আনন্দদায়ক হয়। খেলা আরম্ভের পর ১২ মিনিটের সময় বাংগলা প্রথম গোল করে। বলরামের পাস থেকে বল পেয়ে পি কে ব্যানার্জি সুতীব্র ভলির সাহায্যে প্রথম গোল করেন। ৩ মিনিট পরে দ্বিতীয় গোল হয়। পি কে ব্যানার্জি দুজনকে কাটিয়ে নিয়ে সুন্দরভাবে বলরামকে বল পাস করেন, বলরাম আবার একজনকে কাটিয়ে সেণ্টার ফরোয়ার্ড দামোদরনের দিকে বল ঠেলে দেন দামোদরন এইবার তীব্রগতির কোনাকনি নিচু শটে দ্বিতীয় গোল করেন। এর পর চুনী গোস্বামীর একটি তীব্র শট গোলপোস্টে লেগে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটের সময় সার্ভিসেস দলের লেফট আউট উইলিয়ামের সুতীব্র ভলি গোলকিপার এস শেঠ যেভাবে ব্যর্থ করে দেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে পূরণ বাহাদুরের তীব্র শট এস শেঠ আটকাতে পারেন না। ফলে সার্ভিস দল একটি গোল লাভে সমর্থ হয়। বাংগলা ২—১ গোলে বিজয়ী হয়ে ফাইন্যালে ওঠে।

সার্ভিসেস (১) অন্ধ (০)
(কাজিপানি)

জাতীয় ফুটবলের ফাইন্যাল খেলার আগে সেমি-ফাইন্যালের পরাজিত দুটি দলের মধ্যে একটি বিশেষ খেলার ব্যবস্থা আছে। এ খেলার বিজয়ী সাম্পাংগী কাপের অধিকারী হয়। এবারকার বিশেষ খেলায় সার্ভিসেস দল ১—০ গোলে অন্ধ্রকে পরাজিত করে সাম্পাঙ্গী কাপ লাভ করেছে। খেলা আরম্ভের পর দ্বিতীয় মিনিটেই কাজিপানি এই বিজয়সূচক গোলটি করেন। অন্ধ্রের খ্যাতনামা ফরোয়ার্ডরা পরে আক্রমণের উপর আক্রমণ চালিয়েও গোলটি শোধ দিতে পারে না। বেশীর ভাগ শটই তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বাংগলা (৩) বোম্বাই (১)
(বলরাম, পি কে ব্যানার্জি (জাফর)
ও চন্দ্রশেখর—নিজ গোল)।

আগেই বলেছি, ফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই দল ৩—১ গোলে হার স্বীকার করলেও বাংগলা ও বোম্বাইয়ের ফাইন্যাল খেলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলারই অনুরূপ। সত্যিই দুই দল চমৎকার ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং খেলার ছলাকলায় হারজিতের প্রশ্ন গৌন হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তুলনামূলক বিচারে বাংগলার কিছুটা প্রাধান্য ছিল, একথা অনস্বীকার্য। বাংগলার পুরোভাগে বলরাম, চুনী গোস্বামী, দামোদরন ও পি কে ব্যানার্জির অনবদ্য ক্রীড়াধারা অগণিত দর্শককে বিপুল আনন্দ দেয়। বিশেষ করে বলরামের চাতুর্যপূর্ণ ড্রিব্লিং দর্শকদের খুশীর খোরাক হয়। মধ্যভাগে জারনেল সিং ও রাম বাহাদুরও দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেন। বোম্বাইয়ের প্রশংসা পান অধিনায়ক লতিফ, জাফর ও ফ্রাঙ্কো। সেণ্টার ফরোয়ার্ড নেভিল ডিসুজা মন্দ খেলেননি।

খেলা আরম্ভের পর এক মিনিট অতিবাহিত হতে না হতে বোম্বাইয়ের রাইট ইন জাফর অতর্কিতে একটি গোল করে বসেন। তাঁর মাটিঘেঁষা শট, গোলকিপার এস শেঠের হাতের উপর দিয়ে গোলে প্রবেশ করে। কিন্তু এই বিপর্যয় বাংগলার খেলার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের মধ্যে খেলা চলতে থাকে। ৩১ মিনিটের সময় পি কে ব্যানার্জির দর্শনীয় সেণ্টারে আরও দর্শনীয়ভাবে হেড করে বলরাম গোলটি শোধ করে দেন। এর পর সম্মিলিত আক্রমণধারা থেকে বল পেয়ে পি কে ব্যানার্জি আর একটি গোল করলে বাংগলা দল বিশ্রাম সময়ে ২—১ গোলে এগিয়ে থাকে।

বিশ্রামের পর নতুন উৎসাহ এবং নতুন প্রেরণা নিয়ে দুই দল আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চালাতে থাকে। বোম্বাইয়ের খেলাতেই কিছুটা প্রাধান্য দেখা দেয়। তারা গোল শোধ করে দেবে বলেও মনে হয়। কিন্তু গোল শোধ করা দূরে থাক, শেষদিকের খেলায় একটি বল হেড করতে গিয়ে বোম্বাইয়ের রাইট ব্যাক চন্দ্রশেখর দুর্ভাগ্যবশত নিজ গোলেই বলটি ঢুকিয়ে দেন। ফলে ৯ বারের বিজয়ী বাংগলা ৩—১ গোলের মাত্রায় জাতীয় ফুটবলে ১০ বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

খেলার শেষে আসামের নতুন রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীনাগেশ বিজয়ী ও বিজিতের পুরস্কার বিতরণ করেন। রাজ্যপালের কার্যভার গ্রহণের পর এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে সর্বপ্রথম শ্রীনাগেশ সাধারণের সামনে উপস্থিত হন।

জাতীয় ফুটবলে আগে যারা বিজয়ী ও রানার্স হয়েছে তাদের নাম:—

সাল	বিজয়ী	রানার্স
১৯৪১	বাংগলা	দিল্লী
১৯৪৪	দিল্লী	বাংগলা
১৯৪৫	বাংগলা	বোম্বাই
১৯৪৬	মহীশূর	বাংগলা
১৯৪৭	বাংগলা	বোম্বাই
১৯৪৯	বাংগলা	হায়দরাবাদ
১৯৫০	বাংগলা	হায়দরাবাদ
১৯৫১	বাংগলা	বোম্বাই
১৯৫২	মহীশূর	বাংগলা
১৯৫৩	বাংগলা	মহীশূর
১৯৫৪	বোম্বাই	সার্ভিসেস
১৯৫৫	বাংগলা	মহীশূর
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই
১৯৫৮	বাংগলা	সার্ভিসেস

জাতীয় ফুটবলের ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার পর ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচক সমিতি ৩০ জন খেলোয়াড় নিয়ে এশিয়ান কাপের জন্য প্রাথমিকভাবে ভারতের দল গঠন করেছেন। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের জন্য বোম্বাইতে ১৪ দিনব্যাপী এক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ১৪ই নভেম্বর থেকে কোচ শ্রী রহিমের তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষাশিবির পরিচালিত হবে। তারপর ২৮শে নভেম্বর চূড়ান্তভাবে এশিয়ান কাপের জন্য ভারতের দল গঠন করা হবে।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ থেকে এর্নাকুলামে এশিয়ান কাপের খেলা আরম্ভের কথা। কিন্তু যোগদানকারী ছয়টি দেশ—ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ইস্রাইল ইরান ও আফগানিস্থানের মধ্যে আফগানিস্থান ও ইস্রাইল এশিয়ান কাপের খেলায় এখন যোগ দিতে অনিচ্ছুক। তাদের অবশ্য খেলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার তারা যোগ না

দিলে পাল্টা লীগ খেলার নিয়মে লীগ প্রথায়ও এশিয়ান কাপের খেলা পরিচালনার কথা উঠেছে। যাই হোক এশিয়ান কাপে ভারতের দল শক্তিশালী হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, যেখানে ১৫।১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গড়া হবে সেখানে দ্বিগুণ সংখ্যক খেলোয়াড়কে মনোনীত করার কি সার্থকতা আছে? জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার সময়ই ত বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করা গেছে। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরাও এই খেলার সময় [illegible] উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং কাদের নিয়ে দল গড়া হবে তার একটি ছকও তাঁরা না এঁকেছেন, এমন নয়। ফুটবল মরসুমের শেষে এক গাদা খেলোয়াড়ের এ ধরনের শিক্ষাশিবিরে কোন ফল হবে কি? তার চেয়ে পাকাপাকিভাবে ভারতের দল গড়ে সেই দলের যদি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে একটা সফরের ব্যবস্থা করা হত কিংবা একটি কেন্দ্রে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা হত তবে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা সুন্দর সমঝোতা গড়ে উঠত। এশিয়ান কাপে খেলার ফলাফলও ভাল হত। [illegible] এশিয়ান কাপের জন্যই নয় অলিম্পিকের [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] এবং সেই খেলার [illegible] উপরেই [illegible] [illegible] তাই মনে হয়, [illegible] এখন থেকে [illegible] এশিয়ান কাপ ও অলিম্পিকের জন্য ভারতের দল তৈরি হোক। তারপর সে দলের শিক্ষা ব্যবস্থাই হোক আর অনুশীলনই হোক সব কিছুরই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর জাতীয় সাঁতারের জন্য বাঙলার দল গঠন করা হয়েছে। নভেম্বরের ১২ তারিখ থেকে বোম্বাইতে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার কথা। জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার কথায় পরে ঘুরে আসছি—তার আগে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

আজাদ-হিন্দ বাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের তিনদিনব্যাপী সাঁতার উৎসবে এবার সর্বমোট ১০টি বিষয়ে নতুন রাজ্য রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সিনিয়র বিভাগে দুটি, মেয়েদের বিভাগে পাঁচটি, ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগে দুটি আর জুনিয়র বিভাগে একটি।

যদিও মেয়েদের বিভাগে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সাঁতারপটিয়সী কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্রের নবপ্রতিষ্ঠিত ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকের এবং ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ড ভারতীয় রেকর্ডের চেয়ে অনেকখানি উন্নত তবু যেহেতু জাতীয় সাঁতারের অনুষ্ঠান ছাড়া কোন জাতীয় রেকর্ড অনুমোদনের বিধান নেই, সেহেতু সন্ধ্যা চন্দ্রের নতুন

সাঁতারপটিয়সী কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র

ভারতীয় রেকর্ডও স্বীকার করা হয় নি। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ড ছাড়া কুমারী সন্ধ্যা ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলেও নতুন রাজ্য রেকর্ড করেছেন। [illegible] একা চারটি বিষয়ের অধিকারিণী হয়েছেন।

এ ছাড়া মেয়েদের ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের নতুন রাজ্য রেকর্ডেরও তিনি অন্যতম অংশীদার।

পুরুষদের সিনিয়র বিভাগে ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কালীকিংকর মণ্ডলের নতুন রাজ্য রেকর্ডের সময় শ্রীচাঁদ বাজাজের ভারতীয় রেকর্ড সময়ের চেয়ে মাত্র ০·৪ সেকেণ্ড বেশী। ৪×২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের নতুন রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠার কথাও উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর বাঙলার সাঁতার-মান দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক সময় ভারতীয় সাঁতারে বাঙলারই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল; কিন্তু বোম্বাই ও সার্ভিস দলের সাঁতারুদের কাছে সে প্রাধান্য খর্ব হয়ে যায়। বাঙলার সাঁতারুদের মধ্যে সম্প্রতি যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, তাতে অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় সাঁতারে বাঙলা শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হবে, এ আশা অমূলক নয়।

মেয়েদের সাঁতারে অবশ্য বাঙলা এখনই ভারতের পুরোভাগে। গতবার দিল্লীতে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাঙলার মেয়েরাই দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারিণী হয়েছিল। কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাঙলার মেয়েদের রিলে টীম করেছিল ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন জাতীয় রেকর্ড। এ ছাড়া ১০০ মিটার বুক সাঁতারে কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা এবং ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কুমারী কল্যাণী বসু প্রথম স্থানের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

গতবারের জাতীয় সাঁতারে পুরুষদের ফলাফল আশাপ্রদ না হলেও ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে অরুণ সাহার নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠার কথা আর ওয়াটার পোলোতে বাঙলার জয়লাভের বিষয় বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। এবার অসুস্থতার জন্য অরুণ সাহাকে বাঙলা দলে নেওয়া হয়নি; তবে ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কালীকিংকর মণ্ডলের নতুন রেকর্ড করার খুবই সম্ভাবনা আছে।

মেয়ে-পুরুষ সাঁতারু ও ওয়াটার-পোলো খেলোয়াড়দের নিয়ে মোট ২৩ জনের একটি দল এবার জাতীয় সাঁতারে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করছে। অরুণ সাহাকে পাওয়া যাবে না বলে বাটার-ফ্লাই স্ট্রোকে বাঙলার কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়নি। ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকেও বাঙলার মান অনেক নীচুতে, এই জন্য এ বিষয়ের প্রতিনিধিও বাদ গেছেন। আর বাদ গেছেন ডাইভিংয়ের প্রতিনিধি কান্তি সাহা। স্কুলের ছোট ছেলে কান্তি সাহা তার ডাইভিংয়ের শিক্ষাগুরু আশু দত্তকে পরাজিত করে হাইবোর্ড ডাইভিংয়ে এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অনেকেই মনে করেন কান্তিকে এবার ডাইভিংয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বোম্বাইয়ে পাঠান উচিত ছিল। কিন্তু বাঙলার সাঁতারের কর্মকর্তারা মনে করেন এত অল্প বয়সে কান্তিকে জাতীয় সাঁতারে পাঠানোর অর্থ তার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করা। কথাটা মিথ্যা নয়। অপরিণত বয়সে প্রতিনিধিত্বের অধিকার পেলে অনেকেরই উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। একটু পাকা-পোক্ত হলেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা উচিত।

দেশী সংবাদ

২৬শে অক্টোবর—ভারতের দায়িত্বশীল মহল এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার দ্বারা বোঝা গিয়াছে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত রাজ্যসমূহের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্যই কমানিস্ট চীন ভারত-সীমান্তে হামলা করিতেছে।

নবেম্বর মাসের প্রথম হইতে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণ শুরু হইবে বলিয়া জানা যায়। প্রথম পর্যায়ে নবেম্বর এবং ডিসেম্বর এই দুই মাসে একদিন অন্তর চল্লিশটি করিয়া শিবির-বাসী উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর—২১শে অক্টোবরের ঘটনায় চীনাদের দ্বারা বন্দী দশজন ভারতীয় পুলিসকে প্রত্যর্পণের জন্য একটি তারিখ ও পূর্ব লাডকে একটি স্থান নির্বাচন করিতে ভারত সরকার চীন সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সাম্প্রতিক বন্যায় বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা ও বাঁধ মেরামতকল্পে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চলতি আর্থিক বৎসরে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২৮শে অক্টোবর—সরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, চীনারা তিব্বত হইতে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করিয়াছে। সড়কটি ভারত সীমান্তের নিকট দিয়া সিকিম ঘেঁষিয়া গিয়াছে। উহা দিয়া তিন টনী ট্রাক চলাচল করিতে পারে।

দণ্ডকারণ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পদস্থ কর্ম-চারীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের ফলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

একটি সংবাদে প্রকাশ, বিহার সরকার কিছু-কাল যাবত পুটিয়া মৌজার গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করিতেছেন। পুটিয়া মৌজা পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপুকুর থানার অন্তর্গত।

২৯শে অক্টোবর—গত ২৪শে অক্টোবর রাত্র আনুমানিক সাড়ে ১০টার সময় হাবড়ার বয়েজ হোমের পাঁচ শত ছাত্রের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ চলে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই খণ্ডযুদ্ধের ফলে হোমের বহু ছাত্র আহত হয় এবং ১২ জনকে হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রকাশ, গত বৎসরের দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদের মধ্যে এই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ডাক ও তার বিভাগ জানাইয়াছেন যে, একটি বেতার লাইসেন্সে একই গৃহে একাধিক বেতার সেট রাখা চলিবে। তবে প্রত্যেক অতিরিক্ত সেটের জন্য বৎসরে তিন টাকা করিয়া ফি দিতে হইবে। ১৯৬০ সালে এবং তৎপরে যে সকল লাইসেন্স দেওয়া হইবে সেগুলি এই সুবিধা পাইবে।

৩০শে অক্টোবর—অদ্য ট্রামওয়ে উপদেষ্টা কমিটির এক বৈঠকে কমিটির সদস্যগণ সকল পর্যায়ে ট্রাম ভাড়া এক নয়া পয়সা বৃদ্ধির প্রস্তাবে একমত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। তবে ঐ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের উর্ধতন তথ্যাভিজ্ঞ মহল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তিব্বতের পথে হিয়াং সি তুঙ নামক জনৈক চীনা গুপ্তচরের নেতৃত্বে একদল চীনা নাগরিক ভারতে গত দুই মাসাধিককাল পূর্বে অনুপ্রবেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কেরল রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে এবং দিল্লীতে বসবাসকারী চীনাদের সহিত অবস্থান করিতেছে।

৩১শে অক্টোবর—ভারত সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করিয়া লাডক সীমান্ত বরাবর পরীক্ষা ঘাটি নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সেণ্ট্রাল রিসার্ভ পুলিস এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অধীনে যে সমস্ত পরীক্ষা ঘাটি এখন আছে সেগুলির দায়িত্বও সেনা-বাহিনী গ্রহণ করিবে।

১লা নবেম্বর—ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মিথিলা রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার উদ্যোগে অদ্য দাবি দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতিত্বকালে কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ঘন-বসতিপূর্ণ ও উদ্বাস্তু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভাষার ভিত্তিতে এই রাজ্যের পুনর্গঠন করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

গত ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় বিদ্রোহী নাগা-দের আক্রমণের ফলে তামেংলং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ, তিনজন কনস্টেবল খণ্ডজাতীয় এক ব্যক্তি এবং একজন ঝাড়ুদার নিহত হয়। ঐ ঘটনায় আর একজন কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে অক্টোবর—পাকিস্তান প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান আজ "মূলে গণ-তান্ত্রিক বিধান" প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র দেশের পাঁচটি স্তরে অংশত নির্বাচিত ও অংশত মনোনীত পরিষদ গঠনের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

একজন চেকোস্লোভাক বিজ্ঞানীকে রসায়ন-বিদ্যার জন্য এবং দুইজন আমেরিকানকে (তাহাদের মধ্যে একজন ইতালীয় বংশোদ্ভূত) পদার্থবিদ্যায় ১৯৫৯ সালের নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর—বহুসংখ্যক তিব্বতী পশ্চিম-নেপালের খোজাং ও সামাতু গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল। এই তিব্বতীরা তাহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট অবস্থান করিতেছে এবং নেপালের যে অংশে তাহারা বসবাস করে তাহা তিব্বতের অন্তর্গত—আত্মীয়দের দ্বারা তাহারা (তিব্বতীরা) স্বীকার করাইয়া লইতে চাহিতেছে।

চন্দ্রের অদৃশ্য দিকটি সমতল মরু-প্রান্তর—সেই দীর্ঘ প্রান্তরের মধ্যে মরু-সমুদ্ররূপী একটি গভীর গর্ত রহিয়াছে। ইতস্ততভাবে কয়েকটি ছোট পাহাড় ও সমুদ্র বা হ্রদরূপী কয়েকটি অগভীর গর্ত থাকিলে পরিদৃশ্যমান অংশের তুলনায় তাহা নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন মনে হয়।

২৮শে অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার আজ তাঁহার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিনি এবং বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্মানীর নেতৃবর্গ এখন পাশ্চাত্য শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত।

গতকাল রাত্রে চীনের উপকূলরক্ষী কামান-শ্রেণী হইতে কুয়েময় দ্বীপে ২২৭টি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। আজ ফরমোজা সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই খবর জানাইয়াছে।

২৯শে অক্টোবর—আজ 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হইবার 'সম্ভাবনা' আছে বলিয়া লণ্ডনস্থিত ওয়াকেবহাল কূটনৈতিক মহল মনে করেন।

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমরিস কুভ দ্য মারভিল আজ ফরাসী জাতীয় পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনের নিকট বলেন যে, ১৫ই ডিসেম্বর নাগাদ প্যারিসে পশ্চিমী 'শীর্ষ' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

৩০শে অক্টোবর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন, সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক কোজিরেভ চন্দ্রের আলফানসো গিরি-মুখের মধ্যবর্তী অংশের বর্ণালী বা স্পেক্টোগ্রাফ তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

৩১শে অক্টোবর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ আজ মস্কোতে বলেন, ভারত-চীন সীমান্তের ঘটনাবলীর জন্য রুশীয়রা অত্যন্ত দুঃখিত।

দলাই লামার ভ্রাতা নিয়ালো থানডাপ আজ ওয়াশিংটনে এক ভোজ-সভায় তিব্বতে চীনাদের সামরিক ঘাটি নির্মাণ সম্পর্কে বলেন যে, কিছুকাল আগে এক চীনা কমানিস্ট জেনারেল তাঁহার সৈন্যদের নিকট বলিয়াছেন—তাহাদের শুধু তিব্বতকে মুক্ত করিলেই চলিবে না—ভারতীয় জনগণকে মুক্ত করার জন্য ভারতে অভিযান চালাইতে হইবে।

১লা নভেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মিঃ জাকির হোসেন গতকল্য লাহোরের সাংবাদিকগণের নিকট বলেন, পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী হইবে ঢাকা শহরে। সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম এবং রাজধানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বাড়িঘরও রহিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

দেবতার কাছাকাছি...

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা ওঁর কাছে প্রায় ধর্ম্মের সামিল। পূজার্চ্চনায় যাবার আগে গোদরেজ স্যাণ্ডেল দিয়ে স্নান করা ওঁর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। গোদরেজ স্যাণ্ডেল ছাড়া অন্য কোন সাবানই উনি ব্যবহার করেন না, কেননা ওটা নিশ্চিত-ভাবে জান্তব চর্ব্বি থেকে মুক্ত।

কোমলকারক ভেজিটেবল অয়েলের সাবানে বিশুদ্ধ মহীশূর স্যাণ্ডেলউড অয়েল যুক্ত হয়ে গোদরেজ স্যাণ্ডেল সাবানকে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। ভেজিটেবল্ অয়েল টয়লেট সাবানের প্রস্তুতকারকদের অগ্রগামী কর্ত্তৃক তৈরী এই সাবানে চটপট প্রচুর ফেনা হয় যা শীতল ও স্নিগ্ধ করে এবং এর খাঁটি চন্দনের গন্ধটি অনেকক্ষণ থাকে···

গোদরেজ স্যাণ্ডেল আপনাকে দামের পুরো মূল্য দেয়।

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ১৩ কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 31st October, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৫২

সূচীপত্র

কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমল: কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদা: (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়: সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদা: সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরেসুস্থে চলেছো কি কুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমল তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমল: ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায় খ্যাচ খ্যাচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারি দিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্র্যাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদা: আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমল: মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজাপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদা: যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়: বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদা: (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদা: সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটির গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

এ ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে। বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি ে ছাড়েন।

ভুতোদা: কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা যলটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।

বিনয়: কি ব্যাপার?

ভুতোদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলো! হোত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।

বিমল: বলুনইনা কি করলে?

ভুতোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী যেই 'ডালডার' টিনে হাতাটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায়?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। ডালডা কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা?

ভুতোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার সহরের হালচালই আলাদা মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডা' তে আমরা কিনে থাকি। ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি বসে" বলে গট্ গট্ করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি, বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করেছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা। বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা' —আহাহা কি ডায়েট—হাঃ হাঃ

ভুতোদা: হাসির কি হোল?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই? বিনয়: ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ? বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস?

বিমল: আপনি এই রেষ্টুরেণ্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। শুধু মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা মিসফায়ার হয়ে গেল।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 31st October, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শূন্য জয়

চন্দ্র অভিযানে সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য নাকি সুনিশ্চিত। তিন নম্বর লুনিক মর্তসীমা অতিক্রম করিয়া চন্দ্র-রাজ্যের অতি নিকটে ঘোরাফেরা করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। শোনা গিয়াছিল, চন্দ্রের অদৃশ্য অংশের খবরাখবর শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। সোভিয়েট আন্তর্গ্রহ বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে অদৃশ্য অংশের কী পরিমাণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন জানি না, তবে এ-যাবৎ সাধারণের কৌতূহল নিরাকরণার্থে এমন কোনো সংবাদ বা তথ্য প্রচারিত হয় নাই যাহা বিস্ময়কর।

আমরা শেষ সংবাদ যাহা পাইয়াছি তাহাতে দেখি, লুনিক-৩ পৃথিবী হইতে ৩ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া চন্দ্রের অদৃশ্য অংশের ছবি তুলিতেছে এবং অন্যান্য এমন বহু সূত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে যাহাতে চন্দ্রের জন্ম ইতিহাস উদ্ঘাটন ও বর্তমান রূপ পরিগ্রহের বিষয় শীঘ্রই জানা যাইবে। সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক বারাবাশোভ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভরসা হয়, চন্দ্রদেহের রূপ বিবর্তন ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের আর দেরি নাই। এ-ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অপেক্ষা করাই সংগত। ইতিমধ্যে অ-রুশীয় বিজ্ঞানীদের কোনো কোনো মহল হইতে কিছু কিছু সন্দেহ-মূলক প্রশ্ন উঠিয়াছে। তবে, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরই মত, সম্পূর্ণ না হইলেও অ-দেখা চন্দ্র-আননের অংশত চিত্র গ্রহণ লুনিকের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

কিছুদিন হইতে 'শূন্য জয়ের' ধ্বনি তুলিয়া সর্বত্র একটা হট্টগোল চলিতেছে। ভাবটা যেন এই, মানুষ শূন্য রাজ্য জয় করিয়া ফেলিয়াছে, মহাশূন্যে গ্রহ উপগ্রহ আজ তার করতলগত। বলিতে কি—কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি, চন্দ্র অভিযান, মহাশূন্যে বিচরণকালে প্রাণী জীবনের পরিবর্তনাদি বিষয়ে সাফল্য ও জ্ঞান যে বিংশশতকীয় বিজ্ঞানের এক চরম কীর্তি এ-সম্পর্কে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ নাই। গাণিতিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এই অসাধ্য সাধনের গৌরব অবশ্যই যোগাজনের প্রাপ্য। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহার সহিত মানবসমাজের কতটুকু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

উপরাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ রাশিয়ার চন্দ্র জয়ের সাফল্যকে খুব বড় করিয়া দেখেন নাই। গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার অবিশ্বাস্য বিশুদ্ধতা তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সহিত মানব সমাজের কল্যাণ বা মঙ্গলের সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তিনি যেন বেদনার্ত হইয়াছেন।

দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের বক্তব্য সরল, কিন্তু সরল হইলেও উপেক্ষা করার নয়। শুধু শ্রীরাধাকৃষ্ণণ নহে, পৃথিবীর অন্যত্র বহু মনীষীই এই শূন্য-জয়ের ব্যাপারটায় যথেষ্ট শান্তি পাইতেছেন না। না পাওয়ার কারণ একাধিক। প্রথমত এই ধরনের শূন্য জয়ের ফলাফল মূলত বিজ্ঞানের একটি কি দুটি বিশেষ শাখার সমৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত ইহার দ্বারা মানবসমাজের বিশেষ কোনো কল্যাণ সাধন হইতে পারে বলিয়া আপাতত কিছু চোখে পড়ে না। তৃতীয়ত দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় অগ্রগামী রাষ্ট্র মাত্রেই এখন শূন্য জয়ের সাধনায় হঠাৎ তৎপর হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা এবং রাশিয়ায় রকেট পরিকল্পনা ও আন্তর্গ্রহ-গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে বলিয়াও শোনা যায়। আর আশ্চর্যের কথা এই যে, এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় একটা সমান উত্তেজনা ও রেষারেষি জিয়াইয়া রাখা হইতেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কোন দেশ আগাইয়া আছে তাহা লইয়া ত এইরূপ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখি না। তবে এ-ক্ষেত্রে এত উত্তেজনা কেন? সন্দেহ হয়, শূন্য জয়ের আপাত বিস্ময় যতই থাকুক পরোক্ষে একটা রহস্য যে একেবারে নাই তাহা নয়।

আমরা বিজ্ঞানের কল্যাণমূর্তি না দেখিয়াছি এমন নহে, বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রায় সকল আবিষ্কার ও অগ্রগতি মানবসমাজের কল্যাণের সহিত জড়িত হইয়াছে, সভ্যতাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয় নাই, কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে বিজ্ঞানের যতখানি রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইয়াছে এমন বুঝি আর আগে হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও সে-কালে জার্মানীর ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু নাৎসী রাষ্ট্রে বিজ্ঞান কাহার দাস হইয়াছিল, কোন পথে চলিয়াছিল তাহা কাহারও অজানা নয়। বলিতে কুণ্ঠা নাই, সেই চরম বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের হাতে পড়িয়া আর যাহাই হোক জার্মানীর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের ও পৃথিবীর অপরিমিত লোকসান বই লাভ হয় নাই।

লুনিকের চন্দ্ররাজ্য জয়ে বিস্ময় অবশ্য আছে, কিন্তু ইহার দ্বারা যতক্ষণ না মানবসমাজের একটা প্রত্যক্ষ কল্যাণ-মূলক যোগাযোগ ঘটিতেছে ততক্ষণ বিহ্বল হইবার মতন কারণ দেখি না।

প্রসঙ্গত

গত বন্যার পরে যে দুটি সমস্যা সকলকে চিন্তিত করে তুলেছে সে হচ্ছে খাদ্য আর স্বাস্থ্য। অনেক অঞ্চলে ইতিমধ্যে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। বন্যার ফলে খাদ্য এবং পানীয় জলের অভাব ঘটেছে। মহামারী তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। চিকিৎসার জন্যে সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসকদল ওই সব অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। দুর্গতদের জন্যে চাল, গম গুঁড়ো দুধ প্রভৃতিও সরবরাহ করা হচ্ছে। অবশ্য সরবরাহের পরিমাণ সর্বত্র যে প্রয়োজনানুরূপ তা হয় তো নয়।

কিন্তু এই সমস্ত আপত-সমস্যার পরে বৃহত্তর সমস্যা আছে। পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে এমনিতেই ঘাটতি অঞ্চল। তার উপর অন্তত দশ লক্ষ একর জমির ফসল এই বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। যে সব অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ হয় নি সেখানে নাকি এখন পর্যন্ত ফসলের অবস্থা খুব ভালো। এখন পর্যন্ত বলা হল এই জন্যে যে শস্যহানির অনেক আশঙ্কা এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান। মাঠের ফসল যতক্ষণ না ঘরে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফসলের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।

ফসল ওঠার সময় পর্যন্ত আর কোনো প্রাকৃতিক উৎপাত যদি না ঘটে তাহলে, আশা করা যায়, এই সমস্ত অঞ্চলে ফসল বেশ ভালো হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, একটা ঘাটতি অঞ্চলে দশ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হলে অবশিষ্ট অঞ্চলের সুফসলও ঘাটতি পূরণের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এ বিষয়ে মিথ্যা স্তোকবাক্য নিরর্থক। ভিক্ষাপাত্র হাতে আমাদের বার হতেই হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

•

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সে কথা ভাবতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সঙ্গে এক প্রস্থ আলোচনা হয়ে গেছে। তার ফলও সন্তোষজনক বলেই মনে হয়। খুব সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাকে নিয়ে একটি খাদ্য অঞ্চল গঠিত হবে। খাদ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ যেমন ঘাটতি রাজ্য, উড়িষ্যা তেমনি উদ্বৃত্ত রাজ্য। এই দুটি রাজ্যকে নিয়ে একটি খাদ্যাঞ্চল গঠিত হলে সে অঞ্চল খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের এবিষয়ে সম্মতি পাওয়া যাবে বলেই মনে হচ্ছে।

তথাপি আপত্তি উঠেছে।

উড়িষ্যার জনসাধারণের একাংশ আপত্তি জানাচ্ছে যে, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে চালের দাম যেমন কমবে, উড়িষ্যায় বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পন্ন প্রদেশ। সেখানে বর্ধিত মূল্যে চাল কিনতে জনসাধারণের কষ্ট হবে না, কিন্তু দরিদ্র উড়িষ্যার জনসাধারণের কষ্ট হবে। এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গও সম্পন্ন প্রদেশ নয়। উপর্যুপরি আঘাতে তার অর্থনৈতিক কাঠামো আজ বিপর্যস্ত। জনসাধারণ আজ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত। গত বৎসর যদি চল্লিশ টাকা মণেও চাল কিনতে পেরে থাকে, সে এই জন্যে যে চাল না কিনে উপায় নেই। এবং তার জন্যে অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় বস্তু থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখতে হয়েছে।

বিশেষ এই বন্যার আঘাত আরও ভয়ঙ্কর। এই আঘাতের ফলে শুধু যে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোই বিপর্যস্ত হয়েছে তা নয়, তার সামাজিক কাঠামোও একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের একটি রাজ্যের এই চরম দুর্দিনে ভারতবর্ষের অন্য একটি রাজ্য (প্রতিবেশী রাজ্য) প্রাদেশিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে স্বভাবিক উদারতার পরিচয় দেবে, এই প্রত্যাশাই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ করে। এই উদারতা উভয় রাজ্যকে যে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবে, ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে তার মূল্য অনেকখানি।

•

আর আপত্তি উঠেছে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে। এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যদিও ব্যবসায়ীদের গত কয়েক বৎসরের কর্মেতিহাসে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়।

নিখিল ভারত খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সমিতি-সমূহের সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক মণ্ডলী হায়দরাবাদ অধিবেশনে মন্তব্য করেছেন, খাদ্যাঞ্চল গঠন ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ খাদ্য-সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমস্যা আরও গুরুতর করে তুলছে। এর ফলে চালের চোরা-চালান বাড়বে। কারণ স্থলপথে চোরাচালান কিছুমাত্র কঠিন নয়। অন্ধ্র থেকে বোম্বাইতে চালের চোরা-চালান চলছে, উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গেও চলবে, তাতেও সন্দেহ নেই। সঙ্ঘ সরকার কর্তৃক দুর্দিনের জন্যে চাল মজুত করার নীতিরও সমালোচনা করে জানিয়েছেন, এর ফলে দেশে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম অনটনের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং মূল্যও সেই কারণে বাড়ছে। সঙ্ঘ দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়ে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারী হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছেন।

*

একেই বলে দুষ্টচক্র। সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যশস্য মজুত করার নীতির মধ্যে ভুলভ্রান্তি এবং দুর্বলতা অবশ্যই আছে। কিন্তু ভ্রান্তি ও দুর্বলতার সুযোগ ব্যবসায়ীরাই গ্রহণ করে থাকেন, যার ফলে জনসাধারণের আজ দুর্গতির অবধি নেই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অন্ধ্র থেকে বোম্বাইতে খাদ্যশস্যের যে চোরাচালানের উল্লেখ সঙ্ঘ করেছেন এবং উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গে যা হতে পারে বলে সঙ্ঘ শাসিয়েছেন, সেই চোরাচালান কারা করে? ব্যবসায়ীরাই নয় কি? এবং সরকারী নীতির ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতার সুযোগেই কি এই অসাধুতা অবাধ প্রশ্রয় পাচ্ছে না? লাভের লোভ আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের এমন-ভাবেই পেয়ে বসেছে যে, দেশের ধনপ্রাণ ও স্বার্থ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়েছে। তাঁরা সরকারের নীতি ও কাজের যে সমালোচনা করেছেন, তার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়ার পরেও খাদ্যের কৃত্রিম অনটন ও মূল্যবৃদ্ধিতে তাঁদের দায়িত্ব ও অপরাধ লঘু প্রমাণিত হয় না। লোভ ও দুর্নীতি আমাদের দেশের ব্যবসায়ে এমনই মজ্জাগত হয়ে পড়েছে যে, তাঁদের কোনো উপদেশই বিনা দ্বিধায় কেউ গ্রহণ করতে চাইবে না।

*

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি যে খাদ্য সমস্যা সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হলে মূল্য নিজে থেকেই কমে যাবে। ব্যবসায়ীদের কোনো প্রয়াসই মূল্যবৃদ্ধি করতে পারবে না। আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি বলেছেন, ভারতের খাদ্যোৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং তা তাঁরা করবেনও। যা অন্য দেশে সম্ভব হয়েছে তা ভারতেও নিশ্চয়ই সম্ভব। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এ পর্যন্ত সরকারের দিক থেকে উদ্যম তো যথেষ্টই হয়েছে। কিন্তু তার ফলে ফসল বাড়েনি, বেড়েছে দুর্গতি। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুও এখন স্বীকার করছেন, "অন্যান্য সম্ভবপর ফলাফল সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করেই বাঁধগুলো তৈরি করা হয়েছে।" শুধু বাঁধেই নয়, সরকারের সমস্ত ব্যয়বহুল কল্যাণ কর্মেই এমনি ঘটে থাকে। জলের মতো টাকা খরচ হয়, বিনিময়ে শস্যহানি, শস্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং "মনুষ্যসৃষ্ট" বন্যা, হয়তো বা দুর্ভিক্ষও।

দক্ষিণ লাদাকে—সীমান্ত থেকে ৪০ মাইল ভারতের ভিতরে—একটি ভারতীয় টহলদারী পুলিশের দল চীনাদের হাতে সাংঘাতিক রকম ঘায়েল হয়েছে। চীনা সৈন্যরা মর্টার, বোমা প্রভৃতি প্রয়োগ করে ভারতীয় দলের ১৭ জনকে নিহত এবং তিনজনকে গুরুতররূপে আহত করেছে। এই ঘটনা ২১শে অক্টোবর ঘটে এবং সরকারীসূত্রে ২৩শে অক্টোবর এই সংবাদ প্রচারিত হয়। তখনো ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিল্লিতে সরকারের হস্তগত হয় নি, হতাহতের সংখ্যা এর চেয়ে বেশিও দাঁড়াতে পারে, চীনাদের হাতে ভারতীয় কেউ বা কজন বন্দী হয়েছে কিনা তাও ২৩ তারিখের সংবাদে জানা যায় নি। নেফায় লংজুএর ঘটনার চেয়েও এটা অনেক বেশি গুরুতর ঘটনা, কেবল প্রাণহানির দিক থেকেই যে গুরুতর তা নয়। লংজু সীমান্তের অতি নিকটবর্তী স্থান, একরূপে বসতিবিহীন অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু ২১এ তারিখ লাদাকে যেখানে ১৭ জন ভারতীয় টহলদারী পুলিস নিহত এবং তিনজন গুরুতররূপে আহত হয়েছে সেখানটা সীমানা থেকে ৪০ মাইল এদিকে এবং জায়গাটা বসতিশূন্য নয়। ঘটনার গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এই সম্পর্কে চীনা সরকারের নোট। নিজেদের ত্রুটি স্বীকার দূরের কথা, পিকিং সরকার ভারত সরকারকে এই অভিযোগ জানিয়েছেন যে, ভারতীয় টহলদারী দলকে মারা হয়েছে তারা চীনা এলাকার মধ্যে অবৈধ প্রবেশকারী ছিল। তার অর্থ যে-জায়গায় এই ঘটনা ঘটে সেটা চীনের এলাকাভুক্ত বলে দাবি করা হচ্ছে। তাছাড়া রাইফেলমাত্রধারী ভারতীয় পুলিশদলের উপর ঢের বেশি শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চীনা সৈন্যরা যে-রকম আক্রমণ চালিয়েছিল তা থেকে ভারতীয়দের কী চক্ষে দেখার নির্দেশ তাদের প্রতি দেওয়া আছে সেটা অনুমান করা যায়।

লাদাকের এই ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী অস্বীকার করেন নি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভ্যস্ত রীতি অনুসারে দেশবাসীর প্রতি উপদেশ বর্ষণ করেছেন। চীনের ব্যবহারে ভারতবাসীর স্বভাবতই ক্রোধানুভব হবে, কিন্তু এসব ব্যাপারে মাথা গরম করে কিছু করা উচিত নয়, আমরা কারো ভয়ে আমাদের ন্যায্য জায়গার দাবী কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

তবে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আপোস মীমাংসার পথ আমাদের কাম্য, যারা বলছে "চীনকে আক্রমণ কর" তাদের কথায় কান দিও না, নিজেদের তো সেই দুর্গম জায়গায় গিয়ে লড়তে হবে না, সেইজন্য এরা এতো কথার তুবড়ি ছোটায়, ইত্যাদি। এই কথাগুলি অসত্য, অর্ধসত্য এবং অসত্য ইঙ্গিতে ঠাসা বলা যায়। প্রথমত এই প্রসঙ্গে যাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে তাদের অনেকেরই চীন কর্তৃপক্ষের চেয়ে ভারতীয় কর্তাদের উপর রাগ হচ্ছে বোধহয় বেশি। হওয়াই বোধহয় উচিত। কারণ পিকিং সরকারের উদ্দেশ্য যত মন্দই হোক সেটা অবোধ্য নয়। মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই উদ্দেশ্যকে গোপন করা, তাকে সাজিয়ে অন্যরকম দেখানো অথবা সোজা দিনকে রাত বলা—এসব বুঝা যায়, কারণ মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের এই সব পন্থা আবহমানকাল অনুসৃত হয়ে আসছে। সুতরাং চীন সরকার যা করছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। তবে রাজনীতিতে আশ্চর্য না হয়েও আশ্চর্য হওয়ার ভাব দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সে প্রয়োজন রাজপুরুষদের পক্ষে হয়, সাধারণ লোকের পক্ষে নয়। এক্ষেত্রে সাধারণ লোকের যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে তার কারণ আমাদের কর্তারা, এঁদের উপরই রাগ হওয়া উচিত। চীনারা তাদের মন্দ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সেই উদ্দেশ্য এবং নিজেদের আচরণের উপর নানা মিথ্যার সাজ পরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয় কিন্তু আমাদের কর্তারা যে এই ব্যাপারের উপর ক্রমাগত কুহেলিকার আচ্ছাদন টেনে চলেছেন ইতিহাসে এর তুলনা আছে কিনা জানি না। চীনাদের কর্মকাণ্ড যতই প্রসারিত হচ্ছে এবং ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়ছে, আমাদের কর্তারা ততই কুহেলিকার চাদরটা আর একটু টেনে বাড়িয়ে আবার তাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছেন।

তা না হলে দুদিন মাত্র আগে কলকাতার এক প্রেস কনফারেন্সে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, সীমান্তে চীনাদের সশস্ত্র অভ্যুদয়ের পিছনে পিকিং-এর বড়ো কিছু মতলব আছে বলে তিনি মনে করেন না! পণ্ডিতজী বলেন যে তিব্বতী বিদ্রোহীদের দমন এবং তাদের নিষ্ক্রমণ-আগমনের পথ বন্ধ করতে গিয়েই চীনা সৈন্যরা এই সব সীমান্ত গোলযোগে জড়িয়ে পড়ছে! আশ্চর্য! যিনি গত ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে চীন প্রধানমন্ত্রীকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে জানাচ্ছেন কী রকম ভাবে ১৯৫৪ সালের তিব্বত সম্পর্কিত ভারত-চীন চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে একটার পর একটা চীন কর্তৃক ভারত সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে আসছে এবং ভারতের জনমত পাছে উত্তেজিত হয় সেই ভয়ে ভারত সরকার ভারতীয় পার্লামেণ্টের কাছ থেকে পর্যন্ত সেসব ঘটনার কথা চেপে রেখেছিলেন—তিনি কিনা পঁচিশ দিন পরে কলকাতার সাংবাদিকদের এমন কথা বললেন যার এই অর্থ দাঁড়ায় যে তিব্বতী বিদ্রোহীদের দমন ও তাড়া করার ব্যাপার থেকেই এই সব সীমানা হাঙ্গামার উৎপত্তি। পণ্ডিত নেহরু ভুলে গেলেন যে, যে-বিদ্রোহের কথা তিনি বলেছেন সেটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার, তিনি ভুলে গেলেন যে দলাই লামা এবং তাঁর সঙ্গের অন্য শরণার্থীরা মাত্র মাস কয়েক হলো ভারতে আশ্রয়লাভ করেছেন। লংজুংএর ঘটনা, যার দ্বারা ম্যাকম্যাহন লাইন লঙ্ঘিত হয়েছে তার সঙ্গে তিব্বতী বিদ্রোহীদের তাড়নের পরম্পরাগত সম্পর্ক কিছু থাকতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে লাদাকে কয়েক বছর থেকে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে তার কী সম্পর্ক? মানচিত্র সম্পর্কিত কুহেলীর বয়সও তো কয়েক মাস মাত্র নয়।

পাপের জন্য বিধিপ্রদত্ত দণ্ডে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এটা কিন্তু কি একটু আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, যে-২১ অক্টোবর তারিখে পণ্ডিতজী কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে বলছিলেন যে, সীমান্ত হাঙ্গামাদির পিছনে চীনের বড়ো কোনো মতলব আছে বলে তিনি মনে করেন না এবং এসব কাণ্ড চীনাদের তিব্বতী বিদ্রোহ দমনের পরম্পরায় সৃষ্ট হয়েছে—ঠিক সেই ২১ অক্টোবর তারিখেই লাদাকে সীমানা থেকে ৪০ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় পুলিস চীনা সৈন্যদের দ্বারা নিহত হচ্ছে? পণ্ডিতজী যদি সেইদিনই খবরটা জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে একথাগুলো বলতে পারতেন না। কি জানি, মাত্র ২৫ দিন আগে তিনি নিজে চীন প্রধানমন্ত্রীকে যে-সব কথা লিখেছিলেন সেগুলো মনে থাকলেই বা কেমন করে কলকাতায় সেদিন অমন "থিসিস" জাহির করতে পারলেন?

আসলে আমাদের কর্তারা বোধহয় আজকাল হয় এত বেশি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অথবা জনসাধারণের বুদ্ধির প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা এতদূর বেড়েছে যে সত্যের সঙ্গে কালের সঙ্গতি রেখে কথা বলার প্রয়োজন আর তাঁরা বোধ করেন না। পিকিং সরকার অভিযোগ করেছিলেন যে ভারত সরকার চীনের বিরুদ্ধে ভারতে উত্তেজনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। পার্লামেণ্টের চীনা নীতির সমালোচনাতেও পিকিং সরকার ক্রোধ প্রকাশ করেন। উত্তরে পণ্ডিতজী তাঁর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে মিঃ চু এন্-লাইকে অভিমানের সুরে লেখেন যে ভারতে উত্তেজনা সৃষ্টিতে সহায়তা করার কথা দূরে থাক, পাছে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেই ভয়ে ভারত সরকার বছরের পর বছর সীমান্তের ঘটনা পার্লামেণ্টের কাছ থেকে পর্যন্ত চেপে রেখেছিলেন। তার জন্য ভারত সরকারের কার্যের সমালোচনা হয়েছে এবং সে সমালোচনা যে অন্যায় সমালোচনা নয় তাও পণ্ডিতজী বলেন। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজী মিঃ চু এন-লাইকে জানান যে ভারতের পার্লামেণ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন, সেখানে কোনো আলোচনা নিবারণ করার ক্ষমতা কারো নেই। কম্যুনিস্ট চীনারা আমাদের পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসিতে বিশ্বাস করে না। করলেও তারা না হেসে পারত না। যে পার্লামেণ্টের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা পণ্ডিতজী বলেছেন সেই পার্লামেণ্টের কাছ থেকেই গভর্নমেণ্ট ৩।৪ বছর ধরে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির দ্বারা ভূমি বেদখলের সংবাদ গোপন করে রেখেছিলেন!

পণ্ডিতজী জনসাধারণকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলেছেন। হায় জনসাধারণ! পার্লামেণ্টের মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতায় যাঁর বিশ্বাস নেই তিনি জনসাধারণকে কতটুকু বিশ্বাস করতে পারেন? জনসাধারণের মাথা ঠাণ্ডা রাখার একমাত্র উপায় দেখা যাচ্ছে যতদিন সম্ভব সংবাদ চেপে রাখা আর যদি সংবাদ বার হয়েই যায় অথবা বার করে দিতেই হয় তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে কাহিনী সজ্জায় সাজিয়ে লোকের মনে মোহ উৎপাদন করা। তা না হলে চীনে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত পণ্ডিত নেহরুর শুভেচ্ছা বাণীর উত্তরে মিঃ চু এন্-লাইএর তারবার্তার একটা সাধারণ কথা নিয়ে এতো রং ফলানো, তার ভিতর থেকে এতো বড় একটা গভীর অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা হয়? ভারত ও চীনের মধ্যে সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের ইতিহাসে সাম্প্রতিক ব্যাপারগুলি একটি "এপিসোড" মাত্র বলে গণ্য হবে—মিঃ চু এন্-লাইএর এই কথার মধ্যে কতো কিছুই না খুঁজে বার করবার চেষ্টা হয়েছে! অথচ একদিক থেকে মিঃ চু এন্-লাইএর কথাটার তাৎপর্য অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক বলা যায়। কারণ যেখানে ভারত-চীনের সম্বন্ধের ইতিহাস হাজার হাজার বছরে হিসাব করা হচ্ছে সেখানে একটা "এপিসোড" দু তিন পুরুষ ধরে চলতেও তো পারে?

তাছাড়া আর একটা খবর কি আমরা জানি? চীনের প্রতি ভারতের বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপক তারবার্তার উত্তরে মিঃ চু এন্-লাইয়ের যেই তারবার্তা যা নিয়ে এদেশে এতো হৈ চৈ হল, সেটা কিন্তু চীনে প্রকাশিত হয় নি! ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো উল্লেখ—সেটা প্রাচীন বা আধুনিক যে কালেরই হোক—চীন শাসকদের মতে চীন জনসাধারণের আপাতত শোনা বোধহয় বারণ।

২৬।১০।৫৯

কবির দায়িত্ব

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

[ইতালির প্রবীণ কবি সালভাতোর কোয়াসিমোদো-কে এ বছর নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। কবির বয়স ৫৮। ইনি আলবার্তো মোরাভিয়া, উনগ্রাটে প্রমুখ সোভিয়েত ও ইতালির কবিদের মধ্যে

কবি কোয়াসিমোদো

সেরা লিখিয়েদের বিশেষ বন্ধু। গত ১৯৫৭ সালের শরতে ইতালিতে কাব্য সম্পর্কে যে বিতর্ক হয় তার নেতৃত্ব করেছিলেন কবি সালভাতোর কোয়াসিমোদো। পরে, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কবিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইতালীয় ও সোভিয়েত কবিদের মধ্যে সেবারও এক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু যাত্রাপথে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর লিখিত রচনাটি অন্য একজন ইতালীয় কবি পাঠ করেন। সেই রচনাটিই এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল। রচনাটির মধ্যে কাব্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।—অনুবাদক]

কাব্যের সমস্যা এমনই যা সর্বদাই আলোচনাযোগ্য। কবির "জন্ম" সব সময়ই "বিশৃঙ্খলা" থেকে। জীবনের ঘনিষ্ট সান্নিধ্য প্রয়াসে এ যেন নতুন কোন পথ। এখানে একটা কথার স্বীকৃতি থাক, কবি কখনও জীবনকে দূরে সরিয়ে দেন না, কবি যখন হতাশায় দগ্ধ হন বা নিজেকে তাঁর নির্জন মনে হয় অথবা জনমনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখেন; তখনও না। এমন কি যখন তিনি দেখেন মানব-সমাজের অর্ধেকের জন্যে স্বর্ণ-উপহার আর অন্য অর্ধেক রক্তস্নাত প্রত্যহের রুজির জন্যে মৃত্যুর মধ্যে স্বর্ণ আর রক্তের একটানা সংলাপ; তখনও না।

কেউ কেউ বলেন, আজকের মানুষ তার নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। এই কথা থেকে আসে, এ যুগের কবি, যিনি নগ্ন আবেগকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে ছাড়েন না, তিনি পর্যন্ত "নিন্দিত" না হয়ে পারেন না এবং তিনি তাঁর সৃজনশীল লেখনীতে শুধুমাত্র মানুষের ক্রমক্ষয়ে অধঃপতনকেই চিত্রিত করবেন।

মানুষের সাময়িক ভাগ্যের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, একথা যেসব অনভিজ্ঞ জন তারস্বরে বলে থাকেন তাঁদের মধ্যে প্রায়ই একটা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়।

কখনই কবিতা "এটা" বা "ওটা" নয়। কবিতা সর্বদাই কবিতা; একথা পূর্বেও বলেছি, কবিতা হ'ল সর্বদাই এক অমূর্তভঙ্গী, গভীর বিশ্বাস। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, এটা হ'ল মানুষের সৃজনীশক্তির ওপর আস্থা এবং এ কারণে তা' অন্যকোনো প্রেরণার আজ্ঞাবহ হতে পারে না।

কবি মানুষ হিসেবে সমাজ গঠনে ব্রতী হন। যদিও এই নির্মাণ কর্মে তিনি "প্রধানত স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব" মাত্র। এ প্রসঙ্গে বলা যাক যে তাঁর ক্ষমতার জন্যে কোন বাইরের উৎসাহের প্রয়োজন নেই। আমি বিশ্বাস করি না যে, কবিতা "সান্ত্বনা" মাত্র। আমার কাছে কবিতা হ'ল মানুষের হৃদয়ের গভীরে জীবনের যে আশা আন্দোলিত হয়, তার-ই স্বাক্ষরিত আন্দোলন।

আধ্যাত্মিকতার "দলিল" কবিতা হতে পারে না। কোনও আধুনিক কবি কি "জ্ঞানের শীর্ষে" উঠে মানুষ ও পৃথিবীর ব্যাখ্যা করবেন? এখানে টি এস এলিয়ট-দান্তে সম্পর্কিত গ্রন্থে দান্তের ভাষার "শুদ্ধতা" সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঈর্ষা প্রকাশ করেছেন। [নিজের দিক থেকে যেমন, তেমনি অ্যাংলোস্যাকশন জগতের সমগ্র কবি, যার মধ্যে অবশ্য সেরা কবিরাও রয়েছেন, তাঁদের দিক থেকেও তাঁর এই ঈর্ষা]।

দান্তে আধুনিক কবিদের এক উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে সময়টাই বড় কথা নয় যেটা হ'ল আসল কথা তা হল সময়ের "জ্ঞান"। তাই পেত্রার্ক আর লিয়োপারডি বিশ্বকবি, তাঁরা জনগণের অন্তরে বিরাজমান। আমরা স্মরণ করি পেত্রার্ককে, স্মরণ করি তাঁর কবিতাকে যা এখন, আমাদের

কালে দূরের মনে হতে পারে, কিন্তু যা' তিনশতাব্দী ধরে সমগ্র য়ুরোপীয় কাব্যের-মৌচাককে লালন করে আসছে। আমরা স্মরণ করি লিয়োপারডিকে কারণ তিনি ভার্জিস'-এর মত নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে "ভাষার মুন্সিয়ানা" দেখিয়েছেন।

বস্তুত লিয়োপারডি'র পর থেকে ইতালীয় কাব্যে নতুন ঢেউ এল, যার ফলে আজকের ইতালীয়কাব্য প্রবাহিনী। যা' হোক, আজ দায়িত্ব অনেক বেশি, এখনই মানুষের "রূপান্তর"এর সময়। শব্দগুলো লক্ষ্য করুন। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ বদলে যাচ্ছে। মানুষকে বদলানো—যার গোপন আকাঙ্ক্ষার চোখ রয়েছে কবিতার বইয়ের পাতায়, যারা শয়তানকেই মানুষের প্রিয় ভাবে, যারা ঠাট্টা করে মায়ের চোখের জলকে, যাদের রক্তাক্ত হাত রয়েছে পকেটে, তাদেরও নবজন্ম দিতে হবে।

মানুষের রূপান্তর—কবির প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সমস্যা হ'ল এখনও এমন মানুষ আছেন যাঁদের কাছে কবিতা নিছক সাহিত্য-খেলা, কবিরা জীবনের পথে এক অজ্ঞাত পথিকমাত্র। এবং কেউ কেউ মনে প্রাণে এমন কামনাও করেন যে, রাত্তের বেলায় কবি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন এক মিনার শীর্ষে, সেখান থেকে খুশিমত উপভোগ করবেন মহাজাগতিক-দৃশ্যাবলী।

কিন্তু নক্ষত্র দেখার দিন, চলে গেছে। কবির কর্ম ও দায়িত্ব—মানুষের রূপান্তর।

অনুবাদ : মিহির ঘোষ দস্তিদার

তিন্দারিতে ঝড়

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

তিন্দারি, তোমায় চিনতাম—
দুসার চওড়া পাহাড়ের মাঝখানে, আর কোমলে,
অমরাবতীর সেই সুন্দর দ্বীপটিতে
জলের ধারে ঝুঁকে তুমি দাঁড়িয়ে।
আজ রণরঙ্গিণী সাজে আলোড়িত করেছ
আমার সমস্ত হৃদয়।

পাইনবনের হাওয়ার সুখস্পর্শে ভেসে
আমি পাহাড়ে চড়ি,
পৌঁছাই খাড়াই শিখরে,
আমায় যারা আনন্দময় সঙ্গ দিয়েছিল
তারা শূন্যে যায় মিলিয়ে,
শব্দের তরঙ্গ আর ভালোবাসা,
মিলিয়ে যায় ছায়া আর স্তব্ধতার ভয়
আমার মরণ,
যাদের থেকে ভুল করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম
সেইখানে আমাকে তুমি নাও
অতীতের সেই ক্লান্তিহর বিরাম কুঞ্জে,
একদা যে দিয়েছে আশ্রয়।

সে দেশ তোমার অচেনা
যেখানে প্রতিদিন আমি গোপনে এক ভাষাকে লালন করি :
আর এক আলোকে তোমার জানালায়
রাত্রিবাস-পরা তোমার অপরূপ রূপ উন্মোচিত হয়,
যে-আনন্দ আমি হারিয়েছি
সে তোমার কোলে শুয়ে আছে।

নিষ্ঠুর এই নির্বাসনের দিনগুলি,
আর তোমার মাঝে যে সঙ্গতি খুঁজেছিলাম
আজ তা মুমূর্ষুর উদ্বেগে রূপান্তরিত,
আর সব ভালোবাসা বিষাদকে রুখবার বর্ম,
সেই অন্ধকারের বুকে স্তব্ধ পদক্ষেপ
যেখানে তুমি আমায় ঠেলেছ,
জীবিকার তিক্ত অন্ন খুঁটে খেতে।

তিন্দারি, শান্তিময়ীর রূপে ফিরে এসো ;
প্রিয়তমা, আমাকে জাগাও
যেন আমি গিরিশিখর থেকে স্বর্গের দিকে উঠে যেতে পারি
আর আমি জানি তারা ভয় পাবে, যারা জানেনা
এই উদ্দাম হাওয়া আমার মধ্যে তোলপাড় করে
কী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অনুবাদ : প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

("Wind at Tindari" কবিতার অনুবাদ)

তিন্দারি—সিসিলির একটি জায়গার নাম। এখানে কবি কোয়াসিমোদোর কৈশোর কেটেছে। এই গীতি কবিতাটিতে সিসিলির সেই স্বপ্নময় কৈশোর পরিবেশের জন্যে নস্টালজিয়ার অনুভূতি একটি বিশেষ 'মুড্' সৃষ্টি করেছে—যা কবির রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। —অনুবাদক

চক্রদত্ত

খেলাধুলো আরম্ভ হওয়ার সময় বন্দুকের আওয়াজ দিয়ে সময় জ্ঞাপন করা হয় আর বন্দুকের আওয়াজ হওয়া মাত্র সময়-রক্ষক তার স্টপওয়াচটি টিপে দেন। কিন্তু দৌড়ের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে লম্বা দৌড়ের দরকার হলে যেখান থেকে প্রতিযোগিগণ রওনা হবে অনেক সময় সেখান পর্যন্ত বন্দুকের

ফ্লাশ বাল্‌ব সহ স্টার্টার

আওয়াজ পৌঁছায় না, ফলে সময়রক্ষকও তাঁর ঘড়িটি সময় মত টিপতে পারেন না। আজকাল সেজন্য বন্দুকের সঙ্গে একটি ফ্লাশ বাল্‌ব লাগানর ব্যবস্থা হয়েছে। বন্দুকের ঘোড়া টেপার সঙ্গে সঙ্গেই আলো জ্বলে উঠবে এবং সময়রক্ষকও তাঁর ঘড়ি টিপে দিতে পারবেন।

*

শব্দভেদী বাণের কথা আমাদের কারো অজানা থাকার কথা নয়, তবে সেটা নিতান্তই কথার কথা হিসাবেই জানি। সত্যকারের শব্দভেদী বাণ আমরা এযুগে দেখিনি এবং একান্তই হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ না থাকলে শব্দ শুনে কারো মৃত্যু ঘটেছে এমন কথাও এযুগে শোনা যায়নি। "সাউণ্ড ইংক ইনকর্পোরেটেড" কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট উইলিয়ম টমাস ল্যাংসিং আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান যুগেও শব্দের দ্বারা মানুষের মৃত্যু ঘটে। ল্যাংসিং বলেন যে, যে শব্দের দ্বারা মানুষের মৃত্যু ঘটান যায় সেটি একটি বিশেষ ধরনের শব্দ এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য এর নামকরণ করেছেন "হিস্‌"। তিনি বলেন, "হিস্‌" মানুষের শরীরের জীবন্ত টিস্যুগুলি নষ্ট করে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মানুষের সমস্ত দেহটা এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রে ফেলতে পারে এবং তাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। ল্যাংসিং আরও বলেন যে, "হিস্‌" শব্দটি এত জোরে হয় যে এর দ্বারা একটি বাড়িকে প্রায় ভূমিকম্পপ্রপীড়িত বাড়ির মত কাঁপিয়ে

ভূমিসাৎ করে ফেলা যায়। অবশ্য শব্দভেদী বাণের মত এ শব্দ যুদ্ধের কাজে লাগবে না কারণ খোলা জায়গায় শব্দটি বাতাসের সঙ্গে মিশতে পেয়ে শব্দতরঙ্গ বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার দরুণ শব্দটির মৃত্যু-ঘটনকারী ক্ষমতা লোপ পায়। যে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে হিস্ উৎপন্ন হয় সে যন্ত্রটি একটি বেশ মজবুত কংক্রিটের বাড়ির মধ্যে রাখা আছে আর অনেকগুলো লাউড স্পীকারের ছোট মুখ দিয়ে শব্দটি বার করানর পর শব্দটি একটু দূরে ধাতব পদার্থে ধাক্কা মেরে ধীরে ধীরে ঐখান থেকে মিলিয়ে গিয়ে অন্য একটি পদ্ধতির দ্বারা বাইরে চলে গেলে মৃত্যু ঘটনকারী ক্ষমতা খুব জোরে শব্দটি শোনা যাবে। ল্যাংসিং বলেন যে, এ শব্দ পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের ওপর প্রয়োগ করে খুব লাভ হবে না, কারণ শব্দটি শোনামাত্রই মানুষের মৃত্যু ঘটবে। কাজেই শব্দটি কেমন করে কীভাবে তার কর্ণপটহে আঘাত করেছে সে খবর পাওয়া সম্ভব হবে না।

অমল হোম

আসন্ন রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের কথা স্মরণ করে মনে জাগছে, কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সহায়তা ও সহযোগিতার কথা।

সে-কথা বলবার আগে শুধু এই ভূমিকাটুকু করে নেওয়া হয়তো দরকার যে, শরৎচন্দ্রকে আমি প্রথম খুব কাছ থেকে দেখি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের শ্রীমানী বাজারের সামনে— এখন যেখানে ডি রতন ফোটোগ্রাফারের দোকান, সেই বাড়িতে— "যমুনা" মাসিক পত্রিকা আপিসে। সেটা ১৯১২ সন। তখন কলেজে পড়ি; আর, আজকালকার ছেলেরা যেমন কলেজ থেকেই পলিটিক্স-এ হাত পাকায়, তেমনি আমরা হাত পাকাতাম সাহিত্য-চর্চায়। অনেক বছর পরে শরৎবাবু তাঁর একখানি চিঠিতে আমাকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—

"—মনে পড়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই সভাতেই জয়ন্তী-উৎসব-পরিষৎ আপিসের আড্ডা। ফণীর ['যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল] ওখানেই প্রথম দেখি তোমাকে। —তুমি আর প্রভাত [বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]। কি তার্কিকই না ছিলে তোমরা দুটি বন্ধু। সমানে আমাদের সঙ্গে তাল ঠুকে গিয়েছ। আর কি পাকা! কতই বা তখন বয়স তোমাদের!"

১৩৩৮, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্ণ হোল। তার কয়েক দিন আগে এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর সংবর্ধনা-প্রস্তাব নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম— রূপনারায়ণের ধারে সামতাবেড়ে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমান নীহাররঞ্জন রায়। শরৎবাবু চিরদিনই খেয়ালী মানুষ; মনে একটু খটকা ছিল, আমাদের তরফ থেকে তাঁকে এই উৎসবে যোগদান করার আমন্ত্রণ তিনি কীভাবে গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে ভূরিভোজনের পর দোতলার বারান্দায় রূপনারায়ণের দিকে মুখ করে বসে কথাটা পাড়া গেল। আমরা জানালাম যে, তাঁকে আমাদের মধ্যে চাই— তাঁকে আসতেই হবে। এক কথাতেই তিনি রাজি হলেন। শুধু বললেন,— 'আমাকে বাপু কমিটি-টমিটিতে রেখ না, ওসব আমি পারব না। আমি তোমাদের পেছনে থাকব। আর দেখ, আর-একটি কথা, বক্তৃতা-টক্তৃতা আমার দ্বারা হবে না, ওসবে আমায় ডেকো না।' আমরা তথাস্তু বলে তখনই তাঁর সব কথা মেনে নিলাম। পরে কিন্তু এ-সব কথার একটিও আমরা রাখিনি বা তিনিও রাখেন নি।'

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ (১৬ই মে, ১৯৩১) কলকাতায় য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্বোধন-সভা আহূত হোল। সে-সভার আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের মনীষী কর্মবীর ও লোকনায়কদের প্রায় সকলেই; আর ছিলেন কলকাতার দেশী-বিদেশী সমস্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ। (১)। সভাপতির আসনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বরণ করলেন বিপিনচন্দ্র পাল। বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-যুগের মধ্যে শাস্ত্রীমশাই সেতু-স্বরূপ—এই কথা বিপিনচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন মনে আছে। সভা প্রথমেই কবির "বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ ও আনন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন" করলেন। প্রস্তাবক ছিলেন— কবি কামিনী রায়; আর সমর্থক মধ্যে ছিলেন—ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কবি অতুলপ্রসাদ, হাসান সুরাবর্দি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার), আর্থার মুর (স্টেটসম্যানের সম্পাদক), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাব— "এই সভার মতে, কবিবরের সমগ্র দেশবাসীর এবং সকল সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কলিকাতা নগরীতে, এই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্যে তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা ও একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য" উপস্থাপিত করলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। এই প্রস্তাবের অনুমোদনে উঠলেন শরৎচন্দ্র। ঠিক পনের দিন আগে তিনি কোনো সভায় বক্তৃতা করতে পারবে

(১) সভার আমন্ত্রণপত্রের প্রতিলিপি এ প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হোল। সে-পত্রে স্বাক্ষরসংগ্রহকালে পরিচয় পেয়েছিলাম বাংলা দেশে নিবাসী ও প্রবাসীদের শীর্ষস্থানে সেদিন যাঁরা ছিলেন, কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কতখানি। মূল পত্রটি আমার কাছে আছে। পত্রটি তাঁর অনবদ্য হস্তাক্ষরে আমাকে লিখে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়।—লেখক ॥

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

সবিনয় নিবেদন—

অদ্য ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮ (শুক্রবার, ৮ই মে ১৯৩১) কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষের পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে, এই শুভঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য, আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ (শনিবার, ১৬ই মে ১৯৩১), সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে একটি পরামর্শ-সভার অধিবেশন হইবে।

এই সভায় আপনার উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়।

ইতি। কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮॥

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

না, এই কথা জানিয়েছিলেন; কিন্তু চমৎকার একটি ছোট বক্তৃতা করলেন। সেদিন তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে তাঁর দেশবাসী যদি তাঁকে যথোচিত সংবর্ধনা জানাতে চায়, তবে তাঁদের কর্তব্য হবে তাঁর বিশ্বভারতীর সহায়তাকল্পে তাঁকে 'অর্ঘ্য' দান। তাঁর সে বক্তৃতার একটি কথা আজও আমি ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন—

> আমি জানি আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্বভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হলই বা খেয়াল, কিন্তু কার খেয়াল ও কত বড় সে খেয়াল, তা তো আমাদের ভুললে চলবে না। তাই বলি, অনুষ্ঠান করুন, আনন্দোৎসব করুন, সব করুন, কিন্তু আসুন কিছু টাকা তুলে দেশের লোক আমরা তাঁর হাতে দিই। তিনি এই বুড়ো বয়সে দেশ-বিদেশে বিশ্বভারতীর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন— এ-লজ্জা আমাদের।

সেই সভাতেই জয়ন্তী-উৎসব-পরিষৎ গঠিত হোল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন—আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু, আর সহকারী সভাপতিদের মধ্যে রইলেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য সহকারী সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, কবি কামিনী রায়, রেভারেণ্ড আর্কুহার্ট, আব্দুল কাসেম আজাদ, চন্দ্রশেখর ভেংকট রমন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, সুভাষচন্দ্র বসু, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও বিধানচন্দ্র রায় (তখন কলকাতার মেয়র)। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সেদিনের সভায় আরও যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন— রেভারেণ্ড আর্কুহার্ট, মৌলভী মুজিবর রহমান, জলধর সেন, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কর্নেল গিডনী, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মৌলানা আক্রাম খাঁ, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জে আর ব্যানার্জি), শ্রীশচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার), দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, জাহাংগীর কয়াজী, আনন্দজী হরিদাস, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজয়কুমার বসু (পরে মেয়র বি কে বসু), সন্তোষকুমার বসু (পরে মেয়র), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবের উদ্বোধন-সভার সেই দিনটি থেকে শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র সকল রকমে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

স্বাক্ষরকারিগণের নাম

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকামিনী রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বাসন্তী দেবী, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীসরলা রায়, শ্রীনীলরতন সরকার, শ্রীপ্রমথনাথ রায়-চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি ভি রমন, সারাওয়ার্দি, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, মোহাম্মদ আক্রম খাঁ, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীঋষিকেশ লাহা, ফস, কলিকাতা (মেট্রোপলিটান), শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীহরিশচন্দ্র নন্দী, ডাবলিউ এস আরকুহার্ট, জে আর ব্যানার্জি (শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এ কে ফজলুল হক, এইচ এ [illegible], শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীজলধর সেন, মজীবর রহমান, শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দজী হরিদাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এ মুর (আর্থার মুর), ই সি বেন্থল, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী (মিসেস কে সি দে), [illegible], শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার, [illegible], হরিরাম গোয়েঙ্কা, [illegible], পদমরাজ জৈন, জাহাঙ্গীর কয়াজী, শিবানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশন)।

কমিটির মিটিং-এ প্রায় নিয়মিত এসেছেন —কখনও সোজা সামতাবেড় থেকে। যুক্তি-পরামর্শ যখন যা তাঁর কাছে চেয়েছি, তিনি অকাতরে দিয়েছেন। কত সময় নিরুৎসাহ হয়েছি, উৎসাহ দিয়েছেন।

জয়ন্তীর কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ উত্তর বাংলায় এল প্রবল বন্যা। ইতিমধ্যে একটি চিঠি পেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে—

কল্যাণীয়েষু,

অমল, জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমাকে পার্স দেবার সংকল্প ত্যাগ কর। সে-টাকা তোমরা বন্যার্তদের দিও। আমি শরৎকে লিখলুম। চিঠিখানা তাকে পৌঁছে দিও। সে সামতা না আমতা কোথায় আত্মগোপন করে আছে, তার পত্তা পাওয়া কঠিন। ঠিকানা ভুলে গেছি, লেখা আছে কোথাও। আপাতত হাতের কাছে অমিয়ও (কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তী) নেই। অতএব—দুটি মাজনীয়। ইতি ১২ই ভাদ্র, ১৩৩৮

শুভার্থী,
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎবাবুকে লেখা চিঠি—

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্য-রূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেছ। দেশে এখন দারুণ দুর্দিন, এ সময়ে অন্য কোনও ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবি করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও, তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখহরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করছি। এই উদ্দেশে একটা কিছু গানগানের কথা চলছে— এই উপায়ে কিছু কুড়ানো যাবে আশা করি। তোমরা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অর্ঘ্য স্বরূপ যা কিছু একত্র করতে পারবে আমার হাতে দিলে এই পুণ্যকার্যে আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি, এই বন্যাতে সে উপায়ে বাখেনি। ইতি ১২ই ভাদ্র, ১৩৩৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজেই জয়ন্তী-উদ্বোধন-সভায় শরৎ-চন্দ্রের প্রস্তাবমতো বিশ্বভারতীর জন্য

কবিকে 'অর্ঘ্যদান সেদিন হয়নি। এজন্যে শরৎবাবুর মনে বরাবরই ক্ষোভ ছিল।

কিন্তু ক্ষোভ শুধু ঐ ব্যাপারেই নয়, আরও কিছু কারণ ছিল ক্ষোভের। কার্তিকের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই চিঠিখানি পেলাম,—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অমল, আজ এই চিঠিখানা পেয়েছি। তোমাকে পাঠাই। লেখক নিশ্চিত জেনেছেন যে, জয়ন্তীর কল্পনা ও উদ্যোগ আমারি—তোমাকে সামনে রেখে। অনেক পাপের জন্যই বাংলাদেশ আমাকে এ পর্যন্ত দায়ী করেছে, পাপও তো কম করিনি বাংলাদেশে জন্মে, তাই আজ সত্তর বছরে পুণ্য অর্জনে লেগে গিয়েছি মহা আড়ম্বরে নিজের জন্মোৎসব-সম্বর্ধনায়। শরৎকে চিঠিখানা দেখিও।*

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ যে-চিঠিখানি শরৎবাবুকে লেখা এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, সেটা শরৎবাবু আমাকে দেননি—আমি চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'কী করবে ও চিঠি নিয়ে, শুধু তোমার মেজাজ খারাপ হবে।' তাঁর কিন্তু এ-চিঠির কথা মনে ছিল। জয়ন্তী-উৎসব থেকে সামতা-বেড়ে ফিরে গিয়ে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন (২৮শে পৌষ, ১৩৩৮) তার মধ্যে অন্য কথার সঙ্গে এই কথাগুলিও ছিল—

"......জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি, স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি—পেছনে থেকে তিনি তোমাকে সব করাচ্ছেন! এ যে বাংলাদেশ অমল—'সোনার বাংলা।' তবু বলতে হবে—আমি তোমায় ভালবাসি।' মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না,—যে যা বলে বলুক।"

জয়ন্তী-উৎসব আরও এগিয়ে এল। কবির মানপত্র রচনা করতে হবে। যথারীতি কথাটা কমিটির সামনে আনলাম। কে রচনা করবেন? কমিটিতে যেমন হয়—দু-চারজনের নাম হোল, মতভেদও ঘটল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আমি ছিলাম যুগ্ম সহযোগী-সম্পাদক।(২) তর্কাতর্কি দেখে শ্যামাপ্রসাদ কমিটিকে বললেন—'আচ্ছা ওটা এখন থাক, পরের মিটিং-এ ওটা বিবেচনা করা যাবে।' পরদিন সকালে শ্যামাপ্রসাদ আমাকে ফোন করলেন—'কাকে দিয়ে করাবেন ভেবেছেন কিছু? কমিটিকে দিয়ে ও কাজ হবে না, আপনাকেই ঠিক করতে হবে।'

তৎক্ষণাৎ আমার মুখে এল—'কেন, শরৎবাবু থাকতে আর কে করবেন?'

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—'তা হলে সে-কথাটা মিটিং-এ কাল বললেন না কেন?'

আমি বললাম—'মিটিং-এ শরৎবাবু বসে; তাঁর সামনে তাঁর নাম করে দশজনের কমিটিতে দশজনের বিভিন্ন মত হয়ে অন্যরকম দাঁড়ালে সেটা কি ভালো হোত? আমি আজই বিকেলে হাওড়ায় শরৎবাবুকে গিয়ে বলব। তিনি মিউনিসিপ্যাল অফিসে এস পি সি-এর মিটিং-এ আসবেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে আমি ধরব।'

শরৎবাবুকে সেদিনই রাজি করিয়ে সোজা গেলাম শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে। সেনেট-সিণ্ডিকেট-মিটিংবিশারদ শ্যামাপ্রসাদ যুক্তি দিলেন—'কাউকে কিছু এখন বলবেন না। লেখাটা শরৎবাবুর কাছ থেকে এলে সোজা মিটিং-এ তুলবেন।'

ক'দিন বাদে সামতাবেড় থেকে এল মানপত্রের খসড়া আর তার সঙ্গে এই চিঠি। (ইতিমধ্যে মিটিং ডেকেছি)।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
৮ই অঘ্রাণ, '৩৮ [নবেম্বর, ১৯৩১]

ভাই অমল,

এই সঙ্গে লেখাটা পাঠালাম। দেখতেই পাবে, কারুকার্যের ছটায় অভিভূত করবার চেষ্টামাত্র করিনি। কারণ সেটা অসম্ভব।

তবে, তোমার নিজের দায়িত্বে কিছু করে কাজ নেই। যাঁরা কমিটিতে আছেন, তাঁদের সকলের মত নাও। বড় অসুস্থ, তাই যেতে পারলাম না।

একটা কথা তোমাকে বার বার জানিয়েছিলাম যে, আমি এ-কাজের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি তো কিছুতেই শুনলে না।

তোমার
শরৎদা।

সে-মানপত্রের প্রথম পংক্তিটি চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে,—

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" (৩)

কবির প্রতি চাহিয়া শরৎচন্দ্রের এই বিস্ময়, তিনি অন্য একটি উপলক্ষ্যেও প্রকাশ করেছিলেন আমার কাছে একটি চিঠিতে—

...অনেকদিন পরে সেদিন তোমার বিবাহ-সভায় [ডিসেম্বর ১৯২৭] রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য সুন্দর—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব সভায় সেই মানপত্র শরৎচন্দ্র স্বয়ং পাঠ করেন, এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কি করে জানি না তাঁর কানে গিয়েছিল, কমিটির সভ্যদের মধ্যে এতে দ্বিমত আছে; তাই তাঁকে রাজি করাতে পারিনি। অসুস্থতাবশত সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সেই

---

* চিঠিতে তারিখ ছিল না—লেখক।

(২) পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ বসু মশাই 'জেনারেল সেক্রেটারী' নির্বাচিত হবার পরেই য়ুরোপে চলে যান এবং ফিরে আসেন জয়ন্তী-উৎসবের মাঝখানে। —লেখক॥

(৩) মানপত্রের বাঁদিকে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর ও ডানদিকে রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বাক্ষর রয়েছে। মূল মানপত্রখানি আমার সংগ্রহে আছে। —লেখক॥

মানপত্র পাঠ করেছিলেন কবি কামিনী রায়। আমার মনে আছে, মানপত্র যখন পড়া হচ্ছিল, শরৎবাবু তখন যেন সংকোচে সারা হয়ে মাথা নিচু করে বসেছিলেন, কেননা, সেটি যে তাঁরই রচনা, সে-কথা কাগজে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

মানপত্র পড়াতে রাজি করতে তাঁকে না পারলেও জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য-আলোচনার জন্য টাউন হলে যে সম্মেলন হয়, সে-সভার অধিনায়ক ছিলেন শরৎচন্দ্র। সে-সভায় তাঁর অভিভাষণের এই কথাগুলি আজ কবির শততম-জন্ম-জয়ন্তীর পূর্বাহ্নে বার বার আমার মনে পড়ছে—

—"কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হল; বিধাতার এই আশীর্বাদ কেবল আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানব-জাতিকে ধন্য করেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল করে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু দিয়ে যাবো যে কবির শুধু কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেছি, তাঁর কথা কানে শুনেছি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।"

এই সম্মেলনে যাঁরা কবিতা পাঠ করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, নিরুপমা দেবী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার নরেন্দ্র দেব, গোলাম মুস্তফা; আর যাঁরা প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—জলধর সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় শিশির-কুমার মৈত্র, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ (১)

জয়ন্তী-উৎসবশেষে 'রূপনারাণের কূলে' ফিরে গিয়ে আমাকে যে-চিঠিখানি শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, তা থেকে কিছু অংশ তুলে দিয়ে আমার এই অসম্পূর্ণ স্মৃতিকথা সমাপন করি—

..."সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলে নয়,—যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, —এ যেমন সত্যি, এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই, —আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী নকসো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বল— — — কিন্তু

(১) সময়ের সীমার মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক বা লেখিকার অনুপস্থিতি-বশত যাঁদের কবিতা বা প্রবন্ধ সেদিন সভায় পঠিত হতে পারেনি, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—বর্ণকুমারী দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, লীলা দেবী, অতুলপ্রসাদ সেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, হেমচন্দ্র বাগচী হেমেন্দ্রলাল রায়, দিলীপকুমার রায় ও গিরিজাকুমার বসু (কবিতা); আর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ, কালিদাস রায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধচন্দ্র সেন নলিনী-কান্ত গুপ্ত, অন্নদাশংকর রায় (প্রবন্ধ)। এঁদের প্রায় সকলেরই রচনা "জয়ন্তী-উৎসর্গ"-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। এঁরা ছাড়া সেদিনের সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বাংলা ভাষণে কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন —হৃষীকেশ ভট্টাচার্য (পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়), নিশিকান্ত সেন (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়), ক্ষিতীশরঞ্জন ভট্টাচার্য (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়), আশা অধিকারী (বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়), চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহম্মদ শহীদুল্লাহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রমথ-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মিণ্টো প্রফেসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে এই বাংলাসাহিত্য সম্মিলন ছাড়া আর একদিন একটি ইংরেজী আলোচনাসভা হয়েছিল টাউন হলে। সভাপতি ছিলেন—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।

আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্যে। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না বললে, মানলে কি না মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি না। মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি।
প্রাণ ভরে তোমাকে আশীর্বাদ করি।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে শরৎচন্দ্র যা পেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে তাঁর এমন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আমি আর কোথাও দেখিনি। তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার সুযোগ যাঁদের হয়েছিল তাঁরাই শুধু জানেন, রবীন্দ্রনাথকে কী চোখে দেখতেন তিনি। আমি ভাবি, সেই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা ও সেই অনুরাগ নিয়ে আজ আর কেউ নেই আমাদের মধ্যে যিনি রবীন্দ্র-শততম-জন্ম-জয়ন্তী-উৎসবে শরৎচন্দ্রের আসন পূর্ণ করতে পারেন!

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

উনত্রিশ

দেবতা-দম্পতির প্রকৃতি দুটি যা চলতি ভাষায় চালিত আছে সেটা হচ্ছে এই যে লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর চিরকালই ঝগড়া। এ-দুই বোনের মধ্যে বনি-বনাও নাকি বড় একটা দেখা যায় না। উত্তরাধিকার-সূত্রে 'শ্রীমতাং গেহে' জন্মলাভ করে অকাতরে লক্ষ্মীকে দান করে সরস্বতীর চরণে নিবেদন করার নজির বিরল, যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বিদ্যাসাগর মহাশয় দারিদ্র্য পাথেয় করে জন্মেছিলেন। উত্তরকালে তিনি বিদ্যাদেবীর কৃপায় ধনাধিকারী হন এবং সেই অর্জিত ধনের পুনর্নিয়োগ করেন সরস্বতীর বন্দনায়। তিনি পাঠ্য-পুস্তক লিখে অর্থোপার্জন করেছিলেন। ইদানীং শোনা যায়, অপাঠ্য-পুস্তক লিখে অনেক টাকা রোজগার করছেন অনেকেই। যেমন প্যাঁচ ফোড়ন দিয়ে খারাপ রান্নাকেও মুখরোচক করা যায়, তেমনি আদি-রসের আমেজে পুষ্ট নিকৃষ্ট রচনা সাধারণ মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে। তাতে শান্তি বা সুরুচির নির্বাসন ঘটলেও লেখকের অর্থ-স্পৃহা চরিতার্থ হয়। বাংলা বই ছাপিয়ে তেমন কোনো প্রকাশককে আমীর বোধ হয় শরৎ চাটুজ্যে ছাড়া আর কেউ করাতে পারেন নি। রবি বাবুরও বইয়ের কাটতি গোড়ার দিকে তত ছিল না। নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁর বিদ্যা যথার্থ অর্থকরী হল।

প্রমথ চৌধুরীর জন্ম-পত্রিকা দেখি নি, সুতরাং বিদ্যা দ্বারা অর্থোপার্জন করা তাঁর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল কিনা তা আমায় জানা নেই। তবে এটা সকলেই জানেন যে, উনি ধনের পথ ধরেন নি, ধরেছিলেন মনের পথ। সরস্বতী ছিলেন ও'র ইষ্ট দেবতা। বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী তাঁর ভক্তের নমস্কার গ্রহণ করে যে বর দিয়ে গেলেন তার সার কথা এই: বীণাবাদন-তত্ত্বজ্ঞ শ্রুতিজাতিবিশারদ হও, জন্মার্জিত-নামানুযায়ী রুদ্রলোকে যাও, কর্মার্জিত ফলানুসারে মহান হও, শ্রুতির ভারতীয় ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে মুখের ভাষা পুস্তকে প্রতিষ্ঠিত করো, বাণীমন্দিরে রুচি ও শুচি অক্ষুণ্ণ রাখো—সমধর্মী মানুষের অভাব হবে না।

এই বরপ্রাপ্তির প্রমাণ পাই ওঁর তিনখানি পত্রে।

৫৮

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৮।২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

এ শনিবারে সেদিনকার কথামত তোমাদের গানবাজনা শোনাতে পারব না, তার কারণ সঙ্গীত-সঙ্ঘের সরস্বতী পুজোর উৎসব

নিয়ে সকলে ব্যস্ত আছেন। তবুও যদি পারোত আমার ওখানে এসো—পাঁচজনে মিলে বর্কাম করা যাবে। সুধীন্দ্রর খবর কি—আশা করি সে এখন ভালো আছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫৯

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২১।২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

আসছে শনিবারে যখন অপর কোনও সভাসমিতিতে আমাদের উপস্থিত হতে হবে না—তখন আমাদের ক্ষুদ্র সবুজসভা এইখানেই বসানো যাবে। অপরের পক্ষে সরস্বতী পূজা একটা নৈমিত্তিক কর্ম—আমাদের পক্ষে ত তা নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে। এবং যত বেশি লোকের পক্ষে সরস্বতী পূজাটা বারোমেসে হয়ে ওঠে ততই দেশের মঙ্গল। এ-কথা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু অনেকে করেন না—তাঁদের মতে সরস্বতী শুধু লক্ষ্মীর সেবাদাসী। এ-ভুল আমাদের দশে মিলে ভাঙাতে হবে। সবুজসভার সার্থকতাই এইখানে। সে যাই হোক—আসছে শনিবারে আমাদের সভায় যোগদান করতে চেষ্টা করো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৬০

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
২৬।২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেই তোমার চিঠি পেলুম। আসছে শনিবাসরের আসর তোমার ওখানে বসাতে আমার কোনই আপত্তি নেই, কেননা সেদিন ও-পাড়াতে যাবার পক্ষে আমার কোনই অসুবিধে নেই। ল-কলেজ থাকার দরুন শনিবার বিকেলে আমি কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হয়ে পড়ি—তাই বাড়ি এসে ধড়াচুড়ো না ছাড়া তক্ আমি শরীর-মনের সোয়াস্তি পাইনে। কিন্তু এ-হপ্তায় শুক্র-শনি দুদিনই কলেজ বন্ধ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বিতরণ উপলক্ষে. সুতরাং ও-দুদিন বিকেলে আমার ঘরের কোলে আশ্রয় নেবার কোনই দরকার নেই। কি স্থির করো সময়মত জানিয়ো। আমি মনে করছিলুম এবার শুক্রবারেই এখানে সবুজসভা আহ্বান করব, কিন্তু এখনো মনস্থির করে উঠতে পারিনি। দেখো—সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজিতে যাকে বলে coterie এবং সংস্কৃতে কলা-গোষ্ঠী—সে জিনিসের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। বড় বড় সভাসমিতি সব রাজনীতি, সমাজনীতির এলাকাভুক্ত। ও-সব ব্যাপারে সকলেরি অধিকার আছে—কেননা সকলেরি স্বার্থ আছে। কিন্তু যে-যাই বলুন আর্ট জিনিসটের চর্চায় সকলের অধিকার নেই—কেননা দুনিয়ার অধিকাংশ লোক দুনিয়াদারি ছাড়া আর কিছু বোঝেনও না, বুঝতে চানও না। সুতরাং এ-বিষয়ে সমধর্মী লোকের সংখ্যা অতিকম এবং সেই স্বল্পসংখ্যক লোকেদের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গ যেমন প্রয়োজন তেমনি উপকারী। যারা কোনও একটি আর্টের চর্চা করে—সমাজের বিরাট উপেক্ষার ভিতর সমাজের প্রতি বীতরাগ হবার সম্ভাবনা তাদেরই খুব বেশি। এ-অবস্থায় দুচারজন লোকের সহানুভূতি তাদের মনকে সুস্থ রাখে। আর তা ছাড়া হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলনের চাইতে মনের সঙ্গে মনের মিলনের প্রয়োজন মানুষের পক্ষে কিছু কম নয়। সুতরাং হপ্তায় দু ঘণ্টা গল্পগাছবে কাটানো ছাড়াও সবুজ সঙ্ঘের আরও কিছু সার্থকতা আছে।

সুধীন্দ্রের প্রতি আমার একটু বিশেষ পক্ষপাত আছে—সম্ভবত সে 'হিঁদুয়ানি'র বেজায় পক্ষপাতী বলে। এ-যুগে কোনও বিষয়ের বেজায় পক্ষপাতী হওয়া শক্ত, কেননা কোনও লৌকিক গণ্ডীর ভিতর সমস্ত মনটাকে একেবারে প্যাক করে ফেলা অসম্ভব,—সে মন চারিদিক থেকে ঠেলে বেরিয়ে যায়। এ-রকম অবাধ্য ও বেয়াড়া মন

নিয়ে দিন কাটানো, আর যাই হোক, আরামের নয়। সুতরাং যদি কাউকে দেখতে পাই যে দিব্যি মনের আরামে আছে, তাহলে তা ভালো লাগে। যে সব সংশয় সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি সে সব সংশয় ও সমস্যা থেকে যার মন মুক্ত তার অবস্থা যে হিংসনীয় তাতে আর সন্দেহ কি? বাঙলার নব্য হিন্দুয়ানিই আমার কাছে অসহ্য, কেননা তার মূলে কোনরূপ সরল বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যে নেই তার প্রমাণ নব্যহিন্দুরা তাঁদের মত খাড়া করবার জন্য একবার যান দৌড়ে স্পেন্সার-এর কাছে, আর একবার শংকরের কাছে--তারপর Hegel, Eucken, Bergson, কবিরাজ গোস্বামী--দাশরথী রায়--শশধর তর্কচূড়ামণি--Hertz, Poincare--এ সবই তাঁদের গুরু। একটু দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্য, তাঁরা একবার এর পায়ে ধরছেন আর একবার ওর পায়ে ধরছেন, শুধু এক কাজ করতে এ'রা একান্তই অক্ষম, সে হচ্ছে মনোরাজ্যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এই মানসিক কাপুরুষতা যেমন কমিক তেমনি ট্র্যাজিক:--সে যাই হোক এ রোগের সৃষ্টি করেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। বুদ্ধিকে মেরে বিদ্যেকে বাড়াতে যাওয়াতেই এই অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। যাক্ ওসব কথা, সুধীন্দ্রকে ভরসা দিতে পারো যে, সে নির্ভয়ে আমার যুক্তিতর্ক মজাঠাট্টা শুনতে পারে, তাতে তার হিন্দুয়ানির গায়ে দাগ ধরবে না। একজনের বিশ্বাস আর একজনে দূর করতে পারে না--যদি না তার মনে সে একটা নতুন বিশ্বাস জন্মে দিতে পারে। আমি যা বিশ্বাস করি তা অপরকে বিশ্বাস করানো শক্ত--কেননা তা ধরা-ছোঁয়া ত যায়ই না তা ডিফাইন পর্যন্ত করা যায় না--সে বস্তুর নাম হচ্ছে স্পিরিট--আমি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করলুম, কেননা ওর সংস্কৃত প্রতিশব্দ "আত্মা"র আমাদের নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে এতই দুর্গতি হয়েছে যে, ওর নাম উল্লেখ পর্যন্ত করতে প্রবৃত্তি হয় না। ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া আমার ধাতে আছে, সুতরাং এ-চিঠির শেষ অংশটি বাজে বকুনির কোঠায় ফেলে দিয়ো। ইতি--

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এ-চিঠিতে যে সুসংগের সুধীন্দ্র-প্রসংগ রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিত ভাল করে বুঝতে হলে সুধীন্দ্রকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর দুটি চিঠি পড়া উচিত। চিঠি দুটির তারিখ, ৯।৮।১৭ আর ১৭।৮।১৭

[সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা]

ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ।
৯।৮।১৭

কল্যাণীয়েষু,

হারিতের মুখে শুনলুম যে তুমি সেদিন আমার নিমন্ত্রণ কাটিয়ে দিলে তার কারণ, তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে যে, সে নিমন্ত্রণ ফাঁকা নয়--কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলক।--শুনলুম তোমার ধারণা এই যে, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা কূল-কিনারা করে দেবার জন্যে তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা যে ষড়যন্ত্র করছেন, আমি সে ব্যাপারে যোগ দিয়েছি। এর ভিতর কিছু সত্য যে নেই তা নয়। বিলেত যাওয়ার দরুণ আমি বারেন্দ্র সমাজে পতিত হলেও সে-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হই নি, তার কারণ বারেন্দ্র-সমাজ আমার আত্মীয়সমাজ। এই আত্মীয়তার খাতিরে আমি বারেন্দ্র সমাজের অনেক ব্যাপারে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ি এবং অনেক সামাজিক পরামর্শের ভিতর থাকতে বাধ্য হই। এ-সকল ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কিম্বা পারিবারিক কোনও স্বার্থ নেই--সম্ভবত এই কারণে বারেন্দ্র সমাজের উপরওয়ালারা আমার মতামত ও সাহায্য চান এবং সে সব ক্ষেত্রে আমিও নারাজ হইনে--তবে এতে তোমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। জানই ত--আমি একটি আর্টিস্ট; সুতরাং আমার উপর এ-ভরসা রাখতে পারো যে আমার কাছ থেকে কোনও জিনিসের aesthetic দিকটে উপেক্ষিত হবে না। তোমার সংগে দেখা হলে এ সকল কথা তোমাকে মুখেই বলতুম। কেননা আমার মতে জীবনের বড় বড় ব্যাপারগুলো সকলের চোখ চেয়েই করা উচিত।

সে যাই হোক--আমার এখানে আসতে তোমার ইতস্তত করবার কোনই কারণ নেই।

ধরো যদি তোমাকে উৎপাত করবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হয়ে থাকি, তাহলে সে উৎপাত আমার বাড়িতে করব না—তোমার বাড়িতে গিয়ে করব।

আস্‌ছে শনিবার বিকেলে যদি এখানে এসো ত খুসি হই। তুমি নির্ভয়ে আস্‌তে পারো—এখানে সাহিত্য ছাড়া কোনো সাংসারিক বিষয়ের আলোচনা হবে না,—কেননা এমন অনেকে উপস্থিত থাকবেন, যাঁদের সুমুখে কোনও সামাজিক ব্যাপারের কথাবার্তা কওয়া চল্‌বে না।

এ-চিঠি কাউকে দেখাবার দরকার নেই। কারণ তোমাকে মুখে বল্‌ব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪

[সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা]

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
১৭।৮।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার শেষ পত্রের উত্তর দিই নি, কেননা—যে-কথা নিয়ে আমরা চিঠি চালাচালি কর্‌ছিলুম সে কথাটা আপাতত কোনও কারণে চাপা পড়ে গিয়েছে। এ-সংবাদ শুনে তুমি বোধ হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।
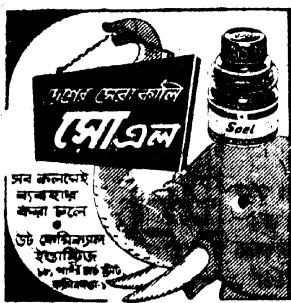
তুমি লিখেছ, তোমার "স্ব" বলে একটি পদার্থ আছে। কথাটা শুনে খুসি হলুম, কেননা আমাদের জাতের ভিতর ঐ পদার্থটিরই একান্ত অভাব। আমরা—হিন্দুরা—ভূমিষ্ঠ হবামাত্র আমাদের নিজের জীবনের উপর স্বত্বস্বামিত্ব হারিয়ে বসি। জীবনের বিষয়ে আমাদের মত "নিঃস্ব" জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।—আমার স্মরণ হচ্ছে আমি একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখি যে—

"যেমন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তেমনি আমরা না জন্মাতে আমাদের "আমায়ণ" লেখা হয়।"

এ-দুই জীবনচরিতের মধ্যে তফাৎ এই-টুকু যে, রামায়ণ লিখেছিলেন বাল্মীকি, আর দেশসুদ্ধ লোকের "আমায়ণ" লিখেছেন মনু। এই বিশ্বাস থাকার দরুণ আমি স্বজাতির ভিতর কোথাও "স্ব"র সন্ধান পেলে খুসি হই। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি লোকে এ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে একই জীবন নাটকের অভিনয় করে চলেছে এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না, হোক্ না সে নাটক একটা মস্তবড় ট্রাজেডি। এ অবস্থায় কেউ যদি ফূর্তি করে প্রহসনেরও অভিনয় করতে পারে—তাহলে আমি বল্‌ব—"বাহবা কি বাহবা, ক্যা রও, সোভানাল্লা, তুহারি কাম" ইত্যাদি, কেননা তার ভিতর আর কিছুর না হোক "স্ব"র পরিচয় পাওয়া যাবে। আমার এ সব কথা শুনে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবশ্য কানে হাত দেবেন, কিন্তু তা বল্লে কি করা যায়। শাস্ত্রেই লেখা আছে—লোকের রুচি বিভিন্ন। এবং আখেরে মানুষের আপ্-রুচি ছাড়া আর আশ্রয় নেই।—কেননা আর সকল বিষয়েই তর্ক চলে, এক রুচি ছাড়া।—আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি—এ যুগে এক aestheticsই আমাদের ভরসা।—তুমি বিউটির নাম শুনেই তার শত্রু ইউটিলিটির কথা পেড়েছ। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে—বিউটিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের স্বহস্তলিখিত পরিচয়পত্রকে অগ্রাহ্য করা—আমার নিজের বুদ্ধির এতটা ভরসা নেই যে তা অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা করতে পারি। আর ইউটিলিটির দোহাই সেই সব ক্ষণজন্মা লোকেই দিতে পারে—যাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আছে—যাদের পাকা হিসেবে সব ব্যাপারেরই শেষ ফল আগে থাক্-তেই কশা হয়ে থাকে। যেহেতু আমাদের চোখে দূরবীক্ষণও নেই অণুবীক্ষণও নেই—সুতরাং ইউটিলিটির অতি-সূক্ষ্ম কিম্বা দূর চেহারা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।—সে যাই হোক, কাল বিকেলে যদি পারো ত এখানে একবার এসো—জলযোগ করতে হবে না। যখন তুমি জলগ্রহণেই নারাজ তখন অবশ্য তোমাকে কারও "পাণী"গ্রহণ করতে অনুরোধ করব না। —ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এইবার থেই ধরি আমাকে লেখা চিঠির।

৬১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
১।৩।১৮

কল্যাণীয়েষু,

তথাস্তু। কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তোমাদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হব। যে রোদ! ওর চাইতে সকালে যাওয়া কঠিন। পাখার অভাবটা আমার কাছে তেমন একটা অভাব নয়। আমি কারও পাখার তলায় থাকতে ভালবাসিনে—এমন কি বিদ্যুতেরও নয়।

ভাল কথা,—তোমার সেই প্রথম চিঠির প্রস্তাব অনুসারে আমি কাজে পরিণত করেছি। কাল রেডিয়োতে [illegible] পড়িয়েছি। ১৫ মিনিট একটানা বাঙলায় বক্তৃতা করেছি। সে বক্তৃতা কোথাও ঠেকেনি কোথাও বাধেনি, এবং আমার বিশ্বাস আমি আমার বাঙলার ভিতরে ইংরেজির ফোড়ন দিইনি। এর জন্য শেষে আমাকে [illegible] কর্তৃপক্ষদের কাছে [illegible] না করতে হলেই বাঁচি। [illegible] বক্তৃতা শুনে [illegible] মুখে হাসি দেখা দিয়েছিল, সে হাসির পিছনে ছিল আনন্দ কি অবজ্ঞা তা বলতে পারিনে। সে যাই হোক, আমার বিশ্বাস আমি এইটুকু প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে বাঙলা ভাষা আর যাই হোক, [illegible] নয়।

আমি যে [illegible] সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। তবে [illegible] সকল [illegible] যে আমার [illegible] এ দাবী আমি করতে পারিনে। [illegible] থেকে [illegible] করতে—[illegible] উত্তরাধিকার [illegible] এসেছে। [illegible] ও বাঙলা [illegible] মণি-কাঞ্চনের যোগ হয়। যাক এ সব বাজে বকুনি। "পুনর্দর্শনায়"। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৬২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
৮।৩।১৮

কল্যাণীয়েষু,

আমাকে চিঠি লিখতে তোমরা পাঁচজনে যে শিখিয়েছ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই, এবং সে পাঁচজনের মধ্যে তুমি হচ্ছ একজন মহাজন। কেননা তোমার চিঠির জবাবে তুমি আমার কাছ থেকে সন্দে-

শুধ আদায় করে নিয়েছ। সে যাই হোক আজকাল আমি আবার চিঠি লেখায় ঢিলে দিয়েছি, তার কারণ সময়ের অভাব। এখনি এম এল-এর পড়া তৈরী করতে বস্‌তে হবে, আর তাতে সমস্ত সকালটা কেটে যাবে। সেইজন্য এ-চিঠি নমঃ নমঃ করে সারব।
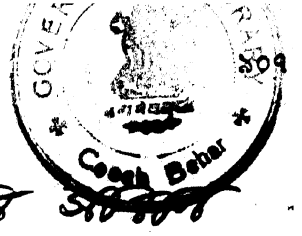
বাৎস্যায়নের কথা এই—"কর্তর্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেবীং মলয়-বতীং"—এখানে "জঘান" উহ্য থেকে গেল।

শাতকর্ণির অর্থ "কানকাটা"—যদি তেলেগু স্ত্রীলোক দেখে থাকো তাহলে অন্ধ্ররাজদের কেন "কানকাটা" বলা হত তা সহজেই বুঝতে পারবে।

আমার এখানে আসছে শনিবারে না এসে রবিবার বিকেলে এসো। শনিবার আমি বাড়ি থাকব না। রবিবারে সত্যেন্দ্র দত্তকেও আসতে লিখেছি, ছন্দ নিয়ে তর্ক করা যাবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৬৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
১৯।৩।১৮

কল্যাণীয়েষু,

তুমি যদি বন্ধুর বিবাহে বিব্রত না থাক তাহলে পরশু শনিবার সন্ধ্যায় আমার এখানে উপস্থিত হয়ো। আমার গল্প তৈরী রয়েছে—শুনতে চাও শোনাতে পারি—তবে কথা হচ্ছে তাতে এত ছিবলেমি আছে যে, তোমাদের পড়ে শোনাতে ঈষৎ সংকোচ হয়। আমি আবার লেখায় হাত দিয়েছি—আশা করছি এ ঝোঁক কিছুদিন চলবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

৬৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
২৭।৩।১৮

কল্যাণীয়েষু,

আসছে শনিবারে এখানে একটু গান-বাজনার বন্দোবস্ত করছি। ঢাকা থেকে একটি নামী সেতারী এসেছেন—তিনি বাজাবেন এবং সেই সঙ্গে আরও দু'একটি গাইয়ে বাজিয়ে থাকবেন। সব বাঙালের দল এবং সেতারীটি ব্যতীত আর সকলেই আমার স্বজাতি অর্থাৎ বারেন্দ্র। আশা করি তুমি সেদিন উপস্থিত থাকতে পারবে। যদি পারো ত সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

এবারকার ছুটিটে আমার মাঠে মারা গেল অর্থাৎ বালিগঞ্জেই কাটল। নানা কারণে বাইরে যাওয়া হয়নি, তারপর ঘরের বাইরে যাওয়াও ঘটে উঠছে না—তার প্রথম কারণ শরীর তেমন চাঙ্গা নেই, দ্বিতীয় কারণ হাতে কাজ আছে, তৃতীয় কারণ মোটর

নক্ষত্রপুঞ্জ প্রক্ষেপের যন্ত্র

যে অজস্র জ্যোতিষ্ক ছাড়িয়ে আছে, তাদের যথাসাধ্য পরিচয় লাভ এবং তৎসংগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কতগুলি জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে সহজ ও প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর প্রথম প্ল্যানেটোরিয়াম বা গ্রহানুশীলনকেন্দ্র নির্মাণের কৃতিত্ব জার্মানীর। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সেখানকার জেনা শহরে এটি স্থাপিত হয়। একটি অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজের তলদেশ আকাশের প্রতিনিধিত্ব করে। কক্ষের মধ্যস্থলে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতিসমন্বিত একটি অভিক্ষেপক (প্রোজেক্টার) রাখা হয়। ঐ যন্ত্র সাহায্যে গম্বুজের বক্রতলের ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং খালি-চোখে দৃষ্ট আরও পাঁচটি বিভিন্ন গ্রহের প্রতিকৃতি প্রক্ষেপিত হত। জ্যোতিষ্কগুলোর দেহাকৃতির পারস্পরিক অনুপাতই যে কেবল অক্ষুন্ন রাখা হয়েছিল তা নয়, তাদের আপেক্ষিক দূরত্বেরও কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। প্ল্যানেটোরিয়ামটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার করে। প্রথম দেড় বছর কালের মধ্যে এখানে আশী হাজারেরও বেশি দর্শক-সমাগম ঘটে। এই অভাবিত সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্যোক্তাগণ প্ল্যানেটোরিয়ামটিকে আরও উন্নতকরণে প্রয়াসী হন। ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশেও গ্রহানুশীলন কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে সর্বসমেত সাতাশটি প্ল্যানেটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় যে কেন্দ্রটি স্থাপিত হতে চলেছে, বিশ্বগতভাবে তার স্থান সম্ভবত ছত্রিশতম।

গ্রহানুশীলন-কেন্দ্রের গম্বুজের আয়তন সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই; তবে আশী ফুট ব্যাসবিশিষ্ট গম্বুজ মোটামুটি প্রমাণ আকারের বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। একটি বর্তুলাকার ধাতব কাঠামোর গায়ে লিনেন কিংবা সচ্ছিদ্র ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়ামের চাদর চড়িয়ে অবতল (Concave) অভিক্ষেপক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অভিক্ষেপযন্ত্রটি ডাম্বেলসদৃশ এবং তিনটি পরস্পরচ্ছেদী অক্ষে ঘূর্ণনক্ষম। প্রথম অক্ষ ভূ-মেরুরেখার সংগে সমান্তরাল। পৃথিবীর কোন স্থানে আহ্নিকগতিহেতু আকাশের গ্রহনক্ষত্রের যে স্থান পরিবর্তন প্রতীয়মান হয়, এই অক্ষের চারদিকে অভিক্ষেপযন্ত্রকে ঘুরিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা যায়। দ্বিতীয় অক্ষ পৃথিবীর কক্ষতলের সংগে লম্বভাবে অবস্থিত, তৃতীয়টি প্রথম অক্ষের সংগে নব্বই ডিগ্রী কোণে অবনত এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে একই দ্রাঘিমা বরাবর দক্ষিণ মেরুর
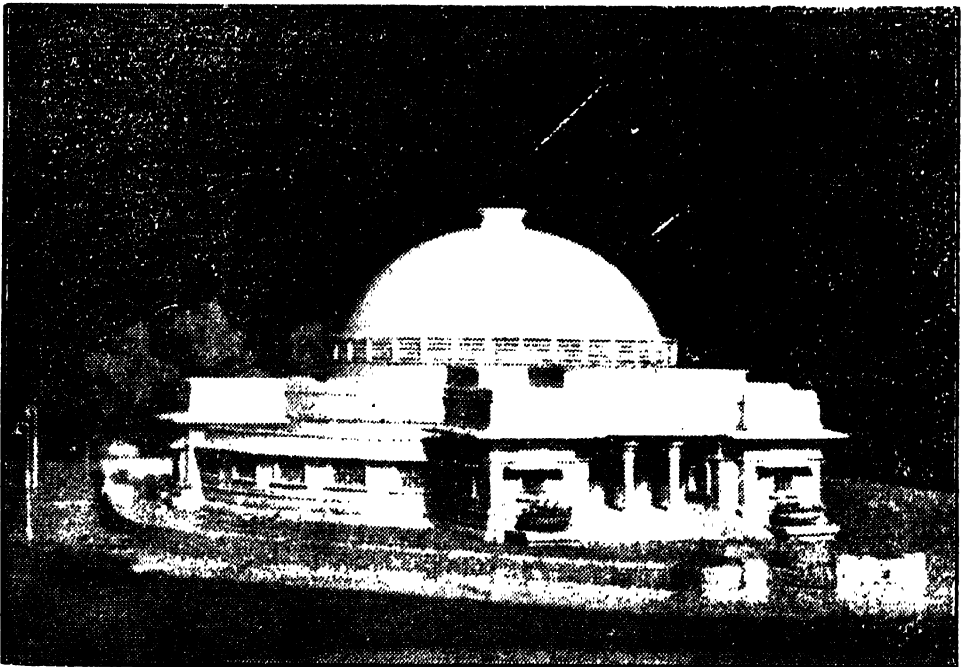
কলকাতায় যে প্ল্যানেটোরিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার মডেলের আলোকচিত্র

দিকে অগ্রসরমান পর্যবেক্ষকের কাছে আকাশের যে ক্রমরূপান্তর ধরা দেয়, তৃতীয় অক্ষে ঘূর্ণনের দ্বারা অভিক্ষেপযন্ত্র নকল আকাশে তা সূচিত করতে সমর্থ। এর ফলে বিভিন্ন অক্ষাংশে আকাশের যে বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হয়, আমরা একই জায়গায় বসে তা প্রত্যক্ষ করতে পারি। শুধু তাই নয়, এখানে অতীতসঞ্চারী, এমন কি ভবিষ্যৎ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত করা চলে। পাঁচ হাজার বছর আগেকার বা পাঁচ হাজার বছর পরেকার আকাশে ছবি কেমন হবে, প্ল্যানেটোরিয়ামে তা স্বল্পায়াসেই দেখানো সম্ভব।

অভিক্ষেপযন্ত্রের দুপ্রান্তে দুটি গোলক সংলগ্ন আছে। এরাই নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতিকৃতি নিক্ষেপের জন্য দায়ী। একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোকপ্রভব (source of illumination) এবং ষোলটি সংগ্রাহক কাঁচ (condenser lense) প্রতিটি গোলকের অন্তর্ভুক্ত। আলোকরশ্মি সংগ্রাহকের মধ্য দিয়ে সংহত হয়। তারপর একটি সচ্ছিদ্র তাম্রফলক পার হয়ে অভিক্ষেপতলের ওপর আপতিত হয়। নক্ষত্রদের আয়তনের সঠিক তারতম্য বজায় রাখার জন্য তাম্রফলকের ছিদ্রগুলি অসম আকৃতিবিশিষ্ট। ছায়াপথের আভাসসৃষ্টির জন্য পারদপূর্ণ একটি বিশেষ ধরনের অভিক্ষেপক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অভিক্ষেপকের মধ্যাংশে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহদের প্রতিকৃতি সৃষ্টির সরঞ্জাম রয়েছে। গ্রহমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সূর্যের আপাত পথ-পরিক্রমা এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের চক্রবর্তন সার্থকভাবে উপস্থাপিত করার যন্ত্রকৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে। একই সঙ্গে প্ল্যানেটোরিয়ামের আকাশে ৮৮টি বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের একত্র সমাবেশ ঘটানো সম্ভব। এছাড়া অত্যন্ত সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন দর্শকের কাছেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন দুরূহ তত্ত্ব এবং সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, জলবিষুব, মহাবিষুব প্রভৃতি সৌরজাগতিক প্রক্রিয়াগুলি এমন প্রাঞ্জলভাবে বোধগম্য করে তোলা হয় যা এককথায় অকল্পনীয়।

উন্নত সাজসরঞ্জাম এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উৎকর্ষ বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাইডেনস্থিত কেন্দ্রটি সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয়। এতে বিভিন্ন উচ্চতায় দুটি পিঠোপিঠি গম্বুজ রয়েছে। ওপরের গম্বুজে প্রধানত ঝড়বৃষ্টি প্রতিরোধ এবং নিচেকার গম্বুজের ভারবহনের জন্য নির্মিত। দ্বিতীয় গম্বুজের ভেতর পিঠে গ্রহনক্ষত্রের প্রতিকৃতি প্রক্ষেপ করা হয়। অভিক্ষেপযন্ত্র ১২ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং ১২০টি আলোকোৎস সমন্বিত। ফলত কৃত্রিম আকাশ রচনায় অন্যান্যদের তুলনায় এটি অনেক বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে।

বাড়ি

আলোক সরকার

এখন বৃষ্টির পরে নির্মেঘ দুপুর, এখন পাখির উড়ে-যাওয়া,
কতো সহজের পাতা জ্বলে ওঠে হীরক খণ্ডের অনুরূপ।
সম্পূর্ণ সংবাদ—দ্যাখো আকাশের অফুরান, প্রান্তরের বিজন
উজ্জ্বল ;
প্রজাপতি, কালো ভ্রমরের ফুল, একাগ্র অমল নীল ধূপঃ
গোপনে উঠেছে ফলে এই ফল ?

একদিন নিশ্চয় একটি বাড়ি ছিলো, খুব রৌদ্র ছিলো
নাকি উন্মুখর বৃষ্টি তামসী প্রখর।
জানলার দুইটি কপাট যেন প্রতিবাদ, কিশোর জিজ্ঞাসা—
স্রোতস্বিনী, আমার প্রেমিকা তুমি, মিলনের অবসর
এই ঘাটে ? দ্যাখো, নৌকো ভাসিয়েছে শুভকামনায় কারা—
জ্যোৎস্না, আশা।
স্পষ্ট মনে আছে ঘরে পরদা ভাসিয়ে হাওয়া দিলো।

আমি যদি জানলা বন্ধ করি তুমি তো আমার পাশাপাশি
পাহাড়ের পাশে, দূর অরণ্যের সমান্তরাল।
স্বাভাবিক ভালোবাসা, দ্যাখো আমি আছি
কিন্তু এই পাতা এই পাখি এই নির্মেঘ দুপুর
এই ফল ঘাসের উপরে—আমি কিছুতেই প্রস্ফুটিত লাল
আলমারির ভিতরে রাখবো না।

নাকি অভিশাপ ? আমি তোমার শরীর ভালোবাসি, তোমার
প্রেমের
মহিমা জানিনি। কতবার স্বতঃস্ফূর্ত দুই হাত অর্পিত
আকাশ,
রোদ-বৃষ্টি দালানের নিবিড় সকাল, আরো প্রসন্ন মেঘের
নিমীলতা—প্রেমিক সংরাগে তারা শাশ্বত চিত্রের অবকাশ
প্রবাহিত জ্বালে। স্রোতস্বিনী, দ্যাখো ওরা ছাদের কার্নিশ
ধরে ঝুঁকে
শুভ্র স্থির নিজের বাড়িকে কিন্তু করেনি করেনি অবিশ্বাস।

মাইথন

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

একটা ইস্পাতী খড়্গ নদীটাকে আড়াআড়ি কেটে
গেঁথে আছে ; বাঁয়ে ছিন্নমুণ্ড স্থির ; সম্মুখে বিগ্রহ
উদাসীন মাইথন। ডাঙাটা সাষ্টাঙ্গে বুকে ঢালু জলা হেঁটে
পাহাড়ে প্রণত যেন। স্বর্গজয়ে মূর্তিমান কঠিন নিগ্রহ।

রাস্তাটা পাথর ভেঙে এগিয়ে কিছুটা দূরে আরেক পাথরে
কল্যাণেশ্বরী দেখে, নিভৃত আড়াল নিয়ে স্থির হয়ে থাকে—
কাঠুরে যেমন গাছ একে-একে কেটে শেষে গাছেরই মর্মরে
জিরোয়, জুড়োয়, শোয়। এই পথ চায় শুধু তার মাটি-মাকে।

কেন মুখ রাখো

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কেন মুখ রাখো এই বুকে—
তুমি-আমি বিপরীত গতি।
তুমি কাঁপো কী অসহ্য সুখে !
তবু বুক রাখো এই বুকে।
জানো না তো কঠিন নিয়তি
আনে ক্রূর বিরহ-সিন্ধুকে।
কেন মুখ রাখো এই মুখে,
তুমি-আমি বিপরীত গতি ॥

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

১৭

মাধুরী ভেবেছিল কত হৈ চৈ গোলমালই না জানি হবে। পান থেকে চুন-খসলে যে বাড়িতে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটির অন্ত থাকে না, সেই বাড়ির মেয়ে রাত বারটার সময় ট্যাক্সিতে করে অনাত্মীয় এক যুবকের সঙ্গে বেড়িয়ে এল, এ ঘটনার জের দু একটি বাঁকা কথায়, তীর্যক টিপ্পনীতে নিশ্চয়ই শেষ হবে না। সারা রাত ধরে নিন্দা তিরস্কার শাসন অনুশাসনের ঝড় বইতে থাকবে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সূচ বিঁধতে বিঁধতে মাধুরীর কোন অঙ্গে আর তিলমাত্র জায়গা বাকি থাকবে না।

কিন্তু তেমন কিছুই হল না। যে যার ঘরে নিঃশব্দে শুতে গেল। বাবা কী যেন বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মা ঠোঁটে আঙুল চেপে নিষেধের সংকেত করলেন আর বাবা সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রৌষধের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এমন আশ্চর্য ঘটনা এ বাড়িতে বেশি ঘটতে দেখা যায় নি।

দাদু সেই প্যাসেজের মধ্যে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। বাবা আর অসীমের যে এক ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা ছিল তাই ঠিক রইল। হাতকড়া পরা চোরের মত অসীমকে বাবার পিছনে পিছনে যেতে দেখে কেমন যেন মায়া হল মাধুরীর। আহা, বেচারাকে সারারাত ধরে জবাবদিহি করতে হবে। যে শোধ বাবা মাধুরীর ওপর নিতে পারেন নি, ঘরের দরজা বন্ধ করে গভীর রাতে ওর ওপর দিয়ে হয়তো চতুর্গুণ শোধ তুলবেন। বাবার তুলনায় অসীমের গায়ের জোর বোধ হয় এখন বেশি, কিন্তু মনের জোর তো আর নেই। তার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকবে না। তার অসহায়তার কথা ভেবে এই মুহূর্তে ভারি মায়া হল মাধুরীর। অসীম ভীরু, দুর্বল কাপুরুষ—বলতে গেলে পুরুষ নামেরই যোগ্য নয়। তবু তার জন্য ব্যথায় মাধুরীর সমস্ত বুক টন টন করে উঠল। আর সেই বেদনার মধ্যে অবসন্ন আধা মূর্ছিত হারানো প্রেমকে ফের যেন অনুভব করল মাধুরী—গভীর শোকের মধ্যে শ্রান্ত সুপ্ত সান্ত্বনা যেমন আস্তে আস্তে চোখ মেলে, প্রায় তেমনি।

মা মায়া মঞ্জু আর মিনু এক ঢালা বিছানায় শোয়। মাধুরী আর মানসীর জন্যে আলাদা ছোট বিছানা পাতা রয়েছে। বড় হওয়ার পর থেকে তারা দুই বোন এমনি পাশাপাশিই শুয়ে এসেছে। আজ অন্যরকম হবে কেন?

তবু মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাধুরী, তুই কি আজ এখানে আসবি? মঞ্জুকে ওখানে দেব?'

মাধুরী বলল, 'কেন মা?'

'বিছানা তো ছোট তাই বলছি।'

মাধুরী ভাবল তা ঠিক। আজ তাদের দুজনের পক্ষে এই বিছানা বড়ই ছোট। কিন্তু একটি বিছানায় যদি তাদের না ধরে, একটি ঘর, একটি বাড়ি একটি পৃথিবীই কি তাদের ধরবে?

মাধুরী একটু হাসির চেষ্টা করে বলল, 'কী দরকার মা। ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কেন মিছামিছি টানাটানি করবে।'

মা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। মানসীকে বললেন, 'তুই আজ এখানে আয় না।'

মানসী ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'কেন? এত রাত্রে শোয়াশুয়ি নিয়ে এমন মাথা ঘামাবার এখন কি দরকার পড়ল মা? আমি যেখানে রোজ থাকি সেখানেই থাকব।'

মা একটু হেসে বললেন, 'ছোটবেলায় তুই আমাদের কাছে শোয়ার জন্যে কত কোঁদল করতিস, মনে আছে?'

মানসী বলল, 'আছে।'

তারপর চুপ চাপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাধুরী ভিজে কাপড় ছেড়ে আটপৌরে একখানা শাড়ি পরল। একই জোড়ার শাড়ি দুজনে পরে। কে কারখানা পরে অনেক সময় তা কেউ খেয়াল করে না। কিন্তু আজ মাধুরী বিশেষ করে লক্ষ্য রাখল যাতে ভুলে মানসীর শাড়ি গায়ে না জড়িয়ে বসে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের কাঁটা খুলল মাধুরী। খোঁপার ফুলগুলি তুলে আনল। ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে কাঁটা। আবার কাঁটার সূচী-তীক্ষ্ণ মুখে মুখে মধুবিন্দু।

চারদিকে একবার তাকিয়ে সেই ফুল-গুলির ওপর দুই ঠোঁট চেপে ধরল মাধুরী। তার হাতের স্পর্শ এতে আছে, তার অধর স্বাদের ক্ষীণ সাদৃশ্য এতে ধরা রয়েছে।

'কিন্তু এই শেষ। পুষ্পধনু, এই শেষ। তোমার এই ফুলগুলি দিয়ে আমার শেষ শয্যা রচিত হোক।'

ফুলগুলি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল মাধুরী। দুটি ঠোঁট যতটুকু পীড়ন করেছিল, পাঁচটি আঙুলে তার চেয়ে হাজার গুণ পীড়ন করল। তারপর ভাবল জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে

য়। কিন্তু হাতের যদি তেমন নিরিখ
থাকে মাধুরীর যদি জোর না থাকে?
লগুলি যদি বাইরে গিয়ে না পড়ে ফিরে
সে নিজের বুকেই পঞ্চশর হয়ে বিঁধে
স! তাই দূরে থেকে ছুঁড়ে ফেলতে
াহস পেল না মাধুরী, জানলার কাছে
গিয়ে গেল। আস্তে আস্তে গলিয়ে
ফেলে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু পোড়া মুঠি
যে ছাই আলগা হয় না। পাঁচটি আঙুল
পাঁচটি ধনু হয়ে হাতের তালুর সঙ্গে মিশে
রয়েছে। যেন বুক দিয়ে এক পরম সম্পদ
রক্ষা করছে। মাধুরীর সাধ্য কি তা কেড়ে
নেবে। হতাশ হয়ে মাধুরী বাইরের দিকে
তাকাল। ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই
দেখতে পেল না। শুনতে পেল অল্প
অল্প বৃষ্টি ফের শুরু হয়েছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই,
দু'তিন মিনিটের বেশি হবে না হয়তো।
কিন্তু মনে হল যেন যুগ যুগান্তর কেটে
গেছে, আরও যুগযুগান্তর কাটবে। আর
মাধুরী এই জানলার ধারে অন্ধকার বর্ষণ-
মুখর আকাশের নিচে অন্তহীন প্রতীক্ষায়
এমনি চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে।

হঠাৎ কার একখানা হাত মাধুরীর

কাঁধে এসে লাগল। সীমাহীন সময় সমুদ্র ফের একটি বিন্দুতে এসে আবদ্ধ হল।

মাধুরী চমকে পিছন ফিরে তাকাল। না মানসী নয়, মা, যাঁর কাছে সব দোষেরই ক্ষমা আছে।

সুহাসিনী বললেন, 'মাধুরী যা এখন শুতে যা।'

মাধুরী বলল, 'যাই মা।'

মা নিজেই সুইচ টিপে বিদ্যুতের আলো নিবিয়ে দিলেন। বললেন, 'রাত অনেক হল, এখন শুয়ে পড়।'

মাধুরী বলল, 'যাই মা।'

তারপর অন্ধকারে ওঁদের বিছানার পাশ দিয়ে যাতে ছোট বোনদের কারো হাত কি পা মাড়িয়ে না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অন্ধকারে পা টিপে টিপে নিজের বিছানায় এসে পৌঁছল মাধুরী।

বিদ্যুতের আলো থাকলেও লক্ষ্মীর আসনের কাছে রোজ সন্ধ্যায় পিতলের মুচিতে মঙ্গলদীপ মা রোজ জ্বেলে দেন। আবার গভীর রাত্রে যে আলো চোখ জুড়োয় ঘুম তাড়ায় সে আলোও নিজের হাতেই নিভিয়ে দিয়ে যান মা। সন্তানের জন্যে কখন আলো চাই কখন অন্ধকার চাই তা তিনি যেমন বোঝেন আর কেউ তা বোঝে না।

মাধুরীর মনে পড়ল আজ ভোরে মা-ই তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলেন আবার এই শেষ রাত্রে তিনিই তাকে ঘুমোতে পাঠালেন। মার মুখ দেখে আজ উঠেছিল মাধুরী। দিন কেটেছে হাসিকান্নার খেলায়। ঘড়ির পেন্ডুলাম মন দুলে দুলে নিমেষে নিমেষে সুখ ছুঁয়েছে, দুঃখ ছুঁয়েছে। ঘুমের মধ্যে সেই দোলা কি থামবে? সব চঞ্চলতা শেষ হবে মাধুরীর?

আশ্চর্য, হাতের মুঠির মধ্যে সেই ফুল-গুলি এখনো ধরা রয়েছে। এ ফুল দিয়ে আর কী হবে? এ ফুল দিয়ে এখন কী করবে? বিছানায় রাখবে? ছি-ছি-ছি। কেউ যদি দেখে—ভুল করে ভাববে ফুলশয্যা। এই রাতটুকুর জন্যে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলে হয়। কিন্তু সেখানেও যদি কারো চোখে পড়ে? যদি মনের ভুলে ফুলের কথা ভুলে যায় মাধুরী? যে বিছানা তুলতে আসবে, সে-ই দেখে ফেলবে? লজ্জার আর শেষ থাকবে না। তাহলে ফুল এখন কোথায় রাখে? কোথায় লুকোয়? এই মুহূর্তে সেই চিন্তাই বড় হয়ে উঠল মাধুরীর। উঠে যদি আয়নার পিছনে রেখে আসে? মা নিশ্চয়ই ঘুমোননি। টের পেয়ে বলবেন, 'আবার কি খুটখুট করছিস ওখানে?' কী বিড়ম্বনা। ফুলগুলি কিছুতেই ফেলে দিতে পারল না মাধুরী? খেলা শেষ হয়েছে, সঙ্গী চলে গেছে, তবু খেলাঘর ভাঙতে মন চায় না। তবু প্রাণ সেই শূন্য ঘরে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদে। ফুলগুলি বুদ্ধি মাথায় এল। সেই এক মুঠো ফুল ব্লাউজের মধ্যে ছেড়ে দিল। বুকের ওপর কোথায় রাখে মাধুরী? ভাবতে ভাবতে পুষ্পবৃষ্টি, ফের সেই স্পর্শবৃষ্টি অনুভব করল মাধুরী। এর মত নিভৃত গোপন জায়গা আর নেই। দলিত গোলাপগুলি এখানে আজ রাত্রের মত লুকিয়ে থাক। ঘুমোক। ঘুম যদি না পায় নির্ভয়ে কাঁদুক। তাদের সেই কান্না এখন কেউ শুনতে পাবে না। বুকের উত্তাপে ভেজা পাপড়িগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাক, মধুগন্ধ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হোক, মাধুরীর মাথার ফুল আর মানের এখানে এক সঙ্গে সমাধি রচিত হয়ে থাকুক।

ঘুম আজ আর আসবে না। ঘুমোতে পারলে ভালো হত মাধুরীর। সব কিছু ভুলতে পারত। না কি ঘুমের মধ্যে দুর্নিবার তৃষ্ণা আর বাসনা তার পিছনে পিছনে ছুটত? তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধত? ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন সারাজীবনের বাস্তবের বেশ ধরে ছলনা করত? ঘুমোতেও যে সাহস হয় না মাধুরীর। সেই অলীক স্বপ্নের ফাঁদে ফের যদি ধরা পড়তে হয়! অলীক। কিন্তু অ-রসিক ছাড়া স্বপ্নকে কেউ অলীক বলে? অ-কবি ছাড়া কল্পনাকে কেউ জীবন থেকে বাদ দিতে চায়? রম-ধনুর রঙ পলকে মুছে যাবে কেউ কি তা অপলকে তাকিয়ে দেখে না।

শান্তির জন্যে নয়, স্বপ্নের জন্যেই মাধুরী ঘুমোবে। যা স্বপ্নের মত এসে-ছিল তা ফের স্বপ্নের মধ্যে আসুক। মাধুরীর মনে পড়ল গাড়ির মধ্যে অসীম তার হাত ধরেছিল, তাকে কাঁদতে দেখে ফের তাকে বুকে টেনে নিতে চেষ্টা করেছিল। সেই আকর্ষণ কি একেবারেই মিথ্যে? শুধু নৈতিমূলক? তারপর ফিরে এসে সকলের জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে মাধুরীর কাছেই তো দাঁড়িয়েছিল অসীম। নিঃশব্দে সমস্ত লাঞ্ছনা আর অপমান সহ্য করেছিল। সেই একসঙ্গে আসা, একসঙ্গে দাঁড়ানো একসঙ্গে সহ্য করার কি কোন দাম নেই? আরো যদি কিছু ঘটত অসীম কি তাকে রক্ষা করত না? বাবা যদি মাধুরীকে এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলতেন—অসীম কি তাকে একা ছেড়ে দিত? সঙ্গে যেত না? আর সঙ্গী যদি থাকে তাহলে পৃথিবীর কোন স্থানই বা অগম্য? কোন জায়গাই বা বাসের অযোগ্য? ভালোবাসা যদি মেলে তাহলে আর কোন কাম্যবস্তু আছে যা ছেড়ে দেওয়া যায় না? বাদ দেওয়া যায় না? প্রেমের মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিল অসীম। প্রেম তার নিজের মূল্যে মূল্যবান। মাধুরী জানে তা আর কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে না, বরং

তার ওপরই জগৎ সংসার নির্ভর করে। সব চেয়ে বড় সমস্যা সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখা। যে আগনে ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল তাকে চিরদিনের মত ভাস্বর করে রাখা। তা যারা পারে তারা কখনো হারে না। যারা পারে না তারাই অর্থ যশ প্রতিপত্তির মধ্যে মৃত প্রেমের সঞ্জীবনী সুধা খোঁজে। কিন্তু ভালোবাসা যাদের কাছে আরো পাঁচটা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা, আরো পাঁচটা আসবাবের একটা মাত্র—তারা কী করে তার সত্যিকারের স্বাদ পাবে? মাধুরীর ভালোবাসা তো তা নয়। তার কাছে ভালোবাসার তুলনা অতল গভীর মহাসমুদ্রের সঙ্গে। সমস্ত জীবনকে যে ধরে রাখতে পারে ভরে রাখতে পারে। যার বৈচিত্র্যের শেষ নেই, তরঙ্গের অন্ত নেই, বিস্ময়ের পারাপার নেই। সেই অগাধ বিপুল ভালোবাসার ঐশ্বর্য দিয়ে মাধুরী কি আর একজনের সারাজীবন ভরে তুলতে পারবে না? জয় করে নিতে পারবে না সব ঔদাস্য অবহেলা অনিচ্ছা আর অতৃপ্তিকে? তাই যদি পারে তাহলে আর ভয় কিসের? তাই যদি পারে তাহলে কেন তুচ্ছ মান অভিমান, সম্ভ্রম মর্যাদার জন্যে মাধুরী দূরে সরে আসবে? কি দু হাতে দূরে সরিয়ে দেবে? জড়িয়ে ধরায় জড়িয়ে থাকায় যে কী অপার্থিব আনন্দ তা যখন মাধুরী জেনেছে তখন কেন সে ইচ্ছা করে বিচ্ছেদ ডেকে আনবে? সমস্ত শক্তি দিয়ে কেন মিলনের সব বাধাকে জয় করবে না?

নিশ্চিত সংকল্প নিয়ে মাধুরী ঘুমোবার জন্য পাশ ফিরে শুতেই মানসীর গায়ে তার হাতখানা গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল মাধুরী। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। মানসী আছে। মানসী যেন শত্রুপক্ষের মারাত্মক সাবমেরিন। মাধুরীর চেতনার সমুদ্রে অকস্মাৎ একেকবার ভেসে উঠে তার সাধের তরণীকে বানচাল করে দিয়ে যায়।

মা আজ দুজনকে এক বিছানায় শুতে দিতে চান নি। কী ভেবেছিলেন তিনি? মাধুরী আর মানসী সেই ছেলেবেলার মত মারামারি করবে? আঁচড়াবে, কামড়াবে, চুলের মুঠি ধরে টানবে? সেই ছোটবেলা আর নেই। কিন্তু তাই বলে ছোটত্ব কি আর গেছে? মানুষের ভিতর থেকে কোনদিনই কি তা যায়? না বাইরে মাধুরী আর মানসী কেউ কারো গায়ে আঁচড়টি কাটবে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নখ হবে নখর, শিশুর কচি কচি দাঁত হবে দংষ্ট্রা। সেই ধারালো অস্ত্র তারা পরস্পরকে কেটে ছিঁড়ে কুটি কুটি করবে। না হয় চিরজীবনের মত মুখ-দেখাদেখি বন্ধ করে মনের মধ্যে অনির্বাণ বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। নিজে পুড়বে আর একজনকে পোড়াবে। বাইরের আগুন শুধু পোড়ায়, পুড়তে জানে না। কিন্তু ভিতরের আগুন নিজেকে দহন করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্তরে-বাইরে এই বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ড কিসের জন্যে? প্রেমের জন্যে। নিজের বোনকে বলি দিয়ে তবে প্রেমের পূজায় বসতে হবে মাধুরীকে। নিজের বোনের সমাধির ওপর এক পরম সুন্দর মিলন মন্দির গড়ে তুলতে হবে। সে কি মিলন মন্দির না নিষ্ঠুরতার জয়স্তম্ভ, নাকি হিংস্র বাসনার শোণিতসিক্ত সৌধ-চূড়া? সে-চূড়ার ওপর মাধুরীই বা কতক্ষণ স্থির হয়ে থাকবে? সে-চূড়া কি মাধুরীকেও বুকে পিঠে গেঁথে নেবে না? অশ্রু ঝরবে না? রক্ত ঝরবে না?

মানসী তার দিকে পিছন ফিরে উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। মুখ সে ঘুমের ঘোরে আবার ফেরাবে। কিন্তু সেই প্রসন্ন মুখ আর দেখতে পাবে না মাধুরী। সেই স্নিগ্ধ প্রীতিভরা অপূর্ব দুটি চোখ—সেই ইশারা-ইঙ্গিতের সাংকেতিক দুটি চোখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে। তার বদলে চেয়ে থাকবে পাথরে-গড়া দুই কঠিন বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা, যা নড়ে না, চড়ে না, বদলায় না, মমতায় কোমল হয় না, আনন্দে উজ্জ্বল হয় না, দুঃখে-শোকে, সহানুভূতিতে সিক্ত হয় না, সেই কালো কঠিন পাথরের দুটি নির্মম চোখ মাধুরীর দিকে চিরকাল অপলকে চেয়ে থাকবে।

খানিক আগে সিঁড়ির কাছে মানসীর সেই দুটি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে মাধুরী। দুটি চোখ ধারালো দুটি ছুরির ডগা। মাধুরী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর এক পলক চেয়ে থাকলে যেন মাধুরীর আর পলক ফেলতে হত না। দুটি ছুরি তার দুই চোখকে বিদ্ধ করত। মাধুরীর যে চোখের পাতা চুম্বনে ভিজেছিল, অশ্রুতে ভিজেছিল, তা রক্তে সিক্ত হত।

কিন্তু কেন? মানসীর এত বিদ্বেষ, এত হিংস্রতা কেন? সে তো নিজের চোখে কিছুই দেখেনি। শুধু মাধুরী আর

অসীমকে একসঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু সে তো বৃষ্টির জন্যে। সে তো বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। না হলে তো তারা বাসেই আসত। আর ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে যদি তারা এসেই থাকে, তাতেই বা এমন কি দোষ হয়েছে? অসীম কি তাদের পারিবারিক বন্ধু নয়? সে মানসীর প্রেমিক না হয়ে যদি স্বামীই হত, তাহলে কি মাধুরী কোনদিন ভগ্নীপতির সঙ্গে বেড়াতে বেরোত না? আর দায়ে পড়লে এমনি একসঙ্গে ভিজে-পুড়ে গাড়িতে করে ফিরত না? মানসী যখন কিছুই দেখেনি, শোনেনি, শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে মাধুরীর দিকে অমন জ্বলন্ত চোখে না তাকালেও পারত। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে ঘৃণায় বিদ্বেষে কথা বন্ধ না করে থাকলেও পারত। তাদের ফিরতে একটু দেরি হতে দেখে মানসীর কি উচিত ছিল অমন দস্তুরমত হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে পিছনে পিছনে ছুটে যাওয়া! মাধুরী তা যেত না, মাধুরী তা পারত না। মানসী অবশ্য মুখে একথা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, মাধুরীদের খোঁজেতেই সে বেরিয়েছিল। বলবে মানব ছোলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতেই বেরিয়েছিল সে। কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করবে? মাধুরী অন্তত করবে না। মাধুরী কি দেখেনি সেই সকাল থেকে হিংসায় আর সন্দেহে মানসী জ্বলছে? তার সঙ্গে যখনই অসীম হেসে কথা বলেছে, কি একটু বেশি ঠাট্টা-তামাসা করেছে, অমনি ওর মুখ ভার হয়েছে, তা কি মাধুরী লক্ষ্য করেনি? 'তুই ফুলে হয়ে ফুটে উঠেছিস,' 'তুই আহ্লাদে আটখানা হয়েছিস', এমন কত বাঁকা বাঁকা ঠেস-দেওয়া কথাই না মানসী সেই সকালটুকুর মধ্যে তাকে বলে সেরেছে। মাধুরীর মনে হল, মানসী যে সারাদিনের মধ্যে অসীমের সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখে নি, ফোন করে নি, ফোন ধরে নি, প্রোফেসর প্রিয়গোপালবাবুকে সেবার নামে বাইরে বাইরে কাটিয়েছে, তা অসীমকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে। কোন অপরাধের শাস্তি? না অসীম মাধুরীর সঙ্গে বেশি কথা বলেছে, মাধুরীকে দেখে বেশি খুশি হয়েছে, হেসেছে, হাসিয়েছে। তার বেশি তো কিছু দেখে যায় নি মানসী। কিন্তু ওইটুকুতেই চোখে অন্ধকার দেখে মুখখানাকে অন্ধকার করে গেছে। চিরকালের হিংসুটে মেয়ে মানসী। ওকে কি আর একসঙ্গে ফিরতে দেখে মানসী মনে মনে কত কল্পনাই করেছে। যা হয়েছে তাও ভেবেছে, যা হয় নি তাও নিশ্চয়ই ভাবতে বাকি রাখে নি। যদি রাখত তাহলে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে এমন স্থির হয়ে থাকত না। মানসী এখন শান্ত হয়ে আছে, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই জবাবদিহি চাইবে। অসীমের কাছেও চাইবে, মাধুরীর কাছেও চাইবে। অসীম কী বলবে তার ওপর মাধুরীর বলা নির্ভর করে। অসীম কী বলবে তার ওপর তার নিজের পৌরুষ আর মাধুরীর মর্যাদা নির্ভর করে। অসীম যদি সত্য কথা বলতে ভয় না পায় তাহলে মাধুরী তার পায়ের তলায় রঙীন আঁচলের মত অনুরাগরঞ্জিত হৃদয়-আসন পেতে দেবে। হোক সে সাধারণ একজন পুলিস-কর্মচারী, হোক সে নামহীন, খ্যাতিহীন, বিত্তহীন দুর্বল পুরুষ। এখন একটি পরীক্ষায় যদি সে উত্তীর্ণ হয় মাধুরী তাকে জীবনের সব পরীক্ষায় শুধু পাসমার্কস্ নয়, ফুল মার্কস্ দেবে। মানসীর গঞ্জনার জবাবে, তিরস্কারের জবাবে, বিষাক্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাবে অসীম যদি সেই পাথুরে চোখের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারে, 'আমি মাধুরীকে ভালবাসি বলেই কাছে টেনে নিয়েছি, তাকে ছাড়া আমার চলবে না জেনেই তাকে সঙ্গে নিয়েছি।' তাহলে মাধুরীর সমস্ত লজ্জা, দীনতা, দৌর্বল্য সেই সত্যের ঔজ্জ্বল্যে ঢেকে যাবে। অসীম যদি নিজের মুখে তার এক ভালোবাসার মৃত্যু এবং আর এক ভালোবাসার জন্মের ঘোষণা করতে পারে তাহলে ধারালো তরবারির নিষ্ঠুর নির্মম আঘাতে রক্তস্নানে মাধুরীর সব কলঙ্ক-কালিমা মুছে যাবে। সেই দিগ্বিজয়ীর গলায় রজনীগন্ধার নয়, শ্বেতচন্দনে যুঁই-বেল-বকুলের নয়, রক্তজবার মালা হয়ে দুলবে মাধুরী।

'দিদি, তুই এই করলি?'

মাধুরী চমকে উঠল। মানসীর গলা। আশ্চর্য, ঘুমকাতুরে মানসী এখনো এই শেষ-রাতেও জেগে আছে নাকি? এতক্ষণ তাহলে কি ঘুমের ভান করে পড়েছিল! মাধুরী কান খাড়া করে রইল। না আর কোন কথা নেই। মানসীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক-ভাবেই পড়ছে। ঘুমন্ত মানুষের যেমন পড়ে। তাহলে কথাটা কি ঘুমের ঘোরে বলেছে মানসী? তাই হবে। নইলে ওর মত জেদী তেজী মেয়ের গলা থেকে তো অমন কাতর-করুণ স্বর বেরোবার কথা নয়। মাধুরী কান পেতে রইল। না, আর কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। আর কোন কথাই মানসীর মুখ থেকে বেরোল না। কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তাই যে যথেষ্ট। ছোট বোনের মুখ থেকে যে কথাটুকু শুনেছে, তার বুকের ভিতর থেকে অতি গোপনে এই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে যে কান্নাটুকু উঠে এসেছে তারই যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বিরাম নেই। মনের মধ্যে এত যে গিরিকন্দর লুকিয়ে আছে, মাধুরী কি জানত। সেই কন্দরে কন্দরে অজস্র কান্নার ঝরনা ছুটে চলেছে— 'দিদি তুই এই করলি, দিদি তুই এই করলি, দিদি তুই এই করলি।'

একটু আগে পাছে অন্ধকারে ছোট বোনদের হাত-পা মাড়িয়ে বসে সেই ভয়ে কত সাবধানে পা টিপে টিপে নিজের বিছানায় এসে শুয়েছে মাধুরী। তার আগে আর এক বোনের হৃদয় যে দুই পায়ে থেঁতলে দিয় এসেছে তা কি তার মনে পড়ে নি?

মাধুরীর ইচ্ছা হল ছোট বোনকে এবার নিজের বুকে টেনে নেয়। কিন্তু সাহস হল না। কাল মানসীর যে দিদি ছিল, আজ তো আর সেই দিদি নেই। মানসী যদি জেগে থাকে? কি ঘুম থেকে জেগে উঠে মাধুরীকে দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়! কি পরম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'ছুঁয়ো না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না!' ট্যাক্সির মধ্যে মাধুরী আর একজনকে যেমন বলেছিল—বোনের সেই ঘৃণা কি মাধুরী সহ্য করতে পারবে? মাধুরীর একবার ইচ্ছা হল ঝুঁকে পড়ে মানসীর মুখখানা একবার দেখে। চেয়ে আছে না চোখ বুজে আছে একবার দেখে নেয়। এমন লুকোচুরির খেলা দুজনে মিলে এর আগে কত খেলেছে, কতবার নকল ঘুম ভেঙেছে আসল ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু আজ তো আর মাধুরীর সে দাবি নেই। তাছাড়া বিশ্বাস কি—দেখতে গিয়ে ঘুমন্ত চোখের দুটি জলের ধারাই দেখবে মাধুরী। সেই ধারা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়ার অধিকার তো তার আর নেই।

কী করে সেই অধিকার ফিরে পাওয়া যায়? বোনের সেই স্নেহ-সান্ত্বনা নির্ভরতার নিধি সখী-বান্ধবী মেজদিদি ফের কী করে হতে পারে মাধুরী? সব গোপন করে? না সব প্রকাশ করে? তাই করবে মাধুরী। গোপন করবার তো কিছু আর নেই, প্রকাশই করবে। অসীম কিছু বলুক আর না বলুক, মাধুরী ওর কাছে সব বলবে। পাওয়ার কথাও বলবে, হারাবার কথাও বলবে, ফুলের কথাও বলবে, ভুলের কথাও বলবে। না, আর কাউকে দোষী করবে না মাধুরী, সমস্ত দোষ নিজের ওপর টেনে নেবে। সে-ই প্রলুব্ধ করেছিল। কথা দিয়ে, হাসি দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, বাসনার রাঙা ফুলগুলি দেহের ডালিতে সাজিয়ে দিয়ে, সে-ই আগে সর্বস্ব ধরে দিয়েছিল, একথা স্বীকার করবে মাধুরী। তারপর? তারপর, কাল সারা-দিন কি দিনই থাকবে? সবার সহস্র কৌতূহলী চোখ তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেও রাত্রির অন্ধকারে সবই নিমীলিত হবে। বাবার চোখ, মার চোখ, অসীমের চোখ, মানসীর চোখ, কারো চোখই আর তখন তার দিকে চেয়ে থাকবে না। তখন সেই গভীর রাত্রে মাধুরী পা-টিপে টিপে তেতলায় উঠবে। ব্রজবাবু তাকে ছাদের চাবি দেবেন। তিনি মাধুরীর সব অনুরোধ রেখেছেন, এবারও রাখবেন। তারপর ছাদে দাঁড়িয়ে নির্মল উদার বিকল অসীম আকাশের দিকে তাকাবে মাধুরী।

কালে রাত্রে নিশ্চয়ই আর এমন মেঘ থাকবে না। মুক্ত আকাশে মুক্তোর মত তারাগুলি জ্বলতে থাকবে। সেই তারাগুলির মধ্যে মুক্তির ইশারা দেখতে দেখতে ছাদের ধারে এগোতে থাকবে মাধুরী। ধীরে ধীরে আলিসার ওপর উঠবে। আরো খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখবে আর ভাববে, দেখবে আর ভাববে। তারপর! তারপর টুপ করে একটি শব্দ হবে। অত রাত্রে কেউ নিশ্চয়ই আর তেতলায় জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। নীচে ফুটপাতের কাছে নিজের রিক্‌শার ওপর শ্রান্ত ঘুমন্ত কোন রিক্‌শাওয়ালা যদি সেই সামান্য শব্দে একটু জেগেও ওঠে সে ঘুমের-ঘোরে স্বপ্নের মত দেখবে একটি নাম-না-জানা তারা আকাশ থেকে খসে পড়েছে। রাত ফুরোতে না ফুরোতে এমন কত তারাই তো ঝরে যায়। আকাশে তবু তারার শেষ হয় না। বোঝাই যায় না যে একটি চলে গেছে। মাধুরীও তেমনি করে যাবে।

নিজের মৃত্যুর কল্পনাকে মধুর থেকে মধুরতর করতে করতে, তাকে প্রিয়তমের মত নিজের হাতে সাজাতে সাজাতে মাধুরী আস্তে আস্তে ঘুমের আশ্রয় পেল—যে ঘুমে সাময়িক মৃত্যু, সাময়িক বিরতি, জীবনের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের সাময়িক ছেদ, সাময়িক সন্ধি। (ক্রমশ)

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

ত্রিশ
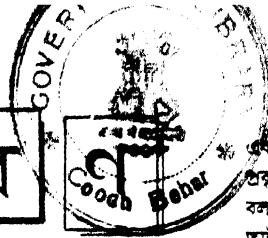
আমার সাঙ্গীতিক জীবন সম্বন্ধে চেষ্টা ক'রেও এক অধ্যায়ে সব শেষ করতে পারলাম না। বলবার আরো অনেক কিছুই ছিল ইতিহাসের দিক দিয়ে, কিন্তু সে-সব হ'ল—যাকে সাহেবী ভাষায় বলে, "টপিকাল"—সাময়িক, অর্থাৎ দু'দিনেই বাসি হয়ে যায়। স্মৃতিচারণ লেখা যখন শুরু করি তখন বার বার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছে: "মন! লোকের চিত্তরঞ্জন করতে ছুটো না চটুল রসের বেসাতি ক'রে: যথাসাধ্য চেষ্টা করো সেই সব স্মৃতিরই ছবি আঁকতে যাদের উপস্থাপনা চিরন্তন। লোকে নেবে কি না নেবে—আমার এক বন্ধুর ভাষায়: "তোমার ভক্তরা তোমার সাহিত্যিক সত্তাকে আক্রমণ করছে কিনা মাথা ঘামিয়ো না এসব হারজিতের সম্ভাবনা নিয়ে: শুধু লিখে চলো যা লিখতে তোমার অন্তরে সত্যিকার সাড়া পাও।" আমার গানের নানা-চালিয়ে-দেওয়ার খুঁটিনাটি ইতিহাস লিখতে আমার মন সাড়া দেয় নি। তবু সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছু লিখছি শুধু একটি আভাস দিতে: ভক্তি সাধনা যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিল্প বা কীর্তির ডাকে সাড়া দিতে চায় তবে চিত্তবিক্ষেপ হয় কীভাবে ও তার প্রতিক্রিয়ায় কী ধরনের উদ্ভ্রান্তি এসে হানা দিয়ে তাকে বিপাকে ফেলে। তাই বলি—এ-প্রতিক্রিয়া এল কীভাবে।

গান শিখাতে আমি শুরু করি খানিকটা অন্তরের প্রেরণায়ই বটে, কেন না, গান আমি ভালোবাসতাম চিরদিনই। কিন্তু গান শিখাতে শিখাতে যশঃস্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর্জীবনের আসল লক্ষ্য ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা একটু একটু ক'রে দূরে সরে গেল। বহু লোকের—বিশেষ ক'রে গুণী ও সমজদারের—বাহবা পেয়ে আমি মেতে উঠলাম গান নিয়ে তত নয় যত গানের সূত্রে-পাওয়া প্রবর্ধমান নামডাক নিয়ে। এজন্য আমার সময়ে সময়ে যে চিত্তগ্লানি হ'ত না তা নয়, কিন্তু সকাম কর্ম শুধু তো বন্ধনই আনে না, সেই সঙ্গে আনে অন্ধতা যার ফলে মানুষ বন্ধনকে বন্ধন ব'লে চিনতেও বেগ পায়। এইজন্যেই কামনা পূরনে খতিয়ে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি দাঁড়ায় জমাখরচের খাতায়। সুতরাং আমারও হ'ল লোকসান: ভক্তির সম্পদ শনৈঃ শনৈঃ ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে শেষে একদিন আবিষ্কার করলাম যে, যে-আধ্যাত্মিক মূলধন শৈশবে পেয়েছিলাম, যৌবনজলতরঙ্গাকস্রোতে প্রায় সবটুকুই ভেসে গেছে। এই সময়ে আমাকে চিরন্তনের কথা মনে করিয়ে দেন দুটি মহৎ মানুষ: শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—আমার বন্ধু তথা সতীর্থ—ও শ্রীঅরবিন্দ—আমার আশ্রয়দাতা তথা গুরু। কৃষ্ণপ্রেমের কথাই বলি আজ—গুরুদেবের কথা বলব পরে।

কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলতে যাওয়ার এক মুশকিল আছে। ও স্বভাবে চাপা প্রকৃতির মানুষ, তাই সাধন-জীবনের কথা বলতে শুধু যে ওর নিজের আপত্তি আছে তাই নয়, আমি বলতে গেলেও ও আমাকে পই পই ক'রে মানা ক'রে এসেছে বরাবরই। আমি শুনিনি, নিজের কথা লিখেছি অবাধে, ওর চিঠিপত্র ছাপিয়েছি সানন্দে, লোকের কাছে ওর কথা বলেছি সগৌরবে যে, কৃষ্ণপ্রেমের মত পরম ভাগবতের দেখা পাওয়াও ভাগ্য। ও রাগ করেছে, ধমকেছে কত, কিন্তু আমি ওর নিষেধ মানি নি। শেষে ও লিখেছে: "আর কেউ হ'লে আমি তার মুখদর্শনও করতাম না, কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে এই যে, তোমার 'পরে কিছুতেই রাগ আমার রাখতে পারি না।"

ও কেন আমার 'পরে রাগ করত আমি বুঝতাম: সাধনার পথে নানা বাধাই

রকমারি ছদ্মবেশে হানা দিয়ে মন ভুলিয়ে সাধককে বিপথে ঠেলে। এদের মধ্যে একটি মস্ত বাধা হ'ল—প্রতিষ্ঠার কামনা। তাই শাস্ত্রীরা বলেছেন—প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠার মতই বর্জনীয়। কিন্তু বললে হবে কি, আমার মন আবাল্য এই একটি পণে অটল ছিল যে, আমি পরের মুখে ঝাল খাব না, বা বাইরের নজির মেনে চলব না—যদি দেখি তাতে আমার মন সাড়া দিচ্ছে না। তাই ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করেছিলাম যে, আমি চলব আমার স্বভাবের ঝোঁকেই যতক্ষণ না এ-চলার ফলে আমার অন্তর্জীবনের বিকাশ ব্যাহত হয়। পরমহংসদেবের বিখ্যাত উপমা আমার "অঘটন আজো ঘটে" বইটির ভূমিকায় উদ্ধৃত করেছি আমার আত্মকথনের সাফাই হিসেবে : যে, দুরকম মানুষ আছে, এক যাঁরা কোথাও মিষ্টি আম খেলে মুখ মুছে চুপ ক'রে থাকেন, আর এক যাঁরা কোনো বাগানে মিষ্টি আম খেলে সবাইকেই খবর দিতে চান: "যাও হে অমুক বাগানের আম খেয়ে এসো—মিষ্টি যেন গুড়!" যাঁরা আম খেয়ে মৌনী হয়ে থাকেন তাঁদের শ্রদ্ধা করতে আমার বাধে না, কেননা, আমি জানি, এ হ'ল মাটিতে স্বভাবের কথা, তাই এক-জনের কাছে যা বরণীয় আর একজনের কাছে তা বর্জনীয় হ'তে পারে বৈ কি। কেবল আমি বহু ওঠা-পড়ার পরে শিখেছি একটি পরম তত্ত্ব : যে, আমার স্বভাব ও স্বধর্ম আমাকে আবিষ্কার করতে হবে নিজের অভিজ্ঞতারই এজাহারে—আপ্ত-বাক্যের নির্দেশে নয় নয় নয়। আপ্তবাক্য শ্রদ্ধেয় বটেই তো, একশোবার—কিন্তু তা ব'লে অলংঘনীয় নয়। যাঁরা মনে করেন আপ্তবাক্য না মানলে শিষ্যের নরকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাঁদের সশ্রদ্ধ নমস্কার ক'রেও আমি বলব : "যা আমার কাছে অন্যায় মনে হয় না তাতে আর কারুর নজিরেই অন্যায় ব'লে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আমি নিরুপায়।" আমার মন চির-দিনই গেটের ফাউস্টের একটি ভাগবত বাণীতে সাড়া দিয়ে এসেছে :

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sinch des rechten Weges wohl bewuszt

অর্থাৎ

শুভমতি যে-অন্তর—আন্তর প্রেরণা মানি যদি
চলে—আঁধারেও—তবু লভিবে সে সত্যপথদিশা।

একথা যদি সত্য না হয় তাহ'লে ভাগবত করুণাকেও সত্য ব'লে মানা চলে না। অবশ্য মানুষের ভুল ভ্রান্তি হবেই—সে হাজার "শুভমতি" হোক না কেন। গেটের আর একটি উক্তিও আমার কাছে সমান অপ্রতিবাদ্য মনে হয় : Es irrt der Mensch so lang er strebt অর্থাৎ মানুষ যতদিন সাধনা করবে ততদিন সে ভুলভ্রান্তি করবেই করবে—সময়ে সময়ে বিপথে পা দেবেই দেবে। কিন্তু এমনিই ঠাকুরের করুণার লীলা যে, এই ভ্রান্তির আলোয়ও আমরা সত্য হ'তে গভীরতর সত্যের অভাব পাই বাধার মধ্য দিয়েই বিকাশের নব দিশা পাই। অন্তত আমার মনে হয়, এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই সত্যকে জানবার, চিনবার, নিজের স্বরূপের সঙ্গে মুখোমুখি হবার। তাই আমি আবাল্য মন্ত্রগুপ্তির বাণীতে বিশ্বাস করতে না পেরে আম খেয়ে আমের খবর সবাইকে ব'লে বেড়ানোটাকেই আমার স্বভাব ব'লে বরণ ক'রে এসেছি, কোথাও কিছু নতুন তথ্য বা তত্ত্বের সন্ধান পেতে না পেতে পাঁচজনকে ব'লে এসেছি কী পেলাম, কেমন ক'রে পেলাম কোন্ অঘটনের মাধ্যমে। আমি যথাসাধ্য নিজেকে খুঁটিয়ে দেখেছি যে, এতে ক'রে আমার ক্ষতি তো হয়ই নি, বরং আনন্দের পুঁজি দেখ-দেখা করতে করতে বেড়ে চলেছে। তাই তো পদে পদেই ঘোষণা করতে পেরেছি—অনেক তথাকথিত বন্ধুর বাঙ্গবিদ্রূপ সত্ত্বেও—যে ঠাকুর আছেন, তাঁর কৃপা অঘটন ঘটিয়ে ভক্তকে বাঁচাতে, তাঁর বাঁশির ডাকে চলাতে বংশীধরের দিশা পাওয়া যায়—একটু একটু ক'রে মনের আঁধার কাটেই কাটে। এ আমার পুঁথিপড়া বুলি নয়—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে আমাকে প্রকাশের দিকে ঠেলেছে। তাই না ব'লে যে আমি থাকতে পারি নি, এতে আমার কোনোদিন চিত্তগ্লানি তো হয়ইনি—বরং চিত্তপ্রসাদই গভীরতর হয়েছে বলব ; আমার বারবারই মনে হয়েছে—গভীর কথা গভীর সুরে বললে অবিস্মরণীয় অস্বীকৃতিতে কথক শান্তি পায় এ-রটনা আর যার পক্ষেই সত্য হোক না কেন, আমার পক্ষে সত্য নয়। অন্য ভাষায়, আমি শুধু জিজ্ঞাসু বা সাধকই নই, যে পেয়ে সফল হ'তে চায়, আমি ঐ সঙ্গে শিল্পীও বটে, কর্মীও বটে, যে যা পায় তা পাঁচজনের সঙ্গে ভোগ ক'রে উজিয়ে উঠতে চায় গুহ্য কথাকে গুহ্য না রেখে। প্রকাশের এ-প্রবৃত্তি যার কাছে দুর্নিরোধ্য তথা বরণীয় ব'লে মনে হয় তাকে তারা সুনজরে দেখে না যারা প্রকাশ ক'রে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কৃষ্ণপ্রেম আমাকে প্রায়ই তিরস্কার ক'রে এসেছে বুঝতে না পেরে যে আমার এ স্বধর্ম, কাজেই এতে নিধন হ'লেও তাকেই আমাকে বরণ করতে হবে এই বিশ্বাসে যে, মরণের মধ্য দিয়েই মুক্তি আমাকে ডাক দেবে যদি জীবনে না দেয়। এসব কথা সম্প্রতি যোগিবর মহাতপস্বী শ্রীমৎ অনির্বাণকে খোলাখুলি লিখেছিলাম তাঁর অভিমত চেয়ে। তিনি আমাকে যা লিখে-ছেন আমার মন পুরোপুরিই নিয়েছে, তাই উদ্ধৃত করি।

অনির্বাণ শিলং থেকে ১৯ জুলাই ১৯৫৯ তারিখে লিখছেন : "অনুভূতির কথা সাধারণ্যে বলার সম্বন্ধে দুরকম মতই তো আছে। আমার বিশ্বাস, যার যার স্বভাবের অনুসরণ করাই ভাল। আসল কথাটা হ'ল অহংকার না থাকে যেন। একটা কিছু পেয়েছি, দেখছি, যে-আনন্দ ধ'রে রাখতে পারছি না, সবাইকে তার ভাগ দিতে চাইছি—আমার অস্মিতাকে চরিতার্থ করবার জন্যে নয়, ঠাকুরের মহিমাকেই প্রসাদকেই হৃদয়ে হৃদয়ে জয়যুক্ত করবার জন্যে—এতে দোষ হবে কেন? ঠাকুর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে নাম করতেন। লোকে বলত : 'কেন বাপু? মনে মনে তাঁকে ডাকলে হয় না?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'আমি তো শুধু আমার নিজের জন্যেই নাম করি না, যারা নাম করতে পারে না তাদের শোনাবার জন্যেও চেঁচিয়ে নাম ক'রি যাতে আমরা সবাই তরে যাই।' বগল টিপে নাচা আপনার স্বভাব নয়, দু'হাত তুলে নাচায় দোষ কোথায়? যা করবেন আপনভোলা হ'য়ে মুক্তপ্রাণে করবেন। আজ তিনিই বলাচ্ছেন ব'লে বলছেন, যেদিন চুপ ক'রে দেবেন মুখ থেকে একটি কথাও বেরুবে না, কিন্তু সমস্ত সত্তা থেকে আলো ঠিকরে

পড়বে—যেমন ইন্দিরা দেবীর পড়ে। সেও তো প্রকাশ।"

আজ ঘাটের কোঠা পেরিয়ে দেখতে পাই একটি অপ্রতিবাদ্য সত্য : যে কৃষ্ণপ্রেম মস্ত সাধক হ'লেও তার চলার ছন্দের সঙ্গে আমার নিজের চলার, ছন্দের সর্বত্র মিল নেই, এবং যেখানে যেখানে অমিল সেখানে তাকে গভীর শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে আমাকে দ-য়ে মজতে হবে। তাই কৃষ্ণপ্রেমের আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে বলতেই হবে ঢাক পিটিয়ে যে, সে একজন মহৎ সাধক। শ্রীমৎ অনির্বাণ ঠিকই বলেছেন :· আজ ঠাকুর বলাচ্ছেন বলেই বলছি—যেদিন ঠাকুর চুপ করিয়ে দেবেন সেদিন সাধ্য কি আর কিছু বলি। তাই আজ অনন্যচিত্ত হয়েই খুশিখেয়াল ক'রে বলব কৃষ্ণপ্রেমের গুণগান—বলব যা প্রাণ চায় : কীভাবে ও আমাকে পথের পাথেয় জুগিয়েছে ওর স্নেহোপদেশে, যুক্তির সমর্থনে, জ্ঞানের আলোয়—সর্বোপরি ওর পুণ্য ব্যক্তিরূপের দীপ্ত আকর্ষণে। আমার শুভার্থী বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই নানা সময়ে আমাকে দিয়েছেন অনেক কিছু আত্মবিকাশের পাথেয়, উৎসাহের প্রেরণা, দরদের বরমালা। কিন্তু কোনো বন্ধুর কাছেই আজ পর্যন্ত আমার প্রাণের পরম তীর্থপথে পাই নি যা পেয়েছি কৃষ্ণপ্রেমের কাছে। কেবল দুজনের কাছে পেয়েছি আরো বেশি পথের পাথেয় তথা অভয়ের ভরসা : গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দ ও কন্যাশিষ্যা ইন্দিরা। শ্রীঅরবিন্দের কথা গত বিশ বৎসর ধ'রে বলেছি নানা কথা। যদিও যা বলি নি তার তুলনায় যেটুকু বর্ণন করেছি সেটুকু সামান্যই বলব। তবু তাঁর মহিমার কিছু সংবাদ দিয়েছি আমার Sri Aurobindo came to Me আত্মকথায়। কেবল ইন্দিরার কথা বিশেষ বলা হয় নি। বলব একদিন নিশ্চয়ই, কারণ ওর মধ্যে যে-মহাশক্তির অবতরণ চাক্ষুষ করেছি সে-এজাহারের কিছু অন্তত না রেখে গেলেই নয়—আরো এইজন্যে যে, আমি বিশ্বাস করি যে, সে-সব কথা শুনে অনেক অবিশ্বাসীর মনও বিশ্বাসের দিকে মোড় নেবে। অনেকে প্রশ্ন করেন—কবে লিখব ওর কথা। উত্তরে আমি বলি : "এখনো জানি না—তবে আশা করি, পুনায় ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পরে আমাদের জীবন যে-সাধনার দিকে মোড় নিয়েছে তার একটা স্থায়ী পরিণতি লাভ হ'লে বলা সম্ভব হবে।" তাই আপাতত কৃষ্ণপ্রেমের কথা কিছু বলেই স্মৃতিচারণের যৌবনপর্ব শেষ করি—ইতিপাঠের সময়ও এসেছে বৈ কি।

কৃষ্ণপ্রেমের কথা আমি প্রথম লিখি আমার অনামীর প্রথম সংস্করণে—পত্রাধ্যায়ে, ওর অনেকগুলি চমৎকার পত্র ও গুরুদেবের মন্তব্য ছাপিয়ে। তার পর লিখি যথাক্রমে আমার তীর্থংকরে, Among the Great-এ, আবার ভ্রাম্যমাণ-এ ও সর্বশেষে Sri Aurobindo came to Me শীর্ষক স্মৃতিচারণে। তাই এখানে বেশি ফলিয়ে বলব না—কারণ এসব হাবি-জাবি কথা ও পড়বে না এ-ভরসা থাকলেও লোকমুখে ওর কাছে সাতখানা হয়ে পৌঁছবেই পৌঁছবে, সুতরাং মুখ সামলে কথা কওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বলেছি, অতুলদার ওখানেই আমার প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে দেখা হয় ও প্রথম দেখায়ই ওকে আমি ভালোবেসে ফেলি। সে-সময়ে ও ছিল লক্ষ্ণৌয়ে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক। মোটর সাইকেলে ও কী যে দুরন্ত বেগে ছুটত—কখনো কখনো আমাকে ওর সাইড-কারে নিয়ে—সে আমি ভয়েই মরি। আমার বড় অহংকার ছিল যে, আমি সহজে ভয় পাই না, কিন্তু ওর সঙ্গে নক্ষত্রবেগে লক্ষ্ণৌয়ের পথে বেঁক নিতে না নিতে বারবারই মনে হয়েছে বুঝি মর্মান্তিক পতন হ'ল বা অপঘাতে! ও হাসত ওর নির্মল, নির্ভয় হাসি। কিন্তু আমার চোখে ভাসত শুধু দুর্ভাবনার অশ্রু—কী হয় কী হয়! বেঁচে যেতাম যতবারই আর মনে পড়ত মধুসূদনকে, যাঁকে ডাকতাম ওর সাইড-কারে বসে : "প্রভু, দেখো কিন্তু!"

এ-প্রসঙ্গ তুললাম একটি সাধু উদ্দেশ্যে—কৃষ্ণপ্রেমের এই বেপরোয়া স্বভাবটির কথা জানাতে। অতুলদা হেসে বলতেন : "হবে না কেন দিলীপ? মুখে ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করলে কী হয়—বাকী তো ও গোরাই বটে।" তাঁরও উদ্বেগের অবধি ছিল না পাছে আমার সাংগীতিক জীবন সাঙ্গ হয় অকালে ওর সহযোগী হয়ে।

তখন শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন যোগিপুরুষ, যেমন সুদর্শন তেমনি জন-প্রিয়, তেমনি সর্বশ্রদ্ধেয়। আমার মুখে ভজন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী যশোদা দেবীও আমার ভজন শুনে চোখের জল ফেলতেন প্রায়ই। কৃষ্ণপ্রেম পরে এঁর কাছেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম যখন আমি জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর অতিথি হই তখনো ও দীক্ষা নেয় নি বলেই মনে হয়। "মনে হয়" বলছি এইজন্যে যে, ওর কাছে দীক্ষার কথা সে সময়ে শুনিনি।

লক্ষ্ণৌয়ে আমি ভাগাভাগি ক'রে থাকতাম—কখনো অতুলদার ওখানে, কখনো জ্ঞানেন্দ্রবাবুর রমা নিকেতনে। জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর ওখানে থাকতে ভাল লাগত এইজন্যেই যে, কৃষ্ণপ্রেমও থাকত তাঁর অতিথি হয়ে একটি মস্ত ঘরে চারদিকে ছড়ানো বইয়ের মাঝে ওর অশ্রান্ত ধূমপান এবং এর ওর তার সঙ্গে নানা বিষয়ে উদ্দীপ্ত তর্ক বিতর্ক আলোচনার স্মৃতি আজও আমার চিত্রপটে অক্ষয় ছবি হয়ে আঁকা আছে। কী চমৎকার যে লাগত আমার ওর দীপ্ত নির্মল বুদ্ধি-উজ্জ্বল মুখ! কানে যেন মধু বর্ষণ করত ওর খোলা হাসি আর স্নেহ-ভর্ৎসনা। এভাবে পদে পদে আমাকে আর কেউ কোনোদিন ভর্ৎসনা করে নি আমার অবিশ্বাস ও সংশয় নিয়ে। অন্য কারুর পক্ষে অবশ্য সে ধরনের ভর্ৎসনা করা সম্ভবও ছিল না, কারুর ছিল না ওর মতন আশ্চর্য কারণ আমার বন্ধুদের মধ্যে আর বিশ্বাসের জোর। তাই তো আরো ওর কথার জোর পেত ওর তিরস্কারের মধ্যে

দিয়ে আমার মনে নামত বিশ্বাস শ্রদ্ধা—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর শুধু যে কৃতজ্ঞতায় কোমল হয়ে আসত তাই নয়, বিস্মিত গৌরবে ভরে উঠত যে, এহেন মহাজ্ঞানী ও মহাবৈরাগী আমার মতন নিত্যসন্দিগ্ধকেও স্নেহ করে! না, শুধু গৌরবই নয়, ধর্ম সম্বন্ধে ওর নানা মতামতের মধ্যে দিয়ে এমনই এক আশ্চর্য দীপ্তি ফুটে উঠত যে, আমার অনেক অবিশ্বাসের অন্ধকারেও প্রত্যয়ের পূর্বরাগ দেখা দিত। যোগশক্তির সম্বন্ধে অনেক ঘটনাকেই আমি যে সময়ে অজ্ঞ বুদ্ধিবাদীদের মতন "আষাঢ়ে গল্প" ব'লে হাসাহাসি করতাম—(তখনো তো আমি বরদাবাবু বা ইন্দিরার সংস্পর্শে আসি নি) —এতে ও ঘোর আপত্তি ক'রে টেবিলে ঘুষি মেরে আমাকে ধমকাত: "কেন তুমি সংশয়ীদের এজাহারকে এত বড় ক'রে দেখ দিলীপ? মনে নেই গীতার কথা—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'? না দিলীপ, এসব সংশয়ী বন্ধুদের কথায় কান দিও না। মনে রেখো, তুমি মহাভাগ্যবান যে জন্মেছ ভারতবর্ষে যেখানে কৃষ্ণ লীলা ক'রে গেছেন আর শুনেছ তাঁর বাঁশি শৈশবেই।"

বলেছি, ওর স্নেহ-তিরস্কার আমার কানে অত্যন্ত মিষ্টি লাগত। কিন্তু শুধু স্নেহের মাধুর্যেই নয়, ওর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিরূপের আন্তরিক ঘোষণার মধ্যে দিয়ে প্রায়ই জ্বলে উঠত এমন এক আশ্চর্য সহজ প্রত্যয়ের স্বর্ণচ্ছটা যার কোনো সংজ্ঞা দেওয়াও অসম্ভব। ওকে যাঁদেরই একটু কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরাই আমার একথায় সায় দেবেন।

হিন্দুধর্মের অনেক আচারকেই ও ওর বলিষ্ঠ ঢঙে সমর্থন করত এই যুক্তিতে যে, এ-সব আমারই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহজ সোপান। এ নিয়ে ওর তর্ক বাধত বেশি ধূর্জটির সঙ্গেই, কারণ ধূর্জটি ছিল বুদ্ধিবাদী, কৃষ্ণপ্রেম বিশ্বাসবাদী। আরো দুচারজন অধ্যাপক ওর সঙ্গে লড়তে আসতেন আধুনিক যুক্তি ও বিজ্ঞানবাদের বল্লম উঁচিয়ে কিন্তু ওর সঙ্গে তর্করণে সবাই হার মেনে শেষটা দু হাত তুলে বলতেন কালিদাসের ছন্দে: "আর বাণ-বর্ষণ করো না, যথেষ্ট হয়েছে—ন খলু ন খলু বাণঃ....." ইত্যাদি।

পঁয়ত্রিশ বৎসরের বন্ধুত্ব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ-বন্ধুত্ব বন্ধন অনেক মতভেদ সত্ত্বেও আজো শিথিল হয় নি, বরং আরো দৃঢ়ই হয়েছে বলব। আমি জানি ও খুশী হ'ত যদি আমি মনে-প্রাণে শাস্ত্রবাদী ও আচারী হতাম। কিন্তু এ-ও জানি যে, আমার বাইরের চলার ছন্দ ওর চলার ছন্দের সঙ্গে সর্বদা না মিললেও মনে মনে আমি আজও ওর কাছে তেমনি কৃতজ্ঞ আছি যেমন ছিলাম ত্রিশ বৎসর আগে। আর এ-কৃতজ্ঞতার মোটামুটি তিনটি কারণ আছে যা বলবার মত।

প্রথম: কৃষ্ণপ্রেমই আমাকে সব আগে বলে যে, শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনা ক'রে এমন এক প্রজ্ঞার আলো পেয়েছেন যা বুদ্ধির নাগালের বাইরে—শুধু সাধনাতেই অর্জনীয়। বলে তাঁর Essays on the Gita পড়তে —যে-বইটি লক্ষ্ণৌয়ে সে ছাড়া আর কেউই পড়ে নি সে-সময়ে। এই বইটি প'ড়ে আমি এতই মুগ্ধ হই যে, শ্রীঅরবিন্দকে লিখি তাঁর দর্শন চেয়ে। কিন্তু এসব কথাই আমার তীর্থংকর-এ লিখেছি তাই এখানে পুনরুক্তি করব না।

ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যখন আমি কৃষ্ণপূজা ক'রে আমার গুরুভাইদের বিরাগভাজন হয়েছিলাম, তাঁদের ঘোষণা মানতে না পেরে যে শ্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণের চেয়েও বড়—তখন কেবল কৃষ্ণপ্রেমই আমাকে আশ্বাস দেয় সস্নেহে—লেখে ওর ১৭-১-১৯৪২ তারিখের দীর্ঘপত্রে (এখানে সে চিঠির শেষের দিকের কয়েক লাইনের অনুবাদ দিলাম):

"কৃষ্ণের দিকে চোখ রাখো, কৃষ্ণকে চিন্তা করো, কৃষ্ণের জন্যে কর্ম করো—বিশ্বাস করো তাহলে কৃষ্ণকে তুমি পাবেই পাবে, এমন কি, যদি ধরণী তোমার পায়ের নিচে দ্বিধা হন তাহলেও। এই-ই হ'ল সত্যের সত্য, তিনি ছাড়া আর যা-কিছু সবই ফাঁকি, একেবারে হাওয়া।

"অপিচ, যারা বলে—তাদের যোগে কৃষ্ণের কোনো স্থান নেই—তারা অজ্ঞান ব'লেই এমন কথা উচ্চারণ করতে পারে। তারা যে জানেই না কৃষ্ণ কে—তাই না নিজেদের অজ্ঞানের বড়াই ক'রে বলতে সাহস পায়—কৃষ্ণ সেকেলে মামুলি! যেন যোগের ধর্ম নিত্যনূতন প্যারিসের ফ্যাশন প্রবর্তন করা!"*

আমার আজো আশ্চর্য লাগে ভাবতে—কৃষ্ণকে ও সত্যি কী ক'রে এমন ভালোবাসে! একবার ভারি মজা হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেম পণ্ডিচেরি থেকে ফেরে মাদ্রাজ হয়ে। মাদ্রাজে আমার এক বাঙালী বন্ধু ছিলেন—ও তাঁরই ওখানে ওঠে। সন্ধ্যায় তিনি ওকে স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে যান। কামরায় একটি ইংরাজ মহিলা গেরুয়া-তিলকধারী স্বদেশবাসীকে দেখে রেগেই আগুন। বন্ধুবর আমাকে হাসতে হাসতে বললেন: "সে যদি দেখতেন দিলীপদা—কী কাণ্ড! মেমসাহেব যেন ক্ষেপে গেলেন—বকতে লাগলেন নেটিভদের পুতুলপুজো কুসংস্কার, আরো কত কিছুর আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে। শেষে কৃষ্ণপ্রেমকে বললেন: 'খৃষ্টের মতন মহা-তারককে ছেড়ে কী পেয়েছ তুমি বলতে পারো?' কৃষ্ণপ্রেম হেসে বলল: পারি। কৃষ্ণ।'"

সত্যিই অবাক লাগে আমার এখনো। জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ব'লে আমার এক ডাক্তার বন্ধু ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ে। তিনি কৃষ্ণপ্রেমকে আর আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি একদিন বলেছিলেন মনে আছে (তখন কৃষ্ণপ্রেম আলমোরায় দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে সাধনা করছে): "ভাবো দিলীপ, একবার ভাবো। দেখেছিলে তো তাকে: একেবারে খাস গোরা—লাল গোরা তোমার পিতৃদেবের ভাষায় 'শূকরগোমাংসে পুষ্ট, আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট?' মনে আছে তো ওর দুর্দান্ত মোটর-সাইকেলে তোমার চংক্রমণ? ও ছিল আকাশগামী বৈমানিক এও মনে রেখো। এহেন রণপ্রবীর পাঞ্জা সাহেব আজ কী করছে? না, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কী খাচ্ছে? না, ভিক্ষান্ন। কোথায় আছে? না বিদেশে বিভূঁয়ে একলাটি—বন্ধ্যা গুরুদেবীর সঙ্গে। কী গাইছে? না 'মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?' তবু লোকে বলে—অঘটনের যুগ গত।"

ওর সম্বন্ধে আরো কত কথাই যে মনে আসে ভিড় ক'রে! কী ভালোই ও বাসত ভজন গাইতে—বিশেষ ক'রে আমার কৃষ্ণ-কীর্তন 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম'! এ-গানটি সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় অঘটনের কথা আজ বলব—না একদিন বলি নি ওরই ভয়ে।

১৯৪৩ সালের কথা। তখন আমি আলমোরাতে থাকি কৃষ্ণপ্রেমেরই পাশের ঘরে। ও তখন শুত ওর গুরুদেবীর ঘরে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে। চব্বিশ ঘণ্টাই ওকে তাঁর দেখাশুনা করতে হ'ত, কেননা তখন তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ—শয্যাশায়ী—কৃষ্ণ-প্রেমকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর দেখাশুনা করতে হ'ত। এমন গুরুসেবা করতেও কাউকে দেখি নি সে সময়ে—যদিও পরে দেখেছিলাম: ইন্দিরাকে। ও কোথাও যেত না, সব কাজ ফেলে এই গুরুসেবাকেই বরণ ক'রে নিয়েছিল ওর পরম সাধনা বলে। আমাকে প্রায়ই বলত যে, ভাগবতে কৃষ্ণের বাণী চিরন্তন-সত্য যে:

"As for those who say that seeking Krishna has no part in their Yoga—that is the ignorant talk of those who do not know who Krishna is and vainly plume themselves on their own vain ignorance of 'all that old stuff!' Paris fashions in Yoga!

ঐকান্তিকে শিষ্য যবে করে তার আত্মনিবেদন
গুরুর সেবায়—তার জেনো আর নাহি
নাহি প্রয়োজন
কৃচ্ছ্র তপস্যার—সর্বসিদ্ধি তার
করতলগত।

গুরুসেবার কিছু তত্ত্ব অবশ্য আমি জানতাম—কারণ গুরুকে আমিও ভালবেসেছিলাম যদিও কৃষ্ণপ্রেমের মতন গুরুর সেবা করবার অধিকার পাই নি—গুরু গৃহবৈগুণ্যে পর্দানশীন হয়েছিলেন বলে। তবু গুরুর জন্যে সব ছাড়বার প্রেরণা পেয়েছিলাম আমি প্রথম কৃষ্ণপ্রেমেরি দৃষ্টান্তে। সব কথা বলতে গেলে এ স্মৃতিচারণ অতিকায় হয়ে উঠবে, তাই সংক্ষেপে বলতে হবে।

হয়েছিল কি, কৃষ্ণপ্রেম ১৯২৬ না ২৭শে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে আলমোড়া যান ওঁর গুরুর সঙ্গে। গুরুর কথায়ই ও চলত ফিরত। তিনি ওকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন তাই ও নিয়েছিল; ওকে ভিক্ষায় জীবিকা-নির্বাহ করতে বলেছিলেন তাই ও দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছিল; বলা মোতিরানীকে ওর কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন তাই তাকে ও শিষ্যা করেছিল—এক কথায় গুরুর কথায় ও উঠত বসত, [illegible] দেশ এমন কি মাতৃভাষায় কথা কওয়াও ও ছেড়ে দিয়েছিল গুরুর সান্নিধ্য পেতে। যশোদা মা ও মোতিরানীর সঙ্গে ও সবসময় হিন্দীতে বা বাংলায় কথা বলত। হিন্দীতে [illegible] পড়ত গুরুর সঙ্গে বাংলায় চৈতন্যচরিতামৃত পড়ত সম্ভবত মোতিরানীর সঙ্গে। [illegible] ভাষা শিখেছিল শিষ্যার জন্যে। ও ছিল গুরুসেবী ও [illegible] প্রাণ।

[illegible] কাহিনী।

কৃষ্ণপ্রেমের মন্দিরটি ছিল [illegible]। বর্তমান কাহিনীটির মর্ম ঠিক বোঝবার জন্যে বলি: [illegible] দুটি ঘরের মাঝে দরজা। সেখানে একটি চৌকাঠে বসে মোতিরানী কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন করত। সে এ-চৌকাঠে বসলে যশোদামায়ের ঘর থেকে মন্দির কক্ষে পৌঁছতে হলে মন্দির পরিক্রমা করা ছাড়া উপায় নেই। ঐ ঘরটিতে খাটে যশোদা মা অষ্টপ্রহর বসে বা শুয়ে থাকতেন—কারণ, চলাফেরা করা ডাক্তারের মানা। আমি মিরতোলায় যে-কদিন ছিলাম প্রত্যহ সন্ধ্যায় কৃষ্ণপ্রেম ও মোতিরানীর সঙ্গে বসে ভজন ও আরতিতে যোগ দিতাম। সে সময়ে মিরতোলায় মন্দিরে কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে ছিল ওর আর এক উদাসী বন্ধু হরিদাস—পূর্বাশ্রমের নাম Alexander—লক্ষৌয়ের প্রাক্তন সার্জন। তাকে আমরা অ্যালেক বলেও ডাকতাম সময়ে সময়ে। যশোদা মা, মোতিরানী ও হরিদাস তিনজনেই ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন, মিরতোলায় এখন আছে মাত্র দু জন: কৃষ্ণপ্রেম ও তার ইংরাজ শিষ্য আশীষ। সে সময়ে আশীষ আসেনি।

প্রথম দিন ভজনের সময় কৃষ্ণপ্রেম গেয়েছিল বিখ্যাত কীর্তন "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব।" মোতিরানীও যথাবিধি যোগ দিয়েছিল ভজনে তথা নামকীর্তনে। যশোদা মা শুনেছিলেন তাঁর ঘর থেকে খাটে বসেই, কারণ হরিদাস তাঁকে পই পই করে মানা করেছিল উঠতে কি চলাফেরা করতে। সে সময়ে তিনি সত্যিই অত্যন্ত অসুস্থ অথচ মুখে স্নিগ্ধ শান্ত হাসিটি লেগেই আছে, একদিনও তাঁকে অনুযোগ করতে শুনি নি। তিনি বলেছিলেন আমাকে যে বাকের মধ্যে তিনি তাঁর ঠাকুরকে সর্বদাই দেখতে পান।

দ্বিতীয় দিন যথাবিধি ভজন শুরু করলাম। মোতিরানী মন্দিরের ও-ঘরের বাঁ দিকের দরজার চৌকাঠে বসে—আজো যেন তাকে দেখতে পাই কল্পনাচক্ষে—মুখে সরল ভক্তি কমনীয় আভা, প্রফুল্ল হাসির আলো! যশোদা মা তাঁর ঘরে চৌকাঠের ওপারে খাটে বসেই রোজ ভজন কীর্তন শুনতেন। আমি কৃষ্ণপ্রেমের অনুরোধে ধরলাম:

সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি
আজো পড়ে মনে মোর,
পড়ে যে কেবলি মনে!
গান গাইতে গাইতে চক্ষে ধারা বয়ে যায়, গেয়ে চলি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে:
ওরা হাসে সব, বলে:
"হায় রে মধুর স্বপন!"
বলে: "কৃষ্ণকাহিনী কল্পনা কবিকথন।"
ওরা হাসে......করুভাবে
ওরা জানে না—তাই হাসে।
ওরা জানে না—তাই মানে না,
আমি জানি—তাই মানি,
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি
তাই বঁধু আমি জানি
আমি বাদলে তোমায় জানি,
আমি কিরণে তোমায় জানি,
আমি বিরহে তোমায় জানি,
আমি মিলনে তোমায় জানি,
আমি হরষে তোমায় জানি,
আমি বেদনে তোমায় জানি,
আমি জীবনে তোমায় জানি,
আমি মরণে তোমায় জানি

গানের সময় মন্দিরের হাওয়া যেন থমথমে হ'য়ে আসে...বুকের মধ্যে বাণ ডেকে যায়......

গান শেষ হ'তে কৃষ্ণপ্রেম সস্নেহে আমার দিকে তাকায়। আমি চোখ মুছে ঠাকুরের বিগ্রহের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে।

হঠাৎ চমক ভাঙল হরিদাসের কণ্ঠস্বরে। সে কৃষ্ণপ্রেমকে বলল : "জানো, তোমরা যখন গান করছিলে মা সামনে খোলা জায়গায় এই ঠাণ্ডায় হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিগ্রহের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে?"

কৃষ্ণপ্রেম চমকে ওঠে: "সে কি? তাঁর যে অসুখ......"

আমরা তৎক্ষণাৎ মোতিরানী যে চৌকাঠে ব'সে ছিল সেটি পেরিয়ে ফিরে এলাম যশোদা মার ঘরে। দেখি তিনি হাত জোড় ক'রে ব'সে।

তারপর তিনি বললেন ঠাকুরের অদ্ভুত আবির্ভাবের কাহিনী। তাঁর কথার প্রতি শব্দটি মনে আছে আজো। সে কি ভুলবার কথা? সাক্ষাৎ ঠাকুরের দর্শন!

যশোদা মা : আহা বাবা, দেখতে পেলে না?

আমি: দেখতে পেলাম না? কী মা?

যশোদা মা : ঠাকুর, বাবা, ঠাকুর! তিনি স্বয়ং এসেছিলেন যে—দেখতে পেলে না?

আমি (বিহ্বল হ'য়ে): না তো। (একটু বাদে) কখন এসেছিলেন মা?

যশোদা মা : শেষের দিকে—যখন তুমি আঁখর দিতে দিতে নিজেকে ভুলে গিয়েছিলে বাবা! আহা...ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন প্রথম আমার সামনে...তারপর ঐ চৌকাঠ ডিঙিয়ে মন্দিরে চলে গেলেন।...আমি কেমন ক'রে আর ব'সে থাকি বলো দেখি বাবা?...উঠে বাঁ দিকের দোর দিয়ে বেরিয়ে ওদিক দিয়ে চক্র দিয়ে ঠাকুর দাঁড়িয়ে...স্বয়ং ঠাকুর বাবা...আর মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। দেখি তখনো তোমার গান শুনছেন...তোমারি কাছে... অথচ তুমি দেখতে পাচ্ছ না হায় হায়! আমি ঠাকুরকে মনে মনে বললাম : "ঠাকুর! আহা—তুমি নিজে এসে ওর গান শুনছ অথচ ও বেচারা দেখতে পাচ্ছে না!... ওকে চোখ দাও ঠাকুর...দেখুক ও নয়ন ভরে..."

শেষে বললেন যে আমার ভজন ক'রেই ভগবানের দর্শন মিলবে। কিন্তু সে কথা "আমার ভ্রাম্যমাণ"-এ লিখেছি ব'লে পুনরুদ্ধৃত করলাম না।

ঠাকুর আমার গান শুনতে এসেছেন এর পরে আরো অনেকবার—ভাগ্যবতী ইন্দিরা দেখেছে তার ভাবনেত্রে যশোদা মা-র কথা মনে পড়ে আজ প্রতিবারই যখনই ও আমার ভজনের সময়ে কখনো কখনো ঠাকুরকে দেখতে পায়। কখনো বা ঠাকুরকে ছোঁয়, আর অমনি ওর হাত পা কণ্ঠ বুক থেকে নিঃসৃত কস্তুরীগন্ধ ঘর ছেয়ে যায়। এ বহুবার হয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার—এটুকু লিখেছিলাম কাল বিকেলে ১৮-৬-৫৯ তারিখে। সন্ধ্যায় আমাদের মন্দিরের কক্ষে গাইলাম ইন্দিরারই একটি গান—ইকবার জো দরশন পাউঁ :

যদি একবার সখি পাই তার দরশন,
ভুলে জনমান্তর-ব্যথা রাঙা পায়
লব লো তার শরণ।......ইত্যাদি

হঠাৎ ইন্দিরার গভীর সমাধি! তারপর চোখ চাইতে কিছুই দেখতে পায় না, লোকে প্রণাম করে টেরও পায় না। আমি গাইতে গাইতেই হঠাৎ ওর অংগ থেকে নিঃসৃত কস্তুরীগন্ধ পেয়েছিলাম। গানের শেষে সবাই প্রণাম করতে এসে দেখে পায়ের সুগন্ধ আরো বেশি নিবিড়। শুধু তাই নয়—যারই হাতে হাত ঘষে তারই হাতে কস্তুরী-সৌরভ পাওয়া যায়—কি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী।

সকলে চলে গেলে বিহ্বলতা কাটলে বলল : "ঠাকুর এসেছিলেন—কী সুন্দর যে দাদা! ছোট্ট বালগোপাল! এসে বললেন, 'আমাকে পরিষ্কার করে দাও।' এখানে ওখানে কাদাধুলো। পরিষ্কার করে দিলাম।"

এইভাবে যখনই ঠাকুরের অংগ ও স্পর্শ করে অমনি ওর অংগ থেকে প্রবল কস্তুরী-গন্ধ নিঃসৃত হয়ে ঘর ছেয়ে যায়। একথা গোপন করতে একটুও ইচ্ছা করে না, বলে ফেলে কই, অনুতাপের লেশও তো জাগে না! —তা ছাড়া এ-আশ্চর্য ঘটেছে বার বার বহু লোকের সামনে—গোপন রাখিই বা কেমন করে?—অবশ্য অবিশ্বাসীরা কেউ কেউ অবিশ্বাস করে না কি আর? করে বৈ কি। কিন্তু তারা না-মঞ্জুর করলেই বা, বিশ্বাসীরা তো আনন্দে অধীর হল ভাব-সমাধিতে ওর অংগে কস্তুরী-গন্ধ পেয়ে! তাই কেমন করে বলি—ঠাকুর তাঁর নিজের অংগসৌরভের কাহিনী গোপন রাখতেই চান? যদি চাইতেন তবে সকলের সামনেই এ অঘটন বার বার ঘটাতেন কি?—তাই সাফাই রেখে ধরি ফের হারানো খেই।

কৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে কত কথাই যে বলতে সাধ যায়—কিন্তু ভয় ভয় করে—যদি ও শেষটায় উত্যক্ত হয়ে সত্যিই আমাকে ত্যাজ্য-বন্ধু করে—বলা তো যায় না। তাই ওর কথা বেশি না বলে যশোদা মার কথাই বলি, কারণ তাঁকে তো কোনো কথা দিই নি যে, তাঁর কথা কাক-পক্ষীকেও বলব না। কৃষ্ণপ্রেম এজন্যেও রাগ করতে পারে হয়ত—কিন্তু যদি করে তবে তাকে বলার পথ রইল : "বলেছি আমি তোমার গুরুর দর্শনের কথা—তিনি শুধু তোমার গুরুই তো নয়, আমিও যে তাঁর অপার স্নেহ পেয়েছিলাম ভাই। তাই জানি তাঁর ভাইকে তাঁর ঠাকুর দর্শনের কথা লেখার জন্যে তিনি আমার 'পরে অপ্রসন্না হবেন না। তা হলে তুমিই বা রাগ করবে কেন?"

এবার বলি—কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার তৃতীয় কারণ। এ-কারণটির উল্লেখ করছি সব শেষে কেননা আমার জীবনের মোড় ফেরে খানিকটা ওরই জন্যে বলব। কীভাবে বলবার সময় এল।

বলেছি, লক্ষ্ণৌয়ে আমি প্রায়ই আসতাম ঘুরেফিরে। অতুলদা বলতেন হেসে : "আমার বাড়িই তোমার গানের হেড-কোয়ার্টার হোক, দিলীপ!"

সত্যিই আমার গীতিরাজ্যের রাজধানী দাঁড়িয়েছিল দুটি—কলকাতা ও লক্ষ্ণৌ। একদিকে অতুলদা অন্যদিকে কৃষ্ণপ্রেম—দু দুটো প্রবল টানে আমাকে প্রায়ই টেনে আনত লক্ষ্ণৌয়ে।

কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব ছাপিয়ে গেল অতুলদার প্রভাবকে। অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল ফের। আমাকে সংসার গান সংগীত আকাদেমি প্রভৃতির দিকে টানেন আমার অতুলদা প্রমুখ আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব—বৈরাগ্যের দিকে টানে একা কৃষ্ণপ্রেম। বলে হেসে : "চিরদিনের তীর্থযাত্রী কী করবে ঐহিক সাফল্য নিয়ে—যা দুদিনের?" আমার সংগীতকোবিদের শুভার্থীরা বলেন: "গানাৎ পরতরং নহি।" কৃষ্ণপ্রেম হাসে : "বটে, কিন্তু সে কোন গান? যে-গানে শিল্পীরা হাততালি দেয় সেই গান—না যে-গানে ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করেন সেই গান?" পরে ও একটি পত্রে লিখেছিল (২১শে জুন, ১৯৪৩—এখানে অনুবাদ দিলাম) :

"তুমি লিখেছ তুমি গান গাইতে চাও কৃষ্ণকে নিবেদন করে। খুব ভাল কথা। কিন্তু ঐ সঙ্গে এমন কথা লিখলে কেন যে, এর ওর তার সামনেও গাওয়া তোমার কর্তব্য? কর্তব্য? মোটেই না। যদি কেউ নিজে থেকে গান শুনতে আসে আসুক। কিন্তু তুমি কেন তাদের কথা ভাববে? তুমি শুধু ঠাকুরকে গান শোনাবে—কেউ আসুক বা না আসুক। শ্রোতার কথা তুমি আদৌ ভাববে না, শুধু ঠাকুরের কথা ও কিসে তিনি খুশী হবেন। তারপর তুমি তাঁকে যে-গান নিবেদন করবে, সে-প্রসাদ অপরে উপভোগ করুক বা না করুক তোমার কী? আমি যদি তুমি হতাম, তা হলে কী করতাম বলব? একা শুধু ঠাকুরকে গান শোনাতাম—অন্তত যতদিন না ঠাকুরের নামে তন্ময় হয়ে শ্রোতাদের উপস্থিতির কথা ভুলে যেতে পারি। আসল কথা হল তোমার কণ্ঠ কী চায়? কৃষ্ণের কাছে গান গেয়ে কৃতার্থ হতে—না লোকের বাহবা পেয়ে দিগ্বিজয় করতে?"

এই ধরনের কথা ও সে-সময়েও বলত অকুতোভয়ে। আর শুনতে শুনতে আমার মনে ফের জেগে উঠত ঘুমিয়ে-পড়া বৈরাগ্য। এইবারে একটু একটু করে আমার দৃষ্টি যেন ফের খুলে গেল, আমি দেখতে পেলাম—আমি গানের নাম করে যশ কুড়োতেই চলেছি—এর নাম আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কী? সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে জানি না, মনে হল শ্রীঅরবিন্দের কথা, মনে বেজে উঠল—তাঁর একটি বিশেষ বাণী যে, ভাগবত সাধক "কাজ করবে শুধু ভগবানের জন্যে—যজ্ঞ বা নিবেদনের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো আসক্তি বা বাসনাকে আমল না দিয়ে।"*

যজ্ঞ (Sacrifice) সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নানা মন্ত্রাক্ষর ও গভীর ভাবনা আমাকে একটু একটু করে আবিষ্ট করে তুলতে না তুলতে আমি দেখতে পেলাম আমি ভুল পথে চলেছি। তখন তাঁকে চিঠি লিখলাম ও তাঁর অনুমতি পেয়ে পণ্ডিচেরি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম ১৯২৪ সালে।

তাঁকে দেখেই বুকের রক্ত উঠল দুলে, মনে পড়ল উপনিষদের ঋষির কথা, যিনি বলেছিলেন:

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

জেনেছি আমি তাঁকে তমসার পারে আসীন সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে। তাঁকে জানলে তবেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে—অমৃতলাভের অন্য পথ নেই।" (একথা পরে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম—কথাচ্ছলে।)

শ্লোকটি যখন প্রথম পড়ি, খুবই ভাল লেগেছিল ঠিক, কিন্তু শ্লোকটির নিহিতার্থ জীবন্ত হয়ে উঠল প্রথম অরবিন্দকে দেখে। মন আমার বলল: এঁকেই গুরু করতে হবে, এই তো সেই মূর্তি।

কিন্তু হায় রে তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন না, বললেন—আমার সময় হয়নি। আমি বিষণ্ণ হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। কিন্তু যে-মানুষ পণ্ডিচেরি গিয়েছিল মহাপুরুষ দর্শনে, আর যে-মানুষ তাঁর দর্শনের পরে সংসারে ফিরে এল, তারা বাইরে দেখতে এক হলেও আসলে দুটি আলাদা মানুষই বলব। একথা বলতে ঠিক যে কী বলছি ব্যাখ্যা করে বোঝানো মুশকিল। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—শিল্পী দিলীপকুমারের মধ্যে মুমুক্ষু-আর-শান্তিতে জেগে উঠল যেন সেই সুপ্ত দুরাশা—যে দেখতে চেয়েছিল শুধু কৃষ্ণকে—ধন মান যশ কাব্য গান শিল্প কিছুই নয়।

একই মানুষের মধ্যে নানান মানুষ থাকে অংশাংশী হয়ে—একথা পরে শ্রীঅরবিন্দের শ্রীমুখেই শুনি, কিন্তু সে-সময়ে জানতাম না। তাই বিপন্ন বোধ করলাম দেখে যে, আমি সংসার চাইও বটে, চাই না-ও বটে।

ফিরে এলাম কলকাতায় ১৯২৪ সালে বৈরাগ্য নিয়ে। কিছুদিন পরে কৃষ্ণপ্রেমের এক চিঠি পেয়ে চমকে উঠলাম: ও সব ছেড়ে ওর গুরুর সঙ্গে চলে গেছে মিরতোলায়—গভীর অরণ্যে, সেখানে এক মন্দির স্থাপন করে সাধনায় বসেছে। মনের মধ্যে ধিক্কার জেগে উঠল: আমি নিজেকে ভারতীয় বলে গৌরব করি, কথায় কথায় বলি ভারতের ধর্ম আজও জীবন্ত, কিন্তু বিলাতী গোরা হয়েও যা পারল খাস অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর হয়েও আমি তা পারলাম নাকি? মন আমার তখন বৈরাগ্য চাই চাই করছে, কিন্তু সে না জানি আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এই ভয়ে আমি সর্বদাই কাঁটা হয়ে আছি। সত্যিই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের গুরুগম্ভীর [illegible] করতে বসে যায় ভাবতেও প্রাণের মধ্যে আতঙ্কের ডমরু বেজে উঠত। আমার কি এই-ই স্বধর্ম? —কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ মন্ত্র জপতে জপতে সংসারের হাসি অশ্রু, আনন্দ বেদনার অপরূপ বৈচিত্র্য-রাজ্য ছেড়ে নিস্তরঙ্গ নির্মায়িক অভিনব মঠে আশ্রয় নেওয়া? মনে পড়ত আমার কুষ্ঠির কথা—সন্ন্যাসী হওয়া আমার ললাট-লিখন। কিন্তু একদিকে গৈরিকধারী হব ভাবতে আনন্দ, অন্যদিকে সংসার ছাড়ব ভাবতে ত্রাস—এ-দুই বিরোধী মনোবৃত্তির টানাছেঁড়ায় আমার মীরার একটি গানের অবস্থা হল প্রায়: "দিবস ন ভূখ নীদ নাহি রৈন।" এক কথায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, শ্রীঅরবিন্দ যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তখন সংসারে থেকেই সাধনা শুরু করি। সংসারেও কি ভগবানকে পাওয়া যায় না? পরমহংসদেব বার বার বলেছেন—যায়। তবে? এর বিকল্প কী আছে?

এই সময় হঠাৎ অভেদানন্দ স্বামীর বক্তৃতা শুনে আকৃষ্ট হয়ে সোজা তাঁকে গিয়ে বললাম আমার বৈরাগ্যের কথা: আমাকে দীক্ষা দেবেন কি? তিনি রাজি হলেন।

এই সময় আমার একটি বন্ধু—ইনি পরে অরবিন্দ আশ্রমে প্রয়াণ করেন—

* "He does works for the sake of the Divine or [illegible] es a pure sacrifice, without attachment or desire."
... Essays on Gita—Chapter XII

আমাকে বললেন অভেদানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার আগে তাঁর এক যোগী বন্ধুর উপদেশ নিলে মন্দ কি? বন্ধুবর বললেন তিনি মস্ত যোগী, নাম বরদাচরণ মজুমদার, লালগোলার এক স্কুলের হেড-মাস্টার। শুনলাম রাতে দশ বারো ঘণ্টা তিনি এক আসনে বসে ধ্যানস্থ থাকেন। মহা উৎসাহে বন্ধুর সঙ্গে ছুটলাম লালগোলায়। এই বরদাবাবুর কাছেই পরে কাজি নজরুল ইসলাম দীক্ষা নিয়েছিলেন ও শুনেছি দ্রুত উন্নতিও করেছিলেন। তারপর কেন কাজি পাগল হয়েছিলেন তাও জানি, কিন্তু বলব না—আরো এই জন্যে যে তার সঙ্গে আমার অন্তর্জীবনের বিকাশের কোনো সম্বন্ধই নেই।

বরদাবাবুর কথা একটু না বললেই নয়। আমি তাঁর কাছেই সর্বপ্রথম যোগবিভূতির পরিচয় পাই বলেই নয়—মানুষটিকে দেখে আমার গভীর শ্রদ্ধা হয়েছিল বলেও বটে। পরে নানা বন্ধুর কাছে তাঁর নানা অলৌকিক শক্তির কথা শুনি। অনেক কথা বিশ্বাস করতে পারি নি সে সময়ে। কিন্তু পরে এই সব শক্তির বিকাশ ইন্দিরার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে আজ মনে হয় বরদাবাবুরও এসব যোগবিভূতি ছিল—যথা দূরদর্শন, পরের চিন্তার খবর পাওয়া, ধ্যানে দেখতে পাওয়া কার কোন স্বধর্ম। আমার একটি বন্ধুর কাছে পরে পণ্ডিচেরিতে শুনে-ছিলাম বরদাবাবুর একটি বিশেষ শক্তির কথা। অঘটনটি বলবার মত তাই বলি সংক্ষেপে।

বন্ধু আমাকে কথায় কথায় বলেন যে, বরদাবাবুর কাছে তিনি বিশেষ ঋণী। হয়েছিল কি—বন্ধুর ভাষায়ই বলি:

"আমার শিশুপুত্রের পেটের অসুখ। কিছুতেই সারে না। ছয়মাসের শিশু। ডাক্তারে বলে পেটে ফোড়া—অপারেশন না করলে বাঁচবার আশা নেই। ভয় পেয়ে সোজা গেলাম লালগোলায় বরদাবাবুর কাছে—যেমন আরো অনেকে যেতেন বিপন্ন হয়ে। তিনি শুনে আমাকে সামনে বসিয়ে ধ্যান শুরু করলেন। একটু বাদে বললেন: 'তোমার ছেলের পেটে ফোড়া হয় নি, ক্রিমি হয়েছে। অমুক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াও সেরে যাবে।'

"আমার ধড়ে প্রাণ এল। কলকাতায় ফিরে ওষুধটি ছেলেকে খাওয়াতেই পরদিন দাস্তের সঙ্গে বহু ক্রিমি বেরিয়ে গেল। ছেলে বেঁচে গেল।"

আরো শুনেছিলাম—বরদাবাবুর মুখেই—যে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের ঘরে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি দেখেছেন নিজে লালগোলায় বসে। একে বলে ক্লেয়ারভয়ান্স—দূরদর্শন। ইন্দিরার মধ্যে এ-শক্তির প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ বিকাশ দেখি বহু বৎসর পরে কিন্তু সে সময়ে এ-শক্তির কথা শুধু বইয়েই পড়তাম বলে পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি। এবার বিষ্কম্ভক থেকে নাট্যলোকে নামবার সময় হল।

বন্ধুর সঙ্গে বরদাবাবুর কাছে যেতেই তিনি সাদরে বসালেন। সব শুনে আমাকে সামনে রেখে ধ্যানে বসলেন। খানিক বাদে বললেন একটু আশ্চর্য হয়েই: 'আপনি কেন অন্য গুরু করতে যাচ্ছেন? শ্রীঅরবিন্দই আপনার গুরু।'

আমি (আশ্চর্য হয়ে): সে কি? তিনি যে আমাকে দীক্ষা দিতেই চাইলেন না।

বরদা (দৃঢ়স্বরে): তিনিই আপনার গুরু। আপনি ভাগ্যবান। হিমালয়ের নিচে এতবড় যোগী আর নেই এখন।

আমি (তৃপ্ত না হয়ে): কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন আমার সময় হয় নি। আমি সব ছাড়তে পারি কিন্তু গান ছাড়তে পারি না বলবামাত্র বললেন এই কথা যে, আমার জিজ্ঞাসা এখনো বুদ্ধির কোঠায়ই আছে তাই আমাকে তিনি দীক্ষা দিতে পারেন না।

বরদাবাবু (হেসে): তবে শুনুন। তিনি আমাকে এই মাত্র বলে গেলেন—আপনার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে—ওকে মানা করো অন্য গুরু বরণ করতে, সময় হলেই আমি ডেকে নেব ওকে।

ঠিক এই কথাগুলি বরদাবাবু বলে-ছিলেন, আমি সাজিয়ে বলছি না। এ তো ভুলবার কথা নয় তাই ভুল হওয়া অসম্ভব আরো এই জন্যে যে আমি বিস্ময়ের অথই জলে পড়ে তাঁকে স্রেফ অবিশ্বাসই করে-ছিলাম। তাঁকে এসে শ্রীঅরবিন্দ বলে গেছেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে—একথা শুনে আমি প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে খানিক চুপ করে থেকে শেষে বললাম: 'কিন্তু...'

বরদাবাবু (মুচকে হেসে): বিশ্বাস হয় না এই তো? আপনার খুব অপরাধ নেই। তবে যে বলেছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি যে সত্যবাদী তার একটা প্রমাণ চান আপনি—এই না?

সত্যিই আমি ভাবছিলাম তাঁর সত্য-পরায়ণতা সম্বন্ধে। প্রমাণের কথা। তাই অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইলাম। বরদাবাবু বললেন: 'শুনুন তবে বলি আর একটু, এবার হয়ত বিশ্বাস হবে। আপনার ডান-দিকের তলপেটে কি হার্নিয়া আছে?'

আমি (অবাক হয়ে): আছে। ভারি ওজন তুলতে রাপচার হয়। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? যোগবলে?

বরদাবাবু: কতকটা তবে যোগে জানা নয়। কারণ শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম যোগবলে কিন্তু একথা জানলাম তাঁর মুখে শুনেই। তিনিই বললেন: দিলীপ আমাকে লিখে-ছিল ওর হার্নিয়ার কথা। আমি ওকে লিখেছিলাম অপারেশন করাতে। অপারে-শনের পরেই ওকে ডেকে নেব।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর পরে আর অবিশ্বাসের পথ কই? শ্রীঅরবিন্দ আমাকে যে অবিকল ঐ কথাগুলিই লিখেছিলেন।

বরদাবাবুর মধ্যে এই যে যোগবিভূতি আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম তার ফলে আমার মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ বিভূতি—আরো এই জন্যে যে এ-অঘটনটির ভবিষ্যদ্বাণীও ফলেছিল দু-বৎসরের মধ্যেই—সে কাহিনী পরের অধ্যায়ে বলছি—এখানে বরদাবাবুর প্রসঙ্গটি শেষ করি।

বরদাবাবুর কথাবার্তার ভঙ্গি ছিল চমৎকার—গম্ভীর, সহজ, আত্মসমাহিত। তাই তাঁর যোগবিভূতি আমাকে আরো অভিভূত করেছিল—সহজে বোলচাল তিনি দিতেন না বলে। তাঁর কথা পরে আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে যোগীদের যোগ-বিভূতি নানারকম থাকে। সে-আলোচনা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। আমি শুধু বলতে চাই যে যোগের রাজ্যে এই-ই আমার প্রথম অঘটনের—miracle-এর অভিজ্ঞতা। এরকম অলৌকিক ঘটনা পণ্ডিচেরিতে আমি একটিও দেখি নি, দেখেছি শুধু ইন্দিরার মাধ্যমে—শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পরে—আর দেখেছি মাসের পর মাস, দিনের পর দিন—যার ফলে আমার সব সংশয় ভেঙে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সে অন্যকথা। এবার শেষ অধ্যায়ে আসার সময় হল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

'মিট সেফে। বিকেলের জন্যে যে মাছ তুলে রেখেছিলাম ঢাকা দিয়ে তার আদ্যোপান্ত কিছুই রাখে নি।'

ধাতস্থ হল বন্দনা। আঙুলের মধ্যে ঝরনা কলমটা স্থির হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠল। বললে, 'কে খেয়ে গিয়েছে? বেড়াল?'

'বেড়ালের বড়দিদি। বিজয়া।'

'কাকিমা খেয়েছেন?' হাসতে গিয়ে আঁতকে উঠল বন্দনা।

'ও একই কথা। সোয়ামীকে খাইয়েছে। আর সকলের দুখানা করে, ওর সোয়ামীর একখানা। এ সইল না ঠাকরুণের। মিটসেফ থেকে চুরি করে এনে সোয়ামীর পাতে ঢেলে দিল।'

'সে কি কথা? অফিস যাবার আগে খুব লাইট, হালকা খাবেন এই তো কাকার হুকুম। এক হাতা ভাত, এক চিলতে মাছ—'

'আর, এক চামচ দই! তোমাকে আর সর্দারি করতে হবে না, বউমা।' কান ঠিক খাড়া রেখেছিল, নীচে থেকে বিজয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। 'কবে আবার ঐ ফরমান জারি করল তোমার কাছে? কই আমি তো শুনিনি। ভাবখানা দেখাচ্ছ যেন ঐ নির্দেশের জন্যেই ঐ সরু ব্যবস্থা। তাই যদি হবে তবে দু টুকরো মাছের ভরপুর ঝোলের বাটিটা উনি 'না' করলেন না কেন? চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কেন খেলেন চেটেপুটে? সর্দার' হালকা খাওয়াবার আর তুমি জায়গা পেলে না?'

কী বলতে যাচ্ছিল বন্দনা, চোখেমুখে নীরব তর্জন করে দমন করল মৃণালিনী। তারা দুজন, শাশুড়ি-বউ, এক পক্ষে, ইঙ্গিতটা তাই বিশদ করল। বললে, 'কিছু বলতে যেও না। ওরা এই বাড়ি কিনছে, কিনেই উচ্ছেদের নোটিশ দেবে আমাদের।'

'খ্যাদা নাকে অনেকেরই নথ পরতে সাধ যায়।' মুখ টিপে হাসল বন্দনা। 'তা স্যাকরার বাড়ি থেকে নথ আগে আসুক গড়িয়ে। যত দিন না আসে ততদিন নাক উঁচু করতে না চাওয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ, ততদিন মানতে হবেই আমার কর্তৃত্ব। শোনো, আমি আবার বাজার থেকে মাছ আনাচ্ছি।' ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে টাকা বের করল মৃণালিনী। 'তুমি গিয়ে রেঁধে ফেল নতুন করে। রেঁধে মিটসেফে রেখে তালা দিয়ে বন্ধ করে এস ভালো করে। হ্যাঁ, রুপোর নথ আগে গড়িয়ে আসুক তারপর যেন গোদা পায়ের লাথি তোলে!'

বারান্দার একধারে ছোট আয়নাটাকে অনেক কায়দা কসরৎ করে দাঁড় করিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে সুকান্ত, বুকের ভিতরটা এবার ছাঁৎ করে উঠল। এবার না তাকে স্মরণ হয়! বাজারে যাবার লোকের দরকার, এবার না ঝোপ বুঝে কোপ পড়ে। মাছ খাবে অন্যে আর কাঁটা বিঁধবে তার নিজের গলায়। নতুন করে গালে সাবান ঘষতে লাগল সুকান্ত। ভাবখানা এমনি যেন কারুকার্যের এই মোটে আরম্ভ।

মৃণালিনী নীচেই নেমে গেল চাকরের খোঁজে। নীচে আবার না আরেক প্রস্থ শুরু হয়! এক দেশের বুলি তো অন্য দেশের গালি। মায়ের কাছে কাকিমা চোর, কাকিমার কাছে মা জোচ্চোর। যেমন হিটলারের কাছে চার্চিল, চার্চিলের কাছে হিটলার। অথচ কী সামান্য নিয়ে কলহ, কী অসামান্য ক্ষুদ্রতা! এ মিটবে কবে, মিটবে কিসে?

ঘন করে ফের বুরুশ করতে লাগল সুকান্ত, কিন্তু, এ কী, নীচে আবার এ কিসের গোলমাল?

হরিপদর খোঁজে মৃণালিনী সদরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাগ কাঁধে অচেনা মহিলা সামনে পড়তেই ঝাঁজিয়ে উঠল: 'না, না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগবে না। অন্য বাড়ি দেখুন।'

'আমাকে বলছেন?' সদরের মুখে, রাস্তার উপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাকলি।

'তা ছাড়া আবার কাকে! আপনি কী এনেছেন, কিসের স্যাম্পল?'

'স্যাম্পল?'

'হ্যাঁ, চা, না, সাবান, না গুঁড়ো দুধ? যাই আনুন কিছু লাগবে না আমাদের।' মৃণালিনী চাকরের জন্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

'না, চা হলে আমার লাগবে।' নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিজয়া। 'এজমালি চায়ে ভীষণ ঝামেলা, তাই আমার আলাদা স্টোভ জ্বলে। আলাদা টি-সেট। আসুন। আপনি কোন কোম্পানির এজেন্ট? দার্জিলিঙ না আসাম না মধ্যপ্রদেশ?'

হাসতে-হাসতে প্যাসেজটাতে উঠে এল কাকলি। বললে, 'না, আমি এজেন্ট নই, আমি প্রিন্সিপ্যাল।'

'প্রিন্সিপ্যাল?' হাঁ হয়ে গেল মৃণালিনী।

'কোন কলেজের?' সবিস্ময় চোখে জিগগেস করল বিজয়া। সসম্ভ্রমে বললে, 'আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে আসুন। ফ্যান আছে ঘরে।'

বাইরেই দ্বিধা করতে লাগল কাকলি। বললে, 'প্রিন্সিপ্যাল মানে বলতে চাচ্ছি, আমি নিজেই নিজের কর্তা, কারু আমি প্রতিনিধি নই। গোমস্তা বা আমমোক্তার নই। তা ছাড়া অধ্যক্ষ হব কোত্থেকে? আমি এখনো ছাত্রী।'

'এত বড় মেয়ে এখনো ছাত্রী?' মৃণালিনী আবার প্রায় হাঁই তুলল। 'ঠিকমত প্রমোশন পাওনা বুঝি?'

'প্রায় তাই। এবার শেষ প্রমোশনের চেষ্টা।' কাকলি বাড়ির মধ্যে তাকাল।

'শেষ মানে?' বিজয়া বেশি ওয়াকিবহাল, তাই গম্ভীর আন্দাজ করল: 'বি-এ দেবে বুঝি?'

'এম-এ দেব।'

'এম-এ!' বিজয়ার কটাক্ষ মৃণালিনীর উপর। বললে, 'এইটুকু ছোট্ট এক চিলতে মেয়ে, এম-এ দেবে! বলো কি!'

মৃণালিনীও গম্ভীর হতে জানে। বললে, 'কেন, আমার সুকু—সুকান্ত—সেও তো এবার এম-এ দেবে।'

'ও! আপনিই তাহলে সুকান্তবাবুর মা?' অক্লেশে মৃণালিনীকে প্রণাম করল কাকলি। বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি?'

'যাই হই, ওঁকে যখন করেছ আমাকেও করতে পারো।' বিজয় চিড়বিড় করে উঠল।

বিজয়াকেও প্রণাম করতে দেরি হল না। সহাস্য নম্রমুখে বললে, 'আমি আর সুকান্তবাবু একসঙ্গে পড়ি, একই বিষয়। পরীক্ষাসমুদ্রে আমরা একই জাহাজের সোয়ারি, যদিও উনি ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে আর আমি খোলা ডেকে। উনি বাড়ি আছেন?' তাকাল মৃণালিনীর দিকে।

'কী জানি আছে কিনা। সারাক্ষণই তো আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।' মৃণালিনী পাশ কাটাতে চাইল: 'পড়ার নামে ঠন ঠন। কখন বেরিয়ে গেছে টো-টো কোম্পানি হয়ে কিছু ঠিক আছে?'

'আপনি জানেন?' কাকলি তাকাল বিজয়ার দিকে।

'অনেকক্ষণ তো শুনিনি সাড়াশব্দ। বোধহয় নেই।' মৃণালিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হল বিজয়ার।

'দেখুন না একটু। ওঁকে আমার দরকার।' যেন পুলিস চার্জ গেপ্তার করতে এসেছে এমনি শোনাল কাকলিকে।

'কেন, দরকার কেন?'

'আমার প্রোফেসর, মানে যিনি আমাকে বাড়িতে পড়ান, তিনি জানতে পেরেছেন কটা প্রশ্ন যা ঠিক আসবে পরীক্ষায়, নির্ঘাৎ আসবে।' ঢোঁক না গিলে দিব্যি বানাতে পারছে কাকলি: 'যতই কম পড়ুন সুকান্ত-বাবু ঠিক পাবেন ফার্স্ট ক্লাস, আর যদি এ প্রশ্নগুলিও তাঁকে পৌঁছে দিতে পারি তবে আর দেখতে হবে না, একেবারে সকলের মাথার উপরে। চূড়োর উপরে ময়ূরপাখা হয়ে বসবেন। তাই ও'র জন্যেই ও'কে দরকার আমার জন্যে নয়।' বলতে বলতে নিজেই দু পা এগিয়ে গেল অভ্যন্তরে।

'সুকু, সুকু!' স্বর যতদূর কর্কশ করা যায় ডাক ছাড়ল মৃণালিনী। 'দ্যাখ এসে কে এক মেয়ে তোকে ডাকছে, কে এক ছাত্রী—'

খালি গা, পরনে ল্যাংগ, গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, এক গালে সাবান আরেক গাল কামানো, পড়ি-মরি ছুটে এল সুকান্ত। দেখল কাকলি দাঁড়িয়ে। অভ্যাসের দেশে আশ্চর্যের মত। যে মাধুরীর শেষ নেই ইয়ত্তা নেই, যে মাধুরী আস্বাদ করে জীবনে কেউ বলেনি না আমার আশা মিটেছে সেই নিত্য-অবসরের নিত্য-অপূর্বের মত। পাষাণস্তূপের তলে অজানা নির্ঝরিণী।

'এ কী, আপনি?' ন যযৌ ন তস্থৌর মত করে উঠল সুকান্ত।

যেন সুকান্তকে এখন দু চোখ ভরে দেখবার মত নয় এমনি উদাসীন চোখে ঘাড় ঘাটিতে লাগল কাকলি। বললে, 'দাঁড়ান, যার জন্যে আসা, আপনাকে কটা 'শিওর' কোশ্চেন দিই। আপনাকে কিন্তু কপি করে নিতে হবে।'

'আপনি একটু বসুন কাকিমার ঘরে। ঐ ঘরেই শুধু ফ্যান আছে এ বাড়িতে।' দিশেহারা উদ্বাস্ত হয়ে উঠল সুকান্ত: 'আমি একটু আসছি মানুষ হয়ে।'

'এখন বুঝি বনমানুষ আছেন!' স্বচ্ছ স্রোতে সারল্যের ধ্বনি তুলল কাকলি: 'আর কাগজ-কলম নিয়ে আসবেন।'

'না, আমার ঘরে অত লেখালেখির জায়গা নেই।' বিজয়া কাঠ-কাঠ গলায় বললে, 'তোমার নিজের ঘরেই নিয়ে যাও। সেখানেই ভালো জমবে।'

'তাই চলুন।' যেন বাঁচিয়ে দিয়েছে এমনি কৃতজ্ঞ চোখে বিজয়ার দিকে তাকাল কাকলি। তারপরে নির্ভয়ে, যেন কতদিনের আনাগোনা, ভিতরে ঢুকে পড়ল। উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। যেন সুকান্ত তাকে টেনে আনছে না, কাকলিই তাকে ঠেলে তুলছে।

দুই জায়ে আর ঝগড়া নেই, তৃতীয় একটি মেয়ের বিষয়ে আলোচনার খাতিরে একত্র হয়েছে।

'কে এই মেয়ে?' বিজয়া কোনো হদিস দিতে পারে কিনা এমনি অসহায় চোখে তার দিকে তাকাল মৃণালিনী।

'আর কে! সুকান্তর বন্ধু। নইলে, কী সাহস দেখলেন, সটান ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে?' মৃণালিনীর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল বিজয়া।

'বন্ধু মানে?' হতাশপাংশু মুখ করল মৃণালিনী।

'ঐ যে নাকে দড়ি বিঁধিয়ে টানে। মানে যে বেঁধে আর বাঁধে তাকেই বন্ধু বলে। কিন্তু যাই বলি মেয়েটা কিন্তু দেখতে মন্দ নয়।'

'আর বেশ বড়লোক তাই না? বাপ না জানি কী করে!' মৃণালিনী বিজয়া'র কাছে আবার আশ্রয় খুঁজল।

'হাতে ঘড়িচুড়িব্যাগ জামায় ফাউন্টেন পেনের ক্লিপ এই সরঞ্জাম থেকে আর কী বোঝা যাবে?'

'কিন্তু হাতে চুড়ি একগাছা দুগাছা নয়, চারগাছা করে। তা বুঝি দেখিসনি?' আরো সন্নিহিত হল মৃণালিনী।

'আরো কত দেখব কে জানে!'

এক রাজ্যের নোংরার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসছে কাকলিকে। নিচে এঁটো বাসনের পাহাড় পড়ে আছে উপরে ময়লা কাপড়ের কুড়। সমস্ত শরীরে ছি ছি ছি করে উঠল সুকান্ত। আর তার নিজের এই রাজ-সজ্জা!

'আপনাকে একটা জঞ্জালের জংগলে নিয়ে এলাম।' উঠতে-উঠতে সুকান্ত বললে।

'আহাহা এতে কুণ্ঠিত হবার কী! এ সব আবর্জনাই তো সংসারের শোভা।' এক কথায় জয় করে নিল কাকলি।

'আর এই আমার বউদি। গোময়ে কমল-মণি।' বন্দনাকে লক্ষ্য করল সুকান্ত।

প্রস্তুত হতে দিল না, ঝুপ করে বন্দনাকে প্রণাম করল কাকলি।

'আর এ কাকলি।' কী বিশেষণ দেবে একসংগে একগুলি সিঁড়ি ভাঙবার পর সুকান্তর মাথায় এল না।

একসংগে ঘরে ঢুকল দুজনে আর বন্দনা নীচে সামিল হবার জন্যে ছুটে দিল। সম্মিলিত আলোচনার বৈঠকে তারও কোন না বক্তব্য পেশ করা যাবে!

'তুমি কী জাদুকরি!' বিগাঢ় চোখে তাকাল সুকান্ত।

'তার চেয়েও বেশি।' হাসতে লাগল কাকলি। 'সাবানের এজেন্ট। ও'রা তাই আমাকে ভেবেছেন নীচে।'

'সাবানের এজেন্ট? ঠিকই ভেবেছেন তবে।'

'ঠিকই ভেবেছেন?'

'হ্যাঁ, কে জানে এ সংসারে অনেক ময়লা সাফ হবার জন্যে তোমার সাবানের অপেক্ষা করে আছে। আগে থেকে খবর দিয়ে আসনি কন?'

'তুমি খবর দিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে একেবারে ধরে ফেলে দিলে স্বপ্নের মধ্যে।' চোখের মধ্যে কৌতুকের কুহক নিয়ে তাকাল কাকলি।

'আমি তার চেয়েও স্বরূপ।' ব্র্যাকেটে হাত বাড়াল সুকান্ত। 'দাঁড়াও, জামাটা গায়ে দিই।'

'কেন, মানুষ হতে চাও? বেশ তো দেবতা হয়ে আছ। তাই আরেকটু থাকো না দেবতা হয়ে।'

ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল সুকান্ত। আশে-পাশে দ্রুত তাকিয়ে বললে, 'দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

পাশের ঘর থেকে দুহাতে করে কী একটা মস্ত পুতুলের মতন কাকে নিয়ে এল সুকান্ত। বললে, 'এই আমার সেণ্টু। আর, সেণ্টু,' পুতুলটার দিকে তাকাল: 'এই কে জানিস?'

কোল থেকে ঘাই দিতে-দিতে নেমে পড়ল সেণ্টু। বললে, 'কে?'

'সেই তোকে বলেছিলাম না এমন এক লোক আছে যে আসে অথচ দেখা দেয় না সে।'

'তুমি সেই?' নীচু একটা তক্তাপোশের উপর বসেছে কাকলি তার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সেণ্টু।

'হ্যাঁ, সেই।' দু হাতে তার চুলের মধ্যে আনন্দে হাত বুলোতে লাগল কাকলি।

'না রে, সে নয়। আরেকজন।' ব্র্যাকেট থেকে জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল সুকান্ত। বললে প্রায় বিষণ্ণ সুরে, 'যে দেখা দেয় অথচ আসে না সে।'

(ক্রমশঃ)

টাটার ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই
আমি আমার সব কিছু কাচি
তার কারণ
• ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর তাতে জামাকাপড়ের ময়লা আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়।
• এতে খুব সহজে ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
• এর ভেতরে অপ্‌টিক্যাল ব্রাইটনার থাকায় শাদা কাপড় ধবধবে আর রঙীন কাপড় ঝকঝকে দেখায়।
তাছাড়া
• ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচবার পক্ষেই সেরা—ফিনফিনে নাইলন, দামী সিল্ক, নরম পশম কি সুতী কাপড় সব কিছু।
বিনা আয়াসে কাচতে হ'লে
TATA'S
501
FOR ALL HOUSEHOLD WASHING
PURE SOAP POWDER
দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

ট্রামে-বাসে

সাম্প্রতিক সাংবাদিক বৈঠকে জনৈক সাংবাদিক নেহেরুজীকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাঁহার কী বাণী তাহা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে নেহেরুজী বলিয়াছেন—"হাসি মুখে কাজ করিয়া যাও।" বৈঠকে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলেন—"কথাটা ঘুরাইয়াও বলা যায় কষ্টের পরিশ্রমে মুখের হাসি সমান রাখ।" বিশুখুড়ো বলিলেন—"আরো ঘুরিয়ে বলার প্রয়োজন নেই, একথা আগেই বলা হয়েছে—হাসামুখে অদৃষ্টেরে করে তারা পরিহাস"।

* * *

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় অন্নের অভাব দুধে মিটাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। —"দুধের সাধ ঘোলে মেটে; পিটুলি-গোলাতেও মেটে একথাই হয়ত বলতে চেয়েছেন শ্রীপাতিল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সংবাদে শুনিলাম কম্যুনিস্ট নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাতিয়ালাতে নাকি একটি স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী ক্ষ্যাপা বাউলের গান ধরিলেন—"তুই কত পাবি শেষকালে, ভালো কইরো পড়ুয়া ইস্কুলে"!!

* * *

জোড়হাটের সংবাদে প্রকাশ সেখানে পুলিসের জন্য লাল পাগড়ির লাল টুপি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—"উদ্দেশ্য যদি জুজুর ভয় দেখানো হয়ে থাকে, তবে তা নিরর্থক হতে বাধ্য। এ চেষ্টা আগেই ব্যর্থ হয়েছে, এখন তো জুজু জলভাতের সামিল"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

মধ্যপ্রদেশ সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর প্রায় চারিশত কর্মচারী জেলা পরিসংখ্যান অফিসারের বাসভবনের সম্মুখে বসিয়া তাঁর আচরণের প্রতিবাদে দুই ঘণ্টাকাল রামধুন গান করে। শ্যামলাল বলিল—"ব্যবস্থাটি দাবী মানাতে হবে ধ্বনির চেয়ে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর। কিন্তু কথা হলো ধর্মের কাহিনী সবাই শোনে না। শোনাতে হলে কর্ণপটহের সন্নিকটে একটি মাইক সন্নিবেশই একমাত্র পন্থা। রামধুনে ফেল করলেও রাম-আওয়াজ করবে না"।

* * *

নয়াদিল্লির কৃষিমেলায় চীন যোগদান করিবেন বলিয়া গোড়াতে সিদ্ধান্ত করিলেও সম্প্রতি নাকি যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"নিকিতা খ্রুশ্চেভ এক পত্রে চীন সরকারকে জানিয়েছেন—চৌ তুমি কৃষি কাজ জান না; এমন ভারত-ভূমি রইল পতিত—ইত্যাদি"!!

* * *

লুনিক-৩ কর্তৃক চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের চিত্র গ্রহণ"—একটি সংবাদের শিরোনামা। —"লুনিক কর্তৃক চন্দ্রমুখের চিত্র গ্রহণের সংবাদই শুধু, সাংবাদিক রাখেন না"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি জয়ী হইয়াছে। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"এটা শুধু সংবাদ হিসেবেই গ্রাহ্য। অন্য দিকের বিচারে বলতে হয়—ইথে কী হইবে বল নবর পিসির"!!

* * *

সাম্প্রতিক সংবাদে শুনিলাম খ্রুশ্চেভ ফ্রান্সের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।—"আমরা একথাও শুনেছি (সংবাদ অবশ্য অসমর্থিত) যে ফ্রান্স নাকি পত্রে জানিয়েছে যে লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম জার্মানীতে ক্যানারী পাখিদের গান শিখাইবার জন্য নাকি স্কুল আছে।—"আমরা স্কুল করিনি, কিন্তু মনকে হীরামন তোতা সাজিয়ে শিখিয়েছি পড়িয়েছি, আবার এই মনকেই কর্তাভজা করে কর্তার বুলি কপচানো অভ্যাস করিয়েছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সাম্প্রতি অভিনয় শিল্পীরা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া নগর পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন।— —"তাদের এই উদ্যম নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয়। এতে বন্যার্তরা উপকৃত হবে। আবার ভাবনায় পড়লাম নিবেরাও ক্ষণেকের তরে প্রতিপদের চাঁদ দেখে কৃতকৃতার্থ হয়েছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মালয়ের শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, এশিয়ার শাশুড়ীরা নাকি পরম স্নেহময়ী ও জামাতা বৎসল।—"কথাটা হয়ত নেহাত মিথ্যা নয়। কড়ি দিয়ে কিনে, দড়ি দিয়ে বেঁধে যাকে ভাগ্যধর করেছি তার সম্বন্ধে শাশুড়ীর রূপ স্নেহেরই রূপ। কিন্তু শাশুড়ীর অন্য একটি রূপ আছে, শিক্ষামন্ত্রী সে খবর জানেন কিনা জানিনে সে রূপ হলো বধূ সম্পর্কে। সেখানে আগে ছিলেন তিনি ছাঁকময়ী বর্তমানে ছাঁক চলে না বলেই কলহময়ী। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে তবু, আমিও তা জানি না পরের মেয়ে মানি না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

এ সপ্তাহে ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব দমদম-এর ব্যবস্থায় তাঁদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফী প্রদর্শনী চলছে মিউজিয়াম-এ। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ইংল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, হংকং, হাঙ্গারী, ভারতবর্ষ, ইতালী, মালয়, ফিলিপাইন, পর্তুগাল, দঃ আফ্রিকা, সুইডেন, আমেরিকা, ভিয়েতনাম এবং পঃ জার্মানী এই ১৭টি দেশ থেকে এবার ফটোগ্রাফ এসেছে। এবারের প্রদর্শনীর মান সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রায় ৬০০টি ছবির মধ্যে থেকে ২৪৯টি ছবি বাছাই করে এঁরা প্রদর্শন করেছেন। গতবার মাত্র ছয়টি দেশ থেকে ছবি এসেছিল সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এই প্রদর্শনীটি বিদেশে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হংকং থেকে যে ফটোগ্রাফগুলি এসেছে সেইগুলিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে আমাদের। ইংল্যাণ্ড, মালয়, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গারী ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইন এই কয়টি দেশ থেকেও বেশ উচ্চ মানের কয়েকটি কাজ এসেছে। এদের তুলনায় ভারতীয় মান অনেক নিম্ন। একমাত্র শ্রীবেণু সেনেরই রচনাগুলি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে রাখার উপযুক্ত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা পি এফ আক্তেলোর 'মে মর্নিং', কে. সি. চিউ-এর 'রেইনী ডে', এডী চিং-এর 'উইণ্ডো ইন হোয়াইট', কোভাক্স গিউলার 'অ্যাডোলেসেণ্টস' ওয়েলিংটন লীর 'ডে ড্রীমিং', বেণু সেনের 'মাদার', পুন পোর ইয়েট-এর 'প্যাসচোরাল পোয়েট্রী' এবং হুং আয়েউং-এর 'অর্ডার'।

ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব দমদম-এর মুখপত্র 'ইমেজ'-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এঁরা জানিয়েছেন কাস্টমস অফিস থেকে বিদেশী ফটোগ্রাফগুলি আদায় করতে এঁদের কি রকম বেগ পেতে হয়েছিল। কাস্টমস অফিসের বিরুদ্ধে এ রকম অভিযোগ আমরা আগেও শুনেছি। কাগজে লেখালেখিও হয়েছে অনেক কিন্তু প্রতিকার হয়নি কিছুই। আশ্চর্যের বিষয়, কাস্টমস আইন সম্বন্ধে সেখানকার অফিসারদের বিভিন্ন ধরণের মতামত।

মা — বেণু সেন

*

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রি হাউস-এ ইণ্টার ন্যাশনাল ক্যালেণ্ডার এক্জিবিশন সোসাইটির ব্যবস্থায় তৃতীয় হাতে-তৈরী দিনপঞ্জী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। হাতে তৈরী দিনপঞ্জী প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, কুটির-শিল্পের কিছুটা চাহিদা বাড়িয়ে দেওয়া। হাতে তৈরী দিনপঞ্জীর জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠলে, আশা হয় কুটির শিল্পীদের মধ্যে যে বেকার সমস্যা বর্তমানে দেখা দিয়েছে তার কিছুটা সমাধান হতে পারে। এবারের এই প্রদর্শনীতে অন্যান্যবার অপেক্ষা অনেক বেশী রকম কারু-শিল্পের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এটা সত্যিই ভাল লক্ষণ। মুগা, সুতি, বাঁশ, মাদুর, কাঠ, শোলাই উড, ম্যাসোনাইট, নারকেলের খোলা, তালপাতা, বেত হাতীর দাঁত, পোড়ামাটি প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে এসব দিনপঞ্জী তৈরী। খুব উচ্চাঙ্গের আর্ট বলে এগুলিকে স্বীকার করতে না পারলেও এগুলির কারিগরী উৎকর্ষ অস্বীকার করা চলে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এসব দিনপঞ্জী এসেছে। এগুলি আকর্ষণীয়, কারণ এগুলির মধ্যে ভারতীয় লোক-শিল্পের স্পর্শ রয়েছে। যন্ত্রের প্রসার যতই হোক না কেন হাতে তৈরী জিনিসের মান কখনই কমে না, সেই কারণেও এসব ক্যালেণ্ডার ছাপা ক্যালেণ্ডারের অপেক্ষা মূল্যবান। মহীশূরের কাঠের কাজটি, উরিষ্যার কয়েকটি কাজ, বাণী শিল্প মন্দিরের কয়েকটি কাজ এবং ডি এস ভার্বাইড স্টিল কাজগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে আমার মনে হয় সাজানোর দোষে এগুলির আকর্ষণ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লাল শাড়ি এবং মোটা কালো ফিতের পরিবেষ্টনের মধ্যে দ্রষ্টব্যগুলি রাখার ফলে এগুলির সূক্ষ্ম উৎকর্ষ ঢাকা পড়ে গেছে। চোখের সামনে শুধু ঐ কালো ফিতের এবং লাল শাড়ির কম্বিনেশনগুলিই ভাসে। এ ধরনের আধুনিকতা লোক শিল্পের প্রদর্শনীর পক্ষে উপযুক্ত নয় বলেই আমার বিশ্বাস। সাজানোর ভার কোনও বিশেষজ্ঞ ডিজাইনার আর্টিস্ট অথবা কোনও ডিজাইন আর্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দিলেই কর্তৃপক্ষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। অনেক সময় ডিসপ্লের দোষে অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

শাঙর্গদেব

ভ্রান্তি না পরস্বাপহরণ?

'গানের আসর'-এ একটি তথ্য জানাতে চাই। এবারকার পুজো সংখ্যা উল্টোরথে পুজোর রেকর্ড তালিকা এবং গানগুলির বাণী প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখলাম হিন্দুস্থান রেকর্ডে জনৈক হীরালাল সরখেল একটি গান গেয়েছেন—'চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা' ইত্যাদি। গানটির সুরকার হিসাবে নাম আছে রঞ্জন সেনের এবং গীতিকারের নামোল্লেখের বদলে লেখা আছে প্রচলিত। অথচ আমরা জানি গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা। সুর যোজনাও তিনিই করেছিলেন। গানটি একেবারে অপ্রচলিতও নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলীতে গানটি মুদ্রিতও আছে। এক্ষেত্রে আধুনিক রেকর্ড কোম্পানীর এই চৌর্যাপরাধের বিচার কে করবে? সমগ্র ঘটনাটি কি বর্তমান বাংলার সাংগীতিকগণের চূড়ান্ত অরাজকতা এবং প্রবঞ্চনা অনাচারের পরিচায়ক নয়?...

সুধীর চক্রবর্তী,
বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা—৮

সাধারণতঃ বাংলা গানে পরের সুর চুরির কথাই শুনে আসছি, কিন্তু সুরকে স্থানভ্রষ্ট করে পরের ভাষা দখল করার রীতিও যে ধীরে ধীরে প্রচলিত হতে আরম্ভ করেছে, এচিঠি থেকে সে খবরও পাওয়া গেল। এদৃষ্টান্ত অপরাপর প্রতিষ্ঠান বা সুরকারগণ অনুসরণ করতে থাকলে বাংলার সংগীতে সুপ্রতিষ্ঠিত গীতিকারদের মর্যাদা ক্রমেই লোপ পাবে এবং অচিরে ক্লাসিক্যাল বলে কিছুই থাকবে না।

বিষয়টি অবগত হবার পর রেকর্ডটি সি সি সাহার দোকানের আনুকূল্যে শোনার সুযোগ পেয়েছি। মূল সুরের সঙ্গে রেকর্ডের সুরের কোন সম্বন্ধ নেই। বলা বাহুল্য রেকর্ডে যে সুর শুনলাম, সেটি দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটি অজ্ঞতাজনিত না ইচ্ছাকৃত। অজ্ঞতা বিচিত্র নয় কিন্তু অপর সন্দেহ প্রবল হয় যখন দেখি রেকর্ডের উপযোগী করে গানটির দুটি কলি ছেঁটে ফেলা হয়েছে। অতএব, জানতে ইচ্ছে করে কোন সংগ্রহ পুস্তক বা কোন সূত্র থেকে রেকর্ড কোম্পানী গানটির এই আকৃতি লাভ করেছেন। গানের সঙ্গে তার সুরের উল্লেখ থাকাও স্বাভাবিক। সেই প্রচলিত সুরটিকেই বা বর্জন করা হল কেন? এছাড়া মূল সুর অবলম্বনে এ গানটির রেকর্ড পূর্বেও ছিল এবং সে রেকর্ড শুনেছেন এমন লোকের অভাব হবে না। সুরকার বা হিন্দুস্থান
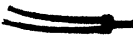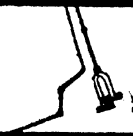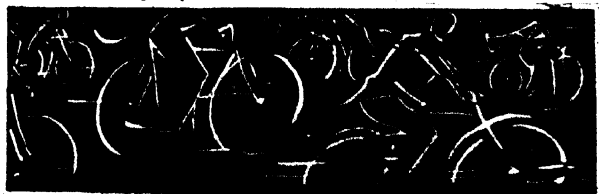
রেকর্ড কোম্পানী এসব খবর রাখেন না, সেটা আশ্চর্য ঠেকছে।

অবশ্য ভুল হয়। লেখকেরই কয়েকবার হয়েছে। এইতো সেদিন মুকুন্দ দাসের আলোচনায় 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' গানটি সম্বন্ধে লেখকের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করে দিয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। কিন্তু পত্রিকায় লেখা আর বাজারে রেকর্ড প্রচারের মধ্যে অনেক তফাৎ। পত্রিকার ভ্রম অনায়াসে সংশোধন করা যায়, কিন্তু রেকর্ডে যে লেবেল পড়ে তাকে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব যতটা পারা যায় নিঃসন্দেহ হয়ে রেকর্ড বাজারে চালু করা উচিত। কপিরাইটের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন অনুসারে খবরের কাগজে অন্তত দুবার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কপিরাইটের ব্যাপার কতখানি আছে জানি না, তবে রচয়িতা বা প্রচলিত সুর সম্বন্ধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, সর্বোপরি বিবেক বলে একটা কথা আছে। বাংলা সাহিত্য এবং সংগীতেরও একটা বিরাট মর্যাদা আছে। প্রবল স্বার্থবোধ এসবই উপেক্ষা করে অগ্রসর হলেও তার কাছে শুভবুদ্ধির আবেদন আমরা জানাব।

এই জিনিসগুলি সংঘটিত হতে পারছে কেবলমাত্র এই কারণে যে, আমরা আমাদের দেশের গীতিকারদের সংগে পরিচিত নই, সংগীতের বিবর্তন সম্বন্ধে আমরা উদাসীন এবং সাংগীতিক মূল্যায়নবোধও আমাদের অল্প। সংগীত জগতে অধিষ্ঠিত থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সংগে পরিচয় না থাকাটা কি গভীর পরিতাপের বিষয় নয়? একটা প্রচলিত গান যদি আমাদের হাতে আসে, তাহলেও কি আমাদের মনে কৌতূহল জাগে না যে গানটির রচয়িতা কে এবং তার কোন সুর প্রচলিত আছে কিনা। এইরকম ঔদাসীন্যের প্রশ্রয় কেন দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যেতে পারে, সেটা আমরা ভাবতেই পারি না।

বাংলার ভক্তিরসাত্মক সংগীতের মধ্যে 'চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা' একটি শ্রেষ্ঠ গান। এই ধরণের রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বৈশিষ্ট্য আছে যেটি তাঁর নিজস্ব। তিনি চিরাচরিত ধরা বাঁধা পথ অনুসরণ করেননি। শ্যামা-সংগীতকেও তিনি সাহিত্যে এবং সুরে কাব্যসংগীতের স্তরে নিয়ে এসেছেন অথচ ভক্তির সৌম্য প্রকাশ তাতে অব্যাহত থেকে গেছে। সমগ্র গানটি উদ্ধৃত করি—

চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে
দেখিস না মা
মত্ত আছিস আপন খেলায় আপন
ভাবে বিভোর বামা।
একি খেলা খেলিস ঘুরে স্বর্গমর্ত্য
পাতাল জুড়ে
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি চরণ ধরে
ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয় পায়ে ভব
আত্মহারা
মুখে হা হা অট্টহাসি অংগ বেয়ে
রক্তধারা।
তারা ক্ষেমংকরী ক্ষেমা অভয়ে অভয়
দে মা
কোলে তুলে নে মা শ্যামা কোলে তুলে
নে মা শ্যামা।
আর মা এখন তারা রূপে স্মিতমুখে
অট্টহাসে
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন
নেমে আসে
এতদিন যে কালী ভীমা তোরই পূজা
করেছি মা
পূজা আমার সাংগ হল এখন মা
তোর অসি না মা।

বর্তমান রেকর্ডে "হাতে মা তোর মহাপ্রলয়" এবং "আর মা এখন তারা রূপে।"—এই দুটি কলি বাদ দেওয়া হয়েছে অথচ এই দুটি কলিতে আশ্চর্য সৌন্দর্য বর্তমান। এই দুটি সঞ্চারীতেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয় পৌরুষ এবং ভক্তিবিনত কমনীয়তার সমন্বয় ঘটেছে। ভৈরবীতে এমন একটি মধুর গান বাংলা সংগীতে খুব কমই মেলে। দিলীপকুমার রায় মহাশয় বহু পূর্বেই মূল সুরের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর 'দ্বিজেন্দ্র গীতি'র দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠায় এই স্বরলিপিটি মুদ্রিত আছে। এই স্বরলিপি থেকেই মূল সুরটির মহত্ত্ব উপলব্ধি করা যাবে। এসব চমৎকারিত্ব গেয়ে বা লিখে বোঝানো যায় না। "নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।"—এর আবেগ এবং প্রকাশ না শুনলে হৃদয়ংগম করা যাবে না। অতএব অধিক বাগ্‌বিস্তার করে লাভ নেই।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী যে ভাবে এই রেকর্ডটি প্রকাশ করেছেন তাতে শুধু যে গানটির অংগহানি ঘটেছে তাই নয় তাকে মামুলি পর্যায়ে এনে ফেলা হয়েছে। ফলে সংগীত জগতের একটি ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং বাংলার প্রকৃত সংগীত রসিকগণ অত্যন্ত মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। অথচ গানটিকে যদি যথাযথভাবে মূল সুরে গাওয়ান হত তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গৌরব বাড়ত এবং রেকর্ডটি সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারত। এক্ষেত্রে উচিত কর্তব্য সমগ্র রেকর্ড বাজার থেকে প্রত্যাহার করে আবার নতুন করে দ্বিজেন্দ্রলালের সুরে এ গানটি রেকর্ড করা। একমাত্র তাহলেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির প্রতি সুবিচার করা হবে এবং শ্রোতৃসাধারণের মন থেকে ক্ষোভ দূরীভূত হবে। তাঁদের কাছ থেকে এটা আমরা আশা করতে পারি কি? এই সংগে সংগীত জগতের "প্রফেসনাল"দের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ বাংলা গানের ঐতিহ্য যেন তাঁদের কাছে অবহেলিত না হয়। বিশিষ্ট সুরকারগণের সুরের অমর্যাদার অর্থ দেশের সংস্কৃতির অবমাননা। এখনও আজ সহ্য করতে হয় এটাই আমাদের দুঃখ।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংগীত সম্মেলন

২৫শে অক্টোবর হিন্দী হাই স্কুল ভবনে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রী বি ডি যোগ্লেকর (পুণা), শ্রীরইস খাঁ (বোম্বে), শ্রীমতী পদ্মাবতী গোখলে (নাগপুর), শ্রীগোপালকৃষ্ণ (দিল্লী) এবং শ্রীনারায়ণরাও ব্যাস (বোম্বে)। এঁদের মধ্যে রইস খাঁ সেতার বাজালেন এবং গোপালকৃষ্ণ যে বিচিত্র বাজালেন প্রোগ্রামে তার নাম হয়েছে 'বিচিত্রবীণা'। বাকি তিনজন কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে নারায়ণরাও ব্যাসের মিঞামল্লার এবং ভজন উল্লেখযোগ্য। এই সুকণ্ঠ শিল্পীর সংগীত পরিবেশন মধুর, পরিচ্ছন্ন অথচ এঁর কাজগুলিতে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলতে বোধ হয় এই একজনের নামই করা যায়। পাঁচজন শিল্পীর মধ্যে চারজনকেই বোম্বে অঞ্চল থেকে বাছাই না করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করলে ভাল হ'ত। কলকাতার সংগীত সম্মেলনে ভবিষ্যতে আরও উন্নততর প্রতিভার সমাবেশ না করতে পারলে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর এই জাতীয় সম্মেলনের গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকবে বলে মনে হয় না।

বাইবেলে আছে পৃথিবী জলে ভেসে যাবার উপক্রম হতে নোয়া জীবজন্তুদের বাঁচাবার জন্যে তাঁর জলযানে তাদের আশ্রয় দেন। বলতে গেলে তেমনি একটা কাজের দায়িত্ব দেখা দিয়েছে আফ্রিকায় দক্ষিণ রোডেশিয়ার জামবেজি নদীর কূলে। তফাৎটা এই যে জামবেজির এই বন্যা মানুষের সৃষ্টি এবং এযুগের নোয়ারা হচ্ছে একদল বনরক্ষক যারা সম্প্রতি [illegible] বাঁধের
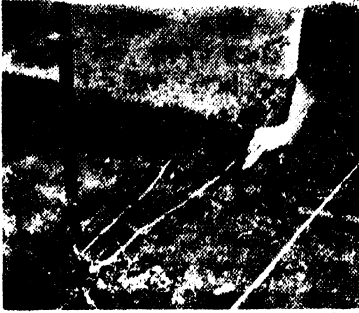
খেলার মাঠকে উষ্ণ করে তোলা—এডিনবরার মারেফিল্ড রাগবি খেলার ময়দানটিকে হিম এবং তুষারপাতকালে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রীর কম হয়ে গেলে জমির ছ ইঞ্চি নীচে দিয়ে তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে মাটি গরম করার পৃথিবীর মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র এই ব্যবস্থা

জলে ভেসে যাওয়া জীবদের রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছেন। জামবেজিতে কারিবা বাঁধ সমাপ্ত হওয়ার পর গত বছর শীতকাল থেকে এই কাজ আরম্ভ হয়েছে। নদীর জলপ্রবাহ বাঁধের দরুণ রুদ্ধ হওয়ায় ক্রমান্বয়ে একটা দশ মাইলব্যাপী হ্রদ সৃষ্টি হতে থাকে। এখানকার পঞ্চাশ হাজার বাটোংগা অধিবাসী গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু নানারকমের বহু সহস্র জীবজন্তুকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। যদিও এর মধ্যে এমন জীবও ছিল যারা তলিয়ে গেলে তাদের বংশই সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যেতো। জল জমাতে থাকায় প্রথমে জন্তুগুলো ডাঙা দেখে আশ্রয় বেছে নিয়েছিল কিন্তু ক্রমশ সেইসব ডাঙাও জলের তলায় চলে যেতে অনেক জন্তুই ডুবে যায়। এই অবস্থায় বন সংরক্ষণ বিভাগের ষোলজন এবং জনকতক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। কতকগুলো ছোট নৌকা জোগাড় করে অবিলম্বে তারা কাজ আরম্ভ করে দেয়।

জলে কবলিত একটার পর একটা দ্বীপে গিয়ে তারা জীবজন্তুদের উদ্ধার করে স্থানীয় শিকারীদের নাগালের বাইরে কোন জায়গায় এনে ছেড়ে দেয়। কাজটা শুনতে যেমন, তেমন সহজসাধ্য মোটেই নয়। কারণ জীবজন্তুর কাছে জলের চেয়ে মানুষ বেশী ভীতিপ্রদ এবং তাদেরই উদ্ধারকার্যের জন্য হলেও মানুষ দেখলেই তারা প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে থাকে। এপর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার প্রাণীকে রক্ষা করা হয়েছে তবে কাজ এখনও চলছে। কারণ ১৯৬৩ সনে এই হ্রদটি পরিকল্পনানুযায়ী ক্রমশ পঁচাত্তর মাইল দীর্ঘ হবে কাজেই এখন যা আছে তার চেয়ে বিশাল একটা ভূখণ্ড জলে নিমজ্জিত হবে। তাই এখন থেকেই জীবজন্তুদের রক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত শিকারীদের যত রকম কৌশল জানা আছে সবই খাটাতে হয়। প্রচণ্ড আঘাত হানা শুঁড় ও তীক্ষ্ম দাঁত উৎক্ষেপণ, খুরে দেওয়া পায়ের ক্ষিপ্র নিক্ষেপ, বিষাক্ত সাপ মানুষকে একেবারে ঘায়েল করে দেবার এই সব বিপদ। তাছাড়া আবার এমন সুখী জীবও আছে যাদের কঠিন হাতে ধরলে মরে যাবার সম্ভাবনা।

এক একটি জীবের আচরণ অনুযায়ী তাদের ধরবার রীতি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে হাতী, গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ারদের তাড়া করে দ্বীপ থেকে জলে নামিয়ে ফেলে নৌকোর সাহায্যে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মূল ভূমিভাগে হাজির করে দেওয়া হয়। ছোট ছোট জন্তুগুলোকে পাকড়াও করে নৌকায় না তুললে উপায় নেই। অনেক উদ্ধারকারিদের দৌড়ে তাড়া করে দূর থেকে গলায় ফাঁস আটকে কোন কোন জানোয়ারকে ধরতে হয়। হয়তো তাড়া করতে করতে কুমীরসংকুল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েক শ গজ সাঁতরেও ভয়ে সন্ত্রস্ত পলায়মান কোন জীবকে পাকড়াও করে ডাঙায় তুলতে হয়। অনেক জানোয়ারকে ধরবার জন্যে বড় বড় জাল পাতা হয়। দলের কয়েকজনকে পাইথনের কামড় খাওয়া ছাড়া উদ্ধারকারিদের কাউকে বিশেষ ভুগতে হয়নি—পাইথনের কামড় অবশ্য মারাত্মক হয় না।

বিপদ যে একেবারে আসেনি তা নয়। একদিন উদ্ধারকারিদের অন্যতম রেক্স বীন ন' ফিট লম্বা এক কৃষ্ণবর্ণের মাম্বা সাপকে সাঁতরে তাদের নৌকোর দিকে আসতে দেখে। মাম্বার একটি কামড় মানে, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ প্রযুক্ত না হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। রেক্স কিন্তু একটা দড়ীর ফাঁস ঝুলিয়ে সাপটিকে বেঁধে নৌকোয় তুলে নেয়। পরে একবার কয়েকজনকে একটা দশ ফিট লম্বা কাঠের নৌকায় যেতে যেতে এক মাইল দূরের ডাঙা থেকে জলে নেমে সাঁতরে আসা একটা বুনো শুয়োরের সামনা সামনি পড়তে হয়। রেক্স নৌকাটিকে আড়াআড়িভাবে রেখে

দিতে অপর একজন একটা ফাঁস গলিয়ে দিলে জন্তুটার চোয়ালে। কিন্তু তারপরই শূকরটি এমন ধস্তাধস্তি আরম্ভ করলে যে নৌকাটাই উল্টে যায় যায়। অমানুষিক চেষ্টায় কোনক্রমে শূকরটিকে নৌকায় টেনে তোলা হল। তবে অত্যন্ত সংকটে পড়তে হয়েছিল। কারণ নৌকা উল্টে গিয়ে কুমীর আর বিষাক্ত সর্পসংকুল সেই জলাশয়ের মধ্যে যদি আরোহীদের পড়তে হতো তাহলে একজনেরও বোধহয় প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হতো না। শূকরটা নৌকাতে উঠতেই পলকের মধ্যেই রেক্স তার পিছনের পা মুচড়ে তাকে কাৎ করে শুইয়ে ফেলে দেয় এবং অন্যান্য স্কাউটরা ওর ঘাড়ে চেপে সংগে সংগেই বেঁধে ফেলে।

জীবজন্তু জলে থাকলে তাদের আয়ত্তে আনা সহজ, কারণ ডাঙায় খোলা জমিতে স্বাধীনভাবে যদেচ্ছ তারা ছুটোছুটি করতে পারে এবং তাদের গতিও তীব্র হয়ে ওঠে। একবার একটা দ্বীপে জাল ফেলা হয়েছিল জানোয়ার ধরবার জন্যে। দলের ফটোগ্রাফার টেরেন্স স্পেন্সার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্কাউটদের জংগল ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে চীৎকার করা শুনছে, হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে দুটো দাঁতাল বরাহ লাফিয়ে পড়লো এবং সামনে জালটি দেখে টেরেন্সের দিকে বেগে তেড়ে গেল। একেবারে শেষ মুহূর্তে কি মনে করে ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আর এক দ্বীপে একদিন এই অভিযানের একদলের নেতা রুপার্ট ফদারজিল এবং টেরেন্স একটা ক্ষুদ্র শশককে ধরবার জন্য এগিয়ে যেতে পায়ের নীচের জমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

ধরা পড়লে ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার সিংওয়ালা হরিণগুলোকে ধরলে শিশুর মতো কঁকিয়ে ওঠে। বন্য শূকরেরা ভীষণ হুটোপাটি করে তীক্ষ্ণ চীৎকারে বাতাস ভরিয়ে তোলে, কিন্তু একবার বেঁধে ফেলতে পারলে একেবারে নিঃঝুম পড়ে থাকে। এক প্রকার চমরী গাই ধরা পড়লে খুব দাপাদাপি করে কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই এমন শান্ত হয়ে যায় যে তখন হাত চাটতে থাকে, কিছু বলে না। সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ব্যাপার হলো বানর ও বেবুনদের সম্পর্কে। জল থেকে বাঁচতে তারা গাছের ওপর আশ্রয় নিয়ে সেই গাছের পাতা খেয়ে নিঃশেষিত করে শেষে গাছের বাকলও খেয়ে কাল কাটাচ্ছে। কতকগুলোকে তাড়া করে জলে ফেলে দিয়ে তারপর লেজ ধরে জল থেকে টেনে তুলে রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে যাদের শক্তি কিছু অবশিষ্ট আছে তারা তাড়া খেয়ে এমন এ-ডাল সে-ডাল করে বেড়ায় যে তাদের উদ্ধার করা একেবারে অসম্ভব।

*

অস্ট্রেলিয়ার টরীতে চার্লস পিটার্স নামক এক ব্যক্তির হাতে বিষাক্ত সাপ দংশন করতে বিষাক্ত রক্ত দ্রুত বের করে দেবার জন্যে দংশিত স্থানে সে পিস্তল দিয়ে গুলী করে। চার্লস তারপর অবশ্য আরোগ্য লাভ করে কিন্তু সেটা রবিবার হওয়ায় এবং রবিবার পিস্তল নিয়ে ঘোরা আইনবিরুদ্ধ হওয়ায় চার্লসকে আদালতে জরিমানা দিতে হয়।

দর্শন

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন —রবি রায়। সিগনেট প্রেস। কলকাতা-২০। দাম পাঁচ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি দর্শনের আলোচনা বালক-পাঠ্যতার স্তর থেকে পরিণত প্রকর্ষের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ একাধিক রচিত হয়ে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। রবি রায়ের পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন নিঃসন্দেহে তাকে সমৃদ্ধতর করবে।

লেখক এখানে প্রাচীনতম গ্রীক দর্শন থেকেই আরম্ভ করেছেন। গ্রীক দর্শনেই পরবর্তী যুগের ভাববাদ এবং বাস্তববাদের বীজ নিহিত রয়েছে। মার্ক্সীয় দর্শনে আসবার জন্য লেখককে স্বভাবতই ভাববাদ খণ্ডন করেই অগ্রসর হতে হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ভাববাদের প্রতি অবিচার তিনি করেননি তবে বস্তুবাদের ক্রমবিবর্তনেই তাঁর লক্ষ্য নিবিষ্ঠ বলে পাঠককে স্বভাবতই এদের দ্বন্দ্বে কৌতূহলী করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এখানেই লেখকের প্রথম সাফল্য। দ্বিতীয়ত মার্ক্স-বাদ যে নেহাত যুগগত আবশ্যকতার ফল নয়, এটাও তিনি প্রতিপন্ন করেছেন, যদিও যুগের পটভূমির প্রতিও পাঠকের মনোযোগ ঘটিয়েছেন। তাই মার্ক্সবাদের দার্শনিক ঐতিহ্যে পাঠক জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন। তৃতীয়ত লেখক ইংরেজী উদ্ধৃতি এবং শব্দ বাদ দিয়ে আড়াই হাজার বৎসরের দর্শনের ইতিহাসকে যেভাবে প্রায় একশ নব্বই পৃষ্ঠার মধ্যে ধরে দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। স্কুল কলেজে দর্শনের রীতিমত শিক্ষা যাঁরা পাননি তাঁরা এই বইখানা পড়ে উপকৃত তো হবেনই বিশেষজ্ঞেরা অল্প পরিসরে আলোচনাযোগ্যরূপে দর্শনের ইতিহাসকে পেলেন বলে খুশী হবেন। সমগ্র ইতিহাসকে দুই ভাগ করে মার্ক্স-এর দর্শন (ষাট পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় ভাগে এবং পরবর্তী দর্শনকে (১২৫ পৃষ্ঠা) প্রথম ভাগে আলোচনা করেছেন। হেগেল-ফয়ারব্যাখে পূর্ববর্তী দর্শন শেষ করে মার্ক্স-এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে। যদিও ইউটিলিটারিয়ানদের সঙ্গে মার্ক্সের সাদৃশ্য সুন্দর, তবু 'সোশ্যাল ফিলজফার' রূপে তাদের আলোচনা থাকলে ভালোই হত মনে হয়। গ্রন্থশেষে দার্শনিক পরিভাষার তালিকাটি মূল্যবান। ২৩৬।৫৯

আণবিক অস্ত্র

সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ—বার্ট্রাণ্ড রাসেল। অনুবাদ—কল্পনা রায়। আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, জবাকুসুম হাউস: কলিকাতা—১২। মূল্য—২·৫০ নঃ পঃ।

চিন্তাশীল লেখক হিসেবে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। রাসেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যে কোনো বিষয়ের সমগ্র দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্বচ্ছ ও মুক্ত দৃষ্টিতে যুক্তিবাদের সাহায্যে শেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান। অথচ তাঁর বিচারশীল মন বিশ্বমানবতা-বাদী। আলোচ্যগ্রন্থেও তিনি শান্তির পথে পদক্ষেপ করার জন্যে পক্ষপাতহীন এমন কর্মসূচী দান করেছেন যা কম্যুনিস্ট, ন্যাটোর চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি এবং নিরপেক্ষ দেশগুলি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। আণবিক অস্ত্রকে তিনি উন্মত্ত কুকুর ও ব্ল্যাকডেথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কি বলতে পারে যে তারা আমাদের ছেড়ে শত্রুদেরই বেশি ক্ষতি করবে? কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, রাজনীতিবিদদের এই সামান্য কথাটুকুও চিন্তা করার অবসর নেই! যদি আসন্ন যুদ্ধের আশংকা অবিচ্ছিন্ন থাকে, যদি আণবিকযুদ্ধ বাধে, নিরস্ত্রীকরণ, শান্তির পথে পদক্ষেপ প্রভৃতি সম্পর্কে রাসেল তাঁর মতামত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত

করেছেন। মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন—"আমার এই আবেদন মনুষ্য জাতির কাছে, বিশেষ করে তাঁদের কাছে যাঁরা বাঁচতে চান।" অনুবাদ সহজ ও প্রাঞ্জল।

৩৫১।৫৯

শারদ সাহিত্য

মঞ্জরী (১৩৬৬)। সম্পাদিকা শ্রীআরতি সেন। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

অতি সুন্দর কাগজে ছাপা এবং অত্যন্তই সুন্দরভাবে ছাপা এই শারদ সংকলনটি আশা করি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ এবং শ্রীবিমল মিত্রের একটি উপন্যাস এই সংকলনটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের মধ্যে শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীলীলা মজুমদার, শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ও শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ।

শারদ বসুধারা (আশ্বিন, ১৩৬৬)। সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থনায় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬ থেকে শ্রীজয়ন্ত বসু কর্তৃক প্রকাশিত। তিন টাকা।

গত বছরের 'শারদ বসুধারা' পাঠক-মহলে খুবই আদৃত হয়েছিল। এবারেও হবে, তাতে সন্দেহ নেই। গুণী লেখকদের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ আর কবিতায় কাগজটিকে এবারে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হয়েছে। এবারকার 'শারদ বসু-ধারায়' উপন্যাস লিখেছেন শ্রীসন্তোষ ঘোষ ও শ্রীদীপক চৌধুরী। উপন্যাস দুটির নাম 'শর্মিষ্ঠা' ও 'নীলে সোনায় বর্ষাতি'। গল্প লিখেছেন পরশুরাম, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং আরও অনেক খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রূপদর্শীর রচনা খুবই উপভোগ্য ও সুন্দর হয়েছে। কবিদের মধ্যে শ্রীউমা দেবী, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনার পারিপাট্যও উল্লেখ করবার মত। তা ছাড়া অঙ্গসজ্জাও অতি মনোরম হয়েছে।

যষ্টিমধু—সম্পাদনা কুমারেশ ঘোষ। ৪৫, গড়পার রোড। কলি-৯। দাম ১·৭৫ নঃ পঃ।

ব্যঙ্গ ও সরস পত্রিকার এই পূজো সংখ্যাটি বিচিত্র রচনাসম্ভারে পূর্ণ। অনেকগুলি সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-কবিতা,

কার্টুন ও পরশুরাম, বনফুল, কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস, প্র-না-বি, আশাপূর্ণা দেবী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা এবং তার সংগে উঠতি চৌকশ লেখকদের নানা ধরনের রচনা এতে স্থান পেয়েছে।

নহবত—সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার সেনগুপ্ত। ৮।৩এ, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ কলিকাতা ২৫। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীকমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস এবং এখনকার উঠতি লেখক সর্বশ্রী দেবেশ রায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প এবং ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডাঃ রমা চৌধুরীর প্রবন্ধ সম্বলিত বিশেষ সংখ্যাখানি পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে।

শারদীয়া নববাণী—সাধারণ সম্পাদক—শ্রীগুরুদাস মৈত্র। ৫, ত্রৈলোক্য চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা—৩৬। মূল্য এক টাকা।

'নববাণী'র শারদীয়া সংখ্যাটি সাহিত্য-রসিক পাঠকমহলে বিশেষ আদরণীয় হবে। ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে কিছু কিছু উত্তম রচনা সম্ভারে পত্রিকাটির মধ্যে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য, অশোক সেনের প্রবন্ধ, সুশীল ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্রের গল্প এবং তরুণ দলের মধ্যে মতি নন্দী, হরেন ঘোষ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, আশিস্ ঘোষ ও বীরেন্দ্র মিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শোভন সোম, মানস রায়চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেন ও আলোক সরকারের কবিতা উল্লেখযোগ্য। 'মিত্রনের 'বৈঠকী' পাঠক সাধারণের ভাল লাগতে পারে।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এল্ ডোরাডো—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ।
পঙ্কজ ও প্রেম—শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত।
শুভ-নির্মাল্য—নবীনচন্দ্র সেন।
রাজনীতিশ্চর (নাটক)—সত্যকাম।
ঢাকার কথা—নির্মল গুপ্ত।
প্রাথমিক সংগীত বিজ্ঞান—শ্রীবারিদ দেববর্মণ।
Short History of Indian Music—Barid Debbarman.
রবীন্দ্র সংগীত—রাধেশ্যাম পুরোহিত।
ঋগ্বেদ (প্রথম অষ্টক)—ডক্টর মতিলাল দাশ।
একটি রাতের রূপ—সুধীরকুমার দাশ।

চন্দ্রশেখর

আর্তসেবার আহ্বান

বন্যার্ত দেশবাসীর সাহায্যের জন্যে রঙ্গ-জগতের শিল্পী, কলাকুশলী ও শিল্পপতি-দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সারাদেশে আজ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

শিল্পীদের যে শোভাযাত্রা গত ১৮ই অক্টোবর দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, গত রবিবার (২৫শে অক্টোবর) তারই অনুরূপ আর একটি শোভা-যাত্রা উত্তরাঞ্চলে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে-ছিল। এবারেও শিল্পীদের পুরোধা হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, তরুণকুমার, অনুভা গুপ্তা, কমলা মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীর দল। এই শোভাযাত্রায় বহু কণ্ঠশিল্পী, চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও কলাকুশলীও যোগ দিয়েছিলেন। এই শোভাযাত্রায় সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ন্যূন্যাধিক পনেরো হাজার টাকা।

এছাড়াও শিল্পীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। এণ্টারটেনমেণ্টস্ নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে যার উদ্যোগে আগামী ৬ই নভেম্বর থেকে এক সপ্তাহব্যাপী অনেকগুলি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বন্যার্তদের জন্যে অর্থসংগ্রহ করতে। এই উপলক্ষে চৌরঙ্গী রোড ও হ্যারিংটন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে সাড়ে চার হাজার দর্শক বসবার উপযোগী একটি বিরাট মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। প্রথম দিনের বিচিত্রানুষ্ঠানে বাংলা ও বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও সংগীতশিল্পীরা যোগ দেবেন। দ্বিতীয় দিন একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বসবে এবং তাতে রাশিয়া, চীন, জাপান, আমেরিকা, নেপাল, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশের নৃত্যগীত পরিবেশন করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন দিনে "শ্যামলী", "ঠাকুর শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ" ও "চারিত্রহীন" এই তিনটি নাটকও অভিনীত হবে বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী (সভাপতি), কানন দেবী, পঙ্কজ মল্লিক, জহর গাঙ্গুলী, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি। মণ্টু বসু এই সমিতির সম্পাদক। দশ, ছয়, চার ও দুই টাকা মূল্যের প্রবেশপত্র অগ্রিম বিক্রি হচ্ছে।

রঙমহলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা "এক-মুঠো আকাশ"-এর অভিনয় শারদীয়া পূজার আগেই শতরাত্রি অতিক্রম করেছে। এই উপলক্ষে কোন স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে। এই উৎসব আগামী ১৬ই নভেম্বর করা স্থির হয়েছে। রঙমহলের কর্তৃপক্ষ ঐ দিনকার টিকিট বিক্রির সমস্ত টাকা বন্যা তহবিলে দেবেন বলে জানিয়েছেন। স্মারক রজনী উপলক্ষে শিল্পীদের যেসব উপহার দেওয়া হয়ে থাকে তাঁরা তা না নিয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন যেন সেই টাকাটাও তাঁরা বন্যা তহবিলে দেন।

যাঁরা এমনিভাবে দুর্গতদের সেবায় এগিয়ে আসছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, আর কামনা করছি—তাঁদের এই কল্যাণব্রত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক বৃহত্তর জনকল্যাণের সাধনায়।

বিশ্বরূপায় 'সেতু'

বাংলা মঞ্চলোকে আজ সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের নতুন সাড়া জেগেছে। এই নব-জাগরণের ধারায় নাটকের কথাবস্তু, আঙ্গিক, সংলাপ এবং অভিনয়-শৈলীরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় আজকের দিনের সর্ব-ব্যাপক শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রের প্রভাবও তির্যকভাবে এসে পড়েছে নাট্য-শিল্পরূপের উপর। চলচ্চিত্রপটে অভিনয়ের বিস্তার ঘটে যান্ত্রিক কলাকৌশলের সাহায্যে, তাই ভাষণ ও ভাবের 'অতিশয়তা' এখানে অবাঞ্ছিত। মঞ্চে শিল্পী সশরীরে এসে দাঁড়ান দর্শকের

বিশ্বরূপার বর্তমান নাটক "সেতু"-র নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অসিতবরণ ও তৃপ্তি মিত্র

মুখোমুখি—আবেগ ও অভিব্যক্তির পরিমিত অতিশয়তায় পূরণ করে নেন যন্ত্র-কৌশলের অভাব। নাট্যাভিনয়ে এই বাঞ্ছিত অতিশয়তাকে পুষ্ট করে গুরু-গম্ভীর সংলাপ। নাট্য-ভাবরূপের এই স্বভাব-সম্পদ আজ মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে বসেছে। চিত্রাভিনয়ের সংযমিত ও শাসিত আবেগ ও লঘুস্বর, এবং সেই সঙ্গে যন্ত্র-কৌশলের চমৎকৃতি—যা অনেক সময় নাট্য-প্রাণস্বরূপ আবেগের অতিশয্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে—আজ মঞ্চকে প্রভাবিত করে চলেছে।

নাট্য-আন্দোলনের নবধারায় মঞ্চশিল্পের এই দিকপরিবর্তনের শুভাশুভ-বিচারের দিন হয়তো এখনো আসেনি। উনিশ-শতকীয় নাট্যধারার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের স্মৃতি যে-সব নাট্যামোদীদের মনে আজও অম্লান, তাঁরা নাট্যশিল্পের এই নব-উন্মেষকে হয়তো শঙ্কার চোখে দেখবেন, নতুন যুগের নাট্য-রসিকেরা একে হয়তো অভিনন্দন জানাবেন। তবে আশা ও আশঙ্কার এই দ্বন্দ্ব পরিহার করে বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ পুরাতনকে পুরোপুরি বিসর্জন না দিয়েও নতুনকে স্বাগত জানাবার প্রগতি-মূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ব-রূপার তৃতীয় নাট্যোপহার 'সেতু' পুরাতন ও নতুনের এই সেতুবন্ধের আয়োজন।

কিরণকুমার মৈত্রের কাহিনী অবলম্বনে 'সেতু'র নাট্যরূপ ও সংলাপ রচনা করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাটকটি দুটি অংকে সম্পূর্ণ। নাটকের প্রধান পুরুষ এক বেবি-ফুড কারখানার স্বত্বাধিকারী সহৃদয় চরিত্রবান তাপস রায়। তার স্ত্রী অসীমা নিঃসন্তানা এবং তাকে কেন্দ্র করেই নাটকের ভাব-মূলের বিস্তার। শূন্য মাতৃ-হৃদয়ে সে শুধু নিরন্তর আশার মায়াজাল বুনে চলে অতৃপ্ত তৃষ্ণার গ্রন্থিতে। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের গরমিল শুধু বাড়িয়ে দেয় তার অন্তরের জ্বালা। অসীমার এই জ্বালার দাহ ব্যথিত হৃদয়ে অনুভব করে তার স্বামী ও দেবর পুলক। অসীমার বঞ্চিত-বিড়ম্বিত মনের অবচেতন-তটে দিশেহারা হয়ে ফেরে তারা, তাকে বাঁধতে পারে না সংসারের বাঁধনে।

এই নিঃসন্তানা রমণীর আশেপাশে যারা ঘোরাফেরা করেন তাঁদের মধ্যে আছেন এক বৃদ্ধ যিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুকে অবিশ্বাস করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সুখমায়ার শান্তিতে ভরে রাখতে চান। এই মায়াকে যখন বিদ্রূপ করে নির্মম সত্য তখন তাঁরও বাঁচার দিন ফুরিয়ে আসে। এক প্রৌঢ়া বিপথগামী সন্তানের কলঙ্ক ঢেকে রাখেন অপরিসীম লজ্জায়, ঢেকে রাখেন এই বিশ্বাসে যে তারও সুপ্ত মনুষ্যত্ব হয়তো একদিন জাগবে। অসীমার বাড়ির ঝিয়ের মনে তার পর-হয়ে-যাওয়া সন্তানকে নিয়ে দুরন্ত অভিমান। অভিমান একদিন কাটে, পরম সন্তোষে সেও একদিন চলে যায় ছেলের ঘরে।

বঞ্চনা ও সার্থকতার এই যে নিত্য প্রবাহ তা একদিকে যেমন কূল ভাঙে, অপর দিকে তেমনি আনে নতুন উর্বরতার আশ্বাস। অসীমার জীবনে কিন্তু এর একদিক থেকে অন্য দিকে উত্তরণের সেতু রচিত হয় না। সে বন্ধ্যা, তাই যেন তার কোন বন্ধন নেই সংসারে। সহোদরা অণিমার প্রথম সন্তানের গলায় আশীর্বাদী হার পরিয়ে দিতে গিয়ে সে নিগৃহীত হয় এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুর-নারীর কাছে। সে সচকিত হয়ে শোনে, নিঃসন্তানা নারীর স্পর্শে নাকি পরের শিশু জ্বলে-পুড়ে মরে। অণিমার অনুদার মনও তাই বিশ্বাস করে বসে, দিদিকে কঠিন আঘাতে জর্জরিত করতে তার বাধে না।

এর পর বেঁচে থাকবার কোন আগ্রহ থাকে না অসীমার মনে। সে চলন্ত ট্রেনের তলায় আত্মবিসর্জন দিতে যায়। স্বামীর স্নেহ বন্ধন তাকে নিবৃত্ত করে এই সর্বনাশা সংকল্প থেকে।

এর পর অসীমার জীবনের বঞ্চনার সঙ্গে এসে মেশে নিয়তির ছলনা। মিথ্যা মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দেয় তার দেহে। অপ্রত্যাশিত পুলকে অসীমার অন্তরের দুই কূল ছাপিয়ে ওঠে।

অণিমার স্বামী অপরেশ তাপস রায়ের কারখানার বেবি-ফুডের পরিবেশক। এক কুচক্রী অবাঙালী ব্যবসায়ীর খল পরামর্শে বেবি-ফুডে ভেজাল দিয়ে রাতারাতি অর্থবান হবার পাপ-পিচ্ছিল পথে দ্রুত পদক্ষেপে সিদ্ধিলাভ করে অপরেশ। তার এই পাপ-বৈভবে অণিমারও গর্বের অন্ত নেই, তার অর্থকামনা পূর্ণ করেছে অপরেশ। দিদি ও জামাইবাবুর প্রতি চরম ঔদ্ধত্য দেখাতেও তার বাধে না।

অসীমার দেবর পুলকের সঙ্গে তার প্রেয়সী রীতার বিবাহও আসন্ন। দুই পরিবারের সাময়িক সুখস্রোত যখন এমনিভাবে প্রবাহিত, তখন পুলিস গ্রেপ্তার করে অপরেশকে। তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

নিরাশ্রয়া অণিমা যখন এসে দাঁড়ায় আশ্রয়ের ভিক্ষায় অসীমার কাছে, অসীমা তখন সবে জানতে পেরেছে তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলার কথা। সন্তান-সম্ভবা সে কোনদিনই হয়নি। কোন এক শারীরিক বৈকল্য প্রবঞ্চিত করেছে তাকে, তার চিকিৎসককেও। ব্যথার পাষাণভারে সে যখন ভেঙে পড়েছে, তখন অণিমার আর্তি এসে তার কানে পেঁছোয়। অণিমাকে সে দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচাল নিজের বাড়িতে তাকে আশ্রয় দিয়ে।

অসীমাকে নিয়ে ভাগ্যের নির্দয় পরিহাসের শেষ অঙ্কটুকু তখনও বাকী। নবদম্পতি পুলক ও রীতাকে বরণ করে ঘরে তুলতে হবে তাকে। অসীমা তার জীবনের অপার দুঃখবরণের ব্যথাভরা লগ্নে মুখে হাসি ফুটিয়ে, অন্তরের কান্না রূঢ় শাসনে স্তব্ধ করে হাত বাড়িয়ে ঘরে তুলে নিল পুলক ও রীতাকে। অসীমার এই নিঃসীম আত্মনিগ্রহের বিস্ময়-বিমূঢ়, মূক সাক্ষী রইল শুধু তাপস রায়। জীবনে যারা পেল তাদের পাওয়ার আনন্দের সঙ্গে অসীমার জীবনের না-পাওয়ার বেদনার সেতু-বন্ধনের মধ্যেই রূপ নেয় কাহিনীর নাট্যপরিণতি।

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'সেতু'র নাট্যরূপের গতি স্বচ্ছন্দ হলেও এতে অনাবশ্যকভাবে কতকগুলি দৃশ্যের সংযোজন ঘটানো হয়েছে। অসীমার চার পাশে সন্তান-সুখে আহ্লাদিত এবং সন্তান-সন্তাপে বিমর্ষ যে কয়টি চরিত্র ভিড় করে আসে তারা নাটকের মর্মরস সঞ্চারে অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি; বরং এই চরিত্রগুলি নাটকের মূল রসের আবর্তনে ছন্দপতন ঘটায়। অপরেশের অপরাধ-প্রবণতা ও এই নিয়ে যে আলাদা ছোট উপাখ্যানের সূচনা তা নাট্যবস্তুতে জনমনোরঞ্জনের জন্য অনেকটা প্রক্ষিপ্ত ও কৃত্রিম আয়োজনেরই সামিল। নাটকের সংলাপ সাহিত্যরসপুষ্ট; কিন্তু দুয়েক জায়গায় কোন বিশেষ বক্তব্যের উপর জোর দিতে গিয়ে সংলাপ-কর্তা 'রামকৃষ্ণ কথামৃতে'র বাণী ও উপমার সরাসরি সাহায্য নিয়েছেন। অণিমার চরিত্রটিও অনেকক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত ও সঙ্গতিবিহীন বলে মনে হয়।

নরেশ মিত্রের পরিচালনায় নাটকটি সামগ্রিকভাবে উপভোগ্য ও আবেগপ্রধান হয়ে উঠেছে। তবে এর কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্নপ্রাশনের দিন অণিমার অসীমাকে অভ্যুত্থান

রূঢ়ভাবে অপমান করার দৃশ্যটি স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যে অণিমাকে দিদি আসতে পারেনি বলে অভিমানে ফেটে পড়তে দেখা যায়, এর পর তার পক্ষে এই ব্যবহার অস্বাভাবিক। বিপথগামী স্বপনের পক্ষেও তার মাকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। এইটুকু বাদ দিলেও ঘটনাটির বক্তব্য সুপরিস্ফুট থাকতে পারত।

'সেতু'র সব চাইতে বড় সম্পদ অভিনয় অসীমার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রর অভিনয় ইদানীংকালের পেশাদারী মঞ্চে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যে নিপুণতার সংগে তিনি চরিত্রটির মর্মবেদনা, সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলেছেন তা মঞ্চাভিনয়ে তাঁর অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করে। তাপস রায়ের চরিত্রে অসিতবরণের অভিনয় যেমন সংবেদনশীল তেমনি স্বচ্ছন্দ। মমতাজ আহমেদ অপরেশের চরিত্রটিকে তাঁর অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। পুলকেশরূপী তরুণকুমার তাঁর সাবলীল অভিনয়-দক্ষতার নতুন করে প্রমাণ দিয়েছেন। জয়শ্রী সেনের অণিমা দর্শকদের সহানুভূতি পায় না সংগত কারণেই। কিন্তু চরিত্রটির প্রতি তিনি অবিচার করেননি। নরেশ মিত্র এক পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের চরিত্রে মনে ছাপ রেখে যান। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সন্তোষ সিংহ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দীপক, আরতি দাস ও ইরা চক্রবর্তী।

নাটকটির অন্যতম সম্পদ এর দৃশ্যসজ্জা ও সামগ্রিক অঙ্গসৌষ্ঠব। আলো-আঁধারের অনবদ্য বিন্যাস ও সম্পাতের মধ্য দিয়ে তাপস সেন মঞ্চে যে মায়াজাল বিস্তার করেছেন তা সত্যিই অপূর্ব। অসীমার চলন্ত ট্রেনের নীচে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার দৃশ্যটি দর্শকেরা কোনদিনই ভুলবেন না। শুধু আলোকসম্পাতের অদ্ভুত কৃতিত্বের সহায়তায় তিনি দৃশ্যটিকে রূপাঢ্য ও বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন। দৃশ্যপরিকল্পনায় অমর ঘোষের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য।

চিত্রালোচনা

জেমিনীর নতুন হিন্দী ছবি "পয়গম" এ সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। জাঁকজমক ও আঙ্গিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে মাদ্রাজের এই চিত্র প্রতিষ্ঠানটি সারা ভারতে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সামাজিক পটভূমিতে রচিত "পয়গম" সে ঐতিহ্য রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। এস এস ভাসান প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, রাজকুমার ও জনি ওয়াকার।

এ সপ্তাহের দ্বিতীয় আকর্ষণ দীপক ফিল্মসের "লাল নিশান"। এখানিও হিন্দী ছবি। দলজিত, ভগবান, রাধিকা, হীরালাল ও মজনুকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। প্রকাশ ছবিখানির পরিচালক।

ইস্টার্ন সারকিটের নির্মীয়মাণ ছবি "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্যকে এই রূপ-সজ্জায় দেখা যাবে

গৌতম চিত্রমের "অবাক পৃথিবী"র একটি দৃশ্যে নায়ক-অভিনেতা উত্তমকুমারের সংগে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদে শিল্পী শ্রীমান টুকাই-কে

"কল্যাণ পারিসদ্" নামক একটি তামিল ছবিও এ সপ্তাহে নিয়মিত প্রদর্শনীতে দেখান হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রামোদী-দের পক্ষে এটি সুসংবাদ।

*

শুধু বাংলা ছবির ব্যাপারে এ সপ্তাহও নিষ্ফলা রইল। আগামী সপ্তাহে "অবাক পৃথিবী" ও "রাতের অন্ধকারে" একসংগে মুক্তিলাভ করবে আশা করা যাচ্ছে।

* * *

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির অন্যতম চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার প্রথম নিবেদন "শুভ বিবাহ"। শম্ভু মিত্রের ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম পরিচালনায় তোলা এই ছবিটি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার একটি অবহেলিত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ওপর আলোকপাত করবে আধুনিক যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে। "একদিন রাত্রে" ছবিতে যে লেখক-পরিচালক জুটি আন্ত-র্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন "শুভ বিবাহ" তাঁদেরই সৃজনী প্রতিভার দ্বিতীয় অবদান। ছবি বিশ্বাস, তৃপ্তি মিত্র, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমলা মুখোপাধ্যায়, অমর গাঙ্গুলি ও শম্ভু মিত্র নিজেদের অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই ছবিতে।

• • •

ইস্টার্ন সার্কিটের "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর শুটিং শুরু হয়েছে এই সেদিন। এরই মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন পরি-চালক তপন সিংহ অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের ব্যাপারে। পুরো নভেম্বর মাস ধরে ছবি-খানির বহির্দৃশ্য নেওয়া হবে ভূপালে ও বিকানীরে। কলাকুশলীদের নিয়ে পরি-চালক সিংহ আর দুএকদিনের মধ্যেই ভূপালে যাচ্ছেন। সেখানকার কাজ সেরে তাঁরা যাবেন রাজস্থানে। এই ছবির প্রধান ভূমিকাগুলি রূপায়িত করছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বীণা চাঁদ। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।

* * *

নাচে-গানে অনন্য বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে "সুরের পিয়াসী", যার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে বিশু দাশগুপ্তের পরি-চালনায়। শুধু সুরের মূর্ছনায় নয়, ছবির পর্দায় কয়েকজন স্বনামধন্য সঙ্গীত-শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়ে ছবিখানি দর্শক মহলে অবশ্যই আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলি আকবর খাঁ, হীরাবাঈ বরোদেকর, বিলায়েৎ হোসেন, ইমরাৎ হোসেন, পান্নালাল ঘোষ, শান্তাপ্রসাদ, নিখিল ঘোষ প্রভৃতির নাম। এঁরা ছাড়া নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে থাকবেন লক্ষ্মী শংকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, এ টি কানন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখো-পাধ্যায় প্রভৃতি। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ এ ছবিটিরও সুরকার। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, প্রবীর কুমার, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী ও নবাগতা কান্তা রায়। চিত্র-নাট্য লিখেছেন জ্যোতির্ময় রায়।

• • •

আর একখানি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ছবি তুলছেন পরিচালক বারীন সাহা নব-গঠিত রামধনু পিকচার্সের পতাকাতলে। ছবিটির নাম "তেরো নদীর পারে"। এর সবটাই তোলা হচ্ছে স্টুডিওর বাইরে একে-বারে প্রকৃতির কোলে। একটি গ্রাম্য সার্কাসের দলকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। একে সব দিক দিয়ে পরিবেশানুগ করে ছবির পর্দায় তুলে ধরতে গত কয়েকমাস ধরে এর চিত্রগ্রহণ চলছে মেদিনীপুরে হলদী নদীর ধারে তেরো লেখা নামক একটি জায়গায়। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম্ হাজারিকা এবং একটি পুরো সার্কাস দলকে এই ছবিতে দেখা যাবে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সুরসৃষ্টি করছেন সমাপ্তপ্রায় এই ছবিটির জন্যে।

• • • •

ইউ বি ফিল্মসের প্রথম ছবি "মনে মনে"-র কাজও অনেকখানি এগিয়েছে। কাহিনীকার-পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র কলকাতায় বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে সম্প্রতি সদলবলে কাশ্মীর রওনা হয়েছেন বরফ-ঢাকা পটভূমিকায় বিশেষ ধরণের চিত্র-গ্রহণের উদ্দেশ্যে—যা বাংলা ছবির ইতি-হাসে অভূতপূর্ব। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন তুলসী চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, অলক চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, নবাগতা ঈষা এবং আরো অনেকে। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ
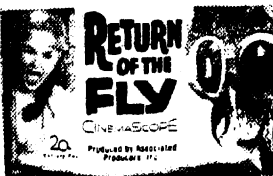
রচনা করেছেন আশুতোষ সরকার। চিত্র-গ্রহণ করছেন তপন বাগচি।

কিশোরকুমারের নবরঙ্গ

হিন্দী ছবির আমোদ-আয়োজনে যে-সব উপাদান আজকাল অপরিহার্যরূপে দেখা যায় এবং দর্শকদের বাস্তবের দুঃখ-কষ্ট কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দেয় ললিত কলা-মন্দিরের "জাল সাজ" ছবিতে তার কোনটাই অনুপস্থিত নয়।

নরেন্দ্র ঘোষের যে-কাহিনীর ভিত্তিতে এ-ছবি তৈরী, তার শুরুতে দেখা যায় কুচক্রী সুন্দরদাস ও তার কুচক্রাধীন এক চালচুলা বিহীন "আওয়ারা" যুবক কুন্দনকে। তাদের এক যুগ্ম পাপ-প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার।

পনের বছর আগে একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ধনী ব্যবসায়ী দ্বারকাদাস ও তার সহধর্মিণীর দুঃখের অন্ত নেই। তাদের হারানো ছেলে শংকরের সংগে কুন্দনের চেহারার সাদৃশ্য আবিষ্কার করার পর সুন্দরদাসের মনে এক নতুন পাপবুদ্ধির উদয় হয়। সে কুন্দনকে শংকর সাজিয়ে দ্বারকাদাসের বাড়িতে পাঠিয়ে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করার মতলব আঁটে। তার এই সকল কুমতলবের প্রাথমিক কাজে সহায় হয় দ্বারকাদাসের বাড়িরই এক কর্মচারী রাজেশ।

শংকররূপী কুন্দন দ্বারকাদাসের বাড়িতে এসেই জীবনে প্রথম অপত্যস্নেহের মধুর স্পর্শ পায়। ফলে সুন্দরদাসের অসৎসংগও সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে এবং পাপের পথ ছেড়ে মানুষ হতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে দিয়ে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে মরীয়া হয়ে ওঠে সুন্দরদাস।

ইতিমধ্যে সে একটি হত্যাকাণ্ডের অপরাধ কৌশলে চাপিয়ে দেয় রাজেশের উপর। ভয়ে রাজেশ ফেরারী হয়। রাজেশের অনুপস্থিতিতে তার বোন মীরার সংগে কুন্দন ঘটনাচক্রে প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুন্দরদাস মীরাকে বোঝায় কুন্দনই রাজেশের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। রাজেশের ফেরারী হয়ে যাওয়ার দিন কুন্দনই প্রথম তাদের বাড়িতে যায় রাজেশকে সুন্দরদাসের সংগে দেখা করার জন্যে খবর দিতে। কিন্তু রাজেশের সংগে গোপন সাক্ষাতের পর মীরার ভুল ভেংগে যায়। সে'ও চেষ্টা করে সুন্দরদাসের অপরাধ প্রমাণ করতে। অবিলম্বে পুলিসের সন্দেহও গিয়ে পড়ে সুন্দরদাসের উপর। পুলিসের তাড়নায় সে ফেরারী হয়। ফেরারী অবস্থায় আসল শংকরের সন্ধান পেয়ে সে কুন্দনকে ভয় দেখিয়ে শেষ চেষ্টা করে অর্থ আদায়ের।

কুন্দন অসীম সাহসে সুন্দরলালকে বাহুযুদ্ধে অচৈতন্য করে পুলিসের হাতে

ললিতকলা মন্দিরের 'জাল সাজ' ছবির নায়িকা মালা সিংহ

তাকে ধরিয়ে আসল শংকরকে নিয়ে আসে তার বাপ-মার কাছে। কুন্দনের জীবনের "জাল সাজ" খসে পড়ে—আসল মানুষটির সন্ধান পায় ধনী দম্পতি এবং মীরা। দ্বারকাদাস ও তার পত্নী তাদের হারানো ছেলেকে বুকে তুলে নেয় আর জড়িয়ে ধরে তাদের নতুন ছেলে কুন্দনকে। শংকরের সংগে পুনর্মিলনের বিজয়, আর কুন্দনের সংগে মীরার আশু মিলনের পূর্বাভাসে ঘটে চিত্রনাট্যের সুখপরিণতি।

কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র সুক্ষ্ম বিচার ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাঁরা যাচাই করতে যাবেন তাঁরা এ-ছবি থেকে আমোদ আহরণে হয়তো ব্যর্থ হবেন। পরিচালক অরবিন্দ সেন প্রণয়, কৌতুক, ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড নাচ-গান প্রভৃতি উপাদানের সুষ্ঠু বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ছবিটিকে নিঃসন্দেহে আমুদে করে তুলেছেন। বিপুল প্রমোদ-সম্ভারে সমৃদ্ধ এ-ছবি দর্শক মনো-রঞ্জনে সক্ষম হবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছবির প্রধান আকর্ষণ নায়ক কিশোর-কুমার। কৌতুক পরিবেশনে সর্বক্ষণ তিনি দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। তাঁর হাব-ভাব, চলা-ফেরা, কথা বলার ভংগি ও নাচ-গান প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান ছুটিয়ে দেয়। দৈবত-ভূমিকায় আবেগ-মুহূর্তেও তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। মালা সিংহ নায়িকা মীরার চরিত্রটি আনন্দ-ব্যথার অভিব্যক্তিতে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নাচ-গান ও কৌতুক দৃশ্যেও তিনি দর্শকমনোলোভা হয়ে উঠেছেন। কুচক্রী শঠের ভূমিকায় প্রাণের অভিনয় প্রাণবন্ত। অন্যান্যদের মধ্যে নজরে পড়বার মতো অভিনয় করেছেন নাজির হুসেন, অচলা সচদেব, নবাগত কমল চৌধুরী ও নানা পলসিকর।

সংগীত পরিচালক এন দত্তের সুরারোপে ছবির কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। ছবির

শিশু রংমহলের ক্ষুদে শিল্পীর দল বোম্বাইয়ের আরে মিল্ক কলোনীর উদ্যানে আনন্দের হাট বসিয়েছে

আলোকচিত্র ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ, এবং আঙ্গিক পারিপাট্য উঁচুদরের।

বোম্বাই শহরে শিশু রংমহল

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

চারিদিকে বন্যা ও প্লাবনের মুখে একটি ছোট্ট সি এল টি-র দল গত ৯ই অক্টোবর বোম্বাই যাত্রা করে। বৃষ্টি ভেজা কলকাতা শহর পুজোর সময় পিছে ফেলে যাওয়ার মূলে ছিল বোম্বাইয়ের প্রবাসী বাঙালীদের কাছে কথা দেওয়া "আমরা পুজোর সময় দুর্গাবাড়ির জন্য অর্থ-সাহায্যের উদ্দেশ্যে আসবো"।

সারা রাস্তা বৃষ্টি। দশমীর দিন ১১টায় দাদার স্টেশনে এই ১০০ জনের দলটি যখন নামে তখনো বৃষ্টি চলছে। কিন্তু এই শিশুবাহিনীর আনন্দ তরঙ্গ কে রুদ্ধ করবে? যদিও প্রতিমা নিরঞ্জন শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীর ব্যবস্থায় প্রাতঃকালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, শোভাযাত্রা হয়নি। মণ্ডপ ও প্রদর্শনী গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত। সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে। দুর্যোগ কাটবে কি? বাচ্চারা বলে "নিশ্চয়—আমরা স্টেজে উঠলে বৃষ্টিও পালাবে। আর আমরা কখনো গাইব না—মাগো বৃষ্টি ভেজা কেন মানা?"

১২ তারিখে "জিজ্জো" দিয়ে যখন উৎসবের শুরু হয়, বোম্বাইয়ের সমস্ত সাংবাদিকরা উপস্থিত। ক্রশ ময়দান তখনো জল কাদা ভর্তি। বোম্বাইয়ের শিশু বন্ধুরা মুখ গুঁজে বাৎসরিক পরীক্ষা দিচ্ছে। মণ্ডপে বড়রাই বেশী। টারপলিন ভেদ করে নানা জায়গায় জল পড়ছে। স্টেজেও মিউজিসিয়ানরা টুপি মাথায় বাজাচ্ছে, গ্রীনরুম একেবারে গ্রে রুম। তা হলে কি? জিজ্জোর রূপকথা সমস্ত অডিটোরিয়ামকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বাচ্চারা অভিনয়ের পর সাত মাইল দূরে দাদারে বাংলা স্কুলে ফিরে যাওয়ার পরও স্থানীয় সাংবাদিকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করছেন—"একি করে সম্ভব হল?" তোমরা কি যাদু জান?"

পরের দিন কাগজে তোলপাড়! টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলল: "একমাত্র কথা magnificient! এ ছাড়া প্রকাশ করার অন্য ভষা নেই।" ইণ্ডিয়ান একসপ্রেস বলল: "তাজ্জব বনে গেলাম—এমনটি বোম্বাই শহর আর কখনো দেখেনি।" গুজরাটি ও মারাঠি ভাষার কাগজ উচ্ছ্বসিত: "শিশু রংমহলের নাম শুনেছিলাম, কিন্তু আজ দেখে প্রাণ ভরে উঠলো।"

পরের দিন আকাশ একটু ফরসা হল, কিন্তু "অবনপটুয়া" সুরু হবার আগেই আবার জল, আর সাগরের নোনা হাওয়া। বোম্বাইয়ের গণ্যমান্য সবাই এসেছেন; শিশুর সংখ্যাও মন্দ নয়। সাংবাদিকরা উপস্থিত—আর আছেন বোম্বাইয়ের মেয়র। শিশু রংমহলের পুরাতন বন্ধু স্টেট ব্যাংক-এর চেয়ারম্যান শ্রীপরেশ ভট্টাচার্যকে দেখে কলকাতার উদ্যোক্তারা আনন্দিত। অনুষ্ঠানের পর আবার উচ্ছল আনন্দ। মারাঠি, গুজরাতি, ও অন্যান্য অবাঙালীদের অভিনন্দন।

১৪ ও ১৫ তারিখে রবিশংকর ও আলী আকবরের যুগ্ম বাদন, তারপর ১৬ তারিখে শিশু রংমহলের "মিঠুয়া"। ইতিমধ্যে বোম্বাই শহরে সংবাদপত্র মারফৎ সি এল টির কথা ছড়িয়ে পড়েছে। প্যারেল, শিবাজী পার্ক, দাদার থেকে নিমন্ত্রণ—"বোম্বাই বড় শহর, ক্রশ ময়দানে যাবার সংগতি নেই—আপনারা আমাদের মহল্লায় আসুন।" পুণা থেকে টেলিগ্রাফ—"তোমরা এসো।" কিন্তু ১৮ তারিখে ফিরতে হবেই। "মিঠুয়া" অভিনয়ে স্থানীয় লোকদের অপরিসীম বিস্ময়।

"সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড" বলল: "বোম্বাই শহর অনেক বিষয়েই অন্যান্য শহর থেকে অগ্রগামী, কিন্তু শিশু রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে কলকাতা অনেক অনেক এগিয়ে আছে।" "জামে জামসেদ" বলল: "শিশু রংমহল পৃথিবীর দশম আশ্চর্য।"

১৭ তারিখে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী চাবন এলেন। "অবন পটুয়া" দিয়ে বোম্বাইয়ের অভিযান সমাপ্ত। সারা ফেস্টিভালে সেই দিনই সবচেয়ে বেশী লোক এসেছিল ক্রশ ময়দানে। সি এল টির বাচ্চাদের কিন্তু আফশোষ রইল—"আহা সামনে কেন আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা নেই!" তারা সারা সপ্তাহ বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। বোম্বাইয়ের অবাঙালী সাংবাদিকরা বললেন, "আবার এসো বন্ধুরা, তখন শিশু শ্রোতা দিয়ে সারা প্রাঙ্গণ ভরিয়ে দেবো।"

আর সি এল টি'র বাচ্চারা? নিয়মানুবর্তিতা, সহনশীলতা ও প্রফুল্লতার উচ্চ নিদর্শন দেখিয়েছে তারা এই এক পক্ষকাল। বৃষ্টি ও কাদায় স্কুলবাড়ীর ঠাণ্ডা মেঝেতেই তাদের থাকতে হয়েছে। এই দলে গুজরাটি, দক্ষিণী ও উত্তর প্রদেশের বাচ্চাও ছিল, কিন্তু বোঝবার উপায় ছিল না কে কোথা থেকে এসেছে। বোম্বাইয়ের নানা দর্শনীয় স্থান তাদের আনন্দের খোরাক জুটিয়েছে। সাউথ ইস্টার্ন ও সেন্ট্রাল রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় পুজোর হিড়িকেও তারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য বোম্বাই দর্শন করে ঘরে ফিরেছে সুস্থ শরীরে।

একলব্য
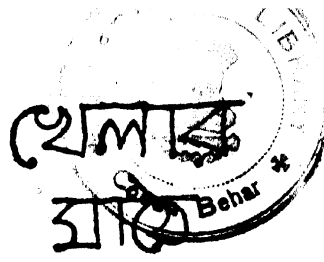
মওগীয় ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা শেষ মুখে এসে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। বাকী শুধু নক আউট প্রথার সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা। গত সপ্তাহে এ বছরে জাতীয় ফুটবলের উদ্যোগ আয়োজন সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এ সপ্তাহে সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আগেই বলেছি দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতায় ৮টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। একদিকে আছে গতবারের বিজয়ী বাংগলা, অন্ধ্র, বিহার ও উত্তর প্রদেশ। অপর দিকে আছে গতবারের রানার্স—সার্ভিসেস, বোম্বাই, কেরালা ও আসাম। এর মধ্যে এ গ্রুপ বা প্রথম গ্রুপে বাংগলা অপরাজিত থেকে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে, অন্ধ্র লাভ করেছে রানার্সের সম্মান। দ্বিতীয় বা বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে বোম্বাই, সার্ভিসেস লাভ করেছে দ্বিতীয় স্থান। প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বাংগলাকে সেমি-ফাইনালে খেলতে হচ্ছে বি গ্রুপের রানার্স সার্ভিসেসের সংগে আর বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বোম্বাই খেলছে এ গ্রুপের রানার্স অন্ধ্রের সংগে। তারপরই দুই সেমিফাইনালের দুই বিজয়ীর মধ্যে ফাইনাল খেলা।

আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি—জাতীয় ফুটবলের ১৫ বারের অনুষ্ঠানে ৯ বারের বিজয়ী ও ৩ বারের রানার্স বাংগলা দলের এবারও বিজয়ী হবার সম্ভাবনা। যদি না হয় সেটাকে অঘটন বলে ধরে নিতে হবে, যেমন অঘটন ঘটেছিল কটকে প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলায় আসামের কাছে বাংগলার পরাজয়ের ক্ষেত্রে। সত্যিই বাংগলা দল যে এবার সবচেয়ে শক্তিশালী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলার আলোচনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের দুটি গ্রুপের আটটি দলের মধ্যে একমাত্র বাংগলা দলকেই কোন পয়েণ্ট হারাতে হয়নি, তাদের বিরুদ্ধেও কোন গোল হয়নি, তাছাড়া গোল করেছেও সবচেয়ে বেশী। এই সংগে দুটি গ্রুপের লীগ টেবল দ্রষ্টব্য।

এখন গ্রুপ হিসাবে প্রতিটি রাজ্য দলের খেলা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংগলা দল তিনটি খেলাতেই নিজেদের প্রাধান্যের পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। প্রথম খেলায় বাংগলা বিহারকে পরাজিত করে ৩—০ গোলে। দ্বিতীয় খেলায় উত্তর প্রদেশকে শক্তিশালী বাংগলা দলের কাছে ৭—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তৃতীয় খেলায় অন্ধ্রকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ৩—০ গোলে। বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য বিহারের বিরুদ্ধে একাই পর পর তিনটি গোল করে বাংগলার রাইট ইন রহমতুল্লা দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। দ্বিতীয় খেলায় বাংগলার অন্যতম সেণ্টার ফরোয়ার্ড দামোদরণ হ্যাটট্রিক করেন উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে।

বাংগলা (৩) বিহার (০)
(রহমতুল্লা—হ্যাটট্রিক)

বিহারকে ৩—০ গোলে হারাতে বাংগলার একটুও বেগ পেতে হয়নি। প্রায় সমস্ত সময় বিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বাংগলার খেলোয়াড়দের প্রায় একতরফা আক্রমণ চালাতে দেখা যায়। নিজেদের পায়ে বল রেখে বাংগলার খেলোয়াড়রা যদি পায়ের কেরামতি দেখাতে চেষ্টা না করতেন, তবে গোলসংখ্যা অনেক বাড়াতে পারত। এ খেলায় বাংগলার রক্ষণভাগে স্টপার জারনেল সিং ও লেফট হাফ রাম বাহাদুর খুব ভাল খেলেন। ফরোয়ার্ডে ভাল খেলেন রহমতুল্লা, চুনী গোস্বামী ও অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জি। বলরাম ও চুনীর যোগাযোগপূর্ণ আক্রমণধারাও দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। বিহারের একমাত্র রাইট ব্যাক ওয়াদেশ ছাড়া আর কারো খেলাই চোখে পড়ে না। বিজয়ী বাংগলার পক্ষে রহমতুল্লা বিশ্রামের আগে একটি ও দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল করে হ্যাটট্রিক করেন।

বাংগলা (৭) উত্তর প্রদেশ (০)
(দামোদরণ—৪—হ্যাটট্রিক,
সি গোস্বামী, রহমতুল্লা ও
বলরাম)

বাংগলা দল দ্বিতীয় খেলায় ৭—০ গোলে উত্তর প্রদেশকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেও বিশ্রাম সময়ের মধ্যে একটির বেশী গোল করতে পারে না। উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়রা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সংগে প্রথমার্ধে যথেষ্ট দৃঢ়তা নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কয়েকবার বাংগলার গোলে হানা দিতেও তারা কসুর করে না। উত্তর প্রদেশের সেণ্টার হাফ ব্যাক কমলার খেলা বেশ প্রশংসনীয় হয়। তিনি শুধু প্রতিপক্ষের আক্রমণই প্রতিরোধ করেন না; নিজের পুরোভাগকে প্রচুর বল সরবরাহ করেন। কিন্তু পুরোভাগের খেলোয়াড়রা কোন গোল করতে অসমর্থ হয়।

বাংগলার পক্ষে এ খেলাতেও জারনেল সিং ও চুনী গোস্বামী দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন, কিন্তু হ্যাটট্রিক সমেত চারটি গোল করে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন সেণ্টার ফরোয়ার্ড দামোদরণ।

দামোদরণ ত্রিশ মিনিটের সময় একটি গোল করায় বিশ্রাম সময়ে বাংগলা দল ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ২১ মিনিটে চুনী গোস্বামী দলের দ্বিতীয় গোল করেন ২—০। এর পর দামোদরণ তৃতীয় গোল করেন—২২ ও ২৩ মিনিটের সময় পর পর আরও দুই গোল করলে তার হ্যাটট্রিক পূর্ণ হয়ে যায় ৫—০। খেলার শেষ দুই মিনিটে রহমতুল্লা ষষ্ঠ এবং বলরাম সপ্তম গোল করেন ৭—০।

জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধন দিনে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা বোম্বাই দলের খেলোয়াড়দের সংগে করমর্দন করছেন

জাতীয় ফুটবলে সার্ভিসেস ও কেরালা দলের খেলায় কেরালার গোলের মুখের এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি

বাংগলা (৩) — অন্ধ্র (০)
(রহমতুল্লা, ভারালু ও দামোদরণ)

বাংগলা ও অন্ধ্র দলের খেলাটি ছিল জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও আকর্ষণীয় খেলা। একে দুটি দলই রীতিমত শক্তিশালী। তারপর দু দলই এ খেলার আগে সেমি-ফাইন্যালে উঠে বসেছিল। কে গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হবে এ খেলা ছিল তারই পরীক্ষা। সুতরাং খেলা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে সে কথা আগেই সকলে ধরে নিয়েছিল। কার্যক্ষেত্রেও তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাংগলার কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড়ের মধ্যে অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জি, রাম বাহাদুর ও বলরাম এ খেলায় যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংগলা যোগ্য দল হিসাবেই অন্ধ্রকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

খেলার সূচনায় অবশ্য অন্ধ্রকেই প্রাধান্য বিস্তার করে আক্রমণ চালাতে দেখা যায় এবং কোন গোল না হয়েই প্রথমার্ধ শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে রহমতুল্লা, ভারালু ও দামোদরণ বাংগলার পক্ষে একটি করে গোল করেন।

দুই দলেরই কয়েকজন খেলোয়াড়ের খেলা দর্শকদের মনে গেঁথে থাকে। এদের মধ্যে একজন বাংগলার স্টপার জারনেল সিং।

'এ' গ্রুপের রানার্স অন্ধ্র দল প্রথম খেলায় উত্তর প্রদেশকে ৪—১ গোলে ও দ্বিতীয় খেলায় বিহারকে ৬—০ গোলে অতি সহজেই পরাজিত করে। তৃতীয় খেলায় বাংগলার কাছে অন্ধ্রকে হার স্বীকার করতে হয় ৩—০ গোলে।

এ বছর অন্ধ্র দলে কয়েকজন নূতন খেলোয়াড়কে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এর মধ্যে রাইট ইন হামিদ ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুলরাজের যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় দলে এরা নিজেদের স্থান করে নিতে পারবেন বলে মনে হয়। বিহারের বিরুদ্ধে গুলরাজের হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব সমেত চারটি গোল করার ঘটনা মনে রাখবার মত।

অন্ধ্র (৪) — উত্তর প্রদেশ (১)
(হামিদ, গুলজার—২ ও কার্নাক দাশ) (কাইজার)

উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে অন্ধ্র দল আগাগোড়াই আধিপত্য বিস্তার করে খেলে ৪—১ গোলে বিজয়ী হয়। খেলার প্রথম মিনিটেই সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুলজার একটি পেনাল্টি কিকের অপব্যবহার করেন। কিন্তু অন্ধ্র দলের গোল করতে বেশী দেরি হয় না। ৯ মিনিটের সময় হামিদের সুতীব্র শটে উত্তর প্রদেশ গোলরক্ষককে পরাভূত করে গোলে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় উত্তর প্রদেশের কাইজার গোলটি শোধ করে দেন। ফলে অল্প সময়ের জন্য উত্তর প্রদেশের খেলার প্রাধান্য প্রকাশ পায়। অন্ধ্র দল সম্মিলিত-ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করলে আবার উত্তর প্রদেশের খেলা ম্লান হয়ে পড়ে। গুলজার পর পর দুটি ও কার্নাক দাশ একটি গোল করায় অন্ধ্র ৪—১ গোলে বিজয়ী হয়।

অন্ধ্র (৬) — বিহার (০)
(গুলজার—৪—হ্যাটট্রিক জুলফিকার ও জাফর)

বিহারকে একরকম হেলা ফেলা করেই অন্ধ্র ৬—০ গোলে পরাজিত করে। ফরোয়ার্ডদের কয়েকটি শট গোলপোস্ট ও ক্রসবারে লেগে ফিরে না এলে অন্ধ্র এ খেলায় আরও বেশী গোল করতে পারত। সেণ্টার ফরোয়ার্ড গুলজার ও রাইট ইনের সংঘ-বদ্ধ আক্রমণধারা দর্শক চোখের খুবই আনন্দদায়ক হয়। গুলজার, জুলফিকার ও জাফর প্রথমার্ধেই একটি করে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের তিনটি গোলই করেন গুলজার। ফলে তিনি হ্যাটট্রিক লাভ করেন।

বিহার (৫) — উত্তর প্রদেশ (১)
(বিধান—হ্যাটট্রিক, পি চ্যাটার্জি ও গণেশ) (কাইজার)

উত্তর প্রদেশ ও বিহার দুই রাজ্যই পর পর দুটি করে খেলায় বাংগলা ও অন্ধ্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করে পরস্পর তৃতীয় খেলায় মিলিত হয়। বিহার ৫—১ গোলে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করায় কোন পয়েণ্ট না পেয়েই উত্তর প্রদেশ দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের খেলা শেষ করে।

তিনটি খেলায় উত্তর প্রদেশকে ১৬টি গোল খেতে হয়। অপরদিকে বিহার এই খেলাতেই পাঁচটি গোল করে। তাদের বিরুদ্ধে হয় মোট ১০টি গোল।

এই খেলায় বিহারের সেণ্টার ফরোয়ার্ড বিধানের হ্যাটট্রিক করবার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। পর পর প্রথম তিনটি গোল করে তিনি হ্যাটট্রিক করেন। এর পর পি চ্যাটার্জি পেনাল্টি থেকে চতুর্থ গোল শোধ করে দেন। গণেশ বিহারের পক্ষে পঞ্চম গোল করেন।

গ্রুপ—'এ'

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	প
বাংগলা	৩	৩	০	০	১৩	০	৬
অন্ধ্র	৩	২	০	১	১০	৪	৪
বিহার	৩	১	০	২	৫	১০	২
উত্তর প্রদেশ	৩	০	০	৩	২	১৬	০

দ্বিতীয় গ্রুপের খেলায় বাংগলার মত বোম্বাই দলও অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ান-শিপ লাভ করেছে। তবে বাংগলার মত বোম্বাইয়ের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানশিপ নিখুঁত হয়নি। সার্ভিস দলের কাছে তাদের একটি পয়েণ্ট নষ্ট করতে হয়েছে।

বোম্বাই (১) — আসাম (০)
(ডেরিক ডিসুজা)

নওগাঁয় জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধনী খেলায় বোম্বাই ১—০ গোলে আসামকে পরাজিত করে। দর্শকসমাকীর্ণ মাঠে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে খেলাটি আরম্ভ হয়। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলা-প্রসাদ চালিহা খেলার আগে দুই দলের খেলোয়াড়দের সংগে করমর্দন করেন। কিন্তু খেলাটি মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় না। অবশ্য শক্তিশালী বোম্বাই দলের সংগে আসামকে আগাগোড়াই দৃঢ়তার সংগে খেলতে দেখা যায়। আসামের খেলার মধ্যে কিছুটা দৈহিক শক্তির ছাপ ছিল। তুলনায় বোম্বাইয়ের খেলায় ছিল নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের পরিচয়। কিন্তু তবু ক্রীড়া-নৈপুণ্যে বোম্বাই সুনাম পায়নি। কেবল পুরোভাগের ডেরিক ডিসুজা ও জাফরের

খেলা দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে ডেরিক ডিস্‌জাই বোম্বাইয়ের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি করেন।

বোম্বাই (৪) কেরালা (০)
(জন, ডি'সা ও
ডেরিক ডিস্‌জা)

দ্বিতীয় খেলায় বোম্বাই দল প্রতি অর্ধে দু'টি করে গোল করে কেরালাকে অতি সহজেই পরাজিত করে। বোম্বাইয়ের প্রথম খেলার সংগে এ খেলার আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা যেমন অদম্য দৃঢ়তার সংগে কেরালার আক্রমণ প্রতিহত করেন, আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা তেমন চমৎকার যোগাযোগ বজায় রেখে প্রতিনিয়ত কেরালা গোলে হানা দেন। বোম্বাইয়ের পক্ষে ডেরিক ডিস্‌জা দু'টি ও জন ও ডি'সা একটি করে গোল করেন। কেরালার রাইট ব্যাক রবীন্দ্রনাথ খেলা শেষ হবার কিছু আগে বোম্বাইয়ের লেফ্‌ট ইন জনকে বিশ্রীভাবে ফাউল করায় রেফারী ডি সেন রবীন্দ্রনাথকে মাঠ থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন।

বোম্বাই (০) সার্ভিসেস (০)

বোম্বাই ও সার্ভিসেস দলের খেলাটি হয় খুবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। দুই দলের খেলোয়াড়দের কাছ থেকেই উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু সময় সার্ভিস দলের খেলোয়াড়েরা প্রাধান্য বিস্তার করে আক্রমণ চালান, আবার কিছু সময় বোম্বাই আধিপত্য স্থাপন করে পাল্টা আক্রমণ চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষই গোল করতে পারে না। দুই দলের রক্ষণভাগের সম্মানই বজায় থাকে। বোম্বাই ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অপরাজিতের গৌরব সমেত দ্বিতীয় গ্রুপে বিজয়ী হয়।

সার্ভিসেস (১) আসাম (১)
(কাঞ্জিপানি) (রিয়াজ)

জাতীয় ফুটবলের গতবারের রানার্স সার্ভিস দল আসামের সংগে মোটেই তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। অপর-দিকে আসাম, যারা গতবারের বিজয়ী বাঙলা দলকে আঞ্চলিক লীগের খেলায় পরাজিত করেছিল তারা সার্ভিসের সংগে খুবেই ভাল খেলে। দুই দলই খেলায় গোল করবার প্রায় সমান সুযোগ পায়। ভাগ্য একটু সহায় থাকলে আসামের পক্ষে এ খেলায় জয়লাভ করাও অসম্ভব ছিল না। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সার্ভিস দলের রাইট ইন কাঞ্জিপানি এবং আসামের রাইট হাফব্যাক বিলাস বড়ুয়া সব চাইতে বেশী প্রশংসা অর্জন করেন।

বিশ্রামের একটু আগে রাইট ইন কাঞ্জি-পানি একটি গোল করায় বিরতির সময়ে সার্ভিসেস দল ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ২৩ মিনিটের সময় রিয়াজ গোলটি পরিশোধ করে দেন।

সার্ভিসেস (৪) কেরালা (০)
(পূরণ বাহাদুর—২,
কাঞ্জিপানি ও লাহিড়ী)

উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সার্ভিসেস দল কেরালাকে ৪—০ গোলে পরাজিত করলেও কেরালা এ খেলায় মাঝে মাঝে সার্ভিস দলের রক্ষণভাগকে বিব্রত করেনি, এমন নয়। কিন্তু বিজয়ী দলের গোলরক্ষক থংগরাজের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যই কেরালা কোন গোল করতে পারে না। সার্ভিস দলের পক্ষে পূরণ বাহাদুর দু'টি এবং কাঞ্জিপানি ও লাহিড়ী একটি করে গোল করেন।

আসাম (১) কেরালা (১)
(নওগরী) (জর্জ)

জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের শেষ খেলাটি হয় আসাম ও কেরালার মধ্যে। ১—১ গোলে খেলাটির ফলাফল অমীমাংসিত থাকায় দুই দলই একটি করে পয়েন্ট লাভ করে। প্রথমার্ধে লেফ্‌ট ইন নওগরী আসামের পক্ষে প্রথম গোল করেন। কেরালার রাইট ইন জর্জ দ্বিতীয়ার্ধে গোলটি শোধ করে দেন। দুই দলই এ খেলায় গোলের অনেক সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে এবং আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্যে খেলা চলতে থাকে। দুই দলেরই একটি করে শট ক্রসবারে লেগে ব্যর্থ হয়, বাকী সুযোগগুলি ব্যর্থ করে দেন দুই দলের দুই গোলরক্ষক।

গ্রুপ—'বি'

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বোম্বাই	৩	২	১	০	৫	০	৫
সার্ভিসেস	৩	১	২	০	৫	১	৪
আসাম	৩	০	২	১	২	৩	২
কেরালা	৩	০	১	২	১	৯	১

দেশী সংবাদ

১৯শে অক্টোবর—কান্দি মহকুমার বিধ্বংসী বন্যার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিতে এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কানাডা বাঁধই এরূপ দুর্যোগের অন্যতম কারণ কিনা, তাহা নির্ধারণ করিতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন কমিশন গঠনের সর্বজনীন দাবি দলমত-নির্বিশেষে কান্দির সকল শ্রেণীর লোকের মুখে শুনা যাইতেছে।

অজ্ঞাত পরিচয় বিমান কর্তৃক নেফা, নাগা পাহাড় তুয়েনসাং এলাকা ও আসামের আকাশ সীমানা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘনের ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বিমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাত্রিতে এই সমস্ত এলাকার অত্যন্ত উর্ধ্বাকাশ দিয়া উড়িয়া যায়।

কম্যুনিস্ট পার্টির কেরল কমিটি বলিয়াছেন যে, কেরলে ২৮ মাসব্যাপী কম্যুনিস্ট শাসনের আমলে ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা এবং কর্তব্যপালনে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে।

কলিকাতা পুলিসের সাবইনস্পেক্টর পদে লোক সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত এক পরীক্ষায় জনৈক গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষার্থী একটি প্রশ্নের জবাব দেয় যে, আচার্য বিনোবা ভাবে একজন 'যাদুকর' (ম্যাজিশিয়ান)।

২০শে অক্টোবর—এলাহাবাদের সংবাদে প্রকাশ যে আজ ২নং ডাউন আগ্রা-এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সহিত একটি মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ২৬জন আহত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের 'খামখেয়ালীপনা' অমনোযোগিতা এবং সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের অভাবে ভারত সরকারকে কোটি কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া ১৯৫৮ সালের অডিট রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে।

চেকারের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে জনৈক বিনা টিকিটের যাত্রী ট্রেন হইতে পুকুরে লাফাইয়া পড়িবার পর মারা গেলে, ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অদ্য সকালের দিকে বারুইপুর স্টেশনে এক গুরুতর হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

২১শে অক্টোবর—বন্যাবিধ্বস্ত কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিবার পর অদ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভয়াবহ বন্যার আক্রমণে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে ক্ষয় ও ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, সেই বন্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার ভার সর্বোৎকৃষ্ট বিশেষজ্ঞগণের হস্তে ন্যস্ত করা হউক—এ বিষয়ে আমি একমত।

কালাহাণ্ডির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জি বি রাও পট্টনায়ককে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশক্রমে দুর্নীতির অভিযোগে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট ইন্সপেক্টর শ্রী পট্টনায়কের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়াছেন।

২২শে অক্টোবর—আর্মি মেডিক্যাল কোরের একজন অফিসারসহ নয়জন সৈন্য গত সপ্তাহে নাগা পাহাড়-তুয়েনসাং প্রশাসন এলাকার কোহিমা জেলার চাকাবামা অঞ্চলে নাগা বিদ্রোহিগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নাগা বিদ্রোহীরা পথিপার্শ্বস্থিত অরণ্য মধ্যে ওৎপাতিয়া থাকিয়া অতর্কিতে আক্রমণ চালায় বলিয়া প্রকাশ।

২৩শে অক্টোবর—দক্ষিণ লাডাকের চাং চেন মো উপত্যকায় অধিকতর শক্তিশালী চীনা সশস্ত্র বাহিনীর একটি সৈন্যদলের আক্রমণে সতেরজন টহলদার ভারতীয় পুলিস নিহত ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর তারিখে ভারতীয় এলাকার ৪০ মাইল অভ্যন্তরে একটি স্থানে এই ঘটনা ঘটে।

নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত আলোচনা সম্পর্কে প্রচারিত একটি যুক্ত ইস্তাহারে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের তিনটি মূল বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে মতৈক্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। পাকিস্তান আসামের কাছাড় জেলায় অবস্থিত টুকেরগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থিতাবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইয়াছে।

ভারত সরকার আজ ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষগণকে পারিশ্রমিক হিসাবে কমিশনদানের নূতন এক আনুপাতিক হারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কোম্পানি আইনের উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শানুসারেই এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—লোকসভার কম্যুনিস্ট দলের সহকারী নেতা শ্রী এ কে গোপালন আজ ত্রিচুরে এক বিবৃতিতে বলেন যে, 'বুধবার লাডাক সীমান্তে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, যদি তাহার পুনরাবৃত্তি হয়, তবে ভারতের মহান জনগণের সমর্থন চীন সম্পূর্ণরূপে হারাইবে।'

২৫শে অক্টোবর—বর্ধমান হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ২২শে অক্টোবর ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ প্রতি সেকেণ্ডে ৫৭০০০ হাজার ঘনফুট জল ছাড়িবার ফলে গত ২৩শে অক্টোবর দক্ষিণ দামোদর এলাকায় আবার প্লাবন সৃষ্টি হইয়াছে।

চীন কর্তৃক ভারত ভূখণ্ড দখলে ভারতবাসী চীনা মহলের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে গভীর উদ্বেগ, তীব্র নৈরাশ্য ও হতাশার সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডাঃ ভিক্টর আন্দ্রেস বেলাণ্ডে আজ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বন্যাদুর্গত ভারতের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

২০শে অক্টোবর—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়ক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী শ্রীমতী বিমলা বিজয়বর্ধনকে মন্ত্রিপদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়বর্ধন সিংহলে মন্ত্রিসভায় প্রথম এবং একমাত্র মহিলা মন্ত্রী।

২১শে অক্টোবর—সান এণ্টোনিওর (টেক্সাস) মার্কিন বিমানবাহিনীর জনৈক লেফটেনাণ্টের পত্নী শ্রীমতী সেসিলা হান্নান একলা বিমান ঘাটি হাসপাতালে তিন মিনিট অন্তর পাঁচটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। প্রত্যেকটি শিশুর ওজন ছিল দুই পাউণ্ডের কিছু বেশী। দশ ঘণ্টার মধ্যে চারটি শিশু মারা যায়। পঞ্চমটি এখনও বাঁচিয়া আছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ অদ্য রাত্রিতে তিব্বতের ঘটনাবলীতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তিব্বতের অধিবাসীদের মৌলিক মানবীয় অধিকারসমূহের প্রতি এবং তাহাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধর্মমূলক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা বিবৃত করেন।

২২শে অক্টোবর—সিসিলির কবি অধ্যাপক সালভাতোর কোয়াসিমোদোকে ১৯৫৯ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বে-সরকারী সূত্রে একটি খবর পাওয়া গিয়াছে তাঁহার বিখ্যাত গীতি-কাব্যের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই গীতি-কাব্যে আমাদের যুগে জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে।

কাঠমাণ্ডুর খবরে প্রকাশ, নেপালের উন্নয়ন মন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরি পিকিং হইতে আজ প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন, চীন বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের সহিত তাঁহার সরকারের মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক।

২৩শে অক্টোবর—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খান অদ্য ঘোষণা করেন—ভারত ও পাকিস্তান আর শত্রু হইয়া পরস্পরের মুখোমুখি থাকিতে পারে না। এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য আবেদন জানান।

কিউবা বেতারের এক ঘোষণায় প্রকাশ জনৈক ব্যক্তি আজ ছুরিকাঘাতে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ফিদেল কাস্ত্রোর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—আজ ভারতের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন নিউইয়র্কে সাংবাদিকগণকে বলেন যে [illegible] [illegible] লাডাক হইতে ভারতীয় টহলদারী সৈন্য ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পূর্বের ঘটনা হইতে উহা আরও বিপজ্জনক।

২৫শে অক্টোবর—মস্কো রেডিওতে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মহাকাশে ভ্রমণ সম্পর্কে পরীক্ষাকার্যের জন্য কুকুর 'মিশকাকে' একটি প্রেসার চেম্বারে রাখিয়া চাপ ১০০০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হয়। মিশকা একটি ফুটবল ব্লাডারের মত ফুলিতে থাকে। পরীক্ষাকার্য শেষ হইলে চাপ বৃদ্ধি করিবার পরে মিশকা কক্ষ হইতে লাফাইয়া বাহির হয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ৩৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

২৬ বর্ষ

[৪০শ সংখ্যা হইতে ৫২শ সংখ্যা পর্যন্ত]

REG. NO. C. 2109

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১

দেশ

২৬ বর্ষ]   শনিবার, ৬ই কার্তিক, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 24th October, 1959   মূল্য—৪০ নয়া পয়সা   [সংখ্যা ৫১
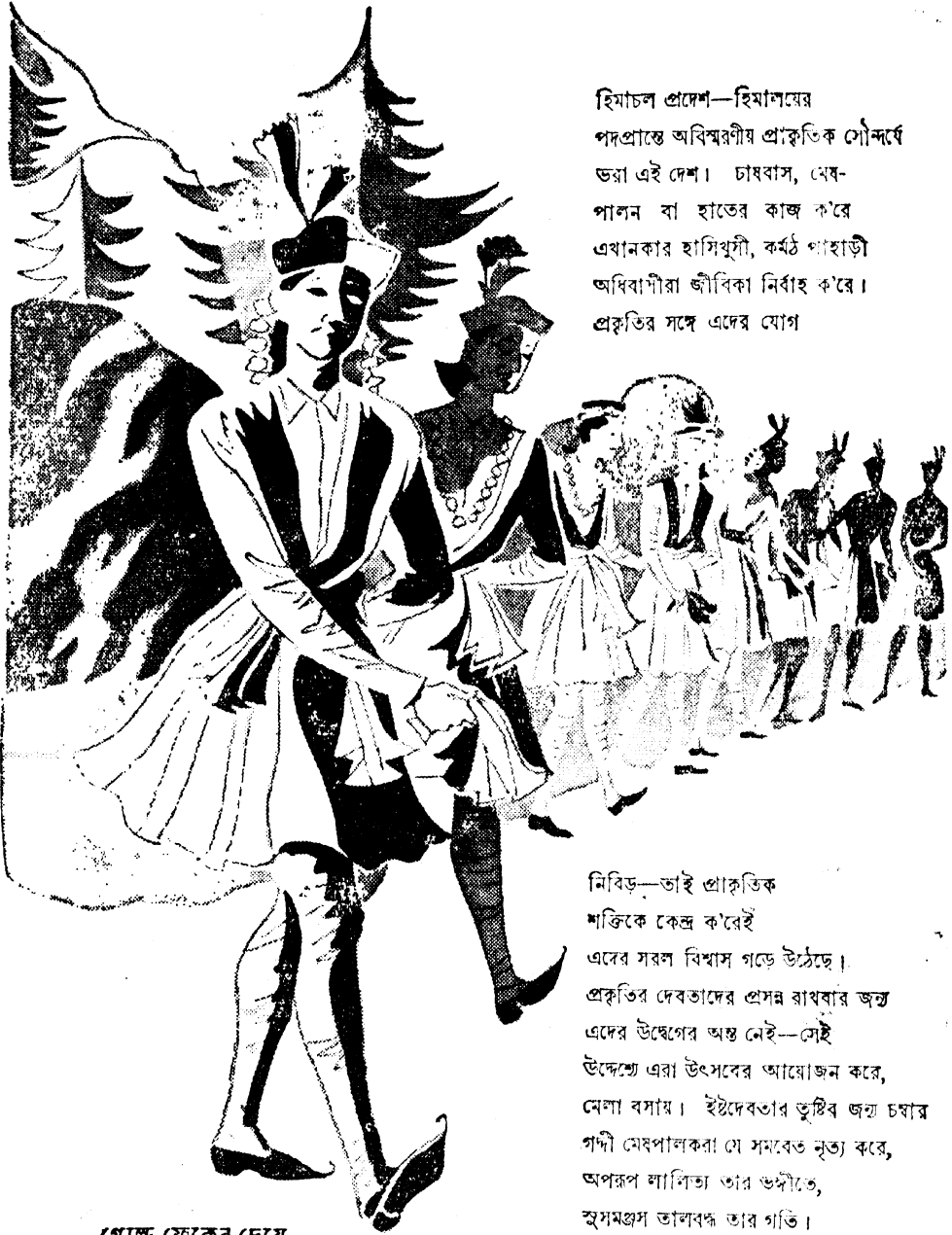
হিমাচল প্রদেশ—হিমালয়ের
পদপ্রান্তে অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে
ভরা এই দেশ। চাষবাস, মেষ-
পালন বা হাতের কাজ ক'রে
এখানকার হাসিখুসী, কর্মঠ পাহাড়ী
অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ ক'রে।
প্রকৃতির সঙ্গে এদের যোগ
নিবিড়—তাই প্রাকৃতিক
শক্তিকে কেন্দ্র ক'রেই
এদের সরল বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।
প্রকৃতির দেবতাদের প্রসন্ন রাখবার জন্য
এদের উদ্বেগের অন্ত নেই—সেই
উদ্দেশ্যে এরা উৎসবের আয়োজন করে,
মেলা বসায়। ইষ্টদেবতার তুষ্টির জন্য চম্বার
গদ্দী মেষপালকরা যে সমবেত নৃত্য করে,
অপরূপ লালিত্য তার ভঙ্গীতে,
সুসমঞ্জস তালবদ্ধ তার গতি।
ভারতবর্ষের যেখানেই যান, কুলু ও
কাঙড়ার উপত্যকা থেকে কানাড়ার
সমুদ্রতট পর্যন্ত সর্বত্রই আপনার
ভ্রমণের আনন্দ বাড়িয়ে তুলবে
উইল্‌স-এর গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের
অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।
গোল্ড ফ্লেকের চেয়ে
ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন?
উইলস-এর
GOLD FLAKE
দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

সূচীপত্র

—প'ড়ে দেখুন!

আজকাল ভালভাবে বাঁচবার কত সুযোগ হয়েছে—তবু পুরণো সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব সুযোগ নষ্ট করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের খাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। বনস্পতির ভেতর এই স্নেহপদার্থ আমরা সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কারে বাধে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিজ্জ স্নেহ দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাখনের দেশেও দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির মত উদ্ভিজ্জ স্নেহের ব্যবহার ঢের বেশী। কেন বলবো? কারণ লোকে জেনেছে যে এই সব উদ্ভিজ্জ স্নেহ দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছয়। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বক ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তাঁরা রান্নার জন্যে বিশুদ্ধ স্নেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার সুরু করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

VMA 9204 A

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 24th October, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৬ই কার্তিক, ১৩৬৬ বংগাব্দ

বোধন ও বিসর্জন

দেশ পত্রিকার পাঠক ও অনুগ্রাহক-বর্গকে আমাদের বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আর সেই সব হতভাগ্য বেদনাবিমূঢ় নিঃস্ব মানুষ-গুলি—যাহারা প্রকৃতির নিদারুণ খেয়াল খুশিতে আজ নিরন্ন নিরাশ্রয় তাহাদের প্রতিও আমাদের প্রগাঢ় সহানুভূতি জানাই।

এবারে আনন্দময়ীর আগমনের পূর্বাভাস তেমন উজ্জ্বল ছিল না। পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক আবহাওয়া যেরূপ দুর্যোগ-পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে আশঙ্কিত হওয়ারই কথা। সারা পশ্চিম বাংলায় খাদ্য আন্দোলনের বিক্ষোভ দিনে দিনে যে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছিল তাহাতে মনে স্বস্তি থাকার কথা নয়। যাহা হউক, এ-তরফ খানিকটা শান্ত হইল, কিন্তু ও-তরফ হইতে যাহা আসিল তাহার রূপ আরও ভয়ংকর। প্রবল বাত্যা ও অবিরাম বর্ষণের ছেদ পড়িল না। স্বভাবতই সন্দেহ হইয়াছিল, এবারে আনন্দময়ীর আগমন তেমন শুভ নয়। তথাপি কেমন যেন এক ভরসা ছিল। বাঙালী জাতিকে দেখিয়াছি, মারী এবং মহামারীতেও দুর্গোৎসবের কয়েকটি দিনের আয়োজনে সে কদাচিত বিষণ্ণ-মুখ, উৎসাহহীন। ইহা যে কতদূর সত্য তাহার একটি প্রমাণ এবারও পাওয়া গেল। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের কোনো এক স্থানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর নৌকার পাটাতনে মহামায়ার বোধন ও বিসর্জন যথারীতি সমাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা অবশ্য বিরল, কোথাও কোথাও বোধনের পূর্বেই বন্যার জলে প্রতিমা ভাসিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঝড়ের দাপটে গৃহপ্রাঙ্গণ ও পূজাপ্রাঙ্গণ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বুঝিতে পারি, যাহারা গৃহ আশ্রয় অন্ন বস্ত্র এমন কি আত্মীয় পরিজনকেও হারাইয়া তখন অকূলে ভাসিতেছিল তাহাদের চোখেও প্রতিমার এই অকাল-বিসর্জনে দু ফোঁটা অশ্রু নামিয়াছিল।

তাহাদের এই অশ্রুর মূল্য কে দিবে জানি না। বাঙালীর অশ্রু বিসর্জন এখন নিত্যকার। এবং নিত্যকার বলিয়া ব্যাপারটা গা-সহা, মূল্যহীন। আমরাও তত কেন না কলরব তুলি, মনে মনে এক ভীষণ হতাশা লইয়া বাঁচিয়া আছি। রাজরোষ যেন আমাদের ভাগ্যের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। রাজরোষের সহিত রুদ্ররোষ যোগ হইলে বুঝি হতাশাটুকু আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। এবার তাহাই হইয়াছে রাজরোষ ও রুদ্ররোষের কবলে পড়িয়া আমাদের হতাশা অপরিসীম হইয়াছে।

শুনিয়াছিলাম এবার পশ্চিম বাংলায় ধানের ফলন ভাল হইয়াছে। এত ভাল নাকি অনেক বৎসর হয় নাই। চাষীর মুখে হাসি ফুটিয়াছিল, নিরন্ন মানুষ আশা করিয়াছিল দু মুঠো অন্ন হয়ত জুটিবে। অথচ এত আশা ভরসা আকাশের অভিশাপে মিলাইয়া যাইতে দেরী হইল না।

পশ্চিম বাংলায় এবারের বন্যা ভয়াবহ। সরকারী হিসাবে এই বন্যার ফলে ৭০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, ৪০ লক্ষ নরনারী আজ বিপন্ন, দেড় শতাধিক নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে, অসংখ্য গবাদি পশু বন্যার জলে ভাসিয়াছে, সহস্র সহস্র কুটির বিধ্বস্ত, ফসল-ক্ষতির পরিমাণও ভয়াবহ। মেদিনী-পুর, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা—বন্যার জল স্পর্শ করে নাই এমন জিলা পশ্চিমবঙ্গে বুঝি ছিল না। ১৯৫৬ সালের বন্যার তুলনায় এবারের বন্যা বহুগুণে সর্বনাশী হইয়া আসিয়াছিল। অথচ তিন বৎসর পূর্বেও যাহা শুনিয়াছিলাম আজও তাহাই শুনি-তেছি। সরকারী প্রচার দপ্তর বার বার শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দিয়াই খালাস হইতেছেন। প্রশ্ন করি, বন্যা ও ফসল নাশ, প্রাণহানি, গৃহসম্পত্তি গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি যদি ভোগ করিতেই হয় তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আশ্বাস কেন দেওয়া হয়! অত্যন্ত লজ্জার কথা, এবারের দামোদরের বিধ্বংসী বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডি ভি সি-র ব্যর্থতা লইয়া নানা মহলে সন্দেহ ও সমালোচনা দেখা দিয়াছে। যদি সরকারের বহু নিনাদী পরিকল্পনাগুলির পরিণাম এইরূপ হয় তবে বুঝিতে হইবে আমাদের দুর্ভাগ্যের রজনী পোহাইতে পোহাইতে আরও অনেক বন্যার জল এ-দেশের মাটি ডুবাইয়া বহিয়া যাইবে।

দুর্গতজনকে সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নই এখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সরকারী তরফ হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, বিভিন্ন কল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের সহানুভূতিপূর্ণ সাহায্যও পাওয়া যাইতেছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালীর এই দুর্গতি অচিরে দূর হউক ইহাই আমরা কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রত্যাশা করিব, বাংলার পল্লী অঞ্চলকে জলাভাব ও জলস্ফীতির দুই রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা যেন সত্য সত্যই যোগ্য ও কার্যকরী হয়। সাহায্য অপেক্ষা স্বাবলম্বনের মর্যাদা-পূর্ণ ব্যবস্থা দাবী নিশ্চয় গৌরবজনক এবং সুসঙ্গত।

পুজোন্তে সকলকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই। যিনি আনন্দময়ী,—যাঁর আবির্ভাবে চারিদিকে আনন্দ বিচ্ছুরিত হয়—যিনি বরাভয়করা—বাঙলার মাটি এবং আকাশে তাঁর স্পর্শ এবারে পাওয়া যায়নি। ভেসে গেছে কত মানুষ, কত গ্রাম-মাঠ, মাঠের ফসল। তার সঙ্গে সঙ্গে পুজোর আনন্দও। সমস্ত বৎসর দুঃখী মানুষ যে আনন্দের দিকে চেয়ে প্রতিদিনের দুঃখের বোঝা বয়ে চলে—কত উদ্দাম, কত আয়োজন, কত প্রস্তুতি—সেই অনাবিল আনন্দের দিনগুলি বন্যাপীড়িত মানুষের চোখের জলে মেঘলা আকাশের মতো মলিন হয়ে গেল।

এবং সেইখানেই দুঃখের শেষ নয়। যাদের ঘর ভেসে গেল, আশ্রয় রইল না, তাদের পক্ষে আবার ঘর তোলা সহজ নয়। শূন্য ধানের গোলা আগামী বৎসরও শূন্য থাকবে। ক্ষুধার পিছু পিছু আসবে মহামারী, মড়ক। নানা সমস্যার জটিল গ্রন্থি পড়বে শুধু তাদেরই জীবনে নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের পরিত্রাণ নেই। তার অসংখ্য সমস্যার সমাধান দূরের কথা, বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এই সমস্যার দুটি দিক: একটি সাময়িক, অপরটি স্থায়ী। যারা চারিদিকে জল-বেষ্টিত হয়ে আটকে পড়েছে, কিন্তু গাছের উপর আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে, তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসতে হবে। আশ্রয়হীনকে আশ্রয়, অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে হবে। শিশুদের দিতে হবে দুধ, রোগীদের ঔষধ এবং পথ্য। বারোটির বেশি সেবাসমিতি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু এদের মধ্যে সংযোগ না থাকায় কিছু বিশৃংখলা হওয়া অসম্ভব নয়। এইগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে আনলে কাজে শৃংখলা আসে। সে কি কোনোমতেই সম্ভব নয়?

এর পরেই আসবে স্থায়ী সমাধানের প্রশ্ন। সে প্রশ্ন শুধুই দুর্গত মানুষের পুনর্বসতির নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার সুসংস্কার। এবং এ বিষয়ে আমরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে একমত যে, এই পশ্চিমবঙ্গের এই জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটিকে সর্ববিধ রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে।

*

সমস্যা অবশ্য শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়। বন্যায় ভারতবর্ষের আরও কতকগুলি রাষ্ট্রই, পশ্চিমবঙ্গের মতো না হলেও, যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় সবগুলি রাষ্ট্রই কম-বেশি অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। পশ্চিমবঙ্গ তো কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পোষ্যেই পরিণত হয়েছে, অন্য রাষ্ট্রও তথৈবচ। সকল রাষ্ট্রই নানা সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ। তার ফলে সমস্ত ক্ষমতা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আমেদাবাদে হ্যারল্ড ল্যাস্কি ইনস্টিটিউট অফ পোলিটিক্যাল সায়েন্সের সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প-মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ এই সম্পর্কে একটি চমৎকার ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

> "একথা সত্য নয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার যত বেশি সম্ভব ক্ষমতা ও প্রভুত্ব হস্তগত করার জন্যে ব্যস্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ভারত সরকার তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার আজ স্টীম রোলারে পরিণত হচ্ছেন এবং রাষ্ট্রগুলির অবস্থা করুণ হয়ে উঠছে।"

শ্রীরাজগোপালাচারীও কেন্দ্রের এই এক-নায়কত্ব-লোভের বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর বলবার কথা, কেন্দ্রের ক্ষমতালোলুপতার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে ভারতের শাসনপদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন থেকে এককেন্দ্রিকতার সরে আসছে। শ্রী শাহ অভিযোগটা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু বলছেন, এটা ঘটছে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের লোভের জন্যে নয়, অবস্থাচক্রে। কারণটা যাই হোক, ব্যাপারটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

প্রশাসনিক ব্যয় সকল রাষ্ট্রেই প্রয়োজনের তাগিদে অতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। অথচ যথেষ্ট করবৃদ্ধি সত্ত্বেও আয় সে অনুপাতে বাড়ছে না। তার ফলে, সকল রাষ্ট্রকেই ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হতে হয়। সুতরাং বহুলাংশে দাতা ও ভিক্ষুকের মধ্যে যে বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক, কেন্দ্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কও সেই রকম দাঁড়াচ্ছে। এর যা পরিণতি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কেন্দ্রীয় সরকার অসহায় কৃপাপ্রার্থী রাষ্ট্রগুলিকে সেই অনিবার্য পরিণতির দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। এর কোনো প্রতিকার নেই তা নয়। আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী কোনো কথা বলেন নি।

*

ডিক্টেটরী বা একনায়ক শাসনের ধর্ম হচ্ছে, শুধু মন্ত্রীদের নয়, রাজপুরুষদেরও প্রভাব এবং প্রভুত্ব বৃদ্ধি। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু হায়দরাবাদের শাদনগরে পঞ্চায়েৎ সমিতির উদ্বোধনে কঠোর মন্তব্য করেছেন। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় প্রায়ই মন্ত্রী এবং সরকারী কর্মচারীদের ছবি প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিকৃতিও ছাপা হয়ে থাকে, সে তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাঁকে পীড়িত করে—তাঁর মন্তব্যে তা বোঝা গেল। তিনি বলেছেন, দেশের এই নূতন গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের স্থান পুরোভাগে এবং সরকারী কর্মচারীদের স্থান পিছনের দিকে। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রে উল্টা ব্যবস্থা। এখানে এই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা যে জনসাধারণের হাতে তা বোঝবার উপায় নেই। পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচনের সময় তাদের মূল্য এবং মর্যাদা একবার বাড়ে। কিন্তু তাদের শক্তি যথার্থ কি, কত মহৎ এবং কত পবিত্র, তা তাদের কদাচিৎ বুঝতে দেওয়া হয়। অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পায় না। হট্টগোল, মিথ্যা-প্রচার এবং ঘুষ ও দুর্নীতির মধ্যে কোনোমতে সে পর্বটা শেষ করা হয়। ওই একদিনেই গণতন্ত্রের জন্ম ও সমাধি। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ এইরকম।

*

শ্রীনেহরু সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় মন্ত্রী ও সরকারী কর্ম-চারীদের ছবি ছাপা দেখে পীড়িত এবং বিস্মিত হয়েছেন। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এরকম প্রতিকৃতি-প্রকাশ যে শুধু শাদনগরে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবে এই প্রথম তা তো নয়। কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত সমৃদ্ধিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, শ্রীনেহরুর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার প্রায় সমস্তগুলিতে এই একই ব্যাপার ঘটে। এবং শ্রীনেহরুর তিরস্কার সত্ত্বেও ভবিষ্যতেও এই একই ব্যাপার ঘটবে সে আশঙ্কাও আমাদের রয়েছে। গণতন্ত্রের গোড়াতেই যেখানে গলদ, যেখানে জনসাধারণ 'সবার নীচে, সবার পিছে, সবহারাদের মাঝে', বানে ডোববার জন্যে এবং দুর্ভিক্ষে মরবার জন্যে, সেখানে জনসাধারণের পুরোভাগে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? তাদের সম্মুখের দৃষ্টি আবৃত করে দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রী এবং রাজপুরুষের দল, যদিও তাঁরা আসলে জন-সাধারণের সেবক। শ্রীনেহরুর তিরস্কার সময়োচিত সন্দেহ নেই। এই গোড়ার গলদ দূরীভূত করা আবশ্যক। জন-সাধারণকে বুঝতে দেওয়া হোক এ রাজ্য তাদেরই। সার্বভৌম শক্তি তাদেরই হাতে।

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে কন্‌জারভেটিব পার্টি জয়ী হয়েছে। উপর্যুপরি তিনবার কন্‌জারভেটিবদের জয় হলো। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ বিশ্লেষণ চলছে এবং চলবে এবং সকলে একমতও হবেন না। ভোটারদের মনের উপর কিসের কতটা প্রভাব কাজ করেছে, ভোট দেবার আগ্রহ বা অনাগ্রহ (চার ভাগের এক ভাগ লোক ভোট দেয়নি) সৃষ্টি করেছে তার নিখুঁত হিসাব দেওয়া কোনো বিশ্লেষকেরই সাধ্য নয়। বাইরের লোকের পক্ষে অনেক জিনিস বুঝা-ই দুঃসাধ্য। যেমন, শুনা যায় যে, রানী যে সন্তানসম্ভবা হয়েছেন এই সুসংবাদও নাকি কন্‌জারভেটিব রাজত্বের প্রতি প্রসন্নভাব বৃদ্ধি করেছে। তবে মোটের উপর, 'বেশ আছি'—সাধারণের মনের এই ভাবের উপর জোর দিয়ে এবং সেটি কাজে লাগিয়ে কন্‌জারভেটিবরা ইলেকশন জিতেছে। বৃটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অনস্বীকার্য। দারিদ্র্যের দুঃখ যাকে বলে তা প্রায় কোথাও নেই। অবশ্য তার জন্য কন্‌জারভেটিব রাজত্বের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব আছে একথা বলা যায় না। সারা পশ্চিম ইউরোপেই ক' বছর ধরে যাকে বলে 'বুম্ পিরিয়ড' চলেছে। লেবার পার্টির বরঞ্চ এই অভিযোগ যে এই সময়ে বৃটিশ শিল্পে উৎপাদন শক্তির যে-প্রসার সম্ভাব্য ছিল কন্‌জারভেটিব গভর্নমেণ্টের পলিসি দ্বারা সেটা ব্যাহত হয়েছে। লেবার পার্টির আরো অভিযোগ এই যে, বৃটেনে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য আরো বাড়ানো সম্ভব। তা ছাড়া কন্‌জারভেটিব রাজত্বে বড়লোক এবং স্পেকুলেটরদের টাকা করার সুযোগ অব্যাহত থাকায় সমাজে অসাম্য বেড়ে চলেছে, ১৯৪৫-৫০এ লেবার গভর্নমেণ্টের আমলে সাম্যের দিকে যে গতি প্রবর্তিত হয়েছিল পরের আট ন' বছরে কনজারভেটিবরা তা উল্টামুখে নিয়ে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক যাদের ভোট এদিকে বা ওদিকে যাওয়ার উপর এ-দল বা ও-দলের জয় নির্ভর করে তারা—'বেশ আছি—গভর্নমেণ্ট বদলালে আবার কী না কী হবে, তার চেয়ে যেমন আছে থাক'—এই মনোভাব নিয়ে ভোট দিয়েছে। বৈদেশিক ব্যাপারাদির কোনো প্রভাব যদি এই শ্রেণীর ভোটারদের মনের উপর পড়ে থাকে তাও মূলত এই 'বেশ আছি'র মনোভাব পুষ্ট করেছে। গত বছর-খানেক মিঃ ম্যাকমিলান 'শীর্ষ' সম্মেলন ঘটাবার জন্য অনেক ছুটোছুটি করেছেন। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়াকে পরস্পরের কাছাকাছি আনার ব্যাপারে মিঃ ম্যাকমিলানের যেটুকু কৃতিত্ব—এর পরিমাণ স্থির করা মুশকিল—তাকে ফলিয়ে এমন করে প্রচার করা হয়েছে যে অনেকের ধারণা হয়েছে—পিছনে মিঃ ম্যাকমিলানের চেষ্টা না থাকলে বুঝি মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকা যাওয়াই ঘটে উঠত না। যুদ্ধের ভয়ে সকলেই ভীত, তার মধ্যে বৃটেনের ভয় বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কারণ হাইড্রোজেন যুদ্ধ বাধলে বৃটেনের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সেইজন্য 'শীর্ষ' সম্মেলন দলনির্বিশেষে বৃটেনের আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মিঃ ম্যাকমিলান বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী থাকলে যেন শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনা এবং সফলতার আশা বেশি। এর অবশ্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মিঃ ম্যাকমিলানের নির্বাচনী প্রচারে এই কথাটা জোর দিয়ে বলা হয় যে, 'শীর্ষ' সম্মেলনে বৃটেনের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে মিঃ ম্যাকমিলানের প্রধানমন্ত্রী পুনর্নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক। শুধু তাই নয়, 'শীর্ষ' সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে জোরদার করার জন্য পার্লামেণ্টে তাঁর দলের গরিষ্ঠতা বৃদ্ধি করার জন্য মিঃ ম্যাকমিলান ভোটদাতাদের কাছে আবেদন জানান। নির্বাচনের ফলে অবশ্য কন্‌জারভেটিব দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেড়েছে, কিন্তু তাতে 'শীর্ষ' সম্মেলনে মিঃ ম্যাকমিলান কিসে বেশি জোরদার হবেন তা বুঝা যায় না। বৃটিশ ভোটদাতারা পার্লামেণ্টে কতকগুলি বেশি কন্‌জারভেটিব সদস্য পাঠিয়ে কার বিরুদ্ধে মিঃ ম্যাকমিলানকে জোরদার করলেন? বৃটেনে 'শীর্ষ' সম্মেলনের বিরুদ্ধে কোনো দল আছে কি? তা ছাড়া 'শীর্ষ' সম্মেলনের সফলতা আসলে যাদের উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে তো বৃটেন নেই। বিশ্বযুদ্ধ লাগানো বা না লাগানোর মালিক তো বৃটেন নয়, সেটা তো নির্ভর করে এক পক্ষে আমেরিকা ও অন্য পক্ষে সোভিয়েটের উপর

সেখানে বৃটেনের ভূমিকা তো প্রকৃত প্রস্তাবে গৌণ। কিন্তু যাই হোক কনজারভেটিবদের প্রচারের ফলে একশ্রেণীর লোকের মনে নিশ্চয়ই এই রকম একটা ধারণা হয়েছে যে, বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ম্যাকমিলান না গেলে বুঝি 'শীর্ষ' সম্মেলনের কাজ ব্যাহত হবে অথবা তাতে বৃটেনের মত যথোপযুক্ত প্রাধান্য পাবে না। এ ব্যাপারেও সেই পরিবর্তনের ভয়, যদিও যুক্তির দিক থেকে সেই ভয় অমূলক মনে হয়। অভ্যন্তর ব্যাপারটিকেও যেমন, তেমনি বৈদেশিক প্রশ্নেও সেই এক ভাব—বেশ আছি, কিছু বদলিয়ে কাজ নেই, কী জানি বদলালে কী হবে!' তা না হলে সুয়েজের কাণ্ডে, সাইপ্রাসে বৃটিশ নীতির দীর্ঘায়িত এবং রক্তাক্ত বিড়ম্বনা, আফ্রিকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির পরিচালনায় কনজারভেটিব গভর্নমেণ্ট যে কুকীর্তির পরিচয় দিয়েছেন তা কেমন করে উপেক্ষিত হতে পারে? এই নির্বাচনের ফল দিয়ে যদি জাতির বিচার করতে হয়, তবে বলতে

হয় ব্রটেনের জাতীয় মনে ভীরুতা এবং আদর্শবিমুখ আরামপ্রিয়তা আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি গণতান্ত্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্রটেনের এই নির্বাচন ফল গৌরবের নয়। শুনা যেত যে ব্রটিশ গণতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এক দলের হাতে একাদিক্রমে ক্ষমতা থাকে না, ভোটদাতারা কোনো দলের হাতে উপর্যুপরি বার বার ক্ষমতা অর্পণ করে না, সরকারী কাজের রেকর্ড যাই হোক, কারণ একাদিক্রমে এক দলের হাতে ক্ষমতা থাকাটাই গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে একটা খারাপ জিনিস। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্রটেনের এই চিন্তার প্রভাব নির্বাচনে কার্যকর হয়নি। অবশ্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সংবাদপত্র যাঁরা লেবার পার্টির সঙ্গে একমত নন তাঁরাও এবার নির্বাচনে লেবার পার্টিকে সমর্থন করার জন্য আবেদন করেছিলেন এই কারণে যে কনজারভেটিভ পার্টির পুনর্নির্বাচন ব্রটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, এই যুক্তির দ্বারা 'ফ্লোটিং ভোট'—অর্থাৎ যারা কোনো দলের একনিষ্ঠ সমর্থক নয় এবং নির্বাচনের সময়ে কোন্ দলে ভোট দেবে স্থির করে, তারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় নি। ব্রটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে এটা গৌরবকর নয়।

ব্রটেনে যে দলেরই গভর্নমেণ্ট হোক স্বাধীন ভারতের পক্ষে সমান, একথা ঠিক নয়। ভারত সরকার অবশ্য ব্রটেনে যে দলের গভর্নমেণ্টই হোক তার সঙ্গে সহযোগিতা বজায় এবং মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন। ব্রটিশ কনজারভেটিভ গভর্নমেণ্ট এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা উভয়পক্ষেরই প্রশংসার কথা। কিন্তু ব্রটেনে লেবার অথবা কনজারভেটিভ যে গভর্নমেণ্টই হোক আমাদের পক্ষে সমান একথা বলা আন্তর্জাতিক সরকারী এটিকেট্সম্মত হতে পারে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য আমাদের অনুভব করা উচিত। ব্রটেনে কোন্ দলের রাজত্ব চলে সেটা ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতের নিজস্ব স্বার্থের পক্ষে তত অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা কালের কথা একটু স্মরণ করলেই বুঝা যাবে যে, এখনও যাদের ব্রটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পাশ কেটে স্বাধীনতার জন্য লড়তে হচ্ছে—যেমন আফ্রিকার একাধিক জাতিকে—তাদের পক্ষে প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। এই সব জাতির স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসের প্রতি ভারতবাসীরা এবং আশা করা যায় যে, ভারত সরকারও উদাসীন থাকতে পারেন না। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি অস্বীকার করার জিনিস নয়। এবং এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহেরই কারণ নেই যে, নির্বাচনে লেবার পার্টির পরাজয় এবং কনজারভেটিব গভর্নমেণ্টের পুনর্নির্বাচন স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানদের পক্ষে একটি শোচনীয় ঘটনা। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যেসব ক্ষেত্রে পরাধীন জাতিদের মুক্তির সমস্যা আলোচনার বিষয় হয় সে সব ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং ব্রটিশ সরকারের মধ্যে সহযোগিতা ব্রটেনে লেবার গভর্নমেণ্ট হলে নিশ্চয়ই অধিকতর সহজ হতো। ভারতের দিক থেকে আর-একটি ভাববার কথা আছে। ব্রটেনে কনজারভেটিব পার্টির জয় থেকে আমাদের সরকার যেন মনে না করেন যে, কনজারভেটিব পার্টির মনোবৃত্তি এবং দর্শনসম্মত নীতির দিকে সর্বত্রই বুঝি লোকের মন ঝুঁকেছে। যে সব দেশে সাধারণের পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য মোটের উপর একটা উঁচু স্তরে পৌঁচেছে সে সব দেশে পরিবর্তনের রিস্ক্ না নেওয়ার দিকে অনেকের মন কিছুটা ঝুঁকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে সেরূপ চিন্তাও বিপজ্জনক। ব্রটেনে লেবার পার্টির পরাজয়ে ভারতবর্ষের নেতারা যদি দুঃখিত না হয়ে থাকেন (প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পক্ষে করা অবশ্য বিধেয় নয়) তবে সেটা ভয়ের কথা বলেই মনে করি। ১৮।১০।৫৯

সেখানে বৃটেনের ভূমিকা তো প্রকৃত প্রস্তাবে গৌণ। কিন্তু যাই হোক কনজারভেটিবদের প্রচারের ফলে একশ্রেণীর লোকের মনে নিশ্চয়ই এই রকম একটা ধারণা হয়েছে যে, বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ম্যাকমিলান না গেলে বুঝি 'শীর্ষ' সম্মেলনের কাজ ব্যাহত হবে অথবা তাতে বৃটেনের মত যথোপযুক্ত প্রাধান্য পাবে না। এ ব্যাপারেও সেই পরিবর্তনের ভয়, যদিও যুক্তির দিক থেকে সেই ভয় অমূলক মনে হয়। অভ্যন্তর ব্যাপারটিকেও যেমন, তেমনি বৈদেশিক প্রশ্নেও সেই এক ভাব—'বেশ আছি, কিছু বদলিয়ে কাজ নেই, কী জানি বদলালে কী হবে!' তা না হলে সুয়েজের কাণ্ডে, সাইপ্রাসে বৃটিশ নীতির দীর্ঘায়িত এবং রক্তাক্ত বিড়ম্বনা, আফ্রিকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির পরিচালনায় কনজারভেটিব গভর্নমেণ্ট যে কুকীর্তির পরিচয় দিয়েছেন তা কেমন করে উপেক্ষিত হতে পারে? এই নির্বাচনের ফল দিয়ে যদি জাতির বিচার করতে হয়, তবে বলতে

হয় ব্রিটেনের জাতীয় মনে ভীরুতা এবং আদর্শবিমুখ আরামপ্রিয়তা আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি গণতান্ত্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্রিটেনের এই নির্বাচন ফল গৌরবের নয়। শুনা যেত যে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এক দলের হাতে একাদিক্রমে ক্ষমতা থাকে না, ভোটদাতারা কোনো দলের হাতে উপর্যুপরি বার বার ক্ষমতা অর্পণ করে না, সরকারী কাজের রেকর্ড যাই হোক, কারণ একাদিক্রমে এক দলের হাতে ক্ষমতা থাকাটাই গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে একটা খারাপ জিনিস। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্রিটেনের এই চিন্তার প্রভাব নির্বাচনে কার্যকর হয়নি। অবশ্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সংবাদপত্র যাঁরা লেবার পার্টির সঙ্গে একমত নন তাঁরাও এবার নির্বাচনে লেবার পার্টিকে সমর্থন করার জন্য আবেদন করেছিলেন এই কারণে যে কনজারভেটিভ পার্টির পুনর্নির্বাচন ব্রিটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, এই যুক্তির দ্বারা ফ্লোটিং ভোট অর্থাৎ যারা কোনো দলের একনিষ্ঠ সমর্থক নয় এবং নির্বাচনের সময়ে কোন্ দলে ভোট দেবে স্থির করে, তারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় নি। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের পক্ষে এটা গৌরবের নয়।

ব্রিটেনে যে দলেরই গভর্নমেণ্ট হোক স্বাধীন ভারতের পক্ষে সমান, একথা ঠিক নয়। ভারত সরকার অবশ্য ব্রিটেনে যে দলের গভর্নমেণ্টই হোক তার সঙ্গে সহযোগিতার ব্যবহার এবং সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন। ব্রিটিশ কনজারভেটিভ গভর্নমেণ্ট এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা উভয়পক্ষেরই প্রশংসার কথা। কিন্তু ব্রিটেনে লেবার অথবা কনজারভেটিভ যে গভর্নমেণ্টই হোক আমাদের পক্ষে সমান এরকম বলা আন্তর্জাতিক সরকারী এটিকেটসম্মত হতে পারে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য আমাদের অনুভব করা উচিত। ব্রিটেনে কোন দলের রাজত্ব চলে সেটা শুধু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতের নিজস্ব স্বার্থের পক্ষে তাতে অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা কালের কথা একটু স্মরণ করলেই বোঝা যায় যে, এখনও যাদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পাশ থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়তে হচ্ছে—সেসব আফ্রিকার একাধিক জাতিকে—তাদের পক্ষে প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। এই সব জাতির স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসের প্রতি ভারতবাসীরা এবং আশা করা যায় যে, ভারত সরকারও উদাসীন থাকতে পারেন না। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি অস্বীকার করার জিনিস নয়। এবং এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহেরই কারণ নেই যে, নির্বাচনে লেবার পার্টির পরাজয় এবং কনজারভেটিব গভর্নমেণ্টের পুনর্নির্বাচন স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানদের পক্ষে একটি শোচনীয় ঘটনা। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যেসব ক্ষেত্রে পরাধীন জাতিদের মুক্তির সমস্যা আলোচনার বিষয় হয় সে সব ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সহযোগিতা ব্রিটেনে লেবার গভর্নমেণ্ট হলে নিশ্চয়ই অধিকতর সহজ হতো। ভারতের দিক থেকে আর-একটি ভাববার কথা আছে। ব্রিটেনে কনজারভেটিব পার্টির জয় থেকে আমাদের সরকার যেন মনে না করেন যে, কনজারভেটিব পার্টির মনোবৃত্তি এবং তদনুসৃত নীতির দিকে সর্বত্রই বুঝি লোকের মন ঝুঁকেছে। যে সব দেশে সাধারণের পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য মোটের উপর একটা উঁচু স্তরে পৌঁচেছে সে সব দেশে পরিবর্তনের রিস্ক্ না নেওয়ার দিকে অনেকের মন কিছুটা ঝুঁকতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে সেরূপ চিন্তাও বিপজ্জনক। ব্রিটেনে লেবার পার্টির পরাজয়ে ভারতবর্ষের নেতারা যদি দুঃখিত না হয়ে থাকেন (প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পক্ষে করা অবশ্য বিধেয় নয়) তবে সেটা ভয়ের কথা বলেই মনে করি।

১৮।১০।৫৯

পৃথিবীতে এমন জীবও আছে, যাদের দেহ সোনার ওজনের চেয়েও বেশী দামে বিক্রী হয়। এ জীবটির নাম চিঞ্চিলা। নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। দেখতে কাঠ-বিড়ালী আর বনবিড়ালের মাঝামাঝি। চিঞ্চিলার কদর হচ্ছে ওর গায়ের ওপরকার ঘন রেশমী লোমযুক্ত চামড়ার জন্য। এণ্ডিস পর্বতমালার প্রায় উনিশ হাজার ফিট উঁচু চূড়ায় এদের পাওয়া যায় এবং এক সময়ে ঐ অঞ্চলের প্রাচীন ইনকা নৃপতিদের পরিচ্ছদের শোভাবৃদ্ধিতে চিঞ্চিলার লোমশ চামড়া ব্যবহৃত হতো। আজ ইওরোপ এবং আমেরিকায় চিঞ্চিলার লোমশ চামড়ার ব্যবহার এমন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে জীবিত ধরে এনে নানা জায়গায় এদের পালন ও প্রজননের ব্যবস্থা হয়েছে। চিঞ্চিলার লোমযুক্ত চামড়ার কদরের কারণ তার গা'টা অত্যন্ত মোলায়েম এবং ওজন অতি হাল্কা—এক বর্গ গজ চামড়ার ওজন এক বর্গগজ রেয়নের সমান।

চিঞ্চিলার চর্মের চাহিদা খুব বলে চিঞ্চিলা ধরার ব্যবসা এমন অবস্থায় পৌঁছোয় যে এক সময়ে জীবটির অস্তিত্বই লোপ পাবার উপক্রম হয়। পাহাড়ের অতি উঁচুতে ওদের ধরতে গিয়ে ঠাণ্ডায় অনেক শিকারীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। চল্লিশ বছর আগে চিঞ্চিলা অতি দুর্লভ হয়ে যায়। চিলির গভর্নমেণ্ট সে সময়ে আইন করে জীবিত বা মৃত চিঞ্চিলার রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। পেরু, ইকোয়েডার ও বোলিভিয়াতেও চিঞ্চিলার ক্রমান্বয়ে বিলোপ এমন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যে, ঐ দেশগুলির গভর্নমেণ্ট শিকার ও রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে এমন আইন প্রণয়ন করেন যাতে আইনভঙ্গকারীর প্রথমবার অপরাধের জন্য একটা হাত কেটে দেওয়া এবং দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এক সময়ে চিঞ্চিলার চর্ম রপ্তানি বছরে চার লক্ষতে পৌঁছেছিল। বর্তমানে আমেরিকার বহু স্থানে চিঞ্চিলা পালন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বিশ বছর আগে এক জোড়া চিঞ্চিলার দাম ছিল সাড়ে ছ' হাজার থেকে আট হাজার টাকা অর্থাৎ একটা চিঞ্চিলাকে পাল্লার একধারে সোনা রেখে ওজন করলে সেই সোনার যে দাম চিঞ্চিলার দাম হয় তার চেয়েও বেশী।

*

পাখিদের জন্য গানের স্কুল—শুনতে অদ্ভুত লাগলেও হার্সং পর্বত ও জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যানেরী পাখিদের গান শেখাবার জন্য স্কুল আছে। অনুশীলনে প্রকাশ পেয়েছে যে, ১৯৩৯-এর ক্যানেরীরা প্রাক্-মহাযুদ্ধ আমলের তুলনায় গানের প্রতি কম অনুরক্ত। যুদ্ধের পর সম্ভবত ক্যানেরীর প্রতিপালকরা সময়ের অভাবের দরুণই ওদের গাইতে শেখানোর দিকে তেমন মন দিতে পারে না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আতলান্তিক সাগরের ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইউরোপে প্রথম এই পাখি আমদানী হয়। দ্বীপের নামানুসারেই হলদে বর্ণের পাখিটির ক্যানেরী নাম হয় এবং পৃথিবীর সর্বত্রই আজ এই নামটিই প্রচলিত। বিভিন্ন স্বরের অনুকরণের একটা প্রবণতা এদের থাকলেও এমন মেজাজী পাখি যে অনেক সময়ে দীর্ঘকাল ধরে গম্ভীর হয়ে খাঁচায় বসে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঁশির সহায়তায় ওদের কণ্ঠে সুর ফোটানোর চেষ্টা করা হতো। এখন ওদের কণ্ঠে সুর এনে দেবার পদ্ধতি বদলেছে। জার্মানীর অনেক স্থানে যেখানে পাপিয়ার গান শোনা যায় অনেকে তাদের ক্যানেরীর পাখি খাঁচায় করে সেসব অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে ঝোপের ধারে রেখে দেয়। এইভাবে পাপিয়ার অনবদ্য সুরতান ক্যানেরী পাখীটাকে দিয়ে আয়ত্ত করিয়ে নেওয়া হয়।

বৃটেনে কোন কোন লোকের ক্যানেরী এমন মিষ্টি সুর আয়ত্ত করেছে যে তাদের গান শুনিয়ে মালিকরা বেশ রোজগার করতে সক্ষম হয়। ১৯২০'র আমলে একটা ক্যানেরী বৃটেনের মিউজিক-হলগুলিতে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কোন ড্রয়িংরুমের দৃশ্যে ওকে হাজির করা হতো। মঞ্চের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর সোনার নির্মিত করা তার খাঁচাটি বসিয়ে রাখা হতো। উইংসের ধার থেকে একটা ঘণ্টা বাজবার সংগে সংগেই ছোট্ট ক্যানেরীটি মিষ্টি গান আরম্ভ করে পরবর্তী শিল্পীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতাদের পুলকিত করে গেয়ে যেত।
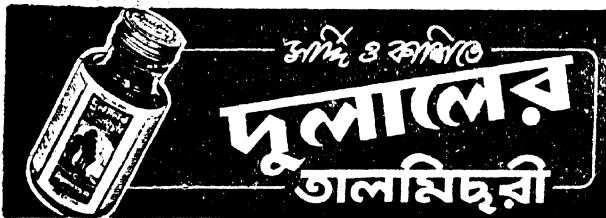
এক গাইয়ে ক্যানেরীকে মঞ্চে বসিয়ে দেবার পর কোন কোন সময়ে এমন গোমড়ামুখ করে থাকতে দেখা যেত যে কোন উপায়েই তাকে গাইতে উৎসাহিত করা সম্ভব হতো না। বারকয়েক তার এইভাবটা লক্ষ্য করে শেষে তার মালিক আবিষ্কার করে যে বেতারে জাজ সঙ্গীত শুনলেই পাখিটি গম্ভীর হয়ে ওঠে। এই 'উন্নাসিক' ক্যানেরীটি জাজ জাতীয় সঙ্গীত বড়ো ঘৃণা করতো, কিন্তু বেথোফেন, মোজার্ট প্রভৃতির ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত এমন একটা প্রভাব এনে দিত যে তারপর তার কণ্ঠের সুরমূর্চ্ছনার আর তুলনা থাকতো না।

*

বরাৎ যে কার কখন কিভাবে খুলে যায় কেউ বলতে পারে না। বলিষ্ঠ এবং দুঃসাহসী আর্থার মাইল্‌স কুইন্সল্যাণ্ডের রকহ্যাম্পটন রোডিও ময়দানে বন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ার প্রতিযোগিতায় নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে সে দশ পয়েণ্ট এগিয়ে। বিজেতা বলে ঘোষিত হতে দশ সেকেণ্ডের জন্য এক অতি দুরন্ত প্রকৃতির ঘোড়ার পিঠে চড়া কেবল বাকি। ঘোড়ার খাঁচার গেটটা খুলতেই চারপায়ে লম্ফমান উন্মত্ত ঘোড়ার পিঠে অধিষ্ঠিত হয়ে আর্থার বেরিয়ে আসতে যেতেই এক উত্তেজিত দর্শক একেবারে ট্র্যাকের ওপরে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আর্থার এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে দর্শককে বিপদ থেকে টেনে সরিয়ে অবশ্য নিলো কিন্তু ঘোড়ার পিঠ থেকে হুমড়ি খেয়ে বেকায়দায় পড়ে আর্থারের অস্থিসন্ধি ভেঙে যায়। আর্থারকে হাসপাতালে যেতে হয়।

যে দর্শক লোকটিকে আর্থার উন্মত্ত ঘোড়ার কবল থেকে রক্ষা করে তার নাম ছিল জেমস লংফিল্ড এক প্রভূত ধনী পশুপালক। আহত আর্থারকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে বলে: "তোমার এই দুরবস্থার জন্যে আমি দায়ী, তুমি বিজেতার পুরস্কার পেলে না বটে তবে এর জন্যে তোমায় আফশোষ পোষণ করে থাকতে দেব না।" ব্যাপারটা ঘটে ছ'বছর আগে। ইতিমধ্যে আর্থার সেই দর্শকের কথা বিস্মৃত হয় এবং সম্প্রতি রোগভোগের পর তাসমানিয়ার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বেকার এবং দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন এক এজেন্ট তার কাছে উপস্থিত—অনেক ঘোরাঘুরি করে আর্থারের খোঁজ পেয়েছে সে। এজেন্ট জানালে যে জেমস লংফিল্ড সম্প্রতি মারা গিয়েছে এবং তার উইলে সে তার কুইন্সল্যাণ্ডের প্রায় সাত লক্ষ টাকার গবাদি পশুর ব্যবসা এবং যাবতীয় নগদ প্রায় চার লক্ষ টাকা আর্থারকে দিয়ে গিয়েছে।

চক্রদত্ত

আজকের দিনে ক্ষয়রোগকে আর 'শিবের অসাধ্য' রোগ বলা যায় না। প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যমে মানুষে টানাটানির পর মানুষই জয়লাভ করছে। এ রোগ নিরাময়ের জন্য কত রকমই ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে। অবশ্য কোনও ওষুধেই বোধহয় রোগনিরাময় করা এপর্যন্ত সম্ভব হয়নি। রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার উপযোগী অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমানে ডাঃ হামাও এবং ডাঃ সুমিও উমেজোয়া নামে দুটি ভাই মিলে অত্যাশ্চর্য-এক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। ক্ষয়রোগ প্রতিরোধকরা নতুন ওষুধটির সর্বশেষ নামকরণ হয়েছে—সুপার কানামাইসিন। প্রথমে ছোটভাই, হামাও উমেজাওয়া 'কানামাইসিন' আবিষ্কার করে। 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের' অধ্যক্ষ ডাঃ হামাও উমেজাওয়া জাপানের নানা দেশ থেকে মাটি সংগ্রহ করে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কানামাইসিন ওষুধটি আবিষ্কার করে দেখেন যে, ওষুধটি যেমন তেমন ক্ষয়রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী তো বটেই এমন কী যে সব রোগ-বীজাণুর স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধকারী ক্ষমতা জন্মে গেছে সেগুলিকেও প্রতিরোধ করতে পারে। গত তিন বছর ধরে এ ওষুধটি বিভিন্ন হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখার পর জানা যায় যে, ওষুধটির মধ্যে কতকগুলি খুঁত আছে। কানামাইসিনের মধ্যে অনেকগুলি বিষাক্ত উপাদান থাকায় ওষুধটি প্রয়োগ করায় আসল রোগ নিরোধ করা যায় সত্য কিন্তু নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ডাঃ হামাও উমেজাওয়া বলেন যে, ঐ সব বিষাক্ত উপাদানগুলি নষ্ট করা সম্ভব হলে 'কানামাইসিন'কে বিশেষ উপকারী ওষুধ বলে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। কিন্তু এ কাজ রাসায়নিকের, সুতরাং একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট হামাও উমেজাওয়ার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এইবার বড় ভাই ডাঃ সুমিও উমেজাওয়া রণভূমিতে নামেন। তিনি সাংশ্লেষিক রাসায়নিকে বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি। বড়ভাই যখন ওষুধটির রাসায়নিক সংগঠনের রদবদল করেন, ছোটভাই তখন অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে 'কানামাইসিন' 'সুপার-কানামাইসিনে' পরিণত হলো। সাধারণ 'কানামাইসিনে' যে পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থ বর্তমান ছিল 'সুপার কানামাইসিনে' তার আটভাগের একভাগও নেই। ফলে এখন নির্ভয়ে 'সুপার কানামাইসিন' অনেকখানি পরিমাণেই ব্যবহার করা যায়। কোনওরকম প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে না। দুই ভাইয়ের প্রচেষ্টায় শুধু যে একটি অতি নির্দোষ বিশেষ উপকারী ওষুধই আবিষ্কৃত হলো তা নয়, যে পদ্ধতিতে 'কানামাইসিন'কে প্রতিক্রিয়াহীন 'সুপার কানামাইসিনে' পরিণত করা হলো সেই পদ্ধতিতে অন্যান্য অনেক আন্টিবায়োটিক ওষুধকেও এখন থেকে প্রতিক্রিয়াহীন করা সম্ভব হতে পারে।

*

আমরা পয়সা দিয়ে বনস্পতি কিনতে রাজী কিন্তু পয়সা দিয়ে ভেজাল ঘি কিনতে রাজী নই। আজকাল বাজারে খাঁটি ঘি বলে কোন জিনিসই পাওয়া যায় না। কতরকমের যে ভেজাল দেওয়া হয় ঘিয়েতে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সবচেয়ে বড় ভেজাল হচ্ছে ঘি-এর সঙ্গে বনস্পতি মিশিয়ে খাঁটি ঘি বলে চালান। মহীশূরের 'সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' ঘিয়ের ভেজাল ধরার বুডোইন পরীক্ষা পদ্ধতির দুরকমভাবে একটু রদ-বদল করে পরীক্ষার উপায় বেশ সহজ করে দিয়েছেন। সাধাণভাবে বুডোইন পরীক্ষায় ফারফ্যুরালের অ্যালকোলিক সলিউশনের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মিশানর পর ঐ সংমিশ্রণ যদি ঘিয়ের নমুনায় মেশান হয় তাহলে রং বদলে গোলাপী রং হয়ে যায় এবং তাহলে বুঝতে হবে যে ঘিয়ে ভেজাল আছে। কিন্তু সাধারণভাবে সংমিশ্রিত ফারফ্যুরালকে বোতলজাত করে বেশীদিন রাখা যায় না—তার রং বদলে যায়। এখন সংশোধিত পদ্ধতিতে এটি প্রায় মাস তিনেক রাখা যায়। আলাদাভাবে দুটি পদার্থ অর্থাৎ ফারফ্যুরাল ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড দুটি বিভিন্ন বোতলে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। অপর সংশোধিত পদ্ধতি অনুসারে ফারফ্যুরালের বদলে হাইড্রো-ফ্যুরামাইডের পাউডার ব্যবহার করা হয়। যখনই ফারফ্যুরালের প্রয়োজন হবে তখন ঐ পাউডারে যদি কয়েক ফোঁটা হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড মেশান যায় তাহলে তখনই ফারফ্যুরাল পাওয়া যাবে। এই নতুন দুটি পদ্ধতির সুবিধা এই যে, যদি শতকরা দশভাগ ভেজাল মেশান থাকে তাহলে মাত্র দশ ফোঁটা ঘি-এর ওপর পরীক্ষা করলেই ভেজাল ধরা পড়বে।

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

এবার আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে আশ্রমেই থাকব এবং জগদানন্দবাবুর কাছে আমাদের অংকের জ্ঞানটা ঝালিয়ে নেব—এইরকম কথা হয়েছিল। চিঠি লিখে বাড়িতে সে কথা জানিয়ে দিলাম। ছেলের পড়াশুনোয় চাড় দেখে বাবা খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন। আমাদের সহপাঠীরাও বাড়ি থেকে অনুমতি পেলেন। অন্যান্য ছেলেরা বাড়ি চলে গেলেন—আশ্রম প্রায় খালি হয়ে গেল। জগদানন্দবাবু ও আর দু-একজন ছাড়া মাস্টারমশায়রাও অনেকেই চলে গেলেন।

সারা গ্রীষ্মের ছুটিটা সকালে বিকেলে জগদানন্দবাবুর কাছে চলল আমাদের পাটিগণিত, জ্যামিতি আর বীজগণিতের চর্চা। সকালের ক্লাসটা নির্বিঘ্নে হয়ে যেত, মাঝে মাঝে গোল হত ঐ সন্ধ্যার ক্লাসে। ব্যাপারটা খুলেই বলি। অনেক গীতিরচয়িতা প্রথমে গানের পদগুলি লেখেন, পরে তাতে সুর সংযোগ করেন বা করিয়ে নেন। এতে করে অনেকসময় কথায় এবং সুরে সামঞ্জস্য থাকে না। এ কথা এখন সকলেই জানেন যে গুরুদেবের বেশির ভাগ গানই আরম্ভ হয়েছিল সুরে, কথা এসেছিল পরে। কত সময়ে দেখেছি গুরুদেব নিস্তব্ধ হয়ে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অমৃতধারা নিঃশেষে টেনে নিচ্ছেন নিজের অন্তরে গুনগুন করতে করতে। সেই সুরের অংকুরকে পরিণত মূর্তি দেবার জন্যে কথা যেন আপনি আসত। আর যখনই এইরকম সুরের স্রোতে কথা জুটে একটি কোনো গান রচনা হত তখনি সেটি তিনি কাউকে শিখিয়ে দিতেন, নইলে সে সুর অনেক সময় আর তাঁর মনে থাকত না। যাঁর অন্তরে সুরের সুরধুনী নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে, তার একটি ঢেউ যে মিলিয়ে মিশিয়ে যাবে অন্য শত শত ঢেউয়ের মধ্যে তাতে আর বিচিত্র কী! এইজন্যে তাঁর প্রয়োজন ছিল তাঁর 'গানের ভান্ডারী' দিনুবাবুকে। দিনুবাবু অনুপস্থিত থাকলে অনেক সময় অজিতবাবুকেও শিখিয়ে দিতেন। এখন হল কী, ঐ গরমের ছুটিতে যখন আমরা বাড়ি না গিয়ে আশ্রমেই রয়ে গেলাম, আশ্রমে তখন না ছিলেন দিনুবাবু, না ছিলেন অজিতবাবু। দায়ে পড়ে বলতে হল, আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কারো গানের খ্যাতি ছিল না। সুতরাং মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত সন্ধ্যার সময়। ভাঙা কুলোও যেমন অনেক সময় কাজে লেগে যায়। দূর থেকে দেখা যেত লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে কে আসছে জগদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে। তার পরেই দেখি স্মিতহাস্য উমাচরণ সসম্ভ্রমে সমাচার জ্ঞাপন করছে, 'আজ্ঞে, সুধীরঞ্জন-দাদাবাবুকে বাবুমশায় ডেকেছেন।' জগদানন্দবাবু যে খুশি হলেন না তা তাঁর মুখের ভাবে ও চোখের চাহনিতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু উপায় নেই; বাবুমশায় ডেকেছেন, কাজেই ইচ্ছে না থাকলেও যেতেই বললেন। আমিও যেন একান্ত অনিচ্ছা নিয়ে উঠে পড়লাম। এই ব্যাপারটা যখন একটু নিয়মিতভাবে ঘটতে লাগল, জগদানন্দবাবুর অসন্তোষের তাপও দিনে দিনে বাড়তে লাগল বৈ কমল না। শেষে একদিন যেই না দেখা গেল লণ্ঠনটি এগিয়ে আসছে তিনি বলে ফেললেন, 'আর কেন ধষ্টামো—পা তো বাড়িয়েই আছ, উঠে পড়ো। বাবুমশায়কে আমিও বলে রাখব যে তোমার পাস-ফেলের মধ্যে আমি নেই। পষ্ট দেখছি তুমি ফেল হবে আর আমারও নাম ডোবাবে। নাও, উঠে পড়ো।' আমি তখন গ্যাঁট হয়ে মাথা গুঁজে জ্যামিতির একটা নকশা আঁকতে লেগে গেলাম। 'কৈ হে, উঠছ না যে বড়ো—হল কী?' আমি বললাম, 'না মশায়, আমি যাব না, কে শেষে গান শিখতে গিয়ে পরীক্ষায় ফেল হবে?' জগদানন্দবাবু ভাবলেন তিরস্কারটা আর-একটু কড়া হলেই আমি উঠব। তাই বললেন, 'নাও, ঢের হয়েছে। লেখাপড়ায় এত মন কবে থেকে হল হে? পড়াশুনোয় মন যদি থাকবে তবে তোমার বাপ-মা বাড়ি থেকে তোমায় দু-দুবার খেদিয়ে দেবেন কেন? এঁদের বাপ-মায়েরা এঁদের একবারই খেদিয়েছেন। আর তুমি এমনি ছেলে যে তোমার বাপমা তোমাকে দু-দুবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েছেন। বাস্ রে, কী ছেলে! যাও যাও খসে পড়ো।' তখনো আমি নড়বার নাম করি নে। অবশেষে মাস্টারমশায় দেখলেন, শান্তির পন্থা অবলম্বন না করলেই নয়। বললেন, 'আহা দেখছ না? বাবুমশায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কাল সকালে না-হয় একটু আগে এসো—ঐ আঁকটা তখন ভালো করে বুঝিয়ে দেব।' দেখলাম যে এই অবস্থায় সন্ধি করাই শ্রেয়। সুতরাং উঠে পড়লাম। উমাচরণ মুচকি মুচকি হাসছে, আর মাস্টারমশায় খালি বললেন, 'বাস্ রে, কী ছেলে!' এর পরে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গান শেখা নিয়ে কোনো অসুবিধা হয় নি।

গুরুদেবের কাছ থেকে গান শিখে ফিরে আসতাম ঠিক রাত্রে খাবার ঘণ্টা পড়বার অব্যবহিত পূর্বে। খাবার পরেই এক বিশুদা ছাড়া প্রায় সবাই অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজকে কী গান শিখে এলে ভাই?'

বীথিকা-গৃহ

ছাতিমতলায় মহর্ষির সাধনবেদী

তখন তাঁদের শোনাতেই হত সেই সদ্য-শেখা গানগুলি, যা পরে গীতাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছিল। দিনুবাবু ফিরলে যে-কটা গান আমি শিখেছিলাম সেগুলি তাঁকে শুনিয়ে দিতে হয়েছিল। পরে তিনি সেগুলি আবার গুরুদেবকে শুনিয়ে ঠিক হয়েছে কি না জেনে নিলেন। একদিন এইরকম একটা নূতন গান শিখলাম—

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।'

সেদিন রাত্রের গৌরপ্রাঙ্গণ ভেসে গেছে জ্যোৎস্নায়। খাবার পর সুহৃদ আর আমি মাঠে বেড়াচ্ছিলাম শরীরটা একটু জুড়োতে। সুহৃদের নির্দেশানুসারেই নূতন-শেখা গানটি গলা ছেড়ে গাইতে লাগলাম। গানটির প্রথম অন্তরাটা পেরিয়ে থাকবার জায়গাটাতে পৌঁছতে-না-পৌঁছতে শুনলাম 'সুধী-ধীরঞ্জন! সুধীরঞ্জন!'—কণ্ঠস্বরেই বুঝলাম কোন মাস্টারমশায় ডাকছেন। গান মুলতুবি রেখে মাস্টারমশায়ের সামনে দাঁড়াতেই রুক্ষস্বরে তিনি বললেন 'লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, থিয়েটারি গান করবার আর জায়গা পেলে না? আশ্রমে গান হচ্ছে—হতভাগিনী জাগেন নি। যাও। এক্ষুনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' আমি নেহাত বোকার মতো বলে বসলাম, 'থিয়েটারি গান কী মশায়, গুরুদেব তো নিজে শিখিয়ে দিলেন আজকেই।' মাস্টারমশায়ের ঠিক যেন প্রত্যয় হল না, বললেন, 'হ্যাঁ, গুরুদেব শিখিয়েছেন?' আমি যখন তবু জোর করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—গুরুদেবই তো শেখালেন।' তখন তিনি বললেন 'গাও তো দেখি শুনি।' আমি তখন আবার গানটির আদ্যোপান্ত তাঁকে শুনিয়ে দিলাম। শুনতে শুনতেই দেখলাম মাস্টার-মশায়ের মাথাটি নড়ছে। গান শেষ হলে খালি বললেন, 'হ্যাঁ, কথাগুলোর বাঁধুনি রয়েছে বৈকি। আচ্ছা যা শুগে যা।' সুহৃদে আমাতে যে সেদিন গোপনে একটু হাসাহাসি করি নি সে কথা বলতে পারব না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর আবার আমাদের জীবনযাত্রা বাঁধা নিয়মের লাইন ধরে চলতে শুরু করল। দিনুবাবুর গানের ক্লাসে এই গানটা নূতন শেখা গেল—

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার॥'

এই গানটার কথা আর সুর মনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল তা সত্যি, কিন্তু গানটি এখনো মনে থাকবার অন্য কারণ ঘটে ছিল এই সময়ে, সেটা তবে খুলেই বলি। দিনুবাবু সে সময়ে কিছুদিন ছিলেন গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরি-বাড়ির তৃতীয় কামরাটাতে। নগেন আইচ মাস্টারমশায় তখন ছেলেদের সঙ্গে পাশের প্রাককুটিরেই থাকেন। নগেনবাবু বেশ সুর করে করে আমাদের নদী কবিতাটি পড়াতেন। এ ছাড়া দিনের বেলায় অন্য কোনো গান তাঁকে গাইতে শুনি নি কখনো। দিনুবাবু একদিন বললেন, 'ওরে, নগেন-বাবুকে গানে পেয়েছে শুনেছিস।' আমরা বললাম, 'শুনি নি তো।' দিনুবাবু বললেন, 'গানে পেয়েছে নিশ্চয়ই জানি। এমনিতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু এই আমারই জানলাটার পাশে রাত দুপুরে না গাইলেই কি নয়? কী করা যায় বল্ তো?' 'তাঁকে ডেকে বলে দিলেই হয় যে একটু তফাতে মাঠের মধ্যে গিয়ে গাইলে ভালো।' দিনুবাবু বললেন, 'তা কি বলা চলে রে বোকা! দেখি কী করা যায়।' সেই দিনই একটু বেশি রাত্রের আমাদের ঘর থেকেও শুনতে পেলাম নগেনবাবু গুন গুন করে কী একটা গান করছেন। যেই-না নগেনবাবু গুনগুনিয়ে উঠেছেন অমনি দীনুবাবু এসরাজটা নিয়ে গান জুড়লেন—

'গভীর রাতে তোমার অত্যাচার
নগেন আইচ শুনু হে আমার।
তোমার গান কান্না-সম
আসে না ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে মোর যম
তোমায় তাড়াই বারে বার।'

নগেনবাবুর গুনগুনোনি নিমেষে থেমে গেল। তার পর থেকে আশ্রমে কেউ তাঁর গান শোনে নি কখনো।

২

একবার বুধবারের সঙ্গে অন্য তিন দিনের ছুটি এসে পড়ায় একটানা তিন-চার দিন ছুটি পাওয়া গেল। মাস্টারমশায়দের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, কটা দিন একটু বেড়িয়ে এলে ছেলেদের দেহমনের শ্রান্তি দূর হবে। ঠিক হল যে, ক্ষিতিবাবু, সত্যেশ্বরবাবু আর বঙ্কিমবাবু কয়েকজন বড়ো ছেলেকে নিয়ে ভ্রমণে বের হবেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের অনেকেই আমরা দলে ভিড়লাম। যখন তোড়জোড় সব হয়ে গেল তখন প্রশ্ন উঠল কোন্ দিকে যাওয়া যাবে— পুবে না পশ্চিমে। কেউ বললেন, ছেলেদের কলকাতায় জাদুঘর চিড়িয়াখানা শিবপুর বাগান, মারবেল প্যালেস এই-সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনা হোক। কেউ-বা বললেন, 'আরে ছ্যা— কলকাতায় ঘোরা কি হল ভ্রমণ? পশ্চিমের দিকেই যাওয়া যাক।' বঙ্কিমবাবু রফা করলেন— 'চলো তো স্টেশনে, যে দিক থেকেই হোক প্রথম যে গাড়ি আসবে তাইতেই চড়া যাবে।' এ একটা বেশ লটারির মতো নিষ্পত্তি হল। মঙ্গলবার অপরাহ্ণে হৈ হৈ করে স্টেশনে যাওয়া হল— বোলপুরের লোকেরা বুঝলে যে ঠাকুরমশায়ের ইস্কুলের দাদাবাবুরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। স্টেশনের মাস্টারবাবুর কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, কলকাতার দিক থেকেই প্রথম গাড়ি আসবে, যাবে নলহাটি পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে। সত্যেশ্বরবাবু বললেন, 'ঠিকই হয়েছে —নলহাটিতে জ্ঞানবাবুর (জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়) পিতা থাকেন তাঁর ভদ্রাসনবাড়িতে। সেখানে না নেমে গেলে তিনি খুবই ক্ষুণ্ন হবেন।' কথাটা বঙ্কিমবাবু এবং ক্ষিতিবাবুরও মনে ধরল যেন। নলহাটি পর্যন্তই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটা হল। গাড়িতে ওরই মধ্যে একটা খালি কামরা দেখে উঠে পড়া গেল। ট্রেন ছাড়তেই বঙ্কিমবাবু বললেন 'ওরে ছেলেরা ঐ যাত্রার গানটা ধর্-না।' অমনি আমরা শুরু করে দিলাম—

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।

সে কামরায় আর যে কজন নিরীহ লোক ছিলেন, তাঁরা নিশ্চিত ভেবে নিলেন যে একটা যাত্রাদল চলেছে কোথাও পালা গাইতে। অবশেষে ট্রেন এসে থামল নলহাটি জংশনে। সকলে নেমে পড়লাম। সঙ্গে মালপত্রের কিছু হাঙ্গামা ছিল না। নিজের নিজের কম্বলের মধ্যে গুটিয়ে দুখানা ধুতি, কি পাজামা, একটি গেঞ্জি এবং একটি শার্ট কি পাঞ্জাবি নিয়েছিলাম প্রত্যেকে— পরনে ছিল ধুতির উপর গেঞ্জি জামা, তার উপরে ছিল গেরুয়া আলখাল্লা, আর হাতে ছিল মাথা-সমান

'গৈরিক'

লাঠি। নিজের নিজের বোঁচকাটি কাঁধে কি বগলে নিয়ে রওনা হলাম জ্ঞানবাবুদের বাড়ির দিকে। পৌঁছলাম সন্ধ্যা নাগাদ। জ্ঞানবাবুর পিতাকে সত্যেশ্বরবাবু প্রথমেই বললেন যে, আশ্রমবালকেরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন— রাত্রিতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই নিশিযাপন করে অতি প্রত্যূষে আবার রওনা হবেন। প্রভাতে সময়-সংক্ষেপ বলে আজ সন্ধ্যায়ই তাঁরা তাঁকে প্রণাম করে যেতে এসেছেন। এতগুলি লোকের রাত্রের বিছানা প্রভৃতি বন্দোবস্ত করতে হবে না জেনে বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে জ্ঞানবাবুর পিতা বললেন, ছেলেদের রাত্তিরে না খাইয়ে ছাড়বেন না। সত্যেশ্বরবাবু মুখে খুশির ভাব গোপন করে বিনীত ভাবে চোখ মাটির দিকে করে অল্প একটু হেসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আমরা বুঝে নিলাম যে, রাত্রে আহারপর্বটা আতিথ্যের উপর দিয়ে চালিয়ে দেবার জন্যই নলহাটি পর্যন্ত টিকিট কেনা। যা হোক, ভিতর খবর দিয়ে জ্ঞানবাবুর বাবা বসলেন মাস্টারমশায় ও আমাদের নিয়ে। আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা হল ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে, আমাদের কয়েকটা গানও তিনি শুনলেন। রাত্রে ভূরি-ভোজন সেরে নলহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসে কম্বল পেতে শুয়ে পড়া গেল। মনে আছে সেদিন ঘুমোবার আগে আমি গান করেছিলাম—

'আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো হে।'

অসময় শীতের ভোরের হাওয়ার আমেজে গা টা শীত-শীত করে যখন ঘুম ভাঙল তখনো মাঝ-আকাশে দু-একটা তারা জ্বলছে —কেবল দিগন্তে একটু ফিকে আলোর রেখা ফুটেছে মাত্র। দু একটা পাখি আসন্ন ভোরের খবর পেয়ে অন্যদের ডাকাডাকি শুরু করেছে। নলহাটি গঙ্গার উপরেই। হঠাৎ একটা ফেরি-স্টীমারের ভেঁপু বেজে উঠল। সেই ডাকে ঘুম ভেঙে উঠেই বঙ্কিমবাবু ক্ষিতিবাবুকে জানিয়ে বললেন, 'ক্ষিতিদা বাঁশিতে ডেকেছে যে।' ধড়ফড় করে সবাই উঠে পড়ে যে যার কম্বলটি ঝেড়ে আবার পোঁটলা বেঁধে ফেললাম। স্টেশনেই হাতমুখ ধুয়ে উপস্থিত

আম্রকুঞ্জ

ছুটিতে দেশভ্রমণে

হলাম ফেরি ঘাটে। গঙ্গার উপরটা তখনো কুয়াশায় ঢাকা। পৌঁছে দেখি স্টীমার প্রস্তুত। আমরাও প্রস্তুত— টিকিট কেটে চটপট উঠে পড়া গেল। অনেকবার ভোঁপু বাজিয়ে তবে স্টীমার ছাড়ল এবং আধঘণ্টার মধ্যেই ও পারে পৌঁছে দিল। শুনলাম জায়গাটির নাম সৈয়দাবাদ। জাহাজ-ঘাট থেকে সোজা রাস্তায় খানিকটা হেঁটে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতো বাড়ির সামনে গিয়ে পড়লাম। বাড়িটি বস্তুতই প্রাসাদ—দেউড়িতে এক সিপাই সঙিন উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বঙ্কিমবাবু বললেন, 'আরে, এই তো মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর রাজপ্রাসাদ। খবর নেওয়া দরকার মহারাজা এখানেই আছেন কি না।' তখন সবে সূর্যের রক্তিমরাগ ফুটে উঠছে। দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, মহারাজা প্রাসাদেই রয়েছেন, তবে বৈঠকখানায় নামতে কিছু বিলম্ব আছে, আটটার আগে দেখা হবে না। বঙ্কিমবাবু বললেন, "মহারাজা যখন রয়েছেন তখন তো অপেক্ষা করাই কর্তব্য—নইলে অভদ্রতা হবে।' ক্ষিতিবাবু বললেন, 'রাজদর্শনে পুণ্য হয় এ কথা শাস্ত্রে লেখে।' সন্তোশ্বরবাবু মন্তব্য করলেন, 'এমন আড়াল দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না—জানতে পারলে মহারাজা বেজার হবেন।' সাব্যস্ত হল, আমরা তবে অপেক্ষাই করব। আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, মাস্টারমশায়রা আমাদের প্রাতরাশটির সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে গোড়াতেই মনঃস্থির করে এই পথে এসেছেন। অপেক্ষা করতে গিয়ে সময় যেন আর কাটে না। আটটা নাগাদ খবর এল, মহারাজা বৈঠকখানায় নেমে আমাদের তলব করেছেন। ক্ষিতিবাবুকে এগিয়ে দিয়ে বঙ্কিমবাবু ও সন্তোশ্বরবাবু আমাদের পিছনে রইলেন। বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই আমরা জোড়হস্তে প্রণতি জানালাম। অতি প্রশস্ত ঘর—মূল্যবান কাচের ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে ঢাল-তলোয়ার টাঙানো, নানা আকার-প্রকারের। দু-একটি আলমারিতে ছোটো বড়ো কামানের গোলা সযত্নে সাজানো রয়েছে। সাদা ফরাশের উপর মহারাজা বসেছেন। বেশ ফরসা চেহারা—গোঁফজোড়াতে একটু একটু পাক ধরেছে—পরনে সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি। প্রশান্ত মুখচ্ছবি, দেখলেই ভক্তি হয়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা?' ক্ষিতিবাবু বললেন তিনি এবং তাঁর দুটি সহকর্মী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক। জনকতক আশ্রমবালককে নিয়ে ভ্রমণে বের হয়ে মহারাজের প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—মহারাজা প্রাসাদেই রয়েছেন জেনে রাজদর্শন করে প্রণাম জানিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছে ছেলেদের। মহারাজা বললেন, 'রবিবাবু ভালো আছেন তো? আপনারা এসেছেন বলে ভারি খুশি হলাম। বসুন আপনারা—বাবারা, তোমরা বোসো। এখানে চার পাশে ঐতিহাসিক স্থান বিস্তর রয়েছে।—আপনাদের যখন পেয়েছি তখন সহজে যেতে দিচ্ছি নে। আমার এখানে হেডকোয়ার্টার করে চার দিক ভ্রমণ করে দেখুন। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। ঐ-যে গোলাগুলো দেখছেন, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র চাষ করতে করতে পাওয়া গিয়েছিল। পলাশী নিকটেই—সেটা অবশ্য দেখবেন।' এইরকম করে আশে পাশে যা-যা দেখবার সবগুলিই উল্লেখ করলেন। আশ্রম সম্বন্ধে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন। পিছন সন্তোশ্বরবাবু বঙ্কিমবাবুকে খুব নিচু গলায় বললেন, 'কেমন, বলেছিলাম না মহারাজা বেজার হবেন পাশ কাটিয়ে যদি চলে যেতাম।' ঠিক সেই সময়ে মহারাজের প্রশ্নের জবাবে ক্ষিতিবাবু বললেন যে, আশ্রমের ছেলেরা নিরামিষ আহারই করে থাকেন। শুনেই বঙ্কিমবাবু একটু নড়ে চড়ে উঠে সন্তোশ্বরবাবুর কানে কানে বললেন, 'দেখলে সন্তাদা, ক্ষিতিদার কাণ্ডটা দেখলে। রাজভবনে নিরামিষ আহার! আরে ছ্যা!' পরে আড়ালে ক্ষিতিবাবুকে তিরস্কার করায় তিনি বঙ্কিমবাবুকে বললেন, 'আরে, আমি তো বলেছি আশ্রমে ছেলেরা নিরামিষ খান। তাঁরা যে রাজবাড়িতেও নিরামিষ খাবেন এমন কথা তো আমি বলি নি।' কিছুক্ষণ পরে মহারাজা একজন কর্মচারীকে কী যেন বলায় সে ব্যক্তি আমাদের ইঙ্গিত করতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম এবং মহারাজকে আবার নমস্কার জানিয়ে কর্মচারীটির পিছু নিলাম। প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে গিয়ে গোটা ছুটিটারই ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় শিক্ষক ছাত্র সকলেরই খুব স্বস্তি বোধ হল।

কত হলঘর ও বারান্দা পেরিয়ে কত সিঁড়ি দিয়ে উঠে নেমে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একেবারে নীচের তলায় একটা প্রকাণ্ড ঘরে, যার তিন দিকেই গঙ্গা প্রবাহিত। মনে হয় প্রাসাদের একটা হাত যেন চলে গিয়েছে নদীবক্ষে। ঘরের তিন দিকে মেঝে থেকেই উঠেছে বড়ো বড়ো জানালা, যাতে করে ঘরের মেঝেতে বসেই দেখা যায়, যেন নদীপ্রবাহ চলেছে ঘরটি ঘিরে নিয়ে সাগরের দিকে। পরে শোনা গেল, ঐ ঘরটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে রানীমার স্নানের জন্যে গঙ্গার জল চলে যায় একেবারে প্রাসাদের অন্তঃপুরে। আমরা আমাদের বোঁচকাবুঁচকি খুলে এক খানা ধুতি ও গামছা বের করে নিয়ে সকলে মিলে গঙ্গায় স্নান করে সাঁতার দিয়ে অপূর্ব উল্লাস অনুভব করেছিলাম। স্নানান্তে নিজেদের কাপড় ও গেঞ্জি ধুয়ে নিঙড়িয়ে শুকোতে দিয়ে, আমরা যে যার কম্বলের আসন পেতে এখানে ওখানে নিরিবিলি বসে গেলাম আমাদের দৈনিক উপাসনায়। পরে শুনেছি, ঠিক সেই সময় রানীমা নাকি এসেছিলেন আশ্রমবালকদের দেখতে। এসে যখন দেখলেন ছেলেরা নিবিষ্টমনে ধ্যানাসনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, সে দৃশ্য নাকি রানীমার বড়ো ভালো লেগেছিল এবং ছেলেদের উদ্দেশে তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এর বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল যখন আমরা বেলা দশটা নাগাদ খেতে বসলাম। সে খাওয়াকে ভোজ বললেও যথোচিত হবে না। কত না ভাজাভুজি, ঝাল ঝোল, চাটনি, অম্বল—ছত্রিশ ব্যঞ্জনের কম হবে না। তারপর শুরু হল মিষ্টি-হরেক রকমের মিষ্টি—জিলিপি, পানতুয়া, আর রাজভোগ। কী বিশাল আকৃতি! পানতুয়ার জন্যে বহরমপুর অঞ্চলের যে নামডাক শোনা ছিল দেখলাম তা মিথ্যে নয়। নিরামিষ আহারের কথা শুনে বঙ্কিমবাবুর যে নৈরাশ্য হয়েছিল দু-চারটে মিষ্টি খেয়েই তার অবসান হয়ে মুখে হাসি ফুটে বের হল। তার উপর যখন এল বাদাম-কিশমিশ-দেওয়া পরমান্ন, তখন

সবাইতে হার মানতে হল। কিরণচন্দ্র সেবার আমাদের সঙ্গে ছিলেন কি না মনে নেই। থাকলে পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। আর না থেকে থাকেন তো পরে আমাদের কাছে ভোজের বর্ণনাটা শুনে আপশোষ-অনলে দগ্ধ হয়েছেন তাতেই বা সন্দেহ কী।

তারপর শুরু হল আমাদের ঐতিহাসিক-স্থান পরিদর্শন। কত যে দেখলাম জায়গা—যার খবর শুধু ইতিহাসের পাতায় পড়েছি। দেখলাম পলাশীর রণক্ষেত্র। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়েছে ডাকবাংলা পর্যন্ত। সামনেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ। ডাকবাংলোতে রয়েছে যুদ্ধের একটি মানচিত্র। সেটি ভালো করে দেখে নেমে পড়া গেল ধানক্ষেতের মধ্যে। এক জায়গায় একটি শান-বাঁধানো স্তম্ভে লেখা রয়েছে ইংরেজিতে: Right Flank of Mir Jaffer's Army। বেশ খানিকটা হেঁটে যাবার পর আর-একটি স্তম্ভ পাওয়া গেল যেটিতে লেখা আছে: Left Flank of Mir Jaffer's Army। বেশ বোঝা গেল মীরজাফরের সৈন্যদল কোন্ জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করে পা বাড়ায় নি এক কদম। দূরে নিশানী পেলাম: French Guns। বোঝা গেল ফরাসী গোলন্দাজরা কোথায় কামান সাজিয়েছিল। এইরকম কত স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলা তথা ভারতের অপমান ও দুর্দশার মূক সাক্ষী রূপে। লর্ড কার্জনের উৎসাহে এইসব চিহ্ন রক্ষা করা হয়েছে এবং এখনো লোপ পায়নি। ক্যাপ্টেন ক্লাইভের শিবির যে আমবাগানে ছিল তা এখন আর নেই—নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মোহনলাল কোথায় আহত হয়ে পড়ে ছিলেন এবং মারা গেলেন, মীরমদনের সমাধি, সমস্তই দেখলাম। আমাদের মানসচক্ষে এইসব বীরপুরুষেরা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন আমাদের তরুণ মনের কল্পনায়। আমরা সকলেই যেন কেমন বিমনা হয়ে গিয়েছিলাম। একটা মর্মবেদনায় যেন মুষড়ে পড়লাম। কেবলই মনে পড়তে লাগল বাংলার ভাগ্যহীন শেষ নবাবের করুণ কাহিনী। শত অপরাধ তাঁর ধুয়ে মুছে গিয়েছিল জীবনের অন্তিম আত্মোৎসর্গে।

দেখলাম হীরাঝিল, মতিঝিল, এক কালে যা নবাবের প্রমোদোদ্যান ছিল। সে শ্রী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল নবাবের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা যখন গিয়েছিলাম, দুটি ঝিলই কচুরিপানায় ছেয়ে গেছে। গেলাম সিরাজের সমাধি দেখতে। দেয়াল দিয়ে ঘেরা বেশ খানিকটা বাগান। মাঝে রয়েছে বড়ো একটি গম্বুজের তলায় শ্বেতপ্রস্তরের স্তূপ। উর্দু ফার্সি

গোয়ালপাড়ার রাস্তা

হরফে ও ভাষায় ক্ষিতিবাবু ছিলেন ওয়াকিফহাল। পড়ে তিনি বললেন, 'এটি নবাব আলিবর্দী খাঁর সমাধি।' সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ালাম। এই কবরের সামনেই প্রশস্ত একটি শান-বাঁধানো চাতাল, সেই চাতালের উপর ইঁট সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি একটু উঁচু উঁচু অসংখ্য কবর—নবাব-পরিবারের কত-না বিস্মৃত অজানা নর-নারীর শেষ আবাসস্থান। কোনো কবরে কারও নাম লেখা দেখলাম না। তাঁদের পরিচয় কেউ আর জানবে না কোনোদিন। এইসব নামগোত্রহীন হারানো কবরের মধ্যে একটির শিয়রে দেখা গেল একখানা সাদা প্রস্তরফলক। পড়ে ক্ষিতিবাবু বললেন, 'এইটিই নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সমাধি।' স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বহুক্ষণ। বাংলাদেশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাবের এই শেষ স্মৃতিচিহ্ন। এও রয়েছে লর্ড কার্জনের অনুকম্পায়। মনে হয় না আমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন সেদিন, সেই বাগানে সিরাজের এই পরিণাম দেখে যিনি বিচলিত হননি। বাগানে ঢোকবার সময় দেখেছিলাম প্রবেশদ্বারে এবং দেয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে কিংবা কয়লায় লেখা কত উত্তেজনাময় বাণী বা কবিতা—'জাগো সিরাজ! ওঠো সিরাজ!' স্পষ্ট বুঝলাম যে আমাদেরই মতো বহু তরুণের প্রাণ এইসব লেখায় আপন আপন মুহ্যমান হৃদয়ের বেদনাকে ভাষা দিতে চেষ্টা করেছে। মনে পড়ল বিদেশী বণিকের সাম্রাজ্যলিপ্সার, মনে পড়ল মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা। মনে পড়ল সর্বস্বহারা একাকিনী লুৎফউন্নিসার নিত্য অভিসার এই বিজন বনে। আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক অনাদৃত, সেনাপতি ও সামন্তগণের দ্বারা পরিত্যক্ত, হতভাগ্য স্বামীর সমাধিস্থলে প্রতি সন্ধ্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে একটি প্রদীপ জেলে এই পতিব্রতা নারী তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করতেন তাঁর বেদনাতুর চিত্তের অপরিসীম প্রেম—'ভুলিনি হে প্রিয়তম, তোমাকে ভুলিনি।' কী সকরুণ সে চিত্র, মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছিল। সেই নিত্য অভিসার কবে বন্ধ হয়ে গেছে—সে সন্ধ্যাদীপ আর তো কেউ জ্বালে না। আনতশিরে ক্ষুব্ধচিত্তে বের হয়ে এলাম সেই সমাধিক্ষেত্র থেকে।

তারপর আরো কত কী দেখলাম—জগৎশেঠের বাড়ি, মুর্শিদাবাদ-নবাবদের আধুনিক প্রাসাদ। আমরা শান্তিনিকেতনের ছাত্র বলে এবং নবাববাহাদুর তখন ছিলেন না বলে সে প্রাসাদে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছিলাম। মুর্শিদাবাদের যা দেখবার সব দেখে চললাম বহরমপুরে। প্রথমে দেখলাম সেখানকার রেশমীকুঠি। রেশম সম্বন্ধে মোটামুটি রকমের জ্ঞান আমাদের হয়েছিল জগদানন্দবাবুর কাছে গল্প শুনে আর সুধাকান্তের খাঁচায় পোষা গুটিপোকা দেখে দেখে। এখানে কত রকম পোকার কত স্তরের চেহারাই দেখলাম। তারপর জানলাম কেমন করে গুটি ফাটিয়ে প্রজাপতিটি বেরিয়ে যায়। দেখে নিলাম কী করে রেশমের সুতো তৈরি হয়, কী করে সেই সুতো থেকে কাপড় চাদর বোনে। তারপর চলে গেলাম দূরে নিবিড় বেলবনের মধ্যস্থিত এক শিবমন্দির দেখতে। কিংবদন্তী শুনেছি, সেই শিবমন্দিরের একটি কুঠরিতে বসেই নাকি বাংলাদেশের সিপাহী-বিদ্রোহের প্রথম গুপ্ত মন্ত্রণা হয়েছিল। আমাদের কিশোর বয়সে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোরে চলছিল, আমাদের মন নিঃশব্দে প্রস্তুত হচ্ছিল স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণের জন্যে। সুতরাং এই বিজন শিব-মন্দির দেখে ও তার গল্প শুনে আমাদের মন যে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী। এই মন্দিরে বিগ্রহের সামনে প্রণাম করতে গিয়ে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করবার সংকল্প করেছিলেন যে-সব সর্বত্যাগী স্বদেশভক্ত তাঁদের কথা স্মরণ করে মন আপ্লুত হয়েছিল সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায়। এই মন্দিরের বিগ্রহের নিয়মিত পূজা কেউ হয়তো আর করে না, সন্ধ্যারতির ধূপের ধোঁওয়া আর হয়তো ওঠে না, মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা হয়তো আর বাজে না—সে দিনও নেই সে লোকসমাগমও নেই। সেই-সকল বিদ্রোহী প্রাণের ব্যাকুলতার মূক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেবল ভাঙা দেউলের দেবতা।

[লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থের এক অধ্যায়। রেখাচিত্রগুলি শ্রীবিশ্বরূপ বসু কর্তৃক অঙ্কিত]

একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তিসম্পন্ন *

ম্যাকলীন্‌স্

পেরক্সাইড টুথপেস্ট

সব চেয়ে বেশী
* পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর প্লেক-পদার্থের [illegible] জীবাণুযুক্ত যে আচ্ছাদন পড়ে ম্যাকলীনস্ এর একান্ত নিজস্ব [illegible] তার প্রতিরোধ করে এবং [illegible] দিয়ে এই আচ্ছাদন উচ্ছেদ করে আপনার দাঁতকে আরও ফলপ্রদ ভাবে পরিষ্কার করে।

সব চেয়ে বেশী
* সাদা করে।

ম্যাকলীনস্ এর সুবিখ্যাত 'পেরক্সাইড' দাঁতের বিশ্রী দাগ ও বদ রং তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।

ম্যাকলীনস্

সব চেয়ে বেশী
* রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীনস্ এর অপূর্ব্ব তাজা আঘ্রাণ দাঁতের মাড়িকে শক্তিমান করছে এবং ক্ষয়কারী বীজাণুকে রোধ করছে।

সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

এই তিনটি গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীন্‌স্ কিনুন।

৩

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

আটাশ

শারদীয়া পূজোয় মহাষ্টমীর স্থান উচ্চ, বিশেষত এই কারণে যে দেবী-পক্ষ আরম্ভ হয় আশ্বিনের অমাবস্যার পরেই আর শেষ হয় তৎপরবর্তী পূর্ণিমায়, এবং মহাষ্টমীর স্থান হচ্ছে ঠিক তার মাঝখানে। মহালয়ার পর চন্দ্র প্রতি তিথিতে এক কলা বেড়ে বেড়ে মহাষ্টমীর সময় অর্ধবৃত্তাকার ধারণ করে, আর কোজাগরী পূর্ণিমায় পূর্ণপ্রকাশ প্রাপ্ত হয়। একথা যখন লিখছি, তখনই শুনতে পেলুম কলকাতা আকাশ-বাণীতে মহালয়ার আরম্ভ-সংগীতের সুর। সুতরাং কলমকে ছুটি দিয়ে এখন গান শুনি। পরে আবার লিখবো।

* * *

আশ্চর্য! রেডিও থেকে যে-সব সুর কাণে এল, তার 'সা' ঠিক আমার ঘরের ঘড়ির ঘণ্টার সঙ্গে মিলে গেছে! এ-ধরনের ঘটনাকে কেউ কেউ হয়তো Coincidence বলবেন, যেমন গান গাইতে গাইতে সময় সময় রাস্তা থেকে মোটরের হর্ন এমন শোনা যায় যে ঠিক ঐ সুরের 'সা'। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলে বলা যায় এ 'সা'-য় মোটরের হর্নের সায় আছে: শীঘ্রগতি পথচারী যেন ইঙ্গিত করে গেল মন্থর-গতি গৃহবাসীর সংগীতকে : বহুৎ আচ্ছা, ঠিক হ্যায়। কিন্তু আর দুটি ঘটনা বলছি, যার সামনে সায়েন্স এখনও কিছুকাল অবাক হয়ে থাকবে।

বন্ধুবর সংগীতজ্ঞ কৃষ্ণনাগরিক ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যাল এক সময়ে কলকাতায় ডাক্তারী প্র্যাকটিস করেছিলেন। তাঁর বাসা যখন মানিকতলা স্ট্রীটের একটি বাড়িতে, তখন একদিন সেখানে যাচ্ছি। হেদোর ধারে পৌঁছতে না পৌঁছতে মনে পড়ল একটা থাম্বাজ-রাগিনীর গান, আর তদনুসারে চলতে লাগলুম গলায় সেটিকে গুনগুনিয়ে আর পায়ে তার তাল ফেলে —যতটা সম্ভব আস্তে, যাতে রাস্তার লোক না ভাবে যে আমি একটা আস্ত পাগল। এইভাবে যেতে যেতে অমিয়নাথের ডেরায় গিয়ে যখন হাজির হলুম, তখন আমার কাণে ভেসে এল ওঁরই গলার গান, যার ঠিক ঐ 'সা' আর ঠিক ঐ সুর ও তাল। এতটা মিল-কে কেউ কি Coincidence বলবেন?

আর একটি ঘটনা এই। দুর্গাপূজো আর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর সময়ে আমাদের ঠাকুরবাড়িতে তখন থিয়েটার হোতো। তদুপলক্ষে চার রাত্তির ধরে হরেক রকম প্লে দেখার সুযোগ পেয়েছি বাল্যকাল থেকে অনেকবার। আলিবাবার অভিনয় যে কতবার হয়েছে তা গুণে বলতে পারি না যদিও তার গুণ-গান করি। এ-নাটকের গান আমার বরাবরই এত ভাল লেগেছে যে শুনে-শুনে-শুনে আবার শোনবার ইচ্ছে আজ পর্যন্ত থেকে গেছে। একবার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর দিন খবর পেলুম, একটি থিয়েটার-পার্টি সে-রাত্তিরে আলিবাবা প্লে করবে দুই আঙিনায়— আমাদের ঠাকুরবাড়িতে আর আমাদের 'ইন্দুবৌরানীর বাড়িতে যেখানকার পান-সাজার কথা বলেছি প্রমথ চৌধুরীর "কমলালয়ে" পান সাজার প্রসঙ্গে। শেষ রাত্তিরে আলিবাবা হবে, এ-খবর পেয়ে ভাবলুম একটু ঘুমিয়ে নিই—কপালে থাকে তো ঠিক সময়েই ঘুম ভেঙে যাবে। শুধু "ছিছি এত্তাজঞ্জাল"-টা শোনার ভারী ইচ্ছে। অ্যালার্ম-ওয়ালা ঘড়ি আমার ঠাকুরদাদার ছিল; আমার নেই। ভালই। যাচ্ছেতাই বিশ্রী আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙলে মেজাজ বিগড়ে যাওয়ার কথা। তবে তাঁর একটা ট্যাঁক-ঘড়ি ছিল মেকেবের তৈরী, যেটার পিন টিপলে শোনা যেত, কটা বেজে ক' মিনিট—'টুংটুং' আর 'টিং টিং' করে সুরেলা আওয়াজে সে ঘণ্টা-মিনিট দুই-ই জানিয়ে দিত। সে-ঘড়িও আমি পাইনি। সুতরাং কপাল ঠুকেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম থেকে ওঠার পর কি হ'ল, পরে বলছি। ততক্ষণ আলিবাবার গান সম্বন্ধে চৌধুরী পরিবারের মন্তব্য শোনাই—কালের পৌর্বাপর্য উপেক্ষা করে, কারণ নিদ্রাতুরের কালজ্ঞান থাকে না।

প্রমথবাবু তখন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে বসবাস করছেন। রবিবাবু স্বর্গগত, সুতরাং আমি সেখানে অধ্যাপক প্রবোধ সেনের আহ্বানে তাঁর অতিথি হয়ে একবার বৈশাখ মাসে যাই। দেখলুম, প্রমথ চৌধুরীর ক্ষুদ্র বাসভবনে প্রতি সন্ধ্যায় ছোট্ট আসর বসে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সবুজ-সভারই সেকেন্ড এডিশন। পূর্ব স্মৃতির স্মারক-চিহ্নের অভাব নেই। সেখানে ননী নামক ভৃত্যটিও

তখন রয়েছে। কথার ওপর Pun আর গল্পের ওপর গান আগেকার মতনই সম্মান পাচ্ছে। একটা বিলিতী সুরের স্বরলিপি আমায় লিখে দেবেন বলে মিসেস চৌধুরী আমাকে খুঁজতে বললেন তাঁর টেবিলের কলম। সে-কলমের মাথা আলগা থাকায় আমার হাত থেকে যখন ছুঁয়ে পড়ে গেল, তার শব্দ শুনে তিনি বললেন : কি, হারীত, কলমের মুণ্ডপাত হল বুঝি? গণেশের মুণ্ডপাতের কথা তখন শুনে-ছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর লেখনীর মুণ্ডপাত কখনো আমার কর্ণগোচর হয়নি। ইন্দিরা দেবী ব্যাসদেবের মতন ডিক্টেট করে গেলেন সেই বিলিতী সুরের স্বরলিপি, আর আমিও গণেশের মতন বুঝে লিখে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সিদ্ধিদাতার প্রসাদ না পাওয়ায় ততটা কৃতকার্য হইনি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন একটি পার্শী-মহিলা, যিনি তখন কলা-ভবনে ছবি-আঁকা শিখে নিচ্ছিলেন। ইন্দিরা দেবী তাঁকে 'রতি' বলে ডাকতেন। মেয়েটি

দেখতে-শুনতে ভালো, অর্থাৎ দেখতেও ভালো, শুনতেও ভালো,—ছবিও আঁকতেন, গীটারও বাজাতেন। তাঁর গীটারের সঙ্গে আমার গান গাওয়ার ব্যবস্থা করলেন ইন্দিরা দেবী। তার পরের দিন ছিল পূর্ণিমা। সুতরাং দুজনেই রাজী হলুম। রবি-কলায় গলা-যোগ দেবার সুযোগ দুর্লভ, এ-কথা তখন ভেবেছিলুম কিনা মনে নেই। কিন্তু এখন ভাবছি, পূর্ণিমার চাঁদ আমায় চিরকালই ঠকিয়ে আসছে।

শৈশবে মাতৃস্থানীয়াদের মুখে ডাক শুনেছি : "আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, খোকার কপালে টী দিয়ে যা।" টী পেয়েছি পরে, যা সোমরসের পর্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ চা। বোধ হয় "টী দিয়ে যা" মানে "চা দিয়ে চলে যা"। কিন্তু "আয় চাঁদ" কাতো আদরের ডাক! সে-ডাক শুনে কি চাঁদ না এসে থাকতে পারে? এসেছিল নিশ্চয়। টী দিয়ে চলে গেছে। পোড়া-মুখ দেখাবার জন্যে আসে একবার তার মুখসর্বস্ব চেহারাটা দেখিয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিলে চাঁদের "মুখ-পোড়া"-আখ্যাই প্রাপ্য মনে হয়। কবি যাকে কলঙ্ক বলেছে, বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে যে সেগুলো হচ্ছে আগ্নেয় গিরির ধ্বংসাবশেষ। অর্থাৎ নিজের আগুনেই সে নিজের মুখ পুড়িয়েছে। রুশ দেশের বৈজ্ঞানিকরা যে তাকে রকেট ছুড়ে মেরেছে, বেশ করেছে। চাঁদের আর একটি পোড়া-দিকের ছবি পাঁইই সে শাস্তি পাবে। পাছে প্রদর্শিত সে এখনো পরাঙ্মুখ।

Astronomy-তে শেখানো হয়, চন্দ্রের অপর পিঠ আমরা দেখতে পাই না এই কারণে যে তার পৃথিবী পরিক্রমণে যে সময় লাগে ঠিক সেই সময়েই লাগে তার নিজের অক্ষের ওপর একবার ঘুরে যেতে। কিন্তু এটাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা যায় না—কেননা যা দেখি সেইই বর্ণনা মাত্র। কেন যে চাঁদের পীরিয়ড অফ রেভল্যুশন আর পীরিয়ড অফ রোটেশন সমান, সে-প্রশ্নকে চাপা দেওয়া হল। বুঝি বৈজ্ঞানিকদের ইচ্ছে, চাঁদের ও-পিঠটার ছবি তুলে নেন। সে ইচ্ছা পূর্ণ হলেও বিজ্ঞান আমাদের বোঝাতে পারবে না, চন্দ্র কেন এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। আমার মনে হয়, সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, কারও কথা শোনে না, ধরণী-গর্ভ-সম্ভূত চন্দ্রও তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে তার গর্ভধারিণীর দিকে। এই ধরণীকে ভালবেসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে সবুজ পাতা ছেয়ে আছে চির-যৌবনের আশ্বাস নিয়ে। তাই চাঁদও চেয়ে থাকবে আমাদের দিকে চিরকাল।

Geography-তে শেখে, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। এবং জোয়ার-ভাটার সন্ধান যারা জানে তারা এটাও জানে যে, চাঁদের টান জলের ওপরই বেশি। এতে মাটির মনে হিংসে একটু হতে পারে, কিন্তু রাগ হওয়া উচিত নয়। জলের দেহ নরম, সুতরাং তাকে কাছে টানা সোজা। তাই জলের ওপর খেলা করে যায় চাঁদের আলোর ঝরণা-ধারা।

সাগর-ময় সূর্যের জলক্রীড়াকে লক্ষ্য করে একটি ইউরোপীয় ভাবকে সুন্দর কথা বলে গেছেন। মূল গদ্য-রূপটি ভুলে গেছি। শখের মাথায় তার যে সংস্কৃত অনুবাদ করে ছন্দে বেঁধেছিলুম সেটা মনে আছে :

> জলস্য হাস্যং কিরণোর্মিসংগমে
> তরঙ্গভঙ্গে ভ্রূকুটি শ্চ বেদিতা
> নিরংকুশত্বং খলু নির্ঝরে সদা
> রুষো মহত্ত্ব সফেনগর্জনে।

এখানে অবশ্য 'হীরো' করা হয়েছে জল-দেবতাকে। আমি কিন্তু আরতি সাহার মতন ইংলিশ চ্যানেল পার না হয়েও জাহাজে দাঁড়িয়েই লক্ষ-হীরার সৃষ্টি দেখেছি সাগর-বক্ষে, যখন রবির আলো সাড়া দিল সাগর-পারে, আর চক্র-গতি-ছন্দে উজ্জ্বল জলদল হীরের ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে, নৃত্যের তালে তালে।

গোদাবরীর উৎস-সন্ধানে গিয়েও দেখেছি, সূর্যের আলো পেয়ে জল হীরের মতন জ্বল-জ্বল করছে, যেন অহ্লাদে আটখানা। আবার পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে, যেন জানাতে চায়, মধুরভাবে, স্রোতস্বতীর প্রসব-বেদনা। এ-দৃশ্য থেকে সৃষ্টি-তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না, কেবল তার মহিমাই উপলব্ধি করা যায়।

সূর্যের আলো যখন চন্দ্রে গিয়ে পড়ে, আর আমরা তারপর চন্দ্রলোক থেকে পূর্ণভাবে পাই, তখন আমরা বলি : পূর্ণিমা হয়েছে। এই ধার-করা আলোর ধার কম, কিন্তু কদর বেশি। চন্দ্রলোক থেকে সাকার হয়ে এসে চন্দ্রালোক জলে পড়লেও স্বীকার করে না যে সে সত্যি জলেই পড়েছে। তার অধঃপতনের ফলে যে মাধুর্যের সৃষ্টি হয় তা সব দেশের কাব্যে প্রশস্তি পেয়েছে। আমি কবি নই। কেবল পূর্ণিমার চাঁদ কেমন করে একদিন জল-তরঙ্গে নেমে আমার নয়ন-মন রস-সিক্ত করেছিল, তার গল্প বলতে চাই।

দামোদর নদীতে সে-বছর ভীষণ বন্যা। বরাকর নদী—যা অনেক বার হেঁটে পার হয়ে গেছি—সেই বন্যার ফলে তখন স্রোতস্বতী। বরাকরে আকর-কার্যে ব্যাপৃত বন্ধুবর সুকুমার রক্ষিতের ডাকে আমি প্রায়ই বছরে-বছরে সাড়া দিতুম। সে-বছরেও দিয়েছিলুম। তাঁর বাংলো যে-গ্রামের লাগাও, তার নাম 'রাধানগর'। তাই একবার যখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলুম তখন সুকুমারের চিঠি পেলুম যে নাগরিক থাকতে হলে আমায় কৃষ্ণ আর রাধা দুজনেরই টান সহ্য করতে হবে। করতে কোনো কষ্ট হয়নি। বন্যার প্রকোপ হ্রাস হওয়ার পর সুকুমারের কন্যা অনুরোধ জানালে : চলুন, আমরা সবাই মিলে বরাকর ব্রিজে বেড়াতে যাই।—পূর্ণিমার চাঁদ এখনো মেঘে ঢাকা, কি দেখব সেখানে? পূরবী বললে : কেন? একবার শান্তি-নিকেতনে রবি ঠাকুরকে দর্শন করে এখানে যখন এসেছিলেন, তখন কি আপনাকে দেখাইনি, আমাদের বাড়ির পেছনে লেকের ধারে কেমন রবির আলো ফুটে ওঠে?—হ্যাঁ, সত্যি চমৎকার।—আপনি কি তখন বলেন

নি, রবি ঠাকুর আমায় না দেখেও আমার নাম দিয়ে একটি কবিতার বই লিখেছেন? —বলেছিলুম নিশ্চয়। কিন্তু তুমি তো তার ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলে, সেটা বুঝি ভুলে গেছ?—ভুলি নি। তাঁর নাম আর আমার নাম দিয়ে আপনি যে পদ্য লিখেছিলেন, সেটা মুখস্থ করে রেখেছি, বলব?...বারণ করলেও বলব:—

পূরবীর কবি কহিতেছে রবি,
নিবে যাবে মোর আলো।
সুরতির সাজে সাজিয়া যে সাঁঝে
আসিবে, সে ঘোর কালো॥
কোরো না তাহারে ভয়।
স্বপনের কোলে ধীরে যেও চলে,
আপনি হবে সে লয়।
প্রভাতে উঠিয়া দেখিবে লুটিয়া
পড়িয়া হয়েছে ক্ষয়॥

অকবির রচনা, মেয়েটি কিন্তু ঠিক মনে রেখেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর আবদার মেনে নিলুম। তাদের মোটরে চড়ে তার মা, বাবা, মাসীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম বরাকরের সেতুতে।

নিম্নে খরস্রোত সশব্দে বহমান। এত খাদের সুর ওখানকার কয়লা-খনির খাদে নেমেও কখনো শুনিনি। দেখতে দেখতে আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে এলো। পূর্ণিমার চাঁদ যেন জল থেকে ভেসে উঠল। জলতরঙ্গে ফুটল তার মুক্ত মধুর হাসি। ঢেউগুলো সব পলকে পলকে পুলকের ছোঁয়া জানিয়ে খুসি! পূরবী বললে: সেই গানটা গান—ও-ও-ও-ও গো-ও তুমি পঞ্চদশী, ও-ও-ও-ও গো-ও-ও-ও পঞ্চদশী, তুমি পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।

অবান্তর? কক্ষনো নয়। পূর্ণিমার চাঁদ কবে কোথায় আমায় ঠকিয়ে খুসি করেছে, তা বলব না? আচ্ছা না হয় যেখানে থেকে গতি-পরিবর্তন করেছিলুম, এইবার সেখানেই ফিরে যাই। সে-ও পূর্ণিমার ঘটনা, প্রমথ চৌধুরীর সামনে ঘটেছিল, এই যা তফাৎ। হ্যাঁ পূরবী মেয়েটি তো ইন্দিরা দেবীর কথা-মত গীটার নিয়ে এসে বসলেন। প্রথমটা ধরলেন নিজের খেয়াল মত একছত্র আলিবাবার গানের সুর—পিড়িং-পিড়িং করে তাঁর গীটারে। আমি চমকে উঠলুম। শান্তিনিকেতনে আলিবাবার গান? ভাবলুম, হয়তো বা কেউ কেবল সুরটি নিয়েছে, কথা বদলে দিয়েছে। এমনও ত হয়। কৌতূহলী আমি প্রশ্ন করলুম: এ-সুর আপনি পেলেন কোথায়? উত্তর আসতে বিলম্ব হয়নি: কেন? মাতু বোসের কাছ থেকে। বোঝা গেল মধু বোসের আলিবাবা-ফিল্মের রেকর্ড থেকে। বলে ফেললুম, প্রমথবাবুকে শুনিয়েই: কেন তা জানি না, কিন্তু আলিবাবার গান আমার বড্ডো ভাল লাগে।—কথাটা বলেই জিভ কেটে ফেলেছি। ইন্দিরা দেবী কি একটা সেলাই করছিলেন। তিনি সেলাই না ছেড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন: আলিবাবার গান তোমার ভাল লাগে? আমি তো ভয়ে কাঠ! মনে মনে বললুম: এই রে: বকুনি খেতে হবে এবার। ভরসা কেবল এই যে, উনি ভর্ৎসনা করবার সময়েও ভদ্রতা ভুলে যান না। বেশিক্ষণ এ-রকম ভাবতে হয়নি। সেলাইটা ঝপ করে হাত থেকে টেবিলে ফেলে দিয়ে বললেন: আলিবাবার গান? ওর প্রত্যেকটি অনবদ্য! আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সাহস পেয়ে নাচের কথা তুলতে প্রমথবাবু মুখ খুললেন: নেপা বোসের নাচ আমি অনেকবার দেখেছি। সেই তো আবদাল্লা সেজে মর্জিনার সঙ্গে নাচে। খুব ভাল সে-নাচ।—আলিবাবার গানে কে সুর দিয়েছিলেন, জানি না। সম্ভবত রামতারণ সান্যাল।

রবির গীটারের সঙ্গে কী গান গেয়েছিলুম সেদিন ভুলে গেছি। তবে মনে আছে, টেরাসের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ হামলা করায় শ্রীমতী চৌধুরাণী বললেন: রোমান্স যদি ভাল করে পেতে চাও হারাই তাহলে বিজলী বাতিটা নিবিয়ে দাও।—দিলুম। কিন্তু আমার অন্তরে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। এখন মনে হয়, সেটা ক্ষণপ্রভা। পূর্ণিমার চাঁদও আমায় রোমান্স দিয়ে যায়নি। শিশু-কালে কপালে যে 'টী' দিয়ে গেছে, সেই-'টী'ই আমার সম্বল।

বলেছি, সেই কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বিশেষ করে আলিবাবার একটা গান শোনবার ইচ্ছে নিয়ে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন রাত্রের দুটো কি আড়াইটে। চা না খেয়ে তো বেরুনো যায় না। যে 'টী' শিশুকালে পেয়েছিলাম সে-টী যেন ড্যাম্প লেগে খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু স্পিরিট ঠিক আছে, ড্যাম্প হয়নি। স্পিরিট দিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে বোঁ করে এক পেয়ালা চা তৈরি করে নিলাম। শেষে বেরুবো, ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পৌনে তিনটে। ঐ যাঃ! এতক্ষণ কি "ছি ছি এত্তা জঞ্জাল"—গানটা হয়ে যায়নি? কী ঘুম বাবা! একটু আগে ভাঙতে পারলি না? নিদ্রাদেবীকে এ-ভাবে তুই-তোকারী করাটা উচিত নয়, একথা আজ-

কালকার সভ্য-সমাজ বলবে বটে, কিন্তু ভক্ত রামপ্রসাদের গানে তো শ্যামা-মাকে তুই-মুই করা আছে। সুতরাং একটা বড় নজীর হাতে পেলুম। তাছাড়া নিদ্রাদেবীর আগমনের আগে আমি যে-মাকে ভজনা করেছিলুম, তিনি স্বর-গ্রামের মা— সুর-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুরু-দুরু বক্ষে আমি 'ইন্দু বোরাণীর আঙিনায় যখন প্রবেশ করলুম, দেখি ড্রপ-সীন উঠে গেছে, আর ময়ূর-পুচ্ছের সম্মার্জনী-হস্তে দণ্ডায়মানা মর্জিনা গান ধরেছে : ছিছি এত্তা জঞ্জাল, এত্তা বড়া বাড়িমে এত্তা জঞ্জাল! মর্জিনার মর্জি না হলে এ-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারতুম বটে। কিন্তু মর্জি দিলেন কে? 'কো জাগর্তি' এ-প্রশ্ন নিয়ে এলেন কে—লক্ষ্মী, না সরস্বতী? কেবল ডাবের জল খেয়ে যখন আমি রাত্রি-জাগরণ করিনি তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে লক্ষ্মী নিশ্চয় এসেছিলেন কিন্তু আমায় ঘুমন্ত দেখে চলে গেছেন। আমার সৌভাগ্য-দাত্রী হলেন সরস্বতী।

সবুজপত্রের ডাকে প্রথমেই বলেছি, প্রমথ চৌধুরীর প্রথম দর্শন যেখানে পাই, সেই "কমলালয়"-কে মনে হয়েছিল যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন-কেন্দ্র। এই দুই দেবতার সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে ওঁর মত একটু পরে জানাবো। তার আগে আমার একটা আপত্তি পেশ করবার আছে।

অন্যায় করেছি। বিজয়া দশমীকে প্রণাম না জানিয়ে কোজাগরী পূর্ণিমার কথা বলেছি। প্রমথ চৌধুরী বছরের পর বছর আমায় বিজয়ার আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন, সুতরাং বিজয়া উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আমার কর্তব্য। হয়তো ক্ষমা চাইতে পারি এই বলে যে, বিজয়ার নমস্কার লক্ষ্মী-পুজো পর্যন্ত করা চলে। এ-প্রথার মর্মকথা বোঝা সোজা। যুদ্ধে বিজয়ের পর লক্ষ্মী-শ্রী লাভ হবে এ আশা নিয়েই মানুষ যুদ্ধ করে। জয়-লাভের পর জয়শ্রী-লাভ উৎসাহ-সাপেক্ষ, এই হিতোপদেশ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে কল্পনা করা হয়েছে যে, নিদ্রাতুর লোকের কাছে সম্পদ হাতে করে এসেও লক্ষ্মীদেবী ফিরে যান।

কিন্তু বিজয়ার শান্তির জল না পেলে তো আর লক্ষ্মীলাভ হয় না। সিংহ-বাহিনী দুর্গার বিজয়-বার্তা ঘোষণা করাই যখন বিজয়া-দশমীর প্রধান উদ্দেশ্য, তখন এ-প্রশ্ন ওঠে—জয়মাল্য প্রাপ্য কার? দেবীর না তাঁর বাহনের? পূর্বে বলেছি, কুষাণ রাজা হুবিষ্কের মুদ্রাতেই আমরা সিংহ-বাহিনীর প্রথম সাক্ষাৎ পাই। তার আগে কনিষ্কের মুদ্রাতে কেবল দেবীর মূর্তি আছে। তারও আগে শবলেশ নামক রাজার মুদ্রায় কেবল বাহনের রূপ দেখা যায়।

এই তিন প্রকার মুদ্রাতেই গ্রীক অক্ষরে 'ননা' লেখা। গ্রীক মুদ্রার রীতিকে স্মরণ রাখলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে দেবীর বাহন সিংহকে এখানে দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে। এখনকার দুর্গা-প্রতিমাতেও সিংহের বিক্রম স্পষ্ট করা হয়ে থাকে—তার কামড়েই মহিষাসুর কাবু। আমার বিচারে, জয়ের জন্যে মালা সিংহকেই দেওয়া উচিত। অন্য বিচারক দেবী-পক্ষে 'ভোট' দিলে একটা 'টাই' হতে পারে। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমার বিশ্বাস, যিনি 'আম্পায়ার' হবেন তিনিও মালা সিংহকেই দিতে বলবেন। ফলে আমার বা তাঁর লক্ষ্মীলাভ হলেও হতে পারে, কেননা সংস্কৃত বচন আছে : উদ্যোগিনং পুরুষ-সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

আমাদের যেমন বিজয়া-দশমীতে শান্তি নিয়ে মিষ্টি-মুখ করার ব্যবস্থা রয়েছে, রোমানদেরও তেমনি পয়লা জানুয়ারীতে শান্তি-দেবকে স্মরণ করে মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। উভয়ের উদ্দেশ্য সমান—নূতন বৎসরকে মিষ্ট সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা। নতুন কাপড়, নতুন জামা, নতুন জুতো—সবের মধ্যেই নূতনের সূচনা।

১৯১৮ সালের পয়লা জানুয়ারীতে যখন সত্যেন বোসের চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ হল, তখন আমাদের বাড়িতে যে সবুজ সভার বৈঠক বসেছিল, সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাবার একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু—রসরাজ 'অমৃতলাল বসু। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সেদিন তাঁর প্রথম পরিচয় হল। দুজনেই খুব খুসি। আমিও খুসি, কারণ আমি জানতুম যে হাসির জন্যে ওঁদের দুজনেরই মন কাঁদে।

ইংরেজদের নিউ ইয়ার্স ডে-কে আমরা যেন ডেকে আনলুম। এইরকম একটা মনোভাব প্রমথ চৌধুরীর বোধ হয় হয়েছিল, কেননা উনি আমায় লিখলেন—

৫৫

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ, ১০।১।১৮

কল্যাণীয়েষু—

আমার নতুন ইংরাজি লেখাটা শেষ করেছি—আসছে শনিবারে সেটি 'সবুজে পাত্র'দের পড়ে শোনাবার ইচ্ছে আছে। তুমি সেদিন বিকেলে অবিশ্যি করে এসো। না এলে একটি সমজদার শ্রোতা হারাব। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

পত্রোত্তরে সে-শনিবারে গিয়েছিলুম নিশ্চয়। কিন্তু নূতন ইংরাজী বৎসরের নতুন ইংরিজী লেখাটির বিষয়-বস্তু কি ছিল তা মনে পড়ছে না। তার পরের শনিবারে ও'র ওখানে যাবার কথা ছিল বটে, তবে যাওয়া ঘটে উঠেনি, কারণ এ-পাড়াতেই কোনো বন্ধুর বিয়ের বৌভাতে নেমন্তন্ন যেতে হল। প্রমথবাবু সেদিন আমায় অ্যাবসেণ্ট্-মার্ক করেই ক্ষান্ত হননি, চিঠিতেও ঠোকা দিয়েছিলেন।

৫৬

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ ২৪।১।১৮

কল্যাণীয়েষু,

গত শনিবারে ত তোমরা কেউ আসতে পারলে না। আশা করি সামনের শনিবারে তোমার কোন বন্ধুর বিবাহের বৌভাতে যেতে হবে না। অন্য কোনও বাধা না থাকলে সেদিন আমাদের বৈকালিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ো। পাঁচজন মিলে "রাজা রুদ্ভির" মারা যাবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

পণ্ডিতী ভাষায় বৌ-ভাতকে 'পাক-স্পর্শ' বলে। কুমারী যখন বধূ হন, তাঁর গোত্র-পরিবর্তন হয়ে যায়—তিনি শ্বশুর-কুলের গোত্র পান। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাত-গোত্তর-রা যে তাঁকে বাড়ির বৌ বলে মেনে নিলেন, তার প্রমাণ ত চাই। নববধূর হস্ত পাক-করা অন্ন গ্রহণ করলে এ-কার্যটি সিদ্ধ হয়। দুঃখের বিষয়, বৌভাত—যথার্থ বৌভাত—আজকাল উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। তার বদলে হয় প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণ, আর হাল আমলের আইন-মত নিমন্ত্রণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, অনেক সময়ে। কিন্তু বৌ-এর হাতের রান্না কেমন, সেটা টের পাওয়া যায় কোথা? আজকাল গৃহলক্ষ্মীরা অনেকেরই গৃহ-সরস্বতী হতে চান। গান না গেয়ে রান্না করতে যাওয়াটা যেন কেমন-কেমন লাগে।

মনু-স্মৃতিতে বলে তৌর্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্য হচ্ছে কামজ ব্যসন, সুতরাং রাজার পরিহার্য। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও নাচ-গান-বাজনার ওপর আক্রোশ দেখা যায়। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে পাই সংগীতের ভূয়সী প্রশংসা, এবং রাজার পক্ষে বিহিত বিধান হচ্ছে রোজ সন্ধ্যের পর অন্দরমহলে নাচ-গান-বাজনা উপভোগ করা। মনুস্মৃতিতে নারী-প্রশংসা-প্রসংগে বলা আছে যে তাঁরা গৃহ-দীপ্তি অর্থাৎ ঘর আলো করে রাখেন (ভাগ্যিস্! সেকালে ARP ছিল না!), আর 'শ্রিয়ংশ্রিয়শ্চ গেহেষু নাস্তি ভেদো কথঞ্চন, অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছেন গৃহলক্ষ্মী। সবচেয়ে বড় প্রশংসা যে-শ্লোকে পাই, সেই শ্লোককে বড় নিন্দা বলে ধরে নিয়েছেন কেউ কেউ ঃ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ মহাভারতে 'স্ত্রী প্রশংসা'-অধ্যায়ের মুকুটমণি এই শ্লোক। এবং তার পরেই 'স্ত্রী-নিন্দা'-অধ্যায়ে যা বলা আছে (আদি বেশ্যা পঞ্চচূড়ার মুখ দিয়ে) তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। এই দুটি ঘন-সন্নিবিষ্ট অধ্যায়ের উক্তিগুলি মনু-স্মৃতির নবম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে মেলে এবং এই স্মৃতিতে ঐ উক্তিগুলি সাজানো আছে এমনভাবে যেন পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ আর সিদ্ধান্ত।

এখন মনু-স্মৃতিকে রেহাই দিয়ে আবার প্রমথ-প্রসংগে আসা যাক্। প্রমথবাবুর ১।২।১৮ তারিখের পত্রে তাঁর 'স্ত্রী-প্রশংসা' আছে।

৫৭

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ ১।২।১৮

কল্যাণীয়েষু,

কাল পারো ত বিকেলে আমার এখানে এসো। এক গল্প করা ছাড়া অপর কোনও কাজ নেই। লেখা আজকাল আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌ছে না—সুতরাং কোনও নতুন লেখা শোনাতে পারব না। গান বাজনাও একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে গান শুনতে চাও যদি, তাহলে শ্রীমতী সরলা দেবীর গান শোনাতে পারি। তিনি সম্প্রতি লাহোর থেকে কলিকাতায় এসেছেন এবং খুব সম্ভবতঃ কাল সন্ধ্যাবেলা আমার ওখানে উপস্থিত থাকবেন।

সুধীন্দ্রকে বলো তার যখন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর লেখা অত পছন্দ হয়েছে, তখন তাকে তাঁরই শিষ্য করে দেব। সুধীন্দ্র দেখতে পাচ্ছি একটা সত্য আবিষ্কার করেছে—সে-সত্য এই যে আমার বাড়ির সদরটা radical আর অন্দরটা conservative, এ-ব্যবস্থা আসলে মন্দ নয়। ও না হলে আমাদের মত শিকলি-ছেঁড়া লোককে ঘরে রাখাই কঠিন হত। তবে বাঙালী জীবনের বৈচিত্র্য আছে। আমি দু'এক পরিবার জানি যাদের সদরটা conservative আর মফঃস্বলটা radical সুতরাং লিখতে জানলে গল্পের খোরাক আমাদের সমাজেও কম পাওয়া যায় না। যাক এ-বিষয়ে বক্তৃতা মুখে করা যাবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পুঃ—ভালো কথা, পারো ত কাল সুধীন্দ্রকেও সংগে নিয়ে এসো।

পত্রোক্ত শ্রীমতী সরলা দেবীর মুখে শুনলুম, লাহোরের স্থানীয় প্রসিদ্ধি এই যে তাঁর স্বামী ছিলেন বিখ্যাত 'পোরাস্'-রাজার বংশধর। এ-কথা যখন শুনি, তখন আমার মনও ঐ পোরাস্-এর যুগে বাস করছে, আর ঐতিহাসিকদের এ-অনুমান আমার অজ্ঞাত ছিল না যে, 'পোরাস্'-নামটি 'পৌরব'-শব্দেরই প্রতীচ্য রূপান্তর। পুরাণে রাজ বংশকথন-প্রসংগে বলা আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অর্জুনের বংশধর-রা, যাঁরা প্রথমে হস্তিনাপুরে এবং পরে কৌশাম্বীতে রাজত্ব করেন, তাঁরাই 'পৌরব'। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় (ইংরিজীতে লেখা) আমি প্রমাণ দেখিয়েছি যে অর্জুনেরই এক বংশধর, এবং তৎসম যুগপৎ যোদ্ধা ও প্রেমিক, যাঁকে 'বৎসরাজ
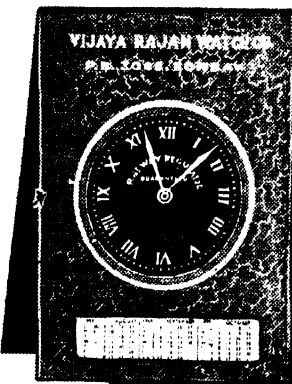
উদয়ন' কন্যা হয়, পৌরব-বংশের লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করেন। ভাসের দুটি নাটক, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তা, আমাদের কাছে সাক্ষ্যদান করছে যে, উদয়নের প্রথমা পত্নী ছিলেন অবন্তি-রাজ প্রদ্যোত-মহাসেনের দুহিতা বাসবদত্তা এবং দ্বিতীয়া পত্নী হলেন মগধ-রাজ দর্শকের ভগিনী (অজাতশত্রুর কন্যা) পদ্মাবতী। হর্ষের রত্নাবলী-নাটকে উদয়নের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যে-ভাবে দেওয়া আছে, তার থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা যায় যে তিনি সত্যই সার্বভৌম রাজা হয়েছিলেন। বৃহৎকথায় তাঁর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলা আছে যে তিনি মগধে ও অবন্তিতে পূজিত হয়েছিলেন।

সিংহলের ইতিহাস 'মহাবংশ' বলে যে, 'নাগ-দাসক' অর্থাৎ শিশুনাগ-বংশীয় দর্শক, পুরবাসী-কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন, এবং শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক-নাটকের নাটকীয়তা বাদ দিলে বোঝা যায় যে, অবন্তি-রাজ পালক (প্রদ্যোতের পুত্র) পশুবৎ নিহত হন এবং তারপর 'গোপাল প্রকৃতি আর্য' অর্থাৎ বৎসরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কালিদাসের কালেও অবন্তিতে উদয়ন-কথা-কোবিদ গ্রাম-বৃদ্ধ অনেক ছিলেন। বিশেষ করে অবন্তির কথা কালিদাস বলেছেন এই কারণে যে, বিরহী যক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠাচ্ছেন তাঁর অলকাস্থিতা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে এবং উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেমের স্থান ছিল অবন্তি যেখানে তিনি বন্দী—অবস্থাতে তাঁর বীণা বাজিয়ে বাসবদত্তার মন হরণ করেন। প্রদ্যোত-মহাসেনকে বৌদ্ধ সাহিত্যে 'চণ্ড প্রজ্জোত' বলা আছে, যেমন তাঁকে অশোকের বর্ণনায় তাঁকে 'চণ্ড-অশোক' বলা হয়েছে। উদয়ন সেই প্রচণ্ড যোদ্ধা প্রদ্যোতকে কলা দেখিয়ে যখন বাসবদত্তাকে হরণ করে নিয়ে যান, তখন হয়তো তাঁর পূর্বপুরুষ অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ বৃত্তান্ত স্মরণ করেছিলেন।

আমার বিশ্বাস যে-মহাভারত আমরা শত-সাহস্রী-সংহিতা-রূপে পেয়েছি, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল উদয়নের সময়ে এবং তাঁরই সহায়তায়। অর্জুনই মহাভারতের আসল 'হীরো'।

উদয়ন বাহুবলে এবং বিবাহ বলে একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যার বিস্তার বঙ্গোপসাগর থেকে আরব-সাগর পর্যন্ত। এই সংহতি সাধন হওয়ার ফলেই পারস্য সাম্রাজ্য পঞ্জাব আর সিন্ধুদেশের চাইতে বেশি এদিকে এগোতে পারেনি। তিনি পাটলীপুত্রে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন এবং পৌত্র মহানন্দী-এঁরা ছিলেন 'পূর্ব-নন্দ'। মহানন্দীর এক শূদ্রানী মহিষীর গর্ভজাত মহাপদ্ম এবং মহাপদ্মের আট পুত্র (সহলি-প্রভৃতি)—এঁরা হলেন 'নব-নন্দ'। চাণক্যের চেষ্টায় নব-নন্দ'-দের উচ্ছেদ-সাধন হল; এবং 'পূর্ব-নন্দ'-বংশীয় অভিজাত চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করলেন। জয়স্বালই প্রথমে নব-নন্দের নব-ব্যাখ্যা দেন।

প্রমথ চৌধুরী ১৬।১১।১৭ তারিখের পত্রে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, চন্দ্রগুপ্তের একটা "হেস্ত-নেস্ত" করে ফেলি। ১৯১৮ সালে জয়স্বাল-সম্পাদিত বিহার উড়িষ্যা জর্নালে আমার যে প্রবন্ধ ছাপা হল, তাতে ঐ হেস্ত-নেস্ত করা আছে। এখন আর চন্দ্রগুপ্তকে কেউ অনভিজাত বলেন না।

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ স্মরণ-যোগ্য। সে-প্রবন্ধ—"ভারতবর্ষের ঐক্য" প্রকাশ হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এ-প্রবন্ধকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাতে প্রমথবাবু বলেছিলেন, চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে মনোভাব ছিল সেটা বৈদিক নয়, সম্ভবতঃ আর্যও নয়। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রে ধর্মশাস্ত্রের স্থান নীচু করা আছে। 'কৌটিল্যের মতে রাজশাসন সকল ধর্মের উপরে। একথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনোই মেনে নেননি।' আমার সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে, কৌটিলীয় মতটি পারস্য-রাজনীতি থেকে ধার করা। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সেলিউকাস যখন পারস্য দেশের অধীশ্বর হন, তখন শুনেছেন সেখানে রাজ-শাসনই হচ্ছে 'ল'। কিন্তু আমাদের দেশে এই মতের প্রথম প্রবর্তক কৌটিল্য নন—তাঁর পূর্বেই মহাপদ্ম-নন্দ এই মতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুরাণেও পাই, মহাপদ্ম "অনুল্লঙ্ঘিত-শাসন" ছিলেন। তাঁর সমকালীন পারস্য-রাজ দ্বিতীয় দারয়বুস (Darius II, Nothus) তাঁরই মতন অনভিজাত ছিলেন এবং এ-দুই রাজার মধ্যে কি-রকম সদ্ভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় Ctesias-এর বিবরণে। এই পারস্য প্রভাবের ফলে যে 'ব্যুরোক্রাসি' (bureaucracy) ভারতের শাসন-প্রণালীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, সেইটেই কৌটিল্য বহাল রাখলেন, কিছু অদল-বদল করে। মোগল-সাম্রাজ্যে সেই প্রণালী নানা পরিমাণে অনুসৃত হয়েছিল এবং ইংরেজ আমলেও এই মামুলী শাসনপদ্ধতির মোটামুটি বজায় আছে, দেখা যায়।

প্রমথ চৌধুরী শুধু ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র আলোচনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। কামশাস্ত্রেও তিনি যথেষ্ট চর্চা করেছিলেন। তার পরিচয় ওঁর 'বই পড়া'-শীর্ষক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রথম ভাগে এটি ছাপা আছে। রচনা-কাল ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই আগস্ট। এর অনতিপূর্বে উনি যে-কথাসি চিঠি আমায় লিখেছিলেন তা পড়লেই বোঝা যায়, উনি বাৎস্যায়নের কামসূত্র কতো মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করছিলেন সে-সময়ে।

[ক্রমশঃ]

ত্রিলোকীর দক্ষিণদিকে অন্ধকারের উদ্যত গ্রাসের মত ভয়ংকর সেই গুহা-গহ্বর। তারই ভিতর দিয়ে বহুদূরে প্রসারিত সৃষ্টির পুরাতনী পথ। বিশ্বমানবের শাশ্বতী ধ্রুবা গতি। কিন্তু পরমাশ্চর্য! সে পথের পরিচয় কেউ জানে না। বিস্মৃতির আঁধার-ঘেরা নীহার-শীতল পথ—ঘন কুহেলিকাময়, আর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেখানে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, নক্ষত্র নেই। নিরগ্নি, নিষ্প্রদীপ—জ্যোতিলেশশূন্য মহাতমিস্রা। তমিস্রার জ্যোতি শব্দ। সেখানে নিস্তব্ধ শব্দতরঙ্গ। অন্ধ শূন্যক ব্রাহ্মীনিশার মত অনন্ত শূন্যতা, অনন্ত নৈঃশব্দ—যেন এক অনন্ত, অনুত্তর জিজ্ঞাসা।

অজ্ঞাতপরিচয় সেই নির্গম, নিগূঢ় পথের সন্ধান জানে শুধু সে। পুরাণ পথের অগ্র-পথিক—অনাদি কাল থেকে সে সেই পথের পথ-প্রদর্শক। ওই পথের মতই সে রহস্যময়। সে অদৃশ্য অলক্ষ্য—চির-অচেনা, চির-অজানা। কে বলতে পারে, কে তাকে দেখেছে? কে তার স্বরূপ জেনেছে?

কিন্তু সে আছে। জগতের বুকে সে এক নির্মম, কঠিন সত্য। মমতা-করুণ মহাভয়াল। তার অমোঘ পদক্ষেপ মর্ত্যলোক আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কলহাস্যে সে করুণ ক্রন্দন, সুখের নীড়ে মহা দুঃখ, বসুপর্ণা বসুধারায় বসুহা বর্জোপল। সে মৌন কিন্তু অমোঘ তার হস্তসংকেত। প্রচণ্ড শক্তি প্রচণ্ড বেগ। তারই প্রবল আকর্ষণে সম্মোহিতের মত তার পশ্চাতে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়—কম্পিত কৃষ্ণছায়ার মত অশরীরী সত্তা যেন ঘোর ছায়ার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ সুসূক্ষ্ম ছায়ার বীজাণু। তারা পাশবদ্ধ, লুপ্ত-স্মৃতি। তারা জানে না, কেমন করে পথ অতিবাহিত হয়—কোন স্মৃতিহরা হরণ করে স্মৃতি, কোন স্বরংহারিকা হরণ করে জ্ঞান।

সেই ভীষণ বিস্মৃতির পথে একমাত্র স্থির বুদ্ধি, স্থিরস্মৃতি সে। ধ্রুবা স্মৃতি, ধ্রুব লক্ষ্য। যে পথে পদাঙ্ক পড়ে না—তমিস্রায় নিশ্চিহ্ন পদচিহ্ন, যে অন্ধকারে অক্ষম দৃষ্টি ও বুদ্ধি—সে অন্ধকারে সে অতন্দ্র অভ্রান্ত—যেন অকূল অন্ধকার সাগরে এক অভ্রান্ত দিগ্‌-দর্শন। প্রলয়ের প্রাক্কালের মত অটল গাম্ভীর্য নিয়ে সে নিঃশব্দে অতি দ্রুতবেগে সেই গুহাস্থিত ভয়ংকর পথ অতিক্রম করে।

তার জীবনের আর-এক গূঢ় রহস্য তার একাকিত্ব। বহুর মধ্যে সে একা। কোটি কোটি সত্তার নিয়ন্তা, কিন্তু সঙ্গীহীন। সে নিঃসঙ্গতা ধারণার অতীত। উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে তৃণহীন মরুভূমির নির্জনতা ধারণা করা সম্ভব। অসহ্য নৈঃশব্দ সন্ধ্যায় বিশাল প্রান্তরের বিপুল বিরলতাও বোধের অতীত নয়। গভীর অমাবস্যার রাত্রিতে পরিত্যক্ত শ্মশানের ভয়াবহ একাকিত্বও কল্পনা করা যায়—কিন্তু সকল বোধের অতীত, অনির্দেশ্য, অনিবার্য তার একাকিত্ব। সেই ভীষণ একাকিত্ব নিয়ে গাঢ় কৃষ্ণ ছায়ার মত নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে সে পথ চলে।

সুদীর্ঘ সেই গুপ্ত পথের দুই প্রান্ত কোলাহলমুখর। যে প্রান্তে অন্ধকারের মত রহস্যময় সেই গহ্বর, সেই প্রান্তে পুরোর গ্রামস্বরূপ প্রাণ-প্রাচুর্যে পূর্ণ হাসি-কান্নার সংসার—অপর প্রান্তে ক্রন্দনে-উতরোলে উত্তাল ভয়ংকরী সংযমনী পুরী। সংযমনী পুরীর প্রত্যন্ত সীমায় এসে পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে: ঊর্ধ্বে দেবযান, নিম্নে পিতৃযান। ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে আলো—আলো—শুধু আলোর ঝর্না। ওই আকাশগঙ্গা অলকনন্দা, ওই সুশুভ্র ছায়াপথ, ওই দিব্য হিরণ্ময় আদিত্যলোক, —আনন্দলোকে উত্তরায়ণ। আর নিম্নে অন্ধকার—নিদারুণ অন্ধকার, যেন নিভাঁজ তমিস্রার পুঞ্জীভূত স্তূপ। সেদিকে পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর উত্তরঙ্গ গর্জন, কাদের যেন হুহুংকার, কাদের যেন বুকভাঙা আর্তনাদ। সেদিকে পিতৃলোক, নিরয়পুরী —দক্ষিণায়নে গ্রথিত ভবচক্র। 'শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে'—বিশ্বের শাশ্বতী দুই গতি।

এই দ্বিপথের সংযোগস্থলে কখনো কখনো সে এসে দাঁড়ায়, উদ্ভ্রান্তচিত্তে তাকায় চতুর্দিকে। জীবনের একাকিত্ব যেন বিভীষিকার মত তাকে অধিকার করে। পৃথিবীতে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি। কৌমুদি-ধৌত অনন্ত নীরবতা। উপরে অসীম শূন্য আকাশ, আকাশের বুকে কালচক্রে গ্রথিত অগণিত নক্ষত্র। শূন্যতার বুকের আনন্দ এই নক্ষত্ররাজি। আরো দূরে অস্পষ্ট নীহারিকা—নটিনীর মত নৃত্যোচপল। ওদের নিঃশব্দ চপল চরণ-স্পর্শে শিহরিত শূন্যাঙ্গন। আকাশের শেষ সীমায় দিগ্বলয়—বলয়বেষ্টনে

আনন্দাবিলীন দিগ্‌বধূ। সঙ্গীসহ সুখী নিখিল আকাশ—শূন্যতায় পূর্ণতার আনন্দ। কিন্তু সে? সে একা, অসংলগ্ন—যেন সৃষ্টির বিরাট ব্যতিক্রম।

হু-হু করে হৃদয়। আপিঙ্গল অশ্রুহীন নয়ন। অতি শুষ্ক, অতিশয় রুক্ষদৃষ্টি। আনন্দপূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অসহ বোধ হয় ভীষণ একাকিত্ব। সে জানে, সংযমনী পুরীর ওপারে—ওই আলোক-লোকে তার প্রবেশ নিরিদ্ধ। ওই নক্ষত্র, ওই নীহারিকা, ওই ছায়াপথ, ওই দিগঙ্গনা—তার নিরাশার স্বপ্ন।

নিঃশব্দে আপন কক্ষপথে পদক্ষেপ করে সে। সে পথ অনন্ত অসূর্য। 'অমন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা'। কিন্তু সেই পথটিই বুঝি তার একমাত্র আপন, একান্ত পরিচিত। তারই মত ঘোর কৃষ্ণ, তারই মত গহন-গভীর, তারই মত রহস্যময়। অপলক দৃষ্টিতে খানিক সেই পথের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। শূন্য জীবনের প্রিয়তম বন্ধু ওই পথ—বিশ্ব-লোকের মহাভয়, ঘোর কুটিল—কিন্তু তার প্রিয় বান্ধব। চির নীরব বন্ধু, চির নীরবতাময় বন্ধুত্ব। মৌন সখ্যে সুখ আছে কি? —দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সে পথের এ-প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

পথের এ-প্রান্তে প্রাণময়ী পৃথিবী, উচ্ছল জীবন-নদী। কি মত্ততা, কি উচ্ছ্বাস, কি আনন্দ চাঞ্চল্য! মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে মমতাময়ী ধরণী। সঙ্গীত-মুখর সমীরণ, কলমুখর কল্লোলিনী, পিক-কূজিত কুঞ্জবন। পঞ্চযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণী প্রজা। গৃহে গৃহে মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পতি-পত্নীর কলকোলাহল। বাৎসল্যে, প্রীতিতে, প্রেমে—মিলন-সুখের আনন্দ-গুঞ্জনে আত্মহারা স্নেহময়ী বসুন্ধরা।

ধরণীর এ-মিলনযজ্ঞে সে অনাহূত, অবাঞ্ছিত। জগতে কেউ তাকে প্রার্থনা করে না। সঙ্গাত্মক সম্ভোগের জগতে সে একা, সৃষ্টির বুকে এক মহাশূন্য। উদাসীন সাক্ষীর মত সে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় নিখিলের আনন্দ-উৎসব, ইচ্ছা করলে নিমেষে নীরব করে দিতে পারে সমস্ত কোলাহল—কিন্তু যোগ দিতে পারে না। জগতের আনন্দ-জোয়ারে অবগাহন করার অধিকার তার নেই।

বক্ষ ভেদ করে জাগে শুষ্ক ক্রন্দন! কেন এই অভিশাপ? কেন সে একা? সে তো একা ছিল না। মিথুন-সম্ভব সমাজে তার জন্ম—মাতা ছিল পিতা ছিল, ছিল ভ্রাতা ও ভগ্নী। অধর্মপ্রভব মহাভয় 'অনৃত' তার জনক, নিকৃতি-নিপুণা 'নিঋতি' তার জননী। কামনা-কুটিল সমাজ, অত্যুগ্র ক্ষুধা। সে ক্ষুধা ন্যায়-অন্যায় বিচারহীন। চিরলোভী, চিরমদান্ধ অধর্মের কুল। ইচ্ছা করলে এই জীবনকে গ্রহণ করে সে সুখী হতে পারত। কিন্তু পারেনি। কোথা থেকে যেন তার ভিতরে দেখা দিয়েছিল অদ্ভুত ধর্মবোধ। দুর্নীতির রাজত্বে সে হয়েছিল নীতির ধারক। সে-ও উগ্র, উদ্ধত, ক্রোধ-বশ—নিরঙ্কুশ তার ক্ষমতা, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার।

ন্যায়াধীশ বিধাতাপুরুষ তারই হাতে ন্যস্ত করেছিলেন সুকঠিন এক কর্মভার। অধর্মের বংশধর হয়েও সে হয়েছিল ধর্মরাজের অনুচর। যেমন সৃষ্টি, তেমনি প্রলয়: যেমন আনন্দ, তেমনি বেদনা। প্রলয়-বেদনার ন্যায়দণ্ড বিধাতা তার*

হাতেই তুলে দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, 'দুঃখের আঘাতে ধমনীতে সুখের শতদল ফুটিয়ে তোল তুমি, শ্মশানের চিতাধূমে মেঘ সঞ্চার করে নবসৃষ্টির সহায়ক হও তুমি! নাও এই প্রাণ ও অপান বায়ুর বিশ্লেষকারী 'উৎক্রান্তিদা শক্তি', নাও এই অমিতপ্রভ ন্যায়ের দণ্ড। নবজীবনের অভ্যুদয় সূচিত হোক তোমার 'প্রাণঘাতী-বেদনায়', নীতির নিয়ম রক্ষা কর প্রলয়-বেদন হাতে রেখে। কণ্টক-মুকুটে তোমায় অভিষেক করলুম।'

সে এক বিস্ময়কর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। তখন আদ্যকল্প। প্রজাপতি ব্রহ্মার ঋতাভিধ্যানে প্রজায় পূর্ণ সপ্তলোক, পরিপূর্ণা সৃষ্টি। সুন্দর নিয়ম, সুন্দর শৃঙ্খলা। কিন্তু সৃষ্টি চলল অব্যাহত-গতিতে, দেখা দিল স্থানাভাব। ভূরি-সজ্জনে শ্বাসরুদ্ধ ত্রিভুবন। চিন্তিত হলেন প্রজাপতি। তিনি লক্ষ্য করলেন, শৃঙ্খলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে একদল প্রজা হয়ে উঠেছে স্বার্থান্ধ, স্বাধিকারপ্রমত্ত। উদগ্র তাদের লালসা, উৎকট দম্ভ। তাদের হুংকারে-গর্জনে, শাসনে-শোষণে পীড়িত কল্যাণী সৃষ্টি। অবাঞ্ছিত এই জীবনের ভারেই ভারাক্রান্ত ধরণী।

ক্রুদ্ধ হলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। শান্তির রাজ্যে একি অশান্তি! কল্যাণী সৃষ্টিতে একি বিপর্যয়! সহসা সংক্রুদ্ধ ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়রন্ধ্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল, আকুঞ্চিত ভ্রূফলক ভেদ করে দক্ষিণাবর্তে বহির্গত হল সেই প্রলয়ঙ্করী বহ্নিশিখা! নীল-লোহিত বর্ণ পরিব্যাপ্ত প্রগাঢ় ক্রোধের ভীষণ সংহার মূর্তি। নীল-লোহিত সেই অগ্নি দ্রুত অগ্রসর হল উচ্ছৃঙ্খল প্রজার প্রতি। পলকে প্রলয়। ক্রন্দন করে উঠল অত্যাচারী স্বার্থপর। 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্তবাণী উচ্চারিত হতে না হতেই ভস্মীভূত হল কামুক, লম্পট। রুদ্র কালাগ্নি তাদের ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হল না, প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হল সমগ্র সৃষ্টির দিকে। স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে ব্যাপ্ত ক্রোধবহ্নি। করুণ ক্রন্দনে পূর্ণ চতুর্দশ ভুবন।

মহাপ্রলয়ের অধিকর্তা মহাকাল রুদ্র, কিন্তু তিনি শিব, তিনি শংকর। তাঁর বামপদের নৃত্যে রুদ্রবীণায় অগ্নি ঝরে, দক্ষিণ পদের নৃত্যে সুন্দর হয়ে ফোটে সৃষ্টির শতদল। ত্রিলোকের এই অশিব অকাল প্রলয়ে তিনি ব্যথিত হলেন। দেব-সঙ্ঘের পুরোবর্তী হয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ক্রোধান্ধ ব্রহ্মার নিকট, কাতরকণ্ঠে বললেন, 'ক্রোধবহ্নি সংহরণ করুন, সংহরণ করুন। সৃষ্টির উপর এ উপদ্রব অশিবজনক।'

শুভংকর শংকরের প্রার্থনায় প্রজাপতি প্রকৃতিস্থ হলেন। দেখলেন, মুহূর্তের ক্রোধে প্রলয় ঘটে গেছে। দ্রুত রুদ্রবহ্নি সংহরণ করলেন তিনি। স্বীয় দেহেই সংরুদ্ধ হল তেজ, শান্ত হল সৃষ্টি। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মহাকাল, 'কার এই প্রলয়ংকরী শক্তি? কে এই মহাভয়ংকর লোক-সংহারক?'

সহসা দেখা গেল, ব্রহ্মার দক্ষিণদিকে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির মত আবির্ভূত হয়েছে—অতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মহাকায় ঊর্ধ্বরোমা, জ্বলজ্জটা, ক্রোধভীষণ এক উগ্র মূর্তি! একি নারী, না পুরুষ? ইচ্ছানুরূপ বেশ-ধারী আশ্চর্য শক্তি! ক্ষণকাল পরে আরো স্পষ্ট হল মূর্তি। সাতঙ্কে, সবিস্ময়ে সকলে দেখল, সে আর কেউ নয়—সেই উগ্রভীষণ নীতিধর নির্ঋতি-নন্দন।

সে-ও বিস্মিত! বুঝতে পারেনি কোন্ শক্তিবলে সে উপস্থিত হল ব্রহ্মার সম্মুখে। মুহূর্তে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে। প্রচণ্ড বহ্নিরূপে সে প্রত্যক্ষ করেছে নিজের প্রলয়ংকর তেজ, প্রত্যক্ষ করেছে স্ব-শক্তির বিভীষণ রূপ। ধ্বংসের রুদ্র মূর্তিতে অগ্রসর হয়েছে সে। তার পদার্পণে পৃথিবীতে জেগেছে আকুল ক্রন্দন! কি কাতর মিনতি! তবু সে ক্ষান্ত হতে পারেনি। মাতা-পিতা-পত্নীর প্রার্থনা উপেক্ষা করে নির্মমভাবে সে আকর্ষণ করেছে প্রাণীর প্রাণ! শুধু আকর্ষণ নয়, আরো বিস্ময়কর তার অভিজ্ঞতা। নিদারুণ অন্ধকার—সেই অন্ধকারে গুহাহিত এক রন্ধ্রপথ। বায়ুহীন, নিষ্কম্প, হিমশীতল, স্তব্ধ। সেই পথে প্রচণ্ডবেগে সে অগ্রসর হচ্ছে—পশ্চাতে ছায়ার মত অসংখ্য জীবাণু। আলোহীন সেই মহাতমিস্রায় কেমন করে সে অগ্রসর হল?—তা সে জানে না। শুধু এইমাত্র জানে, নিমেষের প্রখর দৃষ্টিতে সে সে-পথ দেখেছে—স্পষ্ট দেখেছে পথের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি অন্ধিসন্ধি। অতি ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ সে পথ।

সপ্রশংস নয়নে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মহাকাল মহাদেব, 'এই সেই?' সগর্বে স্মিতহাস্যে চতুর্মুখে উত্তর করলেন স্রষ্টা ব্রহ্মা, 'এই সেই।' তারপর আপন ক্রোধ-মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'অধর্মের বংশে অনৃত-নির্ঋতির নন্দন তুমি, আমার ক্রোধাংশে নবজন্ম হল তোমার। আজ থেকে জীব-জগতের মৃত্যু-শক্তির অধিকারী হলে তুমি, তোমার নাম হল 'মৃত্যু'। তুমি জীবনের অন্তকারী 'অন্তক', পাঞ্চভৌতিক দেহের 'পঞ্চত্ব'—তুমিই 'অবসান', তুমিই 'নিমীলন'। হে ভয়ংকর, যাও, ইচ্ছানুরূপ মূর্তি ধারণ করে, কর্মের বিধান অনুসারে, পুরুষরূপে পুরুষের—নারীরূপে নারীর প্রাণ সংহার কর।'

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল অন্তক। একেই সে গম্ভীর, স্বল্পভাষী। দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হল তার। একি পুরস্কার, না অভিশাপ?

অধর্মের বংশধর বলে বিধাতা কি কঠিন শাস্তি দিলেন তাকে? কি নির্দয় এই লোক-সংহার কর্ম। প্রীতির জগতে প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, স্নেহের নীড় থেকে হরণ করতে হবে প্রাণময় জীবন। অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক এই সংহার-ক্রিয়া!

বেদনায় কম্পিত হয় অন্তকের আয়ত রক্তলোচন। অন্তকের অন্তর্ভাব বোঝেন অন্তর্যামী ব্রহ্মা প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমার বাক্য অসত্য হয় না। জগতে তুমিই প্রথম রহস্যময় নিমীলনের পথ সন্দর্শন করেছ। গুহাহিত নিগূঢ় পথের সন্ধান জেনেছ তুমি। তোমাকেই এ দুরূহ কর্তব্য গ্রহণ করতে হবে।'

তবু পাষাণের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে অন্তক। হায়, প্রিয় পিতা, প্রিয় মাতা, প্রিয় পতি ,প্রিয় পত্নীর মিলন-ডোর কেমন করে ছিন্ন করবে সে! মহা ভয়ঙ্কর এই নিমীলন, অতি ভৈরব এই মৃত্যু! শান্তির জগতে এ অশান্তি, এ অকল্যাণ! মনে মনে প্রার্থনা করে অন্তক—স্নেহ-প্রীতির জগতে অক্ষয় হোক প্রীতির বন্ধন, মৃত্যুর কবলমুক্ত হয়ে কল্যাণ লাভ করুক মানুষ।

গম্ভীর স্বরে বলেন বিধাতাপুরুষ, 'জগতের পক্ষে মৃত্যু অকল্যাণকর নয়। জাতমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যু। সত্য যেমন জন্ম, তেমনি সত্য মৃত্যু:

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বা অব্দ শতান্তে মৃত্যুর্বৈ
প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥

মৃত্যু সনাতন। মৃত্যু আছে, তাই অবাঞ্ছিত বস্তুর ভারে সৃষ্টি দুর্বহ হয় না। মৃত্যু আছে, তাই রক্ষা হয় সৃষ্টির ভারসাম্য। অন্তক, তুমি এই সনাতন সত্যকে স্বীকার কর, আমার বাক্য রক্ষা কর। আমার ক্রোধই লোক-সংহার করবে, তুমি হবে নিমিত্তমাত্র।

তবু বিধাতার বাক্য স্বীকার করতে পারে না অন্তক। অভিশাপ ভয়ে সে ভীত হয়। বিচ্ছেদ-কাতর সংসার অভিশাপ দিতে তাকেই পারে! অন্যদিকে মানুষের প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তার অন্তর। একান্তমনে মানুষের কল্যাণ কামনা করে সে; একান্তমনে বিধাতার ক্রোধকে শান্ত করতে চেষ্টা করে সে। অন্তক ব্রতী হয় সুকঠিন তপশ্চর্যায়। উপবাসে ক্ষীণতনু, বায়ুভুক অন্তক প্রার্থনা করে, ক্রোধশান্ত হোন বিধাতাপুরুষ, জগৎ শান্তিময় হোক।' একপদে দণ্ডায়মান হয়ে সে আকুল কামনা জানায়, 'প্রসন্ন বিধাতার আশীর্বাদে মৃত্যু-মুক্ত হোক অসহায় মানুষ—শান্তি হোক জগতের।' তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করে বিশ্বের কল্যাণ করুণাভিক্ষা করে অন্তক—পবিত্র তীর্থনীরে পুণ্যস্নান করে মানুষের জন্য শান্তি প্রার্থনা করে সে।

কিন্তু সত্যমূর্তি বেদগর্ভ ব্রহ্মা। তিনি বলেন, 'মিথ্যা অধর্মের ভয়ে কাতর হয়েছ তুমি। তোমার কর্ম ভয়াল হলেও—এ কোনো পাপ নয়, অধর্ম নয়। নবজীবনের অভ্যুদয়-সূচক তোমার কর্ম—পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পুণ্যের আকর। দুঃখীর জীবনে তুমি স্বর্গের আশীর্বাদ, ধার্মিকের জীবনে গভীর প্রশান্তি। তাদের কাছে তুমি সুন্দর—পরম সুন্দর। হে অনন্ত মৌন, হে রুদ্র-সুন্দর, যাও, তোমার কর্মভার গ্রহণ কর। পিতৃতর্পণে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করবে তোমার নাম।'

অবিচল সত্যের বাঙ্‌মূর্তি সত্যদর্শী ব্রহ্মা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অন্তককে তাঁর আদেশ স্বীকার করতে হয়। আপিঙ্গল রুক্ষ চক্ষু—সেখানে অশ্রু

উদ্‌গত হয় না। তবু বেদনায় চিক্ চিক্ করতে থাকে রক্তসন্ধ্যার অভ্রের মত তার রক্ত নয়ন। রাত্রিদেবী—কালরাত্রি, মোহরাত্রি আর মহারাত্রির ছায়ায় সাজিয়ে দেন তাকে; মহাকাল রুদ্র তার দেহে আধান করেন রুদ্র তেজ। পাশী বরুণ তার হাতে তুলে দেন অমোঘ পাশ, ধর্মরাজ দেন অমিতপ্রভ ন্যায়ের দণ্ড। প্রলয়-বেদনার কণ্টক-মুকুটে অভিষিক্ত হয়ে নিজের সমাজে ফিরে আসে সর্বসংহারক অনন্ত-নন্দন।

সমাজে তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হল বক্র-কটাক্ষ। কেউ সশ্লেষে বলল, 'ওহে, অধর্মের বংশে ইনি যে হলেন ধর্মপুত্তুর! পঙ্কে পঙ্কজ।' কেউ ব্যঙ্গ হাসি করে বলল, 'অন্তক হল সর্বান্তক। ভালই হল, আমরা ওর আত্মীয়স্বজন—অমরা অমর হব।' সর্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হল কামনা-বুভুক্ষু সমাজের নারী। অনিরুদ্ধ উচ্ছৃংখল কামনার মলোচ্ছয় মৃত্যু। তারা বলল, 'আমরা দেখে নেব কত বড় শক্তিমান অন্তক।'

সেদিন সমাগত হল কাল-রাত্রির মত দুর্যোগঘন এক রজনী। অন্ধকারে আচ্ছন্ন দিঙ্মণ্ডল, মহামেঘে আবৃত আকাশ। কৃষ্ণ যবনিকায় অবরুদ্ধ দৃষ্টি। নেপথ্যে সংবর্ত জীমূতের ঘোর ডম্বর—ঊনপঞ্চাশ পবনের মত হুংকার। বৃক্ষে বৃক্ষে যখন কম্পন, মৃত্তিকা গর্ভে হাহাশ্বাস। দশদিকে আজ বন্ধনমুক্ত দিঙ্‌নাগ, আজ উন্মাদ সহস্রফণা বাসুকী। সৃষ্টি জুড়ে যেন নর্তন করছে বামদেবের ভূত প্রেত পিশাচ। অন্ধ দৃষ্টি, বধির কর্ণ, তন্দ্রাহীন নয়নে দুঃস্বপন!

স্বগৃহ প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়েছিল অন্তক—ন্যায়ের রক্ষক, নীতির তত্ত্বাবধায়ক। তাকেও শুরু করতে হবে এই সংহারলীলা। কি কঠিন বিধাতার নির্দেশ। সে ভেবে পায় না কেন উন্মাদিনী হয় প্রকৃতি, কেন বেসুরে বাজে সৃষ্টির বীণা।

সহসা কে তাকে ডাকল, ডাকল তারই নাম ধরে। চমকে ফিরে তাকাল অন্তক। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল বাইরের এই উন্মাদিনী ঝটিকার মতই নির্জন কক্ষের অন্তঃপুরে এসে দাঁড়িয়েছে কামার্তা তারই সহোদরা।

কি কুটিল কদর্য দৃষ্টি। বিদ্যুতের মত তীব্র জ্বালাময় কটাক্ষ। বিস্রস্ত বক্ষ, শ্লথ কুন্তল। স্ফুরিত অধরে মদিরার গন্ধ!

শিউরে উঠল অন্তক—ভয়ে নয়, ঘৃণায়। কিন্তু প্রতিবাদ করবার পূর্বেই ঝটিকার বেগে ছুটে এল কামিনী, যেন বংশের চিরগত ব্যভিচার ছুটে এল তাকে ব্রতভ্রষ্ট করতে। প্রাণপণ শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুত হল অন্তক।

সে কথা বলে না। সচকিত গম্ভীর মূর্তি। স্তব্ধ নীরবতার মূর্ত প্রতীক। বিপুল অন্ধকারের মত বিশাল বপু, সূচিমুখ শঙ্কুর মত ঊর্ধ্বরোমা। সংরক্ত নয়নে নীরবে সে শুধু উত্তোলন করে দোর্দণ্ড কালদণ্ড। অস্পষ্ট আলোকে অতি ভীষণ তার মূর্তি!

দম্ভভীতা স্বেচ্ছাচারিণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, যেন যাদুদণ্ড সঞ্চালনে স্তব্ধ কাল-নাগিণী। উদ্যত ফণা অগ্নিবর্ষী নয়ন।

বাইরে তখন ঊনপঞ্চাশ পবনের মত হুংকার, উন্মত্ত সংবর্তের গর্জন। সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা তাদের নেই, কিন্তু সৃষ্টির একাংশকে পঙ্গু করে দিচ্ছে তারা। ক্রুদ্ধা সহোদরার অভিশাপ তেমনি পঙ্গু করে দিয়েছিল অন্তকের ভয়ংকর জীবনের একটি দিক। ক্ষুভিতা নারীর তপ্তশ্বাস বিধৃত কণ্ঠে গর্জন করে উঠেছিল, 'বংশের নিয়ম লঙ্ঘন করে যে দণ্ডকে বড় বলে মনে করলে তুমি সেই দণ্ড দুর্দৈব সৃষ্টি করবে তোমার জীবনে। এ জগতে কোন নর, কোন নারী স্বেচ্ছায় তোমাকে কামনা করবে না। হে নির্মম—নীরস, নিঃসঙ্গ মরুর মত দয়াপত্রহীন শুষ্ক, শূন্য হবে তোমার জীবন।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামিনী, যেন শেষ ঝাপটা দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল উন্মাদিনী ঝটিকা। উদ্যত দণ্ড হস্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্তক। শান্ত ঝড়, তবু কেন মর্মবিদারী চাপা ক্রন্দন?

অভিশপ্ত অন্তক এসে দাঁড়াল বিধাতার সম্মুখে। তেমনি মৌন, তেমনি গম্ভীর। পাঁজর যেন ভেঙ্গে গিয়েছে তার। মুখে সুগভীর বেদনার ছায়া।

'সাধু! সাধু অন্তক!'—উৎসাহে বলে উঠলেন সর্বদর্শী বিধাতাঃ 'কদর্য কামকে জয় করে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করলে তুমি। কুটিল কামনায় যারা অন্ধ, তারা জানুক—শাস্তার শাস্তি কি ভয়ংকর! সকল কামনার পরমা নিবৃত্তি, আজ থেকে তোমার দণ্ড হবে কাম-কিঙ্করের মহাভয়।'

বিধাতার উৎসাহে অন্তক উৎসাহিত হয় না। হায়, সপ্রজা প্রজাপতি কেমন করে বুঝবেন, নিঃসঙ্গতার কি দুঃখ—শূন্যতার কি হাহাকার! সুখী কি করে বুঝবে দুঃখীর অন্তর্দাহ?

অন্তর্দ্রষ্টা ব্রহ্মা। তিনি সবই দেখেন, সবই বোঝেন। নিঃসঙ্গতার বেদনা তাঁর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এ বেদনা অন্তককে বহন করতে হবেই—এ বিধাতারই অভি-প্রেত। প্রশান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনার বাক্য বলেন তিনি, 'শোন অন্তক জগতে দুরূহ মহৎ কার্যে ব্রতী যাঁরা, তাঁরা সকলেই একা—

নিঃসঙ্গ। জ্ঞানী একা, যোগী একা, কর্মী একা। আত্মীয় তাঁদের বর্জন করে, প্রিয়জন মুখ ফিরিয়ে নেন। একাই তাঁরা অগ্রসর হন কঠিন কর্মের পথে। চেয়ে দেখ, জগতের ওই শাশ্বতী গতিপথ যে পথের পরিচালক তুমি স্বয়ং। সে পথে কে একা নয়? একা কোটি কোটি প্রাণী, একা আসে—একা যায়। একা তাদের অনন্ত পথ-পরিক্রমা, একা তাদের কর্মফলভোগ। মিথ্যা ভ্রান্তি মহান্ 'এক'কে বহুরূপে প্রতিভাসিত করে। অন্তক, তুমি সেই বিরাট একককে দেখ, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি কর। এক ছাড়া দুইয়ের অস্তিত্ব কোথায়?'

নীরব হন বিধাতা পুরুষ, নীরব হয় একটি সুগম্ভীর নাদ। বিস্ফারিত নয়নে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে অন্তক—বিশ্ব জুড়ে আছে শুধু এক। কমলযোনি ব্রহ্মা, কমলাপতি বিষ্ণু, প্রলয়ঙ্করী মহাকাল—সব সেই একের অন্তর্ভুক্ত। একেরই দেহগত আকাশ, সাগর, সপ্তলোক, চতুর্দশ ভুবন। এক—এক—এক। দুইয়ের অস্তিত্ব তো নেই কোথাও!

আবার সব মিলিয়ে যায়। নির্বাক, স্তব্ধ মৃত্যু। নীরবে সে বেরিয়ে আসে। নিশ্চল গাম্ভীর্যে সে আরম্ভ করে বিধি-নির্দিষ্ট কর্ম। বিশ্বের সন্ত্রাস সে, মহাভয়াল। প্রাণঘাতী বেদনায় সে মুহূর্তে নীল করে দেয় প্রাণময় দেহ, কোটি কোটি প্রাণীকে নিয়ে যায় জীবন-নদীর ওপারে, স্তব্ধশীতল গুহাপথে। সে নির্মোহ, নির্মম। পশ্চাতে ফেরে সহোদরার অভিশাপ। নিঃসীম একাকিত্ব!

অন্তরে ক্ষোভের সহস্র তরঙ্গ, বাইরে ক্রোধের কম্পন! অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে অন্তক। বিদ্রোহী যেন চঞ্চল রক্তকণা! মিথ্যা মিথ্যা! কে বলে, বিশ্ব নিঃসঙ্গ? এ জগতে কেউ একা নয়। সংজ্ঞা-প্রিয় সূর্য, রোহিণী-প্রিয় চন্দ্র, পৃথিবী-প্রিয় দৌষ্পিতা। একাকী নিরানন্দ স্বয়ং ব্রহ্মা। 'একাকী ন রেমে'—পুরাণ-প্রসিদ্ধ এ বাক্য। 'একোঽস্মি বহু স্যাম্'—এ আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং প্রজাপতির। আক্রোশে উদ্যত হয় ভৈরব বাহু। একাকিত্বের বিধান কি শুধু তার জন্য?

রুদ্র উগ্রদৃষ্টিতে তাকায় পৃথিবীর প্রতি। বসন্তের আবির্ভাবে আরক্তিম প্রকৃতি, দিব্যপাটলের রক্তাম্বর পরিহিতা ধরণী যেন নববিবাহের বধূ: কণ্ঠে চম্পকমালা, কর্ণে রক্তাশোকের কুন্তল, কটিতে কুসুম্ভ মেখলা। সালোক ঋতুরঙ্গশালায় কে ওই নারী?

'মমতা'—প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব প্রাণ-প্রতিমা। এই মমতাকে চেনে অন্তক। জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত এক মূর্তি! মমতাকে সে দেখেছে—জায়ার প্রেমে, জননীর স্নেহে। তাকে দেখেছে গৃহীর গৃহাঙ্গনে, সংস্কৃতির স্নিগ্ধ শিখায়। দেহে লাবণ্যের উচ্ছল তরঙ্গ, নয়নে মেঘের সজলতা। হৃদয়ের শান্তি, করুণার কমকান্তি মমতা। ধরণী মমতা-ধন্যা।

হু হু করে ওঠে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর হৃদয়। ক্ষুৎকাম সমাজের চিরন্তন ক্ষুধায় উন্মাদ বুঝি শোণিত-কণিকা!

তখন বসন্তের রঙ্গশালায় সংগীতে ছন্দিত জীবনের স্পন্দন, নৃত্য-চঞ্চল চরণে আর চারু অঙ্গে উচ্ছল প্রাণতরঙ্গ। কৌতুকে বলছে সখীদল:

'দেখ সখি, অশোক হয়েছে লাল।'

'দেখ, বকুল হোল মুকুলিত।'

'কার দোহদে অশোক লাল হল, বকুল হল গন্ধে ভোর?'

'মমতার ছোঁয়ায় প্রাণময় বনতল।'

'মমতা-ধন্য ওগো অশোক, ওগো বকুল, —তোমরা প্রতিদান দাও।' হেসে লুটিয়ে পড়ে তরুণীদল, বেদনায় ভরে ওঠে মমতার অন্তরতল। রণিত হল কোমল করুণ কণ্ঠ, যেন সকরুণ সুরে রণিত হল বীণার তার :

'হায় সখি, প্রতিকূল বায়ুতে
ঝরে যায় অশোক, ঝরে
যায় বকুল। আলোর ক্ষণিক
আশীর্বাদ ক্ষণিকের ওই ফোটা
ফুল! মমতার ছোঁয়ায় লাল হয়ে
ফোটে, কুঁড়ি মেলে গন্ধ
বিলায়। তারপর নিমেষে মিলিয়ে
যায় আনন্দের বুদ্‌বুদ!
কি প্রতিদান দেবে ওরা?

করুণায় কম্পিত হয় মমতার নীল নয়ন, যেন বাতাহতনীলোৎপল। স্ফুরিত হয় নধর ওষ্ঠাধর। সহসা তার চোখে কিসের যেন ছায়া পড়ে। অশোকের বুকে কি প্রলয় মেঘের রক্তছায়া? বকুল কি ছাইয়ের মত বিবর্ণ? দিনে কেন আকাশে এত তারার ফুল? কে আসে ওরা? ছায়ার মত অস্পষ্ট অংগুষ্ঠপ্রমাণ কোটি কোটি জীবাণু! দ্রুতবেগে দক্ষিণদিকে ছুটছে ওরা। ওদের পুরোভাগে অন্ধকারের মত বিশালকায়, রক্তাম্বর পরিহিত এক পুরুষ। কে ওই ভয়াল! প্রাণের আনন্দ-নিকেতনে কার আবিভাব? ভয়ে একবর্ণময় বাকা, ঊর্ধ্বেবহ শ্বাস, বিঘূর্ণিত দৃষ্টি পরিশুষ্ক কণ্ঠ—করুণ চিৎকার করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল মমতা। আতংকে ছুটে পালাল সখীদল।

দ্রুত এগিয়ে এল ক্ষুধাতুর অন্তক দ্রুত ভূমিতে জানু স্পর্শ করে বসল সে দ্রুত উগ্র দৃষ্টিতে তাকাল মমতার দিকে। কিন্তু একি! একি পাণ্ডুরতা রক্তাধরে! সূর্যোদয়ে নিমীলিত কুমুদিনীর মত সংকুচিত আঁখি, চন্দ্রোদয়ে মুদ্রিত পংকজের মত ম্লান বদন। শব্দহীন চারু অংগ। ধীরে সে স্পর্শ করল মমতার দেহ। সুতীব্র হিম-শিহরণ খেলে গেল নিজেরই সর্বাংগে। এ যে তুহিন-শীতল! সে করেছে কি? মুহূর্তের আত্মবিস্মরণ। সে আকর্ষণ করেছে মমতার প্রাণ—রাহুর মত গ্রাস করেছে রাকা চন্দ্র।

বেদনায় নয়, ক্রোধে রক্তনীল অন্তক উঠে দাঁড়ায়। বসন্তের রক্তরাগ আচ্ছন্ন হয়েছে শীতের ধূমল ধূসরতায়। সে সর্বান্তক, জীবের মহা অবসান। সে নিমীলন, সে প্রলয়। প্রলয়ই সৃষ্টি করবে সে। ফণা তুলে খাড়া হল জটাজুটা, মাথা তুলে দাঁড়াল সূচিমুখ শংকুর মত রোমাবলী। জ্বল জ্বল করে উঠল পিংগল চক্ষু, যেন রুধিরবর্ষী রক্তমেঘ। উদ্যত পাশ, উদ্যত দণ্ড। ভয়ংকর ছায়াটা চলতে শুরু করল।

ব্যর্থকাম ক্ষ্যাপা প্রেমিকের বিকট ক্ষ্যাপামি নিয়মের রাজত্বে স্বেচ্ছাচার উত্তাল হয়ে উঠল। সবুজ শস্যক্ষেত্র দগ্ধ হল, শ্মশানভূমিতে পরিণত হল জনপদ। মাতার অশ্রু আর জায়ার রক্তাবিন্দুতে প্রবাহিত হল রক্তসিন্ধুর স্রোত। মুহূর্তে অশান্ত ক্রন্দন, মুহূর্তে অনন্ত স্তব্ধতা।

কল্যাণী সৃষ্টির প্রতি করুণাঘন নয়ন মেলে তাকালেন কমলযোনি। বেদনায় উন্মথিত চিত্তপ্রদেশ, নয়নে ছলছল অশ্রু। মহাভয়ঙ্কর উন্মাদকে আহ্বান করে রুদ্ধ-কণ্ঠে বললেন তিনি, 'পাগল, দেখ তোমার কীর্তি! দেখ, আমার সৃষ্টির করুণ দশা'!

সংরক্ত নয়নে স্বীয় সংহার-লীলার প্রতি তাকাল অন্তক। শূন্যতায় রিক্তা বসুমতী। সম্বিৎ যেন ফিরে এল। অপরাধীর মত মস্তক অবনত করে দাঁড়াল সে, বিচারক বিধাতা পুরুষ।

প্রথমে স্নেহদ্রব কণ্ঠেই বললেন প্রজা-পতি, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে শক্তির প্রয়োগ—শক্তির অপব্যবহার। তোমাকে অমোঘ উৎক্রান্তিদা শক্তির অধিকারী করেছি, তোমার হাতে তুলে দিয়েছি প্রাণঘাতী বেদনা। সে কি স্বেচ্ছাচার সৃষ্টির অভিপ্রায়ে? এ তুমি করেছ কি?'

উত্তেজিত হলেন অমিততেজা ব্রহ্মা। কঠিন কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তুমি কি ভেবেছ, তোমার শক্তির ওপর শক্তি নেই? তুমি কি জানো না, বিরাট বিশ্বশক্তির নিকট তৃণের মত তুচ্ছ তোমার দণ্ড। তোমার অধিকর্তা কাল, কালের অধীশ্বর বৈবস্বত যম, যমের নিয়ন্তা মহাকাল রুদ্র। মহাকাল—যিনি কল্পান্তে সমগ্র সৃষ্টি কলন করেন—তাঁরও কলন-কর্তা সেই বিশ্বশক্তি। সৃষ্টির মহদ্ভয় সেই শক্তির প্রশাসনে সূর্য উদিত হয়, মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়। তাঁরই প্রশাসনে সন্ত্রস্ত মহাকাল, যম, চণ্ডবেগ কাল। সে শক্তির কথা কি জানো না তুমি?'

সংকোচে তৃণের মতই যেন মাটিতে মিশে যায় অন্তক। বজ্রস্বরে নিনাদিত হয় স্রষ্টার কণ্ঠ : 'তোমার শক্তি আকর্ষণ করে কাকে? কার ওপর বিস্তৃত হয় তোমার অধিকার? এ জগতে ক্ষুদ্র যারা, কাম-কিংকর, ভীরু, যারা—মৃত্যুর পূর্বে সহস্রবার বরণ করে মৃত্যু, অজ্ঞান যারা—মোহান্ধ—তারাই তোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়। তুমি কি পারো কীর্তিমানের কীর্তি গ্রাস করতে? পারো কি অমৃতলোকের যাত্রীর প্রাণ আকর্ষণ করতে? ওই চির-চলমান মহাজীবন—কালপ্রবাহে ভাসমান অক্ষয় অমর জীবন—তুমি কি পারো তার গতিরোধ করতে? তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিত্য প্রলয় তুমি, মহাজীবন প্রবাহের ক্ষণিক ছেদ—তাতেই এত গর্ব! কল্পান্তে যা প্রতিসঞ্চরে কোথায় থাকে তোমার অস্তিত্ব?'

কম্পিত হয় মৃত্যু, যেমন মৃত্যুর নামে কম্পিত হয় মোহান্ধ জীব। মন্দ্রস্বরে বলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, 'বিনা কারণে মমতার বন্ধন ছিন্ন করেছ তুমি! হে মমতাকর্ষণ তাহলে কঠিন সত্যে পরিণত হোক এই বিধিবাক্য—'দেব পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি ন মমেতি চ'—মমত্ব হোক বন্ধন-মৃত্যুর কারণ। কামনায় খিন্ন হয়ে ছিন্ন করেছ স্নেহের শৃংখল—চিরকাল বঞ্চিত হও স্নেহ-মমতা থেকে, ভোগের সুধাপাত্র গরল হয়ে উঠুক তোমার হাতে। মমতার অন্তকারী রূপে চিরশূন্য হোক তোমার জীবন।'

নীরব হন ব্রহ্মা। অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে অন্তক। ক্রোধের মূর্ত প্রতীক সে, ক্রোধবল। আজ নিরুদ্ধ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ—কে যেন কঠিন বন্ধন-রেখা টেনে দিয়েছে দুর্দম স্রোতোমুখে। আজ সংরুদ্ধ রোষ, সংক্ষুব্ধ গর্জন—আজ শুধু শুষ্ক উত্তাপ।

সে অভিশাপ, সৃষ্টির অভিশাপ! সে সর্বান্তক—বিশ্বের আতংক। পণ্ডিত-

মূর্খ, বলবান-দুর্বল, সম্রাট-দরিদ্রে—সকলের কাছে সে মহাভয়। 'নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ'—এমেন চরম বিভীষিকা। কেউ তাকে প্রার্থনা করে না—না নর, না নারী। সে একা। জীবন তার শূন্যে হাহাকার!

হৃদয়ে অন্তর্গূঢ়ে বিষস্ফোটকের যন্ত্রণা, মস্তিষ্কে সুতীব্র জ্বালা, দেহময় প্রচণ্ড প্রদাহ। সে উন্মাদ, অস্থির। পাগলের মত সে ছুটে যায় পুঞ্জিত ছায়াবীথিকায়, নিমেষে দগ্ধ হয়ে যায় সরিৎ-সরোবর। ব্রহ্মঘাতক নীল লোহিতের মত অভিশপ্ত, জ্বালাময় তার জীবন। রুদ্র নীল লোহিত—তিনি একদিন শাপমুক্ত হয়েছিলেন; কপাল-মোচন তীর্থে প্রেমময়ী কপালীর স্নেহস্পর্শে শান্তি পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হায়, অন্তকের জীবনে কে বর্ষণ করবে সুধাধারা? সুধাপাত্র তার স্পর্শে গরল হয়ে যায়। মমতাকে হত্যা করেছে সে। কামনার বজ্রাঘাতে সে পঙ্গু, কামিনীর অভিশাপে সে নিঃসঙ্গ। জগতে সুদুর্লভ প্রেম!

রক্তাক্ত অন্তর বিদীর্ণ করে জাগে দীর্ঘশ্বাস, জাগে শুষ্ক ক্রন্দন। অশ্রুহীন ক্রন্দন। বিরাট পাষাণ-শিলার মত শুষ্ক তার দেহ। নিষ্প্রাণ পাষাণে কোথায় প্রাণময় অশ্রু? সে নীরস, ভৈরব—নির্দয়, নিষ্করুণ!

অথচ অশ্রুময়ী পৃথিবী। ওই কোথায় গৃহপ্রাঙ্গণে কাঁদছেন জননী। কি আকুল-করা ক্রন্দন! কোথাও বক্ষে করাঘাত করে কাঁদছেন পিতা—শোকের উন্মাদ মূর্তি! ওই শোকাতুর পতি, ওই শোকাতুরা পত্নী।

অশ্রুতে বিধৌত সিঁথির সিঁদুর! অশ্রুর কি শেষ নেই? নিখিল বিশ্বে উত্তাল অশ্রুসিন্ধু!

অসহ্য মনে হয় অন্তকের। অস্থির হয়ে ওঠে সে। সে তো অবারিত করেছে অশ্রুর উৎস। নিজে অশ্রুহীন, কিন্তু জগৎ পারাবারে অশ্রুর প্লাবন তারই সৃষ্টি কঠিন দায়িত্বভার অর্পণ করে অভিশাপ দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ।

সংসার ভাল লাগে না তার। সংসারে অপাংক্তেয় সে। অন্ত্যজের মত সে এসে দাঁড়ায় শ্মশানপ্রান্তে। ধীরে প্রদোষের ছায়া নামে। এমনি করেই আলোর জগতে নামে মৃত্যুর স্তব্ধ যবনিকা। অদূরের শ্মশান—মৃত্যুর নির্মম বিজয়-কীর্তি। স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে অন্তক। লক্ লক্ করে জ্বলছে ঊর্ধ্ব-শিখ অগ্নি—তার জয়ধ্বজা; চিৎকার করছে অসংখ্য শিবা—তার জয়ধ্বনি।

সহসা শিউরে ওঠে অন্তক। বিজয়ের আশীর্বাদ নয়, বঞ্চিতের অভিশাপ যেন রূপ ধরেছে অন্ধকার শ্মশানে! অন্ধকার যেন রাক্ষসের মত করাল গ্রাস বিস্তার করেছে। রক্তরাঙা নয়ন মেলে তাকিয়েছে ক্রব্যাদ চিতাগ্নি—কাদের যেন রক্তচক্ষু! সহস্র শিবার চিৎকার যেন উন্মত্ত প্রতি-হিংসার গর্জন।

অভিশাপ! অভিশাপ যেন তুরন্ত গতিতে ছুটে আসছে অন্তকের দিকে। বহ্নির অভিশাপ, সহেশ্বরার অভিশাপ, স্বজন-বিরহিত আত্মীয়ের অভিশাপ। অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করছে প্রিয় মাতা, প্রিয় পিতা, প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় ভগ্নী প্রিয় পতি, প্রিয় পত্নী। অনাথ শিশু, তারা অবুঝ—উচ্চকণ্ঠে দারুণ অভিশাপ দিচ্ছে তারা। চিতাগ্নির হু-হু শ্বাসে অভিশাপ, শিবাকণ্ঠে ধ্বনিত অভিশাপ, বাতাসে প্রতিধ্বনিত অভিশাপ। নিখিল বিশ্বের মর্ম থেকে উচ্চারিত ভয়াল অভিশাপ!

পলায়নের পথ পায় না অন্তক। রোম-হর্ষক ভীতি! শিহরিত আপাদমস্তক। কোথায় আশ্রয় নেবে সে। সম্মুখে সেই গুহাহিত পথ। পাগলের মত ত্রস্তে সে সেই রন্ধ্রপথে পদক্ষেপ করে।

অন্ধকার—নিবিড় অন্ধকার। অন্ধকারে আতঙ্কগ্রস্ত অন্তক। পরিচিত পথ—তবু সর্বাঙ্গে ছমছম! অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে উঠছে যেন বিকট, অশান্ত চিৎকার—চিৎকার উঠছে রন্ধ্রহীন, নিস্তব্ধ গুহাপথ থেকে। অভিশাপ দিচ্ছে কি প্রিয়তম বান্ধব? অভিশাপ দিচ্ছে বুঝি কোটি কোটি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সত্তা।

সভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে অন্তক—যেন বজ্রভয়ে দ্রুত ছুটে চলে বিশাল মন্দির—যেন অংকুশ-তাড়িত হয়ে উন্মাদের মত ছুটে চলে ঐরাবত। আতঙ্কগ্রস্ত ভীষণ মৌন, প্রচণ্ড তার গতি। পশ্চাতে পড়ে থাকে সংসার, পড়ে থাকে গহন গুহাপথ, পড়ে থাকে বিশাল সংযমনী পুরী। অন্ধ উন্মাদের মত সে এসে উপস্থিত হয় সেই শাশ্বতী শুক্লকৃষ্ণ গতিপথের সংযোগস্থলে।

ভয় কাটে, কিন্তু হু-হু করে ওঠে সমগ্র অন্তরাত্মা। ঊর্ধ্বে, নভোমণ্ডলে ওই দেবযান, অর্চিরভিমানী দেবলোকের পথ। অমৃত ও অভয়ের আশীর্বাদ। সহস্র ধারায় ঠিকরে পড়ছে অজস্র আলোর ধারা। জ্যোতির তরঙ্গে সঙ্গীতমুখর উত্তরায়ণ। কিন্তু সে?

আলোর আঘাতে কাঁপছে কি পাষাণ-শিলা? কাঁপছে কি অন্ধ গুহার পাষাণ-চাপা নির্ঝর? বুকে কিসের যেন অশান্ত কম্পন! একি! কোথা থেকে শুষ্ক পাষাণে এল জল? কোথা থেকে উত্তাল ফেনা ভাদ্রপদ কোটাল? অন্তকের নয়নে অশ্রু! শুষ্ক নয়নে প্রাণের মুক্তধারা! কোনদিন কাঁদেনি সে। আজ কাঁদছে—অঝোর ধারায় কাঁদছে নির্মোহ, নির্মম, নিষ্করুণ মৃত্যু। দুই নয়ন বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে স্বর্গগঙ্গার সুপবিত্র মুক্তাধারা।

বিস্মিত, বিগলিত অন্তক। নির্নিমেষ নয়নে সে তাকিয়ে থাকে সেই নয়ন-ধারার প্রতি। অঞ্জলি পূর্ণ করে সে ধরে রাখতে চায়—ধরে রাখতে চায় প্রাণের এই সঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু পারে না। বন্ধগুলি ছাপিয়ে সে অশ্রুধারা সংযমনী পুরী অতিক্রম করে—অনন্ত অন্ধকারময় গহন গুহাপথ বেয়ে মুক্ত অশ্রুধারা কলকল শব্দে ছড়িয়ে পড়ে মর্ত্যে। অভিশপ্ত মৃত্যুর অশ্রান্ত অশ্রু উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয় প্লাবিত হয় ধরাতল।

শুষ্ক বক্ষ-নিংড়ানো এই অশ্রুই মৃত্যুর অভিশাপ মোচন করেছে। বিধাতা বলে-ছিলেন, এই অশ্রু ভয়ংকর ব্যাধিরূপে জীবকে আক্রমণ করবে—ব্যাধির আক্রমণেই নির্জীব হবে জীবকুল। মানুষ ব্যাধিকেই অভিশাপ দেবে, মৃত্যুকে নয়। কিন্তু অভিশাপমুক্ত হয়েছে কি অন্তক? মৃত্যুর তপ্ত অশ্রু কি রোধ করতে পেরেছে বিশ্বের অশ্রু-অভিশাপ। ভীষণ রহস্যময় সেই ছায়াদেহকে কি প্রিয় বলে গ্রহণ করেছে কেউ? অলক্ষ্যচারী মৃত্যু আজো অভিশপ্ত, আজো অবাঞ্ছিত, আজো একা। মৃত্যু বিভীষিকা মৃত্যু অনন্ত মৌন, মৃত্যু বিরাট রহস্য।*

* স্ত্রীরূপিণী মৃত্যুর কাহিনী রয়েছে মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ২৫৩ অঃ), এখানে মৃত্যুকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। মমতা-মৃত্যু কাহিনী রূপক।

দিলীপকুমার রায়

ঊনত্রিশ

কিন্তু সুরেনমামার কাছে বহুদিন ধরে গান শিখলেও গানে রীতিমত তালিম নেওয়া বলতে যা বোঝায় তা নেওয়া হয়নি—যদিও উপদেশ নিতাম নানা গায়ক-গায়িকার শৈলী তথা আঙ্গিক সম্বন্ধে। বাল্যস্মৃতিতে লিখেছি, গ্রামোফোন থেকে আমি অনেক গায়ক-গায়িকার গানই গলায় তুলেছিলাম। সুরেনমামা ও পিতৃদেব ভালোবাসতেন বিনোদিনীর, কৃষ্ণভামিনীর ও লালচাঁদ বড়ালের গান। লালচাঁদ বড়ালের একটি দেশ রাগে গান—"এ হো রাজা"—আমি অবিকল তুলি গলায়। এতে পিতৃদেবের গর্বের সীমা ছিল না, বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে ডেকে শোনাতেন আমার তানঃ "দেখো হে আমার কুলতিলকের কাণ্ড! সাক্ষাৎ লালচাঁদ বড়ালের তান গলায় তোলা......" ইত্যাদি। গ্রামোফোনের আরো অনেক গালগল্প করতে পারি, কিন্তু দরকার নেই। শুধু কয়েকজনের নাম করি, যাঁদের গান ও তান থেকে আমি লাভ করেছিলামঃ

লালচাঁদ বড়াল, বিনোদিনী, যোহরা বাঈ, জানকী বাঈ, মমতাজ জান, গহরজান, দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধ শরৎ, অন্ধ নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, বেদানা দাসী, মানদাসুন্দরী, মুকুন্দচন্দ্র নন্দন, বিজয় লাহিড়ী, টপ্পাগায়ক রমজান খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, আবদুল করিম, মৈজুদ্দীন খাঁ, রাধিকা গোস্বামী, বকুবাবু, নগেন্দ্র-বালা, অমলা দাশ (দেশবন্ধুর ভগ্নী), পান্না দাসী (কীর্তনী), ইত্যাদি।

গ্রামোফোন ছিল আমার শুধু নিত্য-সহচর নয়—ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড, যাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। এক-একটা রেকর্ড এত বাজাতাম যে কয়েক মাস পরেই আর বাজত না, তখন আবার কিনতে হত—এমনিই ছিল আমার উৎসাহ। গানেই আমার বার আনা সময় কাটত—নৈলে ক্লাসের পরীক্ষায় ঢের বেশি নাম করতে পারতাম। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন বসত না,—বিশেষ নতুন কোনো রেকর্ড এলে। আমি কোনোমতে ক্লাসের পড়া সেরেই ফিরতাম আসল কাজে—গ্রামোফোন চর্চায়। তা সত্ত্বেও আমি পড়াশুনোয় যে 'ভালো ছেলে'ই ছিলাম, এতে আমি ধরাকে সরা জ্ঞান করতাম। ভাবটা "যদি গানে গানে এত সময় না দিয়ে ভালো ছেলে হয়ে পড়াশুনো করতাম, তবে ভাবো—কী হতাম!" স্বভাবে যে-মানুষ অহংকারী, তার আত্মপ্রসাদকে মারে কে? এই অহংকার চূর্ণ হয়, প্রথম যখন বি এস-সিতে ফেল হই রসায়নের ব্যবহারিক পরীক্ষায়। ঠাকুরের করুণা বলে তখন একে চিনতে পারিনি বটে, কিন্তু পরে বারবারই দেখেছি যে, যখনই মাথা গরম হয়েছে, তাঁর করুণা এসে আমার আত্মাভিমানকে ধূলিসাৎ করেছে, আর গাইতে হয়েছে—সত্যিই চোখের জলে!

আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার
চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

ম্যাট্রিকে প্রথম কুড়িজনের মধ্যে হয়ে দশ টাকার স্কলারশিপ পেয়ে খুশি হয়েই শুরু করলাম বকুবাবুর কাছে গান শিখতে। বকুবাবুর কথা বলেছি—বিখ্যাত অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল উপেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

আমার বকুবাবুর গান যে কী ভালো লাগত, কী বলব। গ্রামোফোন থেকে তাঁর ইয়াদ আতি হয়—খাম্বাজ; পরের কথা শুনে—সিন্ধু: কোন্ ছলে তোর আমার মতন—রজনীকান্তের গান; পতিত পাবনী তারো গঙ্গে—কাফি; আরো অনেক গান গলায় তুলি, এমন কি, তাঁর খাঁচার পাখি গেল উড়ে যুড়ে দুটো লম্বা ঠ্যাং-ও গাইতাম। উৎসাহ আমার উজিয়ে উঠলে কি আর রক্ষে আছে? আমি গানে ছিলাম সর্বভুক, বাছ-বিচার করতাম না—তাই নিম্নশ্রেণীর আদি রসাত্মক গানও গাইতাম মানে না বুঝে। যথা লালচাঁদ বড়ালের—

আমারে আসতে বলে
এত অপমান করা!
মনে কি পড়ে না জাদু
দুহাত দিয়ে পায়ে ধরা?

কি বেদনা দাসীর—

তুমি যে পরের সোনো
আগে তো ছিল না জানা
জানলে পরে পরের সোনা
দিতাম নাক কিম্বা কর্ণমূলে।
ভালোবেসে ভালো কাঁদালে

গানে সর্বভুক হওয়ার ফলে আমার ক্ষতি হয়েছিল সমূহ—বিশেষ রুচির দিক দিয়ে। নইলে নিশ্চয়ই বাল্যকালে পিতৃদেবের ভালো ভালো গান আরও শিখে রাখতাম। আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারতাম বলেই তাঁর শতাধিক গানের সুর মনে রেখেছিলাম। এ একটা কীর্তিই বলব, কেননা, আমি লোকের কাছে গাইতাম এই সব বাজে গানই বেশি—ওস্তাদি তান হলেই আমি উৎফুল্ল—কথা যেমনই হোক। সুরুচিতে নব দীক্ষা হয় পরে সুভাষের সংস্পর্শে এসে। তখনই এসব বাজে গান গাওয়া ছাড়ি তার 'ছি-ছি' শুনে। সে বলতঃ "আমার অবাক লাগে ভাবতে—ডি এল রায়ের ছেলে হয়েও তুমি তাঁর চমৎকার চমৎকার গান ছেড়ে কী করে এই সব বাজে গ্রামোফোনের গান
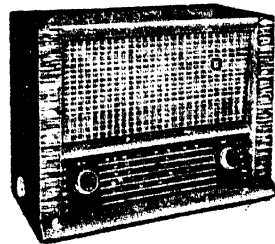
নিয়ে মেতে থাকো!" তাঁর ভর্ৎসনায় আমার চৈতন্য হয়—আমি এসব গান ছেড়ে ফিরি পিতৃদেবের গানের দিকে। ভাগ্যক্রমে আমার স্মরণশক্তির জোর ছিল, তাই তাঁর শতাধিক গান শুনে শুনেই শেখা হয়ে গিয়েছিল, নিজে বেশি না গাওয়া সত্ত্বেও। বিধাতার আর-এক করুণার দান—আমার এই স্মৃতিশক্তি। আমার শত্রুরাও অবাক হত—অনেক রূক্ষ ক্রিটিকও আমাকে পরীক্ষা করতে এসে সদীর্ঘশ্বাসে বলতেন, দ্বিজুবাবু নাই দিয়ে এমন ছেলেটার মাথা খেলেন! পড়াশুনোর নাম নেই—কেবল গান আর তর্ক আর ডেঁপোমি" ......ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদ্বৎসমাজে স্মরণশক্তির মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমি নিজের জীবনে দু শ্রেণীর মনীষী দেখেছিঃ এক, লোকেন কাকা (পালিত)—কী যে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—কত কবিতা যে তিনি অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করতে পারতেন—নানা ভাষায় দ্রুত কথা বলতে পারতেন—"নজিরের জন্যে ওঁকে বই খুলতে হয় না তো, নিজের মাথায় টোকা দিলেই হয়—" পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন হেসে। অন্য দিকে বিরাট প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ, যিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে, ওঁর স্মৃতিশক্তি সামান্যই। বেশ মনে আছে, তিনি হেসে বলতেনঃ "বলব কি দিলীপ, সময়ে সময়ে এমন লজ্জাও পড়তে হয়েছে যে, দিনুর মুখে আমার নিজের গান শুনে চমকে উঠে বলেছি—কার গান দিনু? বেশ লিখেছে তো!" বলেই তাঁর সে কী স্নিগ্ধ ঈষৎ সলজ্জ হাসি—আহা, সে-হাসি কি ভুলবার? কোনো কোনো মনীষীর বইতে পড়েছি যে, স্মৃতিশক্তি হল স্বধর্মে কেরানী, কর্মী—সস্তা ওর কৃতিত্ব—মনের শ্রেষ্ঠ শক্তিদের কোঠায় পড়ে না।

অভিযোগটির মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও আমার মনে হয়, স্মরণশক্তির প্রাখর্য অনেক মনীষীর প্রতিভার বিকাশেও প্রচুর সহায়তা করেছে, যথাঃ শ্রীঅরবিন্দ, অলডাস হাক্সলি, বার্টরান্ড রাসেল। তবে জীবন বিচিত্র, তাই এ বিষয়ে কোনো সাধারণ সূত্র দেওয়া চলে না।

মরুকগে, আমি নিজে ভেবেচিন্তে স্থির করেছি যে, ঠাকুর আমাকে যতগুলি মূল্যবান সম্পদ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আমার স্মৃতিশক্তি প্রধানদের মধ্যেই পড়ে। অন্তত আমি নিজে আমার স্মৃতিশক্তির কাছে চিরদিনই ঋণী থাকব—বিশেষ করে এইজন্যে যে, নানা সময়ে নানা মহাজনের উক্তি টুকে রেখে শুধু যে নিজেই গভীর আনন্দ পেয়েছি তা নয়, বহু মহাজন-পন্থীকেই আনন্দ পরিবেষণ করেছি। তাই তো আমি না মেনে পারি না যে, গানে সর্বভুক হওয়ার ফলে আমার শুধু ক্ষতিই হয়নি—লাভও হয়েছিল সমূহ—কেননা, বহু গান ও বহু সুর মনে রাখার নিত্য সাধনার ফলে আমার স্মৃতিশক্তির আরো উন্নতি হয়েছিল। সবাই জানেন—কোনো বৃত্তির অনুশীলন করলে তার তেজ বাড়ে। স্মরণশক্তির বেলায়ও একথা খাটে। আমি খুব চেষ্টা করতাম নানা গান ও সুর মনে রাখতে। বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে, হিন্দী, উর্দু, বাংলা মিলিয়ে আমি চার-পাঁচশো গান খাতা না দেখে গাইতে পারতাম যখন তখন—অতুলদা আমার স্মরণশক্তির এ-দৌড় দেখে খুশি হয়ে আমাকে 'শ্রুতিধর' বলে ডাকতেন সময়ে সময়ে। য়ুরোপে যখন প্রথম রোলাঁর সঙ্গে কথালাপের রিপোর্ট লিখতে বসি, তখন আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে উঠি লক্ষ্য করে যে তাঁর বার আনা কথা আমার মনে গেঁথে গেছে! কেম্ব্রিজে দাবা খেলায় নাম করি। খেলার পরে বাড়ি ফিরে বাজিটা ফের খেলে দেখতাম। কোথায় কোন- চালে ভুল হয়েছিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে তাঁর মহাভারতপ্রমাণ গ্রন্থগুলি পড়বার সময়েও ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতাম যে, গুরুদেবের কোন্ স্মরণীয় উক্তি কোন্ বইয়ে পড়েছিলাম, অবলীলাক্রমেই রেফারেন্স দিতে পারতাম বন্ধুবান্ধবকে—যদিও এর একটি কুফল ফলেছিল এই যে, আমি বড় বড় উদ্ধৃতি দিয়ে মুরুব্বিয়ানা করতাম। এর পরে এ-মোহ কাটে বিষম আঘাত পেয়ে, যখন দেখি, এমনকি, ঋষি-কল্প গুরুবাক্য আওড়ালেও মনে শান্তি নামে না। তখনই লিখি অনামীতে আমার কবিতাঃ "কথা কথা কথা"—যে কবিতাটির অনেকেই মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করেছিলেন, ওর মধ্যে আমার মধ্যেকার দুটি সদ্‌বৃত্তি ফুটেছিল বলেঃ দীনতা ও জিজ্ঞাসুতা। কিন্তু বকুবাবুর কথায় ফিরে আসি।

বকুবাবুই গানে আমাকে প্রথম তালিম দেন নাড়া বেঁধে। এতে আমার আনন্দের অবধি ছিল না—এইবার প্রথম ওস্তাদ বনতে চললাম—সুঁয়োপেকার গায়ে প্রজাপতির পাখা উঠতে শুরু করল বুঝি মহা উৎসাহে আমি তাঁর কাছে একের পর এক আদ্যন্ত ভুল হিন্দী গান রপ্ত করতে শুরু করলাম মানে না জেনে। একটি গান শুনে পরে সুরেশদা হেসে অস্থির—তাঁর কথা বলছি পরে—বললেনঃ "তন মন তু পয়দারু আ—এ কী রে!" এ-গানের অন্তরায় ছিলঃ

বিন দেখ নাহি পরত চায়েনু
কও কায়সে কাটি হা দিনু আর বিনু

সুরেশদা বললেনঃ "দিনু আর বিনু দু ভাই বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কেটে ফেলবার জন্যে বকুবাবুর এ নিদারুণ রোখ চেপে গেল কেন রে?" বলে বললেনঃ এ-গানটির শুদ্ধ বাণী হবেঃ

তন মন তো পে ডারিয়াঁ।
বিন দেখ নাহি পরত চয়েন
কহো কয়সে কাটেংগে দিন ঔর রয়েন।

অর্থাৎ তনু মন তোমাকে সঁপলাম—তোমার অদর্শনে আসে না শান্তি, কাটতে চায় না দিন ও রাত......" ইত্যাদি।

কিন্তু তখনো হিন্দীতে সুরেশদার অভ্যুদয় হয়নি তো—তাই আমি বকুবাবুর কাছে সানিধাপা সানিধাপা করে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে ভুল হিন্দী বাণীর গানগুলি পরম ভক্তিভরে মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা সাজিয়ে পূজো করে চলেছি। বকুবাবুর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট ছিল—তাই তো তিনি দেখতে আমার মনের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজো আমি ভুলতে পারি নি কোমল গান্ধার খরজে তাঁর তারসপ্তকে পঞ্চমে স্থিতি। তাঁর টপ্পার দানাও ছিল চমৎকার। নন্দিনী বোলো নাগরে ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে—দাশুরায়ের এ-গানটি তিনি চমৎকার গাইতেন—আমি এখনো গাই সময়ে সময়ে। বড় সুন্দর খাম্বাজ টপ্পা। তাঁর কাছে কয়েকটি নিধুবাবুর টপ্পাও শিখেছিলাম। তবে তিনি খেয়াল বেশি জানতেন না, তাই মাসকয়েক তাঁর কাছে শিখে যাই দৌলতরামের কাছে।

এ-পালোয়ানটি আমাকে শেখালেন দুর্ধর্ষ সার্গমই একটি ভৈরোঁ খেয়ালও শিখিয়েছিলেন। সুরটি ছিল ভালো—কিন্তু সার্গমের চার্কিবাজিতে গানটি দম বন্ধ হয়ে মারা গেল। এত বেশি সার্গম ভালো লাগল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন বড় কটুভাষী ও বিশ্বনিন্দুক। কোনো ওস্তাদই কিছু জানে না, ত্রিলোকে সবজান্তা

ত্রিলোকী দৌলতরাম। তাই কিছুদিন পরেই বিরক্ত হয়ে বিদায় নিই। তবু মানতে হবে, সার্গম শিখে আমার কিছু উপকার হয়েছিল।

তারপর শিখি একজন সত্যিকার বড় গায়কের কাছে শোধীয় টপ্পা। তিনি চন্দননগরের রাম কথক। বড় মধুর গায়কের কাছে শোরধীর টপ্পা। তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে ত্রিশ-চল্লিশটি টপ্পা শিখে আমি বিশেষ লাভ করি—আরো এইজন্যে যে, তানপুরার সঙ্গে প্রথম গাওয়া শুরু করি আমি তাঁর কাছেই বলতে ভুলেছি—বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে আমার বোন মায়া গান শিখেছিল কিছুদিন। ঐ সঙ্গে আমিও শুনে শুনে শিখেছিলাম কয়েকটি রাগ। একটি রাগ—মধুমাদ সারং —"ধর্ম সংবর্ধিনী দনুজ সংমর্দিনী..." আরো কয়েকটি ধ্রুপদ তথা তেলানা শিখেছিলাম মনে নেই। তবে লাভ হ'ল এই যে, ধ্রুপদে প্রথম রস পাই তাঁর গান শুনে। গ্রামোফোনেও তাঁর রেকর্ড থেকে শিখেছিলাম কয়েকটি গান ও কিছু সার্গম।

এর পরে আমি কখন তার কাছে কী পর্যায়ে গান শিখি ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে মনে আছে, জমীরুদ্দিন খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলাম খেয়াল ও গৌরী-শঙ্কর মিশ্রের কাছে ঠুংরি। মিশ্রজি ছিলেন বিখ্যাত সারেঙ্গিয়া—সঙ্গত করতেন গহর-জানের সঙ্গে। সুরেনমামার কাছে প্রায়ই শুনতাম যে, সারেঙ্গিয়ারা সুরের অন্ধিসন্ধি জানে ও বাইজিদের শেখায়। এই কথা শুনে মহা উৎসাহে তাঁর শরণাপন্ন হই ও পনের কুড়িটি খেয়াল ও ঠুংরি—ঠুংরিই বেশি। লছমিপ্রসাদ মিশ্রের কাছেই কিছুদিন খেয়াল ও ঠুংরি শিখি।

কিন্তু এ-সব শিক্ষা খানিকটা গৌণই বলব। কারণ এঁদের কাছে গান শিখে আমি কমবেশি লাভ করলেও এঁরা কেউই আমার কিশোর মনে তেমন ছাপ ফেলতে পারেন নি। আমার জীবনের একটি ল্যান্ডমার্ক হয়ে এসেছিলেন এক অবিস্মরণীয় সন্ন্যাসী একটু আগে যাঁর নামোল্লেখ করেছি—সুরেনদা। তাই এঁর কথা একটু ফলিয়েই বলতে হবে।

ইনি ছিলেন সন্ন্যাসী—বলেছি। কিন্তু এমন সন্ন্যাসী আমি আর দেখি নি—বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেশার পরেও। যেমন সুপুরুষ তেমনি সুগায়ক, তেমনি মিশুকে, তেমনি ফিটফাট সাজসজ্জা। গৈরিক রঙে রাঙানো রেশমি চুড়িদার পাজামা ও পাঞ্জাবি পাগড়ি প'রে যখন তিনি আসরে বসতেন তখন সভা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। রূপেই তিনি অর্ধেক যুদ্ধ জয় ক'রে ফেলতেন। সত্যিকার পার্সনালিস্ট যাকে বলে। তার পর যখন কিন্নরবিনিন্দিত কণ্ঠে ভজন ধরতেন অপরূপ হার্মোনিয়ম সঙ্গতে—মনে

হ'ত যেন আকাশ থেকে গন্ধর্বরা প্রসন্ন হয়ে পুষ্পবৃষ্টি শুরু করেছেন। তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে ক'রে এসেছি চিরদিনই। তিনি আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না। তবে বছর কুড়ি আগে সার আকবর হায়দারির এক মেয়ের বাড়িতে যখন আমি গান করি—বম্বে শহরে—তখন সেখানে এক মুসলমান ভদ্রলোক আমার মুখে সুরেশদার শেখানো "তুনে ক্যা কিয়া মুঝে বতা তো সহি" গজলটি শুনে চমকে উঠে বলেন আমাকে যে, বৃন্দাবনের কাছে কোন্ এক জঙ্গলে একদিন তিনি এক সুপুরুষ সন্ন্যাসীকে এ-গানটি গাইতে শুনেছিলেন। তিনি একলা গাছতলায় ব'সে গাইছিলেন গানটি—শুনে মুসলমান শ্রোতাটি মুগ্ধ হয়ে আলাপ করেন ও শোনেন তাঁর নাম—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। আমি বলি—তিনিই আমার গুরু—ভজনের।

আমি যখন বি এস-সি পড়ি তখন এই অপরূপ ব্রহ্মচারী কলকাতায় এসে এণ্টালিতে ও নানা মাড়োয়ারি বাড়িতে দিনের পর দিন আসর জমাতেন। শান্তি-পুরের ব্রাহ্মণ—সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম। কিন্তু বাঙালী শ্রোতারা তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, সুরেশদা ব'লেই ডাকতেন।

ইনি শুধু যে অদ্ভুত গইতেন তাই নয়—তাঁর হিন্দি ও উর্দু গানের বাণী ছিল নিখুঁত, অনবদ্য। বহু বৎসর বৃন্দাবনে থেকে হিন্দি ও উর্দু তিনি বলতে পারতেন মাতৃভাষার মতনই স্বচ্ছন্দে। ভাষাশিক্ষায় তাঁর একটা সহজপটুতা ছিল মনে হয়, কারণ গুজরাতি ভাষাও তিনি চমৎকার বলতে পারতেন। বাঙালীর মুখে এমন অনর্গল চোস্ত হিন্দি বা উর্দু খুব কমই শুনেছি। তাই তাঁর কাছে গানের তালিম নিয়ে আমার একটি মস্ত লাভ হয় এই যে, আমি শুদ্ধ বাণীতে হিন্দি ও উর্দু গান গাইতে শিখি। তিনি প্রায়ই ঠাট্টা করতেন বাঙালীদের হিন্দি উচ্চারণ ও হিন্দিদের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে। তাঁর কাছ থেকেই আমি শিখি বাইজিদের বাংলা গানের ক্যারিকেচার করতেঃ

নিমিসের দেখা জোদি (আরে হাঁ)
পাই হে তুমহারি
আঁখেতে মছাই জোত্তো (আরে হাঁ)
বলাই তুমহারি

...সুরেশদার ঠোঁট বেঁকিয়ে বাইজিদের নকলে এই ধরনের গান গাওয়া শুনে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম—"গুণেমণি! দাসি ভোবো পোয়"...ছিল তাঁর আর একটি প্রিয় গান। কিন্তু এবার প্রগল্ভতা রেখে তাঁর গুণকীর্তনের কোঠায় আসি।

সুরেশদা যাই গাইতেন চমৎকার আসর জমিয়ে গাইতেন—তালে তালে হার্মোনিয়ম-সংগতে সর্বোপরি, দিগ্বিজয়ী ভঙ্গিতে। তাঁর উর্দু হিন্দি ও বাংলা গান শুনে আমার মনে হ'ত যেন দেবদূত সশরীরে নেমে এসেছেন দেবতার খবর দিতে। দেখতে দেখতে তিনি আমাকে তাঁর ভজনে ও কীর্তনে আবিষ্ট ক'রে তুলতেন, আর অমনি মনে মনে ফিরে এল আমার শৈশবের ভক্তি-উচ্ছ্বাস যাকে মিথ্যে খেয়ালটপ্পার মোহে ভুলতে বসেছিলাম। তাঁর কাছে গিয়ে যখনই গান শিখতাম পুলকে আমার রোমাঞ্চ হ'ত। চোখে জল ভ'রে আসত তাঁর অপরূপ গজলভাঙা সুরে গাইতেঃ

কী গুণে বলো কী গুণে জানে হরি হে,
তোমার বাঁশের বাঁশি।
এ কি সাধনা তার, মহিমা তোমার
কেমনে ঢালে সে অমিয়রাশি।

আহা, এ গানটি কী অপূর্ব যে গাইতেন তিনি!—যখন তিনি গাইতেন শেষ অন্তরাঃ

হাসে বাঁশি নাথ তব সহচর—কেবল
ছাঁদাতে সরলা অবলা অন্তর,
অবোধ পরাণ বোঝে না কো তাই
সকলি তেয়াগিয়া ছুটিয়া আসি।

তখন সত্যিই বুকের মধ্যে আমার অশ্রুসাগর উঠত দুলে, মন হয়ে যেত উদাস—তখনকার মতন। কিন্তু সে অন্য কথা। গানের কথাই বলি, নৈলে শেষ করা দুর্ঘট হবে।

এ-গানটি তিনি বানিয়েছিলেন একটি উর্দু গজলের সুরে—যেটি পরে গ্রামোফোনে আমার হিন্দুস্থানী গানের মধ্যে সবচেয়ে লোকপ্রিয় গান হয়ে ওঠে। এ-গানটির বাণী শুদ্ধ ছিল না তাই যেখানে সেখানে গেয়ে উর্দু-হিন্দিভাষীদের মন গলিয়েছি। গানটি গ্রামোফোনে অনেকেই শুনেছেন।

তুনে ক্যা কিয়া মুঝে বতাতো নহি
মেরা চৈন গয়া মেরি নিঁদ গঈ।
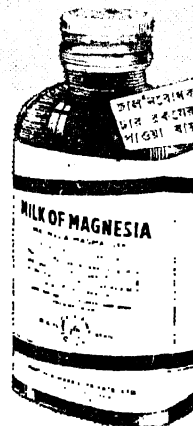
তাঁর কাছে আরো উর্দু গজল শিখেছিলাম কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। এছাড়া, তাঁর কাছে অনেকগুলি চমৎকার ভজন শিখি যদিও ইন্দিরার অতুলনীয় ভজনের পরে সে-সব ভজন আর গাইতে মন চায় না। বলে নাঃ "ভালোর সবচেয়ে বড় শত্রু মন্দ নয়, সে হ'ল—আরো ভালো।"

কিন্তু তবু বলবই বলব যে আমার জীবন ভজনের দিকে মোড় নেয় প্রথম সুরেশদার গান শুনেই। এখানেও আজ দেখতে পাই বিধাতার সেই একই করুণার অভ্যাগম—যে ওস্তাদি গানের সর্গরম পর্বের মোহসর্গনে এসে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলঃ

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে।

অর্থাৎ

নয়নের শেষ লক্ষ্য—তোমার দরশন,
তনুর স্বপন- তোমার অঙ্গ পরশন,
রসনা [illegible] তৃপ্ত—নামগানকীর্তনে,
দুর্লভ [illegible] হেন ভাগবত মহাজন।

মনে [illegible] দিয়েছিল বড় সময়েই, বলব [illegible] হাতে গানের সম্পদে ঠিক পৌঁছে [illegible] আমার [illegible] দেরি হয়। [illegible] বলছি এই জন্য যে, আমার জীবনে ভজন-[illegible] আসতই আসত, কারণ আমি মুখে ওস্তাদিপন্থী হলেও অন্তরে ছিলাম [illegible] ভজনপন্থীই বটে—[illegible] তখনো আত্মপরিচয় হয় নি বলে রসনার শেষ লক্ষ্য হরিনামকীর্তন এই সত্যের সত্যটিকেই ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর যাকে কৃপা করেন সে ঠাকুরকে ভুললেও তিনি তো তাকে ভোলেন না—তাই নানা সময়ে অপ্রত্যাশিত লগ্নে দুর্বাসা মুনির মতনই হানা দিয়ে চমকে ডাক দিয়ে বলেনঃ "অয়মহং ভোঃ।" দুর্বাসার সঙ্গে ঠাকুরের তফাৎ কেবল এইখানে যে, আনমনা শকুন্তলা অতিথি-সৎকার না করলেও তিনি শাপ দেন না—মৃদু হেসে অদৃশ্য হন—বলে যে পরে আসবেন আবার—সময় হ'লে। আমার গানের বিকাশে এই সময়ে তিনি ঠিক এমনি ভাবে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিলেন—আমার তখনো ওস্তাদি গানের মোহ কাটেনি বলে। কিন্তু সুরেশদার মাধ্যমে ঠাকুর এ-সময়ে এসেছিলেন শুধু ভজন শেখাতেই নয়—মনে আর একটি ইঙ্গিত অংকুর-রূপে বুনে রেখে যেতে, যে, হিন্দি ভজনের সুরে বাংলা গান বাঁধলে বাংলা ভক্তিসংগীতের সম্পদ বাড়বে। উত্তরজীবনে আমি ইন্দিরার প্রায় পাঁচশ হিন্দি ভজনের অনুবাদ করি খানিকটা এই পরম ইঙ্গিতকে স্মরণ ক'রেই বলব। মনে পড়ে তাঁর একটি গজলের সুর—(গজলটি আমি আজো গাইতে পারি—যদিও গাই না)—কী সুন্দর সুরটি, আহা! যখন তিনি গাইতেন তাঁর বিশুদ্ধ উর্দুতে—কান ও প্রাণ দুই-ই জুড়িয়ে যেত যেন। তবু বাঙালীদের মন খুঁৎ খুঁৎ করত এর সস্তা ভাবে। তাই একটি শ্লোক (শের) মাত্র উদ্ধৃত করিঃ

তযাজ্জু বেমরোবৎ বেবফা না আশনা
তুম হো
মগরই তুনী বুরাঈ পর ভী কিৎনী
খেষসুরৎ তুম হো

অর্থাৎ

প্রেমিক তুমি নও, তুমি নও একান্ত
হে নটবর!
ছলের দোষের নেই সীমা হায়, তবু
তুমি কী সুন্দর!

কিন্তু এই সুরে এই তানে বসিয়ে যখন তিনি গাইতেনঃ

নীলসলিলা লহরীলীলা যমুনা নটিনী
(ও যার) শ্যাম তটে শ্যামের বাঁশরী
বাজিতে নিবাযামিনী

তখন মন আমার উজ্জ্বল হয়ে উঠত যমুনার তটে সেই চিরন্তন মুরলীধরের ছবি কল্পনা ক'রে! শুধু আমার নয়, অনেক ভক্ত-প্রার্থীই বসিয়ে উঠত, চোখ ঝাপসা হয়ে আসত অশ্রু-আভাসে।

সুরেশদার কাছে গান শিখতে গিয়ে যেন নতুন ক'রে দীক্ষা পেয়েছিলাম আমার শৈশবের প্রায় ভুলে-যাওয়া মুরলীমন্ত্রে—যে-বাঁশি আমার পবিত্র শিশুহৃদয় শুনেছিল কিন্তু তার পরে আবার ভুলে গিয়েছিল কৈশোরে। কিন্তু ভুলতে কি কেউ পারে কিছু—বিশেষ ক'রে নীল যমুনার বাঁশি? সে-বাঁশির রঙে যে-মন একটিবারও রঙিয়ে উঠেছে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য—কেন না, সে যে-মোহের টানেই বিপথে পা বাড়াক না কেন, মোহের আঁধার তার একদিন না একদিন কাটবেই কাটবে সেই হারিয়ে-যাওয়া বাঁশির আলোয়। এই-ই বুঝি ঠাকুরের লীলা—তাই ভাগবতে বার বার গোপীহিয়া কেঁদে বলেছেঃ

পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি।

অর্থাৎ

প্রিয়-পরিজন-লাজকুলভয়-
মান-অভিমান-বাধা
সব ভেসে যায় যবে বাঁশি তব
শোনে নাথ হিয়া রাধা!
শুধু হায় লীলা নিঠুর তোমার একী!—
সব ছেড়ে যাব আমি যমুনায়—দেখিঃ
মুরলীমোহন নাই নাই—
হয় সার শুধু বৃথা কাঁদা
বাজে কানে বাজে প্রাণে মুরলীর
"আয় আয়" সুর সাধা!

সুরেশদার কাছে শিখেছিলাম অনেকগুলি হিন্দি ভজন, কয়েকটি উর্দু গজল ও চার পাঁচটি বাংলা কীর্তন। উর্দু গজলগুলির মধ্যে একটিই (তুনে ক্যা কিয়া) আমার উত্তরজীবনে কাজে এসেছিল যখন আমি (শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষা নেওয়ার পরে) ভক্তিসংগীত ছাড়া আর কোনো গানই গাইতাম না। পণ্ডিচেরিতে আট বছর কাটিয়ে ১৯৩৭-এ যখন কলকাতায় আসি তখন আমাকে অনেকেই গাইতে বলতেন আমার সাবেক কালের প্রাক্ যোগজীবনের—গজল ঠুংরি। কিন্তু আমি গাইতাম না বলে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতেন। এ নিয়ে একবার পণ্ডিচেরিতেও তর্ক উঠেছিল—আমার এক বুদ্ধিমান বন্ধু 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতিকে সমর্থন করে আমাকে বলেন যে, প্রেমের গান গাইতে না চাওয়া চেতনার অবনতিরই সূচনা করে। আমি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর এ-অভিযোগের কথা জানালে গুরুদেব ২৭-৮-৩৩ তারিখে একটি চিঠিতে আমাকে লেখেন (অনুবাদ দিলাম)ঃ 'ম—যদি বলে থাকে যে তোমার শৃঙ্গার রসের গান গাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা তোমার সংকীর্ণতা বা অধোগতির সূচনা করে তাহলে আমাকে একটু ফাঁপরেই পড়তে হয় বৈ কি। যদি কারুর রুচি বদল হওয়ার ফলে তার আর জ্যাজ সংগীত ভালো না লাগে ও সে শুধু শ্রেষ্ঠ সংগীতকারদের সুরশৈলীই উপভোগ করে তা হলে বলবে কি—তার অধঃপতন হয়েছে? নিচের স্তরের থেকে উপরের স্তরের চিন্তা, ভাব ও কলাকারুর আত্মপ্রকাশে উত্তীর্ণ হওয়াকে অধোগতি বলব কেমন ক'রে? আমি নিজে এক সময়ে প্রাথমিক স্তরের প্রেমের-কবিতা লিখতাম—কিন্তু এখন আমি কেবল আত্মিক প্রেমের সম্বন্ধেই কবিতা লিখতে পারি—এথেকে কি প্রমাণ হয় আমি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি, না বলব—আমি উচ্চতর চেতনায় অধিরূঢ় হয়েছি বলেই নিম্নতর প্রাণশক্তির প্রকাশে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতে পারি না? যারই চেতনার স্তর বদলায় তারই সম্বন্ধে একথা খাটে। যদি কেউ বয়স্ক হবার পরে তার ছেলেমানুষি খেলনায় আর আনন্দ না পায় তাহলে বলবে কি এর জন্যে দায়ী তার সংকীর্ণতা বা অধঃপতন?' (মূল ইংরাজি চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে।)

শ্রীঅরবিন্দের এ-চিঠিটি থেকে আমি কম আলো পাইনি, কেন না তাঁর নির্দেশে আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে হয়ে উঠেছিল একটি সনাতন উপলব্ধি ঃ বৃন্দাবনের বাঁশির ভাব শুনে যে-মানুষে রাতারাতি সাবালক বনে গেছে তার আনন্দ সে-নাবালক বুঝতে পারে না যে সে-বাঁশি আদৌ শোনেইনি। এইজন্যেই অধ্যাত্ম সাধকের ও গড়পড়তা সংসারীর মধ্যে দেখতে দেখতে দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে এবং সংসারীরা বৈরাগীকে বেদরদী মনে করে ভুল বোঝেন। গানের ক্ষেত্রেও এই কথাঃ অর্থাৎ কীর্তনের গভীর রসে যার মণপ্রাণ রঙিয়ে উঠেছে তার কাছে অভজন অকীর্তনের রং ফ্যাকাশে না লেগেই পারে না—পক্ষান্তরে ভজন কীর্তনে যে-গড়পড়তা সংগীতরসিক আদৌ রস পেতে শেখেনি তার কাছে মনে হয় ভজন কীর্তন উচ্চসংগীতই নয়। এ-প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমার এক সংগীতজ্ঞ বন্ধু আমাকে বলেছিলেন বিস্ফারিত নেত্রেঃ 'তুমি বলো কী—দিলীপ? তুমি যোগী হয়ে এমনিই অরসিক বনে গেলে যে নজরুলের 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'-র মতন সরস গানকে জাতে ঠেলা করতে চাও!' আমার রুচি বদলের কাহিনীটা কোনোমতেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, ভজনকীর্তনকে তিনি গানই মনে করেন না, বলেনঃ 'এক আধটা ভজন মন্দ লাগে না, কিন্তু গানের রাজ্যে ওর দাম নেই বললেই হয়।' মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথিকা—প্যারাবল্ঃ

একদা এক শিষ্য পেলো একটি মণি
পথের বাঁকে।
কুড়িয়ে নিয়ে ফিরতে ঘরে
বললেন হেসে গুরু তবে;
"বলছিলাম না সেদিন তোকে—
যেমন আধার তেমনি বিচার,
যেমন পুঁজি যার—
সে ধরে দর তেমনিই যা দেখে তার?
পারিসনি তুই
এ কথাটির নিহিতার্থ বুঝতে—না রে?
বুঝিস যদি এই মণিটি
যাচাই করতে যাস বাজারে।"

বেগুন বেচে মুদী।
শিষ্য গেল প্রথম তার দোকানে।
মণি দেখে বলল মুদীঃ
"বাঃ! এর দাম কে না জানে?
নয়টি বেগুন দিতে পারি এর বদলে।"
শিষ্য বলেঃ

"দশটিই দিন পুরোপুরি।"
মুদী বলেঃ "যাও হে চ'লে!
কেন বকাও? কে না জানে—
পাঁচটি বেগুনে ঠিক দাম এটার—
দর দিয়েছি আমি বেশি।"
শিষ্য হেসে শালওয়ালার
কাছে যেতে বলল সেঃ
"এর বদলে তাই দিতে পারি
গাল বড় জোর দুটি।"
শিষ্য তখন জবর ভারি
এক জহুরির কাছে।
দেখেই চমকে বলে সেঃ "এ কী রে?
লাখ টাকা নে—এক্ষুনি দে—
ছাড়ব না তো—এ যে হিরে!"

কথিকাটি বন্ধুকে বলিনি কারণ ভজন-কীর্তনের ব্যাপারে তিনি যে বেগুনওয়ালার মতই অজ্ঞ ও অসমঝদার এ-হেন দারুণ ইঙ্গিত করলেও তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যেত। মরুক গে, ফিরে আসি ইতিহাসের অধ্যায়ে।

বিলেতেও আমার নতুন নতুন গান শেখার উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি—আমি বিখ্যাত কবি শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনেকগুলি রাগ ও ভজন শিখেছিলাম। হারীনের গলা চমৎকার খেলত, এমনি কি আবদুল করিমের অনেক তানই সে হুবহু নকল করতে পারত। তার মুখে আবদুল করিমের গানের অপরূপ ঢং শুনেই আমি প্রথম আবদুল করিমের ভক্ত হয়ে উঠি ও সংকল্প করি দেশে ফিরে তাঁর কাছে কিছুদিন খেয়ালের তালিম নিতেই হবে।

বিলেতে আমি সুরেশদার নানা ভজন ও গজল গেয়ে নাম করেছিলাম ছাত্রসমাজে। কিন্তু আমি গজল গাইলেও বাজে গজল বড় একটা গাইতাম না— যে সব গজলের লক্ষ্য ভগবান শুধু সেই সব গজলই গাইতাম সাধারণতঃ। দেশে ফিরেও আমি মুলত এই আদর্শের পথেই চলেছিলাম, মানে যদিও ঠুংরি গজল বর্গীয় গান গাইতাম নানা সভায়ই কিন্তু সবাই স্বীকার করত যে আমার কণ্ঠ ও অন্তর সবচেয়ে সাড়া পেত ভক্তিসংগীতেই। এইজন্যেই অতুলদার ভক্তির গান আমি সাদরে বরণ করে নিয়েছিলাম। যদিও তাঁর 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে', 'কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা' জাতীয় সেন্টিমেন্টাল প্রেমের গানও কখনো কখনো উপরোধে পড়ে গাইতাম—বিশেষ করে আমার চ্যারিটি কন্সার্টে। গম্ভীরাত্মা নীতি-বাদীরা প্রশ্ন করতে পারেনঃ কখনো কখনোই বা গাইতাম কেন ভক্তিসংগীতকে বরণ করার পরেও? উত্তর এই যে, জীবনে রুচি বদলালেও স্বভাব বদলাতে সময় লাগে—অতীতের অভ্যাস পেয়ে বসে মানুষকে—মরিয়া-না-মরে-রাম ঢঙেই দাবি করে তার চিরাভ্যস্ত খোরাক। ফলে এ-দোটানায় জাগত দোলা অতৃপ্ত অস্বস্তি যার অশান্তি থেকে সে-সময়ে কিছুতেই অব্যাহতি পেতাম না। সবপ্রথম মুক্তির স্বাদ পাই—যখন শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিয়ে মনের জোর অর্জন করি ও পণ নিই যে ভক্তিসংগীত ছাড়া আর কোনো গানই গাইব না ভক্তিবিরাগী শিল্পী বন্ধুদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও। গুরুদীক্ষায় কীভাবে শিল্পসাধনাকে অধ্যাত্মসাধনার কাজে লাগিয়েছিলাম সে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সময় এখনো আসেনি—জানি না কোনোদিন লেখা হয়ে উঠবে কিনা—কারণ আজ যে-মন আত্মকথা লেখার তাগিদ পাচ্ছে এমন হতে পারে বৈকি যে সে-মনের মতিগতি পরে একদম বদলে যাবে, মনে হবে কী হবে লিখে? কিন্তু পরের কথা জানেন শুধু পরাৎপর আর কেউ নয়, তাই ও নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, চলি যে-পথে চলতে আজকের প্রাণ সহজ আনন্দে সাড়া দেয়—লিখে যাই কত ঘাটের জল খেয়ে কেমন করে পৌঁছেছি ঠাকুরের চরণে—কী ভাবে সাংগীতিক যশস্পৃহা আদর্শবাদের মুখোশ পরে আমাকে নাকানিচোবানি খাইয়েছে যদিও তা থেকেও যে তীর্থপথের কিছু পাথেয় পাইনি এমন নয়।

যশস্পৃহা—ঠিক শব্দটিই এসে গেছে। কারণ বিলেত থেকে ফিরে যশস্বী হতে না হতে আমার মোহ আমাকে পেয়ে বসল—আমি মহা দাপাদাপি শুরু করলাম আরো যশস্বী হতে চেয়ে। শুধু গানে নয়—সাহিত্যেও। কিন্তু পণ্ডিচেরি প্রবেশের আগে—অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে—আমার সাংগীতিক জীবনের মুখরতা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আমার সাহিত্য-সৃষ্টির অর্ধস্ফুট আবেদন ডুবে গিয়েছিল আমার সংগীতানুরাগীদের করতালিতে। আমি সে-করতালিতে উজিয়ে উঠে একের পর এক ওস্তাদ ও বাইজির কাছে গান শিখে বাহাদুর ওস্তাদ বনতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম আরো ওস্তাদদেরও ওস্তাদ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের উচ্ছ্বসিত তারিফ পেয়ে। তিনি একবার আমাকে 'নাইটিংগেল অব্ বেংগল' বলে আমার সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে যে-তারিফ করেছিলেন আমি তাঁকে আমার প্রাপ্য (ডিউ) বলে গণ্য করে হয়ে উঠতে চাইলাম তাই, যাতে আমার মন সায় দিত নাঃ অর্থাৎ ধনুর্ধর ওস্তাদ। ফল যা হবার—কর্মফল এড়াবে কে?—বাহাদুরির আত্মাভিমানে আমার অন্তরের সরল উচ্ছল ভক্তিরস এল শুকিয়ে, অথচ তবু আমি দেখেও দেখতে চাইলাম না যে আমি চিরদিন যার বিরুদ্ধে লড়েছি—কি না প্রাণহীন কালোয়াতির কসরৎ—দৃপ্ত মোহে তাকেই বরণ করতে চাইছি—কাঞ্চন ছেড়ে কাঁচ কুড়োতে। তাই তো আমি ঠিক করলাম ভজনকীর্তন—ও তো হবেই, এখন কষে শিখি ধ্রুপদ, খেয়ালঃ লোকে যেন বলতে না পারে উচ্চসংগীতের

বলেন আমার নেই। যে-কথা সেই কাজঃ ধরলাম একেবারে ধ্রুপদের মুকুটমণি শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে। তিনি তখন পাথুরিয়াঘাটায় থাকতেন।

এ-মহাগুরুর প্রসাদে আমি দেখতে দেখতে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদ, ধামার ও চৌতাল শিখে পাখোয়াজে শুধু যে নিখুঁৎ তালে গাইতে শিখেছিলাম তাই নয়—নানা দুনে চৌদুনে আড়ি কুয়াড়ির কসরৎ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে দিলাশা দিতাম 'বা রে আমি!' বলে। গোঁসাইজি আমার 'বাহাদুরি' দেখে বিস্মিত হয়ে বলতেনঃ 'ছেলেটির যদি মাথা গরম না হয়ে যায় তবে ও একজন বড় ধ্রুপদী হয়ে উঠবে।' কিন্তু হায়রে নিয়তির পরিহাস!—এই সাবধান-বাক্যই আমার কাল হল—আমার মাথা একেবারে টগবগে হয়ে উঠল—আমি আরো কষে কোমর বাঁধলাম শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে কুস্তিগির কালোয়াৎ বনতে।

আমার একটি মাত্র বাঁচোয়া ছিলঃ আমি অহংকার করলেও শেখা যে দরকার এটুকু ভুলতাম না। তাই ধ্রুপদ শিখবার সংগে সংগে খোঁজ করতে লাগলাম একজন বড় খেয়ালী ওস্তাদের।

খুঁজেদের মিথ্যা বলেননি—'হু সীকথ্ ফাইণ্ডেথ্'—আমিও খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একজন উঁচুদরের খেয়ালী গুরুঃ শ্রীরামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন চমৎকার গম্ভীর ও মনোহর খেয়ালের ঢং আমি বেশি শুনিনি। রামাচরণবাবুর গায়কী কৃতিত্ব বেশি ছিল না, কিন্তু শিক্ষকী কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। তানালাপে তিনি সুরেনমামা বা আবদুল করিমের সমকক্ষ ছিলেন না কিন্তু উদাত্ত খেয়ালের কুলীন চালে যে-ছবিটি তিনি ফুটিয়ে তুলতেন এ'র মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠে যে মুগ্ধ হতে হত—বিশেষ করে তাঁর হলক তানে। এত ভালো হলক তান আমি আর কোনো বাঙালীর কণ্ঠে শুনিনি যদিও সপমক তানে আল্লাবন্দে খাঁ ও বিদ্যুৎগতি তানে আবদুল করিম তাঁর চেয়ে অনেক বেশি রসসৃষ্টি করতে পারতেন।

রামাচরণবাবু যৌবনে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখতে পাড়ি দিতেন মেটেবুরুজে যখন লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত নবাব ওয়াজিদ আলি শা লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁর সর্বপ্রধান সভাগায়ক আল্লাবক্স খাঁ ছিলেন এই উৎসাহী বাঙালী যুবকের একমাত্র গুরু। বিখ্যাত অঘোর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর গুরুভাই। তবে অঘোর বাবু শিখতেন ধ্রুপদ, রামাচরণবাবু খেয়াল। তাঁর কাছে ওয়াজিদ আলি শার সভার আরো কয়েকটি ওস্তাদ ও বাইজির গল্প শুনতাম প্রায়ই মুগ্ধ হয়ে। সে সব বলার প্রয়োজন নেই—কেন না তার সঙ্গে আমার গীতসাধনার কোনো সম্বন্ধই নেই। কেবল একটি কথা বলব।

রামাচরণবাবু আমাকে পুত্রাধিক স্নেহে খেয়াল শেখাতেন। কিন্তু কী যে বকতেন দিনের পর দিনঃ "ছি ছি দিলীপ: শেষে ঠুংরি! তোমার এমন গলা—তুমি কি না ঠুংরি গাও? সাত নকলে আসল খাস্তা! তোমার মুখে হলক তান আমাকে মেটেবুরুজের খেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়—এ-হেন তুমি কিনা বাইজির ঢং নকল করো? ওদের কণ্ঠের মিহি তানে পারবে তুমি ওদের টেক্কা দিতে? তুমি চলো তোমার পথে—অপরের পথে চলবার এ-দুর্মতি কেন? দুটো সস্তা হাততালি পেতে? ছি ছি ছি! তোমার আশ্চর্য কণ্ঠ শুনি আর কপাল চাপড়াই—কণ্ঠে যার সরস্বতী মগজে তার দুষ্টু সরস্বতী ভর করল কেন গো বলো!"......এইভাবে তিনি আমাকে নিরন্তরই ধমকাতেন। কিন্তু সে স্নেহের মিষ্টি ভর্ৎসনা, তাতে তাপ নেই তো—তাই তাঁর ভর্ৎসনা শুনে আমার বন্ধুবান্ধব সবাই হতেন হেসে কুটিকুটি, আমিও হেসে সায় দিতাম। মনে আছে একদিন আমার গীতিশিষ্যা তাঁর অশ্রান্ত বকুনি শুনে কী যে খুশি! হাততালি দিয়ে বলেছিলঃ 'তোমাকেও বকতে পারে এমন গাইয়ে আছে মন্টুদা?"

তাঁর কাছে আমি পুরো দুটি বৎসর গান শিখেছিলাম। এর আগে বা পরে এতদিন ধরে কোনো ওস্তাদের কাছেই আমি গান শিখিনি কখনো—শেখা সম্ভব ছিল না বলেই। কারণ আমার তো শুধু গানের নেশা নয়—ছিল আরো অনেক নেশাঃ ভাষা শেখার, পড়ার, ভ্রমণের, শুধু খোঁজার,

বাণীসংগ্রহের, মেলামেশার — সর্বোপরি, লেখার। এখানে একটি কথা বলবই বলব—যা থাকে কপালে। মানে সুধীবৃন্দ মৃদু হেসে মাথা নাড়লেও বলব কেন না এ বিশ্বাস আমার বহুদিনের। কথাটা এই যে, আমি নিজেকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষা তথা পরীক্ষা করে দেখেছি যে সাহিত্য আমার কাছে গানের থেকে একটুও কম প্রিয় নয়। বড় লেখকের লেখা পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বড় গায়কের গান-শুনে-পাওয়া আনন্দের চেয়ে এক তিলও কম নয়। এক্ষেত্রে আমার হয়ত রোঁলার সংগে কিছু মিল আছে কারণ তিনিও শেষ পর্যন্ত কোনোদিনই জোর করে বলতে পারেননি—কাকে তিনি বেশি ভালোবেসেছিলেন—সাহিত্য না সংগীত? আমার জীবনে প্রাক্-যোগপর্বে অবশ্য সংগীত-চর্চাতেই বেশি আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু ১৯২৮-এ শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষার পরে আমার সাহিত্য-অনুরাগ আমাকে বানের জলের মতন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—দিনের পর দিন। পণ্ডিচেরিতে পঁচিশ বৎসর থেকে শ্রীঅরবিন্দের স্নেহোৎসাহে আমি দিনের পর দিন সাহিত্য সাধনাতেই ডুবে থাকতাম বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু সে-বিকাশ পরে হলেও প্রাক্-যোগপর্বেও আমি হৃদয়ে প্রবল টান অনুভব করতাম সাহিত্যের দিকে—বিশেষ করে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর থেকে। তাই বলছিলাম গানে আমার পক্ষে সে-সময়েও ঐকান্তিক হওয়া সম্ভব ছিল না। লেখায় না হোক পড়াশুনোয় আমার বহু সময় যেত—লিখতামও সময় পেলেই কিন্তু সময় বেশি পেতাম না বলে। পণ্ডিচেরি প্রয়াণের পূর্বে লেখার সাধনাকে বরণ করতে পারিনি তেমন করে—যেকথা শরৎদা আমাকে একাধিকবার লিখেছিলেন ধমক দিয়ে। এ-সময়ে আমি সাহিত্যসাধনায় উৎসাহ পেয়েছিলাম শুধু তাঁরই কাছে। আমার বন্ধুরা কেউই আমার সাহিত্যিক উচ্চাশাকে আমল দেননি—অধিকাংশই স্বতঃসিদ্ধের মতন ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি স্বধর্মে সাংগীতিক মাত্র, সাহিত্যিক বা কবি নই। এতে আমি গভীর দুঃখ পেতাম বলেই শরৎদার কাছে কৃতজ্ঞতার আমার অবধি ছিল না। পরে মহাগুরু শ্রীঅরবিন্দের উৎসাহ পেয়ে আমার এ-দুঃখ ঘোচে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। যা বলছিলাম বলি।

সংগীতে যশঃস্পৃহা দেখতে দেখতে আমাকে উদ্দীপিত করে তুলল। ব্যাসদেবের নির্দেশ 'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি—হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে'* মাঝে মাঝে আমার মনকে টোকালেও আমি আর গ্রাহ্যই করতাম না নিবৃত্তির নিষেধ—আরো এইজন্যে যে হবি তো হ—ঠিক এই সময়ে অভ্যাগতদের মধ্যেও আমার নাম হল গান্ধীজী, ভগবান দাস, যুগলকিশোর বিরলা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শিউপ্রসাদ মিশ্র, আম্বালাল সারাভাই প্রমুখ মহাজনদের সমাদরে। এতে আমি আরো মেতে উঠে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ কাশী আগ্রা গোয়ালিয়র আমেদাবাদ দিল্লি ছিল্লি সর্বত্র গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চরে বেড়াতে লাগলাম। তিনি এই সময়ে মাঝে মাঝে দেখা হলেই আমাকে সস্নেহ পরিহাসে বলতেন: "তোমার বাবাও গান গেয়েছেন দিলীপ, আমিও বড় কম যাইনি, কিন্তু তোমার মত দাপাদাপি করে ভভারত চষে বেড়াইনি।' কিন্তু তিনি আমার আর একটি সাথী উচ্চাশার কথা উল্লেখ করেননি—গান শেখার। যেখানে বড় ওস্তাদের খোঁজ পেয়েছি গিয়ে দিয়েছি ধর্না। কিন্তু হায়রে খুব কম ওস্তাদই শেখাতেন মন দিয়ে—যদিও টাকা নিতেন খুশি হয়েই। সময় সময়ে বহু অর্থ ব্যয় করেছি শুধু একটি কি দুটি গান শিখতে। একটি দৃষ্টান্ত দেই

* নিরত উপভোগে কবে হয়
তৃপ্ত ভোগের বাসনা? আহুতি
যতই দাও হুতাশনে তত জ্বলে
ওঠে দাহনা।

নমুনা হিসেবে ঃ বরোদায় গেলাম ফৈয়াজ খাঁর কাছে গান শিখতে। কিন্তু প্রতিদিন তের টাকা করে নিয়েও তিনি দিনে একটির বেশি গান শেখাতে চাননি—যদিও আমার দিনে একটি করে গান শেখার ক্ষমতা সত্যিই ছিল। কিন্তু সে-খেদ থাক—এখানে শুধু একটা ছক কেটে যাই কার কার কাছে গান শিখেছিলাম।

গয়ার সোনি, গোয়ালিয়রের হাফেজ আলি, মিরজের আবদুল করিম, গয়ার ফৈয়াজ খাঁ, মথুরার চন্দন চোবে, উদয়পুরের জিয়াউদ্দিন—জাকরউদ্দিনের পুত্র, ইন্দোরের কেশবরাও আপ্তে, জয়পুরের ফলজি ভট্ট, বম্বের বালগন্ধর্ব, দিল্লির মুজঃফর খাঁ, কাশীর মোতি বাই, এলাহাবাদের জানকী বাই, লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছন বাই। এ ছাড়া বরোদায় রাইহানা তায়েবজির কাছেও শিখেছিলাম কয়েকটি রাগ তথা ভজন। হ্যাঁ, ইন্দোরের সারেঙ্গিয়া বন্দে খাঁর কাছেও কয়েকটি গান শিখেছিলাম এবং রত্নজনকারের কাছে অনেকগুলি গানেরই তালিম নিয়েছিলাম। লক্ষ্ণৌয়ে একটি স্মৃতি ভুলবার নয়। রত্নজনকার ও আমি দিনের পর দিন যেতাম বিখ্যাত ঠুংরি সুরকার নবাব কদর পিয়ার পৌত্র নরেন্দ্রর মির্জার কাছে। ঠুংরি শিখে আমি সবচেয়ে লাভ করি এই নবাব পৌত্রের তথা অচ্ছন বাইজির কাছে। ঠুংরির শ্রেষ্ঠ ঘরানা চাল শিখি এঁর কাছে ও গায়কী [illegible] শিখি অচ্ছন বাইজির কাছে। এই [illegible] অপরূপা আমাকে পুত্রের স্নেহ করতেন। তাঁর বয়স তখন [illegible], আমার [illegible]। তিনি আমাকে বহু যত্ন নিয়ে শেখাতেন। তাঁর স্নেহ ও সদাশয়তার কথা আমি ভুলব না। আমি যে-গানই কেন না ফরমাস করতাম, তিনি তৎক্ষণাৎ শোনাতেন অনেক সময়েই সারেঙ্গিওয়ালার সাথে। যে-গম্ভীরপ্রকৃতি অধ্যাপকটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁকে বাই সাহেবার গান শুনিয়েছিলাম এইভাবেই—আসর করে শোনাতে চাইলে তিনি ভয় ও-মুখোই হতেন না। একথা বাই সাহেবার কাছে বিদায় নেবার দিন বলি হাসতে হাসতে। কিন্তু বাই সাহেবা না হেসে হঠাৎ এমন এক সুর ধরলেন যে, আমি শুধু যে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাই নয়—আমার মনের উপর তাঁর কথাগুলির ছাপ পড়েছিল গভীর-ভাবে। কেন—বললেই বোধগম্য হবে কেননা তিনি যথার্থক ভাষায় কথা বলেননি, অতি মধুর মুসলমানি বাংলায় দিয়ে-ছিলেন আমাকে সাবধান করে। একটু নমুনা দেই তাঁর বাক-ভঙ্গির ঃ

"তোমাকে বাচ্চা, আমি নিজের লেড়কার মতনই দেখেছি প্রথম থেকে। তোমার শকল্ দেখে আমার মায়া পড়েছিল। তোমার আওয়াজও আমার মন টেনেছিল—আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে, তুমি পারবে বাকায়দা শিখতে। কিন্তু একটি কথা তোমাকে বলি বাচ্চা, কিছু মনে কোরো না। তুমি যে-প্রফেসরটির ভয় পাওয়া নিয়ে মজাক্ করলে তাঁর ভয়ের বেশক্ কারণ ছিল জেনো। গান খোদার দান বটে বাচ্চা, কিন্তু গানা শিখে কত নেক লড়কা যে জাহান্নমে গেছে তুমি বা প্রফেসর না জানলেও আমি জানি তো। তাই তোমাকে বলি—গানে তালিম নাও—কিন্তু বাইজীদের কাছে নয়। আমি তোমার মা-র মতন, আমার কাছে এলে তোমার কোনো আফৎ হবে না। কিন্তু জওয়ানীর পথ বড় পিছল বাচ্চা, আরো এইজন্যে যে, তোমার শুধু রূপিয়াই নেই, আছে সুরৎ আর মীঠী আওয়াজ। তুমি জানো না বাচ্চা, তবায়েফ-দের হালচাল। তাদের মধ্যে ভালো আওরৎ একেবারেই মেলে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার না হলে খুবসুরৎ আওরৎরা প্রায়ই মরদদের গিরফতার করে—খাস করে তোমার মতন শরীফ নও-জোয়ানকে তারা নানা নাজ [illegible] করতে চায় বেবশ—বুঝলে না? না না বাচ্চা, গোস্সা কোরো না। তাছাড়া তুমি জানো না তবায়েফরা মীঠী আওয়াজ শুনলে [illegible] কী রকম দিবানী হয়ে যায়।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, কথা-গুলি একটু সাজিয়ে বললাম ইচ্ছে করেই—এদিকটা তাঁর সঙ্গে আমার কী ধরনের কথা হত তার একটা নমুনা দিতেও বটে।

কিন্তু তিনি আরো অনেক কথা বলে-ছিলেন—শনেওছিলাম কিছ, কিছ, তিনি কত দঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে দটি স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয় থাকবেঃ এক, তিনি পঙ্কের মধ্যে বাস করেও পংকিল হননি, ফটে উঠেছিলেন পংকজিনীর মতন, আর দুই, আমি তাঁর কাছে যে-স্নেহ পেয়েছিলাম, তার মধ্যে সত্যিই মাতৃস্নেহের আমেজে আমার মন ভরে উঠেছিল। তিনি বাইজী হয়ে কীভাবে জীবনযাপন করে-ছিলেন, আমি আজো জানি না, জানতেও চাইনি কোনোদিন। কারণ আমার মনে তিনি এমন একটি অমল গৌরবের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন তাঁর মিষ্ট অভ্যর্থনায়, কিন্নরী-কণ্ঠে ও (সর্বোপরি) মাতৃস্নেহের সহজ মর্যাদায় যে তাঁর ঋণ আমি কোনোদিনই শধতে পারব না—আরো এইজন্যে যে, তাঁর সাবধান-বাক্য আমার মনকে স্পর্শ করেছিল—এর পরে আমি আর কোনো তবায়ফের কাছেই গানের তালিম নিইনি—এক বর্ষীয়সী মোতি বাঈয়ের কাছে ছাড়া।

(ক্রমশ)

মা-ও বুঝি উঠছেন পিছু-পিছু। পা না উঠলেও কান উঠছে নিশ্চয়ই। তাই ছাদে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে চাইল কাকলি। কিন্তু কই ঃ সুকান্ত কোথায়?

'এ কী, কোথায় গেলেন?'

এপাশ ওপাশ কাকলি তাকাল ব্যাকুল হয়ে। ছাদ এমন কিছু ঘোড়দৌড়ের মাঠ নয় যে নজরে আসবে না। কিন্তু সত্যি, গেল কোথায়? গাছটা যেখানে ডালে-ফুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে রেলিঙ ছাপিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সেদিকটাতেও নয়। একি আশ্চর্য, হাওয়া হয়ে গেল নাকি? না কি লাফিয়ে পড়ল ছাদ থেকে?

কাকলি গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। রেলিঙে ভর রেখে ঝুঁকল নিচে।

না কি গাছ বেয়ে নেমে রাস্তায়?

তাকাল ফুলগুলির দিকে। যেন ওরা জানে। ওরাই বলতে পারবে। যেন ওদেরই একটি হয়ে রয়েছে লুকিয়ে। রয়েছে ঘুমিয়ে। সুগন্ধ হয়ে।

কী অদ্ভুত ছেলেমানুষ! জলের ট্যাঙ্কটার পিছনে লুকিয়েছিল গুঁড়ি মেরে। ঝকঝকে দাঁতে এক পাঁতিহাঁস উড়িয়ে বেরিয়ে এলেন কালো মেঘ।

'কী সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!' ফ্যাকাসে মুখের সব জায়গায় এখনো নিশ্চিন্ত রক্ত আসেনি, কাকলি বললে ধূসর স্বরে, 'বুক এখনো কাঁপছে নিদারুণ।'

'বিশ্বাস করি না।' বললে সুকান্ত।

'কী বিশ্বাস করেন না?'

'আপনার বুক যে কাঁপছে।'

'মুখে বলছি—'

'বুকের কথা কি মুখের কথায় শ্রবণীয়? পরীক্ষা চাই।'

'পরীক্ষা! আপনি কি ডাক্তার! সঙ্গে আপনার স্টেথিসকোপ আছে?' তুমি চালাক হতে পারো, আমি হতে পারি না—এমনি দুরন্ত জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল কাকলি।

'কিন্তু আমার পরীক্ষা আরো নিকট, আরো নিবিড়।' হাসল সুকান্ত ঃ 'আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমারি গান—'

'আপনার ছাদ থেকে পথে যাওয়াই উচিত ছিল।'

'সেটা তো মাটিতে, রাস্তায় পড়া হবে। যদি পড়ব তো এভারেস্ট থেকে পড়ব। আর নড়ব এই ছাদের উপর।'

'কেন এই ছাদের উপর কেন?' যেন এতে বিশেষ আপত্তি বর্তমান, এমনি ভাব করল কাকলি।

'ছাদের উপর মানে পাহাড়ের কোলের কাছাকাছি।' নিচু গলায়, বলতে পারল সুকান্ত। 'যেখানে এভারেস্ট। চিরন্তন বিশ্রাম।'

আশির পলকাখ গম্ভীর হয়ে গেল কাকলি। ফিতের রিল ঘুরিয়ে যাচ্ছে এমনি দ্রুত শেষ করবার উদ্যোগে বললে, 'যার জন্যে এসেছিলেন ছাদে, এই দেখুন সেই কদমগাছ। দেখুন কী গাঢ় পাতা আর কী নিটোল ফুল, সাদায়-সোনায় গায়ে হলুদ!'

এক ফুঁয়ে সব যেন উড়িয়ে দেবার মত। সুকান্ত বললে, 'মানুষ পেলে গাছ কে দেখে!'

'মানুষ পেলে!'

'হ্যাঁ তা ছাড়া ঐ গাছ, কদমগাছ তো অশ্লীল।'

'অশ্লীল?' যেন বসে পড়ল কাকলি।

'হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে যারা দেবদেবী মানে না নিরাকার মানে তারা কদমগাছকে অশ্লীল বলে। এই কদমগাছের উপরে-নিচে

আমাদের কৃষ্ণ অনেক দুষ্কাণ্ড করেছেন, তারই জন্য।'

'উপরে-নিচে?'

'নিচে থেকে বাঁশি বাজিয়ে ঘরের বউকে বার করে এনেছেন। আর' 'চোখে মুখে হাসির কুঙ্কুম ছড়াল সুকান্ত : 'আর, উপরের কথা শুনতে চেয়ো না। এবার কুল-চোর নয়, দুকুলচোর। স্নানার্থিনীদের শাড়ি চুরি করে নিয়ে দিব্যি বসেছেন মগডালে। জলাঙ্গিনীদের কী দুর্দশা! দুর্দশা দেখেও দয়া নেই গুণমণির।'

'জানো', গলার স্বর আর্দ্র করল কাকলি : 'মা তোমাকে কালো মেঘ বলেছেন।'

'সে আমার গায়ের রঙ দেখে। আমি স্বভাবে কৃষ্ণ বলে নয়। তাছাড়া আমার নাম তো শ্রীকান্ত নয়, আমার নাম সুকান্ত।'

'কিন্তু কালো মেঘ দেখে শ্রীমতীর কী আকুতি! সুকান্তর চোখের মধ্যে তাকাল কাকলি।

'কলির শ্রীমতীর তো কালো মেঘকে তাড়াতে পারলেই শান্তি। বলে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ুন। চম্পট দিন।'

'কিন্তু আমি কি শ্রীমতী?'

'তুমি এই কলকাতার সন্ধ্যা। দেখ দেখি তাকিয়ে। এখনো জ্বলেনি আলো, গায়ে হাতে পরেনি একটিও গয়নার চিহ্ন। আভরণহীনতার আভা। রংটি মাজা-মাজা, মৃদু-মৃদু মিষ্টি। আর থুল-ভাঙা চুল, আস্তে-আস্তে পড়ছে ছড়িয়ে-গড়িয়ে। আর চোখ ভরা বৃষ্টির মমতা। তুমি আরেকরকম শ্রীমতী।'

'সন্ধ্যা হয়েছে। এবার তবে বাড়ি যাও।' যেন সত্যিসত্যিই বললে কাকলি।

'যেতে ইচ্ছে করছে না।' শিশুর মত মুখ করল সুকান্ত। মুখ করল বটে কিন্তু নির্ভুল ফিরে চলল দরজার দিকে। দুর্দান্তের মত পা ফেলে।

'ওকি, এখুনি চলে যাচ্ছেন কি!' প্রায় আর্ত হাঁক দিল কাকলি: 'একটা অন্তত ফুল নিয়ে যান। যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা।'

ফিরল সুকান্ত। কাছে এল।

কাছে আসতেই কাকলি বললে, 'ফুল একটু দেখবে না? ধরবে না?'

নিষ্ঠুর নির্লিপ্তের মত সুকান্ত গাছেরই একটা ফুল ধরল মুঠোতে। বললে, 'জানো কদম খুব খাঁটি ফুল।'

'খাঁটি?' বিশেষণ শুনে আশ্চর্য হল কাকলি।

'হ্যাঁ, একনিষ্ঠ। প্রথম থেকে, উদ্গম থেকেই গোল হয়ে দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত গোলই থাকে। আকার বা অবয়ব কিছুই বদলায় না একটুকু। আদিম থেকে অন্তিম এক অবস্থিতি। জীবনে প্রথম ভালোবাসার মত।'

গোবর্ধন দু-কাঁধে দুই বেতের চেয়ার নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

'এ কি, চেয়ার কেন? চেয়ার দিয়ে কী হবে?' কাকলি হকচকিয়ে উঠল।

'বাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, আপনারা পড়বেন বসে। ঘরে ঘরে পড়তে নাকি অসুবিধে হচ্ছে। তারপরে, যাচ্ছি, আবার একটা টেবিল নিয়ে আসতে হবে।'

'টেবিল? কিন্তু এখানে আলো কই?'

'তা জানি না।' চলে গেল গোবর্ধন।

'তার মানে দু চেয়ারে হয়নি এবার অন্ধকারে টেবিল ছুঁড়ে মারা হবে। এবার পালাই।' পিছন ফিরেও তাকাল না, নেমে চলল সুকান্ত।

'সে কি, একটা ফুল নিয়ে যান।' ডেকে উঠল কাকলি।

একটা ফুল হাতে করে নিয়ে না গেলে এখানে আমার সাধুতাটা সাব্যস্ত হয় কি করে?

কিন্তু দাঁড়াল না সুকান্ত।

সেতলায় নেমেই টেবিল কাঁধে গোবর্ধনের সামনে পড়ল। কি মাথায় এল, বলে বসল, 'বাবু কোথায়?'

ঘর দেখিয়ে দিল গোবর্ধন।

প্রণাম করবে কি, না পা পুরু কম্বলে ঢেকে শুয়ে আছেন বনবিহারী।

'আমি এবার যাই।' বিনয়নম্র স্বরে বললে সুকান্ত।

'ও! তুমি? তুমি এখনো আছ? কি, এখন যাবে? বেশ, যাও। এরপর আবার যখন আসবে, যদি আস, বাইরে থেকে প্রথমে জানান দেবে—সুকান্ত?'

'কেন, এখন তো জানাশোনা হয়ে গেল।' সুকান্ত মাথা চুলকোলো : 'এখন তো সটান চলে আসতে পারব।'

'সটান? আর টানে দরকার নেই। শোনো।' বনবিহারী থামালেন সুকান্তকে : 'তোমার বাবা কি করেন?'

'বাবা উকিল।'

'যে বাড়িতে থাকো সেটা নিজেদের বাড়ি?'

'না। ভাড়াটে বাড়ি।'

'কে কে, কজন থাকে সে বাড়িতে?'

'রাবণের গুষ্টি। আমরা একান্নবর্তী কিনা—এক-একগুচ্ছি গো-গো চিড়িয়া—' ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিচের সিঁড়ি ধরল সুকান্ত। আর বনবিহারী পায়ের কম্বলে মাথা ঢাকলেন।

সিঁড়ির মুখেই কাকলি। তার হাতে একটা কদমের ডাল। তাতে তিনটি ফুল। কী ভেবে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ডালটাকে দু-ফুল করলে। কোনো কথা বলল না। ডালটি দিয়ে দিল সুকান্তর হাতে।

নিচের তলায় নেমেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা। তাঁর এক হাতে চায়ের কাপ আরেক হাতে খাবারের প্লেট।

'এ কি, চা করেছিলাম যে—'

'আরেকদিন এসে খাব।' দ্রুত বেরিয়ে গেল সুকান্ত।

বাড়িতে এসেই ডাক দিল সেন্টুকে। দ্যাখ তোর জন্যে কী এনেছি।

'কী এনেছ কাকা?' পড়ি-মরি করে ছুটল সেন্টু।

'দেখবি আয়। রাধাকৃষ্ণ এনেছি।

'খুব ভালো, খুব ভালো।' ফুলের বৃন্ত ধরে সেন্টুর খুশি আর ধরে না।

'ভীষণ ভালো।' বললে সুকান্ত। 'বাসেও ভালো রসেও ভালো। রাতেও ভালো দিনেও ভালো। সুখেও ভালো স্মৃতিতেও ভালো। এমন ভালো আর হয় না।'

কদিন পরে এ বাড়িতে একটা হট্টগোল উঠল।

'কাকে চাই?'

'সুকান্তবাবু আছেন?'

ওরে সুকু, শিগগির আয়, তোর কাছে কে এসেছে। চারদিক থেকে সমস্বর কোলাহল উঠল।

এসেছে তো এসেছে, তার এত ভূমিকম্প কিসের? এসেছে তো রাস্তায় দাঁড়াক, অপেক্ষা করুক। আমি এখন দাড়ি কামাচ্ছি।

বকলা চোখ মুখ স্বর ঝাপসা করে বললে, 'এ তোমার সুবল সখাদের কেউ নয়। এ মেয়ে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ফটোনিকা ডিব্বা।'

(ক্রমশ)

ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভুতোদা পট্ পট্ করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

"তিনমাস ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে।" বিমল হন্ত দন্ত হয়ে দৌড়ে এল—

"আহা হা করছেন কি ভুতোদা।"

ভুতোদা: "করব না তো কি?"

বিনয়: দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে?

ভুতোদা: তার মানে!

বিনয়: তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভুতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে): হ্যাঁ: যতসব কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিমল: সে কি ভুতোদা? গাছ যে মানুষেরই মত, সার

জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মানুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি!

ভুতোদা: যা: যা: তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয়: নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে?

ভুতাদা: তাই বলেই কি আমায় মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল?

বিনয়: নিশ্চই। আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙ্গতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল: 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকতাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা: কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয়?

বিমল: মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয়: আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা: দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্য-গুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয়: একটুও না। পুষ্টি বিষারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা: আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে?

বিমল: আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয়: তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল: এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে?

ভুতোদা: কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।

DL/P1-X54 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

ভ্রমণ

জাপানে—অন্নদাশঙ্কর রায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১২। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'পথে প্রবাসে' পড়ার সময় শুধু প্রমথ চৌধুরী কেন, দেশসুদ্ধ সবাই চমকে উঠেছিলেন। তারপর এলেন 'সত্যাসত্যের' লেখক, বিনু, এবং সর্বশেষে দেখা দিলো 'রত্ন ও শ্রীমতী'র মৃগতৃষ্ণিকা। ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক পি ই এন কংগ্রেসের টোকিও অধিবেশনে 'জাপানের মত ভূস্বর্গে যাবার নিখরচার নিমন্ত্রণ' পেয়েছিলেন অন্নদাশংকর। অধিবেশন শেষ হবার পরেও তিনি সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে আসেনঃ 'ভোজবাজির মত সব কেমন করে ঘটে গেছে'। সেই 'ভোজবাজির' সবাক চিত্র 'জাপানে'।

কিন্তু 'চোখে মায়াকাজল' লাগলেও সরসতার অভাব ঘটেনি—তেমপুরা ('ভাজা মাছ বললে ঠিক বোঝা যাবে না'), জাজ-ব্যান্ড, হাজব্যান্ড ইত্ত 'দি গ্রেটেস্ট টেরর অফ জাপান!' থেকে নো, কাবুকি, গেইশা, স্নানসমস্যা কিছুই বাদ যায়নি। নানা রঙের নিসর্গচিত্র, মুহূর্তের টুকরো ছবি, ঘটনা, বিদগ্ধ মানুষ ও আলোচনা—চলচ্চিত্রের মতই, সব চলে এক চালে। আর পাল্লা দিয়ে চলেছে অন্নদাশংকরের ভাষা। কিন্তু যে বর্ণনা, মনন ও টীকাটিপ্পনী 'পথে প্রবাসে'কে অমর করেছে এখানে—কিছুটা জানেন কিছুটা পেয়েছেন, বাকিটা অনুচিন্ত তার পরিচয় পাবেন চেয়ে অনুভবে। অভিজ্ঞতাকে দূরে নিয়ে লক্ষ করা তার একটি কারণ হতে পারে। অথচ আসছেন তাঁর বিপুল বক্তব্যের দায় হতে নিস্তার নেই। মৈত্রী ভাবনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সহজাত, কিন্তু তাকে চলে রূপকথার রাজা, কিশোরের মানসী আজও তাকে হাতছানি দেয়, ঘরছাড়া করে। 'ইচ্ছা করে মায়াশতরঞ্চে বসে উড়ে যেতে এক যুগ থেকে আরেক যুগে'। কিন্তু তিনি নিজেও জানেন 'এই রাজ্যের উপর কী যেন একটা অভিশাপ আছে। কোথায় কী যেন গলদ। সেইজন্যে ত্যাগ আর বীর্য আর শ্রম আর সৌন্দর্য আর বুদ্ধি আর বিবেক থেকেও ঠিকমত মিশ্রণ হয়নি'। এসব কথা উঠছে এইজন্য যে 'জাপানে' শুধু ভ্রমণকাহিনী নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী'। 'জাপানের' সমস্ত ঘটনা, বর্ণনা, অভিজ্ঞতার পিছনে একটি তত্ত্ব, অন্নদাশংকরের ভাষায় 'জীবনবিধাতার উদ্দেশ্য', আছে। সেটি তাঁর শিল্পীজীবনের সার কথাঃ 'রত্ন ও শ্রীমতী' লিখতে লিখতে কলম কেবলি থেমে যাচ্ছে। মন বলছিল সত্যই যথেষ্ট নয়, সৌন্দর্যও চাই। কেবল বহিঃসৌন্দর্য নয়। অন্তঃসৌন্দর্য। সৌন্দর্যের দীক্ষা যে পূর্বে কোনোদিন হয়নি তা নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অভিজ্ঞতা জাপানে গিয়েই হলো।'

শুদ্ধির আকাশে 'সৌন্দর্যসাধনার অনলস ও অগ্রগণ্য' জীবনশিল্পীর পরিণতির, 'ঠিকমত মিশ্রণের' জন্য অপেক্ষা করবো। সে হবে একাধারে পরিণতি ও পরীক্ষা। বিনুর তপস্যা। পুনদর্শনায় চ।

২৬৭।৫৯

শারদ সাহিত্য

শারদীয় বেতারজগৎ। সম্পাদক **শ্রী** জি সি চক্রবর্তী। ১ গার্স্টিন প্লেস, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দু টাকা।

রচনা-সম্পদে এবং মুদ্রণ-পারিপাট্যে বেতার জগৎ-এর এই বিশেষ সংখ্যাটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। রমাপদ চৌধুরী, অমল হোম, সুকুমার সেন, গোবিন্দ চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, সুশীল রায়, পরিমল গোস্বামী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার মজুমদার প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ছাড়া দুটি উপন্যাসও এই সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছে। উপন্যাস দুটি লিখেছেন নরেন্দ্র বসু ও সমরেশ বসু। সংখ্যাটির অঙ্গসজ্জা এবং চিত্রসম্ভারও উল্লেখযোগ্য।

রোশনাই— সম্পাদক—শ্রীবিমল দাস। বঙ্গীয় শিশুসাহিত্য পরিষদ পক্ষে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশিত। ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ ১২। মূল্য তিন টাকা।

বড়দের মতো ছোটদের জন্য পূজার বিশেষ সংকলনের সংখ্যা বহু। তাদের মধ্যে "রোশনাই" বিশিষ্ট লেখকদের লেখা গল্প, জীবনী, নাটিকা ও কবিতা এবং প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির সম্ভারে দৃষ্টিতে পড়বার মতো। ছাপা ও বাঁধাইও ভাল। দাক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, অন্নদাশংকর রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুখলতা রাও, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, স্বপন বুড়ো, ধীরেন বল, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরকিশোর ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুনির্মল বসু, শৈল চক্রবর্তী, বন্দে আলি মিয়া, কার্তিক দাশগুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ চল্লিশজনের লেখা এবং অন্নদা মুন্সী, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন বল, জর্মান শিল্পী মিঃ এম আই ই, রেবতীভূষণ ঘোষ প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা অলংকরণে 'রোশনাই' কিশোরদের একটি সুখপাঠ্য ও সুদৃশ্য সংকলন।

রূপমঞ্চ—সম্পাদক—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। ৮১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। মূল্য তিন টাকা।

মঞ্চ ও পর্দা সম্পর্কিত সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা "রূপমঞ্চ" এবার তাদের শারদীয়া বিশেষ সংখ্যাটিকে স্বর্গত নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের উদ্দেশে শিশির-স্মৃতি-তর্পণ-সংখ্যারূপে প্রকাশ করেছেন। নাট্যাচার্যের জীবনের ঘটনপঞ্জী, শিশিরকুমার ও নজরুল রংগরংগমঞ্চ ও শিশিরকুমার ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে শচীন সেনগুপ্ত, নিতাই সেন, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, মন্মথ রায়, শিশির মল্লিক, দেবনারায়ণ গুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা আছে। শিশিরকুমারের দলে থেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতিভার সম্পর্কে যাঁরা এসেছিল তাঁদের মধ্যে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় লীলা মুখোপাধ্যায়, উষারানী, প্রফুল্লবালা **প্রমুখ** শিল্পীদের শ্রদ্ধাবনত **স্মৃতিচারণও** সংখ্যাখানিকে এমন একটি তথ্যপূর্ণ সংকলনে পরিণত করেছে যা নাট্যামোদী জনসাধারণের সংগ্রহ করে রাখার মতো মূল্যবান।

এছাড়া, নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত 'পাদপ্রদীপের আলোকে' ইসাডোরা ডানকান, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কুসুমকুমারী, প্রবোধ গুহ, ডেভিড গ্যারিক, মিসেস রবিনসন, নেল গোয়েন, এডমণ্ড কীন, শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ললিত মস্টার, দামোদর রায় প্রভৃতিকে জড়িয়ে

একখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। অজস্র ছবিও সংখ্যাখানির একটি আকর্ষণ।

চলচ্চিত্র—প্রেস এণ্টারপ্রাইজ। ৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, বাগরি মার্কেট, কলিকাতা১। মূল্য দুই টাকা।

বাঙলার চলচ্চিত্র আজ বিশ্বের চলচ্চিত্র-রসিকদের কাছে সম্মানিত হবার মতো প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও, চলচ্চিত্র সম্পর্কে 'সিরীয়াস' চিন্তা প্রসারের উপযুক্ত মাধ্যমের অভাবটা বিশেষভাবেই অনুভব করা যায়। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা যা আছে তারা সস্তা বাজারে উপাদান নিয়েই মাতামাতি করে, গঠনমূলক কোন চিন্তাধারার ধার ঘেঁষেও তারা যায় না। এমনি অবস্থায় "চলচ্চিত্র" বার্ষিকীর আবির্ভাব একটা মস্ত প্রয়োজন মেটাতে যে এগিয়ে এসেছে সেটা আলোচ্য সংখ্যাখানি দেখে বোঝা যায়। বিশেষ আশ্বস্ত হবার বিষয় হচ্ছে যে, আজকের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিন্তায় ও কাজে যারা অগ্রণী তাদেরই কতকজন রয়েছেন "চলচ্চিত্র" প্রকাশের মূলে। সত্যজিৎ রায়, নিরঞ্জন পাল, গোপাল হালদার, শম্ভু মিত্র, জ্যোতির্ময় রায়, ঋত্বিক ঘটক, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, তৃপ্তি মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি সান্যাল, অসীম সেন, রঘুনাথ গোস্বামী প্রমুখের রচনা সম্ভারে সংখ্যাখানি বৈশিষ্ট্য অর্জন করার মতো। বিভিন্ন বিষয় নিয়েই আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া, আগেকার নানা স্মরণীয় ছবির দৃশ্য সংকলনও সংখ্যাখানির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। জানা নেই, এদের পরিকল্পনা কি তবে এরকম একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ যদি উদ্যোক্তারা সম্ভব করে তোলেন তাহলে চলচ্চিত্রের প্রকৃত সুরসিকদের বড়ো একটা প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। বাঙলাতে এ একটি অভিনব প্রচেষ্টা।

হিমাদ্রী—সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য। ১৬, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা ১২। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রমাপদ চৌধুরী প্রভৃতির গল্প, ডঃ গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায়, রানী চন্দ, ডঃ রমা চৌধুরী, কালিদাস রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, নলিনী সরকার, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতির প্রবন্ধ এবং কাজী নজরুল ইসলাম, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দিলীপকুমার রায়, জগদানন্দ বাজপেয়ী প্রভৃতির কবিতা সমন্বয়ে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যা। রচনাবলীর দিক থেকে সংখ্যাখানি সুখপাঠ্য।

শনিবারের চিঠি—সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস। ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭। মূল্য দু' টাকা।

বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সম্ভারে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে "শনিবারের চিঠি" অন্যান্য বছরের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। এবারের বিশেষ আকর্ষণের মধ্যে আছে মহাস্থবিরের লেখা উপন্যাস চতুর্থ পর্ব "মহাস্থবির জাতক" ও বাণী রায়ের তৃতীয়াংক নাটক একখানি। এছাড়া, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ অমলা দেবী, সুশীল রায়, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতির গল্প ও রসরচনা, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মধু বসু প্রভৃতির প্রবন্ধ এবং কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে প্রমুখ কবির রচনা সংখ্যাখানিকে শোভন করে তুলেছে।

ডানপিটেদের আসর—পরিচালক রত্নাকর। জলপাইগুড়ি। মূল্য এক টাকা।

জলপাইগুড়ির ছোটদের আসরের মুখপত্র। গোপাল ভৌমিক, মনোজিৎ বসু প্রভৃতি এবং স্থানীয় লেখকদের রচনা নিয়ে এই বিশেষ সংখ্যা।

স্ফুলিংগ— সম্পাদক শ্রীসুধাংশুভূষণ নায়ক। কুমারডুবি, ধানবাদ। মূল্য এক টাকা।

দীপক চৌধুরী, সুশীল রায় প্রভৃতির গল্প; হাসিরাশি দেবীর একাঙ্কিকা, নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ শারদীয়া সংখ্যাখানি মফঃস্বল শহরের সাহিত্য সেবায় প্রশংসনীয় উৎসাহের পরিচয় দেয়।

ময়ূখ—সম্পাদক সর্বশ্রী হেম বসু, রবীন গুহ ও কল্যাণ সেন। হোমি হাউস, নাগপুর। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

নাগপুরের ইউথ কালচারাল লীগের মুখপত্র "ময়ূখ"-এর শারদীয় সংখ্যাখানি প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেয়। গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা ছাড়া ছোটদের জন্য একটি বিভাগ সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য। লেখকদের সকলেই স্থানীয় প্রবাসী বাঙালী এবং এদের এই উদ্যম প্রশংসা লাভের যোগ্য।

শিক্ষক—সম্পাদক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী। ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯। মূল্য এক টাকা।

প্রথিতযশা পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতীদের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্পের সমাবেশে শারদীয় সংখ্যাখানি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি যার লেখকদের মধ্যে আছেন ডাঃ কে এল শ্রীমালি, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সমকালীন— সম্পাদক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাহিত্য সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকার আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি সুনির্বাচিত রচনাগুলের জন্য আদরণীয় হবার যোগ্য। লেখকদের মধ্যে আছেন ভবতোষ দত্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, কল্যাণী দত্ত, সোমেন বসু, পবিত্র পাল, রাখাল ভট্টাচার্য, উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রতিটি রচনাই চিন্তাশীল পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে।

বিচিত্রা—সম্পাদক শ্রীহীরেন চৌধুরী। ৮২বি, যতীন্দ্রমোহন এভিন্যু, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকাগুলির বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা হিসেবে "বিচিত্রা" মুদ্রণ সৌষ্ঠব ও আঙ্গিক পারিপাট্যের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শৈলজানন্দ, বনফুল ও নরেন্দ্র ঘোষের লেখা উপন্যাস ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রভৃতির গল্প, রূপদর্শীর রসরচনা, নন্দলাল বসুর স্কেচ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা তিনরঙা ছবি, এছাড়া চলচ্চিত্রের শিল্পীদের ছবির সম্ভারে সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ।

জাগরী—সম্পাদক শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা। ৯এ, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৩। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার আদর্শে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আছেন গল্প ও রম্য রচনায়

গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি; প্রবন্ধ রচনায় হরপ্রসাদ মিত্র, পশুপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি এবং কবিতা রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্র দেব, নিশিকান্ত প্রভৃতি।

সারণী—সম্পাদক শ্রীললিত শর্মা। সারণী কর্ম পরিষদের পক্ষে করিমগঞ্জ, আসাম থেকে প্রকাশিত। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আসামের বাঙলাভাষীদের দ্বারা প্রকাশিত শারদীয় সংকলন। স্থানীয় লেখকদেরই রচিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও রম্যরচনা এই সংখ্যাটিতে আছে।

ভ্রমসংশোধন

গত ১০ই অক্টোবর—(২৬ বর্ষ ৫০ সংখ্যা) দেশ পত্রিকায় **'অন্য অন্ত'** শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত কবিতার লেখকের নাম শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত। মুদ্রণ গোলযোগে লেখকের পদবী বাদ গিয়াছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

অবরোহণ—কনক গুপ্ত।

ইতিউতি—শ্রীধর্মদাস।

মুখর মৌন—বিভুপ্রসাদ বসু।

কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে—শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের **ক-একটি চিত্র**।

স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ—অনিমা দাশগুপ্ত।

প্রশ্নোত্তরে সোভিয়েত দেশ—সরোজকুমার দত্ত।

প্রেমের কবিতা—আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন।

রূপচাঁদ পক্ষী—পক্ষধর ভট্টাচার্য।

সহযাত্রী—শ্রীমাধব রায়।

হাল ফ্যাশানের উলের পোশাক বুনতে—লাল-ইমলি উল চাই
লাল-ইমলি উল সব সময় মোলায়েম থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী উলের সুতোয় বিশেষ ধরনে তৈরী এই লাল-ইমলি উল—অনেক রকম রঙে পাবেন। সেরা 'কাউণ্টেস' উল ৩-প্লাই, 'লেডী লেমলী' ও 'তরুশীলা' উল ৪-প্লাই।
দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি
ট্রেড মার্ক
'কাউণ্টেস' ৩-প্লাই
'লেডী লেমলী' ও 'তরুশীলা' ৪-প্লাই
লাল-ইমলি উল
রেডিমেড উলের পোশাক
আপনার যদি বোনার অভ্যাস না থাকে —নানা আকর্ষণীয় ডিজাইনে তৈরী লাল-ইমলী উলের রেডিমেড পোশাক ব্যবহার করে দেখুন!
LAL 3360

ট্রামে-বাসে

বিজয়ান্তে ট্রামে-বাসের পাঠক-পাঠিকাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করিতেছি দুর্গতিনাশিনী সবার জন্যই ট্রামে-বাসের সীট যেন সুলভ করিয়া দেন। পরমানন্দে লেডীস সীটে সমাসীন

থাকাকালীন লেডীসদের আকস্মিক আবির্ভাবে যেন তাঁরা উৎখাত না হন। রূপ, জয়, যশ ত অনেকবারই প্রার্থনা করিয়াছি, এবারে সম্পূর্ণ নূতন প্রার্থনা ট্রামে-বাসের নিষ্কণ্টক আসন।

•   •   •

শুনিলাম দেবী নাকি এবারে দোলায় আগমন করিয়াছেন এবং মহামারীর আভাসও পাইয়েছি। কিন্তু গমন করিয়াছেন গজে, অথচ তার ফল যে শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা একথা বিশ্বাস করিবার মত ভক্ত এক খাদ্যদপ্তরের কর্ণধারেরা ছাড়া বুঝি আর কেউ নাই!

•   •   •

আমাদের অসংখ্য দুর্গতির মধ্যে দুর্গতিনাশিনী এইবারে একটি দুর্গতির আংশিক নাশ করিয়াছেন, সেইটি হইল মাইক। সুতরাং আংশিক বিশ্বাস আবার ফিরাইয়া পাইয়াছি, তাই পুনরাগমনায় চ বলিয়া মাকে প্রণাম করিয়াছি।

•   •   •

মায়ের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনার মাঝখানে জনৈক সহযাত্রী অকস্মাৎ আমাদিগকে একটি অদ্ভুত কথা শুনাইলেন, বলিলেন—"মা এবারে আসেন নি মোটে। হিমালয় থেকে নাববার পথে ম্যাকমোহন লাইনের গোলমালে পথেই আটকা পড়ে গেছেন।" কথাটা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু চীনারা ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া না গেলে কোন আলোচনাই তাদের সঙ্গে করিব না স্থির করিয়াছি বলিয়া মায়ের মাঝপথে আটকা পড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে সঠিক খবরাখবর নেওয়া সম্ভব হইতেছে না। আমরা হতভম্ব হইয়া সহযাত্রীর দিকে তাকাইলে তিনি বলিলেন——"এ একবারে পাকা খবর। কিন্তু অবিশ্বাসী তো বুঝবে না, যাঁরা "সিদ্ধি" লাভ করেছেন তাঁরাই বুঝবেন!"

•   •   •

মাছ তরিতরকারি বাজার হইতে উধাও হইয়া গেলেও পূজাবাজারে একটি বস্তুর অভাব হয় নাই, তাহা হইল "পূজা-সংখ্যা"। অনন্ত শব্দশাস্ত্রের মতই অনন্ত পূজা-সংখ্যা। স্বল্প আয়ু ও বহু বিঘ্নের মধ্যে পাঠ সমাধা সম্ভব নয়। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিলাম সেই সার্কাসের "খেলা"। সেই এক হাতী-ঘোড়া-সিংহ-বাঘ।

কিন্তু দেখিলাম সব হাতী ঐরাবত নয়, সব ঘোড়া নয় পক্ষীরাজ। সিংহের দাঁত নাই। বাঘ শুধু ডোরার মহিমায় টিকিয়া আছেন।।

•   •   •

পূজার বাজারে উচ্চাঙ্গ আলোচনার মাঝখানে জনৈক সহযাত্রী অকস্মাৎ আমাদিগকে বুঝি মর্তে টানিয়া নিয়া আসিলেন। বলিলেন—হায়দ্রাবাদে শ্রীনেহেরুজী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের ছবি প্রকাশের নীতির নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—জনগণের স্থান হওয়া উচিত পুরোভাগে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"আরো একটি নীতি আছে; হয়ত নেহেরুজী তা জানেন না। সেটা হলো—আগে গেলে বাঘে খায়!!"

•   •   •

শ্রীশ্রীপ্রকাশ বলিয়াছেন যে, নবগঠিত মহাগুজরাটের প্রথম রাজ্যপাল একজন নারী মনোনীত হইতে পারেন; নারীরা পরিশ্রমী ও তাঁরাই কাজে বেশি মন দিতে পারেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমাদের এতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শ্রীপ্রকাশজী নিজে বৃটিশ আমলে রেল-আইনের বিতর্কে আইনসভায় বলেছিলেন, রেল-আইনে নারী তিন শ্রেণীর, যথা—জেনানা, মহিলা আর লেডীস। কথাটা নিশ্চয়ই তাঁর মনে আছে। এখন প্রশ্ন, কোন- শ্রেণীর নারী রাজ্যপাল হতে পারেন বলে তাঁর ধারণা।"

•   •   •

করাচীর সংবাদে জানা গেল যে, কর্তৃপক্ষ সহশিক্ষা সমর্থন করিলেও আদেশ জারি করিয়াছেন, কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে বা কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না, করিলে প্রথমে পাঁচ টাকা জরিমানা এবং পরে রাস্টিকেট পর্যন্ত করা হইবে। শ্যামলাল বলিল—"এই হুকুমের আভাস পেয়েই কি গান লেখা হয়েছিল—চোখে চোখে কথা কও, মুখে কেন বল না!!"

•   •   •

একটি সংবাদে শুনিলাম, নিউগিনি দ্বীপপুঞ্জে তের লক্ষাধিক অধিবাসীর অর্ধেকই নাকি গত পাঁচ বছরে "হাস্যরোগে" মারা গিয়াছে। মারা গিয়াছে হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া। এই রোগের নাকি লক্ষণই এই। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"হাসতে হাসতে মরা এক হিসেবে মন্দ নয়। তবু নিরাময় যদি

কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে ডাক্তার-কবরেজ না ডেকে দেশবিদেশ থেকে জাঁহাবাজ গিন্নী আমদানীর চেষ্টা দেখুন, হাসি বাপ বাপ বলে পালাবে।"
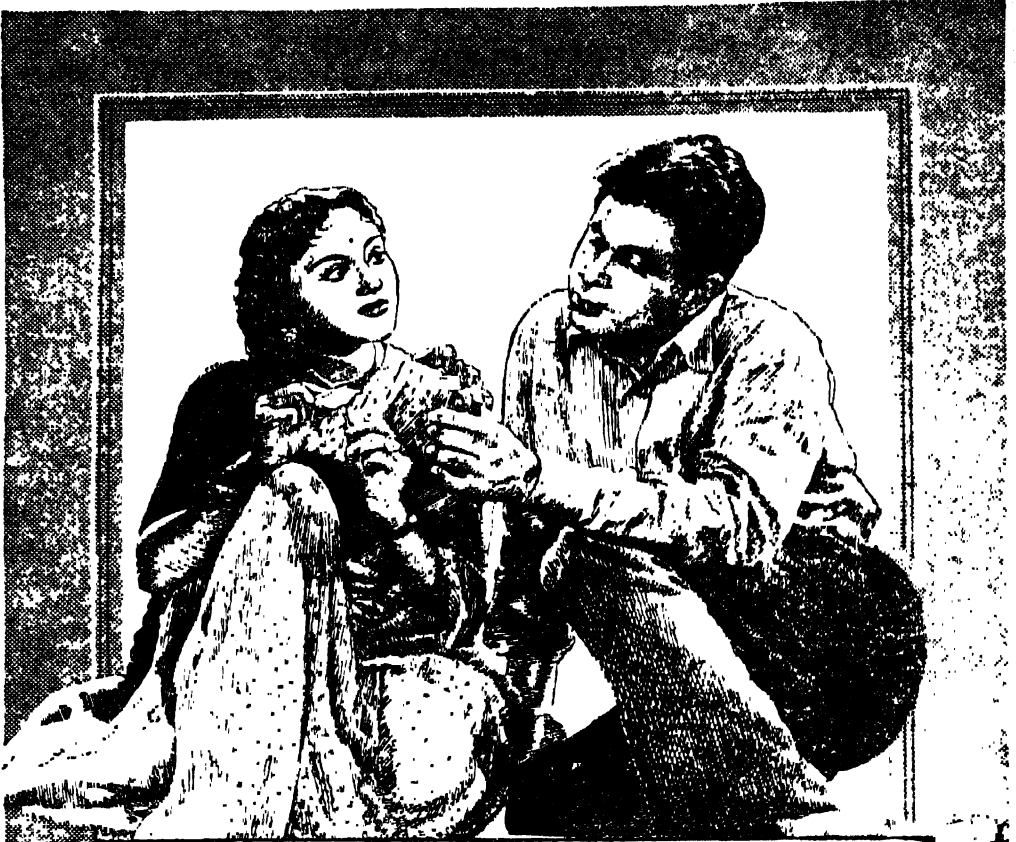
ভূমিকায় ঃ দিলীপকুমার ● বৈজয়ন্তীমালা ● রাজকুমার ● মোতিলাল
পাণ্ডারী বাঈ ● বি সরোজা দেবী ● মিস্ মমতাজ ও জনি ওয়াকার
সঙ্গীত ঃ সি রামচন্দ্র ● গীতকার ঃ প্রদীপ ● সংলাপ ঃ রামানন্দ সাগর
প্রযোজনা ও পরিচালনা ঃ এস, এস, ভাসন

চন্দ্রশেখর

রঙ্গজগতের সমবেদনা

বন্যাবিধ্বস্ত পশ্চিম বাংলার দুর্গত নরনারীর সাহায্যকল্পে আজ নানা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন। ফিল্মশিল্পের যাঁরা শিরোমণি তাঁরাও বাদ যান নি।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতির বন্যাত্রাণ তহবিল অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে প্রশংসনীয় তৎপরতা দেখিয়েছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শোভাযাত্রা বার করে একদিকে যেমন জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলছে, অপরদিকে বি-এম-পি-এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সিনেমার নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় যাতে এই তহবিলে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্টারস্ অফ বেঙ্গল নামে অভিনয়শিল্পী ও সুরশিল্পীদের একটি যুক্ত-সমিতি ইতোমধ্যেই প্রায় ছয় হাজার টাকা তুলেছেন গত রবিবার নিউ এম্পায়ারে পি সি সরকারের ইন্দ্রজালের একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। একাধিক জলসার আয়োজন করেও এই সমিতি আরো অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

কয়েকটি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় মিলিত-ভাবে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে টাকা তুলতে সহায়তা করবেন স্থির করেছেন।

এমনি ধারা আরো অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে যাতে করে বন্যার্ত দেশবাসীর প্রতি রঙ্গজগতের অকুণ্ঠ সমবেদনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে।

বন্যার্তের সাহায্যে চিত্রজগৎ

গত রবিবার (১৮ই অক্টোবর) দক্ষিণ কলিকাতাবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছে। এই অভিজ্ঞতা আশার ও আনন্দের। ছায়াছবির ও মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ও সঙ্গীত-শিল্পীরা দক্ষিণ কলিকাতার পথে পথে বেরিয়েছিলেন বি-এম-পি-এ সভাপতির বন্যার্ত সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ-বস্ত্র-অন্ন সংগ্রহের জন্য। সকাল ৮টার সময় এলগিন রোড থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং বেলা ১টার সময় গড়িয়াহাটার মোড়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন বি-এম-পি-এর সভাপতি মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, দেবকীকুমার বসু, ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি অজিত বসু, অসিত চৌধুরী প্রমুখ চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, জহর রায়, তরুণ রায়, কমল মিত্র, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, শ্যামল মিত্র, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কানন দেবী, চন্দ্রাদেবী, সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, রমা দেবী, লীলা পাল, দীপান্বিতা রায়, জয়শ্রী সেন, কাবেরী রায় এবং আরও অনেকে। চিত্র-পরিচালকের মধ্যে যাঁরা শোভাযাত্রার পুরোভাগে বন্যার্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—তপন সিংহ, বিভূতি লাহা ও সুশীল মজুমদার। এ বাদেও অনেক প্রযোজক, কলাকুশলী, প্রদর্শক, পরিবেশক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্র-সাংবাদিক এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন।

শোভাযাত্রা শুরু হবার পরই হাতে সাহায্য-ভাণ্ড নিয়ে শিল্পীরা ট্রাকের ওপর থেকে পথে নেমে পড়েন। উত্তমকুমার হাতে ভিক্ষা ভাণ্ড নিয়ে গিয়ে দাঁড়ান পথের দুই ধারের সারি সারি বিপণীর দরজায়, পথি-পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনতার সামনে মেলে ধরেন সাহায্যের ঝুলি। এই সর্বজনপ্রিয় চিত্রাভিনেতার নতুন পরিচয় বুঝি পান তাঁর গুণমুগ্ধেরা—তাই দলে দলে, হাজারে হাজারে তাঁকে অনুসরণ করেন জনতার এক বিরাট অংশ। রৌদ্রতপ্ত রাজপথে তিনি শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেন বন্যার্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে ও বিপুল জনতার উল্লাস-অভিনন্দন ও সাধুবাদ কুড়িয়ে কুড়িয়ে। সঙ্গে তাঁর প্রখ্যাত গায়ক শ্যামল মিত্র ও অসিত চৌধুরী। অপর রাজপথে প্রযোজক-পরিচালক-শিল্পী বিকাশ রায় দোকানে দোকানে, পথচারীর সামনে তুলে ধরেন সাহায্য-ভাণ্ড। সাহায্য-ভাণ্ড নিয়ে তিনি গিয়ে দাঁড়ান সিনেমা-হাউসের পাশে টিকিটের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়ানো জনতার সামনে। অন্যান্য শিল্পীরা ভিক্ষা-ভাণ্ড নিয়ে কখনও ঢুকে পড়েন চলন্ত বাস অথবা ট্রামে, শহরবাসীর গৃহাঙ্গণে, পথিপার্শ্বের দোকানে। শহরবাসীরা সাধ্যানুযায়ী ভরে তোলেন সকলের সাহায্য-ভাণ্ডার। বন্যার্ত দেশবাসীর সাহায্যের জন্য শিল্পীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-সংগ্রহ অভিযানকে অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দিত করেন দক্ষিণ কলিকতার অধিবাসীরা। গৃহের অলিন্দে, রাজপথে দণ্ডায়মান জনতার চোখে-মুখে ভেসে ওঠে সপ্রশংস বিস্ময়। বস্ত্রব্যবসায়ীরা মুক্তহস্তে নতুন বস্ত্রের বোঝা উজাড় করে ঢেলে দেন শিল্পীদের সাহায্য-ঝুলিতে। এক বৃদ্ধা ভিক্ষুককে দেখা যায় তার সার্ধ-দিবসের সঞ্চয় এক শিল্পীর সাহায্য-ভাণ্ডে ঢেলে দিতে। শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে

আর্তত্রাণে অভিনয়শিল্পী: গত রবিবার বন্যার্ত দেশবাসীর সাহায্যকল্পে সর্বজনপ্রিয় উত্তমকুমার ও উদীয়মান অভিনেতা বিশ্বজিৎকে দেখা যাচ্ছে ভিক্ষাপাত্র হাতে দক্ষিণ কলিকাতার রাজপথে

মাইকে শিল্পীরা গান ধরেন, "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ।" জনৈক সাংবাদিক উদাত্ত কণ্ঠে আবেদন জানান জনতার উদ্দেশে শিল্পীদের সাহায্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতে। জনতার দান-যজ্ঞ ও শিল্পীদের সানন্দ সাহায্য-ভিক্ষার এই বিস্ময়কর পর্বের সমাপ্তি ঘটে হয়তো অল্পকালের মধ্যেই; কিন্তু মানবতার যে মহান আদর্শ এতে রূপ পেয়েছে, তা সর্বকালের প্রেরণা হয়ে থাকবে। ভিক্ষার সঞ্চয় যতটুকুই হোক, এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে চিত্রজগতের লোকদের চলার পথের সঞ্চয় অপরিমেয় হয়ে উঠেছে। দেশবাসীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছেন তাঁরা এই প্রশংসনীয় উদ্যমের ভেতর দিয়ে।

চিত্রালোচনা

হালে যে ক'খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে। বাঙলা ছবি সম্বন্ধে যেটা সবচেয়ে বড় আশার কথা, সেটা হচ্ছে তার প্রগতিশীলতা। বাঙলা ছবি আজ এক জায়গায় আটকে নেই—কাহিনী, বিন্যাস, অভিনয়, আঙ্গিক সৌষ্ঠব, সৃজনধর্মিতা, সব দিক দিয়েই। সব ক'টি গুণের সমন্বয় হয়েছে এমন ছবি হয়তো বিরল, কিন্তু নব দিগন্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন আজকের অধিকাংশ প্রযোজক। ফলে প্রমোদ-মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, যা দর্শকের কাছে তুলে ধরছে আনন্দের নতুন উপচার, নব নব রসের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছে। যাঁদের জন্যে প্রযোজকদের এত আয়োজন, এত চেষ্টা, তাঁরা যে তৃপ্তি পাচ্ছেন ছবির জনপ্রিয়তায় তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। এর দ্বারা ছবির নির্মাতারা যেমন ভাল ছবি তোলবার প্রেরণা পাবেন, তেমনি সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবসায়িক ভিত্তিও সুদৃঢ় হবে এই সাফল্যে।

• • • •

পূজোর পর আর কোন নতুন বাঙলা ছবি মুক্তি পায় নি—এ সপ্তাহেও নয়। মাত্র একখানি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহের নতুন আকর্ষণ—ললিত কলা মন্দিরের "জাল সাজ"। অরবিন্দ সেনের পরিচালনায় তোলা এই ছবির মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার, মালা সিংহ ও প্রাণ। এন দত্ত এর সংগীত পরিচালক।

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাঙলা ছবিগুলির পুরোভাগে রয়েছে গৌতম চিত্রমের "অবাক পৃথিবী" ও নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের "রাতের অন্ধকারে"। আর দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই সিনেমার রজতপটে এদের সাক্ষাৎ মিলবে। "অবাক পৃথিবী"র নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। উত্তমকুমারের অনুজ তরুণকুমার ছবিখানির প্রযোজক। "রাতের অন্ধকারে" প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের নবতম নিবেদন। ভূমিকালিপিতে তারকার সমারোহ ছবিখানির অন্যতম আকর্ষণ।

• • • •

ইতোমধ্যে কতকগুলি নতুন বাঙলা ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একাধিক নতুন ছবির তোড়জোড় চলছে।

গত ১৪ই অক্টোবর মিরাকালস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বিতীয় চিত্র "রাতের

শিল্পী শোভাযাত্রার অপরাংশ : সামনের সারিতে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) পরিচালক জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জয়শ্রী সেন, কাবেরী সরকার প্রভৃতি। পিছনে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি অজিত বসু, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় (সান্টুবাবু), খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (হারুবাবু), বিনয় চট্টোপাধ্যায়, হরিভাই, বিভূতি লাহা প্রভৃতি কে দেখা যাচ্ছে

অতিথিপুর মহরৎ অনুষ্ঠান ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। শচীন্দ্রচন্দ্র পালের কাহিনী অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য লিখেছেন গৌর শী। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ইউনিটের ওপর ছবিটির পরিচালনাভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

গত মহালয়ার দিন দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ অর প্রোডাকশনস তাঁদের প্রথম নিবেদন "নার্সিং হোম"-এর শুভারম্ভ করেন। রমেন ঘোষ ছবিখানির পরিচালক।

রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" অবলম্বনে পরিচালক তপন সিংহ যে ছবিটি তুলছেন, তার নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ছবিটি তোলা হচ্ছে ইস্টার্ন সারকিট প্রাইভেট লিমিটেডের পতাকাতলে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

গৌরাঙ্গ চিত্রমের প্রণয়মধুর সামাজিক আলেখ্য "মনীশের প্রেম"-এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। অনেকগুলি নতুন মুখ দেখা যাবে এই ছবিতে।

* * *

টেমি ফিল্মসের দ্বিতীয় ছবির নাম "স্মৃতিটুকু থাক"। যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী "চাওয়া পাওয়া"তে যে সাফল্য অর্জন করেছেন, এ ছবিতে তাকে অতিক্রম করবার সংকল্প নিয়ে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে নেমেছেন। সুচিত্রা সেন একটি দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের পরবর্তী ছবি "মেঘে ঢাকা তারা"র নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প অবলম্বনে চিত্রকল্পের এই প্রথম চিত্রের প্রযোজকও ঋত্বিক ঘটক।

প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম ইউনিটের "রতনলাল বাঙালী"-ও প্রস্তুতির পথে। এর ভূমিকালিপিতে আছেন আশিসকুমার, বাসবী নন্দী, কমলা মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, চন্দ্রাবতী, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

• • •

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের ওপর একটি ছোট প্রামাণ্য চিত্র তুলে আশীষ মুখোপাধ্যায় চিত্ররসিকদের প্রশংসা পেয়েছেন। আরো চারখানি প্রামাণ্য চিত্র তিনি ইতোমধ্যে তৈরি করেছেন। তার একটি "গরুমুখী বিদ্যা" মার্গসংগীতকে কেন্দ্র করে তোলা। ওস্তাদ আমীর খাঁ এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। "মুর্শিদাবাদের ইতিকথা" আর একটি ছবির নাম। এই নামের মধ্যেই বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত রয়েছে। বাঙলার রেশম শিল্প ও কাঁসারি সম্প্রদায়ের ওপর আর দুটি ছবি তোলা হয়েছে।

বাঙলা ছবির বোম্বাই গতি

কষ্টকল্পনার চরম নিদর্শন ন্যাশনাল পিকচার্সের "সোনার হরিণ"। অর্থের প্রলোভন সোনার হরিণের মতই মানুষকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায়, বিবেকহীন করে তোলে—এই ধরনের একটি বক্তব্যের আভাস
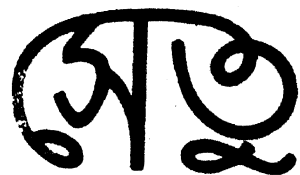
আছে ছবিটিতে। কিন্তু যে কাহিনীর মাধ্যমে এই বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে, তা এতই অসার ও পারম্পর্যবিহীন যে, একটি রসপুষ্ট শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে ছবিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

রাসবিহারী লাল রচিত যে কষ্টকল্পিত কাহিনীর চিত্ররূপ এই ছবি, এতে দুটি উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের সন্ধান মেলে। একজন সন্দীপ, যে সোনার হরিণের মায়ায় অন্ধ। দমদম বিমান-বন্দরের গ্রাউণ্ড এঞ্জিনীয়ার সে। পঙ্গু ছোট ভাইকে বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানোর দায়িত্ব তার ওপর এবং মা ও বোনদের সুখে রাখবার। অতএব বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এক পাপচক্রের সঙ্গে যোগসাজসে সে তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন মিটিয়ে চলে এবং চোরাইকারবার থেকে আরম্ভ করে হীন ষড়যন্ত্রমূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজেও সে পেছপাও হয় না।

এ-ছবির অপর উদ্‌ভ্রান্ত যুবক পাইলট জয়ন্ত—অবশ্য সৎপথে থেকে। ভীষণ এক প্লেন দুর্ঘটনায় আহত হবার পর প্রথমটায় তাকে দেখা যায় কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ও বেশীরভাগ আত্মধিক্কারে ম্রিয়মান। এই দুর্ঘটনায় সে হারিয়েছে তার একমাত্র ভগিনীপতি ও এক ঊর্ধ্বতন সহকর্মীকে। পরে হঠাৎ কলকাতায় এসে সে পুলিস বিভাগের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে সপ্রতিভ গোয়েন্দার মতো এই দুর্ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করে। পুলিসের সহায়তায় ছদ্মপরিচয় নিয়ে সে সন্দীপের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখে এবং শেষ পর্যন্ত পাপচক্রটির সন্ধান পায়।

ইতিমধ্যে জয়ন্তর বিলাতী-প্রবাসিনী প্রণয়িনী কুন্তলা কলকাতায় আসে এবং জয়ন্ত জানতে পারে যে, সে সন্দীপেরই সহোদরা। উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে সে কুন্তলাকে আঘাত দিয়ে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে সন্দীপ রুগ্ন ভাই বিদেশে আছে বলে এবং বোনদের বিয়ে হয়নি বলে নিজের প্রণয়িনী রুবীকে বধূর মর্যাদা দিয়ে ঘরে আনতে পারেনি। এই না পারার গভীরতর কারণ তার অপরাধী জীবনের অনিশ্চয়তা। রুবী সংসার চালাবার জন্যে অসুস্থ বাপের অজ্ঞাতে নাইট ক্লাবে নর্তকীর কাজ করে।

কাহিনীতে জয়ন্ত ও সন্দীপের এই দুই প্রেয়সীকে উপলক্ষ্য করেই প্রেমের অনুপ্রবেশ। এই প্রেমই ক্রাইমের মুখোশ খুলে ধরে যখন প্রণয়-বিড়ম্বিতা বোনকে সুখী করবার পণ নিয়ে সন্দীপ হোটেলে জয়ন্তর ঘরে প্রবেশ করে। এর আগেই সন্দীপ জয়ন্তর আসল পরিচয় জানতে পেরেছে এবং উভয়ের কথাবার্তার সূত্র ধরে কাহিনীর পাপ-রহস্য যখন উদ্ঘাটিত হবার পথে, তখন তাদের লক্ষ্য করে বাইরে থেকে রিভলবারের গুলী ছোঁড়ে দুষ্কৃতকারীদের একজন। জয়ন্তর হাতেও রিভলভার গর্জে ওঠে এবং অপরাধী মারা যায়। গুলীতে আহত হয় সন্দীপও এবং মৃত্যুর আগে সকল রহস্য সে ফাঁস করে পুলিসের কাছে। সন্দীপের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়—জয়ন্ত ও কুন্তলার আশু মিলন সম্ভাবনার মধ্যে চিত্রনাট্যের সমাপ্তি ঘটে।

এই ক্রাইম-ছবিটি মূলতঃ 'সাসপেন্সধর্মী'। কিন্তু রহস্যের গ্রন্থিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকমনে যে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা দানা বেঁধে ওঠে, এই ছবিতে তার আয়োজন নেই। এ-ছবিতে রহস্যজয়ী গোয়েন্দা পুরুষটি যেন ত্রিকালদর্শী ও সর্বজ্ঞ। কলকাতায় এসে জয়ন্তকে সরাসরি বিমান-বন্দরে ঢুকে অলক্ষ্যে শুধু কর্মরত সন্দীপের ওপরই যেভাবে নজরপাত করতে

মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান আকর্ষণ 'নীচের মহল'-এর একটি দৃশ্য। লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ অভিনীত এই নাটকটি গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌' অবলম্বনে রচিত।

ইওরোপের প্রধান পুরস্কারটি এবার বেসিল রাইটকে তাঁর গ্রীস সম্পর্কে তোলা '**দি ইমর্টাল ল্যাণ্ড**' চিত্রের জন্য প্রদান করা হয়েছে। ইতালী তার **বার্লিন-ইওরোপীয়ান প্রবলেম** চিত্রটির জন্য লাভ করেছে সংবাদচিত্রের পুরস্কারটি। অ্যাসোসিয়েটেড ব্রিটিশ প্যাথে তাঁদের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত একটি সংবাদচিত্রের জন্য লাভ করেছে একটি পুরস্কার। যে সমস্ত চিত্র জাতি-সমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করে সেই সমস্ত চিত্র এই পুরস্কার লাভ করে থাকে।

এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসবের সমস্ত চিত্র সম্পর্কে এই কথা বলা চলে: এই সমস্ত চিত্রের মধ্য দিয়ে জাতিসমূহ নিঃসন্দেহে পরস্পরকে ভাল করে জানবার ও বোঝবার সুযোগ পেয়ে থাকে। এই বৎসর এই সমস্ত চিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা প্রাগ, ওয়ারস এবং বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি: লস এঞ্জেলসের জীবন যাত্রা লক্ষ্য করেছি: নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী অট্টালিকা এবং আক্রার সার্ফ বোট দেখে এসেছি: আর দেখেছি উৎসবকালীন রিও ডি জানেরিওর রূপসজ্জা; সুইডিশ কৃষকদের চিত্রাবলী এবং জাপানের শিল্পসম্ভার: আর সেই সঙ্গে উপভোগ করেছি স্কট-ল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

ভারতের যে চিত্রটি উৎসবে প্রদর্শিত হয় সেটি হল বিমল রায় প্রযোজিত **মধুমতি**; চিত্রটি দুইটি তরুণতরুণীর প্রেম কাহিনী নিয়ে তোলা। সিংহলের চিত্রটি হল **দি লিভিং ওয়ার্ল্ড**—এটি একটি অ্যাডভেঞ্চার চিত্র: এতে রূপায়িত হয়েছে দ্বীপের অরণ্যজীবন।

আমি অনেকগুলি ছবি দেখেছি, কিন্তু আমার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে যুক্তরাষ্ট্রের **দি স্যাভেজ আই**, ফ্রান্সের **অর্ফেউ নিগ্রো**, সুইডেনের **দি ফেস** এবং রাশিয়ার **ইউজিন ওনেগিন**।

আমেরিকার তিনটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান চার বৎসর ধরে **দি স্যাভেজ আই** চিত্রটি নির্মাণ করে। এটি **লস এঞ্জেল** শহরের একটি দলিল চিত্র বিশেষ।

অর্ফেউ নিগ্রো চিত্রটি এই বৎসরের কান উৎসবে গোল্ডেন পাম পুরস্কার লাভ করে: মার্শেল কামু উৎসবকালীন রিও ডি জানেরিওর আধুনিক পটভূমিকায় অর্ফিউস ও ইউরিপিডিস-এর পুরাতন কাহিনী শুনিয়েছেন।

দি ফেস চিত্রটি একটি ভৌতিক কাহিনী। ইংমার বার্গম্যান এতে আলোছায়ার যে 'এফেক্ট' সৃষ্টি করেছেন তা দর্শকগণ বহুকাল ধরে স্মরণে রাখবেন।

ইউজিন ওনেগিন সাইকোভস্কির অপেরার একটি চিত্ররূপ: এর সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করেছেন বলশয় অপেরার সদস্যগণ।

আর একটি চিত্রের কথা আমি এই প্রসঙ্গে স্মরণ না করে পারছি না, তা হল চেক চিত্র **অ্যাপ্যাশনাটা, জিরি উইস** এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। একটি ছাত্রী ও বিবাহিত অধ্যাপকের প্রেম কাহিনী নিয়ে চিত্রটি তৈরি।

জাপানী চিত্র **হুইসল ইন মাই হার্ট**ও আমাকে সমানভাবে মুগ্ধ করে—হোক্কাইডোর আইনু উপজাতির ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ছবিটি তোলা। তাদের সমস্যা তাদের সুখদুঃখ এতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

পোল্যাণ্ড তার তিনটি কাহিনী চিত্র এবং কতকগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝাতে পেরেছে চিত্র নির্মাণের দক্ষতা তার কতখানি। কাহিনী চিত্রগুলির মধ্যে দুটি যুদ্ধকালীন অবস্থার পটভূমিকা তোলা; তৃতীয়টি—**মিঃ অ্যানাটোলস্‌ ইনস্পেকশন**—একটি কমেডি।

হল্যাণ্ডের একটি উপভোগ্য চিত্র হল **ফ্যানফেয়ার**—দলিল চিত্র তুলে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন সেই বার্ট হানস্ট্রার-এর এটি প্রথম কাহিনী চিত্র। এর আলোক চিত্রশিল্পীর শিল্প সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

উৎসবে বীভৎস রসের চিত্রও কিছু কিছু প্রদর্শিত হয়: জর্জের ফ্রানজুর **আইজ উইদাউট এ ফেস** এদিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। এতে একজন শল্য চিকিৎসককে (পিয়ের ব্রাসুর) কেন্দ্র করে বীভৎস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চিকিৎসক তাঁর কন্যার বিকৃত মুখকে জীবন্ত টিশুর সাহায্যে স্বাভাবিক করার জন্য স্ত্রীর সহায়তায় বাইরে থেকে বহু মেয়ে অপহরণ করে আনেন। তাঁর পরীক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য থাকে কতকগুলি কুকুর। এই কুকুরগুলিই শেষ পর্যন্ত তাঁর বিপদের কারণ হয়।

এই বৎসরের উৎসবে ইতালী থেকে কোন কাহিনী চিত্র প্রেরিত হয় না। এবং ব্রিটেনের একটি মাত্র কাহিনী চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়, চিত্রটি হল হ্যারি ওয়াট-এর **দি সীজ অব পিঞ্চগাট**—সিডনী বন্দরের পটভূমিকায় তোলা। নিউজিল্যাণ্ড থেকে আসে চারটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র, অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনটি, কানাডা থেকে একটি।

এডিনবরায় এই সব স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের আকর্ষণ বরাবরই লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই বৎসর আমি বিশেষভাবে উপভোগ করি চেকোশ্লোভাকিয়ার **হিয়ার আর দি বাটারফ্লাইজ** চিত্রটি। ব্রিটেনের স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রটি হল **দি রানিং, জাম্পিং অ্যান্ড স্ট্যান্ডিং স্টিল ফিল্ম**, এটি পিটার সেলারস-এর একটি হাস্যমধুর অতি বাস্তব-বাদী চিত্র।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চিত্র হল ব্রিটেনের **দি কালচার্ড এপ** এবং পোলাণ্ডের **মাউস অ্যাণ্ড ক্যাট**।

এডিনবরা উৎসবে কোন পুরস্কার প্রদান করা হয় না; প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষ প্রদান করে থাকেন 'ডিপ্লোমা অব মেরিট'। ১৯৫৯ সালে যে সমস্ত চিত্র ডিপ্লোমা অব মেরিট লাভ করে তাদের মধ্যে থাকে **অর্ফেউ নিগ্রো, ফ্যানফেয়ার, দি ফেস, দি স্যাভেজ আই, দি হোয়াইট বিয়ার, দি নান্‌স স্টোরি,** ও ওয়াল্ট ডিস্‌নির **হোয়াইট ওয়াইল্ডারনেস**।

খেলার মাঠে

একলব্য

মহাপূজোর আগেই কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। মহাপূজোর পর আসামের নওগাঁয় আরম্ভ হয়েছে ফুটবলের মহা-উৎসব—ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। অবশ্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে জাতীয় ফুটবলের খেলা আগেই আরম্ভ হয়েছিল। নওগাঁয় এখন চলছে জাতীয় ফুটবলের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের খেলা। তাই সারা ভারতের ফুটবল ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি এখন আসামের দিকে।

কলকাতার খেলাধূলার আসর এখন একেবারেই শান্ত। এখানকার খেলোয়াড় ও খেলাধূলার পরিচালকরা এখন রাস্তায় নেমেছেন বন্যাক্রান্ত নরনারীদের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে কয়েক হাজার টাকাও সংগৃহীত হয়েছে। খেলোয়াড় ও খেলাধূলার পরিচালকদের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। প্রকৃতির রুদ্ররোষে আজ বাংলার দিকে দিকে হাহাকার। নিরন্নকে অন্ন দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় এবং বিবস্ত্রকে বস্ত্র দেবার জন্য আজ সবাই যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। খেলোয়াড়রাও এই চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন এবং সবাই আন্তরিক। সাধারণের কাছে খেলোয়াড়দের আবেদনের একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাই একদিন রাস্তায় বের হয়েই তাঁরা হাজার দশেক টাকা তুলেছেন। চেষ্টা করলে তাঁরা আরও বহু হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। রাস্তায় রাস্তায় এবং দ্বারে দ্বারে অর্থসংগ্রহ করা ছাড়া এঁরা নানা স্থানে ছোট-বড় চ্যারিটি ম্যাচের আয়োজন করেও বহু অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের কাছে আবেদন করলেও কিছু অর্থ আসতে পারে। নওগাঁর জাতীয় ফুটবলের একটি বিশেষ খেলাও বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারের জন্য চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে আয়োজিত হতে পারে। এই-ভাবে যেখান থেকে যতটা অর্থ সংগ্রহ করা যায়, ততটাই আর্তের সেবায় কাজে আসবে।

সবশেষে বলি—এই সময়ে আই এফ এ শীল্ডের অসমাপ্ত ফাইন্যাল খেলাটি কি বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হতে পারে না? জাতীয় ফুটবলের খেলা শেষ না হলে অবশ্য ফাইন্যাল খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কারণ ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজন খেলোয়াড় জাতীয় ফুটবলে এখন বাংলা দলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কিন্তু জাতীয় ফুটবলের খেলা শেষ হয়ে গেলে নভেম্বরের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে অনায়াসেই কলকাতায় আই এফ এ শীল্ডের অসমাপ্ত ফাইন্যাল খেলার আয়োজন করা যেতে পারে। আশা করি, বন্যাত্রাণের মহৎ উদ্দেশ্যে খেলাটির কথা উঠলে মোহনবাগান ও ইস্ট-বেঙ্গলের তরফ থেকে কোন ওজর-আপত্তি উঠবে না, মাঠ পাওয়া সম্পর্কেও কোন সমস্যা দেখা দেবে না।

* * *

গত ১৫ই অক্টোবর আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা নওগাঁর জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধন করেছেন। বর্তমান ব্যবস্থামত অক্টোবরের ৩১শে তারিখে জাতীয় ফুটবলের ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার কথা। তবে শেষ পর্যায়ে সেমি-ফাইন্যাল বা ফাইন্যাল খেলা এক-আধদিন অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হলে প্রতিযোগিতা শেষ হতেও এক-আধদিন দেরি হতে পারে।

জাতীয় ফুটবলের এবার ষোড়শ অনুষ্ঠান। এতদিন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নক আউট প্রথায় এই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়ে এসেছে। গতবার থেকে লীগ ও নক আউট প্রথায় খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথমে আঞ্চলিক ভিত্তিতে লীগ খেলা পরে চারটি অঞ্চলের বিজয়ী ও রানার্স আটটি দলের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ। তারপর নক আউট প্রথায় সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা। দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে আছে আবার দুটি গ্রুপ। একটি গ্রুপে আছে

মুলাজোড়ে আই এফ এ ও জাপানের ইয়াওয়াটা স্টিলওয়ার্ক ফুটবল দলের প্রদর্শনী খেলার আগে তোলা দলের খেলোয়াড়দের ছবি
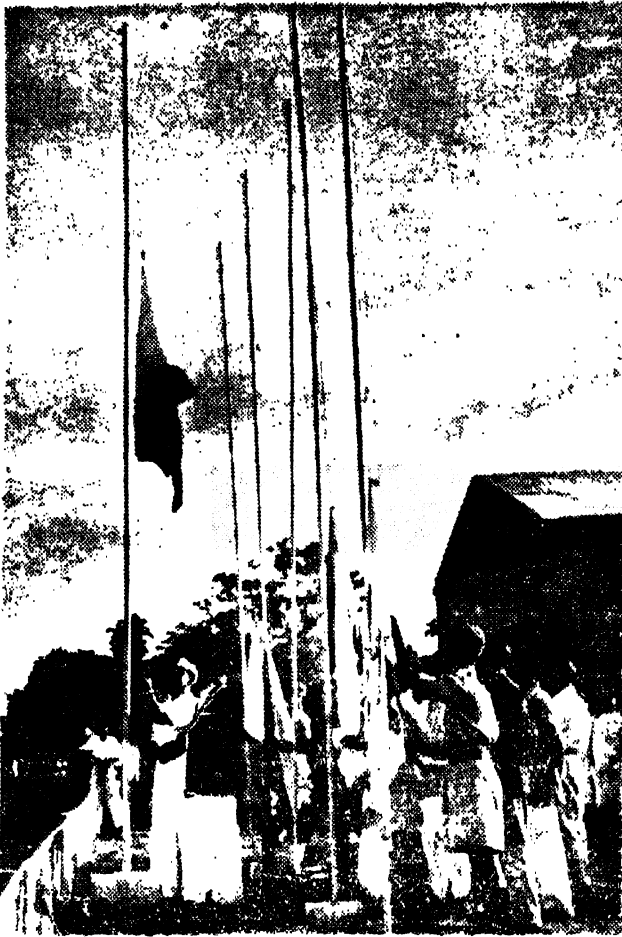
আগরতলায় নিখিল ভারত স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলীয় লীগ খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্কুল গেম ফেডারেশনের সহ সভাপতি শ্রী বি এন বসু ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পতাকা উত্তোলন করছেন

বাংলা, অন্ধ্র, বিহার ও উত্তর প্রদেশ। আর একটি গ্রুপে আছে সার্ভিসেস, আসাম, কেরালা ও বোম্বাই।

এবার সার্ভিসেস দল সমেত মোট ১৫টি রাজ্য জাতীয় ফুটবলে অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে দিল্লি, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহীশূর ও মাদ্রাজকে আঞ্চলিক লীগ খেলার প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আঞ্চলিক লীগে বিভিন্ন দলের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ—

পূর্বাঞ্চল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
আসাম	২	১	১	০	১	০	৩
বাংলা	২	১	০	১	৫	১	২
উড়িষ্যা	২	০	১	১	০	৫	১

উত্তরাঞ্চল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
সার্ভিসেস	৩	৩	০	০	৯	০	৬
উত্তর প্রদেশ	৩	২	০	১	৩	২	৪
দিল্লি	৩	১	০	২	৭	৭	২
মধ্যপ্রদেশ	৩	০	০	৩	২	১২	০

মধ্যাঞ্চল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বোম্বাই	৩	১	২	০	২	১	৪
বিহার	৩	১	২	০	৬	৩	৪
রাজস্থান	৩	১	১	১	২	৪	৩
পাঞ্জাব	৩	০	১	২	৩	৫	১

দক্ষিণাঞ্চল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
অন্ধ্র	৩	২	১	০	৪	১	৫
কেরালা	৩	১	২	০	২	১	৪
মহীশূর	৩	১	০	২	৪	৬	২
মাদ্রাজ	৩	০	১	২	৩	৫	১

বলা বাহুল্য, ফুটবল মাঠে ভারতের রাজ্যে রাজ্যে এই লড়াইয়ের নামই জাতীয় ফুটবল। আই এফ এর পরম ক্রীড়ানুরাগী প্রাক্তন সভাপতি পরলোকগত সন্তোষের মহারাজার নামানুসারে এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কারের নাম 'সন্তোষ ট্রফি' এইজন্য জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির খেলা নামেও পরিচিত। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪১ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে এবং এক-এক বৎসর এক-এক রাজ্য প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে আসছে।

দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায়ের খেলা পরিচালনার ভার পেয়েছে এবার আসাম রাজ্য ফুটবল এসোসিয়েশন। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসতে পারে, রাজধানী শিলং অথবা আসামের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র জোড়হাট বা গোহাটীতে খেলার ব্যবস্থা না করে আসাম ফুটবল এসোসিয়েশন নওগাঁয় খেলার আয়োজন করলেন কেন? এর উত্তর—আসামের বিভিন্ন জেলার মধ্যে নওগাঁয় ফুটবল খেলা সবচেয়ে জনপ্রিয়। নওগাঁ স্পোর্টিং মাঠ আসামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মাঠ। আর আসাম ফুটবলের প্রধান কর্মকেন্দ্রও এখন নওগাঁয় অবস্থিত।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আসাম ফুটবল এসোসিয়েশন কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। মাঠে পনেরো থেকে বিশ হাজারের মত দর্শকের জায়গা করা হয়েছে। গোহাটী, জোড়হাট, শিলচর ও ডিব্রুগড় প্রভৃতি আসামের প্রধান প্রধান কর্মকেন্দ্র থেকে দর্শকরা যাতে সহজে নওগাঁয় এসে খেলা দেখতে পারে, তার জন্য সমস্ত রুটে বিশেষ ট্রেন বাস চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী আটটি দলের খেলোয়াড়, বিভিন্ন দলের কর্মকর্তা ও রেফারীদের থাকা-খাওয়ার জন্য নবনির্মিত স্কুল বাড়ীতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন রুচির আহারেরও ব্যবস্থা আছে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু সে খেলার আলোচনা জাতীয় ফুটবলের পরে করা যাবে। গতবারের বিজয়ী শুধু গতবারের কেন জাতীয় ফুটবলের ১৫ বারের অনুষ্ঠানে ৯ বারের বিজয়ী এবং ৫ বারের রানার্স বাংলা দলের এবারও বিজয়ী হবার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী।

• • •

ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। চিরদিনই বাংলা দল শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে। আজও তার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একথা বলা যায় না। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি খেলায় বাংলা ফুটবলের ছোটবড়োদের পরাজয় বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রীড়ামোদীদের বেশ চিন্তিত করে তুলেছে। বড়োদেরই প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে জাতীয় ফুটবলের আঞ্চলিক লীগের খেলায় আসামের কাছে। পরে কাশ্মীরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হার স্বীকার করতে হয়েছে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। একে বাংলার মাঝারি খেলোয়াড়দের

নিখিল ভারত স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলীয় চ্যাম্পিয়ন মণিপুর স্কুল ফুটবল দল

পরাজয় বলা যেতে পারে। আর কাঁচাদের পরাজয় ঘটেছে ত্রিপুরায় নিখিল ভারত স্কুল ফুটবলের পূর্বাঞ্চলীয় লীগের খেলায়। একবার নয়। পূর্বাঞ্চলীয় লীগের ৪ বারের খেলার মধ্যে তিনবার।

নিখিল ভারত স্কুল ফুটবলের পূর্বাঞ্চলীয় লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, মণিপুর ও ত্রিপুরা এই পাঁচটি স্কুল দল। এর মধ্যে মণিপুর অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান লাভ করেছে। আর পাঁচটি দলের মধ্যে বাঙলা দল লাভ করেছে পঞ্চম স্থান। মণিপুর উড়িষ্যা ও বিহারের কাছে বাঙলার স্কুল দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাঙলা বিজয়ী হয়েছে ২—১ গোলে।

কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান। এখানে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তাও সবচেয়ে বেশী। এই কারণে অন্য রাজ্যের কুশলী খেলোয়াড়দেরও এখানে আনাগোনা এবং এই সব কুশলী খেলোয়াড়দের নিয়েই ভারতীয় ফুটবলে বাঙলার শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এখানকার কলেজ ও স্কুল টীম যদি এভাবে অন্য সব টীমের কাছে হার স্বীকার করে তবে বাঙলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ কোথায়? শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব তো অপরকে নিয়ে।

বাঙলার স্কুল টীমের এই শোচনীয় পরাজয় সত্যিই বেদনাদায়ক। নীচে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলীয় লীগের ফলাফল দেওয়া হল:—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মণিপুর	৪	৪	০	০	১২	৩	৮
ত্রিপুরা	৪	২	০	২	৫	৫	৪
উড়িষ্যা	৪	২	০	২	৬	৭	৪
বিহার	৪	১	০	৩	২	৫	২
পঃ বাঙলা	৪	১	০	৩	৩	৮	২

• • •

জাপানের ইয়াওয়াটা স্টিলওয়ার্ক ফুটবল টিম স্বল্প সময়ের জন্য ভারতে এসেছিল কয়েকটি ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে। জাপানী দলের এ সফরকে অবশ্য ভারত সফর বলা যায় না। তাদের খেলাও হয়েছে মাত্র কয়েকটি শিল্পপ্রধান শহরে। বলা যেতে পারে ইয়াওয়াটা স্টিলওয়ার্ক দলের এ সফর ছিল ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে ভারতের কয়েকটি ইস্পাত-নগরীতে শুভেচ্ছা সফর। এখানে তারা পাঁচটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে দেশে ফিরে গেছে। দুটি খেলায় তারা বিজয়ী হয়েছে, একটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছে, আর দুটি খেলার ফলাফল থেকে গেছে অমীমাংসিত।

ভারতীয় রেলের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র খড়্গপুরে ইস্টার্ন রেল দলের সংগে জাপানী দলের প্রথম খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। লৌহ উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র বার্নপুরে দ্বিতীয় খেলায় জাপানী দল ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল কোম্পানীর কাছে ২—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। ইস্পাত-নগরী জামশেদপুরে তৃতীয় খেলায় ইয়াওয়াটা স্টিল ওয়ার্কের কাছে টাটা আয়রন ও স্টীল কোম্পানী দলকে ১—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। মুলোজোড়ে শক্তিশালী আই এফ এ দলের সংগে জাপানী দলের চতুর্থ প্রদর্শনী খেলার ফলাফল ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। কুলটিতে সর্বশেষ খেলায় জাপানী দল ৩—১ গোলে কুলটি একাদশকে পরাজিত করে।

ফুটবল খেলায় জাপানের তেমন সুনাম নেই। সেই জাপানের একটা স্টীল কোম্পানীর ফুটবল টিম যখন ফুটবল খেলতে এখানে এসেছিল, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন প্রতিটি খেলায় জাপানী দলকে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করে দেশে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল জাপানী দল উপেক্ষার বস্তু তো নয়ই, বরং খেলার গৌরবের বেশী অংশ তাদের ভাগেই পড়ে পাল্লা ভারী হয়েছে। প্রায় প্রতিটি খেলায় জাপানী দলের কিছু না কিছু নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেছে। অন্য খেলার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, মুলোজোড়ে শক্তিশালী আই এফ এ দলের সংগে এদের ১—১ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করার ঘটনা সত্যিই জাপানী দলের কৃতিত্বের পরিচায়ক। রীতিমত শক্তিশালী করেই আই এফ এ-র দল গড়া হয়েছিল এবং শক্তিসামর্থ্যে দলটি ছিল প্রায় সর্বভারতীয় দলের অনুরূপ। তবুও আই এফ এ-র বাছাই দল জাপানী দলকে পরাজিত করতে পারেনি। ভারতীয় ফুটবলের মান বেড়েছে বলে কর্মকর্তাদের অনেকেই গর্ব করে থাকেন। কিন্তু অখ্যাতনামা ইয়াওয়াটা স্টিল ওয়ার্ক দলকে পরাজিত করতে যাঁরা হিমসিম খেয়ে ওঠেন তাঁদের খেলার মান বেড়েছে—একথা স্বীকার করি কিভাবে?

• • •

শুধু ফুটবল কেন? যে খেলাটা ভারতের গর্বের বস্তু ছিল সেই হকি খেলাতেও কিছুদিন থেকে আমরা পিছু হটতে আরম্ভ করেছি। মেলবোর্ন অলিম্পিক ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের কষ্টার্জিত জয়লাভের পর টোকিওর এশিয়ান গেমে পাকিস্তানের কাছেই আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব খুইয়েছি। তারপর সাম্প্রতিক পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম জার্মানী সফরে আমাদের হকি খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে উঠেছে। পূর্ব আফ্রিকায় অবশ্য আমাদের মাঝারি ধরনের হকি দলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। বহু খেলাতেই তারা বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু সুনিশ্চিত প্রাধান্য সত্ত্বেও কয়েকটি খেলায় একটিমাত্র গোল করতেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়েছে। এটা বিশ্বজয়ী ভারতের হকি খেলোয়াড়দের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। তারপর ভারতীয় হকির গৌরব বেশী করে ম্লান হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর কয়েকটি খেলায় ভারতের শক্তিশালী দলের ব্যর্থতার পরিচয়ে। এখানে পশ্চিম জার্মানী হকি এসোসিয়েশনের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হকি প্রতিযোগিতায় কেবল যে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারেনি তা নয়। এখানে জার্মানীর সংগে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে, বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি, ব্রিটেনের কাছে হারতে হারতে বেঁচে গেছে এবং পশ্চিম জার্মানীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। বলা বাহুল্য, এ ফলাফল ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ দুর্দিনেরই ইংগিত।

দেশী সংবাদ

১২ই অক্টোবর—গত রবিবার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে চূর্ণী নদীর জলোচ্ছ্বাসের প্রবল স্রোতে একটি নৌকা ডুবিয়া যায় এবং উহার আরোহীদের মধ্যে ১০ জন নিমজ্জিত ও ৬ জন নিখোঁজ হয় বলিয়া অদ্য সন্ধ্যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—মাত্র ৪টি বাঁধ নির্মাণে পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ রাখায় ডি ভি সি-র বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া যখন বে-সরকারী বিভিন্ন মহল মনে করিতেছেন —বন্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রসঙ্গ লইয়া নাকি এখন রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং ডি ভি সি-র কর্তৃপক্ষের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়াছে।

জানা গেল উড়িষ্যা সরকার কালাহাণ্ডির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দায়ের করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১৪ই অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গত সোমবার পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে জিনিসপত্র ও নগদে ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী সূত্রে জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'জরুরী' সরবরাহ হিসাবে ৪ হাজার টন গম ও ৪ হাজার টন চাউল পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এ পর্যন্ত ১২২ জনের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্থান হইতে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের খবরও পাওয়া যাইতেছে।

১৫ই অক্টোবর—দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার পরালকোটে প্রায় ৫২ হাজার একর চাষের জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আগামী ১৫ই নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আনুষ্ঠানিকভাবে ডি ভি সি-র পাঞ্চেৎ বাঁধের উদ্বোধন করিবেন। ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বাঁধটি ডি ভি সি-র প্রথম পর্যায়ের শেষ বাঁধ।

১৬ই অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শুক্রবার সাংবাদিকদিগকে জানান যে, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আগামী ২১শে অক্টোবর বুধবার পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-পীড়িত এলাকাগুলি পরিদর্শন করিবেন।

সুপ্রীম কোর্ট আজ এই মর্মে রায় দেন যে, শিল্প-বিরোধ আইনের ২৫ (এফ) ধারা মতে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী ছাঁটাই কর্মিগণ গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনার সুবিধাও দাবি করিতে পারেন।

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, সর্বত্র বন্যার জল কমিতেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ইতোমধ্যেই সাধিত হইয়া গিয়াছে। পাকা আউশ ধান পর্যন্ত জমিতে নাই। উর্বর ভূমি স্থানে স্থানে বালুর স্তূপে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থানে নদীর ভাঙ্গনে বহু কৃষিজমি নদীগর্ভে গিয়াছে।

১৭ই অক্টোবর—সরকারী সূত্রে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার দরুণ ক্ষয়-ক্ষতির আপাতত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তদনুযায়ী প্রায় ৭০ কোটি টাকার মত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন জেলার বন্যা-দুর্গত লোকের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষের মধ্যে।

কলিকাতা পোর্ট কর্তৃপক্ষ হলদিয়া বন্দরের মাল খালাসের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া কোন "নিগূঢ় কারণে" সমস্ত কণ্ট্রাক্টটি একটি বিদেশী কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন এবং উক্ত কোম্পানী বাঙ্গলার বাহিরের কয়েকটি রাজ্য হইতে শ্রমিক আমদানীর ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ফলে বাঙ্গালী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

১৮ই অক্টোবর—দণ্ডকারণ্যের কর্তৃত্ব লইয়া কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এবং দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রীফ্রেচারের মধ্যে মন কষাকষি বর্তমানে এমন প্রকাশ্য কেলেঙ্কারীর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, উহা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

আজ পালাম বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ বলেন যে, পিকিং-এ যাঁহাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথাশীঘ্র ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের মীমাংসায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই অক্টোবর—রাশিয়ার চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী রকেট কক্ষপথে পৃথিবী হইতে দূরতম বিন্দু অতিক্রম করিয়া এখন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া আজ সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী "তাস" সংবাদ দিয়াছেন।

আজ ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এ পাশাপাশি চীনা ও রাশিয়ান মানচিত্র প্রকাশ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মত চীন-সোভিয়েট সীমান্ত লইয়াও বিরোধ রহিয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গত রাত্রে তিব্বত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আয়র্ল্যাণ্ড ও মালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী তিব্বত প্রসঙ্গ বিতর্ক-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভিয়েনার ৮৩ বৎসর বয়স্কা মহিলা মেরি স্টুয়ার্ট ভিয়েনার একই হাসপাতালের একই ওয়ার্ডের একই শয্যায় ৬৫ বৎসর যাবৎ রহিয়াছেন। আস্টিওমিলাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া স্টুয়ার্ট ১৮ বৎসর বয়সে হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর। রোগ উপশমের লক্ষণ কিন্তু এখনও দেখা গেল না।

১৪ই অক্টোবর—পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্যে অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক, আইনসঙ্গত ও প্রশাসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনে রাষ্ট্রপুঞ্জে আপত্তি উত্থাপন করায় ভারত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

১৫ই অক্টোবর—অধ্যাপক ডাঃ সেভেরা ওচেয়ো ও অধ্যাপক ডাঃ আর্থার কর্নবের্গ ১৯৫৯ সালের জন্য ভেষজবিদ্যায় অদ্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

সহাবস্থিতি সম্পর্কে মস্কো ও পিকিং এর মধ্যে মতভেদ সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহে যে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে, সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ অদ্য অস্ট্রিয়ায় তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

১৬ই অক্টোবর—লণ্ডনে একটি নূতন গাণিতিক যন্ত্র (ইলেকট্রনিক ব্রেন) প্রদর্শিত হইয়াছে। হিসাব, পণ্য বিক্রয় গবেষণা ও সংখ্যাতাত্ত্বিক সমীক্ষার কার্য এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হইবে। কে ডি পি নামে অভিহিত এই যন্ত্রটির দাম পড়িবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার স্টার্লিং হইতে ৫ লক্ষ স্টার্লিং। ইহার গণনা পদ্ধতি এত ব্যাপক যে পৃথিবীতে এই যন্ত্রের সমকক্ষ যন্ত্র আর নাই।

১৭ই অক্টোবর—আগামী ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে বিশ্ব কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে চীন সরকার যোগ দিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৮ই অক্টোবর—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই জনরব চলিতেছে যে, বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ আইন সম্পর্কে সরকারের নীতির গুরুতর পরিবর্তন ঘটিবে। এই সমস্ত জনরবে প্রকাশ যে, ভারতীয়গণ যদি নির্দেশ অঞ্চলগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে বাসের ব্যবস্থা মানিয়া লন তাহা হইলে সরকার তাঁহাদিগকে নগর, শহর ও গ্রামগুলিতে তাঁহাদের দোকানসমূহ রাখিতে দিবেন।

সোভিয়েট আন্তর্গ্রহ স্টেশন লুনিক-৩ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যে দিকটা দেখা যায় না, সেই দিকের চিত্র গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাস আজ ঘোষণা করিয়াছে।

সম্পাদক—**শ্রীঅশোককুমার সরকার** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

২৬ বর্ষ] শনিবার, ২৩ আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 10th October, 1959. মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৫০

সূচীপত্র

স্মরণীয়

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

নিত্য ব্যবহারে
নিম
টুথ পেষ্ট
ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাঢ়ী সুদৃঢ় হয়।
একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 10th October, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫০ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৩ আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

গান্ধী জন্মজয়ন্তী

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর একনবতিতম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে, এই বিশেষ দিনটি ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যময় হইলেও দেশবাসী যেন সেই তাৎপর্য ও সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিতে কিছুটা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই দিনটিতে সরকারী বাঁধা ছকের অনুষ্ঠান ও সংবাদপত্রের ক্রোড় পৃষ্ঠা প্রকাশ ব্যতীত আর কোথাও তেমন কোনো সাড়া দেখি না। আমরা আড়ম্বর অথবা অনুষ্ঠান-আতিশয্যের পক্ষপাতী নহি, একটি পুণ্য মুহূর্তের ভাবগভীরতার মর্মও না বুঝি এমন নহে—তথাপি সত্য বলিতে কি, দেশবাসীর এই উদাসীনতায় বিস্মিত না হইয়া পারি না। স্বভাবতই এ-প্রসঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, দেশবাসীর এইরূপ উদাসীনতা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত।

ইচ্ছাকৃত, এমন কথা বলিতে পারি না। অনিচ্ছাকৃত বটে, তবে সম্ভবত পরোক্ষভাবে এই অনিচ্ছার পিছনে কিছু কিছু কারণও দেখা দিয়াছে। গান্ধীজী একক পুরুষ মহাপুরুষ—হইলেও তাঁহার সহিত একটি প্রতিষ্ঠানের অনুষঙ্গ এমনভাবে জড়িত যে একাকে বাদ দিয়া অপরটিকে দেখা অথবা ভাবা একেবারে অসম্ভব। সত্য বলিতে কি, গান্ধীজীর প্রতি জনসাধারণ যে আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছে, যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে—এই প্রতিষ্ঠান সেই আনুগত্য ও শ্রদ্ধা হইতে কিছুমাত্র বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলিবে না, গান্ধীজীর নিকট সাধারণের যে প্রত্যাশা ছিল সে-প্রত্যাশা উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর আপনা হতেই স্বাভাবিকভাবেই বর্তাইয়াছিল। এই প্রত্যাশা কী? সহজ কথায় বলা যায়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে মানুষ হিসাবে বাঁচিবার নৈতিক ও প্রাথমিক দাবীগুলির পূরণ। মহাত্মাজী পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানটি ত আছে। তাহার দায়িত্ব যায় কোথায়! অথচ, এই প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া সাধারণ মানুষের দিন যাপনের গ্লানির ভার কতটুকু কমাইতে পারিয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয়। বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা কর্মপ্রচেষ্টার সুদূরপ্রসারী ফল লাভের জন্য বর্তমানের মানুষ স্থির হইয়া ধৈর্য ভরে বসিয়া থাকিলে কি হইত জানি না—তবে সাধারণ মানুষের প্রত্যহের ও বর্তমানের জন্য যতটা চিন্তা ব্যগ্রতা ভবিষ্যতের জন্য ততটা নহে। অস্বীকার করা যায় না, সাধারণ মানুষ বর্তমানকে লইয়া তেমন খুশী নয়। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দিনে দিনে তাহাদের মনে যে অসন্তোষ, ক্ষোভ, হতাশা সৃষ্টি হইতেছে তাহার পরিণাম হয়ত এই, কংগ্রেসের প্রতি বিতৃষ্ণায় জাতির জনকের প্রতিও আমরা উদাসীন হইতে বসিয়াছি। সাধারণ মানুষের স্বভাব-ধর্মে যুক্তি অপেক্ষা যুক্তিহীনতাই বেশী, কংগ্রেসের বহু ন্যায়-অন্যায়ের ভাগীদার করিয়া গান্ধীজীকে আমরা কম পীড়ন পূর্বেও করি নাই, হয়ত এখনও সেই দায় হইতে এই মানুষটিকে বাদ দিতে পারি না। ইহা পরম পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়।

সাধারণ মানুষের মন হইতে এই হতাশার ভাব দূর করিবার দায়িত্ব অবশ্য নেতাদের—বিশেষত গান্ধীপন্থী নেতাদের। বলা বাহুল্য গান্ধীজীর মত ও পথ হইতে অধুনা কংগ্রেস যে দূরে সরিয়া আসিতেছে এ-বিষয়ে কূটতর্ক অনেক হইয়াছে; হয়ত ইহাও সত্য, গোঁড়া গান্ধীবাদীরা কেহ কেহ শাসক কংগ্রেসের মধ্যে নীতিহীনতা ও প্রবঞ্চনার রূপ দেখিয়া দিশেহারা হইয়া কংগ্রেস ছাড়িয়াছেন। কিন্তু মূলত সমগ্রভাবে কংগ্রেস-নীতি এখনও যাহা রহিয়াছে তাহাতে আমরা গান্ধীজীর আদর্শ বিকৃতি দেখি নাই। গান্ধীজী একদা মহাসংকটকালে বলিয়াছিলেন, "বিশ্বে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ, যে জ্ঞাতসারে সত্য ও অহিংসাকে মুক্তির একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে।" শ্রী নেহরু পরিচালিত কংগ্রেস যে এখনও জ্ঞাতসারে সত্য ও অহিংসাকে মানব-সমাজের মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়া আছে আমরা তাহা বিস্মৃত। কংগ্রেসের কিছু বিপথগামী নেতৃবর্গ যদি আজও গান্ধীজী প্রদর্শিত মানব-কল্যাণের পথকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হন—সাধারণ মানুষের মনে জাতির জনকের সুউজ্জ্বল মহান রূপটি কিছুমাত্র অপরিচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেশ পত্রিকা কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা ১৭ই অক্টোবর প্রকাশিত না হইয়া ২৪শে অক্টোবর প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক 'দেশ'।

প্রসঙ্গত

কলিকাতা বন্দর বোর্ডের সভায় শ্রীরাজবাহাদুর হুগলী নদীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নদী ক্রমেই মজে আসছে। আরও কিছুদিন এই রকম চললে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে যাবে। এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অনেক দিন থেকেই আন্দোলন করে আসছে। সম্প্রতি শ্রীরাজবাহাদুর আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, হুগলী নদী এবং কলিকাতা বন্দরের সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত হয়েছেন।

এই অবস্থা শুধু হুগলী নদীরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীরই আজ একই শোচনীয় অবস্থা। পলি-মাটিতে সকল নদীই মজে আসছে। বৎসরের অধিকাংশ ঋতুতে নদীতে জল থাকে না, বর্ষায় বন্যা নামে। নদী তীরবর্তী স্থানগুলি উত্তরোত্তর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে।

অনেকদিন আগে সরকারী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনায় প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, এই সমস্ত পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার আগে মজা নদীগুলির সংস্কার প্রয়োজন। জল নিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে কোনো উপত্যকা-পরিকল্পনাই কাজে আসবে না। তাঁর উক্তির সত্যতা জনসাধারণ আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। সরকারী হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, এবারও বন্যায় (এবং অতিবৃষ্টিতেও বটে) পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একর জমি জলমগ্ন হয়েছে এবং তিন লক্ষ সাতাশ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

শ্রীরাজবাহাদুর জানিয়েছেন, হুগলী নদীর পলি-সমস্যা সম্পর্কে তিনজন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞকে দিয়ে গবেষণা করানো হয়েছে। এছাড়া ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞরা তো আছেনই। তাঁরা সকলেই এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করে নদীর নাব্যতা রক্ষার তিনটি উপায় নির্দেশ করেছেন: ড্রেজিং বা পলিমাটি তোলা, নদী রক্ষা ব্যবস্থা এবং জল সরবরাহ। প্রথম দুটি ব্যবস্থা অবিলম্বেই অবলম্বন করা হবে, সে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয়টি সম্বন্ধে এই কথা শুধু জানিয়েছেন যে, সে সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হয়েছেন।

এর বেশি আর কিছু তিনি বলতে পারেননি, কারণ সেটি নির্ভর করছে ফরাক্কা বাঁধের উপর। বহু আবেদন-নিবেদন, উপরোধ-অনুরোধ সত্ত্বেও, ফরাক্কায় বাঁধ নির্মাণ প্রথম দুটি সরকারী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শ্রীরাজবাহাদুরের সংক্ষিপ্ত উক্তি থেকে আমরা কি আশা করতে পারি যে, ফরাক্কা বাঁধ তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে?

•

কাব্য-সাহিত্য, শিল্পে সুনীতি-দুর্নীতি, শ্লীল-অশ্লীল—এ সমস্যা অনন্তকালের। কোনো দিন এর মীমাংসা হয়নি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এর বিচার করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা আছে। কারণ রসের জগৎ আর সামাজিক জগৎ এক নয়। তাই কালিদাসের কাল থেকে আজ পর্যন্ত এর বিচার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। অথচ এটা যে একটা বৃহৎ সমস্যা, তাতে আর সন্দেহ নেই, যেহেতু সামাজিক জগৎ এবং রসলোক পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ নয়। সমাজের রুচি তার কাব্য, সাহিত্য, শিল্পে প্রতিফলিত হয় এবং কাব্য-সাহিত্য-শিল্পও সমাজের রুচিকে প্রভাবিত করে। সাধারণভাবে এই দ্বন্দ্বের অবতারণা কমই হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন সমাজের চিন্তাশীল অংশও এ নিয়ে দুশ্চিন্তিত না হয়ে পারেন না।

আজ সেই অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছে।

সাহিত্য যেখানে রসোত্তীর্ণ, সেখানে শ্লীল-অশ্লীলের বিচার ছেড়েই দিই। কিন্তু রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সব দেশেই খুব বেশি নয় এবং সুকুমারমতি বালক-বালিকারা তা পড়েও না। কিন্তু যা স্থূল, যা চোখে দেখা যায় এবং বালক-বালিকাদের চোখও এড়ায় না, সে সম্বন্ধে কি করা যায়? ছোট ছেলেমেয়েরা সিনেমা যায়, কখনও অভিভাবকের সঙ্গে, কখনও অনভিভাবক। সেখানে তারা এমন অনেক ছবি দেখে, যা তাদের দেখা উচিত নয়। অভিভাবক যেখানে সন্তানদের সম্বন্ধে সতর্ক, সেখানেও সিনেমার ছবির এমন প্রাচীরপত্র থেকে তাদের দৃষ্টি আড়াল করা যায় না। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ভাবী নাগরিকদের জন্যে সরকারের উদ্বেগ বোধ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সম্প্রতি এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র প্রযোজক ও প্রদর্শকদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। প্রকাশ, সেই সম্মেলনে প্রযোজক ও প্রদর্শকেরা তাঁদের ছবির প্রাচীরপত্র ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার প্রচারের পূর্বে সরকারের অনুমোদনের জন্যে পেশ করতে সম্মত হয়েছেন। এ অত্যন্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নেই। দেশের হাওয়া যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে এই সতর্কতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

কিন্তু সেই সঙ্গে আর-একটি প্রশ্ন স্বতঃই এসে পড়ে: শ্লীল-অশ্লীলের বিচার কে করবেন? কোনো ব্যক্তি কি? তার অসুবিধা আছে। তাহলে সেন্সর ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এর জন্যে সরকার একটি ছোট বোর্ড গঠন করেন।

•

সংবাদপত্রসমূহের উপর কটাক্ষ করে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেছেন, যেহেতু সংবাদপত্রের কর্ণধারগণ ধনী ব্যবসায়ী, সেহেতু তাঁরা স্বভাবতই সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী এবং বেসরকারী ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক সত্য, কিন্তু শুধু সেই হেতু তাঁরা সরকারী মালিকানার বিরুদ্ধে নয়। বিরুদ্ধে—সরকারী মালিকানা ত্রুটিপূর্ণ বলে। সরকার অনেক ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ করেছেন, যেমন বীমা কোম্পানির। সেখানে তাঁদের আমলে যে কেলেঙ্কারী হয়েছে, অতি দীর্ঘকালের বেসরকারী পরিচালনাতেও তা দেখা যায়নি। সম্প্রতি সরকার নাকি একটি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন গঠন করতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য, এই কর্পোরেশন বড় বড় সরকারী ভবন নির্মাণে বেসরকারী ফার্মগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর। বিশেষত, ব্যবসায়ে। কিন্তু দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের অল্প দিন আগেকার তৈরি একটি পুল যেমনভাবে ভেঙে গেল কিংবা ভাকরা বাঁধের যে ক্ষতি সেদিন হল, তা সরকারী-বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই গৌরবজনক নয়।

আর এমন যে ঘটে, সেটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ব্যবস্থা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলে। কৃতিকে সন্তুষ্ট করে তাকে অর্থোপার্জন করতে হয়। ফাঁকি সেখানে অচল। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানে কে কার কড়ি ধারে? যে কৃতি, সেই কর্মী। কে কার উপর দোষ দেয়? যে কলঙ্ক একেবারে জনসাধারণের চোখের সামনে পড়ে যায়, সকলেই তখন সেটা চুনকামে লেগে যান। অপরাধী শাস্তি পান কমই। অথচ সরকারের অর্থ জনসাধারণেরই। সেকথা বিবেচনা করে ব্যক্তি-মালিক যখন উদ্বেগ বোধ করেন, সে কি খুবই দোষের?
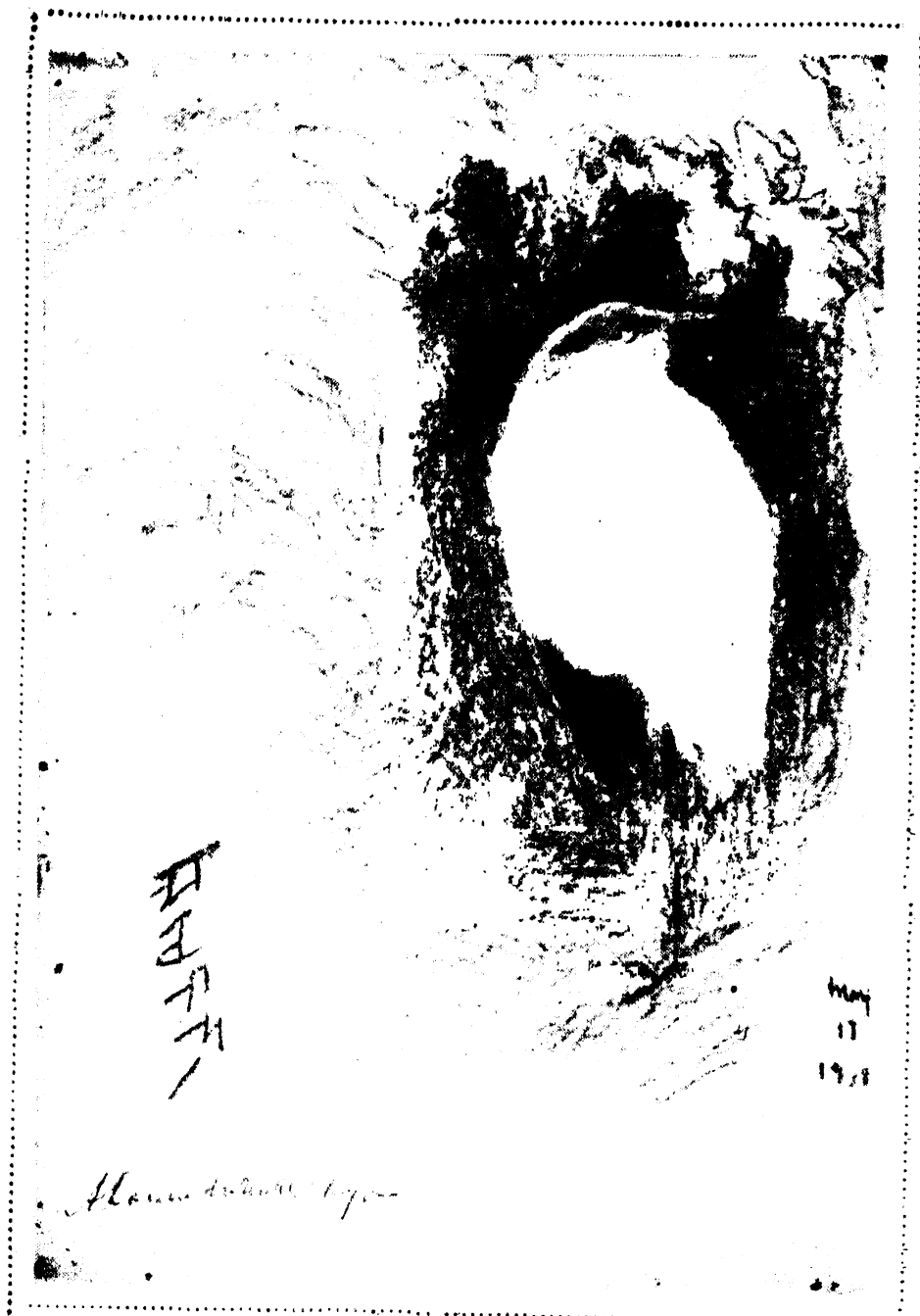
প্রত্যাশা — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বন্দরনায়কের হত্যায় দুঃখ এবং উদ্বেগবোধ সিংহলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সিংহল ভারতের এত সন্নিকট যে, আমাদের কাছে শ্রী বন্দরনায়কের মৃত্যু একজন বিদেশীর মৃত্যু বলেই মনে হয়নি, যেন এই দেশেরই একজন প্রিয় সন্তান আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়েছেন। আহত হবার পর থেকে যে সময়টুকু শ্রী বন্দরনায়ক জীবিত ছিলেন, সেই সময়কার তাঁর কথা এবং ব্যবহারের যে বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি একটি মহাপ্রাণ মানুষের মহিমায় উজ্জ্বল। মৃত্যুর দ্বারা যে-ছবিটি আঁকা হল, সেটি তাঁর কর্মময় জীবনের স্মৃতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। সেই জন্যই বোধ হয়, শ্রী বন্দরনায়কের মৃত্যুতে সিংহলে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা গেছে, সেদেশে তেমন করে কখনো দেখা যায়নি। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে এসে গুপ্তঘাতক বুদ্ধের নামের যে অপমান করল, সেই অপমান বন্দরনায়ক আপন করুণার দ্বারা মুছে দিলেন, জীবনের প্রান্তে এসে বন্দরনায়ক প্রমাণ রেখে গেলেন যে, তাঁর বৌদ্ধ দীক্ষা নিরর্থক হয়নি।

কিন্তু এই মহান সান্ত্বনাও বুঝি কাপুরুষের রাজনীতি ব্যর্থ করে দেয়। কারণ তদন্ত আরম্ভ হতে না হতেই কলম্বোর ডিটেকটিভ পুলিসের কর্তা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বন্দরনায়কের হত্যা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল, কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি এর পিছনে নেই। এত তাড়াতাড়ি পুলিস কর্তৃপক্ষের মুখে এরূপ ঘোষণা খুবই সন্দেহজনক। সিংহলের বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে অনেকে এর প্রতিবাদ করে গভীরভাবে এই ব্যাপারের তদন্তের দাবী করেছে। কারো কারো বিশ্বাস, এক সময়ে যারা বন্দরনায়কের দ্বারা নিজেদের হীন রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার চেষ্টায় ছিল, তারাই বন্দরনায়কের উপর চটে গিয়ে তাঁকে হত্যা করিয়েছে। সিংহলে প্রধানত যাদের দ্বারা গত বছর ভীষণ দাঙ্গা সংঘটিত হয়, মহাসংঘে অন্তর্গত সেই গোঁড়া দুর্বৃত্তের দলই বন্দরনায়কের হত্যা ঘটিয়েছে বলে অনেকেরই বিশ্বাস। এই গোঁড়ার দলই সিংহল থেকে তামিল ভাষা এবং তামিলভাষী সিংহলীদের উচ্ছেদের প্রয়াসী।

বন্দরনায়কের হত্যার প্রকৃত রহস্য সিংহল সরকার চাপা দেবার চেষ্টায় আছেন, এই সন্দেহ আরো দৃঢ়ীভূত হয়েছে নূতন প্রধান মন্ত্রী শ্রী দহনায়কের কয়েকটি উক্তির দ্বারা। গত শনিবার শ্রী দহনায়ক কলম্বোতে একটি প্রেস কনফারেন্সে নানা বিষয়ে সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করেন। তাতে অনেক ভালো ভালো কথা তিনি বলেন। তিনি দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার উপর বিশেষ করে জোর দেন। সংখ্যালঘুদের প্রতি তিনি এই আশ্বাসবাক্য বলেন যে, গত কয়েক বছর তারা যে একটা ভীষণ ভয়ের মধ্যে ছিল, সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার 'পাসিং ফেজ' ছিল। তিনি সংখ্যালঘুদের কোনো রকম আঘাত করবেন না, পুরাতন ক্ষতগুলি যাতে শুকিয়ে যায়, তার জন্য যথাসাধ্য করবেন। সিংহলবাসী ভারতীয়দের সমস্যাও তিনি আগামী দেড় বছরের মধ্যে সমাধান করে ফেলবেন। শ্রী দহনায়ক বলেন যে, এসব ব্যাপারে কী কর্তব্য, তা বন্দরনায়কই স্থির করে গেছেন, সুতরাং নীতিনির্ধারণের কোনো সমস্যা নেই। এসব ভালো কথা, কিন্তু সবই মামুলি সাধারণ কথা, এর মধ্যে কোনো বিশিষ্ট কাজের কথা নেই। ঐরকম প্রেস কনফারেন্সে হয়ত এই রকম সাধারণভাবে কতকগুলি আশ্বাস দেওয়া ছাড়া কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার আশাও করা যায় না। কিন্তু যে একটি বিষয় শ্রী দহনায়ককে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হয়, তাতে তিনি যে উত্তর দেন, সেটা মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না।

বৌদ্ধ মহাসংঘের ভিতর কোনো সংস্কারের জন্য সরকার চেষ্টা করবেন কিনা, শ্রী দহনায়ক এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে যা বলেন, তাতে বুঝা যায় যে সরকার মহাসংঘকে ঘাটাতে চান না। তিনি বলেন, মহাসংঘ সিংহলের সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, মহাসংঘের যে ভূমিকা পূর্বে ছিল, তাই থাকবে; কোন একজন সদস্যের কুকার্যের জন্য মহাসংঘের সেই ভূমিকার কোনও ক্ষতি হতে পারে না। ভিক্ষুদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতার উপরও সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না।

মহাসংঘের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের সংকোচন কেউ দাবি করে না। ব্যক্তিগতভাবে কোনও ভিক্ষুর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতাও হরণ করা হয়ত উচিত নয়। কিন্তু মহাসংঘের মধ্যে যে-দুর্নীতি এবং দুরাচার চলছে। এবং সেই দুরাচারের সহযোগিতায় একদল ভিক্ষু যেভাবে হিংসাত্মক কাজে অগ্রণী হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে সিংহলের রাজনীতিকে কলুষিত করছে—একথা সর্বজনবিদিত। বোধহয় সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসী আজ মহাসংঘের ভিতরকার দুরাচার এবং ভিক্ষুবেশী দুর্বৃত্তদের দমন চায়। সিংহলের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে স্পষ্ট লেখা হয়েছে যে, মহাসংঘের মধ্যে যদি এই দুরাচারীদের দল না থাকত তবে বন্দরনায়কের হত্যা সংঘটিত হত না। মহাসংঘের মধ্যে সেই দুরাচারী দলগুলি দুর্নীতি এবং ভোগবিলাসে নিমগ্ন, অগাধ অর্থ তাদের হাতে এবং ইচ্ছামত তারা মানুষ খুন করে। শ্রীবন্দরনায়কের হত্যার পরে যারা সিংহলে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা গেছে তা থেকে বুঝা যায় যে, সিংহলের সর্বসাধারণ চায় যে, বুদ্ধের নামে কলঙ্কলেপনকারী এই ছদ্মবেশী দুর্বৃত্তদের দমন করা হোক।

জনমতের সমর্থনে এই সময়ে মহাসংঘের অভ্যন্তর সংস্কারের জন্য চাপ দিলে সেটা অবশ্যই কার্যকর হত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সরকার তা করতে রাজী নন বা ভীত। মহাসংঘের পবিত্রভূমিকা যাদের দ্বারা পাপের ভূমিকায় পরিণত হয়েছে তাদের প্রতি দণ্ড উত্তোলন করতে শ্রী দহনায়ক সাহসী হচ্ছেন না। সাবধানতার প্রয়োজন হয়ত আছে। প্রেস কনফারেন্সে হম্বিতম্বি করার কোনও প্রশ্ন উঠছে না। শ্রী দহনায়ক এই সম্পর্কে যে-সব কথা যেভাবে বলেছেন, তাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, মহাসংঘের ভিতরকার দুর্নীতি এবং সিংহলের রাজনৈতিক জীবনের উপর তার কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে সিংহল সরকার দাঁড়াতে রাজী নন। কারো কারো মনে এ সন্দেহও হতে পারে যে, বন্দরনায়কের হত্যাকারীদের প্রভাব থেকে বর্তমান সরকারও মুক্ত নন। তাই যদি হয়, তবে সিংহলের দুর্ভাগ্য বন্দরনায়কের হত্যার দ্বারাই সীমিত নয়, তারপরেও কিছু।

৪।১০।৫৯

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***
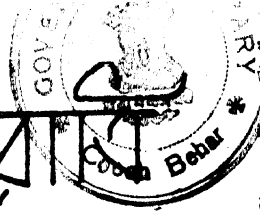
১৬

মিনিট কয়েকের মধ্যেই দুজনে ভিজে প্রায় নেয়ে উঠল। কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার। এরই মধ্যে দোকানঘরগুলিতে পর্যন্ত ঝাঁপ পড়েছে। কোথাও দাঁড়াবার একটু জায়গা নেই।

আশ্রয় শুধু আছে একটি ছাতার তলে। আশ্রয় আছে শুধু আর একজনের ঘন সান্নিধ্যে।

অসীম বলল, 'মাধুরী, এ যে দুজনেরই পাল্লা করে ভেজা হচ্ছে। এর চেয়ে বরং তুমিই ছাতাটা নাও।'

মাধুরী বলল, 'আর পুরো ভেজাটা বুঝি তুমিই ভিজবে। এ কথাটা যদি আমি বলতাম ?'

অসীম বলল, 'মনে করতাম অন্তত অবলা ভাষিতম্।'

এতক্ষণে বড় রাস্তার বাস-স্টপটা পাওয়া গেল। কিন্তু বাস কোথায়। চারদিকে শুধু ধারাপাতের শব্দ। রাস্তার ওপর দিয়ে শুধু জলস্রোত বয়ে চলেছে। একটু দূরে লাইট পোস্টের মাথায় বাল্‌বের মধ্যে যে ক্ষণপ্রভা সারারাত্রির জন্য বাঁধা পড়েছে ধারাস্নানে তারও যেন আধখানা চোখ বোজা।

এমন জায়গা, এমন বৃষ্টি, এমন একজন পাশে নিয়ে এমন কয়েকটি মুহূর্ত যাপন মাধুরীর জীবনে এই প্রথম, অনাস্বাদিত, অভূতপূর্ব। এত যে ভিজে গেছে মাধুরী তবু ঠাণ্ডা লাগছে না, শীত করছে না, কোনরকম অস্বস্তি বোধ নেই। যে তীব্র অনুভূতি তার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে তাকে শুধু স্বস্তি বললে, সুখ বললে তার তীব্রতার বিন্দুমাত্রও বোঝানো যায় না। মাধুরী মনে মনে বলল, এই বৃষ্টি যেন না থামে, এই রাত্রি যেন শেষ না হয়, এই কয়েকটি মুহূর্ত যেন সারা-জীবন পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

অসীম বলল, 'বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোন যানবাহনের তো দেখা নেই। আজ বোধ হয় এই প্রাগৈতিহাসিক নিঃসীম নগরেই আমাদের থেকে যেতে হবে।'

মাধুরী একটু হাসল, 'তাই যদি হয়। তাতেই বা ভয় কিসের।'

অসীম বলল, 'আমার আর ভয় কি। ভয় তো তোমাকে নিয়ে।'

মাধুরী বলল, 'তুমি যে কত বড় সাহসী জানা আছে। আমাকে নিয়ে তোমার কোন ভয় পেতে হবে না।'

পরক্ষণেই তার মনে হল ছি ছি ছি, এ কী বলে বসল মাধুরী। অসীম যদি একথার অন্য কোন ব্যাখ্যা করে। কী মানে করবে সে-ই জানে।

ছাতা মাথায় একটি লোক তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল।

অসীম বলল, 'লোকটি কীভাবে তাকাচ্ছিল দেখলে ?'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাও। ওর আবার দেখবার কি আছে। পথের লোক তো ওইভাবে তাকাতে তাকাতেই যায়।'

অসীম বলল, 'আর পাশের লোক বুঝি যায় না। সে আশায় আশায় দাঁড়িয়েই থাকে।'

মাধুরী এবারও বলল, 'যাও।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যে অসীম ছাতাটা তার হাতে গছিয়ে দিয়ে 'এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি' করে ছুটে যাবে তা ভাবতে পারেনি মাধুরী। সে অসীমের তৎপরতা দেখে অবাক হয়ে রইল।

ট্যাক্সিটা রাস্তার উল্টোদিকের একটা গলির মুখে গিয়ে থামল। মাধুরী দেখল, অসীম তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখ কাণ্ড। 'রথচক্র তলে প্রাণ দেবে নাকি।' মাধুরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ড্রাইভারের সঙ্গে খানিকক্ষণ কী যেন কথা বলল অসীম। মাধুরী এখান থেকে শুনতে পেল না। কিন্তু অনুমান করতে পারল, অনিচ্ছুক সারথিকে প্রাণপণে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে অসীম। শেষ পর্যন্ত রথীকেই বিজয়ী হতে দেখে মাধুরী খুশী হল। ট্যাক্সিটা অসীমকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে মাধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল।

অসীম দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'এসো।'

দুটি অক্ষরের মধ্যে যে অপরিমেয় ধ্বনি-মাধুর্য আছে মাধুরী সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হল। সে পাশে এসে বসলে অসীমই ঝুঁকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মাধুরী নিজের ভিজে শরীরে আর একজনের সিক্ততার স্পর্শ পেল। কিন্তু মানুষের দেহের উত্তাপ বৃষ্টিতে কতটুকুই বা শীতল হয়।

অসীম ড্রাইভারকে বলল, 'গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যান একটু।'

মাধুরী চমকে উঠে বলল, 'না না সে কি। বেলগাছিয়া যেতে গঙ্গার ধার পড়বে কিসে। সোজা বি টি রোড দিয়ে বেরিয়ে গেলেই তো হয়।'

অসীম ড্রাইভারকে বলল, 'গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যান একটু।'

অসীম বলল, 'সোজা পথ বড় সংক্ষিপ্ত হবে মাধুরী। তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আমরা বোধ হয় আজ গন্তব্য চাইনে, শুধু গমনটুকুই চাই। তাই যত ঘুরপথ হয় ততই ভালো।'

মাধুরী ভয়ার্তের মত বলল, 'না না, চল সোজা পথেই ফিরে যাই। এই ভিজে কাপড় চোপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে অসুখ-বিসুখ হবে।'

কিন্তু বৃষ্টির শব্দে তার কথাগুলি এত অস্ফুট হয়ে রইল যে, কি রথী, কি সারথী কারোরই তা কানে গেল না। না কি কথাগুলি মাধুরী শুধু বলবে মনে করেছে, সত্যি সত্যি উচ্চারণ করেনি, করতে পারেনি?

অসীম নিরুত্তর থাকায় তাই মনে হল।

ট্যাক্সি কোন্ দিকে কোন্ পথে যাচ্ছে মাধুরী তা চিনতে পারল না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল, এ-পথে সে এর আগে আর আসেনি। অসীম প্রাগৈতিহাসিক নগরের কথা বলেছিল মাধুরীর মনে হল, সত্যিই যেন তাই। মাটির তল থেকে খুঁড়ে বার করা এক পরিত্যক্ত পাতালপুরীর অলি গলি দিয়ে তারা যে কোথায় যাচ্ছে তা মাধুরী জানে না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন এক অলৌকিক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। এই বৃষ্টি অলৌকিক, অন্ধকার অলৌকিক, অচেনা পথে উদ্দেশ্যহীন যাত্রা অলৌকিক, তার পাশে যে মানুষটি বসে আছে সেও যেন এ-লোকের কেউ নয়।

বৃষ্টির ঝাপটায় গাড়ির সামনের কাঁচের আবরণ অস্পষ্ট হয়ে আসছে, দুদিক থেকে দুটি স্বয়ংক্রিয় বস্তুপিণ্ড এসে সেই জল আবার মুছে নিচ্ছে। এই সাধারণ ব্যাপারটাকে পর্যন্ত এ মুহূর্তে অপার্থিব বলে মনে হল মাধুরীর।

'ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে কি ভেজাটাই ভিজেছি। তোমার কাছে কোন শুকনো রুমাল টুমাল আছে মাধুরী? আমার পকেটের রুমালটাও জামাকাপড়ের মত ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।'

মাধুরী একটু যেন চমকে উঠল। আর একজন পার্থিব শরীরী ব্যক্তি যে তার পাশে রয়েছে তা যেন একটু আগেও তার খেয়াল ছিল না। কিন্তু এই চমক তাকে আর ত্রস্ত করে তুলল না। বরং যেন এক নতুন আশ্রয় আর আশ্বাস এনে দিল। এই অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রায় মাধুরী একক নয়, নিঃসঙ্গ নয়, তার দোসর আছে। তুমি যা-ই কর না কেন, যা-ই ভাব না কেন, যেখানেই যাওনা কেন তোমার দোসর আছে। এর চেয়ে বড় আশ্বাস আর কী আছে জীবনে?

'কোন রুমাল টুমাল নেই নাকি মাধুরী?'

আছে, মাধুরীর সব আছে। এই মুহূর্তেও যদি তার কিছু না থাকে আর কখন থাকবে?

মাধুরী বলল, 'আমার হাতের রুমাল তো তোমার মতই ভিজে। ব্যাগের মধ্যে আর একখানা আছে কিনা দেখি।'

রঙীন থলিটার সুতো শিথিল করে তার মধ্যে হাত দিল মাধুরী। ভাঁজ করা ছোট একখানা রুমাল বেরোল আর বেরোল এক গুচ্ছ টকটকে রক্তগোলাপ। বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত।

আশ্চর্য, এই ফুলের কথা তো মাধুরী একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

অসীম বলল, 'বাঃ, এ ফুল কোথায় পেলে?'

মাধুরী বলল, 'সন্ধ্যাবেলায় আমার এক ছাত্রী দিয়েছিল। তাদের টবের ফুল।' তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি নাও।'

অসীম বলল, 'নেব তো, কিন্তু রাখব কোথায়?'

মাধুরী হেসে বলল, 'বাঃ রে, কয়েকটা ফুল রাখবার মত ফুলদানি তোমার কি আর নেই?'

অসীম বলল, 'একটি অপরূপ ফুলদানি আমার কাছেই আছে। যদি অনুমতি দাও তো ফুলগুলি সেখানে রেখে দিই।'

মাধুরী কথাটা যে বুঝতে না পারল তা নয়, কিন্তু জবাবটা কী দেবে ঠিক করতে না করতে নিমেষের মধ্যে অসীম তাকে কাছে টেনে নিল। তারপর একটি একটি করে তোড়ার ফুল খুলে মাধুরীর খোঁপায় গুঁজে রাখতে লাগল।

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'এ কি হচ্ছে?'

কিন্তু তার সেই অস্ফুট প্রতিবাদ বৃষ্টিধারার মধ্যে ভেসে গেল।

সর্বাঙ্গ এমন করে কাঁপছে কেন মাধুরীর? এতক্ষণ বাদে কি সে শীতার্ত হয়েছে? কিন্তু যে দেহের সঙ্গে সে আশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে তা তো শীতল নয়, তা আগুনের মতই উত্তপ্ত। না, শৈত্য নয়, মাধুরী নিজের দেহের অনুপরমাণুতে সেই অগ্নির উত্তাপই অনুভব করছে। এ কম্পন কি তা হলে দুটি অগ্নিশিখার? আর এই বৃষ্টি? তার ঠোঁটে গালে চিবুকে চোখের পাতায়—সর্বাঙ্গে এই যে নিরবচ্ছিন্ন সুধাবৃষ্টি হচ্ছে বাইরের ধারাপতনের সঙ্গে তার কি কোন মিল আছে? একটু আগে আকাশেরই সেই বাসনা-বৃষ্টি মাধুরী তো সর্বাঙ্গ পেতে নিয়েছে। তাতে কি এমন অসহ্য আনন্দ ছিল? এমন অনির্বচনীয় অনাস্বাদিত সুখ? সেই অবিচ্ছিন্ন দাহ আর শান্তি, গরল আর অমৃত, মৃত্যু আর জীবনের রসায়ন? আকাশ যত বিশালই হোক আর যত বৃষ্টিই ঝরাক মানুষের দুই ঠোঁটের সেই অপরিমেয় ঐশ্বর্য কোথায় পাবে? বাক্য আর চুম্বনের অফুরন্ত সম্পদ অধর ছাড়া আর কিসে ধরে?

অবশ আচ্ছন্ন মাধুরী যে কতক্ষণ এমনভাবে রইল তা সে টের পেল না। কখন বৃষ্টি থেমে গেল, আঁকাবাঁকা ঘুর পথ ছেড়ে ট্যাক্সিটা কখন যে ফের তাদের চেনা পথ, সোজা পথ ধরল মাধুরী তাও খেয়াল করতে পারল না। শুধু কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে খানিকটা সরে বসল। ভিজে আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানা ভালো করে মুছে নিল মাধুরী। কিন্তু তাতে কি সব দাগ মোছে?

ছি ছি ছি, ড্রাইভার তো যান্ত্রিক রকেট নয়; এমন নয় যে স্টীয়ারিং ধরবার মত তার শুধু দুখানা হাতই আছে, তার ঘাড় ফেরাবার শক্তি নেই, তার দুটি চোখ নেই। চোখের তারায় দৃষ্টি নেই তাতো নয়। ও যদি দেখতে পেত তাহলে কি হত! দেখেছে কিনা তাই বা কে জানে। তাহলে লজ্জায় মরে যাবে মাধুরী। গাড়ি থেকে নামবার সময় কী করে ওর দিকে তাকাবে? সে নিজে না তাকালেও ওর দুটি চোখ বন্ধ করবে কী করে।

ড্রাইভার রকেট নয়। তার দু হাত নড়ছে। মুখ নড়ছে, পান চিবুচ্ছে বোধ হয়। কানে একটি বিড়ি গোঁজা। ড্রাইভার যদিও এদিকে চোখ ফেরাচ্ছে না তবু সে যে জীবন্ত মানুষ মাধুরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং পাশে যে মানুষটি স্থির হয়ে বসে আছে সে-ই যেন মুহূর্তের মধ্যে রবোট হয়ে গেছে। তার নড়া নেই, চড়া নেই, ভাষা নেই, ইশারা নেই, যেন কাঠ দিয়ে তৈরি এক মনুষ্যমূর্তি। এই মুহূর্তে বিশ্বাস করা শক্ত যে, একটু আগে ওই দারুতেই দাবাগ্নি জ্বলেছিল; ওই দুটি শক্ত নিশ্চল হাতের চাঞ্চল্যের শেষ ছিল না, ওই দুটি নীরব ওষ্ঠাধরের প্রতিটি স্পর্শে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হচ্ছিল। এখন সেই মানুষই এমনভাবে চুপ করে বসে যেন মাধুরীকে সে চেনে না, কি সামান্যই পরিচয় আছে তার সঙ্গে। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। কর্মবীর মানুষটি বসে বসে কি ভাবছে এখন? এমন একটা অঘটন কেন ঘটল তার কারণ বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নাকি?

মাধুরীর অনেক কথাই আজ বলবার ছিল। তার স্কুলে যাওয়ার পথে কলোনীতে ঢুকবার সময় যে গুরুত্বের প্রশ্নটি করেছিল অসীম, মাধুরী ভেবেছিল ফেরার পথে তার জবাব দেবে। প্রেমের মর্যাদা যে কিসে, অসীমের সঙ্গে তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করবে। কিন্তু সে সুযোগই হল না। তাকে মুখ খুলতেই দিল না অসীম। এক অপূর্ব কৌশলে সব বন্ধ করে রাখল, দুই ঠোঁট এক করে এক সঙ্গে গেঁথে দিল। একটি শরের নামই কি পঞ্চশর? লক্ষ গুণ বাড়ালেও কি শুধু সংখ্যায় তার তীব্রতা প্রকাশ করা যায়? অসীমের সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বলে মাধুরীর এই মুহূর্তে আর কোন ক্ষোভ নেই। যে জবাব শুধু সে বাক্যে দিত তাই কায়মনোবাক্যে দিয়েছে। এর চেয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আর কী-ই বা সম্ভব ছিল? এর চেয়ে সদুত্তর আর কিভাবেই বা দিতে পারত মাধুরী?

আশ্চর্য! [illegible]ভূতি আবার তার কাছে [illegible] এসেছে। মাধুরীর হাতখানা ফের তুলে নিয়েছে তার হাতের মধ্যে। যে ধরে তার হাতখানাই কি কাঁপছে, না কি যে ধরেছে তার হাত? নিরাপদ নীড়ের মধ্যে পাখি যখন কাঁপে, তার সে কম্পন কি ভয়ের, না কি তা বুকের মধ্যে হৃদস্পন্দন, মনের মধ্যে বাসনার শিহরণ? একটু আগে মাধুরী সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্বাঙ্গ অনুভব করেছে, সর্বাঙ্গের স্বাদ নিয়েছে। এখন শুধু হাতের সঙ্গে হাতের মিল। কিন্তু একই অঙ্গে সেই সর্বাঙ্গের স্বাদ। কখনো প্রতি অঙ্গের লাগি প্রতি অঙ্গ কাঁদে, কখনো একই অঙ্গে সর্বাঙ্গ এসে বাসা বাঁধে। একটি হাতের মধ্যে যে একটি পুরো জীবনের স্বাদ মেলে, একটি হাত বাড়িয়ে যে একটি সম্পূর্ণ জগৎকে ধরা যায়, এ রহস্য কি কোনদিন মাধুরীর জানা ছিল? কোনদিন কি অনুভব করেছিল যে হাতে হাত দিলেই সর্বস্ব দেওয়া হয়? আর সর্বস্ব দেওয়া মানেই সর্বস্ব পাওয়া?

অসীম বলল, 'মাধুরী, তুমি কি রাগ করেছ?'

কীর্তিধর পুরুষের কথা শোন। এতক্ষণ বাদে তার খোঁজ নেওয়ার সাধ হয়েছে মাধুরী রাগ করেছে কিনা। সে কি মুখ ফুটে বলবে রাগ করে নি? সে কি মুখ ফুটে বলবে রাগ করেছে? সে কথা বলবার সাধ্য কি আর আছে মাধুরীর?

'তুমি এত কি ভাবছ বল তো? কার কথা ভাবছ মাধুরী? মানসীর কথা?'

মাধুরী চমকে উঠল। প্রশ্নটা কি পাশ থেকে এল না ভিতর থেকে তা যেন হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। মানসী! কোত্থেকে এই শব্দময় তীক্ষ্ণ তীরটি এসে বুকে বিঁধল মাধুরীর। তার অস্তিত্ব তো কোথাও ছিল না। সে তো জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাকে পুনর্জীবন কেন দিল অসীম, কেন ওই নাম ওর মুখে আনল? যে মুখ এতক্ষণ মাধুরীর মুখের সঙ্গে মিশে ছিল সে মুখে আর একজনের নাম কেন? পঞ্চশর, তোমার তূণে এই শক্তিও ছিল? এই ঈর্ষার বিষাক্ত তীরে তুমিও কি বিদ্ধ হও মাঝে মাঝে? না কি মানুষের এই পরম ক্লীব শত্রু রিপুই তোমার চির-সুহৃদ, প্রিয় সহচর?

মাধুরী যেন অসীমকে জবাব দিল না, নিজেকে বলল, 'তার কথা না ভেবে কি আমরা পারব? সে তো একদিন জানবেই।'

'জানুক। কিছু এসে যায় না মাধুরীর। সে আর আমাকে ভালোবাসে না। আমাকে ছেড়ে দিতে তার আর কোন দুঃখ নেই। তার চোখে আমি এখন অকর্মণ্য, অপাংক্তেয় পুলিস কর্মচারী ছাড়া আর কিছু নই।'

অসীমের গলায় এ কী ক্রোধ, এ কী আক্ষেপ, এ কী নৈরাশ্য! তবু সব ছাপিয়ে এ কী তীব্র আবেগ! আর তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি করুণ সুর-তরঙ্গ। অপমানিত, আহত বাসনার এ কী গোপন কান্না না গুঞ্জরণ?

মাধুরী স্তব্ধ হয়ে রইল।

অসীম বলতে লাগল 'মানুষের কাজটাই তার কাছে বড়। কীর্তিই তার কাছে একমাত্র পরিচয়। তাই সাধারণ একজন পুলিস কর্মচারীকে নিয়ে তার লজ্জার সীমা নেই। তাই একজন খোঁড়া বুড়ো প্রফেসরের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতেও তার এত গৌরব!'

মাধুরী অস্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলল, 'তুমি এসব কী বলছ।'

অসীম বলল, 'আমি ঠিকই বলছি মাধুরী, সব জেনে শুনেই বলছি। আমি দু দুবার তাকে ফোন করেছি, পাইনি। অসুস্থ বন্ধুকে কে না দেখতে যায়? কিন্তু কে সারারাত ধরে তার কাছে আটকে থাকে? এর মানে যে কী বুঝতে পারছ না?'

বুঝতে আবার পারেনি মাধুরী? অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছে! কেন আরো আগে বোঝেনি, সেই ধিক্কারই এখন তার মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠল। এই লজ্জা সে কী করে ঢাকবে, এই অপমান সে কোথায় লুকোবে? এই মুখ সে কি করে দেখাবে? হাজার বার আঁচল দিয়ে মুছলেও যে এ চিহ্ন মিলাবে না, হাজার বার চোখের জলে ধুলেও যে এ-ক্ষত শুকোবে না। তার ঠোঁটে গালে কপালে চিবুকে তো কোন অধিকারের প্রণয়-চিহ্ন নেই, এক ব্যর্থ আহত, লাঞ্ছিত, কামার্ত পুরুষের নিষ্ফল আক্রোশের অশুচি দংশন-ক্ষত জ্বলজ্বল করছে। সেই ঔচ্ছৃঙ্খল্য তার সমস্ত জীবনকে যে ম্লান করে দিল। মাধুরী তা বুঝবে কী করে।

হঠাৎ হাতখানা ছাড়িয়ে নিল মাধুরী। সরে এসে জানলার কাচে মাথা রাখল। মাথা খাড়া করে রাখবার জোর আর নেই তার।

অসীমের ক্ষুব্ধ, বিস্মিত স্বর কানে এল, 'এ কী মাধুরী, তুমি কাঁদছ! কী হল তোমার—কী হল মাধুরী।'

মাধুরী আরো সরে, আরো সঙ্কুচিত হয়ে কাঁচের সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলল, 'ছুঁয়ো না, তুমি আমাকে আর ছুঁয়ো না।'

একটু আগে মাধুরী হাতে স্বর্গের সুধা পেয়েছিল। তুলে মুখে দিতে না দিতেই তা নিমেষে বিষ হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, ট্যাক্সিটা কোন অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতে পারল না, পারল না ব্রীজ ভেঙে খালের জলে পড়ে যেতে, মধ্যরাত্রির প্রমত্ত দোতলা বাসটার সঙ্গে ধাক্কা খেতে। কিছুই তার সাধ্যে কি বুঝিয়ে কুলোল না। নির্বিবাদে মাধুরীদের বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সির সাড়া পেয়ে দোর খুলে প্রায় সবাই বেরিয়ে এসেছেন। বাবা, মা, নন্দু, মানসী।

সুহাসিনী বললেন, 'এত রাত করলি যে মাধু। আমরা তো ভেবেই অস্থির।'

মাধুরী মৃদুস্বরে বলল, 'যা জল।'

নন্দু উল্লাসের সঙ্গে বলল, 'ট্যাক্সি করে এসেছ নাকি মেজদি? আমাদের চেয়ে বেশি ভিজতে পারনি। আমরাও ট্যাক্সিতে গিয়েছি, ট্যাক্সিতে এসেছি।'

মাধুরী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'তাই নাকি? কোথায় গিয়েছিলি তোরা?'

নন্দু বলল, 'কোথায় আবার? বরানগরে। দাদার ওখানে। আমি আর মেজদি তোমাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, গিয়ে শুনলাম, একটু আগে তোমরা বেরিয়ে পড়েছ। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরোলাম। মনে হল কাশীপুর রোড দিয়ে যে ট্যাক্সিটা চলে গেল, সেটায় তোমরাই আছ। মেজদিকে বললাম, আয় আমরা চেজ করি। দারোগার পিছনে গোয়েন্দা হয়ে ছুটি। কী মজাদার একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস হত তাহলে। কিন্তু মেজদির মনে কোন রস কষ নেই। আমাকে ধমকে ধমকে সোজা বাড়িতে নিয়ে এল।'

মাধুরী লক্ষ্য করল মানসী নিষ্পন্দ পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অসীমও ততক্ষণে সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখেও কোন কথা নেই।

সুহাসিনী বললেন, 'যাক, ভালোয় ভালোয় সব বাড়িতে এসে পৌঁচেছ, এই আমার ভাগ্য। এখন ঘরে এসো তোমরা।'

মাধুরী মার পিছনে পিছনে প্যাসেজের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল।

হঠাৎ নন্দু বলল, 'বাঃ, কত বড় বড় গোলাপ পরেছ মেজদি। এ-ফুল কোথায় পেলে!'

মাধুরী জবাব দেওয়ার আগেই মনোমোহন মন্তব্য করলেন, 'শুধু কি ফুল, খোঁপায় ফুলের বাগান বসেছে। চল ঘরে চল।'

(ক্রমশ)

অন্য অস্ত্র

বীরেন্দ্রকুমার

এ-জন্যে কুণ্ঠিত। থাকি সবার আড়ালে আবডালে।
নিজেরি কার্পণ্যে যেন শশকের মতন গুটিয়ে
সংকোচের ঘেরাটোপে সংগোপনে নিভৃতে লুকিয়ে।
আসি না সভায় কিংবা গানের আসরে তালে তালে
যেখানে অন্যেরা আসে—নানা রং দীপশিখা জ্বালে।
নিজেরি দৈন্যের দায়ে মুখ ঢাকি। অন্ধকার নিয়ে
একরাশ একাকিত্বে ক্লান্তি আর নৈঃশব্দ কুড়িয়ে।
কারণ, বিদগ্ধজন যে-উচ্চ মার্গের বেড়াজালে
সমাহিত, সেখানে আমার দৌড় অপাংক্তেয়, পাশে।

অবশ্য, এমন বিত্ত নেই যাতে দম্ভের প্রকাশে
দাঁড়াই। উদ্ধত বুকে উজ্জীবিত সোজা সগৌরবে।
তাই নতমাথা আমি সশঙ্কিত তোমার নিকটে
হতবাক। অন্য অস্ত্র তূণে নেই—শুধু এ-সংকটে
কবিত্ব কৃতিত্ব ছাড়া, তাতে কী ও-মন দ্রব হবে?

দিন-লিপি — জ্যৈষ্ঠ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বর্ষার বিষণ্ণ রোদে বাড়িঘর প্রৌঢ় হয়ে গেছে
আমার মতন।
আমি তুলে নিই বেছে বেছে
ক্লান্ত পায়ে ওখানে যে কারা-কাজ করে।
তাদের অনীহা-ভরা মন
ছোঁয়াচ লাগায় মনে, বসে থাকি ঘরে।

রুগ্ন বুকে কী আলস্য বাসা বাঁধে আজ—
মেঘে-রোদ্রে চেয়ে থাকি, তার কারুকাজ
আমাকে ভাবায় শান্ত জীবন-মরণ—।
কবে তুমি, কন্যা, সব ভেঙে দিয়ে পণ
আমাকে ভাসাও—
অনির্দেশে, সেই অনির্দেশে তুমি আজও নিয়ে

একটি হালকা কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

একটি কবিতাও লেখেনি মণিময়
ছিলো সে কবিতার সত্য।
ভালো সে বেসেছিল হারিয়ে সংশয়
তাতেই একদিন মরতো—
যদি-না থাকতুম আমরা——অর্থাৎ
মর্ত্যে ফেরাবার বন্ধু,
ফিরলো তাই শেষে,—কিন্তু দৈবাৎ
মনটা রইলোই পঙ্গু!
একটি গল্পও লেখেনি মণিময়,
নিজেই হোলো এক গল্প।
রইলো আপনার লুপ্ত অধ্যায়ে
যেখানে লোকজন অল্প।
বাতাস, আলো আর ফুল বা পাতা আর
পাখি বা পোকাদের উৎপাত
কিছুই ঢোকবার রাস্তা রাখেনি সে,
যেমন আমরাই দৈবাৎ।
একটি নাটকের বিরস অন্তিমে
ছিলো সে শূন্যের সম্রাট!
আমরা বলতুম কাজ কি জাঁহাপনা?
একলা থাকা এক বিভ্রাট!
তাই সে-দৃশ্যের স্বল্প পরিসরে
হঠাৎ এলো শেষ-রাত্রি·
পড়লো যবনিকা, মরলো মণিময়।
আমরা জীবনেরই যাত্রী!
এ সাদা গল্পের কিছুই মানে নেই
হালকা ঢেউটাই গ্রাহ্য—
হিসেবী মানুষেই বাঁচার অধিকারী
আগুনে বোকারাই দাহ্য।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

২৭

বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে মহাষ্টমীর দিন রাঁচি থেকে প্রমথ চৌধুরী আমায় চিঠি লেখেন।

৪৬

[গত সংখ্যায় প্রকাশিত]

রাঁচী
২৩।১০।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রবন্ধ এবং পোস্টকার্ড পত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রপাঠ উত্তর দিতে বসেছি—কেননা হাতে কোনও কাজ নেই, তাছাড়া বাইরে যে ঘুরে ফিরে বেড়াব তারও জো নেই—বৃষ্টি এখানেও সমান চলেছে।

তোমার বন্ধুর প্রবন্ধ ছাপাবার মত হয়েছে। সুতরাং তুমি পত্রোত্তরে তাঁর নাম লিখে পাঠিয়ো, কেননা, সবুজপত্রে আমরা বেনামী লেখা ছাপাইনে। ছাপাখানার ভাষায় বলতে হলে এ প্রবন্ধে Composition-এর যা ত্রুটি আছে impositionএ আমি তা সেরে নেব। অর্থাৎ যেখানে দেখব লাইনগুলো তেড়া-বেঁকা হয়েছে সেখানে সেগুলোকে সিধে করে নেব।

আজ অষ্টমী পুজোর দিন, এই কথা ত পাঁজিতে বলে, কিন্তু চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি জন্মাষ্টমী—কেননা আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন আর মাঝে মাঝে শ্রাবণের ধারা বর্ষে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে সব ঋতু লোপ পেয়ে শেষটা এক বর্ষাই টিঁকবে, এরপরে এদেশে আর আকাল হবে না—যা হবে তা হচ্ছে চির বিকাল। যদিচ এখন বেলা সবে সাড়ে চারটে—তবুও বিনা বাতিতে ভালো দেখতে পাচ্ছিনে বলে, লেখা এইখানেই শেষ করি। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এ-চিঠি আমার হাতে পৌঁছোয় দুবছর পরে, ঠিক মহাষ্টমীর দিনেই। ডাকঘরের গাফিলতির জন্যে নয় চিঠিটি বাড়িতেই কি রকম অন্য কাগজপত্রের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, দুবছর বাদে সেই সব ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল। এ-ঘটনাটি আশ্চর্য লাগায় আমি তার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে সেইদিনই প্রমথবাবুকে চিঠি লিখলুম। পত্রোত্তরে উনি আবার রাঁচি থেকেই লিখলেন:

৪৫

রাঁচি
৮।১০।১৯

কল্যাণীয়েষু,

কার্যান্তে আগে তোমাকে আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে পরে জানাচ্ছি যে তোমার চিঠি কাল পেয়েছি।

দুবৎসর পূর্বের অষ্টমীতে লেখা আমার পত্র দুবৎসর পরে আর এক অষ্টমীতে যে তোমার হাতে পৌঁচেছে এটা অবশ্য আশ্চর্য ব্যাপার বটে। তুমি জিজ্ঞেস করেছ যে এর পর দুর্গায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না? আমার উত্তর, এই রকম Coincidence-এর বলেই যদি "দুর্গা"র উপর বিশ্বাস পাকা করতে হয়, তাহলে বিশ্বাসী খুঁজতে গিয়ে আমাদের শেষটা বলতে হবে "লাখে না মিলল এক"। সে যাই হোক্, এ ঘটনার মধ্যে একটু মজা আছে। আমাদের চারপাশে যা ঘটে তা এমনি নিয়মমতই ঘটে যে মানুষে ঘটনা সকলের মধ্যে একটা কার্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করে উঠতে পেরেছে অর্থাৎ মানুষের মগজ থেকে Science বলে একটা বিদ্যে বেরিয়েছে। এর ফলে আমাদের কাছে কোনও জিনিষই আর নতুন ঠেকে না যার কারণ জানি তার কার্যের ভিতর নূতনত্ব আর কি থাকতে পারে? এর একটি ত আর একটির ফল মাত্র। সেদিন থেকে আমরা এ বিশ্বের ভেদ জেনে নিয়েছি সেদিন থেকে মানুষে আর

কিছুতেই আশ্চর্য হয় না—কেননা তার বিশ্বাস যে, এই আইন-শাসিত বিশ্বে কোনরূপে আশ্চর্যকর অর্থাৎ বেআইনী ঘটনা ঘটতেই পারে না। অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে এইরূপ তখন যদি এমন কোনও ঘটনা চোখে পড়ে যা নিতান্তই খাপছাড়া, যার কোনও হিসেব পাওয়া যায় না—তখন মনটার ভিতর বিস্ময় আপনা হতেই জন্মায়। এই দেখ না কেন, আমরা গরুর প্রতি ভুলেও দৃষ্টিপাত করিনে, কিন্তু বৈদ্যনাথের গরু পয়সা দিয়ে দেখি, কেননা সে গরু চারপেয়ে নয়, পাঁচপেয়ে—আর আমরা জানি যে বৈজ্ঞানিক গরু চতুষ্পদ। এ চিঠি সত্যেন্দ্রকে দেখিও না,—সে চটে যাবে। বিজ্ঞান হচ্ছে এ যুগের mythology, সুতরাং তার উপর ঠাট্টা বিদ্রূপ ভক্তের দল সইতে পারে না। সে যাই হোক, যে সব জিনিষের অর্থ বোঝা যায় না, সে সব জিনিষের অনুরক্ত হওয়াটা আমার ধাতে নেই—আর যার আছে তার ধাত বদলাবার জন্য চিকিৎসা করা প্রয়োজন। যা আশ্চর্যজনক তা exception বলেই গ্রাহ্য। দেশসুদ্ধ গরু যদি বৈদ্যনাথের গরু হয়ে ওঠে তাহলে চারপেয়ে গরুই একটা freak of nature হয়ে উঠবে। এই মোটা কথাটা উপেক্ষা করেই বাঙলা দেশের গল্প লেখকেরা সাহিত্যজগতে একধার থেকে বৈদ্যনাথের গরু সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। তাঁদের এ কার্যের প্রতিবাদ করলে দেশসুদ্ধ লোক চীৎকার করে বলবে—"বাঙালীজাত romantic—অতএব সাহিত্যরাজ্যে সে তার স্বধর্ম পালন করেই চলেছে।" স্বধর্মে নিধন যে শ্রেয়—একথা ত স্বয়ং ভগবান বলে গেছেন, সুতরাং আমি কাউকেও তাঁর স্বধর্মচর্চা হতে নিবৃত্ত করতে চাই না। বলতে চাই শুধু এইটুকু যে ও চর্চার ফলে নিধন শ্রেয় হোক আর না হোক নিধন নিশ্চিত।

কি কথা থেকে কি কথায় এসে পড়লুম? একেই বলে বাজে বকুনি—যে বিষয়ে আমি চতুর্মুখ। এখন বিশ্ব ছেড়ে ঘরে ফিরে আসা যাক। এখানে দিব্যি শান্তিতে আছি, ফলে এতটা শান্ত হয়ে পড়েছি যে, জড়পদার্থের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি। কাজের মধ্যে শুই, খাই আর শুই, তবে দুই সমান মাত্রায় নয়—খাই কম—শুই বেশি। লেখাপড়ার হিসেব এই। চিঠি লিখি আর পড়ি, হাতের গোড়ায় যা পাই তাই অর্থাৎ বিশেষ কিছু না। আজ এ বইয়ের দুপাতা কাল ও বই-এর তিন-পাতা—এই হচ্ছে আমার দৈনিক বরাদ্দ। শুক্লপক্ষটা এইভাবেই কাটাব। ইচ্ছে আছে পক্ষান্তরে কালি কলম নিয়ে বসব। আমার বিশ্বাস মনের জমিও মাঝে মাঝে পতিত রাখা দরকার।

এখানে এসে সুনীতির আর একখানি চিঠি পেয়েছি। সে যে মহা ফূর্তিতে আছে তার পরিচয় তার চিঠির প্রতি অক্ষরে ফুটে উঠেছে। এইত চাই। সুনীতির মহাগুণ যে আধমরা লোক নয়। যেমন শতকরা নিরানব্বইজন বাঙালীর ছেলে হয়ে থাকে। কাল তাকে আটপাতা পুরে একখানি চিঠি লিখেছি। তবে তেমন যত্ন করে লিখতে পারিনি। হালে আমার মনটা বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল আছে, তার কারণ বর্তমানে আমি 'গৃহহীন'। রবিবাবু তাঁর একটা গানে দুঃখ করে বলেছেন, 'হায় গৃহহীন হায় পথহারা'। 'গৃহহীন' ব্যক্তি যে কতটা কৃপার পাত্র সে সত্যের সম্যক উপলব্ধি ইতিপূর্বে আমি কখনো করতে পারিনি। তবে ভরসার কথা এই যে আমি 'পথহারা' নই এবং সম্ভবত কখনও হব না। আমি জীবনে আমার একটা পথ ধরে নিয়েছি এবং ধীরে ধীরে হোঁচট খেতে খেতে সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি—এর চাইতে অবশ্য ঢের বড় বড় পথ আছে—যথা ধনের পথ, মানের পথ ইত্যাদি—কিন্তু আমি ঐ মনের পথ ধরেই চলব। এ পথের পথিকদের কপালে ঘরে বাইরে পুরস্কারের চাইতে তিরস্কারই জোটে বেশি, তাতে যারা ডরায় তাদের পক্ষে ধনের পথ ধরাই উচিত—কেননা ধনের পিছনে মান আসে। তখন তারা দাবী করেন যে তাঁদের মনও খুব বড় এবং দেশ-সুদ্ধ সে দাবী সাগ্রহে মঞ্জুর করেন। যাক ও সব কথা—সুরেশ চক্রবর্তীর বীরবল প্রসঙ্গ কি রকম লাগল? ও ভদ্রলোকের কলমের মুখে আর কিছু থাক আর না থাক 'কিন্তু কিন্তু' নেই। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ আমায় যে 'নাম-লক্ষি'র কথা বলেছিলেন সেদিক থেকে ভেবে দেখলে বলতে হয় যে শিব-লগ্ন যাঁর নাম সেই প্রমথনাথের উচিত ছিল দুর্গায় বিশ্বাস করা, কারণ শিবের পত্নী দুর্গা। হয়তো এ মন্তব্য আমার কলম দিয়ে বেরোনো অনুচিত, কেননা আমি তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি এই চিঠিতেই। প্রায়শ্চিত্তের অনুকূ বিধান অনুসারে এখন পত্নীতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব মিশিয়ে একটু 'ইন্ডলজি' করি, যাতে পিতৃদেবের স্মৃতিতর্পণ হতে পারে।

শিব ও দুর্গা এ-দুটি নামের ছাপ নিয়ে আছে দুটি সংস্কৃত শব্দ, 'শিবির' আর 'দুর্গ'। পূর্বেই বলেছি, মহেন-জো দড়োতে দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশকারী 'মাহেশ'-শিবের দর্শন মেলে। আলেকজাণ্ডারের সময়ে হারাপ্পা ও মহেন-জো-দড়ো অঞ্চলে 'শিব' ও 'শূদ্র' নামে যে দুই জাতি বসবাস করতেন তাঁরা দাবী করেছিলেন যে তাঁরা ওখানকার প্রাচীন অধিবাসী এবং তাঁদের ধমনীতে গ্রীকদের সমগোত্রীয় জাতির রক্ত আছে। এ দাবীকে আলেক-জাণ্ডার স্বীকার করে নেন। আমরাও যদি অস্বীকার না করি, তাহলে বুঝতে পারবো, কেন ওখানকার প্রাচীনতম শিল্পে এত চমৎকার কারু-কার্য এবং শিব কেন শূদ্র-দের জন্যে নাট্য-বেদ তৈরী করলেন—যে কথা ভারত-নাট্য-শাস্ত্রে বলে। কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রেও দেখি, কারুকর্ম আর কুশীলব-কর্ম হচ্ছে বিশেষ করে শূদ্রের কাজ।

হুইলার সাহেব প্রমাণ করেছেন যে হারাপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর সভ্যতা দুর্গ-প্রধান, যেমন আমরা মৌর্য যুগের প্রারম্ভেও দেখি। কৌটিল্যের পূর্বে বৃহস্পতি বলে গেছেন, রাজ্য হচ্ছে সপ্তাঙ্গ—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ আর বল—একথা কামন্দকীয় নীতিসারে লেখে। একটা বার্হস্পত্য অর্থ-শাস্ত্র পাই বটে, কিন্তু সেটা পরবর্তীকালের রচনা। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের 'দুর্গ-নিবেশ' অধ্যায়ে বিধান রয়েছে, দুর্গের বিশিষ্ট স্থানে বিশিষ্ট দেবতার মূর্তি স্থাপন করার। তাঁদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছেন শিব, বৈশ্রবণ, অশ্ব শ্রী আর মদিরা। এখানে 'মদিরা' যে দুর্গারই নামান্তর, সেটা দেখিয়ে গেছেন বন্ধুবর ডক্টর নারায়ণচন্দ্র ব্যানার্জি। আমার মনে হয় শিব যখন এখানে সস্ত্রীক উপস্থিত, তখন বৈশ্রবণই বা একলা থাকবেন কেন? অশ্বশ্রীকে আমি মিসেস বৈশ্রবণ বলতে চাই। সকলেই জানেন, ধনপতি কুবেরের নাম বৈশ্রবণ, এবং তিনি ছিলেন যক্ষ-কিন্নরদের রাজা। সেখানকার নারী-দের কিন্নরী বলা হয় এবং কিন্নরীরা অশ্বমুখী।

ঋগ্বেদে সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে যক্ষদের 'যক্ষবঃ' বলা আছে, এবং সেখানে তাঁরা 'শিব'-জাতি ও অন্যান্য জাতির লোক নিয়ে রাজা সুদাসের সঙ্গে যুদ্ধে রত। ১৯৩১ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে এই সব সুদাস-বিরোধী জাতির মধ্যে চারটির নাম পাওয়া যায় (যক্ষু-তুর-বশ-শিগ্রু) যারা সমবেতভাবে খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে মিশর আক্রমণ করে, এবং 'যক্ষব' হচ্ছে (মিশরীয় চিত্রাক্ষরের 'ইঅথউঅস') সেই জাতি যাকে গ্রীকরা বলতেন 'অখৈওয়াই' আর ইংরেজরা বলেন Achaeans। ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তে এঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এঁরা অশ্ব-মুণ্ড বলি-রূপে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতেন। প্রতীচ্য পুরাতত্ত্বেও Acaean-দের সঙ্গে অশ্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ডক্টর সুনীতি চাটুয্যের মুখে শুনেছি, একজন আধুনিক প্রতীচ্য পণ্ডিত প্রমাণ দেখিয়েছেন যে গ্রীকদের 'কিংনর'-নামক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের কিন্নর-কিন্নরীর শব্দগত সম্পর্ক আছে।

বৈশ্রবণ ছিলেন পুলস্ত্য-পুত্র বিশ্রব-র তনয়, আর রাবণ ছিলেন তাঁর বৈমাত্র-

ভ্রাতা। ব্রহ্মার বরে তিনি না-কি একটি পুষ্পক-রথ পান্। কথাটা সত্য হলে বলতে হয়, সেকালেও এয়ারোপ্লেন ছিল। আমি কিন্তু এটিকে সেকেলে সাবানের ফানুস বলে বিশ্বাস করি। কল্পনাকে হাওয়ায় ওড়ালে অনেক উঁচুতে যাওয়া যায়। রাবণের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় বৈশ্রবণ-কুবের পিতৃ-নির্দেশে লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে চলে যাওয়ার কাহিনীকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সুবর্ণ-সম্পদে বিশ্বাসী মানুষের মনে রাবণের স্বর্ণ-বহুল লঙ্কা, আর স্বর্ণ-বহুল তিব্বত-ভূমিতে অবস্থিত কৈলাস, তুল্যমূল্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

যক্ষ-রা যে রাক্ষসদের সমগোত্রীয়, একথা বায়ুপুরাণেও আছে। সেখানে যক্ষ-দের ভুঁড়ি-ওয়ালা চেহারার বর্ণনা পাই, আর পৌলস্ত্য-রাক্ষসদের বর্ণনায় বলা আছে যে, তাঁদের মাথার চুলগুলো ছিল উলু-খড়ের শীষের মতন খাড়া-খাড়া। বৈদিক টীকাকাররাও পুলস্তি-শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঠিক এইরকম চুল-ওয়ালা মাথা আঁকা আছে ক্রীট্-এর মাটি খুঁড়ে পাওয়া চিত্র-লিপিতে। এ-লিপি পড়ে বোঝ-বার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এখনো মাথা খুঁড়ে মরতে প্রস্তুত, এবং অনেক মাথা খুঁড়েও এর পাঠোদ্ধার অদ্যা-বধি কেউ করতে পারেন নি। তবু ঐ মাথাকে 'ফিলিস্টাইন হেড্' বলা হয়, কারণ ঐরকম মাথাওয়ালা মানুষ আঁকা আছে ১২০০ খৃঃ পূঃ-র মিশরীয় শিলালিপি-ফলকে, যেখানে ঐরূপ মানুষকে 'পুলস্তি' নাম দেওয়া হয়েছে, এবং বাই-বেলে বলে এদেরই নাম হচ্ছে 'ফিলি-স্টাইন।' এখন যে-দেশকে প্যালেস্টাইন বলা হয়, সেই দেশেই এদের অধিকাংশ বসতি করেছিল।

আমার ধারণা, আসল স্বর্ণ-লঙ্কার অনু-সন্ধান করতে গেলে আমাদের যেতে হয় ক্রীট্-অঞ্চলে। 'পার্জিটার সাহেবের মতে লঙ্কার রাবণ' বললে বুঝতে হবে শুধু 'দ্বীপের রাজা', কারণ দ্রাবিড় ভাষায় 'ইরাইবন (=রাবণ) মানে 'রাজা', আর 'লঙ্কা' মানে 'দ্বীপ'। কোন্ দ্বীপ এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ক্রীট্-এ যাওয়া অযৌক্তিক নয়। ট্রয়-এর মতন সেখানেও মাটির নীচে অনেক সোনার বাসনকোসন পাওয়া গেছে। রামায়ণের সুন্দর-কাণ্ডে লঙ্কার যে সুন্দর বর্ণনা পাই, তার মধ্যে প্রাচুর্য দেখা যায় স্বর্ণের আর রক্ত-প্রবালের। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশেই রক্ত-প্রবালের বাস্তবিক প্রাচুর্য। সুন্দর-কাণ্ডে বর্ণিত লঙ্কার কারু-কার্যে যে পদ্ম ও স্বস্তিক-চিহ্নের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, সে-প্রাধান্যও পরিস্ফুট হয়ে আছে ট্রয় ও ক্রীটের প্রাচীন শিল্পে।

ক্রীট্-এর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, সেখানে বহুসংখ্যক 'গোলোক-ধাঁধা (Labyrinth) ছিল। মহাপণ্ডিত আল-বেরুনী লিখে গেছেন তাঁর 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে যে, রাবণ ছিলেন 'যাবন-কোটি'র, রাজা আর তাঁর পুরীতে ছিল একটি গোলোক-ধাঁধা, যার ছবিও ঐ গ্রন্থে আঁকা দেখি। অবশ্য, আলবেরুনী রাবণের সমকালীন ছিলেন না কিন্তু রাবণ-সম্বন্ধে এ-সংবাদ নিশ্চয়ই কোনো পরম্পরাগত কিংবদন্তী থেকে আহরণ করা। আল্‌বেরুনী লিখেছেন যে, হিন্দুরা এই কথা তাঁকে বলেছিল।

এ-ধাঁধার কাছ থেকে এখন ছুটি নিয়ে একবার কলকাতার যাদুঘরে আসা যাক। এখানে দুটি পাথরের যক্ষমূর্তি আছে, যাদের গায়ে-লেখা অক্ষর দেখে অনুমান করা যায় যে সে-লেখা শুঙ্গ-যুগের, যদিও শিল্পশৈলী থেকে মনে হয় যে, উভয়েরই মূর্তি গড়া হয়েছিল তার পূর্বে। মথুরার যাদুঘরে এদের মতন আর একটি যক্ষ-মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, যার পায়ের কাছে কুষাণ-যুগের অক্ষরে লেখা দেখে টের পাওয়া যায় যে সেটি মণিভদ্র নামক যক্ষের মূর্তি। তিনজেরই চেহারা ভুঁড়িওয়ালা। এদের হাতে যে চামর আছে তা দেখলেই স্মরণ করতে হয় তিব্বতের চমরী-গাই, কেননা চামরের জন্যে চমরীর চুল চাই।

এখনও দেখা যায়, বড়-মানুষদের প্রায়ই ভুঁড়ি হয়ে থাকে। স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ কেউ নেয়নি, কিন্তু স্যাম্পল-সার্ভে করার সুযোগ একবার পেয়েছিলুম এই বাড়িতেই বসে। পাশেই, জয়পুরিয়া কলেজে, একটি বিরাট বিবাহ উপলক্ষ্যে জমায়েৎ হন অনেক ধনী মাড়োয়ারী। তাঁরা যখন গাড়ি থেকে নামছিলেন, তখন লক্ষ্য করে দেখলুম যে, শতকরা নিরেনব্বই জনের বেশ ভুঁড়ি— যাকে আমার ঠাকুরদাদার আমলে লোকে নেয়াপাতি-ভুঁড়ি বলত। ভুঁড়ি বাগানোর কাজটা তখন জমিদাররা জানতেন ভাল। বোধ হয় সেটাকে lost art বলা যায় না, যেমন মৌর্য-যুগের পাথর-পালিশকে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেছেন।

ভাল কথা। মনে পড়ল, পাটনা যাদুঘরে একটি সুন্দরী যক্ষিণীর সুন্দর পাথরের মূর্তি দেখেছি, যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে পালিশ করা যে, সবচেয়ে বেশি চকচকে তার মাথা, আর সবচেয়ে কম চকচকে তার পা। এর কারণ কি? শিল্পীর যে পালিশ করায় হাত ছিল তা ঐ মাথা দেখলেই মালুম হয়। এক

নজরে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলে অনুভূতি আসে যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে আসার সময় শিল্পী তাঁর পালিশের হাত খাটো করছেন ক্রমে ক্রমে—হঠাৎ পায়ের কাছে নেমে এসে নয়। যখন এই যক্ষিণীর সাক্ষাৎ পাই পাটনার ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে গিয়ে ১৯৩০ সালে, তখন মনে হল বাৎস্যায়নের একটি কথা : কুসুম সধর্মাণো হি যোষিতঃ, অর্থাৎ মেয়েরা হচ্ছে ফুলের মতন। আমার বিশ্বাস, শিল্পী যখন এ-মূর্তিকে পালিশ করে তখন সে ফুলের কথাই মনে রেখেছিল। ফুলের চিকনাই সবচেয়ে বেশি হয় ওপর দিকে, আর সবচেয়ে কম বোঁটার কাছে। এটি নিশ্চয় অশোকের আমলে তৈরী। সে-সময়েই পাথর-পালিশের কাজ শিল্প-নৈপুণ্য সাধনার উচ্চতম স্তরে ওঠে। সারনাথের যে অশোক-স্তম্ভ-শীর্ষকে আমরা জাতীয়-প্রতীক-রূপে গ্রহণ করেছি, তার চাকচিক্য এই যক্ষিনী-মূর্তির অনুরূপ। অবশ্য অশোক ছিলেন রাজা, এবং তিনি বহু অর্থব্যয় করে উত্তম শিল্পীর নিয়োগ করতে পারতেন। সেই দরের শিল্পীর হাতেই এই যক্ষিণী-মূর্তি তার রূপ পেয়েছিল, সম্ভবত কোনো তৎকালীন ধন-কুবের শ্রেষ্ঠীর উদারতায়। বুদ্ধদেবকে জেতবন-বিহার দান করার যে-গল্প ভারহুত স্তূপে রূপায়িত দেখি, তার থেকে এ-শিক্ষা লাভ করা যায় যে ধনীরা সেকালেও দিল-দরিয়া মেজাজ দেখাতে পেছ-পাও ছিলেন না। তাঁদেরই ত যক্ষপুজোর শখ হওয়া উচিত বেশি।

পাথুরে প্রমাণ বলছে যে যক্ষ-পুজোয় ঘাটতি পড়েছিল খৃষ্ট-জন্মের কিছু পরে, কুষাণ-যুগে। হোমশিখা-পত্রিকায় ১৩৬৫ সনের পুজো-সংখ্যায় আমার লেখা 'খৃষ্ট-কৃষ্ণ ও কুষাণ বংশ' প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে খৃষ্ট ছিলেন সম্ভবত কুষাণ-বংশ-জাত এবং কুষাণরাও সম্ভবত দাবী করতেন যে, তাঁরা কৃষ্ণেরই বংশধর। খৃষ্ট-প্রচারিত ধর্মে দানের এত প্রশংসা আছে যে তাঁকে গরীবের দেবতাই বলা উচিত। উক্ত প্রবন্ধে খৃষ্ট-শিষ্য টমাস্-এর ভারত-আগমন-কাহিনীকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে যে টমাস ছিলেন তাঁরই যমজ ভ্রাতা এবং মথুরার মন্দিরে কনিষ্কের (কানিষ্কের' বলা উচিত) মূর্তির পাশেই ছিল খৃষ্টের যমজ টমাসের মূর্তি যার পাদ-দেশে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁর নাম দেওয়া আছে, 'যম-তক্ষম' অর্থাৎ 'যমজ-টমাস'। ইনি যখন ভারতে আসেন, তখন গণ্ডফর্নিস পঞ্জাবে রাজত্ব করছিলেন। এই রাজার ইচ্ছে হয়েছিল একটা চমৎকার রাজবাড়ি বানাবার। সেই জন্যে স্থাপত্য-শিল্পে কুশলী লোকের সন্ধানে তিনি দেশান্তরে পাঠালেন একজন বণিক 'হব্বানি'কে। টমাস জানালেন, তাঁর দক্ষতা আছে কাষ্ঠ-প্রস্তর-তক্ষণ-কার্যে। টমাসকে কুড়ি টাকায় কিনে নিয়ে এসে হব্বানি যখন গণ্ড-ফর্নিসের কাছে তাঁর সুপারিশ পেশ করলেন, তখন গণ্ড-ফর্নিস অনেক টাকা দেন টমাসের হাতে, যাতে তাঁর মনোমত প্রাসাদ নির্মান করা যায়। দিনকতক বাদে, রাজা প্রশ্ন করলেন : কৈ, প্রাসাদ-নির্মাণ ত এখনও হল না, ব্যাপার কি? টমাস উত্তর দিলেন : আপনি যে-টাকা দিয়েছিলেন সে-সব আমি দান-খয়রাত করেছি, এবং দানার্জিত পুণ্যের ফলে স্বর্গে আপনার জন্য সৌধ নির্মিত হয়েছে। এইভাবে ধর্মপ্রচার করার ফলে গণ্ডফর্নিস, তাঁর ভাই এবং অন্য অনেকে খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

এ-কাহিনী থেকে বোঝা যায়, খৃষ্ট-ধর্ম যখন এদেশে প্রথম প্রচার করা হয়, খৃষ্ট-জন্মের ৪০।৫০ বৎসর পরে তখন সে-ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল দরিদ্রনারায়ণ-সেবা। শৌখীন বড়লোকদের বিরুদ্ধে এটা হল একটা প্রকাণ্ড অভিযান। এইরকম ধাক্কা খেয়ে এখানকার ধন-কুবেরেরা ভেবে থাকবেন যে, যক্ষ-পুজো করা আর বেশিদিন চলবে না। এ-অনুমানকে স্বীকার করলে আমরা বুঝতে পারি, কেন এই সময় থেকে যক্ষ-পুজো ক্ষয়িষ্ণু হল।

কিন্তু বহুকাল-পুজিত মূর্তির ছাপ মন থেকে সহজে উঠিয়ে দেওয়া যায় না। অর্থকে আদর্শ না করলেও, কার্যসিদ্ধি সকলেই চায়। সে-সিদ্ধির কার্যে দৈব সহায় লাভ করতে গেলে সিদ্ধি-দাতা কোনো দেবতার মূর্তিকে কল্পনা করা প্রয়োজন। বুদ্ধদেবের সিদ্ধার্থ নাম স্মরণ করে শিল্পী বসে গেলেন কল্পনাকে রূপ-দান করার কাজে। মায়া-দেবী, বুদ্ধ-মাতা, স্বপ্ন দেখেছিলেন, এক শ্বেত-হস্তী আকাশ থেকে এসে তাঁর কুক্ষি বিদীর্ণ করে প্রবেশ করছে তাঁর গর্ভে। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতেই এ-স্বপ্নের পাষাণ-ময় প্রতিফলনকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করতে পেরেছিল প্রতিভা-শালী শিল্পীর অসাধারণ কৌশল। তার নিদর্শন কলকাতার যাদুঘরেই আছে, ভার-হুত স্তূপের রেলিং-য়ে। পরবর্তীকালের শিল্পী এ-স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিলেন, যক্ষ-মূর্তির কবন্ধ-দেহের উপর হস্তী-মুণ্ড স্থাপন করলেন। বুদ্ধদেব বারণ করে গিয়েছিলেন, তাঁর মূর্তি কেউ যেন না গড়ে। এ-নিষেধকে তাঁর মহানির্বাণের পাঁচ-শো বছর পরেও মান্য করা হয়েছিল। সেইজন্যেই দেখি, ভারহুত স্তূপ বা সাঁচী স্তূপে তাঁর উপস্থিতি জানাতে হলে শিল্পী তাঁর মূর্তির পরিবর্তে অঙ্কিত করেছেন তাঁর স্মৃতির প্রতীক—বোধিদ্রুম, ধর্মচক্র বা পদ-চিহ্ন। অশোক পথ দেখিয়েছিলেন সারনাথের স্তম্ভশীর্ষে। এবং অশোকের ঐতিহ্যকে বরণ করে নিয়ে পরবর্তীকালের শিল্পী শ্বেত-হস্তীর মুণ্ডকে বুদ্ধ-প্রতীক-রূপে কবন্ধ যক্ষের শীর্ষে আরোপণ করলেন, কারণ আমরা ভুবনেশ্বরের (ধৌলি) অশোক-অনুশাসন পাঠ করতে গেলে দেখতে পাই, উপর দিকে পাহাড়ের গা কেটে যেন বেরিয়ে আসছে একটা হাতী, আর একটু তলার দিকে লেখা আছে 'সেতো' অর্থাৎ 'শ্বেতঃ' এবং দেরা-দুনের (কলসি) পাহাড়ে তাঁর অনুশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত হস্তী-চিত্রের 'লেবেল' হচ্ছে 'গজতমে' অর্থাৎ 'গজোত্তমঃ'। জুনাগড় (গিরনার) পর্বতেও সম্ভবতঃ অশোক এরকম একটি হস্তী-মূর্তি আঁকিয়েছিলেন যেটা এখন নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এক-লাইন লেখা এখনও পাওয়া যায় যেটি অশোকানুশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তৎসংলগ্ন বটে : '(স)র্বশ্বেতো হস্তি সর্বলোকসুখাহরো নাম।' সুতরাং কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, অশোক ও তাঁর শিল্পীরা বুদ্ধদেবের মানা মেনে বুদ্ধ-মূর্তি না গড়ে বুদ্ধ-শ্রদ্ধাকে রূপ দিয়েছিলেন মায়া-দেবীর স্বপনকে স্মরণ করে।

গণেশ-মূর্তির উদ্ভব সম্বন্ধে আমার এ-থিওরিটি পিতৃদেবের কাছ থেকে পেয়ে-ছিলুম। তিনি নিজে ঠাকুরপুজো পছন্দ করতেন না এবং বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি বলতেন, মানুষ পাপ কাজ করে তার জন্যে শাস্তি ভোগ করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় দেবতার কৃপা-প্রার্থী হয় এবং কর্ম-ফলের নিয়ম অতিক্রম করতে চায়।

আমাদের একটি পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। গণেশের হস্তী-মুণ্ড হল কেন, সেটা বোঝাবার জন্যে এই উপাখ্যান। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডপাত হয়, আর শনির নির্দেশেই এক শ্বেত হস্তীর মুণ্ড কেটে এনে সেটা বসানো হয় গণেশের কবন্ধ দেহে। সাধারণ লোকের কাছে এ-মূর্তি পাছে অ-প্রিয় হয়, তাই শিব আদেশ দিলেন, গণেশ সর্বাগ্রে পূজনীয়। এ-উপাখ্যানে শনিগ্রহকে এত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর কুদৃষ্টি বা সুদৃষ্টি পড়লে দেবতারও মাথা কাটা যায় বা কাটা মুণ্ড জোড়া দেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং এই উপা-খ্যান রচনা করার সময়ে গ্রহ-পুজো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিশ্চয়।

গ্রহ-পুজোর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এ পুজো অতি প্রাচীনকালে ব্যাবিলোনিয়ায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু, যদিও সেখানকার গণিত-জ্যোতিষের প্রভাব ভারতের গণিত-জ্যোতিষে লক্ষ্য করা যায়, সেখানকার ফলিত-জ্যোতিষ এখানে গোড়ায় ততটা পাত্তা পায়নি। জ্যোতিষ-বেদাঙ্গে, কিম্বা কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে

কাল-মান-প্রসঙ্গে গ্রহ-সপ্তকের উল্লেখ নেই, যে-গ্রহের নাম অনুযায়ী আমরা পরবর্তীকালে বারের নাম বলে আসছি (যেমন, শনিবার, মঙ্গলবার ইত্যাদি)। গ্রীকরা ব্যাবিলোনিয়া থেকে গ্রহ-গতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান পেলেন, সেই জ্ঞান তাঁরা আমাদের দিলেন যবে থেকে, তবে থেকেই আমরা গ্রহ-গতি এবং গ্রহ-পূজা, এ-দুই বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে শুরু করি। এর পূর্বে গ্রহ-গতি সম্বন্ধে ব্যাবিলোনিয়ার জ্ঞানকে অবহেলা করার একটা কারণ এ হতে পারে যে, গ্রহের গতি সূর্য-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্রের মতন নিয়ন্ত্রিত মনে হয়নি, কেননা, প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিতে গ্রহ-গতি কখনো শীঘ্র, কখনো বক্র। পঞ্জিকা-রচনার কাজে এরকম খামখেয়ালী চালকে চালু করা যুক্তিযুক্ত না মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।

এ-কৈফিয়ৎকে মেনে না নিলেও আমরা বলতে পারি যে, কুষাণ-যুগের প্রারম্ভেই এদেশে গ্রহ-পূজার আমদানি হয়। কনিষ্ক-হুবিষ্কের মুদ্রাতেই আমরা সর্বপ্রথম সকল গ্রহের মূর্তি পাই—একথা কানিংহাম সাহেব দেখিয়ে গেছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ও মনু-স্মৃতিতে গ্রহ-পূজার নাম গন্ধও নেই। অথচ, এ-দুই গ্রন্থের উপরে অত্যন্ত নির্ভরশীল যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে গ্রহ-পূজার জয়জয়কার: [illegible] পঞ্চানন ?।

মনু-স্মৃতির রচনা-কাল-নির্ণয়ের জন্য আমি দুটি শ্লোককে সাক্ষী মানবো। শক-যবন পহ্লব চীনাদের ক্ষত্রিয় স্বীকার করা আছে—অর্থাৎ যখন এরা ভারতবর্ষে এসে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছেন। আর চতুর্বর্ণের নামকরণ সম্বন্ধে মনু বিধান দিচ্ছেন যে ব্রাহ্মণের নাম প্রথমাংশে হবে শুভসূচক আর দ্বিতীয়াংশ হবে শর্মবৎ। এই নিয়মের অনুবর্তী কাণ্ব রাজা সুশর্মার নাম। শুঙ্গ রাজাদের সময় যাঁরা মনু-স্মৃতিকে ফেলেন, তাঁরা লক্ষ্য করেন না যে, বৈশ্য জাতির 'ভূতি' নামাংশ সে-রাজাদের নামকরণে দেখা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির রচনা-কাল সম্বন্ধে আমি পীটার্সন সাহেবের একটি মত উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন ঐ স্মৃতিতে 'নানক' নামে যে-মুদ্রার কথা আছে, সে নামের উদ্ভব হয় কুষাণ মুদ্রায় লেখা NANA শব্দ থেকে। আমি [illegible] পাতার ডাকে পূর্বেই বলেছি যে, এই 'ননা' ছিলেন ব্যাবিলোনিয়ায় উরুক নগরের দেবতা। এঁর মূর্তিকে সেখান থেকে [illegible] নিয়ে এসে সুষা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বহু শতাব্দী ধরে সুষায় পুজো পাবার পর মূর্তির সৌভাগ্য হল স্বদেশে ফিরে যাবার এবং সে-সৌভাগ্যের উদয় হয় খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে, অ্যাসিরিয়ান রাজা অসুর-বানী-পালের সৌজন্যে। এ-ঘটনার কিছু পূর্বে খৃঃ পূঃ ৭০০ এমনি সময়ে, সুষা থেকে এক রাজপুত্র এসে মগধে রাজা হন, যাঁকে আমরা শিশু-নাগ বলি। ইনি ছিলেন রাজর্ষি, আর এই শিশু-ঋষির একটি সূক্ত আছে ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলে, যেখানে 'মা'কে 'ননা' বলেছেন। এই 'ননা'কে সিংহবাহিনী দুর্গারূপে দর্শন করি কুষাণ-যুগে হুবিষ্কের মুদ্রায়।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেই গ্রহ-পূজার সঙ্গে সঙ্গে বিনায়কের অর্থাৎ গণেশের পূজা করার বিধান দেখি। এর পূর্বে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে, নাগ-পূজা ও মূষিক-পূজার বিধান পাই। গণেশ মূর্তির আধা-যক্ষ, আধা-বৌদ্ধ রূপ কল্পিত হবার পর মূষিককে এঁর বাহন করে দেওয়া হল, অর্থাৎ মূষিককে গণেশ পূজায় 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' পেয়েই খুশী থাকতে হল। সংস্কৃত মুষ্ ধাতুর অর্থ লুণ্ঠন করা। ভয় ভক্তির মনোভাব নিয়েই নাগ-পূজো আর মূষিক-পূজো বিহিত হয়েছিল। ইঁদুর বেচারী এই নিন্দাসূচক মূষিক নামটি পেয়েছিলেন সেকালের ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে। ইংরেজীতে চরম দরিদ্রতার উপমা দিতে গেলে চার্চের ইঁদুরকে উপলক্ষ্য করা হয়। সেখানে যে দুর্গত-সহানুভূতিকে প্রতিফলিত দেখি, সেই অনুরূপ মনোভাব এখানে রূপায়িত হয়ে আছে গণেশের বাহনে। আমরা যখন পুজো-পুষ্পাঞ্জলি দিই, তার কিঞ্চিৎ অংশ ইঁদুর বেচারীও পায়। শিবরাত্রি ব্রতকথা শুনলেই বোঝা যায়, শিবের পূজায় কতখানি রিক্ততার আদর্শ অন্তর্নিহিত। সেই পরম-রিক্ত ভোলানাথের কল্পিত তনয়ের পূজায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন পরম ত্যাগী বুদ্ধদেব, আর পদদেশ অধিষ্ঠান করেন চরম দরিদ্র ইঁদুর।

শিবের সঙ্গে কুবেরের যে সখ্য দেখি, সেটা আদর্শের দিক থেকে হচ্ছে রিক্ততার সঙ্গে সম্পদের সমন্বয়। ক্যাপিটালিস্ট কাজেই অনুচর হয়ে রইলেন কম্যুনিস্ট শিবের। পূর্বেই বলেছি, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের 'দুর্গ-নিবেশ' অধ্যায়ে আমরা সস্ত্রীক শিবের সঙ্গে সস্ত্রীক কুবেরকে পূজার দেবতাদের প্রধান আসনে দেখতে পাই। সেখানে শিব-দুর্গার লড়াইয়ে ওঁদেরই বরণ করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে রিক্ততার গুণগান থাকতে পারে না। রাজা-রাজড়ার অর্থ-লাভের ইচ্ছাই ও-শাস্ত্রের প্রেরণা দিয়েছে।

মহাভারতের সভাপর্বে কুবের-সভার যে বর্ণনা আছে তাতে লক্ষ্য করা যায়, লক্ষ্মী সেখানেই সর্বদা বাস করছেন। ভারহুত স্তূপেও দেখি, 'শিরি-মা-দেবতা'র যে রূপ, একটি যক্ষীরও সেই রূপ। এই 'সিরি' অর্থাৎ 'শ্রী' যক্ষরাজকে ত্যাগ করে বিষ্ণুপ্রিয়া হলেন কেন? কুবেরের সভায় দেখি, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, ইরা, প্রভৃতি অপ্সরারা ও নৃত্য-গীতে বিশারদ গন্ধর্বরা কুবেরের উপাসনা করছেন। সুতরাং এ অনুমান সংগত যে, তত্রস্থ কুবের-পত্নীর পরিণয় হয়েছিল গান্ধর্ব বিধানে।

গান্ধর্ব শব্দের বাংলা উচ্চারণকে স্বীকার করে নিলে একটা মজাদার ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। 'গান ধরবো', একথা প্রশ্ন-চ্ছলে যদি কোনো আধুনিকা বলেন আর গানও ধরেন, সে-গান শুনে মুগ্ধ হয়ে কোনো আধুনিক হয়তো তাঁর পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতে পারেন, আর আধুনিকতম আইন অনুযায়ী কেবল খাতায় নাম সই করে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন করার ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের পরিণয়কে বাংলাদেশে গান্ধর্ব-বিবাহ বলা চলে। এ-বিবাহে ডিভোর্স সংগত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও বিধান রয়েছে, গান্ধর্ব-বিবাহ করার পর 'মোক্ষ' অর্থাৎ ডিভোর্স করা যায়। অনুরাগে মিলন, সুতরাং বিরাগে বিচ্ছেদ। কুবের-পত্নী

বোধ হয় এই বিধান অনুসারেই বৈশ্রবণের গৃহ ত্যাগ করে বিষ্ণু-প্রিয়া হন।

মৌর্যরা ছিলেন হিরণ্যার্থী, একথা পতঞ্জলির মহাভাষ্যে লেখা আছে। পতঞ্জলি যখন লিখছিলেন, তখন শেষ মৌর্য রাজাকে হত্যা করে তাঁর সেনানী পুষ্যমিত্র শুংগ রাজ্যভার হাতে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাচ্ছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারনাথ লিখে গেছেন, পুষ্যমিত্র মগধ থেকে জলন্ধর পর্যন্ত নির্মম অভিযান করেন, যার ফলে বহু বৌদ্ধ মঠ ভস্মসাৎ হয়। যা রটে, তার কিছুও বটে, এই প্রবাদ-বাক্য মেনে নিলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, পুষ্যমিত্রেরও উদ্দেশ্য ছিল, তিব্বতের হিরণ্য-সম্পদ আত্মসাৎ করার। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের যে 'এডিশন'-টা আমরা পেয়েছি, সেটা খুব সম্ভব ও'রই আমলের। আসল কৌটিল্যের ধার্মিকতা এই 'সংস্করণে' চাপা দেওয়া হল—নৃশংসতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, অর্থলোলুপতা, হয়ে উঠল এর প্রধান লক্ষণ।

পূর্বে বলেছি, ধর্মের নাম করে পশু-বলি অশোকের কাছে অসহ্য হওয়ায় তিনি শেষটা হঠাৎ বলিপ্রথাকে বন্ধ করে দেন। এই অনুশাসনকে সেকালের যাজ্ঞিকরা নিশ্চয়ই মনে মনে মান্য করেন নি। তাঁদের অসন্তোষকে মূলধন করেই বোধ হয় পুষ্যমিত্র শুংগ অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

এইবার এখনকার এবং এখানকার একটি বলির কথা বলি। "দুর্গা-পূজায় জীববলি" নামক একটি পুস্তিকায় প্রমথবাবুর বাল্য-বন্ধু আমার "অনাথকাকা"র অনেক শাস্ত্রীয় যুক্তি আছে যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, জীবকে হত্যা করে বলিদান করাটা অনুচিত। এ-পুস্তিকা লেখার উপলক্ষ্য এই। আমাদের ঠাকুরবাড়িতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হয়ে আসছে আজ দুশো বছরের ওপর। সে-পূজায় পাঁঠা বলি হয়। এককোপে কাটা নিয়ম, কিন্তু একবার সেটা না হওয়ায় বলি-কার্যে বাধা পড়ে। বলি-প্রথা এর পর রাখা হবে, না তুলে দেওয়া হবে, এ-প্রশ্ন নিয়ে দুটো মত হল। তাই বাংলাদেশের বড়-বড় পণ্ডিত-দের আহবান করে এখানে এক সভা বসালেন অনাথকাকা। সে-সভার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় 'চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার। সভায় অনাথকাকা তাঁর পুস্তিকাটি পাঠ করেন। কিন্তু সভাপতি মহাশয় অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, অনাথকৃষ্ণ অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন দেখে তাঁরা আনন্দিত বটে, কিন্তু যেহেতু তিনি জাতিতে কায়স্থ এবং এই সভা আহূত হবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবেত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নির্দেশ ও আদেশ গ্রহণ করা, সেহেতু ও'দের আদেশই এই যে, বলিদান চলুক!—এতে অনাথকাকা ক্ষুণ্ণ হয়ে আমায় বলেছিলেনঃ আমি তোমার বাবার চেয়ে বেশি ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলুম, কিন্তু চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের মতন সদ্‌ব্রাহ্মণের মুখে একথা শুনে আমার সে-ভক্তি কমে গেল।—বোধ হয় তর্কালংকার মহাশয় ভেবেছিলেন, যুক্তি দেখিয়ে বিধান দিলে সে-বিধান অনু-ল্লঙ্ঘনীয় 'আদেশ' হয় না। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতায় যখন রয়েছেঃ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা, তখন পাঠাবলিতে আপত্তি কি? এজাতীয় মনোভাবকে নির্বাসন দেওয়া কঠিন।

শারদীয়া পূজো নববর্ষারম্ভের পূজো। প্রাচীনকালে বৎসর-আরম্ভ-বিষয়ে নানান মত ছিল। 'বর্ষ'-শব্দ থেকে বোঝা যায়, বর্ষা থেকে একরকম নতুন বছর শুরু হত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পতির শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করে বলা হয়েছে—দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্‌। সুতরাং সেখানে বছর আরম্ভ হচ্ছে শরৎকালে। এই ঋতুকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ গেয়ে-ছিলেন : শরৎ তোমার অরুণ-আলোর অঞ্জলি!

ইংরেজরা যে নিউ ইয়ার্স ডে পালন করেন পয়লা January-তে, তার আদিতে আছে রোম্যান Janus-এর অর্চনা। এই Janus ছিলেন দু'-মুখো। রোমে এ'র যে-মন্দির ছিল সে-মন্দিরকে বন্ধ করা হত, যখন রোমক সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান।

রোমানরা এত লড়াইয়ে-জাত ছিল যে, Janusএর মন্দির বন্ধ করার সুযোগ বড় পাওয়া যেত না। সম্রাট অগস্টস (খৃঃ পূঃ ২৭—১৪ খৃষ্টাব্দ) তিনবার এই সুযোগ পেয়েছিলেন, কেননা তিনি যুদ্ধ-বলের চেয়ে বুদ্ধিবলের ওপর বেশি বিশ্বাস করতেন। সম্রাট নীরো (৫৪—৬৮ খৃঃ) একবার মাত্র এই দেবতার মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করেন, যখন আর্মীনিয়া নিয়ে পার্দিয়ার সঙ্গে রোমের যে যুদ্ধ বহুকাল ধরে চলছিল সে-যুদ্ধের অবসান হয় (৬৬—৬৭ খৃঃ)।

এই Janus-দেবতার মূর্তি আঁকা দেখি, সমকালীন বিম-কদ্‌ফিসের একটি তাম্র-মুদ্রায়। তাতে রাজার দণ্ডায়মান মূর্তির ওপর দিকে একটি রোম্যান জাহাজের অগ্রভাগ দেখা যায়। এইপ্রকার তাম্রমুদ্রা উপহার দেওয়ার রীতি ছিল রোম্যান নব-বর্ষের আরম্ভে, পয়লা জানুয়ারীতে। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টান্নও দেওয়া হত। বিম-কদ্‌ফিসের একপ্রকার মুদ্রায় ও'কে যে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা যায়, সে-সিংহাসন রোম্যান Bisellium-এর অনুরূপ। তাঁর পিতা কুজুল-এর মুদ্রাতেও রোম্যান চেয়ার Sella Curulis পাওয়া যায়। মথুরায় যে 'দেবকুল' অর্থাৎ মন্দির-এ কণিষ্কের মূর্তি পাওয়া গেছে, সে দেবকুলেও রোম্যান-প্রভাব অনুমান করেছিলেন অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, কুষাণ যুগে এদেশে Janus-এর মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর পয়লা জানুয়ারী তখনই নববর্ষারম্ভের সম্মান লাভ করে।

তবে এইটুকু বলে রাখি যে, আমাদের বাড়িতে ১৯১৮ সালের পয়লা জানুয়ারীতে যে সবুজ-সভা আহূত হয়, সেটি সতোন বোসের জন্মদিন পালনের জন্যে। সেদিন সবুজ পাতার ডাক এসেছিল, পউষের ঝরা পাতাকে বিদায় দিতে। এর তিনদিন পরে প্রমথ চৌধুরী যে-চিঠি আমায় লেখেন তার অনুলিপি এইঃ

৫৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট

বালিগঞ্জ

৪।১।১৮

কল্যাণীয়েষু,

সেদিন তোমাদের ওখানে তোমাদের আদর আপ্যায়িতে যে কতদূর খুশী হয়েছি বলতে পারিনে। আমি যত না সাহিত্যিক তার চাইতে ঢের বেশি সামাজিক, সুতরাং সমালোচকের সুখ্যাতির চাইতে সামাজিক-দের সুব্যবহার আমার কাছে বেশি প্রিয়। সবুজপত্রের দৌলতে আমি যথেষ্ট খ্যাতি না হোক জনকতক বন্ধু লাভ করেছি এই আমার মহালাভ।

যদি নিতান্ত শীতভীত হয়ে পড়ে না থাকো তাহলে, কাল বিকেলে এখানে এলে খুশী হব। কাজ গল্প করা। সুধীন্দ্রকে যদি সঙ্গে আনতে পারো ত খুশী হই। তাকে ভরসা দিতে পারো যে, সবুজ-সভা প্রজাপতি সমিতি হয়ে ওঠেনি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

(ক্রমশ)

কিশোরী

রাম রায়
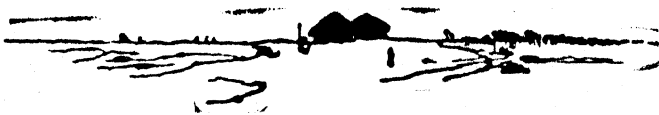
ফ্রকের বেল্টটা তাড়াতাড়ি কোমরে এঁটে নিয়ে রুমী রোজই নীচে নেমে এসে ভর্ৎসনার চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলবে, এখনো ভাত বাড়োনি মা! আজ নিশ্চয়ই লেট করিয়ে ছাড়বে। তুমি তো কোনদিন স্কুলে পড়োনি। না হলে বুঝতে আমাদের অংকের দিদিমণি কত কড়া।

ফার্স্ট-পিরিয়ডে রুমীর অংক কিনা।

মা এই কথার জবাবে মিষ্টি মিষ্টি হাসবেন। তাতে রুমীর সমস্ত রাগ কোথা দিয়ে জল হয়ে যাবে।

এদিকে কোনরকমে জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে নিয়ে কাচানো ফ্রকটা বাঁচিয়ে মেঝেতেই থপ্ করে বসে পড়বে রুমী।

মা সামনেই হাঁড়ি থেকে থালাতে ভাত বাড়বেন হাত দিয়ে থেবড়ে থেবড়ে। আর মিষ্টি মিষ্টি হাসবেন।

রুমী বসে বসে ভেতরে বাইরে দারুণ একটা তাড়া নিয়ে দাঁতে করে নোখ কাটবে।

এদিকে আবার দশটা না বাজতেই খিড়কিগলির চামেলী আসবে হাঁপাতে হাঁপাতে।

সদর থেকেই হাঁক পাড়বে, রুমী তোর হলো। আমি যাচ্ছি ভাই। কত আজ দেরি হয়ে গেলো।

চামেলীর যেন সবেতেই একটু তাড়া। অবশ্য তার ঐ মোটা শরীরটা বালিকা বাণী মন্দিরের সদর গেট্ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পাকা পনের মিনিট সময় লাগবে। স্কুলের শেষ ঘণ্টা পড়বার দশ মিনিট আগেই সে রোজ পৌঁছে যায়। তবু তাড়া। একটু দাঁড়াতে বললেই অমনি বিচ্ছিরিভাবে খেঁকিয়ে উঠবে।

রুমীর পাতে অর্ধেকেরই বেশি ভাত পড়ে থাকে।

তর্জনী বাড়িয়ে তখনও মা আদেশের ভঙ্গিতে বলেন, রুমী এটা খাও। ওটা খাও। রুমী অত কম করে ভাত খেয়ো না।

না। মা-টা যেন কি। কিচ্ছু বোঝে না। একটু দেরি হয়ে গেলে রুমীর যে তখন কি হবে! এই ভরপেটের ওপর অংকের দিদিমণির কড়া কড়া কথাগুলো তাকে তখন একাই হজম করতে হবে।

মা তো কোনদিন স্কুলে যায়নি। গেলে টের পেতো মজাটা একবার।

মায়ের খুব অবাধ্য হয়ে নাকে-মুখে চারটি কোনরকমে গুঁজেই উঠে পড়বে রুমী।

বাথরুমে গিয়ে কোনরকমে চৌবাচ্চায় মগ-টা ডুবিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেবে। মা গামছা বাড়িয়ে ধরবেন। রুমী হাত-মুখ মুছেই এক-দৌড়ে ওপরে উঠে আসবে।

বই আর খাতাগুলো টেনে নেবার আগে আরশিটার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াবে।

কপাল থেকে সুন্দর চিকন সরু থুতনিটা পর্যন্ত পাউডারের পাফটা আর একবার আলতোভাবে বুলিয়ে নেবে। লম্বা বিনুনি দুটি বুকের ওপর ফেলে টেনে টেনে পরীক্ষা করে নেবে রিবনের ফাঁস-গুলো। তারপর ড্রেসিং টেবিলটার সামনে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে আরশির কাচে প্রতিফলিত নিজের প্রতি-বিম্বটাকে একবার ভেংচি কেটেই তরতরিয়ে বইখাতাগুলো টেনে নিয়ে সিঁড়িগুলো টপ্‌কাতে টপ্‌কাতে নীচে নেমে আসবে।

আজ রুমীর কি একটা হয়েছে। ভূগোলের বইটা থেকে চোখ তুলে আসন্ন শীতের স্বচ্ছ নীল বর্ণের আকাশটার দিকে তাকাতেই মনটা তার কেমন করে উঠলো।

ভোরের দিকে খুব কুয়াশা করেছিল। গাছগুলো সব ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। তার ওপর আবার সকালের সদা রোদটা পড়ে ঠিক অভ্রের মত চিক্ চিক্ করছে।

পেন্সিলের শিষটা ব্লেড দিয়ে ছুলে বাড়িয়ে নেবার অবসরে, কিম্বা ফাউন্টেন পেনটায় কালি ভরে নেবার ফাঁকে এরকম দৃশ্য রোজই দেখছে রুমী। পড়ার মধ্যে

আবার কখন ডুবে গেছে সে খেয়াল রাখেনি। তারপর ন'টা বাজতেই স্কুলে যাবার তাড়া পড়ে গেছে।

কিন্তু আজকের মত রুমীর কোনদিন হয়নি।

সকালবেলা, দাঁত মাজবার সময় ঠিক এমনি হয়েছিল। ডেন্টাল ক্রিমের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা ভারি ভালো লাগে। একদিন তো একটু চেখেই দেখেছিল সে।

চোখে-মুখে কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব। না, ঠিক ঘুম নয়—খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙেও তার রেশটা যেমন অনুভূতিগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখে—ঠিক তেমনি আর কি!

এই তন্ময়তাকে ভাঙতে একটুও ইচ্ছে করছিলো না তার।

কিন্তু হলে কি হবে। ঠিক সময়ে মানদা বাথরুমে ঢুকে পড়ে অবাক হয়ে বললে, ওমা দিদিমণি তুমি এখনো দাঁত মাজনি!

রুমীর যা রাগ হচ্ছিল। কে তোমাকে হুট- করে এখানে আসতে বলেছে বাপু। আবার ন্যাকা ন্যাকা কথা দেখ না। আমি দাঁত মাজি কি না মাজি তোমার কি!

ঝি-টার সবেতেই বাড়াবাড়ি। মা'টার জন্যেই এত আস্কারা পেয়েছে দিন দিন।

রুমী যাই ভাবুক। মানদার কিন্তু দাঁড়াবার একটুও সময় নেই।

চলো গো, একটু জল নেব।

রুমীর খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু একটিও কথা বললো না সে। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো, তেমন দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠকাস্ করে জলের বালতিটা মাটিতে ঠুকে বসিয়ে রেখে মানদা আপন, মনেই গজ্ গজ্ করে উঠলো, আমার হয়েছে জ্বালা! এখনও সাত বাড়ির কাজ পড়ে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কখন কলতলা খালি হবে বলে।

ওপরের পাট চুকিয়ে মা তখন বোধ হয় নীচে আসছিলেন। সিঁড়ি থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, রুমী!

রুমী যখন খুব অবাধ্য হয়, মা তখন এমনিভাবে ডাক দেন। রুমীর তখন চোখে জল আ...

দাঁত না মেজে মুখে-চোখে কোনরকমে একটু জলের ছিটে দিয়ে দুম দুম করে সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যায়।

নীচ- থেকে খানিক বাদেই ডাক আসে, রুমী......রুমী......

খালি রুমী আর রুমী! রুমীর কিচ্ছু ভাল লাগে না। অথচ কালও সে এমন ছিল না।

এদিকে ডেকে ডেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পড়ার ঘরগুলো ভেবে চা আর জল-খাবার ওপরেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মা।

রুমী চা-ও খায়নি। খাবারও খায়নি।

ন'টা বেজে গেলো ঢং ঢং করে। মা একবার করে এসে উঁকি দিয়ে গেলেন। তারপর নীচে নেমে গিয়ে খানিক বাদে আবার ওপরে এসে রুমীকে সেই একইভাবে বসে থাকতে দেখে বললেন, রুমী ন'টা বেজে গেলো যে?

রুমী শুধু বললে, হুঁ।

মেয়েকে এবার ভালো করে পরখ করলেন মা। তারপর কাছে এগিয়ে এসে কপালে একটা হাত রেখে কতকটা শঙ্কিত হয়ে বললেন, কি রে, জ্বরটর হয়নি ত?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুমী এবার খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, না মা, আমার কিচ্ছু হয়নি। উঃ কখন ন'টা বেজে গেছে! তুমি ডাকতে পারনি মা!

মা বললেন, সেই কখন থেকে ত ডাকছি চা-ও খাসনি, খাবারও খাসনি! দেখ বাবা শরীরটরীর খারাপ হলে ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

রুমী মিষ্টি করে হেসে বললে, আমার কিচ্ছু হয়নি।

না হলেই ভালো। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে মা নীচে নেমে গেলেন।

সত্যিই ত আমার কিচ্ছু হয়নি। তেলের শিশিটা হাতের চেটোয় উপুড় করে ভাবলো রুমী। ঘড়ির দিকে আবার চোখ পড়লো। ইস্। কখন ন'টা বেজে গেছে। দশটা বাজবার আগেই চামেলী এসে তাড়া দেবে।

রুটিন দেখে বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে নীচে নেমে এলো সে। কাঁধে গামছা ফেলে কোনরকমে কাক-স্নান সেরে ওপরে উঠে এলো আবার।

কাচানো ফ্রক বাইরে আর একটাও নেই। কালো-ধুলো যেখানে যা ছিলো মানদা তেনেটুনে নিয়ে গেছে সাবান দেবে বলে।

বাক্স খুলে পাতলা একটা শাটিনের ফ্রিল দেওয়া ফ্রক বার করে কোনরকমে গলা দিয়ে গলিয়ে নিলো। ভিজে চুলের রাশে বার-কয়েক চিরুনি দিলো। রিবন বাঁধলো। তারপর দুই ভুরু ফাঁকে ছোট্ট একটি কুম্-কুমের টিপ দিয়ে হিমানীর শিশি খুলে তর্জনীর ডগা দিয়ে তুলে নিলো গরম চুনের মত খানিকটা স্নো।

এদিকে দশটা বেজে গেলো। কাঁটা-গুলো তো আর রুমীর জন্যে বসে থাকবে না।

মা নীচ থেকে চেঁচাচ্ছেন, রুমী...... রুমী......।

না। রুমীর কোন সাড়াশব্দ নেই। মেয়ে যেন এ জগতেই নেই। স্নো-টা কখন শুকিয়ে চড় চড় করছে আঙুলের ডগাতে। সে খেয়াল নেই। আরশির দিকে চেয়েই আছে অপলক।

মা ডাকছেন, রুমী......রুমী......

খালি রুমী আর রুমী। না। কিচ্ছু ভালো লাগে না। অথচ কালও সে এমন ছিল না।

হিমানীর শিশিটা ঠকাস্ করে বসিয়ে দিলো রেডিও-বক্সটার ওপর।

শুকনো চড়চড়ে আঙুলের ডগার স্নো'টা তুলে ফেললে ফ্রকের ওপর ঘষে ঘষে। তারপর রাগের মাথায় পাউডার কেসটা টেবিলের ওপর থেকে টেনে আনতে গিয়ে ভেঙে ফেললে খুব সুন্দর একটা নক্সাকাটা কাঁচের প্লাস।

নীচে নেমে আসতেই মা রুমীর দিকে তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে বললেন, আজ কি তোর হয়েছে বল্ তো?

রুমী বলতে যাচ্ছিল, কই, কি হয়েছে? কিন্তু মা এমনভাবে তার দিকে তাকালে যে, রুমী লজ্জায় অসম্ভব লাল হয়ে উঠলো। মা'টা যেন কি! রুমী ভাবলো।

চামেলী বললে, জানিস আজ ফার্স্ট পিরিয়ডে ছুটি হয়ে যাবে।

রুমী কোন জবাব কাটলো না। গলিটা পেরিয়ে ওরা তখন বড় রাস্তাটায় এসে পড়েছে। রুমী দেখলে একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে পকেটের ভেতর হাত দুটি ঢুকিয়ে দিয়ে অরুণ ওদের দিকেই চেয়ে আছে।

গাল দুটো অন্ধকার। ক্ষুরটা এবার ঠেকানো যায় কিনা এখনো অবিশ্যি সে ভেবে কিছু ঠিক করতে পারেনি।

রুমীর হঠাৎ মনে পড়লো কাল অনেক রাত্তির পর্যন্ত অরুণদা জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল।

মরুগ্ গে। বাজে ভাবনা বাপু ভাবতে পারি না।

এদিকে শ্যামবাবুর ঘাট, বোসের ঘাট, নন্দেশ্বরতলা থেকে শীলা লীলা এদের দলটা এসে ওদের ধরে ফেললে।

স্কুলে পড়ুয়া প্রগল্‌ভ কিশোরীর দল চপল একটা ঢেউ তুলে রাস্তার মোড়টা শূন্য করে দিয়ে চলে গেলো।

রুমীও মিশে গেলো ওদের সঙ্গে। আর একবারও সে অরুণের দিকে ফিরে তাকালো না।

ফার্স্ট পিরিয়ডে ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটি হয়ে গেলো। স্কুল-গেট'টা কলরবে মুখর হয়ে উঠলো।

আজ শনিবার। কাল রবিবারে পুরো ছুটি থাকবে। সকলের মুখগুলোই তাই হাসি-উজ্জ্বল।

কেবল রুমীর মুখে হাসি নেই। অথচ কালও সে এমন ছিল না।

সকালের ঘটনাগুলো ভেবে মনটা বিচ্ছিরি হয়ে উঠছে ক্রমশ।

কাঁচের প্লাসটা ভেঙে ফেলেছি। রুমী ভাবলো। কে জানে মা এতক্ষণ জানতে পেরেছে কিনা। পারলেই বা জানতে।

রুমী তো আজ কাঁচের গ্লাস নতুন ভাঙছে না। কত ভেঙেছে। মা বকে না। খালি বলে, রুমী তুমি বড় আক্কুটে!

তবে? তবে কেন তার এত ভয়?

ভাবতে গিয়ে রুমী আবার লাল হয়ে উঠলো। আসলে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তার লজ্জা। না। মরে গেলেও রুমী আজ মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

শীলা আর লীলা বাদাম কিনছিলো। রুমীকে দেখে লীলা চেঁচিয়ে উঠলো, এই রুমী যাবি?

রুমী জানে, কোথায়। তাই না দাঁড়িয়েই মাথা নেড়ে ও বললে, না।

শীলা ছুটে এসে হাত ধরে সাধতে লাগলো। চল না ভাই। এক্ষুনি চলে আসবো।

না। তোরা যা। আমি যাব না।

ঢং। বলে ঠোঁট ফুলিয়ে একটু আহত হয়ে রুমীর হাতটা ছেড়ে দিলে লীলা।

শনিবার হাফ ছুটির পর শীলা লীলা করবী বসু দু'নম্বর এলা দত্ত (রুমীও মাঝে মাঝে থাকে) কলেজ ঘাট দিয়ে নেমে গঙ্গার চড়া ধরে অনেকদূর অব্দি বেড়িয়ে আসে।

ব্যাপারটা একদিন এলার মুখ থেকে জানতে পেরেছিল রুমী। আসল টানটা ওদের কলেজ।

ছেলেগুলো এমন ভাব দেখিয়ে ওদের দিকে তাকায়। সিগারেট খায়।

রুমীর খুব বিচ্ছিরি লাগে। অথচ শীলা লীলা কি মজাটাই না এতে পায়!

পাকা মেয়ে বলে শীলার একটু বদনাম আছে। একবার কি একটা কথা বলেছিল শীলা। রুমী যার অর্থটা জানে না। অথচ ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে হেসে লুটোপাটি খাচ্ছিল। রুমী ভারি অপ্রস্তুত বনে গিয়েছিল সেদিন। তখন তার বিচ্ছিরি লাগছিলো। কেন, কেন সে মানেটা জানে না। আর ভীষণ একটা কৌতূহল ওর মনে পাক দিচ্ছিল। ওকে অস্থির করে তুলছিল।

বাড়ি এসে কথাটা মাকে বলতেই মা কিন্তু কড়া এক ধমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রুমী আর শীলার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি।

শীলাকে কিন্তু রুমীর মাঝে মাঝে একটুও খারাপ লাগে না। জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে তখন। গাল টিপে দিতে ইচ্ছে করে ওর।

কলেজের কথা মনে পড়তেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'টো কথা মনে এলো রুমীর। এক—তাদের স্কুলের মত কলেজে তেমন নিয়ম বাধ্যতা নেই নিশ্চয়ই। না হলে রোজ ঐ ঘাটে বসে ছেলেগুলোকে আড্ডা মারতে, সিগারেট ফুঁকতে দেখত না।

রুমী মনে মনে বললে, কলেজটা বেশ। আরো কিছু দিন পরে আমি তখন কলেজে পড়ব। তখন ফার্স্ট পিরিয়ডে অংকের দিদিমণির ভয়টা থাকবে না।

দুই—অরুণদা কলেজে পড়ে। কখন যায়?

রুমী একদিনও অরুণকে কলেজে দেখেনি। মরুক গে! বাজে ভাবনা আর ভাবতে পারি না।

লীলা আর শীলা চলে গেছে। চামেলীও কখন এগিয়ে গেছে।

স্কুলে যাবার পথে ও একবার ডাকে বটে। কিন্তু ছুটির পর ও ছাতাটা খুলে টুকুস্ টুকুস্ করে একাই এগিয়ে যায় কাউকে না ডেকে।

রুমী আর দাঁড়ালো না।

বাড়ির কাছে আসতেই আবার বুকটা দুপ-দুপ্ করে উঠলো।

মা কি এতক্ষণে ওপরে গেছে!

সদরটা যদি বন্ধ হয়ে থাকে, আর মানদা যদি কাজ সেরে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে কড়া নড়ার শব্দ পেয়ে মা-ই নেমে এসে খিল খুলে দেবে।

রুমী মায়ের দিকে তাকাতে পারবে না। মরে গেলেও না।

হে ভগবান দরজাটা যেন খোলা থাকে! হে ভগবান মানদা যেন এখুনিই না চলে যায়!

রুমী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো।

না। দরজাটা খোলাই আছে। ভেতরের একটা পাল্লা টানা খালি। কেমন নিঝুম নিঝুম সব। জুতো খুলে ফেললে রুমী। কে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। পিসিমা নিশ্চয়ই। বারটা প্রায় বাজেনি। কারণ এগারটার সময় পিসিমা রোজ আসেন। পান খান। গাল-গল্প করেন মায়ের সঙ্গে। গল্প পেলে মায়ের তখন কিছুই মনে থাকে না।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললে রুমী। তারপর খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে উঠান পেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো তর তর করে।

বই আর খাতার রাশগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিলো টেবিলে। মাথার রিবন খুলে ছুঁড়লো আয়নার ফ্রেম টিপ্ করে। কুঁজোটা একবার মুখে উপুড় করলো। তারপর শরীরটা একটা বলের মত ছুঁড়ে দিলো নরম সাদা বিছানার মধ্যে।

পাড়াটা ক্রমে ক্রমে আরো থম-থমে নিঝুম হয়ে উঠলো। দুপুরটা গাঢ় হলো। পায়রাগুলো গলা ফুলিয়ে বকম্ বকম্ ডেকে উঠলো।

আর ভীষণ একটা মন খারাপ এলো রুমীর বুকে।

ঘরে একটা ফড়িং আসে। তার পিছু আর একটা। একটার রং হলদে। ঠিক সকালবেলার রোদের মত। অপরটা কালো। আর খুব লম্বা। মাথাটা বেঢপ্।

বুকের ওপর হাত রেখে রুমী ফড়িং দু'টোকে দেখল।

উড়তে উড়তে হলদেটা সিলিংএ ধাক্কা খেয়ে রুমীর প্রায় মাথার কাছে নেমে এলো।

তারপর পায়ের দিকের খোলা জানলাটা দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেলো।

কালোটাও গেল হলদেটার পিছু পিছু।

স্তব্ধতার সমুদ্রে ঘরটা আবার ভরে গেলো। পায়রাটাও ডাকছে না আর। ডানা ঝটপট করছে না। শুধু শোনা গেল রাস্তায় কাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে পিয়নটা চেঁচিয়ে উঠলো, চিঠি আছে।

আবার সব থম্‌থমে। সেই একঘেয়ে স্তব্ধতা।

হেমন্তের দুপুরটাকে কে যেন রোদের জ্বাল দিয়ে মিছরির আঠার মত গাঢ় তুলছে।

একাকিত্বে রুমীর মনটা অস্থির হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর।

না। কিছুই ভালো লাগে না। উঠতে-বসতে। স্কুলের ছুটিটা না হলেই বরং ভাল হ'ত। রুমী বাঁচত। এখন তার কিছু ভাল লাগছে না।

ফ্রকটা খুলে ফেলল। ভেতরের টেপ্‌-ফ্রকটা ঘামে জবজবিয়ে গেছে। সময় বুঝে আজ যেন গরমটাও পড়েছে বেশি।

খড়খড়ি দিয়ে রুমী এক সময় উঁকি মেরে দেখলে, জানলায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশটার দিকে অরুণ অপলক তাকিয়ে আছে।

কালও অরুণ এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। মরুক-গে। রুমী ভাবলো।

আকাশটার দিকে তাকালো। খুব দূরে একটা চিল ঘুরপাক খাচ্ছে। লাল বাড়ির ছাদটায় কে যেন উঠলো। অনেকগুলো কাপড় শুকোচ্ছে। একটা কাক এসে বসলো। চিলটা ডাকছে। কেমন বিচ্ছিরি লাগে। ভালো লাগে না দৃশ্যটা।

জানলার পর্দাগুলো টেনে দিলো রুমী। বিছানায় লাফিয়ে পড়লো। একটা মাসিক পত্রিকা নিলো।

পড়ে না। ছবি দেখে। তারপর পত্রিকাটা দুমড়ে ছুড়ে দেয় আয়নার পেছনে। ওঠে। রেডিওটা খুলে দেয়। শুধু একটা চিঁ-ই শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরুল না। মা পান চিবুতে চিবুতে ওপরে উঠে এসেছেন।

তারপর অসহ্য দুপুরটা কেটে গিয়ে রুমীর সুন্দর বিকেল আসে।

মানদা এলো। তারপর বাবা। রাজ্যের জিনিসপত্তর দু'হাতে ঝুলিয়ে।

বাড়িটা আবার গম্‌ গম্‌ করে উঠলো।

রুমী সাবান মাখলো। মা সুন্দর খোঁপা করে দিলেন।

ছাদে উঠে মনটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে কানায় কানায় উপ্‌চে উঠলো। কত রং লেগেছে আকাশে। ঠিক এলা সেনের বাহারি শাড়িটার মত।

যে দিকেই তাকায় রুমী খালি রং আর রং।

কে একজন ডাকলো অরুণকে। রুমী ঝুঁকে পড়লো আলসেতে বুক রেখে। বেরিয়ে এলো অরুণদা। রুমীর দিকে একবার তাকালো। রুমী হেসে ফেললো! গলিটার আদ্দেক গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অরুণ আর-একবার তাকাল।

রুমী তখন আর সেখানে নেই। ছাদের ওপাশে গিয়ে গলা ফাটিয়ে পাশের বাড়ির বাণীকে ডাকছে।

বাণী রোজই আসে। আজও এলো।

দুই সখীতে কত কথা হলো। মনের গূঢ় কথা খুলে বলে একে অপরকে।

তারপর দুজন অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো প্রাক্‌-সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশটার দিকে চোখ রেখে।

হেমন্তের বিকেল ভারি সুন্দর। তাই কখন এক সময় টুপ্‌ করে ফুরিয়ে যায়। বাণী চলে গেল সন্ধ্যা দিতে হবে বলে।

ফিকে অন্ধকার নেমে এলো বাড়িগুলোর চূড়ায়। রাস্তার মোড়ের আলোটা জ্বলে উঠলো।

দিনের অন্তিমে মুমূর্ষু আকাশটার মাঝ দিয়ে ক্লান্ত ডানায় উড়ে গেলো এক ঝাঁক বক।

বুকের মাঝে কোথায় যেন বেদনাটা আবার প্রকট হয়ে উঠলো।

একটা তারা উঠেছে। ঐ শেষ গোধূলির তারাটার মধ্যে রুমী যেন নিজেকে দেখতে পেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে কান্নাটা আবার বুক ঠেলে এলো।

প্রগাঢ় স্তব্ধতায় চারিদিক ভরে যাচ্ছে। এ স্তব্ধতার আকুতি আছে। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দেবার দুর্বার যন্ত্রণা।

সদ্য ফোটা একটি প্রেম তার সব কটি পাপড়ি মেলতে চাইছে। আর এ-ফোটার আকতি কোন ভোরের দুয়ারে মাথা কুটছে। বলছে আমি এখন কত একা।

ছাদ থেকে রুমী নেমে এলো কান্না চেপে।

পা টিপে টিপে ঘরে এলো। কেউ নেই। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালালো না রুমী। শরীরটা গুটিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। চোখের জলটা মুছে নিলো বালিশে।

খানিক বাদেই বাবা আসবে।

সংবাদে দেখিলাম, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিরোধী দলের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন—"আপনারা কোন্ পথে যাইতেছেন?" বিশু খুড়ো বলিলেন,—"এ প্রশ্নের কোন জবাব কেউ দেননি। কিন্তু বিরোধী দল বললেই পারতেন, প্রথম পথ ছিল রাজভবনের পূব দিক ধরে সেক্রেটেরিয়েটের পথে, তারপরের পথ দক্ষিণ দিক ধরে বিধান সভার দিকে। অত্যন্ত সহজ উত্তর। গোলমালের এতে কী আছে?"

• • •

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, বিধান সভার কোন কোন সদস্য নাকি তাঁহাদের জুতা ফিরাইয়া পাওয়ার জন্য ডেপুটি স্পীকারকে ধরাধরি করিতেছেন। কিন্তু তিনি রাজী হন নাই। শ্যামলাল বলিল—"সবিনয়ে বলব, ডেপুটি স্পীকার মশাইর এ অত্যন্ত অন্যায়। পুজোর

বাজারে বাচ্চাদের জুতো পরবার আবদার তো তিনি ইচ্ছে করলেই রাখতে পারতেন" !!

• • •

এবার পুজোর বাজারে দেখিলাম, 'পুষ্পধনু' 'দীপ জেলে যাই' প্রভৃতি নূতন নূতন শাড়ি। —"মনে হলো এসব বিজ্ঞাপনদাতার নেহাত পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কিছু নয়। পুজোর বাজার তো শুধু মেয়েদেরই নয়। পুরুষও তো আছে। এই বেচারাদের জন্যে অন্তত একখানা "হনুমানের পাতাল পরিক্রম" ধুতি ছাড়লেও তো পারতেন"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

• • •

পশ্চিম তিব্বতে খাম্পা বিদ্রোহীদের সঙ্গে চীনা সৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "চীনা সৈন্যদের ভারত ভূমিতে পদার্পণে অনেকেই খাম্পা হয়ে আছেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।
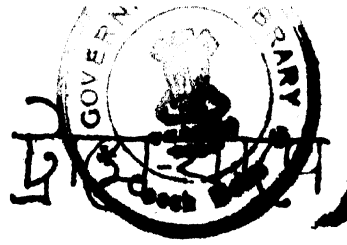
• • •

সিডনী হইতে প্রকাশিত সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে, অচিরেই নাকি ছোটদের জন্য কাগজের পোশাক প্রস্তুতের ব্যবস্থা
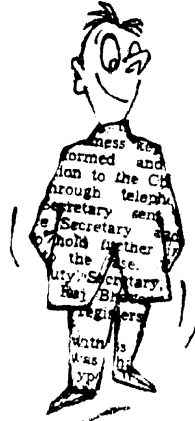
করা সম্ভব হইবে। —"শুধু ছোটদের ব্যবস্থা না করে বড়োদের জন্যও একটা কিছু করা উচিত। আমাদের তো মনে হয়, কাগজের প্রিণ্টিং ছোটদের, আর্ট পেপার মহিলাদের আর নিউজ প্রিণ্ট পুরুষদের জন্য রেখে দিলে বেশ হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

আমেরিকাতে তামাক ছাড়া সিগারেট তৈরির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশু খুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"শুনলাম, এই সিগ্রেট মঃ খ্রুশ্চেভের জন্যই করা হয়েছিল। তাঁকে কারুর দেওয়া হবে না বলেই সিগ্রেটের ব্যবস্থা, তা-ও আবার তামাক ছাড়া"।

• • •

মাননীয় আগা খাঁ সাহেব বলিয়াছেন—আমি এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করিব, খাদ্যের ব্যাপারে যাহার রুচির সঙ্গে আমার রুচির একটি সহাবস্থান সম্ভব। —"বেশ জুৎসই কথাই তিনি বলেছেন এবং আগা খাঁর জন্য গাছকোমর বেঁধে অনেকে হয়ত রান্না শেখার কাজেও লেগে যেতে পারেন। রুচিটা এক হলে ভালো হয়, কিন্তু না হলেও এমন কিছু যায় আসে না। এই যেমন ধরুন, মাছের কাঁটা আমার দু চোখের বিষ। আবার গিন্নি দু চোখ নিমীলিত করে পরমানন্দে কাঁটাচচ্চড়ি চিবোন। কিন্তু সহাবস্থান ঠিকই আছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

হিন্দ্র, ধোলাই-র সংস্থায় কয়েকটি মেয়েকে কাজ করিতে দেখিয়া খ্রুশ্চেভজী নাকি বলিয়াছেন—তোমাদের সাফল্য কামনা করি। কিন্তু তোমাদের পক্ষে আসল কাজ হইতেছে একটি ভালো স্বামী লাভ করা। —"নূতন কথা বলেন নি। আমরা বহু আগেই বলে রেখেছি—কিঞ্চিৎ লিখনং, বিবাহের কারণং"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী

• • •

আমেরিকার বক্তৃতায় খ্রুশ্চেভ ভাই বলিয়াছেন—ঈশ্বর আমাদের দিকে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"পৃথিবীর সাধারণ মানুষের তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক পক্ষ নিয়েছিলেন; জয় সে পক্ষের হলো বটে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রটা বন্ধ করা গেল না।"

• • •

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে শরৎকালের পরিবর্তে বসন্তকালে রাশ্যা পরিভ্রমণের আহ্বান জানানো হইয়াছে। এ ব্যাপারে কেহই কোন মন্তব্য করিলেন না। শুধু শ্যামলালকে গুন গুন করে গাইতে শোনা গেল—"বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ"!!

• • •

কলিকাতায় এবার আই এফ এ শীল্ডের খেলা স্থগিত আছে। শুনিলাম, ইস্টবেঙ্গল্স সান-ডেতে খেলিতে রাজী হন নাই আর মোহনবাগান রাজী হন নাই মানডেতে খেলিতে। বিশু খুড়ো এই প্রসঙ্গেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন—"আজকাল সবাই সহাবস্থান সহাবস্থান করেন। কিন্তু এটা যে কিছু নয়, তার প্রমাণ এই দুটি ক্লাবের অবস্থান। একই মাঠ, পাশাপাশি দুটি তাঁবু, কিন্তু — — —" বিশু খুড়ো কথাটা শেষ করিলেন না, কে জানে দু' পক্ষেরই ফ্যানদের অভাব তো নাই। গরম, তপ্ত ফ্যান"!!

ইন্দ্রধনু প্রতিবিম্ব

বিষ্ণু দে

জোড়মুণ্ডি পার হয়ে আকাশের মেজাজ পাল্‌টাল,
অশ্রুর লাবণ্য স্নানে এল স্বচ্ছ হাসির প্রসাদ,
টার্‌মাক পথের বাঁকে, গাছে, মাঠে, ন্যাড়া কালো কালো
পাহাড়ে পাথরে রৌদ্র ঃ সত্য হল মামুলি প্রবাদ,
আশ্চর্য সৌন্দর্যে ভিজা পৃথিবীর নির্মল শরীরে।
নয়নাভিরাম পথে চলেছি কজনে, আঁকাবাঁকা
উঁচুনিচু বিস্ময়ের ক্রমাগত বৃষ্টি স্নিগ্ধ তীরে,
চোখের খুশির আর মনের খুশির স্রোতে আঁকা
দৃশ্যের নদীর পাড়ে, প্রকৃতির খেয়ালী কৌশলে।
এ প্রকৃতি এ নিসর্গ ঘনিষ্ঠ সৌন্দর্য চেতনায়,
আজন্ম এ তীব্র স্মিত সৌন্দর্য চেয়েছি ছলে বলে
প্রাত্যহিক সাধারণ্যে, সেই জলে রৌদ্রে বেদনায়
এল নেমে ইন্দ্রধনু, পরগনার পাহাড়ে পাহাড়ে;
পাহাড়-আকাশ বেঁধে আদি সাতরঙের বাহারে,
আর তার পুনর্বৃত্তি বৃষ্টির শিশিরে সদ্য ধোয়া
সবুজ প্রান্তরে মুক্ত প্রতিবিম্ব মর্ত্যের দোহারে।
ননিহাট পাঁচপাহাড়, অন্যদিকে মহুয়াগড়ির
অনেক চূড়ার আভা দৈবত পায় পথের বাঁপাশে:
মাটিতে আধৃত জোড়া ইন্দ্রধনু আনম্র আকাশে
তোমার দুহাতে বাঁধি, এ দৃশ্য যাবে না আর খোয়া।

আ জা দী

গোরাচাঁদ নন্দী

উদ্ধত উজ্জ্বল মুহূর্ত আঘাত হানে
আলস্যে অবকাশী ঊষাকে।
আজাদী চোখ মেলে দেখে আর ভ্রূকুটি তোলে,
রাষ্ট্রের তৎপর শিশুরা ছুটেছে বরমাল্য দিতে
অভিজাত আত্মার গলায়।

জনতার অস্ফুট অব্যক্ত আপত্তি পেশ হয় না।
সুধীজনেরা দূরে থাকে,
সহিষ্ণুরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে
কৌটিল্যের কেতাবে এ কি ব্যঙ্গচিত্র!

চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা প্রশ্ন।
ইতিহাসের নির্যাস আর দেশজ বিকাশ থেকে
নতুন বিধানের জন্ম হয়—
বড় বড় পরিকল্পনা গড়ে ওঠে।

অধীনতার অমানিশা ভরে বজ্রনির্ঘোষে
ধ্বনিত হয়েছে এরই দৈববাণী!
অত্যাচারের চাবুক বেজেছে তার শৃঙ্খলের তালে,
আকাশের বুক চিরে বেরিয়েছে আদিগন্ত আলো!
তারারা মিটমিট করে হেনেছে রহস্য-কটাক্ষ,
বাতাস গাছের মাথায় মাথায় ছড়িয়েছে তার বার্তা!

নিশাচরেরা সময় থাকতে সরে পড়েছে।
এখন অকলুষ মেষশিশুরা নির্ভয়ে খেলা করে প্রভাতে
শহীদ-জননী বসুন্ধরা শিশির-ভেজা চোখে
হৃদয়ের ব্যথা চাপে।

অদূরে পাগলা বৃষ্টি ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে
পুকুরের জলে জলদে পিয়ানো বাজায়।
গাড়ির চাকা কড়মড় করে পথের পাথরকুচি চিবোয়,
আজাদীর খুশির বাঁশি বেজে চলে
আর দরাজ হাতে চারদিকে আনন্দ বিলোয়।

শাঙর্গদেব

অল ইণ্ডিয়া সদারঙ্গ মিউজিক কনফারেন্স

সদারঙ্গ মিউজিক কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষ এবার যথেষ্ট অর্থব্যয়ে অনেকখানি জমি নিয়ে তাঁদের অনুষ্ঠান-মণ্ডপ তৈরি করেছিলেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, উৎসাহী শ্রোতার সংখ্যা বিস্তর কিন্তু আসলে তেমন কিছুই মনে হল না। দু-একটি নাচের অনুষ্ঠান ব্যতীত তেমন জনসমাগম দেখা গেল না। অনুষ্ঠান মণ্ডপে যতবার প্রবেশ করেছি ততবারই মনে হয়েছে গানবাজনার আবহাওয়া বিশেষ নেই। পোটেটো চিপ্স্, চকোলেট, ঠাণ্ডা পানি—ঘন ঘন হেঁকে যাচ্ছে; আর তার সঙ্গে—"আরে ইয়ার এক বাত তো শুনো—এ পানওয়ালা জরুর আও ইধার"—এ স্বরেরও বিরাম নেই। প্রায় কনফারেন্সেই একশ্রেণীর লোক আসেন তাঁরা বোধ করি মোটা ডোনেসনের দরুন সামনের আসনগুলির স্বত্ব উপভোগ করেন। গান বাজনার দিকে তাঁদের আদৌ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। খানিকক্ষণ বসেন, তারপর চলে যান। অনেকগুলো আসন ফাঁকা পড়ে থাকে। সদারঙ্গ মিউজিক কনফারেন্সেও এই ধরনের লোকের অভাব ছিল না। আর একটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার হচ্ছে লোকজনের সর্বক্ষণ আসা-যাওয়া। কারুর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে একটা গোলমাল লেগেই থাকে। যাঁরা মন দিয়ে কোন অনুষ্ঠান শোনেন তাঁরা অত্যন্ত বাধা পান। ইউরোপীয় কনসার্টের সঙ্গে আমাদের কনসার্টের কত তফাৎ—এই কলকাতাতেই সেটা প্রত্যক্ষ করেছি। একটা অনুষ্ঠান চলবার সময় তাঁরা কাউকে হলে ঢুকতে দেন না। এতটুকু গোলমাল হয় না যতক্ষণ গানবাজনা চলে—এমন কি তার অবসরেও নয়।

আগন্তুকের শ্রান্তিরও যে কারণ নেই তা নয়। পনেরোটি অধিবেশন। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত। ছুটির দিনে সকালেও আছে। এমন অফুরন্ত সময় কারুর নেই যে সব অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কয়েকজন শিল্পীর অনুষ্ঠান একাধিক এবং বৈচিত্র্যহীন। এছাড়া, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান অনেক সংক্ষেপ করা যেত। একই কর্তবের পুনরুক্তি নিতান্ত ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। নামকরা গাইয়ে বাজিয়েদের অনুষ্ঠান শুনে মনে হল—তাঁদের কেউ কেউ এরই মধ্যে—পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের পারে আসি।

নাচের অনুষ্ঠানগুলিতে অনেককেই বেশ তাজা দেখা গেল। কেরল মিস্টার্সদের মডার্ন ভারতনাট্যম দেখে অনেকে খুশীতে বিহ্বল হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতীয় রক্ষণশীল সঙ্গীতকলার দ্রুত আধুনিক পরিবর্তন কতখানি সমর্থনযোগ্য সেটা দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

বহু শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নামের তালিকা দিয়ে লাভ নেই, কেননা, প্রত্যেকের অনুষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া যাবে না। একটি পুস্তিকা সংগ্রহ করেছিলাম নামগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে—তারও অতিরিক্ত পেয়েছি। পেট্রন এবং একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বারদের ছবিও পাওয়া গেছে। না—সেসব দিক দিয়ে কোন ত্রুটি নেই।

শিল্পীরা যেসব রাগ-রাগিণী গেয়েছেন বা বাজিয়েছেন তার চুলচেরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। যিনি যেটা গেয়েছেন বা বাজিয়েছেন তিনি সেটা ভাল করেই শিখেছেন নিশ্চয়—আমরা যদি মল্লারী কানাড়া, ইমনি, ছায়া-হিন্দোল, এমন সব রাগের তাৎপর্য না বুঝতে পারি সেটা আমাদেরই অজ্ঞতা। কেবলমাত্র কবিগুরুর "কত অজানারে জানাইলে তুমি" স্মরণ করে তাঁদের সাধুবাদ দিই। আমাদের সঙ্গীতে নতুন রাগ বা মিশ্র রাগ তৈরি করা শক্ত নয়, বিভিন্ন স্বরের বিভিন্ন সন্নিবেশ করে নিলেই হল। এইরকম ধারণাই তো আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় ব্যক্তিরই আছে। কিন্তু এর মধ্যে গলদ কোথায় আর ফাঁক কোথায় সেটা অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত—"রাগজ এণ্ড রাগিনীজ" গ্রন্থের অনেক যত্ন করেই দেখিয়েছেন। কিন্তু সে বই-এর খোঁজ করে কে? কাজ উদ্ধার করবার সহজ উপায় থাকতে কে আর গোলমালের মধ্যে যেতে চায়।

অনুষ্ঠান কারুর নিন্দনীয় হবার কথা নয় এবং সেটা হয়ও নি। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক পট্টবর্ধন, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, রবিশঙ্কর, আলি আকবর, তারাপদ চক্রবর্তী, বিলায়েত খাঁ, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—সবাই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তা ছাড়া, সারেঙ্গী, তবলায় সগিরুদ্দিন, কানাই দত্ত, রামনাথ মিশ্র, রথীনারায়ণ, কেরমিং, শান্তাপ্রসাদ, নিখিল ঘোষ, সুবোধ নন্দী—এঁরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যতগুলি অনুষ্ঠান আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কোনটিতেই কৌশলের অভাব দেখা যায় নি। তবে পছন্দ, অপছন্দ সবাইকার সমান নয়—তা ছাড়া, সঙ্গীত সম্বন্ধে অ্যাপ্রোচটাও এক একজনের এক একরকম।

ইমরাটের বাজনা বেশ লাগল তবে শেষের দিকে দ্রুতটা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। খেয়াল ঠুংরি মন্দ নয়, তবে গজলটাই ভাল লাগল। তাঁকে ধন্যবাদ যে, মামুলি খেয়াল ঠুংরির বাইরে একটি জিনিসও তিনি শুনিয়ে গেলেন। রবিশঙ্কর, আলি আকবর যেমন বাজান তেমনি বাজিয়েছেন। ২৬শে সেপ্টেম্বরের প্রোগ্রামে রবিশঙ্করের সঙ্গে শান্তা প্রসাদের তবলা ছিল। তবলার সামনে দুটো মাইক রাখা সঙ্গত হয় নি। শান্তা প্রসাদ খোলা বাজাতে অভ্যস্ত। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তবলা থেকে মাইকটা একটু দূরে রাখা। এতে যদি তবলার আওয়াজটা বেশি প্রবল হয়ে ওঠে তবে তবলিয়া দোষী নন। শান্তা প্রসাদ এবার তবলা লহরায় এগার মাত্রার শাঙ্ক তাল এবং ন' মাত্রার খট তাল বাজিয়ে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। শুনেছি, এক সময় অঘোর চক্রবর্তী বেনারসে এইসব তালে ধ্রুপদ গাইতেন। গোপীনাথের সঙ্গে নাচে তিনি পঞ্চম সোয়ারি এবং ধামার বাজিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন।

তারাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গীতানুষ্ঠান ভালো লাগল। ২৫শে সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে তাঁর শেষের গানটি কি বাংলা? "দ্রুমে দ্রুমে লতায় লতায়"—এইরকম ভাষা শুনলাম বলে মনে হচ্ছে। যদি বাংলাই হয়ে থাকে তাহলে তাকে হুবহু হিন্দী ঢঙে পরিবেশন না করে একটু পরিষ্কার উচ্চারণে বাঙালীর সেন্টিমেন্ট দিয়ে গাইলে বেশি রস পাওয়া যেত এবং একটা

বৈশিষ্ট্যও থাকত বলে আমাদের ধারণা। অবশ্য তিনি যে ঢঙে গেয়েছেন সেদিক দিয়ে বিচার করলে গানটি অসার্থক হয় নি।

গৌর গোস্বামীর বাঁশী আমাদের চমৎকার লেগেছে। বাঁশিতে অনেক দুরূহ কাজ তিনি অবলীলাক্রমে দেখিয়েছেন।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওঙ্কারনাথ এবং পটবর্ধন সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার নেই। তাঁদের উপস্থিতি অনেককে উৎসাহ প্রদান করেছে।

নবাগতদের মধ্যে সবাইকার অনুষ্ঠান মোটামুটি ভালই হয়েছে—এইরকম শ্রোতৃমদের ধারণা।

পশ্চিমবঙ্গীয় স্টেট একাডেমি অফ ড্যান্স ড্রামা এণ্ড মিউজিক কর্তৃক পরিবেশিত অনুষ্ঠানটি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দেখতে এবং শুনতে গিয়েছিলাম—কিন্তু নেহাৎ মামুলি লাগল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর সঙ্গে একাডেমির পরিচয় আছে বলে মনে হল না। টপ্পা যদি শোনাতে হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গ ব্যতীত বাংলার টপ্পা কি ছিল না? এতে তাঁদের নানাভাবেই মুন্সীয়ানার দেখাবার সুযোগ ছিল, কিন্তু অনুষ্ঠান এমন হল যেন এটি একটি সামান্য ইস্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসন মাত্র। তাও, রবীন্দ্রনাথের গানে তান এবং বিস্তারের প্রয়োগ যোগ্যও নয় সুপরিকল্পিতও নয়। যেসব বাংলা গানে তান বিস্তারের বিশেষ সুযোগ আছে সেগুলি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েই রইল। বাংলা গানের এমন অকিঞ্চিৎকর পরিবেশন না করাই উচিত ছিল। নৃত্যে বন্দনা সেনগুপ্ত কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। চেষ্টা করলে ইনি খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হবেন।

একাডেমির অনুষ্ঠানে কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষ মঞ্চের উপর যথেচ্ছ বিচরণ করেছেন। একটা অনুষ্ঠান যে চলেছে এবং সেটার একটা গুরুত্ব তাঁরা দিয়েছেন সেটা সম্যক বিস্মৃত হয়েছেন বলে মনে হল। ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার পর সর্বসমক্ষে মঞ্চের ওপর ঝাড়ুদারের সম্মার্জনী পরিচালনা অতিশয় অশোভন ব্যাপার। তাছাড়া, যখন যার ইচ্ছা তখনই তিনি প্রবেশ করেছেন। মণিপুরী রাস নৃত্যে রাধা আর তাঁর সখিদের সঙ্গে সঙ্গে সার্টপ্যাণ্ট পরা দুচারজন লোকও প্রবেশ করলেন। এতে স্টেজ-এফেক্ট কিছু থাকে কি? অথচ কেরল সিস্টার্সদের নাচের বেলায় এঁরা কতই না সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন! এই ধরনের বিসদৃশ আচরণ অতিশয় পরিতাপজনক। মঞ্চে একটা পর্দার ব্যবস্থা করলে অনেক কাজ পর্দার আড়ালে তাঁরা করতে পারতেন এবং আমাদেরও এই পীড়াদায়ক আলোচনা করতে হত না।

যাই হোক, এইরকম দু-একটি ঘটনা ব্যতীত সদারঙ্গ মিউজিক কনফারেন্সের ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল। মণ্ডপনির্মাতার যোগ্যতা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই ঝড়-বৃষ্টিতে এতটুকু জল ভিতরে আসতে পারে নি। তবে, ভারতীয় সংগীতের সূক্ষ্মতার দিকটা চিন্তা করে দেখলে এইরকম বিস্তৃত আসর অসুবিধাজনক বলে মনে হয়। কোন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান হলে অনেক সুব্যবস্থায় কার্যনির্বাহ করা যেতে পারে।

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের অমূল্য পেইণ্টিং চুরি যাওয়ার একটা ব্যাপক রেওয়াজ ইওরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায়। বড় বড় আর্ট মিউজিয়াম থেকে ছবি চুরির খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এই সেদিন গত মাসের মাঝামাঝি একদিন টরণ্টোর আর্ট গ্যালারি থেকে ছখানি পেইণ্টিং, যার মধ্যে ছিল ফ্রান্স হলসের 'ইসাক এব্রাহাম মাসা'র (খুব কম করেও যার বর্তমান মূল্য প্রায় পৌনে ছ লক্ষ টাকা) ও 'ভিনসেণ্ট লরেন্স ভ্যান দার ভিনে'র (দাম প্রায় চার লক্ষ টাকা), রেমব্রাঁর 'লেডি উইথ এ ল্যাপ ডগ' (সাত লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা) ও 'লেডি উইথ এ হ্যাণ্ডকারচিফ' (প্রায় বার লক্ষ টাকা), পিয়ের রেণোয়ার 'পোর্ট্রেট অফ ক্লড' (পঁচানব্বই হাজার টাকা) এবং পিটার পল রুবেন্সের 'এলিভেশন অফ দি ক্রশ' (পঁচানব্বই হাজার টাকা)। এছাড়া গেন্সবরোর 'দি হার্ভেস্ট ওয়াগন' (সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা) এবং ভ্যান ডাইকের 'ডেমক্রিটাস অ্যাণ্ড আইরেকেটাস' ছবি দুখানির ক্যানভাস ফ্রেম থেকে ওরা কেটে ফেলে, তবে নিয়ে যায়নি। এছাড়া টিনটোরেটোর একখানি এবং রেনোয়া ও ডিগাসের একখানি করে পেইণ্টিংয়ে মোটে হাত দেয়নি। ক্যাশ বাক্স থেকে শ' পাঁচেক মতো টাকাও চোরেরা নিয়ে পালিয়েছে এবং এ থেকে পুলিস মনে করে যে, ছবিগুলি চুরির পিছনে অর্থ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না। যাই হোক ১৯১১ সনে ল্যুভোর মিউজিয়াম থেকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনা লিসা' (প্রায় সাড়ে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা) চুরি যাবার পর এত বড় চুরি আর ঘটেনি।

চুরি যাওয়া ছবিগুলি ফিরে পাওয়া যাবে কিনা, এ বিষয়ে নিশ্চিত কেউ কিছু বলতে পারে না। কারণ গত কয়েকশত বৎসর ধরে বিভিন্ন রক্ষণাগার থেকে বহু ছবি চুরি গিয়েছে পরে যাদের কোন হদিশ আর পাওয়া যায়নি। 'মোনা লিসা' অবশ্য চুরি যাবার দু বছর পর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল—ভিন্সেঞ্জো পেরুজিয়া নামক ল্যুভোর যে কর্মচারী ছবিখানি চুরি করেছিল, দু বছর পরে সে ভুলক্রমে এক সৎ চিত্র-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতে গিয়েই ধরা পড়ে। এর তিনশ বছর আগে মোডেনার ডিউক কোরিজিও 'ভার্জিন উইথ সেণ্ট ম্যাগডালেন অ্যাণ্ড সেণ্ট লুসি' ছবিখানির মোহে পড়ে এলবিনিয়ার গির্জা থেকে সেখানি চুরি করায়। ১৮৭৬ সনে লণ্ডনের বিখ্যাত শিল্প বিপণি এগনিউ অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে গেন্সবরোর আঁকা 'জর্জিয়ানা, ডাচেস অফ ডিভনশায়ার'-এর পোর্ট্রেটখানি চুরি যাবার পঁচিশ বছর পর পুরস্কারের বিনিময়ে ছবিখানি শিকাগোর এক জুয়াড়ীর কাছ থেকে ফেরত পাওয়া যায়। টরণ্টো আর্ট গ্যালারিতেই এর আগেও ছবি চুরি হয়েছে। ১৯৫৫ সনে রুয়লের 'দি সার্জন' ছবিখানি চুরি যায়, আজো তার পাত্তা নেই। এবার রুবেন্সের যে ছবি চুরি গিয়েছে, পাঁচ বছর আগেও সেখানি একবার চুরি গিয়েছিল, কিন্তু চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় অসতর্কতাহেতু চোরের হাত লেগে সতর্কীকরণ ঘণ্টা বেজে ওঠায় সে চোরাই মাল সামনের পার্কে ফেলে চম্পট দেয়।
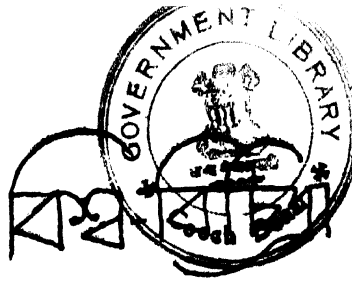
পেইণ্টিং চুরির ঝুঁকি কম নয়, কারণ এটা সোনা-রুপার মতো এমন জিনিস নয় যে, গালিয়ে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করে ফেলা যাবে। শিল্প ব্যাপারীরা যতোই অর্থলোলুপ হোক, খুব বিখ্যাত কোন শিল্পসামগ্রী হাতে রেখে দেওয়ার বিপদটা তারা ঘাড়ে নিতে চায় না। আগেকার দিনে বড় নামকরা ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রেতা পাওয়া যেত এবং অনেক সময়ে কোন ছবির ওপর নজর পড়লে কেউ কেউ টাকা দিয়ে লোক লাগিয়ে চুরিও করাতো। কিন্তু এখন আর সেটা চলে না। টরেণ্টো আর্ট গ্যালারি থেকে এই যে ছবিগুলি চুরি গেল,

এথেন্সের পুরাকালীন বন্দর পাইরিয়াসে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত বৎসর আগেকার গ্রীসীয় শিল্পকলার প্রচুর নিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে—উপরে ব্রোঞ্জের তৈরী আর্টেমিসের মূর্তি

এ সম্পর্কে পুলিসের মত হচ্ছে যে, বীমা কোম্পানি একটা মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ ঘোষণা না করা পর্যন্ত চোরেরা ছবিগুলি হাতে রেখে দেবে।

*

দক্ষিণ রোডেশিয়ার সিনোয়াতে সি টি আর উইলিয়ামস নামক এক ব্যক্তি ঋণ আদায়কারী এক প্রতিষ্ঠান তার পাত্তা জানবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করায় সে নিজেই নিজের বর্তমান ঠিকানা জানিয়ে পুরস্কারটি আদায় করে।

*

বিরাট আকারের একটা নীলকান্তমণি নিয়ে শিকাগোর ন্যাচুরাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের বৈজ্ঞানিকরা বড় ফাঁপরে পড়েছেন। তিনশ বারো পাউন্ড ওজনের এবং উচ্চতায় দু ফিট ও প্রস্থে চৌদ্দ ইঞ্চি এই নীলাটি প্রস্তর বিশেষজ্ঞদের মতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত এই ধরনের পাথরের মধ্যে বৃহত্তম। বৈজ্ঞানিকদের ধাঁধায় পড়ার কারণ, পাথরটির উৎপত্তি স্থান নির্ণয় নিয়ে। সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে নীলা পাওয়া যায়, কিন্তু এই বৃহৎ নীলাটির মতো পাথর ওখানেও কখনো দেখা যায় না। পেরুর রাজধানী চিলির যেখানে নীলা পাওয়া যায়, আলোচ্য পাথরটি সেখান থেকে ছ'শ মাইল দূরে পেরুর প্রাচীন এক রাজার কবরে পাওয়া যায়। পাথরটা কিভাবে এতটা দূর দুর্গম রাস্তা পার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, বৈজ্ঞানিকদের সেটা একটা ভাববার বিষয়—আজও তার কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ওঠে, নীলার এই বিরাট খণ্ডটি শত শত বৎসর পূর্বে স্পেনীয়রা দক্ষিণ আমেরিকা আক্রমণ করার সময়ে তাদের দৃষ্টি কিভাবে এড়িয়ে ছিল। সেটা কেউ বলতে পারে না। তবে খুব আশাবাদী খনিজ ইঞ্জিনীয়াররা মনে করেন, কোনোদিন হয়তো এর চেয়েও বড় নীলা খণ্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কোথায়?

এটা বোঝা যাচ্ছে যে, শিকাগো মিউজিয়ামের এই পাথরটির ঝকঝকে বর্ণ তার প্রাচীন উত্তরাধিকারীকে এতটা আকৃষ্ট করে থাকবে যে জন্যে সে তার অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে এটিকেও কবরে সঙ্গে করে নিয়ে রেখেছিল। প্রাচীনকালে এদেশে নীলাকে মনমরা ভাব ও ঘুষঘুষে জ্বরের প্রতিষেধক বলে লোকে মনে করতো। হয়তো সেই কারণেই এর উত্তরাধিকারী পাথরটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে।

*

সার্ডিনিয়ায় ক্যাগলিয়ারি শহরে মারিও মামেলি নামক এক ব্যক্তি স্থানীয় টাউন হলে যায় তার একটা নতুন পরিচয়পত্র করে নিতে। এক করনিক বেশ খানিকক্ষণ ধরে খাতাপত্তর ঘেঁটে, গবেষণা করে মামেলিকে জানায় যে, সরকারি কাগজপত্রে সে উনিশ বছর হল মৃত বলে উল্লিখিত হয়ে রয়েছে এবং এখন বেঁচে থেকে মামেলি আইন ভঙ্গ করছে।

*

প্রস্তর যুগের মানুষ এখনও কি বেঁচে আছে? অস্ট্রেলিয়ার ডাঃ জন প্রাইনিয়াসের নেতৃত্বাধীনে পাঁচজনের একটি দল উত্তর মাঞ্চুরিয়ার এক জঙ্গলের রোমশ মানুষ দেখে এই সত্য আবিষ্কারে যাত্রা করেছেন। সভ্য জগতের ছোঁয়া থেকে দূরে থাকার জন্য এদের দেখে পাঁচ লক্ষ বছর বা তার চেয়ে বেশী দিন আগেকার মানুষের কি রকম আচরণ ছিল, কি ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, এসব জানতে পারা যাবে। আলামাস নামে খ্যাত এই আধা-মানুষ জীবরা গর্জন বা কণ্ঠ দ্বারা এক প্রকার শব্দের সাহায্যে কথা বলে তবে সভ্য জগতের একটা যে শ্লীলতা তাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে লজ্জা আবরণের জন্য চামড়ার বস্ত্র পরিধান। এক রুশীয় বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক বি পোর্শনার সম্প্রতি এই আদি মানুষদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

ডাঃ প্রাইনিয়াসের দল এই আদি-মানুষদের খুঁজে বের করে তাদের সংস্পর্শে এসে যাবতীয় তথ্য বের করতে চান। তাদের বিশ্বাস, কোথাও পাহাড়ের গুহায় এই প্রস্তর যুগের মানুষদের খুঁজে বের করতে পারবেন।

*

দীর্ঘতম প্রেমপত্র লেখার ব্যাপারে ভিয়েনার মাজো উলরিকের রেকর্ড বোধহয় কেউ ছাপিয়ে যেতে পারবে না। আড়াই বছর ধরে তিন হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এই চিঠি। মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করে যে, তার প্রেমিককে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সে তার পত্রে 'ইতি' টানবে না। তার প্রেমিক এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রহার করে ভিয়েনা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। শেষে ১৯৩৭ সনে মেয়েটি তার প্রেমিকের ঠিকানা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে তার সেই চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, অতো লেখবার পর ওদের মিলন হতে আর বিলম্ব হয়নি।

সম্প্রতি প্রেম-পত্র রচনায় একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের এক সৈনিক। পাঁচ মাসে সে তার প্রেমিকাকে দু'শ ছিয়াত্তরখানি প্রেমপত্র পাঠিয়েছে। অবশ্য তার প্রেমিকাও কম যায়নি ঐ সময়ের মধ্যে তার লেখা উত্তরের সংখ্যা পাঁচশ পনের। কিউবার এক প্রেমিক আর স্পেনের এক প্রেমিকার মধ্যে কুড়ি বছর ধরে যে প্রেমপত্র বিনিময় হয় তা পরিমাণে দাঁড়ায় দু' টন। কুড়ি বছর পর তাদের বিয়ে হয় এবং এখন তারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে ঘর করছে তবে প্রেমপত্র লেখার বাতিক কিন্তু তাদের আজো এত তীব্র রয়েছে যে, প্রায়ই ওরা একই বাড়িতে থেকেই পরস্পরের সঙ্গে প্রেম-পত্র আদান-প্রদান করে।
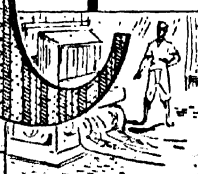
ত্রুটি স্বীকার: গত ২৬শ বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় ভ্রমবশত একটি খবর এই বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে ২৬শ বর্ষ ৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। (সঃ দেশ)।

অন্ধকার নিশীথ রাত্রি। বিশাল নির্জন প্রান্তরে দিকভ্রান্ত পথচারী। কোন্ দূর জলাভূমিতে জ্বলে উঠেছে আলেয়া—আলোর মায়া। দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে ভয়ার্ত ভ্রান্ত পথিক—তার চোখে আশার নেশা। দূরে-বহুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আলো। বিভ্রমবতী আলেয়া ভুলিয়ে সর্বনাশ করছে পথিকের।

উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের দগ্ধ মরুভূমি। প্রচণ্ড সূর্যের দহনে ধূ ধূ করছে বালু। তাপিত তৃষ্ণার্ত মরুযাত্রী—যেন কশাহত উচ্চৈঃশ্রবা, যেন অঙ্কুশ-তাড়িত ঐরাবত। সহসা তার নয়ন সম্মুখে উঠল মরীচিকা—মরুর মায়া। নয়ন-বিমোহন মরূদ্যান—শীতল ছায়াতরু, স্বচ্ছ সরসী-নীর। দ্রুতবেগে ছুটে চলল তৃষিত পান্থ। হায়! দূরে—আরো দূরে মিলিয়ে গেল মরীচিকা। অদ্ভুত এ ভ্রান্তি।

ওই ভূভাগে নন্দনবনসম পঞ্চবটী। রাজপুত্র, রাজবধূ এসেছেন নির্বাসনে। জীবনে দুঃখ নেই তাঁদের। বন যেন প্রজাপূর্ণ জনপদ। সুখের সংসার। তাঁদেরও ভ্রান্তি। সজীব সোনার হরিণ এসেছে বনে। কি অভিরাম স্বর্ণাজিন! কি সুন্দর স্বর্ণ-শৃংগ। বধূর প্রার্থনায় মৃগের প্রতি ধাবিত হলেন ঋষিবেশী রাজপুত্র। হায় মায়া স্বর্ণমৃগ—সে কি সত্য? তবু ভ্রান্ত হলেন নররূপী নারায়ণ।

কে এই মোহিনী যার মায়ায় মোহিত ত্রিভুবন? কে এই নিকৃতি-নিপুণা, যে প্রতি মুহূর্তে ছলনা করে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে? আলেয়ার মত রূপসী, মৃগতৃষ্ণিকার মত মায়াবিনী—কে এই বিভ্রমবতী?—স্মৃতিকে নিমেষে ডুবিয়ে দেয় বিস্মৃতির অতল সাগরে?

নাম তার 'স্মৃতিহরা'। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে বিশ্বের স্মৃতি হরণ করছে সে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংসারীর ওপর বিস্তৃত তার ভীষণ মায়াজাল। ভয়ংকরী সে, স্মৃতির প্রলয়ংকরী। বিষকন্যার মত বিভ্রমবতী।

শুক্র-শোণিতে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয় জীবসত্তার বীজাঙ্কুর। ক্রমে গঠিত হয় অংগপ্রত্যঙ্গ, উপাংগ। উদ্ভবকোষে বর্ধমান সত্তা—পূর্বজন্মের সংস্কার ও স্মৃতির একটি বুদ্‌বুদ—অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল। গর্ভবাস যন্ত্রণায় কাতর সে প্রতিজ্ঞা করে—আর দুষ্কর্ম নয়, এ জন্মে সুকৃতি অর্জন করব, সুগতি লাভ করব। সহসা সূতিমারুত তাকে আকর্ষণ করে, উদর থেকে অধঃশিরায় নিষ্ক্রান্ত হয় জীব। জন্মমাত্র অলক্ষ্যে আসে 'স্মৃতিহরা', মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে গর্ভস্মৃতি। কোথায় জীবের জ্ঞান? কোথায় তার কল্যাণী ইচ্ছা?—'বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি।' ভ্রষ্ট স্মৃতি, মোহগ্রস্ত জীব আবার সংসার-মায়ায় বদ্ধ হয়। আবার কাম, আবার ক্রোধ, আবার পঞ্চেন্দ্রিয় ষড়রিপুর তাড়না। এমনি করে কৈশোরে, পৌগণ্ডে, যৌবনে, বার্ধক্যে—জীবন ভরে চলে স্মৃতিহরার লীলা। তারপর জীব উপস্থিত হয় মৃত্যুর দ্বারে। তখনো অপূর্ব মোহিনীর বেশে আসে মৃত্যুদূতী 'স্মৃতিহরা'। পশ্চাতে প্রিয়জনের করুণ ক্রন্দন, সম্মুখে বিভ্রমবতী স্মৃতিহরার রূপমায়া। অলক্ষ্য শক্তি বিস্তার করে সে স্মৃতি আকর্ষণ করে। চেতনাশূন্য জীব মূর্ছিত হয়, বুঝতেও পারে না, কে কাঁদে, কে আকর্ষণ করে। তারপর ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আশ্চর্য সে স্মৃতিলোপ!

অতি ভীষণ স্মৃতিহরার ক্ষ্যাপামি। উন্মাদিনীর মতই সে জ্ঞানশূন্যা। তার স্মৃতিভ্রংশতা আরো শোচনীয়। অথচ সে রূপসী। আলেয়ার মত, মরীচিকার মত, স্বর্ণমৃগের মত তার বিভ্রান্তিকর রূপ; অবশ্য রূপের সে জলুস আজ আর নেই। রূপসী আজ নিজে উন্মাদিনী। তবু যে রূপ অবশিষ্ট আছে, চুম্বকের মত তার আকর্ষণ। আজ তার কটা কটাক্ষ, জটার মত কুটিল কেশ, রক্তাক্ত কর্তরিকল্প দন্ত-পংক্তি, অতিকৃত অসহ্যসম চরণ। আজ উগ্রা ভৈরবীর মত সে ভীষণা। তবু মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে জাগে সেই রহস্যময়ী রূপ, চপলার মত চকিতে চমক দেয় সেই মোহিনী হাসি। মানুষ মোহগ্রস্ত হয় তারই মায়ায়।

রূপের কেন এমন বিপর্যয়? ভুবন-মোহিনী সৌন্দর্যের কেন এমন শোচনীয় পরিণাম? কোথায় তার জীবনের সামঞ্জস্যের সুর? নয়নে উজ্জ্বল দীপ্তি, সাবলীল হংসগতি কি ছিল না তার? কেমন করে নিভলো নীল নয়নের জ্যোতি—এলো

আলেয়ার পাণ্ডুরতা? কিসের কঠিন আঘাতে ছিন্ন হল হৃদয়-বীণার তার?

—সে এক লোক-বিশ্রুত সকরুণ পুরাণ কাহিনী!

কমলযোনি ব্রহ্মার সত্ত্বগুণাত্মক কলেবর থেকে একে একে উৎপন্ন হয়েছে সত্ত্বগুণাধার ধর্ম, ধর্মপ্রভব দেব-দেবতা, ঋষি। তাঁর তমোমাত্রাত্মিকা তনু থেকে সৃষ্টি হয়েছে মহামোহ অধর্ম, অধর্ম-প্রভব ক্ষুৎকাম অনাসৃষ্টিঃ হিংসা, ক্রুরতা, মিথ্যামতি, দুঃখ, ভয় বেদনা—বিশ্বের বিভীষিকা এরা। এই বংশেরই আর একটি লোকত্রাস সন্তান 'দুঃসহ'।

দুঃসহ চিরক্ষুধাতুর, চির অধোমুখ, চির অসহিষ্ণু। প্রচণ্ড ধর্মবৈরী সে। তার ভার্যা 'নির্মাষ্টি'। নির্মাষ্টি যমদুহিতা। যেমন কুটিলা, তেমনি ভয়ংকরী। এই দুঃসহ-নির্মাষ্টির ষোড়শ সন্তান—আট পুত্র, আট কন্যা, তথোক্তি, পরিবর্ত, অংগধ্রুক, প্রমুখ পুত্র অতি ভীষণ জগৎ-অমঙ্গলের নিদানঃ নিয়োজিকা, ভ্রামণী, স্বয়ংহারিকা প্রভৃতি কন্যা বিশ্ব-বিভীষিকা। বিনাশকালে এরাই জীবকে আক্রমণ করে, অধর্মের সংগে যুক্ত করে প্রাণীকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়। দুঃসহের প্রত্যেকটি সন্তান সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ও মৃত্যুদূতী। দৌঃসহগণের দৌরাত্ম্যে ব্যাপ্ত নিখিল জগৎ।

এই দুঃসহ-নির্মাষ্টির অন্যতমা নন্দিনী 'স্মৃতিহরা'। নিখিল মানুষের দুঃখের কারণ সে। সে কামগতি, কামচারিণী, ছলনাময়ী। সে বিদ্বেষিণী—বিশ্বের বুকে দারুণ অক্ষমা। স্মৃতির প্রলয় সৃষ্টিতে সে অদ্বিতীয়া।

কিন্তু আকৃতির দিক থেকে দুঃসহের কুলে আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই স্মৃতিহরা। অদ্ভুত তার রূপ। সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন রূপ সমুদিত একটিমাত্র সন্ধ্যাতারার, প্রলয়-রাত্রিতে যেমন রূপ চঞ্চলা চপলার—তমোময় তামসকুলে তেমনি রূপ এই কন্যার। মনোহরা স্মৃতিহরা যেন তমিস্রার দীপশিখা।

কৃষ্ণকায় মিথুন-সমাজে কোথা থেকে এল এই প্রভাতরশ্মি জ্যোতি—ভেবে পায় না মাতাপিতা। এ যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর চুরি-করা অংগকান্তি। নয়নে সুরাংগনার স্নিগ্ধ দীপ্তি, ভ্রূবিলাসে স্বরপ্সরীর ভংগি, অংগে অংগে বিম্বাধরীর লাস্য। রুচিরা স্বর্গশ্রী যেন শাপভ্রষ্টা হয়ে এসেছে অধর্মের বংশে। বারেকমাত্র দর্শনে সে কান্তিচ্ছটা নয়নদ্বয় মোহিত করে, দেহে জাগায় উন্মাদনা। পরমুহূর্তেই স্তম্ভিত মন, লুপ্ত স্মৃতির সূত্র। সকলে আদর করে তাকে ডাকে বিভ্রমবতী, উন্মাদিনী। তার সার্থক নাম স্মৃতিহরা।

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—ভাবে দুষ্ট-মতি দুঃসহ। কিন্তু তার রাজ্যে কোথায় এমন যোগ্য পাত্র? কুরূপ, কদাকার, ভীষণদর্শন প্রজায় পূর্ণ অধর্মের কুল—কেউ বিকলাঙ্গ কেউ বিকৃত। সুন্দর-দর্শন পুরুষ ধর্মরাজ্যের অধিবাসী। যেমন শুদ্ধ তাদের অন্তর, তেমনি নয়ন-মোহন রূপ—যেন স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সুন্দর প্রতিকৃতি।

অনেক চিন্তার পর দুঃসহ এসে উপস্থিত হল রাজা ঔশীনর শিবি-পুত্রের সভায়। ত্যাগশুদ্ধ নির্মল শিবিবংশ, দানধর্মে প্রতিষ্ঠিত ঔশীনর কুল। শিবিপুত্র নিজে যেমন ধর্মশীল, তেমনি রূপবান। অশ্বিনী-কুমারের মত তাঁর রূপ, শশাংক-সদৃশ কান্তি। দুঃসহ ভাবল, রূপবান অবশ্যই

রূপের মর্যাদা রক্ষা করবেন। তাই রাজাকে উদ্দেশ করে বলল সে, 'আমার বংশে কমলাক্ষী কমলার মত প্রস্ফুটিত হয়েছে এক কমলিনী। নাম তার স্মৃতিহরা। রাজ-রাজেশ্বরীর মত রূপ—রাজভোগেরই যোগ্যা। তার লক্ষণ পরীক্ষা করে আপনি তাকে গ্রহণ করুন।'

যোগ্যকে সমাদর করা রাজারই কর্তব্য—ভাবলেন শিবিধর্মে প্রতিষ্ঠিত ঔশীনর। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন লক্ষণ-বিদ্‌ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করলেন দুঃসহের গৃহে।

যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি হল না। ব্রাহ্মণেরা এসে উপস্থিত হলেন পরীক্ষা-গৃহে। বিচিত্র আসন, বিচিত্র ভোজন-পাত্র, বিবিধ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার্য। 'নৃত্যান্বিত ভোজনে বিপ্রাঃ'—কিন্তু নৃত্যের কথা ভুলে গেলেন ব্রাহ্মণবর্গ। আহার্যের চেয়েও আকর্ষণীয় এক রূপপ্রতিমা তাঁদের সম্মুখে। সে স্মৃতিহরা। দীপ্ত কাঞ্চনের মত অঙ্গবর্ণ, পরিধানে শুভ্র চীনাংশুক। শুভ্র অভ্র ভেদ করে যেমন ষোড়শকলায় প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণ চন্দ্র, তেমনি সূক্ষ্ম রেশম ভেদ করে পূর্ণ প্রকাশিত নবযৌবনের ফুল্ল সুষমা। সযত্নগঠিত অঙ্গে সযত্ন-বিন্যস্ত আভরণ—যেন একখানি রহস্যময় স্বপন!

বিমুগ্ধ লক্ষণবিদ- বটুবৃন্দ। 'অহো রূপম্‌ অহো রূপম্‌' ভাবতে ভাবতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটল তাঁদের। বিকলচিত্তে হাস্যকর কাণ্ড করে বসলেন তাঁরা। কেউ আসন ভেবে বসে পড়লেন আহার্যস্থালীতে, কেউ আহার্য মনে করে আসনকেই তুলে ধরলেন মুখে; কারো বা আসনে উপবেশন করতে গিয়ে হল পদস্খলন, কেউ বা 'প্রাণায় স্বাহা' বলে আহার্য দ্রব্যকে অর্পণ করলেন মস্তকে।

অস্থিরচিত্ত এই বটুবৃন্দ পরীক্ষা করবে তার রূপ?—চারু দন্ত পংক্তি বিকাশ করে উচ্চ সশ্লেষ হাস্য করে উঠল কুটিলা স্মৃতি-হরা। লজ্জিত হলেন লক্ষণ-বিশারদ ব্রাহ্মণ। পরমুহূর্তে ক্রোধে আরক্ত হলেন তাঁরা। অতি ভীষণ অপমানিতের ক্রোধ। সত্যকে আচ্ছন্ন করে রুদ্ররোষ। রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে মিথ্যাবাক্য বললেন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ, 'অপ্সরী নয়, এক কাল-কর্ণী যক্ষী। সম্রাজ্ঞী হবার যোগ্যা সে নয়।'

বিনাবিচারে তাঁদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করলেন ধর্মভীরু ঔশীনর। নির্লোভ, সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁরা মিথ্যাই বা বলবেন কেন? দুঃসহের গৃহে সংবাদ প্রেরিত হল—স্মৃতিহরাকে গ্রহণ করা রাজার পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্রোধে উত্তপ্ত হল স্মৃতিহরা। এত দর্প রাজার? তিনি কি এতই নির্মোহ যে স্মৃতিহরার রূপ তার কাছে তুচ্ছ! একবার যদি সুযোগ আসে দেখে নেবে সে, কত বড় যত্নাত্মা রাজা ঔশীনর। রুষ্টা হয়ে রইল আহতা ভুজঙ্গিনী। সুযোগ পেলে বিষোদ্গার করবে সে।

ঔশীনরের পরম বন্ধু, আবাল্যের সহচর, সুযোগ্য সেনাপতি অহিপারক। ধর্মবুদ্ধিতে ও কর্তব্যে সে অবিচল। সে শাস্ত্রপারঙ্গম অস্ত্রাভিজ্ঞ। রাজা স্মৃতি-হরাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন জেনেই সে তাকে বিবাহ করল। রাজা জানলেন না, আহতা নাগিনী আশ্রয় পেয়েছে তাঁরই রাজ্যে, দংশন করার সুযোগ খুঁজছে সে। বন্ধুবৎসল অহিপারকও জানতে পারেনি পত্নীর অভিসন্ধি। সে শুধু জেনেছে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে—আশ্চর্য স্মৃতিহরার উন্মাদিনী শক্তি, অতিশয় বিভ্রান্তিকর তার রূপ। ইচ্ছা করলে যে কোন মানুষকে সে উন্মাদ করতে পারে।

সেদিন শিবিরাজ্যে কার্তিকী পৌর্ণমাসী উৎসব। চন্দ্রিকাস্নাত, আলোকমালায় সজ্জিত সন্ধ্যায় এইদিন রাজা নগর প্রদক্ষিণ করেন, গৃহের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে বিতরণ করেন দৃষ্টি-প্রসাদ। অহিপারকের গৃহে থাকবার উপায় নেই নগর সীমান্তে অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তার ওপর। বহির্গমনকালে স্মৃতিহরাকে উদ্দেশ করে সে বলল, 'আজ কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসব। রাজা নিশ্চয় আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হবেন। তাঁকে দর্শন দিও না তুমি।'

'কেন, ভয় কিসের?'

'তুমি কি জানো না, অতি উন্মাদক তোমার রূপ!'

'রূপজয়ী রাজর্ষি ঔশীনর। তিনি নির্মোহ।'

'রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও নির্মোহ ছিলেন, তাঁরও পরাজয় হয়েছিল।'

'অজের তোমার রাজা, তিনি নিষ্কাম। প্রভুভক্ত সেনাপতির ন্যায় কর্তব্যই পালন করব আমি।'

বর্মচর্মে আবৃত অহিপারক বহির্গত হল নিজের কর্তব্যপথে। জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল স্মৃতিহরার হিংসাকুটিল চোখ। প্রত্যাখ্যানের মর্মজ্বালায় অস্থিরা রূপ-প্রমত্তা। আজ প্রতিশোধ নেবার মাহেন্দ্র যোগ। দাসীকে নির্দেশ দিল সে, 'রাজা উপস্থিত হলেই সংবাদ দিবি আমাকে।' স্বভাবসুন্দরী তিলোত্তমা তারপর মনোনিবেশ করল অঙ্গ-প্রসাধনে। কন্দর্পের দর্পহরণ করতে হবে আজ।

ক্রমে প্রতীচী সীমান্তে অস্তে গমন করলেন দীপ্ত দীধিতি দিবাকর, পূর্বাচলে দেখা দিলেন যামিনী-শ্রী চন্দ্র। মহাতেজা মহর্ষি অত্রির নয়ন-সম্ভূত স্নিগ্ধ তেজে সোমের জন্ম—পূর্ণিমায় তাঁর পূর্ণ সমৃদ্ধি। সুস্নিগ্ধ কিরণ বিস্তার করে সমগ্র সৃষ্টিতে রসসঞ্চার করেন তিনি। রসময় হয়ে ওঠে ওষধি-বনস্পতি, প্রাণ-

চাঞ্চল্যে উন্মাদ হয় নিস্তরঙ্গ সাগর। এই চন্দ্রোদয়ে শিবিপুরী অপূর্ব শোভা ধারণ করল। গৃহচূড়ায় দীপমালার দীপালি, পুষ্পহারে সজ্জিত গৃহতোরণ। পূর্ণচন্দ্র, ফুল্লকুসুম, উজ্জ্বল দীপালোক, মধুর সঙ্গীত। উৎসবমত্তা শিবিপুরী যেন দ্বিতীয় অমরাপুরী।

অহিপারকের গৃহও আজ সৌন্দর্য-শোভার সার। শুভ্র স্ফটিকে নির্মিত দ্বিতল মর্মর প্রাসাদ, প্রাচীর-গাত্রে মনঃশিলার মণিদীপ্তি। রাত্রির সহস্র চক্ষুর মত জ্বল-জ্বল্ করছে তাদের দ্যুতি। তোরণে সহস্র দীপসজ্জা, আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত প্রাসাদ-প্রাকার।

প্রজাবৎসল প্রিয়দর্শী রাজা ঔশীনর বহির্গত হয়েছেন নগর-ভ্রমণে। সপ্তাশ্ব-বাহিত রথ চলেছে মৃদুমন্দ গতিতে। অগ্রে, পশ্চাতে পাত্র, মিত্র, সভাসদ। বাদ্যভাণ্ডে মুখর উৎসব যাত্রা। প্রিয়দর্শন রাজা আজ দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি-প্রসাদ বিতরণ করছেন। উন্মুক্ত পুর-বাতায়ন। গবাক্ষপথে সহস্র পুরনারীর নীল উৎসুক নয়ন রাজাকে অভিনন্দিত করছে। ওপর থেকে ধারাসারে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, বর্ষিত হচ্ছে খই, শুভ্র লাজাঞ্জলি। আজ রাজায়-প্রজায় মিলন, আজ রাজায়-প্রজায় দৃষ্টির কোলাকুলি। ধন্য রাজা, ধন্য তাঁর প্রজা।

উৎসব-যাত্রা এসে দাঁড়াল অহিপারকের গৃহ-তোরণে। কি আন্তরিক নিষ্ঠা। রাজা জানেন না, কার এ গৃহ, কে গৃহস্বামী। যে-ই হোক সে রাজভক্ত প্রজা। উৎসবের মর্যাদা যথাসাধ্য রক্ষা করতে যত্ন করেছে সে। পরিতৃপ্ত রাজার রথ এসে থামল বহির্দ্বারে।

দাসী এসে ত্বরিতে স্মৃতিহরাকে জানাল রাজার আগমন সংবাদ। সর্বশৃঙ্গার-বেশাঢ্য সজ্জা, পুষ্পকরণ্ড হস্তে স্মৃতিহরা এসে দাঁড়াল বাতায়নপথে। কিন্নরী-লীলায় রাজার মস্তকে সে পুষ্প বর্ষণ করল। দাসীরা বাজাল শুভ শঙ্খ।

সবিস্ময়ে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করলেন যশস্বী ঔশীনর। বাতায়নপথে কে এই সুন্দরী? আবক্ষমস্তক মাত্র প্রকাশিত, যেন তৈলচিত্রে অঙ্কিত একটি চিত্রার্ধ। এ কি গন্ধর্বকন্যা, অপ্সরী, না সুরবালা! রহস্যময় চন্দ্রালোকে রাজার মনে হল, স্বপ্নাবেশময় সুরলোকে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। দৃষ্টির সম্মুখে জ্যোতির্বিমণ্ডিতা সুর-কন্যা; রাকাচন্দ্রের মত অঙ্গবর্ণ, সুবিন্যস্ত কবরী, সীমন্তে চন্দনচর্চিত রক্তসিন্দুর। মরি মরি, কি রূপ! কি অপরূপ প্রসাধন-নৈপুণ্য! বিধাতার নির্মাণ-কৌশল সেই দেহ, মানুষের কলাচাতুর্য সেই সজ্জায়—যেন উভয়ের শিল্পরচনা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই অঙ্গে তাঁদের স্ব স্ব শক্তিসীমা নিঃশেষ করেছে।

বিক্রমে আদিত্যতুল্য ঔশীনর, সংযমে ব্রহ্মচারীতুল্য শিবিপুত্র মুহূর্তে বিক্রম ও সংযম হারিয়ে ফেললেন। বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'কে এই রমণী?'

উত্তর করলেন অমাত্য প্রধান, 'মহারাজ, ইনি আপনার হিতকাম সেবক অহিপারকের পত্নী। দুঃসহ কুলে উৎপন্না ইনি বিভ্রমবতী স্মৃতিহরা।'

স্মৃতিহরা! যাচক হয়ে যার পিতা এসেছিলেন তাঁরই দ্বারে? লক্ষণবিশারদ
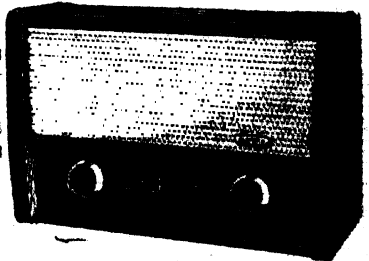
পণ্ডিতগণ যার লক্ষণ পরীক্ষা করে বলেছিলেন—ও একটা যক্ষী, কালকর্ণী?

ক্রোধে আরক্ত হলেন ঔশীনর। করজোড়ে নিবেদন করলেন অমাত্য—'এই বিভ্রমবতী কন্যাকে গ্রহণ করলে আপনি রাজকার্যে উদাসীন হবেন, তাই আপনাকে মিথ্যা বলা হয়েছিল মহারাজ!'

ঈষৎ শান্ত হলেন রাজা। যথার্থই বটে। অলোকসামান্য এ রূপের অত্যাশ্চর্য মোহিনী শক্তি। অতি উন্মাদক এর মাদকতা। নিজের অজ্ঞাতসারে পুনর্বার ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ধর্মশীল ঔশীনর। কোথায় রূপমায়া?

রুদ্ধ বাতায়ন, অন্তর্হিত লাবণ্যরাশি। রাজার মনে হল, সহসা অস্তমিত হয়েছে চন্দ্র, সহসা নিভে গিয়েছে দীপের সহস্র আলো, সহসা কৃষ্ণ যবনিকার মত নেমে এসেছে অন্ধকার। দোলাচল চিত্ত নৃপতি আর অগ্রসর হতে পারলেন না। গম্ভীর মুখে সারথিকে বললেন তিনি, 'রাজপ্রাসাদে রথ ফিরিয়ে নিয়ে চল সারথি।'

নিমেষে নীরব হয়ে গেল উৎসববাদ্য, নীরব হলো প্রমত্ত কোলাহল। আজানেয় অশ্ববাহিত রথের গতিমুখ ঘুরে গেল। বিরস বদন রাজাকে বহন করে লঘুসঞ্চারে রথ ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। কারো সঙ্গে কথা বললেন না রাজা। স্খলিত চরণে স্বকক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিলেন তিনি। রুদ্ধ হয়ে গেল কক্ষদ্বার।

পরদিন আর রাজসভা বসল না। অমাত্যগণ নীরবে প্রতীক্ষা করলেন, প্রার্থী নিরাশ হয়ে ফিরে গেল, বিচারার্থী বিমুখ হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করল, রাজসিংহাসন রইল শূন্য। শিবিরাজ্যে এই প্রথম নিয়মভঙ্গ। রাজা সেই যে শয্যা আশ্রয় করেছেন, আর বাইরে আসেন নি। কে জানে, তাঁর অন্তরে চলছে কোন স্বর্গ ও নরকের কি ভীষণ দ্বন্দ্ব!

চিন্তিত হলেন অমাত্যবর্গ। অহিপারককে জানালেন তাঁরা,—সেনাপতির গৃহদ্বারে পৌঁছেই বিচেতন হয়েছেন ঈশ্বরতুল্য নরেশ্বর।

অহিপারক বুঝল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। দ্রুত গৃহে ফিরে অভিযোগের সুরে স্মাতিহরাকে প্রশ্ন করল সে, 'রাজাকে দর্শন দিয়েছ তুমি?'

'আমি! কখন?'

'কাল কার্তিকী পূর্ণিমার সন্ধ্যায়!'

'কে জানে, তিনিই রাজা কি না! গৃহদ্বারে এসে একটি রথ থেমেছিল বটে! সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি হবেন বিবেচনা করে আমি বাতায়ন-পথে তাঁর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করেছি।'

'সর্বনাশ করেছ। তিনিই রাজা। তোমায় দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন।' বিজয়ের আনন্দে নৃত্য করে উঠল উন্মাদিনীর অন্তর।

আশ্চর্য ছলনাময়ী নারী। হৃদয়ে কুটিল হাসা, মুখে ছদ্ম বিষাদ গাম্ভীর্য। কপট সমবেদনার সুরে টেনে টেনে বলল সে, 'ভারি দুঃসংবাদ! এখন উপায়?'

'উপায়?'—উত্তর দিতে পারে না অহিপারক। দুঃখে ক্রোধে জর্জর হৃদয়। পাগলের মত সে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে।

বিজয়োল্লাসে বিহ্বলা বিজয়িনী। শিকারকে হিংস্র নখরে আহত করে সুতীব্র উল্লাস দৃষ্টি নিয়ে প্রতীক্ষা করে ব্যাঘ্রী। যন্ত্রণায় ছটফট করে শিকার—পাশব প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যাঘ্রীর বদন। তেমনি পৈশাচিক উল্লাসে উল্লসিতা হয় রূপদর্পিতা স্মৃতিহরা। ঔৎসুক্যে সে প্রতীক্ষা করে,—আরো কি তৃপ্তিকর সংবাদ বহন করে আনে তার স্বামী!

ওদিকে চিন্তাক্লিষ্ট অহিপারক এসে উপস্থিত হয় প্রজাবৎসল, তপোধীর ঔশীনরের কক্ষদ্বারে। অর্গলবদ্ধ কক্ষ। কক্ষমধ্যে অস্থির পদচারণা ধ্বনি। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ হা-হুতাশ, তীব্র আত্ম-সংযমন। 'ছি ছি—শিবিপুত্রের একি চিত্ত-বৈকল্য! এতদিনের অভ্যস্ত সংযম, এতদিনের অর্জিত ঋদ্ধি, তার এই পরিণাম? রূপমোহে পদভ্রষ্ট ধর্মাত্মা? অনঙ্গ আজ সঙ্গোন্মুখ, অনাসক্ত আজ অনুরক্ত! রাজা কিনা প্রজার সম্পদ-লোলুপ! ধিক্ আমার শিক্ষায়, ধিক্ আমার জীবনে।'

হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় অহিপারকের। রাজার এই মোহ, এই দুঃখের হেতু সে। সে যদি স্মৃতিহরাকে গ্রহণ না করত, তাহলে এ বিপর্যয় ঘটত না আজ। এর প্রতিবিধান করতেই হবে। মুহূর্তে বুদ্ধি স্থির করে সে, কক্ষদ্বারে করাঘাত করে বলে, 'দ্বার খুলুন মহারাজ!'

কক্ষাভ্যন্তর থেকে উত্তর আসে, 'কে?'

'আমি অহিপারক।'

'অহিপারক! না-না, তুমি ফিরে যাও!'

'ফিরে যাব না। প্রজা রাজার দর্শনপ্রার্থী।'

'রাজা আমি নই। বিনষ্ট আমার রাজধর্ম!'

'শিবিরাজ্যে রাজধর্ম বিনষ্ট হতে পারে না। দুয়ার খুলতেই হবে। আমি শুধু প্রজা নই, আপনার ভৃত্য। ভৃত্য কি প্রভুর দর্শনলাভে বঞ্চিত হবে?'

পবিত্র-মধুর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন না রাজা। কিন্তু আজ কে প্রভু, কে ভৃত্য? আজ অনঙ্গায়ত্ত ঔশীনর। আর্তনাদ করে তিনি বলেন, 'এ আমি নই। আমি ভৃত্যেরও অধম অহিপারক!'

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারী রাজার দৈন্যে অহিপারক অশ্রু সংবরণ করতে পারে না। সিক্ত কণ্ঠে সে বলে, 'আপনি তো শুধু রাজা নন, শুধু প্রভু নন। শৈশবের বন্ধু আপনি। বন্ধু কি কেবল সম্পৎ-কালের সঙ্গী? আপৎ-কালের কেউ নয়?'

এ কাকুতি উপেক্ষা করতে পারেন না ঔশীনর। কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে অহিপারক। এ কি মূর্তি হয়েছে রাজার! একটি রাত্রি ও একটি দিনের কয়েক প্রহরের মাত্র ব্যবধান। অকাল বার্ধক্য দেখা দিয়েছে পূর্ণ যৌবনে। চক্ষু কোটরাগত, নয়নকোণে গাঢ় কালিমা, মুখে বিনিদ্র রজনীর দুশ্চিন্তার চিহ্ন—যেন অগ্নিস্পর্শে বিশুষ্ক অম্লান পঙ্কজ। কাতরকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে বলে অহিপারক, 'উপায় থাকলেও যেন অসিধার ব্রত গ্রহণ করেছেন, মহারাজ! স্মৃতিহরা আপনার দাসী। আদেশ করলেই সে আপনার সেবায় নিযুক্ত হতে পারে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অহিপারকের প্রতি তাকান ধর্মশীল ঔশীনর। তিনি কামমোহিত, কিন্তু বিবেকরহিত নন। লজ্জার আরক্ত হয়ে বলেন, 'আমি স্মৃতিহরার রূপমুগ্ধ, একথা তুমিও জেনেছ অহিপারক? সবাই জেনেছে?' —ক্ষোভে ভেঙে পড়েন ধর্মধীর। সুগভীর আর্তনাদ ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে, 'নিষ্কলঙ্ক শিবিকুলে কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছি আমি। রাজার যদি ধর্ম গেল, তবে আর কি অবশিষ্ট থাকল, অহিপারক!'

'আপনার পক্ষে এ দৈন্য অশোভন।

আপনি রাজা, রাজ্যের প্রভু। রাজ্যের যে-কোন দ্রব্য গ্রহণে রাজার পূর্ণ অধিকার।'

'এ যুক্তি স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের। রাজা প্রজার রক্ষক। রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তাহলে তা স্বৈরাচার। আমি স্মরাতুর হলেও শাস্ত্রজ্ঞান হারাইনি, অহিপারক! 'বরং ভিক্ষার্থিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণম্'— শাশ্বত এ শাস্ত্র-শাসন।'

'শাস্ত্রে এ অনুশাসনও আছে, ভর্তা ইচ্ছা করলে পরের কল্যাণে আপন ভার্যাকে দান করতে পারে। পতি আমি, আমি স্বেচ্ছায় আমার পত্নীকে দান করছি। আপনি গ্রহণ করুন।'

মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠেন ধর্মধীর বীর ঔশীনর, বলেন, 'শিবিবংশের রাজা চিরকাল দান করেই এসেছে, দান গ্রহণ করেনি। পরার্থে প্রাণ পর্যন্ত দান করেছেন তাঁরা। দুর্বলতার সুযোগে সেই মহৎ মর্যাদায় আঘাত করছ তুমি?'

ক্ষোভে উন্মাদবৎ হয়ে ওঠেন শিবিপুত্র। ধার্মিকের হৃদয়স্পন্দ অতি প্রচণ্ড, অতি প্রচণ্ড তার অভিঘাত। আত্মদ্বন্দ্বে তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন। চিৎকার করে বলেন, 'তা হয় না। অনন্তপারা দুষ্পূরা
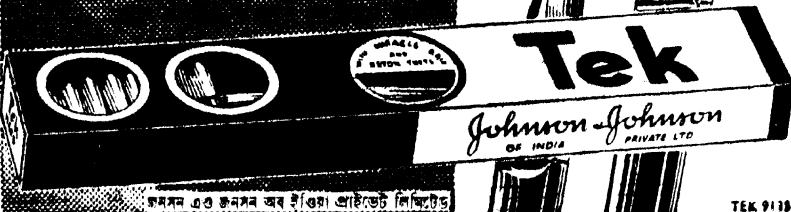
তৃষ্ণা'—তার নিবৃত্তি নেই, শান্তি নেই। আমি মৃত্যু বরণ করব, তবু তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দেব না। রাজা প্রজার নেতা, রাজার আদর্শই প্রজার আদর্শ। বক্র পথানুসারী রাজা প্রজাদের বক্রপথেই আকর্ষণ করে। সে রাজধর্ম শিবিকুলের ধর্ম নয়। তুমি যাও অহিপারক আমার ব্রত আমি রক্ষা করব।'

অহিপারক আর প্রতিবাদ করতে পারে না। দুঃখে যে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু অলঙ্ঘনীয় প্রভুর নির্দেশ। বেদনা-বিধুর হৃদয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে সে।

এদিকে চরম রূপ ধারণ করে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিস্ফোটকের মত গূঢ়দাহী যন্ত্রণা। একদিকে নীতির অনুশাসন, অন্যদিকে রূপের উন্মাদনা; একদিকে বিবেকের বাধা, অন্যদিকে কন্দর্পের প্ররোচনা; একদিকে নিয়মের বন্ধন, অন্যদিকে অনিয়মিত মোহ। অস্থির উশীনর। পঙ্কে বদ্ধ মত্ত হস্তী যেমন হস্তীপকের কঠিন কশাঘাতে পঙ্ক থেকে উত্থানের প্রয়াস করে, গভীর পঙ্ক-গহ্বর থেকে তেমনি উঠতে চেষ্টা করেন তিনি। ভীষণ দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত শিবিপুত্রের হৃদয় যেন বিবেক ও মোহের ভয়ঙ্কর রণভূমি-দগ্ধ, প্লাবিত, বিপর্যস্ত।

দশদিন ধরে চলল এই ভীষণ দ্বন্দ্ব। দশদিনে বিরহজনিত দশ দশা অতিক্রম করলেন উশীনর। লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ মোহ ও মৃত্যু। অষ্টম দিনে স্পষ্ট উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিল। ঘোর বিকার, ঘোর উন্মত্ততা। নবমদিনে অদ্ভুত মোহ—অচৈতন্য জড় দেহ। দশম দিনে বিরহের দশমী দশায় উপনীত হলেন ধার্মিক, প্রজাবৎসল রাজা।

বিষাদাচ্ছন্ন রাজা, আকুল প্রজা। চিন্তা-ক্লিষ্ট অমাত্য, পুরোহিত। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, প্রার্থনায় পূর্ণ শিবিরাজ্য। সকলের মুখে এক কথা—'সুস্থ হোন রাজা, সুস্থ হোক শিবিরাজ্য।' সর্বাপেক্ষা মর্মাহত হল অহিপারক।

কিন্তু উৎকট উল্লাস আজ স্মৃতিহরার। গর্বিতার গর্ব সার্থক তার স্মৃতিহরা নাম। নিঃশেষে খর্ব করেছে ধার্মিকের দম্ভ স্মৃতিভ্রংশ করেছে যত্তাচ্ছা পুরুষকে। নিজের প্রকোষ্ঠে বিজয়োৎসবের আয়োজন করে কুটিলা বিজয়িনী। উন্মাদের মত এসে উপস্থিত হয় অহিপারক, 'রাজার কথা নিশ্চয় শুনেছ তুমি!'

'ও, সেই রাজা!' —নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর করে স্মৃতিহরা, যেন রাজার ব্যাপারটা নগণ্য। অসহ্য মনে হয় অহিপারকের। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে, 'দুঃখ হচ্ছে না তোমার?'

'দুঃখ? কেন?' —আলেয়ার মত কুটিল দৃষ্টি স্মৃতিহরার, কণ্ঠে যেন বিষের বীণা, 'ধার্মিক তোমার রাজা, রূপাতঙ্কে কঠিন তার প্রায়শ্চিত্ত।'

'এ রূপাতঙ্ক সৃষ্টি করেছ তুমি'—গর্জন করে ওঠে অহিপারক। সশ্লেষে বলে স্মৃতিহরা, 'আমি নই। আতঙ্কের বীজ ছিল তোমার রাজারই মনে। বাইরে ধার্মিক, অন্তরে কুটিল কামনা! ভণ্ড, কামাচারী উশীনর।'

লজ্জনার রসনা যেন খোপানসী খড়্গ। ক্রোধে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় অহিপারক। পিধানমুক্ত হতে চায় অন্তরাভিজ্ঞের অস্ত্র। রুদ্রস্বরে গর্জন করে ওঠে সে।

কিন্তু মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় অহিপারক। দূত এসে ত্রস্তে জানায়, 'অন্তিম দশায় উপনীত রাজা। সচিব সেনাপতিকে স্মরণ করেছেন।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় অহিপারক। বাধা দেয় স্মৃতিহরা। প্রতিহিংসার আগুন তার চোখে, রূপের আগুন তার দেহে। সে অহিপারকের সামনে এসে দাঁড়ায়। মরিয়া হয়ে ওঠে অহিপারক। বজ্র-রবে সে বলে, 'সরে দাঁড়াও! রাজার চেয়ে প্রেয় নয় প্রিয়া, বন্ধুত্বের চেয়ে বড় নয় রূপজ মোহ!' কঠিন বীর্য দুর্বার বিক্রমে রূপকে দলিত করে চলে যায়।

গর্জন করে ওঠে অপমানিতা, যেন দলিতা ফণিনী। পিশাচীর মত জ্বল জ্বল করে তার হিংস্র চোখ! তারপর কি ভেবে সে এসে দাঁড়ায় বাতায়ন পথে, দেখে, —ঝটিকাবেগে অহিপারক চলেছে রাজ-সন্নিধানে।

রাজপথে বাধামুক্ত জনস্রোত। স্রোত চলেছে রাজপ্রাসাদের দিকে। সকলের মুখে এক প্রার্থনা, 'হে ঈশ্বর, রাজাকে রক্ষা কর।' কেউ বা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে অহিপারকের গৃহ-গবাক্ষে 'ওই পিশাচীই রাজার সর্বনাশ করেছে! নিপাত যাক্ যক্ষী।'
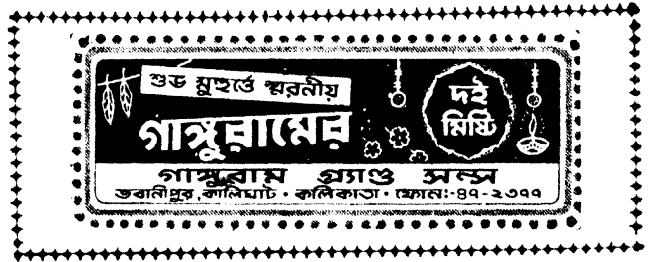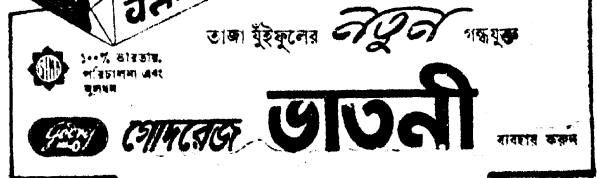
স্তব্ধ স্মৃতিহরা। কে যেন কণ্ঠ রোধ করেছে তার। অথবা কে জানে, স্তব্ধ সাগরতলে রচিত হচ্ছে কিসের আবর্ত! অথবা এ স্তব্ধতা প্রলয়ের পূর্বাভাস।

সহসা দূরে থেকে ভেসে আসে বিষাদ-ঘন বিপুল ক্রন্দন। হাহাকারে পূর্ণ গগন, পূর্ণ প্রতিটি ভবন। যূপকাষ্ঠে নিহতশির কোটি কোটি মেষশাবক যেন সমবেত আর্ত ক্রন্দনে দিঙ্মণ্ডল কাঁপিয়ে তুলছে। বিদীর্ণ হয়ে যায় স্মৃতিহরার কর্ণ। তবু সে স্থির। তার বক্ষ বেদনাহীন, তার কণ্ঠ ক্রন্দনহারা। দাসী এসে বৃথাই জানিয়ে যায়, 'শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রজাপ্রিয় ঔশীনর।' —তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিহরা। অবিকৃত বদন, অবিচল হৃদয়, শুষ্ক স্থির নয়ন—যেন নিষ্প্রাণ অনড় পাষাণ।

নিষ্পলক দৃষ্টিপথে দিবসের গতি অগ্রসর হয়। ত্রিবিক্রম সূর্যের রথ এগিয়ে চলে। ত্রুটি, বেধ, লব, নিমেষ, ক্ষণ কাষ্ঠা লঘু দণ্ড, মুহূর্ত, প্রহর অতিক্রান্ত হয়। সপ্তাশ্ববাহিত হিরণ্ময় রথ এখন মস্তক-শীর্ষে। তৃষ্ণার্ত অশ্ব যেন মরুর মত জিহ্বা বিস্তার করে ভবনরস পান করছে। অনাথ প্রজাবর্গের হাহাকার যেন ক্লান্ত সপ্তাশ্বের শ্রান্তিহীন হ্রেষা। কে যেন দারুণ কশাঘাত করেছে তাদের।

ক্রমে উপস্থিত হয় অপরাহ্ণকাল। তপ্ত-শ্বাস পরিত্যাগ করে উত্তপ্ত ধরণী। শুষ্ক সমীরণে সমীরিত দীর্ঘশ্বাস। একটা শূন্য ঘূর্ণি ধরণী-ক্রোড় থেকে আকাশের দিকে উড়ে চলে।

শবযাত্রা বেরিয়েছে রাজপথে। অপার জনসাগর। কৃষ্ণসাগরে কোটি কোটি কৃষ্ণ চলোর্মি। নীরবে বর্ষিত হচ্ছে অশ্রুধারা, কৃষ্ণ ঊর্মির সিক্ত শীকর। কি গভীর নিস্তব্ধতা! মধ্যভাগে স্বর্ণপালঙ্কের শবাধার। রক্তরেশমে আচ্ছাদিত শবদেহ, পদ্মমালো আবৃত রক্ত-রেশম। কালীর দহে কি ফুটে উঠল রক্তকমল!!

গৃহে গৃহে উন্মুক্ত বাতায়ন। বাতায়ন-পথে সহস্র বরাঙ্গনার নীল উৎসুক নয়ন। আজও যেন কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসব। রাজা নগর-প্রদক্ষিণে বহির্গত হয়েছেন। দিক্‌পাল সদৃশ মহাভাগ রাজা ঔশীনর। প্রিয়দর্শী তিনি, লোকপ্রিয়। সহস্র সহস্র পুরঙ্গনা অন্তরের শুভ কামনা নিয়ে পরম আগ্রহে নয়নভরে দর্শন করছে প্রিয়-দর্শী রাজাকে। ধারাসারে হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি —রঙীন শুভ কামনা; বর্ষিত হচ্ছে শুভ্র লাজাঞ্জলি—হৃদয়ের পবিত্র আশীর্বাদ! আজও রাজার পাশে পাশে চলেছে কাতারে কাতারে অমাত্য, সদস্য। সেদিন তারা ছিল মুখর, আজ মূক। আজ তাদের মৌনব্রত। উপরন্তু আজ রাজার সংগে পদব্রজে চলেছে সৈন্যাধ্যক্ষ অহিপারক, রাজার আবাল্যের বন্ধু,—নগ্নশির, নগ্নপদ, আনত আনন। গভীর শোকে নিরস্ত, নিরস্ত্র অস্ত্রবীর।

শবযাত্রা অহিপারকের গৃহের সম্মুখে আসে। মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে জনসমুদ্র, মুহূর্তে গর্জমুখর হয়ে ওঠে উত্তাল তরংগ। ক্রুদ্ধ শ্লেষ বর্ষিত হয় বাতায়নে। আবার সব নিস্তব্ধ। পুষ্প করণ্ড হস্তে দাসীরা পুষ্প বর্ষণ করে। আজ সে পুষ্পবর্ষণে কেউ সাড়া দেয় না, মুগ্ধ লোচনে কেউ ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। সভয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিহরা। স্বর্ণ-পালঙ্কের শবাধারে রক্ত-রেশমে আবৃত দেহ, পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন—কেবল অনাবৃত রাজার বদন। একখানি সুশুভ্র পাণ্ডুর প্রসন্নতা! স্থির, উদাসীন। কোথাও কি মদনাতুরতার চিহ্ন আছে? —কোথাও নেই। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে স্মৃতিহরা। তার আয়ত উগ্র চক্ষু দুটি আরো বিস্ফারিত হয়। প্রকাণ্ড, নিশ্চল, অতিশয় তীব্র তার দৃষ্টি।

শবযাত্রা অহিপারকের গৃহ অতিক্রম করে যায়। অদূরে অস্ত যাচ্ছেন প্রদীপ্ত স্বর্ণ-ভানু। রঞ্জিত সন্ধ্যাভ্রের আবরণে যেন এক-খানি দীপ্ত আনন! কিঞ্চিৎ ম্লান, কিন্তু কি প্রশান্ত, কি মহনীয়। সহসা কেমন উদাসীন!

এ ঔদাসীন্য স্মৃতিহরাকে উত্তেজিত করে তোলে না, এ অপমানে দুঃসহ-নন্দিনী অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে না। নিঃশেষিত

কি প্রতিশোধ স্পৃহা? কালনাগিনীর চোখে কি আজ অন্ধকার?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। শূন্য রাজপথে আলো জ্বলে না। অহিপারকের গৃহও আজ নি-প্রদীপ। শোকের কালিমায় আচ্ছন্ন নগরী, মূর্ছাহত পুরবাসী। এই অনন্ত শোকের ছায়া নিয়ে নেমে আসে কৃষ্ণাদশমীর তামসী রাত্রি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্মৃতিহরা। দূরগৃহ অন্ধকারে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে কি যেন অর্থ খোঁজে সে।

হয়তো এতক্ষণ শ্মশানভূমিতে প্রেতকার্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে রাজোচিত মর্যাদায়। দক্ষিণ শিরায় শয়ান ধর্মশীল শিবিপুত্র। মন্দাকিনী নীরে স্নাত শব—সপ্ত ছিদ্রে সপ্ত রত্ন, গন্ধচন্দনে চর্চিত রাজদেহ, পরিধানে শ্বেত উত্তরীয়। রাজপুরোহিত অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন প্রেত-আবাহন মন্ত্রঃ 'এহি প্রেত সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বেণেভিঃ'—আর যেন শোনা যায় না: কোটি কণ্ঠের আর্তনাদে মন্ত্রধ্বনি মজ্জিত হয়ে যায়। তুগ ও পদ্ম নামক গন্ধদ্রব্য-মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠের চিতায় আরূঢ় শব : সহস্রকণ্ঠে অগ্নির আবাহন: হাহাকার, বিপুল আর্তনাদ। ওই লক্ লক্ করে বুঝি জ্বলে উঠল চিতা!

নিস্তব্ধ স্মৃতিহরা। তার বিস্ফারিত চক্ষু আরও বিস্ফারিত হয়। কৃষ্ণাদশমীর রাত্রিতে ভুজঙ্গসুর কি নিদ্রাভঙ্গে নয়ন মেলে তাকিয়েছে? ঘোর কৃষ্ণদেহে ঘোর আরক্ত দৃষ্টি! তার লেলিহান জিহ্বা! পুরোহিতের কণ্ঠে উচ্চারিত গম্ভীর মন্ত্র যেন বজ্রমন্দ্র কার ভর্ৎসনা:

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর
কৃতং স্মর॥

—মহাবায়ুতে বিলীন প্রাণবায়ু। এখন স্মরণ কর, স্মরণ কর। স্মরণীয় যা কিছু, স্মরণ কর, যা করেছ স্মরণ কর, কৃতকর্ম স্মরণ কর—'ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।'

কিছুই স্মরণ করতে পারছে না স্মৃতিহরা। লুপ্ত পূর্বস্মৃতি। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। কে স্মৃতিহরা? কার ওই শব? কিসের ওই চিতা?—অন্ধকারে দিক-ভ্রান্ত পথিক। বিভ্রমবতী আজ নিজে বিভ্রান্ত।

সহসা সন্ত্রস্তে দাসী কক্ষে প্রবেশ করে, সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাকুলভাবে বলে, 'সর্বনাশ উপস্থিত!' কিছুই বোঝে না স্মৃতিহরা। শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকায় দাসীর প্রতি। দাসী এক নিশ্বাসে বলে, 'প্রভুর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ সেনাপতি, কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, কেউ বাধা দিতে পারেনি। রাজার অকালমৃত্যুর কারণ তিনি—এই বিবেচনা করে চিতায় আরোহণ করে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন প্রভুভক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ।'

ভীষণ চীৎকার করে ওঠে স্মৃতিহরা। বহুক্ষণের নীরবতা যেন একসঙ্গে উদ্দাম হয়ে ওঠে, যেন সহসা রুদ্ধ আগ্নেয় বিদারণ! বাধাবন্ধহীন উন্মাদ আবেগাগ্নি যেন দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করে। আতঙ্কে তাকে জড়িয়ে ধরে দশবারজন দাসী। বাধা কি মানে? দুর্বলার দেহে সহস্র প্রমত্তা করিণীর শক্তি! প্রোদ্দাম গতি, কণ্ঠে মুহু-মুহু স্খলিত গর্জন। ভীষণ চিৎকার! ভীষণ অঙ্গ-বিধূনন! কুটিলা হলেও স্বভাব-দুর্বলা নারী। তাই উচ্চগ্রামে বাজতে গিয়ে ছিন্ন হয় হৃদয়-তন্ত্রী। প্রলয়-কম্পনে বিপর্যস্ত দেহ-প্রাকার, চূর্ণ-বিচূর্ণ বুদ্ধির দুর্গ।

তারপর সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তির এক শোচনীয় পরিণাম। কাঞ্চনের মত অঙ্গবর্ণ বহুদিনের খররৌদ্রে বিবর্ণ হয়ে গেল, সুবিন্যস্ত কেশপাশ হল অবিন্যস্ত। দীর্ঘদিনের অযত্নে জটার আকার ধারণ করল কাজল কুন্তল। ঘোলাটে চোখ, অর্থহীন দৃষ্টি। কুণ্ডলীকৃত স্মৃতি—মাঝে মাঝে সুতহীন প্রলাপ। এই উত্তেজনা, এই গর্জন, এই মৃত্যুর স্তব্ধতা। কখনো বুকভাঙা আর্তনাদ! অতি মর্মান্তিক সে ক্রন্দন! বদ্ধ উন্মাদিনী স্মৃতিহরা—সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদিনী তার কুটিল প্রকৃতি। ভীষণ আক্রোশ, বিচারহীন তার আক্রমণ। সুস্থ মানুষকে মুহূর্তে মাতাল, উন্মাদ, বিভ্রান্ত করে সে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই বীভৎস উন্মত্ততার মধ্যেও কোথায়

যেন রয়েছে উদ্‌ভ্রান্তিকর এক রূপের মায়া। এই রূপ-মায়াই মানুষের স্মৃতি হরণ করে।

আজও সৃষ্টিকে উন্মাদিত করছে আলেয়ার মত রূপবতী এই উন্মাদিনী। মরীচিকার মত বিভ্রান্ত করছে এই বিভ্রমবতী। জনমে, জীবনে, মরণে, স্মৃতিহরা লুপ্ত করে দিচ্ছে স্মৃতি। ত্রিলোকময় তার প্রমত্ত সঞ্চরণ। প্রচণ্ড আক্রমণ। ধৃতব্রত সংযমীরও মুক্তি নেই তার হাতে। রূপের মোহিনী মায়া স্মৃতিহরা—স্মৃতিহরা উন্মাদিনী, স্মৃতিহরা বিভ্রমবতী, স্মৃতিহরা মৃত্যুর অগ্রদূতী।*

* দুঃসহ-নন্দিনী স্মৃতিহরার পরিচয় ও প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে মার্কণ্ডের পুরাণে (৫০—৫১ অধ্যায়); উশীনর-ঘটিত যে কাহিনীটি স্মৃতিহরার ওপর আরোপিত হয়েছে, তা 'উন্মদন্তী' জাতক থেকে গৃহীত। কথাসরিৎসাগর ও বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থেও পরিবর্তিত আকারে 'উন্মাদিনী'র কাহিনী আছে।

৬

একটু এগিয়ে আসতেই সিঁড়ি। নিচেটা ফাঁকা। কেউ নেই কি কোথাও? এ কখনো হতে পারে? এ-দিক ও-দিক একটু উঁকিঝুঁকি মারল সুকান্ত। দুটো টিকটিকি একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। ঝগড়া করছিল নাকি? কী দেখেছে বাইরে, একটা কালো বেরাল বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

কেমন যেন থমথম করছে চারদিক। নিজের নিশ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছে।

দরকার নেই, ফিরে যাই।

বাড়িটা, বাইরেটা, দেখে গেলাম—আজ এই পর্যন্ত থাক। কিন্তু কী আশ্চর্য, কদম গাছটা তো দেখিনি। কোন দিকে গাছটা? ফুলে কি গাছ ভরে ফুটে আছে, না কি একটি দুটি? নিজের মনেই হাসল একটু সুকান্ত। গাছের চেয়েও আর কিছু উঁকিঝুঁকি আর কিছু, ফুলগন্ধ দেখবারই বুঝি উদ্দেশ্য ছিল। কই তেমন তো কিছু দেখিনি সজ্ঞানে। কে যেন টেনে এনে খোলা দরজা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঢুকিয়ে দিয়েছে তো থামিয়ে দিচ্ছে কেন?

যাক, ফিরে যাই। যাবার সময় দেখে যাবখন গাছটা। একা ঢুকে দেখে নেবখন কত উঁচুতে কত ফুল ধরা।

এতদূর এসে, শুধু এসে নয়, এতটা ঢুকে পড়ে ফিরে যাবার কোনো মানে হয়? চোর হয়ে এলে বরং সহজ ছিল। এতক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হত না, দোনামনা করতে হত না। টেবিলের উপর টেবিল ক্লথটা আছে তাতে ঐ কটা বাসন-কোসন আর কাপড়চোপড় জড়িয়ে নিয়ে গলির মুখে খিড়কির দরজাটা খুলে সটকান দিলেই চলে যেত। আর যদি উপরে যাবার, ছাদে যাবার দরকার হত তাহলে সিঁড়িটা লাগত না। বাইরে থেকে গাছে চড়েই, গাছ বেয়েই, পারত হাজির হতে।

বাড়িটা অবশ্য ছোট, তাই বলে নিচে কাছে-পিঠে, একটিও লোক থাকবে না? লোক থাকলে তার কী এমন সম্পদ বাড়ত? যদি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলত, ও মশাই, শুনছেন, কাকলি দেবীকে ডেকে দিন, তাহলে কি সিঁড়িটা সুগম হত? সভাস্থলে বেদীতে ওঠবার আগে লাট-বেলাটদের জন্য যে ঘাসের উপর লাল শালু পড়ে তেমনি শালু পড়ত সিঁড়িতে? যদি জিগগেস করত, কে আপনি, একটা চলনসই উত্তর না হয় দেওয়া যেত, কিন্তু যদি নিরস্ত না হয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করত, কী দরকার, তাহলেই গলার কাছে দলা পাকাত। বরং এই ভালো হয়েছে কাছে-পিঠে কেউ কোথাও নেই। খালি মাঠে বল ফাঁকায়-ফাঁকায় এগিয়ে শেষ মুহূর্তে বলটা গোলকিপারের হাতে তুলে দেবার মত। আমি তো স্কোর করতে চাই না। ধরা পড়তেই চাই।

সিঁড়িটা যেন স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে গেছে। হয়তো এরই একটানে নাগাড়ে উঠে যাওয়া যাবে ছাদে। পাওয়া যাবে কাকলিকে। সিঁড়ি যে উপেক্ষা করতে পারে সেই শুভক্ষণকে। আর, তখন, তারপর ধরা পড়ে গেলে সুকান্তকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কাকলির ডাক পড়বে। আর, কৈফিয়ৎ দিতে, বানিয়ে বলতে, বাঁচিয়ে বলতে, মেয়েদের জুড়ি নেই।

সিঁড়ির দিকে এক পা এগুলো সুকান্ত। বুকের মধ্যে থেকে কে খুট করে উঠল। আবার থামল, আবার তাকাল চারপাশ। মহাশূন্যতার ইতিহাস ছাড়া দেয়ালে আর কিছুই লেখা দেখল না।

আচ্ছা, কী করা উচিত, যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে কী করা উচিত? পিছু হটে সদর পর্যন্ত ফিরে গিয়ে চাকরের শরণাপন্ন হবে, আর চাকর যদি ততক্ষণে পানের দোকানে বা তাসের আড্ডায় সরে গিয়ে থাকে, তাহলে খোলা দরজায় কড়া নাড়বে? কড়া কি খোলা দরজায় নাড়বার জন্যে? খোলা দরজা মানেই তো চলে এস, তোমাকে মোকাবিলা করবার জন্যে ভিতরে লোক আছে। ঠাকুর-ঠাকুর বলে ডাকবে? সেটা সম্ভ্রান্ত শোনাবে? নয়কি বন্ধ কাঠের জানলার গায়ে আঙুলের গিঁট দিয়ে শালীন শব্দ

করবে? নিজের সরু সরু আঙুলগুলির জন্যে মায়া হল সুকান্তর। কাকলির হাতের আঙুলে না জানি কি রকম দেখতে? মোটাসোটা বেঁটে-বেঁটে ভোঁতা-ভোঁতা? না কি ছুঁচলো ধারালো খরশান?

শুধু উঁকি মারলেই চলে না ঝুঁকি নিতে হয়। দু ধাপ সিঁড়ি উঠে পড়ল সুকান্ত। কিন্তু সত্যি যা সে করছে, করতে চাচ্ছে বা করে ফেলেছে তা আইনের চোখে রীতিমত অপরাধ। বিনানুমতিতে ঢুকে পড়েছে এবং ঢোকার উদ্দেশ্য, সে নিজে যাই ভান বা ভাব করুক, খুব স্বচ্ছ নয়। সুতরাং—আবার থামল সুকান্ত, আঙুল না ভেবে লাঙুল ভাবুক। আঙুল না দেখে লাঙুল দেখিয়ে পালিয়ে যাক। ছোট একটা ছেলে মেয়েও বাড়িতে নেই? কাকলি কি একশ্চন্দ্র? হয়তো আছে ভাই-বোন, কিন্তু এ সময় ভাই গিয়েছে হয়তো খেলতে আর বোন পাড়া বেড়াতে। আর ওরা থাকলেই বা এগোত কী? হয়তো গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠত, ও দিদি, নিচে তোমাকে কে ডাকছে দেখবে এস। একতারার জিনিস মাটি হত ঢাকে-ঢোলে। আর, ভাই-বোন কেন, দিদিও তো এসময়টায় একটু নিচে থাকতে পারতেন। তিনি একদম নিচে নামেন না এমন তো নয়। এবং কখনো-কখনো, এমন হওয়াও আশ্চর্য নয় যে যখন তিনি নেমেছেন তখন তিনি একলা আর নিচেটা এমনি হা-হা করা সাদা শূন্যের দেশ।

নিচে, দোরগোড়ায় বা প্রথম উঁকিতেই, দেখা হলে লাভ হত কী! কী ধরনের আলাপ হত?

কাকলি বলত, এই দিকে এসেছিলেন বুঝি?

ও, হ্যাঁ, এই পাড়ায় আমার মাসিমার বাড়ি।

কদ্দূরে বলুন তো?

ঐ যে ওখানে—হাত দিয়ে দিশেহারা একটা প্রাচ্য নাচের ভঙ্গি করে দিত।

মাঝে-মাঝে আসতে হয় বুঝি এদিকে।

কচিৎ-কদাচিৎ।

তারপরে আরো হয়তো একটু বলত কাকলি। বলত, সেদিন কী বৃষ্টি!

হ্যাঁ, বেরাল-কুকুর। মানে ক্যাটস অ্যান্ড ডগসের বাঙলা করলাম।

আর আপনি কেমন নামলেন রিকশা থেকে। নামবার কী দরকার ছিল!

রিকশাওলা আর যেতে চাইল না। আমতা-আমতা করে বলত সুকান্ত।

আর এক পা এগিয়েই তো বাস-স্টপ। অদ্দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলেই পারত। অত ভেজবার পর যত শিগগির সম্ভব বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। নামবার বা থামবার কোনো মানে হয় না।

না, কিছু না। ঢোঁক গিলত সুকান্ত। কিন্তু আপনি দেখলেন কোত্থেকে?

আমি যে ছিলাম ওখানে।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি?

না।

তবে?

ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম বৃষ্টি এসে পড়তেই আশ্রয়ের জন্যে ঢুকে পড়লাম। আমি ভিজিনি, আমার দাঁড়াবার মানে হয়। আর আপনি ডোবা জাহাজের থেকে জ্যান্ত তোলা সোয়ারি—আপনার ওখানে দাঁড়াবার, দেরি করবার মানে হয় না—

আমার বন্ধু অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিনা—

তাই। তবু—

আচ্ছা। আসি।

নমস্কার।

তার চেয়ে এ অনেক অনেক অনেকানেক ভালো যে কাকলি নিচে নেই, ছাদে আছে। 'তারপরে'র দেশে আছে। সিঁড়ি না ভাঙলে ছাদ কই। যা হয় তাই হবে, পিছু হটব না। একটা কিছু বাধা না থাকলে চলায় সুখ কী! পাশ করতে চাই অথচ পড়ার পাশ কাটিয়ে যাব, এ হতে পারে না। বাধা আছে বলেই তো মজা। সরকার চালাব অথচ বিরুদ্ধবাদী রাখব না, ডান কাত বললে সবাই একবাক্যে ঘাড় কাত করবে, এ একটা চালানোই নয়। ব্যাট করব অথচ ফাস্ট বল দেখলে উইকেট ছেড়ে আম্পায়ারের পিছে গিয়ে লুকোব এ ছেলেমানসি বললেও বেশি বলা হয়, এ শিশুয়োমি।

একটার পর একটা করে সুকান্ত সিঁড়ি

ভাঙতে লাগল। চাকরের যা বর্ণনা তাতে কোথাও ঠেকবার কথা নয়, একেবারে সোজা বন্দরে গিয়ে পেঁছুনো। আর যদি পেঁাছবার আগেই নৌকোর তলা ফুটো হয়ে যায় তো যাবে। ভরাডুবি করে দিয়ে এসেছি বলা যাবে সেন্টুকে। হাতের দান আর ফেরৎ হয় না।

দোতলা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরেছে, পিছন থেকে কে বলে উঠল: 'এ কে!'

এ একটা ধূসর বিস্ময়ের সুর মাত্র, স্বগতোক্তি, তাই সুকান্ত গায়ে মাখল না। উপেক্ষা করেই উঠে চলল।

এবার যে স্বরটা নির্গত হল সেটা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পরুষপ্রখর।

'কে?'

সিঁড়ির উপরেই থামল সুকান্ত।

'কে যাচ্ছে উপরে?'

একটা ঘুড়ি কাটা পড়ে উড়ে এসেছে ছাদে, এ যদি বলতে পারত সুকান্ত, এ বলবার যদি তার বয়স থাকত। কাটা ঘুড়ি কোথায় না নিয়ে যেতে পারে, গোঠে-মাঠে-ময়দানে বনে-জলে-জংগলে, বিদেশে-বিভুঁয়ে, ছাদ তো সামান্য। আর কাটা ঘুড়ি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলে মনে-মনে হাত তুলবে না এমন মানুষও আছে নাকি পৃথিবীতে। তাই বলবে নাকি কাটা ঘুড়ি? বাঁচুন ঘুড়ি?

'এ কি, কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ?' হুমকে উঠল পরুষস্বর।

ফিরল সুকান্ত। নেমে এসে দেখল স্থূলাঙ্গ প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় আধ-ইজিচেয়ারে আধশোয়াভাবে হেলান আছেন আর তাঁর পাশে মেঝের উপর বসে তাঁর দুই পায়ের পাতায় তেল মেখে দিচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা।

এগিয়ে এল সুকান্ত। নিচু হয়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিলেই চুকে যায়, থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের পা দুখানি অস্বাভাবিক ফুলো, তাতে আবার এখন তেল মাখানো। প্রণাম করতে প্রাণে রস পেল না। দুহাতে শুকনো নমস্কার সেরে বললে, 'আমি সুকান্ত বসু—'

'আমি বনবিহারী মিত্র—শুধু এটুকু বললেই পরিচয় হল?' গর্জন ছাড়লেন ভদ্রলোক।

'আস্তে-আস্তে বলছি।' ঢোক গিলল সুকান্ত: 'আমার বাবার নাম—'

'তোমার বংশ পরিচয়ে আমার কৌতূহল নেই। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে তুমি কী সুবাদে এ বাড়িতে ঢুকেছ? কী চাই তোমার?'

যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই, সুকান্ত বললে, 'কাকলিকে চাই।'

'কে কাকলি?' পায়ে নিশ্চয়ই বাঁধ ও ব্যথা, একটানে ঝটকা মেরে দাঁড়াতে পারেন না ভদ্রলোক, তবু উত্তেজনায় নড়ে চড়ে উঠলেন।

সুকান্তর মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, 'কাকলি এ বাড়ি থাকে না?'

'থাকে কি না থাকে তাতে তোমার কী?'

'তাহলে থাকে।' অস্ফুটস্বরে বললে সুকান্ত।

'হ্যাঁ, থাকে। সে আমার মেয়ে। কিন্তু তোমার তাকে কী প্রয়োজন?' ভদ্রলোক বললেন আবার রোখা গলায়।

এখানে আবার আরেকটা সম্ভাবনা ছিল। নত হয়ে সুকান্ত তাকাল আবার ভদ্রলোকের পায়ের দিকে। ভরসা পেল না। কে জানে পায়ে হাত ঠেকলেই হয়তো তারস্বর চিৎকার করে উঠবেন। চাকর যে বলেছে বাবুর অসুখ তার মানে এই পায়ের অসুখ।

ঘাড়টা আস্তে-আস্তে একটু চুলকে নমস্কারে সুকান্ত বললে, 'তার সঙ্গে আমি পড়ি।'
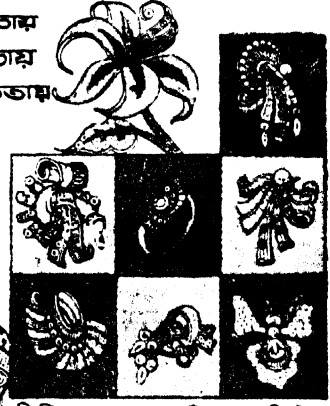
পড়ো তো এখানে কী, বাড়িতে কী। সটার উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে তার মানেটা কী ' বনবিহারী আবার হুমকালেন।

'দরজাটা খোলা পেলাম—'

'দরজা খোলা পেলেই উঠে আসতে হয়? নিচে থেকে খবর দিলে না কেন?'

'লোকজন কাউকে দেখলাম না—একটা কলিং বেল নেই।'

'কলিং বেল! তোমার জন্যে কলিং বেল ফিট করতে হবে।' বনবিহারী আবার তড়পালেনঃ 'কেউ নেই তো নিচে ওয়েট করো।'

'সে এক ক্যাসাবিয়ানকা পেরেছিল।' সুকান্ত তাকাল আরেকবার চারপাশ। বললে, 'ভাবলাম নিচে নেই হয়তো উপরে পাব।'

'তা আমাদের লক্ষ্য না করেই তো উঠে যাচ্ছ ছাদে। ছাদে কী! আজকাল পড়া-শোনা ছাদে হচ্ছে নাকি?'

'ঘরে-ছাদে কোথাও হচ্ছে না। তবে ঘরের মধ্যে তো গুমোট, ছাদে ঘুরলে মাথাটা ঠান্ডা থাকে, রিক্যাপিচুলেশানটা ভালো হয়।'

'কী ভালো হয়?' বনবিহারী ছুঁড়লেন আরেক মেঘধ্বনি।

কথাটা পুনর্বার আওড়াতে সাহস পেল না সুকান্ত।

'গোবর্ধন! গোবর্ধন!' ডাকাত-পরা আওয়াজ তুললেন বনবিহারী।

সুকান্ত বুঝল চাকরকে ডাকছে।

'দাঁড়াও, আমি ডাকছি।' এতক্ষণে মুখ খুললেন ভদ্রমহিলা। বালিশ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

তবুও আশ্বাস নেই বনবিহারীর। এবার অন্য ডাক ডাকলেন। 'বিজন, বিজন! বিজন বাড়ি নেই।'

সুকান্ত বুঝল এবার ছেলেকে ডাকছেন।

একটা ফাটাফাটি না হয়ে আর যায় না। হাত দিয়ে নিজের মাথাটা একবার অনুভব করল সুকান্ত। যদি খাড়া পায়ে দাঁড়াতে পারতেন তাহলে বনবিহারী নিজেই প্রমাণ করে দিতেন যে তিনি বসেই ভ্রাম্যমাণ।

কোলাহলটা এমন আর মন্দ কোথায়। যার লক্ষ্য, নিচের লোককে সন্ত্রস্ত করা, বাড়ির আনাচে-কানাচে তোলপাড় জাগানো, বিজনকে পর্যন্ত সজাগে নিয়ে আসা, সে এক নিভৃতচারিণী ছাদবিহারিণীর কানে ঢুকছে না!

তাকেও আর বাধা হল না শান্তিতে। ভদ্রমহিলা উপরের দিকের সিঁড়ির ক ধাপ উঠে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে লাগলেনঃ 'কাকলি! কাকলি!'

এবার উনি এসে কী সুরে ধরেন সেটা-গুলিই বলতে পারে।

এক দৃষ্টে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

আহা, এ কি কলিং বেল টিপে কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে এলে দেখা যেত। না কি দিনক্ষণ ঠিক করে এসে ড্রয়িং রুমের পারিপাট্যে চিত্রার্পিত করে।

দ্রুত পায়ে ধুপ ধুপ করে নেমে আসতে লাগল কাকলি।

সন্ধ্যার গা ধোয়া হয়নি তারই আগেকার শৈথিল্য শাড়িতে-শরীরে গুচ্ছীকৃত হয়ে আছে। চুল খোলা, খালি পা। পরনের আটপৌরে শাড়িখানি আধময়লা। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য, এই একটু নিজের সঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গ হয়েও অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, হাত দুখানি খালি।

'কে এই লোক তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে'—ভদ্রমহিলা বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

'ও, আপনি এসেছেন! আমি ভাবলাম শুনতে পেলেন না বুঝি ডাক।' কাকলি কলকলিয়ে উঠল। বনবিহারীর বিস্ময়ীভূত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাদের সঙ্গে পড়ে বাবা, খুব ভালো ছেলে, ফার্স্ট ক্লাশ পাবে নির্ঘাত। এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ছাদ থেকে দেখতে পেলাম।'

'দেখতে পেলে!'

[illegible] দেখা যায়। [illegible] হাতছানি দিয়ে। [illegible] না বুঝি, [illegible]'

[illegible] কাঁপছে না এখনও।

[illegible]

'নেই ঈশ্বর [illegible]।'

'বাবা, অনেকদিন ছোট ছোট [illegible] না [illegible] থেকে একটু দেখাশুনো আলাপ করে নেওয়া—'

তারপর ভদ্রমহিলার কাছে এগুলো কাকলি। [illegible] সুর বের করে বললে, 'জানো, মা, উনি এখনো নাকি কদমফুল দেখেননি। বাঙালী ছেলের কী দুর্দশা! লেখাপড়ায় ভেতরে অথচ নিজের দেশের ফুল ফল চেনে না। আসুন, দেখবেন আসুন, এবার লক্ষ্য করল সুকান্তকে। 'কেমন ঝেঁপে ফুল হয়েছে ছাদের উপর।'

উঠে দাঁড়াবার ভাঙা-ভাঙা চেষ্টা করছেন দেখে কাকলি এল বাবাকে তুলতে। সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে বনবিহারী স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে উঠলেন, লাঠি নিয়ে ভর দিয়ে দিয়ে এগুলেন ঘরের দিকে। পিছন ফিরে লক্ষ্য করলেন সুকান্তকে। বললেন, 'যাও দাঁড়িয়ে আছ কেন? ছাদে গিয়ে কদমফুল দেখে এস।'

(ক্রমশঃ)

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

আঠাশ

স্মৃতিচারণ লেখা যখন শুরু করি তখন ভেবেছিলেম স্থির করেছিলাম যে, আমার সাংগীতিক জীবনের সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখব না। কারণ শুধু এই-ই নয় যে, এ সম্বন্ধে আমার নানা লেখায়ই বলেছি, কীভাবে আমার সাংগীতিক জীবনের বিকাশ হয়—এও বটে যে, সংগীতের ইতিহাস কথার মাধ্যমে পেশ করা যায় না, গেয়ে শোনাতে ও বোঝাতে হয়—যার অন্য নাম—লেকচার ডেমনস্ট্রেশন—এক সময়ে আমি এভাবে নানা বক্তৃতা দিয়েছি সারা ভারতে টহল দিয়ে দিয়ে। শুনেছি সাড়াও জেগেছিল। আমার গান শুনে [illegible] হিসেবে খানিকটা [illegible]। কিন্তু পরে মনে হল গানের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ-রসের সৃষ্টি করা, মনের কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। তাই গান সম্বন্ধে [illegible] করিয়ে [illegible] এখন [illegible] অনুকূলই মনে করে। [illegible] জীবনের [illegible] আনন্দের [illegible] সংগীতে এইখানেই গুরুর প্রয়োজন ও চরম সার্থকতা। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একথাটি আমাকে একবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বেশ প্রাঞ্জল করে। এই পুণ্যশ্লোক [illegible] কথা আমি আমার [illegible] দিনপঞ্জিকা ও গীতশ্রীতে লিখেছি, তাই কেবল কথার পুনরাবৃত্তি না করে শুধু এইটুকু বলেই থামি যে, [illegible] যেগুলি আশ্চর্য মানুষ দেখেছি ইনি তাঁদেরই দলে—গড়পড়তা মানুষের দলে নন—যারা দিনরাত [illegible] করে [illegible] জন্যেই চলে, বাঁচার জন্যেই বাঁচে। সংগীতকে ইনি ভালবেসেছিলেন যেমন পূজারী ভালবাসে ইষ্টদেবকে। সারা জীবনের সঞ্চয়—অর্থে তথা সামর্থ্যে—ইনি নিবেদন করেছিলেন বীণাপাণির পূজায়। ভারতে আজ সংগীত কনফারেন্সের অধিবেশনের পর অধিবেশন বসছে, তার অগ্রদূত ছিলেন এই মহাত্মা। লক্ষ্ণৌয়ে ১৯২৮-এ তিনি যে যুগপ্রবর্তক সংগীত কনফারেন্স ডাকেন, তার কথা আমাদের দিনপঞ্জিকায় লিখেছি। ভারতে কোথায় কোন্ ওস্তাদ কোন্ গায়কী নিয়ে চলেন, জেনেছেন, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে খুঁজে খুঁজে তাঁদের কাজে লাগিয়েছেন—শিক্ষক তৈরি করে, চাঁদা আদায় করে, কলেজের পর কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এ বিষয়ে বেশি লেখার এখন আর প্রয়োজন নেই কেননা এ অক্লান্তকর্মী সংগীতপ্রেমিক তথা রাগশাস্ত্রীর সংগীতে দানের কথা আজকাল প্রমুখ অনেক সংগীতকোবিদই জানেন, যদিও যখন আমি এঁর সম্বন্ধে লেখা শুরু করি তখন বড় কেউই জানতেন না বলে আমাকে কম নিন্দা সইতে হয়নি নানা নিন্দুকের। যাক, যা বলতে চাই প্রসঙ্গের অবতারণা :

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দুর্গা রাগটির প্রবর্তন করেন পরম কৌশলে। সে কাহিনী বলেছি ইতিপূর্বে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি : "দুর্গা রাগ আমরা সবাই শিখেছি, কিন্তু এ-রাগটির স্রষ্টা যে আপনি জানতাম না তো—আপনিও তো কই কোথাও প্রকাশ্যে বলেন নি?" তবে পণ্ডিতজী হেসে উত্তর দেন, "দরকার কী? সংগীতে গানের তোশাখানায় একটি রাগের মণি বেশি সঞ্চিত হ'ল—এইটুকুই স্মরণীয়। সে-মণি কে কোথা থেকে এনেছিল কী হবে সে—ইতিহাসে?"

আমি স্তম্ভিত হই একথা শুনে। স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দে সৃষ্টি করলেই তার সৃষ্টির পরে নিজের নামের শিলমোহর ছাপতে চায়—সব দেশে এটি তো শুনে এসেছি বরাবর। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমার একথার প্রতিবাদে আমাকে বলেন : "ভারতের ধারা অন্য। আমরা রস চাই, ইতিহাস চাই না, সৃষ্টি চাই স্রষ্টাদের বংশতালিকা না। ভারতীয় সংগীতে ভূপালী, ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, কেদারা কামোদ ইত্যাদি রাগ কে করে রচনা করেছিল আমরা কোনদিন মনে রাখিনি—তাই বলে এসেছি যে, শিব নারদ ব্রহ্মা বা ভরতমুনি এদের সৃষ্টিকর্তা।"

তারপরে ক্রমশ আমি বুঝি যে, একথা ধর্মের জগতেও সত্য। ধর্ম আমাদের

দেশে আজও জীবন্ত—ধারা তার অশেষ গবেষণা অফুরন্ত : কিন্তু কোথায় কোন্ সাধনায় কোন্ গুরু কোন্ নবপদ্ধতির সৃষ্টি করেন কেউ জানে না, কোন্ মার্গ কার পায়েচলা পথে প্রথম তৈরি হয়ে ওঠে কেউ খবর রাখে না। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এক সমৃদ্ধ যোগরাজ্য, ধর্মক্ষেত্র যার তুলনা নেই এ-জগতে। এ-মহারাজ্যে কবে কোন্ দিক-পাল নব ঐশ্বর্য আহরণ করেছিলেন কার দীক্ষায় বা সহায়তায়, এ-পুণ্যক্ষেত্রে নানা-রকম সুরের উদ্ভাবন, নানারকম আশ্চর্য মন্ত্রতন্ত্র ধ্যানপদ্ধতির প্রবর্তক কে—কে খবর রাখে? সম্পদ হাজির • দিয়েছে, আমরা তাকে ভোগ করেছি, জানতে চাইনি কোনোদিনই কে এনে দিল সে-সম্পদ, বা কে কোন্ সম্পদকে খাটিয়ে চতুর্গুণ করে তুলল। এক কথায় ভারতীয় মন সৃষ্টিকে সমাদর করলেও সৃষ্টির ব্যাকরণ বা ইতিহাসকে—'এহ বাহ্য' বলেই সমাদর করে এসেছে।

পণ্ডিতজির কথায় আমারও উৎসাহ কমে যায়। মনে হয়—সুর রচনায় নাম রেখে গিয়ে কী হবে? গান গেয়ে যাই—ফলদাতা ঠাকুর গীতার এ-মহাবাণী শিরোধার্য করে। তাই কার কাছে কবে কোন চালের গান শিখে কী লাভ করেছিলাম তার বর্ণনা সম্পূর্ণ নিরর্থক না হলেও সে নিয়ে বেশি খুঁটিয়ে আলোচনা কার কাজে আসবে! এইজন্য গানের তীর্থযাত্রায় কবে কোন গীতমন্ত্রের কাছে কী ভাবে দীক্ষা পেয়েছি তার ইতিহাস লিখে রাখিনি আমার উত্তর জীবনের দিন-পঞ্জিকায়।

কিন্তু হঠাৎ মনে হল: যখন এখানে নানা সূত্রে প্রসঙ্গত কোনো কোনো ওস্তাদ বা বাইজির নাম ক'রে ফেলেছি, তখন সংগীতে কার কার কাছে কী পেয়েছি তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখে যাওয়া মন্দ কি? ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে যে তথ্য লাভ হয়, তা থেকে কিছু হয়ত তত্ত্বেরও ছিটেফোঁটা মিলতে পারে। যদি নাও মেলে তবে কাহিনী সরস হ'লে রসের দিক দিয়েও কিঞ্চিৎ মুনফা হ'তে পারে তো। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার নীতি-শিক্ষার তথা ভজনদীক্ষার ইতিহাস।

ছেলেবেলায় আমার গানের প্রথম গুরু ছিলেন অবশ্যই পিতৃদেব। তিনি গান অত্যন্ত ভালোবাসতেন—বিশেষ কীর্তন ও হিন্দুস্থানী গান। তাই যেখানেই তিনি যান না কেন, ডাকতেন হিন্দুস্থানী ওস্তাদকে বা বাঙালি গায়ককে। আমাদের গয়ার বাড়িতে মনে পড়ে হনুমান দাশের ওস্তাদি গান, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সোনির হার্মোনিয়ম বাজনা। অমন হার্মোনিয়াম বাজানো আমি আর শুনিনি। এমন কি ঠাকুর নবাবানির বাজনাও সোনির বাজনার সমকক্ষ নয়। সেখানে আর এক মস্ত এস্রাজির এস্রাজ শুনি, যাঁর নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না। হয়ত অমিয় সান্যাল মহাশয় বলতে পারবেন। ইনি পরে থিয়েটার কনসার্টেও বাজিয়েছিলেন এস্রাজ। সোনিও বাজিয়ে-ছিলেন হার্মোনিয়াম থিয়েটার রোডে—আমার বহু বন্ধু এসে শুনেছিলেন। বিখ্যাত গায়ক অঘোর চক্রবর্তীর ধ্রুপদ গানও শুনি —তাঁর অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠ আজও কানে বাজে। বিশ্বনাথ রাওয়ের ধ্রুপদ, সুরেন্দ্র-নাথ মজুমদারের খেয়াল, [illegible] টপ্পা, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের [illegible]-সংগীত, আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা গায়কের গান নিরন্তরই আমার চারদিকে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করত। তাই তখন আমি গানে খানিকটা খুঁতখুঁতে হয়েই উঠি। মানে অনেক সুরই কিছু কিছু মনে রাখতে পারতাম কিছুদিন ধরে। থিয়েটারের নানা নাটকেও কত সুর শুনতেম, বাড়ি এসে পিতৃদেবকে শোনাতাম —নানা গানের ধুয়াটুকু। পিতৃদেব আশ্চর্য হ'য়ে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে শোনাতেন, 'দেখ হে, আমার কুলতিলকের কীর্তি!'

এর পরে যাঁর কাছ থেকে স্থায়ীভাবে লাভ করি, তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। নাড়া বেঁধে তাঁর কাছে গান না শিখলেও আমার গানের দ্বিতীয় গুরু ছিলেন তিনিই। আমার রাঙা জ্যাঠামহাশয় হরেন্দ্র-লালের শ্যালক ব'লে তাকে আমি সুরেন-মামা ব'লে ডাকতাম, আমার জেঠতুত ভাই-বোনদের সুরে সুর মিলিয়ে। পিতৃদেব বলতেন প্রায়ই: 'আহা এমন ঢং সুরেনের—ও একেবারে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা। শিখে

এ ঢং গ'ড়ে তোলেনি সুরেন—নিজে থেকেই ও ফুটে উঠেছে—আশপাশের জল-হাওয়া থেকে প্রাণের খোরাক টেনে—ফুলের মতন।'

সত্যি, এমন অপরূপ ঢং আমি জীবনে আর শুনিনি। কি হিন্দুস্থানী খেয়াল টপ্পা, কি ধ্রুপদ (যদি ধ্রুপদ তিনি বেশি গাইতেন না শ্রোতারা তানকর্তবই বেশি চাইতে ব'লে) কি কীর্তন কি বাংলা ভক্তি-সংগীত যা গাইতেন তারি উপর তিনি রেখে যেতেন নিজের প্রতিভার আশ্চর্য ছাপ। সে ঢঙে আর কাউকে আজ পর্যন্ত গাইতে শুনলাম না। কিন্তু তাঁর ঢং থেকে আমি পেয়েছিলাম অনেক সুষমার ইঙ্গিত, বিস্তারের সংকেত। তাঁর অনেক হিন্দী তথা বাংলা গানই আমি গাইতাম নিজের ঢঙে বসিয়ে। কারণ তিনি বলতেন পিতৃদেবকেঃ 'দেখবেন দ্বিপু-বাবু মন্টু যেন কারুর নকল করতে না ছোটে, যেন নিজের পথ কেটে চলে—অপরের কাছ থেকে নেবে বই কি, কিন্তু নকল করতে নয়, হজম করতে। ওর বেশি শেখার দরকার নেই। শুনতে শুনতে শেখাই ভালো।' আশ্চর্যঃ অনেক বৎসর বাদে অবিকল এই কথাগুলিই পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একদিন বলেছিলেন ধূর্জটিকে। কিন্তু একথায় আনন্দ বা গৌরব নিতান্তই সস্তা, মাত্র অহমিকারই এতে শ্রীবৃদ্ধি, বিকাশের দুর্গতি। বেশি প্রশংসা পেয়ে আমার ক্ষতি হয়েছিল খুবই প্রথম দিকে। তাই না ঠাকুরকে ভুলতে বসেছিলাম গানে যশস্বী হ'তে না হ'তে। তাঁর অপার করুণা, তাই গানের নোঙরও ছাড়িয়ে আমাকে ঠেলে দিল সোজা অকূল পাথরে—তাঁর চরা বন্দরের শেষ ধ্রুবদিশা দিতে। কিন্তু সে অন্য কথা।

সুরেনমামার কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি খুব গলাবাজি আরম্ভ করলাম—বিশেষ করে তাঁর শেখানো কয়েকটি গানেঃ যথা, রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো—সিন্ধু কাফি; রাঙা কমল রাঙা করে—মালকোষ; ঝাউ ঝাউ ঘন গরজে—দেশ; নিবিড় আঁধারে মাগো—বাগেশ্রী; বিফল জনম—ভৈরবী; আমার মন ভুলালো যে—ভৈরবী; শ্যামপ্রেমরসসায়রে আমি মীনের মতন ডুবে রইতাম—কীর্তন; এই তো কানন গো—কীর্তন। আরো অনেক গান শিখেছিলাম। অবশ্য তার মতন গাইব কেমন ক'রে? (মণিমামার পরিহাস স্মরণীয়ঃ 'ভালো গান গাওয়া কি সোজা?') কিন্তু বাংলা গানে সুরবিহার-এর এই ইঙ্গিতটি আমি প্রথম তাঁর কাছেই পাই যে, বাংলা গানে ভাব বজায় রাখতে হ'লে কথার সঙ্গে মিশিয়ে তান দিতে হবে। অর্থাৎ 'রাঙা জবা কে দিলো' ব'লে আ আ ক'রে তান দেওয়া নয়, দিলো-র ও-কে টেনেই তান দিতে হবে। আকারান্ত তান দিতে হ'লে দিতে হবে জবা-র শেষে কিম্বা রাঙা-র শেষে। কিন্তু ঐ যে বললাম, এসব করে দেখানোর জিনিস ব'লে বোঝাবার নয়। তাই এ-খুঁটিনাটি আঙ্গিকের বর্ণনা থাক।

সুরেনমামার কাছে আর একটি সত্যের দীক্ষা পেয়েছিলাম যে, ওস্তাদি গানেও কণ্ঠলাবণ্যের দাম খুব বেশি। তাই বেশি সেধে কণ্ঠকে ভেঙে ফেলা আত্মহত্যারই সামিল। তানের সৌকর্য সাধনার্থে এ-ভুল অনেক ওস্তাদেই ক'রে থাকেন—বলতেন তিনি প্রায়ই। আমার উত্তরজীবনে দেখেছিলাম আমার এক প্রিয় গায়ক এই ভুলই করেন লক্ষ্ণৌয়ে বিপর্যয় সেধে। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব মধুর, কিন্তু লক্ষ্ণৌ থেকে তিনি যখন ফিরলেন—হা হতোস্মি—দেখলাম তাঁর কণ্ঠের সে-মাধুর্য লুপ্ত হয়েছে অত্যধিক সাধনায়। অর্থাৎ কোকিল-কণ্ঠ ম'রে ভূত হ'য়ে নবজন্ম নিয়েছে কালোয়াৎরূপে। আমি এ-ভুল করিনি সুরেনমামারই উপদেশে। তাঁর কাছে আরো আমি শিখি যে, কণ্ঠলাবণ্য বজায় রাখলে আট আনা শ্রম ক'রে যে সুরের আনন্দ বিলানো যায়, কণ্ঠ অমধুর হ'লে সে-আনন্দের সিকিও সৃষ্টি করা যায় না ষোলো আনা পরিশ্রম ক'রেও। একথা বলছি গায়ের জোরে নয়—কণ্ঠলাবণ্যের অপরিসীম জাদু-শক্তি স্বচক্ষে দেখে তবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

একবার সুরেনমামা ছিলেন শ্রোতা সুকিয়া স্ট্রীটে ডাক্তার কৈলাসবাবুর বাড়িতে। সেখানে ধ্রুপদ গেয়ে শ্রীঅঘোরচন্দ্র চক্রবর্তী সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করার পরে আর কোনো ওস্তাদই গাইতে রাজি হলেন না। যাঁকেই ধরা হয়, তিনিই মাথা নেড়ে বলেনঃ 'এর পরে গাইব আমি? পাগল!' পিতৃদেব ছিলেন সুরেনমামার মহাভক্ত, ধরলেনঃ 'সুরেন! তুমি ধরো একটা কীর্তন।' সুরেনমামার কুণ্ঠা কেটে গেল পিতৃদেবের সমর্থন পেয়ে। তিনি ধরলেন, 'এই তো কানন গো......'

তানে আঁখরে সুরবিস্তারে ভাবে তিনি এমন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করলেন যে, অঘোর-

বাবুর অমন অপরূপ ধ্রুপদও ভেসে গেল—সবাই আহা আহা ক'রে অধীর হ'য়ে উঠলেন। গানের শেষে অঘোরবাবু যে অঘোরবাবু, উনিও প্রতিযোগিতার ঈর্ষা ভুলে যুবক সুরেন্দ্রনাথের চিবুক ধরে আদর ক'রে বললেনঃ 'এমন কণ্ঠ কোথায় পেলে বাবা?'

কণ্ঠলাবণ্যের আর একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ল—যদিও এ পুরো কাহিনী—আমার দিদিমার কাছে শোনা। ঘটনাটি অঘটনের পর্যায়ে পড়ে ব'লেই বলবার মতন। আমার দিদিমার ভাষায় বলি (একটু সাজিয়ে অবিশ্যি নইলে সাধারণ পাঠকের কাছে আমার বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হবে না)।

'আমার দাদামশায় রামদাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীরামপুরের এক ডাকসাইটে ধ্রুপদী জানিস? তোরা কীই বা গাস আজকাল—কেউ ভঁর পায় না। দাদামশায়ের গান শুনে ঘুমন্ত ছেলেরা আঁতকে উঠে মা-র বুক চেপে থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে দুধ খেত। আমরা চিকের মধ্যে থেকে শুনতাম তো—তবু বুক কেঁপে উঠত তাঁর দুল চৌদুল বাঁট শুনে। এমন বাজখাই আওয়াজ—যে সে কী বলব? কিন্তু আর একটা জিনিস আমাদের চোখে দেখা রে মণ্টু—চাক্ষুষ করা—আর একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, বিশ্বাস কর। দাদামশায়ের একটি রক্ষিতা ছিল, নাম গুণমণি। সে-যুগে জমিদারদের রক্ষিতা রাখাই দস্তুর ছিল। আমরা প্রায়ই শুনতামঃ 'তা পুরুষ মানুষ মদ—তার উপর জমিদার—রক্ষিতা না রাখলে মান থাকে কখনো?' সত্যি বলছি।

'কিন্তু হ'লে হবে কি, শুনি দিদিমার সে কী মনঃকষ্ট! দাদামশায়ের মুখে গুণমণির গুণগান শুনলে দিদিমা রাগ ক'রে গোসা-ঘরে চলে যেতেন। গুণমণি ছিল তাঁর চক্ষুশূল। সে থাকত দাদা-মশায়ের পাশেই একটি মহলে তিন-চারটি ঘর নিয়ে। আমরা গেলে খুব আদর ক'রে গান শোনাতো আর আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুনতাম। আহা সে কী গলা রে মণ্টু! কী তোদের বেদানা দাসী, মানদা-সুন্দরী, গহরজান—গুণমণির গান শুনলে পাখিরাও ঘাড় নাড়তে ভুলে যেত। যেন মধু জমাট হ'য়ে গলায় দাঁড়িয়েছে রে।

আমি (হেসে)ঃ নানি, তুমি নাটক লিখলে বাবা ব'সে পড়তেন। ভাগ্যে লেখো নি'

দিদিমাঃ ভাবছিস বাড়িয়ে বলছি, না রে না। তবে শোন বলি তাঁর গলার জাদু। আমার দিদিমা না? বলেছি তিনি হিংসের জ্বলেপুড়ে মরতেন। কিন্তু গুণমণি কীর্তন ধরলে তিনি গুটি গুটি এসে পাশে ব'সে শুনতেন আর চোখ মুছতেন। একেই বলি গলা রে, একেই বলি গলা। গহরজান মান্‌বা বাঈ—ঝাঁটা মার!'

সুরেনমামাও ছিলেন এমনি গাইয়ে। গুণমণিকে যদি উপাধি দেওয়া যায় কিন্নরী, তবে সুরেনমামাকে উপাধি দিতে হয় কিন্নর। তিনি নিজেও কণ্ঠস্বরের লাবণ্যে আত্মহারা হ'তেন। তাই পরীক্ষার সময়ে রাত্রে পালিয়ে বাইজীদের গান শুনতেন। রাঙা জেঠামহাশয়ের মুখে শুনেছি—ফলে তিনি পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করতে তাঁর পিতৃদেব তাঁকে খড়ম দিয়ে বেদম মারেন। পরেরবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষায় গম্ভীর হই ফের।

বড় বেশি হালকা গালগল্প হ'য়ে যাচ্ছে। গম্ভীর হই ফের।

সুরেনমামার গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা ভুলতে পারবেন না তাঁর কণ্ঠলাবণ্যের জাদু। ভাগলপুরে ও অন্যত্র আমি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি তাঁর গান—তাঁর সঙ্গে হার্মোনিয়মে সংগত ক'রে। আমার কান অত্যন্ত তৎপর ছিল ব'লে আমার সংগতে সুরেনমামা খুব তুষ্ট হ'তেন—তিনি কোনো পর্দা গলায় তুলতে না তুলতে আমি বাজনায় সেটি টিপেছি। এইভাবে বাজনায় সংগত করার ফলে তাঁর অনেক মনোহর সুরভঙ্গী আমার কণ্ঠায়ত্ত হয়—যদিও তাঁর সে অনুপম ঢং আমি আয়ত্ত করতে পারিনি। তবে তিনি বলতেনঃ '[illegible] এবং তোমার নিজস্ব—একেই খাঁটি বাড়িয়ে তোলা মণ্টু—আমার ঢং নকল করতে যাবে কেন? আমি মিশ্রদের ঘরানা খেয়াল শিখতাম কিন্তু তাদের ঢং নকল করেছি কোনোদিন? কখনো না—সাধ্যমত নিজের ঢংয়েই [illegible]—কারুর অনুকরণ না ক'রে। [illegible] হও, বাবা—নিজের [illegible] তোলো নিজের পায়ে নিজের [illegible]'

এর পরে আমি [illegible] দীনবন্ধু লছমীনারায়ণ [illegible] কিছুদিন [illegible] মিশ্রদের [illegible] সুরেনমামার [illegible] তালিম পাই [illegible] কিন্তু [illegible] দেখি মিশ্রদের মধ্যে বড় বড় ওস্তাদ থাকলেও তাদের গানের ঢং [illegible] সুরেনমামার ঢং তাঁর প্রতিভার নিজস্ব [illegible] খাপ-খাওয়া সম্ভব নয়।

(ক্রমশঃ)

(১)

১৮৬৬ খৃঃ ১৭ই জানুয়ারী লণ্ডন হইতে লিখিত এক পত্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইতেছেন—

"I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr. Goldstrucker (of whom you have no doubt heard) was anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary. The Doctor is a profound Sanskrit Scholar and loves all Hindus."

উদ্ধৃত পত্রাংশের অন্তিম ছত্রটিতে মনীষী গোল্ডস্টুকারের প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা কবিচিত্ত হইতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহারই সাক্ষ্য মধুসূদনের নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দশ পদী কবিতাটিতেও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে—

যথা জলধিমাথে যথা দেব-দৈত্যদলে
লভিলা অমৃত রস, তুমি শুভক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ব-বলে,
সংস্কৃত-বিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মন্থনে!

পণ্ডিতকুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে!
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসংগীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?

বাজায়ে সুকল-বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হ'তে মহা-গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম ধ্বনি করে!
যথা তব কালিদাস কবি-কুল-মণি!
কে জানে, কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে! ২

মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাধর পুরুষ যাঁহার বিদ্যাবত্তায় বিমুগ্ধ হইয়া এই জাতীয় প্রশস্তি গাহিতে পারেন, তিনি যে সত্যই 'পণ্ডিত-কুলের পতি' ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত যিনি আপন পাণ্ডিত্যপ্রভায় য়ুরোপীয় বিদ্বৎসমাজকে চকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ভারততত্ত্ববিদ্ মনীষী গোল্ডস্টুকারের বিলীয়মান স্মৃতি বাঙালী পাঠসমাজের হৃদয়ে পুনরুজ্জীবিত করিবার মানসে তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যটি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

(২)

১৮২১ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারী প্রুসিয়ার অন্তর্গত কানিগস্‌বের্গ (Konigs berg) শহরে জর্মান ইহুদী পরিবারে থিওডোর্ গোল্ডস্টুকরের জন্ম হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ে (Das Alt Stadtische Gymnasium) তিনি বিদ্যালাভ করেন—১৮২৯ হইতে ১৮৩৬ খৃঃ পর্যন্ত তিনি ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং স্ট্রেড ও এলেন্‌ৎসেন্ নামক দুইজন খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষকের অধীনে তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ১৮৩৬ খৃঃ কানিগস্‌বের্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোল্ডস্টুকর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররূপে যোগদান করেন এবং সেই সময় লোবেক্ (Lobeck), শুবের্ৎ (Schubert), রোজেনক্রানৎস্ (Rosenkrant) প্রমুখ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট হইতে ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি বোলেন্ (P. von Bohlen)-এর অধীনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। দর্শনাধ্যাপক রোজেনক্রানৎস্ এবং সংস্কৃতাধ্যাপক বোলেনের সাহচর্য তাঁহার পরবর্তী জীবনের শিক্ষাধারাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তখন হইতেই তিনি সংস্কৃত ও দর্শন—এই উভয় বিষয়ের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন। কিছুকাল পরে ১৮৩৮ খৃঃ গোল্ডস্টুকর বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে যোগদান করেন এবং অধ্যাপক ফ্রাইটাক (Freytag)-এর অধীনে আরবীয় ভাষা এবং সুবিখ্যাত মনীষী শ্লেগেলের (A W von Schegel) অধীনে ভারতীয় সাহিত্যের অনুশীলন করিবার সুযোগ লাভ করেন। বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার গুরু ছিলেন সুবিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ মনীষী লাস্‌সেন্ (Lassen)। ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি পুনরায় ক্যানিগ্‌সবের্গে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ক্যানিগ্‌সবের্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ১৮৪০ খৃঃ ২রা জুলাই 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। এইবার প্রকৃতপক্ষে গোল্ডস্টুকরের বিদ্যার্জন শুরু হইল। তিনি ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ গোল্ডস্টুকর কৃষ্ণ মিশ্র বিরচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত রূপকখানির একখানি জর্মান অনুবাদ প্রণয়ন করেন—ইহাই তাঁহার সংস্কৃত বিষয়ক গবেষণার প্রথম নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তিনি ঐখানি দর্শনাধ্যাপক রোজেনক্রানৎসকে প্রদর্শন করেন, এবং তাঁহারই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গোল্ডস্টুকার্ উক্ত অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, যদিও নিজের নাম প্রকাশ করিতে তিনি শেষপর্যন্ত কিছুতেই সম্মত হন নাই। ঐ বৎসরই গোল্ডস্টুকর্ কানিসবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যের জন্য প্রুসীয় সরকারের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় জন্মভূমির শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হন।

কিন্তু গোল্ডস্টুকর ইহাতে কিছুমাত্র

বিচলিত হইলেন না। তিনি ১৮৪২ খৃঃ আগস্ট মাসে জন্মভূমি প্রুসিয়া ত্যাগ করিয়া উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে প্যারী নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎকালিক য়ুরোপের সংস্কৃতবিদ্যার শ্রেষ্ঠ কর্ণধার অধ্যাপক বুর্নুফের (B Burnouf) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বুর্নুফের অধীনে তিন বৎসর নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গোল্ডস্ট্যুকর্ পুনরায় ১৮৪৫ খৃঃ কনিগসবের্গে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি সেখানে অবস্থান করিতে পারিলেন না—১৮৪৭ খৃঃ তিনি বার্লিন শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। বার্লিনে অবস্থানকালে গোল্ডস্ট্যুকরের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মহামনীষী হুমবোলট (Alexander von Humboldt)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গোল্ডস্ট্যুকরের বিদ্যাবত্তার প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হন। হুমবোলট গোল্ডস্ট্যুকরকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহার নিদর্শনরূপে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Kosmos'-এ প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের প্রকৃতিপ্রীতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে গোল্ডস্ট্যু-করের মতবাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উক্ত আলোচনার সমাপ্তিতে একটি পাদটীকায় মনীষী হুমবোলট গোল্ডস্ট্যুকরের একটি দীর্ঘ পত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"In order to render more complete the small portion of the text which belongs to Indian literature, and to enable me, (as I did before with relation to Greek and Roman Literature,) to indicate the different works referred to, I will here introduce some notices on the more general consideration of the love of nature evinced by Indian writers, and kindly communicated to me in manuscript by Herr Theodor Goldstucker, a distinguished and philsophical scholar thoroughly versed in Indian poetry".

কিন্তু গোল্ডস্ট্যুকরের পক্ষে দীর্ঘকাল বার্লিনে অবস্থানও সম্ভবপর হইল না। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য শাসকবর্গের আদেশে গোল্ডস্ট্যুকরকে শীঘ্রই বার্লিন ত্যাগ করিতে হইল। সৌভাগ্যবশত সেই মুহূর্তে তিনি তদানীন্তন সুবিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতবিদ্ অধ্যাপক হোরেস্ হেমান্ উইলসনের (H H Wilson) নিকট হইতে ইংলন্ড গমনের জন্য এক আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন। উইলসন তাঁহার সংস্কৃত অভিধানের একটি নূতন সংস্করণ প্রণয়নের জন্য উহার সম্পাদনভার গোল্ড-স্ট্যুকরের হস্তে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গোল্ডস্ট্যুকরও এই সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করেন। বিশেষত, ইহার ফলে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের সংগৃহীত মহামূল্য সংস্কৃতগ্রন্থভাণ্ডারে অবাধ প্রবেশের অধিকার লাভ করিবেন—গোল্ড-স্ট্যুকরের নিকট এই প্রলোভন ছিল সর্বাধিক। অধ্যাপক উইলসনের আমন্ত্রণে গোল্ডস্ট্যুকর্ ১৮৫০ খৃঃ মাঝামাঝি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ইহার কিছুকাল পরেই উইলসনের প্রস্তাবক্রমে গোল্ড-স্ট্যুকর্ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক সংস্কৃতাধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণকে অকৃপণভাবে বিদ্যাবিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে গোল্ডস্ট্যুকরের সহিত বহু ভারতীয় ছাত্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয় ঘটে।৬ তিনি ছিলেন ভারতীয়-গণের পরম আত্মীয় ও হিতৈষী বান্ধব। গোল্ডস্ট্যুকরের ভারতপ্রীতি সম্পর্কে এক-জন ইংরেজ লেখকের সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"No other European appeared to understand them (i.e. the Indians) so well as Goldstucker; he seemed to have watched over their development from the infancy of their civilization, and to have a parental affection for them. Whether he could help them or not, and he did held many of them, they knew they could place implicit confidence in him."

ইহা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা এই প্রবন্ধের সূচনায় উদ্ধৃত মাইকেল মধু-সূদন দত্তের পত্রখণ্ড হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে গিয়া মনীষী গোল্ড-স্ট্যুকরের সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়াছেন, এইরূপ শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা অল্পই ছিল।

ইংলণ্ড প্রবাসই গোল্ডস্ট্যুকরের নিকট ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্যময় জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। ইণ্ডিয়া হাউসের সুবিশাল গ্রন্থসংগ্রহ গোল্ড-স্ট্যুকর্ অদম্য অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাত্রিতেও তাঁহার অধ্যয়নের বিরাম ছিল না! জীর্ণ প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ হইতে তিনি নিত্য নব নব তথ্য আবিষ্কার করিয়া আপন জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইত না। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এমনই গভীর ছিল যে, যখনই হিন্দু আইন সংক্রান্ত কোন জটিল প্রশ্ন প্রিভি কৌন্সিলের সমক্ষে উপস্থিত হইত, তখনই তাহার মীমাংসার ভার গোল্ডস্ট্যুকরের উপর পড়িত। এবিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত।৮

কিন্তু দীর্ঘদিনের এই বিরামহীন তপস্যা তাঁহার শরীরকে ক্রমশ পঙ্গু করিয়া ফেলিতে লাগিল। অকস্মাৎ ১৮৭২ খৃঃ ৬ই মার্চ ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া গোল্ডস্ট্যুকর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৩)

ইহাই সংক্ষেপে গোল্ডস্ট্যুকরের জীবন-বৃত্তান্ত। কিন্তু গোল্ডস্ট্যুকরের রচনাবলীর কিঞ্চিৎ বিবরণ না দিলে, এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর জীবনালেখ্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতার তুলনায় তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা স্বল্পই বলিতেই হইবে। গোল্ডস্ট্যুকরের প্রবন্ধ-সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদকের মন্তব্য এইস্থলে বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"The more materials Goldstucker accumulated sifted, and arranged for use in the various publications he had projected, the more fastidious he became in going to print, more especially as he worked with no view to literary fame, or to any selfish advancement. Thus it is that what he published amounts to considerably less than what most other scholars with his brilliant intellect, his indefatigable industry, his vast erudition, and his splendid opportunities, would have accomplished."

যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিঃশেষে তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোল্ডস্ট্যুকর তাঁহার বক্তব্য লোক-সমক্ষে প্রকাশ করিতে কোনওমতেই সম্মত হইতেন না। জনপ্রিয়তা বা প্রতিষ্ঠা অর্জন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সত্যানুসন্ধান। কিন্তু তথ্যসংগ্রহের কি আর অন্ত আছে? "অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।" সুতরাং গোল্ডস্ট্যুকরের অনুসন্ধিৎসার বিরাম ছিল না, আত্মতুষ্টিও সহজলভ্য ছিল না। গোল্ডস্ট্যুকরের এই তথ্যনিষ্ঠাও সত্যানুসন্ধিৎসা কতদূর প্রবল হইতে পারে, তাহা একটি উদাহরণ হইতেই স্পষ্ট হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৫০ খৃঃ অধ্যাপক উইলসনের আহ্বানে গোল্ডস্ট্যুকর ইংলণ্ডে আগমন করেন এবং উইলসনের সংস্কৃত অভিধানটির একখানি অভিনব সংস্করণ প্রণয়নে ব্রতী হন। কিন্তু গোল্ডস্ট্যুকর যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আদর্শের সহিত না মিলিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা হইতে বিরত হইতেন না। উইলসন সাহেবের অভিধানের পুনঃ-সম্পাদন করিতে গিয়া তিনি এত নূতন নূতন শব্দ ও তাহাদের এত নূতন নূতন প্রয়োগ অক্লান্ত অধ্যয়ন ও গবেষণার সাহায্যে আবিষ্কার করিতে লাগিলেন যে, সে-সকল যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করিলে একখানি অতিকায় কোষগ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। ফলত

এ-কার্যে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, পূর্বসূচীর রচিত গ্রন্থের পুনঃ-সম্পাদনের দ্বারা তাঁহার আদর্শ ঠিকভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না। গোল্ড-স্ট্যাকরের সম্পাদিত অভিধানখানি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর ('অ') পর্যন্ত কোনও প্রকারে পৌঁছিয়াছে এবং তাহাতেই ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৮০ পৃঃ। ১৮৫৬—৬৪ খৃঃ মধ্যে এই অংশটুকু প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সমগ্র অভিধানখানি পুনঃ-সম্পাদনের জন্য যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন ছিল, তাহাতে প্রকাশকগণের পক্ষে সম্মত হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে প্রথম বর্ণ পর্যন্ত সম্পাদিত হইতে না হইতে অভিধানখানির প্রকাশ কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গোল্ডস্ট্যাকরের গবেষণার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভর্শনিষ্ঠার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে?১০

১৮৬১ খৃঃ গোল্ডস্ট্যাকর 'মানব-কল্প-সূত্র' নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ফিল্ম সংস্করণ প্রকাশ করেন।(১১) ইহার ভূমিকাস্বরূপে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' বিষয়ে তাঁহার গবেষণা গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়।১২ পাণিনীয় ব্যাকরণ গোল্ডস্ট্যাকরের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির নিদর্শনরূপে এই গবেষণা গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্য রসিকদের নিকট চির-স্মরণীয় হইয়া রহিবে। এই নিবন্ধে জ্ঞানকল্পবী এই গ্রন্থে পাণিনীয় ব্যাকরণের বিভিন্ন দুরূহ প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে যে অনন্যসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে তাঁহার স্বাধীন চিন্তা জাজ্বল্য হইয়া উঠিয়াছে। গবেষণার গতানুগতিক পদ্ধতি বর্জন করিয়া সম্পূর্ণ ভারতীয় মনোভাব অবলম্বন করতঃ কুসংস্কারবর্জিত উন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুশীলন কিভাবে করিতে পারা যায় গোল্ডস্ট্যাকরের এই গ্রন্থখানি তাহার আদর্শরূপে বিরাজমান থাকিবে। স্বকীয় সিদ্ধান্তের সত্যতা স্থাপন করিতে গিয়া তিনি সমসাময়িক বহু বিদগ্ধজনের মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। বেবর, ম্যাক্সমূলের, রোট বাটলিংক প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃতের পণ্ডিতগণের মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করেন নাই—ইহার ফলে তিনি পণ্ডিতসমাজের অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। কিন্তু গোল্ডস্ট্যাকর অন্যের নিন্দা বা প্রশংসা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য গবেষণা পদ্ধতির সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইয়াও গোল্ড-স্ট্যাকর প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অলোকসামান্য প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যের প্রতি কিছুমাত্রও শ্রদ্ধা হারান নাই, বরং যতই তিনি জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, ভারতীয় আচার্যগণের প্রজ্ঞার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ক্রমশ ততই গভীরতা অর্জন করিয়াছে। রুডলফ রোট (Rudolph Roth) যখন তাঁহার বেদ ব্যাখ্যায় সায়নাচার্যের ভাষ্যের প্রতি অশোভন কটাক্ষ করিয়াছেন, তখন গোল্ডস্ট্যাকর তীব্র ভাষায় উহার সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সে সমালোচনার ভাষা এমনই শাণিত ও বিদ্রূপপূর্ণ যে, প্রতিপক্ষের পক্ষে উহা মর্মান্তিক হইয়া উঠিত। এই প্রসঙ্গে রোটের বেদ ব্যাখ্যার সমালোচনার কিয়দংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

"Professor Roth no doubt enjoys a great advantage when he can put some ten or twenty passages for examining the sense of a word which occurs in them,...... But the assurance with which he implies that Sayana was not capable of mustering ten or twenty passages which are at the command of Professor Rath, presupposes, indeed, in his readers a degree of imbecile credulity which is, no doubt, a happy condition of mind for those who rejoice in it, and pernaps at best fitted for reading assertions like these, but which may not be quite so universal as he seems to assume. Madhava-Sayana, one of the profoundest scholars of India, the exegete of all the three Vedas as he tells us himself—of the most important Brahmanas and a kalpa work,—Madhava, the renowned Mimansist—he, the great grammarian, who wrote the learned commentary on the Sanskrit radicals, who shows at every step that he has Panini and Kaltyayana at his fingers' ends, —Madhava, who on account of his gigantic learning and his deep sense of religion, lives in the legends of Inda as an incarnation of Siva, in short, the great Madhava, we are told, had not the proficiency of combining in his mind or otherwise those ten or twenty passages of his own Veda, which Professor Roth has the powerful advantage of bringing together by means of his little memoranda."

সুবিখ্যাত St. Petersbarg Sanskrit—Wo"rterbuch নামক বিশালকায় অভিধানখানির সম্পাদন করেন—বাটলিংক এবং রোট্। রোট্ বৈদিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা করেন এবং বাটলিংকের উপর লৌকিক সংস্কৃত শব্দগুলির ব্যাখ্যার ভার পড়ে। এই অভিধানখানির প্রকাশ সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু গোল্ড্-স্ট্যাকরের প্রশংসা অর্জনের সৌভাগ্য খুব স্বল্পসংখ্যক মনীষীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। ডঃ রোটের বৈদিক শব্দ ব্যাখ্যার প্রণালী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

"....I will merely here state that I know of no such work which has come before the public with such unmeasured pretensions of scholarship and critical ingenuity as this Worterbuch, and which has, at the same time, laid itself open to such serious reproaches of the profoundest grammatical ignorance."

লৌকিক সংস্কৃত শব্দরাজির বিন্যাস ও ব্যাখ্যায় ডঃ বাটলিংকের অনুসৃত প্রণালীতে গোল্ডস্ট্যাকরের সন্তোষ বিধান করিতে পারে নাই—ফলে বাটলিংককে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহার জ্ঞানা যে কিরূপ অসহনীয়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি হইতে কিছুটা অনুমান করিতে পারা যাইবে—

"....It is known that many Sanskrit bases, and amongst them the bases in ri undergo various changes in their declension and otherwise. Pitri, for instance, becomes pitar, in the accusative pitaram, white it remains as it is, in the instrumental Pitri—bhis; dadhi remains so in dadhi this; but it base is dadhan, with the less of a, in dadhu—a;

asthi forms asthi-bhis, but asthua. Naw there exist a paper of Dr. Rochtinik on Sans- a paper of Dr. Boehtingk on Sanskrit declension; but whoever reads it must fancy that the language either played dice with these and similar farms, or is undergoing some remarkable Cure. He talks of bases "which are strengthened as well as weakened", of bases "which are only strengthened" and of bases "which are only weakned". Why language should nurse and physic its bases, as we learn from him, no one will understand. But a sadder spectacle of the treatment of a language or of linguistic facts than is presented in that paper, it is not possible to imagine. Exactly the same game at dice or the same vagaries of disease reign in this Dictionary...."

কিন্তু এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শেষ কয়টি ছত্রে তাঁহার বিদ্রূপ চরমে পৌঁছিয়াছে। মহাভাষ্যের 'পস্পশা' আহ্নিকে তিনি মহর্ষি পতঞ্জলির একটি সুপরিচিত উক্তি [১৬] উদ্ধার করিয়া গোল্‌ডস্টুকের এই প্রসঙ্গের উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন—

"......Happy Patanjali! blessed in thy ignorance! Here we have potters who can fabricate—and not simply meanings of words but the very words themselves, and words, too, which you laboured so earnestly, so learnedly, so conscientiously, to save from the pottering of all future "exegetes and lexicograppers". Nay, we have, too, men who can repair to these potters, and call for, and admire, their linguistic wares!"

বাট্‌লিংক কর্তৃক সম্পাদিত পাণিনীয় ব্যাকরণের[১৮] নানারূপ দোষত্রুটি গোল্‌ডস্টুকর সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন—সমালোচনার কথা ছাড়িয়া দিলেও গোল্‌ডস্টুকরের পাণিনীয় ব্যাকরণে অতুলনীয় ব্যুৎপত্তির নিদর্শনরূপে তাহা আজিও পণ্ডিতগণের অবশ্য আলোচ্য বলিয়া মনে হয়। এক জায়গায় ব্যাট্‌লিঙ্ক সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"But what must one think of the proficiency of an "editor" of Panini, who has none of the laborious work,—which always gives a title to indulgence—of comparing MSS. and compiling a Commentary,—who merely reprints the labours of others,—and yet, even a simple case like this, does not feel induced to consult the Kasika or Siddhanta—Kaumudi, though he **talks** a great deal, even on this occasion, of the Kasika "A. B. and C." but without mastering its "a, b, c", simply repeats the gross blunder of the editors of his edition of Panini!"

ম্যাক্সমুলার, রেবর প্রভৃতির ন্যায় ধুরন্ধর পণ্ডিতকেও গোল্‌ডস্টুকরের উগ্র আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। মোট কথা, 'Panini' গ্রন্থে গোল্‌ডস্টুকরকে আমরা যে মূর্তিতে দেখি, তাহা এতই বীরত্বব্যঞ্জক, যে তাহা বিদগ্ধ পাঠকের সম্ভ্রম উদ্রেক না করিয়া পারে না। পাণিনীয় ব্যাকরণের যথোচিত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথিকৃৎরূপে গোল্‌ডস্টুকর যে সংস্কৃত গবেষণাক্ষেত্রে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।[২১]

ইহা ছাড়া, গোল্‌ডস্টুকরের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে Chambers' Encylopoedia নাম বিশ্বকোষে ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নানা প্রবন্ধ। ঐগুলি ১৮৬২ খৃঃ হইতে ১৮৬৮ খৃঃ মধ্যে উক্ত বিশ্বকোষের ষষ্ঠ হইতে দশম খণ্ডের নানাস্থলে বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত হয়।[২২] দুঃখের বিষয় 'G' অক্ষরের পূর্বে গোল্‌ডস্টুকর উক্ত বিশ্বকোষের সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদানের জন্য আহূত হন নাই—নতুবা তাঁহার লেখনী হইতে অধিকসংখ্যক মূল্যবান রচনা আমরা পাইতাম। পাণিনি, কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক সম্পর্কে গোল্‌ডস্টুকরের বহু সুচিন্তিত মন্তব্য ঐ সকল রচনার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে।

গোল্‌ডস্টুকরের রচনাবলীর বর্তমান মূল্য হয়ত পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে—কেননা, জ্ঞান সাধনার পথে মানবের মনীষা ক্রমশই আগাইয়া চলিয়াছে, এক জায়গায় থামিয়া দাঁড়াইয়া নাই। কিন্তু যে আদর্শনিষ্ঠা, কুসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ বিচারদৃষ্টি, লাভ-পূজা-খ্যাতির সর্ববিধ প্রলোভন জয় করিয়া জ্ঞানযোগে নিরন্তর যুক্ত করিয়া রাখিবার অনলস সাধনা প্রভৃতি দুর্লভ গুণের সমাবেশে এই পাশ্চাত্ত্য মনীষীর জীবন ব্রাহ্মণ্য দীপ্তিতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল গুণ বর্তমান বিদ্বৎ সমাজে এতই বিরল যে, সেই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা উদ্রেকের জন্য এই জ্ঞানতপস্বীর স্মৃতিতর্পণ অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করি।

পাদটীকা

(১) দ্রঃ মধুস্মৃতি, পৃ. ৪২০ (নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত, ১৩২৭)

(২) চতুর্দশপদী কবিতাবলী: 'পণ্ডিতবর থিওডোর্ গোল্‌ডস্টুকের্'।

(৩) প্রসিদ্ধ
Inside Alterthumskunde
(৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ)। গ্রন্থের রচয়িতা।

(৪) 'Description of Nature—The

Difference of Feeling excited by the Contemplation of Nature at Different Epochs, and amongst Different Races of Man'—
—নামক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৫) দ্রঃ

A. von Humboldt: Cosmos, vol. ii, p. 406 (Translated from the German by E. C. Otte'). London. Henry G. Bohn. 1864.

(৬) সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষার্থী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমেশচন্দ্র দত্ত সংস্কৃত বিষয়ে গোল্ডস্টুকারের ছাত্র ছিলেন।

(৭) J. Dickinson দ্রঃ Literary Remains ভূমিকা।

(৮) দ্রঃ
'Article VI: Opinions on Privy Council Law cases. A. On the Case between Neelkisto Deb Burmano and Beerchunder Thakoor. B. On the Question whether the Law of Bengal favours or discountenances the Principle of Perpetuity as Applicable to the Right of Inheritance.' **Literary Remains of the late Professor Theodore Goldstucker.** In Two Volumes. London: W. H. Allen & Co., 13, Waterloo Place, Pall Mall. S. W. 1879

হিন্দু আইন ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে গোল্ডস্টুকারের অগাধ জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে 'On the Deficiencies in the Present Administration of Hindu Law' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৯) **Literary Remains**, Vol. I. P. Xiii.

(১০) গোল্ডস্টুকের তাঁহার অভিধানখানি অধ্যাপক উইলসনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।
A Dictionary, Sanskrit And English Extended and Improved from the Second Edition of the Dictionary of Professor H. H. Wilson, With his Sanction and Concurrence; Together with A Supplement, Grammatical Appendices and Index, Serving as An English Sanskrit Vocabulary. By Theodor Goldstucker. Berlin: A. Asher and Co. London: D. Nutt, and Trubner and Co. MDCCCLVI.

(১১) Manava-Kalpa-Sutra Being a Portion of this Ancient Work on Vaidik Rites, together with the commentary of Kumarila-Swamin, with a Preface by Theodor Goldstucker. London, N. Trubner & Co., 1861.

(১২) **Panini: His Place in Sanskrit rature! An Investigation of Some Litarature! An Investigation of Some Literary and Chronological Questions which may be settled by a study of his work.**

পরবর্তীকালে এই ভূমিকা অংশটি পৃথক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খৃ এলাহাবাদ পাণিনি অফিস হইতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে শেষোক্ত সংস্করণটিই ব্যবহার করা হইয়াছে।

(১৩) দ্র Panini পৃ ১৯১—৯২,

(১৪) ঐ পৃ ১১

(১৫) ঐ পৃ ১৯৬—৯৭

(১৬) ঐ

(১৭) ঐ পৃ ১৯৮

(১৮) **Panini's Granematik, herausgegeben, "ubersetzt, erla" utert und mit verschiedenen Indias versehen von Otto Bohtlingk'** Leipzig.

(১৯) দ্রঃ পা সূ ৩ ৩ ১২২ ('ন্যায়' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়।)

(২০) Panini পৃ ১১৬ (পাদটীকা ১৭৮)। ... নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও বোট্‌লিংকের পাণিনি সংস্করণের উপযোগিতা যে নিতান্ত অল্প নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উৎসর্গ-পত্রটি উল্লেখযোগ্য—

"Goldstucker has admirbaly attacked Bohtlingk, but for Bohtlingk we forget Goldstucker;
and Whitney has admirably attacked Panini, but for Panini we forget Whitney.
I adore Bohtlink because he reveals to us the spirit of Panini.
I adore Panini because he reveals to the Spirit of India, adore India because it reveals to us the Spirit, the Spirit."

—Barend Faddegon: Studies on Paninis Grammer

(Amsterdam, 1936)

(২১) গোল্ডস্টুকারের Panini গ্রন্থের স্থায়ী মূল্য সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য যে আছে, একথা বলা যায় না। বিরোধী মতের উদাহরণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি লক্ষণীয়:—

"I cannot agree with Renon that Goldstucker's **Panini** (1861) **is the** "fundamental work on Panini (and accessorily, the Maha bhasya). ......If his Panini seems "eton namment vivant" it is because of its brilliant style and witty—though often malicious argumentation and the spark of intuitive genius that keeps flashing up now and again (without, however, shedding any light that could be trusted as a guidance). In reality and for all serious purposes—aside from its significance as a not altogether glorious chapter in the history of Western Indology—it is a corpse which should not be allowed to haunt our pertinent discussions, it can only cause mischief."—Paul Thieme: **Panini and the Paniniyas** (Journal of the American Oriental Society, vol. 76, No 1, P. 12. f.n. 26)

(২২) Literary remains —গ্রন্থে এই সকল প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা—আদিত্য ওহদেদার। এভারেস্ট বুক হাউস ৯৪, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০। সাত টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যই বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা আলোচিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কারণ এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা বাংলা সাহিত্যের দশ অবতারের মুখ দেখেছি। গল্প কবিতা নাটক প্রবন্ধ উপন্যাস ছড়া গান রম্যরচনা চিঠিপত্র এবং আলোচনা—কিনা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর জীবন এবং শিল্পজীবন একটি বৃহৎ এপিক উপন্যাসের মত বহু-পর্বের বিবিধ স্রোতের ঐক্যে প্রবাহিত। আদি এবং অন্ত্য বিশিষ্ট এই বিশাল কবি জীবনের পাশে পাশে নীহারিকাপথের মত সমালোচনার ধারাটিও প্রবাহিত।

শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার অতন্দ্র মনোযোগের সঙ্গে সেই বিপুল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সাময়িক আলোচনা এবং মন্তব্য টিপ্পনীর কালানুক্রমিক অংশ নির্বাচন করে নিজের দৃষ্টিসূত্রে সেগুলিকে গ্রথিত করেছেন। ১২৮০ থেকে ১৩৬০ সাল পর্যন্ত রচিত আলোচনাই তাঁর গ্রন্থের কক্ষীভূত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ আশী বছরের আলোচনার ধারা বাংলাদেশের একটি মাত্র সাহিত্যিক পরমাণুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই আবর্তনের মধ্যে বহু দৃঢ় এবং স্খলিত কণ্ঠ এবং সুরবদলের দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে।

বর্তমান লেখক অত্যন্ত সংযমের সঙ্গেই সমস্ত সমালোচনার উদ্ধৃতি লেখাগুলির মোটামুটি একটা মূল্যায়ন করেছেন তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ মিল হয়ত হবে না, তবু নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক দৃষ্টির প্রশংসা আমরা করব।

ভাষাটি সাবলীল। বিভিন্ন সময়ের বিচিত্র ঘটনার সংগ্রহ হিসেবেও বইটি কৌতূহল উদ্দীপ্ত করবে। সমালোচনা এবং ইতিহাস একসঙ্গে অনুগ্রথিত হয়েছে এবং উপভোগ্য হয়েছে। গবেষণাকামী আগামী দিনের ছাত্রদের এটি অনেক সহায়তা করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ২১২।৫৯

উপন্যাস

মৌসুমী সুর—কল্যাণী গোস্বামী। শতাব্দী লাইব্রেরী, ১০-বি কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য : আড়াই টাকা।

সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত শিল্পী-জীবনকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত। সেই জীবনে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত। সে কখনো বস্তী বাস করে, কখনো অতিবাহিত করে নবরত্নের একজন হয়ে মেস-জীবন। বস্তীতে বাসকালে সেই বস্তীর কঠোর মালিকের মেয়ে বাল্যবিধবা লক্ষ্মীর সদয় হস্ত মেঘলা আকাশে কতকটা উত্তাপের মতোই মনে হয় তার কাছে। তবু কোথাও বাঁধা থাকে না শিল্পী রবীন। সাধের বেহালাটিকে সংগী করে অজানার পথে বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ পেল রাজেনকে, তারি মাধ্যমে সংগীতরসিক ডাক্তার সাহেবের। রবীন নিযুক্ত হল ডাক্তার সাহেবের মেয়ে নমিতাকে বেহালা শেখাবার জন্য। কিন্তু ডাক্তারের আরেক কন্যা নন্দিনী চাইলো রবীনকেই। এমন সময় নমিতাও অসুখে মারা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রবীনের বাঁধন যেন ছিঁড়ে গেল। দূরপ্রান্তে সে দিল পাড়ি। সেখানে পরিচিত হল এক পাঞ্জাবী পরিবারের সঙ্গে। সঙ্গ পেল রোজেনার। কিন্তু শিল্পীর জীবন তখন নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। শুধু ডায়ারির পাতায় আশার ছবিটি কথার রেখায় আঁকা থাকলো। এখানেই উপন্যাসটির শেষ। কিন্তু এটিকে উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলাই ভালো। আর সর্বাপেক্ষা মধ্যে প্রাচীন দোষটিই বর্তমান রয়ে গেছে। তবে লেখকের গল্প বলার মুন্সিয়ানা আছে। লক্ষ্মী রাজেন ও ডাক্তারবাবুর চরিত্র মনে ছাপ রাখে। ৩৬৩।৫৯

রোদ জল ঝড়—দক্ষিণারঞ্জন বসু। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণ-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্যঃ সাড়ে চার টাকা।

টি বি রোগ বর্তমান শতাব্দীর এক অভিশাপ। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেমন বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল, স্যানাটোরিয়াম ইত্যাদির অভাব নেই তেমনি অভাব নেই বিভিন্ন ধরনের বইয়ের। এদের প্রায় সবগুলিই প্রবন্ধ আকারে লিখিত। রোদ জল ঝড় টি বি রোগীদের সম্পর্কে লিখিত হলেও এই বইটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। গুরুভার প্রবন্ধের বিষয়কে লক্ষণাবাদ, সহজ ও সাবলীল ভাষায় অল্প পরিসরের মধ্যে একটি কাহিনীতে সাজিয়েছেন। বইটি একটানা পড়ে যাওয়া যায়। এবং কাহিনীর টানে, পড়ে যেতে যেতে টি বি সম্পর্কে বহু তথ্য মনে গেঁথে যায়। রোদ জল ঝড় এই দিক থেকে বিচার করলে নিঃসন্দেহে সার্থক রচনা।

উপন্যাসে বর্ণিত দীননাথ হাসপাতালের নানা ধরনের টি বি রোগীদের দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্না, প্রেম, সাথীত্ববোধ এইজন্যেই মনে রেখাপাত করে।

লেখক আশাবাদী। তাই শত নৈরাশ্য দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি আশার ইঙ্গিত রেখেছেন। উপন্যাসটি শেষও হয়েছে আশার স্বপ্ন নিয়ে। ২৮৬।৫৯

নীল নীল চোখ—শ্রীমানব গঙ্গোপাধ্যায়। বেংগল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

সাহিত্যক্ষেত্রে মানব গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব একেবারে নতুন না হলেও 'নীল নীল চোখ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তরুণ লেখকের প্রথম উপন্যাস। বিকাশ এবং তার স্ত্রী রমা, রমার দাদা হরেনবাবু, এবং তার স্ত্রী—বড় বৌদি, এই চরিত্র চতুষ্টয় বর্তমান গ্রন্থের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে। একজন বিকারগ্রস্ত যুবকের কাহিনী উপন্যাসের আবহাওয়াকে ধূসর করে তুলেছে। বিকাশ সেই বিশেষ চরিত্রের মানসিক ব্যাধির মমতামাখা নীল নীল চোখের চাহনিতে সে কি এক আশ্চর্য ইঙ্গিত অনুভব করেছিল—যার ভাষা উদ্ধার করতে গিয়ে অকারণে সে নিজেই কেবলমাত্র ক্লান্ত হলো না, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে অবশেষে সে নিজেকে বিকৃত-চিত্তভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত অসুস্থ বলে প্রমাণিত করলো। অন্যান্য উপন্যাস থেকে এটা একটু পৃথক গ্রন্থকার একটি বিশেষ শ্রেণীর অনালোচিত চরিত্রকে বর্তমান গ্রন্থে পরিস্ফুটভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অনেক সময়েই তা স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করেছে বলেই মনে হবে।

গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কাহিনীর বিস্তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের অস্পষ্টতর সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমান গল্পাংশ সার্থক-ভাবে উপস্থিত, বরং একটি স্বাতন্ত্র্যবান ছোটগল্প হিসেবে পাঠক কাহিনীটিকে নিজের মনের মতো ভাবতে পারলে সুখী হতো। লেখকের মধ্যে আন্তরিকতা এবং কল্পনাশক্তির অসদ্ভাব নেই, রচনা নৈপুণ্যও আছে; তবে এক্ষেত্রে চরিত্রচিত্রায়ণ এবং কাহিনীর সম্যক বিন্যাসে তিনি তাঁর ক্ষমতার বিশেষ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। লেখকের সাহিত্যিক আন্তরিক তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে। ভাষা সাবলীল এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ উপমা

প্রয়োগের কৌশল প্রশংসনীয়। তবে বাক্‌ভঙ্গীর অযথা পুনরাবৃত্তি এবং স্থানে স্থানে দীর্ঘসংলাপ, প্রতি প্যারাগ্রাফে ব্যবহৃত অতিরিক্ত 'স্পেস্' ইত্যাদি গল্প পাঠের আমেজকে ক্ষুণ্ণ করবে।

গ্রন্থসজ্জা এবং প্রচ্ছদ সাধারণ রুচির পরিচায়ক॥ ৩২৫।৫৯

বাসর—উত্তমপুরুষ। তুলি-কলম, ৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২·৫০ ন প।

নবাবী আমলের একটি জীর্ণপ্রায় রহস্যময় জমিদার বাড়ি এই উপন্যাসের পটভূমি। ঘটনাক্রমে অগ্নিকাণ্ড, হত্যা, প্রেম প্রভৃতি কোনো বিষয়ই বাদ থাকেনি। জমিদারপুত্রের সঙ্গে এক গৃহশিক্ষিকার যে অনুরাগ কাহিনী তাতে তেমন মন টানে না।

উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করে কৌতূহলচরিতার্থ হয় না। শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'বিদেশী উপন্যাসের কাঠামো অনুসরণে।' ৩৪৮।৫৯

ধানদূর্বা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। বিশ্বসাহিত্য প্রকাশনী, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩৲।

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য সাধনা করছেন। স্বভাবতই তাঁর কাছে থেকে নতুন কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থে যখন সেই গ্রাম্য সমাজের একঘেয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি, রহস্য-রোমাঞ্চের সংমিশ্রণ দেখি, তখন আমাদের আশাভঙ্গ করেন তিনি, একথা বলাই বাহুল্য। বর্তমানকালে সাহিত্যিকের দৃষ্টি তীর্যকগতিতে রূপালী পর্দার দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে; শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী এই গতির দিক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি,—'ধানদূর্বা' উপন্যাসটিই তার প্রমাণ। জমিদারের ছেলের উচ্ছৃংখল জীবন এবং পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন, বিজয় ও উদয়ের মনোমালিন্য এবং মিলন, দাদুর মহৎচরিত্র এবং সর্বোপরি শ্যামার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা মনে ছাপ রাখলেও সর্বাধুনিক জীবন এতে অনুপস্থিত। ২৪০।৫৯

ঝরা বকুল : কৃষ্ণকলি। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা : ৬। দাম : পাঁচ টাকা।

সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস। বিষয়বস্তু সাধারণ হলেও ছদ্মনামী লেখক বা লেখিকার একটি তির্যক দৃষ্টিকোণ আছে। সাজিয়ে গুছিয়ে একটি গল্পকে তিনি বুনতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অক্ষুণ্ণ থাকে। রচনার এটি একটি বিশেষ গুণ। যাঁরা ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ ঘটনাবহুল উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন, এই বই তাঁদের প্রিয় হবে।

কবিতা

আকাশিনী ও মৃণ্ময়ী—শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দু' টাকা।

উত্তর কল্লোলযুগের খ্যাতনামা কবিদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই অধুনা প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিরই সন্ধান করেছি। এই কাব্যগ্রন্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিন্তার বিস্তৃতির পরিচয় পেয়েছি; কিন্তু সেই অনুপাতে পংক্তিতে পংক্তিতে গভীর যন্ত্রণায় দীর্ঘনিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়নি। অবশ্য, রোমান্টিক মনের মিষ্টি সুর; অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের সমন্বয় ও নিসর্গবোধের অভাব কোথাও ঘটেনি। 'সকাল: কুমারহাট' কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে নিসর্গবোধযুক্ত মিষ্টি সুরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ব্যঞ্জনাও ধ্বনিত হয়েছে সুরের প্রলেপে। অথচ 'নার্সিসাসের মতো কবিতায় যে দীর্ঘনিঃশ্বাসকে চিরন্তন করা সম্ভব ছিল,—তা আশীর্বাদীতা সত্ত্বেও পুরোপুরি সার্থক হয় নি। স্থানে স্থানে চলমান চিত্র ফুটিয়ে তুলতেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন,—

> উর্ণার মতো চুল যার
> আর চিন্তার মতো পাকানো জট
> বন্যার মতো উচ্ছল যার দেহের ঘট
> বিকেল-বন্যা সেই কন্যার ভাসাক মুখ।
> আলো-বন্যার স্বর্ণিল সেচে
> ভিজোক বুক।

এসব সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যনির্মিতিতে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষিত হল। তিনি অনেক কবিতায় দুই বা ততোধিক পংক্তিতে অন্ত্যমিল দিয়েছেন ক্রিয়াপদের সাহায্যে—যা কবিশক্তির নানতারই পরিচয় দান করে। তা ছাড়া তিনি প্রতন, পরাপ্রেপ্সা, অভোগ, দৃশার, প্রত্নস্থপক প্রভৃতি দুরোচ্চার্য শব্দ ব্যবহারের মোহ এখনো ত্যাগ করতে পারেননি। সাধারণ পাঠক এখন কবিতামুখী হয়েছেন, তাঁরা যেন পুনরায় ভীতিগ্রস্ত হয়ে না পড়েন। ছন্দের ব্যবহারেও মাঝে মাঝে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যায়। যেমন, 'ডাকপাখি' কবিতার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তারি যতো মূর্ছনা' পংক্তিটি ধীরলয় তানপ্রধান ছন্দে লেখা। কিন্তু পংক্তিটির যুগ্ম শব্দগুলিকে টেনে না পড়ে যদি একটু এদিক ওদিক করে লেখা হত, তাতে ছন্দের টানা-পোড়েন পড়তে হত কি? তবে বলবো 'একটি গাঁয়ে দুটি ভোর'এর মতো খুব ভালো কবিতাও এই কাব্যগ্রন্থে আছে। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই ভালো। ১৭৯।৫৯

রোদনভরা এ বসন্ত—চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১।১এ, গোবিন্দ বসু লেন, কলিকাতা-২৫। মূল্য এক টাকা॥

দশটি কবিতা নিয়ে এই কাব্যপুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। না পাওয়ার বেদনামধুর অনুভবকে কবি কাব্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন—প্রতিটি লেখায় অপরিণত হাতের পদ্যগন্ধী তরল উচ্ছ্বাস বর্তমান। 'রোদনভরা এ বসন্ত' নামে অন্য একজন কথাসাহিত্যিকের একটি উপন্যাস রয়েছে—পাঠক যে নামবিভ্রাটে পড়বেন,—এ তথ্য কবির জানা উচিত। ২৫২।৫৮

শিশিরবিন্দু—সমীরকুমার গুপ্ত। স্বাক্ষর প্রকাশনী, ৬৬ কালীনাথ মুন্সী লেন, কলিকাতা-৩৬। মূল্য: এক টাকা॥

উনিশটি কবিতা নিয়ে একখানি নতুন কবিতার বই। কবি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কাব্যের উপকরণ আহরণ করলেও তাঁর কণ্ঠে যৌবনযন্ত্রণার একটা করুণ সুর ফুটে উঠেছে, কোনো সুস্থির লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ভূমিকায়

লেখক বলেছেন, সময়ের অপব্যবহার, শক্তির অপচয় এবং অক্ষম কবি-কল্পনা-বিলাস ছাড়াও মননশীল পাঠক যদি এর মধ্যে গভীরতর কিছু খুঁজে পান, সেটা তাঁর সৌভাগ্য। অবশ্য সহজ আবেগবাহী 'নদী, প্রেমমৃত্যু মৃত্তিকা, কান্না, পঞ্চবটী, রাধিকা, শিশিরবিন্দু' ইত্যাদি কবিতাগুলি অনায়াসে হৃদয়কে স্পর্শ করবে। ২৯৫।৫৮,

ভ্রমণ কাহিনী

হিমতীর্থ—সুকুমার রায়। প্রাপ্তিস্থান: বেংগল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·৫০ নঃ পঃ।

শ্রীসুকুমার রায় রচিত হিমতীর্থ—হিমালয় সম্পর্কিত ভ্রমণ-সাহিত্যের তালিকায় নূতন সংযোজন। এই গ্রন্থের লেখক বয়সে তরুণ, হিমালয়ের ডাকে তিনি বেরিয়েছিলেন দুর্গমতম অঞ্চলে এবং লাভবান হয়েছেন। শ্রীসুকুমার রায় সেই জাতের লেখক, যাঁদের চোখ নিয়তই খোলা আর মন সর্বদা সজাগ। এই খোলা চোখ আর মন নিয়ে তিনি সব দেখেছেন—ক্যামেরার লেন্সের মত যা কিছু মনের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, তাই রূপায়িত করেছেন তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে। অতি সুন্দর ঝরঝরে ভাষায় ভাবাবেগমুক্ত ভংগীতে যে চির নূতন জগতের সন্ধান তিনি দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। এই ভ্রমণ কথা পড়ে মনে হয়, হিমালয় লেখককে বারবার আকর্ষণ করবে, আর পরিণত মন নিয়ে লেখক তাঁর অনাড়ম্বর ভংগীতে সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরেও যে হিমকন্দর রয়েছে, লেখক সেদিকে দৃষ্টি দিলে সাহিত্যের উপকার হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

১১২।৫৯

সুন্দরী কাশ্মীর—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়। শ্রীপশুপতি বিশ্বাস, ১, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য—১·২৫ নঃ পঃ।

গ্রন্থকার কিছুকাল পূর্বে ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করে এসে যে প্রাকৃতিক ও অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করেছেন, তারই বিবরণ তিনি বর্তমান পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতিকে দু' চোখ ভরে দেখার বা অনুভব করবার একটা মন লেখকের আছে, তবে সেই অনুভূতি যে একেবারে সাক্ষা সেকথা বলা যায় না। আবেগের দুরন্ত হাওয়া বর্তমান কাহিনীর বক্তব্যকে অনেক জায়গায় একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছে লেখকের ভাষা এবং বর্ণনাভংগী আদর্শ-স্থানীয় নয়। ২৮২।৫৯

আত্মকাহিনী

ডাক্তারের দুনিয়া পশুপতি ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬।

শুধুমাত্র দেহের রোগের চিকিৎসকই ইনি নন, মনের বিচিত্র রোগের অনুসন্ধানও করেছেন। শুধু তাই নয়, সংবেদনশীল মন নিয়ে বিচার করেছেন মানুষকে। দীর্ঘ চিকিৎসক-জীবনের অভিজ্ঞতায় অজস্র নর-নারীর সান্নিধ্যে এঁকে আসতে হয়েছে। তবু এঁর 'ফি'-এর চেয়ে দরদী মনটাই বড়—তারই পরিচয় পাই এই গ্রন্থে। আর সবার পেছনে রয়েছে একটি কবিমন, অগাধ সাহিত্য-প্রীতি। তাই রবীন্দ্রনাথের শুধু তিনি চিকিৎসাই করেননি, তাঁর গানের আসরের অন্যতম গায়কের পদও অলঙ্কৃত করেছেন। কতো বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এই গ্রন্থে; সাধারণ মানুষের মধ্যে কত অসাধারণত্ব। মালার মতো নারীচরিত্র—প্রথম থেকে যে রহস্যময়ী, নির্মলার মত মেয়ে—যার বাসনা মিটেও মিটলো না, বাই-চরণের মতো কয়েদী—যে পরবর্তী জীবনে ভদ্র হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, কমলের মতো কবি সাধীর ঘোষালের মতো রূপ-মুগ্ধ স্বার্থান্বেষী, বানীমার মতো উদার-হৃদয়া মহীয়সী নারী,—এমনকি আরো অনেক চরিত্র মনে স্থায়ী ছাপ রাখে। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর একটি অধ্যায় মাত্র হলেও, এই গ্রন্থে একটি সর্বজনীন আবেদন আছে। তদুপরি গ্রন্থটির ভাষা সাবলীল ও সুখপাঠ্য। ৩৩১।৫৯

সঙ্গীত

রাগ ও তাল—অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী। সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ২০সি লেক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। মূল্য: দু' টাকা।

ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় সংগীত বিলাসের বস্তু হিসেবে মুষ্টিমেয় রাজা মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিদের কুক্ষিগত ছিল। যদিও তাদের দানকে স্বীকার করা যায়, তথাপি জনসাধারণই এর প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক হওয়া উচিৎ। সেই কারণে সংগীত বিষয়ক পুস্তকের প্রয়োজনীয়তাও দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া আনন্দের ব্যাপার।

উপরোক্ত পুস্তকে পঁচিশটি প্রচলিত ও অপ্রচলিত তালের তালাংক সম্বলিত তবলা পাখোয়াজের ঠেকা দিয়েছেন এবং বর্ণানু-ক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শতাধিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের ছোট ছোট গৎ সন্নিবেশিত করেছেন। এই ছোট ছোট গৎগুলি তবলা লহরার সংগে বাজাবার বিশেষ উপযোগী। এই ধরনের রাগাশ্রিত ছোট গৎগুলোকে উর্দুতে নগমা (short melody) বলা হয়। রাগ রাগিণীর এই সংক্ষিপ্ত গৎ বা স্বর-মালিকাগুলো কণ্ঠ-সংগীত ও নৃত্যশিক্ষার্থীদের রাগ ও তালের জ্ঞান অর্জনেও বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে কাজে লাগবে। তাই, সংগীতের নবাগত অনুশীলনকারী, গায়ক, বাদক, তালযন্ত্রশিক্ষার্থী, নৃত্যার্থী এবং পরীক্ষার্থীদের এগুলো বিশেষ কাজে লাগবে। রাগরাগিণী নির্ণয়েও এ গৎগুলো অভিজ্ঞানরূপে সাহায্য করবে।

এ গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হলেও এর বহুল প্রচার কামনা করি। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হলে এ ধরনের গ্রন্থও অবশ্য প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য। ৬৪।৫৯

প্রাথমিক হাওয়াইয়ান গীটার শিক্ষা—প্রদ্যোৎ দাস, এস চন্দ্র এণ্ড কোং, ৪, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। তিন টাকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে হাওয়াইয়ান গীটারের উৎপত্তি, গীটারের প্রকারভেদ, বাজাইবার পদ্ধতি, সুর বাঁধিবার পদ্ধতি, আঙুলের চিহ্ন ও বাজাইবার নিয়ম প্রভৃতি সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে স্টাফ নোটেশনের প্রণালীও বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুস্তকটিতে কয়েকটি গৎ এবং রবীন্দ্রনাথের শিউলি ফুল শিউলি ফুল, সংকোচক বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী এবং আসা যাওয়ার পথের ধারে—এই চারটি গানের গীটারের উপযোগী স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকটি নবীন শিক্ষার্থী-দের উপযোগী করিয়া লেখা এবং তাহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। দাম আরও কম করিতে পারিলে ভাল হইত। ৩৬।৫৯

কাবর লড়াই—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। প্রকাশক শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী, ৯এ, বলরাম বসু ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-২০। মূল্য এক টাকা।

আবৃত্তি ও অভিনয় সহজভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র ছড়ার মাধ্যমে লেখক তরলমতি বালক-বালিকাদের নিঃসন্দেহে হাসি এবং আনন্দের খোরাক জোগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রতিটি ছড়ার সংগে চিত্র সংযোজিত হইয়া পুস্তিকা-খানি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছড়া-গুলি উপদেশাত্মক হইলে বালক-বালিকারা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগের সংগে সংগে অল্পাধিক জ্ঞানলাভেও সমর্থ হইতে পারিত। ছাপা ভাল এবং প্রচ্ছদপট সুন্দর।

৪২৭।৫৮

বিবিধ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান: আর্মেনগার্ড ইবার্স। প্রকাশক: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি। ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা: ৯। দাম: ১·১০।

সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে উজ্জ্বল কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে। এই লক্ষণগুলি পাঠকের প্রত্যাশাকে বাড়িয়ে

ফুলছে। Total বা পরিপূর্ণ সাহিত্য বলতে যা বোঝা যায়, তা শুধু গল্প এবং উপন্যাসের বৃত্তেই সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সকল শাখাকে সে আত্মসাৎ করে নেয়।

ইদানীং মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান--নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার পথ খুলে গিয়েছে। সাহিত্যের কান্তি, পুষ্টি এবং ঋদ্ধির জন্য এই উন্মোচন খুবই প্রয়োজন ছিল।

'চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান'--নামই বইটির বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেয়। এই ছোট্ট বইটি আর্মেনগার্ড ইবার্লের Modern Medical Discoveries-এর অনুবাদ।

সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের রোগজয়ের ইতিহাসটি জড়িত। যন্ত্রযুগের পর থেকেই মানুষের ব্যাধিও জটিল হয়েছে। নতুন নতুন রোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোগ-নিরাময়ের নতুন নতুন পন্থারও উদ্ভব হয়েছে। মানুষ কোনদিন রোগের কাছে হার মানে নি।

'চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান' আধুনিক ব্যাধি এবং আধুনিক ভেষজ সম্বন্ধে সুন্দর, মূল্যবান একটি আলোচনা।
(১৮৯।৫৯)

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে রোগ-নিবারণ--'আয়রনম্যান' শ্রীনীরদকুমার সরকার। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা--১২। মূল্য ৩.।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ব্যায়াম ও আসন--'আয়রনম্যান' শ্রীনীরদকুমার সরকার। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা--১২ মূল্য ১·৫০ ন প

শ্রীযুক্ত নীরদকুমার সরকার ব্যায়াম শিক্ষক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকাল ধরে তিনি রোগ দূরীকরণের ও স্বাস্থ্যদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা অসামান্য এবং মতামতও অমোঘ।

অবশ্য ব্যায়ামেই মানুষ নীরোগ হয় না। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে রোগ ও রোগের ত্রুটি দূর করাও প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। দেশী-বিদেশী পদ্ধতিতে ব্যায়াম করে 'মোটা-সোটা' হওয়া যায়, রোগ দূর করা যায় না। পরে সেই রোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই আভ্যন্তরিক রোগ নির্মূল করার জন্যে চাই যৌগিক ব্যায়াম। প্রথম গ্রন্থটিতে শ্রী সরকার কমপক্ষে ৩৮ রকম অসুখ ও যৌগিক ব্যায়ামের দ্বারা তা প্রতিকার করার উপায় নির্দেশ করেছেন। সর্দি, কাশি, উদরাময়, প্লুরিসি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, বাত, একশিরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগ শ্রী সরকার যৌগিক ব্যায়ামের দ্বারা সারিয়েছেন। পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে কয়েকটি যৌগিক আসনসম্বলিত ছবিও আছে। পুস্তকের শেষে মলশুদ্ধি, অশ্বিনীমুদ্রা, অগ্নিসার ধৌতি, শীতলী-কুম্ভক ও নাভিকুণ্ড ধ্যান সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় পুস্তকটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত। উপদেষ্টা ছাড়া ব্যায়াম-চর্চা অনেক সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই এই পুস্তকের সাহায্যে যাতে 'রোগা-পটকারা'ও ছেলেরা ঘরে থেকে ব্যায়াম-চর্চা করতে পারে, শ্রীসরকার সেইভাবেই পুস্তকটি রচনা করেছেন। ভাষা সহজ ও সরল। প্রত্যেকটি আসন-প্রণালী চিত্রের দ্বারা সহজবোধ্য করা হয়েছে। তাছাড়া এই পুস্তকটির লভ্যাংশের অধিকাংশ শরীর-চর্চা প্রচারে ব্যয়িত হবে বলে লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন।
২৩৮।৫৯, ২৩৭।৫৯

শারদ সাহিত্য

নতুন খবর--সম্পাদক ধীরেন মল্লিক ও শচীন সিংহ। ১৬।১৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকাটির এই বিশেষ শারদীয়া সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য শৈলজানন্দর বড় গল্প, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বিজয় গুপ্তের উপন্যাস; মন্মথ রায়, প্রশান্ত চৌধুরী ও অখিল নিয়োগীর নাটক। এ ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সাংবাদিকের রচনা সংখ্যাটির শোভা বর্ধন করেছে। চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পী ও আগামী আকর্ষণের ছবি ছাড়া শৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের শিল্পীদের ছবি এর আর একটি আকর্ষণ।

আলোছায়া--সম্পাদক মাধবলাল মল্লিক। ১৬।১৭ কলেজ স্ট্রীট। মূল্য এক টাকা চার আনা।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু ছাড়া প্রধানত নতুন লেখকদের গল্প প্রবন্ধ সম্ভারে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। এখনকার রেওয়াজ মতো চলচ্চিত্রের শিল্পীদের ছবিও যথেষ্ট মুদ্রিত হয়েছে।

চতুষ্কোণ--সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও প্রদ্যোৎ গুহ। ২০৬ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা--৬। মূল্য ২ টাকা।

সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান কথা-সাহিত্যিকদের সঙ্গে নবীনদের লেখা আটটি গল্প, সুনীল ঘোষ রচিত একখানি উপন্যাস; বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ষোলজন কবির রচনা; প্রবন্ধের দিকে সরোজ আচার্য, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রম্যরচনায় হিরণকুমার সান্যাল এবং এ ছাড়া চলচ্চিত্র ও মঞ্চ সম্পর্কিত প্রবন্ধ সমন্বয়ে 'চতুষ্কোণ' রুচিবান পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে।

ঘরে বাইরে: সম্পাদিকা--কনক মুখোপাধ্যায়। কার্যালয়, ১৮৮।২, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা--১২; মূল্য : ১·৫০ টাকা।

লেখিকাবৃন্দের রচনায় সমৃদ্ধ শারদীয়া ঘরে বাইরে। বর্তমান যুগের কয়েকজন--যে সকল খ্যাতনাম্নী মহিলা সাহিত্যিকের লিখিত উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সংখ্যাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার মধ্যে আছেন প্রবন্ধে শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, ডাঃ রমা চৌধুরী, শ্রীমণিকুন্তলা সেন, কবিতায় শ্রীরাণী রায়; রম্য-রচনায় শ্রীলীলা মজুমদার; গল্প ও উপন্যাসে শ্রীপ্রভাবতী-দেবী সরস্বতী, শ্রীবেলা দে ইত্যাদি। আলোচ্য পুস্তকটিতে সন্নিবেশিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে শ্রীসত্য সেনের 'রাত্রির তপস্যা' উল্লেখযোগ্য। শিল্পকলা বিভাগে 'চাইনিজ এমব্রয়ডারী প্যাটার্নস'-গুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাটির পরিচ্ছন্নতা আকর্ষণীয়।

ময়দানে (শারদ সংকলন) : সম্পাদক--মানিকলাল চক্রবর্তী : ৪৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা--৯ হইতে প্রকাশিত মূল্য : ০·৫০ নঃ পঃ।

আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাটি ক্রীড়ামোদী পাঠকের নিকট সমাদৃত হবে বলে মনে হয়। শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেনের 'অলিম্পিকের ট্র্যাজিকমিক' এবং সম্প্রতি ইংলন্ড সফরকারী ভারতীয় দলের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে শ্রীঅসীমরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের গুলি কৌতূহলী পাঠকের কৌতূহল কিছুটা মেটাবে। কয়েকটি ছোট গল্পও সংখ্যাটিতে আছে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

Our Struggle—Moni Ghosh.
Basic Labour Problems—Edited by Pratap Kumar Banerjee.
সর্বাণী—দীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
আমি কে?—উত্তর—শ্রীসূর্যকুমার দত্ত।
চন্দ্রগুপ্ত—শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা।
রস ও কাব্য—ডক্টর হরিহর মিশ্র।
ধ্যান ও প্রার্থনা ২য় ভাগ—শ্রীমা।
জাতিস্মর-কথা—শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু।
রূপমতী—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
প্রেমের গল্প—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা—শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

চক্রদত্ত

আজকাল ধান চাষের সাহায্যের জন্য একটি বেশ সস্তার নতুন যন্ত্র বার হয়েছে। কটকের "সেণ্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট" এই যন্ত্রটি বার করেছেন। ধানক্ষেতে জল জমলে এই যন্ত্র দিয়ে জমি চাষ করা সহজ হবে। যন্ত্রটি খুব জটিল নয় এবং চালান খুব সহজ। একজোড়া বলদের সাহায্যে চালান যাবে। ঘুরে ঘুরে মাটি কাটার উপযোগী অনেকগুলি ব্লেড এর মধ্যে আছে। যন্ত্রটি যখন চালান হবে, তখন শুধু যে মাটি কাটা হবে তা নয়, কাটা মাটি জলের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়ারও সহায়তা করবে। রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, শুধু মাত্র খুব শক্ত এঁটেল মাটি ছাড়া আর সব রকম মাটির ওপরেই এ-যন্ত্রটি কাজ দেবে। আট ঘণ্টার মধ্যে প্রায় তিন একর জমি যন্ত্র দিয়ে চাষ করা সম্ভব হবে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, ধান রোপণের আগে জমিতে অতি অবশ্যই হালচষাতে হয়। সাধারণভাবে জমি ধান রোপণের উপযোগী করতে হলে অনেকবার করে চষতে হয়, কিন্তু এই যন্ত্র দিয়ে মাত্র দুবার জমি চষে ফেললে অনেক বেশী উপকার পাওয়া যায়। বর্তমানে যন্ত্রটি বাণিজ্যিকভাবে কোয়েম্বাটুর ও হায়দরাবাদের দুটি বিভিন্ন কোম্পানি তৈরী করছেন, তবে এটি খুব জটিল না হওয়ায় যে-কোনও স্থানেই তৈরী করা সম্ভব হবে। মাত্র সত্তর টাকা দামে এত কার্যকরী যন্ত্র পাওয়া সত্যই খুব লাভজনক মনে হয়।

*

বছর দুই আগে যুক্তরাজ্যের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গবেষক হঠাৎ এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যার সাহায্যে চোখের ছানি অপারেশন করা সহজ হয়ে গেছে। এমনিতেই ছানি অপারেশন করা খুব একটা শক্ত ব্যাপার ছিল না। তবু চোখে অস্ত্রোপচার করতে হলে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেই হয়। অনেক সময় চোখে ছানি পড়া সত্ত্বেও চোখের মণিটা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তারেরা বেশ কয়েক বছরের জন্য অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। আলফা-সাই মোট্রিপসিন নামে নতুন ওষুধটির সাহায্যে আর অযথা অপেক্ষা করার দরকার তো হয়ই না, উপরন্তু খুব অল্প আয়াসে অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়। যেসব লিগামেন্টের দ্বারা চোখের মণি আটকান থাকে, এই ওষুধ দিয়ে অন্যান্য টিস্যুগুলি নষ্ট না করে ঐ লিগামেন্টগুলো গলিয়ে ফেলা যায়—ফলে সাধারণভাবে যতটা কাটাছেঁড়া করা হতো ততটাও দরকার হয় না।

*

আজকের দিনে খোদার ওপর খোদকারী করা কিছু নতুন কথা নয়। নকল মুক্তো, নকল হীরার গয়না যে-কোনও দোকানেই দেখতে পাওয়া যায়। স্ফটিক একটি অমূল্য রত্ন বলেই জানি এবং এখানেও যে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করা যায়, একথা সত্যই নতুন মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কারখানায় এই অমূল্য রত্ন উৎপন্ন করা হচ্ছে এবং সেগুলি প্রাকৃতিক রত্নগুলির চেয়েও নিখুঁত হয়। কতকগুলি ছোট ছোট স্ফটিকের দানা প্রেসারের কুকারে রেখে তার সঙ্গে কিছুটা সোডার জল ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে কিছুক্ষণ গরম করতে থাকলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড গলে গিয়ে স্ফটিকের দানার মত দানা বাঁধতে থাকে। এ-রত্নে কোনও রকম দাগ থাকে না। এগুলো টেলিফোন সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে খুব কাজে লাগে। প্রকৃতির বিধানে এই রত্ন জন্মাতে হাজার হাজার বছর লাগে, কিন্তু মানুষের হাতে এক মাসের মধ্যেই তৈরী হয়ে যায়।

*

প্রফেসার উইলিয়ম হ্যাজার বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক রকম বাড়ি তৈরী করেছেন। একটা স্টীল ফ্রেমের চার ধারে দেওয়াল হিসাবে দুখানা করে কাঁচের মধ্যে একখানা প্লাস্টিকের চাদর দেওয়া থাকে, আর প্লাস্টিকের চাদরে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, শীতের দিনে ঘর গরম করার জন্য তাপ উৎপন্ন করা যায়, আবার গরমের দিনে ঠাণ্ডা হাওয়া পাম্প করে ঢুকিয়ে দিলে ঘরটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। পরীক্ষামূলকভাবে ২০ ফুট×২০ ফুট মাপের একখানি ঘর এই পদ্ধতিতে তৈরী করেছেন এবং প্রফেসর উইলিয়ম আশা করেন যে ঐ ঘর যদি সত্যই কার্যকরী হয় তাহলে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এই পদ্ধতিতে একটি আটতলা বড় বাড়ি তৈরী করবেন।
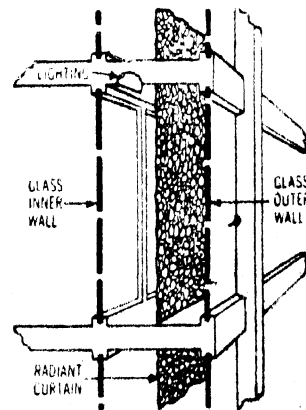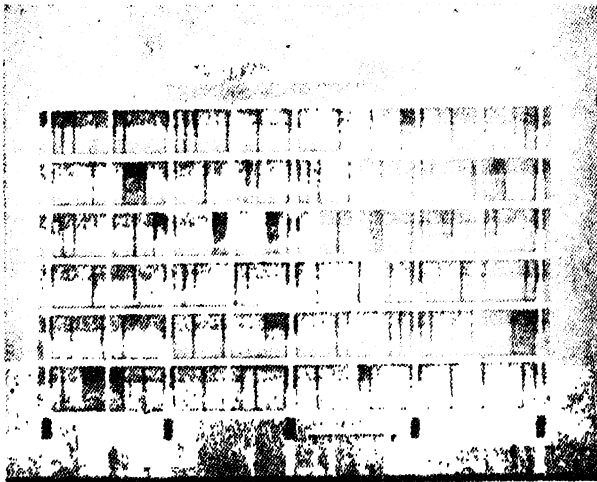
বাঁদিকে বায়ু নিয়ন্ত্রিত বাড়ির নক্সা এবং ডানদিকে ঐ বাড়ির দেওয়ালের নির্মাণপদ্ধতি

চন্দ্রশেখর

ছ' মাসের ছবি

বর্তমান বাংলা বছরে অর্থাৎ গত ১লা বৈশাখ থেকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের যে সঞ্চয় তা পথপ্রান্তে ফেলে যাবার মতো নয়, পাথেয় করে চলবার মতো। এই স্বল্পকালের মধ্যেই এমন তিনখানি ছবির শুভমুক্তি ঘটেছে যেগুলি বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টিগুলির পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য। বলা বাহুল্য, ছবি তিনটি 'সাগর সঙ্গমে', 'অপুর সংসার' ও 'হেডমাস্টার'। এ-বাদেও আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি এই সময়ের মধ্যেই দর্শকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে। ছবি দুটি হলঃ 'কিছুক্ষণ' এবং 'ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি'।

বাংলা ছায়াছবির উৎকর্ষের মূলে রয়েছে মুখ্যত তিনটি কারণঃ—(১) প্রয়োগ-নৈপুণ্যের বিচিত্র ধারা, (২) নবাগত রূপকার ও শিল্পীর আবির্ভাব, (৩) চলচ্চিত্রে সাহিত্যের মর্যাদা।

প্রয়োগ-নৈপুণ্যের আলোচনায় এ-বছরের শ্রেষ্ঠ তিনটি ছবির কথাই ধরা যাক। কলাকৌশলের বহু আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যকে দূরে সরিয়ে রেখে কাহিনীর গূঢ় মর্মসঞ্চারী রসটিকে পর্দায় আবেগে আলোকিত করে পরিবেশন করবার সহজ, সরল গুহ্যমন্ত্রটি দেবকী বসু ব্যক্ত করেছেন, 'সাগর সঙ্গমে' ছবিতে। সত্যজিৎ রায়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যে শিল্পশোভনতা, কথাবস্তুর যে শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস, ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের যে সূক্ষ্ম ব্যবহার তাতে অপণ্ডিত বা নাট্যভাব-গ্রাহিষ্ণু দর্শকের প্রবেশাধিকার নেই বলে যে অভিযোগ প্রায়ই শোনা যেত —বিশেষত 'পথের পাঁচালী'র পরের ছবিগুলিতে,—'অপুর সংসার'-এর মাধ্যমে প্রখ্যাত পরিচালক সে অভিযোগ সমূলে খণ্ডন করেছেন। অগ্রগামী রূপকার গোষ্ঠী 'হেডমাস্টার' ছবিতে যে অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা শুধু এ-দেশের ছবিতে নয়, বিদেশের ছবিতেও বিরল। চলচ্চিত্রের যে ভাষা অনেক সময় পুঁথির ভাষার চাইতেও মুখর তাই আশ্চর্যভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছে 'হেডমাস্টার'কে।

উল্লিখিত ছবিগুলি ছাড়াও প্রয়োগ-কৌশলের বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে অসিত সেনের 'দীপ জ্বেলে যাই' ও ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবি দুটিতেও। বুদ্ধিদীপ্ত, বাস্তবধর্মী ও শিল্পসচেতন চিত্রপরিচালনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই দুটি ছবি। 'কিছুক্ষণ' ছবিতে নবাগত প্রয়োগ-শিল্পী অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় রসানুভূতির অনাড়ম্বর পথটি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু প্রগাঢ় সাহিত্যচেতনার জন্যে যাঁরা দর্শকের অন্তর জয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন, 'ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি'র পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য ও 'কিছুক্ষণ'-এর পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

আলোচ্য কালে বাংলা ছবিতে যে দুজন নতুন রূপকারের স্বাগত আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে 'মাহুত বন্ধুরে'-র পরিচালক ভূপেন হাজারিকা ও 'কিছুক্ষণ'-এর পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নতুন শিশুশিল্পীদের মধ্যে প্রথম অবতরণেই দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছেন মঞ্জু অধিকারী ('সাগর সঙ্গমে'), পরমভট্টারক লাহিড়ী ('বাড়ি থেকে পালিয়ে'), বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায় ('নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে') সজল ঘোষ ('ইন্দ্রনাথ,

জয়শ্রী পিকচার্সের প্রথম নিবেদন "অজানা কাহিনী"র সঙ্গীত গ্রহণকালীন এই দৃশ্যে (বাম দিক থেকে) দেখা যাচ্ছে ছবির পরিচালক সুনীলবরণ, গায়ক হেমন্তকুমার ও সঙ্গীত পরিচালক অপরেশ লাহিড়ীকে

শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি')। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বাংলা ছবির গৌরব বাড়াতে যাঁরা নতুন এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হেমাঙ্গিনী দেবী ('কিছুক্ষণ') শর্মিলা ঠাকুর ('অপুর সংসার') সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ('অপুর সংসার') ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ('হেডমাস্টার')। সুপ্রিয়া চৌধুরীকে বাংলা ছবির একজন নতুন নায়িকারূপে দেখা গেল এ-বছরে 'আম্রপালী', 'এ জহর সে জহর নয়' ও 'সোনার হরিণ' ছবিগুলিতে। নৃত্য-পটিয়সী ও সুঅভিনেত্রী এই নায়িকা সহজেই দর্শকের মন জয় করে নিয়েছেন। শিল্পী-নির্বাচনে এ-বছরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে 'নৃত্যেরই তালে তালে', 'মাহুত বন্ধুরে' ও 'পুষ্পধনু' ছবি তিনটিতে অবাঙালী শিল্পী-সমাবেশের ফলে।

মহৎ সাহিত্য রজতপটে রূপায়িত করবার গৌরব বাংলা অর্জন করেছে ফিল্মশিল্পের আদি যুগ থেকেই। এই ঐতিহ্যেরই প্রকৃষ্ট বাহক হয়ে উপস্থিত হয়েছে এ-বছরের কয়েকটি ছবি। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ছবির শুভমুক্তি ঘটেছে সেগুলির মাধ্যমে অনেক বিচিত্রধরনের চরিত্র ভিড় করে

কল্লোল ফিল্মসের "বাইশে শ্রাবণ" চিত্রে নবাগতা মাধবী মুখোপাধ্যায়। মৃণাল সেন ছবিটি পরিচালনা করছেন

এসেছে বাংলা চলচ্চিত্রপটে। এদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বারোসী ও দাক্ষায়ণী ('সাগর সংগমে'), বনফুলের লেখনীতে জন্ম-নেওয়া একটি আটকে পড়া ট্রেনের বিচিত্ররূপী যাত্রিদল ('কিছুক্ষণ') নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কৃষ্ণপ্রসন্ন ('হেডমাস্টার') ও শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি ('ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি') অমরত্বের দাবি নিয়ে এসেছে। শুধু চরিত্রগুলির প্রকৃত সাহিত্য-পরিচয় প্রতিষ্ঠাই নয়, রসসিদ্ধ এই সাহিত্যিকদের অমর সাহিত্যকীর্তির মূল রস ও বক্তব্যের বিস্ময়কর অবয়ব হিসাবেও উপস্থিত হয়েছে এই ছবিগুলি। 'অপুর সংসার'-এর অপু অনেকাংশে সত্যজিৎ রায়ের মানস-কল্পিত চরিত্র হলেও তার উত্তর-বিবাহিত জীবনের কাহিনীতে সাহিত্যরসের অভাব নেই। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের যাত্রাস্থল যে একই, উভয়ের সম্পর্কও যে অবিচ্ছিন্ন ও নিবিড়, এবং সাহিত্যের রসে সঞ্জীবিত হয়েই যে ছায়াছবি আর্টের রাজ্যে স্থায়ী প্রবেশপত্র লাভ করতে পারে, বর্তমান বছরের এই ছবিগুলি তা প্রমাণ করেছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শিবরাম চক্রবর্তীর দুটি মধুর শিশু-কাহিনী রূপ নিয়েছে 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' ও 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'-তে। আশাপূর্ণা দেবীর একটি মরমী পারিবারিক গল্প চিত্রায়িত হয়েছে 'শশীবাবুর সংসার'-এ। এ বাদেও প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও অবধূত-এর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী 'পুষ্পধনু', 'জল জঙ্গল', 'দীপ জেলে যাই' ও 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে' ছবিগুলি অভিনব বিষয়বস্তুর আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিরল প্রয়োগ-নৈপুণ্য, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও নতুন রূপকারের আবির্ভাব (পরিচালক ও শিল্পী) বর্তমান বছরের বাংলা ছবিগুলিকে একটি বিশেষ কৌলীন্য দান করেছে।

নূতন পুরাতন হবার আগেই চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নেবেন তাঁর আসন্ন পরিণয়ের পর। "বসন্ত" ও "মঞ্জিল" এই ছবি দুখানিতে তাঁকে আচিরেই দেখা যাবে

চিত্রালোচনা

শারদীয়া পুজোর প্রাক্কালে এ সপ্তাহে তিনখানি নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে—বাংলায় "সোনার হরিণ" এবং হিন্দীতে "চার দিল চার রাহে" ও "দিল দেকে দেখো"

রাসবিহারী লাল ও মঙ্গল চক্রবর্তী—এই লেখক-পরিচালক জুটি ছবির পর্দায় ইতিপূর্বে যে সাফল্য অর্জন করেছে, তারই ঐতিহ্য বহন করে এসেছে তাঁদের নবতম যৌথ অবদান "সোনার হরিণ"। ন্যাশনাল পিকচার্সের এই ছবিতে তারকা সমাবেশও লক্ষ্যণীয়। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী এর নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, বিপিন গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য,

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার "শুভ বিবাহ" ছবির একটি আবেগময় দৃশ্যে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল

তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, নমিতা সিংহ প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনা এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

হিন্দী ছবি দুটিতে "দিল"-এর ছড়াছড়ি, সুতরাং "মহব্বত"-এরও মহোৎসব। নয়াসংসারের "চার দিল চার রাহে" খাজা আহমেদ আব্বাসের প্রযোজনা ও পরিচালনায় তোলা হয়েছে। ভূমিকালিপির পুরোভাগে স্থান পেয়েছেন রাজকাপুর, মীনাকুমারী, নিম্মি, কুমকুম, জয়রাজ, অচলা সচদেব, ডেভিড, আনোয়ার ও শাম্মী কাপুর। এককথায় এটি একটি তারকাখচিত ছবি। অনিল বিশ্বাস এতে সুরসৃষ্টি করেছেন।

শশধর মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ফিল্মালয়ের প্রথম নিবেদন "দিল দেকে দেখো"। শাম্মী কাপুরের বিপরীতে প্রধান স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবাগতা তারকা আশা পারেখ। অন্যান্য ভূমিকায়ও একাধিক নতুন শিল্পীর দর্শন পাওয়া যাবে। তাছাড়া এতে আছেন সুলোচনা, রাজমেহরা, রণধীর, ওয়াস্তী, রাজেন্দ্রনাথ, মমতাজ আলী, সুরেন্দ্র প্রভৃতি। গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনা—এসব কিছুর কৃতিত্ব নাসির হুসেনের প্রাপ্য। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন উষা খান্না—সাম্প্রতিক কালের একমাত্র মহিলা সুরশিল্পী।

* * *

গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "দেবী"র শুটিং শুরু হয়েছে। একটি বোর্ডিং হাউসের সেটে প্রথম দিনের কাজ হয় এবং সেদিন ক্যামেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও কালী সরকার। এরা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে আছেন ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর।

* * *

রূপজ্যোতির নতুন অসমীয়া ছবি "পুরণি নিশার সপোন"-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনী সম্প্রতি ওরিয়েণ্ট সিনেমায় অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক-কাহিনীকার ফণী শর্মার এই সামাজিক ছবির নাট্য আবেদন গভীর। ভূপেন হাজারিকার সংগীত পরিচালনায় ছবিটি সমৃদ্ধ। কয়েকটি সুখশ্রাব্য গান ও পরিবেশানুগ আবহসংগীত ছবিটিকে আবেগমণ্ডিত করে তুলেছে। অনিল গুপ্ত আলোকচিত্র গ্রহণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন ফণী শর্মা, জ্ঞানদা কাকোতি, দুর্গা গোস্বামী, ইভা আচাও, ইউসুফ, ধীরাজ দাস প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

* * *

শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি" অবলম্বনে দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ভানুমতী একটি তামিল ছবির প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। ভানুমতীর স্বামী রামকৃষ্ণ ছবিটি পরিচালনা করবেন। এর নামকরণ হয়েছে "কনল নীড়"। প্রধান দুটি ভূমিকায় ভানুমতী ও নাগেশ্বর রাও অভিনয় করবেন।

* * *

দিলীপ চিত্রমের প্রথম প্রয়াস 'কে জাগে'-এর শুভমহরত উৎসব সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনীর ভিত্তিতে নির্মীয়মাণ এ-ছবির পরিচালক নারায়ণ দাস।

অলঙ্কার চিত্রের "শারহাদ" ছবিতে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন দেবানন্দ ও সুচিত্রা সেন। ছবিখানি বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে

প্রতীক—সুন্দর অথচ নিষ্প্রাণ। ছবির প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্ত স্বয়ং কাহিনীর চিত্রপরিচালক-নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করেছেন।

গল্পের প্রথম যে যুগে তখন ফিল্ম জগৎ ও তার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে অভিজাত মহলের বিরূপতার অন্ত নেই। ফলে নায়ক সুরেশ যখন চিত্রপরিচালকের বৃত্তি গ্রহণ করে, তখন তার স্ত্রী তার বয়ে-যাওয়া স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায় পিতৃ-গৃহে। একমাত্র কন্যাকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে রাখতে তার অভিজাত্যগর্বিত বাপ-মা এগিয়ে আসেন।

সুরেশের জীবনের এমনি সংকটময় মুহূর্তে আসে শান্তি। সে শহরে আসে জীবিকার সন্ধানে, আর এই শান্তির মধ্যেই সুরেশ খুঁজে পায় তার ছবির নায়িকাকে। সুরেশের কাছেই হয় শান্তির শিল্পী-জীবনের দীক্ষা। নায়িকা হিসাবে তার নাম অচিরেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর ছড়িয়ে পড়ে সুরেশ ও শান্তির ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে নানারকমের অপবাদ। এই অপবাদের জন্যেই সুরেশের মেয়েকেও চলে আসতে হয় স্কুলের হস্টেল। সুরেশের মেয়ের অভিযোগ শান্তির বিরুদ্ধে—তারই জন্যে তার বাবার অসম্মান। শান্তি অভিনেত্রীর জীবন ছেড়ে চলে যায় অনেক দূরে। এদিকে আইনের সাহায্যে সুরেশের কাছ থেকে মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসে তার স্ত্রী।

একদিকে দাম্পত্য জীবনের এই ব্যথা বঞ্চনা, অন্যদিকে শান্তির বিরহ। সুরেশের দেহ-মন ভেঙে পড়ে দিনে দিনে। সে মদ ধরে। একদিনের প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জনবিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে থাকে দিনের পর দিন। শান্তি তার দুরবস্থার কথা জেনে আবার ছুটে আসে তার কাছে তাকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত করতে। কিন্তু সুরেশের অবসন্ন জীবনে সে নতুন প্রাণের সাড়া জাগাতে পারে না।

বিয়ের আগে মেয়ে বাবাকে খোঁজে পথে পথে, সুরেশ দূর থেকে তাকে দেখে, কিন্তু ধরা দেয় না। শহরের কোনও বস্তীতে অপমান আর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটে সুরেশের। জীবনসন্ধ্যায় একদিন এসে সে ঢোকে চুপি চুপি তার পুরনো স্টুডিওতে রাত্রির অন্ধকারে। জেগে ওঠে তার মনে অতীত দিনের কত স্মৃতি। ভোরের আলোয় স্টুডিওর দরজা খোলে নতুন দিনের রূপকার আর কলা-কুশলীরা দেখে বিগত-দিনের বরেণ্য প্রয়োগ-শিল্পী চিরকালের জন্য বিশ্রাম নিয়েছে চিত্রপরিচালকের আসনে—যে আসনকে সে একদা অলংকৃত করেছে নিজের প্রতিভা ও নিষ্ঠায়।

গুরু দত্ত ছবির কাহিনীতে যে কৃতী চিত্রপরিচালকের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন, বাস্তবজীবনে এই ছবির পরিচালক হিসাবে তিনি সে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি। কথাবস্তুর দিক দিয়ে এ-ছবিতে অভিনবত্ব দেখবার চেষ্টা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে-চেষ্টা মোটেই সফল হয়নি বলে সমস্ত কাহিনীটিকে ছেয়ে রয়েছে নাট্য-উপাদানের বিবর্ণতা। ভাবাবেগের ভাটার টানে টানে কাহিনী শেষ পর্যন্ত যে দৃশ্যে গিয়ে দাঁড়ায় তা সুচিন্তিত হলেও সুষ্ঠু নাট্যপরিণতির রস দর্শকমনে বিস্তার করতে পারে না। নায়ক-চিত্রপরিচালকের জীবনের দ্বন্দ্ব-ব্যথা—তা পারিবারিক জীবনেই হোক, আর অভিনেত্রী শান্তিকে উপলক্ষ্য করেই হোক—ছবিতে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি

উপাখ্যানের দুর্বলতা ও এর শিথিল বিন্যাসের দোষে। একদিক দিয়ে পরিচালক যেমন মার্জিত রস ও চিন্তার পরিচয় দিতে চেয়েছেন, তেমনি অপরদিকে অতিমাত্রায় লঘুতার প্রমাণ দিয়েছেন জনি ওয়াকার ও মিনু মমতাজ অভিনীত দুটি অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের বিন্যাসে।

তবে আঙ্গিক সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে ছবিটি অতি উন্নত মানের পরিচয় বহন করে এনেছে। সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে চিত্রগ্রহণের ফলে পরিচালক স্টুডিওর 'ফ্লোরে'র দৃশ্যগুলি যেমন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চমকপ্রদ ও জাঁকজমকপূর্ণ করে দেখাতে পেরেছেন, তেমনি সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক দিয়েও ছবিটি নতুনত্বের দাবী রাখে। আলোকচিত্র ও কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজও উচ্চশ্রেণীর।

নায়কের চরিত্রে গুরু দত্তের অভিনয় বেশ সংযত ও সাবলীল। কিন্তু চরিত্রটির নিগূঢ় মর্মব্যথা তিনি তেমন সহজগ্রাহ্য করে তুলতে পারেননি। শান্তির চরিত্রটি ওয়াহীদা রেহমান শান্ত-মধুর অভিব্যক্তিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। পার্শ্বচরিত্রে জনি ওয়াকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লোক হাসাবার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। নায়কের কন্যার ভূমিকায় কুমারী নাজের অভিনয় মর্মস্পর্শী। অন্যান্য চরিত্রে মহেশ কাউল, বীণা ও মিনু মমতাজ-এর অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালনায় শচীন দেববর্মণ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আবহসংগীত মনোরম; ছবির প্রারম্ভিক গানটি সুন্দর সুরারোপিত ও সংগীত।

''মুঘল-এ-আজম'', ''হাফ টিকিট'', ''নীল আশমান'' ইত্যাদি হিন্দী ছবির নায়িকা মধুবালা

নাট্যাভিনয়

গত বৃহস্পতিবার মহাসপ্তমীর দিন বিশ্বরূপার নতুন নাট্যোপহার 'সেতু'র উদ্বোধন হয়। কিরণ মৈত্র রচিত একটি রসমধুর কাহিনীর ভিত্তিতে 'সেতু'র নাট্যরূপ দিয়েছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাট্য পরিচালনা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে নরেশ মিত্র ও তাপস সেন। এই নাটকে অভাবনীয় শিল্পীসমাবেশ করা হয়েছে। অ-পেশাদারী নাট্য-সংস্থার প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মমতাজ আহমেদ খাঁ ('অনুশীলন'), তারক ঘোষ ('অভ্যুদয়')' দীপিকা দাস ('খেয়ালী সংসদ')। এ'রা ছাড়া বহুরূপীর প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রকে এই নাটকের একটি বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে। বিশ্বরূপার অন্যান্য খ্যাতনামা শিল্পীদের মধ্যে আছেন নরেশ মিত্র, শান্তি গুপ্তা, অসিতবরণ, তরুণকুমার, কমল লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, জয়শ্রী সেন, সুব্রতা সেন, আরতি দাস এবং ইরা চক্রবর্তী।

• • •

রঙমহলের বর্তমান নাট্য নিবেদন ধনঞ্জয় বৈরাগীর বাস্তবনিষ্ঠ ও ভিন্নধর্মী নাটক 'এক মুঠো আকাশ'এর শততম অভিনয়-রজনীর উৎসব সমাসন্ন। জন-অভিনন্দনের পথে নাটকটি নতুন ইতিহাস রচনা করে চলেছে। নাটকটির প্রধান ভূমিকাগুলিতে রূপদান করেছেন তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, রবীন মজুমদার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার, শীলা পাল, শুক্লা দাশ, কবিতা রায়, কেতকী দত্ত প্রভৃতি।

• • • •

গত ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর রামরাজাতলায় রমেন গাঙ্গুলীর লেখা পাঁচখানি একাংক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। প্রথম দিন অভিনীত হয় 'আলোর নীচেই' ও 'রাজযোটক'। দ্বিতীয় দিন 'ধূসর দিগন্ত', 'জীবন বিতৃষ্ণা' ও 'মনোবিকলন'। মৌলিক ও মনস্তত্ত্বমূলক নাটকগুলি রচনায় লেখক বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। রচনার গুণে 'রাজযোটক' নাটকটিকেও বিদেশী নাটকের অনুবাদ বলে মনে হয়নি। এই নাটকটির অভিনয়ে স্থানীয় হাওড়া অ্যামেচার্স দল বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। অন্যান্য নাটকগুলোর প্রযোজনায় কলকাতার লোকমঞ্চ ও লোক ও নাটক সম্প্রদায় সাফল্য লাভ করেন। মধুচক্রের অভিনয়ে নিষ্ঠার অভাব অনুভূত হয়েছিল।

ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত ইতালীয় ছবি "জেনারেল ডেলা রোভেয়ার"-এর পরিচালক রবার্টো রোসেলিনির সঙ্গে তাঁর সিনারিয়ো-লেখিকা সোনালী দাশগুপ্তকে স্টুডিও ফ্লোরে দেখা যাচ্ছে

শৌভনিকের শুভ প্রচেষ্টা

দক্ষিণ কলিকাতার সুখ্যাত নাট্য সংস্থা শৌভনিক মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে গণ-মনোরঞ্জনের জন্য নাটক পরিবেশনের সার্থক ব্রত গ্রহণ করেছেন কিছুকাল হলো। গণ-রঙমহল নাট্যোৎসবের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকাবলী সর্বাধিগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে গত বছর তাঁদের পরীক্ষামূলক প্রয়াস সফল হয়েছে। মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে অল্প প্রবেশ-মূল্যে তাঁরা একই সঙ্গে পাঁচ হাজার দর্শককে আনন্দ-রস পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন। শৌভনিকের বর্তমান লক্ষ্য শৌভনিক নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠা। এই পরিকল্পনায় কলকাতায় একটি নিয়মিত স্থায়ী মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে একটি নাট্য-বিদ্যালয়, নাট্যবিষয়ক পাঠাগার ও পত্রিকা প্রকাশনা; এবং গ্রামাঞ্চলে অন্ততপক্ষে বারোটি মুক্তাঙ্গন নাট্যকেন্দ্র উদ্বোধনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার রূপায়ণে অন্তত দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তাই শৌভনিক জনসাধারণ ও সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শৌভনিক শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র নাট্যরূপ পরিবেশন করবেন। এই নাটকের একটি পূর্ব-প্রদর্শনী গত ৪ঠা অক্টোবর লোটাস চিত্রগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

চিঠিপত্র

আত্মপ্রত্যয়ের অভাব

মহাশয়,

'দেশ'-এর রঙ্গজগৎ-এ প্রকাশিত দুখানা চিঠিতে দেখলাম, বিলাতের একাধিক সংবাদপত্র 'অপুর সংসার' সম্বন্ধে কী উচ্চ মত পোষণ করেন। ভারতবাসী হিসাবে এতে আমরা অংশত গৌরব বোধ করতে পারি। ওদেশের সাংবাদিকদের মন্তব্য থেকে এই ধারণাও আমাদের হয় যে, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের বিচারকমণ্ডলী এবারে নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করেন নি; বুঝি ওখানে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ছবির শিল্পগত গুণ দেখে নয়, অন্য বিশেষ কয়েকটি কারণ বিচার করে। এই ধারণা হয়েছে বলেই একটি প্রশ্ন মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছি না। তাই আপনাদের শরণ নিলাম।

ভেনিস ফেস্টিভ্যালে এই পাপের বীজ কবে অনুপ্রবেশ করেছে? মাত্র এই বছরই কি? না, কি আরও আগে? ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে, বোধ হয়।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা আমি ভেবেছি। আমাদের শিল্পবস্তু সম্পর্কে বিদেশের সমালোচক বা শিল্পবেত্তাদের অভিমতকে চরম, অভ্রান্ত বিচার বলে কেন আমরা মেনে নেব? রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি এ-কথা জানবার জন্য নিশ্চয় আমরা ওদেশের দ্বারস্থ হব না। বলতে কী, রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম লিখতে হলে আমরা সেই তালিকায় নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত "গীতাঞ্জলি"কে স্থান না-ও দিতে পারি। ছায়াছবির ব্যাপারেই বা কেন আমাদের এই আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব? সত্যজিৎ রায়কে সর্ব-প্রথম আমরাই অভিনন্দন জানিয়েছি। জানি, "পথের পাঁচালী" কান উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে; কিন্তু এ-ও জানি, তার আগে ছবিটি পেয়েছে বাংলা দেশের রসিকজন এবং অগণ্য দর্শকের সাধুবাদ। বিদেশের হাততালি না পেলেও তার গুণ কমে যেত না।

আজ বিলাতের 'সানডে অবজারভার'-এ দেখছি 'জলসাঘর'-এর ভূয়সী প্রশংসা। দুঃখ এই, সমালোচক কাহিনীটি না বুঝেই তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আবার ফরাসী সমালোচকরা 'পরশ-পাথর'কে যে-ভাষায় নিন্দা করেছেন, তা আক্রমণাত্মক, ভব্যতাবিরুদ্ধ বলতে পারেন, তবু কেন নিজেদের বিচারশক্তি প্রয়োগ না করে আমরা বিদেশের ভাবোর দিকে তাকিয়ে থাকব?

ইতি—

কাকলী বসু,
কলিকাতা

খেলার মাঠে

একলব্য

কুমারী আরতি সাহার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের খবর গত সপ্তাহের খেলাধুলোর খবরের মধ্যে ভারতবাসীর কাছে সব চেয়ে বড় খবর। কয়েকদিন আগে এই উপমহাদেশের অন্যতম সাঁতারু ব্রজেন দাশের অপেক্ষাকৃত কঠিন পথে অর্থাৎ ইংলণ্ড থেকে

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী কুমারী আরতি সাহা

ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পার হবার ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ব্রজেন দাশ গত বছর ভারত ও পাকিস্থানের প্রথম সাঁতারু হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এ বছরও বাটলিন রেসের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন। তার পর অপেক্ষাকৃত কঠিন পথ হিসাবে আখ্যাত ইংলণ্ড-ফ্রান্স পথে তার চ্যানেল পাড়ি দেবার ঘটনা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। এডওয়ার্ড টেম্পি, নেড বার্নি, ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক, ফিলিপ-মিকমান, টম ব্লোয়ার, হাসান আব্দেল রহিম, বার্ট টমাস প্রভৃতি দূরপাল্লার সাঁতারুরা এর আগে দুই পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেও স্কটল্যাণ্ডের নেড বার্নি ও আমেরিকার বার্ট টমাস ছাড়া একই বছরে আর কেউ দুই পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেননি। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে নেড বার্নি ফ্রান্স-ইংলণ্ড পথে ইংলিশ চ্যানেল জয় করে আগস্ট মাসে আবার ইংলণ্ড-ফ্রান্স পথে চ্যানেল জয় করেন। বার্ট টমাস দুই পথে চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন গতবার। সুতরাং ব্রজেন দাশ বিশ্বের তৃতীয় সাঁতারু যিনি একই বছরে দুই পথে চ্যানেল জয় করেছেন। তবে এক দিক দিয়ে ব্রজেন দাশ দূরপাল্লার সাঁতার ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ ইংলণ্ডে পৌঁছে—এই বছরই তিনি ভূমধ্যসাগরের বুকে 'নেপলস' থেকে 'ক্যাপ্রি' পর্যন্ত সাঁতার কেটে পার হয়েছেন। দূরপাল্লার সাঁতার ক্ষেত্রে নেপলস-ক্যাপ্রির সম্মানও কম নয়। একই বছরে নেপলস-ক্যাপ্রি প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে দুইবার ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল জয় করা বিশ্বের যে কোন সাঁতারুর পক্ষেই এক মহাসম্মানের কথা।

• • •

ঘর-কুনো বাঙালীর প্রথম মেয়ে প্রতিনিধি হিসাবেই নয়—কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন এশিয়ার সর্বপ্রথম মেয়ে হিসাবে। দুঃসাহসিক অভিযানে আরতির দীপ্তিময় কৃতিত্ব তাই আজ শুধু বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করেনি, বাঙলার গর্বেরও কারণ হয়েছে—খেলাধুলোর ক্ষেত্রে বাড়িয়েছে ভারতের সম্মান। আর বঙ্গ-ললনা আরতি সমগ্র এশিয়ার মাতৃজাতিকে দিয়েছেন এক নতুন সম্মান। নিজের কৃতিত্বে দূর করেছেন তাদের অকৃতিত্বের অপবাদ। তাই ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী আরতি এশিয়ার মাতৃজাতির কাছে গর্বের পাত্রী।

অটুট মনোবল, ঐকান্তিক আগ্রহ এবং দুর্জয় সংকল্প থাকলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়ে অভীষ্ট সাধনায় কতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারে আরতি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতার ছাড়া মহিলাদের সাঁতারের সমস্ত বিষয়েই তিনি এক সময়ে রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী ছিলেন। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেও তিনি ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিলেন। সুতরাং বাঙলা তথা ভারতের সাঁতার ক্ষেত্রে আরতির প্রতিষ্ঠা অর্জনের বিষয় কারোই অজানা নেই। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের অন্যান্য যে সব বিষয় সাধারণের অজ্ঞাত আজ তারই কিছু কিছু উল্লেখ করতে চাই। শুধু সাঁতার আর লেখাপড়া নিয়েই আরতি সময় কাটাননি। গানবাজনারও চর্চা করেছেন। অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে তিনি রবীন্দ্র সংগীত ও খেয়ালে অংশ গ্রহণ করেছেন। তার ঘরে অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন থেকে আহরণ করা কৃতিত্ব নিদর্শন পত্রও দেখেছি। অভিনয় ক্ষেত্রে দেখেছি রুক্ষ সুষমায় সুষমার ভূমিকায় একাধিকবার সু-অভিনয় করতে। সাইকেল চালনায় তিনি রীতিমতই পটু। অধুনা মোটর চালনাতেও পটু হয়েছেন। সংসারের কাজকর্ম করেই আরতিকে এই সবের চর্চা

চ্যানেল বিজয়ী ত্রয়ী—মাঝখানে আরতি সাহা, বাঁদিকে ব্রজেন দাশ ও ডানদিকে ডাঃ বিমল চন্দ্র

জাপানের ইয়াওয়াটা স্টিল ওয়ার্ক ফুটবল টীম—ভারতের ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রে কয়েকটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য জাপানী দলটি এখন ভারত সফর করছে

করতে হয়েছে। শিশুকালে মাতৃহারা আরতিকে শুধু বিপত্নীক পিতাকেই দেখতে হয়নি, বৃদ্ধা পিতামহী এবং শিশুভগিনী ভারতীকেও দেখতে হয়েছে। মধ্যবিত্ত ঘর —মধ্যবিত্ত কেন, নিম্নবিত্ত ঘরের যাবতীয় কাজকর্মও করতে হয়েছে। আরতি এখন সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক কলার ছাত্রী। সাউথ ইস্টার্ন রেলে একটি চাকরীও সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সব দিকের তাল রেখেও তিনি সাঁতারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। এবং বলা যায় সাঁতার জীবনের গৌরবদীপ্ত লণ্ডন পার হবার পরেই তিনি অর্জন করেছেন সাঁতার ক্ষেত্রে গৌরবময় সম্মান।

আরতির এই গৌরবের দিনে আজ একটি লোকের কথা বিশেষভাবেই মনে পড়ছে। তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় বিজিতেন বসু। সাঁতার-পাগল বিজিতেন বসুর কাছেই আরতির সাঁতারের প্রথম হাতে খড়ি হয়েছিল। ছোট্ট মেয়ে আরতি রোজ গংগার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে একটু একটু সাঁতার কাটত। তাই দেখে বিজিতেনবাবু আরতির বাবার অনুমতি নিয়ে আরতিকে এনে ভর্তি করেন হাটখোলা ক্লাবে। বিজিতেনবাবুর কাছেই তার সাঁতারের হাতে খড়ি হয়। অবশ্য আরতির সাঁতারের প্রকৃত শিক্ষাগুরু শচীন নাগ। শচীন নাগই আরতিকে সাঁতারের উন্নত ছলাকলায় শিক্ষিত করেছেন। সেই শিক্ষা এবং নিজের অধ্যবসায় আজ তাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে দুর্লভ সম্মান এনে দিয়েছে।

* * *

ব্রজেন দাশ, মিহির সেন, বিমলচন্দ্র ও আরতি সাহা—ভারত ও পাকিস্তানের এই ৪জন বাঙালীর সাফল্য অর্জনের পর ইংলিশ চ্যানেলের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কিছুটা বদলে গেছে। চ্যানেলের দুর্জ্ঞেয় রহস্যও যেন অনেকটা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। এখন অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছেন ইংলিশ চ্যানেল আর দুরতিক্রম্য নয়—সহজেই একে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞ মহল এ কথা মনে করেন না। তাদের ধারণা বহুজনের সাফল্য সত্ত্বেও চ্যানেল জয় করার কৃতিত্ব এক দুর্লভ কৃতিত্বের সামিল। বোধ করি আমি আগেও একবার লিখেছি—এখনও লিখছি, চ্যানেলের কোলে লালিত পালিত বহু দক্ষ সাঁতারুর পক্ষেও ইংলিশ চ্যানেল জয় করা সম্ভব হয়নি। একজনের একুশবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এমন ঘটনাও লিপিবদ্ধ আছে।

তবে একথা সত্য, একজন মহিলা সমেত ৪জন বাঙালীর ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর আর কোন বাঙালী হয়তো চ্যানেল অতিক্রমের কৃতিত্বে উৎসাহী হবেন না। ইংলণ্ডের একখানি পত্রিকাও এ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

এখন সাঁতারুদের লক্ষ্য হবে অধিকতর কৃতিত্ব অর্জনের দিকে। অর্থাৎ একই সংগে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ও প্রতি অতিক্রম করা যায় কিনা সেইটাই সাঁতারুদের প্রচেষ্টা হবে। আজ পর্যন্ত কেউই এ প্রচেষ্টা করেননি। ফ্রান্স ফিরে আসা আপাতত অসম্ভব বলে মনে হলেও একদিন হয়তো দেখা যাবে কোনো বাঙালী এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু এই কৃতিত্ব অর্জনের প্রধান অন্তরায় অর্থ। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পেলে নদীমাতৃক এই বাঙলা দেশে এমন সাঁতারু পাওয়া হয়তো কষ্ট নয়, যার পক্ষে একই প্রচেষ্টায় ইংলিশ চ্যানেল পারাপার হওয়া সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলে এখনই কয়েকজন বাঙালী এই কৃতিত্বের জন্য এগিয়ে আসবেন।

* * *

সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি কাপের ফাইনাল খেলায় এবার অমৃতবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাব ১—০ গোলে আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি কাপের খেলায় এবার বেশ কয়েকটি দল অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পার্লামেন্টারী এবং ইউ এস আই এস অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেট অব ইনফরমেশন সার্ভিস দল দুইটি ছিল প্রতিযোগিতায় নবাগত।

'আনন্দবাজার' পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার কর্মীরা সে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন এখন সেই প্রতিযোগিতার ভার গ্রহণ করেছেন কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা। কয়েক বছর ধরে এরা সুষ্ঠুভাবেই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে আসছেন।

দেশী সংবাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ হইতে উত্থাপিত দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সম্প্রতি প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাল্লা রোড স্টেশনের নিকট ডি ভি সি খালের উপর নির্মিত একটি সেতু গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রে ভাঙিয়া পড়ে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সংবাদপত্র ও সংসদে বহুবার দাবি উত্থাপিত হইবার পর আজ ভারতের একটি রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মানচিত্রের উত্তরভাগে প্রচলিত ২৫০০ মাইলব্যাপী আন্তর্জাতিক সীমারেখা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—অদ্য নয়াদিল্লিতে আগামী ছয় মাসের জন্য (অক্টোবর হইতে মার্চ) যে আমদানী নীতি ঘোষিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এখানে সেখানে অল্প স্বল্প পরিবর্তন ভিন্ন আমদানী সম্পর্কে কমবেশী পরিমাণে বর্তমানে অনুসৃত নীতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

গত ৭ই হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮ ধরিয়া যে বর্ষণ হয়—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তজ্জন্য মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমি জল-প্লাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে ফসলের ক্ষতি হয়। এজন্য প্রায় ২ লক্ষ টন ধান নষ্ট হইবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

১লা অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কোন কোন স্থানে গত দুই দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বর্ষণ ও ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। হাওড়ায় গৃহাদি পতনে আহত ৭২ জনের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশংকাজনক। বর্তমানে ২৪ ঘণ্টায় ১৮ ইঞ্চি বারিপাত হয়। হাওড়া জেলার একাংশে খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া বলা চলে।

এক খবরে প্রকাশ, রাজ্য সরকারের কারিগরী কর্মচারীরা নদীবক্ষে জলের এলাকার 'জমি' বন্ধক রাখিয়াই উদ্বাস্তুদের কৃষিঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যদিকে তাঁহারা ডি ভি সি খালের জল সরবরাহ ব্যবস্থা হইবার আগেই জলকর আদায়ের জন্য বাজেটে বিভাগ সৃষ্টি করিয়া কর্মচারীদের বেতন, রাহা খরচ ইত্যাদি বাবদ ২। লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ৪ বছরে মাত্র ৯৪০, টাকা জলকর সরকারী ভাণ্ডারে জমা দিলেন।

২রা অক্টোবর—গত তিন দিনের ঝঞ্ঝাবাত্যা এবং প্রবল বর্ষণের ফলে মেদিনীপুরে সদর ঘাটাল, কাঁথি ও তমলুক মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হাজার হাজার পরিবার বন্যার জলে আটকা পড়িয়া গিয়াছে।
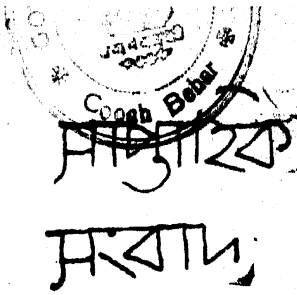
প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য জয়পুরে বলেন যে, রাজস্থানে প্রশাসনিক ব্যবস্থার গণতন্ত্র-সম্মত বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার। "ইহা যে সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করিবে সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

অদ্য সকালে কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে পূর্ব রেলপথের শিয়ালদহ-বনগ্রাম শাখায় 'অশোকনগর স্টেশনে'র উদ্বোধন হয়।

৩রা অক্টোবর—কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১লা অক্টোবর বাঁকুড়া দামোদর লাইট রেলওয়ের কুমরুন ও ইন্দাস স্টেশনদ্বয়ের মধ্যে এক চলন্ত ট্রেন ঘূর্ণিবাত্যায় লাইনচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাওয়ায় একজন যাত্রী হত এবং আটজন আহত হইয়াছে। বগিগুলির গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল এস এম শ্রীনাগেশকে আসামের রাজ্যপাল নিযুক্ত করিয়াছেন।

পি টি আই কর্তৃক শেষরাত্রে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, মাইথন জলাধারের কূল ছাপাইয়া জল প্রবাহিত হইতেছে।

৪ঠা অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু এন লাইয়ের চিঠির উত্তরে বলিয়াছেন যে বহু শতাব্দী যাবৎ ইতিহাস-ভূগোল, রীতি ও প্রথা দ্বারা নির্ধারিত ভারতের সমগ্র উত্তর সীমা সম্পর্কে চীনের সহিত আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

রবিবার কলিকাতায় নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে বিপদজ্ঞাপক বহু বন্যার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছে। এইদিন মধ্যাহ্নে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, দুইকূলপ্লাবী গঙ্গার জল প্রবল বেগে নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরে শহরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িতেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত স্থানীয় অধিবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় অন্যত্র ছুটিয়া চলিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে সেপ্টেম্বর—গত সপ্তাহের শেষভাগে মধ্য জাপানে যে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ২৫০০ এরও অধিক লোক নিহত অথবা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ দুই সপ্তাহব্যাপী মার্কিন যুক্তরাজ্য পরিভ্রমণের উপসংহারে গতকাল এখানে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট-আমেরিকান সহযোগিতার পুনরোন্মেষের পথে "দুরতিক্রম্য কোন বাধা নাই।"

২৯শে সেপ্টেম্বর—তাসের সংবাদে জানা যায় যে, চীনের দশম বার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ আজ রাত্রে বিমানযোগে পিকিং যাত্রা করিয়াছেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর—ভারতীয় মহিলা সাঁতারু কুমারী আরতি সাহা প্রথম এশিয়ান মহিলা হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়াছেন। এই ১৯ বৎসর বয়স্কা বালিকা কলিকাতা কলেজের ছাত্রী কুমারী আরতি সাহা ফ্রান্স উপকূল হইতে যাত্রা করিয়া ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ইংলণ্ড উপকূলে উপনীত হইয়াছেন।

১লা অক্টোবর—ভারত ও পাকিস্তান কি পরিমাণ সূতি কাপড় রপ্তানি করিতে পারিবে, তৎসম্পর্কে ল্যাংকাশায়ার ভারত ও পাকি-পাকিস্তানের সহিত চুক্তি করিয়াছে।

২রা অক্টোবর—করাচীর ওয়াকিবহাল মহল হইতে বলা হয় যে, পাকিস্তানের ৬ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকা চীনের মানচিত্রে প্রদর্শনের প্রশ্নটি সম্পর্কে পাকিস্তান সম্ভবতঃ শীঘ্রই চীনের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে।

৩রা অক্টোবর—মিশরের 'আল্ আহ্রাম' সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, চীনা কর্তৃপক্ষ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পিকিংস্থ দূতাবাস অবরোধ করিয়াছেন। দূতাবাসে সাহায্যকারী ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

পাঁচজন বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী একটি যুক্ত স্মারকলিপিতে বলিয়াছেন যে, ইতিমধ্যে যে সকল আণবিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহার তেজস্ক্রিয়ার ফলে "লিউকেমিয়া" এবং কর্কট রোগে দশ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হইবে। এই পাঁচজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে তিনজন জাপানী, একজন আমেরিকান ও একজন ফরাসী।

৪ঠা অক্টোবর—চন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকল্পে সোভিয়েট ইউনিয়ন আদ্য মহাকাশে একটি "স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ গবেষণাগার" স্থাপন করিয়াছে। "তাস" এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, আন্তঃগ্রহ যন্ত্রটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত হয়। অদ্য প্রত্যুষে সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে উক্ত মহাকাশযানটিকে রকেটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। ফোন : ২৩—৫২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ১৬ আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 3rd October, 1959. মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৯

লাল-ইমলি উলের পোশাকে ফ্যাশানদুরস্ত দেখাবে
—আরাম পাবেন
বাড়ীর সবার জন্যে তুলোর মত কোমল ও মোলায়েম লাল-ইমলি উলের পোশাক বুনুন। বিদেশ থেকে উল সুতো আনিয়ে বিশেষ ধরনে তৈরী লাল-ইমলি উলের মসৃণ ও নরম পোশাক সব্বার পছন্দ হবে। তার চেয়েও বড় কথা, লাল-ইমলি উলের আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর রঙের কথা ফ্যাশন দুরস্ত মহলে এখন সবার মুখে মুখে। নানান ধরনের উল পাবেন—মিহি 'কাউন্টেস' উল ৩-প্লাই আর 'লেডী লেস্‌লী' ও 'তক্ষশীলা' উল ৪-প্লাই।
লাল-ইমলি
উল
'কাউন্টেস
৩-প্লাই
'লেডী লেস্‌লী ও
'তক্ষশীলা' ৪-প্লাই
রেডিমেড উলের পোশাক
বুনবার সময় পান না? কিন্তু হাল-ফ্যাশানের চমৎকার উলের পোশাক পরতে হয়তো আপনি ভালবাসেন। লাল-ইমলি উলের হরেক রকম রেডিমেড পোশাক পাওয়া যায় —পছন্দ মতো বেছে নিন।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৬৬

প্রকাশিত হইল

রসরচনা
যশোমতী
পরশুরাম

দীর্ঘ কবিতা
পাঁজোর চিঠি
নিশিকান্ত

*

বড় গল্প

সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ময়ূরী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

*

অন্যান্য গল্প : লেখক-সূচী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, দেবেশ রায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, নরেন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, মনোজ বসু, রমাপদ চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, সরলাবালা সরকার, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সুশীল রায়, শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ, ক্ষিতিমোহন সেন, দীপক সেন, ধরণী সেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন, শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সোনালী দাশগুপ্ত

কবিতা

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, অরুণকুমার সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচি, আরতি দাস, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, উমা দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সরোজ আচার্য, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির পত্রাবলী

রঙীন চিত্র ও স্কেচ

বাংলার প্রাচীন পট : শ্রীশ্রীদুর্গা
অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মূল্য : : **তিন টাকা**
রেজেস্ট্রি ডাকে ৩·৫৮ নঃ পঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
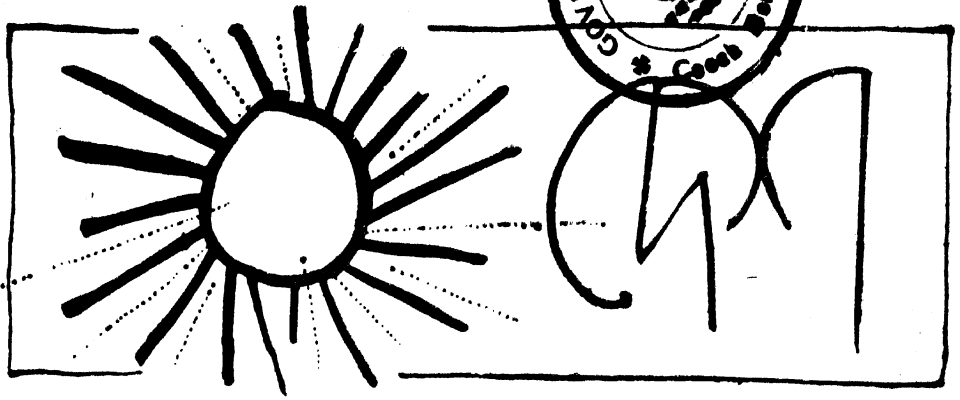
DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 3rd October 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯৯ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা দেশের একটি বৃহত্তম সমস্যা। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর গিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার ছায়াটা থাকিয়া থাকিয়া দেশের লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়া থাকে। খাদ্যশস্যের অল্প-বিস্তর ঘাটতি একটি সর্বভারতীয় সমস্যা হইলেও এখানে আমাদের প্রধান লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। চোখের সম্মুখে এখানে প্রতি বৎসর "দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ" উপলক্ষ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে। এবারে সেই আন্দোলনটা অত্যন্ত শোচনীয় পরিণামে গিয়া ঠেকিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এতাবৎকাল দেশের মধ্যে যাহা ঘটিয়া গেল তাহার বিশদ সমালোচনায় কোন লাভ নাই। তিক্ততা বাড়িবে মাত্র। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন, আর তাহা হইতেছে প্রতিকারের পথ সন্ধান।

এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের দর চড়া। সরকার পক্ষ বলেন শস্যের দর গত বছরের মতই, কোন কোন ক্ষেত্রে কম।

তাহা যদি হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে গত বছরেও দর চড়া ছিল। কিন্তু কারণটা কী?

সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ যে সব কারণ দর্শাইয়া থাকেন এতদিনে তাহা সকলেই জানিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষকেই পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এখানেও দুই পক্ষের নির্ভর স্বতন্ত্র। সরকার পক্ষের পরিসংখ্যান বিরোধিগণ মানিতে রাজি নন। আবার বিরোধিগণের পরিসংখ্যান সরকার মানিতে রাজি নন। এখন মীমাংসা হইবে কিরূপে?

শস্যের রাজস্ব আদায়

বছরের পর বছর এইভাবে বাদ প্রতিবাদ চালাতে থাকিবে কি? কলহ জীয়াইয়া রাখিলে আর যাহাদেরই সুবিধা হোক না কেন জনসাধারণের সুবিধা হইবার কথা নয়।

আমরা প্রতিকার চাই, আর যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিকার চাই। নানা জনে নানা উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন—এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে। আমরা একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাই। ধানী জমির রাজস্ব মুদ্রার পরিবর্তে শস্যে আদায় করা সম্ভব কিনা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিবার কারণ নাই, যে হেতু কিছুকাল আগে এই প্রস্তাব সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কেহ কেহ করিয়াছেন। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে হিন্দু, অমলে, পাঠান ও মুঘল আমলেও শত শত বৎসর এই পদ্ধতিতেই রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। অনেকে বলিবেন যে, তখন দেশের জনসংখ্যা অল্প ছিল কাজেই ব্যাপারটা সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু অপর পক্ষে মনে রাখিতে হইবে পথঘাট অপ্রচুর ও দুর্গম ছিল, যানবাহনাদি নিতান্ত 'সেকেলে' ছিল—তুলনায় এখন সমস্ত ব্যবস্থাই অনেক উন্নত। আমরা জানি, হঠাৎ নামিয়া বৃহৎ কাজের মীমাংসা হয় না, একেবারে কাজে নামিয়া পড়িতে হয়। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ধানী জমির শস্যে রাজস্ব আদায়কে বিকল্পরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে অর্থাৎ মুদ্রায় বা শস্যে রাজস্ব দেওয়া প্রজাদের ইচ্ছাধীন। ইহার প্রধান অন্তরায় হইতেছে শস্য আদায়ের, শস্য সংগ্রহের, শস্য সংরক্ষণের উপযোগী কর্মচারী ও গুদাম প্রভৃতির অভাব। কাজ শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। সর্ব ক্ষেত্রে সূচনায় যে অনিবার্য অসুবিধা দেখা যায় এক্ষেত্রেও তাহা ঘটিবে ধরিয়া লইয়া নামিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর এ ভার কতখানি দেওয়া যায় তাহাও ভাবিয়া দেখিবার মত। আমাদের প্রস্তাবে যদি কিছু সারবস্তু থাকে তবে আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তবে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তাহার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। এ প্রস্তাবের প্রধান সুবিধা এই যে, বছরের প্রথমেই প্রচুর ধান সরকারের হাতে আসিয়া পড়িবে আর সে ধান স্বভাবতই বিভিন্ন জেলায় মজুত থাকিবে বলিয়া কোন জেলায় মূল্য বাড়িলে বা অভাব ঘটিলে সরকার বাজারে ধান ছাড়িতে পারিবেন। অনেকে বলেন যে, মজুতদারেরা ধান চাল কোণঠাসা করিয়া বিপাক ঘটায়। ইহা যদি সত্য হয় তবে সরকার বৃহত্তম মজুতদার হইলে অপেক্ষাকৃত ছোট মজুতদারেরা শাসিত থাকিবে। সরকারের হাতে ধান নাই, অথচ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল—ইহাই যত দুরবস্থার মূল। শস্যে রাজস্ব আদায় হইলে সরকার নিজে বৃহত্তম মজুতদার হইয়া ইহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। আর আশা করা যায় ইহাতে "দুর্ভিক্ষেরও" অবসান ঘটিবে।

প্রসঙ্গত

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্যগণের অশোভন আচরণে সকলেই দুঃখিত এবং লজ্জিত। বহু অশোভন আচরণ বিধানসভার অতীত ইতিহাস কলঙ্কিত করে রয়েছে। কিন্তু ২১শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা এই শ্রেণীর সমস্ত অতীত ঘটনাকে অতিক্রম করে গেছে। সুখের বিষয়, এই অশোভনতা স্থায়ী হয়নি। স্পীকারের আসনে অধিষ্ঠিত শ্রীআশুতোষ মল্লিক ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিচক্ষণতা ও উদারতায় পরের দিনই সভায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায় স্থির হয়েছিল, বিরোধীপক্ষ তাঁদের আচরণের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ ও মার্জনা প্রার্থনা না করলে তাঁদের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে বলতে দেওয়া হবে না। এই প্রকার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মল্লিক মহাশয় সে পথে যাননি। তিনি বুঝেছিলেন, এভাবে সভায় শান্তি ফিরে আসবে না। পরন্তু কদর্যতার উত্তেজনা এবং অধিকতর লজ্জাকর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। নিজেদের আচরণের জন্যে অনুতপ্ত হওয়ার প্রশ্নই কারো মনে উঠবে না। আইন-কানুন, ধারা-উপধারার সাহায্যে সবক্ষেত্রে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় না।

*

মল্লিক মহাশয় অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর পথ। ২১শে তারিখের ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে উভয়পক্ষের পাল থেকে সমস্ত উত্তেজনা তিনি বার করে দেন। তাঁর অতর্কিত আবেদনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সভা স্তব্ধ হয়েছিল। সভা এমনটির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হয়ে মল্লিক মহাশয়ের আবেদন সমর্থন করে যুগপৎ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকসুলভ বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি ও উদারতার প্রশংসনীয় পরিচয় দেন। তাঁদের উভয়ের কৃতিত্ব বিধানসভায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে নবীননগর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যে উক্তি করেছেন তাতে কিন্তু মনে হয়, তিনি এই উদারতা সমর্থন করতে পারেননি। মনে হয়, স্পীকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই তিনি খুশি হতেন। অবশ্য সংবাদপত্রের বিবরণের উপর নির্ভর করেই তিনি এই রকম মন্তব্য করেছেন, সেকথাও এই সঙ্গে বিবেচ্য। তা ছাড়া বাঙলা দেশকেও তিনি তেমন ভালো করে চেনেন না, যেমন চেনেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়।

*

বৌদ্ধভিক্ষুবেশী জনৈক আততায়ীর গুলীর আঘাতে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীসলোমন বন্দরনায়ক নিহত হয়েছেন। এই জঘন্য এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার ভাষা নেই। এই কার্যে সিংহলের সুনাম এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর পীতবাস উভয়ই কলঙ্কিত হয়েছে। হত্যার কারণ জানা যায়নি। এই পর্যন্ত জানা গেছে যে, এর পিছনে একটা দল আছে। তাদেরই প্ররোচনায় আততায়ী এই পৈশাচিক কাজ করেছে এবং প্রধান মন্ত্রীর শান্ত্রীর গুলীতে আহত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় না নিলে সে নিজেও তাদের দ্বারা নিহত হ'ত।

স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই শ্রেণীর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছে। দুর্বহ জীবনযাত্রা থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থসিদ্ধি পর্যন্ত সবই এর পিছনে আছে।

প্রধান মন্ত্রী বন্দরনায়ক যে মস্ত বড় মানুষ ছিলেন মৃত্যুকালে তাঁর পরিচয় তিনি রেখে গেছেন। যখনই জ্ঞান হয়েছে তখনই তিনি আততায়ীর অবস্থা জানতে চেয়েছেন, তাকে মার্জনা করতে বলেছেন। তিনি নিজেও তাকে মার্জনা করে গেছেন। আমরা তাঁর পরলোক আত্মার জন্যে এবং সমগ্র সিংহলের জন্যে শান্তি প্রার্থনা করি। যে জীবন তিনি মাতৃভূমির জন্যে উৎসর্গ করে গেলেন তার মধ্যে সিংহল যেন মহত্তর এবং প্রসন্নতর জীবনের সন্ধান লাভ করে।

*

পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অকৃতকার্যতার ক্রমবর্ধমান হার কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরকে উদ্বিগ্ন করেছে। সমস্যাটা তাদের পাস করিয়ে দেওয়া নয়। প্রশ্নপত্র সহজ করে এবং অকৃপণচ্ছন্দে মার্ক বিতরণ করেই অতি সহজে তার সমাধান করা যায়। কিন্তু সমস্যা তার চেয়ে জটিল। শিক্ষার মান কমানো তো নয়ই বরং আরও বাড়ানো দরকার এবং শিক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণের উচ্চতর মানে আরও অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে পারে, সেইটেই চিন্তার বিষয়। তার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্যে উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি।

বেতন বৃদ্ধির দ্বারা শিক্ষকদের মধ্যে সন্তোষ আনা এবং যোগ্যতর ব্যক্তিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আনা সম্ভব। কিন্তু তার দ্বারা যে শিক্ষাদানের উন্নতি হবেই এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গত কয়েক বৎসরে শিক্ষকদের কিছু পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাদানের (যার পরিচয় পরীক্ষার ফলাফলে জ্ঞাতব্য) কি সেই পরিমাণ উন্নতি হয়েছে? বরং উত্তরোত্তর অবনতিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তার জন্যে জনসাধারণ থেকে গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত সকলেই শংকা অনুভব করছেন। যদি বোঝা যেত, শিক্ষকদের বেতন ১০% বাড়ালে পরীক্ষায় পাসের হারও ১০% বাড়বে, তাহলে আর সমস্যা কোথায়?

*

আসল সমস্যা হচ্ছে, শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো। শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীর মনে যতক্ষণ না শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগছে ততক্ষণ শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। উন্নত ক্ষেত্র, উন্নত সার এবং উন্নত বীজের সার্থকতা অবশ্যই আছে, কিন্তু উন্নত আবহাওয়ার অভাবে জমির ফসল তথাপি নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই আবহাওয়া আসে শ্রদ্ধা থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে সেই শ্রদ্ধার ভাব আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি। তার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলির উপর দোষারোপ করা মিথ্যা। অধ্যয়নই যে ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা, একথা বোঝবার পরিবেশ কোথায়? তারা জনসাধারণ এবং পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা অংশ নয়। গৃহে অভিভাবকের মনোভাব থেকে শিক্ষায়তনের শিক্ষাদান পদ্ধতি পর্যন্ত সর্বত্রই এই কথাই তাদের সুকুমার মনে অনুপ্রবিষ্ট করা হচ্ছে যে, বিদ্যালাভের চেয়ে বড় লক্ষ্য পরীক্ষায় পাস করা এবং সাধারণভাবে একটি অপরটির পরিপন্থী। পরীক্ষা-পাসের স্বতন্ত্র কৌশল। স্কুল-কলেজে এবং টিউটোরিয়াল কারখানায় সেই কৌশলটাই বেশি করে শেখানো হয়।

*

তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা কী প্রত্যাশা করতে পারি? যে দেশে পণ্ডিতের চেয়ে মূর্খ ধনীর সম্মান বেশি, সাধুর চেয়ে অসাধুর,—যেখানে দেশের চেয়ে দল বড় এবং দলের চেয়ে গোষ্ঠী,—সত্য ভাষণের দুঃসাহস যেখানে মূর্খতার পরিচায়ক, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মহৎ কিছু প্রত্যাশা করা নিষ্ফল। তারা সেখানে করবে কি? বিদ্যালয়ে নিত্য ধর্মঘট, সিনেমা-হলে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়ানো রোদ-বৃষ্টি তুচ্ছ করে, পরীক্ষাগৃহে চুরি এবং বাধা দিলে গার্ডকে প্রহার, আর কি করবে? এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যে চাই শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত আবেষ্টন সৃষ্টি। ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে মহৎ এবং উজ্জ্বল আদর্শের সৃষ্টি। ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের মহান দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন, এ কাজ তাঁদের।
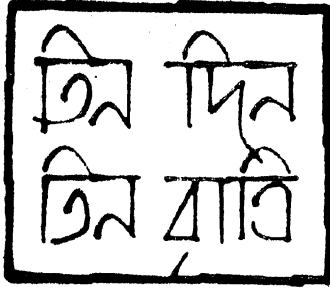
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৫

জানলার ধারে দেয়াল ঘেঁষে যে ডবল বেডের খাটখানা পাতা রয়েছে তার ওপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে পিলু। ছোট্ট পা খানা পাশ বালিশে তোলা। কতবড় নবাব! ঘুমন্ত শিশুর ঠোঁটে হাসি তো নয় এক ফোঁটা মধু। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল মাধুরী। দাদার ছেলেতো বড় সুন্দর হবে, বংশের মধ্যে সব চেয়ে সুপুরুষ হবে বোধ হয়। দাদা দেখতে তেমন সুন্দর নয়। তাদের বংশে কেউ রূপ নিয়ে জন্মায়নি। কিন্তু বুদ্ধি করে দাদা একটি রূপবতীকে ঘরে এনেছে। ছিনিয়ে নিয়ে এলেও এনেছে। সেই রূপ পেয়েছে ছেলে। শুধু গায়ের রঙই নয়, মায়ের নাক চোখ ভ্রূ সবই বোধহয় পিলু পাবে। পেয়ে রূপবান পুরুষ হয়ে উঠবে। মার রূপ পেলে পুরুষ নাকি ভাগ্যবান হয়। অসীমকার রূপ পেয়েছে?

নন্দিতা বলল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিসীকে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে আর হাসছে। চল আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। আকাশের অবস্থা খুব ভালো নয়। ওঁদের বসিয়ে দিই গিয়ে। এক বাচেই সব হয়ে যাবে।'

ঘর থেকে বেরোবার আগে মাধুরী মুখ ফিরিয়ে আর একবার পিলুকে দেখে গেল। লাল নীল হলদে সবুজ চারদিকে ছড়ানো একরাশ পুতুলের মধ্যে পিলু রঙ্গরাজ রঙ্গেশ্বর হয়ে রঙীন স্বপ্ন দেখছে।

ছেলের দিক থেকে চোখ ফিরাতে না ফিরাতে বাপ এসে হাজির।

শঙ্কর বলল, 'মাধু, সঞ্জীবরা কিছুতেই ছাড়ছে না। ওরা তোর একখানা গান না শুনে নাকি এখান থেকে কিছু না খেয়ে-দেয়েই চলে যাবে।'

মাধুরী বলল, 'তাহলে তোমার বন্ধুদের তাই যেতে বল দাদা। গান আমি কিছুতেই গাইতে পারব না। এ কি তোমার বক্তৃতা যে মুখ খুললেই ঝরঝর করে ঝরে পড়বে? গানের কি স্থান কাল নেই?'

নন্দিতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখন যদি গান টান নিয়ে বসো, তাহলে কখনই বা খেতে দেবে কখনই বা কি করবে। আর এর মধ্যে যদি ঝপঝপ করে একবার নেমে পড়ে তাহলেই হয়েছে।'

শঙ্কর বলল, 'কী আর হবে। কেউ তো আর বেশি দূর থেকে আসে নি। যেতে পারবেই। আর মাধুরী আজ এখানে থেকে যাবে।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শঙ্কর, 'তোমার ছেলের জন্মদিনে একখানা গান হবে না সেইটাই কি ভালো?'

মেয়েদের মধ্যে দ্বিমত দেখা গেল। কেউ কেউ যাওয়ার জন্য ব্যস্ত; ছেলেমেয়ে ফেলে এসেছে। ওসব পাট যাদের এখনো হয়নি, কি হতে দেওয়া হয়নি তারা গান শুনতে চায়।

শেষপর্যন্ত দাদার মুখ চেয়ে মাধুরীকে বাইরের ঘরে এসে হারমনিয়ম সামনে নিয়ে বসতেই হল।

সঞ্জীব অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'বেশ বেশ। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। মাধুরী তোমার গান শুনিনি এক যুগ হয়ে গেল।'

মৃন্ময় পাশ থেকে টিপ্পনী কাটল, 'তাহলে দ্বাপরে শুনেছিলে বল? দ্বাপরে তুমি কোন্ মূর্তিতে ছিলে সঞ্জীব? সুবল না, সুবলসখা?'

কেউ কেউ হাসল। মাধুরী লক্ষ্য করল অসীমের মুখেও হাসি ফুটেছে। এতক্ষণ তাকে যেন বিষণ্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কেন? মানসীর সঙ্গে সারাদিন ঘুরে ঘুরেই কি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে অসীম? অমন ঘোরায় কি শ্রান্তি আসে? মানসীকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে নি? সেও কি শ্রান্ত? না কি দুজনে একসঙ্গে আসতে লজ্জা পেয়েছে? কার জন্য লজ্জা? কার কাছে লজ্জা?

পুরোন বন্ধুত্বের সুবাদে সঞ্জীব একটু এদিকে এগিয়ে এসেছে। হেসে বলল, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন? হে মাধুরী দ্বিধা কেন? গান শুরু হোক।'

মেয়েরাও এসে আসরের চারদিকে কাছাকাছি হয়ে বসেছে। তর্কবিতর্কের ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, গানের নাম শুনে তারা ফের ধরা দিয়েছে। গানে কি সবাইকে ধরা যায়?

মাধুরী বলল, 'কী গাইব?'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'সুধা আমি কি গাহিব গান?'

সঞ্জীব বলল, 'না, ও গান নয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতই হোক।'

শংকর দোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'একখানা জন্মদিনের গানটান ধর না।'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'কেন, তোমার ছেলের জন্মদিন বলে? তোমার ছেলে কি রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মেছে না কি?'

ঘরের অনেকেই জোরে হেসে উঠল। শংকর ভারি অপ্রতিভ হল।

অমূল্যবাবু সহকর্মীকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে এলেন। যেন কলেজের ক্লাস নিচ্ছেন তেমনি বিশুদ্ধ ভাষায় উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, 'শংকরের ছেলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মায়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা সবাই জন্মেছি। আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি নব-জন্ম নিয়েছে। আরও কয়েক পুরুষ ধরে নবজাতকরা তাঁর কাব্যে গানে এমনি করে পুনর্জন্ম নেবে।'

প্রদোষ ফস করে বলে উঠল, 'নিজের পুরুষের কথাই বললেন। উত্তর পুরুষ সম্বন্ধে অত অসংকোচে দৈববাণী করবেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা যেমন রস পাচ্ছি, আমাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রেরা তা না পেতেও পারে।'

অমূল্যবাবু বললেন, 'তা যদি না পায় তাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। এই দুশ্চিন্তা তোমাদের মনে এসেছে, কারণ সেই রস তোমরা নিজেরাই পাচ্ছ না। তোমরা কি তেমন নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা কর যে পাবে? আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এখনো আধুনিকতম। তোমরা তাঁর চেয়ে একপাও এগিয়ে যেতে পারনি। না পেরেছ কোন নতুন সম্পদ বাড়াতে, না পেরেছ কোন নতুন মূল্য সৃষ্টি করতে। একদল তাঁকে দুর্বলের মত অনুকরণ করে যাচ্ছে আর একদল প্রগতির নামে, অতি আধুনিকতার নামে যতসব উৎকট বিকট—।'

প্রদোষ তাঁকে বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'এবং কটকট। আর কি কোন অনুপ্রাস আছে অমূল্যবাবু? বোধহয় নেই। উপমাটা যেমন যুক্তি নয়, গালাগালটাও তেমনি কুযুক্তি। একটু আগে আপনি নালিশ করছিলেন, আমরা নাকি স্বদেশে বাস করিনে। সে কথা সত্যি নয়। কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই যে স্ব-কালের খোঁজখবর রাখেন না, নিজেদের সেই যৌবনকালেই প্রবাসী হয়ে রয়েছেন তার কি হবে? সেইজন্যেই আধুনিক কাব্য আপনাদের কাছে অপাঠ্য, আধুনিক সঙ্গীত অশ্রাব্য, আধুনিক চিত্রকলা দেখবার অযোগ্য। আপনারা ভাবেন আপনাদের যৌবনেই সমস্ত আধুনিকতা শেষ হয়েছে, তারপরে কাল আর এগোয় নি। পৃথিবীর সমস্ত ঘড়িই যেন বারোটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে আপনাদের সেইরকম ধারণা।'

অমূল্যবাবু বললেন, 'তুমি ভুল করছ। ঘড়ি বন্ধ হবে কেন? তাতে দম পড়ছে, চলছেও ঠিক। কথাটা হচ্ছে দাম নিয়ে। আমি বলতে চাই সময়ের আধুনিকতাই মূল্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। সবচেয়ে যে পরে জন্মাল সেই ক্ষণজন্মা একথা ভাবা ভুল। এমনো হতে পারে, সেও ক্ষণকালের জন্যেই এসেছে।'

প্রদোষ বলল, 'ক্ষণকালের না দীর্ঘকালের সে বিচার করবার অধিকার কার? যিনি দূরে থেকে দেখেন, ভালো লাগবে না বলে আতঙ্কে পিছিয়ে থাকেন তাঁর অন্তত নয়। তাছাড়া অনেক সময় আজকাল পরশুর তুচ্ছতার ভিতর থেকেই তরশুর অমূল্য সম্পদ গড়ে ওঠে। নিত্যকালের দোহাই দিয়ে আজ আর কালকে আপনি বাদ দিয়ে চলতে পারেন না।'

গানের আসরকে তর্কের আসর হতে দেখে মেয়েরা লক্ষ্মীর মতই চঞ্চলা হল। মাধুরী

লক্ষ্য করল ছেলেদের মধ্যেও অনেকেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তারা নারায়ণের মত চক্রপাণি না হলেও বারম্বার ভ্রূ বাঁকাচ্ছে।

সঞ্জীব বলল, 'মাধুরী এসো আমরা সবাই মিলে কোরাস ধরি, নইলে এ তর্কের তুফান থামবে না। ধর, খর বায়ু বহে বেগে—।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমরাই ধরে দাও।'

অমূল্যবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সত্যি আমারই দোষ। কোথায় একটু গানটান হবে তা নয় আমরা তর্ক জুড়ে দিয়েছি। আপনি শুরু করুন।'

এর পরে কি আর গানের মেজাজ থাকে? মুড একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সঞ্জীব আর মৃন্ময় নাছোড়বান্দা। ওরা তার গান না শুনে আজ আর ছাড়বে না। কী গান গাইব তা নিয়েও মতদ্বৈধ। কেউ বলল বাদলাদিনের গান, কেউ বলল জন্মদিনের, কারো বায়না অন্য গান শোনবার।

প্রথমে দাদার অনুরোধই রাখল মাধুরী। গাইল, 'আবার তারায় দীপ্ত শিখায় অগ্নি জ্বলে।'

তারপরে মৃন্ময়ের ফরমায়েশ, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।'

শেষ করে উঠতে যাচ্ছিল, সঞ্জীব ছাড়ল না। তার অনুরোধও রাখতে হল। 'চিনলে না আমারে কি।'

মাধুরী লক্ষ্য করল অসীম কোন ফরমায়েশ করল না। কিন্তু তিনখানা গানই সাগ্রহে শুনল। মনে হল সে বেশ খুশীই হয়েছে। তার মুখে যে ক্লান্তির মেঘ ছিল তা যেন আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

গাইবার জন্যে আরো দু-একটি মেয়েকে সাধাসাধি করা হচ্ছে—ভিতর থেকে ডাক এল খেতে দেওয়া হয়েছে। আকাশে মেঘের ডাকও কানে আসছে। অমূল্যবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

ভিতরের একখানা ঘরে দুইসারিতে আসন পাতা হয়েছে। মেয়েদের পাশাপাশি বসতে লজ্জা, কারো-কারো মুখোমুখি বসতেও আপত্তি।

সঞ্জীব বলল, 'পাশেও নয়, সামনেও নয়, তাহলে আমাদের কাঁধ আর পিঠ ছাড়া ও'দের কোন আসনই থাকে না।'

শেষপর্যন্ত সামনের সারিতেই বসলেন ও'রা।

নন্দিতা বলল, 'মাধুরী তুমিও বসে যাও। আমি আর দিদি পরিবেশন করব।'

মাধুরী বলল, 'মা আর মাসীই বুঝি ছেলের সব? পিসীরা কি ভেসে এসেছে?'

নন্দিতার দিদি ভাঁড়ার থেকে জোগান দিতে লাগলেন। বউদির সঙ্গে মাধুরীই পরিবেশনের ভার নিল।

সঞ্জীব মৃন্ময় আর অসীম পাশাপাশি বসেছে।

মাধুরী লুচির থালা এগিয়ে নিয়ে যেতে সঞ্জীব বলল, 'ননদ আর ভাজের মধ্যে পটুতা কার বেশি এবার দেখা যাবে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'এর মধ্যে আবার পটুতা অপটুতার কী আছে। বরং তোমরা কে কত খেতে পার তাই দেখব।'

মৃন্ময় বলল, 'শুনেছ তো অসীম? কম্পিটিশনে নাম দিতে রাজী আছ তো? আর কিছু না পারি খেতে পারি খুব। কী বল, কম্পীট করবে?'

অসীম মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'না, আমি কোনরকম প্রতিযোগিতার মধ্যে নেই। খাওয়ার প্রতিযোগিতাই হোক, আর পরার প্রতিযোগিতাই হোক। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাই হোক আর সন্তরণ প্রতিযোগিতাই হোক।'

সঞ্জীব বলল, 'এই তো অসীমের মুখ ফুটেছে। তুমি বলতে চাও তুমি মোটেই প্রতিযোগী নও, শুধু যোগী? তোমার কোনরকম উপসর্গই নেই?'

পরিহাসরত বন্ধুদের রেখে মাধুরী এগিয়ে চলল।

পদ খুব বেশি করা হয়নি। আবার কমও নয়। লুচি, মুড়িঘণ্টের ডাল, একটা মাছ, মাংস, চাটনি, দই মিষ্টি। ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করতে লাগল মাধুরী। কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে মাধুরী। দ্রুতহাতে নিমন্ত্রিতদের পাতে পাতে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য জুগিয়ে যাচ্ছে। পেয়টাই শুধু অদেয়।

মাংসের বাটি নিয়ে আবার সঞ্জীবদের কাছে ঘুরে আসতে সে বলল, 'তোমার মহিমা স্বীকার করছি মাধুরী। দেখ অসীম দেখ। কে বলবে একটু আগে এই মেয়েই সুরে পরিবেশন করছিল, এখন রাক্ষসদের মাংস খাওয়াচ্ছে।'

মৃন্ময় বলল, 'কথাটা কি আমাকে লক্ষ্য করে বলা হল? আগেকার দিনে যারা বেশি খেতে পারত তারাই মেয়েদের বেশি আদর পেত। কিন্তু আজকাল আর সেদিন নেই। হায় অমিতাহারী তোমার দিন গিয়েছে। এখন যারা খেতে পারে না তাদের পাতের দিকেই মেয়েদের পক্ষপাত বেশি।'

তারপর অসীমের পাতের দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে মৃন্ময় হেসে বলল, 'দেখেছ ওখানে কিরকম উঁচু করে সব ঢেলে দেওয়া হয়েছে?'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদ করে বলল, 'কী যা তা বলছ। উনি খাচ্ছেন না, তাই সব পড়ে আছে।'

অসীম হেসে বলল, 'অত কথার দরকার

কি। তুমি বাগানটা অনেক, মৃন্ময়ের পাতে ফেলে দিয়ে যাও। তাহলে ওর আর কোন আক্ষেপ থাকবে না। মৃন্ময়, তুমি যেভাবে খাচ্ছ তোমাকে হাত ধরে টেনে তুলতে হবে, না হলে উঠতে পারবে না।'

অসীমকে খুশি হয়ে হাসি-পরিহাসে যোগ দিতে দেখে মাধুরীর ভালো লাগল। একটু আগে ও যে বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে ছিল তা মাধুরীর মনঃপূত হচ্ছিল না। উৎসবের বাড়িতে এসেও অত ভাবনা কিসের অসীমের? যেখানে সবাই আনন্দিত, উচ্ছ্বাসে উল্লাসে মুখর, সেখানে কেউ যদি চুপচাপ গম্ভীরভাবে বসে থাকে তাহলে কি দেখতে ভালো লাগে?

অমলেন্দুবাবু আর প্রদোষ বাদ আর প্রতিবাদ দুজনে এখন পাশাপাশি বসে খাচ্ছেন। তারা কি ইচ্ছা করে পাশাপাশি বসেছেন, নাকি আর পাঁচজনে চক্রান্ত করে ওঁদের অমনভাবে বসিয়ে দিয়েছে কে জানে। মাধুরী মিষ্টি পরিবেশন করতে গিয়ে ওদের অলক্ষ্যে একটু হাসল। তারপর ফের ঘুরে এল অসীমদের সারিতে।

সঞ্জীব বলল, 'মানসীর কথা হচ্ছিল। সে এল না যে। এর আগে তোমাদের দুটি সহোদরাকে একসঙ্গে দেখতাম। আজ যে বিচ্ছিন্ন?'

খুব সাধারণ পরিহাস। তবু মাধুরীকে তা হঠাৎ বড় আঘাত করল। সেভাবে কোন অরসিক যেন বেসুরো ঝংকার দিয়েছে। বেদনায় টন টন করে উঠল মন। সীতা তারই তো আগে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। মানসীর কথা সবচেয়ে আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কিন্তু নিজেকে সমর্থন করবার যুক্তিও আছে মাধুরীর। সে কি সময় পেয়েছে যে জিজ্ঞাসা করবে? প্রথমে তো এক গুচ্ছের গান গাইতে হল। তারপর এই পরিবেশন। এ সব নিতে নিতে কি আর অত কথা জিজ্ঞাসা করা যায়? যদি কিছু জানাবার মত থাকত, অসীম নিজেই কি তা বলত না?

সঞ্জীবের পাতে একটা সন্দেশ তুলে দিতে দিতে মাধুরী বলল, 'আইবুড়ো থেকে ওরও তো অসবার কথা ছিল। কিন্তু এল কই?'

তারপর অসীমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে—' বলেই তাড়াতাড়ি থেমে গেল।

অসীম বলল, 'না আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।'

এ প্রসঙ্গ এখানেই চাপা দেওয়া ভালো। সঞ্জীব আর মৃন্ময় তো কেউ কম চালাক না। হাঁ করতেই পেটের কথা সব বুঝে ফেলে।

পেটুক মৃন্ময়কে দুটো সন্দেশ দিল মাধুরী। বলল, 'দই খাবে আর একটু? খাওনা, নিয়ে আসছি।'

খানিক বাদে সবাই উঠে পড়ল। মৃন্ময় বলতে লাগল, 'শংকর আশীর্বাদ করি তোমায় এমনি আরো গুটি তিনেক ছেলে হোক। আর তাদের প্রত্যেকের জন্মদিন পালন করার সুমতি হোক তোমার। তাহলে বছরে চারবার আমাদের বাঁধা বন্দোবস্ত থাকবে। যা খাওয়ালে! জীবনে কোনদিন ভুলব না। লোকে আজকাল নিজের বিয়েতে এমন খাওয়ায় না হে। আর তো ছেলের জন্মদিন।'

সঞ্জীব বলল, 'খাওয়াবে না? নিজের বিয়েতে খাওয়ায়নি, ছেলের অন্নপ্রাশনে খাওয়ায়নি, জন্মদিনটাও যদি বাদ দিত তাহলে কি ওকে আস্ত রাখতাম নাকি আমরা?'

মৃন্ময় বলল, 'ও, তিনটের মিলে? তাহলে

কিন্তু খুব বেশি হয়নি। তাহলে কিন্তু আমি কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

সবাই হেসে উঠল। তারপর ফের বসল গিয়ে বাইরের ঘরে। পানের বাটা সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নন্দিতার দিদি অমিতার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বেশ মোটাসোটা চেহারা। তাই দেখে শঙ্কর আড়ালে বলে, 'অপরিমিতা।' ছেলেমেয়ে হয়নি। জরুরী কাজে স্বামী আসতে পারেননি। নিজে এসে বোনের সব করে দিচ্ছেন। দুই বোনে বেশ ভাব। এরই মধ্যে মাধুরীর সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, 'মাধুরী তুমি এবার খেয়ে নাও। রাত অনেক হল।'

মাধুরী বলল, 'অমিতাদি, আমার কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে না।'

অমিতা বললেন, 'দিয়ে-টিয়ে উঠলে অমন হয়। তাই বলে তুমি না খেলে কি আর চলে।'

শেষ পর্যন্ত মাধুরীকে ওদের সঙ্গে বসতে হল।

বসবার ঘরের কলরব ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। শঙ্করের বন্ধুদের মধ্যে যারা জোড়ে এসেছিল, তারা আগেই বিদায় নিয়েছে। এবার বিজোড়রাও খসে পড়তে লাগল।

খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে মাধুরী বাইরের ঘরে এসে দেখলে সবাই চলে গেছে, শুধু দাদা তার পুরোন বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গল্প করছে।

মাধুরী বলল 'দাদা, আমি এবার পালাই। রাত দশটা বেজে গেল।'

শঙ্কর বলল, 'বৃষ্টি পড়ছে যে। কি করে যাবি। আজ বরং এখানে থেকে যা।'

মাধুরী বলল, 'না দাদা, বাড়িতে বলে আসিনি। শেষে এই নিয়ে অশান্তি হবে।'

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলল, 'আচ্ছা চলে যা। আমার ছাতাটা নিয়ে যা।'

পাশের ঘর থেকে নিজের ছাতাটা এনে মাধুরীর হাতে দিল শঙ্কর।

মাধুরী হেসে বলল, 'ও ছাতা বরং তোমার বন্ধুকে দাও। আমি বউদিরটা নিচ্ছি।'

নন্দিতা বলল, 'ইস, এই জলবৃষ্টির দিনে দুটো ছাতাই তোমাদের দান করে বসি আর কি। বাস স্টপ অবধি একটাতেই বেশ যেতে পারবে।'

ঘুমন্ত শিশুকে আর একবার দেখে তার কপালে চুমু খেল মাধুরী। তারপর নন্দিতার দিদিকে প্রণাম করে, দাদা বউদির কাছে আর একবার হাসি মুখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল মাধুরী। রঙীন থলিটি শুধু তার হাতে। ছত্রধর হয়ে অসীম চলল পাশে পাশে।

ছাতার ওপর টপ টপ করে জল পড়ছে।

অসীম বলল, 'সরে এসো ভিজে গেলে যে।'

মাধুরী সরে এলেও তার আধখানা গা ভিজতে লাগল। বুঝতে পারল অসীমও শুকনো নেই।

গলিটা অন্ধকার। বাস ধরবার জন্যে দুজনে ভিজতে ভিজতে এগোতে লাগল।

সকালে ছাতা ছিল না। তবু ভিজতে হয়নি। এখন ছাতা আছে তবু বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা নেই। (ক্রমশ)

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

ছাব্বিশ

অধ্যাপক সত্যেন বোসের সঙ্গে আমি যখন প্রমথ চৌধুরীর আলাপ করিয়ে দিই—১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে—তখন প্রমথবাবুর মনে বিশেষ উৎসাহ জন্মাল, বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ হবার এবং ঐ উদ্দেশ্যে চৌধুরী মশাই কিনতে লাগলেন এমন কতকগুলি বই যার ভিতর বিজ্ঞানের পরিচয় সহজ সরল ইংরিজীতে দেওয়া আছে। একথা পূর্বেই বলেছি, তা ছাড়া বলেছি যে, ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে উনি সবুজ-পত্রে সুবীন্দ্র সিংহকে লিখলেন: 'আমি ইলিয়টের পুস্তক দেখেছি কিন্তু এক অধ্যায়ে ফিজিক্স-এর বই কোন পপুলার [illegible] পাই নি। তবে এ বিষয়ের প্রতি জনগণের উপর খুব ভাল ভাল ছোট বই আছে।—আমি তার দু'একখানা আনিয়েছি। আমার বিশ্বাস আমাদেরও ফিজিক্সটা ভাগ ভাগ করে নিতে হবে। তুমি যদি ইলেকট্রিসিটির ভার নেও ত তোমাকে এ বিষয়ে পপুলার বই দিতে পারি। তার থেকে তুমি অনেক সাহায্য পাবে, অন্তত কি রাখতে হবে, কি ছাড়তে হবে—তার হিসেব পাবে।' এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, বাঙলা ভাষায় ইওরোপীয় বিজ্ঞানের স্থূলে পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞানকে সাধারণ বাঙালীর জ্ঞানগম্য করার জন্য উনি কত উৎসুক হয়েছিলেন তখন। সত্যেনের সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্বে ওঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান ভাসা-ভাসা ছিল। উনি ছাত্র-জীবনে সায়েন্স তত কিছু শেখেন নি, কেননা ওঁদের সময়ে এখনকার মতন প্র্যাকটিকাল ক্লাস ছিল না। বি-এ আর এম-এ পরীক্ষার জন্যে উনি সাহিত্য আর দর্শন-শাস্ত্র বেশি করেই পড়েছিলেন এবং কলেজ ছাড়ার পর এ-দুই বিষয় নিয়েই ওঁর মন সবচাইতে মেতেছিল। সে-সময়ে ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে দুজনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। একজন হচ্ছেন ফরাসী Comte; আর একজন হচ্ছেন Herbert Spencer, যাঁর সিনথেটিক ফিলোসফিতে পদে পদে বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু যে-কারণেই হোক, এই সব হেতুবাদী (র‍্যাশানালিস্ট) দার্শনিকদের প্রতি প্রমথবাবুর তাদৃশ ভক্তি না থাকায় এঁদের বিজ্ঞান-প্রীতির ছোঁয়াচ ওঁর মনে লাগে নি।

ফিলসফি-শব্দটির আগম হয় গ্রীক ভাষা থেকে। সে-ভাষায় ওর অর্থ "জ্ঞান-প্রিয়তা।" প্রতীচ্য-দর্শনে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের স্থান উচ্চ হয়ে উঠল, যখন সেখানকার বিজ্ঞানও উন্নতি করলে। প্রত্যক্ষ-দর্শন বিনা দর্শন-লাভই হয় না, এবিশ্বাস প্রতীচ্য বিজ্ঞানে অন্তর্নিহিত।

আমাদের দেশের চার্বাক-দর্শনেও বলে, প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ গ্রাহ্য নয়, আর পরলোক যখন নেই, তখন ইহলোকে যা সুখ পাওয়া যায় তাই কাম্য।

সাধারণ মানুষের কাছে এই মতটা সহজ-বোধ্য। ইউরোপীয় র‍্যাশানালিস্টদেরও অনুরূপ মত। সেখানকার মানুষেরা সাধারণত ঐহিক সুখকে বরেণ্য করেন। প্রত্যক্ষ-দর্শনের উপর প্রত্যয়শীল ফলিত বিজ্ঞান ইউরোপে স্বীয় প্রভাব এতটা বিস্তার করেছে, তার প্রধান কারণ এই যে, মানুষ চায় সুখ, চায় জীবনের পরিপূর্ণ সম্ভোগ। দুঃখ-নিবারণও তাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। রোগ দূর করা প্রভৃতি সমাজের কল্যাণকর কাজ প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেকটা করা যায়, সে-জন্যেও তার সমাদর। লোকের জীবনযাত্রাকে দুঃখহীন ও সুখময় করার ভার নিয়েছে বিজ্ঞান।

প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টাকে আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি। তাই সবুজ পাতার ডাকে আমি ঝরা পাতাকে ডাকি। প্রাচীনকে বারম্বার আহ্বান জানাই। সেকালের সঙ্গে একালের মিল কোথায়, গর-মিল কোথায়, উন্নতি হয়েছে কি অবনতি হয়েছে সেটা ভেবে দেখা উচিত।

প্রমথ চৌধুরীর মনে সবুজ-পত্রের যুগে যে সাহিত্য ও সায়েন্স প্রাচীন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মিলিত হয়েছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। ১।৯।১৭ তারিখের পত্রে উনি আমায় লিখছেন: 'তুমি কাল "বিচিত্রা"য় গেলে না কেন? প্রফেসর গেডেস দিব্যি বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে রস ও সার সমান মাত্রায় ছিল।' এই কথা থেকেই বোঝা যায়, উনি তখন সাহিত্য-রস এবং বস্তু-সারকে যুগপৎ শ্রদ্ধা করছেন। গেডেস ছিলেন বৈজ্ঞানিক। এঁর লেখা জগদীশ বোসের জীবনী ১৯২০ সালে বেরোয়। বইটি সুখপাঠ্য ও সারবান্। কলকাতার টাউন-হলে ইনি টাউন-প্ল্যানিং সম্বন্ধে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন: বাংলার ছোটলাট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁকে কলকাতার সিটি আর্কিটেক্ট করা হবে, এ-সংবাদ খবরের কাগজে বেরুল। তারপর উনি আর এক বক্তৃতায় বললেন: কলকাতা শহর গঙ্গার ধারে, চন্দননগরও গঙ্গার ধারে। সেখানে ছোট স্ট্র্যান্ডকে ফরাসীরা কেমন সুন্দর করে রেখেছে। আর কলকাতার স্ট্র্যান্ড কি বিশ্রী করে রাখা হয়েছে। কলকাতার তৎকালীন পোর্ট কমিশনররা প্রায় সকলেই ছিলেন, ইংরেজ। Geddes-এর মন্তব্যকে তাঁরা নিশ্চয়ই সার্টিফিকেট বলে মনে করেন নি। এর পরেই শোনা গেল, ওঁকে সিটি আর্কিটেক্ট করা হবে না। তলায় তলায় কারা বাদ সেধেছিলেন, তা জানি না। তবে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন, এ-মহানগরীর নদীতীর এখনো অসুন্দর। যে ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে বেরিয়ে জগদীশ দেখেছিলেন বাস্তবিক শিবের জটা, সেই নদীকেই গেডিশ এখানে দেখে বললেন, এ তো সুন্দর নয়! সত্যকে বাদ করে শিব-সুন্দরের মিল হয় নি।

সুন্দরের উপাসনাকে সুন্দর ভাবে প্রশংসা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, তাঁর সবুজপত্রে ছাপা "রূপের কথা"য়। ওঁর "সুরের কথা"য় হার্মনি-প্রধান ইউরোপীয় সংগীতকে মেলডি-প্রধান হিন্দু সংগীতের চেয়ে উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। এর কারণ খুব সম্ভব ওঁর সহধর্মিণীর ইউরোপীয় সংগীতে অসাধারণ দক্ষতা, কেননা আমাদের বিবাহ-সংযুক্ত স্ত্রী-আচারে একজন প্রশ্ন করেন, "বর বড়, না কনে বড়?" আর সে-প্রশ্নের সগর্ব উত্তর আসে সমবেত-কণ্ঠে—"কনে বড়।"

"কমলালয়" অর্থাৎ এক নম্বর ব্রাইট স্ট্রীটে যে দিন শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীকে পিয়ানো বাজিয়ে বীট্‌হোফেনের Moonlight Sonata পরিবেশণ করতে দেখলুম, সেদিনই তাঁর অঙ্গুলি-চালনায় অসামান্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করি। সঙ্গে সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসারও উদয় হল আমার মনে: হিন্দু-সংগীতে এ-রকম হার্মনি নেই কেন? কোনো উত্তর তখন খুঁজে পাই নি। এখন মনে হচ্ছে, এর কারণ, আমরা একক-সাধনাতেই বিশ্বাস করি। হিন্দু-সংগীতের মূলে আছে এক-কণ্ঠনিঃসৃত সুরের পরম্পরা; এবং গানের বাণী এই সুর-পরম্পরার সংযোগে যে রস-সৃষ্টি করে, সেই রসই শ্রোতার ভোগ্য পদার্থ। বিধাতা আমাদের কণ্ঠ-যন্ত্র এরূপ-ভাবে গড়েছেন যে, সে-যন্ত্রে এককালীন একটি মাত্র সুর নির্গত হতে পারে। অথচ, সুর জিনিস এমন যে, মানুষের হাতে-গড়া যন্ত্রে যদি তিনটি সুরও একসঙ্গে বাজানো যায় (যথা সা-গা-পা), সেই যোগফল বিধাতাসৃষ্ট কর্ণ-যন্ত্রে প্রবেশ লাভ করে আমাদের চিত্তে অপূর্ব আনন্দ এনে দিতে পারে। এ সত্য যে প্রাচীন হিন্দুদের অবিদিত ছিল, তা নয়। তানপুরার তারে 'সা-পা-পা-সা' কেবলিই বেজে একটা হার্মনিক ব্যাকগ্রাউন্ড বজায় রেখে আসছে অনেককাল। এই হার্মনিক কথা জেনেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা একক-সাধনার দিক থেকে মেলডি-প্রধান সংগীতেরই উৎকর্ষ-সাধনে যত্নবান হন।

সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করাটা ভারতের নিজস্ব প্রকৃতি নয়। পক্ষান্তরে সেটা ইউরোপের বিশিষ্ট ঐতিহ্য। এখানকার যোগী প্রায়শ নির্জন স্থানেই ধ্যান করেন। বৌদ্ধ ত্রি-শরণের মধ্যে 'সংঘ' আছে। বুদ্ধদেবের সময়েই দেখা যায়, হঠাৎ একাধিক সংঘের আবির্ভাব। আমার ধারণা, সংঘ-শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল সুমেরিয়ান 'সংগু' থেকে। 'সংগু' মানে 'Corporation of priests'। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করার পর যে দুজন জ্ঞান-বৃদ্ধ দার্শনিকের কাছে শাস্ত্রের শিক্ষা নিলেন, তাঁদের একজনের নাম ছাঁকা ব্যাবিলোনিয়ন'—আরাড় কালাম। তাঁর সময়কার মগধে ছিলেন বিম্বিসার রাজা, এবং পুরাণে রাজবংশকথন-প্রসঙ্গে লেখা আছে, শিশুনাগের পর কাকবর্ণ, তৎপরে ক্ষেমধর্মা, তৎপরে ক্ষত্রৌজ, আর তৎপরে বিম্বিসার। এই শেষোক্ত নামের শেষাংশ 'সার' অবিকৃত ব্যাবিলোনিয়ন। আর শিশুনাগই হয়ত শেষ-নাগে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে

এসেছেন, তখন তাঁর অনন্ত-নামকে স্মরণ করেই আজ শয়ন করি, এ-ইচ্ছা মনে উদয় হলেও কার্যে পরিণত করতে পারলুম না। ১৯১৭ সালের শেষাংশে প্রমথবাবু আমায় চিঠিতে যা লিখেছিলেন তার মধ্যে 'রস ও সার' সমান মাত্রায় বর্তমান, এবং সেটা গোপন রাখলে অনিদ্রার সম্ভাবনা আছে।

৪৬

রাঁচি—২৩।১০।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রবন্ধ এবং তদন্তর্গত পত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রপাঠ উত্তর দিতে বসেছি—কেননা হাতে কোনও কাজ নেই, তাছাড়া বাইরে যে ঘুরে ফিরে বেড়াব তারও জো নেই,—বৃষ্টি এখানেও সমান চলেছে।

তোমার বন্ধুর প্রবন্ধ ছাপাবার মত হয়েছে। সুতরাং তুমি পত্রোত্তরে তাঁর নাম লিখে পাঠিয়ো, জানত সবুজপত্রে আমরা বেনামী লেখা ছাপাইনে। ছাপাখানার ভাষায় বলতে হলে এ-প্রবন্ধে Composition এর যা ত্রুটি আছে imposition এ আমি তা সেরে নেব। অর্থাৎ যেখানে যেখানে লাইনগুলো তেড়াবেঁকা হয়েছে সেখানে সেগুলোকে সিধে করে নেব।

আজ অষ্টমী পূজোর দিন, এই কথা ত পাঁজিতে বলে—কিন্তু চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি জন্মাষ্টমী—কেননা আকাশ একেবারে অন্ধকার আর মাঝে মাঝে শ্রাবণের ধারা বর্ষে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে সব ঋতু লোপ পেয়ে শেষটা এক বর্ষাই টিঁকবে, এরপর এদেশে আর আকাল হবে না—যা হবে তা হচ্ছে চির-[illegible]। যদিও এখন বেলা সবে সাড়ে চারটে—তবুও দিনে রাত্তিরে ভালো দেখতে পাচ্ছিনে বলে, লেখা এইখানেই শেষ করি। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। ইতি

প্রমথনাথ চৌধুরী

৪৭

মোরাবাদি—রাঁচি
২৪।১০।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি যে পেয়েছি তার প্রমাণ তার উত্তর লিখতে বসেছি। রবিবাবু মহাশয় একসময় আমাকে বেশি কথা কইতে বারণ করেন। তাঁর বিশ্বাস মনের কথা একবার মুখে বলে ফেললে তা লেখবার প্রবৃত্তি আর থাকে না। সেই অবধি, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব, তাঁর পরামর্শ মেনে চলছি। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আমার বকনির আর একটা দরজা খুলে দেন। আজ বছর তিনেক আগে আমি কাউকেও চিঠি লিখতুম না; এমন কি অপরিচিত লোকের চিঠির উত্তরও দিতুম না। তারপর রবিবাবু মহাশয়ের পরামর্শ মত আমি চিঠির জবাব দিতে শুরু করি। তার সুফল হয়েছে আমার ভাগ্যে বন্ধুলাভ তুমি, সুরেশানন্দ, কিরণ, অমিয় প্রভৃতির সঙ্গে পত্রসূত্রেই আমার পরিচয় হয়, এবং এখন তোমরাই হচ্ছ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বক্তৃতা না করে থাকতে পারি নে, সুতরাং রবিবাবু আমার মুখবন্ধ করে এবং সেই সঙ্গে হাত খুলে দিয়ে আমার লেখার তেমন সুসার করতে পারেননি। চিঠি হয়েছে এখন আমার লেখার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার মনটা এখন চিঠির ফাঁক দিয়েই

গল্পে বেরিয়ে যাচ্ছে—প্রবন্ধাদির জন্য বেশি কিছু জমিয়ে রাখ্‌তে পারছি নে। এর কারণও স্পষ্ট। কথা কওয়া ও চিঠি লেখার ভিতর কোনরূপ দায়িত্বজ্ঞান থাকে না, সুতরাং সে-কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দভাবে, বেপরোয়াভাবে ও বেকারভাবে করা যায়। তাই এখানে এসে অবধি চিঠি লিখছি আর কিছু করছিনে। চারপাশে আমার যাঁরা শুভার্থী আছেন তাঁরা অবশ্য বলেন যে আমি সবুজপত্রের বদলে পত্র লিখে মিছে সময় নষ্ট করছি। জানি কথাটা সত্য, কিন্তু মুখে তা স্বীকার করিনে। আমি উত্তর দিই যে চিঠি লিখে আমি লেখার হাত তৈরী করে নিচ্ছি: কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্যও নয় সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। কথাটা এই হিসাবে মিথ্যা যে, আমার উদ্দেশ্য ও নয়, আর এই হিসেবে সত্য যে, যে-উদ্দেশ্যেই হোক—লিখলেই লেখার হাত তৈরী হয়। আসল কথা এক বছরের নানারূপ খাটুনির পর—আমার কোমর বেঁধে লিখতে বসবার প্রবৃত্ত হচ্ছে না। অক্টোবরের বাকী কটা দিন এইভাবেই কেটে যাবে—১লা নবেম্বর থেকে আবার সাহিত্যরচনায় বসে যাব। আমি যে মনের আলস্যেমি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছিনে, তার আর একটা কারণ এখানকার আবহাওয়ার গুণে আমার শরীরেও আলস্যেমি ধরেছে। এ বৎসর রাঁচির হাওয়া এযাবৎ শরীর মনকে চাংগা করে তোলবার মত হয়নি। এসে প্রথমে পেয়েছিলুম বর্ষা, এখন পাচ্ছি গ্রীষ্ম। যে কারণেই হোক, আমাদের দেশের ঋতুগুলো সব উলটে পালটে গেছে। অন্য বৎসর এ-সময় রাঁচিতে কম্বল জড়াতে হয়। এ বৎসর শাল ওড়াতেও হচ্ছে না। তবে আশা করছি, শীত একদিন হঠাৎ আকাশ থেকে ঝুপ করে আমাদের গায়ে এসে পড়বে, তখন দেহমনের সকল গ্লানি কেটে যাবে আর আমার কলমের মুখ দিয়ে কালির ফোয়ারা ছুটবে। উপরে যা লিখলুম তার থেকে বুঝতে পারছ আমি একরকম "আলেতালে" দিন কাটাচ্ছি।

তোমার বন্ধুর লেখাটায় এইবার হাত দেব। বেশীকিছু কাটকুট করতে হবে না। ওরকম আরও দু'একটি সহযোগী পেলে ত আমি বেঁচে যাই। কেননা তাঁদের হাতে লেখার কাজ চাপিয়ে দিতে পারি। রবিবাবু মহাশয় আমাকে ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছেন, ইউরোপের নূতন চিন্তা সব সবুজপত্রে প্রকাশ করতে। আমার পক্ষে একহাতে তা করা অসম্ভব। সুতরাং আমি দু'চারটি এমন লোক চাই, যাদের হাতে ইংরাজি বই দিলে তা বাংলা প্রবন্ধে রূপান্তরিত হবে। তুমি ত এখন অশোকের যুগে বাস করছ, সুতরাং বর্তমান যুগে তোমাকে ফিরিয়ে আনতে ঢের সময় লাগবে। কলকাতায় গিয়ে সবুজের এই নতুন recruit-টির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে। এইখানেই শেষ করি, স্নানের সময় গতপ্রায় হয়ে এল।

আশা করি তোমাদের সব খবর ভালো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪৮

রাঁচি

১৬।১১।১৭

কল্যাণীয়েষু,

আমার কাছ থেকে তোমার একখানা চিঠি পাওনা আছে। এ ঋণ যে হাত হাতু শোধ করিনি, তার কারণ এ ক'দিন চিঠি লেখা বন্ধ করেছিলুম। দেখলুম আস্তে আস্তে ও নেশা আমাকে বেশ পেয়ে বসছে—তাই মাসে ক'টা দিন ফাঁক দিলুম। আমি লেখা-পড়ার বিষয় কোনরূপ অভ্যেসের দাস হতে ভালবাসিনে। আমি সঙ্গে যে সব বই এনেছি তা দেখ্‌লে বুঝতে পার্‌তে আমি মনের খোরাক কেমন থেকে থেকেই বদ্‌লে নিই। এখন Semantics পড়ছি—এ হচ্ছে একটি নতুন শাস্ত্র। আসলে জিনিসটে হচ্ছে ভাষাতত্ত্ব—তবে আমরা যাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলে জানি তা নয়—বরং তার উল্টো বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপের একজন সেরা ভাষাবৈজ্ঞানিক এই নূতন শাস্ত্র বার করেছেন। এ বই থেকে কি নতুন বিদ্যে লাভ করেছি তার পরিচয় একদিন না একদিন পাবে হয় কথায় নয় লেখায়।

চিঠি লেখা বন্ধ করে প্রবন্ধ লিখতে সুরু করেছিলুম। সবুজপত্রের দুমাসের খোরাক জোগাড় হয়েছে। এইবার কলকাতায় ফিরে গল্প লেখায় হাত দেব যদি-না রাজনীতির হুজুগে মেতে উঠি। মেতে উঠি আর না উঠি তাতে যে কতকটা জড়িয়ে পড়ব তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে—একটা ভরসার কথা আছে। আমার "কংগ্রেসের দলাদলি" পড়ে কংগ্রেসের দু'পক্ষই হয়ত আমাকে স্বদল থেকে বার করে দেবেন। ও লেখাটি পড়ে তাঁরা যে খুশি হবেন না, তার প্রমাণ দেশের লোক খুশি হয়েছেন। রাজনৈতিক-দের উপর ওভাবে হাত চালানোর দরুণ পাঁচ-জনে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠাচ্ছে। তবে রাজনৈতিকদল আমাকে একদম ছেঁটে নাও দিতে পারেন—কেননা যাদের হাতে কলম আছে তাদের তাঁরা পারৎপক্ষে চটাতে চান্‌ না।

এখন আমার আসল খবর হচ্ছে এই যে আমি কাল কলকাতামুখো রওনা হচ্ছি। পরশু সকালে বাড়ি পৌঁছব। সামনে হপ্তায় তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হবে। এখানে আমি সত্য সত্যই নির্জনবাসে থাকি—সুতরাং এর পরে বন্ধুসংগ একটু বেশি করেই ভালো লাগে।

আশা করি, তোমার খবর ভালো আর চন্দ্রগুপ্তের না হয় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেছে। কেননা তোমার শুভার্থীর চান যে যত শীঘ্র সম্ভব তুমি অশোকে এসে পৌঁছও। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪৯

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
শুক্রবার (২৩।১১।১৭)*

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। এখানে এসে

অবধি এতটা কাজের ভিড়ে পড়ে গিয়েছি, যে একখানা চিঠি লেখবারও অবসর পাইনে। তাই তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি যে, কাল বিকেলে এখানে এলে খুশি হব। সবুজ্‌-দল এখানে একত্র হবার কথা আছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫০

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৩০।১১।১৭

কল্যাণীয়েষু,

কাল বিকেলে বাড়ি থাকব, সুতরাং তুমি এলে নিশ্চয় আমার সাক্ষাৎ পাবে। একছত্র চিঠি সারবার কারণ দুছত্র লেখবার অবসর নেই। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৭।১২।১৭

কল্যাণীয়েষু,

যদি অতিশয় শয্যাশায়ী হয়ে না থাক' ত' কাল বিকেলে সবুজের বৈঠকে উপস্থিত হলে খুশি হব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৫।১২।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলুম এবং বলা বাহুল্য যে, তোমার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলুম। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি তারিখে যথাসময়ে তোমাদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

সত্যেন্দ্র প্রভৃতি যে-কটি সবুজদলের মেম্বর তোমার প্রসাদে লাভ করেছি তাদের ঠিকানা ত তোমার জানা আছে। বাকী কজনের নামধাম যতদূর মনে পড়ে নীচে লিখে দিচ্ছি।

(১) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—
51/5, Okhil Mistry's Lane,
Amherst Street.

(২) কিরণশঙ্কর রায়—
44, European Asylum Lane.

(৩) বরদাচরণ গুপ্ত—
37, Harrison Road.

(৪) অতুলচন্দ্র গুপ্ত—
66, Lansdowne Road.

(৫) প্রবোধ এবং সুবোধ চট্টোপাধ্যায়—
8, Jellatola Lane, Simla P.O.

এছাড়া আর কেউ বোধহয় এখন কলিকাতায় নেই, যথা—অমিয়, সোমনাথ ইত্যাদি। সবুজদলে যাঁরা নতুন ভর্তি হয়েছেন তাঁদের মধ্যে চারু ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে বলতে পারো। তাঁর ঠিকানা—
3, Sukhia Row.

আমার ইচ্ছে এই সংগে শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও নিমন্ত্রণ করো।

আমার ৩০শে ডিসেম্বর এখানে সবুজের বৈঠক বসাবার ইচ্ছে আছে। সুতরাং সেদিন বিকেলটা খালি রেখো। কাল পরশুর মধ্যে পাকা খবর জানাব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৯।১২।১৭

কল্যাণীয়েষু,

পূর্বপত্রে জানিয়েছিলুম যে আসছে কাল এখানে সবুজের বৈঠক বসাবো। কিন্তু সে সংকল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম। চারদিকে যখন মহা মহা সভাসমিতি বসছে তখন তার মধ্যে একটি অন্-সভা বসাবার চেষ্টা বৃথা, হুজুগের মধ্যে সাহিত্যের চর্চা করা চলে না।

সে যাই হোক, পয়লা জানুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে তোমাদের ওখানে গিয়ে হাজির হব। কিরণ ও অতুলবাবুকে সংগে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। ধূর্জটির বাড়িও আমার পথে পড়ে সুতরাং সম্ভবতঃ তাকেও তুলে নিয়ে যাব। আজ এই পর্যন্ত। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[ক্রমশঃ]

* এ-তারিখ চিঠিতে নেই; তবে বার দেখে আর খামে ডাকছাপ দেখে এ সেটা নির্ণয় করা গেছে।

শা ন্ত

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ক্ষুব্ধ জগৎ, তুফান এল ধেয়ে
ঝোড়ো মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে
নোঙর-ছেঁড়া বাতাস সর্বনাশা।

দ্বীপের পাহাড় ছোট্ট পাখির বাসা
দুলছে ভয়ে কাঁপছে থর থর।
মত্ত হাওয়া ক্ষোভে প্রবলতর
ভাঙতে চায় প্রাচীর কারা বাঁধন আগল যত।
গর্জে ওঠে শপথ করে, 'না হয়ে পারে না'—
ধাক্কা খেয়ে নিজের দেহে ফুটছে শুধু ক্ষত,
চিরকালের যুক্তি অটল শিকড় ছাড়েনা।

ফুঁসল উঠে সাগর অজগর—
ক্রুদ্ধ চোখ কুটিল ফণা নেইকো ভয় ডর।
আছড়ে শত ছোবল মারে শক্ত পাথর পা'য়
বিষের ঝলক কালচে হল সোনা বালির গা'য়।
গড়িয়ে পড়ে রক্তধারা রাঙায় গোধুলি
ঝিকমিকিয়ে উঠল ফেণার শঙ্খচূড়ের ঝুলি।

নেতিয়ে পড়ে দৈত্য পাহাড়, শিথিল হল মাটি
কাতর হয়ে পাথর তবে ছাড়ল নিজের ঘাঁটি।
বলল ঃ হতেই হবে যখন হবার যা হয় হোক!
লগ্ন এল, শান্ত হল সিন্ধুশকুন শোক।

কাশ্মীরে যুদ্ধরত সৈনিক স্বামীর উদ্দেশে

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

তোমার গাঁয়ে অঘ্রাণের গায়ে-হলুদ,
অড়হরের হলুদ ফুলে হনহনিয়ে
আঘ্রাণের নেশায় বুঁদ নানা জাতির
হলদে ডানায় প্রজাপতি উড়ে এলেও,

মোমবাতির শিষের মতন ফুটফুটে
হলদে ধানের টানে মাতাল অঘ্রাণেই
শহর থেকে ঝাঁকড়া চুলে কাটতে ধান
বৌয়ের কাছে সবুজ চাষী ফিরে এলেও,

এমন দিনে হলুদ গাঁয়ে নাই বা এলে,
তোমার গান ভোমরা গায় তানপুরায়
হলদে ফুলে হিমের ভোরে শিমলতায়,
আমিই যেন গায়ে-হলুদ অঘ্রাণের,
আমার নাকি ছয় মাসের মায়ের রঙ,
শ্যামলা গায়ে হলুদবরণ ফুটন্ত,
হীরার ধার ভেতর থেকে কাটছে কাচ,
চোখের জলে গড়াচ্ছি শিশু দুরন্ত।
কী যে লড়াই দুই দলের, বুঝাই দায়,
কোথায় তুমি হাঁটছ তুষার-কাশ্মীরে?
লড়াই তবু শেষ না-হলে হরিয়ালের
ডানা মেলে পালিয়ে এসো হলুদ গাঁয়।

মা ঃ স ন্তা নে র জ ন্য

আরতি দাস

হে ঈশ্বর
এ সংকটে পায় যেন ত্রাণ
আমার সন্তান।

ওরা যে অবোধ
একান্ত খেলার ছলে করে পথরোধ
সম্মুখে বিষাক্তফণা যে লুব্ধ ময়াল
তির্যক দু'চোখে চায়। ভীষণ ভয়াল
অব্যর্থ শিকার কোনো হিংস্র শ্বাপদের
এ যুগের জনারণ্যে কোরো না ওদের,
হে ঈশ্বর চেয়ে দেখো মানুষের হিংসামত্ত রূপ
মুখোশের অন্তরালে, ওরা শিশু, হোয়ো না বিরূপ।

তার চেয়ে ওরা হোক্
বহুদূরে অরণ্যের তরুণ তমাল
পল্লবপ্রসার ঘন শাল কি পিয়াল,
আমি হব মাটি
কোমল শয়ন পরিপাটি
আমার স্নেহের কোলে
ওরা যেন বাতাসের দোলনায় দোলে।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ ১৩৬৬ ॥

প্রকাশিত হইয়াছে

এই সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

সা রা রা ত

*

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপন্যাসোপম বড়গল্প

ম হা শ্বে তা

*

পরশুরামের অতুলনীয় গল্প 'সাড়ে সাত লাখ'

*

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ব্যাঙ্গাত্মক ছড়া 'ভস্মলোচন'

*

খ্যাতনামা কথাশিল্পীদের তিনটি বড়গল্প

কুড়িটি গল্প

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	শ্রীবিমল কর
শ্রীআশাপূর্ণা দেবী	শ্রীমনোজ বসু
শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ
পরশুরাম	শ্রীসমরেশ বসু
শ্রীপ্রফুল্ল রায়	শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
বনফুল	শ্রীসুবোধ ঘোষ

রম্যরচনা ও **প্রবন্ধ**

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, ডঃ শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীবাকু আঢ্য, শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়, 'সমুদ্রগুপ্ত' শ্রীসরলাবালা সরকার, শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কবিতা

শ্রীঅবন্তী সান্যাল, শ্রীঅরবিন্দ গুহ, শ্রীঅরুণকুমার সরকার, শ্রীঅরুণ মিত্র, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীউমা দেবী, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণধন দে, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী, শ্রীচিত্ত ঘোষ, শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী, শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবটকৃষ্ণ দে, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য, শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

*

ইহা ব্যতীত চব্বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী **আনন্দ-মেলা**

•

তিনখানি বহুবর্ণ আর্ট প্লেট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনীর প্রাচীন পট : শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত বর্ণচিত্র

দাম সাড়ে তিন টাকা রেজেস্ট্রি ডাকে : চার টাকা বার নয়া পয়সা

টেপ রেকর্ডারের নাম এখন আমাদের কারো কাছেই প্রায় অজানা নয়; কিন্তু সিক্রোরিডারের নামটা এখনও প্রায় অনেকের কাছেই অজানা। এটি টেপ রেকর্ডারের মতই একটি যন্ত্র। "টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির" প্রফেসর ইয়াসুশি হোসিনো এই অপূর্ব যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন। ১৯৫২ সাল থেকেই তিনি এই রকম একটি যন্ত্র আবিষ্কারের সাধ, ইচ্ছা তিনি মনে পোষণ করতেন, অবশেষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৫৬ সালে তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের প্রথম মডেলটি প্রকাশিত হয়। প্রফেসর হোসিনোর এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তিনিও ঘরে বাইরে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষত গত বছর ব্রাসেলসের বিশ্বমেলায় এটিও একটি দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল।

আগেই বলেছি যে, জাপানী যন্ত্র সিক্রোরিডার টেপ রেকর্ডারের মতই একটি যন্ত্র। তবে টেপ রেকর্ডারে যেমন শব্দটি রেকর্ড করে রাখার জন্য ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার করা হয়, এখানে তার বদলে সিক্রোশিট বলে এক টুকরো কাগজ ব্যবহার করা হয়। সিক্রোশিটের পিছন দিকে ম্যাগনেটিক লোহার গুঁড়োর সঙ্গে আরকালি মিশিয়ে লেপা থাকে, তাতেই গলার আওয়াজ বা যে কোনও রকম শব্দ তুলে রাখা হয়, আর ঐ আওয়াজ শুনতে হলে ঐ ম্যাগনেটিক ফিল্মটা অর্থাৎ সিক্রোশিটের পেছনটা সিক্রোরিডারের ওপর রেখে বোতাম টিপে দিলে ঐ যন্ত্রের দ্বারাই সব শোনা যাবে। আবার সিক্রোশিটের সামনের পিঠে যদি ঐ খবরগুলো ছাপা হয়ে থাকে, তাহলে সিক্রোরিডারে যখন খবরটা শোনা যাবে, তখন ঐ ছাপার অক্ষরের কথাগুলোও শুনতে পাওয়া যাবে। বিদেশী কোনও ভাষার উচ্চারণের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে হলে এই পদ্ধতি বেশ কাজ দেয়।

তাছাড়া টেলিফোনের কথাবার্তা, ব্যবসায় সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা এবং ধর্মালোচনা ইত্যাদি রেকর্ড করার পক্ষেও এটি বিশেষ সুবিধাজনক পদ্ধতি। কারণ সিক্রোশিট থেকে অন্য কাগজে এই উপায়ে এগুলো তুলে রাখতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগে। সোজা কথায় বলতে হয় যে, সিক্রোশিটের মধ্যে যে খবরাখবর থাকে সেগুলিও সাধারণ খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকার মতই ছেপে রাখা যায়। বহুরকমে এ যন্ত্রের ব্যবহার হতে পারে। কাউকে চিঠি লেখার দরকার হলেও সিক্রোশিটের মধ্যে লেখা কিছু লিখে পাঠালে কোনই ক্ষতি হয় না, কারণ সিক্রোশিটখানা দুমড়ে মুচড়ে গেলেও, রক্তজলে দেখা যাবে গলার স্বরের কোনও তারতম্য হয় না। শোনা যাচ্ছে যে, শব্দটি [illegible] হলে এটিকে কথা বলা খবরের কাগজে পরিণত করা যাবে। একটি

চক্রদত্ত

সিক্রোশিট খবরের কাগজে কোনও দাঙ্গা বা যুদ্ধের ছবি দেখে যদি ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করে, তাহলে ঐ ম্যাগনেটিক লোহার গুঁড়ো লেপা কাগজটি সিক্রোরিডারে রেখে যথারীতি বোতাম টিপলেই দাঙ্গা বা যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ জানা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তার সিক্রোশিটের এক পিঠে রোগীর অবস্থার বিবরণ এবং অন্য পিঠে রোগীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রেকর্ড করে রাখেন।

*

বাংলাদেশ আজ জলে থৈ থৈ করছে, পথে লোক চলাচলের রীতিমত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। অসুবিধার মধ্যেও একটু সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। [illegible] কাঠ দিয়ে একটা ভেলার মত জিনিস তৈরী করে নিতে হবে, আর [illegible] করার জন্য যেমন কাঠের [illegible] একটু খাঁজ করা থাকে সেই রকম একটু খাঁজ করে পা দুটি আটকে রাখার মত করা দরকার, তাহলে ঐ খাঁজে পা আটকে কাঠের ভেলায় চড়ে জলের ওপর দিয়ে বেশ পারাপার করা যায়। ঐ ভেলাটা একটা বাক্সের আকারের হবে এবং জল নিকাশের জন্য একটা ছেঁদা করে সেটি সাধারণভাবে ছিপি আঁটা থাকবে, যদি কোনও কারণে ভিতরে জল ঢুকে যায় তাহলে ছিপিটা খুলে অনায়াসেই জল বার করে দেওয়া যাবে।

*

শহর কলকাতায় মশা মাছির উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে গুপ্ত কবির মুখ দিয়ে তার সর্বপ্রথম কাব্য রচিত হয়েছিল:—"রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।" শুধু কলকাতা কেন অনেক শহরেই মানুষ মশামাছির উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। কবি কাব্য করেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অত সহজে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি; তাই মানুষের বিরুদ্ধে মশা-মাছির এই আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ফিলিপাইনের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে, মশা নিতান্ত অহেতুকভাবে মানুষকে আক্রমণ করে না উপরন্তু নিজেদের উপকারের জন্যই মানুষকে কামড়াতে হয়। মনুষ্য-দেহের রক্তে 'সেরোটোনিন' ও 'নোরিপাইনফ্রিন' নামে যে দুটি কেমিক্যাল্স থাকে সেগুলি মশামাছি ও এটুলি জাতীয় জীবের জীবনীশক্তি বিশেষ। এই কেমিক্যালগুলির দরুণ ঐ পোকামাকড়গুলির জীবনীশক্তি খুব বেড়ে যায় ফলে ওদের খাওয়াদাওয়া চালচলন থেকে আরম্ভ করে প্রজনন বৃদ্ধিও বেড়ে যায়। মশামাছি সাধারণভাবে সব মানুষকে [illegible] বিশেষ [illegible] লোক [illegible] বেশী [illegible] মশার [illegible] বেশী [illegible] আক্রান্ত হন কারণ তাদের রক্তে ঐ কেমিক্যাল দুটি খুব বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে।

জলে চলার ভেলা

চন্দ্রলোকের যাত্রী

অশোক মুখোপাধ্যায়

চাঁদের বাধ ভেঙেছে। মানুষের প্রতিভার এক কণা প্রায় আড়াই-লক্ষ মাইলের ব্যবধান পার হয়ে তাকে গিয়ে আঘাত করেছে। কিন্তু এতো সবে শুরু। যন্ত্রের চোখে আর বেতারের ভাষায় বিশ্বকে দেখে শুনে তৃপ্ত থাকাটাই শেষ কথা নয়। আসল উদ্দেশ্য মানুষ নিজেই একদিন হবে মহাকাশের যাত্রী।

চন্দ্রলোকে রকেট পৌঁছেছে। অতএব সেখানেই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদ খুব দূরে নেই, একথা প্রায় জোর করেই বলা যায়।

আমরা কেউই এখনও চাঁদে যাইনি। না গেলেও পথে বা সেখানে যাবার পর যে সকল অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করে নিয়ে আসব (যদি ফিরে আসতে পারি) তাদের কিছু কিছু আঁচ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। সেগুলো যেমন লোভনীয়, তেমনি বিপজ্জনক।

পৃথিবী ছাড়ার সময় থেকেই শুরু করা যাক। বিস্ফোরণ হল। রকেট তীব্রবেগে ওপর দিকে চলল। সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদেরও নানা যন্ত্রণাকর অনুভূতি সৃষ্টি হতে লাগল। রকেট যদি বরাবর একই গতিতে চলত, তাহলে আমরা মোটামুটি বহাল তবিয়তেই থাকতে পারতাম। এরোপ্লেন না উঠে-নেমে সমান জোরে চললে আমরা খুব অসুবিধে বোধ করি না। কিন্তু রকেটের ভ্রমণ মোটেই তেমন হবার সম্ভাবনা নেই। মাধ্যাকর্ষণের সুতো ছিঁড়তে হলে তাকে সেকেণ্ডে সাত মাইলের বেশি জোরে ছুটতেই হবে। অথচ যাত্রা শুরুর আগে গতিবেগ ছিল শূন্য। এই যে বৃদ্ধি এটা ঘটতে হলে ত্বরণ (acceleration) আসবেই, যা সইতে আমরা অভ্যস্ত নই। দেখা গেছে গতির ঈষৎ পরিবর্তনও মানুষকে দুর্বল করে ফেলে।

রকেটের খোলসের মধ্যে বসে বসে আমরা যখন ত্বরণের ধাক্কা সামলাচ্ছি, তখন ধীরে ধীরে অনুভব করব আমাদের ভারবেগ ভীষণ বাড়ছে। অবশ্য এমনিতেই নানান ভারি ধাতুতে তৈরী এক জমকালো পোশাক আমাদের পরতে হয়েছে যার নাম স্পেশ স্যুট। স্পেশ স্যুট না পরলে মহাশূন্যে যেসব মারণরশ্মির বিনা বাধায় চলাচল হয়, তাতে মুহূর্তেই আমাদের ইহলীলা সাঙ্গ হতে বাধ্য। পৃথিবীর মাটিতে দিব্যি সুতোর তৈরী জামাকাপড় পরে (এবং কিছু না পরেও) আমরা নিরাপদে থাকতে পারি, কারণ পৃথিবীর চারদিকের হাওয়ার উড়ুনি সব বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে। মহাশূন্যে তা নেই। তাই স্পেশ স্যুটের আবরণ অপরিহার্য। তবে স্পেশ স্যুট হল বোঝার ওপর শাকের আঁটি, কারণ ওটা না থাকলেও এমনিতেই নিজের হাত পাগুলো নাড়াচাড়া করাও কষ্টকর মনে হত। এখানেই দুর্গতির শেষ নয়। এমন হতে পারে যে এসময় খানিকক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তিও আমরা হারিয়ে বসতে পারি।

মাধ্যাকর্ষণের টানকে অগ্রাহ্য করে চলেছি বলেই এই ভারবোধের জন্ম। মাধ্যাকর্ষণের সীমানা যেই পেরোলাম অমনি ঘটল ঠিক উল্টো ব্যাপার। ভারবোধটা হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সব কাগজের মত হাল্কা। হাত-পাগুলো যেন কাঠি, দেহের সঙ্গে লেগে আছে বলেও মনে হচ্ছে না। আরও নানা গোলমেলে ব্যাপার ঘটতে থাকবে। রকেট বিজ্ঞানের অন্যতম জন্মদাতা ৎসিওলকভস্কি সেগুলো অনুভব করে প্রকাশ করেছেন এইভাবে।

...রকেটের ওপর মাধ্যাকর্ষণের টান নেই। ...যেসব বস্তু আলগা ছিল, তারা ইচ্ছেমত স্থান পরিবর্তন করে শূন্যে ঝুলছে।... আমরা যে শুধু রকেটের মেজেতেই দাঁড়িয়ে থাকছি তা নয়—মেজে, ছাদ বা দেয়াল যে কোন কিছুর ওপর যে কোনভাবে দাঁড়িয়ে বা ঝুলে থাকতে পারছি...আবার কোন কিছুকে স্পর্শ না করেও ভেসে থাকতে পারছি ইচ্ছেমত।

...কলসী থেকে জল ঢাললে পড়ছে না... ঘড়ির পেণ্ডুলাম আর দুলছে না...হাতের মুঠো আলগা করে কিছু ফেলে দিলে সেটা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকছে।

সব মনে হচ্ছে অর্কাটন...যেন কোমলতম পালকের বিছানায় শুয়ে আছি।...রক্ত মাথায় গিয়ে জমা হচ্ছে। যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিও ভীষণ অসুবিধে বোধ করবে এ অবস্থায়।

সব কিছু শান্ত এবং স্তব্ধ...জানলার বাইরে দেখা যাবে দুটো আকাশ—একটা ওপরে, আরেকটা নিচে...যেন আমরা একটা ফাঁপা বলের ঠিক মাঝখানটাতে রয়েছি। ওপরের আকাশটা গাঢ় কালো, সেখানে রয়েছে সূর্য। নিচেরটা হরিদ্রাভ—তার ওপর উজ্জ্বল এবং অন্ধকার বিন্দুর

পৃথিবীর আড়াই লক্ষ মাইল দূরের চন্দ্রের সুভাকার রূপ

স্পেস-স্যুট পরিহিত মহাশূন্যের যাত্রী

সমারোহ। ওটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী, যা এইমাত্র আমরা ছেড়ে এলাম। পৃথিবী গোলাকার...কিন্তু এখন তার পিঠটা উঁচু দেখাচ্ছে না...উল্টে একটা ঢালু বাটির মতই দেখাচ্ছে। এমনি নানা বিচিত্র অবস্থা পার হয়ে হয়ে আমরা চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় গিয়ে পৌঁছোলাম। চন্দ্রের কলেবর মা বসুন্ধরার মত অত পৃথুল নয়। তাই তার স্নেহের টানও কম। তবে যত কমই হোক, আমাদের রকেটকে সে টান থেকে রক্ষা না করলে আমরা তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব। এটা এড়ানোর দুটো পথ খোলা। একঃ—চাঁদের খানিকটা দূরে থাকতেই রকেটকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে সে মারমুখী হয়ে ছুটে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে চাঁদের সঙ্গে আনুভূমিক (horizontal) হতে পারে। তাতে সে চাঁদের এক উপ-উপগ্রহে পরিণত হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট গতিতে আবর্তিত হয়ে চলবে। দ্বিতীয় পথটা আরও মজার। সেটা হল রকেটের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে চাঁদের টানের এক বিপরীত-মুখী গতি সৃষ্টি করা। তার জন্যে চাঁদের দিকে মুখ করে রকেটে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। এই বিস্ফোরণ রকেটের ওপর চাঁদ-বিমুখী একটা চাপ দেবে; তাতে চাঁদের টান অনেক কম কার্যকরী হবে।

যাহোক, মনে করা যাক কোনক্রমে চাঁদের মাটিতে নামা হল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সম্বন্ধে আমাদের এতকাল যে মোহ ছিল, তা গেল কেটে। দূরে থেকে তাকে যত নয়নাভিরাম মনে হত, এখন দেখা গেল সে ঠিক ততটা কুৎসিত। সারাটা গা ঝাঁঝরা। কোথাও গর্ত, কোথাও মালভূমি, আর সবটাই মরুভূমি। তাছাড়া ধুলোর আবরণ তো রয়েছেই।

ভবিষ্যতের পারমাণবিক শক্তিচালিত স্পেস-শিপ
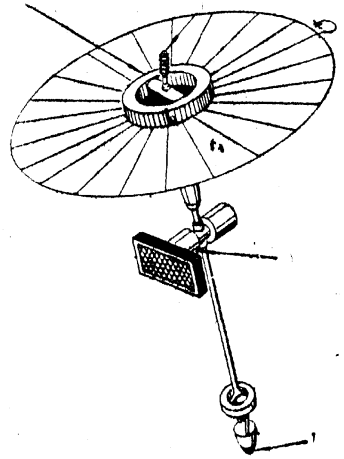
মহাশূন্যের বিভিন্ন দিক থেকে এখানে উল্কারা নেমে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে এবং অবাধে। আর অতীতে এখানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লেগেই ছিল। তাতে ওপরের পাথরে শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। সুতরাং ধুলোর অভাব কি!

পৃথিবী থেকে চাঁদের গায়ে যে ছায়াগুলো দেখে চীনদেশের লোকেরা বলত, ওখানে খরগোস লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, সে ছায়াগুলো যে আসলে উঁচু উঁচু সব পাহাড়ের, তা পৃথিবীতে থাকতেই জানা ছিল। কিন্তু সেগুলো যে কত উঁচু তা বোঝা গেল চাঁদে আসার পর। এদের কাছে পৃথিবীর অনেক পর্বতই পাহাড়, আর অনেক পাহাড়ই টিলা হয়ে যাবে।

চাঁদের গায়ে রয়েছে বিশাল খাদের ছড়াছড়ি। আগেকার দিনে এগুলোকে সমুদ্র বলে ভাবা হত। বিজ্ঞানীরাও তা বলতেন। বড় বড় কয়েকটার নাম দেওয়া হয়েছিল—ঝড়বৃষ্টির সমুদ্র (দি সি অব শাওয়ার্স), প্রশান্তির সমুদ্র (দি সি অব সিরিনিটি), স্তব্ধতার সমুদ্র (দি সি অব ট্র্যাঙ্কুইলিটি) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো যে নির্জলা সমুদ্র সে খবর পেতেও বিজ্ঞানীদের দেরী হয়নি। জল হল এক ধরনের তরল আয়না। তাতে আমরা প্রতিবিম্ব দেখি। কিন্তু চাঁদের সমুদ্রে আজ অবধি কেউ সূর্যের মুখ দেখতে পায়নি।

জল কেন নেই, সে রহস্যও জলের মতই সহজ হয়ে গেছে। এটা ভালো করে বোঝার জন্য পৃথিবীকে টেনে আনা যেতে পারে। পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি হল কি করে? সৃষ্টির আদিম অবস্থায়, সৌর-

কন্যারা যখন শৈশব—তরলতা কাটিয়ে কঠিন হতে লাগল, তখন তাদের দেহের বায়বীয় উপাদানগুলো (যেগুলো কঠিন হবার নয়) ছাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু বেরিয়ে বেশি দূরে যেতে পারেনি। মাধ্যাকর্ষণের টানে তার দেহের চারপাশেই ঘুরঘুর করতে বাধ্য হল। আর তখন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একত্র মিলে মিশে জলের অণু তৈরী করল। তা ক্রমে ক্রমে মেঘ এবং মেঘ জমে জল হয়ে পৃথিবীকে সরস করল। চাঁদেরও সেই লগ্ন এসেছিল। কিন্তু সে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি। পারেনি কারণ, শক্তির অভাব। শারীরিকভাবে পৃথিবীর অনেক ছোট বলে তার মাধ্যাকর্ষণের টান ভূ-মাধ্যাকর্ষণের মাত্র দু' ভাগের এক ভাগ। সুতরাং তার বায়বীয় উপাদানগুলো ছাড়া পেয়েই মহাশূন্যে লাফ দিয়েছে। ঠিক এ জন্যেই বায়ুমণ্ডল থেকেও চাঁদ হয়েছে বঞ্চিত।

সুতরাং চাঁদে যখন আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি, তখন গুরুত্বহীন হয়ে মহানন্দে লাফালাফি করতে পারলেও বুকভরে নিশ্বাস টানতে পারছি না। নাকে নল আর পিঠে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার চাপিয়ে আমাদের জবুথবু হয়ে থাকতে হচ্ছে।

এছাড়া প্রাণভরে কথা কয়ে বাঁচবারও কি উপায় আছে? এমনিতে যতই চিৎকার করি না কেন, এক হাত দূরে দাঁড়ানো মানুষও তার বিন্দুবিসর্গ শুনতে পাবে না। এরও কারণ হাওয়ার অনুপস্থিতি। হাওয়ার সমুদ্রে ঢেউ উঠলে, তার কাঁপন কানের পর্দায় আঘাত করে শব্দ শুনিয়ে দেয়। পৃথিবীতে হাওয়া আছে, তাই পৃথিবী মুখর। চাঁদে তা নেই, তাই সে মূক। কিন্তু মানুষ তো মূক হয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং চাঁদে থাকাকালে আমাদের সঙ্গে রেডিও সেট বয়ে বেড়ানো ছাড়া গত্যান্তর নেই। একমাত্র বেতারের মাধ্যমেই পৃথিবী বা সঙ্গের বন্ধুদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করতে পারব।

চাঁদে সবুজের ছিটেফোঁটাও দেখতে পাব না। জল ছাড়া গাছপালা এবং সরলতম শ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্বও অকল্পনীয়। তবে চাঁদে গেলে একটা বড় লাভ হবে। পৃথিবীর এবং চাঁদ—উভয়ের চক্রাবর্তনের যোগাযোগে পড়ে তার একটা দিক সব সময়েই আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে।

"To us dewellers on the Earth, the moon shows always the same face. It moves like a child who holds both our hands and dances round us in a circle. The child is actually revolving, but in such a way that his laughing face is looking up at us".
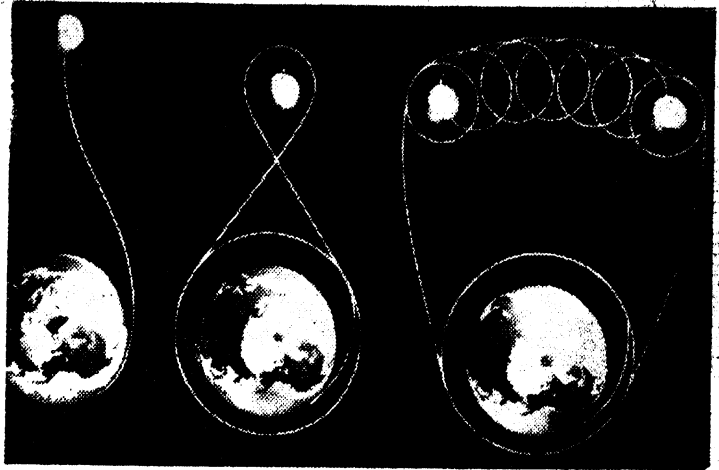
ওপরের ছবি তিনটি পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত স্পেস্-শিপের ভ্রমণের তিনটি সম্ভাব্য পথ দেখাচ্ছে। প্রথম ছবিতে চাঁদের মাটিতে গিয়ে স্পেস্-শিপের যাত্রা শেষ হচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিতে দেখানো হয়েছে স্পেস্-শিপ চাঁদের চারদিকে এক-পাক দিয়ে কেমন করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। তৃতীয় ছবিতে স্পেস্-শিপ চাঁদের চারদিকে বেশ কয়েকটি পাক দিয়ে আসতে পারছে (বৃহত্তর গোলকটি পৃথিবীর এবং ক্ষুদ্র তর গোলকটি চন্দ্রের প্রতীক)

চাঁদের সেই মুখ ফিরিয়ে থাকা অংশটা চন্দ্রলোকের যাত্রীদের ফাঁকি দিতে পারবে না।

বায়ুমণ্ডলের অভাবে চাঁদকে বিস্ময়কর উত্তাপের ওঠানামার কষ্ট ভোগ করতে হয়। সেখানে দিন এবং রাত্রি পৃথিবীর দিনরাত্রির চোদ্দ গুণ বড়। দিনের বেলা তাপমাত্রা ওঠে শূন্যের ২৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ওপরে, আর রাত্রিবেলা নামে শূন্যের ২৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট নিচে। পৃথিবীর অধিবাসীরা উত্তাপের এই তারতম্য সইতে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং চাঁদে কয়েকদিন বাস করতে হলেও আমাদের থাকতে হবে বিশেষভাবে তৈরী তাপনিরোধক আধারের আশ্রয়ে, যার মধ্যে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করা যাবে। এছাড়া শিলার নিচে গর্ত করে থাকলেও প্রচণ্ড শীত বা গরমের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হবে বলে মনে হয়। কারণ চাঁদের মাটির এক ইঞ্চি ওপরে যখন ফুটন্ত জলের উত্তাপ, তখন ঠিক এক ইঞ্চি নিচেই তাপমাত্রা হিমাঙ্করও বহু ডিগ্রি তলায়। চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে নীল আকাশ দেখা যাবে না। সেখানে দিন রাত্রির সব সময়েই আকাশ থমথমে কালো। সেই কালো আকাশের পর্দায় পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেরা রক্তগোলাপের মত ফুটে থাকবে। চাঁদে রাত্রির আবির্ভাব মৃদুমন্দ গতিতে নয়। মনে হবে দিকচক্রবাল যেন অকস্মাৎ ছোট হতে হতে চারদিক থেকে আমাদের গ্রাস করতে আসছে।

চন্দ্র থেকে ফিরে আসা খুব কষ্টকর হবে না। পৃথিবী ছাড়তে রকেটের যতটা শক্তি প্রয়োজন, চাঁদ ছেড়ে আসতে তার অনেক কম হলেই চলবে।

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ শিল্পী কল্যাণ বসুর চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। 'উত্তরাংগ শিল্পকেন্দ্র' উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সংগে কল্যাণ বসুর ছাত্রী এগারো বছরের ইন্দ্রাণী সেনেরও কিছু ছবি প্রদর্শন করা হয়। শ্রী বসু গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট-এর প্রাক্তন

রিফ্লেক্টিং ম্যান —কল্যাণ বসু

ছাত্র। তবে বর্তমানে এঁর চিত্রকলায় কলেজী শিক্ষার কোন ছাপ নেই। ইনি অনুরঞ্জন, বিকৃতিকরণ, বর্ণিকাভঙ্গ, ডাই-মেনশন প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ করে চলেছেন স্বতন্ত্রভাবে গতানুগতিকতা বর্জন করে, সুতরাং এঁর ছবির মেজাজ 'আধুনিক'। রচনাগুলি বাস্তব ছাড়া কল্পনা না হলেও আপন প্রবৃত্তি এবং রসবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে শিল্পী যে রূপে সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবতার গণ্ডি পেরিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শিল্পী এটা বেশ অনুভব করেন যে, জড়-জগতের লোকপ্রসিদ্ধ সব আকৃতির হুবহু অনুকরণ রসোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টির কাজে আসে না। কি ভাবে দেখলে উপাদানগুলি শৃংখলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনে, প্রকৃতি থেকে কতটা গ্রহণ বা বর্জন করলে এবং কোন খানে কি রং ব্যবহার করলে যে রসের অবতারণা হতে পারে সে বিষয় শিল্পী বেশ সচেতন।

ইনি মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তেল, জল এবং প্যাস্টেল। সবসুদ্ধ ছবি পেশ করেছিলেন ৫০টি। প্রত্যেক মাধ্যমেই প্রায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'দি পিপ্‌ল', 'রিফ্লেক্‌টিং ম্যান', 'দি মুন', 'নাইট টাউনগর', 'ফ্যাক্টরী অ্যাট দুর্গাপুরে', 'স্ট্রাগল ফর একজিসট্যান্স' এবং বৃদ্ধার প্রতিকৃতিটি। কোনও কোনও রচনায় বর্ণ উগ্র, আবার কোনও কোনও রচনায় স্তিমিত। বিষয়বস্তু এবং ভাব অনুযায়ী বর্ণের এই পরিবর্তন। কৃষ্ণবর্ণের স্থূল রেখার [illegible]-পরিবেষ্টনে রচিত ছবিগুলি ব্যক্তিগত ভাবে আমি সমর্থন করতে পারি নি। লাইনের সাহায্যে আমরা আকৃতিকে বাঁধতে পারি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া যেখানে প্রধান সেখানে রেখার পার্ট গৌণ। রেখা প্রধান হয়ে দেখা দিলেই ছবির তাৎপর্য সীমার দ্বারা পরিমিত হয়ে পড়ে। এঁর এই রেখাপ্রধান রচনাগুলি কিছুটা কমার্শিয়াল আর্ট ধর্মী 'স্টান্ট' বলে মনে হয়েছে। উপাদানগুলির আকৃতির বিকৃতি-করণও রুচিসম্মত বলে মনে হয় না। যাই হোক অন্য সব রচনায় শিল্পী যে

হারভেস্ট গার্ল —কল্যাণ বসু

প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। কি কি গুণ থাকলে রচনা একটি পূর্ণাংগ ছবির পর্যায়ে উঠতে পারে সেবিষয়ে শিল্পীর জ্ঞান পাকা।

ইন্দ্রাণী সেনের ছবি ছিল ২৭টি। আট বছর বয়স থেকে আঁকা আরম্ভ করে কলা-কৌশলে ক্রমশ কি ভাবে এ উন্নতি করে চলেছে তার পরিচয় এ প্রদর্শনী থেকে বেশ পাওয়া যায়। বৈলক্ষণ্য থাকলেও রচনাগুলি সরল মনের ভাবাবেগে বিশিষ্ট এবং আনন্দ-দায়ক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ইন দি জু' এবং 'থ্রী গার্লস্ বাই দি ওয়েল'।

শ্রীবসুর অধ্যনিষ্ঠা অনস্বীকার্য। পরিণত শিল্পী বলে এঁকে এখনও ঘোষণা করা যায় না বটে, তবে এঁর সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। ভবিষ্যতে অসাধারণ কিছু করে ফেলা এঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

ইন্দ্রাণী সেনের আঁকা একটি ছবি

আলোচনা

মাতৃভাষা ও জীবিকা

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের 'মাতৃভাষা ও জীবিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটির (দেশ, ২৬ ভাদ্র ১৩৬৬) জন্য ধন্যবাদ। বাংলা ভাষা-চর্চার মূল ত্রুটিগুলো তিনি নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ছাত্র হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের রীতি এবং মান সম্পর্কে দু' একটি কথা বলতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্রসংখ্যা, গড়পড়তা পাশের হার এবং সার্বিক মেধা থেকে যে কেউ অনুধাবন করতে পারবেন যে, বাংলা পড়ানোর মান কত নীচু। বিশেষভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, স্নাতক শ্রেণীতে যে সাম্মানিক বাংলা পড়ানো হয় তা যে-কোনো ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান পাওয়াও অসম্ভব নয়। কেন এমনটা হচ্ছে? কেউ কি বলবেন যে, বাংলা সাহিত্যটা খুব সহজ এবং যে কেউ তা আয়ত্ত করতে পারে? শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যাবে যে, বাংলা সাহিত্যকে সহজ বলা শ্রোতার পক্ষে উচ্চহাস্যের কারণ হতে পারে না। সুতরাং তা নয়। তবে এত অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বাংলা নিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন কি করে? উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও কেন তাদের বাংলা অলংকার, ছন্দ এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকছে এবং তা সত্ত্বেও কেন স্নাতকোত্তর শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে গিয়ে তাঁরা মোটেই ক্লেশ বোধ করছেন না? এর উত্তর দিতে পারেন তাঁরাই যাঁরা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এত অবৈজ্ঞানিক পাঠ্য-তালিকা খুব কম চোখে পড়ে। ফলস্বরূপ যাঁরা চাকরি করেন তাঁরা মানপত্রের আশায় যাঁরা বহুমুখী বা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তাঁরা বেতন বৃদ্ধির আশায়, যাঁদের অন্য কিছু করবার নেই, তাঁরা সময় কাটানোর আশায় বাংলায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছেন। ভর্তি হওয়ারও ধরাবাঁধা কড়াকড়ি কোনো আইন নেই। অথচ উত্তীর্ণের হারও কমছে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণের হার রীতিমত বিস্ময়কর। বিশেষ সম্মান (special honours) পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে।

পাঠ্যতালিকার সংশোধন ছাড়া এর বোধহয় কোনো সমাধান নেই। খুব কম নম্বরের জন্য বেশী বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হলে সবগুলো বই আয়ত্ত করা বৃথা-পরিশ্রম বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। ফলস্বরূপ অনেকেই সাহায্যকারী (Reference এবং Note) বইগুলোর উপর নির্ভর করতে ভালবাসেন এবং তার ফলও খারাপ হয় না, যদিও বইগুলো প্রায় অপঠিতই থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, ব্যাকরণ, অলংকার ও ছন্দ সম্বন্ধে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে কিছুই পড়ানো হয় না, আর সাম্মানিক বাংলায় স্নাতক শ্রেণীতে যা পড়ানো হয় তা প্রায় না পড়ানোরই সামিল। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু পড়ানো হয় তাও যথেষ্ট বলে মনে করবার কোনো হেতু নেই। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেই ভাষাতত্ত্বের জন্য আছে মোট ৫০ নম্বর। তৃতীয়ত, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যে পালি ও প্রাকৃত পড়ানো হয় তার সত্যিকারের প্রয়োজন কতটুকু তা অনেক ছাত্রছাত্রীই জানেন না বা ও নিয়ে মাথা ঘামান না। সত্যি কথা যে, বাংলা ভাষাকে জানতে গেলে পালি ও প্রাকৃত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ও দুটি ভাষার বর্ণ-পরিচয় শুরু হয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেই এবং তারও পাঠ্যবিষয়ের জন্য (দুটি বিষয় একসঙ্গে) পঞ্চাশ নম্বরের বেশী দেওয়া হয় না এবং পাঠ্য-তালিকা খুব সংক্ষিপ্ত নয়। অথচ ও দুটিকে ঐচ্ছিক বিষয় অনায়াসে করা যেতে পারে এবং উৎসুক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তখন ও দুটি বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনো করা সম্ভব হতে পারে। স্নাতকোত্তর শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ছাত্রের মুখেই শুনেছি যে, পালি ও প্রাকৃত তার কিছুই মনে নেই, কিন্তু তার জন্যে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তার কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না। চতুর্থত, সম্ভবত স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে একমাত্র বাংলায় ঐচ্ছিক বিষয়ের পত্র মাত্র একটি নিতে হয়। ঐচ্ছিক বিষয়ের পত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা যে-কোনো ছাত্রছাত্রীই অনুভব করবেন। সাতটি আবশ্যিক পত্র প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রতিযোগিতার কথা অনেকে ভাবতেই ভয় পান। নিজের ইচ্ছামতো বিষয় নির্বাচন করতে পারলে প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চমত, নতুন একটি বিষয়কে (তুলনামূলক সাহিত্য) ঐচ্ছিক পত্র হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে, অথচ পড়াচ্ছেন মাত্র একজন অধ্যাপক। ফলত, এই পত্রটি অচিরেই জনপ্রিয়তা হারাবে বলে মনে হচ্ছে, কারণ, দু' বছরে ওর পাঠ্যতালিকা শেষ করা একজন অধ্যাপকের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বশেষে একথা বলে রাখা ভাল যে, বাংলা পাঠ্যতালিকার ত্রুটির জন্যেই অনায়াসে ফাঁকি দিয়ে পাশ করে যাওয়া সহজসাধ্য হয়েছে। এবং এর ফলে ভাল ছাত্রেরা প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে পিছু হটছেন এবং অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্র শুধুমাত্র মুখস্থ করার জোরে ভাল ফল করছেন। সত্যিকার পড়াশুনো বা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান বাংলায় স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর শ্রেণী পার হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করছে না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে এই বিষয়গুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

রণেন্দু মুখোপাধ্যায়, ষষ্ঠ বর্ষ (বহির্গামী)
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দিলীপকুমার রায়

সাতাশ

অতুলপ্রসাদের সুরশৈলী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া হবে পণ্ডশ্রম, কেননা যা কেবল কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে তার বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা করবে কে? তবে তাঁর গানের তানের সম্বন্ধে কিছু না বললেই নয়। সংক্ষেপেই বলব—শুধু এইজন্যেই নয় যে তাঁর গানের কাব্যরস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার নানা ভাষণে যথেষ্ট বলেছি, এজন্যেও বটে যে, স্মৃতিচারণের প্রধান উপজীব্য গবেষণা নয়—ছবি আঁকা। তাই বলি দু' কথায়—যা পারি।

তাঁর গানের একটি প্রধান গুণ—সবারই মন টানেঃ তাঁর সরল প্রকাশভঙ্গিঃ এত সরল যে, শুনতে না শুনতে সে-ভাবের মাধুর্য বুকের তারে বেজে ওঠে—যাকে ইংরাজীতে বলা চলে direct appeal. এ-সরলতায় তিনি চেষ্টা ক'রে পৌঁছন নি—পৌঁছেছেন না ভেবে চিন্তে—যা তাঁর প্রাণে বেজে উঠেছে তাকে ঠিক সেইভাবেই পরিবেষণ করেছেন উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাস অলঙ্কারকে পাশ কাটিয়ে। তাঁর গান শুনতে শুনতে মনে হয়, দৈনন্দিন ঘরকন্নার মধ্য দিয়ে যেন একটি সরল উচ্ছ্বাসী কবি-হৃদয় নিজের মনের কথা বলে চলেছে—আনন্দ বেদনা আশা নিরাশার পসরা নিয়ে। এই দৈনন্দিন সরলতা তাঁর কাব্য গানগুলিকে উঠেছে একটি মৃদু কোমল লিরিক রসে রসিয়ে। লিরিক-এর বাংলা প্রতিশব্দ গীতিকাব্য। কিন্তু গানেরও নানা রূপ। অতুলপ্রসাদের গান চেয়েছে একান্ত ক'রে গানের ঘরোয়া রূপ, যার ভাব সরল, ছন্দ সরল, ভাষা সরল ভূষণ সরল। তাঁর গানে নেই কল্লোল, ওজস্, ধ্বনিসমারোহ, গঠন-চাতুরী। কিন্তু কোনো কবিরই কাব্যে কী নেই তা দিয়ে তার বিচার চলে না—কী আছে তাই দিয়েই তাকে কষতে হবে, নৈলে সে হবে অবিচার। এসব কথা বলছি তাঁর গানকে ছোট করতে নয়, কারণ তাঁর গান গান হয়ে উঠেছে ব'লেই বড় হয়ে উঠেছে, তাকে ছোট ক'রে কার সাধ্য? ভাষা প্রকাশ-শক্তিতে পরম হয়ে ফুটে উঠল সাহিত্যে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কাব্যে, কাব্যের চরম অভিব্যক্তি গানে। তাই অতুলপ্রসাদের গান গান হয়ে উঠেছে বলবামাত্র তাকে সেরা শিরোপাই দেওয়া হচ্ছে—আরো এইজন্যে যে, সে-গানে আমরা পাই হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ বেদনা যার গতি নির্বাধ, তার ভাব সরল, রস মধুর, স্পর্শ স্নিগ্ধ। তাই তো তাঁর শ্রেষ্ঠ গানের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কবির আপনভোলা আত্মপ্রকাশ—দার্শনিকের বুদ্ধিবৈভব নয়; প্রার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা—তত্ত্বজ্ঞানীর আপ্ত-বাক্য নয়। যথা (পুরো গানগুলির জন্যে অতুলপ্রসাদের "গীতিগুঞ্জ" দ্রষ্টব্য):

যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হোলো রে
উছল রে ভোলা,
তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে
দিয়ে চল-রে ভোলা!
যে আসে মনের সুখে
যে আসে ক্ষুণ্ণ মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে—তোর থাক না
চোখে জল রে ভোলা!
জীবনের হাটে আসি'
বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক না সেথা বেচাকেনার দারুণ
কোলাহল রে ভোলা!...

কখনো তিনি শোনেন ডাক—কিন্তু ছুঁয়েও ধরতে পারেন নাঃ

কে যেন আমারে বারে বারে চায়।
আমি তো চিনি নি তারে, সে চেনে আমায়।
যবে থাকি ঘুমঘোরে
কে দোরে আঘাত করে,
"কে তুমি"?—ব'লে ডাকিলে কে যেন
পালায়।...

কখনো দুঃখের মাঝে পেয়েছেন ভরসা,
তাই হয়েছেন অভয়ঃ
বিধি, আর তো তোমারে নাহি ডরি
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।
হানো যদি খর বাণ,
আমারো তো আছে গান,

আমি সম্মুখে রহিব তারে ধরি
যারে ব্যথা দিবে তুমি
তাহার নয়ন চুমি'
সব যতনে বেদনা তার হরি'।...
কখনো শুধু মধুর নিবেদনেই আত্মা
কৃতার্থঃ

বঁধু, ধরো ধরো মালা পরো গলে,
ফিরে দিয়ো না বনকুসুম ব'লে।
কাঁটার ঘায়ে, রাঙা হাতে,
ফুল তুলেছি আঁধারে দুঃখ রাতে,
আহে গেঁথেছি বিজনে
আঁখিজলে।...

কখনো শুধু স্মরণ ক'রে ব্যথার বিলাসেই পরম তৃপ্তিঃ

তাহারে ভুলিব বলো কেমনে?
গাঁথা যে সে তব শত গানে যতনে।
কি হবে রুধিয়া দোর
ভাঙা যে হৃদয় তোর,
মানিবে না মনচোর বাহিরের বারণে।...

এই ধরনের কত উদাস করুণ গানেই যে তিনি সুরের আলোয় আনন্দ-বেদনার অপরূপ রস পরিবেষণ করেছেন—কিন্তু শুধু গানের পদাবলি উধৃত করে কী করে ফোটাব সে মাধুর্য—যা বহুকাল আগে ফোটাতাম আমার তরুণ মনের রঙিন আবেগে?

তাই গানে তাঁর আর একটি দানের কথা উল্লেখ করেই আমি অতুলপ্রসাদের গীতি-মূল্যায়ন-পর্বের সমাপ্তি টানব ঃ বলব তাঁর ভক্তির কথা।

ভক্তি বলতে আমি শুধু ভক্তিসূত্রের সংজ্ঞা দিচ্ছি না যে "পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অনুরাগ তো বটেই, কিন্তু জীবনে এ-অনুরাগ সব আগে প্রকাশ পায় কিসে? না, পূজায়। অবশ্য মানবিক প্রেমের উচ্চতম বিকাশেও পূজার ভাব থাকবেই থাকবে, কিন্তু তাতে ঐ সাথে আরো অনেক মিশালও থাকে। ভগবদ্‌ভক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশে—কি না অহৈতুকী প্রীতিতে—পূজাই হয়ে ওঠে তার পরম ও চরম লক্ষ্য। ভারতের ভক্তিসাধকদের শ্রেষ্ঠ গানে এ-কথার পরিচয় মিলবে ছত্রে ছত্রে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গান সব দেশেই বিরল তাই খুব কম সাধন-সংগীতেই ভক্তির সৌরভ মেলে নিবিড় রসে জড়িয়ে। আমাদের আগেকার যুগে (generation) ভক্তির গানে ফুলের মতন ফুটে উঠেছিলেন চারজন কবিঃ দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ। এঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সর্বকনিষ্ঠ তথা অত্যাধুনিকই বলব। তাই তাঁর গানের হিন্দুসুলভ ধারণা ভক্তির মধুর উচ্ছ্বসতা জাগায়—আরো এইজন্যে যে, তিনি গড়ে উঠেছিলেন ইঙ্গবঙ্গ ব্রাহ্মদের আধুনিক আবহাওয়ায়। আমাকে এখানে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে বলে একটু টীকা করি। ব্রাহ্মদের মধ্যে ভক্তি নেই একথা কেহই বলবেন না, আমার "বাল্যস্মৃতিতে" আমি খাঁটি ভক্তিমান্ ব্রাহ্মদের প্রণাম জানিয়েছি, এখনো তাঁদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভক্তি থাকলেও যে কবিত্ব ছিল না একথার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলবে ব্রহ্মসংগীতের পাতা উল্টালেই। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বাদ দিলে দেখা যাবে, প্রায় সাড়ে পনের আনা ব্রহ্মসংগীতেই ভক্তি ফুটতে পারেনি গদ্যের গুরুগম্ভীর শাসানিতে। দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য হবে, তাই কেবল একটিমাত্র পরিচায়ক (typical) ব্রহ্মসংগীতের চারটিমাত্র চরণ উধৃত করি যেটি ছেলেবেলা আমি গাইতাম সোৎসাহে ঃ

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব
প্রেমভক্তিভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি' শুভমতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান্, মাগি।

শুনতে না শুনতে মন ভরিয়ে বলে ওঠে নাকি : "বাবা গো।"

হয়েছিল কি, সে-সময়ে এ-শ্রেণীর গানের রচয়িতারা প্রাণে ভক্তি অনুভব করলেও তাকে গানে প্রকাশ করবার কৌশলটি জানতেন না যার নাম আর্ট বা হৃদয়ের রসায়নসিদ্ধি। অতুলপ্রসাদ এ-গণ্ডির তথ্য সাহেবী ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে প্রথমদিকে এ নীরস শ্মশ্রুল ভারিক্কিয়ানার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি, তাই লিখেছিলেন এমন নিছক গদ্যাত্মক গান :

"ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কহিব
দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম।
মৃত্তিকা বলে মোরে : "ওরে মূঢ় নর,
হৃদয়-আঘাতে তব এত কেন ডর?
দীর্ণ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর,
শস্য সুফল তত ততই শ্যাম
মনোরম!"...

কিংবা কুলীন ব্রহ্মসঙ্গীতের ধনুর্ধর টংকারে :

বিঘ্নহরণ সুখবিধায়ক নায়ক একচ্ছত্র
ত্রিভুবেশ্বর :
ধরণীধর জগপতি গুরু, মহেশ
ঋদ্ধি সিদ্ধি বিধাতা, গুণীন্দ্র মহান্,
বিপদকল্লুষ হর কৃপানিধি বিধি
অসীম চির-অবিনাশ
দুখীজন-পিতা পাতা বন্ধু দীনেশ।"

গীতিগুচ্ছে এ-গানটি ছাপা না হলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, স্বভাব-গীতিকার অতুলপ্রসাদ এর রচয়িতা।

কিন্তু ঠিক এইজন্যেই তাঁর হৃদয়ের জয়ধ্বনি করা যায় আরো আশ্বস্ত হয়ে কেননা, এই হৃদয়ের প্রেমের টানেই তিনি এ জাতীয় গুরুগম্ভীর ব্রাহ্ম স্কুলমাস্টারির হুমকি ছেড়ে চলতে শিখেছিলেন হিন্দুদের প্রাণোচ্ছলতার পথে। নৈলে তাঁর হৃদয়ে কখনই নামত না ভগবৎ-করুণার ধারা ভক্তির ঢলে—তিনি প্রেমের ঠাকুরের পায়ে এমন ক'রে মাথা কুটতে পারতেন না :

শকতি নাই তোমায় ধরি,
হার মেনেছি হে শ্রীহরি,
দিয়ে খুলি' চোখের ঠুলি
দেখা দাও হে দুঃখহর!.

অতুলপ্রসাদ স্বভাবে বড় অমায়িক ছিলেন, কাউকেই সহজে "না" বলতে পারতেন না। তাই দশচক্রে প'ড়ে তিনি অনেক সময়েই চলেছেন, পরধর্মকে স্বধর্ম ভাবতে চেষ্টা ক'রে। পারেন নি—আর অমনি ফিরে এসেছেন গুটি গুটি নিজের এলাকায়—কি না গানে। লিবারেলদের পাল্লায় প'ড়ে নিষ্ফল ভাষা দিয়েছেন ফাঁপা রাজনীতির অপলকা রঙ্গমঞ্চে—কিন্তু তার পরেই টের পেয়েছেন যে, এ তাঁর কাজ নয়—স্বদেশসঙ্গীত লেখাও তাই তাঁর ব্যর্থ হয়েছে, কেননা দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্তের মত দেশভক্তি তাঁর স্বভাব-

সিদ্ধ ছিল না। ভক্তির দিকেই ছিল তাঁর হৃদয়ের সহজ তথা প্রবল টান। বলেছি, মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন সরল, উদার, একরোখা—তর্ক, বিতণ্ডা, সংশয়, বিচার—এসবের তিনি ধার ধারতেন না। তাই যখনই জীবনে গভীর দুঃখ পেয়েছেন, শরণ চেয়েছেন দুঃখহারীর কাছে। গেয়ে উঠেছেনঃ "আমারো তো আছে গান"! তাঁর মুখে একটি গান আমার কী যে ভালো লাগত!—গানটি দেশ রাগে বাঁধা, কিন্তু তাঁর স্বকীয় সুকুমার ঢঙে। এ-গানটির ছন্দ সুরে শুনলে তবেই এর ত্রিমাত্রিক কদমের রস পুরোপুরি মিলবে। গানটি এইঃ

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি,
কেমনে বলো তাঁরে ডাকি,
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি?
কুসুম ল'য়ে গন্ধ চরণ
নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ
এ কণ্টকবনে কী করি চয়ন,
কোন্ ফুলে বলো সে-পদ ঢাকি?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে—
যখন গাবে না পাখি,
কণ্টক দিব চরণে—যবে
কুসুম মুদিবে আঁখি।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভালো—
কেন তুমি মোরে করিলে কাঙাল
বলো হে হরি! আর কতকাল
সুদিনের লাগি' রহিব জাগি'?
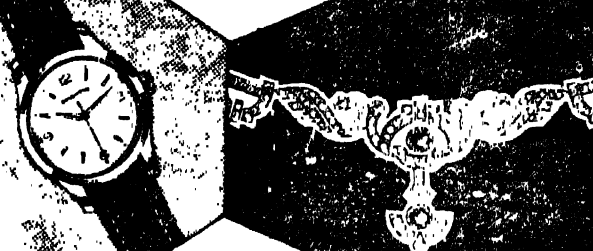
এহেন ভক্তি যাঁর হৃদয়ে এমন সহজে ফুটে উঠেছে তাঁর সর্বোচ্চ উপাধি—"ভাগ্যবান্"। কারণ ভক্তের চেয়ে ভাগ্যবান্ কে এ-সংসারে? অতুলদা ছিলেন স্বভাবে কবি ও স্বধর্মে ভক্ত তাই দুঃখ পেয়েও এমন সহজ স্বীকারে হিন্দু সাধকের সরল বিশ্বাসের অমল উচ্ছ্বাসে বলতে পেরেছিলেনঃ

তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে?
শাসন তোমার যতই গুরু,
ততই টেনে লও বুকে।...
ভবের পথে শূন্য থলি,
বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালি
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব
দীনবন্ধুকে।

কিংবা
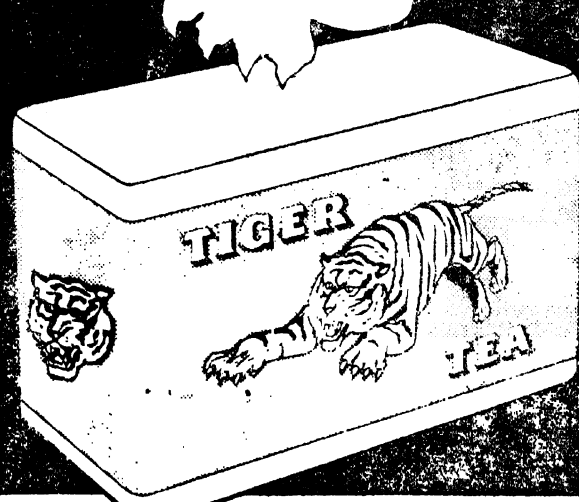
নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখলি
না রে মন?
সুখী জনের করিস সেবা দুখীর
অযতন। (মূঢ় মন!)
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কী নিবি
তার চরণধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে
চন্দন। (মূঢ় মন!)

কিংবা

সবারে বাসরে ভালো
(নইলে) মনের কালো ঘুচবে না রে!
আছে তোর যাহা ভালো ফুলের মতন
দে সবারে
যারে তুই ভাবিস ফণী, তারো মাথায়
আছে মণি,
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি, ভবের বনে
ভয় বা কারে?

এরকম মর্মস্পর্শী বহু গান তিনি বেঁধেছিলেন ভক্তির আবেগে। তাই তো তাঁকে আমি এত কাছে পেয়েছিলাম প্রাণের সহজ টানে। কারণ সংসারে যত গান আজ পর্যন্ত বাঁধা হয়েছে তাদের মধ্যে যুগে যুগে হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর সুর বেজে উঠেছে ভক্তির গানে—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। তাই তো কৃষ্ণপ্রেম একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিল:
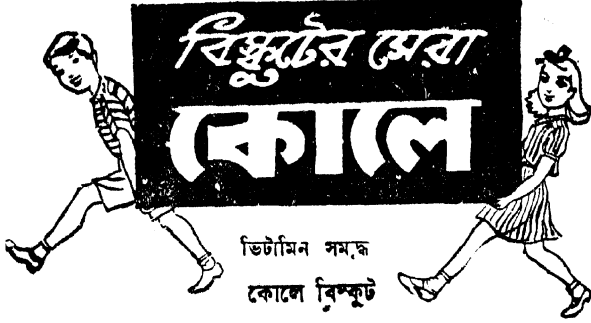
"After all India is India!"

সত্যি কথা, তাই হাজার হাজার বাণীর ঘনঘোর তর্জন গর্জনের মাঝেও আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সুরকার, শ্রেষ্ঠ বাউল, শ্রেষ্ঠ কীর্তনী চিরদিনই কান পেতে এসেছেন ঠাকুরের সেই ঘরছাড়া বাঁশির সুরে—যার জন্যে উদাস হয়ে বিলাত-ফেরত ব্রাহ্মকবি অতুলপ্রসাদও গেয়েছিলেন সরল হিন্দুর উচ্ছল আবেগে:

যদি যতই মারি দূরে তুমি ততই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশির সুরে ডব ডরে শুধু
ধাওয়াও?

কিন্তু এবার স্মৃতিচারণে ফিরে আসার সময় এল। কবি অতুলপ্রসাদের গান ও সুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে, এবার কিছু বলি মানুষ অতুলদা সম্বন্ধে।

তিনি ছিলেন সেই জাতের মানুষ যারা বুদ্ধিকে মেনেও মানতে পারে না—হৃদয় এসে বাদ সাধে ব'লে। এইজন্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক হয়েও ব্রাহ্মদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন না। চলতি কেতা কানুন মেনে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। একথা বলছি না তিনি ভুল ভ্রান্তি করেন নি কখনো—যার জন্যে লোকে তাঁর 'পরে গভীর অবিচার করেছিল। আমাকে তিনি তাঁর জীবনের অনেক কথাই বলেছিলেন। কেন কখন কীভাবে তিনি ভ্রমে পড়েন। কিন্তু জগতে ভুল ভ্রান্তি হয়নি কার? অথচ তবু, এমনিই বিচিত্র মানবচরিত্র যে, গড়পড়তা মানুষ অপরকে বিচার করার সময়ে অতি সহজেই ভুলে যায় যে, সে নিজে কিছু অপাপবিদ্ধ অবতার নয়। অতুলদা ছিলেন স্পর্শকাতর মানুষ, তাই পাঁচজন যখন তাঁর ভুল ভ্রান্তির জন্যে তাঁকে কঠোরভাবে বিচার করত তখন তিনি নিজেকে পাপী নিয়ে সঁপে দিতেন তাঁর ঠাকুরের চরণে, গেয়ে:

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি তো আমার রহিবে
বহিবারে যদি না পারি এ-ভার,
তুমি তো বন্ধু বহিবে॥
দুখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার,
জানি তুমি মোরে করিবে অমল,
যতই অনলে দহিবে॥

তিনি মিথ্যা বলেন নি, কারণ দুঃখ পেয়ে তিনি সত্যিই আরো মহৎ, আরো উদার-ধর্মী হয়ে উঠেছিলেন—যেজন্যে তাঁর অনুরাগী জুটেছিল অজস্র—শুধু বাঙালির মধ্যেই নয়—সর্বপ্রদেশের সর্ববিধ মানুষের মধ্যেই। না জুটবে কেন? দানে মুক্তহস্ত, স্বভাবে সরল, ভাবাবেগে একরোখা, স্পর্শকাতর, সুরকার, বন্ধুবৎসল, বিদগ্ধ, সুরসিক...গুণ কি ছিল তাঁর একটা? আমি প্রায়ই তাঁকে ডাকতাম "গুণধাম" ব'লে।

শেষে তার রসিকতার কিছু পরিচয় দিয়ে এ-তর্পণের মধুরেণ সমাপয়েৎ করি।

পিতৃদেবের অট্টহাস্যের কথা বলেছি। অতুলদার হাসিও ছিল সেই জাতের। আমাদের এক রসিক আত্মীয় ছিলেন, তাঁকে আমরা ডাকতাম মণিমামা ব'লে। গল্প বলায় অমন রসিক মানুষ আমরা আর দেখি নি। বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাই। সেবার শিমুলতলায় আমরা অতুলদাকে নিয়ে খুব গান-বাজনার আসর বসিয়েছি আমার বোন মায়ার বাড়িতে। আমার ভগিনীপতি শংকরও ছিল রসিক, বলল: "ডাক দাও মণিমামাকে।" ট্রেনভাড়া পাঠিয়ে তাঁকে টেনে আনা হ'ল ভাগলপুর থেকে। তাঁর রসিকতার দু-একটা নমুনা দেই—যা শুনে অতুলদা হাসতে হাসতে সত্যিই গড়িয়ে পড়তেন—মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠত। তারপরই বলতেন—"উঃ, এত হাসা আমার ভালো নয় দিলীপ—রক্তের চাপ বেশি কি না।"

কিন্তু মণিমামার রসনা একবার সঞ্চালিত হ'লে আমরা সবাই নিরুপায়—না হেসে পারবে কে? মনে আছে পরে, একদিন ট্রেনে প্রশান্তর (মহলানবিশ) মতন রাশভারি মানুষেরও হেসে গড়িয়ে পড়া তাঁর গাল-গল্পে। পিতৃদেবেরও ঐ অবস্থা হ'ত সুরধামে। কিন্তু ভূমিকা রেখে গল্পে নামি।

মণিমামা অতিভোজনবিলাসী ছিলেন, আর সবচেয়ে ভালবাসতেন নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস। যেদিন তিনি এলেন, শংকর তিনটি রামপক্ষী ফরমাস করল। মণিমামা বললেন, "এ কী? শংকর! এ যে দারুণ গুরু-পাক—ক্যারি!" কিন্তু না না করতে করতে তিনি খেয়ে ফেললেন অত্যধিক। পরদিন সকালে গানের আসরে বসতেই অতুলদা হেসে বললেন—"কী মণিবাবু! মুখ মেঘলা যে?"

মণিমামাঃ আর কেন অতুলবাবু! অ-কবির দুঃখ কবি কী বুঝবে? জঠর জ্বালাচ্ছে। হ্যাঁ—সকাল থেকে তিনবার—বুঝলেন না? কিন্তু আমার অসহায় অবস্থাটি একবার সমক্ষে দেখুন অতুলবাবু! আমি করি কী? আমার পেট হিন্দু, জিভ মুসলমান—অষ্টপ্রহর আমার দেহে দাঙ্গা বেধেই আছে......(করুণ হেসে) কিন্তু আমার পেটের কী পিটিফুল প্লাইট বলুন তো? ওরে অর্বাচীন! তোর কি এটুকু বুঝবার মতোও ব্রেন নেই যে তোকে আমি সুবিধে পেলেই এত সরেস মাল দিই তোরই ভালোর জন্যে? তবু তুই-ই হলি কি না আমার সবচেয়ে বড় শত্তুর!

অথ অতুলদার অট্টহাস্য কল্পনীয়।

মণিমামা চমৎকার হার্মোনিয়ম বাজাতেন। গাইতেনও ভালো। সুরেনমামার কাছে শেখা গান। একদিন অতুলদা তাঁকে বললেনঃ "গান তো সুরেনবাবুর সেই মালকোষটি—আহা! সেই 'বন ঘন মুরলিয়া বাজি বাজি রে' কী গানই গান আপনার দাদা! লক্ষ্ণৌয়ের সেরা ওস্তাদরাও হার মানে তাঁর তানের কাছে।"

মণিমামা সহজে সুরেনমামার গান গাইতে চাইতেন না। কিন্তু অতুলদার উপরোধে গাইতে হ'ল। গাইলেন, কিন্তু জমল না।

অতুলদাঃ কিন্তু গান তো আজ তেমন ভালো হ'ল না মণিবাবু?

মণিমামাঃ ভালো হবে কোত্থেকে অতুলবাবু? ভালো গান গাওয়া কি সোজা?

অথ অতুলদার পুনরট্টহাসি।

এবার অতুলদার রসবোধের প্রসঙ্গ রেখে তাঁর রসিকতার দু' একটি নমুনা দিই।

অতুলদা বললেনঃ "তবে আমার গল্পও শুনুন মণিবাবু—যদিও আপনাকে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব—তবু। (একটু থেমে হাসি চেপে) মনে করতেও হাসি পায় মণিবাবু! সেবার আমার ওখানে এক গার্ডেন পার্টি দিয়েছি। এসেছেন গভর্নর সাহেব স্বয়ং। সেখানে ছিলেন এক বিখ্যাত তালুকদার। লক্ষ্ণৌয়ের তালুকদার, বুঝতেই পারেন। গভর্নর সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'শুনলাম এবার নাকি এ-অঞ্চলে প্লেগের বাড়াবাড়ি হয়েছে?' তালুকদার সসম্ভ্রমে বললেনঃ 'উঃ সে আর কী বলব স্যার? এমন প্লেগ আর কখনো হয়নি এ-অঞ্চলে—যারা এর আগে কখনো মরেনি তারাও এবছর পটল তুলছে (people who never died before are dying this year, sir!) হা হা হা।

মণিমামা : আমাদের এক বিহারী রাজাও অমনি বলেছিলেন এক গোরা সাহেবকে : you look fine sir, bloody! হো হো হো।

অতুলদা : আমাদের তালুকদাররাও বলতে পারেন এমন ইংরিজী। একদিন আমাদের কাউন্সিলে এক উপরওয়ালা সাহেব বললেন, গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্যে গভর্নমেণ্ট দু' তিন লাখ টাকা দিতে পারবেন না। তাতে এক রগচটা তালুকদার গর্জে উঠলেন : The Government can't sanction money? আরে! Whose money? Your father's money? উঃ—কী বলব দিলীপ—ঠিক যে টোনে ওরা উর্দু বলে সেই টোনেই বলে ইংরাজী : আরে! কিসকা রুপেয়া? তেরা বাপকা রুপেয়া?......হা হা হা!

অতুলদা প্রায়ই গল্প করতেন বিখ্যাত বিপ্লবী ব্যারিস্টার পি মিত্রের। বললেন : "লণ্ডনে তখন আমরা এক ঘরে থাকি। একদিন আমরা শুনে এলাম এক মেমের গান All the way to Mandalay! পি মিত্তির ঘরে ফিরেই ভাবাবেশে ধরলেন : All the way to Mandalay—স্বরলিপিতে রে রে রে রে রে রে—সা সা সা সা সা সা। তারপরই ধরলেন এক বাঙলা গান দাশরথি রায়ের : ছিল বারি কক্ষে ক্রমে এল বক্ষে—ঠিক ঐ এক সুর রে রে রে রে রে রে—সা সা সা সা সা সা।

কিন্তু এ-রসিকতাটি সুরে না শুনলে তেমন মজা পাওয়া যাবে না। অতুলদার রসিকতার নমুনা আর দেব না, কেননা, তাঁর বলবার ভঙ্গিটার স্বরলিপি করতে না পারলে শুধু বক্তব্যের পেশ করা নিষ্ফল। তাই শুধু তাঁর আর একটি কাহিনী ব'লেই ইতি করব।

অতুলদা একদিন আমাকে ও ধূর্জটিকে বললেন : "তোমাদের কাছে বলেছি "ডাকাতে" ক্লাবের কথা। একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমি ছিলাম সে-ক্লাবের সর্বকনিষ্ঠ মেম্বর। একদিন গানের আসর দারুন জমেছে। আমি শেষে গাইলাম, যে-গানটি সেদিন তোমাকে শেখালাম"—ব'লেই ধ'রে দিলেন :

"আমার মনের ভগন দুয়ারে
সহসা তুমি কেগো, তুমি কে?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত তনু
উজ্জ্বল নিজ আলোতে
তুমি কে গো, তুমি কে?
একি প্রেমপ্রতিম অঙ্গ! এ কি
যৌবন-রূপ-রঙ্গ!
এ কি মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল ভঙ্গ!
এ কি সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত
তোমার নয়ন পলকে—
তুমি কে গো, তুমি কে?"......

ব'লে থেমে : "তারপর কী হ'ল জানো? রবিবাবু খুশী হয়ে মাথা নাড়লেন, দ্বিজুবাবু হেসে বললেন : জিতা রহো। আমার মন একেবারে আহ্লাদে আটখানা! বুঝতেই পারছ আমি তখন সবে গান বাঁধা শুরু করেছি—সেখানে গেয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে—ভয় হবে না? শ্রোতা কে? স্বয়ং রবিবাবু, তোমার বাবা, লোকেন পালিত, সুরেশ সমাজপতি—সব দিকপাল তো। আমার তখন সবে গোঁফ উঠেছে—আমি অল্পবয়সেই ব্যারিস্টারি শুরু করি তো। আচ্ছা।

"এ হেন আমি—বুঝলে না?—উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলাম সকলের প্রশংসা ও হাততালি পেয়ে। মনে হ'ল গানটি উতরেছে বটে। এমন সময় ঘরের ওদিকে বারান্দায় ব'সে ছিলেন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়—ডাকলেন আমাকে হাতছানি দিয়ে। আমি দুরুদুরু বক্ষে গেলাম—নিশ্চয় তিনিও বাহবা দেবেন—আমাকে আর পায় কে?

"আমি আসতেই তিনি আমার ঘাড় ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললেন : কে র‍্যা?'—ও হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ........"

সে প্রাণখোলা হাসি আজো কানে বাজে—মনের সব গুমোট কেটে যেত তার দমকা হাওয়ায়।

শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর রক্তের চাপ খুব বেড়েছে। কিন্তু ঠিক তেমনিই প্রাণখোলা সদানন্দ মানুষ—কথায় কথায় হাসি। একদিন আমি বলেছিলাম : "ডাক্তারে বলেছে আপনার অত জোরে হাসা ভালো নয়—রক্তের চাপ এত বেশি......"

অতুলদা টুপ্ করে জবাব দিয়েছিলেন : "দিলীপ, না হেসে বাঁচার দরকারই বা কী বলো তো? শুনবে, আজকাল আমি কী ভাবি? ভাবি—যেদিন আমাকে খাটে করে শ্মশানে নিয়ে যাবে সেদিনও আমি একটিবার উঠে ফিক্ করে হেসে তবে চিতায় শয্যা নেব—তার আগে না।"

একথা বলবার এক্তিয়ার তাঁর ছিল; জীবনে সকলকে চিরদিন আনন্দই যে দিয়ে এসেছিলেন তিনি—বেদনা রেখেছিলেন নিজের অন্তরে গহনে। তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন একটি ইংরাজী প্রবচন :

Laugh and the world laughs with you
Weep and you weep alone.

হাসিলে তুমি—তোমার সাথে হাসিবে
ভাই সবে,
কাঁদিলে—একা কাঁদিতে হয় হবে।

(ক্রমশ)

৫

কিন্তু কোথায় নীলাকাশ?

দেখতে দেখতে মেঘ করে এল পশ্চিমে। বাসএর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একবার সুকান্ত। চোখজুড়ানো কিন্তু হৃদয়-জ্বালানো কালো। মনে হল যেমনি আছে তেমনি লেগে থাক আকাশে, চিত্রার্পিতের মত। আর যেন না ছড়িয়ে পড়ে। যেন আর না জমাট বাঁধে।

বাস-এ একজন সোয়ারি তার পাশের বন্ধুকে বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখেছিস? এবার ঝরবে।'

ওদিক থেকে আরেকজন টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'তাকাবেন না মশাই। নজর দেবেন না।'

'হ্যাঁ', প্রথমোক্তর বন্ধু বললে, 'নজর দিয়েছেন কি লজ্জায় সরে গেছে নববধূ।'

সুকান্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টির কি কোনো শক্তি আছে, সম্মোহনী কি উচাটনী? সে কি ভস্মলোচন? তার চোখের দৃষ্টিতে মেঘ কি ভস্ম হয়ে যাবে? চলে যাবে দূরান্তরে?

কত মেঘ তো আসে আবার চলে যায়। এও যেমনি এসেছে তেমনি চলে যেতে পারে না? একবেলা দেরি করে ঝরলে কলকাতা কী এমন অশুদ্ধ হবে?

'ঝরুক মশাই ঝরুক। প্রাণ ভরে ঝরুক। হাড়মাস সেদ্ধ হয়ে গেল।'

'ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে বাত ধরে গেল শরীরে।'

'কী ঘাম আর ঘামাচি রে বাবা। মশা-মাছি তো গা-সওয়া। এ যাম আর সুগ্রীব একসঙ্গে। ঘাম আর ঘামাচি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।'

সবাই খুশি। তাই যে যার মনে টিকা-টিপ্পনী কাটছে।

প্রথমোক্ত বললে, 'মাইরি যদি বৃষ্টি নামে তাহলে ফাজটা হবে না। ঠিক বলবে, বৃষ্টির জন্যে দেখছেন না বিক্রিবাটার অবস্থা। মাইরি দেবে না টাকা।'

'বা, তুই তো বৃষ্টির আগেই গিয়ে পড়বি।'

'জানি না পারব কিনা পৌঁছুতে যে রকম তোড়জোড় চালিয়েছে। বৃষ্টির আগে পৌঁছুতে পারলেই বা কি। বলবে, মেঘ দেখেই খদ্দেররা হাঁটা-চলা বন্ধ করে দিয়েছে। মাইরি, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

'তবু নামুক বৃষ্টি। সব ভণ্ডুল হয়ে যাক।'

'তোর কী—'

'কারুরই কিচ্ছু না। আকাশের খেয়াল। বৃষ্টি হলে আমি মাইরি গান ধরব।'

'আমি মশাই ভিজব গা খুলে।'

'খুব তো উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তারপর যখন খানিক ঝরার পর রাস্তাঘাট এক হাঁটু কি এক কোমর হবে, ট্রাম-বাস বন্ধ হবে তখন কী করবেন?' বললে আরেকজন।

'হ্যাঁ, সেকথা কেউ ভেবে দেখে না।' বলে ফেলল সুকান্ত। 'তখন কী?'

'যে মুখে প্রশস্তি করেছি সেই মুখেই গালাগাল দেব।'

'দোষ বৃষ্টির কী মশাই। দোষ করপোরেশানের।'

'করপোরেশান নয় মশাই, পারফোরেশান। টালা থেকে টালি আর ট্যাংরা থেকে থ্যাংরা এফোঁড়-ওফোঁড়।'

'শহরে লহর খেলে।'

'আহাহা, তবু আসুক। মাটি ঠাণ্ডা হোক। ঘাস-পাতা সবুজ হোক।'

'বলুন না ব্যাঙ ডাকুক, সাপ বেরোক, পিঁপড়ের পাখা গজাক, বাদলা-পোকারা ফর ফর করুক।'

'চাষারা আশা করে বসে আছে।'

'তা চাষার মাঠেই ঝরুক না। কে বারণ করছে?' বললে সুকান্ত। 'কলকাতা যেখানে ঝরলেই সমুদ্র, সেখানে এ উৎপাত কেন?'

'বেশ রাত্রে খেয়েদেয়ে ঘুমুব, ঘুম আসবার আগ মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে, থামবে ভোররাত্রে। উঠে দেখব রাস্তাঘাট জলে ডোবা। স্বপ্নের মত লাগবে।'

'আপিস দেরি করে যাব।'

'কিংবা যাবই না। বৃষ্টির অজুহাত দেব। বৃষ্টি কল্যাণকারিণী।'

'আগে বৃষ্টি নেই বৃষ্টি নেই বলে হাহাকার, পরে বেশি বৃষ্টি বেশি বৃষ্টি বলে আর্তনাদ।'

'সব জিনিসেই তাই। আগে কাজী পরে পাজি।'

'তারপরেই বন্যা।' যার যার মনে আসছে বলে যাচ্ছে। 'সব মুখস্ত মশাই। তার পরেই বন্যাত্রাণ। উপশমের ঢেউ। তারপরেই ভোট। বন্যাতে তাই কারু কারু পিঠের পৌষমাস।'

'তেমনি আগুনেও।' বৃষ্টির সম্ভাবনায় সকলেই প্রায় প্রগলভ হয়ে উঠেছে। বললে আরেকজন: 'আগুন লেগে বস্তি ছাই হয়ে গেল। তার পরেই নিয়ে এস খাদ্য-বস্ত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জাম। তার পরেই ভোট।'

'দুষ্ট লোকে বলে ভোট পাবার জন্যে নিজেই নাকি আগুন লাগিয়েছিল। যাতে উপশমে ভুলিয়ে ভোট-কুসুম তুলতে পারে।'

'সব মুখস্ত মশাই সব মুখস্ত। তারই জন্য প্রতি বছরে বন্যা, প্রতি বছরেই ধস।'

কে একজন কবি-কবি ছিল, বলে উঠল, 'নতুনত্বের মধ্যে শুধু এই নীল মেঘ।'

একদল লোক বৃষ্টি চায়, আরেক দল লোক চায় না। বৃষ্টি আর না-বৃষ্টি কোন দিকেই সুকান্ত নেই। তার শুধু এক ইচ্ছে, ছোট্ট এক ইচ্ছে, কাকলির সঙ্গে দেখা হোক। বৃষ্টি হলে ও আসবে কি করে? ফিরবে কি করে? ওর বাড়ি ফিরে যাবার পর বৃষ্টি হোক, যত পারুক ঢালুক আকাশ। তার এক সমুদ্র স্নেহ ঢেলে দিক পৃথিবীর হৃদয়ে। প্রলয় নামুক। কলকাতার ভদ্রতার বেশটা ঝড়ের তাড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক। যত ইচ্ছে তার নিজের কষ্ট হোক, অসুবিধে হোক, অসুখ হোক, শুধু যেন সাক্ষাৎটা নির্বিঘ্ন হয়।

কত সামান্য প্রার্থনা। সুকান্ত তাকাল আকাশের দিকে। নির্বোধ নিশ্ছিদ্র আকাশ। তার শুনতে তো ভারি মাথা-ব্যথা পড়েছে। কিন্তু কত সময় তো মেঘ শুধু জমাটই বেঁধে থাকে, বর্ষায় না। কত ব্যথা পুঞ্জিত হয়ে থাকে, বলা হয় না। কত ভাব সঞ্চিত হয়ে থাকে, লেখা হয় না। যন্ত্রে কত তারের বন্ধনের পরেও আর বাজনা নেই, কান্না নেই।

তার ক্ষুদ্র একটা অভিলাষকে ধুয়ে মুছে দেবার জন্যে নিষ্ঠুর ভাগ্য এক আকাশ অভিযানের আয়োজন করেছে। যে অল্প-বল তারই উপর নিয়তির ভ্রুকুটি।

সেই মেয়ে-বাপের গল্পের কথা মনে পড়ল সুকান্তর। বাপ মুমূর্ষু, সেবামগ্ন মেয়ে রাত-দিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, বাবাকে নিও না, বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই। কত কাঁদছে মেয়ে, কত মাথা-মুড় খুঁড়ছে, বাবাকে বাঁচাও। তবু কিছুতেই কিছু হল না, টলল না ভগবান। বাপ মারা গেল। স্বপ্নে মেয়েকে দর্শন দিল ভগবান। মেয়ে নানা কথা বলে ভগবানকে গঞ্জনা দিতে লাগল, নিষ্ঠুর, একচোখো, খামখেয়ালী। ভগবান বললে, আমি করি কি, আমি কার প্রার্থনা শুনি? তুমি বলছ, বাবাকে বাঁচাও, আর বাবা বলছে আমাকে নাও। আর সইতে পাচ্ছি না এ ভবদাহ। নীচুকুলে জন্মেছি আমাকে উচ্চ-কুলে পুনর্জন্ম দাও। আমি কাকে লাই, কাকে থুই?'

তেমনি কত লোক হয়তো প্রার্থনা করছে, আজ, এই লগ্নে বৃষ্টি হোক। হয়তো কেউ তার মনের মানুষের থেকে বিদায় নিয়ে যাবে, বৃষ্টির জন্যে আটকে গেল, সঙ্গটা দীর্ঘতর মনোহরতর করবার সুযোগ পেল। তার প্রার্থনা শুনল অন্তরীক্ষ। হয়তো কত রুগী কষ্ট পাচ্ছে গরমে, বৃষ্টি তাদের আরাম দেবে, ঘুম দেবে। কত বিচ্ছিন্নকে তাপতৃপ্ত সান্নিধ্য দেবে। কত মনে পাড়িয়ে দেবে জন্মান্তরের সুহৃদের কথা।

বৃষ্টি যারা চায় তাদেরই দল ভারি। আর, সুকান্ত দেখল তাদের প্রার্থনাই ন্যায্য।

বাস থেকে নেমেছে, অমনি ঝড় উঠল। সতর্ক-অসতর্ক সকলকে মুহূর্তে নাজেহাল করবার জন্য এসেছে উড়নচণ্ডী। এসেছে বেহিসেবী। ঝরাপাতা, ধুলো তো বটেই, উড়তে লাগল টুপি, উড়তে লাগল ছাতা,

দোকানের ঝাঁপ, চালের টিন, সাইনবোর্ড। ভাঙতে লাগল গাছের ডাল, তছনছ তছনছ—

বাবা, এত মারণমূর্তি কেন? বৃষ্টি নামাও। শান্ত হও প্রভঞ্জন।

কি আশ্চর্য, কখন সুকান্ত বৃষ্টির জন্যেই প্রার্থনা করে বসেছে। ঝড়ের প্রেক্ষিতে বৃষ্টিই বুঝি কামনীয়। ছুটতে ছুটতে ভিজতে ভিজতে ঢুকে পড়ল সে ছাপাখানায়।

'দিন মশাই, বাকি প্রুফটা দিয়ে দিন।' ম্যানেজারের সামনে টেবিলের উপর প্রুফের তাড়া রেখে মূর্তিমন্ত ঝড়ের মত দাঁড়াল সুকান্ত।

'বসুন।' বললে ম্যানেজার।
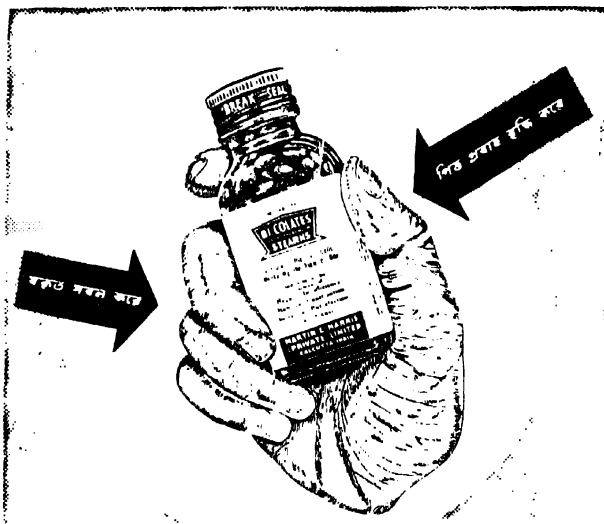
'বসবার সময় নেই। দিন তাড়াতাড়ি।'

কথাবার্তা বলে ম্যানেজার বুঝল, কিসের প্রুফ কী বৃত্তান্ত—

'না বসে উপায় কী। এত বৃষ্টিতে যাবেন কোথায়? বৃষ্টিটা ধরবে তবে তো যাবেন।'

নিরুপায়। চেয়ার টেনে বসল সুকান্ত। বৃষ্টি হচ্ছে, যেন গলানো সিসে ঢেলে দিচ্ছে। হাতঘড়ি নেই, সুকান্ত জিগগেস করলে, 'কটা বেজেছে বলতে পারেন?'

প্রশ্ন নিরর্থক। সামনে দেয়ালেই ঘড়ি। তাকিয়ে দেখল পাঁচটা দশ।

আধ ঘণ্টা বসা যায় বোধ হয়। এখান থেকে স্বাতী সিনেমায় আধ ঘণ্টায় যাওয়া যাবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তার কী অবস্থা হবে কে জানে। সঙ্গে একটা ছাতা নেই যে, মাথা ঢেকে চলে যাবে হাঁটু ডুবিয়ে। এদিকে বাস-ট্রাম কোথায়? থাকলেও হয় মরেছে, নয় নাভিশ্বাস উঠেছে। একটা রিকশা লাগবে, কী বীভৎস ভাড়া চায় তা কে জানে। অত পয়সা কোথায় পাবে? সবচেয়ে অনিশ্চিত, রিকশা পাবে কি না।

'দিন না, দয়া করে বাকি প্রুফটা তুলে দিন না—'

'দিচ্ছি—ওরে—' ডাক ছাড়ল ম্যানেজার। তারপর সুকান্তকে লক্ষ্য করে বললে, 'অত তাড়া কিসের? এই অঝোর বৃষ্টিতে যাবেন কি করে?'

'যেতেই হবে। আমার একটি ছাত্রীর মরণাপন্ন অসুখ।' বলে ফেলল সুকান্ত।

'খুব খারাপ অবস্থা? থাকে কোথায়?'

'এই কাছাকাছি।' বলে ফেলল সুকান্ত।

সমস্ত পাড়া নখদর্পণে, জিগগেস করলে ম্যানেজার, 'কোন্ বাড়ি?'

'নম্বরটম্বর জানি না।'

'কার বাড়ি?'

'তাও না। শুধু এইটুকু জানি মেয়েটির নাম আশা। ডাক-নাম আশা, পোশাকি নাম প্রতীক্ষা। আমার অদর্শনে তার যদি আজ মৃত্যু হয়—'

ত্বরান্বিত হল ম্যানেজার। ভিতরে নিজেই গেল খোঁজ নিতে। ফিরে এসে বললে, আধ ঘণ্টাটাক দেরি হবে। 'তা এক কাজ করুন না। আপনি চলে যান। প্রুফ কাল পাঠিয়ে দেব।'

'না, আমি যে এসেছি তার প্রুফ দেখাতে হবে বাবাকে।'

'তাহলে একটু না বসলে তো চলে না।' অপরাধীর মত মুখ করল ম্যানেজার।

'বসছি। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। এরই মধ্যে ধরে যেতে পারে বৃষ্টি, কি বলেন?'

বৃষ্টি-ধরার নাম নেই। অচ্ছিন্ন ঝরে চলেছে।

ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুলে দিল প্রুফ।

'যাবেন যে, প্রুফ সব ভিজে যাবে।' বললে ম্যানেজার।

'প্রুফ ভিজলে কী হয়? তবু প্রমাণ গরম থাকবে। প্রমাণ ভিজে গেলেই মুশকিল।'

'যাবেন কী করে? একটা রিকশা ডেকে দি।' দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিল ম্যানেজার। বললে, 'বলবে ভীষণ জরুরি। একজন রুগী মরতে চলেছে—'

কোথায় দারোয়ান! কোথায় রিকশা! পৌনে ছ'টা প্রায় হল।

আর কি, নিজেই বসে বসে এখন প্রুফ দেখি। ভাবল সুকান্ত। 'ম'-কে কেটে দন্ত্য 'স' করি। প্রেমকে কেটে প্রেস করি।

এসেছে রিকশা। কিছু দরদস্তুর না করেই উঠে পড়ল সুকান্ত। ঘেরাটোপের মধ্যে বন্ধ হল।

রিকশাওলা জিগগেস করলে, 'কোথায় যাবেন?'

'স্বাতী সিনেমা।'

'দু টাকা লাগবে।'

এ কী জুলুমবাজী! এমনিতে পাঁচ আনা ছ' আনা বড় জোর। আজ মৌকা পেয়েই হামলাদার হয়ে উঠেছে।

'বলুন দু টাকা দেবেন কিনা। নয়তো নেমে যান। কিংবা বলুন আমি গাড়ি ছেড়ে দিই। কী রকম জল!'

ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই। পকেটে কুড়িয়ে-জাড়িয়ে দুটো টাকাই হয়তো আছে। নে, চল, তাই দেব।

ঝপরঝপ ঝপরঝপ চলেছে রিকশা। উপরে সমুদ্র নিচে সমুদ্র, মাঝখানে ডুবু-ডুবু পার্নাস।

কোথায় চলেছে কে জানে। সমস্ত অবাস্তব মনে হচ্ছে সুকান্তর, সমস্ত বিদেশ। যেন শহর-পসার নয়, পাথর-দেয়াল নয়, অনাদ্যন্ত জল। জলের মরু-ভূমি।

গাড়িবারান্দার নিচে কতগুলি লোক দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে, তার মধ্যে থেকে একটা লোক সোজা রিকশার দিকে ধাওয়া করলে।

'আমি দেখেছি রিকশায় শুধু একজন আছেন।' লোকটা বললে আকুল হয়ে, 'আমাকে দয়া করে তুলে নিন মশাই। ভীষণ জরুরি।'

সত্যি হয়তো কেউ মরতে বসেছে।

প্রায় জোর করে রিকশা নামিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল আগন্তুক।

গাঁইগুঁই করে লাভ নেই। সুকান্ত বললে, 'কদ্দুর যাবেন?'

'ঐ বাজার পর্যন্ত। ভয় নেই আপনার ভাড়ার শেয়ার দেব। আপনি কোথায়?'

'স্বাতী সিনেমা।'

'বই দেখতে? কী হচ্ছে ওখানে?' এক

মুহূর্ত চিন্তা করল আগন্তুক। বললে, হ্যাঁ, হাওয়া-দিয়ে-যাই। বইয়ের শেষটা মাইরি—কী প্যাথেটিক। মাঠ দিয়ে নায়িকা মাইলখানেক প্রায় ছুটেছে, মাঠ পেরিয়ে এসে পলকে নায়কের বুকের উপর—ধ্বস—'

রিকশাটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল হোঁচট খেয়ে। সামলেছে।

'কত ভাড়া হয়েছে?'

'দু টাকা।'

'বেশ, এক টাকা আমি দেব। আমাকে বাজারে নামিয়ে দিয়েই আপনি চলে যাবেন স্বাতীতে। ছটায় শো আরম্ভ। তা ছটা এখন বেজে গেছে। তা আজেবাজেতে আধ ঘণ্টা। সাড়ে ছটাতে ঢুকলেই চলবে। কী বৃষ্টি মশাই, কী বৃষ্টি।'

যাক এক টাকা সুরাহা হল। স্বস্তির মুখ দেখল সুকান্ত। পকেটে একটাও টাকা না থাকলে কী রকম! যদি দেখা হয় কাকলির সঙ্গে, যদি আবার একটা রিকশা করতে হয় তাকে নিয়ে।

বাজার আসতেই নেমে গেল আগন্তুক। একটু দাঁড়ান, টাকাটা নিয়ে আসি। গেল আর এল না। গলে গেল। মিলিয়ে গেল।

চলল আবার রিকশাওলা।

নৈরাশ্যের মতই জল চারদিকে। কী হবে স্বাতীতে গিয়ে? এত বৃষ্টিতে যে কাকলি আসেনি, কোন মেয়েই যে আসতে পারে না, আসে না, সে তো জানা কথা। আর ও তো প্রাচীনপন্থীদের মেয়ে। তবে সুকান্ত যাচ্ছে কেন? যাচ্ছে, সে যে কথা রেখেছে শুধু সেই প্রমাণের আনন্দে। সে যে তার কথা রেখেছে এইটুকুই তার তৃপ্তি, এইটুকুই তার প্রাপ্তি। বলতে পারবে চিঠিতে, আমি গিয়েছিলাম কিন্তু তোমার দেখা পাইনি।

স্বাতীতে পৌঁছে দিল রিকশা। কিন্তু কাকলি কই?

শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবু লবিতে অনেক লোক। সব বৃষ্টির ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দারোয়ান হটিয়ে দিতে চাইছে, বলছে, টিকিটওলাদের ঢুকতে দিন, কিন্তু কেউই হটছে না। সকলেরই বৃষ্টির টিকিট।

'এ কী, সুকু যে! এ তোর কী চেহারা! ভিজে একেবারে চোল হয়েছিস যে।'

ওর কলেজের ছাত্র অনিমেষ।

'তুই এ পাড়ায় কেন? এ হাউসে বই দেখতে এসেছিস? রাবিশ বই। যৌন ছাড়া আর সবই এর গৌণ। সেন্সর কি ঘুমোয়, না কি সেন্সই ঐ রকম?'

'ভাই, চার আনা পয়সা দিতে পারিস? সত্যি বাসভাড়া নেই।'

একটা সিকি দিল অনিমেষ।

ভাগ্যিস কাকলি আসেনি। দেখেনি তার এই দৈন্যের চেহারা। এই হাত পাতা।

'যা দৌড়ে কাসনে। যখন 'পুরোপুরি ভিজেছিস তখন আর দাঁড়ানো কিসের জন্যে। সোজা বাড়ি চলে যা। নইলে অসুখ করবে। যেমন চেহারা করেছিস না বাস-এও জায়গা দিলে হয়।'

'না হয় হেঁটেই চলে যাব। কিন্তু জলে জুতোর স্ট্র্যাপটিও ছিঁড়ে গেছে দেখছি।' সুকান্ত নিচু হয়ে তাকাল জুতোর দিকে। বললে ,'খালি পায়েই মেরে দেব ঠিক।'

ভাগ্যিস কার্কাল আসেনি। দেখেনি তার এই কাতরতার মূর্তি।

তবু একবার তাকাল এদিক-ওদিক। ওদিক-এদিক। কোথায় কার্কাল! তার তন্তুলেশও নেই। বৃষ্টির জলে তার মুখ যেন মুছে গেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না সুকান্ত। তবু যদি কেউ দেখবার থাকে, সে দেখুক আমি এসেছি, আমি কথা রেখেছি। সত্যের মত সুখ নেই। সর্বাঙ্গ তো জল নয়, সুকান্তর মনে হল, সত্যের শান্তি।

বাড়ি ফিরে এলে সেণ্টু বলে উঠল, 'এ তুমি কী হয়ে এসেছ কাকা! কোথায় গিয়েছিলে?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' বললে সুকান্ত।

'দেখা পেলে?'

'তারও সেখানে আসবার কথা, কিন্তু জানিস,' মুখে ব্যথা আঁকল সুকান্ত, 'সে এল না।'

'এল না? দেখা হল না তার সঙ্গে?'

'না, না, দেখা হল বৈ কি।'

'সে কি কথা কাকা? এল না অথচ দেখা হল?' অবাক মানল সেণ্টু।

'জানিস সেণ্টু, জীবনে এমন লোকও আছে যে আসে না অথচ তার সঙ্গে দেখা হয়।'

দুদিন পরে খামে চিঠি এল কার্কালর:

'সেদিন স্বাতীতে দেখলাম আপনাকে, কী চেহারা নিয়ে নামলেন রিকশা থেকে! কাছে যেতে সাহস হল না। কে এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আপনি আমাকে দেখেন নি। না দেখে ভালোই করেছেন। দেখতে পেলেই ভিজে কাপড়ে আটকে থাকতেন অনেকক্ষণ। আপনার বন্ধুর কাছে আমিও ধরা পড়তাম। সত্যি কোথাও জায়গা নেই যে, একটু নিরিবিলি দেখা হয়।

খোকা খোকা আরও কদমফুল ফুটেছে। আপনাকে যদি পারতাম দেখাতে।'

বাসাটা চিনে নিতে কতক্ষণ! এক সন্ধ্যায় ঠিক হাজির হল সুকান্ত। এই তো সেই বিস্তীর্ণশয়ান ঠিকানা।

বাইরে সদরে চাকর বসে।

'আচ্ছা, এ বাড়িতে কার্কাল থাকে?'

'কে, এম-এর দিদিমণি? হ্যাঁ, থাকে।'

'কোথায় আছেন এখন?'

একবার আকাশের দিকে তাকাল চাকর। বললে, 'বোধ হয় ছাদে বেড়াচ্ছেন।'

'বাবুরা কোথায়?'

'বড়বাবুর অসুখ, ঘরের মধ্যে শোয়া। মা তাঁর কাছে। দাদাবাবু বেরিয়ে গেছেন।'

'তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়?'

'কেন হবে না? আপনি কেন আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, নিকট আত্মীয়।'

'তবে সোজা উঠে যান উপরে। ছাদেই হয়তো পাবেন। নয়তো বারান্দায়। সারা দিন ঘুরছেন আর পড়ছেন।'

সুকান্ত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। যাই না চলে ভিতরে। কী হবে? যা হবার তাই হবে। তবু একটা কিছু হোক। সেদিনের বৃষ্টির পর নদীর জল কি একটুও বাড়ে নি? ঘাস কি হয় নি একটুও ঘন-শ্যাম? কদম অনেক উঁচুতে, মাটির কাছাকাছি ফোটেনি দোপাটি? লাল মেজেণ্টা সাদা সোনালি!

পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল সুকান্ত।

(ক্রমশ)

ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভুতোদা পট্ পট্ করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

"তিনমাস ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে।" বিমল হন্ত দন্ত হয়ে দৌড়ে এল—

"আহা হা করছেন কি ভুতোদা।"

ভুতোদা : "করব না তো কি ?"

বিনয় : দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে ?

ভুতোদা : তার মানে!

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভুতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে) : হ্যাঁ : যতসব কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিমল : সে কি ভুতোদা ? গাছ যে মানুষেরই মত, সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মানুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি!

ভুতোদা : যা: যা: তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে ?

ভুতাদা : তাই বলেই কি আমায় মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই ! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্য-গুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিশারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে ?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল: এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভুতোদা : কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

DL/P1-X54 BG

সিঁড়ি

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

এই ঘর তার। দু'দিন আগেও এ ঘরেই সে ছিল। ওপরে থেকেও লোক দেখে সে আছে। নিঃশব্দ মনে হলেও তার অস্তিত্ব অনুভব করা যেত। অথচ অনুভব করতে কষ্ট হত না কোন। আজকের মত বিস্ময় লাগত না ভাবতে! সে আছে! কেবলমাত্র এই বোধটুকুই, এই মন্থর অনুভূতিটুকুই কী এক সহজাত সুখে সুলতাকে সজাগ করে রেখেছে এতদিন। দু'দিন আগেও।

দু'দিন আগেও এই ঘরে আসতে হয়েছে সুলতাকে। বার বার। একাদিক্রমে ওঠা-নামা করতে হয়েছে। ওপর থেকে নিচে। নিচে থেকে ওপরে। সিঁড়ি ভাঙার সুখকর ক্লান্তিটুকুকেই আনন্দ আর বিরক্তি দিয়ে স্বীকার করতে হয়েছে কতবার। দূরত্ব ছিল। ওপর-নিচে ব্যবধান ছিল না তবু। টেকেনি। টিকিয়ে রাখেনি তারাই। তাকালে কাছে না এসে পারে! অজুহাতের গোঁজামিলেই কি কোন মিল বাঁচে!

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাত। লেখা থামিয়ে কলমের মাথায় টুপি পরাত। চোখে-চোখে হেসে একটা অকারণ মুদ্রা দোষের মতই সেই অনেক-বলা আর অনেক-শোনা কথাটাই আরো একবার উচ্চারণ করত শিখরেশ, 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। বার-বার। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। দেখা তবু মেটে না যে! আবার ভয় পাই, আমার চোখে-চোখেই তুমি উবে যাবে না তো! তাই দূরে সরিয়ে দিই। পরমুহূর্তেই কাছে টানি। থাকতে পারিনে। একলা হাঁপিয়ে উঠি। আবার তোমাকে পেয়ে বাঁচি। মাঝে মাঝে ভাবি, না, এখনো মরিনি। আমি বেঁচেই আছি এখনো।' বার-বার উঁকি দেয়: 'তুমি কি রাগ কর লতা?' যেন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ না শিখরেশ। মানুষের ছায়া। কথাগুলো ওর। শিখরেশেরই কল্পনা আর স্মৃতি দিয়ে বানানো এবং শীসের হরফে ছাপানো কোন উপন্যাসের নায়কের উক্তি। সাজানো-গোছানো মিষ্টি মিষ্টি কথা। একটি মেয়ের মন ভুলানোর পক্ষে যথেষ্ট ছাড়া কী! আর সুলতা নয়, লতা! অন্তহীন আদরে দেহকে না ছুঁয়েও মনকে পিষ্ট করার কি অভিনব কৌশল!

শান্ত আর অচল। দু'জনেই তখন পৃথিবীতে এসেছে। দু'জনের আগে-পিছে। বয়সের সীমা ভুলেই সবকিছু তোমার নেশায় তখনো মেতে ওঠেনি কেউ। তবু তো ছেলে-মেয়ে। কথাগুলি যদি ওদের কানেই ওঠে। মানে না বুঝেও না জানি কী ভাববে ওরা! ভালবাসার আবেগে ভেজানো শিখরেশের কথাগুলি বড় বেশী মন-মাতানো আর ঝক-ঝকে। কথার উত্তাপে একটু, আগের ক্লান্ত আর বিরক্ত মনটাই এখন মোমের মত গলতে-গলতে আর পারে না। ঘুলিয়ে ওঠা ভেতরটা হঠাৎ থিতিয়ে শান্ত হয়ে যায়। কেমন নিস্তরঙ্গ আর আড়ষ্ট মনে হয় সুলতাকে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে ওরা। শান্ত আর অচল। আরক্ত হয়ে সুলতা বলে, 'আর কেন? ছেলে-মেয়েরা বড় হল এবার। তোমার-আমার বয়স কি তবু বাড়বে না?' কথা শোনা যায় কি যায় না। এত ধীর, এত অস্পষ্ট সুলতা।

শিখরেশ হাসে। মুঠোর ভেতরে সুলতার হাতটা ঘেমে উঠেছিল। ছেড়ে দিয়ে বলে, 'মন যে মানে না!' এক সেকেন্ড থেমে নিঃশ্বাস ছাড়ে। দাঁড়ায়। সুলতার চোখে চোখ রেখে বলে, 'মনটা বুড়িয়ে গেলে বাঁচবে কী নিয়ে?'

—'না, না অমন করে ডেকো না।' একটা ছোট আর অবুঝ মেয়ের মতই মাথা ঝাঁকায় সুলতা। বলে, 'বার-বার সিঁড়ি ভাঙতে আমার কষ্ট হয়।'

'সিঁড়ি নয়, সেতু। আমাদের ভালবাসার সেতুবন্ধ, সুলতা।' কথা যেন বলে না। কথার গায়ে রং মাখায় শিখরেশ। কথায় কথায় জাল বোনে। আর ছোট্ট একটা পোকার মতই ভাবনার পাখায় উড়তে উড়তে, উড়তে-উড়তে কখন সেই জালে জড়িয়ে হারিয়ে যায় সুলতা

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে। কী ভয়ঙ্কর, বিদ্ঘুটে স্বপ্ন! দম আটকে আসছিল। একটা পাহাড়ের চূড়ো থেকে কে যেন ঠেলে ফেললে। বহুদূর শূন্যে থেকে সীমাহীন অতলে ডুবে যাচ্ছে। একটু পরেই অমন সুন্দর শরীর গিয়ে ধুলোর মতই গুঁড়িয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে। নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ পাহাড়। সুলতা একা। কেউ চীৎকার শুনছে না। বাঁচাতে ছুটে আসছে না কেউ। সুলতা মরে যাচ্ছে!

কিন্তু পাহাড়ের নিচে না। কার ডাক শুনে দরজা খুলে বাইরে এল। ঠিক তখনই। এক সঙ্গে আলোগুলি নিবে গেল সব। চারদিক থেকে হৈ-হৈ করে কারা ছুটে এল। অন্ধকার ঘিরে ধরল ওকে। এক পা নড়তে পারছে না। পা দুটো পাথর হয়ে আটকে রইল মেঝেয়। ভয়ে কাঁপতে লাগল কান পাতল। কারা যেন ডাকছে। নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু শিখরেশের গলা শোনা গেল না।

নিচে দাঁড়িয়ে কারা চেঁচিয়ে ডাকছে ভূমিকম্প নাকি এখুনি ভেঙে পড়বে বাড়িটা। সুলতা চোখ মেলে তাকাল। ভয়ে-ভয়ে দেখল চারদিক। অন্ধকারে ভূতের মতই বাড়িটা দুলছে। চারদিকে কিসের শব্দ! ভাঙছে! ভেঙে-ভেঙে পড়ছে সব। সুলতার মনে হল, এক্ষুনি বাড়িটা শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এখানেও নির্জনতা। এখানেও একলা সুলতা। শিখরেশ নেই। একা-একা কী করবে সে! ভূমিকম্পের হাত থেকে কেমন করে বাঁচাবে বাড়িটাকে!

আবার কে ডাকল। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে নাম ধরে কে ডাকল তাকেই। সুলতা ছুটে গেল। কিন্তু নিচে নামা আর হল না। ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে অতল অন্ধকারের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠল। সিঁড়িটা নেই। ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু অন্ধকার। এলো-মেলো অন্ধকারে কে যেন কাতরাচ্ছে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে কে! ভীষণ অসহায় মনে মনে হল নিজেকে। কান্না পেল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুলতা।

ঘুমটা ভেঙে গেল চারদিকে তাকাল। নিজের ঘরেই শুয়ে আছে সে। বালিশে মুখ গুঁজে দম বন্ধ হয়ে আসছিল শুধু।

ওপরে-নিচে এখনো ওরা ঘুমিয়ে। কেবল একলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সুলতা। আরো একটা রাত কাটল। আরো একটা দিনের শুরু হবে এইবার। শোকের বয়স বাড়ল আর একটু। হয়তো এমনি করেই আস্তে আস্তে পুরনো হবে। সময়ের সঙ্গে ছুটতে গিয়ে ক্লান্ত হবে। থেমে যাবে একদিন। চলতে-চলতে হাঁটু মুড়ে এক জায়গায় বসে পড়বে। পাথর হয়ে পড়ে থাকবে কোথাও। নড়তে পারবে না। সাধ্যে কিম্বা শক্তিতে আর কুলোবে না হয়তো। এই বাড়িয়ে-যাওয়া দেহের মত, দেহের আড়ালে অতি গোপন অবসন্ন মনের মত শুধু একটা ঘটনার স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকবে শোকটা। না-বাঁচার মত। না-থাকার মত। কেবল মাঝে-মাঝে মনে পড়বে তাকে। কোন একটি মুহূর্তে কেমন উন্মনা হয়ে যাবে সুলতা। কিন্তু কবে, কতদূরে সেইদিন! সুলতা জানে না। জানে না তাই কষ্ট হচ্ছে। বেজায় ক্লান্ত লাগছে। মনটা এখনো বিষন্ন। ঠিক আগের মতই ভারি। মনকে হালকা করার সাধেই চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে। কেঁদে ভারমুক্ত হতে চেয়েছে সে। তবু পারেনি। এবং না-পারার প্রাণান্তকর কষ্টে সময় যে কী করে কাটে!

অচল নেই। এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। বিকেলের গাড়িতেই হয়তো আসবে।

টেলিগ্রামটা হাতে পেয়ে কী ভাবছে এবং ভেবে আদৌ কেঁদেছে কিনা কে জানে! কান্না কাঁদা উচিত ভেবেছে কিনা! পুরুষের জাত। পায়ে-পায়ে যুক্তি মেনে চলাই যে স্বভাব। আবেগের পাশ কাটিয়ে চলা। শিখরেশ নিজেই কি জীবনে কেঁদেছে? বরং হাসি আর পরিহাসের প্রচ্ছদে ঢাকতে চেয়েছে দুঃখ। আর দুঃখ থাকেনি তখন। সুখের কাঁটা হয়ে বুকে বিঁধেছে। সুতরাং শিখরেশের ছেলে হয়ে অচল কি আর কাঁদবে? বাপের শোকে পাগল হবে কি আর? সমস্ত শিক্ষা আর যুক্তির বালাই ঘুচিয়ে মন কি আর ছেলেমানুষ হতে চাইবে? সুলতা জানে না। এবং এই না-জানার অসহায়তাই ওকে কাবু করে ফেলছে।

অথচ এই দুদিনে কতবার কত চেষ্টাই না করেছে! ইচ্ছে হয়েছে, কাঁদে। কেঁদে হালকা হয়। কি করুণ, কি অসহায়, কি সাধহীন সাধ সুলতার! কি দুর্বল বাসনা!

তবে কি কাঁদার একচেটিয়া অধিকার শুধু ওদের! চোখের জলের পুঁজি কেবল ওদেরই! শত কান্না কেঁদে-ও চোখের জল ওদের ফুরোয় না! চোখে-চোখে ভরা-কোটালের বান। অথচ সুলতার চোখ শুকনো ভটা। কী যে অবাধ্য চোখ! চোখের জল! কাঁদতে না পারার আপসোসে কাঁদতে ইচ্ছে করে সুলতার। এক ফোঁটা লোক-দেখানো নোনা জল-ও কি ফেলতে নেই চোখের! তাহলে এত আয়োজনের জীবনে একটা মানুষের মরণ কেমন মূল্যহীন হয়ে যায়। সংসারে অসংখ্য ঘটনার কাছে শিখরেশের মৃত্যু-ও কি তবে অতি সাধারণ, তুচ্ছ আর অর্থহীন ঘটনামাত্র? অথবা কোন ঘটনাই নয়?

এ বাড়িতে আর সবাই কেঁদেছে। সাদা চোখের অফুরন্ত জল ফেলে জীবনযাপনের আর পাঁচটা নিয়মের আর কর্তব্যের মতই একটা সহজ আর স্বাভাবিক অনিয়মকে অন্তত একদিনের জন্য-ও মেনে নিয়েছে। কেঁদে কর্তব্যের দায় মেটাতে চেয়েছে যে-যার! ঋন শোধের!

বার বছরের পরে যে-শান্তা ইহজীবনে আর কখনো কাঁদবে না ভেবেছিল, হাস-পাতাল থেকে ফিরে এসে সকলের আগে কেঁদে জিততে চেয়েছে ও-ই। টেবিলে মাথা কুটে কপালের ঠিক মাঝখানে টীপ-পরার বদলে একটা আস্ত আব বানিয়েছে এরই মধ্যে। কান্নার পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ছাপ ওর সর্বাঙ্গে। কেঁদে-কেঁদে চোখ দুটো করমচা। বাপ কিনা ওকেই ভালবাসত সবচেয়ে বেশী! মেয়েটা জন্মাবার পরেই যত উন্নতি। একটা মেয়ে বিয়োনোর সঙ্গে সংসারের ক্রমোন্নতির যোগাযোগটা সুলতার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা না দিলেও ব্যাপারটা

আর সবাই জলের মত বুঝে যায়, মেয়েটা ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে! শান্তা সত্যি-সত্যি পয়া! ওর পৃথিবীতে আসাটাই একটা আশ্চর্য রকমের দৈবিক ঘটনা! যত অস্বাভাবিকই হোক, স্বচ্ছল জীবনের দিকে তাকিয়ে অমন যুক্তিবাদী শিখরেশও মনে-মনে কথাটা না মেনে শান্তি পায় না। শান্তার নাকি তাই এত আদর! আহা, আঘাতটা না জানি কী ভাবেই ওকে বেজেছে! কত গভীর ওর দুঃখ!

কিন্তু বিচারক নিরপেক্ষ হলে প্রথম পুরস্কার কমলারই প্রাপ্য। আপন জন না হয়েও কেঁদে প্রথম হয়েছে ও-ই। কাল রাত্রে ঘুম না-আসা পর্যন্ত নাকে সর্দি টানার মত অস্পষ্ট আওয়াজ করে কেঁদেছে। হায়-হায়! বাড়ির ঝি বলে কি ওর মন নেই! এত বছর এক নাগাড়ে কাজ করেও বাড়ির মানুষগুলির ওপরে বুঝি মায়া পড়ে না! কমলা তাই কাঁদে। সুর করে গান গাওয়ার মতই কান্নাটাকে বজায় রাখে গলায়। নইলে এতবড় একটা অঘটনের মান বুঝি আর থাকে না!

দেখে আদিখ্যেতা মনে হয়েছিল! শুনে হাড় পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল সুলতার।

এ কি যার-তার মরা! যদু-মধুর মত একটা সাধারণ আর অখ্যাত জীবনের যেমন-তেমন সমাপ্তি! শুধু মুখে-মুখে নয়, ছাপার অক্ষরে খ্যাতিমান শিখরেশ। ক-অক্ষর গোমাংস কমলায়। ওর গলায় কান্নাটা তাই বেমানান মনে হয়। বেতাপ্পা লাগে। ইচ্ছে হয়েছিল, এক ধমকে চুপ করিয়ে দেয়। ফর্সা গালের ওপরে একটা চড় কষিয়ে দিলে আর হয়তো রা কাড়বে না। কিন্তু শক্তিতে কুলোয়নি। পুরোপুরি উৎসাহ বোধ করেনি সুলতা। নিজেকে নিয়েই কেমন ক্লান্ত আর ব্যস্ত থাকতে হয়েছে সারাক্ষণ। সংসারের অনেক কিছু ভুলেই নিজেকে নিয়ে ভাবতে হয়েছে। তারপর বিস্ময়ে কাটাতে হয়েছে।

লোকটা যে কোনদিনই মরবে কে জানত! অন্তত ভুল করেও কথাটা কেউ ভাবত কি? সুলতার মনে পড়ে না। এখনো বিশ্বাস করতে বাধে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, লোকটা আর নেই। বেঁচে নেই সংসারে। অথচ বেঁচে থাকতে সুলতাকে ছাড়া সময় কাটেনি তার। একলা বাড়িতে ছেলেমানুষের মতই অসহায় মনে হত শিখরেশকে। হাসি পেত সুলতার। ছেলে-মেয়ে-ঝি-চাকরের সামনে লজ্জা। খুশী না হয়ে থাকা যেত না। বিজয়িনী মনে হত নিজেকে। [illegible] গৌরবে আর অহংকারে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হত। বাইরের মানুষের কাছে অবশ্য আকাশছোঁয়া নামটা শুধু তার কাছেই দেহ-মন বিকিয়ে বসে আছে। তার মত অতি সাধারণ একটা মেয়ের কাছে। আর, পুরুষেরা কি অসহায়! পৃথিবীর সব পুরুষই কি এমনি? একটি মেয়ের কাছে ধরা দিয়ে এমনি করেই নিজেকে [illegible] আর উজাড় করে [illegible] পেতে চায়? [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] একই সঙ্গে [illegible] আর তৃপ্তি [illegible] [illegible] করেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আর এই [illegible] [illegible] সেই পুরনো কথাগুলিই ভাবল সুলতা। ভেবে কান্না পেল না। মনে হল না, লোকটা নেই। বরং ভাবনাটা এক সুখের সূক্ষ্ম যন্ত্রণার মত, একটা ছোট্ট আর কালো পিঁপড়ের মত মস্তিষ্কের ভেতরে কুরে-কুরে খেতে লাগল। এতক্ষণে মাথা-ধরাটা টের পেল সুলতা।

অচল আসবে বিকেলে। হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসবে। হয়তো চোখ মুছতে-মুছতেই মায়ের কাছে এসে দাঁড়াবে। সুলতা কি তখনো কাঁদবে? বিশ্বাস করবে, শিখরেশ নেই? বুকের মধ্যে কেঁপে উঠবে একবার? বোবা আর কঠিন যন্ত্রণাটা তখনো কি চোখের জলে গলবে না? ভাবা যায় না, কী হবে তখন। নিজেকে বোঝা যায় না আর। যেন নিজের ওপরে কোন হাত নেই সুলতার। কোন কর্তৃত্ব। এখন নিজেকেই বড় অচেনা আর অবিশ্বাসী মনে হয়।

দুঃখ না। লজ্জায় মাথা তোলা দায়। শান্তা কাঁদে। কেঁদেই ও এখন ক্লান্ত। ক্লান্তির ফাঁকে জিরিয়ে নিতেই মুখ তুলে তাকায়। মায়ের নিরশ্রু চোখের দিকে চেয়ে থমকে যায়। ভয়ে-ভয়ে কত কথাই না ভাবে!

চুপি-চুপি কমলাই কথাটা শোনায়। আঘাতটা বড্ড বেজেছে। কেঁদে হালকা না হলে বাঁচবে না। সুলতা-ও মরবে! দু'দিন আগে আর পরে! মরবেই! শান্তা তাই বাপকে ভুলে মায়ের কথাই ভাবে। ভেবে কূল-কিনারা পায় না। সুলতাকে কাঁদাবার পথ খুঁজে পায় না। বয়স তো কম হল না! নাবালিকা আর নেই শান্তা। বুদ্ধি তার চেয়ে-ও প্রখর। মায়ের এমন আকস্মিক স্তব্ধতা আর বাবার আচমকা মরে যাওয়ার কার্যকারণ খুঁজতে খুঁজতেই তাদের দৈহিক আর মানসিক সম্পর্কের জটিলতায় কখন কী করে জড়িয়ে গিয়ে কলেজের আশ্বিন

গোটানো, ব্যায়ামে তৈরী মজবুত চেহারার ছেলেটিকে মনে পড়ে বায়, শান্তা টের পায় না।

মেয়ের চোখে চোখ রাখতে ভয় পায় সুলতা। লজ্জা-ও। শান্তাকে বড্ড বেশী সেয়ানা মনে হয়।

কমলা কাছে আসে। গলায় সহানুভূতি মাখিয়ে বলে, 'ভেবে আর কী হবে মা? সবাই তো মরবে! লোহার টোপর মাথায় পরে কেউ পৃথিবীতে আসিনি আমরা।' লাগসই কথা শোনাতে পেরেই কমলা খুশি। সুলতার মনে তার কথার প্রতিক্রিয়া-টুকু বোঝার ইচ্ছে-ও আর হয় না। একটা মানুষ মরে গিয়ে এত বড় সংসারের সব কাজ এলোমেলো করে দেয়, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কমলা দেখে, দুদিনে কোন কাজই সে করেনি। আগোছালো হয়ে পড়ে আছে সব। অথচ মাসের হিসেব ঠিকই চলবে।
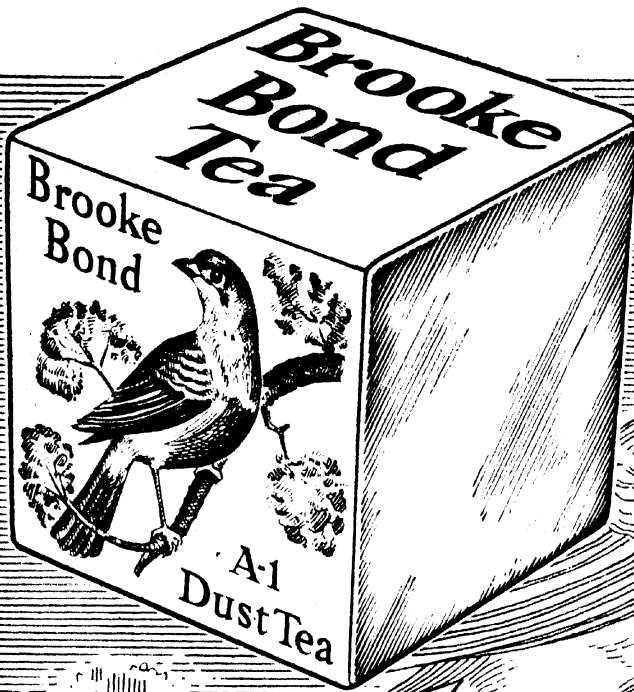
টাকা ছাড়া মাস চলবে না তার-ও। ভয়ে-ভয়ে কমলা তাই কাজে লাগে।

শান্তার লেখা-পড়া জানা মাথাটাই বিগড়ে যায়। নেশার মতই শোকের ঝোঁকটা প্রায় কেটে গেলে কমলার কথাটা ভাবে। ভেবে হাত-পা হিম হয়ে আসে। মায়ের চোখে এক ফোঁটা জলও দেখেনি সে। বাবার শোকে কেমন বোবা হয়ে গেছে মা। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। যদি কমলার কথাই সত্যি হয়! বাবা গেল! মা-ও যদি না বাঁচে! আতঙ্কে শিউরে ওঠে শান্তা। মায়ের কাছে এগিয়ে যায়। নেশার খোয়ারি ভাঙার মতই বুকে মুখ গুঁজে আরেক চোট কাঁদে। সুলতা তবু কি পাষাণ! শান্ত ভাবলেশহীন দুটো চোখ। মেয়ের কান্না দেখে ঠাট্টার মতই ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল একটু। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল হাসির রেখাটা। ভয়ে পিছিয়ে গেল শান্তা। আর না-কাঁদার প্রতিজ্ঞায় পাথর হয়ে রইল সারারাত। সারারাতে আর একবারও কান্না শোনা যায়নি ওর। ও হয়তো আর কাঁদবে না। অনেক রাতে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে উঠে আবার কাঁদবে কিনা কে জানে! কিন্তু কমলার কান্নাটা যেমন একঘেয়ে আর সুরেলা। ঘুম-পাড়ানি গানের মত। কমলাকে তাই বিশ্রী আর অশ্লীল লাগে। কান পেতে শুনতে ইচ্ছে হয় না। অথচ কত চেষ্টা করে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে ও!

সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল সুলতা। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারপর কতক্ষণ রেলিংয়ে কনুই চেপে দাঁড়িয়ে আছে মনে নেই।

আস্তে আস্তে চোখের সামনে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। দেখতে দেখতে রাতটা দিন হয়। একটা প্রিয়তমে যন্ত্রণার বয়স বাড়ে। শোকের আয়ু আরেকটু ক্ষয় হয়।

হাওয়া বইছে। ঝির-ঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ বুজে আসছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে চেয়ে-থাকা চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে এখন। ক্লান্ত লাগছে। এইখানে, এই সাপের শরীরের মত ঠাণ্ডা শানের ওপরেই এলিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।

নির্ঘুমে চোখ দুটো কর কর করছিল। দুহাতে চোখ রগড়ে সামনে তাকাল। উঠোনে কাক ডাকছে। সুলতা শুনল। দেখতে পেল না কাকটাকে। পাঁচিলের ওপাশে অশ্বত্থের মাথাটা চিকচিক করছে। আর একটু পরেই রোদে ঝল-মলিয়ে উঠবে। আলোয় আলো হয়ে যাবে চারদিক। হাওয়া উঠবে জোর। অশ্বত্থ পাতার হরতনে হাত-তালির শব্দ শোনা যাবে। বেলা বাড়লে অন্যদিনের মত হয়তো আজকেও আসবে জগদীশ। শিখরেশের কথা বলে, গল্পে-গল্পে আজকেও কাঁদাতে চাইবে তাকে। কিন্তু পারবে না। হয়তো ইচ্ছে করেই কাঁদবে না সুলতা। চুপ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবে। দেয়াল দেখবে। দেয়ালের ছবি। জগদীশ ফিরে যাবে। বিরক্ত, বিস্মিত মনে হবে তাকে। প্রসাধনের মতই চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাবে। আজকেও যেতে-যেতে বলবে, 'একটু কাঁদুন বৌদি। কাঁদতে হয়। কেঁদে হালকা হতে হয়।' থামবে। ফিরে তাকাবে জগদীশ। আবার বলবে, 'একজন করে। কিন্তু বাঁচে অনেকে। বাঁচার দায়িত্ব মরার চেয়ে কম ভেবেছেন নাকি?'

সুলতা তবু কিছু বলবে না। একবার হাসতে চাইবে। পারবে না। পরাজিতের মত ফিরে যাবে জগদীশ। ঠিক অন্যদিনের মতই। কাল আর পরশু যেমন করেছে।

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাবে জগদীশ। সুলতার চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী

ভাববে। কমলের মতই, শান্তাকে কাছে ডাকবে। চুপি-চুপি কী-সব বলবে। সুলতা শুনতে পাবে না।

—'আমার ভয় করছে, শান্তা। তোমার মাকে দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিনে।

—আমার-ও শুধু ভাবতেই ইচ্ছে করছে। ভেবে কূল পাচ্ছিনে কাকাবাবু। তাই কান্না পাচ্ছে।' ছোট পিসীর অবস্থাও হয়েছিল এমনি। ব্যাংক ফেল পড়ার খবর শুনেই কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল। পিসেমশাই তো দুদিন কেঁদে-কেটে চাংগা হয়ে উঠলেন। কিন্তু কান্না তো দূরের কথা, পিসীমার স্বর বেরুল না গলায়। না মরে তাই পাগল হয়ে রইল। এখনো বেঁচে আছে। মা জানে। মা-ও কি তবে—' গলা বুজে এসেছিল। অমন টানা-টানা বড়-বড় চোখ দুটোই জলে ঝাপসা হয়ে এসেছিল শান্তার। দেখে কী ভালই যে লাগছিল! নিজের বয়সের কথা ভুলেই যেন দু' পা কাছে এগিয়ে এসেছিল জগদীশ। চোখের জল মুছিয়ে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। পরম সান্ত্বনা আর সহানুভূতির জারকে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'ভয় কী? আমি তো মরে যাইনি এখনো।' এক মুহূর্ত থেমে হেসে বলেছিল, 'মরবো না। মরার বয়স এখনো হয়নি। ঠিক সময়েই মরেছে তোমার বাবা। এ বয়সে রোগে ভুগেই মরা উচিত ছিল ওর।' আরো কিছুক্ষণ থেমে মনের কথাটাই গুছিয়ে মুখে বলতে চেয়েছিল, 'বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল কিনা শিখরেশ!'

শান্তা কী করে টের পেয়েছিল কে জানে। অতি সহজ একটা মানসাঙ্কের মতই জগদীশের ছোট হতে যাওয়ার সমস্যাটা তার নিজের বড় হতে চাওয়ার মতই আর জটিল মনে হল না। একবার চারদিকে চোখ চেয়ে দেখল শান্তা। শিখরেশের কথা মনে পড়ল না। সুলতাকে-ও ভুলে গেল। সন্তর্পণে জগদীশের হাতখানা টেনে বুকে চেপে ধরল শান্তা। বললে, 'দেখুন, দেখুন, বুকটা এখনো কাঁপছে!'

হাতটা বুঝি পড়ে গেল। চমকে সরে গেল জগদীশ। হাতটা ছাড়িয়ে নিলে শান্তার মুঠো থেকে। কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'আমি যাই, আবার আসবো। তোমার মা কাঁদেন কিনা খোঁজ নিয়ে দিও। সারারাত তোমাদের কথা ভেবেই ঘুমোতে পারিনি।'

শান্তা জানে জগদীশ আর আসবে না। কিন্তু সুলতাকে কাঁদাবে কে? দুশ্চিন্তার পোকাটা অবাধে মাথার ভেতরে ঘোরাঘুরি শুরু করে। কান্না পায়। বাবার জন্যে নয়। মায়ের কথা ভেবেই।

চাকরির ঝামেলা কি একটা। হাজার রকমের বায়নাক্কা মিটিয়ে তবে বজায় রাখা একটা চাকরি। কিন্তু সব ঝামেলাই কি মেটে! শুধু যেন জল-তোলা আর বাসন মাজাই নয়, বাড়ির মানুষগুলির মনের অন্ধকার গলিপথেও নির্ভয়ে যাতায়াতের অভ্যাস থাকা চাই। কখন কী যে খেয়াল হবে কার! সুলতার যেমন হয়েছে। অমন দেবতার মত স্বামী মরে গেলেও না-কাঁদার বদখেয়াল চেপেছে মাথায়। কমলার মনটা তাই খচ্ খচ্ করে। সারাদিন একটা অস্বস্তি তাকে বসে থাকতে দেয় না। ঘুমোলে যত সব দুঃস্বপ্নের বালাই এসে জোটে। জেগে থেকে সুলতাকে কাঁদাবার দায়িত্বটুক তাই যেচেই নিতে হয়। কিন্তু সুলতা কি সে কথা বোঝে? কমলার অশান্তির কথা?

একে একে জানলাগুলি খুলে দিল সুলতা। এতক্ষণ আবছা অন্ধকারে ঘরটা কেমন নিঝুম মনে হচ্ছিল। মাকড়সার
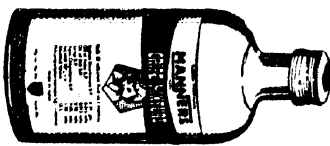
জালের মতই ছেঁড়া-ছেঁড়া, টুকরো-টুকরো অন্ধকার ঝুলছিল এখানে-ওখানে। আলোর হাতে ছিঁড়েখুঁড়ে উধাও হল এবার। হাওয়া এল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার স্তব্ধতা কেঁপে উঠল যেন। নিঃশব্দতা আড়া-মোড়া ভাঙল। পাখির পাখা ঝাপটানোর মত ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলি শব্দ করে কাঁপল। আবার হাওয়া এল। হাওয়ায় কিসের গন্ধ।

—বাইরে কাঠ-চাঁপা গাছটা বুঝি এতদিনে সেয়ানা হল, লতা।

অবুঝ দৃষ্টি তুলে ধরল সুলতা।

—চল ছাদে যাই। ঘরের ভেতরে ভাল লাগে না।

ছাদের কোল ঘেঁষে কাঠ-চাঁপা গাছটা দাঁড়িয়ে। গাঁটে-গাঁটে ফুল ফুটিয়ে মাথা দোলাচ্ছে গাছটা। ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে হাওয়া। হাওয়ায় চুল উড়ছে সুলতার। মুখে-চোখে চুমো খাচ্ছে চুল।

—চল, নিচে যাই। পাশের বাড়ির চিলে কোঠায় পড়া থামিয়ে ছোঁড়াটা আমাদের দেখছে।

—দেখুক। দেখে জ্বলে-পুড়ে মরুক।

—আঃ, ছাড়ো। আমি চেঁচাবো নইলে।

বিছানার চাদরে ভাঁজ নেই। কুঁচকে যায়নি কোথাও। দুদিন আগে পাল্টা

পালটে দিয়েছে সুলতা। বাইরে যাবার আগে হয়তো একবারও বিছানাটা ছুঁয়ে দেখেনি শিখরেশ। সে কি জানত আর ফিরবে না? রাস্তা থেকেই হাসপাতালে যেতে হবে তাকে? আর কোনদিনই এঘরে আসবে না?

—বাইরে রাত জাগতে পারি। কিন্তু অন্য কারো বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারি না। আমার ঘেন্না করে, সুলতা।

সুলতা ভাবলে, এবার কাঁদবে। কিন্তু পারল না। শুকনো চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরখ করতে ইচ্ছে হল সব। সহস্র ভাবনা এসে ভিড় জমাচ্ছে মনে।

টেবিলে খানিকটা লেখা হয়ে পড়ে আছে গল্পটা। পাশে টুপি-পরা কলমটা কাত হয়ে। কাচের পেপার-ওয়েটের তলায় খান দুয়েক চিঠি। একখানা চিঠিও হয়তো পড়ে দেখেনি। খামের মুখটা বন্ধ। কাচের গ্লাসে খানিকটা জল। ওপরে চীনে মাটির ডিশের ঢাকনা। বাইরে যাবার আগে খানিকটা জল খেয়েছে শিখরেশ। ঘরের কোণে তাকাল সুলতা। কুঁজোটা এখনো আছে। অথচ আর কোন কাজ নেই ওকে দিয়ে। শিখরেশের সংগে ওর প্রয়োজন-ও যেন ফুরিয়ে গেছে। ফুলদানিতে ফুল-গুলি শুকনো। আর কখনো বাগানে যাবে না সুলতা। তাজা ফুলে ফুলদানিটাকে সাজাবে না। এই ঘরের সব কিছুই মৃত। সব কিছুই এখন প্রাণহীন। আলমারির বইগুলিও আর নাড়া-চাড়া করবে না কেউ। অযত্নে না, এসব আর লাগবে না। সময় হবে না এদের পড়বার। মানুষের নাড়ী টিপে আর ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও নাকি হাতে রাখতে পারে না সে। বাপের লেখা এত বই পড়বে কখন। সত্য-মিথ্যায় বানানো এত গল্প।

আলনায় কাপড়-জামা শিখরেশের। দুটি পরতে জানত না। জোর করে সুলতাই দুটি পরা শিখিয়েছে। একপাশে ছাতাটা ঝুলছে। কাঁধে ঝিমে ঘরে ফিরেছিল অনেক রাতে। বৃষ্টির জলে আটকে গেছে ছাতাটা ছিল বারান্দায়। পরদিন নিজে দোকানে দিয়েছিল সুলতা। ছাতাটা কিনে এনেছিল।

—কী, বড় অসময়!

দুষ্টুমিতে চিক-চিকিয়ে উঠেছিল শিখরেশের চোখ দুটো। ছেলেমানুষের মতই আকাশ দেখছিল। সুলতা কিন্তু উৎসাহ বোধ করেনি।

—তাতে কী হয়েছে? আসুক না ঝড়!

—চল, বাইরে যাবো।

অদ্ভুত আবদার। যত সব অবুঝ বায়না।

—বৃষ্টি নামবে যে!

—আমরা বৃষ্টিতে ভিজে আসি, চল।

হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে

গিয়েছিল সুলতাকে। আর কোন আপত্তি করতে পারেনি সুলতা। বাইরে ঘাটে দাঁড়িয়ে মনের বিরক্তি চেপে ভিজতে হয়েছিল।

আশ্চর্য স্বভাব ছিল লোকটার। অবশ্য ছেলে-মেয়েরা বড় হলে স্বাভাবিকভাবেই শান্ত হয়ে এসেছিল। এ যেন আরেক অস্বস্তি। অনেক রাত্রে সবাই ঘুমোলে এই কথাটাই কতদিন শিখরেশকে শোনাতে এসেছে সুলতা। আফশোস করেছে। ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে। আমরাও বুড়ো হলুম, না?

বুকটা বুঝি টন-টনিয়ে উঠেছিল। ভাবনা থামিয়ে সুলতা কাঁদতে চেষ্টা করল একবার। এবারেও ঝাপসা হল না চোখ। চেঁচিয়ে কাঁদতে পারল না।

নিভাঁজ-নিপাট বিছানার ওপরে চোখ রাখল। আরেকবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। দেয়ালে ল্যাণ্ডস্কেপ। শিখরেশের ছবি। সুলতার। একা-একা। আবার এক সংগে। ছবি তোলার ভীষণ বাতিক ছিল লোকটার। ক্যালেণ্ডারে মাস ফুরিয়েছে কাল। পাতাটা ছিঁড়ে ফেলা হয়নি। কে ছিঁড়বে? শিখরেশ নেই। সুলতা-ও এঘরে আর আসেনি। কমলা এঘরে কখনই আসে না। শিখরেশ পছন্দ করত না অন্য কারো আসা। সুলতা ছাড়া আর কারো কাজই যে ভাল লাগত না তার! ছেলে-মেয়েদের কাছেই কি তাতে কম লজ্জায় পড়তে হয়েছে! তবু সুখ ছিল। সে লজ্জায় অপমান কিংবা অস্বস্তি ছিল না। বরং আনন্দ।

ছাইদানির ওপরে আধ-পোড়া সিগারেট। নিবিয়ে রেখেছিল। ভুল করে খাওয়া আর হয়নি। ফুলদানির ফুলগুলি শুকনো। কেমন বিমর্ষ, করুণ দেখাচ্ছে ফুলদানিটা। বড্ড ফাঁকা আর শূন্য মনে হচ্ছে ঘর। সে নেই। তবু সবকিছুকেই জড়িয়ে আছে সে। সবকিছুতেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিখরেশের অগুনতি কথা। যেখানেই চোখ রাখে সুলতা, সেখানেই স্মৃতি। শিখরেশকে মনে পড়ে। তার কথা। তার কণ্ঠস্বর। অথচ কান্না পাচ্ছে না সুলতার।

ক্যালেণ্ডারের পাতায় মাসটা পুরনো হয়ে গেছে কাল। তবু পাতাটা ছিঁড়ে ফেলার আজ আর কোন আগ্রহ নেই সুলতার। কোন উৎসাহ। কেমন বিমনা, বিমর্ষ চোখে দেখতে লাগল সব। যেন হাজার বছর পরে কোন এক সুলতা পৃথিবীর যাদুঘরে দাঁড়িয়ে তার অতীতকে দেখছে। তার সমস্ত মন এখন বিস্ময়, বেদনা আর কৌতূহলে আচ্ছন্ন। চারদিকে হিম আর কুয়াশার মুখর স্তব্ধতা। সুলতা বড় একলা, বড় অসহায়।

অন্যদিনের মতই জগদীশ এল। একটু

বেলা করেই এল আজ। আর সুলতার কাছে গেল না। ওপরে শান্তার কাছে এল। মুখ চুন করে এখান থেকে যেতে হয়েছিল কাল। শান্তা অপমান করেছিল। মনটা তাই তিক্ত আর বিষাদময়। ইচ্ছে, কিছু রূঢ় কথা শোনাবার। যেমন করেই হোক, অপমান করে পাল্টা প্রতিশোধ নেবার। কিন্তু কমলার কাছে অমন করে কথা বলা যায়? বাড়ির ঝি-চাকরের সামনে? কথায় কথায় শান্তাকে তাই সিঁড়ির কাছে টেনে আনে। নিচে নেমে মুখটা কালো করে দিতে সাধ হয়। কিন্তু অপমান করার মত তেমন জোরালো ভাষা এই মুহূর্তে আর যে মুখে জোগায় না জগদীশের। তাই সেই পরিচিত পুরনো সুরেই বলতে হয়, 'সারারাত একদম ঘুমোতে পারিনি কাল।'

শান্তা সংকুচিত হয়ে বলে, 'লজ্জা পাচ্ছি, কাকাবাবু। আমাদের জন্যে আপনার ভোগান্তির একশেষে।'

জগদীশ হাসে। বলে, 'না, তোমার কাকিমাকে কালকে আবার হাসপাতালে পাঠিয়েছি। সারারাত তার কথাই ভেবেছি। ভোর বেলা দেখে এলাম একটা ছেলে হয়েছে। কী সুন্দর যে ছেলেটা হয়েছে, শান্তা, আমাকে দেখে তুমি তা বিশ্বাস করতে পারবে না।'

হাসি মুছে মুখটাকে গম্ভীর করে জগদীশ। একদৃষ্টে শান্তার মুখ দেখে। আর কালো না, মুখে কেমন লালচে আভা ধরে শান্তার। অস্ফুট গলায় কোনমতে বলে, 'কমলা কেন ডাকছে শুনে আসি, কাকাবাবু।' শান্তা পালিয়ে যায়। দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেন বাঁচে। হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেয়।

জগদীশ দাঁড়িয়ে থেকে মনে-মনে হাসে। ভাবে, এখন থেকে কমলার ডাকাডাকির আর শেষ হবে না! মনের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। এক অমানুষিক তৃপ্তিতে গলে গিয়ে দেহটাকে একটা পাখির মতই হালকা লাগে জগদীশের। অনেকদিন পরে ভয়ংকর সুখী মনে হয়।

যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ায়।

—কার ছেলে হয়েছে, আপনার? শিখরেশের মরার পরে এই প্রথম কথা সুলতার।

থতমত ভাবটা কাটিয়ে জগদীশ বলে, 'হ্যাঁ।'

আর কিছুই বলে না সুলতা। আর কোন কথাই শোনে না। নিঃশব্দে ভেতরে চলে যায় ফের। জগদীশ আরো কিছুক্ষণ চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে বিস্ময় মেখে খোলা দরজার দিকে চেয়ে থাকে। একটু আগেও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সুলতা। তারপর ফিরে যায়।

খাটের বাজু দুহাতে চেপে ধরে পাথর হয়ে যায় সুলতা। জগদীশের কথা শুনে ভীষণ কষ্ট হয়। এতক্ষণে শূন্য মনে হয় নিজেকে। সব থেকেও কিছুই না-থাকার অসহায়তা। রক্তে-রক্তে এক অস্থির যন্ত্রণার দাপাদাপি শুরু হয় এইবার। এ-জীবনে রক্তের গভীরে এসে আর কেউ বাসা বাঁধবে না। কোন সুন্দরতম কীটের প্রার্থনা শোনা যাবে না রক্তে। জন্মের দাবী নিয়ে আর কেউ তাকে ক্লান্ত, ক্লান্ত আর সুখী করতে আসবে না। সে এখন একা। নির্মূল-ভাবেই শূন্য। জগদীশের বউ হয়তো আবার হাসপাতালে যাবে। আরো অনেকবার। কিন্তু এ-জীবনে আর কখনো হাসপাতালে যাবে না সুলতা। কোনদিন না। একটি মনোরম যন্ত্রণার স্বাদ নতুন করে আর কখনো পাবে না।

শেষরাতের স্বপ্নটা সত্যি। একলা মরেনি শিখরেশ। সিঁড়িটা ভেঙে গেছে। তাদের ভালবাসার সেতুবন্ধ। আর কেউ ডাকবে না। কোনদিন না। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামবে না সুলতা। লজ্জায় আর আনন্দে আর অবসাদে কোনদিনই ফিরে যাবে না ওপরে!

সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। বুকটা দুলে উঠল। চারদিক আবছা, অস্পষ্ট মনে হল। জ্বালা করে উঠল চোখ দুটো। জল এল।
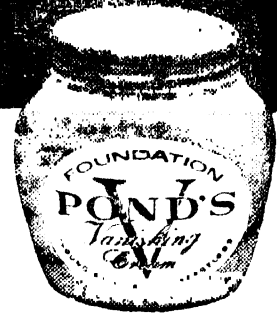
মোটর বাসের দুর্ঘটনা রোধ করবার একটা অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন টোকিওর কোকুসাই বাস কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মোতোজি হাতানো। এ বছরের গোড়ার ক-মাসে কোম্পানীর উনবাটখানি বাস বাইশটি দুর্ঘটনা ঘটায়—পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে তিন গুণ বেশী দুর্ঘটনা। জাপানে ঘুরে বেড়াবার জন্যে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বাসসমূহের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দুর্ঘটনার আধিক্য ঘটেঃ একান্নটি দুর্ঘটনা, পনেরটি মৃত্যু এবং আটশ তেতাল্লিশ জন আহত। ব্যাপারটি প্রেসিডেণ্ট হাতানোকে বিশেষ বিচলিত করে তুলতে তার কোম্পানীর ম্যানেজার দুর্ঘটনা নিরোধীকরণের এক উপায় প্রস্তাব করেন। উপায়টি হচ্ছেঃ বাসের চালকদের বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে কিছুকাল ধর্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করে আসা।

এই ধর্মানুষ্ঠানের রীতি হচ্ছে কোন বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে পাঁচদিন ভোর সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে ওঠা, নিজের ঘর ও মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা এবং ধ্যানে বসা। ধ্যান করার সময় কেউ যদি মনে করে যে তার মন চঞ্চল এবং বিষয়ান্তরে বিচরণ করছে তাহলে তার সংকেত হিসেবে সে ব্যক্তি তার যুক্তকর মুক্ত করে দেবে এবং তাহলেই প্রহরারত মন্দিরের সন্ন্যাসী একটা ছড়ি দিয়ে তিনবার তীব্র আঘাত করবে। মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ দিনে দুবার করে তাদের বোঝাবেনঃ "বাসে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে যখন বসবে বা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে যদি মনে হয় ক্লান্তি তোমাকে অবসন্ন করে দিচ্ছে তাহলে যা করছিলে তা থেকে বিরত হবে এবং যুক্তকরে দশ মিনিট সোজা হয়ে বসে থাকবে। ঈশ্বরের নাম করবে। দশ মিনিট পর গাড়ি চালিয়ে যাও।"

নির্দিষ্ট ধর্মাচরণ কাল সমাপান্তে বাস ড্রাইভাররা চলে যাবার সময় মন্দিরের মোহান্ত তাদের বাণী দেনঃ 'ধ্যান করার অভ্যাস রেখে যাবে, নয়তো মনের জ্যোতি নিভে যাবে।"

শুধু প্রাচ্যেই নয়, পাশ্চাত্যেও মোটর-চালকদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্যে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃদ্ধ করার কথা শোনা যায়। বৃটেনে যেখানে মোটর দুর্ঘটনায় গত বছর ছ হাজারের বেশী লোক নিহত এবং প্রায় তিন লক্ষ লোক আহত হয়, চার্চ অফ ইংলণ্ডের এক যাজকের জাপানের অনুরূপ একটি নির্দেশ আছে। ডার্লিংটনের পল সেণ্ট চার্চের যাজক ডিভান ওয়াটস জোন্সের নির্দেশ হচ্ছে প্রত্যেকবার গাড়ি চালাবার আগে ড্যাসবোর্ডে সাঁটা রাখা এই প্রার্থনা করতে হবেঃ "হে ভগবান, যখন গাড়ি চালাবো

আমার প্রতিবেশীদের আমার নিজের মতোই ভালবাসতে সহায় হও, যাতে আমি যেন এমন কিছু না করি যাতে তোমার কোন সন্তান আঘাত পায় বা বিপদগ্রস্ত হয়। আমার চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট রেখো এবং আমার হাত ও পায়ের দক্ষতা বজায় রেখো। আমার চিত্তকে শান্ত রেখো, দেহকে ধীর রেখো। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দীপনা থেকে এবং অপরের কোন কাজের ওপর বিরক্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো এবং আমাকে আমার যাত্রার সমাপ্তিতে পৌঁছে দাও।"

*

বৃটেনের অধিবাসীদের সম্পর্কে একটা প্রবচন আছে যে, মরুভূমিতে যদি দুজন মাত্র লোক থাকে আর রীতিসম্মতভাবে তাদের পরস্পরের পরিচয় না হয়ে থাকে, তাহলে তারা কথা বলবে না। বিদেশের বহু লোক বৃটেনে ভ্রমণকালে ওদের পরিচয় না থাকলে কথা না-বলার নীতিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই দুর্নাম ঘোচাবার জন্যে ১৯৫০ সনে লোচওয়ার্থে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার বর্তমান সভ্য সংখ্যা এক হাজার। এই সমিতির সভ্যদের নীতি হচ্ছে ট্রেন বা বাসে একত্রে ভ্রমণ করার সময়ে অপরিচিতদের সঙ্গেও সাময়িক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা। সমিতির সভ্যদের একটি করে ব্যাজ পরে থাকবার নিয়ম। সভ্যদের নিয়ম হচ্ছে ভ্রমণকালে অপরিচিত যে কোন লোকের সঙ্গেই আলাপ করতে পারবে এবং যাত্রাশেষে পরস্পরের অনুমতি নিয়ে আলাপ বন্ধ করবে।

*

পৃথিবীর বিস্ময়কর কাজ নিয়ে যারা আছে, তাদের মধ্যে কেরিম হলবার্গের নাম অবশ্যই করতে হয়। সুইডেনের এক উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত বিষয়ক এক প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করে। তার কাজ হচ্ছে

উড়ন্ত পিরীচ—হোভারক্র্যাফট যা পরিবহণ কাজে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে পরিগণিত

পিনের মাথার মত ক্ষুদ্রাকার একপ্রকার পত্র-কীটের দেহে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া। মুলোর পাতার গায়ে এই পোকাকে উজ্জীবিত করে তোলায় কেরিন খুব আনন্দ পায়। আর উদ্ভিদের রোগ প্রসারের কারণ নির্ণয় করতে কেরিন একটি পোকার রক্ত নিয়ে আর একটি পোকার দেহে সঞ্চারিত করে দেয়।

এই উপায়ে কেরিন আবিষ্কার করতে পারবেন বলে আশা করেন যে, উদ্ভিদের রোগজীবাণু পোকার রক্তের মধ্যে দিয়ে অথবা কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারাই সংক্রামিত হয় কিনা। মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে ঐ ক্ষুদ্র পোকাগুলির দেহে অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করায় কেরিন এমন হাত পাকিয়েছে যে, ঘণ্টায় ঐ রকম তিরিশটি করে রক্ত সঞ্চারণ কাজ করে থাকে। তার মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচটি হত হয়। বাকিগুলি অস্ত্রোপচারের পর ঘোর কাটিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার ঘুরে-ফিরে বেড়ায়।

●

ইতালীর মোনজা শহরে চলচ্চিত্র দেখায় রত ভার্জিনিও রোনফান্ড্রাকে চুরির অপরাধে পুলিস গ্রেপ্তার করতে সে ছবি-খানি শেষ পর্যন্ত দেখে যাবার অনুমতি চাওয়ায় ব্যর্থ হয়ে জামিনে খালাস হয়ে আবার ছবিখানি দেখতে আসে।

●

উচ্চে আরোহণ ও নিম্নে অবতরণের ঘটনাবহুল জীবনের কথা বলতে জোহানেবিন সেলিমের নাম করতে হয় যে, উনিশ হাজার ফিট উঁচু আফ্রিকার উচ্চতম কিলিমাঞ্জারো পর্বতে শত শত বার ওঠানামা করেছে। এক পর্বতারোহীর জীবনরক্ষার জন্য এ বছরের নববর্ষ দিনে বৃটিশ এম্পায়ার মেডেল পুরস্কার পাবার পর সেলিম তার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। শিখরের প্রায় কাছাকাছি উঠে পড়ে গিয়ে লোকটির মাথার খুলি ভেঙে গিয়েছিল। কাজ চালাবার মতো একটা স্ট্রেচার তৈরী করে নিয়ে সেলিম পর্বতারোহীর মালবাহকদের সহায়তায় আহত ব্যক্তিটিকে বত্রিশ মাইল পথ নেমে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

কিলিমাঞ্জারো পর্বতটি পৃথিবীর একটি আশ্চর্যতম বস্তু। আজো স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, পাহাড়ের চূড়াটি রূপোর, তবে সেলিম জানে যে, সত্যি তা নয়। পৃথিবীর আদিকালে এক ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে পাহাড়টি উদ্গত হয়। পাহাড়টিতে ওঠায় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে খুবই চাপ লাগে। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে ঐ উনিশ হাজার ফিট উচ্চে নাড়ীর গতি ১২০—১৩০; অথচ শ্বাস পড়ে মিনিটে পঁয়ত্রিশ বার।

কিংবদন্তী আছে যে, পর্বতটির প্রধান চূড়া কিবোর তুষারাবরণের নীচে ইথিওপিয়ার প্রাচীন শাসকরা কবরিত হয়ে আছে এবং রাজা সলোমনের আমলের সম্পত্তি প্রোথিত হয়ে রয়েছে।

★

দুটো পরিত্যক্ত খাদ্যের টিন ও একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে একদিন উদ্ভাবিত হয় এস আর এন—১ হোভারক্র্যাফ্ট—বৃটেনের উড়ন্ত পিরিচ। পরিবহনের ক্ষেত্রে এই হোভার-ক্র্যাফ্ট একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। গত ২৫শে জুলাই হোভারক্র্যাফ্ট সণ্ডার্স-রো টেস্ট পাইলট লেঃ কমান্ডার পিটার ল্যাম্বের পরিচালনাধীনে ক্যালে থেকে ডোভার পর্যন্ত চ্যানেল অতিক্রম করে ২ ঘণ্টায়—এই সময় তার গড়পড়তা গতিবেগ হয় ১৩ নট। প্রসংগত স্মরণ করা যেতে পারে ৫০ বছর পূর্বে ঠিক এই দিনই ব্লেরিয়ট তাঁর বিমানে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

মিঃ সি এস ককারেল আবিষ্কৃত এই হোভারক্র্যাফ্ট যানটি বিমান নয়, কারণ তার পাখা নেই এবং তা কেবল সামনের দিকেই চলে না; এটি জাহাজও নয়, কারণ তা জল স্পর্শ না করেই চলে। এটি এক হিসাবে বিমান ও জাহাজের মাঝামাঝি একটি যান।

যানটির উত্তোলন রীতি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এবং তা আবিষ্কৃত অন্যান্য যান থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। উপর ও নীচ থেকে বাতাসের চাপ সৃষ্টি করে যানটিকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা হয়। গতি সৃষ্টি করা হয় দুটি চক্রকোণ পাইপের মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবেশ করিয়ে, এই পাইপ দুটি এয়ার-কণ্ডিশনিং ব্যবস্থায় যে ধরনের পাইপ ব্যবহৃত হয় অনেকটা সেই ধরনের। এই বাতাস যোগায় এস আর এন-এর ক্ষেত্রে ৪৩৫ অশ্বশক্তিসম্পন্ন এলভিস লিওনাইডস এঞ্জিনচালিত একটি ফ্যান।
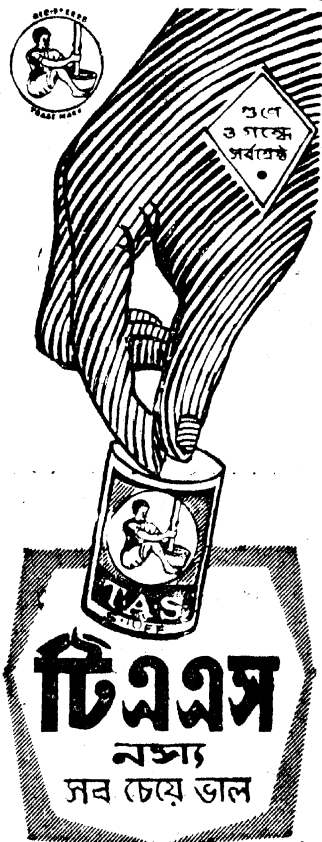
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সদস্যদের কেহ কেহ নাকি পরস্পর পরস্পরে গায়ে জুতো ছুঁড়িয়াছেন। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ

উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"শুনেছি যাঁদের একটু দূরদৃষ্টি আছে, তাঁরা নাকি এইসব জুতোর আক্রোকর্টির সংগে করে রেখেছেন; হয়ত পরবর্তী নির্বাচনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের জন্যই।"

• • •

রাষ্ট্রপুঞ্জে মঃ ক্রুশ্চেভের সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের ঘোষণায় সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন—"একেই বলে কামারের

এক ঘা; শুনেছি ক্রুশ্চেভজী কামারের ছেলে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

মঃ ক্রুশ্চেভের সফর এঞ্জেলস ত্যাগের প্রাক্কালের খবরে শুনিলাম যে তিনি সাংবাদিকদের সংগে কোন কথা বলেন নাই, তবে হাসিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এই হাসির অর্থ কী, তা নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে নানারকম গবেষণা চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে কেহ লিখলেন—হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে—আবার কেহ লিখলো—কেন তুমি নাইচা নাইচা মুচকি হাইসা চইল্যা যাও।"

• • •

মিসেস ক্রুশ্চেভকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যুক্তরাষ্ট্রে কী দেখিতে তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছে—তখন তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—"পল্লী অঞ্চল"। তাঁহার আর কী কী দেখিতে ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—"আমার স্বামী

ট্রামে-বাসে

যা যা দেখতে চান আমি তা-ই দেখতে ইচ্ছা করি"। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কথাটা কি তিনি স্বামীর অনুগামিনী গৃহিণী হিসেবে বলেছেন, না অনুরাগে প্রটোকল-এর রঙ মিশিয়ে বলেছেন তা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না"!!

• • •

মঃ ক্রুশ্চেভ হলিউডে গিয়া জনৈক কোটিপতি প্রযোজকের সংগে দেখা ও কথা কাটাকাটি করিয়াছেন। আমাদের এক কিশোর সহযাত্রী বলিলেন—"কোথাকার বোকা রে! এত বড় "চান্স" মাটি করে দিলে। আর হলিউডে চান্স কি চাট্টিখানি কথা!"

• • •

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন রাষ্ট্রপুঞ্জে ঘোষণা করিয়াছেন—আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জন্য অপরের উদ্বেগ বাঞ্ছনীয় নহে। শ্যামলাল বলিল—"এই ঘোষণার পর মায়ের চেয়ে দরদী মাসীরা কি আর মধ্যস্থতায় সায় দিবেন?"

• • •

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল বলিয়াছেন যে, মার্কিনের ৫০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ভারতে মজুত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আগ্রহান্বিত করা হইবে। তিনি বলিয়াছেন, ইহা অনেকটা ব্যাংকের মত কাজ করিবে। —"কিন্তু ওভারড্রাফটের ব্যাপারে কী হবে, তা তিনি বলেন নি"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

জনৈক প্রকাশক বলিয়াছেন—আফগানিস্থান ভারতকে বড়ভাইয়ের মত মনে করে; তাহা জানে পাকিস্থানের মত ভারতের রাজ্য সম্প্রসারণের বাসনা নাই। —"পাকিস্থানও বড়-দা সম্পর্ক পাতাতে আগ্রহান্বিত, তবে সেটা নিজের দাদা নয়, বিবির দাদা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম বাগদাদ চুক্তির নথিপত্রের ভিত্তিতে ইরাক সরকার এই চুক্তির যে-কয়েকজন পাণ্ডাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন, জনাব সোহরাবর্দি তাঁহাদেরই একজন। সংবাদে প্রকাশ, সামরিক আদালত সোহরাবর্দি সাহেবের অনুপস্থিতিতেই বিচারে তাঁহার ফাঁসীর আদেশ হইয়াছে। জনৈক সহযাত্রী প্রশ্ন করিলেন—ক' মাসের ফাঁসী, তা কি সংবাদে বলা হয়েছে!!

• • •

জনৈক মিশনারি নাকি নিজের চোখে দেখিয়াছেন সিডনীর উপর দিয়া সম্প্রতি একটি "উড়ন্ত পিরিচ" উড়িয়া গিয়াছে। পিরিচে চারটি মনুষ্যমূর্তি ছিল। আর শুধু তাই নয়, হাতছানি দিলে সেই মানুষদের একজন নাকি আবার হাতছানি দিয়া সাড়া দিয়াছে। —"বোধ হয় তার অর্থ—দেখা হবে চাঁদনাতলায়, বলে গেল ইশারায়"!!

• • •

পূর্ব পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জে একটি লাইব্রেরী নাকি জুয়ার আড্ডায় পরিণত হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—

"বইর এত পাতা নিয়ে কে মাথা ঘামায়, তার চেয়ে "তিনপাত্তি" বা "আটপাত্তি" অনেক ভালো"।

• • •

ঘানাতে "ফুটবল স্ট্যাম্প" প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —"গাছে চড়ে ফুটবল খেলা দেখার স্ট্যাম্প চালু করা যায় কিনা তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার আই এফ এ কর্তৃপক্ষের সংগে পরামর্শ করে দেখবেন"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের গভীর তলদেশের রহস্য সন্ধানের অভিযানে বাহির হইয়াছেন। —"তাঁদের অভিযান হয়ত সাফল্যমণ্ডিত হবে। কিন্তু যে-রহস্যে পূর্ণ-চাঁদের মায়ায় সমুদ্র উতলা হয়ে ওঠে তার সন্ধান হয়ত আর কোনদিনই মিলবে না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

রবীন্দ্রচর্চা

রবিতীর্থে—অসিত হালদার। পরিবেশক—পাইওনিয়র বুক কোং, ১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৫৲

রবীন্দ্র-সাহিত্যই শুধু নয়, রবীন্দ্র-জীবনও আমাদের কাছে এক অনন্ত বিস্ময়। সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি-সাহিত্যিকই নন—বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে তাঁর কত বিচিত্র রূপ! এমন মহিমময় জীবনকে তার স্বরূপে ধরে রাখা, বলাই বাহুল্য, একজন লেখকের পক্ষে সম্ভবই নয়। তাই বৃহৎ 'রবীন্দ্র-জীবন' আমাদের যা দিয়েছে, আমরা তার চেয়েও বেশী কিছু চাই এবং এখন পর্যন্ত এই একটি জীবনকে অবলম্বন করে বাঙলা সাহিত্য খানিকটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠারও সুযোগ পেয়েছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এখনও বোধ হয় অনেক কিছুই জানার বাকী আছে।

প্রখ্যাত শিল্পী অসিত হালদার শুধুই যে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে লালিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তা-ই নয়, ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই মহান পুরুষের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং শিশুকাল থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর পরিপার্শ্বকে এমন নিবিড়ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন, যা কচিৎ লোকের ভাগ্যেই জুটেছে। একটু দেরিতে হলেও লেখক যে তাঁর সেই পরিচয়কে আমাদের কাছে খুলে ধরেছেন, তার জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এই গ্রন্থ থেকে কৌতূহলী পাঠক রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারবেন সন্দেহ কি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, রবীন্দ্র জীবনের স্বাভাবিক গতিটাও যেন লেখকের দেখার গুণে এখানে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। এ বইটি থেকে পাঠকদের বোধ হয় সেইটেই আসল লাভ।

কিন্তু এখানে শিল্পী শুধু ছবির পরে ছবি এঁকেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দেন নি। সাহিত্য-সৃষ্টির উপযুক্ত বিষয়বস্তু পেয়েও কেন যে লেখক ভাষার প্রতি এমন উদাসীন থাকতে পারলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ৭২।৫৯

অনুবাদ

কালিদাসের শকুন্তলা—অনুবাদক—শর-জিৎ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—চিরায়ত সাহিত্য, ১৬ এস যোগেন্দ্র লেন, কলিকাতা ২৯। দাম ৫.৭৫ নয়া পয়সা।

কালিদাসের শকুন্তলার পরিচয় ভারত-বর্ষের পাঠকদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে। দেশবিদেশের মনীষীরা পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করেছেন, এ সংবাদ আজ সর্ব-জনবিদিত। বাঙলা ভাষায় শকুন্তলা কাহিনীকে অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায় তার একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। শরজিৎ দাশগুপ্ত সে অভাব পূরণ করলেন। অনুবাদ স্বচ্ছ সরল বললে যথেষ্ট হয় না, একেবারে ঘরোয়া কথা-বার্তার আমেজ এখানে এসে পড়েছে পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনে। তার ফলে অবশ্য অনেক নাটকীয় মুহূর্ত হালকা হাওয়ায় ভেসে গেছে। প্রয়োজনমতো আরও একটু গাম্ভীর্য বজায় রাখলে অনুবাদক হয়তো ভালো করতেন। অনুবাদের চেয়েও প্রশংসনীয় তাঁর সম্পাদনা। শকুন্তলা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তিনি তথ্যের জোগান দিতে চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থে। বিশেষ করে এই কারণেও এই গ্রন্থটি বাঙালী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। এ-সঙ্গে ত্রিবর্ণ ও এক বর্ণ কয়েকটি প্রাচীন ছবি যোজনা করে প্রকাশক বইটির অঙ্গ-সজ্জা নিখুঁত করেছেন। শিল্পী গোপাল ঘোষের আঁকা প্রচ্ছদপট ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সুন্দর। ৭৬।৫৯

ছোট গল্প

বিয়ের প্রুফ বউ—শিবরাম চক্রবর্তী। কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্য দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

এগারোটি গল্পের সংকলন। শিবরাম চক্রবর্তীর পূর্বকৃতিত্ব এই এগারোটি গল্পের মধ্যে অব্যাহত। তাঁর নিপুণ বাক্-বিন্যাস তাঁর যমক ও অনুপ্রাসের বিস্ময়কর প্রাচুর্যে উজ্জ্বল। এই গল্পগুলিতেও সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ এবং বহু-বর্ণান্বিত। এই সংকলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। দ্রুতনিশ্বাসে বর্ণিত এইসব গল্প ছোট গল্পের নিয়ম অনুসারে ছোট এবং গল্প। নিরবচ্ছিন্ন এবং পরিণতি-নির্ভর। উচ্চকিত অথচ পরিস্রুত হাস্যরস-রচনায় শিবরাম চক্রবর্তী বর্তমানে অন্যতম অগ্রণী লেখক। সেই ক্ষমতা আলোচ্য গ্রন্থের অনেকগুলি গল্পেই প্রবহমান।

একাধারে বাক্‌বিস্তার ও বাক্‌সংযমের জন্য এই বইখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, একথা বলা বাহুল্য। এ দুয়ের আড়ালে যে-চরিত্রায়নের সমস্যা, হাস্যরসিক প্রায়শই সেই সমস্যাটি বিচিত্র উপায়ে সহজ ক'রে তোলেন। এখানেও লেখকের সেই সাবলীল দক্ষতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ বইয়ের নাম-কাহিনীতে নিহিত অথচ অতিক্রান্ত কারুণ্যের যে মর্মস্পর্শী ইঙ্গিতটি আছে, তা কি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে? লেখকও কি তাঁর পরবর্তী রচনার প্রবাহে প্রচ্ছন্ন বেদনাকে হাস্যরসের আরো সন্নিহিত করে তুলবেন না?

(১১৫।৫৯)

ময়নামতীর দীঘি—শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ভবন, আন্দুল, হাওড়া। মূল্য ১.।

দু'টিহীন রঙিন কাগজে ছাপা সাতটি গল্পের সমষ্টি। ময়নামতীর দীঘি গল্পটিতে বলা হয়েছে, জমিদার সন্তানের আশায় বিয়ে করলেন ময়নাকে। ময়নার সন্তানও হল বেশ কিছুদিন পর। কিন্তু সে সন্তানের মুখাকৃতি হল ময়নার পূর্ব-প্রেমিক প্রভাতের মতই। অথচ বিয়ের পর বহুদিন তার সঙ্গে প্রভাতের দেখাই হয়নি। এই শোকে দুঃখে সে দীঘিতে আত্মহত্যা করে। এই গল্পের কোথাও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই এবং ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় না। অন্যান্য গল্পগুলির প্লট আরো তুচ্ছ, নগণ্য। বাংলা গল্পসাহিত্যের এখনও এত দারিদ্র্য দেখা দেয়নি যে, এ ধরনের গল্পগ্রন্থকে প্রশ্রয় দিতে হবে।

১৮০।৫৯

ভ্রমণ কাহিনী

সুন্দরী কাশ্মীর—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়। ১, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। দাম ১-২৫ ন প।

ভ্রমণপথে ভারতীদের সঙ্গে সুখেন জীবনের প্রভৃতির সখ্য হল। ভারতীর মা-বাবা চাইলেন সুখেনের সঙ্গে ভারতীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ভারতী চায় তার জীবনদাকে জীবনসাথী হিসেবে। কিন্তু ইতোবসরে জীবেন তৃতীয়বার বিবাহিতা ও বিধবা এক মুসলমান রমণীর প্রেমে বাঁধা পড়েছে। নাম তার রূপসী। আবার এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে রূপসী কাশ্মীর ভ্রমণের কথা। গল্পের প্লট অবাস্তব, গাঁথুনি কাঁচা। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কেও লেখকের কোন ধারণা নেই। একের সঙ্গে আরেকের জোড়াতালি দিলেই সাহিত্য হয় না। এছাড়া রবীন্দ্র-নাথ থেকে উদ্ধৃতিগুলিও যথাযথ হয়নি। ছাপায় ভুল আছে। প্রচ্ছদপট অশোভন।

১৫২।৫৮

তুষারতীর্থে—শ্রীঅনিলবরণ চৌধুরী। শ্রীতারামঠ, ৬-এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলকাতা—২৬। দাম তিন টাকা।

লেখক তারামঠের সাধুবাবা এবং অপর এক সংঘভ্রাতার সাথে প্রায় চৌদ্দ বছর আগে কাশ্মীরের তুষারতীর্থ অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন—কাশ্মীরের কথা, সেই তীর্থ-যাত্রার কাহিনী এবং বিশেষ করে তুষারতীর্থ অমরনাথ যাত্রার রোমাঞ্চকর বিবরণ লেখক

বর্তমান গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখক কাশ্মীর দর্শন করেছিলেন; বর্তমানের মতো পাঠানকোট দিয়ে যাবার ব্যবস্থা তখন ছিল না—তিনি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মরী হয়ে কাশ্মীর প্রবেশ করেছিলেন, সে পথটা এখন অবশ্য পাকিস্থানী এলাকায়। সেদিনের কাশ্মীর আর আজকের কাশ্মীরের চেহারায় রাজনীতিগত প্রভেদ থাকলেও নিসর্গ চেতনায় তার আবেদন চিরন্তন। এবং তুষার-দেবতা অমরনাথ তাঁর বিশিষ্ট মহিমায় যে কারণে আজিও লক্ষ লক্ষ ভক্তকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করে সেই লৌকিক কাহিনীও লেখকের বক্তব্যে একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। লেখকের বলবার রীতিটি মন্দ নয়, তবে সহযাত্রীদের একেবারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংলাপ ভ্রমণ-কাহিনীর আমেজটিকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ 'তুষারতীর্থ' পাঠ করে আনন্দ পাবেন। গ্রন্থের ভেতরকার আলোকচিত্রগুলি অত্যন্ত সাধারণ, কোনো আকর্ষণ নেই বলা যেতে পারে। ২৭৮।৫৯

উপন্যাস

একটি স্বাক্ষর—রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ৯৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

এক দিকে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির নামে লক্ষ্যহীন আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা, অন্য দিকে সমস্ত বাধানিষেধের গণ্ডি ভাঙিয়া স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন—এই দুই দিকের টানে আমাদের সমাজ-জীবন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। শান্তিতে চিত্তের সংস্থিতি আমরা পাইতেছি না। এই অবস্থা আমাদের পারিবারিক জীবনের উপর নির্মম এবং নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতেছে। রামপদবাবু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে আমাদের বর্তমান পারিবারিক প্রতিবেশের বেদনাময় একটি আলেখ্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে অহঙ্কার। ব্যক্তিগত বিচারকে আমরা বড় করিয়া দেখিতেছি। ইহার ফলে তরুণ-তরুণীদের চিত্তে পরিস্ফীতি জাগিতেছে এবং জীবনে তাহারা সংগতি পাইতেছে না। সমাজ সৌষ্ঠবহীন হইয়া পড়িতেছে। মনুজ ও ঊর্মিলা, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের জীবনকে আদর্শানুযায়ী গঠন করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের কল্পনা। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা কেহ বিদেশে গিয়া সাহেব বনিল, কেহ বা সিনেমা আর্টিস্ট হইবার মোহে জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিল। ছোট হইয়া তাহারা কেহই থাকিতে চায় না। কিন্তু জীবনের মৌলিক ভিত্তি যে চরিত্রশক্তি, তাহা হারাইলে বড় হওয়া যায় কি? পরিণতি পরিতাপজনক হইয়া দাঁড়ায়। নিজের সুখ প্রধান হইলেও অন্যের বেদনাও উপেক্ষার নয়। কিন্তু বৃহত্তর বেদনা আমাদের সমাজকে উজ্জীবিত করিতে পারিতেছে না। আমরা নিজে নিজেদের সুখই শুধু খুঁজিতেছি। মানুষের চিত্তবৃত্তির এখানে পরিস্ফূর্তি নাই। এই বিশ্ব জুড়িয়া আছে এক অনন্ত জীবন—আনন্দময় জীবন, তাকে স্পর্শ করিতে না পারিলে আমরা সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, কর্তব্য, নীতি, প্রেম কিছুই লাভ করিতে পারিব না। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে, জীবনের মূলে এই সত্য উপলব্ধি যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে মহৎ জীবনের আশ্রয়ে আমাদের জীবনের মূলে সেবার সংযম সৌষ্ঠব অর্জন করিতে হইবে। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য দেব এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনকে আমাদের সমাজ-জীবনের সমৃদ্ধি এবং নৈতিক সংগতির আদর্শস্বরূপে আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। রামপদবাবুর আলোচ্য উপন্যাসখানি বর্তমান সমাজে সুষ্ঠু চেতনার জাগরণে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। পাঠক পাঠিকাগণ এই পুস্তকখানিতে চিন্তার অনেক কিছু খোরাক পাইবেন। ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সুন্দর। ২৫৬।৫৯

প্রেমতারা—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রাঃ) লিমিটেড। কলিকাতা ১২। মূল্য ৪্

আলোচ্য উপন্যাসটিতে সার্কাসের মানুষেরাই এর নায়ক-নায়িকা। যদিও নায়িকা প্রেমতারার নামেই উপন্যাসটি লিখিত, আসলে তার একার কথাই বড় হয়ে ওঠে নি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাচ্ছি অজস্র চরিত্র—যারা খেলা দেখায়, লোককে আনন্দ দেয়, কিন্তু তাদের আনন্দ বেদনার খবর কেউ রাখে না। তবে কি তারা যন্ত্র? তা নয় এবং সে কথাই জানতে পারি এই উপন্যাসে। সার্কাসের মানুষের একটি খেলা শিখতে সময় লাগে পনের বছর, অথচ সে খেলা দেখায় সাত-আট বছর। যৌবন গেলেই খেলা ফুরোয়। তখন বড় থেকে মাঝারি সার্কাস। সেখান

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

থেকে রাস্তার ধারে তাঁবু ফেলে খেলা, অবশেষে ছেঁড়া কাপড়ের পাজা খাটিয়ে দু-আনার টিকিটে খেলা দেখানো। এই তাদের জীবন। সার্কাসের লোকজনের ইন্সিওর হয় না। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে, সার্কাস কোম্পানীও দায়ী নয়।

নায়িকা প্রেমতারা সাধারণ সমাজের নীতি আদর্শ মানে না, তবু সে বাধা দেয় মাস্টার গোপীকে, মুক্ত হতে চায় তার লোলুপ কবল থেকে। মনোহরকে সে ভালবেসেছে, সেই তার স্বামী, যদিও তাদের বিবাহ কোন আইনসিদ্ধ ব্যাপার নয়। তারা পরস্পরকে ভালবাসে, আর দলের সবাই তাদের মিলনকে মেনে নিয়েছে অকুণ্ঠিত-চিত্তে; তাই তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করে। সার্কাসের সেরা সম্পদ শার্দুলরাজ বাদশা: তাকে বশ করেছে মনোহর। বাদশার প্রতি অসীম মমতা—সেই বাদশাই মনোহরকে জখম করে অকেজো করে দেয়। উচ্চ আসন থেকে মনোহর নেমে যায় সাধারণ ক্লাউনে। এবার অন্য কাহিনী। প্রেমতারার দুঃসহ জীবন, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। অবশেষে তাদের জীবনের কী করুণ পরিণতি! বিগতযৌবনা প্রেমতারা, তার সৌন্দর্য নিঃশেষিত, আর সে সার্কাস-কুইন নয়; এখন সে বস্তিবাসিনী—জুয়া খেলে, গোপনে মদ বিক্রয় করে। তবু মরে নি তার প্রেম। সেকেণ্ড শোতে প্রায়ই বেড়াতে যায় মনোহরকে নিয়ে। দুজনে ঝগড়া করে, ভাবও হয়। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এই তো মানব-মনের রহস্য।

শুধু প্রেমতারাই নয়, ছোট-বড় নানা চরিত্র, যথা—শশী, চামেলি, মাসী, লাল-বাবু, কেষ্টবাবু, কিরণ, বিমল, টিয়া চন্দনা প্রভৃতি ভিড় করেছে এই উপন্যাসে।

২৬৮।৫৯

পূজাবার্ষিকী

দেবদেউল—দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা—৯। পাঁচ টাকা।

বাঙলা দেশের শিশুদের কাছে দেব-সাহিত্য কুটীরের পূজা-বার্ষিকী পরম সমাদরের জিনিস। মুদ্রণ পারিপাট্যে, অলংকরণ মাধুর্যে এবং রচনা সৌকর্যে এই বার্ষিকী প্রতি বৎসরই কিশোরদের মধ্যে আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তোলে। এ বছরের পূজা-বার্ষিকী 'দেবদেউল' পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে বাঙলার স্মরণীয় ও বরণীয় লেখকদের বহু বিচিত্র রচনা বহু বর্ণের চিত্র শোভিত হয়ে বৃহদায়তনে প্রকাশিত হয়েছে। বড়রা ছোটদের হাতে এমন একখানি মনোরম গ্রন্থ তুলে দিয়ে সমান আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বার্ষিক শিশুসাথী। প্রকাশক: বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স, ৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম ৪৲।

বাংলা দেশে শিশু সাহিত্যের সম্ভার নিয়ে একাধিক শারদীয়া পূজা বার্ষিকী প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বার্ষিক শিশুসাথী অন্যতম। তিনশতাধিক পৃষ্ঠার এই সচিত্র সংকলন গ্রন্থে পঁচাশীজন লেখকের গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা আছে, আর আছে বহু ফটো ও ছবি। শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনাগুণে ও শিশুচিত্ত আকর্ষণকারী সাহিত্যিকদের রচনা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই বার্ষিকী শিশুদের পূজার ছুটির দিনগুলি আনন্দে ভরিয়ে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

চন্দ্রশেখর

কিশোর প্রাণের অভিযান

অভিনেত্রী কানন দেবীর কাছ থেকে বাঙলা ছবি পেয়েছে অনেক। প্রযোজকের

"গীতা-ভাব-দর্শন" ছায়ানাট্যের একটি দৃশ্য। সম্প্রতি এই ছায়ানাট্যটি হিন্দী হাই স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে

ভূমিকা গ্রহণ করে বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পকে তিনি যা দিয়েছেন তার মূল্যও সামান্য নয়।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখনীর আঁচড়ে বঞ্চিত-বিড়ম্বিত নারী-জীবনের যে মর্মবেদনা ঝরে পড়েছে, রজতপটে পরম নিষ্ঠার তারই আলপনা এঁকে দেবার শুচি-শুভ্র প্রেরণাই যেন কানন দেবীকে নিয়োজিত করেছে চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রে। মহৎ সাহিত্য ও শিল্পের এমনি এক যুক্তবেণী রচনার মহৎ সংকল্প নিয়েই তিনি একদিন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"র ধারাবাহিক চিত্ররূপদানে। শরৎচন্দ্রের এই অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম খণ্ডের অংশবিশেষ নিয়ে তৈরী এবং হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত শ্রীমতী পিকচার্স-এর সর্বাধুনিক ছবি "ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি"-তে এই ধারাবাহিক চিত্ররূপ-পরিকল্পনারই একটি সুন্দর সার্থকতা রূপ পেয়েছে।

"শ্রীকান্ত"র প্রথম খণ্ডের ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত দুবার কিশোর প্রাণের দুই আশ্চর্য বিগ্রহ। অজেয়কে জয় করবার ও অজানাকে জানার এক নিঃসীম ব্যাকুলতা এই দুটি কিশোর জীবনকে বার বার লোকালয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে বিপদসঙ্কুল বনে, প্রান্তরে, মাঠে, সর্বনাশা খাল-বিল-দীঘির কোলে। তাদের পায়ে পায়ে ঠেকে বিষাক্ত সাপ, মরণকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে চলে তারা রাত্রির অন্ধকারে। দুর্জয় প্রাণশক্তির বেগে তারা উড়িয়ে নিয়ে চলে প্রকৃতির সব বিভীষিকার ছদ্মরূপ। কিন্তু তাদেরও সর্ববন্ধনহীন মন বাঁধা পড়ে অন্নদাদির নিবিড় স্নেহের কাছে। জনপদ থেকে দূরে জঙ্গলের ধারে বাসা বেঁধেছে সাপুড়ে দম্পতি—শাহ্জী ও অন্নদা। ইন্দ্রনাথ তার অন্নদাদির কাছে নিয়ে যায় শ্রীকান্তকে। একটির জায়গায় দুটি ভাই মিলে যায় অন্নদাদির। তাদের দিদির সব দুঃখই ঘুচিয়ে দিতে চায় ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত। কিন্তু বিয়ে হবার পর দুঃখের হাটেই চলেছে যার জীবনের সব বেচাকেনা, তার দুঃখ কি করে মেটাবে এই দুই অবোধ কিশোর?

নেশার ঝোঁকে সাপ খেলাতে গিয়ে শাহ্জী মারা যায়। তারপর অন্নদাদিও বিদায় নেয় একদিন অলক্ষ্যে তার একমাত্র আপনার জন ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর কাছ থেকে। যাবার আগে দুঃখিনী অন্নদাদি শ্রীকান্তর উদ্দেশে লিখে যায় একটি চিঠি—তার জীবনের দুঃখ-অভিসারের অশ্রুসজল ইতিবৃত্ত। খুনের দায়ে ফেরারী পাপাচারী স্বামীর হাত ধরে কেমন করে এই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-

কন্যা চলে আসে সাপুড়ের জীবনে—চরম লাঞ্ছনা ও নিদারুণ অবমাননার মধ্যে—তাই জানতে পারে শ্রীকান্ত অন্নদাদির চিঠি পড়ে। জানতে পারে এই অবমানিতা মানবীর অন্তর-মহত্ত্ব ও ত্যাগের কথা। কুলত্যাগিনী বলে সমাজ যার কপালে এঁকে দিয়েছে কলঙ্ক-টীকা, তার সিঁথির সিঁদুরেই যে সতীত্বের মহিমা অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই অবজ্ঞাত সত্যের বেদনালব্ধ উপলব্ধিই শ্রীকান্তর জীবনে অন্নদাদির সব চাইতে বড় দান হয়ে থাকে।

মহৎ সাহিত্যের মর্মমূলে সহজ, স্বচ্ছন্দ প্রবেশের গূহাপথটি সূক্ষ্ম রসবোধের মধ্য দিয়ে ছায়াছবির যে পরিচালক অনায়াসে আবিষ্কার করে নিতে পারেন, তাঁর সৃষ্টি দর্শকদের নিমেষে আবিষ্ট করে রাখার ক্ষমতা রাখে। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য এ-ছবিতে সে অনিন্দ্য রস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের অপরূপ উপাখ্যানের মর্মরস ছবিটিতে আবেগমধুর রূপ নিয়েছে সুগ্রথিত চিত্রনাট্যের বাঁকে বাঁকে। ফ্ল্যাশ-

শ্রীমতী পিকচার্সের নবতম অবদান "ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি"-র একটি দৃশ্যে অন্নদাদি ও শাহজীর ভূমিকায় যথাক্রমে কানন দেবী ও বিকাশ রায়

যাকে অন্নদাদির জীবনের করুণ ইতিহাস ছবিতে সুন্দর রসবোধ ও কল্পনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই অংশের অতিরিক্ত সংলাপগুলিও সাহিত্যরসে মণ্ডিত। কাহিনীর নাট্যপরিণতিতে চিত্র-নাট্যকার-পরিচালক শরৎচন্দ্রের অসামান্য সাহিত্যকর্মের মূল রস ও সুরের সঙ্গে দর্শকমনের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে এক বিরল রসাস্বাদনের আয়োজন। শরৎ-সাহিত্যের এই আখ্যানভাগে কিশোর প্রাণপ্রাচুর্যের যে মরমী রূপে প্রকাশ পেয়েছে, পরিচালক চলচ্চিত্রপটে তা'ও সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। নয়নাভিরাম বহির্দৃশ্যপটে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর বাধাহীন, ভয়হীন দুঃসহ অভিযানের চিত্রায়ণ মনোরম। জীবন্ত সাপ নিয়ে ইন্দ্রনাথ ও শাহজীর যে খেলা ও সাহসিকতা দেখানো হয়েছে বাঙলা ছবিতে তা অভূতপূর্ব।

ছ'বি শুরু হবার পর 'মেজদা'কে নিয়ে কয়েকটি দৃশ্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘায়িত। নকল বাঘ 'মেজদার ভাষায় 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার') নিয়ে ত্রাস সঞ্চারের ঘটনাটিও আশানুরূপ কৌতুকজনক হয়ে উঠতে পারে নি। ছোটখাটো এ-রকম দুয়েকটি ত্রুটি বাদ দিলে ছবিটি সামগ্রিকভাবে সুনিমিত ও পরিচ্ছন্ন।

শরৎ-কাহিনীর বালক শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি যেন সত্য সাহিত্য-পরিচয় নিয়ে এ-ছবিতে উপস্থিত হয়েছে। এর জন্যে এই দুই চরিত্রের শিল্পীদের অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় অভিনন্দনযোগ্য। শ্রীকান্তর চরিত্রটির মুক্ত ভাব, তার অপার কৌতূহল, অন্নদাদির জন্য গভীর মমতা নবাগত কিশোর শিল্পী সজল ঘোষ স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সঙ্গে অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনেকদিন পরে কানন দেবী তাঁর পরিণত, স্বভাবসুন্দর অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ-ছবিতে। শরৎচন্দ্রের অপূর্ব নারী-চরিত্র অন্নদাদির মর্মব্যথাটি তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাপুড়ে জীবনের পূর্ববর্তী অংশেও অন্নদার চরিত্রে তিনি যে ব্যক্তিত্ব এবং বেদনার যে অভিব্যক্তি আরোপ করেছেন দর্শকদের কাছে তা

অভিনয়-কৃতিত্বের এক দৃষ্টান্ত নিদর্শন হয়ে থাকবে।

ইন্দ্রনাথরূপী পার্থপ্রতিম চৌধুরীর অভিনয়ে সামান্য আড়ষ্টতার ছাপ থাকলেও মোটের ওপর তা মনোজ্ঞ। ইন্দ্রনাথ চরিত্রের ঘরছাড়া-বাঁধনহারা রূপটি তিনি সযত্নে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। শাহজীর চরিত্রটি বিকাশ রায়ের অভিনয়ে প্রাণবন্ত। শাহজী পরিচয় দেবার আগে অন্নদার উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর চরিত্রটিও তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মেজদারূপী শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রটির মতই কিছুটা অতিরঞ্জিত। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মলিনা দেবী, বীরেশ্বর সেন, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতনুকুমার।

আলোকচিত্র পরিচালনায় জি কে মেহ্‌তা ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখেন। মনোরম চিত্রগ্রহণ ছবির পরিবেশ রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সুরসৃষ্টিতে পবিত্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর কাজ মামুলি ধরনের। রূপসজ্জা ও শিল্পনির্দেশ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। দেবেশ ঘোষের শব্দগ্রহণ যথাযথ। কতকগুলি সংলাপ উচ্চপর্দায় গৃহীত হওয়ার ফলে ছবির স্বাভাবিকতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ ও আঙ্গিক পারিপাট্য উচ্চশ্রেণীর।
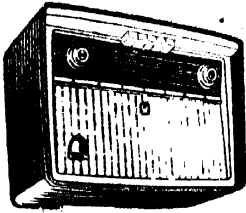
চিত্রালোচনা

যে দুঃসাহস ও জীবনধর্মিতা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তকে বহুর মধ্যে অনন্য করে রেখেছে, তারই প্রতিফলন দেখা যাবে শ্রীমতী পিকচার্সের নতুন নিবেদন "ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি" ছবিতে। বড়দের ছবির পর্দায় এটিই এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন আকর্ষণ। শ্রীকান্তের বাল্যজীবনের এই চিত্রায়ণে দুজন নতুন কিশোর শিল্পীর সঙ্গে চিত্রপ্রেমিকদের পরিচয় ঘটবে। একজন পার্থপ্রতিম চৌধুরী ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় নেমেছেন। অপরজন শ্রীকান্তবেশী সজল ঘোষ। কানন দেবী এ ছবির প্রযোজিকা এবং দীর্ঘ চার বছর বাদে অন্নদাদির ভূমিকায় তিনি আবার ক্যামেরার সামনে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, গুরুদাস, অতনু ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্ব হরিদাস ভট্টাচার্যের প্রাপ্য। পবিত্র চট্টোপাধ্যায় এতে সুরযোজনা করেছেন।

•

এ সপ্তাহে হিন্দী ছবির ডালিতে তিনখানি নতুন ছবির নাম। তার মধ্যে প্রধান গুরু দত্তের "কাগজ-কে-ফুল"—সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে তোলা প্রথম ভারতীয় ছবি। অন্য দুটি হচ্ছেঃ এন সি ফিল্মসের "সাবন" ও বোরিয়া ফিল্মসের "ও তেরা ক্যা কহনা"।

গুরু দত্ত ফিল্মস্‌ প্রাইভেট লিমিটেডের 'কাগজ-কে-ফুল' চিত্রলোকের একটি

গণ-চিত্রমের আগামী ছবি "প্রবেশ নিষেধ"-এর একটি কৌতুককর দৃশ্যে নমিতা সিংহ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
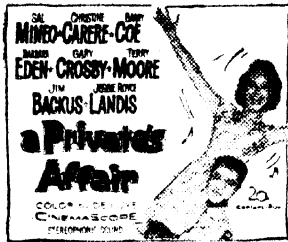
করেছেন। গয়াসুরের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে তোলা হবে তাঁর প্রযোজিত প্রথম বাংলা ছবি "গয়াসুর"। নাম-ভূমিকায় অভিনয়ও করবেন তিনি। রঙ্গমঞ্চে এই চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তিনি ইতিপূর্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্রীনিবাস ফিল্মস রবীন্দ্রনাথের "ছুটি" গল্পটিকে চিত্রে রূপ দেবার পরিকল্পনা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপর চিত্রনাট্য লেখবার ভার দেওয়া হয়েছে। চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবেন নরসিংহ রাও। ফটিকের ভূমিকায় শ্রীমান দীপক নির্বাচিত হয়েছে। হিন্দী ছবির সুবিখ্যাত তারকা বলরাজ সাহনীকে মামার ভূমিকায় নামাবার চেষ্টা চলছে।

যোগ্য পরিচালনায় শান্তিদেব ঘোষ, শিল্প-নির্দেশনায় দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় ও আলোকসম্পাতে তাপস সেনের অনিন্দ্য কৃতিত্ব।

*

আগামী ২রা অক্টোবর থিয়েটার- লাই-ব্রেরীর সভাবৃন্দ কর্তৃক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন কমল মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন সরযূবালা দেবী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থিয়েটার লাইব্রেরীর বাস্তবধর্মী নাটক "তুমি শুধু ছবি" মঞ্চস্থ হবে। সংগীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী।

* * *

সম্প্রতি রঞ্জনার সভ্যগণ কর্তৃক রঙমহল মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের অমর নাটক "সধবার একাদশী" অনিল মুখার্জীর পরিচালনায় চতুর্থবার অভিনীত হয়। বর্তমানে ক্লাসিকাল নাটক অভিনয় আমাদের কমে যাচ্ছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের তিরোধানের পর বাঙলার দর্শকসমাজ এই ধরনের নাটক অভিনয়ের অভাব বোধ করবেন। সেই কারণে রঞ্জনার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

* * *

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মুখার্জি নাট্য-সংস্থা "গন্ধর্ব" রঙমহলে "থানা থেকে আসছি" ও "অঙ্কুর" একাঙ্ক পরিবেশন করেন। নাটক দুটির মূল রস ও আঙ্গিকে দর্শকদের আনন্দদান করে। সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্যের দিক দিয়েও নাটক দুটি উপভোগ্য হয়। "থানা থেকে আসছি"-তে কাজল ঘোষ কণিষ্ক রায় ও শ্যামল ঘোষের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "অঙ্কুর"-এ রত্না চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে।

নাট্যাভিনয়

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর হিন্দী হাই স্কুলের ছাত্রেরা "গীতা-ভাব-দর্শন" নামে একটি নতুন ধরনের ছায়ানাট্য পরিবেশন করেছিলেন স্কুলেরই প্রেক্ষাগৃহে। উদ্দেশ্য ঐ প্রেক্ষাগৃহটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারই সারমর্ম নৃত্যগীতের মাধ্যমে রূপায়িত করেছিলেন কিশোর শিল্পীর দল। কাজটি মোটেই সুসাধ্য নয়। কিন্তু যে ছান্দিক সুষমার সঙ্গে সেদিন তাঁরা এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা সত্যিই অভিনন্দন-যোগ্য। অবশ্য সমগ্র প্রচেষ্টাটির পেছনে ছিলেন কয়েকজন দক্ষ শিল্পী ও কলা-কুশলী। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনের চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিনেই প্রদর্শিত হবে সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার'—এই মর্মে লণ্ডনের বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট একটি খবর পাঠিয়েছেন। উক্ত ইনস্টিটিউটের উদ্যোগেই এই উৎসবটি গত তিন বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যান্য উৎসবের পুরস্কৃত ছবিগুলিই কেবলমাত্র দেখান হয় এই উৎসবে। 'অপুর সংসার'-এর বেলায় তার ব্যতিক্রম করে উদ্যোক্তারা ছবিটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

* * *

আগামী ২রা অক্টোবর থেকে এক সপ্তাহের জন্যে বোম্বাইতে পূর্ব জার্মানীর

রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন অগ্রদূত পরিচালকবৃন্দ। ভৃত্য রাইচরণ ও খোকা বাবুর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে উত্তমকুমার ও দীপ্তি রায়।

ছবির একটি উৎসবের আয়োজন করেছেন একাডেমি সিনেমা নামক একটি প্রতিষ্ঠান। এই উপলক্ষে ওখানকার এক্সেলসিয়র থিয়েটারে তিনখানি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ও অনেকগুলি নামকরা প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হবে। এইসব ছবির মাধ্যমে কুর্ট মায়েটজিগ, কনরাড উলফ্, কার্ট জাং-এলসেন, হার্বার্ট বলমান প্রমুখ বিখ্যাত জার্মান পরিচালকদের শিল্পকীর্তির রস গ্রহণ করবার সুযোগ পাবেন এদেশের চিত্রপ্রিয়রা। বোম্বাইয়ের পর এই চিত্রোৎসব দিল্লি, কলকাতা ও মাদ্রাজে পুনরনুষ্ঠিত হবে।

* * *

গত বছরের মত এবারও শীতের প্রারম্ভে কলকাতায় একটি শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। গত বছরের উৎসবে পনেরোটি বিভিন্ন দেশ থেকে ১১৩ খানি শিশু চিত্র পাওয়া গিয়েছিল এই উৎসবে দেখাবার জন্যে। এবং সেগুলি বাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেখান হয় সাতানব্বইটি প্রদর্শনীতে। প্রায় ৭০,০০০ শিশু এই সব প্রদর্শনীতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকেছে। এবছরে, আশা করা যাচ্ছে, আরো বৃহত্তর ভাবে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানা যাবে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্যালয়ে (১০৭, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪)।

* * *

আগামী ৪ঠা অক্টোবর, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণীর 'বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব' আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার এই উৎসবে ভাষণ দেবেন এবং স্নাতকদের যোগ্যতাপত্র বিতরণ করবেন। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

* * *

গত ২৫ই সেপ্টেম্বর চিত্রজগতে "মামু" নামে সুপরিচিত প্রবীণ শিল্পী ধীরেশচন্দ্র মজুমদার ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার"-এ অপুর শ্বশুরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "খেলাঘর"-এ বিচারকের ভূমিকায় তাঁর সর্বশেষ অভিনয়।

চিঠিপত্র

ভেনিসের প্রত্যাখ্যান

মহাশয়,

৫ই ভাদ্র সংখ্যার বিবিধ সংবাদ বিভাগে আপনি লিখেছেন, "নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেল, প্রাথমিক বাছাইয়ের পর যে চোদ্দটি ছবির মধ্য থেকে ফেস্টিভ্যালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত হয় তার মধ্যে 'অপুর সংসার' স্থান পায় নি।"

আপনার এই উক্তিতে পাঠকগণের হয়ত ধারণা হবে যে, উক্ত চিত্র আন্তর্জাতিক চিত্রসমালোচকদের চোখে আশানুরূপ মান অর্জন করতে পারে নি। সেইজন্য নিম্নে "দি অবজারভার" পত্রিকার ৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্যাট্রিশিয়া বেকার লিখিত "Venetian Lion" শীর্ষক আলোচনার একটি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম। তিনি লিখছেন:

কায়রোতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে কথাকলি নৃত্য প্রদর্শন করছেন অনুরাধা বসু ও তবলা সংগত করছেন তাঁর মা শ্রীমতী বসু।

quirks and fancies of the committees responsible for selecting the films in competition. At Venice this year, for instance, many of the most rewarding items could be found in the so-called Information and Retrospective sections, while many official entries scarcely deserved the honour of a full-dress evening performance. The inadequacy of the official selection was made even more acute by the absence of the third part of Satyajit Ray's Bengali trilogy "The World of Apu," which was denied official entry apparently because the committee felt "it was rather similar to the preceding parts." (Two years ago "Aparajito" won the Grand Prix at Venice!) The extreme illogicality of this attitude became apparent when a small group of journalists and film-makers saw the film privately at a little down--town cinema. "The World of Apu" triumphantly confirms Ray as one of the greatest film talents of the post-war generation, it is a work of outstanding beauty and humanity and is clearly destined for worldwide acclaim and many prizes—but not, unfortunately, at Venice."

ইতি—কুমারকুমার ভট্টাচার্য, নটিং হিলি, লণ্ডন।

"....The best film of the festival was refused by the festival committee. Like its two predecessors, "The World of Apu" by Satyajit Roy, screened privately at a tiny theatre on the Lido, clearly is a truly great work. One was left to the conclusion that the selection committee had felt unwilling to award a second Golden Lion ('Aparajito' won one in 1957) to India. It is sad to think that Venice, which some twenty years ago awarded "Man of Aran" a Golden Lion, has now become bound to interests quite remote from judgements on merit."

এ পর্যন্ত কোনো বিদেশী চিত্রসমালোচক কর্তৃক "অপুর সংসার" সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা পড়ি নি। ইতি

এস চক্রবর্তী,
হ্যাম্পস্টেড, লণ্ডন।

ভেনিস সম্বন্ধে আরো একটি

মহাশয়,—

"অপুর সংসার" এ-বছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাথমিক নির্বাচনে যে কারণে মনোনীত হয়নি তা নিতান্তই হাস্যকর, এবং তা ছবি হিসেবে "অপুর সংসার"-এর গুণাগুণের ওপর কোন আলোকপাত করে না। এই প্রসঙ্গে "দি গার্ডিয়ান" ("ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান"-এর নূতন নাম) কাগজের সমালোচকের মন্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। প্রবন্ধের শিরোনামা হচ্ছে—

Bumbledom In Venice.

[illegible] "Having been on rounds of European film festivals for several years, I should not really be surprised by the strange

দিল্লিতে বাংলা ছবি

মহাশয়,

২৮শে আগস্টের সংখ্যায় অনিমেষবাবুর চিঠি পড়লাম। তাঁর অক্ষেপে তিনি আমার ঈর্ষার কারণ হয়েছেন। কারণ? দিল্লী আর কটকের এক নয় বলে।

মরুবাসী আমরা দিল্লির প্রবাসী বাঙালীরা। বহুবাঞ্ছিত বাংলা ছবির মরীচিকা দেখি। চাতকের মত চেয়ে থাকি বাংলা ছবির ইন্সপেক্টারের জন্য।

বাংলা ছবি পথ ভুলে যদিও বা আসে, আসে বড় অসময়ে। রবিবার বা ছুটির দিনের সাথে সকালে। তাও আবার সাত দিন আগে তার টিকিট নিঃশেষ হয়ে যায়। ছবির ভালো-মন্দের বাছবিচার থাকে না। মরুভূমিতে জল। বিশেষ-অশেষের কেউ প্রশ্ন তোলে না।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—নিয়মিত শোয়ে টাটকা-তাজা বাংলা ছবি কেন দেখান হয় না? নাগপুরে, কানপুরে, এলাহাবাদ ও লখ্নৌতে যেমন হয়ে থাকে। দিল্লিতে বাংলা ছবির বাজার আছে, কিন্তু সুযোগ নেবার লোক নেই। বাঙালী ব্যবসা বিমুখ। কথাটা নেহাত রটনা নয়। তা না হলে এমন হয়। "অপুর সংসার" তাই দিল্লিতে আজও দেখান হল না। ইতি

পুলক দত্ত,
বিনয়নগর, নিউ দিল্লি।

খেলা ধুলা

একলব্য

"এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী। সুয়ো আর দুয়ো। রাজা সুয়ো রানীকেই বেশী ভালবাসতেন। দুয়ো রানীকে যে কখনো-সখনো ভালবাসতেন না, তা নয়। কিন্তু যখনই দুয়ো রানীর আব্দার রাখতেন তখনই সুয়ো রানী যেতেন ভীষণ চটে। সুয়ো রানীর মান ভাঙ্গাতে রাজা গলদঘর্ম হয়ে উঠতেন।"

ছোট বেলায় সুয়ো রানী আর দুয়ো রানীর এইরূপ কথা মা ঠাকুমার কাছে শুনে এসেছি। এখন দেখছি আমাদের ফুটবল খেলাতেও এই সুয়ো রানী, দুয়ো রানীর পালা চলছে। এখানে রাজা আই এফ এ। আর তার দুই রানী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। রাজার অবশ্য আরও অনেক রানী আছে। কিন্তু সাধারণত তাদের মর্যাদা ঘুটে কুড়ুনী, ঘুম পাড়ানী বা ফুল তুলুনী রানীর উপরে নয়। তবে যদি কখন সখনো প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তারাও সুয়ো রানীর মর্যাদা পেয়ে থাকে।

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে কাকে সুয়ো রানী আর কাকে দুয়ো রানীর মর্যাদা দেব? আই এফ এ রাজের উপর দুজনেরই ত প্রায় সমান প্রতিপত্তি। তাই দুজনকেই পাটরানীর মর্যাদা দেওয়া ভাল। এর মধ্যে আবার ছোট বড় আছে। ইস্টবেঙ্গল নিশ্চয়ই ছোট রানী। আর বড় রানীর মর্যাদা মোহনবাগানের। রাজা কোন সময় বড় রানীর প্রতি অনুরক্ত থাকেন, কখনো অনুরক্ত থাকেন ছোট রানীর প্রতি। তা রাজ অন্তঃপুরে অশান্তিও প্রায় সব সময় লেগে থাকে।

যারা আই এফ এ রাজ-পরিবারের খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা সবাই জানেন দুই পাটরানীর মান অভিমানের ঠেলায় আই এফ এ-রাজের অশান্তির অন্ত নেই। এবারকার আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার ব্যাপারেই দেখুন না। আই এফ এ-রাজ ফাইন্যাল খেলার তারিখ ঠিক করলেন। ছোট রানী আব্দার ধরলেন ও তারিখে খেলতে পারবো না। অগত্যা তারিখ বদলাতে হল। এবার চটে গেলেন বড় রানী। 'ওঃ বড় যে সোহাগ দেখছি। ছোট রানীর আব্দার শোনা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' পরের নির্ধারিত তারিখে তিনিও বেঁকে বসলেন। বড় রানী বললেন আমরাও ও তারিখে খেলতে পারবো না। রাজা অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। কিন্তু যে রাজার ভীমরতি ধরেছে তার কথা কোন রানী শোনে? পারবো না ত পারবো না, এখন একেবারেই খেলতে পারবো না। কর তোমার যা করার ক্ষমতা আছে।

রাজার কিছু করার ক্ষমতা নেই বলেই তো রানীদের এত জোর। কিছু করার ক্ষমতা থাকলে রানীরাও সোজা হয়ে যেতেন। শীল্ডের খেলাও নির্ধারিত তারিখে শেষ হয়ে যেত। এখন শীল্ডের খেলা ঝুলে রইল অনির্দিষ্টকালের জন্য। রানীদের মান অভিমানের পালা ঘুচলে নভেম্বরের মাঝামাঝি ফাইন্যাল খেলার ব্যবস্থা হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। কারণ রানীর অধীন দুর্বল রাজার পক্ষে সবল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় নেই।

না। মস্করা নয়। সত্যিই আই এফ এর দুই পাটরানী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ফাইন্যালে উঠলেই এই অশান্তি দেখা দেয়। হয় খেলার তারিখ নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দেয়, না হয় খেলার সময় গণ্ডগোল বাধে, না হয় গণ্ডগোল বাধে খেলার পরে। গতবারও ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা সময় মত অনুষ্ঠিত হয়নি। ফুটবল ফাইন্যালের মীমাংসা হয়েছে ক্রিকেট মরসুমে। ফুটবলের শেষ মুখে একদিন ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হবার পর গোল বাধে চ্যারিটি খেলার প্রশ্ন নিয়ে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বলে আমরা চ্যারিটি ছাড়া ম্যাচ খেলবো না। মোহনবাগান বলে আমরা চ্যারিটি হলে খেলব না। এ যেন দুই সতীনের ঝগড়া। পরস্পরবিরোধী অভিমত। বলা বাহুল্য, আই এফ এ চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবেই খেলার আয়োজন করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খেলাও হয়েছিল চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে। তবে সময়ে নয়, অসময়ে। 'অভিশপ্ত' আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা এবারও হয়তো অসময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ডের উপর বার বার এই 'অভিশাপ' ডেকে আনার জন্য কি আই এফ এ-ই দায়ী নয়? তাদের সিদ্ধান্ত এভাবে পরাজিত হবে কেন? রবিবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ফাইন্যাল খেলার দিন ধার্য করে কেন তাঁরা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দাবীতে সে তারিখ পরিবর্তন করলেন? ২৫শে তারিখে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সেমি-ফাইন্যাল খেলার আগেই ত আই এফ এ-র তরফ থেকে দুটি ক্লাবের কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঐদিন সেমি-ফাইন্যালের নিষ্পত্তি হলে ২৭ তারিখে মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁদের ফাইন্যাল খেলতে হবে। তবু ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে ২৭ তারিখে ফাইন্যাল খেলার বিষয়ে আপত্তি উঠল কেন?

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই অজুহাত তুলে আই এফ এর কাছে আপত্তি জানায় যে, একদিনের মধ্যে তাদের পক্ষে সভ্যদের কাছে টিকিট বিক্রি করা সম্ভব নয়। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে যদি একদিনে সভ্যদের কাছে টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হয় তবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? আর একদিনে টিকিট বিক্রির নজিরও ত এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার একদিনে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। যথারীতি খেলাও হয়েছে। আসল কথা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় নারায়ণ অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ থাকার জন্যই সেমি-ফাইন্যালে তিনি মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। নারায়ণ যাতে একটু সুস্থ হয়ে ফাইন্যাল খেলায় যোগ-দানের সুযোগ পান সেই জন্যই ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে ২৭ তারিখে খেলতে আপত্তি জানান হয়েছিল। আই এফ এর কর্তৃপক্ষ এ কথাটা না জানতেন এমন নয়। তবুও তাঁরা খেলার তারিখ পরিবর্তন করে দুর্বল চিত্ততার পরিচয় দিলেন। ফলে মোহন-বাগান ক্লাবও বেঁকে বসল। তাই আজ আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলাও অসমাপ্ত রইল।

ফাইন্যাল খেলা রবিবার স্থগিত রাখার ব্যাপারে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আবেদনে নারায়ণের অসুখের কথার কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, নারায়ণের অসুস্থতাই খেলা স্থগিত রাখার ব্যাপারে ঐকান্তরে আই এফ এ-কে প্রভাবিত করেছে। অথচ খেলোয়াড়ের অসুস্থতার জন্য খেলা স্থগিত রাখা হয় বিশ্বের সুগঠিত কোন ফুটবল এসোসিয়েশনে এমন নিয়ম নেই। একজন খেলোয়াড় ত দূরের কথা। একাধিক, এমন কি ৫।৬ জন খেলোয়াড়ের অসুস্থতাও কোন ক্লাবের খেলা স্থগিত রাখার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়। যাদের অনুকরণে আমাদের দেশের খেলাধুলার কাঠামো রচিত হয়েছে সেই ইংলণ্ডে তো নয়ই।

ইংলণ্ডে যদি এমন ব্যবস্থা থাকত তবে গত বছর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনার পর তাদেরও খেলা বন্ধ থাকত। মিউনিক বিমান দুর্ঘটনায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের বজায় বার্ণ, টমিন্সন, এডি

আই এফ এ শীল্ডের সেমিফাইন্যালে ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চ্যারিটি খেলায় ইস্ট বেঙ্গল গোলরক্ষক আর গুহকে ডাইভ দিয়ে একটি বল বাঁচাতে দেখা যাচ্ছে। ইস্ট বেঙ্গল এ খেলায় ৪—০ গোলে জয়লাভের করে

কোলম্যান, ডেভিড পেগ, লিওক বেণ্ট, মার্ক জোন্স ও বিলি হুইলম্যানের এই ৭ জন কৃতী খেলোয়াড় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া সত্ত্বেও লীগে এবং এফ এ কাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের খেলা বন্ধ থাকেনি। আর আমাদের দেশে কারো 'ফ্লু' হয়েছে, কেউ জ্বরে পড়েছে, খেলার দিন কারো উপাসনার তারিখ পড়েছে—এইসব খুঁটিনাটি ও তুচ্ছ কারণেও খেলা বন্ধ রাখা হয়। অতীতে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আর একটি ফাইনাল খেলার তারিখ রবিবার পড়ে। কিন্তু রবিবার মোহনবাগানের এক ক্রিশ্চিয়ান খেলোয়াড়ের উপাসনার দিন এই জন্য খেলা স্থগিত রাখা হয়। সেবারও ফাইনাল খেলা নিয়ে যথেষ্ট টালবাহানা হয়েছিল। যেমন এবার হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়ের অসুস্থতায় খেলা স্থগিত রাখার জন্য।

অবশ্য এবার ইস্টবেঙ্গলের জন্য একদিন এবং মোহনবাগানের জন্য একদিন ফাইনাল খেলা স্থগিত থাকায় দুই দলের আবদারে আবদারে এক রকম কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল। তারপর মোহনবাগান ক্লাব একটু অভিমান ত্যাগ করলে অনায়াসেই ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফাইন্যাল খেলা শেষ হতে পারত। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব তাদের অভিমান ত্যাগ করেনি। এদিকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ফুটবল মরসুমও শেষ হয়ে গেছে।

নিরপেক্ষ ক্রীড়ামোদী মাত্রেই যেমন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা স্থগিতের আবেদন সমর্থন করতে পারেননি, তেমন বর্তমানে মোহনবাগান ক্লাবের না খেলার সিদ্ধান্তকে ততোধিক ধিক্কার দিচ্ছেন। কোন কোন মহল থেকে এমনও কথা উঠেছে যে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪—০ গোলে শোচনীয় পরাজিত করবার পর মোহনবাগান ক্লাবের মনে পরাজিত হবার একটা শংকা জেগে উঠেছে। তাই তাদের বর্তমানে না খেলার সিদ্ধান্ত। কিন্তু এমন কিছু ধারণা করার কোন যুক্তি নেই। কারণ খেলার জন্যই মোহনবাগান ক্লাব প্রস্তুত হয়েছিল, সভ্যদের কাছে তাঁদের টিকিট বিক্রি করার পালাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করেছে বলে মোহনবাগানের কাছে তাঁরা পরাজিত হবে না এর কি কোন যুক্তি আছে? তবে মোহনবাগান ক্লাব এক কোপে পাঁঠা না কেটে দুই কোপে পাঁঠা কেটেছে। খেলা স্থগিতের জন্য ইস্টবেঙ্গলের দাবী যেমন আই এফ এ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল, মোহনবাগানের দাবীও তেমন স্বীকৃত হয়েছিল। তারপরও মোহনবাগানের না খেলার কোন সংগত কারণ ছিল না। পরিবর্তিত তারিখে খেলতে পারবে না, মোহনবাগান ক্লাব এই কথা জানিয়ে দিয়ে কবে খেলতে পারবে তা জানাবার জন্য পরেরদিন সময় নেয়। পরের দিন বলে বর্তমানে তাঁদের পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। এ যেন সেই দেনাদার ও পাওনাদারের টালবাহানা। পাওনাদার এলেন টাকার তাগাদা করতে। দেনাদার বললেন, আজ নয় পরশু এসো। পাওনাদার বললেন পরশু টাকা দেবেন ত? দেনাদার বললেন—না, কবে দিতে পারব তা পরশু দিন জানিয়ে দেব। পরশু দিন পাওনাদার এলে শুনলেন দেনাদার একেবারেই টাকা দিতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে মোহনবাগান ক্লাব কবে খেলতে পারবে তা না বলে, বললো বর্তমানে খেলতে পারব না; প্রয়োজন হলে ইস্টবেঙ্গলকে বিজয়ী সাব্যস্ত করে তোমরা শীল্ড দিয়ে দিতে পার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বললো—আমরা না খেলে শীল্ড নিতে রাজী নই। পরস্পরের প্রতি দুই ক্লাবের অনুরাগ এবং উদারতাও কম নয় দেখছি। কিন্তু এ কোন ধরনের উদারতা ক্রীড়ামোদীদের তা অজানা নেই। মোটের উপর ভারতের সুপ্রাচীন আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা নিয়ে দুই প্রাচীন ক্লাব এবং পরিচালক প্রতিষ্ঠান যে কাণ্ড করলেন তাতে কারো সম্মানই বজায় থাকেনি। বিশেষ করে, শেষ-মুখে মোহনবাগান ক্লাব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে ক্লাবের সুমহান ঐতিহ্য বেশ কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে, সন্দেহ নেই।

* * *

আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা ছাড়া ফুটবলের সমস্ত খেলাই শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে কলকাতা ফুটবল মরসুমের উপরও যবনিকা পড়েছে। পয়লা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত ময়দানে খেলাধুলোর আকাল। পুলিস কর্তৃপক্ষের বিধান মত এই সময়ে ময়দানে সমস্ত রকমের খেলাধুলো বন্ধ থাকে। ক্লাব তাবুও বন্ধ রাখতে হয়। ময়দান এলাকায় ক্লাবতাবু ও মাঠের উপস্বত্বভোগীদের যাতে চিরদিনের জন্য জমির উপর স্বত্ব স্বামীত্ব না জন্মায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। আগে এই সময়ে সমস্ত ক্লাব তাবুই ভেঙে

ফেলার ব্যবস্থা ছিল। এখন শুধু ক্লাবের কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয়।

১৫ই অক্টোবরের পর থেকে কলকাতা ময়দানে আরম্ভ হবে ক্রিকেট মরসুম। তবে ফুটবলের দাপাদাপিতে ক্ষতবিক্ষত মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে বেশ কিছু সময় লাগবে। আর ভিজে মাঠ ভাল মত শুকিয়ে না উঠলে তো ক্রিকেট খেলা যাবে না। সুতরাং কিছুদিনের জন্য কলকাতার খেলাধুলোর প্রাণকেন্দ্র ময়দান থাকবে শান্ত।

দীর্ঘস্থায়ী ফুটবল মরসুমের আলোচনা করতে গেলে অনেক কিছুই লিখতে হয়। ৬ মাসের মধ্যে লীগ ও নক আউটের বহু খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সব খেলাকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনাও ঘটে গেছে। আজ শুধু সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি যে ঘটনা খেলাধুলোর নিয়মনিষ্ঠার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে।

একটি ঘটনা ঘটে উইলিয়ামস ইয়ংগার কাপের ফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে। অপর ঘটনা ঘটে আন্তঃ কলেজ নক আউটে ইলিয়ট শীল্ডের ফাইনাল খেলায়। ইয়ংগার কাপ ফাইনালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল ভবানীপুর ও ডালহৌসী ক্লাব। ইলিয়ট শীল্ড ফাইনালে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যাদবপুর পলিটেকনিক ও আশুতোষ কলেজ। ফাইনাল খেলার শেষে দুটি ক্ষেত্রেই দুই পরাজিত পক্ষ ডালহৌসী ক্লাব ও আশুতোষ কলেজ রেফারীর বিরুদ্ধে কারিগরি অভিযোগ করে পুরস্কার বিতরণের সভা বর্জন করেছে। বিজিতের পুরস্কার গ্রহণ করেনি। খেলার মাঠ শুধু ক্রীড়া-ক্ষেত্রই নয়। নিয়মনিষ্ঠা, ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার শেখারও এখানে অনেক কিছু আছে। আজ ডালহৌসী ক্লাব এবং আশুতোষ কলেজ যে বিজিতের পুরস্কার গ্রহণ করলো না এটা কি অবাধ্যতা নয়। এ ক্ষেত্রে আই এফ এ-র কি কিছুই করণীয় নেই? এসব ক্ষেত্রে আই এফ এ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না বলেই আজ খেলাধুলোর ক্ষেত্র থেকে শালীনতা ও নিয়মনিষ্ঠা ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। আশা করি আই এফ এর কর্তৃপক্ষ কথাটা ভেবে দেখবেন।

• • •

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রিয়জন-বিয়োগ চিরদিনই বেদনাদায়ক। পরিণত বয়সেও কারো মৃত্যু হলে প্রিয়জন ব্যথা অনুভব করে। আর অপরিণত বয়সে মৃত্যু হলে তো কথাই নেই। সে ব্যথা আরও বেশী করে বুকে বাজে যদি অপরিণত বয়সে এবং অস্বাভাবিকভাবে কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

খেলোয়াড় বা ক্রীড়াবিদ্ দর্শকমাত্রের কাছেই প্রিয়। দেশজোড়া তাদের জনপ্রীতি। কয়েক মাস আগে ইস্টার্ন রেলের উঠতি ফুটবল খেলোয়াড় অসীম সোমের অকাল মৃত্যুতে বাঙলার ক্রীড়ামহলে কি পরিমাণ শোকের ছায়া নেমে এসেছিল তা কারো অজানা নেই। সম্প্রতি আরও তিনজন ক্রীড়াবিদের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এবং অস্বাভাবিকভাবেই এরা অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতার পুলিস ক্লাবের খেলোয়াড়। নাম উইদার্স। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড় কোলী স্মিথ। আর তৃতীয় ব্যক্তি গ্রীসের একজন সাঁতারু। নাম জ্যাসন জিরগানাস।

ইনস্পেক্টর উইদার্স ছিলেন ক্যালকাটা পুলিস ক্লাবের একজন নামকরা হকি খেলোয়াড়। ফুটবল এবং রাগবী খেলাতেও তার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। একজন অ্যাথলীট হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে ক্যালকাটা মাঠে রাগবী খেলার সময় আঘাত পেয়ে তিনি দুইবার মাটিতে পড়ে যান। খেলার শেষে তিনি পুলিস তাঁবুর মধ্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উইদার্সকে পুলিস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসতে পারেননি। পরের দিন তার জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কোলী স্মিথের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে লণ্ডনে এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে। তিনজন ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স, টম ডিউডনে ও কোলী স্মিথ মোটরযোগে যাচ্ছিলেন ক্রিকেট মাঠে। সোবার্স গাড়ি চালাচ্ছিলেন এমন সময় এক মালবাহী ভারী লরির সঙ্গে মোটরের সংঘর্ষের ফলে তিনজনই গুরুতর ভাবে আহত হন। তখনই তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুদিন পরে কোলী স্মিথ মারা যান। তার শবদেহ লণ্ডন থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্মিথকে অন্তিম শয্যায় সমাহিত করা হয়েছে।

গ্রীসের সাঁতারু জ্যাসন জিরগানাস সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন আইসল্যাণ্ড থেকে সাঁতার কেটে স্কটল্যাণ্ডে পৌঁছবার পথে। দীর্ঘ ষোল ঘণ্টা সাঁতার কাটবার পর তিনি যখন স্কটল্যাণ্ড থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ছিলেন তখন এক প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে তিনি তিন মাইল পিছিয়ে যান। তার পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব হয় না জলের মধ্যেই তার জীবনের খেলা শেষ হয়। জিরগানাস একাধিকবার ইংলিশচ্যানেল অতিক্রম করেছেন, লেক উইণ্ডারমেয়ারও পার হয়েছেন। তাছাড়া ইউরোপে ইনি একজন দক্ষ সাঁতারু হিসাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। অথচ আইসল্যাণ্ড থেকে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত ২২ মাইল সাঁতার কাটবার সময় জিরগানাসের মৃত্যু হল! উইদার্স, কোলী স্মিথ ও জিরগানাস কেউই পরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হননি। স্মিথ তো একেবারে কাঁচা বয়সেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সব ঘটনাকে নিয়তি বলেই মানতে হবে।

দেশী সংবাদ

২১শে সেপ্টেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শারদ অধিবেশনের প্রথম দিনে সমস্ত শারদ শুচীতার অপমৃত্যু ঘটে। হট্টগোলের মধ্যেই এই উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষিত দিনের পাট উত্তোলন, মধ্য অংকে অশ্রাব্য গালিগালাজ, অসহিষ্ণু উত্তেজনা, জুতা ছোড়াছুড়ি, অবশেষে চরম বিশৃংখলার মধ্যে যবনিকা-পাত।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল আজ মাদ্রাজে বলেন, ভারতে আমেরিকার ৫০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা করিতেছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর—সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল থিমায়া অদ্য রাত্রিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, সেনাবাহিনী লাডাক এলাকার ভারত-চীন সীমান্তের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

চীনা সৈন্যগণ সিকিমের সীমান্তে মোতায়েন হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বস্তুত নাথুলা হইতে চীনা সৈন্যগণকে এখন দেখা যায়।

২৩শে সেপ্টেম্বর—অদ্য সকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীশশাংকশেখর সান্যাল সংবিধানগত গুরুত্বপূর্ণ এক বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া সরাসরি এই অভিযোগ করেন যে, রাজ্যের মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকার অধিকার হারাইয়াছেন। কারণ মন্ত্রীরা জনস্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং ন্যায় ও আদর্শের দিক দিয়া নিজেদের শপথের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই।

২৪শে সেপ্টেম্বর—নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, আলমোড়া জেলার ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি ডিপপোট হইতে মাইল দুয়েক মাত্র দূরে তাকলাকোটে চীনা সৈন্যরা ঘাঁটি নির্মাণ করিতেছে। তাহারা এই স্থানে পরিখা খনন করিতেছে এবং মাটির নিচে অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

সরকারী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আলোচনায় প্রকাশ যে, খাদ্য আন্দোলন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় পুলিশী ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রশ্নটি এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সাম্প্রতিক হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বিরোধী পক্ষের দশটি মুলতুবী প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধী সদস্যরা ভোট গণনার দাবি উঠাইলে মোট দশটি মুলতুবী প্রস্তাবের উপর একত্রে ভোট গণনা করা হয় এবং উহা ২০—৪০ ভোটে না-মঞ্জুর হয়।

অদ্য নয়াদিল্লিতে জানা গিয়াছে যে, বর্তমান মাসের মধ্যে বারাউনিতে সরকারী তৈল শোধনাগারের জন্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং সোভিয়েট সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—অদ্য নবীননগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পরিকল্পনা সাব কমিটির রিপোর্ট আলোচনাকালে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত হন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—ভারতের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বড় বড় ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশনের মুনাফা ও সর্বোচ্চ সীমা শতকরা দশ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা চার ভাগ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে বলিয়া শ্রীশাস্ত্রী জানান।

বিদেশী সংবাদ

২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবাবলীর সূত্র ধরিয়া আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন "সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ" সম্পর্কে একটি নূতন বিষয় রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারীভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর—আফগানিস্থান এবং ইরান পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া দিল্লি যাত্রার পূর্বে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য তেহেরানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তিব্বতে এবং ভারত-চীন সীমান্তে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও তিনি ইহাই বলিতে চাহেন যে, ভারত নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিবেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ভারত যে প্রস্তাব করেন, সাধারণ পরিষদ অদ্য উহাকে তাহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে অস্বীকার করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৮৪ বৎসর বয়স্ক ঝানু রাজনীতিক স্যার উইনস্টন চার্চিল স্বীয় নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, চার বৎসরের মধ্যে পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী উত্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবটি অতিমাত্রায় বিস্ময়কর।

উত্তর নাইজিরিয়ায় কানোতে একটি মহিলা জোড়া-লাগা যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কানোতে এই তৃতীয়বার এ ঘটনা ঘটিল।

২৪শে সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী মাসে চন্দ্রে যে রকেটটি প্রেরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, আজ তাহা ভূপৃষ্ঠেই বিস্ফোরিত হইয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

২৫শে সেপ্টেম্বর—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়ক আজ তাঁহার নিজস্ব বাসভবনে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশধারী এক আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়াছেন। ফলে সিংহলের সর্বত্র জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়।

শ্রীহার্ডি আমিয়েস নামক জনৈক বৃটিশ পোষাক বিশেষজ্ঞ সিডনীতে বলেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা কাগজের প্রস্তুত পোষাক পরিধান করিবে। কয়েক মাস ব্যবহারের পর তাহারা উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসলোমন বন্দরনায়ক আজ সকালে প্রায় ৮টার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়ক আজ বেলা ১১টার সময় সিংহলের প্রধানমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর আজ একটি যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে : প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, সর্বাধিনায়কের সংশ্লিষ্ট দলগুলির অনুমোদন পাওয়া গেলে বার্লিন সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা শুরু করা উচিত।

জাপানী পুলিশ আজ এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছে যে, গতকাল মধ্য জাপানে প্রবল [illegible] ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ৮৫১জন নিহত, ৩৯০৭জন আহত ও ১৪৬২জন নিখোঁজ হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশী লোক গৃহহীন হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—৪২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশী সংবাদ

২১শে সেপ্টেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শারদ অধিবেশনের প্রথম দিনে সমস্ত শারদ শুচিতার অপমৃত্যু ঘটে। হট্টগোলের মধ্যেই এই উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষিত দিনের পট উত্তোলন, মধ্যে অনেক অশ্রাব্য গালিগালাজ, অসহিষ্ণু উত্তেজনা, জুতা ছোড়াছুড়ি, অবশেষে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে যবনিকা-পাত।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল আজ মাদ্রাজে বলেন, ভারতে আমেরিকার ৫০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা করিতেছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর—সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল থিমায়া অদ্য রাত্রিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, সেনাবাহিনী লাডাক এলাকার ভারত-চীন সীমান্তের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

চীনা সৈন্যগণ সিকিমের সীমান্তে মোতায়েন হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বস্তুত নাথুলা হইতে চীনা সৈন্যগণকে এখন দেখা যায়।

২৩শে সেপ্টেম্বর—অদ্য সকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল সংবিধানগত গুরুত্বপূর্ণ এক বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া সরাসরি এই অভিযোগ করেন যে, রাজ্যের মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকার অধিকার হারাইয়াছেন। কারণ মন্ত্রীরা জনস্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া নিজেদের শপথের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই।

২৫শে সেপ্টেম্বর—নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, আলমোড়া জেলার ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি ত্রিপিঠ হইতে মাইল দুয়েক মাত্র দূরে টাকলাকোটে চীনা সৈন্যরা ঘাঁটি নির্মাণ করিতেছে। তাহারা এই অঞ্চলে পরিখা খনন করিতেছে এবং মাটির নিচে অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

সরকারী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ওয়াকিবহাল মহলের আলোচনায় প্রকাশ যে, খাদ্য আন্দোলন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় পুলিসী ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রশ্নটি এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সাম্প্রতিক হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বিরোধী পক্ষের দশটি মুলতুবী প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধী সদস্যরা ভোট গণনার দাবি উঠাইলে মোট দশটি মুলতুবী প্রস্তাবের উপর একত্রে ভোট গণনা করা হয় এবং উহা ২০—৪০ ভোটে না-মঞ্জুর হয়।

অদ্য নয়াদিল্লীতে জানা গিয়াছে যে, বর্তমান

মাসের মধ্যে বারাউনিতে সরকারী তৈল শোধনাগারের জন্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং সোভিয়েট সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—অদ্য নবীননগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পরিকল্পনা সাব কমিটির রিপোর্ট আলোচনাকালে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত হন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—ভারতের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বড় বড় ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশনের মুনাফা ও সর্বোচ্চ সীমা শতকরা দশ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা চার ভাগ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে বলিয়া শ্রীশাস্ত্রী জানান।

বিদেশী সংবাদ

২১শে সেপ্টেম্বর—শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবাবলীর সূত্র ধরিয়া আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন "সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ" সম্পর্কে একটি নূতন বিষয় রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারীভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর—আফগানিস্থান এবং ইরান পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া দিল্লী যাত্রার পূর্বে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য তেহারানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তিব্বতে এবং ভারত-চীন সীমান্তে সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও তিনি ইহাই বলিতে চাহেন যে, ভারত নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করিবেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ভারত যে প্রস্তাব করেন, সাধারণ পরিষদ অদ্য উহাকে তাঁহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে অস্বীকার করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৮৪ বৎসর বয়স্ক ঝানু রাজনীতিক স্যার উইনস্টন চার্চিল স্বীয় নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, চার বৎসরের মধ্যে পুরোপুরি নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী উত্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবটি অতিমাত্রায় বিস্ময়কর।

উত্তর নাইজিরিয়ায় কানোতে একটি মহিলা জোড়া-লাগা যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কানোতে এই তৃতীয়বার এ ঘটনা ঘটিল।

২৪শে সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী মাসে চন্দ্রে যে রকেটটি প্রেরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, আজ তাহা ভূপৃষ্ঠেই বিস্ফোরিত হইয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

২৫শে সেপ্টেম্বর—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়ক আজ তাঁহার নিজস্ব বাসভবনে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশধারী এক আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়াছেন। ফলে সিংহলের সর্বত্র জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়।

শ্রীহার্ডি আমিয়েস নামক জনৈক [illegible] পোশাক বিশেষজ্ঞ সিডনীতে বলেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে সকল বয়সের ছেলেমেয়েরা কাগজের প্রস্তুত পোশাক পরিধান করিবে। কয়েক মাস ব্যবহারের পর তাহারা উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসলোমন বন্দরনায়ক আজ সকাল প্রায় ৮টার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়ক আজ বেলা ১১-৩০টার সময় সিংহলের প্রধানমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর—আজ একটি যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে: প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অনুমোদন পাওয়া গেলে বার্লিন সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা শুরু করা উচিৎ।

জাপানী পুলিস আজ এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছে যে, গতকাল মধ্য জাপানে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় অন্ততপক্ষে ৮৭২জন নিহত, ৩৯৩৭জন আহত ও ১৫৬২জন নিখোঁজ হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশী লোক গৃহহীন হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—৫২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

দিনের পর দিন প্রতিদিন...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে সুন্দর করে তোলে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সরের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে...রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 26th September, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৮

ফ্যা শা ন
নিপুণতা...... ...... নক্সা......
উৎকৃষ্টতা...... সুরুচি...... সৌন্দর্য......
যারে পরশ দিয়ে যায় না ধরা
চেষ্টা করলেও 'ফ্যাশান'কে ঠিক পুরোপুরি বোঝানো যায় না। স্পর্শ দিয়েও এ-কে ছোঁয়া যায় না। তবে এ-ও সত্যি দেখা মাত্র এ-কে আপনি বুঝতে পারেন। বিশেষ করে যখন আপনি আসেন 'হ্যাণ্ডলুম হাউসে', ফ্যাশানকে চেনা যেন খুবই সহজ হয়ে ওঠে।
ভারতের সেরা আর সুন্দর তাঁতের কাপড় পেতে হলে—
শীততাপনিয়ন্ত্রিত
"হ্যাণ্ডলুম হাউস"
ফ্যাশন নামের অগ্রদূত
২নং লিনড্‌সে ষ্ট্রীট, কোলকাতা-১৬
★ সোনার কারুকার্যভরা একখানি মনভোলানো বিরল শাড়ী—হ্যাণ্ডলুম হাউসের ডিজাইন সেণ্টারের তৈরী।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র
GOVERN
LIBRARY
Behar

কাপড়
ভাল ধোওয়ার
গোপন কথা
বিনা আয়াসে, কাপড় না আছড়ে, যাবতীয়
বস্ত্র পশম, সিল্ক, রেয়ন ও তুলো—এই সস্তা উপায়ে
আরও ভালভাবে পরিষ্কার করুন···
আরও শুভ্র করে, নতুনের চাইতে উজ্জ্বল করে।
...দীপ ব্যবহারের মধ্যে
সবরকম জিনিস ধোওয়ার এই সাবান
দীপ ব্যবহারে একই ভাবে সক্ষম
চীনে মাটির বাসনপত্র, পোর্সিলিনের
জিনিস, মেঝে ও পরিষ্কার করা চলে।
• বিশুদ্ধ গুঁড়ো সাবান
• অপটিক্যাল ব্রাইটনার
• সোডা বিহীন
দীপের সহিত
বিনামূল্যে
দেওয়া হয়
Godrej
DIP
PURE POWDERED WASHING SOAP
১০০% ভারতীয় পরিচালনা ও মূলধন
১ পাউণ্ড
ও ৩ পাউণ্ড
কার্টন
গোদরেজ সাবান নির্মাণে শ্রেষ্ঠ নাম
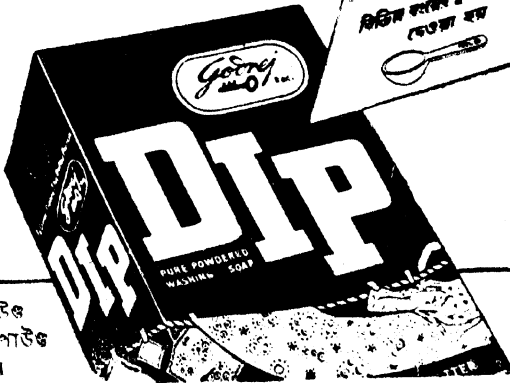
এবার
পুজোয়
রঙ-বেরঙের
বিনীর কাপড় চাই
বাড়ীর সবার জন্যে বিনীর কাপড় পাবেন। সুন্দর সিল্কের শাড়ি, আপনার ও আপনার ছেলে-মেয়েদের জন্যে রঙ-বেরঙের কটসউল, চমৎকার সুতীর শার্টিং, ক্রেপ, ড্রিল, তসর ও স্যুটের কাপড়—যার যেমনটি চাই। আজই বিনীর কাপড়ের দোকানে গিয়ে দেখে আসুন।
দি বাকিংহাম এণ্ড কর্ণাটিক কোম্পানী লিমিটেড
দি বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্ : বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ

পূজা
আসিতেছে!
আপনার
বাড়ীতে
যথেষ্ট
ডালডা
এনে রাখুন।
ডালডা

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 26th September, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৮ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

বাঙালীর ইতিহাসে সন্ধিস্থান

কয়েকদিন আগে হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় "The Decline of the Bengalees" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দিল্লী নগরীর বাঙালী সমাজের অবস্থা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সামগ্রিক বাঙালী সমাজ সম্বন্ধেও অনেক কথা তাহাতে আছে এবং কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। বাঙালী সমাজের বর্তমান দুরবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া লেখক একটি সূত্র ও একটি বিবর্তনের ধারা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, বাঙালী সমাজকে যেন একটু জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেই তৎকালীন ইংরাজ সরকার ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে অপসারিত করিয়াছিলেন—আর সেই হইতেই বাঙালীর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা হ্রাস পাইতে থাকে। এখন লেখকের সবগুলি মন্তব্য সম্বন্ধে একমত না হইয়াও বর্তমান মন্তব্যটি স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কোন সমাজের অবনতির একটিমাত্র কারণ হইতে পারে না কিম্বা একটিমাত্র ঘটনা বা তারিখ দ্বারাও অবনতির সূচনা চিহ্নিত করা যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু একটি বিষয়ে লেখকের সঙ্গে আমরা একমত। যে-সব কার্যকারণের ফলে বাঙালী সমাজের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা হ্রাস পাইতে থাকে, কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী অপসারণ তাহাদের অন্যতম প্রধান। বিষয়টির গুরুত্ব সমকালেও কোন কোন লোকের মনে উদিত হইয়াছিল যদিচ উভয় বঙ্গের পুনর্যোজনার আনন্দকে অতিক্রম করিয়া তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'A Nation in the Making' গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার একটি খসড়া আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হইবার সংবাদ আসিল। জনতা বেঙ্গলী পত্রিকার অফিসে আসিয়া রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে একখানা গাড়িতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া গোলদীঘির দিকে চলিল। এবারে সুরেন্দ্রনাথের ভাষাতেই শোনা যাক। "সেখানে উপস্থিত হইয়া বিষম উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিলাম। তখনও আলো জ্বলে নাই, সব অন্ধকার, আমরা কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, সকলে উল্লাস চীৎকার করিতেছিল, কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছিল। একটি কণ্ঠস্বর শুধাইল—দিল্লীতে রাজধানী সরাইবার বিষয়ে আপনার মত কী? আমি বলিয়া উঠিলাম, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, আমার আকস্মিক জবাব মূলত সত্য।"

রাষ্ট্রগুরু বলিয়াছিলেন যে, পরবর্তী ঘটনা তাঁহার সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী কালেরও যে পরবর্তী কাল আছে। আমরা সেই পরবর্তী কালে বাস করিতেছি, আর বুঝিতেছি এই ঘটনা বাঙালীর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা হ্রাসের একটি সূত্রপাতস্থান।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে গোড়া হইতেই কলিকাতা ভারতের রাজধানী ছিল আর স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিল। বৈষয়িক ব্যাপারে অর্থাৎ ব্যবসায়ে ও চাকরিতে বাঙালীর বিশেষ সুযোগ সেই আমলে আরম্ভ হয়। তৎকালীন কোম্পানির রাজত্বের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ও শ্রেষ্ঠ চাকুরে ছিল প্রধানত বাঙালী। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বাঙালীর হাত হইতে ব্যবসা চলিয়া যাইতে শুরু করিল। ইহার কারণ ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে অস্বস্তিবোধ ও আরামপ্রিয়তা। ব্যবসায়ে অর্জিত বিপুল বিত্তে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীদের উত্তরপুরুষ জমিদার হইয়া বসিল (প্রধানত কলিকাতায়)। বাঙালী ব্যবসায়ীর স্থান অবাঙালী অধিকার করিয়া লইতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাহার হাতে শ্রেষ্ঠ চাকুরীগুলি ছিল। ইহার কারণ, ইংরাজি শিক্ষায় বাঙালীর অগ্রসরতা—আর কলিকাতায় রাজধানী। তারপরে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কালক্রমে বাঙালীর চাকুরীক্ষেত্রে যে প্রাধান্য ছিল, তাহাও গেল। যে-সমাজের উন্নতির মূলে ছিল চাকুরী ও ব্যবসায়, তাহা লোপ পাইলে তাহার প্রাধান্য হ্রাস পাইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

কলিকাতায় গোড়া হইতে ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে বৈষয়িক ব্যাপারে বাঙালী যেমন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, তেমনি সর্বভারতীয় দৃষ্টিও সে লাভ করিয়াছিল। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ একাধারে সেই সর্বভারতীয় দৃষ্টির সৃষ্টি ও স্রষ্টা। কিন্তু কলিকাতার সর্বভারতীয় সত্তা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সর্বভারতীয় দৃষ্টিও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এখনও যে তাহা সাকল্যে লোপ পায় নাই, তাহা পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণের কল্যাণে। কিন্তু যদি কালক্রমে সেই সর্বভারতীয় দৃষ্টিও লোপ পায়, তবে বাঙালীর হাতে আর অবশিষ্ট থাকিবে কী? এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃথা জল্পনা না করিয়াও বলা যায় যে, কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তরকরণ বর্তমান বাঙালীর ইতিহাসের একটি সন্ধিস্থান। যিনি নিরাসক্তভাবে এই ইতিহাস আলোচনা করিবেন, বিষয়টির উপরে তাঁহাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতেই হইবে।

প্রসঙ্গত

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। সেজন্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে শস্যোৎপাদন কি পরিমাণে বেড়েছে তার একটা সরকারী হিসাব অবশ্য আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যশস্যের মূল্য উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে এবং আজ মানুষের ক্রয়শক্তির উর্ধ্বে উঠে গেছে। এর দুটো কারণ সম্ভবঃ হয় সরকারী হিসাব ভুল, নয় সরকারী দুর্বলতা ও অব্যবস্থা। কারণ যাই হোক, এ নিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের সর্বত্র উত্তেজনা এবং অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। তার জন্যে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী জৈনকে পদত্যাগ করতে হল। বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিল এই সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করছেন। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কোনো উপায় নেই। এবং তার জন্যে দরকার উন্নততর সেচ ও সার ব্যবস্থা এবং আবশ্যক হলে কৃষিব্যবস্থারও উন্নয়ন। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা ভাবতে হচ্ছে, পতিত জমিগুলি কাজে লাগানো। এর কোনোটাই এলোমেলো করে করবার নয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা দরকার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রেট ব্রিটেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃটেন কৃষিপ্রধান দেশ নয়, শিল্পপ্রধান। তথাপি যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধপরবর্তী অনিশ্চিত অবস্থায় তাদের অন্নে স্বাবলম্বী হবার কথা ভাবতে হয়েছিল। সেখানে সেজন্যে একটা কৃষি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সেই সঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির ম্যাপও তৈরি করা হয়।

ভারতবর্ষেও জরিপের ম্যাপ রয়েছে। তাতে আবাদী এবং পতিত জমির নক্সাও আছে। কিন্তু জমিগুলি কেন পতিত আছে তা নির্ণয় করা হয়নি। নানা কারণে জমি পতিত থাকতে পারে। কোথাও জলের অভাবে, কোথাও জলে ডুবে থাকার ফলে, কোথাও বা মালিকের ঔদাসীন্যে জমি পতিত থাকে। কিন্তু এই দুর্দিনে কোনো মালিকই শুধু খেয়ালের বশে জমি ফেলে রাখে না। তারও নিশ্চয় একটা কারণ আছে। তা নির্ণয় করতে হবে। অন্য জমিগুলিও যাতে কৃষিযোগ্য হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। নচেৎ শুধু অনাবাদী জমির পরিমাণের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত ফসলের পরিমাণ জানিয়ে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। সরকারী পরিসংখ্যান সর্বদিকে যথাসম্ভব নিখুঁত না করতে পারলে আমাদের সমস্যার যথাযথ পরিমাণ এবং তার সমাধান কোনোটাই নির্ণয় করতে পারা যাবে না।

*

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের যে বন্যা তার অনেকখানি অতিবর্ষণের জন্যে, আর কিছুটা দামোদর এবং ময়ূরাক্ষীর বাঁধের জন্যে। এবার অত্যন্ত বর্ষণের ফলে নদী-নালা, খাল বিল সমস্তই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। মাঠ ডুবে গেছে, গ্রামও ডোবে-ডোবে, যখন এই অবস্থা তখন দামোদর এবং ময়ূরাক্ষীর বাঁধ থেকে জল ছাড়া হতে লাগল। এবং এই উভয় দিকের চাপে জন-সাধারণের অবস্থা সংগীন হয়ে উঠল। আরামবাগ মহকুমা এইভাবেই বন্যাপ্লাবিত হয়েছে। তার উত্তরে ডি ভি সি'র সহকারী ইন-ফর্মেশন অফিসার জানিয়েছেন, তাঁরা যা-কিছু করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সেচ-বিভাগের অনুমোদনক্রমে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই করেছেন। অর্থাৎ ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর যখন 'নিরাপদে' আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া চলত, তখন মাত্র এক লক্ষ কিউসেক ছেড়েছেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর যখন বর্ধমান সদরঘাটের জল বিপদ-রেখার মাত্র দেড় ফুট নিচে তখন প্রায় চল্লিশ হাজার কিউসেক ছাড়েন এবং পরের দিন সন্ধ্যায় চৌদ্দ হাজার কিউসেক। অতি উত্তম। কিন্তু সরকারী অনুমোদন এবং সতর্কতার সার্থকতার পরিমাপ যদি জন-সাধারণের সুখ-দুঃখের মানদণ্ডে করতে হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে যে, এক্ষেত্রে (এবং অন্যক্ষেত্রেও) তা ব্যর্থ হয়েছে।

*

'মারিব' না মরে রাম'! হিন্দীকে জোর করে রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন শ্রীনেহরুর স্পষ্টোক্তির পরও রয়েছে। সম্প্রতি পাঞ্জাব হিন্দীরক্ষা সমিতি স্থির করেছেন, আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে তাঁরা আবার দুই বৎসর পর। আন্দোলন আরম্ভ করবেন। অর্থাৎ আবার একটা অনাবশ্যক অশান্তির সৃষ্টি! শ্রীনেহরু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে-ছেন, এখনও অনির্দিষ্টকাল ইংরাজিই "সহযোগী রাষ্ট্রভাষা" হিসাবে থাকবে। তার পরেও পাঞ্জাব হিন্দীরক্ষা সমিতির আন্দোলন হিন্দীকে কতখানি রক্ষা করবে জানি না, কিন্তু শান্তিরক্ষা করতে পারবে না, অতীত-অভিজ্ঞতা থেকে এ আশঙ্কা প্রকাশ করা যায়। মানুষের মনের উপর জোর চলে না। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর প্রসার হচ্ছে। মাদ্রাজে দক্ষিণ ভারত হিন্দী প্রচার সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন উৎসবে প্রায় দুই হাজার প্রার্থীর সমাবেশ হয়েছিল। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে গত চার বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ প্রার্থী বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়েছেন। এই যে স্রোত ধীরে ধীরে হিন্দীর অনুকূল হচ্ছে, মানুষের মন থেকে হিন্দী-বিরোধিতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে, 'হিন্দী বাঁচাও'-এর ধাক্কায় সেইটেই ব্যাহত হবে।

*

যাঁরা 'হিন্দী বাঁচাও' ধুয়া তুলেছেন তাঁরা আন্দোলন করার চেয়ে ভাষার ঐশ্বর্য-বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিলে আসল কাজ হয়। প্রভুশক্তির ভাষা হিসাবে পরাধীন ভারতের মন ইংরাজির অনুকূল ছিল না। যদিচ ঐশ্বর্যের জন্যে ইংরাজির উপর কখনই অপ্রসন্নতা ছিল না। তার পরিচয় পাওয়া গেল ইংরেজ চলে যাবার পর। সংবিধান রচনার সময় ইংরাজিকে স্থানভ্রষ্ট করার জন্যে যে দৃঢ়তা এবং উদ্যম দেখা গিয়েছিল, দেখতে দেখতে তা ফিকে হয়ে গেল। দাপাদাপি ক'রে তথাকথিত হিন্দী রক্ষা-কারীরা তার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। যেসব অঞ্চল হিন্দী বলে না, বলতে পারেও না, তাদের মন এই জবরদস্তির বিরুদ্ধে উগ্র হয়ে উঠল। আরম্ভ হয়ে গেল অশান্তি এবং উপদ্রব। দেখা গেল, হিন্দীর বিরুদ্ধে তাদের মন ইংরাজির উপর প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। অকস্মাৎ নয়, এই প্রসন্নতা তার মনের গভীরে ছিল।

*

এই ব্যাপারটা শুধু বহু ভাষা-ভাষী ভারতবর্ষেই চলেছে তা নয়। বর্মা, মালয়, সিংহল, ঘানা—যে সমস্ত রাষ্ট্র সম্প্রতিকালে ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে—মনে হয়েছিল সব জায়গায় সেখানেই ইংরেজ-প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ভাষাও অপসৃত হবে। কিন্তু তা হয়নি। বিদেশী শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাষার উপর অপ্রসন্নতাও লুপ্ত হয়ে গেছে। পরাধীনতাকালে ওই সমস্ত রাষ্ট্রে ইংরাজি-শিক্ষিতদের পরানুকরণপ্রিয়তা, দেশীয় সংস্কৃতির উপর বিতৃষ্ণা ও উপেক্ষা এবং জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবধানের ফলে প্রধানত ইংরাজির উপর অপ্রসন্নতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষিতদের মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত এবং স্বাভাবিক হতে লাগল। এই অবস্থা ভারতবর্ষেও ঊনবিংশ শতকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধির ইচ্ছা জাগার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের মন থেকে পরানুকরণপ্রিয়তা লোপ পায়। স্বাধীন ভারত আজ যে তবুও অনির্দিষ্টকাল ইংরাজিকেই সহযোগী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে রাখতে চায় তার কারণ ইংরাজি ভাষার মোহ নয়, প্রয়োজনের তাগিদ। হিন্দী রক্ষাকারীর দল এই সহজ সত্য উপলব্ধি না করে যদি দাপাদাপি চালাতে চায় তাহলে, তার ফলে প্রাদেশিক সংকীর্ণতাই প্রশ্রয় পাবে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৪

দু'জন ভদ্রলোক লেডীজ সীটে বসে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন। মাধুরীকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে।

একজন বললেন, 'আমি তোমাকে তখনই বলেছিলাম ওখানে বোসো না। ও বড় অনিশ্চিত জায়গা।'

তাঁর বন্ধু গম্ভীর স্বরে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন, 'জীবনে সবই তো অনিশ্চিত।'

একথা শুনে মাধুরীর হাসি পেল। একটু আগে তার মনে যে অস্বস্তির ভাব ছিল, সেই ছোট একটু হাসির ঢেউয়ে তা ভেসে চলে গেল। মাধুরী জানলার দিকে সরে গিয়ে দুই বন্ধুর একজনকে বলল, 'বসুন।'

তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন, 'তুমি বোসো।'

'আরে না না, তুমি বোসো।'

আরো বার দুই দুজনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় চলল। তারপর একটু দূরে আর একটা সীট খালি হয়েছে দেখে একজন সেখানে চলে গেলেন। আর একজন মাধুরীর পাশেই বসলেন। এঁদের মধ্যে কোন-জন যে জীবনের সবরকম অনিশ্চয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন আর কে যে তা করতে পারল না। তবে এই অক্ষমতার জন্যে সে যে কোনরকম অস্বস্তি বোধ করল তা-ও নয়।

ট্রামে-বাসে মেয়েদের আলাদা বসবার ব্যবস্থা রাখা উচিত কিনা এই নিয়ে মাধুরীদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। এখনো হয়। কারণ সমস্যাটা রয়ে গেছে। রেওয়াজটা উঠেও উঠছে না। অরুণা খবরের কাগজের বিতর্কের আসরে যোগ দিয়েছিল। সে আলাদা সীট রাখবার পক্ষপাতী। নইলে মেয়েদের অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হয়। পুরুষদের মধ্যে সেই উদার বীরত্ব আজকাল আর দেখা যায় না যে, মেয়েদের দাঁড়িয়ে যেতে দেখলে নিজেরা উঠে দাঁড়াবে। অফিসের সময় মেয়েদের বাসে-ট্রামে দেখলে অনেক

সহযাত্রীই বিরক্ত হন। তাঁদের মত মেয়েদেরও যে অফিসটফিস থাকতে পারে, কি বাইরে অন্য দরকারী কাজ থাকতে পারে তা যেন তাঁরা ধারণা করতে পারেন না। তাছাড়া অনেক ভদ্র যুবককে পাশে বসতে দিয়ে অরুণাদের অভিজ্ঞতা প্রীতিকর হয়নি। সেই সহযাত্রীরা শুধু অর্ধাসন পেয়েই নাকি খুশী থাকেন নি, পার্শ্ববর্তিনীকেও পুরো-পুরি জয় করে নিতে চেয়েছেন। অরুণার অভিযোগের কথা মনে পড়ায় মাধুরীর হাসি পেল। অরুণার নাকি এমন অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। মাধুরীর কিন্তু একবারও হয়নি। নানা বয়সের নানা শ্রেণীর নানা পোশাকের লোককেই তো মাধুরী পাশে বসতে দিয়েছে, কারো কাছ থেকেই কোন আপত্তিকর ব্যবহার সে পায়নি। যে যার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই তো জগৎটাকে যাচাই করে। মাধুরী অরুণাকে ঠাট্টা করে বলেছে, 'ওরা জানে কাকে বিরক্ত করতে হবে। ওরা মুখ দেখলেই টের পায়, চোখ দেখলেই বুঝতে পারে।'

কিন্তু হাসির কথা নয়। শুধু অরুণা কেন, রমলাদি, অনুপমাদি প্রত্যেকেরই নাকি ও ধরনের অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা আছে। তাই তাঁরা সবাই স্বতন্ত্র মহিলা আসনের পক্ষে। যতদিন না দেশের পুরুষরা ভদ্র হয়, শালীনতা শেখে, মেয়েদের এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে হবে। হেডমিস্ট্রেস বেলাদি কিন্তু মাধুরীর পক্ষে। তিনি বলেন, পুরুষদের ওভাবে আলাদা রেখে তাদের ভদ্রতা শেখানো যাবে না। একাসনে বসে এবং একাসনে বসিয়েই তাদের ব্যবহার শুধরে দিতে হবে। রমলাদি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আপনি বলছেন কি। ভদ্রবেশী ওইসব ইতরলোকের উৎপাত মেনে নেব?' তিনি বলেছিলেন, 'মানি নেবেন কেন? কী করে ভদ্রভাবে চলতে হয় তাকে শিখিয়ে দেবেন। শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই তা শেখানো যায়। চোখের অমোঘ শক্তি আপনার চোখে শুধু যে সম্মোহনের যাদু আছে, তা ভেবে রেখেছেন কেন। তেমন-ভাবে তাকাতে পারলে আপনার চোখকে ভয় করবে না, এমন কে আছে।'

বেলাদির কথাগুলিই বেশি মনঃপূত হয়েছে মাধুরীর। সত্যি ওঁর চোখে যে একদিন সম্মোহনের যাদু ছিল তা বোঝা যায়। সে চোখ যেমন দীর্ঘ তেমনি কালো। কিন্তু সেই চোখকে এখন তিনি শুধু মোহ-ভঙ্গের কাজে লাগিয়েছেন। দুই চোখ এখন শুধু তাঁর কাছে শাসনের অস্ত্র। আর কিছু নয়। বেলাদি কেন এমন হয়েছেন, আঘাত দিয়ে দিয়ে না আঘাত পেয়ে পেয়ে—তা মাধুরী জানে না। কিন্তু বেলাদি পুরোপুরি সিনিক হয়ে যান নি। পুরুষের কাছ থেকে তিনি ঘর পাননি, সংসার পাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষের নাম শুনলে তিনি কানে আঙুল দেন না। পুরুষ মাত্রেই তাঁর চক্ষুশূল নয়। সে যেখানে শ্রেষ্ঠ, সেখানে তিনি তাকে স্বীকার করেন। মেয়েদের জীবনে তার সান্নিধ্য সাহচর্য, সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা তিনি বার বার বলেন। বেলাদির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে মাধুরীর। তাঁর ভাষায় মিষ্টতা কম, ব্যবহারে রূঢ়তা বেশি, অল্পেই চটে যান, মেজাজ বড় খারাপ। কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে জীবন সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলেন তার সঙ্গে মাধুরীর নিজের মত বেশ মিলে যায়। তিনি বলেন, 'পুরুষের ছোঁয়া লাগলেই মেয়েদের জাত যায়, তাদের সতীত্ব, শালীনতা, মানসম্ভ্রম নষ্ট হয়, এই সংস্কার ছাড়তে হবে। কই আপনাদের ছোঁয়ায় তো ওদের জাত যায় না। ওদের সঙ্গে যদি প্রতিযোগিতা করতে চান, ওদের সমান হতে চান এই ছুঁৎমার্গের শুচিবায়ুতে ছাড়ুন। পুরুষদের এখানেই জিত—ওরা যা মানে না তাই আপনাদের দিয়ে মানিয়ে নেয়। শাস্ত্রের নামে পারিবারিক শুচিতার সমাজবন্ধনের দোহাই দিয়ে যত বাজেয় বস্তাপচা জঞ্জালে ওরা আপনাদের ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর আঁতুড়ঘর ভরে রেখেছে। সেই বেড়ি ওরা নিজেরা যে কতবার ভাঙে, তার ঠিক নেই। কিন্তু আপনারা ভাঙলেই দোষ। ওরা বলেছে সেই বাঁধনই আপনাদের ভূষণ, অমনি আপনারা তাই মেনে নিয়েছেন। ওরা বলেছে সেই বেড়ির মধ্যেই যত নারীত্ব অমনি আপনারা মাথা নেড়ে বলেছেন ঠিক ঠিক। তাইতো তাইতো তাইতো। যে অন্য কথা বলে সে পুরুষই হোক নারীই হোক সে আপনাদের চোখে অশুচি অসামাজিক অসচ্চরিত্র।'

হেডমিস্ট্রেসের ভাষা তীব্র হয়ে উঠেছে, চোখ ধারালো।

রমলাদিরা ওঁর এসব কথা পছন্দ করেন নি। তাঁরা ভেবেছেন পবিত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ কী সমাজবিরোধী প্রচারকার্য। আড়ালে এসে তাঁরা বলেছেন, 'ওঁর মতামত তো এমন উগ্র হবেই, উনি তো জীবনে মাধুর্যের স্বাদ পাননি। আমাদের সংসার আর সমাজকে উনি যে ছেঁড়া কাগজের

টুকরোর মত ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবেন, সে আর বেশি কথা কি!'

মাধুরীর কিন্তু হেডমিস্ট্রেসের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য বলে মনে হয়নি। বরং তাঁর কথার মধ্যেই এক ভিন্নতর সত্যের স্বাদ সে পেয়েছে।

হেডমিস্ট্রেস বলেছেন, 'পুরুষের সংগে প্রতিযোগিতার জন্যে তার সংগ আপনারা এড়িয়ে চলবেন না, বরং তার সংগে সংগে চলবেন। তার মূঢ়তাকে আঘাত করবেন, তার লোভকে শাসন করবেন, তার প্রলোভনকে চিনতে শিখবেন। সে যেখানে ঠক প্রবঞ্চক, সেখানে তাকে বার বার ঘা দেবেন, কিন্তু ত্যজ দুর্জন সংসর্গ এ নীতি মেনে নেবেন না। তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। জীবনে আর দোসর মিলবে না। পুরুষের সংগে লড়বার জন্যে আলাদা মহিলা সমিতি গড়ব, সংঘ গড়ব, স্বতন্ত্র নারী-বাহিনী তৈরী করব, এ পথ আমার পথ নয়। পুরুষের সংগে লড়তে হবে তার স্ত্রী হয়ে, তার প্রণয়িনী হয়ে। খেতে, বসতে, শুতে সেই সংগ্রামই আসল সংগ্রাম।'

রমলাদি বলেছিলেন, 'সে তো দাম্পত্য কলহ। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।'

হেডমিস্ট্রেস জবাব দিয়েছিলেন, 'লঘুক্রিয়া কারণ আমরা বিদায়-বুদ্ধিতে খাটো। কারণ জাত যাবার ভয়ে, ঘর হারাবার ভয়ে আমাদের দেশের তরুণীরাও জুজুবুড়ী। এই ভয় ভাঙতে হবে। তার জন্যে মেয়েদের জন্যে আলাদা কামরা, পুরুষের কামরায় আলাদা আসন, ট্রাম-বাসে আলাদা সীটের কোন দরকার নেই। তপশীলভুক্ত শ্রেণীর মত তপশীলভুক্ত সেক্স হয়ে থাকা মেয়েদের পক্ষে পরম অপমানের। তার চেয়ে এক বেঞ্চে বসলে যদি শ্লীলতা হানি হয় হোক। আপনার পাশে বসলে কারো যদি আঙুল চুলবুল করে আপনি তার হাত চেপে ধরবেন, যদি আরো বাড়াবাড়ি করে ঘাড় ধরে তুলে দেবেন, কিন্তু কক্ষনো আলাদা সীটের দাবি করবেন না। মাঝে মাঝে আমার ভাবনা হয় মেয়েরা লজ্জায়, ভয়ে, ঘৃণায় পুরুষের উপর অভিমানে আলাদা নারীস্থানের দাবি না করে বসে।'

শেষের দিকে আর বাংগ হেডমিস্ট্রেসের ভাষা-ভঙ্গি তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তিনি অমনিতে কলীগদের সংগে বেশি কথা বলেন না, যেদিন বলেন একেবারে বাণীর বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যান।

মাধুরীর হঠাৎ খেয়াল হল তার পাশে যে অপরিচিত ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি আর নেই। তিনি যে কখন উঠে গেছেন, তা মাধুরী জানতেও পারেনি। তার মনে পড়ল সকালবেলায় আরো একজন সংগী তার পাশে বসে গিয়েছিল। হাসিতে গল্পে আলাপে সারাটা পথ সে ভরে

রেখেছিল। এখন তার পাশের আসন খালি। শুধু কি পাশের আসনই?

বাসটা তাদের বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে টালা পার্কের পাশ দিয়ে মণীন্দ্র রোডের মোড় ঘুরে কখন যে বি টি রোডে এসে পড়েছে সে খেয়াল নেই মাধুরীর। বাসে করে নিজেদের বাড়ির পাশ দিয়েই এসেছে কিন্তু বাড়ি চোখে পড়েনি, বাড়ির কারো কথা মনেও পড়েনি। ভেবে অবাক লাগল মাধুরীর। সে যেন বাসে করে আসছে না, নিজের চিন্তাস্রোতে ভেসে চলেছে। সেই স্রোতস্বতীর তীরে তীরে যেসব ঘাট গাছ-পালা তাদের দেখেও দেখেনি মাধুরী, চিনেও চিনতে পারেনি। চিনতে পারেনি না কি চিনতে সাহস পায়নি? তার মন আজ বার বার এমন করে দলিত মথিত হচ্ছে কেন; সে তো এসব চায়নি।

মল্লিক কলোনী।

বাস কন্ডাক্টর জায়গাটার নাম বলতেই মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ব্যস্তভাবে নেমে পড়ল বাস থেকে। কন্ডাক্টর না ডেকে দিলে সে এই স্টপ ছাড়িয়ে যেত। একেবারে দক্ষিণেশ্বরের টার্মিনাসে গিয়ে পৌঁছত হয়তো।

নম্বরটা বড় রাস্তার। কিন্তু শংকরদের ফ্লাট বাড়িটা গলির ভিতরে গিয়ে। গলি হলেও তার মধ্যে গাড়ি ঢুকতে পারে। শংকরের বাড়ির সামনে দুখানা গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাধুরী বুঝতে পারল দাদার অতিথিদের মধ্যে অভিজাত অভ্যাগতরাও আছেন। সবাই তার মত বাসযাত্রিনী নয়।

সিঁড়ির মুখেই শংকরের সংগে দেখা হয়ে গেল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পাজামা নয়, চুলপেড়ে ধুতি। মাধুরী হাসল। দাদা আজ কর্মকর্তা। বাবার যৌবনের যে ফোটো আছে বাড়িতে একটি বাচ্চা ছেলেকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছেন সেই চেহারার সংগে প্রায় অবিকল মিল আছে দাদার। শুধু গোঁফটাই যা নেই।

শংকর হেসে বলল, 'যাক, তুই এসেছিস। যা ওয়েদার। ভাবলাম আসতে পারবি কি পারবিনে। আমি তো আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

মাধুরী বলল, 'দাদা, আর কেউ আসেনি।'

জিজ্ঞাসা আর জবাবের মাঝখানের মুহূর্তটি তার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করতে লাগল।

শংকর বলল, 'না। আর কে আসবে। আমাদের বাড়ির আর কাউকে আমি আশাও করিনি।'

বাড়ির কেউ ছাড়া আর কেউ এসেছে কিনা সে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে মাধুরীর বাধল। শংকরও সেই অনুচ্চারিত প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

শংকর বলল, 'আয়, ভিতরে আয়।'

প্রথম ঘরখানা ভিতরের নয়, বাইরের ঘর। সোফা সেট চেয়ার টেবিল সরিয়ে এই ঘর জুড়ে আজ ফরাশ পাতা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক গোল হয়ে বসে জোর তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। গোলটেবিল বৈঠক নয় গোল ফরাশ বৈঠক। দোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই আলোচনার খানিকাংশ মাধুরীর কানে এল: "আগে ছিল যত দোষ নন্দ ঘোষ, এখন যত দোষ গভর্নমেন্টের। আরে মশাই, গভর্নমেন্ট কি নিরবয়ব কোন বস্তু কি কারকটি ব্যক্তি যে, তাদের দোষ দিলেই আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন? দেশের গভর্নমেন্ট যদি খারাপ হয় সে তোমার সে আমার পাপ। সরকারী আমলা কর্মচারী কে? সে তোমার ভাই বন্ধু, সে আমার বাপ।'

কমবয়েসী কয়েকজন যুবক পিছন থেকে হেসে উঠল। একজন বলল, 'বাঃ, বেশ মিলিয়েছেন তো। আমরাও তাই বলি। আসলে বাপের সংগেই পাপের মিল। বাপই পরম পাপী এবং চরম পাপী। ছেলেরা নির্দোষ। ছেলেরা যদি খারাপ হয় সে রক্তের দোষে। তার জন্য বাপকে সালসা খাওয়াতে হবে, আধুনিক চিকিৎসায় লাখ লাখ পেনিসিলিনের সুঁচ।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এ পরিহাসে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি তেমনি জোরাল গলায় উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, 'যত দোষ

ছুটি গদ্দদ সব গভর্নমেণ্টের। গভর্নমেণ্ট যেন কতগুলি বাড়ি গাড়ি চেয়ার টেবিল বেঞ্চ আর আলমারি। সেখানে যারা বসে কাজ করে তারা যেন এই দেশের মানুষ নয়। তারা বাসের ভিতরে ঢুকে বসেছে আর আমরা বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকবার জন্যে চেষ্টা করছি। আমাদের মধ্যে তফাত শুধু এইটুকুই। ভিতরে ঢুকতে পারলে আমাদেরও চেহারা পালটে যাবে। তখন নতুন যারা ঢুকতে চাইবে আমরাও তাদের ঠেকিয়ে রাখব, কথায় না থামাতে পারলে মাথায় লাঠি মারব।'

পিছনের যুবকটি বলল, 'উপমাটা নিখুঁত অমূল্যবাবু। আপনি সাহিত্য পড়ান। উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাস আপনার মুখ খুললেই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস তার রাজনীতি, অর্থনীতি, শুধু উপমা দিয়ে লেখা যায় না, বোঝানো যায় না, বিচারও করা যায় না। আমি স্বীকার করি, দোষ ত্রুটি শুধু সেক্রেটারিয়েটের বাড়িটির মধ্যে নেই। তার [illegible] আরো নিচে। এ দেশের ঘরে ঘরে [illegible] বাসা বেঁধেছে। আমরা যারা চারটি পয়সা বাস-কণ্ডাক্টরকে ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়িনে, তারাই [illegible] লাখ লাখ টাকা চুরির সমালোচনা করি। [illegible] একথা ঠিক। কিন্তু অপরাধের মূলটা কোথায় তা আজ খুঁজে বের করুন। পাপটা কি নীচে থেকে ধাপে ধাপে উপরে ওঠে না উপর থেকে ধাপে ধাপে নীচে নামে? সাধারণ মানুষ [illegible] অনুসরণ করে। এ [illegible] কথা। আপনাদের [illegible] কথাগুলোই বললাম। [illegible] আমাদেরও?'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'মনে তো হয় না। মনে হয়, না একটি বিশেষ [illegible] আপনাদের দেশ। আপনাদের কাছে [illegible]'

তাঁর প্রতিপক্ষ বলল, 'একথা আমরা মাঝে মাঝে মনের দুঃখে বলি, কারণ মাকে আমরা দাসী বানিয়ে রেখেছি। যদি দেশ না বলেন বলব, দাসী। দেশ মানে তো দেশের মাটি নয়, দেশ মানে তার জনসাধারণ। সেই সাধারণ লোক অসাধারণদের পায়ে পায়ে চলে। তাদের কাছে পদচিহ্ন কি খুব স্পষ্ট না সব পথ অনুসরণযোগ্য?'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার মতে তাহলে একজন আদর্শ পুরুষ চাই? একজন সর্বগুণান্বিত ডিক্টেটর? তাঁর হাতে একটি শাসনরজ্জু? আর আপনারা সব নাকে-দড়ি-বাঁধা জীববিশেষের মত—'

যুবকটি প্রতিবাদ করে বলল, 'মোটেই তা চাইনে। আমরা শুধু ব্যবস্থাটা বদলে নিতে চাই যাতে প্রত্যেকের মধ্যে সেই আদর্শের সাক্ষাৎ মেলে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে—।'

প্রৌঢ় বললেন, 'শুধু ব্যবস্থাটা পালটালেই রাতারাতি সেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ জ্বলবে?'

প্রতিপক্ষ বলল, 'রাতারাতি কেন হবে—'।

মাধুরী দোরের পাশে একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল, 'দাদা আমি ভিতরে যাই। দেখি গিয়ে বউদি কী করছে।'

শঙ্কর বলল, 'আরে না না। এখানে

আয়। আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

মাধুরী লক্ষ্য করল ঘরের মধ্যে দাদার সেই একজন বন্ধু ছাড়া আর সব বন্ধুই আছেন। অবশ্য এ'দের কারো সঙ্গেই মাধুরীর প্রায় পরিচয় নেই। এই মুহূর্তে পরিচিত হবার খুব বেশি আগ্রহও সে বোধ করল না।

কিন্তু শংকরের আগ্রহে যেতেই হল। সে আলাপ করিয়ে দিতে লাগল, 'আমাদের কলেজের বাংলার সিনিয়র প্রফেসর অমূল্য রতন চট্টোপাধ্যায়। আর এ হল প্রদোষ দাশগুপ্ত, এতক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল। মাস কয়েক হল আমাদের ইকনমিক ডিপার্টমেণ্টে এসে ঢুকেছে। প্রদোষ, আমার বোন মাধুরী।'

অমূল্যবাবু বললেন, 'বেশ বেশ। দেখতো কি কাণ্ড। শংকরের ছেলের জন্মদিনে আমরা সব তর্ক করে মরছি। এর চেয়ে দু' একটা গান টান হ'লে বেশ হত। প্রদোষ, তোমার জন্যেই এই তর্কটা বাধল।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'যত দোষ দাশ প্রদোষ।'

শংকর তার আরো জনদশেক বন্ধুর সঙ্গে মাধুরীর পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের মধ্যে দু' একজন মাধুরীর চেনা। সঞ্জীব সেন আর মৃন্ময় ভদ্র।

সঞ্জীব বলল, 'তর্ক শুনে শুনে কান ঝালাপালা। এবার একটা গান গাও তো মাধুরী। ঘরখানা জুড়োক।'

মাধুরী কোনরকমে ওঁদের হাত এড়িয়ে বউদির শোবার ঘরে এসে ঢুকল। সেখানে মেয়েদের মজলিশে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মাধুরী। বেলাদি যাই বলুন, সব সময় পুরুষদের সঙ্গে যদি ওদের থাকতে হত দম বন্ধ হয়ে যেত। মেয়েদের যেখানে নিজেদের মধ্যে অতি উৎসাহে ওরা তর্কের ঝড় তুলে দেয়। কিন্তু মেয়েরা যে ওসব তত্ত্ব সব সময় পছন্দ করে না সেকথা বুঝবার সাধ্য ওদের নেই। মাধুরী নিজের মনেই হাসল।

'বউদি, পিলু কোথায়?'

নন্দিতা বলল, 'পিলু? সে পিসীর আশায় আশায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জেগেছিল। তারপরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তো ভাবলাম তুমি আর এলেই না। অবশ্য আর কেউ না এলেও তুমি যে আসবে একথা আমার মন বলছিল।'

মাধুরী হেসে বলল, 'ঈস, আমার কথা কত যেন মনে থাকে তোমার। এত মন রাখা কথাও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পার।'

নন্দিতা তরুণী অধ্যাপকজায়াদের সঙ্গে মাধুরীর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। হেসে বলল, 'দিদি এসে দয়া করে ভাঁড়ারের ভার নিয়েছে। তাই ওঁদের কাছে একটু বসতে পেরেছি, নইলে কি আর। একা একা এত অসুবিধে। তোমার দাদা তা বুঝতে চান না।'

শংকরের নাম করতে করতেই সে এসে হাজির। স্বামীকে নন্দিতার নাম ধরে ডাকতে হয় না। মনে মনে শুধু স্মরণ করলেই চলে।

শংকর দোরের কাছে এসে বলল, 'অসীম এসেছে। এতক্ষণে তার সময় হল।'

মাধুরী বলল, 'এসেছে!'

নিজের আগ্রহের জন্য নিজেই লজ্জিত হল। নিজের গলার স্বরটাকে গোপন করতে পারলে যেন বাঁচে।

নন্দিতা বলল, 'আর কে এসেছে?'

শংকর বলল, 'আর কেউ নয়। সে একাই।'

পৃথিবীতে সুখও কি অনন্ত? তারও কি কোন সীমা নেই, পার নেই?

ছি ছি ছি।

মাধুরী বলল, 'বউদি চল। পিলুকে দেখি গিয়ে। তার জন্যে এই হাতীটা নিয়ে এসেছি, লাল হাতী দেখলে ও বোধহয় খুব খুশী হবে।' (ক্রমশ)

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

পাঁচশ

চলিত বাংলায় বড় বড় বিষয় গভীর আলোচনা করা যে চলে না, এ ধারণা চল্লিশ বৎসর পূর্বে অনেকেরই ছিল। "সাহিত্য"-নামক অভিজাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এইরূপ মতই পোষণ করতেন। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রে যখন আমার লেখা সাহিত্যে বাংলা ভাষা প্রবন্ধ বেরোয়, সমাজপতি মহাশয় তার তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু ১৯১৯ সালে, যখন আমি ঐতিহাসিক গবেষণা করতে কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছি, এবং শিবাজী সম্বন্ধে তাঁর [illegible] সম্বন্ধে নিজের মত প্রত্যাহার করে আমার মত গ্রহণ করেন, তখন সমাজপতি মহাশয় আমার কাছে একটি বাংলায় লেখা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ চান। তদনুসারে [illegible] প্রবন্ধ দিই। তিনি সেটি পড়ে আমায় বললেনঃ "দেখ, এটি ত তুমি চলিত বাংলায় লিখেছ। এ-পর্যন্ত এ জাতীয় প্রবন্ধ চলিত বাংলায় কেউ লেখেনি। আমি জানি, বাংলা লেখায় তুমি প্রমথ চৌধুরীর অনুকরণ করার পক্ষপাতী। কিন্তু তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ কি-না তা জানি না। প্রমথ যা লেখে তার মধ্যে রসিকতা বেশি থাকে, এর আসল কারণ, চলিত বাংলায় গভীর ভাব প্রকাশ করতে গেলে হালে পানি পায় না, সুতরাং রসিকতা দিয়ে ভাষার অক্ষমতা ঢাকা দিতে হয়। আমি বলছি না যে, তোমার এ-প্রবন্ধ ছাপাতে আমি রাজী নই। শুধু বলছি যে, এই নতুন ধারা—চলিত বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণা—তুমি সাহিত্যে প্রবর্তন করবে কি-না, এ-কথা আর একবার ভেবে

দেখ।”—সুরেশচন্দ্রের উক্তিতে একটু অনিচ্ছার সুর শুনতে পেলুম, তাই প্রবন্ধটি আর ছাপতে দিলুম না। এবং টেক্‌নিক্যাল শব্দের অভাব অনুভব করে বাংলায় বড়-একটা ঐতিহাসিক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখি নি। এ-অভাব এখনো আছে এবং সাধু-বাংলায় লিখে সেটা দূর করা যাবে না।

বাঙালী ও বাংলা-জানা পাঠকদের জন্যে গভীর-আলোচনামূলক নিবন্ধ চলিত বাংলাতেই লিখতে হবে, এই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রায়, এবং সেই উদ্দেশ্যেই জোড়াসাঁকোয় ২৭।৬।১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সভা বসে। পূর্বেই বলেছি, প্রমথ চৌধুরীর ইচ্ছে ছিল সবুজ-দলের সুধীন্দ্র সিংহকে দিয়ে Physics-এর বইখানা লেখাবার। সুধীন্দ্র ঐদিন জোড়াসাঁকোয় অনুপস্থিত থাকায় প্রমথবাবু আমায় তাঁর ২৮।৬।১৭ তারিখের চিঠিতে লিখলেন: “আসছে শনিবারে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসো, তাকে Physics-এর বইখানা লেখবার জন্য ভজাতে চেষ্টা করব।” ওঁর ১২।৭।১৭ তারিখের পত্রেই প্রকাশ পায়, সত্যেন বোসের বিশেষ বন্ধু, মানিক যে সত্যেনের “লেজুড়” হয়ে যেতে অরাজী। সুধীন্দ্রও তেমনি আমার সঙ্গী-মাত্র হয়ে রবিবাবু বা প্রমথবাবুর ওখানে যেতে কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন। প্রমথবাবুকে সুধীন্দ্রের ঠিকানা দিয়ে যখন পাঠালুম, ওঁর ১২।৭।১৭-র চিঠি পেয়ে, তখন প্রমথবাবুর কাছ থেকে স্বতন্ত্রভাবে ওঁকে লেখা নিমন্ত্রণ পাবার পর সুধীন্দ্র বালিগঞ্জে গেলেন, কিন্তু আমার শরীর খারাপ থাকায় আমি সেদিন (১৪।৭।১৭) যেতে পারিনি। তারপর আবার পাই প্রমথবাবুর চিঠি।

(৪০)

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৩।৭।১৭

কল্যাণীয়েষু,

সুধীন্দ্রের মুখে [illegible] অসুখের [illegible] সেদিন শুনেছি। আমার মতে এখন [illegible] প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শরীরটাকে চাঙ্গা [illegible] তোলা। সেখানে Huxley's Physical basis of life নামক একটি প্রবন্ধ [illegible] [illegible] দার্শনিক মত [illegible] [illegible] সুতরাং জীবনের [illegible] বরং সকলের পক্ষেই [illegible] বয়সে যদি [illegible]
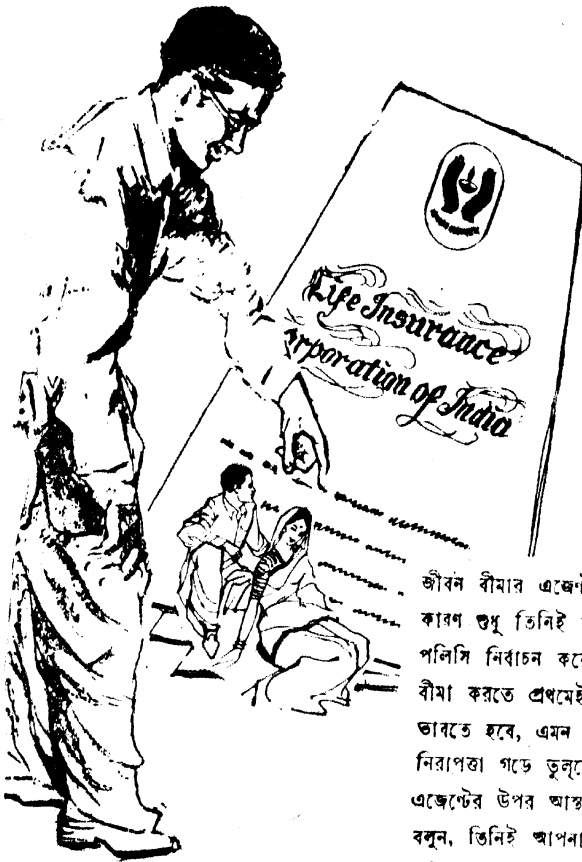
তাহলে আমার দ্বারা সংসারের কিছু কাজ হত।

ভারতবর্ষে সবুজ অসবুজ-এর কথোপকথন পড়েছি। তুমিই তার উত্তর দিয়ো। আমার এ-বিষয়ে বক্তব্য এই যে, "অসবুজ" বলেছেন যে আমি বঙ্কিমের মত মানিনে, সে কথা ঠিক নয়। বঙ্কিমের মত আমি কতটা মানি আর কতটা মানিনে, তার পরিচয় গত বৈশাখ মাসের সবুজপত্রে পাবে।

আর এক কথা—"অসবুজ" বলেছেন যে, ২৪ বছর আগে "ফুলদানী" নামক গল্প আমি সাধুভাষাতেই লিখি। একথা সত্য যে, বঙ্গসাহিত্যে যখন আমি হাতে খড়ি দেই তখন অবশ্য বড় হাতের অক্ষরেই লিখি তারপর ছোট অক্ষর ধরি। তবে সাধুভাষার মক্স আমি বেশিদিন করি নি। "ফুলদানী"র পিঠপিঠ আমি "আদিম মানব" নামক একটি প্রবন্ধ লিখি কিন্তু সে চলতি ভাষায়। সেই অবধি যে "হচ্ছে-করছে" ধরেছি—আজও তা ছাড়িনি। ঐ "আদিম মানব"ই হচ্ছে আসলে আমার হাতের প্রথম লেখা। সে লেখায় বীরবলি ঢং পুরোমাত্রায় ফুটে উঠেছিল। সুতরাং কলেজ থেকে বেরুতে না বেরুতে সাহিত্য-সমাজে আমার অধঃপতন হয়েছে। এর থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হয় যে, বিলেত যাবার পূর্বেই আমি সাহিত্যে একঘরে হই।

অসবুজ লিখেছেন যে, চলতি ক্রিয়া-পদের সঙ্গে তৎসম কথা খাপ খায় না। এবং এ দুই একত্র করলে ভাষা বিটকেল হয়। এর উত্তর, এ-কাজ কথকেরা চিরকালই করে আসছেন এবং বক্তারা নিত্য করেন। অথচ কি কথকতা কি বক্তৃতা কারও কানে বিটকেল ঠেকে না।

তুমি লেখাটা শনিবারের মধ্যে তৈরী করে আমাকে এনে দিয়ো। আশা করি, আসছে শনিবারে তুমি আসতে পারবে।

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এরপর সুধীন্দ্রকেও ১৯।৭।২৭ এবং ২০।৭।১৭ তারিখে প্রমথবাবু চিঠি লেখেন।

১

[সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা]

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৯।৭।১৭

কল্যাণীয়েষু,

আমি ইতিমধ্যে অনেক খুঁজে দেখেছি কিন্ত এক ভলুমে Physics-এর বই কোন p pular series-য়ে পাইনি।—তবে ও বিষয়ের প্রতি ভাগের উপর খুব ভাল

ভাল ছোট বই আছে।—আমি তার দু'একখানা আনিয়েছি।

আমার বিশ্বাস, আমাদেরও Physics-টে ভাগ-ভাগ করে নিতে হবে। তুমি যদি Electricityর ভার নেও ত তোমাকে এ বিষয়ে popular বই দিতে পারি। তার থেকে তুমি অনেক সাহায্য পাবে, অন্ততঃ কি রাখতে হবে আর কি ছাড়তে হবে—তার হিসেব পাবে।—আসছে শনিবারে যদি আমার এখানে এসো ত তোমাকে দু'একখানা বই দেব।—আমার এখানে আসা অবশ্য তোমাদের পক্ষে কষ্টকর—কতকটা উত্তর-মেরু থেকে দক্ষিণ-মেরু যাওয়ার মত; তবে তোমাদের বয়েস অল্প—তাই কতক পথ উজান ঠেলে আসা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

সুতরাং যদি বিশেষ কোনও অসুবিধা না হয় ত শনিবারে বিকেলে আসতে চেষ্টা করো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

২

[সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা]

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২০।৭।১৭

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। আমার কালকের চিঠি আশা করি পেয়েছ। Physicsটা তিন চারজনে ভাগ করে নিয়ে লিখতে হবে—সেকথা পূর্বেই তোমাকে লিখেছি।—Cambridge University seriesয়ে এ বিষয়ে চারখানা বই আছে—(1) Beyond Atom, (2) Earth, (3) Sun—আর চতুর্থখানার নাম মনে পড়ছে না। এর একখানিও বাজারে পাওয়া যায় না—নচেৎ দেখতে পাওয়া যেত, ১৫০ পাতার ভিতর কিভাবে এক একটা বিষয়ের মোদ্দা কথা লেখা হয়েছে।

আমি স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা করিনি, সেইজন্যেই এই বই লেখা সম্বন্ধে আমাদের মতামতের একটা বিশেষ মূল্য আছে। তোমরা যে বই লিখবে আমরা হব তার পাঠক।—সুতরাং কিরকম লেখা পাঠকের মুখরোচক হবে—সে-কথা আমরাই ভাল বলতে পারব। মানুষে এই উদ্দেশ্যে বই লেখে যে, অপরে তা পড়বে—সুতরাং যা অপাঠ্য তা বই-ই নয়।—শুধু বিজ্ঞান কেন—সকল বিষয়ের বই—এই নিয়মের অধীন।

অবশ্য পাঠকে পাঠকে বিস্তর প্রভেদ আছে। একশ্রেণীর পাঠকের কাছে যা অপাঠ্য আর একশ্রেণীর পাঠকের কাছে তা তাঁ'ত সুপাঠ্য হতে পারে। সুতরাং লেখকের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য তিনি বই লিখছেন সেইটে স্থির করা। এক্ষেত্রে ত কারও কোন দ্বিধা হবার প্রয়োজন নেই। ধরে নিতে পারো যে, এসব বই তাঁরাই পড়বেন যাঁদের বিশ্ব-সংসারের খবর জানবার জন্য কৌতূহল আছে, অথচ বিশেষ শিক্ষার অভাবে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের সকল শাখার মোটা কথাগুলো সহজভাবে বলাই হবে তোমাদের কর্তব্য।

কাল বিকেলে প্রশান্তবাবু[১] আমার এখানে আসবেন, তুমি উপস্থিত থাকতে পারলে ভাল হয়। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে যথাকর্তব্য স্থির করা যাবে।—তবে একটি কথা বলে রাখছি, একটা বড়গোছ

১ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

তর্ক উঠবার খুব সম্ভাবনা আছে—কেননা প্রশান্ত হচ্ছেন strong in Logic এবং তাও আবার যে-সে logic নয়—mathematical logic, বলা বাহুল্য, আমি ও-শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানিনে,—অথচ তর্ক উঠলে তাতে যোগ নিশ্চয়ই দেব। অঙ্কের আর কিছু জানি আর না জানি, আমি যোগ দিতে জানি। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
২৩।৭।১৭
(সোমবার)

কল্যাণীয়েষু,

পরশু তোমরা চলে যাবার পর আমার ওস্তাদজির গান হল। কিরণের সে-গান এত ভাল লেগেছে যে, তার অনুরোধে কাল সন্ধ্যেবেলা এখানে একটি ছোটখাটো গানের মজলিস বসাচ্ছি। কিরণ, ধূর্জটি ও মণ্টু থাকবে। তুমি গানবাজনা ভালবাসো—সুতরাং তুমিও যদি আসতে পারো ত ভাল হয়। গানবাজনা একবার শুরু করলে তা "সারা" করতে প্রায়ই দেরি হয়—সুতরাং শ্রোতাদের রাত্তিরের আহারের বন্দোবস্তটা এখানেই করা গেছে। যদি এসো ত তুমিও এখানে খেয়ে যেয়ো। ভাষার মত আহার সম্বন্ধেও আমি "চলতি"র পক্ষপাতী—অর্থাৎ সাদাসিধে আহারই আমার পছন্দসই। সুতরাং আমার এখানে আহার করতে কারও ভয় পাবার কারণ নেই।

বেশি রাত হবে না—সাড়ে ছটায় যদি গান শুরু করা যায় ত নটার ভিতর তা শেষ করা যাবে।—খেয়ে তার আর দেরী—তারপর আমার মোটরে তোমাদের ঠিক পৌঁছিয়ে দেব।

তোমার লেখা সম্বন্ধে আমার একটা প্রস্তাব আছে। দেখা হলে মুখে বলব।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু,

আজ সন্ধ্যেবেলা এখানে এলে অবশ্য আমার দেখা পাবে। আমিও আজ বিকেলে একট সভাপতিত্ব করতে চলেছি। হেয়ার স্কুলের ছেলেরা আজ বেলা চারটেয় একটা কি হাংগাম করবে, তাতে আমার যোগদান করতে হবে—যেহেতু আমি এককালে হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলুম। আশা করছি, ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারব।

তুমি বলেছ "প্রাণের কথা"য় আমি বৈজ্ঞানিকদের উপর অবিচার করেছি—কেননা আমি একজন দার্শনিক। কিন্তু

আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের ভিত তেমন পাকা নয়। উক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিকের চাইতে দার্শনিকের উপরই চোট্‌টা বেশি পড়েছে। সর্বভূতে আমার সমান বক্রদৃষ্টি। কলকাতায় একটা কথা আছে যে, সেকালে জনৈক ভদ্রলোক রামগোপাল ঘোষের শ্যালক বলে পরিচয় দেওয়াতে লোকে হেসেছিল এবং সেই হাসির জবাবে তিনি বলেন যে—"রামগোপাল ঘোষের শালা অনেকের বাবার চাইতে বড়"। একথাটা কতদূর সত্য তা বলতে পারিনে, তবে রবিবাবুর চিঠি যে অনেকের প্রবন্ধের চাইতে ঢের ভালো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজরা বলে যে, ভগবান কাউকে ২ রূপোর চামচ মুখে দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠান। কিন্তু সে-সব লোককে আমি হিংসে করিনে—যদিচ আমাকে অনেক সময়ে দাঁতে কাঠি দিয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আমি হিংসে করি রবিবাবুকে, কেননা ভগবান তাঁকে সোনার কলম হাতে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যাক্ তা বলে আর আক্ষেপ করে কি হবে?

তুমি কাল "বিচিত্রায়" গেলে না কেন? Professor Geddes দিব্যি বক্তৃতা করে-

ছিলেন। তাতে রস ও সার সমান মাত্রায় ছিল।
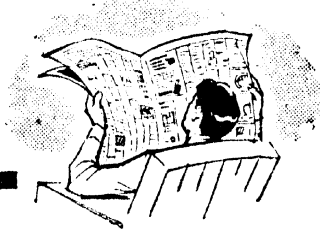
ভাল কথা, কাল সন্ধ্যে ছ'টায় রবিবাবু মহাশয় দাদার বাড়িতে সংগীত সম্বন্ধে একটি সোদাহরণ বক্তৃতা করবেন। তুমি ছ'টার ভিতরে যদি এখানে এসে জুটতে পারো তাহলে তোমাকে সংগে নিয়ে যাব। সবুজদল প্রায় সকলেই যাচ্ছে—কাল "বিচিত্রায়" যাদের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের মুখে বলেছি। আর এক কথা—তোমাকে একটা প্রবন্ধ লেখবার ভার দিতে চাই—তারি জোগাড় কাগজ কাল তুমি এলে তোমার হাতে দেব। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৭।৯।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলুম। আজ বছর চারেক আগে আমি তাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি—সেটি Modern Reviewতে ছাপা হয়েছিল। খুঁজে দেখব সে কাগজখানা এ বাড়িতে আছে কিনা।

কাল বিকেলে সবুজের পাতা ঠিক করতে—যদি আসতে পারো ত ভাল হয়। পরিচিতার কার্ড ভুল করে বেরিয়ে গেছে। Sarkies-এর বক্তৃতা কাল হবে না—আসছে হপ্তায় শুক্রবারে হবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪৪

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৫।১০।১৭

কল্যাণীয়েষু,

আমি পূজোর দিনের ভিতরে কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাব। সুতরাং আমার ইচ্ছে কাল বিকেলে এখানে আমাদের পুরো আড্ডা বসে। আশা করি, তুমি আসতে পারবে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৪৫

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৭।১০।১৭

কল্যাণীয়েষু,

কাল যে তোমরা কেউ আসতে পারোনি, তাতে আশ্চর্য হইনি, কেউ এলেই আশ্চর্য হতুম। তুমি যখন "জয়সবালের" সংগে জুটে গেছ—তখন যে তুমি যা হয় একটা কিছু পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করবে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি যে "ভাসে"র কাল নির্ণয় করতে ব্যস্ত হয়েছিলুম, সেও ঐ সংসর্গগুণে। "জয়সবাল" আর কিছুদিন কলকেতায় থাকলে আমি যাদুঘরে জমে যেতুম। পুরাতত্ত্বের যে একটা নেশা আছে, তা আমি বিলক্ষণ জানি।

বালিগঞ্জের চাইতে জোড়াসাঁকোয় তোমার সাক্ষাৎ যে বেশি পাওয়া যায়—তাতে আমার কিছু মনে করবার কারণ নেই। আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য নই—সুতরাং জোড়াসাঁকোর সংগে বালিগঞ্জের যে তফাৎ আছে সে বিষয়ে আমি খুবই সজ্ঞান।

আমি আরও দু'চারদিন কলকাতায় আছি, সুতরাং পারো ত আসছে মংগলবার বিকেলে এখানে একবার এসো। কাজ—গল্প করা।

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

উদ্ধৃত পত্র-গুচ্ছে—যার প্রথম দুটি সুধীন্দ্রকে লেখা, আর বাকি পাঁচটি আমার—একটা হার্দিক ইংগিত পাওয়া যায়। এখানে সায়েন্স আর সাহিত্য হাত মিলিয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর এই সময়কার তিনটি রচনা—"সুরের কথা", "রূপের কথা", "প্রাণের কথা"—পাঠ করলে দেখা যায়, প্রমথবাবু আর্ট ও সায়েন্স, এ দুই বিষয়েই মৌলিকভাবে চিন্তা করেছেন এবং তার পিছনে বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত আছে। ওঁর ৭।১০।১৭ তারিখের চিঠিতে যে জয়সবালের কথা লিখেছেন, তিনি ছিলেন সাহিত্যের এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্বের গবেষক। প্রথমে কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করতেন, তারপর পাটনায় চলে যান। তাঁর কথাবার্তায় যাদু ছিল, সুতরাং বেশিদিন কলকাতায় থাকলে হয়ত প্রমথবাবুকে যাদুঘরে জমাতে পারতেন। নাট্যকার ভাস যে কাণ্ব বংশীয় রাজা নারায়ণের সমকালীন, জয়সবালের এ-যুক্তি কৌতূহলোদ্দীপক এবং তখন রমণীয় মনে হলেও এখন বর্জনীয় বোধ করি।

প্রমথ চৌধুরীর "প্রাণের কথা" প্রবন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের আবিষ্কার সম্বন্ধে "বক্রোক্তি" আমার ভাল লাগেনি। তার কারণ, আমি বোস মহাশয়ের দুটি পুস্তক পাঠ করে এবং তাঁর সংগে ঐ বিষয়ে মৌখিক আলাপ আলোচনার সুযোগ পেয়ে তাঁর আবিষ্কারকে শ্রদ্ধা করতে শিখি। ১৯১৭ সালে বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হবার পরে আমি সেখানকার মেম্বরও হয়েছিলুম। সেই শ্রদ্ধা থাকার জন্য ১৯৫৮ সালে ইংরেজী ভাষায় "আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস" নামে যে বার্থ-সেন্টিনারী পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদনা-কার্যে আমি সানন্দে বন্ধুবর অমল হোমের সহায়তা করতে পেরেছি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, সবুজ পাতার ডাক শুনেই জগদীশচন্দ্র সাড়া দিয়েছিলেন। লজ্জাবতী লতার মানভঞ্জন, তার প্রাণের কথাকে কলম দিয়ে লেখানো, অব্যক্তকে ব্যক্ত কথা, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ, তিনি উদ্ভিদকে মনে-প্রাণে ভালবাসতেন। (ক্রমশ)

শার্ঙ্গদেব

হায়ার সেকেণ্ডারি এডুকেশনে সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা

হায়ার সেকেণ্ডারি এডুকেশনের সিলেবাসে সংগীত শিক্ষার বিষয়বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু অনেক ব্যাপারে সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরাও অনুরূপ অসুবিধায় পড়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে হায়ার সেকেণ্ডারির প্রথম পরীক্ষা হবে; অতএব এবিষয়ে যাতে কোন সমস্যার উদ্ভব না হয়, সেদিকে বোর্ডের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সিলেবাসের অসংগতিগুলি সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করছি। অপরাপর পত্রপত্রিকায় দীর্ঘতর আলোচনায় আরো বহু ত্রুটি উদ্ঘাটিত হবার আগেই সেগুলি সংশোধিত করবার ব্যবস্থা বোর্ড করবেন এই আশাই আমরা করি।

যদিচ সংগীত শিক্ষার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, তদনুযায়ী কোন পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হয়নি। বোর্ডের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করবেন। তাঁদের মতে যেটামুটি ভাল বই হলেই কাজ চলবে। এই ব্যাপারে শিক্ষকদের কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। অসুবিধাটা পাঠ্যপুস্তকের জন্য নয়—আসলে শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ অত্যন্ত অস্পষ্ট হওয়ায় তাঁরা বোর্ডের উদ্দেশ্য বুঝতে অসমর্থ হচ্ছেন। বোর্ড যখন একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা কিছু কিছু গ্রন্থের সহায্য নিয়েছেন সেই সব গ্রন্থের একটা উল্লেখ করলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুবিধা হত। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তাঁরা মনের মত বই বেছে নিয়ে পড়তে পারতেন।

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার কতকগুলি বিষয়ে যে রীতিমত প্র্যাকটিক্যাল অসুবিধা আছে, সেটা বোর্ড আদৌ ভেবে দেখেছেন কি না সন্দেহ। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

মীরা, সুরদাস, চণ্ডীদাস এবং কবীরের ভজন গাইতে বলা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব ভজনের নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক সুর কোথায় পাওয়া যাবে? এসম্বন্ধে কোন নির্দেশ বোর্ডের সিলেবাসে নেই। ক্লাশ ইলেভেনের তালিকায় দেখছি একটি ট্রাডিসন্যাল এবং বাংলা ভজনের কথা বলা হয়েছে। এই ট্রাডিসন্যাল ভজনই হচ্ছে প্রকৃত ভজন এবং এর আকৃতি প্রকৃতি লোক-সংগীতের মত। বাকি ভজন হয় ধ্রুপদ নয় খেয়ালের ঢঙে গাওয়া হয়। সিনেমার দৌলতে নানারকম সুরের তো অভাব নেই। অনেক শিল্পীর কণ্ঠে সেগুলি রীতিমত পাকা হয়েই বসে আছে। পরীক্ষার নামে সেগুলি চালিয়ে দিলে ক্ষতি কি? বাংলা ভজন অর্থে বোর্ড কোন গান বোঝাচ্ছেন, তা বলেননি। ঐ সম্বন্ধেও বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। ক্লাশ নাইন এবং টেনের সিলেবাসে বেদগান গাইবার নির্দেশ আছে। রবীন্দ্রনাথ বেদগান নিজের সুরে গেয়েছেন। আরো কিছু কিছু বেদ-মন্ত্র আছে, যাতে আধুনিক কালের ব্যক্তি-গণ সুরারোপ করেছেন। প্রকৃত সাম-গান শেখাবার বন্দোবস্ত বাংলায় কোথাও আদৌ আছে বলে জানি না। অতএব এ সম্বন্ধেও যথেষ্ট অসুবিধা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ঘটেছে, কেননা তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, বেদগান সম্বন্ধে বোর্ডের অভিপ্রায় কী।

শ্যামাসংগীত এবং ব্রহ্মসংগীত গাইবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই দুই প্রকার সংগীতেই ধ্রুপদ, খেয়াল বা টপ্পার রীতি প্রচলিত। শিক্ষার্থীরা কোনটা বেছে নেবে? এক্ষেত্রে গীতিকার এবং সুরকারদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত ছিল এবং গানগুলিও নির্দিষ্ট করে দিলে ভাল হত।

সমগ্র সিলেবাসের মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের অর্থ বোধ করা আমাদের দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বোর্ডের ভাষাও যাকে বলে রীতিমত "ক্রীপটিক"।

(১) শর্ট হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক উইথ স্পেশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স অন বেংগলস রিজিঅনাল মিউজিক।

বাংলায়—বাংলার আঞ্চলিক সংগীতের ওপর বিশেষ প্রভাবসহ ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যেমন ইংরেজি বাংলাও তেমনি করা হল। উদ্দেশ্য কি বোঝা কঠিন। 'রিজিঅনাল স্টাইল' কথাটি সিলেবাসে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। 'রিজিঅন' এর অর্থে বাংলার যাবতীয় সংগীতকেই ধরা হয়েছে নতুবা রবীন্দ্রসংগীত এর অন্তর্ভুক্ত হত না। কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় আবার বলা হয়েছে—বেংগলস রিজিঅনাল মিউজিক। একথার অর্থ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সংগীত অর্থাৎ সাদা কথায় বাংলার আঞ্চলিক লোকসংগীত। রবীন্দ্র-সংগীত বা রামপ্রসাদীকে এর অন্তর্গত করলে ভুল হবে। কীর্তনকেও বাংলার আঞ্চলিক সংগীত বলা যায় না। কেননা কীর্তন একটা আলাদা বিশিষ্ট সৃষ্টি।

যদি বলা যায়, ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলার নিজস্ব সংগীতের ওপর মার্গ ভারতীয় সংগীতের প্রভাব—তা হলে উদ্দেশ্যটা বোঝা যায়। এখন আসল উদ্দেশ্য যে কী, সেটা বোর্ডই একমাত্র বুঝিয়ে দিতে পারেন।

(২) ইনফ্লুয়েন্স অফ বেংগলস রিজিঅনাল মিউজিক অ্যান্ড স্বদেশী সংস অন আওয়ার ন্যাশনাল লাইফ। বাংলায় দাঁড়ায় এইরকম—আমাদের জাতীয় জীবনের ওপর বাংলার আঞ্চলিক সংগীত এবং স্বদেশী সংগীতের প্রভাব। এক্ষেত্রেও আঞ্চলিক সংগীত অর্থে কী বোঝাচ্ছে, সেটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আবশ্যক।

সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলি—রিজিয়ন অফ বেংগল, তাহলে গোটা বাংলা দেশকে বোঝায়। রিজিঅন শব্দের আসল অর্থটা ভৌগোলিক এবং ভারতবর্ষের একটি অঞ্চল হচ্ছে বাংলা দেশ। কিন্তু বেংগলস রিজিঅনাল মিউজিক বললে সেটা বাংলার সংগীতকে সামগ্রিকভাবে বোঝায় না—তখন বোঝায় বাংলার বিভিন্ন রিজিঅনে বা অঞ্চলে প্রচলিত সংগীত।

বোর্ড যাঁদের ওপর সিলেবাসের ভার দিয়েছিলেন, তাঁরা রিজিঅন শব্দটির প্রয়োগে গণ্ডগোল করেছেন—বোর্ডকে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ক্লাশ ইলেভেনের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় একটি জয়দেবের পদাবলী গাইতে বলা হয়েছে। গত শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত জয়দেবের গানের যত সুর পাওয়া গেছে তার কোনটাই প্রামাণিক নয় ট্রাডিসনালও নয়। বহু শতাব্দীর পরে মূল সুর খ‍ুঁজতে যাওয়াও বৃথা। তা সত্ত্বেও যদি গাইতে হয় ছেলেমেয়েরা আধুনিক যাত্রা, থিয়েটার বা সিনেমার সুর অবলম্বন করে কাজ উদ্ধার করবে। বোর্ড যদি তাই চান তাহলে বলবার কিছু নেই।

সিলেবাস অনুযায়ী যেসব শব্দ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া দরকার, তার তালিকা থেকে কতকগুলি বিশেষ শব্দ বাদ গেছে, যথা—ধ্বনি, নাদ, সংগীত, মূর্ছনা, মার্গ দেশী, প্রবন্ধ। এ কটাই মনে এল—এ ছাড়াও বহু প্রয়োজনীয় শব্দ আছে, যা শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন।

ক্লাশ ইলেভেনের তালিকায় রয়েছে—টাইম থিওরী অফ ইণ্ডিয়ান রাগজ। কথাটা পোপলির বই থেকে ধার করা বলে মনে হয়। পোপলি ভাতখণ্ডের সন্ধিপ্রকাশ রাগের কথা বলেছেন, কিন্তু ওইটুকুই সব নয় এর বহু পূর্বে নারদের সংগীত মকরন্দ থেকে এর জের শুরু হয়েছে। এসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষকগণ যেন যথেষ্টই বিস্তৃত নোট প্রস্তুত করেন। বোর্ড এসম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

কণ্ঠ সংগীতের ব্যাপারে গ্রেট মিউ-জিসিয়ানস অ্যাণ্ড কম্পোজার্স বলতে সিলেবাসে এই কটি নামের উল্লেখ আছে—বৈজু, নায়ক গোপাল, তানসেন, সুরদাস, তুলসীদাস মীরা জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যা-পতি রামপ্রসাদ যদুভট্ট ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাতখণ্ডে বিষ্ণু দিগম্বর এবং রবীন্দ্রনাথ।

এ থেকে বোঝা যায়, মিউজিসিয়ান এবং কম্পোজার এ দুটি শব্দের স্পষ্ট অর্থ সিলেবাস প্রণেতাদের জানা নেই। এ যুগে ধ্রুপদ, খয়াল, টপ্পা এবং ঠুংরি—এই চারটি রীতি প্রধানত প্রচলিত। এর মধ্যে খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুংরি—এই তিনটির একটিরও প্রতিনিধিত্বমূলক কোন ব্যক্তির উল্লেখ এই তালিকায় নেই। আমীর খসরু এবং সদারঙ্গ—এই দুটি নামও এঁদের মনে পড়েনি। একথা অকুতোভয়েই বলব যে, উক্ত তালিকায় খুব কম ব্যক্তিকেই প্রকৃত মিউজিসিয়ান বা কম্পোজারের মধ্যে ফেলা যায়।

ভারতীয় সংগীত সাহিত্য বা সংগীত শাস্ত্রকার সম্পর্কে পরিচয়ের কোন আবশ্যকতা আছে বলে বোর্ড মনে করেন না এবং এসম্বন্ধে কোন উল্লেখ তাঁদের সিলেবাসে নেই।

বাংলার টপ্পা তথা কাব্যসংগীত এবং বাংলার নাট্য সংগীত, যা দুই শতাব্দী ধরে বাংলা গানকে সংগঠিত করেছে, সে সম্বন্ধে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা সিলেবাসে নেই। তার আগেকার কথা ছেড়েই দিলাম। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বা কৃষ্ণধন বন্দ্যো-পাধ্যায় যেখানে স্থান পেয়েছেন, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তির স্থান হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গানের অতি প্রাধান্য এবং অপরাপর বিশিষ্ট গীতিকারের সম্পূর্ণ অনুল্লেখ অতিশয় পরিতাপের বিষয়। রামনিধি থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল প্রভৃতি কোন গীতিকারের নাম পর্যন্ত সিলেবাসে নেই—অথচ রিজিঅনাল মিউজিকের বড়াই ঘটা করেই করা হয়েছে।

এই সিলেবাস থেকে ছেলেমেয়েরা ভারতীয় সংগীত বা বাংলা গানের ধারা-বাহিক প্রগতির প্রায় কোন পরিচয়ই পাবে না। আসলে এই পাঠ্য তালিকার মূলে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার একান্ত অভাব, যার ফলে তিন বৎসরব্যাপী শিক্ষার মধ্যেও সর্বাঙ্গীণ ব্যাপকতার একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হবে। বস্তুত এই সিলেবাসে ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় নেই—কেবলমাত্র কতক-গুলি বিষয়বস্তুর প্রক্ষেপে একটা খাপ-ছাড়া তালিকা তৈরি হয়েছে, যার সার্থকতা তদনুরূপ পারম্পর্যবিহীন শিক্ষাতেই পর্যবসিত হবে।

বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এডুকেশনকে, আমরা অবিলম্বে এই অতি অসম্পূর্ণ এবং অসংগতিবহুল সিলেবাসের পূর্ণতা এবং শৃঙ্খলতা সাধনে যত্নবান হতে অনুরোধ করি।
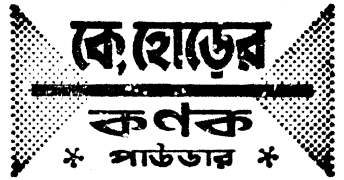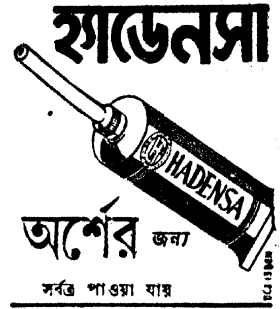
ডঃ শশধর সিংহ

॥ ৪ ॥
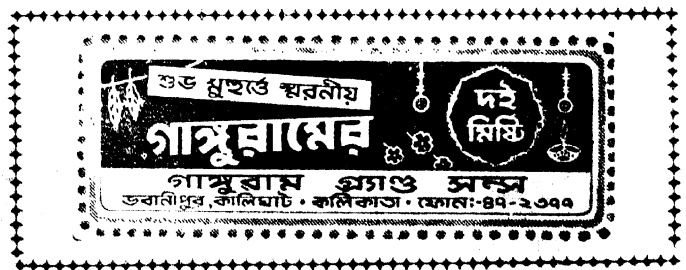
প্রথম যখন হাসপাতালে আসি, তখন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আমার চিকিৎসা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন হবে কিনা, এই নিয়ে এঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ হ'ল। তাই পর্যবেক্ষণের জন্য আমাকে মেডিক্যাল ওয়ার্ড থেকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে পাঠানো স্থির হ'ল।

একদিন বিকালবেলা আমি এই অনিশ্চিত অভিযানের জন্য প্রস্তুত হ'লাম। নার্সরা আমার খাটটা ঠেলে নিয়ে লিফ্‌টে ক'রে উপরের তালায় নিয়ে গেল। এখানে এসে দেখি সবই নূতন, সবই অপরিচিত। বড় একা একা লাগল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। অল্প সময়ের মধ্যেই নানারকমের পরীক্ষা শুরু হ'ল। এতে করে সময় কাটতে লাগল। নিজের সম্বন্ধে ভাববার বেশী সুযোগ মিলল না।

সন্ধ্যায় সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত "ভিজিটিং আওয়ার" অর্থাৎ রোগীদের দেখতে আসার সময়। দিনান্তে কাজের শেষে আমার পত্নী রোজ আমাকে দেখতে আসে। এই সময়টা আমার কাছে বড় লোভনীয়। এর জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করে থাকি। তার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আবার নতুন জীবন লাভ করি। নিরাশা দূরে হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে আশা ফিরে আসে।

যে-সব আদর্শ নিয়ে মানুষ হ'য়েছিলাম, তার এই ক্রূর পরিণতি হবে তা কখনও কল্পনা করিনি। আমার স্ত্রীর বিষাদ মুখের দিকে যখন তাকাই আর ভাবি আমার জন্য তাকে কত দুঃখ বরণ করতে হয়েছে, তখন নূতন ক'রে সংকল্প করি, বাঁচতেই হবে, সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে। জীবনে এখনও ত কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে, কত কর্তব্য করা হয়নি। এসব অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাব, তা হ'তেই পারে না, এসব কথা মনেও স্থান দিতে চাই না। মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে উঠি সত্য, সে ত স্বাভাবিক। কিন্তু মনে মনে পণ করি, কিছুতেই হার মানব না। হার যদি মানি, তাহ'লে কোথায় রইল আমার পৌরুষ, কোথায় রইল আমার মনুষ্যত্ব। অবশেষে বিধাতার কাছে কি কৈফিয়ত দেব?

নূতন জায়গায় এসেছি, রাতটা কিভাবে কাটবে ভেবে দুশ্চিন্তা হয়েছিল। আমার স্ত্রীর আসার পর থেকে মনটা শান্ত হয়েছে, সাময়িক কাপুরুষতাও দূর হ'ল। সেই রাত্রে আমার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হ'ল না।

পরদিন ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভাবলাম যেন এক নতুন জগতে এসেছি। যেখানে শুয়ে আছি, সেই বৃহৎ কামরাটা রোদে ভরে গেছে। মনে পড়ল পিয়ের লোটির (Pierre Loti) একটা লেখার কথা। ভারতবর্ষের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন "আলো! আলো! আলো!" আমারও মনের ভাব একই প্রকার। চারিদিকে অজস্র আলোময়। মনে হ'ল যেন সমুদ্র-তীরের কোন এক বড় হোটেলের কামরায় শুয়ে আছি। হাওয়ায় ছুটির উত্তেজনা। চতুর্দিকে নারীপুরুষেরা ছুটোছুটি করছে। তাদের কথাবার্তা, হাসি-তামাশা কানে ভেসে আসছে। কামরার এক কোণে একটি মেয়ে গান গাইছে। মনে হ'ল, ইতালীয় সুর ও গান। আর শুনতে পাচ্ছি, ঢেউয়ের শব্দ, অবিরাম সমুদ্রতটের উপর ভেঙে পড়ছে। একবারও সন্দেহ হয়নি যে, যা শুনতে পাচ্ছি তা শহরের রাস্তার শব্দ মাত্র।

"তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে"

আমার জীবনে আজ ত উৎসবের দিন নয়, তবুও মনটা উল্লসিত হয়ে উঠল।

চারিপাশের যৌবনের মাদকতা আমাকেও স্পর্শ করেছে।

কৌতূহল হ'ল কোথায় আছি জানতে। বিছানার পাশে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, বলতে পার এটা সমুদ্রতীরের কোন্ শহর আর আমরা কোন্ হোটেলে আছি।" প্রশ্ন শুনে সে একটু অবাক হ'ল বলে মনে হ'ল। উত্তর দিল, "না আমরা ত লণ্ডনেই আছি, ন্যাশনাল হাসপাতালে।"

ঘুমের ঘোর কাটল। কল্পলোক থেকে বাস্তব জগতে নেবে এলাম। ক্রমে আগের দিনের সব কথা মনে পড়তে লাগল।

এই ইংরেজ যুবকটির কথা আগেই লিখেছি। তার অভিনেতা হওয়ার খুব শখ। এর পর থেকে যখনই সময় পেতাম এর সঙ্গে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের বিষয় আলোচনা করতাম। ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমার পরিচয় ত্রিশ বছরের উপরে। মনে পড়ে, ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় প্রতি শনিবারে, কখনও কখনও বা অন্যদিন থিয়েটার যাত্রীদের সারিতে যোগ দিতাম এবং সস্তায় গ্যালারী বা পিটের টিকেট কিনে কত নাটক দেখেছি। এইভাবে যৌবনে ও পরজীবনে ইংল্যাণ্ডের এমন কোন প্রসিদ্ধ নাটক নাই যা আমি না দেখেছি। বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডের নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখবারও আমার সৌভাগ্য হয়েছে। ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবের্গ (Strindberg) ও চেখভের লেখা নাটকও দেখার আমার অনেক সুযোগ মিলেছে। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় মলিয়েরেরও (Moliere) কত নাটক দেখেছি।

দুঃখের বিষয় এই যে, গত যুদ্ধের পর থেকে এদেশে থিয়েটারে যাওয়া এত ব্যয়-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির একটা বিশেষ দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, এর দরুণ এদের শিক্ষায় একটা অভাব রয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের কথা। আমার যৌবনে বার্নার্ড শ' ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁকে কতবার দেখেছি ও তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। একবার মনে আছে, তিনি কিংসওয়ে হলে (Kingsway Hall) আচার্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন এবং আমাদের খুব কাছে এসে বসেছিলেন। আর তাঁর লেখা এমন কোন নাটক নাই যা দেখিনি। দেখলাম, আমার এই যুবক বন্ধুটিও শ'র খুব ভক্ত। আমাদের কোন্ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় ভাল লাগে, সেই নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম। দেখলাম যে, আমাদের আশ্চর্য মনের মিল। আমাদের যৌবনের অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী আজ বেঁচে নেই বা বয়স হওয়াতে অভিনয় করেন না। তবুও এঁদের স্মৃতি এখনও সজীব রয়েছে। ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চ এখনও খুব সজাগ এবং এর উৎকর্ষ কোনপ্রকারে কমেনি। কেবল তফাত হ'ল এই যে, আগের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী নাটকের অভাব। এর একটা ফল হয়েছে এই যে, বাধ্য হয়ে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চকে ভাল নাটকের জন্য আমেরিকা ও ফ্রান্সের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই অবস্থাকে খুব শোচনীয় ব'লে মনে করি না, কারণ এতে করে হয়ত একটা আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতির ঐক্যও এতে বাড়বে ব'লে আশা করা যায়।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আসার পর থেকে রোজ বিশেষজ্ঞরা আসছেন। এ'রা এসে আমার খাটের চারপাশে বৈঠক বসাচ্ছেন। আমি শুয়ে শুয়ে এ'দের আলোচনা শুনি এবং তাতে মাঝে মাঝে যোগও দিই। এ'দের সংগে এইভাবে খুব জানাশুনো হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস যে, এ'রা আমার সংগে কথাবার্তা বলে খুশী হ'তেন। দুর্দিনে এ'দের আশ্বাসবাণী আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। সেজন্য আমি এ'দের কাছে খুব কৃতজ্ঞ।

মনে আছে, একদিন এ'দের মধ্যে একজন একটা সংবাদপত্র নিয়ে এলেন এবং আমাকে তার প্রথম পাতাটা পড়তে বল্লেন। চশমা কাছে ছিল না তাই ছোট হরফে লেখা পড়তে পারলাম না। কিন্তু বড় হরফে লেখা সবই অনায়াসে পড়ে দিলাম। বিজ্ঞানী পণ্টেকরভের নাম চোখে পড়ল। চিকিৎসকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পণ্টেকরভ কে?" আমি উত্তর দিলাম, "কেন, ইনিও বিশ্ববিখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানী; ইনি জাতিতে ইতালীয় আর তাঁর স্ত্রী সুইডেন থেকে এসেছেন। ইনি আগে ইংলণ্ডে কাজ করতেন, এখন রাশিয়াতে আছেন মস্কোর কাছে এক আণবিক বিজ্ঞানাগারের অধ্যক্ষ হিসেবে"। উত্তর শুনে চিকিৎসকটি একটু অবাক হলেন। বল্লেন, "আপনি এত সব জানলেন কি করে?" আমি বল্লাম, "এসব জানা ত আমার ব্যবসায়।" বুঝতে পারলাম, আমার মানসিক কোন অবনতি হয়েছে কিনা ইনি পরীক্ষা করে নিলেন।

সে যাই হোক, এখানে আর বেশীদিন থাকতে হ'ল না। স্থির হ'ল, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না। আবার মেডিক্যাল ওয়ার্ডে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল।

ইতিমধ্যে ফিজিওথেরাপি (physio-theraphy) শুরু হ'ল। এর উদ্দেশ্য হ'ল ব্যায়ামের সাহায্যে রোগীর অবশাংগকে কেবল পুনরায় চালু করা নয়, সংগে সংগে রোগীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। প্রথমদিন থেকেই আমার "চিকিৎসার" বা ট্রিটমেণ্টের ভার পড়ল একটি মার্কিন মেয়ের উপর। রোজ বিকেলে দুটোর সময় এসে উপস্থিত হ'ত এসেই বলত, "গুড আফটারনুন, ডক্টর, আমরা কাজে লেগে যাব?" এই কাজে লাগার কথাটা মার্কিন চরিত্রের পরিচায়ক। কাজের ভিতর দিয়েই মার্কিন জাতি এত বড় হয়েছে। একে দেখেই মনে হ'ত যে, এই মেয়েটি ফিজিওথেরাপিতে খুব অভিজ্ঞ। আমি তখন একেবারে অচল, আমাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে চলন্ত চেয়ারে করে লিফটের সাহায্যে ব্যায়ামাগারে নিয়ে যেত। সেখানে গিয়ে আমার হাঁটবার প্রথম হাতে-খড়ি হ'ল। কি ধৈর্য! কি কর্মনিষ্ঠা! এই বিভাগে নানা দেশের মেয়েরা কাজ করে—ইংরেজ, ওয়েলস্, জর্মন, মার্কিন, কানে-ডিয়ান। অসীম ধৈর্যের সংগে এরা কত রোগীকে আবার নূতন জীবনদান করছে। মার্কিন মেয়েটি কিছুদিন পর ছুটিতে গেল এবং তারপর পর পর দু'টি ওয়েলস্ মেয়ে ও দু'টি ইংরেজ মেয়ের উপর আমার "চিকিৎসার" ভার পড়ল। এরা অল্পবয়সের মেয়ে, অন্য হাসপাতাল থেকে শিক্ষানবীশ হিসেবে এসেছে। এদের সবার কাছ থেকে কন্যার সেবা পেয়েছি। যেদিন প্রথম ওয়েলস্ মেয়েটি নিজের হাসপাতালে ফিরে যাবে সেদিন এসে সে বলল, "ডক্টর সিন্‌হা, তুমি এত ভেবো না, এ-ব্যাধি সারতে সময় লাগে, তুমি ভাল হয়ে যাবে।" হাসপাতাল ছাড়বার শেষদিন, ইংরেজ মেয়েটিকে বললাম, সেরে উঠলে আমি দেশ থেকে তাকে একটা চিঠি লিখব। সে ভারি খুশী হয়ে উঠল। বলল, ঠিকানা লিখতে ভুলো না, চিঠি ফিজিওথেরাপি বিভাগের ঠিকানায় পাঠিও। এখানে একটি জাপানী মেয়ের সংগেও আলাপ হ'ল। সে খুব কাজের মেয়ে, দেখলাম, এর উপর সবাই নির্ভর করে এবং কোন সমস্যা উঠলে তার কাছে ছুটে যায়। একদিন তাকে সম্বোধন করে জাপানী ক'টা কথা, যা জানি আওড়ালাম। দেখলাম সে কিছু বুঝতে পারল না। সে বলল যে, সে কখনও নিজের দেশে যায়নি, যাবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু অর্থাভাব, তাই পয়সা জমাচ্ছে। প্রথম প্রথম সে খুব লাজুক ছিল, কিন্তু যখন লজ্জা ভাংগল, তখন সে এসে আমার সংগে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলত।

একদিন সন্ধ্যায় মেডিক্যাল ওয়ার্ডে ফিরে এলাম। আমার নার্সরা একে একে দেখা করতে এল। ঝণ্টু স্টাফ নার্সটি এসে বলল, "আমাকে খবর পাঠাওনি কেন, তাহ'লে আমি তোমাকে দেখতে যেতাম।" পরে একটি নাইট-নার্স এল। বলল, "আমাকে চিনতে পারছ?" কথা শুনে বুঝলাম যে, সে ফরাসী। তার নাম ভুলে গেছি বলে তার খুব অভিমান হ'ল। এ মেয়েটির মধ্যে তার স্বজাতির দোষ-গুণ দুই-ই লক্ষ্য করতাম। তার প্রখর বুদ্ধি ও কর্মকৌশল উপেক্ষা করার উপায় নেই, কিন্তু সংগে সংগে তার জাতিসুলভ চরিত্রের অসহিষ্ণুতাও চোখে পড়ত। ইংরেজদের তুলনায় ফরাসীরা নিজেদের মতামত সম্বন্ধে খুব অসহিষ্ণু। অন্যদের মতামতও যে শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারে তা এরা বিশ্বাস করে না।

হাসপাতালে যখন ছিলাম, তখন অনেক বন্ধুবান্ধব আমাকে দেখতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে আমার এক পুরাতন বাঙালী মুসলমান বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীও আসতেন। এই মেয়েটি অনেক সময় নিজের হাতের তৈরী খাবার নিয়ে আসত। এঁর সংগে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করতাম। একদিন তাকে বললাম, "বিদেশে এসে এভাবে বোনের আদর পাব তা কখনও ভাবিনি।" এসব দেখে-শুনে প্রায়ই ভেবেছি যে, হিন্দু-মুসলমান আমরা এক রক্তের মানুষ, তবু আমরা আজ বিভক্ত। এতে করে বাংলাদেশের মেরুদণ্ড ভেংগে গেছে, কিন্তু তাতে কার উপকার হয়েছে? ভারতবর্ষের পক্ষে বাংলাদেশের উন্নতি দরকার। সম্প্রতি মৌলানা আজাদের পুস্তক পড়ার পর থেকে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।

ট্রামে-বাসে

এসপ্তাহের জোর খবর রাশ্যার রকেট চন্দ্রলোকে পৌঁছিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, বুডাপেস্ট হইতে চন্দ্রে একটি কৃষ্ণ বস্তু পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এই কৃষ্ণ বস্তু রকেটের আঘাতজনিত ধূলিজাত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন "শুধু অনুমান কেন, এ ধূলিজাল না হয়ে যায় না। মানুষের এই অমানুষিক প্রচেষ্টার গায় চন্দ্রলোক নিশ্চয়ই ধুলো দিয়েছে! চন্দ্রাহতদের কাণ্ড দেখে "তারকা" লাঞ্ছিত পতাকা লজ্জায় অবনমিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের এতে আনন্দে মুক্তকচ্ছ হবার কোন কারণ নেই"।

* * *

পরবর্তী জোর খবর রাশ্যার প্রধান-মন্ত্রী মঃ খ্রুশ্চেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করিয়াছেন। সংবাদে দেখা গেল, রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনায় খ্রুশ্চেভ বেশ সহাস্যবদন

ছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইকের মুখশ্রী কঠোর ভাব ধারণ করে—না করে উপায় কী। খ্রুশ্চেভ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন—আজ আপনারা আমাদের চেয়ে ধনী, কাল আমরা আপনাদের মতোই ধনী হব এবং পরশু আপনাদের চেয়েও ধনী হব।—এই ধরনের কথা শুনে তো আর ধনীরা দাঁত বার করে হাসতে পারে না"—বলে শ্যামলাল।

* * *

মঃ খ্রুশ্চেভের হাসির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন জনৈক সহযাত্রী, বলিয়াছেন—"চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো; সুতরাং কাজে কাজেই"।

* * *

কমিউনিস্ট নেতা শ্রী ডাঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন—চীন ভারত আক্রমণ করিবে না। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন "ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আরো বেশি করে চাইড-রাইস খাওয়ানো। শ্রী ডাঙ্গে হয়ত এই বলতেন, কিন্তু সভারা হৈ হৈ করে তাঁকে কথাটা শেষ করতেই দিলেন না"!!

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম, পাকিস্তানে অক্সফোর্ড ডিক্সনারি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কর্তার খাঁদের মাথা মুণ্ডু নেই তাঁরা অভিধানের ধার ধারেন না। সুতরাং ডিক্সনারিটির অভাবে পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তবে একথাও বলি, যে দোষেই অভি-ধানটিকে নির্বাসিত করে থাকুন, এর নামের সঙ্গে অন্ততঃ "অক্স" তো যুক্ত ছিল, সেদিক থেকে একটু ক্ষমা ঘেন্না করা উচিত ছিল নয় কি"!

• • •

একটি সংবাদ শিরোনামায় বলা হইয়াছে "স্পীকার অন্বেষণের প্রচেষ্টা বাধা"। আমাদের শ্যামলাল বুঝাইয়া বলিল—"কথাটা হলো বিধান-সভার স্পীকারকে নিয়ে; নইলে অলি-গলি, ট্রাম-বাস, মনুমেন্টের তলা তো স্পীকারে স্পীকারে ধূলপরিমাণ"।

• • •

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—দেশে খাদ্যের অভাব নেই, অভাব শুধু বিশ্বাসের।—"অথচ এই সামান্য কথাটা আমরা মনেই করতে পারলাম না যে, বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত মিলে, আর খাদ্য মিলবে না! মনে করতে পারিনি বলেই না এত বড় সংকাণ্ডটা ঘটে গেল"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

শুনিলাম, ভারতের রেলগাড়ীগুলির চলার হিসেবে সেইগুলি দিনে অন্ততঃ পঁচিশবার পৃথিবী পরিক্রম করে।—"আমাদের রক্ত যে-গতিতে মাথায় উঠে চাপ সৃষ্টি করে, পরিসংখ্যান নিলে দেখা যেতো তাতে দিনে অন্তত একবার সেই রক্তস্রোত চন্দ্রলোকে না হলেও তার কাছে-পিঠে নিশ্চয়ই পৌঁছে যায়"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

ভারতে টেলিভিশনযোগে বেতার-বার্তা প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টা সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"টেলিভিশনকে বেতারবীক্ষণ বলা হইয়াছে। কিন্তু খরচের কথাটা ভেবে একে "টেলু-ই-ভীষণ" ছাড়া আর কিছু বলা যায় না"।

• • •

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"তাঁর ভাষণে

রপ্তানি পণ্যের প্রায় সবকিছুরই উল্লেখ আছে, নেই শুধু বাঁদরের। অথচ শুনে-ছিলাম, বিদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাঁদরের স্থান নেহাত নিচে নয়। চারিদিকে বাঁদরামো দেখে তো মনে হয় না বাঁদরের অভাব"!!

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ, বার্মিংহামের কোন এক বীমা কোম্পানী প্রণয়-প্রেমের বীমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রণয়িনী অকস্মাৎ প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া যদি অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন তাহা হইলে বঞ্চিত প্রেমিক বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে মোটা টাকার অঙ্ক পাইবেন, ইহাই হইল প্রেম-পলিসির মর্ম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বুঝতেই পারছি, এটা হলো "বিবাহের চেয়ে বড়" প্রেমের কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে বীমার ব্যবস্থা করতে হলে কোম্পানীকে গণেশ উল্টাতে হবে। আমরা ভাবছিলাম বিয়ের পরের পলিসির কথা। প্রেম নেই অথচ প্রেয়সী আছেন আঠার মতো লেপ্টে, এই অবস্থার বীমা হলে একটা কাজের মতো কাজ হতো"।

অতি ভয়ংকর বীভৎস সে দৃশ্য! কাল-নাগিনীর মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণা এক ললনা—দুই হাঁটু গেড়ে বসেছে মাটিতে। পশ্চাতে প্রসারিত পদযুগল, ঈষৎ নত সম্মুখের কলেবরের দেহযষ্টি। বিকট করাল বদন, কটা চোখে অনুগ্র দৃষ্টি। স্খলিত কণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারিত আভিচারিক মন্ত্র। দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করে তৃষিত লেলিহ রসনায় কি যেন পান করছে সে।

তামসী নিশাকালে কলেবর পান করছে কালকন্যা 'ভয়া'। দুরন্ত, মহাভয়ংকর কাল। ক্ষমাহীন করাল গ্রাসে তিনি বিশ্ব-রস পান করেন। তাঁর তিনশত ষাট পুত্র, তিনশত ষাট কন্যা। প্রত্যেকেই ভীষণদর্শন, উগ্রস্বভাব, পিতৃ-প্রকৃতির প্রতিরূপ।

এই কালেরই অন্যতমা কন্যা ভয়া। পিতার মতই অত্যুগ্র, ভ্রাতা-ভগ্নীর মতই ভয়ংকরী। তবুও স্বভাবে চিরকালের ক্ষুধা। উদ্যত গ্রাস, উদ্ধত প্রকৃতি। কুটিল-ভাষণে সে অদ্বিতীয়া—বাক্য বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ, জিহ্বায় দুষ্টা সরস্বতী। ভগ্নীরা সহোদরার নাম রেখেছিল 'দুর্মুখা'। দুর্মুখা কেবল দুষ্টভাষিণী নয়, সে দুষ্টমুখে পান করে মানুষের কলেবর—নিমেষে শোষণ করে নেয় দেহের সদ্‌গুণ—বিদ্যা, বিনয়, সদাচার। অতি ভীষণ তার তামসী বিদ্যা।

পিতা আদর করে নয়নানন্দ দুলালী কন্যার নাম রেখেছিলেন 'সুনীথা' অর্থাৎ ধর্মশীলা। অধর্ম-সম্ভব কাল, ধর্মের চিরবৈরী। কিন্তু তিনি জানতেন, ধর্ম ও অধর্মের আদি পুরুষ এক। একই বিরাট পুরুষের বক্ষ থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠ থেকে অধর্মের উৎপত্তি। কালক্রমে বংশলতিকা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, দুই বংশের মধ্যে জেগেছে বিরোধ। বৃদ্ধ কালের অন্তরে তাই প্রচ্ছন্ন ছিল একটি কামনা,—আবার দুই বংশের মিলনবন্ধন স্থাপন করা যায় কিনা। তিনি স্থির করেছিলেন, এই কন্যাকে সমর্পণ করবেন কোন ধর্মশীলের করে, একসূত্রে গ্রথিত করবেন দুই বিরোধী কুল। সাধ করে তাই তিনি ভয়ার নামকরণ করেছিলেন সুনীথা।

শৈশব অতিক্রম করে সুনীথা যৌবনে উত্তীর্ণ হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হল বংশগত দুর্গুণ। বক্রকুটিল প্রকৃতি, দুর্দমনীয় ঔদ্ধত্য। সর্বোপরি তার কলেবর পানের মত্ততা। চিন্তিত হলেন প্রবৃদ্ধ কাল, কোন ধর্মশীল গ্রহণ করবেন এই দুর্বিনীত অধর্মশীলাকে?

স্বায়ম্ভুব মনুবংশের ধর্মপ্রভব রাজা অংগরাজ 'ক্ষতু'—সুকৃতকর্মা, আচারনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারংগম। তিনি প্রজাবৎসল, সাধু-সজ্জনের একাশ্রয়। তাঁর রাজ্যে নিত্য যাগ, নিত্য দানক্রিয়া, নিত্য অতিথিসংকার। প্রজাপুঞ্জ রাজভক্ত, সুশীল, ধর্মপরায়ণ।

কাল ভয়াকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজা অংগের দ্বারে। ত্রিলোকত্রাস মহামান্য কাল। সন্ত্রস্ত অংগরাজ। পরম সমাদরে তিনি অতিথিকে পাদ্য-অর্ঘ দিলেন, মধু-পর্ক ও আসন নিবেদন করে বিনীতভাবে করলেন কুশলপ্রশ্ন।

কাল বললেন, 'প্রার্থী হয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার বহু কন্যার মধ্যে আদরিনী কন্যা এই সুনীথা। সৎপাত্রে কন্যাদান করাই পিতার কর্তব্য। তুমি ধর্মপরায়ণ, সুকীর্তিশীল। আমার কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর।'

কাল-বাক্যে চিন্তিত হলেন অংগরাজ। কালের বংশগত শীলাচার তাঁর অজ্ঞাত নয়। সেখানে পুরুষ দুঃশীল, নারী দুঃশীলা—প্রত্যেকেই অধর্মবন্ধু, ধর্মবৈরী। অথচ প্রার্থী স্বয়ং কাল। প্রার্থীকে বিমুখ করাও অধর্ম। চোখে যেন অন্ধকার নেমে আসে, সে অন্ধকারে পথ খোঁজেন আলোর সন্ধানে অংগরাজ।

মিনতিভরা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন কাল, 'ধর্মের পূত স্পর্শে আমার বংশ পবিত্র হোক—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়, তোমার করস্পর্শে কলধৌত সুবর্ণের মত উজ্জ্বল হোক আমার কন্যা। তুমি একে গ্রহণ কর। এই সেতুবন্ধে যুক্ত হোক ধর্ম ও অধর্মের দুই বিরোধী কুল।'

মুহূর্তের দ্বিধা, পরমুহূর্তেই স্থির-সংকল্প, স্থিতধী, সংযত অংগরাজ—নীলকণ্ঠের মতই তাঁর দুর্জয় তপঃশক্তি।

উৎপাতই সৃষ্টি করবে সে। রাজ্যময় ছড়িয়ে দেবে পুত্রকামা নারীর ব্যর্থ হাহাকার!

রাত্রি গভীর হলেও শয্যাকক্ষে সুনীথাকে না দেখে চিন্তিত হলেন অঙ্গরাজ। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করলেন। 'কোথায় গেল সে!'—এমন তো হয় না কোনদিন! কামার্তা আস্ফালন করে, গর্জন করে— শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে ঢলে পড়ে নিদ্রার ক্রোড়ে। কিন্তু আজ—

চিন্তাকুল চিত্তে রাজা বেরিয়ে এলেন কক্ষ থেকে। পার্শ্বকক্ষে প্রদীপ নেই, অথচ কক্ষ নিষ্প্রদীপও নয়। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি! সোৎকণ্ঠ অঙ্গরাজ-দ্বারের কাছে এলেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ নয়। একটু ঠেলে দেখলেন, তৈলপ্রদীপের স্বল্পালোকে রহস্যঘন কক্ষ। রুদ্ধশ্বাসে কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি।

এ কি ভয়ংকর দৃশ্য! প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে অভিচার ক্রিয়ায় রত সুনীথা। সম্মুখে ক্রিয়ার দ্রব্য—কপালপাত্র, রক্তজবা, রক্তসিন্দুর। নতজানু হয়ে পদযুগল পশ্চাতে প্রসারিত করে বসেছে সে, সম্মুখে ঝুঁকে পড়েছে কৃষ্ণসার বিশীর্ণ দেহ। আথর্বণ মন্ত্রের অস্পষ্ট হুংকার তার কণ্ঠে, দ্রুত চলেছে উপাংশু জপ। মাঝে মাঝে হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করে উগ্র তৃষ্ণাতুরের মত কি যেন পান করছে সে!

এ কি যক্ষী, না রাক্ষসী? ডাইনী, না প্রেতিনী! আতঙ্কে শিহরিত রাজা। দ্রুত সম্মুখে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন, 'সুনীথা!'

সুনীথা তখন এ রাজ্যে নেই, যেন সে চলে গিয়েছে ভূত-প্রেত-পিশাচের জগতে। রাজার আহ্বানে অর্ধজাগরিতের মত তার সম্বিৎ ফিরে এল। উৎকট, বিভ্রান্ত, অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকাল অঙ্গরাজের প্রতি। রাজার মনে হল, দেহ যেন বিশুষ্ক হয়ে যাচ্ছে! সভয়ে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'এ কি করছ সুনীথা!'

উদ্‌ভ্রান্তের মত অট্টহাস্য করে উঠল ভয়া, যেন অন্ধকারের অন্ধগর্ভে পিশাচীর অট্টহাস, যেন মহাতামিস্র নরকে নারকদের খলখল উচ্চরোল। ভয়ে, কম্পিতপদে দ্রুত বেরিয়ে এলেন অঙ্গরাজ।

পরদিন থেকে রাজ্যে ঘোর দুর্নিমিত্ত সূচিত হল। দিনমানে অন্ধকার দিঙ্‌মণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন গগন। কোথাও উল্কামুখী শিবার ধ্বনি, কোথাও অস্থি-করকা, কোথাও অকারণ শোণিতবৃষ্টি। সীমান্ত থেকে এল শস্যহানির সংবাদ, অকালমৃত্যু দেখা দিল রাজত্বে।

আতঙ্কগ্রস্ত প্রজা, আতঙ্কিত অঙ্গরাজ। ঋষিদের আহ্বান করলেন তিনি, আহ্বান করলেন কুলপুরোহিতকে। একে একে

সমবেত হলেন অঙ্গিরা, কশ্যপ, ভৃগু, ক্রতু। অমংগল শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন হোমের নির্দেশ দিলেন তাঁরা।

রাজোচিত আড়ম্বরে হোমের আয়োজন হল। দেশবিদেশ থেকে সমাহৃত হল যজ্ঞ-দ্রব্য। নানা স্থান থেকে এলেন বেদবিদ্ ঋত্বিক, অধ্বর্যু, উদ্গাতা, হোতা। সূত, ভাট, মাগধে পূর্ণ হল যজ্ঞস্থল। কৃত সংকল্প হয়ে রাজা বসলেন যজমানের আসনে, বামপার্শ্বে বসল, ভার্যা সুনীথা।

উদাত্তকণ্ঠে সামগান গীত হল, পর্যায়ক্রমে সুস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করে হোতা যজ্ঞাগ্নিতে হবি আহুতি দিলেন।

কিন্তু কি দুর্দৈব! বেদমন্ত্রের আকর্ষণে কর্মসাক্ষী দেবতা আবির্ভূত হলেন না। বিমুখ দেবমুখ অগ্নিদেব। যজ্ঞের হবি কুণ্ড ভূমিতে গড়িয়ে পড়ল। সোমপাত্র যেমন পূর্ণ, তেমনি পূর্ণ রইল। বিস্মিত পুরোহিতবর্গ, বিস্মিত সমাগত ঋষিবৃন্দ। যজমান অংগরাজের অন্তরে আশংকা—এ কি বিঘ্ন!

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন পুরোহিত, 'রাজা অপুত্রক—এইজন্যই হবিগ্রহণে পরাঙমুখ হয়েছেন দেবতা।'

উৎকট উল্লাসে জ্বল জ্বল করে উঠল ভার্যার উগ্র চক্ষু, লজ্জায় আরক্ত হল রাজার বদন। সংকোচে তিনি মস্তক আনত করলেন। তাঁর নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠল, প্রত্যাখ্যাতা রতিকাম নারীর কুটিল মুখ, ভেসে উঠল—অন্ধকার নিশীথে বঞ্চিতা সুনীথার প্রাপ্তি-প্রয়াসের বিকট লজ্জা! কেমন করে তিনি শুদ্ধ, সকল ঋষিদের বোঝাবেন, কেন তিনি অপুত্রক! পুত্রকামনা কি তাঁরও ছিল না? তাঁর প্রকৃতির মহত্তাপে বংশ-রক্ষার আকাঙ্ক্ষা—কিন্তু তিনি শঙ্কিত হয়েছেন, পূর্বেই সুনীথা ভার্যার স্বরূপ দেখে! লজ্জায়, দুঃখে, অনুতাপে নীরব রইলেন অংগরাজ।

ঋষিগণ নির্দেশ দিলেন, 'পুত্রকামনা করে আপনি যজ্ঞ করুন, নিশ্চয় মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। যজ্ঞেশ্বর অনপত্যকে অবশ্যই অপত্য-দান করবেন।'

সুনীথার কটা চোখে উল্লাসের পৈশাচিক দীপ্তি। শেষ পর্যন্ত অংগরাজ সম্মত হলেন। যজ্ঞে যদি সুনীথার অন্তর শুদ্ধ হয়, হয়তো সুপুত্রও লাভ করতে পারেন তিনি!

স্বস্ত্যয়ন হোমের হোমস্থলীতেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সূচনা হল। যাজ্ঞিক ঋষি-গণ যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে হবি নিবেদন করতেই পরিতৃপ্ত দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ যজ্ঞে আবির্ভূত হলেন এক দীপ্ত হিরন্ময় পুরুষ—স্বর্ণকান্ত কান্তি, কণ্ঠে কাঞ্চনমালা, হস্তে সিদ্ধ পরমান্ন। ব্রাহ্মণগণের নির্দেশে অংগরাজ অঞ্জলিপুটে সেই পায়স গ্রহণ করলেন, যজ্ঞেশ্বরকে স্মরণ করে প্রথমে নিজে আঘ্রাণ করলেন সেই পরমান্ন—তারপর অন্নপাত্র দিলেন রাজ্ঞী সুনীথার হস্তে। নির্লজ্জা সুনীথা, তার রসনায় বহ্নিতৃষা! ঋষি, ঋত্বিক ও সদস্যগণের সম্মুখেই সে এক নিশ্বাসে অন্নপাত্র নিঃশেষ করে ফেলল। হতবাক্ অংগরাজ, স্তম্ভিত জনগণ! কামনার এ কী কদর্য নগ্ন মূর্তি! যজ্ঞ শেষ হল। ভূরি দক্ষিণা গ্রহণ করে

বিদায় হলেন ব্রাহ্মণগণ। আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন রাজ্যের মঙ্গলকামী ঋষিবৃন্দ। চিন্তিত অন্তরে রাজা প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা, প্রদোষের ছায়ায় প্রায়ান্ধকার জগৎ। লোকে একে বলে আসুরী মুহূর্ত। অসুরের মত্ততা প্রকাশ পায় সন্ধ্যার রহস্যঘন আধআলো, আধঅন্ধকারে। ক্ষুধার্ত কামনার বীজ সৃষ্টিকে আকুল করে তোলে, এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হন সন্ধ্যায়। যতি, সন্ন্যাসী, ধৃতব্রত গৃহী তাই এ সময়ে নিযুক্ত হন সন্ধ্যা-বন্দনায়। 'যদঙ্কা পাপমকার্যম্' মন্ত্রে কলুষের বীজানু বিনষ্ট হয়ে যায়, হৃদয়ে জাগে অমেয় প্রশান্তি! কিন্তু কলুষ-চিত্ত-জীব সন্ধ্যাক্ষণেই পীড়িত হয় কামবাণে। রুদ্রাধিকারভুক্ত সন্ধ্যায় যজ্ঞক্রিয়াহীন অসুর-বৃত্ত জীব উন্দাম হয়ে ওঠে আসুরিক মত্ততায়।

কালকন্যা ভয়ার অন্তরেও আসন্ন সন্ধ্যায় মন্মথের মত সঞ্চরণ। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেই বিদ্যুল্লতার মত ছুটে আসে সে, যেন ছুটে আসে বিষমুখ একটা অব্যর্থ তীক্ষ্ণ তীর। বুকে পাশব উত্তেজনা, মুখে আদিমতম আরণ্য প্রবৃত্তির বীভৎসতা! ধর্মশীল অংগরাজ আর্তংকিত হয়ে, অনুনয়ে-উপদেশে শান্ত করতে চেষ্টা করেন অশান্ত তরুণ। অশুভ মুহূর্তের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে পুরাণ-ইতিহাস থেকে উধৃত করেন অসংযত কামনার ভীষণ পরিণামের উদাহরণ। কিন্তু সুদুষ্কর যেমন বায়ু, অনিয়ত যেমন প্রলয়কালের উল্কা, প্রমত্তা যেমন মদস্রাবী কারণী—তেমনি উন্দাম ভয়া। বিচারহীন প্রচণ্ড ক্ষুধা, কামান্ধের নিকট ব্যর্থ শাস্ত্রের অনুশাসন। অসহায়, উপায়হীন অংগরাজ।

ফলও ফলল প্রত্যক্ষ। ভয়ার দুর্বিনীত বাসন-ভোগের বাসনায় জন্মগ্রহণ করল অধর্মাংশপ্রভব পুত্র বেণ। মাতামহের মত দুরতিক্রমণীয়, মাতুলদের মত অতি কুটিল, মাতৃস্বসাদের মতই মহাভয়ংকর। সে নির্দয়, নিষ্ঠুর, নির্মম। শিশু হলেও বালভুজঙ্গের মত বিষধর, ক্ষুদ্র হলেও সর্বগ্রাসী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত কণ্টকর। মূর্তিমান অধর্ম, হিংস্রতা, দুঃসহ মহামদ আবির্ভূত হল ধর্ম-পরায়ণ স্বায়ম্ভুব মনুর গোত্রে।

কিন্তু এই দুরন্ত শিশু হল জননী ভয়ার নয়নানন্দ, দ্বিতীয় আত্মা। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।' নন্দন-দর্পণে আত্মরূপের প্রতিবিম্ব দেখে পরিতৃপ্ত হল সে। কি অপূর্ব শিশুর শৈশব-লীলা! দেখে দেখে সাধ মেটে না মায়ের। শিশু বেণ অট্টহাস্য করে পক্ষি-শাবকের কণ্ঠ দ্বিখণ্ডিত করে, ফিনকি দিয়ে ছোটে রক্তধারা—ভয়ার অন্তরে পৈশাচিক তৃপ্তি! বেণ ক্রীড়াছলে অন্যান্য শিশুদের কণ্ঠ চেপে ধরে, পীড়নে করুণ আর্তনাদ করে ওঠে ক্রীড়া-সংগী—মুহূর্তে দেহ নীল হয়ে যায়, মৃত্যুতে নিশ্চুপ হয় দুগ্ধপোষ্য বালক। উৎকট উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে, ভয়ার হৃদয়। ভয়ার বক্রস্বভাবের অবিকল প্রতিরূপ দৃষ্ট বেণ। জঘন্য পুত্রগর্বে গর্বিতা কালকন্যা। বেণ তার নয়নের আনন্দ, প্রাণের প্রাণ। চোখের আড়াল হলে সে পলকে পাগল হয়।

কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন, খিন্ন হন ধর্মভীরু অংগরাজ। বংশে এ কি অভিশাপ! এই আশঙ্কাই পূর্বে করেছিলেন তিনি—কুমাতার স্বভাবদোষে জন্ম নেবে কুসন্তান, কুটিল কামনার বিষবীজে অংকুরিত হবে লোকত্রাস বিষবৃক্ষ। সন্তানের দুষ্ক্রিয়া তাঁকে চিন্তাকুল করে তোলে,—'এর চেয়ে কি নিঃসন্তান হওয়া ভাল নয়?' সংক্রামক ব্যাধির বিভীষিকায় ব্যাকুল অন্তরে রাজ্য, গৃহ, পুত্র—সবই অসার মনে হয়, মনে হয়—অর্থহীন প্রপঞ্চসার সংসার। অন্তরে বিরক্তি, গৃহধর্মে নৈরাশ্য, রাজকার্যে নিরাসক্তি—নির্বিণ্ণ মহারাজ ক্ষুব্ধ। একদিন নিশিযোগে নিদ্রিতা দুর্বিনীতা ভার্যা ও দুর্বিনীত পুত্রকে পরিত্যাগ করে নির্বেদপ্রাপ্ত অংগরাজ বহির্গত হলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পশ্চাতে পড়ে রইল সর্বসম্পত্তি পূর্ণ রাজত্ব!

প্রজাবর্গ পিতৃহীন অনাথের মত হাহাকার করে উঠল। চতুর্দিকে চলল অনুসন্ধান। ব্যর্থ চেষ্টা। অনন্ত অমৃত পথের পথিক ধর্মশীল অংগরাজ। মরজগতের মানুষ সে সাবিত্রী-পথের সন্ধান পাবে কোথা থেকে?

প্রথমে ক্রোধে গর্জন করে উঠল স্বামি-পরিত্যক্তা দুর্মুখা, যেন অভিহতা কাল-

নাগিনী। অকথ্য দুরুক্তির অসংখ্য দ্বিরুক্তি —স্বামী বলে ক্ষমা নেই, গুরুজন বলে দ্বিধা নেই। তারপর আকুল স্নেহে সে বুকে তুলে নিল শিশু বেণকে—পত্নীর ক্ষোভ উত্তাল হল মাতৃত্বের অন্ধ স্নেহোল্লাসে। স্বামী গিয়েছে যাক্—ধর্মভীরু, দুর্বল স্বামীকে সে কামনা করে না—সে চায় না শান্তির নিঃসীম নির্জীবতা। বেঁচে থাক তার পুত্র। হৃদয়ের ধন এই পুত্রই হবে রাজ্যের সর্বস্ব, প্রজার দণ্ডধর রাজা। অন্তরের দুঃশীলতার নির্যাস ঢেলে দিলেন পুত্রের ওপর। তার মাতৃত্বে বর্ধিত হল দুরন্ত কালের মতই মহাভয়ংকর বেণ, যেন অতি দুষ্ট এক কালসর্প! একে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, অন্ধ স্নেহের প্রশ্রয়ে এই কৃষ্ণতা বিস্তৃত হল অন্তরে ও আচরণে—যেন বিস্তৃত হল সর্বধ্বংসী, বজ্রসূচি কালান্তের নীললোহিত মেঘ।

নিরুপায় অমাত্যবর্গ ও প্রজা। সম্রাজ্ঞী সুনীথার নির্দেশে দুঃশীল বেণকেই তারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করতে বাধ্য হল।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লেলিহান শিখা বিস্তার করল এবার। মাতৃস্বভাব বেণের পিতৃস্বভাব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ ক্রোধ, মহাদম্ভ, নির্মম নিষ্ঠুরতা—তার সঙ্গে যুক্ত হল দণ্ডনীতি, ঐশ্বর্য-মত্ততা ও আত্মাদর-পরায়ণতা। নিরঙ্কুশ গজেন্দ্রের মত দুর্বিনীত, মদোদ্ধত বেণ। প্রচণ্ড দণ্ড—তার পীড়নে ও যথেচ্ছাচারে ত্রস্ত ত্রিভুবন। বেদ-ব্রাহ্মণ কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না। বৈদিক ক্রিয়ার মূর্ত প্রতিবাদ, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের বৈরী, অধর্মের পরম মিত্র বেণ। সমাজ-শৃঙ্খলার মূলে সে কঠিন আঘাত হানল। বর্ণাশ্রমধর্মকে উপেক্ষা করে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করল অবৈধ অনুলোম, প্রতিলোম মিলন; সে মিলন বিবাহ নয়, ব্যভিচার—দাম্পত্যবন্ধন নয়, স্বৈরাচার। প্রদুষ্টা স্ত্রী-জাতি থেকে ক্রমে উৎপন্ন হল কুলঘ্ন বর্ণ-সংকর। আত্মদম্ভে শৃঙ্খলার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে বজ্রনাদে ঘোষণা করল ভয়া-নন্দন,—তার রাজ্যে নিষিদ্ধ দেব-আরাধনা, নিষিদ্ধ যজ্ঞক্রিয়া; একমাত্র রাজাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর—এই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরেরই পূজো করতে হবে বেণ রাজ্যে।

ঘোষণা শুনে পরম পরিতৃপ্তির হাসি হাসল ভয়া। স্বামীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ছিল যে আক্রোশ—এ ঘোষণা যেন তারই প্রতিশোধ। ধর্মকে যোগ্য আঘাত হেনেছে তার উপযুক্ত সন্তান! ওটা চোখে কুটিল প্রসন্ন দৃষ্টি!

কিন্তু অকল্যাণ-ভয়ে ভীত হলেন অমাত্যবর্গ, ক্রিয়ালোপে প্রমাদ গণলেন নিরীহ পুরোহিত, শঙ্কিত সন্ত্রস্ত হল প্রজাকুল। পণ্যরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত গৃহমেধী আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। এ কি বিপর্যয়!

ধর্মহীন রাজা, প্রজা ক্রিয়াহীন। মহা-দুর্দৈব আসন্ন ভেবে চিন্তিত হলেন রাজ্যের হিতার্থী তপোধন ঋষিবৃন্দ। তপস্যার ষষ্ঠভাগ তাঁরা কররূপে রাজাকে অর্পণ করেন। সেই কর অশেষ কল্যাণের আকর। সেই করেই সুখে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয় রাজ্য-শ্রী। কিন্তু অন্ন, ঐশ্বর্য, শ্রী—সবই যজ্ঞ-সম্ভূত। অধর্মাচারী রাজা সেই যজ্ঞ বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে। ক্ষুব্ধ হলেন আহিতাগ্নি ঋষিসংঘ। অন্তরের বিক্ষোভ বহ্নি অন্তরে প্রচ্ছন্ন রেখে ভৃগু, প্রমুখ প্রজাপতি বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন বেণ-সকাশে।

চণ্ড-শাসন ভয়া-নন্দন তখন দম্ভভরে বসেছিল রাজসভায়। সে সভার মন্ত্রী—কুমন্ত্রী, কৌটিল্য-নীতিবিশারদ; পণ্ডিত বিতণ্ডাবাদী চার্বাকপন্থী; কবি কামশাস্ত্র—পারঙ্গম। বিচারমূঢ় ভূপতির বিচারহীন সভা। মহামান্য মুনিগণ উপস্থিত হলেও উদ্ধত রাজা আসন থেকে উঠে প্রত্যুদ্গমন করল না, এমন কি আসন পর্যন্ত প্রদান করল না তাঁদের। মহা ঔদ্ধত্যে মুখ থেকে কেবল উচ্চারিত হল মদস্খলিত বজ্রস্বর, 'কি প্রয়োজন!'

বিনম্রভাবে দাঁড়িয়েই বললেন মুনিগণ, 'যজ্ঞ থেকেই পর্জন্য, পর্জন্য থেকে অন্ন। ঋদ্ধি ও সিদ্ধির মূলে যজ্ঞ। যজ্ঞনিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়।'

'কার যজ্ঞ? কে যজ্ঞেশ্বর?'—ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে গর্জন করে উঠল দাম্ভিক বেণ। মহাদম্ভে আস্ফালন করে সে বলল, 'রাজাই যজ্ঞেশ্বর, মর্ত্যের প্রত্যক্ষ দেবতা; রাজ-দেহেই বর্তমান কাল্পনিক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ইন্দ্র-মিত্রাবরুণ। রাজার পুজোই দেবপুজো, যজ্ঞের হবি-সোমে রাজারই অধিকার।'

দুষ্টবুদ্ধি ভর করেছে বেণের রসনায়। বিনষ্ট সত্তার সদ্‌বৃত্তি। ঋষিগণ বুঝলেন, মাতৃদোষে দুষ্ট সন্তান। যে কাম-মত্তা নারীর শোণিতে পুষ্ট এই পুত্রদেহ, এ দম্ভোক্তিও সেই দুর্মুখা জননীর প্রকৃতি-সম্ভব। প্রতিকার প্রয়োজন! দীপ্তকণ্ঠে বললেন, মহর্ষি ভৃগু, 'রাজা দ্বিতীয় ঈশ্বর, কিন্তু তাঁর ওপরে রয়েছেন পরমেশ্বর—তিনি সর্ব-নিয়ন্তা; বেদে-পুরাণে নানাছন্দে তাঁর মহিমা কীর্তিত।'

ক্রোধে কুঞ্চিত ভ্রূযুগ, মদঘূর্ণিত আরক্ত লোচন—বজ্রনির্ঘোষে বলল মদোদ্ধত বেণ, 'মিথ্যা কথা! মিথ্যা বেদ, মিথ্যা যজ্ঞক্রিয়া। এ সকল ধূর্ত, লোভী ব্রাহ্মণের রচনা। রাজাই সর্বদেব, রাজদণ্ডই সর্ব-নিয়ন্তা, নৃপতিই একমাত্র প্রভু, স্বামী। স্বৈরাচারিণী বারাঙ্গনার মত তোমাদের পর-পুরুষে আসক্তি। যাও, স্বীয় পতিরূপ নৃপতির নিমিত্ত ভোগ্য সামগ্রী আহরণ কর।'

বারবার যজ্ঞেশ্বরের নিন্দায় রুষ্ট হয়েই ছিলেন সাগ্নিক ঋষিবৃন্দ, অন্তরে গূঢ় ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। সেই ক্রোধ দীপ্ত শিখা বিস্তার করে বাইরে প্রজ্বলিত হল। তপ্ত তাম্রের মত আরক্ত হল আনন। তাঁরা অভিশাপ-বাণী

উচ্চারণ করলেন, 'দগ্ধ হও, ধ্বংস হও!' বাক্য সমাপ্ত হতে না হতেই ভীষণ পরিণাম সূচিত হল। ক্রুদ্ধ ঋষিদের বাক্যই অগ্নি-গর্ভ বজ্র। সেই বাগ্‌বজ্রে নিমেষে গত-জীবন হল বেণনন্দন, দুর্ধর্ষ ভয়ানন্দন।

ক্ষণেকের তরে নিস্তব্ধ স্বভাকক্ষ। পর-মুহূর্তেই সেখানে উঠল ভয়ার্ত ক্রন্দন-রোল। চিরকালের ভীরু, দুষ্ট অধর্মাচারী—তাদের নিকট অতি ভয়ংকর মৃত্যুভয়। কু-মন্ত্রী, কুতার্কিক পণ্ডিত, স্তাবক-দলের ত্রস্ত হাহাকার সভা অতিক্রম করে প্রবেশ করল রাজ-অন্তঃপুরে।

পাগলিনীর মত ছুটে এল বেণ-জননী ভয়া। রুক্ষ, ধূসর, আলুলায়িত কেশ—বিশুষ্ক বদন—শুষ্ক পিঙ্গল নয়ন। শোকাতুর হিংস্রতা—অতি করুণ, কিন্তু অতিশয় ভীষণ! হাহাকার করে সে লুটিয়ে পড়ল পুত্রের প্রাণহীন দেহের ওপর, যেন বিধ্বস্ত বৃক্ষের ওপর সবেগে প্রবাহিত হল শোকের ঝড়। মুখে বুকভাঙ্গা গভীর, স্খলিত আর্তনাদ, 'বেণ! আমার দুলাল!'—মর্ম-বিদারী সে পুত্রশোক।

জননীর এই শোকমূর্তি দেখে বেদনাতুর হলেন করুণাঘন ঋষিগণ। স্বভাব-শান্ত তাঁরা—চির দয়াদ্র হৃদয়। রুদ্র কারণেই তাঁদের রুদ্রতেজ প্রকাশিত হয়। বেণের উদ্ধত আচরণে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বাগ্‌-বজ্র, শোকার্তা জননীর অরুন্তুদ ক্রন্দনে সে বজ্র বিগলিত হল। তাঁরা দেখলেন, সকল জননীই শোকে একাকার। মাতা ক্রূরা হোন, পিশাচীহোন, হোন পাপীয়সী—সন্তান শোকে বিশেষ নেই। পুত্রশোকাতুরা জননী যেন খড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড জীব! দ্রবীভূত হৃদয়ে তাঁরা দেখলেন—প্রাণহীন নৃপতির দেহ, দেখলেন জননীর মর্মান্তিক শোক-করুণ মূর্তি, দেখলেন হীনসত্ত্ব প্রকৃতি-পুঞ্জের অসহায় মুখ। তাঁদের মনে একে একে জেগে উঠল স্বায়ম্ভুব মনুবংশের ধর্ম-শীল, কীর্তিমান নৃপতিবর্গের চিত্র। মহানুভব 'বৎসর', বিনীত 'পুষ্পার্ণ', 'সর্ব-তেজা 'চক্ষু', 'নড়্‌বলা-পতি মনু'—সর্বো-পরি ধর্মপরায়ণ 'ক্ষুত' এমন বংশ নির্মূল হবে?—কিন্তু কি উপায়? তপোবল তাঁদের আছে, ইচ্ছা করলে তপঃশক্তি প্রভাবে এই মৃত বেণ-দেহেই তাঁরা প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। কিন্তু পাপে পূর্ণ দুঃশীল বেণ। এ পাপদেহ পুনর্জীবিত করলে পাপেরই পুনরাবির্ভাব ঘটবে। যদি কেউ শোষণ করে নিতে পারত বেণ-দেহের দুষ্কৃতি!

চকিতে উপায় উদ্ভাবিত হল। কলেবর-পায়ী সুনীথা একমাত্র সেই-ই পুত্রের দুঃশীলতা পান করতে পারে। কিন্তু সে কি সম্মত হবে?—তাকে সম্মত করাতেই হবে। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন ঋষিবৃদ্ধ ভৃগু, 'সম্রাজ্ঞি সুনীথা!'

মূর্ছাহতা ভয়ার কর্ণে দূরাগত বজ্র-ধ্বনির মত ধ্বনিত হল সেই রব। সে যেন চলে গিয়েছিল এমন এক লোকে, যেখানে কেবল মূর্ছা আর নিদ্রা। নিদারুণ শোকের আশ্রয় সে লোক। ঋষির আহ্বানে সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠল ভয়া। স্মৃতি ও বিস্মৃতির মোহময় ঘোর। বিমূঢ় দৃষ্টি, বিধৃত ওষ্ঠাধর। সভয়ে সে মুখ তুলে তাকাল। শুষ্ক চোখে গভীর বেদনার ছায়া।

'বংশরক্ষা করতে হবে। রাজ্ঞীকেই অগ্রণী হতে হবে এ কাজে।'—বললেন ভৃগু। নিরাশায় আশার আলো! কোথায় ভয়ার বক্রকুটিল প্রকৃতি? কিসের আঘাতে যেন বক্র হয়েছে ঋজু! সোৎকণ্ঠ মাতৃ-হৃদয়, সোৎ-সুক প্রতীক্ষা।

ঋষি বললেন, 'তামসী বিদ্যায় পারদর্শিনী তুমি, কলেবর-পানে অদ্বিতীয়া। তোমাকে পান করতে হবে পুত্রের কলেবর।'

অতঙ্কে শিউরে উঠল ভয়া। ভয়ংকরী সে, ভীষণা। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ এই নির্দেশ! মাতা হয়ে পুত্রের কলেবর পান? পিশাচী হোক, রাক্ষসী হোক—কোনও জননী এ কাজ করেনি কোনদিন। জননী কি সন্তানের দেহভুক্ হতে পারে? কর্কশস্বরে প্রতিবাদ করে ভয়া, 'এ অসম্ভব। মাতা সন্তানের দেহ পান করতে পারে না।'

'মাতাই চিরকাল সন্তানের দেহ পান করে'—কঠিন কণ্ঠে বলেন মহর্ষি ভৃগু, তাঁ
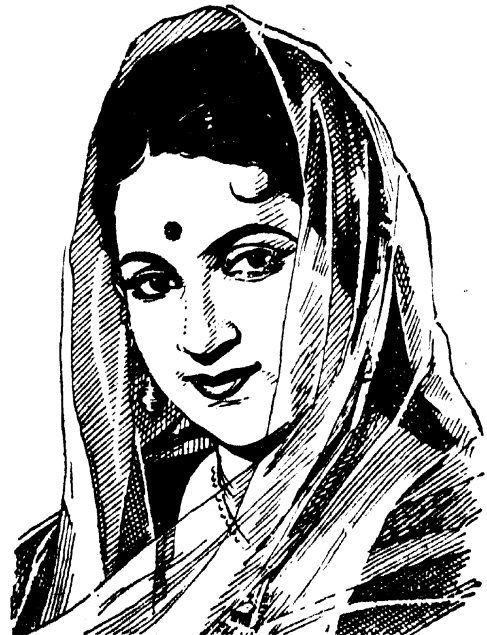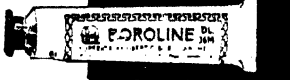
নয়নে রোষ-দীপ্তি: 'কুমাতার কুশিক্ষাই শোষণ করে সন্তানের সদ্‌গুণ, সদ্‌বৃত্তি। তার দৃষ্টান্ত তুমি!'

'আমি!'—শুষ্ককণ্ঠে বলে ভয়া। দেহ যেন হিম হয়ে আসছে। বজ্রমন্দ্রে বলেন ঋষি, 'হ্যাঁ তুমি! ধার্মিক স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে এ পাপ ছড়িয়ে দিয়েছে কে?—তুমি। তুমিই পান করেছ ধর্মপুত্রের ধর্ম, ক্ষান্তি, উদারতা।'

প্রতিবাদ করতে পারে না দুর্মুখা। একে শোকে বিদীর্ণ হৃদয়, তার ওপর এই কঠিন অভিযোগ। উদ্দাম শোক ও দুর্জয় ক্রোধে স্তব্ধ কণ্ঠ। কেবল কম্পিত হয় তার নয়ন, মুহুর্মুহু কম্পিত হয় ওষ্ঠ। বজ্র স্বরেই বলেন ভৃগু, 'মাতা একদিকে যেমন সন্তানের ভক্ষক, তেমনি তার রক্ষক। মাতাই বংশে নবজীবন সঞ্চার করতে পারে। এতদিন তুমি পান করেছ সন্তানের সদ্‌গুণ, এবার তার দুর্গুণ শোষণ করে বংশ রক্ষা কর।'

দারুণ ভয়ে কাঁপতে থাকে ভয়ার দেহ। নির্বাপিত যেন আশার ক্ষীণ দীপ—সম্মুখে মৃত্যুর [illegible] অন্ধকার! [illegible] কালের কন্যা সে, কলেবরভুকা। কিন্তু চিরকাল [illegible] সে পান করে এসেছে কলেবরের সদ্‌গুণ। [illegible] দয়া, ক্ষমা, [illegible] ঔদার্যই তার পানীয়—[illegible] এবার সন্তানের দেহ থেকে [illegible] এই দুষ্পাচ্য পানীয়। কঠিন হয়ে ওঠে ভয়ার মুখে দেখা দেয় সেই [illegible] কুটিলতা। [illegible] হিংস্রতা, কুটিল কেশে [illegible] ফণা! [illegible] থাকে তার দেহ।

[illegible] ঋষিকণ্ঠ, [illegible] উদ্দীপ্ত করো না [illegible]! [illegible] তুমি পাপকে পান করে বংশ রক্ষা কর। নইলে বাক্যবজ্রে তোমাকেও বরণ করতে হবে পুত্রের মত শোচনীয় পরিণাম।'

সম্মুখে মৃত্যু, পশ্চাতে মাতা! কোন কথা বলতে পারে না ভয়া। একে শোকে বিদীর্ণ বক্ষ, তার ওপর এই কঠিন বাক্যবজ্রের ভীতি। বিমূঢ়া বিষধর ভুজঙ্গিনী! সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু, তবু কোথা থেকে যেন ক্ষত বক্ষে ক্ষরিত হচ্ছে মধু-স্নেহ—কে যেন কঠিন অনুতাপ স্থাপন করেছে তার ফণায়!

কম্পিত দেহে নীরবে উঠে দাঁড়াল ভয়া। মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পরাধীনতা। স্তম্ভিত বিদ্রোহিণীর শক্তি। উঠে দাঁড়াল—কিন্তু শোকে টলমল অঙ্গ—যেন কতকালের একখানি বিশুষ্ক, শোকার্তা জননীমূর্তি! তারপর মন্ত্রচালিতের মত দুই হাঁটু ভূমিস্পর্শ করে বসল সে, জোড় পা ঠেলে দিল পশ্চাৎভাগে। বিশীর্ণ দেহ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। শুষ্ক দুইখানি হাত একত্র করে প্রাঞ্জলি পানের মুদ্রা ধারণ করে ওষ্ঠাধরের নিকট নিয়ে এল সেই অঞ্জলি। বিকট মুখ, বীভৎস দৃষ্টি! সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে স্খলিতকণ্ঠে কি যেন সে উচ্চারণ করল। তারপর অগস্ত্য যেমন করে সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, তেমনি করে উগ্রগ্রাসে শোষণ করতে লাগল প্রিয়তম পুত্রের কলেবর। এবারকার পানীয় দেহের সদ্‌গুণাবলী নয়, অতি দুষ্পাচ্য পৈশুন, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, নির্মমতা।

দেখতে দেখতে উদর স্ফীত হল, বক্ষে সঘন শ্বাস। চক্ষুতারকা প্রথমে বিস্ফারিত হল, তারপর নিশ্চল। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, দেহ পাষাণের মত শক্ত, হিম শীতল তার স্পর্শ। সন্তানের পাপ পান করে প্রাণহীন দেহে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল কালকন্যা, বেণ-জননী ভয়া। এতক্ষণ তার চোখে চিকচিক করছিল এককণা করুণা, এখন কুটিল চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল শুষ্ক বক্ষনিংড়ানো দু ফোঁটা অশ্রু। কালকন্যা ভয়ার বুকে কোথায় গোপন ছিল এই মুক্তার মত নয়নজল?

তখন মৃত বেণের দক্ষিণ-বাহু মন্থন করেছিলেন তপোক্লিষ্ট ঋষিবৃন্দ। তাঁর মন্থিত বাহু থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন দিব্যলক্ষণযুক্ত ধর্মপরায়ণ প্রজাবৎসল 'পৃথু'। স্বায়ম্ভুব মনুর গোত্রে অমিতপ্রভ নৃপতি এই পৃথু, তাঁর নামেই সাগর-মেখলা বসুন্ধরার নাম হয়েছে 'পৃথিবী'। তিনি কালকন্যা ভয়ার পৌত্র।*

* (১) শ্রীমদ্‌ভাগবত—৪র্থ স্কন্ধ, ১৩-১৪ অধ্যায়।
(২) বামনপুরাণ—৬৭ অধ্যায়।

THI-2

৪

সকলের আগে যাবে আর সকলের শেষে ফিরবে, এই ছিল ভূপেনবাবুর গুরুমন্ত্র: আর কখনো হাকিমের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তোমার আইন না-জানা থাকলেও চলবে, হাকিমকে জানো, লোকচরিত্রে ব্যুৎপন্ন হও। হাকিম যদি ত্যাড়া হয় তাকে খোসামোদের ঘি ঢেলে নরমা করো, যদি অযামারা হয় তুমি তাকে বুজিয়ে সুজিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও আর যদি তুখোড় হয় তুমি বোকা সাজো। নইলে তুমি কিসের উকিল? কিসের তোমার কথাবেচা পেশা? কিসের তবে তোমার তুকতাক, উচাটন-বশীকরণ? যেমন তরবার তেমন দরবার। যে ব্রতে যে কথা। শনিপুজোয় নারকেল, হরির লুটে বাতাসা, সত্যনারায়ণে সিন্নি। হাকিম যদি স্তব্ধ হয়, যদি সাতচড়েও রা না কাড়ে তা হলেই গেছ। যদি শতং লিখ মা বদ এই মন্ত্র ধরে, বলে, বলব না, শুধু লিখব তা হলেই কঠিন। তখন তাকে তোয়াজ করো, যা করে পারো কথা কওয়াও। যে বউ হাসে না কাঁদে না কথা কয় না, তাকে নিয়ে ঘর করবে কি করে? তবে তুমি উকিল, তোমার অসাধ্য বলতে কিছু নেই, হয় তুমি তাকে হাসাও, নয় রাগাও, নয়তো পিছনে লেগে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ো। বোবার শত্রু নেই ভেবেছ, কিন্তু উকিল কারু মিত্র নয়, এমন কি নিজের মক্কেলেরও নয়।

'এত সকালে যাচ্ছ কি, কোর্টে গিয়ে ঝাঁট দেবে নাকি?' মৃণালিনী গোড়ায় গোড়ায় বিদ্রূপ করত: 'এখন তো লাইব্রেরিও খোলেনি।'

'উকিলের লাইব্রেরি কি ঘর নাকি? উকিলের লাইব্রেরি তো সমস্ত বটতলা।'

'বটতলা?'

'ভূসংসারে এমন কোনো আদালত পাবে যেখানে বটগাছ নেই? বটতলার বই কথাটা চলেছে শুনতে পাই, কেন চলেছে জানি না। আসলে কথাটা হবে বটতলার বউ, মানে উকিলের স্ত্রী—'

এমনি সকাল সকাল গিয়েই এক মক্কেল গেঁথেছিল ভূপেন। কে একটা লোক দূর মফস্বল থেকে এসেছে বোধহয়, ফ্যাফ্যা করে ঘুরছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ভ্যাল-ভ্যাল করে। ভূপেনের খপ্পরে পড়ে গেল। ভূপেন তাকে একটাও মিথ্যা কথা বলল না, একটুও বাকতাল্লা মারল না, ভুল পথ বা ঘুর পথ দেখাল না—ফেলল না খরচের নর্দমার মধ্যে—মোলায়েম কথায় তার বিশ্বাস জমিয়ে সম্বন্ধ পাকা করে নিল। পরে দেখা গেল শাঁসালো মক্কেল—ক্ষীরের বাটি—হাত লাগাতে না লাগাতেই ডুবে যায় কব্জি পর্যন্ত।

'আশেপাশের সমস্ত বাবুরা কখন সন্ধ্যে হতে না হতেই ফিরে আসে। তোমারই আর দেখা নেই।' মৃণালিনীর এ আরেক অভিযোগ।

'ওদের আপিস, আমার আদালত। কর্তব্য শেষ হয় ধর্তব্য শেষ হয় না, মানে কখন কাকে ধরা যাবে কেউ বলতে পারে না।'

তেমনি সন্ধ্যার দিকে বেশ খানিকক্ষণ বসে ভূপেন ধরেছিল আরেক মক্কেল। হাকিমরা চলে যায় বটে, কিন্তু আমলারা থাকে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে, সরকারী আলো জ্বালিয়ে কাজ করে। আর যতক্ষণ আমলা ততক্ষণ হামলা। এ নথি ঘাঁটো ও-নথি হাটকাও। এর থেকে চোরাই নকল নাও ওর থেকে সিল খুলে দলিল দেখ। ঘুষ দেওয়া

অপরাধ হতে পারে, কিন্তু ধুলো দেওয়া তো অপরাধ নয়। অনেকে আছে হাত পেতে ঘুষ নেবে না, কিন্তু চোখ পেতে ধুলো নেবে না এমন চোখ কার। স্বয়ং বট-কেই ধুলো দিতে পারো এ তো তৃণ-মর্ত্য। আর ধুলো দিয়ে দাখিল নেবাও, কাটাকুটি করো, উলোপাল্টা মারো কিংবা টিপছাপ বেঁধে দাও। আর এই সব কৌশলের কার্তিক, যে যাই বলো, উকিলরাই। আমলার ঘরও যদি বন্ধ হয়, আছে খাবারের দোকান, পানের দোকান, অবশেষে বারান্দা। উকিলের সেরেস্তা ট্র্যামস্টপ পর্যন্ত প্রসারিত।

তেমনি একদিন অনেকক্ষণ থেকে, শেষ পর্যন্ত থেকে, এক সাহেব ধরেছিল ভুপেন। রেল কোম্পানির সাহেব।

আসতে আসতে দেরি করে ফেলেছে। বিদেশী মানুষ, কায়দাকানুন কিছু জানে না, জানে না অন্ধিসন্ধি, চারদিক কালো

দেখছে। তার মধ্যে আরেক কালো, কালোর কালো দেখে উৎফুল্ল হল।

হ্যালো ব্ল্যাক—হাত তুলে ভুপেনকে ডাকল সাহেব।

ভুপেন বুঝল, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো নয়, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো কোট।

এত বড় সম্মান তাকে আর কে দিয়েছে? একখানি আসান!

সাহেব জিগগেস করলে, 'তুমি উকিল?'

হ্যাঁ।

সিভিল না ক্রিমিন্যাল?

চেহারায় নিঃসন্দেহ সিভিল, চরিত্রে কি-রূপ, মাথা চুলকে ভুপেন বললে, তুমি বলবে।

আমাকে উপশম দিতে পারো?

উকিল উপশম করতে জন্মায়নি। তবে আইন যতদূর সিঁড়ি ফেলে রেখেছে ততদূর নিয়ে যেতে পারে উকিল—এই পর্যন্ত।

ভুপেনকে ভালো লাগল সাহেবের। ভুপেনের জুটল আরেক কাবুড়ের খেত।

কয়েকটা বছর নথিতে নাক ডুবিয়ে প্র্যাকটিস করেছিল ভুপেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার কেমন বেসুরো লাগতে লাগল। সে দেখল সত্যের স্থান খুবই সংকীর্ণ আদালতে—শুধু স্থান কেন, সম্মানও। যার মামলা নিরাবরণ সত্য তাকেও মিথ্যের গয়না পরাতে হয়—গয়না না-পরা থাকলে কোনো মামলাই পায় না ছাড়পত্র। আর যার মামলা ডাহামিথ্যা, নির্বাধে, বন্ধ্যাপুত্রের মত বানানো, সে শুধু টাকার জোরে, সাক্ষীর জোরে, উকিল-ব্যারিস্টারের চোপার জোরে ঠিক জিতে নেবে মামলা। পর পর কটা মিথ্যে মামলা জিতে হতাশ হয়ে গেল ভুপেন।

জিতবে না কেন? আইনকে যেখানে ভাষায় বেঁধেছে, আর ভাষা যখন বহুক্ষেত্রে প্রকাশের উপায় না হয়ে প্রকাশের বাধা, তখন সেখানে বিচার সূক্ষ্ম চলে গিয়েছে, চলে গিয়েছে কমা-সেমিকোলনে, [illegible] ভাষান্তরে। সত্য সূক্ষ্ম হয়ে [illegible] না, মিথ্যেরই সূক্ষ্ম জ্ঞানের নৈপুণ্য। ন্যায়ের সোজাসুজি বিচার নয়, আঁকাবাঁকি বিচার। বিচার ভাবগ্রাহী নয় ভাষাগ্রাহী। তাই কারুকার্যের জয়, আন্তরিকের নয়। বস্তুর জয় নয়, শিল্পের জয়। স্বাস্থ্যের জয় নয়, চাকচিক্যের জয়, পরিপাট্যের জয়। আর সে-ই হারবে যে গরিব, যে দুর্বল, যে মূর্খ। তবে আজকাল গরিবও জাল সাজে, দুর্বলও দুষ্ট আর যে মূর্খ সে আসলে দুর্যোধনের মাতুল।

যতই এগুতে লাগল ততই বিতৃষ্ণা ধরল ভুপেনের। এফিডেভিট, যাকে গাঁয়ের লোকেরা বলে এপিঠ-ওপিঠ, এপিঠ-ওপিঠই মিথ্যে। উপায় কি, একটা সাক্ষীরও পারো. সত্য কথা বলার স্বাধীনতা নেই। মামলার যেভাবে স্বরলিপি করা হয়েছে সেভাবেই

তাকে তাল মান রেখে গাইতে হবে। স্বাধীন সুর দিয়েছ কি মামলা ফানুস হয়ে গেছে। হরফ দেওয়া কেন? সত্যের পাকা গোঁফে মিথ্যের কলপ দেওয়ার জন্যে।

'আইন যদি এ চালাকি করতে দেয় আপনি করবেন না কেন?' সহযোগীরা কেউ বলেঃ 'আমরা তো আইনেরই খিদমৎ করতে এসেছি।'

'মানুষের জন্যে আইন, আইনের জন্যে মানুষ নয়।' ভূপেন বলেঃ 'চালাকির জোরে আরেকজনের ন্যায্য দাবি ভন্ডুল হয়ে যাবে তাতে আমি নেই।'

এ উকিলের পসার হয় কি করে?

'আপনি তো দোষ করেছেন, গিলটি-প্লিড করুন, দোষ স্বীকার করুন।'

'বা, আমি বাঁচবার চেষ্টা করব না?'

'তার মানে আইনকে কলা দেখাবেন?'

'দেখালামই বা। আইন যদি কলা দেখাবার জন্যে বাজার বসায় আমি ছাড়ি কেন? আমার কলাই যে পণ্য।'

'ও সবের মধ্যে আমি নেই।' ভূপেন কাঠখোট্টাঃ 'মিথ্যে ডিফেন্স আমি নিতে পারব না।'

'কিন্তু ও পক্ষের তো প্রমাণ করতে হবে। সেইখানে আপনি লড়ুন। ওদের প্রমাণের পাহাড়ে চিড় ধরিয়ে দিন।'

'অত শত আমি বুঝি না। দোষ করেছেন যখন তখন পরুন হাতকড়া। নয়তো অন্য উকিল দেখুন।' ভূপেন মুখ ফেরাল।

'আপনি আমাকে, ব্যক্তিটাকে দেখছেন কেন? আপনি মক্কেলকে দেখুন। আইনের ফল বিচার, অবস্থার ফল মক্কেল। বিশেষ অবস্থায় পড়ে মক্কেল যদি অনাচার কিছু করে থাক ওকে তার পক্ষে বলবার বা করবার কিছুই থাকবে না? সে নিজের থেকে গলা বাড়িয়ে কোপ নেবে?'

'না, কোপ নেবে কেন? গলা বাড়িয়ে মালা নেবে। রেপ কেসের আসামী, তাকে গলায় ফুলের মালা দেবে। নিয়ে যাবে মিছিল করে।'

ক্রমে ক্রমে প্র্যাকটিস আরো পড়ে গেল ভূপেনের। সংসারে দেখা দিল অনটন। পেণ্টালুন ছোট হতে শুরু করল। জ্বলে গেল কালো কোট।

যেটা সত্যি-মামলা বুঝব সেটা নেব। তেমন আর ক'টা? এ প্রায় শিশিরের আশায় চাষ করা। ভূপেনের যদিও সৎ উকিল বলে সুনাম, সৎ মামলার ইনাম পাবার সুনাম নেই। তা হারলে হারব, সত্য প্রতিষ্ঠা করতে লড়ছি এই আমার তৃপ্তি। কারু তৃপ্তি টাকায় কারু তৃপ্তি সাধুতায়।

'সাধু, সাধু হয়েছেন!' মৃণালিনী কত গঞ্জনা দিয়েছে। 'সত্যপীর এসেছেন চেরাগ জ্বেলে!'

উকিল উকিল, তার মধ্যে সাধু অসাধু কি। টাকা টাকা, তার মধ্যে ভিতরি-উপরি কি। প্রেম প্রেম, তার মধ্যে বৈধ-অবৈধ কি!

কোর্টে যাওয়া ছাড়েনি ভূপেন। তার এখন প্রধান কাজ হচ্ছে বই লেখা। গল্প-উপন্যাস নয়, গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা-ভাষ্য নয়, লিখছে আইনের বই। স্ট্যাম্প য়্যাক্ট, রেজিস্ট্রেশন য়্যাক্ট, কোর্ট-ফি য়্যাক্ট। সব বই-ই বাজারে চালু, নাম-দামও যথেষ্ট কিন্তু ঢালাঢালি টাকা কই? প্রকাশকরা ঠিকমত হিসেব দেয় না আর দিলেও বেশি ছাপিয়ে কম দেখায়।

হ্যাঁ, বিদ্যাই তৃপ্তি। বিদ্যাই সকল অভাবের ভরণপূরণ।

উন্নতির সরু ডগায় এসে উঠলেও সকল উন্নতেরই যে বুদ্ধির ডগা সরু নয় তাই তার বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ভূপেন। যারা নজির সৃষ্টি করছে তাদের নজর যে নির্ভুল নয়, বহু জায়গায় তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। আর আজকাল হাকিমদের রায়ের কি ছিরি? না আছে রস না আছে গন্ধ। বলে আইনে আবার রস কি। আইন নীরস হোক, আইন যে কাহিনীটি আছে

তাকে দেখার গুণে লেখার গুণে সরস করা যায়। কাঠঠোকরা পর্যন্ত শুকনো কাঠের মধ্য থেকে চিনির বাসা আবিষ্কার করে।

বড় কর্তাদের অশুদ্ধি আর শৈথিল্য শাসন করছেন, ও'রটা করে কে। দিবারাত্র গজগজ করে মৃণালিনী। তবু যদি বুঝতাম লিখেই, ঘরভরা দূরে থাক, পেট ভরছে। টাকা একদিক দিয়ে এলেই হয়, ঘোড়ায় নয় তাসে নয় বইয়ে। আর সে বই প্রসিদ্ধই হোক কি নিষিদ্ধই হোক। রোজগার দিয়ে কথা। হাসালিতে না পারো দালালিতে। কাঁচি দিয়ে পকেট মেরে নয়তো কলম দিয়ে। এ জাতও গেল, পেটও ভরল না।

'সুকু!' ডাক দিলেন ভূপেনবাবু।

শনিবারে জজকোর্ট খোলা থাকে কিন্তু মুৎফরাক্কা মামলায় সেদিন তো সমস্ত আদালত বোঝাই। তিনটের মধ্যেই বাড়ি চলে আসে কে? বার লাইব্রেরীতে দিব্যি ফরাস আছে, গড়গড়া আছে, আড্ডা আছে, কেচ্ছা আছে, ওসব ছেড়ে ছেড়ে অসময়ে কে প্রত্যাবৃত্ত হয়! তারপর যা একখানা হাঁক দিয়েছেন নিশ্চয়ই ফরমায়েসের হাঁক, কী বিপদে ফেলেন না জানি!

'কেন?' কাছে এসে দাঁড়াল সুকান্ত।

'শোন, একবার প্রেসে যাবি। এই অর্ডার প্রুফগুলি দিয়ে আসবি। আর নতুন প্রুফ যা হয়েছে নিয়ে আসবি। সাত ফর্মা পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। যদি আরো কিছু ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে নিয়ে আসবি ফাইল-কপি।'

'এ কীরকম প্রেস!' গলার কাছে বালি-বালি লাগাতে লাগল সুকান্তর: 'ওদের লোক দেয়া-নেয়া করতে পারে না?'

'তাই তো করে। তবে এ প্রুফগুলি ভারি জরুরি। ওদের লোকের জন্যে বসে থাকলে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। বইটা খুব শিগগির বার করে দেওয়া দরকার।'

'না, আমার পড়া নেই?'

'শুধু যাবি আর আসবি। কতক্ষণের বা মামলা!' একটু যেন অপরাধী শোনাল ভূপেনবাবুকে: 'পাঁচটা সাতে পাঁচটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

'তারপর ফেরবার সময় বাসন্তীকে একবার দেখে আসিস।' বললে মৃণালিনী। 'কাছেই তো বাড়ি। আর যদি আসতে চায়—'

'নিয়ে আসিস—' ভেংচে উঠল সুকান্ত।

বিজয়া এসেছে উপরে।

'কি, তোমার জন্যে ফ্ল্যাট কোথাও দেখে আসতে হবে?' সুকান্ত মুখিয়ে উঠল।

'না, তুমি যদি বলো তো তোমার সঙ্গে যাই। আমার বোনপোর ছেলেটার কি অসুখ শুনেছি।' বললে বিজয়া। 'আমাকে সেখানে রেখে প্রেসে যাবে আর ফেরবার সময় নিয়ে আসবে।'

'তোমার বোনপো থাকে তো সেই কার-বালায়। ভারতবর্ষের বাইরে।'

'না, না বাসন্তী যদি আসতে চায় তাহলে বাস-এ ট্রামে দুজনকে ও সামলাবে কি ক'রে?' বললে মৃণালিনী। 'বাসন্তী এলে তার আণ্ডাবাচ্চা কোন-না নিয়ে আসবে!'

'কেন যে তোমাদের চলনদার লাগে কাকিমা—'

'ট্রাম-বাস লাগবে না। ট্যাক্সি নেবে।' ঝলক দিল বিজয়া: 'এপিঠ-ওপিঠ দুপিঠেরই না হয় ভাড়া দেব।'

বন্দনা বেরুচ্ছে ঘর থেকে।

"তোমার কিছু ফরমায়েস?' সুকান্ত তাকাল চোখ তুলে।

'আমার কথা তুমি কত শোনো।' মুখ ভার করল বন্দনা।

'তোমার কথাটা দাদার কথা বলে এলে না শোনে সাধ্য কার।'

'তোমার দাদা বলছিল—'

'ঐ তো—'

'তোমার দাদা বলছিল', হাসতে-হাসতে গম্ভীর হল বন্দনা, 'তোমার দাদা বলছিল, যদি ও'র ওষুধটা একবার খোঁজ করো।'

'কেউ পায়না খেতে, কেউ আবার পারে না হজম করতে।' দার্শনিক হবার ভাব করল সুকান্তঃ 'শুধু খাবার হলেই চলে না, আবার হজম করবার ওষুধ চাই।'

'তা তো বটেই।' বন্দনা ফোড়ন দিলঃ 'শুধু পরীক্ষা পাশ করলেই চলে না, তারপর আবার চাকরি চাই।'

'শুধু চাকরি পেলেই চলে না, মাসান্তে আবার মাইনে চাই। তুমি চটছ কেন?' একটু মোলায়েম হল সুকান্তঃ 'তুমিই বলো কখন খোঁজ করব ওষুধ।'

'তা জানি না—' হালকা ছুটিয়ে চলে গেল বন্দনা।

'কেন, প্রেসে যাবার পথেই না হয় খোঁজ করলি।' মন্দাকিনী বললে, 'একটু আগে না হয় বেরো—'

'একটা শ্লোক আর সতেরো গণ্ডা ফরমাস।' বিজয়ার দিকে তাকাল সুকান্তঃ 'তাই তো বলি কাকিমা, যদি শান্তি চাও, একটা ফ্ল্যাট নাও, নয়তো হোটেলে গিয়ে ওঠো—'

'অতশত কাজের বোঝা দিও না ওকে।' ভূপেনবাবু হাঁক দিলেনঃ 'আমার প্রুফ ঠিক আনা চাই।'

নিজের ঘরে ফিরে এল সুকান্ত। এরা কী জানে কত কী কাণ্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে এই তারপরের পৃথিবীতে। আজ কি সমস্ত দুপুরটা পথে-পার্কে ঘুরে ঘুরে এখানে-ওখানে ছোটখাটো আড্ডা দিয়ে চলন্ত মানুষের মুখ দেখে-দেখে কাটাবার মতন নয়? কাকলি যেহেতু ছ'টার সময় দেখা করতে বলেছে, ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে পাঁচটার সময়ই সে বেরুবে ঠিক করেছিল। এমন স্বপ্নকেও সে আনতে চেয়েছিল হিসেবের মধ্যে, বাঁধতে চেয়েছিল ঘড়ি-ঘণ্টায়? বেশ হয়েছে। কাজলের ঘরে থাকা মানেই গায়ে কালি লাগানো। সংসারে বসবাস করা মানেই পাঁচজনের ফরমাস খাটা।

কত জল চলে গেল গঙ্গায়। কত হাওয়া বয়ে গেল মাঠ দিয়ে। কত মেঘ ভেসে গেল আকাশে-আকাশে।

কত মুহূর্ত তার দিনরাত্রির সবুজে ঝরে পড়ল সোনার শিশিরের মত।

তারপর?

তারপরের পাপড়ি মেলতে-মেলতে এটুকু পর্যন্ত খুলেছে। এটুকু রঙ এটুকু রস এটুকু সুগন্ধ।

'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। বিপন্নের চোখে নয়, বিস্ময়ের চোখে নয়, আত্মীয়ের চোখে। আত্মীয় কথাটার মানে কমে গিয়েছে অভিধানে, তাই না?

তোমাকে বাড়িতে ডাকি সাহস নেই। কিন্তু যদি ডাকতে পারতাম, ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারতাম দেয়াল-ঘেঁষা রাস্তার কদমগাছে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। দেখেছ কদমফুল? ছুঁয়েছ? শুঁকেছ?

তাই বলছি, 'স্বাতী' সিনেমার সামনে আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে দেখা করতে এস। আমি থাকব। এস কিন্তু। কাকলি।'

পায়ের কদাকার কাবলিটার দিকে তাকাল সুকান্ত, স্যাণ্ডেলটা আরো রোমহর্ষক। কে তাকাবে পায়ের দিকে? ধুতি আর শার্ট একেবারেই বিদখুটে। কে দেখবে ধুতি-শার্ট? আর পকেট তো গগন-সম্রাট। কে উঁকি মারবে পকেটে?

সুকান্তর কত দুশ্চিন্তা কত ক্লেশ। পড়ে কিছুই মনে থাকছে না, রাত জাগতে পারছে না। কী খাতা না জানি রেখে আসে সে পরীক্ষায়। টিউশানি ছেড়ে দিয়েছে, দাড়ি কামাবার তুচ্ছ যে ব্লেড তাও ঠিক দিনে কিনতে পাচ্ছে না। তবু, এতসব সত্ত্বেও, তার সুখ কেন? তার তো এখন দেয়ালে মাথা কোটা উচিত, যাতে পরীক্ষাটা মানে-মানে উতরে যায়, যাতে একটা চলনসই চাকরি হয়, মার মেজাজটা একটু বশে আসে, বাবা একটু হেসে নিয়ে

গর্ব করতে পারেন, দাদাকে খাটতে না হয় ওভারটাইম, বৌদি নিজেকে একটু কম দুঃখী বলে মনে করে, কাকিমার অহঙ্কারটা একটু নরম হয়, সুবীরের একটা মাস্টার জোটে আর বাসন্তীর নির্যাতন নিবারণের পথ মেলে—তার কত সমস্যা, কত অভাব, কত দায়িত্ব, কত যন্ত্রণা, কত সংগ্রামের ভূমিকা—তবু, তবু তার সুখ কেন? এত কালো বর্ষায়ও আকাশ অমার নীল কেন? কেন না চাইলেও সুখ আসে। এত এত সুখ। কেন সুখকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? কেন বলা যায় না, আমি সংগ্রামী, আমার সময় নেই, তুমি চলে যাও। বললেও যায় না কেন? মাটি চায় না তবু কেন আসে বন্যা? মরাকাঠ চায় না তবু কেন মঞ্জুরিরঙন?

'শোন, সতেরো-আঠারো এ দুটোর অর্ডার গেল।' ভূপেনবাবু বলেছেন যখন সুকান্ত নেয়েছে, 'আর পরের গ্যালিপ্রুফ যেন মেক আপ করে দেয়। টাইপ-ফুরিয়ে যা দেয় নিয়ে আসবি। শোন...

তুমি কি এখনো গ্যালিপ্রুফ, না মেক-আপ?

(ক্রমশ)

দিলীপকুমার রায়

ছাব্বিশ

অতুলপ্রসাদ বয়সে আমার চেয়ে পনের কুড়ি বছর বড় হ'লেও তাঁকে আমি পিতৃবন্ধু হিসেবে কাকা বলতাম না। কারণ তাঁর মনটি পঞ্চাশেও ছিল কিশোরেরই মতন—বিশেষ ক'রে ভাবুকতায়। যে-কোনো সভাসমিতিতেই তিনি এলেই উজ্জ্বল হয়ে উঠত, কিন্তু তিনি কখনো ভুলেও নিজেকে সামনে ধরতেন না। এরি তো নাম সৌকুমার্য।

ধূর্জটির সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ে যেদিন প্রথম তাঁর ওখানে যাই সেদিন তিনি কী যে খুশী! উজিয়ে উঠে বলতে লাগলেন, পিতৃদেবের সঙ্গে এক সময়ে কী আনন্দেই না তাঁর দিন কাটত! মন ভিজে উঠল দেখতে দেখতে—পূর্বরাগ ও প্রণয়ের যুগপৎ অভ্যুদয়। আমি যথাবিধি গান গাইলাম। তারপর অতুলদাকে অনুরোধ করলাম তাঁর নিজের দু' একটি গান শোনাতে। তিনি অতি কুণ্ঠিত হয়ে "না না" ক'রে শেষে গাইলেন তাঁর মিষ্ট গাঢ় কণ্ঠে

> পাগলা মনটারে তুই বাঁধ
> কেনরে তুই যথন তখন পরিস প্রাণে
> ফাঁদ
> শীতল বায়ে অতল নিশি,—
> তুই কেন রে হোস উদাসী?
> (ওরে) নীলাকাশে অমন ক'রে
> হেসেই যাবে চাঁদ।

চলতি ভৈরবী, কিন্তু তাঁর গানের একটা বিশিষ্ট ঢং ছিল বিশেষ ক'রে তাঁর ঠুংরি-ভঙ্গিম গানে। এর পরেই তিনি গাইলেন:

> রুমুক ঝুমুক রুমু ঝুমু
> নূপুরে বাজে.........
> বিরহী পরাণখানি সে-দুটি চরণ যাচে।

ধূর্জটি সমঝদারের মতো ব'লে উঠল: "ইউরেকা! একেই তো নাম সৃষ্টি!"

আমি সায় দিয়ে সোৎসাহে বললাম: "শুধু সৃষ্টি নয়, বাংলা গানে এর আগে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার আমদানি হয়েছে—কেবল ঠুংরির বাকি ছিল। আপনিই তার এ-অভাব প্রথম পূর্ণ করলেন।"

এ গানটি যে হিন্দি ঠুংরির পর্যায়ে পড়ে তার প্রমাণ হিসেবে একটি অঘটনের কথা বলি। অতুলদার গান তখন আমি খুব গেয়ে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ কলকাতায় শ্রীদামোদরদাস মান্না নিমন্ত্রণ করলেন কাশীর বিখ্যাত মোতিবাইয়ের গান শুনতে। এক বাগানবাড়িতে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ধরলাম আমাকে কিছু গান শেখাতেই হবে। তিনি বললেন: "আপনি আগে গান শোনান একটি।" আমি এই "রুমুক ঝুমুক রুমু ঝুমু" গানটি গাইতে তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন: "আমি আপনাকে শেখাতে পারি যদি আপনিও আমাকে এই গানটি শেখান।" আমি মহানন্দে রাজি হয়ে কলকাতায় তিনি যে বাসায় ছিলেন—চিত্তরঞ্জন আভীনউয়ে—যেতাম দিনের পর দিন। তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন অনেকগুলি ভজন। তার মধ্যে একটি ভৈরবী ভজন—আওত ব্রজ নন্দলাল ঐসী ছব বনিয়া—আমি আমার কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে শিখিয়ে চ্যারিটিতে গাওয়াই। আর একটি গান শিখিয়েছিলেন হংসকামিনী রাগে—লক্ষ্মাগীত।

আমি তাঁকে শেখাই পিতৃদেবের একটি ভীমপলশ্রী খেয়াল—"এ জগতে আমি বড়ই একা" এবং অতুলদার এই খাম্বাজটি। আহা কী অপরূপই না গাইতেন এ পিক-কণ্ঠী বাইজি! একদিন আসর ক'রে আমার বন্ধুবান্ধবদের শোনালাম। রাহুল সংগীতানুরাগীও কয়েকজন লুকিয়ে এসে-ছিলেন তাঁর গান শুনতে। আমার মনে ছিল—অতুলদাকেও শোনাতেই হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যোগাযোগ ঘটে নি ব'লে শোনানো হয়নি। কিন্তু এবার ফিরে হারানো খেই ধরি।

শিহরণটুকু অবিস্মরণীয় ব'লেই অতুলদার মুখে শোনা এ-গান দুটির কথা মনে আছে, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয়টি—পিলু খাম্বাজ ঠুংরিতে বানানো। কিন্তু এ সম্বন্ধে লিখে কী বোঝাবো—হরফের মাধ্যমে তো নয়, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই যে গানের স্ফূর্তি। তাই বেশি বলা বৃথা—খানিকটা পরীমা-সুন্দরীর সৌন্দর্য বর্ণনার পণ্ডশ্রমের মত।

অতঃপর যা হবার তাই হ'ল—ভবিতব্য—কিনা আমি অতুলদাকে তথা তাঁর গানকে ভালোবেসে ফেললাম, শুরু ক'রে দিলাম তাঁর গানের প্রচার, আমার নানা কন্সার্টে গাওয়ানো আরম্ভ করলাম তাঁর নানা সুন্দর
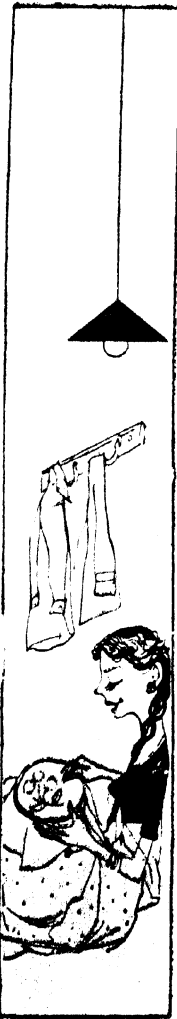
সুন্দর গান আমার ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে। দেখতে দেখতে অতুলদার গান খুবই লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। সে-সময়ে তাঁর গানের কিরকম আদর হয়েছিল সঙ্গীতরসিকরা কয়েক বৎসর আগেও বলতেন, যথা সোমনাথ মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, মেঘনাদ সাহা, পাহাড়ি সান্যাল, রেণুকা দাশগুপ্ত আরো অনেকে। যাক্।

অতুলদার গান আমার কাছে ঠিক সময়েই এসেছিল, কেননা সে-সময়ে আমি নানা ওস্তাদের ও বাইজির কাছে, বিশেষ ক'রে হিন্দী ঠুংরিতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই বাংলায় ঠুংরির রস পরিবেশন ক'রে আমি নিখরচায় নাম কিনলাম।

"নিখরচায় নাম কিনলাম" বলাটা অবশ্য অত্যুক্তি, কারণ অতুলদার গান প্রচার করতে আমাকে কম খাটতে হয়নি, এমন কি স্বরলিপিও করতে হয়েছিল তাঁর অনেক গানের। আমার বলবার কথা শুধু এই যে, সব জিনিসের মতন গানেরও এক একটা যুগ আসে। বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ধ্রুপদী ভঙ্গিতে গান বাঁধেন। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁধেন খেয়াল ও টপ্পাভঙ্গিতে গান—যে কথা আমি তাঁর গান সম্বন্ধে নানা বক্তৃতায় বলেছি সে-সময়ে। এই সময়ে বাংলাদেশে খাঁটি হিন্দুস্থানী ঢঙের গান অনেক সঙ্গীতরসিকদের মনকেই একটু একটু ক'রে বশ ক'রে তুলেছিল। ফলে বাঙালী সঙ্গীতরসিকেরা ঠুংরির রস চাইছিলেন বাংলা গানে, কেননা হিন্দুস্থানী ঠুংরির নানা গানেরই কথা অতি কাঁচা—শ্রীমন্ত গায়ক ভুরু কমান চোখ কাঁপিয়ে (কিনা নয়নবাণ), কোঁকড়া চুল। একটি গান শিখাতে ঠুংরি গায়ক শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় গাইতেন "ননদিনী পান খায়ে মুখ লাল"—এক কথায় [illegible] শৃঙ্গার রসে ভরা। ভদ্র বাঙালী শ্রোতার উপরে এসব গান গাওয়া অচল, অথচ ঠুংরির মেজাজ আনিবারে আপত্তি করবে কে—অরসিক ছাড়া? এইরকম পরিস্থিতিতে হাজির হ'ল অতুলদার নানা ঠুংরি-ভঙ্গিম গান: ঝুমকো ঝুমক রুমু ঝুমু, শ্রাবণ ঝুলাতে, জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে, আমার বাগানে এত ফুল......কত বলব?

অতুলপ্রসাদ তাঁর এই শ্রেণীর বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে যে হিন্দী ঠুংরির অনেক চমৎকার তান, মিড়, খোঁচের প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি সুরকারের প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন, নৈলে তাঁর গানের বাঙালী কাঠামোয় হিন্দী সুরকারের চলাচল এমন সুন্দর ক'রে সাজাতে পারতেন না কখনই। তাছাড়া, লক্ষ্ণৌয়ে বহু বৎসর থেকে সেখানকার সেরা ঠুংরির রস তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল

তো, তাই যে-রসে নিজে রসিয়ে উঠেছিলেন অপরকে সে-রসের রসিক ক'রে তুলতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। কীভাবে লক্ষ্ণৌয়ের ঠুংরি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি স্মৃতি-চারণী ঢঙেই।

বলেছি, বিলেত থেকে ফিরে আমি নানা ওস্তাদের ও বাইজীর কাছে খেয়াল ও ঠুংরিতে তালিম নেওয়া শুরু করি। লক্ষ্ণৌয়ে আচ্ছন বাইয়ের কাছে পৌঁছাই অতুলদারই মাধ্যমে। হ'ল কি, লক্ষ্ণৌয়ে সেবার যেতেই আচ্ছন বাইয়ের গান শোনার সুযোগ হ'ল এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে। বাইজীর দক্ষিণা অতুলদাই দিয়েছিলেন, কারণ সে-ভদ্রলোকের পক্ষে অত খরচ করা সম্ভব ছিল না। আমি অতুলদাকে ধরেছিলাম—আচ্ছন বাইয়ের গান না শুনলে মান থাকে না। অতুলদা হেসে বলেছিলেন: "কেবল দেখ দিলীপ প্রাণ নিয়ে না টানাটানি হয়।"

বলতে মনে পড়ল মজার ঘটনা। যে-আসরে বাইসাহেবার গান হয় সে-আসরের আমিই ছিলাম কর্মকর্তা। কিন্তু ওমা, অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখি, অনেকেই আতঙ্কে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন: "সে কী দিলীপ? আমরা বাইনাচ দেখতে যাব?" আমি বললাম: "নাচ নয়, শুধু বৈঠকি গান।" তাঁরা তবু মাথা চুলকে বললেন: "তবু—বাই তো! মানে বুঝলে না, আমাদের একটা ঠাট বজায় রাখতে হয় কিনা!" কী করি—বিরস মুখে ফিরে গিয়ে অতুলদাকে সব বললাম। তিনি হেসেই কুটি কুটি, বললেন: "শুধু ঠাট নয় দিলীপ, ঠমকও আছে!"

যাহোক, সে-আসরে দু' একজন অধ্যাপক দুর্গা বলে এসে এক কোণে গলাবন্ধ জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে গান শুনে-ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন পরে আমার কাছে এসে একদিন ফিসফিস ক'রে বললেন, "দিলীপ, আহা কী গানই শোনালে! শুনি, তুমি তাঁর ওখানে যাও গান শিখতে—আমাকে—মানে—ইয়ে—একদিন লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারো?"

এমনিই গাইতেন আচ্ছন বাই: অধ্যাপক যে অধ্যাপক সেও চায় লুকিয়ে গিয়ে শুনে আসতে—অতুলদার ভাষায়—প্রাণের মায়া ছেড়ে! যাক।

আমি আচ্ছন বাইয়ের অপরূপ চঙে এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, অবিলম্বেই তাঁর কাছে দিনের পর দিন গিয়ে অনেকগুলি ঠুংরি শিখেছিলাম। সেকথা পরে বলছি। সেদিন সন্ধ্যায় এ-মহীয়সী গায়িকা কী গানই যে গাইলেন সমজদার শ্রোতা পেয়ে! কোনোদিন কি ভুলব তাঁর "মুকুটধারী কানহ বজায়ে বাঁসিয়া রে!" সে কত তান, কত মিড়, সুরকে নিয়ে কত আদর, কখনো অশ্রু কখনো আনন্দ......মনে হ'ল বুঝি সত্যিই মুকুটধারীর মুরলী শুনছি। অতুলদার চোখ আবেশে সজল হয়ে এল সাবাস দিতে দিতে। ধূর্জটি ও আমারো অবস্থা তথৈবচ। অতুলদার সঙ্গে দাদা পাতয়েছিলাম কি সাধে? অমন খাঁটি সুর-প্রেমিক জীবনে কটাই বা দেখেছি? যাহোক বলি যা বলবার জন্যে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা।

পরদিন সন্ধ্যায় অতুলদা আমাকে তাঁর সুরম্য ছাদে ডাকলেন। নিজের গান শোনাতে তিনি সত্যিই লজ্জা পেতেন, তার উপর ঈষৎ তোতলামি তাঁর সৌকুমার্যকে আরো মধুর ক'রে তুলত। বললেন লাজুক সুরে: "দিলীপ..... কু-কাল রাত্রে একটি গু-গান বেঁধেছি। কু-কেমন হয়েছে কে জানে?"

আমি সোৎসাহে ধরলাম: "এক্ষুনি শিখিয়ে দাও।"

অতুলদাঃ আহা......শ্‌-শোনোই তো আগে......ত্‌-তারপর তো বিচার......

আমি (হেসে)ঃ না অতুলদা, তোমার গান যখন, তখন আগে ফাঁসি তারপর বিচার।

অতুলদা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন—সে প্রাণখোলা হাসি আজও কানে বাজে। পরে তাঁর সুকুমার লাজুক ভঙ্গিতে, সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠে গাইলেনঃ

চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে।
উজল নয়নে কে গো হাসিলে!
মোহন সুরে ধীরে মধুরে
পরাণ বীণায় কে গো বাজিলে......

সেদিন সন্ধ্যায় ধূর্জটি আসতেই তাকে গেয়ে শোনালাম এ-গানটি নিজের নানা তানে মিড়ে সমৃদ্ধ ক'রে। ধূর্জটি আনন্দে আত্মহারা, বলল হাততালি দিয়েঃ "কী গানই বেঁধেছেন অতুলদা! উঃ!"

অতুলদা (সুকণ্ঠে)ঃ না না। হয়েছে কি—দ্‌-দিলীপ গাইছে তো। ম্‌-মানে—ক্‌-কণ্ঠ—বুঝলে না?

কিন্তু তারিফের কথা অবান্তর। প্রাসঙ্গিক কথাটা হচ্ছে এই যে, এ-গানটি পরে বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল এইজন্যেই যে, এর ঠুংরি চালে বাঙালী রসিক পেয়েছিল বাংলা কবিতার ভাব ও হিন্দী ঠুংরির সুর, দুইয়ের মনোহর সমন্বয়—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, অর্ধনারীশ্বর যুগলমিলনের রস। এই সঙ্গে আরো স্মরণীয়ঃ আচ্ছন বাইয়ের নানা মর্মস্পর্শী মিড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এ-গানটির মধ্যে সহজেই অনুপ্রবেশ করেছিল অতুলদার শিল্পিহৃদয়ের আনন্দের সহজ তাগিদে। তাই না চিরন্তনী উজল নয়নের চাহনি সুরে বিগলিত হয়ে তাঁর প্রাণের বীণায় বেজে উঠেছিল! এর পরে আমার ও কাজি নজরুলের কয়েকটি সুর নিয়েও তিনি গান বেঁধেছিলেন কয়েকটি। এইজন্যেই বলছিলাম, তিনি এসেছিলেন বাংলা গানের সুর-উচ্ছলতার জোয়ারের দিনে তাঁর সুকুমার হৃদয়ের প্রেম নিয়ে, লাজুক মনের মাধুর্য নিয়ে, সূক্ষ্ম আবেশের রং নিয়ে। এক কথায় তাঁর গান হিন্দী ঠুংরির নকল ছিল না ব'লেই বাঙালী তাঁর রসসৃষ্টিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও করবে যদি তাঁর গানের প্রাণের রসটি ঠিক মত পরিবেশন করা যায়।

কিন্তু বলি, এই সূত্রে আমার এই সময়কার জীবনপটের আরো কিছু কাহিনী—কেন না তা থেকে সে-সময়ের সংগীত-আবহের কতকটা পরিচয় মিলবে।

রোলাঁর কথা আমি ভুলি নি, তাঁকে মাঝে মাঝেই সব খবর দিয়ে বড় বড় চিঠি লিখতাম। তিনিও খুশী হয়ে লিখতেন—চলো গানের অভিসারে। রবীন্দ্রনাথও দিতেন দিলাশা। সর্বোপরি, বাঙালী ও অবাঙালীর মধ্যে বহু অনুরাগী অনুরাগিণীর উৎসাহ ও প্রশংসমান দৃষ্টি আমাকে উদ্দীপিত ক'রে তুলল। আমি সুভাষের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলাম যে, কলকাতায় একটি মস্ত সংগীতসদন তৈরি করতেই হবে—মিউজিকাল আকাডেমি। ইতিপূর্বে শ্রীমদনমোহন মালব্য আমাকে দু' তিনবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের আসন (chair) গ্রহণ করতে, ও আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলাম যে, কলকাতায় আমাকে একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে হবে, কাজেই......ইত্যাদি। বলতে ভুলেছি, রবীন্দ্রনাথও আমাকে সস্নেহে ডাক দিয়েছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। সেখানে যাওয়ার লোভ আমার খুবই ছিল—বিশেষ করে তাঁর দুর্লভ সঙ্গের লোভে, কিন্তু শুধু যে কলকাতা আমাকে পেয়ে বসেছিল তাই নয় আমার পরম শুভার্থী, আত্মীয় ও বন্ধুরা সবাই বাধা দিলেন। শরৎদা বললেনঃ "তুমি গেলে আমাদের গান শোনাবে কে?" সুভাষ বললঃ "দেশের কাজে চ্যারিটি করে টাকা তুলবে কে?"

অতুলদা ব্যস্তসমস্ত হয়ে লক্ষ্মৌ থেকে রসিকতা করে পত্র লিখলেন: "বাংলা দেশে গান ছড়িয়ে দিতে হলে কলকাতাকেই তোমার সুয়োরানী করতে হবে।" পরে আমার সঙ্গে দেখা হতে তিনি বলেছিলেনঃ "দেখ দিলীপ, রবীন্দ্রনাথ বিরাট পুরুষ, কিন্তু জানো তো বড় গাছের আওতায় এমন কি চারাগাছও বাড়তে পায় না....." ইত্যাদি। এ সূত্রে বলি—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলাগানে গায়কের তানবিস্তারের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রায়ই আমার যে-দ্বন্দ্ব চলত সে-দ্বন্দ্বে অতুলদা ছিলেন আমার দিকেই। কিন্তু এ-নির্বিবাদী অজাতশত্রু মানুষটি কারোর মনেই আঘাত দিতে চাইতেন না, তাই আমাকে বলতেনঃ "রবিবাবুকে বোলো না কিন্তু দিলীপ, তুমি আবার যে মুখহলস মানুষ—ভয়ে মরি।" আমাকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না—ঝোঁকের মাথায় আমি কখন কী করে বসি!

এই মানুষটির মধ্যে দেখেছিলাম আশ্চর্য আপন করে নেওয়ার শক্তি। লক্ষ্মৌতে তাঁর নিরুপম নিকেতনে তাঁর কত যে ভক্ত ও অনুরাগী তাঁর সান্ধ্য মজলিশের গালগল্পের মজলিসে উচ্ছল হয়ে উঠত সে একটা দেখবার জিনিস ছিল। কিন্তু গালগল্প ভালোবাসলেও তাঁর প্রাণের উপজীব্য ছিল—গান। তাঁর একটি সুন্দর গান তিনি জৌনপুরী টোড়িতে বসিয়ে আমাকে প্রায়ই শোনাতেনঃ

ওগো দুঃখ সুখের সাথী,
সাথী দিন রাতি, সংগীত মোর!
তুমি ভবমরুকান্তারে মাঝে
শীতল শান্তির ক্রোড়।

তাঁর একটি সুবিখ্যাত গান সম্বন্ধে একটি বড় অপরূপ স্মৃতি মনে পড়ে। অতুলদার ও-গানটি আজো আমার কাছে দেদিন প্রিয়ই আছে—ভৈরবী ঘরে বাঁধাঃ

কী আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়!
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।
যে পথে চালাবে নিজে চলিব
চাব না পিছে
তুমি যাহা ভালো বোঝো তাই করিও।
রাখিবে না রেখো সুখে,
চাহো যদি রেখো দুখে
আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবিও।
দেখ সকলে আনিল মালা,
ভকতি চন্দন থালা,
আমার এ-শূন্য ডালা তুমি ভরিও।

একদিন অতুলদা কি কাজে বাইরে গেছেন। আমি তাঁর ঠাকুর ঘরে একলা বসে এ-গানটি গাইতে গাইতে ভাবাবেশে চোখের জল রাখতে পারি নি। গানের শেষে উঠে দাঁড়াতেই দেখি—সামনেই অতুলদা—তাঁরও চোখে জল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন গাঢ় কণ্ঠেঃ "জানো দিলীপ, এ-গানটি আমি বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়ে—যখন মনে হয়েছিল ......যাক্‌ সে কথা আর একদিন বলব—" বলেই চোখের জল গোপন করতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন আমি অতুলদাকে দেখতে শিখি এক নতুন দৃষ্টিতে। জীবনে দুঃখ পায় শতকরা একশোজনই। কিন্তু কজন বেদনাকে বোধনায় রূপান্তরিত করতে পারে অন্তঃশক্তির রসায়নে? গ্যেটে বলতেন প্রায়ই যে, গভীর দুঃখ পাওয়াও সার্থক যদি সে-দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে আঁধারে তারার মত। কিন্তু একথা সাজে কবিরই মুখে। সাধারণ মানুষ দুঃখে হাহাকার করেই মরে, এক কবিই দুঃখের দহনে ধূপের সৌরভ বিলাবার শক্তি ধরেন। অতুলদা ছিলেন কবি তাই পেরেছিলেনঃ

হৃদয়ের শব্দ শুনে
চমকি ভাবি মনেঃ
ঐ বুঝি এল বঁধু মৃদুল চরণে!
পরাণে লাগলে ব্যথা ভাবি বুঝি—
আমায় ছুঁলে!
বঁধু আমার
আর কতকাল থাকব বসে দুয়ার খুলে
বঁধু আমার!

এর পরে অতুলদার সঙ্গে আমার স্নেহ-সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে উঠল দুটি আনন্দের যোগাযোগেঃ এক আমি তাঁর গান সর্বত্র প্রচার করার ফলে তিনি গানের পর গান বাঁধতে আরম্ভ করলেন—একে বলতে পারি সাংগীতিক লাভ। দুইঃ আমাদের গানের আনন্দ পেতে আমরা নানা অভিযান শুরু করলাম—কখনো মধুপুরে, কখনো সুন্দরবনে স্টীমারে, কখনো বা শিমুলতলায় আমার বোন মায়ার সুরম্য ভিলায়। একে নাম দেওয়া যেতে পারে হার্দিক লাভ। দুয়ের যোগাযোগে গানে গানে আমরা যেন মাতাল হয়ে উঠতাম অতুলদা যোগ দিতে না দিতে। কিন্তু তাঁর গানের কথায় ফিরে আসি।

আমি দিনের পর দিন তাঁর কাছে তাঁর নানা গান শিখে তানবিস্তারে সমৃদ্ধ করে শুধু যে বাংলার নানা শহরে গেয়ে বেড়াতাম তাই নয়, ঐ সঙ্গে নানা বক্তৃতা দিয়ে সংগীতরসিকদের সোৎসাহে বোঝাতাম—অতুলদার সুরকার বৈশিষ্ট্য কোথায়। কিন্তু এ নিয়ে বহু লেখা লিখেছি, তাই আজ আর নতুন করে এ-গবেষণা করতে মন চায় না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অতুলদার গানের সহজ সরল কথার আবেদন ঠুংরির সুরমাধুর্যের মাধ্যমে সত্যিই এক বিচিত্র রকমের সাড়া করত যাতে সংগীত কোবিদরা সবাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আজ বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের বা তাঁর গানের শুনি সে-আদর নেই শুধু রবীন্দ্র-সংগীতেরই জয়জয়কার। আমিও রবীন্দ্র-সংগীতের অনুরাগী। কিন্তু সুরকার হিসেবে আমি আজো দ্বিজেন্দ্র-

লাল ও অতুলপ্রসাদেরই বেশি পক্ষপাতী। এ নিয়ে বেশি নাই বললাম—রবীন্দ্রনাথের সংগীত যাঁরা সত্যিই ভালোবাসেন তাঁদের মনে আঘাত লাগতে পারে, কাজ কি? তাই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে শুধু অতুলদার সুরভঙ্গি ও কলাকারু সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে পিতৃদেব কি অতুলদার শ্রেষ্ঠ গান বাংলাদেশে আজকের দিনে খুব বেশি লোকপ্রিয় হবে না। তবে লোকপ্রিয়তাকে আমি কোনো শিল্পেরই একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে গ্রহণ করতে পারি নি। কোনো শিল্পের শ্রেষ্ঠ আবেদন কোথায় ও কোন্ পথে ফুটে ওঠে তার বিচার করতে হলে সব আগে বিচার করতে হবে "কার কাছে" ফুটে উঠছে, বিচারক কে? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কাব্যের রস কোন্ নিকষে কষতে হবে এ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বহু আলোচনার অন্তে আমি তাঁর মতে সায় দিতে বাধ্য হই—যেকথা তিনি আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—যেঃ "Contemporary judgments we know to be unreliable; there are only **two judges whose joint verdict cannot easily be disputed: the World and Time, but the world's verdict is secure only when it is confirmed by Time—the verdict of posterity."**
অর্থাৎ জনমত আর কাল এই দুই বিচারকের রায়ই প্রামাণ্য, এবং জনমতের রায় বলতে বোঝায় না তার আজকের রায়, বোঝায় অনাগত বিশ্বের লোকমতের পাকা রায়। রবীন্দ্রনাথও একথা বলতেন প্রায়ই নানা সুরে যে, সমসাময়িকদের বিচার নির্ভরযোগ্য নয়। আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ "নিজের বিচারবুদ্ধি আমি অন্ধভাবে বিচার করি নে।......আমাদের ছুটির পরে যে-আদালত বসবে তার উপরেই শেষ বিচারের ভার রইল। কিন্তু হায় রে, শেষ বিচারের দরবার শতাব্দীর কোন্ প্রান্তে বসবে তা কেউ বলতে পারি নে!" (তীর্থংকর, ১৯৯ পৃঃ) মোদ্দা কথা, মানুষের রুচির তাপমান যন্ত্র বহু ওঠাপড়ার পর কালাতিপাতে খানিকটা থিতিয়ে না এলে কোনো কলাকরুর যথার্থ দাম ধরা সম্ভব নয়।

তাই আমার মনে হয় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানে সুরভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আজ সাধারণের কাছে তেমন আদর না পেলেও আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ নেই, যেহেতু কালের দরবারেই হবে শেষ বিচার—যাকে কেউ কাটতে পারবে না। সব বিচারই সাময়িক, কাজেই অপলকা।

এইটুকু মাত্র বলে সংক্ষেপে দু'কথায় বলি কেন অতুলদার শ্রেষ্ঠ গানকে আমি গানের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ মনে করি।

এখানে একটু থেমে বলে নিই, গানের দিক থেকে রসোত্তীর্ণ বলতে কী বুঝছি।

অতুলদার অনেক গানেই ছন্দের খুঁত আছে। উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য হবে—যে-কোন ছন্দজ্ঞেই তাঁর নানা মনোজ্ঞ গানেও ছন্দপতন ধরতে পারবেন। এরকম ছন্দের খুঁত রবীন্দ্রনাথেরও অনেক গানে আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্তেরও কোনো গানের মাত্রা সুরের টানে ঠেলে পড়তে হয়। কিন্তু তবু বলব যে অতুলদার ছন্দের কান রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্তের মতন অনুশীলিত ছিল না। মানে তাঁর অনেক গানে এমন সব ছন্দপতন আছে যাকে সহজেই নিখুঁত করা যেত এবং করলে সুরের জলুস বাড়ত বৈ কমত না' এরূপ ক্ষেত্রে যে গানের ছন্দও নিখুঁত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ নিয়ে বোধ করি রসিক সমাজে মতদ্বৈধ হবে না।

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মানতেই হবে যে অতুলদার অনেক গানেই যেখানে ছন্দের ফাঁক সুরে এমন অপরূপ ভাবে ভরাট করা হয়েছে যে সেখানে ফাঁক রাখা অন্যায় হয় নি—যথা ধরা যাক তাঁর "শুধু তুমি যে কবি তাহা বুঝিতে দিও।" রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের নজির দিচ্ছি আমার এ-ওকালতির স্বপক্ষেঃ

না না গো না কোরো না ভাবনা
যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না......

চিরকুমার সভায় এ-গানটি সুরে শোনবার সময় আমার মন আনন্দে উজিয়ে উঠেছিল—তাই বলছি এ-গানে ছন্দপতনকে খুঁত বললেই ভুল হবে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ গানেই রবীন্দ্রনাথ এই ভাবেই সুরের জন্যে ফাঁক রেখেছেন তাঁর ছন্দে। আমি এ-গানগুলি সুরের সংগতে শুনি নি, তবে মনে আছে রবীন্দ্রনাথ আমাকে প্রায়ই বলতেন যে কাব্যে ছন্দকে নিখুঁত করা চাইই বটে, কিন্তু গানের বেলায় সময়ে সময়ে সুরকে ছাড়া দেওয়ার জন্যে ছন্দের ফাঁক রাখলে অপরাধ হয় না।

একথা সশ্রদ্ধে মেনেও বলব যে অতুলদার অনেক গানের ছন্দে এরকম ফাঁক সমর্থনীয় হলেও তাঁর অনেক ছন্দে—তথা মিলে—কান ব্যাহত না হয়েই পারে না। কিন্তু এটুকু উল্টো গেয়ে ফিরে তাঁর গানের সাধুবাদে বলতে পারি অসংকোচেই যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ গানে মন যে গভীর আনন্দ পায় তার জন্যে সংগীতরসিকদের কাছে তিনি চিরদিনই বাংলার একজন বড় কবি না হোন, সুরকার বলে আদরণীয় থাকবেনই থাকবেন।
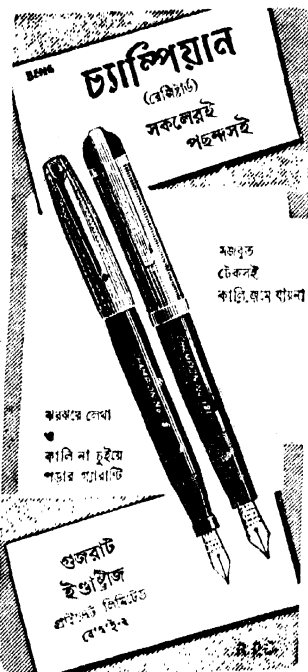
(ক্রমশ)

কন্যাদান ব্যাপারে ভাবী জামাতার যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখবার নানা অদ্ভুত রকমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দিল্লীর এক মেডিক্যাল-ছাত্র একবার এক ধনী মহাজনের কন্যার প্রেমে পড়ে। কিন্তু ছাত্রটি ভাবনায় পড়লো এই জন্যে যে, ধনীর কন্যা যেভাবে ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিতা হয়েছে তার পক্ষে সেই ঠাট বজায় রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু ছেলেটি দমে গেল না। খবর নিয়ে জানতে পারলে সেই মহাজন লোকটি এক সাংঘাতিক জুয়াড়ী। একথা জানবার পর ছেলেটি মহাজনের কাছে গিয়ে এক বিচিত্র প্রস্তাব পেশ করলে। বললে, বিষাক্ত সাপে ভর্তি একটা কামরায় সে এক রাত কাটাবে। মহাজন রাজী হয়ে জানালে যে, সে যদি সেই রাতের পর জীবিত থাকে তাহলে কন্যাসহ তার সম্পত্তির একাংশ দান করবে।

বাজীর শর্ত অনুযায়ী সেই মহাজন লোক লাগিয়ে বিষাক্ত সাপ বেছে বেছে জোগাড় করে একটা ঘরে ভর্তি করে দিলে। ছেলেটির মুখে চোখে কিন্তু ভয় বা উদ্বেগ কিছু প্রকাশ পেল না। কথামতো সে যথাসময়ে সাপভর্তি সেই ঘরে প্রবেশ করলে। পরদিন সকালে দরজা খুলে দিতেই হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে এল। মহাজন তার কথা রাখলে। পরে অবশ্য জানতে পারলে যে তার জামাতা বর্ম পরে সাপের ঘরে রাত কাটিয়েছিল, কিন্তু তখন আর উপায় কিছু নেই।

আফ্রিকার ট্রান্সভালের এক বর্ধিষ্ণু কৃষক-কন্যার পাণিগ্রহণ করার অভিপ্রায়ে ড্যান এস্টারহুয়েস নামক এক যুবক একটি সিংহীকে ধরে তার দুধ দুইবার শর্ত পালন করে। পালওয়ানের মতো চেহারা হলেও ড্যান বাঘ-সিংহ তো দূরের কথা একটা বিড়াল ছানাকেও কোনদিন হাতে ধরেনি। নম্র, ভালমানুষ একটা দৈত্য বলে সে অঞ্চলে ওর খ্যাতি ছিল। কেউ কেউ তাকে কাপুরুষও বলতো। ড্যান এইসব মন্তব্য নির্বিকার চিত্তে সহ্য করে যেত এবং ক্রমে সে কৃষক দুহিতা এস্টিলার হৃদয় জয় করে নেয়। এস্টিলার বয়েস তখন মাত্র আঠারো এবং তার বাবার ইচ্ছে ছিল না এমন জামাই করে তার অবর্তমানে লোকে যাকে গ্রাহ্য করবে না।

এস্টিলাকে লাভ করার কঠিন শর্ত ঠিক হবার পর এক সপ্তাহ ধরে ড্যান সিংহী-দের আচরণ লক্ষ্য করে যেতে লাগলো এবং যতোই সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করতে থাকে ততোই সে তার শর্ত পালনে বিরাট ঝুঁকি বিষয়ে অবহিত হতে থাকে। ড্যান বুঝলে যে ক্রুদ্ধ জানোয়ারটির একটি ঝটকানিতেই অস্থিপঞ্জর চুরমার হয়ে যাবে।

এক সপ্তাহ পর কিন্তু ড্যান বৃদ্ধ কৃষক জোয়ানেসানের কাছে জানালে, সে শর্ত পালন করতে প্রস্তুত। বৃদ্ধ বললে "তোমাকে আমি পথপ্রদর্শক এবং একটি বন্দুক দেব। কিন্তু তুমি যদি তা ব্যবহার কর তাহলে এস্টিলাকে লাভ করার কথা ভুলে যেতে হবে।"

ট্রাকে করে সিংহসংকুল অঞ্চলে ওরা

যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটস্ শহরে মোটরচালকদের রাস্তায় চলতে সাইকেল-আরোহীদের সম্পর্কে অবহিত করে তোলার জন্য সম্প্রতি ছেলেমেয়েরা রাস্তায় সাইকেল নিয়ে শুয়ে পড়ে এইভাবে ধর্মঘট করে। ১৯৫৮ সনে মোটরের ধাক্কায় ১৩৩৭টি দুর্ঘটনা ঘটে।

পৌঁছল বিকেলের দিকে। ডান বন্দুকটা ট্রাকে রেখে সিংহের পায়ের ছাপ দেখে দেখে অস্তগামী সূর্যের দিকে এগিয়ে চললো। সন্ধ্যার মুখে ডান এসে পৌঁছলো একটা জলভরা গর্তের ধারে। সিংহের পায়ের দাগ সেখানে এসে মিলিয়ে গেছে। ডান সেখানে একটা ফাঁদ পাতলো এবং সে আর তার অনুসরণকারীরা সেই জলের গর্তের চারদিকে ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর বিরাট এক সিংহীকে সেই জলাশয়ের ধারে আসতে দেখা গেল—সেই দলের কেউ কখনো অত বড়ো সিংহী দেখেনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সিংহী ফাঁদে পড়লো। একটা দড়ির ফাঁস হাতে নিয়ে ডান এগিয়ে গেল। ফাঁসটা গলায় জড়িয়েই দড়িটাকে গর্জনমুখর সিংহীর সর্বাঙ্গে পাক খাইয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে ডান। তারপর একটা বোতলে এক কোয়ার্টার পাইট দুধ দুয়ে নিলে। অনুসরণকারীদের আনন্দধ্বনিতে চার উঠলো মুখরিত। কিন্তু ডানকে সেই সিংহীকে ধরে প্রহার করতে দেখে আনন্দধ্বনি ভয়ার্ত আর্তনাদে পরিণত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ ধরে মানুষ আর পশু মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সিংহী খানিকক্ষণ ড্যানের চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে চলে গেল।

বৃদ্ধ কৃষকের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই ড্যানের এই দুঃসাহসিক কৃতিত্বের কথা তার কানে পৌঁছে গিয়েছিল। ড্যান সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জোয়ানেস্যান বললে: "অনেক বাহাদুরী দেখিয়েছ, যতোটা চেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশী। এস্টেলা এখন তোমার।"

বুয়েনস এয়ার্সের এক মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয় দুই যুবক। দুজনেই ওরা দ্রুত গাড়ি চালানোর ওস্তাদ। মেয়েটির পিতা ঠিক করলে, দ্রুত গাড়ি চালানোর প্রতিযোগিতায় তাদের মধ্যে যে জিতবে তারই হাতে কন্যাকে অর্পণ করবে।

সেইমতো ওরা দুজনে গাড়ি নিয়ে দৌড় আরম্ভ করলে, কিন্তু মেয়েটিকে লাভ করলে যে শেষে পৌঁছেছিল সেই। কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী একশতের অধিক মাইল বেগে চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে।

*

ইওরোপ বিজ্ঞানে যতোই এগিয়ে যাক, সাধারণ মানুষের কুসংস্কারের দিক থেকে কোন অনগ্রসর দেশের চেয়ে কম নয়। জার্মানীর দূর পল্লী অঞ্চলে যাদের বাস সেখানকার গৃহকর্ত্রীদের একটা কুসংস্কার আছে যে, ত্রিশে এপ্রিলের রাতে বাইরে বের হলে ডাইনীর খপ্পরে পড়তে হবে এবং এই বিশ্বাসে তারা একপ্রকার সুগন্ধী প্রস্তুত করে ডাইনীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রতিরোধক হিসেবে। প্রাচীন এক কিম্বদন্তী অনুসারে এই রাতটা হলো ডাইনীদের উৎসব রাত্রি এবং তারা সাধারণ লোকের অনিষ্ট করে বেড়ায়। আজ এই ১৯৫৯ সনে বহুলোক এই কুসংস্কারটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেও অনেকে আছে যারা এই রাতে বাড়ির বাইরে বের হবার কথা ভাবতে পারে না। তাদের ভয়, এই রাতে বাদুড়ের মত নিঃশব্দে দ্রুতগামী এক আকৃতির খপ্পরে পড়তে পারে। কিম্বদন্তী আছে, "এই রাতে যদি কোন গির্জা বা কোন বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখ, গোয়ার্তুমি করে দেখতে যেও না যেন। ভেতরে ডাইনীরা উৎসব করে এবং তোমায় দেখলে আঘাত করতে পারে।"

নিজেদের বাড়ির মধ্যে থেকেও লোকে নিরাপদ মনে করে না, অনেকের বিশ্বাস, ডাইনীরা মাঝরাত পর্যন্ত বাড়ির দরজায় দরজায় ঘোরাফেরা করে। যারা বিশ্বাস করে তাদের মতে জুনিপারের ডাল দরজায় বেঁধে রাখলে ডাইনীদের দূরে সরিয়ে রাখা যায়। কারণ বলা হয় এই যে, ডাইনীরা জুনিপারের অসংখ্য পাতা গুনতে গুনতে ধৈর্য হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে সরে পড়ে।

ইউ-এন্ অ্যাসেমব্লীতে মিঃ খ্রুশ্চেভ যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি চার বছরের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রের সৈন্য-সামন্ত ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সাজ-সজ্জার বিলোপ সাধনের একটি প্রস্তাব করেছেন। মিঃ খ্রুশ্চেভের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন ধাপে এই কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে। প্রথম ধাপে "যথাযোগ্য কন্ট্রোল"-এর ব্যবস্থা রেখে সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সৈন্যসংখ্যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ১৭ লক্ষে এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সাড়ে ছয় লক্ষে নামিয়ে আনা। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সৈন্যসংখ্যাও কমাতে হবে, তার পরিমাণ কী হবে সেটা ইউ এন অ্যাসেমব্লীর একটি বিশেষ অধিবেশনে অথবা এই উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করে স্থির করতে হবে। সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও কমাতে হবে, অর্থাৎ হ্রাস করার পরে প্রত্যেক রাষ্ট্রে অবশিষ্ট সৈন্যসংখ্যার উপযুক্ত অস্ত্রপাতি থাকতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপে অবশিষ্ট সৈন্য-বাহিনীগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে হবে; বিদেশে যেসব সামরিক ঘাঁটি আছে সেগুলো তুলে দিতে হবে এবং সেইসব ঘাঁটি থেকে সৈন্যসামন্ত স্বদেশে ফিরিয়ে এনে তাদের সামরিক কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। তৃতীয় ধাপে সমস্ত রকম নিউক্লিয়ার এবং রকেট অস্ত্র নষ্ট করে দিতে হবে; রাসায়নিক এবং জীবাণু যুদ্ধ চালাবার উপকরণ তৈরি এবং রাখা নিষিদ্ধ হবে এবং ঐরকমের সমস্ত মজুত উপকরণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নষ্ট করে দেওয়া হবে; সামরিক উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্র এবং অন্যবিধ উপকরণ উন্নয়নের কাজ নিষিদ্ধ হবে; যুদ্ধের জন্য কোনোরকম শিক্ষা দেওয়া চলবে না, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ-ভাবে কোনো সামরিক সংস্থা বা ভলান্টিয়ার দল রাখা চলবে না, যুবকযুবতীদের সামরিক শিক্ষাদান প্রত্যেক রাষ্ট্রে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হবে; কোনো রাষ্ট্রের বাজেটে কোনো সামরিক উদ্দেশ্যে টাকা বরাদ্দ করা চলবে না।

মিঃ খ্রুশ্চেভের এই প্রস্তাব একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবার মতো ব্যাপার নয়, পশ্চিমা মহলে এই ভাব রক্ষা করা হচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হোক না হোক, মিঃ খ্রুশ্চেভ প্রোপাগাণ্ডার দিক থেকে লাভবান হতে পারেন, এই ভয় রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সোভিয়েট নেতার প্রস্তাব ভালো করে তলিয়ে না দেখে কোনো মতামত দেওয়া যায় না। কেউ কেউ আবার মিঃ খ্রুশ্চেভের প্রস্তাবের মধ্যে পশ্চিমা দৃষ্টি-কোণের দিকে সোভিয়েটের এগিয়ে আসার প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন। বৃটিশ কর্তারা বলছেন যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আন্ত-র্জাতিক পর্যবেক্ষণ এবং কন্ট্রোলের কথায় যে রাজী হয়েছেন এইটাই সবচেয়ে আশার কথা। সোভিয়েট নেতার প্রস্তাব একটা অপূর্ব ব্যাপার, এই ধারণার প্রচারে পশ্চিমা মহলের আপত্তি।

মিঃ খ্রুশ্চেভের প্রস্তাব যথারীতি ইউ-এন-এর নিরস্ত্রীকরণ কমিটির আলো-চনার বিষয় হবে। প্রথম লণ্ডনে, তারপর জেনেভায় বছরের পর বছর এই কমিটির আলোচনা চলছে। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। বছরের পর বছর নিরর্থক আলোচনার পরে হঠাৎ একটা আশ্চর্য পরিবর্তন কখনো যে ঘটে না তা নয়। হঠাৎ ভয় অথবা অন্য কোনো প্রবল আবেগের বশে মানুষ পূর্বে যা করতে পারে নি, এমন কি করার কথা ভাবতে পারে নি, এরকম কাজও করে বসতে পারে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাষ্ট্র বা অনুরূপ কোনো সংস্থার পক্ষে ঠিক সেরূপ ঘটা খুবই কঠিন, তবে অসম্ভব না হতে পারে। নিউক্লিয়ার এবং রকেট অস্ত্রের ভয়াবহতা

ক্রমশই বাড়ছে। সাধারণ লোকের চেয়েও রাষ্ট্রনেতারা তার খবর আরো বেশি রাখেন। সুতরাং এই ভয়ের তাড়নায় অত্যন্ত পথ ছেড়ে একটা দুঃসাহসিক আদর্শের দিকে লাফ মারা অচিন্ত্যনীয় নয় কিন্তু তার সম্ভাবনা যৎসামান্য।

চার বছরের মধ্যে পৃথিবীর কোথাও সৈন্যবাহিনীর চিহ্ন থাকবে না, যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম অবসন্ন; সামরিক শিক্ষাদান পর্যন্ত নিষিদ্ধ, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো দেশের বাজেটে একটি টাকাও খরচ হবে না—এর মতো সুখকর কল্পনা আর কী হতে পারে? কিন্তু এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার যে উপায় বলা হয়েছে সেটা কষ্টকর হবে, এ আশা কি করা যায়? যুদ্ধ আজকের দিনে সর্বনাশা রূপ নিয়েছে কিন্তু সেটা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধেই ভাবা হয় অর্থাৎ অ্যাটমিক পাওয়ার যারা তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলেই সর্বনাশ হবে এইটাই হল দুই ব্লকের কর্তাদের দুর্ভাবনা। কিন্তু এদেরই প্রশ্রয়ে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে যুদ্ধ চলেইছে, নরহত্যারও বিরাম নেই। যুদ্ধের কারণ এখনো পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। সেইসব কারণের যদি নিরসন বা উপশম না হয় তাহলে সংঘর্ষ থামবে কী করে? মানুষ সব মহাত্মা বনে না গেলে যুদ্ধ বন্ধ হবে না, এটা কথা নয়। কিন্তু হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অন্যায় নিবারণের জন্য বলপ্রয়োগ বিনা অন্য কোনো নৈতিক উপায় গ্রহণ করতে হবে অথবা এক রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তি এবং শান্তিরক্ষার যে-ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে তাই গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আইন আদালত এবং শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস আছে। অহিংসভাবে রাষ্ট্ররক্ষার উপায় যতদিন উদ্ভাবিত বা গৃহীত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ নিরসনের উপায় কেবল ওয়ার্লড কোর্ট দিয়ে হবে না, ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টও চাই যার হাতে পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্র তাদের সামরিক কর্তৃত্ব সমর্পণ করবে।

পৃথিবীকে যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে হলে পৃথিবী থেকে একেবারে সমস্ত মিলিটারী বিলোপের কল্পনা না করে প্রথমে মিলিটারীর কর্তৃত্ব বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির হাত থেকে একটি বিশ্বসংস্থার হাতে সংগৃহীত করার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিসংগত হবে এবং তার সফলতার সম্ভাবনা বেশি। জাতিগত সমাজ যেখানে পুলিস ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারছে না সেখানে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত মানবসমাজ একেবারে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করে বসবে, এটা সম্ভব নয়। তার চেয়ে একটি ওয়ার্লড গভর্নমেণ্ট যার হাতে রাষ্ট্রগুলি তাদের সামরিক কর্তৃত্ব সমর্পণ করবে সেটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে। এই অর্থে ওয়ার্লড গভর্নমেণ্ট স্থাপনের ফলে জাতি-সমূহের রাষ্ট্রীয় সত্তার বিলোপ হবে না, কেবল মিলিটারীর ভার থেকে রাষ্ট্রীয় সরকার মুক্ত থাকবেন। ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টের অধীনে যে-মিলিটারী সংস্থা থাকবে তার আয়তন স্বভাবতই পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রের সামরিক সংস্থার যোগফলের চেয়ে অনেক ছোট হবে। বাড়িতে বাড়িতে বা গ্রামে গ্রামে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখতে হলে যত অস্ত্রের প্রয়োজন হত তার চেয়ে পুলিসের মোট অস্ত্রের প্রয়োজন নিশ্চয়ই অনেক কম।

ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনার সঙ্গে আদর্শের দিক দিয়ে পৃথিবীব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের আদর্শের কোনো অসংগতি নেই। যে রাষ্ট্রে সমাজ জীবন যত সুশৃংখল হয় তার পুলিসের প্রয়োজন এবং পুলিস বাহিনীর আয়তনও তত কমে আসে। ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টের সামরিক সংস্থা আন্তর্জাতিক পুলিসের কাজ করবে, সুতরাং এ বিষয়ে তার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আশংকা হতে পারে যে, সকল জাতি নিজের হাত থেকে তার মিলিটারী ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। অথবা এ আশংকাও কোনো কোনো রাষ্ট্রের মনে উঠবে যে, ইউ এনকে যেমন এক গোষ্ঠী কব্জায় করে অন্যকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করে তেমনি ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টের হাতে মিলিটারীও দলীয় স্বার্থ-সাধনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এরূপ সন্দেহ ও অবিশ্বাস ওয়ার্লড গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা নয়। কারণ প্রারম্ভে সকল রাষ্ট্র যদি যোগও না দেয় তাহলেও ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টের পত্তন হতে পারে। যদি একাধিক, এমন কি একটিমাত্র বৃহৎ শক্তি নিজের রাষ্ট্রীয় সামরিক কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে অপরদের যোগ দিতে আহ্বান করে তবে কয়েকটি রাষ্ট্র অবশ্যই সেই আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তার দ্বারাই ওয়ার্লড গভর্নমেণ্টের পত্তন হবে। এই নূতন সংস্থা যদি প্রথমেই ঘোষণা করে যে, কোনো কারণেই, এমন কি আত্মরক্ষার্থেও তারা নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করবে না তাহলে ক্রমশ অন্যদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হতে থাকবে। মোট কথা, কোনো এক জায়গা থেকে অন্যনিরপেক্ষ ত্যাগের ঘোষণা হওয়া চাই। তা নাহলে স্থায়ী সফল কিছু হবার নয়। বলা বাহুল্য, কোনো রাষ্ট্রীয় সরকারেরই প্রকৃত ত্যাগের ক্ষমতা নেই বা হয় না যতক্ষণ না তার উপর জাতিমানসের আগ্রহের চাপ পড়ে। মুশকিল এই যে, সেই ত্যাগের আগ্রহ যাঁরা মানুষের মনে জাগাতে পারেন তাঁদের সচরাচর উচ্চরাজ-পদে দেখা যায় না।

* * *

শ্রী নেহরুর আফগানিস্তান ও ইরাণ ভ্রমণের সংবাদ দু নম্বর লুনিক এবং মিঃ খ্রুশ্চেভের মার্কিন সফরের সংবাদে অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এই নিকটবাসী মিত্রদের সৌহার্দ্য ফেলনা জিনিস নয়। ২১।৯।৫৯

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

ভাল লাগার নেশা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। মূল্যঃ দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গর্বের বিষয় তার কথাশিল্প। রবীন্দ্রনাথ এর মুক্তিদাতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ও তাঁকে এড়িয়ে যে কয়জন কথাশিল্পী অপূর্ব নবত্ব সঞ্চার করেছিলেন, শৈলজানন্দ সেই সংখ্যালঘুদের একজন। সেই সংখ্যালঘু শিল্পীর দল একটি সৌহার্দ্যসূত্রে অন্তরঙ্গ ছিলেন—সে হলো মানবজীবনের 'উপেক্ষিত' অংশের সাহিত্যভুক্তি। 'উপেক্ষা' শব্দটি এখানে কোনো রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, একথা বলা বাহুল্য।

শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির দুর্জ্ঞেয় জীবন-রহস্য যখন আবিষ্কার করেছিলেন, অনেকে বিস্মিত হয়েছিলাম। শিল্পীসুলভ অন্তর্দৃষ্টি সেই আবিষ্ক্রিয়ার স্বরূপ লক্ষণ, যে-অন্তর্দৃষ্টি নিশ্ছিদ্র, গভীর। কি ক'রে প্রদর্শনীয় বিষয়বস্তুর উপর আলো ফেলতে হয়, চিত্রশিল্পজ্ঞ শৈলজানন্দ তা ভালোভাবেই জানেন। তাঁর মনোগত বিষয়কে দেখাবার সময় কোথাও তিনি এই দীপ্তিক্ষেপের কাজে অসার্থক হন না। 'ভাল লাগার নেশায়' সেই একই শৈলজানন্দ অগ্রসরমান।

'নোংরা বস্তি' গল্পটি ধরা যাক। বস্তি ব্যাপারটা এখানে কোথাও বাইরে থেকে সংযোজিত নয়, অপরিহার্যরূপে অন্তর্ভুক্ত। 'এত বড় কলকাতা শহর, কোথাও একখানা ঘর পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বস্তির ঘরখানাই নিতে হলো।' এভাবেই গল্পের শুরু। এই স্বাভাবিকতা গল্পের শেষে অবিকৃত এবং দীপ্তিমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ও উজ্জ্বলতার এই সন্নিবেশ শৈলজানন্দের গল্পের বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্পকথনে কোনো আয়োজিত চমক নেই, কোনো কেন্দ্রাতিগ বাক্ছল নেই।

অথচ 'লকোচুরি' গল্পের পরিবেশ যে সদ্যোক্ত 'চমক' বা 'বাক্ছলে' সহজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে পারতো। এর পরিবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে 'ম্যাড'—সমস্তটাই অতিলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হ'তে পারতো।

কিন্তু মানুষের মনের একটি চিরন্তন দুর্বলতা আর তার শাস্তি এই গল্পটিকে কোথাও সংগীতের পথ হারাতে দেয়নি। যবনিকার সূত্রপাত অথবা কাহিনীপট প্রাকৃত অথচ সেই পরিচিত পরিবেষ্টনীকে মানবমনের একটি সনাতন প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে কিভাবে যে লেখক শিল্পের অর্থে বাস্তবিক ক'রে তুলেছেন, সেই সাবলীল নিপুণতা আস্বাদে পাঠক ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না। সুখদুঃখময় জীবনের কয়েকটি বিষণ্ণসুন্দর উন্মোচন 'ভাল লাগার নেশাকে পাঠকপ্রিয় ক'রে তুলবে।

সুবোধ দাশগুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদ অনবদ্য। (৯৫৯।৫৯)

কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্বনির্বাচিত কবিতা—প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ দাম—৪৲।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রবীণ সাহিত্যিক। দীর্ঘদিনে তিনি বাংলাসাহিত্যের এমন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, যা গতানুগতিক সাহিত্যের মানদণ্ডে ঠিক ধরা পড়ে না। তিনি মোটামুটি মননধর্মী লেখক এবং এই বিশেষণেই আজ পর্যন্ত তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন। বস্তুত মননধর্মী বলে তাঁকে বিশেষভাবে চেনা যায় তাঁর গদ্যসাহিত্যে—প্রধানত উপন্যাসে। কবিতার ক্ষেত্রেও যে এই মননধর্মকে তিনি কখনও কখনও আশ্রয় করেছেন তার প্রমাণ আছে 'প্রাচীন প্রাচীরে', আর কিছুটা 'নতুন দিন' ও 'যৌবনোত্তরে'। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য যে মূলত রোমাণ্টিক কবি তার অজস্র প্রমাণ আছে তাঁর কবিতার সম্পূর্ণ সংকলনে। 'সংকলিতা' থেকে 'অপ্রেম ও প্রেম' পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পংক্তিই একটা অখণ্ড সুরে বাঁধা, সে সুর রোমাণ্টিক সুর। কখনও-কখনও এমন মনে হতে পারে যে, কবি একান্তভাবেই আত্মমগ্ন এবং সে-কারণেই এই মৃদুস্পর্শ স্বপ্নময়তায় তিনি লুপ্ত হয়ে যেতে চেয়েছেন; কিন্তু তাঁর কবিতার পর্বে পর্বে সন্ধানে ধরা পড়বে যে, তিনি আত্মমগ্নও বটে আবার বিস্তৃত পটভূমিতে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো বিচরণ করবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীবও বটে। আসল কথা, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ভালোবাসার কবি। শুধু মানুষই নয়, আত্মা ও আত্মার অতীত জড়বস্তুতেও তাঁর ভালোবাসা সঞ্চরমান। এবং এইজন্যই 'প্রাচীন প্রাচীর' মতো দীর্ঘ শ্রেণী-কাব্য রচনাও তাঁর দ্বারা সম্ভব।

আলোচ্য গ্রন্থটি কবির স্বনির্বাচিত কবিতাসংগ্রহ। দীর্ঘকালে তিনি অসংখ্য ভালো কবিতা লিখেছেন, তার পূর্ণ সংকলন হয়তো সম্ভব নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে এই সংকলনটিকে সার্থক বলা চলে। কারণ, দক্ষ সম্পাদকের মতোই তিনি অবশ্যগ্রাহ্য কবিতা কয়টিকে এখানে স্থান দিয়েছেন, অর্বাচীনের মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তথাপি একটি প্রশ্ন থাকে, এ-সংকলনে 'পত্রাবলী' গ্রন্থ থেকে একটিও কবিতা নেই কেন? কবি কি নিজে স্বীকার

করেন না যে, সেখানে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যা বাংলা কাব্যসাহিত্যের পক্ষে সত্যিই গৌরবের জিনিস!

৬২৯।৫৮

নাটক

প্রিয়া—সরোজ ঘোষ। নব সংস্কৃতি প্রকাশন, ২১০।১-এ রাসবিহারী এভেন্যু। কলিকাতা—২৯। মূল্য ২্।

সমাজ-সমস্যামূলক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাট্যকার নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী। তিনি যে বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন, তাতেই তাঁর সাহসের পরিচয় পাই। তবে একটি নাটকে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি করলে সব কটি সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয় না। কাহিনী ও চরিত্র বিশ্লেষণ উপযোগী হয়েছে। ক্ষণিকা পতিতা নারী, কিন্তু তার অতীত জীবন এ নয়। সে ছিল রত্না মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বিবাহের রাত্রে স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে অদৃষ্টের পরিহাসে আজ সে পতিতা। কিন্তু এ জীবন সে মেনে নেয় নি। তাই মনের মানুষ অধ্যাপক সাহিত্যিক যুগলকে পেয়ে সব ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। তারই ঘরে আসে চন্দন, আসলে সে অশোক, ক্ষণিকার প্রথম জীবনের স্বামী। অশোক তার মনের ব্যথা ভুলতে চায়—সে তার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে, অনুশোচনায় জ্বলে মরছে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করে শান্তি পায় নি। রেবা অত্যাধুনিক সোসাইটি গার্ল, ক্লাব-বন্ধু নিয়েই মেতে থাকে। অনায়াসে সে তার স্বামী অশোককে ত্যাগ করে চলে গেল। অশোকের সনাতনপন্থী পিতার ও কর্মচারী হরিহরের চরিত্র ভালভাবে ফুটে উঠেছে। অশোক জানতে পারলো ক্ষণিকাই তার পূর্ব-পরিণীতা স্ত্রী রত্না—এখন পতিতা, সে সমাজের ভয়ে তাকে স্বীকার বা গ্রহণ করতে পারলো না। করুণ রসে নাটকটির যবনিকাপাত হয়েছে।

৫৪৫।৫৮

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

গত সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় 'বলাকা প্রকাশনী'র 'দুই পকেট হাসি'র বিজ্ঞাপনে দাম ৩·৭৫ মুদ্রিত হয়েছে, হবে ২·৭৫।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

যান্ত্রিক—মনোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
কন্যামগয়া—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
দুমুঠো গল্প—সুধা চক্রবর্তী।
প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব-মূল্যায়ণ—ক্ষেত্র গুপ্ত।
শ্রীনাম-ভাগবতম (১ম খণ্ড)—শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর।
The Kerala Upsurge
স্বগতোক্তি—প্রশান্ত চৌধুরী।
জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প।
কত আশা—মোপাসাঁ অনুবাদক—গঙ্গেশ রায়চৌধুরী।
কাশ্মীর পরিক্রমা—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ।
নীল দর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র (শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)।
দুই পকেট হাসি—প্রবন্ধ।
মুখের রেখা—সন্তোষকুমার ঘোষ।
মন মানে না—গৌরকিশোর ঘোষ।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

স্মরণীয় শিল্পকীর্তি

যে তরুণ রূপকার-গোষ্ঠী অপার আত্মবিশ্বাসে একদা "অগ্রগামী" নাম গ্রহণ করেছিলেন, চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সে ছদ্মনামই আজ তাঁদের সত্যপরিচয় ঘোষণা করছে। কিছুকাল আগে "ডাক হরকরা" ছবিতে তাঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আমাদের রসিকসমাজ। অগ্রগামী পরিচালক-গোষ্ঠীর এই অকম্পিত শিল্পপথ পরিক্রমার এক মহান উত্তরণের প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে রীতেন অ্যান্ড কোম্পানীর "হেডমাস্টার"। বাংলা ছবির বরণীয় নব-ঐতিহ্যের যুগে এক অসামান্য চিত্রসৃষ্টি এই "হেডমাস্টার"।

রসসিদ্ধ সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

শ্রীমতী পিকচার্সের "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি"-তে অন্নদাদিদির ভূমিকায় কানন দেবী।

একটি ছোট গল্পের এই চিত্ররূপের প্রধান পুরুষ বাণীর দেউলের একজন একনিষ্ঠ পূজারী—পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে এসেছেন তাঁর এই বাণী-পীঠে। কিন্তু দেশবিভাগের প্রচণ্ড ঝাপটায় একদিন প্রদীপের শিখা নিবে গেল। বিদ্যালয়টি বন্ধ হবার পর শিক্ষার জীবন ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে সপরিবারে তিনি এলেন কলকাতায়। কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে নিজের দুরবস্থার কথা জানালেন। অবশেষে গুরুদক্ষিণা তিনি পেলেন প্রতিষ্ঠাবান এক ভূতপূর্ব ছাত্রের কাছ থেকে—তার চেষ্টায় তারই অফিসে তাঁর চাকুরি জুটলো।

অফিসের কাজে ঢুকে দিনের পর দিন তিনি দেখেন মনুষ্যত্ব ও শিক্ষার কি নিদারুণ অপচয় স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে এই জীবিকার্জনের পথে। আজীবন সত্য ও ন্যায়ের উপাসকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে কর্মস্থলে চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া অনেক অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ। কিন্তু জীবন-ধারণের নির্মম প্রয়োজনে চাকুরি জীবনের সব গ্লানি পরম বেদনায় মেনে নেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর স্থান হয় না এই উন্নাসিক ও অকরুণ পরিবেশে। জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই অসম্মানিত পুরোহিত বেরিয়ে পড়েন আবার পথে ক্লান্তপদে এক বিরতিহীন জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিভূ হয়ে।

মহৎ চিত্রসৃষ্টির যে সংজ্ঞা বিদগ্ধ ও রসিকজন মেনে নিয়েছেন তা-ই যেন অগ্রগামীর এই ছবিতে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে।

এক বিড়ম্বিত অথচ মহান ও সুন্দর জীবনের এই আবেগমধুর চলচ্চিত্র একদিকে যেমন মহৎ বেদনা ও রসের আলপনায় রঞ্জিত, অন্যদিকে তেমনি অনন্যসুন্দর শিল্পগরিমা ও অঙ্গশোভার বিচিত্র রামধনুতে বর্ণোজ্জ্বল। ছবির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালক-গোষ্ঠী প্রতি দৃশ্যে যে সূক্ষ্ম রসবোধ, বাস্তব নিষ্ঠা, অপূর্ব পরিমিতি ও শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা দর্শকমনকে সর্বক্ষণ এক অনাস্বাদিত রসানুভূতিতে উদ্দীপিত ও আবিষ্ট করে রাখে।

কাহিনীর বিন্যাসে ও সুগ্রথিত চিত্রনাট্যের বিস্তারে রূপকারেরা জায়গায় জায়গায় যে ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়েছেন তা কাহিনীর মর্মরসটিকে বাঙ্ময় করে তোলে। কাহিনীর অপ্রধান চরিত্রগুলিও ছবিতে বাস্তবের প্রতীকরূপে উপস্থিত। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি পরিপূর্ণ বাস্তবানুগ ও মনোময় রূপ ফুটে উঠেছে এ-ছবিতে যাতে ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট ব্যথা, আশা ও আনন্দের মুহূর্তগুলি দর্শকের মনকে অনাস্বাদিত রসে ভরে দেয়। হেডমাস্টারের কন্যা গীতা ও তাঁর পরম উপকারী ছাত্র নিরুপমের স্নেহমধুর সান্নিধ্য ছবিতে যে প্রণয়োপাখ্যানের রূপ নেয়নি এবং দরিদ্র, জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত শিক্ষকের কাহিনীতে যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার গলদ নিয়ে কোন বাণী প্রচারের চেষ্টা করা হয়নি তার জন্যে অগ্রগামী পরিচালক-দল রসজ্ঞ দর্শকের সাধুবাদ পাবেন। সামগ্রিকভাবে অগ্রগামীর একাগ্র সাধনা ও নিবিড় সিদ্ধির এই অবিস্মরণীয় নিদর্শন শুধু তাঁদেরই নয়, সমগ্র বাংলা চিত্রশিল্পের গৌরব।

যে প্রতিভাধর অভিনেতাকে নিয়ে বাংলা চিত্রশিল্পের গৌরবের অন্ত নেই, সেই অদ্বিতীয় ছবি বিশ্বাস এক অনিন্দ্য জীবন-শিল্পীর গৌরব অর্জন করেছেন এ ছবিতে। নাম-ভূমিকার রূপায়ণে তিনি যে অনবদ্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু তাঁর শিল্পীজীবনের নয়, বাংলা রজতপটের গৌরব। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সময় সময় দুঃখক্লিষ্ট জীবনের রুক্ষতার রূপ অতিরিক্তভাবে ফুটে উঠলেও তিনি চরিত্রটিকে সামগ্রিকভাবে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। নবাগতা হয়েও হেডমাস্টারের কন্যার ভূমিকায় বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অবতরণেই তাঁর শান্ত-নম্র বাচনভঙ্গি ও মধুর অভিব্যক্তিতে দর্শক মন জয় করে নিয়েছেন। নিরুপমবেশী শ্যামল ঘোষালের অভিনয় সংযত ও চরিত্রানুগ। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন শোভা সেন, শিশির বটব্যাল ও গঙ্গাপদ বসু। কতকগুলি পার্শ্ব-চরিত্রে

ঐতিহ্যের উপর আলোকসম্পাত ছবিতে যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, বাঙালী দর্শকের মনে তার ফলে ছবিটি অনায়াসেই প্রীতিরস ও আত্মপ্রসাদের সঞ্চার করবে।

তবে ছবির প্রণয়োপাখ্যানে আমোদের আমেজ থাকলেও এমন নাট্যসংঘাত এতে দানা বেঁধে ওঠেনি যা দর্শকমনকে আবেগে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে। এর মূলে কারণ গল্পের ও চিত্রনাট্যের শিথিল বিন্যাস—নাটকের পরিণতিতে যা সুপরিস্ফুট। আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের নৈতিক সমর্থনে এবং ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্যে এর অবদান প্রসঙ্গে ছবিতে যে বক্তব্যটি প্রাধান্য লাভ করেছে, তা যেন অনেকটা কাহিনীর প্রণয়োপাখ্যানের যৌক্তিক ছাড়পত্রের মতো—যা নাট্যরস আস্বাদনে কৃত্রিম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। "বিবিধের মাঝে মিলন মহান" এই কবিবাক্যে—ছবির যা মর্মবাণী—বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের ঐক্যসাধনের মন্ত্রটি নিহিত এবং এর বাস্তব-সিদ্ধি শুধু আন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহ-মিলনেই সম্ভব এমন ভাবটা কষ্টকল্পনার নিদর্শন। ছবির বক্তব্য শুনে কিন্তু মনে হয় যেন ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন বেশধারীর শুভ-পরিণয়েই জাতীয় ঐক্যের আদর্শ সার্থক হতে পারে।

সুখের বিষয় ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যের ফাঁকগুলি ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে নাচ ও গানের সম্ভারে—ছবির আমোদ আহ্লাদকে যা পূর্ণ করে তোলে। কথক ও ভারতনাট্যম নৃত্যাংশে গোপীকৃষ্ণ, সুকুমারী ও রাগিনীর অসাধারণ নৈপুণ্য ছবিটিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। গোপীকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব রচনায় দ্রুততায় দেহ-সঞ্চালনের যে কৌশল প্রদর্শন করেন তা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই দৃশ্যে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করেন। রাগিনী ও সুকুমারীর নৃত্যভঙ্গির কমনীয়তা দর্শকদের মন জয় করে নেয়। "কুমকুম কি তাই কাহেই বাঁসি" গানের সঙ্গে গোপীকৃষ্ণের অংশগ্রহণ ... নৃত্যের পক্ষে অতিশয় উপভোগ্য হয়েছে। এ-ছবির সঙ্গীত-পরিকল্পনা ও সংগীতসৃষ্টি অনেকাংশে সুরেলা ও রুচিপূর্ণ।

বিশিষ্ট শিল্পীদের অভিনয়-কৃতিত্ব এ-ছবির অন্যতম সম্পদ। শাম্মা ও তার বড় বোন উমার চরিত্রে সুকুমারী ও রাগিনীর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অভিনয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবে। ছবি বিশ্বাসের মতো শক্তিমান অভিনেতার সামনে দাঁড়িয়ে রাগিনী একটি দৃশ্যে যে অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন তা বাস্তবিকই দর্শনীয়। গোপীকৃষ্ণ নৃত্যে কৃতিত্ব দেখালেও, অভিনয়ে অরুণোদয়ের চরিত্রটিতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেননি। বৃদ্ধ জিতেন্দ্রনাথের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় তাঁর খ্যাতির অনুরূপ। সোম-নাথজীর চরিত্রটি পাহাড়ী সান্যালের অভি-নয়ের গুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ভৈরবীতে গাওয়া তাঁর গানের একটি অংশ যেমন সুখ-শ্রাব্য, তেমনি তা দর্শকের মনে এই প্রখ্যাত গায়ক-অভিনেতার পুরনো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। অসিতবরণ তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক

নির্মলের চরিত্রে। নন্দিতাবেশিনী সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় চরিত্রানুগ। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন পদ্মা দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, পশুপতি কুণ্ডু ও রাজলক্ষ্মী।

সংগীত পরিচালনায় রথীন ঘোষ প্রশংসনীয়ভাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। প্রচলিত সুরে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও সত্যেন দত্তের গান ছবির সাঙ্গীতিক আবেদন বাড়িয়েছে। নির্মলা মিশ্রের গাওয়া কবি সত্যেন দত্তের "বন্ধুরে মহামানবের গাহ জয়" গানটি মনমাতানো।

ছবির সম্পাদনায় ভূয়সী প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অমরেশ তালুকদার। আলোকচিত্র ও কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ উঁচুদরের না হলেও পরিচ্ছন্ন। মুসৌরী ও মাদ্রাজের বহির্দৃশ্যাবলী ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে দুখানি নতুন ছবির মুক্তি। একখানি অগ্রগামী পরিচালিত বাংলা ছবি "হেডমাস্টার", অপরটি তসবীরিস্তানের হিন্দী উপহার "চাঁদ"।

এক আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকের জীবনের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডিকে উপজীব্য করে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের যে কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, তাকেই রূপে-রসে সমৃদ্ধ করে ছবির পর্দায় এনে হাজির করেছেন অগ্রগামী পরিচালকবৃন্দ রীতেন অ্যান্ড কোম্পানীর "হেডমাস্টার"-এ। নামভূমিকায় ছবি বিশ্বাস তাঁর শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ বসু এবং নবাগত শিল্পীদ্বয় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষাল। সংগীত পরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

মাতৃস্নেহের একটি কাহিনীকে ঘিরে হৃষীকেশ মুখার্জির "চাঁদ"। মীনাকুমারী, পাণ্ডারীবাঈ, বলরাজ সাহনী ও ডেজি ইরাণী মুখ্য ভূমিকাগুলিতে রূপদান করেছেন। লেখরাজ ভকরী ও হেমন্তকুমার যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

• • •

কাননদেবী প্রযোজিত "ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি"র মুক্তি ঘোষিত হয়েছে আগামী সপ্তাহে। শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"-এর দ্বিতীয় খণ্ড অবলম্বনে "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত" তুলে শ্রীমতী পিকচার্স ইতিপূর্বে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তারই পরিপূরক হিসাবে আসছে তাঁদের এই নতুন চিত্রসৃষ্টি—"শ্রীকান্ত"-র প্রথম খণ্ডের ঘটনাবলী যার ভিত্তি। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর ভূমিকায় দুটি নতুন কিশোরশিল্পী—পার্থপ্রতিম ও সজল ঘোষ—এই ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন। আর সব চেয়ে বড় খবর যেটা—সেটা হল প্রায় চার বছর বাদে কানন দেবীর প্রথম চিত্রাবতরণ অন্নদাদির ভূমিকায়। এর অন্যান্য ভূমিকায় আছেন বিকাশ রায়, মলিনা দেবী, গুরুদাস, অতনু ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। হরিদাস ভট্টাচার্য একাধারে এর চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক।

ন্যাশানাল পিকচার্সের "সোনার হরিণ"ও পুজোবকাশের অন্যতম আকর্ষণ। রাসবিহারী লাল রচিত এই গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক উত্তমকুমার। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন উদীয়মানা চিত্রতারকা সুপ্রিয়া চৌধুরী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কৃতিত্ব মঙ্গল চক্রবর্তীর। হেমন্তকুমার এ ছবির সুরকর্তা।

সদারং সংগীত সম্মেলন

নিখিল ভারত সদারং সংগীত সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন এই সপ্তাহে (২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে) শুরু হয়ে ওরা অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। সুদৃশ্য ও বিরাট মণ্ডপে (৪৩, চৌরঙ্গী রোড) এবারকার সম্মেলনের মোট ১১টি অধিবেশনের মধ্যে সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৮টি, সকালে ২টি ও সারারাত্রিব্যাপী ১টি।

কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করবেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ, পণ্ডিত ভি এন পট্টবর্ধন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করবেন পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পণ্ডিত রামনারায়ণ, পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ, নিখিল ঘোষ প্রভৃতি। নৃত্যাংশে দর্শকদের আনন্দ দেবেন কেলুচরণ মহাপাত্র(?), গোপীকৃষ্ণ, কুমারী রাণী, শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায় ও সুস্মিতা ভট্টাচার্য।

চিঠিপত্র

শিল্পনির্দেশকের বক্তব্য

মহাশয়,

২৬শে ভাদ্রের "দেশ" পত্রিকায় "আম্রপালী"-র ঐতিহাসিক অসংগতি সম্বন্ধে আলোচনা পড়িলাম। সেই সাথে আপনার উপযুক্ত উত্তর পড়িয়াও বিশেষ আনন্দ পাইলাম। চলচ্চিত্রশিল্পে ঐতিহাসিক খুঁটিনাটির রূপ দিবার চাইতে সমষ্টিগত রূপে কাল অনুযায়ী সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করাই উচিত।

পত্রলেখক "সৌর-গবাক্ষ" বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমার বক্তব্য: বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যে আমরা স্থাপত্যের পূর্ণ রূপ দেখিতে পাই এবং ঐ যুগেই সৌর-গবাক্ষের বাস্তবরূপে সুন্দররূপে দেখা যায়। কিন্তু সৌর-গবাক্ষ বুদ্ধজন্মের বহু পূর্বেই ছিল এবং তাহার রূপ পরিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এবিষয়ে পার্সি ব্রাউনের লেখা "ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার" গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় "দি ইণ্ডাস সিভিলিজেশান" (খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—২০০০) ও "দি বৈদিক কালচার" (খৃষ্টপূর্ব ১৫০০—৮০০) সংক্রান্ত নিবন্ধ পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

নটরাজ বিষয়ে পত্রলেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দু পুরাণে নটরাজের উল্লেখ আছে। অতএব ঐ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। তবে ইলোরায় বৌদ্ধ চিত্রশিল্পীর দ্বারাই ১৬নং গুহার ছাদে আট হাত বিশিষ্ট নটরাজ মূর্তি আঁকা দেখিয়াছি। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, বৌদ্ধযুগেও শিল্পীদের কল্পনায় নটরাজ মূর্তির রূপ ছিল। ইতি

সত্যেন রায় চৌধুরী,
কলিকাতা—৩৫।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার ফুটবল মরসুম প্রায় শেষ হয়ে এল। আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর যবনিকা পড়বে। আই এফ এ শীল্ডের খেলাও শেষ মুখে এসে পড়েছে। তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। খাদ্য আন্দোলনের জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে কর্তৃপক্ষ বেশ অসুবিধায় পড়েছেন। কারণ পুলিসের সাহায্য ছাড়া তো কলকাতার বড় খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। অথচ অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য খেলার মাঠে পুলিসের সাহায্য পাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাই বলছিলাম ভালয় ভালয় এখন আই এফ এ শীল্ডের বাকী কটি খেলা শেষ হলেই বাঁচোয়া। না হলে 'অভিশপ্ত' আই এফ এ শীল্ডের অদৃষ্টে এবার কি আছে কে জানে!

এদিকে খাদ্য আন্দোলন ও রাজ্যের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে স্টেডিয়ামের কথাটা ধামাচাপা পড়ে গেছে। ফুটবল মরসুমের মাঝে এক সময় মনে হয়েছিল এডেনবরা কোর্সে এই বুঝি স্টেডিয়ামের ভিত্তি স্থাপন হয়। কলকাতার স্টেডিয়ামের যে নিতান্ত প্রয়োজন রাজ্য সরকার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ক্রীড়ামোদি পর্যন্ত সবাই একথা উপলব্ধি করছেন। সম্প্রতি আই এফ এ শীল্ডের কয়েকটি খেলায় অসম্ভব দর্শক সমাগম হওয়ায় স্টেডিয়ামের অভাবের কথা বারবার মনকে পীড়ন করেছে। সেদিন এরিয়ান-মহমেডান মাঠে মহমেডান স্পোর্টিং ও দেরাদুনের গুর্খা ব্রিগেড দলের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলার সময় ৫০।৬০ জন গাছে-চড়া দর্শক সমেত একটা বড় অশ্বত্থ গাছ মাটিতে পড়ে যাওয়ায় ১০।১২ জন দর্শক অল্পবিস্তর আঘাত পেয়েছেন। খুবই ভাগ্যের কথা মাঠের পূর্ব দিকে গ্যালারী সন্নিহিত গাছটি মাঠের মধ্যে না পড়ে বাইরে পড়েছে। ঐ প্রকাণ্ড গাছটি তার আশ্রিত ৫০।৬০ জন দর্শক সমেত মাঠের মধ্যে পড়লে সেখানে বসে যারা খেলা দেখছিলেন তাদের অনেকের জীবনের খেলা সাঙ্গ হয়ে যেত। যাই হক খেলার সময় দর্শকসমেত গাছ পড়ার এ ঘটনাও স্টেডিয়ামের অভাবের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য স্টেডিয়াম তৈরী হলে লোকে গাছে চড়ে খেলা দেখবে না, এমন কথা বলছি না। যদি গাছে চড়ে স্টেডিয়ামের মধ্যের খেলা দেখার সুযোগ থাকে তবে এক শ্রেণীর দর্শক তখনো গাছে চড়ে খেলা দেখবে। হয়তো গাছ থেকে পড়ে তাদের হাত পাও ভাঙবে। কিন্তু স্টেডিয়াম খাড়া হলে লোকে তার জন্য সরকারকে দায়ী করতে পারবে না।

আরও একটি কথা। আজ পুলিসের সাহায্য ছাড়া কোন বড় ম্যাচ হতে পারে না। কিন্তু স্টেডিয়ামের মধ্যে খেলা হলে সাধারণ দর্শক, সমর্থক, খেলোয়াড় ও রেফারীদের নিরাপত্তার অনেক ব্যবস্থাই করা যেতে পারে। সেদিক দিয়েও স্টেডিয়ামের আশু প্রয়োজন। স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে সরকারের একটা নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও আছে। এই কথাটা উপলব্ধি করে সরকার যত শীঘ্র স্টেডিয়াম রচনা করেন ততই মঙ্গল।

* * *

আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হবার সঙ্গে কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর যবনিকা পড়লেই না আমরা ফুটবলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি কোথায়? ভারতে এখন সারা বছরই ফুটবল খেলা লেগে আছে। এবং সমস্ত খেলার সঙ্গেই আছে কলকাতার ক্লাবগুলোর প্রগাঢ় যোগাযোগ। আই এফ এ শীল্ডের পর আরম্ভ হবে দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা। তারপর আছে বোম্বাইতে রোভার্স কাপের এবং দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপের দুই নামডাকের প্রতিযোগিতা। ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এখনো আরম্ভ হয়নি। তা ছাড়া আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতি-

কলেজ ছাত্রীদের আন্তঃ কলেজ সাঁতার প্রতিযোগিতায় রিলে রেসের বিজয়ী স্কটিশ চার্চ কলেজ দল। বাঁ দিক থেকে—তপতী দত্ত, মীরা দেবী, বীণা মহেন্দ্র ও কল্যাণী বসু। কল্যাণী বসু চারটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারিণী হয়েছেন
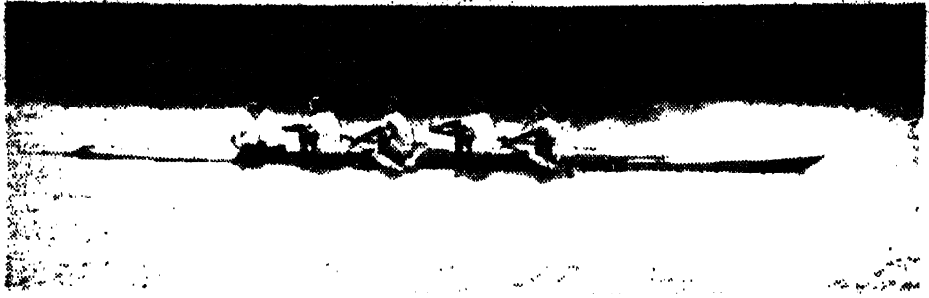
চাকুরিয়া লেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌ-চালকদের নৌ-চালনার দৃশ্য।

যোগিতা এখনো বাকী আছে। বাকী আছে এশিয়ান কাপের পশ্চিমাঞ্চলের খেলা। তা ছাড়া এখানে ওখানে ছোট বড় নানা প্রতিযোগিতা তো আছেই। আবার জাপান থেকেও একটি দল আসছে বিভিন্ন ইস্পাত নগরীতে কয়েকটি ফুটবল খেলার জন্য। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ প্রতিযোগিতাতেই কলকাতার বহু ক্লাবকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে। প্রতিনিধিমূলক খেলাতেও অংশ গ্রহণ করবেন কলকাতার নামকরা খেলোয়াড়রা।

এখন কথা হচ্ছে, এমেচার খেলোয়াড়দের পক্ষে সারাবছর ধরে এইভাবে ফুটবল খেলে বেড়ান কি সম্ভব? না এতে খেলার মান বাড়ে? খেলোয়াড়দের চাকরী দেবার জন্য সাধারণভাবে একটা দাবী উঠেছে। সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ অফিসের মালিকরা খেলোয়াড়দের চাকরী দিয়ে নানা সুযোগ সুবিধাও করে দিচ্ছেন। কিন্তু কোন অফিসের খেলোয়াড় কর্মী যদি কাজ না করে সারা বছরই এইভাবে খেলে বেড়ায় তাতে অফিস কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে খেলোয়াড়দের চাকরী দিতে পরাঙ্মুখ হতে পারেন। কলেজের ছাত্রদের পক্ষেও এইভাবে খেলে বেড়ান পড়াশুনার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তা হলে উপায়? এর একমাত্র উপায় ফুটবলকে এমেচার ও প্রোফেশনাল এই দুই পর্যায় ভাগ করা। খেলাকে যদি কেউ বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তবে তার পক্ষে সারা বছর খেলে বেড়ানর পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এমেচার বা শখের খেলোয়াড়ের পক্ষে সারা বছর খেলে বেড়ানর অনেক অসুবিধা আছে। এর ভবিষ্যৎও ভাল নয়। এতে এমেচার খেলোয়াড়দের চাকরী পাবার পথে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে।

ভারতের ফুটবল কর্তৃপক্ষ অনেকদিন থেকেই আমাদের দেশের ফুটবল খেলায় পেশাদার বৃত্তির প্রবর্তন করবেন বলে পরিকল্পনা করে আসছেন। কিন্তু কার্যকরী কোন পন্থাই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। বরং নতুন নতুন নানা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে ফুটবল মরসুমকে দীর্ঘ ও ভারী করে তুলছেন। ভারতের ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য এবং খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের জন্যই এ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। আশা করি, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ কথাটা ভেবে দেখবেন।

• • •

ভারত সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীমের আগামী ১০ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এসে পৌঁছবার কথা। ভারত সফর বলতে অস্ট্রেলিয়ান দলের মাত্র ৭টি খেলার কথাই বুঝতে হবে। পাঁচটি টেস্ট। আর বাকী দুটির একটি ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির একাদশের সঙ্গে, অপরটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের। এই ব্যবস্থার নাম যদি ভারত সফর হয় তবে তাকে 'সফর' কথাটির অপভ্রংশই বলবো। মাত্র ৭টি কেন্দ্র নিয়ে এই 'বিরাট দেশ পরিক্রমা' নয়। ১৯৫৬ সালে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফেরবার সময়ও অস্ট্রেলিয়া দল ভারতে মাত্র তিনটি টেস্ট খেলে গিয়েছিল। এবারও তারা ৭টি ম্যাচের বেশী খেলতে রাজী হয়নি। এইভাবে কোন দেশের সঙ্গে সফরের ব্যবস্থা করা হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। তবে সুখের বিষয় অস্ট্রেলিয়া দল ভারতে আসছে তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে। ইংলণ্ডের কাছে আমরা গো-হারা হেরেছি। আবার ইংলণ্ড গো হারা হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি সেই অস্ট্রেলিয়া আসছে ভারতে। ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দলগত শক্তির কোন তুলনাই চলে না। সুতরাং ফলাফল সম্পর্কে কারোই আগ্রহ থাকবার কথা নয়। আগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা বোলার ও ব্যাটসম্যানদের নৈপুণ্য পরখ করার। সেই আশাতেই ভারতের ক্রিকেটরসিকরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের যে পাঁচটি টেস্ট খেলার আয়োজন করা হয়েছে এবার তার শেষ খেলাটি হবে কলকাতায়। এতদিন কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে এবং বড়দিনের ছুটির সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারীর সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতার টেস্ট খেলা। কিন্তু এবার খেলা হচ্ছে জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে! আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ অস্ট্রেলিয়া যদি আগেই 'রাবার' পেয়ে যায় বা চারটি খেলাতেই বিজয়ী হয় তবে কলকাতার টেস্ট খেলায় আর আকর্ষণ থাকবে না। তবে আগেই বলেছি ফলাফলের জন্য নয়, অস্ট্রেলিয়া দলের খেলা দেখার জন্যই এ সফরের যা কিছু আকর্ষণ। তাছাড়া কলকাতা হচ্ছে বিচিত্র শহর। ভারতীয় দলের সুনাম যতই নষ্ট হক আর তারা খেলতে পারুক না পারুক কলকাতার টেস্ট খেলায় দর্শকের অভাব হবে না।

• • •

হায়দরাবাদে একটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা করার জন্য হায়দরাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশন ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কাছে এক দাবী পেশ করেছিলেন। কিন্তু সে দাবী গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ ক্রিকেট খেলার জন্য ভারতকে পাঁচটি 'জোন' বা অঞ্চলে ভাগ করেছেন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ আর মধ্য অঞ্চল। এই পাঁচটি অঞ্চলে পাঁচটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থার কথা স্বীকৃত হয়ে আসছে। এবং পূর্ব অঞ্চলের খেলার ব্যবস্থা করছেন বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন। পশ্চিম অঞ্চলের খেলার আয়োজন করছেন বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন। উত্তর অঞ্চলের ব্যবস্থা করছেন উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন। দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যবস্থা মাদ্রাজ ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং মধ্য অঞ্চলের ব্যবস্থা দিল্লি ক্রিকেট এসোসিয়েশন করে আসছেন। হায়দরাবাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফরের সময় উত্তর প্রদেশ ও হায়দরাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সঙ্গে এমন এক চুক্তি হয়েছিল যার ফলে দুই রাজ্য পর্যায়ক্রমে টেস্ট খেলায় আয়োজনের অধিকারী। কিন্তু ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড বলছেন এই চুক্তি সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। সুতরাং তাদের দাবীও গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু কথা হচ্ছে চুক্তি সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলেও নতুন চুক্তি হতে পারে না কি? টেস্ট কেন্দ্র হিসাবে লক্ষ্ণৌ বা

কানপুরের চেয়ে হায়দরাবাদের দাবী কোন অংশে গৌণ নয়। হায়দরাবাদে ক্রিকেটও ফুটবলের মত জনপ্রিয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে বোর্ডের কিছু করণীয় ছিল বলেই মনে হয়। একই জোন বা অঞ্চলের দুটি রাজ্য এসোসিয়েশনের মধ্যে টেস্ট খেলার বিধিব্যবস্থা নিয়ে রেষারেষি বাড়লে আর কন্ট্রোল বোর্ড নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন, এটা সমর্থনীয় নয়। আমরা আশা করি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড হায়দরাবাদ ও উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের মধ্যে একটা চুক্তির ব্যবস্থা করে গোলযোগের অবসান ঘটাবেন।

নীচে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের খেলার তালিকা দেওয়া হল:—

প্রথম টেস্ট—দিল্লী: ১২ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর।

দ্বিতীয় টেস্ট—কানপুর অথবা লক্ষ্ণৌ: ১৯শে, ২০শে, ২১শে, ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর।

বোর্ড সভাপতির একাদশের সঙ্গে খেলা—আমেদাবাদ: ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর।

তৃতীয় টেস্ট—বোম্বাই: ১লা, ২রা, ৩রা, ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের সঙ্গে খেলা—ব্যাঙ্গালোর: ৯ই, ১০ই ও ১১ই জানুয়ারী।

চতুর্থ টেস্ট—মাদ্রাজ: ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী।

পঞ্চম টেস্ট—কলকাতা: ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে, ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী।

* * *

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোট ক্লাবের বিশ্বখ্যাত নৌ-চালকরা অল্প কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ঢাকুরিয়া লেকে এরা তিনদিন ধরে নৌ-চালনার কলা-কৌশল দেখিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। অক্সফোর্ডের নৌ-চালকরা এর আগে কোনবার কলকাতায় আসেননি। সুতরাং এদের নৌ-চালনা দেখবার জন্য বাইচ ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। ঢাকুরিয়া লেকে এরা তিনদিন ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব, বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাব এবং লেক ক্লাবের নৌ-চালকদের সঙ্গে। স্কালিং, পেয়ার্স, ফোরস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদিন পাঁচটি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতার নৌ-চালকরা একটি বিষয়েও জিততে পারেননি। অক্সফোর্ডের নৌ-চালকরা ১৫টি রেসেই বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে গেছেন।

অক্সফোর্ডের বিশ্বখ্যাত নৌ-চালকদের কাছে এখানকার সবাই পরাজিত হবেন এটা আগে [illegible] জানা ছিল। কারণ অক্সফোর্ড দলের ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জনই [illegible] সেই সব খ্যাতনামা নৌ-চালক যাঁরা এবারকার কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের ঐতিহাসিক নৌ প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছিলেন। এদের দীর্ঘ-কান্তি, সুঠাম গঠন, চওড়া বুক, সর্বোপরি সারা দেহে শক্তির উজ্জ্বলতা সত্যই দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। আর নৌ-চালনার পদ্ধতি কত মনোরম। একই সঙ্গে জলের বুকে দাঁড় পড়ছে ছপাং ছপাং। তাদের সুষম পতনোত্থানের সঙ্গে সূচীমুখ কাঠের স্কিপ এগিয়ে চলেছে তীরবেগে। দাঁড় পড়া আর নৌকো চলার ছন্দ নয়, সুরের ঐক্যতানের মতই সু-সমঞ্জস।

বিলেতী কায়দায় বড় বড় জলাশয়সম্পন্ন শহরে কিছু কিছু বাইচ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হলেও তথাকথিত নৌ-বাইচ আমাদের দেশে এখনো জনপ্রিয় হয়নি। ইউনিভার্সিটির কিছু কিছু ছাত্র এবং কতিপয় ধনীর দুলালদের মধ্যেই আমাদের নৌ বাইচ সীমাবদ্ধ আছে। অবশ্য বাগী উত্তর-পাড়ায় নৌ-বাহন সমিতি নামে একটি সমিতিরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গংগার বুকে তারা বার্ষিক নৌ-প্রতিযোগিতার আয়োজনও করে আসছেন। নদী-মাতৃক এই বাংলা দেশে একদিন গ্রাম্য প্রথায় নৌ-চালনার যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। বাংলার খাল-বিল-নদীতে পূজা পার্বণ বা ঐ ধরনের অনুষ্ঠানের সময় গলায় রুমাল বেঁধে গ্রাম্য নৌ-চালকরা বাইচ খেলতেন। লম্বা লম্বা কাঠের পানসী নৌকো ছিল। তার গলুইতে কারুকার্য করা পেতলের চোখ বসান। বাইচের আগে নৌ-চালকরা নৌকো পুজো করে তার গলায় মালা পরিয়ে, সিঁদুর মাখিয়ে তারপর 'হে'-ই মারো মার টান হে'-ইও' বলে বাইচ খেলতেন। তার মধ্যে কি উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, কি অনাবিল আনন্দ ছিল। বিলেতী কেতায় নৌ-বাইচ দেখে আজ সেই কথাই মনে পড়ছে।

এক সাহিত্যিক ক্রীড়াসমালোচক অক্সফোর্ড দলের নৌ-বাইচের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"খেলা তো খেলা বাইচ খেলা। এমন নিখুঁত ছন্দজ্ঞান, এমন একতাবোধ আর কোন খেলায় দরকার হয়? 'এক প্রাণ একতা' বাইচ খেলায় যথেষ্ট সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এ খেলায় প্রতিঘাত নেই। আছে শুধু অতিক্রম। এগিয়ে যেতে পারলেই হয়। দৌড় প্রতিযোগিতাতেও এগিয়ে গিয়ে জিততে হয়। কিন্তু সে হল একক দৌড়। আর বাইচ হচ্ছে একত্রে দৌড়, অবশ্য জলের 'পরে নৌকোয় চড়ে। বাইচ খেলা সেই ধরনের খেলা যাতে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য, যৌবনের উচ্ছ্বাস প্রাণভরে উপভোগ করা যায়।"

কথাটা খুবই সত্য। বগাীর নৌ-বাহন সমিতি তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে আবার কি বাঙলার গ্রামে গ্রামে নৌবাইচের প্রবর্তন করতে পারেন না।

দেশী সংবাদ

১৪ই সেপ্টেম্বর—প্রতিদিন ভারতীয় রেলওয়ের ট্রেনগুলি ৫ লক্ষ ৬২ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। অর্থাৎ দিনে সেগুলি ২৫ বার বিষুব রেখার নিকট পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রতিদিন চলাচলকারী সাড়ে সাত হাজার ট্রেনের মধ্যে সাড়ে চার হাজার যাত্রিবাহী এবং তিন হাজার মালবাহী। ভারতের লোক-সংখ্যার একশতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ লোক প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করে।

কলিকাতার শিল্পপতি শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা আলিপুরের স্পেশাল ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন-জজ শ্রী বি বি মিশ্র কর্তৃক বিভিন্ন অভিযোগে ৬ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ২ লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল থিমায়া আসামের রাজভবনে অদ্য অসামরিক ও সামরিক অফিসারদের সহিত ৮০০ মাইলের ম্যাকম্যাহন লাইন রক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা সমাপ্ত করিয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে যে সব শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিতে পুনর্বাসন বিভাগের নিকট হইতে সুবিধাজনক সর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ লইয়াছিল; কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে নাই, তাহাদের সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মূল্য-বৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি পরিচালিত আন্দোলনকালে পশ্চিমবঙ্গে পুলিসের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে শাসন বিভাগীয় তদন্ত আগামী সপ্তাহে শুরু হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর—তাপ্তী নদীতে প্রবল বন্যার ফলে সুরাট শহরের তিন-চতুর্থাংশ দুই হইতে পনর ফুট পর্যন্ত জলনিমজ্জিত হইয়াছে। দশ সহস্রাধিক লোক নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া আটক হইয়া রহিয়াছে। উদ্ধার ও ত্রাণকার্যের জন্য কর্তৃপক্ষ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় ২৫ হাজার টন ধান্য (আউশ ও আমন) নষ্ট হইবে বলিয়া রাজ্য সরকার আশংকা করিতেছেন। প্রায় দেড় লক্ষ একর ধানজমি জলে ডুবিয়া উপরোক্ত পরিমাণ শস্যহানি ঘটাইয়াছে বলিয়া রাজ্য সরকারের প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ।

আজ বিশ্বকর্মা পূজার দিনে ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৪০ জন ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া বা অন্যভাবে আহত হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের জলপ্লাবিত অঞ্চলসমূহের সমস্যাগুলি বিচার বিবেচনা করিয়া ঐ সমস্যা সমাধানের উপায়াদি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ক্যাবিনেট সাব-কমিটি গঠন করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঐ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলিয়া প্রকাশ।

খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়া বৃহস্পতিবার পর্যন্ত গত দুই মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট ১০৪৪১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

১৯শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী পক্ষের অধিকাংশ দল হইতে রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব অদ্য বিধান সভার অফিসে দাখিল করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতীয় বাহিনী এবং আসাম রাইফেলস উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির লংজু বাহির দুই মাইলের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে। লংজু এখনও চীনাদের অধিকারে রহিয়াছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—আজ রাজকোটে এক মেলায় হুড়োহুড়ির ফলে ২১ জন লোক পিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছে এবং অপর ২৯ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

তাপ্তী নদীর বন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া আসন্ন-প্রসবা এক নারী গত বৃহস্পতিবার এক বৃক্ষ-শাখায় আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে সে একটি সন্তান প্রসব করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিষদীয় রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, বর্তমান বৎসরের শেষভাগ নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট হইতে খাদ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—বুদাপেস্ট রেডিও আজ ঘোষণা করিয়াছে যে, বুদাপেস্ট মান-মন্দির রাশিয়ান রকেটের চন্দ্র অবতরণের সময় চন্দ্রের উপরে একটি কৃষ্ণবৃত্ত লক্ষ্য করেন। রকেট চন্দ্রের গাত্রে আঘাত করিলে যে ধূলি উত্থিত হয়, তাহাতেই সম্ভবত ঐ বৃত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ সকালে ১১-৩০ মিনিটের সময় কাবুলে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আফগান সরকারের আমন্ত্রণে চারিদিনের জন্য তিনি এখানে আসিয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ আজ ওয়াশিংটনের নিকটস্থ এণ্ড্রুজ বিমান ঘাটিতে ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ৫১ মিনিটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া বলেন, "সদিচ্ছা এবং খোলা মন লইয়া" তিনি ওয়াশিংটনে আসিয়াছেন।

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি কর্তৃক লাসা হইতে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, তিব্বতের 'কাসাগ'-এর (শাসন পরিষদ) প্রাক্তন সদস্য শ্রীরোম্পা টুটান কুঞ্চিং বলিয়াছেন যে, তিব্বতের স্থানীয় সরকার কখনও ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী 'বেআইনী' ম্যাকম্যাহন লাইন স্বীকার করেন নাই এবং সর্বদাই উহার দক্ষিণে প্রশাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ গত রাত্রে বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। এই তাঁহাদের প্রথম আলোচনা। আলোচনার ফলে তিনি "উৎসাহিত" বোধ করিতেছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের স্টিয়ারিং কমিটি আজ পুনরায় ৮২ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদকে প্রজাতন্ত্রী চীনকে আসন দানের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিতে নারাজ হওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ গত রাত্রে ওয়াশিংটনে এক সরকারী ভোজসভায় বলেন, [illegible] শুধু [illegible] নাই, [illegible] আরম্ভ করিয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে কোন সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রধানের পদার্পণ এই প্রথম।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সরকারীভাবে চারিদিন ইরান পরিদর্শনের জন্য আজ অপরাহ্নে বিমানে কাবুল হইতে তেহরান আসিয়াছেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ চারি বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত বাহিনীসমূহের বিলোপ সাধন সম্বন্ধে গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ ও প্রতিনিধিগণ আজ সারাদিন তাঁহাদের সরকারসমূহের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

গতকল্য লাওসের প্রধান দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা সামনেউয়া প্রদেশের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের উপর আঘাত হানিতেছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—চীনারা গতকাল ভোর হওয়ার আগেই কুয়েময় দ্বীপের উপর গোলা-বর্ষণ আরম্ভ করে এবং ক্ষুদ্র কুয়েময় দ্বীপের উপর ৫২টি গোলা বর্ষিত হয় বলিয়া জাতীয়তা-বাদী চীনাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হয়।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার · সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—৫২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

প্রিয়জনের প্রীত্যর্থে
কেশরঞ্জন
অসাধারণ কেশতৈল
কবিরাজ এন,এন,সেন
এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ।
কলিকাতা-১
N. N. SEN & CO. LTD
CALCUTTA

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ২ আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 19th September, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৭

সূচীপত্র

স্মরণীয়
৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মহালয়ার পূর্বেই বেরুবে।
দাম: ৩

জলসা ॥ ৫বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড। কলিকাতা-১৪ ॥ ফোন: ২৬-৩৬৮৫

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিত্রপ্রদর্শনী—	... ...	... ৫৬৯
পৌষমেবাসে—	... ...	... ৫৭০
পুস্তক পরিচয়—	... ..	... ৫৭১
রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর	... ..	... ৫৭৫
খেলার মাঠে—একলব্য	... ...	... ৫৮১
সাপ্তাহিক সংবাদ—	... ...	... ৫৮৪

"দু' নম্বর লুনিক" নামধারী সোভিয়েট রকেট চাঁদে গিয়ে লেগেছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির এই দৌড় দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কবোধ হবে। আতঙ্কের কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দৌড় যত বেড়ে যাচ্ছে ধর্মবুদ্ধি থেকে তার দূরত্বও তত বেড়ে যাচ্ছে। চাঁদে রকেট পাঠানোর শক্তি মারণ-বিদ্যায় আরো উন্নতিলাভের দ্যোতক। এই শক্তি যদি এক বা একাধিক জাতির হাতে আলাদা আলাদাভাবে না থাকত, এই শক্তিকে যদি জাতির সঙ্গে জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সকল জাতির উপরে একটি সর্বজনীন সংস্থার অধিকারভুক্ত করা যেত তাহলে আতঙ্কের প্রশমন হত। কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়? এই শক্তিচর্চা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরপেক্ষ কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না।

রকেট বিদ্যায় পারদর্শিতা [illegible] দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সূচক। এই বিদ্যায় রাশিয়া আমেরিকাকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার এই প্রাধান্য চিরস্থায়ী হবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। এক সময়ে আণবিক বোমা আমেরিকার একচেটিয়া ছিল কিন্তু অল্প সময়ের জন্য ছিল। রকেট বিদ্যায় রাশিয়া যেমন এগিয়ে গিয়েছে তেমনি [illegible] বিজ্ঞান এবং প্রয়োগ কৌশলের অন্য কোনো ক্ষেত্রে হয়ত আমেরিকা এখনো রাশিয়ার চেয়ে এগিয়ে আছে এবং উভয়েই যে যে বিষয়ে খাটো আছে সেই সেই বিষয়ে অপরের সমান হতে অথবা অপরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই দৌড়ে যে যখন আপেক্ষিক প্রাধান্যলাভ করছে তেমনি সেটার জানান দেবার চেষ্টাও আছে, কারণ কোনো পক্ষই অন্যপক্ষের প্রাধান্যের চিন্তা মনে নিয়ে রাজনীতির চাল চালাতে পারে না। মিঃ ক্রুশ্চেভের আমেরিকা গমনের ঠিক প্রাক্কালে যে দু' নম্বর লুনিক ছাড়া হল এটাকেও আকস্মিক বলা যায় না। মিঃ ক্রুশ্চেভের মার্কিন সফরের জন্যই ঠিক এই সময়ে এই ব্যাপারটি ঘটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে অনুমান হয়। কিন্তু আপস নিষ্পত্তির মনোভাব সৃষ্টি করা, রাশিয়ার শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস জন্মানো, দুই ব্লকের মধ্যে রেষারেষির ভাব কমানোই যদি মিঃ ক্রুশ্চেভের আমেরিকা গমনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঠিক এই সময়ে রাশিয়ার রকেট-বিদ্যার এই অসাধারণ কৃতিত্বের প্রমাণ জাহির করা কি সেই উদ্দেশ্যের পরিপোষক হবে? অথচ মিঃ ক্রুশ্চেভের প্রচারিত উদ্দেশ্যকে ভণ্ডামি বলে অশ্রদ্ধাও করা যায় না। কারণ এই সময়ে দুই ব্লকের মধ্যে রেষারেষি বাড়ে এমন ঘটনা কিছু ঘটে, এটা সোভিয়েটের অভিপ্রেত নয় একম অনুমান করা অসঙ্গত

নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অথবা ভারতের সঙ্গে চীন সরকার সংঘর্ষ বাড়িয়ে তোলেন এটা যে সোভিয়েট সরকার চান না তা বুঝা যাচ্ছে। এরূপ সংঘর্ষ মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকা গমনের সাফল্যের প্রতিবন্ধক হবে।

অথচ সোভিয়েট সরকার নিজের ব্যবহারে সংযম দেখাতে পারছেন না। এই সময়ে লূনিকের সাফল্য প্রদর্শন মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকা সফরের সফলতার পক্ষে সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হবে বলেই আশংকা হয়। লূনিকের চন্দ্রস্পর্শের সংবাদে মার্কিন জনমত সন্ত্রস্ত হবে কিন্তু সেই সন্ত্রাসের ফলে আমেরিকায় আপস-নিষ্পত্তির মনোভাব বর্ধিত হবে এরূপ আশা করা যায় না। বরঞ্চ ভীত মার্কিন জনমত বর্কেটবিদ্যায় আমেরিকার ন্যূনতা দূর করার জন্য মার্কিন সরকারের উপর আরো বেশি করে চাপ দেবে। ফলে ঘটনার গতি নিরস্ত্রীকরণের দিকে না হয়ে অস্ত্রসজ্জার পাল্লাপাল্লি উগ্রতর হয়ে উঠার সম্ভাবনা। দুই পক্ষ যেখানে মোটামুটিভাবে সমান বলশালী সেখানে কোনো এক বিষয়ে একপক্ষের বলবৃদ্ধির প্রমাণ অন্য পক্ষের ভয় উৎপাদন করলেও সেই ভয় থেকে আপস-নিষ্পত্তির মনোভাব জাগে না। যে পিছিয়ে আছে তার এগিয়ে যাবার জেদ বাড়ে মাত্র। আমেরিকার অস্ত্রসজ্জার কর্তৃত্ব যাদের হাতে, দু' নম্বর লূনিকের খোঁচা খেয়ে তারা নরম না হয়ে আরো গরম হয়ে উঠবেন।

সম্প্রতি একজন ইংরেজ ইতিহাস পণ্ডিত লিখেছেন যে, ইতিমধ্যে আশ্চর্যজনক কিছু না ঘটলে পাঁচ ছ' বছর পরে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অনেকের ধারণা যে, দুই পক্ষ যদি সমান বলশালী হয় তবে [illegible]

[illegible]

অনেকে আশা করেন যে, আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা [illegible] এরূপ আশার [illegible] না। যুদ্ধ যখন লাগে তখন কী থেকে লাগে তা কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া, আণবিক যুদ্ধের [illegible] সম্বন্ধে সামরিক কর্তাদের [illegible] বলা যায় না। আণবিক অস্ত্র নির্মাণশালার

মিসরে বর্তমানে মেয়েদের চাকরিস্থলগুলো পতিলাভ করার এক একটা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মিশরীয় নারীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যে তাদের কর্মে নিয়োগ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট

পারস্যের শোগা জার্নাবলে খনন করে দু' হাজার বৎসরের পুরাতন স্ত্রীলোকের মস্তকাকৃতি পুষ্পাধার

নাসেরের আবেদন শুনে কায়রোর এক পরিবহণ প্রতিষ্ঠান পঁচিশজনকে কণ্ডাক্টরের কাজ দেয়। ছ' মাসের মধ্যে তাদের বেশীর ভাগই হয় বাসগুলির ড্রাইভার নয়তো যাত্রীদের কাউকে বিয়ে করে বসে এবং এখন মাত্র তিনজন কাজে নিযুক্ত রয়েছে। আফাফ আবু আলি নামক আলেকজান্দ্রিয়ার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের গ্রাজুয়েট দুহিতা রোজগারের উদ্দেশ্যে যত না হোক, মেয়েরা কাজ করতে বের হোক এই নীতিটির প্রতিষ্ঠাকল্পে কায়রোর নাইল হিল্টন হোটেলে পরিচারিকার কাজ গ্রহণ করে। দীর্ঘস্থায়ী কাজে মিসরীয় মেয়েদের কাজ গ্রহণ করা কমই ছিল এতাবৎকাল। তাছাড়া আফাফ এটাও দেখে যে, কোন সরকারী বিভাগে কাজ নিলে যে বেতন পাওয়া যায় হোটেলে পরিচারিকার কাজে পাওয়া যায় তার তিনগুণ। উপরন্তু অভাবনীয়ভাবে পরিণয়ের যোগাযোগ ঘটে যায়। আফাফের পরিবেশনাধীন একটি টেবিলে রোজ এসে বসে এমন এক ব্যক্তি একদিন আফাফের কাছে জানতে চায়, সে কুয়েতে গিয়ে কাজ করতে রাজী কিনা। প্রথমে আফাফ কথাটির অর্থ ঠিক ধরতে পারেনি, কিন্তু পরে বুঝতে পারে, লোকটি পরোক্ষভাবে জানতে চায় যে, সে তার স্ত্রীরূপে যেতে রাজী কিনা। প্রস্তাবক ডাঃ ওয়াহিদ ওমর খালিদ এর পর আফাফের বাপ-মার সঙ্গে দেখা করে এবং সম্প্রতি তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

নাইল হিল্টন হোটেলটি উদ্বোধিত হবার পর ছ' মাসের মধ্যে ওখানকার বত্রিশজন পরিচারিকার ঐভাবে পতি জুটে গিয়েছে। হিল্টন হোটেল কাজে নিয়োগকারী হিসেবে এখন এত জনপ্রিয় যে, ওখানে কাজ পাবার জন্য চাল্লিশ হাজার অবেদনের মধ্যে বেশীসংখ্যক হচ্ছে মেয়েদের আবেদন।

*

ব্রাজিলের রাজধানী রিও দ্য জেনেইরোতে হাম্বার্টো মেনেসেস নামক এক ব্যক্তি এক সাপ দ্বারা দংশিত হয়ে সেই সাপটিকে কামড়ে দেয়। সাপটি মারা যায় কিন্তু হাম্বার্টো বেঁচে ওঠে।

*

প্রাণের মায়ায় মানুষ যে কিরকম বেপরোয়া সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে তার একটি উদাহরণ সম্প্রতি পাওয়া গেল জাপান থেকে। ঘটনাটি আরো কৌতূহলোদ্দীপক কারণ ঘটনার নায়ক চৌদ্দ বছর থেকে ন বছর বয়স পর্যন্ত চারটি ছেলে। চার ভাই। [illegible] মাসামি, [illegible], [illegible] ও [illegible]। দিন কয়েক আগে [illegible] সমুদ্রের ধারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। বড় ভাই মাসামি একটা পাথরের [illegible] জলের [illegible] একটি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তার ছোট তিন ভাই তাকে [illegible] থাকে। [illegible]

৩

তারপর একটা চিঠি এল।

পড়ল: 'আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? তারপর—? ইতি কাকলী'

তারপর? তারপর?

লাফিয়ে উঠল সুকান্ত। গাছপালা ঘাস-ফুল পর-ঘর লোকজন সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে জিগগেস করতে লাগল —তারপর? একটি অনন্তকালের প্রশ্ন জুড়ে প্রাণে মনে সর্বত্র সর্বদা দুলতে লাগল চোখের উপর: তারপর? তারপর?

এক কবি লিখেছিল কে যেন রোদ হয়ে গিয়েছে। তখন কথাটা বোঝেনি সুকান্ত। আজ মনে হল সে যেন সত্যি রোদ হয়ে গিয়েছে আলো হয়ে গিয়েছে, তারপর হয়ে গিয়েছে।

ঈশ্বরের স্রষ্টা কে? ঈশ্বর। তার স্রষ্টা কে? ঈশ্বর। যদি শেষ স্রষ্টা কল্পনা করতে পারো সেই ঈশ্বর।

তার পরের পরে কী? তার পরে? তার পরে? তার পরের শেষ সংহর্তা তারপর। ঈশ্বরের জন্ম নেই। তারপরের মৃত্যু নেই।

এখন যাই কোথায়?

একবার দীপঙ্করের কাছে যাই।

পকেট ফাঁকা মাঠ, হেঁটেই যাই। হাঁটতেই ভালো লাগছে। দিনরাত্র কত নালিশ করেছে ঘরে-পরে, ভালো লাগে না। এই হেয়ালি কান্নাই তো জীবনের নিশ্বাসবায়ু হয়ে আছে, কিন্তু, আশ্চর্য, এখন যেন অভাব বলে কিছু নেই, অভিযোগও দেশান্তরী। এই রোদ এই পথ এই চলবার ইচ্ছে, চলতে পারার শক্তি এই অনেকানেক। দীপঙ্করও তাই বলে। বলে, চাকরি-বাকরি নেই, ধারে-ভারে দুঃখে-কষ্টে আছি, তবু এত সত্ত্বেও নিজেকে [illegible] বলে ভাবতে লজ্জা করে। একেক সময় মনে হয়, আমি তো রাজা। কখন জানিস?

'যখন কবিতা লিখি।'

'সত্যি?'

'একটা গোটা রাত কেটে যায় কখনো। একটা কবিতাকে মেলাতে-চালাতে সাজাতে-গোছাতে, ভাঙতে-চুরতে। সে যে কী সুখ কাকে বোঝাই। জানি, বহু লোকের এ আনন্দে অধিকার নেই। বহু লোক কবিতা পড়ে একটুও রোমাঞ্চিত হতে জানে না, এক আকাশ দেখে না এক নদী। মানুষ কোনোটাই অর্থ জানে না, তাদের কাছে। জানি, ওদের চেয়ে আমার পাওয়া কি ভারী নয় ওদের? আমার এই বোঝবার মত মন বোঝবার মত মন এ কি আমার একটা সম্পদ নয়? না-এর মধ্যেও কি হ্যাঁ নেই?'

'সাধে কি আর তোকে কবি বলি?'

'কিন্তু যখন চাকরি পাব, প্রাচুর্যের ঘরে আসব, তখন কে জানে এই মন থাকবে কিনা, এতখানি থাকবে কিনা। তখন কে জানে, নরুন পাব নাক খোয়াব। কত লোক জানি আরাম পেয়ে অভিরামকে হারিয়েছে। স্থূলে পেয়ে সূক্ষ্মকে। স্ত্রী পেয়ে প্রেয়সীকে।'

'তবু দরকার তো উদর আর স্ত্রী আর টাকা—'

'একশোবার দরকার। শুধু দরকার নয় ফুল আর তারা, প্রেম আর শ্রী, ধর্ম আর কবিতা—'

'আমরা তোমাকে এমন স্টেট দেব যেখানে তুমি আরামে থাকবে আর কবিতা লিখবে।'

'কে জানে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলে ছন্দ বাজবে কিনা। যন্ত্রণা না থাকলে হবে কিনা সৃষ্টি। আর যদি সংগ্রামই না থাকে থাকবে কিনা ভালোবাসা।'

'কী বলছ তুমি? সংগ্রাম তো ঘৃণায়, আক্রোশে।'

'না, যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ঘৃণা নয় ক্রোধ নয়; যাদের জন্যে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কাজ করছে না বলেই কিছু হচ্ছে না।'

তাই ভালোবাসি বাংলা, জীবনকে ভালোবাসি। কোনোকিছু কেটে-ছেঁটে নয়, বাদ-সাদ দিয়ে নয়, না মাথার দিকে, না পায়ের দিকে। বিরাটের বার্তাবহ মানুষ, তার পা পাতালে মাথা আকাশে।

আজ যদি এসব কথা বলত দীপঙ্কর, তবে সুকান্ত বলতে, 'তারপর?'

তাকে সহজ করে দেবে।

'দীপঙ্কর কোথায়?' ঘর খালি দেখে থমকে দাঁড়াল সুকান্ত।

'অফিসে। চাকরি পেয়েছে যে।' মেসের বাসিন্দের একজন বললে।

'চাকরি পেয়েছে?' উৎফুল্ল হল সুকান্ত: 'কোথায়?'

'ধীরেন এণ্ড সনসে।'

'ও, আমাদের বরেনদের ফার্মে!' এ যেন আরো খুশির খবর।

কিন্তু—তারপর?

বুকপকেট থেকে চিঠিটা আবার বার করল সুকান্ত। একটা একসারসাইজ খাতার মাঝখান থেকে ডবল পৃষ্ঠার আস্ত পাতা ছিঁড়ে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে দ্বিতীয়টা সাদা রেখেছে। তবে, তারপরে কি শূন্যতা, শুভ্রতা, নিশ্চিহ্নতা?

তবুও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। তারপর?

(ক্রমশ)

চমৎকার!

ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিলে হাসি আর মুখে ধরে না! বাচ্চাদের জন্যে অদ্ভুত ভালো এই ব্রিটানিয়া বিস্কুট—ওদের দৈনন্দিন খাবারে প্রায়ই যেসব জিনিসের অভাব থেকে যায় সেই স্বাস্থ্য ও শক্তিপ্রদ পুষ্টি ও ভিটামিনে ভরপুর। আপনার ছেলেমেয়েদের ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিন—এই বিস্কুট খুব সহজে হজম হয়!

বড়দের মধ্যে যাঁরা কেবল ভালো জিনিসই চান তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই নিয়ে থাকেন, কেননা স্বাদে ও গন্ধে ব্রিটানিয়ার তুলনা নেই।

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

BC 3024

সারাদিন ভোরের মত স্নিগ্ধ ও সজীব
রাখে—
পণ্ড্‌স
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
সারাদিন স্নিগ্ধ ও সতেজ থাকতে হলে
স্নানের পর পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডার
ব্যবহার করুন।
পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডার ভারি
কোমল, মিষ্টি গন্ধে ভরপুর ও ঘাম
শুষে নেয়—এতে দিনভোর ঝরঝরে ও সতেজ
মনে হবে!
চিজব্রো-পণ্ড্‌স ইনক (সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

মনীষী স্যামুয়েল জনসন

সুরঞ্জন

এ বছর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর মনীষী ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন বিশেষভাবে করা হয়েছে। এই ব্যবসায়ী পৃথিবীতে উৎসাহী পাঠক যেন আবার নতুন করে জনসনের সমগ্রন্থে এক অলৌকিক প্রেরণা পায়। শুধু বিদগ্ধ গ্রন্থকার হিসেবে নয়, বাকশক্তিতে নিপুণ আর জীবন-সংগ্রামে অপরাজেয় এই চিন্তাশীল দার্শনিকের জনপ্রিয়তা তাঁর কালের মতোই আজও অসংখ্য মানুষের মনে অটুট হয়ে আছে।

বার্মিংহামের কাছাকাছি ছোট একটি শহরের নাম লিচফিল্ড। তিন চূড়ো প্রাচীন গির্জের সামনে মার্কেট স্কোয়ারের কাছে সেই বাড়িটি আজও ঠিক তেমনি আছে। আজ থেকে আড়াই-শো বছর আগে এই বাড়ির নিচের তলায় ছিল মাইকেল জনসনের বই-এর দোকান। তার ওপরের ঘরে ১৭০৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর স্যামুয়েলের আবির্ভাব। তখন রাণী অ্যানের রাজত্বকাল।

[illegible] একটি [illegible] জনসনের [illegible] বাঁধা ছিল। এই শিশু চোখ মেলেই দেখে বাড়িতে নানা রকমের বই। অসংখ্য। এক একটি এক এক রকম। [illegible] রঙ [illegible]। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশু বুঝতে পারে যে, বইগুলির আসা-যাওয়ার ওপরেই তাদের পরিবারের সাধ-স্বাচ্ছন্দ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে।

কিন্তু তখন জনসনের পুস্তক-প্রীতির মূলে জীবিকা অর্জনের কোন আগ্রহ ছিল না। কাছাকাছি ছোট শহর উটোক্সিটারে মাইকেল তাঁর দোকানের একটা শাখা খুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল স্যামুয়েল সেই নতুন শাখার সমস্ত ভার নিয়ে সেখানে গিয়ে বসবে।

কিন্তু প্রস্তাব শুনে মাথা বাঁকিয়ে প্রবল আপত্তি জানায় কিশোর জনসন। এ কাজের ভার সে কিছুতেই নেবে না। সে ইস্কুলে যাবে। যত বই আছে এ বাড়িতে—সব-গুলো পড়ে অর্থ বুঝবে। সেই অল্প-বয়সেই কিশোর মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সংকেত স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করেছিল তাঁর আকর্ষণ বই-এর দোকানের ওপর নয়—শুধু বইগুলির ওপর।

কিন্তু এ ঘটনার আর একটু আছে। সেখানে দোকানের শাখা খোলবার কথা ছিল, সেই উটোক্সিটারে প্রায় পঞ্চাশ

ডাঃ স্যামুয়েল জনসন

বছর পর হঠাৎ জনসন একদিন এসে উপস্থিত হলেন। [illegible]

পিতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি হিসেবে উটোক্সিটার বাজারে খালি মাথায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে স্বনামখ্যাত ডাঃ স্যামুয়েল জনসন নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

বাড়িতে বসেই জনসন দেখতে পেতেন গির্জের তিনটি চূড়া। তার আশেপাশে তাজা সবুজ ঘাস। শীতের আগে আগে কোথা থেকে একটা ধোঁয়াটে রঙ এসে মেশে সবুজের সঙ্গে। নির্জন শহর। মানুষের আনাগোনা এত কম যে, কান দুটো হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। স্কাইলার্কের ডানা ঝাপটানি ওক আর ইউক্যালিপটাসের সারি পেরিয়ে কবি কিশোরকে টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে। গির্জের মিষ্টি ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং। লিচফিল্ডের তামাটে মাটি। ঘোলাটে আকাশ। কোথায় শহর? কোথায় [illegible] বই-এর দোকানে অসংখ্য বই নাড়াচাড়া করতে করতে একটি কিশোর মন বিভোর হয়ে যায়।

লিচফিল্ডে জনসনের স্মৃতি-সংরক্ষিত ঘরে প্রবেশ করে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। একদিকে জনসনের সমসাময়িক লেখকদের অনেক দুর্লভ বই। তিনি যে টেবিলে বসে বিখ্যাত "রেম্বলার" গ্রন্থ লিখেছেন সেই টেবিল। অন্যদিকে তাঁর শেষ অসুখের সময় ব্যবহার করা চেয়ার। [illegible] কৌটো। তামাকের কাঠি।

দেখতে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে হয়। হাতের সিগ্রেট ধরা-ই থাকে [illegible] থেকে। পা চলে না—পাছে জোরে জুতোর আওয়াজ হয়। যেন

লিখতে লিখতে লেখক এই মাত্র উঠে গেছেন। হঠাৎ আবার এখুনি ফিরে আসবেন।

সাহিত্য, শিল্প, অভিনয়—এই তিন শাখার অনেক শিল্পী জনসনের অন্তরঙ্গতার গুণে যেন এক সূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ, জেমস বসওয়েল, জোসুয়া রেনল্ড আর ডেভিড গ্যারিক—এঁদের সঙ্গে জনসনের অটুট বন্ধনের মতো উদাহরণ ইতিহাসে সহজে পাওয়া যায় না। লিচফিল্ডে জনসন, বসওয়েল আর গ্যারিকের মর্মরমূর্তি আজও তাঁদের নিবিড় বন্ধনের কথা দর্শককে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু শুধু জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও জনসন খুব সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারতেন। প্রকাশক থেকে আরম্ভ করে হাসপাতালের সার্জেন কিম্বা পশম ব্যবসায়ী—বার্মিংহামে তাঁর এমন অনেক বন্ধুর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল।

লিচফিল্ড থেকে বার্মিংহ্যাম। তেইশ বছর বয়সে জনসন তাঁর পুস্তক-ব্যবসায়ী বন্ধু ওয়ারেনের বাড়িতে এসে উঠলেন। এই বন্ধুই তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন। কিন্তু শুধু প্রথম বই প্রকাশের রোমাঞ্চ নয়, এই বার্মিংহ্যাম শহর তাঁর মনে অন্য আর এক অনুভূতি হঠাৎ হাওয়ার ঝলকের মতো সঞ্চারিত করে দিল। নিগূঢ় এক দ্বন্দ্ব। যাকে পাবার কোন উপায় নেই, তাকে পাবার গোপন তাগিদ। আজ হোক, কাল হোক তাকে পেতেই হবে। তাকে না পেলে হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকারে চলতে হবে সারা জীবন।

বার্মিংহ্যামেই জনসন প্রথম দেখেছিলেন পশম ব্যবসায়ী হ্যারি পোর্টারের স্ত্রী

লিচফিল্ড : তিন চূড়োর প্রাচীন গির্জা।

এলিজাবেথকে। তাঁর প্রায় দ্বিগুণ বয়স। হ্যারি পোর্টারের মৃত্যুর পর বিধবা এলিজাবেথকে তিনি বিয়ে করলেন। নতুন নামে তাঁকে ডাকলেন, টেটি।

কিন্তু সারাজীবনে যা কিছু দেখেছেন জনসন, যত ঘুরেছেন এখানে ওখানে—লিচফিল্ড, বার্মিংহাম, উটক্সিটার, স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূল আর কত ছোট বড় গ্রাম শহর—লণ্ডনের কাছে তারা কিছু নয়। কি এক মোহ, টেমসের ঘাট ঘাট থেকে অদ্ভুত এক আবেশ আর বন্দরের কঠিন পাকে জনসনকে বেঁধেছিল দৃঢ় আলিঙ্গনে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে বন্ধন শিথিল হয় নি। [illegible] দিশাহারা

লণ্ডনে ডাঃ জনসনের লেখাপড়ার ঘর : আজও টেবিলে রাখা আছে তাঁর প্রণীত অভিধান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ

হয়ে পড়লেও এ শহরের স্বাদ তাঁর কাছে ছিল একই রকম।

তিন বছর বয়সে প্রথম যখন লণ্ডনে আসেন—ভাল মনে পড়ে না। হীরে ঝলমলে এক নারী। দীর্ঘ কালো আবরণ। রানী অ্যানের ভাসা-ভাসা মুখ—লণ্ডনকে তখনই তাঁর কাছে অপরূপ করে তোলে। মায়ের 'স্করফুলো' রোগ শিশুর শরীরে সংক্রামিত হয়েছে মনে করে তখনকার দিনের সাধারণ লোকের বিশ্বাস অনুসারে জনসনকে তাঁর মা নিশ্চিত আরোগ্যের জন্যে রানী অ্যানের কাছে পাঠান তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শ লাভের আশায়। জনসনের অসুখ সেরেছিল কিনা জানা যায় না, তবে লণ্ডনের অলিতে-গলিতে সব রোগ অবসানের যে একটা আশ্চর্য উত্তাপ ছড়িয়ে আছে, সেকথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবনীকার বন্ধু বসওয়েলকে এই শহরের কথায় তিনি একদিন বলেছিলেন, এই শহরের বিশালত্বের কথা যদি সত্যি জানতে চাও, তাহলে শুধু বড় বড় রাস্তা আর পার্ক দেখেই খুশি হলে চলবে না—তোমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এখানকার অসংখ্য গলি-ঘুঁজিও দেখে বেড়াতে হবে। লণ্ডন সম্পর্কে যে উৎসাহ হারায়, তাহলে বুঝতে হবে জীবন সম্বন্ধেও তার আর কোন উৎসাহ নেই। কারণ জীবনে যা প্রয়োজন লণ্ডন তার সব কিছুই দিতে পারে।

পাকাপাকিভাবে লণ্ডনে থাকবার জন্যে এলিজাবেথের সঙ্গে জনসন লণ্ডনে এলেন ১৭৪৮ সালে। সাংবাদিকপাড়া ফ্লীট স্ট্রীটের কাছে গোটা একটা বাড়ি। নিচে মহাপণ্ডিতের নকল [illegible] কিছু কিছু নিদর্শন। ওপরে ছাদে একটা ছোট ঘর। সংসারের কোন কাজে কখনও না লাগে ওই এক ফালি চিলে ঘরের দিকে কখনও পা বাড়াতেন না এলিজাবেথ। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে জনসন এটিকেই তাঁর লেখাপড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। এখানে বসেই তিনি "রেম্বলার" রচনা করেন আর তাঁর প্রসিদ্ধ অভিধানও এ ঘরেই সম্পূর্ণ করা হয়। প্রায় বছর চারেক পর একদিন এই বাড়িতেই এলিজাবেথ শেষ নিশ্বাস ফেলেন।

গাফ স্কোয়ারের এই বাড়িটির নাম আজ "ডাঃ জনসনস্ হাউস।" ঢুকতেই দরজার কাছে চোখে পড়ে মোটা একটা শিকল। ইংল্যাণ্ডের রসিকমহলে প্রচলিত যে প্রকাশক আর পাওনাদারদের ভিড় এড়াবার জন্যে মাঝে মাঝে জনসন দরজার ওপর এই শিকল নামিয়ে দিতেন। এ বাড়ির ঘরে-ঘরেও জনসনের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, আর তার প্রাণ চিরকাল ধরে রাখবার সুন্দর ব্যবস্থা করেছে ইংল্যাণ্ডের অসংখ্য উৎসাহী

নাগরিক। দোতলার ঘরে জোসুয়া রেনল্ডের আঁকা লেখকের একটা বিরাট তৈলচিত্র। অলিভার গোল্ডস্মিথকে লেখা ফ্রেমে বাঁধানো তাঁর এক চিঠি। আর ফ্লীট স্ট্রীটের ওল্ডককক টেভার্ন পান্থশালা থেকে আনা মস্ত বড় এক চেয়ার। এই চেয়ারটা সেখানে রোজই খালি থাকত জনসনের জন্যে। তিনি গিয়ে বসতেন। লোকে তখন এই চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলত, জনসনের চেয়ার। সারা বাড়িতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের গভীর ছাপ। পুরনো প্রথায় গাঁথা দেয়াল। মূল্যবান প্রাচীন কার্পেটে ঢাকা সিঁড়ি। সেকেলে ফায়ার প্লেস। অতীতের হাতছানি ভারতীয় দর্শককে কোলাহলমুখর বর্তমান সাংবাদিক পল্লীর কথা ভুলিয়ে দেয়। শীতের দুপুরে সেই অট্টালিকা থেকে বেরিয়ে এসে ভারী ঠান্ডা হাওয়ায় নিজের দেহটা যেন হঠাৎ অসাড় হয়ে যায়।

জনসনের লণ্ডনের বাড়ির পাশেই সরু একটা গলি। নাম ওয়াইন অফিস কোর্ট। সেই গলিতে থাকতেন "ভিকার অব ওয়েকফিল্ডের" লেখক অলিভার গোল্ডস্মিথ। দুই অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী মিলে আসতেন কাছাকাছি "ওল্ড চেশায়ার চীজ টেভার্নে"। গভীর আলোচনায় কাটাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই সরাইখানার দেয়ালে টাঙানো জনসনের প্রতিকৃতি আজও গৌরবের সঙ্গে যেন তাঁর এখানে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের আগন্তুকদের কাছে ঘোষণা করে।

লণ্ডন শহরের বড় অলি-গলি পথঘাট পার্ক এবং সরাইখানা এর একদিন জনসনকে এক-এক রকম স্বাদ পরিবেশন করলেও মাঝে মাঝে তিনি বেরিয়ে পড়তে চাইতেন সাগর সমুদ্র—নির্জন কোন দ্বীপ কিম্বা দূরে কোথাও প্রকৃতির ছড়ানো নিরালায়। ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি একবার লিখেছিলেন, বাস্তবের সাহায্যে কল্পনাকে পরিচালনা করা আর কোনটা কেমন হতে পারে সে-ভাবনা না করে সেটা যেমন তাকে ঠিক তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করাই ভ্রমণের সার্থকতা।

জনসনের বয়স যখন ষাটের ঊর্ধে তখন বসওয়েলের সঙ্গে দীর্ঘকালের জন্য বাইরে কোথাও কাটাবার অদম্য ইচ্ছা দেখা দেয় তাঁর মনে। বয়সের কথা ভুললেন জনসন। বসওয়েলকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। স্কটল্যাণ্ডের ইনভারনেস থেকে ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা এলেন গ্লেনেলগে। সেখান থেকে স্কী দ্বীপের জাহাজ ধরলেন। তখন গ্রীষ্ম শেষ হয়ে গেছে। ভয়ংকর শীতের ইঙ্গিতে থম থম করছে ন্যাড়া গাছ আর ঠাণ্ডা মাটি। ইংল্যাণ্ডের চেয়ে স্কটল্যাণ্ডে আরও অনেক বেশি শীত। শুধু সে-কালের

ভ্রমণ আজকের মতো এমন সহজ ও সুখের ছিল না। শুধু বয়সের কথা নয়, মনের অন্য আর এক তাগিদে পথের সব দুঃখ-কষ্টের কথা ভুললেন জনসন।

প্রকৃতির বন্য সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ স্কী দ্বীপ। বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। ১৭৪৫ সালে স্টুয়ার্টদের হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করে এই দ্বীপেই যুবরাজ চার্লস আত্মগোপন করেছিলেন। চারপাশে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন জনসন। এমন কোন দ্বীপে চিরকাল বসবাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বসওয়েলের কাছে। কথা শুনে হয়তো মনে মনে হেসে বসওয়েল ভেবেছিলেন, আর কিছুদিন যাক। তারপর দেখা যাবে দার্শনিক বন্ধুর এ ইচ্ছা ক্ষীণ হয়ে আসে কিনা। লণ্ডনকে কতদিন আর ভুলে থাকবেন তিনি!

স্কী থেকে আর এক দ্বীপে যাবার সময় হঠাৎ এল প্রবল ঝড়। অক্টোবরের ভয়াবহ রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। উত্তাল ঢেউএর ধাক্কায় নৌকো উঠছে নামছে। বসওয়েল হাতের কাছের মোটা দড়িটা ধরে আকুল প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু অদ্ভুত এক দৃষ্টি জনসনের। একটুও বিচলিত নন তিনি। হাওয়ার সোঁ সোঁ গর্জন। চারপাশে উত্তাল ঢেউএর উন্মত্ত বিক্ষোভ। প্রকৃতির এক অপরিচিত রূপ। আদিম সমুদ্রে যেন আদিম মানুষ মাতামাতি। তন্ময় জনসনের দৃষ্টি স্থির। নির্বাক।

প্রায় তিন মাস ধরে নানা দ্বীপে বসওয়েলের সঙ্গে ভ্রমণ করে বেড়ালেন জনসন। এত দীর্ঘদিন তিনি আর কখনও লণ্ডনের বাইরে কাটান নি। কিন্তু কিছু-দিন ধরেই বসওয়েল লক্ষ করছেন শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মন ভরে উঠছে না জনসনের। শহরের কাছে যাবার জন্যে তিনি ছটফট করছেন। নির্জন দ্বীপে চিরকাল বাস করবার ইচ্ছে ঘুচে গেছে এর মধ্যেই।

স্কটল্যাণ্ড থেকে আবার ফিরে এলেন ওঁরা। আর কালবিলম্ব নয়, দ্বিগুণ আকর্ষণে নাগরিক জীবনের বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ লণ্ডনের পাড়ি ধরলেন জনসন।

একদিকে মহৎ প্রকৃতি। অন্যদিকে শহরের কাটাকাটা রূপ। নির্জনতা আর কোলাহল। আদিম সৌন্দর্য আর আধুনিক সভ্যতা। এ দুয়ের সমন্বয় জনসন নিজে। দ্বীপ পরিভ্রমণ শেষ করে লণ্ডনের টানে অধীর জনসন বসওয়েলের কাছে উক্তি করেছিলেন, শুধু স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে বাস করলেই চলে না। তার সঙ্গে চাই সভ্যতার যোগ। না হলে তৃপ্তির পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করা অসম্ভব।

করে নি। প্যাকার্টিদি লক্ষ্য করেছে। বিমল এসে দাঁড়িয়েছিল। প্যাকার্টিদির বড় ছেলে বিমল। শহরতলীর কারখানায় কাজ করে। মাইনে সামান্য। কাজ করছে কিন্তু ক বছর।

ছেলেটা কি শুনতে পেয়েছে? প্যাকার্টিদি লজ্জা পেল। গায়ে কাপড় জড়াল। আক্কেল বলাতে যদি কিছু থাকে। দেখে শুনে, রেখে ঢেকে কথা বলতে পারে না। এই তো মাত্র ক'মাস। ছেলেপিলে নেই বলে এমনি হ্যাংলা!

পা পা ক'রে বাইরে এল ও। প্যাকার্টিদি। কলতলায় বেশ অন্ধকার। বাইরে বড্ড আলো। চোখে লাগে। এত আলোয় কেমন কেমন বোধ হয়। চারিদিকে কাপড় আলগা না থাকলেও গায়েও তা সাপটে সুপটে দিল। হঠাৎ দুপুরে বাড়ি এল কেন? শরীর খারাপ নাকি? ওর কি চাকরি গেছে? ওদের কারখানায় তেমন কাজকর্ম নেই—সকালে ছেলেটা বলছিল। ভাত খেতে খেতে মুখ নীচু ক'রে কথাগুলো বলেছিল। অপরাধীর মত। ভয়ে ভয়ে; থেমে থেমে। তা ওর দোষ কি! ও কি করবে! সত্যি যদি যায়?

বড্ড পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল। প্যাকার্টিদি।—দুপুরে বাড়ি এলি যে বড়? শরীর খারাপ?

চাকরির কথা শুধোল না। মুখে কেমন বাধল। না, মনে খটকা লাগল।

ছেলের কপালে হাত রাখল ও। না—গরম নয়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কপালটা চিট চিট করছে। কোমর থেকে আঁচলটা খুলে ঐ আঁচল দিয়ে ছেলেটার মুখ মুছিয়ে দিতে ওর ইচ্ছা করল। কেমন অসহায় মুখটা। কচি-কচি।

—এমনি। ও বলল। মাটিতে ওর দৃষ্টি। পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। বুকে দুটি হাত একটা অপরটাকে জড়িয়ে রয়েছে।

—তাই ভাল। আমি ভেবেছি কি জানি কি!

ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু ছেলেটা ভাল করে [illegible] বলছে না কেন! ও ভাবল। এক ফোঁটা ছেলেকে বাপ হয়ে চাকরি করতে হচ্ছে। চাকরি করবার কি বয়স হয়েছে? ওর বয়সী ছেলেরা সব স্কুলে পড়ে। পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছিল তাই এ দুর্ভোগ। গত জন্মে অনেক পাপ করেছিল। এ জন্মে তার শাস্তি। [illegible] প্যাকার্টিদির চিন্তার [illegible] পাপ [illegible] করেনি, করেছে ও নিজে। ছেলের কি দোষ! লেখাপড়া শেখাতে পারেনি, মানুষ করতে পারেনি। [illegible] ওর বাবা বলে, [illegible] পেটের [illegible] স্কুলে দিয়েছে। বলে: [illegible] যদি লেখাপড়া শেখে তাহলে মা-বাপকে ছাড়বে কেন? উল্টো মা-বাপের পরিচয় দিতে ঘেন্না করবে। ও বিশ্বাস করেনি; আমরাও পড়িনি। তার [illegible] এই ঠিক হয়েছে। এ কথা ও বিশ্বাস করে না। আজকের বিমল সে ছেলেই নয়। [illegible] ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে গেছে!

বিমল কিছু ভাবতে পারছিল না। ওর মন অসাড়, যেমন ও নিজে। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে। অবশ্য কলতলার ভেতরে তখনও প্যাকার্টিদি। বোধ হয় তাই ওর নড়ার কোন চেষ্টাই নেই! তাই কি?

—কিছু খাবি?

বিমলের মা ওকে প্রশ্ন করল। প্রশ্ন ক'রেই বুকটা কেমন করে উঠল। হিমু

হিম্। পা গলোল। যদি ছেলেটা বলে, হ্যাঁ। তাহলে খেতে দেব কি?

ছেলেটা বোঝে। ও শুধু ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ' বলায় বাহাদুরি এবং মজুরী পোষাবে না। বিমল কি তাই ভাবল?

এমনি অভিনয় ওদের নিজেদের মধ্যে চলে। অতি নগ্নতা ভাল নয়। কিছু ঢেকে ঢুকে অভিনয় ক'রে চললে বোধ হয় মনে কিছু শান্তি পায় ওরা। শান্তি না পেলেও স্বস্তি। অভাবকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকার আর্তি।

বিমলের ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কত হাল্কা মনে হল নিজেকে। স্বতঃস্ফূর্ততা। ভেলেদুলে হাল্কা পদে ঘরে যেতে ভাল লাগছে।—আয়, ঘুমুবি। দুপুরে আর বেরুসনি। রোদে ঘুরলে শরীর খারাপ করবে।

মাকে ও ভালবাসে। খুব। কিন্তু এখনই মাকে ও সহ্য করতে পারছে না। কী বিশ্রী যে লাগছে! মনে হচ্ছে মুখের ওপর যা তা ক'রে বলে। এ বাড়ির অনেক ছেলেই মা-বাপের সঙ্গে খিস্তি খেউড় করে। ও যদি করলে ঠিক হয়। পরক্ষণেই মনে মনে বলল, কি ভাবছি আমি! ওর মাথাটা আরও ঝুঁকে গেল মাটির দিকে। নিজেকে ও শাসন করল।

ওর মা চা'ল পোল ও অনুভব করল কপালে ঘামের বিন্দু। কৌটোয় খোঁপার। নাকের ডগায়। ঘাড় তুলল। দেখল। মা নেই। [illegible] নিয়ে দাঁড়িয়ে [illegible] হাতে [illegible] পিঠ দেখিয়ে। পা খালি। [illegible] অসহায় লাগছে। [illegible] কিলবিলে [illegible] কি ওকে [illegible] হাত দুটি [illegible] রাখল অসহায়ভাবে।

দরজার একপাশটা এখনও নট নড়ন-চড়ন। [illegible] কি করে এতক্ষণ ব'সে? [illegible] বেরুতে [illegible] না। একটিমাত্র [illegible] যদি থাকত? একটুও [illegible]? দেখাচ্ছে আমি এসেছি। তা নয় নিজের শরীরেই অস্থির। [illegible] এত শক্তই!

[illegible] ও বুক থেকে হাত নামিয়ে [illegible] রাখল। শরীরটাকে ধনুক টেরী করল। ঠিক [illegible] মত।

[illegible] চোখ পড়বে যার। আর [illegible] পারা যায় না। ভাঙা ক্যানেস্তারার বেড়া দু'দিকে। বাকি দু'দিকে ছেঁড়া [illegible] দেওয়াল। বাইরে থেকে একটু লক্ষ্য করলে সবই দেখতে পাওয়া যায়। যে ভেতরে থাকে সে জানে। বাইরের যে, সে-ও। অথচ কলতলায় ও-জন লজ্জা পায় না। বাইরের এ-জনও পিঠ প্রদর্শন করে। ওঃ ভারী আমার আব্রু! কে আমার রে! ভাল লাগে না। ও চাইতে গিয়েও চোখ

নামাল। বক বক ক'রেও পারল না ঘাড় তুলতে।

আরও অনেকক্ষণ বিমলকে জর্জারে গ্যাদাউলী বেরল। ধোয়া চোখ দু'টোর পাতায় এখনও ঘুম যেন জড়িয়ে আছে। আধ বোজা; আধ খোলা। কপাল থেকে ডান হাতে চুল সরাতে সরাতে গ্যাদাউলী হাসল। জড়িয়ে জড়িয়ে প্রশ্ন করল ওকে বুঝি রাগাবার জন্যেই;—দেরি হয়ে গেল, না? রাগ হচ্ছে তো!

এইটুকু হাসি বিমলের বুকের উত্তাপে জল ঢালার বুঝি কাজ করল। ওর রাগ কি দৌড়িয়ে পড়ল? তাড়াতাড়ি কলঘরের দিকে এগোতে এগোতে ও ভাবল। রোজদিন নয়, সময় হ'য়ে এসেছে। মেয়েদের ওখানেও হাঙ্গামা লাগল বলে। এত ছুটি তখন কোথায় থাকে দেখব? আঁ! শালার, ভারী ইয়ের! লোকটা কিন্তু ভাল। আমার জন্যে অনেক খেটেছে। কিন্তু কি করবে? ওর ক্ষমতা কতটুকু? দুঃখ ক'রে বলল, দেখলে তো তোমার জন্যে কত চেষ্টা করলুম। কিছু করতে পারলুম না—এ দুঃখ রয়ে গেল। সত্যি লোকটা খেটেছে। কর্তা কেমন! গিন্নীটা অমন নয় কেন?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জোরে জোরে ও হাতল ওঠা-নামা করতে লাগল। যত রাগ কলের হাতলটার ওপরে।

এরা বুঝি এমনিই করে! বাইরে এরা ক্ষতবিক্ষত হয়। অপমানিত হয়; লাঞ্ছনা সহ্য করে। মুখ ফোটাতে পারে না। যত তম্বি বাড়িতে। বিমল তা করে না। ও ভাবছিল: ও ওর মাকে বাবাকে আর পাঁচ ভাইবোনকে ভালবাসে। দু' একটা কোন কঠিন কথা ব'লে ফেললে ও পরে ক্ষমা চায়। অপরাধ স্বীকার করে। ভাল ছেলে হিসেবে ওর নাম আছে। তার জন্যে গর্ববোধ করে ও। নামটাকে বজায় রাখার চেষ্টাও করে। এখনও করছে।

একই পা অনেকবার করে ধুল। বাঁ পা'টা দিয়ে ডান পা'টাকে ঘষল। ডান পা'টা দিয়ে বাঁ পা। মুখ ধুল। কুলকুচি করল। কলে মুখ দিয়ে জল খেল খানিকটা। আঃ! ও বাইরে বেরুল।

পেটটা বেশ ভরে গেছে। এতক্ষণ খিদেয় চোঁ চোঁ করছিল। খিদের সময় জল খেলে মনে হয়, পেটটা ভরল। কিন্তু শালা, খানিক পরে পেট কোঁ কোঁ করে। আরও বেশী খিদে চাগান দেয়। মা তো বললে। দেখব একবার বলে? বললে আর কি হবে! বলবে, ফুরিয়ে গেছে, যখন বললুম তখন কিছু বললি না! যেন এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল! যদি বলি, কে খেল? মা কি জবাব দিতে পারবে?

যাঃ শালা ভাল লাগে না। মা'র সামনে, মা'র মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব না। ও ভাবল, খাবার থাকলেও খাবার উপায় নেই।

দেখলে বোধ হবে কাকে বুঝি ও দাঁত দেখাচ্ছে। শালার রোদ দেখনা—যেন বয়লার!

একটা দোকানের ছায়ায় ঢুকল। পকেটে হাত ঢোকাল। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়েও গোটা বিড়ি মেলে না। পোড়া বিড়ি একটা। বাড়িতে ঢোকার আগে কয়েক টান দিয়ে আগুন নিভিয়ে পকেটে পুরেছিল। অসময়ের সঞ্চয়। পকেটে পয়সা নেই। তবু একবার টানা যাবে। ঐটেই টেনে বের করল পকেট থেকে। পকেটে যে পয়সা নেই এবং সেই সঙ্গে গোটা বিড়িও—এতক্ষণে ও যেন অনুভব করল। যা শালা যা হয় হবে! দিই গোটা কতক টান। বিড়িটা বার দুয়েক দেখল। কি ভাবল। আবার পকেটে পুরল। হাঁটতে শুরু করল।

একটা বাস হাওয়ার ধাক্কায় ওকে কাত করে দিল। একটু হলে ও পড়ে যেত। বাসের তলায়। পড়লেই চিড়ে-চ্যাপ্টা। চোখ, মুখ, নাক, গোটা শরীর ধুলো বালি ভর্তি। এইসান্ একদিন দেব—বাস চালান কাকে বলে শিখিয়ে ছাড়ব। অবাক্ত আক্রোশে ও পালিয়ে যাওয়া বাসটাকে দেখছিল এবং হাঁটছিল। পদক্ষেপ সামনের দিকে; দৃষ্টি পেছনে।

আর একটু হ'লে মেয়েটার সঙ্গে ধাক্কা লাগত। উল্টো মুখো হয়ে পথ চলার ফল। খুব জোর বেঁচে গেছে। বিমল একটু ভয় পেল। হৃৎপিণ্ডটার দ্রুত তাল। মেয়েটার দৃষ্টিতে আগুন। ভ্রূতে জিজ্ঞাসা: বাঁদরামো হচ্ছে? তা যদি না হয়; দেখে পথ চলতে পার না?

পকেটে ও হাত ঢুকিয়েছে অনেকক্ষণ। গতি গেছে বেড়ে। পিঠের ওপর ক্রোধান্বিত দৃষ্টি। জামা ফুঁড়ে বুঝি ফুটছিল! মেয়েমানুষের দৃষ্টি এত বিশ্রী! টেরাচোখে দেখল মেয়েটাকে। মেয়েটা দেখছে না। হাত বের করল এবার। গজ্ গজ্ শুরু হল। ভারী আমার রে' ভিড়ে অমন হয়-ই। অত যদি ছুঁচিবাই গাড়িতে গেলেই হয়। গাড়ি নয় নাই জুটল, বাস তো ছিল। আরে বাবা—সব শালাকে জানি। বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। জোরে জোরে পা পড়ছে ওর। কত যেন ব্যস্ত! দেখছে দেখ না! একেবারে গিলে ফেলবে। ভাল জামা কাপড় পরা দেখে হাল ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগাতে। দৃষ্টি অন্যরকম হতো। তোমাদের চিনিনে, বিমল আবারও ফিরে দেখল। সেই দিকে দৃষ্টি ছাড়ে দিল। না—নেই। অদৃশ্য।

বাড়ির মেয়েগুলোর কথা এবার ওর মনে এল। এতক্ষণ আসে নি। ভয় ও উত্তেজনায় ওর সব গোলমাল পাকিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ির মেয়েগুলো যখন সেজেগুজে বেরোয় তখন কে বলবে এঁদো-কুঁড়েয় বাস করে! মনে হবে কত না ভদ্র লোকের মেয়ে। কত না লেখাপড়া জানে। কত ভদ্র! শালার মূর্তিই এমনি।

চায়ের দোকান একটা। ভীষণ হট্টগোল ওখানে। বহু মানুষের কণ্ঠস্বরের খিচুড়ি-আওয়াজ ওর কানে বিঁধল। চলতে চলতে—গতি সামান্য মন্থর হল শুধু—মাথা ঘোরাল।

লোকগুলো তর্ক করতে ব্যস্ত। এত তর্কও করতে পারে? কোথা থেকে এত শক্তি পায় যে, এত চেঁচায়? ওরা তো বড়লোক নয়। বড়লোকেরা রেস্টুরেন্টে চা খায়। আমাদের মতন যেগুলো শুধু এমনি ঝড়ঝড়ে চায়ের দোকানে চা খায়। ঐ তো সব চেহারা! মানুষ নয় যেন কাদার পুতুল! সোজা হয়ে বসতে পারে না। প দুমড়ে হাত দিয়ে আঁকড়ে বসে আছে। এই

লোকগুলোর গলায় এত তেজ? নাকি এক কাপ চা খেলে এত শক্তি পাওয়া যায়?

হঠাৎ বুঝি ও এ-তত্ত্বটা আবিষ্কার করে ফেলেছে। আর আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ—ঐ ফুটো টিনের চায়ের দোকানে বসে—খাবার তরে ওর মনটা আঁকুপাঁকু করল। চোখ চক্ চক্। জিভে ইচ্ছার জল।

এগিয়েও গেছে কয়েক পা। এমন সময় এই দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে এতখানি পথ হেঁটে, এই দুপুর-শেষ-হয়ে-আসা বেলায় কার না ইচ্ছে করে এক কাপ চা খাওয়ার? বাজে খরচ কেন করবে মনে মনে তার হিসেব কষতে কষতে 'পকেটে যে ছুঁচোয় ডন মারছে' সে-সত্য চোখের সামনে ফুটে উঠল। পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে সদা-সর্বদা যে পকেট খালি তা নতুন করে মনে হতে ও যেন ক্ষেপে গেল। গা-হাত-পা জ্বালা জ্বালা। ফুঁসছে ও। মাথা ভোঁ ভোঁ।

—দূর শালা! পোড়া বিড়ি-ই নেই! আবার পয়সা।

সময় কিছু পালিয়ে গেলে ও হাসল। বড় মজা [illegible]। আমাদের পকেটে সব সময়েই ছুঁচোয় ডন মারে। আচ্ছা, ঐ লোকটার পকেট মারলে কেমন হয়? কয়েক গণ্ডা পয়সা। এক কাপ চা, এক বান্ডিল বিড়ি। এক বান্ডিল হলেই আজ, কাল চলে যাবে। পরশু দিনের কথা আজকে ভেবে কি হবে? সে পরশুদিন ভাবা যাবে। [illegible] শালা কি আবোল-তাবোল ভাবছি। নিজেকে ও ধিক্কার দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে পড়ল। সামনে লোকটা যাচ্ছিল। কি যে হল—ও লোকটার সঙ্গে [illegible] কী রকম [illegible] এবং লোকটাকে ছাড়িয়ে ও [illegible] এমন হাঁপিয়ে পড়েছে যে, বসে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। [illegible] পড়লে হয় না? ও হাঁপাচ্ছে। পা কাঁপছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর এত কষ্ট? আরও একটু কুঁজো হয়ে গেল ও।

সবার শেষে বসে পড়ল। ফুটপাথে। উবু হয়ে। ঘাড় বেঁকানো। মাথা নীচু। ও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, অতএব ওকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না এমনিভাব। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সর্বাঙ্গে [illegible]। [illegible] লাগছে। [illegible] পড়তে মন চাইছে। রাস্তার সব লোকগুলো অন্য কিছু না দেখে, গাড়ির চাপা পড়ার ভয়কে উপেক্ষা করেও ওকে বুঝি দেখছে! এত অস্বস্তি। কেউ যদি এসে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে? অসুখবিসুখ নাকি! না, ওকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। যা চেহারা! নাক সিঁটকে পালাবে। আমাদের সাহায্য করতে এলে পকেট থেকে কিছু খসবে। উপরি লাভ তো হবেই না। ও কি হাসল?

বুকের হাপরে ওঠা-নামা তখনও চলেছে। তবে কমেছে। কমার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমনো ভাব। ঝিমনো ভাবটা ওর সব চিন্তাকে ঠেকিয়ে রাখছিল। কিন্তু পারে নি কারখানার চিন্তাকে। কি দেখবে ও?

আর ভাবতে ভাবতে যখন মনে হল 'কিছুই হবে না, কিছু হবার আর কোন উপায় নেই', তখনই ওর খিদেটা ফের চাগান দিয়ে উঠল। ও উঠল। টিউবওয়েলটা বেশীদূরে নয়। পা বাড়াল ও।

কিছুক্ষণ আগে জল খাবার ইচ্ছে হয়েছিল। তবে তেমন জোরালো ছিল না এখনকার মত। সামনের দোকানটাকে মেরে যদি কিছু খাওয়া যেত? ও ভাবল। আচ্ছা, খেয়েদেয়ে লুকিয়ে সরে পড়লে হয় না? ধরে যদি ফেলেই তাহলে করবে আর কি? দু'চার ঘা মারবে। এমনি যা তা বলেও ছেড়ে দিতে তো পারে! যা তো বলল তো ভারী বয়েই গেল। আমার গায়ে কি ফোস্কা পড়ছে? এমন কি করে না লোকে? আমাদের মত লোকেরা? যারা খেতে পায় না? পরতে পায় না? যারা বেকার? যাদের চাকরি গেছে?

কারখানার কাছ বরাবর এসে গেছে। এখন ওর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ও ভাবছে কি হবে গিয়ে? এমনি হয়। হচ্ছে। কারখানায় এলে মনে হয় বাড়ি যাই। বাড়ি গেলে ইচ্ছে করে কারখানায় যেতে। এতটুকু শান্তি খুঁজছে ও। শান্তি শুধু খুঁজছে না ওকে।

এতক্ষণে সবাই শুনেছে। [illegible] লোকটা কি বলতে বাকি রেখেছে? প্রথমেই মা'র কথা ওর মনে পড়ল। মা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না। আড়ালে বসে বসে শুধু চোখের জল ফেলবে। মা'র ঐ এক চোখের জল। মা বকে না, ধমকায় না। কিন্তু চোখের জল না ফেলে যদি বাবার মত গালাগালি দিত, মারত, বরং বুঝি ভাল হত।

বাবার কথা মনে হতেই ও যেন শিউরে উঠল। বাবাকে ও ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। পৌরুষে বুঝি ঘা লাগে। আজ একও একটা [illegible] লাগাবে। গালাগালি করবে। [illegible] করবে। [illegible] আর আমি তোমাদের খাওয়াব। [illegible] আমার। এত বড় সংসার কোন ভাবনা চিন্তা নেই। যেন উনিই [illegible] চিন্তা করেন? মারধরও করতে পারে। ও ভাবল। যদি পারত হাতে [illegible] না। [illegible] কিন্তু দোষ কি আমার! আমার কি! এটা কি আমার সংসার? বছরে বছরে তোমরা যখন সংসারের পুষ্যি বাড়াও তখন মনে থাকে না?

ও চমকে উঠল। মুখের রক্তটুকু কে যেন শুষে নিয়েছে। ওর মনে মনে কথা বুঝি সবাই শুনতে পেয়েছে! চেনাশোনা কেউ সামনে, কাছে আছে?

সামনেটা দেখল। এপাশ ওপাশ। পেছন ফিরেই ও আঁতকে উঠল. খোঁড়া একটা লোক ভিক্ষে চাইছে। মুখময় ঘা। পিচুটিভরা চোখদুটি কোথা হারিয়ে গেছে। আর একটা মস্ত ময়াল সাপ লোকটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে।

ও বুঝি ভয় পেয়েছে! ভীষণ ভয়! অন্য সময় হলে ও হাসত। বলত, ভিখিরীর কাছে ভিক্ষে! এখন ও ছুটতে শুরু করল উর্ধ্বশ্বাসে। নির্দিষ্ট কোন দিকে নয়; যে-কোনও দিকে।

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

পাঁচশ

১৯২২ সালে নভেম্বরে দেশে ফিরে কিছুদিন পরেই সুভাষের সঙ্গে দেখা। তাকে সব কথাই খুলে বললাম—কিছুই গোপন না ক'রে। সে শুনে একটুও বিচলিত না হয়ে বলল: "ঠিকই করেছ ভাই, দেশের ছেলে দেশে ফিরে। এখন দেশকে দিয়ে চলো তুমি য়ুরোপে যা কিছু পেয়েছ, শিখেছ, জেনেছ। য়ুরোপে যাওয়া আর কী জন্যে বলো?", ইত্যাদি।

দেখলাম সুভাষের মন আরো অনেক বিকশিত হয়েছে এই এক বৎসরে। উত্তর বঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে অমানুষিক খেটে ওর আরো নামডাক হয়। বাংলা দেশে তখন সবারই মুখে ওর নাম: "চিত্তরঞ্জনের মানসপুত্র"—বলত অনেকেই।

কিন্তু সুভাষ আমাকে "সৎপাত্র" জানলেও আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকেই বিষম মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এক জ্ঞানবৃদ্ধ বললেন: "বিলেত গিয়ে এত খরচপত্র ক'রে সাড়ে তিন বৎসর কাটিয়ে শুধু দু' তিনটে ফাজিল ভাষা শিখে এলি তুই?"

আমি (অবোধিক অনুম): ফাজিল ভাষা কেন? গান—

জ্ঞানবৃদ্ধ (ভ্রূকুটি ক'রে): ওসব উচ্চাঙ্গ সংস্কৃত গানের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না ছাই। তুই এখন কী করবি তাই বল।

আত্মীয়রা: কেন? বিয়ে।

দিদিমা: তা বৈ কি। ওর ভাবনা কী? পাশ তো তিন চারটে করেছে গা। বাঁচলুম—ও মেম বিয়ে করে আসে নি।

আমি (দিদিমার সঙ্গে চিরকেলে ঠাট্টার সুরে): কেমন ক'রে জানলে নানি?

মেজমামিমা (কলহাস্যে): মা, হাসবেন না, কারণ এ হ'ল কাঁদবারই কথা। জানেন, প্রভাতবাবুর একটি গল্পে আছে আপনার নাতির মতনই এক ধনুর্ধর মেম বউকে বিলেতে ফেলে চম্পট দিয়েছিল। কিন্তু মেমের সঙ্গে পারবে কেন? একদিন সে ঠিকানা জোগাড় ক'রে হঠাৎ এসে হাজির—ঠিক যখন সে এক স্বদেশী কনেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সোনার টোপর প'রে।

দিদিমা (সত্রাসে): অমন অলক্ষুণে কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই বৌমা। মণ্টু আমার তেমন ছেলে নয় যে, মেম বিয়ে ক'রে আসবে।

আমি (হেসে): এ কি কথা নানি? তোমার যে ভাবনায় ঘুম হ'ত না আমি মেম বউ নিয়ে এলে তোমাকেই তাকে বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হবে ব'লে?

বিয়ে নিয়ে এই ধরনের ঠাট্টা তামাশা হাসাহাসি হ'ত প্রায়ই থিয়েটার রোডের মাতুলালয়ে। তাই একটা প্রগল্‌ভ নমুনা দিলাম।

কিন্তু ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহে—বিলিতি ডিগ্রির অভাব আমাকে বাধ্য করবে কোথেকে? শহরে মাথে ছাই দিয়ে আমি দেখতে দেখতে জনপ্রিয় গায়ক হয়ে উঠলাম—বিশেষ ক'রে নানা সভায় কংগ্রেসে গান ক'রে। বন্ধুদের আসরে গল্পালাপেও আমি অচিরে রসালাপী ব'লে সুপ্রতিষ্ঠ হলাম। আমাদের থিয়েটার রোডে দাদামহাশয়ের লোকান্তরের পর থেকে কর্ণধার হয়েছিলেন আমার মেজমামা, দিদিমা—ছিলেন রসদদার। কিন্তু মেজমামা প্রকৃতপক্ষে কর্তা হলেও মেজমামিমা নিজেকে কর্ত্রী বলতেন না—দিদিমা থাকতে। থিয়েটার রোডে আত্মীয় আত্মীয়া আরো অনেক ছিলেন, তাঁরাও মোটের উপর আমাকে স্নেহই করতেন। না করবেন কেন? আমি গান গেয়ে নানা মনীষী মহাত্মা দিকপালকে থিয়েটার রোডে ডাকতাম—সবাই পুলকিত হতেন তাঁদের শুভাগমে। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষ, সত্যেন, মেঘনাদ সাহা, আরো অনেক বাঙালী ও অবাঙালী মনীষী থিয়েটার রোডে এসে আমার আসর জমাতেন। এর পরে ক্রমশ ওস্তাদ বাইজী বাদক এ'রাও পদার্পণ করেছিলেন একের পর এক: যথা, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, আবদুল করিম, হাফেজ আলি খাঁ, সেনি, গয়ার বিখ্যাত সেতারী (নামটা মনে পড়ছে

না। আরো কত গায়ক। কেশর বাই ও ভীষ্মদেব আসেন সবশেষে—১৯৩৭, ৩৮ সালে।

কিন্তু ওস্তাদরা ওস্তাদি দেখাতে অভ্যুদিত হবার আগেই আমি কলকাতায় নানা সভাসমিতিতে গান গেয়ে নাম করেছিলাম। ফুল্লমনে ভাবলাম—এ ধরনের তানওয়ালা বাংলা গান, হিন্দি ভজন ও উর্দু গজল যখন এত লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন থেকে থেকে প্রকাশ্য গীতসভা বসালে মন্দ কী? কিন্তু সভা করি কোথায়—প্রকাশ্য হল মিললে তবে তো!

বাঞ্ছাকল্পতরু ফের বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন: প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার গান বিশেষ ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন সে সময়ে রামমোহন লাইব্রেরীর হর্তা কর্তা বিধাতা—বললেন: "আমাদের হলে গাও না দিলীপ।"

কাঙালকে শাকের খেত দেখানোর ফল কে না জানে? আমি উল্লিয়ে উঠে শুধু একা নয়, আমার কয়েকটি নবলব্ধ বালক-বালিকা ছাত্রী নিয়ে কলকাতার শ্রোতৃবৃন্দকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য কন্সার্টিং নিবোধত" বলতে বলতে মাসে দু' তিনটি আসর বসানো শুরু করলাম রামমোহন লাইব্রেরীর রঙ্গমঞ্চে। আমার উদ্দেশ্য ছিল গান গেয়ে শিক্ষিত সমাজের একটু চিত্তরঞ্জন মাত্র। কিন্তু মুনফা লাভ হ'ল অভাবনীয়: কলকাতার সংগীতরসিকরা দলে দলে আসতে লাগলেন—সে কী ভিড়! অনেকেই উঠলেন চমকে, কারণ সে সময়ে কোনো পাবলিক হলে কেউ এভাবে অবিমিশ্র গানের আসর জমকায় নি সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ ক'রে। হয়ত সেই অভিনবত্বের জন্যেই রামমোহন লাইব্রেরীতে লোক ভেঙে পড়ল। আর ধরে কোথা? আমার স্নেহময় অধ্যাপকের উর্বর মস্তিষ্কে গজালো একটি মনোহর আইডিয়া। তিনি বললেন: "যখন নির্মাশুল্ক গানের আসরে স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল তখন একবার মাশুল চেয়ে দেখলে মন্দ কি?"

আমি (মাথা চুলকে): স্যার!...টিকিট ক'রে কেউ কি গান শুনতে আসবে?

স্যার (অর্থাৎ শ্রীচারুচন্দ্র): যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ—পড়ো নি ইস্কুলে?

ভোটে টিকে সার্ ঠিক করলেন, চার আনার মাশুল ধরা যাক প্রতি টিকিটের। যদি আশানুরূপ জনসমাগম না হয় তবে ফের নির্মাশুল্ক গানের আসরেই নামা যাবে পুনর্মূষিক হয়ে। টিকিট বিক্রির টাকা অবশ্য রামমোহন লাইব্রেরীতেই দেওয়া হবে—যাকে বলে চ্যারিটি কন্সার্ট আর কি।

কিন্তু টিকিট করতে হ'লে কিছুটা তোড়জোড় না করলে চলে না। একটা একটা ক'রে জুড়ে দেওয়া হ'ল আমার বালক-বালিকা ছাত্রীর একক, দ্বৈত ও কোরাস গান, দু' একটি খ্যাতনামা গায়িকার কীর্তন, আমার প্রকৃত বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের হাসির গান, দু' একটি [illegible] [illegible] কমিক ক্যারিকেচার, কাজি নজরুলের প্রাণোন্মাদী স্বদেশী গান: [illegible] ইত্যাদি। সবশেষে আমার গান: ভজন, ঠুংরি, স্বদেশী সংগীত ইত্যাদি।

সব প্রথমে টিকিট কি? চার দুয়ানী আট আনা। পরে হ'ল দুগুণ এক টাকা, তার পরে দু' টাকার টিকিট, শেষে তিন টাকা। তবু প্রতিবারই ফুল হাউস। স্যারের মুখে একগাল হাসি: "দিলীপ, দেখালে বটে এক হাত!"

এ-কাহিনী এত ফলাও ক'রে বললাম নিজের কীর্তি প্রচার করতে নয়—কারণ এ কীর্তি কি এমন কীর্তি যা নিয়ে জাঁক করা চলে? আমার সাংগীতিক অভ্যুদয়ের সূচনা রামমোহন লাইব্রেরীতেই হয় এই কথাটুকু জানাতেই এ-ইতিহাসের অবতারণা। না, আরো একটু আছে।

১৯২২—২৩ সালে শুধু গান ক'রে

চ্যারিটি কন্সার্ট কেউ করেনি বাংলা দেশে। রবীন্দ্রনাথ তাই তো আমাকে দিলাশা দিয়ে বলেছিলেন পরেঃ "নির্ভেজাল গান গেয়ে আমাদের দেশে চ্যারিটি কন্সার্ট ক'রে গানকে পৌঁছে দিলে তুমি সর্বসাধারণের কাছে। এই-ই তো চাই কেবল যখন অগ্রণী হয়েছ আর পৌঁছও না—কে কী বলছে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে নিজের পায়েই নিজের পথ কেটে চলো। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"

কবিগুরুর সাশিস উৎসাহ ভুলবার জিনিস নয় তাই এখানে টুকে রাখলাম কাগজে কলমে। এর পরে তিনি আমাকে আরো উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং রামমোহন লাইব্রেরীতে আমার গীতসভায় সভাপতিত্ব ক'রে তথা ভাষণ দিয়ে।

অতঃপর এ-জাতীয় চ্যারিটি কন্সার্ট আরো দিলাম অজস্র—একের পর এক। বৎসর দুয়ের মধ্যে অন্তত পনের কুড়ি হাজার টাকা নানা সৎকার্যে পরিবেশন করা হয়েছিল। এতে আমার প্রতিষ্ঠা হ'ল বটে, কিন্তু দুর্নামও রটল কম নয়—বিশেষ ক'রে গানের আসরে ভদ্রকন্যার নৃত্য প্রবর্তন ক'রে। আজকের দিনে শোভনারা যখন শুধু যে নিজেরা নাচছেন তাই নয়—নাচাচ্ছেন আরো বেশি লোককে অথচ কেউ কথাটি কইছে না, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি গানের আসরে শ্রীমতী [illegible] নৃত্য প্রবর্তন করায় আমার নামে নানা কাগজে [illegible] [illegible] [illegible] বিধবার মতো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার এক [illegible] বেড়েছিল।

বিলেত থেকে ফিরে দেখতে দেখতে পেলাম এ-ভাবে [illegible] পেয়ে। কিন্তু আমার একটা ক্ষতিও হ'ল—যাকে মনঃক্ষুণ্ণ নিশ্চয়ই অনুমোদন করতেন না, কেন না তিনি [illegible] শিক্ষাই বলে ছিলেনঃ "সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব"—কি না ব্রাহ্মণ সম্মানকে প্রশংসাকে নিত্য বিষবৎ জ্ঞান করবেন। এর ভাষ্য এই যে, নিজে গান গেয়ে ও নানা ছাত্রছাত্রীকে গাইয়ে নমস্কার হ'তে না হ'তে আমি প্রশংসাকে বিষবৎ জ্ঞান করা দূরে থাকুক পরমানন্দে সর্বত্র হাততালি ও ফুলের মালা কুড়োতে লাগলাম। অথ, দেখতে দেখতে যশের কামনা আমাকে পেয়ে বসল—বৈরাগ্য এ-কামনার প্রবর্ধমান স্রোতের সামনে গেল ভেসে, মন আমার রঙিয়ে উঠল কীর্তিমান হবার উচ্চাশায়। ফলে, ঠাকুরকে ভুলে না গেলেও আর সময় পেতাম না ডাকাডাকি করতে। বাল্যকালের দিলীপের সঙ্গে যৌবনকালের দিলীপের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া ভার হ'য়ে উঠল, অথচ এমনই যশের মায়া যে, আমি স্রেফ ভুলে গেলাম শ্রীম-র কথা, রাখাল মহারাজের কথা, কুমারনাথের কথা, পরমহংসদেবের কথা। এগিয়ে চললাম তো চললামই একটানা—সবে-জাগা উচ্চাশার বানের মুখে ভক্তি প্রার্থনা ধ্যান জপ শুধু যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তাই নয়, উচ্চাশার মোহে মনে আক্ষেপ পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এল, তাই এ-প্রশ্নও আসত না যে, পারমার্থিকতার নোঙর কেটে চলেছি কোন্ লক্ষ্যহীন দীপ্তিহীন সামাজিকতার নিরুদ্দেশ যাত্রায়! ছেলেবেলায় কথামৃতের সুরে সুর মিলিয়ে যে-অঙ্গীকার করেছিলাম — ভগবানকে পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য, সে-অঙ্গীকার থেকে থেকে কানে বেজে উঠত বটে, কিন্তু অনাদৃত অর্ধবিস্মৃত স্মৃতির মতনই বলব।

উচ্চাশার ও কীর্তিলাভের স্বাদ পেয়ে মনের মধ্যে এক বিচিত্র নেশা জেগে উঠল—জ্ঞানীরা মায়া শব্দটির উদ্ভাবন করেছেন কি সাধে?

মন যেদিকে ঝোঁকে তার স্বপক্ষে যুক্তিও জোটে সহজেই। কাজেই আশ্চর্য কি যে আমি নিজেকে প্রবোধ দিলাম—গানাৎ পরতরং নহি? এই সময়ে আলাপ হ'ল আর একজনের সঙ্গে, যাঁকে ভালোবেসে আমার গীতোচ্ছ্বাস আরো ফেঁপে উঠল বানের জলের মত। তাঁর নাম অতুলপ্রসাদ সেন—বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সুরকার-গুণীর

অন্যতমঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর স্থান। আমার সাংগীতিক জীবনে অতুলদা আমাকে শুধু যে অজস্র উৎসাহ দিয়েছিলেন তাই নয়—জুগিয়েছিলেন অপর্যাপ্ত সুমধুর প্রাণের তথা গানের খোরাক। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতেই হবে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার—সবাই জানেন। বহু টাকা উপায় করতেন। উর্দু বলতেন চমৎকার। অবাঙালীদের মধ্যেও তাঁর বন্ধুর অবধি ছিল না। যেমন উদার, তেমনি রসিক, তেমনি আতিথেয় ও বন্ধুবৎসল। লক্ষ্ণৌয়ের প্রবাসী বাঙালীদের তিনি ছিলেন সত্যিই মুকুটমণি।

এক সময়ে তিনি ছিলেন আমার পিতৃদেবের একজন প্রধান পার্ষদ, তাঁর সঙ্গে দিতেন হাসির গানে দোয়ার। কারণ হাসিতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল বাঙলার রসিকসমাজে। তারপর বিবাহিত জীবনে অসুখী হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এজন্যে তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না। কিন্তু এই নিবিড় বেদনায় তাঁর গানের একটি গভীর দিক খুলে যায়। তিনি নিজের মনে গান বাঁধতেন ও সুর দিয়ে নিজেই গাইতেন কী ভাবে—তার বড় সুন্দর ছবি এঁকেছেন তাঁর একটি চমৎকার বাউল গানে:

মিছে তুই ভাবিস মন।
(তুই) গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন।
পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে
(ওরে) নাই-বা যদি কেহ শোনে
(তুই) গেয়ে যা গান অকারণ।

স্বভাবে ছিলেন তিনি লাজুক, সুকুমার অর্থাৎ রিফাইন্ড। এত সুকুমার যে, তাঁর মধুর স্নেহের নানা খেলার পরশে আমার মনে প্রায়ই বিচিত্র ভাবনা হত। এরকম অতি-সুকুমার মানুষ আমি জীবনে বেশি দেখি নি পুরুষদের মধ্যে। প্রৌঢ় বয়সে ও দীর্ঘাকৃতি হলেও স্বভাবে তিনি ছিলেন—ঐ যে বললাম পেলব—সুকোমল। অথচ হাসতে গেলে তিনি উচ্ছল হয়ে উঠতেন—যদিও শুধু অন্তরঙ্গ মহলে। বাইরে ছিলেন নিখুঁত সুভদ্র সুপুরুষ—সলজ্জ-ভাষী ও ঈষৎ তোতলা। এই ঈষৎ-তোতলামি, কিন্তু তাঁর বিকাশের পথে বাধা হয় নি, অনুকূলেই হয়েছিল। এমন মধুর তোতলামি সত্যি আর কখনো শুনি নি। তাঁর এই অর্ধস্ফুট উচ্চারণ শুনে অনেকেই মুগ্ধ হত। বহু বৎসর বাদে ১৯৩৪ সালে বম্বেতে পাহাড়ী সান্যাল একদিন তাঁর এই ঈষৎ তোতলামি/ভঙ্গির অবিকল নকল করে আমাকে আর্দ্র করে তোলে—মনে করিয়ে দিয়ে কী অপরূপ ভাবেই যে তিনি তাঁর স্নেহ জ্ঞাপন করতেন। অমন স্থায়ী স্নেহ

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

চৌত্রিশ

প্রমথ চৌধুরীর যে [illegible] চিঠি [illegible] [illegible] [illegible] সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ে বহুমূল্য উপদেশ দিয়েছেন এবং [illegible] সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে কেবল স্বতঃ উদ্দীপ্ত মনোভাবই যথেষ্ট নয়, তার প্রকাশ ভঙ্গীতে অটুট থাকা চাই, একথা আমার যে অজ্ঞাত ছিল তা নয়। ক্ষেতে বীজ বপন করলে তবে শস্য জন্মায়, একথা সকলেই জানে, কিন্তু চাষের কাজ করতে গেলে চাষীর কাছে তার টেকনিক শিখতে হয়। হাতে-কলমে সাহিত্য সৃষ্টি করাটা সহজ কথা নয়। গুরু চাই। সংগে রামপ্রসাদের গান কানে ভেসে আসছে: মন তুমি কৃষিকাজ জানো না। আমার মনে আবাদ করলে সোনা ফলত কিনা সন্দেহ। সে-মনে তখনই চন্দ্রগুপ্তের 'ডেট্' নিয়ে ঢেউ উঠেছে। ঐতিহাসিক গবেষণা জিনিসটাকে সাহিত্য বলা যায়, যদি ডিকুইন্সির কথা মেনে নিই যে, সাহিত্যের প্রকারভেদ হচ্ছে, 'লিটারেচার অফ নলেজ' আর 'লিটারেচার অফ পাওয়ার'।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন: "মানুষের ভাবগুলো আসে তার মনশ্চৈতন্য থেকে; অন্ততঃ কবিতা ও রসিকতা সম্বন্ধে একথা যে সত্য, তার আর সন্দেহ নেই।.....যে ভাব সাহিত্যরাজ্যে স্থান পায়, তার জন্মভূমি হচ্ছে মনশ্চৈতন্য।" আমার বিশ্বাস, কেবল কবিতা ও রসিকতা সম্বন্ধেই যে এ-উক্তি প্রযোজ্য তা নয়। জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করে যে-সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সেখানেও ভাব ভূমিষ্ঠ হয়েছে মানুষের মনশ্চৈতন্যে। এ-জাতীয় সাহিত্যে হেতুবাদই প্রধান; কবিতা-রসিকতা জাতীয় সাহিত্যে হেত্বাভাসের জয়-জয়কার। এ দুই জাতির মধ্যে অন্তর্জাতীয় বিবাহের ফলে যে বর্ণ-সংকরের উৎপত্তি হয়, তারও স্থান আছে সাহিত্য-সমাজে। এর কারণ, প্রত্যেক পাঠকের মনে একটা অহেতুকী প্রীতি

আমার বেশ মনে আছে যে, মুসলমানরা বংগসাহিত্যে পদ্য নিয়ে আসে আর ইংরেজরা আনে গদ্য। কথাটা অর্ধ-সত্য বলেই মনে রাখতে পেরেছি, সম্পূর্ণ সত্য হলে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণটাই ভুলে যেতুম। এই "স্টোরি"র মধ্যে হিস্টরির আঁচ থাকায় আমি ক্ষণিকের জন্যে ভেবেছিলুম history বোধ হয় his+story, কিন্তু এ-ধরনের পুস্তিকার একটা সার্থকতাও উপলব্ধি করেছিলেন অনেকে। গভীর গবেষণার ফল সাধারণের বোধগম্য করার চেষ্টা যে কল্যাণকর কাজ, এটা বুঝে প্রমথবাবু মতলব আঁটলেন, হোম ইউনিভার্সিটি সীরিজ-এর মতন একটা সীরিজ বাংলায় বের করবেন। এ-বিষয়ে উনি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিয়েই উৎসাহী হন এবং সম্ভবতঃ দুজনে ঠাণ্ডা মেজাজেই প্রাথমিক আলোচনা করেন টিণ্টোরিয়ায় আশু চৌধুরীর বাড়িতে। প্রমথ চৌধুরীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রে এই নূতন অভিপ্রায়ের সূচনা দেখি।

(৩৬)
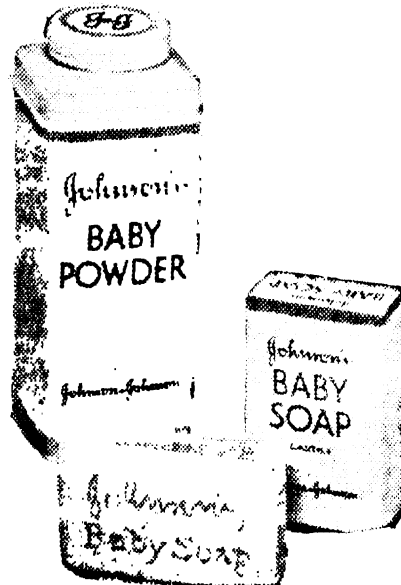
৯, ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৬।৬।১৭

কল্যাণীয়েষু,

কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় আমরা রবিবাবু মহাশয়ের ওখানে, বাংলায় Home University series বার করবার পরামর্শ করবার জন্য সমবেত হব। রবিবাবু মহাশয়ের ইচ্ছে যে, যাঁরা এ বিষয়ে interest নেন তাঁরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকেন। তুমি যদি কাল আমাদের সভায় যোগদান করো ত সুখী হই। বাড়ি অবশ্য জানো তবু ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। ৬ নম্বর দ্বারিকানাথ ঠাকুরের স্ট্রীট—যোড়াসাঁকো। মানিককেও লিখছি চাও ত তাঁর সঙ্গেই আসতে পারো। মানিক ওবাড়ি খুব ভালরকমেই চেনে।

ইতি—
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এই পত্রোক্ত আমি ২৭শে জুন জোড়াসাঁকোতে গিয়ে হাজির হলুম। ঠাকুরদের বাড়িতে এই হল আমার প্রথম অভিযান। প্রমথবাবু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে অবনীন্দ্রনাথ আমায় বললেন যে, আমার ঠাকুরদাদা [illegible] লেখা [illegible] তিনি আগ্রহ করে [illegible] সময়ে, তখন ওঁদের বাড়ির কর্তাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব।

সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলেন [illegible] একটি [illegible] তৈরী হবে, [illegible] এই লেখা হবে এবং [illegible] ভুল হয়। প্রমথবাবু [illegible] এই ছিলেন। এ প্রস্তাবের কার্য পরিচালনা করবার জন্য রবিবাবুর অনুমতি [illegible] আমার ওপর ভার পড়ল। অধ্যাপক মনমোহন ঘোষের সহায়তা চাইলাম। আমি মনমোহন ঘোষের স্নেহপাত্র ছিলাম বলেই এ ভার পেয়ে শিরোধার্য করে নিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর শরীর-মন দুই-ই অসুস্থ থাকায় ও-কাজে তিনি মন দিতে পারেন নি। আমার সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়, অবশ্য ইংরিজীতে, এবং সে-আলাপের কথাগুলো আমার স্মৃতিপটে লেগে আছে। কথোপকথনের প্রথম অংশটি সবুজপাতার ডাকে গত ২৬শে আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশটি এই:

—Rabindranath and Pramatha Choudhury contemplate a series like the Home University Library

Series in Bengali wherein I am commissioned to write a history of English literature of a certain period. May I get your guidance in the matter ?

—What's the use increasing the confusion of tongues in this tower Babel ?

—To what are you refering as the tower of Babel ?

—Why, the British Empire !

—But Bengali is now a world-language, thanks to the Nobel Prize for Tagore.

—One swallow doesn't make a summer !

এরপর আর কি করবার ছিল ?

Physics-এর ওপর বই লেখবার জন্যে সবুজ-দলের সুধীন্দ্র সিংহকে আহ্বান করবার ইচ্ছে ছিল প্রমথ চৌধুরীর, কেন-না সুধীন্দ্র তখন Physics-এ M. Sc. পাশ করেছেন, এবং সুধীন্দ্রের লেখবার ক্ষমতা ছিল। ২৯শে জুন জোড়াসাঁকোর সভায় সুধীন্দ্রকে না পাওয়ায় প্রমথবাবু তার পরদিনেই আমার চিঠি লিখলেন।

(৩৭)

১, ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৭।৬।২৭

কল্যাণীয়েষু,

কাল একটি কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি সেই কথাটা চিঠিতে লিখছি।—

আসছে শনিবারে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তাকে Physics-এর বইখানা লেখবার জন্য ভজাতে চেষ্টা করব। এ কাজটা দেখছি আমাদেরই করতে হবে।

বিদ্যা প্রকাশ করতে হলে, তা সে বিশ্ববিদ্যাই হোক না কেন, বুদ্ধিকে একেবারে বাদ দিলে চলবে না, এবং আমাদের যখন প্রথম বস্তুটি নেই তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, দ্বিতীয় বস্তুটি আছে।

কাল সমস্ত রাত ধরে জর্মান প্রফেসার-দের স্বপ্ন দেখেছি—আর সে কি বিভীষিকা! এখন পর্যন্ত সে স্বপ্নের জের চলেছে। একটু সামলে নিয়ে, পাণ্ডিত্যের মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে কিছু লিখে, তোমার প্রবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দেব। কিন্তু একথা গোপন রেখো—নইলে বিশ্ববিদ্যা ভণ্ডুল হয়ে যাবে

মাণিকের চিঠি পেয়েছি—সে ভদ্রলোকের বড় অসুখ।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩০শে জুন বালিগঞ্জে প্রমথবাবুর ওখানে সোৎসাহে সবুজ-দলের অনেকেই জমায়েৎ হলেন। ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রকেও আমাদের সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিত, এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে

* এটি ভুল তারিখ—২৮।৬।২৭ হবে। খামে ডাক ছাপ দেখে বোঝা যায়। বালিগঞ্জ থেকে ২৮শে জুন বিকেলে চিঠি ছাড়া হয়, আর ডেলিভারি হয় ২৯শে সকালে। সুতরাং এ পত্রের কাল মানে ২৯শে—অর্থাৎ সে-দিন জোড়াসাঁকোর সভা বসে।

এবার
পুজোয়
রঙ-বেরঙের
বিনীর কাপড় চাই
বাড়ীর সবার জন্যে বিনীর কাপড় পাবেন। সুন্দর সিল্কের শাড়ি, আপনার ও আপনার ছেলে-মেয়েদের জন্যে রঙ-বেরঙের কটসউল, চমৎকার সুতীর শার্টিং, ক্রেপ, ড্রিল, তসর ও স্যুটের কাপড়—যার যেমনটি চাই। আজই বিনীর কাপড়ের দোকানে গিয়ে দেখে আসুন।

এত আগে শীতাংশুবাবুর বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। মাধুরী ট্যাঙ্কের বাঁধানো ঘাটের ওপর এসে বসল। দু'দিকে দু'টি লাল রঙের ঘাটলা। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে জলের ধার পর্যন্ত। মাধুরী ডানদিকের ঘাটের এক প্রান্তে এসে পা ঝুলিয়ে বসল। দীঘির কানায় কানায় জল টলটল করছে। 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো মোর হৃদয়নীরে।' এই চোখ-জুড়ানো প্রাণ-জুড়ানো জলকে হৃদয়-নীর বলা যায়। এ দীঘির জলে গাগরী ভরতে কেউ কি আসে? এ পর্যন্ত কোন কলোনীবাসিনীকে জল ভরতে আসতে দেখেনি মাধুরী। জল নিশ্চয়ই কেউ কেউ ভরে নিয়ে যায় মাধুরীরই চোখে পড়েনি। শহরে এক ফোঁটা জলের জন্য মাধুরীরা কাঙাল আর এখানে কত জল। তার সত্যিই ইচ্ছা করে এই অগাধ জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সাঁতরায়, ডুবসাঁতার কাটে। তারপর জলভরা পিতলের কলসী কাঁখে নিয়ে ভিজে শাড়ি চুপচুপ করতে করতে বাড়ি ফেরে।

সে যেন আর এক জীবন, আর এক জন্ম। এই প্রখর নাগরিকতার স্বাদ তাতে নেই। কিন্তু তা বড় স্নিগ্ধ সজল আর সরস। এই মেঘকজ্জল দিবসে আর এক জন্ম নিতে সাধ যায় না কার।

চারদিক বড় নির্জন, খুব চুপচাপ। কলোনীর এদিকটায় বসতি কম। তাছাড়া, থেকে থেকে বৃষ্টি আসছে বলে কেউ হয়তো তেমন ঘর থেকে বেরোয়নি। এখনো বেশ রোদ থাকবার কথা। কিন্তু আকাশে মেঘের অনাগোনা আছে বলে সেই রোদের আভা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, তাপ আর নেই। বেড়াবার মতই সময়। জায়গাটাও বেশ। কিন্তু একা একা ঘুরে বেড়াতে কি আর সব সময় ভালো লাগে? যদি কেউ সঙ্গে থাকত বেশ হত। কিন্তু এ সময় কে আবার থাকবে? অরুণাকে বললে ও নিশ্চয়ই আসত। কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কাটিয়ে ও যেত। এই স্কুলে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা মাধুরীর ওর সঙ্গেই। তবু মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গ তেমন যেন ভালো লাগে না। কেন যেন এড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করে। অরুণা হয়তো বসে বসে [illegible] ভাইদের কথাই বলবে। সমস্যা অনেক জটিল। তার বৈচিত্র্যও বেশি। তবু মাধুরীর ভয় হয়, এই মুহূর্তে ওসব আলোচনায় সে হয়তো পুরো মনোযোগ দিতে পারবে না। অরুণার সহানুভূতির আবেগ তার [illegible] উঠবে না। অরুণা ক্ষুণ্ণ হবে, মাধুরী নিজেও কি তাতে কম লজ্জা পাবে? তার চেয়ে অরুণাকে না ডাকাই ভালো হয়েছে। এমন সময় মাঝে মাঝে আসে যখন কাউকে মনের গোপন [illegible] জানাতে [illegible] যায় না। [illegible] একা [illegible] কাটিয়ে দেয়। [illegible] হাসতে [illegible] কি [illegible] নিজের [illegible] পারবে না। তার চেয়ে নিজের মনে নিজের মুখোমুখি সে থাকা ভালো। নিজের সত্তা দ্বিখণ্ডিত করে আর একজনকে [illegible] নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেওয়া এখন বরং অনেক নিরাপদ। দুই সখী দুই পাখির মত মুখোমুখি। এক পাখি রঙীন ফলটি ঠোঁটে করে নিয়ে আসতে চায় আর-এক পাখি বলে না না না না। এক পাখি উড়তে চায়, আর-এক পাখি বলে না না না। এক পাখি মরতে চায়, আর-এক পাখি বলে না না না না। নিজের মধ্যে সেই দুই পাখির কিচিরমিচির শোনা বরং অনেক ভালো। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে, ঠোকরাঠুকরি করবে, একজনের আঘাতে আর একজন ক্ষতবিক্ষত হবে তবু একজনের গোপন ব্যথা কেউ আর পাঁচজনের কানে দেবে না। তারা যে দুইয়ে মিলে এক,

তারা যে পরস্পরের পরিপূরক। ঝগড়াটাও তাদের লীলা। নিজের ভিতরের সেই দ্বিতীয় পাখি ছাড়া এমন বিশ্বাসী বন্ধু মাধুরী আর কাকে পাবে। অসীম একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোমরা দুজনে ঠিক যেন দুটি পাখি।' একদিন বলেছিল ফুল, আর একদিন বলেছিল পাখি। মেয়েদের সঙ্গে পৃথিবীর যত কোমলতার তুলনা। মেয়েরা যেন সব সময়ই নরম, স্বভাব-কোমলা। মাধুরী নিজের মনে হাসল। পুরুষে তাদের কোমল রূপে ভাবতে বড় ভালোবাসে। মেয়েরা ননীর কোমলা হলে তাদের চোখে বড় ভালো লাগে। কিন্তু মেয়েরা যে সব সময় তা থাকে না থাকতে পারে না, তা কি আর মাধুরী জানে না? তবু না পারলেও সেজে থাকতে হয়। ওটা মেয়েদের স্বভাব [illegible]। মানসী বড় চাঁচাছোলা কথা বলে, রুক্ষতা ওর ভাষায়। মাধুরী কতদিন বলেছে, 'মানু, অমন করিসনে, মেয়েদের অমন স্পষ্টবাদিতা শোভা পায় না। তাদের পক্ষে বরং অস্পষ্টতা ভালো, আড়ালে থাকা ভালো। আর একটু সাজ-সজ্জা না হলে মেয়েদের মানায় না। তুই যে হাতে কিছু পরিসনে, গলায় কিছু পরিসনে, কানে কিছু পরিসনে এওটা কাঠখোট্টা ভাব কিন্তু আমার ভালো লাগে না। অমন যদি তোর ধরনধারণ হয় তোকে লোকে বলবে পুরুষালী মেয়ে। তা কি খুব ভালো শোনাবে? এদিক থেকে মার সঙ্গে কিন্তু আমার মতের মিল আছে।'

মানসী হেসে বলে, 'শুধু মা কেন, দিদি তোর মতামতের কথা শুনলে তোকে ঠিক দিদিমা বলে মনে হয়। মেয়েদের একেবারে মেয়ে হয়ে থাকবার দিন কি আজও আছে! দিদি, তুইও তো মা-দিদিমার মত ঘরে বসে থাকতে পারিসনি। কি বাবা যে কোন ছেলেকে জামাই করতে চাইলেও তুই তাতে রাজী হয়ে মনের সুখে ঘর-সংসার শুরু করে দিসনি। তুইও অফিসে বেরোচ্ছিস পুরুষের ভিড় ঠেলে, বাসে উঠছিস। তাদের ছোঁওয়া, তাদের তাকানো যে নিষিদ্ধ হেম নয় তা জেনেও তাদের সঙ্গে যাচ্ছিস, পাশে বসছিস। মা-দিদিমার যাতে জাত যেত তোর তাতে জাত যায় না, আমারও যায় না। আমি যদি পুরুষালি মেয়ে দিদি, তুই-ই বা তা নয় কিসে?'

মাধুরী একটু ভেবে জবাব দিয়েছে, 'দেখ, এ যুগে কাজ আর আমাদের ছেলেদের চেয়ে আলাদা হবে না। কিন্তু কাজ একরকম হলেও আমাদের আকৃতি যেমন আলাদা থেকে যাবে, প্রকৃতিও তেমনি আলাদা থাকবে। আর এইটুকু আলাদা ভাব দরকারও। নইলে ছেলে আর মেয়েতে ভাব হবে কী করে?'

মানসী হেসে বলেছে, 'দিদি, তোর শুধু বই পড়া বিদ্যে। আমি বইয়ের রাজ্যে বাস করি, কিন্তু বই পড়বার সময় পাইনে অন্তত তোর মত। অত সময় আমার নেই। খুব রুচি আছে তাও নয়। ময়রায় যেমন সন্দেশ খায় না, আমিও তেমনি। কিন্তু ওদের তো বেশ আলাদা ভাবেই দেখলাম, কোন ছেলের সঙ্গে তেমন ভাব জমতে তো দেখলাম না।'

এ কথায় মাধুরীর বুকে যে-আঘাত লেগেছিল মানসী তা টের পায়নি। অবশ্য সে তাকে টের পেতেও দেয়নি। বরং তেমনি সাধারণ কৌতুকের হাসিতে ঢেকে রেখে বলেছে, 'মানসী, আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।'

কিন্তু সত্যি কলেজে পড়তে এবং এতদিন ধরে চাকরি করতে এসে বাইরে যে [illegible] ... একটু অন্যরকম [illegible] ... এই ধরনের [illegible] ... মানসী। [illegible] ... একরকম [illegible] হয় না।

মানসী [illegible] ... দিদি [illegible] ... মেয়েরা পুরুষের [illegible] ... পরিবর্তনহীন রূপের [illegible] আমার তো মনে হয় না। দিদি কালের ধরন পুরুষকেও বদলে দেবে, মেয়েকেও

বদলে দেবে, হয়তো পোশাক টোশাকও অনেকটা একরকম করে দেবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়?'

মাধুরী ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলেছে, 'কিছুই এসে যায় না?'

মানসী মাথা নেড়ে বলেছে, 'না। পোশাকে একরকম হলেও ওরা আমাদের আলাদা বলে চিনতে পারবে। বিদেশী মেয়েদের মত হয়তো আমরাও একদিন ছোট চুল ছাঁটব। তোর চুলের গৌরব বেশি, যত্ন বেশি, একথা ভাবতে তোর হয়তো কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু একদিন আমাদেরও এসব দরকার হবে। তুই যদি বা পার পেয়ে যাস, আমার বোনঝি পারবে না। কিন্তু তার দাদাবাবা তখন তার সেইরূপ দেখেই মুগ্ধ হবে। সে ঘাড়ছাঁটা চুলই রাখুক আর আমার মত কিলকুন্তলা হয়েই ঘুরে বেড়াক, আমার বোনঝির দাদার নিশ্চয়ই তাকে আমার বোনপো বলে ভুল করবে না। তার চোখের হাসি, তার মুখের হাসি, তার গলার স্বর, তার ভালোবাসার ধরন নিশ্চয়ই তাকে ধরিয়ে দেবে যে, সে মেয়ে। তা ছাড়া তাকে এখনকার স্ট্যান্ডার্ডের মেয়েলী মেয়ে না হলেও চলবে।'

মাধুরী ছোট বোনের সঙ্গে তর্কে পারবে না। কিন্তু মন সায় দেয় না তার। হার কোনও দিন মানতে চায় না। 'তুই [illegible] [illegible] আলাদা করে [illegible] দরকার নেই।'

মানসী [illegible] দিয়েছে, 'এখন [illegible] দরকার নেই। [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] হবে।'

মাধুরীও চুপ করতে জানে না। [illegible] বলেছে, 'আজকাল তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে না পুরুষ বীরেরা। তুই তোর বীরের হাতে বরং কামান-টামান, তাও প্রায় অবসোলিট হবার পথে চলেছে, তুই তার হাতে তুলে দিবি এটম বম, নাইট্রোজেন বম। থাকলেও, একটু কম মারাত্মক হলে কিছু চলবে না।'

মানসী সংক্ষিপ্ত, 'দেখা যাক।'

আজ মাধুরীর মনে হচ্ছে, অসীম কি সেইরকমের বীর যে, নারীকে তরবারির মত ব্যবহার করতে জানে, কি তরবারি হিসেবেই পেতে চায়? পুলিশে কাজ করলেও অসীম কি বন্দুক ধরতে জানে, কি সৈনিকের তেজ তার আছে? বোধ হয় না। মাধুরী অসীমকে যতদূর চিনেছে সে তেমন ধরনের

বীর না। মানসী তার বীর পুরুষকে যত রণসাজেই সাজাতে থাক সে সজ্জা তার গায়ে মানাবে না। মানসী তা কি নিজেই জানে না? কিন্তু তবু যেন মেনে নিতে পারে না সে। কেবল খুঁৎখুঁৎ করে, কেবল খুঁৎ ধরে। যে-সমাজে পুরুষ নিজের রুচি অনুযায়ী মেয়েকে গড়ে, তার নিজের মনের গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে মনোরমা করে তোলে সেই সমাজে, সেই দেশে বাস করেও মানসী যেন তার ভালোবাসার পুরুষকে নিজের আশার-আকাঙ্ক্ষার কল্পনার প্যাটার্ন দিতে চায়।

মাধুরী কতদিন তাকে বলেছে, 'মানু, সব মানুষ সমান হয় না। সব পুরুষ বীর পুরুষ হয় না।'

মানসী বলেছে, 'কী যে বাজে কথা বলিস দিদি। যে পুরুষ বীর নয়, সে পুরুষই নয়।'

মাধুরী অবাক হয়ে গেছে। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে যে আদরের কাছে ছোট করা চলে, খাটো করা চলে এমন ধারণা মাধুরীর ছিল না। যে ভাবে যাকে ভালোবাসব তাকে শ্রদ্ধা করব, সেই শ্রদ্ধা যদি তাকে না দিতে পারি তাহলে কত কাঁটা যে মনের থেকে যাবে তার আর ঠিক নেই।' কিন্তু মানসীকে দেখে যেন মনে হয় ওর এই বীর বাসনা ভরা ভালোবাসার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের ঘৃণা, অনুকম্পা আর অশ্রুধারার খাদ মিশানো আছে। তাতে কোন রসায়নের সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা মাধুরী জানে না। কিন্তু ওদের সম্পর্ক যে জটিল হয়েছে তা বেশ বুঝতে পেরেছে। মাধুরীর মনে হয় হয়তো এই জন্যেই মানসী চট করে বিয়েতে রাজী হচ্ছে না। দিদির বিয়ের সমস্যা এবং আরও পাঁচটা পারিবারিক দায়িত্বকে জুতসই অজুহাত হিসেবে খাড়া করে রেখেছে। ওর মনে যদি কোন দ্বিধা না থাকত তাহলে মানসীও দাদা বউদির মত পালিয়ে গিয়ে, অন্য কোন কথা বিচার বিবেচনা না করে অসীমকে বিয়ে করে ফেলত। সেই ভালোবাসা হল বন্যার স্রোতের মত। সেই স্রোতে বাপ-মা ভাই-বোন, জাতকুল মান সম্মান কুটোর মত ভেসে যায়। তেমন করে ভেসে যেতে কেমন লাগে মাধুরী জানে না। কিন্তু সেই ভেসে যাওয়ার কথা পড়তে ভাল লাগে, শুনতে ভালো লাগে, সেই ভেসে যাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বন্যাস্রোত দেখেও আনন্দ। মাধুরীর মনে হয় মানসী ভালোবেসেছে কিন্তু ভেসে যেতে পারেনি। পৌরুষের আদর্শের, বীরত্বের আদর্শের তুরোপাহাড়ে প্রেমের তরণী আটকে রয়েছে।

মাধুরী বোনকে কতদিন বুঝিয়েছে, 'মানু, বীরত্ব তো একরকমের নয়। সবাই যে যোদ্ধা হবে তার কি মানে আছে?'

মানসী হেসে বলেছে, 'দিদি তুই কি সত্যিই ভাবিস আমি ওকে আর্মিতে ভর্তি হতে বলছি, বন্দুক হাতে নিয়ে ও সীমান্ত রক্ষা করুক তাই চাইছি? আর্মিতে নয়, নেভিতে নয়, এয়ারফোর্সে নয় আমি তাকে কোথাও যেতে বলিনে। আমি এমন কথাও তাকে বলিনে, তোমাকে পাঁচ শ' টাকা, সাত শ' টাকা কি হাজার টাকা মাইনের চাকরি এখনই করতে হবে। অবশ্য টাকাটা যে সংসারে তুচ্ছ না, ঘরসংসার করতে হলে তার দরকার আছে সেকথা সেও জানে আমিও জানি। আমার কথা, যে-চাকরি তার ভালো লাগে না, যে কাজ তার যোগ্য নয়, সে কাজ সে ছেড়ে দেয় না কেন? পৃথিবীতে আর কি কোন কাজ নেই যে কাজ তার যোগ্য, যে কাজের সে যোগ্য? তার চিঠিগুলি যদি তুই দেখিস দিদি, যে কাজ সে করতে জানে না তার চিঠিতে কেবল সেই কাজের কথা। কেবল আক্ষেপ আর হাহাকার। শুনে শুনে

মাধুরী এ সব অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছে, 'কিছু বরিক কটন কিনে নিজের কাছে রেখে দিলেই পারিস।'

মানসী একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে, 'হাসিসনে দিদি, হাসবার কথা নয়। আমার কাছে বীরত্ব মানে আত্মপ্রত্যয়। তারই নাম পৌরুষ। সে পৌরুষ পুরুষেরও চাই, মেয়েরও চাই। সে মেয়েকে তুই যদি পুরুষালি মেয়ে বলে নাম দিস আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমি যার ওপর নির্ভর করব সে যদি নিজের ওপর নির্ভর করতে না পারে কি না চায় তাহলে উপায় কি হবে।'

বোনের মনোভাব ভালো করেই জানে মাধুরী। শুধু ভেবে পায় না অসীমের যোগ্যতা সম্বন্ধে এতই যদি হীন ধারণা মানসীর তাহলে তাকে সে ভালোবেসেছিল কোন গুণে? না কি গুণে নয় শুধু রূপে? নিজে রূপসী বলে আর কিছু না দেখে না শুনে সে কি রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়েছিল? এখন আর ডুব দিতে ভরসা পাচ্ছে না? লোনাজল চোখে মুখে লাগছে? সমুদ্রের স্বাদ আর স্বাদু নয় এখন? না কি অসীম মানসীর কাছে এখন আর সমুদ্রই নয়। অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার চৈত্র বৈশাখের খাল বিল মাত্র? নামতে না নামতেই টের পেয়েছে জল হাঁটুর ওপরে ওঠে না। বৃথাই আর একজন ডেকে চলেছে 'যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো এই গহনতলে।'

কোন উপন্যাস পড়বার পর তার নায়ক-নায়িকার চরিত্র এবং পরস্পরের সম্পর্কে কথা যেমন নিজের মনে কখনো কখনো বিশ্লেষণ করে মাধুরী আজও তাই করল। করে একটু তৃপ্তি পেল। সে যেন এই উপন্যাসের কেউ নয়। শুধু এক নিরপেক্ষ পাঠিকা। আলোচনা আর সমালোচনা ছাড়া যার কিছু করবার নেই যার অন্য কিছুতে আগ্রহও নেই। একটু আগে নিজের মনে

ধর্মতত্ত্ব

দীক্ষিতের নিত্যকর্ম ও উপাসনা—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, বি এ কর্তৃক সন্তোষপুর মডার্ন কলোনী, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫.।

হিন্দুর ধর্মের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—দৈনন্দিন এইসব কর্ম বা নিত্যকর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের বিধান আছে। দীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারটি কি এবং দীক্ষা গ্রহণের পর কিরূপে জপ-যজ্ঞাদি সাধন ভজন করিতে হয়, আলোচ্য গ্রন্থে তৎসম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান বিস্তৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বর্গতঃ শ্রীমৎ ... ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য। তিনি শাস্ত্রবিধির মর্মজ্ঞ এবং ... প্রাণী পুরুষ। গ্রন্থখানিতে শুধু শাস্ত্রীয় বিধান বা বিভিন্ন ... সাধকদের পক্ষে অনুষ্ঠেয় কর্মাদির মন্ত্রাদিই সংকলিত হয় নাই, গ্রন্থকার প্রত্যেকটি বিষয় কর্মের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ... করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির দ্বারা দীক্ষিত বা দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু, যাঁহারা, শুধু তাঁহারাই যে উপকৃত হইবেন, তাহা নয়, ... দীক্ষাদানপ্রণালী নির্ভুলভাবে দীক্ষাদানের সুযোগ পাইবেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর নিত্যকর্ম, পূজা, ধ্যান, জপ প্রভৃতির সব অনুষ্ঠানের পক্ষে আবশ্যক মন্ত্রাদি পুস্তকখানিতে সংকলিত হইয়াছে, প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া কোনটিই বাদ যায় নাই। ইহা ছাড়া, কুণ্ডলিনীতত্ত্ব বা ষট্‌চক্র ভেদের ন্যায় সাধারণের পক্ষে দুরূহ তত্ত্বটি গ্রন্থকার বিশদ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। সাধন-জীবন নামক অংশের আলোচনা পাঠে সকলেই অধ্যাত্ম-জীবনের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অনুভূতি লাভে উপকৃত হইবেন। পুস্তকের ছাপা কাগজ এবং বাঁধাই সুন্দর, তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, পুস্তকখানি নির্ভুল। ২৪৯।৫৯

জপসূত্রম—শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা। মূল্য—৫.।

'জপসূত্রম' গ্রন্থের এই বিপুলায়তন পঞ্চম খণ্ড পাঠ করে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত

হতে হয়। বইটি কারিকাসম্বলিত এবং বাংলা ভাষায় বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদ সহ প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্ম একটি অনুভূতিসংবেদ্য বিষয়, কিন্তু [illegible] বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অতুলনীয় ধর্মকাব্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাই ভক্তি ও যুক্তির অপূর্ব সমাবেশ। আলোচ্য বইটিতেও লেখকের ভক্তি ও যুক্তির একটি সমন্বিত পরিচয় ফুটে উঠেছে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর সেই সমন্বয়ের দাবি যেন আরো বেড়ে গেছে। পাশ্চাত্ত্যের জীবন-জিজ্ঞাসা ও প্রাচ্যের জীবন-সমাধান আধুনিক মানুষের মানসিকতায় একটি সদুত্তর চায়। বস্তুত উনিশ শতকের সংস্কারক মনীষীবর্গের জীবনবোধে এই সদুত্তর শ্রবণের আগ্রহ সর্বপ্রথম উদ্রিক্ত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতেও সেই আগ্রহের ধারা যে প্রবহমান, এই গ্রন্থখানি তার উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। ভূমিকা-রচয়িতা অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'তাঁহার সমন্বয়ী দৃষ্টির স্বচ্ছ আলোকে বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাদি প্রাচীন অধ্যাত্মশাস্ত্র, এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিও এক অখণ্ড তাৎপর্যে সমুদ্ভাসিত।' উক্তিটি যথার্থ। স্বামীজী দর্শন ও বিজ্ঞানে সব্যসাচী। প্রসঙ্গত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নাম মনে পড়ল। 'তপস্যাত্রয়' গ্রন্থের সবগুলি খণ্ডই যে-কোনো শিক্ষার্থী, ধর্মজিজ্ঞাসু ও সৎ পাঠকের কাছে থাকবে—একথা আশা করা যায়। এরকম গ্রন্থের বিপুল সমাদর আমাদের একান্ত কাম্য। লেখক আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ৫৩০।৫৮

শ্রীমন্দাক্ষিণাকালিকা দেবীর যৌগিকতত্ত্বে সাম্যবাদ বা ব্রহ্মবাদ—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ত্রসেবক। ৩৬৬।৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য—২৲

তন্ত্রসেবক লেখক এই গ্রন্থে মন্ত্র, ধ্যান, গায়ত্রী, অন্তর্হোম প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের আলোচনা করেছেন। মূলে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে টীকা-টিপ্পনিসহযোগে লেখক যে ব্যাখ্যা দান করেছেন, তাতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ধর্মপ্রবণ পাঠকমহলে সমাদৃত হবে। ৬২৬।৫৮

দিব্যজীবনের সন্ধানে—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। দু' টাকা।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও প্রাপ্তির মূলকথা ছোট বইখানির মধ্যে বিবৃত হয়েছে এবং লেখক বলেছেন, এ বইখানি পড়ে যাঁদের মনে [illegible] উৎসুক্য জাগবে তাঁরা সরাসরি মূল গ্রন্থগুলি পড়বেন, এবং তখন হয়তো সহজেই তার অর্থ বুঝতে পারবেন। পর পর পাঁচটি অধ্যায়ে [illegible] থেকে [illegible] [illegible] ও [illegible] আলোচনা [illegible] লেখক [illegible] মনে হয় না [illegible] এই প্রসঙ্গের কথা [illegible]। [illegible]।৫৮

পারের কড়ি—[illegible] [illegible] [illegible] কর্তৃক ৬০ [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই আলোচ্য পুস্তকখানির প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড পরে প্রকাশিত [illegible] ফুরাইয়া গিয়াছে। প্রকাশকগণ [illegible] এই পুস্তকের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড একত্র করিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন এবং পৃথকভাবে উভয় খণ্ডের [illegible] আলোচ্য যুক্ত সংস্করণের মূল্যও কম করা হইয়াছে। জনসাধারণের আগ্রহ মিটাইবার জন্য তাঁহাদের এই আয়োজন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। শ্রীমৎ [illegible] ব্রহ্মচারিজী সাধক পুরুষ। তিনি বাংলাদেশের ধর্মাচার্যগণের মধ্যে অন্যতম স্বরূপে সর্বত্র সম্পূজিত। তাঁহার উপদেশাবলীর এইরূপ সমাদর, আমাদের সমাজ জীবনের সমুন্নতির সম্বন্ধে আমাদিগকে আশান্বিত করে। কারণ আমাদের চিন্তা জগতের গভীর অনুধ্যানমূলক প্রেরণা লাভে আমাদের

অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেন না।

এদিকে মধুমালার অনুপস্থিতিতে রবীন যায় তার বস্তির বাড়িতে। মধুমালার মতো বোনের শিশুপুত্র মধুমালাকে 'মা' বলে পরিচয় দেওয়ায় রবীনের মনে দেখা দেয় এক ঘৃণ্য সংশয়, যার বীজ শঙ্করাই একদা তার মনে বপন করেছিল। দুঃখে ঘৃণায়

রবীন চলে যায় বিলেতে—চিঠিতে তার প্রেমিকাকে কুৎসিত ইঙ্গিতে আঘাত করে যায়।

জীবনের দুঃখের পাট চুকিয়ে দিয়ে মধুমালা গভীরভাবে মন দেয় তার সাধনায়। কেটে যায় বেশ কয়েকটি বছর। ক্যান্সার নিয়ে মধুমালার গবেষণা একদিন দেশে-বিদেশে আলোড়ন আনে, বিশ্বের সুধী-সমাজ তাকে অভিনন্দন জানায়। মধুমালা তখন ডাঃ মধুমালা মিত্র। ডাঃ রায়ও জীবন-সন্ধ্যায় তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি পান বিশ্বের দরবারে।

মধুমালা ও তার গুরুর জীবনের এই গৌরবলগ্নে একদিন তাদের সঙ্গে এসে দেখা করে বিদেশ থেকে সদ্য-প্রত্যাগত রবীন। সে এখন প্রৌঢ়। মালার কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নেয় তার অতীতের ভুলের জন্য। রবীন তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে ডাঃ রায়ের গবেষণাগারের উন্নতিকল্পে। ডাঃ রায় ও ডাঃ মধুমালার সাফল্যে গভর্নমেণ্টও এগিয়ে আসে এই গবেষণাগারকে সাহায্য করতে। মালা ও রবীন পরম উৎসাহে এই গবেষণাগারকে কেন্দ্র করে লোককল্যাণের ব্রতে আত্মনিয়োগ করে। মধুমালার বোনের ছেলে [illegible] গড়ে [illegible] প্রসন্নর [illegible]। এই [illegible] মালা ও রবীনকে। আর প্রিয় শিষ্য-শিষ্যার উপর সব রকমের ভার অর্পণ করে পরপারের ডাকের প্রতীক্ষায় দিন গোনেন ডাঃ রায়।

ছবির কাহিনী একদিকে যেমন আবেগের রসে অভিষিক্ত, অন্যদিকে তেমনি সমাজ জিজ্ঞাসায় [illegible]। [illegible] আবেগের দিকটা [illegible] প্রসন্ন ও মধুমালার [illegible] ও [illegible] উৎকণ্ঠায়, [illegible] জীবনের দুঃখ-বেদনা ও আশা-[illegible] পরিচালক সুশীল মজুমদার প্রত্যেকটি নাট-[illegible] আবেগ-[illegible] কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে উপস্থিত করেছেন। [illegible] কয়েকটি মর্মস্পর্শী নাট্য-মুহূর্ত রচনার কৌশল দেখিয়েছেন তিনি, এবং এর ফলে ছবিটি রসগ্রাহী দর্শকদের কাছে সহজ, নিশ্চিত আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কাহিনীর বিন্যাসে ডাঃ রায়ের কাছে মধুমালার জীবনকাহিনী বর্ণনার সূত্র ধরে ফ্ল্যাশব্যাকের সংযোজনটি অনাবশ্যক মনে হয়েছে কারণ এ ঘটনা প্রসন্নর মুখে আগেই শোনা গেছে। চিত্র-রূপায়ণে আরও দুয়েকটি অপ্রয়োজনীয় অংশ থাকলেও ছবিটির গতি স্বচ্ছন্দ এবং এর জন্যে পরিচালকের সঙ্গে চিত্রনাট্যকার মনোজ ভট্টাচার্যও ধন্যবাদার্হ।

ক্যামেরার ঝোঁক কোনদিকে তার পরিচয় মেলে ছবির গোড়াতেই—[illegible] বর্তমান

সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৫০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিজয়ী হন।

১৯৪৫ সাল—আন্তঃ কলেজ সাঁতারের একাধিক বিষয়ে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৭ সাল—বোম্বাইতে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাঙলার পক্ষে নির্বাচিত হয়ে ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিজয়ী হন।

১৯৪৮ সাল—লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। লণ্ডন অলিম্পিকে বিমল চন্দ্র ছিলেন ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের প্রতিযোগী।

১৯৪৯ সাল—৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে আন্তঃ কলেজ রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে এই দুই বিষয়েই বিজয়ী হন।

১৯৫০ সাল—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং জাতীয় সাঁতারে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে ৪০০ ও ১৫০০ মিটারে শুধু বিজয়ীই হন না, ৪০০ মিটারে শচীন নাগের ও ১৫০০ মিটারে মদন সিংহের ভারতীয় রেকর্ড ভেঙে দেন।

১৯৫১ সাল—নতুন দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমে ভারতের পক্ষে ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৪০০ মিটারে লাভ করেন তৃতীয় স্থান।

১৯৫২ সাল—মাদ্রাজে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে বিজয়ী হন।

১৯৫৪ সাল—রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটারে ফ্রি স্টাইলে প্রথম স্থান লাভ করেন।

১৯৫৬ সাল—জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন।

সাঁতারে কৃতিত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিমল চন্দ্র চিকিৎসা শাস্ত্রের কষ্টসাধ্য অধ্যয়নেও সমানভাবে এগিয়ে গেছেন। ইনি আর জি কর মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কলেজ থেকেই ১৯৫২ সালে এম বি বি এস ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ সুবোধ মিত্রের তত্ত্বাবধানে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডাঃ চন্দ্র ডি জি ও উপাধি লাভের জন্য চেষ্টা করছিলেন। প্রধানত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার জন্যই ইনি লণ্ডন গিয়েছেন। তবে লণ্ডনে প্রসূতি চিকিৎসায় এম আর সি ও জি ডিগ্রী লাভেরও এর বাসনা আছে। খেলাধুলো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলে অনেকের ভুল ধারণা আছে। কিন্তু চেষ্টা থাকলে লেখাপড়া এবং খেলাধুলো উভয় বিষয়েই যে কৃতিত্ব অর্জন করা যায় ডাঃ বিমল চন্দ্র তার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। থাক সে কথা।

ডাঃ বিমল চন্দ্র ও কুমারী আরতি সাহা ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে গিয়েছিলেন বিলি বাটলিন প্রবর্তিত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য। বাটলিন রেসে সাহায্যকারী বোটের অভাবে ডাঃ চন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি আর ভাগ্যদোষে কুমারী আরতি সাহা ডোভারের কাছাকাছি এসেও জল থেকে উঠে পড়তে বাধ্য হয়েছেন, এ খবর আগেই

তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!
সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা
২৫,০০০ টাকার
চমৎকার পুরস্কার!
২টী
প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার
ভেতর সারা ভারত
ভ্রমন বা নগদ
৪,০০০ টাকা
চারটী
২য় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি.
রেডিওগ্রাম
৬ টী
৩য় পুরস্কার
মার্ফী অল
ওয়েভ রেডিও
এবং একটি
করে হিন্দ র‍্যালে
সাইকেল
২,০০০
অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার
রঙের বাক্স
বা
ডল পুতুল
অভিভাবকরাঃ আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সানলাইটের প্রতিটী মোড়ক পাঠিয়ে তারা সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।
এই প্রতিযোগিতা দুটী বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্য্যন্ত। এই দুটী বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অন্য পুরস্কার যারা পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।
তাড়াতাড়ি করো
শেষ তারিখঃ ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।
বিনামূল্যে আপনার সানলাইট বিক্রেতার কাছ থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে আসুন। প্রতিটী প্রবেশপত্রে একটা সুন্দর ছবি আছে তাতে আপনার ছেলেমেয়েদের রঙ লাগাতে হবে! যে রকম রঙ তাদের ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।
SUNLIGHT SOAP
অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।
S/9-X52 BG

এই তিনটি কারণে টেক কেনাই উচিত !

একমাত্র টেক টুথব্রাশেই পাবেন—

★ মিরাকল গ্রিপ হ্যাণ্ডেল
আরামে ধরবার জন্য

★ পছন্দমত ২ রকমের মাথা
ওভাল ও শর্ট ওভাল

★ 'কীটন'-এর কুঁচি
ভালভাবে দাঁত পরিষ্কারের জন্য
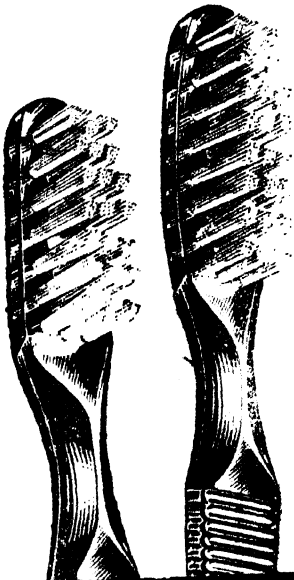
তাই টুথব্রাশ কেনতে হ'লে—সবসময় **টেক**-ই নেবেন !

জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

TEK 9168

সূচীপত্র

২টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

শেষ-সন্ধ্যা
বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক রচনা

সহরতলীর মেয়ে
শক্তিধর লেখনীর অনন্য উপন্যাস

লিখেছেন দু'জন স্বনামধন্যা মহিলা সাহিত্যিক

১টি বড় গল্প

৭টি ছোট গল্প

যাঁরা লিখেছেন :— প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রতিভা বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, গীতা গুহ, শিবানী ঘোষ, আশা দেবী, হাসিরাশি দেবী, ডঃ উমা দেবী, বেলা দে, ইন্দিরা দেবী, ঊষা দেবী সরস্বতী, শিবরাম চক্রবর্তী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী, লীলা মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, বিমল সাহা, সুপ্তা সেন ও আরও অনেকে।

আরও
প্রবন্ধ, কৌতুকী, রম্যরচনা ভ্রমণ

শারদীয়া : ১৮৮১

দাম মাত্র দু টাকা

আধুনিকাদের জন্য — মডার্ণ ফ্যাসন, কবরী বন্ধন, সাজসজ্জার রুচি
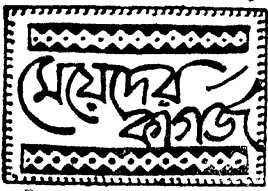
নতুন ধরণের সেলাই বোনা
অনিল ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত গান ও স্বরলিপি সমেত মনের মত গান

৪টি

এছাড়া প্রতিটি নিয়মিত বিভাগ

ছবি ও কার্টুন আঁকছেন — অন্নদা মুন্সী, সতীন্দ্র লাহা, অরুণ রাহা বাদল ভট্টাচার্য, নরেন রায়, কান্তিতুষার

১লা অক্টোবর প্রকাশিত হবে

এজেন্টগণ অবিলম্বে অর্ডার দিন। নির্দিষ্ট সংখ্যা অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর অর্ডার গ্রহণ করা হবে না।
ভিঃ পিঃ করা হবে না।
রেজেষ্ট্রি ডাকে ২·৬৪

কার্যালয়—২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

(সি ৯০৯৫)

মাসিক রহস্য পত্রিকা

শারদীয়া সংখ্যা : দাম আড়াই টাকা

—এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ—

দুইটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। লিখেছেন :

বিমল কর
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ছোট গল্প লিখেছেন :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সন্তোষকুমার ঘোষ
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবোধবন্ধু অধিকারী । অজয় দাশগুপ্ত ।
গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । রঞ্জন রায় ।
অশোক মুখোপাধ্যায় । বিমল সাহা ।
অনিল চট্টোপাধ্যায় । কানু ঘোষ ।
জয়দেব রায় । জগদীন্দ্র মজুমদার ।

২৫শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে। সডাক তিন টাকা।

॥ ভি পিতে পত্রিকা পাঠানো হবে না ॥

মাসিক রহস্য পত্রিকা
১৬৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া

শারদীয় বেতার জগৎ

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

আগাগোড়া মূল্যবান সুপার-ক্যালেণ্ডারড্ ও আর্ট পেপারে মুদ্রিত এবারের শারদীয় বেতার জগতে দুইটি পূর্ণাংগ উপন্যাস লিখেছেন :

১। মনোজ বসু ২। সমরেশ বসু

একটি বড় রহস্য কাহিনী লিখেছেন : ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত

ছোটগল্প লিখেছেন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। আশাপূর্ণা দেবী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। রমাপদ চৌধুরী। বাণী রায়। বেচু প্রামাণিক। সন্তোষকুমার দে। সুশীল রায়।

এবং

অসমীয়া, তামিল, গুজরাতী ও তেলুগু ভাষার নির্বাচিত আধুনিক ছোট গল্পের সংকলন।

॥ কবিতাবলী ॥ রাধারাণী দেবী; গোবিন্দ চক্রবর্তী; উমা দেবী, কৃষ্ণ ধর; আনন্দ বাগচি।

অন্যান্য রচনাবলী

রূপকথার বাংলা : ডক্টর কল্যাণকুমার গংগোপাধ্যায়। **ভারতের আদিবাসীদের লোককাব্য :** ডক্টর ভেরিয়ার এলুইন। **লোকশিল্প ও চারুশিল্প :** অসিতকুমার হালদার। **আধুনিক যুদ্ধ : ছয়টি পর্যায়ে আলোচনা :** জেনারেল কে. এম. কারিআপ্পা। **উত্তর বিহারের এণ্টিলোপ ও কালোহরিণ :** ই. এম বেদী। **চম্পাবণের একশিংযুক্ত গণ্ডার :** এম. ভেংকটেশ্বরম। **দাবা খেলার কাহিনী :** পি. সি. যোসেফ। **মনে রাখার মতো মানুষ :** অমল হোম। **বিজ্ঞাপন ও ক্রেতা :** ডি এ অর। **সমকালীন শিল্পী :** গোপাল ঘোষ, হেব্বার, লক্ষ্মণ পাই ও হুসেন— চারজন বিশিষ্ট চিত্রকলা সমালোচক। **শৈলনগরী উটাকামণ্ড :** হিল্টন ব্রাউন। **দুর্গম পথযাত্রী : কোলাহাই হিমবাহ :** অজিতকুমার শ্রীমানি। **পল্লীগীতি ও তরজা :** ডক্টর সুকুমার সেন। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (চরিত্র চিত্রণ) :** পরিমল গোস্বামী। **গ্রহান্তর যাত্রা :** সরোজ আচার্য। **মহাকাশ জয়ের অভিযান :** কে. বি. স্যাণ্ডেল। **কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর :** টি এগুয়ার। **পক্ষী নিরীক্ষণ :** জি. মুখোপাধ্যায়।

ঘর সাজানো : শুভ্রা সেনগুপ্ত; **ডেনমার্কে রান্নার আসর :** বীণা চৌধুরী; **নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা :** নরেন্দ্র দেব; **ভূতের গল্প নয় :** মণীন্দ্র দত্ত; **ভুলো মহারাজ :** শৈল চক্রবর্তী

॥ রম্যগীতি ও অন্যান্য গানের কয়েকটি স্বরলিপি ॥

বহুবর্ণ চিত্র ॥ ১ **মহিষাসুরমর্দিনী** জগন্মাতা শ্রীশ্রীদুর্গা : দীপেন বসু। ২ **একটি ফুল :** গোপাল ঘোষ। এবং **একটি প্রাচীন রাজপুত চিত্র "রাধাকৃষ্ণ"।**

এছাড়া, বেতার শিল্পী পরিচিতি ও অন্যান্য চিত্রাবলী।

মূল্য : ২.০০ টাকা (ডাকে ২.৫০ টাকা)

বেতারজগৎ-এর বিশেষ সংখ্যার আপনার কপিটির জন্য নিকটস্থ সংবাদপত্র বিক্রেতাকে বলুন অথবা ১নং গার্স্টিন প্লেসস্থ বেতারজগৎ অফিসে অগ্রিম মূল্য জমা দিন।

সম্পাদক, বেতার জগৎ : অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলিকাতা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রসঙ্গত

দিন চারেকের ভয়াবহ তান্ডবের পর খাদ্য-আন্দোলনের প্রচন্ডতা অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেল। এখন কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক। দুঃসহ গ্রীষ্মের পর অকস্মাৎ বৃষ্টি নামলে যে অবস্থা হয়, জনসাধারণ এখন সেই রকম আরাম বোধ করছে। যদিচ তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ এখনও কাটেনি। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলন আরম্ভ হবে বলে ঘোষিত হয়েছে। সেই আন্দোলন কি রূপ নেবে কেউ বলতে পারে না। কারণ আন্দোলন আরম্ভ করার ভার নেতাদের হলেও রূপদানের ভার উগ্রপন্থীদের হাতে চলে যায়। বোধ হয় সেই জন্যেই পুলিসের ধরপাকড় এখনও চলছে। আন্দোলনের উগ্রতা নিবারণে ধরপাকড় কতখানি ফলপ্রদ, সে বিষয়ে জনসাধারণ সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং যদিচ জনসাধারণ নিজেদের কাজকর্মে মন দিয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে নয়। তার মন থেকে ভয়ের মেঘ এখনও কাটেনি। কারণ দেখা গেছে দুর্যোগ অতর্কিতে নামে। চালের দর কমতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সেটা আউশের জন্যে না আন্দোলনের জন্যে, আরও কিছুদিন না গেলে তা নিশ্চয় করে বলা যাবে না। এই সব নানা কারণেই আন্দোলনের উগ্রতা শান্ত হলেও সাধারণের মন এখনও শান্ত হতে পারে নি।

*

জেনারেল থিমায়া এবং তারপরেই প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের পদত্যাগের সংবাদে সকলেই স্তম্ভিত হয়েছিলেন। আরও শোনা গিয়েছিল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতিরাও শীঘ্রই পদত্যাগ করবেন। যখন চীন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হানা দিয়েছে এবং সেদিক থেকে বৃহত্তর আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, তখন একই সঙ্গে জল-স্থল-বিমান বাহিনীর তিনজন প্রধান সেনাপতিরই পদত্যাগ নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সুখের বিষয় প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে প্রধান সেনাপতিত্রয়ের বিরোধের মীমাংসা হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ মেনন এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সেনাপতিদ্বয় পদত্যাগপত্র দেননি। জেনারেল থিমায়া তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী এই সম্পর্কে লোকসভায় যে কথা বলেছেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণ মেননের উপর রাজনৈতিক কারণে নিয়োগ ও পদোন্নতির যে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন এবং বলতে গেলে জেনারেল থিমায়ার উপরই দোষারোপ করেছেন। পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে সেই দোষারোপ তিনি মেনেই নিয়েছেন বলা যেতে পারে।

*

অর্থাৎ শ্রীনেহেরু তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এইখানে আর একটি ক্ষত চাপা দিয়ে রাখলেন। সৈন্যবাহিনী জাতির মেরুদণ্ড। এখানে ক্ষত নিরাময় না করে চাপা দিয়ে রাখা নিরাপদ কি না বিচার্য। সৈন্যবাহিনীর তিনজন প্রধান সেনাপতি যখন পদত্যাগ করার কথা চিন্তা করেন, তখন তা নিশ্চয়ই গুরুতর। অপর দিকে শ্রীমেননের সম্পর্কে জনমত খুব অনুকূলে নয়। জীপ-কেলেঙ্কারীর কথা লোকে একেবারেই ভুলে গেছে, একথা মনে করা ঠিক হবে না। তাঁর সম্পর্কে মৌলানা আজাদ যে মন্তব্য করে গেছেন, তাও উপেক্ষণীয় নয়। তিনি বলেছেন, সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে অধিকাংশ বিষয়েই তাঁর মতভেদ ছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁরা উভয়েই একমত ছিলেন— শ্রীমেনন সম্বন্ধে। তাঁরা কেউই শ্রীমেননের সম্বন্ধে সদভিমত পোষণ করতেন না।

*

জেনারেল থিমায়া চলে গেছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে। সেখানে কি ঘটছে অথবা বিশেষ কিছু ঘটছে কি না জানা যাচ্ছে না। চীন ভারত আক্রমণ করবে কি না চীনই জানে। সম্প্রতি দিল্লী থেকে যে উত্তর এসেছে, তাতে চীনই উলটে চীন সীমান্ত আক্রমণের জন্যে ভারতের উপর দোষারোপ করেছে। মন্দ নয়! চীনের সংবাদপত্রে নাকি এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নেই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে নানারকম আলোচনা চলছে। তাঁরা মোটামুটি একটা বিষয়ে একমত যে, রাশিয়া চীনের ভারতাক্রমণ সমর্থন করবে না। কিন্তু একদলের অভিমত, চীনের সামরিক সিদ্ধান্ত রাশিয়ার মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ যদিও উভয় রাষ্ট্রই কমিউনিস্টপন্থী, কিন্তু উভয়ের কমিউনিজম যেমন এক নয়, উভয়ের মধ্যেকার গাঁটছড়াও তেমনি শক্ত নয়। অন্য দলের অভিমত, সেখানে চীন-ভারত সংঘর্ষটা আর কিছুই নয়, খ্রুশ্চেভ-আইজেনহাওয়ার আলোচনার প্রাক্কালে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি করা, এই মাত্র। চীনকে বাদ দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে রাশিয়া কোন আলোচনায় অগ্রসর হয়, চীন তা চায় না।

*

তৃতীয় দলের অভিমত হচ্ছে, চীনের মনোগত অভিপ্রায় যাই হোক, নেফার মতো দুর্গম অঞ্চলে কোন বৃহৎ অভিযান সম্ভব নয়, চীন তা জানে। বৃটেন এবং মার্কিন মনোভাব দেখে চীন এও জানে যে, ভারতের বিরুদ্ধে বৃহৎ অভিযান চালাতে গেলে পূর্ব এশিয়াতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবে। মহাযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, ব্যাপারটা চীন এবং ভারত কারও পক্ষেই খুব কল্যাণকর হবে না। চীন ভারতের বিরুদ্ধে যে পাল্টা অভিযোগ করেছে, সেটা কূটনৈতিক ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু চীন-ভারত সংঘর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত যা প্রকাশিত হচ্ছে তার থেকে বলা যায়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ভারতবর্ষের সতর্ক থাকার বিশেষ প্রয়োজন যদিচ নিঃসন্দেহে রয়েছে, কিন্তু খাদ্য-আন্দোলনের প্রাক্কালে এই নিয়ে যে হৈ-চৈ উঠেছিল (এবং এখন চুপ হয়ে গেছে), তার বিশেষ সার্থকতা ছিল না। সকন্যা প্রধান মন্ত্রীর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের আয়োজন দেখে এই রকম আশাই আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছিলাম।

*

গোদের উপর বিষফোড়া। যখন সবাই আশংকা করছিলেন, তিব্বতের পরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল, ভুটান, সিকিম এবং নেপাল সম্ভবতঃ চীনা আক্রমণের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল হবে এবং ভুটানের প্রধান মন্ত্রীর দিল্লী আগমনের সংবাদ থেকে সেই আশংকা সকলের মনে প্রবলতর হচ্ছিল, তখন শোনা গেল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য চীনা আক্রমণের সম্ভাবনা নয়, ভুটানের স্বাধীনতা! লোকসভায় প্রশ্ন উঠেছিল, চীন যদি ভুটান আক্রমণ করে, ভারত কি করবে? শ্রীনেহেরু সগর্বে জানিয়েছিলেন, ভুটান ভারতের আশ্রিত রাজ্য। ভুটান রক্ষা ভারতের দায়িত্ব কর্তব্য এবং চীন যদি ভুটান আক্রমণ করে তাহলে তা ভারত আক্রমণ বলেই গণ্য করা হবে। এখন ভুটান জানাচ্ছে চীনের ভুটান আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই। অন্ততঃ তেমন কোন আশংকা ভুটান পোষণ করে না। সে ভারতকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে উৎসুক।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। যে সময় চীনের আক্রমণাশংকায় ভারতে এবং সমস্ত পৃথিবীতেই একটা সাড়া পড়ে গেছে এবং সে আক্রমণ যদি হয় তাহলে নেপাল, সিকিম, ভুটান কিংবা নেফা অঞ্চলের ভিতর দিয়ে হওয়া ছাড়া উপায় নেই সেই সময় ভুটানের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভুটান কি চীনের কাছ থেকে কোন সুনিশ্চিত ভরসা পেয়েছে? রাজনীতিক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ভরসা বলে কি কিছু আছে? ভুটান কি জানে না যে, সেখানে তিব্বতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে শুধু ভুটানই নয়, ভারতও বিপন্ন হবে? সমস্ত জেনে-শুনেও ভুটান এতকাল পরে এই দুর্যোগের মুহূর্তে অকস্মাৎ স্বাধীনতা লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করছে কেন?

মনুষ্যত্বের অবমাননাও আর কিছু হতে পারে না।

তিব্বতে পিকিং সরকারের কার্যক্রম যে মানবতাবিরোধী এবং অত্যন্ত গর্হিত বলে ভারত সরকার মনে করেন সেকথা গোপন নেই। অনুনয় বিনয়ের দ্বারা ভারত সরকার চীন সরকারের নীতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন বলে হয়ত ভারত সরকারের প্রথমে কিছু আশা ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমন একটা মীমাংসা হয় যাতে তিব্বতও বাঁচে এবং পিকিং-এরও মর্যাদাহানি না হয়—এই আশা করে ভারত সরকার চীনের নিকট অনেক আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু চীন সরকার সেই সকল আবেদনে কেবল উপেক্ষা মাত্র করেন নি, উপরন্তু ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তিব্বতী বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজ্য বিস্তার স্পৃহার অভিযোগ করেছেন। দলাই লামাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিব্বত থেকে অপহরণ করে ভারতে এনে আটক রাখার অভিযোগ পর্যন্ত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে করতে পিকিং সরকার দ্বিধাবোধ করেন নি। তিব্বতীদের প্রতি ভারতবাসী ও ভারত সরকারের সহানুভূতি অকথ্য বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও ভারত সরকার ধৈর্য রক্ষা করেছেন এবং তিব্বত সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এসেছেন। কিন্তু পিকিং সরকার তাতে এতটুকু নরম হন নি। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সৈনিক অভিযান তিব্বতের সীমানা অতিক্রম করে ভারত-ভূমির উপর উপচে পড়েছে। বন্ধুসুলভ অনুরোধ উপরোধের চাপে পিকিং সরকারের তিব্বতী নীতি সংযত এবং পরিবর্তিত হবার আশা যতদিন পর্যন্ত ছিল ততদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের ধৈর্য মোটের উপর অযৌক্তিক ছিল না বলা যায়। তিব্বতের বিপদে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কারো সাহায্য করার সম্ভাবনা ছিল না। তিব্বতকে সশস্ত্র সাহায্য দানের প্রশ্ন কোনোদিনই ভারত সরকারের মনে ওঠেনি। সুতরাং বন্ধুত্বের চাপই একমাত্র উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। চীনের প্রতি ভারত সরকার এবং ৪০ কোটি ভারতবাসীর সৌহার্দ্য পিকিং সরকারের নিকট মূল্যহীন বিবেচিত হবে না এই আশাই ছিল ভারত সরকারের নীতির ভিত্তি। এই অবস্থায় এমন কিছু করা ভারত সরকারের চীনের সঙ্গে সুসমঞ্জস হতো না যা বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে চীনা সরকারের বিরোধী বলে পরিগণিত শক্তিবর্গের সুবিধা হয়। তিব্বত সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের মনের বিক্ষোভ চীনাদের জানানো যেমন দরকার ছিল (তা না হলে বন্ধুত্বের চাপ কোথা থেকে আসবে?) তেমনি বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে চীনবিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো কাজ করাও ঠিক হোত না, বিশেষ করে সে কাজের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে তিব্বতের দুর্গতি নিবারণের যদি কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

তিব্বত সম্পর্কে ভারত সরকারের এরূপ প্রায়-অসহায় অবস্থা হওয়া অনিবার্য ছিল কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। ১৯৫০ সাল থেকে ভারত সরকার যে-নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা যদি ভিন্নরকমের হতো তাহলে হয়ত তিব্বতের দশা এবং ভারত সরকার আজ যে-অবস্থায় পড়েছেন তা-ও অন্যরকম হতো। কিন্তু সে কথায় এখন কী ফল? এখন যা বুঝা এবং স্বীকার করা দরকার তা হচ্ছে এই যে, বর্তমান তিব্বতী হাঙ্গামার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় নীতিই ভারতবর্ষের দিক থেকে বিফল হয়েছে। তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য—অটনমি—রক্ষিত হবে এই আশা এবং পিকিং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে ভারত সরকার তিব্বতে চীনের সভারেনটি স্বীকার করে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেছিলেন। তারপর প্রাণপণে চীনের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন চলেছিল। আশা করা হয়েছিল যে, হিমালয়ের অঞ্চলে অসন্তোষের ভার চাপবে না। কিন্তু কোনো আশাই পূর্ণ হয় নি। তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস হয়েছে, চীনা অস্ত্রের ঝনঝনা তিব্বত পেরিয়ে ভারত সীমানার এদিকেও শুনা যাচ্ছে। তিব্বতের প্রশ্ন ইউনোতে উত্থাপন করার সম্বন্ধে পূর্বে যে আপত্তি ছিল এখন সে আপত্তির মূলোচ্ছেদ পিকিং সরকারই করেছেন। পিকিং সরকার স্পষ্ট প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের বন্ধুত্বের খাতিরে তাঁরা তাঁদের কোনো মতলব এক চুল বদলাবেন না। ইউনোতে তিব্বতের প্রশ্ন তুললে ফললাভের আশা আগের চেয়ে এখন বেড়েছে তা নয়, কিন্তু পূর্বে (অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ভারত সরকার চীনকে বলে কয়ে কিছু করাতে পারবেন এই আশা ছিল ততদিন) তিব্বতের প্রশ্ন ইউনোতে না তোলার পক্ষে একটা যুক্তি ছিল। সে যুক্তি এখন আর নেই। এখন তিব্বতের মন্দ হবার আর কিছু বাকী নেই এবং ভারত সরকারের নীতির কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ করারও কোনো কথা নেই।

এখন তিব্বতের কথা যদি ইউনোতে কাউকে বলতে হয় তবে সে কর্তব্য ভারত সরকারেরই। কারণ, এ ব্যাপারে ভারত সরকারেরও কৈফিয়ত দেবার আছে। ভারত সরকার তিব্বতে চীনের সভারেনটি স্বীকার করাতে চীনের দণ্ডনীতি একটা লিগ্যাল ভিত্তি দাবি করার সুযোগ পেয়েছে। সেই স্বীকৃতি যে তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য—অটনমি রক্ষার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেটা জগতের সম্মুখে ভারত সরকারকে স্পষ্ট করে দিতে হবে, তা না হলে একটা জাতির বিনাশে ভারতবর্ষ সম্মতি দিয়েছে এই পাপ আমাদের লাগবে। চীন যদি তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে তবে তিব্বতের চীনের সভারেনটি অস্বীকার করে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর অধিকার আছে, একথা ভারত সরকারের ঘোষণা করতে হবে। তাতেই তিব্বত স্বাধীনতা পাবে এ আশা কেউ করে না কিন্তু জগৎসমক্ষে আজ ভারত সরকারের নিজের নৈতিক পজিশন পরিষ্কার করা দরকার।

চীনের সঙ্গে আজ ভারতের সাক্ষাৎ স্বার্থসংঘাত বেধেছে বলেই ভারত তিব্বতের প্রশ্ন ইউনোতে উপস্থিত করতে যাচ্ছে—একথা উঠতে পারে। কিন্তু তাতে লজ্জা পেয়ে তিব্বত সম্বন্ধে চুপ করে থাকা আরো লজ্জাকর ব্যাপার হবে, আরো অন্যায় করা হবে। তাছাড়া, ভারতবর্ষ এখনো চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে চায়, সুতরাং এ বিষয়ে ভারত সরকার যে-রকম সংযম ও শুভবুদ্ধির ভাব নিয়ে প্রশ্নটি উপস্থিত করতে পারবেন সেরকম অন্য কেউ পারবে না। ভারত একই সঙ্গে চীনকে ইউনোর সদস্যপদ দানের প্রস্তাব এবং তিব্বতে চীনা দুষ্কার্যের প্রতিবাদ পেশ করতে পারে। তিব্বতীদের ধ্বংস করা পিকিং সরকারের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ইতিহাসের যুক্তি ছাড়াও, আমরা কি ভুলে যাব যে, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও বছরের পর বছর ভারত সরকারই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশীয়দের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইউনোতে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন আন্দোলন করে আসছেন?

৭।৯।৫৯
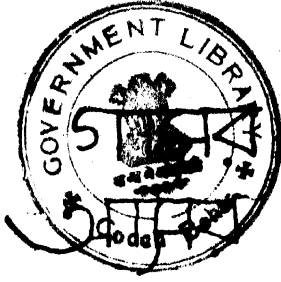
শার্ঙ্গদেব

আধুনিক বাংলা গানের আবার জের টানতে হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন এবং বাংলা গানের প্রগতি সম্পর্কে ভাবিত হয়েছেন। কয়েকটি পত্রের বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং এই উপলক্ষে কিঞ্চিৎ আলোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হতে হচ্ছে।

একটি পত্রে আমাদের দু একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নকর্তা সামসুল হক। প্রকারান্তরে আমাদের বক্তব্যকে তিনি আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। সামসুল হক লিখেছেন—"শার্ঙ্গদেব বলছেন 'আধুনিক গান কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের উপযোগী যাদের মনের ওপর সংস্কৃতির একটি মৃদু প্রলেপ আছে মাত্র।' জানতে চাই সংস্কৃতি বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন। তিনি কি স্থূল এবং সূক্ষ্মের পার্থক্যটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?" সংস্কৃতিবোধ যে পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং মানসিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল সেটা তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন। তাঁর যুক্তি অস্বীকার করবার উপায় নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থূল এবং সূক্ষ্মের পার্থক্যটা কোন কারণেই ঘোচে না সেটা মানবেন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, বোধশক্তিটা নানা কারণেই সকলের সমান নয় এবং সমান নয় বলেই রুচির তারতম্য ঘটে। রুচি যাঁদের স্থূল তাঁরা স্থূল জিনিসেই সন্তুষ্ট—যাঁদের রুচি সুমার্জিত তাঁরা সূক্ষ্মের ভক্ত। প্রত্যেক আর্টই তো প্রথমে ছিল স্থূল, তারপরে ধীরে ধীরে চিন্তা, পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতায় রুচির উন্নতি হয়েছে এবং সৃষ্টি সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। পথের পাঁচালী যখন দেখান হচ্ছে তখন মোহন সিরিজের একটা ছবিও দেখান হচ্ছিল। এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। মোহনের ছবি প্রত্যক্ষ করে পরিতুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরছেন। ছবিটির বিষয়ে প্রশংসা তিনি করলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—"পথের পাঁচালী দেখেছেন? কেমন লাগল?" কথাটা শুনে তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টিতে মনে হল, আমার প্রশ্নে তিনি হতাশ হয়েছেন। বললেন—"ওতে তো কিছুই নেই ওটা গপ্পোই হয় নি—ওসব বই তোলার কোন মানে হয় না।" অতঃপর আবার মোহনের প্রসঙ্গ উঠল মহা উৎসাহে। ভদ্রলোকের রুচি এমনভাবেই তৈরি হয়েছে যে, পথের পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে কিছুই ধরা পড়েনি। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মনোভাব তাঁর আদৌ নেই এমন কথা বলব না কিন্তু স্থূল বস্তু বোঝবার মত জ্ঞানটুকুই তাঁর আছে—এইটুকু স্বীকার করব মাত্র।

সামসুল হক বলছেন—"আমার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত যদি ভাল না লাগে তাতেই কি এই প্রমাণিত হ'ল যে, আমার মধ্যে সূক্ষ্ম সংস্কৃতি বোধ নেই?"—তা প্রমাণিত হ'ল বৈ কি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে কারুর সব প্রত্যাশা না মিটতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বর্তমান তার মর্ম যদি কেউ গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে তাঁর রুচিকে সূক্ষ্ম বলে মেনে

নেওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যুগে যুগে সংস্কৃতির মান পরিবর্তিত হয়েছে এটা মানি, কিন্তু সত্যিকার রসবস্তু যার মধ্যে আছে তার একটা চিরন্তন মূল্যও আছে। সেই স্বীকৃতিকে কোন কালেই প্রত্যাহার করা যায় না। এখানেও আবার সামসুল হকের প্রশ্ন—প্রকৃত রসজ্ঞ কারা? এতাবৎ-কাল অনেক বলা এবং অনেক লেখা এ বিষয়ে হয়েছে কিন্তু তর্ক দ্বারা রস-প্রতীতি হয় না। এটুকু বলতে পারি যে, গানের হাটে তথাকথিত আধুনিক গানের রসে যাঁরা পরিতৃপ্ত তাঁরা অন্তত প্রকৃতিস্থ রসজ্ঞ ব্যক্তি নন।

আলোচ্য নিবন্ধে লিখেছিলাম—"আমাদের সংগীতশিল্পের স্বরূপ কি সেটি বুঝিয়ে দেবার ভারও বিবিধ সংগীত প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করতে হবে।" সামসুল হক জানতে চেয়েছেন যে, এই "সংগীতশিল্পের স্বরূপ" অর্থে কি বোঝায়। স্বরূপ মানে আর কিছু নয়, স্বভাব বা প্রকৃতি। একটি পরিবারের এক একটি ছেলেমেয়ের এক একরকম প্রকৃতি। প্রত্যেকেরই এক একটি স্বরূপ আছে। সবাইকার স্বভাব মিলিয়ে পর্যালোচনা করলে এমন একটা প্রকৃতি পাওয়া যাবে যেটি হচ্ছে সেই পরিবারের স্বরূপ। এক একটি জাতির স্বরূপও আমরা এইভাবেই নির্ণয় করে থাকি। সংগীতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সুরকারের সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেকের সৃষ্টির একটি স্বরূপ ব্যক্ত হয়। সামগ্রিকভাবে বাংলা গানকে বিশ্লেষণ করে দেখলে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে যা বাংলা গানের স্বরূপ ব্যক্ত করে। মূল্যায়ণ বা উপলব্ধির জন্য এই স্বরূপ নির্ধারণ অত্যাবশ্যক। মূল্যবোধ না হলে সে শিক্ষার কোন সার্থকতা নেই।

সনৎ মুখোপাধ্যায় দুঃখ করে লিখেছেন—"একালে এমন কোন সাহিত্য পত্রিকা নেই যা গান তথা গীতিকবিতাকে প্রকাশ ব্যাপারে কণামাত্র মর্যাদা দিয়ে থাকেন।......আধুনিক বাংলা গানের চটুল বৈচিত্র্যের এবং জন-সাধারণের রুচির সাম্প্রতিক ধারার ভোল এক সাংগীতিক আন্দোলনের মাধ্যমে পাল্টে দিতে গেলে একমাত্র সাহিত্য পত্রিকাগুলির সহায়তা প্রয়োজন। আমার মতে সে আন্দোলনের সার্থক ক্ষেত্র সর্বাগ্রে সাহিত্য-পত্রিকার মাধ্যম।" এ আবেদন সম্পাদক মহাশয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেল—তাঁরা বিচার করে দেখুন, এই প্রস্তাবটি কতখানি সফল করে তোলা যায়। এই উপলক্ষে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনিশিকান্তের সার্থক গীতিকবিতাগুলির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ল।

দেবাশীষ দাশগুপ্ত আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে বিদগ্ধজনের ঔদাসিন্য এবং শিল্পীদের "সৃষ্টির দৈন্যদশা" ঘুচিয়ে দূর করবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টার অভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে এই যে, সাহিত্য পরিষদ্ যেমন প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষণে যত্নবান এ দেশের শিল্পী পরিষদ আজ পর্যন্ত হারানো গানের কোন স্বরলিপি রক্ষায় যত্নবান হন নি বা কোন রেকর্ড লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে জানানো যেতে পারে যে, সম্প্রতি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা পুরাতন গানের স্বরলিপি প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা সংগীত প্রতিষ্ঠান থেকেই হওয়া উচিত ছিল; তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হত। কিন্তু সেই "[illegible]"—অতএব সে বিষয়ে কারুর মাথাব্যথা নেই।

দেবাশীষ দাশগুপ্ত বিগত বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার কয়েকটি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলি অত্যন্ত সমীচীন। তিনি জানিয়েছেন যে, এই আলোচনায় দিলীপ রায়, হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মণ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোন উল্লেখই করা হয়নি। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা যদি করতেই হয় তবে সেটি যাতে সার্থক, ব্যাপক এবং গঠনমূলক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কয়েকটি লঘুসংগীত পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি কণিকা প্রস্তুত করে তাকে সারগর্ভ আলোচনার মর্যাদা দিতে চাওয়াটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা নয়।

বিশ্বাস আমার মনে নেই, তবুও যে তা প্রকাশ করি তার কারণ, মানুষের হাতের কাজের সম্বন্ধে পাঁচজনের মত শোনা ভালো।

নিজের উপর কতকটা ভরসা না থাকলে লেখক হওয়া শক্ত, এবং তোমার মনে যে ভরসা আছে এর পরিচয় পেয়ে খুশি হলুম। সুতরাং সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি যে কথাগুলো বলেছ, সেই সম্বন্ধে আমারও দু' চারটে কথা বলবার আছে। মনের কারবার ভালো করে চালাতে হলে পরস্পরের মতের আদান-প্রদানের দরকার আছে।

তোমার লেখার কথাটা এখন থাক্, সাধারণভাবে দু' চারটে কথা বলি।

তুমি লিখেছ যে তুমি "spontaneity"র পক্ষপাতী আর "যদি ভাবগুলো স্বতঃ উদ্দীপ্ত হয়" তাহলেই তুমি "যা খুশি তাই লিখতে পারো।" যেখানে spontaneity নেই, যে-মনের ভাবগুলো স্বতঃ উৎসারিত না হয়, সে-মন থেকে সাহিত্য জন্মলাভ করে না। ভিতরকার একটা তাড়া না থাকলে কথার মত কথা মানুষের মুখ থেকে বেরোয় না, ও ত sine quanon; আমি পূর্বে বহুবার একথা বলেছি যে, মানুষের ভাবগুলো আসে তার মগ্নচৈতন্য থেকে; অন্তত কবিতা ও রসিকতা সম্বন্ধে একথা যে সত্য তার আর সন্দেহ নেই। একমাত্র ইচ্ছাশক্তির বলে ও-দুই জিনিস তৈরী করা যায় না। কিন্তু তার পরেই আসে আর্টের কথা। লেখকমাত্রেই জানেন যে, মনের ভিতর আপনা হতে যে সকল ভাব দেখা দেয় অপরকে তা দেখিয়ে দেওয়া, ভাবকে ভাষায় সাকার করা, কত শক্ত। কটা লেখা লিখে আমাদের নিজেদের মনস্তুষ্টি হয়? যা বলতে চেয়েছিলুম তা ভাল করে 'পুরো করে' বলা হল না—একটা লেখা শেষ করে এই অসন্তোষটাই ত আমার মনের ভিতর থেকে যায়। তার কারণ—কোনও একটা ভাবে তন্ময় হওয়া সহজ মানুষের পক্ষে সহজ নয়—কেননা, আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত। রাগ রাগিণীর মত ভাবের চেহারা দেখবার জন্য, যে-পরিমাণ ধ্যান ধারণার আবশ্যক তা আমাদের ক'জনের আছে? আমরা যাকে প্রতিভা বলি তা হচ্ছে এক অংশে ঐভাবে তন্ময় হবার ক্ষমতা। এই কারণেই ভাব আমাদের মনে আপনা হতে এলেও আমাদের হাতে আপনা হতে ধরা দেয় না। তাই মনের এক অবস্থায় আমরা সাহিত্যের স্রষ্টা, আর এক অবস্থায় তার দ্রষ্টা। সাহিত্য গড়তে creative এবং critical faculty দুই চাই। হিন্দুস্থানীরা বলে, "যো আপসে আতা উসকো আনে দেও"। কিন্তু সাহিত্যিককে সময় সময়ে বলতে হয়, "উসকো যানে দেও"। আমরা আমাদের নিজের লেখার যুগপৎ কর্তা ও ভোক্তা। এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্তৃত্ব অপেক্ষাকৃত আমাদের ভোক্তৃত্বের অধীন।

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, লেখার কথা উঠলেই আমি আর্টের উপর বেশি ঝোঁক দেই, তার কারণ এ নয় যে, আমি ভাবের চাইতে ভঙ্গীকে বেশি মূল্যবান মনে করি। যে কথার অন্তরে মন নেই—তার যত কারিগরি করে দেহ গড় না কেন তার ভিতর প্রাণ থাকবে না। তবে যে এত আর্ট-আর্ট করি তার কারণ অপরকে বড় ভাবে ভাবতে শেখানো বড় কঠিন কিন্তু ভালো করে লিখতে শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ। আগেই বলেছি, যে ভাব সাহিত্যের রাজ্যে স্থান পাবে তার জন্মভূমি হচ্ছে মগ্নচৈতন্য। মানুষের sub conscious selfকে গড়ে তোলবার কোন conscious process নেই। কিন্তু ভাব প্রকাশ করবার আর্ট কতকটা শেখানো যায়। সঙ্গীতের

নিজে আসে না, তাকে ডেকে আনতে হয়। অদ্বৈত প্রভুর ডাকাডাকিতেই চৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এবং এই ডাকাডাকির কাজটা আমাদের মত আইডিয়ালিস্ট-দেরই করতে হবে। রিয়ালিস্টদের রিয়ালিজম্-এর পঙ্ক থেকে আমাদেরই উদ্ধার করতে হবে।, সুতরাং আইডিয়ালিস্ট মাত্রেই আমার শুধু মনের মানুষ নয়, ঘরের লোক। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি যে, তোমার আইডিয়ালিজম্-এ যেন কখনও মরচে ধরে না যায়। আইডিয়ালিজম্-এর শাস্তি ঢের, তার সবচেয়ে বড় শাস্তি এই যে, আইডিয়ালিস্টরা যাদের জন্যে চুরি করে তারাই বলে চোর। এইখানেই শেষ করি, চিঠি ত দূরে থাক্, প্রবন্ধের পক্ষেও লেখাটা বড় হয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, আজ সকালে আর কোনও কাজ করা হল না।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩১

১ ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১।৫।১৭

কল্যাণীয়েষু,

আমার লম্বা চিঠির উত্তরে তুমি যে লম্বা চিঠি লিখেছিলে তা যথাসময়ে পেয়েছি। তোমার ইচ্ছামতই তার আর জবাব দিই নি। তাছাড়া, আশা ছিল, গত শনিবারে তোমার সাক্ষাৎ পাব, এবং উত্তর প্রত্যুত্তর সব মুখেই হবে।—কথোপকথন লেখা শক্ত হলেও বলা সোজা। অন্ততঃ আমার পক্ষে ত তাই, কেননা আমি যত না লিখতে পারি—তার চাইতে ঢের বেশি বকতে পারি। ভাল কথা, তোমাকে একথা পূর্বে কি কখনো বলেছি যে, আমার কোনও শুভানুধ্যায়ী গুরুজন আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যই আমাকে কলম ধরবার পরামর্শ দেন? সে পরামর্শ গ্রহণ করে যে বুদ্ধির কাজ করেছি তা বলতে পারি নে। আমার লেখায় কার যে কি উপকার হয়েছে তা বলতে পারি নে, দেখতে পাচ্ছি লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে আমি নিত্য গাল খাচ্ছি। তার পরিচয় ছাপার অক্ষরে বহুদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, উপরিরভাগ এ-দানিক চিঠিপত্রে পাচ্ছি। চিঠির মারফৎ যে গালিগালাজ আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, বলা বাহুল্য, তার ভাষার ভিতর আর যে জিনিসেরই অভাব থাক্—জোরের অভাব নেই। রবিবাবু যে আমার লেখাকেই বাঁদরামি বলেছেন, এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়াটা যেন কোনও ভদ্রলোক তাঁদের কর্তব্যকর্ম মনে করছেন।

এ-সত্ত্বেও যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—এই বিধি অনুসারে সবুজপত্র চালাতে হবে। আমরা সব পাশ-করা লোক—সুতরাং সাহিত্যের ইউনিভার্সিটিতেও পরীক্ষা দিতে আমরা পিছপাও নই, পাশ ফেল ত কপালের কথা। দুঃখের বিষয় এই যে, যারা লিখতে জানে না, এক্ষেত্রে তারাই লেখার পরীক্ষক—যাক্, ওসব কথা, তোমার "অনুবাদের" কই? সবুজপত্র যাতে সময়ে বেরোয় তার জন্য চেষ্টা করা দু'চারটে লেখা হাতে না থাকলে এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে—সুতরাং যত শীঘ্র পার তোমার নতুন লেখাটি পাঠিয়ে দিও। এবার অর্ধেক সবুজপত্রে আমার লেখায় ভরে গেছে। আসছে মাস থেকে আমাকে লেখার হাত খাটো করে আনতে হবে। কেননা, সবুজপত্রের অনেক গ্রাহক আমাকে পত্র লিখেছেন যে, আমার লেখা পড়বার জন্য তিনি ও-পত্র গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। সম্ভবতঃ বহু পাঠকের মতও তাই। এ অবস্থায় তোমরাই হচ্ছ সবুজপত্রের ভরসার স্থল। এ সম্বন্ধে আর বেশি লেখা উচিত নয়, নচেৎ তোমার মনে হতে পারে যে, ক্রমান্বয়ে কটু কথা শুনে শুনে আমার মনটা তিতো হয়ে গেছে।—কথাটা যে একেবারে মিথ্যে তাও নয়। তার উপর আমি হচ্ছি "বাঙাল"—কিল খেয়ে কিল চুরি করা আমার স্বভাব নয়—সুতরাং পাঁচজনে বেশি খোঁচাখুঁচি করলে আমার কলমের মুখ চাই কি ছুঁচলো হয়ে উঠতে পারে, সেটা অবশ্য মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা, তাতে আমার লেখার মোলায়েমত্ব নষ্ট হতে পারে।—

সত্যেনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তুমি

তাঁকে যে ভরসা দিতে বলেছ—অবশ্য তা দেব। তবে কবে যে তাঁর সাক্ষাৎ পাব তা জানি নে।

আসছে রবিবার বিকেলে যদি পারো ত আমার এখানে এসো। যখন অপরের লেখা পড়ে — সাহিত্যামৃত-রসাস্বাদ আমাদের ভাগ্যে জোটে না—তখন সজ্জনের সংগে আলাপই আমার কাছে একমাত্র প্রেয় বস্তু।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩২

১ ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১২।৫।১৭

কল্যাণীয়েষু,

গেল রবিবারে তুমি এখানে এলেও না এবং না আসবার কোন কারণও জানালে না। এর জন্য আমার কাছে তোমার একটি জবাবদিহি আছে, এবং সে কৈফিয়তটা মুখে দেওয়াই সংগত। অতএব কাল বিকেলে যদি এখানে উপস্থিত হও ত খুশি হই। সে সময়ে রবিবাবু, মহাশয়ও উপস্থিত থাকবেন সুতরাং গল্প ও গানের প্রচুর আয়োজন থাকবে।

"[illegible]" [illegible] হয়েছে। আমার লেখার উপর টীকা আছে বলে যে, আমি [illegible] হয়ে পড়ে এ সন্দেহ তোমার মনে কি করে স্থান পেলো। [illegible] আমার লেখাও কি [illegible] যে, ভগবান আমাকে আর কিছু দিন আর না দিন saving grace of humour দিয়েছেন। ও বস্তু আমার শরীরে না থাকলে আমি [illegible] সাহিত্য সমাজে টিকে থাকতে পারতুম না।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩৩

১ ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৩।৫।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার শেষ পত্র যথাসময়ে পেয়েছি, কিন্তু যথাসময়ে তার উত্তর দিতে পারিনি, কারণ একে আমার শরীর ভালো নেই, তার উপর আবার এ ক'দিন হাতে অনেক কাজ ছিল।

তোমার "টি পার্টি" যে ছাপাব না একথা ত আমি বলিনি। তবে আমার মতে লেখাটা একটু 'টানকে' দিলে ভালো হত। কিন্তু তুমি নিজে যখন সে কাজ করতে রাজী হলে না, তখন যেমন আছে তেমনি ছাপাব। সম্ভবতঃ লেখাটিকে আমি আর একটু ধারালো করে দিতে পারতুম। কিন্তু ভেবে দেখলুম, তা করতে গেলে, ওর ভিতর থেকে আমার হাত না হোক, নখ বেরিয়ে পড়বে। একটা প্রবন্ধের ভিতর এখানে ওখানে দুচার কথা গুঁজে দেওয়া যায়। কিন্তু এ ধরনের জিনিসে এক হাতের সংগে আর এক হাত মেলানো একটু শক্ত। তোমার সংগে সাক্ষাৎ হলে, কোথায় কি বদল করলে লেখাটি আরও তাজা হয়ে উঠত তা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারতুম। এইটি জেনো যে, সাহিত্যেরও উপর-চাল অনেক সময়ে কাজে লাগে।

খুব সম্ভবতঃ আমি পরশু (শুক্রবার) কলকেতা থেকে দিন পোনেরোর জন্য বেরিয়ে যাব। ইতিমধ্যে তোমার সংগে দেখা হবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনে, আমি কাল আপিসে গিয়ে তোমার লেখাটা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

Pindharia
D. H. R.
27.5.17

কল্যাণীয়েষু,

উপরোক্ত ঠিকানা থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে, আমি কোনও গরম দেশে আসিনি, তবে তাই বলে ঠাণ্ডা দেশেও আসিনি। এ হচ্ছে স্কুলের ছেলেরা যাকে বলে নাতি-শীতোষ্ণ স্থান। এ জায়গাটার প্রধান গুণ এই যে, এখানে লোকালয় নেই—আছে কেবল উপরে আকাশ আর পাহাড় আর নীচে গাছপালা। এহেন নির্জন স্থানে সকলে টিকতে পারে না। কিন্তু আমার দিন বেশ ভালই কেটে যাচ্ছে। সংগে বই আছে আর আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ,

সুতরাং হয় কাব্যামৃতরসাস্বাদে নয় সজ্জনের সঙ্গে আলাপে দিন কেটে যাচ্ছে।

তোমার চিঠি পাবার পূর্বেই তোমার লেখাটি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তার প্রুফ সতীশবাবুকে দেখতে বলে এসেছি। তিনি আমার অনুপস্থিতিতেও আমার আপিসেই আপিস করবেন। সুতরাং সেখানে গিয়ে যদি তাঁকে ধরতে পারো, অবশ্য কাল পরশুর মধ্যে তাহলে, প্রুফের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারো। এ অবস্থায় কিন্তু দু' এক কথার বেশি বদল করবার সুবিধে পাবে না।

আমি এখানে দিন আষ্টেক দশেক থাকব। একে শরীরটে ভাল ছিল না, তার উপর যে বিশ্রী গরম পড়েছিল, তাতে করে দিন কতকের জন্য কলকেতা থেকে পালানোটাই সুযুক্তি মনে করলুম।

এবারকার কাগজে রবিবাবু মহাশয়ের একটা গল্প বেরবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩১

১ ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২২।৬।১৭
শুক্রবার

কল্যাণীয়েষু,

অতঃপর আমি কলকেতায় ফিরেছি। কাল বিকেল ছটার সময় যদি এখানে একবার এসো ত সুখী হই। আমি দার্জিলিংয়ে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় একটি বক্তৃতা পড়ি। ছাপতে দেবার আগে তোমাদের সেটি একবার পড়ে শোনাতে চাই।

তোমার লেখাটায় এবার অনেক ছাপার ভুল আছে—কিন্তু তার জন্য আমি দোষী নই। আশা করি, লেখাটি লোকের ভাল লেগেছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর অনেক মনের কথা ও সারগর্ভ উপদেশ এই সাতটি চিঠিতে লিপিবদ্ধ আছে। সেই দিক থেকে এই পত্রগুচ্ছ মূল্যবান। প্রসঙ্গত আমার মন্তব্য সে-রকম ফলাও করে বলতে পারবো না, বোধ হয়। সবুজপাতার ডাককে যদি সংগীতের মতন ধরা যায়, তাহলে এতক্ষণ যে বিলম্বিত লয় অবলম্বন করেছিলুম, তার পরিবর্তে এখন দ্রুত লয় আশ্রয় করা উচিত। উচ্চাঙ্গ-সংগীতে শীঘ্রগতি হচ্ছে গান শেষ হবার পূর্বলক্ষণ। এবং সেই-ভাবেই আমি যত শীঘ্র পারি সবুজপাতার ডাক শেষ করতে চাই।

(ক্রমশ)

ওপর। আকাশের মেঘের মত ওর মুখখানা যেন থম থম করছে। কিন্তু মনের মধ্যে চাপা হাসির হিল্লোল খেলে যাচ্ছে। ঠিক মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই। আসলে মাধুরী আজ চটেনি। আজ কি ওর চটবার দিন! চেয়ার বেঞ্চ ভাঙা তো দূরের কথা, স্কুলটা সুদ্ধ উড়িয়ে দিলেও তো আজ মনে সত্যিকারের রৌদ্ররস আনা শক্ত হত। কিন্তু মেয়েদের গোলমাল করতে দেখলে ভারি গলায় ধমক টমক না দিলে চলে না। ভালো পড়ানো আর ভালো ক্লাস ম্যানেজ করা—সাকসেসফুল টিচারে এই দুই গুণই চাই।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে, কিন্তু ঘরে কোন সাড়া শব্দ নেই। মেয়েদের এই বাধ্যতায় মাধুরী ভারি খুশী। আবার একটু দুঃখও হল। আহা, বেচারা মেয়েগুলি কীরকম মুখ ভার করে আছে দেখ। পুটি পঁচিশেক আনন্দের ঝরনাকে মাধুরী একটিমাত্র শব্দে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সাইলেন্স।

আত্মশক্তির পরীক্ষা হয়ে গেছে। শৃঙ্খলার শিকল এবার একটু শিথিল করা যায়।

ফার্স্ট বেঞ্চের এক কোণে বসা লম্বাপানা মেয়েটিকে মাধুরী এবার হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'শিপ্রা, কাল তোমাদের অংকের ক্লাস হয়েছিল?'

শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না মাধুরীদি। আপনি কাল এলেন না। কে আর ক্লাস নেবে?'

মাধুরী বলল, 'কালও তোমরা এমনি হৈ চৈ করেছিলে?'

তার পাশের মেয়ে বীণা বলল, 'না মাধুরীদি, আমরা কাল খুব শান্ত ছিলাম।'

মাধুরী বলল, 'তোমরা হঠাৎ সবাই মিলে এমন দুরন্ত হয়ে উঠলে যে! বৃষ্টি দেখে?'

হাসি গোপন করল না মাধুরী।

বীণা তা দেখে ভরসা পেয়ে বলল, 'শিপ্রা দুঃখ করছিল মাধুরীদি, বৃষ্টিটা আধ ঘণ্টা আগে এমন জোরে এলে আমাদের আজ রেইনি ডে হয়ে যেত। স্কুলে আর আসতে হত না।'

শিপ্রা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'যাঃ।'

নিজের কৈশোরের কথা মাধুরীর মনে পড়ে গেল। বৃষ্টির দিনে সে আর মানসীও তো এই কামনাই করত। স্কুলের ঠিক আগের মুহূর্তে জোরে বৃষ্টিটা চেপে আসুক। স্কুলে যেন আর যেতে না হয়। কোন কোনদিন ভিজে ভিজে বাড়ি আসত। কলেজেও এমন করেছে। চুল থেকে জল ঝরত, শাড়ি থেকে জল ঝরত। মা রাগ করে বলতেন, 'নির্ঘাৎ জ্বর হবে। তোদের আর কি, বড় দুর্ভোগ আমার।'

চকখড়ি নিয়ে বোর্ডে, অংক লিখতে

বছরের, প্রত্যেক বয়সের মাধুরীকে যেন আলাদা করা যায়। তারা একই স্কুলের ছাত্রী, কিন্তু এক এবং অভিন্ন নয়।

টিচার্স রুমে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গেও চোখাচোখি হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল কি হয়েছিল?' আজও তো খুব লেট করে এলে।'

মাধুরী ভাবল, কোন্ কৈফিয়তটা আগে দেয়। কালকের কামাইয়ের না আজকের লেট হওয়ার। তার ছাত্রীদের মত দুটোই তো মিথ্যা কথা বলতে হবে। মাথাধরা কি পেটের অসুখের দোহাই। কালকের সাক্ষাৎকারের অসুখের কথাটা বলা যাবে না, আজকের সুখের কথাটাও নয়।

মাধুরী বলল, 'বিশেষ একটা দরকার ছিল।'

হেডমিস্ট্রেস গম্ভীরভাবে বললেন 'হুঁ, একটা দরকারের জন্যে একদিন কামাই আর চারদিন লেট। জানো তো স্টাফ কম, অসুবিধে হয়। ক্লাসে টিচার না গেলে মেয়েরা হৈ চৈ করে। আশেপাশের ক্লাসগুলিও করতে দেয় না। আগে যদি একটু ইনটিমেট করে রাখ, হয়তো একটা ব্যবস্থা করা যায়।'

হেডমিস্ট্রেস বেলা রায় চেয়ারে বসে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকেন। মাধুরীরা যেমন ছাত্রীদের ক্লাস নেন, হেডমিস্ট্রেস তেমনি টিচারদের ক্লাস নেন। মাধুরী মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হয়। একদিন তো মোটে কামাই। তার জন্যে এত। বিশেষ করে অন্য টিচারদের সামনে। মন খারাপ থাকলে, মাধুরী মুখে মুখে কোন জবাব দেয় না। জানে, জবাব দিলে বেলাদি আরো চটে যাবেন। হয়তো যা তা বলতে শুরু করবেন। তখন নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্যে মাধুরীকেও—।

মাধুরী পরের ক্লাস নেবার জন্যে তৈরী হয়। এই পিরিয়ডে বাংলা পড়াতে হবে ফার্স্ট ক্লাসে। ইংরেজী বাংলা অঙ্ক সবই সে পড়ায়। তার মত টিচার খুব বেশি নেই স্কুলে। সে সব বিষয় পড়ায়, খেটে পড়ায়, ফাঁকি দেয় না। বেলাদি এসব জানেন, তবু একটু খুঁত পেলেই বকবেন।

টিচাররা দু' তিন মিনিট দম নিয়ে ফের যে যার ক্লাসে চলে গেল। অরুণা যেন বইখাতা নিয়ে মাধুরীর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। থার্ড ক্লাসে সে ইংরেজী পড়াতে যাচ্ছে। তার বয়সও চব্বিশ পঁচিশ। এখনো বিয়ে হয়নি।

অরুণা ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'কি মাধুরীদি, মন খারাপ হয়ে গেল নাকি। হেডমিস্ট্রেসের মুখ তো নয়, একখানা ক্ষুর। পান থেকে চুন খসলে গজগজ গজগজ। কী যে স্বভাব।'
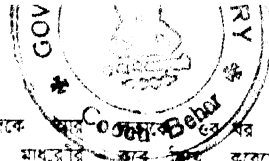
মাধুরী বলল, 'হুঁ।'

অরুণা এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বলল, 'ব্যাপারখানা কি। কাল কি পাকা দেখা টেখা ছিল নাকি।'

মাধুরী বলল, 'যাঃ। ক্লাসে যাও এখন। হেডমিস্ট্রেস যদি দেখতে পান আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, দেখলে ফের এক কান্ড বাঁধাবেন।'

মাধুরী নিজের ক্লাসের দিকে এগোতে লাগল। মনে মনে ভাবল, বেলাদির গুণ আছে যথেষ্ট। ইংরেজী ভালো বলেন, ভালো লেখেন, পড়ানও ভালো; স্কুল কি করে চালাতে হয় তাও জানেন, কিন্তু মেজাজ বড় কড়া, ভাষা বড় রূঢ়। বয়স চুয়ান্ন পঞ্চান্ন তো হবেই। চেহারা যেন ডিসপেপসিয়ার রোগী। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যৌবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন। কিংবদন্তী তখন অনেকের নাকি মাথা ঘুরিয়েছেন। এখন নিজের মাথারই ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ছিটটা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। কেউ বলেন, অবিবাহিতা, কেউ বলেন, বহুবিবাহিতা। এখন পাড়-ওয়ালা শাড়ি পরেন, মাঝে মাঝে গয়না পরেন, মাঝে মাঝে পরেন না। কিন্তু সিঁথি একেবারে সাদা। অবশ্য সিঁথিতে সিঁদুর না পরেও মেয়েরা আজকাল সিমন্তিনী হতে পারে। কিন্তু বেলাদি এখন একা থাকেন। স্কুল কমিটি ছোট একটা কোয়ার্টার্স দিয়েছে। সেখানে বইপত্র নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। অনেকে বলছে, এটা ওঁর স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞাতবাস। অনেকে বলেন, এই স্কুলেও বেলাদি বেশিদিন থাকবেন না। যেখান হতেই অন্য কোথাও চলে যাবেন। সেইজন্যেই তিনি কারো পরোয়া করেন না। না কমিটির প্রেসিডেন্টের, না সেক্রেটারীর। আর স্কুলের কমবয়সী টিচাররা তো ওঁর কাছে থার্ড ক্লাসের ছাত্রীর মত। যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে হেডমিস্ট্রেসের। আছে স্বেচ্ছাচার আর স্বেচ্ছাবিচরণের ক্ষমতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা যে খুব সুখের তাতো মনে হয় না। নিঃসঙ্গ জীবনে যে বেলাদি খুব শান্তিতে আছেন, ওঁর চালচলন, কথাবার্তা তার পরিচয় দেয় না। মাঝে মাঝে বেলাদির জন্যে বড় দুঃখ হয় মাধুরীর। ইচ্ছা হয়, ওর কাছে বসে ওর সব কথা শোনে, সাধ্যমত ও'র সেবা পরিচর্যা করে। ওই দোর্দণ্ড প্রতাপের অন্তরালে যে একটি ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয় রয়েছে, তার একটু শুশ্রূষা করতে সাধ যায়। কিন্তু ও'র কাছে ঘেঁষবার জো নেই। বেলাদি তাঁর কোয়ার্টার্স যেমন কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে রেখেছেন তেমনি নিজেকেও রেখেছেন আত্মমর্যাদা আর অহমিকার বেড়ার আড়ালে। তিনি সবাইকে এড়িয়ে যান, তাঁকেও সবাই এড়িয়ে চলে। হেডমিস্ট্রেস বেলাদিকে আর [illegible] কেয়ারটেকার ব্রজবাবুকে দেখে মাধুরীর মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ভয় হয়, আশঙ্কা হয়। কিসের ভয় তা ঠিক পরিষ্কার করে বোঝা যায় না। বেলাদি বিদুষী, আর ব্রজবাবু সাধারণ লেখাপড়া জানা মানুষ। দুজনেরই নিঃসঙ্গ একক জীবন। কিন্তু কেউ যেন ঠিক সুখী নন, সুস্থ নন। তবে কি মানুষের সঙ্গ কামনা ভিতরে ভিতরে থেকেই যায়? তবে কি মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না? তার সুখের জন্যে অন্তত আর একজন কি অপরিহার্য?

ক্লাসে ঢুকতেই ক্লাসের মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। এদের মধ্যে দু' চারজন বেশি বয়সী মেয়েও আছে। জনতিনেক আছে বিবাহিতা। তাদের মধ্যে একজন অতা। মাধুরী ক্লাসে এলে ও বড় লজ্জা পায়। ওর যে বর তার সঙ্গে মাধুরীর আগে সম্বন্ধ এসেছিল। দেখাশোনাও হয়েছিল। মাধুরীকে দেখে তাদের পছন্দ হয়নি। [illegible] ওর বর নিজে দেখে পছন্দ করে [illegible] করেছে। বাপের বাড়িতে থেকে এই কয়েকটা মাস এই স্কুলে পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিও দিয়েছে। কী করে যেন চালু হয়ে গেছে কথাটা। হয়ত ওর বরই বলে থাকবে। পুরুষের অসাধ্য ত কোন কাজ নেই। তাই অতা মাধুরীকে দেখে বড় লজ্জা পায়। চোখের দিকে তাকায় না। মুখ তুলে কথা বলে না। কিন্তু শুধু কি লজ্জা? ওর মনে এর জন্যে গর্বও কি নেই? তার টিচার তার কাছে হেরে গেছে সেই গর্ব? মাধুরী নিজের মনেই একটু হাসল। তারপর বই খুলে পড়াতে আরম্ভ করল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার একটি অংশ পর্যন্ত ওঁদের পাঠসংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পড়াতে পড়াতে মাধুরী বেলাদির বকুনির কথা ভুলে গেল, তাঁর নিঃসঙ্গতার দুঃখের কথা ভুলল, অতার লজ্জা আর গৌরবের কারণের কথাও তার আর মনে রইল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কিভাবে যে কেটে গেল তা যেন টেরই পেল না মাধুরী।

ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে আসবার পর তার খেয়াল হল। হ্যাঁ এই ভাল। কাজই সবচেয়ে ভাল। নিজের কাজে বিশিষ্টতার মধ্যেই সুখ। এ ছাড়া সুখের আর কোন অর্থ নেই, অস্তিত্ব নেই। বাবা আগে আগে কোন্ এক পুরোন যাত্রার পালা থেকে—বোধ হয় মরুৎযজ্ঞই হবে নাম—পার্ট আবৃত্তি করতেন তার মধ্যে দুটো লাইন ছিল 'কর্ম সূত্রোয় দুখানা ঘুড়ি। ভক্তি আর জ্ঞান বেড়ায় উড়ি।' মাধুরী হাসল। পদ্যটা ভাল না, কিন্তু ভিতরের কথাটা ভাল।

বৃষ্টির ধারা অনেকক্ষণ আগেই ক্ষীণ হয়েছে। আকাশের মেঘ কাটেনি। এখন চিক চিক করছে রোদ। ক্লাস নাইনের মেয়েদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল তা বোধ হয় আর রাখা গেল না। হেড-মিস্ট্রেসের কাছে আর সুপারিশ করতে যাওয়া যাবে না। আজ ত আর পুরো বৃষ্টির দিন নয়, রোদ আর বৃষ্টি মেশানো দিন। তিনি পুরো স্কুলই করবেন।

টিফিন পিরিয়ডে হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টারে চলে গেলেন। নির্মলা মাথায় ছাতা ধরে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল। টিচার্স-রুমে টিচাররা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বেলাদি সব সময় যে বকেন কি উপদেশ দেন তা নয়। কিন্তু তিনি শুধু তাঁর চেয়ারখানায় বসে থাকলেও তরুণী শিক্ষিকারা কেমন যেন একটু আড়ষ্টতা বোধ করে। তাঁর দৃষ্টিতে ভয়, তাঁর হাসিতেও ভয়। মানুষের হাসি যা ফুলের মত তাকেও মানুষে ভয় করে। কিন্তু গাছের ফুল? তাকেও কি ভয় করে কেউ? মাধুরীর জানা নেই। তবে শুনেছে ফুলের ঘায়ে কেউ কেউ নাকি মূর্ছা যায়। সে ফুলের মানে অবশ্য অন্য। পুষ্পশর, পুষ্পধনু। প্রেমের দেবতার কত নামই যে মানুষে দিয়েছে। অপরা ত দিতে পারত! শ্রীকৃষ্ণের একশ আট নাম না হয়ে মদনেরই অষ্টোত্তর শতনাম থাকা উচিত ছিল।

স্কুলের আটজন টিচারকে এবার একসঙ্গে জড় হতে দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে এই কলোনীরই আছেন তিনজন। তাঁরা ফের নিজেদের ঘর-সংসারের খবর নিতে গেলেন। অনুপমাদি আর রমলাদি পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি আলাপ করতে লাগলেন। অনুপমাদির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ভাল না। আবার ছেলেপুলে হবে। কয়েক মাস পরেই দীর্ঘদিনের ছুটি নিতে হবে তাঁকে। এই নিয়ে হেডমিস্ট্রেস বেশ একটু বিরক্ত। তিনি নিজে ত মেয়ে হয়েও মেয়েদের এই সুখ-দুঃখের মর্ম বুঝলেন না। অনুপমাদি নিজেও খুব একটা স্বস্তি বোধ করেন না। সহকর্মীদের সামনে তাঁর কেমন যেন একটু লজ্জা লজ্জা করে। মাধুরী অরুণারা তাঁর সামনে কিছু বলে না। আড়ালে আবডালে ঠাট্টা-তামাশা করে। বেশ টিপ্পনি কাটে। মাধুরী নিজে অবশ্য তেমন মন্তব্য করে না। শোনেই বেশি। আচ্ছা ওই অবস্থা নিয়ে ছোট ছোট ছাত্রীদের সামনে কী করে বসে বসে পড়ান অনুপমাদি? লজ্জা করে না? মাধুরী হলে ত লজ্জায় মরে যেত। সে ভাবতেও পারে না। ছি ছি ছি। কিন্তু বাড়ির অবস্থায় বাধ্য হয়েই বোধ হয় ও'কে এই দশা নিয়েও আসতে হয়। আর কতদূর থেকে, সেই উল্টোডাঙা থেকে ওঁকে এখানে আসতে হয়। ধারে কাছে যে সব স্কুল আছে তাতে ও'র চাকরি হয়নি। হয়েছিল চলে গেছে। কার দোষে কে জানে। অনুপমাদি তা ভাল করে বলেন না। মাধুরীরও ওসব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে। তিনি নিজে থেকে যা বলেন তাই শুধু শুনে যায় মাধুরী। একদিন অনুপমাদি কথায় কথায় বলেছিলেন, 'মাধুরী, আমিও প্রথম প্রথম শখ করেই এ কাজে নেমেছিলাম। যে স্কুলে ছাত্রী ছিলাম, সেই স্কুলেই একজন টিচারের বদলীতে কাজ আরম্ভ করি। তখন কী গর্ব, কী আনন্দ। সেই একই স্কুলে যাই। কিন্তু যাওয়ার ধরনটা পালটে গেছে। যাঁদের ভয় করতাম, তাঁদের পাশাপাশি বসি, তাঁদের সঙ্গে সমবয়সীর মত অসঙ্কোচে আলাপ করি। এর চেয়ে বড় দিগ্বিজয় যেন আর কেউ কখনো করেনি। তার পর এই মাস্টারী করতে করতেই বিয়ে-থা হয়ে গেল। আমার এক প্রিয় ছাত্রীর দাদার সঙ্গে। ছাত্রীই ছিল যোগাযোগের সেতু। বিয়ে হল, চাকরি কিন্তু খসল না। স্বামীর সে অবস্থা নয়। তা ছাড়া দুটো পয়সা বেশি এলে দুঃখের সংসারে একফোঁটা সুখ বেশি মেলে। তারপর কত স্কুল পালটালাম, কিন্তু মাস্টারীটা রয়েই গেল। এখন মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে। ছাড়তে পারি না, আবার রাখাও শক্ত। নইলে একদিন আমিও তোমাদের মতই ছিলাম।'

অনুপমাদিকে দেখে মাধুরীর সেই কথাগুলি আজ ফের মনে পড়ে গেল। এখন অবশ্য তিনি অন্য মুডে আছেন। টিফিন খেতে খেতে রমলাদির সঙ্গে স্কুল-কমিটির মধ্যে যে-পার্টি পলিটিকস ঢুকেছে, আর সেই জন্যেই স্কুলটার উন্নতি হচ্ছে না, পাকা বাড়ি হচ্ছে না—এখন এই সবই অনুপমাদির আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সেই একদিনের অনুপমাদি মাধুরীর মনে যেন গাঁথা হয়ে রয়েছে। সে দিন ওঁকে যেমন করে পেয়েছিল তার পরে আর ও'কে সে ভাবে পায়নি। তার পরেও না তার আগেও না। সেদিনও ছিল এমনি এক বৃষ্টির দিন। ঘরে আর কেউ ছিল না। মাধুরীর মুখোমুখি বসে সেদিন কথাগুলি বলেছিলেন অনুপমাদি। বলেছিলেন, 'মাধুরী, একদিন আমিও তোমাদের মতই ছিলাম।' মাধুরীও কি একদিন তার ছাত্রীদের, কমবয়সী টিচারদের

ডেকে বলবে, 'আমিও একদিন তোমাদের মতই ছিলাম।' আর তারা সে কথা বিশ্বাস করতে চাইবে? ভাবতেও যেন গা শির-শির করে মাধুরীর। ভবিষ্যতে কার মত হবে সে? ওই অনুপমাদির মত না, হেডমিস্ট্রেস বেলাদির মত? জীবনের কোন্ প্যাটার্নটা তার জন্যে অপেক্ষা করছে?

না, কোন প্যাটার্নই না, মাধুরী ও'দের কোন প্যাটার্নই পছন্দ করে না। শুধু ও'দের কেন, এখানে যত টিচার আছেন বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা, স্বামী-ত্যাগিনী কি পরিত্যক্তা—কারও মতই হতে চায় না সে। মাধুরী তার নিজের মত হবে। নিজের হাতে যেমন পুলওভার বোনে, স্কার্ফ বোনে তেমনি নিজের জীবনটাকে মাধুরী নিজের হাতে বুনে নেবে। কিন্তু সেও ত আরও পাঁচজনের আরও পাঁচটা স্কার্ফের মতই হবে। তা হোক। তবু, তা মাধুরীর নিজের। নিজের শ্রমের, নিজের স্বপ্নের, নিজের সাধের। ওই স্কার্ফের মত সবাইর জীবনই দেখতে একরকম। বরণে ধরনে, সুখে দুঃখে, আশা আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু সেই জীবন যারা যাপন করে, বহন করে, তারা জানে যে এক নয়। প্যাটার্নটা বাইরে থেকে দেখতে এক। কিন্তু ভাবে, অনুভবে, স্বাদে আলাদা।

অরুণা জানালার ধার থেকে হাতের ইশারায় তাকে ডাকল।

মাধুরী উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে তার পাশে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

অরুণা বলল, 'কী খুঁজছেন কাছে ছাত্রের ... বসে আছ মাধুরীদি। এদিকে এসো। চেয়ে দেখ আকাশে কি সুন্দর রামধনু উঠেছে।'

'ওমা, তাই ত।'

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল মাধুরী। মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'বাঃ!'

মেঘের কোলে সপ্তবর্ণের লীলাধনু একেবারে আকাশ জুড়ে আসন পেতেছে। এত বড় রামধনু ইদানীং আর দেখেনি মাধুরী। আশ্চর্য এই রামধনুর নামই ত হওয়া উচিত পুষ্পধনু। আকাশের ফুল।

অরুণা মাধুরীর গায়ে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'ইস, একেবারে ভাবেই বিভোর। ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? তারপর কাল কি হল ব্যাপারটা শুনি।'

মাধুরী তার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'ব্যাপার কিছু নয়। কাল সত্যিই বড় মাথা ধরেছিল। শুয়েছিলাম সারাদিন।'

তারপর ফের মাধুরী রামধনুর দিকে তাকাল। আচ্ছা, অসীম কোথায় আছে এখন? ডালহৌসি স্কোয়ারে? নাকি এতক্ষণে স্ট্র্যান্ড রোডে নিউ সেক্রেটারিয়েটে চলে গেছে? উঠেছে গিয়ে সেই তেরতলার ওপর? সেখানে জানলায় দাঁড়িয়ে মাধুরীর মত এই একই রামধনু দেখতে পাচ্ছে অসীম? একতলা আর তেরতলা এক হয়ে গেছে?

আশ্চর্য, রামধনু দেখে হঠাৎ অসীমের কথা এমন করে মনে পড়ল কেন মাধুরীর? পড়বার ত কোন কথা নয়। আর অসীম যে এখন ডালহৌসি স্কোয়ারেই থাকবে তার কী মানে আছে? ওখানকার কাজকর্ম সেরে সে হয়ত এতক্ষণ বেলভেডিয়ারে চলে গেছে। সেখানে দুজনে মিলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছে একই রামধনুর রঙ। আলীপুরের আকাশ এতক্ষণে নিশ্চয়ই রাঙে রাঙে ছেয়ে গেছে। হঠাৎ বুকের মধ্যে ছোট্ট একটু আঁচড় পড়ল মাধুরীর। একটি মিনিয়েচার রামধনু। রামধনু নয় বজ্রধনু।

সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী নিজের মনকে চোখ রাঙাল। ছি ছি ছি, ছি ছি ছি। সে না তার আপন বোন! সে যে তার আপন বোন। তাকেও হিংসা! তার হাতের পুতুল ছেলে-বেলায় কেড়ে নিত বলে আজও নেবে!

নির্মলা ঘন্টা পিটিয়ে জানাল টিফিন শেষ হয়েছে। তারপর আরো তিনটে ক্লাস। হেড-মিস্ট্রেস আর এলেন না। তাঁর শরীর নাকি ভাল নেই। ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেণ্ড ক্লাসকে একসঙ্গে মিলিয়ে মাধুরী গ্রামার পড়াল। গ্রামারই আসল। ভাষায় গ্রামার আর জীবনে নীতি, কর্তব্য। তাতে যেন কোন ভুল না হয়।

চারটেয় ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়ল। যেন সোনার ঘণ্টা।

সে ধ্বনি শুধু ছাত্রীদের কানে নয়, মাধবীদের কানেও বড় মধুর সুরে বাজতে লাগল।

(ক্রমশ)

সেকেলে ধারণা নিয়ে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ নষ্ট করবেন না ?

সেকেলে ধারণা ও অন্ধসংস্কার মানুষের পক্ষে ভালভাবে জীবন উপভোগ করবার এবং আধুনিক জগতের সুযোগ সুবিধে সদ্ব্যবহারের পথে সত্যিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো কোনো লোককে বলতে শুনা যায়, "আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না। শুনেছি, স্বাস্থ্যের পক্ষে জিনিসটা ভাল নয়।" এ হল একেবারেই সেকেলে সংস্কার ··· কারণ স্নেহজাতীয় পদার্থ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে পুষ্টিকর ও উপকারী স্নেহপদার্থের মধ্যে অন্যতম বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ পক্ষে দু' আউন্স ক'রে স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। স্নেহপদার্থ আমাদের অন্য খাদ্য হজম করতে ও তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রোগ ও অবসাদের বিরুদ্ধে যুঝতে এবং আমাদের সুস্থ ও সবল থাকতেও সাহায্য করে।

বনস্পতি বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ স্নেহ—চিনাবাদামের ও তিলের তেল পরিশোধন ক'রে বিশেষ প্রণালীতে তৈরী। এর ভেতরে স্নেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত হয়ে আছে ব'লে বনস্পতি শুধু যে দামে সুলভ ও অল্পেতেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ··· আরো স্বাস্থ্যপ্রদ করবার জন্যে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ভিটামিনও এতে মেশানো হয়। বনস্পতির প্রতিটি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ—যা চোখের ও ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায়, শরীরের ক্ষয়পূরণে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক!

ভাল খাদ্য আপনাকে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে ··· এবং বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে সুলভ বনস্পতির কল্যাণে ভাল খাদ্য খাওয়া সহজ হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে সুরু করা উচিত নয়?

বনস্পতি
— বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

VMA 9202

হাল ফ্যাশানের উলের পোশাক বুনতে—লাল-ইমলি উল চাই
লাল-ইমলি উল সব সময় মোলায়েম
থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী
উলের সুতোয় বিশেষ ধরনে তৈরী
এই লাল-ইমলি উল—অনেক রকম
রঙে পাবেন। সেরা 'কাউন্টেস'
উল ৩-প্লাই, 'লেডী মেমনী' ও
'তক্ষশীলা' উল ৪-প্লাই।
দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড
কানপুর উলেন মিলস শাখা—কানপুর, ইউ, পি
ট্রেড মার্ক
'কাউন্টেস' ৩-প্লাই
'লেডী মেমনী' ও 'তক্ষশীলা' ৪-প্লাই
রেডিমেড উলের পোশাক
আপনার যদি বোনার
অভ্যাস না থাকে
—নানা আকর্ষণীয়
ডিজাইনে তৈরী
লাল-ইমলী উলের
রেডিমেড পোশাক
ব্যবহার করে দেখুন।
লাল-ইমলি উল
LAL 3360

দখল সামান্য বলেই দু' কথায় তিনটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতে হয়? তাঁরা কি জানেন, (৩) বাংলাদেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত মানুষ বলে যাঁদের পরিচয় আছে বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই? তাঁরা কি জানেন, (৪) স্কুলের ছেলেরা মা-মাসির কাছে উপযুক্ত পাঠ সহযোগে শুদ্ধ চিঠি খুব কমই লিখতে পারে? তাঁরা কি জানেন, (৫) বাংলাদেশের সাহিত্য সভার সভাপতিদের পারিবারিক ধারণা, বাংলা পড়লে পড়া হয় না, বাংলা পড়লে জ্ঞান হয় না—তাই তাঁদের ছেলেদের বাংলা শিক্ষার হাওয়া থেকে মিশনারি স্কুলে পাঠিয়ে সযত্নে রক্ষা করেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রামতনু অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা শিক্ষার মান অতি অল্পকালে যথেষ্ট উন্নীত করেছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করেও বলতে হয়, সামগ্রিকভাবে মানুষের মনে আপন মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত যে হয়নি, তার প্রমাণ, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চস্তরের কোন গবেষণা গ্রন্থ আজ পর্যন্ত বাংলাভাষায় লেখা হল না। বাংলার পরি-

ভাষা এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্নতি করে তুলতে হলে বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থগুলি (যা অন্তত আমাদের পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত) বাংলাভাষায় লিখতে হবে। ভাষাজনিত প্রাথমিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এসকল গ্রন্থে থাকতেই পারে, তবু আশা করি, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুশীলনে ভাষাও একদিন পূর্ণতা অর্জন করবে। স্বীকার করি, বাংলাভাষায় গবেষণা গ্রন্থ লিখিত হলে যশ ও অর্থ লেখকের ভাগ্যে সামান্যই জুটবে। সঙ্গে আবার এইটুকুও মনে করি, মাতৃভাষার জন্য যদি আমাদের কোন দরদ থাকে তবে এই আত্মত্যাগ করতেই হবে। তাছাড়া, প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা যে ভাষায়ই লিখিত হোক না কেন, আসল লোক তার খবর রাখবেই। আমাদের আগামী দিনের গবেষণা গ্রন্থগুলির যদি কোনরূপ বিশ্বজনীন আবেদন থাকে, তা বাংলাভাষায় লিখিত হলেও বিশ্বের কাছে পরিচিত হতে পারবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আজ লক্ষ্য করতে পারছি বাংলাভাষাকে ভালোবেসে বাংলাভাষার উন্নতির জন্য এটুকু আত্মত্যাগ করার মত লোকের দেশে একান্তই অভাব রয়েছে।

অন্যদিকে স্কুল কলেজে বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ভঙ্গিটি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কয়েকদিন আগেকার কথা, বাংলা দেশের স্কুলগুলিতে বাংলার জন্য কোন স্বতন্ত্র শিক্ষক ছিলেন না। ও বাংলাটি অন্যান্য "স্কুল স্যার" কি বড়জোর পণ্ডিতমশাইকে দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হত। এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে বলা চলে না। যদি [illegible] উপর [illegible] পাওয়া অসম্ভব হবে না। তার কারণ, মাতৃভাষার প্রতি আমাদের [illegible] এবং অবহেলা। আবার এমন অনেক স্কুল দেখেছি যে এ পাশ শিক্ষক একেক নম্বর [illegible] বাংলা পরীক্ষা পাশ করে এসেছেন, এই লোকেরাই নবম এবং দশম শ্রেণীতে বাংলা সাহিত্য পড়ান। কিন্তু কেন? তিনি ইতিহাস পড়াতে পারেন, এর একটা যুক্তি আছে, কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩০০ নম্বরের পাঠ্যসূচী পড়ে এসেছেন এবং বি এ-তেও ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা পাশ করে এসেছেন। ইতিহাস পড়াতে পারেন ঐ একই কারণে, কিন্তু বাংলা কেন? ৮০ নম্বরের জন্য পাঁচখানা বই তাড়াহুড়ো করে পড়ে বাংলা পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করা যায় না, স্কুলওয়ালারা যেন একথা মনে রাখেন। এমনি অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষা না-পেয়ে মাতৃভাষার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা গড়ে ওঠেনি মোটেই।

মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি ক্লাশে পাঠ্যসূচী আরো হাস্যকর। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকটি কবিতা ও গুটিকতক প্রবন্ধ আবশ্যিক পাঠ্যতালিকায় আছে—আর সেজন্য পরীক্ষা হয় মাত্র ৪০ নম্বরের। বাকি ৬০ নম্বর পাঠ্যতালিকার বাইরে থেকে আসে। কাজেই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পড়াশুনার প্রয়োজন খুব কম ছাত্রই অনুভব করে। এবার ভেবে দেখুন, মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় যে ছাত্র বাংলা সংকলন গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা এবং গুটিকতক প্রবন্ধ পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, মাতৃভাষার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা গড়ে উঠবে কোন্ পথে? ডিগ্রি ক্লাশে তো আর তাদের বাংলা পড়তে হয় না।

বি এ ক্লাশের অবস্থা আরও খারাপ। উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ এবং প্রবন্ধসংকলন—জাতীয় পাঁচ ছ'খানা বইয়ের জন্য পরীক্ষায় থাকে মাত্র চল্লিশ নম্বর। এর [illegible] কথা মনে রেখেই বোধ হয় ছাত্ররা রাজসিংহ না-পড়ে রাজসিংহের সমালোচনায় চোখ বুলিয়ে যায়, মেঘদূত এবং শকুন্তলা কি বা কোথায় না-জেনেও সমালোচনার সমালোচনায় তারা বিদগ্ধ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্ণধারগণ এমনি করে পল্লবগ্রাহিতার অজস্র সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাই দেখি, যারা মূল গ্রন্থ দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পড়েনি তারা [illegible] করে বায়রন, কীটস এবং [illegible] (সাধারণ উদাহরণ নয়) জীবনদর্শন নিয়ে [illegible] লাগে।

আমাদের দেশে যখন দেশ গঠনের সময়ে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে দেশ গঠনের দায়িত্ব বিজ্ঞানীরা নিজেরাই গ্রহণ করেছেন, তখন ভুললে চলবে না যে, একটি বিচিত্র [illegible] সমাজের অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণ মানুষের ভাগ্য তাঁদের কলমের এক এক খোঁচায় নির্দিষ্ট হচ্ছে। অতএব এই মানুষকে জানতে হবে, সমাজের সাধারণ মানুষকে চিনতে হবে, তবেই তাদের উপকার করা যাবে। কোন ইংরেজ, কোন মার্কিন সাহেবের থিওরি পড়ে এদের জানা সম্ভব নয়, এদের জানতে হলে দেশের ভাষা জানতে হবে, দেশের সাহিত্য পড়তে হবে। অথচ আমাদের দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় মাতৃভাষাকে কিভাবে অবহেলা করা হচ্ছে তা দেখলে দুঃখ হয়। এই শিক্ষা ক্ষেত্রের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই ছাত্রদের মাতৃভাষার মুখও দেখতে হয় না। ফলে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে উঠবার অবকাশ কোথায়? উপরন্তু এই উচ্চশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় সচেতন বা অসচেতনভাবে মাতৃভাষার প্রতি

একটি অবজ্ঞাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। পুরুষানুক্রমে এই অবহেলা সংক্রামিত হয়ে চলেছে। তা নাহলে মাতৃস্তন থেকে ছিন্ন করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাহেবি স্কুলে পাঠানো হবে কেন?

নিজেদের চোখে তারই ফল আজ ফলতে দেখছি। কোন শিক্ষিত মানুষ, বাংলা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ থাকলেও ছেলেকে বাংলা পড়তে পাঠান না। কোন ভাল ছাত্র বাংলা পড়তে আসে না। যারা আসে অতি সাধারণ ছেলে। এদের মধ্যে দুটো ভাগ করা যায়, (১) একদল আসে বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটি অনুরাগ নিয়ে; এরা সংখ্যায় অতি অল্প। (২) অন্যদল আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে বা অন্য কোন বিষয় আয়ত্ত করা তাদের সাধ্যাতীত জেনে। কথাটি অপ্রিয় হলেও নিদারুণ সত্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খতিয়ান নাড়াচাড়া করলে দেখা যায়, অতি উচ্চ পর্যায়ের মেধাসম্পন্ন ছাত্র দু' একজন এসেছেন। সে আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু সঙ্গে একথাও বলতে হয়, সাধারণ ছেলেদের মান অত্যন্ত নীচু। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি কৃতী ছাত্ররা বাংলা পড়তে আসে না। আসবে কেন? মাতৃভাষাপ্রীতির উচ্ছ্বাস দেখাতে গিয়ে কে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়? সর্বনাশই বলবো। কেননা, বাংলায় অনার্স পাশ করে এম এ পাশ করেও বাংলার ছেলেদের চাকরী জোটে না। একমাত্র শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনা ছাড়া চাকরীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাংলার ছেলেদের সব পথ বন্ধ। কেন? আমি তো দেখতে পাচ্ছি তাদের একমাত্র অপরাধ তারা মাতৃভাষায় শিক্ষা পেয়েছে। বাংলা যদি ইংরেজীতে পড়া ও পড়ানোর ব্যবস্থা থাকত—বাংলার ছেলেদের এমন দুর্দশা হত না।

এই দুরবস্থার মধ্যে নিজেদের অপরিসীম দায়িত্বকে যাঁরা অস্বীকার করছেন, সে হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। বিভাগই সর্বতোভাবে দুর্গতি পাওয়ার জন্যে দায়ী, ছাত্র প্রতি বছর বাংলা পড়তে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এই ছাত্রদের ভবিষ্যতের আশা দিতে পারেন না, যদি কাজের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না, তবে কেন এই ছাত্রদের বাংলা পড়তে অনুৎসাহিত করেন না? যদি এমন হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ছাত্রদের ভবিষ্যতের ভরসা দিতে অপারগ, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে উদাসীন। সরকারপক্ষ যখন উদাসীন [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ।

কি পরিমাণ উৎসাহের সঙ্গে বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের মন [illegible], ভাবলে অবাক হতে হয়। এই সংকটের মুহূর্তে যখন বাংলার ছেলেরা স্কুলমাস্টারি থেকে শুরু করে কেরানীগিরির জন্য চাতক হয়ে আছে তখন কি স্পর্ধায় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলার আসনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন? যে হারে বাংলার পাশের সংখ্যা বাড়ছে তার তুলনায় নতুন কলেজে ক'জনের কর্মসংস্থান হতে পারে? নিয়মিত এবং অনিয়মিত ছাত্র মিলে প্রতি বছর ২০০ থেকে ৩৫০ জন

ছাত্র বাংলায় এম এ পাশ করছে। অথচ বাংলাদেশে ক'টা কলেজ আছে? ১৯৫৯ সালে বিশেষ এবং নিয়মিত ছাত্র মিলে ৮০০ ছাত্রছাত্রী বাংলায় অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করে বেরুলে এদের কর্ম-সংস্থান হবে কোথায়? বাংলা পড়ার অপরাধের দায়িত্ব কি এদের একার?

অনেকেই হয়তো বাংলার ছাত্রদের মেধা এবং মানের প্রতি কটাক্ষ করে আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতে চাইবেন। হয়তো বলবেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেন বাংলার ছেলেরা তাদের কৃতিত্ব প্রমাণ করে না? এরও উত্তর আছে। শিক্ষার যাঁরা হাল ধরেছেন তাঁদের ঔদাসীন্য এবং দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার জন্য প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষিত ছাত্রদের আজ (অন্ততঃ বাংলার) এই চরম দুর্দশা। সেদিনও একদল মানুষকে চীৎকার করতে শুনলাম হিন্দীর পক্ষে; অনলস জ্ঞানের অভিমানে বললেন ইংরেজীর পক্ষে। অথচ একটি মানুষকে বলতে শুনলাম না আমরা সকল ভাষাকেই স্বীকার করি, ভারতের চৌদ্দটি ভাষার সম্পদকেই শ্রদ্ধা করি। তাই দেখি আই-এ-এস পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের মধ্যে ইংরেজী আছে, অর্থনীতি আছে, ইতিহাস আছে, আইন তত্ত্ব শাখা প্রশাখা নিয়ে আছে—নেই হিন্দী, বাংলা, তামিল, তেলেগু, ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য। কারণ সে যে আমাদের মাতৃভাষা। আই-এ-এস পরীক্ষায় ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে স্থান দেওয়া মানেই হল ভারতীয় মাতৃভাষা বিমুক্ত, ইংরেজী কেন্দ্রানুবর্তী একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী-দের অপমান। যদি তাই না হবে, ভারত পারে না একটি দেশের শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষায় সে দেশের মাতৃভাষার কি কারণে স্থান নেই? যেখানে আছে W. B. C. S. পরীক্ষায়, সেখানেও কি অবজ্ঞায় অথবা অজ্ঞতায় স্থান দেওয়া হয়েছে মাতৃভাষাকে, দেখুন। সাধারণ অর্থনীতি এবং ভারতীয় অর্থনীতি সমগ্র অর্থনীতি বিষয়ের একটি অংশমাত্র। এ দুটিকেই স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে W. B. C. S. পরীক্ষায় স্থান দেওয়া হয়েছে। আইন ও ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড অংশও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলার দুটি পত্রের জন্য সমগ্র বাংলা সাহিত্য—প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যা এম এ পরীক্ষায় পর্যন্ত নেই। পাঠ্যসূচী হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে।

আমার প্রশ্ন এ অবিচার কেন? বাংলার বেলায় বিচার হবে সমগ্র সাহিত্যের জ্ঞান আর অন্যান্য বিষয়ের বেলায় বিচার হবে সামান্য অংশ মাত্র? কাজেই বাংলার মত বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসন করে নেওয়া সম্ভব নয়।

কাজেই দেখা গেল, জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতা আমাদের পেয়ে বসেছে। ফলে মাতৃভাষা শিক্ষা এবং জীবিকা অর্জন নদীর এপারে ওপারের ব্যবধান, মাঝখানে খেয়া নৌকার অভাব। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতেই হবে, কেননা আমাদের আগামী দিনের উন্নতি অবনতি নির্ভর করছে তাকেই উর্বর করে তোলার মধ্যে যেখান থেকে রস আহরণ করে জাতি হিসেবে আমরা বাঁচবো।

এবার আমাদের সমস্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ করে মূল সমস্যাগুলির রূপ পরিষ্কার করে দেখা যাক:—

(১) বাংলাদেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাগত মূল্য অবহেলিত। তাই এর মানও নিম্নমুখী।

(২) বাংলার ছাত্রদের চাকরীর ক্ষেত্র অপ্রসর, অনুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা বাংলা পড়তে আসে না।

(৩) ফলে, অধ্যাপনা বা গবেষণামূলক কাজের উন্নততর দৃষ্টান্ত গড়ে ওঠে না।

(৪) বিজ্ঞানের ছাত্রদের মাতৃভাষার সঙ্গে আবশ্যিক যোগ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত, তাও অতি সামান্য। ফলে মাতৃ-ভাষার প্রতি অগভীর শ্রদ্ধাজনিত উদাসীনতা

তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। অতএব এঁরা যখন শাসন বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন, তখন মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সামান্যই স্বীকার করেন।

(৫) এছাড়া আছে সরকারী অবহেলা। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক দুই-ই। আইনত বাংলা ইত্যাদি ভাষার মর্যাদা হিন্দীর সমপর্যায়ভুক্ত হলেও কার্যত হিন্দীর প্রসার ও উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণে উঠে পড়ে লেগেছেন সেই তুলনায় বাংলার সামান্য পরিচর্যাও হচ্ছে না। তাই একদিকে হিন্দী শিক্ষিত যুবকের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে চলেছে আসমুদ্র-হিমাচল আর বাংলার সীমা নির্ধারিত হয়ে আছে 'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই।'

(৬) সামান্য কেরানীর চাকরীতেও উচ্চ-পদস্থ সরকারী বাবুদের দৃষ্টি যতটা অর্থনীতি, অংক, ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানের স্নাতকদের উপর তার চেয়ে অনেক কম বাংলার স্নাতকদের প্রতি। এর মূলে অত্যন্ত সংকীর্ণ গতানুগতিক ধারণা। আসলে কেরানীর চাকরীর জন্য ডেফিসিট ফিনান্সিং জেনেও কিছু হবে না, অ্যাকোয়াস্টিক্স্ জেনেও কিছু হবে না। যেটুকু সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার তা বিজ্ঞান কি ইতিহাসের ছাত্রদের মত বাংলার ছাত্রদেরও থাকতে পারে।

(৭) অথচ শিক্ষকতা কি অধ্যাপনা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন পথই বাংলার ছেলে-দের জন্য খোলা নেই। কিন্তু প্রতি বছর বাংলায় পাশ করে যাচ্ছে বহুসংখ্যক ছাত্র। ফলে, চাহিদা কম বা স্থির হলে এবং আমদানী প্রচুর থাকলে বাজারে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, আগামী দু' বছরের বাংলা শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে সে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেবে। অতএব এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন :—

(১) বাংলার অনার্স ও এম এ পরীক্ষার আসন সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হোক। মেধা ও বিষয়ের প্রতি অনুরাগের ভিত্তিতে তাদের নেওয়া হোক।

(২) বাংলার ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা বাংলা পড়াতে এলে তাদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

(৩) সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দীর ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচুর চেষ্টা চলছে। তার পাশাপাশি বাংলার মর্যাদা আরো বাড়াতে হলে, সরকারী উদ্যোগে অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। সেখানে সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের কর্মসংস্থান হবে।

(৪) সাংস্কৃতিক বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে বাংলার ছাত্রদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারী কাজের বিভিন্ন বিভাগে বাংলার ছেলেদের গ্রহণ করার উপযোগী উদার মনোভাব উদ্বোধিত করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের স্কুল কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও অধ্যাপক নিযুক্ত আছে কিনা সরকারী উদ্যোগে তার খবর নিয়ে অপূর্ণ স্থানে ছাত্রদের নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে বাংলার ছেলেদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের যাচাই করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে নিতে হবে।

(৭) বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। এইজন্য বৃত্তি দিয়ে কৃতী ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে। কারণ সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় আজ-কাল যদি বা কিছু লোক অগ্রণী, কিন্তু ভাষা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা সেই পরিমাণে নীরব। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুকুমার সেনের পর ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই আগামী দিনের কোন চর্যাপদকে আমরা আমাদের সম্পদ বলে চিনে নিতে যে পারব না তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষ যখন দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে, তার বিজ্ঞান, কারিগরী ও বিভিন্ন শাখার যখন উন্নতি হচ্ছে তখন মাতৃভাষার এই সমস্যা দাবী উপস্থিত করলাম। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হোক, আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু সেই উন্নতির দিনে অনাদরে পড়ে থাকবে মাতৃভাষা আর অবহেলিত হবে তার অনুরাগীরা, এ কখনোই হতে পারে না। তাই বাংলাদেশ বাংলাভাষা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একনিষ্ঠ সাধকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি :

"বাংলা যার ভাষা, সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি,—তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক, ফলে শস্যে সুন্দর হোক, পুষ্পপল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালী চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"

মনোবৃত্তি সূচনা করে কি ধর্মের মহান্ অভ্যুত্থানের না শোচনীয় অধঃপতনের? পাশ্চাত্যে আজ সত্যিই মহাত্মা জন্মায় না, বা জন্মালেও কলকে পায় না। সেখানে আজ জয়জয়কার রাজশক্তির ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার—এমন কি কবি শিল্পীরও আর সে-প্রতিপত্তি নেই যা এক সময়ে ছিল। শনৈঃ শনৈঃ কোথায় চলেছে ওরা? ওদের কীর্তিকলাপের চোখধাঁধানো দিকটা চোখ আঁধার বলেই বুঝি চোখকে অন্ধ করে? অন্ধ ছাড়া আর কী বলব দিনের পর দিন চাক্ষুষ করে—কী আত্মঘাতী মূঢ়তাকে ওরা বরণ করছে মুক্তিপথ বলে? অলডাস হাক্‌সলি মিথ্যা বলেন নি যে, ধর্ম ও ধার্মিকের লোপ হ'লে মহতী বিনষ্টিঃ অবধারিত, কেন না যোগী ঋষি মহাত্মারাই পৃথিবীর বিষহারী (disinfectant): "The mystics are channels—" বলছেন তিনি—

—"though which a little knowledge of Reality filters down into our

এতে একটু আধটু লাগলেও বেশি লাগেনি আরো এইজন্যে যে, বুদ্ধ কোনোদিনই আমার মন টানেন নি, খৃষ্টকে আমি ঢের বেশি ভালোবেসেছিলাম। ফার্মিকির কথায় তাই মনে একটু ঘা লেগেছিল বৈ কি ভেবে যে, আমি বুঝি খৃষ্টের সমজদার—ঐ স্কাইব ফারিসী ধীবরদের মতন—বুদ্ধকে বরণ করবার যোগ্যতা আমার নেই। তার পরে বুদ্ধের সম্বন্ধে অনেক কিছুই পড়েছি। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের ও আনন্দকুমার স্বামীর বুদ্ধদর্পণ। কিন্তু ঐ ভালো লাগা মাত্র, বুদ্ধের ধম্মপদের কোনো বাণীতেই আমার হৃদয়ের তার বেজে ওঠে নি—মনে হয়েছে শুষ্ক শাসক। তাছাড়া, গীতা ও উপনিষদ ছত্রে ছত্রে যে-স্পন্দমান ভাগবত-বারতা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দীপ্ত এজাহার বহন ক'রে আনে বুদ্ধের ধম্মপদে তার কোনো আভাষই পাই নি। তবু পড়েছি মিলেরাস্পা-প্রমুখ নানা বৌদ্ধ মহাত্মার জীবনী, তিব্বতের গুহ্য সাধনার কাহিনী, নানা বৌদ্ধ বাণীবাহের নির্বাণ-মহিমা প্রচারের কথা, কিন্তু মনে হয়েছে কেবলই একটি কথাঃ "ঘ'ষে মেজে রূপ আর ধ'রে বেঁধে প্রেম"—এ হয় না, হয় না, হয় না। তাই সদুঃখেই বুদ্ধকে দূর থেকে দণ্ডবৎ ক'রে বলেছিঃ "প্রভু, তুমি মহামহিমময় মানি, কিন্তু আমি কৃষ্ণ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ এঁদের নিয়েই থাকব, কিছু মনে করো না। কারণ, আমি চাই ভগবানের নরলীলা—এমন কি, অদ্বৈত জ্ঞানও চাই না। আমার মন পরমানন্দেই জপ করেঃ

> পারমার্থিকমদ্বৈতং দ্বৈতং ভজনহেতবে।
> তাদৃশী যদি ভক্তিঃ স্যাৎ সা তু
> মুক্তিশতাধিকা॥

অর্থাৎ

> অদ্বৈতের পারমার্থিক সত্য—
> জানি মহান্।
> শুধু আমি চাই যেথা আনন্দে
> প্রেমময় ভগবান্।
> ভক্তের পূজা করেন গ্রহণ
> দ্বৈতের লীলামাঝে।
> শত মুক্তিও চাই না—যদি সে
> ভক্তি হৃদয়ে রাজে।

তাই তোমাকে আমি ভক্তি করব প্রভু, কিন্তু দূর থেকে, আর তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো যেন আমি পাই সেই ইষ্টকে যাঁর জন্যে আমি আকৈশোর তৃষিত।"

ফার্মিকি বুদ্ধ সম্বন্ধে নানা স্তবস্তুতি ক'রে আমাকে অপ্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলেন ব'লেই আমি রুখে উঠে এত কথা ব'লে ফেললাম। লিখতে লিখতে মনে হয়েছিল—নাই লিখলাম এসব। কিন্তু পরে ভাবলাম, ক্ষতি কী? ক্ষমাময় বুদ্ধ তো আর রাগ করতে পারেন না থাক না আমার সরল স্বীকৃতি যে, আমি চেষ্টা ক'রেও বুদ্ধের সমজদার হ'তে না পেরে তাঁকে দূর থেকে প্রণাম ক'রেই "স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ" মন্ত্র

জপ করেছি। কিন্তু এসূত্রে আর একটি কথা ব'লে এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব।

কথাটা এই যে, বুদ্ধকে আমি মনেপ্রাণে বরণ করতে না পারলেও বিলেত থেকে ফিরে উপনিষদ বার বারই পড়েছি পরমানন্দে। আর উপনিষদ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা জাগান প্রথমে এই ইতালিয়ান অধ্যাপক। তিনি বলতেন প্রায়ই যে, জগতে যত দর্শন আছে তার মধ্যে উপনিষদ ও গীতার কাছে কেউ নয়।

গীতা আমার চিরারাধ্য, কিন্তু উপনিষদ সম্বন্ধে সে সময়ে খুব কমই জানতাম। ফর্মিকি সাহেবের উচ্ছ্বাসেই আমার তরুণ মনের তারে তাঁর উপনিষদ-প্রেম ওঠে ঝংকৃত হয়ে। কীভাবে তিনি তাঁর প্রেমের সংবাদ দিয়েছিলেন মনে নেই, তবে ভাবটা এই ঃ

"ভারতবর্ষের আত্মার পরিচয় পেয়েই আমি প্রথম স্পষ্ট দেখতে পাই—য়ুরোপে আমরা কেন আজ পথভ্রষ্ট হয়েছি। [illegible]

[illegible]

[illegible] ফর্মিকি কীভাবে আমাকে দেখিয়েছিলেন— [illegible]

অধ্যাপক [illegible] থেকে উপনিষদ খুলে পড়ে পড়ে আমাকে বোঝাতে লাগলেন: "যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র যাবার সময়ে বললেন তাঁর দুই স্ত্রীকে যে, তিনি যাচ্ছেন সম্পত্তি তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে বাঁটোয়ারা ক'রে দিয়ে। তাতে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলঃ ঠাকুর, বুঝলাম তো সব—ধন-সম্পত্তির কথা। কিন্তু এসব ভোগ ক'রে আমি কি অমৃত হ'তে পারব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ না, ধন হ'লে ধনীরা যেমন জীবন যাপন করে তুমিও ঠিক তেমনি ভাবে বাঁচবে সুখে খেয়ে প'রে। তাতে মৈত্রেয়ী বলল—আহা কী কথা, দিলীপ, আর ভাবো, বলল যে—না, একজন গৃহিণী যে আজীবন গৃহকে বরণ ক'রেই এসেছে। বললঃ যাতে আমি অমৃত হ'তে পারব না তা দিয়ে আমার কী হবে?" বলতে বলতে মনে আছে বৃদ্ধের চোখে জল এসেছিলঃ "একবার ভাবো দিলীপ, ভাবো, তোমাদের দেশের নারী এই কথা বলেছিল —এর পরে আর কী বলবার থাকতে পারে? শুধু বলি মহিমময় ভারতের চিরমহিম-ময়ীকে ঃ নমস্কার নমস্কার—saluto! saluto!"

অধ্যাপক ফর্মিকিকে আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না—শুধু এইজন্যেই নয় যে তিনি আমাকে চমকে দিয়েছিলেন, ভারতের এক মহিমময়ী নারীর কথা ব'লে যাঁর সম্বন্ধে সে-সময়ে আমি কিছুই জানতাম না। ফর্মিকি আমার কাছে অবিস্মরণীয় থাকবেন এইজন্যে যে, তাঁর কথা শুনে প্রথম আমি সচেতন হই ভারতের অধ্যাত্মবাণীর বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে। কারণ তাঁর আগে ভারতের আত্মার বাণীতে বহু নরনারীকে স্পষ্ট হ'তে দেখলেও দেখিনি এমন কোনো ভাবুক বিদ্বানকে যিনি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ

অধ্যাত্মবাণীর মর্মজ্ঞ হ'য়েও ভারতের আত্মাকে বরণ করেছিলেন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারি ব'লে। অবশ্য তাঁর আগে ম্যাক্সমুলেরের শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি পড়েছিলাম, কিন্তু বইয়ে পড়া এক, চোখে দেখা আর। Seeing is believing প্রবন্ধটির তাৎপর্য আমি প্রথম উপলব্ধি করি প্রাচ্যকোবিদ orientalist অধ্যাপক ফর্মিকিকে দেখে।

এ নমস্য বিদগ্ধ অধ্যাপক আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না। কিন্তু থাকুন বা না থাকুন তাঁর ঋণ আমি কোনোদিন ভুলব না। কারণ য়ুরোপে অনেকের কাছেই আমি অনেক কিছু পেয়েছি একথা মেনেও বলব যে, ওদেশে বহু আলাপীর মধ্যে মাত্র দুটি মানুষ আমাকে দিয়েছেন ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণাঃ ওলগা—টলস্টয়ের মন্ত্রদূতী হ'য়ে, আর অধ্যাপক ফর্মিকি—উপনিষদের বাণীবাহ হ'য়ে।

রোমে আমার আরো বৎসরখানেক থেকে ইতালিয়ান গান শেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই সময়ে আমি প্রথম খানিকটা একলা পড়ি। কেন জানি না, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আর তেমন ভালো লাগত না—সম্ভবত ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে মন একটু নেতিয়ে পড়েছিল। য়ুরোপে জীবন চলে নিত্য নতুন চমক আহরণ করতে করতে বটে, কিন্তু চমকও দৈনন্দিন হ'লে আর চমক থাকে না তো। দেখতাম দিনের পর দিন সেই একই অশ্রান্ত প্রাণের শোভাযাত্রা, সেই হোটেলে অপর্যাপ্ত ভোজ্যের অফুরন্ত আয়োজন, নরনারীর সেই অকুণ্ঠ সম্ভাষণ, থিয়েটারে সিনেমায় সেই একই প্রণয়ক উত্তেজনার রকমফের—সর্বোপরি সাগরহীন জনস্রোতে নিত্যনব উদ্দীপনা কুড়োতে কুড়োতে আবালবৃদ্ধবনিতার লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলা। মনে বৈরাগ্য জেগেছিল বললে বেশি বলা হবে, তবে এ নিশ্চয় যে, অবসাদের প্রথম ছায়া পড়েছিল আমার তরুণ উৎসাহের 'পরে। দেশে ফিরে গানের নবজাগ্রত উদ্দীপনায় কিছুদিনের জন্যে এ অবসাদ অন্তর্হিত হয় বটে কিন্তু ফের বৈরাগ্যের উদয় হয় শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে। সে-ইতিহাস বলবার সময় এখনো আসে নি—যদি ঠাকুর দিন দেন তো বলব। এখানে শুধু আর একটি কথা ব'লেই আমার য়ুরোপ জীবনের জয়যাত্রায় পূর্ণচ্ছেদ টানব।

কথাটা এই যে, য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, শ্রেষ্ঠ বাণী, শ্রেষ্ঠ ভোগ, শ্রেষ্ঠ সঙ্গ সবই আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছিল। আমি স্বভাবে অকৃতজ্ঞ নই, তাই সানন্দেই স্বীকার করব যে, য়ুরোপের কাছ থেকে অনেক কিছুই এসব থেকেই পেয়েছিলাম যা আমার অন্তর্জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু বলব যে, য়ুরোপের আবহে আমি একটু

অস্থির-অস্থির লাগছে। কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে।

হবেই তো, বুকে অসহ্য ব্যথা। পাশ ফিরতে পারছে না।

যন্ত্রণাটা কি রকম, সমস্ত চেতনা ঘন করে, একত্র করে অনুভব করতে চাইল সুকান্ত। এ কী অদ্ভুত, ব্যথা কোথায়? এ যে সুখ। উত্তাল সুখ। এ যে সৌরভের সমুদ্র।

সুখ যখন খুব বেশি হয় তখন বুঝি ব্যথার মতই লাগে।

আশ্চর্য, বুকের কত কাছে দাঁড়িয়েছিল কাকলি।

কত কাছে! প্রায় নিশ্বাসের নাগালের মধ্যে। এক ফুঁয়ে ধুলো উড়িয়ে দেবার কাছাকাছি।

পাশ ফিরতে কষ্ট হচ্ছে নাকি সুকান্তর? কোথায় কষ্ট? এ তো গভীর আরামের ঢেউ। দিব্যি পাশ ফিরল। উপুড় হল। আপ্রান্ত বিস্তৃত হল। ঘুমের নবনীর মধ্যে ধীরে-ধীরে নেমে যেতে লাগল, ডুবে যেতে লাগল।

এত কাছে, তবু তাকে একটুও ছুঁতে পারল না। গহ্বরে নেমেও ধরতে পারল না বিগ্রহ।

কাঙালের মত কটি কৃপণ আঙুল ধরলে হত কী! উঃ, সে কতকেলে পুরোনো কবিতার ঢং। তার চেয়ে দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্জয় দুই বাহুর মধ্যে সেই এক তাল কোমল ভয়কে পারত লুফে নিতে? কই পারল কই? কেউ পারে?

কেউ পারে না। ভাবতেও পারে না।

চুপ করে ঘুমে যাও। কল্পিতার সামনে অন্ধকারে এখন সাহস দেখাচ্ছ কিন্তু সাধ্য নেই দিনের বেলায় ছোঁও সেই বাস্তবী তনু। সাধ্য নেই তার এক তন্তু বসনকে বিশৃঙ্খল করো। কষ্ট করে পাহাড়ের চূড়োয় উঠলেই ধরা যায় না চন্দ্রমা।

যে সমস্ত জোরকে স্থগিত রাখে, স্তম্ভিত রাখে, দাঁড় করিয়ে রাখে একটা ধারালো ক্ষুরের উপর, তারই শক্তি অসীম।

আর যে তুঙ্গতম শৃঙ্গে উঠেও নিচের অন্ধকার গুহায় ঝাঁপ দেয় না, পুনর্বারে উপনীত হয়েও ফিরে দাঁড়ায়, হায়, তার কোনো শক্তি নেই!

আগুনের উপশম জলে, ক্লান্তির উপশম ঘুমে, খিদের উপশম আহারে। কিন্তু যন্ত্রণার উপশম যন্ত্রণায়।

পাহাড়ের চূড়ো যত উঁচুই হোক পায় না চাঁদকে। কিন্তু সমুদ্র, যে অনেক নিচে পড়ে, তারই উদ্বেল বুকে শত-কোটি অজস্র হয়ে ভেঙে পড়ে চাঁদ।

আহাহা, যাবার সময় কী না জানি বললে। কান খাড়া করল সুকান্ত।

পাশের ঘরে সেন্টু কেঁদে উঠেছে বুঝি। ওর মা ওকে ধমকাচ্ছে। যত ধমক খাচ্ছে তত চড়াচ্ছে তার চিৎকার। কী চাইছে ছেলেটা? যেমন অবুঝ মা, তেমনি অবুঝ ছেলে। উঠে ওকে নিয়ে এলে হয় এ-ঘরে। সুকান্তর কোল পেলে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চিন্তে। সকাল হতে আর কত বাকি? সকাল হলেই দরজা খোলা পেয়ে ঠিক চলে আসবে গুটি গুটি। মশারি তুলে মুখ বাড়াবে। ডাকবে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বলে। কবে আর ভোরের সূর্য দেখছে সুকান্ত, রোজ দেখছে এই শিশুর মুখ। প্রত্যহের একটি পরিচ্ছন্ন আরম্ভ।

মাকে হারিয়ে দিয়েছে সেন্টু। যা আদায় করবার করে নিজের থেকেই শান্ত হয়েছে।

আহাহা, কী যেন কথাটা, কেমন করে না জানি বলেছিল। সঙ্গে ছিল কি একটু হাসি, একটু বা হাসির অতিরিক্ত ইশারা?

হাসির শব্দটা মনে-মনে নির্মাণ করতে পেরেছে সুকান্ত।

হাসি কোথায়, থমথমে জমাট আকাশে মেঘ ডাকছে। ঝেঁপে বৃষ্টি এল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল রাস্তায় মানুষের শোরগোল। ছাদহারা ঘুমহারা মানুষ। যার

কথার পিঠে কথা বলতে কখনো নিবৃত্ত নয় মৃণালিনীঃ 'চায়ের পাট উঠবে, তারপরে প্রশান্তর আফিসের ভাত। দুটো ঠিকঠাক আজ খেয়ে যেতে পারলে হয়।'

'কেন, প্রশান্তর বউ কি করে?' ঝাম্‌টা দিয়ে উঠল বিজয়া।

'সে তো রাঁধবেই এবেলা। শুধু উনুন ধরিয়ে চায়ের জলটা গরম করে রাখা।'

'কিন্তু যার তা করবার কথা সেই চাকরের যদি কোন বিপদ হয় তাহলে দেরি তো একটু হবেই।' মৃণালিনীর মুখ আবার ছুটে ছুটে করে উঠছে দেখে বিজয়া দাবড়ে উঠলঃ 'একটা লোক কষ্টের মধ্যে পড়লে তাকে একটু দেখতে-শুনতে হয় তো! সেই বিছেটাকে মেরে ঘরে দিতে হয় তো সেই যন্ত্রণার জায়গায়। আমি তো আর উপর-তলার বাসিন্দে নই যে, নিচেরতলার লোকের কান্না শুনব না। যান না, দেখুন না কেমন ছটফট করছে হরিপদ।'

'সে পরে দেখা যাবে। এখন এই উপর-নিচ বলে খোঁটা দেবার মানেটা কি! কে থাকতে বলছে নিচে! সোজা বেরিয়ে গিয়ে তেতলার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকলেই তো হয় আলাদা।' মৃণালিনী মারমুখো হয়ে উঠল।

'তাই বলে. বাজার ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া, তুই নোট টুকছিস কোথায়?' লেখাটার উপর মৃণালিনী উপুড় হয়ে পড়লঃ 'এ তো বাঙলা লেখা। নীল কাগজের প্যাড, এ তো তুই কাকে চিঠি লিখছিস—'

অসম্ভব। কতগুলো বইখাতা দিয়ে লেখার কাগজটা চাপা দিয়ে উঠে পড়ল সুকান্ত। এম-এ পরীক্ষার্থী ছেলের লেখা-পড়ায় আড়ি পাততে আসে, কী দুর্ধর্ষ মা দেখ একবার! 'দাও, টাকা দাও, ফর্দ দাও।' হাত বাড়াল সুকান্তঃ 'দরে যদি ঠকে আসি কিছু বলতে পারবে না কিন্তু। খুঁত ধরতে পারবে না। যা আনব তাই গিলতে হবে।'

মৃণালিনীর চোখ তখনো নীল কাগজটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'কিন্তু কাকে চিঠি লিখছিলি?'

'কাকে আবার চিঠি লিখব? আমার কি কোনো লোক আছে, না, কার, আমি ঠিকানা জানি? আমি অমনি শুধু একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম। এক লাইব্রেরিতে একটা এসে-কম্পিটিশন হচ্ছে—ক্যাশ প্রাইজ আছে, ভাবছি পাঠালে হয় একটা রচনা। তারই একটু মক্স করছি। দাও, দাও, আর দেরি করো না। দাদার আবার ন'টায় হাজিরা।'

মৃণালিনী একটু আড়াল হতেই প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরল সুকান্ত। নইলে মার যখন একবার নজর পড়েছে তখন আর ওটাকে বাঁচানো যাবে না।

মনে-মনে একটা চিঠি লিখছিল কাকলিকে। নিভৃতে-নেপথ্যে ঐ লেখা-টুকুই মনে মনে লেখা। যদি লেখবার অধিকার থাকত, যদি ঠিক মুখস্থ থাকত ঠিকানা, তাহলে কীভাবে লিখত তারই নির্ভুল নিদর্শন।

আপনি মনেও ভাববেন না, আমি লিফট্‌ম্যানকে হাত করে আপনাকে খাঁচায় পুরে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। দুর্ঘটনার কত কি বিপরীত কাণ্ড ঘটে কেউ অনুমানও করতে পারে না। একটা জাহাজ-ডুবির পর দেখতে পারি শুধু আমি আর আপনিই বেঁচে আছি, আর, শুধু বেঁচে আছি নয়, পাশাপাশি বসে আছি সমুদ্র-তীরে। সবই দৈবের ব্যবস্থা।

না, না, এভাবে লিখলে ভারি বিসদৃশ শোনাবে। তার চেয়ে মনের কথা সোজা-সুজি লিখে ফেলাই ভালো। প্রাণ যাতে জল হয় সেই প্রাঞ্জল কান্নায়।

কৌটুসকি—বলো এ ছাড়া আর কী বলে তোমাকে সম্বোধন করতে পারি? তোমার নাম কাকলি, আদর করে সম্বোধন করতে হলে কাক বা কাকু বলে ডাকতে হয়—দুই-ই ভয়াবহ। তার চেয়ে তোমাকে মধুমুখী, ওঁচ্ছালো মুড়কিমুখী ডাকা অনেক মিষ্টি। শোনো, তোমার জন্যে কত কিছু করতে পারি, এ তো সামান্য একটু কৌশল। এ কি তুমি মার্জনা করে নেবে না? এটুকু না করলে কি করে পাই তোমার সান্নিধ্যের সৌরভ, তোমার উষ্ণতার স্বীকৃতি? বলো, আমার কি খুব অপরাধ হয়ে গিয়েছে? তুমি কি উপরওয়ালার কাছে আমার নামে নালিশ করবে? এন-কোয়ারি বসাবে? একটা গরিব লিফট-ম্যানের চাকরি খাবে?

না, না, তুমি তো বুঝতে-পারা টলটলে চোখ মেলে হাসলে, আমি-তুমি বললে। ঐটুকু নৈকট্য না হলে এতটুকু কি হত?

কী সুন্দর তোমার চোখ, তোমার দাঁড়াবার ভঙ্গি, তোমার নাকের ঠিক নিচে আর উপর-ঠোঁটের ঠিক উপরে ছোট্ট এক তিল ঢেউ, তোমার ঘননিবদ্ধ লাবণ্যের দুটি স্তূপ—

ছি, অমনি করে কি লেখা যায়?

না, এ তো মনে-মনে লেখা। এ তো কেউ পড়বে না, কেউ দেখবে না। যে জানলে খুশি হত সেই কাকলিও নয়।

চিঠির কাগজটা কুঁচি-কুঁচি করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো পকেটের মধ্যেই রাখল সুকান্ত। রাস্তায় জায়গায়-জায়গায়, এখানে-ওখানে কিছু-কিছু করে ছড়িয়ে দেবে। নইলে, বাড়িতে, টেবিলের নিচে ঝুড়ির মধ্যে ফেললে, মার যা উৎসাহ, কে জানে, হয়তো বা ভাঙা প্রাণ জোড়া দিতে বসবেন। ধরা পড়ে গেলে কিছুতেই তাঁর কাছে আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। টিউশানির মাইনের পর্বতে চুলচেরা হিসেব নেবেন। তার মানে অগুনতি মিথ্যে কথা বলাবেন। কদাচিৎ একটা পয়সা এদিক-ওদিক হলে ভিখিরিকে দিয়েছি বলে পার পেতে দেবেন না। ছাড়া পাঞ্জাবির পকেটে, এমন-কি ধুতির পকেটেও হাত ঢোকাবেন লুকিয়ে।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, স্বাধীনতার চেয়েও সতর্কতা।

বাজারের থলে আর টাকা নিয়ে এল মৃণালিনী। সুকান্ত বললে, 'একটা ফর্দ দিয়ে দাও।'

'নিত্যিকার বাজারে আবার ফর্দ কি। যা বলছি তাই মনে করে নিয়ে আসবি। নইলে মাথাওয়ালা ছাড়ু হয়েছিস কি করতে?' মৃণালিনী কিন্তু কিরকিরে দেখে বলল।

'কার কি দরকার' অন্দরকার দেখল সুকান্ত।

'নিজে দেখে শুনে দেখে নিবি, বুঝে বুঝে—'

হরিপদকে দেখতে গেল সুকান্ত। এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে খানিকটা। তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে জেনে নিল দরদর।

হরিপদর বাজারদরের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে সুকান্ত দেখল নিট বারো আনা পকেটে।

তুমি আমার এ মূর্তিটি দেখো না। আমি থলে হাতে বাজার করে ফিরছি, আমি চোর, আমি মিথ্যেবাদী এ আমার পরিচয় নয়। তুমি কোন না একদিন কোমরে শাড়ি জড়িয়ে ঝাঁটা হাতে করে তোমার শ্যাওলা-পড়া নোংরা উঠোন পরিষ্কার করবে, কোন না দুটো মিছে কথা বলবে, খরচ-বাঁচা টাকা দুটোর একটা কোন না সরাবে এদিক-ওদিক। তবু সেই তোমার পরিচয় নয়। আমি চাকর নই, তুমিও দাসী নও। আমি আসলে রাজা, তুমি আসলে সম্রাজ্ঞী। (ক্রমশ)

অজানা রূপসী ঠোঙাটা বেজার গাড়িতে ফেলে দিয়ে গেল। বেজা তাদের সাবেক কেলে এজমালি মিনার্ভা নাইট গাড়িতে শোভাবাজার থেকে কলেজ করতে আসত। বিডন স্ট্রীটের মোড়ে ভিড়ের জন্য ঘড়ঘড়ে মিনার্ভা নাকি একটুক্ষণ থেমেছিল, হঠাৎ মেয়ে-কলেজের গাড়ির জানলা থেকে অজানা রূপসী বেজার বেঁটে চেহারায় নিমেষে মুগ্ধ হয়ে চাঁপার কলির মত হাত বার করে চকলেটের থলেটা টুপ্ করে তার পাশে ফেলে দিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, কলিকালের রূপকথায় আমরা কেউ বিশ্বাস করি নি, কিন্তু থ্রী চিয়ার্স দিয়ে পলকে চকলেটগুলো সাবাড় করে ঠোঙাটা দরদের সঙ্গে বেজা দত্তর বুকপকেটে গুঁজে দিয়েছিলাম। আজকালকার তরুণেরা আমার কথা শুনে বোধ হয় হেসে গড়িয়ে পড়ছেন, কারণ ওঁরা মন দেওয়া-নেওয়ার ফাইল ক্লিয়ার করতে হিমসিম খেয়ে যান, আমাদের বঞ্চিত যৌবনের জ্বালা বুঝবেন কি করে? তিশ-পঁয়তিশ বছর আগে পিচমোড়া মরুপথে মেয়ে-কলেজের গাড়ি যে কি মোবাইল ওয়েসিস্ ছিল তার সাক্ষ্য বেজা-কেষ্ট স্বয়ং দিতে পারবে। যদিও সে এখন শেয়ারবাজারের ঘুণ দালাল এবং তাদের ঐতিহাসিক মিনার্ভা আর নেই। বেজা তেল-বাঁচানো বাচ্চা গাড়িতে টাকা লগ্নী করেছে। এখন চকলেট তো দূরের কথা পুরোনো বন্ধুদের খাতিরে একটা সিগারেট বাজে খরচ করতেও বেজা উৎসুক নয়।

যাক, আমাদের ওপেন এয়ার অর্থাৎ মুক্ত-প্রাঙ্গণ বৈঠকখানা ক্রমে রীতিমত জেঁকে উঠল আর সেই অনুপাতে আমাদের পার্সেন্টেজও কমতে লাগল। সকালেই খবরের কাগজ খুঁজে অম্বিকার কারি কাঁদে চিড়িয়াখানায় নতুন শিম্পাঞ্জী এসেছে, বরফের চাংড়ার উপর বিজলী পাখার তলায় সাদা ভালুক ধুঁকছে কি না। অম্বিকা তো ক্ষুদে একটি প্রাণীতত্ত্ববিদ হয়ে উঠল। কলেজ লাইব্রেরী থেকে দুষ্প্রাপ্য প্রাণী-তত্ত্বের বই পড়ে সে আমাদের কাছে বিবিধ তথ্য পরিবেশন করতে লাগল। আমাদের মনে হতো কলেজ পালিয়ে ফের কলেজ করছি।

এর মধ্যে হঠাৎ অঘটন ঘটে একদিন আমার ফূর্তির বন্যায় ভাটার টান পড়ল। সেদিন দুপুরে আমরা মোটে তিনজন চিড়িয়াখানায় গিয়েছি, আমি, অম্বিকা, আর তারানাথ। কাগজে দেখেছিলাম কালো কেশরওয়ালা মস্ত আফ্রিকার সিংহ এসেছে। পথে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে ছেদির দোকান থেকে প্রায় এক বিঘত লম্বা গোটা দশেক কিং-সাইজ সিগারেট কিনলাম (সেকালের নির্বাক সিনেমায় 'ফুলিশ ওয়াইভস্' দেখার পর ছোকরা কাপ্তেনদের মধ্যে লম্বা সিগারেট খাওয়া ফ্যাশান হয়ে

"আমি, অম্বিকা আর তারানাথ—"

উঠেছিল)। চিড়িয়াখানায় ঢুকেই প্রথমে সিংহ দেখতে গেলাম। তারপর একটা ছায়াঢাকা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা বসলাম। দলে কম থাকায় সেদিন তেমন বড় জমল না। মোটা [illegible] মাথার নীচে রেখে আমি লম্বা হয়ে পড়লাম। খানিকটা ঝিমিয়ে খানিক গল্পগুজব করে বেলা যখন গড়িয়ে গেল, এবার আড্ডা ভেঙে আমরা ফিরবার জন্য উঠলাম। কিছুটা পথ গিয়ে সাপের ঘর পেরিয়ে বাঁদরের খাঁচার [illegible] একটু দাঁড়িয়েছি, পকেট থেকে একটা লম্বা সিগারেট বার করে ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তেই চোখ পড়ল গুপীবাবুর উপর। তিনি মনোযোগসহকারে আমাদের দিকে ঝুঁকে বাঁদরদের ছোলা খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন। তৎক্ষণাৎ আমার মুখ থেকে সিগারেট খসে পড়েছে। আমার

কালো কেশরওয়ালা মস্ত আফ্রিকার সিংহ

হতভম্ব চেহারা থেকে ব্যাপার আন্দাজ করে আমার সঙ্গীরা মুহূর্তে আলগোছে অদৃশ্য হয়েছে। গুপীবাবুকে দেখে আমি যতখানি ভড়কে গেছি আশ্চর্য হয়েছি তার চেয়ে বেশী। গুপীবাবু চিড়িয়াখানায় বসে বাঁদরকে ছোলা খাওয়াচ্ছেন, আমাদের পাশের বাড়ির বুড়ো গোপীবল্লভবাবু! যিনি গলাবন্ধ কোটের উপর পাকানো চাদর চড়িয়ে চকচকে পাল্কি গাড়িতে রোজ কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় তাঁর কারবার দেখতে বেরোন। গুপীবাবুর মেজছেলে গৌর স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত, সেও অনেকদিন লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে তার বাপের স্টুবেদারীর কাজ দেখছে। গুপীবাবু অত্যন্ত গম্ভীর রাশভারী মানুষ। পাড়ায় তাঁর অখ্যাতি ছিল অসামাজিকতা ও কড়া বিষয়বুদ্ধির জন্য। ছোলার ঠোঙাটা খাঁচার ভিতরে উপুড় করে [illegible] গুপীবাবু এগিয়ে এলেন। আমার অবস্থা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন। বললেন, "কি কানুবাবু, চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছ?" আমি শুকনো গলায় উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" তারপর বললেন, "বাড়ি ফিরবে তো? চল, আমার সঙ্গে চল।" [illegible] আমরা গেটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমার মনে [illegible] [illegible]

[illegible]

কোন ভয় নাই। তুমি যে সিগারেট খাও তা কারুকে বলব না বটে, কিন্তু আর কখন খেও না। ওটা নোংরা অভ্যাস। আর আমি যে চিড়িয়াখানায় এসেছি একথা তুমি না হয় পাঁচকান না-ই করলে।" আমার বুক থেকে দশ মণ পাথর নেমে গেল, কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি

দেখতে পেলাম। যে কঠিন মুখোশটাকে লোকে গুপীবাবু বলে চেনে, সেটা গুপী-বাবুই নয়। আসল গুপীবাবু পিতৃমাতৃহীন একটি অনাথ কিশোর, যে কাপড়ের দোকান থেকে সংসারের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি কুটোর মত ভেসে চলেছে, নিঃসঙ্গ। তাকে কেউ দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না। বোধ হয়। কুটোটা যে তলিয়ে যায়নি সেটাই বাহাদুরি।

চৌরঙ্গীতে আলো ঝলমল করছে, বহুরূপী কলকাতা সন্ধ্যার শৃঙ্গারবেশ ধারণ করতে শুরু করেছে, কিন্তু আমার দৃষ্টি আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মলিন ছবি, এঁদো ঘরে নিঃসম্বল মা আর ছেলে। সে ছবি হ্যামফ্যাশানের পটোদের পেয়ারের বাঁদী গোলগাল মালসাভোগ খাওয়া মা আর ছেলের নয়। সে মা শীর্ণা, স্নেহ-বিষণ্ণা এক দুঃখিনী বাঙালী নারী।

গুপীবাবু আবার কথা বললেন, "তোমরা লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হয়েছ, কলেজে কত তত্ত্ব কত জ্ঞানের কথা শিখছ, কালে আরও কত শিখবে। তবে, মুখ্যু মানুষের একটা কথা শুনে রাখ, মানুষের উপর কখন ভরসা রেখ না। আদতে স্বার্থের টানা পোড়েনের নামই হচ্ছে সংসার। তোমার ভরসা একলা তুমিই। এ অতি সত্য কথা বাবা। এখন যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আখেরে একদিন হবেই। আমি ছ্যাংড়া বয়স থেকে এই দুনিয়ার চেহারা দেখছি, বইয়ের বিদ্যে শিখি নি, কিন্তু মানুষ চেনবার বিদ্যে শিখেছি। মনে কোরো না মনগড়া উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে, যাচাই করে যা ঠিক বুঝেছি তাই বলছি। স্বার্থ পরকে কাছে টেনে আনে, আবার স্বার্থই আপনাকে পর করে দেয়। আত্মারামের চেয়ে আপন আর কিছু নয়, তার খেলায় বড় হেকমারি। শুধু তার উপর নজর রেখে যাও, বাস্"। একটু চুপ করে বললেন, "আমার কথা যদি ঠিক ধরতে পার তাহলে অনেক হয়রানি থেকে রেহাই পাবে।"

আমি মিনমিনে করে সায় দিয়েছিলাম, "আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন"। কিন্তু গুপী-বাবুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমার পছন্দসই হয়নি। সে-কালের তরুণ বাংলা শরৎচন্দ্রী আর রবীন্দ্র-কাব্যের আবেগ রসে মজে আছে। তখন রোমান্টিক যুগের আদর্শবাদীদের দিব্যি দিব্যি প্রতিজ্ঞাপত্রের বেগ বিস্ফোরণ। গল্পের নায়করা যে সমস্ত প্রিয়াবিচ্ছেদের বুকভাঙা বেদনায় কলমে কলমে বুক উপরে দম বন্ধ করে মরবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ত্যাগী বৈরাগ্যে আমাদের দলের অনেকেই তর্কাতর্কি শুরু করে গুপীবাবুকে কোট করে বলা যায়, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নেইকো"। সুতরাং নীরস বিশুদ্ধ স্বার্থের অমার্জিত কেঠো থিয়োরী ভাল না লাগারই কথা। কিন্তু বিচক্ষণ লোকের উপদেশ বিফলে যায় না, উত্তরকালে তাঁর কেঠো থিয়োরীই সত্যের একটি নিরেট হীরকখণ্ড বলে মেনে নিতে হয়েছে।

"এই যে বাড়ি পৌঁছে গেছি" গম্ভীর গলায় গুপীবাবু বললেন। নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিলাম, সস্নেহে বললেন "আচ্ছা, এস কাতুবাবু"।

আমার সিগারেট খাওয়ার বিষয়ে গুপীবাবু আমরণ কথা রেখে গেছেন। আমার প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ করলাম এইমাত্র আপনাদের কাছে কাহিনীটা প্রকাশ করে।

মালিকানা ছিল ভুঁইঞা আর ভুমজের, কিন্তু হাড়িয়ার উগ্র আকর্ষণ আর ঝুমুরের দুর্নিবার প্রবৃত্তিতে অবশেষে ভূম্যধিকারী পরিণত হয়েছে ভূমিদাসে।

পিয়ালীর চরিত্রের বিচিত্র মনোভঙ্গি যা এই উপন্যাসের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, মাতামদাসের মতো একটি ছোট চরিত্র এবং অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; তবে জটাধর ও মানীর ক্রমবিকাশ আরো একটু সযত্ন অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। মাটি ও সেই মাটির মানুষের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগ, মানুষের সুখ-দুঃখের চিরন্তন সৌন্দর্য-প্রকাশ, সমগ্রতার মধ্যে তার বিভিন্ন অংশের সমন্বয় সাধন চরিত্র মিছিলে আঞ্চলিক ভাষার নিপুণ ব্যবহার এবং অরণ্যবাসীদের মনের কথা ফুটিয়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা এই উপন্যাসে বিশেষভাবে উপস্থিত।

২২০।৫৯

বিবিধ

কাশ্মীরের অমর কথা—শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ। ৪০, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। ১৮০।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের আকর্ষণ চিরন্তন। তীর্থক্ষেত্র হিসেবেও কাশ্মীরের মূল্য কম নয়। [illegible] রাজনৈতিক মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি স্বতন্ত্র ধরনের। শ্রীমৎ [illegible] ব্রহ্মচারীসহ অমরনাথ যাত্রার কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। এর [illegible] গ্রন্থটি লিখিয়াছেন। সেই কারণে ইহার মধ্যে [illegible] চিত্তাকর্ষক ইত্যাদি [illegible] প্রয়োজন হয়। তবে ভ্রমণ সম্পর্কীয় কিছু [illegible] আছে, যা [illegible] ভবিষ্যৎ যাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হতে পারে।

১৫৭।৫৯

কালীকীর্তন (৩য় খণ্ড)—সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible], ২-[illegible] সাহা লেন। কলিকাতা-৩৬। মূল্য [illegible]।

সর্বসমেত [illegible] কীর্তন সঙ্গীত এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সঙ্গীতগুলি [illegible] মতই। আমরা [illegible] সহিত কালীমাতার কোন পার্থক্য অনুভব করি না। এই ভাবই স্পষ্টরূপে বর্তমান কীর্তনগুলিতে পরিস্ফুট। তাই শুধুমাত্র ভক্তগণই নয়, সকলেই সঙ্গীতগুলি হইতে রস গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫৩৬।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র।

[illegible]

Sarbadaya Bharat—S. M. Guha

ট্রামে-বাসে

খাদ্য-আন্দোলন ও তার পরবর্তী ঘটনা ও দুর্ঘটনায় মন ভারাক্রান্ত। কেহ বলিতেছেন—"রুটির বদলে বুলেট পাইলাম।" আবার কেহ বলিতেছেন—"বাস, গাড়ি, ইলেকট্রিক বাল্বও নিশ্চয়ই

রুটির বিকল্প নয়।" আমরা কাহার নিন্দা করিব? মাথা নত করিয়া শুধু বলিতেছি—"এ তোমার, এ আমার পাপ।"

• • •

পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর মধ্যে সম্প্রতি পালাম বিমান-

ঘাঁটিতে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দুই রাষ্ট্র-প্রধানের প্রত্যক্ষে যদি সমস্ত সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হয় তাহলে উভয় রাষ্ট্রই উপকৃত হবে। কিন্তু আলোচনা হাওয়াই বন্দরে হয়েছে কি না, সেই আশংকা শেষ পর্যন্ত না সবই হাওয়া হয়ে যায়"!!

• • •

জেনারেল আয়ুব খাঁ বলিয়াছেন—আমি সেনা; ইতিহাসের সহিত আমার পরিচয় আছে। —"কিন্তু জনাব আয়ুব খাঁর স্বদেশবাসী ও সহকর্মীদের অনেকেই ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলেই কৌতূহলী বেশী। অতীতের পৃষ্ঠার চেয়ে তৎসংলগ্ন আমাদের জমিতেই তাঁদের বেশী, মুশকিল যে এখানেই"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

চীনের সৈনিক মহল হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—চীন অন্যের দেশে অনধিকার প্রবেশ করে নাই। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তাঁরা সত্যি কথাই বলেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই "ভাই-ভাই" ধ্বনি ভুলে যান নি। ভাই-এর দেশে ভাই এলে অনধিকার প্রবেশের প্রশ্ন কোথায়? কু-লোকের মত সব ইয়ে"!!

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত সফরের কোন সম্ভাবনা বর্তমানে নাই। —"হয়ত খাদ্যের অনটনের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুল করছেন, খাদ্যাভাব শুধু পশ্চিমবঙ্গে, গোটা ভারতে নয়। সুতরাং মাভৈঃ। নারায়ণ সেবার কোন ত্রুটি হবে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ প্রভৃতির সংখ্যা মার্কিন মুলুকে অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদ পরিবেশন করিতে গিয়া সংবাদদাতা শিরোনাম দিয়াছেন—ভূস্বর্গ আমেরিকা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কাজটি তিনি ভালো করলেন কি? ভূস্বর্গের নামেই মানুষের [illegible] যায়। এদিকে আবার স্বর্গের যে নমুনা দিলেন, সে তো একেবারে সোনায় সোহাগা"!

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম আটাশ বৎসর বয়সের জনৈক জাপানী নাকি শৈশব হইতেই কাগজ খাইয়া বাঁচিয়া আছেন। —"কোন কোন দপ্তরের ফাইলপত্র উইতে খেয়ে গেছে বলে দু-একবার সংবাদ পেয়েছি। জাপানী ভদ্রলোকটির সংবাদ শুনে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে দপ্তরের ফাইলপত্র হয়ত মানুষেই খেয়েছে, সংবাদে শুধু বলা হয়েছে উই"—বলে শ্যামলাল।

• • •

১৪৮১ সালে মুদ্রিত একটি পুস্তক জনৈক আমেরিকাবাসী ১৮২ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। বিশুখুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"যে-বই কিনতে চাই, জানবার জন্য আর সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ হতে হবে না"!!

• • •

দিল্লীর পুরানা কেল্লার কাছে জনৈক ব্যক্তি নাকি একটি কুকুরকে ছিঁড়িয়া তার মাংস খাইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল লোকটি পাগল। —"শুধু পাগল নয়, বোকাও বটে; তা নইলে দিল্লী বসে লাড্ডু ছেড়ে কখনো কুকুর খায়"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

"রূপকুণ্ড" সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে—"রূপকুণ্ডের রহস্য প্রেতলোকের রহস্যেরই মত অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে"। বিশুখুড়ো বলিলেন—"রূপ কঙ্কালটাই যে ঐ; সেটা প্রেতলোকের হোক বা স্বর্গলোকের হোক, সব সময়েই তা রহস্যাবৃত"!

* * *

দিল্লীর এক সংবাদে জানা গেল ভি, আই, পি-দের সংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। —"আমরা নগণ্য লোক।

ভি, আই-পি-দের ব্যাপারে মাথা গলানো আমাদের শক্তির বাইরে। কিন্তু ভাবছি এঁদের নিয়ে কাটছাঁট করতে গেলে দেশে প্রায় লোক থাকবে কি? সরকারী বা বেসরকারী হিসেবে সবাই তো এক একজন ভি, আই, পি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চন্দ্রশেখর

ছকে-বাঁধা "খেলাঘর"

রসপরিবেশনে ছায়াছবির কাহিনীকারেরা যে অঘটনঘটনপটীয়ান তার প্রমাণ মেলে সলীল সেনগুপ্ত রচিত কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী এন-এস-জি প্রোডাকশন্সের "খেলাঘর" ছবিতে।

প্রেমের পরিণতি অশ্রুতে—সিনেমার কাহিনীতে এ-বাক্য সর্বদা স্বীকৃত নয়। সন্দ্বীপ সশস্ত্র বিপ্লবের নায়ক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যে গৌতম চট্টোপাধ্যায় জেল থেকে পালিয়ে গভীর রাত্রে কলকাতার পুলিস-কর্তার মেয়ে রুচিরার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে, যে গৌতম পরে গৃহত্যাগিনী রুচিরার (বাবার অন্যায় শাসন ও অনভিপ্রেত বিয়ের প্রস্তাব এড়াবার জন্য যার গৃহত্যাগ) অনুরাগের স্পর্শ পেয়ে পলাতক জীবনে মরণ-সঙ্কুল পথে প্রেমের সিংহাসন পাতার স্বপ্ন দেখে—ছবির শেষের দিকে আচমকা কাহিনীর মোড় ঘুরতেই জানা গেল যে, এ গৌতম সে গৌতম নয়।

সত্যিকারের বিপ্লবী গৌতম চট্টোপাধ্যায় নকল গৌতমের আসল পরিচয় ফাঁস করল এসে আদালতে। তার নাম শান্তনু—বিপ্লবীদের সে ছিল অকৃত্রিম সুহৃদ। একদিন তারই ঘরে বিপ্লবী গৌতম ও তার সঙ্গীদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে রিভলবার হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় পুলিসের সামনে। পুলিস তাকেই সন্দ্বীপের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতা হিসাবে জেলে পোরে ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। ছবির শেষে আসল পরিচয় গোপন করা ও জেল ভাঙ্গার অপরাধে শান্তনুর দু বছরের জেল হয়। আর যে রুচিরা শান্তনুকে স্বামী বলেই পরিচয় দিয়েছিল নিজের বাবার কাছে এবং বাবার রোষচক্ষু যাকে শান্তনুর কাছ থেকে সরাতে পারেনি, কারান্তরালে যাবার আগে শান্তনু তাকে বলে গেল যে, তাদের দু' দিনের খেলাঘর ধুলোয় মিশে যাবে না।

এইটুকুই ছবির কাহিনীসার। ছবিতে আরও যে ক'টি চরিত্র রয়েছে তাদের মধ্যে নায়কের অবাঙ্গালী 'দোস্ত' ও তার বাঙ্গালী স্ত্রী এবং বিপ্লবী দলের একজন প্রধান কর্মী উল্লেখযোগ্য।

বিপদসংকুল প্রণয়ের বন্ধুর পথে জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে কক্ষচ্যুত দু'টি যুবক-যুবতীর হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার একটি সহজ রসাল প্রেমোপাখ্যান এ-ছবির উপজীব্য। ছবির এই প্রণয়রসের মধ্যে জনপ্রিয় শিল্পীজোড়কে কখনও স্বপ্ন-বিভোর, আবার কখনো বা নিত্য নতুন সংকটে ম্রিয়মাণ দেখতে পেয়ে দর্শকেরা রস উপভোগ করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের কৃষ্ণমেঘ কেটে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবেন। দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের দিক দিয়ে ছবিটির এই আয়োজন ব্যর্থ হয় নি।

কিন্তু কাহিনীকার সলীল সেনগুপ্ত যে-সমস্ত কষ্টকল্পনার মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনে এই স্বস্তি আনবার চেষ্টা করেছেন সেগুলি সূক্ষ্ম বিচারের ধোপে টেকে না। সন্দ্বীপ সশস্ত্র বিপ্লবের নেতা হিসাবে পুলিসের ভুল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়ার ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। এমন একজন বিপ্লবীর গ্রেপ্তার ও দণ্ডবিধান তদন্তসাপেক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল হওয়া কেমন করে সম্ভব? যে বৈপ্লবিক অগ্নি-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির কাহিনী রচিত তার কোন আভাস ছবিতে নেই। বৈপ্লবিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে গৌতম-পরিচয়ধারী শান্তনুর জেল থেকে পালানোর কোন সার্থকতা ছবিতে দেখানো হয় নি। অথবা শুধু আত্মরক্ষার জন্যই যদি তার পলায়ন (যদিও পলায়নেই এই বিখ্যাত নেতা বেরুই
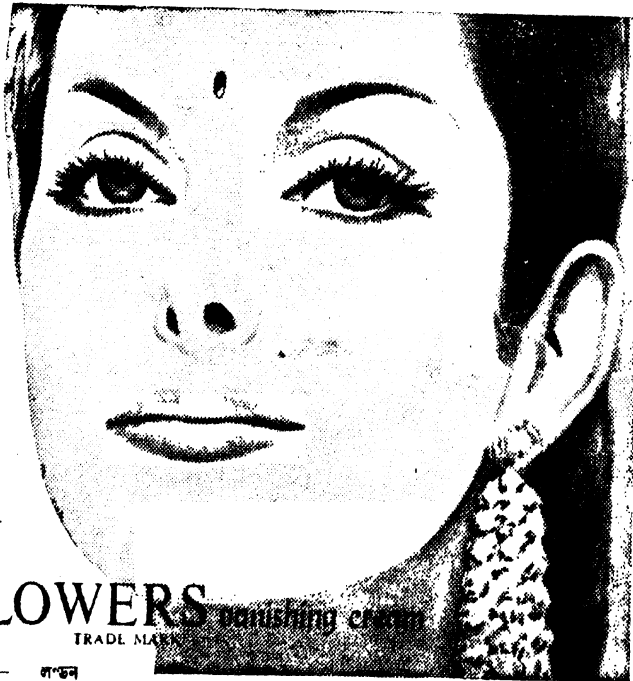
অগ্রগামী পরিচালিত "হেডমাস্টার" চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেবেন

পেয়ে পারে ও পুলিশবাহিনীকে ফিরে যেতে পারে তা নীতিও [illegible]। তবে তাও সহিংস বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ ও [illegible] কমান্ডারপদের [illegible] অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়, মধ্য দিয়ে আরও দুর্বল [illegible] হয়ে পড়েছে। শান্তনু যে বিপ্লবী নেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় নয় সেটা [illegible] বারবারের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কি? ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাকের প্রয়োজন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে এই অস্বাভাবিকতা বর্জন করা যেত।

গল্পের ভিত যে কত কাঁচা তার প্রমাণ পাওয়া যায় যেভাবে আসল গৌতম চট্টোপাধ্যায় শান্তনুর দ্বিতীয়বারের বিচারকালে আত্মপরিচয় দিয়ে তাকে ফাঁসির কবল থেকে বাঁচায়। বন্ধুর প্রাণরক্ষা করাই যদি তার উদ্দেশ্য, তাহলে তার ধরা দেওয়া উচিত ছিল প্রথম বিচারের সময়ে, যখন গৌতমবেশী শান্তনু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিপ্লবী নেতার এই মহত্ত্ব প্রকাশ শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও। অবশ্য তা করলে "খেলাঘর" বানাবার সুযোগ পেতেন না কাহিনীকার সলিল সেনগুপ্ত—এই যা!

গৌতম নামধারী শান্তনুর জেল থেকে পলায়নের পর পুলিসের কর্তার মেয়ের

বিশেষ শারদীয় অর্ঘ্যরূপে চিত্রামোদীদের কাছে উপস্থিত হবে অক্টোবরের গোড়াতেই। অমর কথাশিল্পী রচিত দুর্বার কিশোর-প্রাণের এই অভিনব উপাখ্যানটির চিত্ররূপ দিয়েছেন চিত্রনাট্যকার-পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য। বহুকাল পর অন্নদাদির ভূমিকায় ছবিটিতে অবতরণ করছেন কানন দেবী; ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও শাহজীর চরিত্রের রূপারণে আছেন যথাক্রমে পার্থপ্রতিম, সজল ঘোষ ও বিকাশ রায়। অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন মলিনা দেবী, গুরুদাস, অজেন্দু ঘোষ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায়।

• • •

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক নিজের প্রযো-জনায় যে ছবিটিতে হাত দিয়েছেন সেটির নাম হল "মেঘে ঢাকা তারা"। শক্তিপদ রাজগুরুর "চেনামুখ" গল্প অবলম্বনে তৈরী হচ্ছে ছবিটি। ঋত্বিক ঘটকের নিজস্ব প্রযোজনা-সংস্থা "চিত্রকল্পের" পতাকাতলে ছবিটি নির্মিত হবে।

বাংলায় চিত্ররূপায়ণের জন্য আশাপূর্ণা দেবীর "ছাড়পত্র" গল্পটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন পরিচালক-প্রযোজক প্রভাত মুখো-পাধ্যায়। জানা গেল, শ্রী মুখোপাধ্যায় "ছাড়পত্র"-এর চিত্ররূপ দেবার আগে এভারেস্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদারের জীবনী অবলম্বনে একটি ছবি তৈরীতে আগ্রহশীল। ছবিটির চিত্রনাট্য তিনিই রচনা করেছেন।

• • •

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম-পরিচালনায় চলচ্চিত্র প্রবাস সংস্থার প্রথম প্রয়াস "শুভ বিবাহ"-এর চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিটি বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। বিয়ের দিন সকালে যদি কনে নিখোঁজ হয় তাহলে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটে, তাকে কেন্দ্র করেই এর গল্পাংশ। এবং কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুনোর মত নানাজনের জীবনে এই ঘটনা যে সংঘাত সৃষ্টি করে, তার ভেতর দিয়ে পরিচালকদ্বয় একটি অপ্রিয় সামাজিক সত্যের প্রতি সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন—শুভ বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন অশুভ পরিণতিতে পর্যবসিত হয়। সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পের ঘটনাকাল। একবেলার এই নাটকে সারা জীবনকে প্রতিফলিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন পরিচালকদ্বয়। তাঁরাই এর কাহিনীকারও। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি মিত্র, সুপ্রিয়া চৌধুরী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায়, অমর গাঙ্গুলী, শম্ভু মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা।

*

এম পি প্রোডাকশনস ও অগ্রদূত পরি-চালক গোষ্ঠীর যোগাযোগে গঠিত "কুহক" ছবিটি আর এক নতুন নাট্যবেদনের আস্বাদ নিয়ে আসছে। সমরেশ বসু রচিত এই গল্পের নায়ক ভগবদ্ভক্ত স্বরূপ ও স্বকণ্ঠের আড়ালে তার শয়তানি সত্তাকে গোপন রাখে। নিমাইয়ের ভূমিকায় এর প্রাণ-গলানো অভিনয় দেখে লোকে তাকে ঠাকুর বলে প্রণাম জানায়, তার পায়ে ফুল দেয়। ঠাকুরের মনে কিন্তু পাপের বাসা। তবুও প্রেম এলো ওর জীবনে নতুন আশার বাণী নিয়ে, তাদের ত্যাগে, একান্ত নিষ্ঠাবতীর হাতে একটি অসহায়া পল্লীবালার রূপ ধরে, —জীবনের জঘন্যতম অপরাধে তখন সে লিপ্ত।

এই সংঘাতময় চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার, নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। দুটি ছোট্ট ছেলে—দীপক ও সুখেন—মুখ্য অংশ নিয়েছে এই নাট্যসংঘাতে। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু বসু ও তুলসী চক্রবর্তী। ছবি-খানির মুক্তি আসন্ন।

অসমিয়া ছবি "পুবেরুণ"

কথাকলি চিত্র প্রোডাকশনের অসমিয়া ছবি "পুবেরুণ" (ঊষার উদয়)-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয় গত ২৬শে আগস্ট সোসাইটি চিত্রগৃহে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সামাজিক ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীতে অন্যান্য বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা।

জগৎ জুড়ে রয়েছে একটি শিশু, এবং তার নাম সব-শিশু—একটি রসমধুর নাটকের মধ্য দিয়ে এই সত্যটি ফুটিয়ে

করবেন লোক ও নাটক, মধুচক্র, লোকমঞ্চ ও স্থানীয় হাওড়া অ্যামেচার্স দল।

* * *

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় ইংলণ্ডের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা "দি প্লেহাউস কোম্পানী" ষোল সপ্তাহব্যাপী ভারত, সিংহল ও পাকিস্তান পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগামী ৪ঠা নভেম্বর স্বদেশ ত্যাগ করছেন। ষোলজন নিয়ে গঠিত এই ভ্রাম্যমাণ দল সেক্সপীয়ার, বার্নার্ড শ ও ইলিয়ট রচিত "টুয়েলফ্‌থ্ নাইট," "ম্যান অব ডেস্টিনি," "ডন জুয়ান ইন হেল" ও "দি ককটেল পার্টি" এই তিন দেশের ষোলটি প্রধান শহরে পরিবেশন করবেন। নাটকের দৃশ্যসজ্জা রচনার ভার নিয়েছেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার সেণ্টারের বোম্বাই কেন্দ্র। বেশভূষা নাট্যসংস্থা সঙ্গে করেই নিয়ে আসছেন।

চিঠিপত্র

আন্তর্জাতিক পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে

মহাশয়, গত ৫ই ভাদ্র তারিখের "দেশ"-এর রঙ্গজগৎ বিভাগে একছর বিভিন্ন চলচ্চিত্রোৎসবে ভারতীয় ছবির শোচনীয় পরাজয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—"কান ও বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবগুলির মত ভেনিসেও এবার ভারতীয় ফিল্মের ভাগ্যে শুধু অষ্টরম্ভা।...সাগর সঙ্গমে কুম্ভীরেরা পেল না বার্লিনে। ভেনিসে 'অপুর সংসার'-এর ঠাঁই হল না..." ইত্যাদি। এ-ধরনের উক্তি থেকে ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে হতাশা-বোধটাই শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠে না কি?

বিভিন্ন চলচ্চিত্রোৎসবে পুরস্কার পাওয়াটাই বড় কথা নয়, ছবির শিল্প-মানটাই আসল। আন্তর্জাতিক পুরস্কার-ধন্য "দো আঁখে বারাহ্ হাথ" বা "একদিন রাত্রে" কি "কাবুলিওয়ালা" বা "লৌহকপাট" কিংবা "অযান্ত্রিক"-এর চেয়ে সার্থকতর? কখনোই নয়।

তাছাড়া প্রত্যেক চলচ্চিত্রোৎসবে পুরস্কার পেতেই হবে, না পাওয়াটা লজ্জাকর—এমন কথা ভাবাটাও অর্থহীন। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ভাবধারা বিভিন্ন, তাই অনেক সময়ে সত্যিকারের শিল্পরসপুষ্ট ছবিও বিদেশের দর্শকদের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত মানসের অপূর্ব মরমী সৃষ্টি "পরশ পাথর"-এর বেলায়। তাই বলে কি ধরে নেব "পরশ পাথর" সত্যজিতের ব্যর্থ সৃষ্টি? তাই বলছিলাম, আন্তর্জাতিক পুরস্কারের কথাই শুধু না ভেবে যদি আমরা আমাদের ছবির শিল্প-মানের অগ্রগতির কথা বিচার করি, তবে সেটা আমাদের ছবির পক্ষে মঙ্গলজনক।

তবে একথা স্বীকার করি, আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়াটা পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি তথা সমগ্র চিত্রশিল্পের পক্ষে অবশ্যই গৌরবজনক ও বিদেশের বাজারে ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলার পক্ষে সহায়ক। আর তাছাড়া আন্তর্জাতিক পুরস্কারের আলোকে আমাদের দেশের ছবিগুলিকে পৃথিবীর ভালো ছবির স্ট্যাণ্ডার্ডে বিচার করাটা সহজ হয়ে যায়। ইতি

ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়,
কিংশুকবরণ দেব,
দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়,
পুরী।

ঐতিহাসিক অসঙ্গতি

মহাশয়, গত ৪৫ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় আম্রপালীর সমালোচনা প্রসঙ্গে আপনি লিখেছেন ...ছবিতে পৌরাণিক ভারতের ছাপটি খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু ছবিটি দেখার পর এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

(১) স্কন্দপুরাণ বহু পুরানো এবং তাতে নটরাজের উল্লেখ থাকলেও নটরাজের মূর্তি খৃষ্টজন্মের বহু পরে দেখা দেয়, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তা অসম্ভব। নটরাজের মূর্তির আবির্ভাব প্রথম হয় দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতে এর প্রচলন আরো পরে।

(২) বৈশালী নগরের সাজসজ্জার মধ্যে বৌদ্ধস্থাপত্যকলার বিশেষ অংশ বলে পরিচিত যে সৌরগবাক্ষ দেখা যায়, তার আবির্ভাব হয় বৌদ্ধচৈত্য ও বিহারে এবং বুদ্ধদেবের তিনশ বছর পরে। বিশেষ করে ছবিতে যে আকারের সৌরগবাক্ষ দেখানো হয়েছে তা ইলোরায় দেখা যায় এবং তা খৃষ্টজন্মেরও পরে।

(৩) বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তাঁর কোন পূজা নিষিদ্ধ ছিলো, তাঁর কোন পূর্ণ বা আংশিক প্রতিমূর্তি তখন অবাস্তব। বুদ্ধদেবের কয়েক শ' বছর পরে বুদ্ধমূর্তির ও পূজার আবির্ভাব এবং এ সম্বন্ধেও হীনযান ও মহাযান এ দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ বৌদ্ধ ইতিহাসবেত্তারাই জানেন।

বৌদ্ধ ইতিহাসের সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের নাকি সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এই চিত্রে, তাহলে ঐ সমস্ত অমিল থেকে যায় কেন? ইতি

সন্তোষ ঘোষ,
কলিকাতা-২৯।

পত্রলেখক যে সব অসংগতির উল্লেখ করেছেন ইতিহাসজ্ঞেরা তার বিচার করুন। "ছবিতে পৌরাণিক ভারতের ছাপ খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না"—আমাদের এ উক্তিতে অসংগতি কোথায়?

বিভাগীয় সম্পাদক।

ব্যাপারে এবার রয়টারের সংবাদদাতা পুরো খবর তো পাঠাননি, অধিকন্তু আরতি সাহা ৭ ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর জল থেকে উঠে পড়েছেন বলে এক ভুল খবর পাঠিয়েছেন। এখন জানা গেছে, কুমারী আরতি সাহা জলে ছিলেন ১৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট এবং তিনি প্রায় গন্তব্যস্থান ডোভার উপকূলের কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিলেন। রয়টারের সংবাদদাতা আগের ভুল খবর এখনো সংশোধন করেন নি।

যাই হক, চ্যানেল সাঁতারের দুই ভারতীয় প্রতিযোগী ডাঃ বিমলচন্দ্র ও কুমারী আরতি সাহার ম্যানেজার শ্রীঅরুণ গুপ্তের ব্যক্তিগত চিঠি থেকে যা জানা গেছে এখন সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছি।

আগেই শুনেছিলাম, মিঃ বিলি বাটলিন একজন ঝানু ব্যবসাদার। ইংলণ্ডের 'হলিডে কিং' নামে ইনি পরিচিত। সমুদ্র উপকূলবর্তী বহু ক্যাম্পের মালিক। পয়সা হাতে থাকলে ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে হাজারে হাজারে লোক ছোটে বাটলিন সাহেবের ক্যাম্পে। বাটলিন সাহেবই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন নিজের ব্যবসার সুবিধার জন্য। এর ফলে তাঁর দু' পয়সা রোজগার হয়। তাছাড়া, এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে তাঁর নামের যে প্রচার হয় তার মূল্যই কি কম? কিন্তু এবারকার প্রতিযোগিতায় যে অব্যবস্থা হয়েছে তাতে বাটলিন সাহেবের সুনামের চেয়ে দুর্নামই রটেছে বেশী। ডাঃ বিমলচন্দ্র ও শ্রীঅরুণ গুপ্তের চিঠি থেকেও তার খবর পাওয়া গেছে।

শ্রীঅরুণ গুপ্তের চিঠির অংশবিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি। এ থেকে প্রতিযোগিতার অব্যবস্থা এবং চ্যানেল অতিক্রমের জন্য আরতি সাহার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যাবে। শ্রী গুপ্ত লিখেছেন—

'......এই যে প্রতিযোগিতা—বহু হোটেলের মালিক বিলি বাটলিনের হোটেলের বিজ্ঞাপনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। যেদিন সাঁতার আরম্ভ হবার কথা তার আগের দিন সমস্ত প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগীদের ম্যানেজারদের এক সভা হয়। তাতে ঠিক হয়, আবহাওয়া ভাল থাকলে সাঁতার আরম্ভ হবে। না হলে অনুকূল আবহাওয়ার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে ১০ দিন। কিন্তু এটা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল না। ১০ দিন অপেক্ষা করলে বাটলিন সাহেবের একটা মোটা টাকা খরচ হয়ে যেত। তাই ২২শে আগস্ট রাত্রিতেই সাঁতার আরম্ভ করার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং আমাদের বিপক্ষে [illegible] সাঁতার আরম্ভও [illegible] যে অবস্থার মধ্যে সাঁতার আরম্ভ

সাঁতার-পটীয়সী আরতি সাহা

হয়েছে তাই লিখছি।

যেদিন সাঁতার আরম্ভ হবার কথা সেইদিনই [illegible] সকাল [illegible] [illegible] ছেড়ে গাড়ি করে [illegible] এবং ১১টায় আবার [illegible] এর জন্য। ১২টায় [illegible] উপরে [illegible] এবং বোটের [illegible]। ১২টা ৫৫ মিনিটে আমরা এসে বোটের [illegible] [illegible] পৌঁছলাম [illegible] দাঁড়িয়ে আছে। [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] দিকে। [illegible] পৌঁছে শুনি, দাগনী টাউন হলে আমাদের অর্থাৎ সমস্ত সাঁতারু ও তাঁদের ম্যানেজারদের একটা রিসেপশনের ব্যবস্থা হয়েছে। ৭টার মধ্যে সেখানে হাজির হতে হবে। এতে আমি ও ব্রজেনবাবু (ব্রজেন দাশ) আপত্তি করলাম। বললাম, সারাদিন এত ঝক্কি-ঝামেলা করে সাঁতারুরা সাঁতার কাটবে কিভাবে? কিন্তু আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল, ঐ দাগনী টাউন হলের রিসেপশনেই আমাদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে, ওখানে না গেলে খাবার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। রাত্রি ১টা ৪০ মিনিটে সাঁতার আরম্ভ। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম, রিসেপশনে যাব না এবং খাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করবো। তখনই আমি হোটেলের খোঁজে বের হলাম। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবেন, কাছাকাছি কোন হোটেলেই ডিনার খাবার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। এমন সুন্দর দেশ, কিন্তু কাছেপিঠের কোন হোটেলেই খাবার পাওয়া গেল না। সব হোটেলেই পাওয়া যায় পিপে পিপে মদ আর মদের চাট। সুতরাং ডিনারের জন্যই অগত্যা আমাদের দাগনী হোটেলের পার্টিতে যেতে হল। অবশ্য প্রতিবাদ জানাতে কসুর করলাম না। বললাম, এভাবে স্পোর্টস হয় না। বলেই বা কি হবে। এটা তো আর আসল স্পোর্টস নয়—এটা বাটলিন সাহেবের প্রোপাগাণ্ডার একটা মাধ্যম। মিসেস গ্রেটা এণ্ডারসন, মিস টমসন প্রভৃতি আমেরিকার কয়েকজন সাঁতারু বোধ করি আগে থেকেই এ ব্যবস্থার কথা জানতেন, তাই তাঁরা ডিনারের জন্য আলাদা হোটেলের ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন।

যাই হক, দাগনী হোটেলের পার্টি থেকে আমরা ফিরলাম রাত সাড়ে [illegible]। [illegible] [illegible] এমনি সময় [illegible] হচ্ছে, এখনই আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] করছে। [illegible] [illegible] মিনিট আগে [illegible] [illegible] [illegible] সাঁতারুদের [illegible] ও [illegible] আরম্ভ হল। সাঁতার আরম্ভ হবার [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] সাঁতারুদের [illegible] ও [illegible]। [illegible] প্রতি বোটের জন্য প্রতি সাঁতারুর কাছ থেকে ৫০ পাউণ্ড করে আগেই বাটলিন সাহেব আদায় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাঁতারের সময় দেখি, মাত্র ১০খানা বোট এসে পৌঁছেছে। আমাদের মধ্যে শুধু ব্রজেনবাবুর। আরতির বোট নেই, বিমলবাবুরও না। অবশ্য আবহাওয়ার জন্য এই সময় ইংলিশ চ্যানেল বেশ রুদ্র মূর্তি ধরেছিল এবং তার জন্যই পাইলট বোট যথাসময়ে পৌঁছতে পারেনি। এদিকে সাঁতার আরম্ভের সময় এগিয়ে আসছে। আমি পাগলের মত বোট খোঁজাখুঁজি

REG. NO. C. 2109

আমি কখনো'
ভালো করে না দেখে
গ্রাইণ্ডিং হুইল কিনিনা।
ভালো করে না দেখে কিংবা অল্প দাম দেখে গ্রাইণ্ডিং হুইল কিনলে আপনি খুব ভুল করবেন এবং আর্থিক কোন লাভও আপনার হবেনা। যে-কোন ধরনের গ্রাইণ্ডিং-এর কাজেই বণ্ডেড্ এব্রেসিভ্ খুঁজতে হলে দুটি গুণের প্রতি আপনি সবসময় নজর রাখবেন—অল্প খরচায় বেশী কাজ ও গুণের তারতম্যহীনতা। ইউনিভার্সাল গ্রাইণ্ডিং হুইল-এ আপনি সবসময়ই এই বিশেষ গুণগুলি এবং অন্যান্য সুবিদিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাবেন।
A PRODUCT
বণ্ডেড্ এব্রেসিভ্ :
গ্রাইণ্ডিং হুইল সেগ্‌মেণ্ট, রাবিং ব্রিকস্, স্টিকস্,
শার্পেনিং স্টোন, ভাল্ভ গ্রাইণ্ডিং কম্পাউণ্ড, প্রভৃতি।
কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় : ৫২/৫৩, জাহাঙ্গীর স্ট্রীট,
টেলিফোন : ২৯৪১ (৪ লাইন)
কারখানা : তিরুভত্তিয়ুর,
মাদ্রাজ।
বিক্রয় প্রতিনিধি
মেসার্স উইলিয়াম্ জ্যাকস্ অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা-১, বোম্বাই-১, মাদ্রাজ-১, নয়া দিল্লী,
ব্যাঙ্গালোর-১, কানপুর।
শুধু বৈশিষ্ট্যের জন্য :
মেসার্স এইচ, এস্, কক্স অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২৪, রাম্পার্ট রো, বোম্বাই।
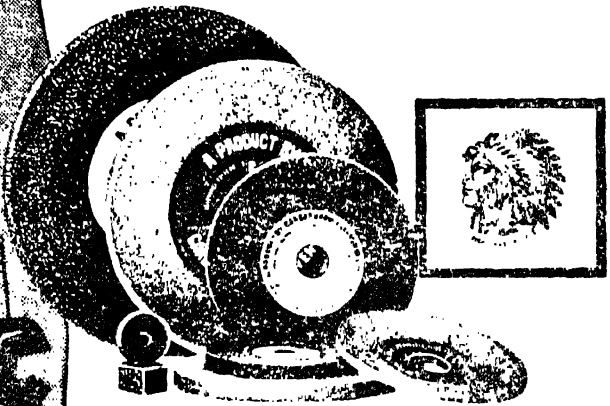
দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 5th September, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৫
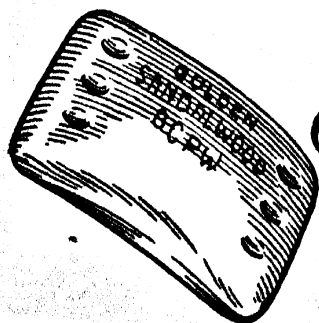
* টিনোপাল এদের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক - জে আর গায়গী এস. এ. বাল, সুইজারল্যাণ্ড

প্রস্তুতকারক : সুহৃদ গায়গী প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াড়ী ওয়াড়ী. বরোদা। একমাত্র পরিবেশক : সুহৃদ গায়গী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, পোষ্ট বক্স ৯৬৫, বোম্বে১

ষ্টকিষ্টস্ ঃ মেসার্স হিন্ডাইস্ প্রাইভেট লিঃ, পি-১১, নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ রোড,

MANNERS GRIPE MIXTURE

তার মুখের হাসি আবার ফুটিয়ে তুলুন

এই চিহ্নটি দেখে নেবেন GM এটি ম্যানার্স এর তৈরী

GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD. BOMBAY • DELHI • CALCUTTA • MADRAS

ASP/GM-9

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

(সি ৪৯৬৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের
বন্দরের কাল
ইদানীং কালের
একটি আশ্চর্য
সৃষ্টি
অপরিহার্য
প্রবন্ধ-গ্রন্থ
চার টাকা
ডঃ গুরুদাস
ভট্টাচার্যের
সাহিত্য জিজ্ঞাসা
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর
ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য
পাঠ্য
সাড়ে তিন টাকা
নীরদরঞ্জন দাসগুপ্তের
সুশান্ত-সা
বাংলা সাহিত্যের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ
উপন্যাস
শোভন
সাড়ে পাঁচ টাকা
বঙ্গ সংস্কৃতি
সম্পর্কে
অদ্বিতীয় গ্রন্থ
বঙ্গপ্রসঙ্গ
সুশীল রায় সম্পাদিত
পাঁচ টাকা
পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ : অলোক ধর

শারদীয়া গোয়েন্দায়

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সুবৃহৎ রহস্য উপন্যাস

॥ জন্মান্তর ॥

পাঠক মহলে আলোড়ন জাগাবে। এছাড়া থাকবে অন্য দুটি রহস্য উপন্যাস ও প্রচুর গোয়েন্দা গল্প

দাম ২.৫০ নঃ পঃ

ঠিকানা—

২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলি-১২

রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা মনস্তত্ত্বমূলক একমাত্র পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যা

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, দুটি নাটক, দশটি গল্প ও ছয়টি বিস্ময়কর ফিচার। লিখবেন,—বনফুল, অবধূত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল এবং আরও অনেকে।

৩০২।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯।

॥ 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

রূপসী রাত্রি

দাম: ৫.০০ টাকা

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে

দাম: ৩.৫০ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

৯ম সংস্করণ: ৫.০০ টাকা

ছেলেদের বিবেকানন্দ

৬ষ্ঠ সংস্করণ: ১.২৫ টাকা

প্রকাশিত হইল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য

দাম : ৩.৫০ টাকা

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া

দাম : ৮.০০ টাকা

ভারত প্রেমকথা

৬ষ্ঠ সংস্করণ: ৬.০০ টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিন্ময় বঙ্গ

২য় সংস্করণ: ৪.০০

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

দাম: ৫.০০ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯
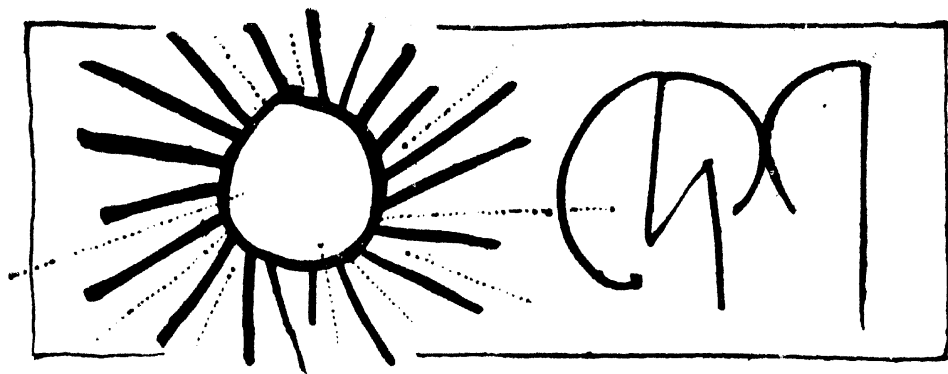
DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 5th September, 1959

২৬ বর্ষ : সংখ্যা ৪৫ : ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

পররাষ্ট্রনীতির পুনর্বিচার

ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় প্রুশিয়ার অনেক সেনাবাহিনী ফরাসী দেশে ঢুকিয়া পড়িলে Valmy নামক স্থানে ফরাসী সেনাদলের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটে আর সমস্ত ইউরোপ বিস্মিত হইয়া দেখে যে নামমাত্র শিক্ষিত ফরাসী সেনাদলের কাছে বিখ্যাত প্রুশিয়া বাহিনীর পরাজয় ঘটিল। এবং পরাজিত প্রুশিয়ার সৈন্য ফরাসী ভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধ হিসাবে Valmy-র লড়াই কিছুই না, ঘটনা হিসাবে নবযুগসূচী। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রুশিয়ার পক্ষে মহাকবি গ্যেটে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, এই ঘটনার তাৎপর্য কি জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন এখানে অদ্য নূতন যুগের সূচনা হইল। মহাকবির দৃষ্টান্তে আমরাও বলিতে বাধ্য হইতেছি চীনা সৈন্যের ভারত সীমান্ত আক্রমণে সমস্ত এশিয়ার না হোক ভারতের রাজনীতির নূতন অধ্যায় সূচিত হইতে চলিল।

চীন ভারত মিত্রতার উপরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভারত সরকারের ধারণা হইয়াছিল যে এশিয়ার অন্যতর প্রবল রাষ্ট্র (জাপানের কথা এখানে ওঠে না) চীন যখন ভারতের মিত্র, পঞ্চশীলের "পবিত্র বন্ধনে" যখন উভয়ে আবদ্ধ তখন ভারত আক্রমণের ভীতি নাই। এখন চীনের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সে ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িল। এবারে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। পররাষ্ট্রনীতির শক্তি নির্ভর করে রাষ্ট্রের ক্ষাত্র শক্তির উপরে। চীন ও রাশিয়া মুখে পঞ্চশীল মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও ক্ষাত্রশক্তি বৃদ্ধিতে ন্যূনতা করে নাই, বরঞ্চ কায়মনোবাক্যে উহা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। পঞ্চশীলের দৌড় যে কতখানি ভারত তো এক্ষণে বুঝিল। এবারে দেশের প্রতিরক্ষায় কোথাও ন্যূনতা থাকিলে তাহার সংশোধনে অবিলম্বে সচেতন হওয়া আবশ্যক। সেইসঙ্গে তোষণনীতিরও একেবারে অবসান ঘটা আবশ্যক। তোষণনীতি ভারত সরকারের একটি প্রধান রন্ধ্র। এই তোষণনীতির একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত পাকিস্তান কবলিত কাশ্মীর। ইহা পাকিস্তানের অনুকূলে তোষণনীতি। তোষণনীতির আর একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত তিব্বত, ইহা চীনের অনুকূলে তোষণনীতি। তোষণনীতিতে যে কাহাকেও তুষ্ট করা যায় না পাকিস্তানের আচরণ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ, এখন চীনের আচরণ তাহার সঙ্গে যুক্ত হইল। তোষিত রাষ্ট্র তোষণনীতিকে দুর্বলতা মনে করে।

চীনের আক্রমণ প্রসঙ্গে নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহার উদ্দেশ্য কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই। উদ্দেশ্য যাহাই হোক ঘটনা সম্বন্ধে মতভেদের কারণ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য কী? নানা দিক হইতে ব্যাপারটাকে বিচার করা যাইতে পারে। চীন কর্তৃক তিব্বতে গণহত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ভারত গণচীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—ভারত আক্রমণ কি তাহারই পাল্টা জবাব? কিম্বা সিকিম, ভুটান ও নেপাল গ্রাস করিবার ভূমিকাস্বরূপ ওইসব রাষ্ট্রের মনে ভীতি উৎপাদন? প্রয়োজনকালে ভারত যাহাতে ওইসব রাজ্যকে সাহায্য না করিতে পারে সেইজন্য আগে হইতে Strategic পথঘাট রোধ করিবার উদ্দেশেই কি এই আক্রমণ? কিম্বা পাকিস্তানের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ভারতে পূর্বোত্তর সীমান্তে একটি নূতন "কাশ্মীর পরিস্থিতি" সৃষ্টি করিয়া সমস্ত সীমান্তকে তরল অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া? ভারতের মানচিত্রে অন্যায়ভাবে চিহ্নিত অংশ সংশোধন না করিতে অনুরুদ্ধ হইলে চীন সরকার যে উত্তর দিয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। চীন সরকার বলিয়াছিল যে, এই সীমান্ত নির্দেশে অনেক ঐতিহাসিক কার্যকারণ নিহিত। এখন কোন কার্যকারণের পরিণাম যে এই আক্রমণ, তাহা কেবল চীন সরকারেরই পরিজ্ঞাত। কিন্তু চীনের মনোগত রহস্য উদ্ধারের চেষ্টায় সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। আক্রমণকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ভূমিকারূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে, অহেতুকভাবে কোন থিয়োরীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া লাভ নাই। থিয়োরীর জন্য দেশ নয়, দেশের জন্যই থিয়োরী। ব্যাপক আক্রমণের আশংকা আছে ধরিয়া লইয়াই প্রস্তুত হইতে হইবে, না ঘটে উত্তম, ঘটিলে যাহাতে শত্রু দেশের সীমান্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এক্ষণে তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এবং তাহারই ভূমিকাস্বরূপ পররাষ্ট্রনীতিকে নবকলেবর দান করিতে হইবে।

প্রসঙ্গত

"সরকারী লাল ফিতা" আজ প্রায় প্রবাদ-বাক্যে পরিণত। একটা ফাইল একই ঘরের এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে যেতে কয়েক মাস সময় নেয়। এর প্রবর্তন হয়েছিল ইংরেজ আমলে। কিন্তু নিতান্ত অকারণে হয়তো নয়। বিদেশী সরকারকে পরাধীন দেশে রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে অনেক সময় আবশ্যকেরও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সম্ভবত তারই সম্ভবপর উপায় হিসাবে এর প্রবর্তন হয়েছিল। মনে পড়ে এক সময় উত্যক্ত হয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তখন হয়তো তিনি ভাবেন নি, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শাসনভার তাঁরই হাতে আসবে এবং লাল ফিতার অত্যাচার তখন আরও পাকা হবে।

লাল ফিতার সেই পুরাতন সার্থকতা আর নেই; অথচ লাল ফিতা রয়েছে। রয়েছে সেই গদাই-লস্করী ভাব। সবই ঢিলে-ঢালা। সবই হচ্ছে হবে। শ্রীনেহরু এর জন্যে মাঝে মাঝেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাতে কাজ বিশেষ হয়েছে, তা মনে হয় না। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ তো অতিষ্ঠ হয়ে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ফতোয়া দিয়েছেন, চাকুরিয়াদের উন্নতি নির্ভর করবে তাঁদের কর্মতৎপরতার উপর। এই রকম একটা ফতোয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

*

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় অন্যান্য স্বাধীন দেশের তুলনায় সর্বদিকেই অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। এখন তাকে দু'দিনে দু'মাসের পথ হাঁটতে হবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজ আমলে ঢিলেমি ছিল বটে,—ইচ্ছাকৃত ঢিলেমি, কিন্তু তার জন্যে যোগ্যতার কোন অভাব ছিল না। আজ ঢিলেমির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অযোগ্যতা এবং সরকারী বিভাগে, সকল বিভাগে অবশ্য নয়, তৎপরতা যদি কোথাও থাকে তা দুর্নীতির। সেদিকে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়। আর একদিকে চলেছে এই সঙ্গে রাজনীতির খেলা। কি করে কম খেটে বেশি মাইনে আদায় করা যায়, তার ফন্দি-ফিকির। অবশ্য এই দুর্মূল্যের বাজারের দিকে চাইলে সরকারী কর্মচারীদের নিচের অংশের বেতন বেশি বলা যায় না। সে তুলনায় বেসরকারী অফিসের বেতনের হার অনেক বেশি। যার জন্যে প্রধান মন্ত্রী একদিন বেতনের হার কমাবার জন্যে বেসরকারী অফিসগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা সরকারী কর্মচারীদের মানসিক প্রবণতার কথাই উল্লেখ করছি।

*

কিন্তু এমন ঘটছে কেন? একদল বলছেন, কর্মে অনিচ্ছা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম। কিন্তু এ ধর্ম কি শুধু ভারতবর্ষের মানুষেরই? বলা হচ্ছে, উপরের মন্ত্রিমণ্ডল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের জন্যে ফাইল অনেক সময় পড়ে থাকে। অনেক সময় হতে পারে, সব সময় নয়। সব জিনিস নিজের চোখে না দেখলে পদমর্যাদাবোধ তৃপ্ত হয় না বলে ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে অনেক সময় ফাইল আটকে থাকে। অথচ অনেক কাজ আছে, যা নিচের অফিসাররাই শেষ করতে পারেন। এ সমস্ত কাজের ভার নিচের অফিসারদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ রকম সরকারী অফিসের নিয়ম কিছু পরিবর্তন করে কর্ম বিভাগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারী দপ্তরসমূহে ইংরেজ আমলের সেই কঠোরতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তার ফল হয়েছে, 'বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো'। সেইটে ভয়ের কথা। এর ফলে মাঝারি দলের কর্মচারীদের মধ্যে উদ্যমের অভাব ঘটে এবং সরকারী দপ্তরে যেহেতু কাজের চেয়ে শৃঙ্খলার নামে আইনকানুনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, সেহেতু ইচ্ছা থাকলেও মাঝারি দলের কর্মচারীদের হাত-পা বাঁধা। আর এই বাঁধাবাঁধি কম বলে বেসরকারী অফিসে যে কাজটা দু'দিনে হয়, সরকারী অফিসে তা দু'মাসেও হয় না।

*

সরকারী দপ্তরে সবচেয়ে গুরুতর বস্তু "গোপনীয় বিবরণ"। এরই উপর সরকারী কর্মচারীদের ভাগ্য নির্ভর করে। কাজের যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপর নয়। শ্রীপন্থ যে ফতোয়াই দিন, নিম্নতন কর্মচারীদের যোগ্যতা-নিরূপণের ভার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের উপর। কর্মে অনিচ্ছা, শৈথিল্য ও উদ্যমের বিচার তাঁরাই করবেন এবং তাঁদের সুনজরে পড়ার বাদশাহী সড়ক হচ্ছে তোয়াজ। কর্মে-অনিচ্ছার মতো মহাজনের পন্থা অনুসরণ করাও মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম। বাদশাহী সড়ক ছেড়ে কে কর্মোদ্যমের সংকীর্ণ পথ গ্রহণ করে ঊর্ধ্বতন অফিসারের অসন্তোষের ঝুঁকি নেবে? আমাদের আশংকা, সরকারী দপ্তরের শৈথিল্য, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি আজ ফতোয়ার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। এখন দুরূহ অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

*

এ সপ্তাহের সবচেয়ে বিপজ্জনক খবর হচ্ছে চীনের ভারতীয় সীমান্ত আক্রমণ। ভারতবর্ষের সকল দল একবাক্যে এই আক্রমণের নিন্দা করেছেন। এই অন্যায় এবং অহেতুক আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং ঐক্যবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট দল বলেছেন বটে যে, "আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না" এবং "হিমালয় সীমান্তের কোনো কোনো স্থানের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় জনসাধারণের উদ্বেগে অংশ"ও গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাতে তেমন যেন জোর নেই।

ভারতবর্ষে নানা দল রয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্যের অভাব থাকলেও একটি বিষয়ে ঐক্য রয়েছে: এরা সকলেই কমিউনিজমের বিরোধী। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বামপন্থী হিসাবে শাসকদল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে এদের দেখা যায়। যেমন দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিব্বতের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, চীনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য-পালনে শৈথিল্য দেখান নি।

এইটেই স্বাভাবিক। তিব্বতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানবধর্ম তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে। চীনের ক্ষেত্রে পবিত্র দেশপ্রীতি। কোনো রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় আদর্শই স্বদেশের স্বাধীনতার চেয়ে বড় হতে পারে না। একটি গণতন্ত্রী দেশ অপর একটি দেশকে আক্রমণ করলে আক্রান্ত দেশের গণতন্ত্রী দল যেমন নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না, একটি কমিউনিস্ট দেশ অন্য একটি দেশকে আক্রমণ করলেও তেমনি আক্রান্ত দেশের কমিউনিস্ট দলের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

আর দেখা যাচ্ছে, এই ব্যাপার নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিনের আগ্রহ। আইসেনহাওয়ার এ যাত্রা ভারতে আসছেন না বটে, কিন্তু চীনের ব্যাপারে ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্যের অভিপ্রায় আগ্রহসহকারে প্রকাশিত হয়েছে। তার অর্থ আগামী বিশ্ব-মহাযুদ্ধের রণাঙ্গণও ভারত-চীন সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত হবে। ঠিক সেই কারণেই মনে হচ্ছে, চীনের মনোগত অভিপ্রায় যাই হোক, রাশিয়া এই ব্যাপারে উৎসাহ দেবে না। মনে হয়, চীন-ভারত সংঘর্ষের ব্যাপারটা যতখানি গুরুতর বলে বোধ হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ঠিক ততখানি অগ্রসর নাও হতে পারে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, আগুন ওখানে ধোঁয়াচ্ছে। বারুদও কাছাকাছি রয়েছে।

সোভিয়েট নেতা মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকায় আগমনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পশ্চিমা ব্লকের তিন প্রধান য়ুরোপীয় শক্তি—বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং মত-বিনিময়ের জন্য সফরে বেরিয়েছেন। মিঃ আইসেনহাওয়ার প্রথমে বন-এ চ্যান্সেলার আদেনাওয়ার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি বৃটেনে মিঃ ম্যাকমিলানের সঙ্গে কথা বলছেন। তারপরে প্যারিসে প্রেসিডেন্ট দ্যগলের সঙ্গে আলোচনার পালা। সেইটাই হবে সবচেয়ে কুটকচালে ব্যাপার। এইসব নিয়ে জল্পনাকল্পনার সুখভোগ এবং পরে মিঃ খ্রুশ্চেভ যখন আমেরিকায় যাবেন তখন সাংবাদিকজগতে যে হৈ-হৈ কান্ড চলবে নিশ্চিন্তে তার রসাস্বাদন করা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ ভারতবর্ষের নিজের উপরেই একটা প্রকান্ড সংকটের ছায়া এসে পড়েছে। তিব্বত পেরিয়ে কম্যুনিস্ট চীনের সশস্ত্র আক্রমণ ভারতভূমি এবং নিরপত্তার দিক থেকে ভারতের আশ্রয়াধীন রাজ্যসমূহকে স্পর্শ করেছে। উত্তর পশ্চিমে লাডাকে এবং উত্তর-পূর্বে নেফায় ভারতভূমির একাধিক স্থানে চীনা সৈন্য প্রবেশ করে ঘাঁটি করেছে চুপে চুপে নয়, ভারতীয় রক্ষিদলকে মেরে তাড়িয়ে। ভুটানের প্রান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পাওয়া গেছে, তদুপরি কিছু চীনা সৈন্য ভুটানের ভিতরেও প্রবেশ করেছে বলে শুনা যাচ্ছে। নেপালের উত্তর সীমানাও অক্ষত আছে কিনা কে জানে। নেপালের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাও সে-তুং এবং চু-এনলাইয়ের অসংখ্য ছবি বিতরিত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। মোটের উপর ভারতের যেসব অংশ চীনামানচিত্রে চীনের অন্তর্গত বলে দেখানো হয়ে আসছিল সেই সমস্ত এলাকা জুড়ে একটা বিরাট চৈনিক অভিযানের আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খাস পিকিং-এর বড়কর্তারা যা করার কাজে করছেন, এখনো মুখে কিছু বলছেন না; কিন্তু দু-একজন ক্ষুদে কর্তার ঘোষণায় চীনা সরকারের মনোভাব ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছে—রাজনৈতিক এবং সামরিক উভয় উপায়ের দ্বারা হিমালয়বাসী তাবৎ জাতিকে চৈনিক অধিকারভুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেছেন যে ভুটান এবং সিকিম রক্ষার দায়িত্ব ভারত সরকারের, এই রাজ্যগুলির উপর যদি আক্রমণ হয়, তবে সে আক্রমণ ভারতের উপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে। "ম্যাকমোহন লাইনের" অস্তিত্ব কোন প্রকারে অস্বীকার করার চেষ্টাও ভারত সরকার সহ্য করবেন না বলে শ্রীনেহরু ঘোষণা করেছেন। চীনাদের ভারতভূমিতে অন্যায় প্রবেশ এবং ভারতীয়-রক্ষীদের হতাহত করার জন্য পিকিং-এ প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে এবং ভারতভূমি থেকে জবরদখলকারী চীনা সৈন্যদের হঠাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে দেশবাসীকে জানানো হয়েছে। এজন্য "নেফা" অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার ভার কেবল মাত্র "আসাম রাইফেলস"-এর উপর না রেখে উক্ত অঞ্চলকে সাক্ষাৎ এক সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বের মধ্যে আনা হয়েছে। মোটের উপর এটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভারতের এবং যারা নিরাপত্তার জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল তাদের রক্ষার জন্য ভারত সরকার বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

এই কর্তব্য যেমন সুস্পষ্ট এর সম্পাদনও কিন্তু তেমনি কঠিন। কারণ এই অবস্থা যে একদিন হতে পারে তার জন্য ভারত সরকার যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন নি এবং তদনুযায়ী প্রস্তুতির ব্যবস্থাও হয়নি। অবশ্য সারা শক্তির প্রশ্নও ছিল। আসলে **প্রথম বাঁধ ভাঙল যখন তিব্বতের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে সেখানে নিরংকুশ চীনা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল এবং** ভারত সরকার তা মেনে নিলেন। তিব্বত যতদিন স্বাধীন ছিল এবং যতদিন তিব্বতকে আত্মসাৎ করার শক্তি চীনের ছিল না ততদিন পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষার সমস্যা যা ছিল ১৯৫০এ তার আমূল পরিবর্তনের সূচনা হল। চীন কর্তৃক তিব্বত গ্রাসের ফলে কেবল তিব্বতীরা যে স্বাধীনতা হারালো তা নয়, "বাফার" স্টেট হিসাবে, তিব্বতের যে কার্যকারিতা ছিল তাও নষ্ট হল। এটা ভারত ও চীন উভয়ের নিকটই সমান ক্ষতিকর বোধ হত যদি চীনের ঝোঁক সম্প্রসারণের দিকে না যেত। কিন্তু ভারত যাকে "বাফার" বলে মনে করত চীনের নিকট সেটা ছিল বাধা। সুতরাং চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকারের ফলে ভারতের পক্ষে যেটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল চীনের কাছে সেটা হল সুযোগ।

১৯৫০ সালে চীনের তিব্বতে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করতে গিয়ে শ্রী নেহরু ভর্ৎসিত হয়ে চুপ করে যান। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারত সরকার তখন আশংকা বোধ করেন নি এরূপ বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যে-কারণেই হোক,

তখন চীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাবার দিকেই ভারত সরকারের নীতি চালিত হয়। তিব্বতকে হজম করার জন্য চীনের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল, সেজন্য চীন তিব্বতকে "মুক্ত" করেও তার স্বাতন্ত্র্য'—অটনমি' রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভারত সরকারের বোধহয় আশা ছিল যে, তিব্বতের 'অটনমি' যদি থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত যদি চীনের প্রতি সর্বপ্রকার সৌহার্দ্য দেখিয়ে তাকে খুশী রাখে তাহলে সীমান্ত রক্ষার সমস্যাটা উৎকট হয়ে উঠবে না। এই মনোভাবের থেকেই তিব্বত সম্পর্কিত চীন-ভারত চুক্তি হয় যাতে তিব্বতের উপর চীনের "সুজারেইনটি" ভারত সরকার স্বীকার করে নেন। এই চুক্তির মুখবন্ধই ছিল "পঞ্চশীল"। এই চুক্তির সঙ্গে "মিউনিক প্যাক্ট" তুলনীয় হত যদি ভারত সরকার সত্যই বিশ্বাস না করতেন যে, চীন তিব্বতের 'অটনমি' নষ্ট করবে না।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে, ভারত সরকারের সেই বিশ্বাস অমূলক ছিল। তিব্বত ও ভারত সরকার উভয়েই প্রতারিত হয়েছেন। চীনের সঙ্গে চুক্তি করে এবং পরবর্তীকালে অসংখ্যভাবে চীনের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করে ভারত সরকার কিছুই বাঁচাতে পারেন নি, না তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য, না ভারতের স্বার্থ। ভদ্রতার মধ্যে চীনের দস্যুবৃত্তির উপর একটা আবরণ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন সময় হল, চীন নিজেই অসঙ্কোচে সে আবরণ টেনে ফেলে দিল। তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য নিঃশেষ হবার মুখে যখন তিব্বতীরা মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করল তখন তাকে দমন করার জন্য যে-চণ্ডনীতি চলেছে তাতে তিব্বতীদের জাতীয় সত্তার অস্তিত্বই সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছে। ভারত সরকারের সবিনয় দুঃখপ্রকাশ চীনকে নরম করার চেয়ে আরো গরম করেছে। দলাই লামা এবং দুর্গত কয়েক সহস্র তিব্বতীর ভারতে আশ্রয়লাভ করাতে চীনা সরকারের ক্রোধের অন্ত নেই। ভারতকে "সাম্রাজ্যবাদী" এবং অন্য দেশের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী বলে কটূক্তির স্রোত বইতে থাকে। কিন্তু তাতেই শেষ হয়নি। চীনের সামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণ তিব্বত পেরিয়ে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার নানা ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে পিকিংএ পত্র প্রেরণ করে আসছেন। তার কোনো উত্তর নেই। অথবা হয়ত চীন সরকার মনে করছেন যে, সীমান্তে চীনা সেনারাই তার উত্তর দিচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। মনে হয়, পিকিং সরকার যেন সেই সম্বন্ধ ছেদন করতেই চান। দলাই লামার ভারতে আগমনের অল্প কয়েকদিন পরেই পিকিং-এর রাষ্ট্রদূত—[illegible] মহাশয়—চীনে চলে যান, তিনি আর আসেন নি, দিল্লীতে চৈনিক দূতাবাসের ভার সেই থেকে শার্জে দ্য অ্যাফেয়ার্সের উপরেই আছে। এই থেকে ভারতের প্রতি চীনের মনোভাব কী প্রকার তা বুঝা যায়। এই অবস্থায় পিকিং-এ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পদে থাকাটাও ভারতের পক্ষে সম্মানজনক নয়, বিশেষত যখন শুনা যাচ্ছে যে, তিনি পিকিং-এর কর্তাদের সঙ্গে চেষ্টা করেও দেখাসাক্ষাৎ প্রায় পান না।

এদিকে এতদিন পরে আমাদের চীন সম্পর্কিত নীতির ব্যর্থতা প্রকাশ পাওয়ায় সরকার এবং দেশবাসী অত্যন্ত চিন্তার মধ্যে পড়েছেন। চীনের উদ্দেশ্য যথাকালে উপলব্ধি করতে পারলে আজকে এতো সংকটে পড়তে হত না। বুঝার যে-ভুল সেটা আদর্শগত কোনো ব্যাপার নয়। অথবা চীনা সরকার কম্যুনিস্ট বলেই এইরকম করছেন তা নয়। অবশ্য কম্যুনিস্ট বলে রাজ্য প্রসারের কায়দায় খানিকটা বিশেষত্ব আছে। আসল কথা, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, চীন মূলত একটা সাম্রাজ্য এবং সেই সাম্রাজ্য অধুনা একটি বিরাট সামরিক শক্তি—মিলিটারী পাওয়ার—হয়ে উঠেছে। এরূপ সংস্থার আচরণের মূলে তার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে।

৩১।৮।৫৯

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

বাইশ

প্রমথ চৌধুরীর ৪।৪।১৭ তারিখের চিঠিতে বিশেষ করে যে চারজন সবুজ সভ্যের নাম আছে, তাঁদের মধ্যে প্রথমটির পরিচয় ইতিপূর্বে দেবার উপলক্ষ হয়নি। তিনি হচ্ছেন বরদা গুপ্ত। তিনি সবুজ দলে ভর্তি হবার আগে ডাকযোগে এক প্রবন্ধ পাঠান, সবুজ-পত্রে ছাপাবার জন্যে। সে প্রবন্ধে নামসই ছিল, নলিনীবালা গুপ্তা। পরে তিনি স্বয়ং এসে স্বীকার করে যান যে, নলিনীবালা তাঁর স্ত্রীর নাম। প্রবন্ধকেও যে স্ত্রীর নামে বেনামী করা যায়, এর পূর্বে বলেছি শুনিনি। ইন্দিরা দেবী। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত একবার নাকি প্রবাসীতে ছাপাবার জন্যে একটি কবিতা পাঠান, নিজেরই নাম সই করে, কিন্তু সেটি ফেরৎ আসে। আবার সেই কবিতাই তিনি পাঠালেন এক মহিলার নাম (নীহারিকা দেবী) দিয়ে, আর তখনই সেটি ছাপা হয়ে বেরুল। এতে মেয়েদের প্রতি একটু এক-চোখামীর প্রমাণ হয়তো পাওয়া যায়, তবে সেটাকে স্বভাবদোষসঞ্জাত বলা চলে। সম্পাদকরা এবং তাঁদের সহকারী যাঁরা, কবিতা নির্বাচন করেন—সকলেই ত ধ্যানমগ্ন মুনি নন।

কবিতার ভাব ও ভাষা থেকে অনেক সময়ে অনুমান করা যায়, কবি পুরুষ কি নারী। 'যে ছিল আমার স্বপন-চারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি', একথা পুরুষের মুখেই মানায়। কিন্তু সব রচনায় এরূপ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে না। এমন অনেক রচনা আছে, যা পড়ে ঠিক বোঝা যায় না, লেখক আসলে লেখক না লেখিকা। অবশ্য এটাও স্বীকার্য যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নর-ভাব ও নারী-ভাব দুইই থাকে, কারো একটা বেশী, কারো একটা কম। কোনো নারীর ব্যবহারে যদি পুংবৎভাব দেখি, আমরা সেটাকে 'পুরুষালী' বলি। অপরপক্ষে কোনো পুরুষের আচরণে যদি স্ত্রীজনোচিত ভাব লক্ষ্য করি, আমরা তার নাম দিই 'মেয়েলী'।

হাতের লেখাতেও এ-দুই ভাবের আত্মপ্রকাশ অনুভব করা যায়। ইংরিজী লেখার খাড়া-খাড়া গোল-গোল অক্ষর দেখলে সেকালে আমরা তাকে বলতুম 'লেডীজ হ্যান্ড'। ডানদিকে হেলানো অক্ষর ছিল পৌরুষের মাপকাঠি। হাতের লেখা দেখে লেখক বা লেখিকার স্বভাব ও চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করেন কেউ কেউ, যেমন হাতের রেখা দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান

বিচার করে থাকেন, যাঁরা সামুদ্রিক শাস্ত্রে পারদর্শী। কর-কোষ্ঠীতে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন, পূর্বজন্মের কর্মফলই ইহজন্মে রেখা-রূপ নিয়ে হাতে আসে। আর আমরা জানি যে, হাত দিয়ে যেলেখা বেরোয়, সে হচ্ছে ইহজন্মেরই কর্মফল, কেননা লেখার কাজ ত একটা কর্ম বটে, এবং সে-কর্ম সুসম্পন্ন করতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন। এ কর্ম-সাধনে কোন লেখক কতটা যোগ-সাধন করেছেন, কার চিত্ত-বৃত্তিনিরোধ কী পরিমাণে হয়েছে, তার প্রমাণ তাঁর হস্তাক্ষরে পাওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন লেখক কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারও আভাস পেতে পারা যায়, যদি তিনি কোনো বিজাতীয় লিপিকে করায়ত্ত করে থাকেন। যেমন, আমরা বাঙালীরা ইংরিজী হরফ লিখতে শিখেছি, কিন্তু যেহেতু সে-হরফ আমাদের কাছে বিজাতীয়, তার চেহারা কিছু বদলে যায়, আমাদের হাতে পড়ে। বাঙালীয়ানার ছাপ নিয়ে ইংরিজী হরফ বেরোয় আমাদের কলম থেকে। অনুরূপ ছাপ পড়ে আমাদের ইংরিজী রচনাতে। অপরপক্ষে, আমরা এত ইংরিজী লিখি ও পড়ি—ইংরিজীতেই ত আমাদের বেশীর ভাগ বাংলা লিখতে বসি, তখন সে-লেখাতে আবার ইংরিজী প্রভাব ফুটে ওঠে।

একথা যে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য—এই দেখুন, ইংরিজীর "true to the letter" বাক্যাংশটির এক্ষুনি কেমন প্রভাব এসে গেল—তার প্রমাণ ডাকযোগে পত্রালাপে অনেকবার পেয়েছি। এসম্বন্ধে আমার মনে অনুভূতির প্রথম আগম হয়, যখন আমি সবুজ দলের একজন হয়েও মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের কাল-নির্ধারণকল্পে 'কুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈনের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করি। ঐ বিষয়ে জৈন-সাহিত্যের সাক্ষ্য মূল্যবান, এ ধারণা তখন আমার হয়েছে। দেবেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন বিহার প্রদেশের অন্তর্গত আরা নগরের অধিবাসী। তিনি বরাবরই আমার অদৃষ্ট-বন্ধুই হয়ে গেলেন, কারণ তাঁকে চোখে দেখার সুযোগ কখনও পাইনি। তিনি আমাকে অনেক বই হিন্দী, প্রাকৃত, সংস্কৃত—ডাকযোগে বিনা-মূল্যে পাঠিয়ে দিতেন এবং তত্রস্থ প্রমাণের ব্যাখ্যা করতেন ইংরিজীতে লেখা চিঠিতে। সেইসব চিঠিতে তাঁর ইংরিজী হাতের লেখার ধরন দেখে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কই? আমরা বাঙালীরা ত এভাবে ইংরিজী অক্ষর লিখি না? নিশ্চয়ই নাগরী অক্ষরের প্রভাব তাঁর ইংরিজী হস্তাক্ষরে প্রতিফলিত।

ইংলণ্ড, জর্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, নর-ওয়ে, সুইডেন, আমেরিকা—এসব দেশ থেকে ইংরিজীতে লেখা যেসব চিঠি পেয়েছি তাতেও হস্তাক্ষরের জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু লক্ষ্য করেছি। সবচেয়ে মজার মনে হয়েছে জর্মানদের 'ব' লেখা—সেটা ইংরিজী 'r' এরই মতন। কিন্তু পেট-কাটা কে যে এই জর্মান সাত-এর পেট কেটে-ছিল তা জানি না। জানতে পারলে হয়তো তার গুণগান করতুম, সুবাকে সম্ভবে চাড়িয়ে, কেননা আমরা এখন নিরপেক্ষ জাতি, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

শিশুকালে বাংলা মূর্ধন্য-ষকে 'পেট-কাটা মধ্যান্ন-ষ' বলতে শুনেছি, কিন্তু তখন লেশমাত্র সন্দেহ হয় নি যে, পেট কেটে তার মধ্যে অন্ন দেবার প্রবৃত্তি থেকে 'পেট-কাটা মধ্যান্ন-ষ'এর সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। এখন যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে পেট-কাটা অনাবশ্যক। যাঁরা আমাদের অন্ন জোগাবেন বলে আশা করছি, তাঁরা আগে থাকতেই আমাদের পেট কেটে রেখে দিয়েছেন এবং পেট ভর্তি করার ব্যবস্থা নিজেদের তরফ থেকে উত্তমরূপেই করেছেন।

প্রাচীনকালের শিলালিপি, পুঁথি প্রভৃতিতে যেরকম হাতের লেখার নিদর্শন মেলে, তার মধ্যেও এই দিক থেকে বিচারের অবকাশ আছে। মিশরে আবিষ্কৃত গ্রীক্ ভাষায় লেখা পুঁথি যা পাওয়া গেছে, তার ভিতর কতকগুলি হচ্ছে খৃষ্ট-জন্মের অনেক পূর্বেকার, যখন আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি তুলমায় (টলেমী)-এর বংশ সেখানে রাজত্ব করতেন। সে-সময়কার গ্রীক্ অক্ষর যেরকম ছাপের, তার পরবর্তীকালে সে-রকম ছাপের মত রইল না। [illegible] ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার পর যেমন সমস্ত মিশরের [illegible] প্রাচীন [illegible] গ্রীক পুঁথির অক্ষরে [illegible] এই প্রকার সূক্ষ্ম [illegible] প্রাচীন লিপি-[illegible] প্রাদেশিক [illegible] লিপির [illegible] নূতন এক [illegible]।

রাজা অশোকের একটি মহীশূরের সিদ্দাপুর শিলালিপিতে লিপিকারের নাম সই আছে [illegible] লিপিকরের। সমস্ত শিলালিপিটি [illegible] লিপির মতন ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা, কেবল স্বাক্ষরে খরোষ্ঠী অক্ষর ব্যবহার হয়েছে। স্পষ্টতঃ এ থেকে মনে হয় যে, স্থানীয় লোকের দেশের ছিল ব্রাহ্মী লিপি, আর লিপিকারের দেশ ছিল অন্যত্র—যেখানে খরোষ্ঠী লিপিরই প্রাদুর্ভাব। লিপিকারের স্বাক্ষরে যে এ সম্পর্কে স্ব-অক্ষর, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এই লিপির প্রথমাংশে বলা আছে যে, সুবর্ণগিরি থেকে 'আর্যপুত্র' ও তাঁর মহামাত্র-রা ওখানকার (মহীশূরে) মহামাত্যদের কাছে দেবানাম্প্রিয়ের (অশোকের) আজ্ঞা পাঠাচ্ছেন। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে এই 'আর্যপুত্র' ছিলেন অশোকের যুবরাজ, এবং সুবর্ণগিরি ছিল মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহে। সে যাই হোক, খরোষ্ঠী-প্রধান প্রদেশের লিপিকারকে এনে মহীশূরের সিদ্দপুরে এই

অশোকের সময়ে ফাউণ্টেন পেন ছিল না বটে, কিন্তু কালি-কলমের প্রয়োগ তখন লোকে জানত। তার চাক্ষুষ প্রমাণ থাকা উচিত বৃটিশ মিউজিয়ামে। সাঁচিতে আবিষ্কৃত সারিপুত্ত ও মোগল্লায়নের দেহাবশেষ যে পাথরের কৌটোয় ছিল, সেই কৌটোর ঢাকনি দুটোয় কালি দিয়ে লেখা ছিল—'সা' আর 'মো', অর্থাৎ ঐ দুই মহাপুরুষের নামের আদ্য-অক্ষর। সে-মিউজিয়াম থেকে খুব ধুমধাম করে যখন দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনা হল, সাঁচিতে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, তখন বৃটিশরা ঐ কৌটো দুটো ফেরৎ দেন নি। সাঁচিতে গিয়ে যদি কেউ ঠুংরি ধরেন: সাঁচি কহো মুসে বাঁওয়া, তাহলে সুরলোক থেকে সদুত্তর পাওয়া যাবে কি? আশা বড় কম।

প্রমথ চৌধুরীর হাতের লেখা রবিবাবু, বা ইন্দিরা দেবীর মতন সুন্দর ছিল না। তাই তাঁর চিঠি নকল করিয়ে নিয়েছিলুম একটি মেয়েকে দিয়ে, এবং সেই নকল সামনে রেখে এখন সবুজপাতার ডাক লিখছি। মেয়েটি এইসব চিঠি নকল করতে যখন আসত, তখন সে আমায় রবীন্দ্রনাথের অনেক গান গেয়ে শুনিয়েছে। সে-সংগীতের সঙ্গ পেয়ে কী পরিমাণে তার হস্তাক্ষর সুন্দর-রূপ ধারণ করেছিল, তা জানি না। তার হাতের লেখা মুক্তোর মতন, তাই তাকে যখন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে পরিচয় দিয়ে পাঠাই শান্তিনিকেতনে, তখন তার এ-গুণেরও পরিচয় দিয়েছিলুম—কেবল এ-কথা লিখে দিই নি যে, তাকে আমি "মুক্ত-হস্তা" বলে থাকি। কেননা বাঙালীর মুখে এই সংস্কৃত শব্দকে উচ্চারণ করলে "মুক্তো-হস্তা"র মতন শোনায়। ফলে ইন্দিরা দেবী নাকি স্মিতমুখে তাকে প্রশ্ন করেন: আচ্ছা, হারীত তোমার কে হয়?—সে তার আত্মপরিচয়ে শুধু বলেছিল যে, তার নাম তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু বলেনি যে, তার মাতামহ ছিলেন আমার সহপাঠী 'প্রভাত মুখুজ্যে' (যিনি পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছিলেন), সুতরাং সে সুবাদে আমার নাতনী। এখন সে [illegible] নিয়ে "কাশীবাস" করছে।

হস্তাক্ষরে নারীভাব প্রকাশ করাতে আজকাল কোনো কোনো মেয়ে কুণ্ঠা বোধ করে। এখনকার বিপ্লবী সমাজে অনেক ব্যাপারে নারীরা পুরুষের কাজ করতে ব্যস্ত। এ-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, যখন ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ-লক্ষ পুরুষ সৈনিক ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল —অর্থাৎ যে সময়ে এখানে আমরা প্রমথ চৌধুরীর সবুজ-সভায় আসর জমাচ্ছিলুম। সেই সময়েই মেয়েরা শার্ট-স্কার্ট পরতে আরম্ভ করে। সেকালের রীতি অনুযায়ী পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া স্কার্ট বা গাউন আর চলল না, কারণ দৌড়-ঝাঁপ করার দরকার হল। কাপড়ের দুষ্প্রাপ্যতাও এই নতুন ফ্যাসানের জন্যে অনেকটা দায়ী। পরশুরামের গল্পে এই ধরনের স্কার্টকে বাদীপোতার গামছা গোছ একটা নাম দেওয়া আছে। শোনা গেল, বিলেতের মেয়েরা পুরুষদের প্রায় সব কাজই করে যাচ্ছে—যায় ট্রাম-কণ্ডাক্টারের কাজ পর্যন্ত। তবে সেগুলোই তাদের 'গৃহকর্ম' একথা বলা যায়, কারণ ওরা স্বদেশকে 'Home' বলে। সুতরাং, ছেলেরা যখন বাইরে লড়াই করতে ব্যস্ত, মেয়েরা তখন ঘরের কাজ-কর্ম নিয়েই রইল। এটা সমাজের পুরাতন ব্যবস্থারই বিস্তৃতি মাত্র, কেননা, সে-ব্যবস্থাতে পুরুষের প্রধান কর্তব্য বাইরে বেরিয়ে অন্ন-বস্ত্রাদির জন্যে অর্থ উপার্জন করা, আর নারীর প্রধান কর্তব্য ঘরে বসে সেই অর্থের সাহায্যে, প্রয়োজন যাতে খাওয়া-পরা ও [illegible] ভাবে হয়।

শুনেছি, মেয়েদের রোজগার করতে দেওয়া হবে কিনা, এ সম্বন্ধে অনেকদিন ধরে ইউরোপে দুটো মত প্রচলিত ছিল এবং এখনও বোধ হয় তার জের মেটে নি। ফরাসী মেয়েরা নাকি অধিকাংশ এ প্রকার [illegible] পছন্দ করে নি। [illegible] বলে, পুরুষেরা রোজগার করে টাকা এনে দেবে, [illegible] [illegible] [illegible] রোজগার করতে [illegible] না। [illegible]

এখন "প্রগতিশীল" সমাজে যে [illegible] চল [illegible] নারীর [illegible] নিয়ে অর্থ উপার্জন [illegible] উৎসুক [illegible] [illegible] একটা [illegible] হয়েছে। [illegible] "মেয়ের বাপ" আর "ছেলের বাপ" এ দুই নামের সার্থকতা কমে যাচ্ছে। [illegible] কোনো কালেই [illegible] জাতীয় [illegible] ছিল না, যদিও পণ-প্রথার [illegible] মেয়ের বাপ অনেক সময়ে বাধ্য হতেন "ছেলের বাপ"কে [illegible] টাকা ধরে দিতে। এখন আর সে নিয়ম নেই বললেই চলে। রোজগার-করা মেয়ের বর পাওয়া যায় সহজে; বিয়ের বাজারে বর চাওয়ার দরকার হয় না তার।

কিন্তু একটা উন্নতি দেখা যায় বাঙালী নারীসমাজে। মেয়েরা অনেকে মন দিয়ে সংস্কৃত শিখছেন। প্রত্নতত্ত্বেও তাঁদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হচ্ছে। ভারতের ইতিহাস আলোচনায় তাঁরা মগ্ন হয়ে থাকতে চান অনেকেই। এটা শুভলক্ষণ। প্রাচীনে-নবীনে সংযোগ রাখা কর্তব্য, আর এ কর্তব্য পালনে আনন্দও প্রচুর। (ক্রমশ)

'যতক্ষণ না কারেন্ট আসে অপেক্ষা করতে হবে।' বললে সুকান্ত।

'আর যদি অন্য কোনো গোলমাল হয়?' কাকলির মুখ আতঙ্কে প্রায় সাদা।

'যতক্ষণ মিস্ত্রি না আসে—'

'বলেন কি। ততক্ষণ ঝুলব ত্রিশঙ্কুর মত?' কাঠ-কাঠ গলায় বললে কাকলি।

'কিন্তু নিঃশঙ্ক হয়ে।' যেন খুব একটা আনন্দের ব্যাপার, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আগাপাশতলা মুখস্থ জানা উত্তর—এমনি উৎসাহ সুকান্তর ভঙ্গিতে।

'নিঃশঙ্ক হয়ে?' ভিতরে-ভিতরে মৃদু-মৃদু কাঁপছে যেন কাকলিঃ 'বলতে চান কোনো ভয় নেই?'

'না, কিসের ভয়?' যেন এক পা এগিয়ে এল সুকান্তঃ 'আমিই তো আছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝি লিফটম্যানকে। মানে লিফটম্যান যদি অশোভন কোনো আচরণ করে তবে প্রতিকর্তা স্বয়ং সুকান্ত। যেন সুকান্তের থেকে কোনো ভয় নেই। সে যেন বনে বাঘ নয়, ঘরে কালসাপ নয়। সে এক দেবশিশু।

আর, সত্যি, লিফটম্যানের ব্যবহারকেও বলিহারি। কলকব্জা যদি কোথাও খারাপ হয়ে থাকে, তবে হাতের যন্ত্রপাতি নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করবে তো, বুঝুক বা না বুঝুক, কোথাও করবে তো একটু তদন্ত-তদারক। তা নয়, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনড় পুতুলের মত। লক্ষ্য নিজের দিকে নয়, অন্য দুই আরোহীর দিকে।

চেঁচাবে? শুনতে পাবে কেউ? শুনলেই বা উদ্ধার করবে কে? কে করবে সাহায্যের তোড়জোড়?

ছটফট করতে লাগল কাকলি।

'আপনি অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন?' সুকান্ত বললে, 'বসুন সিটটায়। বিশ্রাম করুন।'

ঝলসে উঠল কাকলিঃ 'এটা এখন বিশ্রাম করবার সময়?'

'উপায় কি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন দু পায়ে?' বললে সুকান্ত। 'পা ধরে গেলে এক সময় বসতে তো হবেই।'

'এখনো ধরেনি।'

'আমার উপরে অকারণ চটছেন। আমি ভালো কথাই বলছি। কখন মেরামত হয়ে লিফট আবার চালু হয় ঠিক নেই। তাই কি এই সিটটায় বসে ঘুমুতেও হতে পারে—'

'ঘুমুব এখানে?' করুণ কান্নার মত করে বললে কাকলি। 'আর আপনি?'

'যদি জায়গা দেন—'

'এখানে জায়গা কোথায়?' কাকলি দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

'জায়গা নেই, জায়গা নেই এই তো এই যুগের হাহাকার।' আরো কিছুটা যেন এগিয়ে এল সুকান্ত। 'সেটা তো স্থানের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকে নয়। কেননা, যদি হৃদয়ে জায়গা থাকে তাহলে ঘরে কেন, খাঁচাতেও জায়গা আছে। ঐ যে কি বলে, যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় ন'জন—সুজন নয় ন জন। কথাটা হয়তো ঠিক তা নয়। কথাটা হচ্ছে, আমি যাব কোথায়? যতই কেননা রাগ করুন, এই মুহূর্তে আমাকে ফেলবারও তো কোনো জায়গা নেই। সুতরাং—'

আরো কি এক চুল এগিয়ে এল নাকি সুকান্ত? আপনার শাড়ির উপর এ কি একটা ছারপোকা না ডেঁয়ো পিঁপড়ে এই অছিলায় গায়ে হঠাৎ হাত দিয়ে ফেলবে

নাকি? কাকলি আরো কুঁকড়ে গেল, শিটিয়ে গেল।

'সুতরাং আসুন সিটটায় বসি।' সুকান্ত সরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল।

'আপনিও বসবেন?'

'বাধা কি। এটা তো আর ট্রাম বাস্-এর লেডিজ সিট নয়! এখানে সবাই পাশাপাশি, সবাই সমান-সমান।'

'আপনি বসুন। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।'

'কিন্তু কতক্ষণ থাকবেন!' সুকান্ত দার্শনিক হবার ভান করল, 'মানুষ কখনো কোনো অবস্থায়ই খুশী নয়। কেবলই সে ভোল বদলাচ্ছে, ভঙ্গি বদলাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছেন—দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু বসতে পাব। বসে আছেন—বসে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু পা টান করে শুতে পাব। শুয়ে আছেন শুয়ে আছেন, মনে হবে, আর নয় এবার উঠে পড়ি। উঠে পড়েছেন কি, আবার সেই বসে পড়ার, শুয়ে পড়ার জন্যে কান্না। সুতরাং হবেই কেননা দাঁড়ান দাঁড়িয়ে থাকুন, বসতে ইচ্ছে করলেই আপনার এক সময়, তার যখন বসলেনই শেষ পর্যন্ত—'

'তখন কোন না শুয়ে পড়েন!' কাকলির রাগের সবটা কৌতুকের মত শোনাল।

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' একটুকুও কি বিচলিত হবে না সুকান্ত? 'কেন নয় না কে বলেছে কে [illegible] এমনি বন্দী থাকতে হয় আমাদের।'

'কে বন্দির?'

'তা ছাড়া আবার কি। কিছুই তো [illegible] পাচ্ছি না দেখতে। তবু সবাই যখন অন্ধকারে, নিশ্চল নিঃশব্দে, তখন বন্দী ছাড়া আর কি। [illegible] এক রকম বন্দী। [illegible] না নয়—'

'তা নয়?' চোখ তুলল কাকলি।

'না। আপনি যদি নিশ্চিন্তে শুয়েই পড়েন আমি না হয় এই মেঝেতেই কুণ্ডলী [illegible] নিরীহের মত ঘুমিয়ে থাকব শান্তিতে।'

'ঘুমোবেন? পারবেন ঘুমোতে?'

'দেখুন না পারি কিনা।' হাসতে লাগল সুকান্ত।

'আপনার একটুকু ভয় করছে না?'

'কেন করবে? কিসের ভয়? সঙ্গী যদি ভালো হয় মানে সৎ, কি বলে, সুন্দর হয়, তাহলে ভয় থাকে না। সেই কারণে আপনিও নির্ভয় হতে পারেন হয়তো। পারেন না?'

'কিন্তু আপনি কি সুন্দর?'

'সুন্দর ভাবলেই সুন্দর।' একটু লাজুক হবার ভঙ্গি করল সুকান্ত। 'সুন্দর না হই, সৎ তো বটে। ভালো মানে ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলে নই। ভালো মানে ভালো-বাসার ভালো ছেলে। কিন্তু কথাটা তা নয়—'

'তা নয়?' কাকলির চোখে কে গাঢ় করে কালো রেখা টেনে দিল।

'না। আমি বলছিলাম আপনার বসবার কথা। বলছিলাম, যখন শেষ পর্যন্ত আপনাকে বসতে হবেই, তখন আগে-ভাগেই বসে পড়ুন। আমার দরকারি কথাটা সেরে নিই।'

'দরকারি কথা!' একটু বা চমকাল কাকলি। বললে, 'এই বিপদে কারু আবার দরকারি কথা থাকে নাকি? থাকলেও মনে পড়ে নাকি?'

'পড়ে। কে জানে হয়তো ঐ দরকারি কথার জন্যেই এই বিপদ।' ঢোঁক গিলল সুকান্ত। 'কথাটা আর কিছু নয়, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা ভুলে গেছি—'

'ভুলে গেছেন মানে?' চমকে উঠল কাকলি, 'কোনোদিন জানতেন নাকি?'

'জানতাম।'

'কি করে? কে বললে?'

'কেউ বলেনি।'

'তবে?'

চোখের উপর স্থির চোখ রাখল সুকান্ত, 'আপনিই লিখেছিলেন।'

'আমি?' চোখের পলক ফেলল না কাকলি 'আপনাকে?'

'হ্যাঁ, আমাকেই। আর কাকে!'

লিফটটা ফের চলতে শুরু করল নাকি? যেন একটু দুলে উঠেছিল, নিজেকে সামলাল কাকলি। দেখল লিফটের নয়, হৃৎপিণ্ডের দোলা।

'কী লিখেছিলাম? চিঠি?'

'তা তাকে চিঠি ছাড়া আর কি বলে?'

'বা, আমি আপনার ঠিকানা জানলাম কি করে?' কাকলি প্রায় ঝংকার দিয়ে উঠল।

'সে চিঠি আমার বাড়িতে পোস্টে পাঠাননি। তাই আমার বাড়ির ঠিকানা না জানলেও চলে। সেটা আমাকে কলেজেই পৌঁছে দিয়েছেন এবং বেয়ারা মারফত। কি মনে পড়ে?'

খুব একটা নির্দোষ ব্যাপার, যেন হালকা হাওয়ার ঢেউ তুলে কাকলি বললে, 'কলেজ সেমিনারে কোনো বক্তৃতা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে অনুরোধ। মনে পড়েছে। কি তাই না?'

'হ্যাঁ তাই।' গর্বের নিশ্বাস ফেলে সুকান্ত বললে, 'আমাদের গলিতে থাকেন এক বিখ্যাত সাহিত্যিক, তাঁকে সেমিনারে ধরে নিয়ে এসে কিছু বলাবার জন্যে প্রার্থনা—'

'প্রার্থনা!' বাক্যের নির্বাচনে আপত্তি কাকলির।

'নয়তো বলুন আদেশ। আপনি যখন সেমিনারের সেক্রেটারি তখন আপনার বলাই হুকুম করা। কিন্তু' একটু কান চুলকোল সুকান্ত, 'কোথাও একটু মিনতিও হয়তো ছিল। নচেৎ, কোনো দরকার নেই, ঐ চিরকুট চিঠিতে ফলাও করে আপনি আপনার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন কেন?'

'দিয়েছিলাম বুঝি?' চোখের কোলের কাছটিতে লজ্জার রেখা ফোটাল কাকলি। 'ওটা কেমন হাতের টানে অভ্যেসের বশে এসে গিয়েছিল।'

'তাই হবে। কিন্তু কী বিচ্ছিরি ঠিকানা। বাড়ির নম্বর নয়তো ধারাপাতের অংক। ধারাপাতের অংক বলা ভুল হল, কেননা তাতে একটা শৃংখলা থাকে। আপনাদের নম্বরটা তো অংক নয়, আতংক। কোনো ছিরিছাঁদ বা নিয়মকানুন নেই। তিনশো তিয়াত্তর না ছ শো সাতাত্তরের সতেরো, তার আবার বাই—সাতাশ না সাতাশি। কখনো এমন বিদঘুটে নম্বর হয় শুনেছেন?' মুখচোখ গম্ভীর করল সুকান্ত। 'সতেরোর সাতাশ না সাতাশের সতেরো এই ঠিক করতেই প্রাণান্ত। তারপর ঐ তিনশো তিয়াত্তর আচ্ছা, বলুন, অমন কখনো নম্বর হয়?'

এত বিপদেও মানুষে হাসে! দিব্যি হাসি বেরুল কাকলির। বললে, 'মোটেই তিন শো তিয়াত্তর নয়।'

'নয়! তবেই দেখুন কি রকম অসম্ভব গোলমেলে ব্যাপার, কারু সাধ্য আছে তা মনে রাখে?'

'মনে রাখবার কী দরকার! চিরকুটটা দেখে নিলেই পারেন।'

'চিরকুট বললে আপনার লেগেছে বুঝি। চিরকুট বলুন বা চোটপাট বলুন, লিপিটা হারিয়ে গেছে।' মুখ অপরাধের মতো করল সুকান্ত। 'আমার সব জিনিস খালি হারায়।'

'তাই দেখছি। স্মৃতিশক্তি ধৃতিশক্তি দুইই।' মুখ টিপে একটু হাসল কাকলি।

'ধৃতি শক্তি মানে?'

'ধরে রাখবার শক্তি। না পারলেন ঠিকানাটা মনে রাখতে, না বা চিরকুটটা ধরে রাখতে। অতএব আপনাকে ঠিকানা দিয়ে লাভ কি।'

'আর না দিলেই বা ক্ষতি কি।' নৈরাশ্যে মুখ বক্র করল সুকান্ত, 'কে জানে এই পিঞ্জরই হয়তো আমাদের শেষ ঠিকানা।'

'তাই যদি হবে। এই পিঞ্জরই যদি আমার শেষ বাড়ি, বেশ সরল হতে পারত। কাকলি, তবে ঘটা করে প্রাক্তন বাড়ির খোঁজ করছিলেন কেন?'

'বুঝতে পারছি, অনর্থক করছিলুম। সুতরাং' সুকান্ত সিটের দিকে ইঙ্গিত করল, 'আসুন, হতাশ হয়ে বসে পড়ি।'

'না, হতাশ হবার তো কিছু দেখছি না।' সহসা নির্ভয়ে বলতে পারল কাকলি, 'খাঁচার বাইরে কোথাও এক আকাশ আছে। সমস্ত জনতার মধ্যেও আছে এক নির্জনতা।'

এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে নাকি কেউ? কাকলির চোখের মধ্যে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

এপস্টাইন

চিন্তামণি কর
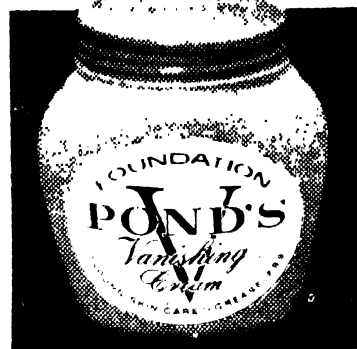
গত ১৯শে আগস্ট বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর স্যার জেকব এপস্টাইন-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর [illegible] পড়ে যাওয়া স্তরের যা তাঁকে উদ্বেলিত করে ছিল, শিল্পের সেই নবরূপের গঠনে ও ব্যাখ্যায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। রোজকার মত সারাদিনের কাজ সেরে রাত্রে নিদ্রায় এই মহান শিল্পী মহাঘুমে বিদায়ী হলেন মরজগত থেকে চিরকালের ছুটি নিয়ে।

ভবিষ্যতে বিংশ শতাব্দী যখন অতীতের খাতায় জমা পড়ে যাবে, তখন এই সময়ের যে কয়টি মহামানবের স্মৃতি মানব সংস্কৃতিতে অবিনশ্বর দানের জন্য ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, তাঁদের পংক্তিতে দেখা যাবে এ যুগের তিনটি সেরা ভাস্করকে— মাইয়ল, ব্রাংকুসি ও এপস্টাইন। মাইয়ল বিগত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হল, ব্রাংকুসি মারা গিয়েছেন এখনো বছর পূর্ণ হয়নি আর এপস্টাইনকে হারালাম এই সেদিন। এঁরা সকলেই কিন্তু বেঁচে রইলেন তাঁদের রেখে-যাওয়া শিল্প-সম্ভারের মধ্যে। এঁদের শিল্পকর্মগুলি পৃথিবীর মিউজিয়মে এখনও বিস্ময়ের নিদর্শন।

গ্রীক [illegible] সাথে রেখে ইউরোপীয় শিল্পীরা শতাব্দীর পর শতাব্দীর যে জীবনের শিল্পরূপকে তার রূপকল্প ও কল্পনায় ছাপ রেখে গিয়েছেন, সেই প্রথার এক অন্তর্পূর্ব [illegible] ভাস্কর মাইয়লের রচনায় মূর্ত হয়েছে। ব্রাংকুসি [illegible] এর পাশে বস্তুর আকৃতি ও গঠনের সারাংশ ও মর্ম-স্বরূপকে প্রকাশ করতে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতার আকারগুলির সৃষ্টি করেছেন, তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বর্তমানের আলংকারিক মূর্তিশিল্প। তাই তাঁকে বলা হয় [illegible] বস্তুনিরপেক্ষ ও [illegible] আধুনিক ভাস্কর্যের জনক।

এপস্টাইন-এর ভাস্কর্য কেবল নিছক সুনিপুণ ও জীবন্ত রূপ-প্রতিকৃতি নয়। এগুলি তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুট বিকাশ এবং এই রচনাগুলি থেকে যেন শুনতে পাওয়া যায় তাঁর মুখর বাণী। ১৮৮০র নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কের এক শহরাঞ্চলে রুশ-পোলিশ ইহুদী পরিবারে এপস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের বাসস্থান হেস্টার স্ট্রীট ছিল রুশ, পোল, গ্রীক, ইতালিয়ান, চীনা ও অন্যান্য জাতির সদা জনতাবহুল এক কেন্দ্র, তথা হট্টগোলভরা প্রাচ্যের একটি শহর। এপস্টাইন এর মূর্তিশিল্পে যে প্রাচ্যভাব-ময় বিশ্বজনীন রূপ দেখা যায় তার উৎসকে খুঁজতে গেলে পৌঁছাতে হয় তাঁর বাল্যের বাসস্থান হেস্টার স্ট্রীটে।

শিল্পী এপস্টাইনকে বহু প্রখ্যাত শিল্পীর মত দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করতে হয়নি। প্রথমত তাঁর পিতামাতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, তারপর তাঁর শিল্পের দ্বারা অর্থাগমের সম্ভাবনাও শুরু হয়েছিল তাড়াতাড়ি। কিন্তু সর্বজনসম্মত-ভাবে তাঁর শিল্পের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা হয়নি সেই মত সহজে। বরং তাঁর প্রতিটি প্রধান রচনা শেষ হলে তার মর্ম না বোঝায় বহুজন বর্ষণ করেছিল নানা অপবাদ ও গঞ্জনা।

১৯০২এ তিনি প্যারিসে এসে একোল-দে-বোজার-এর বিখ্যাত শিল্প শিক্ষায়তনে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর চালচলন ও কর্মপ্রণালীর সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয় ছাত্র ও শিক্ষকদের [illegible]
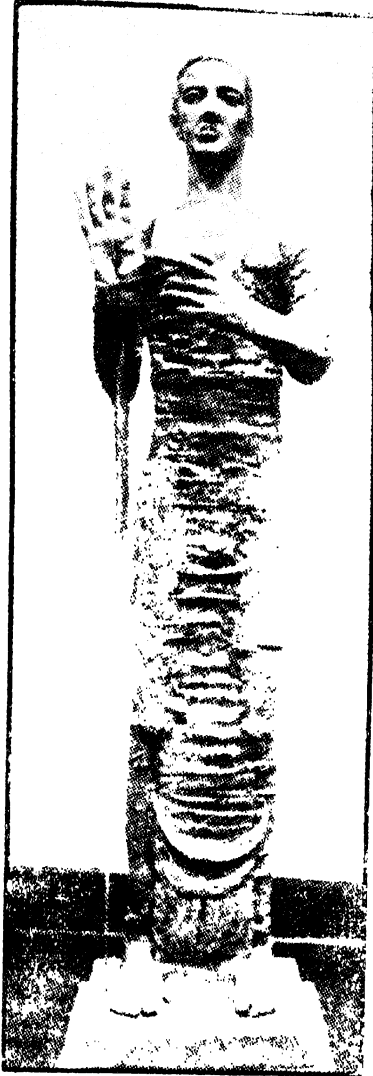
আইনস্টাইন

যীশু খৃষ্ট

আগেও ছিল। এদেশের দুজন মনীষী কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ছিল। কিন্তু এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংস্কারে প্রভাবান্বিত হওয়ায় তিনি এঁদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেছিলেন বহুকাল। ১৯৪০ সালে লেখা তাঁর আত্মকাহিনী 'লেট দেয়ার বি স্কালপচার' বইটিতে এই জন্য কবির প্রতি কিছুটা বক্রোক্তি রয়ে গিয়েছে। কথোপকথনে একদিন যখন তাঁর এঁদের সম্বন্ধে ধারণাকে পরিস্ফুটভাবে জানলাম এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম তাঁদের তিনি কত ভুল বুঝেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ভ্রম স্বীকার করে বলেছিলেন, 'কোন দেশ, জাতি বা মানুষের সম্বন্ধে সহসা একটা বিচার করা খুবই অনুচিত। জাতিগতভাবে যদিও আমি প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমার জন্ম ও পরিবর্ধনে পাশ্চাত্যের প্রভাবই আমাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে। ভারতকে প্রকৃতভাবে জানতে হলে আমার উচিত ছিল সেদেশে গিয়ে কিছুকাল বসবাস করা। আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার ধারণায় কিছু ত্রুটি থাকলেও মূলত তোমাদের সংস্কৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গভীর, তোমাদের শিল্প ও ভাস্কর্যকে আমি সমাদর ও সম্মান করি এবং জাতি হিসাবে তোমাদের আমি সর্বান্তঃকরণে ভালবাসি।'

তাঁর পরিচিত সকলেই জানতেন, এগুলি তাঁর মৌখিক বাক্য ছিল না। আন্তরিকতায় বই পড়ে শিল্প নিদর্শন দেখে আমাদের দেশ সম্বন্ধে বিদেশীরা যতখানি ভারতকে চিনতে পারেন, সে পরিচয় তিনি জানতেন। তাঁর বহু ভাস্কর্যে ভারতীয় আদর্শের অনুকৃতি প্রমাণ দেয় এদেশের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল কত প্রগাঢ়।

এপস্টাইন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, ব্যবহারে ও কর্মে ছিলেন বিশ্বের শিল্পী তাই সকল দেশে সকল জাতির শিল্পানুরাগে বেঁচে থাকবে তাঁর সত্তা চিরন্তনীভাবে।

'চিরন্তন মানব' ও এপস্টাইন

তিন দিন তিন রাত্রি

* * * নরেন্দ্রনাথ মিত্র * * *

১১

ঘর থেকে নামলেই ডানদিকে একটা খোলা গ্যারেজ। বিকল বিগড়ে যাওয়া বাসগুলি এখানে এসে দাঁড়ায়। তাদের ধোয়া মোছা সেরামত চলে। এখন বাস একটাও নেই কিন্তু জায়গাটা জলে কাদায় একাকার হয়ে আছে। শহরতলীর এই অঞ্চলটা ভারি নোংরা। সামনে বস্তি, পিছনে বস্তি, পান বিড়ি, সোডা লেমনেডের দোকান। ফুটপাতের ওপর শাক সব্জী, আনাজ, তরকারির বেসাতি বসেছে।

কিন্তু আরও দু'পা এগোতেই সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়ল মাধুরীর। রোদে বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবার জন্যে ওপরে যে শেডটা রয়েছে তার ঠিক সামনেই অসীম দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যই বটে, অসীম একাই এক দৃশ্য। আশেপাশে কি পিছনে যারা আছে তাদের মধ্যে ওর দিকেই আগে চোখ পড়ে। সে চোখ সরে আসতে চায় না।

চোখে চোখ পড়তে অসীম হাসল।

রাস্তা পার হয়ে মাধুরী ওর পাশে এসে দাঁড়াল, মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি যাওনি।'

অসীম বলল, 'গেলাম আর কই। বাসটায় বড় ভিড় ছিল। আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল। এখন দেখছি তাতে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি।'

'আহা, লাভ আবার কিসের।'

অসীম একথার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল।

মাধুরী এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ এই অঞ্চলটার চেহারা যেন বদলে গেছে। নাকি দৃশ্যপট ঠিকই আছে বদল হয়েছে দৃষ্টির। সেই দৃষ্টিই যেন তুলি হয়ে নতুন রং বুলিয়ে চলেছে। গ্যারেজ, বস্তির বাড়িগুলি, তুচ্ছ অপরিচ্ছন্ন দোকান-পাটেও যেন স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে। ওই যে একটা দোকানে বালতি আর নারকেলের দড়িগুলি জড়ো হয়ে রয়েছে তারও যেন শোভার শেষ নেই। মোড়ের রোদে পোড়া পাতামোড়া নাম-না-জানা গাছটাও যেন নতুন রূপে, নতুন অস্তিত্ব নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

শ্যামবাজারগামী আর একটা বাস এসে স্টপে দাঁড়াল। যাত্রীরা নামতে না নামতেই বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা উদগ্র আগ্রহে এগিয়ে গেল।

অসীম মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'চল।'

মাধুরী বলল, 'ওমা আমি এ বাসে কোথায় যাব। ও বাসে উঠলে আমি আড্ডায় গিয়ে পৌঁছব। সে পৌঁছনোটা পৌঁছানোই নয়।'

অসীম বলল, 'নাই বা পৌঁছোলে। একদিন না হয় পথে পথেই রইলে।'

মাধুরী একথার জবাব না দিয়ে বলল, 'গেল তো বাসটা চলে। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিত্ব কর। আমি যাই। কাল মিছিমিছি স্কুলটা কামাই হয়ে গেল, আজ হাজির না হলে চলবে না। দুজন টিচার ছুটিতে আছে।'

অসীম বলল, 'আচ্ছা চল, আমিই তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। আমার তো আর লেট হবার ভয় নেই। হাজিরা দেবারও গরজ নেই।'

মাধুরী হাসল, 'একেবারেই নেই? কোথাও নেই?'

বাঁ দিকের ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে মোড় ঘুরে কয়েক পা যেতেই আর একটি বাস স্টপ। এই বিরামস্থলে আপাতত আর কোন অপেক্ষমান যাত্রী নেই। শুধু অসীমই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুরী কথা না বলে তার দিকে না তাকিয়ে তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে লাগল।

রাস্তার ওপারের দক্ষিণ দিকে সারি সারি দোকান। তার পিছনে বেলগাছিয়ার বিস্তীর্ণ বস্তি অঞ্চল। মাধুরী অন্যদিন এসব দিকে তাকায় না। বাসটা কখন আসবে শুধু সেই প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু আজ চারদিকের আশেপাশের জগৎ যেন হঠাৎ অস্তিত্বময় হয়ে উঠেছে। লোকজন যানবাহন খুঁটিনাটি যেন এক নতুন অর্থ গৌরব বহন করে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই যে মাংসের দোকানটিতে চামড়া ছাড়ানো একটি পাঁঠাকে দড়ি বেঁধে

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর খোলা গায়ে লুঙ্গিপরা একটি লোক সেই জন্তুটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারালো ছুরিতে কেটে কেটে খদ্দরদের কাছে বিক্রি করছে এই দৃশ্যও চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার মত নয়, চোখ মেলে দেখবার মত। জন্তুটির মসৃণ ওই ত্বকের রং এই মুহূর্তে দেখতে অদ্ভুত লাগছে মাধুরীর। অঙ্গহীন শ্রীহীন ওই জন্তুটি সেই রঙে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কুশ্রীতা, নিষ্ঠুরতা দৃশ্যটি থেকে ঝরে পড়ে গেছে। কিংবা এ যেন আসল দৃশ্য নয়, আসল পৃথিবী নয়, শিল্পীর হাতের আঁকা এক ছবির পৃথিবী। পরম নিষ্ঠুরতার ছবিও শিল্পী পরম মমতায় এঁকে চলেছেন। পরম বিরূপতাকেও শিল্পী রঙে আর রূপে উদ্ভাসিত করে তুলছেন। যাতে কোন শ্রী নেই, যা স্থূল তাতেও লাগিয়েছেন অনুরাগের রঙ।

দেখতে দেখতে আর একটা বাস এসে পড়ল। নাইনটিওয়ান বেশ ভালো নম্বর। বাসের গায়ে নতুন করে সবুজ রঙ লাগানো হয়েছে। সবুজ রঙটাই বেশ সব চেয়ে মানানসই।

মাধুরী অসীমের দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তাহলে যাই এবার। বেশ দেরি হয়ে গেল। বেলাটা বাকে আর রাখবেন না।'

ফুটবোর্ড থেকে ভিতরে যেতে-না-যেতেই মনে হল পিছন থেকে কে যেন হুড়মুড় করে উঠে পড়েছে। একটু বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরাতেই সে বিরাগ মাধুরীর বিস্ময়ে আর আনন্দে ঢেকে গেল।

'তুমি!'

অসীম বলল, 'এগিয়ে চল। একেবারে সামনের বেঞ্চটা খালি আছে।'

পিছন থেকে একজন যাত্রী মন্তব্য করল, 'মশাই দেখে শুনে উঠতে হয়। মেয়েছেলের গায়ের ওপর! ছি ছি ছি।'

তার পাশের লোকটি হেসে বলল, 'আরে বুঝতে পারছেন না। নিজের মেয়েছেলে।'

'হলোই বা নিজের মেয়েছেলে। তাই বলে পথঘাটে বিচার নেই!'

মন্তব্যগুলি শুনি না শুনি না করে মাধুরী সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বাঁ দিকের সীটটি খালি রয়েছে। মাধুরী জানালার ধারে ঘেঁষে বসল। অসীম যাতে আসনের আধখানারও বেশি জায়গা পায় আর খানিকটা ফাঁক রেখে বসতে পারে অসীম পাশে এসে বসল।

মাধুরী মৃদুস্বরে বলল, 'এসব বাসে ওঠ যায় না। এমন বিশ্রী সব—।'

অসীম কৈফিয়তের সুরে বলল, 'উঠব কি উঠব না মনস্থির করতে একটু সময় নিল। আর একটু হলে বাসটা মিস করতাম তাই তাড়াতাড়ি—'

মাধুরী কোন জবাব দিল না। তার

বুঝতে বাকি নেই অসীম সব মিথ্যে কথা বলছে! সব এখন বানিয়ে বানিয়ে বলছে সে। ওর কয়েক মিনিট আগে বেরিয়ে আসা, বাস স্টপে দেরি করা, মাধুরীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে পিছনে পিছনে আসা, শেষ পর্যন্ত এই বাসে উঠে পাশে এসে আসন নেওয়া, কোনটাই আকস্মিক নয়, সবই অসীম আগে থেকে ভেবে রেখেছে। এখানকার অনেক কথাই ওর বানানো। কিন্তু একটি কথা সত্য। মাধুরীর সান্নিধ্য তার সাহচর্য যে অসীম কামনা করছে তার মধ্যে কোন অসত্য কিছু নেই। কিন্তু কেন? তাতে অসীমের লাভ কি?

অসীম বলল, 'আমার সহযাত্রীরা যেভাবে সমালোচনা শুরু করেছিল তাতে আশঙ্কা হয়েছিল, ওদের হাতে প্রাণটাই বুঝি যায়। কিন্তু যেত না। তুমি বাঁচিয়ে দিতে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আমি কী করে তোমাকে বাঁচাতাম?'

অসীম বলল, 'ওদের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে, শোন ভাইসব বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'

মাধুরী স্তব্ধ হয়ে রইল। যদিও কথাটা তামাশা ছাড়া কিছু নয় আর এধরনের ঠাট্টা তামাশা করবার অধিকার অসীমের আছেও তবু মুহূর্তের জন্যে মাধুরীর যেন রক্ত-স্রোত বন্ধ হয়ে গেল। তারা অবশ্য খুবই আস্তে আস্তে কথা বলছে। তবু যদি কারো কানে যায় কী ভাববে। তা ছাড়া অসীম তো কোনদিন এমন উচ্ছলতার পরিচয় দেয়নি। আজ তার কী হল। এমন মত্ততা তার এলো কিসে।

তার এই ব্যবহার, এই চাঞ্চল্য, চাপল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া মাধুরীর মোটেই উচিত নয়। ধমকে না দিক একটু নিস্পৃহ থেকে তার আপত্তিটা ওকে বুঝতে দেওয়া উচিত। কিন্তু ওকে আঘাত না দিয়ে অসন্তুষ্ট না করে কিভাবে যে তা বলা যায় মাধুরী খুঁজে পেল না।

ভেটিবিনারী কলেজের পাশ দিয়ে বাসটা এগিয়ে চলল। পুকুর আর গাছপালায় ভরা কলেজটাকে মনে হয় যেন বাগানবাড়ি। বেড়াবার রাস্তা আছে। বসে থাকবার মত সিঁড়ির অভাব নেই। কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে বইখাতা হাতে হাসতে হাসতে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। হঠাৎ মাধুরীর মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই অসীমের পরিহাস। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। পরিহাসকে আরো জোরালো পরিহাস দিয়েই উড়িয়ে দিতে হয়। না হলে তা আরো ভারি হয়ে মনের ওপর চেপে বসে। যার মূল নেই সেও ডালপালা ছড়িয়ে চারদিকে আঁধার করে রাখে।

কণ্ডাক্টর এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

অসীম ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের করে মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাকার টিকিট কাটব?'

মাধুরী বলল, 'বীরনগর। কিন্তু তুমি কবরে কেন, আমি নিচ্ছি।'

অসীম বলল, 'আমার কাছ থেকে তুমি তো কিছুই আর নেবে না। বাসের টিকিটখানা অন্তত নাও।'

কণ্ডাক্টর একবার হেঁকে উঠল দত্তবাগান। বাসটা সেখানে দাঁড়াল।

অসীম বলল, 'দুটো স্টপ এগিয়ে দিলাম তোমাকে। এবার নেমে যাব নাকি?'

মাধুরী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নেমেই যদি যাবে বেশি দামের টিকিট করলে কেন।'

অসীম হেসে বলল, 'তাহলে টিকিটটা নষ্ট করে লাভ নেই কি বল।'

মাধুরী ভাবল পরিহাসের প্রতিযোগিতায় তার আর একবার হার হল। বললেই হত 'হ্যাঁ নেমে যাও, তোমার জরুরী কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তাহলেই কি অসীম নামত? নিশ্চয়ই নামত না। বেশ জব্দ হত। নামতে ও পারত

না, উঠতেও পারত না। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হবার সুযোগটা মাধুরী হেলায় হারাল।

স্টপ ছেড়ে বাসটা আবার চলতে শুরু করেছে। দোকান পাট বাজার। এক ভদ্রলোক দোকান থেকে বরফ কিনে রঙীন রুমাল দিয়ে বেঁধে চলছেন। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে একটি মেয়ে কলসীতে জল ভরতে শুরু করেছে। চলন্ত বাসের জানলায় জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবি। জোড়া যায় কি? জুড়লে কি কোন মানে দাঁড়ায়? সংগতি আর সামঞ্জস্য থাকে? না থাকুক। দেখতে বড় ভালো লাগছে মাধুরীর। রোজই তো এসব দেখতে দেখতে যায়। কিন্তু ঠিক যেন দেখার মত করে দেখা হয় না। চোখ থাকে কিন্তু দৃষ্টি থাকে না। তা ছাড়া প্রায়ই একখানা করে নভেল কি গল্পের বই নিয়ে আসে মাধুরী। বাসে যাতায়াতের পথে পড়ে। দুদিকের দোকান-পাট বাড়িঘর গাছপালা চোখেই পড়ে না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে বইয়ের অক্ষরের চেয়ে নারকেল গাছগুলির সবুজ পাতার ঝিলিমিলি কম উপভোগ্য নয়। বাতাসের মৃদু আন্দোলনে পাতায় পাতায় যে জীবনলীলা নিত্য নিঃশব্দে হয়ে চলেছে মাঝে মাঝে তাও পড়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

'মাধুরী, তুমি কি রাগ করেছ?'

অসীমের কথা শুনে মাধুরী ফিরে তাকাল, [illegible] রাগ করব কেন [illegible]

অসীম বলল, 'তা নয় তো কি। এতক্ষণ কথা বলছি অথচ তুমি বাইরের দিকে চেয়ে আছ [illegible] নারকেল গাছগুলির [illegible] হয়ে [illegible] সঙ্গে [illegible] আমার [illegible]'

মাধুরী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তাই বটে। আমার জন্যে তুমি লড়াই করলে তোমাকে গাছের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে।'

অসীম বলল, '[illegible] লোকে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু আমার [illegible] আর তা নয়। [illegible] নিশ্চয়ই—'

বলতে বলতে মাধুরী থেমে গেল। ছি ছি। কী একথা কখনই না বলতে যাচ্ছিল। পরিহাস ছলেও এ কথা বলা চলে না। মনের কোণে আনা চলে না। মানসী তার নিজের বোন। শুধু বোন নয়, বোন, বন্ধু সব। মানসী তার দ্বিতীয় সত্তা। কিন্তু আশ্চর্য, মানসী এতক্ষণ কোথায় ছিল। পাশে নয়, ধারে কাছে কোথাও নয়, এমনকি মনের দূরতম প্রদেশেও তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। যেমন এই বাসভর্তি লোক থেকেও মাধুরীর কাছে তারা শুধু ছায়া হয়ে আছে মানসীর সেই ছায়াময় অস্তিত্বও এতক্ষণ ছিল না। মাধুরীর একান্ত যে আপন সেও তার জগৎ থেকে, জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে মুছে গিয়েছিল। ছি ছি ছি, কী করে এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হল! পরম লজ্জার মধ্যে, বেদনার মধ্যে মাধুরীর অনুভবের মানসী পুনর্জন্ম নিল। তার করুণ বিষণ্ণ মুখখানা মাধুরীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মানসীর দুটি চোখে যেন ঈষৎ ঈর্ষা আর তিরস্কারের আভাস। না মাধুরী দিদি হয়ে তাকে ঠকাতে পারবে না, কিছুতেই না।

একটু চুপ করে থেকে অসীম মাধুরীর কথার জের টেনে হেসে বলল, 'তা ঠিক। আমার জন্যে যাদের সঙ্গে তোমার প্রতিযোগিতায় নামতে হবে তারা সবাই লতা নয়। দেবী দানবী মানবী সংখ্যায় অনেক হবে।'

মাধুরী হেসে বলতে গেল, 'তাদের মধ্যে আদিবাসিনীরাও দু চারজন আছেন নিশ্চয়ই।' কিন্তু হাসি আর কথা দুই-ই অস্ফুট হয়ে রইল।

দুটি রেল ব্রীজের তলা দিয়ে পাতিপুকুরের উঠে যাওয়া রেল স্টেশন ছাড়িয়ে বাস এগিয়ে চলল। ড্রাইভার কি নতুন? বড় ঝাঁকুনি দিতে দিতে বাস চালাচ্ছে। এত ঝাঁকুনিতে পাশাপাশি বসে যেতে বড় অসুবিধে হয়। বারবার এমন মেশামেশি হলে কেমন যেন লজ্জা করে। অথচ বলাও যায় না 'একটু সরে বোসো।' তাতে আরো লজ্জা। কোথায় বা সরে বসবে। অসীম যথেষ্ট ফাঁক রেখেই বসেছে। তবু যে বারবার। তারজন্যে দোষ ড্রাইভারের।

মাধুরী বলল, 'তোমার বোধ হয় দেরি হয়ে গেল।'

অসীম বলল, 'কিসের দেরি।'

'ও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না?'

অসীম বলল, 'ও মানে?'

মাধুরী হেসে বলল, 'আহা এখন একেবারে নাম সুদ্ধই ভুলে গেলে। ও মানে বেলভেডিয়ারে যিনি চাকরি করতে গেছেন তিনি। শুধু ও নন এ ঐ ও ঔ। একেবারে পুরো একটি স্বরবর্ণমালা।'

অসীম বলল, 'আর তুমি বুঝি ব্যঞ্জনবর্ণের রত্নহার?'

মাধুরী ভ্রূকুটি করে বলল, 'বাজে কথা রাখো। সত্যি, তুমি কি মানসীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করোনি?'

অসীম বলল, 'না তো। তার সময় কোথায়। অফিসে আজ সে দারুণ ব্যস্ত।'

আমিও তাই। এলামই যখন, কর্তাদের সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করে যাই। দেখি, লালদিঘির চারদিকেই সাতপাক দিই, না কি নেমেই সাঁতারকাটি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমার কেবল কথার বাহার। কথা দিয়ে যদি রাজ্য গড়া যেত তুমি তা পারতে। কিন্তু এদিকে কোথায় যাচ্ছ? এদিকে তো লালদিঘি নেই।'

অসীম মাধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'লালদিঘি নাই-বা হল, একজোড়া কালো দিঘি তো দেখতে পাচ্ছি। শান্ত, স্বচ্ছ, অতল গভীর।'

মাধুরী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। এসব কথার মানে কি? অসীমের এসব কথার মানে কি? তার কৌতুকের কি কোন সীমা নেই। সীমা নেই নিষ্ঠুরতার? তার চোখ তেমন বড় নয় সুন্দর নয়, তাই বলে অত ঠাট্টা। কিন্তু ওর কথার ভঙ্গিতে চোখের দৃষ্টিতে তো সবই পরিহাস বলে মনে হয় না। তবে এ কী।

একটু বাদে মাধুরী বলল, 'এক জোড়া কেন, আমার সঙ্গে বীরনগরে চল, তোমাকে চারটে দিঘি দেখাতে পারব। একটা ট্যাংক একেবারে আমাদের স্কুলের সামনে। ছোট
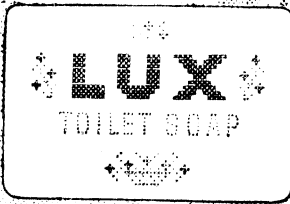
না, মাধুরী আজ তোমার স্কুল থাক। চল বাস যতদূর যায় আমরাও তত দূর যাই। বলতে তো পারলে না চল চোখ যতদূর যায় আমরাও ততদূর যাই।'

কি রকম চকচক করছে অসীমের চোখ। লাগবে আর মাধুরীর সঙ্গে? সারাটা পথ ছিল অসীমের দখলে। মুহূর্তে মাধুরী জগৎ কিনে নিয়েছে। এবার পথে বসকে অসীম। মাধুরী ততক্ষণে নিজের স্কুলে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু দেখা গেল অসীম অত সহজে ঘাবড়বার পাত্র নয়। সে মাধুরীর চোখে দুটি উজ্জ্বল চোখ রেখে বলল, 'আমি যা বলতাম, তুমি তাই বললে। তাহলে চল এবার যাওয়া যাক। একটা বাস চলে গেলেও আরো অনেক বাস আসছে। চল তার যে কোন একটায় উঠে পড়ি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'ক্ষেপেছ! বেলাদি তাহলে রক্ষে রাখবেন না।'

অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ কি সুন্দর মেঘ করেছে। এতক্ষণ পালা করে মেঘ আর রোদের খেলা চলছিল। এখন শুধু মেঘ। আজ অন্তত বিকেল পর্যন্ত তোমার বেলাদি ওই মেঘে ঢাকা পড়ে থাকবেন। চল সেই ফাঁকে আমরা খানিকক্ষণ ঘুরে আসি।'

পুব দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে মাধুরীও প্রলুব্ধ হল। রোদ নেই, সূর্যের দেখা নেই মেঘে মেঘে দিগন্ত জোড়া। এ মেঘ এক্ষুনি হয়তো বৃষ্টি ঝরাবে না, কিন্তু মনকে সংগী করে নিয়ে যাবে। বিনা মন নিয়ে বিমনা হয়ে আজ কি ভালো করে ক্লাস নিতে পারবে মাধুরী?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রলোভন জয় করল মাধুরী। অসীমের দিকে চেয়ে বলল, 'আজ থাক। আজ আমার স্কুলে না গেলেই চলবে না।'

অসীম বলল, 'তোমার স্কুলে না গেলে চলবে না, আর একজনের অফিসে না গেলে চলবে না। তোমরা সবাই মিলে বড় কাজের মেয়ে হয়ে উঠেছ আজকাল। মেয়েরা যদি এত কাজ করে তাহলে কথা বলবে কে, কথা শুনবেই বা কে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমার মত পুরুষের উপযুক্ত কথাই বটে। কিন্তু আমি এবার যাই। এখান থেকে স্কুল পাঁচ সাত মিনিটের পথ।' হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাধুরী বলল, 'দশ-বার মিনিট লেট হতে হবে। এর পর যদি বৃষ্টি এসে যায় তাহলেই হয়েছে।'

অসীম বলল, 'চল তোমাদের প্রমীলা রাজ্যের প্রান্ত অবধি যাই। ভয় নেই বর্ডার লাইন ক্রস করব না। তার আগেই চলে আসব।'

মাধুরী বলল, 'ভয় আবার কিসের।'

বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচু নেমে সরু পথ ধরে এগোতে লাগল মাধুরী। খানিক দূরে দেখা যাচ্ছে নব-নগর বস্তিনগর। সারি সারি ছোট ছোট বাড়ি। মাথা উঁচু দোতলা বাড়িও আছে দুটি একটি। ডান দিকে একটা শুকনো ডোবা। একটি ঝাঁপটানো কুলগাছ তার ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন তার সব শূন্যতা ঢেকে রাখতে চাইছে। আর একটু দক্ষিণে ছোট একখানি ঘর। মাটির ভিত টিনের চালা বাখারির বেড়া। কিন্তু ঘরখানি দেখতে বড় সুন্দর। ছোট উঠোনের এক কোণে একটি ঝোপের মত গোটা কয়েক রক্তরঙা ফুল তার আড়াল থেকে মুখ বার করেছে।

অসীম বলল, 'ফুলগুলি তো দেখতে বেশ। কী ফুল ওগুলি।'

মাধুরী বলল, 'নাম জানিনে। বুনো ফুলটুল হবে। কোন গন্ধ নেই।'

অসীম বলল, 'সেই জন্যেই বুঝি নাম জানবার আগ্রহ নেই তোমার? গোটা দুই ফুল তুলে নিয়ে আসব?'

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'না না। আমাদের স্কুলের দপ্তরী নির্মল ওর বাড়ি। আমি টিচার হয়ে দপ্তরীর বাড়ির ফুল চুরি করেছি একথা রটে গেলে জাত থাকবে না। তা ছাড়া অত লোভই বা কেন। ফুল দেখলেই বুঝি তোমাদের ছিঁড়তে ইচ্ছে করে?'

অসীম স্বীকার করে বলল, 'নিশ্চয়ই। ছিঁড়ে এনে বুক পকেটে না রাখা পর্যন্ত মনেই হয় না ও ফুলের কোন সার্থকতা আছে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'কি স্বার্থপর!'

অসীম বলল, 'তোমাদের নির্মলা দপ্তরী তো বেশ শৌখিন বলে মনে হচ্ছে। বাড়িটি বেশ লেপে পুছে ছবির মত করে রেখেছে। বারান্দায় যে ভিজে শাড়িখানা শুকুতে দেয়া হয়েছে তাওতো বেশ রঙীন।'

মাধুরী বলল, 'এতও চোখে পড়ে! ওর মনে যে এত রঙ কোত্থেকে আসে তাই ভাবি। স্বামীর বয়স হয়েছে। কাজকর্ম তেমন করতে পারে না। হাঁপানিতে ভোগে। বলতে গেলে নির্মলাই সংসার চালায়। স্কুলে আর কটা টাকা পায়। টিচারদের বাড়ির কাজকর্ম করে। তাতে কিছু কিছু হয়। কানাঘুষো নির্মলা নাকি ভালোবেসে বিয়ে করেছে। কী দেখে ভালোবাসল ওই জানে। বনমালী দেখতেও যে ভালো তা নয়।'

অসীম হঠাৎ বলল, 'আশ্চর্য! এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। কিন্তু নানা বাজে কথায় তা চাপা পড়ে গেছে। আচ্ছা মাধুরী তুমি কি ভালোবাসার কোন আলাদা মূল্য আছে বলে বিশ্বাস করো? নাকি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিজেদের নিজেদের রূপ গুণ খাটিয়ে কাটিয়ে রসদ জোগাতে হয়? ভালোবাসা কি আলাদা একটি গাছ, না কি নিতান্ত তুচ্ছ এক পরগাছা মাত্র?'

অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল নিশ্চুপ হয়ে রইল মাধুরী। সারাটা পথ ঠাট্টা আর কৌতুক করতে করতে এই গভীর প্রশ্নটিকেই আড়াল করে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে অসীম? এই ভাবনাই কি তার আসল ভাবনা? হতে পারে, অসম্ভব নয়, হতে পারে। মানুষের সারা জীবনের লুকিয়ে রাখা ভাবনা বেদনা হঠাৎ এমনি কোন কোন গভীরতর মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে।

ট্যাংকের পাড় দিয়ে দুজন ভদ্রলোক এদিকে এগিয়ে আসছিলেন। মাধুরী বুঝতে পারল ওঁরা অনেকক্ষণ ধরে তাদের লক্ষ্য করছেন। কী যেন বলাবলি করছেন নিজেদের মধ্যে। মাধুরী সতর্ক হয়ে বলল, 'একথার আলোচনা অনেক দিন হবে। এখন তো আর সময় নেই। বৃষ্টি বোধ হয় এসে পড়ল। তুমি কি বাস স্টপ পর্যন্ত যেতে পারবে? নাকি আমাদের স্কুলে আসবে? ট্যাংকের ওপারেই স্কুল। ওই যে দেখা যাচ্ছে।'

অসীম বলল, 'না আজ ফিরেই যাই।' আর না দাঁড়িয়ে অসীম দ্রুত পায়ে পশ্চিমমুখে হাঁটতে শুরু করল। উল্টো-দিকে মাধুরীও জোরে জোরে হেঁটে চলল। ভদ্রলোক দুজন একটা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন। মাধুরী একবার ভাবল মুখ ফিরিয়ে দেখে অসীম কতদূর গিয়েছে। কিন্তু সাহস হল না যদি চোখোচোখি হয়ে যায়। ভয়ও হল যদি চোখোচোখি না হয়।

(ক্রমশ)

জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তি

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

শান্তিমূলক উদ্দেশ্যে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে পৃথিবীর সব উন্নতিশীল দেশের বিজ্ঞানীরা অস্পানিস্তরের গবেষণা করছেন। সামরিক প্রচেষ্টার তুলনায় বেসামরিক এই উদ্যম একেবারে নগণ্য নয়। জীবনযাত্রার মান উন্নতিকল্পে শক্তির এই নতুন উৎসকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশের যুগপৎ সরকারী এবং বেসরকারী অনুশীলনী বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরই শিল্পজগতে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার করবার প্রচেষ্টা চলেছে—যানবাহন পরিচালনায়। উড়োজাহাজ বা রেলগাড়ি পরিচালনায় এই নতুন উৎসকে কাজে লাগানো ভবিষ্যতে সম্ভব হলেও এখনও পর্যন্ত তার সক্রিয় ব্যবহারে বিজ্ঞানীরা কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান নি। তবে মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন—জাহাজকে পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূরে পাঠানোর জন্য সবরকমের গবেষণা-কাজ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আজ পর্যন্ত সামরিক প্রয়োজনবশতঃ বেশ কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব হলেও ভাসমান জাহাজে এই শক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগ যেমনই কার্যকরী, তেমনই চমকপ্রদ।

যাত্রী ও মালবাহী জাহাজে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে এ কথায় অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তেল অথবা কয়লায় চালিত জাহাজে এখনও এমন অনেক অসুবিধা বর্তমান, যা কেবলমাত্র পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে সম্পূর্ণ দূরীভূত হবার সম্ভাবনা। পালের জাহাজের পর বাষ্প এবং পরে তেলের জাহাজের আত্মপ্রকাশ যেমন সম্ভব হয়েছিল—অদূর ভবিষ্যতে তেমনই পরমাণবিক শক্তি পরিচালিত জাহাজের প্রাধান্য দেখা দেবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য তার আগে যে অপরিসীম ধৈর্য এবং সমষ্টিগত অনুশীলনীর প্রয়োজন, তা গত বছরে "শান্তির উদ্দেশ্যে পরমাণু"—এই নামে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশ্বের সব দেশের বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

যুদ্ধজাহাজ অথবা অন্যান্য সামরিক প্রয়োজনে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে অর্থনৈতিক সাফল্য গৌণ বলে প্রতিপন্ন হলেও ব্যবসায়ী জগতে তাই হয়ে পড়ে মুখ্য বিচার্য বিষয়। এই জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভই যথেষ্ট নয়—অর্থকরী সাফল্যের জন্য গভীর অভিজ্ঞতা অর্জনেরও দরকার। কিন্তু প্রয়োগ ব্যতীত অভিজ্ঞতা লাভের প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের জগতে নিতান্তই হাস্যকর। অথচ এই অনভিজ্ঞতা-হেতু আর্থিক বিষয়ে যে ঝুঁকির সম্ভাবনা বর্তমান, তা গ্রহণ করবার সামর্থ্য জাহাজ কোম্পানী কেন, যে কোন দেশের পক্ষেই কষ্টসাধ্য। সেইজন্য পরমাণবিক শক্তি ব্যবহারে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণবিক শক্তি কমিটি ১৯৬০ সালের মধ্যে উইলকক্স ও ব্যাবকক্ কোম্পানীর সহায়তায় ১০ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২০০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন মাল ও যাত্রীবাহী 'সাভানা' জাহাজ নির্মাণে সচেষ্ট। অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের ৪৪০০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট 'লেনিন' প্রস্তুতির পথে। অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য সামুদ্রিক-ভাবাপন্ন দেশগুলিতে—গ্রেট বৃটেন, জার্মানি, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ড, ইটালী এবং জাপানে জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে রীতিমত গবেষণা চলেছে। এইসব দেশগুলিতে পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে জাহাজ চালনার প্রচেষ্টার দুটি কারণ বর্তমান। গ্রেট বৃটেন, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক কাঠামো আন্ত-

জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিশেষ নির্ভরশীল—অতএব অর্থকরীভাবে এইসব দেশের পক্ষে বাণিজ্য জাহাজ চালনোর প্রয়াস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে জাপান, জার্মানী, সুইডেন্ বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য আধুনিকতম জাহাজ নির্মাণে বিশেষ আগ্রহশীল; সুতরাং ভবিষ্যতে যে কোন-রকম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে এইসব দেশ বদ্ধপরিকর।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনে জাহাজের আয়তন ও গতি ক্রমে বেড়েই চলেছে। গত পনেরো বছর আগেও যখন সাধারণ মালবাহী জাহাজের আয়তন ২০০০০ টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন আজকের দিনের সুপার-ট্যাঙ্কার অর্থাৎ ১০০০০০ টনেরও বেশী তৈলবাহী জাহাজ নৌনির্মাণে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে—একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নতির সঙ্গে দেশ হতে দেশান্তরে আমদানী রপ্তানির কাজ দ্রুত-গতিতে সম্পন্ন করবার জন্য চিন্তার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। উড়োজাহাজের সাহায্যে যাত্রী অথবা দরকারী মালপত্র অল্প সময়ে স্থানান্তরকরণ সম্ভবপর হলেও মানুষের ব্যাপক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে জলপথে আমদানী রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা দূর ভবিষ্যতেও স্বীকার্য। এই কারণে বিশালায়তন জাহাজের দ্রুতগতির জন্য যে শক্তিশালী ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয়, তা নির্মাণে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। নানারকম সুবিধার জন্য ডিসেল্ ইঞ্জিনের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও ১৫ থেকে ২০ হাজার অশ্বশক্তির বেশী ক্ষমতা ডিসেল ইঞ্জিনে উৎপন্ন করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এদিকে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে ইউরেনিয়াম্ কর্তৃক উত্তাপ সৃষ্টির সঙ্গে বিপজ্জনক রশ্মিবিকীরণ হওয়ার জন্য নিরাপত্তার খাতিরে রিয়্যাক্টর অথবা পরমাণবিক চুল্লী ভারী পুরু আবরণীর দ্বারা সংরক্ষিত করার প্রয়োজন হয়। বিশ হাজারের কম অশ্বশক্তির উৎপাদনে এই আবরণী সমগ্র প্ল্যান্টের তুলনায় এতই ভারী হয়ে পড়ে যে, পরমাণবিক শক্তি ব্যবহার অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক কারণবশত প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু ইঞ্জিনের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আবরণীর ওজন বিশেষ পরিবর্তিত না হওয়ার জন্য বিশ হাজারের বেশী অশ্বশক্তি উৎপাদনে সমগ্র ইঞ্জিনের অনুপাতে আবরণীসমূহের ওজন অপেক্ষাকৃত কম হয়। সেইজন্য বিশ হাজারের বেশী অশ্বশক্তি উৎপাদনে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সাফল্যজনক বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

এখন দু-এক কথায় কিভাবে পরমাণবিক শক্তির উৎপাদন হয়, লেখা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রিয়্যাক্টরের মধ্যে ইউরেনিয়ম-এর সাহায্যে সৃষ্ট উত্তাপ গ্যাস বা কোন জলীয় পদার্থের উত্তাপ পরিবর্তন যন্ত্র বা হিট এক্সচেঞ্জারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই হিট এক্সচেঞ্জের সাহায্যে উত্তপ্ত বাষ্প উৎপাদন করা হয়। এখন এই উত্তপ্ত বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন যন্ত্র চালনা করা হয়। কিন্তু রিয়্যাক্টরের তাপ সৃষ্টির সঙ্গে বিপজ্জনক রশ্মি বিকীরণ হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তা সাধনের জন্য রিয়্যাক্টর, উত্তাপ পরিবর্তন যন্ত্র, তাপ পরিবহনকারী গ্যাস অথবা জলীয় বস্তু প্রথমে প্রাথমিক এবং পরে দ্বিতীয় আর একটি উপাদানের আবরণীর মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়।

জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারের চরম সার্থকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হচ্ছে—জ্বালানী সংগ্রহ বাবদ তেল অথবা কয়লায় চালিত জাহাজকে যখন বন্দরে বন্দরে বহু সময় অতিবাহিত করতে হয় তখন পুনর্বার জ্বালানী ব্যতিরেকে পরমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারে। জাহাজ কোম্পানীদের পক্ষে এই সম্ভাবনা যথেষ্ট স্বস্তির কারণ তো বটেই—মেরুপ্রদেশে বরফ কাটার জন্য অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে দূরদেশে জলপথে সংযোগ রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা কি অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচায়ক তা সহজেই অনুমেয়। আমেরিকার মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজ 'সাভানা' অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে বিশেষ কার্যকরী হলেও রাশিয়ার 'লেনিন' জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তি প্রয়োগের সার্থক নিদর্শন, একথা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে না। মেরু-প্রদেশের মধ্য দিয়ে উড়োজাহাজ অথবা
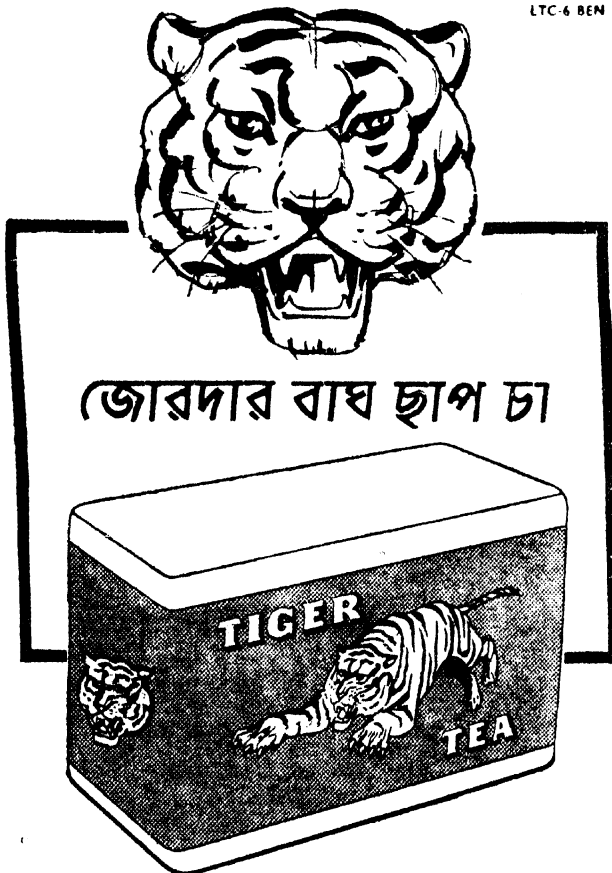
ডুবোজাহাজ চলাচল বৃদ্ধির সংগে সংগে যে কোন দুর্ঘটনায় সাহায্যের জন্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে ঘাঁটি নির্মাণে, মেরুপ্রদেশের খনিজ পদার্থ আহরণে অথবা বর্তমানে কেবলমাত্র গ্রীষ্মের উপযোগী বন্দরগুলিকে সারা বছর ধরে চালু রাখার জন্য হেলিকপ্টারবাহী বরফকাটা জাহাজের প্রয়োজনীয়তায় সকল শীতপ্রধান দেশই সচেতন। বর্তমানে ব্যবহৃত টার্বো ইলেক্ট্রিকচালিত এই সব জাহাজের কার্যকাল মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া কমশক্তি-বিশিষ্ট জাহাজের পক্ষে গভীর বরফের স্তর ভেদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জেনেভার শক্তি সম্মেলনে রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, দুই মিটার গভীর বরফের স্তরের মধ্য দিয়েও 'লেনিন' দুই সাগর মাইল বেগে চলতে সক্ষম হবে এবং পুরো এক বছর ধরে দ্বিতীয়বার জ্বালানী না নিয়ে নিয়মিত কাজ করতে পারবে।

পরমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ নির্মাণে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। (১) নিরাপত্তার ব্যবস্থা, (২) জাহাজের এঞ্জিনের সর্বনিম্ন ওজন, (৩) সাগরে জাহাজ নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা।

জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারে সবরকম দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে যে ধরনের নিরাপত্তার প্রয়োজন, যে সর্ববাদী সম্মত জাহাজের নাবিকগণের নিরাপত্তা ছাড়াও পৃথিবীর সকল বন্দরের স্বার্থে—সকলেই একমত যে, কোন দুর্ঘটনায় বিপজ্জনক রশ্মি-বিকীরণ থেকে সকল রকম নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চমানের ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে লণ্ডনে ১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক 'সাগরে জীবনরক্ষা' (সেফটি অব লাইফ অ্যাট সি) সম্মেলনে বিশ্বের সব দেশের প্রতিনিধিরা আলাপ-আলোচনা করবেন বলে ইতিমধ্যেই স্থির করেছেন।

'সাভানা' এবং 'লেনিন' জাহাজে সবরকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখেছেন। সাভানার রিয়্যাক্টর ৩৫ ফুট ব্যাস এবং ৫০ ফুট উঁচু ইস্পাতের কঠিন আবরণের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এই আবরণী প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৮৬ পাউণ্ড চাপ সহ্য করবে। এই গোলাকৃতি আবরণীর উপরভাগ ৩০ ইঞ্চি গভীর বাটীর কংক্রীট এবং নিম্নভাগ ৫০ ইঞ্চি গভীর সাধারণ কংক্রীটের দ্বারা সুরক্ষিত। এই আবরণী ভেদ করে বছরে মাত্র 5R রশ্মি বিকীরণের সম্ভাবনা—এই অল্প পরিমাণ রশ্মি বিকীরণ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে মোটেই আশঙ্কাজনক নয়। যে কোন রকম ধাক্কাজনিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় এই প্রাথমিক আবরণটি ইস্পাত ও লাল কাঠের দ্বারা তৈরী, দ্বিতীয় আর একটি আবরণীর দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ঘণ্টায় ২০ সাগর মাইল বেগে (২০ নটস) চালিত স্টকহলম এবং আন্দ্রে দোরিয়ার মধ্যে সমকোণে ধাক্কা লাগায় স্টকহলম আন্দ্রে দোরিয়ার পাশে ১৫ ফিট ভেদ করেছিল—এই রকম বড় রকম দুর্ঘটনাতেও সাভানার রিয়্যাক্টর অটুট থাকবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি কোনরকমভাবে সাভানা নিমজ্জিত হয় আবরণীসহ রিয়্যাক্টর অপরিবর্তিত অবস্থায় জলের তলায় অবস্থান করবে। যেখানে জলের গভীরতা কম, সেখানে রিয়্যাক্টরের তাপ বাইরের জলের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হবে—আর গভীর জলের তলায় রিয়্যাক্টরের আবরণী ফেটে যাওয়ার আগে ফ্লাডিং ডিস্কের সাহায্যে আবরণীটি জলপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং জল প্রবেশের দরুণ জ্বালানীর অক্সিডেশন খুবই ধীরে ধীরে সম্ভব।

প্রাথমিক কুলিং সার্কিট ফেটে পড়লে সবচেয়ে মারাত্মক রকমের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা যেতে পারে। এর ফলে জ্বালানী বস্তু গলে গিয়ে ফিসন প্রোডাক্টস নির্গমনে সহায়তা করবে। গুডউইন এবং ডরফ বিজ্ঞানিকদ্বয় আশা প্রকাশ করেছেন যে এই দুর্ঘটনা অবস্থাতেও রিয়্যাক্টরের আবরণী গলিত জ্বালানী বস্তু ধারণে কৃতকার্য হবে এবং রশ্মি বিকীরণকারী দ্রব্যের বহির্গমনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

সার্কুলেটিং পাম্প এবং রিয়্যাক্টর বন্ধ করবার জন্য নিয়ন্ত্রণ দণ্ড (কন্ট্রোল রড) অচল হয়ে পড়লে জ্বালানী বস্তু গলনের সম্ভাবনা বর্তমান যদি না রিয়্যাক্টর বন্ধ করবার জন্য বিশেষ আর কোন ব্যবস্থা না থাকে।

(২) বিপজ্জনক রশ্মি-বিকীরণ থেকে নিরাপত্তার জন্য রিয়্যাক্টরের চতুর্দিকে যে ভারী আবরণীর প্রয়োজন, তার ব্যবহার স্থলদেশে কোন চিন্তার কারণ হয় না বটে, কিন্তু জাহাজের মাল বহন করবার ক্ষমতা যে বিশেষ হ্রাস পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমগ্র পরমাণবিক শক্তির উৎপাদন যন্ত্রের শতকরা ৩০ ভাগ ওজন এই আবরণীসমূহের। সাধারণ অবস্থায় অথবা দুর্ঘটনাবশতঃ যে বিপজ্জনক রশ্মি-বিকীরণের সম্ভাবনা তার প্রতিবিধানকল্পে কত কম ওজনের আবরণীর প্রয়োজন—তা বিশেষ অনুশীলনের পর ভবিষ্যতে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করেন।

(৩) সাগরে জাহাজ চলাচলের সময় যে স্বাভাবিক স্পন্দন এবং কম্পনের সৃষ্টি হয়, তদ্দ্বারা কি কি ব্যবহারিক অসুবিধার সৃষ্ট হতে পারে, তা ভেবে দেখার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এ ছাড়াও জাহাজের দোল্যানর (রোলিং) সময় পরমাণবিক শক্তি উৎপাদনে যে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, এমন আশংকা করা অমূলক নয়। এইসব চলমান অবস্থায় পরমাণবিক এঞ্জিনের যোগ্যতা বিচার বর্তমানে সম্ভব নয়। উচ্চ চাপ জলের রিয়্যাক্টর, ফুটন্ত জলের রিয়্যাক্টর অথবা তরল পদার্থ ব্যবহৃত সব রকমের রিয়্যাক্টর নির্মাণে এ সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা করা দরকার।

পরিশেষে পরমাণবিক শক্তি ব্যবহারে যে আর্থিক অসঙ্গতি দেখা যায়, তার দূরীকরণ সম্ভব না হলে ব্যবহারিক জগতে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। সাধারণ ইউরেনিয়ামের সাহায্যে উৎকৃষ্ট রিয়্যাক্টর নির্মাণ অথবা স্বল্প ব্যয়ে ল্যাবরেটরীতে উৎকৃষ্ট ইউরেনিয়াম (এনরিচড ফুয়েল) উৎপাদনের প্রচেষ্টা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, জাহাজ চালনায় পরমাণবিক শক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগে এখনও নানা সমস্যা বিদ্যমান—তবে অদূরভবিষ্যতে উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা এই সব সমস্যার সমাধান করা যে সম্ভব হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নেই।

প্রিয়দর্শন সুকুমার চার্বাক। তার কষিতকাঞ্চন অঙ্গবর্ণে সুচারু-সুষমা, চারু অঙ্গে চারুতার চারুচিহ্ন। চারু চাঁচর চিকুর, চারু ভ্রূলেখা। চারু নেত্রে চারু চাহনি, অধরে চারু হাসরেখা। যেমন মধুর হাসি, তেমনি মধুর ভাষা। চারুবাক্ চার্বাক।

তার জীবনে দুঃখ নেই, যেন দুঃখকে নিঃশেষে জয় করেছে সে নীলকণ্ঠের মত পান করেছে বিশ্বনীতির বিষ। সদাশিবের মত সদানন্দ, যেন চিরমুক্ত সুখের নিঝর, যেন স্বতঃস্ফূর্ত একটা স্ফূর্তি। সে বিশ্বের আনন্দমেলায় দুঃখী মানুষকে আহ্বান করে বলে, 'সুখময় এই সাগরমেখলা শ্যামাঞ্চলা ধরণী, সুখে পূর্ণ বিশ্বের হৃদয়পাত্র। কেন মিথ্যা দেহের বিড়ম্বনা, কেন মিথ্যা বৈরাগ্যের সাধনা? তোমার ইন্দ্রিয় আছে—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা নাসিকা, ত্বক পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপে দেখ এই ভোগবতী বসুন্ধরা, আকণ্ঠ পান কর তার রূপ, রস। দেহকে সুখভোগ করাও—'দেহ এব আত্মা ন চাপরঃ'।

চার্বাকের মোহন বাক্য প্রভাতে-সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে-মধ্যরাত্রে দ্বন্দ্বমথিত অন্তরে সুধা বর্ষণ করে। দুঃখক্লান্ত জীবনে এ যেন কিন্নর কণ্ঠের গান, লোভীর জীবনে দীপ্ত সুরা। চার্বাককে ঘিরে সমবেত হয় সহস্র লোক। ভোগীরা চার্বাককে লুফে নেয়। যদৃচ্ছাবাদী মহামোহ ও মহামদ তার অজ্ঞাতসারে তাকে গুরুপদে বরণ করে। সবচেয়ে আকৃষ্ট হয় সর্বহারা সাধারণ মানুষ। তারা যুগ-যুগান্তরের বহিঃগ্রাসের অবশেষ। ধর্ম তারা বোঝে না, অধর্মকেও ভয় পায়; মিতাচারী তারা নয়, অমিতাচারেও তাদের ভয়; দুঃখের জগতে তারা সুখ কামনা করে, পায় না। চার্বাককে ভালবাসে তারা, প্রশ্নও করে অনেক। চার্বাকের মধুর হাসি ওদের জীবনের ক্ষণিক আলো, সংশয়াকুল চিত্তে খধূপের মত তার মধুরাক্ষরা বাণী।

উদার অবিচল জ্ঞানী পুরুষ চার্বাককে দেখে উদাস হাসি হাসেন—তাদের নিকট যথা চতুর্বেদ, তথা চার্বাক। কিন্তু চার্বাকের প্রতি কঠিন হয়ে ওঠেন ধার্মিক বৈদান্তিক, সাংখ্যযোগী, নৈয়ায়িক। তর্কে তর্কে তাঁরা চার্বাক-বাক্য খণ্ডন করেন। চার্বাকের উপর খড়্গহস্ত যাজক ব্রাহ্মণ। তাঁরা বলেন, 'অকাটমূর্খ, পাষণ্ড।' কেউ মন্তব্য করেন, 'নাস্তিক, ঘোর নাস্তিক।' কেউ-বা তিক্তকণ্ঠে বলেন, 'কামুক লম্পট—তাই দুঃখের সংসারে ও মিথ্যা সুখের মন্দির স্বপ্ন দেখে।'

নিন্দাবাদে ক্ষুব্ধ হয় না চার্বাক। তার ভুবন-মোহন হাসি যেন আবর্তসংকুল তরঙ্গশীর্ষে শুভ্র ফেনা। হেতুবাদী তার্কিক সে, ক্ষুরধার বুদ্ধি—অকাট্য যুক্তি। সহাস্যে সে প্রত্যুত্তর করে, 'মূর্খ কে? যে প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী, না যে কল্পনা-বিলাসী? আমার দর্শন মিথ্যা স্বপ্ন নয়—এর প্রণেতা স্বয়ং সত্যদ্রষ্টা বৃহস্পতি।'

গুরুকে ভাল মনে পড়ে না চার্বাকের। অনেক কালের অনেক প্রলেপ পড়েছে স্মৃতির ওপর। স্বপ্নের মত মনে হয় সুদূর অতীতের কথা। স্বপ্ন যেমন সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—তেমনি সত্য-মিথ্যায় গড়া তার জীবন-পঞ্জী। এ যেন **তার জীবনের প্রাগৈতিহাসিক যুগের** কাহিনী। কিছু স্মৃতির কঙ্কাল, কিছু কিংবদন্তী, কিছু কল্পনায় রচিত ইতি-স্মৃতি।

অনাদি অতীতের কথা। মরুতের যজ্ঞে পৌরোহিত্যে ব্যর্থকাম বৃহস্পতি আশ্রম বেঁধেছিলেন মর্ত্যে—নন্দীপুরে। চার্বাক উপস্থিত হয়েছিল তাঁরই আশ্রমে। নিরাশ্রয়, অনাথ—কৈশোর-অতিক্রান্ত স্ফুটনোন্মুখ এক মৃণালচ্যুত পদ্ম-কলিকা। আয়ত আননে ভীরু উৎসুক দৃষ্টি, যেন পথহারা হরিণ-শাবক। সে জানে না—কি তার পরিচয়, কোন্ গোত্রে তার জন্ম। সারাদিন সন্দিৎসু দৃষ্টি নিয়ে সে দেখেছিল ঋষির আশ্রম। এখানে উদাত্ত সামগান, ওখানে হুতহবির সৌরভ। কোথাও আশ্রমবটুদের কলকলা, কোথাও আচার্যের সুগভীর কণ্ঠ—'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা', 'অথাতো কর্ম-জিজ্ঞাসা'। কিশোর প্রাণে কৌতূহল, অন্তরে সহস্র প্রশ্ন—কে এই ব্রহ্ম, কি এই কর্ম, কি এদের ফলশ্রুতি?

দিনান্তে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে এসেছিল। ক্লান্ত চার্বাক ঘুমিয়ে পড়েছিল এক কুটিরের পাশে। সহসা ঘুম ভেঙে গেল। মধুখ্য প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে সবিস্ময়ে দেখল চার্বাক, সম্মুখে হিরণ্য-বর্ণ এক ঋষি। জ্যোতির্ময় দ্যুতি তাঁর দেহে। স্নিগ্ধ অথচ মর্মভেদী দৃষ্টি। আশ্রয় প্রার্থনা না করে তাঁরই চরণমূলে লুটিয়ে পড়েছে চার্বাক।

আথর্বান্ আঙ্গিরস বৃহস্পতি। তিনি ঋক্‌মন্ত্রের বরণীয় দেবতা, অমেয় তাঁর তপোবল। তিনি গণপতি, সত্যনিষ্ঠ তাঁর দৃষ্টি। সত্যের সন্ধানী আলো ফেলে কি যেন দেখলেন তিনি ওই কমল-নয়নে, কি যেন আবিষ্কার করলেন তিনি ওই কোমল পদ্ম-কলিকায়। সস্নেহে বালককে উঠিয়ে পরম আগ্রহে মস্তক আঘ্রাণ করলেন। অন্তর জুড়িয়ে গেল চার্বাকের। কি স্নেহের স্পর্শ!

আজন্ম স্নেহের কাঙাল চার্বাক—অনাথ, যাযাবর। কতবার মাতাপিতার জন্য হৃদয় কেঁদে উঠেছে। কেউ বলেছেন, প্রেতলোক থেকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেহ নিয়ে তাঁরা চার্বাককে দেখছেন। সে ভেবেছে, প্রেতলোক থেকে তাহলে কেন ফিরে আসেন না জননী? কেন স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেন না তাকে? মৃত্যুর পর সত্যিই মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে কি? কত মাথা কুটেছে সে দেবতার পায়ে। কোন দেবতা কর্ণপাত করেন নি। মনে জেগেছে সংশয়—দেবতা যদি জগৎপিতা, সন্তান কেন নিরাশ্রয়? দেবতা যদি জগন্মাতা, সন্তান কেন স্নেহবঞ্চিত?

আজ এই প্রথম স্নেহের আস্বাদন, এই প্রথম সুখের অনুভূতি। চার্বাকের মনে হয়—মিথ্যা দেবতা, মিথ্যা পরলোক। সত্য এই পৃথিবী, প্রত্যক্ষ সত্য এই মাটির মমতা। স্নেহের গঙ্গোত্রী ধরণী, বুকে তার সোহাগের সহস্রধারা।

আশ্রমে দ্বিতীয় প্রভাতের কথা। রজনী অতিবাহিত হয়েছিল এক স্বপ্নময় বিভোরতায়। শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে তাকে ডেকে সস্নেহে বললেন কুলপতি বৃহস্পতি, 'যাও চার্বাক, ক্রৌঞ্চ-সরোবরে স্নান করে এস। শুচি হও, শুদ্ধ হও। হোমাগ্নিতে যজ্ঞপুরুষের আবাহন করে আজ তোমায় গায়ত্রী দীক্ষা দেব।'

সবিস্ময়ে নীল আয়ত দুটি নয়ন মেলে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল চার্বাক। গায়ত্রী দীক্ষা! কার গায়ত্রী? দেবতার বরণীয় শক্তিতে তার সংশয়। কোথায় যজ্ঞপুরুষ? হোমাগ্নির দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে সে দেখেছে—নীললোহিত অগ্নিশিখা অগ্নি-শিখাই মাত্র। যজ্ঞপুরুষের কল্পনা অনুমান।

গম্ভীর কণ্ঠে বৃহস্পতি বলেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত অতীত হয়ে যায়। ওই দেখ, পূর্বদিগন্তে প্রত্যুষের পূর্বাভাস। যাও, শুচি-স্নান করে এস।'

নিশ্চল চার্বাক, যেন নিশ্চল একখানি কোমল কচি দারু, যেন অচল বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ। অহীনদ্যুতি নয়নে দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টি। অকম্প্রকণ্ঠে সে বলে, 'আমি বিশ্বাস করি না গায়ত্রী মন্ত্র, হোমাগ্নিতে হিরণ্ময় পুরুষের আবির্ভাবে আমি আস্থাহীন।'

কি বলছে এই বালক! জড়তাহীন কণ্ঠ, দ্বিধাহীন উক্তি। দেবগুরুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেবশক্তিতে সংশয় প্রকাশ করছে এক অর্বাচীন শিশু! শিশুর মত তো কথা নয় তার? বিস্ময়ে হতবাক্ হন সুর-গুরু। কোপ নয়নে নয়, অমৃত-নয়নে তিনি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন সেই চারু নয়ন-শোভিত চারু অঙ্গের প্রতি। কে এই বালক! কার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তাঁরই অন্তরের অত গোপন এক প্রত্যক্ষ সত্যের অনুভূতি? ধীরে প্রশ্ন করেন তিনি, 'দেবতায় বিশ্বাস নেই তোমার?'

দৃঢ়স্বরে বলে চার্বাক, 'পরোক্ষ সত্যে বিশ্বাস নেই আমার। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যক্ষ এই ভূস্বর্গ, বিশ্বাস করি—আপনার মত প্রত্যক্ষ দেবতায়। যদি এমন কোন শাস্ত্র থাকে, যা এই জগৎকে ভালবাসতে শেখায়, আমায় তা উপদেশ করুন।'

নিষ্ঠাবান আস্তিক বৃহস্পতি। বালকের এই নাস্তিকতায় ক্রুদ্ধ হলেন না, ক্ষুব্ধও হলেন না। স্বীয় অন্তরের রহস্যময় জিজ্ঞাসার প্রতিমূর্তি এই বালকের ওপর তিনি নিঃশেষে ঢেলে দিলেন হৃদয়ের স্নেহভাণ্ড। সুরগুরুর আশ্রমেই শিষ্যরূপে আশ্রয় পেলেন চার্বাক।

আশ্রমের অন্যান্য বালক থেকে পৃথক ছিল তার আবাস। সহস্র সশঙ্ক কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্র সে—স্বতন্ত্র। তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও পৃথক। না ছিল কঠোর কর্মের বন্ধন, না ছিল গুরুদায়িত্ব। কঠিন ব্রহ্মচর্যের পথে তার তপশ্চর্যা নয়। তাকে ব্রতভিক্ষা করতে হয় না, ধারণ করতে হয় না বল্কল। তার পরিধেয় কার্পাস বস্ত্র বা চীনাংশুক। আহার-বিহারেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফলমূল আতপান্ন নয়, চার্বাকের রাজসিক আহার্য।

মুক্ত বিহঙ্গের মত ইচ্ছাপক্ষ বিস্তার করে চার্বাক ভ্রমণ করে আশ্রমে, অরণ্যে। সে হৃদয় পূর্ণ করে পান করে নিসর্গ-সৌন্দর্য। আশ্চর্য সুন্দর এই তুচ্ছ ধূলিকণা! কোথায় কোন্ সহকারে

আলোকলতার বন্ধন, কোথায় কোন্ পুষ্পে কোন্ রঙিন প্রজাপতির সঞ্চরণ—সব তার কণ্ঠস্থ। বন-তটিনীর মত লীলা-চঞ্চল তার জীবন প্রকৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

আশ্রমের বহির্ভাগে থাকেন স্নেহময়ী জননীর মত এক যোগিনী। তাঁর রহস্যময় জীবন চার্বাকের পরম বিস্ময়। কাঞ্চন-দীপ্ত দেহবর্ণ, পরিধানে রক্তগৈরিক, আলুলায়িত কেশভার। সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, হস্তে সুদীর্ঘ ত্রিশূল। প্রদীপ্ত নয়নে স্নেহের তরলতা। মাতৃহারা হরিণ ময়ূর, করভ-শিশুর তিনি ধাত্রী, যেন জীবধাত্রী জননী।

মধুর এই প্রীতির পৃথিবীতে চার্বাকের অত্যন্ত বিশ্রী মনে হয় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের বর্ণগত ভেদজ্ঞান। ইনি ব্রাহ্মণ, উনি ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য—তাদের পৃথক পৃথক ব্রহ্মচারীর বেশ। শিক্ষার বিষয়, এমনকি আশীর্বাদের বচনটি পর্যন্ত স্বতন্ত্র। শূদ্রের প্রতি আশ্রমবাসীর উন্নাসিক আচরণে মর্মাহত হয় চার্বাক। একপ্রকার অবয়ব, দেহে একই শোণিত প্রবাহ—তবু ওরা অস্পৃশ্য, বেদাধ্যয়নে বঞ্চিত। চির-কালের মূর্খতার চিহ্ন ওদের মুখে, চিরকালের অবজ্ঞার আতঙ্ক ওদের চোখে। শরবিদ্ধ বিহঙ্গমের মত চার্বাকের আহত হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় ক্রন্দন করে ওঠে। মানুষের অধিকার ও বঞ্চনা তার বিবেকে একটা ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ প্রধূমিত হয় অন্তরে।

এই নিয়মেরই একটি ব্যতিক্রম ছড়িয়ে পড়ল আশ্রমে, যেদিন চার্বাক ইচ্ছে করেই প্রবেশ করল অস্পৃশ্য শবর-পল্লীতে। মৃগয়াজীবী শবর—শবরীর আশ্রমে তাদের প্রবেশ নিষেধ। আশ্রমের বহির্দ্বারে তারা সেবার অর্ঘ্য রেখে যায়—মেওয়ামধু, বনবীজ, গজদন্তশৃঙ্গ—কখনো বা ময়ূরপুচ্ছ, কৃষ্ণাজিন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিচর্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু স্পর্শ করেন না তাদের। তারা নাকি অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ! অথচ চার্বাক লক্ষ্য করে—স্নেহশীলা যোগিনী নির্বিচারে ভ্রমণ করেন শবর-পল্লীতে, তাঁর মধুর হাসি মিলিয়ে দেন ওদের মাদল-ধ্বনির সঙ্গে। অন্ত্যজের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী তিনি।

চার্বাককেও আকর্ষণ করে শবর-শবরীর মুক্ত জীবন, যেন আকাশে সঞ্চরমান মুক্ত কালো মেঘ। শবরী বালিকা-অঙ্গে সুঠাম স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ সুষমা, কণ্ঠে গুঞ্জাহার, কুটিল-কুন্তলে শিখিচূড়া। ওদের ভাষা বোঝে না চার্বাক, কিন্তু ওদের ঝঙ্কার-মুখর অনুকারধ্বনি শ্রুতিমূলে সুধা বর্ষণ করে। অনেকদিন সে ধরতে চেষ্টা করেছে, পারে নি। সর্পগতি ওদের চরণে, চঞ্চল প্রাণ-প্রবাহ ওদের দেহে। চকিতে চমক সৃষ্টি করে নিবিড় বনে অদৃশ্য হয়ে যায়। নির্জন অরণ্য স্পন্দিত হয় অদ্ভুত এক হাস্যতরঙ্গে।

সেদিন ধরে ফেলল সে, যেন হাতের মুঠোয় ধরা পড়ল ছোট্ট একটি নীলাকাশ! অন্তে কাজল নয়ন, চঞ্চল সভয় দৃষ্টি, বক্ষে ঘনশ্বাস! কি নাম? চার্বাক শুধিয়েছিল, ওর নাম নন্দা। নন্দাই বটে দেহ-রেখায় নন্দিত ঝর্ণার কিন্নরী-লীলা। এ এক নূতন অনুভূতি! স্পর্শে সহস্র বিদ্যুতের তরঙ্গ একসঙ্গে নৃত্য করে চার্বাকের অঙ্গে। মোহময় আকর্ষণ ওই অয়স্কান্ত তনুদেহে!

তার অন্যমনস্কতার সুযোগে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল চঞ্চলা বন-হরিণী। চার্বাক দ্রুত
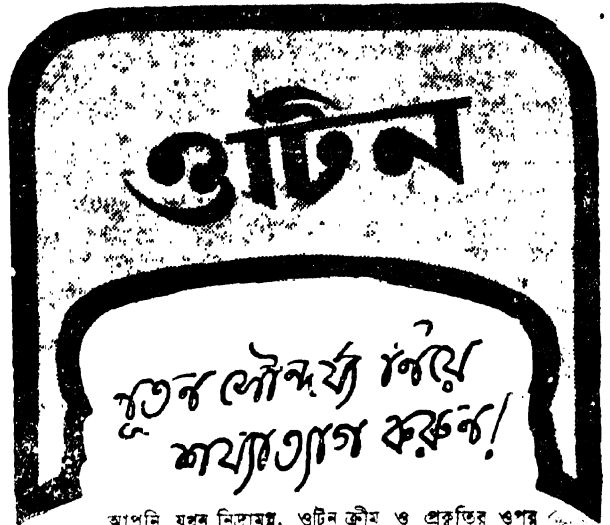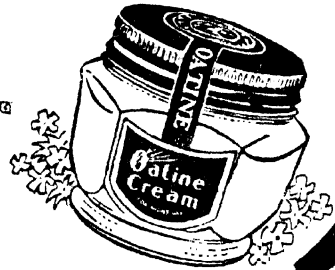
ছুটতে উদ্যত হয়েছিল তার পশ্চাতে। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! নন্দা নয়, সম্মুখে সেই আনন্দ-ভৈরবী—ত্রিশূলধারিণী স্নেহময়ী জননী; নয়নে করুণাধারা, অধরে রহস্যময় হাসি! স্নেহস্নানে অভিস্নাত চার্বাক। এত সুন্দর, এত মধুর, এই পৃথিবী!

আশ্রমে ছি-ছি রব উঠল। চার্বাক সম্পর্কে ধিক্কারে প্রকাশ্য গুঞ্জন উঠল নন্দীপুরে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাসন-সীমা লঙ্ঘন করে সে শবরীকে স্পর্শ করেছে। যজ্ঞহীন চার্বাক, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যও বোধ নেই তার। আশ্রমবটুদের মধ্যে চলল জল্পনা, নিক্ষিপ্ত হল বক্র কটাক্ষ। একজন বলল, 'নিশ্চয় আসন্ন ঘোর কলি, নইলে এমন করে কি লোপ পায় বর্ণাশ্রম ধর্ম?' কেউ-বা বক্র শ্লেষে বলল, 'দুরাচার বিতণ্ডাবাদী ধূর্ত! আবার বলে, আমরা সুশিক্ষিত!' কেউ-বা নাসিকা কুঞ্চিত করে মন্তব্য করল—'কাম এষ'—এ হল আদিমতম পশুবৃত্তি। আশ্রমে তো সুযোগ নেই তার, তাই বাঞ্ছাধন গিয়েছেন শবর-পল্লীতে!"

মন্তব্য শুনে বিমূঢ় হয়ে যায় চার্বাক। বিচারহীন এ কি কুৎসিত সমালোচনা! ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় অন্তর পূর্ণ হয়। পাণ্ডিত্যের এই কদর্য হীনতা? এরাই শম-দম-নিয়মাধীন ব্রহ্মচারী? ক্ষুব্ধচিত্ত চার্বাক আসে গুরু বৃহস্পতির কুটিরে—

'গুরুদেব!'

'কি চার্বাক?'

'শবর-কন্যা নন্দাকে স্পর্শ করেছি আমি।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'ওরা নাকি অস্পৃশ্য!'

প্রশান্ত হাস্যরেখা ফুটে ওঠে গুরুর আননে। তিনি বলেন, 'একই উপাদানে নির্মিত মানুষ। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ—চতুর্ভূতের সমষ্টি জীবদেহ। এতে ভেদজ্ঞান করে তারাই, যারা মূর্খ। তুমি কোন অন্যায় করনি বৎস! মানুষ—মানুষ। এর চেয়ে বড় পরিচয় কিছু নেই।'

গুরুর বাক্যে মেঘের ছায়া কেটে যায় চার্বাকের। কি মুক্ত দৃষ্টি! কি উদার মনোভাব! স্বচ্ছ দর্পণের মত নির্মল হৃদয়! তবু আরো একটা পর্বতপ্রমাণ পুঞ্জিত অভিযোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চার্বাক। ফুল্লযৌবনা শবরীর স্পর্শে যে নূতন অনুভূতি, তাকে কেন্দ্র করে আশ্রমবাসীদের যে কুশ্রী ইঙ্গিত—তা জানানো হয় না গুরুকে।

অন্তর্দ্রষ্টা ঋষি বৃহস্পতি। স্বতঃ নীরব অভিযোগের উত্তরে ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে, 'সবই আমি শুনেছি, বৎস! প্রকৃতির প্রথম স্পর্শে পুরুষদেহে যে নব পুলক-রোমাঞ্চ, তাতো মিথ্যা নয়। দোষেরও নয় এ-অনুভূতি। চিরন্তন এ সৃজন-চুম্বক। ভাগীরথীর উত্তাল প্রবাহের মত এ-আবেগ মত্ত দিগ্‌গজকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আবার এরই প্রভাবে সৃষ্টি মধুময় হয়ে ওঠে। অসত্য, অস্বাভাবিক বলে যারা একে অস্বীকার করে, তারা ভণ্ড। ভণ্ডের কুতর্কে বিচলিত হয়ো না বৎস!'

অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হয়ে যায় চার্বাক। গুরু কি শিবেরই দ্বিতীয় অন্তর? সার্থক তার জীবন, এমন গুরুর শিষ্য সে! পরম তৃপ্তিতে বেরিয়ে আসে চার্বাক। লোক-জীবনের এই গূঢ় সত্যের সংবাদ ভৈরবী ও নন্দাকে শোনাতে হবে।

সারাদিন চার্বাকের অবাধ স্বাধীনতা। নিশান্তে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে বৃহস্পতির আশ্রম কলমুখর হয়, চার্বাক তখন দিব্য আরামে নিদ্রার আরাধনা করে। কখনো কোলাহলে ঘুম ভেঙে যায়, বিরক্ত হয় চার্বাক। কি নির্বোধ এই তাপস, যাজ্ঞিক! যজ্ঞ থেকে নাকি পর্জন্যের সম্ভব! ইন্দ্র নাকি পর্জন্যের অধিদেবতা! স্বাভাবিক কারণেই মেঘ বারিবর্ষণ করে। তার জন্য ইন্দ্র-যাগের প্রয়োজন কি? কে এই ইন্দ্র? যজ্ঞাগ্নিতে মিথ্যা হবির অপব্যবহার। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি না দিয়ে মূর্খেরা যদি ঘৃত সেবন করত—তাহলে পুষ্ট হত ওদের শীর্ণ দেহ, সুস্থ হত বিকৃত মস্তিষ্ক।

নিজের মনেই বিচার করে চার্বাক। আত্মা আর পরলোকের চিন্তায় এরা অবসর নষ্ট করে! অনুমানে প্রকৃত জগৎ! দেহের অতিরিক্ত আত্মা কোথায়? পুং-প্রকৃতিযোগে শুক্রশোণিতে দেহের জন্ম;

নিস্তব্ধ চরাচর, নীরব ঘনকৃষ্ণ রাত্রির আকাশতল। ঊর্ধ্বে সহস্র নক্ষত্রের সভা। উদ্যান-পুষ্পের মত কাঞ্চনবর্ণা তারকারাজি, ওরা রাতের ফুল। কি বিচিত্র এই ভূলোক! লোকচক্ষুর অন্তরালেও এত শোভা, এত আনন্দের আয়োজন আর কোথায়? সুন্দরী ধরণী, প্রাণময়ী নন্দা, স্নেহময়ী ভৈরবী। অন্তঃকর্ণে বাজে যেন গুরুর শেষ কথা কয়টি—'জগৎ দুঃখময় নয়, অত্যন্ত সুখের নিলয় ধরণী।'

একটি বিষয়ে সংশয় ঘোচে না চার্বাকের। যজ্ঞক্রিয়ার বিরোধী হলেও গুরুর আশ্রমে যাগ-যজ্ঞের এত বাহুল্য কেন? কথায় ও কর্মে কোথায় সামঞ্জস্য? গুরুর লোকায়ত দর্শন কি সত্যের উপলব্ধিজাত নয়? কতদিন মনে করেছে সে, এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে, প্রশ্নও করেছে। কিন্তু গুরু প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। এদিকে সমাপ্তপ্রায় চার্বাকের শিক্ষা। গুরুদেব বলেছেন, এবার জগতে প্রচার করতে হবে তাঁর দর্শন। কিন্তু যে সত্যোপলব্ধি থেকে দর্শনের উৎপত্তি তা যদি অজ্ঞাত থাকে, চার্বাক প্রেরণা পাবে কোথা থেকে?

সেদিন সন্ধ্যার ছায়ায় বনান্তরালে দাঁড়িয়েছিল চার্বাক—প্রশ্নব্যাকুল হৃদয়। অদূরে চলেছে আশ্রমবটুদের আলোচনা আস্ফালন, পাণ্ডিত্যের দম্ভোক্তি, পরচর্চা। সহসা সে শুনল, প্রসঙ্গ উঠেছে তাকে নিয়েই। উৎকর্ণ হল চার্বাক।

একজন বলছে, 'ওহে, সুশিক্ষিত চার্বাকের ভালই শিক্ষা হয়েছে। পাষণ্ডকে পাষণ্ড ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন গুরু। চার্বাক হল পাষণ্ড পণ্ডিত।' আর একজন বলল, 'মূর্খ বিচার করল না, বৃহস্পতি সুর-গুরু—স্বর্গের পুরোহিত। তিনি নাস্তিক্যবাদ শিক্ষা দেবেন কেন? সুর ও স্বর্গ যদি মিথ্যা, সুরগুরু নামটাও অলীক!' তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে আর একজন বলে উঠল, 'নির্বোধ বোঝেও না কিছু, জানেও না কিছু। ইন্দ্রের প্রার্থনায় দেবগুরু এ-দর্শন রচনা করেছিলেন দানব মোহনার্থে। 'ইন্দ্রস্য অভয়ায়, অসুরানাং ক্ষয়ায়' এর সৃষ্টি। সেই দর্শন তিনি বেছে বেছে শিক্ষা দিয়েছেন গণ্ডমূর্খকে।'

উত্তেজিত হয়ে ওঠে চার্বাক। গুরু কি তাহলে কপটতা করে তাকে কপট শিক্ষা দিয়েছেন? দানব-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে সে? দ্রুতপদে সে অগ্রসর হয় গুরুর কুটিরের দিকে। অন্তরে অশান্ত বিক্ষোভ-প্রশ্ন। আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলেও কি সেই প্রশ্ন?

কুটির প্রাঙ্গণে পদচারণ করছেন দেবাচার্য বৃহস্পতি। দীর্ঘদর্শন সৌম্য-শান্ত, উত্তরাকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি তাঁর নয়নে। সত্যকে কি গোপন করেছেন সত্যদ্রষ্টা? ত্বরিতে সোজা প্রশ্ন করল চার্বাক, 'যে লোকায়ত দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন আমায় তা কি আপনার পরীক্ষিত সত্য? সত্য কি আপনার অর্থশাস্ত্র?'

গভীর রাত্রি। কার ইঙ্গিতে যেন কোলাহল-মুখর বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গেছে। কুটিরের বাতায়নপথে বিচ্ছুরিত আলোর ম্লান দীপ্তি গুরুর মুখে। শিষ্যের প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করেন কিন্তু পর-মুহূর্তেই আত্মসংবরণ করে প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'নির্বিশেষ নিরঞ্জন সত্যের মুখ কে দেখেছে, বৎস! 'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্?' জগতে যেমন অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ নেই, তেমনি নেই নির্বিশেষ সত্য বা মিথ্যা। সংশয় পরিত্যাগ কর। যা শিখিয়েছি, সেই শিক্ষাকে ধ্রুব বলে গ্রহণ কর।'

'আমি গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু লোকে বলে—'

'কি বলে বৎস!'

'বলে, গণপতি বৃহস্পতির লোকায়ত দর্শন কপট দর্শন। বেদ-বিরোধী এ দর্শন মিথ্যা—দানব ও অসুরকে বিভ্রান্ত করার একটা অপকৌশল।'

নীরব হল চার্বাক, একটু নীরব থাকেন বৃহস্পতি। তারপর ধীর-গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'লোকে একথা বলতে পারে চার্বাক, কারণ, এর পৌরাণিক প্রমাণ রয়েছে। ইন্দ্রের প্রার্থনায় আমি এই মতবাদ বীর্যবান দৈত্যপুত্রদের নিকট প্রচার করেছিলাম। বলি ছিলেন মহাপরাক্রান্ত নৃপতি। তাঁরই পুত্রদের বিরুদ্ধে স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্র অতি কাতর-ভাবে আমার নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেছিল। সে যে কি কাতর প্রার্থনা!—চমকে উঠলাম আমি! এই ইন্দ্র? স্বর্গের অধীশ্বর?—তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলাম, বেশ, এর প্রতিকার করব আমি। তারপর

আমার এই অর্থশাস্ত্র রাজপুত্রদের নিকট প্রচার করেছিলাম। তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল, পরাজয়ও হয়েছিল তাদের। দেবতাদের অনুরোধে শুক্রাচার্যের অনুপস্থিতিতে ছদ্ম শুক্রাচার্যের বেশ ধারণ করে আমি দানবদের কাছেও এই শাস্ত্র প্রচার করেছিলাম। তার ফলে দানবেরাও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল। দৈত্যপ্রধান অরুণ ছিল গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসক—ত্রিভুবনে অজেয়। আমারই হেতুবাদে সে গায়ত্রীমন্ত্র ত্যাগ করে হীনবীর্য হয়েছিল। বহুবার এই দর্শন দানব-অসুরদের বিভ্রান্ত করেছে, —তাই লোকে প্রচারিত হয়েছে, দেবাচার্য বৃহস্পতি দানব-মোহনার্থ এই লোকায়ত দর্শন রচনা করেছেন।'

'তাহলে সত্যি এ পাষণ্ডের শাস্ত্র?'—ক্ষুব্ধকণ্ঠে ধ্বনিত হয় যৌবনের অভিযোগঃ 'পরম সত্য থেকে বঞ্চিত করে আপনি কেন মিথ্যা অর্থবাদ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন? কেন এক সরলমতি শিশুকে ছলনা করেছেন আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দিয়ে?'

'অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষাৎ
মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি।
তদা কঃ সত্যবক্তা স্যাৎ
রাজসন্ত্রমনঃ পুনঃ॥

—সুরগুরু যদি মিথ্যাবাদী, তাহলে সত্যবাদী কে? পরম সাত্ত্বিক হয়েও তাঁর যদি এই ছলনা, তবে অন্যের মৃষাভাষণে দোষ কি?'

উত্তেজিত চার্বাককে শান্ত করতে চেষ্টা করেন বৃহস্পতি। তাকে স্পর্শ করে ধীরকণ্ঠে বলেন, 'মিথ্যা অভিমান কর না বৎস! তুমি উপযুক্ত বলেই জীবনের এক অনুভূত সত্যকে তোমার কাছে তুলে ধরেছি। যে-কোন দর্শনই হক, জীবনের সত্য উপলব্ধি থেকে তার জন্ম না হলে, কোন যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিমানকে তা আকর্ষণ করতে পারে না। দানব বিরোচন, মহর্ষি জাবালি, রাজপুত্র বা দৈত্য অরুণ মূর্খ ছিলেন না বৎস! তাঁদের মত ধীমানদের যে দর্শন মুগ্ধ করে, তা মৃষাগর্ভ বাক্-চাতুরি মাত্র নয়। চন্দ্র সূর্যের মত প্রত্যক্ষ, জন্ম-মৃত্যুর মত সত্য আমার দর্শন। এ দর্শন দুঃখী মানুষকে বিশ্বের আনন্দ-নিকেতনে আনন্দ-আস্বাদনে আহ্বান জানায়। একে ভুল বুঝে কেউ যদি বিপথে চালিত হয়, সে দোষ দর্শনের নয়, দ্রষ্টারও নয়। একই কুসুম থেকে ঊর্ণনাভ আহরণ করে বিষ, মধুমক্ষিকা সঞ্চয় করে মধু। যার ঊর্ণনাভ-বৃত্তি সে বিষই সংগ্রহ করবে, যার মাধুকরী স্বভাব সে এ দর্শন দিয়ে রচনা করবে মধুচক্র।'

সুরগুরুর মুখে কাঁপছে যেন রহস্যময় আলো-আঁধার। চার্বাক লক্ষ্য করে, যেমন সূর্যমণ্ডলে মুহূর্তে মুহূর্তে নানা রঙের খেলা চলে—নীল, সবুজ, লাল—তেমনি ঋষির আননে চকিতে ফুটে ফুটে উঠছে উদ্বেগ, ঘৃণা, ক্রোধ। গাঢ়কণ্ঠে তিনি বলেন, 'একই প্রকৃতিতে কখনো বসন্তের হাসি, কখনো বর্ষার অশ্রু—একই মানুষ কখনো ধীর-গম্ভীর, কখনো লঘু-চপল। শুভাশুভ মিশ্রিত জগৎ, সুখ দুঃখ মিশ্রিত অনুভূতি। যে-কোন অবস্থায় মানুষের এক একটি বিরাট অভ্রান্ত সত্যের উপলব্ধি হতে পারে। সে উপলব্ধি মিথ্যা নয়। সকলে জানে,—বৃহস্পতি সুরগুরু, পরম আস্তিক। কিন্তু, এই আস্তিক্যবুদ্ধি ও সুরেশ্বর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পুঞ্জিত হয়ে আছে—তা তো কেউ জানে না বৎস! সে বিক্ষোভ যে কি প্রচণ্ড, কি ভীষণ তার উন্মত্ততা—কেউ তা বোঝে না! তুমি বোধ হয় জান, তোমার গুরুপত্নী 'তারা' সোম কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিল?'

'শুনেছি সে কাহিনী।'

'কাহিনী শুনেছ, কাহিনীর মর্মসত্য বোঝনি। সাধ্বী, সৎক্রিয়াবতী আমার ভার্যা 'তারা'। একদিন পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হয়ে আমারই উদ্যানে ভ্রমণ করছিল। ঠিক সেই সময়েই সে ওষধিপতি সোমের দৃষ্টি-পথে পতিত হল। একে অম্লান পঙ্কজের মত রূপ, তার ওপর মনোহর অঙ্গসজ্জা। মুহূর্তে কামার্ত হল নিশাপতি, পাত্রাপাত্র জ্ঞানশূন্য হয়ে তারাকে হরণ করল। শুনেছি, আর্তস্বরে অনুযোগ, অনুনয় করেছিল 'তারা', কিন্তু চেতনহারা চন্দ্র সে অনুনয়ে কর্ণপাত করেনি।

উচ্ছ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষণেকের তরে নীরব হয়। সংযত হয়ে আবার বলেন সুরগুরু, 'তারা অপহৃতা হল। দেবতার দুয়ারে আমি অভিযোগ করলুম। মর্মাহত হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। চন্দ্রকে অনুরোধও করলেন তাঁরা। কারো কথা শুনল না সকাম সোম। সোমের বিরুদ্ধে সজ্জিত হল সুর-চমূ—ঐরাবতে ইন্দ্র, শ্বেতাশ্বে ধর্ম,
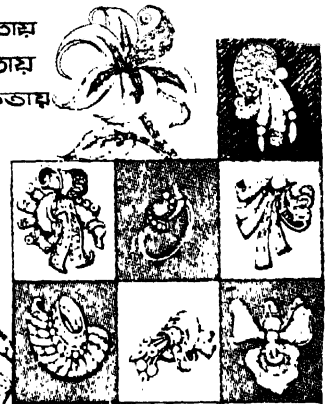
দিব্যরথে কুবের-বরুণ, নাগবাহনে অনন্ত, মহিষপৃষ্ঠে স্বয়ং যম। ত্রিলোকের ধারণা, অপরাজেয় সুর-শক্তি। কিন্তু আমি বুঝেছি বৎস, সুরের শক্তি-কল্পনা দুর্বল স্তাবকের। শক্তিহীন দেববীর্য। যেমন নিঃসার শারদীয় মেঘ, তেমনি নিঃসার দৈবশক্তি। কে বলে, মানুষের ভাগ্যবিধাতা দেবতা?—মিথ্যা কল্পনা। ভাগ্যের নির্মাতা স্বয়ং মানুষ। অপরাজেয় পুরুষকার। 'দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।'

সুরগুরুর নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সরোষে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আকাশস্থ সোমপ্রিয়া নক্ষত্র-সঙ্ঘের প্রতি। ক্ষুব্ধ আক্রোশে যেন অস্থির করে তোলে তাঁকে। প্রত্যোক্ত চার্বাকের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হয় গুরুর কণ্ঠ, 'দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।' সেই তন্ত্রীতে কঠিন আঘাত হেনে বলেন বৃহস্পতি, 'ভেবেছিলাম, যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র, অভিচার ক্রিয়া হয়তো নিষ্ফল নয়। তারাকে সোম-কবলমুক্ত করার উদ্দেশ্যে শ্যেন যাগ করেছি, প্রয়োগ করেছি আভিচারিক মন্ত্র। ব্যর্থ হয়েছে সব। তাহলে কি ফল যজ্ঞে হবি হবনে?—ভস্মে ঘৃতাহুতি; কি ফল মারণ-উচ্চাটন ক্রিয়ায়?—নিষ্ফল ক্রিয়া-কলাপ; কি ফল বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে?—শক্তিহীন মন্ত্র। বৈদিক কর্মমীমাংসা লোভাতুর, ধূর্ত ব্রাহ্মণের রচনা।

উত্তেজিত তপোধীর বৃহস্পতি। রুদ্ধ একটা ক্রুদ্ধ গর্জন তাঁর কণ্ঠে, যেন পাষাণ-রুদ্ধ বেগবতী স্রোতস্বতী। স্রোতস্বিনী বাধামুক্ত হয়, তিনি বলেন, 'এই ঘটনায় যেমন মিথ্যা মনে হয়েছিল যজ্ঞক্রিয়া, তেমনি একটি বড় সত্য অনুভব করেছিলাম,—অবার্যবীর্য কাম। অনাদি নিত্য কামনা—অনিরুদ্ধ তার গতি। বিশ্বে শাশ্বতী নারী-পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সা। সোম কামনাবশে তারাকে অপহরণ করেছিল। কিসের অভাব ছিল তার? সপ্তলোকের রসাধার সোম, সপ্তবিংশ নক্ষত্র তার পত্নী। তবুও কামতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি তার। অনঙ্গমোহে মোহিত মহীতল। এ বিষয়ে সোমই কেবল অপরাধী নয়, 'তারা'কেও নির্দোষ বলা চলে না। তারাবও অন্তরে প্রসুপ্ত ছিল লালসা, মোহিনী নিজেও মোহিতা হয়েছিল চন্দ্রের কান্তিচ্ছটায়। মুখে সে বলেছিল, 'ত্যজ মাং ত্যজ মাং চন্দ্র সুরেষু কুলপাংশুলঃ'—কিন্তু 'সাপি স্মরার্তা'। নইলে কে কোথায় শুনেছ বৎস, অকামা নারী উগ্র কামনার গ্রাসে আত্মসমর্পণ করে? পলায়ন করে না, প্রাণত্যাগ করে না? বিষাঙ্গুরীয় কি তার হাতে ছিল না? শুনেছি, সোমসহ সে বিহার করেছে রম্যাশৈলে, পিকোত্থ পুষ্পোদ্যানে, মলয়ে মলয়ারণ্যে, ত্রিকূটে, বিন্দু-সরোবরে। অকামা নারীতে এত ভোগ সম্ভব?'

স্তম্ভিত চার্বাক। কামনার একি দুরন্ত, কুটিল গতি! তাকে অধিকতর বিস্মিত করে বলেন বাচস্পতি বৃহস্পতি, 'এই শাশ্বত কামনা থেকে আমিও মুক্ত নই বৎস!'

'আপনি!'—আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করে চার্বাক। তার চোখে অন্ধকারের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বৃহস্পতি বলে চলেন, 'সকাম সোম, সকামা তারা। কি মোহময় আকর্ষণ কামনার! তারাকে পর-গৃহীতা জেনেও, আমি তো তার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারিনি। অনঙ্গ-তপ্ত হয়ে তাকেই কামনা করেছি, ক্ষুধিত ভিক্ষুকের মত ভিক্ষার্থী হয়ে সোমের দুয়ারে গিয়ে তাকে যাচ্ঞা করেছি।'

সত্যমূর্তি ব্রহ্মণস্পতি বৃহস্পতি। কোন কথাই তিনি গোপন করেন না। সত্যের শিব-সুন্দর মুখকে তিনি শিষ্যের নিকট উন্মোচন করেন, বলেন, 'শুধু তাই নয়। মাত্র নিজের ভার্যার প্রতিই আসক্ত হইনি আমি। আমি জানি, এ ব্যভিচার, এ অসামাজিক—তবু স্বীকার করি, অনাদি অনিরুদ্ধ কামনার কবল থেকে মুক্তি নেই কারো। গভীরভাবে মর্মে মুদ্রিত হয়েছিল এ সত্য যেদিন প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে চঞ্চল আমি। প্রাণের উন্মাদ নৃত্য শিরায় শিরায়। নয়নের রাগে রাগ-রঞ্জিত ভুবন। সেই ভুবনে মূর্তিমতী ভুবন-মোহিনীর রূপে উদিত হলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ উতথ্য-পত্নী অন্তর্বত্নী দেবী 'মমতা'। মমত্বে ভরা হৃদয়-ভাণ্ড, তারুণ্যে ভরা অঙ্গ-সুষমা। পরিধানে রক্তাম্বর, কণ্ঠে রক্তমালা, ভালে রক্তসিন্দুর, যেন সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তোৎপল কামনার রক্তকমল! কে ভুলাল আমায়? কে আকর্ষণ করল আমায়? কার মায়ায় পরকীয়ার আশ্লেষে বিহ্বল, আত্মহারা হলাম আমি?—সে এই কামনা, জীব-হৃদয়ের চিরন্তন স্বভাবী ভাব-সত্য। এই কামনাই [illegible] পুরুষার্থ।'

নিস্তব্ধ চার্বাক। এই সত্যমূর্তি গুরুকে সে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করেছে। লজ্জায় সে মাটিতে মিশে যায় যে। স্নেহে স্নিগ্ধ কণ্ঠে নম্রস্বরে বলেন বৃহস্পতি, 'কিন্তু সাবধান চার্বাক, এ আগুন নিয়ে খেলা। কামচারী কামনা—তার অর্থ এ নয়, কাম হবে সমাজ-শৃঙ্খলার অতিক্রম। ভোগসুখই পুরুষার্থ—তার অর্থ এ নয়, ভোগী ভোগ করবে বিশ্বের শান্তি। প্রজার প্রতিনিধি রাজাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—আমার দর্শনের আদর্শ। রাজার সম্মুখে অর্জিত ভোগ-সম্পদ কিন্তু তাঁর হাতে দণ্ড, তিনি দণ্ডধর। এই দণ্ড স্বেচ্ছাচারের মহাভয়, [illegible]। দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ। পুরুষার্থ সম্ভোগে এই দণ্ড যেন হস্তচ্যুত না হয়।'

স্বরবর নরম হয়, ধীরভাবে বলেন গণপতি বৃহস্পতি, 'জীবনে অনুভূত এই প্রত্যক্ষ সত্য থেকেই আমার দর্শনের জন্ম। যুগ যুগ ধরে 'লোকেষু আয়তঃ' এই দর্শন, তাই এর নাম 'লোকায়ত দর্শন'। মনোমোহন নয়, লোক-কল্যাণই এর লক্ষ্য। সুন্দর এই পৃথিবী, সুন্দর এই মানুষ। মিথ্যা দিয়ে একে মলিন কর না, সত্যের আলো দিয়ে একে আলোময় কর। মধুময় সুখে ভরা নিখিল বিশ্বের হৃদয়-ভাণ্ড। শিল্পীর মত রুচিসম্পন্ন হয়ে, রাজার মত দণ্ডধর হয়ে এই সুখ সম্ভোগ কর। মধুকরের মত মধু দিয়ে রচনা কর সুখের মধুচক্র।'

নীরব হলেন বৃহস্পতি। তখন রজনীর শেষ যাম। পূর্বাকাশে সমুদিত অতি-উজ্জ্বল শুকতারা। চার্বাকের মনে হয়, আনন্দলোকের দূত ওই শুকতারা যেন বৃহস্পতি-বাক্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য। তারও পরে দিক্-সীমান্তে সুশুভ্র এক জ্যোতি-লেখা—তাতে যেন সিতাক্ষরে মুদ্রিত বার্হস্পত্য দর্শনের সূচিপত্র—'সুখমেব পুরুষার্থঃ'।

বিশ্বভুবনে গুরু বৃহস্পতির উদ্দেশ্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিল চার্বাক। তারও সাধের স্বপ্ন,—অসুন্দরের হাত থেকে মুক্ত করে সে সুন্দর ধরণীকে সুন্দরতর করবে; মিথ্যায় বিভ্রান্ত জগতে প্রত্যক্ষ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে জগতকে সে যুক্তিহীন বিচারের কবলমুক্ত করবে; দিশাহারা মানুষকে সে দেখাবে সুখময় আলোকের

পথ। সেদিন বিশ্বে অসাম্য থাকবে না, থাকবে না অস্পৃশ্যতা; স্বার্থপরতার ক্লিন্নতা থাকবে না, থাকবে না লোভীর শোষণ। প্রেমপূর্ণ ধরায় সকল মানুষ হবে প্রেমিক, দুঃখের ঘরে জ্বলবে সুখের আনন্দদীপ। সুখ সম্ভোগই হবে পুরুষার্থ, কিন্তু সে ভোগ স্বৈরাচার নয় : 'সুশিক্ষিত চার্বাক সুশিক্ষায় সংযত, শিল্পীর মত সৌন্দর্য সম্ভোগই হবে তার লক্ষ্য।

কিন্তু তাকে ভুল বুঝলেন আস্তিক ধার্মিক, ভুল বুঝল দানবধর্মী মানুষ। আচমনীয় জলে চার্বাকের সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব তরুণ তাপসকে সন্ধ্যার মন্ত্র ভুলিয়ে দিল। তার্কিক বৈদান্তিক, সাংখ্যযোগী, নৈয়ায়িক ছুটে এলেন তর্কাস্ত্র নিয়ে, 'বেদ-বিরোধী এ শাস্ত্র—অশাস্ত্র, এ সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল।' হৃদয়ে সত্যের বল নিয়ে, যুক্তিনিষ্ঠ বিচার নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল চার্বাক—'এ অশাস্ত্র নয়, বিশ্বমানবের আদি দর্শন, বিশ্বকে সত্য-সুন্দর করে তোলার সাধনা।'

'এ বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে তুলে দেওয়ার কৌশল'—কুটিল ভ্রুকুটি করে উঠলেন যাজক ব্রাহ্মণ : 'এ পাপ, এ অনাচার! অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে তোমায়।'

এ কি অভিশাপ! সত্যি এ কি হল জগতে! চার্বাককে কিভাবে গ্রহণ করল মানুষ! ওগো মানুষ ভাই, এ কি করলে তোমরা? সুখই পুরুষার্থ—কামই সুখ—দর্শনের এই মূল সূত্র দানবধর্মী মানুষকে মাতাল করে তুলল; 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' বাক্যের অনুসরণে ভয়ংকর শোষণ মূর্তি নিয়ে জাগল মহামোহ, মহা-মদ; 'ন স্বর্গো না পবর্গঃ' সূত্রের প্রতি-ক্রিয়ায় বহ্ন্যুৎসব শুরু হল জগতে।

সত্যি শুরু হল বহ্ন্যুৎসব। কামোন্মত্ত, মদান্ধের মত্ততায় কৃষ্ণবর্ত্ম বহ্নির প্রলয়-শিখা প্রজ্জ্বলিত হল। আকাশে সপ্তহেতি সূর্য, সপ্তপোত সাগরে বিভীষণ বড়বা, মর্ত্যের বনে বনে সহস্রজিহ্ব দাবানল। সাগর-মেখলা সুন্দরী ধরণীর শ্যামাঞ্চলে আগুন!

আগুন! আগুন! সর্বগ্রাসী লেলিহ তার রসনা। কুটির থেকে গৃহ, গৃহ থেকে অট্টালিকা জ্বলে উঠল; জ্বলে উঠল পল্লী, নগর, জনপদ, মহাদেশ। অগ্নি-জঠরে চণ্ড ক্ষুধার অগ্নিমান্দ্য। ত্রিলোক গ্রাস করেও ক্ষান্তি নেই, কোটি কোটি আর্ত মানুষের অশ্রু পান করেও তার শান্তি নেই। ক্রন্দনে পূর্ণ ধরণী, তপ্তশ্বাসে বিষাক্ত বাতাস। চতুর্দিকে 'হায় হায়' হাহাকার, চতুর্দিকে অভিশাপ!

অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত চার্বাক। এ অগ্নি তাকেই স্পর্শ করেছে, তারই দেহে লেগেছে এ আগুন। পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটছে সে। তার চারু দেহ চমরীর মত কৃষ্ণবর্ণ, জটিল হয়ে গেছে কুটিল কেশ, নীল নয়নে মরুর মত রুক্ষতা—কণ্ঠে অনন্ত শুষ্কতা। তবু প্রাণপণে চিৎকার করছে সে, 'ওগো মানুষ, ক্ষান্ত হও—শান্ত হও। আমার কথা ভাল করে শোন।'

কেউ তার কথা শোনে না। হুঙ্কারে, গর্জনে, ক্রন্দনে, দীর্ঘশ্বাসে তুমুল কোলাহল। সে কোলাহলে মত্ত তুফানে তুচ্ছ তুলার মত চার্বাকের কথা কোথায় মিলিয়ে যায়। হায় চার্বাক-দর্শনের পরিণাম! হায় কল্যাণী ইচ্ছার দুর্গতি!

ভৈরব মূর্তি নিয়ে অগ্নিভীত চার্বাকের দিকে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসেন রক্তচক্ষু তার্কিক, নৈয়ায়িক। বজ্ররবে গর্জন করে ওঠেন যাজক ব্রাহ্মণঃ

'এ তোমার পাপের ফল! ধ্বংস হও, ধ্বংস হও তুমি!'

'তোমার চতুর্ভূতাত্মক দেহ চতুর্ভূতে বিলীন হক।'

'কামনার আনন্দ, অসূর্যলোকে মৃত্যুতে মোক্ষ লাভ করে চার্বাক।'

প্রচণ্ড বাগ্‌বজ্র। সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্ধ্বে, অধোদেশে লেলিহান অগ্নিশিখা। চার্বাকের চোখে অন্ধকার, মস্তিষ্কে অসহ্য প্রদাহ। ঘোর উন্মাদের মত তবু সে শেষ চেষ্টা করে, প্রলয় বহ্নির মুখে পাগলের মত এসে সে দাঁড়ায়। নিষ্ফল চেষ্টা। আগুন জ্বলে-জ্বলে! তারই স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চার্বাকের দেহে। কম্পিত অঙ্গ, স্খলিত চরণ, ভূমিতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে চার্বাক, যেন ভূমিতলে পড়ে খাণ্ডব দাহে গাণ্ডীব-বিদ্ধ বিহঙ্গম।

সহসা দেখা যায়, সুতীব্র বেগে ছুটে আসছেন সেই স্নেহশীলা যোগিনীর মত এক জননী মূর্তি—রক্তাম্বরা, এলায়িত-কুন্তলা—তাঁর সিঁথায় রক্তসিন্দুর, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে সুদীর্ঘ ত্রিশূল। প্রাণপণে বলছেন তিনি, 'চার্বাককে বাঁচাতে হবে' ঃ তাঁর নয়নে সহস্রধার অশ্রু। তাঁর পশ্চাতে পাগলিনীর মত ছুটে আসছে সেই অস্পৃশ্য নন্দার মত একটি শবর-কন্যা—নবজলদের মত স্নিগ্ধশ্যাম, পরিধানে পর্ণবাস, চিকুরে পিচ্ছচূড়া; তার কণ্ঠেও অমনি একটা দুর্বোধ্য কথা, 'চার্বাককে বাঁচাতে হবে।' তার পিছনে শায়ক-বিদ্ধ পাখির মত ছুটে আসছে দগ্ধ অঙ্গার সদৃশ কঙ্কালসার কোটি মানুষ—তাদেরও দাবি, 'চার্বাককে বাঁচাতে হবে।' ওদের সকলের বেদনাঘন সজল চোখে—অনাগতকালের সুখময় সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন!*

---

* চার্বাকের উল্লেখযোগ্য কোন জীবনী নেই; জনশ্রুতি—চার্বাক দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য। দেবাচার্য বৃহস্পতির উপাখ্যান গৃহীত হয়েছে দেবী পুরাণ (৪/১৩) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (কৃঃ জঃ খঃ ৮০-৮১ অঃ) থেকে। চার্বাক দর্শনের মূল সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য (i) মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ
(ii) History of Philosophy Eastern & Western Vol. I, Chap. vii.
(iii) চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।
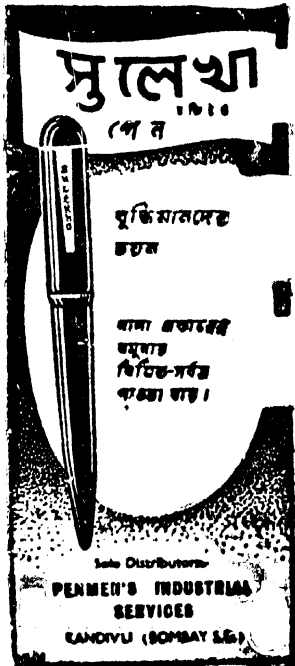
ভাষা একটি নয়, তিনটি; ফরাসী, জর্মন ও ইতালিয়ান। সুতরাং প্রতি সুইসকে এ-তিনটি ভাষাই শিখতে হয়। ফলে এদেশের নাগরিকদের মনে আবাল্য আন্তর্জাতিকতার দিকে একটা সহজ প্রবণতা গড়ে ওঠে ও তাঁদের মন উত্তরোত্তর উদার সহিষ্ণুতার দিকেই ঝোঁকে, আরো এই জন্যে যে নানা দেশের বিপ্লবীরা স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে এদেশে আশ্রয় পান। সবাই জানেন, লেনিন তাঁর বলশেভিসমের প্রচার শুরু করেন এই দেশেই। কিন্তু ইতিহাস থাক, বলি যা বলবার জন্যে এত ভণিতা।

বার্লিনে সে সময়ে জর্মনদের "মরমে গুমরি মরিছে দাহনা শত"। হিটলারের অভ্যুদয় হয়নি বটে, কিন্তু ভার্সেলি সন্ধির প্রতি ব্যাপক আক্রোশবশে জর্মনরা চাপা সুরে গুণগান শুরু করেছে "নর্ডিক" আর্য জাতির যাদের নামকরণ করা হয়েছে Herrenvolk কি না নেতৃক জাতি। অর্থাৎ জর্মনরাই হল স্বধর্মে প্রভু নেশন, জগতের আর সব নেশন স্বধর্মে দাসই বটে। নীটশে, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের দৃষ্টিই শনৈঃ শনৈঃ ওদের এমনতর মনোভাব গড়ে তুলেছিল। জর্মনীতে সে সময়ে নিত্যই ছেলেমেয়েরা সমস্বরে গাইত ওদের জাতীয় সঙ্গীত: Deutschland ueber alles —জর্মনীই সবার উপরে।

এ হেন আবহে আমি [illegible] হয়ে উঠেছিলাম বলেই আরো বেশি [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] এবং এবার [illegible] সম্মুখে [illegible]—তার উপর [illegible] ভারতবর্ষ। আমি ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেস্ট প্রভৃতি নানা শহরে শুরু করলাম ভারতের মহিমা প্রচার করতে—গায়ক হয়ে দাঁড়ালাম বক্তা। এ-সূত্রে একটা লাভ হ'ল এই যে, আমি য়ুরোপের বিশাল রাষ্ট্রটিকে চিনবার সুযোগ পেলাম, শুধু ইংলন্ডকে জানাই যে যথেষ্ট নয়, এই সত্যের পরিচয় পেলাম ইংলন্ড থেকে খানিকটা দূরে এসে তবে।

নানা জায়গায় বক্তৃতা ও গান করে বিদেশীদের মনে কতখানি জ্ঞান বিতরণ করেছিলাম বলতে পারিনে, কিন্তু একথা বলতে পারি যে, নিজে অনেক সম্পদ আহরণ করেছিলাম তাদের প্রীতির আলোয়

তথা দরদের রসধারায়। আমার প্রবাস জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে য়ুরোপ আমার কাছে আর ভৌগোলিক তথ্য রইল না হ'য়ে উঠল জীবন্ত সত্য। অতুলপ্রসাদের গানের ভাষায়ঃ

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই।
সবজন যদি হ'ত আপন
হ'ত না তো আপন সবাই।

কিন্তু উচ্ছ্বাস রেখে বলি আগে—বিশ্বঘরে ঠাঁই পাওয়ার ফলে পর কী ভাবে আমার আপন হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাণী আমার মনে ছিলঃ বিদেশে কীর্তি পাওয়ার মতন প্রমাদ আর নেই। তাই আমি সবসময়ে সজ্ঞানভাবেই চেষ্টা করতাম বিদেশী ও বিদেশিনীর কাছে ভারতের সেইসব ঐশ্বর্যের কথা বলতে যা ওদের নেই—বিশেষ করে আমাদের গান, সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম। ওদের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যখনই আলাপ করতাম, কি বক্তৃতা দিতাম বেশি ঝুঁকতাম [illegible] সঙ্গীতের দিকেই, শুধু এই জন্যেই নয় যে, এ [illegible] ওদের কাছে [illegible] [illegible] পেয়ে।

[illegible] আলাপের দ্বিতীয় উপজীব্য ছিল সংস্কৃত ভাষা। ওদের কাছে আমি বলতামই যে আমার আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যখন সংস্কৃতের নানা ছন্দ আবৃত্তি করে আনন্দ পেয়েছি ও বিতরণ করেছি, তা বলতে পারি না। এ যে পারতাম তার একটি কারণ শৈশবেই পিতৃদেবের কাছে সংস্কৃত উচ্চারণে আমার হাতেখড়ি হয়েছিল, তার উপর জর্মানিতে কণ্ঠসাধনা করে আমার কণ্ঠ এত সুডৌল হয়ে ওঠে যে ওরা আমার শুধু গানে নয়, আবৃত্তিতেও সাড়া দিত সানন্দেই। যাঁরা আমার 'বাল্যস্মৃতি' পড়েছেন তাঁরা খবর পেয়েছেন যে, ভাষা-জগতে আমি 'জন্মভূমি গরীয়সী' বলে মনে করি এই দেবভাষাকেই। তার মানে নয় যে বাংলা ভাষা আমার তেমন প্রিয় নয়। প্রথম শ্বাসের সঙ্গে যে-ভাষার স্মৃতি বিজড়িত, তার প্রাণদা বলদা শক্তিকে কে না সাদরে বরণ করবে? আমার বলবার কথা এই যে, আমার বালকহৃদয়ের 'প্রথম প্রেম'—first love ঘরোয়া বাংলা নয়, রোমান্টিক সংস্কৃত ভাষা। আমি স্বভাবে সব ভাষার গুণগ্রাহী হ'লেও সংস্কৃতের ওজসে ঝঙ্কারে ও বৈচিত্র্যে আমার হৃদয় সবচেয়ে বেশি সহজে সাড়া দেয় আজো। সংস্কৃতের চেয়ে মহত্তর ভাষা যে মানুষ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি, আমার এ-বাল্যবিশ্বাসের মূল আজো একটুও শিথিল হয়নি। তাই যখন আধুনিক উন্মুখর নওজোয়ান ও সর্বজ্ঞ প্রগতি-পন্থীদের মুখে শুনি যে, এ-যুগে সংস্কৃত চর্চা পণ্ডশ্রম, মোক্ষলাভ হয় কেবল বিজ্ঞান পড়ায়—তখন মনের মধ্যে আমার গভীর বিষাদ ঘনিয়ে আসে। কারণ আমি ভারতের গভীর ভাবধারাকে সংস্কৃতের উৎসজ্যোতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবতেও পারি না। কিছুতেই মনে করতে পারি না যে,

আস্তিক আত্মবোধের নিত্যগোমুখী এই দেবভাষার সংগে আমাদের যে নাড়ীর যোগ তাকে বিজ্ঞানের সংগে এক কোপে কাটলেই ভারত আধুনিকতার মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হবে। কিন্তু যা বলছিলাম।

আমার প্রথম য়ুরোপ প্রবাসের এই শেষাধ্যায়ে আমি বিদেশে যেন সংস্কৃত ভাষার মহিমা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বিদেশীর কাছে দেবভাষার নানা উদাত্ত ভাব ছন্দের রসে রসায়িত ক'রে পরিবেশন করতে করতে—বিশেষ ক'রে তোটক উপজাতি, বসন্ততিলক ও অনুষ্টুপের প্রসাদে। সংগে সংগে গাইতাম জয়দেবের সুললিত মাত্রাবৃত্ত, শংকরাচার্যের কাল্লোলিত ভুজংগপ্রয়াত, কালিদাসের মঞ্জুল মন্দাক্রান্তা, ভবভূতির শিখরিণী ও চণ্ডীর স্রগ্ধরা—'করালোত্তুংগ কটাক্ষৈররিকুলভয়দং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখং.....' ইত্যাদি।

এছাড়া গল্পগুজবও চালাতাম বৈ কি—বলতাম মহাভারতের কথা, পঞ্চতন্ত্রের কথা, কালিদাসের কথা, ভবভূতির কথা—সর্বোপরি গীতার কথা। (রামায়ণ আমার কোনোদিন মন টানেনি—শুধু সীতা ও হনুমানের চরিত্র ছাড়া।)

গীতার প্রসংগ এল ভালোই হ'ল। কেননা বলেছি—ওদের সংগে আমি ধর্ম নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা করতাম—গান বা ভাষা নিয়ে আলাপ কতক্ষণ চলে? গীতার বহু শ্লোক আমার কণ্ঠস্থ ছিল, কাজেই কৃষ্ণময় গীতাবাদের কথা মনের মতন ক'রে গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। আমি বলছি না কিন্তু যে, ধর্ম সম্বন্ধে যা যা বলতাম ঠিকই বলতাম। নিশ্চয়ই বহু ভুলচুক হ'ত। কিন্তু তাতে কী? ওরা আমার কাছে পেত তো আমার ভ্রান্তিবিলাস নয়—আমার আনন্দ ও উৎসাহের ছোঁয়াচে ধর্মেরই আনন্দ উৎসাহ আহরণ করত। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবারই হয়েছে যে, অপরকে আমরা শুধু যে প্রেমের চেয়ে বড় কোন দান দিতে পারি না তাই নয়, আমাদের কথালাপের মধ্যে দিয়েও শুধু সেই আলাপেই তাদের মনের পরশ পেতে পারি, যে-আলাপে আমাদের মন সবচেয়ে রসিয়ে ওঠে উচ্ছ্বাসে আবেগে। তাই জন্যেই পুঁজি কম হওয়ার দরুণ আমাকে হাত খাটো করতে হ'ত না—উৎসাহের জাদু জোগাত অফুরন্ত আনন্দের উজ্জ্বলতা আর আমি নিরঙ্কুশ বলে চলতাম ভারতের রাগ-সংগীতের অপরূপ বৈশিষ্ট্যের কথা, সংস্কৃতের অসামান্য গৌরবের কথা, সর্বোপরি ভারতের ধর্মবাণীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমার কথা—যে-মহিমার রসদ জোগাতেন প্রধানত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংসদ।

সেই সময়ে একটি জিনিস লক্ষ্য ক'রে মন আমার প্রায়ই উল্লসিত হ'ত। ভারতের ধর্মজীবনের বাণীতে ওদের বহু জিজ্ঞাসু নরনারীরই মন উঠত দুলে—শুধু স্বামীজীর শিষ্যদেরই নয়, পরমহংসদেবেরই ভক্তদেরও বটে। অনেকেই আমার কাছে বলতেন আক্ষেপ ক'রে যে, য়ুরোপে ধর্ম ও বিশ্বাস মরকত ব'লেই ভারতের কথা শুনতে তাঁদের এত ভালো লাগে যেখানে ধর্ম এখনো জীবন্ত। এমন আক্ষেপও অনেকের মুখে শুনতাম যে, আধুনিক য়ুরোপের আরাধ্য আত্মা নয়, মস্তিষ্ক, তাই য়ুরোপে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা করা এত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেন না মনোজগতে মানুষে মানুষে মিলের চেয়ে

অমিলই বেশি। যদি আন্তর ধর্মকে বনেদ করা হত, তবে মিলের ইমারৎ গড়া ঢের বেশি সুসাধ্য হ'ত—বলতেন তাঁরা।

আমার মন এধরনের কথা শুনে পুলকিত হ'ত আরো এই জন্যে যে, এ-সূত্রে আমি যেন হৃতগৌরব নিরস্ত্র ভারতের অপরাজেয় আত্মার নতুন করে পরিচয় পেতাম—যে-ভারত শত শত বৎসর পরাধীনতার গ্লানিভারে মুহ্যমান হওয়া সত্ত্বেও আজো জন্ম দিতে পারে এমন সব ধর্মাত্মা মহাপুরুষের—যাঁদের কাছাকাছি মহাত্মারও দেখা মেলে না পাশ্চাত্যের ইহসর্বস্ব, বস্তুবাদী আবহে। ওরা বলত, 'আমাদের শেষ ধর্মগুরু টলস্টয়—আর তিনিও আজ য়ুরোপে অনাদৃত। য়ুরোপের উপাস্য এখন তিন শ্রেণীর মানুষঃ বড় শিল্পী, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় রাষ্ট্রপতি। আর এ-ত্রিমূর্তিই সর্বান্তঃকরণে ইহসর্বস্বতার বাণীবাহ তথা পারমার্থিকতার পরিপন্থী'...ইত্যাদি।

উত্তরজীবনে যখন শ্রীঅরবিন্দের কাছে দৃষ্টিদীক্ষা লাভ করি, তখন বারবার মনে পড়ত এইসব য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধবীর কথা, যাঁরা ১৯২২ সালেই প্রায় নিরাশার অথৈ আঁধারে পড়েছিলেন—আজতো সে-নিরাশা প্রায় হতাশায় দাঁড়িয়েছে। নিরাশা কেন? বলি দৃষ্টান্ত দিয়ে।

সুইসানোতে আমার গভীর বন্ধুত্ব হয় একটি বিচিত্র দম্পতীর সঙ্গে—ভ্লাদিয়া ও মার্থা। স্বামী চেক, স্ত্রী ফরাসী। স্বামী মধ্যবিত্ত, স্ত্রী অভিজাত—কাউণ্টেসের দুহিতা। স্বামী আদর্শবাদী, স্ত্রী চিন্তাশীলা। এঁদের জীবন এত বিচিত্র যে, খুলে বলতে গেলে টাল সামলানো শক্ত হবে। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলতে হবে।

ভ্লাদিয়া ছিল আবাল্য আদর্শবাদী—সাহসী। গত যুদ্ধে ও জর্মনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে বন্দী হয়ে মরতে মরতে বেঁচে যায়। সে অনেক কাহিনী। যুদ্ধের পরে চেকরা স্বাধীন হলে ভ্লাদিয়া বড় রাজপদ পায়। লেখার হাত ছিল—উপন্যাস লিখে নামও করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফের জর্মনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে বন্দী হয়। ফরাসী অভিজাত বিদুষীকে ঘরনী ক'রে ওর গৌরবের সীমা ছিল না। পরস্পরকে ওরা গভীরভাবেই ভালোবেসেছিল। মার্থা ভ্লাদিয়ার জন্যে বিলাসবৈভব ছেড়ে আসে এককথায়।

আমি প্রাগে ওদের অতিথি হয়ে সেখানে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বিদ্বৎসমাজে যশস্বী হয়ে উঠি এবং বহু বন্ধুবান্ধবী লাভ করি, যাদের মধ্যে খ্যাতনামা ওরিয়েণ্টালিস্ট লেস্নি (Lesny) ও উইণ্টারনিৎস (Winternizt)এর নাম করতে পারি অসংকোচে—কারণ এঁরা দুজনেই আমাকে স্নেহ করেছিলেন। কিন্তু সে অন্য কথা।

পরে ভ্লাদিয়ার পদোন্নতি হওয়ার ফলে ও প্যারিসে আসে চেক কনসাল হয়ে। সেখানে আমি ফের ওদের অতিথি হই ১৯২৭ সালে—আমার দ্বিতীয় বিদেশ অভিযানে। ১৯২২শে ওদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাই য়ুরোপে ভ্রাম্যমাণ হয়ে। কথা নাস্ এত সুখ আমি জীবনে বড় বেশি পাইনি, আর এ-সুখের প্রধান কারণ—ওদের সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি আলাপ আলোচনা হ'ত ভারতের ধর্ম ও মহাপুরুষদের নিয়ে। মার্থা ও ভ্লাদিয়া ধার্মিক বলতে যা বোঝায় তা ছিল না বটে, কিন্তু ধর্মে দুজনাই শ্রদ্ধাবান ছিল। ভ্লাদিয়ার সঙ্গে মার্থার তফাত ছিল প্রধানত এইখানে যে, ভ্লাদিয়া ছিল স্বভাবে বিশ্বাসী, মার্থা সংশয়ী। সংশয়ী কিন্তু অবিশ্বাসী নয়। আমাকে ও প্রায়ই শোনাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইবেলে খৃস্টের বাণী—ফরাসী ভাষায়। একে খৃস্টের বাণী তার উপরে কমনীয়া মার্থার রমণীয় উদাহরণ—কী ভালো যে আমার লাগত ওলগার কাছে বাইবেলের প্রথম পাঠ নিয়ে আমার লাভ হয়েছিল কম নয়—কারণ আমি বাইবেলের নানা প্রসঙ্গে মার্থার সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারতাম সমান তালে। কিন্তু বাইবেল আমার ভালো

লাগলেও আমার কাছে বেদবাক্য ছিল কৃষ্ণের গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত। তাই আমিই বেশি বলতাম, শুনতাম কম, ওরা শুনত বেশি বলত কম। হয়ত এর একটা কারণ—ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতে ধর্ম নিয়ে চর্চা য়ুরোপের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে তাই ধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ভারতের কাছ থেকে শোনবার আছে অনেক কিছুই। কারণ যাই হোক, ওদের সংস্পর্শে এসে আমি দেখতে দেখতে প্রায় বাগ্মী হয়ে উঠেছিলাম। ভ্যান্দিয়া মাঝে মাঝেই হেসে বলত, "Je veux repondre pour Dilip: menestrel plus messie" 'এই বয়সেই বক্তা, পরে না জানি কী দাঁড়াবে?' মার্থা মৃদু হেসে বলত, অর্থাৎ 'আমি দিলীপের হয়ে বলছি, গায়ক তথা ধর্মপ্রচারক।' কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুলি আসল কথাটা।

বলেছি মার্থা বিশ্বাসী হ'লেও সংশয়কে শুভ বলেই মানত। তাই গীতার 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' কথার ঘোর আপত্তি করত। বলত প্রায়ই যে সংশয়ের মধ্যে দিয়ে যে যায়নি, তার বিশ্বাস পাকাই হয়নি। ভ্যান্দিয়া আপত্তি ক'রে বলত, 'যাও যাও। সংশয় সর্বনেশে—বিশ্বাসেই মুক্তি—খৃষ্টও কি বলেননি একথা? বলেননি—বিশ্বাসে পাহাড় টলানো যায়—জলে হাঁটা যায়?' মার্থা রাগ করে বলত, 'রেখে দাও। খৃষ্টের মুখে যে-বাণী প্রাণ জাগায়, তোমার আমার মুখে তা লোক হাসায় মনে রেখো।' তাছাড়া সে যুগে যা সত্য ছিল, এ-যুগে তা অসত্য হ'তেও তো পারে।' এতে আমি টুকতাম এই বলে যে, সত্যের দুটো থাক আছে—আচারগত সত্য ও উপলব্ধিগম্য সত্য। প্রথমটার রকমফের হ'তে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টা শাশ্বত। যেমন গীতার চতুর্বর্ণ—সে সময়ে ওটা সত্য ছিল, আজ আর নেই। কিন্তু কর্ম নিষ্কাম না হ'লে অশান্তি আসবেই আর 'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্' এ হল শাশ্বত সত্য।" এই ধরনের সোৎসাহ কথা কাটাকাটি চলত আমাদের মধ্যে প্রায়ই। সে-আনন্দ কি ভুলবার—সাধের বাগ ধর্মের তান? কিন্তু এবার বলি য়ুরোপের নিরাশার কথা—যে জন্যে ওদের প্রসঙ্গ পাড়া।

মার্থা শিশুকালে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর খৃষ্টে বিশ্বাস না কমলেও ধর্ম সম্বন্ধে সংশয় আসে একটু একটু করে। এর জন্যে ওর মনঃকষ্টের অবধি ছিল না, বলত আমাকে প্রায়ই: 'সময়ে সময়ে আমার মনে হয় দিলীপ যে ভ্যান্দিয়া ভুল বলেনি—সংশয়কে প্রশ্রয় দিয়ে আমার মন খুঁটি হারিয়ে ফেলবার মতো হয়েছে। অথচ ওর মতন খৃষ্টবিশ্বাসী হ'তেও যে বাধে—করি কী?" এর উত্তরে আমি ওকে বিশ্বাসের স্বপক্ষে কিছু বলতে গেলেই ও করুণ ভাবে মাথা নেড়ে বলত যে, এসব কথায় ওর প্রাণ আর সাড়া দেয় না—বিশেষ করে গত যুদ্ধের পর থেকে। বলত প্রায়ই—মনে আছে: 'আমরা ছেলেবেলায় ভাবতাম যুদ্ধবিগ্রহের দিন গত, * মানুষ আজ পুরোপুরি সভ্য না হ'লেও এতটা বুদ্ধি ধরে যে গায়ের জোর জাহির করতে লজ্জা পায়। কিন্তু আজ? যুদ্ধে শুধু যে লক্ষ লক্ষ লোক হতাহত হয়েছে তাই নয়, তার চতুর্গুণ লোক ভগবানেও বিশ্বাস হারিয়ে নাস্তিক্যের ঝাণ্ডা উত্তোলন শুরু করেছে। তাই খৃষ্ট দেবকল্প মহাপুরুষ ছিলেন মেনেও তাঁর বিশ্বাস-কল্পনায় দোয়ার দিতে পারি না আর। আর এই যদি হয় একটি মহাযুদ্ধের পরিণাম, তাহ'লে কল্পনা করো—আগামী মহত্তর যুদ্ধের ফল কী দাঁড়াবে! আজ মানুষের মনুষ্যত্ব বিশ্বাসেই যে আগুন ধরেছে। আমার মনে আজ কেবলই এই দারুণ প্রশ্নটি হানা দেয়, দিলীপ, যে, মানুষে বিশ্বাস হারালে ভগবানে বিশ্বাস টিকবে কি? এরি মধ্যে দেখ কী হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা আমাদের ছেলেবেলায় তবু বাইবেলে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এ-যুগের মানুষের যেন সে-খুঁটিও নেই আর। অন্তত বাইবেলের সৃষ্টি যে অভ্রান্ত একথা ভাবুকদের মধ্যে আজ বড় একটা কেউ মানেন না। তবে? আমাদের সন্তানদের আমরা কী শিক্ষা দেব শুনি? কী মূল বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে আজ তারা? খৃষ্ট-দেবের একটি কথা আজও সমান সত্য আছে বলে আমার মনে হয়, যাকে তুমি বলছ চিরন্তন, সেটি এই যে মানুষ শুধু রুটিজীবী নয়, বাঁচতে হ'লে তার ধর্মও চাই, জ্ঞানও চাই, আরো অনেক কিছুই চাই। কিন্তু আমরা কি সত্যি একথা [illegible] মুখে বলি, আমরা একেশ্বরবাদী আলোক-পন্থী, অন্য সব জাত পৌত্তলিক, কুসংস্কারে ভরা।' বলে হেসে বলত, 'সাধে কি রাসেল সেদিন [illegible] বলেছিলেন ব্যঙ্গ করে যে, বাইবেলের কেবল একটি উপদেশে তিনি বিশ্বাস করেন শয়তান। আমাদের সবাই যে আজ [illegible] চালাচ্ছে—জর্মনী ফের সৈন্য ও শস্ত্র গড়ে তুলছে—জানো তো। বলছে—আগামী যুদ্ধে দেখিয়ে দেবে বড় কোন্ জাত Herrenvolk।"

(ক্রমশঃ)

* চার্চিলের আত্মজীবনী "My Early Life" ও Stepan Zweig-এর "All Yesterdays" পড়লে দেখা যায় প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের আগে য়ুরোপের মনীষীরা কীভাবে একবাক্যে বলা শুরু করেছিলেন যে জগতে কোনো বড়গোছের যুদ্ধ হবার দিন গত—কাজেই মানুষের প্রগতি অবশ্যম্ভাবী।

বাঁশের কাজ

উপযুক্ত হত না। কয়েক বছর আগে পার্ক দ্য বাগাতেল মনোনীত হয়েছিল এই প্রদর্শনীর জন্য। এ-সালের প্রদর্শনীর পক্ষে ঐ স্থানটি সত্যিই চমৎকার। সেখানে বাগানের সবুজ রঙের মধ্যে মডার্নিস্টিক ভাস্কর্যগুলি সত্যিই বেশ খুলেছিল। আশেপাশের কোনও শিল্প-কর্মের সঙ্গে এগুলির তুলনা করা যায়নি। কিন্তু রদাঁ মিউজিয়াম-এর বাগানে অষ্টাদশ শতকের স্থাপত্য শিল্পের মাস্টারপিস হোটেল বীরোঁ এবং রদাঁর ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে এসব নিদর্শনগুলি তুলনায় এসে যায়। আধুনিক ভাস্কর্য অ্যাবস্ট্রাক্ট, বিকৃত এবং কিম্ভুতকিমাকার সেজন্যে ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পকর্মের সঙ্গে এদের তুলনা ক্ষতিকর।

এ বছরের কাজ দেখে মনে হয়, শিল্পীরা ভাস্কর বলে স্বীকৃতি পাবার শেষ সীমানায় এসে পৌঁচেছেন। এঁরা কোনও মতামত বা প্রথা ধরে রচনা করছেন না। এঁরা নিয়মানুবর্তিতার ধার ধারেন না। এঁদের কাজে চরম বিশৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়।

এগুলির পাশে হোটেল বীরোঁ, ফরাসী উদ্যান এবং রদাঁর মাস্টারপিসগুলি অতুলনীয়। কিম্ভুতকিমাকার এবং বস্তু-নিরপেক্ষ ধরনের কাজের সংখ্যা বেশী থাকলেও কয়েকটি সত্যিই চমৎকার ভাস্কর্য নজরে পড়েছে এ-প্রদর্শনীতে। এসব কাজগুলি যাঁরা করেছেন, তাঁদের সকলেরই 'যুব শিল্পী' দলে ভেড়বার মত বয়স আর নেই। কিন্তু যেহেতু এঁরা হয় এই প্রদর্শনীর ফাউণ্ডার মেম্বার অথবা পরিচালক সমিতির সভ্য, এঁদের সকলেরই এ-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করার অধিকার আছে। সেই কারণে ৪০।৫০ বছর বয়সের প্রবীণ শিল্পী, যাঁরা প্রথাগত ধারায় শিল্প শিক্ষা করলেও মেজাজে আধুনিক, তাঁদের শিল্পকলাও দেখা গেছে এ-প্রদর্শনীতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন লুই লেজ, জোসে রিভিয়ের, রায়ো জেলা, মারুস জীলী রেকাসালদো, ভোলতী এবং রায়ো' লাভুরনা। বাকি কয়েকজনের অনুপস্থিতি আপসোসের বিষয়। বিশেষ করে অনুভব করা গেছে কুতিরিয়া-র অনুপস্থিতি।

পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ডকোস্ট অঞ্চলের বন্দর আবিজ্জান থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন লুই লেজ। সভ্যতা এবং আধুনিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে আফ্রিকার এ অঞ্চল ফ্রান্সের সাহায্যে কয়েক বছরের মধ্যেই। যেসব স্থাপত্য শিল্পী এবং সুকুমার শিল্পী সেখানে কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে লুই লেজ অন্যতম। লুই লেজ সেখানে তিনটি স্মৃতিস্তম্ভ অলংকরণের ভার নিয়েছেন। এঁর ভাস্কর্যে সামগ্রিকভাবে প্রাচ্য ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছে। দি সিসিলিয়ান উওম্যান মূর্তিটির সুন্দর এবং দৃঢ় অবয়ব বাহু বেষ্টনীর মধ্যে যে ভঙ্গিতে রক্ষিত হয়েছে, তা কিউবিস্ট ধারার চমৎকার নিদর্শন।

জোসে রিভিয়ের-এর সিম্বলিজম্ প্রকাশ পেয়েছে তার লাসেভ রচনা থেকে। এ-রচনায় একটি নারী মূর্তির সঙ্গে একটি গাছের ডালের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

রায়ো জেলা নির্মাণ করেছেন সৃষ্টি না বলে নির্মাণ করাই বলা ঠিক। তাঁর শোচনীয় 'জব'। সংকুচিত একটি মনুষ্য মূর্তি কাঁধ খাড়া করে স্বর্গের বাণী শুনেছে। মারুস জীলীর 'গার্ল উইথ-এ বেবী' রচনায় ফলের ওপরে নারীর আবরণ চমৎকারভাবে ফুটেছে। ভোলতীর ভারী কম্পোজিশন-এ নারী আকৃতিকে ভল্যুম-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। রায়ো গোর্দিনের 'বিষয়বস্তু' ভোলতীর মতনই, কিন্তু এঁর রচনা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং অনেক মাপজোখ করা। জাকী রেকাসালদোর 'ডেথ অব এ সোয়ান' শক্তি এবং মাধুর্যের প্রতীক।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা ফিলিপ অসেলীর 'নাদা', ভালসামীর 'দি ফিসার ম্যান', ওয়েং আরাস'-র 'দি ইয়াং মাদার', মারশে পিয়ের বোদা-র 'দি ফাইটার্স', ফ্রাঁকীলিন বেজের 'টরসো', ফ্রাঁকলিন দেম-এর 'দি কাপল', এসথা গোরবাডো-র 'বাস্ট', মারশে ও'-র 'ম্যাটারনিটি', লিওপোল্ড ক্রেৎস-এর অত্যন্ত অল্প কারিগরীর সাহায্যে কালো ব্রোঞ্জে রচিত দুটি যুবতীর নিদর্শন, ইয়াসুসো মাঁজীর আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত 'দ পাগোডা', জাঁ মালেথারলা-র 'ম্যান অ্যাম্পীপ', শানা অরলফ-এর 'দ বার্ড', জেনেভিয়ের জাঁর 'টরসো' এবং জেরা কর 'এ গেম অব ব্যালেন্স।' শেষোক্ত মূর্তিটিতে অদ্ভুত রকম একটা সক্রিয় শক্তি অনুভব করা যায়।
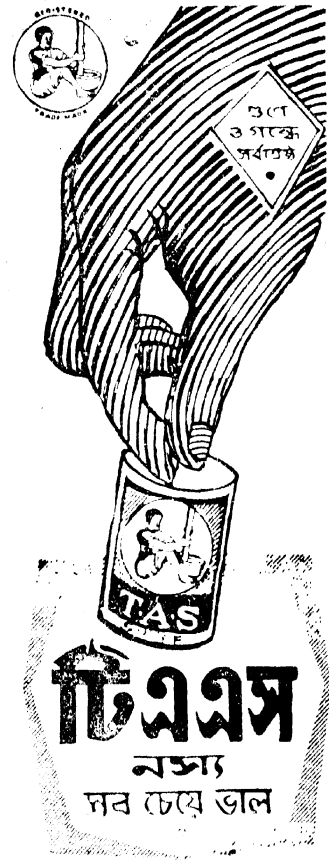
ট্রামে-বাসে

কেন্দ্রের নূতন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল বলিয়াছেন, তিনি খাদ্য ব্যাপারে একটি নূতন নির্দিষ্ট নীতি প্রবর্তন করিবেন।—"এবারে তাহলে বোঝা

যাবে উপুড় হবে, না পাল্টা হবে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • • •
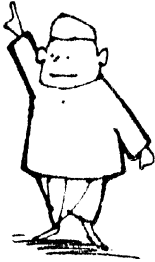
কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। বেতন কমিশন অফিসার গ্রহণের বয়স আটাশ বৎসর ধার্য করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।—"খুব ভুল করেছেন। আমরা আশা করেছিলাম, ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে পঞ্চাশ পেরুলেই বানপ্রস্থের প্রশস্ত সময় বলে সুপারিশ করা হবে। ঐতিহ্য রক্ষা হবে, সরকারী টাকাও বাঁচবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বানপ্রস্থের প্রসঙ্গেই একটি সংবাদ শিরোনামা পাঠ করিলাম—"আইসেনহাওয়ারের বন গমন"। শুনে বোধ হয় প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিলাম। এমন সময় এক সহযাত্রী বুঝাইয়া বলিলেন—"এ বন সে বন নয়, পশ্চিম জার্মানীর শহর বন"—অশ্রুবিন্দুর নিঃসরণ রোধিলাম।

• • •

অন্য একটি সংবাদ শিরোনামা পাঠ করিলাম—"পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কয়লার সন্ধান, বাঙালী যুবকদের কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা"।—"উজ্জ্বলতার কথা ভাবতে পারছি না কেননা আমরা জানি, শতধৌতেন কয়লার মলিনতা যায় না। তাছাড়া, যারা কলকাতায় কেরানী কর্মটিরে কোণ-ঠাসা হয়ে নির্বুদ্ধিতা, আর বড়জোড়ার ওপর ভরসা করা শক্ত"—মন্তব্য করিলেন জনৈক যুবক সহযাত্রী।

* * *

জনৈক বৃটিশ বিজ্ঞানী ঘোষণা করিয়াছেন যে, মাত্র আট আউন্স ওজনের একটি বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঠিকমত বণ্টন করা হইলে ইহা দ্বারা নাকি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের ধ্বংস করা সম্ভব হইবে। শ্যামলাল বলিল—"ঠিক আছে। আবিষ্কর্তা নিজে বেঁচে যাবেন তো? তা হলেই হলো"!!

• • •

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ মার্টিন নরসিংহান নাকি বানরের ভাষা লইয়া গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।—"ডাঃ নরসিংহানের গবেষণা সফল হলে পৃথিবীর উপকার হবে; মানুষ বর্তমানে বানরের

ভাষাতেই কথা বলে কিনা, তাই"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

রেল দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীশাহনওয়াজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, শীঘ্রই শব্দহীন ট্রেন চালু করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।—"আওয়াজহীন ট্রেনের অবস্থা কার্যকরী হওয়া অসম্ভব নয়, যখন বলেছেন স্বয়ং না-আওয়াজ। তবে ট্রেন শব্দহীন হলেও দপ্তরের ঢক্কা [illegible] না [illegible], ট্রেন চালু রাখার ঐ একমাত্র পথ"!!

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম, সুন্দরবনে পেট্রোলের আবিষ্কার হইয়াছে।—"এবার [illegible] মাতে উর্বশীর অভিশাপের দিন [illegible]"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

নিউ ইয়র্কের হাডসন নদী অনুষ্ঠানে জল ঢালিবার জন্য কিছু গঙ্গাজলও ভারত হইতে প্রেরণ করা হইয়াছে।—"মা গঙ্গা দূরে পাড়ি দিলেন! কিন্তু ভাবছি, ভলগা আর ইয়াংসিকিয়াং-এর জল না হলে কি অনুষ্ঠান পূর্ণ হবে?"—বলে আমাদের শ্যামলাল

* * *

আমেরিকার পুরুষেরা নাকি অকস্মাৎ চুলের কলপ, পরচুলা ও নকল দাড়িগোঁফের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।—"আকর্ষণটা খ্রুশ্চেভের আসন্ন

আমেরিকা পরিদর্শন ঘোষণার পর হয়েছে কিনা জানিনে। কিন্তু মেক্-আপের প্রয়োজন নেই; আইসেনহাওয়ার আর খ্রুশ্চেভ দুজনেই ইন্দ্রলুপ্ত"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

কলিকাতায় আই এফ এ শীল্ড খেলা শুরু হইয়াছে।—"সুতরাং অচিরেই স্টেডিয়াম সম্বন্ধে প্রলাপ ও অপলাপ দুই-ই শুরু হবে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

কেশরাশি
কি ক'রে
সুন্দর হ'ল • • •
পঁচিশ বছর ধ'রে মায়েরা ব'লে আসছেন, তাঁদের
চুল কেমন করে সুন্দর হ'ল···বলে আসছেন তাঁদের
মেয়েদের টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা···
মিষ্টি গন্ধের আমেজ ভরা খাঁটি নারকেল তেল···যেমন
হালকা তেমনি চমৎকার···যা মায়ের মতো মেয়েরও
উজ্জল ও দীঘল কেশগুচ্ছের অনুপম সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবে।
টাটা-র সুবাসিত
নারিকেল কেশতৈল
দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড
Tata's
Perfumed
HAIR OIL
COCONUT

'পাঠ্যার্থীদের মানসপ্রবণতা ও ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী' সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনাকে সার্থকভাবে রসোত্তীর্ণ করেছেন। বিশেষ করে 'বাঙলা সাহিত্যের কৈশোর, বাঙলা সাহিত্যের যৌবন, কাব্য ও কবিতা, রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি অধ্যায়গুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। এই গ্রন্থের বিশিষ্ট মৌলিকতার স্বপক্ষে ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন, "রবীন্দ্রসাহিত্যে যাতে অধিকার ও অনুরাগ জন্মে, সেই উদ্দেশ্যে তাঁর অনন্যপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত, সহজ অথচ সামগ্রিক পর্যালোচনা করেছি'—কিন্তু পরিমিত স্থানের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিপুণভাবে বিশ্লেষণে যত্নবান হলেও আমাদের মনে হয় প্রসংগটিকে তিনি এক নিঃশ্বাসে বলতে গিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপী-করণ করেছেন; রবীন্দ্র-প্রতিভার রস-স্বরূপ সম্পর্কে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করলে তিনি ভুল করতেন না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাটক, ছোট গল্প, শিশুসাহিত্য অনুচ্ছেদগুলি আর-একটু আন্তরিকতার প্রত্যাশা করে। বর্তমান গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কাজে আসবে। সাধারণ সাহিত্য-পাঠকও এ থেকে উপকার ও আনন্দ পেতে পারেন। ২৫৩।৫৯,

কবিতা

ক'টি কবিতা ও একলব্য—শ্রীমংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড, ১২, বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—৫৮। দাম দু'টাকা।

সাহিত্য ও সাহিত্যিককে বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী হিসেবে গোষ্ঠীবদ্ধ করার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু মতামত প্রচলিত আছে। তথাপি শ্রীমংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে তথাকথিত বামপন্থী সাহিত্যিক-দেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু কবির কাব্য আলোচনায় পক্ষপাতিত্বপূর্ণ গোষ্ঠী-চিন্তাকে অবান্তর মনে করি। শ্রীমংগলাচরণের এই কাব্যগ্রন্থেও তাঁর খ্যাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। কবির আন্তরিকতা এবং সাধারণ জীবনের দুঃখ-দুর্দশাজনিত একটা যন্ত্রণা প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই ছড়িয়ে আছে। ছন্দবৈচিত্র্যে, শব্দ-ব্যবহারের নৈপুণ্যে, কথাচিত্রের পরি-স্ফুটনে কবি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বুক ধুকপুকে', 'উস্কোখুস্কো চুল' শব্দ-সমূহের নিপুণ প্রয়োগশক্তি যেমন স্বীকার্য, তেমনি অনস্বীকার্য তাঁর চিত্রনির্মাণ-শক্তি। যেমন—

"সন্ধ্যেটা খানিক বুঝি প্রতীক্ষায়
কনে-দেখা-আলো
অন্ধকারে অন্ধ তারপর" (এ-জমি)

নানা কারণে কবির মন কলিকাতাকেন্দ্রিক। তবু পল্লীর মানুষ ও মাঠ সম্পর্কে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন—"এমন মানব-জমি
এ-জমি আবাদ করবে সে কোন্ কৃষক!"
(এ-জমি)

এসব সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য-সম্পদ সম্পর্কে অভিযোগ আছে। তাঁর কবিতায় যেমন গভীরতার অভাব, তেমনি অনেক কবিতার বক্তব্য একই আবর্তে আবর্তিত। বারবার একই সুরে মা, ছেলে এবং বাঙলা মার মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার মোহ কবি ত্যাগ করতে পারেন নি। ছন্দ-সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে ছন্দের ত্রুটিও স্থানে স্থানে আমাদের কানে বেসুরো বেজেছে। 'জননী যন্ত্রণা' কবিতার নবম পংক্তি থেকে দ্বাদশ পংক্তি পাঠ করলেই সে-ত্রুটি ধরা যায়। কাব্যগ্রন্থের শেষাংশে ২৩ পাতা-ব্যাপী 'একলব্য' নামে একটি কাব্যনাট্য আছে। বহুকাল আগে মূলত একলব্য ও দ্রোণকে কেন্দ্র করেই গৈরিশ ছন্দে লেখা 'গুরু দক্ষিণা' নাটকটি বাঙলা সাহিত্যে আলোড়ন এনেছিল। সেই নাটকের মূল সুরের সহিত এই কাব্যনাট্যের বেশ মিল থাকলেও শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের হাতে শেষের কয়েকটি পংক্তি জীবনের জয়গানে মুখরিত। বাঁধাই ভালো। খালেদ চৌধুরী অংকিত প্রচ্ছদপট সুরুচিসম্পন্ন। ১৯৪।৫৯

পূজা সাহিত্য

রাক্ষস-খোক্কস—প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা ৯, দাম তিন টাকা।

শিশুরা রূপকথার গল্প যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসে রাক্ষস-খোক্কসের গল্প। মানুষমাত্রই শৈশব কালে কল্পনার রাজ্যে তাদের মনের খোরাক খুঁজে বেড়ায়। যতই বয়সে বাড়তে থাকে, বাস্তবের মুখো-মুখি যখন হয়, তখন কল্পনার সে-রাজ্য আর তার রাজপুত্র আর রাজকন্যা চিরকালের জন্য বিদায় নেয়। শিশু চরিত্রের আরেকটি দিক হচ্ছে সে ভয় পেতে ভালবাসে, ভয় কে জয় করতে পারার মধ্যেই তার চরম আনন্দ। সেই কারণেই রাক্ষস-খোক্কসের কল্পিত-কাহিনী তাদের বড় প্রিয়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশের শিশু-সাহিত্যের একটি বড় অংশ সৃষ্টি হয়েছে, এইসব দানব-দৈত্য আর রাক্ষস-খোক্কসের গল্প নিয়ে। খুবই আনন্দের কথা, দেব-সাহিত্য কুটীর এবছরে কিশোরদের পূজোর উপহার দিয়েছেন এই রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী সংকলন প্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতের রাক্ষস নিয়ে আঠারটি গল্প আছে এই সংকলনে, প্রত্যেকটি গল্পই রঙিন ও এক-রঙা চিত্রে অলংকৃত। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"যে-মানুষের মধ্যে রাক্ষস আছে, সেই মানুষের ভিতরেই আছে দেবতা। দেবতা আর রাক্ষসে আজও চলেছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এবং মানুষ বিশ্বাস করে দেবতাই হবে জয়ী।" আশা করি, এ গ্রন্থ পাঠে শিশু মনেও সে-বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে।"

উপন্যাস

মোদের বিশ্ব—অমর নন্দী। নবরূপ, কলেজ স্কোয়ার। ২, টাকা।

লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের যে সব চরিত্র তিনি এই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন, তাদের নিজ নিজ দেশের যে নাম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ। উপন্যাসটির সম্পূর্ণাংশ প্রকাশ না করে তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র প্রকাশ করেছেন, একথাও জানিয়েছেন। প্রশ্ন জাগে, এ গ্রন্থটি না লিখলে কি বাংলা সাহিত্যের খুব ক্ষতি হত। বাংলা সাহিত্যের আজও এমন দৈন্য-দশা হয়নি; সুসাহিত্যিকেরও অভাব নেই। তবে কেন এই অক্ষম উপন্যাস রচনার প্রয়াস? তাছাড়া লেখকের নামের পাশে 'অশিক্ষিত' কথাটি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সম্বন্ধে, প্রথমেই অশ্রদ্ধা জাগায়। প্রচ্ছদটি ইস্কুলপাঠ্য ভূগোলের মতো।

২০০/৫৯

বিবিধ

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণিকা (১৩৬৬)—বাংলা ও ইংরেজী বিভাগের সম্পাদনায় যথাক্রমে—শ্রীজ্যোৎস্নাময় চৌধুরী এবং শ্রীশিবনাথ চৌবে। শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতিঃ ৬ মুরলীধর সেন লেন। কলি-৭।

১·৫০+১·৫০ নঃ পঃ

বাংলা বিভাগে লিখেছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দেবজ্যোতি বর্মন, কালিদাস রায় ও অতুল গুপ্ত প্রভৃতি। ইংরেজীতে লিখেছেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, এন সি চ্যাটার্জি, স্বামী ভাস্করানন্দ, শ্রীধর্মবীর প্রভৃতি অনেকেই। এ ছাড়া শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা, রচনা ও চিঠি প্রভৃতি উদ্ধৃত হয়েছে। অধিকাংশ রচনায় দ্রুততার লক্ষণ এবং উদ্দেশ্য প্রচারের প্রাধান্য দেখা যায়।

শ্যামাপ্রসাদের উদ্দেশে কবিতাগুলিও আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ। এই শ্রেণীর সংকলনে আমরা সর্বকালের সর্বজনীন আবেদনই আশা করবো। তাহলেই শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব চিরন্তন হয়ে থাকবে।

২৫২/৫৯

কিশোর চাষীর আপন কথা—অশোক ভাই। বাণী বিতান, ৪৯।১ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-৯। দামঃ ১৸০।

ফসলের রোগ ও তার প্রতিকার—সতীকুমার নাগ। ৯বি, নেবুতলা রো, কলিকাতা-১২। ৭৫ নঃ পঃ

ভালো চাষের জন্য চাই চাষীর কর্মদক্ষতা। কখন কী ভাবে চাষ করতে, কী সার দিতে, কোন মাসে কী ফসল ফলাতে হবে এসব তথ্যই অশোক ভাই দিয়েছেন। মনে হয় লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রচুর।

দ্বিতীয় বইটিতে ফসলের রোগ, কীট-পতঙ্গের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষার উপায়, রোগের প্রতিকার সম্পর্কে সতীকুমার নাগ মূল্যবান আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি বিশেষভাবে সদ্য সাক্ষর বয়স্কদের জন্য লিখিত। তারা এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হবেন।

৭৩৮/৫৬, ৫৬৮/৫৮

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রশ্ন ও উত্তর—পাবলিকেশনস্ ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া। মূল্য ৪০ নয়া পয়সা।

বর্তমান পুস্তিকাটিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাঙলা ভাষায় ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত বিশেষ তথ্যাদির বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জাতীয় অর্থব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে দেশের উৎপাদন ক্ষমতার বিশেষ উন্নতি সাধন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে কেন্দ্র করে প্রশ্নোত্তরে এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উৎসাহী পাঠকসাধারণের নিকট তুলে ধরা হয়েছে। অল্পমূল্যে এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশের সার্থকতা আছে এবং পরিকল্পনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ ও ছাত্রসমাজ এ থেকে কিছু উপকৃত হবেন আশা করা যায়। আলোচ্য পুস্তিকাটির প্রারম্ভেই বড় হরফে শিরোনামার মুদ্রণ-প্রমাদ চোখকে অত্যন্ত পীড়িত করে।

২৯৭।৫৯,

পল্লীবোধন—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য। 'সমাধি মঠ', পোঃ ভূপালপুর, জেলাঃ পশ্চিম দিনাজপুর। দাম ৪৲।

'পল্লীবাসী ভারতবাসী কবে রাণা প্রতাপের শিষ্য হইবে' এই আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে লেখক পৃথকভাবে নয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। প্রস্তাবগুলি উত্থাপনকালে লেখক বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উদ্ধৃতি ও পরিসংখ্যার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষার সমস্যাই ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এইসব বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে লেখকের মতে পল্লীবোধনে সাধকের প্রয়োজন।

লেখক এই পুস্তকে নিজস্ব চিন্তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু পর পর দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কতখানি সাফল্য আমরা অর্জন করেছি তা তুলনামূলকভাবে যে কোনো পাঠকই বিচার করতে চাইবেন। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করার পর ততখানি ধৈর্য কি সাধারণ পাঠকের থাকবে? তাছাড়া, গ্রন্থটি সাধারণের উপযোগী করে লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবু একথা অস্বীকার করা উচিত নয় যে, লেখক অনেক স্থলে পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি, সৎসাহস ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন; আর এখানেই গ্রন্থখানির যা কিছু মূল্য।

৪১৫।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

রাগ কাঁদি (১ম খণ্ড)—শ্রীপরমেশ সিংহ।
সাহিত্য ও পাঠক—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য।
আমরাও হতে পারি রেডিও বিশারদ—জ্যোতির্ময় দে।
বিশ্বমানবের কাহিনী—শ্রীহরিপদ ঘোষাল।
রবীন্দ্র হৃদয়—শ্রীবেণু মিত্র।
শিক্ষক শিক্ষণ প্রবোধিকা—বিমল দাশগুপ্ত।
স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
মিলিত সংলাপ—অরুণ ভট্টাচার্য।
মায়াপুরী (ছোটদের নৃত্যনাট্য)—স্বপন বুড়ো।
শালবনের কান্না—হীরেন কুণ্ডু।
হেড মাস্টার—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
প্রথম দশজন (স্কুল ফাইন্যাল—১৯৫৯)।

পৃথিবীর বর্তমান হালচালের ওপর অনেকে অনেক কারণেই বীতশ্রদ্ধ হতে পারে এবং অবাঞ্ছিতের স্পর্শ ও প্রভাব থেকে নিজেকে বা নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় নিজের মনোমত উপায় অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু মেক্সিকোর মতো অতি আধুনিক শহরে রাফায়েল পেরেজ হার্নান্ডেজ তার পরিবারকে যেভাবে আড়াল করে রেখে আসছিল গত পনের বছর ধরে তার সঙ্গে আদিকালের মানুষের জীবনধারণ রীতিরই তুলনা করতে হয়।

স্ত্রী ও দুটি সন্তানসহ রাফায়েল বাস করছিল একটা বড় অন্ধকার কুঠরিতে যার চতুর্দিকে দুর্গন্ধময় পাঁকভরা নালা। ঘরে আসবাব বাসনপত্র বলতে একটার ওপর একটা টেবিল বসিয়ে শোবার জন্য ডবল-ডেকার বার্থ, রাঁধবার জন্য মাটির দুটো পাত্র, খানকয়েক প্লেট। বাথরুম বলতে দেওয়ালে একটা বড় গর্ত। আর আলো বলতে মোমবাতি জেলে যেটুকু হয়। ইঁদুর মারার বিষ তৈরী করে বিক্রী করা ছিল রাফায়েলের পেশা। এই অবস্থাতেই পরিবারটির আরো কতোদিন অতিবাহিত হতো বলা যায় না যদি না দৈবক্রমে আগে ব্যাপারটা পুলিসের গোচরে আসতো। একটি ছেলে একদিন ঐ ঘরের ধার দিয়ে যেতে একটা চিরকুট পায়, তাতে লেখা "বিচারপতি মহাশয়, দয়া করে আমাদের আপনার কাছে নিয়ে যান।" ছেলেটি চিরকুটটির সেখার কোন অর্থ করতে না পেরে তার অফিসের মালিকের হাতে দেয় এবং তিনি সেটা নিয়ে থানায় হাজির হন। পুলিসের লোক এসে বস্তির সামনের লোহার দরজায় ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে মেয়েলি গলায় জানতে চাওয়া হয় যে ওদের বিচারপতি পাঠিয়েছেন কিনা এবং পুলিসের লোক শুনে বলে যে, তাদের বাবা বাইরে গিয়েছেন এবং এসে পড়লে ওদের খুন করে ফেলবে। পুলিসের লোক দুজন পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে অপেক্ষা করতে থাকে এবং রাফায়েল আসতে সবাইকে নিয়ে থানায় উপস্থিত হয়।

পুলিসের কাছে প্রকাশ পেল, রাফায়েল এক বদমেজাজী ক্ষেপাটে লোক, ট্রেন দুর্ঘটনায় বাঁ হাতটি খুইয়েছে এবং ঈশ্বরই হোক, চিকিৎসকই হোক বা অন্য কোন-কিছুতেই তার কোন বিশ্বাস নেই। প্রথম সন্তানের সে নাম রাখে 'সন অফ দি সান' এবং শিশুটি উদরাময়ে আক্রান্ত হতে স্ত্রীকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে বলে। ফলে সূর্যতনয়ের মৃত্যু হয়। এক বছর পর তার দ্বিতীয় সন্তান ইভল্যুশন-অফ-দি-ওয়ার্ল্ডের জন্ম হয় এবং সে শিশুটিও চিকিৎসাভাবে মারা যায়। এরপর একটি মেয়ে, যার নাম রাখা হয় 'আনটেমড' জন্মাবার পর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে স্ত্রী সোনিয়া ডাক্তারের জন্য পীড়াপীড়ি করায় রাফায়েল রিভলবার বের করে বলে, "এই হচ্ছে তোমার ডাক্তার।" যাই হোক, মেয়েটি বেঁচে ওঠে এবং এখন তার বয়েস সতের। এর পর আরও চারটি সন্তান হয় —'ফ্রি', পনের; 'সভারেন' চোদ্দ; 'কংকারার' বারো বছর এবং দু মাস বয়সের 'ইভল্যুশন অফ লিবারল থট'।

বাইরের জগৎ সম্পর্কে ছেলেমেয়ে কটির যা কিছু ধারণা লোহার দরজার গায়ে ইঁটখানেক একটা ফুটো দিয়ে যা দেখা যেত তাই থেকে। ইঁদুর মারার বিষ তৈরি করতে বাপকে সাহায্য করাই ছিল ওদের একমাত্র কাজ—ভোর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ছেলেমেয়েদের কাউকেই লেখাপড়া শেখানো হয়নি; মোটমাট তিনশটির বেশী কথা ওরা জানে না এবং গালাগালি ওদের মুখে মুখে। নিয়মানুবর্তিতার ব্যতিক্রম হলে—বেশী খাওয়ার জন্যে বায়না, বাইরে বেরিয়ে খেলা করতে চাওয়া, বাবার হাতে শাস্তি অনিবার্য —ওদের ঘাড়ে ছুরির ফলা বসানোর সেইসব দাগ রয়েছে। রাফায়েলকে অপহরণ, বে-আইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা, বলপ্রয়োগ, ছোটদের শ্রম-আইন ভঙ্গ, বিষাক্ত সামগ্রী প্রস্তুতের লাইসেন্স না নেওয়া এবং আয়কর ফাঁকির অপরাধে জেলে পাঠানো হয়েছে। রাফায়েল বলে, "পৃথিবী কি দিতে পারে আমার পরিবারকে?—গণিকাবৃত্তি, গুণ্ডামো, মাতলামো রক-'এন রোল আর কদর্য ঐ টেলিভিসন—আমার পরিবারকে ওসব দিতে চাই না।"

আমেরিকার লস এঞ্জেলসের স্যাম লাইবেরম্যান নামক এক ব্যক্তি তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদ করতে সক্ষম হয় এই বলে যেঃ "ও বলে তোমার খাবার তুমি রান্না করে নাও। নিজের রান্না যদি নিজেই করবো স্ত্রীর আর দরকার কি তাহলে?"

চন্দ্রশেখর

কান্না-ঝরা হাসির আলো

বড় বেদনা শুধুই কাঁদায় না, মানুষের জন্যে হাসি হয়েও বুঝি ঝরে পড়ে। হাসির ডালা সাজিয়ে দুঃখ থেকে আনন্দে উত্তরণের এই সঞ্জীবনী সাধনার ভূমিকা যে কৌতুক-শিল্পীর, তার সাজানো হাসির আনন্দ-মেলায় শুধু তার নিজের কন্যার মুখেই হাসি নেই। জীবনের চিৎকারের বেসুরো কলরব থেকে দূরে সরে গিয়ে সে কীভাবে বিবাগীর একতারার সুরে আঁধারের মনের সুরটি খুঁজে পায়, অবধূত রচিত এমনি এক কাহিনী অবলম্বনে তৈরী মেট্রো-পলিটান পিকচার্সের [illegible] শিল্পীর অনুপস্থিতি হবে"।

গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছে পরাশর। গ্রামের যাত্রা দলের থিয়েটারের সে কমিক নট। পরাশরের ভূমিকায় অনুকরণীয় অভিনয়ের জন্যে পরাশর নামেই সে বিখ্যাত। শহরের [illegible] এই [illegible] দুঃসময়ে তার আশ্রয় [illegible] বিপত্নীক ও নিঃসন্তান এক [illegible]।

জীবনের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে পরাশর হঠাৎ একদিন সুযোগ পায় এক জলসায় হাস্যকৌতুক পরিবেশন করবার। [illegible] সেদিন ছিলেন তার ওপরে সদয়। কৌতুক অভিনেতা হিসাবে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাফল্য তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে জীবনের পথে। অর্থের অনটন দূরেই। বাড়ি ভাড়া করে গ্রাম থেকে স্ত্রী ও তার দু বছরের মেয়েকে শহরে আনবার ব্যবস্থা করে পরাশর।

যেদিন সে গ্রামে রওনা হবে, সেদিনই সংবাদপত্রে খবর দেখে বন্যার তাণ্ডবে ভেসে গেছে তার দেশ। দেশের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে কোন সন্ধান পায় না পরাশর তার স্ত্রী-কন্যার। কলকাতায় ফিরে আসে হাস্যরসিক—অন্তরে তার দুঃসহ বেদনার ভার। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার দয়িতা ও কন্যাকে, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার মনের সব আশা-আনন্দ, আর মুখের সব হাসি। তবু বেঁচে থাকতে হলে চাই হাসি, আর মানুষকে হাসানো। হাসি ছিল তার জীবিকা, হাসি এখন তার জীবনের পরমার্থ। হাসির জোয়ার নিয়ে সে রুখে দাঁড়ায় অন্তরের দুঃখ-বন্যার সামনে। হাসির ঝড় বইয়ে দেয় হাস্যরসিক সারা দেশে। এমনিভাবে কেটে যায় ছ'বছর।

হঠাৎ একদিন এক জলসায় পরাশরের সামনে এসে হাজির হয় তার গ্রামসখা এক বাউল ও তার বোষ্টমী। পরাশর জানতে পারে, বন্যার গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিল তার স্ত্রী ও কন্যা এবং তারই খোঁজে তাদের সঙ্গে এসেছিল কলকাতায়। কিন্তু মৃত্যুর
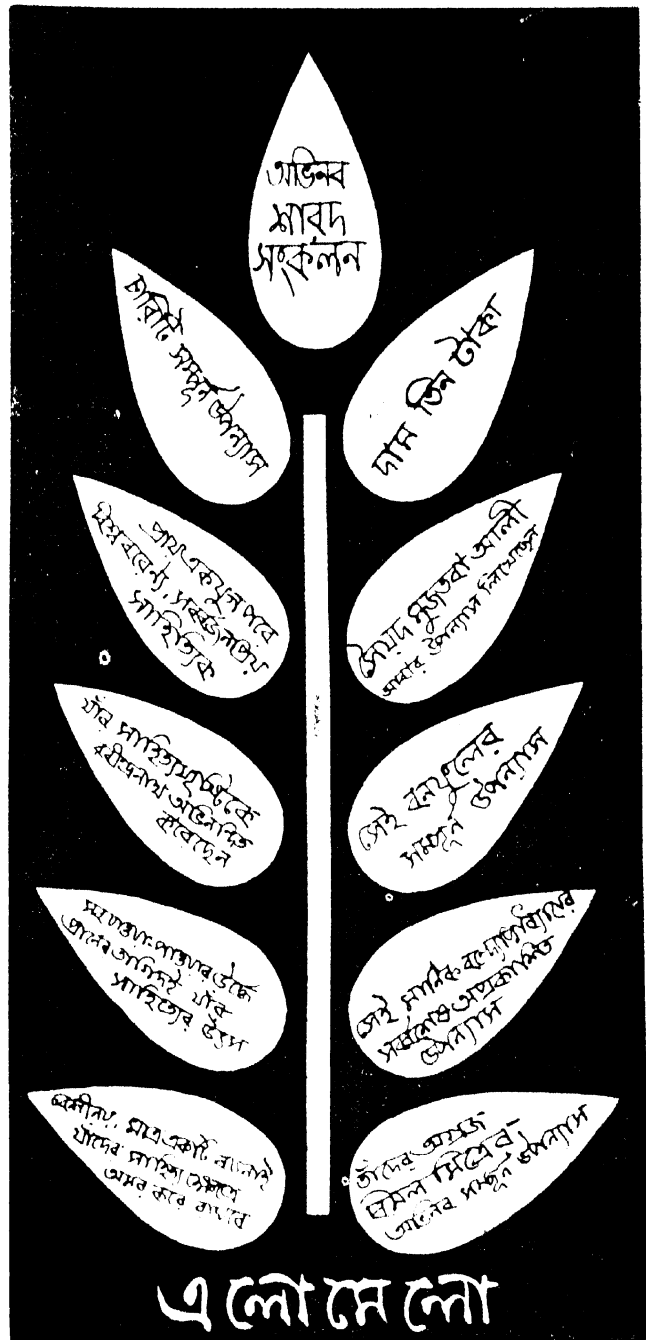
এন এস জি প্রোডাকসন্সের "খেলাঘর"-এর নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও মালা সিংহ।

গ্রাস থেকে তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেনি তার সাথীরা। আরও জানতে পারে পরাশর যে, তার কন্যা এখন তাদেরই সঙ্গে—বাউলদাদা আর বোষ্টমীদিদির সঙ্গে সে দীর্ঘ ছ'বছর পথে পথে গান গেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

পরাশর নিয়ে এল তার মেয়েকে নিজের কাছে। কিন্তু যে এল সে যেন একটি বৃন্তচ্যুত বনফুল। বনের মুক্ত প্রাণবায়ু থেকে বদ্ধঘরের নির্জীব ফুলদানিতে সে শুকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, তার মুখের হাসিটিও ঝরে পড়ল। দেশসুদ্ধ লোককে যে হাসিয়ে বেড়ায়, নিজের মেয়ের মুখে সে হাসি ফোটাতে পারে না। রঙ্গকৌতুকের মাধ্যমে সবাইকে যে আপন করে নিয়েছে, নিজের মাতৃহারা কন্যাকে আপন করে নিতে সে ব্যর্থকাম।

একদিন পরাশরের একতারার সুরে আর উদাস-করা বাউল গান শুনে তার বন্দিনী নন্দিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার কাছে। ব্যথিত পিতার চোখের জল মুছিয়ে দিল সে আপন হাতে। পরাশরের জীবনে পরম পাওয়ার লগ্নটি এল সব ছাড়ার ইশারা নিয়ে। পরাশর বুঝতে পারল, ঘরছাড়া বাউলের জীবনই ফোটাতে পারে তার কন্যার মুখে হাসি। তার কিশোর মন এই বাঁধনছাড়া জীবনের রঙেই রঞ্জিত। অঙ্গে পীতবাস, শিরে নামাবলী, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ, ললাটে তিলক আর করকমলে বাউলের একতারা নিয়ে আত্মজার হাত ধরে পরম বাঁধনের আশায় সকল বাঁধন ছেড়ে পথে পা বাড়ায় পরাশর। দেশের লোকের মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে কন্যার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে জীবনের পরম সার্থকতা খুঁজে পায় শিল্পী এই বিবাগী জীবনে।

ছবিতে অনেক সময় যেমন কাহিনীর মূল রস দানা বেঁধে ওঠে না, তেমনি অন্যের কল্পকাহিনীর অসম্পূর্ণতাকে ভরে তোলে চিত্র-রূপের চমৎকারিত্বে। এ ছবিতে চিত্রনাট্যের [illegible] মধ্যে আছে মর্মী অভিনয়,

চালনার এ-ছবির কাজ নচিকেতা ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গীতিকার পবিত্র মিত্রও প্রশংসা পাবেন তাঁর সুরচিত গানগুলির জন্যে।

আলোকচিত্রে দেওজীভাই আবার বিরল কৃতিত্ব দেখালেন এ-ছবিতে। সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও নিকুঞ্জ ভট্টাচার্যের কাজও প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণে সুশীল সরকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক ও সামগ্রিক আঙ্গিক সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে ছবিটি উন্নতমান বজায় রেখেছে।

চিত্রালোচনা

বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় একটি মিষ্টি মধুর প্রণয়-কাহিনী রূপায়িত হয়েছে এন এস ফিল্ম প্রোডাকশন্সের নতুন ছবি "খেলাঘর"-এ। সলীল সেনগুপ্ত এর কাহিনীকার। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক গল্পে উত্তমকুমার ও মালা সিংহ নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করেছেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁদের সঙ্গে এ-ছবিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, মানসী সোম, বাণীব্রত দত্ত, ধীরাজ দাস, অসিতবরণ এবং আরো অনেকে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর এবং এতে সুর দিয়েছেন হেমন্তকুমার। এ সপ্তাহের এটিই একমাত্র নতুন বাংলা ছবি।

তিনখানি নতুন হিন্দী ছবিও মুক্তি পাচ্ছে এ সপ্তাহে—বিমলদীপ চিত্রের "দুনিয়া না মানে", ফিল্মনগর স্টুডিওর "সাহিল" ও এম এন্ড টি ফিল্মসের "লাখোঁ মে এক"।

"দুনিয়া না মানে"-র নায়িকাও মালা সিংহ। তাঁর বিপরীত নায়ক-চরিত্রে রূপ দিয়েছেন প্রদীপকুমার। শেখ মুখতার একটি মুখ্য ভূমিকায় নতুন করে তাঁর নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভগবান, ডেজি ইরাণী, মীনু মমতাজ ও হেলেন পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন। ডি অবধূত ছবিটির পরিচালক, মদনমোহন এতে সুরযোজনা করেছেন।

"সাহিল" ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন শাম্মী কাপুর, চিত্রা, কুলদীপ কাউর, মুরাদ, সাপ্রু, জানকী দাস প্রভৃতি। আগরওয়াল কে ভূষণ একাধারে ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব যুগ্মভাবে বহন করেছেন সুরেশ ও তলোয়ার।

"লাখোঁ মে এক" নাচ-গানে-ভরা একটি হাসির ছবি। জয়রাজ, স্মৃতি, আশা মাথুর, রাজকুমার ও ডেভিডকে নিয়ে এর ভূমিকা-লিপি গঠিত হয়েছে।

* * *

গত সপ্তাহে কয়েকটি নতুন ছবির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

জন্মাষ্টমীর দিন সকালে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে চিত্রনিকেতনের প্রথম নিবেদন "এমনো দিন আসতে পারে"-র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] পরিচালনায় ছবিটি গৃহীত হবে। [illegible] নায়ক চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন। [illegible] বহন করবেন [illegible]।

[illegible] প্রথম ছবি [illegible] মহরৎ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সম্পন্ন হবে।

জীবানন্দ ঘোষ এর কাহিনীকার ও পরিচালক। অসীমকুমার ও মঞ্জুশ্রী নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করবেন। সুর-সংযোজনার ভার নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

উদয়ন প্রোডাকশন্সের নতুন ছবি "অনাগত" তার যাত্রা শুরু করে সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। ২৪শে আগস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে এর গান রেকর্ড করা হয় কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায়। ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রার যন্ত্রসংগীত সহযোগে কণ্ঠদান করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্মণ) ও শ্যামল মিত্র। ছবিটি মূলত তোলা হবে প্রকৃতির কোলে। উদয়ন চৌধুরী একাধারে এর কাহিনীকার ও পরিচালক।

ডানলপের হীরক-জয়ন্তী ছবি

ডানলপ রবার কোম্পানীর হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে ক্ল্যারিয়ন এডভারটাইজিং সার্ভিসেস্ (প্রাঃ) লিঃ "দি রোড টু অ্যাম্বাটুর" ও "আওয়ার চিলড্রেন উইল নো ইচ্ আদার বেটার" নামে যে দুখানি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রযোজনা করেছেন, গত ২৫শে আগস্ট লাইট হাউস চিত্রগৃহে সে দুটি ছবির একটি প্রদর্শনী হয়।

"দি রোড টু অ্যাম্বাটুর"-এ ভারতে ডানলপ কোম্পানীর পঞ্চাশ বছরের কর্ম-প্রসারণের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা হয়েছে। এর শেষাংশে ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজে অ্যাম্বাটুরে ডানলপের নতুন কারখানার নির্মাণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়টিতে চিত্রিত হয়েছে একটি কিশোরের অভিযান। পথে বেরিয়ে সে কীভাবে পরিচিত হল নতুন শহর ও জনপদের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে গেল তার বয়সী অনেক কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে এবং পরে ফিরে গেল মা-বাপের কাছে— তা নিয়েই ছবিটির চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সত্যজিৎ রায় এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শৈলেন দত্ত। ভি বালসরা পরিচালিত এর সংগীতাংশ উপভোগ্য। দুটি ছবিই দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

নাট্যাভিনয়

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় বার্ষিক গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতা (পূর্ণাঙ্গ) আরম্ভ হয়েছে। শনিবার (২৯শে আগস্ট) থেকে। প্রতিযোগিতায় মোট ২৫টি নাট্যসংস্থা যোগদান করেছেন। গত শনিবার প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে সদ্য সমাপ্ত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। গুণানুসারে নিম্নলিখিত তিনটি নাটকের নাম ঘোষিত হয়। ১। "স্বাম্বিক" (লোক-সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ), ২। "লার্নিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট" (শিল্পীমন), ৩। "অঙ্কুর" (গন্ধর্ব)।

* * *

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর থিয়েটার সেণ্টার আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এবারকার প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫টি নাট্যসংস্থা যোগ দিচ্ছেন। থিয়েটার সেণ্টারের নিজস্ব মঞ্চে অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে।

* * *

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা অনুশীলন সম্প্রদায় তাঁদের বহুপ্রশংসিত নাটক "শেষ সংবাদ" পুনরায় মঞ্চস্থ করবেন আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বরূপা মঞ্চে। মমতাজ আহমেদ খাঁর পরিচালনায় নাটকটিতে অংশ গ্রহণ করছেন বীরেশ্বর সেন, চারুপ্রকাশ ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ খাঁ, অনিমা দাশগুপ্তা প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

* * *

সুপরিচিত সাংস্কৃতিক সংস্থা "চক্র-বৈঠক" গত ২২শে আগস্ট হিন্দী হাই স্কুলের মঞ্চে বনফুলের "শ্রীমধুসূদন" সাফল্যের সহিত পরিবেশন করেন।

* * *

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির স্মৃতির

প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের উদ্দেশ্যে আনন্দ-ভারতী গত ২৮শে আগস্ট থিয়েটার সেণ্টার রঙ্গমঞ্চে "আলমগীর" অভিনয় করেন। "আলমগীর"-এর রূপান্তরিত নাট্যরূপ ও পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন কুন্তল মজুমদার। আলমগীরের চরিত্রটির রূপদান করেন তিনি স্বয়ং। সামগ্রিকভাবে নাট্য-নিবেদনটি উপভোগ্য হয়।

সরকারের ইন্দ্রজাল

যাদুকর পি সি সরকারের নাম আজ কে না জানে? ইউরোপ, আমেরিকা, দূরপ্রাচ্য—এমনকি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত তাঁর যাদুবিদ্যায় মুগ্ধ, সম্মোহিত। সম্প্রতি সরকার তাঁর সমগ্র দলটি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার কয়েকটি শহর সফর করে এসেছেন। অন্যান্য জায়গায় যেমন, এসব দেশেও তেমনি অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী। ভারতের সম্মোহিনী শক্তি নূতন করে মায়াজাল পেতেছে বিশ্বমানসে।

মধ্যপ্রাচ্য সফরান্তে পি সি সরকার গত দু'সপ্তাহ ধরে নিউ এম্পায়ারে তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করছেন। অনেকগুলি নতুন খেলার সঙ্গে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত যাদুগুলিও দেখান হচ্ছে এবারকার প্রোগ্রামে। এবং বলতে বাধা নেই—পুরোন হলেও এ খেলাগুলি (যেমন, এক্স-রে আইজ্ এবং ইলেকট্রিক করাতের সাহায্যে একটি নারীকে দ্বিখণ্ডিত করা) উপস্থাপনের উৎকর্ষে নতুন চমক লাগায় দর্শকদের মনে। নতুন খেলাগুলির মধ্যে শূন্যে বেবি মোটরের অবস্থিতি, মিশরীয় মামির কফিনের ভেতরে জীবন্ত মানুষের আবির্ভাব এবং শক্তির মধ্যে মুক্তার পরিবর্তে মানবীর আবিষ্কার সত্যিই চমকপ্রদ। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপটের বৈচিত্র্য ও আনুষঙ্গিক জাঁকজমক সরকারের এই ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে তুলেছে। কি গুণে পি সি সরকার আজ বিশ্বের অদ্বিতীয় যাদুকররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তা এই অভিনয় দেখলেই বোঝা যায়।

বিবিধ সংবাদ

গত রবিবার পুণায় একটি শিশু রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন করেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, শিশুদের মানসিক উন্নতি সাধনের জন্যে বর্তমানে যে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়েছে, শিশু রঙ্গমঞ্চের পত্তন তারই অংশ। শিশুরা থাকে তাদের নিজের রাজ্যে। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তারা বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছয়। এই ক্রম বিবর্তনের সহায়তা করবার দায়িত্ব এই ধরনের রঙ্গমঞ্চের, কারণ তাদের আমোদ ও শিক্ষা দেবার ব্যাপারে শিশু সাহিত্য ও শিশু রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* * *

আগামী জানুয়ারী মাসে বোম্বাই ও দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। এর উদ্যোক্তা হচ্ছেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সেণ্টার ফর চিলড্রেন্স ফিল্মস্। প্রাক্তন রাজ্যপাল আর আর দিবাকর এই সংস্থার সভাপতি। এগারো দিন ধরে এই প্রদর্শনী চলবে এবং পৃথিবীর প্রধান দেশগুলিকে শিশুচিত্র ও প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এই উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানানো হবে। বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শিশুচিত্র সম্বন্ধে আলোচনা সভাও বসানো হবে এই প্রদর্শনীর সময়ে।

* * *

আগামী রবিবার (৬ই সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ৮৭নং বিবেকানন্দ রোডস্থিত মেহতা হলে ভারতীয় শিল্পী পরিষদ আধুনিক তরুণ শিল্পীদের সহযোগে একটি পরীক্ষামূলক লোকসংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সংগীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ও দীনেন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন সুকুমার মিত্র, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অজিত রায়, সুবল চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। এঁরা উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নানা ধরনের প্রায় কুড়িটি লোক-সংগীত আলোচনা সহযোগে পরিবেশন করবেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

ইংলণ্ডের 'হলিডে ক্যাম্পের' ধনী মালিক বিলি বার্টালন আয়োজিত ইংলিশ চ্যানেল পার হবার আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হয়ে গেছে। ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে ইংলণ্ডের 'ডোভার' পর্যন্ত ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার এই বিপদসংকুল সাঁতার প্রতিযোগিতার পূর্ণ বিবরণ এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। যতটুকু বিবরণ এসেছে তা থেকে জানা গেছে এবারকার প্রতিযোগিতায় ২৩টি দেশের ৪৬ জন প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৩৮ জন প্রতিযোগী সাঁতারের জন্য প্রস্তুত হন। এর মধ্যে আবার যথাসময়ে সাহায্যকারী বোট না পাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে ১৫ জন সাঁতারু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে ৪ জন মহিলা সমেত মোট ২৩ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। এর মধ্যে কতজন শেষ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে পেরেছেন সে সংবাদও আসেনি। শুধু খবর এসেছে ২৮ বছর বয়স্ক আর্জেন্টিনার সাঁতারু আলফ্রেডো ক্যামেরেরো প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ইংল্যাণ্ডের ২৫ বছর বয়স্ক সাঁতারু হারম্যান উইলকস্ আর পাকিস্তানের বাঙালী সাঁতারু ব্রজেন দাশ, গতবার যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন এবার তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন। এর সঙ্গে অবশ্য ভারতের দুই প্রতিনিধি ডাঃ বিমল চন্দ্র এবং কুমারী আরতি সাহার অসাফল্যের সংবাদও এসেছে। ডাঃ বিমল চন্দ্রের ক্ষেত্রে অবশ্য অসাফল্য বলা যায় না। কারণ বোটের অভাবে তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কুমারী আরতি সাহা ৫ ঘণ্টা সাঁতার কাটবার পর জল থেকে উঠে পড়েছেন। পরবর্তী সংবাদে জানা গেছে ডাঃ বিমল চন্দ্র চ্যানেল অতিক্রমের জন্য জোড়জোড় করছেন। কুমারী আরতি সাহাও সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আবার জলে নামবেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ের সংকল্প নিয়ে।

ডেনমার্কের প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসিনী সাঁতারপটিয়সী গ্রেটা এণ্ডারসন, যিনি গত দু'বছর এই প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাঁর সম্বন্ধে রয়টার প্রথমে কিছুই সংবাদ পরিবেশন করেননি। অথচ গ্রেটা এণ্ডারসন এবারও প্রথম স্থান অধিকার করে হাজার গিনি মূল্যের বার্টালন ট্রফি চিরদিনের জন্য লাভ করতে পারবেন কিনা তা জানবার জন্য সারা বিশ্বের সাঁতার আগ্রহীরা উৎসুক ছিলেন। পরে অবশ্য 'নাফেন' পরিবেশিত সংবাদে জানা গেছে গ্রেটা এণ্ডারসন চ্যানেল অতিক্রম করেছেন বটে; কিন্তু কোন 'স্থান' দখল করতে পারেননি। যাই হক, এবারকার প্রতিযোগিতার সময় ইংলিশ চ্যানেল কিছুটা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল, বিপরীতমুখী স্রোতের টানে সাঁতারুদের কষ্টও হয়েছিল যথেষ্ট। তাই সময় কারোরই ভাল হয়নি। প্রথম স্থান অধিকারী সাঁতারু আর্জেন্টিনার আলফ্রেডো ক্যামেরেরো ১১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে ডোভার উপকূলের মাটি স্পর্শ করেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতারে মিশরের হাসান আবেদল রাহিমের রেকর্ড আছে ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। ১৯৫০ সালে তিনি এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

ভয়াবহ ও দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়াকে অনেকেই অসাধ্য সাধনের সামিল বলে মনে করে থাকেন। ১৮৭৫ সালে ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার পর ৩৬ বছর পরে দ্বিতীয় সাঁতারু হিসাবে আর একজন ইংরেজ টমাস আর্জেন্স ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। তারপর আরও ১১ বছর কেটে যায়। তৃতীয় সাঁতারু হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন আমেরিকার হেনরী সুলিভান। এই বছর আর্জেন্টিনার এনরিক টিরাবস্কি এবং আমেরিকার চার্লস টথও ইংলিশ চ্যানেল পার হন। তারপর অবশ্য মাঝে মাঝে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা হতে থাকে। অনেকে সাফল্যও অর্জন করেন। আধুনিক কালে দেশ বিদেশের বহু সাঁতারু এমন কি বহু মহিলাও পুরুষদের সঙ্গে সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন। কেউ পর পর তিনবারও চ্যানেল জয় করেছেন। যেমন মিশরের মারি হামাদ ও হাসান আবেদল রাহিম। আবার অনেকে দুদিক থেকে অর্থাৎ ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে ডোভার পর্যন্ত এবং ডোভার থেকে কেপ গ্রিজ নেজে পর্যন্ত সাঁতার কেটেছেন। তবু বহুজনের সাফল্য সত্ত্বেও দুরধিগম্য চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব ও কৃতিত্ব এতটুকু ম্লান হয়নি। চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারু এখনো দুর্লভ সম্মানের অধিকারী। তার কৃতিত্ব এখনো অসাধ্য সাধনের কৃতিত্বের সামিল।

এর কারণ ইংলিশ চ্যানেলের ভয়াবহতা। ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে অপর পার ইংলণ্ডের ডোভার পর্যন্ত আড়াআড়ি পথে ইংলিশ চ্যানেলের প্রস্থ একুশ বাইশ মাইলের মত। কিন্তু প্রবল স্রোতের টানে আঁকাবাঁকা পথে সাঁতার কেটে চ্যানেল অতিক্রম করতে প্রায় দ্বিগুণ পথ সাঁতার কাটতে হয়। সোজা পথে একুশ বাইশ মাইল বা তার দ্বিগুণ পথ সাঁতার কেটে পার হওয়া এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। দূরপাল্লার সাঁতারের ইতিহাসে একটানা বহু মাইল, এমনকি ২৯২ মাইলও সাঁতার কাটার নজীর আছে। কিন্তু স্রোতের সঙ্গে একটানা নদীতে সাঁতার কাটা আর আড়াআড়ি পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সত্যিই দুরূহ। শুধু স্রোতের টান আর পথের দূরত্বই চ্যানেল অতিক্রমের পথের প্রধান অন্তরায় নয়। বহু রকমের বিপদের আশঙ্কা এবং বাধা বিপত্তি আছে ইংলিশ চ্যানেলে।

ইতিপূর্বে বোধকরি গত বছর এ বিষয়ে 'দেশের' পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। আবারও আলোচনা করছি।

ইংলিশ চ্যানেলের বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে বেশীক্ষণ থাকা যেমন অসম্ভব, তেমন এর দুরন্ত স্রোত আর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বেশীক্ষণ সাঁতার কাটাও অসাধ্য সাধনের নামান্তর। এ ছাড়া ইংলিশ চ্যানেল হচ্ছে জানা অজানা অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল। এর মধ্যে 'জেলী' ফিসের অত্যাচারই বেশী। সাঁতারুদের গায়ের গ্রীজের লোভে জেলী ফিস প্রায় সব সময় গায়ে হুলের মত বিঁধতে থাকে। গ্রানাইটের আলিঙ্গনের মধ্যেও পড়তে হয় অনেক সাঁতারুকে। চ্যানেলের লোনা জলও সাঁতারু-দের কম অসুবিধার সৃষ্টি করে না। যদিও লোনা জলের আক্রমণ থেকে চোখকে রক্ষা করবার জন্য সাঁতারুরা গগলস পরে সাঁতার কাটেন, তবুও গগলসের আশপাশ দিয়ে লোনা জল চোখে ঢুকে সাঁতারুদের দৃষ্টি-

বিভ্রম ঘটিয়ে থাকে। এবার যেমন পাকিস্তানী সাঁতারু ব্রজেন দাশের চোখে বহুবার লোনা জল প্রবেশ করেছে। যাই হক, সাঁতারুদের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের কথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কখন যে ঝড় উঠে চ্যানেলের বুকে প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি করবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ইংলণ্ডের আবহাওয়ার খবর নাকি ভগবানেরও অজ্ঞাত। আর সাঁতারুরা তো ছার। সাঁতার আরম্ভের পর যদি ঝড় ওঠে তবে চ্যানেল যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তার মধ্য থেকে ঘরে ফিরে আসাই সমস্যা। বাত্যাবিক্ষুব্ধ উদ্দাম তরঙ্গের মধ্যে অনেকেরই জীবনলীলা শেষ হয়ে যেতে পারে। চ্যানেলের স্রোতের টান আবার দ্বিমুখী। 'ফ্লাড' ও 'এব' টাইড অর্থাৎ জোয়ার ভাটার টান তো আছেই। তাছাড়া দুরকমের স্রোতের একটি স্রোত আসে উত্তর দিকের 'নর্থ পোল' থেকে যাকে বলা হয় 'ল্যাব্রাডর কারেণ্ট'। আর একটি স্রোত আসে দক্ষিণ দিকের গালফ অব মেক্সিকো থেকে যাকে বলা হয় 'গালফ স্ট্রীম'। 'ল্যাব্রাডর কারেণ্টের জল খুব ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা যে হিম-শীতলও বলা যায়। গালফ স্ট্রীমের জল অবশ্য ঈষদুষ্ণ। তবুও অসহনীয়। দুই জলেই হাড়কাপানো শীত। দু'দিক থেকে প্রবাহিত দুরকমের স্রোতের টানা পোড়েনের মধ্যে সাঁতারুরা খেই হারিয়ে ফেলেন। এত-রকমের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ৩০।৪০ মাইল সাঁতার কেটে পার হওয়া সত্যিই অসাধ্য সাধনের সামিল। জীবন মৃত্যুকে যারা পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করে, দুর্গম গিরি, কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে—যাদের মনে আছে অসাধ্য সাধনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাদের পক্ষেই ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া সম্ভব।

পাকিস্তানী সাঁতারু ব্রজেন দাশ উপর্যুপরি দুবার ইংলিশ চ্যানেল জয় করে পাকিস্তান তথা ভারতের সুনাম বাড়িয়ে-ছেন। কারণ ব্রজেনের সাঁতারের উন্নত কলাকৌশল শিক্ষা এই কলকাতায়। ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেনও বার বার ব্যর্থতার পর গতবার চ্যানেল অতিক্রম করে ভারতবাসী মাত্রের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। আজ ডাঃ বিমল চন্দ্র ও কুমারী আরতি সাহা প্রথম প্রচেষ্টায় চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেন নি এতে ভগ্নোদ্যম হবার কিছুই নেই। কারণ যিনি ভারত ও পাকিস্তানের কাছে ইংলিশ চ্যানেল অভিযানের পথ প্রদর্শক সেই মিহির সেন বারবার ব্যর্থতার পর চ্যানেল অতিক্রম করে দেখিয়ে দিয়েছেন চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। আমরা আশা করি, ডাঃ বিমল চন্দ্র ও কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল জয় করে দেশে ফিরে আসুন। আর ব্রজেন দাশ ফিরে আসুন ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কেটে অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল অতি-ক্রমের অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে।

* * *

কলকাতার ফুটবল লীগের উপর যবনিকা পড়েছে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ডের খেলাও ঢিমে তালে আরম্ভ হয়েছে। ফুটবল লীগ সম্বন্ধে এ সপ্তাহে কিছু কিছু আলোচনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু স্থানাভাব। আর লীগ তো একটা নয়। আই এফ এ পরিচালিত ক্যালকাটা ফুটবল লীগেরই চারটি ডিভিসন। তারপর এলেন লীগ আছে, বেঙ্গল সকার লীগ আছে, পাওয়ার লীগ আছে, আন্তঃ অফিস ও আন্তঃ কলেজ লীগ আছে, আরও আছে বিভিন্ন স্কুল লীগ। ফুটবল মরসুমের শেষে সব লীগ খেলা সম্বন্ধেই কিছু কিছু আলোচনার ইচ্ছে রইল। এ সপ্তাহে শুধু প্রথম ডিভিসন লীগ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলতে চাই।

প্রথম ডিভিসনের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে প্রথমবারের ও ফিরতি লীগের খেলা নিয়ে এবার মোট খেলা হয়েছে ২১০টি। ২১০টি খেলা শেষ করতে কর্তৃপক্ষের সময় লেগেছে ১২১ দিন। ২১০টি খেলায় গোলের সংখ্যা ৪৬৯। ৭ জন খেলোয়াড় এবার হ্যাট্ট্রিক করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বলরাম এবং বি এন রেল দলের আপ্পালারাজু করেছেন দুবার করে হ্যাট্ট্রিক। সবচেয়ে বেশী গোল করেছেন আপ্পালারাজু। এসব খবর এবং কোন্ ক্লাব বেশী গোল করেছে আর কোন্ ক্লাব বেশী গোল খেয়েছে—লীগ কোঠায় কার কোথায় স্থান তা এই খেলার নীচেকার হিসাব থেকে জানা যাবে। এখন খেলা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলি।

যোগ্য দল হিসাবেই মোহনবাগান ক্লাব লীগ বিজয়ী হয়েছে একথা চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনা করেছি। যোগ্য দল সন্দেহ নেই, মোহনবাগানের আক্রমণ ও রক্ষণভাগের মধ্যে আগাগোড়াই বেশ একটা সমন্বয় ছিল। তাই বলে মোহনবাগান কোনদিন খারাপ খেলেনি, তা নয়। অনেক খেলায় তারাও সমর্থকদের হতাশ করেছে। তবুও সামগ্রিকভাবে মোহনবাগানের খেলা ছিল অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ক্লাবের খেলার চেয়ে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের ক্রীড়াধারায় এই সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেনি বলেই তারা লীগ জয়ের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়া দুরদৃষ্টও অভীষ্ট লাভে এদের কম বঞ্চিত করেনি। অদৃষ্ট এবং পুরুষকার নিয়েই জীবন সংগ্রাম। ক্রীড়াক্ষেত্রের সংগ্রামেও এর ব্যতিক্রম নেই। এবং জীবনেও যেমন একটা 'মোড়' ঘোরার ঘটনা থাকে—

ইংরেজীতে যাকে বলা হয় টার্নিং পয়েণ্ট, ক্রীড়া-সংগ্রামেও তেমন টার্নিং পয়েণ্ট থাকে। সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক খেলার ফলাফলে এই টার্নিং পয়েণ্ট লক্ষ্য করবার বিষয়।

সত্য কথা বলতে কি, দলগত শক্তির বিচারে মোহনবাগান, ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং কে নিকৃষ্ট একথা বলা বড় শক্ত। আমার মতে, এদের মধ্যে পার্থক্য মাত্র উনিশ বিশ কি বিশ একুশ। তাই এই তিনটি দলের মধ্যেই একটি চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে, বাকী দুটি লীগ কোঠায় পর পর স্থান দখল করেছে। মোহনবাগান সম্বন্ধে একটা কথা বললে হয়তো কেউই আপত্তি করবেন না। কথাটা হচ্ছে—ভাল খেলেও হার স্বীকার করতে হয়েছে এমন ঘটনা এবার মোহনবাগানের খেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়নি। কিন্তু ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কয়েকটি খেলাতেই বিপরীত ফলাফলে মন ভারাক্রান্ত করে তাঁবুতে ফিরতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইস্টার্ন রেলের সংগে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এবং রাজস্থান ও জর্জ টেলিগ্রাফের সংগে ইস্টবেংগলের খেলার কথা বলা যেতে পারে। প্রতিপক্ষের উপর রীতিমত আধিপত্য বিস্তার করে প্রায় সারাক্ষণ আক্রমণ চালিয়েও এসব খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেংগল ক্লাবকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আমার মতে, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেংগলের এই খেলাই লীগের টার্নিং পয়েণ্ট। যারা লীগ বিজয়ী হয়েছে তাদের আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি, যারা লীগ জয় করতে পারেনি তাদেরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আগামীবারের সাফল্য অর্জনের জন্য। এই সংগে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টার্ন রেলের প্রতিও বিশেষ সমবেদনা জানাচ্ছি। লীগের ভরা মরসুমে তাদের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় অনীল দেব রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় রেল দলের মনোবল ভেঙে যায়। খেলার জামায় শোকের চিহ্ন ধারণ করে কোনভাবে তারা বাকী খেলাগুলো শেষ করে।

সিনিয়র ডিভিসনের জুনিয়র ক্লাব অর্থাৎ লীগ কোঠার মাঝামাঝি বা নীচের দিকে যাদের স্থান আমাদের প্রতি তাদের একটা সনাতন অভিযোগ আছে, আমরা নাকি তাদের কথা ভালভাবে প্রচার করি না। তারা চিরদিনের উপেক্ষিত। কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই বড় বড় ক্লাব সংবাদপত্রের কাছে যে প্রচার পায়—সাধারণের কাছে পায় যে সমর্থন, ছোট ক্লাব তা পায় না। এর জন্য খেলার কর্তৃপক্ষরাও কম দায়ী নন। আজ যদি লীগ 'উঠা-নামার' প্রথা বহাল থাকত তবে এদের অনেক খেলার খবর আরও ফলাও হয়ে প্রচারিত হত—দর্শকদের কাছেও প্রতি খেলার আকর্ষণ থাকত। কিন্তু লীগ থেকে প্রোমোশন রেলিগেশন তুলে দিয়ে আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষ এদের খেলাকে প্রায় বেগার খেলায় পরিণত করেছেন। এদের খেলার মূল্য শুধু বড় ক্লাবের সংগে খেলার সময়। ছোটয় ছোটয় খেলার কোনই মূল্য নেই। যা হক, এবার মাঝারি ধরনের কয়েকটি ক্লাবের খেলায় বেশ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। ফুটবল মরসুমের জন্য মোটা টাকা খরচ না করে এবং বাইরের সব নামডাকের খেলোয়াড়দের ক্লাবে না পেয়েও জর্জ টেলিগ্রাফ, হাওড়া ইউনিয়ন ও খিদিরপুর ক্লাব যে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। লীগে উঠা-নামার প্রশ্ন থাকলে এদের খেলায় আরও নৈপুণ্য দেখা যেত একথা বলাই বাহুল্য। আই এফ এ-র মুরুব্বিরা ৩ বছরের জন্য লীগ থেকে 'উঠা-নামার' প্রথা বাতিল করেছিলেন। এবার ৩ বছর পার হয়ে গেল। আশা করা যায়, আগামীবার তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে—লীগেও পুনঃপ্রবর্তিত হবে 'উঠা-নামার' বিধান।

নীচে প্রথম ডিভিসনের লীগ টেবল এবং যারা লীগে বেশী গোল ও হ্যাটট্রিক করেছেন তাঁদের নাম দেওয়া হল:—

শেষ লীগ কোঠায় কে কোথায়?

প্রথম ডিভিসন

টীমের নাম	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২৮	২১	৬	১	৪৯	৪	৪৮
ইস্টবেংগল	২৮	২১	৪	৩	৫৪	১৩	৪৬
মহঃ স্পোর্টিং	২৮	১৯	৪	৫	৫৭	২১	৪২
ইস্টার্ন রেল	২৮	১৭	৬	৫	৪৩	১৯	৪০
রাজস্থান	২৮	১১	৮	৯	৩৩	৩০	৩০
হাওড়া ইউঃ	২৮	১১	৬	১১	৩২	৩০	২৮
এরিয়ান	২৮	১০	৮	১০	২৪	২৯	২৮
জর্জ টেলিঃ	২৮	১০	৭	১১	২৯	২৭	২৭
বি এন আর	২৮	১১	৫	১২	৩৯	৪৭	২৭
খিদিরপুর	২৮	৭	৮	১৩	২২	২৮	২২
কালী প্রটেক্ট	২৮	৬	৯	১৩	২১	৩৬	২১
উয়াড়ী	২৮	৭	৫	১৬	১৮	৩৭	১৯
ইণ্টারন্যাশনাল	২৮	৪	৮	১৬	১৫	৩৭	১৬
স্পোর্টিং ইউঃ	২৮	৪	৭	১৭	২২	৫৬	১৫
পুলিস	২৮	৩	৫	২০	১১	৫৩	১১

যাঁরা বেশী গোল করেছেন

আপ্পালারাজু	(বি এন আর)	...	২৪
বলরাম	(ইস্টবেংগল)	...	২৩
পি কে ব্যানার্জি	(ইস্টার্ন রেল)	...	১৪
চুনী গোস্বামী	(মোহনবাগান)	...	১৪
ওমর	(মহমেডান স্পোর্টিং)	...	১৩
মুসা	(মহমেডান স্পোর্টিং)	...	১২
কানন	(ইস্টবেংগল)	...	১১
এ দাস	(খিদিরপুর)	...	১১
কে জামান	(জর্জ টেলিগ্রাফ)	...	১০
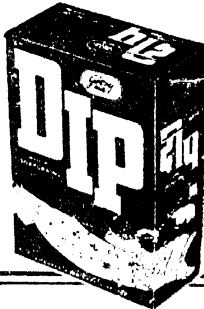
যাঁরা হ্যাটট্রিক করেছেন

পি বসু	(ইস্টার্ন রেল)	...	১ বার
পি কে ব্যানার্জী	(ইস্টার্ন রেল)	...	১ বার
কানন	(ইস্টবেংগল)	...	১ বার
বলরাম	(ইস্টবেংগল)	...	২ বার
আপ্পালারাজু	(বি এন আর)	...	২ বার
এ ব্যানার্জী	(স্পোর্টিং ইউঃ)	...	১ বার
এ দাশ	(খিদিরপুর)	...	১ বার

দেশী সংবাদ

২৪শে আগস্ট—বেতন কমিশন আজ উঁহার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন। সরকারী কর্মচারীদের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ বৎসর হইতে বর্ধিত করিয়া ৫৮ বৎসর ধার্য করার জন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদ্য লোকসভায় ইস্পাত খনি ও জ্বালানী দপ্তরের মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং কয়লার মূল্য পুনর্নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহার ফলে বাঙলা ও বিহারের কয়লা খনিসমূহের ২নং গ্রেড পর্যন্ত যাবতীয় কয়লার মূল্য টন প্রতি ৫০ নয়া পয়সা হারে বৃদ্ধি করা হইতেছে।

আজ নয়াদিল্লিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈনের পদত্যাগ গৃহীত হওয়ায় শ্রী এস কে পাতিল খাদ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন।

২৫শে আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ রাজ্যসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, চুক্তি অনুযায়ী ভুটান ও সিকিমের প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের দায়িত্ব রহিয়াছে। ভুটান ও সিকিমের সীমান্তে বহু চীনা সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত সংবাদ শ্রীনেহরু সমর্থন করেন নাই।

ভারতে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা মিশনারী প্রচারকদের মত উৎসাহ উদ্যম লইয়া এক ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে, মহাজাতি সদনের উত্তরে ফুটপাথের উপর নির্মিত বিরাট মণ্ডপে ব্যাপকভাবে বিনামূল্যে চক্ষুরোগের চিকিৎসা শুরু হইয়াছে। এখানে অস্ত্রোপচারও চলিতেছে।

২৬শে আগস্ট—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির সুবর্ণশ্রী সীমান্ত (লোহিত) বিভাগের হেডকোয়ার্টার জিরো হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, দক্ষিণ তিব্বতে সক্রিয় চীনা মুক্তি ফৌজের সেনারা খম্পাদিগের পশ্চাদ্ধাবনকালে গত সপ্তাহে সুবর্ণশ্রী বিভাগে অনুপ্রবেশ করিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

২৭শে আগস্ট—খনি ও তৈলসম্পদ মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য আজ লোকসভায় বলেন, নর্মদা-নদীর আশে পাশে শিবালিক পর্বতশ্রেণীতে যে ফসিল বা শিলীভূত জীবকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা "আধুনিক স্তন্যপায়ী জীবের আদি-পুরুষের কঙ্কাল" বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। শ্রীমালব্য বলেন, শিবালিক পর্বতের প্রস্তর স্তরের বয়স ১০ লক্ষ বৎসর হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১৯৫৭-৫৮ সালে সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ সম্পর্কিত অডিট রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সকল পরিকল্পনা ও কার্যসূচীর অনেকাংশ কার্যে পরিণত করা হয় নাই। রিপোর্টে প্রকাশিত সমস্ত প্রমাণ কম্পট্রোলার

ও অডিটার জেনারেল আর্থিক বিষয়ে গলদ, লোকসান, অপচয় এবং অপব্যয় সম্পর্কিত কতিপয় গুরুতর বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য লোকসভায় এই অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

২৮শে আগস্ট—চীন কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের বিবরণ দিতে গিয়া প্রবল উত্তেজনার মধ্যে শ্রীনেহরু বলেন, গত ২৫শে আগস্ট তিন শত সৈন্যের এক বাহিনী নেফা অঞ্চলে সুবর্ণশ্রী ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন অতিক্রম করিয়া ভারতের চার মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং লঙজুস্থিত ভারতীয় ঘাটির উপর আক্রমণ চালায়।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের "মধুচক্রের" নায়ক বলিয়া কথিত প্রাক্তন কিউরেটর শ্রীমইউদ্দিনকে বরখাস্ত করার জন্য বিভাগীয় তদন্ত কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন উহা অনুমোদন করিয়া রাজ্য সরকারের নিকট গত সপ্তাহে একটি নোট প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া সরকারীসূত্রে জানা গেল।

২৯শে আগস্ট—আজ বার বার অধ্যক্ষের নির্দেশ উপেক্ষা করায় লোকসভার অধ্যক্ষ সভার [illegible] সোস্যালিস্ট সদস্য ও একজন স্বতন্ত্র সদস্যকে অন্যান্য জন্য সভাত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন।

[illegible] উপজাতি কর্পোরেশনের হিসাব পরীক্ষকগণ তহবিল, হিসাবে গরমিল ও লোকসানের কয়েকটি দফা দেখিতে পাইয়া বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন।

৩০শে আগস্ট—চীনা বাহিনী ভুটানের এলেকায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে। লোয়েস্যা বিভাগ বিশদ সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত চীনা সৈন্য সমাবেশের সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক জনসভার পক্ষ হইতে চীনা সৈন্য কর্তৃক ভারত সীমান্ত আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং দেশের মাটি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে [illegible] কর্তব্য স্থির করার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে আগস্ট—পৃথিবীর অন্যতম নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ লুই লিকি শুক্রবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী টাঙ্গানিকায় প্রায় ৬ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার মানবদেহের একটি ফসিল বা শিলীভূত কঙ্কাল খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

আজ ভিয়েন তিয়েনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীরা উত্তর-পূর্ব লাওসের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য এলাকার মধ্য দিয়া আসিয়া স্যাম নিউয়া প্রদেশকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

২৬শে আগস্ট—কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে লাওসের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য কল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাওসকে সামরিক অস্ত্র ও অর্থ দিবেন।

সোভিয়েট সেনা বাহিনীর সংবাদপত্র "রেড স্টার" অদ্য লিখিয়াছে, কোয়েটা, গিলগিট ও পেশোয়ারে রকেট ঘাঁটি স্থাপনের কথা পাকিস্তান অস্বীকার করিলেও পাকিস্তানেরই সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র মারফত ধীরে ধীরে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের কাজ পুরোদমে চলিতেছে।

২৭শে আগস্ট—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ বন এ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার ডঃ অ্যাডেনাওয়ারের সহিত আলোচনাকালে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে পশ্চিমী ঐক্যের বাঁধন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

২৮শে আগস্ট—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, চীন ভারত সীমান্তের নিকটে ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রীনেহরু নয়াদিল্লিতে যে বিবৃতি দেন তার [illegible] আসলে [illegible] প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে জানান হইয়াছে।

আজ প্রতিরক্ষা বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী [illegible] মধ্যে বিমানযোগে লাওসে সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ করিবে। এই সব সরঞ্জাম ও অর্থ প্রেরণ করিয়া কম্যুনিস্টদের [illegible] করার জন্য লাওস [illegible] সাহায্য করিতেছে।

২৯শে আগস্ট—[illegible] অঞ্চলে সুবর্ণশ্রীর [illegible] প্রবেশ করিয়াছে [illegible] এই [illegible] দপ্তরের [illegible] তাঁহারা এ সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য করিতে বিরত থাকেন।

কোন [illegible] হইতে বলা হইয়াছে, আজ সকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী [illegible] ম্যাকমিলান ও প্রেসিডেন্ট [illegible] আইসেনহাওয়ারের মধ্যে চীন ভারত [illegible] উদ্ভূত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

৩০শে আগস্ট—ভারতভূমিতে চীনাদের [illegible] আক্রমণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান শ্রীনেহরুকে গোপনে সামরিক সাহায্য দিবার প্রস্তাব করেন। তবে তাঁহার বিনা অনুমতিতে তাঁহারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

আর দেরি নয়, পূজোর সওদা শুরু করুন ...

শুরু করুন বাটার দোকানে

ছোটদের জুতো ঠিক তো বাছাই সমঝদারি কাজ, তাড়াহুড়োয় সারবার নয়। রকমারি রঙে এবার হরেক রকম ফ্যাশান, যেমন মাপসই, তেমনি টেকসই। তেমনি আবার বানাবার কায়দা, পায়ের ঠিকমতো গড়নে সবার সেরা বাটার জুতো।

বাটা সু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

REG. NO. C. 2109

দেশ
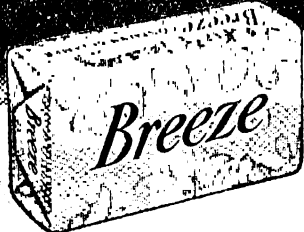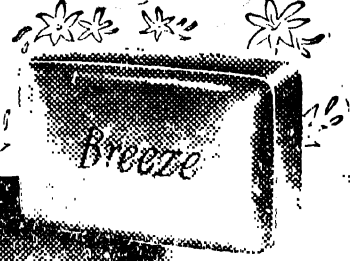
২৬ বর্ষ] শনিবার, ১২ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 29th August, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৪

SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

ব্রিটানিয়া

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতন ভালো জিনিস আর হয়না। অতিরিক্ত ভিটামিন ও পুষ্টিকর জিনিসে তৈরী ব'লে দৈনন্দিন খাদ্যে পুষ্টির অভাব মেটায়, স্বাস্থ্য ভালো করে ও শক্তি বাড়ায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে এত ভালো যে বাচ্চারা ব্রিটানিয়ার লোভ সামলাতে পারে না।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট বড়দেরও ভারি প্রিয় জিনিস। ভালো জিনিস ছাড়া যাদের চলেনা তারা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই চান — স্বাদে ও গন্ধে অপূর্ব এ বিস্কুট।

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

JC 3825

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 29th August, 1959

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৪ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১২ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

কলিকাতা প্রসঙ্গ

কয়েকদিন আগে পত্রান্তরে কোন লেখক কলিকাতা শহরের পত্তন ও পরবর্তীকালের বিচিত্র ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে যে-সব উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতা কিভাবে নূতন যুগের, নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হইয়া উঠিল ইহাই তাঁহার আলোচনার বিষয়। গোয়া কলিকাতার বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহর দুটিও কলিকাতার অগ্রজ, অথচ দেখা যাইতেছে যে গোয়া, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পণ্ডিচারীকে অবলম্বন করিয়া নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে নাই। এখনকার কথা বলিতেছি না, ঊনবিংশ শতকের প্রথমে যখন কলিকাতায় নূতন সংস্কৃতির ঊষালোক বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখনও ওই সব স্থানে মধ্যযুগীয় নিশাবসান ঘটে নাই। এই ঘটনাকে লেখক বিস্ময়কর বলিয়াছেন। আর ইহার তুলনা খুঁজিতে গিয়া ইটালীয় রেনেসাঁসের দৃষ্টান্ত তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। লেখক ঘটনার উপরে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন সে বিষয়ে বোধ করি দ্বিমত হইবার আশঙ্কা নাই, কিন্তু কেন কলিকাতার ক্ষেত্রে এমন হইল আর অন্য সব ইউরোপীয় পত্তনের ক্ষেত্রে এমন হইল না তাহার যথার্থ কারণ নির্ণয় করিতে তিনি পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা সাধ্যমত সেই চেষ্টা করিব।

পাঠান ও মোগল যখন এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তখন উত্তর ভারতে নূতন নূতন শহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পুরাতন ও নূতন মিশ্রিত হইয়া এক নূতনতর সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন হইবার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়, স্থলচারী পাঠান ও মোগলগণ ভারতের পশ্চিম-উত্তর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

ইউরোপীয় বণিকগণের আবির্ভাবে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত ঘটিল, সমুদ্রচারী তাঁহাদের পদক্ষেপে সমুদ্রতীরে নূতন নূতন পত্তন গড়িয়া উঠিল, গোয়া, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা, আবার পুরাতন পত্তন নূতন ঐশ্বর্য লাভ করিল যেমন সুরাট ও হুগলী ইত্যাদি। এগুলি মূলত ইউরোপীয় বণিক জাতিদের ব্যবসায়ের কেন্দ্র। কিন্তু মূলের এই স্বভাব অপ্রত্যাশিত ঘটনার হস্তক্ষেপে বদলাইতে শুরু করিল, কলিকাতার ক্ষেত্রে সে বদল যেমন গুরুতর হইল তেমনি শুভসূচী হইল। সংস্কৃতির মূল উপাদান দুটি, কিম্বা একটিকে পরিবেশ বলা যায় অপরটিকে উপাদান বলা যাইতে পারে। সামাজিক শান্তি ও সামাজিক সম্ভাবনা। এ দুটির শুভ যোগাযোগ না ঘটিলে সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা অর্থাৎ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুবে বাঙলায় কোম্পানীর শাসন ব্যাপকভাবে সর্বপ্রথমে স্থায়ী হইয়া সামাজিক শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিল, আর এই সামাজিক শান্তির পরিবেশেই সমাজের সম্ভাবনা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জল হাওয়ায় পুষ্ট হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। ঘটনাক্রমে, সৌভাগ্যক্রমে ইহা কেবলমাত্র কলিকাতার বেলাতেই ঘটিল, অন্যান্য সমুদ্রোপকূলবর্তী পত্তনের বেলায় এমনটি ঘটিয়া উঠিল না। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। কোম্পানীর পত্তন বোম্বাই শহর দ্বীপ—মূল ভূখণ্ডের সহিত সেকালে তাহার কায়িক ও মানসিক যোগাযোগ ছিল না। তাহাকে অবলম্বন করিয়া নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠা সম্ভব ছিল না। মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি পুণা নগরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু পুণায় কি সামাজিক শান্তি ছিল? ১৮১৮ সালে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া স্থায়ী শান্তির ভূমিকা রচিত হইল, তাহার আগের বছরে কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু তার পরেও অনেককাল ক্ষুব্ধ মহারাষ্ট্র কোম্পানীর হাত হইতে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিবার উদ্যোগ দেখায় নাই। সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশের এমন দুর্মতি হয় নাই। অবশ্য তাহার কারণও স্পষ্ট। পরাজিত পেশবাকে মহারাষ্ট্র যেমন আপন মনে করিত, পরাজিত নবাবকে বাঙালী তেমন আপন মনে করে নাই বলিয়াই তাহার ক্ষোভের কারণ ছিল না; নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত তাহার অসহযোগিতার কারণও ছিল না।

সুবে বাঙলায় প্রথমে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; সামাজিক শান্তির পরিবেশে নূতন শিক্ষার প্রসার ঘটিল, নূতন শিক্ষার প্রসার সামাজিক সম্ভাবনার বিকাশে সাহায্য করিল। তাহার উপরে প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় নিয়মে রামমোহন প্রমুখ নূতন দৃষ্টিমান মনীষীর জন্ম ঘটিল। কিম্বা শেষোক্ত ব্যাপারটিকে পৃথকভাবে না দেখিয়া সামাজিক সম্ভাবনার বিকাশরূপেই দেখা যাইতে পারে। এদেশের চিত্তভূমিতে যে মহৎ সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় ছিল সামাজিক শান্তির সুযোগ লইয়া নূতন শিক্ষায় পুষ্ট হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যে শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক Minor Renaissance সৃষ্টি করিয়া বসিল, যাহার সুফল প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে। কলিকাতায় তথা বাঙলায় কেন জ্ঞানবিজ্ঞানের নব অভ্যুদয় ঘটিল আর অন্যান্য ইউরোপীয় পত্তনে কেন ঘটিল না এবারে বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারা উচিত।

প্রসঙ্গত

আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলীর আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছেন। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তিনি কখনই জড়িত ছিলেন না। কিন্তু উন্নতিমূলক নানা কাজের সঙ্গেই তাঁর সংযোগ ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মিষ্ঠতার জন্যে কি স্বাধীনতালাভের পূর্বে, কি স্বাধীনতালাভের পরে, সকল সময়েই, দলমত-নির্বিশেষে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। যার ফলে অনেক দুরূহ এবং জটিল রাজকর্মের ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই সমস্ত কাজে তিনি তাঁর বিচারকুশলতা, বিচক্ষণতা এবং দক্ষতার নিঃসংশয় প্রমাণও দিয়েছেন।

কিন্তু যে কারণে সবচেয়ে বেশি তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন, সে হচ্ছে তাঁর সাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত, উদার অন্তঃকরণ। তারই জন্যে সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল মতের লোক তাঁর বিয়োগে কাতর হয়েছে। তারই জন্যে নাগা বিদ্রোহীদের একাংশের আনুগত্য তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন। এটা শুধু তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয় নয়, তাঁর অন্তরের সহৃদয়তারও পরিচয়। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর শিক্ষিত মন এবং ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহারের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। অনর্গল ব্যবহারে 'ভদ্রলোক' শব্দটির মাধুর্য এবং অর্থবহতা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। অথচ এর চেয়ে বড় বিশেষণ আর কি হতে পারে? সৈয়দ ফজল আলীর সম্বন্ধে এই বিশেষণটি সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

নিঃশব্দ, শোকগম্ভীর পরিবেশে তাঁর নশ্বর দেহ বারাণসীতে তাঁর পিতৃপুরুষের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হয়েছে। তাঁর বিয়োগে তাঁর পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুসমাজ আজ শোকার্ত। তাঁর প্রিয় কাকাতুয়াটি কেঁদে ডাকছেঃ লাটসাহেব জেগেছেন?

আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জানাই। এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

*

গত ১৭ই ও ১৮ই আগস্ট কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারিগণ এবং ত্রিপুরার চীফ কমিশনার একটি সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে "পূর্ণভাবে এবং খোলাখুলিভাবে" আলোচনা হলেও একমাত্র আসামের ডাউকি অঞ্চল ছাড়া আর কোনো সমস্যা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে চীফ সেক্রেটারীদের যুক্ত বিবৃতিতে জানানো হয়নি। না পাথারিয়া সম্বন্ধে, না টুকেরগ্রাম সম্বন্ধে। অথচ এই দুটি জায়গাই ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয় অধিকার-ভুক্ত ছিল। আমাদের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের ফলে সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারে চলে গেছে। এবং তা ফেরত দেওয়ার কোনো আগ্রহ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

সম্মেলন শেষ হয়ে যাবার পর এই প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক যে, এর ফলে সীমান্তে কতখানি শান্তি ফিরে এল? খবর পাওয়া যাচ্ছে, গত দশ দিন যাবৎ যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলায় জোর সৈন্য-চলাচল আরম্ভ হয়েছে এবং চুয়াডাঙ্গায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর প্রায় তিনশো সৈন্যের একটা ছাউনী পড়েছে। চুয়াডাঙ্গা ভারত সীমান্ত বাণপুর থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে! আরও শোনা যাচ্ছে, মাজদিয়া (ভারতীয় এলাকা) থেকে বাইশ মাইল দূরে কোটচাঁদপুরেও পাক-বাহিনী সমাবেশ করা হয়েছে! যশোহর বিমান-ঘাঁটি থেকে একটি বেলুচি ও পাঠান বাহিনী আসাম সীমান্তের দিকে পাঠাবার খবরও পাওয়া গেছে।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নূতন উপন্যাস
"প্রথম কদম ফুল"
আগামী সংখ্যা হইতে
দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত হইবে

সুতরাং এই সম্মেলনের ফলাফলে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইনি। তাই বলে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপেরও কোনো কারণ ঘটে নি। কারণ উভয় রাষ্ট্রের চীফ সেক্রেটারীদের এইরকম সম্মেলন এর আগে আরও বহুবার হয়ে গেছে। সেই বহুশতা ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, আলোচ্য ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি কিছু ঘটতে পারে এমন আশা, বলা বাহুল্য কেউই পোষণ করেননি। বরং, বলা যেতে পারে, এইরকমের সম্মেলনের কথায় আমরা ভয়ই পাই। কারণ বরাবর দেখে এসেছি, প্রত্যেকটা সম্মেলনে যা-নেবার পাকিস্তান তা আঠার-আনা আদায় করে নেয়, কিন্তু যা-দেবার তা এক আনাও দেয় না। সম্মেলনগুলি দফায় দফায় কিছু-কিঞ্চিৎ আদায়ের কৌশল মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা চলে।

বস্তুত, 'ক্যানবেরা' ধ্বংসের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। ক্ষতিপূরণের দাবী পাকিস্তান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এইরকম অবস্থায় চীফ সেক্রেটারী সম্মেলন এবং তারপরে নেহরু-আয়ুব সম্মেলনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ভারতবর্ষের মন এখনও তৈরি হতে পারেনি। তার উপর অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনে এই আশঙ্কাই প্রবল যে, ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি এবং আপোসের ক্ষেত্রে ভারতের উদারতাই ভারতের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন। অবশ্য কূটনীতিক্ষেত্রে উদারতা দুর্বলতার পোশাকী নামমাত্র। দলগত রাজনীতিক্ষেত্রে তার যদি বা কিছু মর্যাদা থাকে, কূটনীতিক্ষেত্রে একেবারেই নেই। সেখানে একমাত্র বিচার্য বিষয়, কি দিয়ে কি পাওয়া গেল। তাই দিয়েই তার মূল্য নির্ধারিত হয় এবং মর্যাদাও। স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে আজ পর্যন্ত, লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে, বারে বারে আমাদেরই হার হয়েছে। আমরা শান্তি চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু যে কোনো মূল্যে নয়, সম্মানজনক শান্তি।

*

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন পদত্যাগ করেছেন। তাঁর খাদ্য-নীতি ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এই ব্যর্থতা এখন আর তর্কের বিষয়বস্তু নয়, সর্বজনস্বীকৃত তথ্য। খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। চালের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যর্থতা বিনিয়ন্ত্রণের দ্বারা সরকারীভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় খাদ্যাবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সহ-সভাপতিও একান্তভাবে তাঁকেই দায়ী করেছেন, রাজ্য-খাদ্যমন্ত্রীকে নয়। মুনাফা-শিকারীদের সঙ্গে যোগ-সাজসে বাজারে চালের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির জন্যেও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার জন্যে কতখানি তাঁর দায়িত্ব আর কতখানি রাজ্য খাদ্যমন্ত্রীর তা নিয়ে অনেক তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু জৈন মহাশয় সে তর্ক তোলেন নি। সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস গভর্নমেন্টের মর্যাদা বাড়লো বই কমলো না। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যরক্ষার এই রকমের দৃষ্টান্ত গত বারো বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে আরও দুটি আছে। কিন্তু কোনো রাজ্য গভর্নমেন্টে একটিও নেই। সুপ্রমাণিত ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও শাসনযন্ত্রের দেহে জোঁকের মতো লেগে থাকাই প্রথায় দাঁড়িয়েছে।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

একুশ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এবং সবুজ-দলের অন্য অনেকের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর বাসভবন "কমলালয়ে"—একথা পূর্বেই বলেছি। সে সাক্ষাতের তারিখ যে ২৪শে মার্চ, ১৯১৭, এ-সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার জন্যে আমার—এমনকি, সত্যেন বোসের—স্মৃতিশক্তি কালের কুটিলগতির কাছে হার মেনেছে। কেবল ডক্টর সুরেন সিংহকে ঐ সময়ে ঐ ঘটনার একটা বিবরণ দিয়েছিলুম, তাই ঘটনাটির একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাক্ষী পাওয়া গেল, যার বলে বলীয়ান হয়ে বলতে পেরেছি যে, প্রমথ চৌধুরীর পত্র-দলের সাক্ষ্য সূক্ষ্ম বিচারে গ্রহণীয়।

বোলপুরে যাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার তাগিদ প্রমথবাবুর ২৮।৩।১৭ তারিখের চিঠিতে পাই। তবে যে-কারণেই হক, সে-ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, তার প্রমাণ প্রমথবাবুর চিঠিতেই রয়েছে।

১ ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৪।৪।১৭
বুধবার

কল্যাণীয়েষু,

এ-যাত্রা তুমি যে বোলপুরে যাওনি, তা একরকম ভালোই করেছ, কেননা, এ ব্যাপার তোমার শরীরে কুলোতো না—আমার ত কুলোয় নি।

আমি সেখান থেকে সশরীরে ফিরে এসেছি, কিন্তু সুস্থ শরীরে নয়। আমার সঙ্গীদের—বিশেষত বরদা কিরণ সুরেশানন্দ ও ধূর্জটির—রাত্রিজাগরণ, অতিভোজন প্রভৃতি অকার্য করবার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়েছি। এরা দুরাত্তির খাড়া জেগেছে এবং সেই
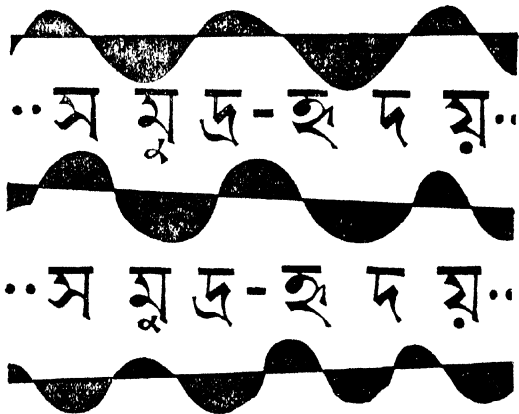
সঙ্গে সমান আহার করেছে। খাওয়াটা অবশ্য নিজের হাতে, কিন্তু ঘুমটা পরের হাতে—অন্ততঃ এক্ষেত্রে ত তাই হয়েছিল। এদের প্রসাদে আমাকেও দুরাত্তির জাগতে হয়েছিল—ফলে আমার দেহের সকল শক্তি ঝিমিয়ে পড়ছে। আজ আমাদের আপিস হয়ে দশ দিনের জন্য বন্ধ হবে, এই সুযোগে আমি তিন দশেকের জন্য রাঁচি ঘুরে আসব মনে করছি।

তোমার লেখাটা দেখেছি,—এবার লেখাটি তেমন Smart হয়নি। আমার বিশ্বাস যে, আমি সেটিকে মেজে ঘসে কতকটা ঝকঝকে করে তুলতে পারি, কিন্তু তাহলে ওটি কতকটা আমার হাতগড়া জিনিস হয়ে উঠবে। সুতরাং আমি চাই যে, তুমিই ওটিকে ফের হাতে নিয়ে নতুন করে গড়ে তোলো। তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি তোমাকে বলে দিতে পারতুম যে, কি করলে তোমার dialogueটি চটকদার হয়। তবে আমি পরশু কলকাতা হতে চলে যাচ্ছি—সুতরাং ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করা তোমার পক্ষে সুবিধে হবে কিনা জানিনে। কাল বিকেলে অবশ্য আমি বাড়ি থাকব। যদি পারো ত সন্ধ্যার দিকে একবার এলে ভাল হয়। নইলে পরশু তোমার লেখাটি ডাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—তারপর তুমি সেটিকে বদলে সদলে ফের আমাকে দেখতে দিয়ো।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এই পত্রের মধ্যে আমার যে-লেখাটার কথা প্রমথবাবু উল্লেখ করেছেন, তাতে আমাদের সবুজ-সভায় যে-ধরনের কথাবার্তা চলত, তারই একটা ছবির মতন পাওয়া যাবে। অবশ্য খুব ভালো ফোটো এটা নয়। আমার মনের 'লেনস্' বা 'প্লেট' সে-রকম উঁচুদরের ছিল না, আর আমিও যে সেরা ফোটোগ্রাফার ছিলুম, তাও বলতে পারি না। তবু নেইমামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এই প্রবাদ বাক্যকে মেনে নিলে আজকের দিনে সবুজ-সভার ইতিহাসের প্রসঙ্গে আমার এই রচনার পুনর্মুদ্রণের কিছু মূল্য থাকতে পারে। তাই আবার এখন ছাপাচ্ছি। রচনার কাল, দোলপূর্ণিমা, ১৩২৩, অর্থাৎ ইং ৮।৩।১৭, যে-দিন প্রমথ চৌধুরীও আমায় একটি চিঠি লিখেছিলেন যেটি সবুজপাতার ডাকে ইতিপূর্বে বেরিয়েছে।

॥ টি-পার্টি ॥

ব্যক্তিগণ

অক্ষয়— হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার; Chikago-ফেরৎ।

ভূপেন্দ্র— সংগীতপ্রিয় সাহিত্যিক।

সত্যব্রত— বিজ্ঞানে পণ্ডিত।

হিমাংশু— ব্যারিস্টার।

পুণ্ডরীকাক্ষ— Antiquarian।

দেবকুমার— বেকার ও সবজান্তা।

স্থানঃ ভূপেন্দ্রবাবুর বাসভবন।

দে—(চা খেতে খেতে) আচ্ছা, আপনারা কি বলেন? চা-টী বেশ উপাদেয় হয়েছে, না?

পু—খাসা লাগছে, ডার্জিলিং চায়ের মতন flavour।

ভূ—তাই বটে। এখানে দোকানে যে-সব চা বিক্রী হয় তার চাইতে ভাল মনে হ'ল বলে খাস্ ডার্জিলিং থেকে সেদিন দশ পাউণ্ড নিয়ে এলুম।

পু—শখও ত মন্দ নয়! চা আনবার জন্যেই অতদূরে গেছলেন নাকি?

ভূ—না, ততটা নেশা ধরে নি। বেড়াতেই গেছলুম; আসবার সময়ে খানিকটা চা সঙ্গে আনা গেল।

হি—মজা দেখেছেন? এই চা-ই আবার ডার্জিলিংএ তৈরী করলে এখানকার মত এত ভাল হয় না।

ভূ—বড্ড শীত কিনা।

স—এবার ওখানে খুব শীত পড়েছিল, না?

পু—কোন্‌বারেই বা কম পড়ে?

স—ওইটে আপনাদের ভুল বিশ্বাস। খবরের কাগজে যে Meteorological report দেয় সেটা কি সম্পূর্ণ বাজে?

দে—তা না হয় মানা গেল যে খুব শীত হয়েছিল, আপনার গায়ে ত আর লাগেনি?

হি—ও আর শীত কি? বিলেতে অমন সময় বরফ পড়ে।

অ—তেমন শীত আমাদের দেশে না হওয়াই ভাল।

হি—কিসে ভাল? এদেশটা যদি আর একটু ঠাণ্ডা হ'ত তাহলে বাঙালীরা এত কুঁড়ে হয়ে যেত না।

অ—মানে, বুঝছেন না? শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যদিও বেশী খাটতে পারে, তাদের মধ্যে lungs-এর অসুখের প্রাদুর্ভাব বেশী।

ভূ—তা আপনার মতন ডাক্তার থাকলে অসুখের বড় ভয় থাকে না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মস্ত গুণ হচ্ছে, তার দ্বারা রোগের উপশম হোক্ না হোক্ রোগের বৃদ্ধি হয় না।

অ—কি জানেন, অ্যালোপ্যাথীতে সবই সবই অন্ধকারে ঢিল মারা। দেখবেন আর বিশ বৎসরের মধ্যে ওদের কেবল Surgery-টুকু থাকবে; আর ওষুধপত্র সব হোমিওপ্যাথিক হয়ে যাবে। এই এখনই দেখুন না, Injectionটা আমাদেরই "বিষে-বিষক্ষয়" principle-এর ওপর base করা। ওরা ওষুধ ফুঁড়ে দেন, আমরা গিলিয়ে দিই, এই যা তফাৎ।

দে—অনেকে আবার mixed treatmentও করেন। এই আমার এক বন্ধুর সেদিন গা-হাত-পা কামড়ে জ্বর এল; একটি ডাক্তার—নাম করব না—এক ফোঁটা Aconite ও একটি Aspirin-এর বড়ির ব্যবস্থা করলেন। জ্বর ছাড়লে দিনকতক রোজ সকালে এক মোড়া করে মকরধ্বজ মধু দিয়ে মেড়ে খেতেও বলে গেলেন।

অ—তাঁর বোধহয় কোনটাতেই বিশ্বাস নেই। অথবা জানতেন না যে, একটি ফোঁটা Rhus Tox 30th. দিলেই হাঙ্গামা মিটে যেত।

হি—আঃ, কি বাজে বক্‌ছেন? চা খাবার সময় অসুখ ওষুধের গল্প করে মন খারাপ করবার দরকার কি? বিলেতে কোন পার্টিতে ওরকম গল্প করাটা বেয়াদবি বলেই গণ্য হয়।

দে—সেটা ঠিক্। বিলেত, অতদূরে যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশেই মুসলমানদের ভিতর ওসব বলবার যো নেই।

পু—হ্যাঁ; মুসলমানেরা সবেতেই কায়দা-দোরস্ত।

ভূ—তার মানে, ওদের জাতটা ত বেশীদিন পূর্বে স্বাধীনতা হারায় নি; সুতরাং কায়দা কানুনও বোঝে, virility-ও আমাদের চেয়ে বেশী আছে।

স—সে আবার কতকটা আহারের গুণেও বটে। এই ধরুন না, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, এইসব খাওয়ার রেওয়াজ আজকাল হিঁদুর ছেলেদের মধ্যেও হয়েছে, আর তাতে করে তাদের শরীরও ভাল হচ্ছে।

পু—ও বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওসব গরম জিনিস খাওয়া যদি ভাল হ'ত তাহলে কি আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ থাকত? কি বলেন, অক্ষয়বাবু?

ভূ—অক্ষয়বাবু 'হ্যাঁ' বলুন আর 'না' বলুন, যা চলে গেছে তার ত আর চারা নেই? আর ঐ শাস্ত্র দেখিয়ে দেখিয়েই আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল।

হি—You're quite right—ঠিক্ বলেছেন। ইংরেজরা অত বড় জাত কেন জানেন? ওরা কথ্‌খন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কথা কয় না।

স—কথ্‌খন না। ওরা গতানুগতিকের দাস হলে কি Science জিনিসটা তৈরী হ'ত? ওদেরই ঘরে ত বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর আজ এত বড় হয়েছে।

পু—তা কিন্তু আপনি বলতে পারেন না। রামায়ণ মহাভারতের সময়ে aeroplane, machine-gun, asphyxiating gas, barbed wire entanglements, সবই এদেশে জানা ছিল। এখন আর

পুষ্পক রথ, অগ্নিবাণ, সম্মোহন বাণ, নাগপাশ এসব কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কৌটিল্য পড়লে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে যে রকম গুপ্তচরের বন্দোবস্ত ছিল তা থেকে জর্মনরাও Spy System কিছু শিখতে পারত। এমন কি আর্যেরা Wireless Telegraphy জানতেন এও প্রমাণ করা যায়।

ভু—না; ততটা বোধ হয় সহজে প্রমাণ করতে পারেন না।

পু—সে আর শক্তটা কি? মুনি-ঋষিরা তপস্যাবলে বর পেতেন যে, তাঁরা অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করলেই তাঁর "টনক" নড়বে, আর তিনি এসে হাজির হবেন। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, telegraphy ছিল; এবং যখন পুরাকালের কোন wire খুঁজে পাওয়া যায়নি, তখন নিশ্চয়ই telegraphyটা wireless ছিল।

স—হাঁ, এ যুক্তিটি আপনার অকাট্য! কিন্তু আমি যতগুলো telegraphyর উপর বই পড়েছি তাতে একবারও একথা বলা নেই। অন্তত Hertz বা Marconিরও তো স্বীকার করা উচিত ছিল।

দে—বোধহয় একটা তাঁরা খবর রাখতেন না!

পু—তা ওরা জানলেও কখনো স্বীকার করতে চায় না। ওদের যে-কোন একটা ইতিহাসের বই খুললে দেখবেন, লেখা আছে যে, ইউরোপে যা কিছু ভাল আবিষ্কার হয়েছে, সে কি সাহিত্যে কি দর্শনে কি অর্থনীতিতে কি ভাস্কর্যে,—সবই গ্রেকো গ্রীস হতে আমদানী হয়েছিল। অথচ গ্রীস যে এখান থেকে, ভারত থেকে কত কি ধার করেছে—তার উল্লেখ নেই। এমন কি আজকাল ঐতিহাসিকেরাও প্রমাণ করতে লেগেছেন যে, ভারতবর্ষে যা কিছু আছে, তা সবই বিদেশী—মায় মানুষগুলো পর্যন্ত।

ভু—এই কালকাতায় এক দুরো উঠেছে যে পাটলিপুত্রে অশোকের যে শতস্তম্ভ দরবার ঘর মাটির নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেটা নাকি Darius এর Hall of a Hundred Pillars এর হুবহু অনুকরণ। অশোকের স্থপতি পার্শী ছিলেন।

স—কোন দিন শুনব যে, বুদ্ধদেব চীনেম্যান ছিলেন।

পু—কথাটা একেবারে আজগুবি ঠাওরাবেন না। যত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়, তার অধিকাংশেরই চোখ ছোট, কপাল উঁচু, নাক খেঁদা,—আর গোঁফ নেই। যদিও বোধিসত্ত্বগুলোর গোঁফ আছে। এই থেকে ধরা যায় যে, বুদ্ধদেব Mongolian race-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দে—তার কারণ এও হতে পারে যে, China, Japan, Burma Siam-এতেই বৌদ্ধধর্মের অধিক প্রচার। সুতরাং যাঁরা বুদ্ধমূর্তি বেশীভাগ গড়েন, তাঁরা নিজেদের নাক-চোখকে আদর্শ ভেবে সিদ্ধার্থের প্রতি ভক্তি-বশত তাঁকে নিজেদের মতন করেই গড়েন।

ভু—হাঁ, Mongolian art-এ ওদের নিজেদের আকৃতি প্রকৃতি একটু বেশী প্রকট। Mongoliandের আর-একটা ব্যাপার দেখবেন, তাদের ঘরের প্রত্যেক জিনিসটিতে সৌন্দর্যের ছাপ আছে।

পু—সৌন্দর্যবোধ আমাদেরই বা কম কিসে? ওরা art শিখলে কোত্থেকে?

Mongolianদের মধ্যে জাপানীরাই ত সর্বশ্রেষ্ঠ? সেই জাপান ত গোড়ায় ছিল একটি বাংলা উপনিবেশ মাত্র।

দে—Okakura-ও স্বীকার করেচেন যে, জাপানীদের আর্ট ভারতবর্ষ হতেই প্রাপ্ত।

ভু—সেরকম ধরতে গেলে সব দেশই এদেশের কাছে ঋণী, এবং আমরাও অন্য দেশে কাছে ঋণী, আর আজকাল ঋণের ভার আমাদেরই বাড়চে।

প—আপনার কেবল ঐ একই কথা। আজই যেন আমাদের কিছু নেই,—ইউরোপের কাছে ধার করচি। যখন ওরা বল্কল পরে বেড়াত আর বনের পশু শিকার করে খেত, তখন এদেশের লোকেরা কত সভ্য ছিল, সে-কথা একেবারেই ভুলে যাচ্ছেন!

হি—কি ছিল না ছিল তা জেনে কি হবে? বরং কি আছে, সেইটেরই ওপর নজর রাখা উচিত।

দে—ঠিক কথা। আমারও ত পূর্ব-পুরুষদের জমিদারীর আয় যথেষ্ট ছিল। এখন কি তা আছে? তাঁদের বড়মানুষীর কথা এখন গল্প-কথার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েচে।

হে—আচ্ছা, আপনাদের গেল কি করে?

দে—সে আর বলে কি হবে? দুঃখ বাড়বে বৈ ত আর কমবে না। আমাদের তিনশ বছরের জমিদারী। দশ-শালা বন্দোবস্তের সময় আমার প্রপিতামহ হরকিংকর, কোম্পানীর দেওয়ানকে ঘুষ দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁর জমিদারীর সদর খাজনা দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর ক্রমাগত ভাগ হয়ে এখন গেরস্ত দাঁড়িয়ে গিয়েচি। তাই ত বলচি, পূর্ব-গৌরবের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

স—বেশ, না হয় তাই বিচার করা যাক না যে কি আছে।

ভু—আমার মনে হয়, আমাদের পূর্ব-সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপে দুটি জিনিস বজায় আছে,—the art of cooking and the art ot music। এই দুই বিষয়ে ইউরোপ অদ্যাবধি আমাদের সমকক্ষ হতে পারেনি।

দে—ও দুটি art-এর কথা এক নিঃশ্বাসে বলা কিন্তু inartistic হল। সেদিন যেমন এক ভদ্রলোক লেকচার দিলেন, Poetry and Zoologyর ওপর!

ভু—আমি ইচ্ছে করেই বলেছি;—আমার রাঁধবার শখ আছে, কেবল তাই জন্যে নয়। কোন দেশের যখন অধঃপতন হয়, তখন সব যেতে পারে, কিন্তু খাওয়া থেকে যায়। যেমন কোন লোকের বিষয়সম্পত্তি সব বিক্রী হয়ে গেলেও বসতবাড়িটি যেতে বিলম্ব হয়। তবে হিন্দুদের সংগীতটা কেন এখনও বজায় আছে তার ঠিক কারণ আমি খুঁজে পাইনি। বোধ হয়, মুসলমান রাজাদের পেয়ারে।

হি—তাই সম্ভব। দেশের রাজা এবং দেশের বড়লোকেরা যদি পেয়ার না করেন ত কোন art-এরই উন্নতি হয় না।

ভু—তাছাড়া মোগল সম্রাটেরা আবার art-এর দিকে বেশী নজর রাখতেন।

দে—সব art-এর নয়। Architecture-এই তাঁরা যাকিছু উন্নতি করেছিলেন। ও জিনিসটা পূর্বে আমাদের তত ছিল না। অর্থাৎ সাজাহান বাদশা যে-রকম taste দেখিয়ে গেছেন, তার পূর্বে হিন্দুদের ত ওরকম ছিলই না, মুসলমানদের আমলেই কতকটা পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল মাত্র।

প—তাজ-টাজের কথা বলচেন ত? সেও আজকাল সকলে স্বীকার করেন না। Havell সাহেব স্পষ্টই প্রমাণ করে দিয়েচেন যে, তাজের Architecture পুরোদস্তুর বৌদ্ধ।

হি—Cooking, music, architecture সবেরই উপর ত বক্তৃতা হল; কিন্তু বাংলার যেটা সবচেয়ে সেরা জিনিস, literatare, সেইটিই বাদ পড়ল কেন? রবিবাবুর গীতাঞ্জলির কবিতার অনুবাদ পড়ে যে সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হয়ে গেল, এটা তো কম গৌরবের কথা নয়। ভূপেন্দ্রবাবুর এ-বিষয়ে কিছু বলা উচিত ছিল।

ভু—দেখুন, সাহিত্যের—সে গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, দুটো দিক; form এবং spirit। অনুবাদে form থাকে না; কিন্তু spirit অনেকটা থাকে। Wiekland যখন Shakspere-এর জর্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন সেইটে পড়েই Goethe বলেছিলেন যে, যার গদ্য-অনুবাদ এত সুন্দর তার মূল কাব্য নিশ্চয়ই অতি উঁচুদরের; কেননা অনুবাদে মূলের সে শব্দবৈচিত্র্য নেই যা মনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। রবিবাবুর অনুবাদ পড়ে সব দেশের লোকেরাই মুগ্ধ হয়েচে, এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, ওঁর কাব্যের spirit সার্বজনীন। সেই spirit-টাই আর্টিস্টের নিজস্ব, এবং তার জন্যে আর্টিস্ট পূর্ব-সভ্যতার কাছে ঋণী নন। তাই সাহিত্যকে বাদ দিচ্ছিলুম।

হি—কিন্তু Goetheর সময়ে আর্টিস্টেরা যেরকম জাতীয় জীবনের সংগে সংস্পর্শ না রেখে থাকতে পারতেন, Ibsen, Maeterlinck, Bernard Shawর সময়ে ততটা পারা সম্ভব নয়। তাঁরা Spirit of the age-এর স্রোতে গা ঢেলে দিতে বাধ্য হলেন।

ভু—এবং সেইজন্যেই তাঁরা উচ্চ সাহিত্য গড়তে পারলেন না।

প—গড়লেই বা কি লাভ হত? ওসব করে কি জাত বড় হতে পারে? নাটক পড়ার চেয়ে পাঁচখনা অন্ধ dynastyর ওপর বই পড়লে কাজ হয়। আমাদের হয়েছে কি, Nova Zembiaয় কত ডিগ্রী ঠাণ্ডা, তা জানি, William the conqueror থেকে ইংলণ্ডে যতগুলি রাজা হয়ে গেছেন, তাঁদের নাম মুখস্থ বলতে পারি, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের date কি তা নিয়ে যুক্তি বিচার করে দেখি না।

হি—তা বটে। আমাদের যা শিক্ষা হচ্ছে, তা যে একদেশদর্শী তার আর সন্দেহ নেই।

ভু—মাফ করবেন, কিন্তু সেটার জন্যে আপনারাও অনেক পরিমাণে দায়ী। এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গেলেন, আর শিখলেন কিনা ল'? দ্বারিক মিত্তির, রমেশ মিত্তির, সার রাসবিহারী, সার আশুতোষ, এঁরা এইখান থেকেই যা আইন শিখেচেন ও লোককে শিখিয়েচেন, এর চেয়ে কি আইন-জ্ঞান আপনার বেশী হয়েচে? ল' পড়াতে দেশের মাওলা national economy নয়। আইনের ব্যবসাটিও national point of view থেকে অর্থকরী নয়। কেবল একজনের টাকা হাতানো করে আর একজনের টাকা জারি করা।

হে—কিন্তু এক হিসাবে আমরা দেশের উপকার করি। ধরুন, যদি আমরা ব্যারিস্টার না হতেম ত যে টাকাগুলো আমরা পাচ্চি, তা ইংরেজ ব্যারিস্টারদের পকেটে যেত।

স—তথাপি, যদি ব্যারিস্টারেরা না পড়ে Science পড়তেন, তাহলে দেশের আরও বেশী টাকা বাঁচাতে পারতেন। দেশে যত উকীল-ব্যারিস্টার হয়, ততই লোকেরা মামলাবাজ হয়ে ওঠে।

হি—কিম্বা দেশের লোকেরা যত বেশী মামলাবাজ হয়ে ওঠে, ততই উকীল-ব্যারিস্টারের দরকার হয়।

ভু—ও বিষয়ে এমন কিছু Statistics নেই, যা আশ্রয় করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে বিজ্ঞান-বস্তু উদ্ধার করবার জন্যে যে সমুদ্র-লঙ্ঘন প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করা যায় না। বিলেতে না গেলে কি আর জগদীশ অত বড়-লোক হতে পারতেন?—গাছের ভাষা মানুষের বোধগম্য হত?

দে—ওটা আমি মানি না। গাছের জীবন আছে, এ-আইডিয়াটার জন্যে সাগর পারে যেতে হয়নি।

হি—কেবল idea পেলে কি হবে? আইডিয়াকে কার্যে পরিণত করতে হলে

—বিশেষত Science-এ—ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না।

অ—এ-কথা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয়ে আরো বেশী রকম খাটে।

পু—কেন, আয়ুর্বেদ ত চতুর্বেদের উপসংহার বলে স্বীকৃত হয়েছে। আজকাল আয়ুর্বেদ হলে মহামহোপাধ্যায় উপাধিও মেলে।

অ—কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না কবিরাজেরা নিজেদের মনগড়া "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ" "আমরাক্ষসী" ইত্যাদি নামকরণে বিরত হচ্ছেন, ততদিন আয়ুর্বেদকে Science বলেই মনে হবে না। কি বলেন, সত্যব্রতবাবু?

স—সে কথা সত্য। তাছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান যেটাকে আজ সত্য বলে মেনে নিচ্ছে কাল যদি সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়, বিজ্ঞান সেটা মিথ্যা স্বীকার করতে বাধ্য। আয়ুর্বেদে কতদিন আগেকার ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে ধারণাগুলো একবার revise করে দেখে, এমন লোকও এখানে নেই।

ভু—অনেক ক্ষেত্রে আবার আমরা পূর্বেকে সংশোধন করতে গিয়ে শুদ্ধটাকে অশুদ্ধ করে ফেলি। এই যা বলছিলুম art of cooking আর art of music-এ জগতে আমাদের তুলনা নেই। রান্নার রীতি বা গানের পদ্ধতিতে আমরা যদি কোন আধুনিক সভ্য দেশকে অনুকরণ করতুম, তাহলে মোচার ঘণ্টও খেতে পেতুম না, আর ভৈরবীর মিষ্টি আলাপও শুনতে পেতুম না।

দে—অনুকরণ যে ঐ দুই বিষয়ে করি না তাও বলতে পারেন না। এই যে এখানে বসে চা, কেক, বিস্কুট খাচ্ছি, এটি কি স্বদেশী ব্যাপার? আর সবচেয়ে ভাল যে স্বদেশী পান সে পান খাওয়া পুষ্পেপ ভরা ... তার সুবাটি ত শুনতে পাই সম্পূর্ণ বিদেশী।

হে—ওরকম আমাদের সবেতেই একটু-আধটু সাহেবিয়ানা ঢুকেছে। এবং ঢোকাও ভাল। এই বাংলা গদ্য, যা এত চমৎকার, তা কবে থেকে হল? —যবে ইংরেজরা আমাদের রাজা হলেন, আর গদ্য-লেখকেরা ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা শুরু করলেন।

ভু—অবশ্য historically তাই বটে, কিন্তু এখন আর গদ্যে ইংরিজীর নকল করা উচিত নয়। বরং যদি নকল করতে হয় ত ফরাসী গদ্যকেই সামনে রাখতে হয়। ফরাসী ভাষা ও ফরাসী মেজাজের সঙ্গে আমাদের বেশ বড্ড মিল।

দে—Lord Lytton ও বলেছিলেন,—The Bengalis are the French of Asia। বড় চারটিখানি কথা নয়।

স—কিন্তু ফরাসীদের যেরকম অগ্নিপরীক্ষা চলেছে, ওরা যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না তারই বা ঠিকানা কি?

ভু—তাহলে আধুনিক সভ্যতারও সহমরণ হবে। ইউরোপে সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, প্রাচীনকালে গ্রীস, মধ্যযুগে ইতালী, বর্তমান যুগে ফ্রান্স।

স—আর জর্মানি?

ভু—জর্মানি ত এখন আত্মবিস্মৃত। 'জ্ঞানাঞ্জনে তার নয়ন আঁধার।' সমগ্র পৃথিবী আজ তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত—তার গর্ব খর্ব করতে উদ্যত।

সে—কিন্তু Science ওদের মতন কারও নেই।

ভু—একজন ফরাসী থাকলে জবাব দিত যে, ওদের conscience-ও অনন্যসাধারণ।

দে—এখন ওটা থাক। আমরা যেরকম Omniscient ভাবে কথাবার্তা কইছি তাতে ভুলে গেলে চলবে না যে, ঘুমোবার সময় হয়ে এল।

(ক্রমশ)

অথই জলবাতাসে আলোর সমুদ্রে

অরুণ মিত্র

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তোমার উপর পড়লে
তুমি কানায় কানায় ভ'রে উঠতে, পড়ন্ত বেলায়
একটুখানি রোদ তোমায় ছুঁলে তুমি সোনা
হ'য়ে যেতে, দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিলে তুমি
মর্মরিত হতে। এবার তুমি দিনের ভারে
চুরমার হ'য়ে গেলে। তোমার হৃদয়কে
কুড়িয়ে নিয়েছে অথই জলবাতাস আলোর
সমুদ্র। তাদের মাঝখানে আমাদের এই
ঘরটা আমি পাল তুলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

নৈসর্গিক

দুর্গাদাস সরকার

ঈশানী হাওয়ার তীক্ষ্ণ তীর
অস্থির দু' চোখে বিঁধে ধুলোয় ধুলোয়
ভেঙেছে তোমারো বুকে শিরীষের শির।

ভিখিরীর হাঁড়ি বাঁধা শিরীষ-শাখায়
ঋতুর গৌরব ছিল। পাতাঝরা কালেও রঙিন
ছিল ফুল ফোটাবার দিন,
তলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, রান্না। তার তবু ছিল গন্ধ-ঘেরা রাত।
নোতুন বধূর মুখে আধখোলা ঘোমটার মতো
পাখি-জাগা প্রথম প্রভাত। তখন সকালে
তুমি সদা শৈশবের দুটি ব্যগ্র চোখে
মেখেছিলে রঙ তার। কখনো ও-মসৃণ কপালে
জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের ঘূর্ণি, অথবা মৌসুমী
কোনো শোক দিতে পারে তা' ভাবোনি তুমি।
মৌসুমী বাঁধেনি তাই, ঝড় তার করেনি ক্ষয়।
ছায়ার সীমায় শান্তি করেছ সঞ্চয়
সে-গাছের ডালের কুঁড়িরে ভরে ফুলে ফুলদানী।
পথে তার ডালভাঙা দীর্ঘ শিরখানি
হঠাৎ চৌচির জ্যৈষ্ঠ-ঝড়ে,
তুমি এলে তারি কাছে চুপচাপ অন্ধকার গোপন প্রহরে।

পোড়ো গাছে চমকায় বিদ্যুৎ। তার ঋজু দীর্ঘ ত্রিশটি বছর
স্তব্ধ ফুটপাথে। তাতে পাখিদের ভাঙা বাসা। হত কাক।
টুকরো ডিমের খোলা। চূর্ণ হাঁড়ি। ঠাণ্ডা মৃত ঝড়।
তুমি দেখো, ডালে গড়া অদূরে তোমারো ভাঙা ঘর।

হি হি হেসে ভিখিরীটা তোমাকেও ডাকে !!

বলল, লাঠি। আমাল লাঠি। মাব্‌ব।

রামকিষ্টো বলল, ওর চাইতিউ ভাল লাঠি আমি তুমারে বানায়ে দিবানে। লক্ষী ছাওয়াল। এখন নলচেডা দাও দিনি। দাদু তামাক খাবে।

না তামাক খাবে না। আমাল লাঠি। মাব্‌ব।

রামকিষ্টোর অনেক কাজ। বাদবিতণ্ডার সময় নেই। সে বৃথা বিলম্ব না করে নলচেটা নিয়ে নিল। শংখর খুব রাগ হল। এ কি কথা। সে যে জিনিসে হাত দেবে, অমনি ওরা ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে নেবে! বেশ, সে চায় না. এদের কোন জিনিসই সে চায় না। প্রচণ্ড অভিমান হল তার। কেউ তাকে দেখতে পারে না। কেউ না। কেউ না। খানিকক্ষণ দুরন্ত অভিমানের জোয়ারে সে ভেসে চলল। কাঁদল। হঠাৎ দেখে উঠনে নৌকোটা পড়ে আছে।

শংখ উঠনে নেমে গেল। নৌকোটা টেনে নিয়ে উঠনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। হ্যাঁ, এইবার একটা ভাল কাজই ত পাওয়া গেছে। কিছুক্ষণ নৌকো টানবার পর খেয়াল হল, তার নৌকো খালি। যাত্রী নেই কেউ। এদিক ওদিক চাইতেই দেখে দুয়ার ধারে নেড়ি কুকুরের বাচ্চা দুটো খেলা করছে। শংখ খুব খুশি হল।

ডাকল, আয় আয়।

ওরা সে ডাকে সাড়া দিল না। বারকয়েক ডাকাডাকি করেও যখন ওরা এল না, তখন শংখ নিজেই ওদের কাছে গেল।

ডাকল, আয়, নৌকো চব্বি। আয়।

ওরা তবুও এল না। তখন শংখ একটা বাচ্চাকে ধরে এনে ওর নৌকোর উপর বসিয়ে দিল। তারপর আরেকটি বাচ্চাকে ধরে এনে দেখে অন্যটা ততক্ষণে আরেক জায়গায় চলে গেছে। শংখ বোকা বনে গেল।

হাতের বাচ্চাটাকে নৌকোয় বসিয়ে, সে তখন আগের বাচ্চার পিছনে ধাওয়া করল। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করে যখন ওটাকে ধরে নিয়ে এল তখন এটা আবার আরেক-দিকে হাঁটা দিয়েছে।

সে ডাকল, আয় আয়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। শংখ মহা মুশকিলে পড়ল। সে একটা করে বাচ্চা ধরে এনে নৌকোয় বসায় ততক্ষণে আরেকটা অন্যদিকে হাঁটা মারে। দৌড়ে দৌড়ে সে হয়রান হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে উঠল। তখন একটা বাচ্চার পেটে মারল লাথি। কেঁউ কেঁউ করে সেটা আর্তনাদ করে উঠল। বা রে! এ ত বেশ খেলা। মারল আরেক লাথি। বাচ্চাটা কেঁউ কেঁউ করে আবার ক'কাতে লাগল। বাঃ বাঃ! খুশিতে ফেটে পড়ল শংখ। হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল।

বাচ্চাটাকে শাসাতে লাগল, আর দুটুটু কব্বি? দুটুটু কব্বি!

আবার মারল লাথি। আবার, আবার। বারবার লাথি মারছে শংখ, বারবার আর্তনাদ করে উঠছে ছোট্ট কুকুর ছানাটা। আর খুব মজা লাগছে তার। চেঁচামেচি শুনে গিরিবালা বেরিয়ে এল। শংখকে কুকুরের ছানা ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে বেজায় রেগে গেল।

ডাক দিল, খোকা, উঠে আয়। অসভ্য কোথাকার। কুকুর ছেনেছিস। উঠে আয় পিচেশ।

শংখ মাকে দেখে নালিশ করল, মারব। দুটুটু। মারব।

থাক, তুমার আর শাসন করতে হবে না। তুমি এখন আসো দিনি। কাদা মেখে একেবারে ভূত হয়ে উঠিছ। আসো চান করায়ে দিই। গিরিবালা শংখকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। তার এখন অনেক কাজ বাকি।

বড়মার জ্বর, চাঁপার জ্বর। ম্যালেরিয়ায় পাড়ু করেছে দুজনকে। খুব ভোগান্তি যাচ্ছে। ফুলির মা, ফুলিও নেই। মেয়েকে নিয়ে বছরখানেক হল শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে ফুলির মা। ছোট কাকিমা কাকার ওখানে। কাকা ঝিকরগাছায় বদলি হয়েছেন। প্রায় মাসখানেক ধরে শুভদাই সবদিক সামাল দিচ্ছিলেন, গিরিবালা আসাতে তাঁর পরিশ্রম একটু লাঘব হয়েছে।

এবারে বাপেরবাড়িতে এসে গিরিবালাকে খুব খাটতে হচ্ছে। ফুরসত মোটে পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি করে বাবার ইস্কুলের ভাত বেঁধে দিতে হয়। দু-দুটো রোগীর সেবা করতে হয়। মাঝে মাঝে, চান করতে গেলে, ধান সেদ্ধও দিতে হচ্ছে। সে যে বাপের-বাড়িতে হয়। মাঝে মাঝে, চান করতে গেলে পারছে না। সাবান-টাবান আসেনি, এরই মধ্যে সে যেন রোগা হয়ে পড়েছে।

তিন বছর সে আসেনি। তার চোখে এতদিন, বাপেরবাড়ির যে ছবিটা ভেসেছে সেটা তিন বছর আগেকার। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে এ সংসারের তার কোন খবরই ছিল না। নদীর ঘাটে নরাকে দেখে তাই সে তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে নরাকে সে বছর তিনেক আগে দেখে গিয়েছিল, আর এখানে এসে যে নরাকে সে দেখল দুইয়ের মধ্যে প্রায় আকাশ পাতাল তফাত। তারপর এখন গিরিবালা বুঝতে পারছে, শুধু নরারই নয়, এখানকার সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে।

শ্বশুরবাড়ি যখন ছিল, তখন তার বাপেরবাড়িটাকে তুলনায় অনেক উজ্জ্বল বলে মনে হত গিরিবালার। এবার সে বাপের-বাড়ির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির বিশেষ তফাৎ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেই আজ-আনা আজ-খাওয়া এখন এখানেও শুরু হয়েছে। বাড়ি ঘরের বাইরেকার চেহারাও অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগে বারবাড়ি আর ভিতরবাড়ির মধ্যেকার চেগারের বেড়াটা সব সময় মজবুত থাকত। এবার গিরিবালা এসে দেখল, বেড়াটা জরাজীর্ণই শুধু হয়ে

ওঠেনি, একপাশে হেলে পড়ার ফলে ভিতরের আব্রু প্রায় নষ্টই হতে বসেছে। পিসিমা অনেক খিটখিটে হয়ে উঠেছেন, বড়মা চাপা রুগ্ন শীর্ণ, বাবা অনেক গম্ভীর, জেঠা-মশাই চিন্তার ভারে ন্যুব্জ। সব মিলিয়ে এখানে এখন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেটা যেন ঠিক আগের মত গিরিবালাকে সোৎসাহে আমন্ত্রণ জানাল না, যেন আগের উষ্ণতা অনেকখানি মিইয়ে গিয়েছে।

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে যত রকমের পরিবর্তন চোখে পড়ে ভিতরে ভিতরে অত পরিবর্তন হয়েছে কি না গিরিবালা জানে না। সে শুধু অনুভব করছে, এই বাড়িটা তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। সেটা কার দোষ, তার, না এ বাড়ির, গিরিবালা তাও জানে না। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানে আসবার জন্য তার প্রাণটা কেন যে এত আকুলি বিকুলি করত, এখন যেন সে তার সঙ্গত কোন জোরাল কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। শ্বশুর-বাড়ি থাকতে সে ভেবেছিল, ভূষণ একবার তাকে বাপেরবাড়িতে এনে ফেলুক, তারপর গিরিবালা দেখবে সে কেমন করে তাকে চা-বাগানে নিয়ে যায়।

এই ত ভূষণ তাকে এখানে রেখে এখন কলকাতায় গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এসেই তাকে সঙ্গে নিয়ে আসাম চলে যাবে। শ্বশুরবাড়ি থাকতেই গিরিবালা মনে মনে অনেক যুক্তি এঁটে এসেছিল। তার পক্ষে শ্রীহট্টে না যাবার স্বপক্ষে অনেক একটা কারণ সে তৈরী করে রেখেছিল। কিন্তু, এখন, তার মত ভীরু লোকেরও যেন মনে হচ্ছে, সবটাই সেসব অজুহাতের কোন মানে নেই। শ্বশুরবাড়ি থাকতে বারবার তার মনে হত, বাপেরবাড়িই বুঝি তার সবথেকে বড় আশ্রয়। এখন তার মনে হচ্ছে চা-বাগানে গেলেও সে এমন কিছু জলে পড়বে না। অর্থাৎ বাপেরবাড়ির এই পরিবেশে সে আলাদা এমন কিছু খুঁটির জোর পেল না যা তাকে শ্রীহট্টে যেতে প্রবল বাধা দিতে পারে। বরং উল্টোই হল। এরই মধ্যে গিরি-বালা মনে মনে, ভূষণ কবে আসবে, তারই জন্য যেন তৈরী হয়ে বসে থাকল।

•

আটত্রিশ

জ্বরটা যখন আসে তখন কিন্তু এত কষ্ট হয় না বড়বউয়ের। মাঝে মাঝে শুরুটা বরং ভালই লাগে। কেমন এক রকম নেশার মতন। হয়ত রাঁধতে বসেছেন কি, বাসন মাজতে, কি কাপড় নিয়ে গেছেন পুকুরে কাচতে, অমনি বড় বউ টের পেলেন তার রক্তে কেমন যেন এক অস্থিরতা জেগে উঠতে শুরু হয়েছে। বুঝলেন জ্বর আসছে। ম্যালেরিয়া এমনি করেই আসে। বড় বউ আর বিশেষ বিলম্ব করেন না। যতটা

পারেন হাতের কাজ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেন। জানেন, কপালের রগ দুটোর টিপ টিপোনি শুরু হলেই কম্প দিয়ে এসে পড়বে জ্বর। তখন আর দিশেবিশে পাওয়া যাবে না।

তাই বড় বউ সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে ওঠেন। জ্বর আসবার লক্ষণ দেখলেই হাতের কাজ চুকিয়ে ফেলেন। এমন কি দাঁতে খানিকটে গুঁড়ো ঘষে নিতেও ভোলেন না। তার পর হয় চাঁপাকে নয় অন্য কাউকে, যে তখন হাতের কাছে থাকে তাকেই বিছানাটা পেতে দিতে বলেন। তার পর পাতা বিছানায় শুতে না শুতেই ম্যালেরিয়ার কম্প শুরু হয়ে যায়। দারুণ শীত করতে থাকে। লেপের উপর লেপ, কাঁথার উপর কাঁথা চাপা দিয়েও শীত মানে যায় না। চাঁপা কি ফুল্সি, ফুলির মা কি শুভদা জোর করে ঠেসে ধরলেও কম্প থামাতে পারা যায় না বড়-বউয়ের। জ্বরের তাপ বাড়তে থাকে। গায়ে যেন খৈ ফুটছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসে। বুক খাঁ খাঁ করতে থাকে। কানের ভিতর হাজার হাজার ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায়। মাথার দপদপানি শতগুণে বেড়ে যায়। তার পর জোয়ার ভেঙে বন্যা, মহাপ্লাবন ... ...। বড়বউয়ের শরীরটা শক্ত শক্ত ধাক্কায় ভেঙে পড়তে থাকে। খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে ওঠে। তার পর কখন যেন দেখবার বোঝবার ভাববার অনুভব করবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। চেনা জগতটা তলিয়ে যায়। অনেকক্ষণ আর কোন কিছুর সাড় থাকে না।

হঠাৎ এক সময় চৈতন্য ফিরে এলে বড়বউ দেখেন তার নির্জীব দেহটা লেপ-কাঁথার বিরাট স্তূপের ভিতর বন্দী হয়ে গলগল করে ঘামছে। বিস্বাদ মুখ, অবসন্ন দেহ। নড়তে চড়তে আর ইচ্ছে করে না। মনে হয়, কোন এক হিংস্র দৈত্য ছেঁচে থেঁতলে তার দেহ থেকে রস বের করে নিয়ে ছিবড়েটা নয়নজুলিতে ফেলে দিয়েছে। এই সময়টা খুব খারাপ লাগে বড়বউয়ের। খুবই অসহায় অসহায় ঠেকে।

আর কেবলই সুধার কথা মনে হয়।

কেমন আছে সুধা? এত করে লেখা হচ্ছে বাড়ি আসার জন্য, আসছে না কেন? কতদিন আসেনি সুধা! এক বছর, দু বছর, এক যুগ। আর কি আসবে না? আসবেই না? যদি হঠাৎ মরে যান তিনি, সুধার মুখখানা ত আর দেখতে পাবেন না। পাবেনই না? সর্বনাশ। বুক ধড়ফড় করতে থাকে। শীর্ণ নিস্তেজ চোখ দুটো দিয়ে অবিরলধারে জল ঝরে পড়ে।

সুধাকে নিয়ে কত আশা ছিল তাঁদের। এখানকার পড়া শেষ করে কলকাতায় পড়ার আব্দার ধরেছিল সুধা। বড়বউয়ের মোটে মত ছিল না। মাজেবাবুর কথা মনে ছিল তাঁর। কলকাতা সম্পর্কে মহাভয় ছিল। কলকাতায় গেলে ধর্মাধর্ম লোপ পায় বলে ধারণা ছিল বড়বউয়ের। তবুও মাজেবাবুর কথার উপর ভরসা করে বুক বেঁধেছিলেন তিনি। সাহস করে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে। শেষ পর্যন্ত কলকাতাই গ্রাস করল সুধাকে। যা ভয় করেছিলেন, তাই হল। কই, এখন মাজে-বাবু কোন কথা বলেন না কেন? সুধা সুধা করে তার প্রাণ যখন বেরিয়ে যাবার জোগাড় হচ্ছে, তখন এনে দিতে পারছেন না কেন তাঁরা ছেলেকে? খুব ত সাহস দিয়েছিলেন তখন!

মাঝে মাঝে বড়বউয়ের মনে হয়, সুধা হয়ত বেঁচেই নেই। সবাই মিলে তাঁকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে। বেঁচে নেই সুধা? ষাট, ষাট! এ কী অলক্ষুণে ভাবনা। তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন বড়বউ, জাগ্রত দেবতাদের কাছে মানত করেন, সুধাকে তাঁর কোলে ফিরিয়ে দিতে। বুক চিরে রক্ত দেবেন তাঁদের পায়ে ঢেলে।

কখনও মনে হয় লেখাপড়া না শেখানোই উচিত ছিল সুধাকে। কোলের ছেলে তা হলে কোলেই থাকত। জমি জমা দেখত। বিয়ে দিয়ে দিতেন তার। এতদিনে বেটার বউ নাতি নাতনি নিয়ে সুখের ঘর বসে যেত। লেখাপড়া না শিখলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত! লেখাপড়া শিখে এই ত হল, সে মা বাবাকে পর্যন্ত গেরাহ্যি করে না। নিশ্চয়ই সুধা কলকাতায় কোন বড় রকমের কেলেংকারী টেলেংকারী ঘটিয়ে বসেছে। নইলে আসছে না কেন বাড়িতে? বড়বউয়ের মন বলছে, কিছু একটা ঘটেছে সুধার। কিছুদিন ধরে তাঁর মনটা কেবলই কু গাইছে। চিঠির পর চিঠি লেখা হচ্ছে বাড়ি এস বাড়ি এস বলে, কোন সাহসে সুধা তা উপেক্ষা করছে? এর মধ্যে দু

তিনটে ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল ওর। বিনোদপুরের অক্ষয় ঘোষের মেয়েটাকে ত পছন্দও হয়েছিল কর্তাদের। মেয়ের বাবারও এখানে বিয়ে দেবার খুব ইচ্ছে ছিল। দেড় বছর ধরে ত ঝুলোঝুলিই না তারা করেছে। কিন্তু বিয়ে যে করবে, তাকে ত ভিড়ানই গেল না। বোশেখ মাসে তারা সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

তবে কি সুধা কলকাতায় বিয়ে থা করেছে? তাঁদের না জানিয়েই বিয়ে করে বসবে সুধা? না না, তা কি হয়? তা কখনও সুধা করবে না। বিশ্বাসই বা কি? বড়বউ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আজকালকার ছেলেদের মতিগতির কি কিছু ঠিকঠিকানা আছে। এই ত আজ বছর দেড়েক ধরে ক্রমাগত ভুগছেন বড়বউ, কবে হয়ত একদিন পট করে মরে যাবেন সে সব কথা সুধাকে লেখা হয়েছে, সুধা জানে, তবু কি একবার এসেছে চোখের দেখা দেখতে? আর তাঁর অসুখের কথা শুনেও একবার তাকে দেখে যাবে না সুধা, বড়বউ কি একথা দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবতে পেরেছিলেন? যে ছেলে এ কাজ পারে, তার অসাধ্য এ জগতে আর কি আছে?

বড়বউই শুধু সুধা সুধা করে ভেবে মরেন। সুধা যার জন্য কাঁচকলাটাও ভাবে না, ... যে সুস্বপ্ন দেখেন সুধাকে ঘিরে, নিশুতরাতে নির্জীব হয়ে যে সময়টা পড়ে থাকেন তখন, তার কি সীমা-সংখ্যা আছে।

আগে এই ত কিছুক্ষণ আগে জলটা ছাড়ল। একটু বৃষ্টি এসেছিল। দেখলেন ভূষণ সুধাময়ের অচৈতন্য দেহটা কাঁধে করে বয়ে আনছে। গাড়ি ধরতে পারেনি ভূষণ, ছোট স্টেশনটাই একেবারে হেঁটে এসে পড়েছে। সুধাময়ের মাথাটা ফেটে গেছে, গলগল করে রক্ত পড়ছে। বারান্দায় এনে ওকে শোয়ান হল। রক্তে বারান্দা ভেসে গেল, উঠান ভেসে গেল। হুড়হুড় করে বাঁধ ভেঙে উঠানে একগলা জল দাঁড়িয়ে গেল। সুধার রক্তে সেই জল লাল হয়ে উঠল। বড়বউ রান্নাঘরে ছিলেন। তাড়াতাড়ি করে সেই গলা জল ভেঙে দালানের বারান্দায় উঠতেই আছাড় খেয়ে তিনি সুধার গায়ের উপর পড়ে গেলেন। সুধার দেহটাও অমনি পিছলে জলে পড়ে গেল আর কে যেন বলে উঠল, হা অভাগী, ছেলেরে জলে ঠেলে ফেলে দিলি। বড়বউ তাড়াতাড়ি করে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন সুধাকে আর অমনি জলে প্রবল স্রোতের টান উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সুধা ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড়বউ, ওরে ধর ধর বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে তাঁর শরীর কাঁপতে লেগেছে। বুক অস্থির অস্থির করছে।

বড়কর্তা পাশের ঘরে ছিলেন। চীৎকার শুনে এ-ঘরে এসে পড়লেন। বড়বউয়ের ভাবগতিক দেখে বড়কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

বড়বউ শ্রান্ত চোখে বড়কর্তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। তিনি তখনও হাঁপাচ্ছেন।

বড়কর্তা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ও বড়বউ? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে ক্যান?

বড়বউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন প্রকৃতিস্থ হলেন খানিকটা। তার পর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

একটু পরে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, তুমরা মানুষ না গো, পাষাণ। আজ পর্যন্তও আমার সুধারে আনে দিতি পারলে না।

বড়কর্তা বললেন, চিঠি লিখলি হারামজাদা জবাব দেয় না। করব কি কও?

বড়বউ বললেন, এক কাজ কর, আমারে কলকাতায় নিয়ে চল। আমার মনডা বড় উতলা হয়ে পড়িছে। ওগো, আজ যাচ্ছেতাই স্বপন দেখিছি। নিয়ে যাবা আমারে কলকাতায়?

বড়কর্তা বললেন, কলকাতায় যাওয়া কি মুখির কথা বড়বউ? আমি ছাই কিছু

চীনিউনে। উতলা হয়ে আর করবা কি? কপালে যা আছে তা কি খণ্ডাতি পারবা? দেখি, জামাইরি ত কয়ে দিইছি, কলকাতায় যায়ে যেন সে নবাবের সঙ্গে দেখা করে। জামাই ত এই পথেই ফেরবে, যেন তারে ধরে নিয়ে আসে।

বড়বউ বললেন, জামাই কি চিঠিপত্তর কিছু দেছে?

বড়কর্তা বললেন, মহী ত কিছু ক'ল না। আসেনি বোধ হয়।

আরে ও কি, ও দাদু, ওষুধির শিশি পালে কনে?

শংখ চাঁপার মিকশ্চারের শিশিটা দু হাতে ধরে থপ থপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বড়কর্তা তাড়াতাড়ি ওষুধের শিশিটা নিতে গেলেন। শংখ দিল না। বড়-বউয়ের কাছে সরে গেল।

বড়কর্তা বললেন, দিয়ে দ্যাও দাদু দিয়ে দ্যাও। ওষুধ ন্যায় না।

শংখ বলল, ওচুদ নে না। দিদি খাবে। দিদি অচুখ।

বড়বউয়ের হাতে শিশিটা দিয়ে দিল শংখ।

বলল, দিদি অচুখ, দিদি খাবি, ওচুদ খাবি।

অমনি বড়বউয়ের মনের গুরুভার অনেকটা লাঘব হয়ে গেল। মুখে হাসি ফুটল। ঐটুকুন ছেলের বুদ্ধিটা দেখেছ একবার। ঠিক ধরেছে কেমন? আমার অসুখ, আমাকেই ওষুধ খাওয়াতে এসেছে।

বললেন, হ্যাঁ দাদু, ওষুধ খাব। তুমি এতক্ষণ কনে ছিলে?

শংখ বললে, ওচুদ খাবি, ওচুদ খাবি।

বড়বউ শংখকে কাছে টেনে নিলেন। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। দেখেছ, মাথায় কত ময়লা। জট পড়ে যাচ্ছে। চুলগুলো ভাল করে আঁচড়িয়ে না দিলে মাথায় যে খুস্কি পড়বে। কিন্তু দায় কে! তিনি ত বিছানায় পড়ে। চাঁপাও পড়েছে। বেচারি বুড়ি! দু দিনের জন্য বেড়াতে এল, আজ বাদে কাল চলে যাবে কোন মগের মুলুকে। কোথায় হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করবে দু-দিন, না এসে ইস্তক হেঁসেলে ঢুকে হাঁড়ি ঠেলতে লেগেছে।

গিরিবালা এক জামবাটি গরম সাবু রেঁধে নিয়ে ঢুকল। কাগজি লেবুর গন্ধ ছাড়ছে সাবুর বাটি থেকে।

বড়বউ গিরিবালাকে হাসতে হাসতে বললেন, ও বুড়ি, এই দ্যাখ, তোর ছেলে কেমন ডাক্তার হয়ে উঠিছে। ওষুধির শিশিডে আমারে দিয়ে কয় কি, দিদি ওষুধ খাবে। দিদির অসুখে।

কথাটা শুনে শংখ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দিদি ওচুদ খাবে। দিদি অচুখ।

বড়কর্তা বললেন, ডাক্তারের বিটা ত। বাপকা বিটা সিপাহীকা ঘুড়া, কুচ নেহি ত থুড়া থুড়া।

ঘোড়ার কথা কানে যেতেই শংখ বড়-বউকে ছেড়ে বড়কর্তাকে ধরল।

দাদু গোড়া।

বড়কর্তা বললেন, ঘুড়ায় চড়বা।

শংখ লাফাতে লাফাতে বলল, গোড়া চব্‌ব। দাদু গোড়া।

গিরিবালা হেসে ফেলল।

বলল, আপনি আবার হাভাতেরে শাগের ক্ষেত দ্যাখালেন ত।

শংখ ততক্ষণে বড়কর্তার হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে।

দাদু, গোড়া চব্‌ব। গোড়া দে।

বড়কর্তা বললেন, তবে চল যাই দাদু, দুজনে মিলে ঘোড়া ধরিগে।

বড়কর্তা শংখকে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই গিরিবালা বলল, জেঠামশাই রান্না হয়ে গেছে কিন্তু। চানটা সারে ফ্যালেন।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বড়বউ সাবুর বাটি কোলে করে ছেলেমানুষের মত খুঁত-খুঁত করতে লাগলেন।

সাবু আর মুখি তুলা যায় না রে মণি। বমি আসে। আমি বরং চাড্ডে ভাতই খাব।

গিরিবালা হাসতে হাসতে বলল, তুমি যে চাঁপার উপর দিয়ে যাও। চাঁপা তবু ত সাবুর পায়েস পালিই খুশি হয়।

বড়বউ বিরক্তি চেপে বললেন, দিনির পর দিন এ ছাই কি গিলা যায়।

গিরিবালা বলল, জ্বরডা না ছাড়লি ত আর অন্নপথ্যি দেবে না ডাক্তারে। ন্যাও, খায়ে ন্যাও। আমি লেবু টেবু দিয়ে সরবত বানায়ে আনিছি। খারাপ লাগবে না।

বড়বউ আর দ্বিরুক্তি না করে ঢকঢক করে গিলে ফেললেন সাবুটুকু। তার পর মুখ মুছে শুয়ে পড়লেন।

ভূষণের চিঠি এসেছে। ভূষণ মেজকর্তাকে লিখেছে :

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবুজি, আমাদের যাবার দিন স্থির হইয়াছে। এই সপ্তাহের শেষেই চা-বাগান

অভিমুখে রওনা দিতে হইবে। হাতে সময় আর মোটে নাই। এদিকে বাগানের ডিস্‌পেন্সারির জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি কেনাকাটা করিবার জন্য আমার এখন কলিকাতা ত্যাগ করিবার উপায় নাই। সেজবৌদির বিশেষ ইচ্ছা, তিনি শংখকে দেখিবেন। তাই উহাদিগকে কলিকাতায় আনিতে হইবে। অথচ আমি গিয়া উহাদিগকে লইয়া আসিব আমার হাতে এমন সময়ও নাই। কাজেই উহাদিগকে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবার ভার আপনাকেই লইতে হইবে। এবং ২।১ দিনের মধ্যেই পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

সেজদা বলিয়াছেন বাগানের বাবস্থাদি ভালই। কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না। আমাদিগকে কলিকাতা হইতে ঢাকা অথবা চিটাগাং মেলে গোয়ালন্দ যাইতে হইবে। চিটাগাং মেলে যাওয়াই সুবিধাজনক। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত স্টীমারে এবং চাঁদপুর হইতে পুনরায় রেলযোগে লাকসাম এবং কুলাউড়া জংশন হইয়া দক্ষিণভাগ স্টেশনে নামিতে হইবে। দক্ষিণভাগ হইতে হাতি অথবা অন্যান্য যানবাহনে বাগানে পৌঁছিতে হইবে। ভাবনার কিছুমাত্র কারণ নাই। তবে আপনি হাতির কথা কাহাকেও জানাইবেন না। অনর্থক ত্রাসবৃদ্ধি পাইবে। আসামে হাতি দিয়া জমি চাষ করে। উহা বলদ অপেক্ষাও নিরীহ।

আমি বর্তমানে একশত টাকা বেতন পাইব এবং পঞ্চাশ টাকা এলাউন্স পাইব। এতদ্ব্যতীত একটি বাংলো এবং চাকর কোম্পানি আমাকে দিবে। মাছ ইত্যাদি কিনিবারও প্রচুর সুযোগ আছে জানিলাম। উহাতে আরও উৎসাহ বোধ করিতেছি।

এবার সুধাদার ব্যাপারে কিছু বলি। কি যে বলিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনারা যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, সুধাদা সেই ঠিকানায় আর থাকে না। উহা একটি মেসবাড়ি। ঐখানে গিয়া সুধাদার খোঁজ করিয়া জানিতে পারি সে অনেক দিন হইল ওখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় কেহ জানে না। আগে মাঝে মাঝে ওখানে আসিত এবং চিঠিপত্র থাকিলে লইয়া যাইত। মেসের ম্যানেজার কোন কথা বলিতেই চাহেন না। শেষে আমি পুলিসের লোক নহি, সুধাদার আত্মীয়, এ-কথা বিশ্বাস করাইবার পর আমার ঠিকানা রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন, সুধাদার খবর কিছু থাকিলে তিনি আমাকে জানাইবেন। এ সকল কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। আমার ভাল ঠেকিতেছে না। সে কারণেও আপনার পক্ষে কলিকাতায় আসা প্রয়োজন। যাহা হউক, আপনি পত্রপাঠ উহাদিগকে লইয়া চলিয়া আসিবেন।

বড়মা এবং চাঁপার শরীর কি ভাল হইয়াছে? আশা করি আর সকলের কুশল। অত্র সকলের মঙ্গল জানিবেন। আপনি ও অন্যান্য গুরুজনগণ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবেন। ছোটদের আশীর্বাদ দিবেন। ইতি—

আপনার জামাতা ভূষণ।

এই চিঠির পর আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছে, এখান থেকে তা জানা যাবে না। মেজকর্তা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, সাত দিনের জন্য কলকাতায় যাবেন। যে করেই হোক সুধাময়কে খুঁজে বের করতেই হবে। কি চায় সুধাময়, জানতে হবে। সত্যিই যদি সে কোন সর্বনাশা সংকল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে থাকে, তা হলে সর্বশক্তি দিয়েই তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে।

ভূষণের চিঠির কথা বাড়ির সবাইকে মেজকর্তা খানিকটা জানালেন। শুধু বললেন, সুধাময়ের সঙ্গে ভূষণ দেখা করতে পারেনি। গিরিবালাদের নিয়ে তিনি ত কলকাতায় যাচ্ছেন। আসবার সময় সুধাকে ধরে আনবেন।

ঊনচল্লিশ

একটুর জন্য ওঁরা কলকাতার ট্রেনখানা ধরতে পারলেন না। প্রায় নাকের উপর দিয়েই সেখানা বেরিয়ে গেল। সারা রাতের মধ্যে কলকাতার ট্রেন আর নেই। এর পরে আছে দার্জিলিং মেল। তা সে ত শেষরাত্রে। হতাশ হলেন মেজকর্তা। রাগ হল হতচ্ছাড়া বাসখানার উপর। ঝিনেদা থেকে চুয়াডাঙ্গার ইস্টিশান, বাইশ মাইল ত মোটে রাস্তা। এর মধ্যে যে কবার বিগড়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

এখন কি আর করা। ওয়েটিং রুমে বিছানা খুলে পাতিয়ে দিলেন কুলিকে দিয়ে। গিরিবালা ঘুমন্ত ছেলেকে শুইয়ে নিজে আরাম করে বসল। শংখর জন্য বোতলে দুধ আছে। দশটা নাগাদ একবার খাইয়ে ঘুমটা পাড়িয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। সকালের আগে সে আর উঠবে না। মেজকর্তা টাইম টেবল দেখলেন, সকাল পাঁচটা পনের মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছে যাবে গাড়ি। সেখান থেকে গড়পারে ভূষণের দাদার বাসায় পৌঁছতে বড় জোর আধ ঘণ্টাই লাগুক।

মেজকর্তা দোকান থেকে কিছু লুচি তরকারী আনলেন। গিরিবালার এসব খাবার খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না তবু খেল। তার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। চাঁপার জ্বরটা ছেড়েও ছাড়ল না। ঠিক তাদের আসবার আগেই নতুন করে জ্বর এসে গেল। ওর শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। ভাল ডাক্তার না দেখালে আর চলবে না। বাবাকে ভাল করে বলে যাবে। আবার কবে এদেশে আসবে গিরিবালা কে জানে?

বাপ ভাই আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে গিরিবালা চলল কোন অকূল পাথারে ঘর বাঁধতে। এখন একমাত্র ভরসা ভূষণ। এবার যে সংসার পাতবে গিরিবালা তাতে সেই হবে কর্ত্রী। হ্যাঁ, তাই ত। তার মাথার উপর আর ত কেউ থাকবে না। এ কথাটা ত আগে খেয়াল হয়নি। এই নতুন সংসারটা হবে তার আর ভূষণের। ভূষণ, সে আর শংখ।

গিরিবালা তার এই নতুন ভাবনাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। বাপের-বাড়িতে বড়মার জায়গা যেখানে, শ্বশুর বাড়িতে বড় জায়ের যেখানে, ডোমারে বাবার বাসাবাড়িতে তার মায়ের জায়গা যেখানে ছিল, গিরিবালা তার নতুন সংসারে সে একলাফে এবার সেই জায়গায় উঠে পড়বে। কারোর অধীন হয়ে, খোঁটা খেয়ে, হাত তোলা হয়ে আর থাকতে হবে না তাকে। সংসারে কোন্ জিনিস কতটা আনতে হবে, কাকে কি দিতে হবে, কে ঠিক করবে? গিরিবালা। সেই গিরিবালা যে কিছুদিন আগে পর্যন্তও সবার হুকুম মেনে চলেছে। কোথাও বিশেষ জোর খাটাতে পারেনি। ভয়ে ভয়ে থেকেছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর বাপের সংসারে মেয়ের আর জোর থাকবে কি করে? শ্বশুরবাড়ি গেল গিরিবালা। কিন্তু সেখানেও ত জোর পেল না। কি করে পাবে? এখন গিরিবালার মনে হচ্ছে, সেটা ত তার সংসার ছিল না, সেটা যে দিদির সংসার।

হ্যাঁ, এইবার তার জোর হবে। তার নিজের সংসার পাবে সে। ভালমন্দ যা কিছু ঘটবে, তার সব দায়িত্ব গিরিবালার। গিরিবালা ভাবতে লাগল, সে দেখিয়ে দেবে সংসার করা কাকে বলে। সে কাউকে খোঁটা দেবে না, অবজ্ঞা করবে না, তার সংসারে কাউকে মনে কষ্ট পেতে দেবে না। এই অল্প দিনের মধ্যে সে যে তিক্ততার স্বাদ পেয়েছে, তার আশ্রয়ের কেউ যাতে সে আস্বাদ না পায়, প্রাণপণে তার ব্যবস্থা করবে গিরিবালা।

আর এই প্রথম গিরিবালার মনে হল, চা-বাগানের চাকরিটা নিয়ে ভূষণ খুব খারাপ কিছু করেনি। বরং গিরিবালাকে একটা গোটা সংসারের গিন্নী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন যতই ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবছে গিরিবালা, ততই দেখতে পাচ্ছে ভূষণ ভালই করেছে কাজটা। সে ভাগ্যিস গিরিবালার কথা শুনে তখন মেজ-ভাসুরের আদেশটা অমান্য করেনি। ভূষণকে এখন কত কাছে কাছে সে পাবে। বিয়ের পর থেকেই ত তার এই বাসনা, ভূষণকে একান্ত করে সে পাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বাসনা তার পূর্ণ হয়নি। বিয়ের পর ভয় আর লজ্জা কাটতেই ত এক বছর গেল। তারপর আরেকটা বছর না ঘুরতেই জানতে পারল সে মা হতে যাচ্ছে। তখন আবার নতুন এক বন্ধন। ছোট বাচ্চাও না সামলে দিল, তবুও সে ভূষণকে মনের মতন করে পেল না। নিজে যেমন সংসারের কাজে, শ্বশুরের পরিচর্যায় দিনরাত মগ্ন হয়ে গেল, তেমনি ভূষণও যেন হারিয়ে গেল বহুজনের ভিড়ে। এই ভিড়, গুরুজনদের সদা উপস্থিতি, এসব ত আর নতুন সংসারে থাকবে না। শুধু সে আর ভূষণ। গিরিবালা হিসেব কষতে লাগল। একদিকে সে, বাবা, বোন, বড় জ্যেঠি, পিসি, জা, এদের সংগ যেমনি হারাচ্ছে, তেমনি ত পাচ্ছেও কিছু। কিছু কেন, অনেক পাচ্ছে। ভূষণকে একান্ত করে পাওয়া তার যে দু মুঠি ভরে পাওয়া। কথাটা মনে পড়তেই রোমাঞ্চ জাগছে তার।

ভস্ ভস্ ভস্ ভস্ করে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। তাদের গাড়ি নাকি? গিরিবালার মন ছ্যাঁক করে উঠল। তাড়াতাড়ি সে উঠে বসল।

মেজকর্তা একটা বেঞ্চিতে, বসেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, উঠে পড়লি যে।

গিরিবালা থতমত খেয়ে গেল।

বলল, ভাবলাম গাড়ি বুঝি আসে গেল।

মেজকর্তা একটু হেসে বললেন, এখানা মাল গাড়ি। আমাদের গাড়ির ঢের দেরি।

গিরিবালা অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে দেখল সত্যিই মাল গাড়ি। রাতের আবছা অন্ধকারে ভূতো ভূতো লাগছে। ডোমারেও সে মাল গাড়ি দেখেছে। তার মোটে পছন্দ লাগে না। সবটা মিলিয়ে কেমন যেন একটা বুকচাপা নিরেট ভাব আছে মাল গাড়ির চেহারায়। আলো নেই, খোলা মেলা নেই। দমবন্ধ করা ভাব। একবার এলে সহজে নড়তে চায় না। স্টেশনে জুড়ে পড়ে থাকে। ঘটাং ঘটাং ঠকাস ঠকাস কত রকম বিশ্রী শব্দ করে। এগোয় পেছোয়। ইঞ্জিনটা হঠাৎ ভস্ ভস্ করতে করতে ছেড়ে মেড়ে যেন চলে যায়। তার দেখে মনে হয়, আর বুঝি ফিরবে না। ওমা, পরক্ষণেই আবার বেহায়ার মত ফিরে আসে। ঐ ওদের গ্রামের সরকার মশাইয়ের মত স্বভাব আর কি। সকালে উঠেই বাড়ির সঙ্গে খিটিমিটি লাগে। অমনি চরমে উঠলে হঠাৎ ছাতিখানা বগলে করে চটিটা ওঠেন সরকার মশাই, খেয়েদেয়ে তোর কাটকরার সংসার, এই চললাম যেদিকে দুচোখ যায়। বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। তারপর দুপুর বেলা খাবার সময় আবার গুটি গুটি করে বাড়িতে ঢুকে পড়েন। যেন কিছুই হয়নি। মাল গাড়ির ইঞ্জিনগুলোর রকম সকম সেই সরকার মশাইয়ের মতই বটে।

গিরিবালা শুয়ে পড়ল। কখন যে এই মাল গাড়িখানা বিদায় হবে। বিরক্তি ধরল তার। কখন আসবে কলকাতার গাড়ি? অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সে।

তা অস্বীকার করে লাভ নেই, গিরিবালা কলকাতায় পৌঁছবার জন্য এর মধ্যেই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আবার ভয় ভয়ও করছে তার। সেজ-ভাসুর সাহেব লোক। সেজ-জা কলকাতায় থাকা মেয়ে। বিয়ের সময় সেই যা গিরিবালা তাঁদের দেখেছিল। তার মনে পড়ে, সেজ-জা তার চুলগুলো দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। প্রশংসা করেছিলেন। তারপর নতুন ফ্যাসানে তার চুল বেঁধে দিয়েছিলেন নিজের হাতে। পাটি খোপা না কি যেন একটা ইংরেজি নাম বলেছিলেন। গিরিবালার মনে নেই। তার বলে তখন সসেমিরা অবস্থা। ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল সে। চম্পির বিয়েতে ও'রা কেউ-ই আসেন নি। টাকা, কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সেজ-জা শঙ্খকে দেখতে চেয়েছেন। যে বাউণ্ডুলে ছেলে হয়েছে একখান, সেখানে গিয়ে কি যে অসভ্যতা করবে, গিরিবালা সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠল।

ঘরের ভিতর বড্ড গুমোট। গরমে অস্থির হয়ে উঠল গিরিবালা। সে ঘামছে। শঙ্খ গলগল করে ঘামছে। বাবাকেও বারে বারে ঘাম মুছতে দেখছে। মাঝে মাঝে বাবা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পাখা একখান পেলে হত। গিরিবালা আঁচলটা দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া খেতে লাগল।

এর আগে গিরিবালা কখনও ইস্টিশানে রাত কাটায়নি। অদ্ভুত এক জায়গা বটে। ওয়েটিংরুমের এই খুপরি ঘরে বাক্স, বিছানা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ঘরে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। দেওয়ালে বড় একটা আলো। দেওয়ালগিরির পেটের লাল কালিতে লেখা 'ওয়েটিংরুম' কথাটা সে-আলোয় জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু ঘরে ভাল আলো হয়নি। কুলি দুটো প্রথমে গিরিবালাকে আরেকটা ঘরে ঢুকিয়ে দিতে গিয়েছিল। সে ঘরের দরজায় একটা মেয়েলোকের ছবি আঁকা। তলায় লেখা জেনানা। এ আবার কি কথা? বাবা ওকে একা-একা সে-ঘরে রাখতে সাহস পাননি। তাই এই ঘরে এনে তুলেছেন। আরও দু-তিনজন লোক আছে সে ঘরে। তাই গিরিবালা এক কোণে পুঁটলিটি মেরে ছেলেকে নিয়ে শুয়েছে।

মাল গাড়িটা একটু আগে চলে গেল। তবুও গুমোট গেল না। পিড় পিড় করে বৃষ্টি পড়ছে ধারে-কাছের কোন টিনের চালে। গোটাকতক হিন্দুস্তানী খচমচ খচমচ বাজনা বাজিয়ে গান গেয়ে কানের পোকা নড়িয়ে দিচ্ছে। বাব্বাঃ, এর নাম গান! রক্ষে কর। কাঁচা চামড়ার বিশ্রী

গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। গায়ে পাক দিয়ে উঠছে গিরিবালার।

এর মধ্যেও একটু তন্দ্রামতন এসে গিয়েছিল গিরিবালার। হঠাৎ এক বিকট শব্দ, হৈ-চৈ, চেঁচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। শংখও ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে পড়ল। গিরিবালা দেখল একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। "চ-গ্রাম, পাঁউরুটি বিসকুট"। টেনে টেনে সুর করে বলতে বলতে গোটাকতক লোক এধার-ওধার যাচ্ছে। "এই কুলি, কুলি," কারা যেন চেঁচাচ্ছে। গিরিবালা আবার ধড়মড় করে উঠে বসল। তাদের গাড়ি এল নাকি?

মেজকর্তা রাতজাগা গলায় বললেন, শো, শো, শুয়ে থাক। আমাদের গাড়ি শেষ রাত্তিরে আসবে। এখনও অনেক দেরি।

এখনও অনেক দেরি! বাবা, আর কত দেরি হবে! গিরিবালা খানিকটা হতাশ হল। জল তেস্টা পেয়েছে তার। পেট ভুটভাট করছে। চোখ জ্বালা করছে। শংখ খুঁতখুঁত করে কান্না জুড়ল। কিছুতেই শোবে না। বিশ্রী লাগছে গিরিবালার। কোনমতে কলকাতায় পেঁাছতে পারলে সে বাঁচে।

মেজকর্তা নিঃঝুমে প্ল্যাটফর্মে শংখকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ পরে ওকে ঘুম পাড়ালেন। ঘরে যে গরম। এই কচি শিশু কি ঘুমতে পারে। একটা পাখা আনা উচিত ছিল। মাঝে মাঝে পশলা পশলা বৃষ্টি হচ্ছে আর ততই যেন গরম বাড়ছে। একেবারে যেন সিদ্ধ করে ছাড়বে। মেজকর্তার পিঠে, পেটে এর মধ্যেই বেশ ঘামাচি গজিয়ে গেল। ঘরে এসে ঘুমন্ত নাতিকে মেয়ের কোলে দিয়ে দিলেন।

আবার বাইরে এলেন। বাইরে তবু কিছুটা আরাম পাওয়া যাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু তারবাবুর ঘরে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা মাঝে মাঝে কিট কিট কিট কিট করে উঠছে আবার থেমে থেমে যাচ্ছে। তারবাবু টেবিলে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন খানিক খানিক, আবার ধড়মড় করে ঠেলে উঠে চাবি টিপে টরে-টক্কা টরে-টক্কা টক্কা-টরে টক্কা টরে করছেন। আর দূরে, প্ল্যাটফর্মের শেষ মুড়ো ছাড়িয়েও অনেক দূরে, সিগন্যালের লাল চোখ নিষ্কম্প চেয়ে আছে। আর মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে তার দৃষ্টি আবছা করে দিচ্ছে। আর মাঠ থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙদের ঐকতানঃ মক্ মক্ মক্ গোঁ গোঁ মক্ মক মক্ মক্......

কলকাতায় পেঁাছেই আর বিলম্ব নয়, ভূষণকে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে সুধাময়ের খোঁজে। বড়বউ ভুগে ভুগে বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে। বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে সুধার জন্য। ওকে বাড়িতে একবার আনতেই হবে। আর বড়বউয়ের ইচ্ছে সুধার বিয়ে দিয়ে দেবার। দিতে হবে ওর বিয়েটা। লেখাপড়া চুলোয় যাক। ভাবনা চিন্তাগুলো অনেক বাস্তব হয়ে উঠবে তাহলে।

দেশ স্বাধীন করার ব্রত নিয়েছে সুধা। বিয়ে করবে না বলে জানিয়েছে। মেজকর্তা হাসলেন। কপনী আঁটার দেশে ত জন্ম! রাতদিন মাথায় ব্রহ্মচর্য, তপশ্চর্যা, এই সব জিনিস ঘুরছে। স্বাধীনতা মানে যে সমৃদ্ধি, সম্ভোগের অধিকার, সেটা আর এদের মাথায় ঢোকে না। উপোসী আত্মার কি কখনও সদগতি হয়? কিন্তু বলে দেখ একথা, আজ-কালকার ছেলেরা কেমন তেড়ে আসে দেখো। মেজকর্তার মাথা আবার কিলবিল করে উঠল। পরনে কপনী, হাতে গীতা, দেশোদ্ধারের সব নয়া ফ্যাসান চালু হচ্ছে। আরেক দিকে আসরে নেমেছেন গান্ধী মহারাজ। চরকা কাটো। চরকাতেই স্বরাজ। সবাই যেন ফুসমন্তরে স্বরাজ এনে ফেলবেন। দেশের লোকের বিচার-- বুদ্ধি ঘোলা করে দিয়ে চোখ বুঁজে মন্তর জপাও। আমার কথা শোন, এতেই স্বরাজ আসবে। লোকেরা অজ্ঞ, অবিবেচক থাকুক, তাদের চোখ ফোটাতে অনেক পরিশ্রম। তার চেয়ে কানামাছি খেলাও।

সুধাময় বারবার কানামাছি খেলতে গেছে। মেজকর্তা বারবার তার চোখ ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। কে জানে এবার সুধা তাকে আমল দেবে কিনা?

আকাশের দিকে চেয়ে মেজকর্তা আশ্বাস পেতেই চেষ্টা করলেন হয়ত। কিন্তু কোথায় আকাশ? বর্ষার মেঘে লেপ মুড়ি দিয়ে সে মুখ ঢেকে আছে।

এক সময় ট্রেন আসবার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ট্রেন এল না। দার্জিলিং মেল এক ঘণ্টা লেট। ধীরে ধীরে ইস্টিশানটার ঘুম ভাঙল। সময় গড়াল। ভোর হল, তবু আলো ফুটল না। আকাশে মেঘ। আলো পলাতক। বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। গিরিবালা অতিকষ্টে ইস্টিশানের জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এল। শঙ্খকেও ধুইয়ে মুছিয়ে আনল। শঙ্খের খিদে পেয়েছে। দুধ নেই। যেটুকু এনেছিল গিরিবালা, সেটুকু রাত্রেই খেয়ে ফেলেছে শঙ্খ। এমন বিপত্তি হবে কে জানত? ওদের ত কাল রাত্রেই পৌঁছে যাবার কথা। শঙ্খ খিদের চোটে কান্না জুড়ে দিল।

মেজকর্তাও বড় বিরক্ত হলেন। দুধ তিনি এখন কোথায় পাবেন। চা-ওয়ালাদের কাছ থেকে কিনতে চেষ্টা করলেন, ওরা দুধ বেচে না। মহা মুশকিল। এর উপর আবার ট্রেনটাও লেট করছে। মেজকর্তা এদিক-ওদিক ঘুরছেন। দুধের সন্ধানে। দেখলেন, এক জায়গায় বেশ লোক জড়ো হয়েছে। জনকুড়ি লোক খদ্দর টদ্দর পরে হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। জনাকয়েক মুসলমানও আছে সেই দলে। কি ব্যাপার?

বোধহয় নেতা-টেতা কেউ আসবে, কি মুক্ত রাজবন্দী। মেজকর্তা ভাবলেন, তাই সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এসেছে। শঙ্খ তাঁর কোলে। সে প্রবলভাবে কান্না জুড়েছে। কি যে তিনি করবেন, ভেবে পেলেন না। এমন বৃষ্টি শুরু হয়েছে যে, ইস্টিশানের বাইরের দোকানেও যেতে পারছেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই বৃষ্টি মাথায় করে আরও যে লোক আসছে ইস্টিশানে। এবার যে দলটা এল, তাদের মধ্যে জনা-দুয়েক খদ্দর-পরা মহিলাকেও দেখলেন মেজকর্তা। অঝোর ধারায় তাঁরা কাঁদছেন। ব্যাপারটা কি?

শঙ্খ কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠল। মেজকর্তা ওকে নিয়ে আবার ইস্টিশানের ভিতরের দিকে চলে এলেন। প্ল্যাটফর্ম এর মধ্যেই আরও অনেক লোক এসে জমেছে। অনেকের হাতেই মালা। মুখ থমথমে, পা খালি।

দুধ কি মিলবেই না নাকি? বড় মুস্কিল হল। শঙ্খ কেঁদে কেঁদে একেবারে বেঁকা হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই থামান যাচ্ছে না তাকে। নিস্তব্ধ স্টেশনে শঙ্খের গোঁয়ার কান্না রীতিমত অস্বস্তির মধ্যে ফেলল মেজকর্তাকে। গিরিবালা শেষ পর্যন্ত ওকে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াতে বসল। কিছুতেই খাবে না শঙ্খ। এমন সময় ট্রেনের ঘণ্টা বাজল। মেজকর্তা টিকিট কিনতে গেলেন। টিকিট কিনে অগত্যা এক পাউরুটিঅলার কাছ থেকে রুটি কিনে খেতে দিলেন শঙ্খকে। শঙ্খ এবারে থামল।

দার্জিলিং মেলখানা যখন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকল, তখন সেটা আষ্টেপৃষ্ঠে ভিজে গিয়েছে। ছাত দিয়ে গা দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যে লোকগুলো এতক্ষণ ফুল, মালা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হুড়মুড় করে ইঞ্জিনের দিকে ছুটল। মেজকর্তা অতি-কষ্টে ভিড় ঠেলে গিরিবালা আর শঙ্খকে নিয়ে একখানা ইণ্টারক্লাস কামরায় উঠে পড়লেন। ততক্ষণে গাড়িসুদ্ধ লোক গলা বের করে চিৎকার করতে লেগেছেন, ও মশাই, সামনে নয়, সামনে নয়, পিছনে যান, পিছনে। গার্ডের গাড়ির সঙ্গে যে লগেজ ভ্যান, সেইখানে। সেই ভ্যানেই আছেন।

মেজকর্তা সকলের সমস্বর চিৎকারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। শঙ্খও দাদুর কোলে চড়ে রুটিতে কামড় দিতে দিতে অবাক হয়ে থেমে গেল।

মেজকর্তা দেখলেন, এদের চিৎকার শুনে বাইরের সেই জনতা হন্তদন্ত হয়ে আবার পিছনে ছুটে দিল। সেই মহিলা দশজনকেও ছুটতে দেখলেন তিনি।

অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে মশাই, এত ছুটোছুটি কিসের জন্য?

একজন জবাব দিলেন, সে কি, আপনি জানেন না। দেশবন্ধু যে মারা গেছেন! এই ট্রেনে ডেড্ বডি যাচ্ছে। লাগেজ ভ্যানে আছে।

দেশবন্ধু মারা গেছেন! মেজকর্তা প্রথমে ধরতে পারলেন না কথাটা। কোন্ দেশবন্ধু? দেশবন্ধু আর কটা আছে বাংলায়। সি আর দাশ মারা গেছেন! মেজকর্তার বুকে কথাটা যেন বুলেট হয়ে এসে বিঁধল। সে কি, কোথায় মারা গেলেন? দার্জিলিঙে! কাল মারা গেছেন। উঃ, কি প্রোসেশন মশাই, মনে হল দার্জিলিঙ বুঝি ভেঙে পড়বে। যাত্রীরা বলে যাচ্ছেন যে যার কথা। দেখছেন ত কি ভিড় ইস্টিশানে ইস্টিশানে। এখেনেই দেড় ঘণ্টার উপর লেট। কলকাতায় সন্ধ্যার আগে পৌঁছবে হয়। মেজকর্তার কানে কথাগুলোর আওয়াজ ঢুকছে, মানে বুঝতে পারছেন না। দেশবন্ধু এই গাড়িতেই যাচ্ছেন, অথচ তিনি নেই! আশ্চর্য! মুহূর্তে সব ফাঁকা হয়ে গেল যেন। যেন এই ট্রেন নেই, এই স্টেশন নেই, এই যুগ নেই। তাঁর বুকের মধ্যে কেমন যেন শূন্যতার সৃষ্টি হল। ধপ করে বসে পড়লেন মেজকর্তা। বর্তমান কালের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর স্মৃতি হু-হু করে উড়ে চলল, পিছনে, কলেজী জীবনে। এই অমিত উৎসাহী এক অগ্নিশিখার সংস্পর্শে তখন তিনি এসেছিলেন। অনেক অগ্নিগর্ভ ভাষণ তিনি তখন শুনেছিলেন। অনেক ভাষণ কাগজেও পড়েছেন। কিন্তু সব ছাড়িয়েও যে ভাষণটির কথা মেজকর্তার মনে আছে, সেটা তাঁর কানে শোনা নয়, কাগজে পড়া। সেটাই যে কেন এঁর মনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল এখন, মেজকর্তা তা বলতে পারেন না। ইংলণ্ডে পড়তে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় চিত্তরঞ্জন সেই ভাষণ দিয়েছিলেন। "Gentlemen, I was sorry to find it given expression to in Parliamentary speeches on more than one occasion that England conquered India by the sword and by the sword must she keep it! England, gentlemen, did no such thing; it was not her swords and bayonets that won for her this vast and glorious empire; it was not her military valour that achieved this triumph, it was in the main a moral victory or a moral triumph. England might well be proud of it. But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of sword is the only policy that ought to be pursued in India is to my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman."

ইংলণ্ড ভারতকে তরোয়ালের জোরে নয়, বেয়নেটের জোরে নয়, জয় করেছে নৈতিক শক্তির জোরে। তাই ভারতকে তরোয়ালের জোরে দাবিয়ে রাখার কথা ইংরেজের মুখে শোভা পায় না। অতি সত্যি কথা। কিন্তু সত্য কথা বলার সাহস কজন রাখে?

সারাজীবনে অনেক ভাষণ দিয়েছেন দেশবন্ধু, কিন্তু এমন কথা আর বলেননি। অন্তত মেজকর্তা আর ত শোনেন নি। কি আপসোস, এ কথাতে কোন পক্ষই কর্ণপাত করেনি। কথাটা কেউ মনেও রাখেনি আজ। একথা সম্ভবত আর কেউ বলবেনও না। যাঁদের ভাবনায় এমন কথা স্থান পেত, তাঁদের যুগ এই হয়ত শেষ হয়ে গেল।

পরক্ষণেই মনে পড়ল, এই গাড়িতেই দেশবন্ধুর দেহ যাচ্ছে কলকাতায়। তিনিও যাচ্ছেন। তিনি যেন তাঁদের যুগের শবদেহকেই বহন করে নিয়ে চলেছেন। কি আশ্চর্য যোগাযোগ। যাত্রীরা আবার আলোচনায় মেতে উঠলেন। হ্যাঁ, এ মৃত্যু রাজার মৃত্যু। দেশবন্ধু এখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলে বিরোধী দলের নেতা, স্বরাজ্য পার্টির লীডার আর বাংলার দেশবন্ধু। শুধু বাংলার নয় মশাই, উনি গোটা ইণ্ডিয়ার। আরেকজন মন্তব্য করলেন। হঠাৎ মেজকর্তার প্রবল ইচ্ছা হল তাঁকে একবার গিয়ে দেখে আসেন। উঠে পড়লেন চট করে।

বললেন, যাই একবার দেখে আসি।

একজন সহযাত্রী চীৎকার করে উঠলেন, এখন কোথায় যাচ্ছেন। হুইসেল দিয়েছে গার্ড। গাড়ি ছাড়ল। পরের স্টেশনে গিয়ে দেখে আসবেন।

একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। কয়েক ধাক্কায় বেরিয়ে এল ইস্টিশানের বাইরে। জোরে বৃষ্টি নামল। মেজকর্তার সামনের জানালা দিয়ে ছাট আসছে জোরে। যাত্রীরা পটাপট কাঁচের শার্শি তুলে দিলেন। একটু পরে পিছন থেকেও ছাট আসতে লাগল। সেদিককার শার্শিও তুলে দেওয়া হল। জলের ঝাপট লেগে কাঁচের শার্শি অস্বচ্ছ হয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ মেজকর্তার মনে হল গোটা কামরাটাই, হয়ত বা গোটা ট্রেনটাই এক বৃহৎ শবাধারে পরিণত হয়েছে।

শূন্য মনে শূন্য চোখে মেজকর্তা অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। হঠাৎ শঙ্খের চিৎকারে তাঁর সম্বিত ফিরে এল। এই ত মৃতের রাজ্যে প্রাণের কোলাহল। হঠাৎ শঙ্খ দুমদাম শার্শিতে কিল মারছে, লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, বিট্‌টি বিট্‌টি, বিট্‌টি।

সমাপ্ত

সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, চাউলের মূল্য নাকি "ফল্" করিতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"অ্যান্ড হোয়াট এ ফল মাই কান্ট্রিম্যান!"

*　　*　　*

রাজাজী নাকি বলিয়াছেন—"আমি বাঘ। বৃদ্ধ বাঘ। কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও বাঘ বাঘ-ই।" শ্যামলাল বলিল—

"এইটিই বাঘের স্বরূপ্য"।

*　　*　　*

কোন এক ঐন্দ্রজালিক সম্প্রতি কলিকাতার রাজপথে চক্ষু বেঁধে অবস্থায় মোটর সাইকেল চালাইয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। "আমাদের দেশের অবস্থায় গাড়ি চালাইতে অ্যাক্সিডেন্ট করে আসলে চোখ খুলিয়া থাকেন" —বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

*　　*　　*

ভূতত্ত্ববিদরা শুনিলাম, প্রস্তর যুগের কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। —"কেন জানি এখন চলছে প্রস্তর যুগ কারণ আছেই শুধু মানুষগুলোর কী করে যেন একটু রকম-ফের হয়ে গেল" মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

*　　*　　*

বিজ্ঞানীরা নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শিশুর মনকে বৈজ্ঞানিক সূত্রে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"অর্থাৎ স্তেপান্তরের মাঠ নয়, ধাপা!"

*　　*　　*

চীন কর্তৃক প্রচারিত ভারতের মানচিত্রের অনেকটা অংশ চীনের অধিকারভুক্ত দেখানো হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"শিক্ষক মহোদয়গণ অবহিত হউন। অতঃপর বলতে হবে—দেখ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত তব হিন্দি-চীনি মানচিত্র, করহ প্রণাম"!!

*　　*　　*

কোন এক ক্লাব নাকি কাঠের ভেলায় আন্দামান অভিযানের পরিকল্পনা করিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে অর্থাৎ মনসা-পুজোর দিনে। সুতরাং মনে পড়ে গেল—গাঙুরের নীরে ভাসে বেহুলার ভেলারে"।

*　　*　　*

কলিকাতার রাস্তায় থুথু ফেলা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু কারো মুখে থুথু ফেলার প্রয়োজন হলে তা ফেলবার অবাধ স্বাধীনতা যেন থাকে"!!

*　　*　　*

একটি সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতার কোন এক সংগীতের জলসায় নাকি গান-বাজনা বন্ধ করিয়া দিয়া মারপিট করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"অর্থাৎ সা-রে-গা'র বদলে মারে-গা"।

*　　*　　*

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি বংশ বৃদ্ধির আন্দোলন চালাইবার পরিকল্পনা করিতেছেন। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা পরিবার নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী, তাঁহারা সংবাদটা শুনিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বিশুখুড়ো অতঃপর বুঝাইয়া বলিলেন—"বংশ মানে বাঁশ। তবু ভাবছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি না দড় হয়"।

*　　*　　*

আন্তর্জাতিক যুব উৎসবে যোগদানকারী চৌদ্দজন যুবকের(?) বয়স ছিল ত্রিশ হইতে তেতাল্লিশ। প্রশ্ন উঠিয়াছে যুব উৎসবের যুবকদের বয়স কত হওয়া উচিত। —"কিন্তু ভিয়েনার যুব উৎসবের পরবর্তী সংবাদ যারা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই বয়সের গাছপাথর গুনবেন না" —বলে শ্যামলাল।

*　　*　　*

বিলাতের কোন এক মহিলার বয়স বর্তমানে এক শত বৎসর। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, শতায়ু হওয়া কঠিন নয় যদি তিনটি নেতিবাচক নীতি পালনই যথেষ্ট—ধূমপান করিবেন না, মদ্যপান করিবেন না, বিবাহ করিবেন না। প্রসঙ্গত অন্য একটি বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল। তিনি তাঁহার বুক পরীক্ষা করাইবার জন্য ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলে বৃদ্ধ বলিলেন—"পরীক্ষার আগে আপনার জেনে রাখা ভাল যে, আমি সিগ্রেট খাই না, মদ খাই না এবং ঘোড়দৌড় খেলি না।" ডাক্তার অবাক হইয়া বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"তবে আর আপনি বাঁচতে চান কিসের জন্য?"

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক

ভারতের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল (১৮৩৩-৩৫) লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিশ বেণ্টিঙ্ককে (১৭৭৪-১৮৩৯) ভারতের তৎকালীন ইউরোপীয়রা "ক্লিপিং ডাচম্যান" এই আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন শান্তি এবং চেয়েছিলেন শাসনব্যবস্থার ব্যয়সংকোচ এবং সংস্কার; পূর্ববর্তী শাসকদের মত তিনি ব্যয়বহুল প্রসারবাদী নীতি আঁকড়ে থাকতে চান নি; তার ওপর তিনি ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত।

লর্ড উইলিয়াম শাসনব্যবস্থার মধ্যে যেখানে যত ত্রুটি ছিল, তা দূর করতে অবহিত হন। তিনি প্রথম সৈনিকদের ভাতা বা যুদ্ধকালীন বৃত্তির অর্ধেক যা তারা তাদের মাইনের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল তা বন্ধ করেন। তাঁর ইকনমি কমিটিগুলি একদিকে যেমন সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে ফেলে, আর এক দিকে তেমনই প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর বেসামরিক দপ্তরের সংখ্যা হ্রাস করে। তাঁর এই ব্যয় সংকোচের কাজে বিচক্ষণতা এবং সৌজন্যের অভাব না থাকলেও তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন এবং ভারতের তৎকালীন ইংরেজদের কাছে তিনি ভারত ত্যাগ না করা পর্যন্ত "ক্লিপিং ডাচম্যান" হয়ে থাকেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট-এ এই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটি দেখতে পাওয়া যায়: "স্থানীয় কোন ব্যক্তিই ধর্মের জন্য, জন্মস্থান, বংশ বা বর্ণের জন্য কোম্পানীর কোন চাকুরি লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারবে না"।

লর্ড উইলিয়াম আইনের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলেন, তিনি এমন কি আইন রচিত হবার দু'বৎসর পূর্বেই স্থানীয় লোকের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৮৩১ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল জজদের বেতন বৃদ্ধি করেন—তাঁদের সর্বোচ্চ বেতন হয় বৎসরে ১০,০০০ টাকা (আজকালকার টাকার মূল্যে প্রায় ৬০,০০০ টাকা); তাঁদের বিচারক্ষমতাও তিনি সম্প্রসারিত করেন। ১৮৩৭ সালে ভারতীয় ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; ১৮৪৩ সালে হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা। সমস্ত দেওয়ানী মামলা বিচার করার ক্ষমতা এইভাবে একদিন ভারতীয় বিচারকদের হাতে এসে পড়ে।

ঠগী দমন

লর্ড উইলিয়াম ঠগীদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ভ্রমণকারী এবং তীর্থযাত্রী সকলের কাছ থেকেই কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন। এই ঠগীরা দলবদ্ধভাবে দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াত এবং সুযোগমত ভ্রমণকারীদের দলের সঙ্গে মিশে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের হত্যা করত, লুট করত, তারপর তাদের কবর দিত।

এই সব লুণ্ঠনকারীদের পেছনে ছিল দেশের বড় বড় জমিদার; তাদেরই সমর্থনে তারা উত্তর ভারতের সর্বত্র আতংক সৃষ্টি করে বেড়াত। ১৯ শতকের প্রথম দিকে অন্যান্য স্থানের মত ভারতের পুলিস বলতে ছিল গ্রামের চৌকিদাররা। লর্ড উইলিয়াম প্রথম একটা বিশেষ বিভাগ গঠন করেন, যেমন আজকালকার "ফ্লাইং স্কোয়াড"-এর বিভাগ, চেষ্টা করেন এই ঠগীর অত্যাচার বন্ধ করতে।

এই বিশেষ বিভাগ পরিচালনার জন্য তিনি যাঁকে নিয়োগ করেন, তিনি হলেন উইলিয়াম স্লিমান। যাঁর নাম ভারতের ইতিহাসের পাতায় চিরকাল থাকবে। ঠগী দমন করার ফলে আইনানুগ নাগরিকরা কি পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করেছিল তার একটা ধারণা স্লিম্যানের ১৮৪০ সালের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় ২০ জন ঠগী রাজসাক্ষীর মধ্যে একজনই ৪০ বৎসরে ৯৩১ জনকে হত্যা করে এবং আর একজন করে ২০ বৎসরে ৫০৮ জনকে।

সহমরণ নিষিদ্ধ

লর্ড উইলিয়াম সংস্কারমূলক বহু কাজ করেন, কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যে সহমরণ নিষিদ্ধ করে ১৮২৯ সালে যে আইন প্রণীত হয় তাই তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ বলে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। মহান দেশহিতৈষী রামমোহন রায় এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতারা সহমরণ নিষিদ্ধ করার জন্য বারংবার অনুরোধ জানিয়ে এলেও পূর্ববর্তী গভর্নররা দেশের মধ্যে বড় রকমের অশান্তি সৃষ্টির ভয়ে এই দিকে কোন কাজ করতে পারেন না। কিন্তু এ সম্পর্কে আইন যখন প্রণীত হল তখন

দেখা গেল আইনের বিরোধী যারা, তারা কেবল প্রিভি কাউন্সিলে সুবিচার প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তাদের বিরোধিতার পর্ব শেষ করল। তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হলে তারা ন্যায়, শান্ত মনেই তা মেনে নিল—এ থেকে বোঝা যায় লর্ড উইলিয়াম জনসাধারণের মন কী পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন।

ভাষা সংক্রান্ত নীতি

মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট হওয়ার ফলে পিণ্ডারী এবং ঠগী অত্যাচার এবং নানা রকমের যুদ্ধজনিত বিপর্যয়ের ফলে এবং সেই সঙ্গে ফারসী ভাষা গভর্নমেণ্টের এবং আইন আদালতগুলির ভাষা হয়ে থাকার ফলে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে সাহিত্যের বিকাশ ঘটে না, ভাষা শিক্ষার প্রসারও বন্ধ হয়ে যায়। লর্ড উইলিয়ামের সময় গভর্নমেণ্টের ভাষা হিসাবে এবং উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ফারসীর স্থান গ্রহণ করুক, এমন কথা বলা না হলেও লর্ড উইলিয়ামের কার্যনির্বাহক পরিষদের আইন সদস্য টমাস মেকলে ইংরাজী ভাষার অনুকূলে রায় দেন এবং এ সম্পর্কে যে বাদানুবাদ তখন চলছিল তার শেষ তিনি করেন। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন মেকলের এই উপদেশ লর্ড উইলিয়াম গ্রহণ করায় ভারত পশ্চিমী জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যার সঙ্গে তার নিজের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির আত্মীকরণের সুযোগ পায়। ফারসীর জায়গায় ইংরাজী ভাষা এসে আদালতগুলিতে স্থান করে নেওয়ায় এবং শিক্ষার মাধ্যম হয়ে দেখা দেওয়ায় সর্বোচ্চ আদালত এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য সমস্ত দিকে ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে ভারতের বিভিন্ন ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে সর্বত্র একটা অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা যেতে থাকে।

প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

লর্ড উইলিয়াম বুঝতে পেরেছিলেন ইংরাজী ভাষার ব্যবহারের ন্যায় বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে। তিনি গঙ্গায় প্রথম বাষ্পীয় পোত চালাবার বন্দোবস্ত করেন এবং তিনিই প্রথম ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে স্টীমশিপ সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগী হন। লণ্ডনে [illegible] তিনি এই সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন, তা ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ নেয়। তিনি বলেন:

"ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে নিরাপদ ও নিয়মিত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে ভারতের জনসাধারণ তাদের অভাব-অভিযোগের কথা এই দেশকে এবং এই দেশের কর্তৃপক্ষকে জানাবার একটা সুযোগ পাবে, তাছাড়া যারা ব্যবসায়ের খাতিরে ভারতে যাবে না, এমন সব ভ্রমণকারীও সুযোগ পাবে ভারত ভ্রমণের পর তাদের নিজেদের দেশে এসে সাম্রাজ্যের এই দূরবর্তী অংশের অবস্থার প্রকৃত বর্ণনা দিতে।"

লর্ড উইলিয়াম-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কারমূলক কাজ হল বিচারব্যবস্থার সরলীকরণ।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের অপসারিত মূর্তি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংলগ্ন উদ্যান হইতে ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি মূর্তিটিকে নির্বাসিত করা হইয়াছে

সখ্যতামূলক মনোভাব

ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর সখ্যতামূলক মনোভাবের অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। মির্জাপুরের ব্যবসায়ী লালা মানমরের কাহিনীটি এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। জব্বলপুর ও মির্জাপুরের মধ্যে কোরাই গিরিবর্ত্মে জলের অভাবে পথিকদের সেই সময় দুর্দশার অন্ত ছিল না। লালা মানমর এই দুর্দশা লাঘব করার জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করেন ও একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন; পথিকদের তিনি এইভাবে কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। এর পর গভর্নমেণ্ট নর্মদা থেকে মির্জাপুর পর্যন্ত একটা নূতন রাস্তা নির্মাণ করেন, এতে পথের দূরত্ব অনেক কমে যায়; পথিকরা এই পথে যাতায়াত শুরু করায় মানমরের পুষ্করিণী এবং তাঁর বিশ্রামাগার চিরকালের মত পরিত্যক্ত হয়।

লর্ড উইলিয়াম যখন পরে একবার কোন কাজে মির্জাপুর আসেন তখন উইলিয়াম স্লিম তাঁকে লালা মানমরের কথা জানান। লর্ড উইলিয়াম তখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মানমরকে তিনি তাঁর জনহিতকর কর্মের জন্য সাধুবাদ জানান এবং তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন।

উপরন্তু লর্ড উইলিয়াম গভর্নর-জেনারেল হিসাবে কাজ করার সময় গভর্নমেণ্ট হাউসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় এবং ইওরোপীয়দের মধ্যে সমস্ত সামাজিক বিভেদ দূর করেন।

জাতিগত বৈষম্যের বিরোধিতা

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক লর্ড রিপনের (গভর্নর-জেনারেল, ১৮৮০—৮৪ সাল) সমমর্যাদাসম্পন্ন। রিপন যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন ভারতীয়রা হুগলী নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিল; তাঁকে এইভাবে সম্বর্ধিত করার কারণ ছিল তাঁর ইলবার্ট বিল, এই ইলবার্ট বিলে তিনি জাতিগত বৈষম্যের বিরোধিতা করেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে যে আর-একজনের নাম স্বতই মনে হয় তিনি হলেন লর্ড আরউইন (১৯২৬—৩১), মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যিনি চুক্তি সম্ভব করে দেশবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের অভিপ্রায়ের আন্তরিকতা কতখানি।

ভারতীয় ঐতিহাসিক মিঃ এস গোপাল বলেছেন, ভারতের শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ এবং কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতের এই অংশীদারিত্বের মূলে আছে ভারতে এবং কমনওয়েলথে লর্ড আরউইন যে উদার নীতি অনুসরণ করে আসেন সেই উদার নীতি। আমি আরও মনে করি, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, লর্ড রিপন, "কংগ্রেসের জনক" এলান অক্‌টাভিয়ান হিউম এবং আরও অনেকে ভারতের এই স্বাধীনতার ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেন।

["ভারত, গণতন্ত্র ও শিক্ষা", "বিশ্বরাজনীতিতে ভারত ও পাকিস্তান" প্রভৃতি পুস্তকের লেখক জসলিন হেনেসি-র প্রবন্ধ হইতে অনূদিত]

দিলীপকুমার রায়

বাইশ

বার্লিনে আমি মাঝে মাঝে যেতাম একটি চমৎকার নিরামিষ রেস্তরাঁয়। সেখানেই প্রথম আমার দেখা হয় ওলগার সঙ্গে। জর্মনিতে আমার নামডাক হওয়ার ফলে আমি অনেক বদলে গিয়েছিলাম—লাজুক কিশোর হয়ে উঠেছিল আত্মবিশ্বাসী নওজোয়ান। কাজেই ওলগার সঙ্গে আলাপ জমাতে দেরি হয়নি আরো এই জন্যে যে, সে যে রুশ তাকে দেখেই চিনেছিলাম এবং রুষরা খুব সহজেই আলাপ পরিচয় করে এ আমার জানা ছিল।

কোন্ অছিলায় আমি ওলগার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়েছিলাম আমার মনে নেই—তবে এটুকু মনে আছে যে, তার মুখের শান্ত কমনীয়তা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল ব'লেই তার সঙ্গে পরিচয় করতে চেয়েছিলাম। বন্ধুত্ব পাতাবার ক্ষমতা আমার ছিল সহজাত, তার উপর ওলগা গান অত্যন্ত ভালবাসত; কাজেই আলাপ জমতে দেরি হয় নি। ভারতীয় গান শুনে সে সত্যিই মুগ্ধ হ'ত বলে আমার ওখানে তাকে মাঝে মাঝেই ডাকতাম ও পিয়ানো বাজিয়ে নানা গান শোনাতাম। তবে সে ভক্তিসংগীত ছাড়া আর কোন গান শুনতে চাইত না। আমাদের ভজন গানগুলি তাকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে তবে গাইতাম।

ক্রমশ গল্পালাপের মধ্যে দিয়ে পরিচয় পেলাম একটি আশ্চর্য পবিত্র হৃদয়ের। জর্মনিতে এর আগে আদর্শবাদিনী তরুণী, শিল্পী তরুণী, স্বরংকর্মা তরুণীর দেখা পেয়েছিলাম যত্র-তত্র, কিন্তু সত্যিকার ধর্ম-প্রাণা ব্রহ্মচারিণীর দেখা পেলাম এই প্রথম ও শেষ।

ওলগার পিতৃদেব পল বিরুকভই ছিলেন টলস্টয়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। টলস্টয় সম্বন্ধে তিনি একাধিক বই লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরে লুনালোতে দেখা হয় ও তাঁর মুখে টলস্টয়ের অনেক গল্প শুনে মুগ্ধ হই। বলতে কি, টলস্টয়কে আমি প্রথম দিকে ভালবেসেছিলাম তাঁর আনা কারেনিনা ও রিসারেকশন প'ড়ে। ওলগার সংস্পর্শে আসার পর আমি পড়ি তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ, গল্প ও নাটক। ওলগা প্রায়ই দুঃখ করত যে, টলস্টয়কে শিল্পী ব'লে সমাদর করতে করতে লোকে ভুলে গেছে মহত্তর টলস্টয়কে যিনি ছিলেন ধর্মাত্মা, মহাত্মা, ঋষি। এ সম্বন্ধে ওলগার শান্ত উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে তার রঙে আমার মন একটু একটু করে রাঙিয়ে ওঠে। আমি বিশেষ চমকে উঠি টলস্টয়ের লাইট সাইনস্ ইন দি ডার্কনেস বর্গীয় কয়েকটি ধর্মাত্মক নাটক, কয়েকটি ধর্মাত্মক গল্প এবং তাঁর হোয়াট ইজ আর্ট প'ড়ে। তাছাড়া ওলগার মুখে টলস্টয়ের ধর্মপ্রাণতার উচ্ছ্বসিত তর্পণ শুনতে শুনতে আমার চোখ যেন প্রথম দেখতে শেখে তাঁর আর্য রূপ, ভক্তি করতে শিখি সেই মহর্ষিকে, যিনি মহা-শিল্পী হয়েও বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে, মানুষের সর্বোচ্চ সাধনা ধর্ম, শিল্প বা বিজ্ঞান নয়। তখন কে জানত যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গিও ঠিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মতনই বদলে যাবে গুরুদীক্ষায়! কিন্তু সে অন্য কথা : ওলগার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।
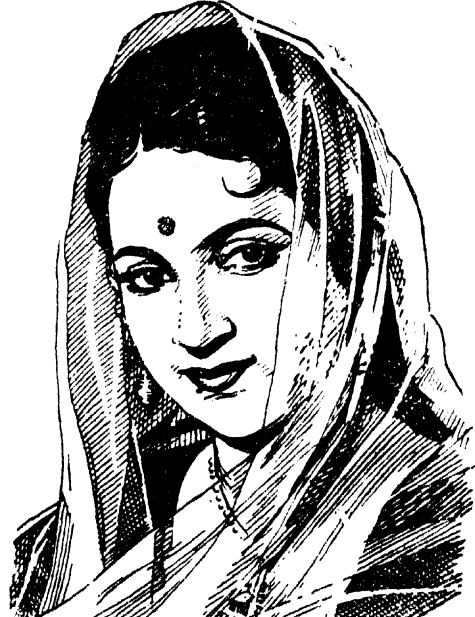
বলেছি ওলগা ছিল ধর্মপ্রাণা। কিন্তু এ ধরনের বিশেষণে কতটুকুই বা বলা হয়? ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পরে ওর যে রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছিল তার ছবি আঁকা সহজ নয়। ওদেশে সন্ন্যাসীনীরা তাদের মঠে খুবই একান্তে থাকে শুনেছিলাম। ওলগা ঠিক সেভাবে একান্তে থাকত না। বার্লিনে ও এসেছিল খৃষ্ট ও মাদনার ছবি আঁকা শিখতে, কাজেই ওকে যেতে হ'ত নানা চিত্রালয়েই, আলাপ করতে হত নানা লোকের সঙ্গেই। ও খুব বেশি মিশুকে না হলেও যখন গল্পালাপ করত তখন সহজেই প্রকাশ করত ওর মতামত, বলত ওর নানা অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লাগত দেখে যে, ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষকে ও সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিল। ও বলত যে, ওর পিতৃদেবের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনতে শুনতে ছেলেবেলায়ই তাঁকে ও ভক্তি করতে শিখেছিল। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ও বিশেষ কিছু জানত না। আমি ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলতাম তাঁর কথা।

শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে বিস্ময়াবেগে ওর গাল দুটি প্রায়ই আপেলের মতন রাঙা হয়ে উঠত ও চোখে জল ভরে আসত। বলা বাহুল্য, পরমহংসদেবের সেইসব বাণীতেই ও সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিত যে-সব বাণীতে টলস্টয়ের সায় ছিল। যথা, আমি পরমহংসদেবের "টাকা মাটি মাটি টাকা" উপলব্ধির কথা শুনবামাত্র ও বলেছিল: "ঠিক টলস্টয়ও বলতেন—অর্থই আনে অনর্থ।" কামিনী ত্যাগের কথা বলতে সংকোচ আসতে ও সোৎসাহে বলেছিল: "এতে কুণ্ঠা কী? দেখছ না কি, আজকালকার মেয়েরা কোন্ উন্মার্গের পথে চলেছে এদেশে? টলস্টয় প্রায়ই বলতেন—ভগবানকে পেতে হলে সব আগে চাই ব্রহ্মচর্য।" তার কাছে প্রায়ই এ ধরনের অপ্রত্যাশিত সাড়া পেয়ে এত চমৎকৃত হতাম যে, আজ মনে দুঃখ হয় কেন যে সে সময়কার ডায়রি রাখিনি—রাখলে আজ স্মৃতিচারণে পরিবেষণ করতে পারতাম ওর কত মূল্যবান সরল বিশ্বাসের কথা, অহিংসার কথা, টলস্টয়ের প্রতি বাণীকে বেদবাক্য ব'লে বরণ ক'রে নেওয়ার কথা, আরো কত কী! ও নিরামিষাশী হয়েছিল গুরুবাক্য মেনে চলতে. অতি সাদামাটা বেশে চলাফেরা করত, চুল বাঁধত টেনে, রং কি পাউডারের ধারপাশ দিয়েও যেত না—সব রকমেরই প্রসাধনকে বর্জন করেছিল নিষ্ঠুর হয়ে—এ সম্পর্কে টলস্টয়ের বাণী শিরোধার্য করতেই বলব। একটি মালা ছিল—জপ করত ইষ্ট নাম। ধূমপান, মদ্যপান বিষবৎ বর্জন, অতি-সুস্বাদু কোন কিছুই মুখে দিত না—এককথায় পবিত্রতার সংযম ও সন্ন্যাসের মূর্তিমতী প্রতিমা।

কিন্তু ওর নিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতা আমাকে মুগ্ধ করলেও আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম ওর সরলতায়। এমন সরলতা যে কোন উচ্চশিক্ষিতা পাশ্চাত্ত্য শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ হ'তে পারে চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কিন্তু এবার বলি, কীভাবে ও আমার কাছে হাজির হয়েছিল যেন দেবতারি দূতী হ'য়ে।

বলেছি—যে-সময়ে আমি ভগবানের কথা প্রায় ভুলে বসে জল্পনা কল্পনা করছি—রুশ দেশে গিয়ে দেখে আসব সেখানে কী নবরাজ্যের পত্তন করছে বলশেভিক আদর্শবাদী তরুণ তরুণীরা। ওলগার কাছে একদিন কথাটা পাড়তেই ও আশ্চর্য হয়ে সরল সুরেই জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মুখে একথা?" আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলল: "তুমি কি মনে করো ভগবানকে যারা মানে না তারা মানুষের সত্যিকার হিতসাধন করতে পারে?"

কথাটা কিছু নতুন নয়। আমি নিজেও তো কতবারই কতলোকের কাছেই বলেছি এই ধরনের কথা। কিন্তু তবুও ওলগার মুখে এমনধারা প্রশ্ন শুনে পড়লাম যেন অথই জলে। ও তারপর অনর্গল বলে যখন যা ওর মনে হয়—একটুও রেখেঢেকে নয়, সম্পূর্ণ খোলাখুলি—যেন আমার সঙ্গে ওর কতদিনের আলাপ!

ওর সব কথা মনে নেই, কেবল ওর মূল বাণীটি তো ভুলবার নয়: পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সত্য ভগবান, কাজেই সবচেয়ে বড় জীবন হ'ল ভাগবত জীবন। বলশেভিকরা ভগবানকে বাদ দিয়ে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। শাসনতন্ত্র বদলে, অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দিয়ে। এ-পথে মানুষের মুক্তি নেই—বলেছেন স্বয়ং খৃষ্ট ও টলস্টয়। তবে? তবে কোন্ ভ্রান্তি-বিলাসের মোহে আমি নাস্তিকদের মায়ায় পড়েছি? আমি বললাম আমার বলশেভিক বন্ধুর কথা, তার ত্যাগের কথা, আদর্শের কথা। ওলগা আমার সঙ্গে তাকে মাঝে মাঝে সেই নিরামিষ রেস্তরাঁতে দেখত, তাকে ওর ভালোও লেগেছিল। কিন্তু ভগবানকে বরখাস্ত করে ভোগবাদের পথে মানুষের পরম মুক্তি হতে পারে একথায় ও কানে আঙুল দিত। বলত: "আমি বুঝি শুধু একটি আদর্শ দিশারী: ভগবান যা চান তাই করা—হিংসা নয়, হিংসা নয়—প্রীতি, সৌভ্রাত্র, শান্তি। খৃষ্টদেব কি বলেন নি:

'Blessed are the peace-makers, for they shall be called the children of God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God'—

—বাস্। মুক্তির এই পথ। ওদের ফাঁপা বুলিতে কান দিও না। আর যদি কিছু মনে না করো তবে বলি:" "নাস্তিকদের
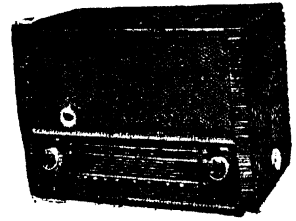
করলে হয়ত আরো পরিষ্কার হবে আমার বক্তব্য ঃ

......গর্বসাধে

খোয়াই মা তীর্থপথে যদি তব প্রসাদ-পাথেয়,
অন্ধতায় যদি শ্রেয়ে করি প্রত্যাখ্যান
বরি প্রেয়,
অপরাধ নিও না মা!—আমি যদি পড়ি
বার বার।

তুমি থেকো ধরে হাত সন্তানের,
মৃত্যুছায়ো আঁধার
ক্লান্ত অশ্রু নিরাশার—যদি পথ
প্রশ্ন-তমসায়
হারাই, নীলিমা-দিশা অবহেলি'
মৃগতৃষ্ণিকায়
করি মা বরণ—ধ্রুবতারা রেখো তোমার
জ্বালায়ে,

ভ্রান্তির তুফানে তব অভ্রান্তির নিশান
উড়ায়ে!
আমি যদি ভুলি ব্রত—তুমি মনে রেখো
মা নিরত—
শুধু বাহিরের অক্ষমতাবশে ভাঙি
আমি ব্রত।
কোরো ক্ষমা জেনে—যদি তোমারে না
সব ছেড়ে ডাকি—

আসি নি, কেননা সে সময়ে য়ুরোপের অসহিষ্ণু প্রাণশক্তির দুর্নিবার মায়ামোহে প'ড়ে আমি ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্মবাদকে আমার মন থেকে খানিকটা দূরেই সরিয়ে দিয়েছিলামই বলব। তাই ভুলে গিয়েছিলাম স্বামীজীর মুখে ভারতের আত্মার সনাতন বাণীঃ "যদি জগতে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে বলা যেতে পারে পুণ্যভূমি—তবে তার নাম ভারত......শুধু এখানকার প্রাণদায়ক পুতসলিলেই জগতের অন্য সব দেশের লক্ষ লক্ষ বস্তুবাদীর অন্তরের তপ্ত তৃষা মিটতে পারে।" *

কিন্তু যে সত্য একবার আমাদের অন্তরে জেগে উঠেছে তাকে আর ঘুম পাড়ানো যায় না—তাই য়ুরোপ থেকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরতে না ফিরতে নতুন করে জানা বৈরাগ্যের অঙ্গনে দেখতে পেলাম মুক্তিনাথের হারিয়ে-যাওয়া পদচিহ্ন, শুনতে পেলাম তাঁর ডুবে-যাওয়া বাঁশির ডাক—সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল মহা-ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে—তাঁর শ্রীমুখে শুনলাম ফের চিরন্তনের বাণীঃ যে বাইরের জোড়জোড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের পথে দেহের সুখ বা বিলাসের ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু মেলে না আত্মার শান্তি, ফোটে না শাশ্বত অমৃত সত্যের দিশা। সঙ্গে সঙ্গে মন ব'লে উঠলঃ এরি তো নাম ঋষি—তাঁর কবিতার মধ্যে নতুন করে শুনলাম উপনিষদের মন্ত্র স্পন্দনঃ

মানব সমুৎধর্ব ধায় করি' দিব্যপর্ণ বিধূনন,
তাই তার মন দোলে সুগভীর অতৃপ্তি-
দোলায়,
চিরন্তনের সে যে আনন্দদুলাল—তাই চায়
মর উপাদান ল'য়ে বিরচিতে অমর নন্দন;
উজ্জ্বলিতে ম্লানদেহ বর্ধমান আত্মার প্রত্যয়,
ঝংকারিতে শ্রমক্লান্ত ধরণীতে স্বর্গের
আহ্বান,
লভিতে অমৃতজন্ম মৃত্যু হতে করিয়া
ব্যুত্থান,
হ'য়ে অনুস্যূত এক শাশ্বত ইচ্ছার
সাধনায়। *

আর আশ্চর্য, শ্রীঅরবিন্দের দিব্য সংস্পর্শে যখন মন আমার ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভরপুর, ঠিক সেই সময়েই আমি পাই ওলগার একটি চিঠি ও ফটো—তার পিতা পল বিরুকভের সঙ্গে তোলা। আমি উত্তরে লিখি যে, আমিও মনে মনে শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ করেছি। তাঁর এ কবিতাটি আমি টাইপ করে ওলগাকে মস্কোতে পাঠিয়েছিলাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে, আমার জীবনের এক পরম দুর্দিনে সে এসেছিল আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে—টলস্টয়কে গুরুবরণ করে আমাকে ফের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, আমিও স্বভাবে ভগবৎপ্রসাদার্থী গুরুবাদী নাস্তিক রাষ্ট্রবিপ্লবী নই। সে আমাকে উত্তরে লিখেছিলঃ মাত্র কয়েকটি লাইন ঃ

"তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম যে, তুমি নাস্তিক সমাজ-সংস্কারের পথে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে; তাই তো তোমাকে অত করে মানা করেছিলাম নাস্তিকদের সঙ্গে মিশতে। যারা ভগবানকে পোঁছে না, তারা চলুক তাদের নিজের পথে, আমরা যেন চলি আমাদের নিজের আত্মার নির্দিষ্ট পথে—হিংসার সঙ্গে, মিথ্যার সঙ্গে অসহযোগ করে, মানবপ্রীতিকে, ভগবৎবিশ্বাসকে সর্বতোভাবে বরণ করে।"

আজ ওলগা কোথায় আছে জানি না। তবে যেখানেই থাকুক না কেন, সে আমার কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয়া থাকবে।

শেষে বলি, আর একটিবার মাত্র তার খবর পেয়েছিলাম—বিচিত্রভাবে। আমার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর পুরো নামটি মনে পড়ছে না। তিনি মহৎ মানুষ, শ্রমিকদের জন্যে নানা আন্দোলন করে কয়েকবার জেলেও যান। একবার তিনি মস্কোতে গিয়েছিলেন—সে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা—সেখানে তাঁর দেখা হয় ওলগার সঙ্গে। কোথায় মনে নেই—সম্ভবত টলস্টয় ম্যুজিয়মেই হবে। ওলগার পিতৃদেব সেখানকার কিউরেটার ছিলেন—ওলগাও বুঝি সেখানেই কাজ করছে—বলেছিলেন বন্ধু। তিনি ওলগার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যও কম হন নি, ওলগার টেবিলে আমার ফটো দেখে। তিনি আজ কোথায় আছেন জানি না। তবে তিনি যদি এ লেখা পড়েন, তাহলে আশা করি খুশি হবেন ভেবে যে, তিনি এই নিমন্ত্রণ ভিক্ষুমতীর বার্তাবহ হয়ে এসে আমার স্মৃতিচারণের উপাদান জুগিয়েছিলেন—যে কথা তিনি ভুলে গেলেও আমি ভুলব না। (ক্রমশ)

* স্বামীজির Lectures from Colombo to Almora পৃঃ ৩, ৪ দ্রষ্টব্য। ইংরাজি উদ্ধৃতিটি সুদীর্ঘ বলে মাত্র কয়েক লাইনের অনুবাদ দিলাম।

* শ্রীঅরবিন্দের In the Moonlight কবিতার শেষ দুটি স্তবকের অনুবাদ।

সাপের চোখের ভেতর দিয়ে

স্মরজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পায়ের শব্দ থেমে গেলে কেমন জুড়ানো চোখে চায় ইছু ওর দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে চায়। সাদেকের পা দেখে, খুব ছোট্ট ফিকফিকে পায়ে সবসুদ্ধু এগারটা আঙুল।

ইছুর পায়ে ফাটা। চুন সুরকির রাবিশের ধসটানো খোয়া-মাড়িয়ে কিছু খাওয়া, কিছু ছেড়ে-ছিঁড়ে গেছে। আমের আঁটা দিয়ে পায়ের ফাটা বোজাত ও; খয়ের পড়েনি কখনও। ওর পা শক্ত করে এখন। এটুকুন অস্বস্তিকর ইছুর কাছে। কদিনই লক্ষ্য করছে আর পায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবনাটা জড়িয়ে ধরছে। ইছুর বাড়ির কোন জায়গায় এত ভাল পালিশ মেঝে নেই। পাটা-কব্বি-উসোর কাজ নেই কোথাও, সিমেণ্ট নেই। ইছুর বাড়িতে সে শব্দ হবার কোন লক্ষণ নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়েছে বারবার। টিনের চাল, ধুবধুবে মাটির দেওয়াল ঘেরা দোতলা। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, সব মাটির। অথচ এতবড় মিস্ত্রির বাড়িতে একটুও সিমেণ্ট নেই। মিস্ত্রির বাড়িটা লোকে হাঁ করে দেখে—কী খোলামেলা, কী বেপাত্তা। হুলগল করে লোক ঢুকে পড়ছে। চাল ভাঙা, একটু নকশা কারুকার্য নেই; নেই বাড়ির রান্নাশালা খিড়কি দলিজখানা—দু মহলের কোন ছিরিছাঁদ নেই। এখানে সেখানে বিস্তার করে আছে। সবটুকুন জুড়িয়ে কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেই বাড়ির নকশার। মিস্ত্রিও বোঝে—এমনিই হয়। আসল মিস্ত্রির বাড়ি খুব সংক্ষিপ্ত ও পরিচ্ছন্ন হয় না। এটা হল আসল মিস্ত্রি চেনার লক্ষণ। কটা লোক মিস্ত্রি চেনে? মিস্ত্রির অভিজ্ঞতার চোখ ক'জন বোঝে? একটুখানি সিমেণ্টের কাজ, বড় খান মাটির, অথচ কোন সম্পূর্ণতার ছাপ নেই তাতে। কী হতে যাচ্ছিল, মিস্ত্রি কী করতে যাচ্ছিল সে—অনেক ভাল ভাল জিনিস একসঙ্গে করতে চাইছে হয়ত, কিন্তু সব মিলিয়ে কিছুই নয়। জগড়জং।

বহু বাড়ির জন্ম দিয়েছে ইছু। কিন্তু তাই বলে ওর নিজের বাড়ি ভাল হবে না? ইছুর বাড়ি ভাল নয়; মাটির বাড়ি। সিমেণ্টের মেঝের ওপর ইছুর পায়ের শব্দ হয়। এখানে সে শব্দ নেই, কারণ ওর বাড়িতে মাটির মেঝে। তবুও গা রক্ত সব দমে গেল। হাত খুব মিষ্টি—বাড়ি তৈরীর হাত ইছুর। কিন্তু ফুলবানু আর সেলিমাবিবির কথা মনে পড়লেই লজ্জা অভিমান সব কিছুকে জড়িয়ে ধরে গা রক্ত সব ভয়ে কাঠ হয়ে আসে। বিবিজানরা দুজনেই মারা গেছে। দুজনেই মারা গেছে একই যন্ত্রণা পেয়ে। সেই যন্ত্রণাটার জন্যে দায়ী ইছু। যন্ত্রণাটা ওর পায়ে ঠাহর করল, হাতেও একবার। সেলিমার ভরা পেট মনে পড়ছে। পেটটা সবচেয়ে ভারি হয়ে ভাসছে চোখের কাছে। চোখের মণিটা চকচক করল। বিবিজানের পেটের নীল শিরায় ছেলের যন্ত্রণা, ইছুর পায়ের শিরায় বিবি-জানের মৃত্যুর যন্ত্রণা। কাঁদল, "মিঞাজান গো......?" ওরা মরল, দুজনেই। ইছুর নেশা ছুটলো তারপর। দুঃখ হল কি বোঝা গেল না। কেবল এখন দোরে দাঁড়িয়ে আতাবিচির মতন দাঁত বার করে হাসল হঠাৎ। হাসি। জীবজন্তুদের কথাটা মনে হওয়াতে। সাপেরা ত ছানা খেয়ে ফেলে, নিজের ছানা নিজেরাই খায়।

পা-টা খস খস শব্দ করে পরিষ্কার মেঝেয়। ওর পায়ে এখানে সে শব্দ নেই। পায়ের যত্ন নেয়, খড়ম্ পরে; চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে আসে। ছাতিমগাছের তলায় যেতেই দেখল মোকসেদ কাজ থেকে ফিরে এসেছে, ডাকছে মেয়েকে, 'মমতাজ রে—লে আয় মানিক পাটা কব্বি উসো নিয়ে আয়।' পাতিপুকুরের জলে ধুতে এসেছে মমতাজ

জিনিসগুলো। পুকুর থেকে উঠে যাবার সময় ওর পায়ের পাতা লক্ষ্য করল। শিশুর নির্মল পা দেখল। আরও একদিন দেখল ওর পা, যখন ও জলের ধারে দাঁড়িয়ে কী খাচ্ছিল। ইছুর পা, পায়ের পেটি সব শিরতোলা। ওর পা-টাকে কখন কেমন দেখায়। যেমন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর ওর পায়ে একটা থমথমে ভাব। বিকালে কাজের সময় পা থামের মতন ভার। শিরা মাংস সব মিশে টান টান হয়ে পড়েছে। আর কাজের শেষে পাটা-কম্বি-উসে। ধোবার সময় কেমন পায়ের আলতাপাটি সাদা মাজা মাজা। অনেকদিন পান-না-খাওয়া জামেনা-বিবির ঠোঁটের মতন।

মাটির মচমচে দোতলায় বসল ইছু। ইছু ছোট চোখ দুটো নামাল। এখন বর্ষা নেমেছে। ঠিক এমনি বর্ষাতেই ও চলে গেছল বাড়ি থেকে। আবার বর্ষা ফিরে আসতেই ও এসেছে। আরবজানবিবি লম্প নিয়ে চলে গেল।

বোকা পাঁঠার গায়ের গন্ধটা এখানেও ছাপিয়ে আসছে। ওর সঙ্গে একটা পাঁঠী ছাগলও আছে। ইছুর দোতলার নিচেই ঠিক। বাতাসে মিশে সেই গন্ধটা নাকে এসে লাগল। গন্ধটা আগে আগে আরবজানবিবির সহ্য হত না; তাই ছাগলের ঘরটাকে ইছুই সরিয়ে ওপাশে করেছে। বর্ষার সময় ছাগলগুলোকে লক্ষ্য রাখতে হত। শেয়ালের হাত থেকে রেহাই করবার জন্যেই ওদের ঘরের মেরামত করিয়ে দিয়েছিল ইছু। তার ওপাশেই হাঁস-মুরগীর ঘর। ছোট খুদি ঘর, কুঁড়ো আর নানান জঞ্জালে ভর্তি। ওদিকের উঠোনে সাদেকের ঘর, বড় লাউমাচা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ফল বেশী হওয়া ভাল কি? গাছের কোঁড়ে কোঁড়ে ফলের শুঁড় বেরিয়েছে। আরসেদের বাড়ির বদনাটা দেখা যাচ্ছে। একটুকরো ঘর। ভীষণ গরীব আরসেদ। ওর কাঠের কাজ। বুড়ো আরসেদ কাঠের কাজ করে। একই উঠোনে সবায়ের বাস। আরসেদের বাড়ি ও আরও পাঁচ বাড়ির জলপড়া উঠোন বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশ খেয়ে যাচ্ছে। শঠের ঘরখানা বুড়ো একেবারে। অনেক পুরনো আমলের ঘর শঠের। বিড়ির পাতা ছড়ান রয়েছে উঠোনে, বিড়ির গন্ধ ছাড়ে ওর বাড়ির কানাচে। ওর উঠোনের পাশে টিনের চালের রান্নাঘর ছোট। আরো ছোট ওর হাঁস মুরগীর ঘরগুলো। কেবল ইছু মিঞার বাড়িটাই এ চত্বরে বড়—বিস্তার আছে।

চট করে ভালবেসে ফেলার মন ইছুর। চট করে ভুলে যাওয়ার মন ইছুর। মন ভোলা। মন গলা। কখন একটা জিনিস ভালবাসলে, অন্য সময়ের ভাললাগার বস্তুকে তখন কাছ থেকে সরিয়ে দেবে। মনের কাছে কাঁটা হবে। তা না হলে সেলিমাবিবিকে কেমন ভালবাসত। অনেক বেহায়াপনা করল সেলিমাবিবিকে নিয়ে। আবার সেলিমাবিবির জন্যে জর্দা এনে দুজনে দোতলা ঘরে বসে খেল কী করে। কী করে ওর চারিদিক দোষগুণের সমাধান করলে সেদিন সারা বিকাল বসে বসে। মাদুরে বসে গল্প করলে। সেলিমা মাথার চুল থেকে ওর কী খুঁটে দিলে। খানিকটা সময় কেন ওরা কাছছাড়া হল না। ইছু কেন কাজে বেরুল না প্রথম সাদি করার প্রথম দিকটায়। সেলিমাকে আর বাপের বাড়ির দেশে পাঠাল না কেন? রব্বানির কাছে যে কাঠের কাজের অস্থায়ী চাকরিটা পেয়েছিল তাতে উন্নতি হবে জেনেও তবুও বাড়িতে বসে রইল। বিবিজান তখন নতুন বিয়ের সুখে, চেহারায়, রংয়ে খোলতাই হয়েছে। মচর মচর পান খায় আর একটু আধটু পাড়ায় বেরোয়।

লুলুপেতু করা আদরের স্বভাব ইছুর আছে, তবে সেই আদরের আমেজ শরীরে জাগিয়ে রাখে না। আদর যখন করে আদরের স্বভাব নিয়ে। তারপর ক' মিনিটেই ও ভুলে যায়। দিনের বেলায় ফিসফাস কথা হয় না—কথা কয় না ইছু আরবজান-বিবির সঙ্গে। রাত্রে ঘুম। নাক ডাকে ভোঁস ভোঁস। দেহের অশান্তির কোষগুলো নাড়া দিয়ে উঠলে তখন বিবিজানকে ও দুঃখের মতন কাছে টানে। আরবজান-বিবি এটুকু সময় ও ভুলিয়ে দিতে চায়; ওর ওপরকার দুঃখটুকু। তারপর মাটির দোতলায় যে হাওয়াটা একটু বেঁকে আসে, করমচা ঝোপের ওপর দিয়ে যে বাতাস আসে তাতে ওর নুর দোলে। দোল খায়। খুশী।

.....বিবিজান তুই এই [illegible] বলছি তাই গড় গড় করে [illegible] ছাঁটি পোলাউটি এবার [illegible] এসেছি। প্রহরে প্রহরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দরকার হয়ে পড়বে। সামাল সামাল। এই ঘর থেকে বিবিজান জিনিসটা নিয়ে আয়। বিবিজান হিসেবের খাতাটা নিয়ে আয়। কি পান দিলি যে মুখে, সরবতের মত মিলিয়ে গেল (অর্থাৎ পান সাজাটা পাতলা হয়ে গেছে) আর একটা সেজে নিয়ে আয়। চুন সুপুরি বেশী করে দিস, খয়ের বেশী করে দিস। দোক্তা আনিস সঙ্গে করে একটু। আর সন্ধ্যে বেলায় আমার বিড়িটা এনে দিস। না পারিস ত কাকেও দিয়ে আনাস। এখন একটা পান দে মুখে ফেলি।.....বিড়ি হল বাইরের লোকসমাজে খাবার জিনিস। বাড়িতে তামাকের ভুর ভুর গন্ধ ছাড়ছে। এধারে ওধারে ধুপধাপ বসে, দাঁড়িয়ে চলা-ফেরা করে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কখন যে মিঞাজান সরে সরে যাচ্ছে, বিবিজানকে তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে রুপোলী রঙের গুটকে-গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে দিয়ে আসতে হবে মুখের গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ। গন্ধ। চমৎকার আমেজ। ধোঁয়া। বিবিজান অস্পষ্ট হয়ে ওঠে মিঞাজানের সামনে।
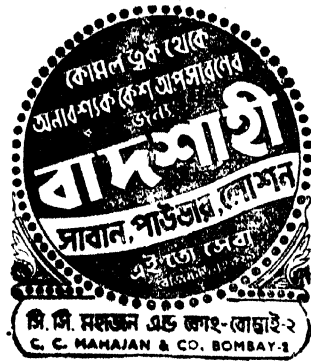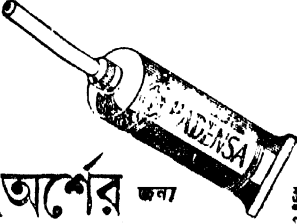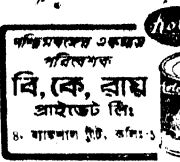
সংগে সংগে ডাক আসে মিঞাজানের, 'বিবিজান! বিবিজান!'

'কেন গা!' বিবিজানের ঘোরখা নড়ল।

'ঘাটের ধারে অমন ডেংড়িয়ে কেন গা—ছমছমে জায়গা। ভয় নেই প্রাণে? ঘরকে আয়।'

ইছুর চোখ দুটোয় দোষ ধরা পড়ে—বিবিজানকে একটু খোলা জায়গা দেবে না। যত দোষ ধরা পড়ে ইছুর চোখে। কিন্তু অমন চোখ হলে ত আরও লজ্জাকর। পুরুষমানুষ ঘরে শুয়ে থাকবে, বিবিজান ভুতের কুঠি বয়ে আনবে, পয়সা ধার করা যাবতীয় সবকিছু! ইছু পান খাওয়া আতাবিচির মতন দাঁত বার করে হাসে, তারপর গম্ভীর হয়। অর্থাৎ বাড়ুই তুমি চাল থেকে নাব। না কেন? না, আমার বিবি হাটে যাবে।' তা ঠিক। বিবিজানের পর্দা দেখ। লোকে হাসে। এই কথাটার তাৎপর্য বুঝে দেখবার আগে দুঃখে যন্ত্রণায় ভারি হয়ে ওঠে মিঞাজান। তারপর শুকনো পাতা ঠোঁটদুটো জিবের রসে ভিজিয়ে নেয়।

আরবজানীবিবি লম্পটা নিয়ে ওপাশে চলে গেল।

চোখদুটো দৃষ্টিতে ভরে যাচ্ছে ইছুর। চোখের পাতাটা নাচল একবার। কাঁটার চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গেল ইছু। কতদিন হ'ল চলে গেছল এখান থেকে। ন মাস দশ মাস হবে। বাড়ির ছবি মনে পেছল। একটি পর্দার দিকে বিবিজানকে পেছনে ফেলে অনেকদূরে সরে পড়েছিল। একটি পর্দা। পাতাপাতানি ঘামঘামানি সব চলে গেছে। আকাশে মেঘ ছিল তখনও। একটি কথার মুখেই ফিরে এসেছে। বিবিজানের কাছ থেকে কত দূরে সরে পড়েছিল। অনেকদূরে। জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না এমনি ভেবে নেয়নি কোনদিন। দেখা অবশ্য হবে, তবে এই দেখার সম্বন্ধটা আরও জোরাল হবে একথা ভেবেই আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। সম্বন্ধটা প্রথমে খুবই জটিল হবে। দুজনেরই দুজনাকে চিনতে কষ্ট হবে। আট মাসের অন্তর্ধানের অন্ধকার থেকে স্মৃতি নিয়ে মেলাতে কষ্ট হবে। আনন্দ হবে। অসহ হবে। খুব-ভাল-লাগার ছমছমানি জাগবে মনে। অনেকদূরেই চলে গেছল—ফুলটুসিপুরে। বাড়ি তৈরীর কাজ যখন জোটে—বিদেশ বিভুঁই মানতে গেলে চলে না। খোদ মিস্ত্রি নজুরালির সংগেই ফুলটুসিপুরে গেছল। তবে সেখানেও কিছুটা এদেশের মতন সাদৃশ্য রয়েছে। সে সাদৃশ্য খুঁজে বার করেছিল ইছুমিঞা। ফুলটুসিপুরকে প্রথমে খারাপ লেগেছিল। ওদেশের আলো বাতাস যেন কেমন কেমন বোধ হয়েছিল (অর্থাৎ এদেশের মতন নয়)। পরে ওর শরীরে চোখে সে জায়গাই পরম হয়ে দাঁড়াল। বেশ ভাল লাগল। এখন এতদিন পরে, আট মাস পরে ফিরে এসে মনে হ'ল এ বাড়ি যেন ইছুমিঞার বাড়ি নয়। বিবিজান যেন ওর নয় (অর্থাৎ আগেকার স্মৃতির চেহারায় এ-চেহারায় কোনও প্রভেদ রয়ে গেছে)। অনেক গাছপালা মরে শূন্য হয়ে এখানকার আগেকার ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। বিবিজান যেন এদেশ জায়গার বসবাস করে আছে। নজুরালির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে মিথ্যাকথা বলে নয়। অমন হাসনোরে বরের মতন গোঁয়ারতুমি করে ছুটি নিয়ে আসেনি। কাজের জায়গায় ওসব মিথ্যে বলতে নেই। সত্য বলেই ছুটি পেয়েছে চিরকাল। এবারেও তাই। বিবিজানের অসুখ—শরীর খারাপ যাচ্ছে; খায় না দায় না। দু-হাঁটু এক করে বসে থাকে। কী সব ভাবছে আকাশের দিকে চেয়ে। আজ বাড়িতে পৌঁছে বিকালের দিকে বিবিজানের স্বভাব লক্ষ্য করেছে নিজের চোখে। বিকাল পর্যন্ত। তারপর সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নতুন সাদি করে এনে যেমন করে লক্ষ্য করছিল ওর চলা, কথা বলা, ওর স্বভাব। তারপরই কাটা মাস পরে চলে গেছে ইছু। এরপর আজ এতদিন পরে এসে বিবিজানকে সেই চোখ নিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। নতুন সাদি করে এনে যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগে দেখেছিল, সেই দেখা মিলিয়ে নিচ্ছে বা হয়ত বাকী থাকা জিনিস আরো দেখছে। বিবিজানও তেমনি এমনি করে মিঞাজানকে দেখছে।

পানের কৌটা নিয়ে গেল বিবিজান। চুন সুপারি আলাদা করে দিলে। তার আগে নজরে পড়ল ওর চোখের চামড়া দেখে থেকে বুঝতে পারল, চোখের ভেতরের অন্ধকার টুকরো টুকরো হয়ে লক্ষপ আলোতে লাল নীল কাচের রং, আসমানি, সলমা চুমকি এমনি সব রং এর কাজ হয়েছে।

মাটির মসমসে দোতলা ঘরে তেমনি শুয়ে রইল ইছু। এতদিন পরে বাড়ি এসেছে, পাড়ার খবর নেওয়া স্বভাব ছিল ওর। হাতের কনুই সরিয়ে এনে ওপাশে চোখ ফিরিয়ে থাকল।......এলার বাবা নতুন সাঙা করল, পুরনো টিনের বাড়িটায় ওরা এখন বাস করছে। দুই উপযুক্ত ছেলে থাকতে সাঙা করাটা ভাল হ'ল কি? মাস কতকের মধ্যেই ওর বাবা এলা-মমলাকে বাড়ির বার করে দিলে ঝগড়া করে। এলা মরল বসন্ত হয়ে, মমলা চৌকাপুরে শ্বশুরবাড়ি বাস করছে এখন। নারা বাতিবিবিকে মেয়ের মতন মানুষ করলে। তারপর কি করে আবার ওকেই বিয়ে করবার কথা ভাবলে।

ওর বউ তেড়ে এল একটা অন্ধকার রাত্রিতে —'মেয়ের মত পিতিপালন করে তাকে বিয়ে করতে চাস ধ্বংস্ বেজন্মার পুত। আর একটা ত সাঙা করেছিলি—তাকে ভাত দিতে পারলিনি, সে চলে গেল।'...ওদিকে লালজানবিবির ঘর। খড়ের চালাঘরে শীত যায় না মোটে। লালজানবিবি এক বছর হ'ল বিধবা হয়েছে। হাত খালি। কানে ওর মাকড়ি, কোমরে চাবুকের মত গোট পরে ও।......আম্মাতির ভাই আজিজ, গাড়ি চালাত, বাঁশি বাজাত। শহরে চাকরি পেয়ে চলে গেল। আজিজ মারা গেল শহরে। ওকে এখানে এনে মাটি দিলে। ...বারসেদরা হ'ল নড়োপানুর বৈমাত্রেয় ভাই। বারসেদরা পাঁচ ভাই। বড় বারসেদ, মেজ ফাঁচ, সেজ আরসেদ, ন' মোকসেদ আর হাম্বির ছোট।......গোলামের বেটা নজু, নারার ভাইঝিকে সাদি করে হরিহরপুরেই রয়ে গেল। একলা মায়ের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, তাই সম্পত্তি পাবার লোভে ওখানেই থাকল। ওর এখানের ঘরের টিনের চাল খুলে নিয়ে ফরাশ মারা গেল। কবরখানার বাড়ি ত!......শঠু সংমায়ের মেয়েকে বিয়ে করলে। এখন খুব কষ্টে পড়েছে। ......অম্বর, আমেনার সালাজকে বিয়ে করলে। দিনের বেলায় মোল্লা এসে বিয়ে দিল। রাত্রে ওদের খড়ের ঘরে আগুন ধরল। নতুনবৌ এসে বাঁশবনে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। নারার বাড়িতে জিনিসপত্র পড়েস সব।......

আরবজানবিবি লম্পর আলোটা চোখের গোড়া দিয়ে নিয়ে যেতেই চোখের ভেতর লাল নীল রং ঘোর হয়ে, ফিকে-পাতলা হয়ে মেরূণ রং, সলমা-চুমকি, জরির ফুল, লতা-পাতা হ'ল। —আরবজানবিবি ওদিকের ঘরে চলে গেল।

চোখ দুটো কূল ছাপিয়ে এল। চোখের এক পাশে একটু তৃপ্তির আস্বাদ আছে ইছুরে। কাজে ঘুরছে আরবজানবিবি। ইছুরে চোখের ভেতরের রংটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে। ও এখনও শোবার সময় পায়নি। বোরখাপরা আরবজানবিবি আর একটু পরেই আসবে এই ঠাণ্ডা বিছানায়। খাটা-খাটুনির শরীরখানা নাচিয়ে রাখবে এই বাদলের কনকনে বিছানায়। আরবজানবিবির রং ইটের মতন লাল। টোপা গাল। আরবজানবিবি রাগলে সিঁদুর হয়ে ওঠে। ফুলবানু আর সেলিমাবিবি ওরাও খুব চমৎকার দেখতে ছিল। ওরা মারা গেছে যন্ত্রণা পেয়ে। ওদের যন্ত্রণার কথাটা আরবজানবিবি জেনেছে কি? এ-খবর চাপা থাকে না কোনদিন—জেনেছে নিশ্চয়। আগেকার বিবিদের স্বভাব চরিত্র, ওদের চাল-চলন, সরল মেজাজ ছিল কিনা, কিংবা ওদের মৃত্যুর খবর। এটা চাপা থাকবার নয়। আরবজানবিবি ওর তৃতীয় পক্ষের সাদি করা বউ। আরবজানবিবিকে ভাল লাগে ইছুরে। ইছুরে ভালবাসা মুরগীর মতন। ভালবাসার লক্ষণটা ঠিক তাই। আরবজানবিবিকে একবার দেখবার চেষ্টা করল। বোরখাপরা আরবজানবিবিকে খুব সুন্দর দেখায় (আগেকার চেহারার সেই স্মৃতি মনে পড়ছে) বোরখা খোলার পর ওকে কেমন দেখায়। পরিষ্কার আকাশকে যেমন দেখায়, একটা বদনাকে মাজলে যেমন দেখায় তেমনি। আটাশটা বর্ষার পানি খেয়ে আসা আরবজানবিবির মুখখানা চেয়ে চেয়ে দেখে। কি দেখে? বয়েস দেখে। সন্দেহের মনে দেখে। বিদেশ বিভুঁই গেলে বিবিজান একলাটি থাকতে পারবে কি তাই দেখে। আটাশটা বছর বয়েস এমন কিছু বেশী বয়েস নয়। এটাই ঠিক বয়েস। শান্ত বয়েস। প্রেমে শান্ত হয়ে বসার সময় এটা। অমন চুড়ুক পুড়ুক করে লোভী লোভী চোখে উড়ে পড়ার বয়েস নয়। একটা বিষভর্তি বয়েসের সাপকে কত সাধাসাধি করলে তবে 'ফোঁস' করে ওঠে একবার। ফোঁস্। নিজের মনেই হাসতে থাকে ইছু —'বিবিজানের ফোঁস্'! কোথা থেকে যেন এনেছিল ইছু এই বিবিজানকে! কী খরচ করেই না খিচুড়ি খাইয়েছিল জাত-ভাইদের!

আরবজানবিবি লম্পর আলো নিয়ে ওপাশে চলে গেল। ইছুরে চোখের লাল নীল রং, হারছড়া, সলমা-চুমকির কাজ, জরির ফুল হ'ল, রং-এর বর্ণালী হ'ল।

চোখ চাইল ইছু বাইরের দিকে। কনুই কাত করে ফিরল। বাইরের ঘরগুলো ভিজছে। ঝমঝম করে ছাতিম গাছ ভিজছে। ছাতিম গাছের ডালের পাখির বাসা ভিজছে। পাখি ভিজছে। ইছুর ঘর ভিজছে দক্ষিণের

জানালা দিয়ে। তুলো ভিজে গেছে। শুকনো খড়, বহুদিনের শুকনো খড় ভিজে গেছে। বাইরে যারা একটু থাকবে, তারা কেউ ভেজেনি একথা বলতে পারবে না। ভেজেনি একথা কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না। টোকা ভিজছে। ঝড় এল। আবার কমলো। জলের টপ টপ শব্দ, এছাড়া আরও অনেক শব্দকে ঠিক বলা শক্ত, তবে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাকে বোঝা যায়। বৃষ্টি থামল। বাইরে জলপড়া থামল। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর আবার সবাই জানছে যে, এ বৃষ্টি থামলেও আবার শতেক ধারায় আসবে, আবার ভিজবে। বৃষ্টি থেমেছে। পুকুরের জলের ওপর গাছের পাতার সঞ্চয়ের জল পড়ল এখন। অন্ধকার রাত্রিতে কে ঘোরাঘুরি করছে। টোকা মাথায় দিয়ে পলুই নিয়ে বোধ হয় আমেনার বর মাছ ধরতে এসেছে—জল উঠবে সেই খাদের দিকটায়। বসুন দিয়ে কড়া ঝাল বানাবে। আরবজানবিবি রাঁধে খুব চমৎকার। আরবজানবিবি চিঠি লিখতে জানে না। আগেকার বিবিরা জানত। ওরা এখন থেমে গেছে। ওদের জীবনের একরাশ চিন্তা ইছুর সারা শরীরের স্নায়ু ধরে একবার মাথায় উঠে এল। ফুলবানু আর সেলিমাবিবি শুয়ে আছে কবরখানায়। ওখানে নাচছে জোনাকি। জোনাকিরা। সমাধি ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। একরাশ কুচো জরির মতন ঝলমল করছে জোনাকিরা। নীল আলো। জোনাকিরা নাচছে কবরের কাছটায়, অন্ধকারে, বৃষ্টিতে। বাতাস বাড়ল বাইরে। ওদের মধ্যে একটিমাত্র জোনাকি নাচতে নাচতে বাইরে এল। অন্ধকার ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এল, পাঁচিল টপকাল দোরগোড়ায় দাঁড়ে, আলনায়, ঘষা আয়নায়, তারপর মাদুরে, মিঞাজানের কাছে এসে দপ্ করে শব্দ হয়ে থেমে গেল জোনাকিটা।

একটু কেঁপে উঠল চোখ দুটো মিঞা-জানের—আরবজানবিবির লম্পটা দপ্ করে শব্দ করে নিবিয়ে দিতে। অন্ধকার।

'বেজনাটা ছাড় একটুকুন।' বিবিজান সরে এল।

'বেজনাটা এতটুকুন যে গা। সরলে মেঝেয় পড়ব।'

'আমার শোবার জায়গা দাও।'

'একা শোয়া অবোস, তাই বেজনাটা জুড়ে শুয়েছি।'

বিবিজানের পা ভিজে। এই বর্ষায় বিবিজানের পা ভিজে থাকবে এটা মনে কল্পনা করে নিয়েছিল ইছু। আর দুজনে কাছাকাছি হতেই; এতদিন পরে বিবিজান কাছে আসতেই—বিবিজানও মিঞাজানের পা থেকে একটা চেনা গন্ধ পেল। শুঁকলো।

গা চুলকলো বিবিজান। গায়ের চাপা খুলে গা চুলকালো খসর খসর। ওদিক ফিরে গা চুলকাচ্ছে। বিবিজান বকছে। ইছুর চোখে ঘোরঘুম—বিবিজানকে রোগে ধরেছে মনে হয়। কী রোগ! বিবিজান শুল, আবার উঠল।

বিবিজান শুল, আবার উঠল। একটা কৌটর ঢাকা নিয়ে পা চুলকলো। বিবিজান বলল, 'গা হাতের চামড়া খসে ফেলতে ইচ্ছে করছে গো মিঞাজান!'

ইছুর মনে পড়ছে এ জিনিসটা হয়েছে আজ ক' মাস ধরে। সাইদের চিঠি থেকে তার কিছুটা আভাস পেয়েছে ইছু। চিঠিতে লেখা ছিল.....'বিবিজান আর সেরকম নেই মিঞাজান। যা খেচ্ছে তে-ডবল বমি হয়ে যেচ্ছে, মুখে হাসি নেই মোটে। কি সব আকাশ পাতাল ভাবতিছে। পানিতে গা ডুবিয়ে বসে আছে গা জ্বলুনির ব্যারাম। অমন যে সোন্দর গড়ন লাশ একখানা নিশিতে শুকিয়ে দিচ্ছে যেন......' ভারার ওপর দাঁড়ান রাজমিস্ত্রি ইছুর হাতে এ চিঠি পড়েছিল।

বিবিজানের ঠাণ্ডা হাতটা মিঞাজান নিজের হাতের মধ্যে একবার রাখল। ইছুর হাত গরম। ইছুর মুখ ঠাণ্ডা। বিবিজানের হাত ঠাণ্ডা, মুখটা গরম। শরীরের সমস্ত রক্ত হয়ত মুখে। বাইরের পৃথিবী ঠাণ্ডা। মুরগীর ঘরে চাপা গরম। মিঞাজানের থুতনিটা, কর্কশ থুতনিটা একবার বিবিজানের মুখে লাগল।

বিবিজান বেঁকে দূরে সরে গেল। বিবিজান গলায় শক্তি পেয়েছে এমনভাবে কথাটা বলল, 'একটা কথা শুনবে গা!'

'কি কথা?'

'না, তোমার বাপের দেশকে গড় করি। কী সাপ গো! কাল-খরিস বেইরেছিল সেদিন নাদনার ধার থেকে। মুখ বার করে শিকার খুঁজতেছিল বোধায়।'

'কোথায়?' চমকে উঠল ইছু।

'জানলার কাছকে এসতেই ফোঁস্ করল।'

'আর কি করল?'

'আর কি। পালিয়ে এনু সোজা বিছেটি থেকে। দববানি এল, সাদেক এল, শঠুর মেজশালা এল—কাঁচা টাঙ্গি আর কাটারি নিয়ে। সাপটা সরে পড়ল।'

বিবিজান থামল। গা চুলকানোতে মন দিল।

ইছু নাদনাটার দিকে চেয়ে রইল। যেখান থেকে সাপটা বিবিজানকে দেখা দিয়েছিল। ইছু ভাবল, সাপটা অন্ধকার থেকে ওদের দেখছে কিনা! ওর নিজের শুনছে মনে হয়। চক্করঅলা সাপকে ভয়ও আছে। মাথায় যার খড়মের দাগ, সেই খুব বড় সাপটাকে দেখতে পেল এখন। ইছু বোড়া সাপটাকে মনে করল একবার। বোড়া, খুব বুড়ো হলে তোকখোপ হয়; উড়তে পারে তখন। 'বাঘের দেখা আর সাপের লেখা কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না' —কথাটা মনে পড়ল। ভয় পেল। অন্ধকারে চাইল একবার। বাইরেও দেখল। তারপর আরবজানবিবির দিকে চেয়ে দেখল, ইছু বাড়িতে আসায় পরিতৃপ্তির ঘুম নেমেছে ওর চোখে। কিংবা শরীরের শান্তিতে ঘুম নেমেছে ওর। কেবল ইছুর মনে হল, এই অন্ধকারে ওর সামনে একটা সাপ আসবেই: যেমন করেই হোক, এখান থেকেই
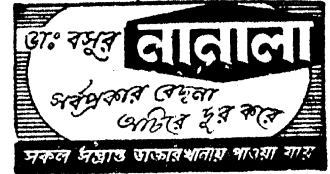
হোক। সমস্ত ঘরখানার প্রত্যেকটি জায়গার দিকে সন্দেহের চোখে চাইল ইছু। সাপের ঠাণ্ডাটা ওর কনকনে পায়ে বুঝতে পারল। মুঠো করে পা-টা জড়িয়ে ধরল।

অন্ধকারে থেকে আরো অন্ধকারে ডুব লাগাল একসময় ইছু। ঘুমিয়ে পড়ল। ইছু ঘুমিয়ে থেকে মুখে একটা শব্দ করল; ঘুমিয়ে থেকে কী একটা বলতে চাইল। ঘুমিয়ে যে অস্বস্তিটা ও বোধ করল—সেটা এখানে জেগে থেকেও যা ভেবেছে, ঘুমের মধ্যেও তাদের নিয়ে কাটাতে হচ্ছে তাই। জেগে থেকেও যে খরিস কেউটার হিলহিল গতি নিঃশ্বাস ভারছিল ঘুমিয়েও তাকেই দেখল।......একটা শান-বাঁধান ঘাটের ওপর দিয়ে ইছু যেতে লাগল, তার করল তার ভয়, কয়েকটা সাপ তার পিছু নিয়েছে। যে সাপের রং কালো, এবং যাদের রং ধূসর, গায়ে-দাগ-টানা সবই এঁকে বেঁকে তার পথ আগলে ধরছে, গাছের ডাল ধরে নিচে ঝুলছে। তারা ইছুকে লক্ষ্য করছে, চাইছে। ইছু যে ওদের দিকে চাইছে সেটা ওদের জানতেই দিচ্ছে না। লম্বা মোটা সাপটা জল থেকে উঠে ইছুর পায়ের পাশ দিয়ে সা সা করে চলে গেল। ইছু থামলো। ইছুর বুকখানা কাঁপছে। চার পাঁচতলা বাড়ির ভারার ওপর দাঁড়িয়ে যে বুক কাঁপে না সেই বুক ধুকপুক করছে। পানের ছোপলাগা দাঁতগুলো শুকিয়ে গলা কাঠ হয়ে আসছে। পথটা বারবারই আগলে ধরছে ওরা। একবার মনে হল, গায়ে লাগবে; কিন্তু লাগল না গায়ে। আকাশটা মেঘলা। (সব স্বপ্নেরই আকাশ ওর মেঘলা থাকে।) একটা রাস্তা পড়ল, যে চেনা রাস্তাটা এখানে থাকা উচিত নয়, কিন্তু রাস্তাটা এখানে কী করে এসে পড়ল! টোকাপুরে ইস্কুল যাবার সময় খালের ধারের নিচু রাস্তাটা। রাস্তাটা শেষ হয়েছে একটা পুকুরের ধারে। আর যাবার রাস্তা নেই। এবার কোথায় যাবে সে। সামনে জল; রাস্তা নেই ইছুর। সাপগুলো ওকে এখানে জড়িয়ে ধরবে। চোখ বুজল। ভয় পাওয়ার পর আর একটু শক্তি সঞ্চয় হল। আর ইছু মুক্তি পেল। ইছু মুক্তি পেয়েছে তাই আনন্দ হচ্ছে। জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে এল পা চালিয়ে। জল ইছুর পায়ে লাগল না। এবার আরো জোরে হাঁটছে ইছু। সোজা শিগ্গির রাস্তায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই একই রাস্তায় ইছু অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে। হাঁটছে। এবার গলা শুকিয়ে গেল। বুক কাঁপল ইছুর, ওর সামনে বড় অরণ্য। যগ্গিডুমুরের কাঁটাগাছ তারপর আরো অনেক বড় বড় গাছ। এ বনটা কেন এল? কোথায় যাবে ইছু। ভয়ানক একা। সাপগুলো ওর পিছন পিছন আসছে। ভাগ্যিস একবারও মা রেখে লাগছে না; লাগবে লাগবে করেই কাটছে সময়। ভয় পেয়ে ইছু খুব হালকা হয়ে গেছে। অরণ্যের ওপর দিয়েই চলে যেতে লাগল ইছু। গাছের পাতার নরম পা সাহায্য করল; অর্থাৎ গাছের ডালপালা ফুটল না ওর পায়ে। সাপগুলো এখানেও ঝিলমিল করে আসছে। ফণা-করে তেড়ে আসছে। ঢোড়া খরিস গায়ে-দাগ-কাটা সাপগুলো আসছে। ধরবে। মাত্র এক আঙুল ফাঁক আছে। তারপরই সাপটা গায়ে লাগবে আর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শেষ করবে......। চোখ বুজল, গায়ে কাঁটা, অসহ্য শিহরণ বোধ করল সে। পায়ের গোড়ালি টাটিয়ে উঠল, বুকটায় ভীষণ কনকনানি। আর যাবার রাস্তা নেই! যতদূর চোখ যায় শুধু জল। সমুদ্র দেখল ইছু। সামনে শুধু জল আর আকাশ ছোঁয়াছুঁয়ি। গাছপালা এখানেই শেষ হয়ে গেছে। আর যেতে পারবে না ইছু। খানিকটা সময় ভাবল। ইছুর বুদ্ধি নেই; ইছুর যেন কিছুই নেই। ওর আশেপাশে মানুষ, পাখি কিছুই নেই। ভয়ে সারা গা ঘেমে গেল ইছুর। সরু ডালটার কাছে কেন যে গেল ইছু। বুকটা হু হু করে উঠল। 'মট' করে গাছের ডালটা ভেঙে নিচে পড়তে লাগল। ইছুর পড়তে বেশ সময় লাগছে। ডাল ভেঙে পড়ে যাবার সময় ইছু যেন মনে মনে কাকে বলল, ওই বন, কাঁটাবেন ঝাড় সেকুল কাঁটার ঝাড়ে যেখানে জট পাকিয়ে আছে ওইখানে আটকে থাকবে। তাই হল। সেকুল কাঁটার ঝাড়েই লুঙ্গি আটকে পড়ে থাকল ইছু। ইছুর নিচু দিয়ে সমুদ্রের জলের স্রোত বয়ে চলেছে। এখান থেকে সাপগুলোকে দেখতে চাইল ইছু। ওদের

জন্ম দেখল। মাটির ভেতর থেকে সরু সরু কেঁচো বেরিয়ে মোটা হয়ে চক্কর ধরছে, মাথায় খড়মের দাগ হচ্ছে; হিলিবিল সাপ হয়ে নাচছে, বেরিয়ে যাচ্ছে বেগাও। কাঠের ঝাড়ে ইঁদুরকে লাগছে না—কোনরকমে হাল্কা হয়ে ইঁদু আটকে রইল। ধকধক করে চাইল, ওকে যেন কেউ না দেখে ফেলে। ঠান্ডা বাতাস হু হু করে লাগছে ওর গায়ে। কনকন করছে। অনেকক্ষণ শীত নিয়ে থাকতে হবে ইঁদুরকে। ইঁদু কাঠ হওয়া গলা নিয়ে, ঠান্ডা রক্ত নিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইল। অনেকক্ষণ থাকল।

ঠান্ডা লাগতে উঠল। মোরগটা মাথার কাছে কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ইঁদু দেখল তার দোতলাতেই শুয়ে রয়েছে সে। মরেনি, সাপেও ধরেনি ওকে। উঠে এসে দাঁড়াল সোজা কাঠের গরাদ দেওয়া বারান্দার কাছে। এ জায়গায় দাঁড়ালে দেওয়ালের ঘষা সস্তা আয়নায় ইঁদুর বুক থেকে মাথাটা দেখা যায়। আর বিবিজানের শুধু মুখটাই দেখতে পাওয়া যায়। আয়নায় ইঁদুর মুখের ছায়া পড়েছে। নাক টিকলো, থুতনিটা লম্বা, চোখের কাছে কালো, নুর ঝুলে পড়েছে অনেক নিচু। আবার একটু পরেই ইঁদুর নাক চাপ্টা হল; থুতনিটা আমড়ার মতন হল, নুর নেই। মুখটা বাড়ছে, কমছে, গোল হচ্ছে। ইঁদু জলাস্রোতের ভাঙে পড়ার মতন ভাঙছে গড়ছে ভাসছে। এ কেমন আয়না ওর। ওকে কত রকম করে দেখাচ্ছে। রাতের স্বপ্নটা কি দেখলো ইঁদু। সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয়। এত স্বপ্ন থাকতে সাপের স্বপ্নটাই সে কেন দেখল। সাপের স্বপ্ন দেখাটা ভাল কি। আমজানের কথাটা মনে পড়ছে। সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশবৃদ্ধি হয়। সাপ কামড়ানোর স্বপ্ন দেখলে নিজের ছেলে হয়। আর সাপ তেড়ে আসার স্বপ্ন দেখলে বংশবৃদ্ধি হয়। বিখ্যাত আমজানের কথার সত্যটুকু খুঁজতে চেষ্টা করল। আয়নায় প্রতিবিম্বিত ইঁদুর বিকৃত রূপের মতন ওর মনের ঘটনাগুলোও স্বপ্ন হয়ে থাকবে হয়ত! ইঁদুর মন তিক্ত হল। চোখ জ্বালা করল। একটা যন্ত্রণাকে সে সারাদেহে সহ্য করল অনেকক্ষণ ধরে।

পাতিপুকুরের দিকে এমন সময় চলেছে বিবিজান। চেতলমাছের চালে চলেছে—বিবিজান। চিতিয়ে চিতিয়ে। বিবিজান ছাতিমগাছের তলায় এল, মুরগীর পাশাপাশি হাঁটল। বিকালের রোদ পড়ল মুরগীর লাল ঝালরের মতন। বিবিজান যেখানে দাঁড়িয়ে কথা কয়—সেখানেই হা-করে থাকে। যেখানে দাঁড়ায়, সেখান দিয়ে ওর বেলা চলে যায়। ভারি চোখের পলক পড়ে না মোটে। ডাসা ডাসা চোখে কাজল নেই দুদিন তিনদিন। আরসেদের রান্না-চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ লাল। শরীরে ওর জ্বর জ্বর ভাব। দিনে শোয় না এজন্যে চর্বি শরীরে খাওয়া-দাওয়ার পর পেটে আরো চাপ পড়ে। হাঁসের মতন আর চলতে পারে না।

আরসেদের বেটা পুঁটিমাছ ডাঙায় তুলল। পেটে ডিম, পুঁটিমাছ ধড়ফড় করছে।

সায়েমের সাদা হাঁসটা দুলে দুলে চলেছে রাস্তার দিকে।

বিবিজান চলেছে গোলামের বাড়ির কাছ দিয়ে লাউমাচাটার পাশ দিয়ে। বিবিজান এল, তখন বেলা পড়ে গেছে।

ফুলবানু আর সেলিমাবিবির মুখ মনে পড়ল। তারা যে কারণে মারা গেছল—তাদের মৃত্যুর যন্ত্রণাটা পায়ে ঠাহর করল ইঁদু। তাদের মৃত্যুর আগে ইঁদুর রাগ হয়েছিল, মন খেয়েছিল ইঁদু। সেই রাগটাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করল। আরো যে কারণে ইঁদুর চোখ জ্বালা করে উঠেছিল সেই জিনিসগুলো, চিন্তা সব এক এক করে জড়ো করল মনে। বিবিজান

পোয়াতি। বিবিজানের পেটে ছেলে নড়ছে। কী দুঃসহ লাগে দেখতে। ইছু বিবি-জানের এ-রূপ দেখেনি। এ-রূপে দেখার পর কাকেও সহ্য করেনি ইছু। ভাবল, বিবিজানকে ডাকবে একবার। বিবিজানের পেটে লাথি মারবে। চোখ দুটো চকচক করল। সেই রাগটা মাথায় উঠে এল। এখন সে বয়স পেরিয়ে গেছে বলেই হাত, বুক, পা কাঁপল মিঞাজানের।

'পান খাবে গা!' বিবিজান সহজভাবে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েছে।

মিঞাজান চাইল ওর দিকে, কিন্তু উত্তর দিল না।

'জর্দা দিয়ে খাও নাঃ সাজলুম যে!'

পান নেবার আগে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকা ইছু বিবিজানের খুঁটিতে-লাগা-হাতটা দেখল; বিবিজান গাছের ডাল ধরে আছে যেন। হিংসায় উন্মত্ত মিঞাজানের দুটো চোখ বিবিজানকে মেরে ফেলবার আগে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। কাছে এল, ভয়ানক কাছে। বিবিজানের থুতনিটা কেমন চওড়া; ও জায়গার মেয়েরা এমনিই হয়। নাকটা ধারাল কঞ্চির ডগার মত। জোড়া-ভ্রূ এই প্রথম যেন লক্ষ্যে পড়ল মিঞাজানের। মিঞাজানের চোখের সাদা জমিতে কালো মণি চকচক করল। ঘুরল। কটাক্ষ। শেষবারের মতন আরবজানবিবির দেহটা দেখল। ভয়ংকর। ছোরা নাচল ও পকেটে। পদ্মর পাপড়ির আকৃতি ছোরা হাতে নিয়ে নাচাল। কাছে এল, লোভী জানোয়ারের মত তাকাল; সরে গেল আবার। লুঙ্গি নড়ল ঘনঘন। সাইদের ঘরের দিকে তাকাল, চোখের তারা নাচাল। ছোরা পকেটে রেখে দিল।

'কি তাকাও অমন—লাও'!

মিঞাজান উত্তর দিল না, চোখের তারা নাচাল শুধু।

'পান লেবেনি—কেটে কুচুরে লাকিন!' বিবিজান হাসিতে ভেঙে পড়বে যেন।

মিঞাজান আতঙ্কে শিউরে উঠল—'কি'?

'পান সেজে আনলুম তা মুখে তাকে কি দেখ?'

কি দেখছে তাই দেখবার জন্যে কাছে এল মিঞাজান। দেখল, আরো দেখল।

ছাতিমগাছের ওপর দিয়ে যে বাতাসটা ঢেউ খেয়ে বেঁকে এল, ওর ঘরের পাশ দিয়ে যে বাতাস এল, তাতে মিঞাজানের নূর নড়ল। বহুদিনের আতর মেহেদি খাওয়ার আর বহুদিনের আতর মেহেদি না-খেতে-পাওয়ার নূরটা নড়ল। বাতাস খেল।

মিঞাজান হাসল, অনেক পরে বলল, 'বিবিজান দেখছি তোকে। তোর মুখের গড়নখানা বেশ। তোর মুখ ভাল।' তারপর অপ্রস্তুত হয়ে ছোরাটার প্রসংগ নিয়ে বলল, 'আজ একটা মুরগী কাটব কিনা—তাই হেঁ হেঁ......।'

নকশাকাটা লাল কাপড়ে বিবিজানের আব্রুর ভেতর থেকেও শরীরের একটা উঁচু অংশের স্পষ্টতা বেড়েছে বরং। পুরানো জরির ফুল বাতাসে নড়ল বিবিজানের বুকে। চমৎকার দেখাল এক মুহূর্ত আরবজান বিবিকে। মদের মতন ভলভলে, লাল শরীর বিবিজানের। বিবিজানের সুন্দর শরীর থেকে সুন্দর ছেলে জন্ম নেবে এ হয় না। আরবজানবিবির খাণ্ডে খাণ্ডে বেঁচে থাকবে। অনেক স্মৃতির মাঝে আরবজানবিবি। জন্মের ইতিহাস হাতড়াল ও। মিঞাজানের প্রাণ ছটফট করে উঠল। অস্থির হয়ে উঠল চোখের তারা মিঞা-জানের। নিচে নামল, দেওয়ালে উঠল। পায়চারি করল। শেষ বেলায় অনেক স্মৃতি মরে গেল অনেক কথার ঢেউ ফুরিয়ে গেল, একটা পরিতৃপ্তিতে মন ভরে গেল। বিবিজানের চুলে হাত দেওয়ার মতন, ওর সহজ নিঃশ্বাসের মতন মনটা আপনার হয়ে গেল। আরবজান-বিবিকে মারতে পারল না সে। মারবে না সে। পাতিপুকুরের জলের মতন ওর মন হল। হাসনুহেনার গন্ধ নাকে এসে লাগল। মন ভাল লাগছে। বিবিজানকে সুখী করবে। দেওয়ালের সস্তা ঘষা আয়নাটা পেড়ে নিয়ে এল। তারপর দাড়ি কামাতে বসল দোরে। সন্ধ্যা হয়ে এল এল। সব দাড়ি কামিয়ে জিয়নো নূরটা পর্যন্ত চেঁছে বেশ ফর্সা হয়ে গেল। দাড়ি ফেলে দিল ইছু।

তারপর কেমন স্বচ্ছ-উজ্জ্বল-চমৎকার জীবন।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

১০

ফিরে এসে মাধুরী দেখল মনোমোহন যেভাবে বসেছিলেন সেইভাবেই বসে আছেন। যে কথা বলছিলেন তাই বলে চলেছেন। ছেলের উদ্দেশ্যে গালাগাল, নিন্দামন্দ এখনো শেষ হয়নি। 'জানো অসীম, ওর মত স্বার্থপর, ওর মত মতলববাজ আমি আর কাউকে দেখিনি! আমার এতখানি বয়স হল, কতরকমের কত মানুষ দেখলাম। কিন্তু ওর মত ক্রূর ওর মত খল—'

অসীম বলল, 'আপনি মিথ্যে রাগ করছেন মেসোমশাই। ছেলের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে এতে তার কি মতলব থাকতে পারে।'

মনোমোহন বললেন, 'তুমি জানো না অসীম। তুমি তোমার বন্ধুকে চেনো না। ওর মাথার মধ্যে নানান চাল। ও এক চাল এগোবার আগে পরের দশ চালের কথা ভেবে রাখে। ও আলাদা হয়ে গেছে কেন জানো। নিজের নামে বাড়ি করবে, গাড়ি করবে। সেই হল আসল উদ্দেশ্য। একসঙ্গে থেকে গোষ্ঠী পালন করে তো আর তা হবে না।'

মাধুরী চলে যাচ্ছিল মনোমোহন তাকে ডেকে বললেন, 'এই শোন, ও তোকে গোপনে গোপনে কী বলে গেল।'

মাধুরী থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী আবার বলবে।'

'যেতে বলে গেল তো? খবরদার যেতে পারবিনে। আমি বলে দিচ্ছি কেউ যেতে পারবিনে।'

মাধুরী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'সে-কথা তো হয়েই গেছে বাবা। বারবার বলে লাভ কি।'

মাধুরী আর সেখানে দাঁড়াল না। তারও এবার বেরোবার উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে। যেতে যেতে শুনল, বাবা বলছেন, 'আমার নিজের ঘরেই একেকটি বিভীষণ। সব আমার খাবে আমার পরবে। কিন্তু যত টান দাদার দিকে। আমার পিছনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই অসীম, পাশে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। জীবনভর আমাকে একাই লড়তে হয়েছে, একাই লড়তে হবে।'

বাবার এই সব আক্ষেপ শুনে মাঝে মাঝে হাসিই পায় মাধুরীর। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের সংসারে থেকেও কেন উনি নিজেকে অত নিঃসঙ্গ মনে করেন, নিঃসহায় ভাবেন? একটু আগে প্রায় বাবার বয়সী ব্রজবাবুও নিঃসঙ্গতার কথা বলছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, কেউ নেই সংসারে। তাঁর নিঃসঙ্গতার একটা মানে হয়। কিন্তু বাবা নিঃসঙ্গ হবেন কেন। ব্রজবাবু বলেছিলেন আর কাউকে না পেয়ে নিজের হাত-পা নিয়ে ঘরসংসার করেন। আর বাবা করেন নিজের মত, নিজের রুচি, নিজের দম্ভ অহংকারকে নিয়ে। আর কারো অস্তিত্ব বাবা সহ্য করতে পারেন না, দেখতে পান না, দেখতে চান না, হয়তো সেইজন্যেই এই নিঃসঙ্গতা। নির্জীব বস্তু তো আর মানুষকে সঙ্গ দেয় না, মানুষই মানুষকে সঙ্গ দেয়।

একটু এগিয়েই মাধুরী দেখতে পেল মানসী বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে। চাঁপা রঙের সেই শাড়িখানা পরেছে মানসী। গায়ে সবুজ রঙের ব্লাউস। কপালে ছোট একটি কুমকুমের টিপ। সব মিলিয়ে বেশ লাগছে দেখতে। দৃঢ় তীক্ষ্ণ বপু। অথচ একটু স্নিগ্ধতাও আছে। রজনীগন্ধার ডাঁটার মত। অন্য কোনদিন তো এত সাজে না। সাজলেও এত সুন্দর দেখায় না। মানসী যে কেন আজ এমন বেশবাসের দিকে মন দিয়েছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। মাধুরী মনে মনে হাসল। মাধুরী বলল, 'কিরে তোর এরই মধ্যে সময় হয়ে গেল। আজ যে এত তাড়াতাড়ি।'

মানসী বলল, 'তাড়াতাড়ি কই দিদি। আমি তো এই সময়েই বেরোই। মিনিট দশ-পনের আগে যাচ্ছি। বাসে যা ভিড়।'

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বলল, 'হ্যাঁ একটু আগে বেরোনই ভালো।'

তারপর বোনের আরো কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আজ কিন্তু তোকে বেশ লাগছে দেখতে।'

মানসী বলল, 'অন্য দিন বুঝি লাগে না।'

মাধুরী বলল, 'লাগে। আজ আরো ভালো লাগছে। তাছাড়া আজ আমি আরো এক-জনের চোখে দেখতে চেষ্টা করছি কিনা। একসঙ্গে দুজনের দেখা দেখছি।'

মানসী আজ যেন কোন ঠাট্টা-তামাশা বুঝবে না বলে পণ করে বসেছে। নইলে যে কথায় ওর হাসবার কথা তাতে ওর মুখ ভার হবে কেন।

পরক্ষণেই মানসী অবশ্য হাসল। হেসে খোঁচা দিয়ে বলল, 'দিদি তোর তো এসব বিদ্যে ছিল না। কারো চোখে তো ভালো চশমা জোড়াও তুই ছুঁইয়ে দেখিসনে। আজ একেবারে আর একজনের চোখ নিয়ে টানাটানি।'

মাধুরী বলল, 'ভয় নেই, চোখ নিলেও সে অন্ধ হবে না। অন্ধ যদি হয়ে থাকে আগেই হয়েছে।'

মানসী একথার কোন জবাব না দিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেল। চমৎকার করে বড় একটি বিড়ে খোঁপা বেঁধেছে। ওর চুলের

গেছে মাধুরীর চেয়ে বড়। কোন মাসিক কাগজে যেন একটি কবিতা পড়েছিল—কবি তাঁর প্রিয়ার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চান। অসীমদাও ওর চুল নিয়ে কম কবিত্ব করেননি। মাধুরী হাসল। গোড়ার দিকের দু একখানা চিঠি চুরি করে পড়েছিল। এখন আর পড়ে না। হয়তো মাধুরী নিজেই লজ্জা পাবে। প্রেমিকরা কি কবি হয়! মূক বাচাল হয়ে ওঠে?

এবার মাধুরীকেও নাইতে যেতে হয়। বেলা হয়ে গেছে। কাল ওঁদের চক্রান্তে পড়ে স্কুল কামাই করতে হল। আজ একটু তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো।

'মা আমি নাইতে চললাম।'

মাধুরী রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট ঘরটুকুর মধ্যে সুহাসিনী রেঁধে চলেছেন। গরমে আর আগুনের তাপে শীর্ণ শরীরকে আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে।

সুহাসিনী বললেন, 'যাও। আমার বেশির ভাগ রান্নাই হয়ে গেছে। এই তো মনুও খেয়ে গেল।'

কেমন যেন লজ্জা করে মাধুরীর। এই বয়সে মা রোজ তাদের অফিসের রান্না

রাঁধবেন ভাবতে বড় বিশ্রী লাগে। যদিও ছেলের মতই মাধুরীরা আজকাল চাকরি করে, বলতে গেলে তাদের টাকাতেই সংসার চলে, তবু রান্নাবাড়ার কাজে মার বাস্ততা দেখে, তাঁর পরিশ্রম দেখে কেমন যেন এক এক দিন সংকোচ হয়। সত্যি কত বয়স হয়ে গেছে মার। অনেক ছেলেমেয়ে হওয়ায় স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। তবু রোজ দুবেলা রেঁধে যাচ্ছেন তো রেঁধেই যাচ্ছেন। শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই, আলস্য-অসুখ রোদবৃষ্টি নেই।

বউদির সঙ্গে এই রান্না নিয়েই তো লাগতো। বউদি বড়লোকের মেয়ে। দু-একটা শৌখীন রান্না ছাড়া রান্নাবান্না তেমন জানে না। এসব কাজে তার কৌতূহলও নেই উৎসাহও নেই। সে চা করতে, গল্প করতে, খবরের কাগজ সামনে নিয়ে যত রাজ্যের তর্ক করতে ভালোবাসে। রান্নার কাছে কিছুতেই আসতে চায় না। এই নিয়ে মা খোঁটা দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাদার মুখভার। দাদারও ইচ্ছে নয় তার বউ ওসব দিকে বেশি যায়। তার সুন্দরী বউয়ের গায়ে আগুনের আঁচ লাগে, কালি-ঝুলি লেগে সোনার অঙ্গ মলিন হয়। খোঁটা খেয়ে খেয়ে যদি বা বউদি দু একদিন যেত তার রান্না কিছুতেই মার পছন্দ হত না। তার হাতের ভাত হয় বেশি ফুটে যেত, না হয় শক্ত থাকত, তার হাতের কোন তরকারিতে কোন স্বাদ আসত না। তবে খোঁটা চলত। বউদির হয়ে দাদা লড়ত, 'এ তো মজা মন্দ নয়, রাঁধতে গেলেও দোষ, না গেলেও দোষ। আসলে কোনো কোন ছলে দোষ দেওয়াটাই উদ্দেশ্য। আর সব উপলক্ষ।'

কখনো বলত, 'দরকার কি অত সবের পদ রান্না করে। শুধু দুটো পদ হলেই যথেষ্ট।'

মা বলতেন, 'কেন, তোর বউ রাঁধতে জানে না বলে আমাদের ভাতে ভাত খেতে হবে নাকি। আমার দুটো হাত নেই? গায়ে শক্তি নেই?'

দাদা বলত, 'তোমার গলার শক্তিও কম নয়।'

মাধুরী লক্ষ্য করেছে আজকে মা রান্নাঘরের সাম্রাজ্য কাউকে ছেড়ে দিতে রাজী নন। তবে কেউ যদি এসে জোগান দেয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকে খুব খুশী। কিন্তু আজকালকার লেখাপড়া জানা বউ রান্নাঘরকে গোটা পৃথিবী কেন করবে। সে চাকরি করুক আর নাই করুক কেন রান্নাঘরে বেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টার বেশি থাকতে চাইবে। তাদের মনে ঘর-সংসারের প্যাটার্ন যে আলাদা হয়ে গেছে তা মা বুঝতে পারেন না। তিনি বউয়ের কাছ থেকে সেকেলে আদর্শে যে আনুগত্য, যে বশ্যতা চান তা পাবেন কি

করে। দুজনের রুচি বুদ্ধি শখ সুখ যে আলাদা আলাদা। মা চাইলেন ছেলের বউ অবিকল তাঁর মত হবে। সে হবে তাঁরই প্রতিমূর্তি। কিন্তু বউ তা চাইল না, ছেলে তা চাইল না। মার শুধু ঘরখানাই ঘর-সংসার। কিন্তু দাদা বউদির সংসার ঘরে-বাইরে ছড়ানো। তাদের থিয়েটার-সিনেমা, পার্টি, পিকনিক, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ সব চাই। মা যা চান আর ওরা যা চায় এই দুপক্ষের চাওয়ায় কেবলই ঠোকাঠুকি লাগতে লাগল। অনেক ছেলে আপোস করে। ভাবে বাবা মা কদিনই বা আছেন। তাঁদের জন্যে কিছু না হয় ছেড়ে দিলাম, সহ্য করলাম। কিন্তু দাদা সে পথে গেল না। অনেক বাপ মা আপোস করেন, ভাবেন হাজার হোক নিজেরই তো ছেলে বলতে গেলে নিজেরই প্রত্যঙ্গ। স্নেহে কৌতুকে তার অবাধ্যতা, বিরোধিতা, স্বার্থপরতা সব উড়িয়ে দেন। কিন্তু বাবা মা সে পথে গেলেন না। ছেলে যেন প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী। ছেলে বড় হলে তাকে যদি সমকক্ষ বলেই ভাব, তাকে ভাই বলে মনে কর, বন্ধু বলে মনে কর। না হলে সে পরের চেয়েও পর। মানসী শুধু দাদা বউদির কাছে [illegible] মাধুরী তা পারে না। কিছুকাল আগেও দাদার সেই ভালোবাসার, বন্ধুত্বের কথা মাধুরীর মনে পড়ে যায়। এই সেদিন পর্যন্ত [illegible] [illegible] না [illegible] করেছে। [illegible] এখন [illegible] ভাবছে মাধুরী [illegible] হয় না।

[illegible] মা [illegible] এতগুলো পদ কেন রাঁধতে শুরু করেছো।'

মার কাছে আরো এগিয়ে এসে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল।

[illegible] কথার মানে হয়, সেই কথাই বলো এবার।'

সুহাসিনী একটু হেসে বললেন, 'ওমা, অসীম যে আজও খাবে এখানে।'

মার মুখে কথাটা বড় মিষ্টি শোনাল। অসীম।

মাঝে মাঝে এক একজনের মুখে এক একটা কথা যেন নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন মাধুর্য পায়।

মাধুরী হেসে বলল, 'তা খেলেই বা। তোমার অসীম যে কত খেতে পারে তা তো দেখছি। সবই তো পাতে পড়ে থাকে। তোমার কেবল কষ্টই সার।'

সুহাসিনী বললেন, 'থাক। আমার কষ্টের কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না বাপু। নাইতে যাবে তো যাও। শেষে যে নাকে-মুখে গুঁজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একেবারে রুদ্ধশ্বাসে—।'

মাধুরী হেসে বলল, 'রুদ্ধশ্বাস নয় মা, ওটা ঊর্ধ্বশ্বাস।'

শাড়ি সায়া তোয়ালে নিয়ে মাধুরী হাসিমুখে এবার বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। দেয়াল আলনায় সেগুলি ঝুলিয়ে রেখে মাধুরী চৌবাচ্চার কাছে এসে জলের দিকে তাকাল। মানসী জল বেশি খরচ করে যায়নি। এখনো প্রায় পুরো চৌবাচ্চাই ভরা। দেখে মাধুরীর মন প্রসন্ন হল। অবশ্য সব জলই তার নয়। বাড়ির প্রায় সবাই এখন বাকি। হিসেব করে, বিবেচনা করে তাকে এ-জল খরচ করতে হবে। তবু দেখতে ভালো লাগে। ভরা চৌবাচ্চা দেখতে ভালো লাগে। 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান।' কিন্তু আহ্বানই সার। কোথায় সেই অতল সমুদ্র। এই চৌবাচ্চার মধ্যেই তাকে কল্পনা করে নিতে হয়। কিংবা কল্পনার দরকার হয় না। চৌবাচ্চাটাই আপনা-আপনি সিন্ধু হয়ে ওঠে। আর মন রঙীন একটি মাছ হয়ে তার মধ্যে ভেসে ভেসে সাঁতার কাটে। অন্তর, বাঁচার বৈচিত্র্যের মধ্যে রঙীন মাছের খেলা, মাছের সেই রঙের খেলা মাধুরী দেখেছে। মুহূর্তের জন্য সেই মৎস্য-জন্ম [illegible] মাধুরীর। একটি রঙীন মুহূর্ত, একটি রঙীন মুহূর্তময় জীবন।

[illegible] আদর করে। মুখে গলায় বুকে সর্বাঙ্গে। আগে আগে ছেলেবেলায় বাসায় মানসী আর মাধুরী একসঙ্গে নাইতে আসত। মনে পড়ে বাথরুমটা তাদের হুটোপুটি দাপাদাপিতে সত্যিই উত্তাল সমুদ্র হত। সেই সমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠত। জলতরঙ্গ, হাসিতরঙ্গ, স্বরতরঙ্গ সুর-তরঙ্গ; মাধুরী বোনের পিঠে সাবান ঘষে দিত মানসীও দিত দিদিকে। তারপর অনেকদিন—অনেকদিন হল তারা একসঙ্গে নাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন লজ্জা করে। আর একজনের সামনে এমন করে নাইতে লজ্জা করে। যদিও সবই জানা, সবই পরিচিত, তবু এক অজানা রহস্য যেন প্রতিটি অঙ্গে, প্রতিটি প্রত্যঙ্গে এসে বাসা বেঁধেছে। সে-বাসাকে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হয়। পাতার আড়ালে বাসা। বাসার আড়ালে বাসনা। শুধু সাবানের ফেনায় মাখা জলের ধারায় ঢাকা এই দেহের দিকে মাধুরী নিজেও তাকায় না। তাকাবার দরকারই-বা কি। না তাকিয়েও নিজের প্রতিটি অঙ্গকে সে অনুভব করতে পারে। প্রত্যেকের যেন আলাদা সত্তা আছে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, বিমুখতা-উন্মুখতা। এমন অনেক-দিন যায়, অনেক রাত্রি কাটে নিজের দেহের অস্তিত্ব যখন আলাদা করে টের পাওয়া যায় না। দেহ তখন সাধারণ একটা যন্ত্র। যন্ত্র কি নিজের সত্তাকে টের পায়? নিজের যন্ত্রণাকে আনন্দকে? দেহ তখন প্রাণহীন, বাসনাহীন এক বাহন মাত্র। ব্যস্ততার সময় যখন ট্রামে কি বাসে মাধুরী যায়, তখন যে কিসে চড়ে গেল, কোন্ পথে গেল মনেই থাকে না, তখন গমনটাই সব। এও যেন তেমনি। কিন্তু অসুখের সময় দেহটাই সব। হাতে পায়ে চোখে কানে কোথাও কিছু ঘটুক, তখন সেই প্রত্যঙ্গই সর্বাঙ্গ হয়ে ওঠে। সেই অঙ্গের দুঃখই পৃথিবীর সব দুঃখের বড়। সুখের সময়েও কি তাই। এই দেহের আধারে তখন লক্ষ শিখা জ্বলে ওঠে, প্রতিটি প্রত্যঙ্গ সাড়া দেয়, কথা বলে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মন তখন দেহে মানে তন্ময়। কিন্তু এত সুখ কিসের মাধুরীর। এমন

মেখে নাও। ও মায়া, আর একটু ঝোল এনে দে তো তোর অসীমদাকে। কুটুম্বিতার বেলায় ও কথা চলতে পারে অসীম। সেখানে পোশাকী সম্পর্ক। তারাও তত্ত্ব পাঠাল আমরাও তত্ত্ব পাঠালাম, তারাও নিমন্ত্রণ করল আমরাও নিমন্ত্রণ করলাম—।'

মঞ্জু বলল, 'বউদির বাপের বাড়ি থেকে কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণ করেনি মা। তার এক খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে হল—।'

সুহাসিনী ধমক দিয়ে বললেন, 'থাম তো। তোর সব কথার মধ্যে আসতে হবে না। কুটুম্বিতার বেলায় ওসব মানায়। মনের মধ্যে যাই থাকুক তারাও হেসে কথা বলল, আমরাও মিষ্টি করে হেসে কথা বললাম, ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। তাও নতুন কুটুম্বিতার বেলায়। চেনাজানা হয়ে যাওয়ার পর কুটুম্বিতা ওভাবে রাখা যায় না। কিন্তু আপনজনের বেলায় মানুষ কি অমন হিসেব করে চলতে পারে? মেপে মেপে কথা বলতে পারে? ভেবে দেখ অসীম আমার এতগুলি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের সঙ্গে যদি অমন করে সম্পর্ক বজায় রাখতে হত আমি কি আর সংসারের কোন কাজ করতে পারতাম?'

খেতে খেতে মাধুরী অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকাল। দরকার হলে মাও যে বেশ গুছিয়ে মনের কথা বলতে পারেন তা যেন সে লক্ষ্য করেনি। মাধুরী মানসী লাইব্রেরী থেকে যত বাংলা বই আনে, কি দুচারখানা করে যা কেনে মা সব পড়ে শেষ করে ফেলেন। সেই বইপড়া বিদ্যা নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে মা কথা বলেন। তাই আর ভালো লাগে। এবার কথা পুঁথি-পত্রের কোটেশন আর তার ব্যাখ্যায় ভরা, মার কথায় রান্নাবান্না ঘর-সংসারের গন্ধ। সে গন্ধ তাঁর গায়ে কাপড়ে, যে রঙ তাঁর হাতের হলুদে। তাঁদের নামও মাতৃভাষা। মুখে অন্ন দেওয়ার মত, প্রথম কথাও মা-ই গুঁজে দিয়েছেন। দুটিই অমৃত। শুধু যে মহাভারতের কথাই অমৃতসমান তাই নয়, মানুষের অন্তরের কথা মাত্রেই অমৃত। ফের রমা বউদির কথা মনে পড়ল মাধুরীর। কী যে সব বিশ্রী বিশ্রী কথাই বলে রমা বউদি। তার মুখের কোন আগল নেই। অমৃত নাকি শুধু কথার মধ্যেই নেই যে নির্বাক দুটি ঠোঁট কথা বলে না, কথা বলবার ফুরসত পায় না তাও নাকি মধুতে মাখামাখি। অমৃত নাকি শুধু মায়ের বুকেই নেই, অমৃতের কাঙাল নাকি শুধু শিশুরাই নয়—।

'মাধুরী তোকে আর দুটি ভাত দিই?'

'না না মা, দিও না, দিও না।'

অসীমদা সমানে উপদেশ দিয়ে চলেছে, 'ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন ভালোবাসেন, তাদের উৎপাত উপদ্রব সহ্য করেন, বড়দের বেলায়ও যদি তাই করতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় অনেক সমস্যা মেটে। একথা যদি মনে রাখেন আপনার ছেলে যত বড়ই হোক সে আপনার চেয়ে কিছুতেই বড় নয়। না বয়সে, না অভিজ্ঞতায়, না ঔদার্যে, না ভালোবাসায়। সেই দৃষ্টিতে যদি দেখতে পারেন তাহলে তার চরম নিষ্ঠুরতায়ও আপনি বেশি দুঃখ পাবেন না। তার হাতের মর্মান্তিক আঘাতকেও আপনি শিশুর হাতের মার বলে ভাবতে পারবেন।'

সুহাসিনী বললেন, 'তাই কি আর হয় অসীম? ওসব তোমাদের কল্পনাতেই সাজে। ছেলে যতদিন পেটে থাকে ততদিন তার কাছে কোন প্রত্যাশাই থাকে না। তার-পর সে কোলে আসে, কোল থেকে মাটিতে নামে, আস্তে আস্তে বড় হয়, তার ওপর আশা ভরসাও বাড়তে থাকে। সেই আশা যদি না মেটে, আকাঙ্ক্ষা যদি পূরণ না হয় সে যে কি দুঃখ, তুমি তা বুঝবে না বাবা।'

অসীম বলল, 'বোঝা কঠিন নয় মাসীমা —কিন্তু।'

সুহাসিনী বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা অসীম, তার ওপরই আমার যত কর্তব্য আছে, আমার ওপর তার কোন কর্তব্য নেই? তুমি সম্পর্ক রাখা না রাখার কথা বলছিলে অসীম, সম্পর্ক রাখব বললেই রাখা যায় না। মানুষ যদি যে যার কর্তব্য করে তাহলে সম্পর্ক আপনিই থেকে যায়। মানুষ যদি ভালোমানুষ হয় তাহলে চার দিকের মানুষ তার সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকে। সে আঠা কিছুতেই ধুয়ে মুছে যায় না।'

অসীমের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠতে উঠতে বলল, 'আজকাল ভালোমানুষ হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার মাসীমা। আগে ভালো কথাটার মানে ছিল সহজ, সরল, বোকা বোকা। এখন সেই ভালোত্ব আমাদের শ্রদ্ধাও পায় না প্রীতিও পায় না। এখন ভালোমানুষ মানে একই সঙ্গে সোজা মানুষ আর শক্ত মানুষ। একই সঙ্গে বুদ্ধিমান, সামর্থ্যবান আর হৃদয়বান মানুষ। সে মানুষ আপনি ঘরে ঘরে পাবেন না, জনে জনেও নয়। কারো কারো মধ্যে কোন কোন ক্ষণে পেতে পারেন। কেউ আজকাল আর নিখাদ ভালো নেই। রাশ রাশ ছাইয়ের মধ্যে আগুনের ফুলকির মত তার ভালোত্ব শুধু কোন কোন নিমেষে জ্বলে ওঠার জন্যে।'

মাধুরীরও অনেকক্ষণ খাওয়া হয়ে গিয়ে-ছিল। কিন্তু লেট হবার ভয় থাকা সত্ত্বেও উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিল না। খালি থালার ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। সে রেখা কখনো সরল, কখনো কুটিল। মানুষের দুর্বোধ্য কর-কোষ্ঠীর মত। মাধুরী বিস্মিত হয়ে ভাব-ছিল অসীমদা এসব কথা কি শুধু মাকে শোনাচ্ছে না আর কাউকেই? না শুধু তাকেই? এই বাগবিভূতি বাগবৈভব দিয়ে অসীমদা কাকে কাকে আবৃত করতে চাইছে? আর কাকে? ওর গলার স্বর তেমন সুরেলা নয়, উত্থানপতনের বৈচিত্র্য কম, উচ্চারণ নিখুঁত নয়। কিন্তু কথা যখন বলে ওসব দোষের কথা মনে থাকে না। ওর সব কথাই যেন উপলব্ধি আর অনুভূতির রসে জড়ানো। তাই ওর কথার বিশেষ একটা রূপ আছে। বাক্যের রূপ। মানুষ যখন কায়মনোবাক্যে এক তখন তিনে মিলে এক রকমের রূপ। আবার শুধু বাক্যেরও যেন আলাদা চেহারা আছে। তা কি শুধু ধ্বনি না কি আরো কিছুর প্রতিধ্বনি?

দশটা বেজে দশ। মাধুরী তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে একটু পাউডারের পাফ বুলিয়ে কুমকুমের ফোঁটা দিয়ে আটপৌরে শাড়িটা পালটে পরতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নিল না।

মঞ্জু বলল, 'মেজদি, তোমাদের স্কুলে কি আজ আবার থিয়েটার টিয়েটার আছে?'

মাধুরী বলল, 'যা ফাজিল কোথাকার। স্কুলে আবার থিয়েটার হয় নাকি?'

'আহা সেবার তো হয়েছিল। তুমি পার্ট করেছিলে। চমৎকার করেছিলে কিন্তু।'

'যা, তোর আর পাকামো করতে হবে না।'

সুহাসিনী এলেন পিছনে পিছনে, 'মাধুরী শোন।'

'কি বলছ মা।'

মাও যেন মঞ্জুর মত হয়েছে।

'তোমাকে কিন্তু মানিয়েছে কিন্তু। এই কলাপাতা রঙের শাড়িখানা সেই পরা আজ তো পরলি মাধু। কাল যদি পরতিস—'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে বলল, 'মা, তুমিই একেবারে। কী যে তুমি বল মা।'

সুহাসিনী আরো কাছে এগিয়ে এসে চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'যাবি নাকি ওদের ওখানে?'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তাদের কথা তো শুনেছ?'

'তার কথা তো আগেকারই শুনে এলাম। যদি যাস, দুইবেলা গিয়ে দেখে আসিস। শ্যামবাজার থেকে ভালো একটা খেলনা-টেলনা কি রঙীন দেখে একটা জামা কিনে নিয়ে যাস যেন। টাকা আছে সঙ্গে? না দেব?'

মাধুরী বলল, 'আছে মা।'

দ্রুত পায়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেল মাধুরী। অসীম মিনিট কয়েক আগেই বেরিয়েছে। তার নাকি আজ বিষম তাড়া। মাধুরী নিজের মনেই একটু হাসল। তাড়া যে কিসের তা যেন তার কিছু বুঝতে বাকি আছে! কিন্তু এতক্ষণই যখন কাটল, দু মিনিট দেরি করলে কি ক্ষতি ছিল!

(ক্রমশ)

অনুতপ্ত গ্রামবাসীরা যারা তাঁকে একদিন বেধড়ক মেরেছিল, বিশেষ বিমান ভাড়া করে সেই মারামারির দুইজন প্রত্যক্ষ-দর্শীকে গোর্কীর শবাধারের সামনে অনুশোচনা প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই গোর্কী তাঁর সাহিত্যের জন্য অমর হয়ে গিয়েছিলেন।

কবি হুইটম্যান যখন ৭৪ বছর বয়সে মারা যান তখন শবব্যবচ্ছেদে দেখা যায় তার দেহ বিভিন্নরকম রোগের আধার ছিল, এর যে কোন একটি তার কবি-প্রতিভার উৎস হতে পারে।

কবি আরনেস্ট বোসন এবং শেলী উভয়েই টিউবারকুলোসিসে ভুগেছেন।

ইউজিন ও' নীল যখন নাবিক ছিলেন তখনই টি বি রোগ তাঁর ফুসফুসে এসে বাসা বাঁধে। ৬ মাসের জন্য তাঁকে স্যানাটোরিয়ামে যেতে হল এই রোগের মূলোচ্ছেদের জন্য। এই বাধ্যতামূলক বিশ্রাম তার কাছে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। এই সময় তিনি প্রচুর পড়াশুনোর সুযোগ পেলেন। ওনীল আজ পৃথিবীতে বিখ্যাত নাট্যকার ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে পরিচিত।

টিউবারকুলোসিস রোগ থেকে যাঁরা আরোগ্য লাভ করেছেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কেউ কেউ হয়ত জানেন কি করে বধির লোকদের কানে শব্দতরঙ্গ পৌঁছে দেওয়া যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়েই আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। মিসেস বেল একেবারেই বধির ছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর স্বামীর কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গিনী হতে তাঁর কোনরকম অসুবিধে হয়নি। গ্রাহাম বেল টি বি রোগ থেকে আরোগ্যের পরেও ৫০ বছর বেঁচে ছিলেন।

এডগার অ্যালেন পো যদি টি বি রোগে আক্রান্ত না হতেন তা হলে সম্ভবত তিনি তার অমর উপন্যাসগুলি লিখতে পারতেন না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নামগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে টি বি রোগ ও সাহিত্যের সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

মিলটন, পোপ, হুড, এলিজাবেথ ব্যারেট, ব্রাউনিং, ফ্রান্সিস, গোটে শীলার, মলিয়ের, চ্যানিংগস্, মীরমী, দেকার্তে, লক, কাণ্ট, স্যামুয়েল, জনসন স্টার্ন, ডি কোয়েন্সী, স্কট, জেন অস্টিন, ভলটেয়ার, রুশো, ওয়াশিংটন, হথর্ন, গিবসন, কিংসলে রাসকিন, এমার্সন, কার্ডিনাল ম্যানিং এবং আরও অনেকে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শনের ক্ষেত্রে এই সব মহান নামগুলি কি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, এদের দান যদি এই সব ক্ষেত্রে না থাকত তাহলে আজ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন এই সমৃদ্ধি পেত না।

কিন্তু এখন শেষ প্রশ্ন হচ্ছে এই, সত্যি কি টিউবারকুলোসিস এই সব সাফল্যের উৎস? বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর জবাব দিয়েছেন।

একটা মত হচ্ছে, প্রত্যেকটি শিল্পকর্মে অনুভূতি এবং আবেগ একটা বড় স্থান দখল করে আছে। টি বি রোগের কষ্ট এই অনুভূতিকে খুব তীব্র করে তোলে, আর আবেগও হয়ে ওঠে সজীব। টি বি রোগের যে জীবাণু মানুষের দেহে ও মনে অবর্ণনীয় দুঃখের ছাপ রেখে যায়, সেই জীবাণুই শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তার স্বাক্ষর রেখে যায়।

আর একটা মত হচ্ছে, টিউবারকুলোসিস ও প্রতিভার সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে এই মনে হয় যে টি বি রোগ একটা গভীর হীনমানস সৃষ্টির প্রয়াস পায়, যার ক্ষতিপূরণ একমাত্র প্রতিভার স্ফুরণেই সম্ভব হয়।

কিন্তু মোটামুটি কথা হচ্ছে এই যে, টিউবারকুলোসিস একটা সাধারণ ব্যাধি, কাজেই কোন প্রতিভাধরের এ রোগে আক্রান্ত হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজেই প্রতিভাধরের পক্ষে এই ব্যাধি এবং তার বাধা নিষেধ তার প্রতিভার স্ফুরণে সহায়তা করে। এই ব্যাধি প্রতিভার স্ফুরণেই সাহায্য করে মাত্র প্রতিভা সৃষ্টি করে না।

কাব্যসংগ্রহ

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। কলিকাতা—৬। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে 'অনামী'র আবির্ভাব পাঠকমহলে বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল; দিলীপকুমারকে কবির ভূমিকায় দেখতে পাওয়াই তার একমাত্র কারণ নয়, সেই সঙ্গে জোগান দিয়েছেন ভিন্ন ভাষার কবিতা থেকে অনুবাদ বা ভাবানুবাদ, দেশ-বিদেশের বহু মনীষী, বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী, কাব্য ও জীবন সম্পর্কে নানান আলোচনা। "অনামী" বিশুদ্ধ কাব্যসংগ্রহ ছিল না, সেদিনও নয়, আজও নয়। "সাবিত্রী"র কিছু অংশের ও ইন্দিরা দেবীর ৯৭ গানের [illegible] রচনা সমগ্র উদ্ধার করতে পারলে বোধ হয় আরও উপভোগ্য হত। অন্যদিক এই নূতন সংস্করণের প্রধান আকর্ষণ।

[illegible] দিলীপকুমার প্রথম থেকেই একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। [illegible] এই [illegible] কৃষ্ণপ্রেমিক, [illegible] আছে যদি [illegible] কারণ এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি!

এখানে এ-বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করা সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে, নিজের নিজের রুচিমাফিক, "অনামী"তে বহুবের, নানা স্বাদের, আনন্দের খোরাক পাবেন; কয়েকটি কবিতার—যেমন 'বন্ধুগো' [illegible]—মাধুর্য ও নূতনত্ব সকলেই স্বীকার করবেন।

পরিশেষে কয়েকটি নিবেদন করি: প্রথম, সম্ভব হলে আরো কিছু বর্জন করা যেতো নাকি? দিলীপকুমার উদার প্রকৃতির লোক, কিন্তু কাব্যে ও কাব্যসংকলনে, austerity-তে ন দোষায়ঃ। "পরিমাণ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম", রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি! দ্বিতীয়ত, বিলকুল ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কিছু বাদ দিলে বোধ হয় ভাল হতো। বিখ্যাত ইংরাজ কবির ভাষায় বলি:

You, I am sure will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity....The thought of such discipline must fall like cold chains upon you, who perhaps never sat with your wings furled for six months."

তৃতীয়ত, "সাধারণ কাব্যরসিক" ও "দিব্যজীবনের সন্ধানীদের" মধ্যে পার্থক্য টানা কতদূর সমীচীন? তাহ'লে আমরাই বা দান্তে বা মিলটন পড়ি কেন, আর দিলীপকুমারই বা গ্যয়টে অনুবাদ করেন কেন? "সাধারণ কাব্যরসিক" ও "দিব্যজীবন সন্ধানী" না হন, উলটোটিও কি কম সত্যি?

২৬৪।৫৯

সাগর পানে ফিরি—সংকলক, অপূর্বকুমার সাহা। প্রকাশিকা ভারতী সাহা। 'জাগরী প্রকাশনী', ৯১এ হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। দাম ২·৫০ টাকা।

ভূমিকায় আছে: "রোমান্টিকতা নয়, মিস্টিকতা নয়, নয় জড়-বাস্তবতা, যুগোত্তরণের অমোঘ বিধানে পরম নির্দেশনার দিকে সম্পূর্ণভাবে ফেরার কথাই 'সাগর পানে ফিরি'।" এই সংকলনে নিশিকান্ত শ্রীদিলীপকুমার রায় সহ ষোল জন কবির প্রত্যেকের এক বা একাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীনকালের ও আধুনিক

যুগের বহু কবির মূল্যবান কাব্যোদ্ধৃতি আছে। একেক জন সংকলক একেক দৃষ্টিতে সংকলন করেন সুতরাং সেই ধরনের সংকলনের উপযোগী পাঠকও আছেন। গ্রন্থের নামকরণে এবং প্রচ্ছদপট অলংকরণে আরেকটু স্বকীয়তা থাকলে আনন্দিত হতাম।

২৩৫/৫৯

প্রণাম তোমায়—শান্তশীল দাস। অগ্রদূত পাবলিশার্স, ৩০।৫৩ আটাপাড়া লেন, কলিকাতা-২। আট আনা।

সীমান্তে—পরেশনাথ সান্যাল। সায়ন্তনী, শক্তিনগর, নদীয়া। দু' টাকা।

শ্রীশান্তশীল দাস 'প্রণাম তোমায়' সংকলনের এগারোটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কবিতা ক'টি সুখপাঠ্য, তবে কবি ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন বেশি।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করেই লিখিত। সাময়িক বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত হলেও রসোত্তীর্ণ হওয়া দরকার। কিন্তু তা হয়নি। কবি যথাযথ চিত্রাঙ্কণে অনেক স্থলে সার্থক হয়েছেন। তবু প্রায় সর্বত্রই হতাশা ও বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই ভালো।

৫১১/৫৭, ২৯১/৫৭

জীবন ও বাণী

বলরাম মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ—বলরাম মন্দির, বাগবাজার, কলিকাতা। ৭৫ নঃ পঃ।

কথিকা সহ সারদা-রামকৃষ্ণ লীলাগীতি—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন শিলং। দাম ১৷৹।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা (৫ম খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায়। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। দাম ১৷৷৹।

শিবলিঙ্গ রহস্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ। ৪৬।২, বারোয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা-১০। দাম—৷৷৹।

Acharya Sankar—Hemanta Kumar Sen. Yogoda Math, Dakshineswar, 24-Parganas.

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বলিত রচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বামী জীবানন্দ বিশেষত ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রথম গ্রন্থটি লিখেছেন। বলরাম মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশিষ্ট লীলাক্ষেত্র। তাছাড়া, এ গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে দুটি পালা সংকলিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবন অবলম্বনে কথিকা সহ লীলাগীতি রচিত। সংগীত এই গ্রন্থে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কমলাকান্তের কীর্তন এবং সঙ্গীতও আছে। স্বামী চণ্ডিকানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

শ্রীঅনিলবরণ রায় রচিত শ্রীমদ্ভাবদ্-গীতার ৫ম খণ্ডে, চতুর্থ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশসহ পঞ্চম অধ্যায়ের মূল শ্লোক, অন্বয়, অনুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা রয়েছে। লেখক কর্তৃক দুরূহ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল এবং প্রশংসনীয়।

চতুর্থ গ্রন্থে লেখক শিবলিঙ্গের প্রচলিত ব্যাখ্যাকে যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু আরও যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল।

আচার্য শঙ্করের এই ইংরেজী গ্রন্থে শঙ্করের জীবন ও দার্শনিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেরল প্রদেশে ৬০৮ বঙ্গাব্দে আচার্য শঙ্কর জন্মেছিলেন। এইসব বিবরণের সঙ্গে লেখক ষট্‌চক্র ও যোগবিদ্যা, প্রাণায়াম, তান্ত্রিকতা, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, অলৌকিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিদের আনন্দ দেবে।

৪৭৯।৫৮, ৬২৮।৫৮, ১৮১।৫৯, ২১৩।৫৮, ৪৪৩।৫৮

প্রবন্ধ সাহিত্য

বিশ্লেষণ—শ্রীহরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এস-সি। প্রকাশিকা—শ্রীমতী কমলা দেবী, হোল্ডিং নং ১৪০, খটির বাজার লেন, হুগলী। দামঃ দেড় টাকা।

বিভিন্ন সময়ে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। লেখকের মন অনুসন্ধানী। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি জগৎকে দেখেছেন এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব মতে প্রতিটি বস্তু বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। যেখানে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে সেখানেই তিনি যুক্তি সহযোগে বিচার করতে বসেছেন। ধর্ম, নীতি সাহিত্য—সর্বত্রই তাঁর বৈজ্ঞানিক-সুলভ অনুসন্ধিৎসা—গ্রন্থের বিষয়বস্তুই এর সাক্ষ্য দেবে। নারী ও পুরুষ, শান্তি ও প্রশান্তি, ধর্ম ও অধর্ম, আদি ও অন্ত, সদর্থ ও কদর্থ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যুক্তির সাহায্যে আলোচনা করেছেন। তবে ভাষায় প্রসাদগুণ নেই। লেখক ভাষা সম্পর্কে সচেতন হলে এমন জটিল বিষয় সাধারণের প্রশংসা অর্জন করতে পারতো।

১৩০।৫৯

সমাজ ও সাহিত্য—দিব্যেন্দুকুমার কর। প্রগতি সাহিত্য ভবন, শিলচর। মূল্য ৩৫ নঃ পঃ।

ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটিতে চারটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ আছে। আমার লেখা ও আমি, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, সাহিত্যে সাধনা, মানুষ ও প্রকৃতি—এই চারটির মধ্যে প্রথম রচনাটিতে লেখকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মান-অভিমানের কথা ব্যক্ত হয়েছে, এবং তা নিজের কাছেই কৈফিয়তস্বরূপ। অন্য তিনটি প্রবন্ধ আকারে সংক্ষিপ্ত এবং সেগুলি আরো আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবুও বাংলাদেশের বাইরে থেকেও বাংলা-ভাষার প্রতি লেখকের মমত্ববোধ এবং সাহিত্য-রচনার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

১৫৩।৫৯

শান্ত্যবিধি

উপনয়নের উপহার—প্রমথনাথ সান্যাল শাস্ত্রী। ৪৫, কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি অপূর্ব আঙ্গিকে প্রমথনাথ আমাদের কাছে পেশছে দিয়েছেন। কিশোর পাঠক এই বই পড়ে উপকৃত হবেন। দুরূহ বৈদিক মন্ত্রকে সরল ভাবানুবাদের সাহায্যে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও প্রসাদগুণ মিশে গেছে। এই বইয়ের ব্যাপক প্রচার আমাদের কাম্য। (৩২১।৫৮)

বিবিধ

দুই দেশ দুই মন—অমিত সান্যাল। গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা। তিন টাকা বারো আনা।

মঞ্চে মঞ্চে নেচে যারা আমাদের চিত্ত-বিনোদন করে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনধারার সাথে আমাদের কতটুকুই বা পরিচয়। তারাও যে ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে আর পাঁচজনের মতই সাধারণ মানুষ, তাদের চিন্তাধারা, রুচিবোধ, ব্যক্তিগত রেষারেষি, হিংসা, নীচতা, উদারতা, মহানুভবতা—তাদের আশা আশঙ্কা, প্রেম, দেহজ কামনা-বাসনা সবকিছুই যে স্বাভাবিক খাতেই বয়ে চলে সে ধারণাও হয়ত অনেকেরই অস্পষ্ট।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক নিজে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। তাই স্বাভাবিক দরদ দিয়েই য়ুরোপ ভ্রমণের পটভূমিকায় নৃত্যশিল্পী দলের ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশানিরাশা, ভালোমন্দ, প্রেমবিরহের এই অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেছেন। দর্শকের সাথে মঞ্চের নেপথ্যের এই পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। শুধু তাই নয়। নবীন হলেও তাঁর এই রচনা যে সার্থক শিল্পকর্মের রূপ পেয়েছে, সেকথাও অকুণ্ঠ চিত্তেই স্বীকার করতে হয়।

বইখানির রূপায়ণে শিল্পী কামরুল হাসান অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। ১০৬।৫৯

আমরা ফসল ফলাই—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুসাহিত্য সংসদ (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা—৯। দাম—১

য়ুনেস্কোর সহযোগিতায় প্রকাশিত এই গ্রন্থে লেখক কেন চাষ করব, উদ্ভিদের বিষয়ে মূলকথা কেন জানব, উপযুক্ত জমি কি, উদ্ভিদের উপযুক্ত খাদ্য কি, ফসলের শত্রু কারা প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, এবং ফসল ফলানো ব্রতের নিয়মগুলি আলোচনাসহ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল, জমি বাছাই, জমি বানানো, সারের ব্যবহার, ভাল বীজের ব্যবস্থা, সেচ ইত্যাদি। এছাড়া লেখক ভাল প্রথায় চাষ, জাপানী প্রথায় ধান চাষ, ঘরের জন্য সব্জি ও ফলের চাষ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকে পাঠে কৃষক-চাষীগণ প্রভৃত উপকৃত হবেন। ১৪৭।৫৯

একটি সুরের কান্না—ভারতপ্রেম্। সাহিত্য। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২·৫০ ন-প।

বাংলাদেশের অজস্র ঐতিহাসিক ঘটনা কল্পনার প্রলেপে কালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, এর প্রচুর নজির মেলে। তা ছাড়াও এমন অনেক লোকগাথা ও প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যা একাধিকবার শুনলেও পুরনো হয় না। ভারতপ্রেম্ ছদ্মনামের অন্তরালে থেকে কোনও লেখক এমনি কয়েকটি কাহিনীকে ছোট গল্পের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন একটি সুরের কান্নায়। লেখকের মন রোমান্টিক; অধিকাংশ কাহিনীও সেই রোমান্টিক মেজাজেই নির্বাচন করেছেন। কিন্তু ভাষার প্রতি লেখকের আরো যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। প্রায় কাহিনীতেই রচনার শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। ২৪২।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—দীনেশ ভট্টাচার্য।
এক মুঠো আকাশ—ধনঞ্জয় বৈরাগী।
মুক্তা—জন স্টাইনবেক অনুবাদক—সুনীলকুমার নাগ।
যুদ্ধ না শান্তি—জন ফস্টার ডালেস, অনুবাদক—দক্ষিণারঞ্জন বসু।
তরুণ তুর্কী—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস।
সাধক কমলাকান্ত—নবকুমার।
মৌসুমী সুর—বনমালী গোস্বামী।
তরঙ্গ রোধিবে কে—শ্রীদিলীপকুমার রায়।
ডাউন ট্রেন—সলিল সেন।
সন্ন্যাসী—সলিল সেন।
ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন—শ্রীপ্রভাত বসু ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।
জলের রূপকথা—ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ।
ধাতুর রূপকথা—শ্রীকানাইলাল রায়।
মহাকাশ জয়ের রূপকথা—শ্রীঅজিত বসু।
তিন শূন্য—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
পুষ্পধন্বা—ধ্রুবেন সেন।
তৃষ্ণা—শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।
অশেষ গল্প—হরপ্রসাদ মিত্র।
সরল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী।
Samsad Anglo-Bengali Dictionary—Sri Sailendra Biswas.
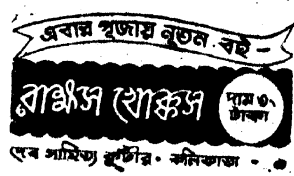
চন্দ্রশেখর

মুক্তির ডাক

ভগবান তথাগতের কৃপাধন্যা বৈশালীর নগর-নটী আম্রপালীর কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে বৌদ্ধসাহিত্যে ও সেকালের শিলা-লিপিতে। এই আশ্চর্য নারীকে নিয়ে বৌদ্ধ ইতিহাসের সুপণ্ডিতদের গবেষণার ভিত্তিতে রচিত নালন্দা ফিল্মস-এর 'আম্র-পালী'র কাহিনী।

এক অজানা জন্মরহস্য নিয়ে পৃথিবীর বুকে চোখ মেললো আম্রপালী। বৈশালীর এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক স্বীয় কন্যার পরিচয়ে তাকে লালন-পালন করে বিবাহযোগ্যা করে তুললেন। কিন্তু কল্যাণী কুলবধূ হওয়ার ভাগ্য নিয়ে আসেনি আম্রপালী। তার বিবাহকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অনেক রাজা, রাজকুমার ও শ্রেষ্ঠীর মধ্যে যখন দেখা দিল ঈর্ষা ও নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা, তখন তার ভাগ্যবিধানের ভার গিয়ে পড়ল লিচ্ছবির গণসভার ওপর। গণসভার বিধান অনু-যায়ী—যার পেছনে ছিল এক কুচক্রী ধন-পতির চক্রান্ত—আম্রপালীকে বরণ করে নিতে হল রাজ্যের 'স্ত্রীরত্নে'র জীবন। অর্থাৎ নগর-বধূ হয়ে নৃত্যের ছন্দে আর সুরের ঝঙ্কারে তাকে নিয়ত নিয়োজিত থাকতে হবে গণ-মনোরঞ্জনে। বিবাহের অধিকার থাকবে না এই কলালক্ষ্মী বহুবল্লভার।

কিন্তু জনতোষিণীর জীবনে একদিন এল একনিষ্ঠ প্রেমের উন্মুখতা। মগধ-রাজ বিম্বিসারের প্রেমালিঙ্গনে ধরা দিল বৈশালীর জনপদবধূ। বিম্বিসারের সন্তান এল আম্রপালীর গর্ভে। সন্তান বাল্যে পদার্পণ করল। নাগরীর জীবনে ঘটল আশ্চর্য রূপান্তর, তার মধ্যে জেগে উঠল জননী। আম্রপালীর এই রূপান্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এক স্বার্থান্ধ শ্রেষ্ঠী। আম্র-পালীর সন্তানকে হত্যা করার চেষ্টায় সে প্রবৃত্ত হল। আসন্ন বিপদের আশংকায় সন্তানবিচ্ছেদের বিরহ তুচ্ছ করে আম্রপালী তার পুত্রকে পাঠিয়ে দিল গোপনে মগধে, বিম্বিসারের কাছে।

আম্রপালীর জীবনের এই সন্ধিক্ষণে বৈশালীতে পদার্পণ করলেন করুণাবতার বুদ্ধ। আম্রপালীর গৃহে ক্ষণিকের আতিথ্য গ্রহণ করলেন দেবমানব। নির্বাণের মহা-মন্ত্র তিনি শোনালেন এই অবমানিতা মানবীকে। রূপবিলাসিনী অঙ্গে ধারণ করল ভিক্ষুণীর বেশ, ভগবান বুদ্ধের শরণ নিয়ে মর্তালোকের আনন্দের পসারিণী হয়ে উঠল অমর্ত্য জ্যোতির্লোকের অভিসারিকা।

আম্রপালীর উপাখ্যানের এই চিত্র-রূপায়ণটি পরিচালক-চিত্রনাট্যকার শ্রীতারা-শঙ্কর নৃত্য-গীতের সম্ভারে উপভোগ্য করে তুলেছেন নিঃসন্দেহে। বৌদ্ধ ভারতের নৃত্য-গীত পটিয়সী এই নগর-বধূর কাহিনীর বিন্যাসে তিনি যে সংযম ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। চিত্রনাট্যটিও সুগ্রথিত এবং পরিচ্ছন্ন। তবে পরিণয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিতা এই জন-তোষিণীর কাহিনীকে যে দুর্বার নাট্যরসে মণ্ডিত করে তোলা যেত, ছবিতে তার একান্ত অভাব। নৃপতি বিম্বিসারের সঙ্গে আম্রপালীর প্রণয়োপাখ্যানটিও ছবিতে কোন নাট্যসম্পদ হয়ে উঠতে পারেনি। ভগবান বুদ্ধের জীবনালোকেই বৈশালীর এই নগর-প্রেয়সীর পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায়। আম্রপালীর বুদ্ধ-শরণ ছবিতে তার জীবনের পরিণতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার জীবনের এই পরম সত্য-পরিচয়ের আভাস উপাখ্যানের বিন্যাসে গোড়া থেকে পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত অস্পষ্ট থাকায় ছবিটি বুদ্ধশিষ্যা দেবী আম্র-পালীর জীবনালেখ্যের আধ্যাত্মিক সৌরভ নিয়ে আসতে পারেনি, এক নগর-নটীর রসকাহিনীর স্বাদ নিয়ে এসেছে। এসেছে তার জীবনের নাটকীয় পরিণতি হয়ে, মহৎ উত্তরণ হিসাবে নয়।

ছবিতে ভগবান তথাগতের উপস্থিতি ও তাঁর পায়ে আম্রপালীর আত্মনিবেদন সুন্দর কল্পনার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। যদিও বৈশালী নগরের একমাত্র দৃশ্যের বার বার উপস্থাপন বিসদৃশ লাগে, তবুও ছবিতে

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের "নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে"-র ছোট্ট নায়িকা বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌরাণিক ভারতের ছাপটি খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না। ছবির সামগ্রিক অঙ্গসজ্জা খুবই প্রশংসনীয় এবং এর শিল্পসৌষ্ঠবের জন্য শিল্পনির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী ভূয়সী প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

নাম ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর প্রাণবন্ত অভিনয় ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। নৃত্যে তিনি যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন আজ আধুনিককালের বাংলা ছায়াছবিতে তা দুর্লভ। রূপসী অম্বপালীর পৌরাণিক রূপসজ্জায় তাঁকে সুন্দর মানিয়েছে। অম্বপালীর প্রণয়ীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী। কুচক্রী ও স্বার্থান্ধ শ্রেষ্ঠীর চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিম্বিসাররূপী অসিতবরণের অভিনয়ও চরিত্রানুগ। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, শোভা সেন, বনানী চৌধুরী, শিপ্রা সাহা, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও দেবাশীষ।

ছবির নৃত্যপরিচালনায় অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী মরুথাপ্পা পিল্লাই (মাদ্রাজ)। সঙ্গীত পরিচালনায় আবহসঙ্গীতে ও কয়েকটি সুখশ্রাব্য গানের মাধ্যমে অনিল বাগচী তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিদ্যাপতি ঘোষের আলোকচিত্রগ্রহণ ও সুশীল সরকারের শব্দগ্রহণ কৃতিত্বপূর্ণ। সুন্দর রূপসজ্জার জন্য শৈলেন গাঙ্গুলী ধন্যবাদার্হ।

শিল্পীর দ্বিজত্ব

ছবিতে শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে যে জহর রায় এতদিন দর্শকদের হাসির খোরাক জুগিয়েছেন, এম এম মুভীজের 'এ জহর সে জহর নয়'-এর নায়ক সে জহর রায় নন। এ-ছবিতে তিনি আনন্দ এবং সেই সঙ্গে বেদনারও নিয়ন্তা। জনপ্রিয় শিল্পীর এই দ্বিজত্বপ্রাপ্তি হয়তো দর্শকদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু এই সম্ভাবনা নিয়ে সার্থক পরীক্ষার জন্য যাঁরা ধন্যবাদার্হ তাঁরা হলেন ছবির প্রযোজক এইচ এস মেহ্‌তা ও পরিচালক-কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার কনক মুখোপাধ্যায়।

ছবির নায়ক জহর একই সঙ্গে বেদনা ও আনন্দের প্রতিমূর্তি। জীবনযুদ্ধে বিজয়ীর আসন সে পায়নি। কিন্তু আপনজনদের অন্তরে এই সদানন্দ যুবক আসন করে নিয়েছিল তার আপন-করা ব্যবহারের গুণে। কৌতুক পরিবেশনে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। মানুষকে সে হাসাত,—কৌতুকে, হাসিতে, গানে, নাচে সে দুঃখীর ঘরে বসিয়ে দিত আনন্দের হাট।

কিন্তু নিজের জীবনের হাটে দেনা-পাওনার হিসাবে সে পেল শুধু ব্যথা ও বঞ্চনা। ধনীকন্যা চকিতাকে সে ভালোবেসেছিল। চকিতা ছিল অন্যের বাগদত্তা। জহরকে সে দিয়ে গেল শুধু চকিত মিলনের ব্যথাভরা স্মৃতিটুকু। দরিদ্র নিঃস্ব প্রেমিকের ভালোবাসা চকিতার সাত মহলা বাড়ি ডিঙিয়ে তার অন্তরে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। চকিতাকে লাভ করবার সকল লৌকিক-অলৌকিক চেষ্টাই ব্যর্থ হল জহরের। সে তার ভালোবাসা বিলিয়ে দিল সমস্ত মানুষের মধ্যে এবং প্রেমের এই সার্বভৌম সার্থকতা নিয়ে সে দাঁড়াল বিড়ম্বিত জীবনের বার্ধক্যে। তার যৌবনের প্রাণচঞ্চল আর আনন্দমুখর দিনগুলির কথা ভেবে পরিচিতদের মতো সে নিজেও বলে, এ জহর সে জহর নয়।

দিলদরিয়া ও রসিকপ্রবর জহরের জীবন-মন্থনে উৎক্ষিপ্ত যে অমৃত ও গরল তা-

নিয়েই চিত্রনাট্যের বিস্তার। এই অমৃতের ভাগ দর্শকেরা পান অফুরন্তভাবে, হাস্য-রস ও কৌতুকের অজস্র সম্ভারে, গানে ও নাচে। আমোদের এই আয়োজন পরিপূর্ণ করে তুলেছেন ছবিতে জহর রায় নায়ক জহরের চরিত্রে। এ-বাদেও ছবিতে রয়েছে অনেক মজার চরিত্র, হাসির ঘটনা ও কৌতুকাবহ পরিস্থিতি। সব কিছু মিলিয়ে ছবিটি দর্শকের চিত্তবিনোদনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

নায়ক জহরের জীবনের যে গরল—অর্থাৎ তার প্রেম যেখানে বিড়ম্বিত—তার অংশ দর্শকেরা নেন স্নিগ্ধ বেদনারসের মধ্য দিয়ে। একটি মহৎপ্রাণের জীবনপথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে কাহিনীকার-পরিচালক কৌতুক বেদনা ও মানবরসের ভিন্নমুখী ধারাগুলি যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তার জন্যে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। নায়ক জহরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বিড়ম্বনা ও মানবিকতাই কাহিনীর মূল কথাবস্তু এবং এই মুখ্যচরিত্রকে তিনি প্রকৃষ্ট রসবোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে ছবির সামগ্রিক আবেদন অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। যদিও চিত্রনাট্যের শিথিলতা ও এর বিন্যাসের ত্রুটি—যার মধ্যে প্রধান হল একই দৃশ্যের বার বার উপস্থাপন—দর্শকের নজর এড়ায় না।

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের "রাতের অন্ধকারে" ছবিতে বোম্বাইয়ের হেলেন নৃত্যাংশে অবতরণ করেছেন

যে শিল্পীকে কেন্দ্র করে এই চিত্রপ্রয়াস, সেই জহর রায়ের অভিনয় এ-ছবির প্রধান সম্পদ। আলোচ্য ছবিতে এই প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা তাঁর শিল্পীজীবনের পরিধিকে বহুবিস্তৃত করে তুলেছেন। বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয়ে এবং অনুকূলে কাহিনীতে নায়ক-চরিত্রেও যে তিনি সমান পারদর্শী তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন এ ছবিতে। বৃদ্ধের রূপসজ্জায় জহর রায়ের অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তেমনিভাবেই অতুলনীয় তাঁর কৌতুকাভিনয়—বিশেষত 'ক্লাউনে'র অভিনয়। নায়িকা চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর চরিত্রে রবীন মজুমদারের অভিনয় প্রশংসনীয়। ছবিতে আর যাঁরা হাসির খোরাক জুগিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অমর ওঝা ও নীতীশ মুখোপাধ্যায়। ছোট একটি স্ত্রী-ভূমিকায় তপতী ঘোষের অভিনয় সুন্দর। অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা নজরে পড়েন, তাঁদের মধ্যে আছেন মণি শ্রীমানী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস ও হরিধন মুখোপাধ্যায়।

ভি বালসরা পরিচালিত ছবির সংগীতাংশ উপভোগ্য। তাঁর পারদর্শিতা বিশেষ করে পরিস্ফুট হয়েছে ছবিটির আবহসংগীতে।

আলোকচিত্রগ্রহণে দেওজীভাই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বহির্দৃশ্যাবলী সুগৃহীত। সম্পাদনায় সুবোধ রায় ও শিল্পনির্দেশে এস রামচন্দ্রের কাজ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য যান্ত্রিক কাজও বেশ পরিচ্ছন্ন।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহেও তিনখানি নতুন ছবির মুক্তি। বাংলায় 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে' এবং হিন্দীতে 'জংলা ডাকু' ও 'খুবসুরত ধোকা'।

এক কৌতুকশিল্পীর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে মেট্রোপলিটান পিকচার্সের 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে'। অবধূত রচিত এই গল্পটি ছবির পর্দায় রূপায়িত করেছেন পরিচালক নির্মল দে। মূল চরিত্রে কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের নতুন স্বাক্ষর রেখেছেন হাসির সঙ্গে অশ্রুর, আনন্দের সঙ্গে আবেগের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। তাঁর শিশুকন্যার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন তাঁরই নিজের মেয়ে বাসবী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, তপতী ঘোষ, কেতকী দত্ত, প্রেমাংশু বসু, অনিল মিত্র প্রভৃতি। নচিকেতা ঘোষ সুর যোজনায় বৈচিত্র্যসৃষ্টি করেছেন এ-ছবিতে।

চিত্রভারতীর 'জংগা ডাকু' এক অসমসাহসিক দস্যুর রোমাঞ্চকর কাহিনী। এর ভূমিকালিপিতে আছেন জয়রাজ, জবীন, মীনু মমতাজ, কৃষ্ণাকুমারী, তেওয়ারী, শীলা বাজ, চন্দ্রশেখর ও মারুতী। চন্দ্রকান্ত ও এস এন ত্রিপাঠী যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

ফিল্মিস্তানের 'খুবসুরত ধোকা'র শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন শশীকলা, রবীন্দ্র কাপুর ও জয়ন্ত। পরিচালনার কৃতিত্ব রাম প্রকাশের। সুরসৃষ্টি করেছেন এস মহীন্দর।

• • •

এন এস জি প্রোডাকসন্সের 'খেলাঘর' আগামী সপ্তাহের নতুন আকর্ষণ। সিনেমাতে প্রেমের গল্পেরই প্রাধান্য। এ-ছবিতে তার ব্যতিক্রম না ঘটলেও প্রণয়-কাহিনীর পরিবেশনে বৈচিত্র্যের দাবি করতে পারেন লেখক সলীল সেনগুপ্ত। উত্তমকুমার ও মালা সিংহ এ ছবির নায়ক-নায়িকা। পরিচালনা করেছেন অজয় কর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর ও গান ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

আরো যে-সব নতুন ছবি মুক্তির প্রতীক্ষা করছে তাদের মধ্যে রয়েছে অগ্রগামী পরিচালিত 'হেড মাস্টার', আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্সের 'অভিসম্পাত', অগ্রদূতের 'কুহক' ও শ্রীমতী পিকচার্সের 'ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত'। শেষোক্ত ছবিটি পুজার অব্যবহিত আগে মুক্তি পাবে।

'এতটুকু আশা' বাণী রায়ের লেখা একটি গল্পের নাম। তাকে ছবির পর্দায় রূপ দিতে ব্রতী হয়েছেন সারদাময়ী পিকচার্স। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এর কাজ এগিয়ে চলেছে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, আশীষকুমার, শুক্লা দাশ ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। অভিজিৎ এতে সুরযোজনা করছেন।

গৌতম পিকচার্সের 'সুরের পিয়াসী'-ও নির্মীয়মান ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখে। সুদর্শনা সুপ্রিয়া চৌধুরী এ-ছবির নায়িকা। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন প্রবীরকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। বিশু দাশগুপ্ত পরিচালনার ভার নিয়েছেন। ওস্তাদ আলি আকবর খানের সুরারোপে এ-ছবিতে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন হীরাবাই বরোদেকর, ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন, ওস্তাদ ইমরাৎ হোসেন, শান্তা প্রসাদ, নিখিল ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিচালক স্বয়ং।

* * *

পরলোকগত লেখক অভিনেতা। ধীরাজ ভট্টাচার্যের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'যখন পুলিশ ছিলাম'-এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন বিকাশ রায় যিনি একাধারে অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক। 'রাজা সাজা'র পর এইটিই হবে শ্রী রায়ের পরবর্তী চিত্রার্ঘ্য।

সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ' কিনেছেন নবগঠিত এ পি ফিল্মস। অজয় করের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হবে।

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোট গল্প 'স্বয়ম্বরা'-কে ছবির পর্দায় রূপান্তরিত করবেন এস বি ফিল্মস্।

রমাপদ চৌধুরীর 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ'-এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন বিভাস সোম—প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে যাঁর খ্যাতি। এম বি ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনালস-এর পতাকাতলে ছবিটি তোলা হবে।

মস্কো উৎসবের ফলাফল

গতবারেই জানানো হয়েছে যে, ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁর সুরসৃষ্টির জন্য 'জলসাঘর' ছবিটি মস্কোর প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একটি রৌপ্য পদক লাভ করেছে।

ঐ উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে সোভিয়েট ছবি 'দি ফেট অব এ ম্যান' গ্র্যাণ্ড প্রিক্স বা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। সার্গি বণ্ডারচুক এই ছবির পরিচালক।

পশ্চিম জার্মানীর ছবি 'উই মিরাকল্ চিলড্রেন' একটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। তার পরেই স্থান পেয়েছে পাকিস্তানের 'দি ডে উইল কাম' ও চেকোস্লোভাকিয়ার 'ফ্লাইট ফ্রম এ শ্যাডো' এই ছবি দুটি। উৎসবের দ্বিতীয় স্বর্ণপদক এদের ভাগ্যে জুটেছে।

আঙ্গিকের উচ্চমানের জন্যে 'দি নিউ স্টোরি অব অ্যান ওল্ড সোলজার' নামক চীনা ছবিটিকে একটি রূপোর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্যে ডিপ্লোমা পেয়েছেন জাপানের কোজি শিমা ও ফ্রান্সের

জাঁ ভানের যথাক্রমে 'দি আনফরগেটেবল্ পাথ' ও 'দি সেণ্টেন্স' ছবি দুটির জন্যে।

নাট্যাভিনয়

একাংক নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে নব নব চিন্তাধারার পরিচয় দিয়ে বঙ্গীয় নাট্য সংসদ ইতিমধ্যেই যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, গত ২২শে ও ২৩শে আগস্ট কাশিমবাজার ভবনে এঁদের চতুর্থ একাংক নাট্যোৎসবে পরিবেশিত রমেন লাহিড়ীর 'ধূসর দিগন্ত' ও সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'আশংসা' নাটক দুটির মধ্যেও সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথম নাটকটি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক ও আবেগপ্রধান। যেমন সুসংবদ্ধ এর ঘটনা ও চরিত্র তেমনি সুন্দর এর সংলাপ। দ্বিতীয় নাটকটিতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমস্যাকে নাট্যকার প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই দুটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অজিৎ কুণ্ডু, চিনু গোস্বামী, দিলীপ রুদ্র, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, উমা দাশগুপ্তা, আরতি গুপ্তা, পাঁচু মুখোপাধ্যায় ও রমেন লাহিড়ী উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

* * *

গত ১৬ই আগস্ট রূপদক্ষের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এর সভ্যেরা থিয়েটার সেণ্টার অডিটোরিয়ামে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উপসংহার' ও নীরেন ভঞ্জের 'সকলি গরল ভেল' নামক একাংক নাটক দুটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। শেষোক্ত নাটকে এক বিকৃতমস্তিষ্ক চিকিৎসকের ভূমিকায় লেখক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

• • •

আগামী ৩০শে আগস্ট ও ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে পিনাকী ডান্স একাডেমি কর্তৃক 'মেঘদূত' নৃত্যনাট্য অভিনীত হবে। নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন শ্রীপিনাকী। বিনয় চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ষড়ঙ্গের 'চণ্ডালিকা'

কলকাতার রসিকজনের কাছে একটি অভিনব আমোদ-আয়োজন সম্প্রতি নিবেদন করেছিলেন দক্ষিণ কলিকাতার ষড়কলা-প্রতিষ্ঠান 'ষড়ঙ্গ' তাঁদের 'চণ্ডালিকা' নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে। নৃত্যনাট্যটি তাঁরা পরিবেশন করেন গত রবিবার নিউ এম্পায়ারে।

রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য নৃত্যনাট্যটির অতুলনীয় ভাবসম্পদ ও রস যে-ভাবে 'ষড়ঙ্গের' শিল্পীদল নৃত্যাভিনয় ও সংগীতের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন তা দর্শকদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে।

এমকেজি প্রোডাকসন্সের আগামী চিত্র 'মায়ামৃগ'-এর তরুণ নায়ক বিশ্বজিৎ

এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য সর্বাগ্রেই প্রশংসা করতে হয় চণ্ডালিকা প্রকৃতি ও তার জননী মায়ার ভূমিকায় যথাক্রমে দীপ্তি পালচৌধুরী ও নীলা মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য নৃত্যাভিনয়। নেপথ্যে সুরারোপিত সংলাপ ও গানের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব নৃত্য-ভঙ্গিমায় ও মুখের অভিব্যক্তিতে তাঁরা চরিত্র দুটিকে মঞ্চের ওপর জীবন্ত করে তুলেছিলেন। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের বেশে পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল।

অনাদিপ্রসাদের নৃত্যপরিকল্পনা ও দেব-ব্রত বিশ্বাসের সুরসৃষ্টি এই নৃত্যনাট্যটির অন্যতম সম্পদ। নেপথ্য সঙ্গীতে দেবব্রত বিশ্বাস, পূরবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপর্ণা ঘোষের কণ্ঠদান এই মঞ্চানুষ্ঠানটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তার ওপর তাঁপস সেনের মায়াময় আলোকসম্পাত ও ক্ষণে ক্ষণে খোল, মৃদঙ্গ, করতাল, সেতার ও বাঁশীর সুরঝঙ্কার এমন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে কৃত্রিম মঞ্চ-সজ্জার কোন প্রয়োজন হয়নি নৃত্যনাট্যটির পরিবেশনে। পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জাও খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল।

বিবিধ সংবাদ

দক্ষিণ ভারত ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স-এর হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতের ২৭টি স্টুডিওতে বর্তমানে ২৩৫টি ছবি নির্মীয়-মান অবস্থায় রয়েছে। প্রায় দু'শো জন প্রযোজক এই ছবিগুলির নির্মাণকার্যে ব্রতী আছেন।

• • •

গত ১৯শে আগস্ট বিশ্বরূপায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রগতি চলচ্চিত্র নাট্যসঙ্ঘের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৫৮ সালের বেঙ্গল মোশন পিকচার্স আ্যাকাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি, শিল্পী, কলাকুশলী ও পরি-চালকদের নাম ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্তাজীবী সঙ্ঘের সভা-পতি অধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির ভাষণ দেন কলকাতার পৌরপ্রধান বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানশেষে 'ময়ূর মহল' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

• • •

ইয়র্কশায়ার ও ল্যাংকাশায়ারের ভারতীয় ও পাকিস্তানী অধিবাসীরা সম্প্রতি একটি যুগ্ম চিত্র-প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। ওদেশের দৈনিক জীবনের সঙ্গে তাঁরা কিভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন সেইটাই ছবির বিষয়বস্তু। শৌখিন শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ব্র্যাডফোর্ড নিবাসী একজন পাকিস্তানী এ-ছবির পরি-চালক। ছবিতে ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীত বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। স্থানীয় অধিবাসীরা চিত্রপ্রযোজনার কাজে সাহায্য করছেন।

• • •

বিখ্যাত ফরাসী চিত্রপ্রযোজক রাওল লেভী তাঁর ঐতিহাসিক ছবি 'মার্কো পোলো'-এর কিছু দৃশ্য গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভূপর্যটক মার্কো পোলো তাঁর ভূপর্যটনের প্রথম দিকে এই দেশে পদার্পণ করেছিলেন। রাওল লেভী 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড ওম্যান'এর প্রযোজক।

চিঠিপত্র

জেগে-ওঠা মানুষের নমুনা

মহাশয়, হিন্দী ছবি "ইনসান জাগ উঠা" দেখলাম। ছবিটি দেখবার আগে মনে হয়েছিল এটি নিশ্চয়ই আদর্শমূলক হবে। দেখে মনে হল এখানি একটি সরকারী প্রচারচিত্র যার মধ্যে আদর্শ জিনিসটা একদম গৌণ।

যেখানে বাঁধ তৈরির মত বিরাট একটি কর্মকাণ্ডের যোজনা সেখানে ছবিতে প্রদর্শিত বৃন্দাবনলীলা চলে কি? কর্মীরা প্রেমের অভিনয়ে এতবেশী ব্যস্ত যে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তারা কাজ করে কতটুকু সময়ে। অন্যান্য অপরাধমূলক ছবির মত এর মধ্যেও হোটেলের নাচ ও ভিলেনের সাথে মারপিটের ছড়াছড়ি।

বোম্বাইয়ের বাঙালী পরিচালকদের ওপর আমার যা-একটু আশা ছিল "ইনসান জাগ উঠা"র পরিচালক শক্তি সামন্ত মশায় তা ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। ইতি—

শঙ্কর ঘোষ,
কলিকাতা—৬

বাংলা ছবির সমাদর

মহাশয়, তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ছবি ও চটুল নৃত্যগীতবহুল হিন্দী ক্রাইম ড্রামার দাপটে চিত্রজগৎ যখন দিক্‌ভ্রান্ত সেই মুহূর্তে একটি শুভ লক্ষণ দেখলুম "অপুর সংসার" ছবিটি দেখতে গিয়ে।

আয়তনে 'ছোট্ট শহর এই কাটিহার। স্থানীয় একটি সিনেমা হলে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে "অপুর সংসার" দেখান হল। দর্শকের ভিড়ে সাতদিনই হলটি ভরাট হয়ে রইল। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম দর্শকদের প্রায় অর্ধেক অবাঙালী। তাঁদের কথাবার্তায় বোঝা গেল ছবিটি দেখবার জন্যে তাঁরা অতিমাত্রায় কৌতূহলী। অথচ অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত দর্শকমাত্র।

এই ঘটনা থেকে কি এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, নৃত্যগীতপূর্ণ যৌন আবেদন ভরা ছবি ছাড়াও স্বল্পশিক্ষিত দর্শককে তুষ্ট করা অসম্ভব নয়? বাংলা ছবির বাজার আজ যে শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ নেই—তারও প্রমাণ মেলে এ থেকে। আজ শুধু বাঙালীই বাংলা ছবির দর্শক নয় অনেক অবাঙালীও তার রসগ্রাহী। এটা কি শুভ লক্ষণ নয়? ইতি—

সলিলকুমার পাল,
কাটিহার, পূর্ণিয়া।

একলব্য

ভারতীয় ক্রিকেট টীমের ইংলণ্ড সফর প্রায় শেষ হয়ে এল। এবার ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের শোচনীয় ব্যর্থতা এবং টেস্ট খেলায় উপর্যুপরি পরাজয়ের ফলে ক্রিকেট-প্রিয় ইংলণ্ড-দর্শকদের কাছে ভারতের খেলা দেখার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তবু টেস্ট খেলার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। যত শক্তিহীন দলই হক, ইংলণ্ডের মাটিতে ইংলণ্ড টীমের সংগে তারা টেস্ট খেলছে—এর তাৎপর্য কম নয়। বিশেষ করে, ওভ্যাল মাঠে পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ড ভারতকে হারিয়ে পাঁচটি টেস্ট খেলায় জয়লাভের এক নতুন রেকর্ড করতে পারে কিনা তা দেখার একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। সে আকর্ষণও শেষ হয়ে গেছে। পাঁচটি টেস্টেই ভারত হার স্বীকার করেছে। সুতরাং ইংলণ্ডে ভারতের বাকী খেলাগুলির আর কোনই আকর্ষণ নেই। রুটিন মাফিক খেলার মত এ ছয়টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় দল স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে। সংগে নিয়ে আসবে ইংলণ্ড সফরের কলংক-মলিন স্মৃতি।

এদিকে অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফরের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। নভেম্বর মাসেই অস্ট্রেলিয়া দলের ভারতে পৌঁছুবার কথা। তারজন্য ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার অন্ত নেই। জানা গিয়েছে, ভারতে প্রতি টেস্ট খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড ৭৫ হাজার টাকা করে দাবী করেছে। তাছাড়া, এখানে তাদের থাকা খাওয়ার খরচ তো আছেই। এজন্য অবশ্য বিদেশী মুদ্রার অপব্যয় হবে না। কিন্তু পাঁচটি টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে যে ৪ লাখ টাকা দিতে হবে সেটা দিতে হবে বিদেশী মুদ্রায়।

বর্তমানে আমাদের ক্রিকেট খেলা যে পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং বিদেশী মুদ্রার অভাবে আমরা যে সংকটের মধ্যে পড়েছি তাতে ক্রিকেট খেলার জন্য এই বিপুল অর্থ খরচ করা যুক্তিযুক্ত কিনা কথাটা দেশের হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেরই ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কথা বলি না, কারণ তারা হয়তো কথাটা ভাববেন ক্রিকেটের পরিপ্রেক্ষিতে। বছর বছর প্রতি কেন্দ্রে একটা করে ক্রিকেট খেলা জাকিয়ে হর্সট্রেডিং করতেই তারা ব্যস্ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কথাটা ভেবে দেখা উচিত।

শুধু এই কথাই নয়। ক্রিকেটকে আমরা মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবো কিনা একথাটিও। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশ যে ক্রিকেট খেলে না। তাতে তাদের কি ক্ষতি হয়েছে? কথাটা হয়তো অনেকের কানেই রূঢ় শোনাবে। কারণ বহুদিন থেকে ক্রিকেটের সংগে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছি যে, ক্রিকেট ছাড়তে হবে কথাটা শুনলেই মন কেঁদে ওঠে। কিন্তু সত্যই এখন ভাববার সময় এসেছে ক্রিকেট খেলাকে আমাদের মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা উচিত কিনা। একথা বলছি বলে কেউ যেন ভেবে না বসেন আমি ক্রিকেটের বিরোধী। তবে যে কথাটা আজ অনেকের মনে এসেছে আমি তারই প্রতিধ্বনি করছি মাত্র। সেদিন এক সাংবাদিক বন্ধুর সংগে এই সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিল। তিনি তো ভারত থেকে ক্রিকেট উঠিয়ে দেবারই পক্ষপাতী। পরিষ্কার বললেন—"আরে মশাই, 'ফ্রাস্টেড ডেমোক্রাসির' মধ্যে ক্রিকেট চলে না। ক্রিকেট খেলার জন্য ধৈর্য ও স্থৈর্য চাই। চাই অপব্যয় করবার মত প্রচুর সুযোগ। আজ ভারতের যে অবস্থা তাতে লোকের মনে শান্তি কোথায়? খেলার জন্য বা খেলা দেখার জন্য পাঁচ ছ'দিন এক নাগাড়ে নষ্ট করবার মত সময়ই বা কোথায়? আগে ক্রিকেট খেলেছে কতিপয় দেশীয় নৃপতি এবং ধনীর দুলাল। তাদেরই আশ্রয়ে ক্রিকেট লালিত পালিত হয়েছে। আজ তাদের সেদিন নেই। ভারতবাসী মাত্রেরই

ঢাকুরিয়া লেকে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুলে আমেরিকার সুইমিং কোচ জন মিলার ছেলেমেয়েদের সাঁতারের কলা-কৌশল শেখাচ্ছেন

প্রায় মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। দেহ-মনের আনন্দ লাভ এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য খেলাধুলোর নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সামন্ত যুগের ক্রিকেই খেলার প্রয়োজন নেই। থাকলেও একদিন বা দু'দিনের জন্য। দীর্ঘস্থায়ী ক্রিকেট খেলা বর্তমান অবস্থায় ভারতে অচল।"

সাংবাদিক বন্ধুর কথার প্রতিবাদও করিনি, সমর্থনও জানাইনি। কিন্তু আজ ভাবছি, তাঁর যুক্তি কি ভ্রান্ত?

• • •

ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন সার্ভিসেসের আমন্ত্রণে আমেরিকার সুইমিং কোচ জন মিলার কলকাতায় এসেছেন। ঢাকুরিয়া লেকে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুলে ইনি বাঙলার তরুণ-তরুণীদের সাঁতারের কলাকৌশলও শিক্ষা দিচ্ছেন। তবে বেশীদিনের জন্য নয়। স্বল্পকালীন শিক্ষাকেন্দ্রে দক্ষ কোচ মিলারের কাছ থেকে বাঙলার ছেলেমেয়েরা যেটুকু শিক্ষা পায় সেটুকুই লাভ।

সেদিন ইউ এস আই এস-এর প্রশস্ত হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জন মিলার বলেছেন, এদেশের তরুণ-তরুণীদের সাঁতার ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রতিষ্ঠা অর্জনের যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। এদেশ সাঁতারের উন্নত কলা-কৌশল শেখার ক্ষেত্রে কি পন্থা গ্রহণ করবে জন মিলার সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেননি। আমেরিকায় কি পদ্ধতিতে সাঁতার শেখান হয় তার এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকায় ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের চারটি গ্রুপে ভাগ করে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১২, ১৪, ১৬ ও ১৮ বছরের চারটি গ্রুপ। সারা বছর ধরেই এরা সুইমিং পুলে এবং খোলা পুকুরে সাঁতার শেখে। ফ্রি স্টাইল ছাড়া ব্যাক স্ট্রোক, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই স্ট্রোক ও ক্রল—চারটি বিষয়েই প্রথমে সকলকে সাঁতার কাটতে হয়। তারপর যার যে বিষয়ে বেশী দক্ষতা প্রকাশ পায় তাকে সেই বিষয়ে উন্নত শিক্ষা দিয়ে নিপুণ করে তোলা হয়। এইভাবেই এক একজন সাঁতারু এক বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে।

আগামী অলিম্পিক সম্পর্কে জন মিলারের অভিমত হাঙ্গেরী বা অন্য কোন দেশের কোন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে সাঁতারের স্বর্ণপদক পেলেও প্রধানত সাঁতারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে। মেলবোর্ন অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়া অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল, কিন্তু মিলারের ধারণা, এবার জাপানের কাছে অস্ট্রেলিয়াকে সাঁতারে হার স্বীকার করতে হবে।

যাই হক, জন মিলার শিক্ষার উপর ভারতের সাঁতার পরিচালকদের বিশেষ জোর দিতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু জোরটা আসবে কোথা থেকে? ভারতের খেলাধুলোর যাঁরা বড় মুরুব্বী সাঁতারের প্রতি তাঁদের বিমাতৃসুলভ ব্যবহার। আজ পর্যন্ত সাঁতারের জন্য বিশেষ কিছুই চেষ্টা করা হয়নি। রোম অলিম্পিকেও কোন সাঁতারু পাঠান হবে না বলে ফতোয়া জারী করা হয়েছে। অথচ আমাদের সাঁতারের মান মোটেই অবনত নয়। বরং প্রতিটি বিষয়েই আমাদের সময় আগের চেয়ে অনেক ভাল। নানা বাধা বিপত্তি এবং অসুবিধার মধ্যেই আমাদের সাঁতারুরা এগিয়ে চলেছেন।

এই প্রসঙ্গে বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের এক প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বিখ্যাত সাঁতারু রাজারাম সাহুকে কোচ মনোনীত করে বিভিন্ন জেলায় জেলায় পাঠাবার এক পরিকল্পনা করেছেন। পরিকল্পনা মত কাজও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। রাজারাম সাহু ইতিমধ্যেই দুইটি জেলায় ঘুরে এসেছেন। খেলাধুলোর কর্মকেন্দ্র বলতে আমরা শুধু শহরকেই বুঝি। কিন্তু শহরের বাইরের প্রাণশক্তিকে আমরা কোন সময়েই কাজে লাগাবার চেষ্টা করি না। নদীমাতৃক এই বাংলা দেশের আনাচে কানাচে কত প্রতিভা যে লুকিয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এদের ধরে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার যে প্রচেষ্টা হয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয়। আশা করি, খেলাধুলোর অন্যান্য বিভাগেও এইরকমের প্রচেষ্টা হবে। গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করা হবে অঙ্কুরিত ক্রীড়া প্রতিভার।

লণ্ডনের চিঠি

বেরী সর্বাধিকারী

লণ্ডন, ২৪শে আগস্ট—সকলের ধারণামত ভারত পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করে ইংলণ্ড ও ভারতের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আমি আগের চিঠিতে লিখেছিলাম পঞ্চম টেস্টে ভারতের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এক বৃষ্টি দেবতা ভারতের পরিত্রাতা হতে পারেন। বৃষ্টিও হয়নি, ভারতও পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। পাঁচদিনব্যাপী খেলার উপর সওয়া তিনদিনে যবনিকা পড়েছে। ভারত হেরেছে এক ইনিংস ও ২৭ রানে। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফর ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলার এক কলঙ্কমলিন অধ্যায় হিসাবে অঙ্কিত হয়ে রইল। কারণ ইতিপূর্বে ১৯২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে এবং ১৯৩১-৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাঁচটি করে টেস্টে পরাজিত করলেও আজ পর্যন্ত অন্য কোন দেশ পাঁচটি টেস্টে জেতেওনি, হারেওনি। আর ইংলণ্ডের মাটিতে এ ঘটনা সম্পূর্ণ নতুন। যাই হক এ সফরে ভারতীয় দলের ব্যর্থতার কাহিনী অনেক লিখেছি। আপাতত আর লেখার বাসনা নেই। পরে অবশ্য অনেক কিছুই লিখতে হবে। তার মালমসলাও জোগাড় হয়ে আছে! আজ অন্যান্য প্রসঙ্গের কিছু কিছু আলোচনা করা যাক।

সবাই জানেন ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক ফুটবল অধিনায়ক মোহনবাগান ক্লাবের শৈলেন মান্না এখানে এসেছেন এফ এ অর্থাৎ ফুটবল এসোসিয়েশনের ট্রেনিং নিতে। তিনি কিন্তু খেলা শিখতে আসেননি, এসেছেন কোচিং শিখতে। অর্থাৎ খেলোয়াড়দের কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে তাই শিখতে। তার শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ডারহাম থেকে প্রাথমিক শিক্ষার সার্টিফিকেটও তিনি পেয়েছেন। এখন এফ এ-র মূল সার্টিফিকেট পেতে বাকী। এই মাসের শেষাশেষি মান্নার পরীক্ষার ফল জানা যাবে। সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখে 'টিলবারী' থেকে জাহাজযোগে তার স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবার কথা।

এফ এ-র কোচিং শিক্ষার ট্রেনিং খুবই শক্ত। পরীক্ষায় পাশ করা আরও শক্ত। দুই তিন রকমের পরীক্ষা। লিখেও পরীক্ষা দিতে হয়, আবার হাতে কলমে শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মকানুন দেখিয়ে দিতে হয়, মুখে মুখেও যে প্রশ্নের উত্তর না দিতে হয়, এমন নয়। এর মধ্যে খেলার কায়দাকানুন এবং ফুটবলের আইনকানুন সবই পরীক্ষার বিষয়।

অবশ্য যাদের অধীনে কোচিংয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় তারা সবাই 'কোচ' হিসাবে বিশ্বখ্যাত। ডর্ট ফিল্ড, রন গ্রীনউড, জর্জ আলিসন সবাই বিশ্বখ্যাত ম্যানেজার। স্মিথ ক্লিফোর্ড আর্সেনালের কোচ, গ্রীনউড আর্সেনালের। আর আর্সেনাল ভারতবাসীর কাছে অপরিচিত নয়। রাজকুমারী অমৃত-কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক বছর আগে এঁকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইংলণ্ডের ফুটবল খেলার আর অতীত গৌরব নেই কিন্তু ইংলণ্ডের ফুটবল কোচিং এখনো বিশ্বশ্রেষ্ঠ। যেজন্য হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ, ফুটবল খেলায় যাদের জুড়ি অল্প, সেইসব দেশ থেকেও 'কোচ' আসেন ইংলণ্ডে কোচিংয়ের উন্নত কলাকৌশল শেখবার জন্য।

রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশ থেকে আমাদের দেশে প্রায়ই 'কোচ' নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার বদলে আমাদের ছেলেদের যদি বিদেশে পাঠিয়ে দক্ষ কোচ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে ফল হয় অনেক বেশী।

ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদীরা এখন ক্রিকেট ও ফুটবলের সন্ধিক্ষণে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ক্রিকেট মরসুম শেষ হবার মুখে। ফুটবল মরশুম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এখানকার সমালোচনার ধারা বড় উগ্র। পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই। একটা উদাহরণ দিই।

বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় বিলি রাইট ফুটবল খেলা থেকে চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সারা ইংলণ্ডে বিলি রাইটের মত খেলোয়াড় বেশী নেই। জনপ্রিয়তায় স্ট্যানলী ম্যাথুজের পরই রাইটের স্থান। জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন বহুবার। আন্তর্জাতিক খেলায় ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেছেন একশবারেরও বেশী। ইংলণ্ডে এ সম্মানের অধিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

এ হেন বিলি রাইটকে এখনকার সমালোচকদের কাছে [illegible] আগে কি [illegible]ই না [illegible] হয়েছে। কারণ ইংলণ্ড দল যখন দক্ষিণ আমেরিকায় পর পর পরাজয় স্বীকার করছিল। সমালোচকরা বিলি রাইটকে উদ্দেশ্য করে এ কথাও বলেছিলেন—"আর কেন? বয়স তো অনেক হয়েছে, এখন মানে মানে বিদায় নাও।" অনেকে আবার [illegible] ভাষায় এ কথাও লিখেছিলেন—[illegible]।

আবার দক্ষিণ আমেরিকা সফর থেকে ফিরে এসে এই বিলি রাইট যখন [illegible] ফুটবল খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন তখন কাগজে কাগজে কি কান্নার সুর। [illegible]। প্রথমটা বিশ্বাস হয়নি। [illegible] কি করে? ভাল করে পড়ে দেখি [illegible] বিলিকে [illegible] ধরে রেখেছিলেন [illegible] বলছেন বিলি না থাকলে ইংলণ্ড দল চলতেই পারে না। তার অবসর গ্রহণের অর্থ ইংলণ্ডের ফুটবল আকাশ থেকে এক মহা জ্যোতিষ্কের পতন।

সমালোচকরা কর্মকর্তাদের উপদেশ দিলেন যেমন করে পারো বিলিকে আটকে রাখ। কিন্তু বিলি রাইট তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। সমালোচকদের ক্ষণিকের আবেগময় আবেদনে তিনি মত পরিবর্তন করলেন না।

এরপর আরম্ভ হল কর্মকর্তাদের উপর সমালোচকদের অগ্নিবাণ বর্ষণ। একদিকে বিলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। অন্যদিকে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কটুকাটব্য। সংবাদপত্রের এই বিক্ষোভগানের মধ্যেই বিলি রাইটের শেষ বিদায়ের খেলার ব্যবস্থা হল। বিলি খেলা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। তাঁর চোখ এখন অন্যদিকে। শোনা যাচ্ছে ইংলণ্ডের আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিলি রাইট পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে নির্বাচনপ্রার্থী।

২৭শে আগস্ট ইংলিস চ্যানেলে 'বাটলিন রেস' আরম্ভ হবার কথা। এখন আবহাওয়া ভাল থাকলে হয়। চ্যানেল সাঁতারে আবহাওয়া যে এক মুখ্য বিষয় এ কথা বলাই অবান্তর।

'বাটলিন রেস' মানে ইংলণ্ডের ধনী প্রযোজক বিলি বাটলিন আয়োজিত চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার। ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে সাঁতার আরম্ভ করে অপর পার ইংলণ্ডের ডোভার উপকূলে পৌঁছনো খুবই কষ্টসাধ্য। বহু সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল এবং হিমশীতল ইংলিশ চ্যানেলের বুকে সাঁতার কাটা যে খুবই কষ্টসাধ্য এ কথা কারো অজানা নেই। তাই চ্যানেল সাঁতারের এত নাম ডাক।

এবার ২৩টি দেশের ৪৬ জন সাঁতারুর চ্যানেল সাঁতারে নামবার কথা আছে। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৯ আর মহিলার সংখ্যা ৭। এত বেশী সংখ্যক সাঁতারু এর আগে কোনদিন একযোগে চ্যানেল অতিক্রম করার চেষ্টা করেননি। এবারকার প্রতিযোগীদের মধ্যে ডেনমার্কের প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসী মিসেস গ্রেটা এণ্ডারসনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। মিসেস এণ্ডারসন গত দু'বছর পর পর প্রথম স্থান দখল করেছেন। এবারও তিনি প্রথম স্থান দখল করে হ্যাট্রিক করে বাটলিন ট্রফি চিরদিনের মত জয় করতে পারবেন কি না তা দেখবার জন্য সবাই আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে। এবার ভারতের দুজন সাঁতারু বাটলিন রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একজন ডাঃ বিমল চন্দ্র আর একজন কুমারী আরতি সাহা। পাকিস্থানের ব্রজেন দাসও অন্যতম প্রতিযোগী। গতবার ব্রজেন দাস দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলেন।

চ্যানেল সাঁতারের প্রযোজক বাটলিন সাহেব বিরাট ধনী ব্যক্তি। সাগরের উপকূলের বহু হোটেলের মালিক তিনি। সারা ইংলণ্ডে বাটলিনের পরিচয় 'হলিডে কিং' নামে। অর্থাৎ ছুটি পেলে আর দু'পয়সা হাতে থাকলে সবাই ছোটে বাটলিন সাহেবের সাগরতীরের হলিডে ক্যাম্প। কি ভাবে পয়সা ডানা মেলে উড়ে যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে। রিটার্ন টিকিট কেনা থাকলে কোনমতে বাড়ি ফেরার আশা থাকে, না হলে হয় হাত পাততে হয় কোন পরিচিত বন্ধুর কাছে, না হয় চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। এখানকার সব জিনিসেরই দাম আগুন। ট্যাক যত ভারীই থাক দু'দিনেই তুমি উজাড়। এইজন্যই বোধকরি বাটলিন সাহেব গর্ব করে বলে থাকেন তার ক্যাম্পের স্মৃতি কেউ জীবনে ভুলতে পারে না। কথাটা খুবই সত্যি। আমারও মনে আছে বাটলিন ক্যাম্পের কথা। চ্যানেল সাঁতার দেখবার জন্য এবার ডোভার যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল, এখনো আছে। কিন্তু বাটলিন সাহেবের ক্যাম্পের কথা মনে আসতেই ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি। অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং ভাল হোটেল অবশ্য ডোভারে আছে। কিন্তু না থাকারই সামিল। চ্যানেল সাঁতারের সময় সেখানে জায়গা পাওয়া যাবে কি?

মিঃ বিলি বাটলিন চ্যানেল সাঁতার চালাচ্ছেন বহুদিন ধরে। ব্যবসার গন্ধ না থাকলে ব্যবসাদারকে সহজে কোন কাজে ভিড়ানো কষ্ট। চ্যানেল সাঁতারের প্রযোজনা করেছেন বাটলিন সাহেব নিজের স্বার্থেরই প্রয়োজনে। হোটেল ও হলিডে ক্যাম্প থেকে মোটা লাভ ত হয়ই। তা ছাড়া এই সাঁতারের সময় কাগজে কাগজে তার নামের যে প্রচার হয় তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়!
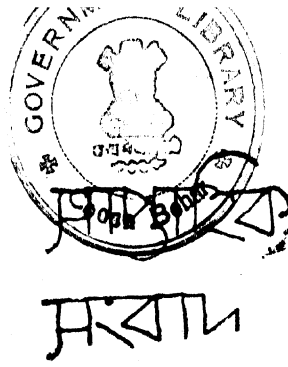
দেশী সংবাদ

১৭ই আগস্ট—আজ লোকসভায় কেরালা সম্পর্কে দুই দিনব্যাপী বিতর্ক শুরু হয়। অধিবেশনের সূচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেরালা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুমোদনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কেরালার রাজ্যপালের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার পেশ করেন।

রাজ্য সরকারের খাদ্যনীতির প্রতিবাদে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে আগামী ২০শে আগস্ট হইতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্বেই পুলিস রবিবার শেষরাত্রি হইতে শুরু করিয়া সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরোধী দলের (পি এস পি ছাড়া) ১৬ জন এম এল এ সহ প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে নিবারক নিরোধ ও নিরাপত্তা আইনে আটক করিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

কেরালার রাজ্যপাল কেরালা পরিস্থিতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে তিনি বলেন, কেরালা সরকারের বিরুদ্ধে কুশাসন ও গণতন্ত্র ধ্বংসের যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য এবং আমি এবিষয়ে নিঃসংশয় যে, সরকার জনসাধারণের অধিকাংশের সমর্থন হারাইয়াছেন।

১৮ই আগস্ট—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা সরকার দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে ২ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমি সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

নয়াদিল্লি হইতে বক্ষণশীল লণ্ডন এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, চীন ভারতকে এক বিপজ্জনক ও কঠোর চরমপত্র দিয়াছে। যথা:—তিব্বতে চীনের কার্যকলাপ প্রকাশ্য সমর্থন কর অন্যথা ভারত ও লালচীনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হইবে না।

১৯শে আগস্ট—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পাক-ভারত বৈঠকে সীমানা ঘটিত বিভিন্ন বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আরও প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ হইতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভারত রাষ্ট্রের কাছাড় ও পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্টের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত পাথারিয়া বনাঞ্চলের সীমারেখা সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বনাঞ্চল ভারতকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

আজ লোকসভায় শ্রী ডি সি শর্মার একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ বলেন যে, ভিক্ষা করাইবার জন্য কেহ শিশু অপহরণ অথবা অন্য কোন উপায়ে শিশু সংগ্রহ করিলে তাহাকে প্রতিরোধাত্মক দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শিশুকে বিকলাঙ্গ করিলে আরও কঠোর দণ্ডদান করা হইবে।

২০শে আগস্ট—তিন দিন যাবত ১৫ ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কের পর অদ্য লোকসভায় কেরালার ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাষ্ট্রপতি যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা ২৭০-৩৮ ভোটে গৃহীত হয়। দুইজন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন।

২৪ পরগণা জিলাকে বিভক্ত করিয়া দুইটি পৃথক জিলা স্থাপনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক্ষণে উত্তরাঞ্চলের জন্য বারাসত এবং দক্ষিণাঞ্চলের জন্য আলিপুর সদর দপ্তর হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে।

২১শে আগস্ট—দেশের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অদ্য লোকসভায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী অসমাপ্ত আলোচনাকালে কংগ্রেস ও বিরোধী উভয় পক্ষের সদস্যরাই সরকারের খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। আলোচনাকালে পশ্চিমবঙ্গের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন কংগ্রেস সংসদ দলের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠকে তাঁহার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন।

২২শে আগস্ট—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে আরও দুইটি গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে—সুচিকিৎসার অভাবে নবজাতক সহ প্রসূতির মৃত্যু ও [illegible]ভাবে রোগী নিয়োগ।

[illegible] কর্তব্যরত একজন ওভারসিয়ার সহ নয়জন কর্মীকে ভাকরা বাঁধে দুর্ঘটনার পর হইতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে। উহারা সকলেই ডুবিয়া মারা গিয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলী অদ্য সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় রাজভবনে পরলোকগমন করেন।

২৩শে আগস্ট—কালিম্পং-এর খবরে প্রকাশ, যেহেতু তিব্বতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, সেইজন্য চীনা কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দিগকে এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা বা অন্য কোন কারণে তাহারা যেন তিব্বতে না যায়।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই আগস্ট—অদ্য লণ্ডনের ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লাওসের যে অঞ্চলে সংঘর্ষ চলিতেছে সেই অঞ্চলে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক প্রেরণের জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সমর্থনের জন্য বৃটেন রাশিয়াকে অনুরোধ জানাইবে।

১৮ই আগস্ট—পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিকী—আগামী ৭ই অক্টোবর হইতে পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে রাওলপিণ্ডিতে নির্বাহ হইবে বলিয়া আজ করাচীতে জানা গিয়াছে।

পাকিস্তান অধিকৃত 'আজাদ কাশ্মীরের' প্রেসিডেণ্ট শ্রী কে এইচ খুরশীদ গতকল্য মজাফরাবাদে এক বিবৃতিতে বলেন, 'চীন লাডাকের একাংশ অধিকার করিয়াছে।

১৯শে আগস্ট—আজ রাত্রে একটি লণ্ডনগামী ব্রিটিশ বিমান বার্সিলোনার নিকটবর্তী পর্বতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিমানখানির মধ্যে ২৭ জন ইংরেজ ও ১ জন স্পেনীয় ছাত্র ও ৪ জন বৈমানিক ছিল। মোট এই ৩৩ জনই নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

২০শে আগস্ট [illegible] ক্যাণ্ডিতে বিখ্যাত বৌদ্ধ উৎসবের শেষ রাত্রির শোভাযাত্রার শেষদিকে একটি হাতী অকস্মাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া তাণ্ডব শুরু করিয়া দিলে অন্ততঃ ১৫ জন নিহত এবং বহু শত ব্যক্তি আহত হয়।

আগামীকল্য অপরাহ্নে হোয়াইট হাউসের একটি অনুষ্ঠানে হাওয়াইকে আমেরিকার ৫০তম অঙ্গরাজ্য বলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হইবে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

২১শে আগস্ট—প্রায় এক শত জন লোক সমেত ২৫২ টনের একটি [illegible] তিন শত মাইল দক্ষিণে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৭ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২২শে আগস্ট—পাক পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রচারিত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

২৩শে আগস্ট—নির্ভরযোগ্য সামরিক সূত্রে প্রকাশ, লাওসের কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীরা ভিয়েনতিয়েন প্রদেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং রাজধানীর ৫০ মাইলের মধ্যে আক্রমণ চালাইয়াছে। সেনাবাহিনীর এক ইস্তাহারে বলা হয় যে বিদ্রোহীরা সপ-ভিয়ম-এর চতুর্দিকে আক্রমণ চালাইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

প্রিয়জনের প্রীত্যর্থে
কেশরঞ্জন
অসাধারণ কেশতৈল
কেশরঞ্জন তৈল
KAVIRAJ
N. N. SEN & CO. LTD.
CALCUTTA
কবিরাজ এন, এন, সেন
এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ।
কলিকাতা-১

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ৫ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 22nd August, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৪৩

—মিত্র-ঘোষের সাহিত্যপসরা—

রমেশচন্দ্র সেনের
উপন্যাস
গৌরীগ্রাম ৫৲
মালঙ্গীর কথা ৪৷৷৹

বাণী রায়ের
রঞ্জনরশ্মি ২৸৹
শ্রীলতা ও সম্পা ২৷৷৹
বর্ষাবিজয় ৩৲

ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রজিতের খাতা ৩।৹

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
(প্রেতলোকের কাহিনী)
আবছায়া ৩৲

চরণদাস ঘোষের
নাগরিকা ২৷৷৹
দান ৩৷৷৹
নিরক্ষর ৪৷৷৹

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
গল্পসংগ্রহ ৩৷৷৹

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
সুভাষচন্দ্র ৪৲

বিক্রমাদিত্যের
দিল্লীর ডাকে ৩৷৷৹

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার
জমি-শিকড়-আকাশ ২৲

মণীন্দ্রনাথ দাসের
বিচিত্র প্রসঙ্গ ৪৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
জীবন জাহ্নবী ৬৷৷৹

শক্তিপদ রাজগুরুর
অগ্নিস্বাক্ষর ২।৹

মহাত্মা গান্ধীর
আমার ধ্যানের ভারত ৩৲
ছাত্রদের প্রতি ৪৷৷৹

॥ শ্রেষ্ঠ কবিতা সঞ্চয়ন ॥

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৫৷৷৹

কালিদাস রায়ের
আহরণ ৫৲

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
অনুপূর্বা ৫৲

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
কাব্যমালঞ্চ ৫৲

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শতনরী ৫৷৷৹

সুনির্মল বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪৲

বিহারীলাল অনূদিত
কুমারসম্ভব ৩৲

॥ প্রবন্ধ ॥

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
রবিদীপিতা ৫৲
কাব্যবিচার ৫৲

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
পশ্চিমের যাত্রী ৫৲
ভারত-সংস্কৃতি ৫৲
চরিত্র-সংগ্রহ ২৷৷৹

ডাঃ সুশীলকুমার দের
নানা নিবন্ধ ৫৷৷৹

সরলাবালা সরকারের
সাহিত্য জিজ্ঞাসা ৩৷৷৹

ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪৲

ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সমীক্ষা ৫৲

বিশ্বপতি চৌধুরীর
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৷৷৹
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

হরপ্রসাদ মিত্রের
সাহিত্য পরিক্রমা ২৷৷৹

॥ অনুবাদ ॥

টলস্টয়ের
ওঅর য়্যাণ্ড পীস (একত্রে ১২৲)
১ম খণ্ড ৪৷৷৹ ২য় খণ্ড ৪৲ ৩য় খণ্ড ৪৷৷৹
আনা কারেনিনা ৩৲

ডস্টয়ভস্কির
ক্রাইম য়্যাণ্ড পানিশমেণ্ট ৩৲

টুর্গেনেভের
ভার্জিন সয়েল ২৸৹

টমাস হার্ডির
এ পেয়ার অব ব্লু আইজ ৬৲

আপটন সিনক্লেয়ার
প্রত্যাবর্তন ১ম—৩৲
২য়—৩৲

জর্জ ওরওয়েল
য়্যানিম্যাল ফার্ম ১৷৷৹

তরু দত্তের
শ্রীমতী আর্ভের ৪৲

অজ্ঞাত সৈনিক
চেনা-অচেনা ২৷৷৹

রোমানফের
অন দি ভলগা ২।৹

॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

মন্মথনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

তারাশংকরের প্রিয় গল্প ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

যদি আপনি জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে চান

—প'ড়ে দেখুন!

আজকাল ভালভাবে বাঁচবার কত সুযোগ হয়েছে—তবু পুরণো সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব সুযোগ নষ্ট করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের খাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। বনস্পতির ভেতর এই স্নেহপদার্থ আমরা সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কারে বাধে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিজ্জ স্নেহ দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাখনের দেশেও দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির মত উদ্ভিজ্জ স্নেহের ব্যবহার বেশী। কেন বলবো? কারণ লোকে জেনেছে যে এই সব উদ্ভিজ্জ স্নেহ দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছয়। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বক ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তাঁরা রান্নার জন্যে বিশুদ্ধ স্নেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার শুরু করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা

বিনামূল্যে উপহারের
মেয়াদ এখন ১৫ই
সেপ্টেম্বর ১৯৫৯
পর্যন্ত বাড়িয়ে
দেওয়া হল
জনসন-এর শিশু-প্রসাধন কিনলে
আপনার বাচ্চার জন্যে বিনামূল্যে
একটি সুন্দর উপহার পাবেন!
জুলাই ছিল জনসন-এর শিশুমাস—কিন্তু বিনামূল্যে উপহারের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের আগে প্রাপ্ত বিনামূল্যে উপহারের অনুরোধ বা ঐ তারিখের ডাকঘরের ছাপ-শুদ্ধ অনুরোধপত্রও গৃহীত হবে। আপনার দরকারী জিনিসগুলো কিছু বেশী করে এখনই কিনে রাখুন—এবং আপনার বাচ্চার জন্যে বিনামূল্যে একটি সুন্দর উপহার নিন।
বিনামূল্যে উপহার কেমন ক'রে পাওয়া যায়
জনসন্স বেবি সোপ, জনসন্স বেবি ক্রীম ও জনসন্স বেবি অয়েল-এর মোট চটি মোড়ক বা জনসন্স থ্রী-ইন-ওয়ান বেবি সোপ গিফট প্যাকের দুটি মোড়ক সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং-এ পোঃ বক্স ১৯৭৬ বোম্বাই ঠিকানায় পাঠান।
মোড়কের সঙ্গে জনসন-এর জিনিস বিক্রেতার কাছ থেকে বিশেষ উপহার-কুপন নিয়ে পাঠান কিম্বা নীচের বিষয়গুলো লিখে একটি চিঠি পাঠান—
(১) যে মোড়কগুলো পাঠাচ্ছেন তার তালিকা
(২) আপনার বাচ্চাটি ছেলে কি মেয়ে
(৩) বড় অক্ষরে আপনার পুরো নাম ও ঠিকানা
এর পরিবর্তে আপনি বিনা ডাকমাশুলে আপনার উপহার পাবেন।
জনসন এণ্ড জনসন
৬০ বছরের ওপর শিশু-প্রসাধন প্রস্তুতকারী
জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃ
Johnson's
BABY POWDER
Johnson's
BABY OIL
Johnson's
BABY SOAP
BABY CREAM
Johnson's
Baby Soap

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 22nd August, 1959

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৩ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শিক্ষার কথা

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি দুইটি সম্মেলন হইয়া গেল ঃ একটি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীদের অন্যটি কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষকদের।

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সূচনাতেই (১৯৬৫-৬৬ সালে) সমগ্র ভারতে ছয় হইতে এগারো বৎসর বালক-বালিকাদের জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে। এখন, তাঁহাদের হিসাবে, ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ। অর্থাৎ এখনকার সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় আড়াই কোটি অধিক। ইহার জন্য অতিরিক্ত ৫ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যেই ইঁহাদের আবশ্যক শিক্ষা দেওয়া হইবে। বালকদের শিক্ষা যে পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে, বালিকাদের ক্ষেত্রে তেমন হয় নাই। সেজন্য আগামী পরিকল্পনায় ডক্টর শ্রীমালী বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় আগামী পরিকল্পনা বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হইবে।

কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে কিন্তু সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাস খুব গভীর বলিয়া মনে হইল না। তাঁহাদের প্রথম এবং প্রধান অভিযোগ শিক্ষকদের বেতন লইয়া। তাঁহাদের মতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ১০০৲ টাকা ও ভাতা ২৫৲ টাকা হওয়া উচিত। তাঁহাদের বিশ্বাস, অর্থাভাবের অজুহাত না তুলিয়া সরকার এই ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দেই করিতে পারেন যদি হাজার হাজার টাকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য অপব্যয় না করেন। সভায় বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর অনাবশ্যক হিন্দী ও চরকা শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদ করা হয়।

কোনো সম্মেলনেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে কোন আলোচনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মন্ত্রী সম্মেলন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কথা চিন্তা করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন বেতন-বৃদ্ধির কথা। আশা করি ছাত্রদের শিক্ষা-বৃদ্ধির কথা উভয় সম্মেলনের মনের অন্তরালে রহিয়াছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে ছাত্রদের শিক্ষার যে শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার মূল কারণ প্রাথমিক শিক্ষার অবনতি। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিবে এবং সম্ভবত, অত্যন্ত ভাল ছেলেরাই কলেজে পড়িবে এই রকম অভিপ্রায় মন্ত্রী-সম্মেলনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তা যদি হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে ভারতের সাধারণ নাগরিকের শিক্ষা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই শেষ হইয়া যাইবে, আর তাহাদের বেশির ভাগেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এমন অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষা নির্ভর করে প্রধানত শিক্ষকের উপর। যাঁহাদের উপর ছাত্রদের বুনিয়াদ গঠনের ভার, বেতন হিসাবে তাঁহাদের এক শত টাকা দেওয়া কিছুই নয়। একজন সাধারণ করণিক অপেক্ষা তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর, বৃত্তিও মহত্তর। শিক্ষা-বিস্তার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন, অত্যন্ত আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয়, তাঁহারা এই নিতান্ত সাধারণ বিষয়টি বিবেচনা করিতে ভুলিয়া যান।

তাহার অনিবার্য পরিণতি এই হইয়াছে যে, শিক্ষার বুনিয়াদ যেখানে প্রস্তুত হইতেছে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ঘটিতেছে। উপযুক্ত বেতন, অর্থাৎ উপযুক্ত মর্যাদার অভাবে শিক্ষা-বিভাগ প্রথম শ্রেণীর লোককে আকৃষ্ট করিতেছে না। একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষকের অভাব তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা আজ প্রহসনে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

যদি ধরিয়া লইতে হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ভারতবর্ষের ভাবী নাগরিকদের চরিত্র ও শিক্ষার বুনিয়াদ গঠিত হইবে, তাহা হইলে সেখানকার শিক্ষক-মনোনয়ন সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। ট্রেনিং-এর আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা, নিচের ক্লাসে পড়াইতে নিচু বেতনে নিচের-ক্লাসের শিক্ষকই যথেষ্ট, এ নীতি ত্যাগ করিতে হইবে।

অন্যান্য বিভাগে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় শিক্ষার জন্য অতি সামান্য মাত্রই উৎসাহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহার ফলে শিল্পক্ষেত্রের কর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়নিজমের আবহাওয়া আজ শিক্ষাক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাক্ষেত্র, সবেরই পক্ষে ভয়াবহ। কিন্তু ছাদের দিক হইতে গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করিলে এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

প্রসঙ্গত

যেদিন পরাধীন ছিলাম সেদিন রাজনীতি আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। আমাদের শিক্ষায়তন থেকে নাট্যশালা এবং পৌরপ্রতিষ্ঠান সমস্তর সঙ্গে রাজনীতি ছিল জড়িয়ে। সেদিন মুক্তির ক্ষুধাই ছিল পরম ক্ষুধা। আর সব ছিল তার নিচে। এবং তার আবশ্যকও ছিল। আজ রাজনৈতিক মুক্তি আমরা পেয়েছি। কিন্তু মন এখনও সেখানে এসে পৌঁছুতে পারেনি, এখনও পড়ে আছে সেই পরাধীন যুগের পরিবেশে।

আমাদের ছেলেবেলায় পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। একটি বেটো ঘোড়ায় চড়ে প্রত্যহ তিনি এই পাঁচখানা গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন এবং একক ম্যালেরিয়া থেকে আরম্ভ করে দুরূহ শল্যচিকিৎসা পর্যন্ত সবই সম্পন্ন করতেন। যে বাঁচবার সে বাঁচত, যে বাঁচবার নয় সে মরত। কলকাতার উন্নত আবহাওয়ায় এসে দেখি যে-ডাক্তার চোখ দেখেন তিনি কান দেখেন না, যিনি ঔষধ দেন তিনি অস্ত্র ধারণ করেন না। বিশেষজ্ঞের মধ্যে কাজ ভাগ হয়ে গেছে। একের গণ্ডি অন্যে মাড়ান না।

আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে, কিন্তু পণ্ডগ্রামী রাজনীতি তার বেটো ঘোড়াটি এখনও ছাড়েনি। তাইতে চড়ে স্কুল-কলেজ থেকে কর্পোরেশন পর্যন্ত পণ্ডগ্রাম পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে এবং একক সকল রোগের ব্যবস্থাও দিচ্ছে, শল্যচিকিৎসাও করছে। বিশেষজ্ঞের মধ্যে কর্মবিভাগের কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

কথাটা মনে পড়ল, কলিকাতা কর্পোরেশনের "কেরল প্রস্তাব" সম্পর্কীয় মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতির রায় দেখে।

*

এবারে স্বাধীনতা দিবসে দিল্লির লাল কেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে একটা নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে। দ্বাদশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় নৈরাশ্যে ও বেদনায় তা ম্রিয়মান। তিনি বলেছেন, 'অন্যের ভিক্ষান্নে কোনো জাতি সমৃদ্ধ হয় না। দিল্লি, কলকাতা কি মাদ্রাজের মতো কয়েকটি বড় শহরের সমৃদ্ধির মধ্যেই জাতির সমৃদ্ধি নিহিত নয়। দেশের পাঁচ লক্ষ গ্রাম যদি পরাধীনতা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পায় তবেই জাতি সমৃদ্ধ হবে। আর গ্রামগুলি যদি সব সময়েই সরকারী সাহায্যের দিকে চেয়ে থাকে, তারা সমৃদ্ধ হতে পারবে না। সরকারী কর্মচারীদের উপর কোনো কাজের ভার দিলেই তা প্রাণহীন কার্যক্রমে পর্যবসিত হয়। তার তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়।"

স্বাধীনতা-উৎসবের দিনে না হলেও এ রকম কথা তিনি আগেও অবশ্য বলেছেন। সরকারী কর্মচারীদের 'নেক-টাই' খুলে ফেলার উপদেশ দিয়েছেন। অথবা বিপদের সময় সকল দেশেই জনসাধারণকে সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয়, তাদের সাহায্যের জন্যে সরকারী কর্মচারীদেরও নেমে আসতে হয়। তা ছাড়া সরকার এবং সরকারী কর্মচারীদের আর সার্থকতাই বা কি? অথচ কোথাও তো সরকারী কাজ এমন প্রাণহীন মামুলী কার্যক্রমে পরিণত হয় না। এখানেই বা হয় কেন? ইংরেজ সবে চলে গেছে। রাজার জাতির কর্মচারীর সেই ঐতিহ্য কি এখনও যায়নি? জনসাধারণের সঙ্গে এ'দের সেই দূরত্ব এখনও রয়েছে কি? এখনও কি বিদেশী শাসকেরাই রাজ্যরক্ষা করে চলেছেন? কে জানে কেন এমন হয়।

*

শ্রীরাজগোপালাচারীর স্বতন্ত্র দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই সমস্ত আলোচনার মোটামুটি সুর কিন্তু একেবারে নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়। স্বতন্ত্র দল এখনই কেন্দ্রে অথবা বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভায় শক্তিবৃদ্ধির কথা ভাবছেন বলে মনে হয় না। তাঁদের লক্ষ্য আগামী নির্বাচন। তাঁরা নাকি স্থির করেছেন যে, আগামী এক বৎসরের মধ্যে অন্তত দশ লক্ষ সভ্য সংগ্রহ করবেন।

এই দশ লক্ষ সভ্য কিভাবে সংগৃহীত হবে তা নিয়ে গবেষণা চলছে। রাজাজী অতি দীর্ঘকাল কংগ্রেসে নেতৃত্ব করেছেন। তিনি কংগ্রেস থেকে সরে এলেও কংগ্রেসের মধ্যে, বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রবীণ অংশের মধ্যে তাঁর কিছুসংখ্যক বন্ধু ও অনুরাগী থাকা অসম্ভব নয়। ঠিক এখনই না হলেও তারও একটু স্বতন্ত্র দলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে ভরসা জাগলে আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁদের স্বতন্ত্র দলে যোগদান করার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেসের ভূমিসংস্কার ও বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধীয় প্রগতিপন্থী নীতির ফলে শুধু প্রবীণ কংগ্রেসীদের মধ্যেই নয়, ধনী সম্প্রদায়ের আরও যে একটা দল স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন তাঁদের মধ্যেও দুশ্চিন্তা জাগা অস্বাভাবিক নয়। আপাতত তাঁরা হয়তো অর্থ সাহায্যের মধ্যেই স্বতন্ত্র দলের উপর সহানুভূতি সীমাবদ্ধ রাখবেন। কিন্তু সুবিধা বুঝলে পরে প্রকাশ্যে যোগদানও করতে পারেন। ধনীদের ঘাঁটি হল বোম্বাই শহর। সেই বোম্বাইতে স্বতন্ত্র দলের সম্মেলন যে অভ্যর্থনা পেয়েছে তাতে এরকম অনুমান অমূলক নয়।

দল গড়তে প্রথম যে বস্তুটির আবশ্যক সে হচ্ছে রাজনৈতিক বুদ্ধি। তার পরেই হল অর্থ। স্বতন্ত্র দলে অন্তত এই দুটোর কোনোটারই অভাব হবে বলে মনে হয় না।

বোম্বাইতে স্বতন্ত্র দলের সূচনা হলেও তাঁদের প্রধান ঘাঁটি কিন্তু মাদ্রাজ। মাদ্রাজে রাজাজীর যথেষ্ট প্রভাব আছে। শ্রীথেবরের দলও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশেও শ্রী এন জি রঙ্গের প্রভাব অনেকখানি। শ্রীরঙ্গ নিজে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর অনুরাগী যাঁরা তাঁরাও পদত্যাগ করতে পারেন। অন্ধ্রে কিন্তু কম্যুনিস্টদেরও কিছু প্রভাব আছে। এই গোলমালে কংগ্রেসের ভিতরকার বামপন্থী দল কি করবেন এখনই বলা শক্ত। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরেও এই রক্ষণপন্থী দলের সমর্থকের অভাব ঘটবে না বলেই মনে হয়। বিহারে ইতিমধ্যেই এ'রা রামগড়ের রাজার 'জনতা' দলের সমর্থন পেয়েছেন। আনুষ্ঠানিক পর্বটুকু বাকি আছে। সেই সঙ্গে যদি ঝাড়খণ্ডের শ্রীজয়পাল সিং-এর দলকে পেয়ে যান, তা হলে বিহারে এখনই স্বতন্ত্র দলের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। উত্তর প্রদেশে শ্রীপালিওয়ালের দলও ইতিমধ্যেই এ'দের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। সেখানে কংগ্রেসের পরেই প্রজা-সোস্যালিস্ট দলের প্রভাব। এই দলে অনেকে আছেন যাঁরা অন্য কোথাও যাবার জায়গা না থাকার জন্যেই আছেন। তাঁদের কিছুসংখ্যক স্বতন্ত্র দলে ভিড়ে যেতে পারেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র দল আদৌ প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, আসাম, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে এখনও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পাঞ্জাবের ধনী কৃষক সমাজের একাংশ যদি বা সাড়া দেয়, অন্যান্য রাজ্য দেবে বলে মনে হয় না। কারণ এই সমস্ত রাজ্যে হয় কংগ্রেসের বামপন্থী দলের নয় কম্যুনিস্ট দলের প্রভাবই সর্বাধিক। আর স্বতন্ত্র দলের সংগ্রামই হচ্ছে, রাজাজীর মতে, কম্যুনিস্ট-পন্থী কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট দলের বিরুদ্ধেই।

সোভিয়েট নেতা মিঃ খ্রুশ্চেভ আমন্ত্রিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা এবং কথাবার্তা হবে। সুতরাং যাকে বলা যায় একেবারে বিশুদ্ধ "শীর্ষ-সম্মেলন" তাই ঘটবে। একেবারে দুই দিকের দুই মাথা, লেজুড়টেজুড় সঙ্গে থাকবে না, ছোটো-বড়ো মাপামাপি নেই। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এটাকে শীর্ষ-সম্মেলন বলা হবে না। শীর্ষ-সম্মেলনের জন্য যাঁরা ওকালতি করেছিলেন, তাঁরা ঠিক এই রকমটি চান নি, যদিও শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ মুখ ফুটেই প্রায় বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, দ্বন্দ্বের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ যখন সোভিয়েট এবং আমেরিকা তখন এই দুই শক্তির কর্তারা যদি মিলিত হয়ে একটু কথাবার্তা কন, তাহলেই আর-সকলের আতঙ্কটা কিঞ্চিৎ কমতে শুরু করে।

কিন্তু এবম্বিধ মিলন আমেরিকা এবং সোভিয়েটের স্ব স্ব দলভুক্ত রাষ্ট্রগুলির কর্তাদের অবিমিশ্র আনন্দের কারণ হবে এরূপ মনে করা যায় না। অবশ্য প্রকাশ্যে কেউ আপত্তি তুলছেন না, তোলা যায়ও না। তবে যাঁরা হেসে হি' হি' করছেন, তাঁদের হাসিও অনেকটা কাষ্ঠহাসি বলে সন্দেহ হয়। এমন কি বৃটেনের সম্বন্ধেও তাই মনে হয়, যদিও মিঃ ম্যাকমিলান শীর্ষ-সম্মেলন ঘটাবার চেষ্টা অনেক করেছেন। তাঁর সোভিয়েট সফর ফ্রান্সের এবং তার চেয়েও বেশি পশ্চিম জার্মানির সরকারী মহলে যথেষ্ট সন্দেহ এবং সমালোচনা উদ্রেক করেছিল। মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকা যাবার আমন্ত্রণের সংবাদে মিঃ ম্যাকমিলান আনন্দ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু তার পেছনে কিছুটা বেদনা, ভয় এবং সন্দেহ নিশ্চয়ই আছে।

প্রথমত, সম্প্রতি মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের সোভিয়েট সফর-কালে তাঁর সঙ্গে সোভিয়েট সরকার যেরূপ ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে মিঃ ম্যাকমিলান তাঁর নিজের সোভিয়েট সফরের অভিজ্ঞতা তুলনা করে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ না হয়ে পারেন না। কারণ, মিঃ নিক্সনের সঙ্গে সোভিয়েট সরকার যেরূপ ব্যবহার করেছেন তার তুলনায় মিঃ ম্যাকমিলান যে ব্যবহার পেয়েছিলেন তাকে তাচ্ছিল্যই বলা চলে। এ তো গেল ও-পক্ষের কথা; এ-পক্ষের ব্যবহারেও মনে খোঁচা খাওয়ার মতো দুটো একটা কাঁটা আছে। মিঃ খ্রুশ্চেভকে আমন্ত্রণ জানাবার পূর্বে মার্কিন সরকার বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে বোধ হয় কিছু জানান নি। অবশ্য সাধারণত এই ধরনের ব্যাপারে কোনো গভর্নমেণ্টের মিত্রশক্তিদের জানানো দস্তুর এমন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকা গমন কেবলমাত্র সৌজন্যের ব্যাপার নয়, এটা সোভিয়েট এবং পশ্চিমা ব্লকের মধ্যে (আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও) শীর্ষ-সম্মেলনের প্রথম অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই দিকে পা বাড়াবার আগে মার্কিন সরকার তাঁর মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি বলে তাঁরা দুঃখিত হতে পারেন। তার চেয়েও গুরুতর কথা হচ্ছে যে, তাঁদের মনে সন্দেহ ও ভয়ের উদ্রেক হয়েছে।

সেই সন্দেহ ও ভয় নিরসনের জন্য অবশ্য মার্কিন সরকার তৎপর হয়েছেন। মিঃ খ্রুশ্চেভের আমেরিকায় যাবার আগেই মিঃ আইজেনহাওয়ার স্বয়ং লণ্ডন, প্যারিস ও বন'এ আসছেন বৃটিশ, ফরাসী এবং পশ্চিম জার্মান সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য এবং এই আশ্বাস দেবার জন্য যে মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এবং তাঁদের সম্মতি না নিয়ে আমেরিকা সোভিয়েটকে কোনো প্রস্তাব দেবে না বা সোভিয়েটের কোনো প্রস্তাব নেবে না। পশ্চিমা মহলের একটা বড়ো ভয় হচ্ছে সোভিয়েট কূটনীতি কখন পশ্চিমা শক্তি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ফেলে। সেই জন্য সোভিয়েটের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পশ্চিমা ব্লকের একটা মূল নীতি হচ্ছে সর্বসম্মতি চাই অর্থাৎ কোনো প্রস্তাবই পশ্চিমা বৃহৎ চতুঃশক্তির—আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর সর্বসম্মতি ছাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলবে না। এই নীতির অলঙ্ঘ্যতা সম্বন্ধে আশ্বাস দানের জন্য

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ইউরোপে আসছেন।

কিন্তু কেবলমাত্র এর জন্যই নয়। মিঃ খ্রুশ্চেভের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার পশ্চিমা ব্লকের তরফ থেকে বার্লিন প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য শর্ত লেনদেনের আলাপ ("নেগোশিয়েট") করবেন না বলা হচ্ছে, কিন্তু কার্যত সেটা হবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনার সীমারেখা যেভাবেই টানা হোক না কেন, আসল সমস্যাগুলির সম্বন্ধে কথাবার্তা এড়ানো যাবে না এবং কথাবার্তা হলে একটু এগোনো-পেছনো হবেই। এক জায়গায় "হ্যাঁ" বা "না"য়ের খুঁটি ধরে, একটুও না নড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হবে। বিশেষত যখন দুই সর্বোচ্চ প্রধানের মধ্যে কথা হবে। এক্ষেত্রে "মিত্রদের সঙ্গে কথা না বলে কিছু বলতে পারি না" এই অজুহাতের সাহায্যেও নিজের মনোভাব সব সময়ে অব্যক্ত রাখা সম্ভব হয় না, স্পষ্টভাষায় না হলেও কিছুটা ধরা দিতে হয়, খানিকটা নৈতিক "কমিটমেণ্ট" হয়ে যায়, অন্তত অপরপক্ষ বুঝতে পারে কোন্‌খানটা নরম, যেখানে ঘা মারলে কাজ হবে। সুতরাং আমেরিকা একা সোভিয়েটের সঙ্গে কোনোরকমে "নেগোশিয়েট" করবে না, কথা বলে বা শুনে কেউ নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। মিঃ খ্রুশ্চেভের হাত থেকে অত সহজে পার পাওয়া যাবে না, কিছু না কিছু বললেও বলতেই হবে বা না বললেও মিঃ খ্রুশ্চেভ বুঝে নেবেন। সুতরাং "নেগোসিয়েশন" করব না বলেও নেগোসিয়েশন যদি করতে হত তাহলে যেরূপ প্রস্তুতি আবশ্যক সেইরকম করা হচ্ছে।

এখানে মজার (পশ্চিমা কর্তাদের পক্ষে নয়) কথা হচ্ছে এই যে, প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের পক্ষে মিঃ খ্রুশ্চেভের সঙ্গে কথা বলাটা যত শক্ত কাজ হবে, তার চেয়ে ঢের বেশি শক্ত কাজ হচ্ছে তাঁর নিজের মিত্রদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা। লণ্ডনে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার যে আশংকার সম্মুখীন হবেন, প্যারিসে তা নয়। আবার বন-এ অন্যরকম, এমন কি লণ্ডনের উল্টো। লণ্ডনের ভয় পাছে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট দ্য গল অথবা চ্যান্সেলর এ্যাডেনয়েরের কথার দ্বারা অত্যধিক প্রভাবান্বিত হন। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার সোভিয়েটের বেশি কাছে চলে যেতে পারেন এটা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ভয় নয়, অন্তত আপাতত নয়—লণ্ডনের ভয় এ্যাডেনয়েরের কথা শুনে তিনি সোভিয়েটের সঙ্গে মিটমাটের দরজা আগের মতোই বন্ধ করে রাখতে না চান। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার এবং মিঃ খ্রুশ্চেভ মিলিত হচ্ছেন, সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে মিঃ ম্যাকমিলান দুঃখিত নন, তাঁর ভয় পাছে মাঝে দুটিতে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। তিনি উপস্থিত থাকলে হয়ত সামলাতে পারতেন! প্যারিসে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল ফরাসী অ্যাটম বোমার পরিকল্পনা (শোনা যাচ্ছে ফরাসী অ্যাটম বোমা তৈরীর কাজ নাকি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় অগ্রসর হচ্ছে), আলজেরিয়ার যুদ্ধ, আরো কত কী জড়িয়ে যে কথা পাড়বেন কে জানে! বন-এ বৃদ্ধ অ্যাডেনয়ের যে শক্ত হাত মুঠো করে বসে আছেন, তাকে খোলা সহজ কর্ম নয়।

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের অবস্থা ভেবে মিঃ খ্রুশ্চেভ হয়ত হাসছেন। কে জানে? তাঁর নিজের এলাকার খবরও ঠিক কী বলা যায় না। মিঃ নিক্‌সনকে ওয়ারসতে পোলিশ জনসাধারণ যে রকম উৎসাহের সঙ্গে সম্বর্ধনা জানান, তাতে মিঃ খ্রুশ্চেভের দুশ্চিন্তার কারণ আছে। চীন যেভাবে বেশ কয়েকদিন সময় নিয়ে মিঃ খ্রুশ্চেভের মার্কিন আমন্ত্রণ প্রাপ্তির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তাতেও মনে হয় সেই সমর্থন শর্তহীন নয়।

১৭।৮।৫৯

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

কুঁড়ি

প্রমথ চৌধুরীর ওখানে—অর্থাৎ কমলালয়ে—আমরা—অর্থাৎ সবুজ দলে যারা ছিলুম—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিলুম ২৪শে মার্চ ১৯১৭ সালে, এটা প্রায় সুনিশ্চিত, কেননা তার আগের দিন প্রমথবাবু আমায় চিঠি লিখেছিলেন সুধীন্দ্র সিংহকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর ওখানে ঐ উদ্দেশে যেতে, এবং তার পরেই আবার তাঁর পত্রে যা পাই তা এই:

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৮।৩।১৭

কল্যাণীয়েষু,

বোলপুর যাবার কি ঠিক্ করলে? আমরা ত মনে করেছি শনিবার সকালে এগারোটার ট্রেনে হাওড়া থেকে রওনা হবো। সুতরাং কালকের ভিতর কে কে যাবে আমার জানা আবশ্যক। তুমি যদি কাল দুপুরে আমার আপিসে একবার এসো কিম্বা বিকেলে আমার বাড়িতে তাহলে এ-বিষয়টার একটা স্থির করা যায়। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

যদি ২৪শে 'ঠাকুর-দর্শন' না পেতুম, তাহলে ২৮শে এ-চিঠি উনি লিখতেন না, একথা বলা যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য! এই প্রথম দর্শনের কোনো চিত্রই আমার স্মৃতিপটে আঁকা নেই। এত বড় স্মরণীয় ঘটনা কি করে যে ভুলে গেছি, তা বলতে পারি না। সত্যেন বোসের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ভাবলুম তাঁর স্মরণাপন্ন হওয়া যাক্। কিন্তু তাঁরও শুধু এইটুকু মাত্র স্মরণ আছে যে, প্রমথবাবুর ওখানেই তিনি রবিবাবুর সঙ্গে পরিচিত হন্। কবে, কি বৃত্তান্ত, কিচ্ছু মনে নেই। —আর কাকে জিজ্ঞেস করি, এই কথা ভাবছি, এমন সময়ে একদিন এসে হাজির সুধীন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর সুহৃৎ সিংহ। সুহৃৎ আমায় বলে গেলেন যে, আমার মুখে তিনি তখন (১৯১৭ সালে) শুনেছিলেন, আমাদের রবি-সন্দর্শনের স্থান হয়েছিল কমলালয়ের কোনো ঘরে নয়, ঘরের বাইরে ফাঁকা জায়গায়, এবং সত্যেনও সেখানে উপস্থিত

ছিলেন। বলে রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে উপন্যাস—যা প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে সবুজ পত্রে ছাপা হয়—পূর্বোক্ত ঘরে-বাইরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন। সুতরাং মনস্তত্ত্ববিৎ ডক্টর সিংহ বোধ হয় স্বীকার করবেন যে, বাইরে ফাঁকায় বসে আমরা শান্ত রবির আলো পেয়েছিলুম প্রমথ চৌধুরীর ওখানে; তার কোনো ফোটো ওঠে নি আমাদের মনে এই জন্যে যে, ফাঁকা জায়গায় দল-বেঁধে বসলে প্রত্যেকের চিত্তে ক্রাউড্-সাইকলজির ফল ফলে, এবং বোধ-শক্তি ও ধারণা-শক্তি দুয়েরই অবনতি ঘটে। সত্যেন বোসের স্মৃতি-শক্তিও এই বেয়াল্লিশ বছর আগেকার ঘটনাকে মনে ধরে রাখতে পারে নি। অন্যে পরে কা কথা? আর আমার মন থেকে এ-স্মৃতি বোধ হয় ঐ ফাঁকা জায়গাতেই উড়ে গিয়েছিল। পবনদেবের ক্ষমতাও ত কম নয়!

কত ছোট্ট-ছোট্ট কথা মনে থাকে, কত বড়-বড় কথা ভুলে যাওয়া যায় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই 'অরবিন্দ ঘোষের জীবন থেকে। ১৯০৪ সালে উনি যখন বরোদায় ছিলেন, সিস্টার নিবেদিতা বরোদার মহারাজার নিমন্ত্রণে সেখানে যান, এবং তদুপলক্ষে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দের কথোপকথন হয়—এই মর্মে ১৯৪৪ সালে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে একটি কাহিনী ছাপান। এর মাসছয়েক পরে শ্রীঅরবিন্দ উক্ত কাহিনীর উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন, যা পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে ইং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত Sri Aurobindo on Himself গ্রন্থের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় বলা আছেঃ

I do not remember whether she was invited but I think was there as a State guest. Khasirao and myself went to receive her at the station.

I do not remember Nivedita speaking to me on spiritual subjects or about Ramakrishna and Vivekananda. We spoke of politics and other subjects. On the way from the station to the town she cried out against the ugliness of the cottage building and its top-heavy dome and praised the Dharmashala near it. Khasirao started at her and opined that she must be at least slightly cracked to have such ideas!

এর মধ্যে দুবার "I do not remember" রয়েছে সুতরাং ১৯০৪-এর ঘটনার সবটুকু ১৯৪৪-এ শ্রীঅরবিন্দ মনে রাখতে পারেন নি, এ-কথা নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

ঐ গ্রন্থেরই ৯৫ পৃষ্ঠা থেকে শ্রীঅরবিন্দের যে-উক্তি শ্রীমান সমীরকান্ত উদ্ধৃত করেছেন, সবুজ পাতার ডাক প্রসঙ্গে[১] সে-উক্তিও গিরিজাশঙ্করের উক্ত প্রবন্ধের উত্তর-স্বরূপে 'চারুচন্দ্র দত্তের পত্রোত্তরে লেখা। সবটা যদি কেউ পড়েন—সমীরকান্ত যে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন কেবল সেইটুকু নয়—তাহলে বুঝতে পারবেন যে, শ্রীঅরবিন্দ সে-চিঠিতে তাঁর কলকাতা ত্যাগ করে চন্দননগরে চলে যাওয়ার সমগ্র ইতিহাস লিখতে বসেননি। শুধু এইটা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য যে, নিবেদিতা বা আর কারো পরামর্শে তিনি চন্দননগরে চলে যান্নি—তিনি স্বকীয় অন্তরের প্রেরণা বা 'আদেশ' পেয়ে কর্মযোগিন্ আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই গঙ্গাঘাটে নৌকোয় চড়ে চন্দননগর যাত্রা করেন। কিন্তু কোন্ পথ ধরে ঘাটে যান সেকথা একদম বলেন নি। বলার প্রয়োজনই বা কি? উনি যথার্থ কলকাতা ত্যাগ করেন, ডাঙা ছেড়ে যখন নৌকোয় চড়েন। ঠিক তখনই বলা যায়, ওঁদের যাত্রা হল শুরু। আর ও'রাও তখন মনে মনে হয়তো বলে থাকবেন,

ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার;
বাতাস উঠুক তুফান ছুটুক
ফিরবো নাকো' আর।

ঘাটে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের নাম করার প্রয়োজন ছিল, কারণ গিরিজাশঙ্কর তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন যে, গণেন মহারাজ ও নিবেদিতা ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেটা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, সুরেশ চক্রবর্তী, বীরেন ঘোষ, আর রাম মজুমদার—কেবল এই তিনজন ঘাটে ছিলেন—রাম মজুমদার নৌকো ভেড়াতে বললেন, সুরেশ আর বীরেন শ্রীঅরবিন্দের সহযাত্রী হলেন। নৌকোটি সাধারণ, ফরাসী নৌকো আদৌ নয়—একথা বলার প্রয়োজন তখন (১৯৪৪ সালে) হয়নি, কিন্তু হয়েছিল পরে, যখন একটি ফরাসী পুস্তকের বিবরণকে শ্রীঅরবিন্দ সংশোধন করতে চেয়েছিলেন ১৯৪৬ সালের ১৩ই নবেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে। (শ্রীঅরবিন্দ অন্ হিমসেলফ্ পৃঃ ১১২—১২২)

শ্রীঅরবিন্দ অল্প কথার মানুষ ছিলেন। উপরন্তু, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘটনার উল্লেখ করার সার্থকতা যে নেই এ-কথাও সকলেই মেনে নেবেন। কোনো ঘটনার অনুল্লেখ থেকে সব সময়ে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সে-ঘটনা ঘটে নি। অনুল্লেখের অনেক কারণ সম্ভব। নিষ্প্রয়োজনীয়তা, গোপন রাখার উদ্দেশ্য, স্মৃতির বিলোপ বা অস্পষ্টতা, ইত্যাদি। আমার ঠাকুরদাদা ১৯১০ সালে রামধন মিত্র লেনের একটা বাড়িতে রাস্তার ধারে একতলা ঘরে বসে বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে অরবিন্দ ঘোষ এসে যে-ভাবে তাঁর সহায়তায় পলায়নের প্রথম পর্ব সমাপ্ত করেন, তার যথাযথ বর্ণনা আমি ঠাকুরদাদার মুখ থেকে সেইদিনই শুনি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করি। সে-বর্ণনা শ্রীঅরবিন্দের জীবদ্দশাতেই মৌখিকভাবে অনেকের কাছেই বলে আসছি, তবে ছাপার অক্ষরে সেটি, বেরোয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬৬ সালের ১লা শ্রাবণ। তার সত্যতা সম্বন্ধে আমি কোনো কালেই সন্দেহ করিনি, এবং এখনো করি না। সমীরকান্তের এ-সিদ্ধান্ত দুষ্ট এবং অযৌক্তিক যে, শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্টত আমার ঠাকুরদাদার বর্ণিত কাহিনী অস্বীকার করেছেন। অস্বীকার বা স্বীকার করবার উপলক্ষ্যই আসেনি।

সমীরকান্ত আর একটি "প্রামাণ্য জীবন-স্মৃতি" এই একই কাহিনীর আই-উইটনেস বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর স্বপক্ষে। এই জীবন-স্মৃতির লেখক ছিলেন 'সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নৌকো করে চন্দননগরে গিয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র বলছেন, রাম মজুমদারই খবর আনেন যে অরবিন্দের নামে আবার ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। এ-সূত্রে শ্রীঅরবিন্দ কারও নাম করছেন না, শুধু বলছেনঃ

I received the word on information given by a high placed police official;

এবং যেহেতু সুরেশের উদ্ধৃত বিবরণ অরবিন্দের উদ্ধৃত বিবরণের ৪।৫ মাস পরে লেখা, আমরা অনুমান করতে পারি যে, হয় অরবিন্দের স্মৃতি থেকে রাম মজুমদারের বার্তা বহন ব্যাপার মুছে গিয়েছিল, নয় উনি ইচ্ছে করেই তার নাম গোপন রেখেছিলেন। কে যে সেই high placed police official তাও প্রকাশ করেননি।

সীক্রেট সোসাইটিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মুলমন্ত্র হওয়া উচিত মন্ত্র-গুপ্তি। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ সালে ছিলেন কেবল poet and politician; একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন (Sri Aurobindo on Himself p. 348)ঃ

"I knew precious little about philosophy before I did the Yoga and came to Pondicherry—I was a poet and a politician, not a philosopher". (4-9-1934)

ঐ গ্রন্থের ৩৪১ পৃষ্ঠায় ও'র আর একটি বক্তব্য পাইঃ

Politics, war, revolution are things of stratagem and ambush—one cannot expect the truth there ....Secrecy is perfectly admissible and usual in spiritual matters except in special relations like that of the Shishya to the Guru.

১ দেশ, ২৫ শ্রাবণ, ১৩৬৬ 'আলোচনা'।

আর উক্ত গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় ও'র স্বীকৃতি রয়েছে যে, উনি চন্দননগরে এবং পণ্ডিচেরীতে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ও'র ফিকির (manbeuvre) অনুযায়ী কর্মযোগিন্ কাগজের মুদ্রাকরের নামে নালিশ রুজু হয়, এবং সে খালাস পায়।

দেখা যাচ্ছে, চন্দননগরে পলায়ন করার আর তার কিছু পরেও ওঁর ধরা পড়বার ভয় ছিল। ও'র তৎকালীন আদর্শবাদে stratagem ও manoeuvre প্রভৃতির প্রয়োগে বাধা ছিল না। তবে যেটুকু যোগাভ্যাস তিনি করেছিলেন তার ফলে কিম্বা বুদ্ধিবলে টের পাওয়া সম্ভব, কার সহায়তা কোন্ বিপদে কী ভাবে পাওয়া যেতে পারে। সেটা বোঝবার ক্ষমতা ছিল ও'র নিশ্চয়, যখন উনি আমার ঠাকুরদাদার সহায়তা চান। হয়তো একথাও উনি জানতেন যে ও'র মাতামহ রাজনারায়ণ বোসের সঙ্গে আমার পিতামহের বন্ধুত্ব ছিল, এবং সেইজন্য সহানুভূতি সহজেই পাওয়া যাবে, এ-ধারণা স্বাভাবিক।

আর একটা বুদ্ধির কাজ হয়েছিল, যখন অরবিন্দ, রাম, বীরেন আর সুরেশ কর্মযোগিন আপিস থেকে গঙ্গার ঘাটে যাবার জন্যে বেরুলেন। সমীরোক্ত সুরেশের আই উইট্‌নেস বিবরণই আমি এখন বিশ্বাস করছি :

প্রথমে বেরুলেন অরবিন্দ ঘোষ ও রাম মজুমদার; তাদের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে বীরেন, বীরেনের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সুরেশ নিজে। দল বেঁধে বেরুলে ধরা পড়বার আশঙ্কা। সুতরাং এঁরা পলায়নপদ্ধতির এই প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে চললেন। "বরাবর ধর্ম-কর্মযোগিন্ আপিস থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তিনজন সহচর ছিলেন"—সমীরকান্তের এ অনুমান ভিত্তিহীন। দুজন (বীরেন ও সুরেশ) গোড়া থেকেই অরবিন্দের কাছে 'অদৃশ্য' থাকার ব্যবস্থা করেই বেরিয়েছিলেন। মাঝপথে রাম মজুমদারের 'অদৃশ্য' হওয়ারই কথা। কেননা তিনিই কোনো 'অদৃশ্য' উপায়ে পুলিস ওয়ারেণ্টের খবর আনেন। সুতরাং অরবিন্দের সঙ্গে বরাবর ঘাট পর্যন্ত তাঁর যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হত না। ঘাটে গিয়ে চারজনে মিলিত হবার প্ল্যান করেই বেরিয়েছিলেন। একটু পথ রাম মজুমদার শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে গেলেন, তার একটা কারণ এ হতে পারে যে, অরবিন্দ আড়ালে রাম মজুমদারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, বা রাম মজুমদার অরবিন্দকে বলতে চেয়েছিলেন, সার্চ ও ওয়ারেণ্টের খবর কীভাবে সে পেয়েছে। ১৯৪৬ সালে অরবিন্দ এ-ঘটনা সম্বন্ধে বলছেন :

It was not Gonen Maharaj who informed me of the impending search and arrest, but a young man on the staff of the Karmayogin, Ramchandra Mazumdar, whose father had been warned that in a day or two the Karmayogin office would be searched and myself arrested. (Pp. 118)

রাম মজুমদারের একথাটা কর্মযোগিন আপিসে সকলের সামনে না বলারই কথা। বললে সুরেশ চক্রবর্তীর বিবরণে তার উল্লেখ থাকত নিশ্চয়। তাই আমার অনুমান, অরবিন্দকে ব্যাপারটা রাম মজুমদার আলাদা করে বিশদভাবে বলেছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে একটু পথ ঐ দুজনে এক সঙ্গে চলেছিলেন।

এইবার দেখা যাক, কোন্ পথে তাদের গঙ্গার ঘাটে গিয়ে থাকবার সম্ভাবনা। যাবার তাড়া খুবই ছিল। এই ঘটনা প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন :

There was no time to inform her—এখানে সিস্টার নিবেদিতাই her-শব্দে উদ্দিষ্ট। তার পরেই লিখলেন :

I sent someone from the office to Nivedita to inform her—যার থেকে বোঝা যায়, নিবেদিতাকে ও'র কলকাতা ত্যাগের খবর দেবার দরকার ছিল কিন্তু সময়াভাবে দিতে পারেননি। যাবার তাড়া এত।

শ্যামপুকুর লেন থেকে বেরিয়েই ও'দের শ্যামপুকুর স্ট্রীটে পড়তে হয়। শ্যামপুকুর স্ট্রীট দিয়ে সোজা পশ্চিমদিকে চলে গেলে তখনকার শ্যামপুকুর থানার সামনে দিয়ে যেতে হত। অত বড় দুঃসাহসিক কাজ

করবার চেষ্টা করাটা বোকামি। অতএব, শ্যামপুকুর লেনের পরই অরবিন্দকে রামধন মিত্রের লেনে প্রবেশ করতে হয়।

রাম মজুমদার অরবিন্দের সঙ্গ ত্যাগ করে একলা শ্যামপুকুর থানার সামনে দিয়ে চলে গিয়ে থাকতে পারেন, কারণ তাঁর নামে ত কোনো ওয়ারেণ্ট ছিল না। অরবিন্দ ঘোষ তার পর একাকী রামধন মিত্র লেনে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তেলিপাড়া লেন দিয়ে বেঁকে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে বেরিয়ে যেতেও পারতেন না। কারণ তেলিপাড়া লেনের L-এর মতন আকৃতি এবং ঐ লেন আবার শ্যামপুকুর স্ট্রীটে যেখানে এসে পড়েছে সেই মোড়টা তৎকালীন শ্যামপুকুর থানার গেট থেকে সহজেই দেখা যেত। সেই গেটে সর্বদাই পুলিস মোতায়েন থাকত। সুতরাং যে-অরবিন্দকে পুলিস গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই অরবিন্দকে তখন ওখান দিয়ে যেতে দেওয়া আদৌ নিরাপদ ছিল না। অগত্যা অরবিন্দের গতি রামধন মিত্র এবং তেলিপাড়া লেনের যোগ-স্থল অতিক্রম না করে তৎপূর্বেই একটা শর্ট-কাট্ ধরবার সম্ভাবনা। তাই তেলিপাড়া লেন না ছাড়িয়ে আমার ঠাকুরদাদার আড্ডা-স্থলে উপস্থিত হয়ে অরবিন্দ একটা শর্ট-কাট করেছিলেন বলেই মনে হয়—সে কোন পোড়ো জমি পার হয়েই হোক্ আর এঁদো গলি দিয়েই হোক্।

সমীরকান্তের একটা ছোট্ট পয়েণ্টের জবাব দিয়ে রাখি। আমি এখনও বিশ্বাস করি অরবিন্দ ভাল ইংরিজী ও টাইপরাইটিং জানতেন বলে তাঁর হাতের লেখা 'কারেকশন' পর্যন্ত পুলিসের হাতে পড়েনি, তাই প্রমাণাভাবে তিনি সিদিশানের চার্জ থেকে আইন মতই খালাস পেলেন।

দেখছি আমারও এখন একটু শর্ট-কাট করা দরকার। সবুজ পাতার ডাকে শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গের অবতারণা যখন করেছিলুম, তখন থেকে এক মাস চলে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ বারো বছর আগে—১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে—বলেছিলেন :

August 15th, 1947 is the birthday of free India. It marks for her the end of an old era, the beginning of a new age....I take this coincidence, not as a fortuitous accident, but as the sanction and seal of the Divine Force that guides my steps on the work with which I began life, the beginning of its full fruition......India today is free but she has not achieved unity. ....the old communal division into Hindus and Muslims seems now to have hardened into a permanent political division of the country. It is to be hoped that this settled fact will not be accepted as settled for ever or as anything more than a temporary expedient....the partition must go ......

কবে যে এই শুভদিন আসবে, তা জানি না। ভক্ত নীলকণ্ঠের গানের প্রথম কলি মনে পড়ে :

"কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার !" শুধু একটা কথা বার বার ভাবি যে, সেকালের মডারেট-দলের দুজন বাঙালী নেতা—স্যার সুরেন বাড়ুয্যে আর ভূপেন্দ্র বোস—ন্যাশনালিস্ট অরবিন্দ ঘোষকে অত শ্রদ্ধা করতেন কেন? সুরেন বাড়ুয্যের জামাই বিজয় চাটুয্যে একদিন আমায় বলেছিলেন যে, তিনিও 'বন্দে মাতরমের' জন্যে অনেক প্রবন্ধ লিখে দিতেন। একথা শোনবার সুযোগ পাই সাহিত্য-সেবক সমিতির একটি সভা বসবার অব্যবহিত পূর্বে। তাই মনে হয়, ভিতরে ভিতরে বাঙালী মডারেটরা অরবিন্দের আদর্শ আর নিজেদের আদর্শের মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য দেখতেন না। অরবিন্দকে যখন পুলিস হাতে দড়ি বেঁধে আর কোমরে দড়ি জড়িয়ে গ্রেপ্তার করেছিল, ৫।৫।১৯০৮ সালে, তখন ভূপেন বোস পুলিসকে ভৎসনা করে ঐ দড়ি খুলিয়ে দেন। (Sri Aurabindo on Himself 87)

প্রমথ চৌধুরী তাঁর বড় ভাই 'আশু চৌধুরীর মতনই 'মডারেট' ছিলেন। তাই তিনি সুরট-কংগ্রেসের মডারেট সভাপতির ওপর এক্সট্রীমিস্টদের বিনামা-বিক্ষেপকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন যে, দেশ একটু বেসামাল হলে সুরটে পরিণত হয়। কিন্তু এতদিন পরে ঐ ঘটনার দিকে পিছু ফিরে দেখলে কি মনে হয় না যে, চরমপন্থীরা চাইতেন জুতো মেরে মন্তর নিতে? সে-গল্প নতুন করে ফলিয়ে বলবার দরকার নেই, সংক্ষেপে বলি :

একজন ছোট জাতের বড়লোকের শখ হয় একটি বড় জাতের 'গুরু' করবেন। কিন্তু গুরুটি মন্তর দিতে ইতস্তত করছেন, এই সংবাদ পেয়ে সে তাঁকে বলে পাঠায়—"কী? মন্তর দেবেন না? জুতো মারবো, মন্তর নেবো!"—

তথাপি প্রমথ চৌধুরী Dyarchy-কে দু'ইয়ার্কি বলতে ছাড়েননি। যখন 'দু'ইয়ার্কি'র প্রবর্তন হয়, তখন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবকে একদিন বলেছিলুম : আপনার কাজও এখন বাড়ল, বাংলা সাহিত্য-সেবায় আর তত সময় দিতে পারবেন না, বোধ হয়। উনি বললেন : কাজ বাড়ল না, বরং কমল। যে-কাজ আমরা কজন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বাররা করছিলুম, সেই কাজের অনেকটা এখন চারিয়ে যাবে মিনিস্টারদের হাতে। আমি প্রশ্ন করলুম : তাহলে রিফরমস্ মানে কেবল এই? উনি রাজোচিত উত্তর দিলেন : তা ছাড়া আর কি?

বাংলা সাহিত্যের আসরে সবুজপত্রের পালা-গান শুরু হওয়ার পর পিঠ-পিঠ দুই পালা-গান আমাদের কাছে রূপায়িত হয়েছিল—চিত্তরঞ্জন দাশের "সাগর-সঙ্গীত" আর বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্রের "গায়ত্রী"। চিত্তরঞ্জনের "নারায়ণ" পত্রিকাটিও সবুজপত্রের আহ্বানে আবির্ভূত হয়। চিত্তরঞ্জন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, নিজেকে বলি দিয়ে দেশকে সেবা করে। এ-দেশের নাম আজ সসাগরা ধরণীতে সুবিখ্যাত। তার নর ও নারায়ণের কৃপায় আজও বাংলাদেশ সবুজ। সুতরাং তাদের জয়গানে এ-যুগেও বলা যায়—

নারায়ণ নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো যয় মুদীরয়েৎ॥

(ক্রমশ)
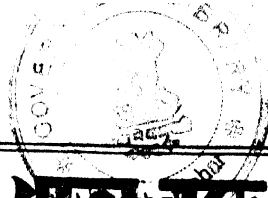
গৌরকিশোর ঘোষ

ছত্রিশ

ইস্কুলের ছুটি অনেকক্ষন হয়ে গিয়েছে। মাস্টার মশাইরাও প্রায় সকলেই চলে গিয়েছেন। সাগর একাডেমির হেড-মাস্টারের ঘরখানা ছাড়া ইস্কুলবাড়ির আর সব ঘরের দরজা বন্ধ করে শ্রীকণ্ঠ বেহারা বারান্দায় বসে ঢুলছিল। মেজবাবু কখন বাড়ি যাবেন, কে জানে?

ইস্কুলের মাঠে খেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে লেগেছে। হঠাৎ ইস্কুলের ঘণ্টায় ঢং করে শব্দ হতেই শ্রীকণ্ঠ ধড়মড় করে জেগে উঠল। দেখল কেউ কোথাও নেই। ঘণ্টাটা দুলছে। নিচে একখানা ঝামা ইট পড়ে আছে। শ্রীকণ্ঠ বেজায় চটে গেল। দৌড়ে নিচে নেমে এল, আনাচ-কানাচ খুঁজল, কাউকে পেল না।

খেলার মাঠের দিকে এগিয়ে যেতেই থার্ড ক্লাসের গোটা আষ্টেক ছেলে ওকে দেখে তালি বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করে দিল: 'উসবতী তু কাঁহাকে যাউঁছি, পায়েতে খড়মড় গলাতে চন্দ্রহাড় নাকেতে বেসড় ঝুলাউঁছি।'

শ্রীকণ্ঠ কটকের লোক। কিন্তু ও বুড়ো হয়ে গেল এই অঞ্চলেই। আগে ও পাইক ছিল। তারপর বহুদিন ধরে হরিশংকর পুর ইস্কুলে দপ্তরীর কাজ করেছে। বয়েস হলে কাজ ছেড়ে বাড়িতে বসেছিল। শেষে এই ইস্কুলটার পত্তন হলে, বছর তিনেক ধরে এখানকার কাজেই লেগে আছে। হরিশংকরপুরের ইস্কুলটা ছিল বড়। হাই-ইস্কুল। আর সাগর একাডেমি হচ্ছে সিভিল ইস্কুল। মেজবাবু হেডমাস্টারও বটেন, সেক্রেটারিও বটেন। তা মেজবাবুর সম্পর্কে কোন নালিশ নেই শ্রীকণ্ঠের। তার অভিযোগ এই ইস্কুলের যত হতভাগা, বদমায়েস, গুণ্ডা, বাঁদর ছেলেদের বিরুদ্ধে। সুযোগ পেলেই ওরা শ্রীকণ্ঠকে ক্ষেপিয়ে মারে।

শ্রীকণ্ঠ তাড়া করতেই ওরা দৌড়ে পালাল। তবে আবার একটু দূরে গিয়ে হাততালি দিতে দিতে গান শুরু করল: 'উসবতী তু কাঁহাড়ে যাউঁছি পায়েতে খড়মড় গলাতে চন্দ্রহাড় নাকেতে বেসড় ঝুলাউঁছি।'

শ্রীকণ্ঠ খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে শ্রান্ত হয়ে হার মানল। বিড় বিড় করে বকতে বকতে ফিরে এল। নালিশ করবার জন্য মেজকর্তার ঘরে ঢুকে দেখল, একখানা খোলা চিঠি চাপা দিয়ে রেখে মেজকর্তা গভীরভাবে কি যেন ভাবছেন। শ্রীকণ্ঠ তাঁকে আর বিরক্ত না করে বাইরে গিয়ে বসল।

মেজকর্তা দুখানা চিঠি পেয়েছেন সেদিন। একখানা ডিস্ট্রিক্ট ইস্কুল ইন্স-পেক্টারের, আর একখানা সুধাময়ের। ইন্সপেক্টারের চিঠিখানা পড়ে বিরক্ত হয়েছেন তিনি। বিরক্ত হবার কারণও আছে। এত খেটে ইস্কুলটা গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি, কিন্তু একটার পর একটা প্রতিবন্ধক এসে তাঁকে কাহিল করে দিচ্ছে। মকর বিশ্বেসই যদিও সব থেকে বেশি টাকা দিয়েছে, তবুও মেজকর্তা গ্রামের আরও অনেকের কাছ থেকে এর জন্য সাহায্য আদায় করেছেন। কেউ জমি দিয়েছে, কেউ বাঁশ-খড়, কেউ বা শারীরিক পরিশ্রম। সাহায্য কেউ কি করত চায়! এদেশের লোক ঘেঁটু পুজোয় মনসা পুজোয় ঘটা করে টাকা খরচ করে, এমন কি সরস্বতী পুজোতেও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে রাজি, কিন্তু ইস্কুল গড়ার ব্যাপারে উপুড় হস্ত করতে চায় না। যা হোক তবুও ত কিছু কিছু তাদের কাছ থেকেও আদায় করেছেন। কিন্তু মেন্দা ছাহেবের ব্যবহারেই সব থেকে বেশি আঘাত পেয়েছেন

মেজকর্তা। মেজকর্তার এই কাজে শরিক হয়নি মেন্দা।

মেজকর্তার ইচ্ছা ছিল, সবাইকে নিয়েই তিনি এই ইস্কুলটা গড়ে তুলবেন। এম ই ইস্কুল নয়, মেজকর্তার ইচ্ছে ছিল একেবারে হাই ইস্কুলের ভিত পত্তন করা। গোপাল বিশ্বাসের ইচ্ছে ছিল না, মেন্দা ছাহেবকে এর মধ্যে মাথা গলাতে দেয়। কিন্তু মেজকর্তার দৃঢ়তা এবং মকর বিশ্বেসের চাপে গোপালও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল।

মেজকর্তা তারপর মেন্দার কাছে গিয়ে প্রস্তাবটা করেন। একটা ইস্কুলের যে দরকার তাঁদের গ্রামে, মেন্দা ছাহেব সেকথা স্বীকার করেছিলেন। এও জানিয়েছিলেন যে, এমন একটা বাসনা মেন্দা ছাহেবের মনে বহুকাল থেকেই আছে। শুনে উৎসাহ বোধ করেছিলেন মেজকর্তা। অনেক আলোচনা, অনেক বৈঠক হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়াল না। মেন্দা ছাহেব একটার পর একটা এমন সব শর্ত করতে লাগলেন, যার কোন মানে নেই। তুচ্ছ সমস্ত ব্যাপার এদের কাছে দারুণ গুরুত্ব নিয়ে হাজির হতে লাগল।

প্রথম ফ্যাকড়া উঠল নাম নিয়ে। সাগর একাডেমি নামটা মেন্দা ছাহেবের পছন্দ নয়। মেন্দা ছাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি মেজকর্তাকে কিছু বলেন নি। কিন্তু নানান রকমে তাঁর আপত্তিটা বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তা কি করে হয়? মকর বিশ্বেস টাকা দিয়ে ইস্কুল করে দিচ্ছেন তাঁর বাবার নামে। এই শর্ত মেনে নিয়েই মেজকর্তা কাজে হাত দিয়েছেন। অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছেন। এখন তাঁকে কি করে বলা যায় যে ইস্কুলের নামটা বদলে দিতে হবে। আর তাতে রাজীই বা হবেন কেন তিনি?

দ্বিতীয় ফ্যাকড়া মেন্দা তুলেছিলেন ইস্কুলের কমিটি বানাবার ব্যাপারে। তিনি বললেন, ইস্কুল কমিটির মেম্বর অর্ধেক হবে মুসলমান আর বাকী অর্ধেক হবে হিন্দু। আবার ইস্কুলের মাস্টার ভিতর নির্দিষ্ট কোটা থাকা চাই।

মেন্দা ছাহেবের এই প্রস্তাবে গোপালরা খুব গরম হয়ে গেল। মেজকর্তা আকাশ থেকে পড়লেন। এরা যে এর মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে ফেলবে, মেজকর্তা সেটা বুঝতে পারেননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল বাছা বাছা কজন লোক নিয়ে ইস্কুল কমিটিটা তৈরী করবে। ইস্কুলের উন্নতিই হবে এই কমিটির আদি এবং অকৃত্রিম উদ্দেশ্য। মেন্দা ছাহেবকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন মেজকর্তা। বলেছিলেন, এটা ইস্কুল, ইউনিয়ন বোর্ড নয়, জেলা বোর্ড নয় কি কাউন্সিলও নয়। ইস্কুল কমিটিতে বেছেগুছে লোক নিলেই কাজ ভাল হবে।

মেন্দা ছাহেব সে কথায় ভোলেন নি। বলেছিলেন, তিনি যে কাজই করুন না কেন, মোছলেম দুনিয়ার খেদমত যেন তাতে হওয়া চাই। মোছলেম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোন কাজ তিনি জান গেলেও করতে পারবেন না। মেন্দা এও শুনিয়েছিলেন, এখন মোছলেম দুনিয়ার ঘুম ভাঙতে লেগেছে। নিজেদের অধিকার সম্মান ইত্যাদি ব্যাপারে তারা খুব সচেতন হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে যে সব ছোকরা লেখাপড়া শিখছে, তারা। মেন্দা মাতব্বর হলে কি হবে, কৌমের রায়ের বিরুদ্ধে যাবার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই।

আসলে এসব কথা যে মেন্দার নয়, তার জামাইয়ের সে কথা বুঝতে দেরি হয়নি মেজকর্তার। মেন্দাকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে চেনেন। তাঁর দুঃখ লাগল, মেন্দার মত লোকও এই রকম গোটা কতক অসার বুলি পাখী-পড়ার মত করে বলতে শুরু করেছেন। আবার তাও কার কাছে? না তাঁরই কাছে। মেন্দার জামাই, ওই ফটিক মিঞার সংগেও তাঁর কথা হয়েছে। ছোকরা এখন নামের আগে মৌলভী লিখতে শুরু করেছে। বয়েসে সুধার চেয়ে বড় হবে না, কিন্তু এরই মধ্যে নূর গজিয়ে দিব্যি ভারিক্কী হয়ে উঠেছে। ফটিক মিঞা বললে বিরক্ত হয় এখন। এখন সে মৌলভী মোদাব্বের হোসেন। চালু নাম মোক্তার মিঞা।

ওই মোক্তার মিঞাই এখন প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের মাতব্বর। মেন্দা ধীরে ধীরে শিখণ্ডীতে পরিণত হচ্ছে। সেই ছোকরাই একদিন সি আর দাসের দোহাই পেড়ে গেল মেজকর্তার কাছে। শুনিয়ে গেল হিন্দু মুসলিম প্যাক্টের কথা। সি আর দাস নাকি স্বরাজ্য চুক্তিতে কবুল করেছেন, হিন্দু মুসলমানের স্বতন্ত্রভাবে অধিকার আদায়ের হক আছে। জন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করেছেন স্বরাজ্যের নেতা সি আর দাস। কাজেই সে চুক্তি ইস্কুল কমিটির বেলাতেই বা মানা করা হবে না কেন? মোক্তার মিঞা মেজকর্তাকে প্রশ্ন করেছিল। তবে কি সি আর দাসের চুক্তি ভুয়া? নাকি হিন্দুরা এখন কথার খেলাপ করছে?

প্রশ্নটার পিছনে জোর ছিল। মেজকর্তা মোক্তার মিঞার মুখিয়ানা দেখে চমৎকৃতও হয়েছিলেন। সংগে সংগে এক রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতার ভয়াবহ পরিণামের কথা ভেবে শংকিতও বোধ করেছিলেন। দাস সাহেব ইলেকসনের বৈতরণী পার হতে গিয়ে যে বিষবৃক্ষের চারায় সার জল ঢেলেছিলেন, এই দু'বছরে তার শিকড় কত দূরে প্রসারিত হয়েছে! আঃ! দাস সাহেবের মত ব্যক্তিকেও সাম্প্রদায়িকতার সংগে আপস করতে হল। কি পেলেন তিনি? কাউন্সিলে একচ্ছত্র মেজরিটি। কিসের জন্য? দলবদ্ধভাবে গবর্নরের কাউন্সিলে বাধা সৃষ্টির জন্য। মেজকর্তা যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছেন। এই দু বছরে কি করলেন তিনি? মন্ত্রীদের বেতন যাতে না বাড়ে, শুধু তাই নিয়ে হৈ চৈ। এর পরিবর্তে কি দিতে হল? সাম্প্রদায়িকতার বাঘের মুখে মাংসের টুকরো। যে আন্দোলন মানুষের মন থেকে এই হিংস্র বাঘকে চিরতরে তাড়িয়ে দিত, তেমন কোন আন্দোলন গড়ে উঠল না কেন? না তাহলে যে জনতার প্রিয় হওয়া যেত না। অনেক

অপ্রীতিকর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হত যে। ভেল্কি দেখান যেত না। তাই কোন নেতাই ত সেদিকে পা বাড়ালেন না।

মেজকর্তা আপন মনেই বললেন, সে আন্দোলনে যে উত্তেজনা নেই। উত্তেজনা না ছড়ালে কোন আন্দোলন যে গড়ে তোলাও যায় না। তাতে যে ঘটা করে লোক জমান যায় না। আর এই অনড় অথর্ব সমাজটার মূলে ধরে যে নাড়া দিতে হত তাতে। মেজকর্তা ভাবলেন, তাতে প্রিয় হওয়ার চাইতে অপ্রিয় হওয়ার ভয়ই যে বেশি।

একটা সোজা কথা কেন আমরা ভুলে যাই? বারবার নিজেকেই বলেছেন মেজকর্তা। ভিত যদি আলগা থাকে, তাহলে তার উপর ইমারত গড়ে যত রঙই লাগাই না কেন, সে ইমারতের আয়ু বেশি হতে পারে না। সোনা ইঁটেই কি মজবুত দালান বানান যায়? আমরা হিন্দু, আমরা মুসলমান, আমরা খৃস্টান, আমরা উচ্চ বর্ণ, আমরা নিম্নবর্ণ, এই যদি আমাদের পাঁজির প্রধান কড়ি হয়, তবে কতদূরে যেতে পারি আমরা? মেজকর্তা অন্তত তার হদিশ জানেন না।

আকর থেকে লোহা এনে, সমস্ত আবর্জনা থেকে লোহাটুকু যেমন নিষ্কাষণ করে ইস্পাত বানাতে হয়, তেমনি করে সাম্প্রদায়িকতার আবর্জনার মধ্য থেকে বাঁকি মানুষকে নিষ্কাষিত করে আনতে পারলে তবেই স্বাধীন সমাজ পত্তন করা সম্ভব। সে বিষয়ে মেজকর্তার মনে কোন দ্বিধা নেই বলেই ত বুড়ো বয়সের শক্তিটুকু একত্র করে একটা চেষ্টায় নেমেছিলেন। সব দিক থেকে বাধা পেয়ে পেয়ে এখন কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠছেন।

মেজকর্তার ইচ্ছে ছিল, সংস্কারমুক্ত শিক্ষার একটা ঘাঁটি তৈরী করবেন। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষের মূল্যে গ্রহণ করবার প্রেরণা জোগাবে, সেই শিক্ষা বিতরণের চেষ্টা করবেন।

তাঁর কলেজী জীবনের চাপা পড়া স্মৃতি বহুদিন পরে তাঁকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করেছিল। বারবার শুধু তাঁর দুটি লোকের কথা স্মরণ হতে থাকে। ডিরোজিও আর বিদ্যাসাগর। দুজনেই শিক্ষাদাতা। শেষ কথা বলার বাতিক ওদের কারোই ছিল না। শিখবার প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়েই ওঁরা কাজ শেষ করেছেন। ওঁদের জ্বালিয়ে দেওয়া মশালের আলোই আজ আমাদের এতদূরে এগিয়ে এনেছে। মেজকর্তা ভাবেন কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, যে আলো আরও চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা আর হচ্ছে না।

তাই ত তিনি শেষ পর্যন্ত মকর বিবেকের প্রস্তাবে রাজী হয়ে পড়লেন। ইচ্ছে ছিল সকলকে নিয়ে পথ চলবেন। পারলেন কই?

মেম্বাররা সরে পড়ল। সরেই শুধু পড়ল না, মেজকর্তা ইস্কুল খোলবার এক
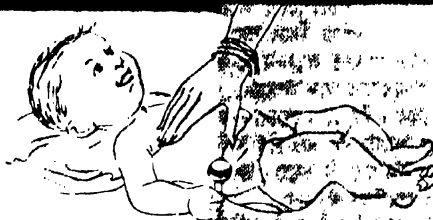
বছরের মধ্যেই মেন্দারা, একটু দূরে, মোছলেম মিডিল মাদ্রাসা খুলল খুব হৈ চৈ করে। এস ডি ও নূরনির হোসেন সাহেবকে নিয়ে উদ্বোধন করাল মোক্তার মিঞা। এস ডি ও সাহেবকে করল প্রেসিডেণ্ট, নজে সেক্রেটারী হল। দশ হাজার টাকা মোছলেম কৌমের তরক্কির জন্য এককালীন দান করে মেন্দা সরকারের সুনজরে পড়ে গেল। খুব গুজব, এই বছরের নিউ ইয়ারে মেন্দা যাতে খান সাহেব খেতাব পান এস ডি ও তার জন্য সরকারের কাছে খুব দরবার চালাচ্ছেন। খেতাব পাবার পর হজ্জ্ করতে যাবেন মেন্দা সাহেব।

কিন্তু এখন এই নির্জন বিকালে, ছুটির পর ইস্কুলে বসে বসে সেজন্য বিরক্ত হয়ে ওঠেন নি মেজকর্তা। মেন্দা সাহেব খেতাব পান, হজ্জে যান, এমন কি মাদ্রাসা খোলার জন্য খয়রাত করাতেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ মেজকর্তার অন্তরে নেই। তিনি দুঃখ পেয়েছেন, শঙ্কিতও হয়ে উঠেছেন একথা সত্য। তবে সে অন্য কারণে। দুনিয়ার হাওয়া যেভাবে বদলাচ্ছে, তা দেখেই কিছুটা হতাশা বোধ করছেন তিনি।

সমস্ত বিচার বিবেচনা ত্যাগ করে সরকার এখন মুসলমান সমাজকে মাথায় তুলে নাচাতে শুরু করেছেন। পরিণাম ভাল নয় বলেই শঙ্কা জাগছে মেজকর্তার। এ গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রেষারেষি প্রকাশ্য বিরোধিতায় এসে দাঁড়াবে, এ যেন ভাবেননি মেজকর্তা।

মুসলমান সমাজ নতুন প্রভু ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এখন দ্রুত সে দূরত্ব কমাতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে। হিন্দু সমাজ পুরনো প্রভু মুসলমানদের বিকল্প বলেই ইংরাজদের কাছে সরে এসেছিল। তাদের ভালমন্দ দোষগুণে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকদিন ধরে আত্মসাৎ করেছে হিন্দু সমাজ। ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত নিতান্ত চাকুরি নির্ভর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিশেষ করে কেরানীদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশে। কি অদ্ভুত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বিপরীত ভাবধারার শত স্রোতে ভাসা।

মাঝে মাঝে অবাক লাগে মেজকর্তার। ইওরোপে একদিন শিল্প বিপ্লব হল, ফরাসী বিপ্লব হল। পুরাতন কাঠামো ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। চিন্তায়, কর্মে জীবিকার্জনের উপায়ে যারা একেবারেই নতুন। পৃথিবীর রঙই যারা বদলে দিল। মানুষ সম্পর্কে ধারণার ভূগোল

অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। যুক্তি, বিবেক, বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে মানুষের নতুন মূল্য নির্ধারিত হল। ইওরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই হল নতুন অর্ঘ্য।

আর আমরাও মধ্যবিত্ত! মেজকর্তা নিজেকে শোনাতে লাগলেন। অতীতের কিছুই বর্জন করিনি। শুধু একটা নতুন কুর্তা গায়ে চাপিয়ে পুরনো চেহারা ঢাকা দিয়েছি। ইংরাজের মারফৎ আমরা এই মধ্যবিত্তয়ানা পেয়েছি। যেন মেকেঞ্জি লায়ালের নীলামখানা থেকে কেনা পুরনো সোফা কৌচ দিয়ে মানস চেতনার চণ্ডীমণ্ডপটা সাজিয়েছি শুধু। তাই আমাদের ব্রাহ্মণত্ব ঘোচেনি, হিন্দুয়ানি যায়নি। এবার মুসলমানও মধ্যবিত্ত উঠছে। ইস্কুল কলেজে ইংরাজী বিদ্যায় হাতে খড়ি নিচ্ছে। আর তাদের মধ্যে মুসলমানত্ব দারুণ বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। উঠতির মুখে সদ্যলব্ধ সাম্রাজ্য হাতে রাখবার জন্য ইংরেজ এককালে হিন্দু তোষণ শুরু করেছিল। এখন পড়তির মুখে এসে সেই সাম্রাজ্য কোন মতে টিকিয়ে রাখবার জন্য সেই ইংরেজ আজ মহোৎসাহে মুসলমান তোয়াজ শুরু করেছে। স্বদেশে থেকে মানব প্রেম, ন্যায়, নিরপেক্ষতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এসে ইংরেজ এদেশে বিভেদ, বিদ্বেষ আর ঘৃণার বীজ বপন করছে। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস!

টেবিলের উপর যে সরকারী চিঠিখানা পড়েছিল, সেদিকে চেয়ে তিক্ত হাসি হাসলেন মেজকর্তা।

ডিস্ট্রিক্ট ইস্কুল ইনস্পেকটার লিখেছেন, আপনার ইস্কুলকে সরকারী স্বীকৃতি আপাতত দেওয়া সম্ভব হইল না। তজ্জন্য দুঃখিত। দুইটি কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইল: (১) আপনাদের গ্রামেরই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মোসলেম মিডিল মাদ্রাসাকে এবার স্বীকৃতি দিতে হইয়াছে। কারণ মাইনরিটি কমিউনিটির মধ্যে শিক্ষার প্রসারের অগ্রাধিকার দানই সরকারী নীতি। এবং (২) আপনার কমিটি যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক নয় বলিয়াও আমরা মনে করি। কমিটির পুনর্গঠন সম্পর্কে আপনারা বিবেচনা করিবেন, আশা করি।

মেজকর্তা চিঠিখানা আরেকবার পড়ে বিরক্ত হয়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। এম ই ইস্কুলের অনুমতিও পাওয়া গেল না। বেশ! মেজকর্তা ভাবলেন, কড়া একখানা জবাব কাল মুসোবিধে করতে হবে। আর ইস্কুলটাকে একছরই হাই ইস্কুলের স্ট্যাণ্ডার্ডে তুলে দিতে হবে। আমার ছাত্ররা নিজের জোরেই দাঁড়াতে পারবে। দুবছরের মধ্যেও যদি সরকারী স্বীকৃতি না পাই, তবে ছেলেদের হরিশংকরপুরের ইস্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়াব। তারপর ধরণা দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। তুড়ি মেরে আমাকে উড়িয়ে দেবে ভেবেছে। পারবে না। চিঠিখানার উদ্দেশ্যে মেজকর্তা বেশ জোরেই কথাগুলো বলে উঠলেন।

শ্রীকণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকল।

মেজকর্তা বললেন, কি চাই রে?

শ্রীকণ্ঠ বলল, আপুনি ডাকিলা না কি?

মেজকর্তা বললেন, না তো। হ্যাঁ শোন, আমার দেরি হবে, তুই বাড়ি যা। চাবিটা আমাকে দিয়ে যা। লণ্ঠনটা জেলে দিয়ে যাস।

ইস্কুল ইনস্পেক্টারের চিঠিখানা পড়ে মেজকর্তা বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সুধাময়ের সুদীর্ঘ চিঠিখানা তাঁকে ভাবিত করে তুলল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ইস্কুলের মাঠে আর ছেলে নেই একটাও। বাজার করে নিয়ে অনেকে হাটতলা থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। কারো কারো কথাবার্তা কানে এসে লাগছে। চেহারাগুলো ধীরে ধীরে স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলছে। শ্রীকণ্ঠ যাবার সময় লণ্ঠনটা হাতের কাছে রেখে গিয়েছিল। মেজকর্তা সেটা উস্কে নিলেন। তামাক খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিন্তু এখানে কোন সরঞ্জাম নেই।

তিন বছর বাড়ি আসেনি সুধাময়। বড়দা, মেজদি, বড়বউ ওর বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। মেজকর্তারও ইচ্ছে, সুধাময় এবার বিয়ে করুক। কিন্তু কোথায় সুধাময়? সেই কবে পরীক্ষায় পাশ করার খবর দিয়ে লিখেছিল, চাকরির চেষ্টায় সে ব্যস্ত, তাই আসতে পারবে না। তার অনেকদিন বাদে লিখল,

শত চেষ্টাতেও চাকরি জোগাড় করতে পারছে না। তারপর কিছুদিন বাদে লিখল, আসাম বেঙ্গল রেলে একটা কাজ পেয়ে সে লামডিং চলল। হঠাৎ কাজে চলে যাওয়ায় বাড়ি আসার সময় পেল না। দু মাস না যেতেই সে কাজ গেল, সেকথাও জানিয়েছিল কলকাতায় এসে। ব্যস্‌ আর তার কোন পাত্তাই নেই। কারও চিঠির জবাব দেয় না। কি করছে না করছে, সেসবও কিছু লেখে না। মেজকর্তা এবার ওকে বিশেষ করে আসতে লিখেছিলেন। আসতে বলার কারণ কি তাও জানিয়েছিলেন। তারই জবাব দিয়েছে সুধাময়। মেজকর্তা প্রায় দু মাস আগে চিঠিখানা লিখেছিলেন আর তার জবাব পেলেন আজ।

সুধাময় স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত বিয়ে করার বাসনা তার নেই। কারণ নিদারুণ অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের মধ্যে সে বাস করছে। কোন চাকরিই সে আর জোগাড় করতে পারেনি এর মধ্যে। পারবে কিনা, তাও জানে না। এমতাবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এর জন্য সুধাময় সকলের কাছেই ক্ষমা চেয়েছে।

বড় বউ শুনলে খুব দুঃখ পাবে। সুধা অন্ত প্রাণ তার। সুধাময়কে একবার দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু মেজকর্তা সেজন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হন নি। ভাবিত হয়েছেন অন্য ব্যাপারে।

সুধাময় লিখেছে ঃ

অনুভব করছি এমন একটা কিছু করবার যাতে সব গ্লানির স্খলন হয়। নিশ্চিন্ত-ভাবে বুঝতে পেরেছি ইংরেজ যতকাল এদেশে আছে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমার দেশে আমি প্রতিষ্ঠা পাব না। আমার দক্ষতা যতই থাক, জ্ঞান যত বেশিই থাক কিন্তু আমি ইংরেজ নই, মাত্র এই কারণেই যোগ্য পদে আমাকে নিয়োগ করা হল না। নিতান্ত আজ এক ইংরেজের বাচ্চাকে তিনগুণ মাইনে দিয়ে আমার উপরে বসিয়ে দেওয়া হল। সেই অপমানে আমি রেলের চাকরি ছেড়েছি। চাকরি ছেড়েছি, কিন্তু অপমানের জ্বালা ভুলতে পারছি না। শুধু এই একটি মাত্র ঘটনাই নয়। আরও অনেক দাগ বুকে জমেছে। চাকরি করার মোহ আমার ঘুচেছে। এখন যাঁর চাকরি নেব ভাবছি, আমি জানি তিনি আমায় কখনও পায়ে ঠেলবেন না। এ'র কাজে মরেও সুখ। দেশের মুক্তি না হলে, আমার দেশ আমার না হলে, আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই কাকা, এখন আমি কাজের মত কাজে লাগব, এমন কাজ যার মূল্য কখনও কমবে না, যার গৌরব ম্লান হবে না। যে পথে আমরা চলেছি, সে পথে ফুলের মালা নিয়ে আমাদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকবে না তা জানি। জীবনের জয়গান জহ্লাদের শোণিতসিক্ত হাতে যাঁরা রচনা করে গেছেন, তাদেরই অনুসরণ শ্রেয়।

সুধাময়ের এই চিঠিখানার শব্দে শব্দে যে আক্রোশ ফুটে বেরুচ্ছে তাই নয়, কেমন একটা স্খলতার পরিচয়ও সর্বত্র ছড়ান। পরিষ্কার অর্থই বা কি? কি করতে চায় সুধাময়।

একটা জিনিস বোঝা গেল, সুধাময় আবার দেবতা বদলেছে। স্পষ্টই লিখেছে, কাউন্সিলে ঘটা করে ঢুকে বিরোধিতা-বিরোধিতা খেলায় ইংরেজের শাসন টলানো যাবে না, অহিংসার নির্বীর্য প্রতিরোধেও মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের আসন তিলমাত্র টলানো যাবে না। সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরাজ চাই, স্বরাজ চাই বলে চেঁচালেও ইংরেজ স্বরাজ দিয়ে দেবে না। ইংরেজকে তাড়াবার ভাষা একটিই আছে, বুলি নয় গুলি, একথা যাঁরা বলেন তাঁরা আমার নমস্য।

না, সুধাময় কোন অস্পষ্টতা রাখেনি।

নূতন দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছে, সে কথা বোঝাই যাচ্ছে। অসহিষ্ণু, একালের ছেলেরা বড্ড অসহিষ্ণু। মেজকর্তার মনে পড়ল তাঁর কলেজী জীবনের কথা।

তখন তাঁদের মনেও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এমন ক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে নয়। উত্তেজনা যে কম ছিল তাও ত নয়। মেট্রোপলিটান কলেজে গিয়ে যেবার তিনি ভর্তি হলেন, সেইবারই কি দারুণ হৈ চৈ হয়ে গেল সুরেন বাড়ুজ্জেকে নিয়ে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। তাই নিয়ে ছাত্রমহলে কি সাংঘাতিক আলোড়ন। সি আর দাস তখন শুধুমাত্র চিত্তরঞ্জন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। কলকাতার অবিসম্বাদী ছাত্র নেতা। পোশাক আসাকের বাহার দেখেই গ্রামের এই লাজুক ছাত্রটির তখন চোখ ছানা বড়া হয়ে যেত। তখন ছিল স্টুডেণ্টস এসোসিয়েশানের প্রতিপত্তি। গরম গরম বক্তৃতা তখনও শুনেছিলেন মেজকর্তা। পরাধীনতার গ্লানি অন্তরে বেজেছে। তবু যেন ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ তখন জেগে ওঠেনি।

বিশ্বাস ছিল তার ন্যায় বিচারের প্রতি। তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন ইংরাজের সংস্পর্শে এসে নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছি আমরা। আমরা উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারলে আমাদের ভাগ্য গড়বার অধিকার আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়ে যাব। তাঁদের বিশ্বাস ছিল মানবতার উদার বন্ধনে দুটো দেশের মনে রাখী বাঁধা হবে। ভারত আর ইংলণ্ড, এত শুধু মাত্র দুটো পৃথক ভৌগোলিক সীমানা নয়, দুটো সভ্যতার প্রতীক।

মেজকর্তা ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। তিনি জানেন, সভ্যতা কোন বিশেষ জাতির বা দেশের বণ্টানিয়োগ্য মাল নয়। সভ্যতায় সমগ্র মানবজাতিরই অধিকার আছে। পৃথিবীর যে কোনও কোণেই সভ্যতার উন্মেষ হোক না কেন, তার প্রসাদ মানুষ-মাত্রেরই প্রাপ্য। এ-অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। ভারত একদিন সভ্যতার শীর্ষে উঠেছিল। একদিন আবার সে ধীরে ধীরে নিভে গেল। উঠল আরব সভ্যতা। তার কাজ শেষ করে সে বিদায় নিল। ইওরোপীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণ হল। ভারতীয় সভ্যতার সুকৃতির বহু ফল আরব সভ্যতা আত্মস্থ করেছিল, আরব সভ্যতার অনেক রোশনাই ইওরোপের নতুন সভ্যতার উন্মেষে সাহায্য করেছে। ইওরোপীয় সভ্যতার একটি ধারাই ইংরেজ আবার বয়ে এনেছে। তাই ত আশা হয়েছিল, এই নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের জড়ত্ব ভাঙবে। ছোট ছোট নিষেধের বন্ধনে যে বিরাট মানবাত্মা সতত পীড়িত হচ্ছিল এদেশে, নবীন স্রোতের বিরাট প্লাবনে সেসব বন্ধন ভেসে চলে যাবে।

কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। শিক্ষকের ভূমিকার চেয়ে ইংরাজ শাসকের ভূমিকার প্রতিই পক্ষপাত বেশি দেখাল। এতে সে জগতের ক্ষতিই শুধু করেনি, নিজেকেও অনেক দীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। নিজের সভ্যতা, নিজের সংস্কৃতির প্রতিই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গণতন্ত্রের পবক্তা ইংরেজ ভণ্ড বলে পরিণত হয়েছে।

আপাতবিরোধিতার জন্ম যে ইংরেজ এদেশে কত দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে ইংরেজী শিক্ষা এককালে সমগ্র ভারতে একাত্মবোধের জন্ম দিয়েছিল, সেই ইংরেজী শিক্ষাই এখন 'ডিভাইড এণ্ড রুলের' চক্রান্তে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতার জন্ম দিচ্ছে। এমন দিন আসবে, মেজকর্তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আসবেই, যখন এই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাই সমস্ত রকম সংকীর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে। গোঁড়ামি[illegible] [illegible]রক-বাহক এবং প্রচারক হবে এরাই।

এদেশের চিন্তারাজ্যে যে অগ্নি-সংস্কার হওয়া উচিত ছিল, ইংরেজ তা ঘটতে দেয়নি। সে পুরাতনের সঙ্গে সর্বতোভাবে রফা করেছে। তাই অধ্যাত্মবাদের জীর্ণ খোলস এখনও আমরা আঁকড়ে ধরে বসে আছি। শিল্প বিপ্লবের প্রসার হতে ইংরেজ দিল না, দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের দ্বারা যে ইংরেজ নিজের দেশে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করল, জীবিকা অর্জনের নতুন উপায় বের করল বিজ্ঞানের কল্যাণে, সেই ইংরেজ ভারতে গাঁটছড়া বাধল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে। রফা রফা রফা। স্বভাবজ বানিয়া বুদ্ধির নির্দেশে ইংরেজ শুধু রফাই করে গেল।

নিজের দেশে যে ইংরেজ আইনের রাজ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই ইংরেজ 'রুল অব ল' ছেড়ে ভারত শাসন শুরু করল 'রেগুলেশন লাঠির' দাপটে। নিজেকেই বারবার অস্বীকার করেছে ভারতের ইংরেজ প্রতিনিধিরা।

যে লিবরেল ভাবধারা এদেশে উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিল, ইংরেজ তাকে বুঝতে পারেনি। অবহেলা উপেক্ষায় তার পরিপুষ্টির অভাব ঘটিয়েছে। এবং তার ফলে উগ্র হিংস্র ইংরেজ বিদ্বেষ সৃষ্ট হয়েছে এদেশে। সুধাময়দের রক্তে বিদ্বেষের সেই আগুনই বুঝি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে আবার। এরই নাম কি প্রতিফল?

মেজকর্তার চোখের উপর কত আন্দোলন হয়ে গেল, কত ঝড় বয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদ, নন-কো-অপারেশন, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স—নরম গরম অনেক আন্দোলন। কত রকম দাবি উঠল। হোম-রুল, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। এখন 'স্বরাজ' চাইতে এসে ঠেকেছে।

দেশে নাড়া যে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই মেজকর্তার। সন্দেহ আছে এই নাড়ার পরিণাম সম্পর্কে। বিদ্বেষের আগুন শুধু পরকে পুড়িয়েই থামে না নিজেরও যে মুখ পোড়ে তাতে সম্ভবত সেকথা বোঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সুধাময়। সুধা ত ছেলেমানুষ। মগজের চেয়ে রক্তের তেজেই বেশি বিশ্বাস তার। কিন্তু নেতারাও কি একই ঘূর্ণিতে ঘুর-পাক খাচ্ছেন না?

গতকালের অমৃতবাজারে লিখেছে, মেজকর্তা পড়ছিলেন, গোলটেবিল বৈঠকের কথাবার্তা চলছে। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস যদি নাই দাও, তবে ওরই কাছাকাছি, দায়িত্ব-শীল সরকার একটা গঠন করতে দাও, আপাতত তাতেই চলবে। নেতাদের নাকি এখন এই ভাব।

সুধাময়রা ওতে সন্তুষ্ট নয়। উগ্রতর পথ অবলম্বনের কথা ওরা ভাবছে। মেজকর্তা অন্য কথা ভাবছেন। রাজনৈতিক চেতনা আমাদের যতদূর বিকশিত হবার তা ত হয়েছে। সামাজিক চেতনা আমাদের সেই তুলনায় এগিয়েছে কি? রাজনৈতিক পরিবর্তনে দেশ খানিকটা এগোয়, মানুষ এগোয় সামাজিক পরিবর্তনে। সম্ভবত একথা বোঝার মত ধৈর্য আজ আর কারোর নেই।

নাঃ, সুধা চিন্তায় ফেলেছে তাঁকে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। কলকাতায় শেষ পর্যন্ত কি তাঁকে যেতেই হবে? হবে বৈকি। সুধার এই চিঠির পর কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়!

নরা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, মাজে-বাবু, বড়দি আর জামাইবাবু আয়েছেন।

মেজকর্তার মাথায় সুধাময়ের কথাই ঘুরছিল। চমকে উঠলেন।

সুধা এসেছে?

নরা বলল, না, বড়দি আর জামাইবাবু আর তিনাদের ছাওয়াল। বাবু, বড়মা কয়ে দেলেন, বাজার করে নিয়ে যাতি হবে আপনারে। ঘরে ত সব বাড়ন্ত হয়েছেন।

মেজকর্তার বুকটা হঠাৎ খুশির ঢেউ-এ তোলপাড় করে উঠল। হঠাৎ গিরিবালারা এল কেন? আগে ত লেখেনি কিছু।

নরাকে বললেন, আলোটা নিভো। দরজায় তালা দে। চল যাই।

(আগামীবারে সমাপ্য)
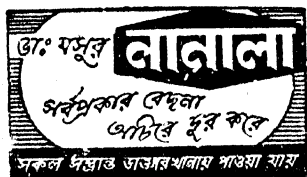
সন্ন্যাসীটা যেন বেমনতরো। যোগ নেই, জপ নেই, ধুনী জ্বালেনা চিমটে-কমণ্ডলু নেই, শুধু বসে থাকে।

তাও সব সময় নয়। ঘড়ি ধরে দেখেছি, রোজ নিয়ম করে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় আসে, সন্ধ্যে হতেই চলে যায়। তারপর আর দেখা নেই, আবার পরদিন পাঁচটা অবধি।

চালচলনও অদ্ভুত। বসে বসে শুধু দেখে। তার মধ্যে সাধুভাব একটুও নেই। দিব্বি সপ্রতিভ ভাবে একে দেখে ওকে দেখে যেন কর্তাঠাকুর মেলা দেখছেন। মাঝে মাঝে কী দেখে যেন উঠে পড়ে; হন হন করে চৌরাস্তার এক রাস্তা ধরে চলতে থাকে, যেন কিছুর পিছু পিছু। কোনো দিন একটু বাদেই ফিরে আসে চৌমাথায়, আবার বসে; কোনো দিন আর ফেরে না।

বাঁধা ভক্ত টক্ত নেই। দৈবে সৈবে দুটো একটা লোক কাছে এসে বসে, গল্পসল্প করে। একদিন এক বুড়ি এসেছিল মন্তর নিতে।

সন্ন্যাসী বললে, হ্যা হ্যা মন্তর। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বুড়ি বললে, কবে দেবে বাবা?

কী রকম মন্তর চাই তোমার?

বুড়ি বললে, আমি তার কী জানি বাবা! তুমি ভালো দেখে একটা মন্তর দিও।

সন্ন্যাসী বললে, না না, এতে কাজ হয় না। মন্তর কি সব এক? কোনো মন্তরে কড়া ঝাঁজ, কোনো মন্তরে মিঠে—সবার সব সয় না। আমাবস্যের দিন এস বুড়ি মা, অনেক মন্তর শোনাবো। তোমার যেটা মনে ধরে সেইটিকে মনে নিও।

এই রকম সব উল্টো পাল্টা কথা। কেউ কেউ বলে লোকটা ভণ্ড। কেউ বলে ও পুলিসের গুপ্তচর—চৌমাথায় বসে, লোকের ওপর নজর রাখে।

একদিন এক জটাধারী তিলকপরা পাক্কা সাধু নিয়ে এলাম, আড়াল থেকে লোকটাকে দেখালাম। চুপি চুপি বললাম, দেখ তো বাবা আমাদের এই বিকেল বেলার সন্ন্যেসীটি সাচ্চা কী দুনম্বর। সাধু শুনে টুনে বললে, আলবাৎ! যদি ঝুটো সন্ন্যাসী হয় তো ওর গেরুয়া পরা চিরতরে ঘুচিয়ে দেব।

নিয়ে গেল সাধুবাবা আমাদের সন্ন্যাসীকে শ্মশান ঘাটের দিকে। আমরা, ভাবলাম লোকটার জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে গেল। পরদিন দেখি ও হরি, মক্কেল হাজির, যেন বাবুটি, আপিস থেকে ফিরে বসে বসে হাওয়া খাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, সাধুবাবা?

সন্ন্যেসী বললে, কামাখ্যা চলে গেল। বড় সজ্জন লোক।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, বাবার ডেরা কোথায়?

সন্ন্যাসী বললে, ডেরা? মানে বাড়ি? বললাম, না না গৃহস্থাশ্রমের খবর জানতে চাইছি না। এখন কোথায় থাকা হয়?

—বাড়িতে।

—কোনো শিষ্যের বাড়ি বুঝি? কাছাকাছি?

—না, নিজেরই বাড়ি। কাছাকাছি নয়, অনেকটা দূরে, শহর পেরিয়ে। রেল-লাইনের ওধারে।

—নিজের বাড়ি! মানে আশ্রম?

—আশ্রম বই কি। সবই তো আশ্রম।

যা প্রশ্ন করি টপাটপ উত্তর দেয়। ঢেকে রেখে যে জবাব দেয় তা নয়, কিন্তু যা বলে তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। চোখের দৃষ্টি অবোলা প্রাণীর মত স্বচ্ছ, কোনো গভীর রহস্যের চিহ্নমাত্র তাতে নেই। তবু লোকটার সবটাই অপ্রকাশ। কাঁচের মন; এপার ওপার দেখা যায়, অথচ মানুষটা অদৃশ্য।

কিন্তু মানুষ আছে তো একটা গেরুয়া ঢাকা খাঁচাটায়? একদিন তাকে ধরা ছোঁয়া যেত। কী ছিল সেই আটপৌরে মানুষটা? কী চেয়েছিল সে? কী পেয়েছিল? কী না পেয়ে চাওয়া ছেড়ে দিল?

সন্ন্যাসী বললে, শান্তি।

বৌ বড় অশান্ত। কথায় কথায় জ্বলে ওঠে। বাধা দিলে প্রলয় বাধায়। তাই লেগে থাকত দৈনন্দিন খিটিমিটি। অন্য

সবাই ভয়ে এড়িয়ে চলত, সবটা ঝক্কি পোয়াতে হত স্বামীকে।

বেচারার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রচলিত যে যে অনুষ্ঠানের দ্বারা স্ত্রীকে খুশী করা যায় তাতে তার গাফিলতি হয় নি। রোজগারের টাকাটা ঘরে পেশছে দিত। আপিসের পর সোজা বাড়ি চলে আসত। ছুটির দিনে বৌকে নিয়ে যেত চিড়িয়াখানা জাদুঘর কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর। স্ত্রীর পছন্দ বুঝে কেনাকাটা করত। স্ত্রীও স্বামীর যত্ন আত্তি খুবই করত, কিন্তু কেন যে হঠাৎ এক একদিন ক্ষেপে গিয়ে অনর্থ বাধাত তা কেউ বুঝত না, স্বামীও নয়।

যেমন তার মাইনে। প্রতি মাসে যা তার পাওনা উচিত তাই পেত, কিন্তু থেকে থেকে এক একবার হঠাৎ স্ত্রী গর্জে উঠত, তার মাইনে অত কম কেন! অমুকের মাইনে তো অমন নয়। অমুকের স্বামীর মাইনে ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে যায় তার স্বামীর মাইনে কেন ঢিমে তেতালার চালে বাড়ে? আসল কথা, চেষ্টা নেই। থাকবেই বা কেন? নিজেরটা তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাচ্ছে! স্ত্রী কী খায় পরে, ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ চোখ ওলটালে কী হবে, সে দিকে ভাববার দরকার তো বাবুর নেই। যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে তেমনিই চলুক।

বাইরেও গঞ্জনা। বন্ধুরা বলত, আগে সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়াতিস আমাদের সংগে, এখন বাড়ির বাইরে তোর টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। আপিসে সহকর্মীরা বলত, ওহে, ঘর সংসার একা তুমিই করো না, আমরাও করে থাকি। ঘরও করি, আবার তাসপাশা ফূর্তি ফার্তি—তাও চলে।

একদিন শনিবার আপিসের পর বাবুরা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেল এক আড্ডায়। তাদের সবার সমবেত চেষ্টায় তার মনের নাটবল্টু গুলো একে একে ঢিলে হয়ে গেল। বাড়ি যখন ফিরল, মন তার ভরপুর এবং রাত প্রায় ভোর।

বৌ ফেটে পড়ল। অগ্নেরো আওয়াজে সে ঘুমন্ত পাড়া নিমেষে জাগিয়ে তুলল, এবং আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলকে জানিয়ে দিল যে এতদিন তার স্বামী ছিল শুধু অকর্মণ্য এবং অপদার্থ; এইবারে সে হল অস্পৃশ্য, ভদ্রসমাজে বাস করার অযোগ্য।

দরজা খুলল না। খুললেও তার স্বামীকে দেখতে পাওয়া যেত না। কারণ স্ত্রীর প্রথম হুংকারেই তার বস উনুনে ছিটকে পড়া তেলের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল, এবং তার অন্তরাত্মা পিলে ভয়ানক চমকে গেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সে চলল পাড়া ছাড়িয়ে।

অনেক ছুটেও তার ছোটা থামল না। কেন, তা তার ভালো মনে নেই। হয়তো অভিমানে। মাইফেলে তো আরও পাঁচজন হাজির ছিল, তাদের তো এমন নাকাল হতে হয় না। মন্দভাগ্য তারই কপালে এমন দুর্গতি কেন?

কিম্বা হয়তো নিছক একটা যাচ্ছেতাই কেলেংকারীর ভয়ে।

ছুটতে ছুটতে একেবারে গংগার ধারে গিয়ে পেশছনোরও কোনো হেতু বিশেষ ছিল না বোধহয়। গংগার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল জ্বালা জুড়োবার উদ্দেশ্যে নয় নিশ্চয়ই, কারণ মাসটা ছিল অঘ্রাণ। জ্বালা যতই হোক, গলা-বরফের মত ঠাণ্ডা জলে ডুবে আত্মহত্যার কথা বাঙলা দেশে বড় একটা শোনা যায় না, পাহাড়ে পর্বতেও কদাচিৎই ঘটে থাকে। তবে গংগা শান্তিদায়িনী এমন একটা ধারণা অবচেতন ভাবে হিন্দুমাত্রেরই মনে [illegible] করে থাকে। তারই বশবর্তী হয়ে হয়তো সে ছুটে এসেছিল গংগার বুকে ছুঁড়তে। এবং অজানতেই [illegible] এসে পড়েছিল নিকটে একটা ধুনীর পাশে, কারণ আগেই বলেছি—[illegible] ছিল [illegible]।

ধুনীর ওপাশ থেকে সন্ত্রস্তকণ্ঠে প্রশ্ন হল, কে?

আগন্তুক মুখ তুলে [illegible] দেখলো [illegible] দুটি [illegible]।

ভাঁ করে সে কেঁদে [illegible]। একটি [illegible] মানুষ—একটি [illegible] পাড়ুনি [illegible] আর [illegible]।

সকালে সে ছিল [illegible] বজায়, আপিস [illegible]। [illegible] সহকর্মীদের অনুরোধ উপেক্ষা [illegible] চলেছিল নতুন দেশে, [illegible] আর ভিতরে [illegible] দিয়ে। এক এক [illegible] পর [illegible] তার চলে গেল। ক্রমে সে হল [illegible]। আরও ঊর্ধ্বে, দেহবন্ধন হারিয়ে সে উঠল একেবারে মহাব্যোমে, যেখানে চলার পথ সবকটাই খোলা, মোক্ষ তার হাতের মুঠোয়। গ্রহনক্ষত্রগুলোও [illegible] পড়ে, [illegible] বলল, আপন আপন কক্ষে আবদ্ধ—তাদের পরিত্রাণ করবে সে, হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে নির্বাণের পথে—

এমন সময় শোনা গেল রাহুর রাক্ষস গর্জন। অতি সন্নিকটে। নির্বাণযাত্রায় বিঘ্ন ঘটল। মুহূর্তে নির্বাপিত সুপ্তচৈতন্য ধিক ধিক করে জেগে উঠল। দেহবোধ ফিরে এল, সংগে সংগে সর্বগ্রাসী একটা ভয় তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, ঠেলে নিয়ে চলল তাকে অভয়ের আশ্রয়ে।

কিন্তু সে কোথায় এসে পেশছল? প্রেতলোকে?

স্থানটা বাস্তবিকই ছিল শ্মশান, তবে আগুনটা ছিল ধুনীরই, নিভন্ত চিতার নয়। চোখজোড়াও ছিল জ্যান্ত মানুষেরই, যার ধুনী তার। সেই প্রশ্ন করেছিল 'কে?' প্রশ্নের জবাবে কান্না শুনে সে, বুঝল

আগন্তুক আর্তজন, সংসারী। কোনো ধাক্কা খেয়ে ছুটে এসেছে, সংসারী জন যেমন আসে। দু দণ্ড থাকে, মন একটু ঠাণ্ডা হলে ভিটের টানে আবার ফিরে যায়।

সাধু জিজ্ঞেস করল, কী হল বাবা?

আর্ত লোকটি মাটিতে মুখ গ‍ুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ধুনীর ওপাশ থেকে কে যেন এসে তার পাশে বসল, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল,

"তুমি কে গো? তোমার কী হয়েছে?"

হাতটি বড় নরম। আবার মুখ তুলে লোকটি দেখল পাশে তার বসে একটি ভৈরবী। সে জবাব দিল,

"আজ্ঞে আমার নাম সন্ন্যাসীচরণ—"

আবার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো কান্না। এমন নরম করে কেউ তো তাকে আগে প্রশ্ন করে নি কী তার হয়েছে। ভৈরবী বললে,

"অমন নাম নিয়ে কাঁদতে নেই গো। বল না তোমার কী হয়েছে?'

তার কী হয়েছে? সে কথা এরা কী বুঝবে? যারা যা খুশী তাই করতে পারে, যেখানে প্রাণ চায় যেতে পারে, যাদের দৈনিক ফর্দ করাতে হয় না, কাউকে হিসেব দিতে হয় না, মেজো-সেজো ছোটো সায়েবের খিঁচুনি যাদের বাঁধা বরাদ্দ নয়, ঘেয়ো কুকুরের পালের মত বন্ধুদের ঘ্যান-ঘ্যানানি যাদের পাগল করে তোলে না, বন্ধুদের ফোঁসফাঁস, অসংখ্যদের হা-হুতাশ, আর সারাদিনের গঞ্জনা আর লাঞ্ছনার পর ঘরে ফিরে কথার পর কথার দুরমুষ যাদের মুখটি বুজে সইতে হয় না—বছরের পর বছর, তারা কী জানবে নিরীহ এই মানুষটির কী হয়েছে!

"একটু পোস্তচচ্চড়ী—"

বলেই সে ককিয়ে উঠল। বুক ফেটে বেরিয়ে এল কান্না।

ধুনীর মালিক সাধুবাবার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। কী দুজ্ঞেয় রহস্য ইহসংসার! কেউ যোগবলে ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বসে গোমুখী পথে—বুঝি স্বর্গটাকে হাতের তেলোয় টেনে আনতে। কেউ ব্রহ্মানন্দে আকণ্ঠ ডুবেও বরণ করে সলিলসমাধি—পিপাসা তাদের সর্বদেহে। কারও জিজ্ঞাসা জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করেও সংবৃত হয় না, তপস্যা শিবসান্নিধ্য লাভ করেও নিবৃত্ত হয় না—আবার কেউ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পুণ্যতোয়া গিরিসুতার চরণে এসে লুটিয়ে পড়ে একটুখানি পোস্ত-চচ্চড়ীর জন্য। শঙ্কর, শঙ্কর।

—"নেবু দিয়ে কড়ায়ের ডাল—"

ভৈরবী বললে, "আর কী? বলো না গো।"

সন্ন্যাসীচরণ বললে, "আর একটুখানি শান্তি। এই তো চেয়েছিলাম। এ আর এমন কী?"

ভৈরবী হাঁপ ছেড়ে বললে, "তাই বলো! এতক্ষণ কী সব ছাইভস্ম বকছিলে!"

ভৈরবী সন্ন্যাসীচরণের পাশে এসে বসেছিল আতুর লোকটাকে একটু সান্ত্বনা দিতে। দুর্বল সংসারী মানুষ, দরিদ্র সংসার, হয়তো বেকার—আর টানতে পারছে না, তাই এসে পড়েছে মা গঙ্গার কোলে।

আহা! দুটো আশার কথা বলে ওর মনে একটু বল দিলে বেচারা আবার উঠে দাঁড়াবে। তাই ভৈরবী ওর মাথায় হাত বুলোতে শুরু করেছিল। কিন্তু প্রথম স্পর্শেই তার শরীর শিউরে উঠল—এ মাথা কার! এ তো সংসারীর নয়! কোন্ ক্ষণজন্মা পুরুষ ছল করে এসেছে রোগা এই মানুষটার দেহে? হাজার বছর তপস্যা করে যে-ধন পায় না যোগী, এ যে তা পেয়ে যাবে এক লহমায়।

মুখ তুলে সন্ন্যাসীচরণ যখন ভৈরবীর মুখের দিকে চাইল, আবার শিউরে উঠল তার গা। ঐ কপাল যার, সেও কাঁদে, হে মা! ঐ চোখ দিয়ে বেরোবে চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতি, সেই চোখে অমাবস্যার অন্ধকার।

সন্ন্যাসীচরণের আকাঙ্ক্ষার ফিরিস্তির শেষ দফা শুনে ভৈরবী আশ্বস্ত হল। অন্ধকারে আলোর প্রথম আভা ফুটল, মন চেয়েছে শান্তি।

আর একে ছাড়া নয়!

ভৈরবী ডাকল, বাবা!

ধুনীর ওপাশ থেকে সাধুবাবা মুখ ঘুরিয়ে ভৈরবীর দিকে চাইলেন। ভৈরবী বললে, "দেখ তো এর দিকে চেয়ে' কী মনে হয়?"

সাধুবাবা কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে সন্ন্যাসীচরণের দিকে চাইলেন। শান্ত ভাসা ভাসা চোখ যেন তাঁর একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখের কোণায় যেন ফুটে উঠল একটুখানি হাসি।

ভৈরবীর প্রশ্ন শুনে তিনি মুখে কিছু বললেন না, শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলেন—হ্যাঁ, এর হবে। ভৈরবী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কী যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাধুবাবা তাকে থামিয়ে দিলেন; ইঙ্গিতে বললেন, ধীরে ভৈরবী, ধীরে।

সন্ন্যাসজীবনে সন্ন্যাসীচরণের প্রথম পদক্ষেপ এইখানেই।

সন্ন্যাসীচরণের জীবনের ইতিহাস পেয়ালা-ভাঙার নকশার মতো। এক টুকরো, তার পর আরেক টুকরো, সংসার, তারপর সন্ন্যাস, কিন্তু দুয়ের যেখানে জোড় সেখানে ফাঁক।

সে ফাঁকটা কল্পনা দিয়েও ভরাট করা যায় না।

নিরীহ সাধারণ একটা মানুষ, আচমকা ভয় পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিল, দৈবে এসে পড়েছিল গঙ্গাতীরে শ্মশানে এক সাধুদের আড্ডায়। সে কী ভেবে সব ছেড়েছুড়ে সাধুদের সঙ্গে জুটে গঙ্গাসাগরের মেলায় চলল, তার জবাবদিহি কে দেবে?

গঙ্গাসাগর স্বচক্ষে দেখলে অনেকেই চায় সন্ন্যাসী হতে। কিন্তু একে গঙ্গাসাগরে ঠেলে পাঠাল কিসে? ঘরে তার স্ত্রী, কোলে ছেলে, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তারা কী খাবে, কে তাদের খাওয়াবে, এ চিন্তা কি সে একবারও করল না? সব কি ভুলে গেল? কিসে, নেশায় না বশীকরণ মন্ত্রে?

তা কি হয়? নেশা টুটে যায়, গেলেই আবার সব মনে পড়ে। আর মন্ত্রবলে কি মানুষের মত বেয়াড়া জীবকে হয় নয় বোঝানো যায়? অথর্ববেদের যুগে কী ছিল জানি না, আজ যা দেখতে পাই তাতে অতটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবই আছে সন্ন্যাসীচরণের। কিন্তু তারা নিজেরা খেটেখুটে কষ্টেসৃষ্টে নিজেদের সংসার প্রতিপালন করে—অপরের সংসার টানবার মতো ক্ষমতা নেই তাদের। একথা সন্ন্যাসী জানত। বেদ-বেদান্ত পড়া মানুষও নয় সে, বৈরাগী হয়ে যাবার কোন ইচ্ছাই তার হয় নি, কোনদিন। ভগবানেও তার ছিল নেহাৎ মামুলী রকমের বিশ্বাস, আর পাঁচজনের মত। 'তোমার কর্ম তুমি করো' বলে সকল দায়িত্ব ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে বিবাগী হয়ে যাবার মত ভক্ত সে নয়। তবে সে কিসের ভরসায় ঘর ছাড়ল?

কেউ বলবে, ঘরে থাকতে সন্ন্যাসীচরণ ছিল স্ত্রীর হাতের পুতুল, বেরিয়ে এসে হল ভৈরবীর। কিন্তু স্ত্রী তো তাকে প্রথম দর্শনেই ভক্ত বলে চিনতে পারে নি, তারও দখল নিতে খানিক সময় লেগেছিল। ভৈরবীর মায়া কি এত দুর্দান্ত যে, একবার মাথা টিপেই সে সন্ন্যাসীর মাথা চিরতরে গুলিয়ে দিল? না, অত চট্ করে কিছু একটা করে ফেলবার সুযোগ ভৈরবী পায় নি বোধ হয়। সাধুবাবা যে তাকে গোড়ায়ই বলেছিলেন একটু রয়ে সয়ে চলতে।

আরও সম্ভাবনা একটা আছে—একটু আধ্যাত্মিক রকমের।

বাবুদের শনিবারের মাইফেলে শরিক হয়ে সন্ন্যাসীচরণের দাম্পত্যজীবনের গাড়ি-খানা হড়কে গিয়ে পড়ল বিরাট একটা খাদে। হয়তো সেই পড়াই হল তার চরম পড়া। তেবড়ে-যাওয়া গাড়িখানার আর এমন ছিরিছাঁদই রইল না যে, তাকে মেরামত করে আবার লাইনে তোলা যায়। অতএব কালোয়াড়েরা যখন তার দেহপিণ্ডটাকে টেনে নিয়ে গেল চুলোর দোরে, অন্তর তাতে বাধা দিল না। বরং একটু আশাই হল মনে, যে তার জীর্ণ অতীতটাকে দাউ দাউ আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিলে হয়তো তকতকে নতুন একখানা কলেবর পাওয়া যেতে পারে।

এও অনুমান।

কী সম্ভব, কী অসম্ভব, এ নিয়ে তর্ক শুধু সমষ্টির বেলায় চলে। আকস্মিক একটা আঘাত যখন বাঁধাধরা জীবনের ধারাকে প্রতিহত করে এবং আঘাতটা হয় প্রচণ্ড, তখন জীবনের স্রোত বাঁধ ছাপিয়ে কখন কোন্ মোহানার দিকে ছুটে চলে, তার একটা গড় নিয়ম হয়তো সমষ্টির উপর খাটানো যেতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের অঙ্ককে জটিল করে তোলে তার বিশিষ্ট সংস্কার এবং অভিজ্ঞতা। এই সব কটা উদ্ভট রাশিকে এক নিয়মের নিক্তিতে ফেলে সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করার চাইতে অনেক নিরাপদ সমাধান হচ্ছে, যা ঘটেছে তাকে নির্বিবাদে মেনে নিয়ে বুদ্ধির পাত্রে নেওয়া: সন্ন্যাসীচরণ সন্ন্যাস বরণ করল।

তার পরের ইতিহাসটাকেও সাজিয়ে লেখবার চেষ্টা বৃথা। টুকরোগুলো দেখে নকশার যেটুকু আন্দাজ পাওয়া যায়, তাই যথেষ্ট।

ভৈরবী সন্ন্যাসীকে শেখায় পদ্ধতি।

যে ক্ষণজন্মা পুরুষ দৈব বিধানে শিশু-মন ধারণ করে এসে পড়েছে তার কোলে, তার গুরু সে, ভৈরবী। আত্মভোলা মহা-জ্ঞানী; সর্বাঙ্গে যার সুলক্ষণ, কপালে ত্রিশূলচিহ্ন। যে একদিন হবে ভৈরবীর গুরু, জগদ্গুরু—সে আজ ভৈরবীর শিষ্য এ চিন্তা মনে এলেই তার রোমাঞ্চ হয়। এখন তার তপস্যা—ঐ দেহে বল দিতে হবে, ঐ মনে শক্তি জোগাতে হবে।

পদ্ধতির পর পদ্ধতি চলল, পরীক্ষার পর পরীক্ষা।

অফুরন্ত আনন্দে দিন কাটে সন্ন্যাসীর। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয় নি। একটি প্রাণী পড়ে আছে তাকে নিয়ে, কখনো খাওয়াচ্ছে, কখনও

মন্ত্র পড়াচ্ছে, কখনো করাচ্ছে তন্ত্রসাধনা। মনে জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, নিরুদ্বেগ—এ অবস্থা ছিল তার স্বপ্নের অতীত।

দৈনন্দিন জীবন দৃঢ় নিয়মবদ্ধ, কিন্তু প্রাণ আকাশের মত উন্মুক্ত। ভৈরবী মাঝে মাঝে বলে, ইচ্ছে হয় গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরে এস। যখন ভৈরবী বলে, তখন মনে হয় সত্যিই গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরে আসা যায়।

অস্বস্তি হয় শুধু যখন ভৈরবী মাঝে মাঝে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে। কী যেন খোঁজে তার চোখে, তার মনের মাঝখানে, কিম্বা আরও তলায়।

সন্ন্যাসীর চোখের মেঘ কেটে গেছে, দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। অবলা প্রাণীর মতো চোখ, শান্ত, যে দেখে তার চিত্ত স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু আলো ফোটে না চোখে। ভাবনায় পড়ে ভৈরবী। পদ্ধতি প্রকরণে তো কোন ভুল হয় নি। পরীক্ষাতেও সন্ন্যাসী সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছে। বাহ্যলক্ষণও সবই মিলেছে। তবু, কী যেন বাকী থেকে গেছে, কী যেন হয় নি।

অনেকদিন কাটল ভৈরবীর, চন্দ্র সূর্যের ছটা সন্ন্যাসীর চোখে দেখবার অপেক্ষায়। শেষে একদিন সাধুবাবার কাছে খুলেই বলল সব কথা।

সাধুবাবা বললেন, পদ্ধতি হল পথ। পথ চলেও না চালায়ও না, শুধু পায়ের গোড়ায় পড়ে থাকে। যে যেতে চায়, তাকে যেতে দেয়। যার যাবার আকাঙ্ক্ষা আছে, শক্তি নেই, সে গুরুর শরণ নেয়, গুরুদর্শিত পথে পা বাড়ায়।

সন্ন্যাসী কি চায় যেতে? কোথায় যেতে চায়?

ভৈরবী স্বীকার করে, আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু নেই তার সন্ন্যাসীর। শক্তি, বিভূতি এসব কিছুই সে চায় না। সেকালের মুনি-ঋষিরা তপস্যা করত, চাইত ব্রাহ্মণত্ব, চাইত ইন্দ্রত্ব। এর না আছে জিজ্ঞাসা, না লিপ্সা। অথচ তার প্রাণ সতেজ, বোধ জাগ্রত—দেহ মনে জড়ত্বের চিহ্নমাত্র নেই।

নিরুদ্বেগ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ওকে টেনে এনেছিল সংসারের চক্র থেকে। দৈব ওর সহায়, তাই বড় সহজে পেয়ে গেছে কাম্যবস্তু। পথ যদি কঠিন হত, হয়তো সুপ্তশক্তি জাগ্রত হত।

সাধুবাবা বললেন, অন্য গুরুর হাতে সন্ন্যাসীকে সমর্পণ করো। উপযুক্ত এক গুরু থাকেন পরশুরামকুণ্ডের পথে, কপিলমুনির আশ্রমে। উগ্রতপা সাধক, বারো বৎসর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছিলেন, এক বৎসর ঊর্ধ্বমুখ। প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তির দিনে বশিষ্ঠাশ্রমে আসেন, পঞ্চকাল উমানাথ মন্দিরে ভূগর্ভবাস করেন। সেই সময়ে ভৈরবী যেন ওকে তাঁর আশ্রয়ে রেখে আসে।

কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন তো শুধু রিপু দমনের জন্য। এ নিষ্পাপ শিশুমনের উপর ও-ব্যবস্থার প্রয়োগ কেন?

সাধুবাবা বোঝালেন, কৃচ্ছ্রের অন্য ফলও আছে।

যে মানুষের চিত্ত জাগ্রত নয়, তার কাছে দেহই মন। দেহের সুখেই তার মনের সুখ, দেহের পীড়াতেই তার মনের অশান্তি। সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন বোধিসত্ত্ব, তাঁরও চেতনাকে জাগ্রত করেছিল বহু-জিজ্ঞাসা নয়, মানুষের দৈহিক ঐহিক ক্লেশ—পীড়া, জরা, শোক। নিরবচ্ছিন্ন সুখ অচেতন মনকে ক্রমে করে তোলে আত্মসর্বস্ব। তখন কৃচ্ছ্রই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানুষে ক্লিষ্ট এবং সেও মানুষ। আঘাতের পর আঘাতে নাভি-কেন্দ্রিক শক্তির তন্দ্রা ভেঙে যায়, গুহাহিত তুষারের স্থির বক্ষ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, আবদ্ধ চৈতন্য উদ্বেলিত হয়ে এক দেহের অণু আবরণ ছিন্ন করে সহস্র ক্লিষ্ট মনের অন্তরে প্রবেশ করে।

ভৈরবী মকর সংক্রান্তিযোগে সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছল কামরূপে।

বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার পথে ভৈরবী তার

শিষ্যকে বলল, তার শেখাবার যা কিছু সবই শেখানো হয়ে গেছে। এবারে এক নতুন গুরুমহারাজ তাকে নিয়ে যাবেন আরো উঁচুতে।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করল, তুমি সঙ্গে থাকবে না?

ভৈরবী বলল, না।

সন্ন্যাসী বলল, কিন্তু—

ভৈরবী হাত তুলে বলল, চুপ। এতদিন তুমি আমার একটি কথায়ও কিন্তু করো নি। আজ করলে বড় কষ্ট পাব। অনেকদিন পথে পথে ঘুরেছি, অনেক গুরুর পায়ের ধুলো নিয়েছি—মুক্তি পাইনি। তোমার মতো একখানা মুখ দেখেছি একদিন হিমালয়ের আকাশে, আর একদিন কন্যা-কুমারীর সাগরে। তুমি আমার গুরু হয়ে আমায় তরিয়ে দেবে। তুমি উঠবে, উঠবে, উঠে যাবে সবার চোখের আড়ালে, মুক্তি পাবে। তারপর, একদিন নেবে এসে আমার হাত ধরে আমাকেও তুলে নিয়ে যাবে। আর কেউ কোনদিন আমাকে দেখতে পাবে না।

ভৈরবী বলতে লাগল, যে গুরুর কাছে তোমাকে সঁপে দেব, ভাববে তিনিও আমি। তিনি যদি দুঃখ দেন, মনে করবে সে দুঃখ আনন্দ। নইলে তোমার কষ্টের দ্বিগুণ কষ্ট আমার হবে। বুঝলে?

সন্ন্যাসীর অবোলা প্রাণীর মত চোখ দেখে বোঝা গেল না, সে বুঝল কি বুঝল না।

গুরু মহারাজের কাছে সন্ন্যাসীকে পৌঁছে দিয়ে ভৈরবী যাত্রীর ভিড়ে মিশিয়ে গেল, উঠতে লাগল কামাখ্যা পাহাড়ে। সঙ্গীরা ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে পড়ল, ভৈরবী একটিবারও থামল না। কামাখ্যা মন্দিরের দরজায় পৌঁছেও সে মন্দিরে ঢুকল না, চড়তে রইল পাহাড়ে। ভুবনেশ্বরীর মন্দির এল, ভৈরবী তবু এগিয়েই চলল।

একেবারে চূড়ায় উঠে ভৈরবী বসল বিরাট একটা পাথরের উপর, সাবেক কালের পুরোনো এক গাছের ছায়ায়। তার চোখ নিচে ব্রহ্মপুত্রের ধারা বেয়ে উঠে চলল উমানন্দের দিকে। তারপর গেল আরও দূরে, যেখানে দিগন্তের ধূসরনীল যবনিকার অন্তরালে সীমা-অসীমের অদৃশ্য সঙ্গতি।

কৃচ্ছ্রের কী ফল সাধুবাবা আশা করে-ছিলেন জানা নেই, তবে সন্ন্যাসীর মনের অবস্থার পরিবর্তন সত্যিই হল।

গুরু মহারাজ নতুন শিষ্যটিকে দেখেশুনে স্থির করেছিলেন, তপের তাপটা তার উপর সইয়ে সইয়ে বাড়াতে হবে। ঘোর তমে নিমজ্জিত মন, তপের মাত্রাটা বেশী হয়ে গেলে কষ্ট এড়াতে গিয়ে মনটা তলিয়ে যাবে আরো গভীর তমোপথে।

কিন্তু ফল দেখে মহারাজের একটু ধোঁকা লাগল। লোকটা টলে না তো! উঁহু আহা মুখে নেই, যা আদেশ দেওয়া যায় তাই পালন করে। মুখভাবে মনে হয় না ক্লেশ লোকটাকে স্পর্শ করে।

আবার কোন প্রশ্নও করে না যে দুদণ্ড তত্ত্ব আলোচনা করে ওর মনের অন্ধকার ঘোচানো যায়। জড় পাথরের মত নির্বিকার লোকটা।

বাস্তবিক, আগেকার একটা সন্ন্যাসী ভেঙে দুটো সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। একজন নিখুঁতভাবে গুরুর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে; আর একজন একটু তফাৎ থেকে চেয়ে দেখছে, চেলা গুরুর আদেশ ঠিক ঠিক মানছে কি না।

গুরুমহারাজের হুকুমের বান্দা যেটি, সেই মানুষটাকেই তিনি দেখছেন, আর অবাক হচ্ছেন, প্রাণীটা মুখ বুজে এত কষ্ট সয় কী করে। উনি বুঝছেন না যে, ওটি প্রাণী নয়, যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রটার পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, মাংসপেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা আছে—কিন্তু অনুভূতির ক্ষমতা আছে অন্য ব্যক্তিটির, যে পাকা মিস্তিরীর মতো মাঝে মাঝে যন্ত্রটার খবরদারী করছে, আর ফাঁকে ফাঁকে নিজের চিন্তা সেরে নিচ্ছে। তার সঙ্গে যন্ত্রটার অনুভূতির লেন-দেন নেই।

গুরুমহারাজ এ খবর জানলে আরও অবাক হতেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বোঝে নি তার এই দ্বিত্বের গুরুত্ব। তার কাছে ব্যাপারটা এত সরল এবং স্বাভাবিক মনে হয়েছে যে, সে এ সম্বন্ধে গুরুকে কোন প্রশ্ন করা আবশ্যক মনে করে নি।

দৈহিক ক্লেশটা অবান্তর। যে অনুভূতিটা কাঁটার মতো তার মনে বিঁধেছে সেটা এই যে সে একটা কিছু পারে নি, যার ফলে ভৈরবীর মনে একটা নৈরাশ্য এসে গেছে। কী পারে নি সে? এই চিন্তাই বার বার তার চিত্তটাকে অধিকার করে বসছে।

বিষয়টা ভৈরবীকে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করে নিলে ভাল হ'ত। কিন্তু গুরুবদলটা এত অকস্মাৎ হয়ে গেল যে, সুযোগ হল না। অতএব, এতদিন সন্ন্যাসীর যে কাজ করতে হয় নি, আজ তাই করতে হচ্ছে। ভাবতে হচ্ছে।

ভেবে ভেবে সে দেখল যে, সাধুসন্ত যত যার সংস্পর্শে সে এসেছে, তারা সবাই যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল তার কখনো হয় নি; তবে কথায়বার্তায় যা শুনেছে তা থেকে তার ধারণা হয়েছে যে, তাদের লক্ষ্যটা স্পষ্টভাবে ধরাছোঁয়ার বা ব্যক্ত করার বস্তু নয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, এগুলো সহজ বাঙলায় বোঝা যায়। কিন্তু এই অন্য জিনিসটি, যাকে নিয়ে সবাই মশগুল অথচ কারো সঠিক খবর আছে বলে মনে হয় না, সেটা কী? একটা বেড়া আছে তাকে ঘিরে, এমনি কথা অনেকে বলে। কেউ কেউ দেখতেও পায়—বেড়া অবধি; কিন্তু তাব অভ্যন্তরের জিনিসটা বোধ হয় কারো ইন্দ্রিয়গোচর হয় নি।

কী আছে সেখানে? কেন সবাই বেড়া ডিঙিয়ে ওইটিকে হস্তগত করতে চায়?

ও'রা যা বলেন, তা থেকে মনে হয় যে, ওটিকে পেলে, চেয়ে না পাওয়ার কষ্টটা চিরদিনের মতো ঘুচে যায়। মনটা এমন-ভাবে থাকে যে, কিছুই দিতে বাধে না, আর সর্বস্ব দিয়েও ভরা মনে একটুও টোল ধরে না।

আচ্ছা, তার মনের অবস্থা তো ঐ রকমই ছিল। তার মনে তো কোন কিছুর চাহিদা ছিল না, মনটা ভরপুর থাকত আনন্দে। যে তার কাছে যা চেয়েছে সে বিনা কুণ্ঠায় তাই দিয়েছে—কারো ফরমাশে তো সে 'না' করে নি। তবে কি সে অজানতে সেখানে পৌঁছেছিল। তা কী করে হবে! তাকে তো কোন বেড়া ডিঙোতে হয় নি। তাছাড়া, যদি সে যেত পৌঁছে, ভৈরবী কি তা জানত না?

কখনো কখনো তার মনে হত, ভৈরবী আশেপাশেই কোথাও আছে। সে নিজে যেমন দেখে তার দেহটাকে, ভৈরবীও হয়তো তেমনি দেখে তার মনটাকে, একটু আড়াল থেকে। ডাকলেই হয়তো আসবে। কিন্তু রাগ করবে। বলবে, 'আমার কথায় অবাধ্য হলে আমার কষ্ট হবে বলি নি?' না, ওকে ডেকে কাজ নেই।

ও বলেছিল গুরু মহারাজকেই ভৈরবীর মতো মনে করে নিতে। কিন্তু ওঁকে তার বর্তমান প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় সমীচীন হবে না। উনি গোলমেলে ভারী গুরু লোক, হয়তো চটে গিয়ে বলবেন, 'যখন যা কিছু করবার আমি বলে দেবো, তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই'। অতএব ওঁর কাছে চুপচাপ থাকাই ভালো।

—অন্য কাউকে ধরতে হবে। মেলায়-পার্বণে কত যোগীপুরুষ আসেন, সুযোগ মতন তাঁদের প্রশ্ন করে বিষয়টা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

পরশুরামকুণ্ডের মেলায় যোগীজন অনেক আসেন, কিন্তু সেবারে নতুন রকমের সন্ন্যাসী এলেন একজন। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, জ্ঞানী-গুণী লোক। ও-অঞ্চলে কোথায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, আর্তসেবা করতে এসে-ছিলেন দলবল নিয়ে, যাবার মুখে ব্রহ্মকুণ্ড পরশুরামকুণ্ড দর্শন করতে এলেন।

গুরুমহারাজের সঙ্গে তাঁর অনেক কথাবার্তা হল। তিনি বললেন, সেবাব্রতে কৃচ্ছ্র অভ্যস্ত সাধকের বড় প্রয়োজন। গুরু বললেন, সেবাও পথ, কৃচ্ছ্রও পথ, কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসরূপে ভিন্ন মূলে এক।

ধীরে ধীরে গুরুকে তিনি নানা প্রশ্ন করলেন তাঁর দীর্ঘ তপোজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। গুরু উত্তর দিলেন, কখনো সোজা ভাষায়, কখনো জটিল রূপকের সাহায্যে।

কথাবার্তার খানিক সন্ন্যাসী বুঝল, অনেক বুঝল না, কিন্তু তার মনে হল এই নতুন লোকটিকে সব কথা নির্ভয়ে খুলে বলা যায়। বিস্তারিতভাবে কথাটা বলবার একটা সুযোগও মিলে গেল। সে বললে সব।

জ্ঞানী পুরুষ শুনে বললেন, "দেখ ভাই, শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে যমজ ভায়ের মতো, কিন্তু দুয়ে তফাৎ একটা পুরো ব্রহ্মাণ্ডের। স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে শূন্য কুম্ভের মতো। শান্তি হচ্ছে পূর্ণ কুম্ভ। স্বাচ্ছন্দ্যও ভাল জিনিস, কিন্তু ঐটেই মনুষ্যজীবনের শেষ কথা নয়। আর দেখ, মানুষ যদি একটা পাথরের পাত্র হত, তবে তার শান্তি পাওয়া খুব দুরূহ হত না। কিন্তু জীবের রাজা এই জীবটির আধার পাথরের পাত্রের মতো স্থির সীমিত নয়। তার সত্তা, তার আধার, কখনো সমুদ্রের মতো বিশাল, কখনো কীটের মতো ক্ষুদ্র। এই বিচিত্র আধারটিকে সকল অবস্থায় পূর্ণ রাখা—এর সাধনার কি শেষ আছে? কখনো মনে হয় আছে কখনো মনে হয় নেই।

এ আমার নিজস্ব কথা। অধিকাংশ সাধকের দৃঢ়বিশ্বাস যে, একটা অবস্থা আছে যেখানে পৌঁছলে মানুষের পূর্ণতার স্থির উপলব্ধি হয় এবং তাঁরা সবাই সেই অবস্থায় পৌঁছানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন, নানা পথ আশ্রয় করে।"

তিনি সন্ন্যাসীকে পরামর্শ দিলেন, এক পথ আঁকড়ে না থেকে ভিন্ন ভিন্ন পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে।

সন্ন্যাসীর প্রত্যয় হল যে জ্ঞানী-পুরুষটি হঠাৎ আসেন নি। ভৈরবীই তাঁকে পাঠিয়েছে এবং এঁর পরামর্শ ভৈরবীর মনের ইচ্ছা। বিনা দ্বিধায় সে তার সামান্য তল্পীতল্পা গুটিয়ে চলল জ্ঞানীর সঙ্গে।

•

বছরের পর বছর কাটল। ভৈরবীরই মতো সে অনেক গুরুর পায়ের ধুলো মাথায় নিল, অনেক আখড়ায় অনেকের সাগরেদী করল। কিন্তু অভূতপূর্ব কোন অনুভূতি, পূর্ণতার নতুন কোন উপলব্ধি তার হল না।

একদিন প্রয়াগে এক পাগলাবাবা সন্ন্যাসীকে বললে,—

"তোমার মন হচ্ছে পদ্মকুঁড়ির মতো, কিন্তু বড় আঁট তার বাঁধনটা, তাই ফুলটা ফুটছে না। একটু ভক্তিরসে যদি ভিজতে বাবা, পাঁপড়িগুলো আলগা হত। গুরু-ভজন পুজোপদ্ধতি অনেক করেছ। জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, এ সবেরও গলি-ঘুঁজিতে অনেক মাথা ঠোকাঠুকি হয়েছে। এবারে ক্ষান্ত দাও—একটু তীর্থে তীর্থে ঘোরো, নবদ্বীপ, বিষ্ণুকাঞ্চী, বৃন্দাবন যাও। জপতপ বাদ দাও। গলায় গান থাকে তো গলা ছেড়ে গান গাও। না থাকে তো শোনো। কানঢাকা টুপির মধ্যে গান ঢোকে না। কান দুটোকে হাট করে খুলে দিয়ে আদুড় গায়ে খোলা মাঠে শুয়ে পড়ো, শোনো আসল সংকীর্তন। তখন উপচে পড়বে রস, গঙ্গা বয়ে যাবে। তখন খুলবে কুঁড়ি, ভাসবে মন। তরে যাবে।"

এও ভৈরবীরই অনুনয়।

গুরুভজায় ইস্তফা দিয়ে সন্ন্যাসী একাই ঘুরতে শুরু করল তীর্থে তীর্থে। একদিন মনে হল, ভৈরবী আর তাকে আড়াল দিয়ে চলছে না, তার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছে, পাশে পাশে। কোনো কথা নেই তার মুখে, কারণ বোধ হয় কথা কইবার প্রয়োজন আর নেই। ক্রমে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল।

এমনি ঘোরাও অনেক হল। দেখাও হল অনেক। আগে আদেশ উপদেশ শুনতে অনেকটা সময় খরচ হত, পদ্ধতি-গুলো পালন করতে হত। এখন শুধু দেখা শোনার পালা—নিরুদ্বেগে।

হরিদ্বারে পৌঁছে ভৈরবী যেন প্রথম মুখ খুলল। বলল, 'আর যাব না তোমার সঙ্গে। চারদিকে ঘাটে ঘাটে শুনেছি গলা-গলি। এখানে বেশ গাছের মেলা, এইখানেই বসি। তুমি যাও। ঘুরে এসো ওপারে, আবার যাব তোমার সঙ্গে।'

আশ্চর্য তার একটুও ভাবনা হল না ভৈরবীকে একলা রেখে যেতে। এ-ভৈরবী রক্তমাংসের নয়, শুধু কল্পনার, ধারণার। কিন্তু লোকে যাকে বন্ধন বলে তার স্পর্শ তো সন্ন্যাসীর জীবন থেকে অনেক দিনই সরে গেছে। লোকে বন্ধন বলে তাকে যেটার আকর্ষণ দেহের বাইরে, যার ধর্ম মনের স্বচ্ছন্দ গতিকে অবরোধ করে নিজের অস্তিত্বের ছাপ প্রত্যেক অনুভবে বসিয়ে দেওয়া। সন্ন্যাসীর পথ রোধ করে কেউ তো দাঁড়ায় না। তাই তার বন্ধনের সংজ্ঞা আলাদা।

বৈশাখী পূর্ণিমা পেরিয়ে গেছে, যাত্রীর ভিড় কমেছে। যারা রয়ে গেছে তারা নাছোড়বান্দা, কিছু একটা না পেলে ফিরবে না। বহুদূর থেকে এসেছে পথের শত ক্লেশ সহ্য করে। আবার কোনো-দিন এ তীর্থদর্শন ঘটবে কি না জানা নেই। যা কিছু নেবার এবারেই নিতে হবে।

বুদ্ধগয়া।

আর আসে তারা যারা আসে গয়াতীর্থে পিণ্ড দিতে, যাবার আগে বুদ্ধগয়াও দেখে যায়।

বোধিদ্রুমের নিচে, মন্দিরের ছায়ায় বসে সন্ন্যাসী দেখে লোকের আনাগোনা। কেউ আসে শুধু দর্শনের জন্য। নীরবে আসে, প্রণাম করে চলে যায়। কেউ মন্দির দেখে, দেউলে ঢোকে, মোহন্তদের সমাধির অঞ্চলটাও ঘুরে যায়।

শ্রমণেরা বসে বসে চলতে চলতে জপ করে, পুঁথি পড়ে। কারো মুখে আভাস শান্তির, কারো চিন্তার—নীরব চিন্তা, কী যেন সমস্যা মনে—হয়তো সন্ন্যাসীরই মতো সমস্যা।

হঠাৎ তার খেয়াল হল, তার সমস্যাটা কী? মনে তো নেই! সমস্যাটা কি মিটে গেল, না হারিয়ে গেছে? মন হাতড়ে প্রশ্ন-গুলোর জবাব মিলল না।

জবাব কি চাইই? কী প্রয়োজন? অনেক দিন বয়ে বেড়িয়েছে সমস্যাটাকে। আজ তার অজান্তে কাঁধ থেকে নেমে গেছে। যাক। আজ ছুটি।

চংক্রমণ পথে একটি অল্পবয়স্ক শ্রমণ ঘুরছিল, সে নেমে এসে বসল সন্ন্যাসীর পাশে। যেন চেনাজানা বন্ধুলোক। বড় শান্ত মূর্তিটি। কী যেন বলল সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, কিছু বললে?

ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে শ্রমণ বললে, [illegible]

শ্রমণ নয়, ভিক্ষুণী। মাথা কামানো, সর্বাঙ্গ মোটা কাপড়ে ঢাকা, তাই সন্ন্যাসী ভেবেছিল শ্রমণ।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?
ভিক্ষুণী বলল, লাসা।

লাসা! লাসা থেকে এসেছে এই মেয়েটি! আবার ফিরে যাবে? একা ঘুরছে চঙ্ক্রমণ পথে, একাই বোধ হয় এসেছে। একা ফিরে যাবে?

দূর তিব্বতে লাসা। সন্ন্যাসী শুনেছিল সেখান থেকে লামারা নাকি পায়ে হেঁটে আসে বুদ্ধগয়ায়, আসতে তিন মাস লাগে। এই মেয়েটি একা অজানা পথে তিন মাস হেঁটে এসেছে?

পথ অজানা, লক্ষ্য হয় তো অজানা নয়।
ভিক্ষুণী হেসে বলল, 'হম জা' তা'।

চঙ্ক্রমণ পথ থেকে নেমে এসেছিল যেন দূর পথের সহযাত্রীকে চিনে। পাশে বসে একটু গল্প করে জিনিস গোছাতে চলে গেল।

যাবার আগে সন্ন্যাসীর মনটাকেও যেন গুছিয়ে গুটিয়ে দিয়ে গেল। তার চোখ থেকে মন্দির, বোধিদ্রুম, শ্রমণদের ধ্যান-ধারণা, যাত্রীদের চলাফেরা সব মুছে গেল। নির্নিমেষ চেয়ে দেখতে লাগল সে ভিক্ষুণীকে।

ভিক্ষুণী একখানি পুঁটুলি খুলতে লাগল—গেরুয়া কাপড়ের পুঁটুলি। অতি সন্তর্পণে, যেন তার সামান্য জীবনের সমস্তটুকু পাথেয় সঞ্চিত আছে ওটির মধ্যে। গ্রন্থির পর গ্রন্থি খুলতে লাগল, আবরণের পর আবরণ, তারপর তার মধ্য থেকে বেরোলো একটি পুঁথি। পুঁথিটি কোলে রেখে ভিক্ষুণী পড়তে আরম্ভ করল। পড়ল অনেকক্ষণ ধরে—কখনো বিড় বিড় করে, কখনো মনে মনে, মাঝে মাঝে চোখ মুদে, আবার কখনো আকাশের দিকে চেয়ে। পড়া হয়ে গেলে পুঁথিটিকে আবার সে অতি যত্নে ভাঁজের পর ভাঁজ সাজিয়ে গেরোর উপর গেরো দিয়ে পুঁটুলিতে বাঁধল।

একবার সে বুদ্ধমন্দিরের চূড়ার দিকে চাইল, তারপর বোধিদ্রুমটাকে দেখে নিল, তারপর দেখল বুদ্ধমূর্তি। তারপর আবার আরম্ভ হল চঙ্ক্রমণ পথে পরিক্রমা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল সন্ন্যাসী তার দিকে। ভিক্ষুণী মন্দির এক একবার প্রদক্ষিণ করে, কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা যায় তার মুখ, আবার মিলিয়ে যায় আড়ালে। কিন্তু সন্ন্যাসীর চোখে ভাসে সেই মুখেরই অখণ্ড প্রতিবিম্ব—অন্য চেতনা তার লুপ্ত।

ভিক্ষুণীর মুখে ফুটে উঠছে অদ্ভুত অভিব্যক্তি — অনির্বচনীয়ভাবে। একদিকে ক্রমবর্ধমান শান্তি, অন্যদিকে তীব্র থেকে তীব্রতর জ্যোতি। এক মন তার যেন দ্বিধা দ্বিখণ্ড হয়ে চলেছে, একে অন্যের বিপরীতমুখে। একের মধ্যে উপলব্ধি হচ্ছে বিশাল থেকে বিশালতর বিশ্বের, *অন্যের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের প্রাণস্পন্দন।*

ভিক্ষুণীর চলা থেমে গেল। পথ থেকে নেমে এল। পুঁটুলিখানা তুলে নিয়ে চলে গেল। গেল সন্ন্যাসীরই সুমুখ দিয়ে, কিন্তু আর তার দিকে চাইল না। কারো দিকে, কোনো কিছুর দিকে যে সে আবার চাইবে তা তার মুখ দেখে মনে হল না।

সন্ন্যাসী নিথর হয়ে বসে রইল। তার চোখ খোলা, চঙ্ক্রমণ পথের সেই বিন্দুতে নিবদ্ধ যেখানে একটু আগে থেকে ভেসে উঠেছিল ভিক্ষুণীর মুখ। কিন্তু বাইরের কোনো কিছুরই ছায়া আর নেই সন্ন্যাসীর চোখে।

এত সহজে? এত স্বাচ্ছন্দ্যে, নিষ্কম্প-চিত্তে কয়েক মুহূর্তের প্রয়াসে ভিক্ষুণী পেয়ে গেল তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু? আসন্ন বিচ্ছেদের চরম সন্ধিক্ষণে সমস্ত প্রাণের তীব্র আকুতি এসে দিল তাকে অক্ষয় পূর্ণতা? বার সন্ধানে এত যুগ কাটাল সন্ন্যাসী!

অসীম আকাশ, অনাদ্যন্ত কাল—এদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য সন্ন্যাসী ঘুরেছে দেশে দেশে, ধর্মান্ধ নাবিক যেমন সমুদ্রের পর সমুদ্র পাড়ি দিত দিকচক্রবালের সীমা-রেখা অতিক্রম করে যেতে।

অসীম কি কখনো সীমায় বিম্বিত হয়? মরীচিকা!

সীমার পর সীমা, কালের পর কাল—এই ত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য। বুদ্ধি বলে, ও-সাক্ষ্য মিথ্যা! আবার মরীচিকা! যে-সত্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অস্তিত্ব নেই সেও ত অসম্পূর্ণ।

যা অনুভূত তা সত্য, যা জ্ঞাত তা সত্য। চরম সত্য তা নয়, কারণ ইন্দ্রিয়ই সাক্ষ্য দেয়, সীমার পর সীমা, কালের পর কাল। একের পর এক সীমার অবগুণ্ঠন সরে যায়, বিশাল থেকে বিশালতরের জ্যোতি এসে আঘাত করে জীবের ইন্দ্রিয়ে, পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত হয় স্মৃতিসঞ্চিত বুদ্ধিপুষ্ট মানবমানসে।

মিথ্যা নয় কোনো সীমা। ক্ষয়ে বিলুপ্ত হয় না সৃষ্টি। নিরর্থক নয় একটিও জীবন। যে-ক্ষুদ্র বিশালের সম্মুখীন, বিশালচেতন, সে অসম্পূর্ণ হলেও জীবন্ত এবং সত্য। মিথ্যা শুধু ধারণায় ধৃত নিঃসঙ্গ একক—হোক তার ব্যাপ্তি অসীম, অর্থহীন কল্পনায়। যে অনন্যচেতন—সে নিষ্প্রাণ, নিরর্থক।

সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে বেজে উঠল বিচিত্র বীণা, মনে জ্বলে উঠল দীপ্ত শিখা। সহস্রদল পদ্মের পল্লবগুলি একে একে খুলে যেতে লাগল—

অকস্মাৎ গগনভেদী আর্তনাদ তার চিন্তাস্রোত সহসা ব্যাহত হয়ে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নারীকণ্ঠ।
কার?
ভিক্ষুণীর, না ভৈরবীর?

চোখ খুলে সন্ন্যাসীচরণ দেখল, তার স্ত্রী। মূর্ছিতা।

ছেলেকে নিয়ে এসেছিল গয়ায় পিণ্ড দিতে। পিণ্ড দিয়ে এসেছিল বুদ্ধগয়ায়।

প্রথমে প্রচণ্ড আঘাতটা সামলে নিতে একটু কষ্ট হয়েছিল সন্ন্যাসীর। তার পর তার মনে হল ঘটনাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অসুস্থা স্ত্রী, অবাক পুত্রকে নিয়ে ফিরে এল ঘরে, যেন সে ফিরছে সপরিবারে তীর্থ সেরে।

দলে দলে আত্মীয় বন্ধুরা তাকে দেখতে এল। কেউ কাঁদল, কেউ হাসল, কেউ সৎপরামর্শ দিল শীগগির একটা চাকরি খুঁজে নিতে। দিনকাল খারাপ, তার বয়সও হয়েছে, তাড়াতাড়ি একটা কিছু না করে নিলে পথে দাঁড়াতে হবে। এতদিন নিরুদ্দিষ্ট থেকে গেল কী কষ্ট পাচ্ছিল তার স্ত্রী ছেলে—এবং একমাত্র সেই কারণেই বন্ধুবান্ধব, অফিসের অত্যন্ত অনুরক্ত সহকর্মীদের সমবেত চেষ্টা এবং স্বার্থত্যাগের দরুণ তার পরিবারের সামান্য একটুখানি সংস্থান করা সম্ভব হয়েছিল। এখন যার ঘর সে বুঝে নিক।

অনুরূপ সতীর্থদের কারো কারো প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তাদের সুপারিশ এবং চেষ্টায় সন্ন্যাসীচরণের চাকরি একটা জুটে গেল। মাইনে অল্প, তবে খাটুনিও কম। ৮টা—৪টে কাজ, বেশী বাঁধাবাঁধি নেই।

সন্ন্যাসী বললে, 'একদিন ঘুরতে ঘুরতে জ্ঞানী পুরুষের এক চেলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে ছাড়ে না কিছুতেই, টানতে টানতে নিয়ে গেল তার আশ্রমে। অনেক কথা হল, তবু কথা ফুরোলো না। আমার কথা শুনে সে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পর বললে,

'রোজ একটিবার নিয়ম করে আসতে হবে এখানে। কোনো কথা শুনবো না।'

তাই রোজ যাই সে-আশ্রমে, গল্প-সল্প করি। গুরুভাই রোজ আমাকে স্নান করিয়ে গেরুয়া পরিয়ে দেয়। বলে,

'যাও ঘুরে এসো একটু। তার পর আবার ভণ্ড-সংসারী সেজে বাড়ি ফিরে যেও।'

কোথায় আর ঘুরবো? এই চৌমাথাতেই বসি, লোকজনের আনাগোনা দেখি। কত আসে লোক, একাজে সেকাজে। কেউ কাছা-কাছিই ঘোরাফেরা করে। কেউ চৌমাথার এক পথ ধরে অনামনস্ক হয়ে চলতে থাকে, যেন অনেকদূর যাবে। তাদের পেছু নিই, দেখি তারা কোথায় যায়। ওদের কেউ কেউ কখনো কখনো আমাকে সঙ্গী পাকড়ে নেয়, খানিকটা দূর সঙ্গে যাই।

দিন কেটে যায়। আবার আসি চৌমাথায়—সহস্রারে।

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মন্মটভট্ট

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রিত গণরুচি

গণতন্ত্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে যদিও সাংস্কৃতিক মানের নিম্নগামিতা এবং পৃষ্ঠ-পোষক সম্প্রদায়ের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক অনস্বীকার্য, তবুও এজন্যে সমস্ত দোষ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপানো যুক্তি-সংগত ঠেকে না। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে পোষণ এবং বর্ধন করার পক্ষে উপযোগী পরিবেশ এবং শিক্ষা জনসাধারণ আজো পায়নি; অন্যধারে বিদগ্ধজনদের মধ্যে অনেকেই সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও নিজেদের চারিত্রিক সততা রক্ষায় এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে হয় অনিচ্ছুক আর না হয় অপারগ। অর্থাৎ জনসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই যেমন তাদের সর্বগুণোপেত বলা চলে না, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে নিকৃষ্টতার অবশ্যম্ভাবী যোগ ধরে নেওয়া অবাস্তব উন্নাসিকতারই পরিচায়ক।

কিন্তু এতাবৎ একটি প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা করিনি। অতীতে স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা বর্ণ-বিভাজিত সমাজে জনসাধারণের না ছিল কোনো মৌল অধিকারের স্বীকৃতি, না ছিল কোন কার্যকরী ক্ষমতা। আধুনিক-কালের সর্বাত্মক ডিক্টেটরশিপে জনসাধারণের কোন কোন অধিকার কাগজে-কলমে স্বীকৃত হলেও কার্যত সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের চালক রাজনৈতিক দলবিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত। সেখানে জনসাধারণের হাতে কোন শক্তি নেই। তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে না, স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না, স্বাধীন কোন সংগঠন গড়ার অধিকার তাদের নেই। সুতরাং সেখানকার অবস্থার জন্য জনসাধারণকে দায়ী করা অর্থহীন। কিন্তু যে-সব সমাজকে আমরা গণতান্ত্রিক বলি, সেখানে এসব অধিকার স্বীকৃত; সেখানে কোন দল বা গোষ্ঠীর হাতে যত ক্ষমতাই থাক, তাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করা যায়। তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়া চলে এবং নির্বাচনের সময় জনসাধারণ ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। প্রশ্ন হোল, এই সব গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, মতামত প্রকাশ, সংগঠন, প্রতিনিধি নির্বাচন ইত্যাদি বিবিধ মৌল অধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে প্রকৃতপক্ষে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনে জনসাধারণের কার্যকরী ক্ষমতা কতটুকু? অর্থাৎ আদর্শ-গতভাবে যাই হোক, বাস্তবক্ষেত্রে সমকালীন গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে জনসাধারণের প্রয়োজন-ইচ্ছা-ভাবনা-প্রচেষ্টার দ্বারা ইতিহাস রচিত হচ্ছে, না জনসাধারণের নামে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি, পরিবার বা সম্প্রদায় সমাজজীবন পরিচালিত করছে? এক কথায়, গণতন্ত্রে গণের শক্তি কতটুকু?

এখন একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, আধুনিক সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রে যেখানে জনবিক্ষোভকে পুলিশ এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অনির্দিষ্টকালের মত দমন করে রাখা সম্ভবপর, আধুনিক গণতন্ত্রে সেক্ষেত্রে জনসাধারণের সমর্থন হারিয়ে কারো পক্ষে বেশীদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকা সম্ভব নয়। যুদ্ধের পর চার্চিল এবং রক্ষণশীল দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়ে ব্রিটেনের জনসাধারণ বিশেষ বেগ পেয়েছিল, এমন কেউ বলে না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষকে হত্যা করা সত্ত্বেও স্টালিন অথবা তাঁর দলকে রুশদেশে সর্বগ্রাসী ক্ষমতার আসন থেকে কেউ হটাতে পারেনি। জার্মানী এবং ইতালিতে যুদ্ধ বিনা শুধু আভ্যন্তরীণ চাপে নাৎসী এবং ফাসিস্তদের গদী থেকে সরাবার কোন সম্ভাবনা ছিল, ইতিহাসে একথার কোন সমর্থন মেলে না। স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে এই মূল প্রভেদ অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত এবং এটি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও কি সত্য নয় যে, স্বৈরতন্ত্রের মত অতটা প্রকট না হলেও আধুনিক গণতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপস্থিতি অনস্বীকার্য; সেখানে কয়েক বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের সময় ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনায় জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের বিশেষ সুযোগ নেই এবং এটাই সম্ভবত সবচাইতে

মারাত্মক অভিযোগ) সেখানে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি এবং প্রত্যয়—অনেকটাই কি ক্ষমতাবান গোষ্ঠির পরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়?

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন স্বাধীন আলোচনার সুযোগ নেই; এমন কি যুগোস্লাভিয়ার মত অপেক্ষাকৃত সহনশীল স্বৈরতন্ত্রেও সে চেষ্টার বিপদ কতখানি মিলোভান জিলাস্-এর কারাদণ্ড তার প্রমাণ। কিন্তু গণতন্ত্রে এ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ শুধু সম্ভবপর নয়, তা নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে। সেই সূত্রে সংগৃহীত কিছু তথ্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

মার্কিন গণতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর আর কোন দেশের সাধারণ মানুষ এখানকার মানুষদের চাইতে বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে বলে আমার জানা নেই।
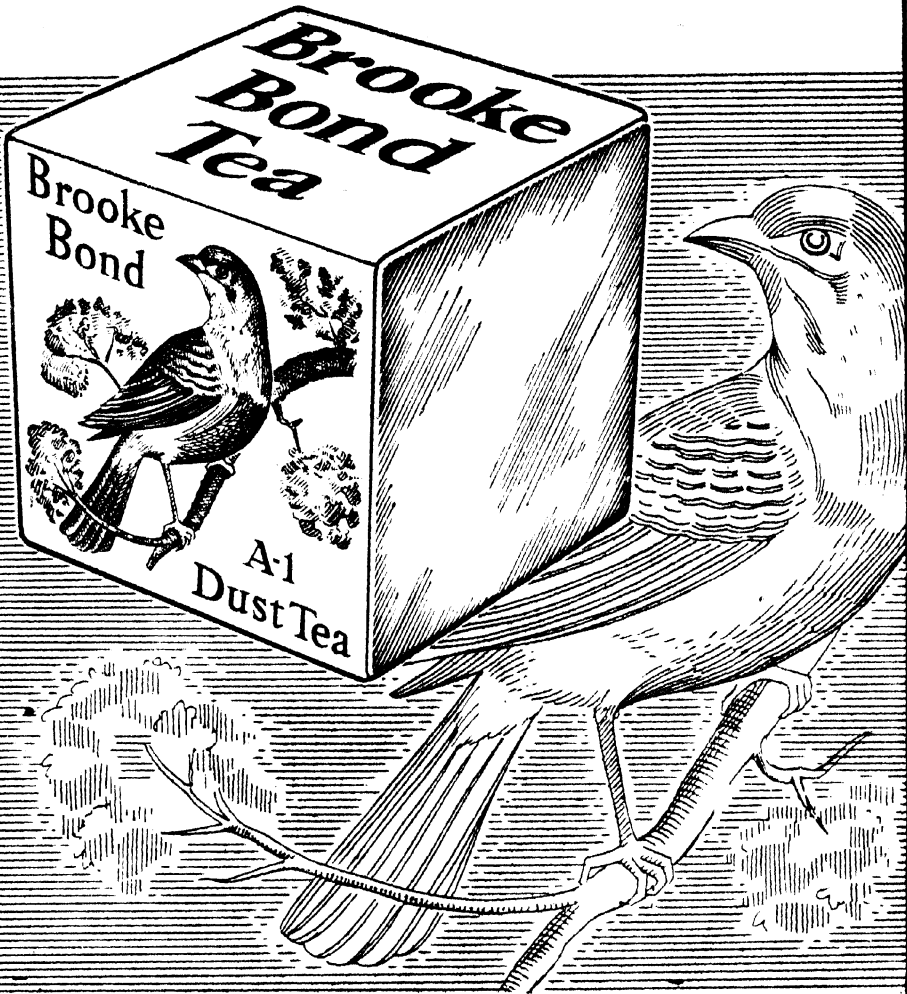
এদের উপার্জন এবং ক্রয়ক্ষমতা প্রচুর; এখানে সমাজের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে ওঠার সুযোগ বিস্তর; শিক্ষা এবং সম্ভোগের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে; মতপ্রকাশ এবং সংগঠনের ওপরে আইনত বিধিনিষেধ খুব কম; এমন কি আমাদের দেশে র‍্যাডিক্যাল মতাবলম্বীরা যে-সব বিশেষ ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলে দাবী করে থাকেন (যথা, ইনিশিয়েটিভ, রেফারেণ্ডাম এবং রিকল), মার্কিনের অনেকগুলি অঙ্গরাষ্ট্রে সেগুলি স্বীকৃত এবং প্রচলিত। তবু অনেক মার্কিন সমাজ-তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ অনুসারে এই গতিশীল গণতন্ত্রেও জনসাধারণের কার্যকরী প্রভাব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের পরিচালনা গুটিকয়েক ক্ষমতাবান ব্যক্তি, পরিবার অথবা "ক্লিক"-এর হাতে কেন্দ্রীভূত; দেশের যন্ত্রশিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য গুটিকয়েক দানবীয় আর্থিক সংগঠন বা "কর্পোরেশনে"র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এমন কি বিত্তবান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে ওদেশে শ্রমিকদের যে-সব বিরাট সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেগুলিতেও অধিকাংশ সদস্যের তুলনায় মুষ্টিমেয় শ্রমিক-নেতা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং কাগজপত্রে সাধারণ নাগরিকের অনেক অধিকার থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ সহজ নয়, বরং অনেকক্ষেত্রে সে চেষ্টা রীতিমত বিপজ্জনক।

মার্কিনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ যে কতদূর সুদূরপ্রসারী সম্প্রতি তা নিয়ে অনেকগুলি তথ্যবহুলপূর্ণ বই বেরিয়েছে। টি. কে. কুইন তাঁর "দানবীয় কর্পোরেশন" গ্রন্থে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে, মার্কিনে আর্থিক ব্যবস্থা গুটিকয়েক বিরাট প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয়।*১ এদের মধ্যে জেনেরাল মোটরস, ইউনাইটেড স্টেটস্ স্টীল, স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল (নিউ জার্সি) এবং ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রায় অর্ধেক শ্রমিক এদের অধীনে কাজ করে; এরা ইচ্ছেমত এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় কারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জনপদ গড়ে তুলতে পারে। প্রতিযোগী শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির হয় উচ্ছেদ ঘটিয়ে নয় তাদের সঙ্গে রফা করে এরা নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিসপত্রের দাম ওঠায় নামায়; এদের কার্যকলাপের ওপরে না-শ্রমিক না-ক্রেতা সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন প্রভাব আছে। এদের উদ্যোগে যেসব শহরজনপদ গড়ে উঠছে, সেখানে সমাজজীবনের স্থান নিয়েছে কোম্পানীকেন্দ্রিক জীবন। (এই জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় জামসেদপুরে গেলে।) ক্ষমতার এই ভয়াবহ কেন্দ্রীকরণের ফলে মুষ্টিমেয় লোকের ইচ্ছা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজকর্ম জীবনযাত্রা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছে করলে কোন কর্মী অবশ্য কোন কর্পোরেশনের চাকরী ছেড়ে দিতে পারে; আইনত সে বিষয়ে তার পুরো স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ছেড়ে সে যাবে কোথায়? অন্য আরেক কর্পোরেশনে? তাছাড়া এক প্রতিষ্ঠানে ঝগড়া করে কাজ ছাড়লে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ মেলাও শক্ত। ফলে দেশের গঠনতন্ত্র অনুসারে নাগরিকের অনেক অধিকার থাকলেও এইসব অতিকায় কর্পোরেশনের চাপে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্রমেই সমাজজীবন থেকে লোপ পেতে বসেছে।

কুইন পরোক্ষ সূত্রে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন নি; তিনি এক সময়ে জেনারেল ইলেকট্রিক নামে বিরাট প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ক্ষমতার এই কেন্দ্রাভিমুখী ধারার বিরোধীতা করে তিনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর তথ্য এবং যুক্তির পেছনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থন আছে। ফাণ্ড ফর দি রিপাবলিক থেকে প্রকাশিত বার্ল সাহেবের একটি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-ও তাঁরি সমরূপ।*২ বার্ল-এর হিসেব অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কল-কারখানা বা ম্যানুফ্যাকচারিং-এ নিয়োজিত মোট মূলধনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মাত্র দেড়শ কর্পোরেশনের করতলগত। যদি কৃষিশিল্প বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার হিসেব ধরা যায়, তাহলে সম্ভবত দেখা যাবে যে মোট নিয়োজিত ধনের তিন-ভাগের দুভাগ পাঁচশটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি। এই সব কর্পোরেশনের মধ্যে আবার মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিই সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনার ক্ষমতা দখল করে আছে। অর্থাৎ সমাজের বুকে এই কর্পোরেশনগুলি কয়েকটি শক্তির পিরামিড; আর সেই পিরামিডের চূড়ায় কয়েকজন ব্যক্তি বা পরিবার একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। যদি স্মরণ রাখা যায় যে বর্তমান পৃথিবীর উৎপাদনশিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সব চাইতে বড় অংশ আজ মার্কিনীদের দখলে, তাহলে বার্ল-এর এই সিদ্ধান্ত বোধহয় আর অতিস্ফীত ঠেকে না যে মার্কিনী গণ-তন্ত্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার তুলনায় মধ্য-যুগের সামন্ত ব্যবস্থা নিতান্ত ছেলেমানুষী।

"Since the United States carries

*১ T. K. QUINN, Giant Corporations: Challenge to Freedom; Exposition; $3.50.

*২ A. A. BERLE, Jr., Economic Power and the Free Society; Fund for the Republic.

on not quite half of the manufacturing production of the entire world today, these 500 groupings—each with its own little dominating pyramid within it—represent a concentration of power over economics which makes the medieval feudal system look like a Sunday school party......" .

বার্লে-এর মত কুইনও আধুনিক গণতন্ত্রে মুষ্টিমেয় বিত্তবান গোষ্ঠির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ত-তন্ত্রের তুলনা করেছেন। মধ্যযুগের শেষ-ভাগে ইংল্যাণ্ডে নর্ম্যান এবং টিউডর রাজারা প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাড়িয়ে সামন্তদের শক্তি লোপ করার চেষ্টা পেয়েছিলেন। আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রও মাঝে মাঝে আইন করে কর্পোরেশনদের ক্ষমতা কমাবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। গুরুশিল্পের জাতীয়করণের দ্বারা এ সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব নয়। তার ফলে কয়েকটি ব্যক্তিস্বত্ব ক্ষমতাকেন্দ্র লোপ পাবে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয়বিধ ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ ঘটায় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা আরো
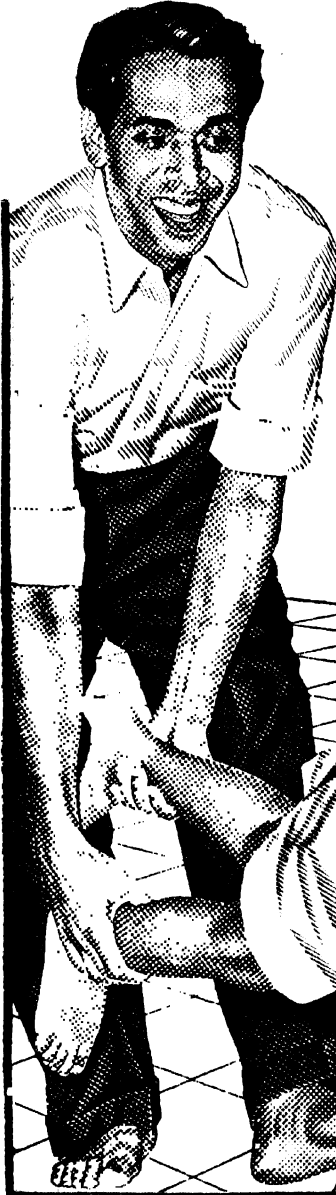
সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অপরপক্ষে মার্কিনের মত দেশে ট্রাস্টব্যবস্থাকে দমন করার জন্যে আইন পাস হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সরকারী ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে কর্পোরেশনদের ক্ষমতা-বৃদ্ধির পেছনে সরকারী সমর্থন বর্তমান। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়ালটার আডামস্ এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোরেস গ্রে তাঁদের একটি গ্রন্থে প্রমাণাদি সহকারে দেখিয়েছেন যে আমেরিকাতে অতিকায় আর্থিক সংগঠনদের হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা আসার জন্যে সে দেশের ফেডেরাল সরকার মুখ্যত দায়ী।*৩ বিভিন্ন বিশেষ বিধিব্যবস্থা মারফৎ সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছে। ট্যাক্সের ব্যাপারে সুবিধে দিয়ে, পরোক্ষ সাবসিডির বন্দোবস্ত করে, যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ক্ষয় বাবদ মোটা খরচার অনুমোদন দিয়ে, সরকারী উদ্বৃত্ত মালমসলা এইসব প্রতিষ্ঠানের কাছে সস্তাদরে বিক্রি করে, এবং এই জাতীয় আরো নানা প্রকাশ্য এবং গোপন উপায়ে সরকার এদের পোষণে এবং বর্ধনে সহযোগিতা করছে। অথচ পূর্বোক্ত দুই অধ্যাপকের বিশ্লেষণ অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ মোটেই অবশ্যম্ভাবী নয়।

"Monopoly is not the result of an inevitable dialectical or immutable process. There is no 'natural' law which transforms the good society into technocracy functioning under the aegis of socially irresponsible private power".

একধারে সরকারী সমর্থন এবং অন্যধারে জনসাধারণের অজ্ঞ ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে এই সব প্রতিষ্ঠান ক্রমে বলশালী হয়ে উঠেছে।

গণতন্ত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের পেছনে সরকারী সমর্থনের কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দল প্রয়োজন; দল চালাতে হলে ভালো মাইনের পুরোসময় কাজ করার জন্যে যোগ্য কর্মী চাই; আর জনসমর্থন পেতে হলে দরকার নিয়মিত এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা। এসবই নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের আর্থিক সামর্থ্যের উপরে। সুতরাং যদিও জনসাধারণের ভোটেই সরকার নির্বাচিত হয়, তবু সেই ভোট লাভের জন্যে বিত্তবান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণ অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরও এই পৃষ্ঠপোষণার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমে না; কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো সরকার-ই চিরস্থায়ী নয়, কিছুকাল অন্তর অন্তর রাজনৈতিক দলদের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের যারা মুখ্য-পরিচালক তাদের অনেকেই পারিবারিক অথবা ব্যবসায়িক সূত্রে দেশের অতিকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বস্তুত এই যোগ না থাকলে তাদের পক্ষে আপন আপন দলে প্রাধান্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হোত।

ফলে আধুনিক কালের ফাসিস্ত অথবা কম্যুনিস্ট সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রের মত গণতন্ত্রে ক্ষমতার সম্পূর্ণ কেন্দ্রিকরণ না ঘটলেও সেখানে এধারা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে। মার্কিন দেশে এই ধারা এখন কত প্রবল রাইট মিলস্ নামে জনৈক অধ্যাপক তাঁর "দি পাওয়ার এলিট" গ্রন্থে তারি একটি বিশদ সাম্প্রতিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন।*৪ মিলস্-এর তথ্য অনুসারে মার্কিনে শুধু শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নয় সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা একটি মুষ্টিমেয় অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আছে ইতিপূর্বে উল্লিখিত অতিকায় কর্পোরেশনের পরিচালকবৃন্দ; দুই প্রধান রাজনৈতিকদলের মুখ্য নেতারা (এঁদের মধ্যে যখন যে দল রাজ্য পরিচালনার ভার পায় সেই দলের নেতারা সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তর অধিকার করে বসে) এবং সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ। এরা আসলে সমাজের একই স্তরের মানুষ; এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান; এদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মোটামুটি একই ধরণের। ক্ষমতার চূড়ায় আসীন হয়ে এরা সুবিধেমত পরস্পরের সঙ্গে আসন অদলবদল করে। সৈন্যবিভাগ থেকে অবসর নিয়ে সেনাপতি হয় অতিকায় কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর, শিল্পপতি ছুটি নিয়ে কোনো সরকারী বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে; রাজনৈতিক নেতার ছেলে কিম্বা ভাইয়ের জন্যে কোনো না কোনো কর্পোরেশনের প্রধান কর্মচারীর চাকরী তোলা থাকে। এই অভিজাত সমাজে বাইরের লোকের প্রবেশ কালেভদ্রে ঘটে; এর সদস্যপদ মুখ্যত উত্তরাধিকারসূত্রে মেলে। এদের এই বিরাট কেন্দ্রীভূত শক্তির সামনে জনসাধারণ অসহায়; শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের সদস্যদের এরা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।
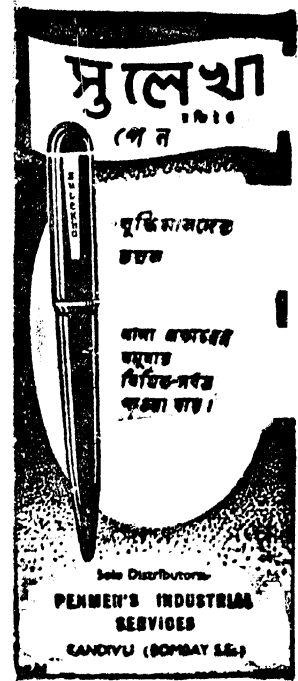
প্রচুর বিত্তসম্পদ সত্ত্বেও এই অভিজাত

* ৩ Walter Adams and Horace M. Gray, **Monopoly in America: The Government as Promoter**; Macmillan, $3.50.

* ৪ C. Wright Mills, **The Power Elite**; Oxford University Press. 36sh.

গোষ্ঠি হয়ত সমাজে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারত না, যদি তাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়ে উঠত। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মস্ত গুণ এটাই যে সেখানে স্রেফ গায়ের জোরে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখা চলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের কাঠামোটা বজায় আছে, ততক্ষণ জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমবেত চেষ্টায় ক্ষমতারূঢ় গোষ্ঠিকে নির্বাচন কালে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। যে কোনো সমাজের ইতিহাসে তাই গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এত মূল্যবান ব্যাপার। কিন্তু গোড়ায় গলদ হোল, জনসাধারণ ব্যক্তিগত অধিকার এবং দায়িত্ব বোধের ভিত্তিতে আজো প্রায় কোথাও নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে শেখেনি। অপরপক্ষে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্ষমতার মূল উৎস হোল তাদের সংগঠন ব্যবস্থা। সুনিপুণ সংগঠনের সামর্থ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কিভাবে সমস্ত সমাজের জীবনযাত্রা নির্ধারিত করতে পারে উইলিয়াম হোয়াইট-এর বহু-আলোচিত গ্রন্থ 'দি অর্গ্যানিজেশান ম্যান'-এ তার বিস্তারিত বর্ণনা মিলবে।৫ হোয়াইট মার্কিনী শিল্পপতিদের মুখপত্র 'ফরচুন'-এ কাজ করতেন; মার্কিনীদের সংগঠনশক্তিকে ব্যঙ্গ করে তিনি প্রথমে 'ফরচুন' পত্রিকায় একটি কাল্পনিক নক্সা লেখেন। এ নক্সায় তিনি রহস্যাচ্ছলে প্রস্তাব করেন যে সংগঠনের কর্তারা সমস্ত সরকারী এবং সদস্যদের জন্য এমন একটা কার্ড সিস্টেম তৈরি করেন যাতে প্রতিটি ব্যক্তি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ লেখা থাকবে আর সেই কার্ড ব্যবহার করে কর্তারা প্রতিব্যক্তির জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করবেন। শিল্পপতিরা কিন্তু প্রস্তাবটিকে মোটেই রসিকতা বলে উড়িয়ে না দিয়ে এর সম্ভাবনা বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন; এবং হোয়াইটের গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, মার্কিনের সবচাইতে বড় স্ট্যাটিসটিক্যাল ফার্ম এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি এবং বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রাদি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। হোয়াইট তখন নিজে মার্কিনে সংগঠন ব্যবস্থা নিয়ে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হন; 'ফরচুন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকায় এদিক দিয়ে তাঁর বিশেষ সুবিধে হয়। অনুসন্ধানের ফলে তিনি সাতঙ্কে আবিষ্কার করেন যে, যে-ব্যবস্থাকে তিনি রহস্য করার উদ্দেশ্যে কল্পনা করেছিলেন, দেশের অধিকাংশ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কমবেশী নিপুণতার সঙ্গে তা আগে থেকেই প্রচলিত। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই লেখার ফলে উক্ত ব্যবস্থার বহুমুখী সম্ভাবনা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার উৎকর্ষ বিধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রতিষ্ঠান-পরিচালকেরা আরো বেশী অবহিত হয়েছেন। হোয়াইট বিস্তর প্রমাণ উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে আধুনিক মার্কিনী সমাজে সংগঠনের বিবর্ধমান শক্তি ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য লোপ করে সমস্ত নাগরিককে একই বিশ্বাস, একই রুচি, একই আচার-ব্যবহার, উচিত-অনুচিত বোধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের পরিচালকরা এই যান্ত্রিক ঐক্যের মূলে আদর্শটি ঠিক করে দিচ্ছেন; আর সেই আদর্শে সকলের মন গড়ে তোলার জন্যে তাঁদের প্রধান সহায় বিজ্ঞান, বিশেষ করে নব্য মনোবিজ্ঞান।

যুথচেতনা নিয়ন্ত্রণে মনোবিকলন বিদ্যার ব্যাপক এবং নিপুণ প্রয়োগ প্রথম ঘটে বোধহয় হিটলারের জার্মানীতে। তারপর কমুনিস্ট রাশিয়া এ ব্যাপারে অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলিও এখন আর এক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে নেই। তফাৎ এই যে সর্বাত্মক রাষ্ট্রে মানসিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে অপ্রতিরোধ্য পাশবপদ্ধতির প্রয়োগ প্রচলিত; গণতন্ত্রে ক্ষমতাবানদের হাতে সে সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে গণতন্ত্রে যাঁরা শিক্ষা এবং সংগঠনের জোরে মানসিক নিয়ন্ত্রণের চাপেও অটল থাকতে পারেন, তাঁদের পক্ষে ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা শক্ত। তবে গণতন্ত্রেও এ চাপ যে নিতান্ত কম নয়, এ বিষয়ে যাঁরা কিছুমাত্র খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা সেকথা স্বীকার করবেন। বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার-সংস্থা মারফৎ ক্ষমতাবান সম্প্রদায় দিনের পর দিন জনসাধারণের

৫ William H. Whyle. **The Organization Man;** Simon & Schuster.

নিজস্ব ভাবনা-কামনা-রুচিকে আপনাদের প্রয়োজনমত ভেঙে গড়ার চেষ্টা করছে; মনোবিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদদের নিয়োগ করে মন-নিয়ন্ত্রণের নিত্য নূতন উপায়পদ্ধতি উদ্ভাবন করাচ্ছে এবং তাকে কাজে লাগাচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; তবে কৌতূহলী পাঠক সম্প্রতি প্রকাশিত গুটি তিনেক বই সংগ্রহ করে পড়ে দেখতে পারেন।৬ প্রথম বইটিতে দেখানো হয়েছে যে, আধুনিক সমাজে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বেড়েছে বটে; কিন্তু ক্রেতাদের রুচি মুখ্যত সমাজের গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে। দ্বিতীয় বইটিতে আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে অনেকগুলো উদাহরণ বিশ্লেষণ করে লেখক বর্ণনা করেছেন কিভাবে বিভিন্ন ক্ষমতাবান গোষ্ঠি পরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থার মারফৎ জনসাধারণের সহজবুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে জনমত নির্মাণ করে। এদের মধ্যে তৃতীয় বইটির তথ্য এবং যুক্তি বিস্তার সবচাইতে মনোজ্ঞ এবং ভীতিপ্রদ। তাতে শুধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের উৎপন্ন জিনিস বাজারে চালাবার জন্য ক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ব্যবস্থা করে সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ক্রেতাদের রুচি এবং চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এমন কি রাজনৈতিক নেতারাও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞাপন এবং তথাকথিত গণ-সংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের মনকে নিজেদের প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী। তিনটি বইতেই একথা খুব স্পষ্ট যে, ক্ষমতাবানদের সংগঠনের মধ্যে বিবেকবোধের কোন চিহ্ন নেই; জনসাধারণ অসংগঠিত বলেই পরিকল্পিত প্রচারের চাপের সামনে তারা একেবারে অসহায়, এবং দেশের উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় ক্ষমতাবানদের কাছে আত্মবিক্রয় করে বলেই গণমন-নিয়ন্ত্রণের এইসব মারাত্মক উপায় পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ সম্ভবপর হয়েছে।

তবে গণতন্ত্র কি শুধু আশাবাদীর অবাস্তব স্বপ্ন? ইতিপূর্বে যে কজন মনীষীর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছি, তাঁরা কেউই কিন্তু এ সিদ্ধান্ত করেন নি। তাঁদের যুক্তিবিস্তার থেকে মোটামুটি এই ধারণা হয় যে বিবেকবান এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মনীষীদের চেষ্টার ফলে জনসাধারণের একটা বড় অংশ যদি তাদের নিজেদের নিহিত সামর্থ্য এবং বর্তমান সংকট বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে তারি প্রভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটা সম্ভব এবং বিকেন্দ্রীকরণের ধারায় বর্তমান কালের আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র কার্যকরী গণতন্ত্রে সার্থকায়িত হয়ে উঠতে পারে। এ প্রত্যাশা আমার কাছে সংগত ঠেকে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক দোষ-ত্রুটি আছে, ঠিকই। কিন্তু অতীতের যে-কোন ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক গণতন্ত্রে সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকার অনেক বেশী সুস্পষ্ট-ভাবে স্বীকৃত এবং সে কারণে এই ত্রুটি-পূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যেই প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থার সম্ভাবনা নিহিত। আধুনিক গণতন্ত্রে ক্ষমতার যতখানিই কেন্দ্রীকরণ ঘটে থাক, নবা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। গণতন্ত্রে এই কেন্দ্রীকরণকে স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তার প্রকাশ্য লিখিত সমালোচনা সম্ভব, এবং সেই জ্ঞান এবং সমালোচনার ভিত্তিতে তারি বিরুদ্ধে জনমত গড়া চলে। প্রমাণ এই আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলি। স্পেন, পর্তুগাল রাশিয়া চীন কিংবা ইজিপ্টে এ প্রয়াস অকল্পনীয়। তাই সে-সব দেশে গুপ্ত ষড়যন্ত্র, রক্তাক্ত বিপ্লব অথবা যুদ্ধ ছাড়া ক্ষমতাবান সম্প্রদায়ের হাত থেকে জনসাধারণের মুক্তি অসম্ভব।

* ৬ Paul Lazarsfeld and Elihu Katz, **Personal Influence.** Stanley Kelly, **Professional Public Relations and Political Power.** Vance Packard, **The Hidden Persuaders.**

"ওঃ সেই কত বছর আগে আপনার
এই প্যাণ্ট করে দিয়েছিলাম"
"হ্যাঁ, পাঁচ বছরের ওপর !
আর তাই তো আমি
সবসময়ই চাই—
বিনীর
ড্রিল"
বিনীর ড্রিল উৎকৃষ্ট তুলোয় তৈরী
হয়—সাদা বা খাকী রঙের—খুবই
টেকসই ; বারবার কাচার
পরও নতুনের মতো দেখায়।
আপনার দর্জীকে জিজ্ঞেস ক'রে
দেখুন—সেও বলবে যে এই
ড্রিলই বাজারের সেরা।
মনে রাখবেন—বিনীর কাপড়
সবসময় কণ্ট্রোল দরে বিক্রি হয়।
দি বাকিংহাম এণ্ড কর্ণাটিক কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেণ্টস: বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ
BY 450

জীবজন্তুদের চোখে কি রঙ ধরা দেয়? প্রশ্নটি খুব আকর্ষণীয় বটে, কিন্তু এর সঠিক জবাব দেওয়া সহজ ত নয়ই, রীতিমত কঠিন। আমাদের চোখে যখন সব রঙই ধরা দেয় তখন আমাদের পক্ষে রঙ-কানা কোন প্রাণীর কথা অনুমান করা কঠিন। এইজন্যই সাধারণত আমরা ধরে নিই যে, জীবজন্তুরা আমাদের মতই বিভিন্ন রঙ দেখে চিনতে পারে। সম্ভবত আমাদের এ অনুমান ঠিক নয়।

রঙ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের ধারণারও ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে এবং কিছুটা পরিবর্তিতও হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যেতে পারে, হোমার সমুদ্রের জলকে সব সময়েই মদের মত লাল রঙ বলতেন। আর প্রাচীন গ্রীকরা তো হামেশাই মানুষের মুখের রঙকে সবুজ বলে উল্লেখ করতেন।

সব কিছুই নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিশক্তি সহায়ক চোখের যন্ত্রপাতির ওপরে। অক্ষিপট থেকে মগজ পর্যন্ত যে তিনটি রঙবাহী পথ আছে সম্ভবতঃ তাদের যে কোন একটির অনুপস্থিতির জন্য যে কেউ রঙ কানা হতে পারে।

জীবজন্তুদের চোখে রঙ তার বিভিন্নতা নিয়ে ধরা দেয় কিনা এ সম্বন্ধে কোন সোজা মত প্রকাশ না করেও বলা যেতে পারে যে, জীবজন্তুদের নিয়ে রঙ সম্বন্ধে যে-সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তাতে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেছে যে, তারা ঠিক কোন রঙ চিনতে পারে না রঙের উজ্জ্বলতার তারতম্য হয় মাত্র সেটা যে কোন রঙই হোক না কেন। প্রাণিজগতের মধ্যে চতুরতম কোন প্রাণী হয়ত রঙের উজ্জ্বলতা দেখে ধরতে পারে কোনটা লাল, কোনটা সবুজ, যেমন কোন কোন রঙ-কানা মানুষ এইভাবেই রঙ চিনতে পারে।

তবে একথা হয়ত বলা যেতে পারে যে, গরিলা, বানর প্রভৃতি প্রাণী ছাড়া অন্য কোন স্তন্যপায়ী জীব কিন্তু রঙ একেবারেই চিনতে পারে না। তারা সাদা, কালো ও কিছুটা ধূসরের জগতে বাস করে। তারা রঙের তীব্রতার জন্যই এই রঙ তিনটির তারতম্য ধরতে পারে। এর থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে না যে, প্রাণীরা রঙ চেনে।

আমরা সাধারণত যে অর্থে রঙ চেনা বুঝি সে অর্থে কুকুর, বেড়াল, খরগোস, ইঁদুর, ঘোড়া, ভেড়া এমন কি ষাঁড়ও রঙের বিভিন্নতা ধরতে পারে না। ষাঁড়ের রঙ জ্ঞান বোঝবার জন্য অনেক পরীক্ষা হয়েছে, বিশেষ করে ষাঁড়ের লড়াইয়ের কৌশল অনুসরণ করে। তার ফলে দেখা গেছে, ষাঁড় লাল রঙকে লাল রঙ বলেই চেনে না—চেনে একটি বিশেষ উজ্জ্বল রঙ হিসেবে। এবং এটাও দেখা গেছে যে, লাল রঙই তাদের কাছে উত্তেজনার কারণ নয়। স্পেন দেশে ষাঁড়ের সংগে লড়াই-এর সময় লড়াইকারীরা যুগ যুগ ধরে যে লাল রঙের কাপড় ব্যবহার করে আসছেন সেটার পরিবর্তন হলেও কিছু এসে যায় না। লাল কাপড়টা এ প্রমোদের একটা অংগ মাত্র, কারণ তাঁরা জানেন যে, এটা কেবলমাত্র উত্তেজিত করে আক্রমণোন্মুখ করার জন্যই ষাঁড়ের সামনে নাড়তে হয়—লাল রঙ দেখানোর জন্যে নয়। যে কোন রঙের কাপড়ই তার চোখের সামনে নাড়াচাড়া করা হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না—সে উত্তেজিত হলেই আক্রমণ করবে।

পাখিদের অবস্থা কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবদের চেয়ে স্বতন্ত্র। তারা প্রায় সব রঙই চিনতে পারে। যৌন মিলনের প্রাক্কালে পাখার রঙের বাহার দেখিয়ে তাদের যে নর্তনকুর্দন সে তো কেবলমাত্র প্রণয়িনীকে আকর্ষণ করার জন্যই। তারা যে রঙ চিনতে পারে এটাই তার বড় প্রমাণ।

পাখিরা সাধারণত হলদে, লাল, সবুজ, হালকা রঙ খুব স্পষ্টভাবেই চিনতে পারে,

গিরগিটি শ্রেণীর প্রাণী ক্যামিলিয়নের আছে এক জোড়া অদ্ভুত চোখ। ছোট একটি গোল গর্ত বাদে চোখ দুটির প্রায় সব অংশই চোখের পাতা দিয়ে ঢাকা। সদা ঘূর্ণমান মণির সংগে চোখের পাতাও ঘুরতে থাকে। এরা চোখের মণি দুটিকে স্বাধীনভাবে যে দিকে খুশি ঘোরাতে পারে—একই সংগে একটা চোখ দিয়ে সামনের, আর একটা দিয়ে পেছনের দিকে তাকাতে পারে। কিন্তু এই-ই সব নয়। ক্যামিলিয়নের ক্ষমতা অনন্ত। এ যে কোন প্রাকৃতিক পরিবেশের রঙ নিজের দেহে প্রতিফলিত করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এত সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এমন কোনও প্রমাণ পাননি যাতে বোঝা যেতে পারে যে, এরা রঙ চেনে।

ভালভাবে বুঝতে পারে না কেবল নীল রঙ। কোন কোন পাখি বেগুনী রঙও চিনতে পারে। স্তন্যপায়ী জীবদের তুলনায় পাখিদের নিয়ে রঙের পরীক্ষা খুব কমই হয়েছে, কেননা, তারা যে রঙ চিনতে পারে এর প্রমাণ তারা নিজেরাই বহুভাবে দিয়েছে। গৃহপালিত মুরগীদের নিয়ে একবার একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাদের সামনে শস্যদানা ছড়িয়ে দিয়ে শস্যের উপর বিভিন্ন রঙের আলো প্রতিফলিত করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, তারা সঙ্গে সঙ্গে লাল, হলুদ এবং সবুজ শস্যদানাগুলো খেয়ে ফেলল, নীল শস্যদানার ধারে কাছেও এগুলো না। এ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মুরগী নিঃসন্দেহে নীল রং দেখতে পায় না।

*

৯৯'র ধাক্কা নাকি সাংঘাতিক। এ ধাক্কা নাকি উতরান যায় না। আর ৯৯৯'র ধাক্কা? সে বোধ হয় আরও সাংঘাতিক।

লুক্সেমবুর্গের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ জোসেফ বেচ তাঁর ৩৩ বৎসরের মন্ত্রিত্বকালে যদিও বলে আসছেন, তাঁর রাজ্যের আয়তন ১০০০ বর্গমাইল, কিন্তু লুক্সেমবুর্গের স্কুলের সব ছাত্রই জানে যে, পাঠ্যপুস্তকে লুক্সেমবুর্গের আয়তন দেওয়া আছে ৯৯৯ বর্গমাইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই মিঃ জোসেফ বেচ একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। যুদ্ধাবসানে 'ইণ্টার এলায়েড কমিশন' যখন সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য লুক্সেমবুর্গকে জিজ্ঞেস করলেন তাদের ক্ষতিপূরণের কথা, মিঃ জোসেফ বেচ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, জার্মান বনাঞ্চল ক্যামারওয়াল্ড থেকে ১ বর্গমাইল জায়গা আমাদের চাই। মিত্রপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই লুক্সেমবুর্গের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

লুক্সেমবুর্গের ৩১৬০০০ অধিবাসীর কেউই মিঃ বেচের এই আকাঙ্ক্ষার অংশভাগী হতে পারলেন না। দুই বৎসর আগেও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী বৈদেশিক সাংবাদিকদের এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যদি কেউ আমাদের রাজ্যের এক ফুট জায়গাও জোর করে নিতে চায়, তাহলে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করব। কিন্তু কোন আইন করে ক্যামারওয়াল্ডে যে তিনটি জার্মান পরিবার বাস করে তাদের লুক্সেমবুর্গের অধিবাসী করে নেওয়া হয়নি। তার ফলে আন্তর্জাতিক চুক্তি বলে ক্যামারওয়াল্ড সরকারীভাবে লুক্সেমবুর্গের অঙ্গীভূত কখনো হয়নি। কয়েক সপ্তাহ আগে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সম্পর্কে এক বৈঠকে লুক্সেমবুর্গ তার ১ বর্গমাইলের দাবি প্রত্যাহার করে আবার সেই ৯৯৯ বর্গমাইল আয়তনে ফিরে এসেছে।

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

একুশ

অভিধানে রয়েছে, কণ্টিনেণ্ট হ'ল ইংলণ্ড-বর্জিত য়ুরোপ। শব্দটির এ-ব্যঞ্জনা গ'ড়ে উঠেছিল কবে বলতে পারি না, তবে কণ্টিনেণ্টে ভ্রাম্যমাণ হ'তে না হ'তে বোঝা যায় কেন কণ্টিনেণ্টের মধ্যে ইংলণ্ড দ্বীপকে ধরা হয় না। ইংলণ্ডে গ'ড়ে উঠেছে এক দ্বীপাবদ্ধ (insular) মনোভাব। ডীন ইঙ্গ তাঁর বিখ্যাত Outspoken Essays-এ লিখেছেন যে, বিদেশীকে পছন্দ করা ইংরাজ জাতের পক্ষে প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। ওদিকে নিউটন আবিষ্কার করেছেন যে ক্রিয়া আনে প্রতিক্রিয়া। পরিণাম: ইংরাজ জাতকেও কণ্টিনেণ্টে কেউ পছন্দ করত না যদিও খাতির করত সবাই।

খাতির না ক'রে উপায়? এতটুকু ছোট্ট দ্বীপের মাত্র কয়েক কোটি মানুষ সারা বিশ্বে হানা দিত কারুর মানা না মেনে! আজ অবশ্য ইংলণ্ডের সে-বোলবোলা নেই —সে-দাপও নেই, না সে-অযোধ্যা। কিন্তু সে-সময়ে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও— ইংরাজের আস্ফালনের সীমা ছিল না:

Rule Britannia! Britannia rules the waves. Britons never shall be slaves.

গানটি সারা ইংলণ্ডে ঝংকারিত হ'ত। কিন্তু এখন ব্রিটানিয়ার কোথায় সে গর্ব? ইংলণ্ড আজ কবি গ্রে-র কবিতাই মনে করিয়ে দেয়:

The paths of glory lead but to the grave!

কত সত্য কথা? অথচ এ-শতকের প্রথমদিকে—য়ুরোপের প্রাক্-হিটলার পর্বে —ইংলণ্ডের "মহিমা"—glory—দেখে কে ভাবতে পারত যে, মাত্র বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড শুধু যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বশক্তি হয়ে দাঁড়াবে তাই নয়—"মহাচলোর্মির রাণী" খেতাবের গর্বও তার কাছে হয়ে দাঁড়াবে শুধু অতীতের স্মৃতি?

কিন্তু কণ্টিনেণ্টে—মানে ফ্রান্স, হলাণ্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজর্লণ্ড ও হাঙ্গেরি—ঘুরে চল্লিশ বৎসর আগে এমন কথা আমার একবারও মনে হয়নি যে, ব্রিটানিয়া অদূর ভবিষ্যতে শুধু যে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বর্গশক্তিতে পরিণত হবে তাই নয়, সমুদ্ররাজ্ঞীর পদবীও খুইয়ে বসবেন নিয়তির চক্রের, আবর্তনে। য়ুরোপ বলতে সে-সময়ে আমাদের চোখে সব আগে ইংলণ্ডের ছবিই ভেসে উঠত—অন্তত আমাদের দেশে।

তাই তো চমকে উঠেছিলাম জর্মনদের সঙ্গে নিকট-পরিচয়ে। প্রতাপাদিত্য বিশেষণটি মনে উদয় হ'ত দেখে ওদের অক্লান্ত কর্মিষ্ঠতা, অফুরন্ত উদ্যম, অপরাজেয় বলিষ্ঠতা। যুদ্ধে ওরা তখন হেরে গেছে, তবু মনে মনে জপছে: Herrenvolk-এর মন্ত্র—মানে প্রভুর জাতি। কিন্তু ওদের প্রতাপ দেখেও আমি তেমন অভিভূত হই নি যেমন হয়েছিলাম ওদের সংগীতানুরাগ দেখে। সংগীতকে যে কোনো জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা এমন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে এ আমি স্বচক্ষে না দেখলে ভাবতেই পারতাম না। বিশ্ববিশ্রুত জর্মন কণ্ডাক্টর আর্থার নিকিশ একবার কুড়িটি সিম্ফনি কন্সার্ট দেন—প্রতি শনিবার একটি ক'রে। তিন মাস আগে সব টিকিট বিক্রয় হয়ে গেছে— season ticket—অর্থাৎ কুড়িটি টিকিট-ওয়ালা গোটা খাতা। আমি অতি কষ্টে এক বন্ধুর সাহায্যে মাত্র চারটি টিকিট সংগ্রহ করি চতুর্গুণ দাম দিয়ে। এছাড়া, চেম্বার মিউসিক, পিয়ানো, বেহালা, রিসাইটাল, অপেরা, গ্রাম্য সংগীত, গির্জা সংগীত, হাজার ড্রইংরুম সালঁ-তে (salon) উদীয়মান গায়ক-গায়িকার সে কী বিপুল সমাদর! জর্মনিতে দু' তিন মাস থাকতে না থাকতে যেন থ হয়ে গেলাম! "ইংরাজী সংগীত" শুনে ওরা তো হেসেই খুন, বলে: ওরা কবিতা লিখুক যা পারে— সংগীত আবার কেন......ইত্যাদি। মনে পড়ত শ্রীশরৎ দত্তর কথা: গান শিখতে চাও তো যাও বার্লিনে। বৃটানিয়া চলোর্মিসম্রাজ্ঞী হ'তে পারেন কিন্তু সংগীতসম্রাজ্ঞী হ'ল জর্মনি।

আমি ফের উড়িয়ে উঠলাম: এসে গেছি ঠিক জায়গায়ই তো—আমাকে আর পায় কে? Sternes Conservatorium-এর ডিরেক্টরের কাছে যেতেই তিনি য়ুকেলিউস ব'লে এক শিক্ষকের কাছে আমাকে পেশ ক'রে দিলেন। ঐ সঙ্গে আর এক বেহালা শিক্ষকের কাছে শিখতাম বেহালা বাজানো বেশি ঝুঁকলাম অবশ্য গান শেখার দিকেই সপ্তাহে তিনদিন ক'রে কণ্ঠকলাবৎ-এর

কাছে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে কণ্ঠসাধনার তালিম নিতাম বহু মার্ক খরচ ক'রে। কিন্তু সে সময়ে জর্মন মার্ক প'ড়ে গেছে—এক পাউণ্ডে আগে মিলত কুড়ি মার্ক, সে-সময়ে—দু হাজার। কাজেই জর্মনিতে ইংলণ্ডের সিকি খরচ ক'রেও থাকা যেত রাজার হালে। অপেরা কন্সার্টে শ্রেষ্ঠ দামী সীটে শুধু যে নিজে যেতাম তাই নয়—মাথায় পাগড়ি এঁটে বন্ধুবান্ধবীকে প্রায়ই নিয়ে যেতাম। ফলে নাম র'টে গেল Prinz Roy. একথার উল্লেখ করছি আমার কোনো রাজকীয় মহিমার ঢাক পেটাতে নয়—শুধু আমার এই উপলব্ধিটিকে পেশ করতে যে, জর্মনিতে সংগীতোৎসাহী সহজেই মান পায়। ইংলণ্ডে আমার কণ্ঠ শুনে কজনই বা উজিয়ে উঠেছিলেন? কিন্তু জর্মনিতে কয়েকটি সাল'তে গান করতে না করতে আমার সে কী প্রতিপত্তি! আনন্দে প্রায় "হৃদয় আমার ময়ূরের মত নাচে রে" অবস্থা—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

আর সত্যিই এর প্রধান কারণ ছিল আমার কণ্ঠ। আরো কয়েকটি যোগাযোগও ছিল অবশ্য—আমার স্বাস্থ্য, মেলামেশায় ক্ষমতা, অর্থস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি। কিন্তু কণ্ঠই ছিল আমার প্রধান সুপারিশ একথা বললে একটু অত্যুক্তি হবে না। জর্মনরা ইংরাজদের মতন চাপা-প্রকৃতির জাত নয়, কথায় কথায় উজিয়ে উঠে grossartig fablehaft, wunderbar, kolossal জাতীয় উচ্ছ্বসিত বিশেষণ ব্যবহার ক'রে থাকে। ইংরাজী ভাষাকে বলা হয় a language of understatement—বেশি উচ্ছ্বাস আবেগের ভার সয় না। জর্মানভাষায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোড়া পাল হু হু ক'রে চলে, বিশেষ করে সামাজিকতা খরস্রোতে। একথা এত ক'রে বলছি শুধু জানাতে যে, জর্মনিতে আমি সমাদর পেয়েছিলাম শুধু আমার কণ্ঠের প্রসাদে তাই নয়—স্বভাবে ওরা উচ্ছ্বাসী ব'লে বটে। তাই আমার কণ্ঠের দৌলতকে বন্ধুদের বাজারে খাটিয়ে যখন আমি ওদের কাছ থেকে জয়ধ্বনির মুনাফা পেতাম তখন নিজেকে সময়ে সময়ে সাবধান ক'রে দিতে বাধ্য হতাম এই ব'লে যে, ওদের স্তুতির মধ্যে ফেনাকে বাদ দিয়ে তবে পানীয়কে বরণ করতে হবে। নৈলে শুধু মাথাই গরম হবে যার ফল শুভ নয়।

কিন্তু আবার যৌবনে বেশি সাবধানী হওয়াও সাজে না। তাই চললাম ওদের সমাদরের স্রোতে গা ভাসিয়ে—দেখতে দেখতে দেখতে নানা সভায় গাওয়া শুরু করলাম—শুধু বাংলা হিন্দি গানই নয়—ইতালিয়ান, ফরাসি ও জর্মন গান। এক-আধটা রুশ গানও শিখেছিলাম, রুশভাষা না জানা সত্ত্বেও—সে-গানগুলি বিশেষ কাজে এসেছিল আমার বার্লিন-জীবনে।

এ সম্পর্কে আমার একটা কথা মনে হয়েছে বারবারই। কথাটা এই যে, বিধাতা নানা মানুষকে নানা মূলধন দিয়ে চুপ ক'রে দেখেন কে তাকে কেমন ক'রে খাটায়। কাউকে দেন মস্তিষ্ক, কাউকে স্বাস্থ্য, কাউকে রূপ, কাউকে ধনসম্পদ, কাউকে চিত্তাকর্ষী লাবণ্য—charm: আমার মনে হ'ত আমাকে বিধাতা নানা মূলধনই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি যে-মূলধনটি খাটিয়ে বিশ্বমানবের বাজারে সবচেয়ে বেশি
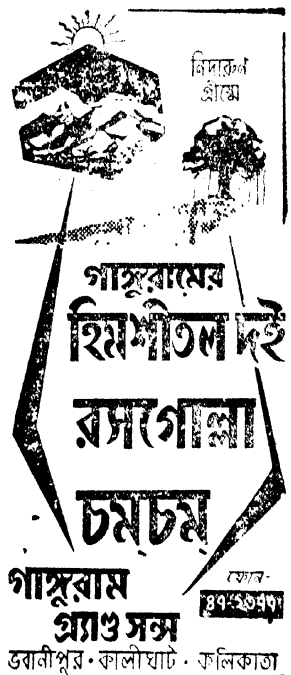
সমাদরের মুনফা কামিয়েছি সে আমার কণ্ঠই বটে। শৈশবে পিতৃদেবের মুখোজ্জ্বল করেছি এরি জোরে। কৈশোরে বহু বন্ধু ও অনুরাগীর প্রীতি পেয়েছি এরই দৌলতে। যৌবনে অপরিচয়ের দূরত্ব কাটিয়ে বিদেশে বিভুঁইয়ে অচেনা শিল্পী তথা দরদী নরনারীর বরণমালা পেয়েছি এরি প্রসাদে, এমন কি বার্ধক্যেও পুণ্যের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এরি জোরে। এ সম্পর্কে আমার মনে পড়ে প্রায়ই রাণা প্রতাপসিংহের বিশ্বস্ত বাহন চৈতকের কথা—যে ক্লান্ত হয়েও প্রভুকে ধারণ করে এসেছিল শেষ পর্যন্ত। তাই আমি আমার অনুরাগিবৃন্দকে আজও প্রায়ই বলি সপরিহাসে: "The old horse can still run": আমার দেহের নানা শক্তিই ম্লান হয়ে এসেছে কিন্তু প্রভুভক্ত কণ্ঠ আজও পেন্সন চায় নি আরামের পিঞ্জরাপোলে ভুষি পেয়ে খুশি থাকতে। কিন্তু যা বলছিলাম।

আমার কণ্ঠের প্রসাদে জার্মানিতে দেখতে দেখতে শুধু যে সংগীতবিদদের অভিজাত সভায় ছাড়পত্র পেলাম তাই নয়—জার্মানির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধবীও লাভ হল যে কত! জার্মান তো বটেই, তাছাড়া পোল, সুইড, চেক, তুর্কী—সর্বোপরি রুশ। এ আর এক বিচিত্র রোমান্স—জার্মানিতে আমার বন্ধুত্ব হল সবচেয়ে বেশি রুশ নরনারীর সঙ্গে। জার্মানদের পরেই সংগীত প্রীতিতে নামডাক রুশ জাতের। নানা রুশ সুর আমাকে নিরন্তরই উতলা করে তুলত। সে সময়ে বার্লিনে রুশ গান, থিয়েটার, কন্সার্ট কাবারে রেস্তরাঁর ছড়াছড়ি। দু' তিন লক্ষেরও বেশি রুশ উদ্বাস্তুর বার্লিনে বসবাস। এঁদের মধ্যে অভিজাত রুশও ছিল, যদিও দরিদ্রই বেশি। তাদের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হল শুধু আনন্দের মহলে নয়, আবেগের অন্তঃপুরেও বটে।

আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল এক রুশ যুবকের সঙ্গে আলাপ হতে। সে ছিল বলশেভিক। কিন্তু আমি প্রথমদিকে সেকথা জানতাম না। তার সঙ্গে অনবরত কথা হত ফরাসী ভাষায়। সে অপূর্ব ফরাসী ও জার্মান বলতে পারত। শিক্ষিত রুশরা প্রায়ই বহুভাষাবিৎ হয়। আমার বলশেভিক বন্ধুটি এর উপর আবার ছিলেন বহুদর্শী ভ্রমণোৎসাহী নানা দেশ ঘুরে, নানা জাত ও জাতীর সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে হয়ে উঠেছিলেন যাকে বলে কসমোপলিটান, কিনা বিশ্বমানবিক। তবে যেহেতু এর কথা "ভাবি এক হয় আর" এ লেখ শীর্ষকেই বলেছি সেহেতু এখানে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে, তাকে ভালোবেসেছিলাম আমি মনে-প্রাণে।

শুনেছি, সে আজ মস্কোয় একজন বড় কর্মচারী, তবে দেশে ফিরে তার দু একটির বেশি চিঠি পাই নি। তার স্নেহকোমল মুখ ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আমি আজও ভুলতে পার নি। যদিও আজ আমার কেবলই মনে একটা খেদ জাগেঃ "আহা, যদি সে বলশেভিক না হ'ত!" মানুষ যা চায় সবই কি পায়? আর পেলে হয়ত লাভের চেয়ে ক্ষতিই হ'ত বেশি—কে জানে? থাকগে।

বার্লিনে আমার মন ফের দুলে উঠে এই বন্ধুটিরই জন্যে। সে ছিল এক হোয়াইট রুশ ডাক্তারের একমাত্র পুত্র। ডাক্তার লণ্ডনে প্রচুর টাকা করেছিলেন। বলশেভিকদের উপর তাঁর ছিল হাড়ের রাগ। কিন্তু নিয়তি কেন বাধাতেঃ তাঁর একমাত্র কুলতিলক হ'ল কিনা সর্বান্তরিক বলশেভিক! পিতা তাকে ভয় দেখালেন ত্যাজ্যপুত্র করবেন। সে অচল অটল। বার্লিনে রুশ কনসুলেটে উদয়াস্ত হাড়ভাংগা পরিশ্রম করত। বিবাহ করেছিল এক সুইস মেয়েকে কিন্তু তার সংগে দেখাশুনো হ'ত খুবই কমঃ স্ত্রী সুইজর্লণ্ডে নার্স হয়ে জীবিকা অর্জন করে, স্বামী বার্লিনে বলশেভিক প্রপাগাণ্ডায় সর্বত্যাগী। তার মুখে তার দেশের জন্য দুঃখের তপস্যা বরণ করার নানা কাহিনী শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে আমার চোখে জল ভরে আসত, কিন্তু সে মৃদু হেসে বলত: "কিন্তু এজন্যে আজ আমার সত্যিই কোনো দুঃখ নেই ভাই, কারণ আমি যে জানি—এছাড়া জগতে আমাদের মন্ত্রসিদ্ধি হ'তে পারে না।" আমি যখন ১৯২২-এ লুসানো রওনা হই তখন তাকে ট্রেনভাড়া দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কেননা সে ছিল সত্যিই দরিদ্র—যা মাইনে পেত তাতে সুইজর্লণ্ডের খরচের সংকুলান হয় না। দৈবদুর্বিপাকে তার আসা হয় নি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা থাক, বলি এখানে আর একটু তার আদর্শের কথা যা আমাকে সে-সময়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তাকে দেখে প্রথম আমি বুঝি লেনিনকে রুষ জাতি কোথায় বসিয়েছে। লেনিনের মহত্ত্বের ডাকে সে কীভাবে সব ছেড়ে বেরিয়ে আসে আমাকে বলত দিনের পর দিন। শুনতে শুনতে একটু একটু ক'রে আমার মন তার উৎসাহের রঙে রঙিয়ে উঠল, আমার সত্যিই মনে হ'ল—রুশ জাত বুঝি এ-অবিচারভরা জগতে এসেছে সুবিচারের সাম্যের গোড়াপত্তন করতেই। তার কাছে শুনতাম, হাজার হাজার রুশ তরুণ তরুণী কত কষ্টই না সয়েছেন এই নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে। সে প্রায়ই বলত "মনে আছেঃ "লেনিন বলেনঃ 'যতদিন জগতে সবাই অন্ন না পাবে ততদিন কাউকেই পরমান্ন পরিবেশন করা হবে না—personne n'aura de gateaux

রুশ বিপ্লবীদের কথা, যাঁরা বলতেনঃ জগৎজোড়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হ'তে না পারলে অত্যাচারীদের নির্মূল করা যাবে না। বলত প্রায়ই ফরাসী বিপ্লবের কথা, আবৃত্তি করত তার বাণীঃ

Allons enfants, de la patrie
Le jour de gloire est arrive
Contre nous de la tyranie
L'etendard sanglant est leve

দেশসন্তান! চল্ ভাই, আগে চল্!
দেখ্ ঃ এলো দিন মহিমময়, মহান্!
অরি আমাদের অত্যাচারীর দল
উড়ুক রক্ত বিদ্রোহের নিশান।

পরে ক্রমশ তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই আমার ঘরে গাইতাম এই গানটি। গাইতে গাইতে তার পাণ্ডুর মুখ উঠত রঙিয়ে। সে দেখতে সুদর্শন ছিল না কিন্তু সে-সময়ে তাকে আমার চোখে সত্যিই কী যে সুন্দর লাগত!

এ-উপলব্ধিটির উল্লেখ করছি একটি মহৎ সত্য পেশ করতেঃ প্রীতি যেখানে অন্তরের রসে সরস হয়ে ওঠে সেখানে এমন কি আদর্শের দুস্তর ব্যবধানও সময়ে সময়ে তেমন দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয় না। প্রেম প্রীতি যে কেমন করে এ অসাধ্য সাধন করে আজো তার তল পাই নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নজিরে শুধু এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, প্রেমের প্রতিভা স্বভাবে অঘটনঘটনপটীয়সী, তাই যখন হৃদয়ে প্রীতির অভ্যুদয় হয় তখন তার ইন্দ্রজালে অসম্ভবও সম্ভব হয়—শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর ভাষায়ঃ তখন miracle is made the common rule, সে-পরম সুলগ্নে একজন আর একজনকে শুধু জানিয়ে দেয় তার প্রেমের প্রতি শিহরোচ্ছ্বাস তানেঃ

জানি না তো স্বপ্ন তোমার কোন্
মোহানার পানে তোমায় টানে,
জানি শুধু—ভালোবাসি, কেন বাসি
—কেউ কি প্রিয়, জানে?

কিন্তু এ-ভালোবাসা আমাকে ধীরে ধীরে আমার নিজের আদর্শ থেকে ছিনিয়ে যেন তার আদর্শের দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি তার মুখে নিরন্তর বলশেভিকদের নানা রঙিন স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে খানিকটা সেই রঙেই রঙিয়ে উঠলাম। আমার মনে মহা উৎসাহ জেগে উঠল, ভাবলাম মানব রায়কে লিখি যে, যাব দেখে আসতে—বলশেভিকরা কী নব সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে, কেমন ক'রে জোগাচ্ছে নিরন্নের মুখে অন্ন, কীভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে ধনতান্ত্রিক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রক্তনিশান ওড়াচ্ছে।

আজ ষাটের কোঠা পার হ'য়ে অনেক কিছু বেশি সাফ দেখতে পাই যা এই সময়ে—যৌবনের মাতাল নেশায়—ঝাপসা দেখতাম, কি ভুল দেখতাম। কিন্তু যৌবন জলতরঙ্গের বহিরুচ্ছ্বাস এমনিই মোহময় যে সে ডুবিয়ে দেয় সব আন্তর গভীরকল্লোলের উদাত্ত আহ্বান—তাই তখন ভুলেও মনে হ'ত না যে, যা দেখছি ভুল দেখছি, কি ভুল শুনেছি। মনে হ'ত কেবলই যে সব প্রগতির মূলেই বুঝি আছে নিষ্ঠুর বিদ্রোহের "আগে চল আগে চল ভাই" হুংকার। এক গভীরায়মান নৈশ্চিত্য আমার মনকে এমনি পেয়ে বসল যে আমি দিনের পর দিন ভগবানকে একবারও স্মরণ করতাম কিনা সন্দেহ। ইংলণ্ডে সুভাষের সংস্পর্শেও উৎসাহ বোধ করেছি বহুবার, কিন্তু ভগবানকে ভুলিনি। কারণ তার মধ্যেও এক দুর্দম বিদ্রোহী তাকে ঠেলত বটে সামনের দিকে, কিন্তু ভগবানের নোঙরছাড়া করে নয়। আমার বলশেভিক বন্ধুটির সঙ্গে তার তুলনা ক'রে আজ স্পষ্ট দেখতে পাই একটি সত্যঃ যে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মন কিছুতেই পুরোপুরি নাস্তিক হ'তে পারে না ব'লে কোনো আদর্শের নামেই ষোল আনা নিষ্ঠুর হ'তে পারে না। তাছাড়া সুভাষ যতই বহির্মুখী কর্মের গুণগান করুক না কেন, তার অন্তরের গভীরে লুকিয়ে ছিল একটি মহান উদাসী যে তাকে চঞ্চলতম দুর্লগ্নেও ভুলতে দিত না শিব শক্তি কৃষ্ণকে—যে মায়ায় ঘোর কর্মাবর্তের মধ্যেও তাকে গীতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে দেয়নি, কি ধ্যানভ্রষ্ট করেনি। আমার বলশেভিক বন্ধুর তো ওসব বালাই ছিল না—মানুষকে নিয়েই তার একান্ত কারবার, ধর্ম তার কাছে "opium of the soul" —বলত সে দৃঢ়কণ্ঠেই লেনিনের বেদবাক্য(?) উদ্ধৃত করে। অথচ আশ্চর্য এই যে এ সময়ে বলশেভিক আদর্শের মোহ আমার মনকে এমনি অধিকার করে বসেছিল যে তার কালাপাহাড়ি মতামতও আর আমার দুঃসহ মনে হ'ত না—তার আরাধ্য সোনার হরিণকে আর মায়ামৃগ মনে হ'ত না। শেষে ঠিক করলাম তার সঙ্গে যাব একবার রুশদেশে—যা থাকে কপালে, দেখে আসি কী ভাবে ওরা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠায় "এ-পীড়ন-পেষণ অবিচার ভরা" পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্যের প্রবর্তন করেছে।

আমার পক্ষে এর চেয়ে বড় পদস্খলন আর কী হ'তে পারে? যে চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছে যে ভাগবত জীবনই সেরা জীবন ও ভগবানকে বাদ দিয়ে মানবহিত-সাধন আকাশ কুসুমের মতোই অলীক, অসম্ভব সে কিনা ভারতের আত্মার সনাতন বাণী ভুলে গেল?

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো
ভবিষ্যতি।
ব্যাপ্ত চর্মসম আকাশ বেষ্টিত করে
কে কোথায় পেয়েছে অমরাবতী?
আরো অসম্ভব—মানবের দুঃখ করা দূর
না জানিয়া দেবদেবেশ্বরে।

কিন্তু মায়ার প্রজনে আলেয়াকে দেখায় তারা—আমি স্থির করলাম যাব রুশদেশে ও সেখানে বেশ ভালো শিখে থাকব বেশ কিছুদিন। থেকে থেকে মনে পড়ত রাখাল মহারাজের বাণী ঃ "ঠাকুরের কৃপা যাকে ঘিরে আছে তার বিপদ হবে না" কিন্তু সে সময়ে য়ুরোপের কর্মমোহ শক্তিবাদ আমাকে এমনই অন্ধপ্রায় করেছিল যে আমি যেন দেখেও দেখতে পেতাম না—আমি কোন বিপজ্জনক বিপথে পা দিয়েছি—সনাতন অধ্যাত্ম বাণী ছেড়ে কান পাতছি, কোন্ সর্বনাশা ঐহিকতার মায়ামন্ত্রে।

এমন সময়ে এল ঠাকুরের কৃপা—দেখা হল ওলগা বিরুকফের (Olga Birukoff) সঙ্গে—অমনি পড়ল চোখের ঠুলি খসে। বলি—কেমন করে ঘটল এ-অঘটন।

ক্রমশঃ

চক্রদত্ত

আজকের বিজ্ঞানের যুগে চিকিৎসা জগতের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন কি অনেক বড় বড় অস্ত্রোপচার করাও আজকাল বেশ সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আরও উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। সাধারণত দেহে অস্ত্রোপচার করার আগে রোগীকে অজ্ঞান করে নেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার রোগীর দেহকে ঠাণ্ডা করে নেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। দেহকে ঠাণ্ডা করার পদ্ধতিটা বাইরে থেকেই করা হয়। হয় দেহে কোনওরকম ঠাণ্ডা কিছু বাইরে থেকে জড়িয়ে দেওয়া হয়, না হয় তো ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। হৃদযন্ত্রে বা মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করার জন্য দেহকে শীতল করার বিশেষ দরকার হয়। কারণ দেহ শীতল হয়ে গেলে রক্ত চলাচল ধীরে হওয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন কম হবে এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও কমে যাবে। ফলে হৃদযন্ত্রে অপারেশন সহজ হয়ে যাবে। আবার মস্তিষ্কে অপারেশনের সময় দেহ শীতল হলে দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়া কম হয় এবং মস্তিষ্কের অনুভূতি কমে যায়। ফলে অপারেশন করা সহজ হয়ে যায়। অবশ্য ঐভাবে শরীর ঠাণ্ডা করতে যেমন দেরি হয়, তেমনি আবার অস্ত্রোপচারের পর দেহকে গরম করতেও সময় লাগে। [illegible] চিকিৎসা বিজ্ঞানী [illegible] দেহকে ঠাণ্ডা করার [illegible] করেছেন। [illegible] বলেন যে, রোগীর [illegible] একটি [illegible] মধ্যে [illegible] দিয়ে তার পর ঐ [illegible] করে দিলে ক্রমশ [illegible] শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এভাবে ঠাণ্ডা করার সুবিধে এই যে, অপারেশনের পর ঐ [illegible] আবার [illegible] শরীর গরম হয়ে যাবে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, অপারেশনের সময় [illegible] মাথার [illegible] [illegible] ডিগ্রী আর অপারেশনের পর ৯৮° ডিগ্রী হওয়া প্রয়োজন।

*

"ইয়াতি" বা "তুষারমানব" যে কোন জাতীয় জীব আজ পর্যন্ত তা সঠিকভাবে কেউই নির্ধারণ করতে পারেন নি। এখনও ইয়াতি নিয়ে গবেষণা চলছে, এখনও ইয়াতি-অভিযান চলে। কিন্তু এখনও স্থির সিদ্ধান্তে কেউই পৌঁছাতে পারেন নি। সম্প্রতি ইয়াতি সম্পর্কে কিছু আলোচনায় জনৈক ভদ্রলোক বলেন যে, "ইয়াতি" বানর কিংবা "ভল্লুক" জাতীয় জীব। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি বিশেষ যুক্তিসহ এই মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম ইয়াতির পদচিহ্ন দেখা গিয়েছিল। তারপর স্যার জন হাণ্ট, মিঃ রাসেল প্রভৃতি বহুজন ইয়াতি অভিযানে গিয়েছেন এবং পদচিহ্ন লক্ষ্য করেছেন। এইসব পায়ের ছাপগুলি দশ ইঞ্চি লম্বা এবং পাঁচ ইঞ্চি চওড়া। সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কোনও দিনই কোনও বানরের এত বড় পা দেখা যায়নি। আর এই তুষার-মানব যে ভল্লুক জাতীয় জীব হতে পারে না, তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, ভল্লুক স্বভাবতই চার পায়ে হাঁটে। মাঝে মাঝে কখনও কখনও দু'পায়ে হাঁটে বটে, কিন্তু সে বেশীদূর পর্যন্ত নয়। সুতরাং ইয়াতির পদচিহ্ন যতদূর পর্যন্ত দেখা গেছে, তার মধ্যে অন্তত এক-আধবার চার পায়ের দাগ দেখা যেত যদি ভল্লুক জাতীয় জীব হত। বিশেষত ভল্লুকেরা চলার সময় মাটিতে নখের দাগ বসায়, এক্ষেত্রে সেরকম কোনই চিহ্ন দেখা যায় না।

*

গেঁটেবাত বা চোরাগবাত রোগের কোনওরকম বিশেষ সুফলদায়ক চিকিৎসা-পদ্ধতি আজ অবধি বার হয়নি। এ পর্যন্ত কোর্টিজোনের সাহায্যে কিছুটা চিকিৎসা করা হয়। এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা করতে গিয়ে ডাঃ হিমার নামে নিউ-ইয়র্কের একজন বায়োকেমিস্ট নতুন আলোকপাত করেছেন। এইসব বাত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের রক্তের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় একরকম পদার্থ থাকে, সেগুলিই রোগের কারণ বিশেষ। এই নতুন ধরনের প্রোটিনের অণুকণাগুলি বেশ বড় বড়। মানুষের দেহে রক্তের মধ্যে রোগ প্রতিরোধকারী স্বাভাবিক যে বস্তু আছে, তাদের সংগে এই নবাবিষ্কৃত প্রোটিনের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার সিফিলিস, হেপাটাইটিস, অ্যানিমিক ইত্যাদি রোগীর রক্তে যে সব অস্বাভাবিক প্রোটিন পাওয়া যায়, এই বাত রোগীর রক্তের প্রোটিনের সংগে সেগুলিরও সাদৃশ্য আছে। ডাঃ হিমার এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বাত রোগীর রক্তের মধ্য থেকে তিন রকম বিশিষ্ট প্রোটিনের সন্ধান পেয়েছেন। ডাঃ হিমার যে পদ্ধতির দ্বারা এই প্রোটিনের অস্তিত্ব জানতে পারছেন, সেটি এত সূক্ষ্ম অনুভূতিবিশিষ্ট যে, এক আউন্সের মধ্যে কোটি কোটি ভাগের এক ভাগও যদি প্রোটিন থাকে তাহলেও তার অস্তিত্ব ধরা পড়বে।

ঝ রে গে ছে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি দুঃখ পাও বলো, দেখো যদি
ঝরে গেছে সবুজের স্নিগ্ধ ডাল থেকে
কটি পাতা। আর পাখি কটি ওই দরদী
হিমের হাওয়ায় প্রাণ টেনে এঁকে-বেঁকে
ওঠা-নামা করে, এক পাখির শবকে রাখে ঢেকে।
তারপরে সেই শব ফেলে রেখে
নিমের ছায়ার অন্ধকারে, তারাও তো কটি পাতা ঊর্ধ্বমুখ।
ক্ষণিকের দীর্ঘশ্বাসে ভরে তোলো যতো দুঃখ সুখ।

আমিও তো পশ্চিমের খোলা জানালায়
দেখি নিয়মিত, সূর্যাস্তের রং থেকে চুরি করে
অতি সন্তর্পণে গোধূলি পালায়
এও কিছু কম দুঃখ? শুধু শোনো ধৈর্য ধরে
আরো: এই রাত্রি নাবে শোনো তরুণের
শব এক যে-তরুণ জীবনের পাষাণ প্রহরে
খর রৌদ্র খাটে মধ্যম থেকে জ্বালে আলো আনে ঘরে।
সেই শেষে পাণ্ডুর মৃত মুখে সূর্যাস্তের রেখাটি জানালায়।

যার গেছে সে-ই জানে, কিসে কী হারায়॥

ম ধ্য বৃ ত্ত

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

প্রত্যহের জীবনটা তোমার ভাল লাগে কি?
সকাল থেকে ঘড়ির কাঁটা ধরে তোমার ওঠা
কোন রকমে নাকে মুখে দুটি গুঁজে বের ছোটা
কর্মক্ষেত্রে ওপরওলার খোঁটা
সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে দেখা
সেখানেও নেই শান্তি।

নিঝুম রাতের অন্ধকারটা মন্দ নয়
চিৎ হয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকা
যেন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানটা আছে আঁকা
মাথার ভেতরটা কেমন লাগে ফাঁকা
মনে হয় যেন কাউকে চিনি না
কারুর সঙ্গে নেই আমার কোন পরিচয়।

আচ্ছা, ছুটির দিনটা ওরই মধ্যে কেমন যায়।
দুপুরবেলার নিস্তরঙ্গ অলস পাড়াতে বসে
মায়েরা লাফায় কিম্বা একটি ইঁটের টুকরো খসে
মাথায় ঐ বাজারে ফিরে বাবুরা পড়ে এসে
তখন গোলকধাঁধাতে পার হয়ে
দেখি বার হয়ে আসা দায়।

তৃ ষা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেক তৃষ্ণার দাহ বুকে তার, অনেক স্বপ্নের
অস্ফুট উন্মুখ কুঁড়ি ঝরে গেছে নীল অন্ধকারে:
তবু শূন্য মন নিয়ে তারা-জ্বলা দূরে আকাশের
চোখে চোখ রেখে চায় সে পড়ে নিতে হৃদয়ের ভাষা।
হঠাৎ মড়কের পারে অবজ্ঞায় যে-পাখি আহত,
সে যেন কী বলতে চায়, বলতে চায় অবাক চিৎকারে!
তুমি কি দেবে না তাকে কিছু আশা, কিছু ভালোবাসা;
শুশ্রূষার হাতে মুছে দেবে নাকি যন্ত্রণার ক্ষত?
হে মেঘ, প্রসন্ন হও, আনো স্নিগ্ধ শ্যাম জলধারা:
মনের মাটিতে তার রাখো শান্ত সান্ত্বনার হাত,
দাও না হৃদয় ভরে ফুল আর ফসলের ঘ্রাণ।
আকাশ, তুমিও দিও অকুণ্ঠ আলোর আশীর্বাদ:
তোমার আভায় দিন দীপ্ত হোক, স্বপ্নময় রাত
নতুন ঐশ্বর্যে তার ভরে দিক জীবন-সাহারা।
ডানা-ভাঙা পাখি ফের ভুলে গেলে সব অবসাদ
আলোকের যাত্রী হোক কণ্ঠে নিয়ে সমুদ্রের গান।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

৯

ডাইনে-বাঁয়ে সারি সারি ফ্ল্যাট। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। কোন ঘরের দরজার সঙ্গে আঁটা চিঠির বাক্স, কোন দরজায় নেম-প্লেট আর গৃহস্বামী বাড়িতে আছেন কি নেই তার নির্দেশসূচী। কোন ঘরের দরজা আধখানা খোলা, কেউ হয়তো এইমাত্র ভিতরে ঢুকেছে, কোন দরজা একেবারেই বন্ধ। এ বাড়ির সব ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে মাধুরীর আলাপ নেই। তবে মেয়েদের প্রায় সবাইকেই চেনে। কাউকে শুধু মুখে, কাউকে নামে ও কারো কারো সঙ্গে আর একটু ঘনতর পরিচয় আছে। কিন্তু রমা বউদির সঙ্গে যেমন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তেমন আর কারো সঙ্গেই হয়নি। অথচ ওরা কদিনই বা এ বাড়িতে এসেছেন, বোধ হয় ছমাসও হবে না। কিন্তু মাধুরী জানে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সময়ের হিসেবটাই সবচেয়ে বড় নয়।

কড়ানাড়ার [illegible] শব্দ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি [illegible] শব্দে দরজা খুলে গেল। যিনি এসে দরজা খুললেন তিনি রমা বউদি নন, তাঁর স্বামী সমীর সরকার। পরনে পাজামা। এক মুখ সাবান মেখে বেশ একটু বিব্রত হয়েই যে ভদ্রলোক এসে দোর খুলে দিলেন তা বেশ বোঝা গেল। রিজার্ভ ব্যাংক অফিসে সম্প্রতি অফিসার গ্রেডে প্রমোশন পেয়েছেন। সেই অহংকারটা চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। মাধুরী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'রমা বউদি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

কিন্তু সমীরের হাঁড়িপানা মুখে তৎক্ষণাৎ হাসি ফুটেছে, 'আরে তুমি মাধুরী এস এসো। দিন যাবে আজ ভালো।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আপনি কি ভেবেছিলেন? পাওনাদার?'

সমীর বলল 'ওইরকমই একটা কিছু। কিন্তু এমন পাওনাদারও কেউ কেউ আছে, যারা নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে ভুলে যায়।.. দিতে চাইলেও তারা নিতে চায় না, এমনই উদাসিনী।'

দেখা হলেই সমীরবাবু এ ধরনের ঠাট্টা-তামাশা করেন। কোন কোন সময় বিরক্ত হয় মাধুরী। কিন্তু আজ তার ভালই লাগল। জবাবে হেসে বলল, 'আমাকে তেমন মনে করেন না। আমি আমার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে জানি।'

সমীরের পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল মাধুরী।

শোবার ঘরের ভিতর থেকে রমা বেরিয়ে এসে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেল, 'এদিকে এসো মাধুরী।'

সমীর হেসে বলল, 'এ যে একেবারে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেলে। মেয়েরা এমনি হিংসুটেই হয়।'

রমা ভ্রূ বাঁকিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'তাই নাকি! আমাদের এই হিংসুটে বুদ্ধিটুকু আছে বলেই সমাজ সংসার রক্ষা পাচ্ছে। নইলে কোথায় তোমরা সব ভাসিয়ে নিতে।'

সমীর এবার জবাব না দিয়ে স্মিত-মুখে রমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে লাগল।

কিন্তু রমা তাকে স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়াতে দেবে না। এক মিনিট যেতে না যেতেই বলল, 'শোন, তুমি ওঘরে গিয়ে শেভ কর। ওখানে ছোট একখানা আয়না আছে। তাতেই তোমার হয়ে যাবে।'

সমীর বলল, 'আমাকে তাড়াচ্ছ কেন? তোমাদের টক্ কি এতই কনফিডেনশিয়াল?'

রমা বলল, 'তাছাড়া কি। পুরুষেরা কি আমাদের সব কথা শোনার যোগ্য? নাকি সব কথা তারা বোঝে? কি বল মাধুরী?'

মাধুরী বলল, 'বউদি, আমার কিন্তু বেশি সময় নেই। জরুরী কথা যদি কিছু থাকে তাহলে বল। আর যদি কম জরুরী হয় তাহলে স্কুল থেকে ফিরে এসে শুনব।'

রমা ধমক দিয়ে বলল, 'বোসো তো। এ যে একেবারে ঘোড়া চড়া ঝান্সীবাঈ। হাতে একখানা তরবারি থাকলেই বেশ মানাত।'

তারপর স্বামীকে ফের তাড়া দিয়ে বলল, 'তুমি এখনও গেলে না? মেয়েদের মত আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনবে? পুরুষ মানুষ যে এমন হয় তা আর দেখিনি।'

সমীর এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'নাঃ জ্বালাতন করে ছাড়লে।'

তারপর শেভ করার জিনিসগুলি নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

মাধুরী বলল, 'খোকন কোথায়?'

রমা বলল, 'সে পদ্মর কাছে আছে।'

পদ্ম এদের রাঁধুনী। ঝি আর চাকরের কাজও রমা বউদি তাকে দিয়ে চালায়। আধবয়সী শক্ত-সমর্থ একটি বিধবা স্ত্রীলোকের চেহারা মাধুরীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। তাকে খবর দিতে বোধ হয় এই পদ্মই গিয়েছিল। বেশ
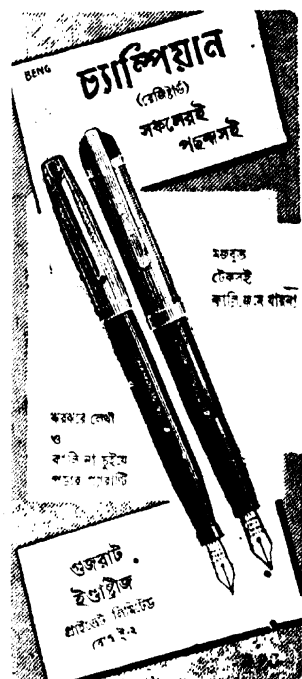
কাজের লোক। তাদের সংসারেও এমন একটি ঝি রাখতে পারলে মন্দ হত না। মার দুখানা হাত একটু বিশ্রাম পেত। দাদা যদি একসঙ্গে থাকত, তাহলে সহজেই এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর ব্যবস্থা হত। কিন্তু শুধু নিজেদের আয়ের ওপর নির্ভর করে আর খরচ বাড়াতে ভরসা পায় না মাধুরীরা। তাছাড়া বাবা হৈ-চৈ করবেন। ঠিকে ঝি রেখেছে বলে তাতেই টানাটানির সময় মাঝে মাঝে বলে বসেন, 'এতগুলি ঝি থাকতে আবার একটা আলাদা ঝিয়ের দরকার কি। হাতে হাতে সবাই যদি কিছু কিছু করে কাজ করে তাহলেই তো হয়।'

মাঝে মাঝে বাবার রুক্ষতা, রূঢ়তা বড় বেশি কঠিন লাগে মাধুরীর। জীবনে বেশি ঘা খেলে মানুষ বোধ হয় ওইরকমই হয়। হঠাৎ ফের অসীমের কথা মনে পড়ল মাধুরীর। বাবার ধর্মতত্ত্বের পাল্লায় পড়ে বেচারা অসীমদা বোধ হয় এতক্ষণে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। মাধুরী ছাড়া তাকে উদ্ধার করবে কে?

'আমি উঠি বউদি। সত্যিই কাজ রয়েছে। ফিরে এসে গল্প করব।'

রমা মুখ ভার করে বলল, 'কাজ যে আছে তা জানি। তোমরা সবাই কাজের মেয়ে। আমিও একটা কাজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। শুধু গল্প করবার জন্যে সাত সকালে ডেকে পাঠাইনি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আচ্ছা কাজটা আগে দেখি।'

রমা হাত বাড়িয়ে খাটের ওধার থেকে কাগজের দুটি চ্যাপ্টা বাক্স টেনে নিয়ে এল। ঢাকনি খুলে দুখানা শাড়ি বার করল। হেসে বলল, 'কাল শ্যামবাজার থেকে নিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কিন্তু তাতো আর হল না। কাল তুমি মহাব্যস্ত। কাল তোমাকে কি ঘরের বার করবার জো ছিল।'

মাধুরী শাড়ি দুখানা নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'সে যাকগে। বেশ শাড়ি হয়েছে। দুখানাই বেশ ভাল।'

রমা বলল, 'উঁহু, অমন দায়সারা জবাব দেওয়ার জন্যে তোমাকে ডাকি নি। বেছে দাও। একখানা কাঞ্জিভরম আর একখানা মুর্শিদাবাদী। দুখানাই সিল্ক। প্রায় একই কোয়ালিটির। আমার মাসতুতো বোন বীণা, তার বিয়ে. তাকে দেব। কোনখানা রাখি বল তো! একখানা তনুশ্রীতে আজই দশটার মধ্যে ফেরত পাঠাতে হবে।'

মাধুরী দুখানা শাড়ির রঙ পরীক্ষা করল, জমি পরীক্ষা করল, পাড়ের নকশা পরখ করে দেখল। তারপর একটু হেসে বলল, 'বিয়ের পক্ষে অবশ্য এই কাঞ্জিভরমখানাই ভালো। টুকটুকে লাল রঙ আছে, আর মঙ্গলশঙ্খ পাড়। রুনু তো ফরসা, বেশ মানাবে।'

রমা খুশী হয়ে বলল, 'ঠিক। আমিও তাই বলি। কিন্তু তোমার সমীরদার কী যে চোখ। তার কেবল নীল রঙের দিকে ঝোঁক। সেই যে মুখস্থ করে রেখেছে—চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি—। আরে তা কি সব সময় চলে?'

মাধুরী বলল, 'বেশ তো আমি সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। লালখানা রুনুকে দাও, আর নীলখানা তুমি রাখ। যিনি নীল ভালবাসেন তাঁর চোখ-জুড়োবে।'

রমা ভিতরে ভিতরে বেশ খুশী। কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করে বলল, 'ইস। আমার ঘরে বুঝি টাকার গাছ গজিয়েছে? এই সেদিন ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে শাড়ি কিনেছি। আজ যদি আবার শাড়ি চাই, আর একজন এখনই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে চাইবে, তা জানো?'

মাধুরী বলল, 'শাড়ি না পেলে তুমি আগে ছিন্ন করবার ভয় দেখাবে।'

'বিয়েটিয়ে তো হয়নি, এসব ট্যাকটিকস্ শিখলে কোত্থেকে?' রমা হেসে উঠল।

মাধুরীও হাসল, বলল—'কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে। কেউ জিতে শেখে, কেউ ঠকে শেখে। সবাইর শেখার ধরন তো একরকম নয় বউদি।'

রমা ওর গাল টিপে দিয়ে বলল, 'আহাহা কী তত্ত্ব কথাই শিখেছ। দেখে শেখাটা কোন কাজের নয়, ঠেকে শেখাটাই আসল। সেইটেই হল হাতে-কলমে শেখা।'

মাধুরী উঠতে যাচ্ছিল গৃহরক্ষিণী পদ্ম এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, তারপর কোল থেকে বছর দুয়েকের একটি শিশুকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গা, কী আক্কেল তোমার বউদি। এই দামাল ছেলেকে তুমি আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছ। জলেই পড়ে না আগুনেই পড়ে। আমি তোমার ছেলে সামলাব না রান্না সামলাব।'

মাধুরীর সামনে ঝিয়ের ধমক খেয়ে রমা চটে উঠল। রাগ করে বলল, 'তোমার কিছু সামলাতে হবে না বাপু, তুমি চুপ কর।' অফিসের রান্না সেই প্রায় রোজ আমিই রাঁধি। আজ একটু রাঁধতে বসেছি, তাই মুখ দিয়ে খই ফুটছে। আর কথা বলতে হবে না। কাজে যাও।'

কড়া গলার সঙ্গে হাতের ইশারায় রমা পদ্মকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। তারপর মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'ওদের প্রশ্রয় দিতে নেই, একদম মাথায় চড়ে বসে।'

পদ্ম চলে যেতে যেতে বলল, 'ইস আবার অপমানিত করা হচ্ছে। আমি কারো

সঙ্গে কোন আলোচনা করতেও চাইনে। তোমাকে বলা দরকার তাই বললাম। আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।'

মাধুরী বলল, 'তা জানি বউদি। এবার যাই। বড়ই দেরি হয়ে গেল।'

কিন্তু রমা বউদির ওই এক দোষ। ছেড়ে দিতে দিতেও দেয় না। আস্ত একটি জোঁক।

জরুরী আর একটা কথা বলবার জন্যে সে মাধুরীকে ফের কাছে টেনে নিল তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বলল, 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

মাধুরী বলল, 'এতক্ষণ কোনটা অসত্য বলেছি?'

রমা বলল, 'তাতো ঠিকই। মানে ভদ্রলোক কে?'

মাধুরী বলল, 'কোন্ ভদ্রলোক?'

'কাল থেকে যিনি এসে রয়েছেন।'

মাধুরী বলল, 'আমাদের বন্ধু।'

রমা হেসে বলল, 'গৌরবে বহুবচন হচ্ছে বুঝি? আমাদের মানে করে সেই কথাই জানতে চাইছি।'

মাধুরী ভাবল মানসীকে ধরিয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। এ ব্যাপারে রমা বউদিকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। ও নিজেই হয়তো সাতখানা করে পাঁচ নম্বর আর ছ' নম্বরের কাছে লাগাবে। ঠিক ইচ্ছা করে নয় অভ্যাস দোষে।

মাধুরী বলল, 'উনি আমাদের দাদার বন্ধু। তারপর বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে।'

রমা হেসে বলল, 'মানে কথাটা ভাঙতে চাও না। আচ্ছা পরে দেখা যাবে। উনি কি সেই রূপকথার আংটি? আংটি তুমি কার? হাতে আছি যার।'

মাধুরী বলল, 'তুমি বসে রূপকথার ছড়া আওড়াতে থাকো, আমি চললাম।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছড়ার ছন্দটা মাধুরীর মনকেও দোলা দিতে লাগল। রূপকথার আংটি, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আর স্পর্শমণি। যা ছোঁয়, তাই সোনা হয়। সেও কি কোনদিন সোনা হবে, কারো ভাবনা বাসনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সোনা করবে? কে সেই অজ্ঞাতনামা অজ্ঞাত পরিচয় পরদেশী?

'এই যে মাধুরী। কোথায় গিয়েছিলে। দেখা হয়ে গেল।'

মাধুরী একটু চমকে উঠল। 'এক বুড়ো ভদ্রলোক ওপরে উঠে আসছেন। চিনতে দেরি হল না। ব্রজবাবু, ব্রজবল্লভ রায়! বাড়ির মালিকের প্রতিভূ। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। তার ভাগ্যে অচীন দেশের রাজপুত্র কি ইনিই?

তাকে পাশ ছেড়ে দিয়ে মাধুরী হেসে বলল, 'যাচ্ছি, একটু তাড়া আছে।'

ব্রজবাবু বললেন, 'তোমার তো সব সময় তাড়া। বিজ্ঞি। সেই যে একটা পদ্য আছে—মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি দাঁড়াওনা একবার ভাই। ওই ফুল ফোটে বনে—।'

মাধুরী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সর্বনাশ উনি কি গোটা কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাবেন নাকি? এই সিঁড়ির ওপরে আর পাঁচজনের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা শোনানো। লোকে দেখলে কি ভাববে।

মনে মনে বিরক্ত হলেও মাধুরী মুখে হাসি টেনে বলল, 'যাই, সত্যি কাজ আছে। আর এক সময় এসে বরং—। আজ আবার তাড়াতাড়ি স্কুলে বেরোতে হবে।'

ব্রজবাবু বললেন, 'ও, স্কুলের তাড়া আছে তোমার? তাই বল। তাহলে আর তোমাকে আটকে রাখব না। জানো, আমাদের গাঁয়ের স্কুলে আমিও এক সময় মাস্টারী করেছি। এদিক থেকে তোমার সঙ্গে বেশ একটা মিল আছে আমার। হে হে হে।'

ভদ্রলোক হাসলেন। তাঁর তোবড়ানো গাল নিষ্প্রভ দৃষ্টি চোখ অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

মাধুরী অবাক। মিল আছে! আশ্চর্য। তুমি মাস্টারী কর, আমিও মাস্টারী করেছি। তোমার সঙ্গে আমার এইটুকু মিল। আমার যৌবন ছিল তোমার যৌবন আছে, তোমার সঙ্গে আমার এইটুকু মিল। ভদ্রলোক কি এইভাবেই মিল খুঁজে খুঁজে নিজের মনে একটি মিলন মন্দির গড়তে চান নাকি?

মাধুরী বলল, কিন্তু পরিহাসের হাসি নয়। এক অদ্ভুত সহানুভূতিতে তার মন ভরে উঠল। আশ্চর্য, এমন কতজন আছে যারা তার রূপের যাচাই করতে এসে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। আবার এমন মানুষও আছে, তার দিকে তাকিয়ে যাদের চোখের পলক পড়ে না। বিড়ম্বনা কোনটাতেই কম নয়। তবু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকদের সব সময় ব্যংগ করতে পারে না মাধুরী। নিজে বার বার আঘাত পেয়েছে বলেই যারা দুর্বল তাদের ঘা দিতে মন সরে না। তার এই সহনশীলতার অপব্যাখ্যা অনেকেই করে। আড়ালে আবডালে বলে মাধুরী এদের প্রশ্রয় দেয়। প্রশ্রয় ঠিক নয়। প্রশ্রয়ও দেয় না, আশ্রয়ও দেয় না। এদের উৎপাত হাসিমুখে সহ্য করে। অনেক সময় বরং হাসির ভান করে তবু সরাসরি অপমান করে না।

সে ওপরে উঠবে না জেনে ব্রজবাবু তার পিছনে পিছনে নেমে আসছেন তা সে টের পেয়েছে।

মাধুরী ফিরে না তাকিয়েই বলল, 'আপনি কি আর কোথাও যাবেন?'

ব্রজবাবু বললেন, 'না। চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। মাধুরী তোমার হাতে সময় নেই, কিন্তু আমার হাতে অনেক সময়। এত সময় নিয়ে কী যে করি ভেবে পাইনে। তাই বার বার ঘরবার করি, উঠি আর নামি।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু আপনার ওই রোগা শরীর নিয়ে এমন অনিয়ম করা তো ঠিক নয়।'

ব্রজবাবু বললেন, 'ডাক্তারের ধমকে মাঝে মাঝে নিজের শরীরের তোয়াজ করি। ওষুধ খাই পথ্য খাই। কিন্তু একেক সময় বড় বিরক্তি ধরে যায়। দূর ছাই, কার জন্যে এই তোয়াজ। এই শরীর দিয়ে কি হবে। তিনকুলে কেউ নেই; শুধু নিজের হাত পা
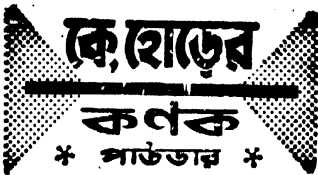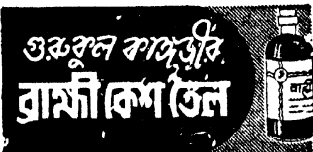
চোখ মুখ নিয়ে নিজের গৃহস্থালী। একি আর সব সময় ভালো লাগে?'

মাধুরী বলল, 'তবু শরীরের যত্ন নেবেন।'

ব্রজবাবু বললেন, 'নেব মাধুরী। দেখ, এই সারা বাড়ির মধ্যে একথাটা আর কেউ বলে না। তুমি ছাড়া—।'

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছিল. মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, 'এবার যাই।'

ব্রজবাবু যেন এই আকস্মিক বিদায় প্রত্যাশা করেন নি। আস্তে আস্তে বললেন, 'আচ্ছা এসো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমাদের বাড়িতে গেস্ট এসেছেন। ঘর-দোরের অসুবিধে। যদি দরকার হয় আমাকে বোলো। আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমার কাছে কোন সংকোচ কোরো না।'

মাধুরী বলল, 'আপনার কাছে সংকোচ কিসের। দরকার হলে আপনাকে জানাব।'

এ কথা শুনে ব্রজবাবু খুব খুশি হলেন। রোগা লম্বা চেহারা। গায়ের রং বেশ করশা। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হবে। কিন্তু জরার চেয়েও যেন অজানিত রোগ দেহকে জীর্ণ করেছে বেশি।

ব্রজবাবুকে বিদায় দেওয়ার পরেও তাঁর শীর্ণ চোয়ালভাঙা অথচ পরম প্রসন্নতা ভরা মুখখানি মাধুরীর চোখের সামনে আরও এক মুহূর্ত ভেসে রইল। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তবুও সেই মানুষই একেক সময় কত অল্পেই খুশী হয়ে ওঠে। এই ব্রজবাবুকে সবাই [illegible] মানুষ বলেই জানে। [illegible] বাঁধন দেওয়া আর [illegible] দেওয়া এই ওঁর কাজ। [illegible] কি [illegible] উনি [illegible] তাঁর ভুবনীপাড়ের [illegible] থেকে। [illegible] সাহিত্যের মানুষ এখানে [illegible] আছেন। তাঁর [illegible] সহজ নয়। সেই ব্রজবাবুর সঙ্গে ভাড়াটের হত প্রায়-ই ঘাত-প্রতিঘাত। কিন্তু মাধুরীর সামনে এসে ভদ্রলোকের যেন রূপ বদলে যায়, স্বভাব বদলে যায়। ভুবনীপাড়ের [illegible] জমিদার [illegible] একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ওঠেন। কোন কোন সময় ওঁর অতি গদগদভাবে মাধুরী বিরক্ত হয়, লজ্জিত হয়, নিজের জন্য নয়, ওঁরই জন্যে, বিশ্রী একটা অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে দুঃখ আর মায়াই হয় বেশি। সহানুভূতিতে মন ভরে যায়। এই মুহূর্তে যেমন হল। ব্রজবাবু যখন পিছন পিছন কথা বলতে বলতে আসছিলেন মাধুরীর মনে হচ্ছিল শুধু এক নিরবয়ব স্বর, আর কিছু নয়। এক বিমূর্ত অনুরাগ আর কিছু নয়। শুধু তাই যদি হত, তাহলে কিছু দুঃখের থাকত না। তা তো নয়। ভদ্রলোককে কষ্ট পেতেও মাধুরী দেখেছে। অঙ্গশুদ্ধের মত আর এক শব্দ। অঙ্গ তিক্ত কষায়-বিস্বাদ। পার্বতীর বিবাহে বিশ্ব মহিষাসুরের ছটফটানি মাধুরী দেখেছে। শুধু কি দেখা? মাধুরী কি নিজেও অনুভব করে নি? আশ্চর্য, তবুও তৃষ্ণাকে উল্টো করে বলা হয় অতনু। অতনু যদি সত্যিই অতনু হতো, শুধু মনোময় মনোজীবী মনোবাসী হয়ে থাকত তাহলে মানুষের তবু অনেক দুঃখ লজ্জা পীড়ন লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু কেউ যদি মাধুরীকে বর দিতে আসে তোমার শরীর বলে কিছু থাকবে না, তুমি শুধু হবে মনোময়ী শুধু একটি আইডিয়া যাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না, যে ধরা চায় না ছোঁয়া চায় না, যে পোড়ে না, পোড়ায় না, জ্বলে না, জ্বালায় না। মাধুরী কি সেই বর নেবে? না না না। মাধুরী যেন শিউরে উঠল। অমন অশুভক্ষণে বর সে চায় না। আধার ছাড়া আধেয় দিয়ে কি হবে? তার যা আছে তাই ভালো। এমন কি রূপটুকু তার নিজস্ব সম্পদ।

বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ভিতরের গোলমাল শুনে মাধুরী অবাক হয়ে গেল। ব্যাপার কি। এই তো একটু আগে সে ওপরে গেছে। এরই মধ্যে কী হল। বাবার চড়া গলাটাই বেশি করে কানে আসছে। তখন তো দিব্যি শান্তভাবে অসীমদাকে ধর্মতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন, কিন্তু এখন এত অশান্তির কোন্ কারণ ঘটল।

দরজা খোলাই ছিল। মাধুরী সেই প্যাসেজের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বাবা উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন। সেই চায়ের টেবিল চেয়ার বেঞ্চ অসীমদা সব ঠিক আছে। শুধু ধর্মক্ষেত্র এখন কুরুক্ষেত্র হয়েছে।

একটু বাদে শংকরের দিকে চোখ পড়ল
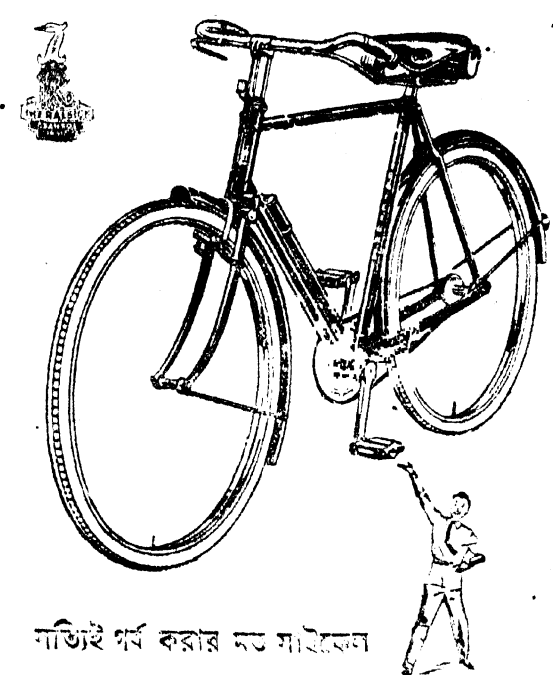
মাধুরীর। সে দেয়াল ঘেঁষে শক্ত একটি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে ছাই রঙের ট্রাউজার গায়ে কেন শুভ্র শার্ট, চমৎকার মানিয়েছে।

মাধুরী এগিয়ে গিয়ে হাসি মুখে ডাকল, 'দাদা, তুমি কখন এলে? এসো এসো ঘরে এসো।'

কিন্তু তার সেই সাদর সম্ভাষণ মনোমোহনের উঁচু গলার কটু ভাষণের নিচে তলিয়ে গেল।

মনোমোহন তারস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাত নেড়ে মুখ বিকৃত করে বলতে লাগলেন, 'হতভাগা হারামজাদা শুয়োর! তুমি আমাকে এসেছ নেমন্তন্ন করতে। লজ্জা করে না? আমার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তোর লজ্জা করে না? কত বড় স্পর্ধা! তুই আমার বাড়িতে এসেছিস! নিজের বাপ-মার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের চূড়ান্ত করে ছেলের জন্মদিনে লোক দেখানো নেমন্তন্ন করতে এসেছিস। কেউ যাবে না। আমার গোষ্ঠীর আমার রক্তে যাদের জন্ম তারা কেউ যাবে না। যদি কেউ যায় সে বেজন্মা।'

অসীম বলল, 'ছি ছি ছি, মেসোমশাই থামুন থামুন। এ সব কী হচ্ছে। এমন দিনে আপনি আরো কোথায় ওকে আশীর্বাদ করবেন।'

'আশীর্বাদ!' মনোমোহন যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'আমাকে ঠাট্টা করছ অসীম? আশীর্বাদ তো শুধু মুখের বচন নয় বাবা, সে অন্তরের জিনিস। সেই অন্তরও আমার ছিঁড়ে দিয়েছে? এখন এসেছে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে। সেই কেনো জলে মূল ওপড়ানো গাছ বাঁচে না অসীম, ডালপালা লতা পাতাসুদ্ধ ভেসে যায়। আমিও অকূল সাগরে ভেসে চলেছি।'

মাধুরী এগিয়ে এসে অনুনয়ের সুরে বলল, 'বাবা, একটু থামো। ব্যাপারটা কী হয়েছে শুনতে দাও।'

কিন্তু মনোমোহন কাউকে কিছু বলতেও দেবেন না, শুনতেও দেবেন না। তিনি সমানে চীৎকার করতে লাগলেন, 'খবরদার ওই কুলাঙ্গারের পক্ষ নিয়ে কেউ আমাকে কোন কথা বলতে এসো না। আমি তা রাখতে পারব না, কিছুতেই পারব না।'

মাধুরী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বাড়ির সবাই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। মঞ্জু আর মিনু স্কুল থেকে এখনো ফেরে নি। ওরা দুজন ছাড়া আর সবাই আছে। মা, মায়া নন্দু। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। এই রঙ্গমঞ্চে বাবা আর দাদা দুজনে শুধু নট। আর বাকি সব নির্বাক মূক মানবীয় পশ্চাৎপট। কিন্তু দেখতে না দেখতে এঁটো হাতে এঁটো মুখে মানসী এসে দাঁড়াল। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে বাবার সামনে এসে তাঁকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী শুরু করেছ তোমরা ছিঃ। যেতে হয় যাবে, না হয় না যাবে। কিন্তু একী চেঁচামেচি শুরু করেছ। বাড়িটা যেন একটা বস্তিবাড়ি হয়ে উঠেছে। হাটে বাজারেও এমন বিশ্রী গোলমাল শোনা যায় না।'

তারপর শংকরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আর দাদা, তোমাকেও বলি, তোমাদের মধ্যে কী রিলেশন গড়ে উঠেছে তাতো জানোই। সব জেনে শুনে কেন এই ফার্স করতে আসা।'

মাধুরী বোনকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ ও কি বলছিস মানু। ফার্স কেন হবে।'

মানসী বলল, 'নিশ্চয়ই ফার্স।' তারপর একটু হাসল, 'অবশ্য তোমরা যদি একে ট্রাজেডীর মহিমা দিতে চাও দিতে পার, আমার আপত্তি নেই।' সেখানে আর দাঁড়াল না মানসী। এঁটো হাত মুখ ধোয়ার জন্যে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মনোমোহন এতক্ষণই কোন কথা বলেননি, এবার জের শুরু করলেন। অসীমকে সাক্ষী রেখে বলতে লাগলেন, 'জানো অসীম, ওই শুয়োর আমাকে আমার নাতির অন্নপ্রাশন করতে দেয়নি। তখন আমার সঙ্গে ওর মতবিরোধ। আর আজ সেই ছেলের জন্মদিনে আমাকে বলতে এসেছে। আমি যাব, তোর ছেলের জন্মদিনের সমারোহে যোগ দেব না আমি কি? জানো, ওই পাঁঠা যখন জন্মাল তার দু বছরের মধ্যে আমি আমার বাবার মুখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারি নি। তিনি ওকে আদর যত্ন করেছেন, ঘটা করে অন্নপ্রাশন দিয়েছেন। আমরা জানি এই রীতি। আর আজ ও নিজেই সর্বে সর্বা হয়েছে! নিজের হাতেই সব করছে, নিজের মুখেই সব বলছে। লজ্জা বলে কোন পদার্থ যদি শরীরে থাকত—।'

বাবার কথা শুনে মাধুরীর হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়। দুঃখ কার জন্যেই। বা না করে পারে? শংকর পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে মাধুরী তাড়াতাড়ি ওর পিছনে পিছনে গেল। কাছে গিয়ে বলল, 'দাদা, চলে যাচ্ছ কেন, ঘরে এসো।'

শংকর বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না মাধুরী, ঘরে আর যাব না।'

শংকর রাস্তায় নেমে পড়ল। ঘর আর পথের ব্যবধান তো সামান্যই।

মাধুরী লক্ষ্য করেছে দাদা সারাক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বাবার একটি কথার জবাবও সে দেয়নি অথচ কাটাকাটা কথা বলে মানুষের মর্ম ছিঁড়ে দিতে দাদা কারো চেয়ে কম পারে না। কিন্তু যে জন্যেই হোক কারো কথারই আজ সে প্রতিবাদ করেনি। বাবারও না, মানসীরও না। এই মুহূর্তেও তার মুখে রাগের তেমন কোন লক্ষণ নেই, চোখে জ্বালাও নেই, জলও নেই। কিন্তু ওই যে একটি কথা, 'মাধুরী ঘরে আর যাব না' ও কথা শুনলে কারো হৃদয় না কেঁদে পারে? চোখের জল বাধা মানতে চায়? যে মানুষ অভিমান করে বলে আর যাব না, সে ভাই হোক বন্ধু হোক, গৃহী হোক সন্ন্যাসী হোক কোন মেয়ে তাকে কি ফিরিয়ে আনবার জন্যে না সেধে পারে?

মাধুরী শংকরের হাতখানা ধরে বলল, 'চল দাদা, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আজ বুঝি পিলুর জন্মদিন।'

শংকর বলল, 'হ্যাঁ, কলেজে একটা ক্লাস আজ নিতে হল না। সেই ফাঁকে চলে এলাম। ভেবেছিলাম সন্ধ্যার পর এই উপলক্ষে এক সঙ্গে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করা যাবে। কিন্তু এসে তো এই কাণ্ড। বাবামাকে বলিনি, জানি ওরা যাবেন না। আমি তোদের বলতেই এসেছিলাম। যাই, ওই আমার বাস এসে গেছে। অসীমকে কালই বলে রেখেছি। যদি যায় যেতে পারে। আর তোদের যদি কারো প্রবৃত্তি হয়—'

কথা শেষ না করে শংকর ছুটে গিয়ে শ্যামবাজারগামী চলন্ত বাসটার হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল।

বাসটা তাকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অনেক দূরে চলে গেল।

মাধুরী একটুকাল অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। দাদা সেই ছেলে মানুষই রয়ে গেছে। গোঁয়ার্তুমি আর গেল না। অত রিস্ক নিয়ে কেউ বাস ধরে? যেন ওতেই যত বাহাদুরী।

মুখ ফিরিয়ে মাধুরী আস্তে আস্তে ঘরের দিকে পা বাড়াল। (ক্রমশ)
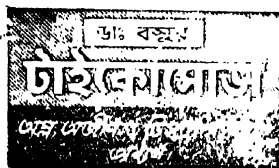
জীবনদর্শন

দিব্য-জীবন-প্রসঙ্গ—অনির্বাণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। প্রথম সংস্করণঃ জানুয়ারী ১৯৫৯। মূল্য ৭·৫০ টাকা।

সংস্কৃতি বা সাহিত্য বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি তা অল্প কথায় বলা কঠিন। তবে 'নাটক নভেল' বা 'রম্য রচনায়' সে পরিচয় আবদ্ধ রাখা উচিত নয় একথা বুঝি। সম্প্রতি রাজশেখর বসু মহাশয় 'পূর্ণ সাহিত্যের' প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, প্রতি দেশের, যুগের, লেখকের, এমন কি ব্যক্তির একটি বিশেষ জীবনদর্শন বা মূল্যবোধ আছে, বা থাকতে বাধ্য। সমাধানের দায় থাকুক বা না থাকুক, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা জীবন এর কোনোটিই শেষ পর্যন্ত তত্ত্ববর্জিত হয়ে থাকতে পারে না। অনুভবের প্রয়োজন ও গভীরতাই আমাদের তত্ত্বের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। উদ্বেগ ও সংকটের যুগে বুঝি বেশি করে। অভিজ্ঞতা ও বিচারের নিরিখে বিশ্বাসের ভিত যাচাই হয়, গড়ে ওঠে। "আমরা বর্তমানে একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছি......বর্তমান যুগ সমষ্টিগত সাধনার যুগ, অদ্বৈতবুদ্ধিকে শুধু আধ্যাত্মিক তুঙ্গতায় সমাসীন না রেখে সমাজ-চেতনায় ও রাষ্ট্র-চেতনায় সঞ্চারিত করবার যুগ।" শ্রীঅরবিন্দের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এই যুগসন্ধির কাব্য, তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অতিমানস রূপান্তরের ঘোষণা। জাতির জীবনে সেই দৃষ্টির মূল্য নিরূপণের সময় হয়তো আজও আসে নি। কিন্তু তার পরিচয় নেবার দিন আগত ঐ।

শ্রীঅরবিন্দ রচনার অসামান্যতা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এই রচনা প্রধানত ইংরাজীতে। The life Divine তার মধ্যমণি। বাংলা সাহিত্য ও পাঠকদের কাছে এই বই উপস্থিত করার কাজে অনির্বাণের অনুবাদের—যদি তাকে অনুবাদই বলতে হয়—দুঃসাহসী সাফল্য সাধারণ পাঠককে এড়িয়ে গেছে। এই নূতন বইটিতে তিনি সেই আদি গ্রন্থের একটি স্বাধীন, প্রাঞ্জল ও কাব্যোজ্জ্বল টীকা রচনা করেছেন যার মহত্ত্ব যে-কোনো নিরপেক্ষ পাঠক স্বীকার করবেন।

এই জাতীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্ভব নয়, বর্তমান সমালোচকের সে যোগ্যতাও নেই। শুধু একটি কথা বলেই নিরস্ত হবে—এই বইটিতে যে জীবনদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে, তাকে বঙ্গসংস্কৃতির ত্রিবেণীসংগম বলা চলে—চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ—বইয়ের ভাবে ও ভাষায় এই তিন ধারাকে তিনি যেভাবে মিলিয়েছেন তা পাঠককে বারংবার তৃপ্ত ও বিস্মিত করে। রসিক বাঙালী পাঠক সার্বভৌম জীবনায়নের, "ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এই এক নতুন অধ্যায়ের" ও সেই সঙ্গে, এই পরিণতচিত্ত, উজ্জ্বল সংস্কৃতিবোধসম্পন্ন আশ্চর্য রসবেত্তা ব্যাখ্যাতাকে একদিন চিনে নেবেন এই আশা রইলো। এ-জাতীয় বই কালেভদ্রে লিখিত হয়।

৩০২।৫৯

সাবিত্রী—শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ।

হিমালয়—অনিলকুমার। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। ১৷৷০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই আলোচিত। পলাসী, মাঝিপাড়া, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

সংসার তত্ত্বদর্শন ও প্রেমাঞ্জলি—বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষাল। ৪-এ গোপাল ঘোষ লেন, কলিকাতা-২৩। মূল্য ২৷৷০।

স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ

হইতে প্রকাশিত। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৷৵।

স্বর্গপথে—ডাঃ কে এন দাস। লেখক কর্তৃক ১২৭-এ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫, টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ রচিত 'সাবিত্রী' আখ্যান কাব্যের নবম পর্বের প্রথম সর্গ অনুবাদ করেছেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী আমাদের পরিচিত। সাবিত্রীকে মৃত্যুদেব আদেশ দিলেন সত্যবানকে ছেড়ে দিতে, মৃত্যুর নিত্যবিধান তাকে স্বীকার করতেই হবে। স্থির নির্বাক সাবিত্রী স্থির প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো এগিয়ে চলেছে সব বাধা অগ্রাহ্য করে। এই অংশটুকুর সার্থক অনুবাদ এই গ্রন্থে রয়েছে।

অনিলকুমার রচিত 'হিমালয়ে' কয়েকটি আধ্যাত্মিক কবিতা, সনেট ও গান একত্র সন্নিবিষ্ট। তথ্যের চাইতে তত্ত্বের প্রতিই কবির আকর্ষণ বেশি। তবে কবি নিসর্গ-সচেতন। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে পৃথিবীকে দেখেছেন। প্রতিটি কবিতার শেষেই শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' নিঃসন্দেহে মূল্যবান গ্রন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যে অসাধারণ যুক্তি ও তত্ত্বের সমন্বয় তাতে বিস্মিত হতে হয়। তাছাড়া এই গ্রন্থের সাহিত্যমূল্যও স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটিতে ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বিষয় আলোচনা করেছেন সহজবোধ্যভাবে।

'সংসারতত্ত্বদর্শন ও প্রেমাঞ্জলি' একটি তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষাল —এই গ্রন্থে গদ্যে ও পদ্যে মানবমনের বিশিষ্ট বৃত্তির আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির সর্বত্রই জীবনজিজ্ঞাসা বিদ্যমান। ধর্মপিপাসুরা এই গ্রন্থপাঠে আনন্দ পাবেন।

'স্বামী অভেদানন্দ বা কালীতপস্বী' গ্রন্থে সাধক অভেদানন্দের অধ্যাত্ম জীবনের একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক অজ্ঞাত বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

ডাঃ কে এন দাসের 'স্বর্গপথে'—কাব্যে লিখিত বৃহদায়তন খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ। লেখকের অধ্যাত্মচেতনা ও ধর্মবিশ্বাস এই গ্রন্থে রূপায়িত। তবে মুদ্রাকর প্রমাদ পাঠকের অসুবিধার সৃষ্টি করে।

৩১।৫৯, ১৩৮।৫৮, ৫৫৮।৫৮, ৩৯।৫৯, ৫৯৯।৫৮, ১৬২।৫৯।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

শিল্পীর সাধনা—আলাউদ্দিন আল আজাদ। পরিবেশক—গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা। এক টাকা আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি 'শিল্পীর সাধনা', 'ভাষা ও ভাষা বিচার', 'ভাষার উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকাশ' এবং 'ভাষার রূপ ও রূপান্তর'—এই চারিটি প্রবন্ধের একখানি সংকলন। প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক নন্দনতত্ত্বের মূল সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পকলা ও পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও তার ঐতিহ্য, অথবা লোকসাহিত্যের সাথে সৃজ্যমান পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের কী সম্পর্ক—এসব সমস্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা তার স্বচ্ছ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করছে। এই একই দৃষ্টির পরিচয় পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে

লেখা অপর তিনটি প্রবন্ধেও মেলে। এরা একে অপরের পরিপূরক। লেখক এই তিনটি প্রবন্ধে যে মূল বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তা হল—'ভাষার জীবন সমাজের সংগে আপেক্ষিক।' 'অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তনের সংগে ভাষার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে একথা ঠিক....কিন্তু গায়ের জোরে ভাষার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনাই সম্ভব নয়।'

পূর্ব বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে বইখানি নিঃসন্দেহে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯১।৫৯

রসরচনা

কেলেংকারী—বিরূপাক্ষ। বিহার সাহিত্য-ভবন প্রাঃ লিঃ, ৩নং ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭। চার টাকা।

কোন কোন ব্যক্তির বয়সের-দলিলে প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রখরতা কম এমন দেখা যায়। আবার কখনো কখনো এমনও দেখা যায় যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও লেখার মধ্যে নাবালকত্ব প্রকাশ করে বসেন। আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করে আমাদের ধারণা বদ্ধমূলে হল। কেননা, মার্জিত ও রুচিবান পাঠকের মনকে দোলায়িত করবার মত সূক্ষ্ম-হিউমার বোধের অভাব এ-গ্রন্থে সর্বত্র উপলব্ধি করা গেল। হাস্য-পরিহাস রসিক বলে লেখকের খ্যাতি আছে। কিন্তু তিনি সেই খ্যাতির অন্তরালে নিছক ছ্যাবলামীকেই বেশী মাত্রায় প্রশ্রয় দিয়েছেন। তবে সকল যুগেই এক শ্রেণীর পাঠক থাকেন যাঁরা চিরকাল মোটামুটির পথ ধরে চলেন, স্থূলে রসেও নিমজ্জিত হতে বাধে না। বিরূপাক্ষের কেলেংকারী তাঁদের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশন বলে গণ্য হতে পারে। সভাপতিত্বের কেলেংকারী, ম্যাও, নকুলেশ্বরের মন্দির্দিরি, • কারণে প্রীতিতে শুধুই যন্ত্রণা, পরোপকারের বাতিক প্রভৃতি অন্যান্য রচনার মধ্যে ভাল। প্রচ্ছদপট সুন্দর। ৬১২।৫৮

ভূদানকর্মী

যাত্রার পথে—শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী. সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি। সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ৯০ নঃ পঃ।

ভূদান কর্মী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী কর্মসূত্রে সারা পশ্চিমবঙ্গ পরিভ্রমণ করেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় হাজার হাজার মাইল ভূদান-পদযাত্রার কালে তিনি অগণিত দরিদ্র, ভূমিহীন, অনশনক্লিষ্ট নরনারীর সংস্পর্শে আসেন। সেইসব দরিদ্র মানুষের সংগে আলাপ-পরিচয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পুস্তকখানি দিনপঞ্জীর আকারে লেখা। অতি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় দেশের এমন বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় সচরাচর কোন পুস্তকে দেখা যায় না। যে কোন দেশকর্মীর নিকট পুস্তকখানি যে প্রভূত প্রেরণা দান করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখচিত্র অংকন করেছেন তা পড়লে মনে হবে লেখক একজন কৃতি দরদী সাহিত্যিক। ১২৩।৫৯

অনুবাদ

নতুন শ্রেণী—মিলোভান জিলাস্। অনুবাদকঃ অমলেন্দু দাসগুপ্ত, মিণ্টু গংগোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ পি কে ব্যানার্জি, কমিটি ইন ডিফেন্স অফ হাংগেরিয়ান ওয়ার্কার্স, ৫১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২। মূল্য—১.৫০।

শ্রীযুক্ত মিলোভান জিলাস্ একজন প্রাক্তন কমিউনিস্ট। পার্টির সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিপ্লবের পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে এবং ঘনিষ্ঠভাবে পার্টির সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং একাধারে কমিউনিস্ট জগতের একজন নাগরিক এবং নিষ্ঠাবান বিপ্লবী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দিকের অনেক কিছুই তাঁর নখদর্পণে ছিল। তিনি ধীরে ধীরে কেন কমিউনিজম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত করে নিলেন, কি কারণে ক্রমশ তাঁর মতান্তর ঘটল তার বিবরণ-বিচার বর্তমান গ্রন্থের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। অন্তত সেই কারণেও অকম্যুনিস্ট জগতের কাছে গ্রন্থখানির আকর্ষণ কম নয়। অনুবাদ এবং ছাপা পরিষ্কার। ২১।৫৯

কবিতা

ভাস্বতী—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশকঃ বিমল দাশ : প্রান্তিক পাবলিশার্স, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দেড় টাকা।

ভাস্বতী কতকগুলি রোমাণ্টিক কবিতার সংগ্রহ। সুধাংশুরঞ্জনের এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে সুরেলা হাতের চিহ্ন বিদ্যমান। ছন্দ সম্পর্কে কবির আরও সচেতনতা আবশ্যক। প্রচ্ছদচিত্র ও অন্তর্চিত্র কাব্য-গ্রন্থের পক্ষে অরুচিকর। ৯২।৫৯

বিবিধ

ভারত যুগে যুগে—কালিপদ দাস। প্রকাশক—বসু প্রকাশনী, ১১৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। দাম—১॥০ টাকা।

একটি গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী দেশ এই ভারতবর্ষ। আজ ভারতবর্ষের সে ভৌগোলিক চিত্র নেই। একদা তাকে আরো বড় কিছু বোঝাতো। প্রাচীন ইতিহাসের অংগাংগীরূপে বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়েরই উচিত। সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থকার এ-গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। সুতরাং তাঁর প্রচেষ্টায় কিছু নূতনত্ব আছে বলা যায়। তবে আর একটু বিস্তৃত হলে ইতিহাস পাঠের আনন্দটুকু উপলব্ধি করা যেতো। দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কয়েকটি কাহিনী ও আংশিক বিবরণ পরিবেশন করলেই দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না, তার গুরুত্বটুকুও যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে, সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

৬৯।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

অচল প্রেম—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

চা মাটি মানুষ—বীরেশ্বর বসু

জল (নাটক)—উমানাথ ভট্টাচার্য।

বন্দরায়ণ সূত্রের প্রয়োজনীয়তা—শ্রীবাসনা সেন।

নাট্যগুচ্ছ—ধনঞ্জয় বৈরাগী।

সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ—বার্ট্রাণ্ড রাসেল অনুবাদক—কল্পনা রায়।

বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেদার বদরী—জ্যোতিষচন্দ্র রায়।

বাঁশীর আগুন—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

রংগব্যংগ—রূপদর্শী।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৯শে শ্রাবণ সবুজ পাতার ডাকের একটি ভ্রম সংশোধন করা আমার উচিত। আমি লিখেছিঃ বাঙালী বিজয় সিংহ 'হেলায় লঙ্কা করিল জয়', সত্যেন দত্তের এ-দাবী এখন সিংহলে কবি-কল্পনার কোঠায় পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

উদ্ধৃত লাইনটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনা। সত্যেন দত্তেরও অনুরূপ উক্তি 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থে "আমরা" শীর্ষক কবিতায় আছে। আমি ডি এল রায়ের 'হেলায়' শব্দটি হেলা করায় এই ছোট্ট ভুলটি করে ফেলেছি। ইতি—

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

ট্রামে-বাসে

শ্রী **রাজাগোপালাচারী** মহাশয় নেহর্-জীকে প্রাচীনপন্থী মাতাপিতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন তাঁর স্বতন্ত্র পার্টির নীতি হইবে শাসনবিহীন স্বাধীনতা। বিশ্খুড়ো বলিলেন—

"রাজাজী হয়ত অচিরেই একটি 'রক্-ই-স্তানের' দাবী জানাবেন"!!

• • •

এ'কটি অদ্ভুত খবর পড়িলাম। কলিকাতা পৌরসভার এক সাপ্তাহিক অধিবেশনে জনৈক সদস্য ঘিয়ে যাহারা ভেজাল দেয় তাহাদের গায়ের মাংস কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইবার অনুমতি চাহিয়াছেন। বিশ্খুড়ো বলিলেন—"অনুমতি দিলেও সদস্যটির কোনই সুবিধে হতো না; শুধু গণ্ডারের চামড়া চিবোনই সার হতো, মাংস দুর্লভ হয়েই থাকত"!!

• • •

আমাদেরই কাগজ আনন্দবাজার-এর "সম্পাদক সমীপেষু" স্তম্ভে জনৈক পত্র প্রেরক মন্তব্য করিয়াছেন—"দুধ চোখেও দেখি না"। —"কিন্তু দুধ যদি সত্যিই দেখতে চান তাহলে তাঁকে যেতে হবে বোম্বাইতে। টাটকা খবর, সেখানে দুধ চার আনা সের দরে বিক্রী হচ্ছে। তাজমহল দেখতে হলে আগ্রা যাবার শ্রম স্বীকার করতে হবে বৈকি। বাংলায় বসে দুধ দেখা সম্ভব নয়, এখানে আছে শুধু রাবণ রাজার দুধের পুকুর"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

'**নি**রংকুশ রাষ্ট্রীকরণ কি বাঞ্ছনীয়?"—একটি প্রশ্ন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমার মনে হয় বাঞ্ছনীয় নয়। হাতী চালাতে হলে অংকুশ হাতে রাখতেই হয়"!!

• • •

পাবলিক ভেহিকল্‌স ডিপার্টমেণ্ট আরো পাঁচশত ট্যাক্সি দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। —"অতি উত্তম সুপারিশ। কিন্তু এই পাঁচশ' ট্যাক্সির ড্রাইভারদের ডাকলে যাতে গাড়ি থামায় সেই সুপারিশ তাঁরা করেছেন কি?"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।
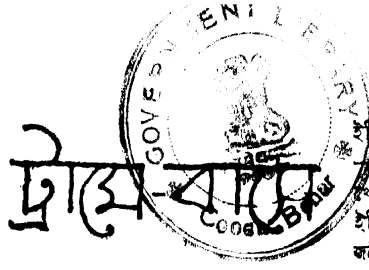
• • •

একটি সংবাদে জানা গেল কুয়ালালামপুরে নাকি মেয়েরাই সর্বেসর্বা। সমস্ত কর্ম মেয়েরাই করে। পুরুষরা তাঁদের কথায় ওঠে বসে। —"মেয়েদের কথায় উঠতে-বসতে আমাদেরও আপত্তি নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা তা করেও আসছি। কিন্তু এখানে কাজকর্মের দায়িত্বটা শুধু পুরুষদের। কোলকাতাটা কুয়ালালামপুর হলে কী মজাই না হতো, অন্তত নিত্যি তিরিশ দিন ভিড় ঠেঙিয়ে দশটা পাঁচটা করতে হতো না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

বিলাতের কোটিপতি বস্ত্র ব্যবসায়ী স্যার জন্ লে-র মৃত্যু হইয়াছে। তিনি রক্ষণশীল দলের সদস্য ছিলেন। সংবাদে বলা হইয়াছে তিনি বাইশ বৎসর

সদস্য থাকিলেও একটিবারের জন্যও মুখ খোলেন নাই। —"মৌনী স্যার জন্ লে নিশ্চয়ই পারিবারিক জীবনে একজন আদর্শ স্বামী ছিলেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

পাক সৈন্যরা এগারজন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে জালসহ আটক করিয়াছে। —"আয়ুবশাহী সৈন্যদের বাহাদুরি আছে বটে, তারা মানুষ ধরে নিয়ে যায়। আর আমরা সামান্য একটা মাছও ধরতে পারিনে"—বলে বিশ্খুড়ো।

* * *

সংবাদদাতা আবহাওয়ার প্রসঙ্গ লিখিতে গিয়া বাদলা দিনে ক্যাজুয়েল লিভ্ লইয়া ভুনি খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। —"সংবাদদাতা খাদ্যরসিক বটে। কল্পনায় খেতে হলে নেটো-পুঁটি খেয়ে লাভ কী, ইলিশ মাছ খাওয়াই ভালো" —বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

বিলাতের গ্লস্টার হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ সেখানকার কোন একটি ফুটবল টীমের খেলোয়াড়দের জন্য

একটি সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। —"মোহনবাগান এই ধরনের বশীকরণ মন্ত্র আয়ত্ত করে নিতে পারলে দেখা যাবে শট্ নিতে গিয়ে বলরামের পা অবশ হয়ে গেছে আর ইস্ট-বেংগল এ মন্ত্র আয়ত্ত করলে চুণী গোস্বামীর সব কটি শট্ বার-এর ওপর দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে আর দর্শকরা শুধু 'গো—হো—হো' বলে চেঁচাচ্ছেন"—মন্তব্য করেন বিশ্খুড়ো।

• • •

ডি ভি সি-র নৌবহ খালের খনন কার্য শেষ হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"আশা করব খালে কুমীর আসবে না। অন্তত অন্য কিছু না হলেও নৌকা বাইচ হবে"!!

আঁধার ঘরের আলো

জীবনের "রোশনী" জ্বালিয়ে রাখে যে "চিরাগ" অর্থাৎ একান্ত আপনার যে জন তাকে হারিয়ে নিরাশার আঁধারে মানুষের মনে যে আর্তি জেগে উঠতে পারে, গোয়েল সিনে করপোরেশনের এই আলোচ্য ছবির নামকরণে রয়েছে তারই সুর—"চিরাগ কঁহা, রোশনী কঁহা"।

ছবির নায়ক ডাঃ আনন্দের মনে এই আর্তির উদ্ভব ও অবসান কিন্তু ঘটেছে অনেকটা আলাদীনের চিরাগের যাদুর মতো। ছবির শুরুতেই ডাঃ আনন্দের স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। নবজাতক তখনও হাসপাতালেই এবং এমন সময়েই সেখানে প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে আসে সদ্যবিধবা রত্না। সেই হাসপাতালেরই অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ আনন্দ প্রসূতিকে বাঁচাবার জন্যে তার মৃত সন্তানের জায়গায় পাঠিয়ে দেয় নিজের নবজাত সন্তানকে। রত্নার ছেলে হিসাবেই ডাঃ আনন্দের একমাত্র পুত্র বড় হতে থাকে।

ডাঃ আনন্দ তার ছেলের আকর্ষণে রত্নার সান্নিধ্যে আসতে বাধ্য হয় এবং এ নিয়ে রত্নার সংসারে ঘটে অশান্তির সূত্রপাত। অন্যদিকে ডাঃ আনন্দের মোহে জড়িয়ে পড়ে সেই হাসপাতালের খলপ্রকৃতির নার্স মায়া, যে অনেক কুচক্রের আশ্রয়ে ডাঃ আনন্দকে স্বামীরূপে লাভ করতে সমর্থ হয়। মায়া যখন জানতে পারে যে সদ্য-পরলোকগত তার শ্বশুরের নগদ টাকার অধিকারী ডাঃ আনন্দের ছেলে এবং সে রত্নার ছেলে বলেই পরিচিত, তখন কাহিনী গিয়ে দাঁড়ায় আদালতের কাঠগড়ায়। আইন মায়ার কাছে ডাঃ আনন্দের ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এই শিশু একদিন রাত্রে তার মা অর্থাৎ রত্নার কাছে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং তাকে খুঁজে বের করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় কিভাবে মায়ার মৃত্যু ঘটে ও পরে নায়কের তৃতীয়বারের বিবাহ অর্থাৎ রত্নার সঙ্গে বৈবাহিক মিলনের মধ্য দিয়ে উভয়ের জীবনে "চিরাগ" (মানে ডাঃ আনন্দের ছেলে) ও তার "রোশনী" কিভাবে ফিরে আসে তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিণতি।

কাহিনীকার ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় এই ভাব-মণ্ডিত নামের পারিবারিক গাথাটিকে দৈব-দুর্বিপাকের যোগাযোগের মধ্য দিয়ে যে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন তার প্রতি পরিচালক-প্রযোজক দেবেন্দ্র গোয়েল দর্শকের কৌতূহল নিবিষ্টভাবে ধরে রাখতে পারেন নি। তার অন্যতম কারণ কাহিনীর গোড়াপত্তনেই পরিণতির আভাস এবং পরিণতির দিকে আখ্যানবস্তুকে নিয়ে যাওয়ার পথে কষ্টকল্পিত, বিসদৃশ ও বহু-ব্যবহৃত উপাদানের ওপর পরিচালকের একাগ্র নির্ভরতা।

তবে ছবির মুখ্য নারীচরিত্রে মীনা-কুমারীর সংবেদনশীল অভিনয়ে ছবিতে কয়েকটি আবেগমুহূর্ত গড়ে উঠেছে।

নালন্দা ফিল্মসের "আম্রপালী"র নায়িকা নবাগতা চিত্রতারকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

ডাঃ আনন্দবেশী রাজেন্দ্রকুমারের অভিনয়ও প্রাণবন্ত। মায়াবেশিনী মিনু মমতাজ চরিত্রটির খল প্রকৃতি ভালভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ডাঃ আনন্দের পত্ররূপী হানি ইরানীকে দর্শকদের ভাল লাগবে। অন্যান্য চরিত্রে হাসির খোরাক জুগিয়েছেন সুন্দর এবং উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মমতাজ বেগম, মদন পুরী, কুসুম ঠাকুর ও এস কে প্রেম।

সংগীত পরিচালনায় রবি'র কাজ প্রশংসনীয়। কয়েকটি গান সংগীত ও সুন্দর সুরারোপিত। সামগ্রিক অঙ্গসজ্জা ও কলাকৌশলের দিক দিয়ে ছবিটি উঁচু দরের।

দূর প্রাচ্যে ভারতীয় ছবি

মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরী'র কে ভেংকটারমন সম্প্রতি দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করে এসে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতীয় ছবির, বিশেষত তামিল ছবির, ভালো ব্যবসাক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু সিংহল ও বর্মা ব্যতীত অন্যান্য দেশে এই ব্যবসায়িক সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হয়নি।

কে ভেংকটারমন দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি হয়ে সিংহলের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের সঙ্গে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেন, তার মধ্যে প্রধান হল সিংহলে ভারতীয় ছবির ব্যবসালব্ধ অর্থ আমদানীর ব্যাপারে ভারতীয় প্রযোজকদের দুর্ভোগ। শ্রীভেংকটারমনের আলোচনা সুফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গেছে।

কে ভেংকটারমন বিবৃতি প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, জাপানে চলচ্চিত্র শিল্প একমাত্র প্রযোজকগণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং সেখানে ছবি সেন্সরের দায়িত্বও জনসংস্থার উপর ন্যস্ত। তিনি বলেন, জাপানে ছয়টি স্টুডিও রয়েছে এবং সেখানে প্রতি বছরে ৫০০টি করে ছবি তৈরী হয়। এর মধ্যে রঙীন ছবির সংখ্যা ২০০। জাপানে ভারতীয় ছবির কদর বাড়াবার দিকে এখানকার শিল্পপতিদের নজর দেওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। বর্মা সম্বন্ধে তিনি বলেন, ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে ও-দেশ অনগ্রসর হলেও সেখানে সিনেমাস্কোপে রঙীন ছবি তৈরী হয়েছে। পরিশেষে তিনি বলেন, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় পৌরাণিক ও রোমাঞ্চমূলক ছবির কদর খুব বেশী।

চিত্রালোচনা

চারখানি নতুন ছবি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—দুখানি বাঙলা ও দুখানি হিন্দী। হিন্দী ছবি দুটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তোলা—"সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান" ও "রাজ সিংহাসন"। বাঙলা ছবি দুটির বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আছে। একটির নাম "আম্রপালী", অপরটির "এ জহর সে জহর নয়"।

বৌদ্ধযুগের একটি কাহিনী অবলম্বনে নালন্দা ফিল্মসের "আম্রপালী" রূপায়িত হয়েছে। শ্রীতারাশংকর এর চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। নাম-ভূমিকায় আছেন চিত্রজগতের নবতম তারকা সুপ্রিয়া চৌধুরী। ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, শোভা সেন, বনানী চৌধুরী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, প্রীতিধন, শ্যাম লাহা প্রভৃতিকে নিয়ে এর নির্ভরযোগ্য ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। অনিল বাগচীর সুরারোপে ছবিটি সমৃদ্ধ।

এম এম মুভিজের "এ জহর সে জহর নয়" কৌতুকাভিনেতা জহর রায়কে কেন্দ্র করে তোলা। কৌতুকের সঙ্গে হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণে এক মনোরম আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছেন লেখক-পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে। এ ছবির নায়িকাও সুদর্শনা সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রবীন মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, তপতী ঘোষ, কমল মিত্র, নীতিশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভি বালসারা সংগীত পরিচালনা করেছেন।

দীনেশ ফিল্মসের "সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান"-এর প্রধান ভূমিকাগুলি রূপায়িত করেছেন জয়রাজ, অনিতা গুহ, উল্লাস ও

চাঁদ উসমানি। হরসুখ ভাটের পরিচালনায় এতে সুর দিয়েছেন বসন্ত দেশাই।

"রাজসিংহাসন"-এর ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন অমিতা, মহীপাল, চন্দ্রশেখর, হীরালাল, কাম্মো ও সুন্দর চিত্রগুপ্ত এ-ছবির সুরকার।

*   *   *

প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের নবতম চিত্রার্ঘ "রাতের অন্ধকারে" আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি মৌলিক গল্প অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অগ্রণী ছদ্মনামে একদল সৃজনধর্মী কলাকুশলী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। রহস্য-রোমাঞ্চ ও নৃত্যগীতের সমাবেশে "রাতের" অন্ধকারে" মনের অন্ধকার কাটাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, শুক্লা দাশ, দীপক মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায় এবং বোম্বাইয়ের হেলেন ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়। সুরযোজনার কৃতিত্ব ভি বালসারার।

গণ-চিত্রমের প্রথম অবদান "প্রবেশ-নিষেধ"ও মুক্তির দিন গুনছে। সুশীল ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, অনুপকুমার, জহর রায়, কালী সরকার, সবিতাব্রত, নমিতা সিংহ, পদ্মা দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত এ ছবির সুরকার।

*   *   *

বাদল পিকচার্সের সংগীতবহুল নিবেদন "সাথীহারা"র কাজ সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন ফণী মজুমদার, যিনি নিজে একজন সুদক্ষ পরিচালক। হেমন্তকুমার সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন। উত্তমকুমার ও মালা সিংহ এ ছবির নায়ক-নায়িকা।

শিল্পী জীবনের এক অকথিত কাহিনী নিয়ে তোলা হচ্ছে জয়শ্রী পিকচার্সের নতুন ছবি "অজানা কাহিনী"। অসিতবরণ ও সুপ্রিয়া চৌধুরী প্রধান ভূমিকাদ্বয়ে অভিনয় করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন নমিতা সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, অমর মল্লিক, দীপিকা দাস প্রভৃতি। ছবিটি সুনীলবরণের পরিচালনায় ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। অপরেশ লাহিড়ী সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বন্ধু প্রোডাকশন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ "পাগল"-এর মহরৎ গত ১৪ই আগস্ট ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। জিতেন্দ্রমোহন ভৌমিকের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন এস মুখার্জী।

সুন্দরম গোষ্ঠীর পরিচালনায় চিত্র নিকেতনের প্রথম নিবেদন "এমনো দিন আসতে পারে"র মহরৎ অনুষ্ঠিত হবে আগামী জন্মাষ্টমীর দিন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন গৌর সী।

নাট্যাভিনয়

স্টার রঙ্গমঞ্চে মনোজ বসু রচিত ও দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত "ডাকবাংলো" নাটকটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে শত রজনী ধরে। এ সপ্তাহেই নাটকটির শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করছেন যথাক্রমে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই শুভানুষ্ঠানে স্টারের কর্তৃপক্ষ "ডাকবাংলো"র নাট্যকার, পরিচালক, কাহিনীকার, গীতিকার, সুরকার, শিল্পিবৃন্দ ও মঞ্চের সকল বিভাগের কর্মি-গণকে পুরস্কারদানে অভিনন্দন জানাবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত। ঐতিহ্যদীপ্ত স্টার রংগমঞ্চে "ডাকবাংলো" নাটক নাট্যামোদীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করে চলেছে, তাতে মনে হয় এই নাটকের বহু রজনী অভিনয়ের উৎসব-লগ্ন এই অনুষ্ঠানের সংগেই শেষ হয়ে যাবে না।

* * *

বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে "ক্ষুধা" যে বিরল মঞ্চ-সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছে, তার পরিপূর্ণতা ঘটছে আগামী ৩০শে আগস্ট। ঐ দিনই নাটকটির ৫৭৩ অভিনয়-রজনী সম্পূর্ণ হবে। ভারতের পেশাদারী মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাসে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। নাট্যরসিকদের কাছে সুখের খবর হল, বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ "ক্ষুধা"র পর তাঁদের নতুন নাট্যনিবেদনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। নাটকটির নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। "ক্ষুধা"র মতোই এই নতুন নাট্যকারের নতুন নাটকটি জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং এতে শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের একাধিক প্রতিভাবান শিল্পীকে দেখা যাবে।

* * *

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় (একাংক) এ বছরে যোগদানকারী নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে যে চারটি দলের নাটক পুনরভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে শিল্পীমনের "লার্নিং ফ্রম দি বার্নিং ঘাট", লোক সাংস্কৃতিক সংঘের "দ্বান্দ্বিক", ক্যালকাটা মেরী-মেকার্স ক্লাবের "ফ্লু" ও গন্ধর্ব-এর "অংকুর"। এই শনিবার (২২শে আগস্ট) এদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ একাংক নাটিকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবে।

* * *

বেংগল সিনে আর্ট সোসাইটি তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উদযাপন উপলক্ষে আটদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নাট্যোৎসব মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। আটদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে দুদিন বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে এবং এতে সুখ্যাত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন। বেংগল সিনে আর্ট সোসাইটি তাঁদের গঠিত বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, নাটক, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার ব্যবস্থা করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, তাঁদের নাট্যোৎসবের মূলে দুঃস্থ শিল্পীদের আপদকালীন সাহায্যার্থে একটি তহবিল গঠনের সদিচ্ছা রয়েছে। এই উৎসব সম্পর্কে বিশদ সংবাদের জন্য সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের (১৭।১ বি গংগাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৫) সংগে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

* * *

বার্মিংহামে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা "বহুরূপী"র সদস্যগণ সম্প্রতি একটি বাঙলা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটিতে কলকাতার নাগরিক জীবনের একটি চিত্র পরিবেশিত হয়। বার্মিংহামের একদল বাঙালী অধিবাসী কর্তৃক "বহুরূপী" গঠিত, এর ৯০ জন সদস্যের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজও আছেন।

ভারতীয় অভিনেতা শিবেন্দ্র সিংহ বি বি সি কর্তৃক প্রচারিত ভারত-বর্মা-চীন সীমান্তের পটভূমিতে রচিত "দি প্যাগোডা ওয়েল" নামের একটি ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেন। গত ১০ই আগস্ট বি বি সি রেডিও থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর যখন আকাশপথে ভেসে আসছিল তখন তিনি স্বদেশে। শ্রীসিংহ জুলাই মাসেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পাটনাবাসী শ্রী সিংহ ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে নাট্যকলায় শিক্ষালাভের জন্য লণ্ডনে যাত্রা করেন। লণ্ডনের রয়েল একাডেমী অব ড্রামাটিক

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি "নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে"র একটি দৃশ্যে বাউল দম্পতির ভূমিকায় কেতকী দত্ত ও অনিল মিত্র।

আর্ট-এ দু'বছর শিক্ষালাভের পর তিনি বৃটিশ ড্রামা লীগের প্রযোজনা কোর্সে যোগদান করেন। তিনি বি বি সি-এর ভারতীয় শাখায় ও টেলিভিশনেও কয়েকবার অভিনয় করেন।

বিবিধ সংবাদ

কান ও বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের মত ভেনিসেও এবার ভারতীয় ফিল্মের ভাগ্যে অপরিবর্তন। কানে 'লাজবন্তী' শুধু লজ্জাই বাড়িয়েছে ভারতীয় ফিল্মশিল্পের। 'সাগর সংগমে' কূল-কিনারা পেল না বার্লিনে। ভেনিসে 'অপুর সংসার'-এরও ঠাঁই মেলে নি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, প্রাথমিক বাছাইয়ের পর যে চোদ্দটি ছবির মধ্য থেকে ফেস্টিভালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত হয় তার মধ্যে "অপুর সংসার" স্থান পায় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে "অপুর সংসার"-এর প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ না দিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

* * *

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব উৎসবের [illegible]যোগিতায় আর্ট এণ্ড কালচার [illegible]লা ছবি 'অগ্নিসম্ভবা' [illegible]ধিকার করেছে। আন্ত-[illegible]ালগুলির 'নৈতি'-'নেতি'র মধ্যে এইটাই কিছুটা আশার কথা। 'অগ্নিসম্ভবা' কলকাতায় শীগগিরই মুক্তিলাভ করবে। মস্কোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'জলসাঘর' প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল এখনও জানা যায় নি। ওদিকে এডিনবরার চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে 'মধুমতী'। আয়ারল্যাণ্ডের কর্ক যাবে 'সাগর সংগমে'। স্টকহলমের আগামী উৎসবের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে বাংলা শিশুচিত্র 'ডাক টিকিট'। স্পেনের স্যান সেবাস্টিয়ান ফেস্টিভালে প্রদর্শিত হবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে শক্তি সামন্তের হিন্দী ছবি 'ইনসান জাগ উঠা'। স্যান ফ্রান্সিসকো ফেস্টিভালের জন্যে 'দীপ জ্বেলে যাই' ছবিটির নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

* * *

দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ষড়ঙ্গ' রবীন্দ্র-চিত্র সংরক্ষণ-কল্পে একটি অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য আগামী ২৩শে আগস্ট সকাল ১০-৩০ মিঃ-এ রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করবেন। এই নৃত্যনাট্যের সুরারোপ ও নৃত্যপরিচালনায় যথাক্রমে থাকবেন দেবব্রত বিশ্বাস ও অনাদিপ্রসাদ। আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিচ্ছেন তাপস সেন। ষড়ঙ্গ' ও শহরের আরও কয়েকটি সুখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা এই মঞ্চানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর" মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একটি রৌপ্য পদক লাভ করেছে ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁর অনুপম সুর-সৃষ্টির জন্যে।

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

চিঠিপত্র

হিন্দী ছবির প্রসঙ্গে

মহাশয়, গত ১৯শে আষাঢ় সংখ্যা "দেশে"র রঙ্গজগৎ বিভাগে "সিনেমা ও সমাজ" শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে কিছুটা আশান্বিত হওয়া গেল। শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার দুর্বার সমালোচনা যে হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের মন নামক বস্তুটিতে আঘাত করতে পারে নি তা বলাই বাহুল্য। তা নইলে কি তাঁরা একের পর এক পাল্লা দিয়ে অভব্য এবং রুচি-বিগর্হিত ছবি তৈরি বন্ধ করতেন না? তাঁরা শিল্পকে যে ব্যবসায়ের যূপকাষ্ঠে বলি

এম এম মুভিজের 'এ জহর সে জহর নয়' চিত্রের একটি দৃশ্যে রবীন মজুমদার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন সে তো আজ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এক শ্রেণীর দর্শকদের মনে সুড়সুড়ি দেবার লোভে তাঁরা নায়ক-নায়িকাদের যে ধরনের পোশাকে সজ্জিত করেন, পোস্টারে পোস্টারে সে সব ছবি যখন চোখে পড়ে—তখন সত্যিই মনে ধিক্কার জাগে। এ বিষয়ে আমাদের তথাকথিত নায়ক-নায়িকারাও (সকলে নয়) যে সাহায্য করেন তাতে স্বতই মনে হয়, তাঁরা শিল্পী নাম নিয়ে যা করে চলেছেন তা কি বাস্তবিকই দেহের বেসাতি নয়? ইতি—

অসিতাভ ঘোষ,
ডিব্রুগড়, আসাম।

একটি প্রস্তাব

আচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির মৃত্যুতে বাংলার এক গৌরবময় অধ্যায় শেষ হল। তেজস্বী পুরুষ শিশিরকুমারের শেষ জীবন মোটেই নিরঙ্কুশ ছিল না, তবু নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখেছিলেন। বাংলার নাট্য আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে আশাবাদী শিশিরকুমার নিশ্চিত ছিলেন এবং তাঁর সব থেকে বড় কামনা ছিল জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা যার অভাব বর্তমান নাট্য আন্দোলনের দিক থেকে প্রতিনিয়ত অনুভূত হচ্ছে।

বহুদিন থেকে, বহুভাবে এবং বহু স্থানে তিনি এমত বারে বারে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বহু সমস্যা পীড়িত জনসাধারণ ও নিস্পৃহ সরকারের কাছে তাঁর সে প্রস্তাব সাড়া জাগাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় শিশির-কুমারের পদ্মভূষণ উপাধি ত্যাগে যে দেশ-ব্যাপী আন্দোলন উঠেছিল, তাতে সরকারী জড়তা সম্ভবত কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের ১৪টি রাজ্যের রাজধানীতে রবীন্দ্র শত-বার্ষিকীর পূর্বেই একটি করে জাতীয় নাট্যমঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে—এই সুসিদ্ধান্তের খবর কদিন আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মিলিত খরচেই হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাব, অন্তত কলিকাতায় যে জাতীয় নাট্যমঞ্চটি প্র... কল্পনাটি হয়েছে, তা যেন নট ও প্রযোজক, যুগস্রষ্টা ভাদুড়ির নামাঙ্কিত হয়। ... তাহলে অন্তত তাঁর জীবিত ... প্রতি জাতির যে ঔদাসীন্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিছুটা অন্তত সংশোধিত হবে। ইতি, নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের পক্ষে রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু, সম্পাদক।